জীবনানন্দ দাশ

উপন্যাস সমগ্র

জীবনানন্দ দাশ

উপন্যাস সমগ্র

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) আজো প্রধান আধুনিক কবি হিসেবে পরিচিত। তিনি বাংলাভাষার অন্যতম পাঠকপ্রিয় কবি। তাঁর আধুনিক কাব্যভাষা আজো আধুনিকতম। তাঁর কবিতার প্রতি পাঠকের এমন নিবিড় সম্পর্ক যে তাঁকে কবি ছাড়া অন্যকিছু ভাবনায় আনা সম্ভব ছিল না।

একজন কবি যে বলিষ্ঠ গদ্যলেখকও হতে পারেন তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন জীবনানন্দ। এখনো তিনি সম্পূর্ণরূপে অনাবিষ্কৃত গদ্যলেখক। তাঁর গল্প উপন্যাস অনেককাল পরে একে একে প্রকাশিত হচ্ছে।

জীবনানন্দ যখন সশরীরে জীবিত ছিলেন তখন তাঁর গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি বললেই চলে। তিনি আমৃত্যু তাঁর গদ্য লেখা সম্ভবত লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি কি ভেবেছিলেন তাঁর গদ্য প্রকাশযোগ্য নয়, নাকি তাঁর গদ্যে এমনকিছু বাস্তববোধ ব্যক্তিগত জীবন ছিল যা তিনি প্রকাশে অপারগ ছিলেন। এ-সব এখন দীর্ঘ গবেষণার বিষয়।

জীবনানন্দ দাশের গদ্য কবিতা থেকে অনেক দূরের নয়, কবিতার অন্তর্নির্যাস তাঁর গদ্যেও বর্তমান। ব্যক্তিক প্রেম-উপলব্ধি, লৌকিক সমাজচেতনা, এবং সর্বোপরি প্রকৃতিআশ্রয় তিনি গদ্যেও নিয়েছেন। মানবের শুভ ও সুন্দরের সৌরচেতনা তাঁর কবিতাতেও যেমন ছিল। যেমন আছে তাঁর প্রেম কবিতায় :

ইতিহাসের অন্ধকারে প্রথম শিশু মানুষ জাগিয়ে
চলছে আজো একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে;
হয়তো মানুষ নিজেই স্বাধীন অথবা তার
দায়ভাগিনী তুমি;
ওরা আসে, লীন হয়ে যায়; হে মহাপৃথিবী
সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম-চেতনার ভূমি।

১৯৪৬ সালে একটি চিঠিতে জীবনানন্দ তাঁর অন্তরের গভীরের একটা খবর দিয়েছেন, ছেলেবেলা থেকেই স্বদেশী-বিদেশী গল্প উপন্যাস তিনি নেহাৎ কম পড়েননি এবং তাঁর 'ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি।' এ ইচ্ছার নেপথ্যের কথা নেপথ্যেই ছিল তখন, আরো বহু কাল গোপন ছিল।

১৯৫০ সালে 'আজকের বাংলা উপন্যাস' নিয়ে জীবনানন্দ প্রবন্ধ লিখেছেন, অর্থকষ্ট কাটাতে স্বয়ং ছদ্মনামে উপন্যাস লেখার প্রস্তাব করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে, শোনা যায় 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদককেও, অজিত দত্তের নবপ্রতিষ্ঠিত দিগন্ত পাবলিশার্সের আনুকূল্য চেয়েছেন পূর্ণাকার উপন্যাস ছাপাতে—কোনো এক জায়গাতে ইচ্ছেটা পূরণ হলেও হয়তো তখনই অবরোধ ভেঙে ভরা নদী বয়ে উঠত কথা সরিতের, না-হওয়ার ফলে কবিতাতেই যে শতাংশ অনন্যমনা হয়ে থাকলেন তাও বলা যায় না। সে-সময়ে তাঁর আরো একাধিক উপন্যাস সম্বন্ধে খসড়া লেখা পড়ে আজ দেখতে পাওয়া যায় সাহিত্যের উপকরণ-বিনিয়োগ, তার অন্তর্গত বয়ন-বিন্যাস নিয়ে তাঁর রীতিমতো মতামত এবং আদর্শেরও কথা—এতোটাই ঘনিষ্ঠতভাবে বলা যে কেবল প্রতিবেদন নয়, সক্রিয় লেখকের কথা বলে মনে হয়। আর এই সূত্রে ১৯৩৮ সালে বরিশাল সাহিত্যপরিষদে শরৎচন্দ্রের শোকসভায় পড়া লেখাটিকেও পাঠকের শোকাঞ্জলি বলে দূরে রাখা যায় না। বিশেষত অক্টোবর ১৯৩১ থেকে মে ১৯৩৩-এর এবং ১৯৩৬-এর সারা বছর ধরে খাতায় খাতায় তোলা তাঁর বহুতর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির বাইরেও ব্যক্তিগত সংগ্রহের আরো আরো খণ্ডিত বিস্তৃততর গল্প-কাহিনীর তথ্য ক্রমাগত পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। এবং কিছু কিছু প্রকাশিতও হয়েছিল।

জীবনানন্দ দাশ ১৯৩৮ সালে তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'ভারতী'-গোষ্ঠীর প্রবল বিদেশীয়ানার হাওয়ায় [illegible] বঙ্কিম, রবীন্দ্র[illegible] শরৎচ

সূচীপত্রে যান

সন্তান হিসেবে, মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর নয়, বাংলার হেয় অবজ্ঞেয় নরনারী তাঁর কবিদৃষ্টি ও মমত্বের ভিতর নতুন জন্ম নিয়ে দীপ্তিমান হয়ে উঠল depth of intimacyর সূত্রে—যতখানি 'প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠত' বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মধ্যেও আমরা পাই না, এবং ডিকেন্স বা বালকাজের ইতিহাস-সূত্র যেন এখানে শরৎচন্দ্র—তার প্রভাব বা প্রভাব-এড়ানোর চেষ্টা তাঁর ত্রিশ-পর্বের জিন কথা সাহিত্যে কতদূর মিলবে বলা কঠিন। 'আজকের বাংলা উপন্যাস' লেখায় অবক্ষয়িত সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং অস্থিরতা-অনিরাপত্তার বিশ্বব্যাপী পটভূমিতে স্থাপন ক'রে তিনি বিচার করেছেন সতীর্থ সমকালীনদের—বিশেষ তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের স্বর্ণপ্রসূ রচনার পরে কারও লেখাতেই তেমন নতুন বিকাশ তিনি দেখতে পাননি। চেষ্টা আছে কিন্তু প্রাপ্তি নেই, আজকের অভিজ্ঞতার প্রসার, নতুন থীম-স্টাইল ম্যানারের লেখা নেই। উপরকণব্যাপ্তি শিল্পবস্তুতে রূপান্তর করার দক্ষতা নেই তারাশঙ্করের, উচ্চ কল্পনাশক্তি সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ সেন্টিমেন্টাল এবং আত্মনুবর্তনময়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যে চলেন, ডেকাডেন্ট রীতিকুশলীর আত্যন্তিক মনস্তত্ত্বপ্রীতিও গণ্ডি ভেঙে বাড়তে পারেনি তেমন এবং 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ভালো গল্প কিন্তু তার বেশি নয়, দ্বিতীয় পাঠেই তার ধার মরে যায়। অপিচ, জীবনানন্দ লক্ষ করেছেন ফলদ রূপে ভাঙবার মতো কোনো প্রুস্ত্ বা জয়েসের জন্ম হয়নি বাংলায়। প্রুস্ত্ বা জয়েসের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত টান কতদূর বলা যায় না (লরেন্স, ফর্স্টর, সার্ত্রকেও তিনি অবধানযোগ্য আধুনিক বলে গণনা করতেন), হেনরি জেম্‌স্ বা রবীন্দ্রনাথ বা টমাস মানের ধ্রুপদী ধরনটির উপরে নিশ্চয় ছিল।

জীবনানন্দের প্রিয় ছিল টমাস মানের উপন্যাস। ১৯৪৯ সালে 'ডক্টর ফস্টাসে'র আলোচনা-সূত্রে জীবনানন্দ লিখেছেন, 'প্রায় কুড়ি রছর আগে 'বুরেনব্রুকস্' প'ড়ে মানের ওপর আমার শ্রদ্ধা জন্মাল, পরে "আর্লি সরোজ", কয়েকটি ছোটো গল্প ও "ম্যাজিক মাউন্টেন" পড়াবার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারলাম এ-ধরনের একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক—হায়, আজকের আমেরিকা ও ইউরোপে কত কম, জার্মানীতে তো নেইই—ঔপন্যাসিককের ওপর শ্রদ্ধা—আমার অন্ততঃ—কিছুতেই আর ঘোচবার নয়। "জোসেফ এ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স" ও "ডক্টর ফস্টাস" পুরোনো ইহুদীস্থান মিশর ও মধ্যযুগের জার্মান জীবনের প্রতীকীয়তার আড়ালে আজকের ক্লান্ত নষ্ট সভ্যতার ও সময়ের নিহিত ও অতীত চেতনা সমাহিতি মুমুক্ষার উপন্যাস সব; এ যুগ কি এর চেয়ে বড়ো উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে? মানের এই বহুগুলোর সমগভীর সমবিস্তীর্ণ পটের উপন্যাস কোথায়?'

জীবনানন্দ টমাস মানের তুলনা পশ্চিমেও দেখতে পাননি এবং ১৯২৮ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে অনূদিত মানের উপন্যাসগুলি যেন ধারাবাহিকভাবেই লক্ষ্যস্থলে রেখেছেন, হয়তো আরো সকারণে। রিল্‌কে অথবা গট্‌ফ্রিড বেনের কবিতা সম্বন্ধে অপরিচয়ের কৈফিয়ত দিয়ে মানের উপন্যাসমালার এমন সোচ্চার উল্লেখ বা বর্ণনার এক কারণ হতে পারে 'ডেথ ইন ভেনিস' বা 'ট্রিস্‌টানে'র শুদ্ধ লেখকের পর্যায়ক্রম সামাজিক-রাজনীতিক সঞ্চার সম্বন্ধে ব্যক্ত অনুমোদন তাঁকেও একটা বিশ্বাসের সূত্র যুগিয়েছে। উত্তর দিনে সামাজিক-রাজনৈতিক এলাকাকে লেখার ক্ষেত্রে টমাস মান অন্তর্গত সত্তা বা চিৎবিশ্বের তুলনায় উপেক্ষণীয় বা নিম্নস্থানীয় গণ্য করেন নি। 'ডক্টর ফস্টাসে'র আলোচনাতেও জীবনানন্দ বলেছেন, 'টমাস মান... চারদিককার সূচনা সমাপ্তি কারণ ও হেতুর...যথার্থ্যকে ধরতে চেয়েছেন', সে শোকাবহ বা ভয়াবহ যাই হোক। আন্তর্জাতিক বিশ্বের আশ্চর্য চলৎপ্রতিভাময়ী পটভূমি' কিংবা 'রাষ্ট্রকর্মের বৃত্তান্তে আবেগ ও মনননভূমির' সন্ধান জীবনানন্দের উত্তরপর্বের কবিতায় যেভাবে ক্ষুভিত ছায়াপাত করেছে, শুদ্ধ কবিতা স্থলে সমাজচেতন কবিতা নিয়ে যেভাবে তাঁর সংবেদনা দেখতে পাই তাতে তাঁরও এই চিত্তলক্ষণ ফুটে ওঠে।

আজ এক বড়ো বিস্ময়ের ব্যাপার, সবচেয়ে বড়ো জিজ্ঞাসা জীবনানন্দ কখন কীভাবে লিখলেন তাঁর গভীরবোধের গল্প উপন্যাস? অমলেন্দু বসু তাঁর প্রথম ছাপা উপন্যাসখানির ভূমিকা লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, শেষ পর্যায়ের কবিতায় কবি 'ধূসর স্বপ্নের দেশ ছেড়ে চলেছিলেন দিনের উজ্জ্বল পথে, আর সেই পথে চলতে গিয়ে আপন আবেগ জড়ানো নিভৃত চিত্তের বাইরে যে অগণিত নর-নারীর বাত্যাহত

সূচীপত্রে যান

ব্যক্তিত্ব; গণিকা দালাল রেস্ত শক্রুর যে সনির্বন্ধতা... হয়তো হয়তো তিনি অনুভব করেছিলেন যে সেই বস্তুনিষ্ট সময়চেতন বহির্জগতের অন্তত আংশিক প্রকাশ কথাসাহিত্যে সম্ভব এবং সেজন্যই তাঁর অভিজ্ঞতা ও চেতনা থেকে উৎসারিত নরনারীর কাহিনী রচনায় হাত দিয়েছিলেন।' পাণ্ডুলিপির তথ্যোদ্ঘাটনের পরে দেখা গেছে শেষপর্যায়ে নয়, বস্তুত প্রথমাবধিই স্বপ্ন আর বাস্তবের বৈপরীত্যের মাঝখানে কবির বাস, 'বনলতা সেন'—'মহাপৃথিবী'র শীর্ষ কবিতা-পর্বেই কথাসাহিত্যের ধূলিলিপ্ত দিনযাত্রা তিনি স্বেচ্ছায় আগ্রহ করে নিয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশের একটি গল্পের ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, 'তিরিশের দশকের যে-সময়ে 'ছায়ানট' গল্পটি লেখা, 'রচনায় সে কালের ছাপটুকু থাকলেই যথেষ্ট হত, কিন্তু—সেই বলিষ্ঠ অন্বেষণের যুগের বিচারেও বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে গল্পটি অভিনব ও দুঃসাহিক।'

জীবনানন্দের তিনটি গল্প প্রকাশের পর প্রকাশিত হয় 'মাল্যবান' উপন্যাস (১৩৮০)। উপন্যাসের ভূমিকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে—'নতুন যুগের ভাব ও চিন্তা প্রতিভা' ব্যক্ত করার উপায় স্বরূপে খণ্ড কবিতার সিদ্ধি ছেড়ে কবি অবশেষে পা বাড়িয়েছেন নতুন রাস্তায়, তার পরেই তাঁর এই প্রশ্ন ও নিরসন : 'কিন্তু নতুন পথে অগ্রসর যদি হলেনই, আরো অগ্রসর কেন হলেন না, কেনই বা এ সব রচনা নিজেই প্রকাশ করেননি? অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁকে দেয়নি কালান্তক।'

মাল্যবান উপন্যাসটি প্রকাশের পরেও কেউ তেমন উদ্দীপ্ত হননি, অতএব বোঝা যায় নিজকালেও তিনি অগ্রসর হননি হতে পারেননি বলে, প্রতিষ্ঠিত লেখক-ব্যূহ ভেদ করে তা হওয়া সহজ হয়নি বলে। অন্তত কয়েকটি চেষ্টার সূত্র গোড়াতেই আমরা বলে নিয়েছি। অমলেন্দু বসু অতএব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'জীবনানন্দের এই উপন্যাসটিকে শেষ পর্যন্ত আমরা... তাঁর কাব্যশিল্পের সূত্রে অন্বিত করতে চাইব' এবং তার ফলে 'তাঁর কবিসত্তার অসংখ্য অভ্যন্তরীণ আভাস পাব' এখানে—শব্দ প্রয়োগে, বাক্‌বিধিতে, বর্ণনায়, সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, যদিও উপন্যাস হিসেবেও 'মাল্যবান' সুপ্রতিষ্ঠিত।

জীবনানন্দ তাঁর 'মাল্যাবান' উপন্যাসে যে জীবনবোধের ঘনিষ্ঠতা তুলে ধরেছেন তা বোধকরি সে-সময়ের সমালোচকের চোখে খটকা বাধিয়েছিল, তীব্র সত্য উপলব্ধি অনেকের পক্ষেই মেনে নেয়া সহজ ছিল না। জীবনচক্রের সীমিত পরিসরে চরিত্রায়ণ, কথোপকথন ও কাহিনীর গতিতে তার শিল্পশক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমকালীন কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে তার পাঠও কেউ রচনা করেননি। কিন্তু ১৩৮২ সালেই 'দেশ' ছাপতে শুরু করে 'মাল্যবানে'র আগে লেখা জীবনানন্দের প্রথম উপন্যাস 'সুতীর্থ'। ১৮ পৌষ ১৩৮২ সংখ্যায় তার সম্পাদকীয় অবতরণিকায় বর্ণিত আছে : 'কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ বলেছেন : "জীবনানন্দ দাশের প্রথম উপন্যাস "সুতীর্থ" ১৯৪৮-এর মে-জুন-এ লেখা, প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৭৬-এ, আরো বলেছেন, 'সুতীর্থ' উপন্যাসটি তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে এবং 'মাল্যবান' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অমলেন্দু বসুকে পড়তে দিয়েছিলেন, তাঁরা দুজনেই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন।' 'মাল্যবানে'র প্রচ্ছদ আঁকার সূত্রে তার প্রুফ প'ড়ে সত্যজিৎ রায়ও জীবনানন্দের সমস্ত অপ্রকাশিত উপন্যাস প্রকাশের জন্য বারবার আমাকে অনুরোধ করেন।' সম্পাদকীয় বিবরণে 'দেশ' লেখেন : 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে, দেশ বিভাগের পর জীবনানন্দ যেন অকস্মাৎ পরপর দুটি উপন্যাস রচনা করেন। প্রথম রচনাটি মে-জুন মাসে ১৯৪৮ সালেই লেখা হয়, নাম 'সুতির্থ'। দ্বিতীয়টিও জুন মাসে ওই একই সালে। দ্বিতীয়টির নাম 'মাল্যবান'। এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। বলাবাহুল্য, কবির প্রথম উপন্যাস 'সুতীর্থ' এতকাল আমাদের অগোচরে ছিল। সম্প্রতি তা 'দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে।' 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর গ্রন্থাগারে 'সুতীর্থ' প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৮৪ সালে।

জীবনানন্দ দাশের তৃতীয় উপন্যাস 'জলপাইহাটি' যখন প্রকাশিত হল 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় ১৩৮৮-৮৯ সালে; জানা গেল, 'সুতীর্থের'ও আগের লেখা এটা, এর রচনা ১৯৪৮-এর এপ্রিলে-মে।

জীবনানন্দ দেশভাগের সময় কলকাতার ১৮৩ ল্যান্ডসাউন রোডের বাসাবাড়িতে উঠে এসে পরপর অন্তত চারটি উপন্যাস লিখেছেন ১৯৪৮ সালে। 'বাসমতীর উপাখ্যান' উপন্যাসের নাম লেখকের নিজের

সূচীপত্রে যান

দেয়া, 'প্রথম খাতাতেই সে-নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা। 'মাল্যবান'ও তার জীবনানন্দের দেয়া নাম। 'জলপাইহাটি' 'নামকরণ জীবনানন্দের নয়, তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশ পত্রিকায় প্রকাশের সময় এই নাম দিয়েছিলেন।

দেশ ছেড়ে এসে ১৯৪৮-এর একটা অব্যবস্থিত জীবনপর্বে এক দমে লেখা চারটি উপন্যাসের শ্রমাক্ত বিপুলায়তনে নতুন মুক্তির সন্ধান করছেন জীবনানন্দ, পঞ্চাশ ছোঁয়নি যখনও বয়স এবং কবিতায় শুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হটিয়ে চারিদিকে ঘন হয়ে উঠেছে সৎসামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চাপ। অতঃপর ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধেই জীবনানন্দ উচ্চকিত করে তুলেছেন এই নিয়ে তাঁর গভীর মানস-দ্বন্দ্ব কিন্তু তার চেহারা অনেকটা বিতর্কিকার মতো। উপন্যাস লেখার ইচ্ছা শেষপর্যন্ত হয়তো তাঁর অবশিষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ।

জীবনানন্দের এগারোটি উপন্যাস রচনার ক্রমানুক্রমসারে সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। বড়ো গল্প আখ্যাত দুটি লেখাও অন্তর্গত হল এখানেই। গবেষকদের বিচারে মোট তেরোটি লেখার রচনাকাল এরকম—

পূর্ণিমা; নভেম্বর ১৯৩১। কল্যাণী; জুলাই ১৯৩২
বিভা; ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩। মৃণাল; ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩
নিরুপম যাত্রা; মার্চ ১৯৩৩। কারুবাসনা; আগস্ট ১৯৩৩
জীবন প্রণালী; মার্চ ১৯৩৩। বিরাজ; আগস্ট ১৯৩৩
প্রেতিনীর রূপকথা; আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৩৩
জলপাইহাটি; এপ্রিল—মে ১৯৪৮। সুতীর্থ; মে-জুন ১৯৪৮
মাল্যবান; জুন ১৯৪৮। বাসমতির উপাখ্যান; ১৯৪৮

একজন গদ্যলেখক জীবনানন্দ একটু নিরালা পরিবেশের জন্য, লেখার উপযুক্ত পরিবেশের জন্য হাহাকার করেছেন। তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করতেন লেখার জন্য নিবিড় কোনো স্থান পাচ্ছেন না। বোঝা যায় তাঁর বাড়িতে লেখার পরিবেশ ছিল না, কিন্তু মনে মনে তিনি অনেকগুলোর লেখার পরিকল্পনা এঁটেছিলেন, এ-কথা তাঁর কাছের মানুষের কাছে বহুবার বলেছেন। এ আজ কেবল আক্ষেপের বিষয়। অনেক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তবু তিনি যে-কটি উপন্যাস লিখেছেন তা বাংলাসাহিত্যের অনন্য সম্পদ। পাঠকের হাতে সুলভে জীবনানন্দের উপন্যাসগুলো একত্রে তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত।

সূচীপত্রে যান

পূর্ণিমা

সন্তোষের অবিবাহিতা বড় শালী চপলা [চামেলি] বিধবা আশ্রমের ইস্কুলের কাজ ছাড়বার পর থেকে সন্তোষ এ মেয়েমানুষটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এই মেয়ে কটির বাপ নেই, মা নেই—একটি বুড়ো মামা টিকির-টিকির কবছেন বটে—কিন্তু কত দিন আর এ-রকম চলতে পারে ভাবতে গেলে সুস্থির ভাবে জীবনটাকে অনুভব করতে পারা যায় না।

অন্য কোনো এক রকম ব্যবস্থা হলেই ভাল হত; অন্তত এই বিধবা আশ্রমের চাকবিটিও যদি থাকত।

চাকরিটি চপলা নিজের ইচ্ছাযই খুইযেছে। সন্তোষ ভাবছে, জীবনেব যে-অবস্থা তাদেব তাতে মান-অপমানবোধ ওর একটু কম হলেই ভাল হত। নিজে সন্তোষও চাকরি খুঁজছে।

টাকাকড়িব অভাবে কমানা-আকাঙ্ক্ষা তো ঢের দূবে—মানুষের জীবনেব সাধারণ ধর্মটারই এত অপব্যবহার চলেছে!

চামেলিকে সে আজ আশ্রয় দিতে পারছে না, তার অন্য ভাইবোনদেরও না, বুড়ো মামাশ্বশুর মানুষটিরও কোনো কাজেই আজ সে লাগল না—কে জানে এদের সকলের কাজে কবেই-বা সে লাগতে পারবে? শেষ পর্যন্ত ঘুরেফিবে সন্তোষকেই এরা একমাত্র নির্ভরের জিনিশ বলে বুঝে নিতে চাচ্ছে কিন্তু তবুও নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা ভেবে সন্তোষ কিছু বুঝে দেখতে চাচ্ছে না—মান-অপমান বোধ নিযে এবা সবেই থাকছে।

সেই ভাল!

একটু অপেক্ষা করা যাক। এমন একটা দিন আসবে না কি যখন আশা-বাসনাব অত্যুচ্চতাব স্বাদ না মেটালেও জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্বগুলোকে সে মিটিযে দিতে পাববে? কেন আসবে না? নিশ্চযই সেই সফলতা তাব জন্য প্রতীক্ষা করছে। ভবিষ্যতের এমন একটা দিন যখন চামেলি দিদিদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দাবিদাওযা সে মিটিযে দিতে পারবে—হয তো ওদেব বিযেব ব্যবস্থাও সে করে দিতে পারবে—কিংবা চাকবির ব্যবস্থা কিংবা জীবনের আবশ্যকমত সাদাসিধে সাধারণ সচ্ছলতার বন্দোবস্ত সব—

সন্তোষের জীবনের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি এতেই।

মানুষের জীবনের সাধারণ কর্তব্যগুলোই আজ তার ধর্ম।

নিজের কোনো মতামত, স্বাধীনতা বা আকাঙ্ক্ষার জন্য কোনো ভালবাসা নেই আজ তার, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো উন্নতি বা যশ আজ আর চায না সে। এক দিন সন্তোষ এমনই ভাবত বটে যে নিজের ঐশ্বর্য বাড়াতে গিয়ে কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ করবে না সে আর, কোনো প্রবঞ্চিতের কথাই ভাবতে যাবে না। বরং মানুষকে সজ্ঞানে প্রবঞ্চনা করে চলবে সে, নিপীড়ন করে, নির্যাতন করে, চারদিককার মানুষের জীবনগুলোকে ব্যথায়, ক্ষুধায়, হয তো মৃত্যুতেও, ভরে দিয়ে নিজের সমৃদ্ধি ও সম্মান সঞ্চয় করে চলবে সে।

সঞ্চয় করতে পারা যেত কি না বিধাতা জানেন—কিন্তু সে রকম নির্মম অক্লান্ত চেষ্টার পথ ধরতে গিযে সন্তোষের জীবনে কোনো বাধা ছিল না। নিজের উপলব্ধি আজ তার সে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।'

অসাধারণ পথের অসম সাহস ও রক্তাক্ততা দিয়ে কোনো দরকার নেই তার। সাধারণ সামান্য জীবনের দায়িত্বগুলোকে সন্তুষ্ট করে এই শান্ত মধুরতার পথেই চলুক সে।

পৃথিবীর আদর-অভ্যর্থনার কোলাহলময় দারুণ রুদ্র জীবন না হয় একেবারেই চাপা পড়ে রইল।

তা হোক। সামান্য মানুষের কর্তব্যগুলোকে পালন করে, সহজ দাবিদাওয়াগুলোর ভিতব দিযে

সূচীপত্রে যান

জীবনটাকে নিভৃতভাবে চালিয়ে, জীবনে স্নিগ্ধতা চাচ্ছে সন্তোষ।'

এরই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে সে।

সন্তোষের স্ত্রী পূর্ণিমাও স্বামীকে ভরসা দিচ্ছে—চাকরি-বাকরি টাকাকড়ি সচ্ছলতা শিগগিরই হবে তাদের। তার পর দিদিকে, ছোট বোন টুকুকে, আর মামাকে পূর্ণিমা নিজের কাছে এনে রাখবে।

ভবিষ্যতের এই ব্যবস্থার কথা ভেবে পরিতৃপ্তি পাচ্ছে পূর্ণিমা। পূর্ণিমার কাছে এটা দায়িত্বপালনের তৃপ্তি নয় শুধু, আরো ঢের সরসতা আছে এর ভিতর। পূর্ণিমা যেমন, তার বোন কটিও দেখতে খুবই সুন্দর।

সন্তোষও নিজে জানে শালী কটিকে নিজেদের আশ্রয়ে এনে শুকনো কঠিন কর্তব্যপালন করাই হল না শুধুঃ এর ভিতর ঢের সফলতা ও কোমলতাও আছে—বেশ একটা নীড় তৈরি হবে, যেন পৃথিবীর কয়েকটি নিরুপম নিবিড় পাখিদের নিয়ে।

পূর্ণিমাও যেমন—তার বোন কটিও দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু তবুও এর ভিতব কোনো অবান্তর ক্ষুধা, পিপাসা, কামনার কথা নেই—কিন্তু সহজ সরসতা সেদিন প্রতি খুঁটিনাটিতেই কত যে ফুটে উঠবে জানে না কি সে? সন্তোষ সবই জানত।

পূর্ণিমাও যেমন—তার বোন কটিও দেখতে খুবই সুন্দর।

বিধবা আশ্রমের কাজটি, চামেলিদি, এদের সকলেরই জীবনের বর্তমান এই দুরবস্থার সময বাখলেই পারত। তবু যে কয়েকটি টাকা পাচ্ছিল তাতে ওদের তো চলে যেত। সন্তোষরাও নিজেদেব টেনে-হিঁচড়ে চালাচ্ছিল এক রকমে। কিন্তু এখন কী হবে, না হবে, ভাবতে পাবছিল না সন্তোষ। সকলকে নিয়ে একটা সুব্যবস্থার ভিতর থাকতে হলে যে সুস্থির চেষ্টাব প্রযোজন, জীবনেব সেই স্থির ধীবতা এমন অন্যায্য রকমে ও আকস্মিকভাবে আঘাত খেযে বসেছে যে ওদের এখন নানা রকম বিপাকই সম্ভব—বিশেষত ওদের রূপ চারদিকে যে-রকম লোলুপতা জাগিযে চলে এবং নিজেদের দু জনের তখন দুশ্চিন্তার আর শেষ থাকবে না।

সন্তোষেব দুশ্চিন্তার গভীরতা অনেক দূব পর্যন্ত পৌঁছুবে।

সন্তোষ খববের কাগজের বিশেষ কলমগুলো দেখে যাচ্ছিল।

পূর্ণিমা বললে, 'চিঠি আছে।'

—'কার?'

—'মামার।'

চিঠি পড়তে-পড়তে পূর্ণিমা হঠাৎ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, 'সুখবর আছে।'

কাগজের ওপর থেকে উঁকি মেরে সন্তোষ বললে, 'কী বকম?'

—'ভেবে দেখো তো কী।'

পূর্ণিমার সুখবরেব জন্য তেমন কিছু কৌতূহল না থাকলেও সন্তোষ একটু বুঝি আগ্রহ দেখাতে চেষ্টা করছে—বেচারি আঘাত পাবে না-হলে।

পূর্ণিমা বললে—'কই, বলতে তো পারলে না।'

সন্তোষ কাগজেব এক শিট তুলে নিয়ে বললে, 'দাঁড়াও না, আগে বলো সুখবর কার, আমাদের না অন্য কারো?'

—'ধেত্তরি তাব! পূর্ণিমা ভ্রুকুটি কবে হেসে উঠে বললে, 'তোমাব মুণ্ডু, দিদিব বিয়ে হচ্ছে।'

—'বিয়ে? চামেলিদির?'

—'বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি?'

সন্তোষ প্রথম ধাক্কাটা একটু সামলে নিযে বললে—'সুন্দরী মানুষদের বিয়ে না-হওয়াটাই তো রহস্যের জিনিশ।'

একটু থেমে বললে—'আমি এত দিন ভাবছিলাম যে দিদি হয় তো সঙ্কল্পই করেছেন যে বিয়ে করবেন না; নইলে অমন রূপসীর জন্য পাত্রের অভাব ছিল?'

পূর্ণিমা শুরু করলে, 'রূপসী কিছু টুকু নয়? আমি নই? লোকে বলে দিদিবই বরং আমাদেব চেযে রূপ কম।'

—'কথাটা সত্যি বটে।'

পূর্ণিমা বললে, 'কিন্তু আমবা গবিব বলে—'

সূচীপত্রে যান

সন্তোষ বললে, 'তা ঠিক; তোমার মত সুন্দরী যদি বড় লোকের ঘরে হত, তা হলে বিয়ে তো বিয়ে—তোমাকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবার অধিকারও হয় তো আমার থাকত না।'

হাসছিল সন্তোষ।

পূর্ণিমা হয় তো একটু আঘাত পেয়ে নিজের জীবনের অন্য রকম একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছিল। তা সে ভাবতে পারে। এত রূপলাবণ্য, সুস্থতা, সামর্থ্য নিয়ে কী পুরস্কার পেল সে? দিনের পর দিন একটু সামান্য সচ্ছলতার তৃপ্তির জন্যও কত যে দুর্ভাবনা ভুগতে হয় তাকে! এমন অপরূপ সম্পন্নতা তার যদি এই দামেই বিকোয় পৃথিবীতে বিচার কোথায় তা হলে?

এই সব সন্দেহ ব্যথায় পূর্ণিমা এখন কষ্ট পাচ্ছে কী না জানে না সন্তোষ—'কিন্তু মাঝে-মাঝে এখন নানা কথা ভেবে খুবই ব্যথা পায় মেয়েটি; কেনই-বা পাবে না? ওব ব্যথার গভীরতার অনুপাতে ওর জীবনের পরম তৎপরপ্রিয়তা ধরা পড়ে। সন্তোষের প্রশ্নগুলোব জন্য বিষম উত্তর সব তৈরি রয়েছে যেন মেয়েটির হৃদয়ে; সন্তোষেব দারুণ উত্তরের জন্য মর্মান্তিক প্রত্যুত্তর সব। তবুও তারপর উপশম রয়েছে; মুছে দিতে আসে কিন্তু সেটা কতদূর অন্তবের বুঝতে পারা যায় না সব সময়।

যাক—পূর্ণিমা একটা সফল সমাধান মোটেই নয়।

শেষ পর্যন্ত সন্তোষেব জীবনের আশ্রয় কোথায় গিয়েছে-জানে না সে।

—'পুরুষ মানুষ যদি হতাম চাকরির জন্য নর্থপোলে যেতে হলেও আমি সেটা ভাগ্যই মনে করতাম,' পূর্ণিমা বললে, 'দিদিব খুব বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে।'

সন্তোষ খবরের কাগজের শিটে একটা মৃদু ভাঁজ দিয়ে বললে—'কী কবে জামাই?'

—'বম্বেতে খুব বড় চাকরি করে।'

—'বম্বে!'

পূর্ণিমা বললে, 'বম্বে শুনে তুমি নাক সিঁটকালে কেন শুনি?'

সন্তোষ বললে, 'না তা নয়; ভাবছিলাম বম্বে—তেমন আব দূর কী—কিন্তু—' পূর্ণিমা বললে, 'বম্বেতে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে আছেন।'

সন্তোষ দু-এক মিনিট আবিষ্টের মত থেকে বললে, 'বাঙালি আজকাল অত বড় চাকবি পায়? আরো, বম্বেতে গিয়ে?'

পূর্ণিমা একটু শ্লেষেব সঙ্গে বললে—'শক্তি থাকলেই পায়।'

—'মামা লিখেছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আব কী লিখেছেন?'

—'কয়েক বছব ধবে ছেলেটি বম্বেতে আছেন।'

সন্তোষ একটু বিস্মিত হয়ে বললে—'ওর বয়েস কত?'

পূর্ণিমাও একটু বিদ্রূপেব সুরে বললে—'দিদির চেয়ে বড় নিশ্চয়ই—কিন্তু তোমার চেয়ে ছোট ঢের।'

সন্তোষ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'আমার চেয়ে ঢেব ছোট আব কী কবে হয—বম্বেতে তো কয়েক বছর ধবেই আছেন—ইণ্ডিযান মেডিকেল সার্ভিসে নতুন লোক শিগগির নেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।'

সন্তোষ একটু নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে বললে, 'হয় তো ছোটই হবে আমাব থেকে।' একটু পরে মাথা তুলে একটু মৃদু রহস্য করে সন্তোষ বললে, তিন বোনেব ভেতব সবচেয়ে রূপসী সতেজ মানুষটিই গেল এক বুড়ো অকর্মণ্যেব হাতে; জীবনেব বিচার, বিবেক, পুরস্কাবের এই রকম উপলব্ধি নিয়ে সৃষ্টিটা কোন দিকে যাবে? টিকবেও-বা কত দিন? টিকলেও এর সার্থকতাই-বা কী?'

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তব সন্তোষের নিজের কাছেই ছিল। পৃথিবীতে সে আনন্দ উৎসব সম্ভোগ করতে আসে নি, এসেছে সহ্য করতে, জীবনের তামাশাটা বুঝে নিতে। কিন্তু পূর্ণিমাকে সেই রকম গোপন, নিশ্চয জীবনের ভিতব জীবিত করে নেবার না আছে কোনো অধিকার সন্তোষের, না আছে কোনো সাহস; রুচি নেই—প্রয়োজন নেই।

পূর্ণিমা দু-এক মিনিট মাথা হেঁট কবে চুপ করে রইল।

আস্তে-আস্তে মুখ তুলে বললে—'রঙ্গ করতেই শিখে এসেছিলে শুধু—এই জন্যই তোমার কিছু হল না। পুরুষ মানুষেব যা কর্তব্য তা করতে পারো না? নিজেকে কেন এতটা হীন করে ফেলতে চাও?'

সূচীপত্রে যান

কিন্তু পূর্ণিমা নিজের বিবাহিত জীবনের সঙ্গে গভীর সংলগ্ন একটা দুঃখকে চাপবার জন্যই বড়-বড় সাহসের কথাগুলো পেড়ে যাচ্ছে শুধু। দুবৃত্ত জীবন—যা মেয়েমানুষকে, রূপকে, রসকে, আগ্রহ আন্তরিকতা যত্ন প্রয়াসকে, কুটোর চেয়েও নগণ্য মনে করে—সেই জীবনেরই একটি পরম কৃপার পাত্র হয়ে বেঁচে থেকেও পূর্ণিমা তাকেই চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে যাচ্ছে। প্রবল, দুর্দান্ত জীবন তামাশা বোধ করে, গোপনে হেসে চলেছে যে, পূর্ণিমা যদি কোনোদিন তা দেখত!

পূর্ণিমা একটু আশ্বস্ত হয়ে বললে—'বাপ-মা নেই আমাদের—আমরা অকূলে ভাসছিলাম। ভেবেই পেতাম না দিদিব কী হবে, ওর যে এমন সুন্দর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল এতে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে।'

পূর্ণিমা তার নিজেব ভাগ্যকে দিদির ভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে এতক্ষণ ব্যথা পেয়ে এ জিনিশটার উপশমের দিকটা খুঁজে বের করে তৃপ্তি পাচ্ছে। জীবনের অন্ধকারের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকবার মত সহ্যশক্তি, সহিষ্ণুতা বা তামাশাবোধ নেই পূর্ণিমার। এ উজ্জ্বল পথের যাত্রী—ওর দিদির চেয়েও ঢের বেশি করবে। কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ সমুদ্রের মত হতাশার অমাবস্যা যে ওর চারদিকে! ওর ভিতব থেকে ও কী দিয়ে যে কী করবে ভাবতে পাবছে না সন্তোষ।

পূর্ণিমা বললে, 'জামাইবাবুর জন্য টুকুরও, দেখো, একটা ভাল বিয়ে হবে! কী বলো?'

সন্তোষ কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

পূর্ণিমা বললে, 'আমার রবিনেরও পড়াশুনোর সুবিধে হবে; টুইশনি পাচ্ছিল না—দিদিও চাকবি ছেড়ে দিয়েছিল। টাকার জন্য ওর বি-এ পড়া হত না বোধ হয় আর। কিন্তু এখন,' পূর্ণিমা হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, 'এখন তো জামাইবাবুই ওকে পড়াতে পারবেন; অত বড় চাকরিওযালা, চাকরিও দিতে পারবেন—হয়তো বিলেত ঘুরিয়েই আনলে—কী বলো? অসম্ভব কি কিছু?'

সন্তোষ ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

—'এমন তো কত জায়গাযই হচ্ছে-হচ্ছে না?'

সন্তোষ বললে—'হচ্ছে বই কি।'

পূর্ণিমা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললে—'সুখেব মুখ এইবার দেখলাম আমরা। এতদিন আমবা ভাইবোন মিলে কষ্টই পেয়ে আসছিলাম।'

সন্তোষ পূর্ণিমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে—'তোমাঁবও সুখ। সুখ বই-কি; ওদেব সুখে তোমাবও সুখ।'

অনুভূতির এই সুখটুকু, এই ছাড়া ব্যক্তিগত কোনো সুখ-সম্পদ-আশ্রয় তাব দিদিব এ বিবাহেব থেকে পূর্ণিমা কি আব আহরণ করতে পাববে? আহরণের উচ্ছিষ্ট যদিও-বা কিছু থাকে টুকু-ববিনেব জন্য—সন্তোষকে গ্রহণ কবে পূর্ণিমার সে সব সুযোগ চলে গিয়েছে।

'কিন্তু পরেব সুখেও—তেমন ভাবে গ্রহণ করে নিলে—সুখী হতে পারা যায়। আব এরা তো তোমার ভাইবোন, পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমা বললে—'আমারও এত দিন পর একটা নিস্তাব, মামাব জন্য আমাদের ভাবনা ছিল বড্ড।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পূর্ণিমা বললে, 'কিন্তু এই সমস্ত যদি তোমাকে দিতে হত।'

এক মিনিট চুপ।

পূর্ণিমা ব্যথায় জড়িয়ে বললে—'কিন্তু যা হবাব নয়-তা হযনা; নইলে এ দু-তিন বছরের ভেতর তুমি তেমন একটা চাকরি খুঁজে পেলে না? অনুপযুক্ত হলে আর-এক কথা ছিল—কিন্তু তাও তো নয়?'

পূর্ণিমা তেমনি কষ্টের সঙ্গে বললে—'কিন্তু দিনের পব যত দিন যায় মনে হয় তুমি কি উপযুক্ত!'

সন্তোষ শুনছিল।

পূর্ণিমা বললে—'অন্তত জামাইবাবুর কাছে তুমি আর কে? অত বড় চাকবি!

অমন সাহেবি! সে কী সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য আমরা ভাবতেও পারি না।

আধ মিনিট চুপ থেকে বললে, 'অত শত কিছু চাইও না। থাকলই-বা রূপগুণ টুকুর—আমাদের মাঝারি জীবন হলেই চলে যায়। নিতান্ত অভাবে পড়ে না মরলেই হল। আজকালকার স্বদেশীব দিনে তবে সাহেবিই বা কে চায়? কিন্তু তাই বলে একটু সচ্ছলতাও কি থাকবার নয়? কতদিন আর এমন ছ্যাঁচড়ামির ভেতর দিয়ে টিকে থাকতে পারা যায়? টাকাকড়ির গর্ব চাইনে—কিন্তু মানুষের জীবনের জন্য যে-স্বাধীনতাটুকুর দরকার সেই হলেই হত। কিন্তু কিছুই তো হল না।'

সন্তোষ পূর্ণিমার হাতটা ঈষৎ আবেগের সঙ্গে টেনে নিয়ে বললে-'ছি, এত হতাশ হয়ে পড়তে হয় কি? তোমাকে কতবার আমি বলেছি, সবই হবে, শুধু একটু প্রতীক্ষা দরকার। তুমি দেখেছই তো, পূর্ণিমা, কত রকম যত্ন করছি আমি। নিশ্চয়ই হবে, নিশ্চয়ই হবে—ছি, অত নিরাশ হয়ে পড়তে হয় না লক্ষ্মীটি—'

পূর্ণিমা সন্তোষের ঘাড়ে মাথা রেখে ব্যথায় অভিভূত হয়ে পড়ে বললে—'আর কত দিন অপেক্ষা করব আমি? আমি যে আর পারি না।'

সন্তোষ আশ্বাস দিয়ে বললে—'আর বেশি দিন নয়। শিগগিরই একটা কিছু হবে ভাবছি। না-হয় সেই যে-এজেন্সির কথাটা বলেছিলাম তোমাকে, তাই নেব।'

পূর্ণিমা একটু নিস্তার পেয়ে বললে-'ভাবছিলাম রবিনকে পড়াব, টুকুকে আমার কাছে এনে রাখব। দু বছর ধরে এই চেষ্টাই তো চলেছে। কিন্তু এখনও তা পারলাম না যে—'

সন্তোষ বললে, 'তা পারবে—পারবে। না-হয় তোমার দিদিই এখন দেখবেন।'

পূর্ণিমা আহত হয়ে বললে—'সব দিক দিয়েই দিদির ভাগ্য আমার চেয়ে বেশি। ওদের মানুষ করার ভাগ্যও তারই হাতে—'একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা উঠে দাঁড়াল।

বললে—'দিদির বিয়েটা হয়ে যাক-তার পর রবিনকে মেডিকেল লাইনে দেবার জন্য দিদিকে লিখব।'

এই প্রস্তাবের উপযুক্ততা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করে সন্তোষ বললে-'তা লিখো।'

—'তোমারও হয় তো কিছু সুবিধে হতে পারে; মেডিকেল লাইনে নয় অবিশ্যি—কিন্তু বম্বে-টম্বের দিকে—অত বড় চাকুরে কি না—'

সে সুবিধা-অসুবিধার পরিপূর্ণবোধ সন্তোষের আছে; জীবন ঢের শিখিয়েছে তাকে। কিন্তু সে-সব উদঘাটন করে এই মেয়েটিকে তেমন কঠিন আঘাত দেওয়ার থেকে এর এই আশা-ভরসা ও স্বপ্নের ভুলের ভিতরেই পূর্ণিমাকে রেখে দেবার প্রয়োজন বোধ করছে সন্তোষ।

তার পর একদিন সুদিন যখন আসবে—এই মেয়েটিকে জীবনের নানা রকম সত্য শেখানো যাবে তখন।

এই সবের জন্য অপেক্ষা করছে সন্তোষ।

চার-পাঁচ দিন পর মামাশ্বশুরের চিঠি এসেছে আবার।

সন্তোষ বললে—'কী লিখেছেন?'

পূর্ণিমা বললে—'তুমি কি কলকাতায় যাচ্ছ?'

'কে? আমি?'

—'হ্যাঁ।'

সন্তোষ একটু স্থির থেকে বললে—'যেতে তো হবেই।'

—'কতকগুলো জিনিশ চেষ্টা করে দেখবার আছে—তার পর কিছু না হলে সেই এজেন্সিটা'

পূর্ণিমা বললে—'মামাবাবু আর দিদিও কলকাতায় যাচ্ছেন।'

—'কবে?'

—'শিগগিরিই; তাঁরা আশা করেছেন তুমিও যাবে।'

—'আমি? তা যাব বই-কি!'

পূর্ণিমা মনের ভিতর কী-একটা প্রস্তাব ফেঁদে ফেলতে-ফেলতে বললে—'তা যেও, বেশ তাড়াতাড়ি যেও; ক-দিন ধরে তো যাবে-যাবে বলছিলেই—আজকালই তো যেতে। মিছিমিছি বাড়িতে বসে থেকে লাভ কী? তার চেয়ে ওখানে গিয়ে জোগাড়জাগাড়ের পথও দেখা যায়—কিন্তু তা ছাড়া ওদের সঙ্গেও দেখা হবে এবার। দিদির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আগের থেকে কথাবার্তা বলে রাখা ভাল।'

সন্তোষ বললে-'কী কথা?' নিজেই থমকে গিয়ে বললে, 'ওঃ সেই?'

—'হ্যাঁ গো, সেই চাকরি-বাকরির চেষ্টাই! জামাইবাবুর এত বড় কাজ—দিদিকে দিয়ে একটা কিছু কি না হবে?'

পূর্ণিমার এই নিদারুণ সরলতা এই দু বছরের ভিতর কতবার ভাঙল-গড়ল। আবার তা ভাঙছে, গড়ে উঠছে আবার। এই বিষম প্রক্রিয়ার কোনোদিনও কি শেষ হবে না আর?

সূচীপত্রে যান

পূর্ণিমাকে বলতে ইচ্ছা করে যে চামেলিদির স্বামী তাকে যে-চোখেই দেখুন না কেন—খুব ভাল চোখেই এখন দেখে নিন না—সন্তোষের শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-প্রয়োজনের সঙ্গে ডাক্তার মানুষটি নিজেকে এত কম সংশ্লিষ্ট মনে করবেন যে বিয়ের আগের কয়েকটা দিন সন্তোষের সঙ্গে অপর্যাপ্ত ভদ্রতা ও খাতির করলেও বিয়ের পর কারো সঙ্গে কারো কোনো সংস্রবও থাকবে না। এ হবেই; এ হতে বাধ্য; এরা দু জনেই একেবারে আলাদা জগতের লোক যে, চাকরি-বাকরি জোগাড় দূরেব কথা, সন্তোষ কোনো সহানুভূতিরও প্রত্যাশা রাখে না, একটুও প্রযোজন বোধ করে না। চামেলিদির বিয়ে পর্যন্ত কলকাতার দিনগুলোর ভিতর ঢের গোপন শ্লেষের ইশারা সে পাচ্ছে, নিজেব মনের ভিতর ঢের নিভৃত আমোদও অনুভব করবে সে—এই মাত্র।

এ ছাড়া আর-কিছু নয়। সন্তোষ একা থাকলে মনের নানা রকম গোপন আমোদ নিয়ে জীবনটা বেশ চলে যেত তার, কিন্তু পূর্ণিমার লক্ষ্য একেবারেই আলাদা এবং সেটাকে পরিপূর্ণরূপেই স্বীকার করতে হবে যে!

পূর্ণিমা বললে—'আজ মঙ্গলবার। আসছে শুক্রবারের পরের শুক্রবার দিদিরা গিয়ে কলকাতায় পৌছবেন-তুমি না-হয় এই শুক্রবারই কলকাতায় চলে যাও।'

—'যেতে হবে বটে, কিন্তু এই শুক্রবারই?'

পূর্ণিমা এ-রকম উদাসীন প্রশ্নে অত্যন্ত আঘাত পাচ্ছে, বিবক্ত হচ্ছে।

—'সুযোগ না বুঝতে পেরেই তুমি মরলে।'

সন্তোষ বললে—'জামাইবাবুও কলকাতায় আসছেন না কি?'

—'তিনিও আসবেন বই-কি।'

—'মামাবাবু কিছু লিখেছেন না কি চিঠিতে, সে সব কথা?'

—'না।'

—'তা হলে ওরা মিছিমিছি কলকাতায় গিযে কী করছে?'

—'মিছিমিছি নিশ্চয়ই নয়। মামাবাবু না জেনেশুনে এত টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন না আর। বুড়ো মানুষ—সব কথা গুছিযে লিখতে পারেন নি হয তো। আমার মনে হয-বিরাজবাবু শিগগিবই আসবেন।'

—'বিরাজ? তোমার দিদিব জামাইয়েব নাম?'

—'হ্যাঁ গো।'

সন্তোষ বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস কবতে ভুলে যাচ্ছি—তোমাব মামাও হয তো খুলে লেখেন নি কিছু-কোথায় দেখা হল দিদিব সঙ্গে বিরাজবাবুব? আমরা একটুও জানলাম না! তিনি বম্বেব থেকে কবেই-বা এদিকে এলেন?' পূর্ণিমা একটু মুগ্ধ হযে হেসে বললে—'এসেছিলেন নিশ্চযই—না হলে আব হাওয়ায হাওয়ায তো কিছু হযে ওঠে নি। এসেছিলেন, দিদিকে দেখেছেন, পছন্দ হযেছে, বিয়ের তাবিখ অব্দি ঠিক হয়ে গেছে, এই সবই সত্যি কথা। বিশ্বেস না হয—এই চিঠিগুলো দেখো।'

মামাবাবুর চিঠি সন্তোষের কোলের উপর ছুঁড়ে ফেললে পূর্ণিমা। বললে—'জানাবেনই বা কেন তোমাকে? দিদিব চাকরি যখন গেল, আমার ভাইবোনদের একটা আশ্রয দিতে পেবেছিলে তুমি? পেবেছিলে মামাবাবুর বোঝা কিছু হালকা করতে? ঐ রকমই সব। নিজের দিক দিযেই ভেবে দেখ। পরের কাছ থেকে প্রত্যাশা কবলে নিজেকেও আশা-আশ্রয দিতে হয।'

পূর্ণিমা বললে—'তুমি হয তো বলবে যে উপায থাকলে তো ওদেব আমি আশ্রয দেব। কিন্তু এ একটা কথাই হল না। উপায অর্জন করবার মত শক্তি তোমার হল না কেন? কেন তবে বিয়ে কবতে গেলে। বোঝো নি কি যে বিয়ে করবার সঙ্গে-সঙ্গে নানা রকম দাযিত্ব এসে মানুষকে জড়ায়?'

এক-আধ মিনিট পরে একটু নরম হয়ে বললে, 'যাক সে-সব, নাও এখন তুমি যাবার বন্দোবস্ত করো। বিরাজবাবু শিগগিবই কলকাতায আসছেন—বিয়ের তারিখটা আবো কিছু এগিযে পড়বে হয তো। তা হলে এক মাসের ভিতরেই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে।'

এখন আর অবিলম্বে কলকাতায় না গেলেই চলে না।

চামেলিদি সন্তোষকে লিখেছে কী করে কোথায় তার সঙ্গে দেখা হল; তিনি না কি চামেলিদির রূপের কথা আগেই শুনেছিলেন। আগেই কলকাতায় একবার দেখেছিলেন পূর্ণিমার দিদিকে, জীবনের এ সব গোপন কথা—এদের দু জনেরই—আগে কাউকেই জানানো হয় নি—সন্তোষকেও না, পূর্ণিমাকেও না।

সূচীপত্রে যান

ঠিকঠাক [না] হতে জানানো যে উচিত মনে করেন নি—চামেলিদি হয় তো জানাতে পারত—তার দিক থেকে তা কি অবিসংবাদী সত্য নয়?

তা ঠিকই তো। তা ঠিক।

জীবনের নানা রকম স্থির নিয়ম ও সিদ্ধান্তকে বোধ করবার ক্ষমতা এবং সেগুলোর প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধায় চামেলিদির চিঠি এমন স্নিগ্ধ।

এই মেয়েমানুষটিকে বরাবরই অনুভব করে দেখেছে সন্তোষ। মানুষের জীবনের এমন কোমল মমতাময় বিবেচক এই লোকটি, এমন নিভৃত, এমন মৃদু সৌন্দর্যে রূপবতী, এ সহিষ্ণু যে নিজের ভবিষ্যৎ নীড়ের ভিতর এর নিতান্তই প্রয়োজন বোধ করেছিল সন্তোষ—একে ছাড়া চলবে না যে! জীবনের নানা রকম রুক্ষতা ও বক্তাক্ততার ওপর উপশমের মত এই মেয়েটি থেকে যেত। কিন্তু তার নিজের জীবনের প্রয়োজনের দিকে চলেছে চামেলিদি। তাকে ছাড়তে হবে।

পৃথিবীতে কোথাও বিরাজের মত ডাক্তারেরও হয় তো এরই জন্য আবশ্যকতা ছিল।

নীড়ের থেকে একটা পাখি খসে পড়ল।

সে নীড় মনের ভিতরই তৈরি হচ্ছিল, কল্পনার ভিতর দিয়েই তার প্রক্রিয়া চলেছে, পরিবর্তন চলেছে। কোথায় গিয়ে যে তার পরিণতি সন্তোষ জানে না, কেউ জানে না।

পূর্ণিমা বললে—'এক মাসের ভিতরেই সব, এবার আর দেরি নয়।'

সন্তোষ বললে—'তুমিও চলো তা হলে।'

কিন্তু পূর্ণিমা কীকরে যাবে? পেটের ভেতর সন্তান যে তার। অত্যন্ত অগ্রসরগ্রস্ত।

এই আরেকটা শস্ত্র। বিবেক-বিচারের সমস্ত শক্তি দিয়েও এ আঘাতকে গ্রহণ করলে চলে না যেন! এ আঘাত যেন আরো তীক্ষ্ণ—জীবনের কাছ থেকে আরো গভীর উপলব্ধি দিয়ে প্রতি মুহূর্তেই নিজের বিচার পাচ্ছে যেন। গভীর অনুভূতিশীল মানুষের জীবনও তত ক্ষুধা মেটাতে পারে না যে।

পূর্ণিমা বললে—'কলকাতায় যাবার উপায় রেখেছ তুমি?'

কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে সন্তোষকে অনেক দিন ধরে অনেক পীড়ন করেছে পূর্ণিমা। কিন্তু জীবনে, এ দু বছরের জীবনটিতে তার, নিজেই সে যে উৎপীড়িতা হয়েছে ঢের বেশি—জীবনের দুঃসময়ে সন্তানকে পেটে ধরেই শুধু নয়-সন্তোষের সঙ্গে, পূর্ণিমার এমন অপরূপ অসামান্য সম্পন্ন জীবনটাকে মিলিয়ে দিয়ে, এই নিরর্থক ভ্রষ্ট দাম্পত্যের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তেই যেন—

কিন্তু তবুও সন্তোষকে আজ নিজের এই মর্মান্তিক গর্ভের কথা নিয়ে আর-একটা কঠিন কথাও বলছে না পূর্ণিমা।'

ক্ষমা করেছে সন্তোষকে সে। স্বামী তার একটা চাকরি জুটিয়ে নিক, সচ্ছল হোক, সাংসারিক স্বাধীনতা অর্জন করুক, তার পর তাদের দু জনের জীবনেই ঢের পরিতৃপ্তির সময় আসবে। এই সব বলছে পূর্ণিমা? পূর্ণিমা খুব মমতা নিয়ে কথা বলছে। নিজের ভরা পেটের যথেষ্ট কষ্ট-ব্যাঘাত নিয়েও সন্তোষের জিনিশ পত্রের সুশৃঙ্খল গোছগাছ করে দিচ্ছে সে—কলকাতায় যেতে এবার সন্তোষের কী-কী লাগবে, গিয়েই-বা কিসের-কিসের প্রয়োজন, সমস্তই যথাসাধ্য জুগিয়ে দিতে লেগে গেছে পূর্ণিমা।

সন্তোষ এবার একটু মুগ্ধ হয়েই কলকাতায় এসেছে।

একটা উপযুক্ত মতন আয়ের ব্যবস্থা দেখে নিতে পারলে জীবনে তাদের পরিতৃপ্তির অভাব হবে না—তারও না, পূর্ণিমারও না।

এই সুস্থিরতা-নিশ্চয়তা, ঘুম-শান্তি-কাজ ও পরিণতির মধুরতা এই? জীবনের থেকে এমন বিচিত্র ব্যবস্থাকে অধিকার করে নেবার জন্য সন্তোষের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চলেছে কলকাতায় এবার। ছ-সাত দিন কেটে গিয়েছে।

এক দিন ভোরের বেলায় মামাবাবুর একটা কার্ড পাওয়া গেল। কলকাতায় তারা দু-দিন হল এসেছে—কিন্তু ব্যস্ততায় সন্তোষকে খবর দিতে পারে নি; সন্তোষ যেন চিঠি পেয়েই অবিলম্বেই গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে। মামাবাবুর চিঠিতে কোনো ঠিকানা নেই।

পর দিন চামেলিদির খাম এসেছে—নিজের প্রতি মৃদু ভর্ৎসনা, সন্তোষের কাছে নিবিড় অনুযোগ—কিছু মনে করে না যেন সন্তোষ এর আগে খবর দেওয়া হয় নি বলে; অবিলম্বেই দেখা করবার জন্য চলে

সূচীপত্রে যান

আসে যেন—ঠিকানাও রয়েছে বটে; পরিষ্কার মৃদু হাতের রূপসী চিঠিখানা এই।

এই সাত-আট দিন কলকাতার নানা রকম হিংস্র ঝঞ্ঝাটের মাথায়, মেসের রুক্ষ কঠিনতার মধ্যে চামেলিদির এই দু পাতা একটা গভীর প্রবোধের মত এসে পড়েছে।

পূর্ণিমা ঢের দূরে। জীবনে আর আত্মীয় কোথাও কেউ নেই তো।

কলকাতায় এসে বন্ধু বলেও এবার কাউকে গ্রহণ করতে পারে নি সন্তোষ। চারদিককার নিঃসঙ্গতা নির্জন রক্তপ্রবণতার মধ্যে বন্ধুই শুধু নয়—ওর মতন, একটু আত্মীয়ার পরশ যেন সে চায়—আত্মীযার, পরমাত্মীযার।

চামেলিদি চেযারটা এগিয়ে দিল।

সন্তোষ বসল।

সে রইল দাঁড়িয়ে।

সন্তোষ কিছু বললে না।

চামেলি বললে—'আপনাকে স্টেশনে গিয়ে আমাদের রিসিভ করতে বলি নি কেন, জানেন? একে তো এই ভীষণ শীত-তার ওপর ট্রেন ভোর চারটে-সাড়ে চারটে সময় কলকাতায় আসে। ঐ সময়ে মানুষকে মানুষ কেউ বিব্রত করতে যায়?'

চামেলি নিজের মনের মুগ্ধতায় একটু হাসল।

বললে—'পূর্ণিমা কেমন আছে? ভাল তো? বাড়ির সব ভাল?'

সন্তোষ ঘাড় নেড়ে বললে—'ভালই।'

চামেলি বলে—'মামাবাবু বেরিয়ে গেছেন।'

—'কখন ফিরবেন?'

—'বেলা এগারটা-বারটার আগে না—'

—'বিয়ের যোগাড়-যন্ত্র করছেন বুঝি?'

চামেলি একটু ঘাড় কাত করে, কোনো জবাব দিল না।

সন্তোষ বললে—'আমার যথেষ্ট অবসর আছে, খাটবারও খুব প্রবল ইচ্ছা, কী-কী করতে হবে, বলুন।'

চামেলি বললে—'কিছু না, বিয়ে সে-রকম ভাবে হবে না! খুবই চুপচাপে হয়ে যাবে; লোকজনকে খাওয়ানোও হবে না। নিমন্ত্রিতও দু-পাঁচজন মাত্র। আমাদের কিছু করবার নেই-সত্যি বলছি আপনাকে-'

সন্তোষ বললে—'ভালই, আমিও হুড়হাঙ্গামার পক্ষপাতী নই। গরিবদের জাঁকজমকেরই বা কী প্রয়োজন?'

চামেলি বললে—'মামাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করবেন। কাজ নেই বললাম বলে আপনি হয় তো আর এ দিক মাড়াবেন না। আসবেন কিন্তু।' সন্তোষ বললে—'এখনো তো চলে যাচ্ছি না।'

চামেলি হাসছিল।

সন্তোষ বললে—'এ বাড়িটা কাদের? বেশ তো বাড়ি!'

চামেলি বললে—'মামাবাবুর এক বন্ধুর—'

চামেলি বললে—'কলকাতায় তো কয়েক দিন হল এসেছেন-কিছু সুবিধে-টুবিধে হল?'

সন্তোষ ঘাড় নাড়ল।

চামেলি বললে—'হবেই-বা কী? আমি নিজেও তো সেদিন পিকেটিং করছিলাম। বিধবাশ্রমের স্কুলের কথা বলছি-সেক্রেটারি কত অনুযোগ করলেন, কিন্তু স্কুলের টিচার হয়েও মেয়েদের সঙ্গে পিকেটিং করলাম আমি—'

চামেলি একটু বললে—'দেখুন, কী রকম আখখুটে মেয়ে আমি; সব কি থেকেই সকলে বললে-কাজটা ছেড়ো না তুমি চামেলি—মামাবাবু কত সাধলেন, আপনিও লিখলেন, কিন্তু আমার জেদ আমি রাখলামই-কী দারুণ বলুন তো দেখি। কোথায় কূল পেতাম, বলুন? কিন্তু সে-সব ভেবে দেখবার মত মন থাকে কারো?'

চামেলি অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করে হাসতে লাগল।

সূচীপত্রে যান

বললে—'দেশের নাড়ী-নক্ষত্র যে কোথায় নিজেরই তো খুব ভাল করে জানা আছে আমাব। এ আর চাকরি-বাকরির সময় নয় যেন! কে কাকে তা দেবেই-বা বলুন—'

একটু থেমে বললে—'কিন্তু বিবাহিত লোকের পক্ষে পিকেটিং কবাও মোটেই সম্ভব নয়। কী যে করবে তারা—'

চামেলি বললে—'এ কযদিন কতকগুলো খবরের কাগজ থেকে কয়েকটা চাকরিব কাটিঙ যোগাড় কবেছি আপনাব জন্য। দিচ্ছি আপনাকে—' .

চামেলি একটা খাতাব ভেতর করে [থেকে] কাটিঙস বেব করে দিলে। সন্তোষ এ সবই দেখেছিল।

তবু কৃতজ্ঞতা জানালে-পকেটে সেগুলো যত্ন কবে [বেখে] দিলে-বললে, 'হ্যাঁ দিদি, দরখাস্ত আমি কববই।'

চামেলি বললে, 'দেখুন।'

সন্তোষ এক-আধ মিনিট চুপ থেকে বললে, 'তিনি কবে আসছেন?'

—'বোধ হয চাব-পাঁচ দিনেব ভেতরই; এক মাসেব ছুটি নিযে আসছেন। তিনি এলে তাঁব সঙ্গে একবাব দেখা করবেন কিন্তু-কববেনই। তাঁদেব বাসায গিযেও দেখা কবতে পাবেন।'

বিবাজবাবুব কলকাতাব ঠিকানা জানিযে দিচ্ছে চামেলি।

পবেব দিনই চামেলিব সঙ্গে আবার দেখা।

—'আমি ভাবতে পাবছিলাম না যে আপনি আসবেন, বড্ড দযা যে! চা করে দেব?'

সন্তোষ বললে—'মিছিমিছি চাযেব ঝঞ্ঝাটে গিযে আমাকে কেন একা ফেলে যাবেন? বিরাজবাবু তো আজকালই এসে পড়বেন-তখন আমাদেব হাতেব কাজ শেষ হযে গেছে; আপনিও নিশ্চিন্ত-আমবাও বিমুগ্ধ!'

সন্তোষ বললে—'বিমুগ্ধ বই কি! জীবনটা একটা মুগ্ধতা ছাড়া কী-আব চামেলি দি? চাবদিককাব পবিবর্তন, উপহাস, অন্যায, বেদনা মনটাকে এমন অভিভূত করে বাখছে-তিক্ততা দিযে নয নিশ্চযই-মধুবতা দিযে।' চামেলি অবাক হযে তাকাল।

—'মধুবতা নয?'

চামেলি যে কী জবাব দেবে সে জানে না।

সন্তোষ বললে—'পূর্ণিমা অতটা বোঝে না, কিন্তু তুমি বুঝেছিলে। এ দু বছব দুঃখ-যন্ত্রণাব আর কোনো অবধি ছিল না তোমাব। কিন্তু যখনই তোমাব জীবনেব দিকে তাকিযেছি তাব স্নিগ্ধতা ও সহ্যশক্তি দেখে আমারও হৃদয মধুবতায ভবে গিযেছে। ভেবেছি, কী রকম কবে মানুষ এমন হতে পাবে? জীবনের আগের মতামত আমাব পবিবর্তিত হল। জীবনকে, সমস্ত জীবনকেই কী বিমুগ্ধভাবে তুমি যে দেখ বুঝতে পাবলাম—'

সন্তোষ বললে-'কিন্তু তবুও তোমাব সঙ্গে আমাব পার্থক্য আছে। শুধু সহ্যশক্তিই তোমাব সম্বল ছিল। কিন্তু একটা বিপুল তামাশাবোধ জীবনেব সমস্ত মর্মান্তিকতাব ভিতব আমাকে নিশ্চয পথে দেখিযে দেয।'

চামেলি বললে—'জীবনেব মর্মান্তিকতাকে আমি অস্বীকার কবি নে সন্তোষ। আজীবনই পূর্ণিমাব চেযেও আমি ঢেব ভুগে এসেছি-তা তুমি জানো। কিন্তু তুমি যে-মুগ্ধতা আমাব ভেতব দেখে সত্যিই তা কোনো দিন ছিল না—'

চামেলি হঠাৎ থেমে গিযে, একটু চুপ কবে থেকে, পবে বললে—'হয তো ছিল না।'

চামেলি বললে—'ছিল কি সন্তোষ?'

সন্তোষ বললে— 'ছিলই তো—কিন্তু থাকবাব কোনো প্রযোজন ছিল কি?' চামেলি চুপ কবে ভাবছিল।

সন্তোষেব মনে হল, কোনো একটা জীবনেব কুযাশা কর্কশতাব ভিতব একটা জোনাকি যেন ডুবে-ডুবে দেখছে তাব সমস্ত স্নেহগুণ সহ্যগুণ মমতা মাযা নিযে।

কিন্তু তবুও এ চিত্র দেখবার কোনো রুচি নেই আজ সন্তোষেব-বাস্তবিকই কোনো রুচি নেই, চামেলিরও নেই-কোনো রুচি নেই, কোনো প্রযোজনও নেই; কাবণ এ ছবি একবারেই ছিঁড়ে গেছে।

চামেলিকে বিদায দিযে মনের ভিতর কোনো ক্ষোভও নেই সন্তোষেব। এই মেযেটিকেও আজ তবু একটু চিন্তিত দেখা যাচ্ছে-কিন্তু পরের দিনই নতুন জীবনেব উৎফুল্লতায সমস্ত সহানুভূতিকেও হারিযে

ফেলছে যেন চামেলি। বিরাজের স্ত্রী হবার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত হচ্ছে সে। বিধবাশ্রমের টিচারের পক্ষে সেটা বরং শক্ত জিনিশই হত-কিন্তু রূপ, শিক্ষা, অর্জন করবার শক্তি-পরিবর্তিত হবার ক্ষমতা শুধু চামেলিরই নয়, নারীদেরই। এই সব বিশেষ অস্থি-মজ্জার জিনিশ চামেলিকে খুব সাহায্য করছে।

সে দিন সে পিকেটিং করছিল-দেশের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের ব্যবস্থা-গুলোকেই বরং দুর্বল মনে করছিল-এক মাসও কেটে যায় নি, বিলেতি দামি সেন্টেড নোট পেপারে বম্বেতে দু খানা করে চিঠি লিখছে সে রোজ। দু খানা করে পাচ্ছে ফিরে-রোজ।

অত বড় সাহেব ডাক্তারকে পিকেটার চামেলি দু বেলা কবে এত কী লিখতে পারে? কিন্তু পিকেটিঙের কথা নিশ্চয়ই সে লিখছে না-বিধবাশ্রমের সেক্রেটারির স্বদেশদ্রোহিতাকে নিন্দে করে না, বরং ডাক্তারের পবিপূর্ণ রুচিমত যথাসাধ্য সাজিয়ে লিখতে প্রয়াস পাচ্ছে চামেলি-যাতে বিরাজ বাবুর খুব ভাল লাগে, মনটা সম্পূর্ণরূপে পবিতৃপ্ত হয়ে ওঠে-সেই সব কথা। জোব কবে নয়-কৃত্রিমতার ভিতর এমন বিমুগ্ধতা থাকে কি? নিজেরই মনের পরিপূর্ণ প্রেরণায লিখে যাচ্ছে চামেলি। নিজেব মতামত কিছু নেই আজ চামেলির-নিজের ভাব নেই-স্বভাব হাবিয়ে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে-কিন্তু আশ্চর্য, কোনো কৃত্রিমতাব গন্ধও নেই। সব বড় দ্রুত, বড় বিরাট পরিবর্তনের ভিতর-স্বাভাবিক আবেগেব সঙ্গেই আরম্ভ হযে যাচ্ছে সব-শেষ হযে যাচ্ছে।

বিরাজের চিঠি দেখাবার মত নয়। জানাবার মতোও কিছু নেই সে সবের ভিতব। চামেলি বললে—'কী আমি লিখি? তাও কী কবে বলব?'

চামেলি বললে—'একটা ভয হয শুধু; আমাদের চেয়ে এব সম্পূর্ণ নতুন জীবনটাব ভিতর আমাকে নিযে একটা নির্ঘাত ধাক্কা না খান।'

সন্তোষ জানে, তা অসম্ভব। আই-এম-এস-বড় মানুষ বটে, কিন্তু কত বড় মানুষই-বা। মেযেমানুষেব মোহ জিনিশটাই আলাদা, বিশেষত চামেলিদেব মত এমন সম্পন্ন পরম মেযেমানুষদেব। লেডি হ্যামিলটন, নেল গোযাইনের প্রেমিকদেব সঙ্গে বিবাজেব তো কোনো তুলনাই হয না, অথচ ভয তো সে-সব মেযেবা কোনো দিন করে নি-ট্রাফালগাবেব বীবেরাই ববং আশঙ্কায আতঙ্কে বিবর্ণ হযে উঠত জীবনের রূপ, প্রেমেব কথা বলতে গেলে।

চামেলি বললে—'অত বড় সাহেব, এমন গ্রেট ম্যান একজন! না পাবি যদি? সমস্তই যদি চূর্ণবিচূর্ণ হযে যায—'

চামেলি ঘাড় হেঁট কবে কী যেন ভাবছিল। আস্তে মুখ তুলে বললে, 'কিন্তু তিনি তো প্রতি চিঠিতেই আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন-বলছেন, ভয তোমাব কী আবাব? ভাবনা ববং আমারই; আমাকে পেযে সুখী হবে কি? ঠিক বুঝতে পারছি না।'

চামেলি প্রসন্ন মুখে হাসতে-হাসতে বললে-'এই সব লেখেন; দেখো তো কী অন্যায়।'

সন্তোষেব মনে হচ্ছিল, কী অপবিমেয ব্যবধান হযে যাচ্ছে এই দুটি বোনেব ভিতব। পূর্ণিমা-যে বিরাজের দিক দিযে, সমস্ত বড় মানুষের দিক দিয়েই, চামেলিব চেযে ঢেব বেশি যোগ্যতব ছিল-তাব আজ এই অবস্থা আর চামেলি-যাব জীবনে এই বীভৎস মোচড়ের কোনো প্রযোজন ছিল না- নিজেবই স্বাভাবিক নিয়মে জীবনেব প্রকৃত উপশম যে ঢেব বেশি পেতে পাবত-দিতে পাবত ঢের বেশি-তাকে নিযে এমন কুৎসিত টানা-হেঁচড়া।

এক দিন সমস্তই ঠিক হযে যাবে বটে।

পূর্ণিমা গরিবেব বৌ বলে বাৎলে [বদলে?] যাবে-চামেলি কর্নেলেব লেডি বলে।

কিন্তু সেই দূর সিদ্ধান্তের স্থিরতায পৌঁছতে গিয়ে এই চাবটি জীবনই যা অপব্যয, অপচয ও রক্তাক্ততায বীভৎস হযে উঠবে। কিন্তু চারটি জীবনই বা ভাবছে কেন সন্তোষ? দুটি জীবন মাত্র-তার নিজের ও পূর্ণিমার। কারণ শেষ পর্যন্ত জীবনকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, জীবনকে বিচার, জীবনকে ধিক্কার, জীবন অনুভব, জীবনকে গ্রহণ, জীবনেব শূন্যতা বেদনা শান্তি সিদ্ধান্ত সমস্তই গবিবদেব দাযে পড়া কাজ; দাযে পড়েই তাদের অনুভূতি এমন গভীর হয়ে ওঠে-মানুষের জীবনটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে এদেরই রুধির কর্দমসিক্ত উপলব্ধির কাছে এমন পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়ে যেতে থাকে-ধবা, পড়ে যেতে থাকে।

নিজের মৃত্যুর আগে সন্তোষ এ জীবনটাকে যেমন বুঝে যেতে পারবে, পূর্ণিমাও-বিবাজ ও চামেলি তাদের নিজেদের জীবনের প্রবোধ ও আশ্রযের ভিতর থেকে কী বুঝবে সে-সবেব? কতটুকুই-বা? তারা আর অগ্রসর হবে না-স্বচ্ছন্দ সংসার, সমৃদ্ধিময় পৃথিবীতে তাদের পরিসমাপ্তি হযে গেল-কিন্তু সন্তোষ-

পূর্ণিমাব আকণ্ঠ প্রযাস ও ব্যথার কোনো পূর্ণচ্ছেদ নেই কোনো দিকে, মৃত্যুর পরে এ উপলব্ধিকে কাজে ধরা জিনিশ মনে হবে না সন্তোষের আর এ অনুভবকে পরিপূর্ণ প্রাণে ভালবেসে যাবে সে; জীবনকে সে দেখল সমস্ত দিক দিযেই তারা নিষ্ফল হয়েছিল বলে; মৃত্যুর সময পূর্ণিমা ও সন্তোষ এই সফলতাব সমৃদ্ধি নিযে চলে যেতে পারবে।

জীবনের সবচেযে বড় সফলতা এই নয কি?

চামেলি বললে—'তিনি লিখেছেন নিজেব চোখেই তো দেখেছি কত রূপগুণ সম্পন্ন তুমি, কিন্তু তোমাব গুনেব জন্যও তোমাকে চাচ্ছি না, তোমার রূপের জন্যও না- তোমাকে চাচ্ছি তোমার জন্য শুধু।'

চামেলি একটু বিদ্রূপেব সুবে হেসে বললে—'দেখো তো, ডাক্তার মানুষেরও কবিত্বেব কী গভীবতা—'

চামেলি বিদ্রূপ অক্ষুন্ন রেখে বললে—'কিংবা নিবর্থকতা'। একটু গম্ভীর হযে বললে—'সত্যি এ-সবের মানে কী?

ধীবে-ধীবে আবিষ্ট হযে চামেলি বললে—'ভালবাসায মানুষকে কী রকম অভিভূত করে ফেলে। ওঁব চিঠির সমস্ত ভণিতাই ঘুবেফিবে সেই ভালবাসারই কারচুপি'—চামেলি মুগ্ধ মুখচোখে হাসতে লাগল; রুপোব চামচে যেন রুপোর বাটিতে আওযাজ করে চলেছে-না জানি কোন অনির্বচনীয যাদু যেন শিগগিবই উদঘাটিত হযে পড়বে। কিন্তু বিবাজ ছিল না-সমস্তই গুটিযে গেল তাই।

চামেলি বিরাজের চিঠিব উত্তব দেবার আযোজন কবছিল।

সন্তোষকে আব বসাল না সে।

বিরাজের আসতে এখনও দশ-পনেব দিন দেরি-বিশেষ কাজেব জন্য ছুটিটা পিছিযে দিতে হযেছে।

এই জন্য ঢের মনখারাপ চামেলিব।

বললে—'বিযেব তাবিখ তো পিছবে না?'

সন্তোষ বললে—'না।'

—'মামাবাবু কিন্তু চিঠি ছাপাচ্ছেন।'

—'ওবাও তো জানে আশা করি।'

—'হ্যাঁ, ওবা নিজেবাও ছাপাচ্ছে, শুনিছি।'

চামেলি একটু আশ্বস্ত হযে বললে, 'উনিও লিখেছেন—আজকের চিঠিতেও-দেরি তো হতেই পাবে না—বরং আগে ছুটি পেলে আজ-কালই ব্যবস্থা করে ফেলতেন'—সমস্ত চোখমুখ লাল হযে উঠেছে চামেলির—নোট পেপারে হাত বেখে একটু কাত হযে বসেছে সে।

সন্তোষ মেসে এসে পূর্ণিমার একটা চিঠি পেযেছে—সাত-আট দিন পবে এক খানা চিঠি! কিন্তু সে নিজেও কি বেচাবিকে এ কয দিনেব ভিতব এক খানা লিখেছিল—বম্বেব থেকে কলকাতায, কলকাতাব থেকে বম্বেতে বোজই দু-তিন খানা যাচ্ছে-আসছে দেখেও? কিন্তু চামেলিদেব জীবনেব ব্যবহাব দিযে নিজেদেব জীবনকে পবিমাপ কবলে চলে কি আজ আর? বিরাজ সন্তোষেব চেযে বযসে ঢের বড় বটে, চামেলিও পূর্ণিমাব চেযে অনেক বড়—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নিজেরাই বুড়ো তাবা দু জনে; চামেলিরাই নতুন; জীবনেব প্রথম পাঠ নিতে চলেছে যেন—প্রেমেব পিপাসাব, বোমাঞ্চেব, স্বপ্নেব নীড়ের।

পূর্ণিমা লিখেছে; পেটেব ভাবে সে না পাবে হাঁটতে, না পাবে শুতে, পা ছড়িযে বেড়ায ঠেস দিযে বসে থাকতে হয শুধু। বসে-বসে কী ভাবে সে?

ভাবে যা তা দু পৃষ্ঠা বসে ব্যক্ত কবেছে পূর্ণিমা।

তা না বলাই ভাল। সন্তোষ যদি ভুলে যেতে পারে-কোনোদিনও এই দু পৃষ্ঠাব স্মৃতি মনে যদি না থাকে আর তার, তবেই সে বেঁচে যেতে পাবে!

কিন্তু বেঁচে যেতে সে আসে নি।

কিন্তু পূর্ণিমাকেও সে বাঁচাতে পারবে না।

পূর্ণিমার যদি মৃত্যু হত-এই প্রসবের সময-তা হলে দু জনেই বেঁচে যেতে পারত তাবা। কিন্তু তা কি হবে? তা যে হবে না এই মনে বেখেই জীবনের জন্য প্রস্তুত হওযা ভাল-দু জনেব সমগ্র জীবনটার সমস্ত পরিশ্রম, প্রযাস ও ব্যর্থতাব ও প্রযাসের জন্য।

সূচীপত্রে যান

মেসের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সন্তোষের মনে হচ্ছে এটা যদি সে ঠিক বুঝতে পারত যে পূর্ণিমা প্রসবের আঘাতটাকে কিছুতেই উৎরোতে পারবে না, মরতে তাকে হবেই, তা হলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বাইরের শীতের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এই অন্ধকারের ভিতর এমনই একটা আরাম পেত সন্তোষ!

কী গভীর নিস্তার পেত তা হলে জীবনে সে? সমস্ত পৃথিবীর দুঃখকষ্ট তার অনুভূতিশীল হৃদয়ের কাছ থেকে যে-করুণা চায়, যে-বেদনা চায়, আনন্দের উপশমের মত মনে হত যেন সেগুলোকে সন্তোষের। পূর্ণিমার এই একটি জীবন যে করুণা, মমতা, মায়া ও ব্যথার দাবি করে চলে গেছে সন্তোষের কাছ থেকে, সে-সবের অপরিসীম বেদনার কাছে, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-কষ্টই আনন্দের উপশমের মত মনে হত যেন।

পৃথিবীতে কাউকেই ভালবাসে নি সন্তোষ।

কিংবা পূর্ণিমাকেই শুধু ভালবেসেছে। পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি লোকের ভিতর এই মেয়েটিরই শুধু দুঃখ দূর করবার জন্য, এর জন্যই শুধু একটা আশ্রয়, একটা শৃঙ্খলা, জীবনের কাছ থেকে একটা মমতামুগ্ধ স্নেহপূর্ণ ব্যবস্থা বিচার আহরণ করে নেবার জন্য-এরই আশা-আশ্বাস পরিতৃপ্তি ও মঙ্গলের জন্য-জীবনে যদি কিছু না পারা গেল মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিয়েও একে প্রকৃত শান্তি, স্নিগ্ধতা ও নিবিড়তা বুঝতে দেবার জন্য অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বেঁচে থাকাটাকে যদি ভালবাসা বলা যায়, তা হলে একমাত্র পূর্ণিমাকেই ভালবাসে সন্তোষ। হয় তো প্রেমের মানেও এই-ই।

কিন্তু করুণা কি প্রেমের চেয়ে বড় নয়?

সৃষ্টির অন্য নক্ষত্রগুলোর কথা জানে না সন্তোষ-কিন্তু এই পৃথিবীর প্রতি অণু পরমাণুও প্রতি মুহূর্তেই যে-অব্যক্ত বেদনায় কুঞ্চিত হয়ে পড়ছে-পরিবর্তে কোনো এক দিক থেকে যে অসীম করুণার প্রতীক্ষা করছে-প্রতীক্ষা করছে শুধু, পাচ্ছে না-এই সমস্তই তো সন্তোষ উপলব্ধি করেছে-এই সবের অপরিসীম বেদনা তাকে ব্যথা দিয়ে গেছে; কিন্তু তবুও এই সব ব্যথা যেন কিছু নয়; পূর্ণিমার জীবন যেন এদের সকলের চেয়েই ঢের কৃপার পাত্র; এদের সকলকে বঞ্চিত করেও সন্তোষের সমস্ত স্নেহ-মমতা, দক্ষিণা, করুণা জীবনের স্বাভাবিক গতিতে বারবার পূর্ণিমাকেই খুঁজে বেড়াতে চায়-পূর্ণিমাকে স্পর্শ করতে না পারলে সে অন্ধ গতির যেন কোনো স্বচ্ছতা নেই, তৃপ্তি নেই, অন্ধকারের কোনো শেষ নেই আর।

জীবনের সমস্ত করুণাও এই মেয়েটিকে দিয়ে দিয়েছে সন্তোষ। একে নিয়ে তাই বড় ব্যথা।

শীত রাতের অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নিজের জীবন থেকে পূর্ণিমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাচ্ছে সন্তোষ; পূর্ণিমা বেঁচে থাক, কী মরে যাক-সন্তোষের জীবনকে সে যেন আর স্পর্শ না করে। পূর্ণিমা তার রূপ-সৌভাগ্য, শক্তি-সমৃদ্ধি ও সুলক্ষণ নিয়ে চামেলির চেয়ে ঢের বেশি করে পৃথিবীর যে-কোনো বিরাজকে কৃতার্থ করতে পারত। পৃথিবীতে লক্ষ-লক্ষ বিরাজ বেঁচে রয়েছে-আজ এই শীতের রাতের এমন কঠিনতার ভিতর জীবনের নিঃসঙ্গতায় রুধিরাক্ত হয়ে রয়েছে-পূর্ণিমাকে পেলে এই মুহূর্তেই তারা জীবনের মানে পরিবর্তিত করে ফেলতে পারে-তাদের একজনকেও যদি চিনত সন্তোষ উপযাচক হয়ে এই রাতেই পূর্ণিমাকে দিয়ে আসত;-আ, জীবনে কী গভীর নিস্তার পেত তা হলে!

আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে সমস্ত শীতটা ভরে ঘুমের একটুও ব্যাঘাত হত না তা হলে আর। চিন্তার ব্যথা থাকত না। পূর্ণিমা যখন নিজের মাথায় তুলে সে-সব কুড়িয়ে নিয়ে চলে যেত, সন্তোষের জীবনে প্রেম আর আসত না তার পর, করুণা আর আসত না। এই দুটো জিনিশই মানুষের জীবনকে পণ্ড করে দেয় না কি?

এই জিনিশগুলোকে বাদ দিয়ে সবুজ ঘাসের মত কোমল কমনীয় উপলব্ধিহীন জীবন যে কী মধুর!

কোথাও কোনো চিন্তার পীড়া নেই, ভাবের কষ্ট নেই-শুধু আস্বাদ করে যাওয়া-শুধু আস্বাদ করে যাওয়া; তাই ভাল হত না কি?

কিংবা সন্তোষ মরে যেত; এত প্রেম ও করুণা বহন করবার শক্তি তার নেই যে!

কয়েক দিন কেটে গেছে।

বিরাজ এসেছে।

আরো কয়েক দিন চলে গেল।

আজ সন্ধ্যায় চামেলির বিয়ে হয়ে গেল।

সূচীপত্রে যান

আরো দু-তিন দিন চলে যাচ্ছে।

এই দুই বোনের জীবনের বিরাট ব্যবধানের অবিচাব সন্তোষকে পেযে বসেছে-এই ভীষণ অভিশাপ নিযে সে কোথায় যাবে? দোষ কি তাব, না বিরাজের? পূর্ণিমার না চামেলির?'

হঠাৎ এমন পার্থক্য হযে পড়ে কেন জীবনে? যে-জিনিশ ক্রমে-ক্রমে হয, আস্তে-আস্তে, অনেক সহিষ্ণুতা, প্রতিভা, প্রযাস ও পবিশ্রমেব পর তার মহিমাকে স্বীকাব কবে সন্তোষ।

কিন্তু যতই মনে হচ্ছে যে পূর্ণিমা বেড়ায় ঠেস দিয়ে, দুই পা ছড়িযে বসে আছে, পাড়াগাঁর নিরানন্দ জীবনের ভিতর প্রসবের প্রতীক্ষা কবছে, গামলা কাঁচি ইত্যাদির জন্য সন্তোষের কাছে পযসা চেযে পাঠিয়েছে, যতই মনে হয যে নাড়ী কাটাবার কাঁচি, বোরিক, গামলা ইত্যাদিব দিকে তাকিযে ও ব্যবস্থা ও উপকরণের সঙ্গতিতে, এতেই, আন্তরিক তৃপ্তি পাচ্ছে পূর্ণিমা আজ।

বিচি বোডে বিবাজদেব মস্ত বড় বাড়িব মেমসাহেব চামেলিব তৃপ্তিব উপকরণগুলোব আকাশস্পর্শী উচ্চতাকে যখন আর অনুসরণ কবতে পারা যায না মেসের দেযালে ঠেস দিযে মাথাটা আস্তে-আস্তে হেঁট হযে আসে, নিজের প্রতি অবিশ্বাস ও অবিচার সমস্ত মন ভবে উপচে থাকে, জীবনের এই নতুন সমস্যার কী মীমাংসা কববে সে? এমনিই তো অনেক অমীমাংসা জীবনকে আচ্ছন্ন কবেছিল, সংসার সন্তোষকে নির্যাতন কবতে একটুও ছাড়েনি তো, কিন্তু সন্তোষের এই পাপেব শাস্তি কোনো সংসার, কোনো পৃথিবী, কোনো পৃথিবী কোনোদিনই, যেন দিযে শেষ কবতে পারে না।

হয তো কোনো অবিবেচক ভাগ্যবিধাতাব যাদুব খামখেযালিতে চামেলি আজ এত বড়।

কিন্তু সে যে এত বড় তা যে নিতান্তই সত্য-যে জিনিশকে আলেযা বলে উড়িযে দেবাব কোনো উপায নেই তা আজ।

কে বড় কে ছোট এ-সব জিনিশ সন্তোষকে কোনো কালেও স্পর্শ করে না, আজও করছে না-কিন্তু পূর্ণিমা ও চামেলির অবস্থা-ব্যবস্থাব এই আকাশ-পাতাল তফাতেব ভিতর যে-অবিচাব ও অপবাধ লুকিযে বযেছে তাব শিকাব তো পূর্ণিমা-কিন্তু শিকাবী কে? যদি ভাবা যেত, চামেলি? যদি বোঝা যেত, বিবাজ? যদি কোনো বিধাতাব ঘাড়ে দোষ চাপিযে নিশ্চিন্ত হযে পড়তে পাবা যেত, নিস্তাব পাওযা যেত?

কিন্তু এ অপবাধ ও অবিচার-শেষ পর্যন্ত পূর্ণিমাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কবে দেবে যা-এই অবিচাব ও অপবাধেব সমস্ত ভাব সন্তোষকেই বহন কবতে হবে।

চামেলিব জীবন হয তো বিবাজেব সঙ্গে গিযে মিলত। পূর্ণিমা তাব নিজেব বিবাজকে তাব দিদিব চেযে ঢের বেশ অবিসংবাদী ভাবে লাভ কবতে পাবত-সে সমস্ত উপবণকই তাব ভিতব ছিল।

এবং এই তিনটি লোকেব জীবনেব সংস্পর্শে আসবাব কোনো প্রযোজনই ছিল না সন্তোষেব।

সুশৃঙ্খল বিধাতা হলে এই কযটি জীবনকে এমনি কবেই সাজাত। কিন্তু সুশৃঙ্খল বা উচ্ছৃঙ্খল-বিধাতা বা শযতান বলে কেউ কোথাও নেই। কিংবা আছে কি? কে জানে? থাকলে ঢের বেশি শান্তি পাওযা যেত-নালিশ কবে কিংবা প্রার্থনা কবে কিংবা বিদ্রোহী হযে-কিংবা ভবিতব্যতাকে স্বীকাব কবে। কিন্তু সে সব উপাযগুলো হেমন্তেব পাতাব মত জীবন থেকে এক দিন ঝবে পড়ে গেছে।

সে ঢেব অতীতেব কথা।

জীবনেব নতুন উপলব্ধিব কাছে সে সবের কোনো মানে নেই আজ। সমস্ত জীবনই শান্তি ও নিস্তাব খুঁজছে-কিন্তু সন্তোষেব পথ আলাদা; জানে না সে এই পথে তার কোনো সঙ্গী আছে কী না; কী যে সে পথঃ বেদনাব পথ বটে-খুব গভীব বেদনাব পথ-খুব গভীব বেদনাব পথ। একজন পূর্ণিমাকেও যে সে ভালবাসতে পেবেছে, লোকেবা বলে, বিধাতা মানুষকে যেমন ভালবাসে; এক জন পূর্ণিমাকেও যে সে করুণা করতে পেবেছে, লোকেবা বলে, বিধাতা তাব তুচ্ছ কীটকেও সেই রকম করুণা করে।

কিন্তু বিধাতা ও লোকদেব কথা আলাদা। সন্তোষ ও পূর্ণিমা সত্য. সন্তোষের এ প্রেম, এ করুণা তার।

পূর্ণিমা লিখেছে 'এখানে থিযেটাবেব পার্টি এসেছিল-খুড়ো শ্বশুরমশায সে সবের বিরুদ্ধে পিকেটিং কবতে গিযে মাথা ভেঙেছেন। বাড়িতে তো আর পুরুষমানুষ নেই। শুনলাম মিশনেব সিসটাব দু জন-মার্গারেট ও এডিথ-যারা আমার কাছে মাঝে-মাঝে আসছেন, এবং প্রসবেব সময থাকবেন বলেছিলেন-এখন আজ দার্জিলিঙ চলে গেলেন। তিন-চাব মাসের ভিতর আর আসবেন না। অথচ আমাব তো তিন-চাব সপ্তাহেব ভিতবেই হতে পারে-কী হবে বলো তো?'

হবে আব কী? এমনই যদি কিছু হয-পূর্ণিমা নিস্তাব পাবে। বেঁচে থেকে যদি সে একদিক দিযে

চামেলি–বিরাজ ও অন্য দিক দিয়ে সন্তোষের জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সহমরণ করতে থাকে তা হলে সে কদর্য অশ্লীল অক্ষম অবসন্ন পৃথিবীতে সে কারো ভার লাঘব করবে না–সকলেরই বোঝা হয়ে উঠবে মাত্র!

হয় তো চামেলিও তাকে ছবিটিই মনে করবে–নিজেব চেয়ে ঢের যোগ্যতর ও উপযুক্ত বোনটিকে জীবনের পাঁকের ভিতব পচতে দেখে চামেলির বিবেক চামেলিকে কষ্ট দেবে।

সম্পদ ঐশ্বর্যেব স্বচ্ছন্দতাব ভিতব হৃদযের এ সূক্ষ্ম অশান্তি কেউ চায় না–। বিবাজও হযতো জীবনের ফাঁকে–ফাঁকে দু--এক মিনিটের জন্য স্তম্ভিত হয়ে থাকবে; 'কী হতে পাবত–কী না হতে পারত, হায!' বিলাস বটে–কিন্তু সেও ব্যথাবই বিলাস। বেদনার বিলাসও মাঝে–মাঝে এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে ব্যথাব থেকে তাকে পৃথক করতে পারা যায় না–তাকে ছাড়াতে পাবা যায় না–একটা বোঝার মত হয়ে থাকে সে। বিরাজেব হৃদযেব ওপরও একটা বোঝাব মত চেপে থাকবাব শক্তি পূর্ণিমাব বযেছে। কিন্তু বিবাজের স্বচ্ছন্দ স্বভাব, জীবনের সঙ্গতির ভিতব এব কি প্রযোজন আছে!

নেই কিছু।

কোথায় কোনো প্রয়োজন নেই পূর্ণিমার যে ব্যথা দেবে, কষ্ট দেবে, গুরুভারে আক্রান্ত করবে মানুষকে।

নিজে সে বুঝে যাবে, যদি সে বেঁচে থাকে, যে সবচেয়ে বেশি প্রবঞ্চিত হল সে–সবচেয়ে বেশি উপাহাসাস্পদ হয়ে গেল; শেষ পর্যন্ত এই–ই তাকে বুঝতে হবে।

পূর্ণিমার আর–এক খানা চিঠি এসেছে–'কাকা মাথার যন্ত্রণায কষ্ট পাচ্ছেন–'সকলেরই সেই জন্য চিন্তা, বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই; আমাব জন্য কাবো কোনো সহানুভূতিও নেই যেন। ওগো, আমাব কী হবে, বলো? তুমি এই চিঠি পেযেই চলে এসো।'

সন্তোষ যাচ্ছে–কিন্তু পূর্ণিমার কাছে নয–চামেলিব বৌ–ভাতে। সঙ্গে অমূল্য চলেছে–পূর্ণিমাকেও সে চেনে, সন্তোষের বন্ধু সে। বড্ড শীত–ভাল এক খানা চাদবও নেই সন্তোষেব। অমূল্য নিজেব শাল–দোশালাখানা সন্তোষকে দিয়ে বিরাজ ডাক্তাবেব ভাযবাব উপযুক্ত কবে নিয়ে যাবাব প্রযাসে বযেছে। অমূল্যেব বিবেচনা বযেছে বটে কিন্তু ঐ শালখানাই শুধু উপযুক্ত বটে, নিজেব দামেব কাছে অন্তত। বাকি সবেব উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা—

[অবান্তব]

বিরাজদেব মস্তবড় কম্পাউণ্ডেব শামিয়ানার নীচে সন্তোষেব কোনো অস্তিত্ব নেই–হলের পব হল, হলের পব হল, হলেব পর হলের সুগন্ধি মানুষ ও মেয়েমানুষদেব অপর্যাপ্ত রূপ রস ও সম্ভোগেব প্রচুবতাব ভিতবেও সন্তোষ নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কী কবে সে এখানে এসে পড়ল স্তম্ভিত হয়ে চোখ পাকিযে এ প্রশ্ন ভিড়েব যে–কোনো মানুষ তাকে করলেও সেটা মোটেই অন্যায হত না। কিন্তু আশ্চর্য এদেব উদারতা–সুন্দবী–সুন্দরী মেযেদের হাত–পা–গা ঘেঁষে গেলেও তাবা কোনো উচ্চবাচ্য কবছে না–না আছে তাদেব বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ।

চরুট, মদ, পদস্থতা, মর্যাদা, রূপ–এবং পুরুষ–মেযেমানুষের চামড়ামাংসেব ঘ্রাণে জীবন এখানে উপভোগেব যে কোন শিখরের উচ্চতায পৌছেছে সন্তোষ খানিক গিয়ে আর অনুসরণ কবতে পাবে না; উপলব্ধি তার স্থগিত হয়ে স্থূল হযেই যেন মাটিতে নেমে আসে। ভাবে (হযতো পূর্ণিমা উঁচু পেটে দুই পা ছড়িযে বেড়ায ঠেস দিয়ে বসে আছে, এক জন পুরুষমানুষেব অপেক্ষা কবছে, কিংবা নিঃসহায প্রসবেব কিংবা মৃত্যুর।

এই সমস্ত স্থূলতার ভিতর গিযে অনুভব কর্দমাক্ত হয়ে পড়ছে সন্তোষের। চোখ মেলে হলেব পব হল দেখা যায–হলের পর হল–হলের পর হল–ওপবে নীচে দোতলায তেতলায একতালায–আসবাব ও উপকরণের দুরন্ত বস্তুসত্যেব পাযেব নীচে, কল্পনা, মাটিব সঙ্গে মিশে গিযে প্রকৃত স্বপ্ন ও প্রকৃত সাধ আহরণ করবার জন্য আকুতি জানিযে পাঠ নিতে চায–লণ্ডভণ্ড হয়ে হয়ে ফিবে আসে–সন্তোষদেব স্থূল কল্পনা–সন্তোষের ও পূর্ণিমার। কিন্তু বিরাজ ও চামেলিব কাছে এ সমস্তই অদ্ভুত–এ সবই সাধারণ; কল্পনা ও চিন্তাব সঞ্চয় মাধুর্যের দিক দিযেও ওরা উচ্চস্তবেব লোক।

সন্তোষের মনে হচ্ছে এই সবের ভিতবে থেকে থেকে, আরো সব বিচিত্রতার ভিতর দিযে গিযে–গিয়ে ওদের মাথার পরিকল্পনা, ছবি–কবিতা–গান, জীবনের সমস্ত রূপ, বস, পুলক ও উপভোগের দিকটা যে–রকম ফুটিয়ে তুলতে পারবে, সন্তোষ ও পূর্ণিমার প্রযাসের থেকে তা সব সমযই ঢেব বেশি আশাপ্রদ হবে। নিজেদেব শবীরের স্থূলতা সব দিক দিয়েই ধরা পড়ে যাচ্ছে। একদল রূপসীব থেকে চোখ ফেরাতে

পারছে না সন্তোষ-অবাক হয়ে ভাবছে এত সব সুন্দরীবা এমন ভরসাজনক ঘনিষ্ঠতার ভিতর থাকতেও বিরাজ কেন মামাবাবুর ভাগ্নীকেই নিকটতম বলে মনে করল? সে অদ্ভুত খোঁজই-বা পেল কোথায় সে?

বৌ-ভাতের রাত চলেছে।

চামেলি কখন কোথায় কাদের দেখা দিয়ে বৌ-ভাতের কাজ শেষ করে গেছে জানা গেল না।

চামেলিদের জন্য পূর্ণিমার ও নিজেব উপহাবটাও, একটা উপহারেরই হয় তো, স্তূপীকৃত মেহগিনির টেবিলের ওপর রেখে এল সন্তোষ।

দেইড্রিব পাশে কয়েকজন ব্যাবিস্টার ও অফিসাব কথা বলছিল-চামেলি ও বিরাজ দু জনে প্রেসিডেন্ট লাইনারে চেপে ইউবোপে যাবে না আমেরিকা, আর দু-চাব দিনের ভিতরেই।

প্রেসিডেন্ট লাইনারের গল্প হচ্ছিল।

সন্তোষ একটু থেমে দাঁড়িয়ে শুনছিল।

প্রেসিডেন্ট লাইনাবের বিশেষত্ব হচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ার ফল-সবজি-সুপ ইত্যাদির আগাগোড়া সমস্ত যাত্রায, প্রত্যেক মিলের সঙ্গেই, dairy product_all outside state room, twin beds ইত্যাদি, গরম জল ঠাণ্ডা জলের পাইপ, থাবমস বট্‌ল্‌, বিডিং ল্যাম্প, স্যুইমিং বাথ, কটেজ অরর্কেস্ট্রা, টি-ডানস্‌, ডিনার ও ইভনিং পার্টি সব সময়ই। মাঝাখানে মিশবে তিন দিন জাহাজ থাকে-পিবামিড-নাইল-

সন্তোষ বাস্তায নেমে পড়েছে।

অমূল্য বললে—'কই, চামেলিদির সঙ্গে দেখা না কবেই চললে?'

সন্তোষ বললে—'আজ তাব মোসাহেব ঢেব-নিজেব পবিচয দিযে বিবাজ ও চামেলিকে লজ্জিত কবা মাত্র।'

অমূল্য বললে—'পূর্ণিমা যদি একটু দাঁড়িয়ে বিযে করত। '

সন্তোষ মাথা নেড়ে সায দিযে পিছনেব বাড়িটার দিকে একবাব তাকালে, এমন ঐশ্বর্য ও রসোন্মত্ততার ভিতর কোনোদিনও সে আব প্রবেশ কবে নি-দূর থেকে এ সব উপভোগ কববাব রুচিও ভবিষ্যতে কোনোদিন আব যোগাড় কবে উঠতে পাববে কি না সন্দেহ।

বিবাজ ও চামেলির জীবনেব একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেব দিকে তাকালেও কোনো দূব দূবান্তবেব পীত অন্ধকাবেব খোড়ো ঘরের ভিতব পূর্ণিমাব উঁচু পেট ও ছাড়ানো পা দুটোব কথা জেগে ওঠে যে।

প্রতি পদে-পদে এমন অপবিহার্য তুলনা নিযে কোথায যাবে সে? এব অবিচাব, অপবাধ, অক্ষমতা ও বেদনার ভাব সমস্ত জীবন নিজেকেই শুধু বহন কবতে হবে তাব-এমন সামর্থ্য নেই যে খোড়ো ঘবকেও সোনাব প্রসাদে দাঁড় করায। তা হলে সে শক্তিকেই সাহায্য করতে ডাকত সে। কিন্তু কিন্তু নিজে কী নিদারুণ অক্ষম সন্তোষ।

এমন কোনো সমর্থ লোকও কি কোথাও আছে যে সন্তোষেব ভাগ্য পবিবর্তন কবে দিযে যায? সন্তোষেব নিজেব উপভোগের জন্য নয, নিজে সে শীতেব বাতে গরুব ঘবে খড়গাদাব ওপর শুযে থাকতেও রাজি আছে—

সন্তোষেব জন্য নয-কিন্তু পূর্ণিমাব মুখেব দিকে তাকিযে।

জীবনের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার সামঞ্জস্যের দিক দিযেও ব্যবধানটা এমন অসংলগ্ন হযে পড়েছে। যে-সৃষ্টিতে নক্ষত্রেরা থাকে কিন্তু তাদের অপর্যাপ্ত নীচে কোনো দিকেই কারো কোনো সহানুভূতি নেই, কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনো সাহায্য নেই, নিজেব কোনো শক্তি নেই, কোনো আকস্মিক যাদু বা ভেল্কিব পৃথিবী ও যুগ নেই, বিধাতা, ধর্ম বা সন্ন্যাসেও কোনো বিশ্বাস নেইঃ তা থাকলেও একটা সম্বল শান্তি থাকত বটে। এব যে-কোনো একটা জিনিশ যদি জীবনে থাকত-পূর্ণিমা যে-উপলব্ধি জাগায (যার থেকে কোনো নিস্তাব নেই আব) তার থেকে ত্রাণ না পেলেও অনেকটা উপশম পাওযা যেত। কিন্তু কোথাও যে কিছু নেই।

অমূল্য বললে-'পূর্ণিমা বিবাজেব চেযেও ভাল জামাই পেত, আহা, একটু অপেক্ষা করত যদি।'

অমূল্য সবটুকুই বোঝে-এ জন্যই ওকে ভাল লাগে সন্তোষের।

অমূল্য একটা সিগাব জ্বালিযে বললে—'তুমিও চেষ্টা করো না সন্তোষ উপযুক্ত জামাই হতে? বিরাজেব মত? তা পাববে না, কিছুতেই না; শুধু কি এই আই-এম-এস ডাক্তারের দৌলতেই এই সব? ওদের সাত পুরুষেব বনিয়াদি, কলকাতায কে না চেনে ওঁদেব?'

—'কিন্তু বিবাজের মত না হলে কিছুই যে হওযা গেল না অমূল্য।'

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বললে—'কেন?'

সন্তোষ বললে–'চামেলি যা পাচ্ছে–পূর্ণিমাকে সবটুকুই দিতে হবে তো। আমি ওর জীবনে হঠাৎ ঢুকে পড়ে মেয়েটাকে এমন না খুইয়ে বসতাম যদি, ও সমস্তটুকুই তো পেত–হয় তো বেশিও পেত।'

—'তা হত হয় তো–হয় তো হত না; কিন্তু এখন কিছুই যে পাচ্ছে না।'—'পাক না পাক–তাকে মরতে দাও।'

অমূল্য বললে—'একটা বৌ–ভাতে এসেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের জীবন ঢের বিস্তৃত। অর্জন করবার ইচ্ছা চেষ্টা ও নিজেকে অক্লান্ত ব্যবহার করবার একটা পুরস্কার পাওয়াই যায়।'

সন্তোষ বললে—বড়জোর একটু সাধারণ সচ্ছল জীবন পাওয়া যাবে। আমার নিজের পক্ষে তা ঢের তৃপ্তির বটে, জীবনের ঘরোয়া স্ত্রীদের পক্ষেও এ জিনিশ খুবই কামনারই জিনিশ বটে; পূর্ণিমাও তার সমস্ত রূপগুণ সত্ত্বেও এতদিন গরিবের ঘরের মেয়েই ছিল, জীবনের সাধারণ একটা স্বচ্ছন্দতা পেলে এখনও সে খুশিই হবে। আমিও সেই ব্যবস্থার চেষ্টাই করেছিলাম এতদিন। কিন্তু বিরাজ এসে একটা ভণ্ডুল লাগিয়ে দিল।'

অমূল্য বললে—'কই, চুরুটটা জ্বালালে না।'

সন্তোষ অন্যমনস্কভাবে মথা নাড়ল। চুরুটটা কোথায় রাস্তায় হাত থেকে পড়ে গেছে তার। বাসের দোতলার একটা নির্জন কোণায় বসে সন্তোষ বলছে–'আমার যদি প্রতিভা থাকত তার বেগে আমি উৎরে চলে যেতাম–পূর্ণিমাকেও সঙ্গে–সঙ্গে উঠিয়ে নিতাম। কিন্তু অত্যন্ত সামান্য শক্তির মানুষ আমি–একটা সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবস্থার পথ খুঁজছিলাম মাত্র–তারই ভিতর আমার মুগ্ধতা ছিল। কিন্তু বলছিলাম যা ভণ্ডুল লাগিয়ে দিল বিরাজ; কিন্তু তারই বা দোষ কি? রূপসীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে–অস্বাভাবিক কিছু করে নি। কিন্তু মনে হয় পূর্ণিমার বোনকেই বিয়ে করবার কী দরকার ছিল বিরাজের? পৃথিবীতে সুন্দরী কি আর ছিল না? কিংবা রূপসী বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখে বিয়ে করবারই বা কী দরকার ছিল আমার? আমার জীবন যা–আমার জীবনের গভীর প্রয়োজনের নিকট রূপ ও তীক্ষ্ণতার কী মূল্য রয়েছে? কতটুকু? নম্র মমতাময়ী সহিষ্ণু সাধারণ মেয়ে পৃথিবীতে কি ছিল না আর? তেমনই কোনো একটিরই যে বড় দরকার ছিল আমার। কিন্তু যা হয়েছে–তা হয়েছে। এই সব বিশৃঙ্খলার ভিতরেও প্রেমকে আমি হারাই নি।'

প্রেমের তার নিজস্ব সংজ্ঞা অমূল্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছে সন্তোষ। বলছে—'একে প্রেম বলতে পারো, করুণা মমতা বলতে পারো, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে আদরের বা কৃপার পাত্রের চেয়ে ঢের বেশি করে পূর্ণিমাকে এই জিনিশ আমি দিয়েছি। একা তাকেই আমি ভালবাসি–এই পৃথিবীতে নানা জায়গায় নানা রকম দুঃস্থতা ও দুরবস্থা থাকলেও একা পূর্ণিমারই এই জিনিশটা সবচেয়ে আগে ও গভীর করে বুকে গিয়ে লাগে। কর্তব্য বোধে নয় অমূল্য—জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের গতিতেই। কিছুতেই এই মমতা, ভালবাসা, দয়ার ফাঁদ থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিতে পারছি না আমি। বিয়ের আগে মেয়ে মানুষের ভালবাসা বলো, করুণা মমতা বলো, পুরুষ যতটুকু মাধুর্য তার জীবনের থেকে বের করতে পারে–তার বিবাহিত স্ত্রীটিকে নিয়েই সব। জীবনের দিনরাত্রির সংসর্গের এমনই একটা জোর, স্বামী–স্ত্রীর জীবনের অজস্র খুঁটিনাটির ভিতর মোহ এত কম, লালসা এত কম, অনুকম্পা এত বেশি, এবং পৃথিবীটা যতটুকু স্থির হয়ে বেঁচে রয়েছে, তুমি ভেবে দেখো, তা অনুকম্পারই অতি তুচ্ছ খণ্ডাংশ নিয়েই, লালসা বা মোহ, উত্তেজনা, ক্ষুধা বা হিংসার জোরে নয়–এ জিনিশটা এত বেশি শক্তিশালী! তোমাদের বিধাতাকেও তোমার এই দিয়েই সৃষ্টি করেছে–দাম্পত্য জীবনেও স্বামীও স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হতে গিয়েও এরই আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারে না–যে স্ত্রীর সঙ্গে সাতটি দিনও ঘর করেছে সে অনুকম্পায় করুণায় তারই জন্য অভিভূত হয়ে পড়ে।

নইলে, জীবনের সব জিনিশের প্রতিই তো শেষ পর্যন্ত গিয়ে বিমুখই ছিলাম–স্ত্রীর রূপ ও মোহও এক দিন লালসার খাদ্য জোটাল না আর, জীবনের অশ্রুমমতার ভিতর তলিয়ে গেল। এই অশ্রু মমতাই সত্য–দাম্পত্য জীবনে বধূকে নিয়ে এই মমতা ও অশ্রু।

সাত–আট দিন কেটে গিয়েছে।

সন্তোষের চোখে সমস্ত পৃথিবী যেন নরম, কোমল, মধুর ও নিবিড় হয়ে উঠেছে: পূর্ণিমা সেই খোড়ো ঘরের ভিতর পা ছড়িয়ে বসে রুদ্ধ হয়ে নেই আর। প্রসবের ভোরের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর ভিতর সে ছড়িয়ে পড়েছে–সমস্ত পৃথিবীর ভিতর সে ছড়িয়ে পড়েছে।

সূচীপত্রে যান

কল্যাণী

রায়চৌধুরী মশাই নানারকম কথা ভাবছিলেন ঃ প্রথমতঃ জমিদারীটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলে কেমন হয়?

ভাবতে গিয়ে তিনি শিহরিত হয়ে উঠলেন। অবস্থাটা অত খারাপ হয়নি।

কোনোদিনও যেন না হয়—ও রকম অবস্থা!

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কথা তিনি ভুলে যেতে চাইলেন।

হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল—

রায়চৌধুরী মশাই জ্বালিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শালিখবাড়ীর নদীর পাশে তার দবদালানটা—রায়চৌধুরীদের তেতলা জমিদার বাড়ি; সেই ক্লাইভের আমলে তৈরি আধ—ইংরেজি আধ—মুসলমানী ধরণে একটা মস্ত বড় ধূসর পুরীর মতো ; চারদিককার আকাশ মাঠ ধানের ক্ষেত, নদী, নদীর বাঁক, খাড়ি, মোহানা, চরগুলোকে উপভোগ করবার এমন একটা গভীর সহায়তা করছে—দৈত্যরাজের উঁচু কাঁধের মত এই প্রগাঢ় বাড়িখানা।

তেতলার পশ্চিম দিকে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে চৌধুরী মশাই দেখছিলেন সব—উত্তর দিকে ন্যাওতার মাঠ—ধূ ধূ করে অনেক দূরে ভিলুন্দির জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। এই মাঠে কত কি যে ব্যাপার কতবার হয়ে গেল—নিজের চক্ষেও চৌধুরী কত কিছু দেখলেন!

তারপর এল শান্তি—মাঠটা স্কুল কলেজের ছেলেদের ফটবল গ্রাউণ্ড হল, কখনো বা মীটিং হয় এখানে, কংগ্রেসের ক্যাম্প বসে, ডিস্ট্রিক্ট টিচারদের, মুসলমানদের, মাহিষ্য নমশূদ্রদের কনফারেন্স হয়; বেদিয়ারা আসে, বৈষ্ণববৈষ্ণবীদের আখড়া হয়ে ওঠে।

এই সমস্তই শান্তির (উন্নতি অবসরের) জিনিস। আগেকার অনেক গ্লানি পাপ কলঙ্কের ওপর এগুলো ঢের সান্ত্বনার মত।

(মাঠটার প্রায় সমস্ত জায়গাই এখন উলুঘাসে ভ'রে আছে—আর কাশে। কিন্তু ফুটবল খেলা আরম্ভ হবার আগেই মাঠের দক্ষিণ দিকটা বেশ পরিষ্কার করে নেওয়া হবে।)

বর্ষার মুখে শালিখবাড়ির নদীটা পেটোয়া হয়ে উঠেছে।

ইলিশ মাছের জালে জালে নদীটা ভরে গেছে; পশ্চিম মুখে নদীর কোলঘেঁষা একটা সরু লাল রাস্তার দিকে তাকালেন চৌধুরী—বিশ পঞ্চাশটা ইলিশের নৌকা জমা হয়ে গেছে ওখানে—আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত টাউনটার নাড়ীনক্ষত্রে ইলিশের চালান সুরু হবে।

কুড়ি পঁচিশটা স্টিমার তিন চারটা বড় বড় জেটির কিনার ঘেঁষে নদীর (ঘাটের কাছাকাছি) ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে; দু'একটা কয়লাঘাটার দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছে ; সবসময়ই এম্নি অনেকগুলো স্টিমার এই ঘাটে মোতায়েন হয়ে থাকে; এখানকার এ ষ্টিমার ষ্টেশন এ অঞ্চলে খুব বড়।

কলকাতার এক্সপ্রেস ষ্টিমার ছাড়ল।

চৌধুরী মশায়ের চুরুট জ্বলতে জ্বলতে নিভে গিয়েছে আবার।

জ্বালালেন তিনি।

জমিদারবাড়ীর তেতলার কাছের আকাশটা ঘিঁষে কাকগুলো ভিলুন্দির জঙ্গলের দিকে চল্ল। পশ্চিমের গোলাপী পিঁয়াজী মেঘের ভিতর নলচের মত কালো কালো ঠোঁট মুখ পাখা নীচে সবুজ নাকি নীল জঙ্গল ধানক্ষেত রূপোর পৈঁছের মত নদী—শকুনের মেটে পাকা চিলের সাদা পেট সোনালি ডানা—রাত গাঢ় হয়ে নামবার আগে এইগুলো রঙের খেলা—রসের খেলাও বটে।

কিন্তু দু' এক মুহূর্তের শুধু—

শঙ্খচিলটা অন্তর্হিত হ'ল।

খানিকক্ষণ পরে পৃথিবী একটু চিমসে জ্যোৎস্না জোনাকী আর লক্ষ্মীপেঁচার দেশে এসে হাজির হয়েছে। (মন্দ নয়।) নিভন্ত চুরুটটা আবার জ্বালানো গেল।

চৌধুরী ভাবছিলেন ঃ বড় ছেলেটা বিলেত থেকে ফিরবে না আর তা হ'লে? আই-সি-এস পড়তে গিয়েছিল; কিন্তু আই-সি-এস পাশ করবার মতো চোপা তো তাব নয়; একটা টেকনিক্যাল কিছু শিখে এলে পারত; কিন্তু তাও তো এল না; এই আট বছরের ভিতর ফেরবার নামটি অব্দি করছে না; আগে খুলে লিখত টিখত; এখন হদ্দ লুকোচুরি করছে। তাকে আর টাকা পাঠাবেন তিনি?

গুণময়ীর জন্যই—নাহ'লে দু-তিন বছর আগেই তিনি টাকা বন্ধ কবে দিতেন।

ছেলেটা হয়তো বিলেতে বিয়ে করেছে; তাব স্ত্রী ছেলেপুলের ফোটোও নাকি কারু কারু কাছে পাঠায় সে—

না, টাকা আর তাকে পাঠাবেন না তিনি।

ছোট ছেলেটা হয়েছে কলকাতার এক লজ্জা ; এদ্দিনে বি-এস-সি হয়ে যেত। কিন্তু এখনো সেকেন্ড ইয়ারে রয়েছে; বাপের টাকায় সুখের পায়রার অনেক সুখই মেটাচ্ছে সে—কিন্তু গোলাপের তোড়া হাতে থিয়েটারের গ্রিনরুমে ঢুকে শালিখবাড়ীর ছোট কর্ত্তা না কি...ভাবতে ভাবতে চৌধুবী বেকুব হয়ে পড়লেন।

কিন্তু মেজ ছেলেটিব কথা ভাবলে মন বিধাতাব প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে—সে এখানে ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে প্র্যাকটিস করছে—বছরখানেক ধরে। এরি ভিতর জমিয়ে নিয়েছে।

চৌধুরী বলেছিলেন ঃ হাইকোর্টে যাবে?

একটু সবুর কর বাবা

একটু সবুর করে প্রসাদ হাইকোর্টে যাবে—হযতো পিউনী জজ হবে।

চৌধুরীর মন পরিতৃপ্তিতে ভবে উঠল।

(তারপব তিনি) নিজের মেয়েটিব কথা ভাবতে লাগলেন; কল্যাণী এবাব চোখের অসুখের জন্য আই-এ দিতে পারল না। তিনিই নিষেধ কবেছেন দিতে! আর কেন? পড়বার সখ—তা সে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঢের হয়েছে—ঢেব—এইবাব মেয়েটাব একটা কিছু স্থিব কবতে হবে।

দুই

চৌধুবী মশাই সন্ধ্যা-আহ্নিক কবেন না বটে, কিন্তু জীবনের প্রতি কাজে—প্রতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজেও পদে পদে বিধাতাকে মানেন তিনি। ভালো করলেও এ বিধাতাই কবেছেন, অমঙ্গল করলেও এ বিধাতারই না জানি কি নিগূঢ় ইঙ্গিত—এম্নি তার বিশ্বাস—অত্যন্ত স্পষ্ট—কেমন সবল—কি যে আন্তরিক—গভীর বিশ্বাস তার। (লোকটি) জানেন শোনেন অনেক; উনিশ শো এক সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে চৌধুবী বি-এ পাশ করেছিলেন। সেই থেকে পড়াশুনার ঢেব চর্চা নানা দিক দিয়ে করে এসেছেন। বাড়ীতে মস্ত বড় একটা লাইব্রেবী আছে—আজো নতুন নতুন মোটাসোটা বই ঢের আসে কলকাতার দোকানপাট থেকে—বিলেতের ফার্মগুলোর থেকে অব্দি; নানারকম দেশী বিলিতী নিবিড় ম্যাগাজিন আসে সব। এত চিন্তা যুক্তি গবেষণাব আবহাওযা মানুষের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের তাল খসিয়ে উড়িয়ে ফেলে—কিন্তু তবুও চৌধুরী আজো কোনো কথা কাজ বা ব্যবহাবের ধাপ্পাবাজি ভোজবাজি গোঁজামিলের ভিতরে নেই,—মানুষেব মনের অতি উৎসুক চিন্তা ও প্রশ্ন যেন বারবধূদের মত (নয় কি?)—সে সবের হাত থেকে তাঁব ধর্ম্মকে বক্ষা করেন তিনি, ন্যাযকে বক্ষা করেন, নিজের বিধাতাকে রক্ষা করেন।

যেন কখনো কোনো ব্যভিচাব না হয—অবিচার না হয় যেন—মঙ্গলময় ভগবান জীবনের পদে পদে প্রতিফলিত হয়ে চলেন যেন—চৌধুরী মশাই খুব খাঁটি আগ্রহে নিজের মনকে অনেক সময়ই এই সব কথা বলেন।

কল্যাণী কলকাতার থেকে এসেছে; ছোট ছেলে কিশোরও এসেছে। একদিন বিকেলবেলা প্রসাদ কোর্টের থেকে ফিরে বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে চুরুট টানছিল।

বাবা এসে আরেকটা ইজি চেয়ারে বসলেন।

প্রসাদ চুরুটটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল

চৌধুরী বললেন—তা খাও; আমিও তো খাই। লাঙ্গস আমাদের দু'জনেরই ভাল আছে।

সূচীপত্রে যান

হাসলেন।

নিজেও চুরুট বের করলেন।

প্রসাদও টানতে লাগল।

চৌধুরী বললেন—এ বার কাজের কথা।

প্রসাদ বাবার দিকে তাকাল

'তোমার দাদাকে আর টাকা পাঠাব না ঠিক করেছি'

প্রসাদ চুপ করে রইল: সে তো বরাবরই বাবাকে বলে এসেছে দাদাকে টাকা পাঠান মানে জমিদারি আস্তে আস্তে গুটিয়ে ফেলা; প্রজারা খাজনা দিতে চায় না, গভর্ণমেন্টকে রেভিনিউ দিতে হচ্ছে, সম্পত্তি ভেঙে খেতে হচ্ছে—ওকালতী করতে বাধ্য হতে হচ্ছে—অনেক কিছুই দাদার খুশখুবির জন্য।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—অন্যায় হবে প্রসাদ?

প্রসাদ বল্লে—একেবারেই ওকে একটা পয়সাও আর কোনোদিন তুলে দেবে না এইটে আগে ঠিক করতে পার যদি—(তারপর কথা।)

পঙ্কজবাবু একটু স্থির থেকে বললেন—কি করে আর দেই?

প্রসাদ বললে—স্টেটে টাকা নেই বলে?

—না, তা নয়।

—তবে কি বাবা?

—টাকা এখনও—টাকা বিজলীকে পাঠাবার ক্ষমতা এখনও দু-চার বছর বেশ আছে আমার—কিন্তু—

পঙ্কজবাবু থামলেন—

প্রসাদ বল্লে—তা হ'লে দু'চার বছর আরো পাঠাও

—তা পাঠাব না।

প্রসাদ একটু হেসে বল্লে—ওর চিঠি পেলে তোমার মন খুব উসখুস করবে না বাবা? কোনো কল্পিত সঙ্কল্পই টেকে না আর তোমার। দাদা খুব চমৎকার চিঠি লিখতে পারে।

—ওর চিঠি এবার আর পড়বও না আমি—কেবল্ পাঠালে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

প্রসাদ ঘাড় হেঁট করে চুরুটটার দিকে তাকাচ্ছিল।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—এইই ঠিক হবে।

তাঁকে খুব দূর মনে হ'ল।

প্রসাদকে বল্লে—তোমার মাকে বলিনি।

—কি দরকার বলবার?

—মিছেমিছি কেন আর?

—অন্যায় হবে না?

—কিসে বাবা?

—এই যে তোমার মার কাছে গোপন করলাম—অন্য কাউকে বলিনি—অন্যায়? Not sending money—অন্যায়?

প্রসাদ চুরুটের মুখের থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলে কিছুক্ষণ ক্লান্ত হয়ে বসে রইল। পরে বল্লে—আমাদের খেতে হবে তো?

—তাই তো।

—কিশোরকে দেখতে হবে, কল্যাণীর কথা ভাববার রয়েছে—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—না, না, অন্যায় হবে না কিছু। কত ছেলে মরে যায় মা'রা সহ্য করে না?

বল্লেন—আমি তো মনে করি বিজলী মরে গেছে—তোমার মাও সেরকম ভাবতে পারবেন না?

প্রসাদ বল্লে—না যদি পারেন তিনিও মরে যাবেন—

পঙ্কজবাবু বিস্মিত হয়ে প্রসাদের দিকে তাকালেন।

প্রসাদ বল্লে—কিন্তু তিনি মরবেন না। কে কার জন্য মরে?

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল—

প্রসাদ বল্লে—কিন্তু মা যেন এ সবের একটুও আঁচ না পায়, —তা হলে খুঁচিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে

দিযে টাকা পাঠিয়ে ছাড়বে—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—তা বটে—

প্রসাদ বল্লে—ঘোঁট আর কোরো না কিছু—টাকাটা বন্ধ করে দিযে—

গুণময়ী এক মুহূর্তের জন্য এসে দাঁড়ালেন—শাড়ীতে হলুদ লঙ্কার চ্যাপসা, হাত পা গাযে মশলাব গন্ধ মাছের মিষ্টি আঁশটে গন্ধ—একেবারে বান্নাঘরের থেকে ছুটে এসেছেন—

প্রসাদের দিকে তাকিয়ে গুণময়ী বল্লেন—একেবারে তিনটে রুইমাছ ভেট পাঠিযেছে

—কারা মা!

ঘোষালবা

স্বামীর দিকে তাকিযে বল্লেন—এক একটা রুই যেন এক একটা সোমথ মানুষের বাচ্ছা—এমন তরতাজা মাছ—আহা কাটতেও কষ্ট হয—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—তা হ'লে কাট কেন

—আহা, এক দিন ভালো করে মাছের কালিযা হল না। যাই—আমি না বাঁধলে আবাব ঐ বামুনের রান্না খেতে পারবি প্রসাদ?

প্রসাদ মাথা নেড়ে বল্লে—তা পারব না আমি

গুণময়ী বল্লেন—আহা, বিজলীও পাবত না—

প্রসাদ ফু ফু করে হেসে বল্লে—আজ খৃষ্টানের রান্না খাচ্ছে—

গুণময়ী হতাশ হযে বল্লেন—সে কি বকম বান্না বে?

—সে কি রান্না! সব সেদ্ধ—শালগম সেদ্ধ—মুলো সেদ্ধ—বিট সেদ্ধ—স্যালাড—আধসেদ্ধ মাছ—আঁশটে

গুণময়ী একটা খোঁচা খেয়ে অন্ধকাবের মধ্যে অন্তর্হিত হযে গেলেন।

পঙ্কজবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে বইলেন—

পরে বল্লেন—মেম বিযে করেছে দেশে আসতে চায না, মা বাবা ভাই বোন কারু কাছে একখানা চিঠি অব্দি না—আমাব কাছে শুধু সেই টাকাকড়িব চিঠিগুলো ছাড়া—এ কেমন?

প্রসাদ বল্লে—কেমন অস্বাভাবিক যেন।

—আমাদেব এষ্টেট তো খুব বড় নয—নানা দিক দিযেই জড়িয়ে গেছে—তাব ওপব নবাবেব হালে এই আট বছর ওকে টাকা পাঠালাম—ও যা পেত তাব চেযে ঢেব বেশী ওকে দেওযা হয়ে গেছে—

পঙ্কজবাবু থামলেন—

তারপব বল্লেন—কাজেই দ্বিধার কিছু নেই—যদি আমি—

প্রসাদের দিকে তাকিযে বল্লেন—না প্রসাদ?

কিন্তু মন যেন পঙ্কজবাবুব সায পাচ্ছে না—কোথায যেন কেমন কি খোঁচ থেকে যায—

মনেব এই সঙ্কোচ বাঁধাকে পেড়ে ফেলবাব চেষ্টা কবে বল্লেন—টাকা পাঠালেই বা হবে কি—কোনো ভালো কাজে তো নয—থিযেটার বেসে ওড়াবে। তা ছাড়া, নিজে সে ঢেব বড় হযেছে এখন; নিজেব ঘাড়েব দাযিত্ব এখন ভালো কবে বোঝা উচিত তার। নিজেব রোজগার কবা উচিত তাব। না করতে পারে—আসুক এখানে—আমবা দেখব সব। নাহ'লে এক পযসাও পাঠাব না।

(পরদিন পঙ্কজবাবু প্রসাদকে বল্লেন—সব বুঝিযে সুঝিযে বিজলীকে আব এক খানা চিঠি লিখলাম এই। না যদি শোনে, আব টাকা পাঠাব না। এ বাব দেড় হাজাব পাঠালাম—আধাআধি কমিযে দিযেছি—

কিন্তু কযেক দিন পবে আরো দেড় হাজাব পাঠিযে দিলেন তিনি।)

পর দিন সকাল বেলা প্রসাদ ছাড়া আব সকলেই ছিল তেতলাব পূব দিকেব বাবান্দায।

কল্যাণী বল্লে—বাবা, ন্যাওতাব মাঠ কেন বলে? ন্যাওতা মানে কি?

—কী জানি।

কিশোর বল্লে—শব্দটা কি আরবী না ফাবসী না ইংবেজী—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—জানি না

কল্যাণী বল্লে—কোনো ডিকশনাবিতে এব মানে পাবে না ছোড়দা—

—তবে ন্যাওতার মাঠের মানে কি?

—সত্যি, ন্যাওতাব মাঠ ওটাকে বলে কেন

সূচীপত্রে যান

—কি অদ্ভুত শব্দ

—কোনো মানে নেই—কি বিশ্রী

পঙ্কজবাবু অবিশ্যি মানেটা জানতেন—(অন্ততঃ) যে প্রবাদ অনেক দিন থেকে এ মাঠের সম্পর্কে এ অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে এসেছে তার সমস্তটুকুই জানতেন তিনি। কিন্তু সে সব কাহিনী বলতে গেলে পূর্বপুরুষদের দু'একটা গ্লানি বেরিয়ে পড়ে—কাজেই বল্লেন না কিছু।

কল্যাণী বল্লে—ভিলুন্দির জঙ্গলই বা কি?

—তাই তো—

—আমি অনেক দিন ভেবেছি—কোনো মানে বের করতে পারিনি—

—আমিও না

কিশোর বল্লে—ভিলুন্দি বলে আবার একটা শব্দ আছে না কি কোথাও?

কল্যাণী বল্লে—ছাই আছে।

একটু পরে ঃ কোনো ডিকশনারিতে পাবে না তুমি ছোড়দা

কল্যাণী বল্লে—কত সুন্দব সুন্দর নাম দিতে পারত না ছোড়দা? তা না ভিলুন্দিব জঙ্গল—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—আচ্ছা বেশ।

বল্লেন—ও নাম আমার কাছে ঢেব সুন্দর শোনায়।

এই জঙ্গলেব সম্পর্কেও অনেক দিন থেকে একটা কাহিনী চলে আসছে; কিন্তু নানা কারণে সেই গল্পটাও এদেব কাছে আজ তিনি পাড়তে পারলেন না।

কল্যাণী বল্লে—মোটের ওপর এ জায়গাটা আমার ভালো লাগে না—

পঙ্কজবাবুব হাত থেকে খবরের কাগজ আস্তে আস্তে তাঁর কোলেব ওপর পড়ে গেল—

কল্যাণীব দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে তিনি বল্লেন—ভালো লাগে না নাকি? এ জায়গাটা তোমাব ভালো লাগে না কল্যাণী?

—নাঃ!—

—কেন?

কল্যাণী বল্লে—বড্ড পাড়াগাঁব মত—

কিশোব বল্লে—হ্যাঁ, একটা ডিষ্ট্রিক্ট টাউন—জজ ম্যাজিষ্ট্রেট 'পুলিশেব হেড কোযার্টাব ওন্নি পাড়াগাঁ বলে দিলেই হল আব কি!

কল্যাণী বল্লে—তা হো'ক গে—

গুণময়ী বল্লেন—তা ছাড়া মেযে আমাব এই কলকাতা থেকে নেমেছে. আহা, একটু একলাটি লাগবেই তো!

পঙ্কজবাবু বল্লেন—আমাদের এ দিক্‌টা আবাব একেবারে শহবেব এর প্রান্তে কি না—

কল্যাণী বল্লে—কি কেবল দিনরাত ঘুঘু ডাকে—আমাব ভালো লাগে না—

কিশোব হেসে উঠল—

বল্লে—সেই হবিণ মাবার রাইফেলটা নিযে এক বার বেরুতে হবে—জান মা, আমি লিলুযাতে গিযে প্রায়ই পাখী মারি—ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুর্গী, বালিহাঁস—হাত বেশ পেকে গেছে এখন—

কিশোবেব কথায় কেউ কান দিচ্ছিল না—

গুণময়ী বল্লেন—তুমি কেন দিনরাত ঘুঘুর ডাক শুনতে যাও কল্যাণী

—বাঃ মাব যেমন কথা ঘুঘু ডাকবে, আমি শুনব না?

কিশোর বল্লে—তুমি বুঝি শোন না মা?

পঙ্কজবাবু বল্লেন—কৈ, আমার তো ঘুঘুব ডাক খাবাপ লাগে না।

গুণময়ী বল্লেন—আমারও না।

কিশোর বল্লে—তা তোমরা গেঁযো বলে

পঙ্কজবাবু বল্লেন—বাস্তবিক

কল্যাণী বল্লে—এমন টেনে টেনে ডাকে; সারাদিন—সাবা দুপুব—শুনতে শুনতে আমার কিছু ভালো লাগে না আর—তার ওপর ক্যারম বোর্ড নেই; তাস খেলব কাদেব নিয়ে—কেউ নেই—সে বকম কোনো লোকজন নেই, একটু সিনেমা দেখতে পাবা যায় না, থিযেটার নেই. গান নেই—সব সময়ই ঘবদোব

এমন থম থম করছে।

কিশোর হো হো করে হেসে উঠল—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—তুমি তাহ'লে, ক্যারম খেলতেও শিখেছ—?

কল্যাণী বল্লে—কবে শিখেছি!

—বোর্ডিঙে গিয়ে?

—বাঃ, এখানেই তো—

—এখানে?

—বাঃ, ছোড়দার একটা বোর্ড ছিল—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—ওঃ—

বল্লেন—বিলিয়ার্ডস খেলতে জান কল্যাণী?

—না।

—কলকাতায় খুব বায়োস্কোপ দেখতে?

—হ্যাঁ

—কার সঙ্গে যেতে?

—কল্যাণী একটু ফাঁপরে পড়ল—

বল্লে—মেয়েদের সঙ্গেই যেতাম

—তা যেতে দেয়—

—দেয়—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—আর থিয়েটার?

থিয়েটারেও সে গিয়েছে বটে ঢের—ছোড়দা আর তার বন্ধুদের সঙ্গে—কিন্তু সে সব কথা চেপে গেল কল্যাণী।

বল্লে—না, থিয়েটাবে আমি যাই নি বাবা।

—কোনো দিনও না?

—না

—তবে যে বলছিলে?

কল্যাণী বল্লে—বল্লামই তো যাইনি

—কেন যাওনি

—তোমাব অনুমতি না নিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি না—তাই—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—এবার আমি যদি অনুমতি দেই তাহ'লে যাবে?

কল্যাণী দু'এক মুহূর্ত্ত চুপ থেকে বল্লে—আমি আরো বড় না হ'লে তুমি কি অনুমতি দেবে বাবা?

পঙ্কজবাবু একটু থেমে বল্লেন—হয়তো আমি কোনোদিনই তোমাকে অনুমতি দেব না—থিয়েটাব দেখতে।

কল্যাণী একটু বিস্মিত হল, আঘাত পেল, কিন্তু মুহূর্ত্তেব মধ্যেই সে সব মুছে গেল তাব; বাবা থিয়েটাব দেখতে বারণ করলে বিশেষ কিছু আসে যায় না, টিকিট কাটবার পয়সা থাকলেই হয—জীবনেব এমন এক রকমেব সত্যকে তার ভাইদের সঙ্গে সেও অধিগত করেছে। অধিগত করতে গিয়ে পঙ্কজবাবুর ছেলেমেয়েদের মধ্যে কল্যাণীকেই সব চেয়ে বেশী বেগ পেতে হয়েছে—অধিগত ক'রেও তারই সবচেয়ে কম শান্তি। কিন্তু তবুও সংস্কারহীন গণ্ডীহীন সুবিধাবাদের জীবনকেও সেও আযত্ত করেছে—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—তোমার বাপ মা ভাইদের মধ্যে এসেও যে তোমার ভালো লাগে না—একটা ক্যাবাম বোর্ড তাস বায়োস্কোপ গল্প গুজব গান কলকাতার সব আনুষাঙ্গিক না হলে তোমার যে চলে না এমনতর মনের ভাবটাকে তোমাব পরিত্যাগ করতে হবে। এখানেই তোমার মন বসাতে হবে। তোমার জন্য একটা ক্যারাম বোর্ড কিনে দেব না আমি, তাসও খেলতে পারবে না, এখানে একটা বায়োস্কোপ হল হয়েছে সেখানেও যেতে দেব না তোমাকে আমি—কিন্তু—

কল্যাণী কাঁদছিল—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—কিন্তু তোমার মা যেমন এই বাড়িতে বসে ঢের পরিতৃপ্তি পাচ্ছেন সে রকম একটা তৃপ্তি ধীরে ধীরে বোধ করা তোমার পক্ষেও সম্ভব হবে।

সূচীপত্রে যান

কল্যাণী চোখের জল মুছতে লাগল—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—এখানে কোনো অশান্তি নেই তো—ভালো লাগবে না কেন তোমার?

বল্লেন—শালিখবাড়ী তোমার ভালো লাগে না—তোমার বাপ-মা ভাইদের ভিতরে এসেও তোমার ভালো লাগে না—এমন কথাও তুমি বলেছিলে।

কল্যাণীর আবার কান্না এল, কিন্তু জোর করে নিজেকে নিরস্ত করে রাখল সে।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—তুমি এদ্দিন চাল যা শিখেছ ভুল শিখেছ—

সকলেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। পঙ্কজবাবু আবার বল্লেন—সব ভুল শিখেছ—

কল্যাণীর মনে হল তার বাবাই ভুল শিখেছেন—কত বড় বড় লোক থিয়েটার দেখে, বায়োস্কোপ দেখে, নাচ গান মজলিসে ফূর্ত্তি করে, এ রকম একটা পাড়াগাঁয় এলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে—তাদের কি ভুল শিক্ষা? কক্ষণো না। তার বাবাই যেন কেমন কঠিন ধরণের মানুষ—

কিশোরের মনে হ'ল কল্যাণী তো ঠিকই বলেছিল, এ জায়গা আবার ভালো লাগে কার? কোনো ভুল করেনি—তার বাবার শিক্ষাই অসম্পূর্ণ।

গুণময়ী ভাবছিলেন, আহা, মেয়েটাকে মিছেমিছে কাঁদাচ্ছেন কেন।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—শুধু কলেজে পড়লেই হয় না, ডিগ্রি নিলেই হয় না—বই তো আমিও ঢের পড়েছি—

থামলেন।

বল্লেন—মস্ত বড় একটা লাইব্রেরী রয়েছে আমার—

বল্লেন—অনেক বড় বড় লেখকদের অনেক বই আছে। তারা নাকি চিন্তাশীল—মনীষী—ঋষি—কত কি। কিন্তু যত অদ্ভুত কথা তারা বলেছে সেই সব যদি মানতাম তা হলে একটা মস্ত বড় ব্যভিচারী জমিদার হতাম আমি আজ—অনাচারকেও ধর্ম্ম মনে করতাম। কিন্তু সে সব ভুল।

অনেকক্ষণ বসে শিক্ষার ব্যাখ্যা করলেন তিনি; ছেলেমেয়েদের শেখালেন ধর্ম্ম কি, নীতি কি, ধর্ম্ম নীতি চরিত্র ছাড়া যে কোনো শিক্ষা হতে পারে না বল্লেন তা, বিধাতা যে কি রকম মঙ্গলময় কত মঙ্গলময় খুলে বল্লেন।

আগাগোড়া সমস্ত কথার মধ্যেই এর ঢের আন্তরিকতা—আগ্রহ ছিল। কিন্তু এর একটা কথাও গ্রাহ্য করল না ছেলেমেয়েরা, গ্রাহ্য করল না।

তাদের মনে হ'ল বাবার চেয়ে জীবনটাকে তারা ঢের বেশী বোঝে। কল্যাণীর মনে হল বাবার মনে কষ্ট না দিয়েও তো থিয়েটার দেখা যায়—বাবা না জানলেই হ'ল; কলকাতায় যেমন সে বরাবর চলে এসেছে তেম্নিই চলবে। বাবার উপদেশ শুনবার পর নিজের রকমটাকে কোনো দিক দিয়ে কোনো ভাবে বদলাবার কোনো তাগিদ বোধ করল না কল্যাণী। জীবনটাকে সে নিজের রুচি অনুসারে চালাবে—বাবা হয়তো একটু আধটু কষ্ট পাবেন; কিন্তু প্রায়ই তো জানবেন না তিনি। কল্যাণীর লুকোচুরির সম্বন্ধে পঙ্কজবাবু যাতে কোনো দিনও কিছু না জানতে পাবেন মনে মনে তারি নানা রকম দুঃসাধ্য উপায় বাৎলাচ্ছিল মেয়েটি। মন তার হায়রান হয়ে উঠেছিল। এক সময় মনে হল: বাবা তো চিরকাল বেঁচেও থাকবেন না।

তিন

আষাঢ় মাস—কিন্তু ঠিক যেন কার্ত্তিক মাসের আকাশ—এমনই নীল—এমনই পরিষ্কার—ন্যাওতার মাঠের দিকে তাকালেও চোখ জুড়িয়ে যায়

আর ভিলুন্দির জঙ্গল—এমন গাঢ় সবুজ—গাঢ় নীল—রোদের সোনার গুঁড়ি জঙ্গলটার মাথার ওপর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত একটা জরির পাড়ের মত চলে গিয়েছে যেন—কোন্ পরীদের যেন—এমন বিচিত্র।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—কল্যাণী এখনো ঘুমোচ্ছ—

মেয়ের মাথার ওপর হাত রাখলেন তিনি—

বল্লেন—আর ঘুমোয় না—

কল্যাণী ঘুমের গলায় বল্লে—বাবা আমি এখন উঠব না

—কেন?

—আমার ঘুমোতে ভালো লাগছে

সে পাশ ফিরল।

একটা কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে অলসতার নিবিড় আরামে মেয়ের সমস্ত দেহ ভরে উঠছে আবার পঙ্কজবাবু দাঁড়িয়ে দেখলেন—

গুণময়ী ছিলেন; বল্লেন—থাক্—ও ঘুমোক্।

পঙ্কজবাবু সে কথায় কোনও কান না দিয়ে আস্তে আস্তে গিযে পুবের দিকে জানালাটা খুলে দিলেন—চড়চড়ে রোদে কল্যাণীর চোখ মুখ মাথা পুড়ে উঠল যেন।

কল্যাণী বিছানার ওপর উঠে বসে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে বল্লে—বাবা, তোমার এই কাজ।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—অনেক ঘুমিয়েছ তুমি—

তিনি আবো যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন—কল্যাণী নাক মুখ খিঁচিযে বল্লে—অনেক ঘুমিয়েছি তাতে তোমার কি বাবা।

গুণময়ী বললেন—খেঁকি হোস্ না

তুমিও আমাব পেছনে লেগেছ মা

—এত দেরী করেই বা তুই উঠিস কেন?

—যটার সময় খুসি তটার সময় উঠব, তাতে তোমাদের কি?

পঙ্কজবাবু বল্লেন—নাও, এখন ওঠো, বিছানা ঝেড়ে ঘর গুছিযে একটু লক্ষ্মী মেয়ের মত হও।

কল্যাণী বল্লে—আমি উঠব না।

পঙ্কজবাবুর সাক্ষাতেই শুয়ে পড়ল সে।

গুণময়ী বল্লেন—থাক্।

কিন্তু কল্যাণী উশখুশ করে সবার চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেই উঠে বসল আবার। উঠে বসল, চুপ করে নখ খুঁটতে খুঁটতে

বল্লে—বিছানা আমি ঝাড়তে পারব না।

গুণময়ী বল্লেন— আমি ঝেড়ে দেব যা—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—না, তোমার নিজেরই ঢের কাজ আছে—মেযেব কাজের জন্য তোমাকে আমি আটকে রাখব না—

কল্যাণী বল্লে—ঝিটা আছে কি করতে? ওসমানকেই বা কিসের জন্য রাখা?

পঙ্কজবাবু বল্লেন—তাদের কাজ আছে—

কল্যাণী গরগব করতে করতে বিছানাটা ঝাড়ছিল—ঝেড়েঝুড়ে বিছানাটা পাট কবতে কবতে বল্লে—কাজ না হাতী! ওসমানটার আবার কাজ! মেজদার বিছানা রোজ সাফ কবে পাট করে দিচ্ছে—আর আমার বেলাই সব—

গুণময়ী বল্লেন—তোব মেজদার সঙ্গে তার কি কথা!

—ছোড়দারও তো

গুণময়ী বল্লেন—তারা তোমার চেয়ে বড়—

—তা বলছ কেন? বল যে তারা ছেলে সেই জন্যই তাদের সব দিক দিয়েই সুবিধে—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—সে কথা সত্য নয় তো কল্যাণী

কল্যাণী বাপের দিকে তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলতে যাচ্ছিল 'সত্য নয়? সত্য কি মিথ্যা আমি জানি না তো?' কিন্তু এমন কান্না পেল তার—বাপের সঙ্গে এই সব নিয়ে তর্ক করা এমন নিরর্থক অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল যে ঘাড় হেঁট করে অত্যন্ত স্তব্ধ হয়ে ঘরের কাজ করে যেতে লাগল সে।

গুণময়ী বল্লেন—এই তো লক্ষ্মী মেয়ে—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—কিন্তু একদিন লক্ষ্মী হলে তো চলবে না—রোজই এই রকম করতে হবে

গুণময়ী বল্লেন—তা রোজই হবে—

পঙ্কজবাবু বল্লেন—এখন আটটা বেজেছে জান কল্যাণী—

কল্যাণী অধোমুখে অস্ফুট স্বরে বল্লে—বাজুক

সে কথা গুণময়ী বা পঙ্কজবাবু কারু কানেই প্রবেশ করল না।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—তোমার মা সাড়ে চারটার সময় উঠেছেন—আমি উঠেছি পাঁচটার সময়—আর তুমি ঘুমোলে আটটা অব্দি—

কল্যাণী কিছু বল্লে না।

সূচীপত্রে যান

পঙ্কজবাবু বল্লেন—এম্নি তো একদিন নয়, কলকাতা থেকে এসে অব্দি রোজই এইরকম অনাচার করছ তুমি—

কল্যাণী চুপ করে রইল।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—বোর্ডিঙে ক'টার সময় উঠতে?

—আটটা ন'টা—শীতকালে দশটার সময়ও উঠেছি।

পঙ্কজবাবু এক আধ মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত থেকে বল্লেন—এ তাবা সহ্য করে? এর জন্য কোনো প্রতিবিধান নেই তাদের? কোনো শাস্তি নেই?

কল্যাণী গর্ব্বের সঙ্গে বল্লে—না।

—রোজ্জি এমন দেরী করে উঠতে তুমি?

—হ্যাঁ

গুণময়ী বল্লেন—আর সব মেয়েরা?

—যে যখন খুসি উঠত।

বোর্ডিং যে এ বাড়ির চেয়ে ঢের স্বাধীনতা ও ঢের তৃপ্তির জায়গা বাপ মাকে সে কথা বুঝতে দিযে কল্যাণী মর্য্যাদা বোধ করতে লাগল, হৃদয় তার প্রসন্ন হয়ে উঠল।

পুবের দিকের জানালাটা বাবা খুলেছিলেন। কল্যাণী এবার জানালাটাব কাছে গিয়ে দড়াম করে সেটা বন্ধ করে তারপর নিজের হাতে ধীবে ধীবে সেটা খুলে দিল মেলে দিল বাবার চেয়ে ঢের নিপুণতা ও দৃঢ়তাব সঙ্গে।

মন তার তৃপ্ত হয়েছে।

অভিযোগের বিশেষ কিছু নেই এখন আর।

চার

সেদিনই—বেলা নটার সময়।

কল্যাণী দোতলার বাবান্দায় ইজিচেযাবে বসে কি যেন পড়ছিল।

গুণময়ী বল্লেন—কি পড়ছিস রে?

—একটা নভেল।

—তোর বাবা তোকে ডাকছেন—

—আমি পড়ছি

গুণময়ী একটু বিস্মিত হয়ে বল্লেন—পড়ার বই তো নয়—

—তা নাই বা হোক পড়ছি তো—

—বাঃ

—আমি যাব না

—আঃ কি যে বলে কল্যাণী।

—বলো গিয়ে বাবাকে যে আমি যেতে পারব না

—দিক কবিস নে—চল্—বাগানে অপেক্ষা করছেন

—কোথায অপেক্ষা করছেন?

—বাগানে

—বাগান আবার কোথায? বাগান! একটা কামিনী গাছ আব দু'টো বকুল গাছ নিযে বাগান! ক্যানাব ঝাড় নিযে বাগান! বাগান!

কল্যাণী উঠে দাঁড়াল—

বল্লে—কিসেব জন্য ডেকেছেন?

—জানি না।

—চুরুট খাচ্ছেন তো?

—কি যে বলিস কল্যাণী

কল্যাণী বল্লে—নিজের বেলায বাবার কিছুতেই কিছু না—আর একটু ঘুমুচ্ছিলাম বলে তিনি আমাকে বল্লেন কলকাতার থেকে এসেই অনাচার আরম্ভ করেছ—অনাচার শব্দের মানে কি তা তিনি জানেন যে

বড় নিজের মেয়েকে অনাচারী বলছেন

বাগানে ধীরে ধীরে গেল কল্যাণী—মার সঙ্গে। একটা বকুল গাছের নীচে বেতের চেয়ারে বসেছিলেন পঙ্কজ বাবু।

গুণময়ী বল্লেন—তা যা; তা যা। জমিদার মানুষ—একটু চুরুট খান। কিন্তু এই ত্রিশ বছর ধ'রে তো আমি দেখে আসছি—এ ছাড়া আর কোনো বদ অভ্যাসই তাঁর নেই। এমন সৎ ধার্মিক লোক আমি আমার জীবনে দেখিনি—

গুণময়ীকে বল্লেন—আচ্ছা যাও তুমি।

গুণময়ী অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

বেতের চেয়ার মোড়া ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিল কয়েকটা; কল্যাণী একটাতে বসল।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—তুমি কলকাতায় যাবে কি আর?

—কেন যাব না?

—পরীক্ষা দেবে?

—নিশ্চয়ই দেব বাবা

—বলেছিলে যে তোমার চোখের অসুখ হয়েছে—

—তা হয়েছিল—

—কৈ, চশমা তো দেখছি না

—সে রকম অসুখ নয়—

পঙ্কজবাবু বুঝতে পারছিলেন না—

কল্যাণী বল্লে—সাধারণতঃ স্মেলিং সল্ট শুঁকতাম; কপালে উইন্টো ঘষতাম; ক্যাফি অ্যাসপিবিন কয়েক ফাইল খেয়েছি; নিউরেলজিয়া হয়েছিল—

—নিউবেলজিয়া?

—হ্যাঁ বাবা।

—চোখ খারাপ হয়নি?

—না বাবা।

—চোখে স্পষ্ট দেখতে পাও?

—পাই তো

—পড়তে গিয়ে কোনো কষ্ট হয় না?

—না।

—চশমা লাগবে না তা হ'লে?

—না

—চোখের অসুখ নয় বলছ?

—না, চোখের অসুখ নয়—

—ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

—না, কি দরকার?

—আচ্ছা চলো আজ এক ডাক্তারের কাছে—

—এখানে?

—হ্যাঁ, আই-স্পেশ্যালিষ্ট তিনি

কল্যাণী বল্লে—আমি বল্লামই তো চোখের অসুখ নয়—

—দেখানো ভালো

—এই গেঁয়ো হাতুড়ের কাছে? তা হবে না।

কল্যাণী বল্লে—চোখ কি মানুষের এতই সস্তা?

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—অকুলিষ্ট—বিলেত থেকে পাশ করে এসেছেন—

কল্যাণীর একটু সম্ভ্রম হ'ল ঃ বল্লে—তবুও—কলকাতায় গিয়ে দেখালে ভাল হত না?

পঙ্কজবাবু বল্লেন—আমার গাড়ী ঠিক রয়েছে—তুমি চল

—এখুনি?

—হ্যাঁ

দু'জনেই গেল।

এগারোটার সময় বাড়ীতে ফিরে এসে কল্যাণী বল্লে—আমার এত যে চোখ খারাপ তা তো বুঝিনি বাবা—

গুণময়ী বল্লেন—খুব খারাপ?

পঙ্কজবাবু বল্লেন—চোখ দু'টো আধাআধি নষ্ট হয়ে গেছে—

গুণময়ী অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে বল্লেন—অন্ধ হবে না তো?

কল্যাণী হো হো করে হেসে উঠল।

বল্লে—কি বল যে তুমি মা! দেখ তো বাবা মা কি রকম ভয় পেয়ে গেছে—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—তোমার মাইনাস সেভেন—ডাবল লেন্‌স্ লাগবে—অ্যাষ্টিগ্‌মাটিজম্ রয়েছে—

কল্যাণী বল্লে—কিন্তু এত সব কি করে হ'ল—আমি কেন বুঝিনি বাবা?

পঙ্কজবাবু একটা ঢোক গিলে একটু পরে বল্লেন—সেই জন্যই তো তোমাকে আর ছেড়ে দেব না ভাবছি—

—তার মানে?

—আর পড়াশুনা ক'রে কি কববে কল্যাণী?

—সে কি কথা বাবা!

গুণময়ী বল্লেন—ঠিকই তো বলেছেন উনি—এমন চোখ নিয়ে তুমি কি পড়বে আব—

—আমি পড়বই।

পঙ্কজবাবু বল্লেন—বাড়ীতে বসে এক আধটু পড়তে পাব—

আমি কলেজে পড়ব।

পঙ্কজবাবু হেসে বল্লেন—না তা পড়বে না; তাব কোনো প্রযোজন নেই।

বাবাব মুখে কেমন একটা নিরেট নির্ম্মম শাসন দেখা দিল—সেই সকাল বেলাকাব মত, যখন বিছানার থেকে কল্যাণীকে উঠতেই হল—

কল্যাণী বল্লে—না, না, আমি ছোড়দাব সঙ্গে কলকাতায় যাবই

—তাই বল—কলকাতায় যাবে; (কলকাতায় যাবে—কোনো নিয়মেব ভিতব থাকবে না—) ফূর্ত্তি কববে,—কিন্তু পড়াশুনা তোমাব আব হবে না।

কল্যাণী আঁচল কামড়ে ধরে বল্লে—আমি পাশ করবই—

গুণময়ী শঙ্কিত হয়ে বল্লেন—পাশ! সেই গুষ্টিব বই গেলা বসে বসে আব চোখ খোযানো!

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—পাশ না করলেও তোমাব চলবে।

কেমন নির্ম্মম হৃদয়হীন ভাবে বল্লেন তিনি।

কল্যাণী কাঁদ কাঁদ বল্লে—এ কি কথা তোমরা সকলে মিলে বলছ আমাকে!

সে কেঁদে ফেল্ল—

গুণময়ী বল্লেন—থাক্, যেও কলকাতায়—কিন্তু

পঙ্কজবাবু কল্যাণীব ঘাড়ে হাত বেখে তাকে বুকেব কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন—না, মেয়ে আর কলকাতায় যাবে না; বাবার কাছে থাকবে—মাযেব কাছে থাকবে—চোখ ভালো হয়ে যাবে—

কল্যাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—আমি যাবই—আমি কলেজে পড়বই—আমি পাশ করবই—

শেষ পর্যন্ত সে কলকাতায় গেল বটে।

পাঁচ

বাস্তবিক কল্যাণীদের বোর্ডিঙটা মন্দ নয়—

মিশনাবি মেমদের কেয়াবে মস্ত বড় নিরিবিলি বাড়ীতে—আলো বাতাস মাঠ খেলা উঁচু উঁচু গাছ ক্রোটন ফার্ণ লতাপাতার ভিতর মন্দ থাকে কি তারা?—বিশেষতঃ বাবা যখন দেড় শো টাকা কবে মাসে পাঠান—ছোড়দা যখন সব সময়ই মোতাযেন—গল্পগুজব বন্ধুসংসর্গের আঁটি চুষতে কল্যাণী যখন এত ভালোবাসে।

কিন্তু এবার কলকাতায় এসে প্রথম দিনটা কল্যাণীব খুব কষ্ট লাগল—শালিখবাড়ী ছেড়ে ষ্টিমারে উঠে অব্দি তার মন চুনমুন করছে—ভালো লাগছে না কিছু—আবার বাড়ী ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—বাবা মার জন্য কষ্ট হয়

ষ্টিমারে কাঁদল সে।

কিশোব যখন ষ্টিমারে সেলুনে নিয়ে গিযে কল্যাণীকে ডিনার খাওয়াল—নিজে খেলে—তখন মনটা তার কিছুক্ষণের জন্য তাজা হযে উঠেছিল—

কিশোর হুইস্কি খেলে—সোডার সঙ্গে মিশিযে কল্যাণীকে বল্লে—দেখ কি খাই—

কল্যাণী বল্লে—ছোড়দা, ছিঃ!

কিশোর বল্লে—তুই খাবি? খা না—

কল্যাণীকে সোডার গেলাসটা এগিযে দিল সে—আধ পেগ আন্দাজ হুইস্কি ঢেলে।

কল্যাণী আগুন হযে উঠে বল্লে—ছোড়দা তোমার মাথা খাবাপ হযেছে! আমাকে তুমি এ সব কি দিচ্ছ!

—খুব ভালো জিনিস

কল্যাণী বল্লে—আমি নদীব মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেব

—আহা, তা আর করতে হবে না—আহা হা—

কিশোর এক চুমুকে গেলাসটা ফুরিযে ফেল্ল

কল্যাণী বল্লে—বাবাকে আমি লিখে দেব

কিশোর বাঁ চোখের ভুরু কুপনেব দিকে খানিকটা তুলে নিযে বল্লে—হুম্—দিস্—

কাটলেট চিবুচ্ছিল কিশোর।

—মেজদাকেও লিখব—

শিকেয তুলে রেখে দে! মেজদা? হুইস্কি না খেযে কোর্টে যায কোনো দিন

—মেজদা?

—হ্যাঁ তোমার ধর্ম্মদাদা—

—মাইবি বলছ?

—মাইবি বলছি।

—আমি বিশ্বাস কবি না।

—তুই না করলি যা—

কিশোব (গেলাসে) আর একটা সোডার বোতল খসাল—

কল্যাণী বল্লে—ছোড়দা?

কিশোর হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বল্লে—এটা ষ্টিমাবের সেলুন—এখানে বাবাও নেই—মাও নেই

কল্যাণী আঘাত পেযে বাইরের দিকে তাকাল—অন্ধকার; বর্ষার শেষেব খরস্রোতা নদী তিমিরাবৃত হযে কোন দিকে চলেছে যে—তাব মুখ দেখতেও ভয করে—ষ্টিমাবের চাকাব সেই জলেজলাকাব মূর্ত্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভীষণ হাহাকারে হৃদয এমন বিহ্বল হযে ওঠে—নিজেকে এমন নিঃসহায মনে হয—

কিন্তু কল্যাণী দেখল ছোড়দাব একেবারেই অন্য বরণ; বাইবের দিকে সে তাকাচ্ছেও না, না দেখছে নদীর মুখ, না শুনছে জলেব দীর্নবিদীর্ণ রব, না পাচ্ছে মাঠ প্রান্তব আলেযার একটুখানি আভাস—বাল মা ঢের দূরে পড়ে আছে বলে ছোড়দার ভালোই লাগছে। কেন যে এত ভালো লাগে ছোড়দার—কি যে তাব প্রফুল্লতা—কোত্থেকে যে সে এত আমোদ পায় এত হৃদযহীন ভাবে ফূর্ত্তি কবে, কথা বলে, চীৎকার পাড়ে কিছুই বুঝে উঠতে পাবল না কল্যাণী। ইলেকট্রিক বাতির নীচে, ষ্টিমারের সেলুনে, হুইস্কি ও চুরুটের মধ্যে ছোড়দাকে যেন একটা বাঁদরের মত দেখাচ্ছে—সে যেন আব মানুষ নয—মানুষের স্বাভাবিকতা হারিযে ফেলেছে যেন সে—ছোড়দার প্রাণে তাই কোনো ব্যথা নেই—আকুলতা নেই—ভাবনা নেই—স্বপ্ন নেই—নিস্তব্ধতা নেই—

কল্যাণী অবলম্বনহীন হযে কিশোরের দিকে তাকিযে রইল

কিশোব বল্লে—বৃষ্টি পড়ছে না কি?

কল্যাণী বাইরের দিকে তাকিযে বল্লে—হ্যাঁ

—তোর শীত করছে?

—একটু একটু

কিশোর বল্লে—তাহ'লে নে—একটু খা

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সোডা হুইস্কি কল্যাণীকে এগিয়ে দিল কিশোর—

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে বল্লে—আমি না তোমার বোন?

—তাহ'লেই বা

একটু পরে? তুই দেখছি বাবার মত হ'লি কল্যাণী

আরো একটু পরে; বাদলার দিনে একটু আধটু হুইস্কি খাওয়া আমি অপরাধ মনে করি না। আমার বৌকেও আমি খাওয়াব। তুমি বোন-আমার বৌযেব চেয়েও বেশী কি?

অত্যন্ত কঠিন ক্ষমাহীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণীব দিকে তাকাল কিশোব। তাবপর বাকীটুকু গেলাস চুপে চুপে ফুরোল!

কিশোরের শেষ হয়ে গিয়েছিল—

কল্যাণীকে বল্লে—চল্—একটু নীচে গিয়ে থার্ড ক্লাসেব ফ্ল্যাটের থেকে ঘুরে আসি

কল্যাণী বল্লে—চল

কিশোর চুরুট মুখে দিল, কেবিনে ঢুকে বেন-কোটটা গায দিযে দিযে বল্লে—তুইও কি ম্যাকিনটোশ নিবি?

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বল্লে—না

—শীত করছিল না?

—এখন আব করছে না।

—বৃষ্টি থেমে গেছে বুঝি—

দু-জনে নীচে গেল

ইতস্ততঃ যথেষ্ট ভিড় ছড়িয়ে বযেছে—গুদামের আশে পাশে কেবানীবাবুব ঘরেব কিনারে—থার্ড ক্লাসেব ল্যাভেটরিগুলোব খানিক তফাতে মেযে পুরুষ ছোট ছোট ছেলেপিলেববা বিছানা মাদুর চট শতরঞ্চি পেতে হা করে কল্যাণী আর কিশোবকে দেখছিল

কিশোব বল্লে—হ্যাংলা যত সব

দু'জন আধবযসী বৈষ্ণবীকে কল্যাণী বল্লে—তোমাদেব গায জলেব ছাঁট লাগছে যে! তারা আপ্যায়িত হয়ে উঠল।

বল্লে—কি আব কবা

কল্যাণী বল্লে—কোথায যাচ্ছ

—নবদ্বীপ

—সেইখানে তোমাদের বাড়ী বুঝি?

—না, মা, তীথ্যি করতে—

কিশোব বল্লে—কল্যাণী তুই ট্যালা হয়ে গেলি যে

কল্যাণী বল্লে—এই যে চেপে জল এল, এইবাব বোষ্টমী তোমবা কি করবে—

দু'জন বৈষ্ণবঠাকুর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুযেছিলেন—উঠে বসে বল্লেন—কার আর কি—রাধাবল্লভ যা কবেন

একটা বিড়ি জ্বালিযে বল্লে—রাধাবল্লভ এবার বড় হেনেস্থা কবছে, বড় নিদয এবার ঠাকুব।

বৃষ্টির মধ্যে তারা ভিজতে লাগল।

ক্যাঁক কবে একটা শব্দ হ'ল।

কল্যাণী বল্লে—ও কি ছোড়দা

—আর কি মুর্গী জবাই হচ্ছে

প্যানট্রির কাছ দিয়ে যেতে যেতে তারা দেখল গলাকাটা দু'টো মুর্গীকে ছাড়ানো হচ্ছে—

কল্যাণী বল্লে—আহা, এই রকম করে এরা কাটে!

চলতে চলতে কিশোর বল্লে—এই দেখ্ হাঁস-মুর্গীর খাঁচা

কল্যাণী তাকিয়ে দেখল ঃ অন্ধকারে—বাদলায় পাখীগুলো জড়সড় জীবন্মৃত হয়ে পড়ে—ভিজছে পাখীগুলো—

সূচীপত্রে যান

এই নিঃসহায় প্রাণীদের পাশে এসে কল্যাণী বাপ মা বাড়ীর কথা ভুলে গেল সব; মনের ভিতর তার কেমন করছিল যেন; অন্ধকার—বৃষ্টি—বাইরের জলের কলরোল—মাঠ—তেপান্তর— পাড়াগাঁ—শ্মশান তার করুণ কল্পনাকে আরো কাতরতর প্রচুর খোরাক যোগাচ্ছিল—

এ রকম সব অভিজ্ঞতা তার জীবনে বড় একটা হয়নি।

এই সবের নতুনতা কল্যাণীকে অভিভূত করে ফেলতে লাগল।

কিশোর বল্লে—এই ট্যালা, লাল লাল ঝুঁটি বুঝি দেখিসনি কোনো দিন

—কল্যাণীর মুখে কথা জুয়াল না।

কিশোর বল্লে—চল

কল্যাণী ছোড়দার পিছে পিছে হাঁটতে লাগল—

একটি দাড়িআলা মুসলমান ছুরি দিয়ে আনারস কেটে যাচ্ছিল—সমস্ত বৈষ্ণব পরিবারটা হাপিত্যেশ করে সেই আনারসের দিকে তাকিয়ে—একটি তিন মাসের শিশুকে তার মা মাই দিচ্ছে। শিশুকে একেবারে উলঙ্গ রাখা হয়েছে—সোঁ সোঁ করে বাতাস বৃষ্টি তার কোনো ক্ষতি করছে না কি? নিউমোনিয়া যদি হয়? পাশেই একটি ফর্সা ছিপছিপে হাঁপিকাশের রুগীর বুকের দু' দিকটার দু'টো পাঁজর ঝট্‌পট্ নির্ব্বিবাদে ফ্ল্যাটের যে দিকে খুশি সে দিকে কাশি কফ

ছয়

কলকাতায় পৌছে কল্যাণী বল্লে—আমি বোর্ডিঙেই যাব, তুমি ছোড়দার

—আমার হষ্টেলে

কল্যাণীকে বোর্ডিঙে রেখে কিশোর চলে গেল।

কল্যাণী স্নান করে খেযে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল—

কিন্তু কাঁদলে কি পৃথিবীতে চলে?

কল্যাণীর উঠতে হ'ল।

দু-তিন দিন হ'ল কলেজ খুলেছে—আজো দু-তিন ঘণ্টা ক্লাস হয়ে গেছে—আরো দু-এক ঘণ্টা হবে। কল্যাণী বই গুছিয়ে নিয়ে কলেজে গেল।

কলেজ থেকে ফিরে এসে বুকের ভারটা তার যেন একটু কমেছে মনে হ'ল। নিজের সীটটা ঠিকঠাক পরিষ্কার করে টেবিল গুছিয়ে বই সাজিয়ে বিছানা সাফ্ ক'রে তারপর কল্যাণী মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে বারান্দায় কম্পাউন্ডে খানিকটা ঘোরাঘুরি হাসি তামাসা করে এল।

কিন্তু মন তার আজ এ সবের ভিতর একটুও নেই যেন—কেবলই শালিখবাড়ীর কথা মনে পড়ছে—বাবার কথা, মার কথা; ঘুঘুর ডাককে সে ঠাট্টা করেছিল—কিন্তু আজ হাজার কান পাতলেও সে ডাক আর শোনা যাবে না এ নিষ্ফলতা যেন পাড়াগাঁর কোন্ শান্তশ্রী পল্লীকন্যার মত ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কল্যাণীকে উপহাস করতে লাগল—দু'চোখ তার বেদনার—বিরহের জলে ভরে উঠল।

রাত হয়ে গেছে।

বাবাকে সে চিঠি লিখতে বসল;

তুমি যদি তাই চাও বাবা তা'হলে আবার আমি দেশে ফিরে যেতে পারি। তোমার মনে কষ্ট দেবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই। তুমি ভেবেছ তোমাদের চেয়েও কলকাতার ফাইফুর্ত্তি বুঝি আমি বেশী ভালোবাসি। তা আমি ভালোবাসি না বাবা। তোমাদেরই আমি বেশি ভালোবাসি—ঢের বেশী। কলকাতার ফুর্ত্তির কোনো মূল্য নেই আমার কাছে এখন আর। এ সব আমার আর ভালো লাগে না।

দেশে থাকতে মুখ ফুটে কিছু বলিনি বলে, বাবা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। এই চিঠিতে তো আমি সব লিখছি; সব খুলে লিখলাম। এখন তুমি তোমার মেয়েকে ঠিক করে চিনতে পারবে।

ষ্টিমারঘাট থেকে সেই যে তুমি চলে গেলে তখন থেকেই আমার এত খারাপ লাগতে লাগল। আমি রেলিঙে ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু ষ্টিমারটা হঠাৎ কেমন করে যে কোন দিকে যে ঘুরে গেল ভিড়ের ভিতর তোমাকে আমি আর দেখতে পেলাম না—দেখতে দেখতে পথঘাট লোকজন কোথায় সব পড়ে রইল—রইল শুধু নদী আর ছোড়দা আর আমি। তখন এমন খারাপ লাগল আমার কি বলব তোমাকে বাবা! অনেকক্ষণ রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর রাত হ'ল।

সূচীপত্রে যান

রোজ রাতে তোমাদের সঙ্গে কত গল্প করতাম—একসঙ্গে খেতে যেতাম—একসঙ্গে ঘুমোতাম। কিন্তু ষ্টিমারে শুধু একা ছোড়দা—বুঝতে পাবলাম বাবা মাকে আমি কত ভালোবাসি—তাদের জায়গা আর কেউ নিতে পারে না; রাত ষ্টিমারে এত কষ্ট হ'ল।

প্রথম রাতে কল্যাণী এর চেয়ে বেশী কিছু আর লিখতে পারল না।

বাইরে তিরিক্ষে ঝড়বৃষ্টি

জানালা খুলে রাখলে সোঁ সোঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস—জলেব ছাঁট—কেমন একটা অভূতপূর্ব স্মৃতি ও চিন্তাব কাতরতা।

জানালা বন্ধ করে দিলে সমস্ত নিস্তব্ধ—বিজন; কেমন একটা গুমোট; যেন সমস্ত কিছুর থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে কল্যাণী কোন্ অজানিত অপ্রার্থিত জায়গায় পাষাণরাণী হয়ে বসেছে—

চিঠির প্যাড বন্ধ করে তাড়াতাড়ি টেবিলের এক পাশে সবিয়ে দু-চারখানা বই তাব ওপর চাপা দিয়ে বেখে দিল কল্যাণী।

ঝড়েব জন্য জানালাটা বন্ধ করে ফেলেছিল সে; খুল্ল আবার।

বাতি নিবিয়ে দিল।

ঘুমিয়ে পড়ল।

পর দিন খুব ভোরেব বেলা উঠে কল্যাণী চিঠিখানা শেষ করল ঃ

কিন্তু কলকাতায় যখন এসেছি পাশ কবে যাব না। মানুষকে তো ভগবান সুখেব জন্যই তৈরি কবেননি শুধু। তোমাদের কাছে থাকলে বেশ শান্তি পেতাম—সুখ পেতাম—কিন্তু তবুও সেটা কুঁড়েমি হ'ত; অকর্ম্মণ্যতা হ'ত; মানুষেব জীবনেব কর্ত্তব্য তাতে পালন কবা হ'ত না।

আমি মেয়ে হযে জন্মেছি বটে, কিন্তু তবুও আমার ঢেব কববাব জিনিস আছে। প্রথমত আমি লিখতে চাই; পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জ্জন করতে চাই। তুমি বলেছিলে ডিগ্রি নিয়ে কি হবে? হযতো ডিগ্রিব কোনো মুরোদ নেই। কিন্তু তবুও একটার পব একটা ডিগ্রিব জন্য এই যে স্কুল কলেজে বছবেব পব বছর পড়তে হয এ জিনিসটা আমাদেব একটা নিয়ম শেখায, একটা শৃঙ্খলাব মধ্যে নিয়ে আসে আমাদের, এই শৃঙ্খলার ভিতব দিযে ধীবে ধীবে আমাদেব অন্য নানাবকম জিনিস শিখিযে দেয়—যা হযতো আমরা অন্য কোনো ভাবে আযত্ত করতে পাবতাম না।

এই দেখ, আমি যদি কলেজ ছেড়ে দিতাম—তাহ'লে এই নিযমেব ভিতব থাকতাম না আব; তাতে হত কি জান বাবা? সহিষ্ণুতা ও চেষ্টা কববাব ক্ষমতা হাবিয়ে ফেলতাম—মন ক্রমে ক্রমে আবাম আযেসেব দিকে চলে যেত। সে বকম মন নিয়ে শুধু শিক্ষাদীক্ষাই নয—পৃথিবীব কোনো সার জিনিসই লাভ কবতে পারতাম না আমি—পাবতাম কি বাবা?

সেই জন্যই আমি সঙ্কল্প ক'বেছি যে কলেজেব এই বকম সব কঠিন আইন কানুনেব ভিতব অনেকদিন থেকে থেকে আমি নিজেকে ঢালাই পিটাই ক'বে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে তৈরি কবে নেব।

এখানকার ডিগ্রি নিযে তারপব আমি বিলেত যাব।

বিলেত থেকে শিখে এসে তাবপব এইখানে মস্ত বড় কাজেব জাযগা পাওযা যাবে, নানাবকম কাজেব কল্পনা আমি ঠিক কবে রেখেছি; ক্রমে ক্রমে সেই সবই আমি সফল কবে তুলব।

এ না কবে আমি ছাড়বই না।

এখন আর আমি দেবীতে উঠি না।

আর কোনো দিন দেবীতে উঠব না।

আজ পাঁচটার সময উঠেছি—এখন ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বোর্ডিঙের মেয়েদের মধ্যে একজনও ওঠেনি এখন। সবাই ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমুচ্ছে। কেউ কেউ হযতো আটটার সময় উঠবে—আমাব এমন হাসি পায।

দেরীতে উঠে কোনো ফূর্ত্তি পাওযা যায না বাবা। তাতে মন খাবাপ হয—তাড়াতাড়ি করে পড়াশুনো, কলেজেব তাড়াহুড়োব ভিতর শরীরও খাবাপ হযে যায—

আজ সকালটা এমন মিষ্টি।

টেবিলের পাশে জানালাটা খুলে চিঠি লিখছি। আকাশ নীল। লতাপাতা ক্রোটন ঝুমকো পাতাবাহারের ভিতব কত ফড়িং প্রজাপতি টুনটুনি চড়ুই; আমাব জানালাব পাশে (উইনডোবক্সেব ওপর) সাদা লোটন পাযরাগুলো; ডান দিকে মস্ত বড় সেগুন গাছটাকে জড়িযে থোকে থোকে হলদে করবী।

কাল রাতে খুব ঝড় হয়ে গিয়েছিল; আজ ভোরটা বেশ ঠাণ্ডা— শ্বেতপাথরের মত ঠাণ্ডা আর শ্বেতপাথরের মত পরিষ্কার যেন—(এই ভোর—এই ভোরের আলো।)

আমার মনে হয় আমার চোখ বেশ ভালো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তবুও এম. এন. মিত্রকে চোখ দেখাব; মেয়েরা বল্লে ডাক্তার অ্যাট্রোপিন দেবে তুমিও তাই বলেছিলে; অ্যাট্রোপিন দিলে আমাকে অন্ধকারে কয়েক দিন থাকতে হবে। কিন্তু চশমা তাহ'লে বেশ ভালো করে ফিট করবে। আজ ছোড়দা এল তাকে বলব শনিবার মিঃ মিত্রের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে আসতে। শনিবার সকালে ছোড়দার সঙ্গে মিত্রের ইনফারমারিতে যাব। শনি, রবি ও ক'দিন ছুটি আছে—বুধবারও ছুটি আছে; সোম মঙ্গল কলেজ কামাই হবে।

এখন থেকে চোখ সম্বন্ধে খুব সতর্ক হব। মেয়েরা বলে চশমা নেওয়াব পর অনেক সময় চোখ ক্রমে ক্রমে ভালোও হয়ে যায়। শুনে আমার খুব ফূর্ত্তি বোধ হ'ল। মাকে এই কথা বোলো।

থিয়েটারে আমি কোনো দিন যাব না।

পরীক্ষা না দিয়ে বাযোস্কোপেও যাব না।

তুমি যা চাও আমি ঠিক তাই কবব।

আমি তোমাব লক্ষ্মী মেযে হব।

তোমাব কল্যাণী।

চিঠিখানা এই রকম।

সাত

চশমা বেশ ফিট করেছে—কালো টরটয়েজ শেলের ডাঁট—তেন্নি রিম—বড় গোল গোল পাথব

—কল্যাণীর রূপ যেন আরো ঢেব খুলে গিয়েছে এই চশমার জন্য।

মেয়েরা তার সঙ্গে এখন আবো বেশি খাতির করতে আসে।

অনেক অদ্ভুত—অসার—আজগুবি—অনেক সেন্টিমেন্টাল—নানারকম রস লালসার কথা বলে তাকে—তাকে ব্যবহাব কবতে চায়, কিন্তু এবার দেশে গিয়ে কল্যাণী যে একটা গুরুত্ব পেযে এসেছে এখনো তা সে খোযাযনি।

বাবা দেড়শো টাকা করে মাসে পাঠান।

বিকেলবেলা কিশোব এল, ছোড়দার নাম শ্লেটে দেখে কল্যাণী লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে এল।

কিশোর কাশছিল।

কল্যাণী বল্লে—'এ কি তোমাব শরীর খারাপ দেখাচ্ছে যে ছোড়দা'

'ইনফ্লুয়েঞ্জা হযেছিল।'

—আমাকে লেখনি কেন?

—তুমি আমাদেব হষ্টেলেব ভিজিটিং ডাক্তার, না?

কল্যাণী একটু হেসে বল্লে—না, জানতাম—

—জেনে কি করতে? টাট্টু প্রিন্সিপ্যালেব মত প্রার্থনা কবতে, না?

—টাট্টু প্রিন্সিপাল আবার কে? ওঃ তোমাদেব কলেজেব প্রিন্সিপ্যাল—

কল্যাণী টেনে টেনে একটু হাসল

বল্লে—ছি, টাট্টু বল কেন? প্রিন্সিপ্যাল মানুষ তাকে টাট্টু?

—কলকাতার সকলেই ওকে টাট্টু বলে।

—তাই বলে তুমিও বলবে?

—না, আমার একটা নতুন কিছু বলা দরকার, আমি বলি গিধোর—

কল্যাণী এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইল

কিশোর বল্লে—গিধোরের মানে জানিস?

—না

—তবে থাক্।

কল্যাণী বল্লে—ইনফ্লুয়েঞ্জা তোমার খুব বেশী হয়েছিল না কি ছোড়দা

সূচীপত্রে যান

—উঃ গা হাত পা এখনও টাটাচ্ছে

—তা হ'লে সারে নি তো—

—আলবৎ সেরেছে—

—কি খাও? দু-একটা দিন ভাত না খেয়ে রুটি খেও অন্ততঃ। দু-এক দিন শুধু ওভালটিন খেয়ে দেখলে পার না? শরীরটা একটু টানলে ভাল হয়।

—এখানে সিগারেট খেতে পারা যাবে?

—না

—কেন? কোনো মেয়ে নেই তো।

—ঐ যে মেট্রন বসে

—পাকামো সব

কিশোর বল্লে—আমি যাই

—বোসো না।

—বসে কি হবে?

—এরকম কর কেন? আমাকে তুমি বোনের মতই মনে কর না। যেন আমি তোমার কত পর—কি যে!

—ষ্টিমারের সেই হুইস্কির কথা মনে আছে?

কল্যাণী লাঞ্ছিত বোধ করল।

—বাবাকে লিখিসনি তো?

—না।

কল্যাণী একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বল্লে—আর খাওনি তো?

—খেয়েছি

—কোথায়?

—ইম্পিরিয়ালে—

কল্যাণী বিবস মুখে কিশোরের দিকে তাকাল।

কিশোর বল্লে—বাপ রে, তোকে যে পিসিমার মত দেখাচ্ছে—

কল্যাণী চুপ করে রইল; ছোড়্দার জন্য যতখানি মমতা তার আছে তার সিকির সিকি প্রভাবও এ মানুষটির ওপর তার নেই। নিজে সে কিছু করতে পারে না। কিন্তু সে সঙ্কল্প করল বাবাকে লিখবে।

কল্যাণী বল্লে—আবারও অপথ্য করলে?

—অপথ্য?

ষ্টিমারে করলে—ইম্পিরিয়ালে করলে—না জানি আরো কত জায়গায়—

—ও, —হুইস্কি—হ'ল তোমার অপথ্য। তুমি মার বঙে মন্দ না

—আর খাবে না বল

—পিসিমার মত মুখ করিস না।

কল্যাণী বল্লে—আমি বাবাকে সব লিখে দেব।

কিশোর বোনের দৃঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা সন্দিগ্ধ হ'ল—

বল্লে—সত্যি লিখবি—

—নিশ্চয়, আজকের ডাকেই আমি লিখব।

—বাবা বিশ্বাস করবে তোকে?

—আমাকে বিশ্বেস করবেন না তো কি তোমাকে করবেন?

কিশোর তা জানে।

ডেস্কের ওপর থেকে একটা চক কুড়িয়ে নিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বল্লে—যাঃ, আর খাব না।

—সত্যি?

—পয়সাই বা কোথায় আর?

—না, বল খাবে না আর।

—বল্লামই তো—

লুকোচুরি কোরো না কিন্তু আমার সঙ্গে

কিশোর একটু অপমানিত বোধ করে ঠোঁট কামড়ে কঠিন হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকাল—
—রাগ কোরো না ছোড়দা, তোমার ভালোর জন্যই বলেছি; চকোলেট খাবে?
—না
—রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি—
কিশোর বল্লে—তুমি বায়োস্কোপ দেখাও ছেড়ে দিয়েছ না কি কল্যাণী!
ছেড়ে সে দিয়েছেই তো—কিন্তু তবুও ছোড়দাকে খুশি করবাব জন্য বল্লে—তুমি যাবে নাকি?
—আমার পয়সা নেই—তুই যদি পাঁচ টাকা দিতে পারিস তা হ'লে কাল গ্লোবে চল্
কল্যাণী বল্লে—আচ্ছা
—আব থিয়েটার?
থিয়েটার আমি দেখব না
—কোনো দিনও না?
—না
কিশোব বল্লে—অবিশ্যি তেমন জোব বই নেই—আর্টিষ্টও নেই—বাংলায়। কিন্তু, চল্ না একদিন ইংরেজি থিয়েটার দেখে আসি
কল্যাণী বল্লে—বল্লামই তো যাব না আর আমি
কিশোব জেরা কবে বল্লে—কেন?
—কে আমি জানি না; আমি যাব না।
—ঈস্?
—তাহ'লে আমি বায়োস্কোপেও যাব না।
কিশোর বল্লে—আচ্ছা না গেলি—আড়াইটা টাকা আমাকে দিয়ে দে
কল্যাণী বল্লে—আচ্ছা নিও
—এখুনি
কল্যাণী টাকা এনে দিল।
কিশোর বল্লে-এঃ, ঠিক আড়াইটেই এনেছিস যে বড় গুণে গেঁথে—
—তাই তো চেয়েছিলে—
—আচ্ছা বেশ পাঁচটাই দে।
কল্যাণী ঘাড় হেঁট করে ভাবল বাবা ছোড়দাকে যা টাকা পাঠান তাব ওপবেও এবকম হাঁকাই কেন—এরকম আগে তো ছিল না—এর মানে কি?—না জানি টাকা কেমন কবে রূপান্তরিত হয়ে কি হয়ে যায়
কল্যাণীর মন খোঁচা খেয়ে উঠল—
ধীরে ধীরে মুখ তুলে সে বল্লে—আমি আর দিতে পাবব না।
পাঁচটা কেন—দশটা পঁচিশটা—অনেক কিছুই সে দিতে পাবত, কিন্তু কিশোবেব মুখেব দিকে তাকিয়ে কল্যাণীর মন সন্দেহে ভ'রে উঠল।
কিশোর বল্লে—পারবি, পারবি—আর আড়াই টাকা তো মোটে—
কল্যাণী নিজেব মনকে বল্লে—দেওয়া কি উচিত? বাবা কি দিতেন? মা? আমি দেব?
কিশোর বল্লে—তুই গেলেও আর আড়াইটা টাকা তো লাগত। সেই টাকাটা না হয় আমাকে দিয়ে দিলি—তুই আমাকে দিয়ে দে।
কিশোর একটু কেশে বল্লে—এতে তোব কি ক্ষতি হবে কল্যাণী?
—থাক, আর বোলো না দাদা।
একটা দশ টাকার নোট এনে কিশোরকে সে দিল।

আট

কিন্তু এবার বাড়ীর থেকে যে একটা সঙ্কল্প ও মর্যাদা সঙ্গে কবে নিয়ে এসেছিল কল্যাণী বেশী দিন আর তা টিকল না।
ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে সে একদিন বায়োস্কোপ দেখতে গেল—
এর ভিতর কোনো অপরাধ ছিল না অবিশ্যি।

সূচীপত্রে যান

কিন্তু তবুও প্রতিজ্ঞা তো করা হয়েছিল—বাবার কাছে প্রতি চিঠিতেই কত প্রতিজ্ঞা জানিয়েছে কল্যাণী—সে কার্নিভালে আর যাবে না, লাকি সেভেন খেলবে না, সার্কাস দেখবে না, বায়োস্কোপেও যাবে না—

প্রতিজ্ঞা যখন ভাঙল বাবাকে আর লিখল না; অবহেলা ক্রমে ক্রমে আরো বেড়ে উঠল—আয়েস বাড়ল, আবার সেই আগের আরাম ফিরে এল। আটটা সাড়ে আটটার সময় ঘুম থেকে উঠে জীবনটাকে তার ভালো লাগতে লাগল।

বেশ চলেছে।

আব একদিন বায়োস্কোপ দেখতে গেল সে; হাফ টাইমের সময় আইসক্রিম খেলে—ছবি কিনলে—মেয়েরা সোডা ফাউন্টেন থেকে ঘুরে এল—কল্যাণীও গেল।

এই সব নির্দোষ আমোদ, কোনো গ্লানি নেই এ সবেব ভিতর। কিন্তু আরাম রয়েছে।

কল্যাণীর জীবন তাহ'লে আরামের দিকে মোড় নিল আবার? এক প্রসাদ ছাড়া এরা সকলেই এই বকম—অনেক কিছুই আরম্ভ করতে পাবে—কিন্তু কোনো কিছুকেই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে দাঁড় করাবার মত অপবিসীম আখখুটেপনার গৌরব এদের চরিত্রের মধ্যে নেই।

কিশোর একদিন কল্যাণীকে থিয়েটাবে নিয়ে যেতে চাইল—

বল্লে—ভাদুড়ীর প্লে তুই কোনোদিন দেখিসনি কল্যাণী

—দেখিনি তো—

—তাহ'লে কি নিয়ে তুই বড়াই কববি

কল্যাণী একটু বিস্মিত হয়ে বল্লে—তার মানে?

—লোকে তোকে ঠাট্টা করে ধুনে দেবে যে—

—কেউ ঠাট্টা কবে না

—এখন কবে না; আছিস তো কতকগুলো খাজা মেয়েব মধ্যে। কিন্তু যখন বড় হবি—বিয়ে কববি—সোসাইটিতে ফিববি—তখন চোখের মাথা খেয়ে বড্ড লজ্জা পেতে হবে তোব—

কল্যাণী এ লজ্জাকে এখনও হৃদয়ঙ্গম কবতে পাবছিল না। থিয়েটারে যাবার তাব একটুও ইচ্ছা ছিল না।

কিশোব বল্লে—এবাব আমাদেব বাঙালীদের ষ্টেজটা ভালো হয়েছে—

ষ্টেজেব জন্য বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না কল্যাণীব—সে চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

কিশোর গম্ভীর হয়ে উঠল।

বল্লে—কল্যাণী, ও রকম অবহেলা কোরো না।

কল্যাণী ছোড়দাব দিকে তাকাল—

কিশোব বল্লে—শুধু তো নাচ গান দেখতে যাওয়া নয়—ফূর্ত্তি তামাসা নয় শুধু। আর্ট আলাদা জিনিস।

আর্টেব সম্বন্ধে কল্যাণীর বিশেষ কোনো ধাবণা ছিল না। আর্ট তাকে কোনো দিন বড় বেশী উৎসুক কবেনি—উত্তেজিত কবা তো দূবের কথা।

কিশোব বল্লে—না যাত্রা-ফাত্রা নয় আব, এ দস্তব মত প্লে—

কল্যাণী একটু বিস্মিত হয়ে বল্লে—প্লে ?

—প্লে—

কিশোর বল্লে—যত গাজন পাঁচালী ঢপ কথকতা যাত্রা শালিখবাড়ীতে শুনেছ—কলকাতার থিয়েটারেও সেই সবেরই কপচানি দেখেছ এদ্দিন, কিন্তু এখন একেবারে আলাদা জিনিস দেখবে।

কল্যাণীর একটু কৌতূহল হ'ল, ভাবলে : না জানি কেমন!

বল্লে—সত্যি ছোড়দা?

—আমার সঙ্গে এসো—দেখো—তারপব বোলো

কিশোর একটু কেশে বল্লে—তারপব বোলো চিবদিন মনে থাকবে কিনা—

—সত্যি?

—তা যদি না তাকে তাহ'লে আর্ট হয়?

—ওঃ বুঝেছি—

কিশোর বল্লে—কবিতা গল্প কত জায়গায় তো আর্টের পরিচয় পেয়েছ—
কল্যাণীর স্পষ্ট কিছু মনে পড়ছিল না।
কিশোর বল্লে—ছবিতেও
বিশেষ কোনো ছবি—কোনো ছবিই মনে পড়েছিল না কল্যাণীর।
কিশোর বল্লে—মানুষের মুখে কিম্বা পাথরের মূর্তিতেও
কল্যাণী গালে হাত দিয়ে ছোড়দার দিকে তাকিয়ে রইল
কিশোর বল্লে—গানে বাজনায়।
একটু কেশে বল্লে—এবার ষ্টেজে দেখবে।
দু'জনে গেল—থিয়েটার দেখতে।
থিয়েটারের থেকে ফিরবার সময় কিশোর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলে।
ট্যাক্সিতে চেপে কল্যাণী বল্লে—রাত হয়ে গেছে
কিশোর বল্লে—বেশী না হুঁ।
—ক'টা ?
—একটা দু'টো হবে।
কল্যাণী ভয় পেয়ে বল্লে—কি হবে তাহ'লে?
—কেন?
—বোর্ডিঙে যেতে পারব না তো এখন।
কিশোর হো হো করে হেসে উঠে বল্লে—সেই জন্য তোমার ভাবনা?
—ভাবনা নয় ছোড়দা ?
—ভাবনা আবার! এই নিয়ে ভাবনা ? এই সেথো জিনিস নিয়ে ? বলতে বলতে কিশোর একটা ষ্টলের দিকে গেল।
কল্যাণীর বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করতে লাগল।
কিশোর পান সিগারেট কিনে এনে গাড়ীতে এসে বসল; বোনের চোখের ছটফটানির দিকে তাকিয়ে বল্লে—ছিঃ এ কি রকম ?
—কি হবে ছোড়দা ?
কল্যাণীর হাত ধরে কিশোর বল্লে—আমি আছি না ?
—তুমি তো আছ—
—তবে?
—বোর্ডিঙে যেতে পারব না যে
কিশোর বল্লে—এই তো থিয়েটার থেকে বেরুলে, বোর্ডিঙের ভাবনা ছাড়া তোমার মাথায় আর কিছুই কি নেই?
—এত রাতে কোথায় যাব আমরা ?
—বলি, এরকম চিন্তাভাবনা ছাড়া তোমার হৃদয়ের মধ্যে আর কিছুই কি নেই?
কল্যাণী বল্লে—না
কিশোর অত্যন্ত নিরাশ হ'ল।
খানিকক্ষণ সিগারেট টেনে বল্লে—একটা নতুন কিছু দেখেছ—অজন্তার গুহায় ঢুকলে বা ইটালীর মাষ্টারদের ছবি প্রথম দেখলে বা জার্মান মাষ্টারদের মিউজিক প্রথম শুনলে বা কাউকে প্রথম ভালোবাসলে মন যেমন করে ওঠে—কেমন নাড়াচাড়া ফেরে তেমন কিছুই কি তোমার হয়নি কল্যাণী?
কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বল্লে—না
তা যাই বলুক ছোড়দা কিশোরের আজকের রাতের এই পৃথিবী থেকে কল্যাণী ঢের দূরে—কিশোরকে তার এমন অস্পষ্ট অসংযত নির্মম মনে হতে লাগল—এমন হৃদয়হীন হয়ে গেছে ছোড়দা—এমন অর্থহীন—
কিশোর বল্লে—এমন অদ্ভুত তুমি—এখন অদ্ভুত—অদ্ভুত—আজগুবির এক শেষ
কল্যাণী বল্লে—কোথায় চলেছ ?
—যেখানে খুসি

সূচীপত্রে যান

কিশোর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেছল—তার নিজের সহোদর বোনটা এমন ভীরু—এমন ভোঁদা—একটা মাংসপিণ্ড যেন—কেমন একটা আর্টের পৃথিবীর থেকে ফিরে এসে নট নিয়ে কথা নয়, নটী নিয়ে কথা নয়, গান কবিতা কুশলতা, প্রাণ, রস, আবেগ, সংযম, সীমা অনুভব, বেদনা কিছু নিয়ে নয়—এমন কি থিয়েটারের ঘট ঘট ফাইফূর্তি নিয়েও নয—শুধু কোথায় চলেছ, কত রাত হয়েছে, বোর্ডিঙে যাব কি করে!

অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল কিশোরের মন।

কল্যাণী বল্লে—ট্যাক্সি চলেছে তো চলেইছে—

—বেশ করেছে—

—আর কত দূর যাবে?

কিশোর কোনো জবাব দিল না।

নীরবে সিগারেট টানতে টানতে সে তার নট-নটীদের কথা ভাবছিল—ভাবছিল এক দিন সেও হয়তো ষ্টেজে দাঁড়িয়ে অমন অভিনয় করবে—আরো রূপান্তর আনবে সে—আরো স্থির—আরো অবিকৃত প্রতিভা—(মুখোস একেবারে দেবে বদলে—)

কিশোর ভাবছিল—বিলেত যদি হ'ত—

কল্যাণী আতঙ্কিত হয়ে বল্লে—এ কি গঙ্গা নয় ?

কিশোর টিটকারি দিয়ে বল্লে—গঙ্গাকে চেন কি তুমি ? কল্যাণী ?

কল্যাণী অভিমানক্ষুব্ধ ছোড়দার দিকে তাকাল—

কিশোর বল্লে—একটা নদী দেখেও তোমার মনের উৎকণ্ঠা ফুরোয় না ? যেন আরো বাড়ে। ভালোবেসে তুমি এর দিকে তাকাতে পার না? এ কেমন?

কল্যাণী বল্লে—রাত যে ঢের হয়ে গেছে ছোড়দা!

—হ'লই বা । তাতে কি নদী মরুভূমি হয়ে গেল? তোমাদের মেয়েদের ঐ বড় দোষ। মনের মুদ্রাদোষ কিছুতেই ছাড়াতে পার না তোমরা। চলতি পথের থেকে এক চুল চুমরে পড়লে সবই যেন গ্লানি—ব্যথা—ভয—কত কি! মেয়েরা জীবনটাকে তাই বোঝে না। পর পর বিস্ময় চমক ও নতুনত্ব নিয়ে যে জীবন মেয়েরা তাতে কেমন যে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে—জীবনটাকে তোমরা অশ্রদ্ধা কর—এই নদীটাকেও তুমি আজ শ্রদ্ধা দিতে পারলে না। আমার কাছে এমন চমৎকার মনে হচ্ছে—অথচ তোমার কাছে এই গঙ্গা একটা কেঁদো জানোয়ার যদি না হয় প্রাণপণে এটা হিংসে করছ তুমি; না কল্যাণী?

কল্যাণীর মনে হ'ল ছোড়দা আজও হয়তো ঢের হুইস্কি খেয়েছে। কিন্তু কোনো রকম হুইস্কি খায়নি কিশোর আজ।

সে খুব সবল মনে কথা বলছিল—অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে; তার বাক্যের চিত্তবৃত্তি তার সমস্ত প্রাণকে ভরে ফেলেছে যেন আজ; দিনরাত্রির মাঝখানের এমন বিস্ময়কর সময়ের গঙ্গাটাকে সে খুব হৃদয় দিয়ে উপভোগ করছিল—

শেষ রাত্রের বাতাস ভালো লাগছিল। অনেকক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

নয়

কল্যাণী ঘুমিয়ে পড়েছে; ড্রাইভার ঘুমিয়েছে।

ভোরবেলা কল্যাণী বোর্ডিঙে পৌঁছে যেন নতুন জীবন পেল।

থিয়েটারের শেষ গ্লানি ঝেড়ে ফেলে, ভদ্রসদ্র মেয়েদের মধ্যে ঢের ভদ্র হয়ে, মেট্রনের সুনজরের শুভ্রতা বোধ করে, ঘাড় গুঁজে হিষ্ট্রির নোট টুকতে টুকতে।

পরদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর জানালার ভিতর দিয়ে গাছপালা আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্যাণীর মনে হ'ল ছোড়দার সঙ্গে থিয়েটারে গেলে এবার আর সে নার্ভাস হয়ে পড়বে না—ভালো করে দেখতে শুনতে পারবে সব। ফূর্তি করতে পারবে—গভীর রাতে ট্যাক্সিতে কলকাতার পথেঘাটে এবার আর সে একটুও সঙ্কোচ বোধ করবে না—গঙ্গা দেখেছি, কেমন ভড়কে ভয পেয়ে গেছল সে কাল—নদীটা কেমন সুন্দর ছিল অথচ-আজ যেন সে রূপ চুপে চুপে ধরা পড়ছে সব—সেই তিনটে আন্দাজ রাত—মোটর—

—ছোড়দা—মিষ্টি বাতাস—গঙ্গাটা—

কিন্তু এ সবের ভিতর এমন বেকুবি করেছিল কেন সে কাল? বেকুব আর সে হবে না।

সূচীপত্রে যান

মিনু এল।
বল্লে—কি ভাবছিস?
—পড়ছি
—কি পড়ছিস?
—লজিক
—হাতী! আধঘন্টা ধবে জানালাব ভিতব দিযে তাকিযে তাকিযে—
মিনু থামল।
মেট্রন একটু দেখেশুনে ঘুবে গেল।
কল্যাণী বল্লে—মিনু বোস—
বসল মেযেটি।
কল্যাণী বল্লে—একটা কথা কারু কাছে বলবি না মিনু?
—কি কথা?
—বল বলবি না।
মিনু কৌতুহলাক্রান্ত হযে বল্লে—না।
—কাল থিযেটাবে গিযেছিলাম
—সত্যি?
কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বল্লে—হ্যাঁ
—কাব সঙ্গে?
—ছোড়দাব সঙ্গে।
—কোন থিযেটাবে?
—নাম মনে নেই
—বেশ তো।
মিনু বল্লে—কেমন লাগল?
—কি যেন
—কি যেন কি আবাব?
মিনু বল্লে—কোথায বসেছিলি?
—বক্সে
—ঈস।
—আমি আগেও থিযেটাব দেখেছি। দেখা কি খাবাপ?
—জানি না।
—তুই দেখিসনি?
—না
—কোনোদিনও না?
মিনু মাথা নেড়ে বল্লে—না; দেখবও না।
—কেন?
মিনু বল্লে—কি দেখে ছাই—আমাব কোনো টেষ্ট নেই
কল্যাণী বল্লে—আমাবও বোধ হয টেষ্ট নেই
—তা হ'লে গিযেছিলে কেন?
কল্যাণী বল্লে—তাই তো।
—আব যাবে?
—কি কবতে যাব আব?
তোমাব দাদাও তো বড় মজাব লোক
—কেন?
—ছোট বোনকে থিযেটাবে নিযে যায?
কল্যাণী একটু আঘাত পেল—

বল্লে—ছোড়দাব ওদিকে বড্ড ঝোঁক কিনা—

বলতে বলতে থেমে গেল সে, থিযেটারেব দিকে ঝোঁক? কেমন শোনায়? কল্যাণী লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল।

দু'জনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

মিনু বল্লে—আমি যাই

—কেন?

—পড় তুমি।

—ছাই পড়ছি।

কল্যাণী বল্লে—এই দেখ বই বন্ধ করলাম।

লজিকের বইটা কল্যাণী বুজে সরিয়ে রেখে দিল—

মিনু বল্লে—পড়বে না আজ আব?

—না

—তুমি?

—আমিও না।

—আমাব চোখ কড় কড় করে বেশি পড়লে—

মিনু বল্লে—কিন্তু চশমা নিযে তোমাকে বেশ মানিয়েছে—

—সত্যি?

—বেশ সুন্দর দেখায

—সত্যি মিনু?

মিনু বল্লে—এই টিকলো নাক কাব কাছ থেকে পেযেছিস—তোব মাব কাছ থেকে?

—বাবাব কাছ থেকে

—এই চোখ?

—বাবাব কাছ থেকে

—এমন সুন্দব থুৎনি?

—বাবাব কাছ থেকে

মিনু ক্লান্ত হযে উঠছিল—

এ সব প্রশ্নেব গুখখুরি বুঝলে সে। কাজেই কথা আব নয—কল্যাণীব মুখেব অনুপম রূপসৃষ্টিব দিকে তাকিযেই রইল সে।

কল্যাণীব নিঃশ্বাসের থেকেও কেমন যেন মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।

মিণু বল্লে—কি খেযেছিস রে?

—কখন?

—মুখের থেকে তোব কিসের গন্ধ আসে?

—জানি না তো

—জানিস না? সব সমযই আমি পাই

কল্যাণী বল্লে—কিসেব গন্ধ রে মিনু?

মিনু কোনো জবাব দিল না; সৌন্দর্যেব বসের থেকেই এ যেন এক ঘ্রাণ; পদ্মের রক্তমাংসেব থেকে যেমন গভীব বিলাসের গন্ধ আসে তেমন, পদ্ম কি কিছু খায?

—একটা চুমো খাই কল্যাণী?

চুমো·সে খেল—

এমন পরিতৃপ্তি মিনু কোনো দিনও পাযনি যেন।

দশ

পরদিন অন্যবকম ব্যাপাব।

রাত দশটা আন্দাজ হবে; কল্যাণীর টেবিলেব পাশে পাঁচ ছয জন মেযে এসে জড় হয়েছে।

কল্যাণী বল্লে—উঃ, কী ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে

মিনু বল্লে—পড়বে না, এখনো তো ভাদ্র মাস—

কমিশনারের মেয়ে চিতু বল্লে—তোমরা কি যে বল ভাদ্র মাস না কি মাস তাই বৃষ্টি পড়ছে—অন্য মাস হলে পড়বে না—এ আমি মানি না। মাসের সঙ্গে বৃষ্টিব কি সম্পর্ক?

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

বাস্তবিক চিতু কিছু জানে না; কেবল কাঁটা ছুরি দিয়ে খট খট করে খাওয়া আর ইংরেজি গান গাওয়া ছাড়া।

চিতু একটু দমে গেল।

বল্লে—তোমরা হাসলে যে

মীরা বল্লে—হাসব না? শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ঝড় বাদলা হবে—এ তো সকলেই জানে

চিতু বল্লে—কেন তা হবে? অন্য মাসে কেন হবে না? এটা তোমাদেব প্রেজুডিস্

মিনু বল্লে—অন্য মাসে বড় একটা হয় তো না দেখি

—খুব হয়, নভেম্বর মাসে বৃষ্টি পড়ে না ডিসেম্বরে পড়ে না?

আবার সকলে হেসে উঠল

চিতুর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল; অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে সে সংযত করে বাখল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মোটে

চেঁচিয়ে উঠে বল্লে—কথায় কথায় তোমাদের giggling; গা জ্বলে যায়; ঝড়বৃষ্টি কি তোমাদেব বাপের চাকর দাবোযান যে নভেম্বরে পড়বে ডিসেম্বরে পড়বে না

মীরা বল্লে—শোন চিতু

চিতু মীরাব ঘাড়ে হাত রেখে বল্লে—বল ভাই মীরা—তুমি তবু ববং একটু truthfully কথা বলতে পারে—peacefully;

মীরা বল্লে—তুমি বাংলা মাসের নামগুলো জান তো চিতু

চিতু বল্লে—না

একটু থেমে বল্লে—দু'একটা জানি—এই ভাদ্র—

আর কোনো নাম তাব মনে এল না।

চিতু বল্লে—বাংলা মাসের নাম জানতে আমি কেয়াব কবি না—

মীরা মাসের নামগুলো আওড়ালে

চিতু বল্লে—অত আমাব মনে থাকবে না

কল্যাণী বল্লে—লিখে নাও

চিতু বল্লে—বয়ে গেছে আমার—

মিনু বল্লে—ক'টা ঋতু তা জান?

—ঋতু আবার কি?

মীরা বল্লে—যেমন autumn—

—ওঃ, খুব জানি— seasons—

—বাংলাযও তেম্নি রযেছে—

চিতু বল্লে—ইংবেজির থেকে নকল?

মিনু বল্লে—দূর!

চিতুর চোখ গরম হয়ে উঠল

মীরা বল্লে—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এ দু'মাস গবম, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র—আশ্বিন শবৎ—

চিতু বল্লে—শরৎ?

—শরৎ

মীরা বল্লে—কার্ত্তিক—অগ্রাণ হেমন্ত, পৌষ-মাঘ শীত—

—মানে, ডিসেম্বরে?

—ফাল্গুন—চোত বসন্ত; বুঝলে চিতু।

চিতু বল্লে—তা কি কখনো হয়? বাংলা মাসের সঙ্গে শীত বা ইযে বৃষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই।

বাঙালীদের মধ্যে দু'একজন তো শুধু আই-সি-এস পাশ করে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার হতে পারে—সাহেবদের সকলেই Administrator ওদেরই সব জিনিসগুলো ঠিক; বলে black in

November, নভেম্বর এলেই শীত।

সকলে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল।

কল্যাণীর আরসীর পাশে গিয়ে মিনু বেণী বাঁধতে লাগল।

কলেজে প্রফেসরদের কথা উঠল।

মিনু চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বল্লে—আমাদের মেয়েদের কলেজে পুরুষ প্রফেসর বড় একটা থাকে না; তাতে লেকচার খারাপ হয়ে যায—মেয়েরা কি লেকচার দেবে? জানে কি মেয়েরা?

মীরা বল্লে—তুমি নিজে মেয়ে নও?

মিনু আরসীর দিকে তাকিয়ে বল্লে—হলামই বা

কল্যাণী বল্লে—মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার এত হীন ধারণা মিনু—

মিনু বল্লে—কিছু জানে না মেয়েরা, যা জানে তাও ফুটিয়ে বলতে পারে না। লেকচার যা ধার করে শুধু

চিতু বল্লে—আমি তা মানব না—মেমসাহেবরা চমৎকার ইংরেজী পড়ান—এর চেয়ে ভালো প্রফেসর কলকাতার কোনো কলেজে তুমি পাবে না—

মিনু বল্লে—হ্যাঁ' বল্লেই হ'ল কলকাতার কোনো কলেজে পাবে না—বাইবেল মুখস্থ করলে আর প্রনানসিয়েশন জানলেই হয়ে যায় না, সাহিত্য ঢের গভীর জিনিস—

মীরা বল্লে—তা ঠিক—সাহিত্য—

চিতু বল্লে—পাকামো যত সব' সাহিত্যের মানে আমি জানি না বুঝি? তোমরা কেউ বলতে পার এখন পোয়েট লরিয়েট কে?

কেউ বলতে পারল না

চিতু বল্লে—ররার্ট ব্রিজেস

সুপ্রভা বল্লে—মেসফিল্ড—

চিতু বল্লে—তুমি ছাই জান'

সুপ্রভা বল্লে—মেসফিল্ড—আমি জানি।

চিতু বল্লে—যা জান না তা নিয়ে কথা বল কেন? ররার্ট ব্রিজেস পৃথিবীর সব চেয়ে (বড়) কবি

মিনু বল্লে—তা হোক গিয়ে; আমরা বলছিলাম কলেজের লেকচারের কথা—তার সঙ্গে ব্রিজেসের কি সম্পর্ক?

চিতু বল্লে—খুব সম্পর্ক। তোমরা সাহিত্য সাহিত্য কর, সাহিত্য তোমাদের চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি। প্রনানসিয়েশনই হচ্ছে সাহিত্যের সব চেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। বাঙালী প্রফেসররা না জানে প্রনাউনস করতে—না জানে গ্রামার—তারা আবার লেকচার দেবে কি?

কেউ কিছু বল্লে না।

মিনু বল্লে—হিষ্ট্রির প্রফেসরটি চমৎকার পড়ান কিন্তু মীরা

—কোন জন?

—ঐ যিনি নতুন এসেছেন—মিঃ গাঙ্গুলি—

মিনু বল্লে—আওয়াজ গুম গুম করতে থাকে—মেমদের মত মেয়েদের মত পিন পিন করে না।

মীরা বল্ল—বেশ ইন্টারেষ্টিং করতে পারেন

মিনু বল্লে—আঃ, রোমান এম্পায়ারের কথা যা বল্লেন—শুনতে শুনতে গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে—মনে হয় যেন টাইবারের পারে সেই ইটালিয়ান সিটিতে আবার চলে গেছি

চিতু হাঃ হাঃ করে করতালি দিয়ে হেসে উঠে বল্লে—মিনু একেবারে পিক-মি-আপ

সুপ্রভা বল্লে—টপিঙ্

চিতু বল্লে—দুঃখের বিষয় আমি হিষ্ট্রি নেই নি. না হ'লেও গাঙ্গুলির বাচ্ছার গ্রামার প্রনানসিয়েশন নিয়ে কড়কে দিতাম

—কি করতে

I'd have corked him

চিতুর কথায় কোনো কান না দিয়ে মিনু বল্লে—এক এক সময় মনে হয় যেন উনি একজন সেন্টুরিয়েন—প্রিফেক্ট—সিনেটর...আঃ পম্পির ওপর কি লেকচারটা দিলেন—

মীরা বল্লে—ভালোবেসেছিস নাকি

চিতু বল্লে—নিশ্চয ওঃ ভীষণ এনামার্ড!

কল্যাণী বল্লে—তাহ'লে বিয়ে করলেই পাব মিনু

—কাকে গাঙ্গুলিকে?

কল্যাণী বল্লে—হ্যাঁ, দেখতেও বেশ সুন্দব—অল্প বয়েস

মীরা বল্লে—বয়ে গেছে গাঙ্গুলিব মিনুকে বিয়ে কবতে—তাব চেয়ে কল্যাণী যদি একটু বেচাবাকে ভরসা দেয

সুপ্রভা বল্লে—কল্যাণীই তো আমাদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর

মিনু বল্লে—কলেজেব বিউটি

মীবা বল্লে—গাঙ্গুলিকে বল্লে এক্ষুণি

কল্যাণী বল্লে—আমাব বয়ে গেছে—

মিনু আহত হয়ে বল্লে—কেন?

কল্যাণী বল্লে—টিচাব বিয়ে কবব আমি? আমাব আর খেযে দেযে কাজ নেই।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে বইল—এমন দেমাক কল্যাণীব পক্ষে হযতো সাজে—খুবই সাজে বটে, তাই তো সে কেন একজন টিচাবকে বিয়ে কবতে যাবে?

মেয়ে কটি এই কথাই ভাবছিল—

প্রথম কথা বল্লে মিনু; মনটা তার কেমন একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল, মনে হচ্ছিল এক জন যোগ্য লোককে সেধে সেধে অপমান করা হ'ল—

মিনু বল্লে—আচ্ছা ভাই সুপ্রভা; তুমি তো খুব ভালো ইংরেজী জান—কলেজেব প্রফেসরকে টিচাব বলে না কি আবাব?

সুপ্রভা ঘোষাল চোখেব থেকে চশমা নামিয়ে আস্তে আস্তে মুছে নিচ্ছিল

মিনু বল্লে—এই যে কল্যাণী বল্লে 'টিচাব বিয়ে কবব আমি?'—একজন কলেজেব প্রফেসবকে কেউ আবাব টিচার ব'লে নাকি?

সুপ্রভা বল্লে—তা বলতে পাবা যায

মীবা বল্লে—টিচাব তো ইস্কুলেব—

মিনু বল্লে—আমিও তো তাই জানি

সুপ্রভা বল্লে—টিচার শব্দেব নানাবকম মানে হতে পারে। ইস্কুলেব মাষ্টাব তো দূবেব কথা কলেজেব প্রফেসবেব চেয়েও এই শব্দটিব জাযগায জাযগায ঢেব বেশী মর্যাদা—যেমন টলষ্টয একজন টিচাব ছিলেন—

সকলেই নীবব হয়ে বইল

চিতু বল্লে—টিচাব বিয়ে কববে না তুমি কল্যাণী?

—আমি বলেছিই তো কবব না।

—কেন, প্রফেসরদেব মধ্যে বড় বড় তো ঢেব আছেন

—তা থাক গে

চিতু বল্লে—গভর্ণমেন্ট কলেজের ইম্পিবিয়াল গ্রেডেব প্রফেসব হলেও কববে না?

কল্যাণী বল্লে—না।

চিতু বল্লে—আমি তো কবি—

সকলে অবাক হয়ে বল্লে—প্রফেসব বিয়ে কব তুমি চিতু?

—আই-ই-এস হলে কেন করব না?

—ওঃ আই-ই-এস!

চিতু বল্লে—তবে কি? একটা প্রাইভেট কলেজেব ববখুটেকে তাই বলে কবছি না।

ওরা খেতে পায় নাকি? ছেলেরা ওদের মাষ্টারমশায বলে।

কল্যাণী বল্লে—মিনুর প্রফেসর হলেই হয—

মীরা বল্লে—মন্দ কি? আমারও একজন হলেই হয—

চিতু বল্লে—গাঙ্গুলির মতন?

মীরা বল্লে—হ্যাঁ—খু-ব।

মিনু বল্লে—বসে আছে।
চিতু বল্লে—আর সুপ্রভার?
—আমি বিয়ে করব না।
—কি করবে?
সুপ্রভা দেখতে সুন্দর ছিল; খুব স্মার্ট; পড়াশুনাযও সকলেব চেয়ে সেবা।
সুপ্রভা বল্লে—পাশ করব। পাশ করে চাকরী ফাকরী নেব না আর। মেজদিব ওখানে গিয়ে কাটাব—নইনীতালে—পাইন বনের বাতাসের মধ্যে।
সকলেব বিমুগ্ধ হ'ল।
চিতু বল্লে—তোমাব মেজদিব বর সেখানে থাকেন বুঝি?
—হ্যাঁ
—কি করেন?
কল্যাণী বল্লে—আমারও ওইরকম একটা কিছু করতে হবে।
মিনু বল্লে—ওতে মনুষ্যত্ব থাকে না।
কল্যাণী বল্লে—কেন?
মিনু বল্লে—হয় স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়—না হয় নিজে করে খেতে হয়—
মীরা বল্লে—তা ঠিক
জিনিসটা কল্যাণীব মনে খুব গভীর ভাবে লেগে গেল।

এগারো

পূজোর ছুটিতে কিশোরের সঙ্গে দেশে চলে গেল কল্যাণী। সকালবেলা শালিখবাড়ীতে ষ্টীমার গিয়ে পৌছুল। কল্যাণীদের নেবার জন্য পঙ্কজ বাবু গাড়ী করে ষ্টেশনে এসেছিলেন।

বাড়ীতে পৌছে কল্যাণী দেখল দোতলার হলে একটি অদ্ভুত মানুষ বসে রয়েছে; অদ্ভুত ঠিক নয়, অদ্ভুত বলা চলে না; কিন্তু তবুও কল্যাণীর বার বার মনে হতে লাগল কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত এই মানুষটি—

লোকটি বেঁটেও নয়—লম্বাও নয়; কুঁজো; মাথার চুল পাৎলা হয়ে সামনে দিয়ে বেশ বড় টাক পড়ে গেছে; মুখ হলদে—কেমন চীনেদের মত যেন; মুখের ছাঁদও একেবারে চীনেদের মত। হঠাৎ দেখে কল্যাণী আঁৎকে উঠল—এমন খারাপ লাগল তার। কিন্তু তবুও ঠিক চীনে নয় যে—বাঙালী যে তা বোঝা যায়। মুখের ওপর পাঁচ ছয়টা আঁচিলের ভিতর থেকে দাড়ির মত লম্বা লম্বা চুল বেরিয়ে পড়েছে; লোকটা সেগুলোকে কাটেও না ছাঁটেও না। একটা সুট পরে বসে আছে সে। টাই ধরে নাড়ছিল। সামনে টেবিলের ওপর একখানা খবরের কাগজ মেলা। কল্যাণীকে দেখে খবরের কাগজ থেকে চোখ তুল্লে সে।

আর শীগগির সে চোখ ফেরাল না।

এমন আবিষ্ট হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে রইল। কল্যাণী ভয় পেল। লোকটার ওপর কেমন অশ্রদ্ধায় ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠল তার। হলের থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই এই মানুষটিকে ভুলে গেল কল্যাণী।

গুণময়ী ঘোল লেবু দিয়ে বেলের সরবৎ করে এনে দিলেন কল্যাণীকে—কল্যাণী খেতে খেতে বল্লে—আমি স্নান করে আসি গে

গেলাসটা সে টেবিলের ওপর রাখল

—এ কি এক চুমুক খেলি শুধু যে—সমস্তটুকু খেয়ে নে
—থাক
—কেন? ভালো লাগে না?
—লাগে বেশ
—তবে?
—আমি ভেবেছিলাম, মা, যে চা খাব—
—তা খাস্
—তুমি বেল দিলে যে?
—বেলও হবে, চাও হবে

সূচীপত্রে যান

কল্যাণী হেসে বল্লে—তা হয় না।

কল্যাণী গেলাসটা তুলে নিয়ে পানাটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল—

গুণময়ী বল্লেন—এত সাধের করা বেল—

কল্যাণী ফেলতে ফেলতে থেমে গিয়ে গেলাসটা টেবিলের ওপর রাখল—

বল্লে—কে খাবে?

—থাক্; কেউ যদি খায়।

স্নান করে কল্যাণী তেতলার বারান্দায় গিয়ে বসল ইজিচেয়ারে। বেশ লাগছিল। পূজোর ছুটিটাই সবচেয়ে ভালো লাগে তার। বেশীদিন দেশে পড়ে থাকতে হয় না। যে ক'টা দিন থাকা যায় সেও বেশ ফূর্তিতেই থাকাই।

খানিকক্ষণ পরে।

একটা বই আনবার জন্য দোতলায় নেমে গেল কল্যাণী; হলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আবার সেই লোকটির সঙ্গে দেখা। এর কথা এক মুহূর্ত আগেও মনে ছিল না, কাগজের থেকে মুখ তুলে কল্যাণীর দিকে আবার সে আবিষ্টের মত তাকিয়ে রইল।

কল্যাণী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে লোকটিকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে এরকম করে তাকানো তার উচিত নয়—এ নিতান্তই অসভ্যতা তার।

সে তা বুঝল কি না কে জানে!

এবারও মুহূর্তের মধ্যেই এ মানুষটির কথা কল্যাণী একেবারেই ভুলে গেল।

একটা বই বেছে নিয়ে তেতলার বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে ঠেসে বসল সে। বইটা; বার্নাড শ'র Intelligent Woman's Pride—

কলকাতার থেকে আসবার সময় মিনু গছিয়ে দিয়েছে। মিনুর বই।

বলেছে : পড়ে দেখিস।

সুপ্রভা দিয়েছে রেড লিলি; মীরা—তার নিজের বাংলা কবিতার খাতা; চিতু—অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড; এর চেয়ে চমৎকার বই পৃথিবীতে আর নেই; নাকি কমিশনার সাহেব বলেছেন; কল্যাণীর হাসি পেল—হোক না ডিভিশনের কমিশনার—

তাই বলেও বইয়েরও কমিশনার?

অ্যালিস অবিশ্যি পড়ে দেখবে কল্যাণী—

কিন্তু পৃথিবীর সব চেয়ে চমৎকার বই? তা কক্ষণো হ'তে পারে না। পৃথিবীর? পৃথিবীর!

পৃথিবর সবচেয়ে চমৎকার বই কি?

জানে না কল্যাণী।

বই সে এত কম পড়েছে!

কল্যাণীর মনে হ'ল কোনো একখানা বইকে সবচেয়ে বড়—সব চেয়ে ভাল—এ রকম বলতে পারা যায় না।

লোকে বাংলা বইগুলোকে এত অগ্রাহ্য করে কেন?

কলেজের মেয়েরাও

বাঙালীদের মধ্যে কি লেখক নেই?

তেমন ধরনের বই নেই?

বাংলা বই অনেক পড়েছে বটে কল্যাণী; মাঝে মাঝে এক একটা বইকে মনে হয়েছে—মন্দ নয়; বেশ তো! এরকম একে একে ঢের বই বেশ লাগল। কিন্তু মিনুকে সেই বইগুলোর নাম বলতেই সে এমন হেসে ফেল্ল—

মিনু এবার বি-এ দেবে। ঢের জানে।

মিনুর কথাই গ্রাহ্য করতে হয়।

মিনু বলে বাংলায় আবার বই আছে নাকি?

সুপ্রভাও তাই বলে।

চিতু তো বলবেই; সে বাংলা পড়তেও পারে না। ছেলেমানুষের মত বানান ভুল করে যা-তা বাংলা চিঠি লেখে।

মীরার আবাল্য এদের সঙ্গে মত মেলে না। মীরা বাংলা সাহিত্যের ঢের জানে। কল্যাণীর মনে হ'ল ছোড়দা সেদিন কলকাতায় আর্টের কথা বলছিল—থিয়েটার থেকে ফিরেও কি সব বলছিল; আস্তে আস্তে মনে হতে লাগল কল্যাণীর।

সে দিনকার সেই গঙ্গাটাকে মনে হ'ল; মীরার কবিতার খাতা Intelligent Women's Pride—এর ভেতরেই রয়েছে। খাতাটা সে কোলের উপর উঠিয়ে রাখল।

বইটা খুল্ল।

কিন্তু পড়তে ইচ্ছা করছিল না।

আশ্বিনের ভোরবেলা।

বহুযার মাঠটা কি সবুজ; সাদা সাদা কাশে ভরে গেছে; মাছরাঙা উড়ছে, এক ঝাঁক গাঙশালিখ কিচির মিচির করছে; ক্ষীরুই গাছের ডালে একটা টুনটুনি।

সুপ্রভা বলেছিল নইনীতালে গিয়ে তার মেজদির কাছে থাকবে—মেজদির বরের কাছে; রামঃ! ওতে কি মনুষ্যত্ব থাকে? মিনু যা বলেছে তাইই ঠিক, মেয়েদের স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়—কিম্বা করে খেতে হয়। বাবার সঙ্গেও চিরদিন থাকবার অধিকার নেই মেয়েদের। বাবা তো চিরকাল বেঁচে থাকেন না। এইসব ভাবনা কল্যাণীর মনকে নিরুদ্দেশের মধ্যে ঘোরাচ্ছিল।

কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল তার।

গুণময়ী এক গজ মসলিনের কাপড় নিয়ে এলেন

কল্যাণী বল্লে—কি হবে মা এটা দিয়ে?

—এটার ওপর একটা নক্সা আঁকব

—কিসের নক্সা

—পদ্মর

কল্যাণী হেসে উঠল—

গুণময়ী বল্লেন—হাসলি যে, ঠাট্টা হ'ল বুঝি? পদ্মর নক্সা আমি আঁকতে পারি না?

কল্যাণী বল্লে—না, তা নয়, মা, আমি ভাবছিলাম এত নতুন নতুন নক্সা থাকতে সেই একঘেয়ে পদ্মর নক্সা ছাড়া আর তুমি কিছু খুঁজে পেলে না?

জুতোর শব্দ হচ্ছিল

কল্যাণী বল্লে—বাবা আসছেন বুঝি।

পরের মুহূর্তেই পঙ্কজ বাবু আর সেই ভদ্রলোকটি এসে দু'টো সোফায় বসলেন। কিশোরও এল; ইতস্ততঃ সোফা ছড়ানো ছিল—সেও একটায় বসল।

কল্যাণী দেখলে মা উঠলেনও না, চোখও তুল্লেন না, ঠায় বসে ডিজাইন বুনছেন—একটা পদ্মর ডিজাইন।

কল্যাণীও বসে রইল।

ভদ্রলোকটি গুণময়ীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—আমি তো আপনাদের সকলকেই চিনি—কাজেই লজ্জার আর কি?

গুণময়ী একটু হেসে বল্লেন—হ্যাঁ, লজ্জাসঙ্কোচের আর কি?

কল্যাণীর মনে হ'ল লজ্জার যে কিছু বা কিছু নয় সে সব কথা এ মানুষটিকে জিজ্ঞেস করেছে নাকি কেউ? ভারী তো গায় পড়ে কথা বলার অভ্যাস। সে বিরক্ত হয়ে বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোকটি বল্লেন—কর্তা আমাকে একেবারে আপনাদের অন্দরের মধ্যে টেনে এনেছেন আমি আপনাদের ডিষ্টার্ব করছি না তো—

গুণময়ী বল্লেন—আপনি আসাতে খুব খুসি হয়েছি—

—তার চেয়েও বেশী খুসি হয়েছি আমি—

পঙ্কজ বাবু একটা চুরুট ধরিয়ে বল্লেন—তুমি একটা চুরুট তুলে নাও চন্দ্রমোহন।

এর নাম তবে চন্দ্রমোহন? কল্যাণী ঘাড় তুলে একবার তাকাল; চন্দ্রমোহন তার দিকে কেমন এক রকম করে যেন তাকিয়ে রয়েছে। কল্যাণীর কেমন যেন গ্লানি বোধ হ'ল।

কেমন কুৎসিৎ—বিশ্রী চেহারা—হলদে রং চীনের মত মুখ—মুখে আঁচিল ভরা ভরা দাড়ি—এ ভদ্রলোক কোত্থেকে এলেন? কেন এলেন? তাদের পরিবারেই বা কেন? বাবার সঙ্গেই বা এত খাতির

কেন? সমস্ত বাড়ীটা পড়ে থাকতে কল্যাণী মধুর অবসরের জায়গায়ই বা কে আসতে বল্লে তাদের...ভাবতে ভাবতে কল্যাণীর সমস্ত শরীর মন যেন পীড়িত হয়ে উঠল।

সে উঠে যেত—কিন্তু নড়তে চড়তেও তার যেন কেমন ঘৃণা বোধ হচ্ছিল—বইটার দিকে একমনে তাকিয়ে রইল সে।

চন্দ্রমোহন বল্লে—আমি চুরুট খাই না; মাপ করবেন।

পঙ্কজবাবু গুণময়ীকে বল্লেন—দেখেছ এমন সৎ—একটা চুরুট অব্দি খায় না।

গুণময়ী একটু হাসলেন

চন্দ্রমোহন বল্লে—আমাকে লজ্জা দেবেন না, আপনার উদার অটুট অতুলনীয় চরিত্রের কাছে আমাকে টেনে এনে কেন কলঙ্ক বাড়ানো। চুরুট কেন, আপনি যদি মদের বোতলও হাতে ধরেন তবুও তা আপনার চরিত্রের মাধুর্য্যে যেন সুধায় রূপান্তরিত হয়ে যায়—

কল্যাণীর এমন হাসি পেল, তার মনে হ'ল ছোড়দাও নিশ্চয়ই হাসছে; কিন্তু কিশোরের মুখ গম্ভীর।

মার দিকে তাকিয়ে দেখল কল্যাণী—মাও স্থির; বাবার মুখ প্রসন্ন।

কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবল : এ কি, চন্দ্রমোহনের ভণ্ডামি কেউ ধরতে পারছে না কেন?

চন্দ্রমোহন গুণময়ীর দিকে তাকিয়ে বল্লে—আপনার অনেক পুণ্যি মা, জন্মজন্মের তপস্যায় এমন শিবস্বামী কপালে আসে—

গুণময়ী ও পঙ্কজ বাবু দু'জনের দিকে লক্ষ্য করেই খুব গভীর ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করল চন্দ্রমোহন।

কল্যাণীর মনে হ'ল চন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে তার মনের ঝাল আগের মতন তেমন তীব্র নেই—লোকটা অসহ্য বটে, কিন্তু তবুও অগ্রাহ্য করতে পারা যায় একে, ক্ষমা করতে পারা যায়।

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনার আলুবখরার টক ভারী চমৎকার মা

গুণময়ী বল্লেন—একদিন তো শুধু বেঁধেছি

—ঐ একদিনেই কিনে নিয়েছেন—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—যে ক'দিন আছে, একটু আলুবখরা দু'বেলা করলেই পার

গুণময়ী প্রীত হয়ে বল্লেন—আমি আগে যদি জানতাম—

চন্দ্রমোহন বল্লে—আমার মা পিসিমা জেঠিমা মাসীমা মামী—সবারই দুর্দ্দান্ত রান্নার হাত—কলকাতার সব জাঁহাবাজ নেমন্তন্ন সামলান—কিন্তু টক, এমন চাটনি তো কেউ বাঁধতে পারেন না।

সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনার চিংড়ী কাটলেটই বা কি চমৎকার! কলকাতার কত রেস্টুরেন্টে আমি খেয়েছি—একদিন এক চীনে বাবুর্চী খাসা বেঁধে দিয়েছিল—কিন্তু আপনার হাতের ভাজা খেয়ে বুঝলাম যে এদ্দিন ছিবড়ে খেয়েছি—

গুণময়ীর চোখ মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—গিন্নী রান্না শিখেছিলেন তাঁর মার কাছে—খুব ঝাঁঝালো রাঁধুনির গুষ্টি

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনি কি আঁকছেন মা?

—পদ্ম

—বাঃ কি চমৎকার ছুঁচের কাজ উঠে আসছে—কি গ্র্যাণ্ড বাঃ! এমন চেকনাই পদ্ম তো আমি কোনোদিন দেখিনি—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—বেশ হাত আছে—

গুণময়ী বল্লেন—এখনও হয়নি—

চন্দ্রমোহন বল্লে—এরকম আরও বুনেছেন আপনি?

—হ্যাঁ

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনার তো শুধু এই করাই উচিত—যে জিনিয়াস আর্টের থাকে অন্য কিছু দিয়ে খোয়ানো উচিত নয়—

কল্যাণী শিহরিত হয়ে উঠল: এ লোকটাও আর্টের কথা বলছে?

চন্দ্রমোহন পঙ্কজবাবুকে বল্লে—আপনাদের ড্রয়িংরুমে কার্পেট দেখলাম—চমৎকার কার্পেট—এমন কার্পেট কোথাও তো দেখিনি আমি আর—অথচ কলকাতায় বড় বড় ব্যাপারীদের সঙ্গে আমার কার্ব্বার—

সকলেই গর্ব্ব অনুভব করতে লাগল—কি না লাগল ঠিক বুঝতে পারল না কল্যাণী। লোকটা বেশি

সূচীপত্রে যান

বাড়াবাড়ি করছে না তো।

চন্দ্রমোহন বল্লে—আর কি জমকালো বই বাড়ীখানা করেছেন—ঠিক যেন একটা পুরীর মত; কলকাতায় কত রাজামহারাজার বাড়ী দেখেও এরকম মন ওঠেনি আমার—

চন্দ্রমোহন গম্ভীর সম্ভ্রম বিস্ময়ের সঙ্গে বাড়ীখানার কড়ি বর্গা দরজা জানালা খিলান চৌকাঠের দিকে তাকাতে লাগল—

বাড়ীখানার রেণুপরমাণুর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রমোহনের সঙ্গে অন্য অন্য সকলেও খুব গৌরব বোধ করছিল হয়তো; কিম্বা আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হয়েছিল

কিশোরের দিকে তাকিয়ে বল্লে—এই ছেলেটি আপনার খুব বড় কবি হবে—

পঙ্কজ বাবু ও গুণময়ী ঈষৎ কৌতূহলে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল—

চন্দ্রমোহন বল্লে—এমন ভাবুক চিন্তাশীল চিত্তবৃত্তি শীগগির আমি আর দেখিনি—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—কি করে বুঝলে?

চন্দ্রমোহন বল্লে—চোখ নাক কপাল দেখলেই বুঝতে পারা যায় এর কত বড় প্রতিভা—আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে বসে বসে দেখেছি—

অবাক হয়ে বসে বসে বাস্তবিক সে দেখছিল কল্যাণীকে; কিন্তু কল্যাণী মুখও তুল্ল না—কিশোরের প্রতিভার প্রশংসার কথা শুনেও চন্দ্রমোহনের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনবার জন্য বিশেষ কোনও আগ্রহ বোধ করল না সে; কল্যাণীর মনে হ'ল এ লোকটি সব জিনিসকেই চমৎকার বলে, সাজিয়ে সাজিয়ে মনের মতন কথা বলে বাবা মার মন গলাতে চায় শুধু, কল্যাণী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তাদের ড্রয়িং রুমের কার্পেট কলকাতার সব দোকানের সব রকম কার্পেটের চেয়ে সেরা—অত্যন্ত শস্তা সাধারণ কার্পেট তাদের; মার হাতের আঁকা পদ্ম অত্যন্ত সাদাসিধে জিনিস—আলুবখরার টকও তেম্নি—চিঁড়ের কাটলেটও তাই—

কিন্তু চন্দ্রমোহনের হলদে রং—আর চীনেম্যানের মত মুখ—মুখভরা আঁচিল আর আঁচিলের দাড়ি—সেগুলো যে অত্যন্ত কুৎসিৎ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কল্যাণী ভ্রুকুটি করে বসে রইল।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—এখন কাজের কথা।

চন্দ্রমোহন অত্যন্ত বিরস ভাবে বল্লে—কাজ আর কি? পাটের জন্য আমাদের বিস্তর ক্ষতি দিতে হয়েছে—

—কত?

—আশী লাখ টাকা

—আশী লাখ!

চন্দ্রমোহন একটু হেসে বল্লে—আশী লাখ আবার টাকা

বলে কল্যাণীর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু এ মেয়ের মুখের ভিতর কোনো পরিবর্তন নেই; সে ঘাড় গুঁজে বই-এর পাতার দিকে তাকিয়ে পড়ে যাচ্ছে—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—তাহ'লে অদ্বিতীয় বিড়লার ব্যবসা

—হ্যাঁ পাঁচ সাত কোটি টাকার

—পাঁচ সাত কোটি

চন্দ্রমোহন একটু বিনয়ের সঙ্গে বল্লে—তা হ'লই বা পাঁচ সাত কোটি! টাকাকে আপনি অত বড় করে দেখেন কেন পঙ্কজবাবু। টাকাই কি সব? তাহ'লে বেনেরাই তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাপুরুষ হ'ত। মহাপুরুষ—মনুষ্যত্ব সে সব একেবারেই আলাদা জিনিস।

এ কথাগুলো শুনতে পঙ্কজ বাবুর ভালো লাগছিল—গুণময়ীরও।

কল্যাণীরও মনে হ'ল বেশ বলেছে; খনখনে গলাটাকে আগের মতন তেমন খনখনে বোধ হচ্ছে না যেন; কেমন যেন আন্তরিকতায় ভিজে উঠেছে এবার।

অনেকক্ষণ পরে এবার চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল কল্যাণী। দেখল চন্দ্রমোহন তার দিকেই তাকিয়ে আছে—খুব অবসন্ন মনে হচ্ছে লোকটাকে; কেমন যেন একটা নিরুত্তর নিবেদন কল্যাণীর কাছে তার। চন্দ্রমোহনের ওপর আগের মত ঘৃণা নেই যেন আর কল্যাণীর—কেমন একটু দয়াবোধ হতে লাগল এ লোকটির জন্য—মনে হতে লাগল এর চেহারা তো এ নিজে তৈরি করেনি—বিধাতা দিয়েছেন; কিন্তু এর

মনটা তো এ নিজে প্রস্তুত করে তুলেছে একরকম মন্দ না—

কিন্তু এ সব ভাবনা কল্যাণীর দ'এক মুহূর্তের জন্য। এ লোকটি কি—এবং কি নয় সে নিয়ে কল্যাণী আর মাথা ঘামাতে গেল না।

সেরকম চিন্তা তার ভালো লাগছিল না। মোটেই ভালো লাগছিল না।

বারো

চন্দ্রমোহন বল্লে—ব্যবসার ফাঁক নানাবকম—আজকাল সবাই দেখছি গুড় খায়; জানেন মা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিযার সিভিল সার্জন এমন কি বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বাড়ীতে এসে গুড় দিয়ে চা খান

পঙ্কজ বাবু অবাক হয়ে বল্লেন—বটে

গুণময়ী বল্লেন—ম্যাজিস্ট্রেটও

—হ্যাঁ; কাজেই এই বেলা গোটা কয়েক চিনির কল শানাব ঠিক করেছি—বেশ পড়তা হবে

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—ব্যবসায় তোমাদের মাথা বেশ খোলে—

চন্দ্রমোহন বল্লে—ক্যাপিটেল থাকলেই মাথা খোলে—

—তাও বটে

টাকা আগুনে গলিয়ে দিনবাতই টেব পাচ্ছি যে কি দুর্দ্দান্ত পক্ষিবাজ ঘোড়াযই চড়েছি পঙ্কজ বাবু—

—পাঁচ সাত কোটি টাকা। তুমি একাই?

চন্দ্রমোহন একটু আমতা আমতা করে বল্লে—না, হ্যাঁ—একবকম একাই চালাচ্ছি

—ক'জন পার্টনাব?

—সব স্লিপিং—

—ক'জন?

—আছে দু'এক জন

পঙ্কজবাবু আর বেশী চাপতে গেলেন না; পাঁচ সাতজন পার্টনাব থাকলেই বা কি—ছ সাত কোটি টাকার ব্যাপাব যখন।

চন্দ্রমোহন বাংলা জোড়া একটা মুচি বোর্ড, জার্ম্মেন ও ডেনিশদেব মত বাঙালীদেবও একটা লটাবি অর্গানিজেশন, বিপুল বিরাট স্বদেশী ব্যাঙ্ক, স্বদেশী ইনসিওবেন্স কোম্পানী ইত্যাদি নানারকম ব্যবসার কথা অনেকক্ষণ বসে বল্লে—

তারপর যখন বাবান্দায় কেউ আব ছিল না তখন পঙ্কজবাবুব কাছে ধীবে ধীবে কল্যাণীর কথা পাড়লে।

মেয়ের পিতার কাছ থেকে এত বেশী ভবসা পেল চন্দ্রমোহন যে সে বাতটা ঘুমিয়ে—ঘুমের মধ্যে দিব্যযোনিদেব স্বপ্ন দেখে কাটিযে দিতে পাবলেই ভালো হত তার। কিন্তু সারাটা বাত ছটফট ক'রে—জেগে থাকতে হ'ল; মুখে মাথায় চাপড়ে চাপড়ে ঠাণ্ডা জল দিয়েও কোনো লাভ হ'ল না, কোনো লাভ হ'ল না আত্মরতি নিগ্রহের পথে ঘুমের আবেশ অধিকার করে নিতে গিয়ে।

পরদিন সন্ধ্যায কেউই বাসায ছিল না।

হরিচরণ চাটুয্যের ছেলেরা ঘটা করে যাত্রা দিচ্ছে—কর্ত্তা গিন্নী প্রসাদ কিশোব সব সেখানে বিকেল থেকেই। কত বাতে যে ফিরবে তার ঠিক ঠিকানা নেই কিছু। কল্যাণী যাযনি—সকাল থেকেই আজ তাব মাথা ধরে রয়েছে—

স্মেলিং সল্টেব বোতল—মীবার কবিতার খাতা— Intelligent—এক শিশি মেন্থল—ও এক ফাইল কি যেন ট্যাবলেট নিয়ে তেতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিল সে।

দুপুরবেলা চশমাটা খুলে রাখতে মাথা ধরা যেন আবো বেশী বেড়ে গেছে; কল্যাণী সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবছিল চশমা না বদলাতে হয় আবার; চোখ তাকে পৃথিবীতে অকৃতার্থ করে তুলেছে না কি?

বইটা সে খুল্লে—পৃষ্ঠা পঁচিশেক আন্দাজ পড়া হয়েছে—সে কিছুই বোঝে না; এ বই তাব ভালো লাগে না।

বইটা সে বন্ধ করে রাখল।

কি যে ভালো লাগে তার—এই পৃথিবীতে কোথায় যে তার প্রয়োজন—জীবনে নতুন বহস্য কখন যে উদঘাটিত হবে কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

ভিলুন্দির জঙ্গল আঁধার হয়ে উঠছে—

সন্ধ্যার কাক নিজের ঘরে যাচ্ছে তার—না জানি কতখানি গৃহিণীপনা বয়েছে এর মধ্যে—নিস্তব্ধ পরিতৃপ্ত দাম্পত্য সম্পদ রয়েছে!

কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবছিল—

জুতোর শব্দ শোনা গেল—

হয়তো বাবা আসছেন।

Intelligentটা আবার খুল্ল কল্যাণী; একটু মেলিং সল্ট শুঁকে নিল—হলেব পুব—ধারের বাঁ দিকের দবজাটা একটা ধাক্কা খেয়ে খুলে গেল—

কল্যাণী চমকে উঠে বল্লে—কে

চন্দ্রমোহন বল্লে—আমি

মুহূর্ত্তের মধ্যে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে—

কল্যাণী বল্লে—আপনি এখানে?

—ওঁরা সব কোথায়?

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল; কিছু বলতে পারলে না সে—

চন্দ্রমোহন বল্লে—তিন তলাই তো ঘুরে এলাম—কাউকেই তো দেখছি না কল্যাণী ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে কবতে বল্লে—কেউ নেই

—কোথায় গেছে?

যাত্রা শুনতে।

—যাত্রা কোথায়?

—হবিচরণ চাটুয্যের বাড়ী—

—আপনাব বাবা মা সব সেখানে?

—হ্যাঁ

—প্রসাদও?

—হ্যাঁ

—কিশোব নেই?

কল্যাণী একটু বিবক্ত হয়ে বল্লে—বল্লামই তো—

চন্দ্রমোহন বল্লে—ওঃ। তা বলেছেন বটে—আমাব ভুল হয়েছিল—আমাকে ক্ষমা কববেন।

একটা সোফার ওপর বসল সে—এমন নির্ব্বিবাদে; কোনো রকম বালাই যেন নেই লোকটাব।

কল্যাণী বেগে কাঁই হয়ে এব এই অদ্ভুত অসভ্যতা দেখল; তাবপব ভাবল, উঠে যাই। কিন্তু তক্ষুণি তাব মনে হ'ল কেন উঠে যাবে সে, তাব নিজেব জাযগাব থেকে একটা উটকো গোলা লোক এসে তাকে সবিয়ে দেবে? সে সরে যাবে? তা কিছুতেই হবে না।

সে ইজিচেয়ারে চেপে বসে বইল—

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনার সব কটি ভাইর নামই খুব সুন্দর—বিজলী— প্রসাদ—কিশোব—বাঃ

একটু পরে—আপনাব মাব নামও; ওবকম নামেব যে কত বাহাদুবী—কি চমৎকার নাম যে—আমি ভেবে শেষ কবতে পারি না—

কল্যাণী নিস্তব্ধ হয়েছিল।

চন্দ্রমোহন বল্লে—চমৎকাব নাম!

অন্ধকার হয়ে আসছিল—বইয়েব দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতে পারা যায—একটা অক্ষবও বুঝতে পারা যায় না—বইটাকে একটা বিষের পুঁটুলি বলে মনে হ'ল কল্যাণীব—বাপ মা দাদাদেব মর্ম্মান্তিক নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ভেবে কান্না পেতে লাগল— কোথায় তার পাশে বসে সকলে মিলে গল্প করবে তারা না এ কি অদ্ভুত অঘটনের ভিতর তাকে ফেলে দিয়ে পালাল সব—

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনাব বাবার কাছ থেকে জেনে নিলাম আপনাব নামটা—

কল্যাণী ব্যথিত হয়ে নদীটার দিকে তাকাল

চন্দ্রমোহন বল্লে—এমন চমৎকার নাম! সবচেযে চমৎকার নাম আপনাব! বাঃ কি চমৎকার!

চন্দ্রমোহন বল্লে—মনে মনে আউড়ে কত কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছি আমি; কত কৃতার্থ হচ্ছি। কিন্তু এ

সার্থকতাকে আরো পূর্ণাঙ্গীণ করে তুলতে পারা যায়—

কল্যাণী বইটার দিকে আবার তাকাল—

চন্দ্রমোহন বল্লে—যায় না!

নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়ে বল্লে—তা যায়—

ওসমান যাচ্ছিল—

কল্যাণী বল্লে—ওসমান

—হুজুর

—একটা বাতি নিয়ায় তো

—হুজুর—বলে ওসমান চলে গেল।

কল্যাণী চশমাটা খুলে আঁচল দিয়ে মুছতে লাগল—

চন্দ্রমোহন বল্লে—ভারী চমৎকার চশমাটা তো আপনার—বাঃ, কেমন সুন্দর! লরেন্সের বাড়ীর?

প্রতিপক্ষের থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বল্লে—আমার এক বন্ধু খুব বড় চোখের ডাক্তার—ডাক্তার হালদার—খুব শাঁসালো—বিস্তর পয়সা করেছে।

কল্যাণী ধীরে ধীরে চশমা পরল

চন্দ্রমোহন বল্লে—এমন চমৎকার মানায় আপনাকে! চশমা আঁচলে! যেমন চশমার সৌন্দর্য্য তার চেয়ে কত বেশী চমৎকার যে—

ওসমান বাতি আনল

কল্যাণী বল্লে—ঐ তেপয়টা এখানে এনে তার ওপর রাখ—

রেখে দিয়ে ওসমান চলে গেল।

চন্দ্রমোহন বল্লে—দেশে দেশে কত সুন্দর মুখ দেখেছি আমি কিন্তু কাল থেকে যে অতুলনীয় রূপরাশি আমি দেখলাম পৃথিবীতে যে এরকম থাকতেও পারে কোনোদিন তা কল্পনাও আমি করতে পারিনি—

কল্যাণী বল্লে—আমি তো আপনার কোনো কথারই জবাব দিচ্ছি না—মিছেমিছে আপনি এখানে বসে কেন হায়রান হচ্ছেন; ওরা আসুক—তারপর কথা বলে ঢের পরিতৃপ্তি পাবেন আপনি—

চন্দ্রমোহন বল্লে—ভুল করলেন

কল্যাণী বাতির আলোর ভিতর বই খুলে ঘাড় ফিরিয়ে রইল।

—আমার কিসে পরিতৃপ্তি তা আমি কি জানি না?

কল্যাণীর মুখে কোনো জবাব জুয়াল না; মুখে যা আসে তা বড় অভদ্র—উগ্র—কেমন মর্ম্মান্তিক। শিষ্টাচার বজায় রেখে কিছু কি সে বলতে পারে না?

কল্যাণী ভাবতে লাগল।

চন্দ্রমোহন বল্লে—পৃথিবীর সবচেয়ে পরিতৃপ্তি আমার এইখানে বসে—বসে শুধু—

চন্দ্রমোহন আরো বল্লে—আপনার সান্নিধ্য বসে যা তৃপ্তি তা স্বর্গেও নেই

কল্যাণী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে বল্লে—কিন্তু ঠিক তাতেই আমার সব চেয়ে বেশি অতৃপ্তি—বড্ড অস্বস্তি—আপনি আমার কথা বুঝেছেন?

নিজের গলার ভয়াবহ রুক্ষতায় কল্যাণী নিরস্ত হয়ে গেল। আরো ঢের কঠিন সাংঘাতিক অনেক কথা বলবে ভেবেছিল সে। (কিন্তু কণ্ঠ তার করাতের মত এক টানেই ঢের জটিলতা কেটে দিয়েছে—কৃতার্থ হয়ে বইটার দিকে তাকাল সে—)

চন্দ্রমোহন অম্লান বদনে বললে—আজ আপনার অতৃপ্তি কিন্তু একদিন আপনিও তৃপ্তি পাবেন—

কল্যাণী স্তম্ভিত হয়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল—

চন্দ্রমোহন বল্লে—বড় একটা ডাঁহা কথা বলে ফেলেছি কল্যাণী দেবী।

একটু পরে আস্তে আস্তে বল্লে—কিন্তু একদিন তা আর মনে হবে না।

একটা ব্যাধের জালের মত কঠিন ছিদ্রহীন যেন এইসব কথা, কল্যাণীর হৃদয় ভীরু পাখীর মত নয় বটে, একটুও নয়, কিন্তু তবুও মনটা কেমন ছমছম ক'রে উঠল তার।

চন্দ্রমোহন বল্লে—ছোটদের বড্ড ভুল ধারণা—আপনার মত ছোট যখন ছিলাম তখন আমিও বড্ড ভুল ভাবতাম। কিন্তু এখন আমার বয়স বিয়াল্লিশ—

সে একটু থামল।

সূচীপত্রে যান

তাবপব বল্লে—আপনাবও যখন বিয়াল্লিশ হবে ঠিক আমাব মতই ভাববেন।

চন্দ্রমোহন একটু কেশে বল্লে—এখন আপনি রূপ চান; চান না? হয়তো শুধু রূপই চান—পুরুষমানুষেব, মেয়েলোকেব—

চন্দ্রমোহন একটু উপহাসেব সুবে হেসে বল্লে—যে পুরুষেব শুধু রূপ আছে সে যে কত অবজ্ঞেয় জীবনেব সব সাধ সাধনায় মণিকর্ণিকাব মত সুন্দব আগুন জ্বালিয়ে বেড়াবাব মত তাব যে আব জুড়ি নেই—একদিন তা বুঝবেন।

চন্দ্রমোহন বল্লে—টাকাব দাম সবচেয়ে বেশী—এও একদিন বুঝতে হবে।

কল্যাণী কাঠেব মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল—

চন্দ্রমোহন উপলব্ধি কবে বুঝে নিল। অত্যন্ত সহানুভূতিব সুবে বল্লে—মানুষেব বিচাবেব ভুল সুন্দব বৈকি—মুহূর্ত্তেব ইন্দ্রধনুব মতনই চেকনাই; রূপ চাই বিদ্যা চাই কুশলতা চাই গা চাই বাজনা চাই আর্ট চাই—কিন্তু তবুও একদিন বুঝবেন যে এ সবেব চেয়ে ঢেব বড় হচ্ছে টাকা আব সে একটু ভেবে বল্লে, স্বাস্থ্য আব চবিত্র—

নিজেব সুস্থতাব কথা বলতে লাগল চন্দ্রমোহন—এই বিয়াল্লিশ বছবেব মধ্যে এক দিনেব জন্যও কোনো অসুখ কবেনি তাব; ভবানীপুবেব কোনও শিখই পাঞ্জায় তাব সঙ্গে লড়ে উঠতে পাবে না; যে কোনও লম্বা চৌকো ক্যামেবন হাইল্যান্ডাবকে কুস্তিতে সে হাবিয়ে দিতে পাবে; (হয়েছে? কলকাতায় সে বোজ পাঁচ সেব ঘি সাত-আট সেব এলাচ—পনেবো কুড়িসেব কিসমিস—পেস্তা বাদাম আখবোট বেদানা সবই এইবকম এইবকম আন্দাজ খায়—)

চন্দ্রমোহন তাব ধর্ম্মেব কথা পাড়ল—ভগবানে অটল বিশ্বাস না বাখলে অবিশ্যি কোনো টাকাবই কোনো মূল্য নেই; একমাত্র জিনিস যা টাকাব চাইতেও বড়—তা হচ্ছে প্রেম—। স্বামী-স্ত্রীব প্রেম। কিন্তু ভগবান স্বামী-স্ত্রীব প্রেমেব চাইতেও ঢেব বড় জিনিস—এত বড় যে কল্পনা কবতে পাবা যায় না। সেই ভগবানে আত্মনিবেদন না কবতে পাবলে কিছুই হয় না।

চন্দ্রমোহন বল্লে : কিন্তু ভগবানেব এমনই নিয়ম যে তাঁব ভক্তকে তিনি নিজেই চিনে নেন, নিজেই তাব ওপব কৃপা কবেন—বড় বিশেষ বকমেব কৃপা সে এক—সমস্ত অমঙ্গল অধর্ম্মেব পথ থেকে নিজেই তাকে তিনি বক্ষা কবেন।

চন্দ্রমোহন বল্লে · নিজেব জীবনে ভগবানেব সেই বিশেষ কৃপা আমি বোজি অনুভব কবি—প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব কবি। যে জিনিস আমি চেয়েছি তিনি সব সময়ই আমাকে দিয়েছেন—একবাবও তো বঞ্চিত কবেননি। টাকাও অনেক সময় মানুষকে প্রতাবিত কবে—কিন্তু ভগবানেব ভালোবাসা—মায়েব ভালোবাসাব চেয়েও আন্তবিক; স্বামী-স্ত্রীব প্রেমেব চেয়েও; বত যে আন্তবিক তা ভেবে কিনাবা কবতে পাবা যায় না।

চন্দ্রমোহন বল্লে—আমাব জীবনেব সম্পদ টাকা নয়,—ভগবানেব কাছে এই আত্মনিবেদন শুদ্ধ হয়ে নির্মল হয়ে—আমাব জীবনকে সব চেয়ে বড় সম্পদ দিয়েছে—

চন্দ্রমোহন বল্লে—টাকাব কথা আমি তুলতামই না—আপনাব বাবা জিজ্ঞেস কবেছিলেন—শুনেছেন হয়তো—সাত কোটি টাকাব কার্ব্বাব আমাদেব—

টাকাব সম্বন্ধে এব চেয়ে বেশী কিছু আব বল্লে না চন্দ্রমোহন। (বলবেই বা কি : সে অনেক কথা। বড় জটিলতাব ব্যাপাব।)

সে কিছুক্ষণেব জন্য থামল।

পঙ্কজ বাবু এসে পড়েছিলেন

বল্লেন—চন্দ্রমোহন তুমি এখানে?

কল্যাণীকেও দেখলেন তিনি,—মেয়ে ভাবল বাবা না জানি এ লোকটাকে কত দূব অভদ্র—অপদার্থ বলে বুঝতে পেবে দু'কথা শুনিয়ে বেব কবে দেবেন—কিন্তু অবাক হয়ে দেখল কল্যাণী বাবা তা কিছুই তো কবলেন না—তাঁব মুখ দিব্যি প্রসন্ন—এখানে এসে আবও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে যেন—

কল্যাণীব মন সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল—এমন নিরাশ নিঃসহায় মনে হতে লাগল নিজেকে তাব—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—চন্দ্রমোহন, যাত্রা শুনতে গেলে না যে?

—যাত্রা আমি শুনি না।

—ভালো লাগে না?

—না।

—কেন?

—নাচগানে ক্রমে ক্রমে একটু আতিশয্য এসে পড়ে—মজলিসী ভাব আসে—নানা কথা বলা হয়—ফুর্ত্তিতামাসাব বাঁধ থাকে না—এই পূজোআচ্চার সময়ে যাত্রাফাত্রায় তো ঢের কেলেঙ্কারি হয় মদ থেকে সুরু করে—

চন্দ্রমোহন থামল—

পঙ্কজ বাবু চুরুট জ্বালালেন; এক টান দিয়ে বল্লেন—তা যা বলেছ—ভাববার মত কথা বটে—

চন্দ্রমোহন বল্লে—আগেকার পালাগানের সে বিশুদ্ধতাও নেই। কেমন একটা আন্তরিকতা ছিল তখন! করুণা মধুরতা প্রেমের কি কোনও অবধি ছিল পঙ্কজ বাবু? ছোটবেলার কথা মনে করে এখনও মন এমন ভিজে ওঠে। সে সব দিন আর নেই—বাইজী খেমটাওয়ালী মদ—হৈরৈ, রাগ রক্ত, কি যে সব—সে করুণতা নেই—মধুরতা নেই—প্রেম নেই—

পঙ্কজ বাবু যেন ভক্তির কথা শুনছিলেন—কল্যাণীর মনে হ'ল—গযাসুরের মুখে।

তেরো

পরদিন সকালে উঠে কল্যাণী দেখল তার টেবিলের বইখাতা লণ্ডভণ্ড হয়ে বযেছে—কে যেন সমস্ত নেড়েচেড়ে গেছে।

মীরার কবিতার খাতার ভিতর যে ফার্ণ ও গোলাপফুলগুলো ছিল সে সব টেবিলেব ইতস্ততঃ রযেছে—কবিতাব খাতাটাও খুঁজে বের করতে তাব ঢের দেরী লাগল—একগাদা বইখাতাব ভিতবে কোথায যে সেটাকে কে গুঁজে রেখে দিয়েছে—Intelligent বইটা পাওয়া যাচ্ছে না।

কল্যাণী চোখ কপালে উঠল; তন্ন তন্ন কবে সমস্ত টেবিল খুঁজে দেখল সে—দেরাজগুলো দেখল—একে একে বইগুলো আস্তে আস্তে তুলে তুলে সমস্ত খুঁজে দেখল আবার—সমস্ত টেবিলের বই একটার পব একটা করে সাজিয়ে রাখল—কিন্তু মিনুব সে বই কোথাও পাওয়া গেল না।

শেলফ দেখল সে—ছোড়দার টেবিল দেবাজ দেখে এল—মেজদা ও বাবাব ঘবেও ঘুবে এল—কিন্তু কোথাও সে বই নেই।

বই কি হল? কে নিল? বিবক্তিতে অশান্তিতে বাগে একেবাবে গুম হয়ে উঠে কল্যাণী কিশোবব ঘবেব দিকে গেল—নিশ্চয এ সব ছোড়দার কাজ!

বাবাব কাছে বলে মেজদার কাছে বলে দেখাব আজ মজা বাছাধনকে আমি—থিযেটাবেব সব কথা বলে দেব—ষ্টিমারে যে হুইস্কি খেযেছিল সব বলে দেব বাবাকে আমি—কিশোর নিজেব টেবিলে বসে একটা নাটকের মতো কি যেন লিখছিল—

কল্যাণী ঢুকে পড়ে বল্লে—ছোড়দা

কিশোর গ্রাহ্য না করে লিখে যাচ্ছিল

কল্যাণী বল্লে—ছোড়দা শুনছ—

—কি

—আমার টেবিল তুমি ঘেঁটেছিলে?

—তোব টেবিল?

—হ্যাঁ

কিশোর বল্লে—তোর আবাব টেবিল আছে নাকি?

—হাত দিযেছিলে নাকি বল ছোড়দা

কিশোর নাটক লেখায় মন দিযে বল্লে—কি দবকার তোমার টেবিল নেড়েচেড়ে আমাব?

—নাড় নি?

কিশোরের কথা বলবার অবসর ছিল না, সে ঘাড় নেড়ে বল্লে, না, সে হাত দেয়নি।

—সত্যি বলছ ছোড়দা

কিশোর কলের মতো ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ সত্যি বলছি—

কল্যাণী বিশ্বাস করতে পাবল না—

বল্লে—তবে আমার বই গেল কোথায়?

কিশোরের কান এদিকে ছিল না—সে কোনও জবাব দিল না।

কল্যাণী গলা চড়িয়ে বল্লে—আমাব বই তাহ'লে কোথায় গেল ছোড়দা? বইর কি ডানা হ'ল নাকি।

—কি হয়েছে?

—আমার বই পাচ্ছি না।

—কি বই?

—দরকাবী বই।

—নাম নেই? (কি দরকারী বই?)

কল্যাণী ক্ষুব্ধ হয়ে বল্লে—কেন, Intelligent…

কিশোর ফ্যা ফ্যা করে হেসে উঠল

কল্যাণী বল্লে—নিয়েছ নাকি তুমি?

—ও সব বইর কিছু বুঝিস তুই?

—খুব বুঝি

—ছাই বুঝিস

—বুঝি আব না বুঝি—তাই বলে তুমি না বলে নিয়ে যাবে কেন?

—আমি না বলে নিয়ে গেছি?

কিশোব চটে লাল

—কে নিল তাহ'লে

—তা আমি কি জানি?

—নাও নি তুমি?

—ফেব ট্যাটামি কববি তো বেব করে দেব এখান থেকে!

কল্যাণী ঠোঁটে আঁচল গুঁজে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজেব ঘবে চলে এল।

বইটা কোথায় গেল তাহ'লে। ছোড়দা নেয়নি; ছোড়দা নিলে ও বকম চটে উঠত না। শেষ পর্যন্ত বলে দিত; বইটা ফিবিয়ে দিত। চটে উঠত না। ছোড়দা আব যাই করুক, কল্যাণীব সঙ্গে এবকম ধবণের ধাষ্টামো কোনও দিনও সে করে না।

কল্যাণী অনুপায় হয়ে বসে বইল।

কোথায় গেল বই? কে নিল?

বিছানাটা ঝেড়ে খুঁজল সে। বালিশের নীচে—তোষকেব নীচে অনেকবাব দেখল—তেতলায় গিয়ে দেখে এল—কোথাও নেই।

কল্যাণী মেজদাব ঘবে একবাব গেল।

প্রসাদ ল' জার্নাল পড়ছিল—

কল্যাণী খুব ধীব শান্তস্ববে বল্লে—মেজদা

প্রসাদ চুরুটে একটা টান দিয়ে বল্লে—কি

—আমাব একটা বই তুমি দেখেছ?

—তোমাব বই?

—হ্যাঁ

—কি বই?

কল্যাণী একটু সঙ্কুচিত হয়ে বল্লে—অবিশ্যি সে বই আমাব পড়া উচিত নয়—

—পড়া উচিত নয়! কি বই কল্যাণী?

—শুনলে রাগ করবে না তো?

প্রসাদ ঈষৎ হেসে বল্লে—কেন বাগ কববাব কি আছে

কল্যাণীর ঘাড়ে সস্নেহে হাত রাখল প্রসাদ….

বল্লে—কি বই রে কল্যাণী?

—বাবা হয়তো পড়তে অনুমতি দিতেন না

—হুঁ?

—Intelligent…

—ওঃ, সে আবাব কার বই?

—শ'যেব

—শ?

—বার্নার্ড শ—

—ওঃ, নাটক বুঝি! তা বেশ, শ'য়েব নাটক মন্দ না; তবে—একটু গর্জন বেশি। তোমাদের মতন মেযেদের পক্ষে না পড়াই ভাল।

প্রসাদ মুখ বিকৃত করে বল্লে—লিটারেচার ফিটারেচার ধার ধারি না আমি—ও বই দেখিওনি কোনও দিন চোখে। তোমার কাছে ছিল বুঝি? কিনেছিলে? কে দিয়েছিল—? মিনু? মিনু কে? কলেজেব মেয়ে? ওঃ; মেযেরা বুঝি এ সব খুব পড়ে? বোঝে কি? শ একটু শক্ত নয় কি? হার্ড নাট! কি বোঝে! তুই বুঝিস? আমবা বুঝি না—বড্ড [?] সেই এক গ্রন্থে ঘুবছে—ঘুবছে—ঘুরছে— মাকড়সাব মত; এই রকম না? মাকড়সা—মাকড়সা—উর্ণনাভ—উর্ণনাভ! অনাদ্যন্ত পৃথিবীব উর্ণনাভ নয। বিশ শতকী England-এব প্রথম ওই দশকেব—। লোকটা আজ মৃত। (কে জানে আজকালকাব ছেলেমেযেবা হযতো আমাদেব চেযে)

প্রসাদ ল' জার্নালে মন দিল

কল্যাণী বল্লে—বইটা তাহ'লে তুমি দেখনি?

—না

—আমার টেবিলে ছিল—কাল বাতেও ঘুমোবাব আগে দেখেছি—আজ ভোবে পাচ্ছি না।

প্রসাদ বললে—কোথাও হয়তো অসাবধানে ফেলে বেখেছে—ভাল কবে খুঁজে দেখ গিযে—যাও—আব বিরক্ত কোবো না।

কল্যাণী চলে গেল।

আস্তে আস্তে নিজেব পড়াব ঘবেব চেযাবে এসে বসল সে। তাব মনে হ'ল কাউকে সে আব অপরাধী স্থিব কবতে পারে না—কারু বিরুদ্ধেই কোনো বকম নালিশ সে আব তৈবি কবতে পাবল না—সে বকম ভিত্তি সে কোনোদিকেই খুঁজে পেল না; দোষ তাব নিজেবই; হযতো এমন কোনো জাযগা বইটা সে ফেলে বেখেছিল সেখান থেকে বাইবের লোক এসে নিযে যেতে পাবে!

কোথায সে ফেলেছিল? অনেকক্ষণ কঠিন চিন্তা কবে মনে কবতে চেষ্টা কবল; কিন্তু মাথাটা তাব তাকে একটুও সাহায্য কবল না যেন। কল্যাণীব মনে হ'ল সমস্ত চিত্তবৃত্তিই যেন দিনেব পব দিন তাব ক্ষয হযে যাচ্ছে, অবনত হযে পড়ছে!—মেযেবা যে বই বোঝে সে তা বুঝল না; পড়তে পড়তে হাবিযে ফেল্ল; কোথায হাবিযে ফেল্ল তাও মনে কবতে পাবল না।

নিজেব প্রতি ধিক্কাবে তাব মন ভবে উঠল।

কল্যাণীব মনে হ'ল পৃথিবীতে কাকে সে তৃপ্ত কবতে পাববে? তাকে নিযে কেউ তৃপ্ত হবে কি? কি হবে পৃথিবীতে তাকে দিযে?

মিনুকে একখানা বই কিনে দিতে হবে।

কিন্তু এই বইখানাব পাশে পাশে মিনুব যথেষ্ট নোট ছিল—সে নোটগুলো কোথায পাবে সে? সেগুলো খুব মূল্যবান মন্তব্য; মিনু অনেক বাত জেগে জেগে অনেক বিদ্যাবুদ্ধি খবচ কবে লিখেছে; এ জন্য অনেক বইও ঘাঁটতে হয়েছে মিনুব-অনেক ভাবতে হয়েছে। এ সব কল্যাণী কি করে উদ্ধাব কবতে পাববে আবাব?

ভাবতে ভাবতে বিছানায শুযে শুযে ঘুমিযে পড়ল কল্যাণী।

চৌদ্দ

বেলা এগারোটাব সময ঘুমেব থেকে জেগে উঠে স্নান কবতে গেল। আজকাল পঙ্কজ বাবু চন্দ্রমোহনের খাতিরে দোতলায একটা গোল টেবিলেব চারদিকে সমস্ত পবিবাবকে নিযে খেতে বসেন—

এ পদ্ধতিটা চন্দ্রমোহন শিখিযেছে; প্রসাদ বলেছে 'মন্দ কি?' পঙ্কজবাবুরও বোধ হ'ল এ বেশ। এক গুণমযী ছাড়া সকলেই দু'বেলা টেবিলে বসে খায।

স্নান শেষ কবে কল্যাণী এসে দেখল টেবিলে জাযগা তৈবী। ভিজে চুলে—একটুও না নিংড়ে—সিঁথিপাটি কিছুই না কবে কল্যাণী খেতে বসল এসে।

চন্দ্রমোহন তাকিযে দেখল—এমন বিষণ্ণ মুখ এ মেয়েটির আজ!

সমস্ত মাথার থেকে অনবরতঃ টপটপ কবে জল পড়ে ব্লাউজ শাড়ি সব ভিজে একাকাব হয়ে যাচ্ছিল

কল্যাণীর।

কিন্তু এক চন্দ্রমোহন ছাড়া সেদিকে আব কারু লক্ষ্য ছিল না। পৃথিবীর কোনও কিছুকেই কল্যাণী আজ আর তার গ্রাহ্যের মধ্যে আনছিল না—একধাবে বসে চোখ নত করে খেয়ে আস্তে আস্তে উঠে সে চলে গেল। নিজের ঘবে আরসীর সামনে গিয়ে ধীরে ধীরে চুল আঁচড়ে বেণী বেঁধে নিজের পড়ার টেবিলের পাশে এসে বসল সে।

চেয়াবে বসে ভাবল 'মিনুকে একখানা চিঠি লিখবে' সমস্ত কথা খুলে লিখবে সে; না জানি মিনু কি ভাববে?

ভাবতে গিয়ে কল্যাণী বড় মর্ম্মাহত হয়ে উঠল।

মীরাব কবিতাব খাতা ঠিক আছে; চিতুব অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডাবল্যাণ্ডও; সুপ্রভা যে বই দিয়েছে সেখানাও রয়েছে। ভাল করে দেখে নিল সব কল্যাণী। যে শুকনো গোলাপ ও ফার্নগুলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে ছিল মীবাব খাতার ভিতর ধীরে ধীরে যত্ন কবে গুছিয়ে বেখে দিল সব সে।

টেবিলটাই সকাল থেকে গুছিয়ে ছিল—

আবও একটু পরিপাটি কবে গুছিয়ে সাজিয়ে ফেল্ল এখন। কল্যাণী ভাবল, দবকারী জিনিসগুলো এব পর থেকে ডেস্কের ভিতর চাবি বন্ধ কবে রেখে দেবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ।

মেয়েদেব বইখাতাগুলো এখনই ডেস্কের ভিতব রেখে দিল সে। বেখে দিতে দিতে ডেস্কের মধ্যে নিজে চিঠিপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখল—মনে হ'ল কে যেন এ সবও ঘেঁটেছে—দু'চাবখানা দু' চাবখানা চিঠিকে খসিয়েছে বলে মনে হল।

কিন্তু চিঠিব তো কোনও তালিকা নেই তাব কাছে—অনেক চিঠিই তো তাব কাছে আসে—নিজেব অবহেলায়ও চিঠি হাবায সে ঢেব—অনেকগুলো রেখেও দেয ডেস্কেব ভিতর; এগুলোব ভিতব থেকে কেউ যদি আবাব কিছু সবিয়ে নেয বুঝে ওঠা বড় দুষ্কর কল্যাণীব পক্ষে।

চোখ তাব ব্যথা কবছিল।

চোখ মাথা—এ সব আব খাটতে চায না যেন।

কল্যাণীব মনে হ'ল চিঠি যদি কেউ নিয়ে থাকে—নিক্ সে; যা খুশি করুক গে; কিছু করবার নেই, বলবাব নেই।

নিজেব ডাযেবীটা বেব কবল সে।

মিনু তাকে ডাযেবী লিখতে শিখিয়েছে। এক বছর ধবে দিনেব পব দিন লিখে আসছে কল্যাণী —একটা মস্ত বড় মবোক্কো চামড়ায বাঁধানো খাতায তাবিখেব পব তাবিখ কত কি ঘটনা—কত কি দুষ্টুমি—ফূর্ত্তি—মন্তব্য—মাঝে মাঝে এক আধটু ভালবাসাব কথা—মেয়েদেব সঙ্গে, দু'একটা ছেলের সঙ্গেও অবিশ্যি।

কল্যাণীব মুখ আবক্তিম হয়ে উঠল।

দু'একটা আধ-ফোটা গোপন ভালবাসাব কথা মনে পড়ে গেল তাব—ভাবতে লাগল—ডাযেবীটা টেবিলে রেখে—ডায়েরীব ওপর মাথা গুঁজে অনেকক্ষণ ধবে ভাবল সে—সে সব ছেলেরা আজ কোথায? ছোড়দাব সঙ্গে বোর্ডিংয়ে এসেছিল একটি একদিন; মামাবাবুব বাসায আব একটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল; এই শালিখবাড়ীতেও আব একজন রয়েছে—অবিনাশদা।

কিন্তু এ ভালবাসাগুলো জমেনি—জমতে পাবেনি তেমন; এদেব সঙ্গে দেখা হয কত কম। এত কম! বিধাতা এদের

কে জানে অবিনাশদা এখন শালিখবাড়ীতেও আছে কি না?

আছে হযতো; পূজোব ছুটিতে এসেছে নিশ্চয।

অবিনাশদার সঙ্গে এক দিন দেখা করতে যাবে সে—ছোড়দাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারপর ছোড়দাকে দেবে বিদায় দিয়ে। তারপর কথাবার্ত্তার পর অবিনাশদা কল্যাণীকে তার বাসায় পৌছে দেবে। ডায়েরীতে অবিনাশের কথা মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প লিখে রেখেছে কল্যাণী। মিনু দেখতে চেয়েছিল—কিছুতেই দেখাযনি; নিজেব ভালবাসাব কথাগুলো কাউকেই সে দেখায়নি।

কিন্তু এ হযতো ভালবাসাও নয।

কে জানে ভালবাসা কি না?

যাই হোক না হোক, সেই কলকাতার ছেলে দু'টির চেয়েও অবিনাশকে তার নিকটতর মনে হয়। হয় না কি?

ডায়েরীতে অনেক কথা লিখবে আজ কল্যাণী।

ধীরে ধীরে ডায়েরীটা খুল্ল সে। কিন্তু খুলতেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কল্যাণীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন; এ কি ডায়েরীর মাঝখানের ক'টা পাতা (এমন করে) কাটা কেন? কে কেটে নিল? এ কি ভীষণ!

কল্যাণী সমস্ত চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল যেন। ঘরের দরজা জানালা আটকে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। কি সে করবে? কি সে কবতে পারে! এ ডায়েরীর কথা কাকে সে বলবে? ছি, ছি, ছি, ছি—

এ করে কি লাভ হ'ল তার?

তারপর বিতর্ক আর নয়। বালিশে মুখ গুঁজে নিঃসহায় শিশুর মতো প্রাণ ঢেলে কাঁদতে লাগল কল্যাণী।

বেলা তিনটের সময় ধীরে ধীরে চোখ মুছে আবার কিশোরের কাছে গেল সে। কিশোর তখনও লিখছিল—তার সেই নাটক।

কল্যাণী গিয়ে বল্লে—ছোড়দা—

গলা তাব এত শান্ত—এত নরম—এত ব্যথিত যে কিশোর অত্যন্ত সমবেদনাব সঙ্গে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বল্লে—কি রে!

কল্যাণী বল্লে—ছোড়দা, কাউকে বলবে না একটা কথা।

কিশোর বল্লে—কেন বলব? আমার কাছে যা গোপন রাখতে চাও সে কথা তুমি আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না কল্যাণী।

কল্যাণী আশ্বাস পেযে বল্লে—ছোড়দা, সেই বইটে আমি কোথাও পেলাম না—হযতো আমিই এমন জায়গায রেখেছিলাম যে সেখান থেকে কেউ নিযে গেছে; তা হতে পাবে।

কল্যাণী থামল

কিশোর বল্লে—আচ্ছা আমি খুঁজে দেখব

—জান ছোড়দা, আমি ডাযেরী লিখি—

—ডাযেবী লিখিস?

—হ্যাঁ

—কৈ, আমি তো জানি না—

—কাউকে আমি বলিনি—

কিশোব সমবেদনাব খোরাক জুগিযে বললে—তা সত্যি, ঢেঁড়া পিটোবাব জিনিস তো এ সব নয়; নিজেব মনের যে সব কথা নিজেকে ছাড়া আব নিজের সখীদেব ছাড়া আব কাউকে বলা চলে না তাই দিয়েই মানুষেব ডাযেবী—মেযেদের অন্তত।

আমিও অনেক সময ভাবি ডাযেরী লিখব—কিন্তু মেযেবা ছাড়া ও লিখতে পারে না। তাই নাটক লিখছি—

কিশোরেব কথাব ভিতব, তাব গলায, কোথাও কোনো উপহাসের সুব নেই; কল্যাণীকে কিশোব এমন সমর্থন কবল, কল্যাণী এমন ভবসা পেল।

সে বল্লে—ছোড়দা, ডেস্কেব ভিতব আমি আমাব ডাযেরী বেখে দিযেছিলাম—কাল রাতে লিখে বেখে দিয়েছি—ঠিকঠাক কোথাও কোনও গলতি নেই। আজ দুপুরে আবার ডেস্কেব থেকে বার করে দেখি মাঝখানের দশ পনেবো পাতা কেটে কেটে নিয়েছে—

কিশোর অবাক হয়ে বল্লে—বলিস কি!

—সত্যি কেটে নিয়েছে ছোড়দা

—কেটে নিয়েছে মানে?

—কাঁচি দিয়ে কেউ কেটে নিলে যে রকম—তাই

কিশোর স্তম্ভিত হয়ে বল্লে—তা কি করে হয়!

—হয়েছে তো

—ইঁদুরে কাটেনি তো?

—তুমি দেখে যাও এসে ছোড়দা মানুষ ছাড়া আর কেউ কেটেছে কি না—
কিশোর কল্যাণীর সঙ্গে গেল—
ডায়েরীটা টেবিলের ওপরেই ছিল
কল্যাণী বল্লে—এই দেখ—
কিশোর ভ্রূকুটি করে দেখল কাঁচি বা ব্লেড দিয়ে কেটে নিলে যে রকম হয় ঠিক তাই। মানুষের হাতে কাটা- বেশ নিপুণভাবেও বটে।
বল্লে—এ কি অন্যায়!
কল্যাণী বল্লে—বিশেষ করে এই পাতাগুলো নিয়ে গেছে কেটে—
কিশোর বল্লে—ওগুলোতে কি ছিল?
—যাই থাক না কেন?
কিশোর বল্লে—তোর ডেস্কের ভিতর ছিল?
—হ্যাঁ
—মজা ছোড়দা?
—জঘন্য
কল্যাণী বল্লে—কি করা যাবে?
কিশোর একটু ভেবে বল্লে—যে নিয়েছে তাকে কিছুতেই ধরতে পারা যাবে না।
কেন?
—কাকে তুমি সন্দেহ করবে?
কল্যাণী অত্যন্ত কঠিনভাবে ভেবেও কাউকে সন্দেহ করতে পারল না।
কিশোর বিমুগ্ধ হয়ে দেখছিল সুন্দর পরিষ্কার হাতে প্রায় আড়াইশো তিনশো পৃষ্ঠা ভরে কল্যাণী কত কি লিখেছে!
কিশোর বল্লে—পড়ব কল্যাণী?
—পড়।
দু'এক পাতা উল্টে কিশোর বল্লে—থাক।
ডায়েরীটা বন্ধ করে রেখে দিল কিশোর
উঠে দাঁড়াল।
কল্যাণী বল্লে—কোথায় যাচ্ছ?
—লিখতে।
—আমার কি ব্যবস্থা হ'ল?
কিশোর চোখ মুখ হাত রগড়ে একটা হাই তুলে বল্লে—কিছু তো আমি ভেবে বের করতে পারছি না। যখন কাটছিল তখন যদি ধরা যেত তাহ'লে প্যাদানো যেত—কড়িকাঠের সঙ্গে লটকে দিতাম—কিন্তু এখন করতে পারা যাবে না কিছু। কাকে সন্দেহ করব তুমি!
কিশোর এক পা দু'পা করে হাঁটতে লাগল—
কল্যাণী বল্লে—তাহ'লে আমাকে চোখ বুজে এ অত্যাচার সহ্য করতে হবে?
—কেউ যদি বলে তুমি নিজে কেটেছ—?
কল্যাণী সে কথা অগ্রাহ্য করে বল্লে—তাহ'লে তোমরাও এ বাড়ীর কেউই আমার কোনো উপায় করে দিতে পারবে না।
কিশোর বল্লে—এখন থেকে চাবি বন্ধ করে রেখে দিস
—কিন্তু সম্প্রতি যা সর্বনাশ হয়েছে তা মুখ বুজে সহ্য করতে হ'বে।
— detective লাগাতে পারিস। বাংলাদেশে তা পাবি কোথা? এ দেশে কচুর শেকড় আর ঘেঁটুফুল ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। করবি কি।
কিশোর চলে গেল
কল্যাণী কাঁদতে লাগল।
ডায়েরীর এক একটা পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল: এত বড় অন্যায়ের কেউ কোনও প্রতিকার করতে পারবে না, এ কেন হবে?

জীবন বিধাতা বললেন: এ ডায়েরীটা তুমি ছিঁড়ো না কল্যাণী, এতে আমার ব্যথা লাগে!

কিন্তু তবুও পাতার পর পাতা ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলতে লাগল মেয়েটি।

পনেরো

সন্ধ্যার সময় আজো সকলে হরিচরণ চাটুয্যের হাবেলীতে যাত্রা দেখতে চলে গেল—পঙ্কজ বাবু পর্যন্ত।

কল্যাণীও ভেবেছিল সে যাবে।

কিন্তু বিবেলের ডাকে মিনু ও মীরার বেশ বড় দু'খানা চিঠি এল।

কল্যাণী তক্ষুণি জবাব লিখতে বসল। চিঠিতে একবার হাত দিলে না শেষ করে ওঠে না সে। লিখতে লিখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—ওরা গেল চলে।

ওসমানকে চিঠি পোষ্ট করতে দিয়ে কল্যাণী তেতলার বারান্দায় একটু পায়চারি করতে গেল—হাতে সুপ্রভার বইখানা! দি বেড লিলি।

বারান্দায় পা দিয়ে দেখল চন্দ্রমোহন একটা সোফার ওপর বসে আছে।

এ লোকটার কথা সারারাত সারাদিন ভুলে ছিল কল্যাণী; পৃথিবীতে যে এ মানুষটি আছে তাও মনে ছিল না।

একে দেখেই সে পিছিয়ে শটকে যাচ্ছিল—কিন্তু চন্দ্রমোহনের হাতেব বইটাব দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী—

চন্দ্রমোহন বল্লে—ওঃ আপনি।

একটু কেশে বল্লে—আপনিও বুঝি যাত্রা দেখতে ভালোবাসেন না? বেশ বেশ।

চন্দ্রমোহন তার হাতের বইটা ধীরে ধীবে বন্ধ করলে—

বল্লে—ওঃ বসেছেন। বেশ বেশ। আমিও ভাবছিলাম বই না পড়ে কথাবার্তা বল্লেই বেশ লাগবে।

চন্দ্রমোহন কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বল্লে—আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে বাঙালীব ঘবে এ রকম রূপ থাকতে পাবে; কিন্তু থাকে বাঙালীব ঘবেই। শিল্পীবা এ জন্যেই বাঙালী মেয়ে বিয়ে কববাব জন্য পাগল।

কল্যাণী বল্লে—আপনাব হাতে ওটা কি বই?

—এটা?

—হ্যাঁ।

—এই বইটা—

চন্দ্রমোহন বইটার শিবোনামেব দিকে তাকিয়ে ধীবে ধীবে—এটা হচ্ছে An intelligent......

কোথায় পেলেন এ বইটা?

—এই সোফার ওপবেই ছিল।

—বই সোফার ওপরে?

—হ্যাঁ

—ঠিক মনে আছে আপনার?

চন্দ্রমোহন বল্লে—বাঃ।

কল্যাণী বল্লে—কখন পেলেন?

—এই তো এক্ষুণি এসে—

এই এসে পেলেন?

হ্যাঁ, কে যেন ফেলে গিয়েছিল; আপনি হয়তো?

কল্যাণী নিস্তব্ধ হয়ে চন্দ্রমোহনেব দিকে তাকাল—

চন্দ্রমোহন বল্লে—এ এক রকম বই, না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু; না আছে কোনো মানে। এসব বই মানুষের পড়া উচিত নয়—

কল্যাণী বল্লে—সোফার ওপর এ বই কে এনে রাখল? আমার যদ্দুর মনে পড়ে আমি তো সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম; কাল রাতে ঘুমোবার আগেও টেবিলে বসে পড়েছি বইখানা—সকালে দেখি কোথাও নেই—

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন—এইখানেই রেখে গিয়েছিলেন—এ রকম ভুল হয় মাঝে মাঝে—আমাদের সকলেরই হয়—

কল্যাণী বল্লে—এ বারান্দাও তো আমি পঁচিশবার করে দেখে গেছি—সোফায়ই যদি থাকবে তাহ'লে আমার চোখে পড়ল না কেন?

চন্দ্রমোহন বল্লে—পড়েনি তো।

একটু পরে বল্লে—একটা সামান্য বই কোথায় ছিল না ছিল এ নিয়ে মানুষের বক্তব্য বেশীক্ষণ চলতে পাবে না।

কল্যাণী ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল।

চন্দ্রমোহন বল্লে—আসল কথা হচ্ছে এ বই আমাদেব পড়া উচিত নয়—

কল্যাণী বল্লে—নাই বা পড়লেন।

—না, পড়ব না আমি।

-দিন বইটা।

চন্দ্রমোহন কল্যাণীকে বইটা ফিবিযে দিযে বল্লে—আপনাব বেশ ভালো লাগে?

কল্যাণী কোনো জবাব দিল না।

চন্দ্রমোহন বল্লে—আমি ব্যবসাযী হ্যেও প্রেমিক হযেছি, প্রেমিক হ্যেও মাষ্টাব হ্তে পেরেছি—বলে সে একটু হাসল।

পবে বল্লে—এখন একটু মাষ্টারী কবা দবকার—প্রেম না হয আর এক সময হবে।

কল্যাণী উঠে দাঁড়াল।

চন্দ্রমোহন বল্লে—শুনুন

—কিছু শুনবাব নেই—

কল্যাণী চলে যাচ্ছিল—

চন্দ্রমোহন বল্লে—কথা আছে শুনুন—আপনার বাবা—

কল্যাণী এক নিমেষের জন্য দাঁড়াল—বাবাব কথা এ আবার কি বলতে চায়?

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনার বাবা আব আমি কাল আপনাব কাছে গিযেছিলাম—

—আবাব বাব?

—হ্যাঁ আপনাব বাবা আব আমি

—আমাব কাছে গিযেছিলেন বাবা!

—হ্যাঁ

—কখন?

—কাল বাতে।

—কোথায?

—আপনার ঘবে

কল্যাণী বিস্মিত হ্যে বল্লে বাতে আমাব ঘবে—কখন?

একটা সোফাব ওপর বসল সে।

চন্দ্রমোহন বল্লে—তখন আপনি ঘুমুচ্ছিলেন—

কল্যাণী স্তম্ভিত হযে বল্লে—বাবা তখন আমাব ঘবে ঢুকেছিলেন আপনাকে সঙ্গে করে?

—হ্যাঁ

কল্যাণী আড়ষ্ট হযে চন্দ্রমোহনেব দিকে তাকিযে রইল।

চন্দ্রমোহন বল্লে—বিশ্বেস হয না বুঝি?

কল্যাণী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চন্দ্রমোহনেব দিকে চেযে বইল।

চন্দ্রমোহন বল্লে—একটা দবকারী কথার প্রসঙ্গে গিযেছিলাম—

সে কথা কল্যাণীর কানে গেল না, অত্যন্ত ব্যথিত হযে সে বল্লে—আমার বাবা আপনাকে নিযে গিযেছিলেন?

—হুঁ

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনাব টেবিল নেড়ে চেড়ে দেখলেন আপনাব বাবা।

সূচীপত্রে যান

—আমার বাবা? কল্যাণীর শরীর মন নিঃশ্বাস ফেলতে চাইছে না যেন আর।

–হ্যাঁ, এই বইটেও তিনি নিয়ে এলেন

—এই বইটে?

—হ্যাঁ

—নিজের ঘরে গিয়ে পড়েছিলেনও বুঝি—পড়ে তার অত্যন্ত খারাপ লাগল—যাত্রা শুনতে যাবার সময় এই সোফাব ওপর ফেলে গেলেন—আমাকে পড়তে বল্লেন।. আমাবও ভালো লাগেনি—আপনার টেবিলেব সব বইগুলি তিনি দেখেছেন—বড্ড দুঃখিত হয়েছেন তাতে—

কল্যাণী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বল্লে—আমি বিশ্বাস কবি না। মিথ্যা কথা সব।

চন্দ্রমোহন বল্লে—আস্তে।

কল্যাণী তেম্নি চীৎকাব করে উঠে বল্লে—কক্ষণও না—

চন্দ্রমোহন বল্লে—ছি

কল্যাণী বল্লে—না—না—না—আমার বাবা কিছুতেই নয—মেজদা হতে পাবে—ছোড়দা হতে পাবে—মা হতে পাবে—বাবা নয—বলুন বাবা যাননি—বলুন—বলুন আপনি—

চন্দ্রমোহন বল্লে—যদি গিয়ে থাকেন, আপনাব মঙ্গলেব জন্য গিয়েছেন; তাতে খাবাপ তো কিছু হযনি।

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে বল্লে—আমাব মঙ্গলেব জন্য?

—বাবা মা মঙ্গল ছাড়া আর কি চান?

—আমার ডাযেরী—

—আপনাব ডাযেবীটাও দেখেছেন তিনি।

—বাবা?

—হ্যাঁ—কযেক পাতা কেটেও রেখেছেন

কল্যাণীর সমস্ত শবীর কাঁপতে লাগল। যেন প্রবল প্রচণ্ড মেরুব শীত এসে ঘিবে ধরেছে তাকে।

চন্দ্রমোহন তাকিয়ে তাকিয়ে মেযেটিব আপাদমস্তক দেখতে লাগল—দেখতে লাগল শুধু—

এই মেযেটিব কোনো মঙ্গল কোনো কল্যাণ কোনো ভবিষ্যতেব চিন্তা তাব মনের ত্রিসীমাযও ছিল না—এর অভূতপূর্ব রূপও মুহূর্তের জন্য অর্থহীন হয়ে গেল চন্দ্রমোহনের কাছে—মন তার কেমন দুরন্ত গভীর ক্ষুধায় ভরে উঠল। হা, বিধাতা, কেমন একটা গভীব ক্ষুধায়!

কিন্তু প্রবল পরাক্রমেব সঙ্গে নিজেকে সংযত করে নিল সে।

বল্লে—কল্যাণী তুমি কষ্ট পাচ্ছ—কেন এত কষ্ট পাও? আমি তোমাকে আমার প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি কল্যাণী।

নিজের সোফাটা এগিয়ে আনল চন্দ্রমোহন।

কল্যাণী আবক্ত চোখ মেলে হাত ইসাবা করে চন্দ্রমোহনকে সরে যেতে বল্লে।

চন্দ্রমোহন নিতান্ত দ্বিধাহীন নিঃস্পৃহভাবে সরে গিয়ে আগের জাযগায বসল আবাব।

তারপব ধীরে ধীরে উঠে সেখান থেকে সে চলে গেল; নইলে তাব ক্ষুধাকে সে রাতে কিছুতেই সে জয করতে পারত না।

ষোলো

পরদিন সকাল বেলা।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন-হ্যাঁ গিয়েছিলাম বটে—

কল্যাণী বলল—পরশু রাতে?

—হ্যাঁ

—আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম—

—তুমি ঘুমিয়েছিলে—

—তখন কেন গেলে বাবা?

—দরকার ছিল।

চন্দ্রমোহনবাবুকেও সঙ্গে নিয়েছিলে?

—হ্যাঁ

কল্যাণী বিহ্বল হয়ে বল্লে—ওকে নিলে কেন?

—কি হয়েছে তাতে।

কল্যাণী হতাশ হয়ে বল্লে—বাবা!

চন্দ্রমোহনকে আমি আমাব ছেলেব মত মনে কবি—

—তোমার ছেলেব মত!

—হ্যাঁ, বিজলীব থেকে ভালো নয় কি?

—বড়দাব থেকে ভাল?

ঢেব—ঢেব—ঢেব—ঢেব ভাল।

কল্যাণী দু'এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দ হয়ে বইল।

পঙ্কজ বাবু নীববে চুরুট টানতে লাগলেন—

কল্যাণী বল্লে—আমার টেবিলেব বইগুলোও দেখেছিলে তুমি?

—হ্যাঁ; ও বকম বই কেন তুমি পড়? ওসব বই কে তোমাকে দেয়? ফরাসী ডিকাডেন্সের ভগবানহীন সংযমহীন নবমাংসেব নাবীমাংসেব নবককুণ্ডেব বই সব—কে তোমাকে দেয়? কোথেকে পাও?

কল্যাণী এ বিশেষণগুলোব একটিবও কোনো মানে বড় একটা বুঝল না; সুপ্রভা অবিশ্যি কয়েকখানা ফবাসী উপন্যাসেব ইংবেজী অনুবাদ তাকে দিয়েছিল; কিন্তু সেগুলো কল্যাণী পড়তে পাবেনি—বোঝেনি—দু'এক পাতা দু'এক পাতা পড়ে কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয়নি তাব।

সে নীবব হয়ে বইল।

আহা, বেচাবী, কল্যাণী,—সাহিত্যেব সঙ্গে তাব কোনো সম্পর্ক নেই—আর্টের সঙ্গেও না; যাদেব কিছু আছে—তারা কয়েকখানা বই দিয়েছিল তাকে; সেগুলোব সুন্দব সুন্দব মলাট বাঁধাইয়ের চমৎকাব কারুকার্য দেখে নিজেব টেবিলের ওপেব বেখেছিল মেয়েটি—নিতান্তই টেবিল সাজাবাব জন্য। আর্টেব কি বোঝে সে? সাহিত্যেব কি জানে? জীবনেব কি বোঝে?

জীবনেব কাছে সে ঢেব ঢেব নিবপবাধ—পঙ্কজ বাবু বা গুণময়ীও কোনোদিন ততখানি ছিলেন না।

পঙ্কজ বাবু না বুঝে মেয়েটিকে অপবাধী সাজিয়ে আর্ট ও সমালোচনাব থেকেও একেবাবে ছিটকে গিয়ে জীবনেব নানা বকম স্থূলতাব কথা বলতে লাগলেন—নিজে ব্যাহত হতে লাগলেন—মেয়েটিকে মর্ম্মান্তিক ব্যথা দিতে লাগলেন.

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—তোমাব ডায়েবীও দেখলাম; ও সব কি লিখেছ তুমি? আমাকে ভুল বুঝিয়েছ এতদিন বসে। তাবিখেব পব তাবিখ মিলিয়ে দেখলাম বায়োস্কোপ দেখেছ—সার্কাস দেখেছ—কার্নিভালে গিয়েছ—লাকি সেভেন খেলেছ—সোডা ফাউন্টেনে গিয়েছ—তুমি থিয়েটাব অব্দি দেখেছ কল্যাণী ওই বিশে বাঁদবটাব সঙ্গে আব বাড়ীতে আমাকে চিঠি লিখেছ আমি কিছুই দেখি নি—এ তোমাব কি অদ্ভুত অন্যায় বল দেখি কল্যাণী।

কল্যাণী কেঁদে ফেলল।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—শুধু কি তাই? মেয়েদেব সঙ্গে কত কি অনাচাব কব তুমি বোর্ডিঙে—

পঙ্কজ বাবু একটু থেমে বললেন—এই বিধাতাহীন সংযমহীন নবমাংসেব নাবীমাংসেব বইগুলো পড়ে এই বকমই তো হবে—কোন মেয়ে তোমাকে চুমো দিল তাই নিয়ে তুমি কবিতা কবতে আবম্ভ কবলে—চাবদিককার ডিকাডেন্সের শয়তান আর্টিষ্টদের মত—কি উৎকট!

কল্যাণী অতসত কিছু বুঝল না; বুঝল এইটুকু যে সে উদঘাটিত হয়ে গেছে—সে যা সমস্ত মনে স্বাভাবিক ভাবে সৌন্দর্য্যেব সঙ্গে কবেছে—যে জিনিষকে মানুষেব প্রশংসা কবা উচিত বলে মনে হয়েছে তখন তাব—বাবা তাব ভিতব পৃথিবীব পাপ ঢুকিয়ে দিলেন; আব সে যা কবেনি, যে সবেব নাম শোনেনি, যা বোধ কবেনি, সেই সবও বাবা তাতে আপত্তি করলেন। সে যদি পাবত—তা হলে অনেক কথা বলত বাবাকে—যাব পব বাবা তাকে আর অভিযুক্ত কবতে পাবতেন না, বাগ কবতে পাবতেন না তার ওপর আব। কাবণ, মন তাব জানে, খুব ভালো কবেই জানে যে বাবা যা চান—তাব নিজেব মনও ঠিক তাইই চায় এবং তাইই সে কবে এসেছে; যেখানে এক আধটু ব্যতিক্রম হয়েছে তা তার দোষ নয়—অপরের দোষে—অপরেরও দোষে নয়—কে জানে কাব দোষে!

কাব দোষ জানে না কল্যাণী। কিন্তু দোষটা মানুষেব অজ্ঞানতাব ও সময়েব ভবিতব্যতাব।

সূচীপত্রে যান

কল্যাণী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ভাবছিল: বাবা কেন এ সব বুঝবেন না?

কিন্তু বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতাও তার একটু ছিল না।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—যাক।

তিনি চুরুট জ্বালাতেন।

'ওসব বই মেয়েদের ফিরিয়ে দিও।'

কল্যাণী শান্তবাবে ঘাড় নেড়ে বলল—দেব।

—আর ডায়েরীটা পুড়িয়ে ফেলো

—ছিঁড়ে ফেলেছি

—সমস্ত

—হ্যাঁ

—বেশ ভালোই হয়েছে।

পরে বল্লেন—আর ওরকম লিখো না।

কল্যাণী বুঝতে পারছিল না যে তার কবিতা বা আর্টই শুধু নয়—তার ভিতরের জীবন স্বপ্ন ও আরাধনা সাধনা ও সৌন্দর্য্যের জীবন তার দিনের পর দিন ঐ লেখার ভিতর দিয়ে ফলে উঠছিল তার। বাবাকে সে বল্লে আর কোনোদিনও ঐ সব লিখতে যাবে না সে।

কল্যাণী বল্লে—আমি বুঝতে পারিনি যে এসব লেখা খারাপ—এর ভেতর অন্যায। কি যেন বল্লে তুমি বাবা বিধাতাহীন সংযমহীন নবমাংসের নারীমাংসের—

পঙ্কজ বাবু কল্যাণীকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন—না—না—না—তা নয়; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সব দিকে যায়।

কিছুক্ষণ ধরে নীরবে চুরুট টেনে পঙ্কজ বাবু বল্লেন—এখন কাজের কথা কল্যাণী—কল্যাণী বাবার দিকে তাকাল—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—পরশু রাতে তোমার কাছ গিয়েছিলাম আমরা—আরো একটা দরকারে—

পঙ্কজ বাবু চুরুটটার দিকে একবার তাকালেন—খানিক্ষণ বসে।

তারপর বল্লেন—তুমি কি কাউকে ভালোবাস?

কল্যাণী মুখ নত করল।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—কোনো ছেলে ছেলেছোকরাকে? কলকাতায়?

কল্যাণী অধোমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল।

—বাসনি তাহ'লে। আমিও তাই ভেবেছিলাম। সে বেশ, সে খুব ভালো কথা। কলকাতায় কলেজেটলেজে পড়ে মেয়েরা অনেক সময় অনেক নির্ব্বোধের মত কাজ করে ফেলে—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—যাক, তুমি সে সবের থেকে ত্রাণ পেয়েছ।

কল্যাণীর মনে হ'ল ভালোবাসার থেকে তাঁর মেয়ের ত্রাণ চাচ্ছেন বাবা—বেশ তাই হোক—যথেষ্ট বিরুদ্ধাচার করা হয়েছে বাবার সঙ্গে, নিজের ভালোবাসার কথা বলে বাবাকে আর সে পীড়িত করতে যাবে না; নিজের ভালোবাসা তার নিজের মনের নিস্তব্ধতার ভিতরেই থেকেই যাক—হয়তো ভালবাসাও পাপ, অন্ততঃ বাবা যদি ডায়েরীর মত সেটা উদঘাটিত করতে পারেন তা হলে নিশ্চয় তা পাপ হবে—বিধাতাহীন সংযমহীন নবমাংসের নারীমাংসের জিনিস হয়ে দাঁড়াবে তা; কিন্তু নিজের মনের গোপনে তা এখন পাপ নয়—ভুল নয়—ভয় নয়—পৃথিবীর নানা দিককার নিঃসঙ্গতার ভিতর কেমন একটা ক্রমায়াত দীপ্ত অবলম্বের জিনিস।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—তারপর আমাদের জমিদারীর যা অবস্থা-দিন দিন দেনা বেড়ে যাচ্ছে শুধু—তোমার দাদাকে বিলেত পাঠিয়ে আমাদের খোয়াবের এক শেষ হয়েছে

কল্যাণী বল্লে—বড়দার চিঠি পেয়েছ বাবা?

মেয়ের কাছে সে সব জিনিস চাপা দিয়ে যেতে চাইলেন পঙ্কজ বাবু। কিছু বল্লেন না।

কল্যাণী বল্লে—আমাদের কাছে চিঠি লিখে না কেন বড়দা?

পঙ্কজ বাবু কোনো উত্তর দিলেন না।

কল্যাণী বল্লে—মার কাছেও লেখে না।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। আরো কিছুটা সময় নিস্তব্ধতায় কেটে গেল।

সূচীপত্রে যান

কল্যাণী বল্লে—বড়দা আসবে কবে? আমাকে এসে কত বড় দেখবে, না বাবা?

যখন চলে গিয়েছিল বড়দা, আমি তখন ফ্রক পরতাম—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—জমিদারীর তো এই অবস্থা—এক এক সময় মনে হয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসে তুলে দেই—

কল্যাণী চমকে উঠল

বল্লে—না বাবা তা দিতে হবে না।

—বলা যায় না, কিশোরকে দিয়েও কিছু হবে না; যা এক প্রসাদ। সে যদি রাখতে পারে তা হ'লে থাকবে—না হ'লে আমার আর কিছু করবার নেই। আমার কিছু সাধ্য নেই আর—

কল্যাণী অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে বল্লে—আমি ছেলে হলে তোমার ঢের উপকার করতে পারতাম বাবা—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—মেয়ে হয়েও কি পারা যায় না? খুব পারা যায়। করবে?

কল্যাণী খুব উৎসাহ গর্ব্ব অনুভব করে বল্লে—আমি খুব পারব।

সে ভেবেছিল তাকে বুঝি আর বায়োস্কোপ দেখতে হবে না, সার্কাস থিয়েটারে যেতে হবে না, ডায়েরী লিখতে হবে না। ভালোবাসাতে হবে না; এই সব। এই সব বিরতির কাজ করতে বলবে বাবা তাকে হয়তো; করবে সে—বাবার এই সব নির্দ্দেশ সজ্ঞানে পালন করবে।

গুণময়ী এলেন—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—তোমাকে দেখে চন্দ্রমোহনের খুব ভালো লেগেছে—আমার কথা শুনছ কল্যাণী।

চুরুটে টান দিয়ে বল্লেন—ছেলেও খুব সৎ—ওদের পরিবার জানি আমি; ওকেও জানি।

কল্যাণীর বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছিল।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—টাকাও ঢের—আমাদের মত দু'দশটা জমিদারি কিনে ফেলতে পারে—ওখানে গিয়ে তোমার সুখ হবে—সব দিক দিয়ে মঙ্গল হবে।

কল্যাণীর নিঃশ্বাস আটকে আসছিল—

সে ডুকরে কেঁদে উঠে বল্লে—কি বল তুমি বাবা!

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—চন্দ্রমোহন তোমাকে বিয়ে করতে চায়—আমিও চাই তুমি তাকে বিয়ে কর—তোমার মাও তাই চান—তোমার মেজদারও অমত নেই।

কল্যাণী কাঁদতে কাঁদতে তর্জ্জন করে উঠে বল্লে—বল কি তোমরা সব? মেজদা বিয়ে করবে, না তুমি করবে? তবে যে বড় বলছ! ঐ উল্লুকটাকে বিয়ে করব আমি? আমার বাপ হয়ে তুমি এই কথা বলতে সাহস পাও? আমি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব তবু ওই বাঁদরটাকে বাঁদর ছাড়া আর কিছু বলতে পারব না। বাঁদর উল্লুক কোথাকার! এত বড় কথা বলে।

আকাশ-পাতাল ভাসিয়ে অসাড় অবোধ হয়ে কাঁদতে লাগল কল্যাণী।

পঙ্কজ বাবু স্থিরভাবে চুরুট টানছিলেন—

একটি চুরুট তাঁর ফুরিয়ে গেল—আর একটি তিনি নিলেন; আস্তে আস্তে জ্বালালেন।

যেমি টানছিলেন—টেনে যেতে লাগলেন।

গুণময়ীও এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন।

গুণময়ী বল্লেন—ওর যদি না ইচ্ছে করে, তবে আর মিছেমিছে এ দিয়ে কি দরকার; চন্দ্রমোহন ছেলে ভালো বটে—কিন্তু মেয়েরও তো একটা রুচি অভিরুচি থাকে—তাও তো দেখতে হয়।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—আমি সব জানি, আমি সব বুঝি। কল্যাণীকে স্থির হতে দাও। নানা রকম বই পড়ে সঙ্গে মিশে ওর মনের ভিতর জিলিপীর পাক আর অমৃতির প্যাঁচ। বয়সও কম—নিজের মনটাকে ধরতে পারছে না তাই। আমাদের কাছে থাকলে শান্ত সুস্থির হয়ে ভাবতে পারবে, নিজের মনের কথা টের পাবে—তখন বুঝবে—বুঝবে সব।

কল্যাণী ধীরে ধীরে মাথা তুল্ল—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—চন্দ্রমোহনের সম্বন্ধে ও তো কিছু জানে না—

কল্যাণী বলল—আমি জানতে চাই না বাবা—

পর মুহূর্ত্তেই বল্লে—যথেষ্ট জানি ঐ উল্লুকটার সম্বন্ধে আমি; চাটগাঁয়ের মগের মত মুখ-হলদে রং; চোখ দুটো কুত কুত করে—সমস্ত মুখে আঁচিল আর দাড়ি—

বলতে বলতে কেঁদে ফেল্লে কল্যাণী

গুণময়ী বল্লেন—ছি!

—আর বোলো না মা—

—কে বলছে তোমাকে যে চন্দ্রমোহনকেই বিয়ে করতে হবে তোমাব

কল্যাণী মায়ের কাছ থেকে এই সান্ত্বনাটুকু পেয়ে ধীরে ধীরে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে একটু শান্ত হয়ে বসল।

মনটা তার এখন খানিকটা ভালো লাগছে·

গুণময়ী বল্লেন—তোমাব বাবা তো বলেননি চন্দ্রমোহনকে তোমাব বিয়ে করতে হবে; তবে একটু ভেবে দেখতে বলেছেন; তোমার ইচ্ছা যদি হয—তা হ'লে তুমি কববে—পাত্রটিকে আমাদেব খুব ভালো মনে হয়—আমবা তোমার মঙ্গল চাই—

গুণময়ী থামলেন।

পঙ্কজ বাবু কোনো কথা বলছিলেন না।

গুণময়ী বল্লেন—তাড়াব কিছু নেই: তোমাকে যে এখুনি বিয়ে কবতে হবে এমন কিছু নয। তুমি আমাদের কাছে থাক—শান্ত হয়ে ব্যাপাবটা ভাব। ধা কবে একটা মতলব কবে বোসো না। তোমাকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে বলে ওম্নিই যে তুমি মত দিয়ে বসবে—তাও আমরা চাই না—কিম্বা চন্দ্রমোহনকে উল্লুক বাঁদর বলে গাল দিয়ে তাড়িয়ে দেবে সেটাও ঠিক কথা নয—একটু স্থিবভাবে ভেবে দেখ কল্যাণী—

কল্যাণী বল্লে—মা আমি ভাবতে পাবি না কিছু—এ আমি কল্পনাও কবতে পাবি না—

—ওই তো, ছি ছি ছেলেমানুষী কবতে হয না—গুণময়ী বল্লেন—

পঙ্কজ বাবু চুরুট টানছিলেন—

গুণময়ী বল্লেন—তোমার বাবা—আমি—আমবা সংসাবেব ঢেব দেখেছি; অনেক কিছু জানি শুনি—বুঝি—আমবা ভেবে যা বলি তাব একটা মূল্য আছে। আমাদেব নির্দেশ শুনলে তোমাব ভুল হবে না। কিন্তু তবুও তোমার মতামতেব স্বাধীনতা দেব আমবা। তুমি যা ভাল বোঝ তাও আমবা শুনব—

কল্যাণী বল্লে—আমি এই ভালো বুঝি যে চন্দ্রমোহনবাবুব কথা ভাবতে গেলেও আমাব অন্নপ্রাশনেব নাড়ীশুদ্ধ প্যাঁচ খেতে থাকে—তাব চেয়েও মৃত্যু আমাব ঢেব ভালো মনে হয।

কেউ কিছু বল্লেন না।

কল্যাণী বল্লে—বাপরে, কি ভীষণ! কলকাতাব থেকে এসে দেখি একটা মগেব মত একটা বাঁদবেব মত দোতলার ঘবে বসে আছে—একটা ছাগলেব মত আমাব দিকে তাকাচ্ছে—আমাব সমস্ত শরীব ভয়ে ঘেন্নায ব্যথায কাঁটা দিয়ে উঠল—আব তাকে নিয়েই কিনা এত দূব! বাপরে, বাপরে, বাপবে, বাপরে—

গুণময়ী বল্লেন—তুমি বড় অস্থিব হয়ে ওঠো কল্যাণী—

—হব না? তোমবা ভেবে দেখেছ কি ভযঙ্কব কথা তোমবা বলেছ আমাকে—

গুণময়ী বল্লেন—চা খেয়েছিলি?

—না

—দুধ? ওভালটিন?

—না

—কিছু না

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বল্লে—না, আমাব খেতে ইচ্ছে কবে না কিছু—

গুণময়ী বল্লে—নে, নে, আয একটু দুধটুধ খেয়ে যা।

কল্যাণী বল্লে—আমাব কিছু খেতে ইচ্ছে করে না মা।

গুণময়ী বল্লে—চল চল না খেলে বাঁচবি কি করে?

মায়ের পেছনে পেছনে বাঁচবাব আয়োজন কবতে অবশেষে গেল সে—এখন খানিকটা শান্ত স্থির হয়েছে তার মন—চন্দ্রমোহনকে বিদায় দিয়ে দিয়েছে একেবাবে সে—পৃথিবীটা আবার আনন্দ ও উপভোগেব জায়গা বলে বোধ হচ্ছে কল্যাণীব।

খুব চমৎকার বেলের পানা খেল কল্যাণী—এক বাটি ক্ষীব খেল—চাব পাঁচটা চাটিম কলা পাউরুটি আর মাখন খেয়ে কিশোরেব সঙ্গে লুডো খেলতে বসে দিনটাকে তার পৃথিবীর একটি নিতা স্বাভাবিক দিনের মত—তাব সমস্ত অতীত জীবনের সমস্ত দিনেব মত অঢেল সুন্দব নৈসর্গিক মনে হতে লাগল।

সতেরো

কিন্তু সন্ধ্যায় অন্যরকম।

প্রসাদ আর চন্দ্রমোহন পঙ্কজ বাবুর বগি গাড়ীতে করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে গেছে; কিশোরও ছিল না।

তেতলার বারান্দায় তিন জন শুধু—পঙ্কজ বাবু, কল্যাণী, গুণময়ী—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—সারাদিনটা কি করলে কল্যাণী?

কল্যাণী সহসা কোনও উত্তর দিতে পারছিল না।

একটু পরে বল্লে—ঘুমিয়েছি—পড়েছি—

—কি পড়েছ?

—কলেজের বই

পঙ্কজ বাবু একটু হাসলেন; কেমন যেন উদাসীন ভ্রূক্ষেপহীন একরকম হাসি। কল্যাণীর মনে হ'ল বাবা পড়াশুনার কোনও মূল্যই দিলেন না। এইরকম করে অবজ্ঞা করে হাসলেন—

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—এখন মনটা একটু স্থির হয়েছে তোমার?

কল্যাণী এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—শান্তভাবে ভেবে দেখলে ব্যাপারটার ভিতর কিছু অমঙ্গল পাবে না তুমি। তোমার মার কাছে যেমন, আমার কাছে যেমন—আশা করি তোমার কাছেও তেম্নি জিনিসটা কল্যাণের জিনিস বলে মনে হয়েছে—

কল্যাণী বল্লে—কি জিনিস?

পঙ্কজ বাবু উত্তর দিতে একটু দেরী করলেন—

পকেট থেকে চুরুট বের করলেন—

চুরুট নিয়ে খেলা করলেন—

পরে চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বল্লেন—চন্দ্রমোহনের সঙ্গে আজো আমার কথা হয়েছে; সে আর অপেক্ষা করতে পারে না। তাকে যা হয় একটা কথা দিতে হবে আমাদের—তা খুব তাড়াতাড়ি—

কল্যাণী বল্লে—কথা দিয়ে দেও যে আমি তাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

পঙ্কজ বাবু একটু হেসে বল্লেন—অত সহজে কি কিছু হয়—

কল্যাণী বল্লে—আমার তা হয়—

একটু থেমে বল্লে—যদি হবার হ'ত, এত কথা বলতে হত না তো তোমাদের। ঢের আগেই হয়ে যেত। আমি কি বুঝি না তোমাদের কত হেনস্থা হচ্ছে? সে জন্য আমার খুব খারাপ লাগে, কিন্তু তবুও ওকে সরে যেতে বলা ছাড়া আর উপায় নেই। আমার সামনে ওকে বেরুতেও বারণ করে দিও তোমরা—আমি টেবিলে গিয়েও আর খাব না—

পঙ্কজ বাবু ও গুণময়ী চুপ করে রইলেন—

খানিকক্ষণ নীরবে চুরুট টেনে পঙ্কজ বাবু বল্লেন—কল্যাণী, যদি বুঝতাম তুমি বড় হয়েছ—তোমার মার মত ভাবতে শিখেছ তাহলে অন্য কথা ছিল—কিন্তু এখনও তুমি ঢের ছেলেমানুষ—

কল্যাণী ছটফট করে নেচে উঠে বল্লে—আমি ছেলে মানুষ নই; আমি ছেলেমানুষ নই। কে বলেছে আমি ছেলেমানুষ? কেন তোমরা এমন কথা বল? ও মা, বাবা কেন আমাকে ছেলেমানুষ বলে—আমি বুড়োমানুষের মত স্থির হয়ে ভেবে কথা বলেছি; আমার মনের ঠিক সত্য কথা বলেছি আমি। জোর করে আমাকে দিয়ে মিথ্যা বলিও না তোমরা—

গুণময়ী বল্লেন—আঃ, কল্যাণী থামরে।

স্বামীকে বল্লেন—আজ আর থাক।

পঙ্কজ বাবু চুরুটের ছাই ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলে নদীটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুরুট টানলেন।

তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে খুব নরম সুরে : কল্যাণী, তুমি তো বায়োস্কোপ দেখতে ভালোবাস, সারকাস থিয়েটারেও যাও, তোমার ছোড়দার সঙ্গে যে দু' একটি ছেলে মাঝে মাঝে তোমাদের বোর্ডিঙে যায়—তাদের দেখে তোমার মন একটু-আধটু চিড় খায় বৈকি—হয়তো ভাব এদের ভিতর কাউকে পছন্দ করলে জীবনের সঙ্গী করে নিলে মন্দ হয় না। একজন সঙ্গী স্বামী—তুমিও হয়তো কিছুদিন থেকে

সূচীপত্রে যান

খুঁজছ—কিন্তু তবুও তোমাব মনকে এখনও ভালো করে বোঝ নি তুমি। যে জিনিস এখন শববতী স্বর্গ মনে হচ্ছে বাস্তবিকই তা সিদ্ধির নেশা। আমবা যে সব খুব জানি। এ সব বিষযে তোমার মা ও আমার অভিজ্ঞতার ওপর তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার। তোমাব তাই করা উচিত। তাইতেই তোমার মঙ্গল। তুমি যাই বল না কেন, কল্যাণী, চন্দ্রমোহনকেই তুমি তোমাব স্বামী বলে বুঝতে চেষ্টা কর। তাতে তোমার জীবন পযমন্ত হয়ে উঠবে। আমি তোমার বাবা হয়ে—তোমার জীবনের পরম কল্যাণ কি তা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেই এই কথা তোমাকে বলছি—আমাকে তুমি অবজ্ঞা কোবো না।

কল্যাণী সারারাত বিছানায লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদল।

একটা পাখীর ছানা—যার বাপ মরে গেছে, মা মরে গেছে—চাবদিককার দুর্বিষহ ভয দুর্বলতা ও উপায়হীনতা ক্রমে ঘিরে ফেলেছে যাকে—এই মেযেটির ধড়েব ভিতব যেন সেই আতুর অনাথ ছানাব প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে; তাকে দেখবাব বুঝবার গ্রহণ কববার জন্য কোথা কেউ নেই—কোনওদিনও যেন থাকবে না আর।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—এই আমার ইচ্ছা প্রসাদ—তোমার মাবও—

প্রসাদ বল্লে—হ্যাঁ, চারজন পার্টনাব; ওদের ব্যবসার নাম আছে; খাতাপত্রখানা সঙ্গে এনেছিল—আমাকে দেখিযেছে; যতটা ব'লে ততটা নয—তবে আমাদেব চেযে ঢেব বেশী টাকা আছে—কাঁচা টাকা অন্তত:

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—তা তো হ'ল—

প্রসাদ বল্লে—তাইতেই অনেক দূব হল বাবা—

—কিন্তু টাকাই তো সব নয—ছেলেও খুব সৎ—চবিত্রবান ছেলে—সেই জন্যই আমাব আগ্রহ খুব বেশি।

চন্দ্রমোহনের জীবনের এ দিকটা নিয়ে প্রসাদ বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা বলতে গেল না, চুপ করে রইল।

পঙ্কজ বাবু বল্লেন—তা'হলে তোমাব মত আছে?

প্রসাদ বল্লে—কিন্তু বিযেব খবচটা খুব সংক্ষেপে সাবাই ভাল—কাঁচা টাকাব মাল ওদেব না হয খুব আছে—ওদের মেযেদেব না হয খুব ঘটা করে বিয়ে দেবে, কিন্তু আমাদেব তো আব সেবকম অবস্থা নয—

পঙ্কজ বাবু অত্যন্ত প্রীত হয়ে বল্লেন—আচ্ছা সে সব বোঝা যাবে—বোঝা যাবে—বিজলীব টাকা বন্ধ করবার পর বেশ একটু আয দেখা দিচ্ছে—কিন্তু ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে না তো? কোনও চিঠিও লেখে না—একেবাবে গুম যে!

প্রসাদকে নাক মুখ খিঁচতে দেখে পঙ্কজ বাবু তাড়াতাড়ি বল্লেন—কল্যাণীকেও আব বোর্ডিঙে পাঠাব না—তাতেও খানিকটা লাভ হবে—

পকেট থেকে একটা চুরুট বেব করে বল্লেন—আমি বলেছি, তোমাব মাও বলেছেন—এখন তুমিও কল্যাণীকে বেশ একটু ভালো করে বুঝিযে বোলো—আমাদেব চেয়ে হযতো তোমাব কথাব শক্তি বেশি হবে—তুমি তাব দাদা বলে সে হযতো বেশ—

পঙ্কজ বাবু চলে গেলেন।

প্রসাদ কথার লোক মাত্র নয—কাজকেই সে ঢেব ভালো বোঝে

কোর্টের থেকে ফিরে এসে একটু খাওযা-দাওযা বিশ্রামেব পর প্রসাদ কল্যাণীব ঘবেব দিকে গিযে বল্লে—কৈ বে কল্যাণী

কল্যাণী দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকাব বিছানাব ভিতব জড়সড় হয়ে পড়ে ছিল। মেজদাব গলা শুনে তার যেন কেমন দিনেব আলোব পৃথিবীটাকে মনে পড়ল—আশা ও সাধের সুদূব পৃথিবীটা এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তার ঘরেব কাছে এসে পড়ল যেন—

কল্যাণী ধড়মড় করে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে বল্লে—মেজদা! মেজদা— এসো!

—ঘুমিয়েছিলি?

—না

—কি করছিলি অন্ধকারের মধ্যে একা বসে বসে

কল্যাণীর চোখে জল এল—

সূচীপত্রে যান

প্রসাদ বল্লে—এই বিকেল বেলাটা বুঝি এম্নি করে মাটি করতে হয়!
প্রসাদ বল্লে—একদিন তো যাত্রাও দেখলি না? দেখেছিলি?
কল্যাণী ধরা গলায় বল্লে—না
—কেন না?
কল্যাণী চুপ করে রইল।
প্রসাদ কল্যাণীর ঘাড়েব ওপব হাত দিয়ে বল্লে—লক্ষ্মীপূজোর সময আবার হবে—আমাব সঙ্গে যাস্—আমি তোকে নিয়ে যাব।
কল্যাণী বল্লে—আমাকে নিয়ে যেও তুমি
—হ্যাঁ নিশ্চয নিয়ে যাব
—লক্ষ্মীপূজোব সময় হবে?
লক্ষ্মীপূজোর সময—শ্যামাপূজোব সময; এখন দিযালিও দেখতে পাববি—একটা ট্যাক্সিতে করে—না হয় আমাদের বাড়ীর গাড়ীটাযই যাওযা যাবে বেশ। সমস্ত শহবটা ঘুরে আসা যাবে বোম পটকা আতসবাজী দেখতে দেখতে
প্রসাদ হেসে উঠল—
কল্যাণী হেসে উঠল—
প্রসাদ বল্লে—চল, আজ একটু গাড়িতে কবে বেড়িয়ে আসি
কল্যাণী আগ্রহের সঙ্গে বল্লে—কোথায?
—নদীব পাড় দিয়ে ঘোরা যাবে—বেশ জ্যোৎস্না রাত আছে
কল্যাণী বল্লে—চল
—সাজগোজ কব
শাড়ী পরে এসে সে বল্লে—মেজদা, আব কেউ যাবে?
—না।
দু'জনে গেল।
গাড়ী খানিকটা চল্ল—
জ্যোৎস্না—নদী—মেজদাব অনেক দিন পবে এমন স্নেহ—কল্যাণীব মন নানাবকম ভবসা ও প্রসন্নতায ভবে উঠল—
সে বল্লে—মেজদা—
প্রসাদ চুরুটে একটা টান দিয়ে বল্লে—কি বে—
—তোমাকে একটা কথা বলব আমি
—বল
—কিছু মনে কোবো না তুমি মেজদা—তোমাকে না বল্লে কাকে বলব আমি আর?
প্রসাদ কল্যাণীব পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে সস্নেহে বল্লে—কি কথা?
চন্দ্রমোহনের কথাটা আগাগোড়া সে বল্লে প্রসাদকে
প্রসাদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল—
কল্যাণী বল্লে—এ লোকটাকে তুমি তাড়িয়ে দাও মেজদা—
প্রসাদ চুপ ক'বে তাকিয়ে ছিল দূব দুর্নিরীক্ষ শূন্যেব দিকে, কোনও কথা বল্লে না।
কল্যাণী বল্লে—তোমাব পাযে পড়ি মেজদা, আমাদের বাড়ি একে আব ঢুকতে দিও না তুমি—ওর গলাব স্বব শুনলেই আমার প্রাণ শুকিয়ে যায—আমাব এত কষ্ট হয় মেজদা
প্রসাদ বল্লে—কিন্তু শুনেছি লোকটাব ঢেব টাকা আছে
—অমন টাকার গলায় দড়ি—
—সে টাকা তাবা সাধু উপাযে রোজগার করেছে
—তা করুক
প্রসাদ একটু ঘাড় নেড়ে হেসে খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বল্লে—কিন্তু আমি যদি মেযে হতাম, চন্দ্রমোহনকে বিয়ে করতাম
কল্যাণী অবাক হয়ে বল্লে—কেন?

সূচীপত্রে যান

—টাকার যে কি সুখ তা তুমি এখনও বোঝ নি কল্যাণী। কলকাতায় চন্দ্রমোহনদের রাজারাজড়াদের মত বাড়ি—সেখানে তার বৌ হয়ে বাড়ির পাটরানী হয়ে থাকা—সবসময় দাসদাসীর সেবা লোকজনের আদর সম্মান, যখন খুসি থিয়েটার বায়োস্কোপ সার্কাস—কত কি আমোদফূর্ত্তি—সে সবের নামও জানি না আমরা। তারপর মধুপুরে বাড়ি—জামতাড়ায় বাড়ি—শিমলতলায় বাড়ি—দেওঘরে বাড়ি—দার্জ্জিলিঙে বাড়ি—ওদিকে দেরাদূনে—আলমোড়ায়—নইনীতালে—এমন সুখ তুমি স্বপ্নেও কল্পনা কবতে পাব না কল্যাণী।

কল্যাণী হতাশ হয়ে বল্লে—মেজদা, তুমিও এই কথা বল?

—আমি ঠিকই বলি বোন, সব কথাই তোমাকে বলেছি—

কল্যাণী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ির পাদানের দিকে তাকিয়ে রইল—

প্রসাদ বল্লে—তুমি জান না হয়তো আমাদের জমিদাবীব আব কিছু নেই

—কিছু নেই মানে?

—এখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলেই ভালো হয়

প্রসাদের হাত ধরে কল্যাণী বল্লে—ছি, অমন কথা বোলো না।

ধীরে ধীরে হাত খসিয়ে নিয়ে প্রসাদ বল্লে—না বলে কি করব? বাবার হাতে আর দু'বছরও যদি থাকে তাহ'লে আমাদের পথে নামতে হবে—

কল্যাণী অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে বল্লে—সত্যি বলছ তুমি মেজদা?

—দাদার ওপর ঢের নির্ভর কবা গেছিল। কিন্তু দাদা দিলেন উল্টে আরো পগার করে সব। সে যাক, যা হয়ে গেছে তা গেছে, কিন্তু হবে তা আরো ভীষণ—

কল্যাণী পীড়িত হয়ে প্রসাদের দিকে তাকাল।

প্রসাদ বল্লে—দাদা আব ফিববেন না, সে মন্দ নয়। কিন্তু ফেবেন যদি, দাবী কবলে এ বাড়ীটা হয়তো তাঁকে ছেড়ে দিতে হতে পাবে—তাঁকে আর তাঁর মেমসাহেবকে—আব এড়িগেড়ি ট্যাশগুলোকে—

কল্যাণী বল্লে—সমস্ত বাড়িটা দিয়ে তিনি কি কববেন?

—মেমসাহেবরা সমস্ত বাড়ি না নিয়ে থাকে না—আমাদেব সবে যেতেই হবে— কল্যাণী অত্যন্ত আশ্বাস ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে বল্লে—তখন তোমাব কাছে গিয়ে থাকব আমি।

প্রসাদ একটু হেসে বল্লে—সে ক'দিন আব থাকতে পাববে তুমি? ক'দিন আব সম্মানেব সঙ্গে সেরকম থাকতে পারবে তুমি?

কল্যাণী একটু আঘাত পেয়ে বল্লে—ভাইদেব কাছে থাকতে গিয়ে অসম্মান কি কবে হয মেজদা?

প্রসাদ বল্লে—তা হয—খুব হয—[...] বিকাব হয—

কল্যাণী বিমূঢ়েব মত প্রসাদেব দিকে তাকাল।

প্রসাদ বল্লে—তোমার ভবিষ্যতেব দিকে তাকিয়ে কোনো কথা চেপে যাওযা উচিত নয তোমাব কাছে আমার। শুনতে খারাপ শুনালেও যা স্বাভাবিক—যেমনটি হয যা ঘটবে তাইই তোমাব জানা উচিত—আমারও খুলে বলা উচিত সব—

চুরুটে একটা টান দিয়ে প্রসাদ বল্লে—জমিদারী বলে আমাদের কারু কিছুই থাকবে না, কোনও অংশ থাকবে না, সম্পত্তি না কিছু না—ওকালতি করেই আমাকে খেতে হবে; আমি বিয়েও করব—হয়তো শীগগিরই; জমিদারী তখন ফেঁসে গেছে—তুমি জমিদারেব মেয়ে নও কিছু নও— আমাব বৌ তখন তোমাব ঘাড়ে হাগবে—খুব জোর দিয়ে এই কথাটা বল্লে প্রসাদ—সেটা তোমাব কেমন লাগবে কল্যাণী?

কল্যাণী শিহরিত হয়ে উঠল।

প্রসাদ বল্লে—কিশোব পুরুষমানুষ আছে—একটা কিছু কবেও নিতে পারবে হয়তো—তাব জন্য তেমন ভাবনা নেই—কিন্তু তুমি কোথায় দাঁড়াবে?

প্রসাদ বল্লে—আর কিশোরও যে না বিয়ে করে ছাড়বে তা আমাব মনে হয না। তার ওখানে গিয়ে থাকলে তার বৌও তোমার ঘাড়ে হেগে বেড়াবে—

এর আর কোনও এপিঠ ওপিঠ নেই—

কল্যাণী বল্লে—গাড়ীটাকে ফিরতে বল—

প্রসাদ গাড়োয়ানকে হুকুম দিয়ে কল্যাণীকে বললে—এই বেলা জমিদারেব মেয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রমোহনকে তুমি বিয়ে করে নাও, না হ'লে পরে দুর্গতির আর শেষ থাকবে না তোমার।

কল্যাণী আঁতকে উঠল—

প্রসাদ বল্লে—তুমি মনে কর তুমি খুব সুন্দব। কিন্তু নির্জ্জলা সুন্দব মুখ দেখেই মানুষে আজকাল বড় একটা বিয়ে করে না। আমি নিজেও তা করব না। তোমার মতন এবকম সৌন্দর্য্য—এও অসাধাবণ কিছু নয়—তুমি পঙ্কজ বাবুর মেয়ে বলেই আজ এ জিনিসেব একটা কিছু দাম আছে—চন্দ্রমোহনেব স্ত্রী হলে এর দাম আরও হাজার গুণ বেড়ে যাবে। না হলে আমাব কুচ্ছিৎ মাগ এলেও—সেই যা বলেছি—হৈ হৈ করে তোমাব ঘাড়ে ঘাড়ে হাগবে—খুব সেয়ানা জিনিস হবে সেটা তখন, না?

আঠারো

শালিখবাড়িতে এসে অব্দিই অবিনাশ ভেবেছিল যে কল্যাণীব সঙ্গে দেখা করতে যাবে একদিন—কিন্তু যাওয়া তাব ঘটে ওঠেনি।

সে অলস হয়ে গেছে—এত অলস যে যে সঙ্কল্পেব পিছনে নবনারীব ভালোবাসাব মত এমন একটা অনুপ্রাণনাব জিনিস তাও যেন তাকে জোব দেয় না।

সে ঢের ভাবতে শিখেছে—

অনেক সময়ই বিছানায় শুয়ে থেকে ভাবে শুধু কোনও কাজ করে না, বিশেষ কারুব সঙ্গে কোন কথা বলে না; এক একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি ঠাই বিছানায় শুয়ে থাকে—মাঝে গিয়ে একটু স্নান করে খেয়ে আসে শুধু—

ভালোবাসাব কথা আজকাল সে বড় একটা ভাবে না—

এক এক সময় মনে হয় কল্যাণীকে আব ভালোবাসে সে কি?

এক সময় এই ভালোবাসা তাকে ঢেব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—এই রূপ এমন গভীব এমন সম্পূর্ণ ভাবে অধিকাব করে রেখেছিল তাকে যে পৃথিবীর মানুষেব জীবনযাত্রাব অন্যতম আশা আকাঙ্ক্ষা ও সার্থকতার সমস্ত দবজাই চাবি দিয়ে বন্ধ করে ভালোবাসা মোহ ও কামনাব উপাসনা করেছে বসে বসে সে—তাতে কি হ'ল?

জীবন তাকে পদে পদে ঠকিয়ে গেল শুধু; কল্যাণীও যেমি দূব—তেমি দূব হয়ে রইল। তবুও কল্যাণীকে পাওয়াব জন্য জীবনের সব দিকই একদিন সে অক্লেশে ছাবখাব করে ফেলতে পারত; কল্যাণী ছাড়া আব কোনো জিনিসেরই কোনো মূল্য ছিল না—কোনো নাম ছিল না যেন; হে বিধাতা, কোনো নামও ছিল না।

আর্টেব কোনো অর্থ ছিল না, প্রতিষ্ঠাব কোনো মানে ছিল না, সংগ্রাম সম্মান মনুষ্যত্ব সাধনা প্রতিভা এগুলোকে এমন নিষ্ফল মনে হ'ত সাধাবণেব ফূর্তি আহ্লাদ দিয়েই বা সে কি করবে? ভালোবাসা ছাড়া মনে হ'ত—আব সমস্তই সাধাবণেব জিনিস। নিজেব রোজগারেব টাকাটুকু মানুষেব জন্য যে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানেব পথ ঠিক করে রাখে তাকেও সে প্রাণ ভরে অবজ্ঞা করেছে—

কিন্তু আজ এতদিন পরে এই জিনিসটাই চায় শুধু সে—নিজেব রোজগারেব নিশ্চিন্ত কয়েকটা টাকা মাসে মাসে—সেই সামান্য ভিত্তিব ওপব যেটুকু স্বাধীনতা থাকে যেটুকু তৃপ্তি থাকে।

কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকব জিনিসও আজ তাকে কেউ দিচ্ছে না। কলকাতা ছেড়ে দেশে এসে মায়েব ওপব নির্ভব করে থাকতে হচ্ছে তাব।

এমন অনেক কথা ভাবছিল অবিনাশ বিছানায় শুয়ে শুয়ে—এমন সময় কল্যাণী এল।

ব্যাপারটা যে কি হ'ল সহসা অবিনাশ বুঝতে পাবল না; ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসে দেযালে ঠেস দিয়ে বল্লে—তুমি—

বিছানাব এক পাশে এসে চুপে চুপে বসে কল্যাণী বল্লে—শুয়েছিলে—শোও।

—না-না-না—এখনই উঠতাম—

—বেড়াতে যেতে?

অবিনাশ বল্লে—আজ লক্ষ্মী পূজো না?

—হ্যাঁ

—এ রাতে তুমি কেমন করে এখানে এলে?

—দেখছই তো এসেছি

—পূজো ফেলে?

—পূজো খানিক হয়েছে—খানিক হচ্ছে—

সূচীপত্রে যান

—তোমাকে ছেড়ে দিল?

কল্যাণী—কৈ, তোমাদের বাড়ী পূজো হবে না?

—কে আর করে?

—আহা, লক্ষ্মী পূজো—

—লক্ষ্মী সরস্বতী সব একাকার—তুমি তো জানই সব—আহা, এই জ্যোৎস্নাটা—বেশ লাগছে! এতক্ষণ শুয়ে থেকে এই জ্যোৎস্নাটার দিকে ছিলাম পিঠ ফিরিয়ে—তুমি যদি না আসতে তা হ'লে হয়তো ঘুমিয়েই পড়তাম—

—কেন, এ বাড়ীর লোকজন সব কোথায়?

—পাড়ায় গেছে হয়তো—

কল্যাণী বল্লে—তুমিও তো কলকাতায় ছিলে?

—হ্যাঁ।

—কবে এসেছ?

—দিন পঁচিশেক—

—আমি যে এখানে এসেছি তা জানতে না তুমি?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বল্লে—জানতাম

—একদিনও গেলে না যে বড়?

অবিনাশ বল্লে—তোমার কাছে গেলে মনটা খুব ভালো লাগত বটে—রাতে বেশ সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম—কিন্তু ঐ অব্দি—আর কি?

কল্যাণী অবোধের মত তাকিয়ে রইল।

অবিনাশের মনে হ'ল এই মেয়েটি বড্ড বোকা, ভেবেই তার বড় কষ্ট হল: মনে হ'ল, ছি, কল্যাণীর সম্বন্ধে এ রকম ভাবনাও এক দিন কত বড় অপরাধের জিনিস বলে মনে হত! আজো পৃথিবীর মধ্যে এই মেয়েটিকেই সব চেয়ে কম আঘাত দিতে চায় সে—নিক্তির মাপের চেয়ে একে একটু বেশি কষ্ট দিতে গেলেই নিজের মন অবিনাশের আজো কেমন একটা ব্যথায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু পড়া উচিত নয়।

কিন্তু, তবুও সেই ব্যথা কয়েক মুহূর্তের জন্য শুধু;—আগেকার মন তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না আর। এ একটা চমৎকার রফা।

কল্যাণীর সময় হয়তো খুব সংক্ষেপ; সে উশখুশ করছিল—

—কি ব্যাপার?

কল্যাণী বল্লে—একটু দরকার—

এই বলে সে থামল—

অবিনাশ তাকাল মেয়েটির দিকে

কল্যাণী বল্লে—শুনেছ নাকি?

অবিনাশ একটু ভেবে বল্লে—হ্যাঁ, শুনেছি

—কি বলো তো।

—তোমাদের বাসায় চন্দ্রমোহন বাবু আছেন—

কল্যাণী বল্লে—তাকে চেন নাকি?

—না।

—কোনো দিন দেখোও নি—

—এই এবার দেখলাম—এ দিককার রাস্তায় মাঝে মাঝে বেড়ায়, তোমার মেজদার সঙ্গে তোমাদের বগি গাড়ীটাতে চড়ে—

কল্যাণী বিছানার ওপর আঁক কাটছিল—

একটু পরে বল্লে—তুমি কি বল?

অবিনাশ বল্লে—আমার মন ক্রমে ক্রমে নিরস্ত হয়ে উঠেছে—কাজ করতে ভালো লাগে না—দুঃসাধ্য জিনিসকেও সফল করে তুলবার মত উদ্যম হারিয়ে ফেলেছি—দিন রাত চিন্তা করে করে সব কিছুরই নিষ্ফলতা প্রমাণ করতেই ভালো লাগে শুধু—এই সব অদ্ভুত ব্যাপারের কথাই ভাবি আমি। এর পর আমার কাছে কি আর শুনতে চাও তুমি?

সূচীপত্রে যান

কল্যাণী বল্লে—আমি দিন রাত কি....চন্দ্রমোহন বাবুর জুতোর শব্দ শুনলেও আমাব ভয় পায—এমন কান্না আসে

অবিনাশ একটু হেসে বল্লে—একদিন এই জুতোর শব্দ না ভালো লাগবে যে তা নয়

কল্যাণী বল্লে—তার আগে যে আমি মরে যাব।

—বুড়ী হয়ে তুমি বুড়ো চন্দ্রমোহনের রক্ত গরম কববার জন্য মবকধ্বজ ঘষবে—

কল্যাণী বল্লে—মিছে কথা বাড়াও কেন? তুমি তো সব জান। তোমার কাছে এসে কি আমার অনেক কথা বলবার দরকার

—শোন তবে—

কল্যাণী অবিনাশেব দিকে তাকাল—

অবিনাশ বল্লে—অনেক দিন আমাদেব দু'জনাব দেখা নেই—তোমাব খোঁজ তবুও আমি সব সময়ই রেখেছি—কিন্তু আমার ব্যাপারটা তুমি একেবারেই জানতে পারনি—

—তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে জানি—আর জানবার দরকার নেই—

মেয়েটিকেই অবিলম্বেই নিজের কথা সব জানিযে দিযে এই ক্ষণিক মুহূর্তের সৌন্দর্য্য অবিনাশ নষ্ট কবতে গেল না।

এই জ্যোৎস্নায এই রূপসীকে—এবং এই রূপসীব এই ক্ষণিক প্রেমকে প্রেমিকের মত না হ'লেও শিল্পী আযুষ্কালেব মত উপভোগ কবতে লাগল সে; মনে হল এ উপভোগ প্রেমিকেব উপভোগেব চেযেও ঢেব প্রবীণ,—একটায় মানুষ মানুষেব মত আত্মহারা হয—আর একটায বিধাতার মত সমাহিত হয়ে থাকে। ঢেব প্রবীণ—ঢেব সুপরিসব এ উপভোগ।

কিন্তু এক আধ মিনিটেব জন্য শুধু; তাব পরেই নিজেব অনিকেত পৃথিবীতে ফিবে এল অবিনাশ।

কল্যাণী বল্লে—চন্দ্রমোহনেব মুখ দেখেছ তুমি?

—দেখেছি

—কেমন বলো তো—

অবিনাশ ভাবছিল—

কল্যাণী অত্যন্ত অসহায বলে বল্লে— এমন মেনি বাঁদরের মত মুখ আমি মানুষের মধ্যে কোনো দিনও দেখিনি—তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না অবিনাশদা—

—মানুষেব মুখেব সৌন্দর্য্যই যদি এত ভালো লেগে থাকে তোমার তাহ'লে কোনো মুখ নিয়েই কোনো দিন তৃপ্ত হতে পাবেবে না—

—তোমাকেও কেউ ঘুষ দিয়েছে নাকি? তুমিও যে চন্দ্রমোহনের হয়ে কথা বলছ?

অবিনাশ একটু হেসে বল্লে—কল্যাণী—আমি—

—তুমি এ রকম অসঙ্গত কথা বল কেন

—জীবন ঢেব অসঙ্গতি শিখিয়েছে; সব চেয়ে অসংলগ্ন জিনিসকেও দেখলাম শেষ পর্য্যন্ত সব চেয়ে সত্য—

অবিনাশ বল্লে—আমাব নিজেব সুখকে এক সময় বেশ পুরুষ মানুষের মত বলে মনে হত; কিন্তু দিনের পর দিন যতই কাটছে চামড়া ঝুলে পড়ছে, মাংস খসছে—হাড় জাগছে—

তারপব এক এক দিন ঘুমের থেকে উঠে আরসীতে মুখ দেখে মনে হয, এ কি হ'ল? নানা রকম বীভৎস জানোযারেব আভাস মুখের ভিতর থেকে ফুটে বেরুতে থাকে! কিন্তু তাই বলে আমাব কোনো দুঃখ নেই; মেয়েদের ভিতর যারা সব চেযে কুশ্রী তারাও আমাকে ক্রমে ক্রমে বসুশ্রী বলে ঠাট্টা করছে—হয়তো দূর সরে যাবে আমাব কাছ থেকে; আমিও তাদের কুৎসিৎ বলে টিটকারি দেব—

কিন্তু তারপর যখন কাজের সময আসবে—তার যদি অনুমতি হয—ওদের মধ্যে একজন পাঁচশো টাকার ইনস্পেকট্রেসকে বিয়ে করতে আমার একটুও বাধবে না; কি বাধা কল্যাণী? মুখেব দোষগুণ শেষ পর্য্যন্ত আর থাকে না। টাকা জীবনটাকে সুব্যবস্থিত করে দেয—

কল্যাণী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অবিনাশের দিকে তাকাল, নাক চোখ মুখ এমন কি দাঁতের ভিতর থেকেও যেন তার আগুন ঠিকরে পড়ছে; কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল অবিনাশ ঠাট্টা করছে; তামাসা করতে যে এ লোকটি খুব ভালোবাসে তা কল্যাণী বরাবরই জানে—

কাজেই মনটা তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল প্রায—আস্তে আস্তে—কেমন একটা অদ্ভুত

সূচীপত্রে যান

অসঙ্গতির খোঁচা খেয়ে নিরুপায়ের মত হাসতে হাসতে বল্লে—তোমার মুখকে তুমি চন্দ্রমোহনের মত মনে কর?

—সেই রকমই তো হয়ে যাচ্ছি

—দেখছিই তো

—চন্দ্রমোহনের ও দোষটা তুমি ধোরো না—

—সে আমি বুঝব

অবিনাশ বল্লে—তাকে বিয়ে করতে হয় কর, না করতে হয় না কর; কিন্তু যে কুৎসিৎ মানুষ প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবেসেছে তাকে কুৎসিৎ বলে ঘৃণা করে খারিজ করবে তুমি এটা বড় বেকুবি হবে।

কল্যাণী নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

একটু পরে বল্লে—তুমি পরিবর্ত্তিত হয়েছ বটে।

অবিনাশ বল্লে—তুমি হওনি? যদি না হয়ে থাক, হওয়া উচিত তোমার

অবিনাশ বল্লে—আর্টিষ্ট ছিলাম—কিন্তু আর্ট জীবনকে কি দিল? প্রেমিক হয়েও জীবনের কাছ থেকে কি গেলাম আমি?

—প্রেমিক হয়ে? এখন তুমি আর প্রেমিকও নও তাহ'লে?

—কাকে ভালোবাসব? একজন রূপসীকে নিয়ে আমার কি হবে কল্যাণী? আমি নিজে খেতে পাই না; প্রেম বা শিল্পসংস্থান মানুষের জীবনের থেকে যে দুরন্ত চেষ্টা সাহস কল্পনা দুঃসাধ্য পরিশ্রম দাবী করে আমার জীবনের যে মূল্যবান জিনিসগুলো খরচ হয়ে গেছে সব—কিছু নেই এখন আর। উপহাস আছে এখন; জীবনের গতিশীল প্রগতিময় জিনিসগুলোকে টিটকারি দিতে পারি শুধু—নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোরের থেকে রাত, রাতের থেকে ভোর সৌন্দর্য্যকে মনে হয় কাদা আর লাল স্রোত, ভালোবাসাকে মনে হয় পুতুলখেলা, পলিটিক্সকে মনে হয় উতোর, আর্টকে ভাঁড়ামি, জীবনের মহত্ব গুরুত্ব মঙ্গল বলে যে সব জিনিস নিয়ে লোকে দিনরাত হৈ হৈ করছে সবই আমার কাছে ভড়ং ঢং নিষ্ফলতা শুধু। আমি আজো বুঝি না এরা সত্য—না আমি সত্য। আমার কোনো বিধাতা নেই। আমার মার দুঃখ কষ্ট দেখে একটা চাকরীর সামান্য ক'টি টাকা ছাড়া অন্য কোনো কিছু জিনিসের জন্যই আমার কোনো প্রার্থনা নেই। কিন্তু সে চাকরীও আমাকে দেয় না কেউ।

কল্যাণী কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইল।

অবিনাশ বল্লে—চন্দ্রমোহন তোমাকে বিয়ে করবে এ জন্য ঈর্ষাও নেই আজ আমার; তেমন কোনো একটা যৌনকাতরতাও নেই। কিন্তু গত বচ্ছর হ'লে এই শেষের জিনিসটাও কি ভয়াবহ হয়ে উঠত—অবাক হয়ে আজ ভাবতে পারা যায়। এক বছরের মধ্যে কতখানি ঘুরে গেছি—

কল্যাণী বল্ল—উঠি

—আচ্ছা

কিন্তু তবুও সে বসে রইল—

অবিনাশ বল্লে—কার সঙ্গে যাবে?

ছোড়দা আসবে—

—কিশোর কোথায়?

—তোমাদের পাশের বাড়ীতেই—

—হিমাংশুবাবুর বাড়ী?

—হ্যাঁ; ডেকে দেবে?

—আচ্ছা দেই

অবিনাশ উঠল

কল্যাণী বল্লে—সত্যিই ডাকতে গেলে

—তুমি বাসায় যাবে না?

কল্যাণীর চোখ ছলছল করতে লাগল—

অবিনাশ একটা চেয়ার টেনে বসে বল্লে—দিব্বি রাত—লক্ষ্মীপূজোর—

—সে দিনগুলো ফুরিয়ে গেল কেন?

—কোন দিন

—যখন তুমি ভালোবাসতে পারতে—

অবিনাশ চশমাটা খুলে বল্লে—ফুরুলো তো

—আমার তো ফুবোয নি—

—অনেক স্বামী স্ত্রীব জীবনই আমি দেখেছি—ভালোবাসা কোথাও নেই, সৌন্দর্য্যের মানে শীগগিবই ফুরিয়ে যায; সমবেদনা থাকে বটে—কিন্তু সমবেদনা তো প্রেম নয—

কল্যাণী বল্লে—আমি স্বামী স্ত্রীর জীবনের কথা বলছি না—

অবিনাশ বাইবের দিকে তাকিয়ে বল্লে—একটা গল্প মনে পড়ছে—এমন লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সেই গল্পটার ভেতর ঢের মাধুর্য জমে ওঠে বটে। তোমাকে নিয়ে যদি আজ এই জ্যোৎস্নায কোনো দূর দেশে চলে যাই আমি যেখানে কেউ আমাদেব খুঁজে পায না—তুমি আমাব স্ত্রী হও, আমি তোমাব স্বামী হই—তাহ'লে আমি কোনো চবিতার্থতা পাব না।

কল্যাণী বুকেব ভিতব কেমন যেন ক'বে উঠল, কোনো কথা বলতে পাবল না সে।—এই, জ্যোৎস্না উৎবে আবার ভোব আসবে দুপুবে আসবে—অমাবস্যা আসবে—বৃষ্টি আসবে

—নানা দিক থেকে অনেক বিরুদ্ধাচারের সঙ্গে লড়াই কবতে হবে। সে সংগ্রাম তুমি হযতো কিছু দিন কবতে হবে। কিন্তু আমি পাবব না।

কল্যাণী বল্লে—কেন?

—ভালোবাসা ও সৌন্দর্য্যকে অন্তঃসাবশূন্য মনে হয যে

—কেন?

—সৌন্দর্য তো একটা ফুলেব পার্পাড়িব মত! কি তাব মূল্য একটা কবিতার খাতায ছাড়া এ পৃথিবীব আর কোথাও তাব কোনো দাম নেই। মন আমাব আজ কবিতাব খাতাব বদলে বিলের খাতায় ভবে উঠেছে—

কল্যাণী আঁৎকে উঠল

অবিনাশ বল্লে—ভালোবাসাও তো শেষ পর্যন্ত লালসায গিয়ে দাঁড়ায শুধু— লালসার কি যে মূল্য তা গত দু'বছবেব আমি খুব বুঝতে পেবেছি। সে গুখখুবিব কাছে তোমাব জীবনকে বিসর্জন দিতে চাই না আমি, আমাব জীবনকেও নষ্ট কবতে পাবি না—

কল্যাণী একটি মৃতপ্রায মানুষেব মত কে কোণে জড়সড় হয়ে বসেছিল

অবিনাশ বল্লে—কিন্তু এও সব হ'ত আমাদের—খুব ভালোই হত যদি চন্দ্রমোহনেব মত টাকা থাকত।

অবিনাশ একটু কেশে বল্লে—কিম্বা তোমাব মেজদাব মত টাকা থাকলেও আমি একবাব চেষ্টা কবতাম, কিন্তু আমাব কিছুই নেই।

উনিশ

সেই বাত্রেই—

লক্ষ্মীপূজোব অশেষ জ্যোৎস্নাব মধ্যে লাল বাস্তাব পব কাঁকবেব আবো লাল বাস্তাব বাঁক ঘুরে ঘুবে বগি গাড়িটা নিঃশব্দে চলছিল—যেন এ চলাব সীমা শেষ নেই। কিন্তু তবুও খুব তাড়াতাড়িই যেন পঙ্কজ বাবুব গাড়ি বাবান্দায এসে ঝট কবে গাড়ীটা থেমে গেল। ঘোড়াটা খট খট কবে খানিকটা লাফিয়ে উঠল—পাগলামি করল—চাবুক খেল—তারপর সব চুপ।

কল্যাণী হঠাৎ চমকে উঠে বুঝতে পাবল যে বাসায এসে পৌঁছেছে—

ছোড়দাব পিছনে পিছনে তেতলা অব্দি গেল কল্যাণী'—

কোথাও কেউ নেই।

কল্যাণী বল্লে—কোথায গেছে সব ছোড়দা—

—কে জানে কোথায?

দোতলায নেমে সিদে খাবার ঘবেব দিকে চলে গেল কিশোব; কল্যাণীও দোতলায নামল—খেতে গেল না সে আব। হলের একটা চেযাবের ওপব চুপ করে বসে ছিল— কিশোবের গলার আওযাজ বান্নাঘবে ক্রমাগতঃ খন খন কবছে—কাকে যেন ধমকে ধমকে সে ভূতঝাড়া করে দিচ্ছে—

কিশোর অবিশ্রাম বকে চলছিল—কিন্তু ছোড়দাব গলাব অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে লোপ পেযে এল যেন

সূচীপত্রে যান

কল্যাণীব কাছে।

সে কিছুই দেখছিল না—বুঝছিল না।

কিশোর খেয়ে এসে কল্যাণীকে অগ্রাহ্য করে ঘুমোতে চলে গেল।

ওসমান এসে বললে—দিদিমণি

কল্যাণী নড়ে উঠল।

ওসমান বল্লে—কত্তারা বোধ হয কেউ আজ বাতে ফিববেন না

—কোথায গেছে?

যাত্রা না পাঁচালী শুনতে হরিবাবুব হাবেলীতে—

কল্যাণী বললে—কে কে গেছেন?

—ছোট বাবু আর আপনি ছাড়া সবাই

—মাও!

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা তুমি যাও।

—খাবেন না?

কল্যাণী বললে—কে?

—চন্দ্রমোহনবাবু—আপনি—

—তিনি কোথায?

—বাগানে বেড়াচ্ছেন—

—খান নি?

—না

—তাঁকে ডেকে খেতে দাও গিযে

—এই টেবিলেই দেব?

—দাও

—ডেকে আনি?

–খাবার ঠিক হযেছে?

—হ্যাঁ

—আন ডেকে

ওসমান চলে গেল।

কল্যাণী ভাবছিল—সে তেতলায চলে যাবে—কিম্বা নিজেব ঘবে যাবে ঘুমুতে; কিন্তু বসেই বইল সে—মস্ত বড় গোল ডিনাব টেবিলটাব পাশে একটা চেযাবে–খাবাবেব জন্য ও চন্দ্রমোহনের জন্য স্তব্ধ হযে প্রতীক্ষ কবছে যেন সে। কল্যাণীব মনে হচ্ছিল, এ কেমন! কিন্তু এমনই তো হ'ল। জিনিসটাকে খুব বেশী অঘটন বলেও মনে হচ্ছিল না তাব।

চন্দ্রমোহন এল।

কল্যাণী বল্লে—বসুন।

বলেই শিউরে উঠল। নিজেব কঠিব বিরূপ কাতব ব্যথিত চোখ দু'টোকে নীলাম্বরীতে ঢেকে তেতলাব দিকে ছুটে যাবাব ইচ্ছে কবল তাব। কিম্বা এই মেঝের ইট চূণ কাঠেব ভিতর মিশে যেতে ইচ্ছা করছিল তার—কেউ কোনো দিন খুঁজে পাবে না তাকে আব।

কিন্তু তবুও সমযবিধাতা তাকে বসিযেই তো বাখলেন।

চন্দ্রমোহনের ভাত এল; কল্যাণীরও

কল্যাণী বল্লে—ওসমান

—হুজুর

—এখন না, আমি পরে খাব।

ওসমান থালা তুলে নিযে গেল—

চন্দ্রমোহন অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িতের মত বল্লে—কেন? পবে কেন?

কল্যাণী বল্লে—আপনি খান।

—আপনি কেন খাবেন না?

—খাব তো; পরে।

—আমার সামনে খেতে খারাপ লাগে

কল্যাণী বল্লে—আপনার ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে

—আমি খাচ্ছি

একটু হেসে বললে—আপনি না খেলেও আমি খাচ্ছি—কাউকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে আমার নেই।

চন্দ্রমোহনবাবুর কখন কি লাগে ওসমান তদারক করে যাচ্ছিল; কল্যাণী তাকিয়ে দেখছিল মাঝে মাঝে—নিপুণ খানসামার মত এসে বুঝে শুনে দরদ দিয়ে লোকটাকে খাওয়াচ্ছে। মাথাটা একটু কাৎ করে জানালার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে রইল কল্যাণী।

খাওয়া হয়ে গেলে ওসমান টেবিল পরিষ্কার করে নিয়ে গেল—কল্যাণীর মনে হ'ল এখন সে চলে যেতে পারে।

চন্দ্রমোহন মুখ ধুয়ে গামছায় মুখ মুছে টেবিল সাফ শেষ আগেই দাঁড়িয়েছে এসে।

ওসমান চলে যাওয়ার পর চন্দ্রমোহন বল্লে—আমি কাল পর্শু তক এখান থেকে চলে যাব—

কল্যাণী মাথা হেঁট করে বসে ছিল—

চন্দ্রমোহন বল্লে—আপনার বাবার মত পেয়েছি—আমারও কলকাতায় ঢের কাজ আছে তাই—

কল্যাণীর বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করছিল। অস্ফুট স্বরে বল্লে বাবার মত? কিসের মত?

চন্দ্রমোহন বল্লে—তা তো আপনি জানেনই—

কল্যাণী বল্লে—আপনার কাছে একটা অনুরোধ

চন্দ্রমোহন হাসি মুখে তাকাল

কল্যাণী বল্লে—আপনি যদি মানুষ হন বাবাকে আর বিরক্ত করবেন না—আমাদেরও না

চন্দ্রমোহন ধীরে ধীরে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে অত্যন্ত করুণ হয়ে বল্লে—আপনার বাবাকে কি আমি বিরক্ত করেছি?

কল্যাণী একটু চুপ থেকে বল্লে—না হয় সেধেই বাবা আপনাকে ভালো বেসেছেন— কিন্তু—

চন্দ্রমোহন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্লে—কিন্তু আর কেন কল্যাণী

কল্যাণীর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই এমন কান্না এল তার—অতি কষ্টে কান্না চেপে চন্দ্রমোহনকে বল্লে—কি চান আপনি?

চন্দ্রমোহন অত্যন্ত কাতর হয়ে বল্ল—তুমি দয়াময়ী; তোমার মতন দয়া আর কারু নেই। আমি প্রথম দিন দেখেই বুঝেছি—শেষ পর্য্যন্ত তোমার জন্য যেন আমার মৃত্যু না হয়—

কল্যাণী ঠোঁটে আঁচল গুঁজে কঠিন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল—নড়বার চড়বারও শক্তি ছিল না তার।

চন্দ্রমোহন একটু এগিয়ে এসে কল্যাণী হাত ধরে বল্লে—তুমি আমাকে ভালোবাস—বল, তুমি আমাকে ভালোবাস—

কল্যাণী হাত খসিয়ে দিয়ে বল্লে—না, ছাড়ুন—

—বল, আমাকে ভালোবাস তুমি কল্যাণী—বল ভালোবাস—

কল্যাণী চোখের জলে একাকার হয়ে বল্লে—না—না—না—কোনো দিনও না— কোনো দিনও আপনাকে আমি ভালোবাসি নি—আপনি সরুন—আমাকে যেতে দিন—যেতে দিন—

চন্দ্রমোহন বল্লে—আমি এখনও জানি তুমি আমাকে ভালোবাস—

কল্যাণী অবোধের মত কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—কে বলেছে সে কথা আপনাকে—আপনি ভুল করেছেন—ভুল করেছেন—ভুল করেছেন—

কল্যাণী চীৎকার করে উঠে বল্লে—আপনাকে দেখলে ভয় করে—আপনাকে দেখলে ঘেন্না করে আমার—

বলতে বলতে কল্যাণী শোবার ঘরের দিকে ছুটে যেতে লাগল—নিষ্কৃতি নাই—নিষ্কৃতি নাই—একটা ব্যাধের জাল যেন কল্যাণীকে ক্রমে ক্রমে ঘিরে ফেলছে—

চন্দ্রমোহন মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে কল্যাণীর পা-দু'টো জড়িয়ে ধরে বল্লে—আমাকে মেরে ফেল—আমাকে মেরে ফেল কল্যাণী।

সমস্ত শরীর চন্দ্রমোহনের যেন কেমন নিষ্পেষিত পাখীর মত—মাছের মত কল্যাণীর পায়ের নীচে

লুটিয়ে লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল। সে কি কাতরতা—মানুষ কোনোদিন এত কাতর—এমন অনাথ শিশুর চেয়েও ভয়াবহ অথর্ব্বতাব পবিক্রমে বোকা মেয়েমানুষকে স্তম্ভিত কবতে পারে—কল্পনাও করতে পারেনি কোনো দিন কল্যাণী।

ধীরে ধীরে কান্না থেমে গেল তাব। কান্না থামতেই নিজেকে সে ধিক্কার দিতে লাগল; সে বোকা মেয়েলোক ছাড়া আর কি? নইলে এই মানুষটার কাছে এমন করে সে ঠকে যায়!

বিচলিত হযে মেঝের ওপর বসে পড়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল কল্যাণী—এই .লোকটাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বীভৎসতাও নয আজ আব—আজকের আকাশ মাঠ জ্যোৎস্না পৃথিবীর কি একটা নিগূঢ় কাতবতা ও নিষ্ফলতার প্রতীকব্যবসাযী—না সত্যিই প্রতীক এই চন্দ্রমোহন।

কল্যাণী বল্লে—উঠুন

কোনো সাড়া দিল না চন্দ্রমোহন।

কল্যাণী বল্লে—উঠুন উঠুন—বলেছিলাম ঘেন্না করি, ভয কবি—কিন্তু এখন আব কবি না সে সব কিছু—

চন্দ্রমোহন মেঝের ওপব মাথা উপুড় বেখেই বল্লে—বল ভালোবাস—

কল্যাণী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে কি বল্লে, চন্দ্রমোহন ছাড়া কেউ আব তা শুনতে পেল না—

কুড়ি

চন্দ্রমোহনের সঙ্গে কল্যাণীব বিয়ে হবাব পর বছর খানেক কেটে গেছে।

কল্যাণীর সাত মাস চলছে—

জবাযুর শিশুটি যখন তাকে তেমন বিশেষ যন্ত্রণা দিচ্ছিল না, দিনটা মন্দ লাগছিল না, স্বামী কাছে ছিল না—তখন একটু অবসব কবে মাকে সে চিঠি লিখতে বসল :

এই এক বছরেব মধ্যে তিন চাবখানা চিঠি মাত্র তোমাকে লিখেছি মা। বাবাকে এক খানাও লিখতে পারিনি।

বাবাব দুইখানা চিঠি আমি ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলোব কোনো উত্তব দিযে উঠতে পারি না। বাবা কি বাগ কবেছেন?

তোমবা তো জানতেই পেবেছ মা যে সাত আট কোটি টাকাব কিছু ব্যবসা নয— ব্যবসাই নয; ব্যাঙ্ক ওঁব পনের হাজাব টাকা আছে মাত্র, তাবি সুদে আমাদেব চলে। উনি অনেক সময বলেন, ব্যবসা না করলে এ টাকা বাড়বে কি কবে? ব্যবসা কবতে চান। কিন্তু আমি জানি—ব্যবসাবুদ্ধি ওঁব একেবারেই নেই। চার দিক থেকে লোকেবা এসে ওঁকে প্রাযই ফুসলায—উনি বিচলিত হয়ে যান। আমি এ বকম কবে শক্ত কবে চেপে না থাকলে এ ক'টি টাকা অনেক আগেই মাবা যেত। তখন আমবা দাঁড়াতাম কোথায়, সেই পনেবো হাজার টাকার মধ্যেও সাত হাজাব টাকা বাবাব দেওযা—আমাব বিয়ের সময যা যৌতুক দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা।

মোট পোনেরো হাজাব টাকা আমাদেব সম্বল—বিযেব আগে ওঁব আট হাজাব টাকা ছিল মাত্র—কিন্তু ভুল খাতা দেখিয়ে ভাওতা দিযে বাবাকে ও মেজদাকে উনি প্রতাবিত কবেছেন বলে বাবা আজো ওঁব ওপব মর্ম্মে মর্ম্মে চটে আছেন—চিঠিতে লোকের মুখে ক্রমাগতঃ ওঁকে গাল পাড়েন। তুমি তো তা কব না মা। তুমি জান মেয়েমানুষের স্বামী ছাড়া কি আর থাকতে পাবে। তুমি বাবাকে বলে দিও তিনি যেন ওঁকে এ রকম কবে আর নির্য্যাতন কবতে না যান—তাতে আমাব বড় বেশী আঘাত লাগে। আমাকেও যা চিঠি লিখেছেন তাও ওঁকে গাল পেড়ে—আমাকে না জেনে না বুঝে জলে ফেলে দিয়েছেন এই সব কথা লিখেছেন। এই জন্য আমার এত খারাপ লেগেছে যে বাবার চিঠিব উত্তবও দেইনি।

বাবাকে বোলো তুমি যে আমাকে জলে ফেলে দেওযা হয়নি—আমার স্বামীর কাছেই আমাকে রাখা হযেছে।

এ সব কথার মর্ম্ম বাবা হযতো ভালোবাসবেন না—আমাব স্বামী তাব এমন বিষদৃষ্টিতে! কিন্তু তুমি তো বুঝবে।

এর আগে আমরা বালিগঞ্জের দিকে একটা বাড়িতে ছিলাম; ভাড়া লাগত না। ওঁব দাদার বাড়ী। দু'টো কোঠা আমাদের জন্য আলাদা করে দেওযা হয়েছিল। বেশ খোলামেলা ছিল—সামনে একটা মস্ত

সূচীপত্রে যান

বড় মাঠ; সেখানে ছেলেবা ফুটবল, হকি, ডাণ্ডাগুলি—আরো কত কি খেলত। আমি অনেক সময় জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম।

বেশ মজা লাগত আমার—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতে। ছোড়দার সঙ্গে—আব ঐ ভূষণ আব আকুশির সঙ্গে ছেলেবেলায় আমিও তো কত খেলেছি!

ভূষণ কোথায় মা এখন? বিয়ে হয়ে গেছে? কোথায় হ'ল? আকুশি কোথায়?

বালিগঞ্জেব বাড়ীতে বেশ আলো হাওয়া আসত। খুব শান্তি ছিল। বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। একটা ঠিকা ঝি ছিল। সেই সব করে দিত। ওঁব দাদাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেতাম।

সারা দিন সেলাই করতাম—আব মাঝে মাঝে উনি আমাব সঙ্গে তাস খেলতে চাইতেন। দু'জনে মিলে খেলতাম—বেশ মজা লাগত।

ওঁর দাদার একটা এস্রাজ ছিল—সন্ধ্যাব সময সেটা বাজাতাম। এস্রাজ বাজাতে জানি না আমি অবিশ্যি। উনিও জানেন না। কিন্তু ঐ এক বকম হত।

কিন্তু সে বাড়ীটা আমাদেব ছেড়ে দিতে হযেছে। ওঁব দাদা বল্লেন যে তাঁব নিজেব লোকজন আসবে। শ্যামবাজাবের দিকে বাড়ী ভাড়া কবতে হয়েছে আমাদেব; গোটা বাড়ী অবিশ্যি নয—দু'টো ঘর ভাড়া কবেছি—একটা রান্নাঘব আছে; বান্নাঘবটা এক তলায—ঘব দু'টো দোতলায—এই সময় ওঠানামা করতে হয—এই যা কষ্ট-এখন আমাব সাত মাস। উনি বলেন একটা বাঁধুনি রেখে দি—কিন্তু তাতে বড় পযসা খবচ; এখন আমাদের সম্পূর্ণ সুদেব টাকাযই চালাতে হচ্ছে শুধু; পঁচাত্তব না সত্তব কত করে পান মাসে, তাব থেকে বাড়ী ভাড়াই দিতে হয পঁযত্রিশ—আব পঁযত্রিশে আমাদের চালাতে হয়। কাজেই রাঁধুনি বাখব কি কবে? ঠিকা ঝিও বাখি নি। সব কাজ আমিই কবি তুমি কিছু ভেবো না মা—ভারী জিনিস কিছু তুলতে হয না; দু'জন মানুষেব বান্না তো মোটে—কত আব ভাব হবে?

কল আছে—জলেব জন্য বিশেষ কষ্ট পেতে হয না।

ওঠানামাও বেশী করি না; সেই ভোবে নামি—একেবাবে রান্না সেবে—স্নান কবে ওঁকে দিযে আমি খেযে তবে গিযে ওপবে উঠি। বেশী হাঙ্গাম পোযাতে হয না।

বাসাটা গলিব ভেতবে। তাই বড্ড অন্ধকার; হাওযা তেমন খেলে না। আমাদেব ঘর দু'টোব দক্ষিণ পূব বন্ধ—উত্তবেব দিকে দু'টো জানালা—জানালাব পাশেই কাদেব বাড়ীর সব প্রকাণ্ড দেযাল—একেবারে আকাশ অব্দি চলে গিযেছে। আকাশটাকে বড় একটা দেখতে পাওযা যায না—সেই যেন কেমন লাগে যেন মাঝে মাঝে।

একেবাবে হাঁফিযে উঠতে হয। গলিব ভেতব আমেব খোসা, নেংটি ইঁদুব মরা, পচা বিড়াল, ভাত তবকাবী উচ্ছিষ্ট, কাদেব একটা গোযাল, দু'এক জন কুষ্ঠ বোগী এই সব মিলে গন্ধ হয বড়—কাজেই জানালার দিকে বড় একটা যাই না।

কিন্তু আমার মনে হয পেটে ছেলে আছে বলেই বোধ হয মনেব এ বকম আঁঠকানে অবস্থা—শবীবটাও খাবাপ লাগে। তাই না মা?

ছেলে হযে গেলে আবাব বেশ আরাম পাব—উনিও তাই বলেন; শীগগিবই হযে যাবে—আব বেশী দেবী নেই; উনি বলেছেন তখন ভাড়াটে ঘোড়াব গাড়িতে কবে আমাকে নিযে বোজ বিকেলে একটু একটু বেড়াবেন।

বড়দা কি এখনও বিলেতে? তাব কোনো চিঠি পাও? বড়দা কি আব দেশে ফিববে না? কতদিন দেখিনি তাকে। যখন বিলেত চলে যায—আমাব মনে আছে আমি ঘুমুচ্ছিলাম—তুমি আমাকে জানালে। আমি দৌড়ে গিযে তাকে প্রণাম কবলাম—মেজদা নাকি কলকাতায এসেছিলেন? আমাদেব সঙ্গে দেখা কবলেন না কেন? তিন চার বাব কলকাতায এসেছিলেন—অথচ এক বাবও এদিকে এলেন না। জানতে পেরে আমি প্রত্যেকবাব কত কেঁদেছি—তোমাকে লিখেছি—কিন্তু তবুও মেজদা একবারও দেখা করতে এলেন না। ওঁব ওপব না হয তাঁব রাগ থাকতে পাবে। কিন্তু আমি তাঁব বোন—নই কি? তবে কেন তিনি আমাকে কাঁদালেন? ওবা আব আমাকে বোন বলেও মনে কবে না—এই জন্য আমাব এত কষ্ট হয। মাঝে মাঝে বুক ফেটে যেতে থাকে।

কিন্তু উনি এসে ধীরে ধীবে আমাকে সান্ত্বনা দেন। তাইতে আমার একটু ভালো লাগে।

ছোড়দা মাঝে মাঝে এখানে আসে—কিন্তু ওঁকে দেখলেই নাক খিচে উঠে চলে যায। এতে আমার বড় খারাপ লাগে। ছোড়দা কেন এ বকম করছে? ছোড়দাকে তুমি লিখে দিও এ বকম কবে না যেন আর,

সব মানুষই মানুষ, বিশেষ করে যে মানুষ ওঁর মত জীবনের কাছ থেকে এত বেদনা বিড়ম্বনা পাচ্ছে তাকে ঘৃণা না করে একটু সমবেদনা দেখালেই মানুষের কাজ হয়।

তুমি কি একবার কলকাতায় আসবে না? তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে; বাবাকেও। কিন্তু তোমরা কেউ আস না কেন?

সন্তান না হলে আমি দেশেও যেতে পারি না। আগে আমাকে দেশে যেতে লিখেছিলে। কিন্তু তখন মেজদা কলকাতায়—অথচ আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না, সেই জন্য যাইনি।

কিন্তু এ সব অভিমান এখন আব আমাব নেই। আগে নানা জিনিসেই ঢেব কষ্ট হত,—কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে সব যেন বুঝতে পাবছি—আঘাত ক্রমে ক্রমেই কম অনুভব কবি—একদিন হযতো কোনো বকম আঘাত বোধই থাকবে না।

এই এক বছরেব ভিতর আমি ঢের বড় হযে গেছি, মা। আসবীতে দেখলে হাসি পায; উনিও মাঝে মাঝে আমাব চেহাবা দেখে হাসেন, দুঃখ করেন, কিন্তু ঠাট্টা কবেন না, বকেন না। নিজেকে মাঝে মাঝে কেমন আধবযসী বুড়োমানুষ বলে মনে হয। কিন্তু মনটাই যেন আস্তে আস্তে ঢের বযস্ক হযে গেছে। বিযের আগের সেই ছেলেমানুষী নেই, অভিমান নেই, অহঙ্কাব নেই, ডাযেবী লিখবাব সাধ নেই, সিনেমা দেখার প্রবৃত্তি নেই, কি সব অদ্ভুত বই পড়তাম—সে সবেব কথা মনে পড়লে এখন গাযে জ্বর আসে। মেযেদের কাছে চিঠি লিখিনি আর—ইচ্ছে কবে না। কি হবে লিখে? তাদেব সঙ্গে দেখা কবতেও ভয কবে। তারা দিন বাত এত সব বড় বড় কথা বলে—তাদেব ভাব, ভাষা, চিন্তা ভালো কবে বুঝতে হ'লে ঢের বিদ্যা বুদ্ধি চাই, কিন্তু এই সবই আমাব কাছে অসাব বলে মনে হয। এ সব দিযে কি হবে? বিযেব আগেব সেই ভালোবাসাও নেই। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা অন্য বকম—সেবা ও শ্রদ্ধার জিনিস। উনি বলেন ভালোবাসাবও জিনিস। কিন্তু আমি বুঝি না। হযতো স্বামীবা ভালোবাসে, স্ত্রীবা শ্রদ্ধা কবে। কিম্বা যে মেযেমানুষদের চবিত্র খাবাপ তারা অন্য পুরুষদেব সঙ্গে ভালোবাসা কবে বেড়ায। তাই না মা?

ওঁর এক বন্ধু আছেন—ডাক্তার—বুড়োমানুষ—মিডওযাইফারি খুব ভাল জানেন। তিনি প্রাযই সন্ধ্যাব সময সময এসে এখানে চা খান; ও আমাকে দেখে যান। ক'দিন থেকে বিছানাব ওপব আমাকে চিৎ কবে শুইযে পেটেব কাপড় উঠিযে পেট নেড়ে চেড়ে দেখছেন। কাল পেটেব ওপব কান বেখে অনেকক্ষণ কি যেন শুনছিলেন। বুড়ো মানুষ না হ'লে আমাব বড় লজ্জা কবত।

তাবপব বল্লেন—ছেলে হবে। পেট খুব বড় কিনা, কাজেই সন্তানও খুব বড়—কাজেই ছেলে। তা ছাড়া নচাচড়াব বকম দেখেও উনি বুঝেছেন যে ছেলেই হবে।...

ছেলেই হ'ল—

যেই দেখে সেই বলে 'একি, এ যে আব এক চন্দ্রমোহন এল—'

ঠিক তেম্নি মেনি বাঁদরেব মত মুখ, হলদে বং, চোখ পিটপিট কবছে—ভুরু দু'টো বোঁযায ভবা—মুখেব ভিতব কেমন একটা নির্ম্মম ধাপ্পাবাজিব ইসাবা—তাবপব কেমন একটা নিঃসহাযতা—

কিন্তু কল্যাণীব চোখে এ সব কিছুই ধবা পড়ে না। সুস্থ সন্তানকে মাই খাইযে নিজেব বুকেব ভিতব জড়িযে এমন ভালো লাগে তাব। এম্নি কবে মাস আষ্টেক কেটে গেল—ছেলেব দাদা দিদিমা কেউ তাকে দেখতে এল না; কল্যাণীবও দেশে যাওযা হ'ল না। চিঠিও সে আব পায না কারু—লেখেও না কাউকে।

একদিন দুপুরবেলা চন্দ্রমোহন দেখল যে কল্যাণী ঘুমুচ্ছে—সমস্ত শবীরেব জামা কাপড় সবই প্রায খোলা—ছেলেটিকে মাই দিতে দিতে কি এক বকম আদবে ও পিপাসায নিজেব শবীরেব সাথে ছেলেব শরীব একেবারে মিশিযে ফেলেছে যেন সে—মিশ্রণ ছাড়া পৃথিবীতে আব কিছুই যেন চায না কল্যাণী—জিনিসটাকে সোজাসুজি বুঝতে পাবল না চন্দ্রমোহন। উদ্ভট ভাবে ভাবলে—এই ছেলেটা তো সে নিজেই—দিকবালিকারা মাথা নেড়ে নেড়ে বল্লে—তুমিই তো

এই স্বর্গসম্ভবা কল্যাণীব মত মেযেব জীবনেরও এক বিবাট উচ্ছৃঙ্খলতা—উপহাস, নোংবামি, অধঃপতন, ও নিজেব মনেব এক অপরিসীম লালসাব বসে মন তার উত্তেজিত হযে উঠল।

কিন্তু সম্প্রতি উপায নেই—বাত্রে হবে।

কল্যাণী আবাব আটমাস—আব এক চন্দ্রমোহন আসছে।

(গভীর পরাক্রমেব সঙ্গে আপাততঃ নিজেকে সংযত করে নিযে চন্দ্রমোহন বেবিযে গেল।)

জুলাই ১৯৩২, কলকাতা

সূচীপত্রে যান

বিভা

বিভার মুখের লাবণ্য বেশ উচ্চজাতীয়। সচরাচর এ-রকম সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। খুব অবর্ণীয় সৌন্দর্য নয়-কিন্তু এর বিশেষ ধরনটা আমার কাছে বড্ড চিত্তাকর্ষক।

অনেক নারীই তো দেখেছি, কিন্তু একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে, যার মুখ অনেকটা এই বিভার মত। সেই মেয়েটি ষোল সতের বছরে মারা যায়, মৃত্যু বড় করুণ। তার মৃত্যুর পর আমার মনে হয়েছিল যুবাবয়সের সৌন্দর্যের একটা বিশেষ বিকাশ পৃথিবীর থেকে মুছেই গেল বুঝি বা।

তারপর এই বিভাকে দেখলাম! মনে পড়ে প্রায় সাত বছর আগে বায়োস্কোপে (চার আনার সিটে) বসে রুথ চ্যাটার টমকে দেখেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে গিয়ে মৃত সেই পাড়াগাঁর মেয়েটি, বিভা, আর রুথ, এই তিনজনের মুখে একই আদল লেগে রয়েছে যেন। একটা ছিপছিপে নিমীলিত চাঁপাফুল, কিংবা শীর্ণ একটা উন্মুখ চাঁপার কলির মত নারীর আঙুলের দিকে তাকালে এ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারা যায় যেন।

একদিন সকালবেলা খুব দেরিতে ঘুমের থেকে উঠে দেখলাম বিভা তার সোফার সামনে একটা তেপয়ের ওপর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে।

আমার ঠিক পেছন ফিরে বসে নি। একটু তেরছা হয়ে ঘুরে বসেছে। আমি যে আমার ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, এ তার চোখে পড়েও যেতে পারে।

কিন্তু এদিকে সে তাকাচ্ছে না। তাকালেও আমি যে এসে দাঁড়িয়েছি এতে তার বিশেষ কিছু এসে যেত না। সে যেমন খাচ্ছে তেমনি নিজের মনে নিশ্চিন্তে সে চা খেয়ে যেত। আমার সম্বন্ধে হয়তো ভাবত এইটুকু যে, নিজেরই জানালার কাছে এসে দাঁড়াবার অধিকার এ-ভদ্রলোকের আছে, তা সে দাঁড়াক, রহস্যের বিশেষ কিছু নেই এ ঘরের ভেতর। যদিও বা থাকে ত আমি নারীই হয়তো সেই রহস্য কৌতুকের জিনিস।

এইটুকু ভেবে সে হয়তো আড়চোখে একবার ফিরে তাকাত। কিন্তু তক্ষুণি দেখতে পেত যে আমি জানালার থেকে সরে গেছি। আমিই বরং আগে জানালা বন্ধ করব-বিভা নয়। আমিই বরং আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাব। কিন্তু মেসের জানালার থেকে (একদৃষ্টে) বিভার দিকে তাকাচ্ছি বলে সে যে তার ঘর থেকে উঠে চলে যাবে একরকম স্থলতা যেন আমাদের দুজনার ভিতর না থাকে। আশা করি তাকাবে না। কিন্তু আশা বা স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব নিয়েই আমাদের ঢের বেশি কাজ। কাজেই বিভা যতক্ষণ না বোঝে যে জানালার কাছে আমি ডেক চেয়ারে বসে আছি-ততক্ষণই নিরাপদ। ভাবি, দেখি, কল্পনা করি। চুরুট জ্বালাই-বেশ কাটে সময় আমার। তারপর হঠাৎ দেখি সে সোফার থেকে উঠে দাঁড়াল, কিংবা কাগজ ছিঁড়ছে, বা চুলের ভিতর দিয়ে চিরুনিটা টেনে টেনে একগোছা ঝরা চুল হাতে নিয়ে পশ্চিমের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি আমি। মেসের বারান্দায় চলে যাই। নিরিবিলি আমার জানালাটার মুখোমুখি তার নিজের পশ্চিমের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কী করে যেন ভাবে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

এই সব আমার কাছে রহস্য। কিছু টের পাই না আমি। কিন্তু খুব গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেছি তা না টের পাওয়াই ভাল।

একদিন দেখলাম আমার জানালার রেলিঙে কতকগুলো চুল উড়ে এসে লেগে রয়েছে। ধীরে-ধীরে গোছাটা তুললাম। বিভার চুল নিশ্চয়ই। রেশমের [illegible]মের মত যেন একটা, রোদের ভিতর দেখায় সোনালি। ছায়ায় কালো। শীতের বাতাসে কেমন ভীরু নিঃসহায়তাকে গড়তে থাকে। কেমন একটা করুণ গন্ধ চার-দিকে যেন জমতে থাকে তার। গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে গিয়ে সেই মৃত মেয়েটির

মুখখানা মনে পড়ে যায় আমাব।

একা বসে থেকে উত্তবেব দরজার দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভাবি আমি। তারপর হঠাৎ তাকিয়ে দেখি চুলের গুটিটাকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি।

এমনি করেই হাবিযে যায়।

ক্ষোভ হয় একটু সাবধানে বাখলে পারতাম না?

কিন্তু হতই বা কি রেখে? বড় জোর বিভার মাথার কয়েকগাছা চুল তো! মানুষের পায়ের নখ বা মাথার চুলে বা পরনের শাড়ি সিঁদুরের কৌটা বা চিঠি শ্রদ্ধা কবে ভালবাসায জমিয়ে রাখবার একটা সময ছিল অবিশ্যি আমার জীবনে। কিন্তু সে সময় এখন আর নেই। একটা কথা ভেবে ভাবি কৌতুক বোধ হয়। বিভার চুল তো? না, তার মানে? না, পাযবাগুলো কাব চুল কোথেকে এনে ফেলেছে?

শেষ পর্যন্ত চুল নিয়ে আমাদের জীবনেব কারবার নয়। তুচ্ছ একগাছা চুলেব মত জিনিস মাঝে-মাঝে উড়ে এসে আমাদের হৃদয়টাকে পরিমাপ কবে যায়? এই অব্দি-আব-কিছু নয়।

স্লিপারশুদ্ধ ডান পাটা তুলে বাঁ পায়ের হাঁটুব ওপর রাখি। তাকিযে দেখি চুলেব গুটিটা এতক্ষণ স্লিপারের নীচে পড়েছিল। থাক। উড়িয়ে দেই। জানালার গরাদের ভিতর দিযে উড়ে একেবাবে একতলার নর্দমার ভিতর পড়ে গিয়ে।

বিভা চা খাচ্ছিল। সঙ্গে একটা টোস্ট আর গোটা দুই ডিম খেলে।

এক পেয়ালা চা ফুরিয়ে গেছে। টিপযের থেকে আর-এক পেয়ালা আন্দাজ ঢেলে বিভা চিনি দুধ মিশিয়ে নিচ্ছিল। এমন সময় একজন বুড়া মতন ভদ্রলোক দুটো খাঁচা নিয়ে ঢুকলেন।

ছোট খাঁচায় একটা মযনা। বড় খাঁচায় বেশ রঙচঙা একটা কাকাতুযা। বিভা চায়ের পেযালায় চুমুক দিতে গিযে বিস্মিত হযে চমকে বললে—'বা!'

চায়ের পেযালাটা তেপযেব ওপর বেখে দিল সে।

বুড়ো বললে—'খান খান, আপনি চা খান।'

না,চা সে খেল না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'এ পাখি কোথায় পেলেন ?'

—'আমি কিনে এনেছি।'

—'কোথেকে ?'

—'ও সেই টেরিটি বাজাব'—

—'তা, ভারি সুন্দর পাখি তো-আপনি পুষবেন বুঝি ?'

বুড়ো চোখ কপালে তুলে বললে—'আবে বাপ রে! আমি পুষব পখি!' একটু কেশে বললে—'এই যে দেখছেন মযনা ইনি হচ্ছেন রানীমা।'

-'রানীমা? কোথাকার ?'

-'আব এই যে দেখছেন কাকাতুযা ইনি হচ্ছেন চিনেব রাজা।'

ভিবা হাসছিল।

বুড়ো বললে—'ছ-সাতশ বছর রাজা হযেছে-এখন দেশ বেড়াবাব সময।'

—'তাহলে পাখিগুলো বুড়ো ?'

—'একটুও না। এদের সাত হাজাব বছব পবমাযু।'

—'বিক্রি করবেন ?'

—'চিনের রাজাকে বিক্রি!'

বুড়া খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। বললে,—'কিন্তু এদেব কপালে কর্মভোগ আছে। না হলে টেবিটি বাজারে এসে জোটে ?'

খানিকক্ষণ হেসে বুড়ো বললে—'কিন্তু যার তাব কাছে মাল ছাড়ি না। পথে এমন বিশ পঁচিশ হাজার লোক শুধিযেছে আমাকে! ধেতরি তার! তাদের কাছে বেচব এই জিনিস? হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে কত বঙ্গই হবে। পাখি চোখে দেখেছে কোনোদিন তাবা ?' একটু হেসে বললে—'সেই জন্যেই আপনাব কাছে এসেছি।'

বিভা উৎসুক হয়ে বললে—'তা, বাবার কাছে যান না।'

—'তিনি রাখতে চান না।'

সূচীপত্রে যান

—'কী বললেন ?'

—'আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'

—'এই কাকাতুয়াটার কত দাম ?'

—'আপনাকে খুব শস্তায় দেব।'

বিভা বুড়োর দিকে তাকালে।

—'এই চিনের রাজাও আপনার কাছে থাকতে চায়।'

—'আমার কাছে ?'

—'খুব।' বললে—'আপনি যদিও ইরানের রানী'—একটু কেশে বললে—'কিন্তু সেকালে চিনে ইরানে বিয়ে চলত। এক-একজন জাপানি মেয়ে দেখেছেন বেশ লম্বা ছাঁদের মুখ-নাক টিকলো—সেই সব বিবাহের সন্তান।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে ছিল। মুখ তুলে বললে-'আপনি মুসলমান ?'

—'হ্যাঁ, মা।'

—'কলকাতায়ই বরাবর ?'

—'না, মা, কলকাতায় আমি এই টেরিটি বাজারের সম্পর্কে। সিঙ্গাপুরে কত জায়গায় ঘুরি।'

—'সিঙ্গাপুরে কী ?'

—'সেইখানেই তো পাখি। এই তো উজাড় করে ময়না ধরে নিয়ে এলাম।'

—'আপনি ?'

—'হ্যাঁ। সেই সিঙ্গাপুর থেকে।'

—'পাখি ধরেন কেন ?'

—'চেনা ব্যবসা। বড্ড ফিটফাট। তবে আগে যে-রকম সুবিধা ছিল, এখন তার তা নেই। পাখি মরেও-বা কত।'

—'কীসে মরে ?'

—'জাহাজে না-চড়তেই ঝুর ঝুর করে মরে যায়। চড়লে তো কথাই নেই। যে-কটাও-বা বাঁচে টেরিটি বাজারে সাফ করতে গিয়ে দেখি ঠ্যাং উঁচু করে হাঁ করে পড়ে আছে।'

—'মরে ?'

—'মরে কেলিয়ে।'

—'ছি!'

—'তবে আপনার চামড়ার কারবার থেকে ঢের ভাল।'

—'সে আবার কী রকম ?'

—'আস্ত-আস্ত গোসাপ ধরে চামড়া খসিয়ে নেয়া হয়ই—'

—'আস্ত আস্ত ?'

—'ত আপনি জানেন না বুঝি? সে দেখলে বড় দুঃখ হয়। জ্যান্ত গো-সাপটাকে-প্রাণের ভেতর কৃষ্ণ ছিল বাঁশি বাজাত'—একটু কেশে বললে—'হিঃ হিঃ!' খানিকটা শিকনি ঝেড়ে নিয়ে বললে—'কিন্তু জীবনটা এই রকমই। শুধু গোসাপের বলেই তো নয়। গোসাপের, টিকটিকির, কুমিরের, ঢোড়া, গোখুরো, দুধরাজ, পাঙরাজ, আপনার গিয়ে উট, গরু, মানুষ, ছাগল। আমাদের মানুষের পিঠের চামড়া নিয়েও মানুষে কত ডুগডুগি বাজায় মা। আমাদের জীবনের কথা ভরাতে গেলে, দুর্নীতির আর শেষ নেই মা।'

—'এ কাকাতুয়াটার দাম কত বললে ?'

—'ব্যবসা আমাদের বেশ দয়ামায়ার, কিসে পাখিটা বাঁচে, সেই দিকেই হচ্ছে, আমাদের নজর। কৃষ্ণকে আমরা মারতে চাই না। তিনি থাকুন। তাকে তেল দেই, জল দেই, বাঁশি দেই।' ময়নার দিকে ফিরে—'বল ত ময়না রাধে প্রাণেশ্বরী!'

—'রাধে প্রাণেশ্বরী।'

—'দেখলেন—'দেখলেন তো বাঁশি কেমন বাজে।'

বাঁশি শুনে বিভা বিশেষ সুখী হল না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বুঝলেন, বললেন—'সব রকম বুলি করতে পারে—'হেলো।'

—'হেলো।'

সূচীপত্রে যান

—'Kissing sweet heart'.
—'Kissing swcet heart'.
—'Idiot! To bother a girl like that'.
—'Idiot! To bother a girl like that'.
বিভা হেসে উঠল।
—'You Northumberland rascal'.
—'You Northumberland rascal'.
—'বড়সাহেব তো আতা হ্যায়।'
—'মেরা দিল ঘাবড়াতা হ্যায়।'
—'দেখলেন, না বলতে কতখানি বলে ফেলল।'
ময়নাটার দিকে তাকিয়ে,—'এই চিনেটাকে ডাক তো—ডাক—হেলো।'
—'হেলো।'
—'তারপর? হেলো।'
—'হেলো।'
—'হেলো বয়!'
—'হেলো বয়!'
—'দেখলেন তো মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলে।'
—'এত কথা কোত্থেকে শিখলে!'

—'কেষ্টধন শেখাই? এর খাঁচায় কি আর থাকে মা। খাঁচায় খাঁচায় ঘোবো।' বললে—'একটা গোবা রেখে ছিল কদ্দিন। যেই বিলেতের দিকে উড়াল দিলে ওমনি পাখিটাকে গেল ফেলে।' একটু কেশে বললে—'তারপর ছিল একটা চোবের আড্ডায—'বললে 'সেখান থেকে এক মাদ্রাজী বাবুর্চি মুসলমান বাটপাড়ি করে নিয়ে যায। চোর কি মুসলমান জেতের ভিতবেও নেই? তা আছে।' মাথা নেড়ে বললে—'তা সেটা মাদ্রাজী-চেট্টির থেকে মুলসমান হয়েছে। খাঁটি আববি মুসলমান চুবিও কবে না, গোলামিও করে না, ও ভারি কাযদার জাত। একেবাবে পযগম্ববের নিজের জিনিস কিনা।' হাত ঘুবিযে বললে—'এটা ছিল চেট্টি-চুবি কবে মরে তাব জন্যে এক বাঙলি ভদ্রলোকেব বাড়ি এল, সেখানে একটি বিধবা এই মযনাটাকে কিনল।'

—'একটা বাঙালি বিধবা ?'

—'হ্যাঁ, তার কাছ থেকেই এই বাধা বুলি শিখেছে। রাধাকৃষ্ণ। আপনাব গিযে একশ আট নাম-তারপর মানভঞ্জন-নিমাই সন্ন্যাস—'

—'এত সব ?'
—'সব শিখেছে। পড়িযেই দেখনু না।'
—'থাক এখন, পরে হবে।'
—'আমার মনে হয বিধবা ঠাকরুনের কাছে থেকে থেকে পাখিটা জাতে উঠেছে।'
—'এর আগের জাত ?'
—''হ্যা, মযনা তো হিন্দুই।'
—'হিন্দু ?'
—'হিন্দু বৈ কি। হিন্দু শুধু নয-বোষ্টম। মযনাব জাতধর্ম হযেছে রাধা কিষ্টো বুলি শেখা।'

একটু হেসে বললেন—'সে একটা মজা দেখছেন কি-মযনার জীবনে ভারি একটা মজা আছে!—'জন্মায় তো সিঙ্গাপুরে। তারপব আপনার সিঙ্গাপুবেই পেনাঙি, চেট্টি, গোরা, মগ, তুর্কমান, ইহুদি, মেড়ো, সব ঘুরে তারপর বাঙালি বোষ্টমিব কাছে আসবেই।'

বিভা চুপ করেছিল।
—'এ একেবারে ধরাবাঁধা-এ আসতেই হবে।'
—'কেন ?'
—'ধর্মচক্রেব এই নিযম।'
বিভা একটু বিস্মিত হযে বললে—'আপনি মুসলমান ?'

—'হ্যাঁ, মা।'

একটু থেমে বললে—'এই পাখিগুলো হচ্ছে জাতবোষ্টম। যৌবনে যতই গোল-মাল করুক না কেন, গোস্ত রুটি, মালাই কারি আর বর্মাই ভাপ্পি যতই খান না কেন আখেরে মতিগতি স্থির হলে বোষ্টমের ঘরে আসবে। নাম শিখবে, নাকে রসকলি আঁকবে-মালপো খাবে—'

বিভা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললে—'আপনি আবার সিঙ্গাপুর যাবেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

—'এই পাখি ধরতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কি করে ধরেন?'

—'সে বড্ড মস্ত গপ্প সিঙ্গাপুরেই কি ধরি শুধু?'

—'তবে?'

—'ধরবার ঢের জায়গা আছে।'

—'আপনাদের জালে আটকা পড়েই তো অনেক পাখি মারা যায়।'

—'না, জালেই কি ধরে শুধু?'

—'তবে?'

—'ধরবার রকম আছে ঢের। এ তো আর পাখির চামড়া খসাবার জন্য পাখি ধরি না, মরবেই-বা কেন বলুন?'

—'কিন্তু জাহাজে উঠে তো অনেক মরে।'

—'সে যাদের কর্মভোগ আছে।'

—'কর্মভোগ থাকে না।'

—'তা থাকে।'

—'কী রকম?'

—'যারা পূর্বজন্মে পাপ করেছিল সে-সব পাখি সিঙ্গাপুরের জাহাজেই মরে যায়। মানুষ যেমন হাত জোড় করে প্রার্থনা করে না, তেমনি ঠ্যাং দুটো উঁচু করে ঠোঁটটা আকাশের দিকে ফিরিয়ে ভগবানের কাছে অপরাধের মাপ চায়। মাপ করেন, বোধ করি করেন না। সব কথা আমরা ভাবতে যাই না: সমুদ্রের ভেতর দেই টি করে ছুঁড়ে ফেলে। হাঙরে সকরে খেয়ে ফেলে। তাই তো 'খায়। খায় না? না হলে যায় কোথয় বলুন? সমুদ্রে নোনাজলে হেজে যায়? তা আশ্চর্য কি? নুনের যা ঝাঁঝ! একটা ময়নাকে বোধ করি এক পাকে সালুন বানিয়ে ফেলতে পারে। এক-একটা টোঙা থাকে জাহাজে, মরা ময়নার মাংস খায়। সে চিনে বলুন আর গোরা বলুন আর মন রসুল আর মুসলমান বলুন এইসব মড়া ময়নার মাংস খায়। খায় তারা হারাম ছাড়া কি? জেতে যাই হোক, কাজে তারা টোঙা মুণ্ডাদের চেয়ে হারামী!'

—'সমুদ্রের ভেতর ফেলে দেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আহা।'

—'কী করব তাহলে?'

—'বেশ গাছে-গাছে পহাড়ে-খেতে তো চরত, খাঁচায় ভরবারই-বা দরকার ছিল কি?'

—'ও, আপনার হচ্ছে সেই হিসেব?'

বুড়ো একটু হেসে বললে—'কিন্তু বুনোর মত বোকা হয়ে চরে বেড়ালেই তো হয় না-(খুব সুন্দর তো হয় তাহলে) রাধাকৃষ্ণ গান শিখতে হবে তো।'

—'না শিখবার এমনই-বা কি দরকার।'

—'বাঃ বাংলাদেশে আসতে হবে না?'

—'কী হবে এদেশে এসে?'

—'এদেশটা হচ্ছে ময়নাদের ধর্মের আখড়া।'

—'আপনি তাই বলছেন।'

—'জিজ্ঞেস করুন গিয়ে গোঁসাইবাবুকে।'

—'কেন গোঁসাইবাবু?'

সূচীপত্রে যান

—'শ্রীধর গোঁসাই এই তো আপনাদের ইমারতের পর। তিনখানা বাসা ছেড়ে।'

—'না হয় হলই-বা এটা গোঁসাইর মত। কিন্তু পাখিদের নিজেদের মত অবিশ্যি আলাদা' একটু থেমে বললে—'দুঃখের বিষয় এবা খুবই সুন্দর আব নিরপবাধ বলে এদের মতামতেব কোনো মূল্য নেই।'

—'আছে ?'

—'মায়ের কাছে সন্তানের মতামতের কোনো মূল্য থাকে না ?'

—'তা তো নেই।'

—'এরাও তো ভগবানের সন্তান, ভগবান এদেব ভালর জন্যই আমাদেব হাত পালটে দেন। এক-একটা বোষ্টম বাড়িতে গিয়ে দেখবেন ময়নাকে কত আদর করে।'

—'কিন্তু তাতে তো বেচাবিব প্রাণ শুকিয়ে যায।'

—'তা শুকোলে কি আব এত বুলি ধবতে পাবে।' বুড়ো বললে—'দেখনু তো কেমন মনেব আনন্দের সঙ্গে পড়ে। (দেখলেন ত?) প্রাণে ফুর্তি না থাকলে এবা পড়া শিখতেই-বা পাবত কী কবে।'

—'কিন্তু শুনেছি যত তাড়াতাড়ি পড়া শেখে তত তাড়াতাড়ি মবে যায।'

—'লোকে বলে। তা কি আর হয! তা হয না!'

—'কিন্তু খাঁচার ভেতব এদেব পবমাযু ঢেব কম, যদি বাইবে থাকতে—'

—'আমরা তো এদেব বাঁচাতেই চাই; একটা পাখির একটু আণ্ডাব মত প্রাণেব জন্য যা শিক্ষা দিনবাত। কিন্তু তবুও যদি মবে যায় আমাদেব অপবাধ কি? এক সময হাঁসমুবগির ব্যবসা কবতাম। শতকরা একশটা পাখিই মবে। নিজে মারব, না হয অন্যকে দেব মারতে। তাব চেয়ে এ ব্যবসা ঢেব ভাল। কী বলেন? আপনিই ভেবে বলুন না। ধবেছিলেম আণ্ডাব ব্যবসা, হাঁসেব আণ্ডা, মুবগিব আণ্ডা, কিন্তু আণ্ডাব ভেতর যে কেষ্ট আছেন তাকে গরম জলে সেদ্ধ কবে কিংবা কড়াইয়ে দগ্ধে মাববাব জন্যই তো।'

বিভা তেপযের ওপর একটা প্লেটেব দিকে তাকিয়ে বুড়ো বললে 'এই তো দেখুন আপনিই ডিম খাচ্ছিলেন, বোধ করি হাঁসেব ডিম ?'

বিভা মাথা নেড়ে বললে—'না।'

—'মুরগির তাহলে ?' বুড়ো একটু কেশে বললে—'ভেবে দেখুন তো এ ভ্রূণ নষ্ট নয ?'

বিভা অধোমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল।

—'টিয়া চন্দনা ময়নাব ব্যবসা ঢেব ভাল। মানুষেব মনটা বেশ। পবিষ্কাব থাকে থাকবেই না বা কেন? কোনো জীবকে তো হত্যা কবতে যাচ্ছি না। ময়না চন্দনাব যা বুলি, যা ধর্ম, বাধাকৃষ্ণেব নামেব জন্য যে-আকুলতা তার মনেব ভিতব আছে সেইটেকে সন্তুষ্ট কববাব জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিঙ্গাপুবে যাচ্ছি। ফেব কলকাতায আসছি। জানেন মা, আমি পাঠশালায পড়েছিলাম অনেকদিন।'

—'পাঠশালায ?'

—'হ্যাঁ।'

বিভা চুপ কবে রইল।

—'তারপর মাদ্রাসায পড়েছিলাম। গরু আমি খাই বটে কিন্তু নিজে কাটি না। যে-সব ব্যবসাব মধ্যে হিংসা আছে, তা আমি কবি না। কাজেই এই পাখিব ব্যবসা ধবেছি।'

বিভা তার ম্রিয়মাণ চোখ তুলে বললে—'কীই বা বলব আপনাকে? আমাব থেকে শুরু কবে ভগবান অবদি অপবাধ তো সকলের। কতদিন আমাব মনে হয়েছে এই যে ডিম ভেঙে-ভেঙে খাই এত বড় মর্মান্তিক জিনিস, কিন্তু তবু তো খেয়েছি, এই বকম সব কত অপবাধ আমাব। এক-এক সময মনে হয়েছে জীবনটা যেন, আমাব জীবনই শুধু নয, অনেকের জীবনেব কথা ভেবে দেখেছি আমি। জীবনটা যেন আমাদের সকলের খাঁচাব পাখির মতো। কিন্তু তবুও ভগবান নিস্তাব দেন নি, অনেকে এই আবদ্ধ অবস্থায মরে গেলেও তো-আরো কত মববে, যতদিন জীবন আছে, এই রকম তো হবে। এক-এক সময মনে হয় এ যেন ভগবানের কেমন একটা অপবাধ। তাবপব দেখুন এই পাখিগুলো, এদেব কি অপরাধ নেই? কত সুন্দর সুন্দব প্রজাপতি ফড়িং খেয়ে এরা বেঁচে থাকে? জীবনেব নিয়মটাই এই বকম।' বলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে কাকাতুয়ার সাতবঙা পালকেব নিববচ্ছিন্ন ঐশ্বর্যেব দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তেই বিমুগ্ধ হযে পড়ল। বললে—'সত্যি কি যে সুন্দর।'

এ-সব পাখি যার ঘরে থাকে তারপব কোনোদিন নষ্ট হয না। মানুষেব জীবনটাকে হয সাজাতে।

সূচীপত্রে যান

ভগবান আমাদের জীবন দিয়েছেন-কি সুন্দব! আব এই পাখিগুলো এই কাকাতুযাটার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে! আমি অনেক ভেবে দেখেছি এইই হচ্ছে বিধি, সৌন্দর্য আর শান্তি। কিন্তু সকলেই তা মনে রাখে কি? কাজেই হযে দাঁড়ায গোলমাল। কিন্তু গোলমালটা পাখি দুটো বিভাব কিনতে চাইল, উদ্দেশ্য যে, না-জীবনের না-বিধাতার। বললে, 'এ পৃথিবীর চারদিককার মানুষদেব আমি বেশ চিনি মৌলবিসাহেব। তাদেব নিষ্ঠুবতাব কথা থাক। কিন্তু আমাদের অদ্ভুত বিধিও এ পাখিগুলো হজম করতে পারবে না। এদের দেহেও তা সইবে না। আমার কাছে থাক, যতদূর সম্ভব শান্তিতে এদের রাখতে চেষ্টা করব আমি।'

বিভা পাখিদুটোর দাম ঠিক না করেই আগেই নিজেকে এ-রকম ভাবে ব্যক্ত কবে দিলে!

বোধ কবি তার চোখ দুটো খুব বিস্ফাবিত, উচ্ছ্বাসিত হযে উঠে ছিল, চোখে এক-আধফোঁটা জলও জমে ছিল হযতো।

কাজেই বুড়ো চেপে দাম চাইলে, এ তার বড় চমৎকার পড়তার সময। এমন একটা সুন্দর খদ্দের [?] সে ছাড়বে-বা কেন?

পাঁচশ টাকাব থেকে দাম কমতে-কমতে সাড়ে তিনশ অবদি নামল। এর চেয়ে নীচে ভদ্রলোক নামতে কিছুতেই বাজি হলেন না। কাজেই কিনলে সাড়ে তিনশতে।

তাকিয়ে দেখলাম পাখিদুটো বুড়ো হযে গেছে। খুব শিগগিবই মরে যাবে, খুব শখের মানুষ এ-রকম দুটো পাখিব জন্য আশি নব্বই টাকার বেশি দেয না। দাযে পড়ে এ-বকম দুটো পাখি অনেক দশ পনেব টাকায বিক্রি করে ফেলে। কলকাতাব চোট্টাবা সে চেট্টিই হোক বা চিনেই হোক বা গোয়ানি বাঙালি মালাঙ যাই হোক না কেন এ-রকম পাখি বিস্তব চুবি করে চালান দেয। তখন তাদের কে পয়সাও মূলধন লাগে না। কিন্তু বিভা কিনলে সাড়ে তিনশ টাকা দিযে। অবিশ্যি টাকা দিয়ে আমাদেব জীবনের হিসেব হয না। বিশেষত সুন্দব-সুন্দর পাখি-গুলোকে অমূল্য বলেই বোধ হয। লক্ষ-লক্ষ টাকা খবচ কবেও মানুষ বামধনু-দার কাকাতুযা তৈরি করতে পারে?

কিন্তু এ-সব হল ভাবজগতের কথা! কিংবা বিভা বুড়ো মুসলমানটিকে যা বলেছে; 'এ পৃথিবীব চারদিককার মানুষদেব....আমি।' এও হচ্ছে সেই ভাব-প্রবণ হৃদযেব সুন্দব স্বপ্ন। কুড়বস্তি-তুমি-আমি সকলেব অগোচব এ এক অপূর্ব জিনিস। চাবদিককাব ছিন্নবিচ্ছিন্ন চূর্ণবিচূর্ণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বিভা সেখানে চীনেব বাজা ও বানীমার শ্রদ্ধাপ্রীতি মাখা মহাবানী।

কিন্তু ভাবেব চেয়ে বাস্তব যে বিচ্ছিন্ন আমাব মত বত্রিশ বছর বযসের দরিদ্র, সন্দিগ্ধ, জীবনের দুযাবে-দুযাবে প্রবঞ্চিত পুরুষ মানুষ তা বিশ্বাস কবলেও বিভাব মত মেযেরা তা করে না।

বেশ আশাব কথা। জীবন তাহলে আমাব মত পুরুষ মানুষ দিযেই তৈবি নয। বিভার মত একদল প্রাণী রয়েছে তাহলে। এদের কথা শুনলে কাজ দেখলে, এদেব দিকে তাকালেও একটা নতুন রচনা পবিকল্পনাব ইশারা পাওযা যায যেন। মানুষেব জীবনের একান্ত পরিসব ও নিঃসঙ্কোচ বিচিত্রতা বোধ করতে পারি—'বেশ ভাল লাগে।

মযনাটার খাঁচা কোন জাযগায রাখা যায, কাকাতুযাটাই-বা কোথায, কী হলে মানায, ঘরের শোভা কী করে বাড়ে-দেখলাম এই সব নিযে ব্যস্ত।

পুবের জানালাটা খুব বড়। জানালাব কপাট আব কাচের শার্সি খুলে দিলে কোনো গরাদের বাধাও থাকে না আব। রোদ আলো অবাধে এসে পড়ে। কলকাতার আধখানা আকাশ ধবা পড়ে যায যেন। কাকাতুযার মস্ত বড় লম্বা খাঁচাটা বিভা ঘবে পুবেব জানালার কাছে টাঙিয়ে রাখলে, শীতের সকালে গরম দুধের ফেনার মতন রোদের ভিতর দিযে কাকাতুযাটার চোখে দেখলাম খানিকটা আমেজ এসেছে।

নীল লাল সবজে সোনালি পালকগুলোও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল পাখিটার। তাকিয়ে-তাকিয়ে মনে হল বিভাব এই চমৎকার সাজানো কোণটাকে এই পাখি তাহলে বেশ একটু বিশেষত্ব দিল্ল।

দক্ষিণ দিকেব জানালার কাছে ছোট্ট তেপযের ওপর একটা ভেলভেট গদি ছিল। মযনার খাঁচাটা সেই গদির ওপর বসিয়ে রেখে দিল বিভা।

কিন্তু মযনাটার গাযে শীতের বাতাস লাগছিল বড়।

বিভা তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধবে নিল। মযনাটাকেও সে পুবের জানলার গাযে রোদের মধ্যে টাঙিযে রাখল। তারপর বই খুলে পড়তে বসল। মিনিট দুই পড়ে কী যেন কী ভেবে মযনার খাঁচাটাকে সে নিজের সোফার ওপব এনে বসাল। তারপর খাঁচার দরজা খুলে পাখিটাকে কোলে নিয়ে খুব করুণভাবে

সূচীপত্রে যান

তার দিকে তাকিয়ে রইল। পাখিটার দু পায়ের পিতলের ঘুঙুর খুলে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা খানিকক্ষণ করলে বিভা। কিন্তু তাতে পখিটা ব্যথাই পেতে লাগল শুধু, আঙুল বোধ করি মচকে গেছে একবাব। ময়নাটা ক্যাঁক করে উঠল। কিন্তু ঘুঙুব খসানো গেল না।

বিভার ইচ্ছে ছিল ময়নাটাকে এই ঘুঙুরের অস্বস্তি ও বেদানাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

কিন্তু তা হল না। খুব খানিকটা জোর করে সাহস করে টানলে হযতো বা হয। কিন্তু ছুঁতে গেলেই পাখিটাব পা যেন ভেঙে অবশ হযে আসে। পাখিটাব কোনো ব্যাবাম আছে নাকি! পাযে হাত দিতে গেলেই পাখিটা যেন কেমন ব্যথা পায, মুহূর্তেই সমস্ত আঙুলগুলো কেমন কুঁকড়ে যায়, (ময়নাটার) চিড়িক দিয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর (ময়নাটার) থর থর কাঁপতে থাকে। যদ্দিন বেঁচে আছে পাখিটা এ-বকম কুঁকড়ে থাকবে? যতদিন বেঁচে আছে ততদিন আর উপায নেই। বিভা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

পাখিটা ধীরে-ধীবে একটা ডানা তুলে দিলে। সেই ডানাব নীচে নবম মাংস ও চোখেব মধ্যে বিভা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখতে লাগল।

তারপর ডাক দিল—'সুদর্শন।'

চাকরটি এল।

—'আচ্ছা দেখ তো সুদর্শন, কী হল ময়নাটাব ?'

—'ফোঁড়া হযেছে।'

—'কী করা যায়'

—'যেই ফেটে যাবে, অমিন টিস কবে মারা পড়বে।'

বিভা নিস্তব্ধ হয়ে বইল।

সুদর্শন—'এটা কোথে কে এল দিদিমণি ?'

—'কিনেছি।'

—'কত দিয়ে? চার আনা ?'

বিভা বললে—'হ্যাঁ চার আনা! চার আনায চড়াই পাওযা যায। ময়না চন্দা কি আব চাব আনায হযরে ?'

—'এ-যে বুড়ো পাখি দিদিমণি।'

—'এই ময়নাটার—'

—'বুড়োব বাবা যে!'

—'তা কী করে বুঝলি তুই ?'

—'সেই কাজলপাবা বং নেই আব, বঙে ঠিক নেই, কেমন টসকে গেছে দেখুন না। লোম গেছে মরে, তো পালকে পাক ধবেছে। এই দেখুন পাখানাব রং কেমন বুড়ো মানুষের গোঁফেব মত হযে যাচ্ছে।'

—'যাক, ফোঁড়াটা কী করে সাবানো যায সুদর্শন ?'

—'ময়নার ফোঁড়া গালতে জানতেন আমার কাকাব বেযাই, যে-কটাই ময়নাব ফোঁড়া গেলেছে একটা ভি মরে নি।'

—'সে বেয়াই কোথায় ?'

—'সেভি মরে গেছে।'

—'একটা মলম দিলে হয না ?'

সুদর্শন মাথা নেড়ে বললে—'উহু!'

—'কেন হবে না ?'

—'মানুষের মলম তো।'

—'হ্যাঁ বেশ ভাল, সুন্দব ননীব মত, খুব ঠাণ্ডা, পাখিটা আবাম পাবে বেশ।'

—'ও সব পাখির গায় লাগবে না; রক্ত সাঁ করে বিষ মবিচের মত কাল হয়ে যাবে।'

—'একবার টিরিক করে লাফাবে তো!'

—'না কিছু করবার নেই।'

—'ডাক্তার দেখালে হয না ?'

—'পাখিব কি ডাক্তাব থাকে আব ?'

সূচীপত্রে যান

—'তা থাকে। কিন্তু কোথায় আছে তা তো জানি না।'

সুদর্শন উপলব্ধি করে বলে—'তা, কোথায় পাওয়া যায়। সকেলই নিজেব ফুর্তি নিযে আছে, পাখি ভি আছে পাখির ডাক্তার ভি আছে। কিন্তু একজনেব এলাকার থেকে এমন বিশ পনের মাইল দূরে আর-একজনের এলাকা।'

—'একটা বেলেব কাঁটা দিযে ফুঁড়ে দিলে হয না ?'

—'তা দেবেন না।'

বিভার বাবা ঢুকলেন।

চাবদিকে তাকিয়ে বললেন, 'পাখি দুটো কিনেছ তুমি তাহলে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কত নিলে ?'

বিভা ঈষৎ আড়ষ্ট হবে—'সাড়ে তিনশ টাকা।'

—'সাড়ে তিনশ ?' ভদ্রলোক বিবক্ত হয়ে বললেন—'কাঁচা টাকা দাও নি তো ?'

—'না।'

—'চেক ?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ। ভালই কবেছ। টাকা পাওযাচ্ছি আমি ব্যাসকেলটাকে।' বিভা উৎসাহিত হয়ে বললে—'কেন, কী কববে তুমি ?'

—'আমি এক্ষুণি ব্যাঙ্কে ফোনকরে দিচ্ছি, পেমেন্ট বন্ধ কবে দিতে। মকবুল ?' নীচেব থেকে জবাব এল-'হুজুর!'

—'গাড়ি বেব কবো।'

নীচের থেকে জবাব এল—'হুজর!'

বিভাব দিকে তাকিযে তিনি বললেন—'ফোন কবেই আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি। ভাগ্যিস ব্যাঙ্ক এখনো খোলে নি। না হলে এতক্ষণে টাকা নিযে কোথায় সটকে পড়ত হাবামজাদা।'

বিভা—'বাবা।'

ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে থামলেন।

—'ফোন তুমি কবো না।'

—'কেন ?'

—'ব্যাঙ্কেও যেও না।'

—'যাব না ?'

—'নিক! সাড়ে তিনশ টাকা নিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখো এ বেচাবা পাখি দুটো যদি আমার কাছে না আসত তাহলে এদেব কী বকম বিপদ হত।'

—'বিপদ? কাদেব ?'

—'পাখিদেব।'

—'কী বকম ?'

—'এই দেখো, মযনাটাব ডানাব নীচে কেমন একটা ফোঁড়া হযেছে।' বিভা খুব আগ্রহে বেদনায তাব বাবাকে দেখতে লাগল।

ভদ্রলোক একবার তাকিযে বললেন—'মরুক সে! ফোঁড়া হয়েছে তো আমার কোন মহাভারত হযেছে!'

ফোঁড়াটাব দিকে তাকিযে বিভা—'এতে তোমাব কষ্ট হয না ?'

—'এই মযনার ফোঁড়াব জন্য ?'

—'হ্যাঁ ?'

ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে পড়ে বললেন—'জীবন আমাব অতটা শৌখিন এখনো হয়ে ওঠে নি।'

—'এ-রকম কবে বিচার কবো না বাবা ?'

—'আমি জানি এই পাখি দুটো আমার কাছে না থাকলে বড্ড কষ্ট পেত। এই রকম ফোঁড়া নিয়ে শীতের ভিতব পথে-পথে ঘোরা!'

সূচীপত্রে যান

ভদ্রলোক কোনো উত্তর দিলেন না।

কাকাতুয়াটাকে দেখে মনে হয় কতদিন খায় নি যেন।

বিভার বাবা চুপ করে রইলেন।

-'জীবনের নানা কাজেই আমি ভগবানের হাত দেখি। এ দুটো পাখিকে তিনি আমার কাছেই পাঠাতে চেয়েছেন। কেন জানো? তিনি জানেন যে আমি এদের খুব পরিচর্যা করব। যত্ন নেব। বেশ শান্তিতে রাখব এ দুটো পাখিকে।'.

—'এই পাখি দুটোর বেলাই তিনি এত কথা ভাবেন! আর কারু বেলা ভাবনে না কেন?'

—'তা ভাবেন।'

—'কই নমুনা তো দেখি না কিছু!'

বিভা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা কাণ্ড হয়ে গেল। ময়নাটা কোন ফাঁকে বিভার কোল থেকে লাফিয়ে কার্পেটের ওপর গিয়ে বসেছে। সকলেই হঠাৎ তটস্থ হয়ে দেখল একটা বিড়াল এসে এক মুহূর্তেব ভেতর পাখিটার ঘাড় মটকে সেটাকে নিয়ে ছুট দিল।

সুদর্শন বিড়ালটাকে তাড়া দিতেই ময়না পাখিটাকে কার্পেটের মাঝপথে ফেলে চলে গেল বিড়ালটা।

বিভার বাবা একটু মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'ভগবানের বিশেষ প্রিয় ভেবে পাখিটাকে যে ঈর্ষা করেছিলাম সে ঈর্ষাব পাত্র তাবা নয় শেষ পর্যন্ত?'

বিভা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

—'পাখি হোক মানুষ হোক, আমাদের সকলেব জীবনই সেই ছাঁচে ঢালা। আমবা কেউ কাউকেই ঠকাতে পারি না। পারি কি!'

বিভার মা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘরেব ভেতব ঢুকে বললেন—'শুনছ?'

বিভার বাবা বললেন—'কী হল আবাব?'

—'সুদর্শনটা কী!'

—'কেন, কী করল?'

—'পাশেব বাড়ির সেই কেঁদো বিড়ালটা, সেই সোহাগিটাকে এমনি করে মাথায় লোহাব ডাণ্ডা মারলে যে সেটা কাতরাতে-কাতরাতে গেল মবে।'

বিভার বাবা বিভার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তা আমি এখন হয়তো সুদর্শনকে মাবব। তারপর বিভা মারবে আমাকে। এই বকমই।' একটা চুরুট জ্বালিয়ে বললেন-'যাই কাজে যাওয়া যাক। যাক গে, ও-চেকটা ফিরিয়ে এনে কী আর হবে? এই সাড়ে তিনশ টাকা খবচ কবে আমি অবিশ্যি বিশেষ কিছু শিখি নি, কিন্তু তুমি বিভা অনেক কিছু শিখলে, এখন থেকে যেখানে-সেখানে ভগবানেব হাত বা মঙ্গল উদ্দেশ্য দেখতে যেও না, নিজে যদি শান্তিতে থাকতে পার তাই যথেষ্ট। পরকে আশ্বাস বা সান্ত্বনা দেবার মতন শক্তি আমাদের কারুরই নেই। কাবণ এদরে পরম শান্তি কীসে হবে তার ব্যবস্থা একমাত্র ভগবানই করতে পারেন। ময়নাটাকে, বিড়ালটাকে খুব সুন্দর নিখুঁত শান্তি দিয়ে দিলেন তিনি তাই। এই ময়নাটার ফোঁড়ার শুশ্রূষা করে কতটুকুই-বা শান্তি তাকে তুমি দিতে পাববে বিভা? ভেবে দেখো, তুমি যা দিতে পারতে তার তুলনায় যে গভীর শান্তি পাখিটা এখন পাচ্ছে তা কত বৃহৎ, তা কত মহৎ।'

কাকাতুয়াটার ইতিহাস এই রকম।

ময়নাটাকে বিড়ালে মেরে ফেলবার পর—বিভার আগ্রহ অনেকটা কমে গেল। পাখি দিয়ে ঘর সাজানো, পাখিকে বুলি শেখানো, একটা পাখির পরিচর্যা শুশ্রূষা, তাকে শান্তিব ভেতর রাখা, এইসব উদ্দেশ্য নিয়ে বিভার যে সুন্দর ঐকান্তিকতাটুকু ফুঠে উঠেছিল-মেসেব জানালা দিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলাম আমি, তা যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। ময়নাটা মরে কার্পেটের ওপর পড়েছিল, বিভা সেটাকে আস্তে-আস্তে তুলে এনে নিজের কোলের ওপর রাখাল। পালকে পালকে যেখানে যেখানে রক্ত লেগেছিল নিজের হাত দিলে, কুঁজোর ভেতর থেকে একটা কাচের গেলাসে খানিকটা জল গড়িয়ে নিয়ে জমাট রক্তের চাঙড়গুলো ধুয়ে ফেললে, তারপর তার পূর্বদিকের জানালার কাছে গিয়ে গেলাসের বাকিটুকু জলে পাখিটার সমস্ত শরীর খুব আস্তে আস্তে ধুয়ে নিজের গরদের শাড়ির আঁচল দিয়ে খুব মমতার সঙ্গে মুছল। তেপযের ওপর ভেলভেটের গদিতে পাখিটাকে রেখে খানিকক্ষণ চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর টেবিলের ওপর একটা প্যাড নিয়ে অনেকক্ষণ বসে কী যেন লিখল।

এই অবসরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জেগে উঠে দেখলাম সোফার উপর বিভা ঘুমুচ্ছে আর ময়নাকে তেপয়ের থেকে কার্পেটের ওপর নামিয়ে নিয়ে একটা বিড়াল চুপচাপ বসে আছে।

দেখলাম পাখিটার মাথা নেই, যতদূর চোখ যায় ময়নার মাথাটা কোথাও আবিষ্কার করতে পারলাম না।

জানি না কী হয়েছে, ঐ বিড়ালটাই খেয়ে ফেলল নাকি? এটা সেই সোহাগি বিড়ালটা নয়। খুব সম্ভব রাস্তার বিড়াল। সারা শরীর নোংরা, লিকলিকে, মুখে হাঁড়ির কালি লেগে রয়েছে। আমাকে দেখেই বিড়ালটা সন্ত্রস্ত হল, ঝপ করে পাখিটাকে মুখে বাগিয়ে নিয়ে মুহূর্তের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

খুব শীত পড়েছিল, বড্ড বাতাস। ই বি রেলওয়েতে কিছুদিন কেরানির কাজ করেছিলাম একবার। সে প্রায় ছ-সাত বছর আগের কথা। তখন বেশ শস্তায় একটা ওভারকোট কিনেছিলাম চোরাবাজার থেকে। কোটটা গায় দেবার সময় অনেক সময়ই অবাক হয়ে ভাবতাম এ কুষ্ঠরোগীর গায়ের কোট না যক্ষ্মারোগীর। কিন্তু যখনই শীত পড়েছে, বা বাদলের বাতাস বড্ড কনকনে হয়ে উঠেছে, তখনই এই কোটটা গায় দেই আমি। বেশ উপকার পাই। যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ আপতাত হয় নি, কোনোদিন হবে না বলেই আশা করি।

দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের র‍্যাকের থেকে ওভারকোটটা তুলে নিয়ে গায় দিলাম। চুল আঁচড়ে জুতো পায় দিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে একবার তাকালাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু বিভা তখনো ঘুমে। বেরিয়ে পড়লাম আমি।

অনেক রাতে ফিরে এসে দেখি বিভা আলো জ্বালিয়ে একটা বই হাতে করে বসে আছে। কিন্তু প্রায়ই বই-র থেকে চোখ তুলে তেপয়ের দিকে তাকায়। ময়নাটা যেখানে মরেছিল কার্পেটের সেই জায়গাটুকু নজর করে দেখে, সমস্ত ঘরের আনাচেকানাচে বিমূঢ় হয়ে চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর ময়নার শূণ্য খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর আবার বই-এর দিকে মন দেয়।

এ চার-পাঁচ ঘন্টা আমি এখানে ছিলাম না। ঘুমের থেকে উঠে বিভা যখন দেখল ময়নাটা নেই তখন সে কী করল? সুদর্শনকে ডেকেছিল বোধ করি? বিভার বাবাও এসেছিলেন হয়তো। এসে নতুন কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন মনে হয়। বিভার মার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল কি? বিভার? তিনিই বা কী বললেন? মেয়েটি এখনই-বা ঘাড় হেঁট করে ভাবছে কী?

একটা চুরুট জ্বালালাম

জানালার পাশে আমার ডেকচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসা গেল। অবাক হয়ে ভাবলাম কী করে আজ দুপুরবেলা সেই হাড়িপানা নেড়ি বিড়ালটা এসে বিভার মরা পাখিটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে বিভাকে বলব কি তা? থাক।

যদি বলতে যাই-বিভা হয়তো মনে করবে বিধাতার মত অলক্ষ্যে থেকে আমিও তার সমস্ত জীবনের খুঁটিনাটি লক্ষ করছি। এ তার ভাল লাগবে না। তার এদিককার জানালাটাকে হয়তো তাহলে এরপর থেকে সে বন্ধ করেই রাখবে। কি বা একটু ভেলভেটের পর্দা দেবে টেনে। এতে আমাদের জীবনেরই খুব ক্ষতি হবে। বিভার ক্ষতি হবে এই যে তার সম্বন্ধে ডায়েরি লেখা আমার আর সম্ভব হবে না। এতে সে ক্রমে-ক্রমে অজ্ঞেয়ের অন্ধকারে চলে যাবে। পৃথিবীর কাছে হয়ে থাকবে সে মৃত, অসাড়। তার মূল্যবান জীবনের গল্প পড়ে কিছু চিন্তা করবার আনন্দ পাবার সুযোগটুকু কেউ আর লাভ করতে পারবে না। আমার নিজেরও আরো একটা বিশেষ ব্যক্তিগত ক্ষতি হবে। সমস্ত দিন, সমস্ত রাতের ব্যর্থতা ও গ্লানির ফাঁকে-ফাঁকে এই মেয়েটির দিকে আমি তাকাই, তার কথা শুনি। কাজ দেখি। ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ লক্ষ করি, যে-সব জীবনের আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে স্বপ্ন ভস্মসাৎ, যাদের বেদনার কূলকিনারা নেই এক সময় ভগবান তাদের অমানুষিক অস্তিত্ব দিয়ে মানবজীবনের মেরুদণ্ড তৈরি করে। (তা তৈরি করে হয়তো) আমার জীবনের গত পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে বিভার মত মেয়ের সংস্পর্শে আমি আসি নি। একদিনের জন্যও না। কিন্তু এই তিন-চার মাস হল এর সম্পর্কে এসে অব্দি মানবজীবনের মেরুদণ্ডের কথা আমি ভাববার অবসর পাই না আর। জীবন দেবতার অন্ধ খেলা মাঝে-মাঝে মনের ভেতর উঁকি দেয় মাত্র। প্রশ্ন কমে এসেছে, সন্দেহ কমে এসেছে, তিক্ততা তত নেই আর; যে-সব জিনিস জীবনকে কষ্ট দেয়। পীড়িত করে মনকে, ম্রিয়মাণ করে রাখে, এক এক মুহূর্তে সেগুলোকে বড্ড অসত্য বলে মনে হয়। খুব অন্ধকারের ভেতর গভীর শীতের মধ্যে নিজের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবি পাশের

বাড়িতে খুব কাছেই বিভাও শুয়ে রয়েছে। একজন ভুঁড়ো মোটা মাড়োয়ারিও তো এখানে শুয়ে থাকতে পারত, কিংবা আর-একটা বুভুক্ষু মেস পারত এখানে আড্ডা গাড়তে। কিন্তু তা করে নি। সে-সবের বদলে এ মেয়েটির দৈনন্দিন জীবন দিনের পর দিন ওখানে গড়ে উঠছে ময়না নিয়ে, কাকাতুয়া নিয়ে, নানারকম ভরসার কথা, আশার কথা, হিশাবহীন হৃদয়াবেগ, অকুণ্ঠিত বিশ্বাস নিয়ে। একদিন পৃথিবীর সমস্ত বস্তি যদি ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে নতুনতর জীবন গড়বার মত পরিকল্পনাকে বিভার মত মেয়েরা খুব সাহায্য করতে পারবে, অন্তত তাদের আগ্রহ ও আশা দিয়ে। এই সব কথা ভাবি আমি, আগে কোনোদিন ভাবি নি। দেখেছি, এরকম চিন্তার খুব প্রয়োজন ছিল আমাব জীবনে। এই রকম সব চিন্তা ও কল্পনা ও বিভার মত নারীর নিভৃত পরিচয়, এই সবের খুব প্রয়োজন ছিল।

বিভা অনেক বাত অব্দি আলো জ্বেলে পড়ছিল, সাবা দুপুর ঘুমিয়েছে বলেই হয়তো বাতে ঘুমের আর দায় নেই বেশি তার। আমিও সমস্ত দিন ঘুমিয়েছি। ঘুম পাচ্ছিল না, নীচেব থেকে গিয়ে ভাত খেয়ে এলাম। ঠাণ্ডা বালাম চালের ভাত, ঠাণ্ডা কড়ায়ের ডাল, পানসে কনকনে ট্যাংবা মাছেব ঝোল। কাজেই চুরুটের গরমের দবকার ছিল। জ্বালিয়ে জানালাব পাশে ডেকচেয়ারে বসলাম।

সুদর্শন বিভার জন্য গরম কফি নিয়ে এল। আমারও এই জিনিসের দরকাব, এমন শীতের রাতে কফি এখন বেশ লাগত, কফিব পেয়ালা পাশে বেখে মোম জ্বালিযে খবরের কাগজ পড়া যেত। এই মেযেটির কাছে চাইলে নিশ্চযই সেই আমাকে এক পেয়ালা দেয; দিযে কৃতার্থ বোধ কবে, হযতো তাব ডাযেরিতে লিখে বাখে, তাবপর অনেক রাতে। একটা খুঁটিনাটি জিনিসেব বিস্ময়টুকু মন্দ নয, ডাযেরিতে লিখে রাখবার মত। পাশের বাড়ির গবিব গৃহস্থ ভদ্রলোককে এক পেযালা গরম কফি পাঠিয়েছিলাম, বাত বারটায়। সুদর্শন গিযে দিযে এসেছিল। যা কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে এবার কলকাতায; কফি খেতে বেশ আরাম। যাবা এত রাত অব্দি জাগে এ জিনিসেব খুব একটা বিশেষ দবকাব আছে তাদেব। ভদ্র-লোকেব নিজের কফি হযতো ফুরিযে গিযেছিল, কিংবা তার স্ত্রী হযতো এত রাতে করে দিতে রাজি হন নি। কাজেই আমাব কাছে তিনি চাইলেন। জিনিসটা বেশ ভাল লাগল আমাব। দিযেও বেশ তৃপ্তি হল। আমাদের পবস্পবেব ভেতব কোনো সুযোগ? না থাকাই ভাল, যাব যা অভাব মুখ ফুটে যদি বলে তাহলে পৃথিবীর গোলমাল ঢেব কমে যায। পরস্পরকে সাহায্য করবাব জন্য আমবা পৃথিবীতে এসেছি। আশা করি কাল রাতেও কফির দবকার হবে। অত বাতে তাব স্ত্রী কবে দিতে চাইবেন না হযতো। সব স্বামী বা সব স্ত্রীই পবস্পবের জীবনের প্রযোজনীয়-তাকে সব সময খুব শান্তভাবে উপলব্ধি কবে দেখতে চায না, কিংবা ভদ্রলোক হযতো কফিব টিন কিনতেও ভুলে যেতে পাবেন। কিংবা কত রকমই তো হতে পাবে। যাই হোক, তার যদি দবকাব হয, আমাকে একটু জানালেই সুদর্শনকে দিয়ে পাঠিযে দিতে পাবি। এ তাঁব জানানো উচিত। ভদ্রলোকে দেখতে কেমন আমি তাকিযে দেখি নি। কিন্তু এত বাতে এক পেযালা কফিব জন্য একজন মহিলাব কাছে তিনি যে নিবেদন জানাতে পেরেছেন সেইজন্য তাকে আমাব ভাল লেগেছে। মেয়েদের ওপর এ পুরুষটির যেন বেশ বিশ্বাস আছে তাহলে। আমাদেব দেশেব পুরুষবা যা সন্দিগ্ধ ও কুণ্ঠিতভাবে, অপরিচিত মেয়েদের কাছে খুব প্রযোজনীয প্রার্থনা জানাতে গেলও তাবা দিযে লাঞ্ছনা কবছে শুধু। আমাদেব সম্বন্ধে এমনি হীন ধাবণা তাদেব। এ-বকম স্থলে এ-পুরুষটিব সাহস ও বিশ্বাস, মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা বিচাব বেশ ভরসাব জিনিস। আমাব মনে হয, ইনি বুড়ো মানুষ। আমাদেব দেশেব যুবকেরা মেযেদের সম্পর্কে এ-বকম নিঃসঙ্কোচ স্বাধীনতা প্রকাশ করতে ভয পায, অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা ভাবে। এর মানে হচ্ছে, তারা নিজেবাই যথেষ্ট ভীরু। মনেব ভেতর নানারকম গ্লানি ও কলঙ্কও রযে গেছে তাদেব। এসবেব হাত থেকে আমরা মুক্ত হব কবে? জানি না। কিন্তু এ-রকম হতাশাব সুব নিযে আজকের ডাযেরি আমি শেষ করতে চাই না। আশা করি শিগগিবই মুক্ত হব। জীবনের নানা কাজেই আমি ভগবানের হাত দেখি, ভগবানের মঙ্গলে আমি বিশ্বাস কবি। বাবা যদিও এই নিয়ে আজ আমাকে ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু আমি জানি তিনি নিজেও আন্তরিকভাবে আমাব মতনই বিশ্বাস করেন যে একদিন সকলেরই সব রকম শুভ হবে। সেদিন খুব দুবে নেই।

রাত বারটা। কলকাতা।

এরকমই হযতো লিখত মেয়েটি।

কফি খাচ্ছিল, ট্রের একটা টি-পট, পাশেই একটা প্লেটে কয়েকখানা বিস্কুট ও কেক। কেক সে ছুঁলেও না, একখানা বিস্কুটের এক কিনারা কামড়ে রেখে দিল শুধু, কিন্তু এক পেযালা কফি ফুবলে আর-এক পেযালা ঢেলে নিল। তাবপর আবো এক পেয়ালা আন্দাজ ঢেলে নিয়ে পাশে রেখে দিল। কিন্তু সেটুকু

খেতে ভুলে গেলে সে, কফির পেয়ালা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল। কেক বিস্কুট পড়ে রইল। এসব জিনিস খাবার কোনো চাড় নেই যেন কারু এ পৃথিবীতে।

চাইলে সে এ-মুহূর্তেই সমস্ত ধরে দেয়। সারাদিন আজ খেয়েছিই-বা কী? বিকেলে এক কাপ চা খেয়েছিলাম। অযথা পয়সা খরচ হবে বলে এক পয়সার ডালমুট কিনে খেতেও ভরসা পাই নি। রাতে ফিরে এসে মেসের ভাত রুটি খেয়েছি কর্তব্যবোধে। খাবার আনন্দ হচ্ছে আলাদা জিনিস। অনেকদিন তা বোধ করি নি।

ইচ্ছে হয়, বিভাকে জানাই এসব কথা। তারপর কেক-বিস্কুট আর কফির পেয়ালা আমার এখানে এনে এই জানালাটা আবডাল করে নিবিবিলি একটু বসি কিছুক্ষণ।

পৃথিবীতে এই একটি মেয়েই যেন যে এই কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করত। সবচেয়ে বেশি সমবেদনা দিয়ে ভাবতে গেলেও যে শান্তি। কিন্তু তবুও তাকে বলতে পারা যায় না কিছু।

চুরুট জ্বলতে থাকে।

মেসের বাতি নিভিয়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ, বিভারটা জ্বলছে এখনো। তাকিয়ে দেখলাম কফির পেয়ালাটা তেমনি পড়ে আছে। খেল না আর তাহলে সে? না খেল বিস্কুট, না খেল কেক। সুদর্শন খাবে হয়তো? ভাবতে গেলে বড্ড তামাশা বোধ হয়। বিভাদের বাড়িতে খানসামার কাজ নিয়ে থাকলেও জীবনটা যেন নরম হয়ে উঠত এখন যা আছে তার চেয়ে?

কাকাতুয়াটা কোথায়? চারদিকে তাকাই। কিন্তু না দেখি পাখিটাকে, না দেখতে পাই খাঁচাটা। কাকাতুয়ার খাঁচাটা তো ঐ পুবের জানালার কাছে ছিল। কিন্তু সেখানে নেই। কোনো দিকেই নেই যেন।

এত বড় একটা রঙচঙা পাখি ঘরের একটা অস্পষ্ট কিনারে থাকলেও ধরা পড়ে যেত। কিন্তু কই, পাখিটাকে কোথাও খুঁজে পাই না তো? ময়নার মত এটাও বিড়াল কুকুরের হাতে শেষ হয়ে গেল নাকি? না, বিভা কাউকে দিয়ে দিয়েছে? না, এ বাড়ির অন্য কোনো কোথাও রয়েছে? তাই সম্ভব।

অনেকক্ষণ পরে বিভা উঠে দাঁড়াল।

ধীরে-ধীরে তেপয়ের গদির ওপর একটা স্তূপীকৃত কম্বলের একটুখানি কানাতে উঁচিয়ে খুব মমতার সঙ্গে করুণার সঙ্গে তাকিয়ে দেখল। একটা উজ্জ্বল নীল পালক আমারও চোখে পড়ে গেল। পাশেই বেগুনি গোলাপি দুটো পালক। কাকাতুয়াটা।

গদির ওপর খাঁচা চড়িয়ে কম্বল ঢেকে রেখে দিয়েছে বিভা। শীতের রাত কিনা। একরম ঢাকা পড়েছিল বলেই এতক্ষণ দেখতে পাই নি।

বিভা চলে গেল ঘুমোতে।

চলে যাবার সময় বাতি নেভাতে গেল ভুলে। এ-রকম মনের ভুল করে সে। এতে এদের কারু কিছু ক্ষতি নেই, ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের লাভই আছে বরং।

কেক-বিস্কুট কফি পড়ে আছে-যে-কেউ নিয়ে যেতে পারে। চুরুট টানতে-টানতে ভাবি চড়াইয়ের মত হলে বেশ হত। আমার এ জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে উড়ে একেবারে গিয়ে পড়তাম বিভার ছোট্ট টি-টেবিলটুকুর ওপর। তারপর যা নিরবচ্ছিন্ন সার্থকতা তা চড়াইই জানে আর চড়াইর ভুবন-বিধাতাই জানেন।

গোটা দুই ইঁদুর গিয়ে বিভার টি-টেবিলের ওপর উঠেছে। কেক-বিস্কুট কফির পেয়ালা, আশেপাশে সোফার গদি, মেঝের গায় বিচিত্র কার্পেট, মাথার ওপর বিদ্যুতের বাতি, এ সব বিলাস উৎসব শহরের অনেক ইঁদুরদের জীবনে আছে।

দু-তিনটা দিন কেটে গেল।

কাকাতুয়াটা মাঝে-মাঝে বড্ড চিৎকার করে। বিভা ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠে দেখতে যায় কী হল পাখিটার। কিছু হয় নি, এর বন্ধনকে এ পছন্দ করে না।

কাকাতুয়ার চিৎকার জীবনে এই প্রথমই শুনছি এক রকম। এ-রকম বড় জাতের রঙিন কাকাতুয়াও এই প্রথমই দেখছি। শুনেছিলাম আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এ-রকম কতকগুলো বড় বড় উজ্জ্বল, অবর্ণনীয় কাকাতুয়া এসেছে, সেগুলোকে পিভটে করে পায় শিকলি বেঁধে মাঝে-মাঝে একটা গাছের নীচে নাকি আনা হয়। তাছাড়া ছোট-বড় মাঝারি নানা রকম কাকাতুয়া নিয়ে একটি কাকাতুয়ার ঘরই নাকি তৈরি হয়েছে চিড়িয়াখানায়। কিন্তু চিড়িয়াখানায় আমি বছর দশেকের ভেতর যাই নি।

বিভার কাকাতুয়াটা যখন মোলায়েমভাবে নালিশ করে তখনো ডানপিটে শিশুর চিৎকারের চেয়ে

একটুও কম নয়। বড্ড অতিষ্ট করে তোলে মেয়েটিকে। আর যখন রাদে বিদ্রোহ, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করতে থাকে পাখিটা তখন এক-একবার ভয় খেয়ে চমকে উঠতে হয়। সেই দশ-বার বছর আগে চিড়িয়াখানায় নিবীর্য সিংহের গর্জন শুনে যেমনি হতাশ হয়েছিলাম, এ পাখির নিঃসঙ্কোচ স্পষ্ট প্রতিবাদের বোমাবারুদের মত আওয়াজ শুনে তেমনি বিস্মিত হয়ে বসে থাকি। চিড়িয়াখানার সিংহের গর্জনের যা নমুনা পেয়েছিলাম তার চেয়ে এদের বেশি সতেজ-ঢের বেশি সজীব। অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ শুনলে যে কোনো মানুষের মনে হৃদকম্প জাগতে পারে।

বাস্তবিক পাখির গলা যে এ-রকম হতে পারে এ আমার কোনদিন জানা ছিল না।

বড় পাখিদের মধ্যে দেখেছি চিল, দুপুরের আকাশে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে চিলের আওয়াজ কেমন যেন উদাস ও কাতর। আর শুনেছি শকুনের গলা, সেও খুব ওপরের আকাশ থেকে ডাকছে। পাড়াগাঁর দুপুরে, কেমন একটা বিজন বিভীষিকা মাখানো, কখনো-বা মৃত্যুগন্ধী কাব্যের স্পন্দন, জীবননদীর পারে বৈতরণীর তরঙ্গের প্রতিঘাত এই রকম সব। আভাস পেয়েছি সে-আওয়াজের ভেতর। কিন্তু এদের কারুরই আওয়াজ গর্জনের মত নয়। এ কাকাতুয়া যেন ইউগাণ্ডার জঙ্গলের সিংহের মত।

বিভা স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকত।

তাকিয়ে দেখতাম, কাকাতুয়াটা তার খাঁচার লোহার এক-একটা শলা ঠোঁট দিয়ে কামড়ে কেটে ফেলার কী দুর্দান্ত চেষ্টা করছে। যখন কিছুতেই কোনো কিছু কিনারা করতে পারছে না আর গলা ছেড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠছে। এ পাখি যদি দেখতে এত সুন্দর না হত, যদি এ প্রাণীট পাখির মতন এমন সুন্দর জীব না হত তাহলে পৃথিবীর সমস্ত হিংসা, রাগ, বিদ্বেষ ও রক্তাক্ততা যেন এখানে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে এ মনে করা খুব সহজ হত, এর চেহারা বিকৃত হলে এর সম্বন্ধে ঢের বীভৎস ও ভয়াবহ রোমহর্ষক কথা ভাবতে পারতাম; সে খুব স্বাভাবিক হত। কিন্তু এ পাখি, এবং খুব সুন্দর পাখি বলে একে এক সময় ধর্ষিতা উন্মত্ত মান্দারিন মহিয়সী বলে মনে হয়।

পাখিটা যখন ঠোঁটের ধারে কিংবা পাখনার ঝটপটানিতে কিছুতেই চারদিক-কার লোহার শিকগুলোকে ভেঙেচুরে ঝাড়াঝাপটা করে ফেলতে পারে না, তখন অসীম অন্ধকায় রাগে বিদ্রোহে ও হিংসায় নিজের পাখনা নিজেই কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে।

টুকরো টুকরো রঙিন পালক খাঁচার নীচে মেঝের ওপর খুলে পড়ে। কখনো-বা নিজের বুক আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেলে ফোঁটা ফোঁটা রক্তে এর বুকের গোলাপি রোম, মখমলের মত কোমল ননীর রঙের মত পালকগুলো ভিজতে থাকে।

বিভা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বসে থাকে।

কিন্তু কী করবে সে? কোনো উপায় নেই। এর এ-রকম অন্ধতার মুহূর্তে এ পাখিটা কিছু খায় না। কোনো রকম আদরই গ্রাহ্য করে না, এ মেয়েটি ওকে যত-রকম সান্ত্বনা ও আরাম দেবার চেষ্টা করে সবই সে অত্যন্ত কঠিন গর্জনে গর্জনে প্রত্যাখ্যান করে। বিভার আঙুল বা হাত কামড়ে চিরে ফেলতে এই পাখিটি খুব ভালবাসে; মাঝেমাঝে রাগে পেয়ে এই কাকাতুয়া যেন তার জীবনের সমস্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে সাক্ষী রেখে মেয়েটিকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলার জন্য উদগ্রীব হয়ে এগিয়ে আসে। তারপর আসে কাকাতুয়াটার অবসাদের মুহূর্ত, নড়েও না, চড়েও না, চুপচাপ হয়ে খাঁচার এক কোণে পড়ে থাকে। এই সময়টা বিভা সব চেয়ে কষ্ট পায় বেশি, কিন্তু কাকাতুয়াটাকে নিয়ে সে কী যে করবে বুঝে উঠতে পারে না।

বিভার বাবা এসে এক-একবার বললেন,—'আঃ, এত ঝামেলা কিসের রে বাপু।'

—'কাকাতুয়াটা'—

সোফায় বসে ভদ্রলোক বলেন—'খাঁচার শিক কাটতে চাইছে বুঝি ?'

—'তাই চাইবেই তো।'

—'চাইবেই তো, আমিও তো চাই।'

—'তুমি চাও? তোমার আবার খাঁচা কোথায়? এই বাড়িটা ?'

বিভা তামাশা পেয়ে হাসে।

—'বাড়িটা নয়—এই জীবনটাই তো আমাদের খাঁচা।'

—'জীবনটা খাঁচা ?'

বিভা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে-'কী যে বলো তুমি বাবা!'

এর কোনো উত্তর দেন না।

বিভা—'আচ্ছা সত্যি করে বলো, তুমি কি মনে কর জীবনটা আমাদের, খাঁচা ?'

—'খাঁচাই তো।'

বিভা একটু চুপ থেকে বললে—'কিন্তু আমি জানি তুমিও তা বিশ্বাস কর না, আমিও না।'

—'এই কাকাতুয়াটার অবস্থা আগাগোড়া ঠিক আমাদেরই মত।'

—'কী রকম ?'

—'এমনি করেই জীবনের বিরুদ্ধে আমরা অসভ্যতার পরিচয় দেই। দেওয়াও উচিত, জীবনটা আমাদের চেয়েও অসভ্য।' ভদ্রলোক প্রতিবাদী মুখ তুলে ভ্রূকুটি করে একবার পাখিটার দিকে তাকান, ভুরু উসকে বিভার দিকে তাকান তারপর। ডান ভুরু কপালে তুলে পাখিটার দিকে তাকান আবার, ভ্রূকুটি করে ফের বিভার দিকে তাকান তারপর।—'তুমি এখনো মানুষ হতে পেরেছ কি বিভা ?'

—'তবে কি!'

—'এখনো প্রজাপতিও তো হতে পার নি।'

বিভা কৌতূহল মাখা হাসি নিয়ে বাবার দিকে তাকাল।

—'এখনো তুমি শুঁয়োপোকার মতন রেশমের গুটির ভেতর।'

বিভা একটু হেসে বললে—'অতটা আরাম ঠিক নেই।'

—'কিন্তু আমার চেয়ে আরামে আছ, আর এই পাখিটার চেয়ে ?'

—'এই পাখিটার চেয়ে ঢের শান্তি আমার সে কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমার একটুও বেশি শান্তি নেই। সে কথাও আমি স্বীকার করি।'

—'এই পাখিটার চেয়ে তোমার একটুও বেশি শান্তি নেই ?'

—'কোনো মানুষেরই নেই।'

—'কোনো মানুষেরই নেই!'

—'কী করে থাকে? এই দেখ, আমরা প্রত্যেকেই এ-রকম শিক কাটতে চেষ্টা করছি, কিছুতেই পারছি না। এমনি গভীর প্রতিবাদ করছি, শুনছে না, এমনি নিজের জীবনটাকে নিষ্ফলতার ফাঁকে-ফাঁকে আঁচড়ে কামড়ে খিচড়ে ফেলছি, অন্য কারু তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। তারপর অবসন্ন হয়ে জীবনের এক কোণে ঘাড় হেঁট করে পড়ে থাকছি। পাখিটার বেলা তুমি বরং এইসব তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছ। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছ। নিজে অন্তত বেদনা পাচ্ছ। কিন্তু আমাদের বেলা তোমার মতন সমবেদনাপরায়ণ বিলাসী শৌখিন তৃতীয় ব্যক্তিকে হাতের কাছে কোথাও হাতড়ে পাচ্ছি না।'

—'দূরে হয়তো থাকতে পারে, কিংবা নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? কাছে থাকলেও-বা কী এগত? খাঁচার জীবন কাবার করে দিয়েছি প্রায়, সকলকেই কাবার করতে হয়। কেউ-বা ময়নার মতন টিবিক টিরিক করে নেচে শিস দিয়ে দেয় ফুঁকে, কেউ-বা এই কাকাতুয়াটির মত বড় গভীর ও অজ্ঞান-তার পরিচয় দেয়।' বলেই তিনি উঠে গেলেন।

বিভা বললে—'শোনো বাবা!'

—'কী।'

—'তুমি যে চট করে উঠে গেলে আমাকে একটা জবাব দেবারও অবসর দিলে না। তুমি যে বললে আমাদের জীবন—'

কিন্তু ভদ্রলোক অপেক্ষা করেন না, পিছন ফিরেও তাকান না, মাথা উঁচু করে সটান চলে যান।

এই রকম অবস্থা!

একটু ঘুরে এসে ভদ্রলোক বলেন,—'ওঃ এখনো দেখছি তুমি মনমরা হয়ে পড়ে আছ মেয়ে? এই কাকাতুয়াটার কথা ভেবে বুঝি ?'

—'না, কাকাতুয়াটার কথা ভাবছিলাম না।'

—'তবে ?' ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে বললেন—'অবিশ্যি ভগবান আছেন, তিনি কেন থাকবেন না? তাঁর মঙ্গলও সর্বত্র।'

বিভা মেঝের কার্পেটের থেকে কুণ্ঠিত আঁচল তুলে কাঁধের ওপর আস্তে-আস্তে সাজিয়ে রাখে।—'তবে কেন ঐ কথা বলে দিলে যে—!'

—'ঠাট্টা করে।'

—'তাহেল তুমি বিশ্বাস কর যে—'

সূচীপত্রে যান

—'খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করি। না করে উপায় আছে ?'

ভদ্রলোক—'আমাদের প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রতি পদক্ষেপেই তো দেখতে পাই তিনি আমাদেব রক্ষা করছেন, সান্ত্ব' দিচ্ছেন, শান্তি ও কল্যাণের জগতে আমাদের সকলকে নিয়ে চলেছেন।'

বিভা নড়ে ... সোফার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে। বোঝা যায়, মেয়েটি খুশি হয়েছে। এও বোঝা যায়, মেয়েটিকে খুশি করবাব জন্যই এ ভদ্রলোকটি এত কথা বললেন। খুব স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি নিজে এসব বিশ্বাস করেন না। ময়না পাখিটার মৃত্যুর ব্যাপাব নিয়ে ভদ্রলোকে যে নিবিড় বর্ণচোরা বিদ্রূপ করেছিলেন সেই কথা মনে পড়ে। এর জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মে। অবাক হয়ে ভাবি এত বিষয় ও বিলাসের অধিকারী হয়ে এব এ তিক্ততা কেন?

ভদ্রলোকে—'এ পাখি বা এর খাঁচার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনো তুলনা চলে না।' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'বিধাতাব সৃষ্টিতে জীবনটা হচ্ছে একটা আনন্দেব ব্যাপার।' এক পা এগিয়ে বললেন—'বিশেষত মানষের জীবন।' একটু হেঁটে বললেন, 'এ যেন একটা আশীর্বাদ।' হাঁটতে-হাঁটতে বললেন—'মানুষ তাব জীবনের এ পরম আশীর্বাদ যেন চারদিককার কুকুব বিড়াল পাখি পতঙ্গেব ওপর ছড়াতে পারে। সে যে একটা কত বড় সার্থকতা, বিভা!' বলেই মেয়েটির মুখেব দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে তার স্বাভাবিক আশা ও উচ্ছ্বাস ও আগ্রহের ভেতর দিয়ে এসেছে। ভদ্রলোক বেবিয়ে গেলেন।

পরদনি সকালবেলা শীত খুব বেশি ছিল। খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ার দরুনই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, কাকাতুয়াটা পুবেব দিকের জানালাব কাছে খাঁচার ভিতব নিবিবিলি রোদ পেয়েছিল। বিভা নিস্তব্ধ হয়ে একটা বই পড়ছিল।

মেসের বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চাবি কবে ফিরে এসে দেখি একটি যুবক বিভার ঘবে ঢুকেছে। হাতে তার একখানা বই। যে কযজন যুবাকে বিভাব কাছে আসতে দেখি তাব মধ্যে এই একজন, যতদূব বুঝতে পেরেছি এর নাম মোক্ষদাচবণ, বড্ড সেকেলেব নাম, কিন্তু নিজে সে এত বেশি একাল ও আগামীকালের জিনিস যে এক-এক সময তার নামটাকেও যে-কোনো আধুনিক চিন্তা ও কল্পনাব সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে সমাদব করতে ইচ্ছে কবে। বিভা তাকে মুক্ষিদা বলে ডাকে।

—'তোমাকে এ কদিন দেখি নি কেন মুক্ষিদা ?'

—'তা আব জিজ্ঞেস কবা কেন ?'

—'বসবে না!'

—'বসবার জন্যই তো এসেছি।'

—'দাঁড়িয়ে রইলে যে ?'

—'কলকাতার শীত থার্মোমিটাবে ফবটি নাইন ডিগ্রিতে নেমেছে।' একটা সোফায় বসল।

—'তাই নাকি? তা হবে, কাল বড্ড শীত শীত লেগেছে।'

—'রাত্তিবে ?'

—'হ্যাঁ, কম্বলে মানাচ্ছিল না যেন।'

—'ভেবে দেখ, কলকাতর পক্ষে ফবটি নাইন ডিগ্রি কী ব্যাপাব!' বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'সেই নাইনটিন থারটিব ডিসেম্ববেব কথা মনে পড়ে বিভা ?'

—'কী হয়েছিল ?'

—'থার্মোটিমার একেবারে ফর্টি সেভেন ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল।'

—'তা হবে।'

—'তোমার যেন এসব বিষয়ে কোনো কৌতূহলই নেই। কেমন খবব দিলাম তোমাকে বলো তো দেখি।'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'এই বত্রিশ বছরের মধ্যে এ-বকম শীত পড়ে নি কলকাতায়।'

—'সত্যি ?'

—'পড়েছিল শুধু এইটটিন নাইটি নাইনে।'

—'তা, তখন তো তুমি জন্মাও নি মুক্ষিদা এইটটিন নাইট নাইনে ?'

—'না জন্মালে কী হয? এ সববে রেকর্ড থাকে।'

—'তা বটে।'

—'থার্মোমিটার ফরটিফোর ডিগ্রিতে নেমে ছিল।'

—'সত্যি ?'

—'কলকাতায় মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত পড়ে কেন বলো তো দেখি।' বিভা একটু ভেবে বললে—'আমার মনে হয় হিমালয়ে খুব বরফ পড়ে বলে।'

—'কোথায়-বা হিমালয়, কোথায়-বা কলকাতা। হাঃ হাঃ হাঃ।'

—'হেসো না।'

—'এই তোমার কালচার!'

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে—'হিমালয় হল গিয়ে তোমার সেই লছমন-ঝোলার পথে, আর কলকাতা হল আদিগঙ্গার পাশে সুন্দরবনের কাছে ডায়মণ্ড হারবারের—'

—'সে-হিমালয়ের কথা আমি বলি নি তো, আমি বলেছিলাম দার্জিলিঙের হিমালয়ের কথা।'

—'আরে, সে যে—হিমালয়ই হোক না কেন, পাহাড়ে বরফ পড়ে বলে কি এখানে শীত।'

—'তবে ?'

—'সেই পাঞ্জাব আর ইউ পি-র থেকে শুরু করে মাঝে-মাঝে এমন একটা ঠাণ্ডা ঝড়ের বাতাস বইতে থাকে যে সমস্ত গ্যাঞ্জেটিক ভ্যালি শীতে ঝালিয়ে যায়, কলকাতাও বাদ পড়ে না।'

—'তা হবে।'

—'তা হবে বললে চলবে না। এটা মনে করে রেখো।'

—'কী লাভ মনে করে রেখে ?'

—'কেন ?'

—'শীতের কথা তো আমরা খুব আরাম করে বলি, খুব আরামে কম্বলের নীচে শুয়েও থাকি; কিন্তু এই শীতে কত লোকের কত কষ্ট।'

—'ওঃ, সেই কথা ?'

ছেলেটি চুপ করল। বললে—'হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, আমি মাঝে-মাঝে কলকাতার ফুটপাতে বেড়াই—'

—'কখন ?'

—'অনেকটা রাত অব্দি। কত জিনিসই যে দেখি। বাস্তবিক মানুষের জীবনটা বড় দুঃখের।' ছেলেটি মাথা তুলে বললে—'বিলেতের কথা মনে পড়ে।'

—'বিলেতের কথা? কবে সেখানে গেলে আবার তুমি!' বলে বিভা একটু হাসল।

—'না, যাই নি। যেতে চাইও না কোনোদিন, ঘোড়ার ডিম হবে গিয়ে। তবে ফিলমে দেখেছি নভেলেও পড়েছি বিলেতের কথা-সেই সবের থেকে ব্যাপারটা কল্পনা করে নিতে পারা যায়, কী বলো, কল্পনা আমাদের এত কম নয়। ওদের অবস্থা কী জানো, আমাদের চেয়েও খারাপ। ওদের গরিবদের কথাই বলছি আমি, লণ্ডনের স্লামে যারা থাকে। কারণ, ওটা নিছক শীতের দেশ কিনা। জীবনের যারা হতভাগ্য, শীত তাদের পক্ষে বিষম।' একটু থেমে বললে—'বাস্তবিক জীবনটাই বিষম!' বিভার দিকে তাকিয়ে বললে—'কী বলো তুমি ?'

—'তোমার হাতে এটা কী বই মুক্ষিদা ?'

—'আমার হাতে ?' ফেল্টহ্যাটটা মাথার থেকে নামিয়ে সোফার এক কিনারে রেখে মোক্ষদাচরণ বললে—'তা দিয়ে তুমি কী করবে ?'

—'কেন ?'

—'আমার বইয়ের সন্ধান তুমি কি রাখ ?'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

বিভা যে একদিন একটা বই ছুঁড়ে ফেলেছিল সেই কথা আমারও মনে পড়ল। এই মোক্ষদারই বই। সেদিন ব্যাপারটা ভাল করে আগাগোড়া দেখতে পারি নি।

বিভা বললে—'তোমার বইয়ের তো অসম্মান করি না!'

—'করই তো ?'

—'তুমি নিজে কোনো বই লেখ নি তো।'

সূচীপত্রে যান

—'নাই-বা লিখলাম। কোনোদিন লিখবও না। লিখে ঘোড়ার ডিম হবে। কিন্তু যে-সব বইকে মানুষ নিজের লেখার চেয়েও ভালবাসে—'

বিভা বাধা দিয়ে বললে,—'কিন্তু তোমার সে-বইটা আমার ভাল লাগে নি।'

—'কেন লাগে নি।' ছেলেটি বললে,—'না লাগবার কোনো কারণ তো আমি খুঁজে পেলাম না।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। কোনো জবাব দিল না।

মোক্ষদা বললে—'এলিজাবেথ-এর 'আই হ্যাভ বিন ইয়ং' বইখানা তোমার ভাল লাগে না!'

—'ভাল লাগল না তো।'

—'মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।'

—'কেমন যেন নোংরা-নোংরা লাগছিল।'

—'নোংরা!'

ছেলেটি চোখ কপালে তুলে দু মিনিট চুপ করে বসে রইল। তারপর বললে—'এ বছরে সবচেয়ে পরিষ্কার বই ওখানা।'

—'তোমরা তা মনে করতে পার ।'

—'না, আমরাই শুধু নয়। বিলেতে তোমার চেয়েও ঢের-ঢের ছোট-ছোট মেয়েরা এই কথাই ভাবে।'

—'বিলেতে তারা অনেক কথাই ভাবে।'

—'ভাবে যে এখানা এ বছরের সবচেয়ে চমৎকার বই।'

—'ভাবুক।'

—'তাতে তোমার কিছু এসে যায় না?'

—'না।'

—'কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা যদি প্রশংসা করত? অবিশ্যি তারা কোনোদিন করবে না। তাদের বই হচ্ছে বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর কিংবা শরৎবাবুর ...তারপর নভেলের পৃথিবীটা লোপাট হয়ে গেলেও তাদের কিছু ক্ষতি নেই!'

ছেলেটি হাসতে লাগল।

বললে—'যদি দেশের মেয়েরা লোনণ্ডের বইটাকে খুব প্রশংসা করে তাহলে তোমার ভাল লাগে? স্বাদেশিকতার ধরনটা তোমার এই রকম! কিন্তু দেখো, মাই ডিয়ার বলতে কোনো দেশ-বিদেশ নেই। খুব মূল্যবান কল্পনা বা চিন্তাকে সব সময়ই পুজো করতে হয়। এ বইখানা শক্ত ঠিকই। খুব মূল্যবান। বহুকাল পরে এক-একখানা এই রকম সুন্দর জিনিস তৈরি হয়।'

বিভা প্রথম কথার উত্তর দিয়ে বললে—'আমি খানিকটা পড়ে দেখেছি। আমার ভাল লাগে নি। আমাদের দেশের মেয়েরা যদি এমন বইয়ের প্রশংসা করত তাহলে বুঝতাম যে তাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।'

—'আবার রুচির কথা?'

—'প্রতিবাদ করতাম আমি।'

—'করতে?'

—'রুচি বলতে আমি শ্লীলতা অশ্লীলতা বুঝি না শুধু।'

—'তবে?'

—'যাদের লিখবার খুব গভীর ক্ষমতা আছে তাদের খানিকটা অশ্লীলতাও আমি ক্ষমা করি।'

—'শুনে আরাম হল খানিকটা।'

—'আমি জানি আমাদের দেশের মেয়েরা এটুকুও করে না।'

—'না তা করে না।'

—'কিন্তু আমি ক্ষমা করি। বড়-বড় লেখকদের বিপদ আমি বুঝি। কিন্তু তাদের রচনার মাধুর্য ও গভীরতা এত বেশি যে খানিকটা নোংরামি ও কদর্যতা যেন সমস্তটুকুর সঙ্গে একতারে বাঁধা বলে মনে হয়। হৃদয়কে পীড়া দেয় না। যাদের রুচি এটুকু অব্দিও ক্ষমা না করতে পারে, বুঝতে হবে তাদের উপলব্ধি করবার শক্তিই ঢের কম, বিচার কম, কল্পনা কম [ভবিতব্য] কম।' বিভা চুপ করল।

মোক্ষদাও কোনো কথা বললে না।

বিভা,—'কিন্তু এ বইটার দোষ কী জান'

—'সেক্স-এর বাড়াবাড়ি ?'

—'নভেলে এ সব আমার ভাল লাগে না।'

—'কিন্তু মারি স্টোপস যদি লেখে।'

—'বুঝি যে কোনো আর্টের বই পড়ছি না, ডাক্তারি পড়ছি। কিন্তু নভেলকে ডাক্তারি হিজিবিজিতে ভরে থাকতে দেখলে বড্ড বিশ্রি লাগে। আর্ট নষ্ট হয়ে যায়।'

—'এ বইটাব আর্ট খুব অক্ষুণ্ন।'

—'আমার তা মনে হয না।'

—'আর্ট সম্বন্ধে কোনো ধাবণাই তোমাব নেই।'

—'টুর্গেনিভের বই তো আমাব ভাল লাগে।'

ছেলেটি হো হো কবে হেসে উঠল। মোক্ষদা হাসতে-হাসতে বললে—'নভেলেব ক্ষেত্রে টুর্গেনিভেব এখন আব কোনো স্থান নেই।'

—'নেই ?'

—'বুড়ো হেডমাস্টাববা পড়ে হযতো।'

বিভা চুপ কবে রইল।

—'কিংবা তোমার মতন মেযেবা।'

—'এ আমাব বেশ লাগে।'

—'এই তোমার আর্ট ?'

—'সে আর্টেব পৃথিবী কবে ভেঙে গেছে।'

—'তাও যায় নাকি ?'

—'ত্রিশ বছব পবে এই বইখানারই-বা কী মূল্য থাকবে ?'

—'এই বকম হয ?'

—'অবিশ্যি বাংলাদেশে না হতে পাবে। এখানে এখন চণ্ডীদাস চলে।'

—'থাক। আমি চণ্ডীদাসেব কথা বলছি না। কিন্তু আমাব ধারণা ছিল একখানা সুন্দব বই বা সজীব কল্পনাব জিনিস চিবকালই বেঁচে থাকে।'

এ-কথা শুনে উত্তব না দিযে মোক্ষদা বললে—'লোমণ্ডেব বইখানা তোমাকে পড়তে দেওয়াই ভুল হযেছে।'

—'আব এ রকম দিও না।'

—'আগে যদি জানতাম যে আর্টেব সম্বন্ধে তুমি এ বকম বেকুবের মত চিন্তা কর, ভাব, কথা বল—'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদা—'কিন্তু তোমার দোষ দিযেই-বা হবে কী? আমাদেব দেশের মেযেবাই এ রকম। কোনো নতুন জিনিস গ্রহণ কবতে পারে না। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ বছব পরে তোমার মত মেয়েরাই এ বইটাকে কত যে প্রশংসা করবে। কিন্তু তখন ঠিক যে-বইটার প্রশংসা কবা দরকার, সেটাকে করবে ঘৃণা। এদেব দুর্বুদ্ধি এই রকম।'

বিভা একটু চুপ থেকে বললে,—'এ বইটাকে আর একটা কারণেও আমার ভাল লাগে নি। সেইটেই হচ্ছে আসল কাবণ।'

—'কারণটা জানতে পারি কি ?'

—'বইটার কোনো উদ্দেশ্য নেই যেন। জীবনটাকে মনে করে অন্ধকারের মত। তারই ফাঁকে-ফাঁকে ফুর্তি করা আবার অবিমিশ্র বেদনার তবলে ভাসতে থাকা। এ কেমন ?'

—'এই রকমই তো জীবন ?'

—'এ আমার ভাল লাগে না।'

—'কিন্তু আমাদের জীবন তো এইরকম।'

—'তাও আমি বিশ্বাস করি না।'

—'তুমি তাহলে ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড পড়ো।'

সূচীপত্রে যান

বিভা একটু হাসল।
—'আর রবিনস ক্রুশো।'
বিভা—'আমি এক-এক সময় অনেকক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখি। আমার মনে হয়—'
—'তুমিও চিন্তা কর ?'
—'জাজ বেন লিণ্ডসের সার্জনস লাইফ কিছুদিন আগে পড়ছিলাম।'
—'তাও পড় ?'
—'আর মরিস হিণ্ডাসের একখানা বই।'
—'হিউম্যানিটি আপরুটেড বোধ করি।'
—'হ্যাঁ।'
—'এ সব বই আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।'
—'কেন ?'
—'জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই এদের।'
—'তা তুমি কী করে বল ?'
—'তা যদি থাকত তাহলে এরা নীরস মন্তব্যের পাট নিয়ে বসত না নিশ্চয়।'
—'তার মানে ?'
—'একখানা সার্থক উপন্যাস লিখত।'
—'সকলেই তো জীবনটাকে গল্পের হিশেবে দেখে না।'
—'কিন্তু জীবনটা গল্প ছাড়া আর কী ?'
—'তুমি তা ভাবতে পার। কিন্তু আমি যা বলছিলাম—'
—'অতি দীর্ঘ একটা গল্প। শেষপাতা দুশোয় যখন পড়ি ভগবান নেই, বেদনাই সবচেয়ে বেশি, মাঝে-মাঝে শুধু উপভোগের অবসর, কিংবা মিথ্যা কতকগুলো কল্পনা নিয়ে ফুর্তির সময়, এই নিয়ে যা আনন্দ আমাদের মন্দ নয়। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকা দরকার। জীবনে কৌতুক যে ঢের আছে এই বুঝেই বাঁচতে চাই আমরা। কেউ মরতে চায় না। কীসের জন্য? আমরা সব মরে গেলে সৃষ্টির এই যে নিষ্ঠুর চিরন্তন তামাশার খেলা, এ খেলবে কে? সেজন্যই তার জীবনীশক্তি তাকে বিদ্রূপ করে বাঁচিয়ে রাখে। আমরাও এই রকম করেই বাঁচি।'
বলেই সে খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল।
বিভা—'আমি যা বলছিলাম। আমি খুব গভীর ভাবে ভেবে দেখেছি যেই যা লিখুক যেই যা বলুক জীবন খুব সাধনার জিনিস। ভগবান খুব মঙ্গল উদ্দেশ্য নিয়ে জবিন সৃষ্টি করেছেন। প্রতিদিন নানা কথায় নানা কাজে এই কথাই আমার মনে হয়।' মোক্ষদা নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল। বিভা যা বলছিল সে কথায় তার কানও ছিল না বোধ করি।
বিভা—'বেদনা কি নেই? তা আছে! কিন্তু তা লাঘব করবার জন্য জিনিসও ঢের আছে।'
মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না। মুখ দেখে মনে হয় বিভা কী বলছে না বলছে, তা তার গ্রাহ্যের বাইরে। সে অন্য কথা ভাবছে।
বিভা বললে,—'এক-একটা উপন্যাস আমাদের খুব নিরাশ করে ফেলে। যে উপন্যাসগুলো হতাশাবাদী সেগুলো আমাদের পড়া উচিত নয়। তাদের ধারণা যে জীবন সম্বন্ধে তারা খুব জানে বুঝি। কিন্তু সেটা ঠিক কথা নয়। লোমণ্ড, কতই-বা বয়স মেয়েটির? বিশেষ তেমন আর বয়স নয় নিশ্চয়ই। এই তো তার প্রথম নভেল! না হয় দ্বিতীয় নভেলই হল। বইখানার নাম রেখেছে তবুও আই হ্যাভ বিন ইয়ং। যেন আটাশ বিশ বছর বয়েসই মানুষের জীবনের সজীবতা চলে যায়। তার সমস্ত আনন্দ ও কল্যাণের জিনিস হয়ে যায় অতীতের স্মৃতি মাত্র। কেমন বিসদৃশ, ভেবে দেখ তো দেখি। জীবন সম্বন্ধে যারা এত নিরাশ, এ সৃষ্টির যুক্তিতে যারা বিধাতার কল্যাণের হতা এত কম আবিষ্কার করতে পারে, জন্যেই যারা যৌবনের জয় হারিয়ে ফেলে, আশা নেই বিশ্বাস নেই, তাদের বই এতটা সফলতাই-বা লাভ করে কী করে? আমি অবাক হয়ে ভাবি।'
মোক্ষদা চুপ করে ছিল।
বিভা,—'বুঝলে মুক্ষিদা, এসব বই তুমি আর পড়ো না।' মোক্ষদা কোনো উত্তর দিল না।
বিভা—'এর সেক্স-এর জন্য নয়। এর সেক্সকে আমি সহ্য করতে পারি। কতকগুলো মাতলামির

সূচীপত্রে যান

ছবি যা এঁকেছে তাও আমার কাছে অপরাধ মনে হয় না। পৃথিবীতে কি মাতাল নেই? ঢের আছে। এই সবই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে এর ধারণা একেবারেই মিথ্যা। অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু সে-অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে নি। কারণ বইটা লিখতে গিয়ে একটা ভুল সংস্কার নিয়ে শুরু করল কিনা। বাস্তবিক এর এই সংস্কারটা ভুল। আমাদের জীবন একটা আশার জিনিস।'

বিভা একটু চুপ থেকে—'এই মহিলাটি, এর বয়স কতই-বা হবে? বড় জোর বিশ। আমার মনে হয় তার থেকেও কম। বাবার বয়স পঁচাত্তর। কিন্তু জীবনটাকে আশীর্বাদ বলে মনে করেন।'

বিভা একটু থেমেই বলে,—'আর চেয়ে কি আমরা বেশি জানি? বা এই মহিলাটি লেখিকা বলেই কি বেশি জানেন?'

বিভা মিনিট খানেক পরে—'আমার দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে নারীরাও শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে এতটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।' বলে মোক্ষদার দিকে তাকাল। তারপর আবার ঘাড় কাত করে বললে-'কিন্তু এ রকম বই যদি এই একখানাই হত তাহলেও তো হত। কিন্তু তা তো নয়। আজকালকার সাহিত্যই এই সব বইয়ে ভরা। জীবনকে এরা একটা অন্ধ পোকার মত নিঃসহায় করে এঁকে দেখাবে। তার বেদনা করে দেবে অপরিসীম। মাঝে-মাঝে খানিকটা স্থূল উপভোগ দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখবে। ভগবানকে বৈঠকের ভেতর কোথাও রাখবে না, রাখলেও তাকে শয়তানের অধম করে আঁকবে। এই রকম সব। এই হল অভিজ্ঞতা আর প্রতিভা। খুব বেস্ট সেলার আশা করি?'

—'কোন বইটা?'

—'লোমণ্ড-এর আই হ্যাভ বিন ইয়ং।'

—'সব তো বেরল?'

—'কিন্তু এরকম বই-ই তো বিক্রি হয়।'

—'হওয়া তো উচিত।'

কাকাতুয়াটা চিৎকার করে উঠল। মোক্ষদা ধড়মড় করে নড়ে ওঠে সবশেষে পাখিটাকে দেখতে পেয়ে—'তা এই, আমি ভেবেছিলাম না জানি কী?'

—'এই রকমই। বড্ড চেঁচায়।'

—'পাখিটা পেলে কোথায়?'

সুদর্শন চা টোস্ট ডিম আর গোটা কয়েক কমলা নিয়ে এল।

দুজনেই খাচ্ছিল। মোক্ষদা—'পাখিটা কেউ দিলে নাকি তোমাকে? জন্ম-দিনে?'

—'না। কিনেছি।'

—'এ এরকম শখও ছিল?'

—'বেশ সুন্দর তো পাখিটা।'

—'তা তো দেখছি।'

—'তোমার পছন্দ নয়।'

—'কেন জিজ্ঞেস করছ।'

—'আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি।'

—'উপাহার হিসেবে?'

—'যা মনে করো।'

—'এ রকম জিনিস আমি নেই না।'

-'কেন?'

—'এ পাখি নিয়ে জীবনটাকে কে বিড়ম্বিত করতে যাবে বল? অবিশ্যি তুমি ছাড়া।'

দুজনেই চুপচাপ খেতে লাগল।

মোক্ষদ—'তাছাড়া আমার সময়ের দামও আছে।' চায়ে এক চুমুক দিয়ে বললে—'অবিশ্যি লিখি না কিছু। কিন্তু পড়ি অনেক। এ পাখির তদ্বির করবে কে বলো?'

—'এ পাখিটাকে নিয়ে কি করি বলো তো দেখি?'

—'কোথেকে কিনলে?'

—'টেরিটি বাজার থেকে একটি লোক এসে বিক্রি করে গেল?'

—'দালাল?'

সূচীপত্রে যান

—'তা হবে।'

—'কত দাম নিলে?'

—'একটা ময়না আব এই কাকাতুয়া সাড়ে তিনশ নিলে।'

মোক্ষদা টিপটের থেকে খানিকটা চা বিভাকে ঢেলে দিতে-দিতে বললে—'সাড়ে তিন হাজার তোমার কাছ থেকে নেয় নি তাহলে?'

—'তাও নেয় নাকি?'

—'ধরো যদি বলত যে কাকাতুয়াটা মহাত্মা গান্ধির আশ্রয় থেকে নিয়ে এসেছে, তাহলে কত দিতে

বিভা ঘাড় কাত করে হাসল।

মোক্ষদ—'এই রকম বলে অনেক সময়।' টিপট থেকে নিজের পেযালায় খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে—'একটা সুন্দর জিনিসেরও নিজস্ব কোনো দাম থাকে না প্রায়ই। যে কিনবে তার অনুভূতিকে আঘাত করে তবে দাম। সৌন্দর্য অনুভূতি অবিশ্যি ধর্তব্যেব মধ্যে নয়। তা খুব সাধারণ জিনিস। অন্যরকম অনুভূতির জায়গায় ঘা দিতে হয়।'

চায়ে একবার চুমুক দিয়ে মোক্ষদা,—'যেমন ধবো যদি বলা যায় গুরুবাবুর?' মন্দিরে এই কাকাতুয়াটা ছিল"। একটা বিস্কুট ভেঙে নিয়ে বললে—'তাহলে অনেক দাম দিয়ে কিনতে চায় এমন ঢের লোক মেলে নাকি?'

বিস্কুটের টুকরোটা কাকাতুয়ার খাঁচার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—'এইরকমই।' কিন্তু বিস্কুট কাকাতুয়াটা খেল না। এ তার খাবাব মুহূর্ত নয়। চিৎকাব কবে উঠল। মোক্ষদা '—এ কাকাতুয়াটা কদিন কিনেছ?'

—'ছ-সাত দিন হল?'

—'এই ঘরেই থাকে বুঝি?'

—'কাকাতুয়াটা? এই ঘবেই থাকে।'

—'আর তুমিও তো সাবা দিনরাত এই ঘরেই?'

—'এক রকম।'

—'জীবনটাকে এত কষ্ট দেবে কেন?'

—'এই কাকাতুয়ার জীবনটাকে?'

—'না। তোমার জীবনের কথা বলছিলাম।'

—'এই চিৎকারের মধ্যে জীবনের কাজ কী করে চলে?'

—'পাখিটাব জীবন অবিশ্যি বাধা পায।'

—'আর তোমার জন্য কী সান্ত্বনা থাকে।'

—'আমি হতবুদ্ধি হয়ে ভাবি কী করে বেচারাকে একটু শান্ত কবব।'

—'হতবুদ্ধি হযে ভাব? কিন্তু কাজে কিছু কবতে পাব কী?'

—'প্রথম প্রথম খাবার দিতাম। নানা বকম ভাবে আবামে রাখতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন দেখছি কিছুতেই কিছু হয় না, কাজেই চুপ করে বসে থাকি।'

—'এ রকম অসভ্য জানোয়াব আমাদেব কাছে না থাকলেও এমনিই আমরা অনেক সময চুপ কবে বসে থাকি। চুপ করে বসে থাকি মানে ব্যথা পাই। আনন্দে কেউ নিশ্চুপ বসে থাকে না। কিন্তু এই বেদনাকে আরো বাড়ানো কেন, একটা কাকাতুয়া ডেকে এনে?'

—'আমি অবিশ্যি ঠিক এ রকম মনে করি না।'

—'কী ভাব তাহলে?'

—'এই পাখিটা একটা আশ্রয় চায় তো?'

—'সে-সব কথা এর বাপ ভাবুক গিয়ে।'

বিভা একটু হেসে বললে-'কিন্তু এর বাপ-মা কোথায?'

—'বনের বাপ-মা অবিশ্যি নেই। কিন্তু এর বিধাতা আছেন বিশ্বাস করো না?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'তার হাতে ছেড়ে দাও।'

—'কী করে?'

—'খাঁচার থেকে খুলে জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে।'

—'হয়তো পাশের বাড়িতে গিয়ে পড়বে, বিড়ালের খেয়ে ফেলবে।'

—'তাহলে আর বিধাতাকে বিশ্বাস করলে কোথায়?'

বিভা একটু হেসে বললে—'এসব তো হল তোমার ঠাট্টার কথা। কাজে কি করা যায় বলো তো?'

—'আমি হলে কী করতাম জান? খাঁচার থেকে খুলে কুকুর লেলিয়ে দিতাম।'

—'এই পাখিটাকে?'

—'কেনই-বা দেব না বলো?'

—'থাক। তামাশা ঢের হল।'

—'না, তামাশা নয়। আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিতে কেউ ছাড়বে? বিভা কোনো উত্তর দিল না।

—'এই পাখিটাব মত যদি নোংরা ব্যবহাব করি তাহলে এ পৃথিবীর কোথাও ক্ষমা পাব?'

বিভা চুপ করে বইল।

—'এমনিই তো কেউ কাউকে ক্ষমা কবতে চায না। খুব ভদ্রভাবে চলি, মিষ্টি কথা বলি। কিন্তু ভাল মনে কবে একজনকে একটা বই পড়তে দিলাম, সে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানায। একটা পাখিব কর্কশতা ও অসভ্যতা অসহ্য হয়ে উঠলে, তাই সেটা আমাকে উপহার দেবার মত মূল্যবান জিনিস বলে বিবেচিত হল।'

মোক্ষদা একটু হেসে বললে—'কিন্তু উপহার দেবার ঢের জিনিস তো পৃথিবীতে ছিল, যা সবচেয়ে আগ্রহ ও সার্থকতাব সঙ্গে গ্রহণ কবতাম আমি। কিন্তু সে সবের তো উল্লেখও হয না।'

চাযেব পেযালা নামিযে বেখে মোক্ষদা—'এই বকমই।' ফেল্ট হ্যাটটা তুলে ধরে বললে—'এই যে এ সব বই পড়ি, যে-বইগুলো তোমাব আদৌ পছন্দ হয না, এই বইগুলোব কাছ থেকেই আমি সবচেয়ে বেশি সহানুভূতি পাই। তুমি বলো এবা জীবনকে চেনে নাই। কিন্তু কোনো কিছু কী হৃদযে এমন স্পষ্ট আঘাত কবতে পাবে? যে-ব্যথা আমি অনুভব কবি কিন্তুপ্রকাশ করতে পাবি না.এবা তাকে মহিমান্বিত কবে তোলে। আমি অবাক হযে ভাবি। তুমি বলো এসব বইযের পৃষ্ঠা তোমাব কাছে একান্তই অসাব। আমি তা বিশ্বাস করি। মিথ্যা ভান কববাব মেযে তুমি নও। কিন্তু অবাক হযে ভাবি তোমার জীবনেব থেকে আমাব জীবন কত পৃথক। কিন্তু আমাদেব দুজনেব পাবিপার্শ্বিক তো এক বকমই ছিল প্রায। ছিল না বিভা?'

—'হ্যাটটা হাতে নিলে যে, উঠবে নাকি?'

—'না, আবো কিছুক্ষণ বসেই থাকব ভাবছি।'

—'এই পাখিটাকে নিযে কী কবি?'

—'আমাকেই দিও।'

—'না, যে জিনিসে আমি নিজেই বিড়ম্বিত—'

—'এক্ষুণি তো দিতে চাচ্ছিলে?'

—'ও, ছেলেমানুষি করে ঢেব ভুল কবে ফেলি। তুমি কিছু মনে করো না।

ভেবো না যে কিছু খাবাপ মনে কবে তোমাকে আমি দিতে যাচ্ছিলাম। এ পাখিটা যে তোমাব ঘাড়েও বোঝা হতে পাবে ভুলেই যাচ্ছিলাম।'

জবাব দেবাব অনেক ছিল, কিন্তু মোক্ষদা চুপ কবে বইল। দেখলাম সে খুব নিবিড়ভাবে কার্পেটেব দিকে তাকিযে ভাবছে। ভাবছিল হয়তো এই বকমই ভুলে যাও তুমি বিভা....কিন্তু তোমাকে যখন আমাব ঘাড়েব বোঝা কবতে চাই তখন তুমি খুব সতর্ক হয়ে ওঠ। একটুও ভুল হয় না তোমার। মোক্ষদা বলে—'একটা কাজ করা যাক বিভা।'

—'কি করবে?'

—'এই পাখিটাকে'—একটু হেসে বললে,—'আমি ফোন করে দেখি।'

—'কোথায?'

—'চিড়িয়াখানায।'

—'সেখানে পাখিটাকে রাখবে?'

সূচীপত্রে যান

—'তা রাখতে পারে।'
—'ওঃ, তাহলে তো খুব চমৎকার হয়।'
—'হ্যাঁ, তোমার দিক দিয়ে সে খুব নির্বিবাদ শান্তির জিনিস হয় বটে—।'
—'পাখিটাও।'
—'এর কী হয় তা অবিশ্যি এর বিধাতা জানেন।'
—'সেখানে আরো ঢের কাকাতুয়া আছে তো ?'
—'তা আছে অবিশ্যি।'
—'তাহলে এক সঙ্গে সেগুলোর সাথে থাকতে পাবে তো ?'
—'তা পারে। কিন্তু তাতে এর বেদনা কতখানি কমবে তা আমিও বলতে পারি না, তুমিও পাবনা।'
—'তা অনেক কমবে।'
—'কীসের জন্য ?'
—'এতগুলো সঙ্গী পেলে।'
—'এই শহর ভর্তি তো আমরা সঙ্গী পেয়েছি। পথে নামলেই হাজার হাজার সঙ্গী,' একটু কেশে বললে—'কিন্তু আশ্বাস কোথায় ?'
—'কাকাতুয়াটা অবিশ্যি তোমার মতন ভাবে না।'
—'জীবন সম্বন্ধে এর ধারণা আমার চেয়ে ঢের উজ্জ্বল ?'
বিভা—'তাই তো মনে হয়।'
—'তা হবে।'
—'চিড়িয়াখানায় একটা কাকাতুয়া-ঘর আছে নাকি ?'
—'চিড়িয়াখানায় আমি যাই নি শিগ্‌গির!'
—'আমিও না।'
—'মনে পড়ে যেন বছর তিনেক আগে অনেকগুলো কাকাতুয়া দেখেছিলাম।'
—'একটা ঘরে ?'
—'হ্যাঁ, তা ছাড়া বাইরেও আছে।'
—'কোথায় ?'
—'এক-একটা গাছের নীচে এনে রাখে। এমনি বড় বড় ওয়াণ্ডারফুল কাকাতুয়া সব। মাছরাঙার চেয়েও পালকের রঙের বৈশিষ্ট্য ইন্টারেস্টিং।'
—'গাছের নীচে এনে রাখে ?'
—'দিনের বেলা তাই করে।'
—'কিসের জন্য ?'
—'যাতে সবাই দেখতে পাবে!'
—'তিন বছর আগে দেখেছিলে ?'
—'হ্যাঁ, এখন উজাড় হয়ে গেছে কিনা কে জানে ?'
—'চিড়িয়াখানায় একবার গেলে হত।'
—'তুমি শিগ্‌গির যাও নি বুঝি ?'
—'না।'
—'যেও।'
—'বরাবরই মনে হয় কলকাতায় বিশেষত্বহীন কোনো জায়গা যদি থাকে তো এই চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এইসব। ছোটবেলায় বারবার দেখে-দেখে এইরকম একটা ধারণা হয়ে গেছে। কিছুতেই তাই আজকাল আর যেতে চাই না। কতবার কত লোকে সাধল।'
—'যেও।'
—'তবুও এই আট-দশ বছর হল যাই নি।'
—'যেও।'
—'কলকাতার চিরপরিচিত জায়গাগুলোই আবার এক-একবার করে দেখব ভাবছি।'
—'হ্যাঁ, দেখা উচিত।'

সূচীপত্রে যান

—'তুমি যাও ?'
—'আমি মাঝে-মাঝে ফুটপাথে ঘুরি।'
—'কিসের জন্য ?'
—'এই বত্রিশ বছব তো কলকাতায আছি। তবুও নানাবকম নতুন জিনিস চোখে পড়ে যায।'
—'ফুটপাথে ?'
—'ফুটপাথেও।'
—'নতুন জিনিস ?'
—'কিংবা পুবনো জিনিসগুলোই যেন কেমন বিচিত্র অনুভূতি জাগায।'
—'আমিও ঘুরে দেখলে পারতাম।'
—'পারই তো।'
—'একটা মোটর নিযে।'
—'না। হেঁটে দেখলেই ভাল।'
—'দুপুববেলা।'
—'কিংবা বাতে যদি বেড়াতে পার, সাবাবাত তাহলে।'
—'সে সুবিধা তো আমাব নেই।'
—'সুবিধা তৈবি করে নিতে হয। তুমিও তো আমাব মতন মানুষ।'
–'অবিশ্যি আমাব বাবা যদি সাবাবাত আমাব সঙ্গে হাঁটতে বাজি হন তাহলে একবার কলকাতাব অলিগলি বেড়িযে দেখতে পাবি।'
—'তোমাব বাবার সঙ্গে ?'
'হ্যাঁ।'
—'তা হলে বেশ হয। এই পৃথিবীতে তোমাব সম্পূর্ণ দাযিত্ব নেওযাব মতও ঐ একটি লোককেই তো দেখতে পাই। আমবা কারু দাযিত্ব নেই না, আমবা একা-একা বেড়াই।'
—'নাও না বুঝি ?'
—'না।'
—'তোমাব ছোট বোন যদি তোমাব সঙ্গে বেড়াতে চায ?'
মোক্ষদা একটু আঘাত পেযে ঢোঁক গিলে বললে—'আমাব ছোট বোন? না, আমার ছোটবোনও আমাব সঙ্গে ও-বকম বেড়াতে চাইবে না।'
—'কেন ?'
—'আমাব ওপর সম্পূর্ণ নির্ভবতা নেই তাব।'
বিভা কোনো জবাব দিল না।
মোক্ষদা—'সে কী ভাবে? আমি তাকে পথে ফেলে কোথাও চলে যাব? বক্ষা কবতে পাবব না? ব্যবহারে আমাব সহানুভূতি নেই? না, এ সব কিছু ভাবে না? ভাবে ববং অন্য একটা কথা। কী ভাবে জান বিভা ?'
বিভা চুপ কবে ছিল।
মোক্ষদা—'ভাবে যে আমাকেই সে সহানুভূতি কবতে পাববে না। সাবাবাত আমার সঙ্গে পথে পথে হেঁটে একটুও জমবে না তাব।'
'কিন্তু তোমাব তো কোনো ছোটবোন নেই।'
—'যদি থাকত, তা হলে এইবকম ভাবত।'
—'তোমার কল্পনা বেশ আছে।'
—'কিন্তু আমাব কল্পনা বাস্তবেব ওপব তৈবি।'
বিভা একটু কাশল।
মোক্ষদা—'যা অসম্ভব, অবাস্তব, মানুষেব সঙ্গে কথা বলতে গিযে সে-সব উপদান আমি দূবে সরিযে বাখি।'
—'ছোট বোন নেই অবিশ্যি তোমার।'
—'তাই জানি।'

সূচীপত্রে যান

—'কিন্তু অন্যরাও তো তোমার বোনের মত হতে পারে।'
—'নারী মাত্রেই পারে।'
বিভা আবার কাশল।
মোক্ষদ—'একজন পরিচিত পুরুষকে ভাই ডাকা সবচেয়ে সহজ।'
—'একজন নারীর পক্ষে ?'
—'হ্যাঁ।'
—'তা খুব স্বাভাবিক অবিশ্যি।'
—'এবং সবচেয়ে নিরাপদ।'
—'নিরাপদ ?'
—'সমস্ত গোলমাল সেইখানেই ঢুকে গেল কিনা।'
—'গোলমাল ?'
—'নারীপুরুষের সম্পর্কটাই একটা গোলমালেব জিনিস। যে পর্যন্ত না একটা মীমাংসা হয়।'
—'কেউ কেউ তা মনে করে।'
—'কিন্তু যখন বুঝলাম সে আমার বোন, আমি তার ভাই, তখন গোলমাল মিটে একটা মীমাংসা হয়ে গেল।'
—'বেশ সুন্দর মীমাংসা তো।'
—'নিশ্চয়ই। পুরুষদের চেয়েও নারীরা এ মীমাংসাকে আবো সুন্দব মনে কবে।'
—'তা ভাল কথা নয় কি ?'
—'এবং এইসব মীমাংসার জন্যই তারা সবচেয়ে বেশি করে তৈরি।'
—'কেনই-বা থাকবে না? এ সম্বন্ধ তো খুব নির্মল।'
—'এবং খুবই শাদাসিধে।'
বিভা একটু কাশল।
মোক্ষদা—'এ সম্বন্ধ পাতাতে গিয়ে কোনো আবিষ্কারেবও দবকাব হয় না।'
—'আবিষ্কার? কী বকম অবিষ্কাব ?'
—'মানুষেব জীবনেব ভেতব প্রবেশ কবে ?'
—'কোন মানুষের ?'
—'যে পুরুষটিব সম্পর্কে সে নাবীটি আসছে সেই পুরুষ মানুষেব ?'
—'কী দরকার তাব জীবনটাকে তালাশ কবে দেখবাব ?'
—'নাবীরা তা দবকার মনে কবে না।'
—'কেনই-বা মনে কববে? মানুষকে সহানুভূতি করতে গিয়ে তাব ভেতরেব খবব ঢেব বেশি জানবার দবকাব আছে কিছু ?'
—'না, তা দরকার নেই। বোনবা ভাইকে ভাই বলেই সহানুভূতি কবে। সে বস্তুত কী তা ভেবে দেখতে যায় না। সে ভাবে এইই যথেষ্ট।'
—'যথেষ্টই তো।'
—'খুব।'
বিভা একটু কাশল।
মোক্ষদা—'বোনভাইযেব সম্পর্কটা তাই বড় মজাব।'
—'কী বকম ?'
—'পবস্পর পরস্পরেব গোপন যন্ত্রণা বোনবা কোনো খবব রাখে না।'
বিভা চুপ কবে রইল।
মোক্ষদা—'কিম্বা গোপন আনন্দ অমৃতও পবস্পরের নিজেদেব জিনিস। কেউ কাউকে জানানোর দরকার মনে করে না।'
বিভা কোনো উত্তব দিল না।
মোক্ষদা—'সহানুভূতিব ধারাই হচ্ছে এ রকম। এব ভিতর স্বাভাবিকতা আছে, কিন্তু সাহস নেই।'
—'সান্ত্বনা আছে, আশ্বাস আছে।'

—'কিন্তু স্বপ্ন নেই।'
—'শান্তি তো আছে।'
—'কিন্তু আনন্দ কী? অমৃত কোথায় ?'
—'কী চাও তুমি।'
—'আমি ?' মোক্ষদা ঘাড় ভরে একটু হাসল।
—'হাসছ যে ?'
—'আমি আশ্বাস চাই না কারু কাছ থেকে।'
—'চাও না ?'
—'তাব বদলে একটু উল্লাস পেলেও হত।'
বিভা তার আঁচলেব পাড় ধবে ঘাড় কাত কেব ভাবছিল।
মোক্ষদা—'কেউ যদি আমাব সঙ্গে কলকাতাব খেলা নিযে বসত, তাব সৌন্দর্যও বেশ চিত্তাকর্ষক হত।'
—'কী যে বলো তুমি।'
—'কিন্তু নারী যখন এল আমার জীবনে, এল যেন আমাকে নিবাশ্রয় পেযে বক্ষা করতে। রক্ষা কববাব মাধুর্যটুকু তাব, সে দাক্ষিণ্যময়ী, স্নেহশীলা। আমার জন্যও তাব জীবনেব বেদন খুঁজে আর-একটা নীড় সে বেব কবে দিতে পাবে, আমি যেন আবাব আব একটা ডানাভাঙা পাখিব মত। এ সবেব ভিতর ঢের মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু কোনো সাধেব কথা নেই তো।'
বিভা একটু কাশল।
মোক্ষদা—'মানুষকে আশ্বাস দেওযাই কি তোমার কাছে সবচেযে বড় জিনিস বিভা ?'
বিভা চুপ করে বইল।
—'ধরো, আমার মত মানুষকে ?'
—'কী জানি!'
—'আঃ' আবাব কেমন ঘাবড়ে গেলে যেন তুমি ?'
—'আমি ভাবছি।'
—'আচ্ছা বেশ, ভেব, বলো।'
—'না, সে কথা ভাবছি না আমি।'
—'তবে কী ?'
—'থাক। তুমি কী জিজ্ঞেস কবছিলে ?'
মোক্ষদা বললে—'আমাব মতন মানুষেব জন্য বযেছে তোমাব সান্ত্বনা ?'
—'সে সান্ত্বনা তুমি শেষ পর্যন্ত কত দূব মেনে নেবে তা তোমাব জীবনবিধাতাই জানেন।' কিন্তু তোমাব আশ্বাস সান্ত্বনা করুণা দযা আমাব জীবনেব কাজে খুব লাগবে।'
—'আমার জীবন সম্পর্কে তোমার কাজ এই বকম ?'
—'আমবা দিতে বাজি, কিন্তু তোমবা তো গ্রহণ কব না।'
—'কী দাও দেখে নিতে চাই।'
—'নাবীব কাছ থেকে দয়া দাক্ষিণ্য এ রকম পেতে খুব ঘৃণা কর তো তুমি ?'
—'না, মাযের কাছ থেকে এ সব পেতে ভালই বাসি।'
—'তারপব ?'
—'তাবপর, আমাব কোনো বোন ছিল না।'
—'থাকলে ভাল হত নাকি ?'
—'হ্যাঁ। কিন্তু বত্রিশ বছব বযসে বোনেব আশা কবি না। আমাব মাও গেছেন মরে।'
বিভা একটু কাশল।
মোক্ষদা—'বোন যদি আমাব থাকত, তাহলে তাব স্নেহমমতা জীবন পেতে গ্রহণ কবতাম।'
সকলেই তো তা করে।'
—'বাস্তবিক, এই পৃথিবীর কোনো নাবীরই মমতা দাক্ষিণ্যকে ঘৃণা করি না। সে বড় মূল্যবান জিনিস।'

সূচীপত্রে যান

—'কিন্তু এতদিন তো বলতে এগুলো উপেক্ষার জিনিস।'

—'তোমাব কাছে এসেই বলতাম শুধু, তোমার কাছে এসে মনে হত মাযের বোনের স্নেহসান্ত্বনার জগৎ পিছে ফেলে এসেছি।'

মোক্ষদা—'তোমাব এ ঘবে ঢুকে মনে হত এ জগতেব বিচিত্রতা আব-এক বকম।'

বিভা চুপ কবে রইল।

মোক্ষদাও নিস্তব্ধ।

একটু পরে সে বললে—'তোমার যে সাহস নেই তা নয়।'

—'কী রকম সাহস ?'

—'নারীব যা সচবাচব থাকে।'

—'কেন থাকবে না।'

—'তাই তো বলছি আছে; স্বপ্নও আছে, সাধও আছে, কিন্তু এ সব তোমাব বুকেব ভেতব প্রতীক্ষা কবছে।'

—'না জানি তুমি কি মনে কর।'

—'কিন্তু এ সব যখন উদ্‌ঘাটিত হবে, কিংবা হচ্ছে যাব কাছে, সে তোমাব তখনকাব সৌন্দর্য ও প্রাণের অপরূপ রূপান্তর দেখেছে না জানি কতদূর চমৎকৃত হয।' জানালাব দিকে তাকিযে বললে,—'যে-সব নারীর জীবনে এই অশ্রুতপূর্ব পবম মুহূর্ত দেখবাব জন্য বুভুক্ষু মানুষেব কত বেশি সাধ তাবা মানুষকে বুভুক্ষুই রেখে দেয। যাদের কোনো স্বপ্ন নেই সাধ নেই সেই সব মানুষকেই কবে জবিনেব সঙ্গী।' বললে—'এ ঠিকই কবে। এ না হলে জীবনের তামাসা সম্পূর্ণও যে হয না। কিংবা চমৎকৃত হবাব শক্তি কি তার আছে ?'

একটু থেমে বললে—'সাধারণত যে-সব পুরুষ নাবীব আদরেব জিনিস হয তাদেব না থাকে কল্পনা, না থাকে কোনো বোধ, না থাকে আনন্দ পাবাব অনুভূতি,' একটু কেশে বললে—'আমি ঢেব দেখেছি, একটা জানোযাবেব চেযে তারা কোথাও পৃথক নয, সেই জন্যই তাদেব নাম পুরুষমানুষ।' বললে—'পৃথিবীর প্রেমিক যাবা, তাদেব প্রেম থেকে বঞ্চিত কবতে হয। যাবা প্রেম চায না, তাদের লালসার জগৎ থেকে ফিবিযে দিতে হয। নইলে হাহাকাবের সৃষ্টি হবে কী করে ?' বললে-'আকাশটাকে ব্যথা ও বিড়ম্বনাব বিশ্বাসে ভরে দিতে না পাবলে সৃষ্টিব সার্থকতাই-বা কোথায ?'

—'কিন্তু এই সবেব ভিতব থেকেই বড় প্রেমিক, বড় কবি, মহৎ মানুষেব সৃষ্টি হয। আশ্চর্য! এই জিনিস যখন দেখি তখন কল্পনাকে তৃপ্ত কববাব জন্যও একজন বিধাতাকে সৃষ্টি কবতে ইচ্ছে কবে, মনে হয এত নিষ্ফলতা ও অন্ধতাব নিগূঢ় উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত এই ছিল? সমস্ত দিনেব সমস্ত গতিবিধি, ন্যায অন্যায বিচার অবিচাবকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে কবে তাবপব।' বলে হ্যাটটা কুড়িযে নিযে আবাব আঁটল।

বিভা—'যাচ্ছ ?'

—'না, যাই না।'

ববং ভাল কবে স্থিব হযে বসল মোক্ষদা। বললে—'সব নারীই অবিশ্যি তোমাব মতন নয।'

—'কী বকম ?'

—'এমন একটি মেয়েমানুষ আমি খুব কম দেখেছি।'

বিভা চুপ কবে বইল।

—'নারীরা সাধাবণত ভান পছন্দ কবে।'

—'করে কী লাভ ?'

—'তাদেব লাভ তাবা বোঝে। তোমাব কোনো লাভ নেই। জীবনটাকে পথে জয কববাব কোনো সাধ নেই তো তোমাব। যথাসমযে যথাবিধি দাম্পত্যতৃপ্তি, ও তাবপর অনেকখানি নির্বিবাদ শান্তি, এই পেলেই তোমাব হয।'

বিভা কোনো কথা বললে না।

মোক্ষদা—'কিন্তু তুমি যদি একটু জয কবতে চাইতে তাহলে আমাব লাভ ছিল। কতকগুলো দিন বেশ একটু নেশায কেটে যেত।'

বিভা ঘাড় হেঁট কবে রইল।

মোক্ষদা—'জীবনে এই নেশাব বেশ দবকাব, এই বত্রিশ বছব বযসেব জীবনেও।'

সূচীপত্রে যান

'কাকাতুযাটা খুব মোলাযেমভাবে নালিশ করছিল।'

মোক্ষদা—'কে জানে এই নেশা আমি বুড়ো বযসেও হয়তো ছাড়তে পারব না। এক একজন মানুষ থাকে নারীকে ঘৃণা করে, তার দযাদাক্ষিণ্যকে করে বিদ্রূপ। কিন্তু সে যদি প্রেম দিতে চায় তা হলে আজীবনেব শেখা বাস্তব জীবনেব সমস্ত নির্মম নীরস মূলসূত্র এক মুহূর্তে ভুলে যায।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'আমাব মনে হয আমিও শেষ পর্যন্ত সেই জাতেব পুরুষ হযে দাঁড়াব নাকি ?' বড় বড় চোখ তুলে বিভাব দিকে তালাক মোক্ষদা। বললে—'হযতো তাই হব, কিন্তু এখনই তেমন' একটু থেমে বললে—'আমার এ জীবনেব ইতিহাস তা হলে নারীব থেকে, নাবী ও প্রেমেব থেকে প্রেমে বিচবণ করে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ফলতা ও হতাশা। জীবনের আমাব মেক্‌আপটা বেশ সুন্দব। কিন্তু এব থেকে যদি বড় কাব্য বড় প্রেম গভীব মনুষ্যত্ব ফুটে বেবয তাহলে হযতো হত। কাব্য অবিশ্যি কোনোদিন তৈবি কবতে পাবব না, কিন্তু বড় প্রেমিক বা মহান মানুষ ইতিহাসেব পৃষ্ঠাব বাইবে যদি কোথাও থাকে, আমার মনে হয ঢেব ঢেব বযেছে, তাহলে একদিন তাদেব দলে যেতে পাব আশা কবি।'

ডাকলে—'বিভা!'

—'বলো।'

—'চুপচাপ যে ?'

—'এমনিই।'

—'শোনো, তোমাকে ভালবাসাব আগে আবো তিন-চাবটি নাবীকে পব পব ভালবেসে ছিলাম।'

কোনো কথা বললে না মেযেটি।

একটু চুপ থেকে মোক্ষদা বললে—'প্রত্যেকবাবই বুঝতে পেবেছি ভুল ঠিকানায নেমেছি, যে-মানুষকে তারা চায, কল্পনার আদর্শ মানবাত্মা তাকে যতই অমানুষ মনে করুক না কেন, নারীদের কাছে সে দেবতা। প্রত্যেক বারই মনে হযেছে ভালবাসতে গিযে যে আঘাত পেলাম এ বুঝি কাটিযে উঠতে পাবব না আব, এই নাবীটিব স্বপ্ন নিযে মৃত্যু অবদি কেটে যাবে আমাব। কিন্তু সমস্ত প্রেম স্বপ্ন সৌন্দর্য ও নাবীব চেযে জীবনেব নিববচ্ছিন্ন অনিযন্ত্রিত স্রোতেব ধাবা ঢেব বেশি সজীব। সেই সব নারী কিংবা তাদেব ঘিরে যে প্রণয স্বপ্ন সৌন্দর্য বেদনা জেগে উঠেছিল আজ সে সবের চিহ্নও যেন কোথাও দেখতে পাই না। জীবন এমনি সমুদ্রেব মত। এ সমুদ্র এমনি করে ভেঙে ফেলে সব। এ জন্যও বিধাতাকে প্রাণের কল্পনা চবিতার্থ করে তৈবি কবতে ইচ্ছা করে, তাবপব ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা কবে তাকে।' মোক্ষদা উঠে দাঁড়িযে বললে—'তুমি, তোমাব সৌন্দর্য, আমাব বর্তমান প্রেম ব্যথা, দুদিন পবে আমাব নবজীবনেব সূচনাব প্রান্তে, বা বাত্রিতে, দুঃসহ স্মৃতিব মত এসে আমাকে ব্যথা দেবে না আব। মানবজীবনেব গতিব উপব যদি নির্ভব কবি, সকলকেই নির্ভব কবতে হয, তাহলে সে গতি মানুষকে এই ধবনেব সাহায্যটুকু সব সময দেবাব জন্য খুবই প্রস্তুত। আমি অবিশ্বাসী, কিন্তু জীবনেব এই মধুব বিস্মৃতিব মান আমি খুব শ্রদ্ধাব সঙ্গে বিশ্বাস কবি। এ আমাব খুব উপকাবে লাগে।'

—'সকলেবই উপকাবে লাগে মুক্ষিদা।'

—'তোমাবও ?'

—'প্রত্যেকেই তো অনেক জিনিস ভুলতে চায।'

—'বেশ। জীবনেব কাছ থেকে ঢেব সাহায্য পাবে।'

—'যা আমি জানি।'

—'প্রেম অবিশ্যি আমবা সকলেই কবি।'

—'নিশ্চয।'

—'একবাব দুইবাব তিনবাব—'অনেকবাব, কী বলো!'

—'তাই তো ব্যবস্থা।'

—'আঘাতেও পাই? সকলেই ?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

—'এবপব তোমাকে খুব শ্রদ্ধা কবতে ইচ্ছা কবে।'

বিভা একটু হাসল।

—'তোমাব সৌন্দর্যেব জন্য নয, তোমাব আশা অনিচ্ছা করুণা দক্ষিণাব জন্যও নয বিভা।'

কাকাতুযার কোমল নালিশটুকু কারো কানে গেল না।'

মোক্ষদা—'তুমি যে গোপনে গোপনে কতবার কতজনকে ভালবেসেছ, ভালবাসাও পরাজিত হয়েছে, ব্যথা পেয়েছে, তাবপর ভুলে গেছ সব, এই সব মাধুর্যের জন্য তোমাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে এখন।' এক পা হেঁটে মোক্ষদা—'আমার মনে হয এই যে শ্রদ্ধা তোমার প্রতি আমার, আমার মনে হয় এ যেন আমার ভালবাসার চেযেও ঢের বেশি গভীর পূজার জিনিস।'

—'চললে ?'

—'না।'

মোক্ষদা কয়েক পা হেঁটে ফিরে এসে—'এখন তুমি আমাকে ভাই মনে করতে পাবো, আমিও তোমাকে বোন মনে কবব, কোনো কুণ্ঠা নেই আজ।'

—'বসো, সোফায বসো, দাঁড়িয়ে কেন ?'

—'না যাই।'

—'বসো।'

—'আসবই তো, আবাব আসব ফিরে।'

—'বসো।'

—'একটা নতুন সম্পর্ক নিয়ে ফিরে আসব। যে-মেযেটিকে এতদিন প্রণযিনীর মত ভালবেসেছিলাম সে আমার বোনের মত হল এই নূতনত্ব নিযে।'

—'বসো।'

মোক্ষদা বসল।

বিভা—'জীবনে আমি ব্যথা পেয়েছি এ কথা তুমি একদনিও বিশ্বাস কব নি ?'

—'না।'

—'কী ভেবেছিলে ?'

—'ভেবেছিলাম ভালবাস নি কাউকে। বাসলেও তৃপ্তি পেযেছ শুধু। তুমিও যে আবাব বিবহিণী এ কে কল্পনা করেছিল। অবিশ্যি বিচ্ছেদ এখন গতজীবনের জিনিস, ব্যথা আব নেই, কিন্তু পেযেছিলে তো। বার বার পেযেছিলে। বারংবাব ভালবেসে! আশ্চর্য তুমি বিভা!'

—'যদ্দিন বেদনা পাই নি মনে করেছিলে'-বিভা চুপ কবল।

মোক্ষদা—'হ্যাঁ। ততদিন তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু সহানুভূতি কবতে পারি নি।'

—'পার নি তুমি ?'

—'না।'

—'কেন ?'

—'তোমাকে বড্ড দূব বলে মনে হত।'

—'কোন হিসেবে।'

—'নারী হিসেবে তোমাকে খুব আকাঙ্ক্ষাব জিনিস মনে হত, কিন্তু এক এক সময তামাসাব মুহূর্তে কখন মনে হত তুমি নারীও শুধু নও, জীবনের বিচারে মানুষ বলে প্রমাণ কববারও দবকাব আছে তোমার, তখন কেমন যেন অশ্রদ্ধা হত তোমাব ওপব।'

—'মনে হত জীবনেব কাছে আমাব নিজেকে পরের প্রণযপাত্রীবলে দাঁড় কবাবার শক্তি আছে শুধু ?'

—'হ্যাঁ। তাই ভাবতাম।'

—'কিন্তু বেদনাতুর মানুষেব'—বিভা একটু থামল, বললে—'কিন্তু বেদনাতুর মানুষের সার্থকতা আমি পাই নি; এই মনে হত।'

—'হ্যাঁ।'

—'সেইজন্য ভালবাসার মোহ ছিল বুঝি তোমাব মনে! আমাব জন্য ?'

—'হ্যাঁ বিভা।'

—'কিন্তু বিশেষ কোনো সমবেদনা বোধ করতে না আমার জন্য ?'

—'মনে হত আমাব ভালবাসার নেশা কেটে গেলে তুমি অপ্রাসঙ্গিক হযে দাঁড়াবে। প্রেম নিযে নারী নিয়ে আগেও ঢের অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা জীবনে।'

—'তা ঠিক। কিন্তু আমাব জন্য কোনো সহানুভূতি বোধ কবতে না ?'

—'সাধারণ মানষের জন্য যতটুকু করি তার বেশি না।'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদা—'সাধারণ মানুষের জন্য আমার যা সহানুভূতি তা অন্য যে কোনো সাংসারিক স্বাভাবিক মানুষের মত। কাজেই বিশেষ কোনো জিনিস নয়, অনেক সময় কোনো কাজেও লাগে না।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা,—'কিন্তু সহানুভূতিটুকুও তোমাকে শিগ্‌গিব দিতে পারতাম না। অনেক দিন পর্যন্ত একটা অবজ্ঞার ভাব থাকত।'

এই বলে মোক্ষদা থামল। একটু কেশে বললে—'দেখো, সেই যে একটি মেয়েমানুষের কথা বলেছিলাম তোমাকে তাদেব কথা মনে হলে আজও কেমন একটা উপেক্ষা, মাঝে-মাঝে অবজ্ঞার ভাবও, আসে আমার মনে।'

বিভা একটু কাশল।

—'আজও তাদেব সাধাবণ মানুষের মত সহানুভূতি কবতে পারছি না আমি।' মোক্ষদা—'কেন জানো ?'

—'বলো।'

—'তাদের ভালবাসতে গিয়ে নিষ্ফলতাব আঘাত পেয়েছি বলে নয়।' হ্যাটটা মাথাব ওপব থেকে খুলে মোক্ষদা—'না সেইজন্য নয়। কিন্তু ববাবরই মনে হয়েছে এই যে প্রেমকে নিয়ে বরাবরই তারা একটা শৌখিন খেরা খেলল। প্রেমকে পূজাব জিনিস বলে বুঝল না কোনোদিন। কিন্তু এসবও ক্ষমা করতে পারা যায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অপবাধ তাদেব এই যে নিবিড়, আন্তবিক বেদনাব আঘাত পেল না কোনোদিন। মানুষের জীবনের হাহাকারকে বুঝলে না।'

মোক্ষদা একটু থেমে বললে—'সেইজন্য আজও যখন তাদেব কথা মনে হয়, কেমন একটা উপেক্ষার ভাব আসে, পথেব পাশের একটা জুতাবুরুশকে আমি যতদূব সহানুভূতি করতে পাবি তাদেব তা পাবি না।'

একটু হেসে মোক্ষদা বললে—'একজন জুতাবুরুশ কিংবা যে কেবানিব জুতো সে বুরুশ কবে দিচ্ছে, এদেব দুজনকেই যেন ভাল লাগে আমাব। কাবণ জীবনটাকে পদে পদে একটা আঘাতেব জিনিস বলেই তাবা জানবাব অবসব পায়, বেঁচে থেকে মানুষেব জীবনেব মর্মান্তিক অবিচারেব স্রোতে তারা ভাসতে থাকে, বোঝে যে জীবন মানে এমনি ভেসে চলা—'

মোক্ষদা একটা চুরুট বেব কবল পকেট থেকে।

বিভা—'ভালবেসেছি, ভালবেসে ব্যথাও পেয়েছি, কিন্তু তাই বলে বেদনা অবিচাবেব স্রোতে ভেসে চলেছি বলে মনে করি না।'

—'কিন্তু ভাল তো বেসেছ ?'

—'হ্যাঁ।'

—'ব্যথাও পেয়েছ, ভালবাসতে গিয়ে ?'

—'তাও পেয়েছি।'

—'হয় তো বাববারই পেয়েছ ?'

—'তুমি তো শুনলেই।'

—'তবে আব কি? এটুকু বুঝতে পাবলেই আমাব পক্ষে যথেষ্ট, তাবপর তোমাকেও আমি অন্ধ জীবনস্রোতের জীব বলে মনে কবি। সাধাবণ বেদনাতুব মানুষেব মহিমা বোধ করি তোমাব ভিতব। তোমাকে আমাব সমস্ত আন্তরিক সহানুভূতি জানাতে গিয়ে একটুও কুণ্ঠা থাকে না।'

চুরুটটা পকেটের ভিতব ফেলে দিয়ে মোক্ষদা—'তুমি অবিশ্যি মনে কবতে পার যে-হতাশা ও ব্যথা তুমি পেয়েছে সে-সব হল পায়ের তলে জিনিস-হৃদয় দেখবে নক্ষত্রেব স্বপ্ন। বেশ। এ নিয়ে আমিও খানিকটা কবিতা করতে পারি। কিন্তু বাস্তব জীবনে তোমাব সঙ্গে ব্যবহারে এ সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক জিনিস, প্রযোজনীয় সত্য হচ্ছে তোমাব প্রেম ও যাতনাব কাহিনী।'

—'প্রেম কি সকলকেই বোধ করতে হবে? পুরুষ নারীর এই প্রেম ?'

—'এ তো একটা কর্তব্য নয় বিভা, খুব মহিমার জিনিস। সব সাধারণ অসাধারণ মানুষই তা বোধ করবে।'

—'কিন্তু যদি কেউ বোধ না করে।'
—'তাহলে সে আমার সহানুভূতি পাবে না।'
—'যদি কোনো পুরুষ বা নারীকে না ভালবেসে কেউ পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের ভালবাসতে যায়।'
—'সেটা একটা অবাস্তব জিনিস।'
—'অনেক বড় বড় লোক তো তাই করেছেন।'
—'সে সব মাতলামির গল্পে আমি বিশ্বাস করি না।'
—'কত সুন্দর সুন্দর কবিতা তো আছে এই নিয়ে।'
—'সেগুলোর যদি ছন্দ ভাষা ঠিক থাকে তাহলে সে সবের ভেতের ঐটুকু মাত্রই সত্য।'
—'কিন্তু এ সব কবিতা আমি তো খুব পড়ি।'
—'পড়ো।'
—'ভাল লাগে খুব।'
—'ভাল কথা।'
—'মুখস্তও করি।'
—'কবিতা আমিও মাঝে-মাঝে মুখস্ত করি-আওড়াতে বেশ সুন্দর লাগে বলে।'
—'না, সেজন্য নয়; আমি খুব গভীর ভাবে বিশ্বাস করি।'
—'এসব কবিতা?'
—'হ্যাঁ।'
—'তোমার জীবনের সামঞ্জস্য এতে বেশ বজায়ই থাকে।'
—'কী রকম?'
—'কিছু মনে করে না। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার জীবন বিধাতার একটি নিগূঢ় ঠাট্টার জিনিস তুমি। ঠাট্টা তুমি ধরতে পার না বলেই আমার কাছে তা আছে। মর্মান্তিক বলে মনে হয়।'

বিভা একটু কাশল। পরে হাসতে হাসতে বললে,— 'কী যে ভাব!'

—'জীবনটাকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে দেখো। একদিন হয়তো বা আমার কথার স্বার্থকতা বুঝতেও পারবে।'

—'তোমার ঠাট্টাটা তো আজই বুঝতে পারছি।'

'আমি অবশ্যি ঠাট্টা করছি না; তোমার জীবনের এই গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আমি সত্য কথাই বলছি বিভা।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'যারা বলে জীবন অপরাজেয়, চারদিককার নিষ্ফলতা ও বেদনার ভিতর যারা চলেছে জীবনকে জয় করতে, গঙ্গাফড়িং যেমন সমুদ্রকে জয় করবার জন্য যাত্রা করে, সমস্ত হতাশা ও অন্ধকার ভেদ করে যারা আশার স্বপ্ন দেখছে শুধু, আমার মনে হয় তাদের জীবনবিধাতা তাদের নিয়ে একটা তামাশার খেলা খেলছে শুধু। সূচ দিয়ে প্রজাপতির বুক ফুটো করে সুতো বেঁধে ছোট-ছোট শিশুরা যেমন করে খেলে।'

—'তাও খেলে নাকি?'
—'খুব।'
—'কোথায় দেখলে?'
—'আমি নিজেই তো কত খেলেছি।'
—'তুমি?'
—'হ্যাঁ, যখন ছোট ছিলাম, চার দিককার অন্ধ জীবনের তালে তালে আমার এখনকার মনের স্পন্দনই ছিল সবচেয়ে বেশি সঠিক,' মোক্ষদা মাথায় হ্যাট এঁটে বললে—'এখন শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার পেয়ে নিজের হৃদযটাকেও প্রজাপতির মতন ফুটো করে ফেলতে শিখলাম। চারদিককার বুকের বেদনা দেখে এলাম অস্থির হয়ে।' পকেটের থেকে চুরুট বের করে বললে—'এর কোনো প্রয়োজন ছিল বিভা? সেই ছোটবেলার জীবনই তো বেশ ছিল। চারদিককার গাছপালা পাখি এবং ফড়িং জোনাকির চেয়ে জীবনের কোথাও কোনো প্রভেদ ছিল।' চুরুট জ্বালাল। কিন্তু জ্বালিয়েই নিভিয়ে ফেলে বললে-'আমাকে ক্ষমা কর।'

—'কেন? যাও তুমি, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

চুরুটটা পকেটের ভেতর রেখে দিয়ে মোক্ষদা—'দেখ একটা ঘুঘু পাখির সমানে বসে আমি কখনো ছারপোকাও মারতে যাই না।'

বিভা হেসে উঠল।

মোক্ষদা—'সত্যি।' উঠে দাঁড়াল।

বিভা—'চললে ?'

—'না। চলব কোথায়? তোমাদেব এই পাশেব ঘরে একটু যাচ্ছি।'

—'কেন ?'

—'ফোন করবাব জন্য।'

—'কাকে ?'

—'চিড়িয়াখানায়।'

—'ও, ভুলেই গিয়েছিলাম। কাকাতুযাটাকে তারা নিতে পারে।'

—'তা পারে।'

—'কিন্তু পাখিটাকে ছাড়তে ইচ্ছা হয না।'

—'এই না বললে এব একটা ব্যবস্থা কবতে!'

—'বলেছিলাম তো। কিন্তু এখন তো আব চিৎকাব কবে বিরক্ত কবছে না!'

—'পাঁচ মিনিট পবেই তোমাকে অতিষ্ঠ কবে তুলতে পাবে আবাব।'

—'দেখো, কেমন করুণভাবে তাকাচ্ছে!'

—'ভেবে দেখো, ফোন করব কিনা ?'

—'পাখিটা ভারি মিষ্টি কী বলো ?'

—'তাহলে আমি যাই, উঠি।'

—'বসো-না।'

—'ফোন অবিশ্যি নিজেও কবতে পাববে, যদি দবকাব হয।'

—'কিন্তু কেনই-বা চিড়িয়াখানায এটা দিয়ে দেব? আমি নিজেই কি এটাকে শান্তিতে বাখতে পাবব না।'

—'শান্তিতে বাখবাব আগ্রহ অবিশ্যি তোমাব আছে।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'ভেবে দেখো।'

—'তুমি যেও না।'

মোক্ষদা কাকাতুযাটাব দিকে তাকিযে বললে—'আমাব মনে হয, তুমি নিজে শান্তিতে থাকতে পাববে না।'

—'এই পাখিটা কাছে থাকলে ?'

—'হ্যাঁ। শুধু চিৎকাবেই যে তোমাকে অতিষ্ঠ কবে তুলবে তা তো নয, তুমি নিজেও বোধ কবি নিজেকে খাঁচাব কাকাতুযা মনে কবে একটা অপ্রাসঙ্গিক যন্ত্রণা অনেক সময়ই অনুভব কববে,' মোক্ষদা—'এও ভাববে, বিধাতা প্রতিটি কোটি কোটি কোটি কীট ফড়িঙেব জন্যও কত মঙ্গলেব ব্যবস্থা কবে রেখেছে। কিন্তু আমি একটা মাত্র পাখিব দাযিত্ব নিযে একে কোনো তৃপ্তি দিতে পারলাম না।'

—'তা তো মনে হয মাঝে-মাঝে।'

—'হ্যাঁ, এই সব ভেবে দুঃখ পাবে তুমি।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'এই সব অবান্তব বেদনা কেন পেতে যাও ?'

—'কী কবব তাহলে ?'

—'একে কিছুতেই তো শান্তি তৃপ্তি দিতে পাববে না।'

—'এ বকম অকর্মণ্য হযে গেলাম কী কবে ?'

—'অকর্মণ্য নয, অনেককে খুব পবিপূর্ণ চরিতার্থতা দেবাব শক্তি তোমার আছে। তাদেব জীবন এই কাকাতুযাটার চেযে ঢেব বেশি জটিল ও গভীর। কিন্তু তবুও তাদেবকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দেবাব অধিকাব তোমার জীবন তোমাকে দিয়েছিল। তুমি অবহেলা কবলে। ব্যস্ত রইলে একটা কাকাতুযা নিযে,' একটু থেমে· মোক্ষদা—'এ বকমই হয, নিছক বেদনা যদি কোথাও থাকত তাহলে তাকে পরাজয কবা

সূচীপত্রে যান

হয়তো-'বা সম্ভবও হত। কিন্তু সঙ্গে তার সব সময়ই বিড়ম্বনা মিশে রয়েছে যে ?'

বিভা একটু চুপ করে থেকে বললে—'তাহলে এই কাকাতুয়া ?'

—'এই কাকাতুয়াটার চেয়ে ঢের বড় জীবন নিয়ে তোমার বসে পড়া উচিত ছিল। হয়তো-বা বসেও গেছ। সেদিককার সফলতা তোমার অবধার্য।'

—'কিন্তু এই কাকাতুয়া ?'

—'হ্যাঁ, এই কাকাতুয়াব মত ছোট জীবন সামলাবার ভার ছোট মানুষদের হাতে। তোমার হাতে নয়। তুমি একে ভাল কবে বুঝবেও না। মমতা মায়ার অপব্যয় করবে শুধু। কিন্তু এর সমস্ত চিনেও খাঁচার জীবনের সম্পর্কে বর্তমানে এব 'কী দরকার, গায় পোক পড়েছে কি না, পালক কেন খসে যাচ্ছে, পা মচকে দেবার প্রয়োজন আছে কিনা, অন্য কোনো কাকাতুযার সঙ্গে যাচ্ছে নাকি, ডিম পাড়তে চায কিনা, হয়তো সন্তানের সাধ বোধ কবছে, এ রকম অনেক, মজাব জিনিস কিন্তু খুব দবকাবি জিনিস। সেইসব ছোট ছোট মানুষদের এলাকায়।'

বিভা মন দিয়ে শুনছিল। বলল—'ঠিকই বলেছ।'

মোক্ষদা ঘাড় হেঁট কবে পাইচারি করছিল।

বিভা—'আমরা এ পাখিটাব মিষ্টত্বটুকু শুধু বুঝি।'

—'কিংবা বুঝি এ বড্ড হাড় জ্বালায়।'

—'একে নিয়ে মাঝে-মাঝে কবিত্ব কবতে পারি।'

—'কিন্তু এক-এক সময এেকে কুকুব দিযে খাওযাতে ইচ্ছে করে।'

—'তা অবিশ্যি কবে না।'

—'আমি ফোন কবে দেই।'

—'চিড়িযাখানায? দাও।'

মোক্ষদা যাচ্ছিল।

বিভা—'শোনো।'

—'কী মতলব হল আবার ?'

—'তাকিযে দেখ তো, পাখিটা কেমন মিষ্টি।'

মোক্ষদা সোফায বসল।

—'মুখে কেমন নিবীহ নিরপবাধ ভাব।'

—'এ বোদেব মধ্যে পাখিটাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে। ভাল লাগছে না?

—'এ বেশ একটা সুন্দব জীব তোমাব কাছে আছে, এই তো ভাবো ?'

—'হ্যাঁ ভাবি।'

—'এ চলে গেলে তোমাব ঘরটা কেমন একটু শ্রীহীন হযে পড়বে। তোমার জীবনটাও। এই তো মনে করো তুমি ?'

বিভা প্রসন্নভাবে হেসে মোক্ষদাব দিকে তাকাল।

মোক্ষদা—'তাছাড়া এই কযদিন একসাথে থেকে মাযাও ধবে গেছে।'

—'এ কথাও আমি ভেবে দেখেছি যে ভগবান এত দিক ঘুবিযে পাখিটাকে যে আমাব কাছেই এনে রাখলেন, এব ভেতরেও কেমন যেন সুন্দব মঙ্গল ইঙ্গিত রযেছে।'

—'সাড়ে তিনশ টাকা দিযে কিনেছিলে ?'

—'হ্যাঁ, দুটো পাখিই।'

—'আর-একটা কই ?'

বিভা একটু চমকে উঠে বললে—'ভুলেই গিযেছিলাম।'

—'আরো একটা কাকাতুযা আছে ?'

—'না, সেটা মযনা।'

—'ও। তাইতো বলেছিলে, মনে পড়েছে।'

—'কিন্তু সেটা নেই।'

—'কোথায় গেল ?'

—'বিড়ালে খেযে ফেলেছে।'

সূচীপত্রে যান

মোক্ষদা একটু চুপ করে থেকে বললে—'ইঙ্গিতেব কথা বলছিলে, এই তো ইঙ্গিত।'

বিভা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—'আমার বড় দুঃখ করে এই কথা ভেবে যে তুমি ক্রমাগত জীবনের সার্থকতার বিরুদ্ধে কথা বল। যে-পাখিটা মরে গেছে তার কথা ভেবে একবাব অপেক্ষা করলে না। তার মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে বিধাতাকে করলে ঠাট্টা।' মোক্ষদা সোফায় নিজের শরীরটা এলিয়ে দিয়ে খুব ভাল ছেলেল মতন হাসতে লাগল।

বিভা—'যাও, ফোন কবো গিয়ে।'

—'কেন?'

—'না। এসব পাখি আমি আব রাখব না।'

—'থাকুক। তোমার কাছেই এবা থাক।'

—'সত্যি বলছি, আমি আর বাখব না।'

—'আমিও তোমাকে ঠাট্টা কবছি না। খুব গভীব বিশ্বাসে আমি বলছি বিভা যে তোমার এই ঘরেই এই কাকাতুয়াটার খুব বেশি ভরসা।'

—'যাই, আমি নিজেই ফোন করি গিয়ে।'

মোক্ষদা সোফার ওপব শুযে পড়ল। খানিকক্ষণ পরে বিভা ফিবে এসে বললে—'নিতে রাজি হযেছে, একটা মোটরে করে পৌঁছিয়ে দিলেই হল।'

—'চলো তাহলে।'

—'চলো।—কিন্তু একবার ভেবে দেখ।'

—'না। কোনো কথা ভেবে দেখতেই আমি আব বাজি নই।'

—'ভেবে দেখো, আজ বাতে—'

—'বাতে কী আবাব?'

—'কী বকম দারুণ শীত পড়বে।'

—'পড়ুক।'

—'পাখিটাব খাঁচাটাকে তুমি কেন কম্বল দিযে মুড়ে রাখতে।'

—'তারা কি রাখবে না?'

—'তাদেব কত পাখি। ভুলেও তো যেতে পাবে। যেখানে এত প্রাণ নিযে কারবার, সেখানে সব সময সকলেব প্রতি ঠিক বিচাব কি হয?'

বিভাব পেশাক পবতে যাচ্ছিল। কিন্তু চুপ করে দাঁড়াল। সোফায এসে বসল আবার। বললে—'কেন আমাব সঙ্গে এ বকম খেলা কর তুমি?'

—'খেলা কবলাম।'

—'জানই তো এবকম কথা শুনলে আমাব কষ্ট হয।'

—'তা তোমার হয। কিন্তু আমি কী কবব? আমাব অপরাধ কোথায?'

—'কেন, মনে করিযে দিতে যাও আমাকে?'

—'বিপদ।'

—'আজ বাতে শীত পড়বে-পাখিটা কম্বল না-ও পেতে পাবে। সাবাবাত শীতে কষ্ট পেতে পারে। নিজের বিচার কল্পনাতে এ সব কথা তো আমি বুঝেও দেখি নি, কোনোদিন মনের ভেতব উঠত কিনা তাও সন্দেহ। কেনই-বা সব খুলে দেখাতে গেলে? এব বকম আঘাত করা তোমাব কি উচিত?'

—'তাই তো।

—'তা হলে বসো।'

—'কেন?'

—'দাঁড়িয়ে থাকাব তো কোনে মানে নেই।'

—'বেবিয়ে যাব না?'

—'কোথায?'

—'দু-পা যেদিকে চালায়—'

—'চিড়িয়াখানায় যাওযা আজ আর হবে না।'

—'নাই-বা হল।'

সূচীপত্রে যান

—'কোনাদিনও হবে না।'
—'বেশ কথা।'
—'তাহলে বসতে আপত্তি কি ?'
—'আমি ভাবছিলাম বাসায় যাব।'
—'বসো।'
মোক্ষদা আবার সোফায় বসল।
বিভা—'বাস্তবিক তোমাকে বকেছিলাম ?'
—'কই ?'
—'কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'
—'কেন ?'
—'তোমাব হাতটা আমাকে দাও।'
ডান হাত বাড়িয়ে দিলে। বিভা মোক্ষদাব হাতটা তাব হাতেব ভেতব নিয়ে বললে—'এই পাখিটাব তুমি কত উপকারী বন্ধু যে এও তা বুঝেছে বোধ কবি, দেখো।'
—'উপকারী বন্ধু ?'
—'তোমাব হাত এত ঠাণ্ডা কেন ?'
—'তোমাবটা বেশ গবম তো।'
—'ঠিক কথাই বলেছ। কম্বল না-ও দিতে পাবত।' মোক্ষদাব হাতটা ছেড়ে দিল বিভা। বললে-'এখন শীতও খুব বেশি। সাবাবাত পাখিটার কী কষ্ট হত, ভেবে দেখো তো।'
মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না।
বিভা—'উঠলে যে ?'
—'না, আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'
—'কী ?'
—'এ পাখিটাকে ছেড়ে দিলেও তো হয।'
—'কোথায ছেড়ে দেবে ?'
—'এই জানালা দিয়ে-'
—'তাহলে হয়তো পাশের বাড়িতে গিয়ে পড়বে, বিড়ালে খেয়ে ফেলবে।'
—'চলো, তাহলে জঙ্গলে ছেড়ে দিই।'
—'জঙ্গল কোথায ?'
—'টালিগঞ্জের ওদিকে।'
বিভা ভাবছিল।
মোক্ষদা—'হ্যাঁ, সেটাই এব পক্ষে সবচেয়ে তৃপ্তিব জিনিস হবে। এই যে চিৎকাব, এ শুধু আকাশে উড়ে ফিববার জন্য।'
কাকাতুযাটার কাছে এগিযে গিযে মোক্ষদা—'এই দেখো, কেমন নিজেব বুকটা কামড়ে জখম করছে।'
—'সত্যিই পাখিটার এ-বকম আত্মনির্যাতনেব প্রতিকাব আমিও কবতে পাবব না। চিড়িয়াখানাব লোকেবাও করতে পারবে না।'
—'একে যদি এক্ষুনি ছেড়ে না দেওযা যায তাহলে দুদিন পবে তুমিই হয়তো তোমার বাবাব সঙ্গে গিযে আলিপুবে দিযে আসবে। সেটা কি ঠিক জিনিস হবে ?'
বিভা মাথা নেড়ে বললে—'তার চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।'
—'যে সংসর্গেব কথা বলছিলাম, স্বাধীন অবস্থাযই তা ঢের বেশি ভোগ করতে পাববে। ডিম পাড়তে পারবে। নীড় তৈবি করবে। সন্তানেব সাধ মেটাবে। তার-পর নীল আকাশ বোদ জ্যোৎস্না তো আছেই।'
বিভা খুব উৎফুল্ল হযে উঠে বললে, 'দাঁড়াও, আমি মোটরটা তৈবি করতে বলি,' ফিবে এসে বললে—'চলো।'
চলছিল। হাঁটতে-হাঁটতে বিভা—'সুদর্শনকে সঙ্গে নেয়া যাক।'

সূচীপত্রে যান

—'কেন ?'

—'একজন চাকব সঙ্গে থাকা ভাল।'

—'এটুকু চাকরের কাজ আমিও কি করে নিতে পারব না ?'

—'সুদর্শনকে ডাকা যাক।'

—'শোনো বিভা।'

—'বলো।'

—'তুমিই তো বলেছিলে কলকাতার ফুটপাথে সাবারাত হাঁটতে পার, যদি তোমার বাবা সঙ্গে থাকে।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে একটু লজ্জিত হয়ে দাঁড়াল।

মোক্ষদা—'এখনকাব প্রস্তাবটাও তোমাব ঠিক তেমনি।'

—'কিছু মনে কবো না।'

—'মনে কবি শুধু এই-যে সাহস তোমাব আছে, কিন্তু সাহসটা খরচ কবতে ভয় পাও। আচ্ছা বেশ। জমিয়ে বেখো। আমি চললাম।'

—'শোনো।'

—'আবার ডাকলে ?'

—'আমাব অপরাধ ক্ষমা কবো।'

মোক্ষদা একটু হেসে বললে—'বলিহাবি তোমাব, এ দু মিনিটেব মৌখিক পবীক্ষাটুকু বেশ পাকা মাস্টাবেব মতই কবে নিলে। বেশ বেশ।'

দুজনে নীচে নেমে গেলে।

এদেব অনুসরণ কবতে হয। আমি একটা ট্যাক্সি কবলাম। ট্যাক্সি কবেছিলাম সে প্রায বার বছব আগে। সেও আমাব কাকাব জন্য। কিন্তু আজ আবাব কবতে হচ্ছে তো। সমস্ত মাসেব হাতখবচেব পয়সা ড্রযাব থেকে গুছিযে নিযে কেবাযা কবে যখন বসেছি তখন বিভাদেব গাড়ি আস্তে আস্তে চলছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভাবকে বললাম—'টালিগঞ্জে যেতে হবে, এই মোটবটাব পেছনে-পেছনে।'

একটা পাড়াগাঁব মত জাযগায গিযে ট্যাক্সি থামল। চারদিকে বাঁশেব, আশ-শেওড়া-ভাঁটের বনজঙ্গল, সুপুবি-নাবকেলেব সাব। দু তিনটে কুঁড়ে ঘব। খানিকটা দূবে একটা একতলা দালান। ট্যাক্সি থেকে যখন নেমেছি কাকাতুযাটাকে ছেড়ে দেওযাও হযেছে। বিভা উড়িযে দিলে।

কাকাতুযাটা উড়ে গিযে একটা ছোট নাবকেল গাছেব ওপব বসল। তাকিযে দেখলাম বিভাব বড় ফুর্তি। বললে—'এ আমাব ডাযবিতে লিখে বাখব।'

মোক্ষদা—'লিখো।'

—'কী শুভ মুহূর্ত-না বলো দেখি।'

—'খুব তো।'

—'একটা চড়াই তো ছেড়ে দিতে পাবা যেত, কিন্তু তাব ভেতব কি এত চবিতার্থতা ?'

—'তা হয না।'

—'অবিশ্যি প্রাণীই তো সব।'

—'তা ঠিক।'

—'কিন্তু এই কাকাতুযাটাকে আমাব মনে হত যেমন একজন দেবতা, কে যেন অভিশাপ দিলে, রূপান্তবিত হল, ম্রিযমাণ হযে খাঁচাব জীবন চালাতে লাগল।'

—'এ কল্পনা তোমার খুব সুন্দব।'

—'কিন্তু এ রকম হওযা সম্ভবও তো ?'

—'সেই সেকালে শোনা যেত।'

—'আচ্ছা, কাছে তো কোথাও কাকাতুযা নেই, ও কী কবে ওব ঘর চিনবে ?'

—'ঘর আপাতত নেই, বানাতে হবে।'

—'কোথায় ?'

—'হিমালযেব দিকে এগুলো থাকে নাকি? ঠিক বলতে পারি না। হয়তো সুমাত্রায় জাভায় বোর্নিওতে।'

সূচীপত্রে যান

—'টেরিটিবাজারের লোকটি বলেছিল, সিঙ্গাপুরেব কথা।'
—'তাও হতে পারে।'
—'অদ্দূর কী করে যাবে?'
—'কেমন সুন্দর দুটো ডানা রয়েছে তো!'
—'কিন্তু উড়ছে না কেন?'
—'অনেক দিনের অভ্যাস নেই কি না।'
—'তাছাড়া এ যে ছাড়া পেয়েছে আমার মনে হয তাও ভাল করে বুঝতে পাবে নি।'

একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। মোক্ষদার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বললে—'আপনাবা এখানে কী চান?'

—'কিছু না।'
—'কিছু না কী রকম? আমার মৌজায় ঢুকলেন কাকে বলে?'
—'আপনার মৌজা?'
—'ভেবেছেন সাহেবি পোশাক পরেছেন বলে ব্রাহ্মণের বাগানবাড়িতেও ঢুকতে পাবা যায়, না বলে কয়ে? তা এটা ফিরিঙ্গি পাড়াও নয়, কলকাতাও নয়। এমন দশ-বিশটা শাহেব সেক্রেটাবিও আছে আমার।'

মোক্ষদা—'বেশ আমরা চলে যাচ্ছি। আমাদেব যা দরকাব তা হযে গেছে। বিভা তুমি আবো থাকতে চাও নাকি?'

বিভা কাকাতুয়াটার দিকে একবাব সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে বললে—'থাক, উড়ে তো যাবেই, কিন্তু দেখে গেলে পারতমা।'

মোক্ষদা—'তাহলে দেখো।'

ভদ্রলোকটিকে মোক্ষদা বললে—'আমরা একটা কাকাতুয়া নিযে এসেছিলাম, জঙ্গলে উড়িযে দেবার জন্যে।'

—'কাকাতুয়া জঙ্গলে উড়িয়ে দেবার জন্য? এ কি লোটন পাযরা নাকি যে উড়িয়ে লুটিযে খেলবাব জিনিস? খপ করে একটা মিথ্যেকথা বলে ফেললেন।' লোকটিব চিৎকাব হা হা করে কযেকজন ছোকবা ছুটে এল।

ভদ্রলোক—'কাব কাকাতুযা মশায!'
—'আমাব কাকাতুয়া।'
—'আপনাব কাকাতুযা? শুনেছ গোবর্ধন, ঐ নাবকোল গাছেব কাকাতুযাটা নাকি এই সাহেবের। উড়িযে দিতে এসেছিলেন।

গোবর্ধন বললে—'পাগল না ছাগল। যা যা কেলো, গাছে চড়ে কাকাতুযাটাকে পেড়ে নিযে যা।'
—'আচ্ছা বেএক্তাব করলে দেখছি। আমার মৌজায ঢুকে আমাবই পাখিকে বাপ ডাকা।'
—'আবার সাহেবি পোশাক পবে এসেছে।'
—'বলে দিয়েছি, অমন দশ-বিশটা সাহেব আমার জুতো বুরুশ করে দেয।'
—'সঙ্গে আবাব একটা মাদ্রাজি ছুঁড়ি এনেছে।'

মোক্ষদা—'কাকাতুয়াটাকে আবার বাসায নিযে যাবে বিভা? বলো তো ওটাকে আবার ধরে নিযে আসি।'

বিভা—'বড্ড ভুল জাযগায ছাড়া হযেছিল।'
—'বেশ তো, ঠিক করে আবাব ছাড়ি, না হয় পেড়ে বাসায নিযে যাই, শিগগির যে উড়বে বলে মনে হয না।'

এমনি সময় কেলোব একটা মস্ত বড় ইটের আঘাতে কাকাতুযাটাব ঝপ করে মাটিতে পড়ে এক-আধ মিনিট ধড়ফড় করে মরে গেল।

ভদ্রলোক—'গোবর্ধন, একটা কাঁচি নিয়ে এসো তো। আর হাড়মাস তুমি এই নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধো। হারামজাদার দুটো কানই আমি কেটে দেব।'

গোবর্ধন মজা পেয়ে কাঁচি আনতে গেল।
—'আহা আপনাব নিজের ছেলে, সামান্য একটা কাকাতুযাব জন্য?'

সূচীপত্রে যান

—'সামান্য কাকাতুয়া! বাঁধো তুমি রাস্কেলকে। ডিসিলভা সাহেবের কাছে এই কাকাতুয়া বেচে আমি দুশ টাকা পেতাম।'

—'একটা বুড়ো কাকাতুয়া তো!'

—'ও কান আমি কাটবই।'

—'আপনার মত মহাজনেব কাছে দুশ টাকা কি একটা টাকা হুজুর?'

—'না, না, কান কেটে তবে কথাবার্তা বলব তোমার সঙ্গে।'

তাকিয়ে দেখি মোক্ষদা ও বিভা কাকাতুযাটাব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক—'আপনারা কী চান?'

—'এটাকে নিয়ে যাব।'

—'তা পঞ্চাশ টাকার কমে হবে না।'

—'এটা তো আমাদেরই জিনিস।'

—'উকিল লাগান গিয়ে।'

মোক্ষদা কাকাতুয়াটাকে তুলে ধরল।

ভদ্রলোক—'মিছিমিছি ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মাব খেতে চান!'

আশেপাশেব গাছে গাছে অনেকগুলো শকুন এসে বসেছিল। মোক্ষদা কাকাতুয়াটাকে সেই শুকুনগুলোর দিকে লক্ষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা বিবাট কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

বিভা হাঁটতে-হাঁটতে বললে—'কি যে ব্যাপার।'

আস্তে আস্তে তাদের পিছে-পিছে হাঁটছিলাম আমি।

—'কেই-বা জানত এরকম হবে?'

—'মরত তো একদিন।'

—'কিন্তু এ বকমভাবে মবা?'

—'শকুনগুলোব কথা ভাবছ বোধ কবি। ওবা মাংস ছাড়া খায না। মাছ খাবে না।'

বিভা নিস্তব্ধ হয়ে বইল।

মোক্ষদা—'কিন্তু কাকাতুয়াটার তো এখন কোনো বোধ নেই আব, তার কাছে তুমিও যা, শুকুনও তা।'

বিভা খানিকক্ষণ চুপ কবে বললে—'যাক, সবথেকে বড় স্বাধীনতা পেয়েছে।'

—'হ্যাঁ। কোনো রকম ঝকমাবিই নেই এখন আর।'

একটু চুপ থেকে বিভা—'তুমি হযতো গোড়াব থেকেই ভেবেছিলে যে পাখিটা এই রকম করে মববে।'

—'আমি? না, তা ভাবি নি অবিশ্যি।'

—'আচ্ছা, ভদ্রলোক আমাকে মাদ্রাজি বললেন কেন?'

—'মেয়েমানুষদেব সম্বন্ধে তাব ধাবণা স্পষ্ট নয় হযতো।'

—'আমি কি মাদ্রাজি মেযেদেব মত দেখতে?'

—'আমার তো তা মনে হয না।'

—'না, ঠিক কবে বলো।'

—'কী জানি, মাদ্রাজি যুবতীদের আমি ভাল কবে দেখি নি।'

—'আমি দেখেছি, কিন্তু আমার ভাল লাগে না তাদেব।'

—'কেন?'

—'হয়তো তাদেব বেণী বাঁধবাব বা কাপড় পববার ধরনাটা পছন্দ হয না। কিন্তু মুখ তো ভাল। নাকচোখ ঠিকঠাক, কিন্তু তবুও কেন যেন মনে ধবে না আমার।'

মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না।

বিভা—'কেন বলো তো?'

মোক্ষদা একটু হেসে-'ঐ ভদ্রলোক তোমাকে মাদ্রাজি বলেছে বলে হযতো।'

বিভা হেসে বললে—'আচ্ছা এ রকম ভদ্রলোকও থাকে?'

—'দেখলে তো রয়েছে।'

—'ছেলেটার কান কেটে দেবে?'

সূচীপত্রে যান

—'না। মনে হয় না। এদের রাগ খুব সহজে পড়ে যায়। আমাদের মারতেও তো এল না।'
—'অবিশ্যি মাদ্রাজি মেয়েরা খুব বুদ্ধিমতী।'
—'নিশ্চযই।'
—'মানুষ হিসেবেও তারা যে-কোনো মানুষের মতই।'
—'খুব।'
—'আমি শুধু তাদের সৌন্দর্যেব বিশেষত্বের কথা বলছিলাম।'
—'তা বুঝেছি।'
—'ইহুদি মেয়েদের দেখেছ?'
—'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি।'
বিভা একটু থেমে—'তাদের রূপ তোমাব কেমন লাগে?'
—'বেশ তো।'
—'পার্সিদের?'
—'তারাও খুব সুন্দর।'
—'আচ্ছা, কলকাতায আর্মানি বলে এক জাত আছে?'
—'আছে।'
—'তাদের কথা প্রায়ই শুনি।
—'দেখ নি?'
—'না।'
—'আমিও বড় একটা দেখি নি।' তাকিয়ে দেখলাম বিভা কাঁদছে। মোক্ষদা—'চোখে জল এসে পড়ল তোমার, কাকাতুযাটাব দুঃখে?'
—'না না, ও মরে ভালই হয়েছে। বেঁচে থেকে কষ্ট পাচ্ছিল মুক্ষিদা।'
—'চলো, এবার তো উঠি। লোকটা তালেবর। কিন্তু মেয়েদের জানে না, চেনে না।'

দিন দুই পরে।
একদিন সকালে উঠে দেখলাম বিভাব বাবা একজন পার্সি যুবকের সঙ্গে তাব মেযেব ঘরে ঢুকে বললেন—'এই যে আমার মেয়ে, এই বিভা। আপনি বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন—'এর সঙ্গে আলাপ করুন। বিভা, ইনি, এব নাম রুস্তমজি, ইনি পার্সি হলেও বেশ ভাল বাংলা বলতে পারেন। দেখো-না আলাপ কবে।' বলেই চলে গেলেন।
—'আপনি বসুন রুস্তমজি।'
—'এই সোফায?'
—'নিশ্চযই।'
—'আপনার কাজের খুব ক্ষতি করলাম।'
—'মোটেই না, আপনি বাংলা শিখলেন কী করে?'
—'সে অনেকদিন হল শিখেছি।'
—'কলকাতায আছেন?'
—'হ্যাঁ।'
—'বম্বের পার্সিরা বাংলা জানেন না?'
—'খুব কম।'
—'বাস্তবিক পার্সিরা ভারি চমৎকার জাত।
—'কোন হিসেবে?'
—'সব দিক দিয়েই।'
রুস্তমজি সুন্দর হাসতে লাগল।
বিভা—'বাস্তবিক আমি অনেকদিন ভেবেছি যে পার্সিদের মতন এমন নীরব গুণী জাত ভারতবর্ষে আর-একটাও নেই।'
—'অনেকে এই কথা বলে বটে।'

সূচীপত্রে যান

—'ঠিকই বলে।'

—'কিন্তু আমার খানিকটা সন্দেহ আছে।'

—'সে আপনার বিনয়।'

—'তা নয়।'

বিভা বাধা দিয়ে বললে—'অমরা হিন্দুরা বা মুসলমানবা যদি আপনাদের মত হতে পারতাম তা হলে আমাদের দেশের ঢের লাভ হত।'

রুস্তমজি অবিশ্বাস করে হাসতে লাগল।

বিভা—'যাক, আপনাদের আদর্শ তো আমাদের সামনে আছে।'

রুস্তমজি তার ছড়ি রাখতে রাখতে বললে—'সেইটে বড্ড ভুল।' বিভা একটু বিস্মিত হয়ে যুবকটির দিকে তাকাল। রুস্তমজি তার হ্যাট খুলে সোফার ওপর রাখল। দিব্যি একমাথা কাল চুল বেরিয়ে পড়ল, এক কিনার দিয়ে পবিপাটি টেরি। বেশ দামি স্যুট, ছেলেটিব বযসও অল্প, পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। বেশ সুন্দব সুগঠিত পুরুষদের চেহারা। বিভার খুব ভাল লাগছিল বোধ করি। রুস্তমজি তার চুলেব নিটোল পালিশের ওপর ধীবে ধীরে একবার হাত বুলিযে নিয়ে বললে—'রতন টাটার নাম শোনেন নি বোধ করি?'

—'কেন শুনব না।'

—'আপনার একালের মানুষ কিনা। তা ছাড়া পার্সিদের খবর কেই-বা রাখে?'

—'বা বে, খুব শুনেছি।'

—'আপনার অবিশ্যি শিক্ষাদীক্ষা ঢের আছে, কিন্তু অনেক বাঙালিই তার নামও জানে না।'

—'স্যাব বতনেব বিষয মোটামুটি খুব বেশি আমিও জানি না রুস্তমজি।'

—'তার জীবনের একটা কথা বলছি।'

—'বলুন।'

—'বিলেতের দবিদ্রতা ও বেকার সমস্যা সম্বন্ধে ভাল করে অনুশীলন কবে দেখবার জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে তিনি পাঁচ হাজাব টাকা দিয়েছিলেন এক সময।'

—'ও।'

—'বতন সম্বন্ধে এই একটা কথা আপনকে বলতে চাচ্ছিলাম। আব-কিছু না।' বিভা ঘাড় হেঁট করে বইল।

রুস্তমজি—'জিনিসটাকে কেমন মনে হয আপনার?'

—'ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

—'সত্যি ভাবি মজার।' রুস্তমজি হাসতে লাগল। বললে—'বিলেতের দরিদ্রতা আর আনএমপ্লয়মেন্ট-এর দাম পাঁচ হাজাব পাউণ্ড, বুঝলেন?' গলাব আওযাজের ভেতব খানিকটা বিদ্রূপ এই ছেলেটিব। বিভা কোনো কথা বললে না।

রুস্তমজি—'এটা অবিশ্যি ইতিহাসের পাতায ছাপা হযে থাকবে। কিন্তু আমরা পার্সিরা আমাদের প্রাইভেট জীবনেও এমনি অনেক অবাস্তবতাব প্রমাণ দেই।' বলে খুব মিষ্টিভাবে একটু হাসল।

বললে—'টাকা আছে কিন্তু টাকা দিয়ে যে কী করে উঠব বুঝতে পারি না। অবিশ্যি টাকার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিলেত থেকে মার্কহ্যাম সাযেবকে আনিযে পার্সি ইন্সটিউসনগুলোও স্টাডি করে দেখবাব ব্যবস্থা কবে নিযে ছিলেন। যাক গে—'

—'আপনি পার্সি তো?'

—'কেন, সন্দেহ হয আপনাব?'

—'এমন নিখুঁত বাংলা বলতে পারেন।'

—'আপনি যদি বম্বেতে পঁচিশ বছর থাকতেন তাহলে চমৎকার গুজরাটি শিখে যেতেন।' বলে ছেলেটি মিষ্টি কবে হাসল আবার। তাকিযে দেখলাম বিভার খুব ভাল লাগছে।

রুস্তমজি—'আরো শুনুন।' বিভা চোখ তুলে ছেলেটির দিকে তাকাল।

রুস্তমজি-'বম্বেতে আমাদের দুটো স্কুল আছে। জামশেদজি জিজিভাই আর জিজিভাই স্কুল। বেশ কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটো স্কুলেরই সেই এক কোর্স, এক সিলেবাস। কোনো বিচিত্রতা নেই।'

বিভা চুপ করে ছিল।

রুস্তম—'এর ভেতর একটাকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল করে দিলেই হত।'

—'আবার ইণ্ডাষ্ট্রির কথা?'
—'কেন খারাপ লাগছে?'
—'পৃথিবী তো এই নিয়েই আছে।'
ছেলেটি হাসতে লাগল।
বিভা—'ব্যবসার কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না।'
—'কিন্তু দরকার যে।'
—'সমস্ত পৃথিবীটাই এই দরকাবটাকেই শুধু মাথায় তুলে নিয়েছে যেন। জীবনে আরো যে কত জিনিসের দরকার ভুলে যায়। যেখানেই যাই, যে বই খুলি, যে কাগজ দেখি, যাব সঙ্গে কথা বলি কেবল ইণ্ডাষ্ট্রি টারিফ, প্রোডাকশন।'
—'আপনারা অবিশ্যি আর্ট ভালবাসেন।'
—'বাঙালি আর্টের জাত।'
—'কিন্তু তাতে জাতির উন্নতি হবে কি?'
—'মিঃ রুস্তম, উন্নতি-অবনতির কথা শুনতে চাই না। যে-জাতেব যে-রকম প্রতিভা তাব সেদিকেই চলা উচিত। না হলে বিড়ম্বনার আব শেষ থাকে না। উন্নতিব নাম যদি হয় লাখ-লাখ টাকাব ব্যাবসা চালনা, এই শুধু, তা হলে সে রকম উন্নতি আমাদেব জাতেব কোনাদিনও যেন না হয়।'
—'আমার এস. নাইডুকে মনে পড়ছে।'
—'বেশ।' বিভা কোনো উত্তব দিল না।
—'তিনিও তো বাঙালি?'
—'হ্যাঁ।'
—'আগে ভাবতাম মাদ্রাজি।'
—'নাইডু বলে?'
—'কিন্তু এ রকম কবিতা বা আর্ট মাদ্রাজিদেব ভেতব হয় না?'
রুস্তমজি একটু থেমে—'আপনিও একদিন তাব মতন হবেন বোধ করি।' বিভা একটু হেসে— 'প্রথম চেহারা আমাদেব দুজনের একটুও মেলে না।' দুজনেই হাসতে লাগল। তাব কথা এখানেই শেষ হল।
—'আপনি যাই মনে করুন না কেন আমার যা বলবাব তা আমি বলব।'
—'তাই তো বলা নিযম। নইলে কথা হবে কী করে?'
—'দেখুন, আমরা ব্যবসাযের জাত।'
—'সে-কথা আমি জানি না।'
—'আমি বলছি আপনাকে আমাদের প্রতিভা ব্যবসাযেই।'
—'পার্সিদের তো অনেক পুরনো একটা ইতিহাস আছে।'
—'তা আছে বই কি।'
—'সেখানে তো দেখতে পাই তারা কবিতা কলাশিল্পেব জন্য বযেছিল বেঁচে।'
—'আপনি ইরানের কথা বলছেন?'
—'ইরানকে বাদ দিতে চান?'
ছেলেটি একটু গম্ভীর ও বিমর্ষ হযে বললে—'না না।'
—'আপনাদের গালিচাব থেকে শুরু করে হাফেজ সাদী রুমির সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু, বিধাতাই জানেন।'
ছেলেটি হাসল।
—'আর ওমর খৈয়াম এমন ব্যবসাদারই ছিলেন যে সামান্য একটা জিনিসেব [জন্যে] সমবখন্দ বিকিযে দিতে চাইলেন।'
ছেলেটি এবার খুব মজা পেয়ে হাসতে লাগল। বললে—'আপনি সবই জানেন দেখছি।
—'ক্রিয়েটিভ আর্টের নোকর ছিল বলেই জানতে হয়েছে।'
—'কিন্তু সে এক যুগ চলে গিয়েছে, সে আর ফিরে আসবে?' বলে ছেলেটি কার্পেটের ওপর ছড়ি দিয়ে গোটা দুই খোঁচা দিল।
—'আপনারা ফিরিযে আনতে পাববেন না?'

সূচীপত্রে যান

—'না। প্রানের ভেতর কবিতা এত কম বোধ করি!'
—'আপনি?'
—'আমরা সকলেই।
—'মানে বম্বেতে?'
—'হ্যাঁ।'
—'কিন্তু ইবানে?'
—'সে-খবর আমি ঠিক বলতে পারি না।' ছেলেটি বললে—'আব একটা বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের এই ক্রিয়েটিভ আর্টকে যে উপেক্ষা করছি সে কথা মনেও জাগে না কোনোদিন। যদিও বা জাগে, ভাবি, এ ভালই করছি।; বললে,—
'কেউ যদি আমাদের জাতেব এ অভাব দেখতে আসে পুবনো গৌববের দোহাই দিয়েই চুপচাপ পড়ে থাকি। থাক আমি আপনার সঙ্গে আর্টেব কথা বলতে পারব না। কিছু জানি না যে!'
—'আপনাদেব প্রতিভা তা হলে এবার ঘুবে গেল?'
—'হ্যাঁ।'
—'ব্যবসাব দিকে।'
—'হ্যাঁ, তাই আমাদেব আজকের আর্ট।'
—'আমার বাবাও ব্যবসা নিয়ে আছেন, কী পবিতৃপ্তি পান জানি না।'
—'যাব যা খেয়াল তাই নিয়েই তাব চবিতার্থতা।'
বিভা একটু বিস্মিত হয়ে—'আপনাব মুখে 'চবিতার্থতা' শব্দটি শুনব বলে আশা কবি নি।'
—'কেন?'
—'এ খুব দামি বাঙালি শব্দ।'
—'বললামই তো পঁচিশ বছব ধবে বাংলা বলছি।'
—'বাংলা বইও পড়েন নিশ্চয।'
—'হ্যাঁ।'
—'কাব? ঠাকুব স্কুলেব?'
—'হ্যাঁ হ্যাঁ।'
—'তাই হবে।'
—'বেডিওতে বাংলা গান শুনি।'
—'বেশ।'
—'বাংলা থিযেটারেও তো যাই।'
বিভা ভয পেযে উঠল।
রুস্তমজি—'চমকালেন যে!'
—'বাংলা থিযেটাবে গিযে আপনার ভাষার সৌন্দর্যটুকু মাটি হযে যাক।'
—'সত্যি!'
—'কোনো নাটক নেই সাহিত্য নেই কিছু নেই সেখানে।'
—'তা তো আমি জানতাম না!'
—'ভাল বাংলা বল্‌তে হলে দুটো জিনিস কববেন না।'
—'কী।'
—'বাংলা খবরের কাগজ পড়বেন না।'
রুস্তমজি হাসতে লাগল।
—'আর থিয়েটাবে যাবেন না।'
—'অবিশ্যি একটু আমোদের জন্য যাই।'
—'কিন্তু আমোদ আপনার ভাষাকে একেবারে বিগড়ে ফেলবে।'
—'আপনিও যান না বুঝি থিয়েটারে?'
—'যাবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু প্রতীক্ষা করছি।'
—'কীসের জন্য?

সূচীপত্রে যান

—'কবে সুসময় আসে।'
—'মানে ভাল বই ?'
—'মানে বেশ মূল্যবান আর্ট হয কবে, আশা করি শিগগিরই হবে।'
—'আশা কবি।'
—'তখন বযস যদি পিসিমার মত হয তাহলেও গিয়ে দেখে আসব।' রুস্তমজি হাসছিল।
বিভা—'যা দেখছি, দিদিমার মত বযস না হতে সে দিন আসবে না।'
—'আপনিই লিখুন না একখানা বই।'
—'থিয়েটারেব জন্য ?'
—'হ্যাঁ।'
—'তাহলে নিজেকেই ধিক্কাব দিতে হবে যে! এটুকু আত্মগ্লানির হাত থেকে এখনো বেঁচে আছি। তাও এক এক সময় মনে হয় বই না লিখে থিয়েটারে অভিনয় করতে নামলে হত। কিন্তু রুচি ছিল আমাব বই লেখার দিকে। শক্তি হযতো অভিনযেই ফুটত। কাজেই কিছু হল না।' বলে বিভা চুপ কবল।
রুস্তমজি—'এসব আর্টের কথা আমাকে বলে নিজেই হতাশ হচ্ছেন শুধু!'
—'কেন ?'
—'অভিনযও বুঝি না, বইও বুঝি না, এক জিনিসেব ইণ্ডাস্ট্রিযাল দিক বুঝি কিন্তু থিযেটাবেব ইণ্ডাস্ট্রিযাল দিকও আমাব কাছে অন্ধকাব।'
—'বাযোস্কোপেব ?'
—'তাও।'
—'পার্শিদেব ভেতব তো বড় বড় পিকচাব হাউসেব মালিক আছেন।'
—'কিন্তু জানি না ফিল্মের বড় বড় ডিবেক্টব আছেন কি না। ।ফল্মেব ব্যবসায স্টাব আব ডিরেক্টারদের তো লস। যাক, আর্টেব কথা থাক।'
—'কিন্তু আর্টেব কথা বলছিলেন না তো আপনি।'
—'কী বলছিলাম ?'
—'আর্টেব সম্পর্কে যে ব্যবসাটুকু তাবই হিসেব তো দিচ্ছিলেন।'
—'মানুষ আমবা হিসেব-নিকেশেরই; সেই ধবনেব কথাই বলি আবাব।'
—'বলুন।'
—'পার্সিদের প্রশংসা কবছিলেন আপনি। আমি দেখাচ্ছি আমবা প্রশংসাব কত কম যোগ্য।'
—'আমার কাছে নিজেদের জাতিকে অযোগ্য প্রমাণ কবে আপনাব কী লাভ? আপনাব ব্যক্তিগত লাভই-বা কি ?'
—'লাভ এই, আমাদের দুজনের কথাবার্তাব ভেতব বেশ খানিকটা আন্তবিকতা জমে উঠবে।'
বিভা ঘাড় হেঁট করল—'সেটা কি বড় লাভ? আন্তবিকতা জমাতে গিযে নিজেদেব জাতকে কি নিন্দা কবতে হয ?'
—'যেখানে তারা অযোগ্য তা নিঃসঙ্কোচে দেখাতে হয না? সে সব চেপে রাখলে আমাব সম্বন্ধে কী রকম ধারণা হত আপনার ?'
—'কিন্তু নিজেব জাতকে না হয বেহাই দিতেন। নিঃসঙ্কোচেব আন্তরিক কথা তো অন্য অনেক বিষয় নিয়েও চলে।'
—'ক্রমে ক্রমে চলবে।'
বিভা যেন সময বুঝে চুপ কবল।
রুস্তমজি—'কলকাতায় ধরুন পার্সিদের সংখ্যা কত কম, কিন্তু তবুও এখানে আমাদেব দুটো অগ্নিমন্দির আছে। দুটো বাখবার কী দরকার? এগুলোর পেছনে খবচও কি কম!'
—'আপনাদের সেই আগুনের পুজো এখনো চলে আসছে ?'
—'হ্যাঁ।'
—'ভারি চমৎকার।'
রুস্তমজি-'ঠাট্টা করছেন হযতো।'
—'না না, এ আমার খুব আন্তরিক কথা মিঃ রুস্তমজি।' বিভা একটু থেমে বললে—'বাস্তবিক মানুষ

সূচীপত্রে যান

যখন প্রথম জন্মেছিল তখন আগুন অরুণ এই সব জিনিসই তার কাছে সবচেয়ে বেশি আর্শীবাদের মতন মনে হয়েছিল।' বললে —'আশীর্বাদের মতনই কি শুধু? খুব বিস্ময়ের জিনিসও নয় কি রুস্তমজি? ধরুন, একটা পাহাড়ের ওপর আরণি জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, তার ভেতর ঘি ঢালা হচ্ছে, সেই কোন এক ভোরের জগতে, কেমন এক ভোরের বেলা।'

—'কিন্তু আমরা ঢের অগ্রসর হয়েছি।'

—'হ্যাঁ, আগুনের চেয়ে ঢের খারাপ জিনসকে পুজো করতে শিখেছি আমরা।'

রুস্তমজি একটু হেসে বললে—'তা যাই হোক।'

—'ভগবানকে কজনে পুজো করি আমরা ?'

—'তা করি না অবিশ্যি।'

—'একটা জিনিসকেও তো আমরা সকলে মিলে পুজো করি আজকাল।'

—'টাকাকে? কী বলেন ?'

—'বলেই তো ফেললেন দেখছি।'

—'খুবই সোজা বলা।'

—'মনের ভেতর সব সময়েই বোধ করি এর জন্য একটা জায়গা রয়েছে ?'

—'শুধু জায়গা ?'

—'তবে ?'

—'আসন।' রুস্মতজি হাসতে লাগল।

বিভা—'সেই জন্যই আমার মনে হয় পৃথিবীর সব জাত মিলে একটা ধর্মমন্দির গড়া যাক, এই টাকাকে কেন্দ্র করে।'

—'একটা ওয়ালর্ড ব্যাঙ্ক গোছের ?'

—'আজকালকার দিনে একটা ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কিছু হবে না।' রুস্তমজি একটু চুপ করে থেকে বললে—'আমি যা বলছিলাম, দেখুন দুটো তো ফায়ার টেম্পল আছে কলকাতার শহরে, কিন্তু পার্সিদের জন্য এমন একটা প্রাইমারি স্কুল নেই এখানে, যেখানে গিয়ে পার্সি ছেলেমেয়েরা তাদের ধর্মের গোড়ার মূল সূত্রগুলো শিকতে পারে।'

—'আপনাদের মধ্যে পুরোহিতদের খুব প্রভাব।'

—'হ্যাঁ, অনেকটা আপনাদের ব্রাহ্মণদের মত।'

—'শুনেছি তাদের নাকি খুব প্রতিভা আছে ?'

—'হ্যাঁ, শিক্ষাদীক্ষায়ও তারা অনেকেই খুব উন্নত।'

—'তাদের ভেতর থেকে এদেশের নেতাও তো অনেকে জন্মেছে ?'

–'দাদাভাই নৌরজি, ফিরোজসা মেটা, জামসেদজি। "উদবাদে"র নাম শুনেছেন ?'

বিভা ভুরু কুঁচকে একটু হেসে বললে—'অবশ্যি কোনো মানুষ নয় ?'

—'না।'

—'বম্বেতে একটা জায়গা তো।'

—'ঠিকই বলেছেন। বাঙালিরা অবিশ্যি অনেকে এর নামও শোনে নি। কিন্তু আপনাদের বেনারস আর গয়া যেমন।'

—'এতটা আমি জানতাম না।'

—'খুব কম লোকেই জানে।'

—'উদবাদা হচ্ছে বুজি আপনাদের কাশী। ?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু দেখনু আপনাদের বাড়িতে কত শাস্ত্রচর্চা হয়, হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা হয়, সংস্কারের চর্চা হয়, কিন্তু উদবাদায় পার্সি ফার্স্ট বুক শেখাবার জন্য দুটো সেমিনারির মতন আছে অবিশ্যি। কিন্তু সে সেমিনারি দুটোর একটি শিক্ষকও আবেস্তা জানে না।' ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বিভার দিকে তাকাল। বললে—'আপনি কল্পনা করতে পারেন বেনারসে কোনো ব্রাহ্মণ সংস্কৃত জানে না।? বললে—'ব্রাহ্মণ কেন, সেখানে মুটেও হয়তো সংস্কৃত জানে।'

—'কোথায়? বানারসীতে ?'

—'তবে কি ?'

সূচীপত্রে যান

—'অতটা অবিশ্যি নয় মিঃ রুস্তমজি। তবে উদবাদায় কেউই আবেস্তা জানে না বুঝি ?'

—'না, পেহলবি অব্দি জানে না।'

—'এ দুটো তো আপনাদের পুরনো ভাষা।'

—'হ্যাঁ, শাস্ত্রের ভাষা, অথচ নেগলেকটেড। কলকাতায় বাংলাদেশে কত পাড়াগাঁয় কত লোক আছে ব্রাহ্মণ নয়, অথচ বেশ সংস্কৃত জানে।'

—'তা আছে অবিশ্যি।'

—'কোন কোনো মুসলমানও তো জানে সংস্কৃত।'

—'শুনেছি।'

—'তাছাড়া দেখুন বাঙালি মুসলমানদের তো সব কিছু আররি-ফারসির মতে নয়, কিন্তু তবুও তাদের ভেতর ঢের ঢের লোক ফারসি জানে, আরবি জানে, এই সব ভাষায় ইসলামের শাস্ত্র স্টাডি করতে পারে।' একটু থেমে ছেলেটি বললে—'কিছুদিন আগেও কোনো লাইব্রেরি ছিল না উদবাদায়। মেয়েদের জন্য সেলাই-ফোঁড়াই শিখবার ব্যবস্থা ছিল না। ছেলেদের খেলা স্পোর্টের জন্য জিমখানা ছিল না। ম্যাজিক লণ্ঠনের এগজিবিশন ছিল না। পার্সিদের স্বদেশী মেলা ছিল না।' ছেলেটি ছড়ি দিয়ে কার্পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে—'কল্পনা করতে পারেন, বেনারসে এসব নেই ? বললে—'কলকাতায় কত জায়গায়ই তো রয়েছে।' একটু কেশে বললে—'কিন্তু আমাদের উদবাদার অবস্থা এই রকম।'

কথা শুনতে-শুনতে বিভার শ্রদ্ধা বাড়ে। ছেলেটির এ-রকম পরিষ্কার অকুণ্ঠিত গলা ও আন্তরিকতা তাকে আকৃষ্ট করে রাখে। ছেলেটি বেশ গুরুতর বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছে বটে। বিভার ভাল লাগল। বললে—'আপনাদের পার্সিদের ভেতর তো ঢের চ্যারিটি আছে।

—'আছে, কিন্তু আমার মনে হয় সেও আর সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। তাছাড়া চ্যারিটি, ছেলেটি অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নেড়ে জানলার দিকে তাকাল।

—'চ্যারিটি আপনার ভাল লাগে না ?' কিন্তু তবুও চ্যারিটির দরকার। খুবই দরকার। আমার মনে হয় ভারতবর্ষে আপনাদের মধ্যেই সে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আছে।

—'তা থাক। কিন্তু সেটা আমি বিশেষ অহঙ্কারের জিনিস মনে করি না। এই যে আমাদের চ্যারিটির বেশির ভাগ দিয়েই তো হয় শুধু [ধর্মশালায়]।'

—'এ সব বেশ ভাল কথা মিঃ রুস্তমজি। কিন্তু চ্যারিটির একটা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে কি না। সেটা হচ্ছে দুঃস্থদের দুঃখ দূর করা।'

—'বুঝলাম, কিন্তু তাতে কতকগুলো অলস লোকেরই তো সৃষ্টি হয়।

—'সেটা অবিশ্যি অপবাদের, কিন্তু আপনি যে-সমস্ত স্কিমের কথা বলছেন এগুলো গভমেন্ট বা ইউনিভার্সিটির বিবেচনার জিনিস, চ্যারিটির সঙ্গে এগুলোর সংস্রব আছে ?'

বিভা—'অলস লোক, অলস লোকের তৈরি হচ্ছে নাকি আপনাদের ভেতর ?

—'খুব।'

—'এই চ্যারিটির জন্য ?'

—'তা ছাড়া আর কী ?'

—'অবিশ্যি আমি জানি না কিন্তু।'

—'চ্যারিটির দরকার আছে বটে, কিন্তু এর নানা রকম গ্লানি ও অপবাদের দিকও যথেষ্ট। আপনারা তা বুঝতে পারবেন না। কোটি কোটি দীন দরিদ্র লোক আপনাদের ভেতর। টাকাও একদম নেই। কিন্তু আমরা খুব ছোট্ট সম্প্রদায় কি-না। অনেক টাকাকড়িও রয়েছে। কাজেই ঢের গাফলতি, ঢের কুঁড়েমি, কর্তব্য-হীনতা, পাপ চোখে এসে পড়ে।' বললে—'আপনাদের কলকাতায় কালীমন্দির কটা আছে শুনি? অথচ আপনাদের সমস্যা আমাদের চেয়ে যে কত বেশি তার কোনো ইয়ত্তাও নেই। ৫০০টা থাকলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আছে কি?; একটু থেমে বললে—'যদি আপনাদের ভেতর একদল লোক ক্রমাগত তৈরি করার তালে থাকে তাহলে ব্যথা লাগে নাকি ?'

—'সত্যি বড্ড বিশ্রি অপব্যয়।'

—'সেইজন্যই বলছিলাম।'

—'জনসাধারণের জন্য কয়েকটা মন্দির থাকলেই হল, কিন্তু যারা জীবনটাকে বুঝতে পেরেছে মিঃ রুস্তমজি তাদের একটা মন্দিরেরও দরকার নেই।'

সূচীপত্রে যান

—'না, তা, নেই।'

—'ভোরের বেলা এই পুবের জানালাটা খোলা থাকে। তাকিয়ে দেখি মেঘের রং একেবারে সোনা হয়ে গেছে। কত রোদ। কী আনন্দই-না পাখিদেব। আব সরল শিশুর চোখের মত নীল আকাশের গায় পায়রাদের সাদা-সাদা ডানাই তো কী সুন্দর। এই সব ছেড়ে কোন মন্দিরে যাব বলুন। কীই-বা শিখব সেখানে গিয়ে, কার কাছেই-বা।'

—'কাজেই ১০০টা অগ্নি মন্দিরের অপ্রাসঙ্গিকতা বুঝলেন তো?'

বিভা নিজের ভাবে ছিল। রুস্তমজির কথা তার কানেও গেল না বোধ করি। ছেলেটি বললে—'গরিব পার্সিদের জন্য শস্তায় বাড়ি তৈরি কবে দেয়া হয়, এগুলোরও তো কোনো মূল্য নেই। দুদিন পরে যাবে নষ্ট হয়ে, ভেঙে। তার চেয়ে বেশ সুন্দর মজবুত বাড়ি তৈরি করলেই তো ভাল, যাতে দেখবার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। সে সব দিকে লক্ষ রাখলেও মন্দ কি? পার্সিরা এতদিন ভারতবর্ষে রইল কিন্তু তবুও তাদের মত একটা জিনিস বেখে যেতে পারল না; কবরও তো কত সুন্দর। আমাদের দেখে লোকে ভয় পায়। একবার দেখলে দ্বিতীয়বার মনে থাকে না,' বললে—'এ সব জিনিসের কোনো মানে আছে?' ঘাড়টা ঘুরিয়ে বললে—'সেই জন্যই আমি এই সবেব কথা বলছিলাম। তারপব কালচার, আর্কিটেকচাব।'

বিভা একটু হেসে বললে—'আস্তে-আস্তে হবে। এত তো নিন্দে কবলেন নিজেদের, তবুও আমি জানি আপনারও জাত খুব মূল্যবান। ক্রমে-ক্রমে সবই করতে পারবেন।'

—'লোকেব মনের থেকে একটা ধাবণা কিছুতেই যায় না যে আমবা মূল্যবান জিনিস।'

—'কী করে যাবে, ভিতবে বাইরে সব দিকেই তো আপনাদের অনেকখানি সর্বাঙ্গীণতা দেখি।'

—'সে-সব পঞ্চাশবছব-একশবছব আগেব কথা, তখন অবিশ্যি আমাদেব সম্বন্ধে মানুষেরা বিমুগ্ধ হয়ে যা ভাবে, আমবা অনেক পবিমাণে তাই-ই ছিলাম,' বললে—'কিন্তু এখন সে সব সফলতা চলে গেছে। ব্যবসায় আমাদেব প্রাধান্য নেই, না আছে শিক্ষায় দীক্ষায়।' বললে—'তাবপব, আমরা আজকাল শিক্ষার যতটুকুই বা ধাব ধাবি সেটুকুও ব্যবসাযেব সুবিধা হবে বলেই। কালচারের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব নেই। জগদশী বোস বা বমণেব মত একজন লোক আমাদের ভেতর নেই, কোনোদিন ছিল কি? এই তো বাধাবমণেব কথা কতদিন ভাবি, কিন্তু পার্সিদের ভেতর এরকম একজন মনীষী কোনোদিন জন্মাবে? রবিবাবু তো স্বপ্নেব জিনিস!' একটু হেসে বললে—'তাবপব গোঁড়ামিও ঢেব, ম্যালেরিয়া হবে, তবুও বাড়ির কুয়ো বন্ধ কবব না, একটা আধুনিক ধবনের কাজের জন্য আমাদেব সহানুভূতি নেই। ভাল কবে কাজ কবতে দেয় না, না জানি কী কবে বসে, কোথায় আমাদের ধর্মে সংস্কাবে আঘাত দেয়?'

বিভা—'এরকম কবে যদি আপনি বলতে থাকেন তাহলে আমাকে বড্ড অপমান করা হয়।'

—'কেন?'

—'এব চেয়ে ঢেব বেশি গলদ, পদে-পদে কলঙ্ক আমাদের ভেতর অসংখ্য পরিমাণে আছে, আপনি তা কল্পনাও কবতে পাবেবেন না হয়তো শুনলে শিহবিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে এত কথা যখন বললেন তখন—'আমাবও তো উচিত আপনাকে সব খুলে বলা?'

—'বলুন।'

—'খুব সবলভাবেই তো বললেন। কিন্তু তবুও আমি পারব না।'

—'কেন?'

—'আপনাদের চেয়ে আমবা ঢের কম মূল্যবান যে!'

—'আমরা যে কী তা তো দেখালামই।'

—'কিন্তু আমাদেব তুলনায় এ তো স্বর্গ।'

—'অবাক হয়ে যাই আমাদেব সম্বন্ধে লোকেব ধাবণা কিছুতেই বলদায় না কেন?'

—'এই তো আপনার সঙ্গে পবিচয় হল, আপনাদেব সম্বন্ধে আগে যে-ধারণা ছিল আমার, কোথাও তাতে একটুও আঘাত পেলাম না তো।'

—'আচ্ছা, ওঠা যাক।'

কিন্তু বসল।

তারপর কী যেন ভেবে উঠে পড়ল ছেলেটি।

কিন্তু পবদিনই আবার এল।

বললে—'সকালটা আপনার এখানে কাটাতে বেশ লাগে।' বললে—'আপনার কোনো ক্ষতি করিনা?'
—'আপনি, আসেন তো নটার সময়, এই সময়ই আমি মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলি।'
—'কটার সময় ওঠেন?'
—'পাঁচটা।'
—'খুব সকালে তো,' বললে—'শীতের ভেতর উঠতে পারেন?'
—'উঠে পড়ি।'
—'আপনাদের জন্য এক বাক্স চকোলেট আর দু টিন টফি এনেছি,' এগিয়ে দিয়ে বললে—'নিশ্চয়ই ভালবাসেন আপনি?'
বিভা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে—'হ্যাঁ, ছোটবেলায় খুব ভালবাসতাম।'
পাঁচ-সাতদিন ছেলেটি ক্রমাগত এল। বিভাকে বই দিলে, বাইনোকুলার দিলে, ছবি দিলে, বায়োস্কোপেব নতুন বেকর্ড দিলে, আরো নানা রকম খুঁটিনাটি জিনিস দিলে, সে-সবেব নামও আমি জানি না। পরিবর্তে বিভা কিছু দিলে না। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, এও কেমন? কিন্তু ছেলেটির দেখলাম দিয়েই পরিতৃপ্তি? নেওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিছু যে পাচ্ছে না সেজন্য মনের ভেতর কোনো আঘাত নেই। এব পর ছেলেটিকে খুব ভাল লাগল আমাব। আমার নিজের জীবনের অনেক কথা মনে পড়ল। আমাব কিশোববেলায় আমাব ব্যবহার ঠিক এ রকমই ছিল। বেশ হত, আজো যদি তা অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু জীবন তা দিলে না যে!
একদিন সকালবেলা ছেলেটি এসে বললে, 'আমাদেব পবিচয় তাহলে খুব জমল।'
—'হ্যাঁ।'
—'বাস্তবিক আপনার এখানে এলে—' ছেলেটি চুপ করল।
বিভা কোনো কথা বলল না।'
—'আপনাব সঙ্গে মিলে ঢের ভাল বাংলা শিখে গেছি আমি।'
—'প্রথম থেকেই তো খুব সুন্দব বাংলা বলতে পবতেন।'
—'কিন্তু আমার বন্ধুবা বলে যে আমার বাংলা অ্যাকসেন্ট আনকালচার্ড বাঙালিদের মত।'
—'বাংলায় কোনো অ্যাকসেন্ট নেই।'
—'নেই?'
—'মাঝে-মাঝে গানেব মত একটা বেশ আছে।'
—'ভাষাটা বেশ সুন্দর।'
—'আপনাদের আবেস্তাও তো বেশ।'
—'কিন্তু বাংলায় যত কবিতা গান ছবি রয়েছে—'
—'বলেন কী, আপনাদের ফার্সিতেও তো কত!'
—'ও ইরান, সে তো ঢের আগে ছেড়ে দিয়েছি আমবা।'
—'কিন্তু সেখান থেকে তো এসেছেন।'
—'তা তো বটেই।'
—'সে গৌরব তো আপনাদেরই গৌরব।'
এ সব কথা বলতে বা শুনতে ছেলেটির ভাল লাগছিল না। কার্পেটেব ওপব ছড়ি দিয়ে আঁখ কাটতে-কাটতে সে খুনসুড়ি করছিল। মুখ তুলে বললে—'চলুন-না একদিন আমাদের পাড়ায়?'
—'কীসেব জন্য?'
—'আমাদের বাড়িটা দেখে আসবেন।'
—'তা যাব একদিন।'
—'বলুন কবে?'
—'ঠিক বলতে পারি না।'
—'যাবেন তো?'
—'হ্যাঁ, যাবার তো ইচ্ছা; তবে বাবাকে মত করাতে পারলে হয়।'
—'ও তাঁর সঙ্গে যেতে চান?'
—'তিনিই নিয়ে যান আমাকে।'

সূচীপত্রে যান

—'আপনি একা বেরন না কোথাও ?'

—'বেরুতে আপত্তি নেই,কিন্তু আপনাদের বাড়ি তিনিও না হয দেখলেন।'

—'কে? আপনার বাবা ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনি দেখেছেন অবিশ্যি।'

—'সে তো একা একা গিযে।'

—'তবু দেখেছেন তোঁ।'

—'এবার আমার সঙ্গে না-হয যাবেন।'

ছেলেটি একটু দমে গেল।

বিভা বুঝেছে। কিন্তু চুপ করে বইল।

ছেলেটি বললে—'তাহলে বাবাকে মত কবাতে হবে ?'

—'হ্যাঁ।'

একটু চুপ কবে বললে—'আচ্ছা কবাবেন একদিন।'

—'তাই করাব।'

—'আশা কবি অমত হবে না!'

—'আপনাদের মত মানুষেদেব বাসায যেতে অমত কেন ?'

—'ধরুন, আপনাকে নিযে ?'

—'অবিশ্যি ও বকম ধরনের গোঁড়ামি আমাদেব নেই।'

ছেলেটি খানিক চুপ করে থেকে বললে—'থাকি বাবা, মা আব আমি।'

—'আপনাব কোনো ভাইবোন নেই বুঝি ?'

—'বোনেব বিয়ে হযে গেছে। পার্ক স্ট্রিটেব বাড়িটা আমাদেব বেশ খোলা-মেলা জাযগায।'

—'বেশ ভাল।'

—'আপনি যে পুবেব আকাশ এত ভালবাসেন—'চমৎকাব দেখা যায। কাবণ পূর্ব দিকটা অবাধ খোলা কি না।'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'বাড়িটা আমবা বছব তিনেক হল তৈবি কবছি। এমন চমৎকার তৈবি। কাজেই শুধু পুবই নয দক্ষিণে পশ্চিমে যে-কোনো দিকেব যে-কোনো জানলাব কাছে গিযে আপনি দাঁড়াবেন, প্রাণটা এমন খুলে যাবে!' বললে—'দেখবেন আকাশ, চিল, পাযবা, মযদান, গাছ-তাবপব কলকাতাব যা কিছু শোভা আছে।'

ছেলেটি থামল।

—'অবিশ্যি কলকাতাব শোভা আপনি পছন্দ কবেন না ?'

—'কই পাড়াগাঁযও তো পালিযে যাচ্ছি না, শোভা খুঁজবাব জন্য!'

—'নীচেব তলায অফিস আব দোকান,' ছেলেটি বললে—'আমাদেবই অফিস, খুব মস্ত বড় আব ওপরেব দুটো তলাযই আমবা থাকি। প্রায বিশটা কামবা আছে। হলেব মত বড়-বড়।'

—'তিনজন মানুষেব জন্য ?'

ছেলেটি একটু হেসে বললে—'অতিথি মাঝে-মাঝে আসে। তাদেব জন্য দুটো কামরা আলাদা পড়ে আছে।' একটু হেসে বললে—'আমাব বেডরুমটা পুবেব দিকে।' বিভাব দিকে তাকিযে বললে—'হলের মতন বড়।

দু জনেই চুপচাপ।

ছেলেটি বললে—'আমাব বেডরুমেব পাশেব হলটাকে বানিয়েছি লাইব্রেরি। বাবাব খুব আপত্তি ছিল। তিনি চেযেছিলেন ওটা গেস্টদেব জন্যই বেখে দিতে। কিন্তু আমি বললাম একটা লাইব্রেবি না হলে কিছুতেই চলে না।'

—'সে লাইব্রেরিতে বই আছে তো মিঃ রুস্তমজি ?'

—'হাজার পাঁচেক বই যোগাড় করেছি।'

—'কী বকম ধবনের ?'

—'আপনি অবিশ্যি ঢের খাপ্পা।'
—'অবিশ্যি লাইব্রেরিটা আমার নয়।'
—'এখন থেকে লিটাবেচাবের বই আনব ভাবছি।'
—'নভেল-কবিতা আপনি পড়েন ?'
—'এখন থেকে পড়ব ভাবছি।'
—'কীসের জন্যই-বা ?'
—'দেখলাম তো আপনি এসব বেশ পড়েন।'
বিভা একটু হাসল।
রুস্তমজি—'দুজনেব ভেতর ঘনিষ্ঠতা জমাতে হলে এক রকম ধরনেব চিন্তা করতে হয।'
—'আপনাব অভ্যাস চট কবে বদলাতে পারবেন না।'
—'খুব পাবব।'
—'কিন্তু প্রযোজন নেই।'
—'আছে।'
—'বাস্তবিক নেই।'
—'আপনার সংস্পর্শেই আমার থাকাব দরকাব।'
বিভা চুপ করল।
রুস্তমজি—'সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মত নন তো আপনি।'
—'কেন তাবা কী বকম ?'
—'জানি না, কিন্তু তাদের কাছে গিযে আমি এত সময নষ্ট করতাম না।'
—'আমার কাছেও সময নষ্ট করছেন শুধু।'
—'মোটেই না।'
—'কী লাভ হল আপনাব ?'
—'আপনাকে আমাব খুব ভাল লাগে।'
—'কোন হিসেবে ?'
—'জানেনই তো আপনি খুব সুন্দর।'
বিভার মুখ খানিকটা আবক্ত হযে উঠল।
রুস্তমজি—'সুন্দর জিনিসকে আমরা খুব যত্ন করে রাখি।'
—'আপনাবা পার্সিরা ?'
—'হ্যাঁ।'
—'তা অবিশ্যি আমি বিশ্বাস করি।'
—'একটা চমৎকাব কার্পেটই হোক বা একজন সুন্দব মেযেমানুষই হোক, এ সব আমাদের খুব শ্রদ্ধার জিনিস।'
—'খুব আশার কথা।'
—'বাঙালিরা ফেলে নষ্ট করে।'
—'কাকে ?'
—'সুন্দরকে।'
—'কিন্তু বাঙালিদের ঘরেই তো আছি; নষ্ট হয়ে গেছি কি ?'
এমনি সময় বিভার বাবা ঢুকলেন।

পরদিন রুস্তমজি যখন ঢুকেছিল আমি তখন ছিলাম না। খানিকক্ষণ পরে জানালার কাছে আমার ডেক চেয়ারটা নিয়ে বসে দেখি রুস্তমজি একটু কেমন গম্ভীর হয়ে মেঝের ওপর পায়চারি করছে। বিভা আছে একটা সোফায় বসে।
বিভার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রুস্তমজি—'টবে ওগলো কী ফুল? বেশ সুন্দর তো।'
—'নেবেন ?'
—'এটা কার ফটো ?'

—'আমার।'

—'ছোটবেলার বুঝি?'

—'হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ ফটোটার দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বিভার মুখোমুখি সোফায় এসে বসে বললে—'ভগবান আমাকে যে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এর একটা উদ্দেশ্য আছে।'

বিভা আস্তে-আস্তে উঠে চলে গেল।

পর দিন সন্ধ্যার সময় দেখলাম বিভা আছে বসে, রুস্তমজি মেঝের খুব কাছাকাছি একটা কুশনে বসেছে। শুনলাম বলছে,—'আপনাকে না হলে আমার কিছুতেই চলে না।'

—'কিন্তু আমার তো চলে।'

—'এ রকম কথা আপনি কেন বলেন?'

—'যা ঠিক তাই তো বলছি।'

—'আমার মনে বেদনা দিতেই কি আপনার ভাল লাগে?'

—'কিন্তু কোনো ভুল ধারণা আপনার মনে ঢুকিয়ে দেয়া কি আমার উচিত?'

—'আপনাকে আমি কত ভালবাসি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।'

—'যারা ভালবাসে তারা ঐ রকমই বাসে।'

—'কাউকে কোনোদিন আমি এই রকম ভালবাসি নি।'

—'আপনার হৃদয়ের প্রেম খুব গভীর।'

—'তা স্বীকার করেন?'

—'চোখের সামনে এ কদিন করেই তো দেখছি।'

—'দিন রাত আমি যা যাতনা পাচ্ছি!'

—'কিন্তু কী করে আপনাকে আমি সান্ত্বনা দেব বলুন?'

—'বলুন, আমাকে আপনি ভালবাসেন?'

—'কী করে তা বলি?'

—'ভালবাসেন না?'

বিভা চুপ করে রইল।

রুস্তমজি—'মনে করবেন না, পথে-পথে মেয়েদের সঙ্গে আমি ভালবাসা করে বেড়াই।'

—'এ নিয়ে একবারও আমি ভাবতে যাই নি রুস্তমজি।'

—'অনেক মেয়ে আছে পুরুষদের ওপর তাদের সন্দেহ।'

—'কিন্তু আমার কাছে এ জিনিস একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।'

—'আমি যে আর-কোনোদিন কোনো নারীকে ভালবাসি নি এর একটা মর্যাদা নেই?'

—'অনেকে তো প্রেমের পর প্রেম করে বেড়ায়।'

—'সেই কি ভাল?'

—'কেউ-বা একটি প্রেম নিয়ে থাকে।'

—'তাই কি উচিত নয়?'

—'কিন্তু যে-নারীকে আপনি ভালবেসেছেন জীবনের কর্তব্য-অকর্তব্য আপনি কতদূর পালন করছের সেই দেখেই তো সে আপনাকে ভালবাসতে যাবে না।'

—'তবে কী?'

—'খুব দায়িত্বহীন একটা লোককেও তো সে ভালবাসতে পারে।'

—'পারে?'

—'একজন অসচ্চরিত্র মানুষকেও।'

—'নারীরা এই রকমই বলে।'

—'নারীরা নয়, ভালবাসা জিনিসটাই হচ্ছে বিচিত্র, এর কোনো নিয়মপদ্ধতি নেই?'

—'তাই কি?'

—'দেখুন-না কেন, পার্শি সমাজে তো কত মেয়ে ছিল, বলছেন কাউকে কোনোদিন ভালবাসেন নি। আমাকে এসে বললেন, "দিন রাত যাতনা পাচ্ছি" বিস্ময়ের জিনিস নয়?'

সূচীপত্রে যান

—'শুধু কথাই কি বলব আমরা ?'
—'অবিশ্যি আমি চুপ করতে পারি।'
—'আপনি নিস্তব্ধ হলে আমার কষ্ট লাগে।'
—'কী করব বলুন ?'
—'চলুন আমরা পৃথিবীর একদিকে চলে যাই।'
—'কেন মিছিমিছি যে বেদনা পেতে যাবেন!'
—'আপনাকে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকলেও আমরা জীবন সার্থক হবে।'
—'কিন্তু আমার জীবন ?'
—'ব্যথা দিতে এত ভালবাসেন আপনি ?'
—'চাই তো সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু পথ যে খুঁজে পাই না।'
—'সান্ত্বনা আমি চাই না। মেয়েমানুষের সান্ত্বনা দিয়ে কী হবে আমার!'
—'একটু আস্তে, পাশের ঘরে বাবা আছেন।'
—'আমি চাই ভালবাসা।'
—'একদিন তো পাবেন।'
—'কিন্তু কার কাছ থেকে ?'
—'যদি বিধাতার মত বড় হতাম তবে তো বলে দিতে পারতাম।'
—'কিন্তু বিধাতার চেয়ে বড় আপনি।'
—'আমি ?'
—'আমার জীবন আপনার হাতে, বলুন, বলে দিন বিভা! বলে, তুমি আমায় ভালবাসা ?'
বিভা অবিশ্যি কিছু বললে না।
ছেলেটি সোফার ওপর কাত হয়ে চোখ বুজে রইল।
বিভা—'একদিন যেদিন আজকের দিনের কথা আপনার কাছে স্মৃতিমাত্র হয়ে রইবে।'
—'কেন এ রকম বলেন আপনি ?'
—'খুব তুচ্ছ স্মৃতিও বটে।'
ছেলেটি ধীরে-ধীরে উঠে বসল।
-'সেদিন বুঝবেন যে কত বড় ভুলের পথে চলেছিলেন।'
ছেলেটির চোখ জলে ভরে উঠল। বললে—'সে-রকম অমানুষ কোনদিনও যেন না হই আমি।'
—'প্রথম যৌবনের একটা সৌন্দর্য কী জানেন ?'
ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না।

বিভা—'এর সবচেয়ে গভীর সৌন্দর্য হচ্ছে যে এই এর আয়ু তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। মায়ের কোলে যে শিশু তার চরম পরিণতি হচ্ছে গিয়ে এই প্রথম যৌবন। তারপর এরা সব শেষ হয়ে যায়। স্বাভাবিক সাংসারিক মানুষের জীবন শুরু হয়।'

ছেলেটি এর-কথার কোনো জবাব না দিলে বললে—'ভুলের পথ যে বলে-ছিলেন, আপনি কি মনে করেন আপনাকে বিয়ে করলে পার্সি সমাজে আমার জায়গা হবে না ?'

—'না, তা নয়।'
—'তবে কী ?'
—'তা খুবই জায়গা হতে পারে। বিশেষত আজকালকার দিনে।'
—'তবে সার্থকতার আর জায়গা রইল কী ?'
বিভা ব্যথিত হয়ে চুপ করে রইল।

ছেলেটি বললে—'আপনি যে কোনো অ্যাটর্নির নাম করুন, আপনাদের নিজের অ্যাটর্নিই দিন, আমার বাবার তিন লাখ টাকা আর যা কিছু সম্পত্তি আছে সমস্তই আমি আপনার ও আমার নামে তিনদিনের ভেতরেই পাকা উইলে তৈরি করে এনে দিচ্ছি।'

—'কাকে ?'
—'আপনাকে।'
বিভা বিক্ষুব্ধ হয়ে ছেলেটির দিকে তাকাল।

সূচীপত্রে যান

রুস্তমজি—'তাহলে আপনার বাবাকে।'

—'না, দরকার নেই।'

—'তাহলে আপনাকে।'

বিভা মাথা নাড়ল।

ছেলেটি বললে—'আচ্ছা বেশ, তাহলে সমস্ত টাকাকড়ি সম্পত্তি আপনাব নামেই শুধু লিখিয়ে আনব।'

বিভা অত্যন্ত করুণ চোখ তুলে ছেলের দিকে তাকাল।

রুস্তমজি—'আমার বাবাকে নিয়ে আসব।'

—'কোথায় ?'

—'আপনাদেব এই বাসায়।'

—'কেন ?'

—'আপনাদের অ্যাটর্নিব কাছে।'

—'আপনার বাবা খুব বুড়ো মানুষ ?'

—'হ্যাঁ।'

—'মাথাব চুল পেকে গেছে বোধ কবছিলাম।'

—'তা গেছে তো।'

—'তাঁকে এইখানে নিয়ে আসতে চান ?'

—'তা তিনি আমাব কথা শুনবেন, তাঁকে দিয়ে আমি সব করিয়ে নিতে পারি।'

—'না, এসব কিছু কবাতে হবে না আপনাব।'

—'আপনি কী চান ?'

—'আমাদের দুজনেব সম্পর্কে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'ভগবানের কাছে থেকে একটা জিনিস ভিক্ষা কবছি।'

—'কী ভিক্ষা ?'

—'আমার হৃদয় প্রেমে ভবে উঠুক।'

—'কাব জন্য ?'

—'মোক্ষদা বলে একটি যুবক ছিল, ভালবাসে, কিন্তু ভালবেসে আপনার মত এত বিফল হয়ে পড়ে না, খুব বেদনা বোধ কবে। কিন্তু ব্যথাকে পদে পদে জয় কববাব আশ্চর্য শক্তি আছে তাব। জীবনের মূলসূত্রও তার আমাদেব চেয়ে আলাদা।'

—'ও, তাহলে এই ছেলেটিকে আপনি ভালবাসেন ?'

—'না।'

—'ভগবানেব কাছে থেকে ভালবাসা ভিক্ষা এব জন্য ?'

—'এ রকম ভিক্ষার কথা শুনলেও ইনি আমাকে উপহাস করতেন।'

—'কেন ?'

—'ইনি ভগবানকে মানেন না।'

—'এমন লোকও থাকে ?'

—'আছে তো।'

—'কোনো ধর্মও নেই বোধ করি ?'

—'মোক্ষদাবাবুর ?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে খুব রহস্যের জগতের মানুষ। আমরা তাকে বুঝতে পারি না।'

—'ভগবানকে বাদ দিয়ে ধর্ম কী রকম ?'

—'সে আলোচনা ভগবান নিজেই মোক্ষদাবাবুদেব সঙ্গে হয়তো বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে করবেন, আমাদের সঙ্গে নয়।'

রুস্তমজি খানিকটা করুণ হয়ে বললেন—'এর জন্যই আপনার প্রাণে প্রেমের ভিক্ষা করছেন ?'

সূচীপত্রে যান

—'বললামই তো ভিক্ষাকে ইনি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবেন।'

—'তবে কার জন্য ?'

—'আপনার জন্য।'

রুস্তমজি উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে—'এই দশ দিনের মধ্যে আজ একটা গভীর আশার কথা শুনলাম। এ নিয়ে সমস্ত জীবন বেঁচে থাকতে পারব আমি! বাস্তবিক কী আনন্দের কথা। সত্যি, আমার জন্য জীবনে আপনার প্রেম ভিক্ষা করছেন ?'

—'তাছাড়া কী আর করব? আর সবই তো আপনি অগ্রাহ্য করেছেন ?'

—'নিশ্চয! মেয়েমানুষের কাছ থেকে সান্ত্বনা নিতে যাবে কে ?'

—'হৃদযে তাহলে প্রেম আসুক।'

—'আমাব জন্য ?'

—'আপনার জন্যই।'

—'বার বার জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে কবলেন না ?'

—'না, দেখছিই তো ভালবাসাব বেদনা আপনাকে অস্থিব কবে তুলেছে।'

—'সেইজন্য এই দযা ?'

—'কিন্তু আমাব দয়া তো আপনি গ্রহণ করবেন না।'

—'আপনার কাছ থেকে প্রেম না পেলে বাকি সমস্ত আমাব কাছে মূল্যহীন।'

—'প্রেম তাহলে জন্ম নিক।'

—'কোথায ?'

—'আমার প্রাণে।'

—'কার জন্য ?'

গলা খাকরে ছেলেটি বললে—'আমি জানি, শেষ পর্যন্ত বড়-বড় প্রে৷.কাবাও পবস্পবের কাছ থেকে সুখ আর টাকাকড়ি চায়। প্রেমের চেয়েও টকাকাকড়িব সুখকে ঢের প্রেমিক আশীর্বাদেব জিনিস মনে করে।'

—'তা আমি জানি।'

—'তবে আব কেন? টাকাকড়ি তো আমাব অনেক বযেছে।'

—'শুধু প্রেমের চেযেই নয। শান্তির চেযেও একদিন আকাঙ্ক্ষাব সুখ বেশি কাম্য হতে পাবে, সব নারীর পক্ষে। আমার পক্ষেও তা আমি স্বীকাব কবি বটে।'

—'সে আকাঙক্ষা ও সুখ আমার কাছে থাকলে আপনি প্রতিনিয়তই তৃপ্ত করতে পাববেন।'

—'একদিন হযতো খুব আগ্রহের সঙ্গে এই রকম তৃপ্তিই চাইব।'

—'সব স্ত্রীকেই তো চাইতে দেখি; হযতো তাবা যৌবনের বড় বড় প্রণযিনী ছিল, প্রেমের ধ্যানই খুব বেশি করে করত।'

—'আমাকেও সেই ধারণা করতে দিন। অন্তত প্রেমের আবহাওযা নিযে দাম্পত্যটা শুরু কবি। তারপর দিন কেটে গেলে কী হবে না হবে সে ভাবনা এখন ভাবতে যাই কেন ?'

—'আ, সে বড় আশীর্বাদের দিন হবে।'

ছেলেটি সোফার গায মাথা কাত করে চোখ বুঝল। খানিকক্ষণ পরে বিভার দিকে তাকিযে বললে,—'হৃদযে আসে নি কি ?'

—'প্রেম ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে কেন আর ভিক্ষে কবতে যেতাম ?'

—'কিন্তু কবে আসবে ?'

অনেক্ষণ পরে বললে—'আমাকে অপেক্ষা কবতে বলেন!'

—'কদ্দিন অপেক্ষা করবেন ?'

—'এক বছর দু বছব।'

বিভা একটু হাসল।

—'কিন্তু প্রেম আপনি কোথায় পাচ্ছেন ?'

সূচীপত্রে যান

—'কেন আমি কি কোনো পুরুষকে ভালবাসতে পারব না ?'

অনেকক্ষণ পরে বললে—'আমার কল্যাণই এত চাচ্ছেন তখন আমাকে না ভালবেসে বিয়ে করলেই পারেন।'

—'সেটা কি সুখের হবে সাহেব ?'

—'শেষ পর্যন্ত গিয়ে স্বামী-স্ত্রী সুখীই হয।'

—'কিন্তু উদাসীনতা দিয়ে যে-সম্বন্ধেব সূচনা তাব ভবিষ্যৎ কি সুবিধার ?'

—'কিন্তু অনেক দিনের সংসর্গে পরস্পরেব প্রতি একটা গভীর মমতা জন্মায়।'

—'উদাসীনতা কেটে যায় ?'

—'নিশ্চয যায় ?'

—'কিন্তু অতৃপ্তি থাকবে।'

—'কেনই-বা থাকবে ?'

—'প্রেম চরিতার্থ হল না বলে।'

—'একজনের তো হল ?'

—'কিন্তু আর-একজন কী করবে ?'

—'সে নাবী, মাযামমতাই তাকে বক্ষা করবে। মায়ামমতা নিয়েই তাদের জীবন।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'সন্তানের দল এসে যখন তাকে পাকাপাকি মা করে তুলবে তখন সে হয়তো প্রেমপ্রণয়কে ঠাট্টাও করবে।'

—'এ রকম মা অনেকেকেই হতে হয অবিশ্যি।'

—'তবে আব দ্বিধা করছেন কেন ?'

—'কিন্তু অন্য কারু সঙ্গে প্রেমেব সার্থকতা নিযেও তো শুরু করতে পারি।' ছেলেটি চুপ করল।

রুস্তমজি—'জীবনের দাম তাতে মোটামুট বাড়বেই।'

—'তা কী কবে বলি! কোনোদিনও তো না আসতে পাবে।'

—'না, না, তা হবে না।'

—'না হলেই ভাল।'

—'ভাল বলছেন? তাহলেই তো আমাকে ভালবাসেন।'

—'না, তা নয। আপনাব কল্যাণ চাই বলে বলছি।'

—'আমাব মত এমন আকুলতা আপনাব জন্য যদি কেউ দেখাতে আসতে তাহলে তারও এ কবম কল্যাণ চাইতেন ?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে পথেব ভিখিরি হলেও ?'

—'পথের ভিখিবি হলেও।'

ছেলেটি যথেষ্ট দমে গেল।

ছেলেটি উঠে বসে বললে—'আট-দশ বছর ?'

—'যদি মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয ?'

—'তাও তো পারি।'

—'কিন্তু বুড়ো বযসে আপনাকে পেয়ে কী লাভ ?'

—'আপনাকে পেযে সব সমযই আমার লাভ।'

—'কিন্তু মাঝখান থেকে জীবনটা তো আপনার নষ্ট হযে যাবে।'

—'তা আমি মনে করি না।'

—'আপনার মতন ছেলেরা এই রকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে।'

—'আর আপনার মতন মেযেরা ?'

—'যখন ভালবাসি, দেখি।'

—'এখন দেখছেন না ?'

—'না, এ জাতীয স্বপ্ন এখন বিগত জীবনেব জিনিস।'

সূচীপত্রে যান

—'একদিন ভালবেসেছিলেন তাহলে ?'
—'হ্যাঁ।'
—'কাকে ?'
—'একে একে অনেককে।'
—'অনেককে ?'
—'আশ্চর্য হলেন ?'
—'আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।'
—'কী ?'
—'এই বুঝি প্রথম ভালবাসতে যাচ্ছিলেন ?'
—'আপনাকে ?'
—'হ্যাঁ।'
—'যদি ভালবাসতে পারি তাহলে এই আর-একটা প্রেমের স্মৃতি যুক্ত হবে।'
—'অনেককার স্মৃতিগুলোর সঙ্গে? বাঙলি মেয়েরা কি এই বকম ?'
—'পৃথিবীর সব ছেলেমেয়েরাই ভালবাসায সায় দিতে পাবে।'
—'কিন্তু বার বার ভালবাসে।'
—'হ্যাঁ। বার বার বিচ্ছেদের ব্যথাও পায। এমনি করে আমাদেব জীবন তৈরি হয।'
—'জীবনের সম্বন্ধে এই বুঝি আপনাব ধাবণা ?'
—'আপনাব অভিমত কী রকম ?'
—'আমি একবারই ভালবাসি।'
—'কিন্তু জীবনটা তো আপনার শেষ হয নি।'
—'কিন্তু শেষ পর্যন্তও এই একটি প্রেমই থাকবে।'
—'এ খুব জোব কবে বলছেন।'
—'জীবনে এটুকু জোর যদি না থাকে।'
—'তবেই তো জিনিসটা জোরজববদস্তিব ব্যাপাব হযে দাঁড়াল।'
—'আমি তা মনে করি না। এ চরিত্রের জোব।'
—'সে তো বড়ি গিলতে যে জোব লাগে, এ তাই। প্রেমকি বড়িব মত তেতো মনে করবেন না।'
—'আমি তা মনে কবি না।'
—'কিন্তু যারা ভালবাসা দিযে শুরু করেছিল সেই সব নবনাবীব (নিজেদেব, পবস্পবেব) সম্পর্কও অনেক সময তেমনি তিক্ত হযে ওঠে।'

ছেলেটি কিছু বললে না।

বিভা—'অন্তত নীরস নিবর্থক শূন্য জিনিস হযে দাঁড়ায।'
—'মানুষ তাহলে বিযে করে কেন ?'
—'অবিশ্যি একটা কর্তব্যের জগৎ আছে। সমাজেব জীবন সৃষ্টিকে চালাতে হবে। গড়ে তুলতে হবে। সমাজের খাতিবে মানুষ তাই একদিন প্রেমেব অভি-সারকে বাদ দেয।'
—'এই সব মনে করে আপনি নিরাশ হযে পড়েন না ?'
—'নিবাশ হবার কী আছে ?'
—'জীবনটাকে সুন্দব মনে হয ?'
—'নরনাবীব প্রেমই তো শুধু জীবনটাকে বিচিত্র সুন্দব করে তুলছে না।'
—'তবে ?'
—'চারদিককাব জীবনের স্রোত আছে, কাজ আছে, বই আছে, গাছপালা আকাশ বযেছে। একটি দিনের পর আব-একটি দিনের জন্য রয়েছে-[....] আছেন।'
—'টেবিলের ওপব ভূমিষ্ঠ হল ?'
—'হ্যাঁ।'
—'ভারি চমৎকাব।'
—'শিগগিরই কৃষ্ণচূড়া ফুটবে।'

—'খুব সম্ভব ইংরেজিতে গোল্ড মোহর বলে।'
—'এই শীতেই কি ফোটে?'
—'না, শীত শেষ হয়ে গেলে।'
—'আজ বড্ড শীত পড়েছে।'
—'খুব।'
—'কুর্চি নামটা ভারি সুন্দর।'
—'বেশ তো।'
—'আপনার জানালার কাপাটে একটা চড়াই এসে বসেছে।'
—'রোদে বেশ ভাল লাগছে পাখিটাব।'
—'ঠোঁটে একটা কুটো রয়েছে।'
—'হয়তো কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধবাব মতলব।'
—'ভারি দুষ্টু পাখি।'
—'চড়াই?'
—'টেবিলে লিখছি এমন সময় কাগজপত্রের ওপর তোষকে খানিকটা ধূলো বালি ছিটিয়ে গেল।'
—'সেটুকু ময়লা এক ফুঁযেই তো উড়ে যায়।'
—'তা যায় বটে।'
—'রুস্তমজি বললে—'মাঝে মাঝে ডিম ভাঙে আমার হ্যাটেব ওপব।'
—'এবকমও হয়েছে?'
—'হ্যাঁ।'
—'কিন্তু তাতে আপনাব চেয়ে পাখিটাবই তো কষ্ট হল বেশি।'
—'কেন?'
—'তার গেল সন্তানই নষ্ট হয়ে। আপনাব হ্যাটের একটা কিনাব শুধু নোংরা হল।'
বিভা চুপ কবল।
রুস্তমজি—'শালেই মেয়েদেব সবচেয়ে বেশি সুন্দব দেখায়। আপনি বরাবরই শাল গায় দেন?'
—'এই শীতকালে দিই।'
—'মেমসাহেবি যে করেন না এ খুব ভাল।'
দুজনেই চুপচাপ।
ছেলেটি ছটফট করছিল। কিছুক্ষণ পবে বললে—'কিন্তু কথা বলুন।'
—'বলছিই তো।'
—'না, ও-বকম কথা নয়।'
—'তবে?'
—'বলুন আমাকে ভালবাসেন।'
বিভা চুপ করে রইল।
—'নিশ্চয়ই বাসেন। নিশ্চযই। নিশ্চযই বাসেন, আব কিছু আমি মনে করতে পাবি না। তাহলে আমি মরে যাব। তোমাকে ছাড়া আমাব একদণ্ডও চলবে না। এক মুহূর্তও না।'
বিভা উঠে চলে গেল।
ছেলেটি খানিকক্ষণ অপেক্ষা কবল। কিন্তু বিভা ফিবল না আব।'

দিন দুই পবে।
কলকাতাব শীত এবার বেশ চলেছে। সমস্ত পৌষ মাসটা বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কেটে যাচ্ছে।
দুপুরবেলা পায়ে একজোড়া ছেঁড়া মোজা আর গায় একটা কম্বল জড়িয়ে জানালাব পাশে ডেকচেয়ারে বসেছিলাম। শব্দ শুনে পাশের বাড়ির দিকে তাকালাম। দেখলাম, ধীরে ধীরে দরজা সবি একটি যুবক ঢুকল। গায়ে টুইডের সুট, মাথায় ফেল্টহ্যাট, হাতে একটা স্টেথোস্কোপ।
এ সেই ডাক্তার ছোঁড়াটি—সকালবেলা আসে না, রাতেও না, আসে দুপুর-বেলা। বিভার কাছে মাঝে-মাঝে একে অনেকটা সময় কাটিয়ে যেতে দেখি। বিভার স্বাস্থ্য অটুট, তার কোনো অসুখ নেই,

ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। এ ছেলেটির সঙ্গে কোনো রকম ডাক্তারি কথাও হয় না কোনোদিন। হয় কি! আমি তো শুনি নি।

—'ডাক্তারবাবু!'

—'না, একথা বললে আমি ঘরে ঢুকব না।'

—'তবে, ডাক্তার সাহেব?'

—'তাহলে তো সিভিল সাজ্জন হয়ে গেলাম মিস রায়, আমরা [....] নেমক কোনোদিন খাব কি? কী দরকার? ও হীন ভীরুদের পথ। জীবনে যদি সাথে থাকে তাহলে কাঁটা পথে চলে না মানুষ। জংলা পথ কেটে। আ। দেখেছেন চড়াইটা?'

—'কোথায়?'

—'আপনারই জানলায় তো।'

—'শীতে বড্ড কাঁপছে!'

—'এ ওর নিজেরই দোষ।'

—'কেন?'

—'সমস্ত আকাশভরা রোদ তো রয়েছে, এই ছায়ায় এসে বসবার কীই-বা দবকার ছিল।'

—'হয়তো কোনো খাবারের লোভে এসেছিল।'

—'ডালমুট খাচ্ছিলেন বুঝি?'

—'কে আমি?'

—'তা বেশ; শীতের দুপুরে বসে বসে ডালমুট খাওয়া বেশ—'

—'ডাক্তারেরা বোধহয় এই-ই করে?'

—'না, এটা হল মেয়েদের খাসদখলের নিজস্ব জিনিস। ডালমুট, ঝালচানা, সমস্ত নুন মরিচ, লেবুর জিনিস,' ছেলেটি বললে—'বলুন, ভালবাসেন কি না?'

—'ভালবাসি বই কি।'

—'মেয়েদেব সম্বন্ধে ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা এই রকম গভীব!'

—'একটা কথা বেশ মনে করিয়ে দিয়েছেন আপনি।'

—'কী?'

—'দুপুরবেলা তো অনেক সময়ই চুপচাপ বসে থাকি।'

ডাক্তার গলা খাঁকরে বললে—'আচ্ছা।'

—'প্রায়ই দেখি, আশেপাশে কার্পেটের ওপর জানালায় টেবিলে কার্নিশে এই চুড়ুইগুলো খুনসুড়ি করছে।'

—'খুনসুড়ি শব্দটা বড্ড দুষ্প্রাপ্য মিস বায়। মেয়েবা প্রায়ই ব্যবহার করে না, কাজেই, এমন চমৎকার শোনায় তাদেব মুখে! আপনি নিশ্চযই কোনো বাংলা গজলে শব্দটা পেয়েছেন?'

—'না না।'

—'তবে?'

—'কবে কোথে কে পেযেছি মনেও নেই।'

বিভা—'যা বলছিলাম, এই চড়াইগুলির করুণ নিরপরাধ আসাযাওয়া দেখে বড্ড ভাল লাগে। কিন্তু প্রায়ই ভুলে যাই ওদের কোনো খাবাব দেওযারও দরকার।'

—'খাবাব এবা বিস্তর পাচ্ছে।'

—'কোথায?'

—'আমি এক সময অবাক হয়ে ভাবি কলকাতায় যত খাবার জিনিসের অপচয হয সেই অনুপাতে ইঁদুর বা চড়াই নেই এ শহরে।'

বিভা হেসে উঠল।

—'কিন্তু চড়াই আর ইঁদুব ছাড়া প্রার্থী তো আরো ঢের আছে, কত ভিখিরিবা, কুকুব বেড়াল।'

—'ষাঁড়, কাক, চিল-তা জানি আমি। কিন্তু কতকগুলো বিশেষ জায়গায মানুষের অন্তঃপুরের খুব আনাচে-কানাচে ইঁদুর আর চড়াই ছাড়া আর-কেউ ঢুকতে পারে না।'

—'ষ্টেথোস্কোপ হাতে অনেকে ঢুকে পড়ে অবিশ্যি।' ডাক্তার একটু হেসে বললে—'এতক্ষণ তো

সূচীপত্রে যান

দাঁড়িয়ে রইলাম, একটু বসতেও বললেন না।'

—'বসুন।'

—'সেধেই বসলাম; ডাক্তারদের সঙ্গে কেউ ভদ্রতা করা উপযুক্ত মনে করেন না। উঠলেন যে!'

—'দেরাজে একটা কেক ছিল।'

—'আমাকে দেবেন ?'

—'এই চড়াইটাকে একটু ভেঙে দিচ্ছি।'

চড়াইটার দিকে এক টুকরো কেক ছুঁড়ে ফেলতেই সে উড়ে গেল। ডাক্তার—'এ রকম বেকুব প্রাণীর জন্যও আপনার এত দরদ!' একটু হেসে বললে—'মেয়েদের এই রকমই হয়।'

স্টেথোস্কোপ পকেটে রেখে বললে—'দিন কেকটা আমাকে।'

—'আপনি খাবেন ?'

—'সাধারনত খাই না, বিশেষত কেকটা যে-রকম ছানছেন, হাত স্টেরিলাইজডও তো নয়। নখও কাটেন নি। আমাদের ডাক্তারদের এই সব জিনিসে বড্ড আঘাত লাগে। কিন্তু তবুও কেক খাবার রুচি এ সব বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করে-করে অপরাজেয় হয়ে উঠল।'

বিভা একটু হেসে—'নিন।'

—'একটু ভদ্রতা করেও দিলেন না তো।'

—'কেন, আপনার গায় ছুড়ে ফেলি নি তো; অভদ্রতা বরং চড়াইটার সঙ্গে করেছিলাম।'

—'কিন্তু আমি তো চড়াই নই। আমাকে একটা ডিশে করে দিতে হয়।'

—'ডিশ কোথায়? নেই তো এখানে!'

—'কিন্তু খানশামা তো আছে।'

—'সে কোথায়? রান্নাঘরে।'

—'তাকে ডাকতে হয়।'

—'আবার গিয়ে ডাকব-'

—'তাহলে নিজে গিয়ে একটা ডিশ নিয়ে আসতে হয়।'

ডাক্তার উঠলেন!—[বিভা উঠল!]

—'যাচ্ছি।'

—'কোথায় ?'

—'ডিশ আনতে।'

—'কিন্তু কেক তো আমি মেরে ফেলেছি প্রায়।'

—'কিন্তু কেক কি আমাদের বাড়িতে নেই ?'

—'আমি একটাই চেয়েছিলাম শুধু, বেশি তো চাই নি।'

—'কিন্তু আমি তো দিতে পারি।'

—'কিন্তু আমি না নিতে পারি তো।'

—'কেন নেবেন না ?'

—'কেনই বা নেব ?'

—'কেন, ডিশে করে এনে দিচ্ছি।'

—'সঙ্গে এক পেয়ালা কফিও আনবেন হয়তো।'

—'বেশ বেশ।'

—'কিংবা এক বোতল লেমনেড।'

—'যা চান আপনি।'

—'কিন্তু আমি আর-কিছুই চাই না মিস রায়।'

বিভা বসল।

ডাক্তার—'শুধু এক গেলাস জল চাই।'

বিভা উঠে দাঁড়াল। বললে—'জল তো এখানেই আছে।'

—'কিংবা টালা ওয়াটার ওয়ার্কসে, যেখানেই থাকুক, আপনি এক গেলাস আমাকে গড়িয়ে এনে দিলেই খুব খুশি হব।'

সূচীপত্রে যান

বিভা ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটা তেপয়ের ওপর কালো কুঁজোটার থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে এনে দিল ছেলেটিকে।

জল খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ডাক্তার,—'এজন্যই বলেছিলাম।'

—'কী রকম?'

—'আপনার কাছ থেকে পেলাম লোকসানে খাওয়া একটা কেক। সঙ্গে একটু সমবেদনা পর্যন্ত না। অন্য কেউ হয়তো কতকগুলো বোবা টাকা দিয়ে দিত। বদলে ভাল টকা চাইলে মনে মনে পাড়ত গাল,' রুমালটা পকেটে রেখে বললে,—

'এই রকম।'

—'বোবা টাকাও দেয়?'

—'তাই দেওয়াই নিয়ম।'

—'বাজিয়ে নেন না?'

—'সেটা অভদ্রতা।'

—'ডাক্তারবাবুর?'

—'না, গোড়ার থেকেই সম্ভাষণটা ঠিক করে নেওয়া উচিত, ডাক্তারবাবুও না, সাহেবও না।'

—'তবে?'

—'ব্যানার্জি।'

—'শুধু ব্যানার্জি?'

—'খুব, খুব।'

—'মিঃ ব্যানার্জি!'

—'কী দরকার আর মিস্টারের।'

—'এমনি ব্যানার্জিটা বড্ড অভদ্র হয়।'

—'আমি তা মনে করি না। কিন্তু আপনি যদি আজ্ঞা করেন।'

—'কিন্তু আমি তা মনে করি।'

—'তাহলে ভেবে নেবেন যে মানুষদের কাছ থেকে অভদ্রতা পাওয়া আমাদের দস্তুর।'

—'কিন্তু তাই বলে আমিই-বা আপনার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে যাব কেন?'

—'এ ঘরে ঢুকেছি অব্দি আপনি আমার সঙ্গে খুব অসমাজিক ব্যবহার করছেন!'

—'প্রথমত আপনার ঘরে এলাম তো, বসতেই বললেন না।'

—'আমি ভেবেছিলাম বাবাকে দেখে বাসায় ফির যাবার পথে একটু এসে দাঁড়ালেন বুঝি?'

ডাক্তার একটু ঢোক গিলে বললে—কিন্তু তবু তো এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম তো।'

—'অতটা খেয়াল হয় নি।'

—'কিন্তু দাঁড়িয়েছিলামও অনেকক্ষণ।'

—'ভুল হয়ে গেছে।'

—'কিংবা হয়তো ভেবেছিলেন ডাক্তারবা ও-রকম দাঁড়িয়েই থাকে। তারা বসতে বলবার মানুষ তো নয় বাবা।'

—'না, আমি তা মনে করি না।'

—'আপনি কী মনে করেন না-করেন তা দিয়ে আমি কী করব? একজন ভদ্রমহিলার খাস কামরায় বিস্তর দোলা খাটিয়া থাকলেও মনের ভেতর আমার ইচ্ছা ছিল, তার নির্দেশ পাওয়া মাত্রই বসব। যেমন সচরাচর হয়, তেমনি আশা করেছিলাম যে সে নির্দেশ মুহূর্তের ভিতরেই পাব কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও পাওয়া গেল না। কাজেই মানুষের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক টানে প্রবৃত্তিকে খাটিয়ে বিনা অনুমতিতে নিজেই বসলাম।'

—'লেকচারটা খুব মস্ত বড়।'

—'কিন্তু খুব মূল্যবান।'

—'হয়তো সাহেবদের কাছে।'

—'আমরাও তো দিনের পর দিন সাহেব হয়ে যাচ্ছি।'

—'আমি অন্তত না।'

—'যদি বাঙালি থাকতেন, চড়াইটাকে খানিকটা মুড়িচিঁড়ে ছড়িয়ে দিতেন। ড্রয়ারের থেকে কেক বের করতে যেতেন না।'

বিভা হাসতে লাগল।

ডাক্তার—'হাসছেন কি! বসতে বললেন না, তবুও বসলাম, এটা আমি বাঙালির মতোই কাজ করেছি; কোনো সাহেব এ-রকম করত না।'

—'সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

—'এটা আপনার সাহেবি ঢং হল; কোনো খাঁটি বাঙালি ভটচাজ্জি পণ্ডিত বা তার গিন্নি বা মেয়ে আপনার মতন এমন সৌখিন ধন্যবাদ জানাতে যেতেন না।'

—'কিন্তু আমরা ভটচাজ্জি পণ্ডিত নই।'

—'তা তো ননই। তার গিন্নিও নন। হবার আশাও নেই কোনোদিন।'

—'তবুও বাঙালি।'

—'একটা শাল গায় দিয়েছেন বলে?'

বিভা একটু হেসে বললে,—'না, তা নয়।'

—'এ শালের কৃপায় আপনাকে বরং খানিকটা কাশ্মীরি পণ্ডিতানীর মতন দেখাচ্ছে।'

—'সে তো খুব গৌরবের কথা।'

—'কিন্তু তবুও তো বিদেশীয় জিনিস।'

—'কাশ্মীরের পণ্ডিত তো ভারতের লোকই।'

—'পণ্ডিত নয়, পণ্ডিতানী।'

—'সেও তো ভারতবর্ষের নারী।'

—'কিন্তু তবুও বাঙালি নারী নয় তো।'

—'বাঙালি নারীরা কি শাল গায় দেয় না?'

—'বিস্তর দেয়।'

—'তবে?'

—'কিন্তু এরকম কাশ্মীরের শাল নয়,' ডাক্তার গলা খাকরে নিয়ে বললে—'ভটচাজ্জির স্ত্রীকে গিয়ে দেখুন পাড়াগাঁয়, হয়তো গেরুয়া রঙের খদ্দরের শাল গায় দিয়েছে একটা, কিংবা শুধু শাড়ির খুঁট বুকে জড়িয়ে শীত কাটাচ্ছে।'

—'বেশ ভাল।'

—'কিন্তু খাঁটি বাঙালি, নিছক স্বদেশী হওয়া বড্ড দুষ্কর। আমরা কেউ তা পারব না।'

—'কিন্তু এও আমরা বিশ্বাস করি যে তারই নিছক স্বদেশী।'

—'তবে কি আপনারা আর আমরা।'

—'যাদের কথা বললেন তারা অনেকটা মোগল যুগের ধারাই বয়ে চলেছে।' ডাক্তার স্টেথোস্কোপটা পকেটের থেকে বের করে সোফার ওপর রাখল। বিভা—'কিন্তু দেশের প্রাণ যুগের পর যুগ বদলে চলেছে।'

ডাক্তার—'ঢের নীরস তর্কের অবতারণা করা হল। অন্য সময় বিচার করা যাবে। আপনার কাছে যে সাহেবটি আসত তাকে আজকাল আর দেখছি না কেন?'

—'সাহেব কে আসত আবার?'

—'অবিশ্যি বলতে পারেন যে-যে-কটিতে আমরা আসি আপনার কাছে, দু-চারজন বাদে আর-সকলেই কিছু কম সাহেব নয়।'

বিভা কোনো উত্তর দিল না।

ডাক্তার—'আমাদের সাহেবি শুধু পোশাকে, প্রাণে আপনিও দেশী, আমিও দেশী।'

—'আমার কথা যদি বলেন পোশাকের সায়েবিয়ানা আমি কোনোদিন পছন্দ করি না। এবং নিজেও তার ত্রিসীমানায়ও থাকি না।'

—'কিন্তু পুরুষদের অনেক সময় দায়ে পড়ে পছন্দ করতে হয়।'

—'বাবা তো কোনোদিন হ্যাটকোট পরলেন না।'

—'সেকালের মানুষদের চোগাচাপকনাই ছিল দস্তুর।'

সূচীপত্রে যান

—'যাক গে।'

—'যাক।'

ডাক্তার স্টেথোস্কোপটা সোফার থেকে নাড়তে-নাড়তে বললে—'কিন্তু একটি খাঁটি সাহেব আসতে আপনার কাছে।'

বিভা একটু ভেবে—'মোক্ষদাবাবুর কথা বলছেন আপনি?'

—'না, কোনো বাবুটাবু নয়।'

—'তবে?'

—'হয়ত কোনো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান!'

—'না, এমন কেউ আসত না তো।'

—'তাহলে পশ্চিমের কোনো লাল টালা হবে বোধ করি!'

—'আমার কাছে? কবেই-বা দেখলেন আপনি?'

—'খুব কয়েকদিন ঘুরতে দেখেছি, দিন নেই রাত নেই,' ডাক্তার ভুরু দুটো খানিকটা কুঁচকে বললে—'দিল্লি বা লাহোরের ওদিকের কোনো বামুনের ছেলে হতে পারে। কিংবা রাজপুত, কিংবা দিল্লিওয়ালি, মুসলমানের ছেলে।'

—'ও, রুস্তমজির কথা বলছেন? তিনি তো পার্সি।'

—'পার্সি নাকি ছেলেটি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু সেই পার্সি টুপি পরে নি তো।'

—'না ফেল্ট হ্যাট পরত।'

—'আপনার সঙ্গে এত দেখা!'

—'তা হয়েছিল।'

—'কী করেই-বা হয়!'

—'আপনার সঙ্গেই-বা কী করে হল?'

—'বাঙালি পাড়ায় বাঙালি ডাক্তারের গতিবিধি তো খুব স্বাভাবিক। পার্সির গতিবিধি তেমনি অস্বাভাবিক।'

—'তাই বলতে যাচ্ছিলাম, ছেলেটি ডাক্তার?'

—'না।'

—'তাও নয়?'

স্টেথোস্কোপটা শূন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডাক্তার—'তা হবেই বা কী করে? মেডিকেল কলেজে পার্সি ছেলে কই, বড় একটা দেখি না তো। জাতব্যবসা ছেড়ে অন্য কোনো দিকে বড় একটা মাড়ায় না ওরা। তা ভেবেছিলাম, ডাক্তার বুঝি। কিংবা ব্যারিস্টার, কিংবা ইঞ্জিনিয়ার। আপনার বাবার যা শখ। একটা নেপালি কাকাতুয়া কিনেছিলেন না তিনি কদিন আগে? ভেবেছিলাম, এই ছেলেটিকেও ঔরঙ্গাবাদ থেকে জোটালেন বুঝি! আপনাদের এখানেই থাকত?'

—'কে, রুস্তমজি?'

—'হ্যাঁ।'

—'না, পার্ক স্ট্রিটে নিজেদের বাসা আছে।'

—'কিন্তু দিনরাত দেখতাম যে।'

—'আসত খুব।'

—'পার্ক স্ট্রিটে বাসা?'

—'হ্যাঁ।'

—'ব্যবসা করে বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার—'তা আজকাল আর সাহেবকে দেখছি না যে?'

—'তা আমি কী করে বলব?'

—'বেশ তো উঁচুদরের সাহেব।'

সূচীপত্রে যান

বিভা কোনো জবাব দিল না।
—'ইংরেজিতে কথা বলতেন ?'
—'বাংলায়।'
—'বাংলাও শিখে গিয়েছে বুঝি ?'
—'বেশ বলতে পারে।'
—'গরজে মানুষ অনেকদূর এগিয়ে যায়।'
বিভা চুপ করে রইল। একটু পরে মুখ তুলে বললে—'আপনি পার্সি শিখতে পারবেন।'
—'আপাতত দরকার নেই।'
—'সকলেই চুপচাপ।
ডাক্তার—'একবার জার্মান শিখতে আরম্ভ করেছিলাম।'
—'তারপর ?'
—'ছিলাম এডিনবরায়। কিন্তু স্কচের চেয়েও জার্মানের প্রতি হল আসক্তি।'
—'কেন ?'
—'কারণটা নাই-বা শুনলেন।'
বিভা ঘাড় হেঁট করল।
—'যাদের-যাদের টাকা আছে এবং নিজেদের সাধারণ শক্তি আছে, সংস্কার নেই, তাদের অনেক বকম সার্থকতা হয় কিনা,' একটু চুপ থেকে বললে—'আপনি যে চুপ ?'
—'কী বলব ?'
—'আমার কথাটা সত্যি নয় ?'
—'আপনি জানেন।'
—'খুবই সত্যি।'
—'অবিশ্যি আমার জীবনেব অভিজ্ঞতা অন্য বকম।'
—'মনে আপনার সংস্কার যে ঢেব।'
—'কোনো মিথ্যা সংস্কার নেই।'
—'কিন্তু ভগবানে তো বিশ্বাস কবেন ?'
—'সেটা কি মিথ্যা সংস্কার ?'
—'আমরা তাই মনে কবি।'
—'এটা বোধ হয় আপনাদেব গৌববেব জিনিস ?'
—'কোনো কিছু নিয়ে গৌরব করবারও প্রবৃত্তি নেই। এ সংস্কাব থেকেও মুক্ত। কিন্তু অনেক গভীব ভাবে ভেবে দেখেছি, ভগবান নেই।'
বিভা একটু হেসে—'আপনাব গভীব ভাবনা জয়যুক্ত হোক।'
—'কিন্তু আপনি ত বিশ্বাস কবেন, ভগবান আছেন ?'
—'এ বকম সংস্কাব নিয়ে যাত্রা করেছি বটে।'
—'যাত্রাব শেষে এটা সংস্কার থাকবে ?'
—'অন্তত চাই, যেন থাকে।'
—'সর্বশক্তিমান সব জাযগায়ই আছেন, সকলে মঙ্গল কবছেন এই রকম ?'
—'হ্যাঁ, এই রকম, এখনো এইই মনে হয।'
—'তাহলে চিবকালই এই বকম মনে হবে।'
—'আমিও তাই আশা করি।'
—'সে আশা আপনার ঠিকই। আপনার এই বয়সেই মানুষের হতাশা ও অবিশ্বাস শরু হয় কি না। এ বয়সেও যদি সরল বিশ্বাস অটুট থাকে, তাহলে বুড়ো বয়সে আবো তা গেড়ে বসবে,' স্টেথোস্কোপটা নেড়ে—'কেন জানেন ?'
বিভা স্টেথোস্কোপটাব দিকে তাকাল।
ডাক্তার—'যে মানুষ জীবনটাকে খুব নিরর্থক বলে জানে যৌবনে সেও সাধলালসার ভেতর ডুবে সবই ভুলে থাকে। কিন্তু বুড়ো বয়সে তাকেও প্রার্থনা করতে হয়। জীবনটা সহসা আলোব জিনিস হয়ে

সূচীপত্রে যান

চোখে দেখা দিল বলে নয়। কিন্তু দাঁত গেছে ভেঙে, চোখে হয়েছে ক্যাটারেক্ট, শরীরের সমস্ত জায়গাই নানা রকম ভযাবহ লোকসান হয়ে গেছে বলে।'

—'জীবনটা আমাদের শরীর নিয়েই শুধু ?'

—'তাই তো বললাম এতক্ষণ, একদিন যদি ফুটপাথের পাশে গলিত কুষ্ঠের ব্যারাম নিয়ে বসে থাকেন তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

বিভা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ডাক্তারও।

ডাক্তার—'পৃথিবীর জীবনে রক্তমাংসই প্রধান।'

—'তাও আমি মনে করি না।'

—'যদি মনে না করেন আপনি ?'

—'কুষ্ঠরুগীরাও তো ভগবানের জযগান করে নি।'

—'বলেছিই তো বুড়ো বযসে আমাদের সকলকেই প্রার্থনা করতে হয।' ডাক্তার স্টেথোস্কোপটা সোফার ওপর একপাশে ঠেলে রেখে দিল, বললে—'যা বললাম, শরীরের সব দিকে সমস্ত রকম লোকসানই এমন হয তখন ভগবান ছাড়া কে আর পারে বলুন? তার প্রতি যদি নাও বিশ্বাস থাকে তবু তাকে তৈরি করে নিতে হয।'

কার্পেটের ওপর বাঁ পাযের জুতোটা একটু ঘষে বললে—'তাকে তৈরি করে নেই, মনের ভেতর বিশেষ কোনো অনুভূতি নেই, তবুও খানিকটা ভাবাবেগ তৈরি করি? এই সব সম্বল নিয়ে পড়ে থাকি। না হলে উপায নেই যে।' বললে—'কিন্তু আবার যদি কোনো ব্যবস্থায সেই পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বযসের জীবনে ফিরে যেতে পারি তাহলে এক মুহূর্তেই প্রার্থনা অপ্রযোজনীয় হয়ে পড়ে। ভাবাবেগকে করি ঠাট্টা, ভগবান যে মিথ্যা তাকে সেই মিথ্যা বলেই জানি।'

—'এ সব কাদের জীবনের কথা বলছেন ?'

—'আমাদের সকলের জীবনেরই।'

—'আপনি কি মনে করেন সকলেই এই রকম ?'

—'কারু-বা মনের অন্ধতা গুবরেপোকার মত। কিংবা সে যদি সুন্দর জীব হয, প্রজাপতি হত। তারা অবিশ্যি জীবনটাকে আমাদের মত করে ভাবে না।'

—'থাক।'

—'বলছিলেন, জীবনের অভিজ্ঞতা আপনার অন্য রকম ?'

—'হ্যাঁ।'

—'বলেছিলাম মনে আপনার ঢের সংস্কার আছে।'

'হ্যাঁ।'

—'ভগবান না হয বিশ্বাস করলেন, কিন্তু পৃথিবীর এই সমাজ ধর্মনীতি সবই কি আপনার শ্রদ্ধার জিনিস।'

আমাদের মত অতটা অবজ্ঞার নয।'

—'পুরোপুরি শ্রদ্ধারও নয ?'

—'না, তাও নয।'

—'উৎকট সুনীতিকে কৃপা করেন তো ?'

—'কৃপারও একটা সীমা রাখি।'

—'নারীরা তা রাখে।'

—'কিন্তু সুনীতিকে শ্রদ্ধা করতে গিযে অনেক পুরুষকেই তো দেখেছি সমস্ত শোভন সীমা ডিঙিয়ে যাচ্ছেন।'

—'আমার মনে হয তাদের ভিতরে নারীস্বভাব বেশি।'

—'নারীরাই কি সবচেয়ে বেশি সশ্রদ্ধা হয ?'

—'আমার তাই মনে হয।'

—'আমি নিজে নারী বলে নারীর জাতকে সব বিষয়েই যে খুব অস্বাভাবিক-ভাবে শ্রদ্ধা করব তা মনে করবেন না।'

ডাক্তার কোনো জবাব দিল না।

সূচীপত্রে যান

বিভা বললে—'কিন্তু ধর্মের ইতিহাস যদি দেখেন'—

—'আমি কোনো ইতিহাসের ধার ধারি না।'

—'তবে ?'

—'ঘরেবাইরে নারীদের সঙ্গে যে আমার পরিচয় তার থেকেই এ বিচারটুকু,' ডাক্তার চুপ করল।

বিভাও কোনো কথা বললে না!

ডাক্তার—'কিন্তু তবুও এ বিচার আমার ভুল নয়, এ তো আমার মনে হয়।' বিভা—'থাক, এ রকম কথা নিয়ে আলোচনা করে আর দরকার নেই।'

—'আমারও তাই মত।'

—'জীবন সম্বন্ধে ধারণা করতে গিয়ে পুরুষ ও নারী যদি ভিন্ন স্বভাবের জীবও হয়, তাহলে এ কথা ঠিক যে এমন অনেক নারীপুরুষ রয়েছে যারা নিছক নারী বা পুরুষ নয়, কিন্তু বিশেষভাবে ব্যক্তিগত মানুষ।'

—'তা আমি জানি।'

—'নারীদের ভেতর এদের সংখ্যা হয়তো কম।'

—'আমার তাই মনে হয়।'

—'সেই জন্যই নারীদের মধ্যে নীতি ধর্মান্ধতা এত বেশি।'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি তা দেখেছি।'

—'আপনার নিজেরও ঢের সংস্কার আছে, কিন্তু আশাপ্রদ সুন্দর সংস্কারগুলো' যেমন ভগবান আছেন, মঙ্গল আছেন। বিষম কাঠখোট্টা সংস্কার, যেমন ঐ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, ঐ মানুষটার মুখ দেখব না, অমন গান শুনলে জাত যাবে, ঐ লোকগুলো জানোয়ার ও অধম.-এই রকম সব সংস্কার আপনার মনে কিছু নেই। কাজেই আপনার কাছে আমি বসি, ভাল লাগে। কিন্তু এমন অনেক নারী এবং বিস্তর পুরুষও রয়েছে এই রকম সব বিজাতীয় সংস্কার যাদের জীবনটাকে বীভৎস করে তুলেছে।'

ডাক্তার স্টেথোস্কোপ ঘোরাতে-ঘোরাতে বললে—'সবচেয়ে চমৎকার এই তারা মনে করে যে তারাই বুঝি দেবতার বেশি আদরের জিনিস। জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদের কাজ করছে।' বলেই ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠল।

বিভা চুপ করে ছিল।

ডাক্তার—'বলছিলাম, জার্মান শিখছিলাম।'

—'কতদূর শিখেছিলেন ?'

—'জার্মান বুঝতে পারা যায়। কিছু-কিছু কথা চালাতে পারা যায় এই অব্দি।'

—'ডাক্তারি বই পড়াবার জন্য ?'

—'মোটেই না।'

—'তবে ?'

—'শুনতে চান ?'

একটু বিব্রত হয়ে ডাক্তার থামল।

—'বলবার কোনো দরকার নেই আপনার, ডাক্তার।'

—'ধারণা করে নিয়েছেন হয়তো ?'

বিভা কোনো কথা বললে না।

—'শুনুন একজন মেয়েকে ভালবেসেছিলাম।'

—'জার্মানিতে গিয়েছিলেন ?'

—'না, মেয়েটি স্কটল্যাণ্ডে এসেছিল।'

—'বার্লিন থেকে ?'

—'না, হিডেনবুর্গ থেকে।'

দুজনেই চুপ করল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে শেষে বললো-'কোনো কৌতূহল নেই আপনার ?'

বিভা—'তা অবিশ্যি বলি না আমি। যা কোনোদিন ঘটে না এমন অনেক ভালবাসার গল্পও মন দিয়ে পড়ি।'

—'মেয়েটি দেখতে বড্ড কুৎসিত ছিল।'
—'এই হিডেনবুর্গের মেয়েটি?'
—'হ্যাঁ।'
—'তবুও ভালবাসা হল?'
—'বয়স বিশ বছর মাত্র যে, স্বাস্থ্য ভারি নিটোল আর রং পাকা আপেলের মত কিনা। আপনার মুখ চোখ্ লাল হয়ে গেল যে!'
বিভা মাথা হেঁট করে মুখ ফিরিয়ে রইল।
—'কোথাও আঘাত দিয়েছি নিশ্চয়ই আপনাকে?'
বিভা—'থাক এ গল্প।'
ডাক্তার—'অবিশ্যি ছেলেদের কাছে বলা অভ্যাস কিনা এ সব গল্প আমার, বিশেষত ডাক্তার ছেলেদেরে কাছে, সব সময় খেয়াল থাকে না।'
অনেক্ষণ পরে বিভা বললে—'ও, আপনি উঠে যান নি এখনো।'
—'না, তো। আপনার কথা শুনবার জন্যে বসে আছি। আমার ভালবাসার গল্পটা কেমন লাগল আপনার?'
—'ওটা তো মোটা জিনিস।'
—'কিন্তু ওকেই আমরা প্রেম-প্রণয় বলি।'
—'আপনারা মানে?'
—'আমরা পুরুষরা।'
—'আপনারা মেডিকেল কলেজের পুরুষেরা।'
—'তাদের সংখ্যাই-বা কম কী?'
—'তাদের ভেতরও সকলে যে এ রকম ভাবে তা আমার মনে হয় না। যাক গে।'
ডাক্তারেব দিকে তাকিযে বিভা—'আপনার তো এত বিচাব, এত বিবেচনা আছে, কিন্তু এ সামান্য অনুভূতিটুকু নেই!'
ছেলেটি স্টেথোস্কোপটা নাড়তে-নাড়তে হাসছিল।
বিভা—'আমি অবাক হয়ে যাই আপনার এ ধবনেব কথা শুনে।'
ছেলেটি হাসছিল।
বিভা—'বাস্তবিক ডাক্তারবাবু, আমি বুঝতেই পানি না যে নিজেকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রচাব কববাব জন্যই এ কথাটা আপনি বললেন, না, এ আপনাব সত্যিই মনের কথা?'
—'নিতান্তই স্বাভাবিক কথা ছাড়া আব কী?'
—'না জানি আপনাদেব অন্তর কি বকম!'
অন্তর বলে কোনো জিনিসই নেই আমাদের।'
—'কেন?'
—'বেশি-বেশি শরীরের সংস্পর্শে থেকে।'
—'এ আপনার বাহাদুরির কথা, এ আমি বিশ্বাস করি না।'
—'কিন্তু গল্পটা শুনবে না?'
—'না, শুনতে চাই না।'
—'কেন?'
—'আপনাদের ডাক্তারমহলেব এ-সব গল্প নিয়ে যত খুশি হাসিতামাশা করুন গিয়ে, আমার একটুও আগ্রহ নেই এ-সব গল্প শুনবার জন্য।'
—'কিন্তু অনেক মেয়েদের কাছেও তো বলেছি।'
—'এই গল্প?'
—'হ্যাঁ, এর সাঙ্গপাঙ্গ।'
বিভা অত্যন্ত পীড়িত হযে—'সে মেয়েদের হাত থেকে ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন। আমার জাতকেও।'
—'নিজেকে রক্ষা কবতে পারবেন কিন্তু জাত তো তার স্বাভাবিক পথে যাবে।'

সূচীপত্রে যান

—'স্বাভাবিক পথে মানে ?'
—'যে-পথে সাধারণ সংসারের মানুষ যায়।'
—'আপনার এই পথে।'
—'সাধ-আহ্লাদের পথে।'
—'সাধের সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম।'
—'তাদের ধারণা অন্য রকম আবার।'
—'বেশ। কিন্তু আমাকে তাদের পঙক্তিতে ফেলবেন না।'
—'কিন্তু তারা তো আপনার জাতের, জাতকে, রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন যে!'
—'আপনার কথা শুনলে বড্ড অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়।'
—'কিন্তু এসব সত্যি কথা।'
—'বাঙালি নারীদের কাছে আপনার এই গল্প করে-করে বেড়ান আপনি? আর তারা তা বরদাস্ত করে ?'
—'অনেকেই তো।'
বিভা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে-'থাক।'
ডাক্তা—'শুধু কি বরদাস্ত-শুনে ফূর্তি পায়!'
-'না জানি তারা কোথায় শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছিল।'
—'এই বাংলায়ই তো।'
—'কিন্তু জীবনে এ রকম ধরনের মেয়েদের সংস্পর্শে আমি কোনোদিন আসি নি, এই সৌভাগ্য।'
—'অনেক এসেছেন, কিন্তু খুঁটে দেখতে যান নি।'
বিভা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে নিস্তব্ধ হল।
ডাক্তার—'হিডেনবুর্গের মেয়েটির গল্পটা শেষ করছি ?'
—'কোনো দরকার নেই।'
—'সে অবিশ্যি আমাকে যা ভালবাসত তার ভেতর ভুয়ো কবিত্ব ছিল ঢের।' বিভা সোফায় মাথা রেখে চুপ করে রইল।
ডাক্তার—'আপনি তো বলবেন তার ভালবাসাই হচ্ছে প্রেম, আমরাটা আকাঙক্ষা মাত্র।'
—'এ গল্পের পাট নিয়ে আপনাকে বসতে বলি নি তো ?'
—'একদিন অবিশ্যি বুঝতে পাবেবন যে ভালবাসা বলে কোনো জিনিস নেই। সবই আকাঙক্ষা, তৃপ্তি আর অতৃপ্তি।'
—'মোক্ষদাবাবুও এমন কথা বলেন না।'
—'মোক্ষদাবাবুই বা কে ?'
—'তিক্ততা তারও আপনার চেয়ে একটুও কম নয় কিন্তু।'
—'তিক্ততা আমার একটুও নেই।'
—'কিন্তু ভালবাসাকে তিনি মর্যাদা দেন।'
—'কোনো ভবঘুরে কবি নিশ্চযই।'
—'কে, মোক্ষদাবাবু ?'
—'তবে আর কী? ভালবাসাকে প্রাণ ভরে শ্রদ্ধা করে, অথচ জীবন সম্বন্ধে তিক্ত, এর চেয়ে মুর্খ পৃথিবীতে আর আছে ?'
—'সুন্দর জিনিসকে যারা শ্রদ্ধা করে তারা হল মুর্খ, আর পাঁকের ভেতর যে সব কেঁচো থাকে তারা হল প্রাণী! জীবন সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই অবিশ্যি একটা স্বাধীন মতামতেব অধিকার আছে।'
বাধা দিয়ে ডাক্তার—'প্রেমের কবিতাটুকুই যে সুন্দর জিনিস আর যাকে আপনি স্থূল বলছেন, সেই সাধ-আকাঙক্ষা, কুৎসিত এ-কথা আনকে কে বললে? বিধাতাও তো বলেন না। আপনি, আমি, আমাদের সৃষ্টির ভেতর কতটুকু প্রেম ছিল হিশাব করে যদি দেখেন।' একটু কেশে বললে—'কিন্তু জন্ম নিতে গিয়ে পূর্বপুরুষদের এক খনা কাম-কামনা বাতিল করতে পারলাম না। আপনিও না। পেরেছিলেন ?'
বিভা অত্যন্ত আহত হয়ে মুখ ফেরাল।
ডাক্তার—'জীবনটা খুব সরস। আমি এর ভেতর কোথাও একটুও তিক্ততা দেখি না।'

সূচীপত্রে যান

বিভা কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—'বেশ তো, কিন্তু ?'

—'কেউ না, কেউই না, অন্তত আমাদের...না। বা রাধাকৃষ্ণদের কখনো কেউ না।'

—'পৃথিবীর সকলের মঙ্গল হচ্ছে তাহলে কী করে ?'

—'কে বলে মঙ্গল হচ্ছে ?'

—'মঙ্গল না হলে নিজের জীবনটাকে এত সরস মনে করবেন কী উপায়ে ?'

—'খুব সহজে, ব্যাঙ্কে লাখ টাকা আছে, সুদ পাচ্ছি। বালিগঞ্জে দিব্যি বাড়ি আছে। বিলেতি ডিগ্রি নিয়ে এলাম, প্র্যাকটিসে পশার জমাচ্ছি। শরীরে অসুস্থতা নেই, কোনোরকম উৎকট আদর্শ দিয়ে জীবনটাকে মাটি করবার সম্ভাবনা নেই, চেহারা সুন্দর, মেয়েরা আমাকে ভালবাসে, আড্ডা জমাবাব শক্তি আছে, কারো পরোয়া রাখি না। খোলাখুলিই সব বললাম আপনাকে। আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করি বলে, বলুন বিরসতা কোথায় ?'

—'না, বিরসতা নেই অবিশ্যি।'

বিভা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—'আমাকে হয়তো কৃপার পাত্র মনে করেন।'

—'কে? আমি ?'

—'দেখেছি অনেকে করে।'

—'মেয়েরা ?'

—'না, মেয়েমহলে আমার ঢেব পসার। ঢের প্রেমের চিঠি পাই, ছিঁড়ে, ফেলি।'

—'তাহলে দেখছি তাবাই কৃপার পাত্র।'

—'কিন্তু এই মোক্ষদাচরণের মত লোক, এরা আমাকে কৃপার পাত্র মনে করে।'

—'মোক্ষদাকে চেনেন ?'

—'না, কিন্তু অনেক সময় আড্ডা মজলিসে এদের মতন একজন ভদ্রলোক এসে পড়েন।'

—'তারপর ?'

—'এদের আমি দু-চোখে; দেখতে পারি না।'

—'কেন ?'

—'কেমন খেয়ালি, অবাস্তব, জীবনটাকে ভোগ করবাব খুবই ইচ্ছা আছে, কিন্তু উপায় নেই বলে কবি বা তত্ত্বজ্ঞ সেজে বসেছেন।'

—'উপায় নেই ?'

—'কী করেই-বা থাকে।'

—'কেন ?'

—'কারু-বা টাকা নেই।'

—'মানে বাপের টাকা ছিল না ?'

—'বাপের টাকাও কি কম জিনিস ?'

—'অবিশ্যি না।'

—'কারু-বা চেহারা নেই, মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে থাকে।'

—'আপনার ধারণা জীবনটাকে ভোগ করতে হলে মেয়েবা সব সময়ই আশেপাশে থাকবে ?'

—'কেনই-বা থাকবে না বলুন।'

—'আমাকে তাহলে খুব মূল্যবান মনে করেন।'

—'হ্যাঁ, সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আপনারাই।'

—'কিন্তু অনেকে তো আমাদের উপেক্ষা করে।'

—'বুড়োরাও করে না।'

—'যুবকারাও তো করে।'

—'এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন ?'

—'দেখলাম তো।'

—'সে কতকগুলো রোগীসোগী অসচ্ছল জীবন রয়েছে পৃথিবীতে, দায়ে পড়ে যাদের অনেক কঠিন মর্মান্তিক পথে চলতে হয়। চলে অবিশ্যি অনেকে, চলে-চলে মুষড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যেই

সূচীপত্রে যান

কেউ-কেউ বেশ অপরাজেয়ভাবে চলে। সুন্দর পরিকল্পনা করে।'

—'মর্মান্তিক পথে কোথায়? জীবনটাকে অন্য নানা রকমভাবে আস্বাদ করে।'

—'সে-সব গবেটদের কথা বাদ দিন।'

—'আচ্ছা বাদ দিলাম,' খানিকক্ষণ পরে একটু কৌতুকের সঙ্গে হেসে বিভা,

—'কিন্তু টাকা আপনার কাছে বেশি মূল্যবান, না নারী ?'

—'মেয়েরা অনেক জিজ্ঞেসা করে আমাকে।'

—'আমিও তো করলাম।'

—'উত্তর শুনে আঘাত পায় অনেকে; কিন্তু তবুও ডাক্তার মানুষ, চাষার মত জাবাব দেওযাই রীতি।'

—'উচিতও ?'

—'মেয়েদের আর-একটা বিশেষত্ব, তাদেব আঘাত করতে পারলেই তারা সচেতন হয়ে ওঠে, বেদনাব ভেতর দিয়ে যে-ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে তা অপূর্ব।'

—'কিন্তু আমার প্রশ্নটার উত্তব দিলেন না তো।'

—'সবচেয়ে বেশি মূল্যবান টাকাও নাবীও। দুধও খাব, তামাকও খাব।' বিভা তেমনি কৌতুকের সঙ্গে হেসে বললে—'সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আব কী-কী জিনিস এ রকম আছে আপনার জীবনে ?'

—'এ দুটি শুধু।'

—'আব-কিছু না? দুধ আব তামাক ছাড়া ?'

ডাক্তাব মাথা নাড়ল।

বিভা আবাব পরিহাস কৌতুকে হেসে উঠে বললে—'আমি ভেবেছিলাম সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আবো আট-দশটি জিনিস আছে আপনার। মজলিশে যান, আড্ডা জামান, মাঝে-মাঝে হয়তো অবসাদ ও হতাশার মুহূর্ত আসে, একটা খাসা সুট, ছড়ি বা টাই-তখন এক কিনাবের সোফা ও সিগারেটকেই বেশি মূল্যবান মনে হয।'

——'মুহূর্তের খেযাল নিয়ে তো জীবনের দামি জিনিসের বিচাব করা চলে না। যখন একটা অপাবেশন কবতে চলেছি তখন ফরসেপই হযতো সবচেয়ে মূল্যবান।

—'তাই তো বটে।'

—'কিন্তু তাই বলে নাবী ও টাকাব যে চিবন্তন মূল্য তাব কাছে একটা ফল-সেপের সার্থকতা কোথায ?'

—'তা ঠিক।'

—'তাবপর বুড়ো বয়সে গিয়ে নাবীবও কোনো মূল্য থাকে না।'

—'কেন ?'

—'শরীরেব সৌন্দর্য যখন নষ্ট, কোনো ইন্দ্রিযও যখন কাজ করতে পারে না। তখন কোন নারীরই-বা এমন আগ্রহ থাকবে আমার জন্যে ?'

—'আপনার স্ত্রীর ?'

—'আগ্রহেব চেয়ে কর্তব্যবোধই থাকবে তাব বেশি। যদি সে দাযিত্বহীন হয অনেক কিছু করতে পাবে। প্রাযই দাযিত্বহীন হয।'

—'বুড়োদেব স্ত্রীবা ?'

—'দাযিত্ব তো খুব একটা সুখের জিনিস নয, তাদেব দোষও দিতে পারা যায না। জীবনের স্বাভাবিক সুখ স্পৃহার নিয়মে চলবে তাবা। চলবে না কেন? আমি আজীবনই তো চললাম। চলবেই তো। তখন একমাত্র টাকা থাকে বন্ধু।'

—'কী রকম ?'

—'আপনারা যাকে অধম নোংরা বলেন কিন্তু মানুষেবা বলবে স্বর্গীয় এমন অনেক জিনিস টাকার বিনিময়ে সম্ভব হবে। বিগত জীবনের কোনো প্রেমিকা বা বর্তমান জীবনের স্ত্রী, এমন-কি সন্তানেরা চাকরেরা, অব্দি সে-রকম একান্ত ঐকান্তিক সাহায্য করতে পাববে না।'

—'শেষ পর্যন্ত তাহলে টাকাই টিকে থাকে।'

—'হ্যাঁ, তাই তো থাকে।'

সূচীপত্রে যান

ডাক্তারা—'বরফ ভেঙে-ভেঙে সেই মেয়েটি আসত আমার কাছে।'

—'কোন মেয়ে?'

—'সেই হিডেনবুর্গের মেয়েটি।'

ডান পায়ের বুটটা বার দুই কার্পেটে ঘষে নিয়ে ডাক্তার-'দেখতাম তার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপছে, র‍্যাকের থেকে আমার একটা ওভারকোট নিয়ে তাকে পরিয়ে দিতাম। চিমনির ধারে গিয়ে বসতাম দুজনে, তারপর সোডা হুইস্কি ঢেলে ঢেলে দিয়ে তাকে চাঙা করে নিতাম—'তারপর'—'একটু চুপ থেকে ডাক্তার,—'তারপর কী হত আপনার জেনে কোনো দরকার নেই।' বলে বর্বরভাবে একটু হাসল।

বিভা এই অসভ্যতাকে উপেক্ষা করে গেল।

ডাক্তার—'কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি, এই যে নিদেন বুড়ো বয়সে সমস্ত টাকা হারিয়ে ফেলে আমি যদি জার্মানিতে সেই মেয়েটির কাছে যাই তাহলে সে দিদিমা আমাকে দেখে কাঁদবে না, হাসবে না, পুলিশে খবর দেবে?'

বিভা চুপ করে ছিল।

ডাক্তার—'আমিও সেই খুনখুনে ডাইনিকে দেখে কতখানি প্রেম বোধ করব? এই তো প্রেম।' একটু চুপ থেকে ডাক্তার বললে—'কিন্তু যদি দু-এক কোটি টাকা থাকে আমার তাহলে সতেরটি নাতি-নাতনির মধ্যেই বুড়ি আমার পায়ে পড়ে বলবে এমন দিনের অপেক্ষাই সে করেছিল, বিধাতা এতদিন পরে এ দুটো আত্মাকে যুক্ত করলেন আবার, গভীর মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হল। এইসব আর কী! আমরা দুজনেই বুঝব যে কপটতা চূড়ান্তে চলেছে আর মোক্ষদা হয়তো বলবে প্রেম। টাকাকে অবিশ্যি আমরা এমনি আন্তরিকভাবে প্রেম করি, মানুষকে নয়।' ডাক্তার—'কিন্তু সেই হিডেনবুর্গের ছুঁড়িটা মরে গেছে।'

বিভা একটু ব্যথিত হয়ে বললে—'এরকম শব্দ ব্যবহার করবেন না ডাক্তারবাবু।'

—'কোন রকম শব্দ?'

—'হিডেনবুর্গের মেয়েটি বললেন যে মরে গেছে তাব প্রতিও শ্রদ্ধা দেখান হত, আমার শিক্ষাসংস্কারের প্রতিও।'

—'আপনার সঙ্গে যে কথা বলছি প্রাযই তা ভুলে যাই। অন্য মেয়েদের চেয়ে আপনি এত পৃথক!'

—'মেয়েটি মবে গেল!'

—'গেল তো।'

—'কীসে মরল?'

—'নিমোনিয়ায।'

বিভা—'স্কটল্যাণ্ডে না জার্মানিতে গিয়ে?'

—'এডিনবরাযই মরেছিল, এত হুইস্কি খাইয়েও বাঁচাতে পারলাম না।'

—'মানুষ কি হুইস্কিতে বাঁচে?'

—'হুইস্কি সে-দেশের খাবার।'

ডাক্তার—'ছ মাস তো আমাদের সংসর্গ, কিন্তু শেষ দিক দিয়ে দেখতাম কী শরীর কী হয়ে গেছে!'

'ছ মাসের ভেতরেই।'

—'হবে না! অত্যাচার কি কম চলেছে!'

—'বড় মদ খাওয়া পড়ত?'

'মদ দিয়ে অত্যাচারটা শুরু হত, তারপর'—ডাক্তার হি হি করে হাসতে লাগল, বললে—'তারপরের খবর আপনাকে দিয়ে আর দরকার কী!' খিক খিক করে হেসে উঠল আবার, বললে,—'আমাদের দিনকার দিনের কথা শুনলে আপাদমস্তক কাঁটা দিয়ে উঠবে আপনার।'

কথাটাকে চাপা দিয়ে বিভা—'এডিনবরায় পড়িছিলেন তখন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'পাশও তো করলেন না।'

—'করলাম তো।'

—'অনেকের পড়াশুনা এতে নষ্ট হয়ে যায়।'

—'আমার জমত।'

বিভা কোনো কথা বললে না।'

ডাক্তার—'বাবাকে জীবনে সবসময়ই ধন্যবাদ দেই, সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি করে দিতাম।'
—'অনেক টাকা বুঝি পাঠাতেন আপনাকে?'
—'টাকার জন্যে নয় মিস রায়।'
—'তবে?'
—'এই শরীরটা আমাকে দিয়েছেন বলে, কি বাঁধন দেখেছেন,একটুও টসকায় না। মায়ের পেটের থেকে পড়ে অব্দি এইবকম। জীবনটাকে চষে খাবাব মত এমন চমৎকার শরীর আমি খুব কমই দেখেছি। যদি আপনাদের কোনো বিধাতা থাকে এ তার বড় উপভোগ্য আশীর্বাদ।'
বিভা শুনছিল।
ডাক্তাব—'দেখুন জার্মানির সেই হাড়ভাঙাটা মেয়েটাও যে অত্যাচারে গুঁড়ো হয়ে গেল, আমার একটা কেশও তা স্পর্শ কবল না।' একটু চুপ হয়ে থেকে বললে,—'মেয়েটির মৃত্যুর পর অনেক সময় অবাক হয়ে এই কথাটাই ভাবতুম।'
—'এই কথাটাই শুধু?'
—'এই কথাটাই কি কম?'
—'সে যে মবে গেল সে জন্যে একটুও দুঃখবোধ'—
বাধা দিয়ে ডাক্তার—'তাব চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর, ঢের বেশি গুণী মেয়ে দিনরাত পৃথিবীতে মরছে।'
—'কিন্তু তবুও যার সঙ্গে এত বিশেষভাবে পরিচয—'
—'তাকে বিদায দেযা সবচেয়ে সহজ।'
বিভা নিস্তব্ধ হয়ে রইল।
ডাক্তার—'তারপব একটি নার্স।'
—'থাক আর।'
—'শুনতে গিয়েও আমাদের অবসাদ বোধ হয।'
—'জীবনকে জীবন বলে বুঝতে এখনো ঢেব দেরি যে আপনার।'
—'আমাব খুবই সৌভাগ্য এ ঘবে সাতটি আলমারিভরা যত বই আছে সে সবেব সমস্ত লেখকরাও আমারই মতন অন্ধকারে পড়ে আছে।'
—'লেখকদের কথা কেন তোলেন?'
—'অনেকেই তো খুব বড় বড় মনীষী এঁবা।'
—'কিন্তু তবুও মানুষ নয।'
—'আচ্ছা কবিতাব বইগুলোকে না নয বাদই দিলাম।'
—'তত্ত্বেব বইগুলোকেও।'
—'বেশ।'
—'তারপর কী আছে আপনার আলমাবিতে?'
—'গল্প-উপন্যাসের বইও তো আছে।'
—'এসব লেখকদের মত আমাব চেয়ে বিভিন্ন? জীবন সম্বন্ধে?'
—'তাই তো দেখছি।'
—'একটা কুজ্ঝটিকার আদর্শ খাড়া কবেছে হযতো?'
—'সব সময অবিশ্যি তা কবে না।'
—'একটা সাধারণ জীবনেব গল্প স্বাভাবিকভাবে বলেছে? এর কোনো একটা বই?'
—'তাই বলাই তো এদেব অনেকটা উদ্দেশ্য।'
—'কিন্তু বলেছে কিনা?'
—'আমাদের তো মনে হয বলেছে।'
—'তা বলা অসম্ভব।'
—'কেন?'
—'অন্তত ভয়ে।'
বিভা চুপ করল।

সূচীপত্রে যান

ডাক্তার—'কাজেই অনেক মিথ্যা সুন্দর কথা বলতে হয়েছে।' ডাক্তার—'একটা চুরুট জ্বালাব ?'

—'জ্বালাতে পারেন।'

—'কোনো আপত্তি নেই ?'

—'না।'

—'জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে কখনো কোনো বইকে সাক্ষী মানবেন না,' চুরুট জ্বালাল। ডাক্তার—'বরং এ সব বইয়ে যে-সব লেখকেরা মনীষী বলে খ্যাতি পেয়েছেন তাঁদের দু-একজনকে কাছে ডেকে আলাপ করবেন ?'

—'তারপর ?'

—'ঢের আঘাত পাবেন।'

—'কেন ?'

—'বাধ্য হয়ে বইয়ের ভেতর যে-সমস্ত পরম বিশ্বাস, আশা আর চরম আদর্শ নিয়ে অভিনয় করছিল তারা, সে সব দেখবেন আপনার সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করতে গিয়েই পচা চুনকামের মত কসে পড়ছে।'

বিভা একটু আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল।

ডাক্তার—'পড়বে না? তা পড়বেই তো খসে। মানুষ না? মানুষকে আমি ঢের বেশি চিনি!' চুরুটে এক টান দিয়ে বললে—'বই লিখতে গিয়ে এঁদের উদ্দেশ্য কী করে সাহিত্যে উজ্জ্বল অমরতা পাওয়া যায়, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এসে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলবে, আমি অমুক কবির মত, অটুট প্রেমের গান কে আর গাইতে পেরেছে? মানুষের জীবনের সম্বন্ধে কী গভীর ভরসা দিয়ে গেছেন ইনি, এঁর সাহিত্য কেমন দৃঢ় পুরুষ মানুষের মতন, জীবনের জয়জয়কারে উজ্জ্বল, ব্যথা দারিদ্র্য মৃত্যুকে পরাজয় করে নরনারীর জন্য ইনি কি অমৃতলোকের সাহিত্য তৈরি করে গেলেন। এঁর কাব্যের ভেতর রক্তমাংসের ঘ্রাণ কোথাও নেই, প্রেমকে নিয়ে না আছে ঠাট্টা না আছে তিক্ততা, না আছে নোংরামি কিংবা হতাশা, তিক্ত দার্শনিকতার একটি বিন্দু অব্দি নেই কোথাও। আছে গভীর আন্তরিক অপরিমেয় অটুট প্রেমিক প্রাণ, ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমকে ও-রকম উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন বলেই কাব্যে এই অতুল অলোকসামান্য প্রেম সম্ভব হয়ে রইল অবিনশ্বর কবিতার ভাষায়-এই রকম সব। কিন্তু এমন অক্ষয় অমৃতলোকের পুত্রদের সঙ্গে দু-চার মিনিট কথা বললেই বুঝতে পারবেন ক্রমে-ক্রমে বোঁটকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সাঁ করে নেচে উঠেছে বামছাগলের দাড়ি, পালাবার কোনো পথও খুঁজে পাবেন না আপনি।' চুরুটটাও ডাক্তারের হাতে পুড়ে-পুড়ে যাচ্ছিল। খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে—'কিন্তু কোনো প্রেসম্যানকে সামনে রাখবেন না। কিংবা প্রেস বা জনসাধারণের খবর দিতে পারে এমন লোককেও না।' চুরুটে এক টান দিয়ে বললে—'কোনো তৃতীয় লোককেই সামনে না রাখলেই ভাল। সুনাম নষ্ট হয়ে যাবার ভয় এদের ঢের। কিন্তু যখন বুঝবে যে নিরাপদ, তখন আপনাকেও বুঝিয়ে দেবে যে বাস্তবিক জীবন বলতে কী বোঝে তারা।'

—'অনেক কথাই তো বললেন।'

——'হ্যাঁ বললাম তো ঢের।'

—'সবই যে একেবারে মিথ্যা তা নয়।'

ডাক্তার চুরুট টানছিল।

বিভা—'যেমন ইতিহাসে, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক প্রেম বা প্রেমের কাব্য, সুন্দর পরিকল্পনা বা বিরাট মঙ্গলময় সফলতা আজও অবদি পুজো পেয়ে চলে আসছে, সে সবের কর্মকর্তারা অত্যন্ত জঘন্য জাতীয় মানুষ ছিলেন।'

—'হয়তো প্রেম সম্বন্ধে নানারকম অস্পষ্টতাই ছিল তাদের সাক্ষী।'

—'এর জীবন সব বিষয়েই অবজ্ঞার জিনিস ছিল।'

—'খুব দুর্বল ছিল, সন্দিগ্ধ ছিল, অকৃতজ্ঞ ছিল, মানুষের কাছ থেকে এ-সবের চেয়ে বেশি অপরাধ আর-কী আপনি আশা করতে পারেন ?'

—'অপরাধ অবিশ্যি আরো অনেক রকম আছে। নামজাদা লেখকদের মধ্যেও অনেকে আছেন নানা রকম নীচে মর্মান্তিক স্বভাব, অপরাধের মানুষ হয়েও খুব উচ্চ অমৃতের খ্যাতি পেয়ে গেছেন, এই সবই আমি জানি।'

—'অনেকে নয়, সকলেই।'

সূচীপত্রে যান

—'তা নয়।'

—'কী বলছেন আপনি ?'

—'এঁদের অনেকে আছেন আমাদের চেয়ে ঢের ভাল জীবন চালিয়ে গেছেন।'

—'কত কম জানেন আপনি ?'

চুরুটের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ডাক্তার—'আমার চেয়ে ভাল জীবন কারো হয়তো ছিল, কিন্তু আমি কল্পনাই করতে পারি না কোনো লেখিকা বা লেখক তাঁদেব বায়োগ্রাফিতে নয় কিন্তু গোপন বাস্তব জীবনে আপনার চেয়ে একটুও সংযত সচ্চরিত্র জীবন কাটিযে গেছে।'

—'এ আপনার গভীব অবিচার।'

—'কার প্রতি ?'

—'এই লেখকদেব প্রতি।'

—'আপনার প্রতি হযত খানিকটা। এদের সঙ্গে আপনার পরিষ্কার জীবনের তুলনা দিয়ে যাওযাও ভুল।'

—'আপনার এ অন্যায় কথা কেউ কি শুনবে!'

—'যারা একটু উপলব্ধি করতে পারে তারাই এর সত্য বুঝবে।'

—'কী যে বলেন আপনি ?'

—'আপনার স্বপ্ন অবিশ্যি আমি নষ্ট করব না।'

—'এ আপনার বড্ড ছেলেমানুষের মতন কথা।'

—'কী বকম ?'

—'আপনি মনে-মনে ভাবেন যে, আমাদেব স্বপ্ন বুঝি একদিনেই; গড়ে ওঠে, কিন্তু তা ভাঙতেও এক জীবন লাগে। এব পব, অন্যদেব স্বপ্ন ভাঙবাব মত দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে যাবেন না আপনি। যে-সব মেযেবা আপনাকে বলেছে যে আপনি তাদের অনেক স্বপ্নেব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এদ্দিন তারা অমাবস্যায় ঢুলছিল, আপনি তাদেব হাতে পিদিম গেলাশ তুলে দিতেই সব জ্যোৎস্নায ঝকমকে হয়ে গেল, ওসব কিন্তু নেশা, স্বপ্ন নেই, সত্য নেই, কিছুই নেই।'

—'আপনি আমাকে শেষ পর্যন্ত ডাকলেন। এই লাভটা তো আছে।'

পরদিন দুপুববেলা ডাক্তাব এল আবার।

জানালাব কাছে বসে একটা খববেব কাগজ পড়ছিলাম।

ডাক্তার—'পাশেব বাড়িটা আপনাদেব একটা মেস ?'

—'কী জানি, বলতে পারি না তো।'

—'একটুও জানেন না ?'

—'বিশেষ কৌতূহল বোধ করি নি।'

—'আপনাদেব প্রতিবেশীদের কোনো খবর রাখা দবকাব মনে কবেন না ?'

—'নিজের মনেই তো বেশ বয়েছে তাবা।'

—'আপনিও নিজেব মনে আছেন বেশ। বেশ কথা, কিন্তু ব্যাপাবটা কী জানেন,' বিভা ডাক্তারের দিকে তাকাল—'আমি কযেকদিন থেকেই লক্ষ্য করে দেখছি, এটা একটা মেস।'

—'তা হতে পাবে।'

—'আপনার মা আছেন, আপনি আছেন, এ বাড়িতে নানা রকম মেয়েরা আসে। বাড়ির পাশে এ রকম একটা মেস থাকা তো ভাল নয়।'

—'কেন, কী ক্ষতি ?'

—'কোনো গ্লানি বোধ করেন নি ?'

—'এই মেসটা রয়েছে সেজন্যে ?'

—'মেসের ছেলেদেব চেনেন না তো আপনি।'

—'তারা তো আমার কাছে পরিচয় দিতে আসে নি।'

—'এলে আশ্চর্য হতাম।'

—'আমি তো বেশ নিরিবিলি আছি।'

—'বোধ করি মেসটা খুব সবে বসেছে।'

সূচীপত্রে যান

—'তা হতে পারে।'

—'আগে এ বাসায় কারা ছিল ?'

—'তা আমি জানি না।'

——'আমার মনে হয়, এখানে নতুন মেস স্টার্ট করা হয়েছে,' বলে ডাক্তার চুরুট জ্বালাল। খানিকক্ষণ টেনে বললে,—'কাজেই এখনো শিকারের সন্ধান পায় নি।'

—'কীসের শিকার ?'

—'কথাটা হয়তো পরিষ্কার করে বুঝলেন না ?'

—'না।'

—'কিন্তু এদ্দিন কলকাতায় আছেন বোঝা উচিত ছিল আপনার।'

—'বিভার কোনো জবাব ছিল না।'

ডাক্তার—'পৃথিবীর হতভাগ্য হচ্ছে এই মেসের ছেলেরা।'

—'কী রকম ?'

—'কেউ-বা পনের টাকার কেরানি, তাই বিয়েও করতে পাবে নি,' ডাক্তার চুরুটে এক টান দিয়ে বললে,—'কেউ-বা পঁচিশ টাকার কেরানি, তাই মাগকে নিয়ে বাসা করে থাকতে পাবে না', খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেললে,—'কেউ-বা টিকোতে টিকোতে পঞ্চাশ টাকায় গিয়ে উঠেছে। কিন্তু এর মধ্যে এত সব এড়ি-গেড়ি ছানাপোনা হয়ে গেছে পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকা একটা মর্মান্তিক ব্যাপার। এইসব লোকেরাই মেসে থাকে। শনিবার দিন বাড়ি যায়, কিন্তু সপ্তাহেব বাকি কটা দিন এদের জীবনেব বোমান্স হচ্ছে আশেপাশের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে।'

—'অনেক কথাই তো জানেন দেখছি।'

—'একটা ইস্কুলের ছেলেও এ সব জানে,' চুরুটে এক টান দিয়ে ডাক্তার,—'নটাব সময ঘুম থেকে ওঠে।'

—'কারা ?'

—'এই সব হতভাগারা।'

ডাক্তার আঙুল দিয়ে আমাদের মেসটা দেখিয়ে দিলে বোধকরি। আমি তাকাই নি, খবরের কাগজ পড়িছলাম।

—'তারপর এক-আধঘন্টা বাংলা খবরের কাগজ পড়ে। এরা খুব স্বদেশী, জানেন ?'

—'সেটাই এদেব দোষেব হল ?'

—'অথচ হতভাগ্যদের অর্ধেকই কাজ করে গভরমেন্ট অফিসে, না হয বিলেতি মার্চেন্ট অফিসে।'

—'কী করবে, পরের টাকা ছিল না তো, যে স্বাধীন ব্যবসা নিয়ে বসবে।'

—'কিন্তু পেটেব দাযে যাকে বাপ ডাকলি তার সঙ্গে নেমোখাবামি করে কী লাভ ?'

—'বাংলা খবরের কাগজ পড়ে আর খদ্দব পরে বলেই বুঝি এদের নেমোখারামি?'

—'খদ্দর এরা পড়ে না।'

—'তবে ?'

—'বেশ ফ্যান্সি বিলেতি শার্ট, চিনেবাড়ির ওপেন ব্রেস্ট কোট ছাড়া এদেব বোচে না।'

—'তা হলে আর নেমোখারামি হল কোথায় ?'

—'না, এটুকু এরা ঠিকই বজায় রেখেছে।'

চুরুটে একটা টান দিয়ে ডাক্তার—'কিন্তু এমন অসঙ্গতি এদের জীবনে যে সকালবেলা একঘন্টা গড়িমসি করে করে ঐ যে বাংলা কাগজটি পড়বে তখন যদি এদেব কর্থাবার্তা শোনেন তাহলে বুঝবেন, এক-একজন কী নিরেট স্বদেশ প্রেমিক।' ডাক্তার একটু হেসে বললে,—'সে-সব স্বদেশ প্রেমের মাশুল লাগে না কি না। মুখের কথা দিয়ে আরম্ভ হয়, মুখের কথাতেই যায় ফুরিয়ে। গায়ের কোনো জায়গায় একটি ফুঁ-ও লাগে না। হাজার-হাজার লোক জেলে যাচ্ছে সে জন্য এদের কী উৎসাহ। সে-গৌরব যেন এদেরই গৌরব। যেন এরাই কত আত্মত্যাগ করল। কত দুঃখকষ্টকে স্বীকার করে নিল। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে, মুভমেন্টটা তাহলে সফল হল, হবে না? বাঙালি ছেলেরা যে-কাজে হাত দেয-বলে পরস্পরেব পিঠ চাপড়ায। চোখমুখও রাঙা হয়ে ওঠে বোধকরি। কিন্তু একবার যদি পুলিশে এসে মেসে হানা দেয অমনি একটা সামান্য কনস্টবলকেও বাপ ডাকতে রাজি,' চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে ডাক্তাব,—'সমস্ত

সূচীপত্রে যান

সকালটা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স ও দেশ-প্রেমেব জন্য নিঃসঙ্কোচ নির্বিবাদ সহানুভূতি, তাবপব সাবান গামছা নিয়ে নিশ্চিত মনে খেয়েদেয়ে, বাঙালিও নয় সাহেবও নয়, দো-আঁশালা একটা পোশাক বিলেতি শার্ট, বিলেতি কোট, বিলেতি মাফলাব, লবেঞ্জ মেয়োব বাড়িব চশমা তাব পব দেশি বাস অগ্রাহ্য কবে বিলেতি ট্রামে চড়ে যেখানে বড়-বড় ইংবেজ সাহেববা বসে ডিভিডেণ্ড গুণছে, সেই সব অফিসে হিসেব উদ্ধাব কবা এই সবেব ভিতবেই এদেব জীবনবেও পবিণাম। এক-এক সময় ঘৃণাব চেয়ে দুঃখ হয় বেশি।'

দুজনেই চুপ কবে বসে ছিল।

—'কিন্তু তবুও যদি এইসব নিয়ে নিজেদেব মনে পড়ে থাকত,' চুরুট নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিয়ে ডাক্তাব,—'কিন্তু বালাই বড় জ্বালা কিনা, বালাই বড় জ্বালা,' চুরুটে এক টান দিয়ে বললে,—'বিকেলে অফিস থেকে এসে চা-বিড়ি শেষ কবে ছাদে চড়বেন, কিংবা জানলাব ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দেবেন পাশেব বাড়িতে কোথায় কোন মেয়েটাকে পোশাক-পবিচ্ছদেব একটু অসঙ্গত অবস্থায় পাওয়া যায়।'

বিভা ঘাড় হেঁট কবে ছিল।'

ডাক্তাব—'কিংবা সঙ্গত অবস্থায় পেলেও হয়। মেয়ে পেলেই বাছাবা তৃপ্ত। তা পাশেব বাড়িব ঝিই হোক আব বুড়ো গিন্নিই হোক' বলে চুরুটে এক টান দিল। বললে—'মাঝে-মাঝে নিজেবে খড়খড়িব ভেতব দিয়ে বায়নাকুলাব দিয়ে দেখে।'

—'মেসেব এত তত্ত্ব জানেনই-বা কী কবে?"

—'আমি সব জানি।'

—'কোনোদিন মেসে ছিলেন না তো?'

—'তা নাই-বা থাকলাম। কলেজে পড়বাব সময় মেসেব আড্ডা মজলিসে গিয়েছি ঢেব।'

ডাক্তাব—'আপনি হয়তো টেবও পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনাকে বায়নাকুলাব দিয়ে এই মেসেব অনেক ছেলেই কি দেখে নেয় নি।'

— দেখুন।'

—'এতে আপনাব কোনো গ্লানি বোধ হয় না?'

—'হয়তো বই পড়ছি, কিংবা লিখছি, চা খাচ্ছি, কিংবা সোফায় বসে ভাবছি এ অবস্থায় যদি আমাকে কেউ দেখে তাহলে আমাব অপবাধ? এ বকম প্রশ্ন আমাব কাছে বড্ড অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।'

—'কেন?

—'পাশেব বাড়ি যে একটা মেস, সে-মেসে যে ছেলেবা থাকে এদ্দিন বসে এ তো আমি টেবও পেলাম না।'

—'সে আপনাব কৌতূহল খুব কম বলে।

—'ওদেব কৌতূহলও আমাব চেয়ে একটু বেশি বলে মনে হয় না।

—'কেন?

—'যদি হত তাহলে নানা বকম ভাবেই আমাকে ইনটাবেস্টেড কবতে চেষ্টা কবত।'

—'তা কবে নি বুঝি?

—'কই একদিনও তো,' বিভা মাথা নেড়ে বললে,—'না।'

—'তবুও জানালাটা বন্ধ কবে বাখা উচিত।'

—'তা আমি দবকাব মনে কবি না।'

—'কতকগুলো জিনিস এবা বেশ নির্বিবাদে কবতে পাবে আপনি তা টেব পাবেন না।'

—'ওদেব নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত জিনিস নিয়ে কেন আমি মাথা ঘামাতে যাব?'

—'কেউ যদি আপনাব ফটো তোলে?'

—'তুলুক।'

—'হয়তো কত অসঙ্গত অবস্থায় কত সময় বসে থাকেন। সে-বকম সব ফটোব মর্যাদাই এদেব কাছে সবচেয়ে বেশি। মানুষকে ত চেনেন না।'

—'সামান্য পঁচিশ-তিবিশ টাকাব কেবানিদেব ফটোব শখও এত?'

—'বললামই তো।' এ সবই হচ্ছে ওদেব জীবনেব দুর্মূল্য সবসতা।' ডাক্তাব—'ভাবছেন

ক্যামেরাই-বা জোগাড় করে কোত্থেকে ?'

—'না, তা ভাবছিলাম না।'

—'নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে চোবাবাজার থেকে একটা কিনে নিয়ে আসে। এরা কি কম বেল্লিক!'

বিভা কোনো উত্তর দিল না!

—'আপনার একশ-সোয়াশটা ঘটনার ফটো কি এদের কাছে নেই ?'

—'মেসের ছেলেদের সম্বন্ধে এ-রকম সব ধারণা বুঝি আপনার ?'

—'যাকেই জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে এদের সম্বন্ধে একটা অন্যায্য কথাও আমি বলি নি।'

—'এরা আব কী করে।'

—'মেসের জানালার খড়খড়ির ভেতব বায়নাকুলার রেখে চারিদিকেব মেয়েদের তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে।'

—'একটা বায়নাকুলারের দামও তো কম নয়।'

—'কিন্তু এ হাড়হাভাতেরা তা বেশ যোগাড় করে নিতে জানে,' চুরুটে টান দিয়ে ডাক্তাব—'হয়তো চুরি করে আনে।'

—'তারপর ?'

—'মাঝে-মাঝে মেয়েদের অন্ধকাব ঘবে টর্চ ফেলে।'

—'কেউ কোনোদিন আমাব বেডরুমে ফেলে নি তো। কিংবা এই ঘরে যখন অন্ধকাবের ভিতর বসে আছি,' বিভা মাথা নেড়ে বললে,—'না।'

—'আপনাকে তাহলে রেহাই দিয়েছে।'

—'আমার মনে হয তাহলে বায়নাকুলার দিযে দেখে না।'

——'তা নয়, আমার মনে হয় টর্চ ফেলতে সাহস পায নি। কিন্তু যেখানে সাহসের দরকাব নেই অথচ ক্ষুধা ও লোভের খুব নিরিবিলি পরিতৃপ্তি হয এই অভাগার দল ঝাড় বেঁধে সেই সব কাজই করে।'

—'তাহলে আপনি মনে করেন বাযনো দিযে দেখে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আব ফটো তোলে ?'

—'আকছাব।'

—'বললেন তো লোভী তাবা, কিন্তু মানুষকে দেখে বা তাব ফটো তুলে যে লোভেব সূচনা হয তাব একটা পরিণতি থাকবে তো।'

ডাক্তাব চুরুটে টান দিল।

বিভা—'শুধু এইটুকু করেই লোভ তৃপ্ত থাকতে পাবে না। এই দেখুন না মেসের জানলায একটি ছেলে খবরেব কাগজ পড়ছে, আমাব মনে হয় অনেক দিন থেকেই সে এখানে আছে। দেখুন, আমি রাতদিন তার কতখানি কাছাকাছিই থাকি, ইচ্ছে কবলে সে আমাকে শুনিয়ে এক-আধটা প্রেমেব গান মাঝে-মাঝে গাইতে পারত না কি ?'

—'হয়তো ছেলেটির গলা নেই।'

—'কিংবা শিস দিতে পারত।'

—'বাঙালি মেয়েরা শিসে আকৃষ্ট হয় না, সে সব বিলেতের কাযদা।'

—'কিবাং ডেকে কথা বলতে পারত।'

—'তদ্দুর সাহস কোনো বাঙালি ছেলেরই নেই।'

—'কিংবা চিঠি ছুঁড়ে ফেলতে পাবত।'

—'সচরাচব সেই জিনিসটাই ঘটে। ভীরু আহম্মকদের একটা হচ্ছে একটা মাত্র আশার পথ।'

—'কিন্তু কেউ ফেলে নি তো ছুঁড়ে। কিংবা আমার ফটো তুলছে ?'

—'কিন্তু বাস্তবিক যদি এ সব করে থাকে ?' ডাক্তার—'আপনাকে আমি হাতেকলমে লিখে দিতে পারি, এ তারা রোজই করছে, রোজই করবে।'

—'আচ্ছা, সে আমি বুঝব।'

—'জানলাটা বন্ধ করবেন ?'

—'না।'

—'কেন ?'
—'আমি কোনো গ্লানি বোধ করি না।'
—'আমার বোন হলে'—
—'কী করতেন ?'
—'তাকে এ ঘরে থাকতেও দিতাম না।'
—'কিন্তু আমি তো আপনার বোন নই।'
পরদিন দুপুরবেলা ডাক্তাব এসে বললে—'সেই সাহেব আব আসে না ?'
—'সাহেব কে আবার ?'
—'রুস্তমজি না কী নাম তার।'
—'না, আসে নি তো।'
—'আপনি নিষেধ করে দিয়েছেন ?'
—'আমি কেন নিষেধ কবতে যাব ?'
—'কিন্তু ভবিষ্যতে আর আসবে না বোধ করি।'
—'কে? রুস্তমজি ?'
—'আসবে কি আর আপনাব এখানে ?'
—'সে তার নিজেব খুশির ওপব নির্ভব করে।'
—'নিজের খুশি তো তাকে গত পনেরকুড়ি দিনরাত এই ঘবের দিকেই টেনেছে।'
বিভা চুপ করল।
ডাক্তার—'কিন্তু সে খুশি হঠাৎ তার থমকে গেল যে ?'
বিভা কোনো জবাব দিল না।
ডাক্তার—'যাক রুস্তমজিব সম্পর্কে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত। ছেলেটির তরফ থেকে কোনো বাধাবিঘ্নেব সম্ভাবনা নেই।'
বিভা ঘাড় কাত করে ছিল।
ডাক্তার—'একটা খুব ভাবী কল আছে, আচ্ছা উঠি তা হলে।
চলে গেল।
তিন-চাব দিন পরে দুপুববেলা একদিন ডাক্তার এসে বললে—'এ কয দিন ভাবি ব্যস্ত ছিলাম, আমাকে পাঁচ মিনিটি সময দেবেন ?'
—'পাঁচ মিনিট শুধু ?'
—'কিন্তু বসব পাঁচটি মিনিট।'
—'বসুন।'
—'না, আমি পায়চারি করে কথা বলছি।'
—'বড্ড ব্যস্ত দেখছি আপনাকে ?'
—'না, এখন ব্যস্ত বড় নই। কিন্তু বডড নার্ভাস।'
—'কেন বলুন তো ?'
—'আস্তে আস্তে বলছি।' ডাক্তার, 'আমাব কথা অবিশ্যি পাঁচ মিনিটে ফুরুবে না।'
—'সমস্ত দুপুবই তো পড়ে আছে।'
—'এতটা সময আমরা জন্যে খরচ করতে পারবেন আপনি ?'
—'আমাকে দিয়ে যদি আপনাব কোনো কাজ থাকে ?'
—'খুবই তো আছে ?'
—'তা হলে আমার কুণ্ঠাব কোনো তো কাবণ নেই।'
—'এত দযা আমার প্রতি আপনার ?'
ডাক্তাব খুব উৎফুল্ল হযে উঠল—'এত মমতা!'
—'নারীরা পরেব কাজেব জন্যেই বেঁচে থাকে।'
ডাকারের মুখ গম্ভীব হযে উঠল। বললে—'তা হলে ফুটপাথে নামুন না গিযে।'
—'কেন ?'

সূচীপত্রে যান

—'সেখানে তো পবোপকাবেব ঢেব জিনিস আছে।'

—'আপনি কি মনে কবেছেন চিবকাল আমি এই সোফাযই বসে থাকব ?'

—'পথে নামবাবও ইচ্ছা আছে ?'

—'ভবিষ্যৎ জীবনেব সংকল্প আমাব অনেক বকমেব।'

ডাক্তাব একটু চুপ থেকে বললে—'অনেক ত্যাগ কবতে চান বোধ কবি ?' পাইপ জ্বালিযে বললে–'দেশে সমাজ মানুষ এই সব নিযে কাজে লেগে যাবেন? নিজেব জীবনেব ভবিষ্যতেব পবিকল্পনা আপনাব কী কবম ?' খানিকটা ধোঁযা ছেড়ে বললে—'বলুন, অনেক বড়-বড় কথা বলবেন তো ?'

—'না, খুব ছোটখাট কাজ নিযে শুরু কবতে চাই।'

—'কিন্তু পবিণতি হবে গিযে তো খুব মহৎ।'

—'কই, আপনাব কী কাজ বলছিলেন না ?'

—'এই যে পাইপ টানছি এব মিক্সচাবটা ভাবি চমৎকাব।'

—'বিলেতি ?'

—'আমবা ডাক্তাব মানুষ, দেশী মিক্সচাব খেযে লাঙস খাবাপ কবতে পাবি না ('।। সব ব্যাপাবেই পাকা জিনিস বেছে নেই।' সোফায বসল। ডাক্তাব—'চুপ কবে বইলেন যে' কেন, ইণ্ডিযাব মিক্সচাবটাব কথা বলাম, ঠিক বলি নি ?'

—'খেযে আপনি তৃপ্ত এই আমাব পক্ষে যথেষ্ট।'

—'কিন্তু মিক্সচাবটা বিলেতি যে।'

—'তা আপনি বুঝবেন।'

—'এ খুব অন্যায উদাসীনতা আপনাব।'

পাইপটা নামিযে ডাক্তাব—'যাতে আমি বিদেশী ছেড়ে স্বদেশী ধবি সেই চেষ্টাই কবা উচিত নয কি আপনাব ?'

—'আপনাব নিজেব ব্যাপাবটা আপনিই ভাল কবে বুঝবেন।'

—'পুরুষেবা সব সময বোঝে না।'

—'আপাতত মিক্সচাবটা শেষ কবে নিন।'

—'কেনই-বা ?'

—'খুব ভাল লাগছে তো আপনাব'

—'কিন্তু এই জিনিসটা তো খুব অপবাধেব।

—'তাহলে নিভিযে ফেলুন।'

—'বলেন আপনি নেভাতে ?'

—'যদি মনে কবে থাকেন অপবাধেব—'

—'কিন্তু আপনাব এ অনুবোধেব ভেতব না আছে কোনো ঐকান্তিকতা না আছে সর্বপ্রাণ সমর্পণ।'

বিভা হেসে উঠল।

—'বুঝতাম যদি এক মুহূর্তেব জন্যও সে-বকম কবে অনুবোগ কবতে পেবেছেন আমাকে, তাহলে এই পাইপটা ছুঁড়ে ফেলে দিতাম।'

বিভা বিব্রত হযে তাকাল।

—'কিন্তু আমাব জন্য আপনাব হৃদযে এ সব জিনিস নেই।'

—'আস্তে-আস্তে, ডাক্তাববাবু'

—'বলুন।'

কিন্তু বিভা চুপ কবে বইল।

ডাক্তাব—'জীবনে একে একে অনেককেই ভালবেসেছিলেন হযতো ?'

—'তা দিযে কী কববেন আপনি ?'

—'আব কোনোই দবকাব নেই, শুধু এইটুকুই বলি যে যখন তাদেব ভাল-বাসতেন তখন তাবা কেউ আপনাব রুচিবিরুদ্ধ কোনো কাজ কবলে আঘাত পেতেন ?'

—'তা পেতাম।'

—'এইটুকুই শুধু বলতে চেযেছিলাম।'

—'আমি যে আঘাত পেতাম তারাও তা বুঝত, কেনই-বা বুঝবে না? আমি নিঃসঙ্কোচে পাইপ টানছি বলে আপনি একটুও যে আঘাত পাচ্ছেন না এ জিনিসও তো আমি বুঝি।'

—'অবিশ্যি।'

কিন্তু বিভা কি বলবে না বুঝতে পেরে থেমে রইল।

ডাক্তার-'আপনার রুচিবিরুদ্ধ অনেক কিছু কাজ কথা ইঙ্গিত আপনার সামনে করি আমি কিন্তু সমস্ত অপরাধের বোঝা বইবার ভার আপনি আমার কাঁধে ফেলেই যে খুব নিশ্চিন্ত তাও তো দেখি।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে নখ খুঁটিছিল।

ডাক্তার—'হয়তো ভাবছেন মনে-মনে ডাক্তারের বোঝা ডাক্তারই বইবে।' পাইপ টানতে-টানতে ডাক্তার—'অবিশ্যি নিজের বোঝা নিজে বইতেই আমি খুব ভালবাসি,' একটু থেমে বললে—'কিন্তু যখন দেখি একজন নারী ধীরে-ধীরে আমার কাছে এসে আমার মুখের থেকে পাইপটা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে বললে 'খেও না, এতে আমি বড় কষ্ট পাই, তখন তার ঐকান্তিকতা স্বীকার করি।'

এরপর ডাক্তার চুপচাপ পাইপ টানতে-টানতে বিভার দিকে তাকিয়ে রইল। বিভা মাথা হেঁট করে ছিল।

ডাক্তার—'একরকম দুচারটি নারী আমার জন্যে কষ্ট পায়,' একটু থেমে বললে,—'সেই যে মেয়েটির গল্প বলতে যাচ্ছিলাম তাদের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে শুধু প্রথমেই আমার মুখ চেপে ধরে ছিল, তাকে আমি কিছুতেই বলতে পারি নি, আমি খুবই আশা করেছিলাম আপনি অন্তত গল্পটার প্রারম্ভে আমার মুখ চাপবেন না অবিশ্যি, কিন্তু ঘর থেকে উঠে চলে যাবেন কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত শুনলেন তো।'

একটু চুপচাপ।'

ডাক্তার—'আমার চরিত্রের দুর্গতির কথা ভেবে আপনি একটুও বেদনা অনুভব করেন না নিশ্চয়ই।'

—'আপনার চরিত্রের কোথায় দুর্গতি রয়েছে তা তো আমি জানি না।'

—'কিন্তু দু-একটি মেয়ে এ কথা ভেবে সব সময় খুব সশঙ্ক, তাদের রাতেও বোধ করি ঘুম হয় না,' ডাক্তার বললে—'আমার হিতাহিতের সম্বন্ধে তারা এই রকম ঐকান্তিক। একে হয়তো ভালবাসা বলে।'

—'তাই তো মনে হয়।'

—'সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে আছাড় খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে এরা খুব সেবা করবে?'

বিভা একটু হেসে বললে—'তা আর বলতে!'

—'দেখতেও তো দুজনেই বেশ রূপসী।'

—'তা হলে আপনার ভাগ্য খুব ভাল।'

—'কিন্তু তাদের ভাগ্যও কি খারাপ?'

—'একজন হয়তো খানিকটা আঘাত পাবে, দুজনকেই তো গ্রহণ করতে পারবেন না?'

—'খানিকটা নয়, খুব বিষম আঘাতই পাবেন। হয়তো মরেও যেতে পাবেন।'

—'যখন এত নারী নিয়ে আপনার জীবন তখন মরতে চাইবে অবিশ্যি অনেকে।'

—'আপনি অন্তত সে-দলের ভেতর একদম নন।'

ডাক্তার গভীর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে বিভার দিকে তাকাল।

দুজনেই চুপ।

ডাক্তার—'যদি সে-বৃত্তের এক কিনারেও থাকনে তা হলে সব অগ্রাহ্য করে আপনাকেই গ্রহণ করব। আজ পাকা কথার জন্যেই এসেছিলাম।'

বিভা হেসে উঠে বললে—'না, সে বৃত্ত কোনোদিন চোখেও দেখি নি আমি।' মিনিট পাঁচেক ডাক্তার চুপচাপ বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—'তাহলে নেমন্তন্নের চিঠি পাবেন। এর চেয়ে বেশি কিছু চাইলেন না তো আর।'

—'কাল দুপুরবেলা তাহলে আসবেন আশা করি।'

—'এখানে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেনই-বা মিছেমিছি?'

সূচীপত্রে যান

—'কথাবার্তা বলব।'
—'আর জমবে না মিস রায়।'
মিনিট দশেক দুজনে চুপ করে বসে রইল।
—'কিন্তু অনেক মজিলেসই তো ঘুবে বেড়ান।'
—'আজকাল আব তত বেড়াই না।'
—'কেন ?'
—'ঢের কল।'
—'পৃথিবীতে অলস তাহলে আমি একাই শুধু ?'
—'কে? আপনি? কেন ?'
—'সমস্ত দুপুবটা কার সঙ্গে কথাবার্তা বলব তাই ভাবি।'
—'কিন্তু সমস্ত জীবনটাই তো বলতে পাবতনে আমাব সঙ্গে।'
না, আমি শুধু দুপুবেব কথা ভাবি।'
—'আচ্ছা তাই ভাবুন।'
ডাক্তার—'বই পড়ছিলেন দেখছি।'
—'হ্যাঁ।'
—'কী বই ওটা ?'
—'একটা নভেল।'
—'কার লেখা ?'
—'টলস্টয়েব।'
—'আবাব সেকালের যুগে চলে গেলেন?'
—টলস্টয় বেশ লাগে আমাব।'
—'তাব মানে ঢেব শ্রদ্ধা বিশ্বাসের মানুষ আপনি—'আনা কারেনিনা" বুঝি ?'
—'না। "ওযার অ্যাণ্ড পিস"।'
—'পড়ি নি।'
—'আনা কাবেনি না" পড়েছিলেন ?'
—'ছ-সাত বার।'
—'কেমন বই ?'
—'বেশ, আপনার ভাল লাগে না ?'
—'বেশ ভাল আর্ট।'
—'আর্ট হিসেবে আমি দেখি না।'
—'তবে!'
—'বেশ মূল্যবান বই বলে মনে হয়।'
—'কিন্তু ওর চেয়ে মূল্যবান বই এব আরো ঢের আছে। পড়বেন ?'
—'আপনার আলমারিতেই আছে বুঝি ?'
—'হ্যাঁ, দিচ্ছি খুলে।'
—'থাক।'
—'কেন, পড়ে দেখুন না।'
—'সেই কিশোর বযস কি আব আছে ?'
—'বয়স এতই-বা কি বেশি হল ?'
—'কিন্তু তবুও সে-কিশোর আর নেই, একটা গভীর ক্ষতিব জিনিস, কী বলেন ?'
বিভা কোনো উত্তর দিল না।

সূচীপত্রে যান

মৃণাল

একদিন বোর্ডিঙের পোস্টবক্সে আমাব নামে একখানা পোস্টকার্ড দেখলাম। এলে না যে? মৃণাল। অনেক দিনের পরিচিত হাতেব অক্ষর, সেই k, সেই h সেই ম ল—অবাক হযে ভাবছিলাম, পৃথিবীর থেকে এসব মুছে যায়নি তাহলে? এখনো রযেছে?

বিকেলবেলা মৃণালের কাছে যেতে আমাব ভরসায কুলোল না। যাদের বন্ধুবান্ধব খুব বেশি, তাদের কাছে বিকেল বা বাতে গিয়ে কোনো লাভ নেই। সকালবেলাও বিশেষ সুবিধা পাওযা যায না। যেতে হয দুপুরবেলা।

কিন্তু তবুও পরদিন সকালে উঠে দিনটাকে এমন সুন্দব ও প্রসন্ন মনে হল, এমন একটা গভীব আগ্রহ এল মনের ভিতব যে তখুনি জামা জুতো পবে একটা চাদর কাঁধে ফেলে তাড়াতাড়ি গিযে একটা ট্রাম ধরলাম। এক কাপ চাও খাওযা হল না।

প্রায় আটটাব সময মৃণালেব বাসায গিযে পৌছলাম।

নীচে একটি বুড়ো মতন [...] গোছের ভদ্রলোক আমাকে বাধা দিযে-'দিদি ঘুমুচ্ছেন, এখন কারু সঙ্গে দেখা কববেন না।'

কিন্তু আমি তাকে গ্রাহ্য না কবে সোজা তেতলায চলে গেলাম। কোথাও কোনো লোকজনের নামগন্ধও নেই। সমস্ত বাড়িটা বড় নিঃশব্দ। উঁচু উঁচু দেবদারু ও নাবকোলেব পাতা বাতাসে নড়ছে। একটা অশ্বথ গাছেব কযেকটা ডালপালা এই তেতলার রেলিঙেব ওপর এসে পড়েছে প্রায। কলকাতা শহরের ভিতব কোনোদিন শালিখ দেখিনি। কিন্তু এখানে আম গাছেব শাখাব ভিতব কযেকটা শালিখ বসে খুনসুড়ি করছে, দেবদারুব ঘন ডালপালার ভিতব ঘুঘু বযেছে, একটা ফিঙে উড়ে গেল, একটা লম্বা সরু সুপুরি গাছেব গাযে একটা কাঠঠোকবা বসে বযেছে। কলকাতার একেবাবে সীমানায এই উঁচু বাড়িব প্রশস্ত বারান্দায একটা ডেকচেযার পেতে কেউ যদি বসে, জীবনেব সৌভাগ্য এমনভাবে উপলব্ধি কবতে পাবে সে। দিনগুলোর এমন চমৎকাব সদ্ব্যবহাব কবতে পারে।

পাশেব একটা ঘরের দবজার পর্দা সরিযে একটি মহিলা চলে যাচ্ছিলেন, আমাকে এরকম রেলিঙেব ধাবে দাঁড়িযে থাকতে দেখে একটু থমকে সরে গেলেন।

একবাব ভিতরে ঢুকে আবাব বেরিযে এসে বললেন—'আপনি কী চান?'

—'মৃণাল আছে?'

মহিলাটি আমার আপাদমস্তকেব দিকে তাকিযে একটু সন্দিগ্ধভাবে—'আছে।'

—'তাকে একটু ডেকে দেবেন?'

মেয়েটি মাথা হেট করে নীরবে দাঁড়িযে রইল।

আমি—'আমি ড্রইংরুমে গিযে বসছি।'

গিয়ে বসলাম।

তিন-চার মিনিট পরে মেযেটি ফিরে এল—'আসুন।'

—'কোথায?'

—'মৃণালের ঘরে।'

—'তার চেযে এই ড্রইংরুমেই তাকে আসতে বলবেন।'

মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—'বেশ আলো বাতাস আছে, কোনো গোলমাল নেই তো এখানে।'

—'তা সম্ভব হয না।'

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—'আবার সেই ঘরেব ভিতর? কেউ আছে আর?'

—'না।'

একটু বিরক্ত হয়ে—'কেন, সে বুঝি এখানে আসতে পারল না? কী করছে?'

—'আসুন আপনি।'

মেয়েটির পিছনে পিছনে একটা ফালির মতো লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে—'মৃণালের বড্ড জেদ!'

মহিলাটি আমাকে একটা দরজার কাছে এনে—'আপনি যান' বলে সে নীচে নেমে গেল।

দরজাটা আটকানো ছিল, কিন্তু টান নেই, খুলে গেল। ভিতরে গিয়ে দেখলাম অনেক দূরে একটা ধবধবে বিছানায় সমস্ত গায়ে শাল টেনে কে শুয়ে আছে। চারদিকে দরজা জানালা খোলা, ফটফটে আলো বাতাস রোদ, মুখ দেখা যাচ্ছিল না, হাত পা সমস্ত শালের ভিতর। কাত হয়ে দেওয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে শুয়েছিল, কিন্তু চুল দেখেই বুঝেছি, এ মৃণাল। অনেকগুলো কালো অজগর যেন জড় হয়ে বালিশের ওপর ছড়িয়ে আছে।

কাছে আসতে আসতে বললাম—'আচ্ছা মৃণাল, তুমি কী?'

কোনো জবাব দিল না। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাতেও গেল না আমার দিকে। এগোতে এগোতে বললাম—'বেলা প্রায় নটা বাজে, এখনো বিছানায় শুয়ে? একটু ড্রইংরুমেও উঠে আসতে পারলে না তুমি? বড়লোকের মেয়ে বলেই এসব শৌখিনতা তোমার সাজে?'

একটু চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললাম—'আমাদের মতো গরিব ঘরে যদি জন্মাতে তাহলে টের পেতে মানুষের জীবনটা।'

মৃণাল তবুও মুখ ফিরাল না।

শালের ভিতর শুয়ে শরীরটাকে বড্ড রোগা দেখাচ্ছিল। বড্ড অস্বাভাবিক রকমের রোগা।

ঘরের ভিতর কেমন যেন একটা গন্ধ, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ঘরের আবহাওয়ার মতো নয় যেন, একপাশে কতকগুলো টেবিল, টেবিলে নানারকম শিশি বোতল, আঙুর বেদানা।

মৃণাল আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে—'ভয় পেও না।' একটু হেসে বললে—'ভয় পেয়েছ তুমি?' তারপর চুপ করে অনেকক্ষণ জানালার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকের একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—কাঁদলেও ব্যথা লাঘব হতে চায় না। কিন্তু কাঁদছি যে মৃণাল যেন তা টের না পায়। একটা কুঁজোর থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে চোখমুখ ধুয়ে ধুতির খুঁটি দিয়ে খুব পরিষ্কার করে মুছে ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসলাম আবার।

মৃণাল—'কোথায় গিয়েছিলে?'

—'জানালার কাছে তোমার বইয়ের শেল্ফটা দেখছিলাম।'

—'নতুন বই নেই কিছু।'

—'না, দেখলাম না তো।'

—'তোমার মুখে জল লেগে রয়েছে যে?'

—'তাই নাকি?'

ধুতির খুঁট তুলে আবার মুছতে গেলাম।

—'কী করে লাগল?'

ধীরে ধীরে মুখ মুছে নিচ্ছিলাম।

মৃণাল—'ভুরু ভিজে, চোখের পাতা ভিজে।'

মুছতে মুছতে—'এখনো ভিজে রয়েছে?'

—'কাঁদছিলে?'

—'কাঁদলে মানুষের ভুরু ভিজে যায় মৃণাল?'

একটু হেসে বললে—'কী করে ভিজল?'

—'একটু জল খেয়ে চোখমুখ ধুয়ে দিলাম। কেমন তেষ্টা পাচ্ছিল, তোমার এই ঘরে এসে—'

—'জল কোথায় পেলে?'

—'তোমার কুঁজোতে তো ভর্তি জল।'

—'ওই জল খেলে?' মৃণাল একটু নিস্তব্ধ থেকে—'কেন খেলে? থাইসিস হবার ভয় নেই?' মৃণাল একটু চুপ থেকে বললে—'আর একটু দূরে সরে বসো।'

—'কেন?'

—'আমার স্পিটুনটা যে একেবারে তোমার পায়ের কাছে, দেখছ না?'

—'না, এমন পায়ের কাছে কী আর মৃণাল।'

—'তোমার বড্ড জেদ বেশি, একটু ঘুরে বসলে কোনো দোষ হয়?'
—'স্পিটিনগুলো দেখতে সুন্দর নয়। ওর থেকে মাছি উড়ে তোমার কোনো উপকারও করবে না।'
—'কিন্তু এই তো বেশ মুখোমুখি বসেছি।'
—'মুখ আমি এখনো সব দিকে ফেরাতে পারি। মরবার দেরি আছে কয়েকটা দিন।'
একটু পরে—'কই, সরে বসলে না? আচ্ছা—' বলে মৃণাল দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল।
উঠে দাঁড়িয়ে—'এই পুবের দিকের জানালাটার ওপর গিয়ে বসতে পারি?'
মৃণাল আমার দিকে তাকিয়ে—'এইবার ঠিক হল।'
একটু চুপ থেকে—স্পিটিনের গন্ধ পাচ্ছ?'
—'না।'
—'গায় মাছি বসছে।'
—'মাছি তো এ ঘরে আমি একটাও দেখছি না।'
—'চারদিকে লাইমল ঢালে কিনা। স্পিটিনেব গন্ধই বা পাবে কী কবে? সমস্ত লাইমলে ভিজিয়ে রাখা হযেছে।' বলে সে একটা নিরিবিলি শূন্য নিশ্বাস ফেলল। বললে—'এই ঘরের ভিতর কেমন একটা গন্ধ না?'
—'ওষুধের গন্ধ।'
—'না, শুধু ওষুধের নয়।'
একটু চুপ থেকে মৃণাল—'থাক তোমার জানালাব কাছে ওরকম বসে দরকার নেই।'
—'কেন?'
—'পড়েও তো যেতে পার।'
— 'গেলে মন্দ কি?'
—'না মৃত্যুব সঙ্গে খেলা কবে বা-কি শান্তি?'
—'ঢেব। আমি তো বাঁচতেই চাই।'
দেবদারু শাখাব থেকে ঝির ঝির কবে বাতাস আসছিল।
মৃণাল—'কই, জানালার থেকে নেমে বসলে না?'
একটু নেমে মৃণালের দিকে তাকালাম।
মৃণাল—'আমার সমস্ত গা কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে।'
—'কেন?'
—'যদি পড়ে যাও।' হাত ইশাবা কবে মৃণাল—'এসো।'
তাব নিজের বিছানা সে দেখিযে দিল। গিয়ে বসলাম।
মৃণাল—'তুমি যখন ঘরে ঢুকলে আমি মুখ লুকিয়েছিলাম, কেন জান?'
— 'কেন?'
—'আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছিল।'
—'কীসের জন্য?'
—'আমার এ মুখ যে দেখে তাবই আমি কৃপার পাত্র হযে দাঁড়াই। আগের সে প্রশংসা ভালোবাসা নিয়ে এ ঘরে ঢোকে না কেউ এখন আর।'
বলে আমার কাছে জবাবের অপেক্ষা করতে লাগল মৃণাল।
আমি চুপ করেছিলাম।
মৃণাল কাতর চোখ বুজে একটা নিশ্বাস ফেলল। আস্তে আস্তে চোখ মেলে বললে—'সেইজন্য আমি মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম।'
—'কিন্তু তোমাব চুল তো দেখলাম।'
—'হ্যাঁ এই জিনিশটাই মানুষকে দেখাবার মতন রযেছে এখনো আমাব।' একটা নিশ্বাস ফেলে—'খুব সুন্দব না?'
মাথা নেড়ে বললাম—হ্যাঁ, কোথাও এর তুলনা পেলাম না।'
একটু প্রীত হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বইল। বললে—'অনেকে বলে চুলগুলো কেটে ফেলতে। কিন্তু তা কি কখনো হয়? মৃত্যুর আগে এই আমার একটা ভরসা।' বলে সে খুব অভিভূত হয়ে নিজের রাশিকৃত চুলের দিকে তাকাল। পাকাঠির মতো আঙুল চুলের গোছার ভিতর ঠেলতে ঠেলতে মৃণাল বললে—'মানুষের কাছে একেবারে কুৎসিত হয়ে মরব না। মৃত্যুর সময এইগুলো সঙ্গে যাবে।'

সূচীপত্রে যান

—তোমার কোনো অঙ্গই কুৎসিত নয়।'
— 'সে আগে ছিল না। এখন এই চুল ছাড়া আর কোনো সৌন্দর্য নেই।'
— 'তোমার চোখদুটো কি কম সুন্দব?'
মৃণাল একটু অবাক হয়ে—'এই কথা তুমি বলো?'
— 'কোনোদিন বলিনি, কিন্তু আজ বলছি।'
—'আজ যখন সৌন্দর্য ভাঁটা পড়ল তখন?'
কিন্তু শুনে সে খুব খুশি হল।

রুগিকে এইরকম কবে ভরসার কথা বলতে হয়। কিন্তু এই ঘরে ঢুকে মৃণালকে যতখানি হতশ্রী দেখাচ্ছিল রূপ তার ততদূব নষ্ট হয়ে যায়নি। চেহাবার ভিতর প্রশংসা কববাব এখনো নানারকম তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য বয়েছে। কিন্তু তবুও এ চেহারা দেখে মুগ্ধতা ভালোবাসার চেয়ে দযা ঢেব বেশি—মনে হয এই সৃষ্টিব কোথায যেন দয়াব দরিদ্রতা।

মৃণাল-'আচ্ছা আবশিটা আমাকে দাও তো।'
টেবিলের থেকে এনে দিলাম।
কিছুক্ষণ আরশিতে মুখ দেখে মৃণাল অত্যন্ত পীড়িত হয়ে—'বেখে দাও।'
টেবিলের ওপর আরশি রেখে এসে বিছানার পাশে এসে বসলাম আবাব।
মৃণাল—'তুমি বলো আমি এখনো সুন্দর?'
—'চিবকালই তো সুন্দর ছিলে।'
—'কিন্তু এখন?'
— 'তোমাব চোখ চুল নাক মুখ ঠোঁট সবই তো খুব উঁচু দবেব জিনিশ, খুব দামি জিনিশ।'

শুনে কযেক মুহূর্ত সান্ত্বনায় আত্মতৃপ্তিতে সে জানলায ভিতব দিযে নাবকোল গাছগুলোব দিকে তাকিয়ে রইল।

পরে আমার দিকে তাকিযে—হ্যাঁ তাকিয়ে ছিলাম খুব উঁচু দবেব জিনিশ, কিন্তু এখন নষ্ট হয়ে গেছি।'
নিস্তব্ধ হয়ে বইলাম।

— 'তোমবা ভাব মানুষকে সান্ত্বনা দেওযাই উচিত, সেজন্য সাজিযে কথা বলো। কিন্তু আবশি তো মিথ্যা কথা বলে না। দিনেব মধ্যে পনেবো কুড়ি পঁচিশবাব যতবাব সেটাব দিকে তাকাই ততবাবই বুঝতে পারি কেন লোকে আজ আমাকে শ্রদ্ধা কবে, সম্ভ্রম করে, স্নেহ করে, দযা কবে। কিন্তু আমাব দিকে তাকিযে বিমুগ্ধ হয না কেউ। এই নাবীকে ভালোবাসার প্রবৃত্তি কারুই নেই আজ।'

চুপ কবেছিলাম।
মৃণাল—'কই প্রতিবাদ কবলে না তো?'
—'দিনের মধ্যে এতবাব কবে আরশি দেখতে যাও কেন?'
—'এই হল তোমাব উত্তব?'
—'টেম্পারাচাবটা নেযা যাক।'
—'থাক।'
—'ওষুধ খাবে?'
—'সময হযনি।'

—'এসো, খানিকটা বেদানা খাওযা যাক।' টেবিলেব থেকে একটা বেদানা এনে ভেঙে মৃণালকে দিচ্ছিলাম, সে একটু করে খাচ্ছিল।

মাঝে মাঝে রোগা হাত তুলে আমাব মুখে কতকগুলো দানা তুলে দিচ্ছিল। তাব বন্ধু ঢের, সকলেব জন্যই এইবকম হৃদয তাব। আমাব নিজেব কোনো বিশেষত্ব নেই।

কিন্তু তবুও এক একবার অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আমিই তো মৃণালের একমাত্র বন্ধু।

মৃণাল—'মানুষেরই বা দোষ কি! পৃথিবীতে কত সুস্থ সুন্দব মেযেমানুষ রযেছে, সে সব ছেড়ে আমার এই হাড় কখানাকে মৌখিক ভালোবাসা ছাড়া কি আব জানাবে তারা?'

বেদানা দিচ্ছিলাম, খাচ্ছিল।

মৃণাল—'তা আমি বুঝি তারা ভাবে আমি সব দিক দিয়েই বঞ্চিতা। রূপ বস জীবন, এমনকী মানুষেব কথাবার্তা পর্যন্ত কতকগুলো শূন্য খোসা এনে সেগুলোকে সত্যিকাবের বলে বোঝাতে চায। কিন্তু আমি বুঝি, সেগুলো খোসা শুধু।'

সূচীপত্রে যান

— 'তোমাব সঙ্গে অনেক দিন পবে আমাব দেখা হল মৃণাল।'

—'হ্যাঁ, প্রায পাঁচ বছব পবে।'

—'এব মধ্যে অনেকেব সঙ্গে আলাপ কবে ফেলেছ হযতো।'

—'তাদেব কথাই বলছিলাম।'

— 'তোমাব বড় একটা দোষ মৃণাল—'

—'কী বলো তো দেখি?'

—'নিজে তুমি যে কত দামি, তা ভুলে যাও কেন?'

—'না, তা আমি কোনোদিনও ভুলিনি।'

একটু হেসে বললাম—'একটা একটা কবে দানা নিচ্ছ যে?'

—'না, ঢেব তো খেলাম।'

একটা দানা চুষে বিচিটা ফেলে দিযে মৃণাল—'তুমি ভেবেছ, ওদেব ভালোবাসা পাবাব জন্য আমি খুব উদগ্রীব?' আব একটা দানা আমাব হাতেব থেকে সে নিল। বললে—'মাযামমতা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেব কাছ থেকে প্রত্যাশা কবে। কেউ যদি তা দেয, আমি তা অস্বীকাব কবি না না যদি দেয তাহলেও আকাঙ্ক্ষা কবাটা অপবাধেব বলে ভাবি না।'

— 'বেশ তো।'

—'মানুষেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যত হয, চাবদিকেব আত্মীযতা যত বাড়ে, এই পৃথিবীবও তো তত মঙ্গল?'

—'তা ঠিক মৃণাল।'

—'কিন্তু এই গেল স্নেহ মমতাব কথা। আমাব পবিচিত কোনো মানুষকে এ জিনিশ দিতে—বা কারু কাছ থেকে এসব পেতে আমি কোনোদিন দ্বিধাবোধ কবিনি।'

—'তা আমি জানি।

—'এই যে পাচ ছয বছব তোমাব সঙ্গে দেখা নেই, এব ভেতব ঢেব নতুন লোকেব সঙ্গে আমাব আলাপ হযে গেছে, অনেকেই তাবা জীবনেব নানা দিকে ঢেব খ্যাতি পেযেছে, পদস্খলনও অনেকেব খুব।' মৃণাল একটা দানা চুষতে চুষতে—'এদেব সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠতা আছে, দাক্ষিণ্যপ্রীতি আছে, কিন্তু তাই বলে প্রেম—প্রণয নিযে এদেব সঙ্গে খেলা কবি, এই মনে কব তুমি?'

গোটা দুই দানা তাব হাতে তুলে দিতে গেলাম, মৃণাল হা কবল, মুখেব ভেতব ছেড়ে দিলাম

চিবোতে চিবোতে মৃণাল—'কই, আমাব কথাব উত্তব দিলে না তো?'

— 'এদেব এক আধ জনেব সঙ্গে তোমাব প্রণযেব সম্বন্ধ হলে ভালোই তো হত '

— তা হত হযতো, কিন্তু—'

—'বিপদ এই যে তুমি যেবকম দযামাযাব জাব, নিজেকে নিঃসঙ্কোচে বিলিযে দিতে যে বকম তাতে এদেব অনেকে হযতো মনে কবেছে, তুমি তাদেব ভালোবাস।'

—'তা আমি জানি।'

—'অনেক প্রেমেব চিঠি পেযেছ হযতো?'

—'চিঠিই শুধু নয, মুখোমুখিও ঢেব নিবেদন শুনলাম '

—'এই পাঁচ বছব বসে?'

—হ্যা।'

একটু চুপ থেকে—'অথচ কই, কুমাবী হযেই তো বইলে।'

—'হ্যাঁ, তাই তো বইলাম।'

—'না, বিযে কবলেই পাবতে মৃণাল।'

মৃণাল চুপ কবেছিল।

— 'কোনো আপত্তি আছে?'

—'বাস্তবিকই আমাব কোনো আপত্তি নেই বিযে কবতে।'

—'তবে কবলে না যে?'

—'কি যেন, মোটেব ওপব হযে উঠল না।'

—'এদেব কাউকে ভালোবেসেছিলে?'

— 'সে খোঁজও আমাব কাছে জিজ্ঞেস কব না।'

সূচীপত্রে যান

—'কেন?'
—'নিজের মনটাকে আমি আজও বুঝি না।'
চুপ করেছিলাম।
মৃণাল জানালার ভিতর দিয়ে নারকোল গাছগুলোর দিকে তাকিয়েছিল।
একটু চুপ থেকে—'এক সময় খুব লোভ হয়েছে।'
—'কীসেব জন্য?'
—'এদেরই এক-আধজনের সঙ্গে নিজেকে ভিড়িয়ে ফেলবার জন্য।'
মৃণাল আব খেতে চাইল না, বেদানাটা বিছানার একপাশে রেখে দিলাম।
মৃণাল—'কিন্তু লোভ তো প্রেম নয়।'
—'কি জানি, অত বাছবিচার কবতে যেও না মৃণাল, তাতে কোনো লাভ নেই।'
—'কী বকম?'
—'প্রেমের জন্য না হয কবিতাব বই পড়। কিন্তু যে মানুষেব জন্য আকাঙ্ক্ষা হয তোমাব, তাকেই গ্রহণ কব।'
—'আমি বললাম লোভ, তুমি বললে আকাঙ্ক্ষা।'
—'হ্যাঁ'।
—'কিন্তু তাই বলে লোভেব দাম বাড়ল না তো।'
—'না, বাড়ল না বটে।'
—'লোভ আকাঙ্ক্ষা কামনা, সবই তো এক জিনিশ, প্রেমের থেকে সবই আলাদা।' নিস্তব্ধ ছিলাম।
মৃণাল—'কী বলো তুমি?'
—'এই আকাঙ্ক্ষা টাকা আর সংযম নিয়েই দাম্পত্যজীবন বড় সুখে শান্তিতে চলে যায, প্রেমেব কোনো দবকাব নেই।'
—'কী যেন বলো তুমি?'
—'স্নেহ মমতা আর টাকা, স্বামী-স্ত্রীর এই সবচেয়ে বড় সম্বল, প্রেম একেবাবেই অপ্রাসঙ্গিক। স্বামীটি যদি কবি হন, প্রেম তাব কাগজ কলমেব ভিতর। স্ত্রীটি যদি কল্পনাপ্রিয হয প্রণযেব সাধ তাহলে সে গল্প পড়ে মেটাবে, না হয অতীত জীবনেব দু-একটা কথা ভেবে, না হয—দু-চাব মুহূর্ত বাজে কোনো পুরুষমানুষেব সঙ্গে কাটিযে।'
—'তোমাব এই কথাগুলো নতুন নয, আমি আবো ঢেব শুনেছি।'
—'কাব কাছে?'
—'যারা আমাব কাছে আসে তাবা এইবকম অনেক কথা বলে।'
—'হ্যাঁ, এই কথাগুলোও ঢেব পুবোনো।' একটু চুপ থেকে—'কিন্তু খুব সত্য।'
মৃণাল মাথা নেড়ে আস্তে—'না।'
মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে—'তা যদি হত, তাহলে ঢেব আগেই বিয়ে কবতাম।' মৃণাল আমাব দিকে তাকিয়ে বললে—'বেদানা খাবে? টেবিলে অনেকগুলো বেদানা বয়েছে খাও না দু-চারটে।'
কোনো উত্তর দিলাম না।
মৃণাল—'আমি তো উঠতে পাবি না, না হলে এনে দিতাম।'
—'থাক, যাব এখন।'
—'আমাকে দু-একটা দানা দাও তো আরো।'
দিচ্ছিলাম।
মৃণাল—'অমলা তোমার জন্য চা কবতে গেল, ফিবল না যে?'
—'তাকে আমি না কবে দিয়েছি।'
—'কেন?'
—'তখন তোমাব ওপর আমাব কেমন অভিমান হয়েছিল মৃণাল।'
—'অভিমান? কীসের জন্য?'
—'তুমি ড্রইংরুমে এলে না বলে, তখন তো বুঝিনি, তুমি এবকম বিছানায পড়ে। ভেবেছিলাম—'
মৃণাল একটু চুপ থেকে আস্তে আস্তে বললে—'কী ভেবেছিলে?'
অমলা চা নিয়ে এল। চা টোস্ট ডিম কেক, কলা, অনেক কিছু। দুটো ডিসে। একটা মৃণালেব জন্য। মৃণালেব

সূচীপত্রে যান

ডিসের সম্পদ খুব কম। একখানা টোস্ট, একটা ডিম পোচ, এক পেয়ালা ওভালটিন, গোটা কয়েক আঙুর।

অমলা দাঁড়িয়েছিল।

মৃণাল হাত নেড়ে বললে—'আচ্ছা যাও তুমি।'

—'এই মেয়েটি কে?'

—'আমার মাসতুতো বোন।' মৃণাল খেতে খেতে—'এখন আমার জায়গা অমলা অধিকার করেছে।'

—'কী রকম?'

—'প্রেমের চিঠি পায়, মুখে মুখে নিবেদনও ঢের।'

—খাচ্ছিলাম।

—'ড্রইংরুম তো আজকাল এর জন্যই।'

—'তোমার হিংসা হয় বুঝি?'

—'কার না হয় বলো, এরকম থাইসিসের বিছানায় পড়ে থেকে?'

—'অমলার বয়স কত?'

—'আমার থেকে তিন চার বছরের ছোট।'

—'উনিশ—কুড়ি তাহলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বিয়ে করেনি, তার মতামতও তোমার মত নাকি?'

—'জানি না।' মৃণাল মুখ বিকৃত করে বললে—'কারু মতামতের খবর রাখি না।' ডিসটা ঠেলে ফেলে দিয়ে বিরস মুখে একবার বালিশে মুখ ঘষল, তারপর পাতলা ঠোঁট দুটো চেপে জানালার দিকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তাকিয়ে রইল। চোখে জল এসে গেছে।

—'কিছুই তো খেলে না তুমি মৃণাল।'

—'খেতে ইচ্ছা করে না।'

—'এই আঙুর কটা খাও।'

দিচ্ছিলাম। খাচ্ছিল।

বালিশে ঠেশ দিয়ে একটু উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, আমার দিকে তাকিয়ে—'ড্রইংরুম থেকে এক এক ফাঁকে সুবিধা করে আমার কাছে আসে এক একজন, এ কর্তব্যবোধ এদের সকলেরই আছে। কেউ বা এ বাড়িতে ঢুকেই আমাকে প্রথম দেখে নিয়ে তারপর ড্রইংরুমে গিয়ে বসে। কেউ বা রাত এগারোটা—বারোটার সময় বিদায় নেবার আগে আমার খবরটা নিয়ে যায় এইরকম।'

—'বেশ তো।'

—'না, এর চেয়ে বেশি কী আর আমি আশা করতে পারি।'

একটা আঙুর খেতে মৃণালের অনেক সময় লাগছিল। চুষতে চুষতে বললে—'কেউ আমার জিভের নীচে থার্মোমিটার রেখে টেম্পারাচার দেখে, কেউ বা শালটা বুকের ওপর টেনে দেয়, [..] কেউ বা ওষুধ খাওয়ায়, কেউ বা চেঞ্জে যেতে বলে।'

—'বাস্তবিক, চেঞ্জে গেলে না কেন?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মৃণাল—'কেউ বা নানারকম মিষ্টি সান্ত্বনার কথা আমাকে শোনায়। কিন্তু জানি এদের কথা, কাজ সমস্তই অন্তঃসারশূন্য। বড়জোর এরা আমার জন্য বেদনাবোধ করে, আমাকে জীবনের হাতে প্রতারিত জীব ভেবে মনে মনে আক্ষেপ করে হয়তো, কৃপা করে আমাকে, কিন্তু কৃপা কে চায় বলো? যদি বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকতাম, তাহলেও কোনোদিন মানুষের কৃপা ভাঙিয়ে নিজের কোনোরকম সুবিধা করতে যাওয়াটাকে আমি সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করতাম। আমাদের জীবনে যতরকম অনুভূতি আছে, এই কৃপা, করুণা হচ্ছে সবচেয়ে অধম। একটা কুষ্ঠরুগির জন্য, একটা মালগাড়ির মহিষের জন্য, একটা ডানাভাঙা ফড়িঙের জন্য তো এর প্রয়োজন আর ব্যবহার কতখানি অপদার্থ জিনিশটি ভেবে দেখো তো একবার।

মৃণাল আঙুরটা মুখের দিকে ফেলে দিল। বিছানার ওপর পড়ে গেল। তুলে নিয়ে দেখলাম এতক্ষণ ধরে চুষছিল, কিন্তু তবুও কত রস আঙুরটার ভিতর রয়ে গেছে এখনো।

—'ওটা ধরলে? ছি ফেলে দাও।'

জানালার ভিতর দিয়ে ফেলে দিলাম।

—'এখানে ফেললে কেন?'

সূচীপত্রে যান

—'কেন কী হবে?'

—'কোনো পাখিটাখিতে হয়তো খাবে। একটা চড়াইয়ের যদি আবার আমাব মতো অবস্থা হয় আঙুবটা খেয়ে?' বলে সে একটু হাসল।

—'না, তা হয় না।'

—'ওদের জীবন ঢেব শক্ত, কি বলো? তা আমি জানি?' একটা শান্ত নিঃশ্বাস ফেলে মৃণাল—'তোমাব হাতটা লাইমল দিয়ে ধুয়ে ফেল।'

—'ধোব এখন।'

—'না, এখুনি ধোও স্পিটিন লেগে বয়েছে, হযতো অন্যমনস্কভাবে কখন নাকেমুখে হাত দিলে।'

ধুয়ে এলাম।

—'হ্যাঁ করুণাব কথা বলছিলাম, অবিশ্যি যে মানুষ নিজে করুণা পায না, পবকে দিচ্ছে, তাব আশ্বাস সব দিক দিয়েই।'

—'কীবকম?'

—'অভাগাদের সঙ্গে নিজেকে সে প্রথমে তুলনা করে, বোঝে নিজেব জীবনে দুর্ভাগ্য কত কম, নিস্তাব, শান্তি কত বেশি। এই হল তাব প্রথম শৌখিনতা। তারপব নিজেব প্রতিষ্ঠিত জাযগায বসে পবেব জন্য সে দযাবোধ করে, বেদনা পায, জিনিশটা যত বেশি আন্তবিক হয ততই তার মনেব বিলাসিতা পবিপূর্ণ হযে ওঠে। বাস্তবিক আন্তরিক অশ্রুব মতো এমন চমৎকার ভোগেব জিনিশ পৃথিবীতে আব কিছু আছে কি নিখিলদা? ভগবান নিজেই এ উপভোগকে সবচেযে বেশি ভালোবাসেন।'

একটু চুপ থেকে—'যাবা তাঁকে করুণাময বলে তাবা অনেক সময স্বীকার কবতে চায না' যে এ করুণাকে আশ্রয কবে বিধাতা কী অসীম বসনিবিড়তা জমিযে রেখেছেন নিজেব জন্য।'

মৃণাল দেওযালের দিকে একবাব মুখ ফিবিযে বললে —'এ পৃথিবীতে সবচেযে বেশি বেদনা পায সবচেযে বেশি কৃপাব পাত্র যারা।'

—'মৃণাল, তুমি চা খাও না?'

—'সকালে একবার খেয়েছিলাম।'

—'আব খাবে না তুমি?'

—'না।'

—'এই ওভালটিনও তো খেলে না।'

—'আমাব কেমন বমি আসে খেতে।'

—'আর একটু আঙুর খাও।'

নীববে হাঁ করল।

ধীবে ধীবে ঠোঁটেব ফাঁকেব ভিতব আঙুলটা ঢুকিযে দিলাম। মৃণাল চুষতে চুষতে —'পাড়াগাঁয যখন ছিলাম, কার্তিক অঘ্রানের সন্ধ্যায কুল বাবলাব জঙ্গলেব ভিতব এক-একটা পাখির ভাঙা বাসা দেখে বড় কষ্ট হত কিন্তু পাখিটার নিজের কষ্ট যে আমার চেযে অনেক গুণ বেশি, সেদিন তা বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝছি।' মৃণাল একটু চুপ থেকে —'ভগবানই হোন, বুদ্ধদেবই হোন, আমাদের ড্রইংরুমে যাবা আসে তারাই হোক, কাতর মানুষেব বা প্রাণীর অবস্থা দেখে এদেব মনে যে দযা তা বাবুগিবি ছাড়া আব কী? সে দযা তাদেব মনে আনন্দবিলাসিতাব খোবাক জোগায, কিন্তু পৃথিবীতে সবচেযে সত্যিকারের ব্যথা পায একটা কলের ভিতবকার ইঁদুর, খাঁচার পাখি, পাখনা কাটা দাঁড়কাক কিংবা আমাব মতো এরকম যাবা বিছানায পড়ে থাকে তাবা।'

—'তুমি আবার যখন সেবে উঠবে তখন—'

মৃণাল বাধা দিযে বললে—'আমাব মনেব ভিতব এত কথা যে আছে, ওরা তা জানে না, ভাবে যে কোনোবকম প্রবঞ্চনা কবে আমাকে বুঝ দেযা খুব সহজ। আমি চুপ কবেই থাকি। কিন্তু তবুও ওদেব চেযে ঢের বেশি বুঝি।'

আঙুবটা এতক্ষণ গালেব এক কিনাবে ফেলে রেখেছিল মৃণাল। আবাব চুষতে চুষতে—'মরে যাবার আগে আমার একটা তৃপ্তি এই যে কী বিধাতা, কী মানুষ, কেউই আমাকে মিথ্যা ভরসা দিযে ঠকাতে পারল না, জীবনটা যে বাস্তবিক কী, ঠিকঠাক বুঝে গেলাম।'

পবদিন বেলা দুটোব সময মৃণালের কাছে গেলাম।

বললে—'হ্যাঁ, তোমাকে এই সময়ই আসতে বলেছিলাম। কষ্ট কবে এসেছ তো? হেঁটে এলে?'

সূচীপত্রে যান

—'না ট্রামেই।'

—'এই দুপুরবেলাটা আমার বড্ড খারাপ লাগে।'

—'কাল রাতে বেশ ঘুমোলে?'

—'না, ঘুম আমার বড্ড কম।'

—'এখন ঘুম পাচ্ছে?'

—'না।' মৃণাল একটু চুপ থেকে—'বড্ড গুমোট।'

পাখা ঘুরছিল, জানলা দিয়েও বাতাস খেলা করছিল খুব খানিকটা। গুমোটটা বাইরের কি ভিতরের বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

একটু চুপ থেকে—'চেঞ্জে গেলে না যে?'

—'ভাওয়ালি যাওয়ার কথা হয়েছিল।'

—'সে তো খুব ভালো জায়গা।'

—'তুমি দেখেছ?'

—'না, শুনেছি।'

—'তুমি তো একবার কাঠগুদাম, নৈনিতাল, ভীমতাল গিয়েছিলে।'

—'হ্যাঁ, সে কি আজকের কথা।'

—'পায়ে হেঁটে তো গিয়েছিলে একেবারে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে। আচ্ছা মানুষ তুমি।'

—'না, এখন বড্ড ছেলেমানুষি মনে হয় সে-সব।'

—'কেন?'

—'মনের একটু অভিমান নিয়ে তখন নানারকম আজগুবি কাজ করতে যেতাম, কোথায় কে তাচ্ছিল্য করল, কার কাছ থেকে অবহেলা পেলাম, এইজন্য হেঁটে হেঁটে কাঠগুদামে চলে যাওয়া—কি রকম বেকুবিপনা বলো তো দেখি? বাস্তব জীবনের দেনাপাওনার সঙ্গে কত কম পরিচয়।'

—'এখন পরিচয় খুব গভীর হয়েছে?'

মাথা নেড়ে একটু হাসলাম।

—'এখন আর অভিমান কর না?'

—'করি বইকী, কিন্তু সেজন্য কাঠগুদামে চলে যাই না।'

—'হয়তো গোলদিঘিতে গিয়ে একটু ঘুরে আস।'

—'অতও দরকার হয় না মৃণাল, বিছানার ওপরেই শুয়ে থাকি, একটা খবরের কাগজ আর চুরুট হাতে।'

—'অভিমানের ব্যাপারটা কেউ টেরও পায় না?'

—'আমিই কি একা শুধু? পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পেরিয়ে গেলে পৃথিবীর সব মানুষই এইরকম।'

—'জীবনের নাড়ীনক্ষত্র ঠিক ধরে ফেলে।'

—'হ্যাঁ।'

—'তাচ্ছিল্যর বদলে তাচ্ছিল্য অবহেলার বদলে অবহেলা, ঘৃণার বদলে ঘৃণা, এই সবই তো ব্যবস্থা এখন তোমাদের জীবনে?'

—'কী করব, আর তো কোনো উপায় নেই।'

—'নতুন করে প্রেম করতে ভয় পাও?'

—'এ জীবনে প্রেম আর সম্ভব হয় না।'

—'জীবন তাহলে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে?'

—'বাস্তবিক, স্বাভাবিক সাধারণ জীবনের খুব গভীর আকর্ষণ মৃণাল। সকলের সঙ্গে মাত্রা রেখে চলতে পারি। এ ভেবে খুব আশ্বাস।'

—'তা ঠিক।'

—'নারীর রূপ বা প্রেমের সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্ক হয়ে পড়িনি, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বইয়ে সিনেমায় বা নিজের কবিত্বপ্রয়াসের ভিতর। এরকম সম্বন্ধ রাখতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক জীবনটাকে খরচ করে ফেলবার ভয় নেই।'

—'না কোনো ভয় নেই অবিশ্যি। কবিতায় কামনার গন্ধ বেশি।'

—'না।'

সূচীপত্রে যান

— 'সেটাও খুব আশ্বাসের কথা, এখন কী রকম লেখ?'
—'প্রেমের কবিতা এখন লিখিই না প্রায়।'
—'মৃত বিড়াল বা মরা মাছির উদ্দেশ্যে লেখ বোধ করি?'
একটু হেসে বললাম—'সেই রকমই।'
—'ছাপাও?'
—'না।'
—'কেন?'
—'কবিতার রকমটা আমার বড় বিদঘুটে হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ এ কেউ ছাপাবে না।'
—'লিখে শান্তি?'
—'হ্যাঁ।'
—'তাহলে প্রেমের আস্বাদ মেটাতে বই আর সিনেমা?'
—'সিনেমাও বাদ দেও।'
— 'কেন?'

—'যাই না বড় একটা। ছমাসে হয়তো একবার। তাছাড়া সিনেমায় নারীর রূপ রয়েছে বটে, কিন্তু প্রেম একেবারেই অরূপ, বাস্তবিক দেহ নিয়েই নানারকম ব্যাপার রয়েছে শুধুমাত্র—তার ভিতরেও কোনো আর্ট নেই।'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'অনেক বই পড় বুঝি? কিন্তু আজকালকার বইগুলোও তোমার কবিতার মতো অনেকটা।'

—'কী রকম?'

—'আমি তো ঢের নামজাদা বই ঘেঁটে দেখলাম, মড়া বেড়াল আর মৃত মাছির কথা লেখে শুধু—প্রেম কই?'

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম।
মৃণাল—'রোদ তোমার চোখে এসে পড়েছে, ওই জানালাটা বন্ধ করে দাও না।'
—'বরং একটু সরে বসি।'
—'থাক, এই তো আমার পাশে বেশ বসেছ।'
সে আমাকে উঠতে দিল না।

একটু চুপ করে থেকে বললে—'রোদ লাগছে যে তোমার মাথায়, এই বালিশে একটু মাথা পেতে শোও না।' মৃণাল তার বালিশের অনেকখানি আমাকে ছেড়ে দিল।

— 'রোদ এখুনি সরে যাবে।'
'তা যাক, তাহলে—'
—'মুখে আঙুর আছে তোমার?'
— 'নেই?'
— 'কোথায় ফেলে দিলে?'
—'কী জানি, কোথায় পড়ে গেছে।'
—'এই বিছানায় হয়তো।'
—'থাক, খুঁজতে যেও না। একটু গ্লুকোজ দাও তো আমাকে।' দিলাম।
—'বেদনা খাবে?'
—'না, এখন আর কিছু না।'
দুজনেই চুপ করে ছিলাম।
মৃণাল—'তোমার স্ত্রীর নাম উষা না?'
—'হ্যাঁ।'
—'দেখতে কেমন?'
—'এই শাদামাঠা।'
—'মনটা কেমন?'
—'উষার? মন্দ কি।'
মৃণাল একটু চুপ থেকে—'একটি মেয়ে হয়েছে শুনলাম।'

—'হ্যাঁ।'
—'মেয়েটি কী বলে?'
—'খুব স্বাভাবিক সাধারণ একটি নারী হয়ে উঠবে, এই তো আশা কবি।'
—'কাব মতো দেখতে?'
—'আমার মতন।'
—'মেয়েটি হাঁটতে পাবে?'
—'হ্যাঁ।'
—'বয়স কত?'
—'ছ বছব হল।'
মৃণাল চুপ থেকে—'না, ভাওয়ালি যাওয়া হল না আমাব।'
—'কেন?'
—'বেডও পাওয়া গিয়েছিল।'
—'বেড পাওয়া তো খুব কষ্ট।'
—'কিন্তু গেলাম না, বিদেশে গিয়ে কে মরবে বল? সেখানে গিয়ে দেখব তো শুধু পাহাড় আব পাইন গাছ, মরাব পবে উড়ে উড়ে তা ঢের দেখা যাবে। কিন্তু যে কটা দিন বেঁচে আছি এই বক্তমাংসেব জীবনটাকে আমার বাংলাদেশেব থেকে ছিড়ে নিয়ে চলে গিয়ে কি লাভ? এই নাবকেল গাছগুলো, বুড়ো অশ্বত্থ টা— শালিখ চড়াই দেশের এ কাকগুলো এদেব ভিতর মবে আমাব ঢের তৃপ্তি।' বলে মৃণাল চোখ বুজল।
দেখলাম ঘুমিয়েছে।
কুড়ি-বাইশ মিনিট ঘুমল। তাবপর হঠাৎ চমকে জেগে উঠে চাবদিকে তাকাল বাববার। দু তিন মিনিট পবে স্বাভাবিকতা ফিরে পেল, ধীব চোখে জানালাব দিকে তাকিয়ে মাথাব চুল আস্তে আস্তে বুলোতে বুলোতে—'বড় খারাপ স্বপ্ন দেখি।'
চুপ কবে ছিলাম।
মৃণাল—'শুনে তোমার দবকাব নেই, দিনেব মধ্যে ঘণ্টায ঘণ্টায আমি মবে যাই, চিতায পুড়ি, আবাব হাত ঠক ঠক কবে এই ঘরে হাঁটতে থাকি, অন্ধকারে মধ্যে অনন্তকালের ভিতবেও এ ঘরের দবজা—জানালা খুঁজে পাই না—এক একটা কঙ্কাল কোথে কে আমাব মুখোমুখি হযে দাঁড়ায।'
—'খিদে পেয়েছে?'
—'না।'
—'আচ্ছা, থার্মোমিটারটা দেখি তো।'
—'দেখো, থার্মোমিটাবটা বালিশেব নীচে না?'
—'দেখছি।'
—'হ্যাঁ, এই জিভের নীচে বাখ!'
মিনিট পাঁচেক পরে থার্মোমিটার তুলে নিয়ে দেখে—'জ্বর কি এই বকমই ওঠে দুপুরে?'
—'কত উঠেছে?'
—'সাড়ে নিরেনব্বই।'
—'জ্বরটার রেমিশন হল না একদিনও।'
—'আস্তে আস্তে হবে মৃণাল।'
—'একদিনও তোমাদের মতো গাযেব টেম্পারেচার হল না আমাব। এমন দুঃখ করে! আমি ছাড়া আর সকলেবই সাড়ে সাতানব্বই। কী এমন পাপ করেছিলাম যে কোনোদিন সাড়ে সাতানব্বই হবে না? মানুষেব গায়েব টেম্পারেচারও আমার লোভেব জিনিশ হয়ে দাঁড়াল বিধাতা।'
একটা বেদানা নিয়ে এসে ভেঙে দু-চারটে দানা মৃণালকে দিলাম।
চুষতে চুষতে মৃণাল—'না, আব দরকাব নেই। আমার মনে হয, আমার মাথাব ভিতর [...] হয়েছে।'
—'কী যে ভাব তুমি।'
—'না হলে এবকম স্বপ্ন দেখি কেন?'
—'স্বপ্নে আমিও তো অনেক সময ঢের খাপছাড়া জিনিশ দেখি।'
—'আমার মতন এইরকম?'
—'হ্যাঁ।'

সূচীপত্রে যান

—'এত বিদঘুটে?'
অমলা ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকে এসে দাঁড়াল।
মৃণাল—'কী চাও তুমি?'
—'কিছু না।' একটু চুপ থেকে অমলা চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসল।
মৃণাল—'বসলে যে?'
—'থার্মোমিটারটা নেব।'
—'নেয়া হয়েছে।'
—'ওষুধ।'
—'আমি গ্লুকোজ খেয়েছি, আর কিছু খাব না।'
—'একটু ওভালটিন দেই?'
—'না।'
—'বেদনা?'
মৃণাল—'বললামই তো তোমাকে, এক কথা কতবার বলতে হয় অমলা?'
অমলা আরক্ত মুখে একটু হেসে চুপ করলে। মৃণাল—'বসে রইলে যে?'
—'এখুনি তো ডাক্তার আসবে।'
—'তাতে কি?'
অমলা উঠে দাঁড়িয়ে—'বিছানাটিছানা পরিষ্কার করতে হয়, তোমার কাপড়চোপড় বদলে নিতে হবে না?'
—'সে এখন থাক।'
—'কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হন।'
—'আচ্ছা, তুমি যাও তো এখন।'
আমি—'আমি তো তোমার কোনো সাহায্য করতে পারছি না, অন্য মানুষদেরও বাধা দিচ্ছি। ইনি এঁর কাজ করুন আমি এখন উঠি, কাল সকালেই আবার আসব।' উঠতে যাচ্ছিলাম।
মৃণাল আমার হাত চেপে ধরল, বললে—'অমলার কথায়ও তুমি বিশ্বাস কর, ডাক্তার আসতে এখনো ঝাড়া দু ঘণ্টা দেরি।'
অমলা একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে— কেন মৃণালদি, এখন সাড়ে তিনটে বেজেছে, তিনি যে চারটের সময় আসবেন।'
—'আসুকই আগে।
—'এর মধ্যে সব ঠিকঠাক করে রাখলে ভালো হত না?'
—'কী আর ঠিক করবে, মানুষটা তো বিছানায় পড়ে আছি, কয়েকদিন পরে বিছানা খালি করে দিয়ে যাব। তখন অনেক ঠিকঠাক করতে হবে। কিন্তু এখন—'
কিন্তু ডাক্তার ঢুকে পড়ল। কোলের ওপর হাতটা রেখে বসে মিনিট পাচ সাত নানারকম পরীক্ষা করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখল, তারপর অমলার কাধে হাত দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
মৃণাল নিস্তব্ধ হয়েছিল।
আমি—'ডাক্তার তো কোনো কথাই বললে না।'
—'বেশ বড় ডাক্তার।'
—'চেহারা বেশ মানুষের মতো।'
—'এর তো সমস্ত স্যুট বিলেত থেকে তৈরি হয়ে আসে।
—'তাই নাকি?'
—'কেমন মানায় শাহেবি পোশাকে দেখলে তো?'
—'এর বয়স কত?'
—'তেত্রিশ—চৌত্রিশ হবে।'
—'মোটে?'
—'কেন, বুড়ো মনে হয়?'
—'না, তা নয়, তবে বাড়ন্ত বেশ।'
—'হ্যাঁ খুব পরিপূর্ণভাবেই পুরুষ মানুষ।'

—'তাই তো দেখলাম।'

মৃণাল—'এব সঙ্গে পার্টিতে আলাপ হয়েছিল।'

—'এই ডাক্তাবেব সঙ্গে?'

—'তাবপব দেখ, এই পবিবাবে যাব যখনই কোনো অসুখ হয় ইনি নিজে সেধে এসে দেখে যান। ডাকলে তো তৎক্ষণাৎ এসে হাজিব, সে যেখানে যত বড় কলই থাকুক না কেন।' মৃণাল বললে—'এখন কাপড়চোপড় বদলাতে হবে, তুমি অমলাকে একটু ডেকে দেবে?'

—'কোথায় সে?'

—'ড্রইংরুমে আছে।'

— 'আচ্ছা।'

উঠলাম।

—'কাল এসো, খুব সকালেই, সাড়ে সাতটা আটটাব সময়।'

—'আচ্ছা।'

যাচ্ছিলাম।

মৃণাল—'শোন।'

বিছানাব কাছে গিয়ে দাড়ালাম। বসলাম।

মৃণাল—'ডাক্তাবকে আজ খুব চুপচাপ দেখলে না?'

—'হ্যা।'

মৃণাল একটু মর্মাহত হয়ে হেসে—'কেন, বলো তো দেখি?'

—'তা আমি কী করে বলব?'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'আমি বলতে পাবি।

—'কি?'

—'ইনি যখন এ ঘবে ঢুকলেন তখন তোমাব হাতেব আঙুল নিয়ে আমি খেলা কবছিলাম।'

—'ও—কিন্তু তাতে ডাক্তাবেব কি?'

—'কোন জিনিশ কাব হৃদয়ে গিয়ে কী ক'বে যে আঘাত কবে' মৃণাল একটু ব্যথিত হয়ে বালিশে মুখ গুজল একটু চুপ থেকে—'ডাক্তাবকে আজ আবাব ডাকিয়ে আনতে হবে।'

—'কখন?'

—'সন্ধ্যাব মুখোমুখি।

—'শবীবটা খাবাপ বোধ কবছ?

—'না, সেজন্য নয়।'

—'তবে, জবাবদিহি দিতে চাও?' একটু হেসে মৃণালেব দিকে তাকালাম।

মৃণাল—'কোনো মানুষেব মনে মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে লাভ কি।

একটু চুপ থেকে—'আচ্ছা, আমি উঠি।'

আমাব হাত খপ কবে ধবে ফেলে মৃণাল।

—'তুমি আবাব কিছু মনে কবলে না তো?' কাতব চোখ তুলে মৃণাল আমাব দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম বিধাতা একেই কেড়ে নিতে চাচ্ছেন কেন, জীবনেব স্রোতে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে যে এত ভালোবাসে।

মৃণাল—'কই, তুমি কথা বলছ না যে?'

—'কথা শুনতে চাও?' আমি একটু নীবব হয়ে বয়েছিলাম।'

—'কেন চুপচাপ কবে থাকবে? দেখি, তো তোমাব হাতটা।' শালেব ভিতব থেকে হাতটা বেব কবে দিল মৃণাল। আমাব হাতেব ভিতব টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ কবে বসে বইলাম।

কিন্তু তবুও মৃণালেব সন্দিগ্ধতা গেল না। একটু উশখুশ কবে—'তোমাব বকম-সকম বুঝি না।'

—'কেন?'

—'কই, কিছু বলে গেলে না তো?'

—'কী আবাব বলব, কাল সকালেই আসব।'

—'না, তা নয়।'

—'তবে?'

—'এই যে ডাক্তারেব কথা বলছিলাম'—'মৃণাল একটু কেশে বললে—'বলেছিলাম সন্ধ্যার মুখোমুখি ডাক্তারকে ডাকব আবার। যাক, দরকার নেই ডেকে। যা কিছু মনে করুক গিয়ে, তাতে আমাব কি?'

মৃণাল আবার একটু কেশে বললে—'ঠিকঠাক ওষুধপত্র দিয়ে আমাকে বাঁচালেই আমি বাঁচি। ডাক্তারের সঙ্গে এর চেয়ে আমার কি বিশেষ আর সম্পর্ক!' বলে সে টিটকিরি দিয়ে একটু হাসল।

ঠিক এমনই সময় অমলার ঘাড়ে হাত জড়িয়ে ডাক্তার ঘরের ভিতর ঢুকল আবাব। মৃণালের বিছানার পাশে চেযাবে টেনে বসল।

অমলা আমার দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—'আপনি একটু শুনবেন?'

উঠে গেলাম।

অমলা—'চলুন।'

দবজা পেরিয়ে বাবান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

অমলা—'আসুন ড্রইংরুমে।'

ড্রইংরুমে ঢুকে অমলা—'একটা কুশনে বসুন।'

বসা গেল।

নিজে সে দাঁড়িয়েছিল, বললে—'কিছু মনে কববেন না ব্যানার্জি শাহেব মৃণালদিকে ভালো করে দেখবেন এবাব—বাড়ির মেয়ে টেয়েবা সব আসবে কিনা—তাই'—

—'আচ্ছা আমি যাচ্ছি।'

—'কোথায়?'

—'বাসায।'

অমলা—'কিছু মনে কববেন না।'

উঠে দাঁড়ালাম।

অমলা—'উঠবাব কি দরকার আপনাব? এইখানেই বসুন না কেন? এখন বাসায গিয়ে কী কববেন?' বলে সে মিষ্টি মুখ তুলে হেসে আমার দিকে তাকাল।

আমি—'আমি আবার কাল আসব।'

—'চা খেযে যান।'

—'না, থাক।'

—'কেন, এত ব্যস্ততা কীসের? বাসায আপনার স্ত্রী আছে?' মাথা নেড়ে—'না।'

—'মৃণালদির কাছে শুনলাম, আপনি বোর্ডিঙে থাকেন, কলেজ হস্টেলে?'

—'না।'

—'সে যে হস্টেলেই হোক, কোনো মেয়েমানুষ নেই তো। খানসামা এসে আপনাকে চা দেবে, তা ভালো লাগবে আপনার।' বলে সে আবার তার সমস্ত অনুপম রূপ তার নিজেরই ইচ্ছায নিজেই জ্ঞাতসারে অনেকখানি স্নিগ্ধ আগ্রহে সরস করে তুলে আমার দিকে তাকাল, ভালো লাগল বেশ। কিন্তু এব ভিতব কতখানি আন্তরিকতা কতখানি খেলা, কারু বুঝবাব সাধ্য নেই। যাইহোক এ খেলা খেলতে সে যে খুব রাজি এ স্পষ্টতাকে অস্বীকার করবার জো নেই।

আমার মুখোমুখি একটা সোফায বসে বললে—'আমার কথা কেউ কোনোদিন অগ্রাহ্য করতে পাবে না, আপনি মনে করেছেন চা না খেয়ে যাবেন? দেখুন, পাবেন কিনা?' আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে—

—'চা কে করবে?'

—'আমি নিজেই। আপনাকে চা খেতে বসিয়ে আমি বাবুর্চি দিয়ে করাব? কেন, এ হাতদুখানা আছে কীসের জন্য তাহলে?'

—'কিন্তু ডাক্তার এখন মৃণালকে দেখছে, এই সময চা নিয়ে ব্যাপৃত থাকা আপনার উচিত নয়।'

—'মৃণালদির ঘরে এখন অনেক মেয়েমানুষ আছে।'

—'কিন্তু আপনার মতন কাজের মেয়েমানুষ একটিও নেই।'

অমলা একটু হেসে—'কী করে বুঝলেন আপনি?'

—'থাক, সে হল আলাদা কথা। এখন আপনি রুগির কাছে যান।'

—'তা যাব বইকী, আগে চা করে আনি।'

—'আমি খুব তাড়াতাড়ি করে আনছি।'

—'সে অনেক দেরি লাগবে।'

সূচীপত্রে যান

—'সবাই এখন ডাক্তারের কাছে, আপনারও হয়তো দরকার সেখানে, এখন আপনি চা নিয়ে থাকবেন?'

—'সে আমি বুঝব।'

—'চা এনে কী করবেন?'

—'আমরা দুজনে খাব।'

—'আমি আর আপনি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর সকলে?'

—'তারা খাবে হিড়িকটা কেটে গেলে।'

—'ব্যানার্জি খেয়েছে?'

অমলা মাথা নেড়ে বললে—'না।'

—'তাহলে আমি একটু বসি, সকলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।'

অমলা—'তাই যদি চান তাহলে চলুন ওই ওদিককার সোফায় গিয়ে বসি।'

—'কেন?'

—'বেশ নিরিবিলি আছে গল্প করা যাবে।'

সোফার দিকে তাকিয়ে অমলা—'চলুন।'

—'রুগির ঘরটা একবার ঘুরে আসুন।'

—'কীসের জন্য?'

—'মৃণালের কাপড়চোপড় বদলাতে হবে, বিছানা ঠিকঠাক করতে হবে।'

—'আপনিও যেমন ডাক্তার থাকলে কাপড় বদলায় কী করে?' বলে অমলা খিল খিল করে হাসতে লাগল। কিন্তু সোফার থেকে নড়বার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না তার।

—'গেলে ভালো হত আপনার।'

—'আমার মনে হয় আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আপনার ঢের অসাধ।'

—'না, তা নয়।'

—'তবে আবার কি? আমাকে ঠেলে আপনি পাঠাবেনই।'

খটখট করে জুতোর শব্দ শোনা গেল, ডাক্তার ঢুকে বললে—'অমলা।'

—'কেন?'

—'কী করছ এখানেই?'

—'কেন? কী হল?'

ডাক্তার একটা সিগারেট জ্বালিয়ে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললে—'মেয়ে মানুষ এমন দুঃসাধ্য জিনিশ?'

আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালবেলা মৃণাল—'আমাকে আজ আগের চেয়ে একটু ভালো দেখাচ্ছে না?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

—'কেন জান, কাল রাতে ঘুম হয়েছিল।' বলে সে হেসে খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল।

—'রাতেরবেলা এ ঘরে কাছে কে শোয়?'

—'মা আর মাসিমা।'

—'অমলা শোয় না?'

—'না, সে কেন শুতে যাবে? বেচারির যা বয়স, এই বয়সেই তো ইনফেকশনে ধরে।' একটু চুপ থেকে—'টেম্পারেচার একটু কমেছে!'

—'কত?'

—'সাড়ে আটানব্বই।' মৃণাল একটু নীরব থেকে—'আজকের দিনটা বড় সুন্দর।'

—'হ্যাঁ, বেশ।'

—'ইচ্ছে করে একটা ডেকচেয়ার নিয়ে বাইরে গিয়ে একটু বসি। অশতথ গাছটার পাতা সবই প্রায় খসে গেছে দেখছি, এই তিন মাসের শীতে এই রকম হয়েছে। আচ্ছা পাড়াগাঁয় কি এইরকম?'

—'এইরকমই তো।'

—'পাতা আবার কখন হয়?'

সূচীপত্রে যান

—'এই ফাল্গুন চৈত্রের ভিতরেই বেবিয়ে যাবে।'
—'আবার ঝাঁকড়া হয়ে উঠবে গাছ না?'
—'হ্যাঁ।'
মৃণাল একটু চুপ থেকে—'অমলা কাল যে তোমাকে বড় ডেকে নিয়ে গে
—ডাক্তাব এসেছিল না কিনা—'
—'তাতে কি?'
—'আমারও যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল।'
— 'কিন্তু থাকলে পারতে।'
—'ডাক্তার কতক্ষণ ছিল?'
—'অনেকক্ষণ, দু ঘণ্টা।' মৃণাল একটা নি:শ্বাস ফেলে—'তোমাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কবেনি, আমিও কিছু বলিনি। কোনো বিষয়েই কিছু বলিনি। কী দরকার আমাব?'
একটু চুপ থেকে—'নিজেব জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে যে যার বিধাতাব বোঝপড়া কববে, আমি কাকে কী সাহায্য করতে পাবি বলো?'
আমার দিকে তাকিয়ে—'পাব তুমি কাউকে সাহায্য কবতে?'
চুপ করে ছিলাম।
মৃণাল—'ওষুধ আব চেঞ্জের কথা হল ডাক্তারের সঙ্গে।' একটু হেসে—'দুটো বসে, এই আব, কিছু নয়।'
—'চেঞ্জে যাওয়া ঠিক হল?'
—'খেপেছ? ভাওয়ালি যাওযার কথা বলছিলেন।'
—'তা গেলেই তো পার।'
—'এখন? এখন সে স্যানিটেরিযাম বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু যখন যাবাব উপায ছিল, তখনো কেন গেলাম না,—এই নিয়ে [...] মৃণাল একটু হাঁপিযে উঠে—'আমাকে শিলং যেতে বলেন।'
—'শিলং তো কাছেই।'
—'ব্যানার্জির খুব ঐকান্তিকতা?'
চুপ করে ছিলাম।
মৃণাল—'যাব শিলং?'
—'ডাক্তাবকে কী বললে?'
—'আমি? না করে দিলাম।'
—'পরিষ্কার না কবে দিলে?'
—'হ্যাঁ। তবে কী কবব আব?'
—'শিলং গেলে তো বেশ ভালোই হত।'
—'সকালবেলা বেশ ভালো লাগছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ ধবে এমন একটা অবসাদ। কেন বলো তো দেখি?'
—'ঘুমুবে?'
—'না।'
—'চেষ্টা করে দেখো না।'
—'মিছিমিছি চেষ্টা কবে কী লাভ? সত্যি আমাব একটুও পাযনি ঘুম।' মৃণাল বালিশে মুখ গুঁজে খানিকক্ষণ চুপ কবে পড়ে রইল। তাবপর ফিবে আমার দিকে তাকিয়ে—'কাব সঙ্গে আমাব কীবকম সম্বন্ধ আজও ঠিক বুঝতে পারি না। ডাক্তাব দু ঘণ্টা কাল আমাব বিছানাব পাশে বসেছিল। পুরুষমানুষ, কী বলবে? আমারই দু-একটা কথা বলা উচিত ছিল। কি বলো?'
—'প্রত্যাশা করে বসেছিল হয়তো।'
—'তুমি তাই মনে কর?'
—'এক-একজন মানুষ আছে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।'
—'ব্যানার্জিও সেইরকম?'
—'আমার তাই মনে হয়।'
—'কাল দু ঘণ্টা আমার কাছে বসল।'
—'তোমাব বিছানায?'

সূচীপত্রে যান

—'না, বিছানাব পাশে, চেয়ারে।'

—'মৃণাল' আমি—'মোটে তো ছ-মাসেব আলাপ, তাতে বিছানায বসা চলে না।'

—'তা ঠিক।'

—'তাছাড়া বিলেতফেবত বড় ডাক্তাব, কতকগুলো প্রাসঙ্গিকতা বজায বাখতে হয। চেয়াবে বসাই নিযম, কি বলো?'

—'তাই—ই স্বাভাবিক।'

—'বসায কি আসে যায!'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'ছ বছরেব ঘনিষ্ঠতা আলাপ থাকলেও আমাব বিছানায যে বসবেন বা আমাব আঙুল চুল নিয়ে খেলা কববেন, তা তুমি ভেবো না। এক এক জন মানুষ এক এক রকম থাকে, কিন্তু তাই বলে হৃদযের আগ্রহ আমাদের কারু.চাইতে এব কম নেই।'

—'তাই তো বোধ হল।'

—'দু ঘন্টা তো মনের কথা বললাম ওব সঙ্গে। কিন্তু বিশেষ যেন পবিতৃপ্তি পেল না মানুষটা।' একটু চুপ থেকে মৃণাল—'কেন বলো তো দেখি?'

—'কী কথা বললে?'

—'দেশেব, বিদেশেব, শবীবেব, অসুখেব, চেঞ্জেব রুগি মানুষ আব কি বলবে বল।'

—'তা তো ঠিক।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে মৃণাল—'কাব আঙুল নেড়ে খেলা কবছিলাম না করছিলাম সেই কৈফিযত দিতে হবে?'

—'তা দিলেই তো পাবতে।'

—'কেন দিতে যাব?' মৃণাল একটু চুপ থেকে—'ওব সঙ্গে অভদ্র ব্যবহাব কবিনি তো কিছু। একজনেব হাত যদি নিজেব হাতেব ভিতব টেনে নেই তাতে উনি অপ্রীত হলে আমি কী কবি বলো?'

কিন্তু মৃণালেব হাত আজ কম্বলেব ভিতরেই ছিল, বেব কবছিল না সে আজ আব। হয়তো হাত হিম হয়ে আছে, গরমেব দবকাব।

মৃণাল—'কৈফিযত কীই-বা দিতে পাবতাম?'

আমাব দিকে সে তাকাল।

একটু হেসে বললাম—'তা তুমি আমাব চেয়ে ভালো জান।'

মৃণাল মাথা নেড়ে—'কিছু জানি না।' একটু চুপ থেকে—'কোনো কৈফিযত নেই, না আছে অস্তিত্ব, না আছে প্রযোজনীযতা।'

বাবুর্চি চা দিয়ে গেল।

আমি—'অমলা কোথায?'

—'ঘুমুচ্ছে হযতো।'

—'এখনো?'

—'ও, বড্ড সুখী শবীব অমলাব।'

—'কিন্তু কাজকর্ম কবে তো ঢেব।'

মৃণাল—'ব্যানার্জি আজও তো আসবে, বারোটাব সময একবাব।'

—'দুপুববেলা আসে নাকি?'

—'তাবপব আসবে চাবটেয।'

একটু চুপ থেকে—'আজও যদি দিনটা গুমবে থাকে তাব?'

—'কই, তুমি চা খাচ্ছ কই? আমাকে ওভালটিন দেযনি বুঝি?'

—'দিযেছে।'

ওভালটিনেব পেযালাটা তুলে নিয়ে মৃণাল—'এইটেই খাওযা যাক।'

—'সবটুকু খেও।'

—'চেষ্টা কবব। তুমি চা খাও। আমি সকালে খেযেছিলাম কযেক চামচ চা। ভালো লাগল না।'

—'এখন খাবে?'

—'না, কোনো রুচি নেই।'

টোস্টেব এক টুকরো ভেঙে মুখে দিয়ে মৃণাল—'আজ না হয দুচাবটে কথা বলা যাবে। ব্যানার্জিব

সূচীপত্রে যান

সঙ্গে।'

—'তা বলো।'

—'কী রকম কথা জান?'

—'কীরকম?'

—'না, অসুখবিসুখ চেঞ্জফেঞ্জের কথা আর নয়, ওতে মানুষের ঘেন্না ধরে যায়, যাতে মানুষের মনের কুয়াশা কেটে যায় সে রকম কথা বলতে হয়।'

চা খাচ্ছিলাম।

মৃণাল—'শিগগিরই তো মরে যাচ্ছি, কোনো মানুষের মনে বেদনা দিয়ে বিদায় নিয়ে কী লাভ?'

চায়ের পেয়ালাটা হাতের কাছের তেপয়ের ওপর রাখলাম।

মৃণাল—'যে যা আমার কাছ থেকে ভালোবেসে গ্রহণ করতে চায় তাই দিয়ে যাব। দুদিন পরে আমার এ জীবন তো কাদার চেয়েও অধম হয়ে যাবে।'

চায়ের পেয়ালাটা তুলে চুমুক দিলাম।

মৃণাল—'আজ এই দশ—পনেরোটা দিন এ জীবনের তবুও ঢের মূল্য আছে দেখলাম।'

চুপ করে ছিলাম।

মৃণাল একটু হেসে—'আমার দেহের জন্য অবিশ্যি কারু খিদে নেই, কিন্তু আমার মনের জন্য এখনো অনেকের ঢের লোভ।'

টিপট থেকে চা ঢেলে নিচ্ছিলাম।

মৃণাল—'মেয়েমানুষকে তোমরা মৃত্যুশয্যায়ও নিস্তার দাও না। তার হৃদয় নিয়ে খেলা করতে ভালোবাস। তোমরা কম নও।'

চা ঢালছিলাম।

মৃণাল—'কিন্তু আমাদেরও বলিহারি পুরুষমানুষকে উপেক্ষা করবার শক্তি নেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা নেই। নিজের হৃদয়কে অন্য অনেকের কামনার জিনিশ ভেবে সার্থকতা।'

দেখলাম চা খুব কড়া হয়ে গেছে।

—'সার্থকতাই শুধু? একেবারে চরিতার্থতা।' বলে সে চোখ বুজল দেখলাম চোখের পাতা খুব নিবিড়ভাবে কাঁপছে।

সমস্ত শরীরও থরথর করে কাঁপছে যেন। এমনি করে পাঁচ-দশ মিনিট কেটে গেল। তারপর চোখ মেলে মৃণাল—'বড্ড শীত করছে।'

—'আর একটা কম্বল চাপিয়ে দিই?'

—'দাও।'

ভালো করে গায়ে কম্বল টেনে দিয়ে—'এখন ঘুমোও।'

—'তাই চেষ্টা করছি।' বলে সে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। এক পট চা ওভালটিন আঙুর বেদানা বাবুর্চি যেমন দিয়ে গেছিল মৃণালকে, তেমনই ছড়িয়ে রইল সব।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মৃণাল বাঁচবে!

দুপুরবেলা মৃণাল—'সকালবেলা তুমি না বলেই চলে গেলে যে?'

—'চলে যাইনি, ড্রইংরুমে গিয়ে বসেছিলাম।'

—'একা একা?'

—'না, অমলা ছিল?'

—'তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

মৃণাল—'ওর সঙ্গে বেশি আলাপ কোরো না।'

—'কেন?'

—'তাহলে তোমার দাম্পত্যজীবনের শান্তি নষ্ট হবে।'

চুপ করে বসেছিলাম।

—'ড্রইংরুম থেকে এখানে ফিরে এলে না কেন?'

—'তুমি তো ঘুমুচ্ছিলে।'

—'না, ঘুমুইনি, চুপচাপ পড়েছিলাম।'

—'আমি তো তা বুঝতে পারিনি।'
—'কিন্তু অমলার বলা উচিত ছিল তোমাকে।'
—'হয়তো টের পায়নি।'
—'সে খুব জানে, খুব বোঝে আমি কখন ঘুমুচ্ছি না ঘুমুচ্ছি। আমাকে দেখে দেখে সে হদ্দ হয়ে গেল। ইচ্ছে করেই তোমাকে জানায়নি।'
—'হয়তো ভেবেছে তুমি একটু চুপ করে পড়ে আছ, তোমাকে বাধা দিয়ে দরকার নেই।'
—'ওর হয়ে কথা বলতে খুব ভালো লাগে তোমার, কি বলো?'
—'না, তা নয়।'
—'এই মেয়েটি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার আর এক কাঁটা।'
একটা বেদানা আস্তে আস্তে ফাড়ছিলাম।
মৃণাল—'আমাকে শাস্তি দিতে চাও?'
একটু হেসে বললাম—'কেন যে ব্যথা পেলে বুঝতে পারলাম না। ব্যথার কিছু ছিল না কিন্তু।'
মৃণাল আস্তে আস্তে আঙুল বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে একটা শান্ত নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল—'কয়েকটা বেদানার কোয়া দাও তো আমাকে।'
চার—পাঁচটা দানা মুখের ভিতর ছেড়ে দিলাম।
মৃণাল—'থাক আর দিও না, আগে খেয়েনি।' চুষতে চুষতে—'অমলার সঙ্গে ড্রইংরুমে বসে কোনোদিন কথা বোলো না।'
—'কেন?'
—'তাতে ঢের ক্ষতি হবে।'
—'আমার?'
—'আমারও। সে বেঁচে আছে, আমি মরে যাচ্ছি ভেবে দেখ পার্থক্যটা কত বড়।'
বুঝতে পারলাম।
মৃণাল—'তাকে খুব ভালো লাগে?'
—'অমলাকে?'
—'ভালো তো লাগবেই। কিন্তু এ ভালো জিনিশকে পথ ছেড়ে চলে যেতে দাও।' মৃণাল একটা একটা করে বেদনার বিচি ফেলে দিচ্ছিল।
আমি—'আর খাবে?'
—'দাও।'
এক একটা দানা দিচ্ছিলাম।
মৃণাল—'অনেকদিন পরে তোমার মনে হয়তো ভালোবাসা এসেছে।'
—'কেন?'
—'এই অমলাকে দেখে।'
আরো একটা দানা আমার আঙুলের থেকে ঠোঁট দিয়ে টেনে নিল সে।
দুজনেই চুপ করে ছিলাম।
মৃণাল—'কোনো উত্তর দিলে না যে?'
—'কয়েকটা মুহূর্ত অমলার সঙ্গে কাটল মন্দ না।'
—'তা আমি জানি, তা কাটবে বেশ।' মৃণাল—'কিন্তু এই মেয়েটির দায়িত্ব বড় কম।'
—'কী রকম?'
—'রূপ আছে, জীবন সম্পদ আছে কিন্তু তার সঙ্গে যদি দায়িত্ব না থাকে তাহলে সে কী রকম মারাত্মক জীব হয়ে ওঠে ভেবে দেখ তো দেখি।'
চুপ করেছিলাম।
মৃণাল—'ছোটবেলায় প্রজাতির ডানা ছিঁড়তে ভালোবাসত।'
—'কে?'
'অমলা।'
একটু চুপ থেকে—'ছোটবেলায় অবিশ্যি অনেকেই আমরা ফড়িং প্রজাপতি মেরে খেলা করেছি।'
—'অমলার দিক টেনে কথা বলতে খুব ভালো লেগে উঠল দেখছি যে তোমার।'

সূচীপত্রে যান

—'না, বলছিলাম, সে এখন বড় হয়েছে, এখন অন্যরকম।'

—'মানুষকে ফুসলে বেড়ানোই এখন তার ধর্ম।'

—'আমার সঙ্গে তার সেদিকের কোনো পরিচয় নেই, কোনোদিন হবেও বলে আশা করি না।'

—'হতে কতক্ষণ?'

—'না, তা হয় না।'

—'তোমরা যারা জীবনের স্রোতে খেলা করছ, এতটা নির্ভর নিজেদের ওপর মিছিমিছি করতে যাও কেন? এ সাজে না।'

মৃণাল—'অমলা যদি তোমাকে ড্রইংরুমে ডেকে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তুমি যেও না।'

—'আমি তো তোমার বিছানার পাশেই বসে আছি। আমাকে ডেকে নেবে কেন?'

—'মাঝে মাঝে আমি ঘুমিয়ে পড়ি তো?' মৃণাল একটু কেশে—তখন হয়তো এসে হাত ইশারা করে বলবে চলুন ড্রইংরুমে গিয়ে একটু গল্পগুজব করা যাক—এখানে কি গুমোট।' মৃণাল—'ঠিক এই রকম বলে।' একটু চুপ থেকে—'যদি ডাকে এসে, তুমি যেও না।'

মৃণালকে আশ্বাস দিয়ে—'আচ্ছা।'

কপালের চুল আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিচ্ছিলাম।

মৃণাল—'কিংবা যখন বাসায় চলে যাচ্ছ হয়তো ড্রইংরুমে খানিকক্ষণ বসতে বলবে। আমার সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা তাদের ওপর এই রকম লোভ।'

চুপ করে ছিলাম।

মৃণাল—'কক্ষনো বসতে যেও না।'

—'কী বলব?'

—'কোনো কথাবার্তার দরকার নেই—চুপচাপ চলে যাবে।'

—'সে বড় অভদ্র ব্যবহার হয় না?'

মৃণাল মাথা নেড়ে—'না।'

—'মানুষের সঙ্গে এটুকু সৌজন্যও রাখব না?'

মৃণাল একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে—'সৌজন্য? তোমার মনেও খানিকটা খিদে আছে যেন।'

—'খিদে?'

—'তা আমি আগেই জানতাম। অমলা কি সোজা পাত্র, মানুষের হৃদয়ের ভিতর কামনা না জাগিয়ে সে ছাড়বে?'

—'অমলার সঙ্গে দেখা হলে আমি হাত তুলে নমস্কার করে অমায়িকভাবে কথা বলি। কোথাও একটু শিষ্টতা না হারিয়ে ফেলি এই-ই দেখি তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এইরকম।'

—'এ তো গেল সম্বন্ধের সূচনা।'

—'এবং এইরকম করেই শেষ।'

—'এই হাত তুলে নমস্কার দিয়ে?'

—'হ্যাঁ, সত্তর বছর যদি বাঁচি তখনো।'

—'এই অমলার সঙ্গে?'

—'সমস্ত নারীর সঙ্গেই।'

মৃণাল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—'কি জানি, মৃত্যুর বিছানায় বসে কথা বলছ, আঘাত দিয়ে কথা বলতে পার না তো, মুখরোচক করে বলতে হয়।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু নিজেকে যে উদাসীন সাজাবার এই-ই তোমার সত্যরূপ?' আমার চোখের দিকে দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে—'মনের ভিতর তোমার কোনো কামনা নেই?'

—'কার জন্য?'

—'অমলার জন্য?'

—'নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গে থাকলে কামনা যে না জাগে তা নয়।'

—'এই বার সত্য কথা বলেছ।'

—'তুমি তো জানই আমি কত নিঃসহায়।'

—'কেন?'

—'তোমার অসুখ বলেই এখানে আসি, না হলে মেসে থেকে টিউশন করে মরা মাছি সম্বন্ধে কবিতা

সূচীপত্রে যান

লিখে তোমাদেব বড় জীবন বড় আবহাওযাব তুলনায আমি কত ক্ষুদ্র জীব। তা কি তুমি বোঝ না?'

মৃণাল কম্বলের থেকে হাত বের করে অনেকক্ষণ চুপচাপ আমাব হাত ধবে রইল। তারপব বললে—'কিছু মনে কোবো না, যে মবতে বসেছে, তাব মনে নানাবকম দ্বিধা।'

পরদিন বিকেলে যখন পৌছলাম মৃণালের কাছে, তখন প্রায সাড়ে চারটা পাঁচটা।

মৃণাল—'তোমাব সঙ্গে আজ আমাব ঢেব কথা।' একটু চুপ থেকে বললে—'মৃত্যুকে কীভাবে গ্রহণ কবছি জান?'

সমস্ত ঘবে গভীব নিস্তব্ধতা, জানালাব পাশে গোটা দুই চড়াই ডাকছিল। জানালাব ভিতব দিযে বিকেলেব রোদ মৃণালেব বিছানায, শালে, চেযারে টেবিলে ছড়িযে পড়ছিল।

মৃণাল—'মৃত্যুব পব নতুন জীবন, ভগবানেব অমৃতলোক, সে বিশ্বাস আমি অনেকদিন হয হারিযে ফেলেছি। সেখানে অন্ধকার ছাড়া আব কিছু নেই।'

আমি—'আমি অনেক বই পড়ে দেখেছি।'

মৃণাল বাধা দিযে—'বলবে তো উপনিষদেব অমৃতেব কথা।'

—'না, উপনিষদ নয।'

—'আমাব কথা শোনো—ছ সাত মাস আগে একদিন দুপুববেলা সার্কুলাব রোডের খ্রিস্টানদেব গোবস্থান দেখতে গিযেছিলাম, কত বড় যে নিস্তব্ধতা সেখানে আব কত ক্রুশ আর সমাধি দেখেছ?'

—'দেখেছি।'

—'গোবস্থান থেকে এসেই মনটা উদাস হযে যায, কী বলো?'

—'তা খুব হয।'

—'সেদিন প্রায ছ ঘণ্টা একা একা ঘুবছিলাম সে জাযগায। প্রায বছব দুই হল আমাব মনে হচ্ছে, কিন্তু যেদিন আমি খুব স্পষ্ট কবে বুঝলাম যে মৃত্যুব পব নিববচ্ছিন্ন নীববতা ছাড়া আমাদের জন্য আব কিছু নেই—'মৃণাল একটু চুপ থেকে—'হযতো এ আমাব ভুল ধাবণা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো ধাবণাই আমার কাছে সৎ বা সাধু বলে মনে হয না। কটা দিন তো বাঁচব আর, জীবনেব সব আচাবেই এখন ঐকান্তিকতা আমাব সম্বল, ভগবান, অমৃত—এই সব সাজানো মিথ্যা নিযে আমি মবতে চাই না।'

ধীবে ধীবে মৃণালেব চুলে হাত বুলিযে দিচ্ছিলাম।

মৃণাল—'কিন্তু তাই বলে আমি ভবসা হারিযে ফেলিনি, এই যে মৃত্যু আসছে, আমি তাকে কীভাবে গ্রহণ কবতে যাচ্ছি শুনবে?' আমাব দিকে সে তাকাল। বললে—'জানালা দিযে এই যে বোদ নবম শাদা শালটাব ওপব এসে পড়েছে, এব ভেতব এখনো তিনটে মাছি দেখছ?'

দেখছিলাম।

মৃণাল—'এই মাছি তিনটে তোমাব কাছে খুব কুৎসিত না?'

একটু হেসে বললাম—'বোদটা কিন্তু খুব সুন্দব।'

—'আব এই মাছি দুটো?'

চুপ কবে ছিলাম।

মৃণাল—'বোদের চেযে এবা একটুও কি কম সুন্দব?' মৃণাল—'দেখ তো যেখানে ছাযা পড়েছে সেখান থেকেই সরে যাচ্ছে, যেখানে বোদ পালাতে পালাতে থেমে বযেছে সেই সেই জাযগা খুঁজে খুঁজে গিযে বসছে আবাব। একটুও ভুল কবে না, একটুও অলসতা নেই। জীবনেব স্পৃহা ও আবাম এদেব এত সুন্দব, দেখে আমাব এত ভালো লাগে!' মাছিগুলোব দিকে তাকিযে তাকিযে মৃণাল—'বোদেব ভিতর পাখনা চালাচ্ছে, উড়ছে, খেলছে, কি সুন্দব।' আমাব দিকে তাকিযে—'এই সব দেখি আমি, সকালে বিকালে। ঘুমের থেকে উঠতে না উঠতেই চড়াইগুলো জানালায এসে খেলা কবতে থাকে। সমস্ত গাযে ভোবেব বোদ, উঁচু গাছের ডালপালার ভিতব কিংবা অনেক আকাশের পথে উড়ে যাবাব কোনো বাধা নেই পাখিগুলোব। নাবকেল সাবির ভিতর বোদ চিক চিক কবতে থাকে। পাতার ভিতর থেকে আলোর মতো তেল ঝরে পড়ে যেন। দেশেব বাড়িব আকাশপ্রদীপ দেওযাব জাযগায় একটা শঙ্খচিল এসে বড় বড় ডানা গুটিযে বসে। অশতথ গাছের ডালপালার ভিতর শাদা শাদা নোটন পাযবাগুলো ছবির মতন বসে থাকে। দূবে ন্যাড়া শিমুলগাছ ফুলে ফুলে লাল, তার ভিতব কতকগুলো কাক খুব কোলাহল ও উৎসাহের সঙ্গে বোজকার ভোরের জীবন শুরু কবে তাদের। আমি শিগগিবই চলে যাব এদের ভিতর থেকে। কিন্তু এবা তো বেঁচে থাকবে! পৃথিবীতে সুন্দর কোনোদিনও শেষ হয না। নীল আকাশ থাকবে, নক্ষত্র থাকবে, ভোর থাকবে, রোদ থাকবে, বোদের মাছি থাকবে, হাজাব হাজার বছর পরেও এমনই ফাল্গুনেব বিকালেব পড়ন্ত বোদেব ভিতব হযতো কোনো যক্ষ্মারোগীর ঘবে এমনই

সূচীপত্রে যান

মাছিগুলো ডানা কাঁপাবে, উড়বে. খেলবে, জীবনের গভীর স্পৃহা ও আনন্দে বিচিত্র হয়ে থাকবে।'

মৃণাল একটু চুপ থেকে—'ভগবান ও অমৃতের জায়গায় এইসব সৌন্দর্য আমাব মনকে পেযে বসেছে আজকাল।'

একটু কেশে—'কিন্তু অন্ধতাকে কোনো কিছু বিশ্বাস করব না বলে অনেকদিন থেকেই আমি নিজেকে স্থির করে নিয়েছি। কাজেই জীবনের বড় জিনিশগুলো এড়িয়ে গেল আমাকে। কতকগুলো অধম তুচ্ছ সৌন্দর্যের ভবসা বুকে করে মবলাম।'

আমার হাত তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে—'ভেবেছিলাম বিয়ে কবব, মানুষের মতো একটি সন্তান রেখে যাব।' একটু চুপ থেকে—'কিন্তু পৃথিবীতে কত মানুষ দাম্পত্য জীবন চালিয়ে কত শান্তি পাচ্ছে, কত মানুষের কত সুন্দর শিশু হয়েছে, ভেবে নিলেই হল, আমি সেই বধূ, সেই সব শিশু আমারই।' বলে সে চোখ বুজল। ধীরে ধীরে ঘুমিযে পড়ল।

পরদিন দেখলাম ডাক্তাবেব হাত বুকেব ওপর তুলে নিয়ে খুব আগ্রহেব সঙ্গে মৃণাল নানারকম ঐকান্তিক কথা বলছে। আমি যে এসেছি তা টেবও পেল না সে। এমনই কযেকদিন আবো কযেকজনেব হাত ধবে আঙুল নিয়ে খেলা কবে অনেক বকম আন্তবিক ঐকান্তিক কথা বললে মৃণাল। কোথাও একটু ভান বা কপটতার গন্ধ পর্যন্ত নেই।

একদিন বিকেলবেলা মৃণালের বিছানায় শালটাব ওপব বোদ এসে পড়ছিল, গোটা দুই মাছি সেই রোদের ভিতর উড়তে লাগল। মৃণাল আমাকে আঙুল দিযে দেখিয়ে দিযে—'দেখলে, রোদের ভিতব দুটো মাছি কেমন।'

আমি তাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলাম।

মৃণাল—'না, উড়িয়ে দিও না।'

—'কী হবে?'

—'যেখানেই রোদ সেখানেই উড়ে উড়ে যাচ্ছে মাছি দুটো, কেন বলো তো দেখি?'

—'কি জানি।'

—'যেখান থেকে বোদ সবে সরে যাচ্ছে সেই ছাযাব ভিতব থাকছে না আব।' মৃণাল অবাক হযে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটু চুপ থেকে বললে—'ছায়া যে নেমে আসছে, সন্ধ্যা হচ্ছে এ তাবা কিছুতেই গ্রাহ্য কবতে চায না। বোদটুকুকে আঁকড়ে থাকতে চায। চাবদিকে জীবনেব স্পৃহা এমনই নিবিড়, এমনই বিচিত্র।' বলে নিজেও সে নিজেব জীবনেব সম্বন্ধে খানিকটা ভবসা পেল যেন। খানিকক্ষণ চুপ থেকে মৃণাল—'শিলং যাওযা ঠিক করে ফেলেছি।'

—'কবে যাবে?'

—'দু-চাবদিনেব মধ্যেই, ডাক্তাবও যাবেন।'

একটু চুপ থেকে—'তুমিও চলো।'

শুনতে পেলাম অনেককেই মৃণাল সঙ্গে নিতে চাচ্ছে।

বাসায় যাবার সময অমলাকে জিজ্ঞেস কবলাম—'মৃণাল চেঞ্জে যাবে নাকি?'

—'কে বলেছে আপনাকে?'

—'সে-ই তো বলে।'

—'আপনি খেপেছেন, আজ বাদে কাল মরে যাবে, সে যাবে আবার চেঞ্জে?' অমলা একটু চুপ থেকে—'সাবাদিন ব্যানার্জির কাছে কত কি হাবিজাবি বলে, দিনেব মধ্যে একশোবাব কবে আংটি বদলে বিযে করে ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তাব আমাকে সব এসে বলে। এই ড্রইংরুমে বসে আমরা দুজনে হেসে খুন হই।'

অমলা—'উঠলেন?'

—'যাই।'

—'চা খাবেন না?'

—'এখুনি তো গিয়ে ভাত খাব।'

পরদিন সকালে মৃণালেব কাছে আর গেলাম না। দুপুরেও না। সমস্ত বিকালটাও বিছানায় বিছানায় কুড়েমিতে বিমূঢ়তায অবসাদে কাটিযে দিলাম। সন্ধ্যাব সময মৃণালদেব বাসায় গিযে অমলাব সঙ্গেই প্রথম দেখা—সে বললে—'বেলা বারোটাব সময মৃণালের দাহ শেষ হযে গেছে।'

সূচীপত্রে যান

নিরুপম যাত্রা

বছর চারেক পরে কলকাতার থেকে দেশে ফিরছে—সম্বল একটা টিনের সুটকেশ, বংচটা শতরঞ্জিতে মোড়া একটা বিছানা এবং মনিব্যাগে তিন টাকা সাড়ে ন আনার পয়সা। একটা বিষয়ে খুব স্বাধীনতা আছে—কলকাতার থেকে চলে যাচ্ছে বলে কোনো উপরওয়ালার অনুমতির দরকার নেই; কোনো উপরওয়ালা নেই, চাকরির বিড়ম্বনার থেকে জীবন নির্মুক্ত—বেশ ঝরঝরে নির্মল দিনগুলো—যতক্ষণ ইচ্ছা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, ফাল্গুনের সোনালি রোদে মাছির মত ঘুরে বেড়াতে পারে, মেসের বারান্দায় চড়াইদের নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত জীবনোপভোগ সমস্ত দীর্ঘ অলস দুপুর বেলা বসে উপলব্ধি করতে পারে। একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় কলেজ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে বসে সমস্ত সকাল অশ্বত্থের খড়-খড়ে ডাল-পালার ভিতর বাতাস ও বুলবুলিগুলোর গান শুনতে পায়—শুকনো পাতা ঝরে, সজীব পাতা গজায়, সবুজ বেঞ্চির ওপর খয়েরি রঙের, বাদামি রঙের পাতা উড়ে আসে, খানিকটা দূরে দেবদারু গাছটা ছোট নিটোল, শিমুলের ডালপালার পাতা নেই—অসংখ্য লাল ফুলের নিশান, কৃষ্ণ শিখার মত কাকের পাখাগুলো সাপের ফণার মত সারাদিন ঘুরছে, বিলম্বিত সকাল এখানে নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারা যায়—কেউ কোনো কৈফিয়ৎ নিতে আসবে না, রাস্তার ট্রামে-বাসে অফিসমুখী কেরানিদের জীবনের উর্ধ্বশ্বাসকে একটা অবাঞ্ছিত বিকৃত অনিয়ম বলে মনে হবে, দেবদারু গাছের লীলা ও ভঙ্গি, জীবনরচনার প্রণালী মনে হবে গভীর সত্যিকারের জিনিশ, অশথ-অশথের বুলবুলিগুলোর জীবন সত্যিকারের মনে হবে, তার নিজের জীবনটাকে সত্যিকারের মনে হবে। সমস্ত রাত মেসের ছাদের ওপর মাদুর পেতে শুয়ে থেকে একটা দূর ভবিষ্যৎ জীবনের আভা পেতে পারে—গোলদিঘির দেবদারু ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম গাছগুলো যার আভাস পায়, এই শহরের শিশির ভেজা অজস্র কাকের নীড় এমনি গভীর গহন রাতে যে-পরিপূর্ণতার স্পর্শে সুন্দর নিবিড় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দিনগুলোকে এমনি ভাবে চালালেও চলে। চালাতে প্রভাতের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিপদ এই যে সামান্য দাড়ি কামাতে, একটা দেশলাই বা ব্যবহার করতেও যার সাহায্যের দরকার, সেই পয়সাই নাই। বয়স ত্রিশ বছর—আরো কুড়ি কি ত্রিশ বছর যদি সে বাঁচে তা হলে তিন টাকা সোয়া ন আনায় হয় না।

নিজে একা মানুষও নয় সে; স্ত্রী আছে—একটি ছেলেও রয়েছে।

এই চার বছর কলকাতায় কবিত্ব করে আর বুলবুলির গান শুনে কাটায় নি সে। শুধু আর্থিক অধঃপতনের অপরাধে আত্মিক জীবনের অমর্যাদা ও গ্লানি সহ্য করতে যারা অভ্যস্ত তাদেরই এক জনের মত সারাদিন পথে-পথে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে সে। সুখ-সুবিধা-সফলতা এই সব অর্জন করার জিনিস—পুরুষকারের দরকার—প্রতিদিন সকালবেলা এই দুবারোগ্য ছন্দ তাকে পেয়ে বসেছে; কেরোসিন কাঠের টেবিলে ডিটমারের লণ্ঠনটা নিভিয়ে অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে প্রতিদিন রাতের বেলা মনে হয়েছে, এই অন্ধকারের যেন শেষ না হয় আর, এ বিছানার থেকে কোনোদিন যেন আর তাকে উঠতে না হয়।

সাধারণ বিশেষত্বহীন জীবনের বিশেষত্বহীন সাধারণ বেদনায় অসহায় গভীরতায় চারটা বছর আস্তে-আস্তে এমনি করে কেটে গেল তার।

বাড়ির থেকে চিঠিপত্র বেশি কিছু পায় না সে। মা মাঝে-মাঝে লিখেছেন 'অনেক দিন তোমাকে দেখি না, মাঝে-মাঝে দেখতে ইচ্ছা হয়—সময় করে একবার আসতে পার না?'

বৌ-এর চিঠি, পনের-কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্তর এক-এক বার আসে। 'কিছু সুবিধা হল? এত দিনেও তুমি যে কিছু করে উঠতে পারলে না এই ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই।'

তাই তো—

সূচীপত্রে যান

প্রভাত লেখে—'খোকা কত বড় হল?'

জবাব আসে —'কুন্দর চিঠি পেলাম আজ; তার স্বামী তো কলকাতায় গিয়ে ছ মাসের মধ্যেই রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টে কত বড় চাকবি জোগাড় করে নিল আর তুমি কিছু পারলে না।'

বেশ কথা। সেই যত উদাসীনতা দেখতে দেশে যেতে ইচ্ছা করে বড়। দেশে সে যাবে একবার—এবাব একবাব দেশে যাবে না কি? যাবে, যাবে। মাব চিঠিতে হয় তো আগ্রহ বেশি নেই— কিন্তু একবার গিয়ে কাছাকাছি দাঁড়ালে তিনি উচ্ছ্বাসে বাঁধন-সম্বিৎহারা যদি না হন। আব এই কমলা—প্রথম দিনটা হয তো সেই একটু মুখ গোঁজ করে সরে থাকবে—কাছে আসবে না, কথা বলবেও না; কিন্তু তার এ বিরসতা, উচ্ছে-চিবনো রূপ দু-এক দিনের মধ্যেই কেটে যাবে। তাব পব চৈত্র-বৈশাখেব নির্জন দুপুরলো-জামরুল পাতাব মর্মর শব্দ, বোলতার গুনগুন, নারকোল গাছে কাঠঠোকবাব ঠোকব, কামিনীগাছেব ডালপালাব ভিতব টুনটুনিগুলোব কিচিবমিচির—মাথাব উপর কড়া রৌদ্রে মাছবাঙাব ডাক—বাতাসে নিদ্রালু মাঠ-প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ও স্বপ্নেব হাহাকার! এমনি সময দুপুরেব বাতাসে অক্ষয বটেব প্রান্তবেব সীমা পবিসীমায আরো দূব অসংবদ্ধ প্রান্তর আকাশেব বিস্তাবকে টিটকারি দিচ্ছে—

আব খোকা?

খোকাকে ছ মাসেব দেখে কলকাতায চলে এসেছিল প্রভাত—আজ বয়স তাব প্রায পাঁচ বছরেব কাছাকাছি। হাঁটতে পারে—দৌড়ুতে পাবে—এমন কথা নেই যা সে না বলতে পাবে। দেখতে কেমন হযেছে? তার নিজেব মত—না কমলার মত?

খোকা হয তো কাবো কথাই শোনে না; সকালে ঘুমেব থেকে উঠে একটা বাঁশেব কঞ্চি কুড়িয়ে নেয নিশ্চয। তাব পব?

নয তো বিড়াল, কুকুব, শালিক, কাক, যা তাব নজবে আসে—সমস্ত তাড়িয়ে বেড়াতে খবু ভাল লাগে তাব। হয তো পিঁপড়ে মাবে—ফড়িং ধবার জন্য মেহেদি পাতার বেড়াব চাবিদিকে ঘুরে বেড়ায-দু-একটা গঙ্গা-ফড়িং কিংবা নতুন ঝিঁ ঝিঁ যদি নজবে পড়ে তা হলে তাব প্রতি লোভ আবক্তিম হযে ওঠে খোকাব। এক-একটা প্রজাপতি উড়ে এসে আচমকা তাকে অন্য পথে ভুলিযে নিযে যায; নানা বঙেব প্রজাপতি: হলদে জর্দা, পাটকিলে নীল—কোনোটা লখনৌ ছিটেব মত, চেককাটা, ফুটফুটে, ডোবাদাব, কত কী! ফড়িংই-বা কত বকম—কোনগুলো টকটকে লাল, সমস্ত শবীবটা একটা পাকা ধানি লঙ্কাব মত চাবটি ডানা—আভেব তৈবি নিটোল নিখুঁত জিনিসেব মত—ভাঙে না, গুঁড়ো হয না—ফড়িংটাকে মাঠের থেকে মাঠ-প্রান্তরেব এ পাবে, দিগন্তে, নদীব ধাবে, শশাব খেতে, বাবলাব জঙ্গলে, শ্মশানে কত জাযগাযই যে নিযে যায!

ঘুবে ফিবে এই প্রজাপতি আব ফড়িংগুলো কানসোনাব শিষে, দ্রোণ ফুলেব ঝাড়ে, ঢেঁকি লতায, আকন্দ ফুলে, ভেবেণ্ডাবনে এসে বসে, কিংবা লাউযেব ডগায, কিংবা বাঁশেব মাচাব একটা কঞ্চিব উপবে! খোকা হয তো এই সব দেখে-দেখে হযবান—

একটা ফড়িংও ধরতে পাবে না সে, তবুও হয তো বর্ণচ্ছটাময অজস্র প্রজাপতিব জগৎ তাব কাছে একটা সুন্দব সুদূর স্বপ্ন—সাম্পানচড়া মলয নাবিকেব চোখে দূব দক্ষিণ সমুদ্রেব স্বপ্নেব মত তাকে এড়িযেই চলে, দিন-বাত এড়িযে-এড়িযে চলে—তাব পব বিকেলেব পড়ন্ত বোদেব ভিতব দিযে সন্ধ্যাব আবছাযা নেমে আসবাব আগে কোনো পবীব বাজ্যে বিলীন হযে যায সে। যাক্। এই বকম বিলীন হযে যাওযাই ভাল। একটা প্রজাপতি ধবে পাখনা ছিঁড়ে খোকাব কী লাভ? তাব চেযে এবা যদ্দিন শিশুটিকে মাঠে পথে ভুলিযে ভুলিযে নিযে বেড়ায বেশ হয; খোকাকে ধবা দেবে না কখনো—তাব মনেব ভিতব নিবরচ্ছিন্ন কল্পনা ও স্বপ্ন জাগিযে রাখবে; ভোরেব থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে অনেক বহুরূপী রূপেব ভিতব দিযে নিযে যাবে—উঠানে, বাঁশাগানে, চালতা তলায, কিংবা লাল কুচ সবুজ তেলাকুচা লতাব দেশে কিংবা আমের বোলগুলো যেখানে সবুজ কচা ঘাসেব ভিতব ঝরে শুকিযে মিষ্টি গন্ধ ছাড়ছে সেই বাজ্যে—

অবাক নিস্তব্ধ হযে ভাবছিল প্রভাত।

একটা পাতি লেবুব সবুজ পাতার উপব কমলা বঙের একটা প্রজাপতি—আজ এই দুপুবেই হয তো খোকাব কাছে তা জার্মশিদেব মিনারেব বাজ্যেব চেযে ঢেব বড় জিনিস। তার নিজের কাছেও এ বকমই মনে হত—খোকাব বযসে।

পৃথিবীব সাধাবণ হাঁটা-চলার পথ-তুচ্ছ খুঁটিনাটি যতদিন অনাবিষ্কারেব বিস্ময কুযাশা হযে থাকে, তত দিনই খুব গভীবে লাভ—ধীবে-ধীবে কল্পনা শুকিযে যায— স্বপ্নগুলো যায ভেঙেচুবে—বিশ্বাস হাবিযে

ফেলি—তৃপ্তি পাই না, শান্তি পাই না, জীবনটা একটা দাঁড়কাকের বাসার মত ছন্নছাড়া জিনিস হয়ে দাঁড়ায়; সকাল থেকে রাত্রি অব্দি একটা ক্ষুধিত কাকেব মত সমস্ত রকম কার্যতা, চিত্তপ্রসাদহীন লালসা ও গ্লানিব ভিতব নিবৃত্তি খুঁজে মবি, জীবনকে বুঝি জীবনধাবণ বলে।

প্রভাত মেসের বিছানায় এ-পাশ ও পাশ কবতে লাগল। আজকের গাড়িতেই সে দেশে চলে যাবে। যাওয়া যায় না?

ট্রেন ছাড়ে প্রায় বিকেলে চারটেব সময়—এখন বেজেছে দুটো। প্রভাত একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিল। ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে আৱ। যাবে কি সে? আজই যাবে? কুলিব মাথায় মোট চাপিয়ে হেঁটে চলে গেলেই হয়—সময় ঢেব বাকি আছে গাড়ি ছাড়বাব। কালকে কমলার একটা পোস্টকার্ড এসেছিল—তোশকের নীচেব থেকে পোস্টকার্ডটা বেব কবল প্রভাত—প্রভাত যে দেশে যাবাব সংকল্প করেছে এ তাদেব কল্পনাব ত্রিসীমানায়ও নেই; ববং অনুযোগ করে লিখেছে এতদিনেও কেন সে চাকরি জোগাড় করে উঠতে পাবল না? বিয়েই—বা করেছিল কেন? ছেলেও তো হয়েছে দেখি? কী দিয়ে কী হয়? কে কোথায় দাঁড়ায়?

চুরুটে এক টান দিয়ে পোস্টকার্ডটা বেখে দিল প্রভাত—

চুরুটে এক টান দিয়ে ভাবল—পোস্টকার্ডে এ-সব লেখা উচিত হয় নি কমলাব। এটা তো একটা মেস—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন মানুষ থাকে। পিয়ন এসে চিঠিপত্র একটা ঢাকনা খোলা টিনেব বাক্সে ফেলে দিয়ে যায়—যে খুশি যখন খুশি চিঠি নেড়েচেড়ে দেখে—কার্ড পড়াব অভ্যাস অনেকেরই আছে। একখানা খামে লিখতে পারত কমলা—

যাক-আজ আব যাওয়া হয় না। মেসের হিসেব মিটিয়ে দেওয়া হয় নি সমস্ত; খানিকটা বাকি আছে। ভাড়াব টাকাবও জোগাড় নেই। খোকাব জন্যও কিছু ছবিব বই, খেলনা কেনা দবকাব। খেলনা মানে, এঞ্জিন কিংবা মোটব—পুতুল নিয়ে তৃপ্তি থাকাব বয়স পেরিয়ে গেছে সে, কমলাব জন্যও অন্তত একখানা শাড়ি না নিলে চলে না—আব মায়েব জন্য একখানা গবদেব চাদব।

শেষ পর্যন্ত এত কিছু সে পাববে না বটে, মায়েব জন্য একখানা থান কাপড় আব কমলাব জন্য একখানা সুতিব শাড়ি আব খোকাব জন্য একটা বেলুন—শেষ পর্যন্ত সম্ভাব এইটুকুতে গিয়েই ঠেকবে হয়তো।

প্রভাত চুরুটেব থেকে খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলল। তাবাপদব কাছ থেকে গোটা পনেব টাকা ধাব করে আনবে সে। বড় লজ্জা করে। তাবাপদব সঙ্গে কলেজে একসাথে পড়েছিল সে—এক মেসেও ছিল অনেক দিন। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। স্ত্রী-সন্তান চাকবি-বাকবি ও ভাড়াটে ফ্ল্যাট নিয়ে সে আজ সফল মানুষ—প্রভাতেব জীবন থেকে সে ঢেব দূবে চলে গিয়েছে।

ঘড়িতে তিনটা বাজল ঃ না, আজ আব বওনা হওয়া যায় না, কলকাতা ছাড়বাব আগে দাবি-দাওয়া মিটিয়ে বওনা হওয়াই ভাল, চোবেব মত পালিয়ে যাবে না সে।

মেসেব বাকি টাকা কটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবে ম্যানেজাবকে। দেশেব বাড়িতে গিয়ে যখন উঠবে সেই মুহূর্তেই একেবাবে ভিখিরিব মত আত্মবিক্রয় কবে ফেলবে না সে; কয়েকটা মুহূর্ত অন্তত বেশ মঃ ব মত বাহুল্য থাকবে তাব—খোকাকে বেলুন দেবে, লাটিম দেবে—

মাকে থান, কমলাকে খদ্দরেব শাড়ি—

প্রভাতের হাতেব চরুটটা নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিয়ে ধীবে-ধীবে খববেব কাগজটা তুললে সে। সকাল থেকেই বাড়ি যাওয়ার ঝোঁকে আছে—সেই থেকে এই অব্দি খববেব কাগজেব একটা লাইনও তার মাথাব ভিতব ঢোকে নি—কাগজটাকে নেড়েচেড়ে দলেমুচড়ে তছনছ করে বেখেছে সে। গুছিয়ে নিল।

টেলিগ্রামের পাতাটা খোলে—এডিটবেব আর্টিকেল কী, একবাব তাকিয়ে দেখে। কিন্তু পড়বার চাড় নেই। কাগজ হাতেব থেকে মেঝের উপব পড়ে যায—চুরুটেব থেকে আগুনের ফুলকি কাপড়ের উপব গিয়ে পড়ে—কাপড়েব খানিকটা-খানিকটা জায়গায় আলপিনেব মাথাব মত ছোট-ছোট ছ্যাঁদা হয়ে যায—ক্রমে চুরুটও নিভে যায—

প্রভাত কলকাতাব দূব দিগন্তেব একটা সুরকিধূলিরক্তাক্ত ঝাউ গাছেব দিকে তাকিয়ে থাকে—

দেশে সে যাবেই। আজ অবিশ্যি যাওয়া হল না। কালও হয় তো হবে না। তাবাপদর কাছ থেকে টাকা ধাব করে এনে তিন-চাব দিনেব মধ্যে নিশ্চয়ই রওনা দেবে সে। বিকেল চাবটেব সময়ও শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেনেব গায় বেশ চড়া রোদ—থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টের থেকে কেমন একটা গন্ধ বেবয়। দেশে যাবাব জন্য যখন সে এই ট্রেনে চড়ত এই ঘ্রাণ এত ভাল লাগত তাব—পড়ন্ত রোদ ভাবী মিটে মনে হত—

হঠাৎ এক সময় গাড়ি একটা ঝাঁকুনি খেয়ে প্ল্যাটফর্মেব বাইবে চলে যেত—তাব পবই কামবাব

বেঞ্চিগুলো রোদে যে ভরে—মুখে রোদ, মাথায় রোদ। কেমন নরম রোদ—আঘাত দেয় না—বোনের মত, মায়ের, মত সস্নেহে সমস্ত শরীর বুলোতে থাকে যেন—হৃদয়ের ভিতরেও একট গম্ভীর ভরসা আসে—এখন থেকে আর সংগ্রামের দরকার নেই—চিন্তার প্রয়োজন নেই—উপায় খুঁজবার আবশ্যকতা নেই—জীবন এখন থেকে বেশ নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত—নরম রোদ এসে আশীর্বাদ কবে, ভালবেসে, এক সুদূব শান্তিব দেশে নিয়ে চলেছে—

দেখতে-দেখতে বি-কে. পালের বাগান—নারকেলের সারি—পামবীথি—পশ্চিমের ধোপাদের কাপড় কাচাব ঘাট—ধোলাই কাপড়-ঢাকা সবুজ ঘাস-দমদম স্টেশনে ট্রেন ধরে এক বার-তার পরেই হুম হুম করে মুহূর্তের ভিতব খোলা পৃথিবীতে এসে পড়ে—দু ধাবে মাঠ-প্রান্তব—খেজুবেব জঙ্গল—আখেব খেত, বড়-বড় সোঁদাল গাছ, পাকুড়.ঝবঝবিযা ও অর্জুনেব বন—নিস্তেজ বিকেল বেলাব কোল থেকে নেমে পৃথিবী ভবা সোনালি বোদেব হুড়োহুড়ি—শূন্য ধান ক্ষেত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাশ, খড়ের স্তূপ, গাঙ শালিখগুলোব ওড়াওড়ি—

তাব পর রাত্রি নেমে আসে—অবসন্ন ঝিঁঝিব ডাক, কোকিলেব গান ও ব্যাঙেব কলববেব ভিতব দিযে মাঠ-প্রান্তবেব সীমানায় জোনাকিমাখা বাতাসেব ভিতবে ট্রেন এসে থামে। তাব পর স্টিমার—এ এক নিরুপম বিচত্রি যাত্রা—মাঠ আছে, তেপান্তব আছে;

সমস্ত বাত বিচিত্র সরীসৃপেব মত একেঁ-বেঁকে নদী যেন তিমিরাবৃত শীতল পাতাল দেশের দিকে চলেছে—

চুরুট নিবে গেল বুঝি?

কিন্তু জ্বালাল না আব প্রভাত—

সকাল বেলা গিযে স্টিমারে দেশেব স্টেশনে পৌছায। স্টেশনে নেমেই সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা চোখে পড়ে-ফাল্গুন মাসেই সেটা ফুলে ভবে যায—

এক দিকে একটা ডালপালায মস্ত বড় শিমুল গাছ—মাঘের শেষেই নীল আকাশেব মাথায আগুন লাগিযে দেয যেন; এমন বক্তাক্ত শিমুল কোথাও কোনোদিন সে দেখে নি আব ঃ বনে সিন্দুব-মাখা সুন্দবী সধবার লেলিহান চিতা জ্বলে উঠেছে।

স্টেশনেব ধাবে এই শিমুল গাছটাব বযস ঢেব। ছোট বেলাব থেকেই দেখে এসেছে প্রভাত—দাঁড়কাক ঠুকবে ফুল ছিঁড়ত—ফুল পাকত—ফল শুকনো হযে ফেটে আকাশে বাতাসে তুলো ছড়াত; এক দল ছেলেমেযেব হাসি-ঝগড়া-কলবব এই ফুল ও তুলোব সঙ্গে কত দিন এসে মিশেছে যে!

সে যে কবেকার কথা! পবেন-কুড়ি বছব আগে একটা পৃথিবী প্রভাতেব চোখেব সামনে জেগে ওঠে, সেই পৃথিবী আজ মবে গেছে। সেই বালক-বালিকাব ভিড় আজ নব-নারীত্বে পর্যবসিত—পৃথিবীব চারিদিকে ছড়িযে পড়েছে—শিমুলেব ফুল ও তুলো আজ তাদেব কাছ সবচেযে উপেক্ষাব জিনিস। কেন এ বকম হয?

দিঘিব পাড়েব অশ্বত্থেব সব চেযে মোটা ডালগুলো তখন জন্মাযও নি, কেওড় বাবলাব বন কত বাব পেকে গেছে তার পর, ঝরে, গেছে কতবাব, কত জল-মেটুলি সাপ মবে গেছে, কত পুকুব শুকিযে গেছে, কত শালিখ কোকিল অন্তর্হিত হযেছে, বিশ্বম্ভব বাবুব শাদা গোঁফ জোড়া তখন কাচ-পোকাব মত নীল ছিল, গাযে ছিল অসুরেব মত শক্তি—এখন তিনি চোখে দেখেন না, লাঠি ভব দিযে হাঁটতে হয, সেদিন একটা ভেড়ার ঢুঁ খেযে রাস্তায গেলেন পড়ে—

স্টিমাবেব সিঁড়ি বেযে-বেযে তাব পর সেই জেটি—চটেব বস্তাব গুদাম—চট ও আলকাতারার গন্ধ সেখানে; কত দিন সে-ঘ্রাণ পায় নি সে; আজ এই মেসেব কামবায বসে তা কত কাছেব জিনিস মনে হয—

জেটিব থেকে বেরিযে তক্তাব সিঁড়ি ধবে তাব পব স্টেশনে লাল কাঁকরেব বাস্তায; বাস্তাব দু ধাবে কৃষ্ণচূড়া আব ছাতিমেব সাবি; সবুজ ঘাসেব উপব কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলগুলো ছড়িয়ে থাকে; মস্ত বড় পল্লবিত ছাতাব মত কৃষ্ণচুড়ার মাথাগুলো সবুজ পাতাব নিবিড় ঘাসে নিববচ্ছিন্ন বক্তিম ফুলেব আভায নীল আকাশেব গায খেলা কবে; ছাতিম গাছের নীচে প্রতিবাবই এক দল নিবীহ ভেড়া ও ছাগলের ভিড় সে দেখে-এগুলো কাব যে জানে না সে। চুপচাপ বসে থাকে, ফুল খায, ঘাস চিবোয, প্রভাতের দিকে মুখ তুলে নিরপবাধ চোখেব শান্ত অভ্যর্থনায তাকায।

সেই ভেড়া ও ছাগলগুলোকে এবারও গিযে দেখেতে পাবে না কি সে? গতবাবও দেখেছিল; তার আগে আরো কতবার দেখেছে যে সে!

স্টেশনে ঘোড়াব গাড়ি ঢেব; প্রভাতকে স্টিমাব থেকে নামতে দেখলে ঝিলকান্দি বোডের আস্তাবলেব

সূচীপত্রে যান

গাড়োয়ান কালিম সবচেয়ে আগে ছুটে আসত; এবারও আসবে নিশ্চয়; মুখে তার ক্রমাগত—'মহারাজ—হুজুর,' 'মহারাজ—হুজুর'। নিজের হাত দুটো জোড়া করে অনবরত কচলাতে থাকে কালিম, কেন এলাম, কেমন আছি, দেশে কদ্দিন থাকব—সে কত জিজ্ঞাসা তার। ঢের উচ্ছ্বাস; প্রভাতদেব বাড়ির সবাই যে ভাল আছে সে কথা আগাবি জানিয়ে দেয় প্রভাতকে সে; শামশ বঙ—জোয়ান চেহারা—উড্ডীন বাজপাখির মত দিব্যি চমৎকার মুসলমান যুবা; কালিমকে দেখলে মনটা খুব তৃপ্তি পায়—

কিন্তু এবার আর গাড়িতে চড়া যাবে না; কালিমকে নিরাশ করতে হবে; পয়সা বড্ড কম; কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে বাড়িতে যেতে হবে।

চুরুটটা জ্বালাল প্রভাত।

একটা টান না দিয়ে ভাবল সেই কুকুরটা বেঁচে আছে তো? বাবা তার নাম রেখে গিয়েছিলেন 'কেতু'—সেই থেকেই সবাই 'কেতু' 'কেতু' বলে ডাকে। বাবা আজ নেই। কুকুরটাও ঢের বুড়ো হয়ে গিয়েছে বোধ করি—

বেঁচে আছে তো? কমলা এ-সব প্রশ্নের কোনো উত্তরই দেয় না। কুকুর- বিড়ালকে সে জীবনে গ্রাহ্য জিনিসের মধ্যেই ধরে না।

কেতুর যখন দু-তিন মাস বয়স মোটে, সারা রাত এমন চিৎকার করে অস্থির করত মানুষকে—প্রভাত এক দিন রাগ করে বারান্দার থেকে বাচ্চাটাকে উঠানে ছুঁড়ে মেরেছিল। মরে নি; কিন্তু একটা পা ভেঙে গেল। কত রকম ফিকির, চেষ্টা, কিন্তু সে পা আর জোড়া লাগল না। কুকুরটি বড় হয়েও খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে—চার বছর আগে দেখে এসেছিল প্রভাত—কুকুরটার বেশ স্ফূর্তি-আনন্দ-জীবনোচ্ছ্বাস কিন্তু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে গিয়ে ল্যাং ল্যাং করে—একটা অপ্রীতিকর বাধা সব সময়েই বহন করতে হয় বেচারিকে—

বাড়ি গিয়ে কুকুরটাকে এবার মাছের কাঁটা দুধ-ভাত নিয়মিত দেবে সে; খোঁড়া পায়েরও একটা ব্যবস্থা করা যায় না কি? দেখবে সে। বাস্তবিক, কেতু যেন মাঝে-মাঝে এ মেসের কামরার ভিতর থেকেও প্রভাতকে টানে—কী যেন বোবার কথা জানাতে আসে : হয় তো উচ্ছিষ্টমাখা ভাত আজ-কাল আর জুটছে না তেমন, হয় তো তিন-চার দিন না খেয়েই থাকতে হয়, হয়তো খিদের লোভে মড়া বিড়ালের মাংস খায়, শকুনদের ভাগাড়ের চারদিকে ঘোরাঘুরি করে, গোরুর ঠ্যাং কুড়িয়ে আনে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ায় বসে সমস্তটা দুপুর চিবোয় তাই—তার পর বিকেলের ছায়া নিস্তব্ধ হয়ে নেমে আসে যখন, তখন বাঁশ ও কাঁঠালের জঙ্গলের কিনারে বসে অবাক হয়ে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে হয় তো—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশ্চর্য হয়ে ভাবে; কোথায় সে গেল? এই চার বছর ধরেই তাকে খুঁজছি, তবুও দেখা পাই নে কেন? কোথায়?

ধীরে-ধীরে চোখ বোজে হয় তো কেতু; ঘুমায় না; মাটির ওপর শুয়ে জিভ বের করে ভাবতে থাকে হয় তো এত দিন মানুষের কাছ থেকে সে যত অকল্যাণ ও গ্লানি পেল প্রভাত এলে সমস্ত জানাবে তাকে সে—

বাঁশের সবুজ পাতা ঝিরঝির করে বাতাসে বাজতে থাকে; ধূসর আকন্দ ফুলে ভোমরা গুন-গুন করে মরে; সজনে গাছের শাদা ফুলগুলো বাতাসে উড়তে থাকে, শুকনো বন চালতা ও কদমের পাতা ঝরে পড়ে, জঙ্গলের থেকে গোটা দুই বেজি বেরিয়ে আসে, ডাহুকের বাচ্চাগুলো কাঁদতে থাকে—আমের বকুল ঝরে, কেতু গা ঝাড়া দিয়ে তার ব্যথিত বিচ্ছিন্ন নিদ্রার থেকে উঠে বসে—বিহ্বল হয়ে চারিদিকে তাকায়—সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবে এ গাঁয়ে সে আর নেই; কিন্তু এ চার বছরের ভিতর আশেপাশের কত গাঁ খুঁজে এসেছে সে—সে মানুষকে সে কোথাও ত পেল না; খানিকটা দূরে একটা শুকনো কচ্ছপের চাড়া পড়ে আছে—শ্রদ্ধাহীন ভাবে সেটার দিকে তাকায় বোধ করি কুকুরটা। এক বার হাই তোলে, ভোমরার গুনগুনানি কানে ভেসে আসে; হলদে প্রজাপতিটার অক্লান্ত ওড়াউড়ির দিকে অবসাদ ভরে তাকিয়ে দেখে; তার পর খামোকা লাফিয়ে উঠে শুকনো পাতার উপর দিয়ে খামচ-খামচ করে হেঁটে মস্ত বড় যজ্ঞডুমুরের গাটার পিছনে প্রান্তরের দিকে অন্তর্হিত হয়ে যায়—

কেতুর কথা ভাবতে গিয়ে চুরুটে আর টান দেয় নি প্রভাত; চুরুটটা নিভে গেছে।

সেই নিরঞ্জন ধোপার দিন কাটছে কেমন? সেই চার বছর আগে দেখা। পাটের দর কমে গেছে বলে সে ত বড্ড ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিল; পাটের চাষ সে অল্প-স্বল্প করত বটে—কিন্তু তা এত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর যে অতখানি ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ ছিল না তার; অবিশ্যি সমস্ত বাজারই মন্দা—সকলেরই দারিদ্র—জীবন্মৃত অবস্থায় মানুষকে বাঁচতে হয় : সেই-ই হয় তো তার বিক্ষোভের কারণ ছিল। এ জীবনে নিরঞ্জন কত পার্টিই যে নিল, ছ বছর বয়সে পালিয়ে গিয়ে যাত্রার দলে ঢুকল—ভাল গাইতে পারত

সূচীপত্রে যান

বলে নবীন অধিকারীব দলে তাব খুব আদর হয়েছিল—প্রভাতও লক্ষ্মণবর্জনে নিরঞ্জনের গান শুনেছে; সে প্রায় কুড়ি বছব আগের কথা; কিন্তু আজও মনে হলে চুপচাপ নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়, হয় তো আজই সেই জিনিসেব মূল্য সব চেয়ে বেশি।

নিরঞ্জনের গানের গলা দু-তিন বছরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল—অভিনয় সে কবতে পারত না—যাত্রাব দল থেকে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল—এব পব নিবঞ্জন অন্য এক অধিকাবীব দলেব জল টেনে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, পান বানিয়ে, তামাক সেজে ফোঁপড়-দালালি করে বেড়াত।

কিন্তু এ সব ভাল লাগল না তাব।

তবুও যাত্রার দলেব গন্ধ সে সহজে ছাড়তে পাবল না। কিছু দিন সে দিন আঁকতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তাব জীবনেব সব চেয়ে নিরেট ব্যর্থতা। নিজে একটা যাত্রাব দল খুলবে বলে ঠিক কবল—কিন্তু অতিবিক্ত মোড়লি কবতে গিয়ে পণ্ড হয়ে গেলে সব।

একবাব প্রভাত শুনল—নিবঞ্জন কলকাতায পালিয়ে গেছে। প্রভাত তখন ইস্কুলে পড়ে। কলকাতাব থেকে যারা আসে তাবা খবব দেয়, নিবঞ্জন থিয়েটাবে ঢুকেছে। কলকাতা শহেব খুব নাম করে ফেলেছে সে; আধাআধি কলকাতার বাসিন্দা তাকে চিনে নিয়েছে। এক দিন হঠাৎ ইস্কুলে যাবাব পথে নিরঞ্জনেব সঙ্গে দেখা—পবনে একটা কপাসডাঙাব চুড়ি পাড়ের কাপড়—গায়ে গলাবন্ধ আলপাকাব কোট—পায়ে নিউকাট [?]-বার্ডসাই মুখে।

নিরঞ্জন খুব চাল দিল না কলকাতাব; প্রভাতকে খুব খাতিব কবল-বার্ডসাই সাধল-বললে, 'লেখাপড়া না করলে মানুষ হতে পাবা যায না—বাস্তবিক!'—'ইস্কুলে কোন ক্লাশে কী রকম মাইনে দিতে হয জিজ্ঞেস করল, যে-ক্লাশে সব চেয়ে কম মাযনা সেই ক্লাশেই ভর্তি হবে বলল; প্রভাত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি ভর্তি হবে একটা পাড়া-গাঁযের ইস্কুলে—কলকাতায তোমাব এত নাম!' নিবঞ্জন মাথা নেড়ে হেসে বললে—'না, ও ঠাট্টা কবছিলাম—এখানে একটা এ্যামেচাব থিয়েটাব কোম্পানি খুলব ভাবছি।'

এ্যামেচার কথাটিব মানে তখন জানত না প্রভাত—অবাক হয়ে নিবঞ্জনেব দিকে তাকিয়ে ভাবছিল; নিরঞ্জন কলকাতায গিয়ে ইংবেজিও শিখে ফেলেছে ঢেব!

ইস্কুলেব কাছাকাছি পৌঁছে একটা খেজুব গাছের আড়ালে দু জন গিয়ে দাঁড়াল, প্রভাত বললে—'বাঃ কলকাতায এত নামগাম কবে এসে পাড়া-গাঁয়ে থিয়েটাব খুলবে? এ আবাব কী ছাই?'

নিরঞ্জন সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলেছিল—'দূব! তোমাব সঙ্গে একটু মশকবা কবলাম। এখানে আমার এজেণ্ট রেখে দেব। আমাব নিজেব থিয়েটাব থাকবে কলকাতায।'

কয়েক দিন পবে ইস্কুল থেকে ফিববাব পথে প্রভাত দেখল পিঠে এক বস্তা নিয়ে চলেছে নিবঞ্জন—

অবাক হয়ে সে থমকে দাঁড়াল, নিবঞ্জন না?

—'কী হে, এ কিসের বস্তা তোমাব পিঠে?'

—'আব কিসেব?'

সেই থেকে ধোপার কাজ সে করছে।

মাঝখানে ইস্টিমাবের ডকে একবাব কাজ পেয়েছিল—মাসে পনেব টাকা মাইনেব কাজ পেয়ে নিরঞ্জন আবাব গোলাপবাহাবি বাবুগিরি আবম্ভ কবে দিল।

কিন্তু অতিবিক্ত বাহাদুবি করাব অপরাধে ডকেব থেকে তাকে তাড়িয়ে দেযা হয। এব পব তাব বযস বাড়তে লাগল; বিয়ে কবল—ছেলে-পিলে হল; লক্ষ্য করে দেখছিল প্রভাত—নিবঞ্জন ঢেব বিজ্ঞ ও নিস্তব্ধ হয়ে উঠছে; মানুষেব জীবনটাকে মনে-মনে পর্যালোচনা করে সে—অত্যন্ত গম্ভীর নানা বকম সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয।

প্রভাত তাকে 'তুই' বলে ডাকে, নিবঞ্জন প্রভাতকে 'হুজুব' বলে সম্মান কবে—'আপনি' বলে সম্ভাষণ কবে; হাত তুলে নমস্কাব জানায, 'যে আজ্ঞে' বলে আদেশ গ্রহণ করে, এই সমস্ত সম্পর্কে একজনেবও কারো মনে কোনো খটকা নেই—ঘনিষ্ট কথাবার্তাও দু জনের মধ্যে কম হয না।

বছর চাবেক আগে, দোলেব দু-তিন দিন পরে সে এসেছিল, কতকগুলো বং-মাখা জামা বের কবে প্রভাত বলেছিল,—'পাবো কি এমন বং ওঠাতে—'

'সে নেড়েচেড়ে বললে—'খুব পাবব হুজুব।'

—'গাযে দেবাব আমাব একটা জামাও নেই কিন্তু, খুব শিগগিরই দিয়ে যাবি।'

—'পরশুই দেব হুজুব।'

দিন পনেব পর এসে সে হাজির।

প্রভাতের শার্ট-পাঞ্জাবি-ফতুয়া সব কটিই গাঁটরিব থেকে বেব করে নির্বিকার ভাবে একটা শতবঞ্জিব ওপব রাখল নিবঞ্জন।

লাল, নীল, সবুজ বঙের জলুশ জামাগুলো গায়ে যেন আরো সুঠাম হয়ে উঠেছে। প্রভাত চোখ নবম করে—'হাবামজাদা এই কাচলে নাকি তুমি?'

—'হুজুব।'

—'হুজুব কী বে শুযাব, পাজি, উল্লুক, তুমি বললে পবশু দিয়ে যাবে, এনেছ পবেন দিন পব, তাও এই বকম—'

—'হুজুব, কাচতে দিয়েছিলাম আমাব ভাইপোকে।'

—'কেন, তাকে কাচতে দিলে কেন তুমি?'

—'ভাবলাম, ওকে লাযেক কবে নেই—আমি মবলে পব ধোপাব কাববাবটা ওই ত বাখবে—'

—'বেশ এক দফা মিথ্যা কথা বললে যে!'

—'বিশ্বাস হয না মহারাজ?'

—'ভাইপোকে কাচতে দিলে তুমি, দেখিয়ে দিলে না কেন?'

—'আমি ছিলাম না মহাবাজ।'

—'কোথায গিয়েছিলে!'

—'গতবাব জামাইষষ্ঠীব সময শ্বশুবমশাই আমাব তত্ত্ব-তলব নিতে পাবেন নি, মনে বড় দুঃখ ছিল তাঁব, এবাব তাই জামাই খাওযালেন।'

—'জামাইষষ্ঠী এখন কী বে! এত মোটে ফাল্গুন মাস—'

—'তা তিনি খাওযালেন ত।'

—'কদ্দিন ছিলে সেখানে?'

—'এই চোদ্দ দিন ছিলাম—কাল ফিবে এসে ভাইপোকে ঝাটা মেবেছি মহাবাজ—কী ঝামেলা বলুন তো—বঙেব একটা পোচড় অব্দি তুলে দিতে পাবে নি—'

চুপ কবে ছিল প্রভাত।

নিবঞ্জন—'আমাকে দিন-দু দিনেই ফকফকে শাদা কবে এনে দিচ্ছি—'

—'না, তোমাকে আব দেব না নিবঞ্জন।'

—'পবশুই এনে দিচ্ছি মহাবাজ—একটা বঙেব আঁশও যদি থাকে তবে আমাব দুটো কান আমাব পাযেব নীচে কেটে বেখে যাব।'

কিন্তু বঙেব একটা আঁশও সে ওঠাতে পাবে নি।

পবে প্রভাত বলেছিল—'আচ্ছা লেবুব বসে বং ওঠে যে?'

মাথা নাড়ে নিবঞ্জন—'তা কি হয? বঙ পেকে যায!'

—'আমরুল পাতাব বসে?'

—'টক জিনিসে বং পাকে—দিতে হয জলেব ছিটে; যত বড় বেযাড়া বঙই হোক না কেন, কড়া বোদে তিন দিন জলেব ছিটে দিয়ে ভাটিতে ফেললে—আচ্ছা, দেখবেন? আপনাব জামাগুলো দিন, আমি তিন দিনেই বং তুলে দিচ্ছি—'

নিবঞ্জন এই বকম।

এক বাব একটি মশাবি কাচতে নিয়ে প্রভাতকে বড্ড বিপাকে ফেলেছিল সে; ভোবেব বেলা মশাবি নিয়ে গেল, বললে,—সন্ধ্যাসন্ধি দিয়ে যাব। কিন্তু তিন সপ্তাহেব ভিতবে তাব কোনো দেখাই নেই।

লোকটিকে খুব ভাল লাগে তবুও; কাপড়েব বস্তা নিয়ে যখন সে হাজিব হয দু দণ্ড বেশি বসিয়ে বাখতে ইচ্ছা কবে তাকে প্রভাতেব; বসতে সেও খুব রাজি....কত বকম গল্পই যে জানে? সামান্য জিনিসও গাজিয়ে সবস কবে বলবাব ক্ষমতা আছে তাব। কেন কথক হল না সে? কিংবা মফস্বল কোর্টেব মোক্তাব?

যাত্রাব দলে কিংবা থিয়েটাবে যে-সব চলতি অভিনয—তাব চেয়ে নিবঞ্জনেব এই হাট-বাজাব ব্যর্থতা-বেদনা জীবন-মৃত্যুর কথা কত বেশি স্পষ্ট, মৃত্তিকাগন্ধী, গাজনেব বসে ভবপুব—

ধোপাব কাজ এব জন্য নয।

এবাব দেশে গিয়ে জামপুবের হাটেব পথে নিরঞ্জনকে পাকড়াতে হবে—সেইখানেই সে আনাগোনা

সূচীপত্রে যান

করে। তার পর তাকে ডেকে এনে বাড়ির পুব দিকের অশ্বত্থ গাছটার নীচে বসতে হবে এক দিন দুপুরবেলা; এ চার বছরের মধ্যে কোনো নতুন বিমর্ষতা পেয়ে বসেছে না কি তাকে? জীবন কি কায়ক্লেশে চলে না কোনো নতুন আত্মিক অর্থ শিখেছে? কাজে সে কি এখনো ফাঁকি দেয়? যাত্রা-থিয়েটারের জন্য মন উড়ু-উড়ু করে না কি আবার? জীবনটা নেহাত নিশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকাব ব্যাপাব হয়ে দাঁড়িয়েছে হয় তো। কিংবা, হয় তো কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে; দাড়ি বেখেছে...বৈবাগী হয়েছে। যাই হোক না কেন, সে যত দিন বেঁচে আছে জীবনের হাট জমানো ব্যাপারেব থেকে ফাঁকি দিয়ে সে কোথাও চলে যাবে না। মুখে তার গল্পের রং বদলাতে পারে কিন্তু ছাঁচ বলদাবে না—

নিরঞ্জন এমন সরস মানুষ!

চুরুটটা থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলল প্রভাত; অনেকক্ষণ ধবে নিভে রয়েছে চুরুটটা এবাব জ্বালিয়ে নেয়া যাক...

দেশে গিয়ে এবাব নানা রকম পুরোন জিনিসেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাকাতে ইচ্ছা কবে। দেশেব হাই স্কুলটা প্রায চল্লিশ বছরের পুবোন। অনেক দিন ইস্কুলটাব কোনো খোঁজ খবব রাখে না প্রভাত; কতকাল ইস্কুলটার মুখও দেখে নি সে। প্রায় বছর পনের-ষোল আগে সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সেই যে বেরিয়ে গেছে প্রভাত—এই ষোলটা বছব ইস্কুলেব দিকে আব মাড়ায় নি সে—

দিন-রাত্রিব ফাঁকে ইস্কুলটার কথা যখনই মনে হয় হৃদযটা এমন নরম হয়ে পড়ে।

ইস্কুলের সামনেব প্রকাণ্ড মাঠটাব কথা মনে পড়ে; ছুটিব পব বিকেল বেলাব সফেন সোনালি রোদেব ভিতব অলস মাছির মত তারা কযেক জন মাঠেব এক কিনাবে বই ছড়িয়ে বসে থাকত মাঝে-মাঝে; মাঠটাব সেই সবুজ কটা ঘাসের গন্ধ ধুসব খড়িব মত মাটিব ঘ্রাণ—শুকনো ফুল ও নিম-পাতাব স্তূপ—লাল বট ফলেব গন্ধ—সেদিন এ-সব বড় একটি গ্রাহ্যেব জিনিস ছিল না। কিন্তু আজ এই সবেব কিনাবে বসে ধীবে-ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কবতেও ভাল লাগে।

এব চেয়ে নিবিড় সুন্দব সফল পবিসমাপ্তি কোথাও নিয়ে যেতে পাবে না আব।

মাঠটার কিনাবে একটা মস্ত বড় তেঁতুল গাছ ছিল—কী যে মিষ্টি তেতুল—টিফিনেব সময় বমেন, অবিনাশ, ইয়ুসুফ আব প্রভাত ঢিল ছুঁড়ে তেঁতুল পেড়ে গাছেব ছাযায-ছাযায চুপচাপ গিয়ে বসত—

সেই তেঁতুল গাছটা আছে আজ?

ড্রিল মাস্টাব ছিলেন দ্বিজেনবাবু। লম্বা-চাওড়া জোযান চেহাবা—পাঞ্জাবি পালোযানেব মত দেখতে, হাতে সব সমযই একটা বেত থাকত; ডেঁপো ছেলেদেব দু-তিন ঘা লাগাতেন মাঝে-মাঝে—কিন্তু এমন মোলাযেম ভাবে যে তাতে চামড়া জ্বলত না কখনো, সুড়সুড় কবত শুধু; বেত নিয়ে আস্ফালন কবতেন বেশি—ছেলেদেব ধবে মাবা তার ধাতে একদম ছিল না। ছেলেদেব সাবিবন্দী সাজিযে কুচকাওযাজ করাতেন—কখনো বাইট টার্ন, কখনো লেফট টার্ন, অ্যাবাউট টার্ন, মাঝে-মাঝে 'হল্ট' বলে চিৎকাব করে উঠতেন। চমৎকার আবহাওযা সৃষ্টি কবে ফেলতেন তিনি; প্রত্যেকেই নিজেকে চোস্ত পদাতিক বলে মনে করত—কোথাও একটা সঙ্গীন লড়াই কবতে চলেছে। প্রভাত মনে-মনে ভাবত ভবিষ্যৎ জীবনেও সে এমনি কাওযাজ কববে—কাঁধে বন্দুক ফেলে মার্চ করে চলবে—সৈন্য হবে—কে জানে হয তো নেপোলিযন হবে কিংবা মার্শাল নে—

বেশ দিনগুলো ছিল সব।

আবাব সব পেতে ইচ্ছা করে। জীবনটাকে আবার প্রথম থেকে শুরু কবতে পারা যেত যদি।

দ্বিজেনবাবু কি বেঁচে আছেন?

এখনো ছেলেবা সেই মাঠে গিয়ে জড়ো হয? ড্রিল করে? কী কথা ভাবে তাবা? বুনো আনাবস খুঁজে বেড়ায়? শুকনো বটপাতার চটেব গন্ধ, ভাল লাগে তাদের?

তাদেব জীবনেব সংস্পর্শে আসতে ইচ্ছা করে বড়; সমস্ত নতুন মুখ—কিন্তু তাদের ভিতবেই সেই পনের বছর আগেব স্কুলের ক্যাপ্টেন অবিনাশ বেঁচে রয়েছে, সেই অমূল্য বেচে আছে, রমেশ বেঁচে আছে, ইয়ুসুফ বেঁচে আছে—হয তো তাদের ভিড়ের ভিতর থেকে কোনো গোধূলি নেশাক্রান্ত কলরবহীন স্বপ্নাতুর নিরালা কিশোরের মুখের দিকে তাকিযে প্রভাত তাব পনেব বছব আগের জীবনটাকে কযেক মুহূর্তের জন্য খুব তীব্রভাবে উদ্ধার করে নিতে পাববে।

চুরুটটা যেমন তেমনি নিভেই আছে। জ্বালানো হয নি বুঝি? কই, দেশলাইটা কোথায? দেশলাই বাব করে এবার চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল প্রভাত।

সূচীপত্রে যান

দেশে যাবার সময় এবার খানিকটা ভাল চা নিয়ে যাবে সে; কমলাকে চা তৈরি করতে শেখাবে-পাতলা চা খেতে প্রভাত ভালবাসে না—চা একটু কড়া হওয়া চাই-চাযেব পাতাও বেশ চমৎকাব হওয়া চাই—তাজা দুধের চা হলেই ভাল। দিনের মধ্যে যতবাব খুশি চা খাবে সে। কমলা হয় তো মাঝে-মাঝে মোড়া নিয়ে বসতে পারে—সে বড় মর্জিব মানুষ।

একটা ছোট স্পিরিট স্টোভ কিনে নেবে প্রভাত-একটা ছোট কেটলি আব একটা পেযালা।

দেশে গিয়ে দুপুবটা কত রকম ভাবে কাটানো যায়?

নবীন মজুমদারের বাড়ি গিযে ব্রিজ খেললে কেমন হয়? তাই কববে সে। মজুমদাবেব মস্ত বড় বাড়ি; টাকা-কড়িব সচ্ছলতা তাদেব খুব-বাড়ির বুড়োবা সাবা দিন শতবঞ্জ খেলে। আব ছোকবাদের ব্রিজেব আড্ডা বাব মাস লেগে বযেছে।

বোজ-বোজ ব্রিজ খেলে অবিশ্যি সে তৃপ্তি পাবে না।

এক-এক দিন দুপুবে বেবিযে পড়বে সে—ছোট বেলায যে-পথ ধবে ইস্কুলে যেতে সেই পথটা ঘুবে আসবে—দীর্ঘ আঁকাবাঁকা বাস্তা—কোথাও কাঁকাবেব, কোথাও মাটিব—কোথাও এক-একটা রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ মাঠ—তাব পরে বাঁশেব জঙ্গল-এক-একটা মস্ত বড় অশ্বত্থ—পাকা-পাকা বেত ফলে ভবা নিবিড় বেতেব বন—ছোট বেলা ইস্কুল থেকে ফিববাব সময থেতলা-থেতলা শাদা ফলগুলো ছিঁড়ে নিত সে—নুন মাখিযে খেত।

সে কত দিন হল বেত ফল খায নি—চোখেও দেখে নি। এবাব দেশে গিযে এক-একটা দুপুবে খানিকটা নুন নিযে বেরিযে পড়তে হবে—নিস্তব্ধ বেতজঙ্গলেব কাছে এসে একটা পল্লবিত হিজল গাছের ছাযায বসে বেত ফল খাবে সে। মনে হবে না কি সেই ইস্কুলেব দিনগুলো জীবনেব থেকে সাঙ্গ হয নি এখনো তাব? টিফিনের ছুটিতে বেতেব ফল খেতে চলছে সে; খাচ্ছে; এক্ষুনি হয তো অমূল্য আব বিজন এসে হাজিব হবে; একটা মোটা গুলঞ্চলতা ছিঁড়ে হাতে জড়াতে-জড়াতে রুক্মিণী একবাব দেখা দিযেই গভীব জঙ্গলেব ভিতব কাটা বহবেব জন্য ঢুকে পড়বে...

বাবা অনেক বই দিযেছিলেন—নানাবকম ইংবেজি বই—হাক্সলি আছে, হার্বার্ট স্পেন্সাব আছে, ডিকেন্সেব সম্পূর্ণ সেট বযেছে—ইস্কুলে যখন পড়ত প্রভাত, তখন ডিকেন্সকে কেমন কঠিন মনে হযেছে তার;

—বড্ড দুর্বোধ্য—বুঝে উঠতে পাবত না।

কলেজে উঠে ডিকেন্সকে উপেক্ষা কবে গেছে; একটা বইও স্পর্শ কবতে যায নি তাব; হিউগো পড়ছে, ডুমা পড়েছে, ফ্লবেযাব পড়েছে,—ফবাসি উপন্যাস না পড়লে মনে উঠত না তখন—কলেজে ছেলেদেব কাছে কেমন বাহাদুবিও বজায থাকত না যেন। তাব পব টলস্টয, চেভখ, টুর্গেনিভ পড়ল—কিন্তু ডিকেন্সকে ছুঁল না। এম-এ পাশ কবে কলেজেব থেকে বেবিযে কন্টিনেন্টেব ঢেব বই পড়ল সে...কিন্তু ডিকেন্স অস্পৃশ্য হযে বইল। আজ এই ত্রিশ বছব বযসে ডিকেন্সেব একখানা বইও তাব পড়া নেই। ব্যাপাবটা হয তো বিশেষ লজ্জাব কিছু নয...কিন্তু এক-একবাব প্রভাত অবাক হযে ভাবে বাবা অত সাধ কবে ডিকেন্সেব সমস্ত বইগুলো কিনলেন, পড়লেন, প্রাজ্ঞেব মত অজড় অমব সংস্থিতি নিযে ডিকেন্সকে কবেছিলেন যেন তিনি তাব খাদ্য—কথাবার্তায অনেক সময ডিকেন্সেব গল্প পাড়তেন। এ-বকম কেন? বইগুলো না পড়া পর্যন্ত কেমন যেন একটা কুজ্ঝটিকা কৌতূহল ডানা বিস্তৃতিকে দাবিযে বাখে। দেশেব বাড়িতে গিয়ে এ কৌতূহল তৃপ্ত কবতে হবে এবাব...ডিকেন্সেব অতগুলো বই, উই-আবশোলা ও চুবি-চামাবিব হাত থেকে বেঁচেছে; খুব স্থির নিবপেক্ষ বিচাব নিযে পড়ে দেখবে প্রভাত...

এই বইগুলো নিযে কযেকটা দুপুর বেশ ভবসাব সঙ্গে কাটবে আশা কবা যায—

সন্ধ্যা হযে গেল—

বিছানাব উপব শুযে পড়ে চুরুটটা ফুঁকে-ফুঁকে শেষ কবতে বাত হযে যায; তারাপদব কাছে আজ আব যাওযা হল না।

পব দিন সকাল বেলা তাবপদ কুড়িটা টাকা দিল—মেসেব ম্যানেজাব আট টাকা পায, থার্ড ক্লাশেব একটা টিকিটের জন্য সাড়ে চাব টাকা বেখে বাকি টাকাগুলো দিয়ে প্রভাত একটা থান কাপড়, সুতিব শাড়ি ও লাটিম বেলুন ছবিব বই ইত্যাদি কিনে নিল।

ধাব কবাব আগে হাত তিন টাকা সোযা ন আনা ছিল—টিকিট কেটেও তাহলে পাঁচ-ছয টাকা হাতে থাকে—প্রভাত কলেজ স্ট্রিটের ওযাই-এম-সি-এতে ঢুকে পাঁচ পযসা দিযে চা খেল। ছোট এক কেটলি

ভরা চা...প্রায় দু কাপ আন্দাজ হল—বেশ চা খেতে-খেতে অনেকক্ষণ ফ্যানেব নীচে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থেকে এই বিরাট পৃ[illegible]ব জীবন ব্যাপারে চারিতার্থ একজন সার্থক জীব বলে মনে হতে লাগল নিজেকে।

কয়েকটা দা[illegible] কেনা যায়; কলেজ স্কোয়াবের বেঞ্চিতে গিয়ে একবার বসে, অশ্বত্থ-দেবদারুব দিকে তাকিয়ে দেখে, দিঘির চার কিনার ঘিরে মরশুমি ফুলের গাছগুলো ঢের বড় হয়ে উঠেছে—ফুলেব সম্ভার ঢের ত এবার—বিমুগ্ধ হয়ে উপলব্ধি করে নেয়। একটা চুরুট জ্বালায়, ছাঁটা-ছাঁটা মেহেদি গাছের ডালপালার ভিতর চড়াই না কি—তাকিয়ে দেখে একবাব—দিঘির পুব-দক্ষিণ কোণে নাবকেল গাছটাকে জড়িয়ে-জড়িয়ে লতাটা বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে এদ্দিনে-কিন্তু দেশের পথেঘাটে এ বকম কত লতা, কত ঝুমকো ফুল! সুইমিং ক্লাবের ছেলেরা ওযাটার পেলো খেলছে। একট ভদ্রলোক, তাব স্ত্রী ও দু-তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে আছেঃ ভদ্র-লোকের মাথায় ছাতা, স্ত্রীব মাথায় ঘোমটা, ছেলেমেয়েদেব মাথায় বাঁদব টুপি। কলকাতায় এরই নাম বোধ হয় মুক্ত বাতাস সেবন। আকাশ-বাতাস আলো-রৌদ্র যেন এখানে লিমিটেড কোম্পানির জিনিস; কাদেব বেশি শেযাব—বড়-বড় ডিভিডেণ্ড টানে, বিধাতা জানেন—বিধাতা একাই টানেন হয তো-কেমন একটা চিমসে দবিদ্রতা ধবা পড়ে যেন এখানে—ভাবতে গেলে দম আটকে আসে যেন—আর তিন-চাব দিন পব পাড়াগাঁব মাঠপ্রান্তরের গভীর দাক্ষিণ্যের ভিতর হাঁটতে-হাঁটতে কলকাতাব রাস্তা-ঘাট, ঘববাড়ি ও জীবনের নিযম, অবাঞ্ছিত অনিযমের রুদ্ধশ্বাস বলে মনে হবে তাব কাছে—

দেবদারু মর্মব কবে ওঠে; অশ্বত্থের ভিতর দিয়ে ল্যাজঝোলা পাখিব মত হু-হু করে দক্ষিণের বাতাস উড়ে যায়—ডালপালা নড়ে—বুলবুলির পাখনা কেঁপে ওঠে—হলদে শুকনো পাতা বেঞ্চি চারদিকে ছড়াতে থাকে—বাতাসের তাড়ায় সূর্যমুখীগুলো প্রভাতের দিকে চোখ ফিবিয়ে কাঁপতে থাকে-

কযেকটা মিনিট কেমন একটু বিহ্বল হয়ে বেঞ্চিতে বসে থাকতে হয; কিন্তু ভাবটা কেটে যায শিগগিরই। সুইমিং ক্লাবের ঘড়িব দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয। আজই বাড়ি যেতে হবে যে তাকে! সব ঠিকঠাক কবে তিনটার সমযই স্টেশনে পৌছুনো চাই।

মেসে গিয়ে দেখল কমলার একটা কার্ড এসেছে। বৌযেব চিঠিব সুব লড়াই-বাজ বক্তাক্ত চিলবধূব মত যেন—নিজেকেও সে ছিঁড়ে খেতে পারলে বাঁচে; আশাস্বপ্নসমাকুল মেঠো ইঁদুরেব জীবনেও এক মুহূর্তেব শান্তি [ফুবিয়ে যায যেন]। মেসেব কামবাব ভিতব ঢুকে হাতের বস্তাটা বিছানাব এক পাশে ফেলে দিয়ে প্রভাত অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ল।

নাঃ—দেশে যাওযা আব হবে না, গিয়ে করবে কী সে?

পব দিন সকালবেলা নিজেকে বডড বোকা মনে হল; একটা দিন মিছিমিছি মাটি কবেছে সে। কমলা যা খুশি তা লিখুক গিয়ে কিন্তু দেশ তো কমলাব নয; মা বযেছেন—কেতু কুকুবটা আছে—নিবঞ্জন আছে—খোকা আছে—শ্মশানে বাবাব ইশাবা রয়েছে—পথে-ঘাটে কত চেনা লোক—বাড়িব পুব দিকেব অশ্বত্থ গাছটা—

প্রভাত সকালবেরাই তাব জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখল; বাকি শুধু বিছানা বাঁধা, খাওযা-দাওযা সেবে একটু গড়িয়ে নিয়ে বেডিংটা বেঁধে ফেলবে সে—আড়াইটাব সময স্টেশনেব দিকে বওনা দেবে।

আর বেরুল না কোথাও সে।

চায়ের দোকানে অব্দি গেল না। চাকরকে দিয়ে বাইরে থেকেই চা আনিয়ে নিল। বিছানায শুযে খবরের কাগজটা অনেকক্ষণ ধরে পড়ছিল—হঠাৎ পাযের শব্দে কাগজ সবিয়ে তাকিয়ে দেখল—চশমা চোখে একটি ছেলে এসে তার চৌকির কাছে দাঁড়িয়েছে।

প্রভাত—'আপনি কাকে চান?'

—'আপনি কি প্রভাব বাবু?'

—'হ্যাঁ'

—'কার্তিক বাবুকে আপনি চেনেন?'

—'চিনি।'

ছেলেটি প্রভাতের চৌকির উপর বসে।

—'আমি থার্ড ইযারে পড়ি, তিনি আমাকে পড়াতেন, কযেক দিন হল দেশে গিয়েছেন, মাস তিনেকের ভিতর বোধ হয ফিবেবেন না আর। সামারটা দেশেই কাটাবেন—'

ছেলেটি একটু চুপ কবে বললে—'তা আপনাব ঠিকানা দিয়ে গেলেন আমাব কাছে। বললেন যে

আপনি খালাস মানুষ আছেন—টিউশন খুঁজছেন—পড়ানোর অভ্যাস-টভ্যাস আছে আপনার—'

ছেলেট মৃদুভাবে একবার গলা খাঁকরে—'তা আছে কি?'

প্রভাত কোনো জবাব দিলু না।

—'শুনলাম, আপনি আট-দশ বছর হল এম-এ পাশ করেছেন; তাই না কি?' কোনো উত্তর না পেয়ে ছেলেটি বললে—'হ্যাঁ, আমি শুনেছি তাই। ছাত্র পড়াবার অভ্যাস আছে আপনার। ম্যাট্রিক থেকে বি-এ অব্দি অনেক ছেলেই পড়িয়েছেন না কি?'

ছেলেট কুণ্ঠিত অমায়িক চোখ তুলে প্রভাতের দিকে তাকাল—

প্রভাত বালিসে মাথা রেখেই—'কার্তিক চলে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ দেশে গিয়েছেন।'

—'কেন?'

—'গরমের সময় এই তিন-চারটা মাস দেশেই কাটান তিনি, প্রফেসার মানুষ, ছুটিও তো কম নয়—'

—'আপনাকে তিন মাস পড়াতে হবে।'

—'তারপর?'

—'কার্তিক বাবু আসবেন।'

—'এই তিন মাসের জন্য অনেক টিউটরই তো পেতে পারেন আপনি।' ছেলেটি একটু বিস্মিত হয়ে প্রভাতের দিকে তাকাল; সামান্য একটা টিউশন পাবার জন্য কাঠপিঁপড়ের মত মানুষের দঙ্গল কতবার তাদের বাড়ির দেউড়িতে ধর্না দিয়েছে—কলকাতা শহরের আধা আধি লোকের মাথা তার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়; আর এ মানুষটিকে নিজে যেচে সে কাজ দিতে এসেছে, আর তার এই রকম জবাব?

প্রভাত—'দেখুন, আমার বড্ড অবসন্ন বোধ হয়—'

—'কেন বলুন তো?'

—'আজ আমার দেশে যাবার কথা ছিল।'

—'ও, সেখানে কারো অসুখ করেছে বুঝি?'

প্রভাত—'কারো অসুখ না করলে দেশে যেতে নেই?'

—'না, তা নয় অবিশ্যি, তবে আমি ভেবেছিলাম—'

—'চার বছর আমি বাড়ি যাই নি। খোকা আছে। মা আছেন। স্ত্রী আছে। কেতু বলে একটা কুকুর আছে। এদের দেখতে ইচ্ছা করে না?'

ছেলেটি একটু হেসে বললে—'তাই তো?'

দুপুর বেলা প্রভাত বিছানা বাঁধাছাঁদা করছিল-কার্তিক এসে ঢুকল। প্রভাত চোখ তুলে—'তুমি? বাঃ, আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গিয়েছ—'

—'দার্জিলিং গিয়েছিলাম, ফিরবার পথে আবার কলকাতা হয়ে বাড়ি যাচ্ছি—'

—'ও, দার্জিলিং গিয়েছিলে বুঝি? তা দার্জিলিং কেমন জায়গা কার্তিক? বেশ চমৎকার, না? একবার গিয়ে দেখতে হবে তো! পয়সাই-বা কোথায়?'

—'তুমি তো আচ্ছা ইডিয়েট।'

—'কী রকম?'

—'সমীরকে পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে—তুমি তাকে ফিরিয়ে দিলে যে!'

—'ও, সে কথা?'

—'এমন আহাম্মক তুমি!'

—'আমি দেশে যাচ্ছি।'

—'কেন, সেখানে কোন উল্লুকের তিন হাত দাড়ি গজিয়েছে যে তোমার না কামালে চলবে না—'

প্রভাত মাথা নেড়ে—'না, সে হয় না কার্তিক—কলকাতায় আর থাকা যায় না—'

—'টাকায় কামড়ায় তোমাকে? ছেলেটা মাসে-মাসে ত্রিশ টাকা করে দেবে তোমাকে—'

—'তা দিলই-বা।'

—'বেশ তো, মেস-এর খরচ চলে যাবে তোমার।'

—'তা চলে যাবে বটে। এই চার বছরও তো টিউশন করে মেসের খরচ চালিয়ে এলাম।'

সূচীপত্রে যান

—'বেশ তো, কী আর করবে! চাকরির যা বাজার তাতে এইটুকুও তো ছোট খাটো একটি যজ্ঞ ফল; পিতৃপুণ্য ছাড়া জোটে না।'

—'তা আমি জানি। এ তিন মাস এই টিউশনটা নিয়ে থাকলে চাকরি খুঁজবারও সুযোগ পাওযা যাবে। কিন্তু কার্তিক, আমি আর কলকাতায় থাকতে পারি না—'

—'কেন?'

—'চার বছব আমি কাউকে দেখি নি কার্তিক, মাকে না, খোকাকে না, খোকার মাকে না।'

কার্তিক চুপ কবে ছিল।

প্রভাত—'কেতু বলে একটা কুকুর আছে—সেটা হয তো সাবা দুপুব চনমন [চুনমুখ?] কবে ঘুরে বেড়ায়! আমাকে খোঁজে। কে জানে খেতে পায় কিনা!'

দু জনেই চুপ।

—'প্রভাত, কেতু বেঁচে আছে কিনা সে খবরও আমাকে কেউ দেয না—নিজের স্বার্থেব বাইরে মানুষ এত উদাসীন।'

কার্তিক কেস থেকে একটা সিগারেট বের কবে জ্বালাল।

প্রভাত—'শ্মশানে বাবার ভস্মের ওপর গোটা দুই ইট আছে; কে জানে জঙ্গলে ভরে দিয়েছে হয তো! দুটো ইট শুধু তার, নীচে কী, কে জানে? মৃত্যুব পব আমাদের কী হয? কী হয কার্তিক? হয তো এই টেবিলটা,এই দেযালটা, এই সিগারেটের ছাইযের মতই অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে থাকি। কিন্তু তবুও এক-এক দিন কিছুতেই টিকতে পারি না যেনই এখানে; মাঝবাতে বিছানাব থেকে ওঠে বসি—মনে হয বাবা যেন আমাকে দেশে তার ঘরে গিয়ে বসতে বলছেন—শ্মশানে তাঁব চিতা বেড় দিযে সাপের বিড়েব মত বনচাঁড়াল আর মনসা-কাটার জল সব—হয তো বা তাব নীচে মৃতেব অস্তিত্ব এই দেয়ালটা, টেবিলটা, এই ধুলো, এই সিগাবেটেব ছাইযের মত কিন্তু তবুও—তবুও—কার্তিক।'

কিন্তু কার্তিকেব ইচ্ছাই টিকল—

তিন মাসের জন্য সমীবকে পড়বার কাজে প্রভাতকে বহাল কবে সে চলে গেলে।

তিনটি মাস বড় সহজে কাটতে চাযনা—

এক-এক দিন দুপুব বেলা মনে হয; কমলাব তো বিশেষ কোনো ব্যাকুলতা নেই মনে—সে কেমন বিমুখ উদাসীনগোছের মেযেমানুষ—কিন্তু খোকাকে আব কেতুকে বড় ফাঁকি দেওযা হযেছে, কোথায ফাল্গুন মাসে দেশে যাওযার কথা। এখন চৈত্র ফুরুতে চলল, খোকার ছবিব বই, লাটিম আব বেলুন বাক্সব ভিতর পচছে। লজেনচুষগুলো গলে গিয়েছে সব, বিস্কুট কেমন মিইযে নষ্ট হযে গেছে, ছাতকুড়ো পড়ে গেছে। কেতুকে হয তো এখনো পচা বিড়াল কাকেব মাংস খেতে হয, সমস্ত দুপুব বাঁশেব ঝাড়েব কাছে বসে কচ্ছপের খোলা চিবোয় হয তো; সমস্ত দিন কুই-কুই কবে একা-একা ঘুবে বেড়ায হয তো... কোনো কাজ নেই, দাম নেই, উপায নেই, ভিতবের খবর জানাবাব কোনো লোক নেই কোথাও; বাস্তবিক একটা কুকুব যখন একটা সাথীহীন হয়ে পড়ে তখন নিঃসঙ্গ মানুষেব চেযেও ঢের বেশি কষ্ট তাব।

কে জানে কেতু বেঁচেই-বা আছে কি না?

এক-এক দিন গোলদিঘিতে ঘুরে-ঘুরে ঘুবে-ঘুবে অবসন্ন হয়ে বাত্তিব বেলা বিছানায এসে শুযে প্রভাতের মনে হয দেশের বাড়িতে এতক্ষণে মার সঙ্গে আর কমলার সঙ্গে কথা বলে নিস্তাব পেযে বাঁচত সে; কিংবা নিরঞ্জনকে নিয়ে অশ্বত্থগাছেব কাছে আমরুল আর ঘাসে ঢাকা বাঁধানো পৈঠার উপব বসে রক্তাক্ত সংগ্রাম থেকে ছুটি নিয়ে বৈতরণী পাবেব স্তিমিত ও নবম অন্ধকাবেব মতো শান্তি ও আশ্বাসে পাড়াগাঁর রাত্রি—

মা-ব চিঠিতে খবর পেযেছে প্রভাত, যে উমা দেশে এসেছে, প্রভাতদেব পাশেব বাড়ির অক্ষয় বাবুর মেয়ে উমা আহা, সে এসেছে! আবাল্য তার সঙ্গে মুখেব আলাপ বাখে নি কোনোদিন প্রভাত, এমনই লাজুক। কিন্তু কত দিন ধবে এই মেয়েটিকে দেখে এসেছে প্রভাত নম্র, স্নিগ্ধ, বিচক্ষণ, নিঃশব্দ। অন্ধকার রাতে কাঁঠাল-হিজলের জঙ্গলেব দিকে অনেকক্ষণ তাকিযে থাকতে যেমন ভাল লাগে—এই মেয়েটিকেও তেমনি লাগে—

দু-তিন বছর পরে উমা দেশে ফিবল—অথচ এই সমযে নিজে সে দেশে থাকতে পাবল না। রাতে গান গাওয়ার অভ্যাস এই মেয়েটিব—রোজ রাতেই সে গায; কেমন গভীর আত্মনিবেদন আত্মসমর্পণেব

গান-নারীর সজীব সাধক হৃদয়ের থেকে উচ্ছ্বিত হয়ে উঠেছে। তাই এমন নিবিড় ভাবে সরস।

এবারও কি উষা গায়?'

এখানে গভীর রাতে মেসের ঝি সৈরভীর গলা খনখন করে ওঠে—ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া না ইয়ার্কি ঠিক বুঝতে পারা যায় না। রাতের অনেক কটা মুহূর্ত—অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কর্কশ বৈচিত্র্যহীন মূল্যহীন গলা নিজের ঢাক পিটিয়ে চলে।

অবাক হয়ে ভাবে; জীবনের বিচিত্র নিয়ম—এমন রাতে।

এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় টালিগঞ্জের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে দেশের শ্মশানের কথা মনে হয়-বাবার মঠের কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে—

চৈত্রের করুণ বাতাসের ভিতর দিয়ে কে আসে?—উড়ো শুকনো পাতা? সুরকি? কাঁকর? খড়? হ্যাঁ, বাবার গলাও যেন—সেই দূর শ্মশান থেকে যেন ডাকছেন 'খোকা, তুমি আমার কাছে এসে একটু বসো—আমি শান্তি পাই। কলকাতার পথে-পথে হতভাগা ছেলে তুমিই-বা কত দিন এই মনের অশান্তি নিয়ে কাটাবে?'

চৈত্রের বাতাস উড়ে ভেসে চলে যায়; টালিগঞ্জের থেকে পায় হাঁটতে-হাঁটতে ট্রাম-বাস-ট্রাক-গ্যাস লাইটের একটা বিপুল উন্মাদনার ভিতর এসে পড়ে প্রভাত। কী নিয়ে এত উন্মাদ? এতে কার কী লাভ?

দেখতে-দেখতে তিন মাস প্রায় শেষ হয়ে এল।

সমীর একদিন বললে—'আপনি ইস্কুলের মাস্টারি পেলে নেন?'

—'তা নেই অবশ্যি।'

—'কোথায়?'

—'আপনার ভয় নেই—কলকাতা ছাড়তে হবে না।'

প্রভাত মাথা নাড়ে—'না, কলকাতা তো আমার এমন একটু প্রিয় জিনিস নয় সমীর—'

প্রভাত একটু চুপ থেকে—'এক-এক সময় পথ ঘাট একেবারে দুঃসহ হয়ে ওঠে—যে কোনো জায়গায় পালিয়ে যেতে পারলে আমি বাঁচি।'

—'মাস্টারিটা কলকাতায় অবশ্যি। বাবার ইস্কুল—বাবা সেক্রেটারি। তা বসে আছেন, নিন না—'

প্রভাত কোনো উত্তর দিল না।

সমীর—'ছ-মাসের জন্য কাজ, ডিসেম্বর অব্দি—করবেন?'

প্রভাত—'ভাবছিলাম দেশে যাব।'

—'দেশে তো সব সময়ই যেতে পারেন।'

—'মনসা কাশীং গচ্ছতি; মনসাবাবু কাশী যায়, না মনে-মনে কাশী যায়।'

—'কেন, ট্রেনে-স্টিমারে করে যেতেই-বা কী বাধা?'

—'বাধা আমি নিজেই।'

—'কী রকম?'

—'নিজেকে যতটা প্রেমিক মনে করি ততটা আমি নই—তাই যদি হতাম তা হলে সেই যে তিন মাস আগে বিছানাপত্র বেঁধে যাচ্ছিলাম, চলেই যেতাম, কেউ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না—'

সমীর একটু চুপ থেকে—'কিছু মনে করবেন না—আপনার দাম্পত্যজীবন বেশ নির্বিবাদ? মানে সুখের? কী বলেন'

প্রভাত একটু হেসে—'বাঃ! একথা জিজ্ঞেস কর কেন তুমি?'

—'আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বেশ শান্তির তো?'

—'যেমন সচরাচর হয়।'

সমীর কেটু চুপ থেকে হেসে বললে—'আপনি বলছিলেন কি না নিজেকে যতটা প্রেমিক মনে করেন ততটা নন—সেই জন্যেই কেমন কৌতূহল হল—জিজেস করলাম। পুরুষ-মহিলার সম্বন্ধ নিয়ে আমি একটা আলোচনা করছি -প্রবন্ধও লিখি—'

প্রভাত একটু হেসে—'আজকালকার ছেলেরা আমাদের চেয়ে ঢের প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই বয়সে আমরা তেতুলবিচি নিয়ে খেলা করতাম—'

প্রভাত একটু চুপ থেকে—'পে' ' লতে তোমরা নর-নারীর নানারকম সম্পর্ক বোঝ—কী বলো সমীর? কিন্তু আমি ঢের জিনিস বুঝি- ' .মী-স্ত্রীর সম্বন্ধই শুধু নয়; দেশের মাঠ, পথ, সেই ইস্কুলের বাড়ি, অশথ গাছটা, খোকা, বা কেতু।'

ইস্কুলের কাজ নেবার কোনো ইচ্ছা ছিল না প্রভাতের কিন্তু মানুষের সাংসারিক লাভক্ষতির ব্যাপার প্রভাতের চেয়ে সমীর ঢের বেশি ভাল বোঝে।

প্রভাতকে ছাড়ল না—একেবারে তার বাবার কাছে নিয়ে গেল। তাঁর কথামত কাজটার জন্যে একটা দরখাস্ত করতে হল। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের কাজ—ছয় ঘণ্টা পড়াতে হয়—পাঁচ-ছয় দিন মাস্টারি করার পর প্রভাত কমলার চিঠি পেল; কেতু মরে গেছে, খোকারও হুপিং কাফ, রক্ত আমাশয়। কিন্তু ইস্কুলে প্রভাত মাস্টারি পেয়েছে শুনে কমলা খুব খুশি।

কলামার এ চিঠি পাওয়ার পর অনেক কটা দিন প্রভাত ইস্কুলের থেকে ফিরে নিজের ঘরে অবিশ্রাম পায়চারি করতে-করতে ভাবত ঃ জীবনে ব্যবসাবোধ মেয়েমানুষের কী ভয়াবহ!

এমন অবসাদ বোধ হয়!

সারাটা দিন হাতে খড়িমাটির রং লেগে থাকে—ইস্কুল থেকে ফিরে এসে ধীরে-ধীরে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে প্রভাত; এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়ে কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখে দু-তিনটি চকের স্টিক—ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে-লিখতে পকেটেই ফেলে রেখেছিল না জানি কখন—ইতিহাস জিওগ্রাফির কয়েক খানা টেক্সট জোগাড় করে নিতে হয়েছে—দিনরাতের অনেকটা সময়ই এই বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে হয় তার; ভাল করে ম্যাপ আঁকা শিখতে হয়, ইতিহাসের সন তারিখ মুখস্থ রাখতে হয়।

মাঝে-মাঝে রাস্তার ওপারে পানওয়ালার দোকানের দিকে তাকিয়ে ভাবে—কেতু গেল মরে! কেউ ঠেঙিয়ে মারল না কি? নিজের থেকেই মরে গেল? প্রভাত বাড়িতে না-যেতেই মরে গেল। একটু অপেক্ষাও করতে পারল না? আর ফিরবে না কোনোদিন? কোনোদিনই ফিরবে না? বাস্তবিক কোনোদিনই ফিরবে না আর?

জিওগ্রাফি, ইতিহাস যত সোজা মনে করেছিল সে তা নয়; সেই কবে আঠার-কুড়ি বছর আগে ইস্কুলের নীচের ক্লাশে এ -সব পড়েছিল সে, এ সবের একটা কথাও কি এখন মনে আছে তার! ইতিহাস ও ভূগোলের অসংখ্য রাশি-রাশি ব্যাপার ও বিষয়ের সমাবেশ বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা করে না, কল্পনার না, কবিত্বের না, স্মরণশক্তির ওপর জুলুম করে শুধু।

বড্ড অবসাদ বোধ হয়।

এক-এক দিন ক্লাশে ভূগোল ও ইতিহাসের নানা রকম খুঁটিনাটি ভুল নিজেই সে করে ফেলে; ছেলেরা বড় একটা ধরতে পারে না। কিন্তু নিজের মনের কাছে বড় লজ্জা পায় সে।

কিন্তু সব চেয়ে মুশকিল অঙ্ক নিয়ে। উপরের ক্লাশের জ্যামিতি পড়াবার ভার তার ওপর। ছেলেরা কঠিন-কঠিন এক্সট্রা নিয়ে এসে হাজির হয়। কাজেই বাড়িতে বসে গত তিন মাস অনেক আঁট-ঘাট করে তৈরি হয়ে যেতে হয় তাকে। ইংরেজির মানুষ প্রভাত। অথচ তাকে ইংরেজি পড়াতে দেওয়া হয় না। এক দিন হেডমাস্টারকে সে—'আমাকে ইংরেজি পড়াতে দিন।'

—'তা হয় না।'

—'কেন?'

—'আপনি যার জায়গায় এসেছেন তিনি হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি-জিওমেট্রিই পড়াতেন।'

প্রভাত—'তিনি কী পাশ করেছিলেন?'

—'এল-টি।'

হেডমাস্টার কাগজপত্র নাড়তে-নাড়তে গম্ভীরভাবে—'তা ছাড়া তিনি টেকনিক্যাল স্কুলেও পড়েছিলেন।'

একবার গলা খাঁকরে নিয়ে-'ড্রিল করাতেও পারতেন।'

হেডমাস্টার প্রভাতের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না—কেমন একটা রাশভারী চাল বজায় রাখেন ও পড়াবার কাজের থেকে অফিসের কাজই তাঁর বেশি; অনেকটা সময় বসে নিজের কী একটা কম্পোজিশনের বইয়ের প্রুফ দেখেন। নতুন ম্যানুয়াল লেখেন,লম্বা কালো দাড়ি, সোনার চশমা, পরেন শাদা পেণ্টালুন, গলাবন্ধ তসরের কোট বুক পকেটে থেকে সোনার চেন ঝুলছে। ইস্কুলের পাঁচিলের কাছে একট কৃষ্ণচূড়ার গাছ—সমস্ত ইস্কুলটার ভিতর এই যেন একটু জীবন।

সূচীপত্রে যান

আর এই ছেলেরা।

কিন্তু মাঠ প্রান্তরের কুয়াশার বিস্তৃতি, কাঁচপোকানীল কাজলস্নিগ্ধ বট, অসংখ্য ডালপালা শুঁড়ি জড়িয়ে অজগরের মত সহস্রধারা লতা, মৃদু বেগুনি ফুল, লাল বটফলের দিকে সহস্র শালিখ কোকিলেব কৌমার্যভার, আনন্দ; বিশাল, অশ্বত্থ, পাকুড়, হিজল, জামেব ডালপালাব ফাঁকে বাত্রির তারা, জ্যোৎস্নাব চাঁদ, দিনেব অপবিমেয় আকাশেব গন্ধ, চট বাবলার জঙ্গল ও ঝিঁঝিঁব ডাকেব ভিতব মানুষ হয়েছিল যাবা সেই সব ছেলেদেব কথা মনে পড়ে। এদের মুখেব দিকে তাকালে তাদেব কথা মনে পড়ে কেবল; তাবা কত অন্য বকম। দেশের বাড়িব সেই ইস্কুলটা চোখেব সামনে জেগে ওঠে; সেই কুড়ি বছর আগেব অমূল্য, বিজন অবিনাশ রুক্মিণী—

দিনের পব দিন কেটে যায়।

মাব চিঠিতে জানা যায় হেমন্ত কিছু দিন হল দেশে ফিবে এসেছে; এখনো সে সেই মঠেবই সন্ন্যাসী; অনেক জায়গা ঘুবেছে; মাথা মুড়নো—গেরুয়া কাপড় গায়ে, পায়ে একটি কাঠেব খড়ম—

আহা, হেমন্ত তা হলে দেশে ফিবল আবাব? এই সময়ে দেশে থাকলে বেশ হত!

দেশেব ইস্কুলেই তাবা দু জনে পড়েছিল—হেমন্ত এক ক্লাশ উপবে পড়ত; কলেজে উঠেই সে সন্ন্যাসী হয়ে বেবিয়ে যায়।—

ইস্কুলে থাকতে একটা ঘড়ি দিয়েছিল প্রভাতকে সে; বোজ শেষ বাতে অন্ধকাব থাকতে প্রভাত হেমন্তকে ডেকে নিয়ে বেরুত সেই এক ক্রোশ দূবে মধুমুখী দিঘিব থেকে পদ্মফুল তুলবাব জন্য। পথে একটা শেয়াল একদিন রুখে এসেছিল দু জনকে; সে কী উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় প্রভাতেব—পিছনে হেমন্ত ছুটতে-ছুটতে চেঁচাচ্ছিল, 'ওবে প্রভাত, থাম-থাম, শেয়ালটা পালিয়ে গেছে-থামবি না বে।'

প্রভাতেব মাকে মা বলে ডাকত; কত দিন কত কাজে-অকাজে প্রভাতেব কাছে এসেছে সে—।

কলেজে উঠেই খুব টলস্টয় পড়ত হেমন্ত—টলস্টয়েব উপন্যাস নয়—অন্য বইগুলো। দেখে শুনে প্রভাত এমন ঠাট্টা করতে তাকে—

কদম ফুলেব মতন চুল ছাঁটত—বিছানাব চাদব গায়ে দিত-বিস্তব নিবস নিষ্ঠুব বই পড়তে সে—কিন্তু নিজে খুব হাসি-তামাশা মজলিশেব লোক ছিল—একদিন কলেজে তাকে আব দেখা গেল না—সেই থেকে সন্ন্যাসী—

হেমন্তব জীবন একটা শ্মশানেব খালেব কিনাবে বহস্যময় ফণীমনসাব জঙ্গলেব মত গেল ন্যাড়া হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে।

বছব পাঁচেক আগে হেমন্ত যখন দেশে এসেছিল প্রভাত ওকে কমলাব সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দেয়। কমবা প্রণাম কবল না। কিন্তু হেমন্ত খুব হৃদয়েব প্রসাদে আশীর্বাদ কবল—একেবাবে ঘোমটাব ওপব পাচটি আঙুল চেপে—তার পব বললে—'যাক, নাকেব ডগা অব্দি ঘোমটা টানো নি যে এই জন্য তোমাকে ঢেব ধন্যবাদ।' কমলার ঘোমটা নিঃসংকোচে ধবে টেনে সিঁথিব সিন্দুব অব্দি উঠিয়ে দিল সে—

বললে—'তোমবা যে কথা বলবে মেঝে ফেটে যাবে।'

কমলা কমলা বললে না কিছু। কিন্তু বুঝলাম হেমন্ত আবাব বাকশক্তি ফিবে পেয়েছে ও শব্দব্রহ্মে তাব খুব বিশ্বাস।

হেমন্ত—'তোমাদেব এই চিৎপটাং কাঁঠাল কাঠেব পিঁড়িব মত ভাবগতিক দেখে ইচ্ছে হয় যে কোথাও লুকিয়ে যাই!'

গতবাব বলেছিল—'পাঞ্জাব-মিবাট-পেশোয়াব-অমবনাথ-বদ্রীনাথেব দিকে চললাম বে ভাই! ফিবব কি না শঙ্কবী জানেন!'

বাস্তবিক!

দেশে ফিরেছে সে এবাব; দেশেব চণ্ডীমণ্ডপ, বাবোয়াবিতলা, বৈঠকখানা, পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তব জমিয়ে বাখবে সে কয়েক দিন।

দিনেব পব দিন কেটে যায়—

দু মাস চলে গেল—আবো চার মাস বাকি।'

মা লিখেছেন: খোকা বেশ গাইতে পাবে। কমলা লিখেছে; খোকা পড়াশুনা করে না কিছু, ঘবে থাকে না মোটে, সারা দিন কামার পাড়ায় টইটই করে বেড়ায়। নচ্ছার ছেলেদেব সঙ্গে মেশে; রোজই পাড়াব ছেলেদেব লাথি কানমলা খেয়ে আসে। ছেলেটার যেন মা-বাবা নেই? সেদিন পায়ে একটা মাদাব

কাঁটা ফুটিয়ে আনল—

পড়তে-পড়তে চিঠিটা রেখে দেয় প্রভাত—

চুরুটটা জ্বালিয়ে নেয়। এই তো বেশ : সেই ছ মাসের নিঃসহায় শিশু ক্রমে-ক্রমে মানুষ হয়ে উঠছে। মুহূর্তে-মুহূর্তে জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করছে। প্রায় পাঁচ বছর আগে যে ছোট্ট টুকটুকে পা দুটো দেখে এসেছিল সে আজ তা [কাঁটা] ফুটিয়ে নেবার মত উপযুক্ত হয়ে উঠল। কে জানে ভবিষ্যতের কোনো এক ভয়ংকর যুদ্ধে এই পা হয় তো ট্রেঞ্চের ভিতর ছুটে বেড়াবে—

এর পর নিজের জীবন সংগ্রামও প্রভাতের কাছে অনেকটা লঘু বোধ হয়। কিন্তু রাতের বেলা মনের ভেতর কেমন যেন করতে থাকে প্রভাতের; কমলা লিখেছে ছেলেটার যেন মা-বাবা নেই। সারা দিন কত ছেলের তত্ত্বাবধান করে প্রভাত—আর নিজের ছেলেটা পথে-পথে ঘুরে মরে।

আরো গভীর রাতে প্রভাতের মনে হল : পাঁচ বছর আগে লাল তুলতুলে ছোট্ট যে দুটো পা সে দেখে এসেছিল—ছোট্ট দুটো হাত—দেশে গিয়ে এবার আর সে সব দেখবে না সে। ছেলেকে কথায়-কথায় কোলে তুলে নেওয়ারও একটা অসভ্য জিনিস হয়ে দাঁড়াবে—খোকা তা প্রত্যাশাও করবে না; বাপও লজ্জিত হবে—ছেলে নিজেই লজ্জা পাবে সবার চেয়ে ঢের বেশি! আদর করতে গেলে এড়িয়ে যাবে, ছুটে পালিয়ে যাবে ছেলেটি। আদর করবেই বা কী—সেই নরম বিচিত্র হাত-পাই বা কোথায় খোকার—সেই রেশমের মত চুল—টুলটুলে গাল—কোথায় গেল সে সব? খোকার জীবনের কে এমন ভয়াবহ মুণ্ডচ্ছেদ করল? প্রভাতের কোনো অনুমতির জন্যও অপেক্ষা করল না?

মানুষের জীবনের গতি বড় তীব্র: কমলার মুখও হয় তো এত দিনে থুবড়ে পড়েছে—

মা-ও না জানি কতখানি বুড়ো হয়ে গেছেন—

সমস্ত রাত মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে একটার পর আর একটা কথা ভাবতে লাগল প্রভাত। একটা কথাও মানুষকে ভরসা দেয় না—কেমন করে তোলে—

পর দিন সকালবেলা কিছুতেই আর উঠতে পারা যায় না যেন—

সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে—গায়ে কেমন অসহ্য ব্যথা—

কিন্তু তবুও ইস্কুলের বেলা হতে না-হতেই উঠে বসল প্রভাত; কিছু না খেয়েই বাসে করে ইস্কুলে চলে গেল। প্রথম দুই ঘণ্টা ককাঁতে-ককাঁতে পড়িয়ে নিজেকে কেমন অমানুষ বলে বোধ হতে লাগল প্রভাতে—নিজের উপর এ কী অত্যাচার তার।

মানুষ কি ইস্কুল মাস্টারি করবার জন্যই বেঁচে থাকে না কি?

ঘণ্টা বাজাতেই হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে ছুটি চাইল সে!

হেডমাস্টার—'আপনার টেম্পোরারি কাজ, দু ঘণ্টা পড়িয়েই ছুটি? কেন, কী হল আপনার?'

—'বড্ড অসুখ করেছে।'

—'অসুখ তো করবেই-আমাদের লোক বড্ড কম—এখনই তো অসুখের সময়—অসুখ না করলে চলে। এত কাজ করবে কে?'

প্রভাত দাঁড়াতে পারছিল না।

হেডমাস্টার—'কী আর করা; যান—অসুখ যখন করেছে—কাল দু-এক ঘণ্টা বেশি পড়িয়ে দেবেন বরং।'

মেসে ফিরে এসে প্রভাত ঠিক করল আজই সে দেশে চলে যাবে। বাক্স-বিছানা গোছাতে গোছাতে প্রভাত ভাবল মানুষ যদি এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তা হলে জীবন তাকে মনে করে অপদার্থ শব, সময় আসে শকুনের মত উড়ে, তাই আসে—তাই আসে। এ পাঁচ বছর ধরে কী করে এত অসতর্ক—অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে—জীবনের হাতে এত প্রতারণা সহ্য করল! এত অসম্ভব অদ্ভুত ব্যাপার কী করে যে ঘটে!

কিন্তু এই সৃষ্টি যার কাছে আঁতুড় ঘরের জননীর মত মমতা প্রত্যাশা করা অসম্ভব, যা অন্ধ অবসাদে চলে-অন্ধকারে ভাঙা সর্পিল সেতুর মত—নিঃসহায়তার নির্মমতায় করে অপপ্রয়োগ, নিরবচ্ছিন্ন অপচেষ্টায় শানিয়ে ওঠে।

বিছানা বাঁধতে-বাঁধতে প্রভাত ভাবল—মানুষ ক দিনই বা বাঁচে, বাঁচে না বেশি দিন। টাকাকড়ি সফলতাও খুব কম মানুষের জীবনেরই হয়। কিন্তু কয়েকটা ভালবাসার জিনিস আমাদের জন্য সে রেখে দেয়। সে সবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে লাভ কী? অন্ধকার সেই অসংস্থিতি, খেয়াল যার এত অন্ধ, সে

কখন কী কঠিনতা করে বসে তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

আরো একটা দড়ির দরকার; প্রভাত খাটের নীচের থেকে একটা মস্ত বড় লম্বা দড়ি বের করে বিছানাটা বাঁধতে-বাঁধতে ভাবল—এ পাঁচ বছর জীবনটাকে নেড়েচেড়ে দেখলাম, সংসারে যারা সফল হবে তাদের জাত আলাদা ঃ ভালবাসার চেয়ে সফলতাকেই তারা ভালবাসে বেশি—আমার ঠিক উল্টো, প্রেম, দাক্ষিণ্য, মমতার, ঘরানা গন্ধেই তৃপ্তি! যে যা ভালবাসে সেই জিনিসেবই আরাধনা করা উচিত তার। নিজেব জীবনটাকে ভুল বুঝে মিছিমিছি অন্ধ হয়ে ঘুরে কী লাভ!

দেশের বাড়িতে একটা মনিহারি দোকান খুলে বসবে সে—কিংবা দেশের ইস্কুলে একটা মাস্টারির চেষ্টা দেখবে—

বিছানা-বাক্স বাঁধা হয়ে যাবাব পর শরীরটা ভাল লাগতে লাগল; জ্বরটা যেন চলে গেছে।

প্রভাতের চিন্তার গতি আবার অন্য পথ ধরল। চেয়ারে সে সুস্থির হয়ে চুপ কবে বসল; একটা চুরুট ধবে নাড়াচাড়া করতে লাগল—ভাবল: হুজুকে কোনো কাজ কবা উচিত নয়। জীবন হচ্ছে লড়াইবাজ বাজপাখির বিশাল আকাশ এবং সংগ্রাম উচ্ছল, আশানীলাভ বিবাট পরিবিস্তৃত আকাশের মত এই জীবন। যারা দুর্বল তারা পিছিয়ে পড়ে, মায়া-মমতার দোহাই পাড়ে—জীবনেব ভিতর বিধাতার খেলা দেখে শুধু—অনিযম দেখে—উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে—তা নয-তা নয।

চুরুটটা জ্বালিযে এক টান দিযে প্রভাতেব মনে হল—জীবনকে হতবিধাতার আস্তাকুড় মনে করে চুপ করে থাকে যারা তাদের ক্লান্তি, গ্লানি, বেদনা, সমস্তই নিজেদের তৈরি জিনিস; তাবা উপলব্ধি করতে ভয পায়—জীবন্মৃত হয়ে থাকতে ভালবাসে; অলসতাকে তাবা ভাবে প্রেম—ভিক্ষাকে ভাবে দাক্ষিণ্য। মানুষের জীবনের আবহমান স্রোতের ভিতর যে সুন্দর নিয়ম আছে তাকে উপেক্ষা কবে মাছির ডিমের মত। এই সংসাবে কোটি-কোটি জন্মায তারা কোটি-কোটি গুঁড়িযে যায—

প্রভাত চুরুটে টান দিতেই ভাবল: পাঁচ বছব বসে প্রাণপাত কবে—জীবনেব সমস্ত অপচয় অপবিন্যাসের থেকে দূরে থেকে জীবনটাকে যেখানে এনে দাঁড় কবিযেছি আমি এ খুব ভরসাব পথ। নীলমণি বাবুব ইস্কুলে চাব মাস ধরে বেশ একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করেছি—কখনও কর্তব্য অবহেলা কবি নি—বেশ সুনাম হয়েছে আমার—ছেলেরা খুশি—মাস্টাবরা খুশি—সেক্রেটারি খুশি-হেডমাস্টাবও বিমুখ নন—

চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে প্রভাত স্বীকার কবে নিল—কাজ পাকা হয়ে যাবে তার। বিছানা খুলতে-খুলতে ভাবল—পাকা হয়ে গেলে চল্লিশ টাকা মাইনে হবে—চল্লিশ টাকাব একটা পাকা কাজ নিযে কলকাতায বসে সে অন্য চেষ্টা করবে—হয তো আব-একটা এম-এ দেবে—হয তো থিসিস লিখবে—হয তো বি-টি পড়বে—

প্রভাত বিছানাটা পুরোপুরি খুলে পেতে নিল—বিছানায শুয়ে-শুয়ে সমস্ত দুপুব সমস্ত বিকাল সে ঢেব উজ্জ্বলতায ও জীবনের সুবিন্যাসেব স্বপ্ন দেখল। সন্ধ্যাব মুখোমুখিই জ্বর এল আবাব—

সংসারের বাজপাখি নয়, চড়ুই পাখি—শালিখ পাখি এই উদাসী, করুণ, সংসারেব কর্তব্য সংগ্রাম নিষ্পেষিত যুবক ক্রমে-ক্রমে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়তে লাগল।

খুব ক্ষিদে পেল। খোকার জন্য প্রায সাত মাস আগে সেই যে কযেকটা খুচরো বিস্কুট কিনেছিল বাক্সব থেকে সেগুলো বের করে নিল প্রভাত; গুণে দেখল পনের খানা; এখন মিইযে তুলোব মত হয়ে গেছে; খেতে কেমন খড়ি মাটির মত লাগে—কোনো স্বাদ নেই কিন্তু তবুও কযেকখানা খেল সে—বাকিগুলো বিছানার এক পাশে ছড়িয়ে বইল। লজেনচুষগুলো গলতে—গলতে শেষে এক সময চট বেঁধে শক্ত হয়ে রয়েছে—দু-একটা খুঁটে মুখে দিযে ডান কাতে শুযে লজেনচুষেব মোড়কটা অনেকক্ষণ হাতের ভিতর রেখে দিল সে—লজেনচুষ বিস্কুট খোকা সেই সাত মাস আগেব সেই বিছানা বাক্স বাঁধা, বাড়ি যাবার আযোজন, দেশের বাড়ি, সেই কেতু যে দিল ফাঁকি, সেই খোকা যার শিশুত্ব গেল নষ্ট হয়ে, সেই মা যার নিজের হাতে লেখা চিঠি আর আসে না, তিন মাস ধরে নিযেছেন বিছানা, বাবার চিতাব উপর বিষাক্ত সাপের মত কেলেকাঁটা খেলছে যে—একটা ডগা ছিঁড়ে পরিষ্কার করবার পর্যন্ত কোনো লোক নেই, সেই অশ্বত্থ গাছটায় পর-পর দুজন লোক গলায দড়ি দিয়ে মরেছে বলে সেই গাছটাকেই নাকি কেটে ফেলেছে—অপরাধ হল গাছের? এমন সবুজ ফলন্ত গাছকে কেউ কাটে? এবার গিয়ে ভাল দেখে আবার একটা অশ্বত্থের চারা লাগাতে হবে কিন্তু কত দিনে বাড়বে বিধার্তা জানেন—বড় আস্তে বাড়ে। কমলার সামনের মাড়ির পাঁচ-ছটা দাঁত পড়ে গেছে। বাঃ কেমন দেখায় তাকে। ছাই দিয়ে দাঁত মাজে! কত দিন প্রভাত তাকে আমের কচি ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে বলেছে-।—বাস্তবিক, কেতু আর নেই? মা

বিছানার থেকে নামতে পারেন না আর?

নিরঞ্জন ধোপার খবর কেউ লেখে না—মরল না কি? কমলা ফোকলা দাঁতে দিন-রাত কথা বলছে, খোকাকে শাসাচ্ছে, হয তো—হাসছে-কে জানে—কাঁদছেও হয় তো। এ কী রকম যেন হয়ে গেল। জীবন যেন তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে দিতে চায নিজেকে। প্রভাতের বুকের ভিতব কেমন যেন শূন্য বোধহয, বড্ড কষ্ট লাগে কমলার জন্য। কেতুর সঙ্গে মাঠে জঙ্গলে উঠানে কোথাও কোনোদিন আর দেখা হবে না?

এই সব অনেক কথা ভাবতে-ভাবতে শরীরটা কেমন অবশ হয়ে আসে। লজেনচুষের মোটড়কটা হাতের থেকে খসে পড়ে যায়—লাল-নীল নজেনচুষ-গুলো বিছানায় গড়াগড়ি খেতে থাকে।

সাবারাত ছট-ফট করে সকালবেলা যখন সে মাবা গেল তখন তার অসুখেব খবরও কেউ জানে না—

নিজেব মৃত্যু অব্দি প্রভাত নিজের সমস্ত কাজ নিজেই সাঙ্গ কবল। কিন্তু এখন থেকে সে অন্যের বোঝা।

দাহের কী হবে? মেসের সকলেই প্রায অফিসে চাকরি করে; কেউ তেল মেখেছে—কেউ স্নান কবে ফেলেছে—কারুর বা খাওযা-দাওযা হয়ে গেছে। অফিসের দিকেই সকলেব মন, এ অসময়ে নিমতলায যাওযা চলে না—

বামপদব অবিশ্যি অফিস নাই—সে লাইফ ইনসিওবেন্সের এজেণ্ট—কিন্তু আজ একটা খুব বড় এনগেজমেণ্ট আছে তাব—ভারী কেস—প্রায পনেব হাজাব টাকার পলিসি—না-খেয়েই সে বেবিয়ে পড়ল—

শ্রীপতিও বেকার-কিন্তু মাথা নেড়ে সে বললে-শ্মশানে যাওযা এখন সম্ভব হবে না তার—কর্পোরেশনের বস্তি ইনস্পেক্টবেব একটা কাজ খালি আছে—আজ সকাল বেলাই কযেক জন কাউন্সিলাবেব সঙ্গে দেখা কববাব তাব কথা—

হরিদাসবাবু একটু বড় ধবনেব মানুষ— দু-এক বছব হল স্ত্রী মাবা যাবাব পব থেকেই একটি ছোট ছেলে ও মেযে নিয়ে মেসেব একটা বড় ঘরে একাই থাকেন তিনি—পেনশন পান—শ্মশানে যেতে তাঁব আপত্তি নেই—কিন্তু কেউই যখন যাচ্ছে না তখন একা গিয়ে আব কি হবে?

ম্যানেজার—আমিই বা মেস ছেড়ে যাই কী কবে?

অফিসেব চাকুবেবা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল আজ। বিষ্ণুপদ থাকলেও থাকতে পাবত—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই যখন চলে গেল তখন কী আব করে সে—বেবিয়ে পানেব দোকানেব এক পযসাব কেনা কাটা কবে।

বাতে দাহ হবে ঠিক হল।

প্রভাতের কামরায দরজায ম্যানেজার একটা তালা আটকে চলে গেল।

সমস্ত দুপুর ঠাকুব-চাকবেরা এক-একবাব এসে মড়া দেখে যায—বাবান্দায থুথু ফেলে—ম্যানেজাব এক-একবার তেতলার থেকে দোতলায নামতে-নামতে, দোতলাব থেকে তেতলায উঠতে-উঠতে মড়াব চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধাব কবে—

কলতলায চাকর বাকবদেব জটলা হয—থালা-বাটি-গেলাশ ঝন-ঝন করে আছাড় খেয়ে পড়ে—

ক্রমে দুপুর আবো নির্জন হয়ে ওঠে; সমস্ত মেস নিস্তব্ধ; রান্না ঘবে চাকর-বাকবদেব নাক ডাকাব শব্দ , বারান্দায বেলিঙে কতকগুলো চড়াইযের নীবব নির্বিবাদ জীবনোপভোগ—

সমস্ত মেসেব ভিতর জনপ্রাণী একটিও নেই—কেবল হবিদাসবাবুব ছোট ছেলে ও ছোট মেযেটি এক-একবার কৌতূহলেব আতিশয্যে প্রভাতেব ঘবের দিকে টিপিটিপি খানিকটা এগিয়ে যায-পব মুহূর্তেই 'ভূত-ভূত' বলে চিৎকার কবে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে আসে; আবাব এগিয়ে যায, আবাব পালিয়ে আসে—

ঘণ্টাব পব ঘণ্টা সমস্ত দুপুর—তাদেব এই চিত্তাকর্ষক খেলা চলে।

প্রভাতের রুদ্ধ ঘরে মাছিব ভনভনানি, অসহ্য গুমোট ও মশা এক-এক সময মৃতেব পক্ষেও যেন অসহ্য হয়ে ওঠে—

পৃথিবীর বাজ পাখির নয—চড়ুই পাখি, শালিখ পাখি, এই উদাসী, করুণ, সংসাবেব কর্তব্য সংগ্রামনিষ্পেষিত বন্ধনাম্না যুবক কোনোদিন তার প্রমত্ততম কল্পনাযও মনে কবে নি যে এই মেসে সে মরবে—তাব মৃত্যুব পব মেসের একটা দিন এইরকম কেটে যাবে—এই মেসেব কযেকটি বাবু সিগারেট আর পানের ডিবে নিয়ে রাতে নিমতালায তাকে পোড়াতে যাবে—

সূচীপত্রে যান

কারুবাসনা

আষাঢ় শেষ হয়ে গেছে, শ্রাবণ চলছিল। এই বর্ষায় বইয়ের বড্ড ক্ষতি হয়। কয়েক দিন আগে স্টেশনের বইগুলো দেখেছিলাম—স্টলের সমস্ত বইগুলোই প্রায় পুরনো। ছেঁড়া-খোড়া মালিকের সঙ্গবিহীন গ্রন্থিহীন জীবনের জর্জরতার অপরাধ এদের চোখে মুখে। নতুন বইও কয়েকখানা আছে। গত বছর কলকাতায় যখন পঁচিশ টাকা ট্যুইশান করি, ট্রাম-সিনেমা ও চায়ের পথ এড়িয়ে, খুব একটা শাদাসিধে মেসের জীবন্মৃত অবস্থার ভিতরে থেকে কয়েকখানা বই কিনতে পেরেছিলাম; ইংরেজি কবিতার বই দুটো, একখানা আমেরিকান উপন্যাস গত শতাব্দীর, একখানা নভেল এবং আরো দু-তিন খানা বই। ক্যাটেলগ দেখে কিনি নি; কারো পরামর্শ নিয়েও নয়; ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সমালোচনা ও খবরাখবর আমি অনেক দিন ধরে দেখি নি; বই ক-খানা কিনেছিলাম নিজের মনের কর্তৃত্বে আমি। টিনের সুটকেসে করে বইগুলো দেশে নিয়ে এলাম; খড়ের ঘরের জানলার কাছে বসে পড়লাম; বাইরে বিকেলের আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকারে কখনো শরৎ কখনো হেমন্তকে দেখেছি; শালিখ ঘাসে-ঘাসে পোকা খুঁটে খেয়েছে, ফড়িং উড়েছে, পাতা খসেছে, দাঁড়কাকের দল গভীর কীর্তির অব্যর্থতায় ঘরের দিকে উড়ে গেছে তাদের, সন্ধ্যামণির পাপড়ির মত লাল মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।

আমাদের এ-ঘরে উইয়ের অত্যাচার বড় বেশি; মেঝেটা মাটির—বড্ড স্যাঁত-সেঁতে; বর্ষাকালে উইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য নানা রকম চেষ্টা চলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নির্জীব নয়—খুব সতেজ ও পরিহাসপ্রিয়। মিশরে যিনি একদিন পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে মজা দেখেছিলেন, আমাদের কুঁড়ে ঘরে তিনি উই ছড়িয়ে দিয়ে তামাসা দেখেন। নানা রকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের, ছিবড়ে কুড়িয়ে-কুড়িয়ে, তার পর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।

দু-তিন দিন আগে শেল্‌ফের বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখেছি একবার; আজ আরেকবার দেখা যাক, কিন্তু যাই-যাই করে আর যাওয়া হয় না; জানালার ভিতর দিয়ে বর্ষার দিকে তাকিয়ে মন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দুপুর বেলা দেখলাম বইয়ের তাক ঠিকই আছে, উইয়ে ধরে নি, নতুন বইয়ের লাল-নীল মলাটগুলো কেমন ছাতকুড়োয় শাদা-শাদা হয়ে গেছে।

কল্যাণীকে বললাম—'আমি চলে গেলে এই বইগুলো মাঝে মাঝে দেখো।'

কল্যাণী সেলাই করছিল; কোনো জবাব দিল না। বইগুলো মুছতে-মুছতে—'মাঝে-মাঝে রোদে দিও এগুলো।'

কল্যাণী কোনো কথা বললে না।

সে আমার উপর বিরক্ত; দেশে এসে বলেছিলাম ছ-সাত দিন থাকব; থাকতে-থাকতে তিন মাস হয়ে গেল। প্রায় এক মাস থেকে বলছি, চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় আজকালই যাব। কিন্তু আজও গড়িমসি করে দেশের বাড়িতেই কাটাচ্ছি। এত অপরাধ ও বেদনার জন্য তার জীবন প্রস্তুত ছিল না।

সে একটা অস্টিন মোটরকার চায় না বটে, সুসজ্জিত বাংলোও চায় না, আমাকে যখন প্রথম বিয়ে করেছিল, তিন বছর আগে, মানুষের জীবনের নিদারুণ পরিমাপের টের যখন সে পায় নি, তখন কী চাইত জানি না, কিন্তু আজ একজন সমান্য ইস্কুলমাস্টারের গৃহস্থালীর ব্যবস্থাও নিজের হাতে যদি সে পায়, জীবনকে ধন্য মনে করে। কিন্তু এমনই ব্যবস্থা, একটা ইস্কুলমাস্টারি জোটে না। 'আচ্ছা, আমি যদি ট্রাম কণ্ডাকটার হই? কী বল কল্যাণী?'

'টি-সি হবার জন্যই এম-এ পাশ করেছিলে?'

'কিন্তু সেও তো কাজ—মাসে-মাসে ২৫,২০ কি দেবে না?'

সূচীপত্রে যান

'বেশ তো, তা হলে তাই করো গিয়ে।'
'এবার কলকাতায় গিয়ে যা হয় একটা কিছু করবই।'
কল্যাণী চুপ করে রইল।
'কী করব জানো?'
কোনো সাড়া নেই।
হেমন্তের বিকেলের নিস্তব্ধ ম্লানতার ভিতর একটা রুগ্ন হাঁসের মত শুকনো পাতাব উড়াউড়ির মধ্যে হংসগামিনী গতিতে একা-একা অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। গলা খাঁকবে-'কী কবব, জানো কল্যাণী?'
কল্যাণী আঁতকে উঠে—'বাপরে, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এ-রকম! বেটপকা চেঁচিয়ে ওঠো কেন?'
'না, চেঁচাইনি তো'—
'না, না, এ-রকম আচমকা ভয় পাইয়ে দিও না, ইস্, কী রকম ধড়ফড় করছে বুক।'
'এখনো? কী হল?'
'কিছু না, বাপরে, কী রকম চমকে গিয়েছিলাম।'
'নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে?'
কল্যাণী—'কথা বলো না, আমাকে একটু চুপ থাকতে দাও; কথা বলতে গেলে হার্টে কষ্ট হয়।'
'বুকে হাত বুলিয়ে দেব?'
'থাক্'
'কাছে আসি?'
'না'
'কেন?'
'কেন?'
'আমাকে একটু চুপ কবে থাকতে দাও।'
পাখা নিয়ে এগিয়ে গেলাম—বাতাস দিতেই কল্যাণী—'পাখা রেখে দাও, ঠাণ্ডা লাগে।'
রেখে দিলাম।
'গরম দুধ খাবে?'
'না, দবকার নেই।'
বালিশে খানিকক্ষণ মাথা গুঁজে পড়ে থেকে কল্যাণী—'বাঃ, তুমি আমাব বিছানাব পাশে দাঁড়িয়ে আছ যে?'
'দেখছিলাম'
'না, মরতে এখনো দেরি আছে ঢের।'
'মরার কথা নয়।'
হ্যাঁ, যা বলছিলে, আমাকে একটু গরম দুধ এনে দাও ত।'
'আচ্ছা দিচ্ছি।'
'কিন্তু এখন দুপুরবেলা সব্বায়ের খাওযাদাওয়া হয়ে গেছে; কোত্থেকে এনে দেবে?'
'কেন খুকির দুধই তো আছে।'
'তা হলে খুকি কী খাবে?'
মাথা হেঁট করে একটু ভেবে, 'বেশ, পিসিমার দুধের থেকে এনে দেব তা হলে।'
'কী করে আনবে?'
চুপ করে ছিলাম।
'পিসিমার কাছে গিয়ে চাইবে?'
ঈষৎ হাসতে চেষ্টা করে—'হ্যাঁ, দরকার হয়েছে, চেয়ে আনব।'
'কেন, আমি কি ভিখিরির মেয়ে যে পরের কাছে থেকে দুধ ভিখ কবে ছাড়া খেতে পারব না।'
একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'এক গ্লাস দুধ, তা পিসিমা খুশি হয়েই দেবেন।'
কল্যাণী একটা নিশ্বাস ফেলে, 'যাক্ যা কাজ করছিলে তাই করো গিয়ে, দুধ আমার লাগবে না।'
বই মুছতে লাগলাম।

সূচীপত্রে যান

কল্যাণী উঠে বসে, সুচ-সুতো হাতে নিয়ে—'তোমাকে বিশ্বাস নেই।'

'কেন?'

'আধঘণ্টা পর হয় ত পিসিমার কাছ থেকে দুধ চেয়ে এনে বলবে, বিনয় ভট্টাচার্যের চায়ের দোকান থেকে নিয়ে এলাম।'

একটু থেমে, 'না তা আর বলব না।'

'বিনয় ভটচায়ের চায়ের দোকানে খুব ভাল দুধ পাওয়া যায়?'

মাথা নেড়ে, 'তা পাওয়া যায়।'

'কত করে নেয় এক গ্লাস?'

'দু আনা'

'ওঃ, দু আনা বুঝি?'

দু জনেই অনেক ক্ষণ চুপচাপ; কল্যাণী সেলাই কবছিল, আমি বই ঝাড়ছিলাম, মুছছিলাম, পাতা উল্টাচ্ছিলাম—কিন্তু দু আনা পয়সাব সম্বল আজ আমাব কাছে নেই। এবং আমাব বয়স চৌত্রিশ, বার বছব আগে এম-এ পাশ কবেছিলাম বটে, বিয়েব আগে দু-তিনটে কলেজে অস্থায়ী কাজ কবেছি—আরো অনেক কাজ করেছি; কিন্তু সংসার ও সমাজেব প্রতিষ্ঠিত মানুষদেব জীবনেব পদ্ধতিব সঙ্গে কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণ [ভিন্নতা] ও জটিলতা নিয়ে পৃথিবতে এসেছি আমি। কাজেই এম-এ ডিগ্রি ও স্ত্রী সন্তান সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছব বয়সে আজও আমি সংসাবী হয়ে উঠতে পাবলাম না আক্ষেপেব কথা হয ত। কিংবা আক্ষেপের কথাই-বা কেন আব? জীবন তো শুধু স্ত্রী-সন্তান নিয়েই নয।

বিকেলেব ধূসবতার ভিতব যখন সবুজ ঘাসের মাঠেব পথে হাঁটতে থাকি, কিংবা হেমন্তেব সন্ধ্যায চড়ুই-শালিখ যখন উড়ে চলে গেছে, দিকে-দিকে কুয়াশা জমে ওঠে, লক্ষ্মীপুজোব ধূপেব ভিতবেও যখন গন্ধ, কিংবা আবো গভীব রাতে অশ্বত্থেব ডালপালা যখন জোৎস্নাব বাতাসে ঝিবঝিব কবে, কত বিহঙ্গম-বিহমঙ্গমাব নীড় বুকে নিয়ে বিবাট বটগাছ দাঁড়িযে থাকে, বটেব নীচে উপকথাব পথিক গিয়ে দাঁড়ায—এক মূহূর্তেব ভিতবেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতেব প্রেম, স্বপ্ন ও সফলতাব সঙ্গে নিজেব সম্পর্ক খুঁজে পাই আমি, এই সৃষ্টিব রহস্যেব ভিতব নিজেব বহস্যময হৃদযেব সঙ্গে আলো-অন্ধকাবেব পথে অবিবাম চলতে ইচ্ছা কবে।

সংসাবেব সঙ্গে সম্পর্কহীন—জীবনেব এই আব-এক রূপ। এই রূপেব পথে চলতে-চলতে কিশোব বেলাব নষ্ট প্রেমেব বেদনা ও লাঞ্ছনা ভুলতে চেযেছিলাম, আজকেব সংসাবেব ক্ষয ও ক্ষতি নিয়ে আক্ষেপ কবব?

অবিশ্যি বাবাব কাছে চাইলে দু আনা পযসা পাওয়া যায। দু আনা চাইলে তিনি হয ত চাব আনাও দিযে দেবেন। আমি মুখ ফুটে বড় একটা চাই না কি-না। সেই জন্য, চাইলেই, তিনি যতদূব সম্ভব দিযে দেন। অবিলম্বে অকাতরে আমাব কলকাতাব খাওযাব খবচও তিনিই যোগাড় কবে দেবেন; তাবপব দাদাকে বেবিলিতে লিখে দেবেন আমাব কলকাতাব মেসের খবচটা কিছু দিন চালাতে—যে পর্যন্ত না আমি ট্যুইশান পাই।

আমি ট্যুইশান পাই বা না পাই, আমি কলকাতায এলেই দাদা একটা মাস মেসেব খরচ দেন; তার পব বন্ধ করে দেন—শত অনুনয-অনুবোধ কবলেও কিছুই গ্রাহ্য কবেন না, আমাব টিকিটের পযসা খরচ হয শুধু; কাজেই অনুবোধ করে চিঠি লিখতে যাই না, এক মাসেব টাকা দিয়ে তিন মাস চালাতে চেষ্টা কবি—দেশেব বাড়িতে খরচ যেন তিনি বন্ধ না কবেন, ভবিতব্যের কাছে এই প্রার্থনা করি।

বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন বন্ধ করবেন না, কিন্তু বাবা চলে গেলে পব? জীবন যদি তখনো আমাব এই পথে চলে? কিন্তু কেনই-বা চলবে? ভবিষ্যতের জন্য আশা কবা যাক। না হয, চড়কায সুতো কেটে কাপড়েব ব্যবস্থা করব, যে-টুকু জমি আছ তাতে লাউ-কুমড়ো-বেগুন-মরিচেব গাছ লাগিয়ে দেব; আব চাল? ভাবছিলাম।

কল্যাণী—'খুব বেশি নেয তো তা হলে?'

'কে বেশি নেয, কল্যাণী?'

'এক গ্লাস দুধ দু আনা নেয় বললে—'

'হ্যাঁ'

'বেশ টাটকা দুধ নিশ্চয়ই?'

সূচীপত্রে যান

'হ্যাঁ, খুব'
'তুমি খেয়ে দেখেছ?'
'না খাইনি'
'বিনয় ভট্চাযের দোকানে শিগগির যাও নি বুঝি?'
'না'
'এক কাপ চা খেতেও যাও নি?'
'না, শিগগির গিয়েছি মনে পড়ে না।'
'সত্যি যাও নি? বাবে, এত তো চাযের ভক্ত ছিলে। কি, বাড়িতে তো চা পাও না, আমি তো ভাবতাম বিনয় ভটচাযেব দোকান থেকে চা খেয়ে আস তুমি।'
'না, মাঝে-মাঝে একটা চুরুট কিনতে যাই'
'চুরুট?'
'হ্যাঁ'
'আব-কিছু না?'
মাথা নাড়লাম—'না'
'চুরুট তো তোমাকে খেতে দেখি না আমি'
'মাসের মধ্যে দু-একটা খাই'
'তাই-বা কখন খাও?'
'খাই রাস্তায়—সন্ধ্যাব সময'
'বেশ লাগে?'
'মন্দ কী!'
'কিন্তু দুধ খেও'
'কে? আমি?'
'হ্যাঁ'
'কেন বলো ত?'
কল্যাণী কোনো জবাব দিল না।
একটু চুপ কবে বললে, 'আধ গ্লাস দুধ চাব পযসায দেবে?'
'তা দিতে পাবে, দব কষাকষি কবতে হবে।' আবো খানিক ক্ষণ ভেবে কল্যাণী, 'তা হলে নিযেসো তো'। অত্যন্ত জড়সড় ভাবে, যথেষ্ট সময খবচ কবে, আঁচলেব গাঁটেব থেকে একটা এক আনি বেব কবলে, দেখলাম, খানিকটা তেলা—
আরো কিছু খুচবো পযসা বেচাবিব গাঁটে ছিল, কিন্তু এক আনিটা বদল কববাব ভবসা পেলাম না। না হয চাব পযসার বাকি দুধ বিনযের কাছ থেকে আনা যাবে।
তাই আনলাম।
কিন্তু দুধ নিযে হাজির হযে দেখি, আর-এক সমস্যা; সে কিছুতেই খাবে না, খেতে হবে আমাকে।
বললে, 'তুমি কী বেকুব! তোমাকে দুধ খাবার জন্য চাবটে পযসা দিলাম আমি, হাত-পা বোগা বকের মত হযে যাচ্ছে, কোথায দোকানে বসে খেয়ে আসবে, না, সেই দুধ তুমি এতটা পথ বযে আনলে আমার জন্য!'
বিক্ষুব্ধ ঝাঁঝে আমার দিকে আপাদমস্তক তাকাতে লাগল সে।
'কই, তুমি ত একবাবও বলো নি কল্যাণী?'
'কী বলি নি।'
'যখন পযসা দিলে বলো নি তো যে—'
কিন্তু খোঁচা দিয়ে ভুল দেখিযে এই নারীটিকে পরাস্ত করে কী লাভ?
বাদলের দুপুবে এক-একটা নিরাশ্রয দাঁড়কাক আমাদের উঠোনেব পেয়ারার ডালে বসে ভিজতে থাকে, তাকে দান করতে হয়, কেউ কোনোদিন তার কাছ থেকে গ্রহণ করবার কথা ভাবতে পাবে কি?
'আমি এক কাপ চা খেযে এসেছি; আর একটা চুরুট।'
'কে? তুমি? দুধ খেলে না কেন? দুধেব জন্যই তো পযসা দেওযা। তোমাব শরীবেব দিকে তাকিযে

দুঃখ হয়। বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে এলে, সব কবলে, তবু আমার কথাটা শুনলে না।'

'দুধ তোমার জুড়িয়ে যাচ্ছে, বক-বক বক-বক বক-বক কথাবার্তা পরে হবে। আগে খেয়ে নাও।'

গ্লাসটা তার হাতে দিলাম।

'বাঃ, এই গ্লাসটা কাব?'

'বিনয়ের'

'বেশ সুন্দর কাচেব গ্লাস তো'

আমাব চোখেব দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি খাও।'

চুপ কবে বই পড়ছিলাম।

কল্যাণী, 'তুমি নাকি আবাব চা খেয়ে এসেছ, চুরুটও?'

গেলাসটা সে ঠোঁট অব্দি তুললে, 'কই কথাব উত্তব দাও না যে?'

'কোন কথা?'

'চা-চুরুট খেয়ে পেট ভবিয়ে আস নি?'

'হ্যাঁ'

'তা যদি না-ভবতে তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে দুধ খেতে হত।'

'তা, তোমাব পাল্লায় পড়লে।'

'আমি কি আমাব জন্য আনিয়েছি, এটা তুমি বুঝলে না?'

তাকিয়ে দেখি দুধ তখনো অভুক্ত।

কাজেই, রামেশ্বরেব ছেঁড়া ছাতাটা নিয়ে বেবিয়ে পড়লাম—আমি চলে না গেলে এ বেচাবিব দুধ আব খাওয়া হবে না।

কল্যাণী—'কোথায় যাচ্ছ?'

'বমনীবাবুব বাড়ি'

'কেন?'

'একটা বই নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'মিনিট পনের পবে ফিবে এসে দেখি দুধেব গ্লাস যেমনি, তেমনি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কবলাম—'এখনো খাও নি?'

'নাঃ'

'কেন?'

'ভক্তি হচ্ছে না খেতে'

'কিসেব জন্য কল্যাণী? দোকানেব দুধ বলে? দাও আমি খেয়ে ফেলি'

হাত বাড়াতেই দুধেব গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে শক্ত কবে চেপে ধরে কল্যাণী, মিনমিন কবে হেসে 'ইস্, দোকানের জিনিস আমি খাই না বুঝি?'

আমাব দিকে তাকিয়ে কল্যাণী একটু লজ্জিত হয়ে—'ছি, খেতে চেয়েছিলে—

বাধা দিলাম, এই নাও—'

ফিবে চেয়ে দেখলাম সে দুধেব দিকে সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে আমার দিকে গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে, হাতভরা তাব অনিচ্ছা ও অনগ্রসবেব অসাড়তা; মুখখানা হেমন্তের সন্ধ্যাব মত হিম, বেদনাতুব; মৃত সন্তানেব মুখের উপর নিবদ্ধ মৃতবৎসা হরিণীব মত বিহ্বল বিষন্ন চোখ।

উটের লোম দিয়ে যে-ব্রাশ তৈবি হয়, যার সঙ্গে বং মাখিয়ে মানুষ ছবি আঁকে, সেই ব্রাশই-বা কোথায়? রং-ই বা কোথায়? ছবি আঁকবার শক্তিই বা কোথায়? [রং-তুলি] নিয়ে একবাব যে ছবি এঁকে ছিল আজ এই কল্যাণীব ছবি এঁকে যাক্—

'না, খাও'

'কে?, আমি খাব?'

আমার স্বরের ভিতর তৃষ্ণা ও আগ্রহের পরিচয় পেয়ে গ্লাসটা সে নিজেব দিকে সরিয়ে নিল—

'দুধ কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, কল্যাণী'

'বেশ, গরম করে নিয়ে এলেই হবে?'

সূচীপত্রে যান

'কে গরম করবে?'
'আমিই করে আনব'
'তার পর খাবে কে?'
'কেন? তুমি খেতে চাও নাকি?'
একটা বই তুলে নিয়ে, একটু দূরে সরে যতেই কল্যাণী গ্লাসটা নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল।
'খাবে, খাও'
'দাও'
'আচ্ছা, একটু গরম করে নিয়ে আসি'
'আনো'
'তা, এই বেশ গরম আছে'
'তবে এই-ই দাও'
'একটু চিনি মিশিয়ে দেব?'
'তা দিতে পারো'
'চিনি হয় ত ওরা দিয়ে দিয়েছে'
'তা দিয়ে থাকবে'
'খাবে?'
'দিলেই খাই'
'কেন? তুমি কি মনে কর একটু দুধের ব্যাপার নিয়ে তোমাকে বঞ্চনা করব?'
'না, সে কথা কে ভাবে কল্যাণী।'
'তুমি কী পড়ছ?'
'একটা বই'
'দুধটা মিষ্টি'
'ও, খাচ্ছ বুঝি?'
তাকিয়ে দেখলাম সে লজ্জিত হয়ে আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।
বললাম—'কী হল?'
'ভুলে চুমুক দিয়ে ফেললাম যে'
'বেশ করেছ।'
'এখন কী হবে?'
'কেন?'
'তুমি যে আর খেতে পাবে না।'
'তা, আমার খেতে আপত্তি নেই।'
'ছি, আমার মুখেরটা খাবে?'
'তা আমি খেতে পারি'
'কিন্তু আমি কিছুতেই সে অনাচার হতে দিতে পারি না ত।'
আধ ঘণ্টা পরে তাকিয়ে দেখলাম দুধের শূন্য গ্লাসটা পড়ে আছে, কল্যাণী নেই, ঘুমুচ্ছে হয় ত।

গেলাসটা ধুয়ে নিয়ে ফিরিয়ে দেবাব জন্য বিনযের দোকানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে কল্যাণীর কথাই ভাবছিলাম। এই কল্যাণী আমার স্ত্রী, তিন বছর আগে আমি বিয়ে করেছি তাকে, কিন্তু এ তিন বছরের ভিতর প্রেমিকের পুলক একদিনও বোধ করেছি? নির্বিকার নিঃসঙ্কোচে আত্মদান অনুভব করেছে কল্যাণী? ইস্, গ্লাসটা হাতের থেকে পড়ে ভেঙে গেল। কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে-কুড়োতে কল্যাণীর কথাই ভাবছিলাম আবার।

আমাদের রক্তমাংসের সার্থকতা খাবার সময়, দাঁড়াবার সময়, হাঁটবার চলবার সময়। আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার সার্থকতা মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে কিংবা সন্ধ্যা ও ভোরের আকাশ প্রান্তরের নিরবয়ব, অবাস্তবতার দিকে তাকিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমাদের রক্ত-মাংস বুদ্ধি-কল্পনা আত্মা-প্রেম কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। সব জায়গাতেই কি এই রকম?

জানি না।

সূচীপত্রে যান

এই চৌত্রিশ বছরে অনেক চিঠি জমিয়েছি; একটা মস্ত বড় টিনের বাক্সে চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিলাম। চিরদিনই মনে করে এসেছি যে ভবিষ্যতে কোনো এক দিন এই চিঠিগুলো একে-একে পড়ব।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোনো এক বিস্তৃত প্রান্তরে আমার বাংলো তৈরি করব।

চারদিকে বাবলাগাছেব ঘন নিবিড় বেড়া দিযে মাঠটাকে রাখব ঘিবে। কিংবা বুনো কাঠ দিযে; ছোট-খাট নানা ঝুমকো লতা, কুঞ্জ লতা ও অপরাজিতার আলিঙ্গনে আলো-বাতাস কাক্-শালিখ ও পাখ-পাখালির সাড়া-শব্দে নিতান্তই বাঙালির ঘরোয়া জিনিস, পাশে হয ত মেঘনা, ধানসিড়ি, জলসিড়ি, কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী; মাঠের ভিতর ইতস্তত অশথগাছ, বাঁশের জঙ্গল, আম-কাঁঠাল, বেতের বন, কাশ, কালসোনা ঘাস, ফড়িং, প্রজাপতি, চোত-বোশেখের দুপুর, শরতেব রাত, হেমন্তের বিকাল, অপার্থিব বট।

এমনি আবহাওযার ভিতব ঘরের বারান্দায় হরিণেব ছাল পেতে বসে কিংবা অন্ধকার রাতে আলোব পাশে একটা মাদুর বিছিয়ে নিযে একে-একে চিঠিগুলো পড়ব; এই বকম ভেবেছিলাম আমি। নির্মলাব চিঠি আছে, মাব অনেকগুলো চিঠি, দাদার চিঠি, তা ছাড়া আবো নানা বকম ঘটনাস্রোতেব বুক থেকে জড়ো করা ঢের। দু-পাঁচজন নারীব উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ও ক্বচিৎ বিহ্বলতাব চিঠি আছে। দু-তিনটি দেশপ্রেমিকেব চিঠি আছে, লিখে সাহিত্যে নাম কবেছে যাবা কিংবা আজও সন্ত্রাস কবে চলেছে, তাবাও আমাকে তাদেব মধ্যে একজন ভেবে চিঠি লিখত। সবই সঞ্চয কবে বেখে দিযেছি—জীবনেব ভাঁটার সময একদিন ম্লান আলোব পাশে এগুলো পড়ব বলে।

তাও বিশ বছব ধবে এগুলো জমিযেছি; পোকা, ইঁদুব ও উঁইযেব হাত থেকে রক্ষা কবে এসেছি।

মা অনেকবাব বলেছেন এই চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিতে, এই চিঠি বোঝাই বাক্সটা কল্যাণীর চক্ষুশূল; আমি নিজেও, মাঝে-মাঝে ভেবেছি, মানুষেব জীবনেব সবচেযে সুন্দর জিনিস হচ্ছে তাব হৃদয। সঞ্চয যদি কিছু কবতে হয তবে সেখানে কবা ভাল। টিনেব বাক্সের ভিতব কেন? কিন্তু তবুও টিনেব বাক্সটা অনেক ঝড় কাটিযে টিকে বযেছে আজও। বাক্সের ভিতব আমাব নিজেব লেখা কযেকখানা খাতাও ছিল।

বিনয়কে গেলাসটা ফিরিয়ে দিযে এসে বাক্সটা খুললাম।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের ভিতবেই মনে হল, কেরোসিন তেল ও দেশলাই ছাড়া আব-উপায নেই।

আচ্ছা মাধুরীব কি একখানা চিঠিও আস্ত আছে? বিহ্বলভাবে অজস্র চিঠির ছিবড়ের ভিতব খুঁজছিলাম, মাধুবীব চিঠি, মাধুবীর চিঠি, মাধুরীর চিঠি। আঙুলে উঁইযেব কামড় লাগছে—কাদা মাটি ও গলিত উঁইযেব বসে হাত যাচ্ছে ভবে, কিন্তু সেই চোদ্দ পাতা, আঠার পাতা—এক-একখানা চিঠিব একটু যদি থাকে।

অবশ্য আঠার পাতা ভবে সে আমার প্রতি তার উপেক্ষাই প্রমাণ কবত। সেই ইস্কুলেব কলেজের কথা লিখত, বইযেব কথা লিখত, তার দিদিব ছেলে-মেযের কথা লিখত, গবম চা খেতে গিযে কী রকম কবে তার জিভ পুড়ে গেছে, পিসিমা তাব কেমন চমৎকাব লেবুর আচার তৈবি করতে পাবেন, কাসুন্দি খেতে তার কত ভাল লাগে, কলকাতায কী রকম গরম পড়েছে, কলেজের বাস কী রকম টিকুব টিকুর করে চলে, তাদের বাড়িতে রোজ দুটো-একটা করে ইঁদুর মরছে, কে জানে বেড়ালে মারে, না, প্লেগ হবে, তাদের গরুটা আজকাল চাব সের করে দুধ দেয, রাস্তার ওপাবে ডাস্টবিনের থেকে ভযঙ্কর দুর্গন্ধ আসে, সেই জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে লেখা হযেছে, গ্রামোফোনেব অনেকগুলো নতুন রেকর্ড কেনা হয়েছে, কলকাতা এবার বৃষ্টিতে তলিযে গেল—এই সব।

অনেক চিঠি লিখত মাধুরী, অনেক কথাও লিখত কিন্তু রক্ত-কাঁকবেব পথেব বুকে যেমন জল পাওয়া যায না, এই চিঠিগুলোর ভিতরেও তেমনি কোনো দরদ কোনোদিন আবিষ্কার কবতে পারি নি। আছে এগুলোর ভিতব একজন সামান্য নারীর অবৈধ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অসংখ্য বানান ভুল। কিন্তু তবুও এই মেয়েটি আমার জীবনকে করেছিল কী ভীষণ দুরতিক্রম্য। এই নারীটি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল বলেই বৈষ্ণব কবিতা, কিশোরী প্রেম ও অনেক বিদেশী সাহিত্যের অন্ধকার অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমার কাছে অপরূপ হয়ে আছে। রূপ ও প্রেমের বেদনা, পাপ ও অভূতপূর্বতা বুঝতে পেরেছি।

পড়তে-পড়তে নির্মলার [?] কয়েকটা ছবি চোখে পড়ল। নির্মলা নিজেও অনেকদিন হয মারা গেছে; কিন্তু বিধাতা তার কযেক খানা চিঠি অন্তত আমার কাছে রাখলে পারতেন।

অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হযেছিল গ্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে। সে দশ বছব আগেব কথা। পাঁচ বছর ধরে সে

আমাকে চিঠি লিখেছে; কখনো দেবাদুন থেকে, কখনো পাহাড় থেকে, কুমায়ুনের থেকে, লক্ষ্ণৌ থেকে, বিলাসপুরের থেকে, রামেশ্বরের সেতুবন্ধের থেকে, চিংল্পিপট্টমের থেকে, ত্রিচিনপল্লির থেকে অনুরাধাপুরের থেকে—পায়ে হেঁটে-হেঁটে ভারতবর্ষ বেড়াচ্ছে সে; একবার ধর্মপুরের থেকে লিখেছিল যে যক্ষ্মায় ভুগে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

তার পর আর-কোনো চিঠি পাই নি।

অনেক আগে, ধর্মপুর থেকে তার চিঠি পাবার বছর দুই আগে, গোলদিঘিতে একদিন অবিনাশের সাথে দেখা হয়েছিল। সেও এমনি শ্রাবণ মাস—গিরি মাটির মত অজস্র মেঘে আকাশ ছিল ভরে—কতকগুলো ধুমসো কাল মেঘ পঙ্গপালের মত ইতস্তত ওড়াউড়ি করছিল; দিনের আলো যাচ্ছিল নিভে; দাঁড়কাকগুলো আকাশের গায়ে-গায়ে ইতস্তত মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঘোলা সরবতের মত মেঘের এক খণ্ডে বরফের দানার মত সপ্তমীর চাঁদ বিকেল শেষ না-হতেই হাজির—তার নীচে আসন্ন সন্ধ্যার অজস্র কালো বাদুড়ের দল।

হাঁটছিলাম—হঠাৎ দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণের থেকে কে যেন আমাকে ডাকল; আবছায়ার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম একটা মিলিটারি খাকির শার্ট পরে অশ্বত্থ গাছের নীচের বেঞ্চিতে অবিনাশ বসে আছে।

সেদিন সারারাত ভরে মেঘের....কিন্তু...মন...

অনেক রাতে আমরা স্কোয়ারের বেঞ্চি ছেড়ে ফুটপথে নামলাম। হাঁটতে-হাঁটতে একবার আমহার্স্ট স্ট্রিট, করিম চার্চ লেন—আর-একবার মনুমেণ্ট, সেণ্ট জনের গির্জা—এমনি করে সারাটা রাত কাটালাম।

কী-ই বা করবার ছিল আর?

জীবন তখন একটা সমস্যার জিনিস, প্রেমের বেদনা ও জর্জরতার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু বিচ্ছেদ ও প্রণয়ের গন্ধও যে জীবন থেকে একদিন নিঃশেষে কেটে যায়! বঞ্চিত হলেও বেদনা থাকে না আর। উত্তর জীবনে মানুষের দুঃখ যে-অন্নকষ্ট নিয়ে, নারীকে নিয়ে একেবারেই নয়, সে আশ্বাস তখনো পাই নি। তাই সারা রাত অবিনাশ কবিতা আওড়াল, চুরুট টানল, অসংলগ্ন কথা বলল, একবার নক্ষত্রের মত অমানুষিক দীপ্তির, একবার ছাগলের মত আকণ্ঠমজ্জিত লালসার পরিচয় দিতে লাগল।

অবাক হয়ে ভাবি, অবিনাশ আজ কোথায়? ধর্মপুরের স্যানোটোরিয়ামে সে আজ আর নেই, হয় ত আমার মত নির্বিবাদ, নির্জীব গৃহস্থ হয়েছে কিংবা মাটির তলে হাড় পচছে হয় ত তার।

অবিনাশের বড়-বড় চিঠিগুলো একবার পড়েই রেখে দিতাম, কোনো এক দূর ভবিষ্যতে এগুলো সরস নবীন জিনিসের মত আবার আগ্রহে খুলে পড়ব বলে; চিংলিপট্টম ও মাদুরার কয়েকটা দিন কয়েকটা চিঠিতে খুব বিশদভাবে গাঁথা ছিল; অনুরাধাপুরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিন খানা চিঠি ছিল।

বারান্দায় হরিণের ছাল পেতে, কিংবা অন্ধকার রাতে প্রদীপের আলোর কাছে মাদুর বিছিয়ে এ সব চিঠি কোনোদিনও পড়তে পারব না, আমি আর। চিঠিগুলো উঁইয়ের পেটের ভেতর গিয়ে তাদের শরীরের মাংস ও রস জোগাচ্ছে, নীড় বাঁধতে সহায়তা করছে তাদের, তাদের ডিম ও সন্তান-সন্ততির কাজে লাগছে।

কিন্তু একটা পচা হোগলার বেড়া দিয়েও ত এই কাজ হত, কিংবা গর্ভস্রাবের রক্তমাখানো বালিশ ন্যাকড়া দিয়ে? আমার এই বিশ বছরের সঞ্চয়ের উপর হাত দেবার কী দরকার ছিল?

কিন্তু কাকে আমি প্রশ্ন করি? এই অন্ধ পোকাগুলোকে? আমার অবসন্ন হৃদয়কে? জীবনের দিন-রাত্রির নিঃশব্দ সঞ্চারকে?

যে-খাতাগুলোতে নতুন কতকগুলো কবিতা লিখে রেখেছিলাম—তাও নষ্ট হয়ে গেছে।

এ কবিতাগুলো কাউকে দেখাই নি। অনেকে ক্ষণ সময় কেটে যায়। অবাক হয়ে ভাবি জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে নিজেকে স্থির রাখা। ভাবতে-ভাবতে অনেক মুহূর্ত কেটে যায়, এক সময় নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করি এই ভেবে যে আলেকজানড্রিয়ার লাইব্রেরি যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন এমন অনেক অনেক চিন্তা ও কল্পনার সম্ভার ধোঁয়ায় মিশে গেছে যার তুলনায় আমার এ কবিতাগুলো কিছুই নয়।

শেষ পর্যন্ত শেক্সপিয়রের সমস্ত কাব্যও ত এক দিন বরফের নীচে ধ্বসে যাবে। পৃথিবীতে একটি মানুষও থাকবে না।

কিন্তু তবুও থেকে-থেকে মনে হয় আলেকজানড্রিয়ার লাইব্রেরির সমস্ত লুপ্ত ঐশ্বর্যের চেয়েও আমার

সূচীপত্রে যান

কবিতাগুলোর ইঙ্গিত ও মূল্য ঢের চমৎকার ছিল, শেক্সপিয়ব যা দিতে পারে নি—তাই ত দিয়েছিলাম আমি।

মেজকাকা এসে বললেন, 'উঁইয়ে খেয়ে ফেলেছে?'

'হ্যাঁ'

'সার্টিফিকেট বুঝি?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ'

'কার সার্টিফিকেট ছিল?'

'বর্ধমানেব মহাবাজাব'

'হুঁ, তা হলে চাকবি পেলে না যে বড়?'

চুপ কবে ছিলাম।

মেজকাকা—'সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন বটে আমাকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই। আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, সে আজ প্রায় ছেচল্লিশ বছর আগেব কথা। সেই সার্টিফিকেট নিয়ে আমি কে-এস শেঠ-এব কাছে যাই। আবগাবি ডিপার্টমেন্টে চাকবি আদায় কবে নেই।'

'তা শাস্ত্রীমশাই শুনে কী বললেন, হয় ত অপেক্ষা কবেছিলেন? সাব ইনস্‌পেক্টব হয়ে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ ফাল হয়ে বেবলাম ইনস্‌পেক্টর।'

গলা খাঁকবে মেজকাকা—'ব্রাহ্ম সমাজে সাধনাশ্রমেব সঙ্গে খুব যোগ [?]

ছিল এক সময আমাব—'

'ছিল বুঝি?'

'ভেবেছিলাম জীবনটা ঐখানেই কাটিয়ে দি, কিন্তু,' শাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মানুষেব জীবনের কত রূপান্তব হয, ভাবছিলাম এই সমাজেব বেদিতে চড়ি-চড়ি বুঝি, কিন্তু বছব দুয়েব মধ্যেই আবগাবিব মোটা তলব।'

'শক্তি যেখানে যায, সেখানেই কাজে লাগে।'

'তা বইকি, তোমাব বাবাবই ত শুধু কিছু হল না। চিবটা জীবন ইস্কুল মাস্টাবি কবে কাটালেন; শক্তি আমাদেব কাবো চাইতে কম ছিল কি তাঁব?' গলা খাঁকরে মেজকাকা—'এই ত তিন দিন হল তোমাদেব এখানে এসেছি, 'পবশুই আবাব কলকাতায চলে যাব।'

'পরশুই যাবেন?'

'জরুব, যতবাব এখানে আসি, দেখি, কী দুববস্থাব ভিতবেই তোমবা আছো। বাহাত্তব বছব বযসে দাদা কাদা-বৃষ্টি ভেঙে এখনো হেঁটে এক মাইল দূবেব ইস্কুলে যান, তোমাব মা চাকবানির মত খাটে—তোমাব চাকবি নেই—বৌমাব কষ্ট; নিজেকেও ধিক্কাব দি একই ভেবে যে তোমাদেব কোনোদিন একটি পযসা সাহায্য কবতে পাবলাম না। যতদিন সার্ভিসে ছিলাম মেবে-কেটে কিছু সাহায্য কবলেও কবতে পারতাম। সেই বড় ভুল হয়ে গেছে, কিছু দেওযা থোওযা উচিত ছিল দাদাকে তখন। কিন্তু এখন পেনশন খাচ্ছি, কোনো উপায নেই তো।'

'আপনাব কত পেনশন মেজকাকা?'

'পেনশন আব-কী?'

দেশলাইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম।

মেজকাকা—'আমাদেব খোঁজখবর তোমবা কিছুই রাখো না দেখছি।'

ঈষৎ হেসে কাকার দিকে তাকালাম।

'কত পেনশন তাও জিজ্ঞেস কবলে? জানো না কী নিদারুন টানাটানিব ভেতব আছি।'

বলে খাকিব হাফ প্যাণ্টেব ভিতর দু হাত চালিয়ে দিয়ে, 'এক জোড়া জুতো কিনতে পারছি না।'

'কেন?'

'পায়ে লাগে। দাদা যখন কলেজে পড়তেন তখনো, এখনো, নিউ কাট [?]

কিন্তু আমার অক্সফোর্ড না হলে চলে না,' একটা হাত তুলে বললেন।

'জুতোর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোল কী রকম হওযা চাই জানো?'

'কী বকম?'

'ম্যাক্সিমাম ওয়েট সোল,' বলে, বিস্ফারিত পরিতৃপ্ত চোখে আমার দি:ক তাকালেন কাকা।

বললাম—'বেশ।'

খুব অস্বস্তিব সঙ্গে—'মেজকাকা, ক দিন টেঁকে?'

'সে অনেক দিন, সঙ্গে কতকগুলো চীনে বাজারের জুতো রাখতে হয। আমি যখন যে স্থলে বেরুই এই জুতো নিয়ে বেরুই। এই তো, যে-জুতোজোড়া পরেছি এ তো অক্সফোর্ড নয, চিনেম্যানেব তৈবি।'

'খুব চরিতার্থতায় দিন কাটছে আপনার।'

'আমার?' ঈষৎ ভ্রূকুটি করে মেজকাকা বললেন, 'কেটে যাচ্ছে এক বকম। অদৃষ্টেব দোষ দেই না। কাউকেই গালিগালাজ করবার প্রবৃত্তি হয় না।'

'কেন দেবেন? সবাই আপনাকে দু হাত ভরে দিযেছেন।'

'না, দু হাত ভরে দেন নি অবিশ্যি। তবে নেমকের চামচের এক চামচে দিযেছেন বটে।'

হাসছিলাম।

মেজকাকা—'যে যা-দিযেছেন, সে কৃতজ্ঞতা সব সময স্বীকার কবো। তোমাব ত এখানে সকাল বেলা মুড়ি খাও। যে-চালের ভাত খাও আমাদের ওখানে চাকর খানশামাও তা খায না।'

'আপনাব জন্য ত বাবা কযেক সের দাদখানি চাল এনে রেখেছেন।'

'তা এনেছেন বটে; আমাকে দাদখানিই দেওয়া হয, না হলে আমাব অম্বল হয। বৌঠানও খুব রেঁধে-বেড়ে খাওযাচ্ছেন আমাকে। কিন্তু এ হল আমাব জন্য তোমাদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তোমবা নিজেবা বাবমাস যা-খাও তা দেখলে আমাদের ছক্কুব অব্দি চক্ষুস্থিব হত।'

'ছক্কু কে?'

'আমাদের বয; বিহারে বাড়ি, ছাপবা জেলায়, সেখানেও সে তোমাদের চেয়ে ভাল খায।'

একটু চুপ থেকে—'সাধনাশ্রমে কেমন খাওয়া হত?'

সে কথার কোনো উত্তব না দিযে কাকা—'মুড়ি যে আমি না খাই তা নয, মাঝে-মাঝে খেতে ভালও লাগে—কিন্তু এই যে সকালবেলা উঠে তোমরা ডাস্ট দিয়ে চা আব মুড়ি নিযে বস, দেখে আমাব বড় দুঃখ করে। আমার ওখানে ভাল দার্জিলিং চা কিংবা লিপটনেব কফি, বোল, মাখন, ডিম এই ত ব্যবস্থা—'একটু চুপ থেকে, 'তাব পর নটার সময আসে,' তাকিযে দেখলাম, চোখ পরিতৃপ্তি ও আত্মমর্যাদায ভবে উঠেছে, বললেন, 'তার পব এগারটাব সময সব চেযে টাটকা মাছ-মাংস, ডাল-তবকাবি, ভাজি, চাটনি। দাদাব মত মিছিমিছি জীবনটাকে বঞ্চিত কবে কী লাভ।

'না, কোনো লাভ নেই।'

'একটা কষ্ট! খেযে-খেযে আমাব গাউট হযেছে

একটু চুপ থেকে, 'বৌমাকে তুমি একটু বলো ত—'

'কী?'

'এই রাত্রের দিকে আমার পাযে একটু লিনিমেণ্ট ঘষে দেয'

'আচ্ছা।'

'কলকাতায দিত ছক্কু মালিশ কবে। কিন্তু এখানে ত তোমাদেব কোনো চাকব-বাকর নেই?'

'না, চাকর আর রাখা হয নি।'

'ভালই কবেছ। চাকর পুষতে আমার মাসে নিট পঞ্চাশটি টাকা খবচ হযে যায। অথচ নেমকহারামেব ধাড়ি সব, ও-পাপ বাখতে হয না, তা ছাড়া দাদার যা ইনকাম, চাকব-বাকব রেখে মুখে রক্ত উঠে বুড়ো বয়সে মরবে এ-মানুষটা।'

'আমিও দিতে পারি আপানার পাযে মালিশ কবে।'

'আচ্ছা, তুমি কেন দেবে? বৌমা থাকতে—সেটা কি ভাল দেখায? বৌমাব যদি কোনো আপত্তি থাকে—'

'না, আপত্তি কিছুই নেই।'

'হয়ত ত লজ্জা করতে পারে—নিজের শ্বশুবকে যেমনটি দেখে আমাকে তেমনটি নাও মনে কবতে পারে হয় ত।'

'কেন মনে কববে না? আপনি বাবার সহোদর ভাই।'

'আহা, এদেব মনের মধ্যে কোথায কী যে খোঁচ আমরা কি তা বুঝতে পাবি?' গম্ভীর কবে, 'নিজেব

স্ত্রীকেও কি ছাই আমি ভাল করে চিনি?'

'আমিই তা হলে মালিশ করে দেব মেজকাকা।'

'তাই দিও। বৌমার নাম যে মুখে এনেছিলাম—বল তো তোমার বাবার কাছে গিয়ে খৎ দিয়ে আসি।'

'গাউট হয়েছে আপনার কত দিন থেকে?'

'ডিম-মাংসের পরিণাম আর কী? তবে বাড়াবাড়ি হয়েছে দু-তিন বছব ধরে।

'মাংস-ডিম খান এখনো?'

'খুব কম খাই। তবুও ভগবানের আশীর্বাদ বলতে হবে এপেণ্ডিসাইটিস হয় নি, স্টোন হয় নি, গলস্টোন হয় নি, ব্লাডপ্রেসার হয় নি, গাউটের উপর দিয়ে আপদ গেছে সব।'

'শুনলাম, সেজ কাকার নাকি ব্লাড প্রেসার হয়েছে?'

'কার? রমেশের? তা তুমি আজ শুনলে? গত বছব ত মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল ।'

'তাই নাকি?'

'জানো না? বাপের ভায়েদেরও খবর রাখো না?' একটা হাত তুলে মেজকাকা—'তোমাদেরই বা বলব কী? দাদাই কি খোঁজখবর রাখেন আমাদের?

কোলের থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে খোঁড়াতে মেজকাকা—'বিধাতার কৃপায় আমি তিন'শ চার শ টাকা পেনশান পাচ্ছি। কাঁচা টাকায় অনেক ঝাল মিটে যায় কিন্তু তবুও আমাদেব মনে প্রাণে কি কোনো বেদনা থাকতে পারে না? যাক্, ভগবান আছেন, তিনিই দেখবেন, বিচাবও কববেন তিনিই। বাব শ টাকা মাইনে পেয়ে ডিম-মাংস, হ্যাম, বেকন, কোকোজ্যামেব পিণ্ডি চটকে জীবন কাটিয়ে দিল রমেশ। বেস খেলে, বছব বছব একটা ব্যবসা, দিন-রাত সিগাবেট আব ইংবেজি বই, ব্লাডপ্রেসাবেব কী দোষ?

'পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়ে এই সব বই পড়েন সেজকাকা?'

একটু আশ্চর্য হয়ে মেজকাকাব দিকে তাকালাম।

'ওপেন হাইম, এডগাব ওয়ালেস এই সব। অবসব পেলেই দিন-বাত এই সব নিয়ে পড়ে থাকে।'

'ওঃ এইগুলো?'

'এইগুলো অত্যন্ত ম্লেচ্ছ বই।'

'সময় কাটে মন্দ না।'

'চণ্ডাল দিয়ে এই সব বই পোড়াতে হয়।'

'কেন?'

'মানুষকে অন্তঃসাব শূন্য কবে ছাড়ে,' ছড়ি ঘোরাতে-ঘোবাতে মেজকাকা, 'সব সময় একটা নিষ্ঠাহীন চঞ্চলতা। রমেশের হয়েছেও তাই। মানুষেব জীবনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে আলোচনা করবার মত না-আছে রুচি, না আছে শক্তি—ভগবানকে নিয়ে রোজ দু দণ্ড বসবাব মত অবসব সে খুঁজে পায় না। একখানা ভাল বই হাতে দিলে হাঁপিয়ে ওঠে। পা ছড়িয়ে দিনরাত ক্রাইম নভেল আর সেক্স নভেল নিয়ে।'

'ক্রাইম নভেল অবশ্য আমি পড়তে পাবি না।'

'শয়তান ছাড়া কেউ পারে না।'

'কিন্তু সেক্স নভেল পড়েছি ঢেব।'

'আর পোড়ো না; তার চেয়ে বরং হকিং পড়ো'

'হকিং?'

'হ্যাঁ আর হাচিংসনের। অবিশ্যি এ সব বই কোনোদিন পড়ব না আমি; পড়লে না-হয় রাস্কিন পড়ব আব-একবার, কিংবা টলস্টয় অথবা—।'

মেজকাকাকে বললাম, 'নভেল কাড়ে সেজকাকা ইংরেজি লিখতে শিখেছে বেশ।'

'হুম, সাহেবদের সঙ্গে দুটো ইংরেজি বলতে পারে না।'

'পারে না?'

'চোখ ঠিকরে বেবিয়ে আসে।'

'তা হলে এত উন্নতি হল কী করে? সামান্য পোস্ট থেকে একেবারে গ্রেড?'

'আমড়াগাছি! খোশামুদি! তা ছাড়া আবার কী? পায়ে তেল মেখে-মেখে। আহা পকেটে ওব সব

সময়েই তেল। রমেশের জন্য তেল যোগাড় করতে গিয়ে বি-ও-সি সাবাড় হয়ে গেল।'

হাসছিলাম।

মেজকাকা—'অত আমড়াগাছি যদি আমাকে দিয়ে করাতেন ভগবান, তাহলে সাঁ করে কমিশনার হয়ে যেতাম। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে হত না আর।'

গলার আওয়াজের ভিতর যেমন বিষ, তেমন ঈর্ষা। তেমনি ক্ষোভ ও যন্ত্রণা।

ছটফট করতে করতে মেজকাকা—'বাব শ তলব মাবলেই যদি মানুষ ভাল ইংবেজি বলতে পাবত তা হলে সুরেন বাঁড়ুয্যে আনন্দমোহন বোসকে অত কষ্ট করে ইংবেজি শিখতে হত না। একটা দারোগাব কাজ নিলেই ল্যাটা চুকে যেত। টেন্স-এর জ্ঞান নেই।'

'কার?'

'রমেশেব। একটা থার্ড ক্লাস-এব ছেলেও ত বোঝে যে যদি পাস্ট টেন্স.....'

কিন্তু চুপ কবে গেলেন মেজকাকা। গ্রামাবেব অনাবশ্যক আলোচনাব কোনো দবকাব বোধ কবলেন না।

গলা খাঁকরে, 'আই-সি-এস-এব কাছে মেয়েব বিয়ে দিয়েই দেমাক বেড়েছে বমেশেব। তোমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করে? একখানা চিঠি লিখে শুধোয়? একটা পয়সা পাঠায়? দাদা চিরটাকাল ভেক ধরেই ধরেই গেলেন—যেন নামাবলি গায়ে বৈরেগি ঠাকুর; বক্ত নেই আঁচ নেই, যেন ঠাণ্ডা শালগ্রামটি। তা না হলে রমেশের এত বাড় বাড়ে? বাব শ টাকা মাইনে পায়, ছ শ টাকা দাদাকে পাঠাতে পারে না?'

'আমাব মেয়ে বি-এ পাশ কবে টিচাবি করছে, বিয়ে কবছে না। মদ-গরু-খাওয়া সিভিলিয়ানদের সঙ্গে বিয়ে দেব তাই বলে? বমেশটা ত দিল।'

সন্ধ্যার সময় মেজকাকাব পায় লিনিমেণ্ট মালিশ কবে দিচ্ছিলাম। বললেন, 'মালতীব জন্য একটা ছেলে দেখে দিতে পাব? নিতান্ত সাবকেল অফিসাব, সাব ডেপুটি যেন না হয়। কবে খেতে পাবে যেন, অন্তত ডেপুটি অ্যাসিসটেণ্ট।' খানিকক্ষণ অশোভন বিস্তব্ধতাব পব মেজকাকাব একটা ব্যথিত দীর্ঘনিশ্বাস। 'মালতী অবিশ্যি নিতান্তই শাদাসিধে মেয়ে। চেহারায় চবিত্রেও।'

'তাহলে এদেব একজনকেই বিয়ে করুক না কেন।'

'তা হয় ত কববে না।'

'কেন?'

একটু স্বদেশীর অভিমান আছে কি না আমাব মেয়ের। মাঝে-মাঝে কংগ্রেসেব ফ্ল্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

'সে ত বেশ ভাল কথা।'

'কিন্তু বর পেলে বিয়ে কবতে পাবে। ধবো, বিলেত-ফিরেত আই-সি-এস যদি ওকে বিয়ে কবতে চায়। একজন সাব-ডেপুটিব জন্য মালতী তাব স্বদেশীকে ত স্যাকবিফাইস কবতে পাবে না; কিন্তু স্বদেশীর জন্য সিভিলিয়নকে স্যাকবিফাইস কবা বাড়াবাড়ি। এক সুভাষ বোস কবতে গিয়েছিল। হত্যা দিয়ে পড়েছে গিয়ে তাই। এ-সব ভগবানেব দাড়ি ধবে টানা-হেঁচড়া কি আমাদেব মত মানুষেব সাজে বে ভাই? তা আমাদের এক বকম ঠিকই আছে সম্বন্ধ।'

'কাব সঙ্গে?'

'অঘোরা মজুমদারের ছেলে বিলেত গেছে সিভিলিয়ান হবাব জন্য। ফিবে এসে মালতীকে বিয়ে করবে। মালতীও কোনো আপত্তি কববে না। স্বদেশী কবে ভাওয়ালি যাবাব সাধ হয় নি ত।'

দেখতে-দেখতে এই মাংসপিণ্ড ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার আগে মেজকাকাকে অবিশ্যি জেগে উঠতে হল।

মেজকাকা আমাদেব রান্নাঘরে গিয়ে কোনোদিন খান নি—রান্নাঘরে মা কী করে রাঁধে, মা, বাবা ও আমরা কী করে খাই, সে সব ইতিহাস তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

তিনি জানতে চান না, জানবাব ইচ্ছেও নেই, প্রযোজনও নেই। বিশেষত এই বর্ষাকালে, এই কাদামাটিব দেশে পাড়াগাঁয়ে এসে পিছল পথে হাঁটতে তিনি রাজি নন। পায়ে কাদা লেগে যেতে পারে, অন্তত ভেলভেটেব চটিজুতো নষ্ট হয়ে যাবে; ছাতাব আড়ে বগলে ফতুয়া যাবে ভিজে; টর্চ আছে বটে কিন্তু তবুও রাত করে বাইবে নামলে সাপখোপের সম্ভাবনাও নিদারুণ।

বিকেল বেলা আলো ফুরুতে না ফুরাতেই তিনি বেড়িয়ে এসে দক্ষিণ দিকের ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেন।

এসে পিসিমাকে বলেন—'আট আনার পয়সা গাড়ি ভাড়া নিলে। এখানকার গাড়োয়ানেরা কান মলে পয়সা আদায় করে নেয়।'

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এলাম নদীর ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে। কাঁহাতক ঘরে বসে থাকা যায়?'

'তা বেশ, ঝাউয়ের বাতাস কেমন লাগল?'

'এদেশে শয়তান আর উল্লুক থাকে বাতাসে,' একটু থেমে, 'বাতাস আলমোড়া পাহাড়ে, পাইনের বনে।'

অনেকে আমরা স্তম্ভিত হয়ে মেজকাকার দিকে তাকাই।

'গত এপ্রিলে গিয়েছিলাম—'

'কোথায়? আলমোড়ায়?'

'আলমোড়া, মুসুরি, দেরাদুন।'

এ বাড়ির কোনো দিন কেউ এ সব দেখে নি আর। দেখবেও না কোনোদিন।

বাবা একটু বিস্মিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো এক বিরাট শাদা মেঘখণ্ডের সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে দূরত্বের সৌন্দর্য ও বিস্ময়কে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন।

'প্রায় সাড়ে বার শ টাকা খসে পড়ল—'

বাবা চমকে উঠে তাকালেন মেজকাকার দিকে।

'তা কুমায়ূনের পাহাড়ে-পাহাড়ে হোটেলে-হোটেলে থাকব, টাকা খরচ হবে না?'

পিসিমা ফোড়ন দিয়ে, 'টাকা তো মেজদা নিজেই উপার্জন করেন, কারু কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয় না ত'। মেজকাকা আত্মপ্রসাদের অহঙ্কারে পিসিমার দিকে একবার তাকান, আমাদের সকলের দিকে একবার।

বললেন—'নিয়েছি সেকেণ্ড ক্লাশ রিজার্ভ করে।'

'কেন ফার্স্ট ক্লাশ রিজার্ভ করে গেলেন না মেজদা?' পিসিমা বললেন।

'যাঃ যাঃ! আমি কি রমেশটার মত বেল্লিক যে ঘুঘু সিভিলিয়ানরা যা করতে ভয় পায় আমি তাই করে বসব।'

'গোঁফে হাত বুলিয়ে নিয়ে মেজকাকা—'মালতী গেল, মালতীর মা গেলেন, বিজয় গেল, একটা বেয়ারাকেরও সঙ্গে নিতে হল—'

'আহা, যদি পাশ পেতেন মেজকাকা, আপনার এত টাকা খসল!'

'দেখো, তোমারা এই দরিদ্রতার ভিতর কায়ক্লেশে থেকে-থেকে বড় প্রবঞ্চিত হয়েছ, মানুষের আত্মাকেই ফেলেছ হারিয়ে; তোমরা ভাব টাকাই সব; কিন্তু সৌন্দর্য ও ভগবানের জন্য আমাদের তেমন পিপাসা থাকলে ডাঙা দিয়ে তিনি যে আমাদের নৌকা চালিয়ে নিতে পারেন তা তোমরা জানো?'

বাবা এই পর্যন্তও বৈঠকে ছিলেন; এবার আস্তে চোখ বুজে নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন; তাকিয়ে দেখলাম একটা টুলে বসে ইস্কুলের ছেলেদের খাতা দেখছেন নিবিষ্ট একান্ত মনে, যেন কোনো বাধা, কোনো পরাজয়, কোনো দীনতার কুয়াশা কোনোদিনও ছিল না জীবনে।

মেজকাকা—'কুমায়ূনে গিয়ে ভগবানের সত্তাকে আমি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে আসতে পেরেছি।'

মা বললেন, 'কুমায়ূনে কেন, এখানে বসে পাবা যায় না? যেমন কুমায়ূনের তেমন একানে বসেও পারা যায়।'

'সব সময়েই জীবনের জীর্ণতার ছোট নজরের কথা বলো না বৌঠান।'

মেজকাকা—'তোমাদের ভিতরে এলে ভগবানের ভাব নিয়ে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি না বৌঠান।'

'কেন?'

'না, যেখানে জীবন মানে জীবন্মৃত অবস্থা, অর্থের দুর্গতি যেখানে মানুষকে দিয়েছে সঙ্কুচিত করে,

সেখানে সৌন্দর্যের কথাই বা কী ভাবব, আনন্দের, বিধাতার স্পর্শই বা পাব কী করে? তিনি ত আনন্দের শুধু নয়, তিনি ত বেদনা—বললেন রবি ঠাকুর কিন্তু সে বেদনাব ভেতবেও একটা রূপ আছে বৌঠান, তোমাদের ব্যথা ত শুধু কুৎসিত'—মা অধোমুখে বসে রইলেন।

'সৌন্দর্য ও ভগবানকে দেখলেন মেজকাকা?'

'হ্যাঁ'

'কোথে কে?'

'কুমায়ূনেই'

'হোটেলের জানলায বসে?'

মেজকাকা বিরক্ত হয়ে আমাব দিকে তাকালেন।

'হোটেলের মেনুই বা কী ছিল? কী আন্দাজ পঞ্চরং চলত?' কে যেন আস্তে বললে।

'[ছেলেমেয়েরা] গিযেছিল?'

'হ্যাঁ গিয়েছিল কয়েকজন।'

'বড্ড ঝালাপালা করে তোলে নি?'

'না, শান্তশিষ্টই তো ছিল'

'পরমাত্মা ও পরমেশ্বর তাদেরও বঞ্চিত করেন নি?'

'না, কেনই-বা করবেন? তাদের টাকা আছে বলে? সুচের ছ্যাদা দিয়ে উট খ্রিস্টিনি কথা, ও-সব সেকেলে ঢুকতে পারে, কিন্তু ধনী স্বর্গে যেতে পারে না সে-কথা আমি মানি না। টাকা থাকলে স্ত্রী সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন করা যায, ভাল জাযাগায যেতে পাবি, ফার্স্ট ক্লাশ হোটেলে থাকা যায়, পরিপাটি খাওয়া-পরা হয়, ঘুম হয় চৌকোশ, মনে শান্তি থাকে আমাদের জীবনের এ-বকম সৎ সচ্ছল ব্যবস্থার ভিতরেই ভগবান আমাদের হৃদযে নামবার ভবসা পান।'

'হৃদয়টা ভেলভেটের কুশনের মত না হলে তিনি নামেন না বুঝি?'

শুনে মেজকাকার বৈঠকি অন্তরঙ্গতা এক-আধ মিনিট থেমে রইল।

আমার প্রতি বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ শুধু মেজকাকাই হন নি, পিপসিমাও হয়েছেন, মা পর্যন্ত।'

তাই ত!

রাত নটার সময ঘুমেব থেকে উঠে মেজকাকা, 'বৌঠান, বৃষ্টিতে ভিজে খাবার নিয়ে এসেছে দেখছি।'

উঠে বসে একটা হাই তুলে, 'এই অন্ধকার বাত-বিবেতে ঝড়-বাদলে কী কবে যে তোমবা চলাফেরা কর বুঝি না, একটা লণ্ঠন নাও!'

'লণ্ঠন? ও বড্ড ঝামেলা ঠাকুরপো'

'চোখ জ্বলে বুঝি? একটা কুপি অব্দি চাই না?'

'কুপি মাঝে-মাঝে ব্যবহার করি বটে ঠাকুরপো'

'আমাকে ঠাকুরপো ডোকো না—'

'ডাকব না?'

'বরং সুবেশবাবু ডেকো।'

মেজকাকা মাথা তুলে, 'কিংবা তাতে যদি সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাটা জড়িয়ে গেছে মনে কবো, তা হলে সুরেশ দা'

সকলেই চুপচাপ।

মেজকাকা, চশমা চোখে আঁটতে-আঁটতে, 'তোমাব শাড়িও দেখছি ভিজে গেছে বৌঠান। একটা ছাতাটাতা ব্যবহার করো না কেন? বাঃ পোলাও রেঁধেছ আজ?'

পোলাও মেজকাকার জন্যই রাঁধা হয়েছিল, ছোট এক ডেকচি আন্দাজ।

'ইলিশ মাছ ভাজাও ত গোটা দশেক দিয়েছ দেখছি—বেশ বেশ!'

খেতে-খেতে, 'আচ্ছা এই তেপযাটা তোমরা কোথায পেলে—যেটার ওপর থালা রেখে খাচ্ছি?'

'কেন? অসুবিধা হচ্ছে?'

'না, সে জন্য না, এমন ছবি-ফুল-কাটা তেপয় তো পাড়াগাঁয় দেশে দেখা যায না বৌঠান।'

'উনি কোত্থেকে এনছিলেন।'

'দাদা কি খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ, দাদার খাওয়া হয়ে গেছে বুঝি—'

পিসিমা বললেন, 'দাদা খেয়েছেন ঐ রান্নাঘরে গিয়ে।'

'কেন, কেন, এ-রকম ব্যবস্থা কেন বৌঠান? আমি খাব টেবিলে বসে, আর তিনি জল-ঝড়ে ভিজে—তেপয়টা কি কাঠের, বড় বৌঠান?'

'দেখত খোকা, সেগুনের বোধ করি।'

বললাম, 'হয় ত মেহগিনির।'

মেজকাকা চোখ পাজলে হেসে—'পাগল না ছাগল, হবে বড় জোর জারুলের। দাদা ত কিনেছেন—না হয় কোরোসিন কাঁঠাল কাঠের।'

মা একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে জানলার দিকে তাকালেন। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

মেজকাকা, 'আমাদের কলকাতার বাড়ির আসবাব পত্র সমস্ত ওক কাঠের কিংবা মেহগিনির। দেখে আসবে গিয়ে বড় বৌ একবার।'

পিসিমা—'মেজদার বাড়ি, কিসে আর কিসে, বাঘে আব বামছাগলে কী আর, ওযে ইন্দ্রের বৈঠকখানা।'

মেজকাকা চশমাব ভিতব দিয়ে বিস্ফারিত চোখে আমাদের সকলের দিকে এক-একবার তাকালেন।

খেতে খেতে, 'তোমবা যে ভরন-কাঁসার থালায় কবে ভাত দাও, আমাদের ওখানে ত সে রেওয়াজ নেই, আমবা খাই ডিশে, ড্রেসডেন চায়নাব ফুলকাটা ডিশ দেখিস নি? আমাদেব চাকর-বাকরও সেখানে থালায় খেতে চায় না। সববাযের জন্য ডিশ। পোলাওটা কেমন কড়কড়ে হয়েছে, ঘি দিতে কার্পণ্য কবেছ বৌঠান।'

পিসিমাব দিকে তাকিযে মেজকাকা, 'জানলে, পোলাও রাঁধে তোমাদেব মেজদিদি—ঘি, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম, জাফবান কত কী যে দেয। যেমন পোলাও, তেমনি ছানার পাযেস, তেমনি মাংস—সুবেন খাস্তগিরের মেযে তো আর যে-সে জীব নয বাবা।'

'কিন্তু মেজদিদি তো ইদানীং খাটেই শুযে থাকনে।'

'হ্যাঁ ইদানীং থাকনে বটে—'

'প্রায দশ-বাব বছর ধবে আমি ত তাকে খাটে শুযে-শুযে পান জর্দা—'

বাধা দিযে মেজকাকা—'সেই ভাল বে; বড়লোকেব বৌ, উঠবাব কী দবকাব বল্? আট-দশটা বাবুর্চি খানশামা ববকন্দাজ বযেছে, গিন্নিবই যদি নিজেব হাতে নেড়ে কাজ করতে হল তো এ অনামুখোগুলোকে রাখা কেন?'

মাব দিকে তাকিযে মেজকাকা, 'তুমি আজ পোলাও রেঁধে বসলে বৌঠান, কড়কড়ে পোলাও। আমি ভেবেছিলাম ঢেঁকির শাক একটু কাসুন্দি দিযে খাব।'

মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে, 'কাল খাবেন।'

'কাল সকালে?'

'বেশ, তাই হবে।'

'কাল ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে?'

'বাজারে আনতে দেব।'

'না, গঙ্গার ইলিশের মত স্বাদ ত এতে নেই।'

'যা বর্ষা—এত বৃষ্টিতে এদেশেব ইলিশের ঝাঁক ধুযে জল হযে যায। ভাল মাছ পাবেন বোশেখ-জ্যৈষ্ঠতে।'

'ভাল হোক, মন্দ হোক, ইলিশই যেন আসে। আর খুব বড় দেখে চিংড়ি, গলদা, আমরা জন্য মাছের ডিমের বড়া করো, মুর্গির ছোট ডিম ওমলেটের মত করে ভেজো। কুমড়ো ফুল পাওয়া যায? ব্যাসন দিয়ে ভেজো তো, বড়ি দিযে একটা পালং শাকের তরকারি রেঁধো তো; তোমাদের গেরস্ত ঘরে আমচুর আছে না বৌঠান?'

'আছে।'

সূচীপত্রে যান

'থাকবারই কথা; আমচুরের টক মন্দ লাগে না। যারা বাগিয়ে রাঁধতে পারে তাদের হাতে। আমাদের বাবুর্চিটা শিখেছে—মালতী শিখিয়েছে। মালতী একজন পাকা গিন্নি, বুঝলে!'

'তা হবেই তো, বড় লোকের মেয়ের হাঁটতে-কাশতেও রূপ খুলে যায়।'

'তবে, এসব ধরনের রান্না সে রাঁধে না, কাটলেট, কাস্টার্ড, পুডিং।

মা—'কাস্টার্ড, পুডিং কী?'

মেজকাকা দাঁত বার করে হেসে, 'সে আছে এক রকম মাকাল ফল। যাক্ তুমি এখন এঁটো পাত কুড়োও বড় বৌ। দাঁড়িয়ে থাকলে তো তোমাদেরই রাত বাড়বে।' এঁটো কুড়িয়ে থালা নিয়ে মা চলে যাচ্ছিলেন। মেজকাকা খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে, 'আবার অন্ধকারের মধ্যে ডুব মারবে বুঝি বৌঠান?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'কোথায় চললে?'

'ঘাটে।'

'থালা বাসন মাজতে?'

'হ্যাঁ'

'এই অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে?'

'এ কি আজ নতুন, ঠাকুরপো।'

'তোমাদের কর্মের ভোগ ভোগো গিয়ে। আশা করি আসছে জন্মে তোমাদের মেজ বৌর মত খোঁচকপাল নিয়ে পৃথিবীতে আসবে।'

'খোঁচকপালে নয়নখান চিরকাল'—বলে হাসতে-হাসতে মা অন্ধকারের মধ্যে নেমে পড়লেন। আমিও চলে যাব ভাবছিলাম; মেজকাকা র‍্যাগটা টেনে নিয়ে গায়ে-পায়ে ভাল করে জড়িয়ে, বালিশে ঠেস, দিয়ে, 'এই অন্ধকারের ভিতরে সিদ্ধ ব্রাহ্মণরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন বুঝলি।'

'কোথায় বেড়াচ্ছেন?'

'আঁদারে-বাঁদারে বিলে-জঙ্গলে, বড় বৌ বাসন ধুতে গেল সেই ঘাটের সিঁড়িতে।'

পিসিমা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে, 'তার মানে?'

'ও কীরে ভয় পেয়ে গেলি?'

'তুমি ভূতের কথা বলছ?'

'ব্রাহ্মণ মানে বুঝি ভূত? আচ্ছা হাবা'

'তবে কী মেজদা?'

'না রে বাবা আমাকে জড়াতে আসিস নি; মেয়ে লোক আর পেত্নির কাণ্ডে ঢের ঘেন্না আমার। ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বোস। ব্রাহ্মণের মানে বলে দিচ্ছি।'

পিসিমা গিয়ে বসলেন।

মেজকাকা—'রাতের বেলা নামটা নেব?'

'ওঃ বুঝেছি, থাক, নিয়ে দরকার নেই।'

'কিংবা রাতের বেলা 'লতা' বললেই হয়। লতার ভিতর ব্রাহ্মণও আছে জানিস।'

পিসিমা ভুরু কপালে তুলে বললেন, 'থাক মেজদা, এসব থাক এখন।'

'গোখরো সাপ জাতে ব্রাহ্মণ, কালনাগিনী ব্রাহ্মণী।'

আমার ঘুম পাচ্ছিল। ঘাটের সিঁড়িতে অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে মা এত বছর ধরে তো অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে আসছেন। গভীর রাতে ঘরের ভিতর একবার নিঃশব্দ পায়ের সঞ্চার শুনি। সুপুরি কাটার শব্দ, গুনগুন করে খানিকটা গান; বুঝি মা সারাদিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরেছেন; এমনি করে চৌত্রিশ বছর দেখলাম; একদিন যদি এই স্নিগ্ধ আশ্বাস ও উপলব্ধির পথে অন্ধকার বাধা এসে আঘাত দেয়, তা দিতে পারে; সৃষ্টির নিয়মই ত আঘাত দেওয়া। বেদনা ও অক্ষমতার কী গভীর সমুদ্র চারিদিকে; উহাসের কী অপরিসীম ধূসর পাণ্ডুর দিন্‌বলয়। এমনি বাদলের অমাবস্যার রাতে (সকলেই তো আর নৈনিতালের উজ্জ্বল হোটেলে ভগবান ও সৌন্দর্যের সন্ধানে যেতে পারে না,) কত চাষি ধানের ক্ষেতে ফিরছে, পাটের চাবার ভিতর ঘুরছে; কত বধূ খাল-বিলের কাছে বসে।

পর দিন সকালবেলা বাবা, 'এই ত তোমার কাকা এখানে রয়েছেন। ইনি থাকতে-থাকতে এঁকে চাকবি-বাকরির কথা বলো না!'

চুপ করে ছিলাম।

বাবা—'তুমিই বলো, সেটাই ভাল হবে; জানো ত এ সব বিষয় নিয়ে আমি কোনোদিন কথাবার্তা বলি না কারু সঙ্গে।'

দক্ষিণের ঘরে গেলাম; কাকা চা খাচ্ছিলেন।

কাগজওয়ালা রাস্তা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল—একটা 'এ্যাডভান্স' রেখে কাকাকে, 'পড়বেন?' হাত বাড়িয়ে কাগজ তুলে নিয়ে—'বেশ, পড়তে আমাব আপত্তি নেই; খবব না পেযে কত দিন মনে হচ্ছিল [অন্ধকাবে] পড়ে আছি। তোমবা এ-বকম জেলখানায় কী করে থাক, বলো ত?'

একটু হেসে, 'আমি ফ্রি রিডিং রুম-এব থেকে নিয়ে পড়ে আসি।'

'আব তোমার বাবা?'

'তিনি কাগজপত্র বড় একটা পড়েন না।'

'মনে-মনে ভাবেন বুঝি কাগজের ভিতর বলাৎকাবেব গল্প ছাড়া আব-কিছু নেই? চশমাটা, এটাচি কেসে, দেখতে পাবছি না, এটা কী কাগজ রাখলে তুমি?'

'এ্যাডভান্স'

'আনন্দবাজার বিক্রি হয না এখানে?'

'হয'

'তাই ত বাখলে হত, কিংবা ষ্টেটস্‌ম্যান, বাসি দুধে চা কবা হযেছে বুঝি?'

'কই না ত।'

'তা হবে, বাসি দুধেই কবে দিযেছে বোধ কবি। বৌঠান তো ঠাকুবপোব জন্য টাটকা দুধ-দুধ বলে খুব দহবম-মহবম কবছিল।'

মা বান্না ঘবে থেকে, 'টাটকা দুধেই কবা হযেছে।'

মেজকাকা—'বেশ, আমি বাজা হয়ে গেছি।'

পিসিমা—'হবে; এটুকুব জন্য বোঠান কি আর বাড়িযে কথা বলবে? তবে তোমাকে বলি কি মেজদা, এবা দুধ জাল দিতে জানে না। আঁচ পাকতে দেয না, কাঁচা আঁচে চড়িযে সমস্ত দুধ ধোঁযায নষ্ট করে ফেলে।'

'মবি, চাযেব পেযালটাবই-বা বাহার কত।'

'দাদা কিনেছিলেন; মোক্তারের পছন্দ।'

কাগজটা তুলে নিলাম।

মেজকাকা—'তা পড়বে? তুমিই পড়ে—'

—'আপনি পড়বেন?'

—'না, খেতে-খেতে পড়তে পাবি না আমি।'

দু-চার মিনিট নেড়ে চেড়ে কাগজটা বেখে দিযে বললাম, 'বাবা বলছিলেন—'

'কী বলছিলেন?'

'আমাব জন্য চাকবি-বাকরির ব্যবস্থা কোথাও কবে দিতে পাবেন?'

একটু চুপ থেকে মেজকাকা, 'দাদা আমাকে নিজে এসে বললেই পাবতেন—'

—'উনি এসব বিষযে কাউকে বলেন না বড় একটা—'

—'তাঁবেদাব পাঠিযে দিলেন তোমাকে; ছেলেব দায যে বাপেবই দায—তা জান, আমি আর বমেশ, কক্ষনো ছেলেদেব পাঠিযে দেই না। মুরুব্বিদের কাছে গিযে নিজেই তাঁবেদারি করি। এই ত সংসারের নিযম।'

চাযে এক চুমুক দিযে, 'দাদা চিরটা কাল ফাঁকি দিযেই বললেন।'

'পিসিমা—'সে যাক; সে কেঁচো খুড়ে কী-আর লাভ হবে মেজদা? আপনাকে যখন এসে ধবেছে হেম, তখন একটা ব্যবস্থা দিন।'

'তোমার মনে কর আমি একেবারে লাট সাহেব; চাকরি আমার পকেটে।'

পিসিমা গলা খাটো কবে—'আজকাল চাকরি-বাকরির যা হা-পিত্যেশ, কপালে অনেক পুণ্যি না

সূচীপত্রে যান

থাকলে কেউ পায় না।'

মেজকাকা—'মানুষের চাকরি জুটিয়ে দেয় শ্বশুর কিংবা মামা। তোমার শ্বশুরকে খুঁজেছিলে?'

পিসিমা—'ওর শ্বশুর তো নেই।'

—'নেই? কী হ'ল তার?'

—'অনেকদিন হল মারা গেছেন।'

—'তবে এমন জায়গায় বিয়ে করতে গেল কেন?'

—'সে ভুল হয়ে গেছে, শোধরাবার উপায় নেই তো এখন আর।'

মেজকাকা—'বেঁচে থাকতে তোমার শ্বশুরমশাই করতেন কী?'

—'কোন একটা স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।'

—'ম্যানেজার না, নায়েব?'

—'ম্যানেজার'

—'তা সেখানে গিয়ে নায়েবি করো না তুমি।'

পিসিমা—'হেম নায়েবি করবে? তা পোষায় না; সে ভুঁড়ি কোথায়? তার চেয়ে মাস্টারি করলে মানায়।'

—'সেখানকার নায়েব এখন কে?'

—'জানি না।'

—'ম্যানেজারই-বা কে?'

—'কী একজন ব্যারিস্টার।'

—'তোমার শ্বশুর কি ব্যারিস্টার ছিলেন?'

—'না।'

—'তবে?'

—'বোধকরি বি-এল পাশ করেছিলেন কিংবা—'

—'ফেরেব্বাজ নিয়ে জমিদারি চালিয়ে নিয়েছে তো?'

খানিকটা গলা খাঁকরে—'আর তুইএ্যা, তোমার, মাতা তিনি করেন কী?'

—'তিনি পোস্ট অফিসে—'

—'চিঠি সর্ট করেন বুঝি?'

—'রেজিস্ট্রেশন ক্লার্ক বোধ হয়।'

—'যাক, তবুও ভাল।'

—'ছোট-খাটো জমিদার যেমন আছে, তেমিন আমার শালা ছোট-খাটো কাজ করে—'

—'শালা কত টাকা পায়?'

—'পঁচিশ।'

—'এই সব আস্তাকুঁড়ের মধ্যে বিয়ে করলে তুমি?'

খানিক ক্ষণ চুপ থেকে—'অবিশ্যি চাকরির উমেদারির জন্য আমার কাছে এসেছ, দাদা দিয়েছেন পাঠিয়ে—তা অনেক বড়-বড় ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ আছে বই কি—'

—'তা হলে—'

—'এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার, মিনিস্টার।'

—'তবে তো আপনি চেষ্টা করলেই পারেন।'

—'না, বেঙ্গলে কিছু হবে না।'

—'কেন?'

—'বড় ছেলেটাকে ইউ-পি-তে পুলিসে ঢুকিয়ে দিয়েছি। মেজটা বেহারে আবগারি ইন্সপেক্টর। বিজয়কে নিয়েই একটু মুশকিলে পড়েছি? হারামজাদাটা ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারত যদি, এক এস-এস-আই কি টি-আই, করে দেব আর কী। আমার আলাপ-পরিচয় সব আগে।'

—'বেশ আপেই হোক।'

—'সে বাঙালির হয় না, আদব-কায়দা জানে পশ্চিমি মুসলমান, বুঝলে? এক-একজন আমাকে নিয়ে কী যে করে উঠবে বুঝতে পারে না। সে আমার পা ধুয়ে জল খেলে যেন কৃতার্থ হয়।'

সূচীপত্রে যান

একটু চুপ থেকে—'কলকাতায় অনেক ডিপার্টমেণ্টেও আমার খাতির; সুরেন দাশগুপ্তকে চেনো?'

—'কোন সুরেন দাশগুপ্ত?'

—'আবার কোন সুরেন দাশগুপ্ত—বাংলা দেশে কটা সুরেন দাশগুপ্ত থাকে? তেলের কারবার করে লাখ টাকা করে ফেলেছে।'

—'আমি ভেবেছিলাম সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল।'

—'দূর দূর! সাত ছেলে। এক ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি দেবার জন্য। জুটিয়ে দিয়েছি; এই তো ছ মাস আগে।'

—'আমাকেও দিন না।'

—'ভেকান্সি নেই আর?'

পিসিমা—'সুরেন দাশগুপ্তের ছেলেকে না দিয়ে ও-কাজটা হেমকে দিলে হত মন্দ না।'

—'আহা, সে ছেলে এসে যে আমাকে বাবা ডাকল।'

একটু চুপ থেকে—'বেশ ছেলে! অত বড় তেলের কারবারের মালিক হল বাপ, অথচ ছেলের একটুও ভড়ং নেই। শাদাসিধে। গান্ধী ক্যাপ মাথায় দেয়। মালতীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম—দিব্যি ঝাড়া ঝাপ্টা।'

বললাম—'অন্য কোনো ডিপার্টমেণ্টে'

—'আলাপ তো আমার সব ডিপার্টমেণ্টেই আছে—'

—'তা হলে কলকাতায় গিয়ে এই সম্পর্কে আপনার সঙ্গে দেখা করব—'

—'কাকার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে, তাও আবার অনুমতির দরকার হয়?'

—'না, এই সম্পর্কে?'

—'এই ডিমটা পচা না কি রে?'

—'কই? না ত।'

—'কেন, ছোট ডিম।'

—'কেমন হাঁস-হাঁস মনে হচ্ছে।'

—'না, না, কাল আবদুল্লার কাছ থেকে রাখল বৌঠান।'

বললাম—'ডিমটা ভালই, তা তোমার [? আপনার] সঙ্গে চাকরির সম্পর্কে কলকাতায় গিয়ে দেখা করব?'

—'ছ মাস আগে যদি দেখা করতে একটা কিছু করা যেতে পারত।'

—'আবার সুযোগ আসবে।'

—'তোমার বাবার যেমন এসেছে।'

—'তদবির করতে দোষ কী?'

—'তুমি গেলে না কেন?'

—'যাওয়া হয়ে ওঠে নি; বিশ বছর আগের কথা, তখন রুচি প্রভৃতি ছিল অন্য রকম।'

—'কাজ শিখতে পারতে কিংবা প্লামবার অথবা ওয়াটার ট্যাঙ্ক-এর কাজ। এর কত রকম ডিপার্টমেণ্ট আছে।'

—'আবগারিরও তো ডিপার্টমেণ্ট আছে। সেও মন্দ পুরুস্কার নয়, অন্তত সাধনাশ্রমের থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তো।'

—'আমি ভাবছি আবার সাধনাশ্রমেই ঢুকব। এইবার বেদিতে উঠবে গিয়ে। সমাজের বন্ধু-বান্ধবরাও তাই বলছেন।'

—'তুমি না শুনেছিলাম ম্যানেজারি নেবে?'

—'কই? না।'

—'পেলে না?'

—'তোমরা আমার সম্বন্ধে কত অভূতপূর্ব কথাই শোনো, সাহেবের সেক্রেটারি হবার জন্য তদবির করছি, মাদ্রাজে চেষ্টা করছি। কলকাতার ইনসিওরেন্সে বড় চাকরি নিয়েছি।'

—'তোমার সম্বন্ধে কোনো গুজবে আমরা বিশ্বাস করি না মেজদা। সংসারের লোকেদের চিনি না না কি? মানুষকে ঈর্ষা করে তার সম্বন্ধে মিছিমিছি কত কুচ্ছা রটিয়ে বেড়ায়।'

সূচীপত্রে যান

—'অবিশ্যি যা পেনশন পাচ্ছি আমি, তাতে আমার চলে না। চাকরি একটা পেলে ভাল হয়। আমাকে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু কাজে লাগালেন না। একজনকে নিলেন। ইনসিওরেন্সের মামাবাড়ির খবর জানি রে কিন্তু আমড়াগাছি করতে পারি না বলেই তো আজও পেলাম না। তা, এই পুজোর পর একটা পাবাব আশা আছে। একটা বড় কোম্পানিতেই ৫০০ করে মাইনে দেবে।'

পিসিমা, একটু চুপ থেকে, 'হেমকেও একটা কিছু জুটিয়ে দাও না:।'

—'ওর হবে ওর বাবার মত।'

—'কী রকম?'

—'থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড়।'

—'তা তোমার একটু চেষ্টা করে—'

—'বেশ তো, ইনসিওবেন্সে একটি এজেন্সি নিক না; নেবে এজেন্সি?'

চুপ করে ছিলাম।

মেজকাকা—'কত ছেলে থার্ড ক্লাশ, ফোর্থ ক্লাশ অব্দি পড়ে ইনসিওবন্সেব এজেন্সি নিযে বেড়াচ্ছে। আর তুমি এম-এ পাশ করে নিতে ভয় পাও?'

—'ভয না মেজকাকা।'

—'তবে? ধরো, বছরে ৫ লাখ টাকার কেস দেবে। আমবণ আওতায থাকবে।'

মা এসে পড়েছিলেন; বললেন, 'তাই তো; এই-ই কব না।'

লেগ পুলিং-এর মানে কী মা জানেন না, মেজকাকাব এ পরামর্শেব অর্থ কী কবে বুঝবেন তিনি আব!

বললাম, 'শুনলাম, কর্পোরেশনের চিফেব সঙ্গে তোমার [? আপনার] খুব আলাপ।'

মেজকাকা একটা ধমক দিযে—'আবাব বাজে কথা বলে!'

—'কর্পোরেশনেব একটা চাকরি জুটিযে দিন না।'

—'কর্পোরেশন আমাকে বলেছিলেন কযেকটা বস্তি ইন্সপেক্টবি খালি আছে শুনেছিলাম। বিজযেব প্রাইভেট মাস্টারটা না খেতে পেযে মবছে না কি, তাবই জন্য একটা জুটিযে দেব ভাবছিলাম।'

—'বেশ তারই একটা দাও না আমাকে—'

—'হ্যাঁ, সে সব কাজ আব বসে থাকে কি না। কলকাতায একটা চামাব মবলেও দু শ গ্রাজুযেট দবখাস্ত নিযে ছুটে আসে।'

—'কী করা যায তা হলে?'

গোঁফে হাত বুলিয়ে 'ও-সব দুবাশা ছাড়ো। তুবও যদি জেল-ফেবৎ হতে, বলে-কযে কর্পোরেশনে একটা ইস্কুলে ঢুকিযে দিতে পাবতাম। কিন্তু যেমন তুমি, তেমন তোমাব বাবা, বাযুভূত নিবালম্ব জীব। ইহকালটা নমো-নমো কবে কাটিযে দাও, আর কী, পবকালে কপাল খুলবে।'

কল্যাণী ভাবে কলকাতায যেতে দেবি করে ফেলছি আমি। কিন্তু দেবি আব কী? দশ দিন আগে গেলেও যা, পিছে গেলেও তাই। কেউ আমার জন্য চাকবি হাতে কবে বসে নেই। ফ্রি বিডিং রুমে বোজ গিযে খবরেব কাগজ পড়ে আসি। প্রায পাঁচ-ছ খানা কাগজ পাওযা যায। নানা বকম চাকবি খালি বযেছে বটে—রোজই খালি থাকবে, অ্যাকাউন্টট্যান্ট, কম্পাউণ্ডার, নার্স, বাজাব সবকাব, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, স্টেনোগ্রাফার, খানশামা, আযা ইত্যাদি।

কলকাতায গিয়েও কাগজপত্রে এই রকম দেখব।

আরো নানা জিনিস দেখেছি, নানা জাযগায গিযেছি, অনেকেব সঙ্গে দেখা কবেছি, কিন্তু গত ছ-সাত বছরের মধ্যে এক-আধটা ট্যুইশান পেযেছি। আব-কিছুই পাই নি। পাবই বা কী কবে? আশা-আকাঙ্ক্ষাব বিচিত্রিতা তো আমার নেই, না আছে বিরাট উদ্যমের অপবিমেযতা।

মরিস বা অস্টিনেব মত কোনোদিন আমি মোটর তৈরি করতে পাবব? গড়তে পাবব? প্রফুল্ল বায বা নলিনী রঞ্জন সরকারের মত বেঙ্গল কেমিক্যাল কিংবা হিন্দুস্থান-এর মত গড়ে তুলতে পারব? পবিমল গোস্বামীর মত অক্সফোর্ড থেকে ফিবে জুতো ব্রাশ করতে পারব?

কারুবাসনা আমাকে নষ্ট কবে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলবব, আড়ম্বরের ভিতব কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দুশ্ছেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বুকে বহন ...বার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীব এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে

দিযেছে। আমার সংসারকে ভরে দিযেছে ছাই-কালি-ধূলির শূন্যতায। যে-উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস, অথবা একটা মোটর কার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চাযের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসাযী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেড মাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে [সেই] আকাঙ্খা-উদ্যম নেই আমার।

আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের অকুতোভয স্বাভাবিকতা ও অমিততেজা সাংসারিকতা যদি থাকত তা হলে গত ছ-সাত বছরের মধ্যে কোনো-না-কোনো কাজ আমি নিশ্চযই খুঁজে পেতাম; হয ত কোনো ইস্কুলে পঁচিশ টাকার মাস্টারি নিতাম, কোনো মেসের সরকার হয়ে যেতাম হযত, লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিযে অন্ধকারের মধ্যে একদিনে হয ত প্রদীপ জ্বালিযে ফেলতে পারতাম, দর্জির কাজ শিখে ফেলতাম কিংবা স্টেনোগ্রাফার হয়ে যেতাম, নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতায ক্যানভাস করতাম হয ত, কিংবা প্রাণপণে শেয়ার বিক্রি করে চলতাম, হয ত মুদির দোকানের মালিক হযে বসতাম, কিংবা দু-তিন গ্রুপে এম-এ নিযে ফেলতাম, হয ত নিদারুণ একনিষ্ঠতার সঙ্গে জেলে পচতাম, কিংবা ভ্রূক্ষেপহীন অক্লান্তিতে পথে-পথে জুতো সেলাই করে চলতাম।

আলুর আড়ৎ না-খুলে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছি বলে মনের ভিতর কোনো বেদনা থাকত না।

যদি আমি বিবাহ না করতাম, সন্তান না হত আমার, যদি একা থাকতাম আমি—তা হলেও শিল্পসৃষ্টি ভালবেসে, সংসারে বিফল হযে, মনের ভিতর কোনো নিরবচ্ছিন্ন বেদনা থাকত না। হয ত খুব লঘু ভাবে থাকত। কিন্তু কল্যাণী ও খুকির ভার এমন একজনের উপর পড়েছে, যে, না-পারে ঐকান্তিক ভাবে শেযার ক্যানভাস করে বেড়াতে, না-পারে ঘোলের-শরবতের দোকান খুলে লক্ষ্মীকে অধিকার করবার বিন্দু মাত্র আগ্রহ দেখাতে।

সমস্ত কারুতান্ত্রিকই কি সংসারের স্ত্রীর প্রতি এমন বিরাট ভাবে উদাসীন?

তা ঠিক নয: শিল্পযাত্রীও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ হিসেবেই রক্তমাংসের সুখ-সুবিধা সুব্যবস্থা চায বই কি. কিন্তু তার জীবনের মধ্যে প্রেরণার ভিতর নিরবযবকে [উপলব্ধি] করে আনন্দ, ও অবযবসম্পৃক্ত নিষ্ফলতা, আবহমান-কাল থেকে এই মধুর মারাত্মক বীজ রযে গেছে।

একখানা গল্পের বইযের সাংসারিক দাম যে তেমন কিছু নয, একখানা কবিতার বইযের দাম যে আরো ঢের কম তা তাকে বারবার চোখে আঙুল দিযে বুঝিযে দিযেছে সংসার; কিন্তু তবুও সমস্ত কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বাতাসে উড়িযে দিযে সংসারের ছককাটা উন্নতির পথে পরিপূর্ণ অন্তর্দান করবার মত স্বাভাবিকতা কোনোদিনই সে অর্জন করতে পারে না। এমনই অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ সে, এই আর্টিস্ট। চণ্ডীদাস একজন, ভিলোঁ আর-একজন, হাইনে একজন, আর-একজন ভারতচন্দ্র। শিল্পের সাহিত্যের আর্টের ইতিহাসে এমন আরো অনেক নাম রযে গেছে যারা না-খেতে পেযে মরেছে, কিংবা যক্ষ্মায, কিংবা লাঞ্ছিত হযে, কিংবা দুর্দিনের তিমিরে স্বল্পতায।

কিন্তু তবুও শিল্পীর জীবনের নিদারুণ ভবিতব্যতার পথ থেকে সংসারের যক্ষের শান্তিনিকেতনে পালিযে যেতে চায নি, যেতে পারে নি, কেউ কোনোদিনও পারে নি, কোনোদিনও পারবে না।

চারদিকে ছাযা জমে গেছে; বিকেলের ছাযার সঙ্গে মিশেছে মেঘের গভীর অন্ধকার। নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি আরম্ভ হল। বেশ লাগে আমার এই বৃষ্টি, খড়ের উপর সম-সম শব্দ হয, ধুলোমাটির নরম সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে, কেমন একটু শীত-শীত করে, সুগন্ধি কেযা-কদমের মত দেহ কাঁটা দিযে উঠে। হৃদয শিহরিত হযে ওঠে অবচেতনে। চারদিকে তাকিযে দেখি শুধু মৌসুমির কাজলঢালা ছাযা। কিশোরবেলায যে-কালমেযেটিকে ভালবেসেছিলাম কোন এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল, বহু দিন যাকে হারিযেছি—আজ, সেই যেন, পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশের দিগঙ্গনা সেজে এসেছে। দক্ষিণ আকাশে সেই যেন দিগবালিকা, পশ্চিম আকাশেও সে-ই বিগত জীবনের কৃষ্ণা মণি, পূর্ব আকাশে আকাশ ঘিরে তারই নিটোল কাল মুখ। নক্ষত্রমাখা রাত্রির কাল দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মত রূপ তার—প্রিয পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মত অপরূপ রূপ। মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দু খানা হাত ম্লান ঠোঁট; পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোন পল্লির দিনগুলোর সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা।

সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক

পৃথিবীতে; বাবার তার লম্বা চেহারা, মাঝ-গড়নের মানুষ—শাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মত দেখতে; বহু দিন হয় তিনিও এ পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানও নেই তাদের আজ; বছর পনের আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উঁইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশহীন কলরব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল, বইঁচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তার পর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘবের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝ পথে গেলে থেমে, তার পর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে শামুক-গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নীচে একবার দাঁড়াল, তার পর পৌষের অন্ধকারেব ভিতর অদৃশ্য হযে গেল।

তার পর তাকে আর আমি দেখি নি।

অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল; মনপবনের নৌকায় চড়ে নীলাম্বরী শাড়ি পরে চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দু খানা হাত, ম্লান ঠোঁট শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায প্রকৃতি, অন্ধকারে তাব যাত্রা—।

খুব মৃদু চটি জুতোর শব্দ।
ঘরের ভিতর বাবা এসে ঢুকেছেন।
—'খোকা'।
—'আমাকে ডাকছ বাবা?'
—'শুয়ে আছিস যে?'
—'এমনিই, তুমি কখন ইস্কুল থেকে এলে?'
—'অনেক ক্ষণ'
—'সাড়াশব্দ পাই নি তো'
—'বাবান্দায় বসে ছেলেদের এক্সসাজই খাতা দেখছিলাম। তোর মা কোথায়?'
—'রান্নাঘরেই তো—'
—'তা হবে; দেখলাম এক থালা লুচি ভেজে সুরেশকে দিল; বিকেলে তুই খাস নি?'
—'না। তুমি?'
—'আমি ঐ ছোলা ভিজিযে বেখেছিলাম, একটু গুড় দিযে দিযে খেলাম। খাবি না কি?'
—'আছে আরো?'
—'ঢের আছে—'
বাবা ছোলা-গুড় আনবার জন্য উঠে যাচ্ছিলেন।
বাধা দিয়ে—'আচ্ছা আমিই নিযে আসব এখন, তুমি বসো।'
—'আচ্ছা বেশ'
একটু হাই তুলে, 'বৃষ্টি পড়ছে যে বে, টেব পাসনি?'
—'হ্যাঁ পেয়েছি।'
—'তা হলে ঝাঁপি খুলে রেখেছিস কেন?'
—'কী আর হবে?'
—'জানলার জলের ছাট এসে টেবিলের বইগুলো ভিজে যাচ্ছে যে।'
—'যাক। এমন কী আর বই?'
—'কেন, কোনো ভাল বই নেই?'
মাথা নেড়ে—'না।'
বাবা বললেন—'খানিকটা খুচরো চা এনেছি'
—'মেজাকাকার জন্য?'

—'না, সুরেশ কি আর এই ছ-আনা পাউণ্ডের চা খাবে?'
—'ছ আনা বুঝি?'
—'হ্যাঁ। চা খাবি? তা খাওয়াই ভাল, এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে ঠাণ্ডা লাগে, একটু গরম চা বেশ কাজ করে; সর্দি-কাশি নষ্ট হয়, মনের ভিতর একটু আশা-ভরসাও পাওয়া যায়। তোমার মাকে দিও, করে দেবে।'
—'তুমি খাবে না?'
—'চা খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার।'
—'নেই অবিশ্যি, কিন্তু—'
—'খেলে ঘুম হবে না যে রে।'
চাযের মোড়কটা জীর্ণ-বিবর্ণ শাদা খদ্দরেব কোটের পকেটের থেকে বেব করে বাবা টেবিলের ওপর রাখলেন।
বললেন—'কলকাতায় যাবার টাকাটা জোগাড় করেছি। কবে যাবে?'
—'একদিন গেলেই হয়।'
—'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল।'
—'এই সাত বছর ধরে কত বারই তো এলাম-গেলাম, বাবা।'
—'কিন্তু এবার তো গত সাত বছরের মত হবে না।'
—'হবে না?' একটু হেসে, 'কী করে তুমি জানলে বাবা?'
—'আমার বিশ্বাস, তোমার মাবও বিশ্বাস.....'
এটকু বিদ্রূপ করে হেসে বললাম, 'কী যেন বলছিলাম...'
বাবাকে আহত হতে দেখে জানলাব ভিতব দিযে তাকিযে চুপ করে বইলাম।
—'তোমাব মেজকাকার সঙ্গে কথা হযেছিল?
—'হ্যাঁ'
—'চাকবি-বাকরির কথা?'
—'হ্যাঁ হযেছিল।'
—'কী বললেন?'
'বললেন, তুমি আর তোমার বাবা ইহকালটা নমো-নমো কবে কাটিযে দাও, পবকালে হয ত কপাল খুলে যাবে।' দু-এক মূহূর্ত বাবা শ্রীহীন, জীর্ণ, ক্ষীণ মুখে বসে বইলেন।
তাব পবেই হো-হো হেসে—'ও, তা এই বুঝি বললে সুবেশ?'
—'হ্যাঁ'
—'মন্দ বলে নি। কিন্তু পবলোকে আমি তো বিশ্বাস করি।'
—'আমি তো কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।'
—'পারলে না?'
—'মৃত্যুর পর কী আব থাকে?'
—'থাকে বই কি; সমস্তই থাকে; আবো গভীর অধ্যাত্মভাবে থাকে, উপনিষদেব—'
—'উপনিষদ যাঁরা তৈবি কবেছেন তাঁবা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা কবেন নি তো; বক্ত মাংসের শবীরে ইহলোকে বসে যে—ধাবণা তাদেব ভাল লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন; তাঁদেব বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনো কাবণ দেখি না।'
—'এক দিন হয ত দেখবে।'
—'আশীর্বাদ করো, দেখতে পাবি যেন।'
—'নিজের মনের আন্তরিক অনুসন্ধানে যা সত্য বোধ হয় সেই টেঁকে। বিশ্বাস করো, এই আর্শীবাদ কবি।'
—'তা হলে হয ত চিরজীবন অবিশ্বাসী হয়েই থাকব।'
—'থেকো।'
—'ভাবতে গেলে তোমার দুঃখ করে না বাবা?'
—'কী দুঃখ? একে-একে যে দুই হয এ-কথা যদি আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, আমার

সূচীপত্রে যান

বুদ্ধি-বিচার কলা সমস্তই যদি সাব্যস্ত করে যে তিন হয়—তা হলে এই অন্ধতার অভিশাপ বুকে নিয়েই জীবনের পথে চলতে হবে; এ অভিশাপ মোচন করবার শক্তি আমার নেই। কোনো মানুষের নেই—বিধাতা যদি দয়া করে আলো দেন তবেই তা ঘুচতে পারে।' শাদা গোঁফ জোড়ায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বাবা বললেন—'কিন্তু এটা মনে করো না হেম, যে একে-একে তিন হয়, দুই হয় না। এই ভুল ধারণা নিয়ে তুমি জীবন চালাচ্ছ। হয় তো আমার এ ভগবানে বিশ্বাস, পরলোকে ঐকান্তিক আস্থা, সেই সব ভুল; জীবন-মৃত্যুতে আমি ধোঁয়ার ধাঁধা নিয়ে কাটালাম।' বলে শাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে হাসতে লাগলেন আবার।

বললেন 'যাক্‌ দু-তিন বছরের মধ্যেই বুঝতেই পাবব সব।'

চোখ তুলে তাকালাম বাবার দিকে।

—'ভগবান ও শান্তির দিকেই যাচ্ছি, এই ভেবে মরব।'

—'কিন্তু এও তো হতে পারে মরে জেগে উঠব না আর।'

খানিক ক্ষণ চুপচাপ।

বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে পঁচিশ টাকার ইস্কুল মাস্টারি নিও না।'

—'কেন?'

—'হেড মাস্টার হয় ত সামান্য বি-এ পাশ, ফার্স্ট ক্লাশ, সেকেণ্ড ক্লাশে ইংরেজি পড়াচ্ছেন, আর তোমাকে দেওয়া হবে ভূগোল আর অঙ্ক পড়াতে। এ সব অবিচার চোখ বুঝে ক্ষমা করে দেবার মত কোনো প্রয়োজন দেখি না আমি।'

চুপ করে ছিলাম।

—'হ্যারিসন রোডের মেসে যদি থাকো তা হলে উল্টাডিঙ্গি, ঢাকুরিয়া বা চেৎলা-ফেৎলায় কোনো টিউশন নিতে যেও না।'

—'নেব না?'

—'না'

—'কেন?'

—'এ সম্বন্ধে আমার মতামত খুব ভাল করেই জানো। হয় তো কুড়ি টাকা-পঁচিশ টাকা দেবে তোমাকে, কিংবা আরো কমই দেবে হয় ত, জীবনে টাকার মুখ তুমিও কম দেখেছ, সে ট্রেন ভাড়া দিতে গিয়ে তোমার অন্তঃকরণ খেঁকিয়ে উঠবে একেবারে। এ বড় দীনতার কথা, মানুষ এতে বড় খাটো হয়, বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে পায়ে হেঁটে যাবে সেই উল্টাডিঙ্গি, পায়ে হেঁটে ফিরবে আবার; শরীরের দিক দিয়ে এর ভেতর যত না কষ্ট, আত্মার দিক দিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি অপচয়; কেন এ অপচয় করবে তুমি?'

একটু চুপ থেকে হেসে—'তা না-হলে কী করব?'

—'তা তুমি জান, আমার সন্তান হয়ে যখন জন্মেছ তখন অনেক বেদনা বইতে হবে তোমাকে। কিন্তু প্রাণ যাতে চিমসে হয়ে যায়, ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে, এমন কোনো জিনিস করো না তুমি; বেদনা ও সঙ্কীর্ণতা এক জিনিস নয়। যে-কোনো কাজে বা চিন্তায় জীবনের প্রসার নষ্ট হয়, তার থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে নিও। বরং বাড়িতেই চলে আসবে আবার; কী আর করবে? পনের টাকার টিউশনের জন্য, টিউশনের টাকার প্রতিটি কানাকড়িও বাঁচাবার জন্য হ্যারিসন রোড থেকে চেতলায় হেঁটে যাওয়া-আসা জীবনের এত বড় শকুন কোনোদিন সাজতে যেও না তুমি।'

হাসছিলাম।

বাবা বললেন—শকুন; কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে দশ টাকা-পনের টাকার টিউশন এর জন্য যারা চেতলা-উল্টোডাঙ্গা পাড়ি দেয় তাদের দলে ভর্তি না হলে কলকাতায় যুদ্ধ যে আজকাল চলে না বাবা কি তা জানেন? দশ টাকা না হোক, বিশ টাকা পেলে?

বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে চা খাও না?'

—'খাই'

—'দোকান থেকে?'

—'হ্যাঁ'

—'বৌমার ঘরে একটা স্পিরিটের স্টোভ পড়ে আছে, খুকি হবার সময় কেনা হয়েছিল, সেইটে নিয়ে নেও।'

সূচীপত্রে যান

—'আচ্ছা'

—'এক বোতল স্পিরিট কিনে নেবে—খানিকটা খুচরো চা, নিজে তৈরি করে খাবে।'

—'তা খাওয়া যায়।'

—'আর খানিকটা বাতাসা, চার, সঙ্গে। সন্ধ্যার দিকে কী করো?'

—'যদি টিউশন থাকে তো ছেলে পড়াতে যাই।'

—'আর যদি না-থাকে?'

—'তাহলে ফুটপথে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে, ওল্ড বুক শপের দু-চার খানা বই নেড়ে দেখি, এক-একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, আবার হাঁটি, চায়ের দোকানের খবরের কাগজ নিয়ে চুপচাপ অনেক ক্ষণ বসে থাকি।'

—'বাঃ, এ সব কি মানুষের ভাল লাগে?'

—'না, আগে ভাল লাগত না একদম, কিন্তু কয়েক বছর ধরে তালিম হয়ে গেছে।'

—'কিন্তু তবুও এ ত সত্যিকারের জীবন নয়।'

—'তা হয় ত নয়—আমার কি ইচ্ছে করে জানো?'

বাবা তাকালেন আমার দিকে।

বললাম—'মস্ত বড় একটা মাঠের মধ্যে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে থাকি; পাশে মেঘনা কিংবা কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী। পেটের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না, দিন রাত লিখি আর পড়ি। দিগন্তবিস্তৃত সোনালি খড়ের মাঠের কিনারে বেড়াই, লাল আকাশ ভেঙে সন্ধ্যার দাঁড়কাকগুলোকে ঘরে ফিরে চলে যেতে দেখি।'

বাবা চুপ করে ছিলেন।

বললাম-'কিন্তু এ হয় ত শখ হল, পলায়ন হল, জীবন হল না। জীবন হয়ত ভিড়ের মধ্যে মিশে, যা করতে ইচ্ছা করে না, ভাবতে ভাল লাগে না, সেই অপ্রেমের কাজ ও চিন্তার জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যের চেষ্টা।'

খানিকটা সময় কেটে গেল।

বাবা এ-সব কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

বললেন—'কলকাতায় তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই?'

—'বছরের পর বছর ক্রমেই কমে যাচ্ছে।'

—'কেন?'

—'মতিগতির পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে হয় ত—'

—'বাবা একটু চুপ থেকে-'তারা হয় তো সাংসারিক সফলতা লাভ করছে।'

—'হ্যাঁ, কেউ করেছে, কেউ চেষ্টায় আছে।'

—'যাদের সঙ্গে থাকতে, কলেজে পড়তে, তারা আজ ট্রামে করে সেক্রেটারিয়েটে যায় আর তুমি ঘোরো ফুটপাতে?'

—'অনেকটা তাই'

—'অবিশ্যি এতে ব্যথা পাবারই তো কথা—'

—'না, সেক্রেটারিয়েট আর এমন-কী জিনিস, সেখানে ঢুকতে না পেরে খুব বঞ্চিত হলাম এ-কথা অবিশ্যি মনে করি না।'

—'নিজের মনকে হয় ত সান্ত্বনা দাও এই ভেবে যে এর চেয়ে কংগ্রেস ঢের বড় জিনিস। সেখানে সকলের অবাধ প্রবেশ; হয় ত কোনো এক ভবিষ্যতে সেখানে সে নেতা হয়ে বসবে।'

—'না অতদূর ভাবি না'

—'খানিকটা ভাবো নিশ্চয়ই; ভাবাই স্বাভাবিক। জীবনের আরাম ও বিলাসের জিনিসগুলো যাদের হাত থেকে ফসকে গেছে, অবশেষে তারা ত্যাগ ও মহিমার অকৃত্রিম ভক্ত হয়ে ওঠে, না-হলে দাঁড়াবে কোথায়, বলো? ঐশ্বর্য যাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করে, ঐকান্তিক অশ্রু দিয়ে ত্যাগকে পূজা করবার শক্তি তার যেমন হয়, আর কারু তেমন হয় না।'

—'কই, কংগ্রেসে আমি যাই নি তো!'

—'যাবার দরকার করে না তো; অনেক দিন থেকেই তোমার হৃদয়ে দেশপ্রেমের আসন পেতে

সূচীপত্রে যান

রেখেছ হয় ত; সে আসন সব সময়ই চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু এক-এক সময় পড়ে, যখন কলেজের বন্ধু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতায় এসে গ্র্যাণ্ড হোটেলের দিকে মোটর চালিয়ে ছুটছে আর তুমি পথের বেকার; যখন ছেলেবেলার খেলার সাথি তার মেমসাহেবকে নিয়ে বক্সে বসেছে আর তুমি চার আনার সিটে মাথা গুঁজে আছ।'

একটু চুপ থেকে—'দেশ, কংগ্রেস, দেশবন্ধু, বিরাট আত্মত্যাগ, অপরিমেয় স্বদেশ প্রেম—এই সবের কথা তখন মানুষের চিত্তকে সজীব করে গেলে তাকে সান্ত্বনা দেয়।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন,—'পৃথিবীতে টিকে থাকবার নিজের আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও আত্মার কাছে মর্যাদা পেয়ে টিকে থাকবার এই রকম সব বিধি ব্যবস্থা আছে। এ-সব না-থাকলে জীবনের নিঃসম্বলতা বড় ভয়াবহভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠত। শুধু কথা ভাবা, শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা করা। কিন্তু তবুও এ-সবের ঢের মূল্য আছে।' একটু চুপ থেকে বাবা—'বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে অবিশ্যি মানুষ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় আর-এক ভাবে—জীবনের সচ্চরিত পথ ও ভগবান কিংবা ভবিতব্যতা ও মৃত্যুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে বয়স এখনো তোমার আসে নি। এখনো দেশের মাটি, কংগ্রেস, কবিতা ও সাহিত্যের মর্যাদা, সাহিত্য স্বপ্ন, অবাস্তববাদ এই সব মোহকে আশ্রয় করেই ফুটপথে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জোর পাচ্ছে।'

—'না, মৃত্যুর চিন্তাও মাঝে-মাঝে করি।'

—'করো?'

—'মাঝে-মাঝে মনে হয় বয়স চৌত্রিশ হয়েছে বটে—সত্তর হয নি, কিন্তু তবুও সবই যেন সমাপ্ত হয়ে গেছে; কেমন একটা গভীর অবসাদ পেয়ে বসে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের বিছানার থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়, সব দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি, সব লিখেছি, তখন ঘুমিয়ে পড়া যাক, অন্ধকাব বেড়ে চলুক, কোনোদিনও যেন এই অন্ধকার শেষ হয না, ঘুম কোনোদিনও ফুবোয না যেন আব।'

—'আরো কী-রকম চিন্তা কবো?'

চুপ কের ছিলাম।

—'এই সৃষ্টিটাকে একটা পাখির খাঁচাব মত তৈবি কবে নিতে পারা যায, তখন মানুষের অবস্থা বড় ভয়াবহ ওঠে। আমার অনেক সময মনে হয জীবনটা কলে ধবা ইঁদুরের মত। যেন চারিদিকে শিক আর শিকল শুধু—না আছে রূপ না আছে ফুর্তি—'

বাবা বিশেষ গ্রাহ্য না করে বললেন—'দুপুববেলা কী কবো? মেসে থাকো?'

—'আগে থাকতাম না, আগে বড় নির্বোধ ছিলাম।'

—'কী বকম?'

—'মেসের বিছানায একা-একা শুযে শাকতে বড় খাবাপ লাগত।'

—'একা-একা?'

—'হ্যাঁ। সবাই অফিসে চলে যায; অফিসাবদেব মেস, সকলেই কোথাও-না-কোথাও কাজ কবে-জীবনেব জবাবদিহি দেয, জীবনেব কাছ থেকে পুবস্কার পায। এই সব অনেক দিন ভেবে-ভেবে বিছানায আব শুযে থাকতে পারি না আমি আব। মনে হত বেড়িয়ে আমিও হয ত সৃষ্টিব কাছে নিজেব জীবনের কৈফিযৎ দেবার সুযোগ বের করে নিতে পাবব।'

—'কিন্তু আজকাল বেরোও না বুঝি আব?'

—'নাঃ,' একটু হেসে বললাম, 'অবাক হয়ে ভাবি, জীবনেব চাব-পাঁচটা বছর ধবে সমস্তটা দুপুর কলকাতা শহরের কত জায়গায় টো-টো করে বেড়িয়েছি। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ইন্সিওরেন্স অফিসগুলো। এক-একটা জায়গায় পনের-বিশ বার কবেও গিয়েছি। নিজের জবাবদিহি দেবার আকাঙ্ক্ষা মানুষেব এমনই প্রবল, এমনই রুচি তার যে সে মনে কবে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের এক জন কেরানি হলেও জবাবদিহি দেওয়া হয, কিন্তু দুটো কবিতার বই বের কবলে হয না। এই চার বছর যদি আমি এক মনে শিল্পসৃষ্টি কবতাম, তা হলে অনেকগুলো মূল্যবান রচনা বের করতে পারতাম।'

—'যাক, চার বছর ঘুরেছ ভালই করেছ; না-যদি ঘুরতে তা হলে হয় ত মনে করতে কতকগুলো অসার কবিতা লিখে রাজত্ব তো নষ্ট কবলাম, রাজকন্যাও গেল।'

গোঁফে হাত বুলিযে বাবা বললেন—'আমাদের মন এই রকমই কেমন যেন রহস্যের জিনিস।'

সূচীপত্রে যান

একটু চুপ থেকে—'আজকাল দুপুরবেলা মেসে কী করো?'

—খবরের কাগজ পড়ি।

—'খবরের কাগজ আর-কতক্ষণ পড়া যায়?'

—'বোর্ডাররা প্রায় চার-পাঁচ খানা খবরের কাগজ রাখে।'

—'পড়বার ভার দিয়ে যায় তোমাব উপর?'

—'পড়তে মন্দ লাগে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত—'

—'এই তো রচনার কথা বলছিলে, কিন্তু লেখোটেখো না কেন?'

—'লিখতে চেষ্টা করি মাঝে-মাঝে।'

—'তাব পর?'

—'পেবে উঠি না-'

—'কেন? দুপববেলা মেস তো বেশ নিরিবিলি।'

—'কবিতা লেখার ওপব আগেকার সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হাবিযে ফেলেছি আমি।'

—'কেন?'

—'মানুষেব জীবন নানা রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আস্তে-আস্তে স্থূল হয়ে পড়ে যেন—অবসাদ আসে, সমাপ্তির গন্ধ পাওয়া যায় যেন...।' একটু চুপ থেকে—'নবপর্যাযের কবিতা লিখবাব আগে এই স্থূলতা ও অবসাদটাকে ধীরে-ধীরে আত্মসাৎ কবে এর [অংশ] হওয়া দবকার। তাই এই কাগজ পড়ে, যা হযেছে যা হয নি সেই কথা ভেবে-ভেবে, জনস্রোতেব দিকে তাকিযে-তাকিযে সমযটা কাটিযে দিচ্ছি।'

দু জনেই খানিক ক্ষণ চুপচাপ।

—'তা হলে নব পর্যাযেব কবিতা লিখবে তো?'

—'হ্যাঁ লিখব বই কি?'

-'হ্যাঁ, লিখো, একটা কিছুতেই বিশ্বাস রেখো,' বাবা বললেন, 'লাইব্রেবি থেকে বই এনে দুপুর বেলাটা পড়ো।'

—'আচ্ছা'

-'খবরেব কাগজ বিশেষ পড়তে যেও না, এই বকম হতাশ পরিশ্রমের কাজ মানুষেব জীবনেব আব দ্বিতীযটি নেই।'

বললেন—'লাইব্রেরি থেকে কী বই এনে পড়বে, সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবার অধিকার আজ আমাব নেই; যে-বই রুচিতে ধবে তাই পড়ো। কিন্তু লাইব্রেরিটা যেন উঁচু জাতের হয, যেমনটি ধবো ইম্পিবিযাল লাইব্রেরি।' একটু চুপ থেকে—'এতদিন ধবে তুমি যা শিক্ষা-দীক্ষা পেযেছ, তোমাব যা শক্তি ও বিচার আছে, তাতে এ-সব লাইব্রেবিব থেকে বই এনে পড়বাব অধিকাব পেলে নিজেব চিন্তা বা কল্পনার অপব্যহার কববে না তুমি—এই আমি আশা কবি,' —বলে উদ্ভাসিত মুখে আমাব দিকে তাকালেন।

আবাব খানিক ক্ষণ চুপ থেকে তার পর বলতে লাগলেন—'আমাদেব সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হযে মেসে একা ঘবে তুমি দুপুরবেলাটা কাটাবে—যাদেব কোনো কাজকর্ম নেই, জীবনে কোনো নিকট সফলতা নেই হয ত, যারা অনেক দিন ধবে সংসাবের কাছে বিড়ম্বিত হযে আসছে, যাদের হৃদয শেষ পর্যন্ত বাস্তবিক স্থূল নয কিন্তু সত্যিই খুব কুণ্ঠিত, নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চিত করবাব শক্তি যাদের ঢেব কম, আত্মপীড়িত করবাব শক্তি খুব বেশি—এই দুপুবেলার সময়টা তাদেব কাছে কত যে যন্ত্রণাব জিনিস হতে পারে আমি তা খুব গভীব ভাবেই বুঝি।'

কিছু ক্ষণ থেমে থেকে শেষে বললেন, 'কিন্তু তুবও কযেকটা কাজ করতে তোমাকে নিষেধ কবছি আমি, তুমি কবতে যেও না। চাকবি-বাকবি না পেযে অলস হযে থাকতে হচ্ছে বলে মিছিমিছি নিজেকে নির্যাতত করতে যেও না, তোমার চেযে অনেক কম শক্তি নিযে অজস্র লোক সংসারেব কাছ থেকে ঢের বেশি পুরস্কার পাচ্ছে বলে। কলকাতায অহরহই এই জিনিস দেখবে তুমি, দুঃখ পেতে যেও না, কারু প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, ট্রাম-বাস-লরি-মোটব ব্যস্ত-সমস্ত নিববচ্ছিন্ন ভিড়ের সমাবেশ নিযে কলকাতা শহরেব কাজের চাকা দিনরাত ঘুরে চলেছে বলে নিজের মনে স্থৈর্য নষ্ট কবে বসো না, উত্তেজিত হযে সময়ে-অসময়ে ফুটপথে ঘুরে মরো না; কাজকর্মহীন লোকের পক্ষে কলকাতা থাকা একটা বিড়ম্বনা। ফ্যাকরা হচ্ছে এই যে চারদিকের ঘাত-প্রতিঘাতেব সম্পর্কে তাবা মুহূর্তে-মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত

হয়ে ঠিকরে বেরোয়; নিজের প্রকৃত পথ ভুলে যায়, আগুনের মুখে দেওয়ালি পোকার মত জীবনের যথার্থ সম্ভাবনাগুলোকে বারংবার অন্ধভাবে নষ্ট করে ফেলে। নিজের শক্তি ও রুচির পরিমাপ খুব গভীর ভাবে বিচার করে ঠিক করে নিও। নিজেকে যে-পথের উপযুক্ত মনে করো বস্তুনিষ্ঠ হয়ে সেই পথেই চলো। জীবনের আশা, আশাভঙ্গ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরিণামের হিসেবে অবঞ্চিত থেকে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করে অগ্রসর হয়ো।'

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বাবাকে আমি বললাম—'দেখেছ বাবা, কী রকম বৃষ্টি পড়ছে।'

—'হ্যাঁ'

—'দেশের এই বর্ষাকে জীবনের সত্তর বছর বসেই তো দেখলে।'

—'দেখলাম।'

—'পাড়াগাঁয়ের এই বৃষ্টি আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষত এমনি রাতের বেলা।'

—'বেশ জিনিস।'

মনে-মনে ভাবলাম, এই রাত আর বর্ষা যদি চিরকাল থাকত। এই বাঁশের জঙ্গলের বাতাস, ঘরের পাশের লেবু পাতার থেকে ছুপ-ছুপ জলের শব্দ, মাঠে-মাঠে ব্যাঙের কোলাহল, জাম, তেতুল ও কাঁঠালের ঠাণ্ডা ডালপালার অবিরাম শব্দ, কোনো তিমিরচারিণীদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে প্রেতজীবনের প্রতিধ্বনির মত দু-তিনটি দাঁড়কাকের অবশ বিহ্বল কলরব।

—'তুমি শুয়ে পড়েছ বাবা?'

—'না'

—'কী করছ?'

—'না, একটু আলো জ্বালিয়ে পড়ছি।'

—'রাতের বেলা পড়ো না, তোমার তো ক্যাটারেক্ট।'

বাবা একটু হেসে, 'তেমন সিরিয়াস ক্যাটারেক্ট তো নয়। ভগবান শিগগির অন্ধ করবেন বলে মনে হয় না।' একটু চুপ থেকে—'এই রাতের আলোতে চোখে তেমন খোঁচা লাগে না তো।' আরো খানিক ক্ষণ চুপ থেকে, 'অবশ্য নীল চশমাটা পরেছি, চোখে বেশ আরাম লাগে।'

নীল চশমাটা অবিশ্যি সামান্য একটা এক টাকা দামের বাজারের জিনিস।

কয়েক মিনিট পরে বই বুঝিয়ে, বাতি নিবিয়ে, বাবা—জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে—'আহা, অনেক বিরহের পরে যেন এই মাঠঘাট, আম-কাঁঠালের জঙ্গল, এই করুণার সমুদ্রকে পেয়েছে।'

অঝোর শ্রাবণের দিকে তাকিয়ে জানলার পাশে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা। চিমসে রোগা চেহারা—জরাজীর্ণ চোয়াল, গাল, হাত-পা, ত্বক।

'জানলার কাছে দাঁড়িয়েছ, ঠাণ্ডা লাগবে তো তোমার।'

বললেন—'জানলা বন্ধ করে দেব?'

—'আমিই দিচ্ছি।'

নিজেই বন্ধ করলেন।

চেয়ারে খানিক ক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, পরে ধীরে-ধীরে বললেন—'এত বুড়ো বয়সেও স্ত্রী যে আমার বেঁচে আছে, রোজগারের জন্য বিদেশে-বিদেশে ঘুরতে হয় না যে আমাকে, এমনি নিবিবিলি শান্ত শ্রাবণের রাতে দেশের বাড়িতে নিজের বিছানায় যে শুয়ে থাকতে পারি—অনেকবার আমার জীবনের এই সব সমস্যার কথা ভেবেছি আমি; কিন্তু তবুও যতটা শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া উচিত ছিল তা পাই নি।'

দু জনেই চুপ করে ছিলাম।

—'দেশের বাড়িতে একাদিক্রমে সত্তর বছর কাটানো বড় কঠিন জিনিস,' একটু চুপ থেকে, 'যাক, কাটিয়ে দিয়েছি।'

বললেন—'তোমার মাও কাটিয়ে দিয়েছেন বিধাতা যদি এসে বলেন। জীবনের পুনরভিনয় করতে, বলি না, থাক, এখন ভবিষ্যতে আমাদের জন্য যা সঞ্চিত আছে তাই দাও।'

তেঁতুল গাছের ডালপালার ভিতর কয়েকটা বক বকবক করে ডেকে উঠল। বাবা বললেন—'তোমার মা এখনো আসেন নি?'

—'না,

—'রান্নাঘরে আছেন?'

—'দক্ষিণের ঘরে মেজকাকার সঙ্গে গল্প করছেন বোধ করি'

—'বৌমা কোথায়?'

—'খুকিকে নিয়ে ঘুমিয়েছেন দেখে এসেছি।'

—'তোমার ঘর আজ যে বড় অন্ধকার করে রেখে দিয়েছ, আলো জ্বালো নি যে?'

—'জ্বালি নি, এমনি।'

—'রোজই তো আলো জ্বেলে পড়াশোনা করো।'

—'আলোটা মেজকাকার জন্য নিয়ে গেছেন।'

—'কে?'

—'পিসিমা।'

—'কেন?'

—'মেজকাকার ও-ঘরের আলোর চিমনি ফেটে গেছে।'

—'ওঃ, তা হলে আমাকে আগে বলো নি কেন?'

—'আলোর দরকার বোধ করি নি আজ আর।'

—'লাগলে আমার দেরাজ থেকে মোমবাতি নিয়ে এসো।'

—'তা আনব।'

—'তোমার এদিকের জানলা খুলে রেখেছ দেখছি—'

—'দেখো, কেমন লেবু গাছের পাতা জানলার ভিতর দিয়ে এসে ঘরের ভিতর ঢুকেছে, লেবু ফুলের গন্ধ পাচ্ছ, বাবা?'

বাবা একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ, অন্ধকারে কেমন একটু হালকা গন্ধ।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'এমনি পাড়াগাঁর এই সব রাত তোমার খুব ভাল লাগে বুঝি?'

মনে-মনে ভাবছিলাম, অলস নিষ্কর্মা লোক, সংসারের পথ থেকে যে ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে, এ রাতগুলো তার পক্ষে কী যে পরম সুন্দর আশ্রয়ের জিনিস! জেগে থেকে স্বপ্ন দেখা যায়। যা পাওয়ার জন্য সারা জীবন মিছিমিছি পথে ঘুরেছি, হাতের কাছে কুড়িয়ে পাই—বেঁচে থেকে, বিছানায় শুয়ে গড়িয়ে, উদ্দেশ্যহীন বিড়ম্বনাহীন রহস্যের আস্বাদ ভোগ করি—কী যে অপরূপ।

হেসে বললাম—'যতই বয়স বাড়ছে, এই আটচালা ঘরখানাকে ততই ভাল লাগছে আমার; চারদিকে এই আম-কাঁঠাল-লেবুর বন, জঙ্গল-মাঠ-নিস্তব্ধতা, বিশেষ করে, এই আষাঢ়-শ্রাবণের রাতে, এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।'

—'তা আমি বুঝি—'

বাবা—'এখনই-বা কলকাতা যাবার এত কী তাড়া তোমার?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'কিছু কাল থাকো এখানে, ভাদ্রমাসে যেও, কিংবা পুজোর পরে।'

মাথা নেড়ে 'না-অনেক দিন দেশে থাকলাম তো। কল্যাণীকে বলেছিলাম চার-পাঁচ দিন থাকব, প্রায় পাঁচ মাস কাবার করে দিলাম। এখন তার মুখের দিকে তাকাতেই ভয় করে। বেচারি আমার ভালর জন্যই আমার উপর রাগ করে।'

—'ভাবে যে কোনোরকমে তোমাকে কলকাতায় পাঠালেই হল?'

—'হ্যাঁ। তার পর চাকরি আমাকে খুঁজে নেবেই।'

—'বহু দিন কলকাতা দেখি না, কে কোথায় বলতে পারো?'

—'না তো'

—'আর বনলতার বাবা সেই কেদারবাবু—আচ্ছা এমন বন্ধু কি মানুষের এক জীবনের তপস্যায় জোটে? চল্লিশটা বছর পাশাপাশি আমরা কাটালাম। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাটির মত মন, কত ক্ষণে-অক্ষণে আমার কাছে এসে বসেছেন। এমনি বৃষ্টির রাতেও কত গভীর রাত পর্যন্ত মুখোমুখি বসে আমরা আলাপ করেছি কিংবা চুপচাপ বসে রয়েছি।'

একটু চুপ থেকে—'আর বনলতা?' আমার দিকে তাকিয়ে, 'মনে হয় তার কথা তোমার?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'না। ভুলেই গেছ হয় ত।'

সূচীপত্রে যান

খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বললেন, 'কিন্তু'—। কিন্তু, এই বলেই চুপ করলেন—কথাটা বাবা আর শেষ করলেন না।

বললেন—'খুকি দুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিল?'

—'কী জানি?'

—'ওর মার আবার এদিকে দৃষ্টি নেই একটুও।'

—'দুধ না-খেলে কেঁদেই উঠবে।'

—'সে তো অনেক রাতে।'

—'মেয়ে কাঁদলে ওর মা বড্ড বিরক্ত হয—মাঝে-মাঝে পাখার ডাট দিযেও মারে। আমিই গিযে দুধ খাইয়ে আসব।'

—'অত রাতে গরম করে খাওয়াবে তো?'

—'হ্যাঁ, তা বইকি, দুধ গরম করে নিতে হবে।'

—'তাই করো; স্পিরিট ফুরিয়ে যায় নি?'

—'গেলে, কাগজ জ্বালিয়ে নেব।'

—'কেমন, গাযে লাগে না যেন কিছু মেযেটার; কেমন চিমটে বিড়ালের মত চেহারা; মনে হয় যেন একটা শুকনো পাতা হাঁটছে, বাতাসেব এক ফুঁয়ে যাবে উড়ে; আড়াই বছর বযস হল, অথচ দেখে মনে হয় যেন এক বছরও পেবয় নি। খেতে পায? না, খেতে পায না? না কিছু গুরুতর অদৃশ্য অসুখ? তুমি বললে—রাতে মাঝে-মাঝে টেম্পারেচার রাইজ করে?'

—'হ্যাঁ'

—'তা, কালমেঘটা খাওযাচ্ছ?'

—'খাচ্ছে।'

—'তুমিই খাইয়ে দিও, বৌমার উপব নির্ভব কবো না, তা হলে হয ত গাফিলতি হবে।'

গোঁফে হাত বুলিযে—'মথুর ডাক্তার বললেন খাওযাতে, আমি এনেছি একটা—'

—'আনলে বুঝি?'

—'ইস্কুল থেকে ফেরবাব সময নিযে এলাম, কালমেঘটা ফুরুলে দিও এটা।,

—'আচ্ছা'

—'বৌমা সন্ধ্যের থেকে ঘুমুচ্ছে? খেযেছিল?'

—'বিকেলে খেযেছে।'

—'কী খেল?

—'জলের মধ্যে খানিকটা তেঁতুল গুড় গুলে, দু-তিন হাতা পান্তা।'

বলে হাসতে লাগলাম।

—'এই শুধু? আর-কিছু না?'

—'না'

—'বোজ এই রকমই করে,'

—'হ্যাঁ এই রকম।'

বাবা গম্ভীর মুখে—'অসুখ করেছে না কি?'

—'না'

—'তবে?'

—'এই রকমই ওর রুচি কিংবা আমাব উপর হয ত মান।' বাবা একটু চুপ থেকে—'বাঁচবার ইচ্ছে নেই?'

'কী জানি।'

দু-চার দিন কেটে গেছে—কিন্তু তবুও কলকাতায যাওযার কোনো চাড় নেই। কল্যাণী তেঁতুলের জল দিয়ে ভাত খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু-চারটে মরিচ পুড়িযে নেয, কোনোদিন উপবাস দেয। কিন্তু তবুও এই সুখ ছেড়ে সহসা যাওয়া হযে ওঠে না। খুকি দুপুর রাতে বোজ কেঁদে ওঠে।

মা, বাবা, কল্যাণী কেউই কোনো সাড়া শব্দ করে না। তার পর কান্না বাড়তে থাকে, পাখার ডাঁট দিয়ে পিটুনি শুরু হয—তবুও নড়তে ইচ্ছা করে না বড় একটা।

সূচীপত্রে যান

বাবা বললেন—'খোকা, জেগে আছিস?'

—'আছি'

—'খুকি কাঁদছে—'

—'শুনেছি।'

—'মার খাচ্ছে মেয়েটা, আহা-হা, আহা-হা।'

পাখার আরো কয়েক ঘা পড়ে।

চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে গিয়ে—'তুমি যে একেবারে অমানুষ হয়ে গেলে, কল্যাণী।'

কল্যাণী খেঁকিয়ে উঠে—'আমি পরের মেয়ে, আমাকে গাল দিও না বলে রাখছি।'

খুকি থেমে যায়।

আমাকে দেখে বিছানার উপর উঠে বসে। আমি বলি, 'বোস, দুধ গরম করেছি।'

কল্যাণী—'রাত দুপুরে বড় বাপ-মা তুলে গাল! অমানুষ! তোমাদের ঐ ঘরে মানুষ কটা শুনি? ফের গাল দিয়েছ তো তোমার মেয়ের গলা টিপে আমি জলে ফেলে দিয়ে আসব।'

পাশের ঘরে থেকে মা 'ছি ছি' করতে থাকেন; হয় ত কেঁদে ওঠেন, কিংবা নানা রকম কথা বলেন বধূমাতাকে।

বাবা বলেন—'তোমাদের সকলের মাথা খারাপ হল না কি?'

ঘরের মধ্যে শোরগোল—বিষ, ঝাল, মৃদু গুঞ্জন, নালিশ, ফোঁপানি, অশ্রু, অভিমানের জের অনেক ক্ষণ চলতে থাকে।

খুকি খাটের এক কিনারে পা ঝুলিয়ে পাথরের মত চুপচাপ বসে থাকে; বয়স আড়াই বছর, দেখায়, এক বছরের মত; বিচার-কল্পনার শক্তি হয় ত চল্লিশ বছরের গৃহিণীর মত; জীবনের আস্বাদ সত্তর বছরের মানুষের মত; এর ভবিষ্যৎ কী, আমি ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারি না কিছু।

কাগজ জ্বালাবার দরকার হয় না, বাবা স্পিরিটের বোতল কিনে এনে দিয়েছেন! অসতর্কতায় অনেক স্পিরিট মাটিতে পড়ে যায়, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে স্পিরিট ঢেলে দেই, কাঠ ঘসে আগুন জ্বালাই, দুধ গরম করি, খুকি অবাক হয়ে একবার আগুনের দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেশি গরম করবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তবুও মনের ভুলে অনেক গরম হয়ে যায়, উপযুক্ত মতন ঠাণ্ডা করে নিতে সময় লাগে, মেয়েটি যাদুমন্ত্রে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসে থাকেঃ বেত ফলের মত চোখ দুটো প্যাট-প্যাট করতে থাকে; হাত-পা, মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। এ সংসারের নানা রকম সমস্যার কারণ যে সে, তা সে খুব ভাল করেই বুঝতে পারে।

দুধের বোতলের প্রয়োজন হয় না, ঝিনুকের দরকার নেই, বাটি সেই নিজের হাতে তুলে নেয়, কিন্তু অসাড় দুর্বল হাত এই সামান্য বোঝাটুকুতেই কাঁপতে থাকে।

বাটিটা আমি ধরি—ধীরে-ধীরে চুমুক দিয়ে খায় সে। ধুতির খুট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেই তার।

একটু জল চায়—এনে দেই।

দেখি, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। ধীরে-ধীরে মুছিয়ে দেই। তার পর, আমার সঙ্গে আমার বিছানায় চলে আসে সে।

মশারি তুলে ফেলি, পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকি, এতক্ষণে, আরামে, রুগ্ন অবিশ্বাসী মুখে, খানিকটা ভরসা আসে তার। কৃতজ্ঞতার আলোকে অনেক ক্ষণ চেয়ে থাকে, তার পর একটু হাসে।

হাসি মুহূর্তের মধ্যেই নিভে যায়, চোখ কেমন অসাড় ব্যথিত হয়ে আসে। বুঝি, বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে সে। হাত বুলিয়ে দেখি হ্যাঁ, ভিজিয়েই দিয়েছে সে অনেকখানি জায়গা। বলি—'বেশ করেছ, ভয় পাচ্ছিস কেন?'

কিন্তু তবুও মুখ-চোখের বিবর্ণতা কাটে না।

—'বিছানা ভিজিয়ে দিলে মা তোমাকে মারে?'

কোনো উত্তর দেয় না।

—'পাখার ডাট দিয়ে পেটায়?'

নিশ্চুপ, নিঃসার; সলতের মত হাত দু খানা তুলে নেই, সমস্ত গায়ে-পিঠে হাত বুলাই, মিঠাইয়ের দোকানের খানিকটা বাসি পরিত্যক্ত ময়দার মত যেন, কারা যেন পিষতে-পিষতে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। হাত-পা-আঙুল কালিয়ে গেছে; কাপাল-চুল ঘামে ভিজে গিয়েছে। দাঁড়কাকের ঘাড়ের ভিজে

রোমের মত কতকগুলো কাল পাতলা চুল।

ভিজে ইজেরটা খুলে ফেলে দি। বলি—'খুকি, মারব তোমাকে?'

চুপ করে থাকে।

—'পাখা দিয়ে লাগাই এক ঘা?'

মাথা নেড়ে নিষেধ করে।

—'তবে আমার বিছানা ভিজিয়ে দিলে কেন? মারি?' পাখার ডাট তুলে ধরি। শিশুর হৃদয়ে কোনো ভাব খেলা করে বিদীর্ণ মুখে বড় একটা ফুটে ওঠে না। পাখার ডাঁটের দিকে একবার তাকায়, আমার মুখের দিকে একবার তাকায়, কপাল ও ভুরুর সরলতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঠোঁট নড়ে, বেত ফলের মত চোখ তুলে চালের বাতার দিকে নিগূঢ় ভাবে তাকিয়ে থাকে।

—'মাব কাছে নিয়ে যাব?'

সহসা কোনো উত্তর দেয না।

—'মাব কাছে যাবি?'

—'না।'

—'এইখানে থাকবি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে একটু সবে শোও।'

খানিকটা সরে যায়।

—'বালিশ লাগবে না?'

মাথা নেড়ে 'না' বলে।'

—'ভিজের উপব শুলি যে—'

কিন্তু ভিজে জাযগায শুতে কোনো আপত্তি নেই বেচারির, কোনো বকমে শান্তিতে, নিস্তবব্ধতায রাতটা কাটিযে দিতে চায হয তো, হয তো ভবিষ্যতে জীবনটাও এই বকম ভাবেই কাটাতে চাইবে সে, ভবিষ্যৎও কী যে নিগূঢ়?

একে পৃথিবীতে আনবার জবাবদিহি কাকে বহন কবতে হবে—আমাকে না বিধাতাকে?

হ্যাঁ, বেছে ভিজে জাযগাটায গিযে শুযেছে, হয তো নিজের কৃতকার্যের ফল নিজেই বহন করতে চাইছে; হয তো আমাকে অযথা অসুবিধায ফেলবাব কোনো ইচ্ছে নেই, হয তো এই বকম ভয ও দীনতাই এব রক্ত-মাংসে দিয়েছেন বিধাতাও, হয তো...

'বিছানা ঠিক কবে দিচ্ছি? ওঠ তো—'

বলা মাত্র বিনা দ্বিধায উঠে বসে।

পাঁজাকোলা কবে ধরে তাকে মাটিতে দাঁড় কবিযে দেই। ভিজে চাদবটা মুড়ে তুলে নিযে, তোশকটা উল্টে দিলাম। তার পব আলনাব থেকে আমাব গাযের খদ্দরেব চাদবটা এনে পাতি।

শোলার পুতুলেব মত অন্ধকাবেব এক কোণে দাঁড়িযেছিল মেযেটি, আবার তুলে উঠিযে দিলাম। বললাম, 'কেমন রে এখন শুতে বেশ আবাম, না?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ'

তেমন বিশেষ কোনো সজীবতা নেই মুখে।

কেমন কাতর ভাবে পা চুলকুচ্ছিল।

—'পাযে হল কী তোব?'

—'পিঁপড়ে।'

—'পিঁপড়ে কোত্থেকে এল আবাব?'

—'মাটিতে।'

দেশলাই জ্বালিযে দেখলাম কতকগুলো বিষ-পিঁপড়ে বেচারিব গাযেব নানা জাযগায কামড়াচ্ছে।

—'এত কামড় খেলি? তবুও আগে বলতে পারলি না? কামড়ে যে লাল করে দিযেছে বে?'

—বাবা বললেন, 'কীসে কামড়েছে রে খোকা?'

—'কিছু নয়, পিঁপড়ে।'

—'পিঁপড়ে? আর-কিছু নয তো?'

সূচীপত্রে যান

পিঁপড়ে ছাড়াতে-ছাড়াতে—'না।'

মা—'মাকড়সা নয় তো রে, মাকড়সা?'

—'না গো না।'

—'দেখিস ভাল করে, মাকড়সার কামড়ে বড্ড বিষ।'

তাকিয়ে দেখি, কল্যাণী নিঃশব্দে বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের। চোখেব নিদ্রালুতা হঠাৎ যেন গেছে কেটে, খানিকটা ভয়জড়িত কণ্ঠে বললে—'কী হল আবাব?'

—'বসো'

—'খুকিব কিছু হযেছে না কি?'

—'এই পিঁপড়ের কামড় খেযেছে আব কী?'

—'ঠিক দেখেছ তো, পিঁপড়ে?'

—'হ্যাঁ'

—'পিঁপড়ে? আর-কিছু নয?'

—'না'

—'কই? দেখি—?'

দেশলাইটা জ্বেলে আবাব দেখলাম।

—'এঃ লাল-লাল চাকা-চাকা দাগ পড়ে গেছে যে একেবারে।'

—'নরম মাংস কি না।'

গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে—'এ যে অনেক কামড়। কোথেকে কামড়াল? আঃ তোমাব দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল দেখছি।'

আবার জ্বালালাম।

—'এ পিঁপড়ে? না বিছে?'

—'না, বিছে নয—'

—'ভাল কবে দেখেছ তো? বর্ষাকালে কত কী যে থাকে, আহা বেচাবি, কিসে কামড়েছে তোমাকে মা?'

—'তা, ওকে তুমি নিযে যাও তা হলে এখন—'

—'কেন দু-দণ্ড বাখতে নিয়ে এতই অসহ্য হযে উঠল?'

—'না, তা নয—'

—'তা বই-কি! তুমি মনে কবো, মেযেব সঙ্গে তোমাব কোনো সম্পর্ক নেই।' দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল।

—'নিভিযে দিলে?'

—'না, নেভাই নি—'

—'তবে?'

—'এমনি গেল নিভে।'

—'বাতাসে?'

—'না, ছোট্ট একটা কাঠি কতক্ষণ আর জ্বলবে?'

—'মশারি গুটিয়ে রেখেছ?'

—'বড্ড গরম।'

—'তাই বলে মশাবি গুটাতে হয, খোলা বিছানা পেযে রাজ্যের যত পোকা-মাকড় এসে ঢুকবে।'

মশারি সে ফেলে দিতে গেল।

—'আমিই ঠিক করে নেব, কল্যাণী।'

—'তোমার লণ্ঠন কোথায? নিভিযে ফেলেছ?'

—'না—'

—'ঘরে লণ্ঠন রাখো না কেন তা হলে?'

—'বাবার দেরাজে মোম আছে, নিযে এসো না লক্ষ্মীটি।'

—'আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। পা নাড়তে ইচ্ছা করে না আর—সত্যি বলছি।'

সূচীপত্রে যান

বিছানার এক কিনারে পাথরের মত বসে রইল কল্যাণী।

—'তা হলে তোমার ঘরের লণ্ঠনটা দিয়ে যাও।'

—'আর, আমি অন্ধকার ঘরে থাকব? আমার বেলায় এই রকমই তোমার ব্যবস্থা।'

বিছানার আর-এক প্রান্তে বসে চুপ করে ছিলাম।

কল্যাণী—'তা কি আমি আজ থেকে জানি? অনেক দিন থেকেই জানি। এ রকম জানলে—'

মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল সে।

আমি চুপ করে বসে ছিলাম। চটি জুতোর শব্দে চমক ভাঙল।

তাকিয়ে দেখি বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ধুতির খুট গায়ে, খুটেব ভিতর থেকে একটা মোম বেব করে বললেন, 'এই নাও। খুকি কি ঘুমিয়েছে?'

—'ঘুমুচ্ছে বোধ করি।'

—'হ্যাঁ ঘুমোক। মশাবিটা ফেলে দিও। ফেলবার আগে মোম জ্বালিয়ে ভাল কবে বিছানাটা একবার দেখে নিও।'

কল্যাণীর পিঠে আস্তে-আস্তে দু-তিন বার হাত বুলিয়ে চলে গেলেন তিনি। কল্যাণী চাপা গলায—'এ কী ভযনাক অন্যায তোমার বাবাব।'

—'কী রকম?'

—'আমি এখানে আছি। অথচ তিনি এ ঘবে ঢুকলেন।'

—'সহজ ভাবেই ঢুকেছেন।'

কল্যাণী মাথা নেড়ে—'আমার নিজেব বাবা হলে এ-বকম অবস্থায় কিছুতেই ঢুকতেন না।'

—'খুকিকে বড্ড ভালবাসেন কি-না বাবা।'

—'তা হোক—তাই বলে এত বাত্রে স্বামী-স্ত্রীর ঘরে একজন পুরুষমানুষ হয়ে ঢুকবেন তিনি?'

কল্যাণী চোখ কপালে তুলে আমাব দিকে তাকিয়ে রইল।

—'সত্তব বছবেব বুড়ো মানুষের পক্ষে এ জিনিস এমন কিছু অশোভন নয।'

—'তুমি তাই মনে করো! রুচি-শোভনতাব এর চেয়ে ভাল নমুনা তো কোনোদিন দাও নি।

—'ছি, আস্তে। শুনলে কী মনে কববেন তাঁরা!'

—'আমাব বাবা হলে—হোক না মেয়ে-জামাই, তাদের ঘবেবব ত্রিসীমানাযও আসত না এত রাত্রে।'

একটু চুপ থেকে, 'আমাব বাপেব বাড়ির রুচি-সংযম তোমাব সে-সবেব কল্পনাই বা কববে কী কবে। অবাক হয়ে ভাবি, কোথায ছিলাম, কোথায এসেছি।'

বাবা তার বিছানাব থেকে গলা খাঁকবে—'আমার হনে হয তোমাব ঘবে বাতাসা কিংবা গুড়েব টুকবো পড়ে ছিল হেম।'

—'তা হবে।'

—'হ্যাঁ, তার গন্ধে-গন্ধে বিষ-পিঁপড়ে এসে জমেছে।'

—'তাই মনে হয।'

মা বললেন—'বর্ষাকালে অনেক সময পোকা-ফড়িং মবে থাকে, দেখিস নি খোকা?'

—'হ্যাঁ দেখেছি।'

—'সেই জন্য এত পিঁপড়ে হয।'

—'তা ঠিক। কাল ঘবটা ভাল কবে ঝাড় দিয়ে ফেলতে হবে।'

—'হ্যাঁ খুব ভাল করে।'

বাবা—'ও, ঐ যে বাতি নিযে পড়ি না আমবা বাত্রে, তখন লণ্ঠনের চাব পাশে অনেক পোকা মবে থাকে, সেইজন্যই এত পিঁপড়ে জমে বুঝি?'

মা—হ্যাঁ, বিশেষত এই বর্ষার সময় অন্য কোথাও খাবার পায় না কি-না।'

দু জনেই নিস্তব্ধ।

কল্যাণী হাই তুলে—'বাবা, হাত-পা অবশ হযে আসছে ঘুমে। সাপে খেল, না ব্যাঙে খেল দেখতে এলাম। অলক্ষুণে মেয়ে, ওকে কারা কাটবে? সারাটা জীবন মানুষের হাড় চিবিয়ে কে খাবে তবে আব?'

ঘুমের চোখে বিড় বিড় করতে-করতে চলে গেলে কল্যাণী। মিনিট তিন চারের মধ্যে সব চুপচাপ।

সূচীপত্রে যান

বিছানায় খুকির পাশে শুয়ে বললাম—'ব্যাথা না কি রে?'
—'হ্যাঁ'
—'কোথায়?'
পিঠের কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে দিল।
—'চুলকে দেব?'
মাথা নেড়ে—'চুককে দাও।'
আস্তে-আস্তে হাত বুলাতে লাগলাম।
—'কিসে কামড়েছে তোমাকে খুকু?'
—'পিঁপড়ে'
—'কেন কামড়াল?'
মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উত্তর দেবাব ইচ্ছে আছে,কিন্তু বাক্য জুগিযে ওঠে না।
'পিঁপড়ে কোথায আছে খুকু?'
—'মাটিতে।'
—'সেখানে কেন গিযেছিলে তুমি?'
এক পা তুলে চুলকুতে-চুলকুতে বিজ্ঞ মুখে অন্ধকাবেব দিকে তাকিযে বইল।
—'তোমার নাম কী?'
—'কুকুলানি'
—'রাণীও আবার?' চোখ দিযে বিরস ব্যথিত মন্তব্য কেটে মেযেটিব দিকে তাকিযে হাসলাম।
—'কে রেখেছে নাম?'
—'দাদু'
—'লানি নয, রাণী'
—'লানি'
—'নাবে, বাণী'
—'লানি'
ধীবে-ধীবে ঘুমিয়ে পড়ল।

পব দিন বাত্রে ঝড়-জল, ভযানক।
বিকেল থেকেই শুরু হযেছে, বাত দশটাব সময বাবা এসে বললেন—
'খেযেছিস খোকা?'
—'হ্যাঁ।'
—'তোমাব মেজকাকা খেযেছেন?'
—'খেযেছেন।'
—'তার খাবাব সময় আমি যেতে পাবি নি। খাতা দেখছিলাম। ঢেব খাতা, কাল হয ত ইনস্পেকশন হবে স্কুলে।'
—'ইনস্পেকটব আসবেন বুঝি?'
—'আসবাব তো কথা; সন্ধ্যার থেকেই ছেলেদের খাতা-পত্র নিযে বিব্রত ছিলাম তাই।'
একটু চুপ থেকে—'যা দুর্যোগ আজ! স্কুলের থেকে এসে দক্ষিণেব ঘবে আব যেতে পাবি নি তাই। তা তুমি তোমাব মেজকাকার খাবার সময ঘরে ছিলে তো?'
—'হ্যাঁ'
—'তত্ত্বাবধান করেছিলে?'
—'করেছিলাম। পিসিমা আসেন, আমার না-থাকলেও চলে'।
—'তবুও থেকো।'
—'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'
—'তিনি তো ঘরে বসেই খেলেন?'
—'হ্যাঁ ঘরেই খান—'

সূচীপত্রে যান

—'টেবিলে?'
—'হ্যাঁ-'
—'কে এনে দিল?'
—'মা।'
—'কী খেলেন?'
—'মেজকাকা আজ খিচুড়ি খেতে চেয়ে ছিলেন।'
—'হ্যাঁ, এমনি বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে খিচুড়িই তো খায মানুষে।'
—'তুমি কী খেলে?'
—'আমি দুটো ভাতই খেলাম।'
—'কী দিয়ে?'
—'এই পুঁই চচ্চড়ি না কী করেছিল আর কাঁচা মুগের ডাল।'
—'রান্নাঘরে গিযে খেযে এলে?'
—'হ্যাঁ, ছাতা আছে; ব্যাস। এত ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তোমার মা কত দিক টানবেন? সুরেশকে খিচুড়ির সাথে ঘি দিয়েছিল তো?'
—'হ্যাঁ। মার সে-সব ঠিক আছে।'
—'আর, আলু ভাজা বুঝি?'
—'ইলিশ মাছ ভাজা'
—'বেশ গবম-গরম ছিল তো?'
—'খাবার সময় ভেজে দেওয়া হযেছে, পিসিমার স্টোভে।'
—'বেশ, তা সুরেশ খানিকটা খেতে পারল তো? আমাদেব সংসারের বান্না চল্লিশ বছব ধবে সে বড় একটা খায় না—কী দিযে বান্না হয কলকাতায, পাকা মুসলমান বাবুর্চি বান্না করে দেয—তাই বড় সঙ্কোচ হয তাকে খাওয়াতে।'
—'ও, ছোটকাকা প্রায ছোট এক ডেকচি আন্দাজ খিচুড়ি খেযে ফেলেছেন।'
—'খেলেন?'
—'হ্যাঁ। খুব তৃপ্তিব সঙ্গে, ইলিশ মাছ ভাজা, ফুল ভাজা, ডিমেব ওমলেট, পেপেব টক, ছানার পায়েস।'
বাবা একটু হেসে—'যাক্, আজকের রাতেব যজ্ঞ শেষ হযেছে তাহলে তোমাব মাব।'
—'হ্যাঁ'
—'সুরেশের হজম হয তো?'
—'হজমের জন্য মেজকাকার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।'
—'কী?'
একটু চুপ থেকে, 'খাওয়ার পব কী যেন খান।'
—'আহা, তা সোডা ওযাটার এনে দিলেই হত সুবেশকে।'
—'আমি বলেছিলাম, সোডা ওযাটারের কথা, মেজকাকার বিশ্বাস, কলকাতা ছাড়া আব-কোথাও ভাল সোডা ওয়াটার পাওযা যায না।'
বাবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—'বৌমা আজও কি সন্ধ্যের থেকে ঘুমুচ্ছে?'
—'হ্যাঁ'
—'খেয়েছে তো?'
—'বিকেলেই খেয়েছে—'
—'কী যেন?'
—'পান্তা ভাত, মরিচ পোড়া, আব সেই তেঁতুল গুড়ের ঝোল।'
খানিক ক্ষণ চুপ থেকে, 'বৌ কি আমার চোখের সামনে হত্যা দিযে মরতে চায?'
—'না মরবে না।'
—'মরবে না? এই খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? আমার কী যে কষ্ট হয় হেম।'
—'মানুষের প্রাণ ঢের শক্ত। কলকাতায কত লোক ফুটপাতের এঁটো কুড়িয়ে খায।'

—'কিন্তু তাদের যে বাঁচবার আগ্রহ। তারই জোরে বেঁচে থাকে ওরা। এই মেয়েটি যে'—বাবা বললেন—'তোমাকে ভালবাসে না?'

—'জীবনের প্রতিই কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে যেন।'

—'তুমিও বীতশ্রদ্ধ হয়েছ না কি?'

—'জীবনের ওপর?'

—'বৌ-এর ওপব?'

—'নাঃ, বড় কষ্ট হয ওর জন্য আমার।'

কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন—'দেখো, কলকাতায গিযে কোনো রকম একটা চাকরি জোগাড় কবতে পারো না কি। না-হলে এই নারীটিকে বাঁচানো বড্ড শক্ত হবে।'

একটু চুপ করে থেকে—'খুকিকে আজ ন-টার সময দুধ খাইয়ে দিয়েছি।'

—'এখন শোবে?'

—'কে আমি? হ্যাঁ, এই শুযে পড়ি আর-কী—'

—'কিছু পড়বে-টড়বে না বুঝি আর?'

—'নাঃ, আর পড়ে কী হবে?'

—'তা, খুকিকে তোমাব কাছে নিযেই শোও। ওব মাকে একটু সুস্থিবে ঘুমোতে দাও।'

—'যাই, নিযে আসি।'

—'তোমার মা কোথায?'

—'দক্ষিণের ঘবে।'

—'কী করছেন?'

—'মেজকাকাব সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।'

—'খেযেছেন?'

—'বোধ করি খেযেছেন—'

—'ফিরবেনই-বা কখন?'

—'এই বারটা সাড়ে-বারটা—'

—'কেন? এত রাত হবে কেন?'

—'মেজকাকা অনেক রাত অবধি গল্প কবতে ভালবাসেন।'

—'তা পিসিমাই তো আছে।'

—'মাকেও চাই।'

কল্যাণী—'কে?'

—'তুমি জেগে আছো?'

—'বাপবে, আমি ভয পেযে গিযেছিলাম—'

আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিযে, 'না-বলে-কযে অন্ধকারের মধ্যে, এই রকম ঢুকতে হয না কি?'

—'ভেবেছিলাম তুমি ঘুমুচ্ছ—'

—'ঘুমুচ্ছিলামই তো—'

—'এসে তো দেখছি চোখ চেযে জেগে রযেছ—'

—'তোমার পাযের শব্দে তো জেগে গেলাম।'

—'আচ্ছা, এর পর পা টিপে-টিপে আসব।'

—'না, ঘরে বাতি নিবে গেলে তুমি আব আসতে পাববে না।'

—'সন্ধ্যের থেকেই তো বাতি নিবিয়ে শুযে থাকো।'

—'এই আমার খুশি, তুমি এসো না।'

—'সারা রাত এত ঘুমুতে কষ্ট হয না?'

—'বকবক করো না, কাজে যাও এখন—'

—'কী খেযেছিলে আজ?

বালিশে মুখ গুঁজে দাঁত কপাটি হয়ে পড়ে রইল কল্যাণী। দেখলাম, কাঁদছে।
—'একী, কী হল তোমার আবার?'
—'থাক, আমার খোঁজ নিয়ে দরকার নেই।'
বিছানার পাশে বসতেই, কেঁদে ফুলতে-ফুলতে—'তুমি ওঠো'
—'একেবারে ঘামিয়ে গেছ যে—'
—'তবুও কথা বলবে? কথা বলতে বলি নি তোমাকে—'
—'সন্ধ্যাব থেকেই কি জেগে আছ?'
—'আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দেবে?'
—'কেন মেজকাকারা তো দক্ষিণের ঘরে খুব হৈ-চৈ করছেন, শুনছ না?'
—'করুক। তাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'
—'কই, মেজকাকার খাওয়ার পাশে একদিনও তো তুমি দাঁড়ালে না, কল্যাণী।'
—'আমার দাঁড়ানোর কী প্রয়োজন?'
—'তিনি বললেন বৌমাকে তো বড় একটা দেখা যায় না।'
—'আচ্ছা,' ঠোঁট উল্টে কল্যাণী—'হয়েছে।'
—'আমি বলেছি, তপস্যা না করলে বৌমাকে দেখা যায় না।'
—'তোমার পায়ে পড়ি, কথা শুনেত ভাল লাগে না এখন আমার।'
—'আচ্ছা,কথা কইব না আর।'
—'বসে রইলে যে?'
—'চুপচাপই তো বসেছিলাম। তুমি কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'
—'তুমি এখন যাও।'
—'কোথায়?'
—'তোমার ঘরে।'
—'গিয়ে কী করব?'
—'যা খুশি তাই করো, তোমাব পাযে পড়ি, তুমি যাও।'
ধীবে-ধীরে তার কপাল থেক হাত খানা সরিযে দিল আমার।
বললাম—'তোমার কপাল তো খুব গরম।'
কোনো উত্তর দিল না।
—'আচ্ছা, বুকটা একটু দেখতে দেবে?'
আবার ঠোঁট কামড়ে কান্না।
অনেকক্ষণ কান্নার পর বললে—'মাথাব থেকে হাতটা সবিযে নেবে?'
ধীরে-ধীরে চুলের থেকে হাত তুলে নিলাম।
—'এখনো বসে আছো?'
কোনো উত্তর দিলাম না।
মৃদু, অবরুদ্ধ কণ্ঠে—'আচ্ছা এইবার যাও, অনেক ক্ষণ তো বসলে।'
ধীরে-ধীরে কল্যাণীর বাঁ হাতটা তুলে নিলাম।
—'কবরেজের মত নাড়ী না দেখলে চলবে না তোমার?'
—'তোমাকে ঢের জ্বালালাম কল্যাণী।'

ঘাড় হেঁট করে চোখ বুজে অনেক ক্ষণ বসে রইলাম—কল্যাণীর হাতের ভিতবকাব নাড়ীর শব্দ। অন্ধকারে কাশের শব্দ।
—'উঠলে?'
—'হ্যাঁ'
—'বুক দেখতে চেয়েছিলে না?'
মাথা হেঁট করে—'থাক্।'
—'কেন? দেখো, তুমি আমার স্বামী, দেখবেই বা না কেন?'
হাত ধরে বিছানার পাশে আমাকে বসালে ধীরে-ধীবে—'আমি চলে যেতে বললেই কি চলে যেতে

হয়?'

একটু চুপ থেকে—'কথা বলছ না যে?'

আমার গালে একটা টোকা দিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা কবল কল্যাণী।

বললে—শেমিজের সেফটিপিন কটা খুলে—তারপব, 'নাও, বুক নিয়ে কত পরীক্ষা করতে পার দেখো।'

সেপটিপিন খুলে দাঁত কামড়ে—'নাও তোমার বুক।'

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

কল্যাণী, 'কেমন দেখলে? খুব গরম?'

একটু হেসে—'যা দেখলাম তা তোমাকে বলব কেন কল্যাণী?'

—'ভাল কথা; দেখা তো হল, এখন সেফটিপিনটা আটকে দি?'

—'দাও।'

—'তোমার মাথাটা আমার বুকের ওপর একটু রাখবে?'

—'মিছিমিছি কী আর দরকার?'

—'কিন্তু আমার যদি ভাল লাগে?'

—'আচ্ছা বেশ।'

কল্যাণী মাথাটা সবিযে দিযে, 'না না থাক্।'

—'কেন'?

—'না, আমার আর প্রবৃত্তি নেই।'

তাড়াতাড়ি সেফটিপিন দিযে শেমিজ আটকে ফেলে বললে—'তেতুল আর মরিচপোড়া দিযে ভাত খাই বটে—কিন্তু অনেকগুলো ভাত খাই। খিদেও আছে—মরব না, ভয নেই। তুমি এখন ঘবে গিযে সুস্থিরে ঘুমোতে পাব।' নিস্তব্ধ হযে বসে আছি দেখে, কল্যাণী, 'আচ্ছা বেশ, কাল থেকে না হয পান্তা তেতুল আব খাব না।'

—'কী খাবে?'

—'যা খাওযাবে তাই খাব।'

—'পোলাও, মাংস খাওযাবাব শক্তি তো আমাব নেই।'

—'চাইও না; কোনোদিন আমাকে মাংস খেতে দেখেছ?'

—'মাংস পেলে তো খাবে।'

—'এ তিন বছরে অন্তত সাত-আট বার এ বাড়িতে মাংস আনা হযেছে,' কল্যাণী একটু হেসে, 'এমন কোনো ঠাকুর-বাবুর্চি পাবে না তুমি কোনো দেশে, এমন কোনো মশলা পাবে না তুমি পৃথিবীতে যাব বান্নার গুণে মাংস আমার কছে তৃপ্তিব জিনিস হযে উঠবে কোনোদিন।'

—'ভাল তো, কিন্তু যাক্ সে কথা, কিন্তু আমরা যা খাই তাই খাবে কাল থেকে।'

—'আচ্ছা।'

—'একলা খাবে না।'

—'না।'

—'আর একটু দুধ খাবে।'

—'দু জনে খাব নিশ্চয়ই।'

একটু চুপ থেকে কল্যাণী, 'কিন্তু মাঝে-মাঝে পান্তা আব তেঁতুল খাব।'

—'কেন?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে।'

—'হয় ত এর উত্তর আমিই জানি।'

—'কেউ জানে না—কারু জানার সাধ্য নেই।'

একটু চুপ করে থেকে কল্যাণী—'তুমি যদি রাজপুত্র হতে আর আমি যদি তোমার রাজপ্রাসাদে থাকতাম, তা হলেও এই পান্তা আর মরিচ খাওযা ও অন্ধকারে মুখ লুকিযে কান্না ঘুচত না আমার।'

—'কী যেন ভাবছিলাম।'

কল্যাণী—'মা এসেছেন?'

—'না'
—'কোথায়?'
—'দক্ষিণের ঘরে'
—'মেজকাকাদেব সঙ্গে গল্প করছেন এখনো?
—'হ্যাঁ'
—'রাত তো কম হয় নি।'
—'না, কম হয় নি।'
—'বাবা শুয়ে পড়েছেন?'
—'হ্যাঁ অনেক ক্ষণ।'
—'ঘুমিযেছেন?'
—'তা বলতে পারব না—হয় তো ঘুমোন নি।'
—'কী করে বুঝলে?'
—'ঘুমোলে একটু মৃদু নাক ডাকাব শব্দ পেতাম। খানিক আগে গলা খাঁকবানির শব্দ পেলাম।'
—'আমার মনে হয় বাবা বড্ড একা'।
—'কী রকম?'
—'সারা দিনরাতের মধ্যে মা তার সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক বাখেন না।'

মাথা হেঁট করে চুপ করেছিলাম।

কল্যাণী—'এই তিন বছর ধরেই তো দেখছি আমি, মা বরং পিসিমার সঙ্গে গল্প করবেন, তবুও বাবার সঙ্গে বসে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলবেন না।'

—'খুকি ঘুমুচ্ছে?'

—'এই জন্য বাবার মনে কেমন একটা ব্যথা আছে—তুমি যখন কলকাতায চলে যাও, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবার ইস্কুল যায বন্ধ হয়ে, সারা দিন-রাত কী ভযাবহ একাকী ভাবে তিনি যে কাটান, তা আমি তোমাকে বলে শেষ কবতে পারব না। খাঁচার পাখিও এর চেয়ে ঢের আনন্দে থাকে।'

—'আমাদের সকলের জীবনই তো এক একটা খাঁচা।'

—'তা বলতে পার।'

কল্যাণী বিমর্ষভাবে জানলার ভিতব দিয়ে তাকিয়ে রইল।

—'যাক্, মা তবুও তোমার মত তেতুলের অম্বল দিয়ে পান্তা খান না, কিংবা কপালে একটা বোনা দিযে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে যখন-তখন কাঁদেন না।'

একটু চুপ থেকে—'আমাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে থাকলেও অন্ধকারে নিজেব কোঠায ঢুকে দবজা বন্ধ করে কাঁদতে? তাই ত বললে—কেন, কী, ব্যাপাব কী কল্যাণী?'

একটু চুপ থেকে, 'এই নারী—যাক্ শুনতে চেও না বড় কষ্ট পাবে তা হলে।'

—'আমাকে ভালবাস না এই তো কথা; কিংবা অন্য কাউকে ভালবাস।'

কল্যাণী মুখে কপালে কাপড় টেনে দিযে তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শুল—কপালের যতটুকু দেখা যাচ্ছিল জরাজীর্ণ মানুষের মত কুঁচকে রয়েছে।

ধীরে-ধীরে খুকিকে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায চলে গেলাম আমি।

বিছানায় আমার পাশে শুইয়ে মুখের দিকে চাইতেই দেখলাম চোখ চেয়ে আমাব দিকে চেয়ে আছে।

—'তুই জেগে আছিস যে রে?'
—'বিত্তি'
—'হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম, কেমন লাগে?'
—'বাবা।'
—'কী মা?'
—'মিছছি কোথায়?'
—'মিছরি?'
—'মিছছি খাব।'
—'এখন খায় না মা।'

সূচীপত্রে যান

—'বোতলে আছে।'
—'হ্যাঁ।'
—'খাব।'
—'কাল সকালে খেও।'
—'মিছ্‌ছি খাব।'
—'সকালবেলা দেব কাল।'
—'বাবা।'
—'কী মা?'
—'মিছ্‌ছি খাব।'
একটু চুপ থেকে—'মিছ্‌রি খেলে পিঁপড়ে কামড়ায়।'
জীবনী শক্তি ঢের কম; পিঁপড়ের কথা শুনে নিস্তব্ধ হল।
মাথায় হাত বুলতে-বুলতে—'তোমাব নাম কী খুকু?'
মনেব অবসাদে সহসা কোনো জবাব দিল না।
—'কী নাম তোমাব?'
অন্ধকাবের ভিতব দু-তিনটে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধীবে-ধীরে—'আমাল নাম?'
—'হ্যাঁ'
—'কুকুলানি।'
এমন নিবপবাধ, এমন মিষ্টি অথচ এমন মর্মস্পর্শী।
অন্ধকাবেব ভিতব আমাব চোখেব জল দেখল না মেয়েটি। ধীবে-ধীবে বললাম—'খুকুরাণী'
—'কী?'
—'তুমি কাকে ভালবাস?'
—'দাদুকে।'
—'আব কাকে?'
—'ঠাকুনকে।'
—'আর কাকে?'
একটু চুপ থেকে—'বাবাকে।'
—'বাবা কোথায়?'
অন্ধকাবেব ভিতর কচি-কচি হাত আমাব চোখ-নাকেব উপব বুলিয়ে দিয়ে, 'এই যে বাবা।'
—'মাকে ভালবাস না?'
—'দাদুকে ভালবাসি।'
—'মাকে?'
—'দাদুকে ভালবাসি'
—'মাকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'
—'না-নিয়ে যাবে না।'
শীর্ণকণ্ঠে উত্তেজনাব আওযাজ বেজে উঠল, 'নিয়ে যাবে না শেয়ালে।'
সন্ত্রস্ত হয়ে বললে—'বাবা—'
—'কী?'
—'মাকে শেযালে নিয়ে যাবে না?'
—'না।'
—'মাকে ভালবাসি যে আমি।'
—'বেশ।'
—'রামুকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'
—'রামু কে?'
উদ্ধত হয়ে—'নিয়ে যাবে শিয়ালে রামুকে।'
একটু ভেবে—'নন্দুকে নিয়ে যাবে।'

আর একটু ভেবে—'বুলুকে নিয়ে যাবে।'
শিশুর মনের এই অন্ধকার স্রোত ফিরিয়ে দেবার জন্য—'না, কাউকে নিয়ে যাবে না রে।'
—'নেবে না?'
—'না, শেয়াল নেই।'
—'নেই?'
নিস্তব্ধভাবে জিনিসটা উপলব্ধি করতে লাগল সে।
গায় হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ গরম।
বললাম—'তোমার জুতো কই খুকুরাণী?'
—'নেই?'
—'বাবা কিনে দেয় নি?
—'না।'
—'খালি পায মাটিতে হাঁটো?'
—'হ্যাঁ।'
—'ঠাণ্ডা লাগে যে?'
—'আমার বোতল ভেঙে গেছে।'
—'কিসের বোতল?'
—'দুধের। দাদু কিনে দেবে আবাল'।
—'জুতো কে কিনে দেবে?'
—'দাদু।'
—'তাই তো, দাদু তোমার জীবনেব বড় মূল্যবান জিনিস। যখন বড় হয়ে উঠবে তুমি, না থাকবে দাদু, না থাকবে ঠাকুমা, তখন কী কববে তুমি?'
মেয়েটি প্যাট-প্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, খানিক যেন বুঝেছে, খানিক বোঝে নি। ভবিতব্যতার অন্ধকারে ঘেরা এই পৃথিবীব পথে চলতে-চলতে এক-একটা ইঁদুরেব ছানাব অবস্থা মাঝে-মাঝে যে-রকম হয—তেমনি হয়েছে এই মেয়েটির।
—'খুকু একটা ছড়া শুনবে?'
—'ছড়া কী?'
—'কবিতা।'
—'কোপাতা কী?'
—'শোনো।'
—'খুকুবাণী-খুকুরাণী অন্ধকাব বাতে'
—'বাবা'
—'কী মা?'
—'আবার বলো—'
—'আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে বলো—খুকুবাণী-খুকুবাণী, বলো'
—'কুকুলানি-কুকুলানি'
—'অন্ধকার রাতে'
—'অন্ধকার লাতে'
—'অনেক কথা বলেছিস—এখন ঘুমো।'
—'জল খাব বাবা।'
একটু জল গড়িয়ে এনে দিলাম।
গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম উষ্ণতা আরো বেড়েছে যেন।
—'খুকু'
—'উঁ?'
—'ব্যথা করে?'
—'বেথা কোলে।'

সূচীপত্রে যান

—'কোথায়?'
—'বাতাস দাও।'
বাতাস দিতে-দিতে—'খুকুরাণী।'
—'উঁ'
—'আমি কলকাতায় চলে যাব যে—'
আমার গলা জড়িয়ে ধরে—'না।'
—'তুমি দাদুর কাছে থাকবে—'
—'না, দাদুকে শেযালে খেযে ফেলেছে।'
একটু হেসে—'তা হলে ঠাকুরমার কাছে থাকবি।'
—'উঁহু না—ঠাকুনকে শেযালে নিয়ে গেছে যে।'
—'মাব কাছে থাকবি।'
উৎপীড়িত হযে—'না, থাকব না।'
—'মিছবি দেবে যে মা, দেবে, লবেনচুশ দেবে, বিস্কুট দেবে।'
লুব্ধ চোখ অন্ধকাবেব ভিতব ঘুবতে লাগল।
—'আমি কলকাতায় চলে গেলে মা তোমাকে মিছবি দেবে, লজেন পাবি, বিস্কুট পাবি।'
—'বিসকুট!'
—'থাকবি?'
—'হ্যাঁ।'
—'কার কাছে?'
—'মার কাছে।'
—'আমি কলকাতায় চলে যাব যে।'
—'হ্যাঁ তুমি চলে যাবে।'
—'আর আসব না।'
মাথা নেড়ে বললে—'না, আব আসবে না।'
দেখলাম মুখেব ভিতর কোনো ভাব পবিবর্তন নেই।
কলকাতায় যাওয়া যে কী, যাওয়া-আসাবই বা কী মানে, তা বুঝাবাব মত বোধ এখনো হয় নি।
—'আব আসব না যে খুকি।'
—'না—'
—'কলকাতায় চলে যাব, আব আসব না—'
মাথা নেড়ে—'না আসবে না। দাদু আছে, ঠাকুন আছে, মা আছে, ভুলু আছে, ববি আছে, খোকন আছে।'
—'আর বাবা?'
—'রবি, ভুলু, খোকন, মিনু আছে, খেলা করবে।
আজকের জন্য এব এই বকম, ভবিষ্যতে এমনি কোনো ভবিতব্যতাব বেদনায় কিংবা সফলতাব শান্তিতে হাবিয়ে যাবে তুমি—কোলাহলে-কোলাহলে দূরেব থেকে দূবে তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলব, আমাকে হারিয়ে ফেলবে তুমি—হয় ত পলক ফেলতেই দেখব, জীবনে তুমি অনেক দূব অগ্রসর হযেছ, পরেব ঘরে চলে গেছ, দূবেব বন্ধু হযেছ, বছবেব পব বছর ঘুবে গেলেও তোমাব সঙ্গে আমাব দেখা হয না। তাগিদও বোধ কব না, তুমিও না, আমিও না। আজও তুমি ববির কথাটা বল, খুকুবাণী।
ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল।
খুকি ঘুমিয়ে গেছে, মশারির চালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বৃষ্টিব আওযাজ শুনছে।
আরো অনেক গভীর বাতে খুকিব মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয, হয ত কোনো মেয়েদেরই স্কুলে মাস্টারি করবে কিংবা বিধবাশ্রমে যাবে, কিংবা অবলাশ্রমে, হয ত কোনো নারী কল্যাণ সমিতির সাহায্যের জন্য দরকার হবে। কিংবা হিন্দু মিশনেব। অথবা পৃথিবীর সমস্ত সাহায্য, সহানুভূতি ও কৃপার অগোচবে জীবনের অন্ধকাব সমুদ্রের পবিহাস ও অট্টহাসির ভিতব হাহাকাব করে ফিরবে।

সূচীপত্রে যান

পরের দিন রাতে বিছানায় আমার পাশে খুকিকে শুইয়ে দিয়ে—
—'আমি রেলগাড়িতে চড়ে কলকাতায় যাব।'
—'নেলগালি?'
—'হ্যাঁ'
—'নেলগালি কী বাবা?'
—'কোনোদিন দেখিস নি?'
মাথা নেড়ে—'না।'
—'এখান থেকে সন্ধ্যার সময় নৌকায় চড়ে তার পর ইস্টিমারে উঠতে হয়, তাব পব কাল সকালে রেলগাড়িতে চড়তে হয়।'
—'খুকি চুপ করে ছিল।'
বললাম—'রেলগাড়িতে চড়ে যাবি?'
—'হ্যাঁ'
—'কোথায়?'
—'ভুলুর কাছে।'
—'ভুলুর কাছে যেতে রেলগাড়ি লাগে না রে।'
—'বাবা আমাল ইজেল ছিলে গেছে।'
—'ছিঁড়ে গেছে!'
—'হ্যাঁ।'
—'আচ্ছা, আমি নতুন ইজের কবে দেব।'
—'দাদু বোতল কিনে এনে দেবে।'
—'বোতল?'
—'হ্যাঁ।'
—'ইজেল কিনে আনবে।'
—'ইজেরও আনবে দাদু?'
—'বিস্কুট আনবে, লজেন আনবে, পুতুল আনবে।'
—'বাবা আনবে না।'
মাথা নেড়ে, 'না, দাদু।'
এব পিতা এব জীবনের রক্তমাংসেব জন্য দাযী শুধু, অন্য সমস্ত দাদু।
—'খু-বাণী?'
—'উঁ?'
—'আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে?'
—'হ্যাঁ'
—'মেসে গিযে থাকতে হবে।'
আগ্রহের সঙ্গে—'আমি যাব তোমাল সঙ্গে বাবা।'
—'মেসের চৌবাচ্চার সমানে দাঁড়িযে স্নান কববি, বাবান্দায় দৌড়ুবি, বাস্তায ছেলেবা এসে যে-ছাদে ঘুড়ি ওড়ায সে দলে মিলে যাবি, আমার কোলে বসে থাকবি, পাথব কাঁকব ভরা ভাত আব গোরুর মাসকলাই, ঠাণ্ডা ট্যাড়সেব তবকাবি আর ছিবড়েব মত মাছ; যাবি রে?'
—'যাব।'
—'বেশ, আর আমি যখন কাজে বেবিযে যাব তখন তুই কী করবি?'
চুপচাপ।
—'একটা কাঁথা দিযে ঢেকে আমাব বিছানায ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেব তোমাকে; না?'
মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'
—'খুব লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমুবে।'
—'হ্যাঁ'
—'মেসেব বাবুদের ঝালাপালা কববে না তো?'

চুপ করেছিল; বললাম, 'বলো, করব না'

—'কলব না।'

—'তারা যদি কান মলে দেয়, কাঁদবে না।'

—'না।'

—'তাদের মুখের পানের ছিবড়ে যদি তোমাকে খেতে দেয়, খাবে?'

—'হ্যাঁ খাব।'

—'মেসের বাবুরা বড় দুষ্টু যে রে খুকি, বিড়িব আঁস দিয়ে তোমার পিঠে ফোশকা ফেলে দেবে, চুরুটের ছাই দেবে তোমাব চোখে-নাকে ঝেড়ে, দিন-বাত চুল টেনে-টেনে পাখিব বাচ্চার মত মাংস বেব করে দেবে তোমার মাথায়। ফড়িঙের মত কবে দেবে যে বে।'

অবোধ ভাবে শুনছিল মেয়েটি।

ধীব-ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে—'না, রে, মেসে গিয়ে কাজ নেই।'

একটু চুপ থেকে, 'আমারও আর ইচ্ছে করে না যেতে। তোমাকে নিয়ে এই খড়েব ঘরে সাবাটা জীবন যদি কাটাতে পারতাম খুকুরাণী।'

আজ বাতে বৃষ্টি নেই।

কদমগাছ একটা পেঁচা বসে ডাকছিল।

মেয়েটি—'ঐ কে ডাকে বাবা—'

—'লক্ষ্মী পেঁচা'

—'কেন ডাকে? কাঁদে?'

—'না কাঁদে না।'

—'কী কলে?'

—'বেড়াতে বেরিয়েছে।'

—'বেলাতে?'

—'হ্যাঁ, আজ বৃষ্টি নেই কি না।'

—'কোথায় বেলাতে?'

—'এই গাছে-গাছে, মাঠে-মাঠে।'

চুপ কবে ভাবছিল।

খানিক ক্ষণ পরে—'আমি মাঠে যাব।'

—'কাল সকালে যেও'

—'ভুলুব সঙ্গে খেলা কলব না?'

—'হ্যাঁ।'

—'নন্দু আসবে, রবি আসবে...'

তেঁতুল গাছের ভিতর থেকে বক ডেকে উঠল, ঘবেব পাশেব মস্ত বড় পেয়ারা গাছের নিবিড় ডালপালার উপর গোটা দুই বাদুড় ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঝাড়া খেয়ে খানিকটা শিশির না বৃষ্টি পড়ার শব্দ—খুকুর চোখে ঘুম নেই, পৃথিবীর সমস্ত গন্ধ, রস, স্মৃতি ও শব্দেব দিকে হৃদয় বয়েছে যেন জেগে—আজ ওব বেশি জ্বর নেই।

খুকু পাশ ফিরে শুল একবার—পঁচিশ বছবের পুরনো কাঁঠালের খুঁটিটার দিকে তাকিয়ে।

ধীবে-ধীরে শিবদাঁড়ায় আঙুল বুলুচ্ছিলাম—একটা টিকটিকির মত মেরুদণ্ডে যেন—শুকনো বাঁশপাতার মত চিমসে শরীর। মা আছে, বাবা আছে, দাদু আছে, ঠাকুবমা আছে তবুও যেন মনে হয়, ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশ রুগ্ন একটা বিড়ালের ছানার মত, ক্ষমাহীন পৃথিবীর পথে-বিপথে, এঁটো ও ঝাঁটা খেয়ে বেড়াবার জন্য এর জন্ম ও জীবন। মেসে যখন থাকি—দুপুর বেলা সমস্ত মেস নির্জন—বিছানায় বসে বাবান্দাব দিকে তাকিয়ে দেখি, দু-একটা চড়ুই নিঃশব্দে লাফিয়ে-লাফিয়ে সমস্ত বারান্দা ঘুবে দু-এক টুকুরো খুদের সন্ধানে ফিরছে; এর ভিতর বেদনার তো কিছু নেই; কিন্তু তবুও মনে আঘাত লাগে যেন কেমন, আমার মেয়েটির কথা মনে হয়, চড়াইয়ের ছোট্ট নিঃসহায় মুখ, করুণ ঠ্যাং, অসম্পূর্ণ

সূচীপত্রে যান

অকৃতকার্য দৃষ্টি ঘুরে-ফিরে একটি আড়াই বছরের শিশুর রূপ মনে জাগায়।

খুকি যখন দেশের বাড়িতে জন্মেছিল, তখনো আমি কলকাতার মেসে ছিলাম। দিনের পর দিন ভয়ে, সন্দেহে, বিক্ষুব্ধতায়, পৃথিবীতে এই শিশুটির আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম।

কে জানে, সে হয় তো মৃত হয়ে জন্মাবে; কিংবা তার জীবনের বিনিময়ে জননীকে মৃত্যুর দায় দিতে হবে? কে জানে, অন্ধ হয়ে জন্মাবে, হয় তো এই শিশু? কিংবা অঙ্গহীন হয়ে? হয় তো মূক বধির হবে? কিংবা অত্যন্ত অজ্ঞান জড়ের মন্ নিয়ে পৃথিবীতে আজন্মকাল নিজেকে পবিহাস কবে চলে যাবে? হয় তো, মৃত হয়ে জন্মালেই ভাল।

পিতাব হৃদযের এই রকম অনেক বিবর্ণ হতাশ অমঙ্গল চিন্তার মধ্যে এব জন্ম; গর্ভে যখন ছিল এই মেযেটি এর মাযের হৃদয তখন বর্ণহীন রূপহীন শাদা করবীর একটা শাখাব মত, হেমন্তেব সন্ধ্যাব কুযাশা ওদিকে তাকিয়ে আছে। গর্ভজাত শিশুর জীবন সম্বন্ধে আশা খুব কম ছিল ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম সন্তান প্রসবের পর একটা টেলিগ্রাম আসবে, আসতও, কিন্তু মেযে হয়েছে বলে বাড়ির লোকেবা টেলিগ্রাম করলে না আর। বিলম্ব করে, অবহেলা কবে একখানা পোস্টকার্ড লিখে সংবাদটা জানাল আমাকে। টিকটিকির মত মেরুদণ্ডসাব এই মেযেটি বিধাতা ও মানুষের এতই উপেক্ষার জিনিস? সুস্থ, সুগোল, সুন্দর শিশুকেই শুধু সম্ভব করতে হবে—আদর করতে হবে? যে-সন্তান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবে সকলের মনে সন্দিগ্ধতা সৃষ্টি করে, জননীর মন দেয নিরাশায ভবে—অন্ধ চোখ নিয়ে যে পৃথিবীতে নেমেছে, কিংবা কথা কইবার শক্তি যে সঙ্গে করে আনতে পারে নি, কিংবা শুনবাব, বুঝবার, গ্রহণ-করবার শক্তিকে যে কোন দূরান্তের পথে রেখে এসেছে, কিংবা যার দেহের নির্জীবতা কাদাখোঁচার ছাযাব মত, চড়াইযেব মত, হেমন্তের বিকেলে শুকনো পাতার বাশের ভিতর বালি-হাসেব বিবর্ণ ডিমের মত, পৃথিবীর হৃদয যেন তাদের সম্বন্ধে নিজেকে সমযে-অসমযে অবাবিত ভাবে ব্যয করতে কেন এমন কুণ্ঠিত হয? আনন্দ-উৎসবই কি জীবনের সব চেয়ে বড় কথা? সহানুভূতি—

তাকিযে দেখলাম খুকু জেগে আছে।

—'কী ভাবছিস রে?'

কোনো উত্তব দিল না।'

—'খাবি কিছু?'

—'হ্যাঁ খাব।'

—'কী খাবি?'

—'আমি গুল খাব বাবা।'

—'গুড়?'

আকাঙক্ষা খুব সাধারণ। এব চেয়ে ভাল জিনিসেব কল্পনা এব জগতে নেই।

—'চকোলেট খাবি বে?'

চুপ করে রইল। চকোলেট কী জানে না অবিশ্যি—

—'টফি?'

এবারও নিস্তব্ধ; ভাবলে, ঠাট্টা করছি।

—'কী খাবি রে?'

কোথার থেকে একটা গঙ্গাফড়িং, তেলাপোকা, চামচিকা, ফড়ফড় কবে উড়ে এল—ঘরেব ভিতর ক্লান্তিহীন ভাবে ঘুরতে লাগল।

চামচিকাটার দিকে তাকিয়ে চোখ ধীরে-ধীরে ভাবী হয়ে এল মেযেটির; ঘুমিযে পড়ছিল, একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিলাম।

—'গুড় খাবি না রে?'

—'কই?' উঠে বসে হাত পেতে বললে।

ধীরে-ধীরে আস্তে-আস্তে শুইয়ে দিযে মাথায আস্তে-আস্তে হাত বুলুতে লাগলাম—'গুড় কাল সকালে খাবে; কেমন?'

—'আচ্ছা।'

—'নলেন গুড় না?'

—'হ্যাঁ।'

অন্যমনস্ক হয়ে অবাস্তব কথা ভাবছিলাম, কিছু ক্ষণ পর ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ঘুমিয়ে যাচ্ছে।

আরো দু-তিন দিন কেটে গেছে।

সকাল বেলা বাবা ইস্কুলের ছেলেদের খাতা দেখছিলেন। ছোট্ট-ছোট্ট টেবিলে বই, ডিকশনারি খাতাপত্র, দোয়াকতকালির স্তূপ—

মা এসে বললেন, 'একটা ছোকরা চাকর রেখেছি।'

—'রেখেছ?'

—'হ্যাঁ'

—'কী নাম চাকরটার?'

—'হরিচরণ।'

—'তুমিই রাখলে?'

—'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবার সময় ছিল না।'

—'কবে রেখেছ?'

—'আজ সকালেই।'

—'কত মাইনে?'

—'পাঁচ টাকা। রাখতে হয়েছে সুরেশ বাবুর জন্য। চাকর ছাড়া ওর বড় কষ্ট।'

দেখতে-দেখতে পিসিমা এসে দাঁড়ালেন।

বললেন—'মেজদার জন্য চাকর না রেখে দিলে চলে না তো দাদা।'

বাবা—'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

—'এই তো কাল পায়খানায় যাবেন—আমরা কেউ ঐ দিকে ছিলাম না, কে ঘটিতে জল দেবে, প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল।'

—'দশ মিনিট? তাই তো চাকর থাকলে এ-রকম বিপত্তি তো হত না।'

—'গাউটটা বেড়েছে কি না, কলকাতায়ও যেতে পারেন না, পায়ে মালিশ করে দেবার লোকেরও নিতান্ত দরকার।'

বাবা—'তা সুরেশ আমাকে আগে বললেই পারত; এসেছে তো দশ দিন, চাকর ছাড়া এত দিন তা হলে খুব কষ্টেই কাটাল।'

পিসিমা—'তা যা হবার তো হয়ে গেছে।'

—'তোমার টানাটানির সংসার দেখে মুখ ফুটে তোমাকে বলতে পারে নি হয় তো।'

—'আমার কিন্তু বরাবর মনে হচ্ছিল একটা চাকর ছাড়া বর্ষার মধ্যে ওর হবে কী করে?'

পিসিমা—'মনে হলেই তো শুধু হয় না, ব্যবস্থা করতে হয়।'

—'তা ঠিক; যাক, তুমি না হয় আমার হয়ে বেশ ভাল ব্যবস্থাই করেছে।'

—'এর মাইনে কিন্তু পাঁচ টাকা।'

—'শুনেছি।'

—'একটা কথা কিন্তু দাদা।'

—'বলো।'

—'মেজদা হয় ত টাকাটা আপনাকে দিতে চাইবে কিন্তু আপনি নেবেন না।'

—'ওঃ, সে কথা কি তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে।'

—'তা হলে মেজদাকে আমি একটা কথা গিয়ে বলব?'

—'কী কথা?'

—'বলব যে দাদাকে টাকা নিয়ে সাধতে যাবেন না। তা হলে দাদা বিরক্ত হবেন।'

—'আমি জানি সুরেশ আমাকে টাকা নিয়ে সাধতে আসবে না।'

—'কী রকম?'

—'সে জানে সে তার দাদার বাড়িতে আছে।'

—'কই? দু ভায়ে বনিবনা কোথায়?'

—'কেন? কী রকম?'

সূচীপত্রে যান

—'তার খাবার সময় তুমি গিয়ে দাঁড়াও?'

বাবা একটু চুপ থেকে—'সকালবেলা তো আমি ইস্কুলে চলে যাই।'

—'বেশ, রাতের বেলা?'

—'আমি খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ি এই আমার চল্লিশ বছরের অভ্যাস—সুরেশের খাবার সময় তদারকের জন্য খোকাকে পাঠিয়ে দি তাই—খোকার মা তো আছেনই—তা তুমি যদি মনে করো আমি না যাওয়াতে সুরেশ ক্ষুণ্ন হচ্ছে, তা হলে আজ থেকে আমি গিয়ে বসব।'

—'বসবার দরকার নেই।'

—'দরকার নেই?'

—'একটু বসে পায়চারি করে চলে আসলেই হবে, আপনি ওখানে গিয়ে বসলে মেজদার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে।'

—'কেন?'

—'অন্তত কথাবার্তার ধারা বদলে যাবে, আধ্যাত্মিক হয়ে উঠবে।'

—'সেটা তোমরা চাও না অবিশ্য।'

—'না।'

—'আচ্ছা, তা হলে গিয়ে দু-চার মিনিট পায়চারি কবা যাবে।'

—'হ্যাঁ, দু-এক মিনিট থেকে, আপনি আপনার ঘবে চলে গেলে, কেউ আপনাব পথ আটকাতে যাবে না, লৌকিকতাও বজায় থাকবে।'

—'বেশ কথা, বেশ কথা।'

—'হরিচরণ কিন্তু একান্তই মেজদার।'

—'তা ছাড়া আবার কার? সুরেশের জন্যই তো রাখা।'

—'না, সেই কথাটাই সব সময় যেন আপনাদেব খেয়ালে থাকে। সেই জন্যই বলছিলাম।'

মা—'বৌমা হয তো মাঝে-মাঝে কিছু ফরমাস দিতে পারে।'

—'তা যেন না দেয।'

একটু কেশে পিসিমা—'বান্নাঘরেব কোনো কাজ হরিচণব কবতে পারবে না।'

বাবা—'না, রান্নাঘরের জন্য তাকে তো রাখা নয়।'

—'বাজারে হেম যেমন যাচ্ছিল তেমনি যাবে। আপনাবা ওকে জল তুলে বা কাপড় কেচে দিতে বলতে পারবেন না। এ-সব বৌমা আর বৌঠান যেমন করছিল তেমনই করবে। সন্ধ্যাব বাতিও বৌমাই জ্বালবে।'

বাবা হেসে, 'কারু কোনো আপত্তি নেই।'

—'হবিচণব মেজদার হাত-পা টিপে দেবে, কাপড়-চোপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে দেবে। বিছানা পাতবে, ঘর ঝাট দেবে, জিনিস পত্র সাজাবে-গোছাবে, পাইখানার জল দেবে, পাকা চুল বেছে দেবে—এই সব আর-কী?'

—'বেশ কথা; এখন চাকরটা কী-রকম হয' আনাড়ি হলে তো সুবেশের বড্ড কষ্ট।'

—'না, সে বেশ চালাক আছে।'

—'গায়ে-পায়ে কাজ কবতে পারবে বেশ?'

—'তা ফুর্তিতে সকাল থেকেই তো কাজে লেগে গেছে।'

—'বেশ।'

—'মেজদার গা টিপছে সেই সকাল থেকে।'

—'সুরেশের গাউট বাড়ল না কি আরো?'

—'বাড়েও নি কমেও নি—যেমন ছিল তেমনি আছে তবে না-টিপলে কষ্ট লাগে।'

—'দেখো, চাকরটা যেন বেশ মোলায়েম ভাবে টিপতে পারে, আর হাত, পা, ঘাড় টিপবার আগে কখনো যেন তামাক না খায।'

—'মেজদা চেয়েছিলেন জমিদারি ষ্টেটে ম্যানেজারি করতে, ঢের বড়-বড় চাকরি পেয়েছিলেন—আমি বললাম, থাকরে বাপু, হাতে-পায়ে এত, বয়সও তো কম নয়, তোমার এখন সেবা শ্রদ্ধা পাবার বয়স, সুস্থিরে বসে ভগবানের সান্নিধ্যে থাকবে, মানুষকে ধর্ম উপদেশ দেবে, পথ দেখাবে, এই আর-

সূচীপত্রে যান

কী।'

মা বললে, 'হরিচরণকে তিন বেলা খাবার দিতে হবে! হ্যাঁ তিন বেলা ভাত দেব কড়ারে নিয়েছি, সুরেশ বাবু আচ্ছা ছেলে মানুষ।'

—'খাবে তো! না হলে কাহিল শরীরে কী কাজ করবে?' বাবা শাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে—'যা খেতে পারে, খাবে।'

একটু গলা খাঁকরে—'মানুষ তো ক্ষিধের অতিরিক্ত কিছু খায় না।'

মা একটু চিন্তিত ভাবে—'তিন বেলা এক জন চাকবেব অন্তত দেড় সেব চালের ভাত লাগবে।'

—'লাগলে লাগবে? এ নিয়ে তুমি ভাবছ কেন বড় বৌ।'

—'না, টেনে-হিঁচড়ে সংসার চলছে কি না।'

—'তা, আমি না হয় বলব মেজদাকে চালের টাকাটা দিতে। এক টাকা কবে তো চালের মণ।'

মা তাড়াতাড়ি পিসিমার মুখে হাত চাপা দিয়ে—'খবরদাব, এমন কাজও কবো না ঠাকুরঝি।'

—'দাদা বললে অবশ্য মেজদাকে গিয়ে লাগাতাম; তোমাব কথার কী—আব মূল্য বৌঠান; তুমি তো বাজাবের ঘটি-বাটি।'

খানিক দূর গিযে পিসিমা ফিরে এসে বাবাব দিকে তাকিযে—'আমি কিন্তু মেজদার সঙ্গে কলকাতায় যাব।'

—'তা একবাব গিযে বেড়িয়ে এলে—বেশ তো।'

—'বেড়িযে আসা শধু নয।'

—'তবে?'

—'পুজোর সময আমাকে আনবার জন্য হেমকে যদি পাঠাও তা হলে আমি আসব না।'

—'কেন?'

—'চালের দব নিযে যাবা কষাকষি কবে সে-সব চামাবেব বাড়ি আমি থাকি না।'

কিছু না বলে পিসিমা হন হন কবে চলে যাচ্ছিলেন। মা ডাক দিলেন—

দাঁড়ালেন না, কিংবা পিছে তাকালেন না।

—'তোমাব দাদা তোমাকে ডাকছেন।'

পিসিমা ফিবে এলে, বাবা—'কই আমি তো তোমাকে ডাকি নি।'

মা বিহ্বল হযে বললেন—'আচ্ছা বেশ, আমিই ডেকেছি—আমাব ডাক বুঝি শুনতে নেই?'

বলে ঝুপ করে পিসিমাব থানেব আঁচলখানা ধবে নিজেব মুটির মধ্যে গুছিযে নিযে কানে-কানে কথা বলতে-বলতে গলাগলি হয়ে পেযাবা গাছটার দিকে চলে গেলেন দু জনে।

পেযাবা তলায দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টা কথাবার্তাব পর পিসিমা পাড়াব দিকে চলে গেলেন।

মা এসে বললেন, 'শুনছ?'

বাবা খাতার থেকে মুখ তুলে তাকালেন।

—'চামার বলুক, কশাই বলুক, আমাদেব অভদ্র সেজে কী লাভ?'

বাবা চোখ নামিযে লিখতে লাগলেন।

—'রাগ করেছ?'

—'ঐ রকমই বলে।'

—'আমাকে বললে বাজারের..!'

কল্যাণী চলে যাচ্ছিল, মা একটু থমকে থামলেন।

বাবা—'কল্যাণী চলে গেল যাক, এ সব প্রসঙ্গ তুলে কোনো লাভ নেই, আমার ইস্কুলেব বেলা হযে যাচ্ছে।'

—'আজ যে দুধ খেলে না, ক দিন ধরে দুধ খাচ্ছ না যে?'

—'দুধ হজম হচ্ছে না।'

—'চা আর মুড়ি তো খুব হজম হয়।'

—'আচ্ছা, এর মানে ডিকশনারিতে দেয নি কেন খোকা?'

—'এটা কার ডিকশনারি?'

—'অক্সফোর্ডই তো'

—'দেয় নি? কী জানি।'
—'কোথায় পাব তবে?'
—'নিউ ইংলিস ডিকশনারিতে আছে হয় তো।'
—'হ্যাঁ। তা কোথায় পাই?'
—'এখানে কারো আছে বলে তো মনে হয় না।'
বাবা একটু চুপ থেকে—'নবাব হামাম মিঞার খুব বড় ডিকশনারি আছে।'
—'আছে না কি?'
—'হ্যাঁ বেশ নামজাদা।'
—'নবাবজাদা কোথায় থাকেন?'
—'সে প্রায় মাইল তিন-চারের পথ।'
—'আগে তো ছিলেন নদীর দক্ষিণ দিকে এক চর, না শকুন চর, কী বলে তারই পাশে।'

বাবা বাধা দিয়ে—'সে বাড়ি নদীতে ভেঙে গেছে। এখন একেবারে নদী এড়িয়ে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে ভিতরের দিকে বাসা করেছেন।'

একটু গলা খাঁকরে, 'তোমাকে—চিনিয়ে দিচ্ছি।'

এক চিলতে শাদা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—'দেখো।'

মিনিট পাঁচকে পরে—'চিনলে?'

—'হ্যাঁ, ওদিকে আগে তো বন-জঙ্গল ছিল বলে জানতাম।'

—'একটা মস্তবড় প্রান্তরও ছিল। এখন বসতি হয়েছে অনেক। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বিঘা জমির ওপরে চমৎকার সুন্দর বাড়ি নবাবজাদার।'

—'কী রকম বই আছে লাইব্রেরিতে?'
—'প্রায় হাজার তিরিশেক বই। প্রায়ই ইংরেজি ক্লাসিক।'
—'তুমি গিয়েছ সেই লাইব্রেরিতে?'
—'হ্যাঁ গিয়েছি কয়েকবার।'
—'নতুন বই আছে?'
—'প্রত্যেক সনেই তো বই কিনছেন। খুব যা-চাও সে-রকম বই পাবে আশা করি।'
—'গেলে হয় এক দিন।'
—'মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের চিঠি নিয়ে যেও।'

বাবা বলতে লাগলেন, 'শব্দটার মানে দেখে এসো, শুধু শব্দার্থ নয়, সেটা আমি জানি খানিকটা, আমি চাই এই শব্দটির আদ্যোপান্ত ইতিহাস, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা।'

বাংলা খবরের কাগজটা পড়ছিলাম। দক্ষিণের ঘরে শুনছিলাম মেজকাকা ও মায়ের হাস্য কলরব বেশ জমে উঠেছে।

পিসিমা গলায় আঁচল জড়িয়ে এসে—'দাদা।'

খাতার থেকে চোখ না তুলেই—'কী, কী মনে করে?'

—'মেজদাকে যে রোজ মিঠাই কিনে দেওয়া হচ্ছে সে কথা তোমাকে বলি নি।'
—'না, শুনি নি আমি।'
—'রোজ বিকেলে, রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া, পান্তুয়া, অমৃতি খান।'
—'বেশ তো, বাজারের থেকে না এনে ঘরেই করে দিতে পারত।'
—'তা, পয়সা অনেক জমে গেছে। ক্ষিতীশ আমাকে বললে—বাকিতে আর আমি দিতে পারব না।'
—'ক্ষিতীশকে খাতা নিয়ে আসতে বলো।'
—'আচ্ছা।'
—'আর একটা কথা।'
—'বসে বলো, দাঁড়িয়ে রইলে? হেম একটা মোড়া এনে দাও।'
—'না, না, আমার বসতে হবে না, এক মিনিট শুধু।'
চৌকাঠের ওপর বসে—'মাঝে-মাঝে গাড়িতে বেড়াতে গেছেন, সেই ভাড়াটা।'
—'আচ্ছা।'

সূচীপত্রে যান

—'আর একটা ইংরেজি খবরের কাগজ রোজ দিতে বলবেন।'
—'অমৃত বাজার কি একটা রাখা হয় না হেম?
—'মেজকাকা স্টেটসম্যান চান।
—'বেশ তাই রেখো; যার যাতে তৃপ্তি হয় তার থেকে তাকে বঞ্চিত করে লাভ নেই ত কিছু।'
পিসিমা—'কাপড় কাচা সাবানের জন্য কিছু পয়সা দেবেন?'
—'এক সের সাবান?'
—'হ্যাঁ, ধরুন, আড়াই সের আন্দাজ।'
—'চাবি তো ওর কাছে। বলো গিয়ে, যত পয়সা লাগে দেবেন।'
বাবা গুন-গুন করে গাইতে গাইতে উঠলেন। সংস্কৃত একটা শ্লোক। হয় তো উপনিষদের।
মাইনে অবিশ্যি পঞ্চাশ টাকা। ধাব, পাঁচ হাজার পেরিয়ে গেছে।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পব খুকিকে ঘুম পাড়িয়ে বাবার কোঠায় গিয়ে বসলাম। সদর রাস্তাব দিকের দরজাটা বাবা বন্ধ করে ইস্কুলে চলে গেছেন, খুলে দিলাম দরজাটা। দিব্যি আলো ঘরের ভিতর ঢুকল, ফুরফুরে মেঘলা বাতাস। কযেক হাত দূবে সবুজ নিবিড় কৃষ্ণচূড়া গাছটা দাঁড়িয়ে—এখনো ইতস্তত কিছু ফুল ফুটে আছে।
একটা টুল নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বসলাম।
পাযেব শব্দ শুনেই তাকিয়ে দেখি মা পান চিবুতে-চিবুতে এসে দাঁড়িয়েছেন।
—'খাওয়া হয়ে গেল?'
—'হ্যাঁ।'
—'কী দিয়ে খেলে আজ?'
এ প্রশ্নেব উত্তব মা কোনোদিনই দেন না, আজও নিরুত্তর হযেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।
বললাম—'বসো।'
—'না, ঢের কাজ আছে।'
—'কোনো সময়ই তো তুমি বসতে চাও না।'
কোনো জবাব দিলেন না।
—'তোমাকে কখন আমি পাই বলো তো?'
এ প্রশ্নেবও কোনো উত্তর নেই।'
—'সকালবেলা ঘুমেব থেকে উঠে দেখি তুমি রান্নাঘবে চলে গেছ। কত সকালে যে যাও তাও ঠিক বুঝে উঠতে পাবি না।'
—'না-গিয়ে উপায় কোথায়?
—'শুধু সেইজন্যই না, আমাব মনে হয় যেতে তোমাব ভাল লাগে।'
—'তাই তোমাব মনে হয় বটে।'
—'তাই না মা? উকিলের যেমন কোর্টে যেতে ভাল লাগে, ডাক্তাবেব যেমন হ্যাট-কোট পবে স্টেথিস্কোপ নিয়ে বেবিয়ে পড়তে খুব উৎসাহ, দালাল যেমন নাকে-মুখে গুঁজে ছাতি নিয়ে ছুটতে ভালবাসে, হেঁসেল হযেছে তোমাব তাই।'
নীরব ছিলেন।
—'এই বৃষ্টিব ভোরে বিছানায একটু শুয়ে থাকতে কত ভাল লাগে মানুষেব। তুমি সব অগ্রাহ্য কবে অন্ধকাব থাকতে একটা গামছা মাথায ফেলে বৃষ্টি ভেঙে বান্না ঘবে দাও ছুট।'
—'চুনে দেখছি জিব পুড়ে গেছে।'
—'তাব পব বান্না ঘবে গিয়ে কী কবো?'
—'পানটা নিশ্চযই বৌমা সেজেছিল আজ।'
—'উনুন জ্বালাও? না আগেকাব দিনেব বাসন মাজো?'
—'বৌ এত চুন খায?'
—'হ্যাঁ চুন খেতে খুব ভালবাসে, শবীবে ক্যালসিয়াম খুব কম কি না।'
—'ক্যালসিয়াম কী?'

—'যা দিয়ে হাড় তৈরি হয়; কল্যাণীর সেই জিনিসের খুব অভাব, তার মেয়েরও। দু জনেবই রিকেট।'

—'রিকেট কাকে বলে?'

—'যাদের শরীরে চুন জাতীয় জিনিস, আরো নানা রকম সার পদার্থ ঢের কম, ভিটামিন কম, ভিটামিন এ-বি-সি-ডি জীবনী শক্তির যত সব মাল-মশলা সবই নিবন্ত প্রদীপের মত জ্বলছে আর কি।'

—'আজ বড্ড চুন দিয়েছে এই পানে। আমি এক শ বার নিষেধ করে দিয়েছি তবু যদি কানে ঢোকে। এর পর দেখছি একটা পান নিজের তৈরি করে খেতে হবে।'

—'আগের রাতের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো আগে মেজে নাও?'

—'তোমার বৌ তো আর মেজে দেবে না আমাকে'

—'তারপর উনুন জ্বালাও?'

—'না, বাসন আগের রাতে মেজে রাখি।'

—'রোজই? সমস্ত?'

—'হ্যাঁ, তবে কি আবার থোক-থোক করে মাজব না কি?'

—'চেপে যে-দিন ঝড়-বৃষ্টি আসে।'

—'বললাম তো, রোজই মেজে রাখি রে। তুইও নিজের চোখে দেখেছিস কত? আজ যে বড় জিজ্ঞাসা?'

—'আগে তো ছাতা নিতে না।'

—'এখনো নেই না।'

—'বৃষ্টিতে এত ভিজতে পাবে মানুষ?'

—'ঘাটলার পাশে মস্ত বড় জাম গাছটা আছে বে।'

—'তাতে বৃষ্টি সানায।'

—'সানিযেই তো যায এক রকম দেখি।'

—'সকালবেলা প্রথম উনুন জ্বালাও গিযে?'

—'হ্যাঁ রে।'

—'উনুন জ্বালানো কি সোজা ব্যাপাব মা, বিশেষত এই বৃষ্টি বাদলের দিনে সমস্তই থাকে স্যাঁতসেঁতে হযে। সমস্ত বাড়িঘবে শুকনো ডালপাতা জোগাড়, কযলা ভাঙা, গোবব দিযে মেখে ঘুটে তৈরি করা।'

—'বড় তো ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে বসলি রে? খুকি ঘুমিযেছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আব বৌমা?'

—'পড়ছে বোধ হয।'

—'কী বই?'

—'কিংবা লিখছে।'

—'চিঠিই লিখছে বোধ করি।'

—'কাকে?'

—'তা তো আমি জিজ্ঞেস করি নি।'

—'জিজ্ঞেস করলে, বলে কি সব সময?'

—'কেনই-বা বলবে? আমরা কেউ-বা কাকে জীবনের সব কথাটুকু বলি?'

হাসতে লাগলাম।

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

বললেন, 'যাই।'

—'দাঁড়িযে-দাঁড়িযেই তো রইলে এত ক্ষণ বসলেও না।'

—'যাই, একটু ঘুমোই গিয়ে।'

—'ঘুমোবে না তুমি নিশ্চয়ই।'

—'কী করব তা হলে?'

সূচীপত্রে যান

—'ঘুমোলেও আধ ঘণ্টার বেশি নয়।'

—'কেন? তার পর কোথায় যাব?'

—'সে সব তুমি জান, তবে দুপুরে আধ ঘণ্টা-তিন কোয়াটারের বেশি ঘুমোতে দেখি নি কোনো দিন; কোনো দিন একাগ্রভাবে অনেকক্ষণ বই পড়তেও দেখি নি; পাড়ায় কড়ি খেলা বা বিস্তিব মজলিশে পনের মিনিটের বেশি তুমি টিকতে পার না; সেলাইয়ের কলের ইতিহাস তোমার জীবনে নেই; না আছে নকসি কাঁথা, মোজা, টুপি বুনবার।'

—'সমস্ত সময়ই রান্নাঘরে থাকি বুঝি?'

—'না, তা নয়।'

—'তবে?'

—'মানুষকে আপ্যায়িত কবতে, কথাবার্তা বলতে, আসর জমাতে, খুবই পার তুমি কিন্তু—'

একটু চুপ থেকে—'সময়ের অভাবে কিছুই হল না তোমার।' মা ঈষৎ প্রসন্ন ও বিমর্ষ মুখে—'যার যেমন ভাগ্য।' ঈষৎ বিরস ও খানিকটা প্রফুল্ল ভাবে—'অবিশ্যি নিজেব ভাগ্যকে দোষ দেই না আমি, বিধাতা আমাকে যা দিয়েছেন'—পবস্পব বিরুদ্ধ কথা কলের মত আউড়ে গেলেন। এখন সময় বিশেষে বিক্ষোভও যাতনা। অন্য সময়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তৃপ্তি।

ভাবলেন নিজেব জীবনেব জবাবদিহি দেওয়া হয়ে গেছে।

—'হ্যাঁ সময়ের অভাবে কী হল না তোমার? এই তো তিন মাস ধবে এখানে এসেছি-দিনেব ভিতব কতবাব তোমাকে চেয়েছি। কিন্তু সব সময় শুনেছি অনেক কাজ। কোনো সময় নেই।'

মা চুপ কবেছিলেন।

—'বাবাও তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান' বলতে পাবলে ভাল লাগে তাব—'

বাধা দিয়ে মা—'এমন মিথ্যা কথা বলো না তুমি।'

—'মিথ্যা নয়, সত্য কথা।'

—'চব্বিশ ঘণ্টা তিনি নিজের কাজ নিয়ে আছেন।'

—'না চব্বিশ ঘণ্টা নয়, অনেকটা সময় তাঁব অবসব।'

—'আমি তো তাঁকে এই পঞ্চাশ বছর ধবে দেখছি।'

—'ইস্কুল থেকে এসে রাত দশটা-এগাবটা, কোনোদিন বাবটা অব্দি তিনি কথার মানুষ খুঁজতে থাকেন, আলাপ কবতে চান, নিজেকে বড্ড একা বোধ কবেন।'

—'বেশ, তো, দাবাব আড্ডায় গেলেই পাবেন।'

—'বাবা তো ইহজীবনে কোনোদিন তাসও খেলেন নি।'

—'এ-রকম অদ্ভুত লোককে বাধ্য হয়েই একা থাকতে হয়।'

—'বাঃ বাঃ তুমি এই বকম কথা বল, তাস-পাশাব মজলিশ ছাড়া, মানুষের আনন্দ পাবাব অন্য কোনো জায়গাই নেই এই পথিবীতে?'

—'যে লোক বাড়ির থেকে বেরুবে না, সমাজে মিশবে না, আন্তরিক কথাবার্তা বলবার জন্য বন্ধু-বান্ধব কী কবে জুটবে তার।'

মা বললেন—'অর্থসম্পদ নেই, প্রভুত্ব প্রতিপত্তি নেই, কোনো একটা প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে সংযোগ নেই।'

—'না, তা নেই।'

—'এ-বকম ধবনেব বোবা লোকেব কাছে কে এসে বসবে বলো?'

—'না বড় একটা কারু আসবাব কথা নয় বটে।'

—'মাঝে-মাঝে দু-চারটি ছাত্র এসে টিক-টিক করে।'

—'হ্যাঁ তা দেখেছি।'

—'ক্বচিৎ দু-এক জন মাষ্টাব আসে। তাও যদি হেড মাষ্টাব হতেন; তাও তো নন তোমাব বাবা।'

—'বাবার জীবনটাকে এ-রকম ভাবে পর্যালোচনা কবা চলে বটে কিন্তু আমি তার জীবনের অন্য রূপ দেখেছি।'

উদাসীন চোখ তুলে মা আমার দিকে তাকালেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে মাথা হেঁট করে রইলাম, কেমন বেদনা বোধ করছিলাম।

—'কোনো অপূর্ব রূপ তোমার চোখে পড়ল?'

—'তোমার চোখেও পড়েছে নিশ্চয় এক দিন, যখন তিনি মরে যাবেন তখন বুঝতে পারবে।'

মা—'ছি, এমন কামনা করো তুমি? জেনো, আমার নোয়া-সিন্দুর এক দিন ঘুচে যাবে এই কথা আমাকে শুনিয়ে বলবার প্রবৃত্তি তোমার সংযম মানে না?'

—'বাবার জীবনী বা চরিত্রের কথা বিশদভাবে তোমাকে বলতে যাচ্ছি না, তোমাকে বলার প্রয়োজনও নেই, কিন্তু দেখে না-দেখেও সবই জান তুমি। আজকালকার ন্যানাবকম নবীন-তরুণ মানুষদের মধ্যে তিনি এমন একজন সাবেকি লোক, যিনি চলে গেলে আমাদের পবিবারের শাখায়-প্রশাখায় কেউ কোথাও তার স্থান পূর্ণ করতে পারবে না।'

—'আবার তুমি সেই কথাই বলছ; নোযা-সিঁদুব নিযে তার পাযে মাথা বেখে আমি মরব।'

—'পায় মাথা রাখবার দরকার নেই—দিনের মধ্যে কযেকবার অন্তত তার মাথার কাছে এসে বসো।'

—'যাই।'

—'কোথায়?'

—'লুচি করতে হবে। তোমার মেজকাকার জন্য।'

—'তা এত তাড়া কী? এখন তো মোটে দুটো।'

—'উদ্যোগ করতে হবে তো।'

—'না হয় একটু দেরিই হযে গেল আজ; বলো হেমের সঙ্গে কথা বলতে গিযে একটু বিলম্ব হযে গেল; কিছু বলবেন না তিনি।'

—'না, আমাব একটু এখন দক্ষিণেব ঘরে যেতে হবে।'

—'কেন?'

—'তোমার মেজকাকা বলেন, দুপুবটা বড্ড একা লাগে।'

—'তাই না কি?'

—'সান্নিধ্য তিনি বড় একটা ভালবাসেন না।'

—'পিসিমা ওখানে আছেন?'

—'হ্যাঁ আছে। ওর বকবকানি মেজবাবুর চক্ষুশূল।'

—'মেজকাকা জেগে আছেন এখনো?'

—'আছেন বই কি; সাবা দুপুবই কি মানুষ ঘুমোয?'

—'কী কবেন সমস্তটা দুপুব বেলা?'

—'কীই-বা কববেন, তাই তো বলছিলেন, বড্ড একা লাগে, সময কাটতে চায না; তুমি এসো বড় বৌ।'

—'বাবা তোমাকে বড় বৌ বলে ডাকেন না।'

মা একটা চিরুনি দিযে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন।

—'কিংবা কাছে এসে বসতেও বলেন না?'

—'বুড়ো বয়সে কাণ্ডজ্ঞান হারান নি তো'—

—'ইস্কুল থেকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন, খুকিকে আদর করেন, কোলে নেন, খুকির সঙ্গে খেলা করেন, কিন্তু তবুও যেন কেমন একটা অভাব ঘুচতে চায না, বুঝি অনেক কথা বলবাব আছে তাঁব, তিনি অনেক বিনিময়ের মানুষ, আমার কাছে সমস্ত কথা ব্যক্ত করবার তাঁব সুযোগ নেই—অধিকাব নেই, নির্দেশ নেই। আর্টিস্ট নন তিনি, লিখে নিজেকে নির্মুক্ত করে নেবার অবসব নেই। সামাজিক লোক নন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে গিযে নিজেব বোঝা হালকা খালাশ কবে নেবাব সৌভাগ্য নেই। ঘুরে ফিরে আমাব কাছেই আসেন। বিছানার অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকেন অনেকক্ষণ, চেযাবে গিযে বসেন, বাবান্দায গিযে পাযচারি করতে থাকেন, আমার কোঠায এসে আবার উঁকি দিযে যান, দু-চার মিনিটের জন্য আলো জ্বালেন, আলো নিভিয়ে ফেলেন। তারপর আবার চলে অন্ধকাবের মধ্যে পাযচারি—এ-কোঠায, ও-কোঠায সে-কোঠায—বারান্দায, এ যেন আর ইহকালেও ফুরুবে না, নিজের কোঠায—চেয়াবে এসে চুপচাপ বসে থাকেন। দক্ষিণের ঘরে পিসিমা, মেজকাকা ও তোমার হাসি-তামাশার কোলাহল ঘণ্টার পব ঘণ্টা শুনতে পাই আমরা—কিন্তু এ-ঘরটা খাঁ-খাঁ কবতে থাকে। কল্যাণী তাব কোঠায, আমি আমার

কোঠায়, বাবা নিজের কোঠায়। জীবনের হাসি-আনন্দকে আমরা কেইউ অপছন্দ করি না, কিন্তু পরস্পর এত কাছে থেকেও সে জিনিস আযত্ত করবার অধিকার আমাদের নেই, অনেক রাত বসে খবরের কাগজটা চিবিয়ে-চিবিয়ে শেষ করি, তারপর আবার চিবোই, তারপব আবার চিবোই। বাবা থেকে-থেকে উপনিষদের শ্লোক আওড়ান, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন—কল্যাণী তেঁতুলের ঝোল খেযে সন্ধ্যারাতেই বাতি নিবিয়ে জীবনের ক্ষমাহীন জীবনস্রোতের কথা ভাবতে থাকে।

মা—'এই জন্যই তো এই ঘরে আস্তে চাই না; এ নিরানন্দের মধ্যে এসে অন্ধকারের ভিতব মুখ গুঁজে কাঁদব—'

—'কিন্তু এটাই তো তোমার ঘর—'

—'সেইজন্যই তো ঘুমোবার সময় এ ঘবে আসি।'

—'আমার ও কল্যাণীর কথা আলাদা। মানুষের জীবনকে তুমিও স্বীকার করেছ, বাবাও স্বীকাব করেছেন, তোমাদের বিশ্বাস আছে, ভক্তি আছে, প্রেম আছে, তোমরা প্রার্থনা কর; অথচ তার এক মুহূর্ত আগেও অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক মানুষদের সঙ্গে অবাস্তব কথা বল—অথচ তুমি ঘুমোবার সময এ-ঘরে আসতে চাও শুধু, বাবা না-ঘুমিয়ে ঘুরে মরেন, বুঝি না এ কেমন?'

—'এক দিন বুঝবে; তুমিই তো এক দিন আমাকে চিতায নিয়ে চড়াবে, সে দিন আমার কপালেব সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পাববে সব।'

—'স্বামী-স্ত্রীব সম্পর্কে শাড়ি-সিঁদুবেব আড়ম্ববেব কোনো মূল্য দেই না আমি; হয ত সিঁদুবেব দিকে তাকাবই না; জীবনে কে কাকে কেমন আঘাত করেছে সেই কথাই মনে হবে।'

—'যাক, তোমাব সঙ্গে মিছিমিছি কথা বলবাব কোনো অভিরুচি নেই আমাব।'

মা চুলের ভিতর ধীরে-ধীরে চিরুনি নাড়ছিলেন।

—'পৃথিবীতে যদি অনেক দিন বেঁচে থাকতে হয তা হলে সৎচবিত্র ধার্মিক আদর্শ গৃহস্থ হয়ে যেন জীবনটা না কাটাই—তার চেযে তাড়িখানাও ঢেব ভাল।'

—'তোমাব যা মনে আসছে, তা বলছ দেখছি হেম।'

—'বাবার মত সত্তব-বাহাত্তর বছব যদি বেঁচে থাকতে হয—কবিতা লিখবাব শক্তি যদি হাবিযে ফেলি, তা হলে, তা হলে চীনাদেব মত জুয়ার আড্ডায কাটাব। কিংবা জাহাজেব খালাশি হযে বেবিযে যাব, মিছিমিছি বাবাব মত উঠানে বাবান্দায অন্ধকাবে পাযচাবি কবে শিষ্ট সাধু হয়ে জীবনেব সম্ভাবনাটাকে নষ্ট কবে কী লাভ? মেজকাকাও করেন না, সেজকাকাও কবেন না; প্রতি মুহূর্তেই জীবনেব কাছ থেকে নতুন কিছু পুবস্কার পাওযার সম্ভাবনায থাকেন।'

ভিজে শালিকেব ঘাড়েব পালকের মত চুল আঁচড়ানো হযে গিযেছিল মাব, শাড়ি বদলাতে গেলেন, ফিবে এসে খুকির মাথায দু-তিন বাব হাত বুলিযে দক্ষিণেব ঘবেব দিলে চলে গেলেন। বাত বারটা-একটাব আগে এ ঘবে আব পদধ্বনি শোনা যাবে না।

বাবা চমকে উঠে—'কে?'

—'আমি'

—'ও, হেম?'

—'হ্যাঁ'

—'রাত কটা বাজে?'

—'এই দশটা হবে।'

—'ওঃ তবে তো কম রাত হয নি—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আরো ঢেব বেশি বাত হযেছে, এই বারটা আন্দাজ,' একটু হেসে, 'অবিশ্যি আমাব মনেব ঘড়ি অনুসাবে বাত একটা-দুটো হযে যাওযা উচিত এতক্ষণে; কিন্তু তুমি খেযেছ?'

—'হ্যাঁ অনেক ক্ষণ, আপনি খেলেন না কিছু?'

—'এক গ্লাস মিছরির পানা খেযেছি, আজ আর খাব না।'

—'কিছুই না?'

—'না,' একটু চুপ থেকে, 'মাঝে-মাঝে উপোস দেওযা দবকার; তাতে শরীবের কোনো ক্ষতি হয না, ভালই হয, খুকি ঘুমিযেছে?'

সূচীপত্রে যান

—'হ্যাঁ।'
—'দুধ খেয়েছিল?';
—'খেয়েছে।'
—'তোমার বিছানায় নিয়েছ?'
—'হ্যাঁ।'
—'খুকির আবার পাঁচড়া হচ্ছে দেখলাম।'
—'হ্যাঁ।'
—'সমস্ত হাত-পা, বুক-পিঠ, খুজলিতে ভরে গিয়েছে।'
—'দেখেছি।'
—'এ তো বড় ভাল কথা নয়।'
—'নাঃ ঘুরে-ঘুরে হচ্ছে।'
—'কিন্তু বার-বার এ-রকম পাঁচড়া হয় কেন? এই আড়াই বছরের মধ্যে তিন বার হল?'
মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন।
—'কলকাতায় তুমি চোদ্দ বছর ধরে আনাগোনা করছ, কখনো কোনো প্রলোভনে পড়ো নি তো? শরীরে কোনো রোগ আছে তোমার?'
—'আছে বলে তো জানি না'
—'এ মেয়ের প্রতি দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পেরেছ বলে মনে হয় না।'
নিস্তব্ধতায় খানিকটা সময় কেটে গেল।
একটু চুপ থেকে—'থাক্, এ প্রসঙ্গ থাক। তুমি ঘুমোতে যাবে এখন?'
—'না।'
—'পড়বে?'
—'এখন আর পড়ব না।'
—'ভবিষ্যতে আর—'
কিন্তু না-বলে থামলেন।
বললেন—'অবিনাশকে কাল ডেকে আনব।'
—'এখানে?'
—'হ্যাঁ।'
—'তিনি তো অ্যাসিসট্যাণ্ট সারজেন—'
—'ভিজিট দেব, বেশ পাকা ডাক্তার, খুব অমায়িক, ভদ্র মানুষ।'
—'কিসের জন্য আনবে তাকে বাবা?'
—'খুকিকে দেখবে, তাঁকে খুলে সব বলো।'
চুপ করে ছিলাম।
—'আর তোমারও ব্লাড এক্সামিন করবে। ওষুধ দেবে, হয় ত ইনজেকশান-এর দরকার হবে।'
একটু বিব্রত হয়ে—'কিন্তু মেজকাকা যদ্দিন এ বাড়িতে আছেন এখানে অবিনাশ বাবুকে না আনাই ভাল।'
—'কেন সুরেশ কোনোদিন এর জন্য ইনজেকশান নেয় নি!'
মাথা হেট করে—'নিলে তো প্রকাশ্যে নেয় নি।'
বাবা—'বছর পনের আগে একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম, সুরেশের বাসায় কয়েক দিন ছিলাম; গামছা ছিল না, সুরেশ এক দিন আমাকে তার টার্কিশ তোয়ালেটা দিয়ে বললে, দেখবেন দাদা, এ গামছায় চোখ-মুখ মুছে অন্ধ হয়ে যাবেন না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন এ-রকম বলছ? বললে, ডাক্তারের নিষেধ আছে, ছেলেপিলেদের দেই না আমার ব্যবহৃত জিনিস, কারুরই ধরবার উপায় নেই। খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললাম, ডাক্তারের এ রকম নিষেধ কেন? সুরেশ বললে, কামনাই বলুন প্রেমই বলুন, সে-সব জিনিসের তাড়া আমার বড্ড বেশি; কাজেই ডাক্তার, লোশন, অনেক কিছুই লাগে। কিন্তু তবুও গামছার এই দুর্দশা; পাশেই ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়েছিল তামাশা পেয়ে হাসতে লাগল। রমেশের মতিগতিও এই রকম। এই পরিবারটা যেন একটা অসুরের। অবাক হয়ে ভাবি, বাবা এমন দেবতার মতন মানুষ ছিলেন

অথচ এই রকম হল কী করে।'

একটু চুপ থেকে, 'আজও সুরেশ রোজ সন্ধ্যায় ইনজেকশান করে বেরোয়।'

অনেকক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—'রাত্রে ফিরে এসে, ইনজেকশান করে আবার।'

—'তাই না কি?'

—'নিজেই আমাকে বলে; বলে জীবন এনজয় করছি।'

দু জনেই চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে বসে রইলাম; আকাশে মেঘের ঘন গভীর আয়োজন, পেয়ারা গাছে বাদুড়ের পাখার ঝটপটানি, পশ্চিম দিকের মাঠে একটা বিড়ালছানার অবিশ্রাম কান্না—আমার কোঠার থেকে খুকির শান্ত নিশ্বাস।

আরো অনেকটা সময় কেটে গেল।

বিড়ালের ছানার কান্না থেমে গেলে বাবাকে—'যাক, তবুও খুকিকে নিয়ে যাব আমি।'

—'অবিনাশ বাবুর কাছে?'

—'হ্যাঁ; তিনি এখানে না এলেই ভাল।'

—'তা বেশ তবুও ব্লাড দেখিয়ে এসো।'

—'তা দেখালেও হয়, না দেখালেও হয়।'

—'কেন?'

—'আমার মনে হয়, শরীরে আমার কোনো রোগ নেই।'

—'নেই?'

—'না, আমার বোধ হয়, পেট পরিষ্কার না হয়ে খুকির এই রকম প্যাঁচড়া হচ্ছে।' একটু চুপ থেকে—'অবশ্য কলকাতায় এ চৌদ্দ বছর যে খুব সুষ্ঠভাবে কাটিয়েছি তা নয়।'

—'আচ্ছা বেশ।'

—'দৈন্য নানা ভাবেই এসেছে।'

—'একটা বিড়ালের ছানা কাঁদছে না।'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

—'পশ্চিম দিকের মাঠে বোধ করি।'

—'নিয়ে এলে হয় না?'

—'ছানাটাকে এনে কোথায় রাখবে?'

—'আমার এই কোঠায় রাখতে পার, ঐ যে বেতের বড় ঝুড়িটা আছে ওরই ভিতর কয়েক টুকরো ন্যাকড়া রেখে শুইয়ে দিলে হয় তো।'

—'কিন্তু কোনো এক জায়গায় তিষ্ঠবে না যে, ঘুরে-ঘুরে কাঁদবে।'

—'কেন?'

—'হয় তো মাকে খুঁজছে।'

—'মা-ইরা ওর আসে না কেন?'

—'সে বেঁচে আছে, না মরে গেছে, বিধাতা জানেন; বেঁচে থাকলেও হয় ত দু-দশটা মাঠ পেরিয়ে। সারা গায়ে উনানের কালি মাখিয়ে। শূন্য ভাতের হাড়ির পাশে বসে জীবনের প্রবঞ্চনার কথা ভাবছে।'

—'আমি আর তোমার মা, তুমি আর কল্যাণী পরস্পরের আরো ঢের কাছে; কিন্তু আমাদের অবস্থাও অনেকটা এই রকম, কী বল হেম?'

টিটকারি দিয়ে বাবা একটু হাসলেন।

পরক্ষণেই—'না, তা নয়, ঐ ছানাটার বেদনা যে কী গভীর তা আমরা ধারণাও করতে পারি না।'

বিছানার থেকে নেমে এসে টেবিলের লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিলেন।

বললাম—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'দেখি, বাচ্চাটাকে নিয়ে আসি।'

—'কিন্তু আনতে তো কেঁদেকেটে একাকার করবে!'

—'তা করুক, তবুও আশ্রয় পাবে তো।'

সূচীপত্রে যান

—'এ ঘরে কারো যে ঘুম হবে না তা হলে; মা আর কল্যাণী হয় ত বিরক্ত হবে।'

লণ্ঠনটা দু-তিনার দুলিয়ে-দুলিয়ে বাবা—'একটু গরম দুধ দিলে হয় ত কান্না থামবে বাচ্চাটার!'

—'দুধ এত রাত্রে কোথায় পাব?'

—'আচ্ছা, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে এসো দেখি।'

দক্ষিণের ঘরের থেকে ফিরে এসে বললাম—'না, দুধ নেই।' ছানাটার কান্নাও আর শোনা যাচ্ছিল না, খুব চেপে জল এল। জীবনের গভীর উদাসীনতা আমাদের পেয়ে বসল। সৃষ্টির ক্ষমাহীনতার রহস্যময় উপেক্ষার সাথে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে অন্ধকারের ভিতর মাথা গুঁজে দু জনে ঝিমুতে লাগলাম। গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভিতর বিড়ালছানার শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম বাবার ঘরে আলো জ্বলছে, মানুষের নড়াচড়ার শব্দ ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে দেখলাম, ছানাটাকে কোলে করে চুপচাপ বসে আছেন চোখ বুঁজে।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, পৃথিবী সব সময়ই কি বাস্তবিক অন্ধস্রোতে চলে? নিশ্চিত বেদনা, নিষ্ফলতা ও মৃত্যুর সমুদ্রই কি জীবনকে ঘিরে রয়েছে?

তা নয় হয় তো, অন্তত আবিষ্কারের জায়গা আছে, হয় তো আমারও।

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে গেলাম; এত ক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তা হলে? কোথাও বিড়ালের ছানা নেই, আলো নেই, কিছু নেই, বাবার স্থূল নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চারদিকে অন্ধকার শ্রাবণের বাদল ও বাতাসের বীভৎস আমোদ-টিটকারি এত ক্ষণে জমল তা হলে?

আরো দুপুর রাতে, রাত তখন প্রায় দুটো-আড়াইটে হবে মনে হল, কল্যাণীর ঘরে আলো জ্বলছে, ধীরে-ধীরে বিছানায় উঠে বসলাম—হ্যাঁ আলোই জ্বলছে।

এত রাতে আলো জ্বালিয়ে কেন?

বরাবরই বাতি নিভিয়ে ঘুমোবার অভ্যাস।

মিনিট পনের বিছানার উপর বসেছিলাম, দেখলাম আলো নিভছেও না, কারু কোনো সাড়া-শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। কল্যাণী, বা কোনো মানুষ, যে ও-ঘরে আছে তাই বোধ হয় না। আস্তে-আস্তে খুকিকে শুইতে দিয়ে, বাতাস দিয়ে মশারি ফেলে, চটির মধ্যে আস্তে-আস্তে পা ঢুকিয়ে কল্যাণীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম বিছানার এক পাশে, এক খানা আনন্দবাজার পত্রিকার উপর লণ্ঠনটা রেখে চুপচাপ বসে আছে। সামনে তিনটে জানলাই খোলা, যত দূর দৃষ্টি যায় কতকগুলো বড়-বড় তাল গাছ, তেঁতুল, হিজল, আম, অশ্বত্থ, বাঁশ, ধানক্ষেত, আরো অনেক দূর গ্রামের প্রান্তর ও শ্মশান।

আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকেতেই কল্যাণী—'তুমি এসেছ, ভাল করেছ।'

একটু হেসে বললে—'ভাবছিলাম, আমি তোমাকে ডাকব।'

বিছানার এক কিনার দেখিয়ে দিয়ে—'বসো।'

একটা টিনের চেয়ার ছিল, সেইটে টেনেই বসলাম।

—'কেন, বিছানায় বসতে দোষ কী? আলো দেখে চলে এসেছ? না?'

—'হ্যাঁ!'

—'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম, তা হলে তো ঘুমোও নি।'

—'ঘুমিয়েছিলাম।'

—'তবে কিছুক্ষণ হল জেগেছ। কেন জাগলে? রাত এখন ক'টা?'

—'আড়াইটা।'

—'এই সময়ে জেগে উঠলে, কী মনে করে?'

—'এমনি, হয় ত মশার কামড় খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।'

—'মশারি ফেলে শোও নি বুঝি?'

—'না, এই মাত্র ফেলে দিয়ে এলাম।'

—'খুকি ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেচারা! আমাকে যে ও পেয়েছে, বোঝা হল না। মনে করো, মাতৃহীন হয়েই পৃথিবীতে এসেছে।'

—'অনেক শিশুই তো আসে। তা নিয়ে এত চোখ ছলছল করবার দরকার কী?'

—'চোখ ছলছল করছে বুঝি আমার?' আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে কল্যাণী—'তুমি না এলে তোমাকে কিন্তু আমি ডাকতে পারতাম না!'

—'তা আমি জানি।'

—'সত্যি জানো না কি? আমার মান-অপমানবোধ বাস্তবিক কিন্তু খুব বেশি।'

আঁচলের খুঁটে আবার চোখ মুছে—'তুমি আমাকে অপমান কর নি বটে, কিন্তু এত রাতে তোমার ঘরে গিয়ে তোমাকে ডাকব—জীবনের মধ্যে আমার না আছে সেই প্রীতি, না আছে তেমন আবেগ।'

একটু চুপ থেকে—'বাস্তবিক, তোমার স্ত্রী হয়ে এসে তোমাকে বড্ড লাঞ্ছনা দিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে-নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখ যদি তুমি, তা হলে হয় ত উপলব্ধি করতে পারবে যে, লোকসান আমার বেশি হলেও শূন্যতা যেন তোমার বেশি—কারণ সঞ্চয় বলে কোনোদিনই কিছু যেন পাও নি'—

পকেটের থেকে একটা সিগারেট বের করে—'জ্বালাব?'

—'হ্যাঁ, জ্বালাতে পারো।'

—'দেশলাই কোথায়?'

—'আমার বালিশের নীচেই আছে—দিচ্ছি।'

দেশলাই হাতে নিয়ে বললাম—'এত রাতে বাতি জ্বালালে যে?'

—'ঘুম আসছিল না।'

—'কেন, কী হয়েছে?'

—'না, হয় নি বিশেষ কিছু।'

—'আজ ভাত খেয়েছিলে?'

—'হ্যা।'

—'কী দিয়ে?'

—'তোমরা যা দিয়ে খেয়েছ।'

—'দু-এক-দিনের মধ্যে আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি যাতে মনে আঘাত লাগতে পারে? এমন কিছু বলেছি বা করেছি বলে মনে তো পড়ছে না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে যদি কিছু বেদনা দিয়ে থাকি—'

—'না, তুমি তো কোনো বেদনা দাও নি আমাকে, কিছু বল নি; তিন-চার দিন ধরে আমাদের মধ্যে কথাই তো হয় নি।'

—'তিন-চার দিন কথা হয় নি? কেন, কল্যাণী?'

—'এই বর্ষা-বাদলের মধ্যে মাঝে-মাঝে এই রকমই হয়; শুয়ে, ঘুমিয়ে, নিজেদের ভাবে থেকে দিনের পর দিন এমনি ভাবেই কেটে যায়।'

সিগারেটটা পকেটে রেখে দিলাম।

কল্যাণী—'তা ছাড়া আমার রুচি বুদ্ধিকে খুব শ্রদ্ধা কর তুমি?'

একটু হেসে—'কী করম?'

—'তুমি জান, মাঝে-মাঝে আমি চিঠি লিখে ডায়েরি লিখে নিজেকে নিয়ে একটু থাকতে চাই; এ-সময়ে আমার কাছে কেউ আসে তা আমার ভাল লাগে না, এ সব জান তুমি; অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ হিতাকাঙক্ষীর মত দূরে সরে থাক, এক মুহূর্তের জন্যও বাধা দিতে আস না। এ জন্য শ্রদ্ধা করি আমি তোমাকে।'

দেশলাইটা রেখে দিলাম।

কল্যাণী—'কিন্তু চলে যেতে হবে আমাকে কাল।'

—'কাল?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

—'এমন বিশেষ কোথাও না। আলমোড়া-মুসুরি পাহাড়ে নয়, যাব আমি,' একটু থেমে-থেমে—'মেদিনীপুরের একটি পাড়াগাঁয়ে।'

—'কেন?'

—'দরকার আছে।'

—'মেদিনীপুরে তোমার কে আছেন?'
—'আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।'
—'নেই?'
—'না, হেমন্তবাবু আছেন আর তাঁর স্ত্রী।'
—'কে তাঁরা?'
—'চিনবে না, সেই বাসাতেই যাব। আজ বিকেলে একটা চিঠি এসেছে।'
—'হেমন্তবাবুর?'
—'না, তাঁর স্ত্রীর।'
—'তোমাকে যেতে লিখেছেন?'
—'যেতে অবিশ্যি আমাকে লেখেন নি, কী ভরসায় যেতে লিখবেন! তাঁরা অত্যন্ত ভদ্রমানুষ—নিজেরা সংসার করছেন, পরের সংসারের উপর তাঁদের সহানুভূতি আছে।'
—'তবে তুমিই বুঝি যাওয়া ঠিক করলে?'
—'হ্যাঁ, একটি মানুষ মরছে—তার মৃত্যুশয্যায় তার কাছ আমি না থাকলে চলবে না।'
বলে, কল্যাণী চোখে আঁচল দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল। খানিক ক্ষণ পর—চোখ মুছতে-মুছতে, 'থাইসিসের রোগী মেদিনীপুরের একটা গ্রামে পড়ে আছে এই বর্ষা বাদলের সময়ে।'
—'বড্ড খারাপ কথা—কেন, বাপ-মা নেই তার?'
—'নির্মলদার? কিচ্ছু নেই। আমার উপরেই তার সব নির্ভর করে—'
—'নির্মলদা?'
—'হ্যাঁ'
প্রায় পনের বছর ধরে মুখ চেয়ে থাকার মত একটু বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, কে কার মুখ চেয়ে থেকেছে পনের বছর? কল্যাণী নির্মলের? না নির্মল কল্যাণীর? প্রয়োজন মত অস্পষ্টতা দিয়ে এই সম্পর্কে নিজের বক্তব্যটুকুকে বেশ আবরণ দিয়ে রেখেছে কল্যাণী।
—'হেমন্তবাবুদের কিছু হন না কি?'
—'কে? নির্মল দা? কিচ্ছু না, ওরা ভদ্রসদ্র মানুষ, দয়া করে তাকে স্থান দিয়েছেন।'
—'তা নির্মলের এই রকম অবস্থা কেন? পৃথিবীতে সে একেবারেই একা বুঝি?'
—'হ্যাঁ।'
—'এ-রকম হল কেন? ইতিহাস কী?'
—'দু জন কাকা আছেন বুঝি, তবে তারা ওর কোনো খোঁজ খবর নেন না। ম্যাট্রিক পাশ করেই স্বদেশী করে জেলে যায়।'
—'কে? নির্মল?'
—'হ্যাঁ, সেই থেকেই জেলেই এক-রকম। এক সময় জেলের থেকে বেরিয়ে চামড়া ট্যানিং শিখবার চেষ্টা করেছিল।'
—'তা শিখল না যে?'
—'টাকা নেই, কড়ি নেই, স্বদেশীর দিকে ঝোঁক, কোনো একটা মার্কেট থেকে ধরে নিয়ে গেল।'
—'তোমার সঙ্গে আলাপ হল কোথায়?'
—'আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই ওরা থাকত।'
—'কোথায়?'
—'তখন আমরা মানভূমে ছিলাম। মানভূমে প্রায় দশ বছর থাকা, তার পর বাবা বাগনানে এলেন—বছর দুই-তিন পরে কালীঘাটে একটা বাসা ভাড়া করে ছিলেন—সেইখানেই বাবা মারা যান। সেই রাত্রে যে—'
কল্যাণী জানলার দিকে তাকিয়ে—'তা হলে কালই যাব আমি।'
—'তা যেও; দুঃখের বিষয় তোমার কোনো টাকাকড়ি নেই।'
—'আমার গয়নার বাক্স সঙ্গে নেব, কলকাতায় বিক্রি করে নেব।'
—'কার সঙ্গে যাবে?'
—'তুমি দিয়ে আসতে পারবে না?'

সূচীপত্রে যান

একটু চিন্তা করে—'রবিকে যদি দেই তা হলে হবে না?'

—'রবি ঠাকুরপোকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে তো বেশ ভালই হবে, আমার মনে হয় তোমার না-যাওয়াই ভাল, আমরা স্বামী-স্ত্রী গিয়ে উঠব, তাতে নির্মলদা আঘাত পাবে। মিছিমিছি তাকে অযথা কষ্ট দিয়ে লাভ কী? তাকে দুঃখ দেবার জন্য যাচ্ছি না তো আমি।'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'যাতে উৎসাহ পায়, ভরসা বোধ করে, জীবনের সম্বন্ধে আশা ফিরে আসে, আলো-বাতাস ভাল লাগে, ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস হয়, সেইজন্যই তো যাওয়া।'

বলে বালিশে মাথা গুঁজে অনেক ক্ষণ চুপচাপ বসে রইল কল্যাণী। উঠল যখন, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

বললে—'তুমি এখনো বসে আছ?'

—'হ্যাঁ গোটা তিনেক সিগারেট খেলাম বসে।'

—'তাই না কি?'

—'টেরও পাওনি বুঝি?'

—'না তো!'

—'এক-এক সময় মানুষের মন বড় অপার্থিব হয়ে পড়ে কল্যাণী, পৃথিবীর স্থূল সামান্য কদর্য জিনিসগুলো সম্বন্ধে খেয়ালও থাকে না—মন থাকে জীবনের মহামূল্য মহিমাময় জায়গায় বিচরণ করতে।'

মাথা কাত করে ধীরে-ধীরে কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে নিচ্ছিল কল্যাণী, চোখ জানলার ভিতর দিয়ে—দূর প্রান্তরের দিকে, কখনো দু-তিনটি নক্ষত্রের পানে।

বনলতার কথা মনে হয়—এমনি শান্ত ধূসর শ্রাবণের শেষ রাতে সেও কি কোনো দূর দেশে তার স্বামীর ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কোনো প্রান্তরের চিতার দিকে তাকিয়ে আমার কথা ভাবছে এমন করে?

আমি যদি যক্ষ্মায় বিছানা নি, সে যদি খবর পায়, এমনি করে সেও কী শিয়রের পাশে বসে থাকবার জন্য চলে আসবে?

না, তা আসবে না, এমন কোনো নারী নেই যে তার মৃত্যুশয্যা থেকে আমার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করবে।

কোনো রূপ নেই, রং নেই, রীতি নেই—কিছুই ঘটে না জীবনে।

আকাশ পরিষ্কার ছিল, ভোরবেলা একটু বেড়িয়ে এলাম। বেশ রোদ, আকাশ চমৎকার নীল' শরৎ আসে নি, তবে কাশ এসেছে।

বেশি দেরি করলাম না, তাড়াতাড়িই বেড়িয়ে ফিরলাম। খানিক ক্ষণ পরে দেখলাম কল্যাণী চা নিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে বললাম—'কোথায় চা পেলে?'

—'কেন, বাবা তো অনেক দিন হয় তোমার জন্য চা কিনে রেখেছেন।'

—'ওঃ।'

—'আমার কাছেই রেখেছিলাম—কিন্তু এদ্দিন তোমাকে দেওয়া হয়ে ওঠে নি।'

দেখলাম, বেশ দেখে-শুনে বিচার-সহানুভূতি দিয়ে চা করেছে। চা খাওয়ার পরে একটা ঝাঁটা নিয়ে এল, বললে—'তোমার ঘরটা যে কী হয়ে আছে, ভাল করে ঝাঁটও দেয় না কেউ।' অনেক ক্ষণ বসে বেশ দরদের সঙ্গে ঝাঁট দিলে, কোণায় যেখানে যা ময়লা ছিল দেখলাম সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আমার বইয়ের তাকটা গুছিয়ে দিল। আমার টেবিলটা গোছাল। মাঝে-মাঝে এসে হাসিমুখে খুকুকে নিয়ে আদর করা, আমাকে মিষ্টি করে কথা বলা—কল্যাণীর এ-বড় গভীর রূপান্তর।

যে-সব জামা-কাপড় ছিঁড়ে ছিল, বোতাম ছিল না, অনেক ক্ষণ বসে সেলাই করে দিল।

এক সের আন্দাজ বাংলা সাবান ও নোংরা কাপড়ের গাদি নিয়ে ঘাটে চলে গেল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর এসে—'যাক, আমি যাব না।'

—'কোথায়? মেদিনীপুরে? কেন যাবে না?'

সূচীপত্রে যান

—'বছর তিন-চার নির্মলের দেখা নেই, কেমন যেন লজ্জা করে।'
—'রোগীর কাছে আবার লজ্জা-সঙ্কোচ কী কল্যাণী?'
—'কিন্তু সে তো আমাকে যেতে লেখে নি!'
—'কে? নির্মল? মৃত্যুশয্যার থেকে কী করে লিখবে?'
—'কিন্তু যারা লিখেছেন, তাঁরাও তো আমাকে যেতে লেখেন নি।'
—'তাঁরা মনে করেছেন, ও-রকম রোগের খবর পেলে তুমি নিজে থেকেই যাবে।'
একটু চুপ থেকে—'কিন্তু আমার তো টাকাকড়ি নেই, শুধু হাতে গিয়ে কী লাভ!'
—'কেন গয়নার বাক্স নিয়ে যাবে—কলকাতায় বিক্রি করে নেবে।'
—'আহা! কেই-বা বিক্রি করে দেবে।'
—'কেন? রবি?'
—'রবি ছেলে মানুষ। সে কি আর পারবে?'
—'তুমি জান না কল্যাণী, রবি এ-বিষয়ে খুব ওস্তাদ, নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, তোমার চেয়ে ছ-সাত বছরের বড়, ব্যবসাদারের ছেলে।'
একটু থেমে—'তা, যদি তুমি তাই মনে করো, আমি এখানে থেকেই বিক্রি করে দিতে পারি।'
—'না, থাক, এখানে বিক্রি করে দরকার নেই, লোকে কী মনে করবে।'
—'কিংবা কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে গিয়ে—'
—'এই তো একমাত্র গয়নার বাক্স আমার সম্বল, কিন্তু গয়নাগুলো আজ যদি বিক্রি করে ফেলি, এক দিন অভাবের সময়?'
—'আজও তো কম অভাবের দিন নয়।'
—'কী রকম?'
—'নির্মলের মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাল চেঞ্জের জায়গায় যায় এমন সঙ্গতি নেই বেচারির-'
—'ভাল চেঞ্জের জায়গায় নিয়ে গেলে কিছু হয় কী? বলো?'
—'হ্যাঁ।'
—'শিমুলতলা, মধুপুর?'
—'কিংবা ধর্মপুর হতে পারে, ভাওয়ালি হতে পারে।'
—'সে ঢের টাকা লাগে তাতে।'
—'টাকা তো লাগবেই।'
—'তা ছাড়া আগের থেকে বেড-এর ব্যবস্থা করে নিতে হয়। আমি মেয়ে-মানুষ কী করে এত সব পারব?'
—'হেমন্তবাবুদের সাথে পরামর্শ করবে, দরকার হলে আমিও সঙ্গে যেতে পারি।'
—'মোটমাট সে ঢের টাকার দরকার, তোমারও কোনো চাকরি-বাকরি নেই, গয়না বিক্রি করলে চার-পাঁচ শ টাকা বড় জোর পাব।'
মাথা নেড়ে—'পাঁচ শ তো খুবই পাবে।'
—'কিন্তু খুকির কথাও তো ভাবতে হয়, মা হিসেবে তার উপর আমার দায়িত্ব রয়েছে।'
চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।
কল্যাণী—'গয়নার বাক্স তো আমারই জিনিস শুধু নয়—এ তো খুকির জিনিস। বেচারাকে বঞ্চিত করবার কোনো অধিকার আমার আছে কি?'
—'গয়নাগুলো এ-রকম কাজে লাগিয়েছ, ভবিষ্যতে হয় তো এ কথা শুনে খুকি অপ্রসন্ন হবে না।'
—'কিন্তু যদি হয়?'
—'তা হলে তার অপ্রীতিকে উপেক্ষা করলে অধর্ম হবে না আমাদের।'
কল্যাণী, একটু ইতস্তত—'শুধু তো এই নয়, ভগবান না করুন—কিন্তু বাবা চলে গেলে আমাদের কটা দিন অনন্ত দাঁড়াতে হবে তো।'
তর্ক আর বহুদূর চালিয়ে লাভ নেই; এই গয়নার বাক্স সম্পর্কে পরাজয় মানবার ইচ্ছা এই নারীটির নেই।
বললাম—'গয়না বেচে টাকাকড়ি নাই-বা সঙ্গে নিলে, এমনিই যেও।'

সূচীপত্রে যান

—'শুধু হাতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কত সময়-অসময় নির্মলের কত খচর দরকার হবে; আমি একটা পয়সাও দিতে পাবব না?'

—'তোমার বাবা যে তোমার জন্য কিছু রেখে যেতে পারেন নি সবাই তো তা জানে; তোমার শ্বশুরবাড়িবও কোনো সম্বল নেই।'

—'কিন্তু তাই বলে দুটো বেদানা কেনার জন্যও পরের মুখেব দিকে চেয়ে থাকা!'

—'কুড়ি-পঁচিশ না হয আমি জোগাড় কবে দেব।'

কল্যাণী—'যক্ষ্মারোগীর কেউ কাছে আসে না। হেমন্তবাবুবা হয তো সেবা কবে-করে হযবান হযে গেছেন, এখন সমস্ত সেবার ভার হয তো পড়বে আমার ওপব।'

—'হ্যাঁ, টাকাকড়ি না থাকাতে যা পাবলে না, সেবা দিয়ে তাই শুধরে দেবে। জীবনের এই দুঃসময়ে নির্মল বুঝবে যে, নারী, তার ভালবাসা কত আশীর্বাদেব জিনিস।'

কল্যাণী অনেক ক্ষণ চুপ করে রইল। তার পব ধীরে-ধীরে বললে—'কিন্তু আমি তো আজ একা নই। সংসারের পাকে জড়িয়ে গেছি যে। আমাব দাযিত্ব আজ অনেক দিক দিয়ে। সংসারেব বধূ আমি। আমি মা। কোনো একটা বোগ যদি বাধিয়ে আসি তা হলে খুকিব কী হবে? তোমাদের এই সংসাবেব শান্তিও যাবে একেবাবে নষ্ট হয়ে। ছেলেবেলাব স্বপ্ন, খেলা, স্নেহ, ভালবাসা অবিশ্যি খুব ভাল জিনিস, কিন্তু সজ্ঞানে হোক, অন্ধকাবে হোক জীবনের পথে আমি এমন জাযগায দাঁড়িয়েছি যে শধু আমার হৃদযেব বিলাসেব জন্য এতগুলো লোকেব অনিষ্ট কবা অন্যায হয।'

একটু চুপ থেকে—'হবিচবণেব কাণ্ড দেখেছ?'

—'কেন? কী কবে? কই দেখি নি তো!'

—'কপালে চোখ থাকলে তো দেখবে? গাছেব সমস্ত পেযাবা ছিঁড়ে খেযে ফেলেছে।'

নিস্তব্ধ ছিলাম।

—'পেযাবা চিবুতে ইচ্ছা করে না অনেক সময মানুষেব? কই? ওর কল্যাণে বাকি আছে কি কিচ্ছু?'

—'পেযাবা গাছ তো তিন-চাবটে।'

—'একটা গাছেও একটা কড়াও যদি থাকে! না পাওয়া যায খাবাব সময একটা লেবু হাতড়ে? একটা জাহাঁবাজ চোব!'

—'লেবু হযতো কাকাব জন্য নিযে যায।'

—'বাবাকে বলে দাও না কেন তুমি?'

—'কী বলে দেব?'

—'এই সব অনাচাবেব কথা।'

—'তা হলে মেদিনীপুবে তুমি আব যাবে না?'

—'উঁহু। সেদিন দেখলাম খুকুর দুধ চুমুক দিযে খাচ্ছে।'

—'কে?'

—'হবিচরণ, আব-কে? রাতেববেলা আবাব ডিবে ভবে-ভবে কেবোসিন নিযে পালায।'

মেদিনীপুবেব পাড়াগাঁয়ে যক্ষ্মা রুগীব সন্ধানে সে গেল না আব।

পানের বাটার কাছে বসে ধীরে-ধীরে আট-দশটা পান তৈরি করল, চিবুল-ডিবের মধ্যে ভবে নিল। তার পব ভাল কবে সিঁথিপাটি কবে টকটকে লাল পাড়েব একটা সুন্দব ধোপদুবস্ত শাড়ি বের কবে সেজেগুজে পাড়ায় বিন্তি খেলাতে চলে গেল।

হয ত বনলতাও আজ এই বকম।

দুপুর বেলা প্রায আড়াইটের সময মা ঘরে শুতে এলেন।

আমি—'ঘুমোবে না কি?'

—'হ্যাঁ একটু জিরিয়ে নেই।'

—'তোমার খাওয়া-দাওয়া কখন শেষ হল?'

খাটে বিছানো মাদুরের উপব শুয়ে পড়ে—'এই প্রায আধ ঘণ্টা আগে।'

—'আজ একটু তাড়াতাড়ি খেযেছ তা হলে? বিনা বালিশে শুযে পড়লে যে?'

—'বালিশটার তুলো বেরিয়ে গেছে।'

সূচীপত্রে যান

—'আমার বালিশটা এনে দেই?'
—'কেন এই তো তোশকে মাথা দিয়ে শুয়েছি।'
বলে, মাথা তুলে ভাঁজ করা তোশকের উপর রাখলেন।
—'দক্ষিণের ঘরে আজ যে কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।'
—'ওরা ঘুমিয়েছে সব।'
একটু হেসে—'তাই আমি ভাবছিলাম।'
—'কী ভাবছিলে হেম?'
—'ভাবছিলাম বৃষ্টি পেয়ে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে—মার আজ আর কথাবার্তা বলবার লোক নেই।'
—'একটা বাংলা গল্পের বই দিতে পারো হেম?'
—'নেই কিছু।'
—'তা হলে ঘুমনো যাক।'
—'আমি ভাবছি দু-চার দিনের মধ্যে কলকাতায় যাব।'
—'তা, গেলেই পারো।'
—'টাকা জোগাড় করেছেন বাবা, কিন্তু গিয়ে কী করব সে বুঝে উঠতে পারি না, এই ছ-সাত বছর যত চেষ্টা করেছি তাতে মানুষ লাটসাহেব হয়ে যায়, আমি হয়ে গেছি পোড়া কাঠ। এখন কলকাতায় মানে একটা থাইসিস-টাইসিস কিছু তৈরি করে বাড়ি ফিরে আসা।'
মা চুপ করে ছিলেন।
—'যদি যক্ষ্মা নিয়ে আসি তা হলে তোমরা কী করবে?'
—'উঠোনের এককোণে একটা আটচালা তুলে দেবেন তোমারা বাবা, সেইখানে তোমার বৌকে নিয়ে থাকবে।'
—'যক্ষ্মা হলে?'
—'হ্যাঁ; আমরা জোগাড় ওষুধ পথ্য আর বৌমার কাছ থেকে দিন-রাত সেবা পাবে। না—সেটুকু ভরসাও তার কাছ থেকে নেই।'
—'সেবা বরং তুমিই করবে; নাঃ, কলকাতায় আজকাল বড্ড যক্ষ্মা হচ্ছে। আমার যদি হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'
মা চুপ করে ছিলেন।
—'বয়স বেড়ে গেছে, চাকরি নেই, শরীরের ধাত চিরকালই খারাপ; টিকটিক করে মনটা ছিল, সেও গেছে যেন ছিঁড়ে টুকরো হয়ে। তার পর দিনরাত কলকাতার পথে-পথে ঘোরা। শ্রাবণ ভাদ্রের বৃষ্টি ও রোদ। মেস-এর যাচ্ছেতাই খাওয়া। এই বয়সে এ-রকম মনমরা হৃদয় নিয়ে যদি দেখি রোজই অল্প-অল্প জ্বর হচ্ছে?'
মা—'মেসে কী খেতে দেয়?'
—'তা তো তুমি জানোই।'
—'আমাদের বাড়ির চেয়েও খারাপ?'
—'আমরা অন্তত ভাল ডাল পাই আর খানিকটা দুধ।'
—'ওখানে দুধ দেয় না ভাতের সঙ্গে?'
—'দুধ খেতে হেলে পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয়।'
—'অল্প-অল্প জ্বর হয় না কি তোমার?'
—'না, তবে মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন শরীর গরম হয়েছে—কেমন অরুচি হয়, কিছু ভাল লাগে না। একটা থার্মোমিটার থাকলে দেখা যেত কী রকম টেম্পারেচার হয়, একটা চার্ট তৈরি করতে পারতাম।'
—'জ্বর-জ্বর বোধ করলে কী করো তখন?'
—'বিছানায় শুয়ে থাকি, আর ভাবি, ভগবান, আর যাই হোক, টি-বি-র বীজ যেন শরীরের থেকে না বেরোয়।'
—'একটা থার্মোমিটার কিনলে পার?'
—'কিনব-কিনব করে আর হয়ে ওঠে না।'

সূচীপত্রে যান

—'ডাক্তার দেখালেই পার।'

মাথা নেড়ে—'হয় তো বলে দেবে স্পুটামের মধ্যে যক্ষ্মার বীজ, তখন কী উপায়?

—'তা বলবে কেন; যক্ষ্মা তোমার হয়নি' কেনই-বা হবে? তোমার বাবা তো সত্তর বছরের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে আছেন, আমিও তো এত জলঝড়ে ভিজি, কিচ্ছু হয় না, আমার মনে হয় ডাক্তার দেখিয়ে খানিকটা কুইনিন খেলে ঠিক হয়, কিংবা একটা মিক্সচার।'

—'এবার গিয়ে স্পুটাম পরীক্ষা করাব ভাবছি।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'রক্তও পরীক্ষা করাব।'

—'মিছিমিছি টাকা খরচ করবি কেন? তোর মেজকাকার সঙ্গে অনেক ভাল ডাক্তারের জানাশোনা আছে। বিনি পয়সায় করিয়ে দেবে।'

—'কী দরকার, কতই-বা আর নেবে?'

—'আচ্ছা, আমি না হয় সুরেশবাবুকে বলব আজ, তিনি খুব খুশি হয়েই রাজি হবেন।'

—'না, থাক, বলতে যেও না।'

—'সঙ্কোচ করছিস কেন হেম? আমি তো খুব নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।'

একটু চুপ থেকে—'অন্তত আজ তুমি বলতে যেও না, দু-তিনটে দিন ভেবে দেখি।'

—'বেশ, এখানে তুমি তো ক-দিন আছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'উনিও আছেন ক-দিন।'

একটু চুপ থেকে—'দেখাতে হলে এখানকার অবিনাশবাবুকেও তো দেখাতে পারি। মথুরবাবুও আছেন। এ তিন মাস এখানেই থেকে একটু ভালই বোধ করছি; হজমের গোলমাল তেমন হয় না, রাতেও ঘুম হয়।'

—'সুরেশবাবুও বললেন—বেশ ঘুম হচ্ছে তার।'

—'পেটের গোলমাল হয় মেজকাকার?'

—'না, তাও হয় না।'

—'খান তো মন্দ না!'

—'তবে কলকাতায় যে ঢের কম খান।'

—'কী সব ওষুধও খান বোধ করি খাবার পর?'

—'কয়েক দিন থেকে সোডা ওয়াটার আনছেন।'

একটু চুপ থেকে—'সোডা ওয়াটার কি শুধুই খান?'

মা নিস্তব্ধ ছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম না আর।

—'সোডার দামটা যেন তোমার বাবা দিয়ে দেন।'

—'বাকিতে আনাচ্ছেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

খানিক ক্ষণ চুপ থেকে—'মেসে গিয়ে প্রথম দিকটা বড্ড খারাপ লাগে, মা। গিয়ে পৌঁছেই একেবারে দুপুরবেলা, মানুষজন নেই, এমন খাঁ খাঁ করতে থাকে, খুকির জন্য বড্ড কষ্ট লাগে।'

মা....

—'তোমার কথা মনে হয়, বাবার কথা মনে হয়; অবাক হয়ে ভাবি, তোমাদের সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে কি না?'

মা.....

—'নীচে নেমে দেখি চৌবাচ্চা শূন্য; খানিকটা ঠাণ্ডা ভাত, পুঁয়ের চচ্চড়ি আর ট্যাংরা মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে, উপরে চলে এসে, পথের ধুলো-কালি-মাখা বিছানাটা পাতি। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু সাধ্য নেই—ছটফট করে উঠে বসতে হয়।'

মা.....

—'বিছানায় উঠে বসে ফুটপথের ওপাশে মস্ত তেতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকি—দেখি আকাশ

প্রদীপ দেওয়া শিকের উপর একটা চিল বসে আছে, কতকগুলো পায়রা; ছাদে তারের ওপর চওড়া লাল পাড়ের, কস্তা কালো পাড়ের কতকগুলো শাড়ি শুকচ্ছে—এক ঝলক শান্ত নিরিবিলি ঘরকন্নার গন্ধ আসে; এমন লাগে!'

মা....

—'চেয়ে দেখি এক জন বর্ষীয়সী মহিলা ভিজে চুলে সিন্দুব মাথায় লুচি ভাজবার ঝাঁঝরি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কিংবা এক জন তরুণী স্নান খাওয়ার পর পান চিবুতে-চিবুতে....।'

ম....

—'মেসের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আমি আর। চাকরটাকে দু পয়সা বকশিস দিই—বলি, রাস্তার কলে এক বালতি জল তুলে আনতে। তাই দিয়ে স্নান করে পথে বেবিয়ে পড়ি।'

—'কোথায় যাও?'

—'দুপুরবেলা কোথায় আর যাব? সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাই সাত বছর ধবে গিয়ে দেখে এসেছি। ওয়াই-এম-সি-এ-তে গিয়ে কাগজ পড়ি খানিক। রেইনট্রি গাছের নীচে গোলদিঘিব বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। আকাশ, মেঘ, দিঘির জল, চারপাশের ফুলের কেয়ারি ও দেবদারু ডালপালার দিকে তাকাই। মনে হয় পৃথিবীটা তো সুন্দর ছিল, মানবজীবনের সম্ভাবনাও ছিল চমৎকাব। এত সহজে বসে উপলব্ধি উপভোগ করছি এ তো ঢের, কিন্তু পবক্ষণেই নিজেকে মাছির মত মনে হবে; অন্ধকাবেব মধ্যে একটা অন্ধ গুবরে পোকার যতখানি নিস্তার তার চেয়ে একটুও বেশি পথরেখা দেখবার উপায় থাকবে না।'

মা.....

—'কয়েক মিনিট বসে থাকতে-থাকতে জীবনটা কেমন ছটফট করে ওঠে, আবার বেঞ্চির থেকে উঠে গিয়ে ফুটপথে দাঁড়াই। রাস্তা পেরুতে গিয়ে দেখি একটা বাস আব-একটু হলেই আমাকে গিলে ফেলছিল আর কি!'

—'কলকাতাব পথে খুব সাবধানে চলতে হয়।'

—'হ্যাঁ সাবধানে ববাববই চলি। তবে মাঝে-মাঝে মনটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।'

—'বাসের ধাক্কা খেলে তো আব রক্ষা নেই।'

—'অবিশ্যি সম্ভাবনটা খুব কম।'

—'ফুটপথ দিয়ে চলো।'

একটু চুপ থেকে—'তাবপব চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।'

—'দুপুরবেলাও চা পাওয়া যায়?'

—'হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টা!'

—'কিন্তু দুপুরবেলা চা খেতে ইচ্ছে হয় তোমার?'

—'ওখানে থাকতে তো মাসেব মধ্যে দু-চাব দিন যাই।'

একটু হেসে—'তুমি আছ, বাবা আছেন, খুকি আছে, তাব মা আছে—চারদিকে আমাব কল্যাণেব মত রয়েছ তোমরা, এ কথা ভাবতে গিয়েই মন তৃপ্তি হয়ে থাকে। মনকে প্রবোধ দেবাব জন্য কোনো অনাবশ্যক কথা বা ঘুষের দবকার হয় না এখানে।'

মা....

—'কিন্তু কলকাতায় মনটাকে স্থির কববাব জন্য এমনি সব ছোটখাটো ঘুষেব দরকাব হয়ে পড়ে।'

মা....

—'চায়েব দোকানে অনেক ক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি।'

—'দুপুরবেলা আরো অনেকে চা খায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'ক্রমাগত মানুষ এসে খেয়ে যাচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কটা অব্দি?'

—'সে প্রায় রাত বারটা।'

—'সেই এক পেয়ালায়ই হয় তো পর-পর পঁচিশ জন খেল?'

—'প্রায় সেই রকমই হয়; তবে পেয়ালা ধুয়ে নেয়।'

—'ধুয়ে নিলেও তো আমার খেতে প্রবৃত্তি হয় না; আর কেমন করেই-বা ধোয—দাযসারা গোছেব নিশ্চযই? তা ছাড়া আর কী? ছি, খেতে ঘেন্না করে না তোমাব?'

—'এক কাপ চা সামনে রেখে ভাবি, কলকাতায় এসে এবাব আর প্রবঞ্চিত হযে ফিরে যাব না, জীবন এবাব পুরস্কার পাবেই; মনে ধীরে-ধীবে আরো উৎসাহেব সঞ্চাব হয; খানিকটা বল পাই।'

মা....

—'মনে মনে নানা রকম ছক কাটি, কী করব না-কবব গতিবিধি ঠিক করি। চাযেব দোকানে অনেক ক্ষণ বসে থাকি।'

মা...

—'কিন্তু পথে নেমেই কী বকম শূন্যতা, কোনো উপায দেখি না যেন। চাবদিকে সাজনো-গোছানো দালান-দোকান, সাইন বোর্ড, প্রতিষ্ঠিত জীনেব পরিচয দেয। ট্রামে-বাসে মানুষের দল তাদেব জীবনেব সঙ্কল্প ও কষ্টেব কথা প্রচার কবে চলে—চড়-বড় আপিস-আদালত কলেজ-স্কুল ইসস্টিটিউশানগুলো জীবনেব ব্যস্ত মোহাসক্ত মৌমাছিব নির্বিবাদ নিরপবাধ গুঞ্জন; অপরূপ! গ্রামোফোনেব দোকান থেকে গান ও টাকার ঝনঝনানি জড়িযে মিশিযে কানে এসে লাগে। বুঝতে পাবি না জীবনের প্রযোজনে কোনো আওযাজটার রূপ ও সফলতা বেশি, এগিযে যাই—রেডিও তাব কাজ করে চলেছে; কাগজওযালা সব কাগজ বিক্রি কবে ফেলেছে, এখন নাগবাই পায দিযে বাড়ি চলে গেলে পাবে, কিংবা সাইকেল চলে আবো একগাদা কাগজ নিযে আসবে; পানওযালিব ভিজে চুল সিথায সিন্দুর, অফিসেব বাবুদেব পান জোগাতে গিযে হাঁপিযে উঠছে সে। বইযের দোকানে বিস্তব ভিড় হয় তো—কলেজে সেশান আরম্ভ হল। হু-হু কবে নোট কাটছে। কাটা কাপড়েব দোকানে মৌতাত লেগে গেছে, হয তো সেলেব বিজ্ঞাপন। থিযেটারে তিনটের সময থেকেই ম্যাটিনি আবম্ভ হবে, একটা হ্যাণ্ডবিল হাতে এসে পড়ে, একটা নতুন ব্র্যাণ্ডেব সিগারেটের বড় পোস্টাব নিযে গাধার টুপি ও সঙেব পোষাক এঁটে সাবি-সাবি কতকগুলো লোক নিঃশব্দে হেঁটে যায। বালিগঞ্জেব দিক থেকে একটি প্রসন্ন প্রদীপ্ত পরিবার অসংখ্য সুটকেস-ট্রাঙ্ক ইত্যাদি নিযে শিযালদাব দিকে ছুটছে। হয তো দার্জিলিঙে যাবে। খানিকটা বৃষ্টি হযে গেল, একটা শেড খুঁজে বার কবতে-করতে ঢের ভিজে গেলাম। ভিজে ফুটপথে হাঁটতে-হাঁটতে এক জন বোগীব ছিটানো থু থু আব-একটু হলেই গায লাগছিল, একটা দোকানেব মস্ত বড় পা-পোষ আমার মুখেব সামনে ঝেড়ে নিল। একটা মহিষেব লেজেব বাড়ি খেলাম। বেলিং-ঘেবা এক বারান্দায এক অনিন্দ্য সুন্দব খুকি দাঁড়িযে আছে, সেই একটি অনিন্দ্য সুন্দব খুকির মুখ অনেক ক্ষণ মনকে আকর্ষণ কবে বাখে। নিবর্থক একটা বেটনের গুঁতো খেলাম। দেখি, বড় রাস্তাব মোড়ে একটা উত্তেজিত ভিড়েব কাছে এসে পড়েছি। এগিযে চলি, কযেকটা কাক দেবদারু গাছেব ভিজে শাখাব দিকে উড়ে গেল। খুপবির মতো স্টলে বসে লুঙ্গিওযালা মুসলমান ছোকবাবা নিদারুণ ভাবে শাল পাতা কেটে চলেছে, বিড়ি তৈবি কববে।'

মা.....

—'এক-এক দিন রেসেব মাঠে যেতে ইচ্ছা কবে।'

মা.....

—'কিন্তু যাওযা হযে ওঠে না আব; মাঠটা কোথায তাও ঠিক জানি না।'

মা.....

—'তিন টাকাব টোটে এমন চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পেযেছে এক-এক দিন খববের কাগজ খুলে দেখতে পাই, অবাক হয়ে ভাবি দুই-তিন মাসেব টিউশানের টাকা পাঁচ মিনিটেই পেযে গেল? উৎসাহ ও উত্তেজনাব কলরবেব ভিতর? প্রলুব্ধ হযে আকাশের দিকে তাকিযে থাকি খানিক ক্ষণ—কিন্তু স্থির হযে নিজেব স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব স্বীকার কবে নিতে হয—তা না হলে বাঁচতেও পারব না যে!'

মা....

মা অবশ্য রেসকোর্স, রেস বা টোটের কোনো মানেও জানেন না।

—'লটারির টিকিট কলকাতায গিয়ে ইদানিং কিনছি—এক টাকায চার খানা পাওযা যায, আট আনাব কিনি।'

—'টিকিট কিনলে কী পাওযা যায?'

—'কপালে যদি থাকে আট-দশহাজার টাকাও জুটতে পারে।'

—'আট আনাব টিকিটে?'

সূচীপত্রে যান

—'এক খানা চার আনার টিকিটেও।'

—'তাই না কি? তাহলে তো সে বড় সৌভাগ্যের কথা।'

—'কিন্তু কয়েকবার কিনে-কিনে দেখেছি—শুধু টিকিটের পয়সাটাই যায়; এখন বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, কিনব না আর।'

—'আরো দু-তিন বার কিনলে পার।'

—'মাঝে-মাঝে মনে হয দু-এক জন মাড়োয়ারিব পকেট কেটে নিলে পাবি।'

—'এমন কথাও মনে হয তোমার?'

—'হ্যাঁ, অত্যন্ত অবসাদ নিরাশার মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় বই-কি; কোনো বড় লোকেব বাড়ি, ব্যাঙ্ক বা মাড়োয়ারির টাকাব ওপর লোভ জন্মায়; তাদের তো অনেক আছে, অত অতিশয্যেব দরকার কী? হৃদয় মনের স্থূলতা ও পাশবিকতায় অর্থ জমিয়ে অর্থ খবচ করেই-বা কী লাভ তাদের? আমাকে কিছু দিক—মানুষের ক্ষমা ও দাক্ষিণ্য বিধাতার হৃদয-হীনতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাক—দেশে ফিরে যাই, দু মুঠো খেয়ে বাঁচি, কবিতা লিখি, শার্ট তৈবি কবি।'

হাসতে লাগলাম।

—'কিন্তু এ-ভাবে শিগগিরই কেটে যায় আমার। দারিদ্র্যেব সংগ্রামেব ভিতর অজস্র নিপীড়িত আত্মা ফুটপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখি। চেয়ে দেখি কুষ্ঠ রোগী জীর্ণশীর্ণ কাঠেব ঠেলা গাড়িতে বসে আছে তাব। ভিজে ফুটপথের উপব এক পশে কাদা-জলের মধ্যে আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে একটি নারী পড়ে রয়েছে—দেবদারু গাছের ছাযায নয়, মেঘের সোনায় নয়, কিন্তু এই পথে-ঘাটে বাস্তায পৃথিবীব আদি অসীম স্থিররূপ আবিষ্কাব করি আমি। নিজেব জীবনের বেদনাকে মুকুটের মত মনে হয। বাদলেব বাতাসে, আবছায়ায়, জনমানব, ট্রাম-বাস, গাছের পাতাপল্লব, পাখপাখালির কলরবে এক-একটা সন্ধ্যা বড় চমৎকার কেটে যায আমাব।'

মা.....

—'কিন্তু তবুও আমাব আত্মহত্যা কবতে ইচ্ছা কবে।'

—'কার? তোমার? কেন?'

—'চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সে বকম মৃত্যু নয়, আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যাব সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে; মনে হয আব যেন পৃথিবীতে ফিরে না আসি।'

—'ও, এই বকম? কিন্তু এ তো কোনো সম্ভবপর কিছু কথা নয়। আউটবাম ঘাট কোথায?'

—'গঙ্গার একটা ঘাট।'

—'কোন দিকে বলো তো?'

—'তুমি দেখো নি।'

—'ঢেব জাহাজ দেখা যায বুঝি সেখান থেকে?'

—'তা যায়।'

—'রেঙ্গুনে যে-জাহাজগুলো যায তা দেখেছ?'

—'দেখেছি।'

—'আমি একবার দেখেছিলাম—সে! অতবড় জাহাজ মানুষ বানায কী করে?'

—'গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয মা?'

—'কেন? সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা কেন?'

—'কিংবা, খুন কবে জেলে গেলে?'

—'স্ত্রী-সন্তান আছে, মিছিমিছি জেলে গিযে কী লাভ?'

—'জেলেব বাইরে থেকেই বা কী করতে পারি?'

—'বাইরে থেকে চেষ্টা তো করতে পারবে।'

মাথা নেড়ে—'হৃদযে যদি বিশ্বাস থাকত, তা হলে অনেক আগেই জেলে চলে যেতাম।'

—'কী সে বিশ্বাস?'

—'যে-বিশ্বাসে মানুষ জেলে যায। সংসার ছেড়ে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াতেও ঢের বিশ্বাস লাগে, তাও নেই।'

—'তোমার রকম-সকম দেখে মনে হয় সংসারেও কোনো বিশ্বাস নেই তোমার।'

—'তা বরং খানিকটা আছে।'

—'কই? কোনো নজির তো পাই না।'

—'দেখো না, বিয়ে করেছি, আজকালকার দিনে কোনো বিষয়াসক্ত লোকও বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু আমার সংসারাসক্তি তাদের চেয়েও যে কত গভীর, কল্যাণীকে এখানে এনে যে ক্ষয় করছি তাই কি তার প্রমাণ নয়?'

—'এত তো বোঝ তবু অকর্মন্য থাক কেন?'

—'তার পর দেখ, একটি সন্তানেরও জন্ম দিয়েছি। পৃথিবীতে এসে সংসারকে পুজো করবার লোলুপতাই তো অত্যন্ত বীভৎস ভাবে দেখালাম।'

—'এখন থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা কর।'

—'চেষ্টা করছি। অন্তত সন্তান সৃষ্টি করব না আর।'

—'বেশ, তা না-করাই ভাল। কোনো কালেও যেন না-হয় আর।'

—'সাজতে চেয়েছিলাম জীবনের সেবায়েৎ, সেজে বসেছি সেবাদাসী। উপভোগ নেই, অন্ধতা ও বেদনার ভোগ্য হয়ে বেড়াচ্ছি।'

—'যাও, কলকাতায় গিয়ে একটা টিউশান জোগাড় করে নাও। এ দুর্যোগ আস্তে-আস্তে ঘুচিয়ে ফেলো।'

—'বাবা বলছিলেন চেতলা কিংবা উল্টোডিঙ্গিতে টিউশান পেলে না-নেওয়াই ভাল।'

মা ভ্রূকুটি করে—'কেন? নেবে না কেন?'

—'এই-বৃষ্টি বাদলা, অনেকটা পথ হাঁটাহাঁটি করতে হয়। মেস থেকে প্রায় দু-তিন মাইল দূরে।'

—'সেই জন্য তোমার বাবার কষ্ট বুঝি? তুমি কি মনে কর পৃথিবীতে তুমি একাই এ-রকম কষ্ট কর? পৃথিবীতে বাপ মায়ের সন্তান তুমি কি শুধু একা? কত কৃতী, মেথরের কাজ করছে, তাদের বাপ নেই? কত ছেলে দেশ-ভুঁই তিন দিনের পথের পিছনে ফেলে, গঞ্জে-গঞ্জে কয়লার কাজ করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, তারা বাপ-মায়ের সন্তান না?'

—'বাবাকে বলো না মা, কিন্তু তোমাকে বলছি, চেতলায় হোক, বা ঢাকুরিয়ায় হোক, দশ-দশ টাকার টিউশান পেলেও আমি নেব।'

একটু চুপ থেকে মা—'মেসের থেকে চেতলা কত দূরে?'

—'এই মাইল চারেক।'

—'আর ঢাকুরিয়া?'

—'সেও ঐ রকম।'

—'হেঁটে যাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন? ট্রামে গেলে হয় না?'

—'ধরো, যদি দশ টাকা দিতে চায় তা হলে ট্রামে গেলে আর কী থাকে?'

খানিক ক্ষণ চুপ থেকে—'সকালবেলা যেও।'

মাথা নেড়ে—'তাই যাব। কিন্তু ভয়, পৌঁছতে-পৌঁছতে ছেলের স্কুলের বেলা হয়ে যায় যদি।'

—'তাই ত; তা হলে সন্ধ্যার পর যাবে।'

—'তাই তারা যেতে বলবে।'

—'কলকাতার ভিতরে টিউশান পাও না?'

—'পেলে নেব।'

মা আমার মাথার দিকে হাত বাড়িয়ে—'আমি আশীর্বাদ করি, তাই যেন পাও।'

একটু চিন্তিত ভাবে—'কিন্তু বাইরে যদি পাও?'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'তা হলে একটা ছাতা কিনে নিও।'

ঘাড় নেড়ে বললাম—'আচ্ছা।'

জননীর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

বললাম—'বাতাসা আছে মা?'

সূচীপত্রে যান

—'কেন?'
—'একটু চিবুতাম।'
—'রাতে ভাতের সঙ্গে খেও।'
একটু চুপ থেকে—'মেজকাকার জন্য আজ লুচি ভাজবে না?'
—'হ্যাঁ।'
—'আমাকে একখানা দেবে?'
—'গুনে দশ খানা ভাজি শুধু।'
—'আজ না-হয় এগার খানা ভাজলে।'
—'কই? তোমার বাবা তো এ-রকম বলেন না?'
—'লুচির জন্য বেগুন ভাজ বুঝি?'
—'হ্যাঁ বেগুন ভাজি, ডিম ভাজি।'

মাযের হৃদয়—এক খানা লুচি নিয়ে আসবেন নিশ্চযই আমার জন্য। বিকেলবেলা ভাবছিলাম, লুচিটা পেলে খুকিকে ছিঁড়ে দেব খানিকটা। বাকিটা দেব কল্যাণীকে। তারা আমাকে রাজা মনে করবে নিশ্চযই।

কিন্তু সন্ধ্যা উতরে রাত হয়ে গেল—তবুও কেউ এল না। জল ধবে গেছে। সন্ধ্যার সময বিবাজ এসে হাজির হল। ছেঁড়া জুতো পায়, মাথায অজস্র বেযাদপ চুল আইনস্টাইনের মত, মাইনাস দশ-নং এব চশমা, উৎক্ষিপ্ত দাঁড়কাকের ডানার মত বিরাট গোঁফ, ছেঁড়া ঢলঢলে নোংরা জামা। যেখানে-সেখানে কালির চ্যাপসা। বুকে নকল সোনার বোতাম। জমকালো জীবনেব কাজ অনেক দিন আগেই শেষ হযে গেছে—এখন জোর করে বেচারিকে আটকে রাখা শুধু।

মস্ত বড় শাদা ন্যাকড়ার তালিওয়ালা ছাতাটা কযেক বার ঝেড়ে লম্বা-চওড়া দোহারা শরীব নিয়ে দরজাব কাছে এসে দাঁড়াল।

—'এসো বিরাজ।'

বাজখাই গলায় চিৎকাব কবে—'যা চেপে জল এল। তোমাব এখানেই আস্তানা নিলাম। কী কবছ, সন্ধ্যার সময বসে-বসে? বেরোও না।'

—'না, জলের ভিতর আজ আব বেরুলাম না। অনেক দিন তোমাব সঙ্গে দেখা নেই—কত দিন হবে হে? প্রায বছর তিনেক?'

—'সে-সব মনে আছে কার? হ্যাঁ, বসে-বসে হিসেব-কিতেব কবি, আব-কী? তোমাদেব বাড়িটা পথের ধারে পড়ল—ঝড়-জল—খেযাল হল—এলাম চলে।'

—'বসো।'

একটা চেযার এগিযে দিলাম।

—'চেয়ার তোমার যা! দেখছি তো, লোহার, কাঠেব না কাঁঠালেব? ঠাকুদ্দাদা কিনে দিযে গিয়েছিলেন বুঝি? বসলে ভাঙবে না তো?'
—'ভাঙলে না-হয আর-এক খানা চেযার দেব।'
—'চেয়ারের দাক্ষিণ্য খুব আছে দেখি, চশমা খুলে হো হো করে হাসতে লাগল।
—'আজকাল প্র্যাকটিশ করছ?'
'হ্যাঁ।'
—'এখানকার বারেই? চলছে কেমন?'
—'লগি গুতিযে চলেছি।'
—'শুনলাম ওকালতিতে সুবিধা হচ্ছে না কারো আজকাল?'
—'কেন হবে না? যারা ইডিযেট তাদের হয় না।''
—'তুমি তা হলে পাচ্ছ বেশ?'

একটা হুমকি দিয়ে বললে—'ব্যবসা কি চাকরি নাকি, যে বাঁধাধরা থাকবে? আজ না-হয মাসে পনের টাকাও না পেলাম—কিন্তু তাই বলে কাল পনের শ টাকা পেতে বাধা কোথায?'
—'তা নেই অবিশ্যি।'
—'এই তো সাব-ডিভিশনে প্র্যাকটিশ করছি। এর পর সদরে যাব।'
—'কেস নিয়ে?'

সূচীপত্রে যান

—'কস নিয়ে কেন? সেখানে গিয়ে বসব, হিয়ার করব, সরকারি উকিলকে ইঁদুরের গর্তে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব!'

হা হা করে হেসে উঠল আবার।

বিরাজ অবিশ্যি মেধাবী ছাত্র ছিল, কিন্তু এখন তাব পাতলুন, বোতাম, ও জামার দিকে তাকিয়ে বোধ হয়, মেধার পুরস্কার সে বিশেষ কিছু পাচ্ছে না।

—'শিগগিরই বসছ গিয়ে তা হলে, সদরে?'

—'কালও যেতে পারি, তিন বছর পরেও।'

চুপ কবে ছিলাম।

—'সদব থেকে যাব হাই কোর্টে।'

—'হাই কোর্টে যাবে?'

—'নিশ্চযই!' বুড়ো আঙুল ঘুবিয়ে-ঘুরিয়ে—এই সব ডিষ্ট্রিক্ট জজদেব ঘাড়ে চেপে-চেপে বেড়াব।'

—'কী কবে?'

—'পনের বছবেব মধ্যে উইগ মাথায় দিযে গিযে বসব; ইযা টাই ঝুলিয়ে, কাল গাউন পরে—হাই কোর্টে।'

—'হাই কোর্টে ব্যাক করাবার কেউ আছে তোমার?'

—'ব্যাক? স্যার বাসবিহারীব কে ছিল? ঘাড়ের ওপর একটা হেডপিস পেযেছি কিসেব জন্য!'

খুকি বিছানায ঘুমিযেছিল, বিবাজের বক্তৃতার গরমে চিৎকার দিযে কেঁদে উঠল।

বিরাজ খানিকটা অপ্রস্তুত হযে—'এটি বুঝি তোমার মেযে?'

—'হ্যাঁ।'

আমি—'বসো বিবাজ। ওকে ওর ঠাকুমাব কাছে দিযে আসি।

রান্নাঘবে খুকিকে রেখে দিযে এসে দেখি, বিরাজ চশমাজোড়া কপালে আটকে বাংলা খবরেব কাগজটা নিযে বসেছে।

আমাকে দেখেই চোখ কপালে তুলে বললে—'এই সব সাপ-ব্যাঙ পড়ো না কি তুমি?'

—'কাগজটা আজ বেখেছিলাম। কেন? কী লিখেছে!'

বিবাজ কাগজটা একেবাবে চোখের কাছে তুলে নিযে বললে—'লিখেছে রালোযা তহশিল.....'

—'সে কোথায?'

—'তারিখ দিযেছে, গোযালিযব থেকে।'

—'ও।'

—'রালোযা তহশিলেব মুসনে গ্রামেব এক পাল গরু পাঁচদেওলি পাহাড়ের গোচাবণ ভূমিতে চবিতেছিল।'

—'বেশ কথা।'

—'চরিতে-চরিতে গাভীব পাল এক বিস্তৃত বনজঙ্গলের প্রান্তদেশে আসিযা পৌছায।'

-'আচ্ছা।'

—'প্রকাশ, যে সেই সময়ে একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র জঙ্গল হইতে একটি গরুর উপব লাফাইযা পড়ে।'

—'বটে?'

—'অন্যান্য গরুগুলি পলাইযা না যাইযা একযোগে ব্যাঘ্রটিকে আক্রমণ কবে।'

—'বাঃ।'.

—'গাভীগণের তীক্ষ্ণধাব শিঙের আঘাত সহ্য করিতে না পাবিযা ব্যাঘ্রটি জঙ্গলের ভিতর পলাইযা যায।'

—'হুঁ?'

—'বহু গ্রামবাসী দূর হইতে এই গাভীদলের সমবেত আক্রমণ দেখিযা বিস্মিত হইয়াছিল।'

—'বাঃ বাঃ।'

—'এই সব আস্তাকুঁড় পড়ে দিন কাটাচ্ছ বুঝি?'

বিরাজ মর্মান্তিক বিক্ষোভে কাগজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিযে বললে—'এই কাগজের ব্যবসা, এব চেযে

সূচীপত্রে যান

পান-বিড়ির ব্যবসাও ভাল—খদ্দের জমাবার জন্য নাকে এমন রসকলি কাটে যারা।' একটা গা-ঝাড়া দিযে উঠে দাঁড়িয়ে—'তোমার এখানে কী বই আছে?'

—'কী রকম বই চাও?'

—'.....বই আছে?'

—'না।'

—'বাইমসের কোনো বই আছে? জে-এম-এর? বাঃ, নাম শোনো নি?'

—'শুনেছি। নেহাত চাষভূষো ছাড়া কে না শুনেছে? তাব কোনো বই কি আর এখানে পাবে? না, আমার কাছে সে সব কী আব থাকবে?'

অপ্রতিহত হযে বিবাজ—'মানির কোনো বই নেই?'

মাথা নেড়ে—'আমার এখানে? দূর। ইকনমিকস নিযে তুমি এত ব্যস্ত কেন? তোমার কাব্যচর্চা তো ব্রিফ নিযে।'

বিরাজ গলা খাঁকরে, ধমক দিয়ে,—'বইখানাব নাম শুনেছ!'

—'এই তো এইমাত্র শুনলাম।'

—'এব আগে শোনো নি?'

—'না।'

—'ইডিয়ট! এ সব কী বই তাকে সাজিযে রেখেছ তা হলে?'

—'দেখ-না।'

চশমাটা কপালে আটকে নিযে বিরাজ একখানা বই তুলে—'পোযেট্রি।'

আর-একখানা বই তুলে পড়ল—'টেলস্ অফ মিসট্রি!'

আমার দিকে দাঁত খিঁচিযে ফিরে তাকিযে—এটা কে? এরা শালা-ভাযবা একটা কিছু বুঝি? না মাসতুত ভাই?'

রাগে-বিরক্তিতে গজগজ কবতে-কবতে বিবাজ বই দুটোকে ঠেলে দিযে আর-একখানা বই টেনে নিযে পড়ে বললে—'অলিভাব টুইস্ট? চার্লস ডিকেন্স?' পরেব বইখানা তুলে পড়তে-পড়তে—'ডেভিড কপারফিল্ড। চার্লস ডিকেন্স। এগুলো কী?'

—'নভেল।'

আমার দিকে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধভাবে তাকিযে—'এই বত্নুটি কে?'

গম্ভীবভাবে—'কার কথা বলছ?'

—'এই-যে, যাব ভোগেব থালা দিযে তাকখানা সাজিঁযে বেখেছ।'

—'ডিকেন্স?'

—'হ্যাঁ, মাই হার্টস সিক্‌নেস।'

—'ডিকেন্সের নাম শোনে নি বিবাজ?'

—'মানে তো শযতান।'

দু-তিন ধাপ পরে গিয়ে বিরাজ আর-একখানা বই হাতে তুলে নিযে—'এখানা কী?'

ধীরে-ধীরে পড়ল— আনন্দ মঠ। আরো পড়ল—'বঙ্কিমচন্দ্র।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'হদ্দ করল বাড়িব মধ্যে প্যাদা এসে।'

বইখানা অজ্ঞাতসারেই হাত থেকে পড়ে গেল বিরাজের; বইযেব উপব দিযে পাতলুন চালিযে নিযে অনেক ক্ষণ সে তাকের আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করে।

—'...এর কোনো খবব রাখো?'

—'অনেকক্ষণ তো বসলে বিরাজ। চা খাবে?'

—'....এর আব....এর মধ্যে বড্ড কষাকষি; চল্লিশ বছরেব বন্ধুত্ব এবাব বুঝি যায় টেঁশে।'

—'চা এনে দেই?'

বলতে-বলতে অনেকখানি ধোঁযা ছেড়ে জমকালো গোঁফজোড়া একবার শানিযে নিযে শাদা তালিমারা ছাতাটা মাথায় দিযে বিরাজ শ্রাবণের অন্ধকারের মধ্যে বেবিযে পড়ল। বিরাজের মত এমন অমূল্য জিনিস সাবডিভিশানের কোর্টে নষ্ট হযে যায়।

সূচীপত্রে যান

যদুনাথ বাবু টাকাপয়সাওয়ালা লোক, বাপের বিপুল জমিদারি ছিল; অনেক খুইয়েছে। তবুও দেদার পড়ে রয়েছে; সারা জীবন এঁব টিকিও এদিকে কেউ দেখে নি; কাশ্মীর থেকে সিমলা, সিমলা থেকে কাশী এই ছিল তার পরিচিতি, এদিকে বড় একটা আসেন নি। বুড়ো বয়সে অবিশ্যি এখন দেশে এসে বসেছেন। সকালবেলা কোনো একটা ইলেকশন সম্পর্কে বাবার কাছ থেকে ভোটের জন্য যদুনাথ বাবু এসে হাজির হলেন। বাবাব সঙ্গে কথাবার্তা হবার পব আমার ঘরে ঢুকে বললেন—'কী করছ? কিচ্ছু না? ব্যড়িতে চুপচাপ বসে আছ বুঝি?'

একটা সিল্কেব পাঞ্জাবি গায়—সিল্কের উড়ানি, এক মাথা শাদা চুল, তাব উপর চিরুনির কোনো ব্যবহার নেই। খুব সাধাবণ এ্যলবার্ট জুতো পায়। ভাল কবে বুরুশও কবা নেই। মুখে আন্তরিকতাব চেয়ে আগ্রহ বেশি; চোখ চতুব ও চিন্তাশীল; জীবন পণ্ড হল, না কৃতকার্য হল, সে বিষয়ে সমস্যা এখনো যেন শেষ হয় নি, মুখাবয়বের উপর এ-রকম এক ভাব; হৃদয়ে পরিকল্পনা ও উৎসাহেব অভাব নেই।

চেয়ারটা টেনে বসে, আক্ষেপ কবে মাথা নেড়ে—'তোমাদেব দেখে বড় দুঃখ হয় আমার; এই তো বি-এ পাশ করেছ, বি-এ না এম-এ? এম-এ? বেশ-বেশ, তা হলে তো গাজন আবো চমৎকার—কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বয়সও, তোমার বাবা বললেন, চৌত্রিশ। বিয়ে করেছ, সন্তান রয়েছে অথচ একটা মুটের যা সম্বল তাও তোমাব নেই।'

একটা চুরুট জ্বালিয়ে—'দিনান্তে দুটো পয়সা নিজের বলে খবচ কবতে পাব? কী আক্ষেপেব কথা! চাকবি খুঁজছ?'

—'এবার যাব কলকাতায়।'

—'কবে?'

—'এই সপ্তাহখানেকেব মধ্যে।'

—'কী, চাকবি পাবে?'

—'দেখি।'

হাত নেড়ে—'মিছে কেন কলকাতায় ফোপব দালালি কবতে যাও? তুমি মনে করেছ আমিই একা এম-এ পাশ কবে বসে আছি—এমন আশি হাজাব ছেলে তোমাব মত বাংলা দেশের পথে-ঘাটে ঘুবছে—একটা ছাগল সাবাদিন চবে যে ঘাসটুকু পায় তাও জোটে না।'

চুপ করে ছিলাম।

খানিক ধোঁয়া ছেড়ে—'মিছিমিছি নিজেকে ঠকিও না; সে যাদেব শ্বশুব-সম্বন্ধী থাকে তাদেব চাকবি জোটে—এ কাঠামে তোমাব কিছু হবে না—একটা টেকনিক্যাল কিছু শেখো।'

কোনো জবাব দিলাম না।

—'শিখে এসো।'

—'টাকা নেই।'

—'বেশ, তা হলে ব্যাঙ্কিং শেখো-না। তাও টাকা নেই? আচ্ছা, তা হলে নিবিবিলি বসে দর্জিগিবি শেখো না কেন?'

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'কিংবা ডিমেব ব্যবসা কবতে পাব, ছোট ডিমেব?'

—'পোলট্রি ফার্মিং!'

—'আঃ, সে তো ঢেব বড় কথা হল; এক নিশ্বাসে মগডালে চড়ে বসতে বলি না। আমাব অবিশ্যি একটা কথা অনেক সময়ই মনে হয়েছে এই যে যদি কোনো ভদ্রলোকেব ছেলে দেশগাঁয়ে এসে দুধের ব্যবসাটা ধরে, তা হলে টাটকা দুধও খেতে পারি, চাকরিসমস্যাও খানিকটা মিটে যায়, কী বলো?'

—'দেখলে হয়।'

ভ্রূকুটি করে হেসে—'আরে দূর! আজকালকাব শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে ভদ্রলোকেব ছেলেরা যত চশমখোর চামার হয়েছে, ছোট লোকরা কি আব তত রে ভাই? না হয় জোলো দুধ দিচ্ছে কিন্তু তোমরা ব্যবসা শুরু করলে পিটুলি গোলা খেতে হবে।'

চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে—'তা ছাড়া গরুর যত্ন আমরা জানি কোনো লোক? ধবলী, কমলা, মঙ্গলী বলে যতই আদর করি, বিলেতের একটা কশাইও আমাদের চেয়ে—দেখবে মিল্ক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের পাশে গরুর ছবিগুলো? কিংবা যে-কোনো বিলিতি কনডেনসড মিল্ক কোম্পানির ইতিহাস পড়ে দেখলেই পার, আমাদের মত তেতুলের খোশা আর হাঁসের ডিমেব খোলা দেয় না তো। কী

সব প্রাইজ পেয়েছে, শুনেছ?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'খবর কিছু রাখ না দেখছি। কেবল উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য? আরে ধেত্তরি তার শিবনৃত্য! শিবচক্ষু।'

আমার দিকে তাকিয়ে—'ডারবাইতে যে রয়েল শো হয়। ডাববাই বলতেই ভেবেছ হয় তো রেসের কথা!'

—'না, তা নয়—'

—'রয়েল শো রেসের চেয়ে ঢের বড় জিনিস। সেখানে এবার গাভীগুলো ছটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার চ্যালেঞ্জ কাপ, আরো সাঁইত্রিশটা।'

চক্ষুস্থির করে আমার দিকে তাকালেন।

বললেন—'এখন হাজার-হাজাব লক্ষ-লক্ষ সের দুধ রোজ দোয়া হচ্ছে। আর সে দুধ কী? খেতে লাগে স্রেফ হুইস্কির মত।'

চুরুটটা নিভে এসেছিল; হাতে রেখে যদুনাথ বাবু—'মোটর ভেকেলস্ ডিপার্টমেণ্টে কত মোটর পারমিট হয়েছে হিসেব রাখ?'

—'না।'

বাঁ-হাতের পাঁচটা আঙুল তুলে—'পাঁচ হাজার প্রাইভেট কার, দু হাজার ট্যাক্সি, এক হাজার বাস।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'বাংলাদেশের পথে-ঘাটে এই সব ছুটছে; কত ড্রাইভাব দরকার হয়, ভেবে দেখ তো! মোটর ড্রাইভারি শিখে নাও।'

ভাবছিলাম।

—'যা পাবে, তাতে দশটা মাস্টারমশাইকে গিলে ফেলতে পাববে। এটা হীন কাজ বলে ভাবছ? স্কুল-কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে মাস্টাবমশাযবা যা সম্মান পান—তাব চেয়ে ঢের বেশি সম্মান পাবে।'

ধীরে-ধীরে চুরুট টানতে লাগলেন।

চরুটে একটা টান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—'না-হয় জমি চাষ কবো। লাঙল ধবো, হলধবের মত, ক্যালকাটা ইউনিভাবসিটিকে জলে ফেলে দাও।'

—'জমি ঢের কিনতে হয।'

—'কলেকটরের সঙ্গে গিযে দরবার করো। দু শ বিঘে চর লিখে দেবেন চাষবাস কবাব জন্য।'

—'একবার গিয়েছিলাম।'

—'তার পর?'

—'শুনলাম ডিসটিবিউশন হয়ে গেছে।'

—'কুছপরোয়া নেই, তোমাদের এই ঘবদোবের চারিদিকে আধ বিঘে জমি হবে তো? মা সর্বমঙ্গলার নাম নিয়ে শুরু করে দাও।'

চুরুটে একটান দিযে—'দাঁড়াও, তোমাকে বাতলে দিচ্ছি আমি।'

চুরুটটা ফেলে দিয়ে, পকেট থেকে আব-একটা চুরুট বার করে—'পঞ্চাশ বছরই তো এ-সব করলাম বসে-বসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তোমাকে লাভ নেই বাছা। তুমি আমাব বন্ধুর ছেলে—অন্তত পঞ্চাশ একর আবাদি জমি যদি না জোগাড় কবতে পার, চাষবাসের কাজে হাত দিয়ে কোনো ফয়শালা নেই।'

বললেন—'তা যদি জোগাড় করতে পাব, তা হলে পেটে ভাত খেয়ে থাকতে পারবে।' পকেট থেকে দেশলাই বার করে—'কিন্তু জমি পেলেই তো হল না শুধু, আরো দু হাজাব মূলধন লাগবে।'

দেশলাই-এর গায়ে একটা কাঠি ঘষতে-ঘষতে—'পরে যদি একশ একর জমি আর চার হাজার টাকা ক্যাপিট্যাল জোগাড় করতে পার তা হলে মাথার ঘাম পায় ফেলে উপার্জন করলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ তোয়াজেই থাকতে পারবে।' কাঠিটা জ্বালতে না-জ্বালতেই নিভে হাতেব থেকে পড়ে গেল। আমাব দিকে তাকিয়ে—'কিন্তু দশ-বিশ একর জমিতে কিছু কাজ হবে না। তা তোমাকে অনেক আগেই বলে রাখছি। দশ একর জমি নিয়ে এক জন আনাড়ি হয় তো বড় জোর পনের-বিশ টাকা সংস্থান করতে পারবে। এক জন ঘুঘু পারবে হদ্দ পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু তাও ধরো যদি বন্যা হয বা অনাবৃষ্টি-অজন্মা, তা

হলে তো সবই গেল। ভগবান আমাদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসেন। এত বড় সৃষ্টি ফাঁদিয়ে বসে কী করবেনই-বা আর। কাজেই কখনো আকাশ থাকে শুকিয়ে, কখনো পৃথিবী যায় ডুবে।' আর-একটা কাঠি জ্বালতে চেষ্টা করলেন যদুনাথ বাবু। সেটাও নিভে গেল।--'কাজেই টাকার জোর থাকা চাই। অন্তত লাখ, দেড় লাখ টাকা মজুদ না থাকলে জমি নিয়ে খেলা করা বিড়ম্বনা; তার চেয়ে পরস্ত্রী নিয়ে ইয়ার্কি করাও ঢের নিরাপদ। এই কথাটা তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।....এক দল ছেলে খেঁকিয়ে উঠেছে ভাদ্রমাসের কুত্তার মতো—জমি চাষ করে তারা বড় লোক হবে। পারবে?'

এইবার ভাল করে কাঠি জ্বালিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে নিলেন যদুনাথ বাবু।

বললেন, 'রোজ এগার ঘণ্টা কাজ করতে পারবে? যদি বলি লাঙল ধরে ষোল ঘণ্টা, তা হলে তো, আচ্ছা, লাঙল না ধরে ষোল ঘণ্টা। যে-সব কিষান খাটাচ্ছ তাদের কাজকর্ম তদারকি করতে হবে। তাদের কাছ থেকে ষোল আনা কাজ আদায় করে নিতে হবে—অন্তত দশ-পনের বছরের মধ্যে নভেল বা নারীর মুখ দেখতে পারবে না, থিয়েটারে যেতে পারবে না, বায়স্কোপ দেখাবার জো নেই। বাপ, মা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, প্রণয়িনী উচ্ছন্ন গেলেও ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না। সৃষ্টির বিধাতা যেমন হৃদয়হীন ও অনন্যকর্মা, অক্লান্ত ও ধূর্ত, তেমনি করে তোমাকেও জমি পাহারা দিয়ে বেড়াতে হবে।'

নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম দু জনে।

—'দেখ, যদি পার। অনেক ছোকরাকে দেখেছি বোশেখ-জ্যৈষ্ঠের ঝাঁ ঝাঁ আগুনের মধ্যে দশ-বার ঘণ্টা—একটা শয়তানেও পারে না। কিন্তু সেই ধকলটাই জমির পিছনে খাটাতে বললে তাদের চোখের তারা কপালে ওঠে। এমনই—'

চুরুটে এক টান দিয়ে—'দিন-কাল ছিল তখন আমার, চোত-বোশেখের রোদে দশ ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা করে খেটেছি আমি। থার্মোমিটারে তখন এক শ সত্তর ডিগ্রি।'

চুলের ভিতর আঙুল চালাতে-চালাতে যদুনাথ—'সূর্য না-উঠতেই বেরিয়ে যেতাম, ফিরতাম যখন আকাশে বাদুড় চরে।'

—'কোথায়?'

—'বললাম যে।'

—'সেখানে গিয়ে কী লাভ আপনার?'

—'লাভ ছিল, অমানুষিক ব্যবসায়ীই ছিলাম না শুধু।'

একটু চুপ থেকে—'জীবনের মনুষ্যত্বের দিকটাও একেবারে ভুলে যেতে চেষ্টা করি নি আমি।'

চুরুটে টান দিয়ে—'থাক। এই তো সম্ভব করলাম, এখন নিদেন বার ঘণ্টা খাটতে পারি'—একটু হেসে—'অবশ্য বোশেখের রোদ এখন আর সহ্য হয় না।'

আরো খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললেন—'কুমায়ুন পাহাড়ে চলো; যাদের এদিকে রুজি আছে ভাবী আনন্দ পাবে তারা।'

নিভে গিয়েছিল চুরুটটা—জ্বালিয়ে নিয়ে, 'কিন্তু এতে ক্যাপিটাল লাগে আরো ঢের বেশি।'

—'কুমায়ুনে কী ফল হয়?'

—'আপেল হয়। পেয়ারা হয়, অবশ্য বিশেষ সুবিধার না, সবচেয়ে কাছে, তাও পাহাড় থেকে প্রায় মাইল চল্লিশেক দূরে, পথ-ঘাট খারাপ। বর্ষাকালে হাপুস চোখে কান্না আসে কিন্তু তবুও ফলের বাগান যখন তৈরি হয়ে ওঠে—বাংলার ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে যা-সুখ, তার চেয়েও ঢের বেশি আনন্দ ও তৃপ্তি।'

—'এ দেশের ধানক্ষেতের শোভাও কি কম?'

—'ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে, ছেলেবেলার থেকেই দেখেছি কি না।'

—'কিন্তু সেই সময় থেকে—তারও ঢের আগের থেকে এই ধান ক্ষেত-গুলোর রহস্য ও বিচিত্রতা কী যে গভীর হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তো জন্ম-জন্ম এগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি।'

—'তাই থেকো, তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না।'

যদুনাথ বলে চললেন—'পোস্ট-অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে যদি কুমায়ুন থেকে মোরব্বা করার ফল—যেমন কুলুর থেকে ভি-পি-পি সিস্টেমে করা হয়—তা হলে অবিশ্যি সুবিধা আছে ঢের।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু এ-সব কাজ বেদখল করে নেবে; বাঙালি তো দূরের কথা, পশ্চিমারাই কিছু করে উঠতে পারে কি না সন্দেহ।'

চুরুটের ছাই খানিকটা ঝেড়ে ফেলে যদুনাথ বাবু—'এখানে যেমন চর দিচ্ছিল, কুমায়ুন পাহাড়ে তেমন যদি জমি দেয়, তা হলেও জমি তৈরি করে একটা বাগান খাড়া করতে, খেদ্দায় হাতি ধরার চেয়েও ঢের বেশি টাকা ও হেপাজত।'

খানিকটা নীল ধোঁয়া উড়ছিল।

—'ছোট-খাটো একটা বাগান যদি তৈরি করে নেওয়া যায়, কুড়ি একব মত বেশ তোযাজ কবা যায় যদি, গাছে যদি উপযুক্ত মত ফল ধরে, তা হলে একর বাবদ মাসে দুশ টাকা আসতে থাকে।'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'আবার যাব ভাবছি, টাকার জন্য নয়-তা হলে পাটেব ব্যবসায় [টাকা ঢালতাম]; কুমাযুনে আমাব সেই কাল বিধবার মত বাগানটার গন্ধে-গন্ধে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। দাঁত মুখ খিঁচে, ভেঙচি দিযে—'আরো তা হলে তো কত জিনিসই করতে হয়। বিধাতা তো পনেবটা জীবন দেন নি, দিয়েছেন একটা, অথচ দুশটা জীবনেব কামনা ও চরিতার্থতা এবই ভিতর গুদামজাত করতে হবে-মানুষের কি আব হাঁফ ফেলাব সময আছে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাই আর ধুলো ঃ পথে—পথে ব্যর্থতা মাড়িয়ে চলা'।

চুরুটটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে—'এই তো আবাব মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের জন্য ভোট কুড়িযে বেড়াচ্ছি—মাঝে-মাঝে দপ কবে মনে হয, কুমাযুনে গেলে হত না? আমার সেই বাগানটা .... সেই....'

মাথা নেড়ে—'ভগবান নির্বাণ দেন নি, দিয়েছেনে স্মৃতি ; ভালবাসা দিয়েছেন। সমুদ্রের মত আকাঙ্ক্ষা দিযেছেন, কিন্তু দেহটাকে তৈবি কবেছেন দুই বত্তি ঘুণ দিযে, এই যাঃ চুরুটটা নিভে গেল।'

জ্বালিযে নিযে—'তা কুমাযুনে আমি তোমাদের যেতে বলি না, মোটা খাও না, জমিদাবিও ভোগ করো না, সহাসনী নদীও নেই, সে ঢের টাকার শ্রাদ্ধ ভাই—সেই বাগানে গিযে ফলেব বাগান তৈবি কবা অন্তত ত্রিশ একর আন্দাজ জমি কিনেত হয, বাড়ি তৈবি কবতে হয, ক্ষেত তৈবি কবতে হয, কমপক্ষে হাজার দুই অন্তত ফলের চারা লাগিযে দিতে হয।'

চুরুটে এক টান দিযে—'তাব পব সেই পবান কথাব বাজকন্যাকে পোষো, ফল ধবতে—ধবতে আট-দশটা বছব কেটে যাবে। মনে হবে যেন জেলে রযেছ'-চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিযে—'কিন্তু মনেব অবস্থাতে নিজেকে না খুন কবে বাঁচো যদি, তা হলে দুনিযার দালাল মুখ তুলে চাইবেন বই কি। ফকিবেব কান্নায তিনি হার্ট ফেল কবনে না। ভিটেব ঘুঘুব কষ্টে প্রাণ টন-টন কবে ওঠে তাঁব। ফকিব সাজা না ঘুঘু সাজা, পৃথিবীকে যদি উপভোগ কবতে চাও তা হলে সৃষ্টিব স্রোতেব ভিতবকাব অক্লান্ত সুবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতাকে মনপ্রাণ দিযে গ্রহণ কবতে শেখো,' ভগবানও আর্শীবাদ কববেন, নাবীও হাতেব পুতুল হবে।'

[দূর থেকে দূরে সবে যায়—
অন্তর্গত পৃথিবীর সুনিশ্চয ঘন পবিচয; প্রত্যাবর্তনেব পথ নিঃশেষে মুছে—
কীর্তি সফলতা আব উদ্যমের বিপুলতা দিযে।
নির্বাসনের এক নিবন্ধ্র বলয় কাছে আসে।
কারুবাসনের লয়, নিরন্ধ্র বলয—]

জীবন প্রণালী

—'আজ আমি বায়স্কোপ দেখতে যাব—'

—'যেও—'

—'তুমি বললেই তো হবে না ; এ বাড়িতে তো তুমি শালগ্রাম।' নিস্তব্ধ নীবব ছিলাম।

কিন্তু বায়স্কোপে যাবাব জন্য অঞ্জলি আব পীড়াপীড়ি কবল না—সন্ধ্যার সময় দেখলাম বালিশের বাঁ পাশে একটা হ্যাজাক লণ্ঠন বেখে একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে আছে।

পেছন থেকে ধীবে-ধীবে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মার্টিমাবেব এথিকস পড়ছে। চলে যাচ্ছিলাম।

অঞ্জলি—'কে!'

—'আমি—'

—'চলে যাচ্ছ!'

—'হ্যাঁ'

—'কিসের জন্যে এসেছিলে?'

—'এমনিই।'

—'এমনিই? ভেবেছ, আমি বুঝি না কিছু? উঁকি দিয়ে দেখতে এসেছিলে আমি কী পড়ছি?'

—'বইখানা কোথায় পেলে তুমি?'

—'এই মার্টিমাবের কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'জোগাড় কবে নিয়েছি। তোমাব মুখাপেক্ষা কবে তো আব দিন চালাই না। তা হলে-'

—'বি-এ পড়বে বুঝি?'

—'পড়ব বই কি—'

—'ফিলজফি নেবে?'

—'হ্যাঁ ফিল আব হিস্ট্রি—'

—'ইকনমিকস নিলে পারতে।'

—'বড্ড শক্ত না?'

—'ম্যাথমেটিকস নাও না?'

—'বটানি নিতে পারলে নিতাম—'

—'আর অ্যাডিশনাল বাংলা? বটানিব সঙ্গে সেটা খাপ খায় বড় ভাল।'

—'পাশ আমাকে করতেই হবে—'

—'মাস্টারি করবে তুমি?'

—'তা ছাড়া তো আর কোনো পথ নেই। বিয়ের পর চার বছব হয়ে গেল—'একটু চুপ থেকে—'তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে হাঁড়িতে ভাত ফুটবে না আব— এ-কথা আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।—পরকাল তো খুইয়েইছি'—খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—'শালগ্রামকে উঠিয়ে-বসিয়ে ধুইয়ে-মুছিয়ে এ-চারবছর যত ছেলেখেলার পাপ হল, সে-সবেব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি—'

—'কোথায় যাবে?'

—'যে কোনো দিকে-চাকরি পেলে—'

—'চাকরি পেতে হলে তোমাকে বি-টিও পড়তে হবে বোধ করি—'

—'আচ্ছা। সে আমি বুঝব—'

—'হয় তো এম-এ ডিগ্রিও পাশ করতে হবে—মেয়েদেরও আগের মতন সে-রকম সুবিধা এখন নেই। দিনের পর দিন শস্তা হয়ে যাচ্ছে সব—'

—'বি-এ পাশ করে আমি মাস্টারি পাব?'

—'হয় তো ত্রিশ টাকার—'

—'পঁচাত্তর টাকার এক পয়সাও কম নয়-একশও পেতে পাবি'—অঞ্জলি এই রকম মনে করে। কিন্তু একদিন দেখবে যে চল্লিশ টাকার মাস্টারিও একজন বি-টি পেয়ে গেছে—কিংবা একজন এম-এ....যাক, বেচারিকে মিছিমিছি বকিয়ে কী লাভ! ক্রমে-ক্রমে সবই তো বুঝবে—

বললাম—'মাস্টারিই যখন কববে তোমার ম্যাথমেটিকস নেওয়া উচিত ছিল অঞ্জলি-অঙ্কের গ্রাজুয়েটের তবুও খানিকটা দাম আছে—'

—'অঙ্ক আমার ভাল লাগে না—'

—'কিন্তু নেওয়া উচিত ছিল—তবুও'

—'তোমার বুদ্ধিতে চলে এই চারটে বছব তো আমি খুইয়েছি—এখন আমাকে পরামর্শ দিতে এসো না আর—'

একটু চুপ থেকে-'আমি ম্যাট্রিক ক্লাস থেকেই অঙ্ক ছেড়ে দিয়েছি যে—'

—'ও তাই দিয়েছিলে না কি?'

—'কী করে বি-এ তে অঙ্ক নিই তা হলে?'

—'না, তা হলে তো আর নিতে পাবা যায় না—'

বললাম-'কিন্তু সংস্কৃত ছাড়তে চাচ্ছ কেন? স্কুলের কাজে সংস্কৃতেবও খানিকটা মূল্য আছে—'

—'সত্যি বলছি তোমাকে, এ-বকম করে তুমি আমাকে ঘাবড়ে দিও না তো—'

—'সংস্কৃতটা নাও—'

—'আঃ!—এখান থেকে চলে যেতে পাব তুমি—'

পবদিন সন্ধ্যাব সময অঞ্জলি—'সংস্কৃতেব ব্যাকরণ হাতে নিলে আমাব মাথা ধবে—'

—'তাই না কি? কিন্তু ব্যাকবণেব এমন কী আর দবকাব?'

—'সমাস-সন্ধি ভাঙতে হবে না? সূত্র মুখস্ত লিখতে হবে না? তোমাব পাযে ধবি—এ আমাকে দিয়ে কিছুতেই হবে না—'

—'সংস্কৃতেব অক্ষবও বোধ কবি চেনো না?'

অঞ্জলি মাথা নেড়ে—'চিনি'; কিন্তু দেখলে ভয করে, তাকাতে-তাকাতে মাথা ধবে যায—'

লণ্ঠনটা বিছানাব ওপব রেখে মার্টিমাব নিয়ে বসেছিল সে। বললাম—'বইটা রেখে দাও।'

—'রেখে দেব? কী করব তা হলে? তোমাব সঙ্গে লুডো খেলতে হবে?

এ সময তো তুমি রোজ ব্রিজের আড্ডায যাও—আজ কেন মিছিমিছি আমাকে জ্বালাতে এসেছ?'

'বড়-বড় বইগুলো না পড়ে সুবিধামত নোট পড়লে ভাল হবে—আমি তোমাকে কতকগুলো নোট যোগাড় করে দেব—'

অঞ্জলি—'নোট পড়ে পাশ করতে পাবে মানুষ?'

—'খুব-মার্টিমার এ-সব ত পড়লে কযেকদিন বসে; হয় ত পড়তে ভাল লেগেছে—'

—'না, বিশেষ সুবিধা লাগে নি—'

—'কী লিখেছে বুঝতে পারো নি হয ত—'

—'কেউ না বুঝিয়ে দিলে কী করে বুঝব?'

—'আচ্ছা আমি বুঝিযে দিচ্ছি—'

—'থাক।'

—'বাঃ বাঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের টিউটোবিয়ালে আমি চমৎকার নম্বর পেতাম মেটাফিজিকসে।'

—'হযেছে! এখন আমার বইটা ছাড়ো তো—'

—'এই দেখো, ধরো, চার্লসন আমার মুখস্ত—'

বইটা এক ঝটকায টেনে নিয়ে অঞ্জলি—'আমি মুখস্ত করতে জানি—।'

একটু বিব্রত হযে—'এ সব বই তৈরি করতে গিযে আমি শক্তির অপব্যয করেছি শুধু; সেদিন বুঝি

সূচীপত্রে যান

নি–কিন্তু আজ বুঝেছি। তোমাকে কয়েকটা বেশ ভাল দেখে নোট জোগাড় করে দেব। খুব কম সময়ে এমন চমৎকার তৈরি হবে—'

বাধা দিয়ে অঞ্জলি—'ইস, আমি বই পড়ি না বুঝি?'

—'এই বড়-বড় বইগুলো?'

চোখ সে কপালে তুললে—'তোমার চেয়ে আমার কম ক্ষমতা?'

—'কিন্তু তোমার শরীর যে বড্ড অসুস্থ; সন্তান হবার পর থেকেই—'

বাধা দিয়ে অঞ্জলি—'বেশি কথা বলো না—আমার মাথা ঘোরে।'

হাত-পাখাটা তুলে নিলাম।

—'না বাতাস দিও না—'

—'মাথায় জল দেবে?'

বাতিটা সরিয়ে রাখো তো'

বাতি কমিয়ে ঘরের একপাশে রেখে দিলাম।

অঞ্জলি বিরস চোখে—'আমার ঘরের ভিতর রাখলে কেন?'

—'একেবারে নিভিয়ে দেব।'

—'কেন?'

অন্ধকারের মধ্যে জানলার ভিতর দিয়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নেমে এল।

অঞ্জলি ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে কলসীর থেকে দু-তিন গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঢালতে-ঢালতে বললে—'তুমি এখন যাও।'

—'কোথায় যাব?'

—'আমি একটু নিরিবিলি হয়ে থাকতে চাই।'

—'একটা অ্যাসপিরিন খাবে?'

—'না।'

—'শোও; আমি তোমাকে বাতাস দেই।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'তোমাকেই-বা ক'দিন বাতাস দেই আমি? মাথা কি আমারই ধরে শুধু—তোমার কোনো রোগ হয় না কোনোদিন? একা পড়ে থাকো—আমাকেও একা পড়ে থাকতে দাও।'

বকতে-বকতে বিছানায় এসে বসল। দেখলাম, সমস্ত মাথার জলে শাড়ি ছর ছর করে ভিজছে।

বললাম—'মুছবে না, অঞ্জলি?'

—'না বেশ আরাম লাগছে—'

—'গায়ে জল বসে যাবে তো—'

খানিকক্ষণ মাথা চটকায়। চুপ করে থেকে—হ্যাঁ-বাতিটা জ্বালিয়ে একটু কমিয়ে দিয়ে চলে যাও তুমি। এইবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব।'

—'বাতি জ্বালানোর কী দরকার?'

—'আচ্ছা বেশ, আমিই না-হয় জ্বালিয়ে নেব—দেশলাইটা—'

—'খেয়েছ?'

—'না।'

—'খিদে নেই?'

—'না।'

—'একটু কিছু খেতে হয়'

—'আমার জর্দা ফুরিয়ে গেছে—খানিকটা জর্দা দিতে পার?'

—'জর্দা খাবে শুধু?'

—'জর্দা পেলে দুটো পান খেতে পারি—'

—'জর্দা আমি এনে দেব না তোমাকে—'

—'আজ রাতের মতন জর্দা আমার কাছে আছে। কাল সকালে অমলকে দিয়ে আনাব—'

চলে যাচ্ছিলাম—

—'আমাকে একটু জর্দা কিনে এনে দেবে?'

সূচীপত্রে যান

—'বললে না তোমার কাছে রয়েছে—'

—'কোনো জর্দা নেই।'

—'পয়সা দাও।'

—'পয়সা তো আমার কাছে নেই।'

—'আমার কাছেও তো নেই।'

—'কী করে এনে দেবে তা হলে?.জর্দা না-হলে তো চলবে না আমার।' ধীব-ধীবে বিছানার উপর উঠে বসে অঞ্জলি-'সত্যি পয়সা নেই? না বিড়ি কিনবার জন্য লুকিয়ে রেখেছ?'

মাথা নেড়ে—'বিড়ি তো না, চুরুট; তা চুরুটও আমি অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছি।'

—'বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে-এম-এ পাশ কবেছ একযুগ আগে, তবুও একটা পয়সা যদি সম্বল নেই তোমার—মেয়েমানুষকে জীবনে আকাঙ্ক্ষা কবতে গিয়েছিলে কেন?'

অঞ্জলি—'একটা খাঁচার পাখিকে পুষতে হলেও তো নিঃসম্বল হলে চলে না! অথচ সৃষ্টির সব চেয়ে বড় জিনিস নিয়ে খেলা করলে কপর্দকহীন হয়ে'— নিঃশব্দে বাতাস খেতে-খেতে অঞ্জলি—'পবজন্মে বিশ্বাস আছে?'

—'কী জানি, বলতে পাবি না।'

—'আজকের এই পাপে পথের পাশে কুকুবটি হয়ে যদি জন্মাও?'

—'তা বলতে পাবি, জন্মালে—'

একটু চুপ থেকে অঞ্জলি—'একটা কথা ভেবে বড় সান্ত্বনা পাই। পরস্পবেব কাছে অপরিচিত থেকেই আমরা দু জনে বিয়ে করেছিলাম। আলাপ-পবিচযেব মধ্যে প্রেমেব ভিতর দিয়ে যদি বিয়ে হত আমাদেব তা হলে চাব বছর পরে প্রেমের এই হাব কখনো দেখে কী ভাবতাম বলো তো দেখি—'

নিজেই উত্তর দিল অঞ্জলি, বললে, 'জীবনেব অনেক জিনিসকে অবজ্ঞা কবতে শিখেছি-কিন্তু তবুও প্রেমের ওপব বিশ্বাস রয়েছে এখনও। যদি কাউকে ভালবেসে জীবনে গ্রহণ কববাব সুযোগ পেতাম, তা হলে দু-পয়সাব জর্দার জন্য এ বেচাবিব পবজন্মেব অভিশাপেব কথা পাড়তে বাস্তবিক বড্ড কষ্ট বোধ কবতাম আমি—'

আমার দিকে তাকিয়ে—'আলোটা জ্বালাও—'

—'দেশলাইটা কোথায়?'

—'দেখো না আমার বালিশেব নীচে আছে না কি—'

বালিশেব নীচেব থেকে নিজেই কী বেব কবে দিয়ে—'দেখো তো হ্যাবিকেনে তেল ভবা আছে না কি!'

দু-একবাব ঝাঁকুনি দিয়ে—'আছে—'

—'কোথায বাখব?'

—'যেখানে আছে সেখানেই থাক—'

—'উশকে দেব?'

—'না, কমানোই থাক—পানেব বাটাটা আমাকে দাও তো—'

দিলাম। একটা পান ছিড়তে-ছিড়তে অঞ্জলি—'না, মানুষেব হৃদযের স্নেহ-সহানুভূতিব বেদনাব বন্ধনও হারাই নি আমি।'

—'দু টুকবো গুপুবি দাও দেখি''—'জাঁতি দিয়ে একটা গুপুবি চাব ভাগ কবে কেটে, দু খন্ড আমাব দিকে ছুঁড়ে দিল অঞ্জলি।

বললে—'এই যে তুমি অন্ধকাবেব মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো, তোমাব মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখ কবে আমাব—এ কোনো বানানো দুঃখ নয়; বুঝবাব ভুল নয়; খাঁটি জিনিস। তুমি মরে গেলে কপালেব সিঁদুব মুছবার নিয়ম আমার, বিধবার থান পরতে হবে—তাতে যত না দুঃখ হবে, তুমি বেঁচে থাকতে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক-এক সময় তার চেয়ে ঢেব বেশি বিচ্ছেদ ও কষ্ট অনুভব কবি আমি—ওটা কী ডাকছে গো?'

—'পেঁচা—'

—'লক্ষ্মী পেঁচা?'

—'হ্যাঁ।'

সূচীপত্রে যান

—'কোথায়?'

—'বোধ করি জাম গাছটায়।'

জানালার ভিতব দিয়ে একবার তাকিয়ে শুধু—'বেশ সুন্দর জ্যোৎস্না, না?'

—'হ্যাঁ—'

—'আজ সন্ধ্যেব সময বৃষ্টি হয়েছিল বুঝি? তেলাকুচোব জঙ্গল—আম-কাঁঠালেব ডালপালা সব কেমন ভিজে-ভিজে না? এই চাবিটা নাও তো?'

—'কেন?'

—'দেরাজেব ভেতব আমার জর্দাব কৌটোটা আছে—এনে দাও না লক্ষ্মীটি।'

—'দেবাজে চাবি লাগাবার দবকাব হল?'

—'বিয়ের সময় জেঠামশায যে হারটা দিয়েছিলেন সেইটে বয়েছে কি না।'

—'কত দাম হবে? পঞ্চাশ?'

—'কী জানি—হাব তো আমি বিক্রি কবব না।'

—'আমি যদি কবি?'

—'কই কৌটো আনলে?'

—'কৌটোব ভিতর আছে কিছু?'

—'না-থাকবারই তো কথা। জর্দা নেই-নেই কবে দু-তিন দিন জর্দা খেতে পাবছি না।'

দেরাজ খুলে কৌটো এনে অঞ্জলিকে দিলাম।

খুলতে-খুলতে—'না যদি থাকে কিছু—তা হলে বাবাব কাছ থেকে পযসা নিয়ে চাব পযসাব জর্দা কিনে এনে দিতে পাববে আমাকে?'

—'এত বাতে? বাবা জিজ্ঞেস কববেন, কেন, পযসা কিসেব জন্য?'

—'তাও জিজ্ঞেস কববেন বুঝি?'

—'সত্তব টাকা ত মোটে মাইনে—এত বড় সংসাব চালাতে হচ্ছে—'

অঞ্জলি একটু থেমে—'যাক পেয়ে গেছি —এই নাও—এইটেই খুঁজছিলাম।'

একটা দোযানি সে আমাব হাতে তুলে দিল।

দোযানিটা নিকেলেব নয—রুপোব।

—'যাও, তুমি চট কবে চাব পযসাব কিনে এনে দিয়ে ঘুমোও গে—'

—'আমাব অবিশ্যি ঘুমোতে দেবি আছে—'

—'তা হলে ব্রিজ খেলো গিয়ে—'

—'ব্রিজ আমি বোজই খেলি তোমাকে কে বললে? মাসেব মধ্যে হয ত বড়-জোব দু-তিন দিন—'

—'নাঃ—দেবি কবো না আব; একটা পান মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ব—'

এক-পা দু-পা কবে চলে যাচ্ছিলাম—অঞ্জলি পিছন থেকে ডাক দিয়ে—'শোনো,' ফিবে এসে দাঁড়াতে আমাব ঘাড়েব উপব একবাব ঝাপসা হাত বুলিয়ে নেবাব চেষ্টা কবে—'তোমাব খাট আবাব বাইবেব ঘবে গেল?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন, বাবাব ঘবে পাশে বেশ তো ছিলে—'

—'সেখানে ইন্দিরা থাকবে।'

—'বিছানা পেতেছ তোমাব?'

—'পেতে নেব।'

—'মশাবি টানিয়েছ?'

—'টানানো যাবে।'

—'দেখো, ভুল কবে আবার মশাবি না খাটিয়ে শুয়ো না।'

আমি—'এই চৌত্রিশ বছব ধবে মেসে-বোর্ডিঙে থাকা আমাদেব অভ্যাস-আমাদের ভুল হয না।'

অঞ্জলি—'খুকি হবাব পর এই আড়াই বছব কেটে গেল। এই আড়াইটা বছর কোন দিন কোথায শোও, বিছানা কে পাতে না পাতে, তোমাব কাপড়-চোপড় জামা-জুতো কোনো কিছুরই খোঁজ খবর বাখতে পারি না আমি—আচ্ছা, দু আনাব জর্দাই এনো—'

সূচীপত্রে যান

—'দু আনার আনব? বললে না চার পয়সার?'

—'দোয়ানিটা জর্দার জন্যই রেখেছিলাম আমি—'

বলে ধোয়া পানগুলো ছিঁড়তে-ছিঁড়তে অঞ্জলি মাথা হেঁট করে রইল। জর্দার দোকানে গিয়ে বুঝলাম—দোয়ানিটা তেলা, চলবে না।

তিন-চার দিন পর ঘুরে-ফিরে আবার বায়স্কোপ যাবার কথা উঠল।

অঞ্জলি—'আজ আমি যাবই।'

'সেদিনও তো যেতে চেয়েছিলে।'

—'সেদিন তো জর্দা কিনবার পয়সাও দিতে পার নি তুমি, আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে-বায়স্কোপ দেখবার পয়সা কোথায় পেতে?'

—'আচ্ছা যেও-নিরঞ্জনকে বলে আমি পাশের জোগাড় করতে পারি।'

—'নিরঞ্জন কে?'

—'এই যে-নিরঞ্জন অরোরা বায়োস্কোপ চালাচ্ছে।'

—'তাকে চেনো তুমি?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ, একসঙ্গে পড়েছিলাম ইস্কুলে—'

—'তোমাকে পাশ দেবে?'

—'কেন দেবে না?'

—'যদিও-বা দেয়, তুমি চাইবে?'

—'নিজে আমি থিয়েটার বায়স্কোপ বড় একটা দেখি না—দেখার রুচিও নেই, সাধ নেই।'

অঞ্জলি আমাকে বাধা দিয়ে—'থাক্, আমি বায়স্কোপ দেখতে চাই না।'

—'কেন?'

—'তুমি নিজে মনে-মনে ভাবো তোমার রুচি আমার চেয়ে ঢের বেশি উঁচু দরের?'

—'তা না; কথাটা তুমি বুঝলে না অঞ্জলি—শোনো, চলে যাচ্ছ কোথায়?' ঘরের ভিতর পায়চারি করতে-করতে অঞ্জলি—'যাচ্ছি না—আমার এক জায়গায় বসে থাকতে ভাল লাগে না।'

খানিকটা ঘুরে এসে আঁচল গুটিয়ে এক কোণে বসল।

বললাম—'আমার জীবনের সঙ্গে কেন তোমার নিজের জীবনের তুলনা করো?'

—'কেন? কী হয়েছে তাতে?'

—'অঘ্রান মাসে এক-একটা পরিত্যক্ত পাখির নীড় দেখেছ হিজলগাছের ডাল-পালার ভিতর দিয়ে? কতকগুলো খড়পাতার ছিবড়ে শুধু? আর কিছু না? হেমন্তের কুয়াশা আর শীতবাতাসের অবাধগতি তার ভিতর দিয়ে?'

অঞ্জলি আবার খাট ছেড়ে উঠে চলে গেল।

মাথা হেঁট করে চুপ করে বসেছিলাম।

খানিকক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখলাম অঞ্জলি টেবিলের আরশির কাছে ভিতরে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মত নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। অনেকক্ষণ বসে রইল।

তারপর এসে বললে—'কী জানি বলছিলে—তোমার জীবনটা যেন কেমনতর?'

—'নাঃ, কিছু না।'

—'ভাবছিলাম, কপালে একটু সিঁদুর দেব।'

—'তা দিলেই পারো।'

—'দেব-দেব বলেই আরশির সামনে বসেছিলাম।'

একটু চুপ থেকে—'যা বলছিলাম, এই যে বললে পাশ যোগাড় করে আনা যায়; অরোরা বায়স্কোপের সেই নাকি এখন পুরোপুরি মালিক হয়েছে।'

বললাম—'সে সহৃদয় হুজুগে মানুষ—হয় ত বক্সের পাশ দিয়ে দেবে।'

—'যেতে হলে গাড়িও লাগবে—'

—'তা লাগবে বই-কি।'

সূচীপত্রে যান

—'গাড়িভাড়ার জোগাড় করতে হয তা হলে?'

আমার মুখের দিকে তাকিযে—'না, আস্তাবলেরও পাশ পাওযা যাবে?'

একটু হেসে—'গাড়িভাড়ার ব্যবস্থা আমি করব—'

—'কাপড়-চোপড় পরি তা হলে?'

—'পরো—'

—'না সে-বন্ধুর সঙ্গে আগে কথাবার্তা বলে আসবে?'

—'কী দরকার?'

—'শেষ মুহূর্তের জন্য ফেলে রাখবে? তখন যদি পাশের কোনো ব্যবস্থা না থাকে?'

—'তা হলে পযসা দিযে যাব।'

অঞ্জলি একটু হেসে আমার হাত চেপে ধরে—'কেন, টাকা কোথায পেলে বলো তো—'

—'মার সিঁদুরের কৌটোর থেকে।'

আমার হাত ছেড়ে দিযে অঞ্জলি—'ছি, সিঁদুরের কৌটোর টাকা এ-রকম ভাবে খরচ করবে?'

—'নোযা-সিঁদুর সম্বন্ধে আমারও কোনো অন্ধ ধারণা নেই অঞ্জলি, তোমারও নেই কিছু।'

অঞ্জলি ভুরু কুঁচকে—'অন্ধ ধারণা কাকে বলো তুমি?'

—'না হয বললাম স্বজনশ্রদ্ধা, আছে কি সিঁদুরের প্রতি তোমার? আমার তো নেই।'

—'তুমি কি মনে করো সিঁদুরকে আমি মনে-মনে উপেক্ষা করি?'

একটু হেসে—'এই তো আধ ঘন্টা ধরে আরশির পাশে বসে সিঁদুর পরবে ভাবছিলে।'

—'তা ভাবছিলাম বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরা হল না—'

—'হ্যাঁ, শাদা কপালে উঠে এলে—'

—'তোমার অভিমান হযেছে?'

—'ভাল লেগেছে আমার অঞ্জলি।'

—'ভাল লেগেছে? কেন?'

—'দেখলাম, আমার মতন তোমারও ফোঁটা-তিলকে বিশ্বাস নেই।'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'ছ-সাত দিন ধরে আর সিঁদুর পরা হচ্ছে না আমার। আমার সঙ্গে তুমি যাবে?'

—'অন্য কাউকে যদি পাও তা হলে আমাকে বাদ দিলেই ভাল হয।'

—'অমল যেতে পারে।'

—'কোন অমল? কেদারবাবু মুন্সেফের ছেলে?'

—'হ্যাঁ, বেচারির বড্ড শখ—কিন্তু ওর বাবা একটা পযসাও দেয না।'

—'অমল এখনো আছে এখানে? কলকাতায যায নি?'

—'নাঃ; থার্ড এম-বি ফেল করে বেচারার মনে বড্ড কষ্ট—কযেকদিন পরে কলকতায যাবে।'

—'সিনেমা হাউস পর্যন্ত আমি তোমাদের পৌঁছিযে দিযে আসতে পারি—'

—'কীই-বা দরকার?'

—'না, এই নিরঞ্জনকে বলতাম পাশের জন্য—'

—'থাক, টাকা যখন পেযেছি তখন পাশের জন্য মিছিমিছি বলতে যাবে কেন আর?'

—'তাও তো বটে—'

—'নিরঞ্জন মনে করবে তাকে সুবিধায পেযে তুমি আদায করে নিচ্ছ—'

—'থাক; পাশ নিযে আর দরকার নেই—'

—'পাশ নিযে গেলে অমলের কাছে তো মুখ থাকে না—'

—'ঠিক কথাই তো।'

—'একটা টাকাই দাও গাড়িভাড়া আসতে-যেতে আট-আনা-অমল আর আমার টিকিট আট আনা-আট আনা এক টাকা। ফার্স্ট ক্লাস, এই দশ দিন, আট আনায পাওযা যাবে।'

—'তাই না কি? কে তোমাকে বললে?'

—'অমল বলেছে। দেড় টাকা খরচ হবে তোমার—'

পোশাক-আশাক পরে বেরুল অঞ্জলি, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। সিঁদুরহীন চওড়া কপালে রূপসী বিধবার মত। কিংবা কুমারীর মত হয় তো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে একা ঘুরতে-ঘুরতে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম। ঘরে ফিরে এসে দেখলাম রাজেন এসে বসে রয়েছে।

—'কী, সব কী খবর?'

—'ব্রিজ খেলতে আপনি আর যান না কেন?'

—'আর কাহাতক খেলা যায়, অনেক খেলেছি—'

—'সে কী কথা, এ খেলায় আবার ঘেন্না ধরে যায় বলে শুনি নি তো—'

—'না, ঘেন্না আমি করি না; ব্রিজ একটা চমৎকার খেলা, সুন্দর শিল্প; সারাটা জীবন এতে উৎসর্গ করলেও সমুদ্রের পারে পাথর মাত্র কুড়ুচ্ছি ভেবে মনে আক্ষেপ থেকে যায়, রাবার করবার সময় মনে হয় স্যার রোল্যাণ্ড রস-এর চেয়েও বড় একটা কিছু করলাম—'

রাজেন—'চলুন আজ যাই।'

—'না-না—'

—'বাঃ, আপনার এমন খেলবার চমৎকার কায়দা-আপনাকে আমরা বড্ড মিস করি।'

—'তুমি খেলতে চলেছ বুঝি?'

—'হ্যাঁ, যাচ্ছি; আপনি চলুন না?'

—'না।'

—'ভেবেছিলাম কিন্তু আপনি যাবেন।'

বলে রাজেন বসল আবার।

জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে—'যা বৃষ্টি আসছে—। চুরুট খাবেন?'

—'দাও।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'বৌদি কোথায়?'

—'বায়স্কোপ দেখতে গেছে।'

—'এই ঝড়-ঝটকার মধ্যে গেল?'

—'যখন গিয়েছে, তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল।'

—'গিয়েছে, ভালই করেছে; আমিও মাঝে-মাঝে আমার বউকে নিয়ে যাই—ঘন্টা দু-তিন বেশ রঙে কেটে যায়।'

চুরুটে এক টান দিয়ে রাজেন—'আপনার আর-ছেলেপিলে হয় নি?'

—'না।'

—'সেই একটি মেয়ে, না?'

—'হ্যাঁ'

—'মেয়েটি কত বড় হল?'

—'আড়াই বছর।'

—'আপনাদের বিয়ে হয়েছে ক-বছর?'

—'বছর চারেক-'

—'আমাদের বিয়ে হল পাঁচ বছর, কিন্তু ছেলেপিলে নেই—ভাববেন হয় তো সে বাঁজা কিংবা আমি কুলধ্বজ। তা নয়।'

—'নয়?'

রাজেন মাথা নাড়ে—'না'?'

—'তবে কী রাজেন ?'

—'বৌয়ের সম্মতি নেই—'

—'কী রকম?'

—'সে ছেলেপিলে চায় না।'

সূচীপত্রে যান

—'এ-রকম মারী স্টোপসের মত মেয়ে বিয়ে করলে?'
—'বাঃ। চুরুটটা গেল নিভে, আপনি যে জ্বালালেনই না—'
—'জ্বালাব।'
—'বাস্তবিক, কোনোদিনও সন্তান হবে না-এ বড় বিশ্রী। যখনই গিয়ে বলি হৃদয়েই গিয়ে লাগে বেশি?'
—'কিন্তু বন্ধ্যাত্ব মাযেব হৃদযকেই বেশি আঘাত দেয়।'
—'মা বলছেন কাকে?'
—'তোমার স্ত্রীকে।'
—'সে মা হল কোন হিশেবে?'
—'সব নারীরই মায়ের মত হৃদয নেই! কী বলো বাজেন?' বাজেন খানিক ক্ষণ নীববে চুরুট টানল। বললে—'এখন আমার বয়েস ত্রিশ, এখন যদি একটি ছেলে হত, তা হলে পঞ্চান্ন বছবে আমি চাকবি ইস্তফা দিয়ে দু-পা ছড়িয়ে বসতাম।'
—'ওঃ, সেই জন্য ছেলে চাও বুঝি তুমি?'
—'কে না চায বলুন; সেই ছেলে—বুড়ো বয়সে বাপকে খাওযাবে—সেই জন্যই তো বিয়ে করা।'
—'সেই জন্যই কি শুধু বিয়ে কবা, বাজেন? তা বেশতো। কিন্তু তোমাব স্ত্রীকে পটাতে পাবলে না বুঝি?'
—'না। থাক গে। রিটাযাবমেন্টে পেনশন পাব।'
—'তোমাব স্ত্রী কী বলে?'
বাজেন নিস্তব্ধভাবে চুরুট টানতে লাগল।
অনেকক্ষণ পবে—'স্ত্রীকে তো আমি পরিত্যাগ কবতে পাবি।'
—'তা পাবো বটে।'
—'হিন্দুসমাজে আব-এক বিযে করলে তো পাবি। কিন্তু কিছুই কবলাম না আমি। জীবন বিধাতাব বিরুদ্ধে যারা লড়াই কবতে পাবে, তাকে চক্রান্ত কবে সাজা দিতে পাবে, তাদেব জাত আলাদা। আমি শুধু মনুষ্যত্ব, চবিত্র, দাক্ষিণ্য, শুভবুদ্ধিব পুবস্কাব মাথায নিযে ফিরছি।'
—'এই পুরস্কারগুলো তো ধুলোব মতন—কী বলো বাজেন?'
—'অন্ধকারে শুযে-শুযে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদি তাই।'
—'কেন?'
—'কী পেলাম জীবনে?'
—'তুমি অবিশ্যি কম পাও নি রাজেন, এক শ টাকাব চাকবি—'
বাধা দিযে বাজেন—'ঘবেব ভিতর যাব অন্তঃসাবশূন্য, চাকবি দিযে সে কী কববে?'
—'বৌমা তোমাকে ভালবাসে না?'
—'খুব।'
—'কোনো বোগ-শোক নেই তো?'
—'কার? বৌযেব?'
—'হ্যাঁ।'
—'না, বেশ সুস্থ শবীর; মনে কোনো বিবসতা নেই।'
—'বুদ্ধি-বিচাব আছে?'
—'খুব।'
—'শুধু সন্তানবহন কবতেচায না—এই এক অভাব বুঝি?'
—'কিন্তু এক জন পুরুষের জীবন এতেই কি পণ্ড হয়ে যায না?' চুরুট জ্বালিযে মানুষেব হৃদয়ের তৃষ্ণাব কথা ভাবছিলাম—আমিও মাঝে-মাঝে তৃষ্ণা অনুভব করি; তৃষ্ণা জাগে—নারী যে তৃষ্ণাহীন সে কথা বুঝতে পেবে বিস্মিত হই, আঘাত পাই, আঘাত পাই, বিস্মিত হই।
তাবপর ধীরে-ধীবে জীবনেব অনুকরণ নামে ভযাবহ দীর্ঘ নদীর পাব ঘেঁষে ঘুমিযে পড়ি। জ্বলতে হয—জ্বলে যেতে হয। কোনো জিনিস নিযে চিন্তিত ও বিক্ষুব্ধ হযে থাকলে কী কবে চলে মানুষের জীবনে?
বাজেন—'ভালবাসা হযেছিল শাজাহানের'
—'কী বকম?'

—'মমতাজ তাকে ষোলটি সন্তান দিয়েছিল—'

রাজেন এ রকম কথা অনেকক্ষণ ধরে ভাবে হয় তো।'

বললাম—'টলস্টয়-এর অনেক সন্তান ছিল—'

—'তা ছিল বই কি।'

—'কিন্তু তাদের দাম্পত্যজীবন বিশেষ সুখের ছিল না তো।'

—'এনিম্যাল লাইফ তো চমৎকার ছিল।'

নীরব ছিলাম।

রাজেন—'তবে আর চাই কী? মানুষের জীবন একটা গাছের মত হবে না শচীনদা? একটা মস্ত বড় জাম বা বটগাছের মত, যত ইচ্ছে তত ফল ফলফলিয়ে, আকাশে-বাতাসে ডালপালা বিস্তার করে, দিনরাত পরিতৃপ্তি ও প্রকাশ চলবে না তার?'

—'তুমি না দু-বছর আগে ওয়ালটেয়ার গিয়েছিলে রাজেন?'

—'হ্যাঁ'

—'কিসের জন্য?'

—'থাইসিস হয়েছিল'-

—'বটগাছের মতন জীবন তুমি চালাবে?'

—'না-হয় পেয়ারাগাছের মতই চালাতে দিন না বিধাতা। এ যে একেবারে কাঠফাটা দুপুরে ফোঁপরা বাঁশের মত করে রেখেছে।'

চুরুট টান দিলাম

রাজেন—'এ স্ত্রীকে দিয়ে আমার কিছু হবে না।'

—'এ-রকম স্ত্রী তো তোমার একার না।'

—'আমার জীবনের সবচেয়ে গভীর মুহূর্তে সে আমাকে বাধা দেয়।'

—'গভীর মুহূর্ত তুমি কাকে বলো রাজেন?'

—'আপনি প্রেমিক মানুষ হয়ে তা বোঝেন না? শাজাহান তো কতবার বুঝেছিলেন।'

—'তাজ পরিকল্পনার মুহূর্তই তো তার সবচেয়ে গভীর মুহূর্ত ছিল।'

—'এটা বাজে ইয়ার্কি হল আপনার।'

—'তাই না কি?'

চুরুটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আগুন নিভে গেছে।

রাজেন—'যে-কটি বছর ধরে তার ষোলটি সন্তান জন্মাল, গভীরতা ও বিহ্বলতায় সে কয় বছরের তুলনা হয় না আর।'

রাজেন এই রকম স্থূল?

কিন্তু তবুও সে বটগাছের কথা বলেছে। শাখাপ্রশাখাবহুল আম ও বটের সবুজে-সবুজে ও ডালপালার উচ্ছ্বাসের কথা ভাবতে ভাল লাগে না তার-গরমে বৃষ্টির অবিশ্বাস্য ফোঁটা ভাল লাগে হয় তো—সুস্থ নরম মাটির ভিতর থেকে যে নিরবচ্ছিন্ন সোঁদাগন্ধ বেরোয়, নিশ্চয়ই ভাল লাগবে রাজেনের-অফুরন্ত সবুজ ঘাস, অবাধগামিনী পদ্মা ও কর্ণফুলীর গভীর জঘন ও জঙ্ঘা অন্ধকারে ও জ্যোৎস্নায় শ্রাবণের রাতে উচ্ছ্বিত কলরব; জীবনের উদ্দাম বীজ সঞ্চারণের পালা তাদের—এই রকম ভাল লাগে রাজেনের-চারদিককার নদী-সমুদ্র-অরণ্যের প্রাণধারণের আনন্দ ও প্রাণ জননের প্রসারণের তীব্রতা। জীবনের গভীরতা বলতে এই-ই সে বোঝে—

আমিও কতদিন এই রকম বুঝতাম—তারপর বেদনা ও নিষ্ফলতার পথে চলতে-চলতে হৃদয় ভিন্ন মোড় নিল। শীতের রাতে আমহার্স্ট স্ট্রিটে কুকুর ও ঐ ফুটপাথের ভিতর একজন দাড়িঅলা নিষ্পেষিত ভিখারির জীর্ণশীর্ণ মুখ কেমন যেন নিবিড় হয়ে বুকের ভিতর এসে লাগে।

গ্রে স্ট্রিটে অন্ধকারের ভিতর সারি-সারি যে রূপহীনা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে কেমন একটা খোঁচা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারি না। কলেজ স্ট্রিটে হাঁটতে-হাঁটতে দেখি ফুটপাথে ন্যাকড়া জড়ানো পায়ে পা ছড়িয়ে কুষ্ঠরোগীরা বসে আছে সব। নুলো হাত তুলে অবিশ্রাম সেলাম ঠুকছে, রাস্তার থেকে এদের তাড়িয়ে দেবার জন্য খবরের কাগজে অবিরাম লেখালেখি চলছে। আমার ইচ্ছা করে এদের গুলি করে রাস্তা সাফ করে ফেলি-জীবনের এই সব বীভৎসতা, বিকৃতি ও পরাজয়ের মুখোমুখি এসব হৃদয়

কোনো পথ খুঁজে পায না, মেসের শূন্য ঘরে ফিরে এসে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে থেকে কোনো বিধাতাকে খুঁজে পাই না। আন্তরিকভাবে আত্মদান করে কোনো প্রার্থনা করতে পারি না। দাঁত ব্যথা করে। একটা রেস্টুরেন্ট থেকে মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসে, রেডিওর দোকানে মজলিশি গান অক্লান্তভাবে ঝঙ্কার দিয়ে চলে, একটা চুরুট মুখে দিতে গিয়ে দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে।

-মাড়ি ও দাঁতই জীবনের সবচেয়ে কৃতী জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। গবর্মেন্টের ডিপার্টমেন্টে একশ টাকার চাকরি করে রাজেন এ সবের কিছু বুঝবে না। তবুও বললাম-'আমি ঈশোপনিষৎখানা এনে তোমাকে দেখাচ্ছি রাজেন।'

—'কী দেখাবেন?'

—'কয়েকটা শ্লোক পড়ব তোমার কাছে—'

—'হেঃ হেঃ বিশ্বাস করেন আপনি?'

—'মাঝে-মাঝে নিজের মনে অন্ধকারের ভিতর ঝঙ্কার দিয়ে পড়তে গেলে খুব তৃপ্তি পাওয়া যায়।'

চুরুটটা জ্বালাতে-জ্বালাতে—'অবিশ্যি সে তৃপ্তি খুব ক্ষণিক রাজেন-অধিকাংশ সময়ই মনটা গুহার মত অন্ধকারের ভিতর হাঁ করে থাকে।'

রাজেন পকেটের থেকে একটা চুরুট বের করে-'আপনাকে দেখে বড্ড দুঃখ করে আমার।'

—'কেন?'

—'বাস্তবিক চাকরি-বাকরি পাচ্ছেন না; একটা পয়সা নিজের বলে নাড়বার-চাড়বার স্বাধীনতা নেই। বয়স হল ত্রিশ। অথচ আপনি আমাদের চেয়ে কত মেধাবী ছিলেন।'

চুরুট জ্বালাল সে।

বললে—'সেই বাইশ বছর বয়স যদি থাকত তা হলে কম্পটিটিভ একজাম দিতেন না?'

—'তা দিতাম বলে তো অবিশ্যি মনে হয় রাজেন।'

—'কিন্তু বয়স যখন ছিল তখন দিলেন না কেন?'

—'কেউ-কেউ দেয়, কেউ-কেউ দেয় না-সকলের জীবনের পথ তো এক রকম নয় রাজেন।'

—'আমি তো খোঁজাখুজি করে কেরানিগিরি পেলাম-আপনারা নিজের শক্তিতে কত হাকিমি নবাবি পেতে পারতেন। কিন্তু এখন হয় তো আমাকেও ঈর্ষা করেন?'

চুরুটে একটা টান দিল সে, বললে—'দেখুন না আপনার চেহারার দিকেই তাকিয়ে-আরশিতে মাঝে-মাঝে দেখেন?'

মাথা নেড়ে—'দেখি বই কি—'

—'কেমন হাড়হাভাতের মতন চেহারা হয়ে গেছে আপনার।'

হাসতে-হাসতে—'সমীহ করে কথা বলতে হয় রাজেন, ইস্কুলে যে তোমাকে দু-চার দিন পড়িয়েছিলাম তাও ভুলে গেলে!'

—'চোয়াল বেরিয়ে গেছে-চোখ গেছে আড়াই হাত ডেবে, কয়েক দিন পরে লোকে যদি বলে কোন্ ঢেঁকির চাল খেয়ে এ ঘাটের মড়ার রূপ হচ্ছে তোমার, তা হলে কী বলবেন?'

—'রূপ যা-খুশি তাই হোক রাজেন-ফুসফুস তো এখনও যক্ষ্মা প্রচার করে নি।'

—'করে নি বুঝি?'

—'কই না তো-'

—'সারাদিনের মধ্যে টেম্পারেচার একবারও রাইজ করে না?'

—'বুঝি না তো।'

—'যক্ষ্মা রুগীদের আত্মতৃপ্তি বড় মারাত্মক-ভাবে যে তারা সবচেয়ে নীরোগ।'

—'না, যক্ষ্মা আমার হয় নি।'

—'হতেই বা কতক্ষণ? বার মাস স্ত্রীকে কাছে রাখেন-আপনার শরীরের এ-অবস্থায় এটা ভাল নয়।'

—'ভাল নয়?'

—'বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।'

—'বাপ নেই যে বেচারির, বাপ-মা ভাই-বোন কিচ্ছু নেই; একজন কাকা আছেন।'

—'তা হলে সেখানে যেতে চায় না।'

—'সেখানে যেতে চায় না।'

—'তা হলে আপনিই না হয় সরে পড়ুন।'
—'না, স্ত্রীকে আমি অত ভয় পাচ্ছি না রাজেন।'
—'কী রকম!'
—'সে সারাদিনই নিজের ঘরে দোর দিয়ে থাকে-'
—'কেন?'
আমি থেমে—'পড়ে।. জীবনের প্রবঞ্চনার কথা ভাবে; দাম্পত্যকে অন্যায্য ভেবে দূরে সরে থাকে! একটি মেয়ে হয়েছিল। আর-কিছু হবে না আমাদের।'
রাজেন অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে-'আচ্ছা উঠি তা হলে—'
—'উঠতে পারো—'
—'আপনার সামনের দাঁতটা পড়ে গেল কি করে?'
—'অনেক দিন থেকেই-দাঁত ব্যথা।'
—'কী দিয়ে দাঁত মাজেন?'
—'উনুনের ছাই দিয়ে।'
—'আপনার উচিত একটা পপলাইলার টুথ ব্রাশ কেনা—'
—'দাম কত?'
—'কলকাতায় চৌদ্দ আনা হবে। এখানে এক টাকা পাঁচ সিকা-আর ফরহান্সের টুথপেস্ট কিনবেন-জোনাটইন বা লিস্টারাইন দিয়ে মুখ ধোবেন।'
রাজেন অবিশ্যি জানে এ সব ব্যবহার করবার কোনো সঙ্গতি নেই আমার। হয় তো একটা ঠাট্টা করল।
চুরুট টানছিলাম।
দেখলাম পকেটের থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করেছে।
বললে—'ইস্কুলে যখন পড়তাম তখন দু চার দিন পড়িয়েছিলেন-তার গুরু দক্ষিণা নিন।'
—'তা তো হেডমাস্টার দিয়েছেন রাজেন।'
—'শুনেছি, হেডমাস্টার কিছু দেন নি।'
—'কে বললে তোমাকে?'
—'কলেজের ভাল ছেলেদের বিনে পয়সায় খাটিয়ে নেবার বদভ্যাস ছিল তাঁর।'
খানিকটা সময় কেটে গেল।
আমি—'রাজেন একদিন যখন তোমাদের কাছে ভিক্ষে চাইব তখন কিছু দেবে না জানি; কিন্তু আজও যখন ভিখিরি সাজি নি তখন মিছিমিছি আমাকে দিচ্ছ কেন?'
—'আচ্ছা নোটটা তা হলে আপনার বালিশের নীচেই থাক—যাবার সময় নিয়ে যাব—আর একটা চুরুট নিন বরং; মুখে যেটা সেটার তো বাপান্ত হয়ে গেছে—'
চুরুটটা আমার মুখের থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাজেন।
বললে—'এইটে জ্বালান এবার।'
—'এগুলো কোথাকার চুরুট রাজেন!'
—'অবশ্য বার্মিজ নয়; এগুলো এসেছে জাভা থেকে।'
—'বাঃ দিব্যি তো।'
—'জ্বালিয়ে নিন।'
—'না, এটা এখন খাব না।'
—'খাবার পর খাবেন? বেশ, সে খুব ভাল কথা।'
আরো দু-চারটা চুরুট আমার বিছানায় গড়িয়ে দিয়ে—'নিন। কলকাতায় গিয়ে মেসে উঠবেন তো?'
একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—'একেই বলে ভবিতব্য।'
—'চশমা নেব-নেব করছি।'
—'থাক, আপনার জীবনের নিষ্ফলতা-বেদনার ঢের আলোচনা করা গেল; এখন আমার কথাটা শুনুন।'
—'বলো।'

সূচীপত্রে যান

—'আপনাদের খিড়কির পুকুরের ওপারে মাধব ভট্চাজকে চেনেন?'
—'চিনি বইকি—'
—'তাব মেজ মেয়েটিকে দেখেছেন?'
—'কোনটি বল তো?'
—'বছর ষোল বয়স হবে; ছিপছিপে একহাবা গড়ন-বেশ ফর্শা চেহাবা।'
—'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি বই কি, বেশ সুন্দব মেয়েটি—'
—'অসামান্য সুন্দবী-রুক্মিনী নাম—'
রাজেন চুরুটে বড় টান দিয়ে—'এই মেয়েটিকে নিয়ে সাধছে আমাকে—'
—'মাধববাবু?'
—'হ্যাঁ'
—'তারপব?'
—'তারপব আমাব সচ্চবিত্র হৃদয, আমাব বিবেক, এটা যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, সাবাবাত রুক্মিনীব স্বপ্ন দেখি আমি। তার পব সকালবেলা অনেক দেবি কবে জেগে উঠে দেখি বৌ ধোপার কাছ থেকে কাপড় বুঝে নিচ্ছে-নিজের সুন্দব ধোপদুবস্ত শাড়ি কটিব দিকে তাকিয়ে চোখ তাব প্রসন্ন পবিতৃপ্ত। অন্য একটি নারীকে এনে এই সুন্দব শান্তিকে নষ্ট কবে ফেলতে ইচ্ছে করে না।'
বালিশের নীচে হাত গলিয়ে পাঁচ টাকাব নোটটা নিয়ে চলে গেল বাজেন। বাজেন চলে যাবাব পব চুপচাপ বসেছিলাম-বাবাব ঘর থেকে আস্তে-আস্তে অভয দত্ত এসে ঢুকল।
নমস্কাব তুলে—'ওহো, আপনি কখন এসেছেন?'
একটা চেযাব টেনে বসে অভয—'প্রায আধ-ঘন্টাটাক।'
—'এতক্ষণ কোথায ছিলেন?'
—'আপনাব বাবাব ঘবে বসেছিলাম।'
—'বাবা আছেন?'
—'না—'
—'কোথায গিয়েছেন তা হলে?'
—'খেতে গিয়েছেন হয তো-আপনাব কাছে কে-এক ছোকবা বসে ডাঁট মাবছিল।'
—'ও-রাজেন—'
—'ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন?'
—'হ্যাঁ-সে প্রায় পাঁচ বছব।'
—'ছেলেপিলে হয নি বুঝি?'
—'না—'
—'কেন হয নি?'
একটু হেসে—'রাজেন বলে তাব বৌ-এব সম্মতি নেই।'
অভয নাক কুঁচকে—'এই রকম সব জাযগায বলে বেড়ায বুঝি?'
—'কী জানি—'
—'এ-বকম এক দল লোক আছে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস কবলেন ওর কথা?' চুপ কবে ছিলাম—
—'এ কখনও সম্ভবপব কথা? কেউ কোনোদিন শুনেছে এ-বকম? যে লোকটা এক ঘন্টায এতগুলো চুরুট টানতে পাবে, ব্রিজ খেলবাব নেশা যাব এত, সে পাঁচ বছব ব্রহ্মচাবী হয়ে বয়েছে—'
—'থাক-এ-সব দিয়ে আব কী হবে আমাদেব।'
—'আসল কথা কি জানেন? এর স্ত্রীটি বন্ধ্যা।'
—'তা হবে হয তো—'
—'কিংবা ইনি নিজেই অক্ষম অকৃতী পুরুষ-ইংরেজীতে যাকে বলে—'
—'আপনাদেব ইস্কুল কেমন চলছে?'
—'আব ইস্কুল! সত্তর টাকা কবে খাতায় লিখিয়ে নিচ্ছে, দিচ্ছে পঁযতাল্লিশ—
—'তাই না কি?'
—'একটা ফার্স্টক্লাস বি-টি ডিগ্রি মেবে এলাম-তাব পরেই এই—'

—'কোনো গবর্নমেন্ট ইস্কুলে ঢুকতে পারেন না?'

—'বয়স নেই—'

—'কেন, পঁইত্রিশ বছর বয়স অব্দি তো নেয়—'

—'আমার সাঁইত্রিশ, সংসাবে কোনো চাচা সঙ্গে কবে আনি নি,...শুনেছি গবর্নমেন্ট স্কুলগুলো ডিপ্রোইজেশন করবে। একটা এইডেড স্কুলে হেডমাস্টাবি পেলে বর্তে যাই—'

—'আমাব মনে হয একটা বি-টি ডিগ্রি যোগাড় করে আনতে পারি যদি—'

—'কিচ্ছু লাভ নেই, এই দেখুন না, আমি ফার্স্ট ডিভিশান ট্রেনিং ডিগ্রি নিয়ে বসে আছি—'

—'বি-এল পাস কবলে কেমন হয়?'

—'ওকালতি করবেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে সম্বন্ধে আমরা মতামত দিতে পাবছি না-'

একটু হাই তুলে অভয়-'তবে অনেক উকিল আমাদেব ইস্কুলে মাস্টাবির জন্য দবখাস্ত করছে-'

—'এম-এ, বি-এল সব?—'

—'ফার্স্টক্লাস এম-এ, ফার্স্টক্লাস বি-এল,'

—'মুন্সেফ তো হতে পাবত—'

—'প্রভিনসিযাল গবর্ণমেন্টের সিনিযার করে দিলেই বা মারে কে? খুব ৬ড বয হয়ে বাজ্যি চালাতে পারত।'

—'বিছানার ওপব আপনার এই চুরুটগুলোর চেহারা তো বেশ ভালো বোধ হচ্ছে—'অভয দত্ত বললে।

—'হ্যাঁ জাভাব চুরুট।'

—'কোথায় পেলেন?'

—'রাজেন রেখে গেছে।'

—'একটা নেওযা যায?'

—'খুব—'

—'চুরুট সিগাবেট আমি বড় একটা খাই নে শচীনবাবু, ইস্কুলেব মাস্টাব-চবিত্রটি হাতে করে নিয়ে বেড়াতে হয়; পৃথিবীর সব ভাল জিনিসই মাস্টাব মশাযের খ্যামা-ঘেন্নাব জিনিস—'

চুরুটটা জ্বালিযে নিয়ে অভয—'বাঃ বেশ: বেশ জিনিস। দেখুন, স্কুল মাস্টারি আমাব একদম ভাল লাগে না—'

—'লাগে না!'

—'না। এব চেয়ে দাবোগা হলেও ভাল হত। মানুষব জীবনেব স্বাভাবিকতা সহজ আনন্দ-উৎসব যদি কোথাও নষ্ট হয, বিকৃত হয় তা-আপনাব স্কুল আর কলেজ-এর ক্লাস রুমে।'

—'কী রকম?'

—'ক্লাস রুম এই কি শুধু?—মাস্টাব সেখানেই থাকুক না কেন তাব জীবনেব প্রতিটি মুহূর্তই ছেলেদেব। সেক্রেটারি, হেডমাস্টাব ও স্টাফেব মেম্বারদেব অদৃশ্য চোখেব সামনে একটা অগ্নি-পরীক্ষা।'

চুপ করে ছিলাম।

অভয—'সাধাবণ মানুষেব সহজ জীবন চালাবাব উপায তাব নেই-সে যেন মঠে প্রবেশ করেছে। কিংবা মাস্টারিতে সেখান থেকে পৃথিবীব নবনাবীর দ্বিধাহীন বৈধ জীবনকে অবৈধ মনে করতে হবে তাকে—চাবদিককার অন্যেব উজ্জ্বল জীবন—স্রোতের দিকে বিবস বিকৃত চোখ নিয়ে তাকাতে হবে-অরুচি অক্ষমা অপ্রেম এ-সব তাব দেবতা—এই যে আমি চুরুট খাচ্ছি এতেও আমার ভয—'

—'কেন?'

—'যদি কোনো ছেলে দেখে ফেলে—'

—'এই রাতে এই বাদলাব ভিতর কোনো ছেলেব এখানে আসবাব সম্ভাবনা নেই—'

—'বলতে পাবা যায় না—এই তো রাস্তার দিকে দুটো জানলা উদাস খোলা রয়েছে-বাস্তার কেউ আধ মিনিট দাঁড়ায যদি—'

—'কেই-বা দাঁড়াবে—'

সূচীপত্রে যান

—'ছেলেরা অত্যন্ত ভযাবহ জিনিস। চেনেন না আপনি। যদি কাল হেড মাস্টার আমাকে ডেকে বলেন, কাল রাতে তুমি মজলিসে বসে চুরুট খেযেছিলে কেন? আমি একটুও আশ্চর্য হব না; বুঝব বিধাতা যা দেখেন না, ছেলেরা তা দেখতে পায়—'

—'এই রকম অবস্থা বুঝি?'

অভয দত্ত মুখ বিকৃত করে বললে—'অখাদ্য!'

—'আপনি চুরুট খেযেছেন হেডমাস্টারের কাছে সে কথা বলে তাদের কী লাভ?'

—'তারা নিজেদের চরিত্তির জাহির করে—'

—'আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে তাদের—?'

—'আমি তাদের মাস্টার এই তো সবচেযে বড় অভিযোগ।'

—'বিশ্বাসের জোর আছে তাহলে তাদের?'

—'অন্তত মাস্টারের সম্পর্কে সেটা ব্যবহার করার দরকার বোধ করে তারা—'

কথা বলতে-বলতে চুরুট নিভে গিযেছিল অভযের, সন্তর্পণে জ্বালিযে নিযে—'সামাজিক ধর্ম ও নীতিতে অচলা বিশ্বাস না নিযে কেউ যেন মাস্টারিতে না ঢোকে।'

একটু চুপ থেকে—'জীবনের কোনো সুন্দর প্রযাসকে শ্রদ্ধা ক'রবার উপায নেই।'

—'তাই তো দেখছি।'

—'বোদলেযারের কবিতা কতকগুলো জাযগা ভাল লেগেছিল আমার। কিন্তু হেডমাস্টার বা স্টাফ-এর কাউকে বললে আর রক্ষে নেই।'

—'বোদলেযার, পড়েন?'

—'আছে একখানা—'কিন্তু মাস্টাররা কেউ জানেন না।'

—'জানলেই বা কী এসে যাবে অভয? বোদলেযার হাতি না ঘোড়া বুঝবে কি কিছু?'

—'একেবারে যে না-বুঝবে তা নয; একটা অপরিচিত বই বা অপরিচিত নামে ঢের সন্দেহ জাগে তাদের।'

—'ভাবে হয তো সেক্স সম্বন্ধে কিছু?'

—'সেক্স সম্বন্ধে বই-কিংবা ফরাসি উপন্যাস-কিংবা আধুনিক ইংরেজী উপন্যাস পর্যন্ত-ধরুন লরেন্স কিংবা জযেস-এর বই, অনেক রাতে খাওযা-দাওযার পর দরজা আটকে সাবধান হযে পড়তে হয-তখন এক-আধটা চুরুটও খুব ভযে-ভযে টানি-তারপর ঘুমোবার আগে সমস্ত ছাই, দেশলাই কাঠি, ঝেড়ে সাফ করে, চুরুটের টুকরা কলাবাগানের দিকে বুনো ওলের ঝোপের দিকে ফেলে দিযে, বইগুলো বাক্সে তালা মেরে এঁটে, তবে এসে বিছানায শুই। বলুন এ জীবন কী খুব কাম্য?'

অভয—'চুরুট কিনি কি করে জানেন?'

—'কী করে?'

—'নিজে গিযে কোনো দোকান থেকে কিনতে ভরসা পাই না।'

—'তবে?'

—'কাউকে দিযে কেনার সে ভরসা নেই-হয তো গল্প করে বেড়াবে। শনিবার দিন ইস্কুল ভাঙবার পর ট্রেনে চড়ি তাই-প্রায ষাট মাইল দূরে গিযে তবে চুরুট কিনে আনি। চুরুট, নস্যি, সিগারেট, প্রাণ ভরে পান খাই, জ্যোৎস্নায নদীর পারে বেড়াই। ইস্কুল নেই, দপ্তরি নেই, ছেলেরা নেই, হেডমাস্টার নেই, স্টাফ নেই, গুপ্তচর নেই। সামনে যতদূর চোখ যায মাঠ আর নদী, ধানের ক্ষেত, বুনো ঝাউ-এর ভিড়ে-ভিড়ে জ্যোৎস্না-এমন অপরূপ লাগে আমার—'

—'যাক, তবু পঁযতাল্লিশ টাকা মাইনে আপনার সম্বল ছিল—'

—'হ্যাঁ, এইটুকু আছে।'

—'আর বিযেও আপনি করেন নি।'

অভয চুপ করে রইলেন।

—'করবেন না?'

কোনো উত্তর দিলেন না তিনি।'

বেচারির হৃদয়ের আর-এক জাযগায হয তো আঘাত দিযেছি।

বৃষ্টি আরো সর্বগ্রাসী হযে উঠল।

সূচীপত্রে যান

অভয়—'রাত কটা বাজে?'

—'নটা আন্দাজ।'

—'বেশি রাতেও বাড়ি ফিবতে ভয় পাই।'

—'কেন?'

—'আমার বাসাব পাশেই এক জন মাস্টার থাকেন; একটু রাতে ফিরলেই তিনি কৈফিয়ত নিতে আসেন।'

—'কেন, কী দরকার তাঁর?'

—'নিজে তিনি ইস্কুল থেকে এসেই শুয়ে পড়েন। রাত নটার সময স্ত্রীকে খালাস করে দিযে হাতে আব কোনো কাজ খুঁজে পান না-কাজেই এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে বেড়ান।'

—'এই কি প্রথম পক্ষ?'

—'যোগেশদার? হ্যাঁ, নটা পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে শুযে থাকেন ওটা তাঁর অভ্যাস। বার্ধক্যেব দোষ নয। বযস বেশি নয তো—উনত্রিশ।'

—'তা হলে সময আছে।'

—'খুব—'

—'তবে এ-সব লোক তৃতীয় পক্ষের মুনাফা পাওযা পর্যন্ত বাঁচবে কি না সন্দেহ।'

—'না, চেলাকাঠের মত বেশ শক্ত শরীব—। বাঁচবে।'

—'ছেলেপিলে কটি হয়েছে এ পর্যন্ত?'

—'হচ্ছে, মরে যাচ্ছে—গুণবার অবকাশ পাই না। একবাব যমজও হযেছিল—'

—'বেঁচে আছে?'

—'না!'

—'তবুও রক্ষা, না হলে এত ছেলেপিলে নিযে কী করতো বেচারা?'

—'লাইন করে তিন-চাবটি এখনও মাস্টাব বাঁচিযে বেখেছেন।'

—'যোগেশবাবুর মাইনে কত?'

—'ত্রিশ টাকা। ঘরের সামনে লাউ, কুমড়ো, বেগুন, মবিচের ক্ষেত আছে—সকাল বেলা একটা টুইশন করেন-'

দু-জনেই চুপচাপ বসে ছিলাম।'

অভয—'এখানে কিছু দিন আগে একটা থিযেটাব এসেছিল জানেন?'

—'হ্যাঁ। কলকাতার থেকে। শুনেছি কযেকজন আর্টিস্ট এসেছিলেন—যোগেশদা আব আবো আট-দশ জন মাস্টার দিনরাত সত্যাগ্রহ করে সেই থিযেটারেব সিটেব সামনে চিৎ হযে পড়ে থাকতেন—'

—'তাই না কি?'

—'কাজেই সেই কলকাতাব দলটাকে ফিবে যেতে হল—'

একটু চুপ থেকে অভয—'আমাকেও শোবার জন্য সেধেছিলেন।'

—'তার পর?'

—'হেডমাস্টারও বলেছিলেন গিযে শুযে থাকতে।'

—'আপনিও শুযেছিলেন?'

—'না, থিযেটার পার্টি আমাকে ভারি সুন্দব নিস্তাব দিলেন।'

—'কী রকম?'

—'যে-দিন সকাল থেকে আমাব শোবার কথা, শুনলাম তাব আগেব দিন বাত্তিবেই নট-নটীবা চলে গেছেন।'

খানিকটা চুপচাপ।

অভয—'বছর তিনেক আগে কলকাতায একবাব গিযেছিলাম থিযেটার দেখবার জন্যই।'

—'তার পর?'

—'কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে সঙ্গে দু-জন মাস্টারও গেলেন।'

—'থিযেটার দেখবার উদ্দেশ্যে?'

—'উদ্দেশ্য কিছু ভেঙে বলেন নি তাঁবা। কযেকদিন চিড়িয়াখানা মিউজিযাম, ভিক্টোবিযা

মেমোরিয়াল, গঙ্গার ঘাট, ইডেন-গার্ডেন ঘুবে বেড়ানো গেল। কার্নিভালেও গেলেন তাঁরা-গ্যাম্বলিং অবিশ্যি খেলেন নি, জয়বাইড-এও চড়েন নি। বায়স্কোপে এডুকেশনাল ফিল্ম কিছু হচ্ছে না কি জানবার জন্য গভীব ঔৎসুক্য দেখলাম তাঁদেব; দেখা গেল এডুকেশনাল ফিল্ম কিছু নেই। কাজেই বাযস্কোপও দেখা হল না। থিয়েটার দেখবার প্রত্যেকেবই ইচ্ছা ছিল আমাদেব, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কাউকে কিছু বলতে পারলাম না।'

—'থিয়েটারে যাবাব কথা পাড়লেও সেটা অথরিটির কাছে যাবে, এই ভয!'

—'হ্যাঁ। চাকবিও যাবে।'

—'পবস্পবের মধ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আপনাদেব দেখছি খুব গভীব।'

—'এক দিন এদেব কাউকে না বলে-কয়েই নাট্যমন্দিবেব দিকে গেলাম। কিন্তু গিযে দেখলাম দ্বিজেন মাস্টার বুকিং অফিসের থেকে হাত দশ-বাব দূবে অত্যন্ত পীড়িত সঙ্কুচিত হয়ে পাযচাবি করছেন।'

—'টিকিট কেনেন নি?'

—'শুনুন। আমি পালিযে যাবার পথ খুঁজছি, দ্বিজেনবাবুব সঙ্গে চোখাচোখি হযে গেল; নিস্তাব নেই; দু-জনেই খানিকটা থতমত খেলাম-খানিকটা হি-হি করে হাসলাম, পাঞ্জা লড়লাম, দ্বিজেনবাবু আমাকে চা খাওযাবেন বলে সাধলেন, আমি তাঁকে পান খাওযাব বলে পযসা বের কবলাম, কাছেই একটা পানের দোকানে গিযে আমাব ঘাম দিযে জ্বর ছাড়ল। তাব পব ট্রামে চড়ে সটান মেসের দিকে যাত্রা!'

—'থিযেটাব আপনি দেখেন নি কোনোদিন?'

—'না। যখন কলেজে পড়তাম, টাকা-পযসাব অভাবে দেখতে পাবি নি, ভাবতাম চাকবি কববাব সময দেখব।'

—'চাকবি তো থিযেটারেব দবজায সত্যাগ্রহ করতে বলছে।'

অভয খানিক ক্ষণ চুরুট টেনে—'এখানে একটা সিনেমা আছে জানেন?'

—'জানি বইকি—'

—'মাসে-মাসে বেশ ভাল ফিল্ম আসে শুনেছি—'

—'এডুকেশনাল?'

—'না-না নন-এডুকেশনাল-কিন্তু দেখবাব জো নেই—'

—'ছেলেবা মাস্টাবমশাইকে বাযস্কোপে যেতে দেখলে আর আস্ত বাখবে না।'

—'নাঃ! নিজে আমি যা নই ছেলেদেব কাছে, টিচাবদেব কাছে নিজেকে সেই অস্বাভাবিক বিড়াল সাধক বলে যে দিনেব চব্বিশ ঘন্টা প্রমাণ কবতে হয, এব চেয়ে কঠিন বিড়ম্বনা আর কি কিছু আছে শচীনবাবু?'

অভয একটু চুপ থেকে—'সিনেমায তো যেতেই পাবি না—কোনো ছেলে যদি গিযেছে এ অভিযোগ কানে আসে, তা হলে তাকে দস্তুবমত শাস্তি দিতে হয।'

—'ওঃ।'

—'নিজেব বিশ্বাস ও বিবেককে এ-রকম উল্টো গাধাব পিঠে চড়িযে পদে-পদে এ-বকম অসত্যের খেলা খেলে কতদিন কাটাতে পারা যায, বলুন।'

—'বিনে পযসায তো খেলছেন না, পঁযতাল্লিশ টাকা কবে পুবস্কার পাচ্ছেন মাসে।'

—'বাস্তবিক। টাকার যে এত দাম কলেজে পড়বার সময তা একেবাবেই বুঝি নি।'

—'ক-বছর মাস্টারি করছেন?'

—'ছ-বছব। হেডমাস্টাবেব তোশামুদি কবি। গভর্নিং বডিব তোশামুদি কবি। তাঁবা যাদেব ঘৃণা কবেন, তাদের পোঁদে পিচকারি কাটি। জীবনে যা পাই নি, কিন্তু চেযেছি, সত্য ও সুন্দর, পদে-পদে তার অপমান কবি—'

—'আপনি নিজে একটা ইস্কুল খুললে পারেন?'

—'কী হবে তাতে?'

—'নতুন নিয়ম করবেন-'

—'নতুন নীতি তৈরি করতে বলেন?'

—'এই ধরুন—থিযেটারের দবজায আপনাদেব ইস্কুলের মাস্টারদেব সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকবাব

কোনো আবশ্যক হবে না।'

—'এক-আধদিন তাবা থিযেটারে গেলেও পাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিংবা সিনেমায়?'

—'সেটুকু স্বাধীনতা তাদের থাকবে। কারু বিরুদ্ধে কোনো তবফ থেকে কোনো নালিশ শুনতে যাবেন না; যে-যার ক্লাশে ঠিক মতন কাজ কবছে কি না-ইস্কুলে কাজ সন্তোষজনক কি না এইটুকু নিজেব বুদ্ধি বিচার দিযে দেখে নেবেন।'

—'তাবপর?'

—'তারপর ঘরে বসে কেউ যদি চুরুট টানে, কিংবা বোদলেযাব পড়ে, অথবা যোগেশবাবুব মতন প্রথম রাতটা স্ত্রীকে নিযে কাটিযে দেয়-তা দিক। এ-সব ব্যাপাব নিযে তাদেব নিন্দে করবাব কোনো দরকার নেই। মানুষ পৃথিবীতে কতটুকুই-বা চায়? পায-বা কতটুকু? কতক্ষণেব জন্যই-বা পায?'

—'কিন্তু এ-রকম ইস্কুল দু দিনও টিকবে না।'

—'তা টিকবে না জানি।'

—'কোনো টিচারই সিনেমায যেতে চাইবে না। বোদলেযাব বা ভিলোঁব নামও তারা শোনেন নি। কর্তৃপক্ষের কাছে কার নামে কেউ কোনোদিন নালিশ কবতে পাববেন না-এ-কথা শুনলে তাদেব পেট ফুলে উঠবে। পঁযতাল্লিশ টাকার বিনিমযে যে কাজগুলোকে আমি অত্যন্ত অখাদ্য বলে বোধ কবি-সেই মত কাজই তাদের অত্যন্ত প্রিয-তাবা ভালবেসে সে সব সম্পূর্ণ কবে।'

—'আর ছেলেরাও এই জন্যই তাদেব ভালবাসে বোধ কবি!'

—'হ্যাঁ—ছেলেদেব না দিন-বাত ভযে-ভযে...। অনেক কথা বললাম আপনাকে; কাউকে বলবেন না। কিছু মনে কববেন না, কিন্তু কোনো বিশ্বাস নেই-'

—'কী রকম?'

—'চাকরি তো কোনোদিন কবেন নি—বুঝবেন না। কিন্তু ছ-বছব চাকবি কবে বড্ড অমানুষ হযে গেছি—'

চুপ করে ছিলাম।

অভয—'পোর্টের পাকা চাকবি থাকলে আমাব বমেনের মত হত। কিন্তু দেশী লোকেব কাছে চাকবি কবতে-কবতে মানুষ দাক্ষিণ্য, বিশ্বাস, প্রেম সমস্ত হাবিযে বসে।'

মাথা হেঁট কবে কুণ্ঠিত হযে হাসতে লাগল অভয।

অভয—'হৃদয বলে কোনো জিনিস নেই আমাদেব।'

একটু গলা খাঁকবে—'সাহস বলেও কোনো জিনিশ নেই। বললামই তো অমানুষ আমবা—সব সময়ই ভয, কে চাকরি খোযায—কী কবে চাকবি বজায থাকে।'

—'আমাকেও ভয পাচ্ছেন তাই?'

—'একেবারে যে নির্ভয পাচ্ছি তাও তো বলতে পাবি না। দেখলাম অন্ধকাবেব মধ্যে জানালার দিকে তাকিযে-এই তো আপনি অনেক দিন চাকবি না পেযে বসে আছেন। আমি সব কথা বলে ফেললাম আপনাদেব কাছে-আপনি হয তো হেডমাস্টাবেব কাছে লাগাবেন—'

—'হেডমাস্টার আমার কথা বিশ্বাস কববেন কেন?'

—'রং লাগিযে বললে বিশ্বাস কববেন বই কি। এক-এক জনেব এমন আন্তবিকভাবে বলবাব ক্ষমতা থাকে যে, মানুষকে বাধ্য হযে বিশ্বাস কবতে হয।'

—'তাকে বিশ্বাস কবিযে আমার লাভ কী?'

—'আমার কাজ যাবে—'

—'এত সহজেই?'

—'যখন যায তখন কাছা খুলবার আগেই যায—'

—'আপনাব কাজ খেযে আমার কী সুবিধা?'

—'আমার জাযগায আপনি বহাল হলেই বুঝতে পাববেন—'

অভয এই সব মনে করেন।

বললাম—'অনেক বাত হযেছে, ভাত খাবেন আসুন—'

সূচীপত্রে যান

মাথা নেড়ে অভয়—'না, যোগেশদা একটা নাইটমেযারেব মত বসে রয়েছে—যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায় তত ভাল—'

—'তাড়াতাড়িই খাইযে দিচ্ছি—'

—'না, আর দেরি করব না। আমাকে ক্লাস টেনের ইংরেজি পড়াতে দিযেছে। আপনাদের কাছে এসেছিলাম একখানা বইযের জন্য। আছে কি?'

—'কী বই?'

—'আমাকে পড়াতে দিযেছে ল্যাম্ব—আমাদেব স্কুল লাইব্রেবিতে তো ল্যাম্বের কিছুই নেই—'

—'ল্যাম্ব-এব 'এসেজ' এবাব ম্যাটিকে পড়াতে দিযেছে? সে তো বড্ড শক্ত, ক্লাস টেনের পক্ষে।'

—'না 'এসে' নয।'

—'তবে?'

—'রোজামুণ্ড গ্রে।'

—'ওঃ-সেই ছোট্ট একটা নভেলেব মত—'

—'এই বইটাব সম্বন্ধে কোনো ক্রিটিসিজম কিংবা ল্যাম্ব-এব সম্বন্ধে কোনো বইটই আছে আপনাব কাছে?'

—'একখানা 'এসে' অব্দি নেই; কী বলব আপনাকে অভযবাবু!'

—'যাক চললাম—কাউকে বলবেন না কিন্তু কিছু—'

—'আমার ডাযেবিতে লিখে বাখব শুধু?'

—'না তাও লিখে বাখতে যাবেন না-কেন মিছেমিছি গবিবকে—'

—'অন্তত আপনাব সম্বন্ধে একটা গল্প লিখব—'

—'আপনি ক্ষেপেছেন? এদেব কাবো হাতে যদি পড়ে তা হলে আমার মাথা আস্ত থাকবে না—'

—'এদেব কাবো হাতে পড়বে না-সে বিষযে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে—'

অভয হাতজোড় কবে আমাব কাছে এগিযে এসে—'আপনাব পাযে পড় হব?'

—'কেন?'

—'কেন মিছিমিছি আমাব পিছনে লেগেছেন?'

—'বসুন—'

—'না, বসব না...আচ্ছা, বসছি—'

চোখাচোখি তাকিযে অভয—'ঐ যে শনিবাব দিন চুরুট কিনতে যাই সে কথা কাউকে বলবেন না—'

মাথা নেড়ে—'না, বলব না।'

—'আব ঐ থিযেটার সিনেমা সম্পর্কে কথাগুলো—ওগুলোও—'

—'বলব না কাউকে—'

—'ইস্কুলের কিংবা-সামাজিক নীতিধর্মেব মতবিরুদ্ধ যে-কথাগুলো বলেছি, সে-সব নিযেও লোকের কাছে গল্প কবতে যাবেন না।' মাথা নেড়ে—'না—'

—'রোজামুণ্ড গ্রে সম্বন্ধে কোনো বই আপনাব কাছে নেই তা হলে?'

—'না। কলকাতায় লিখে দিন না।'

—'বইযের দোকানে?'

—'হ্যাঁ।'

—'পযসা দিযে কিনবার মত সঙ্গতি আমার নেই—'

—'হেডমাস্টারকে বলুন না কেন স্কুল লাইব্রেবির জন্য কিনতে—'

—'তিনি বিরক্ত হবেন। অনধিকাব চর্চা ভালবাসেন না তিনি। নিজে ভাল বুঝে একটা কববেনই। আমাদের চাইতে বিদ্যা তো তাঁর ঢের বেশি!'

—'শুনেছি অত্যন্ত সাধারণ বি-এ পাশ—তাও তিন বারে—'

জিভ কেটে অভয—'ছি, আমাকে জড়াবেন না! একটা চুরুট দিন তো, চুরুটগুলো বেশ। অপ্রাসঙ্গিকতা ঢের হল। এব শাস্তি যদি পেতে হয তা হলে সে আমাবই পাপেব শাস্তি—'

বিছানাব থেকে একটা চুরুট কুড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে গেলেন অভয়।

খানিক গিয়ে ফিরে এসে—'থাক চুরুটটা নিন আপনি, হয় তো যোগেশবাবু আমার বাসায় এসে বসে রয়েছেন; চুরুটটা তাঁর কাছ থেকে সরাতে গিযে জঙ্গলে ফেলে দিতে হবে। আপনার জিনিশ আপনাকে কাছেই থাক—'

চুরুটটা বিছানার উপর রেখে দিয়ে অভয়-'আপনার এমন একটা ভাল জিনিস নিযে যাচ্ছিলাম আপনার মনেও তো গুমর থাকতে পারে। মিছেমিছি আপনার অপ্রীতিভাজন হযেই বা কী লাভ?'

—'রোজামুণ্ড গ্রে সম্বন্ধে কোনো বই নেই তা হলে? আচ্ছা চললাম। আমার বাসায় দু-এক দিন গিয়ে চা খাবেন; কী বলেন? চা আর বিস্কুট।'

খাওয়া-দাওযাব পর মশারি ফেলে ঘুমিযে ছিলাম—মনে হল অনেক দুবে মিশরের কোন এক প্রান্তরে চলে গেছি—সেখানে বড়-বড় দুটো প্রাসাদ-একটা প্রাসাদ আমাব; অন্ধকাবে অপরূপ নীল বাতাস ভেসে আসছে, একসারি খেজুব গাছেব ফাঁক দিযে চাঁদ উঠেছে,বালিব উপব দিযে এক পাল উট ধীবে-ধীরে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ অঞ্জলি এসে আমাব সামনে দাঁড়াল, কোনো এক বিগত যুগেব বানীর বেশে, বললাম—'বোস-'

—'না বসব না—'

—'কোথায ছিলে এতক্ষণ?'

—'আমার যেখানে খুশি ছিলাম—'

—'কেন রাগ কবেছ আমাব উপর?'

কোনো উত্তর দিল না

—'কী অপরাধ করেছি বলো?'

নিস্তব্ধ।

পাথবেব প্রাসাদ অন্ধকাবেব ভিতব থম-থম কবেছে,.একটু চুপ থেকে, 'আমি মামলুকের কাছে যাই—'

—'মামুলুক কে?'

—'চেনো না?'

—'কই না নাম তো শুনি নি—'

—'শোনো নি আবার? কতবাব দেখেছ তাকে!'

—'দেখেছি? কোথায? আমাব তো মনে পড়ছে না—'

—'যাও যাও—আমার পোষা সিংহটা কোথায?'

—'কী দরকার সেটাকে দিযে তোমার?'

——'বলো, সেটা কোথায?'

দেখতে-দেখতে সিংহ এসে হাজিব হল। কেমন বিভ্রান্ত হযে খানিকটা পিছিযে গেলাম-তাকিযে দেখলাম, অন্ধকারে জ্যোৎস্নায় বাতাসে ডালপালার ভিতব দু-জনেব অদৃশ্য হযে যাচ্ছে-নাবী আব তাব অনুবক্ত সিংহ; বাদামি শরীর, কেশর ফুলে-ফুলে উঠছে। ডান দিকে তাকিযে দেখলাম, জানালাব ভিতব দিয়ে সেই অবিরল খেজুরের সারি-তাদেব দীর্ঘ নীলাভ ছড়িব ফাঁকের ভিতব থেকে চাঁদ এক-এক বাব উঁকি দিচ্ছে। চাঁদ, হাতির দাঁতের ধূসব মূর্তিব মত জ্যোৎস্না কেমন নীল, অনেক দূবে এক পিরামিড, মর্মস্পর্শী অপরূপ বাতাস।

ধীরে-ধীরে একটা বর্শা তুলে নিলাম। সিঁড়ি বেয়ে আস্তে-আস্তে প্রাসাদ থেকে নেমে গেলাম। বালির উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে জ্যোৎস্নায় অন্ধকাবে মামলুকেব প্রাসাদে গিযে হাজিব হলাম।

কক্ষের থেকে কক্ষে ঘুবে কোথাও কাউকে দেখলাম না।

কোথাও কেউ নেই। না, নেই কোথাও কেউ। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড সবুজ মখমলেব পর্দা সবে গেল; দেখলাম মেহগিনি কাঠের একটা টেবিলে খানিকটা ধূসর মেঘে ম্লান ও নরম পূর্ণিমাব চাঁদেব মতন একটা বাতি জ্বলছে-পাশেই মামলুক বসে আর তাব স্ত্রী।

সূচীপত্রে যান

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'অঞ্জলি কোথায়?'

—'জানি না—'

—'সে-সিংহটাই বা কোথায় গেল?'

—'সে-সব খবর রাখি না আমরা কিছু।'

একটু চুপ থেকে—'মামলুকের স্ত্রী সেজে বসেছ কেন তুমি অঞ্জলি?'

অঞ্জলি হো-হো করে হেসে উঠল।

রুপার পিলসুজ যেন শ্বেতপাথরের বুকে ভেঙে পড়ে-বুকের সোনালি রঙের বাতিটা যায় নিভে, তাই এমনি আওয়াজ হয় তখন।

—'উঠে এসো অঞ্জলি!'

—'আমাকে তুমি অঞ্জলি মনে করো? তোমার?'

—'কী মামলুক—আমি কোনো ভুল করি নি তো; আমার স্ত্রী এখানে এসে বসেছে কেন?'

—'যাও যাও; আমরা এখন ঘুমোতে যাই; বিদায় নেবে?'

একটা গভীর ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত অন্ধকারে হয়ে গেল।

জেগে উঠে দেখলাম স্বপ্ন দেখছিলাম, সমস্ত শরীরে কেমন বিচিত্র আস্বাদ;

এমন বিচিত্রি স্বপ্ন বড় একটা দেখি নি তো।

এ স্বপ্নের মানেই বা কী?

কাকে জিজ্ঞেস করব?

এ স্বপ্ন নিয়ে অঞ্জলির সঙ্গে আলোচনা করব?

থাক।

একটা গাড়ির শব্দ—আস্তে-আস্তে সদর রাস্তায় সজনে গাছটার কাছে এসে থামল।

অঞ্জলি বায়স্কোপ থেকে ফিরে এল বুঝি?

আস্তে মশারির এক কিনার তুলে আকাশের দিকে তাকালাম: ছেঁড়া-ছেঁড়া শাদা-কালো মেঘ ইতস্ততঃ উড়ছে, বৃষ্টি অনেক ক্ষণ হয় থেমে গেছে, একাদশীর চাঁদ আকাশে অনেকখানি উঠে গেছে, চাঁদের মুখ ঘিরে পাতলা ধূসর মেঘের একখানা ঢাকনি, সেই মামলুকের টেবিলের সবুজ বাতিটার মত...

মশারিটা ফেলে দিলাম।

বালিশে ধীরে-ধীরে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

খানিকটা সিগারেটের গন্ধ। অমল খাচ্ছে বোধ হয়-চারজোড়া লপেটার শব্দ—জামগাছের ঝুঁটি ধরে বাতাস চিড়-চিড় করে খানিকটা আনমনা বক-বক উড়ে চড়ে যাচ্ছে-তাদের করুণ অস্পষ্ট আওয়াজ-ঝিঁ-ঝিঁ-র ডাক-বৃষ্টির অভাবে খাপছাড়া ব্যাঙের চিৎকার, ঘরের ভিতর বাতাসে ভেসে আসা কয়েকটা জোনাকি।

—'আঃ টর্চটা নিভিয়ে ফেললে যে অমল?'

—'কেন, বেশ জ্যোৎস্নাই তো রয়েছে—'

—'না, এই জায়গাটা বড্ড অন্ধকার।'

—'আমি যদি টর্চ না আনতাম।'

—'আঃ জ্বালো না—'

—'অন্ধকারে কিসের এমন ভয়—আমি তো দিব্যি চোখ বুজে হেঁটে চলে যেতে পারি।'

—'এ-সব পথে বড় সাপখোপ থাকে।'

—'কামড়াবে?'

—'কামড় দিয়ে ফেললে আর কী করব? আবার নিভিয়ে ফেললে?'

—'মরবার খুব ভয় বুঝি?'

—'মরবার কী দরকার ভাই?'

—'সিগারেটটা ফেলে দেই; শচীনবাবু কী মনে করবেন?'

—'আঃ। প্যাচ করে খানিকটা কাদা ছিটকে গেল যে?'

—'কোথায়? দেখি—'
—'থাক দেখতে হবে না তোমার—'
—'শাড়িটা নষ্ট নয় নি তো?'
—'সে ঘরে গিয়ে বুঝব।'
—'আহা, আমার অপরাধের হল কি বৌদি?'
—'না তোমার আব দোষ কী ঠাকুরপো-'
—'ঠাকুরপো আমাকে বোলো না।'
—'তবে?'
—'অমল বললেই কাজ চলে যায।'
—'আস্তে; বাড়িসুদ্ধ মানুষ আছে, কাণ্ডজ্ঞান নেই বুঝি তোমাব?'
—'সকলেই তো-'
—'কই, অমল চলে যাচ্ছ না কি?'
—'নাঃ, এই তেঁতুলেব গাছেব ছাযায় একটু দাঁড়াই।'
—'এসো এ-দিকে—'
—'আমি আসব, না আমার [কাছে তুমি] আসবে?'
—'তুমিই এসো—'
—'কতদূর যেতে হবে?'
—'ঘরেই এসো না—'
—'ভেতবে?'
—'হ্যাঁ হ্যাঁ।'
দু জনেই অঞ্জলির ঘবেব ভিতব ঢুকল।
অঞ্জলি—'এখন এক কাপ চা পেলে তোমাব খুব ভাল লাগত, কী বলো অমল?'
—'উপায থাকলে তো আপনি দিতেনই; সেই জেনেই তৃপ্তি।'
—'তুমি বসো, যদি আমি করে দিতে পাবি-'
—'বসতে পাবি কিন্তু চা খাবাব জন্য নয—'
—'তবে?'
—'এমনিই—'
—'আহা গাড়ি ভাড়াটা তো দেওযা হয নি।'
—'গাড়োযান তাই বলে বাস্তায বসে ঝিমুচ্ছে না।'
—'চলে গেছে?'
—'এতক্ষণে মাটিব সবায আগুন নিযে বসেছে।'
—'আমার মাকড়িটা একটু খুলে দেবে অমল?'
—'স্বচ্ছন্দে—'
—'অত আস্তে নয; আর একটু জোব দাও।'
খানিকটা নিস্তব্ধতা।
অঞ্জলি আস্তে হেসে—'হ্যাঁ হযেছে—'
—'এই কানেবটাও?'
—'নিশ্চযই; তবে, এক কানেব মাকড়ি খুলবে না কি শুধু?'
—'মাকড়ি বলেন? আমরা বলি দুল—'
—'যখন যা মুখে আসে; আমবাও কি দুল বলি না অমল?'
—'এই মকবমুখো দুল আপনাকে কে দিল?'
—'মকরেব মুখ দেখলে কোথায তুমি? আংটিব মত তো—'
—'না, ঝুমকোব মত—'
—'যাই বল; আমাকে মানায নি?'
—'খুব। আমার ইচ্ছে করে কি জানেন, আপনাব ঐ কানে দুটো অপরাজিতা ঝুলিযে দি—'

সূচীপত্রে যান

—'অপরাজিতা?'

—'চমৎকার দেখাবে আপনাকে-'

—'কিন্তু অপরাজিতা তো দু মুহূর্তেই শুকিয়ে যাবে অমল।'

—'যাক, সে তার কাজ করে যাবে; মানুষের রূপকে তো দুই মুহূর্তের জন্য উপলব্ধি করতে হয় শুধু—'

—'মোটে দুই মুহূর্তের জন্য?'

—'তা ছাড়া আর কী; যারা চব্বিশ ঘন্টা রূপের দিকে তাকিয়ে থাকতে চায় তারা বড্ড স্থূল-'

—'শুধু দু-মুহূর্তের জন্য আমাদের রূপ?'

—'রূপ নিয়ে আপনারা অনন্ত মুহূর্তই থাকুন না কেন; আমরা দু মুহূর্তের জন্য শুধু দেখে চোখ বুজে চলে যাব।—তারপর আমাদের ধ্যানের সময়—'

—'ওঃ, সেই কথা!'

—'বাসি অপরাজিতা ফেলে দিয়ে তাজা দুটো অপরাজিতা তুলে পরবেন। কিংবা কুরচি, ছোট্ট দুটো তোড়া দু-কানে দোলাবেন-কিংবা জাপানি চেরি যদি ভাল লাগে-কিংবা দালিয়া, ক্রিসেনথিমাম, যা খুশি পরুন গিয়ে। আমাদের কাজ অনেক আগে হয়ে গেছে; যত আভরণে নিজেকে আজন্ম সাজাতে পারেন, দু-মুহূর্তেই আমরা সাজিয়ে শেষ করেছি; তারপর নিরাভরণ স্বপ্ন নিয়ে আমাদের পুরুষদের নিস্তব্ধ রহস্যের দিনগুলো চলে—'

—'খুব আনন্দে? আমার মাকড়ি দুটো রাখলে কোথায়?'

—'এই তো বিছানার উপর—'

—'আচ্ছা বেশ, আমি ভাবলাম মাটিতে পড়ে গেল, না কি কোথাও।'

অমল কোনো জবাব দিল না।

—'বললে মকরমুখো?'

—'কিচ্ছু বলি নি—'

—'মাকড়ি দুটো জেঠিমা আমাকে দিয়েছিলেন—' অঞ্জলি বললে—'আমার বিয়ের সময়। ক ভরি সোনা এর ভেতর আছে বলতে পারো?'

—'আমার কোনো আন্দাজ নেই।'

—'বাঃ, হাতে তুলেই দেখ না—'

—'তুলে কী হবে-আমি বুঝতে পারব না—'

—'এই তোমার ডাক্তারি?'

—'আমাদের সোনা-রুপো নিয়ে কারবার নয় তো—'

—'বড় লোকের ছেলে, সোনা-রুপোর কোনো খবর রাখো না?'

—'এখানে দেখলাম পুকুরের কোল ঘেঁষে একেবারে জলের কাছাকাছি দল-ঘাসের ভিতর এক রকম নীল ফুল ফোটে।'

—'ফুল নিয়েই আছ তুমি শুধু।'

—'সেগুলোকে কী ফুল বলে অঞ্জলি বৌদি?'

—'জানি না।'

—'খুব ছোট্ট-খুব নীল-? বলতে পারো না?'

—'না।'

—'আচ্ছা টেনিশনের 'ব্রুক' কবিতাটা পড়েছেন?'

—'পড়েছি—'

—'ফরগেট মি নট'-এর উল্লেখ আছে মনে পড়ে? আচ্ছা ওগুলোই কি 'ফরগেট মি নট'?'

—'আমি বুঝেছি তুমি থার্ড এম-বি কী করে ফেল করলে—'

—'না। শুনুন ওগুলো 'ফরগেট মিট' কি না—'

—'পাগল, সেগুলো হল বিলেতের ফুল—'

—'আমাদের বাংলাদেশে হয় না?'

—'কী করে হবে?'

সূচীপত্রে যান

—'পুকুরের কোণে দলঘাসের ভিতর এ-ফুলগুলো তা হলে কী?'

—'কোনো আগাছার ফুল হবে নিশ্চয়ই—'

—'যাই হোক বড্ড সুন্দর, আপনি দেখেন নি?'

—'কে দেখতে যায় অত সব—'

—'গোটা দশেক সেই ফুল কুড়িয়ে পাঁচটা-পাঁচটা করে তোড়া বেঁধে আপনার কানে দুলিয়ে রাখলে বেশ হয় কিন্তু।'

—'এই মাকড়ি দুটো গড়তে পঁচিশ টাকা লেগেছিল,' একটু চুপ থেকে অঞ্জলি, 'শুনলাম সোনার দাম এখন বেড়েছে—'

—'জানি না।'

—'আচ্ছা তা হলে এই গয়না দুটোর দাম ত্রিশ টাকা হয় না?'

—'হতে পারে—তিন শ টাকা দিয়েও তো কেউ কিনে নিতে পারে—'

—'কেন?'

—'হয়তো মনে ধরে গেল; আপনার কানে দুলছে-হয় তো মনে ধরে গেল তার-আমাকে একটু জল দেবেন?'

—'এমনি জল খাবে—না মিষ্টি দিয়ে দেব?'

—'না, শুধু এক গ্লাস জল—'

—'কয়েকটা লেবুপাতা কচলে দেব?'

—'কী যে আজগুবি আপনার—'

—'জলের ভিতর সুন্দর গন্ধ হত—'

—'তেষ্টার সময় মানুষ সুন্দর গন্ধ চায়?'

—'চায় না? তা হলে সুগন্ধি সিরাপ খায় কেন?'

—'কিন্তু রকমফের জানে না যে-হাত সেই নারীহাতের সাধারণ খাঁটি জলের চেয়ে গভীর জিনিশ পৃথিবীতে আর কিছু নেই অঞ্জলি বৌদি।'

—'কল্পনা তোমার অনেক দিকেই খেলে দেখছি অমল-'

—'হ্যাঁ, কল্পনা মাত্র; জীবনের অভিজ্ঞতা আমার বড্ড কম।'

—'কম? তাই না কি?'

—'সেই জন্যই যেমন অবসাদ তেমনি আকাঙক্ষা, তেমনি পরিতৃপ্তি, সবই চূড়ান্ত চলে যায় আমার—'

—'এ ঘরে কিন্তু একটা পাথরের গেলাস আছে শুধু অমল; তাতে জল দিলে হবে?'

—'কাঁসার গ্লাসের চেয়ে সে ঢের ভাল জিনিশ হবে অঞ্জলি, পাথরের গ্লাসটা কি শাদা?'

—'কালো'

অমল প্রীত হয়ে—'ঠিক এমন জিনিশটিই এই সময়ে চেয়েছিলাম অঞ্জলি বৌদি।'

—'গেলাসটা কিন্তু নোংরা হয়ে আছে।'

—'এঁটো? ধুয়ে নিন।'

জল গড়িয়ে এনে অঞ্জলি-'কয়েকটা নেবুপাতা কচলে দেই?'

—'আবার নেবুপাতা আনতে যাবেন বাইরে? আনুন। নারীত্বের পূর্ণ পরিচয়ে জিনিশটা নরম হয়ে উঠুক—'

—'বাইরে যাবার কোনো দরকার হবে না অমল—এই তো জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই নেবুপাতা পাওয়া যায়।'

—'যায় না কি?'

—'হ্যাঁ এখানে একটা দিব্যি গাছ রয়েছে—লেবুও ফলেছে ঢের—'

—'বেশ, তা হলে একটা লেবুই কেটে দিন—'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'দিতে তো আমার খুবই ভাল লাগে অমল-কিন্তু এ আমার শাশুড়ির গোনা লেবু—বুঝলে না—? একটা সামান্য লেবুর জন্য কেন তার মুখ ঝামটা সইতে যাব?'

—'ঠিক কথাই তো।'

সূচীপত্রে যান

—'আ হরি! লেবুপাতাগুলো না ধুয়েই কচলে ফেললাম।'
—'বেশ করেছেন; বৃষ্টির জলে যথেষ্ট স্টেরিলাইজড হয়ে আছে।'
—'আমার হাতও তো ধুই নি।'
—'চাইও না যে আপনি ধোন!'
—'আব এক খুরি দেব?'
—'দিন।'
—'লেবুপাতা কচলে?'
—'তা আর বলতে?'
—'একটু মিষ্টি খেলে হত?'
—'হাতেব থেকেই যথেষ্ট মিষ্টি ঝরছে।'
তিন-চাব খুরি খেল অমল।
—'আমাব কপাল বড্ড ঘামে ভিজে গেছে।'
—'নিঃসঙ্কোচে আঁচল দিয়ে সমস্ত কাপালটা মুছে নিন, শুভ্র ললাটে কোথাও সিঁদুবেব বাধাবিঘ্ন নেই-সিঁদুব নেই তো।'
—'আজ আর সিঁদুর পবি নি—'
—'আজকাল এ-জিনিশ কুমারীবা পরে; কয়েকদিন পবে বিধবাবাও পববে। আপনাদেব না পবলেই ভাল।'
—'না সেজন্য নয়।'
একটু নিস্তব্ধতাব পব অঞ্জলি—'আমাব শাড়িতে কাদা লাগল কি না বুঝতে পাবলাম না তো।'
—'আমি ভেবেছিলাম আমাব ধুতি সাফ আছে কি না সেই কথা আগে জিজ্ঞাসা কববেন।'
অঞ্জলি একটু হেসে—'জিজ্ঞেস কবি নি বুঝি? এখন অন্ধকাবেব মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাববে নারী কী বকম স্বার্থপব!'
—'কাল সকালে হয় তো ধুতিটা কেচে দেবাব জন্য চেয়ে পাঠাবেন এই কথা ভাবতে-ভাবতে নাবীব ক্ষমা ও প্রেমেব মূর্তি হৃদয়ে নিয়ে ঘুমোব।'
—'যা হোক, নির্বিঘ্নে ঘুম হলেই ভাল!'
—'আশীর্বাদ করুন যেন ঘুমেব ভিতব কোনো স্বপ্ন না দেখি।'
—'কেন, স্বপ্নেব কী অপবাধ? সুন্দব স্বপ্নও তো আছে—'
—'কিন্তু তবুও স্বপ্ন তো বাস্তব নয়—'
—'যতক্ষণ দেখবে ততক্ষণ তো বাস্তব। ঘুম ভেঙে গেলে সংসাবেব পথে চলতে-চলতে লাখ টাকার বিনিময়েও এমন সুন্দব রূপান্তর খুঁজে পাবে না তো আব—'
অমল—'আশীর্বাদ করুন যেন আপনাব শ্বশুবেব মত সাদাসিধে ঘুমে সাবাটা বাত কাটিয়ে দিতে পাবি।'
—'ঠাট্টা কোবো না অমল—তাঁব ঘুমেব মধ্যে ঢের বেদনা ও অভাবেব জটিলতা বয়েছে। তুমি তা কল্পনাও করতে পাববে না।'
—'যাক্—আমাব বাবা যে-বকম নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমান—সে রকম ঘুমোতে পাবি যেন!'
—'তা ঘুমিও—'
—'হ্যাঁ, এই আশীর্বাদই কববেন।'
—'আশীর্বাদ শব্দটা খুব ভাল খুঁজে বেব কবেছ অমল-'
—'কেন, খাপ খায় না?'
—'ভেবে দেখ তুমি—'
—'তা হলে—আকাঙক্ষা করুন—'
—'তোমাব টর্চটা একটু বেখে যাবে?'
—'বিছানাব উপর অনেক আগেই তো বেখে দিয়েছি।'
—'কাববাইডে আলো আছে তো?'
—'তিন ঘন্টার মত আছে।'
—'আমাব শাড়িতে কোথায়-কোথায় কাদা লাগল তাই দেখব।'

সূচীপত্রে যান

—'দেখতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?'
—'তুমি বাড়ি চলে গেলে তবে তো দেখব।'
—'টর্চ আপনার কাছে বেখে চলে যেতে হবে?'
—'হ্যাঁ, টর্চেব আলোয় বেশ পরিষ্কাব ভাবে বোঝা যায।'
—'আর অন্ধকারে আমাকে সাপ কামড়ালে আমিও অপরিষ্কার কবে বুঝব না অঞ্জলি বৌদি।'
অঞ্জলি—'কাকে?'
—'আপনাকে নয়-জীবনটাকেই।'
—'মিছেমিছি অভিমান কবো কেন অমল? জীবনটাকে যখন বুঝতে আবম্ভ করবে তখন আমার কথা মনেও থাকবে না তোমাব।'

তেঁতুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে দেশলাই জ্বালাল, খানিকটা সিগারেটের গন্ধ, আস্তে-আস্তে চলে গেল।

দুপুরবেলা ঘুম আসছিল না—ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু কী জানি কেন কোনোদিনও পারি না। শ্রাবণের আকাশ, তবুও বৃষ্টি ছিল না, বেশ খটখটে বোদ—খানিকটা দূরে শুকনো অশ্বথেব পাতা, কদমেব কেশর আব বেলের কুঁড়িতে ঘাস রয়েছে ছেয়ে। অনেক দিন পরে ফড়িং আব প্রজাপতি নেমে পড়েছে; ঝি-ঝি প্রাণ খুলে ডাকছে; কয়েকটা শালিখ আব দাঁড়কাক—একটি আগন্তুক বৌ-কথা-কও অশ্বথেব নিবিড় ডালপালার ভিতব নিস্তব্ধে খুনসুড়ি করে ফিবছে: আবার যেন জ্যৈষ্ঠেব দুপুব ফিবে এল।

তাকিয়ে দেখলাম একটা মোটব এসে থেমেছে; গাড়িটা হিলম্যান উইজার্ড বোধ কবি; বেশ নতুন—বোধ হয দু-তিন মাস হল কেনা হয়েছে—আমাদের এখানে থামল যে?

এ কার মোটব? খানিকটা পেট্রোলেব ধোঁযা উড়ল; গন্ধ পেলাম, এক হলকা গবম বাতাস প্রান্তবেব থেকে বয়ে এল।

মোটব কাব এখানে এসে থেমেছে; হয তো পুলিশেব নজব পড়েছে এ বাড়িটাব ওপব; সুপাবইনটেনডেন্ট এখনই হয তো গাড়ি থেকে নামবেন; সার্চ করবেন? না গ্রেপ্তাব কববেন? কাকে!

দেখলাম একজন বাঙালি বাবু নামলেন।'

হয তো পুলিশের কোনো কর্মচাবী; কিংবা কনফিডেনশিযাল অফিসার, হৃদযটা কেমন বিবস হয়ে ওঠে, প্রজাপতি, ফড়িং অশ্বথেব শুকনো পাতা—সমস্ত দুপুব নিরাসক্ত নাবীব মত নিজের মনে খেলা করতে-কবতে দূরেব বৌদ্র কলববেব ভিতব মিলিযে যায—আমাকে দিযে তাদেব দবকার নেই যেন আব।

গরদের চাদর, গবদের পাঞ্জাবি, সোনাব বোতাম, হাতে ছড়ি, মুখে সিগাবেট, পাযে কেডস—ভদ্রলোকটি আমাব দিকে এগিযে এলেন।

দূর থেকে হাসিমুখে নমস্কাবও জানালেন—প্রতিনমস্কাব দিযে মৃদু হেসে বললাম—'আসুন'—ছাতিম গাছ অব্দি পৌছে—'কী হে, চুপচাপ বসে আছো যে—'

—'না ঘুমোবার জো নেই—'
—'কেন, ছারপোকায় কামড়ায়?'
—'কে, চন্দ্রনাথ না কি? তুমি এ সময কোত্থেকে ভাই?'
—'সত্যিই কি আমি চন্দ্রনাথ?'
—'সেই রকমই তো মনে হয।'
—'কত বছর পরে দেখা হল তোমার সঙ্গে?'
—' আট বছর, না বেশি?'
—'আচ্ছা এই ডেক চেযারটায আমি বসি।'
—'বোসো, আমি বিছানায উঠে বসছি।'
—'তোমার সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয়েছিল তখন কি একটা খবরেব কাগজের স্টাফ ছিলে, না?'
—'হ্যাঁ সে আজ-আট বছর তো নয়—দশ বছবেব কথা হবে চন্দ্রনাথ—তাব পর আব তোমায দেখি নি বুঝি?'
—'না। ১৯২৫-এ কলকাতাব ধর্মতলার মোড়ে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা। মনে পড়েছে?'

সূচীপত্রে যান

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি একটা বর্মা চুরুট ফুঁকছিলে—'

—'কী জানি—'

—'বললে চুরুট ফুঁকতে-ফুঁকতে দাঁত টন-টন করে, রক্ত পড়ে, তবুও বদ-অভ্যাস ছাড়তে পারি না—'

—'তা বলে থাকব; মনে নেই আমার; তবে দাঁতের জন্য চুরুট ছেড়ে দিতে হয়েছে আমাকে—'

—'বলেছিলে বাংলার পলিটিকসে এ-বড় এক আশার জিনিশ এসেছে-দেশবন্ধু; দেখো, বছর তিন-চারের মধ্যে আমাদের নেশনের কত প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে। জাপানের মত, টার্কির মত—'

—'হ্যাঁ সেই রকম সব ভাবতাম তখন; বড্ড ছেলেমানুষ ছিলাম—'

—'চায়ের দোকানে গেলে আমাকে নিয়ে—'

—'তা মনে আছে।'

—'ধর্মতলার মোড়ে একটা দোকান ছিল—'

—'হ্যাঁ'

—'দোকানে ঢুকে কেবল দেশবন্ধু—আর অবিশ্রাম চুরুট আর চা।'

—'হ্যাঁ, সে এক রকম দিন ছিল বটে।'

—'খবরের কাগজে লিডার লিখতে; হ্যাঁ, কী লিডার লিখেছিলে সেদিন—দাঁড়াও আমি মনে করছি।'

—'সে বছর দশের আগে কী লিখেছিলাম না-লিখেছিলাম আজ সেই কথা দিয়ে কী হবে চন্দ্রনাথ?'

—'হ্যাঁ মনে পড়েছে; বালগঙ্গাধরের সম্বন্ধে লিখেছিলে-তাঁর মৃত্যুর তারিখ ছিল সেদিন। সে লেখা তোমার আমি পড়েছিলাম—'ইংরাজির ভুল ছিল না-কিন্তু বিচারের চেয়ে কল্পনার চাতুরি ছিল ঢের বেশি; নিজেকে ঢের আত্মপ্রতারিত করেছিলে—'

—'সেই ১৯২৫-এই এ-সব বুঝেছিলে তুমি?'

—'হ্যাঁ'

—'তা হলে তোমার মাথা বরাবরই বেশ ঠাণ্ডা চন্দ্রনাথ—'

—'আর একটা আর্টিকেল লিখেছিলে ভারতবর্ষের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্যারালেলিজমকে নিয়ে—'

পকেটের থেকে সোনার সিগারেট কেস বের করে চন্দ্রনাথ—'লেখো নি?'

—'লিখেছিলাম তো অনেক কিছুই।'

—'তার পর আজকাল?'

—'সে খবরের কাগজ তো অনেক দিন হয় উঠে গেছে—'

—'চিত্তরঞ্জন মারা যাবার আগে?'

—'না, মারা যাবার আগে নয়, কিন্তু আমি ১৯২৩-এই ছেড়ে দিয়ে এসেছি—

—'কেন ছেড়ে দিলে? টাকা দিত না?'

—'টাকা না-দিত এমন নয—'

—'তবে?'

—'ভাল লাগছিল না আর; রাত্রির জেগে-জেগে, মেসে থেকে-থেকে শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল-'

—'যা লিখতে বা প্রচার করতে সেই সব জিনিশে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল না বোধ করি?'

একটু হেসে—'সে-সব কথা এখন জিজ্ঞেস করছ কেন চন্দ্রনাথ?'

—'ছিল বিশ্বাস?'

—'আমরা যা ভালবাসি, বিশ্বাস করি, সে পথে চলবার অধিকার আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে—'

—'অধিকার বোলো না-বলো শক্তি।'

—'শক্তিই তো অধিকার সৃষ্টি করে—'

—'একটা সিগারেট খাবে?'

—'তোমার এই গোল্ডকেসটা তো ভারি সুন্দর—'

—'মন্ত্রীর মহারানী আমাকে দিয়েছিলেন—'

—'মন্ত্রীর মহারানী—?'

—'হ্যাঁ, রাজপুতানা স্টেটের।'
—'ওঃ।'
—'দেখো নি ছবি তার?'
—'মন্ত্রীব রানীর? না তো।'
—'ইলাসট্রেটেড উইকলি বাখো না বুঝি?'
—'নাঃ।'
—'স্টেটসম্যানও না?'
—'নাঃ।'
—'বেশ সুন্দব দেখতে তিনি।'
—'বাজপুতনারী, দেখতে সুন্দব হবেই তো।'
—'আমাদের একজন বাঙালি আর্টিস্ট রানী ভানুমতীব ছবি এঁকেছে, দেখেছ?'
—'ছাপিযেছে?'
—'না, ছাপাবাব জন্য তো নয।'
—'তবে?'
—'বিলেতে ইণ্ডিযা-হাউসে পরিশোভন করছেন।'
—'ওযাল পেইনটিং?'
—'হ্যাঁ, ফ্রেস্কো; বেশ চমৎকাব ফ্রেস্কো; বাংলাদেশে এ-বকম রূপসী দেখা যায না রূপকার যদিও দেখা যায ঢেব; কই, সিগাবেট নিলে না তো?'
একটা তুলে নিলাম।
—'ফিটজেবাল্ডের কথা মনে পড়ে?'
—'কী কথা?'
—'পটার্স আর ক্লে, পটুযা আব তার কাদা; শেষ পর্যন্ত পটুযাই বড় কাদা, কাদা মাত্র, কী বল শচীন? সিগাবেটটা জ্বালালে না? দাঁড়াও আমি জ্বালিযে দিচ্ছি—
লাইটার বাব করল সে।
—'যাক পরে জ্বালানো যাবে।'
—'আচ্ছা, আমারটা আমি জ্বালিযে নি।'
লাইটাইবেব আগুনে সিগাবেটটা তাব জ্বালিযে নিল চন্দ্রনাথ।'
—'ফিটজেরাল্ডেব বইখানা খুব ভাল, না?'
—'রুবাইযাতেব কথা বলছ?'
—'হ্যাঁ; আমার মনে হয ওমব নিজে যা লিখেছিলেন তাব চেযে ঢেব বেশি সুপার্ব; আব দেশ-বিদেশে যে-সব অনুবাদ বেরিযেছে, সে সবেব চেযে অনেক বেশি মর্মান্তিক!'
চুপ করে ছিলাম—
—'ভিকটোরিযান যুগে এই একখানা বই, আব কোনো বই নেই।'
—'নেই?'
—'ব্রাউনিং আগাগোড়া যা লিখেছেন সমস্ত ফাঁকি: একদিন চোরাই চামড়া খসে যাবে, তাব ভিতরের থেকে গাধা বেবিযে পড়বে।'
—'তোমাব সিগাবেটটা জ্বলে যাচ্ছে চন্দ্রনাথ?'
—'প্রথম সিগাবেটটা আমি আগুনে পুড়িযে ছাই কবে দেই, টানি না।'
—'কেন?'
—'শখ।'
—'তাবপর, সেই যে বিদায নিলে এদ্দিন দেখা হল না যে?'
—'ঠিক কবেছিলাম ছেঁড়া চটিজুতো পায দিয়ে আব-কাবো সঙ্গে দেখা করব না—'
—'এই মোটবটা কাব?'
—'আমারই।'
—'হিলম্যান উইজার্ড?'

সূচীপত্রে যান

—'না, হিলম্যান মিনক্স।'
—'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনেছ?'
—'বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি।'
—'ছ-সাত হাজার খরচ লেগেছে বুঝি?'
—'না, চোদ্দ-পনের হাজার—'
—'মোটর-এর ভেতর কে আছে?'
—'সোফার।'
—'দেশের বাড়িতেই এই দশ বছর পরে এলে?'
—'না, বছর পাঁচেক আগে একবার এসেছিলাম।'
—'কই দেখি নি তো।'
—'তোমাকেও আমি দেখি নি।'
—'হয় তো কলকাতায় ছিলাম আমি।'
—'কোথায় ছিলে, না-ছিলে, ইহলোকে না পরকালে, এক মুহূর্তের জন্যও মনে পড়ে নি আমার।'
—'কেন হুইস্কিতে অভিভূত হয়ে ছিলে?'
—'চায়ের কোটেশান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।'
এটকু চুপ থেকে—'হিলম্যান মিনক্স; তা তোমাদের সেই খড়ের ঘরেই আছো?'
—'সেটা অনেক দিন হয় আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি।'
—'এখন কোথায় থাকো?'
—'রবার্টসন সাহেবের বাংলোতে।'
—'ওঃ, সেই বাড়িটায়; সাহেবের সঙ্গে?'
—'রবার্টসন অনেক দিন হয় সেটা আমার কাছে বিক্রি করে বিলেতে চলে গেছেন।'
বিছানার থেকে দেশলাই কুড়িয়ে সিগারেটটা জ্বালিয়ে—'তা হলে দেশেও বাড়ি করলে একখানা?'
—'হ্যাঁ, নৈনিতালে বাড়ি করবার চেয়ে এ ঢের ভাল জিনিশ!'
—'কী রকম?'
—'এখানে পথে-ঘাটে গোখরো ঘুরে বেড়াচ্ছে, খানিকটা দূরে বনের ভিতরে বাঘ, সন্ধ্যার সময় ভাটিয়াল গান শুনতেই পাই, ম্যালেরিয়ায় দেশ-গ্রাম উচ্ছন্ন যাচ্ছে দেখি, জে. এম. সেনগুপ্ত আর সুভাষ বোসের সুখের বাংলা কথা শুনে প্রাণ তৃপ্ত হয়, বাপ-মা ভাই-বোন রয়েছে সব। অন্ধকারে কদম গাছের ভিতর থেকে প্যাঁচা ডাকে, সারা রাত মাঠে-মাঠে শ্রাবনের জল আর ব্যাঙের কলরব; ঢের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় আমার। ভারী ভাল লাগে, নৈনিতালে আছে কয়েকটা হোটেল, ইডিয়েট পাহাড়ি আর ফেরিয়ালা, সে সবের ঢের হয়ে গেছে আমার।'
—'পথে-ঘাটের গোখরো সাপ ভাল লাগে কোন হিশেবে?'
—'বেশ থ্রিল!'
—'মোটরে তো বেড়াও, থ্রিল উপভোগ করবার সুবিধে কোথায় তোমার চন্দ্রনাথ?'
—'সেই পলাশগঞ্জের রাস্তা মনে আছে?'
—'খুব।'
—'এখান থেকে প্রায় ক্রোশ তিনেক, না শচীন?'
—'ইস্কুলে পড়বার সময় কত দিন সেই রাস্তা দিয়ে বেড়াতাম আমরা দুজনে, তুমি গিয়েছ শিগগির সেখানে?'
—'না।'
—'আমি এখানে এসে অব্দি রোজ সন্ধ্যার সময় সেদিকে মোটর চালিয়ে নেই।'
—'একা-একা?'
—'হ্যাঁ, একাই ভাল লাগে, ওধারে অশ্বথ, জাম, তেঁতুল, পলাশ, কতগুলি আমের বন, বাবলা-শ্যাওড়ার জঙ্গল, ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত, মানুষ নেই, গরু নেই, গাছের পাতা খসে, বনমোরগ ডাকে, নদীর দিকে বুনো হাঁসের সাড়া পাওয়া যায়, ধানক্ষেতের এদিকে-সেদিকে কয়েকটা স্পাইগেট, গায়ে রেনকোট, হাতে বন্দুক, মোটরটা থামিয়ে নেমে পড়ি, কাঁচা রাস্তায় হাঁটতে থাকি।'

সূচীপত্রে যান

—'শিকার করবার জন্য?'

—'না, এমনিই।'

ভস্মীভূত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে চন্দ্রনাথ—'রোজই হাঁটি, সেই স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে; জীবনে পরাজয় তত হয় নি, আত্মবিক্রয়ও তত করি নি,কিন্তু তবুও এমন দুঃখ পাই কেন? আমাদের সেই ইস্কুলের আটচালাটা কোথায় গেল? মাষ্টারমশাইদের কাউকেও দেখি না। সে দিন দেখলাম নির্মলাদের ভিটের উপর একটা কুকুর মরে আছে, রাজ্যের শকুন এসে পড়ে; ভিটে উজাড় করে ঘাস, ভেবেণ্ডা, লজ্জাবতী লতা, তেলাকুচা আর ফণীমনসার জঙ্গল-। নির্মলার কোথায় বিয়ে হয়েছিল শচীন?'

—'ক-দিন হল এখানে এসেছ?'

—'দিন দশেক—'

—'নৈনিতাল থেকে?'

—'না, নৈনিতাল অনেক দিন হয় ছেড়েছি। কলকাতায় ছিলাম।'

—'ব্যবসা করে অনেক টাকা করলে?'

—'না। ব্যবসা আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

—'কেন?'

—'খাঁটি দোকানদার আমি নই।'

—'ব্যবসায় টাকা জমিয়েছ মন্দ না।'

—'সে আমার সৌভাগ্য।'

—'এখন কী করছ?'

—'রেওয়া স্টেটে চাকরি করেছিলাম কিছু দিন।'

—'তার পর?'

—'রাজপুতনায় একটা প্রফেসারি নিয়েছি।'

—'এখন তা হলে প্রফেসারি করবে?'

—'বলতে পারি না, তোমার মা কোথায়?'

—'ঘুমিয়েছেন হয় তো।'

—'তাই; না হলে আমাদের গলার আঁচ পেলে নিশ্চয়ই চলে আসতেন। সেই ইস্কুল ছুটির পর, মনে নেই শচীন?—কতদিন তিনি আমাদের মোহনভোগ বেঁধে খাওয়াতেন, মোহনভোগ, লাল আটার রুটি, চিঁড়ে নারকোল আর গুড়, মাঝে-মাঝে দুধভাত আর চাঁপাকলা।—তুমি বিয়ে করেছ?'

—'হ্যাঁ, তুমি কোথায়, তোমাকে নেমন্তন চিঠি দিতে পারি নি।'

—'স্ত্রীর শরীর ভালো?'

—'আছে একরকম।'

—'ছেলেপিলে হয় নি?'

—'একটি মেয়ে হয়েছিল।'

—'হয়েছিল, এখন আর নেই?'

—'না দেড় বছর বয়সে মারা যায়।'

—'কিসে গেল?'

—'শিশুরা অনেক অজুহাতেই এ পৃথিবী থেকে সরে যায় চন্দ্রনাথ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—'তোমার স্ত্রী হয় তো এ শোক উতরে উঠতে পারে নি, কী করেই বা পারবেন? শেষ দিন পর্যন্ত রূপান্তরিত জীবন এ অনুভূতি নিয়ে ফিরতে হবে নারীদের। এই রকমই হয়। অনেক সময়ই হয় তো বিছানায় পড়ে থাকেন?'

আস্তে মাথা নাড়লাম। হ্যাঁ কি না বুঝে নিক যা হয় একটা চন্দ্রনাথ

—'একটা উপায় করলে হয় তো এ-বেদনা কমে!'

চন্দ্রনাথের দিকে তাকালাম।

—'তোমাদের দু-জনের মধ্যে আর-একটি সন্তান জন্ম নিক।'

একটু হেসে-'না।'

সূচীপত্রে যান

—'কেন?'

—'আমাদের কারুরই ইচ্ছে নেই।'

—'তোমার স্ত্রীরও না?'

—'না।'

খানিকটা চুপ থেকে চন্দ্রনাথ সিগারেট জ্বালাল, বললে—'নির্মলার ভালো বিয়ে হয়েছিল শচীন?'

—'কী জানি, আমি তখন এখানে ছিলাম না।'

—'তার পর আর-কোনো খোঁজ খবর পাও নি?'

—'না।'

—'তাই তো। সেদিন দেখলাম একটা কুকুর মরে আছে আর শকুন চরছে নির্মলাদের ভিটেতে।-আর তিনবছর আগে?'

সিগারেটে এক টান দিয়ে অনেক ক্ষণ মাথা হেঁট করে নিস্তব্ধ হয়ে রইল চন্দ্রনাথ। তার পর ধীরে-ধীরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, 'এক নিশ্বাসেই তিনটে বছর কেটে গেল না?'

—'এই রকমই তো যায়।'

—'সেই রকমই তো মনে হয়।'

—'এখন বিধাতাকে যদি বলি আর একটা নিশ্বাস ফেলব তুমি আমাকে তিন বছরের পৃথিবীতে নিয়ে যাও?'

অনেক ক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমরা।

ধীরে-ধীরে হিলম্যান উইজার্ড চলে গেল।

দু-তিন দিন পরে একদিন চন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনি সে মীরাট চলে গেছে।

শ্রাবণ মাস। অসংখ্য স্কুল-কলেজের গরমের ছুটি চলছে এখন, তাই ছেলেবেলার সকল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, দেশের পথেই। কেউ গবর্মেন্ট স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, কেউ নেপালে প্রাইভেট টিউটর, কেউ মফস্বল কলেজের সিনিয়র প্রফেসর অব ইকনমিক্স, কেউ লখনৌ ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রির লেকচারার, এলাহাবাদেও ম্যাথমেটিকসের প্রফেসর। শ্রীবিলাস নাগপুরের একটা কলেজের লেকচারার।

বললাম—'লেকচারার?'

—'বাতিটা একটু কমিয়ে দেবে শচীন!'

—'চোখে লাগে বুঝি?'

—'হ্যাঁ, তা ছাড়া এই হ্যারিকেনের ম্যাড়মেড়ে আলো দেখলে আমার একদম মন খারাপ হয়ে যায়।'

—'বাতিটা একেবারে নিবিয়ে দেব?'

—'তাই দাও, বরং একটা মোমবাতি কাছে রাখো, আছে মোম?'

—'বাবার কাছে একটা আছে বোধ করি; আমি নিয়ে আসছি।'

—'থাক, আনবার দরকার নেই এখন; জানালা দিয়ে বেশ জ্যোৎস্না আসছে। যদি মেঘ করে, অন্ধকার হয়, আলোর দরকার বোধ করি, তখন না হয় নিয়েসো।'

—'আচ্ছা।'

বাতিটা আমি নিবিয়ে ফেললাম।

—'না, না, এই টেবিলে রেখো না শচীন-কেরোসিনের গ্যাসে সমস্ত ঘর ভরে যাবে। শিগগির বাইরে রেখে এসো।'

লণ্ঠনটা বারান্দায় রেখে এলাম।

শ্রীবিলাস—'তোমার এই ডেকচেয়ারে বড্ড ছারপোকা হে!

—'তুমি এই বিছানায় বোসো না।'

—'চুরুটের ছাই আর দেশলায়ের কাঠিতে বিছানা যা ভরে রেখেছ।'

—'বেশ বিছানা গুটিয়ে দিচ্ছি, মাদুরে বসবে?'

—'আর চেয়ার নেই?'

—'ছারপোকা সব চেয়ারেই।'
—'এই ডেকচেয়ারটা রিমডেল করো।'
—'ওটাকে একেবারে বিদায় দেব ভাবছি।'
—'দু টাকার ক্যানভাস কিনে এনে একটা মিস্ত্রি ডেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠিক করতে পারবে।'
শ্রীবিলাস—'এসব হ্যারিকেনের দস্তুর অনেক দিন হয় আমি উঠিয়ে দিয়েছি।'
—'তোমার ওখানে ইলেকট্রিক আলো বুঝি?'
—'নাঃ, ড্রয়িংরুমে একটা বেবি পেট্রোম্যাক্স থাকে, ডাইনিং রুমে আর একটা; শোবার ঘরে গ্যাস; পড়বার ঘরে ফিলিন্টেস।'
—'আচ্ছা দেখব।'
—'বেশ নীল রঙের কিনতে পাওয়া যায় বাজারে।'
—'হ্যাঁ।'
—'আমাদের নাগপুরের কথা বলছি, এখানে কী পাওয়া যায় আমি জানি না, ক্যানভাস পাওয়া যায়?'
—'যেতে পারে—'
—'আর এই কাঠের বার্নিশ?'
—'রঙ লাগিয়ে নেওয়া যাবে।'
—'বার্নিশ নেই বুঝি?'
—'এখানকার বাজারে, কী জানি দেখি নি তো কোনোদিন।'
—'আমি সব সময়ই বার্নিশ লাগাই এ-সব জিনিসে।'
—'ছারপোকা কামড়াচ্ছে না তো আর?'
—'কামড়ালে নাচাব; উপায় কিছু আছে?'
—'একটা খবরের কাগজ পেতে বসতে পারো।'
—'ভেলভেট দিয়ে মুড়ে দিলেও ছারপোকা মানবে?'
—'তবুও খানিকটা রক্ষা পাওয়া যাবে; দেব খবরের কাগজের দু-খানা শিট?'
—'দাও।'
ভাল করে পেতে বসে শ্রীবিলাস—'প্রায় বছর দশেক পরে ক্যানভাসের ডেক চেয়ারে বসলাম।'
—'তোমার ওখানে বেতের আর্মচেয়ার বুঝি?'
—'প্রায় পনের-ষোলটা মেহগিনির চেয়ার রয়েছে; কুড়ি-পঁচিশটে সোফা, ইজি-চেয়ারগুলো বেতেরই প্রায় সব-এর চেয়ার নেই যে তা নয়-তবে তাতে বসা হয়ে ওঠে না আমার; বসলেও ছারপোকার অস্তিত্ব অনুভব করি না।'
—'বেশ ঝরঝরে তো তোমার আসবাবপত্র।'
—'আমার স্ত্রীর সতর্কতায়ই এই রকম; অরুন্ধতী।'
—'স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী বুঝি?'
—'আমি বদলে অরুণা করে নিয়েছি।'
—'বেশ।'
—'সুন্দর নয়? একেবারে ও. কে।'
—'নাগপুরে কাজ নিয়ে গেলে করে?'
—'সে তো প্রায় ছ-সাত বছর হয়ে গেল। ছুটিতে এদিকে আসতাম না।'
—'তোমাকে তো দেখি না অনেকদিন শ্রীবিলাস?'
—'দেশে আমার আসা পড়ে না; মাঝে-মাঝে কলকাতা অব্দি আসি।'
—'কলকাতায় তো তোমাকে আমি দেখি না।'
—'কী করে দেখবে? আমি ফুটপাথে হেঁটে বেড়াই না তো।'
—'কোথাও যাও না বুঝি?'
—'যখন বেরোই মোটরেই যাই—'
—'ট্যাক্সিতে?'
—'প্রাইভেট কার আছে।'

—'তোমার নিজের?'

—'হ্যাঁ।'

—'ফোর্ড কিনেছ বুঝি একটা?'

শ্রীবিলাস মাথা নেড়ে—'না, অস্টিন।'

—'কলকাতাতে কোথায় থাকো?'

—'ঠিক নেই; ব্রিস্টল হোটেলে মাঝে-মাঝে গিয়ে থাকি, মাঝে মাঝে বালিগঞ্জে শ্বশুর মশায়ের সংসারে।'

—'আচ্ছা তুমি কি বিলেত গিয়েছিলে শ্রীবিলাস?'

—'না, তো।'

—'এখানকার পি-এইচ-ডি ডিগ্রি নিয়েছিলে?'

শ্রীবিলাস মাথা নাড়ে—'না।'

—'নাগপুরে ছ-সাত বছর ধরে লেকচারার?'

শ্রীবিলাস বাধা দিয়ে-

—'লেকচারার বলা উচিত নয়; আমি সিনিয়ার গ্রেডে। আমাদের গ্রেড হচ্ছে ২৫০ টাকা থেকে ৭৫০ টাকা, তার পর এফিসিয়েন্সি বার, তার পর বার শ।'

—'বাঃ দিব্যি মাইনে তো।'

—'অনার্স পড়াই, এম-এ ক্লাসও পড়াই।'

—'ফার্স্ট ইয়ার পড়াও না?'

শ্রীবিলাস একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে—'তাও পড়াতে হয়। মোটের মাথায় আমার স্ট্যাটাস লেকচারের নয়, প্রফেসরের।'

—'হয়তো চেয়ার শিগগিরই পাবে?'

—'নাগপুর ইউনিভার্সিটির?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী লাভ তাতে?'

—'লাভ না হোক; সম্মান আছে—'

—'এখন কী কম মর্যাদা আমার? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মতন স্ট্যাটাস, ওখানে সকলেই আমাকে তেমনি খাতির করে।'

—'ডেপুটির মতন?'

শ্রীবিলাস আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মাথা নাড়ে।

বললাম—'একজন ডেপুটির আর কী গৌরব; শেষ পর্যন্ত দেখতে গেলে সামান্য জিনিশ; তার চেয়ে তুমি আছ ঢের ভাল; শিক্ষাদীক্ষা ইউনিভার্সিটির সম্পর্কে; বাঃ, বেশ জীবন তো তোমার!'

—'না, পড়াশোনা অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছি—'

—'ছেড়ে দিয়েছ, তা হলে এত সব ক্লাস পড়াও কী করে?'

—'হ্যাট কোট টাই ঝুলিয়ে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে ক্লাসে যাই, পিতৃপুরুষের কৃপায় লম্বা-চওড়া চেহারা ও ভাল গলায় চমকে দেবার মত কথা বলবার এলেম আছে; ছেলেরা ভাবে তাদের অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি ক্লাসে বসে-বসে সিগারেট ফুঁকলেই তারা খুশি।'

—'পড়াও না কিছু?'

—'হ্যাঁ, একটা এটাচি কেসে করে কয়েকখানা বই আর নোটের খাতা নিয়ে যাই; কোনো ক্লাসে গিয়ে গল্প করি শুধু; কোনো ক্লাসে মান্ধাতার আমলের লেখা নোট ডিকটেট করি; কোনো ক্লাসেই বা বই নেড়ে চেড়ে রিডিং পড়ে যাই-কিংবা হুমকি দিয়ে দু-চারটে বক্তৃতা দিয়ে আসি।'

—'ছেলেদের কাজ এগোয়?'

—'নিশ্চয়ই, আমাকে তারা বড় ভালোবাসে।'

আমার দিকে তাকিয়ে শ্রীবিলাস—'প্রফেসরের পড়ানোর ওপর নির্ভর করে পরীক্ষায় পাশ করব, একরম আহাম্মক ছেলে কোনো ইউনিভার্সিটিতেই দুটি-চারটির বেশি নেই। তারা হয় তো আমার কুৎসা কাটে; কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই আমার চেহারা, আমার বোলচাল, আমার কথাবার্তাকে ফার্স্ট ক্লাস কোচিং

সূচীপত্রে যান

মনে কবে আবিষ্ট হয়ে আছে।'

—'বিলেত যাবে?

—'কে, আমি? কী দবকার?'

একটা সিগাবেট ধরিয়ে নিয়ে শ্রীবিলাস, 'গেলেও ডিগ্রি আনতে যাব না অবিশ্যি, বেড়াতে যেতে পাবি; ব্রাসেলস, প্যাবিস, মন্টিকার্লো, সমস্ত ফ্রেঞ্চ আব ইংলিশ রিভিযেবা, লেক ডিষ্ট্রিক্ট, সুইজারল্যাণ্ড আলপস, ভেনিশ, ফ্লোবেন্স, বোম।'

—'দেশে ফিরবে ক-বছর পবে?'

—'এই বছর পাঁচেক।'

—'ভাই-বোন আত্মীয-স্বজন সবই তো এইখানে?

—'এদেব সঙ্গে আমাব খাপ খায না।'

—'খাওযা-দাওযাব সুবিধে হয না?'

—'শুধু তাই নয; এদের জীবন-ধাবণ মতামত যুক্তি বিচাব সমস্তই কেমন যেন আণ্ডাবডগিশ, বুঝলে শচীন, একেবাবে নিবেট কোম্পানি। এমন ইনফিরিযরিটি কমপ্লেক্স থেকে সাফাব কবছে এবা।

—'ছুটি তোমাব কত দিন?'

—'সাড়ে তিন মাস-দু-মাসতো নাগপুবেই কাটিযে এলাম।'

—'ওঃ, ছুটির সমযটা ইউনিভার্সিটিতে বসে নিবিবিলি পড়াশোনা কবলে বুঝি? কোনো থিসিস দেবে?'

—'ক্ষেপেছ বুঝি? ব্রিজ খেললাম, ক্লাব, ডিনাব, টেনিস, বন্ধুবান্ধব মাঝে-মাঝে দু-চাবটা সেক্স নভেল। তার পর আমাব স্ত্রীটি। কযেকটি পবকীযা হল্লায হুল্লোড়ে দুটো মাস যেন এক নিশ্বাসে কেটে গেল। কুলকার্নী বলে একজন ব্যাবিস্টাবেব স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন খুব জমে উঠেছে, আমার বৈধ পত্নী আমাকে দেশেব কথা মনে কবিযে দিলেন। এলাম ভাই তাই তোমাদেব সঙ্গে দেখা কবতে।'

একটু চুপ কবে থেকে শ্রীবিলাস—'কই, সিগাবেট দেওযা হল না তো তোমাকে।'

কেস বের কবে নাক কুঁচকে হাসতে-হাসতে—'তুমি খাও তো? না?'

—'সিগাবেট? দাও তো।'

—'বেশ, নাও তা হলে; একটা নিলে শুধু? আচ্ছা কেস বন্ধ করি এখন?'

—'কবো।'

—'কতকগুলো টিনেব মাংস এনেছিলাম; এবা কেউ খেল না, আমাকেও খেতে দিল না, পড়ে আছে; নিযে আসবে?'

—'আমি? কার জন্য আনব?'

—'তুমি নিজে খেতে পাবো; তোমাব বউ অবিশ্যি খাবে না?'

মাথা নেড়ে—'এই বর্ষায কোনো জিনিশই পেটে সইছে না শ্রীবিলাস; বাজারেব একটা সিঙ্গাড়া খেলেই অম্বল হয; টিনেব মাংস খাব কী কবে।'

—'মিল্ক অফ মেগনেসিযা খেযে দেখতে পাবো।'

—'দেখা যাবে।'

—'এখানে থিযেটাব নেই?'

—'না। একটা সিনেমা হাউস আছে।'

—'দেখেছি: সেই নিবঞ্জন পাগলাটা চালাচ্ছে। একদিন আমাকে আর গিন্নিকে সেধে নিযে বক্স-এব পাশ দিযে এল, সন্ধ্যাব সময নিজে এসে নিযে গেল, গেলাম, পাঁচ মিনিট বাযস্কোপ দেখিযেই বিল ছিঁড়ে লোপাট, অবিশ্য ছ-মিনিটেব মধ্যে মেবামত কবে নিল আবাবণ, কিন্তু আমবা রইলাম না আর-ইডিযট!'

শ্রীবিলাস জানলাব দিকে তাকিযে-'এখানে কোনো ক্লাব টলাব নেই?'

—'কী রকম ক্লাব চাও শ্রীবিলাস?'

—'দু-একটা নমুনা বলো তো।'

—'কংগ্রেসেব একটা ক্লাব আছে।'

—'ঠাট্টা? ওসব কংগ্রেসের ক্লাবের খবর শুনতে চাই না আমি।'

—'শ্রীবিলাস, কী এক কোম্পানি, কোথায, তা বলতে পারি না। তবে তাদের একটা ক্লাব আছে,

সূচীপত্রে যান

মাস ছয়েক আগে জে. এম. সেনগুপ্ত এসেছিলেন।'

—'বেশ করেছিলেন।'

—'এই ক্লাবেই তাঁর আড্ডা ছিল।'

—'চুলোয় যাক, আর কী রকম ক্লাব আছে?'

—'সাহিত্য পরিষদের একটা শাখা আছে।'

—'অবনক্সাস! আর?'

—'আর-একটা আছে কয়েকজন সাহিত্যিক মিলে।'

—'সাহিত্যিক তুমি কাদের বল?'

—'অবিশ্যি বিশেষ কিছু সৃষ্ট করে নি এঁরা; তবু দু-তিন খানা বই লিখেছে।'

—'কী বই?'

—'কবিতার; একজনে দু-খানা উপন্যাসও লিখেছে।'

—'তুমি মনে করো এই সব কবিতা [.......] এর মতন?'

—'না, তত উচ্চদরের হতে পারে নি।'

—'হিলডা ডুলিটল কিংবা সিউওয়েল যে-রকম কবিতা লিখেছে তা এরা কল্পনাও করতে পারে?'

—'হয় তো নামও শোনে নি—'

—'আর উপন্যাস? জয়েসের ইউলিসিস-এর মতন হবে?'

—'দূর!'

—'কিংবা জয়েসের কোনো একখানা উপন্যাসের মতন?'

—'না, না, তা কী করে হয়।'

—'শ্রীবিলাস ভুরু কুঁচকে হাসতে-হাসতে—'রবিবাবু যখন নাগপুরে গিয়েছিলেন—'

—'[ ] তিনি নাগপুরেও গিয়েছিলেন নাকি?'

—'তখনও আমি তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাই নি।'

—'কেন?'

—'অরুণা আমার পিঠের ঘামাচি মেরে দিচ্ছিল; এই জিনিশটাকেই বেশি মূল্যবান মনে হল তখন।'

—'কুলকার্নীর স্ত্রীটি তখনও বুঝি তোমার জীবনে আসে নি শ্রীবিলাস?'

—'তারপর যখন টেনিস খেলবার জন্য নামলাম, শুনলাম রবিবাবুর বক্তৃতা তখনও শুরু হয় নি। আর রবিবাবুর বক্তৃতা! শরীর ঠিক রাখতে হবে তো? টেনিস গ্রাউণ্ডে চলে গেলাম।'

আমার হাতের সিগারেটটা জ্বালালাম।

শ্রীবিলাস—'তবুও রবিবাবু সাহিত্যিক, কিন্তু তুমি যে জীবকেটির কথা বলছ এরা হয় সোস্যালিস্ট, না হয় অ্যানার্কিস্ট।'

—'কেন, এ রকম কথা তোমার মনে হয় কেন শ্রীবিলাস?'

—'নইলে মফস্বলে থেকে কেউ কবিতা ছাপায়, উপন্যাস লেখে?'

—'কেন টমাস হার্ডি তো লিখেছিলেন।'

—'কিন্তু টমাস হার্ডি মফস্বলে কোনো ক্লাব তৈরি করতে যান নি।'

—'ক্লাব সংঘ সমিতি এ-সব আধুনিক পৃথিবীর লক্ষণ।'

—'যাক, এসব বাছুরের সমিতিতে গিয়ে আমার কোনো লাভ নেই! এদের আদর্শ হচ্ছে মম কিংবা শরৎ চাটুজ্যে। ক্যাসানোভার নামও শোনে নি-ইডিয়টস!'

আমার দিকে তাকিয়ে—'এখানে ঘোড়দৌড় হয়?'

—'না।'

—'সময়টা কলকাতায় কাটালেই পারতাম।'

—'বেশ, মনগুনে রেস বলতে তো কলকাতায়।'

—'খবরের কাগজে দেখি চমৎকার অ্যাকসেপটান্স সব। আমি যে-ঘোড়াটা ধরেছিলাম কাল, গিন্নিকেও বলেছি, আজকের কাগজে দেখলাম সেই ঘোড়া যারা ধরেছে দশ টাকার টোটে নশ পচাত্তর টাকা পেয়েছে।'

—'বাঃ বেশ তো।'

—'চমৎকার সারপ্রাইজ; এবার ইচ্ছে ছিল ছুটিতে পুনায যাই।'
—'পুনায তো খুব রেস খেলা হয?'
—'গিন্নিকে কাল রাতেও বলেছিলাম এবাব এথিকস একটা কিছু করবে।'
—'এথিকস?'
—'মার্টিমারেব এথিকস নয়-স্যাণ্ডহার্ষ্ট প্লেটেব এথিকস-একটা ঘোড়া-একটা বোমা।'
—'ঘোড়ার নামও এথিকস রাখে নাকি?'
—'চাযনিজ সেইন্ট রাখে, নাইটিংগেল রাখে, মাই মিসটেক, বেযাব ওযাইন, লিসিডাস।'
শ্রীবিলাস অনেকখানি ধোঁযা ছেড়ে—'স্যাণ্ডহার্ষ্টেব খেলায হাজার-হাজাব পান্টারেব দফা ঠাণ্ডা হযেছে কাল।'
—'পান্টাব কাকে বলে?'
জবাব না দিযে শ্রীবিলাস—'আবু হোসেনেব অস্ট্রেলিযান ওযেলার্ জিতল শেষে! অরুণাকে আমি দু-চারবার বলেছিলাম এথিকস কিন্তু আপসেট করতে পাববে।'
—'এখানে বসে বললে আব কী হবে? পুনাব মাঠে গিযে যদি এথিকসকে ব্যাক করতে শ্রীবিলাস।'
—'আজ না হয় কাল কবব; বুকমেকারদেব ভাবী ফুর্তি হযেছে কাল।'
—'কেন?'
—'দু-দুটো ফেভাবিটকে কড়কে দিযেছে এথিকস,' নীববে সিগাবেট টানতে লাগল শ্রীবিলাস।'
আমিও কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে—'এথিকস এই শব্দটা বললে দর্শন বিজ্ঞান মানুষেব বোধ বিচাব অনুশীলন সম্পর্কে কোনো কথাই মনে আসে না তোমাব এখন আব?'
শ্রীবিলাস মাথা নেড়ে—'না।'
—'একটা ঘোড়াকে মনে হয শুধু?'
—'হ্যাঁ।'
—'এ ঘোড়াটাকে দেখেছিলে তুমি?'
শ্রীবিলাস উত্তব দিলনা—
অবাক হযে ভাবছিলাম চাইনিজ সেইন্ট বলতে কনফুসিযাসের কথা মনে হয কি ওব? কিংবা লিসিডাস বলতে মিলটনের কবিতাব কথা?'
শ্রীবিলাস—'কলকাতায টার্ফ ক্লাবেব মেম্বার হযেছি আমি।'
—'নাগপুরে ঘোড়াদৌড় হয কেমন?'
—'বিশেষ না। সেই একটা অভাব রযে গেছে। তুমি ডার্বিব টিকেট কিনেছিলে?'
—'না।'
—'ট্রান্সন্যাশন্যাল আইরিশ সুইপেব টিকিট কিনছ না? আমি তো ববাবব কিনে আসছি, এ গুলো আমাব কমিটমেন্ট-পার্সেন্টেজ বা ইনকাম ট্যাক্স-এর মত। কিংবা লাইফ ইনসিওবেন্সেব প্রিমিযামেব মত। ভাগ্যবিধাতা, তাব মানে দুর্ভাগ্যবিধাতাকে যেমন মাথা পেতে নিতে হয, এ গুলোকেও তেমনি নিযেছি-হয তো একদিন দেখব দু-তিন লাখ পেযে গেছি।'
—'হ্যাঁ, ও দেশের অনেক জুতাবুরুশ মেথব ধাঙবড়াও পায; তুমি পাবে না কেন?'
—'এখানে অফিসারদের ক্লাব নেই?'
—'আছে, কেবানিদের একটা আছে।'
—'কী বকম কেরানি?'
—'গবমেন্টেব। পঁযত্রিশ থেকে একশ পঞ্চাশ অবদি।'
—'সেখানে তো যাওযা চলে না।'
—'তবে ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট জাজ যে-ক্লাবে যান, সেখানে যাও না।'
—'যেতে হবে একদিন; ব্রিজ খেলা হয বুঝি? স্টেক থাকে?'
—'গিযে দেখলেই পারো।'
—'তুমি এখানে চুপচাপ বসে আছ, একটা ক্লাবেব স্টুযার্ডও তো হলে পারতে।'
—'স্টুযার্ড অ্যাংলো ইণ্ডিযান।'
—'বাঙালিকে করে না?'

সূচীপত্রে যান

—'আমার মত বাঙালিকে না।'

—'বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।'

—'একটা কম্বল দেই?'

—'আমার ওভারকোটটা, এই পাশের কোঠায় তোমার বাবার ঘর বুঝি- সেখানে ফেলে এসেছি। নিয়েস্যো তো।'

আনলাম।

ওভারকোট আমার হাতের থেকে জড়িয়ে নিয়ে শ্রীবিলাস—'ঠান্ডা লেগে আমার সে-বার নিমোনিয়া হয়েছিল।'

—'নাগপুরে?'

—'হ্যাঁ, তারপর কানে কেমন পুঁজ জমল; নাকে-কানে কেমন সুড়-সুড় করে মাঝে-মাঝে ব্যথাও। আপাতত সেটা সেরে গেছে; কিন্তু চুলকুনিটা যায় না।'

—'ওঃ, নাক-কান এমনিই চুলকায়-ময়লা জমলে।'

—'না হে না, কানে কম শুনতে আরম্ভ করেছি।'

—'ডাক্তার দেখিয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ, নাগপুরে আমার এক ফ্রেণ্ড আছে-খাম্বারকার। লণ্ডনের এম-আর-সি-পি, ঢের দেখল-টেখল তো, অনেক অষুধ-ফসুদ দিল, কলকাতায় এসেও স্পেশালিস্টদের দেখালাম, এই তো এ-বারও হাজারটি টাকা খসল, কিন্তু ডায়গোনোসিস কেউ করতে পারে না। অবশেষে এখন বললে যে এমনিই সেরে যাবে, আমি একবার বিলেতে গিয়ে দেখিয়ে আসব।'

—'নাক,-কান সুড়-সুড় করে, এই তো শুধু?'

—'নাঃ, লণ্ডনের ডাক্তারদের দেখিয়ে আসা ভাল।'

—'তোমার স্ত্রীরও বুঝি এই মত?'

—'হ্যাঁ, গিন্নি আবার আমাকে একা ছেড়ে দিতে চান না, নিজেও সঙ্গে যাবেন।'

—'তোমার স্ত্রীকে তো আমি দেখলাম না শ্রীবিলাস।'

—'একদিনও দেখো নি?'

—'না।'

—'বেশ লম্বা চওড়া মোটা। মোটা বলে কোনো লজ্জা নেই তার; আমিও ডিসকারেজ করি না, দিনরাত কফি-চকোলেট-দুধ-ওভালটিন খাচ্ছে, এক-একটা টিন একদিনেই ফুরিয়ে যায়-ওমলেট, লুচি, কাটলেট নিজেই ভাজে নিজেই খায়, নানা রকম ফ্যাট খায়। টিনের মাংস খায়, কলা যা খেতে পারে তা তুমি যদি দেখতে! ফাউল রোস্ট দু-বেলা তার জন্য দুটো চাই, দুটো আস্ত। তা ছাড়া মাটন আর বেকনের কাটলেট তো আছেই। খাচ্ছে, হজম করছে, মোটা হচ্ছে, হোক না, আমি ডিসকারেজ করি না, আই নেভার ড্যাশ এন ওল্ড...'

—'তুমিও তো কম মোটা হও নি?'

—'ছ-বছর আগে আমাকে যারা দেখেছিল তারা তো চিনতেই পারে না'।

—'স্ত্রীটি তাহলে তোমার বেশ।'

—'প্লাম্প অ্যাণ্ড প্লেজান্ট।'

—'হ্যাঁ বেশ স্থুল!'

—'স্থুল মানে কী? কোর্স? নারীর পক্ষে কোর্স হওয়া তো চমৎকার। শরীরের এক-একটা জায়গা পিন কুশনের মত। চামড়া পালিশ রিচ? রক্ত-মাংসের কোথাও কোনো নোংরামি নেই—হাত—পায়ের বগলের নীচের লোমগুলো ভিট দিয়ে সাফ করে ফেলেছে, সমস্ত গায়ে ক্যালিফোর্নিয়ান প্যাপির গন্ধ, সমস্ত শরীরটা যেন মিশরের একটা মাঠের মত-কোনো ফ্যারাও পাট্টা নিয়েছিল, উর্বর শস্য সেখানে জন্মাতে পারে, কিন্তু'

সিগারেটটা মুখে তুলে নিল শ্রীবিলাস।

—'তোমার ছেলেপিলে নেই?'

—'না, কমপ্যাসনেট ম্যারেজ। কন্টাসেপশনের পদ্ধতি আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লাগে।'

—'গিন্নি এখানে এসেছেন—'

—'হ্যাঁ, এখানে এলে তার বড্ড বিপদ–একটা তো ভযাবহ।'

—'কী রকম?'

—'সাইকেল নিয়ে এসেছেন; কিন্তু এ যেমন আকাট দেশ–চাঁড়াল চোযাড় সব চাবদিকে–মেযেদেব সাইকেল চড়বার জো নেই।'

—'পলাশগঞ্জের দিকে গিয়ে চড়লে পারে।'

—'নাঃ, এ ঘেন্না ধরে গেছে!'

—'আর কটা দিন–বা; এব পরে তো নাগপুরে চলে যাবে।'

—'হ্যাঁ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচব—'

—'পনর দিনেব জন্য এত লটবহব এখানে আনলে, মোটব অব্দি?'

—'মোটরটাই তো কাজে লাগল শুধু; সাইকেল, ক্যামেরা, টেনিসের সবঞ্জাম সমস্ত পচছে বসে–বসে।'

একটা সিগারেট বাব করে শ্রীবিলাস—'নাগপুরে প্রফেসারদের সঙ্গে মিশে চমৎকাব টেনিস খেলে অরুণা।'

—'বাঃ, টেনিসও খেলে বুঝি?'

—'মিক্সড ডাবলসে ওকে নেবার জন্য লোফালুফি।'

—'তা তোমাব সঙ্গেই ভিড়ে যায় বুঝি শেষ পর্যন্ত মিকসড ডাবলসে?'

—'আই ডোন্ট কেয়ার। নাগপুবে কেউ–বা ওকে বেটি নাটহল বলে, কেউ বা উইলস মুডি।'

—'আর তোমাকে বুঝি বোবোট্রা বলে শ্রীবিলাস?'

ধীরে ধীরে মা এসে–'শ্রীবিলাস এসেছে বুঝি? থাক থাক, প্রণাম কবতে হবে না, বসো।'

—'আপনিই–বা দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?'

—'তাই তো, কিছু ক্ষণ ধবে যেন চেনা–চেনা গলা শুনছিলাম, ভাবলাম কে এল? তা তুমি শ্রীবিলাস! বাঃ, দিব্যি শরীব সেবেছে তো তোমাব; কোথায আছ এখন?'

—'নাগপুবে—'

—'নাগপুবে? সে তো অনেক দূব!'

—'[ ] সেই আমাব ঘববাড়ি এখন; আপনাদেব এ সব দেশকেই বিদেশ মনে হয।'

—'অনেক দিন পবে তোমাকে দেখলাম শ্রীবিলাস।'

—'আর হয তো জীবনে দেখবেন না।'

—'কেন শ্রীবিলাস?'

—'এমন হতচ্ছাড়া জাযগায কেউ আসে; গিন্নি আমাব সাইকেল নিয়ে এসেছে; এখানকাব এসব [ ] লোকদের জ্বালায চড়বাব জো নেই।'

—'তোমার বৌও এসেছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'দেখি নি তো তাকে কোনো দিন।'

—'আমাব চেয়ে মাথায চাব ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে, একটু বেধড়ক মোটা, ওজন সাড়ে তিনশ পাউণ্ড প্রায়, গায়ের চামড়া কালই ছিল, পিযার্স্য ঘসে–ঘসে এখন চাইনিজ বেশমেব মত হযেছে–বাদামিও না, বেগুনিও না, তবে বেশমের মতই নরম, তেমনি পালিশ।'

—'একদিন গিয়ে দেখে আসব।'

—'তা যেতে পাবেন; কিন্তু প্রণাম না কবলে অভিমান কবে ফিবে আসবেন না, হয তো প্রণাম করবে না আপনাকে; হয় তো চিনতেই চাইবে না।

মা একটু হেসে—'অসাক্ষাতে ঢেব নিন্দা করছ তো তাব।'

—'নিন্দে নয়, এগুলো তার গুণ।'

—'যাক্, একদিন গিয়ে আশীর্বাদ করে আসব।'

—'আশীর্বাদ তো করবেন; মাথায হাত দেবেন কী কবে শুনি?'

—'কেন?'

—'ঘাড় টান করে দাঁড়ালে নাগাল পাবেন না, আপনি তো কোমবের নীচে পড়ে থাকবেন।' মা চুপ

করে রইলেন।

—'আপনাকে দেখতে পেলেই সে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে।'

—'কেন?'

—'ধান-দুর্বা নিয়ে যাবেন তো?'

—'একটা কিছু নিয়েই যাব।'

—'মনসার কাছে ধুনোর গন্ধ যা আপনাদের, আমার তার কাছে ঠিক তেমনি।'

—'শুনলাম সাইকেলে চড়তে পারেন।'

—'টেনিসও খেলতে পারেন বটে।'

—'নাচ শিখিয়েছ?'

—'বাসনা ধরে উদয়শঙ্করকে দিয়ে শেখাতে; কিন্তু আমার মত মানুষের সাধ্যি কি তা? নইলে পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করি? ছেলে নেই পিলে নেই, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তো, যাই বলুন মা, ভালোবাসার শেষ মাপকাঠি টাকা নয় কি?'

—'শচীনের স্ত্রীকে নিয়ে আসি।'

—'কেন?'

—'তুমি দেখবে।'

—'মাপ করবেন মা।'

—'কেন শ্রীবিলাস? দেখবে না?'

—'আমার স্ত্রীর নিষেধ আছে—'

—'কী রকম?'

—'নাগপুরের কুলকার্নী বলে একজন ব্যারিস্টারের স্ত্রীর সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলাম।'

আমি—'থাক শ্রীবিলাস।'

শ্রীবিলাস—'ঘনিষ্ঠতা যখন পাকাপাকি হল, আমার গিন্নি বললেন অবৈধ প্রণয় করছি, মিথ্যা বলে নি, সেই থেকে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করে নিতে হয়েছে পরের স্ত্রীর মুখও দেখব না আর কোনোদিন।'

অন্ধকারের মধ্যে মাকে আর দেখা গেল না।

শ্রীবিলাস ওয়াটার-প্রুফ আঁটতে-আঁটতে বললে—'বাস্তবিক, এ আমার খুব আন্তরিক ক্ষোভ শচীন। নিজের ঘর ভাঙলে মানুষের কেমন লাগে! তবে, সে পরের ঘর ভাঙতে যায় কেন ওর স্ত্রীর পেটে যে-সন্তান এসেছে, তার মুখের দিকেই-বা বেচারা কুলকার্নী কী করে তাকাবে? হয় তো ভ্রূণেই নষ্ট করে ফেলবে! না হয় আঁতুড়ে গলা টিপে মেরে ফেলবে! কী বলো? পৃথিবীটা বাস্তবিকই বড় ভয়াবহ। জীবনের বিধাতা একজন নির্বোধ চাষারের চেয়েও অক্ষম—অমানুষ।'

চলে গেল।

পরদিন দুপুরবেলা অঞ্জলি—'কাল তোমার কাছে কে এসেছিল?'

—'কাল সন্ধ্যার সময়? শ্রীবিলাস।'

—'কই, একে তো আর-কোনোদিন দেখি নি।'

—'এই পাঁচ বছর পরে দেশে ফিরেছে।'

—'কেন, এতদিন কোথায় ছিল?'

—'নাগপুরে কাজ করে।'

—'কী করে?'

—'প্রফেসার।'

—'প্রফেসার? এ-রকম হ্যাট, টাই, ওভারকোট কি প্রফেসাররা পরে?'

—'পরে না? কটা প্রফেসার দেখেছ তুমি অঞ্জলি?'

—'কেন, আমি তো বরাবর জানি তারা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর গায়ে দিয়ে ক্লাসে যান

—'নাঃ, শ্রীবিলাস খুব উঁচুদরের প্রফেসার।'

—'মাইনে কত?'

সূচীপত্রে যান

—'এখন পাঁচশ পঞ্চাশ পাচ্ছে।'

—'তবে তো বেশ।'

—'বেশ বই কি-বললে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মত সম্মান পায়, আমি বললাম একটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আর কতদূর কী মর্যাদা, তার চেয়ে তুমি ঢের ভাল আছ শ্রীবিলাস—'শিক্ষাদীক্ষা ইউনিভার্সিটি কালচাবের সম্পর্কে। যে কোনো ইনস্টিটিউশনে তোমার জীবন প্রণালীকে ঈর্ষা কবতে পাববে।'

—'এর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কোথায়?'

—'আমরা একসঙ্গে যে পড়েছিলাম অঞ্জলি।'

—'কলেজে?'

—'ইস্কুলেও, সে আজ প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেব কথা। এখন যেখানে টেলিগ্রাফ অফিস পোস্ট অপিসেব দালান কোঠা, সেখানে ভারি সুন্দর একটা খোলা মাঠ ছিল-আর তারই এক কিনাবে এক সারি খড়ের ঘর। সেই ঘবগুলো কবে ভেঙে গেছে সব! সেই আমাদেব ইস্কুল ছিল। সে সব কথা মনে হলে চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।'

—'কেন?'

—'এই সেদিন চন্দ্রকান্ত বলেছিল, এক নিশ্বাসে কুড়িটা বছর কেটে গেল যেন; আবার একটা যদি নিশ্বাস ফেলি-তাহলে সেই বিশ বছব আগেব পৃথিবীতে চলে যাওয়া যাবে? এই বলছিল সে। চোখ বুঁজে আমিও অনেক সময় এই কথাই ভাবি। হৃদযেব এই অনুসন্ধান নিয়েই জীবনেব যা একটু আনন্দ জমে ওঠে-জমে ওঠে যা একটু ঐকান্তিক বেদনা।

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'এক সাথে ইস্কুলে পড়েছিলে, তিনি এত বড় হযে গেলেন?'

—'কে শ্রীবিলাস? হ্যাঁ খুব পয়মন্ত ছেলে।'

—'শুধু পরের দোষ দিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না?'

—'আমারও শ্রীবিলাসের মত হতে হবে?'

—'ইচ্ছা করলেই কি আব হতে পারবে? পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা মাইনে পান; এতগুলো টাকা একসঙ্গে কোনোদিন চোখেও দেখেছ?'

—'না-তা দেখি নি।'

—'উনি তো একমাসেই করেন, কিন্তু এক বছব বসেও এত কটি টাকা অর্জন কববাব ক্ষমতা তোমার হবে কোনোদিন?'

—'দেখি, হযতো ভবিষ্যতে.......।'

—'থাক্, চুপ করো, যা পাববে না, মিছেমিছি সে-কথা বলে মন ফেনাবাব মিথ্যা চেষ্টা করো কেন? এতে নিজেব হৃদয়ও আত্মগ্লানিতে ভরে উঠবে তোমাব। অঞ্জলি চেযাবে বসবে ভাবছিল, কিন্তু চেযাবেব হাতলের ওপর বসে রইল। বসলও না ঠিক, কেমন আন্তরিকভাবে ঠেশ দিয়ে রইল।

—'উনি কি বিলেত গিয়েছিলেন?'

—'না।'

—'তোমার মতন এম-এ পাশ শুধু?'

—'হ্যাঁ।'

—'তবে ওর হল, তোমার হল না কেন?'

—'শ্রীবিলাস এম-এ-তে ফার্স্টক্লাস পেয়েছিল।'

—'তুমি ফার্স্টক্লাস পেলে না কেন?'

—'আমি তো এম-এ দেবই না ভেবেছিলাম, বন্ধু-বান্ধবেরা ধরে বেঁধে—'

—'এ-রকম রুচিবিকার হল কেন তোমার? ইস, নিজের জীবনটাকে এ-রকম করে নষ্ট করে দিতে হয়।'

—'কয়েক নম্বরের জন্য ফার্স্টক্লাস পাই নি। বোধ হয় দশ কি বার—'

—'ছি, মোটে! এই দশটা নম্বরের জন্য তোমাতে আর ওতে এতখানি তফাৎ?'

—'কিন্তু ফার্স্টক্লাস পেলেও শ্রীবিলাসের মত সুস্বাস্থ্য আমার কোনো-দিনই হত না।'

—'কি করে বলো তুমি তা?'

—'শ্রীবিলাসের জ্বলজ্যান্ত চেহারা, সে আত্মতৃপ্তিতে কথা বলে, জীবনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তার;

সূচীপত্রে যান

আকাঙক্ষা আমাদের সকলের চেয়ে ঢের বেশি, কায়ক্লেশে যারা পথে-পথে ঘুরছে তাদের মাড়িয়ে চলতে শ্রীবিলাস খুব ভালবাসে, জীবনটাকে যাবা মাৎলাব হাটে কিনে চেতলার হাটে চড়িয়ে বিকোতে পারে দিনে দু'শ বার করে, তাদের সঙ্গে শ্রীবিলাসেব খুব বন্ধুত্ব—বরাবরই এই বকম।'

—'এ-বকম মানুষ না হলে বেঁচে থেকে লাভই-বা কি! নিজের ভালই যদি মানুষ না বুঝল! একটা ছাগলও গেরস্তের ঘবে ঢুকে ধান-যব খেযে যাবাব বুদ্ধি রাখে। কিন্তু এক-একজন মানুষ হয় ছাগলেব চেযেও অধম!'

একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে জানালার ভিতর দিযে তাকিয়ে বইল অঞ্জলি। খানিকক্ষণ পরে আমাব দিকে ফিরে—'দশটা নম্বর কম কী কবে পেলেই বা- শুনি?'

—'চসাবেব পেপার খাবাপ হয়ে গিয়েছিল।'

—'এ-বকম হয কেন? শ্রীবিলাসেব তো হয নি।'

—'সে তো বার বছর আগের কথা।'

—'হলই-বা! এ বার বছব সে পাপেব প্রাযশ্চিত্ত তো করলে, কিন্তু ভেবেছ ফুবিযে গেল! তা ফুরোয না, কিন্তু সঙ্গে আব-একজন মানুষকে জোযাল বইতে ডাকলে কোনো হিশেবে, আমি অবাক হযে তাই ভাবছি—'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু তুমি তো বি-এ পড়ছ। পাশ কবে।'

—'পড়বার জন্যই কি তোমাব এখানে এসেছিলাম?'

—'কিন্তু পড়বাব জন্য তোমাব আগ্রহেব তো কোনো অভাব নেই।'

—'কুকুবেব সাথে এঁটোচাটা যে ভিখিবির আব-কোনো উপায নেই জেলে যাবাব জন্যও তাব আমাব চেযে একটুও কম আগ্রহ? জেলে তবুও তাব খানিকটা নিশ্চিন্ততা তৃপ্তি।'

—'মশাবিকে তুমি যদি জেলেব মত মনে করো।'

বাধা দিযে অঞ্জলি—'সংসাবেব লোক মনে কবে ভালবেসে আমি তোমাব কাছে এসেছি'—মাথানেড়ে একটু হেসে—'যা খুশি ভাবুক গিযে, সত্য যা তা তো আমবা জানি। মনে কবো বিযে করেছি, বৈধ পত্নী হযেছি, সমস্ত বেদনাব অন্তরালে প্রেম তো বযেছে হৃদযে।'

—'কেই বা এ সব কথা মনে কবতে যায?'

—'প্রেম যদি থাকত তাহলে অনেক অভাব-বেদনাকে অন্যথা কবতে পাবতাম বটে, কিন্তু সংসাবেব লোকেব চোখ তো আব বিধাতাব মত অন্তর্যামী নয, আমার এই নির্বিবাদ কাযক্লেশকে তাবা মনে কবে ভালবাসার ঐকান্তিকতা, আমার এই সহিষ্ণুতাকে তাবা প্রেম বলে ভুল কবে।'

একটু হেসে—'তোমাব হৃদযে প্রেমেব ক্ষমতা আছে একথা যদি তারা ভাবে, তাহলে তো তোমাব গৌরব নষ্ট হয না।'

—'কিন্তু তাবা যা ভাবে তা ভুল।'

—'গৌরব ববং বাড়ে।'

—'কিন্তু তারা মিথ্যা কথা ভাবে।'

—'কেন, প্রেমের শক্তি তোমাব নেই?'

ধীবে-ধীবে আঁচল দিযে মুখ মুছে নিযে একটু চুপ করে থেকে অঞ্জলি-'হৃদযে প্রেমেব ক্ষমতা সব মেযেদেরই আছে, কিন্তু আমাদেব মত কযেকটি দুর্ভাগা নাবীই পথ খুঁজে পায না,' এক-আধ মিনিট চুপ থেকে,'কেনই-বা এমন জিজ্ঞেস কবো তুমি? তোমাব চেযে কেউ কি বেশি ভাল কবে জানে এ চারটা বছর সংসাবের পথে কী বকম অন্ধের মত ঘুবছি আমি।'

একটু চুপ থেকে হেসে—'আচ্ছা, আমি যদি বাব নম্বব বেশি পেতাম!' অঞ্জলি পাযের নখ দিযে মাটি খুঁড়ছিল, কোনো জবাব মিলল না।

—'ধরো শ্রীবিলাসেব মত ডিগ্রি নিযে শ্রীবিলাসেব মত চাকবি করতাম যদি?'

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে খানিক্ষণ চুপ কবে বইলাম।

অঞ্জলি ধীরে-ধীবে মুখ তুলে—'তা তো হয নি; তোমার জীবনে সে-সব হবার নয কোনদিন।'

—'কিন্তু হতেও তো পাবত; যদি হত?'

—'আমাবও এমন ভবিতব্যতা যে যেখানে জীবনের দুঃখ ও আক্ষেপের শূন্যতা শুধু সেখানে আঁজলা হাতে কবে এসে মাথা গুঁজবাব জন্য হাজিব হলাম।'

জানালার দিকে তাকিয়ে বট অশ্বত্থের জঙ্গলের ওপব অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চালিয়ে নিয়ে অঞ্জলি—'কেন, পথ কি আব ছিল না?'

আমি—'হয়তো ভবিষ্যতে শ্রীবিলাসের মতন আমাবও কপাল খুলতে পাবে।'

—'থাক্।'

—'খুলে যেতে পারে; বলতে পারা যায় না ভবিষ্যতে কার কখন কী হয—' আশা-হতাশায মেশানো এক নিশ্বাস ফেললে নারীটি।

বললে—'ছি, আর দশটা নম্বর যদি বেশি পেতে!'

চুপ করে ছিলাম।

—'শ্রীবিলাসেব মতন চাকরিও কি না পেতে পারতে তাহলে?'

—'হ্যাঁ, সৌভাগ্যের জোবে পেতেও পারতাম হযতো!'

—'নিজেকে যতই অবিশ্বাস কর তুমি-আমি কি জানি না তোমার শক্তি রযেছে?'

—'তোমাব মুখে এ-রকম কথা শুনলে বড় আশ্বাস পাই অঞ্জলি'—কেমন ছেঁদো কথাব মত শোনালো আমার মুখের কথা। প্রাণের থেকে তো বলি নি। কিন্তু নারীটি অভিনয কবল না।

বললে—'তাহলে আমাদের সংসাব কত সুখেব হত বলো তো, দেখি?'

—'তা তো ঠিকই।'

—'জীবনকে অন্ধ বলে অশ্রদ্ধা কববার কোনো প্রযোজনও হত কি?

—'না, তা কী কবে হত?'

ধীরে-ধীরে আমার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে অঞ্জলি—'এই যে অনেক সময তোমাকে ব্যথা দিয়ে কথা বলি, সেই সবেরও কোনো দবকার হত না।'

একটা নিশ্বাস ফেলে সে বললে—'নাবীত্ব প্রেম (জীবনেব) সমস্ত (গভীব) জিনিশই যেন টাকাব বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলতে পাবা যায় এমনই একটা দীনতা থাকে মনেব ভেতব; আমাব মনে হয নিঃসম্বল সংসারের প্রত্যেক বধুব জীবনেই এরকম জীর্ণতা থেকে-থেকে উঁকি দিযে যায। যায না?' এই রকম বর্ণবিচিত্র পুতুলেব মত কথা বলে যেতে লাগল সে। কিন্তু একটা কথাও কলেব মত নয, নারীব সার্বভৌম আকাঙক্ষা ও বেদনাব ঐকান্তিক উক্তি।

প্রেম তাব খাদ্য নয, ঘৃণাও নয; খাদ্য তাব সুব্যবস্থিত সুন্দব সংসাব; এই সোনাব সিঁড়িতে সে অনন্ত কাল হাঁটতে পাবে-একটি অজ্ঞান নির্বোধ পুরুষকে সঙ্গী কবেও।

—'শ্রীবিলাসকে দেখলাম কাল।'

—'দেখেছিলে বুঝি!'

—'হ্যাঁ।'

—'কী কবে?'

—'বেড়াব ফাঁক দিযে।'

—'ওঃ, তুমি বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়েছিলে?'

—'মানুষেব মতন দেখতে বটে।'

—'কে? শ্রীবিলাস? বাংলার বাইরে বাঙালিবা চেহারাব গর্ব বজায বেখেছে। এদেব প্রতিনির্ধিত্বে আমাদের গৌরব মারা যাবে না।'

—'দেখলাম সাহেবি পোশাক পরে এসেছেন।'

—'হ্যাঁ, তসরেব স্যুট পবে এসেছেন।'

—'বেশ মানাচ্ছিল।'

—'সব স্যুটেই ওকে মানায।'

—'মানাবে না-পুরুষমানুষ বটে তো।'

—'হ্যাঁ, প্রায় সাড়ে চার হাত লম্বা, শরীরও আজকাল আগের চেযে ঢেব সেরেছে।'

—'মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবি একটা টাইও কি তুমি বাঁধতে পার?'

—'কে, আমি? বাঁধি নি অবিশ্যি কোনোদিন।'

—'কোনোদিনই না?'

—'না।

সূচীপত্রে যান

—'যখন সেই নিউজ পেপারে কাজ করতে?'
—'ধুতি-চাদর পরে যেতাম।'
—'সাহেবি পোশাক পরবে ইচ্ছা হয় নি কোনোদিন?'
—'সে ইচ্ছে যে কত হাস্যাস্পদ নিজেই স্থিব ভাবে চিন্তা কবে অনেকবার বুঝেছি তা।'
—'কেন স্যুট কিনবাব পয়সা কুলোয় নি?'
—'না, তাই শুধু নয়।'
—'তবে?'
—'সাহেবি পোশাকে আমাকে একেবাবেই মানায় না অঞ্জলি—'একটু চুপ থেকে—' হয় তো ফ্লোবিডার নিগ্রোদের মত দেখাবে।'
বলেছিলাম একটু মজা করে, কিন্তু শুনে আঘাত পেল; দেখলাম মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে অঞ্জলিব।
একটা ঢোক গিলে—'কেন বং তো তোমার কালো নয়।'
—'না, কালো বিশেষ নয়।'
—'তবে, নিগ্রোদেব সঙ্গে নিজের তুলনা দাও কেন?'
—'না তুলনা নয়, একটু আমোদ কবে বলেছিলাম।'
—'এ-বকম আমোদ করতে যেও না, নিজেকে নিগ্রো-কান্তি বললে আমার কী বকম খাবাপ লাগে বোঝ না কি তুমি?'
মুখেব মৃদু হাসি ধীবে-ধীবে গুটিয়ে নিযে গম্ভীব হয়ে চুপ করে বইলাম। অঞ্জলি—'স্যুট কিনবার পয়সা যদি থাকত, তা হলে স্যুটের মত স্যুট পরলে তোমাকেও খাপছাড়া দেখাত না; ঠিকই মানাত।'
খানিকক্ষণ পবে আমার দিকে তাকিযে—'চুপ করে বইলে যে!'
—'আসল কথা, ইচ্ছে করে না আমাব এই সব পবতে।'
—'সে হলে আলাদা কথা।'
একটু চুপ থেকে বললে—'কিন্তু দবকাব হলে পবতে হবে তো!'
—'তা তখন পরব বই-কি।'
—'টাই বাঁধা শিখে নিও।'
—'আচ্ছা।'
—'একটা তসবেব স্যুট কেনো, বেশ দেখাবে।'
মাথা নেড়ে—'কিনব।'
—'আব কী ভালো স্যুট আছে?'
—'পামবিচেব আছে-পপলিনের আছে—'
—'এই সবেব থেকে বেছে-বেছে একটা কেনো, সোলাব টুপি মাথায দিও না। শ্রীবিলাস যে-বকম টুপি পরে এসেছিলেন, সেই রকম টুপি পরো—'
—'ফেল্ট হ্যাট?'
—'হ্যাঁ।'
—'আচ্ছা!'
—'আমিও অনেক সময ভাবি আমাদেব বাঙালিদেব পক্ষে ধুতি-চাদব ভাল—হ্যাঁ খালি গাযে কাঁধে একটা চাদর ফেলে চলতে আমাব সবচেযে পরিতৃপ্তি লাগে অঞ্জলি।
অঞ্জলি চুপ কবে ছিল।
বললাম—'চাদবটা না হয সিল্কেরই হল; আমাব বেশ ভাল লাগে কিন্তু অঞ্জলি।'
অঞ্জলি একটু হেসে—'হাতে একটা বাঁশের লাঠি থাকবে।'
—'মন্দ কি?'
-'বাড়ি-বাড়ি গিযে ভটচার্যির মত মন্ত্র আওড়ে বেড়াবে।'
—'না, ততটা দূর নয়।'
—'কেন?'
—'জীবনটাকে একেবারে জলে ফেলে দেই নি তো!'
—'এ কি জলে ফেলে দেওয়া হল নাকি?'

সূচীপত্রে যান

—'আমি তো তাই বলে মনে করি।'
শুনে ভরসা পেল অঞ্জলি।'
বললে—'দেখ, খবরের কাগজে আবার কোনো চাকরি পাও না কি?'
—'তাই দেখব।'
—'গতবার কত মাইনে ছিল?'
—'পঞ্চাশ!'
—'এবার চল্লিশ পেলেও নিও।'
—'আচ্ছা।'
—'মোট কথা নিতেই হবে; এরকম লাঞ্ছনা নিয়ে আব আর-বেশিদিন চলে না।'
—'সবই তো বুঝি, আমি সব বুঝি।'
অঞ্জলির আঁচল খসে পড়ে ছিল, উঠিয়ে নিতে-নিতে বললে—'এমন কি পঁযত্রিশ টাকা—'
—'হ্যাঁ, তা পেলেও নেব।'
—'বাংলা কাগজে পেলেও ভাল হয-তাই নিও।'
—'নিশ্চয়ই।'
—'বাংলা আর্টিকেল লিখতে আব কী?'
—'অবিশ্যি ইংরেজি আর্টিকেল লিখতেই সুবিধা পেতাম আমি।'
—'কিন্তু বাঙালিব ছেলে বাংলা লিখতে কষ্ট হবে না তো কিছু।'
—'না, কষ্ট আব-কী হবে অঞ্জলি।'
—'নিও।'
—'কেউ যদি দযা করে সে-কাজ দেয, নেওযাব জন্য আমি সব সমযই প্রস্তুত।'
—'পঁয়ত্রিশের কম দেবে না?'
—'সেই রকমই তো মনে হয।'
আমি—'কালীঘাটের দিকে একটা ঘবের আর কত ভাড়া হবে-সাত-আট টাকা?'
—'হ্যাঁ-ছ-সাত টাকাযও পাওযা যেতে পাবে।'
—'ব্যস্‌, আব বাকি আটাশ-উনত্রিশ টাকা রইল; আমাদের দু-জনের বেশ চলে যাবে না তাতে?'
—'সে-রকম গিন্নিব মতো চালালে কিছু বাঁচাতে পারবে হয তো।'
—'আমার গিন্নিপনায তোমার অবিশ্বাস আছে না কি আবাব?'
দেখলাম অভিমান ভরে আমাব দিকে তাকিযেছে।

ধীরে-ধীবে অঞ্জলীর মাথায চুলে হাত বুলাতে বুলাতে— 'একবাব চাকবী পেলে তুমি আমাকে অনেক পরিপূর্ণতা দেবে; সে কি জানি না আমি?' আঁচলেব খুঁট দিয়ে ধীবে ধীবে চোখদুটো মুছে নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিযে অঞ্জলি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে একটু হাসল।

কীসের ইঙ্গিত?

অনেক কিছুরই হতে পাবে। ঘাড় হেঁট করে ভাবছিলাম। অঞ্জলির দিকে তাকিযে দেখলাম শাড়িব কমলা পাড় তর্জনীতে জড়িযে-জড়িযে কী যেন ভাবছে, মুখের ভিতর অভিযোগ নেই আব, বেদনা নেই, কেমন একটা বিষন্নতা ফুটে বেরচ্ছে যেন, কেমন দুষ্টুমিব হাসি হেসে আমার দিকে তাকিযে-'শ্রীবিলাসেব স্ত্রী টেনিশ খেলেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'
—'তাই বলছিলেন শুনছিলাম।'
—'খেলবে তুমি?'
—'কে, আমি!'
—'র‍্যাকেট কিনে দিতে পারি।'
—'বড় দায পড়ে গেছে আমার।'
—'কেন, মেয়েরা তো আজকাল অনেকেই খেলে।'
—'খেলুক গিযে; কিন্তু আমার খেলতে গেলে জন্মান্তর নিতে হবে।'
—'না এমন কিছু শক্ত জিনিশ নয়, একটা র‍্যাকেট হাতে নিযে।'

সূচীপত্রে যান

—'তুমি নিজেই (কি) খেলতে জান?'

—'অভ্যাস করলে পারি।'

অঞ্জলি হো হো করে হেসে উঠল।

—'যখন কলেজে পড়তাম—'

—'একদিনও খেলো নি!'

—'খেলা দেখেছি অবিশ্যি ঢের; মার্কাস স্কোয়ারে, উডবার্ন পার্কে।'

—'দেখেছ তো; কিন্তু নিজের হাতে একখানা র‍্যাকেট তুলে ধরেছ?'

—'বেশ ভারী; খেললে যে দস্তুর মতন একসারসাইজ হয় তা বেশ বোঝা যায়।'

অঞ্জলি একটু মুখ টিপে হেসে—'চিরকাল বই পড়েই গেলে—'

বলে একটু গম্ভীর হয়ে জানালার ভিতর দিয়ে দূর অস্পষ্টতার দিকে তাকাল।

আমার মুখের দিকে আবার তাকিয়ে—'দেখো তো একজন মেয়েমানুষ কেমন সুন্দর টেনিস খেলতে পারে। ভাল টেনিস খেলার জন্য সবাই নাকি তাকে নিয়ে লোফালুফি করে?'

—'হ্যাঁ, মিক্সস ডাবলসে?'

—'মিক্সড ডাবলস কাকে বলে?'

—'একদিকে একজন পুরুষ ও একটি মহিলা, বিপক্ষে আর-একটি পুরুষ ও আর-একজন মহিলা।'

উপলব্ধি করে নিয়ে অঞ্জলি—'নাগপুরে শ্রীবিলাসের স্ত্রীকে কার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় যেন বললেন উনি?'

—'বেটি নাটহল এর সঙ্গে!'

—'সে কে!'

—'একজন ইংরেজ নারী, বেশ ভালো টেনিস খেলতে পারে।'

—'শ্রীবিলাসের স্ত্রী সাইকেলও চড়তে পারে, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'বাবা, আমি তো কল্পনাও করতে পারি না।'

—'তুমিই যদি শ্রীবিলাসের স্ত্রী হতে তোমার আজকের এ অভাব-দুরবস্থার কথা ধারণাও করতে পারতে না।'

অঞ্জলি শিহরিত হয়ে উঠে আমার দিকে তাকাল।

—'টেনিস খেলতে পারতে, সাইকেল চড়তে পারতে, কাটলেট-চকোলেট বাঁধতে পারতে, ফ্যাট খেতে পেতে, টিনের মাংস খেতে।'

—'টিনের মাংস কী?'

—'গোরু শূয়োর মুর্গি পাখির মাংস।'

দেখলাম দুটো হাত কাঁটা দিয়ে উঠেছে, জানালার কাছে থুতু ফেলে এল।

—'এই মোটা মেয়েটিকে শ্রীবিলাস ভালবাসেন?'

বললাম—'সে রকম জীবন পেলে এ রকম ডাঁটিভাঙা শুকনো রজনীগন্ধার মতে হয়ে পড়ে থাকতে না তো, বর্ষাকালের কলার ঝাড়ের মত অণুতে পরমাণুতে জীবনকে আদায় করে ছাড়তে-শ্রীবিলাস বললে নারীর পক্ষে স্থুল হওয়া ভারী চমৎকার।'

—'শ্রীবিলাস তো বললে-কিন্তু তুমিও কি তাই বলো?'

—'করবীর করুণ একখানা শাখার পুষ্পিত রূপ; তা নিয়ে কবিতা লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়, কিন্তু আটপৌরে জীবন চলে কি না-আচ্ছা তোমার কি মনে হয়?'

করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, বললে—'আমাকে ব্যথা দিতে তোমার ভাল লাগে?'

—'জীবনের কবিত্ব ও শিল্পের দিক দিয়ে ঠাট্টার জিনিশ তুমি নও তো অঞ্জলি।'

—'যাক, জানি আমার রোগা শরীর তোমার ভালো লাগে না।—আচ্ছা একটা কথা আমাকে বলবে? শ্রীবিলাস আমাকে দেখতে চাইল না কেন?'

—'থাক-সে কথা শুনে তোমার কাজ নেই—'

—'বলবে না?'

—'শুনলে তোমার কোন লাভ হবে না।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'কিন্তু না বলে চেপে রাখলে আমিও তো একটা অভাব বোধ করব; সে অভাবের ব্যথা তো কম নয়।'

—'দেখা করে নি; শ্রীবিলাস মর্জির মানুষ-নিজের মর্জি মত চলে।'

—'এই শুধু? আব কিছু নয়?'

—'আবাব কী থাকবে!'

—'ঐ যে যাবার সময কী বলে গেল!'

—'তাও শুনেছ নাকি?'

—'একটু-একটু শুনেছি!'

—'ও-সব সত্যি নয-বানিযে বলেছে।'

—'বানিয়ে বলে কী লাভ?'

—'ঐ একবকম লোক আছে এই ধবনেব গল্প বানিযে আসব জমাতে খুব ভালবাসে।'

—'কিন্তু তোমাব মা তো সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন—'

—'কই শেষ পর্যন্ত ছিলেন না তো-'

—'কিন্তু গোড়ার দিকে ছিলেন তো—তার সামনেও এমনি সব কুৎসিত ইঙ্গিত করতে দ্বিধা কবল না?'

—'শ্রীবিলাস আলাদা জগতেব মানুষ; বুঝবে না তাকে তোমবা-'

—'কিন্তু যা বললে বাস্তবিক যদি সত্যি হয!'

—'না। সত্যি নয।'

জানালাব ভিতর দিযে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিযে রইল অঞ্জলি-তার পর আমাব মুখেব দিকে তাকিয়ে-'শ্রীবিলাস সত্যি বলেছে কি মিথ্যা বলেছে তা জানি না- কিন্তু সংসাবে এ-রকম অনেক হয়-'একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে-'আমি এখন ঘুমোব—তুমি যাও—।'

বিরস মুখে চোখ বুজে রইল।

নিজেব জীবনেব সবটুকু কথা সে আমাকে কোনোদিনও বলে না।

দু-তিন দিন পবে—আমাদের বাসাব থেকে দু-তিন খানা বাড়িব পব, বামতাবণ ঠাকুরের বাড়িতে, একটা শ্রাদ্ধেব আযোজন চলছিল। বেলা দশটা সাড়ে দশটা হবে। আমাদেব বাড়ির সব লোক, অঞ্জলি, এমন কি বাবা পর্যন্ত সেখানে চলে গেছেন।

শ্রীবিলাসের কাছ থেকে দু-তিনখানা বই নিযে এসেছিলাম-একখানা কবিতাব বই, বাকি দুটো সমালোচনাব। বারান্দায ডেক চেযাবে বসে কবিতার বইটা পড়ছিলাম।

পড়তে-পড়তে চোখে পড়ল—

> Have I a wife? Be damn I have,
> But we were badly mated;
> I hit her a great dart (?) one night,
> And now we are separated.
> And mornings going to work
> I meet her on a quay:
> "Good morning to ye. ma'am", says I,
> "To hell with ye"! says she.

পড়ে ভারি আমেজ লেগে গেল।

বইটা বন্ধ কবা যাক; আব পড়বাব দরকাব কী? চুরুটটা জ্বালিযে বহুদূরেব অশ্বথ, আম, বাঁশ, বেতেব নীলাভ সবুজের দিকে চুপচাপ তাকিযে রইলাম—

মিনিট পনের পবে চেয়ে দেখি, খাকিব প্যান্ট-কোট পরা পোস্ট-আফিসেব পিয়ন আমবাই দিকে এগিযে আসছে।

চিঠি এল হযতো। কার?

কাছে এসে দাঁড়িয়ে—'আপনার নামই তো শচীনবাবু—'

—'হ্যাঁ, চেনই তো।'

—'তবুও-একটু সাবধান হতে হয়—'

—'কেন, বলো তো?'
—'আমার নামে একটা ইনসিওরেন্স আছে—'
—'আমার নামে? না বাবার?'
—'আপনার নামেই।'
খামখানা হাতে তুলে দেখলাম-আমরই নাম, আমারই ঠিকানা বটে।
—'ইনসিওর কে করল আবার?'
—'তা আমি কী করে বলব? পাঁচ টাকাব এম-ও-ওতো আসে নি কোনো দিন আপনাব নামে।'
—'এব ভিতর টাকা? না ইনসিওর কবে যামিনী বাযেব ছবি পাঠিয়েছে?'
—'খুলে দেখুন।'
সাইন করে পিযনকে বিদায দিলাম।
দশটাকার দশখানা নোট। সঙ্গে একখানা চিঠি।

বাঁচি

স্নেহাস্পদেষু

আমি কযেকদিন যাবৎ দবকাবি হিসাবপত্র মিলাইতেছি। যাহাব-যাহা পাওনা চুকাইযা দিতেছি। খুচরা কাগজপত্র নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলাম কতকগুলি ছোটখাট খুচবা ঋণ মিটাইযা দেওযা হয নাই। লাক্ষাব (কিংবা চাযের) ব্যবসা সম্পর্কে কলকাতায তোমাব নিকট হইতে একবাব একশত টাকা নিযাছিলাম; দেখিতেছি সে টাকাটা তোমাকে এখনও ফিবাইযা দেওযা হয নাই; মূল টাকাটা তোমাকে আজ ইনসিওর কবিযা পাঠাইযা দিলাম। তোমার নিকট হইতে যখন টাকাটা লইযাছিলাম—সুদ দিবাব কোনো কড়াব ছিল না। তবুও, টাকাটা এতদিন ফেলিযা বাখিব তাহাও তুমি ধারণা কবিতে পার নাই। এক্ষেত্রে কিছু সুদ যদি তুমি প্রত্যাশা কব, অন্যায নয। লাক্ষাব ব্যবসায আমাব লাভ কিছু হয নাই; বরং লোকসানই গিযাছে। তবুও, বিচার-বিবেচনা কবিযা তোমার এ টাকাব বাবদ বৎসরে শতকবা সাড়ে চাব টাকা হিসাবে সুদ ধার্য কবিলাম। চক্রবৃদ্ধি সুদেব কথা যদি উল্লেখ করো, তাহা হইলে আমি এই বলিব যে এক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওযা চলে না। তুমি যে আমাকে টাকা দিযাছিলে তাহাব কোনো দলিলপত্রও নাই; আমাব বেশ মনে আছে স্ট্যাম্পে সই কবিযা টাকাটা নেওযা হয নাই। যাক, সে সব কথাব উল্লেখ কবিতে চাই না আমি। টাকাটা আট বছব আগে নেওযা হইযাছিল; সুদ বাবদ তোমাব নিট প্রাপ্য একশত ছত্রিশ টাকা। একশত তোমাকে আজ পাঠাইলাম; আব কযেকদিন পবে ছত্রিশ টাকা পাঠাইযা দিব।

আশা কবি কুশলে আছ।

ডাক্তাববা বলেন আমাব গলস্টোন হইযাছে। একবাব কলিকাতায গিযা উত্তমরূপে চিকিৎসা করাইতে হইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
ইতি তোমাদেব বজনীকান্ত খাসনবীশ

'ওঃ বজনীবাবু!—'

লাক্ষা চা—অনেক কিছুব ব্যবসাই করতেন বটে; ব্যবসা কবে টাকাও জমিযেছেন যথেষ্ট; আট দশবছর আগে কলকাতায মাঝে-মাঝে তাব সঙ্গে দেখা হত বটে আমাব। কিন্তু তাকে কোনোদিন দশ টাকা দিযেছি বলে তো মনে পড়ল না।

ডেক চেযাবে বসে আট বছর আগে কলকাতায দৈনন্দিন জীবনটাকে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিযে-খতিযে দেখলাম, অনেকবাব দেখলাম, ঘন্টা দুই কেটে গেল কিন্তু বজনীকান্ত খাসনবীশেব এ-চিঠিব কোনো ভাবার্থই আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

বাস্তবিক, একশ টাকা তিনি কোনোদিনও আমাব কাছ থেকে নেন নি; বজনীর ব্যবসার সঙ্গে কোনোভাবেই আমি কোনো দিনও লিপ্ত ছিলাম না।' দু-চাব টাকা মানুষকে মাঝে-মাঝে ধাব দিযেছি-নিয়েছি বটে, কিন্তু আমার দেনাপাওনা এ সংখ্যার উপরে যায নি কোনো দিন।

চিঠিটা বারবার পড়ে হাসি পেতে লাগল আমাব।

এ মানুষটিব উদ্দেশ্য কী? তিনি আমাকে এমনিই একশ টাকা দিতে চান? যদি তা আমি না গ্রহণ করি সেই জন্যই এই চিঠির সৃষ্টি? কিন্তু রজনী সে রকম জাতেব লোক নন তো। তিনি হিশাবি মানুষ, বিষযী। কল্পনা বা হৃদয নিযে খেলা কববার দোষ তাব কোনোদিনই নেই। ভুল কবেছেন! হযতো অন্য কাবো

প্রাপ্য ভুলে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। তাই হবে হয় তো, কিন্তু খামখানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—নাম-ঠিকানা সমস্তই অকাট্য, জেলা পোস্ট অফিস, বাবার নাম—কোথাও একটুও খুঁত নেই। সমস্তই পরিষ্কার, নির্বেট।

কিন্তু তবুও এ-টাকাটা আমার নিজের অর্জিত জিনিশ বা প্রাপ্য সম্পত্তি নয়। টাকাটা ফিরিয়ে দেব?

বাবার কাছে সমস্ত খুলে বলব?'

মার কাছে?

অঞ্জলির কাছে?

রজনীকে একখানা চিঠি লিখে জানাব যে তিনি সম্পূর্ণ ভুল করেছেন, আমার কাছ থেকে কোনো টাকা কোনোদিন তিনি নেন নি—এ টাকাটা আমি তার কাছ থেকে পাই না?

অবিশ্যি একটা কথা ঠিক। এ টাকাটা যদি আমি রেখে দেই, তাহলে ব্যবহার করতে পারি। আইনে কোথাও বাধে না।

অবিশ্যি নীতিতে বাধতে পারে। কিন্তু নীতির মানেও তো বিচিত্র।

রজনীর অজস্র টাকা আছে, একটি টাকা তার কাছে নদীর জলে শিশিরের ফোঁটার মত। আমার এক পয়সাও নেই, অঞ্জলি চার পয়সার জর্দা কিনতে চেয়েছিল, দিতে পারিনি। বায়স্কোপ দেখতে চেয়েছিল—তার সিঁদুরের কৌটোর টাকা দুটো নিয়ে নিতে হয়েছে। এ একশ টাকার মূল্য আমার কাছে অপরিসীমঃ এ টাকা দিয়ে আমি বিচার-কল্পনার অনুশীলন করতে পারব কয়েকখানা বই কিনে, আমার নিজের কঠিন জীবনের জীর্ণনতাকে খানিকটা সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে পারব দু-এক জোড়া কাপড়-জামা ও জুতো কিনে, মাকে ও বাবাকে কয়েকখানা নতুন কাপড় কিনে দিলে নিরপরাধ পবিতৃপ্তির কল্যাণ আস্বাদ করতে পারা যাবে। অঞ্জলিকে সেই বুটিদার শাড়িটা কিনে দেওয়া যাবে। কয়েক শিশি জর্দা কিনে দিতে পারব, এক জোড়া [......]-র জন্য প্রায় বার বছর ধরে বলে আসছে, কিনে দেওয়া যাবে—তার মলিন বিরস [জীবন দেখবার] অভ্যাস, ও অন্ধকারে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা, কয়েকদিনের জন্য প্রসন্ন জীবনের নীচে ধুলো হয়ে ছাই হয়ে থাকবে।

পৃথিবীতে চৌত্রিশটা বছর কাটালাম। অনেক বই পড়েছি, অনেক মতামত বুদ্ধিবিচারের সংঘর্ষে এসেছি, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে—তারপর দেখলাম সাধারণের পক্ষে আমি কোনো দিক দিয়েই চলি না। সকলে বিধাতাকে বিশ্বাস করে, অন্তত তাকে মঙ্গলময় বলে, আমি সৃষ্টির সম্পর্কে আমার ব্যথিত সমস্যা নিয়ে দিন কাটাই। সকলের জন্য সম্পদ রয়েছে, সমাজের নীতি ও ধর্ম রয়েছে অচলপ্রতিম শামুকটির মত। সে অচলতা আমার চোখে পড়ে না। নিষিদ্ধ পথে ফিরি, নিষিদ্ধ কথা ভাবি, অবৈধ প্রশ্ন তুলে বেড়াই!

রজনীর এ টাকা আমার জীবনের সম্পর্কে আমার কাছে বৈধ বলে মনে হল। যেদিন থেকে মানুষ আনন্দ, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি, মমতা প্রেম, কল্যাণ সমস্তই টাকার বিনিময়ে কিনতে শিখল, বিক্রি করতে শিখল সেদিন থেকেই নারীর হৃদয়ের ঐকান্তিক শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে গেছে! কবি নষ্ট হয়ে গেছে, প্রেমিক নষ্ট হয়ে গেছে—প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন ভালবাসা পেতে হলে তাই সভ্যতার বাইরে বহুদূরে গিয়ে কোনো বনের বালিকাকে খুঁজে পেতে নিতে হয় কিংবা চিতা বাঘিনীকে; কিংবা সভ্যতার ভিতরে একটা কুকুরকে

—'কিংবা—'

এরা টাকার মানে জানে না, ভালবাসা,আনন্দ, শান্তি ও মঙ্গলকে অকল্পিত-ভাবে নিঃসঙ্কোচ সম্পূর্ণতায় জীবনের পথে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা এদের আছে তাই। এরা টাকার মানে জানে না। আমাদের অভিসারিকারা, নারীরা, কবিরা, প্রেমিকরা সকলেই জানে। জানতে আমারও বাধা কী? কাউকে কিছু বলতে গেলাম না আমি। একশ টাকা নিজের কাছে রেখে দিলাম। পিয়ন যখন এসেছিল তখন বাবা বা অঞ্জলি ছিল না যে এ বেশ ভরসার কথা। অঞ্জলিকে তবুও একটু বুঝিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু বাবা থাকলে—এড়াবার কোনো দ্বিতীয় পথ ছিল না। তাকে চিঠি দেখাতে হত, সমস্ত ব্যাখ্যা করতে হত। পরিষ্কার ঝর-ঝরে শাদা ব্যাখ্যা—এক জায়গায় একটুও খুঁত থাকলে চলত না, ঘটনার যথার্থতা বাস্তবিক কী-একবার জেনে নিয়ে তিনি অমনি কাজ করে ফেলতেন;' আজই মনি অর্ডারে টাকাগুলো রজনীকে পাঠিয়ে দিতে হত। সোস্যালিজম বা কমিউনিজম—এর কোনো কথাই তিনি শুনতে যেতেন না। আধুনিক জীবনের দোহাই পেড়ে একচুলও নড়াতে পারতাম না। তিনি সাবেক কালের লোকই শুধু নন—সেকালের যুক্তিনিষ্ট সাধু লোক।

সন্ধ্যার সময় অঞ্জলি নিজেই আমার কোঠায় এল।

সূচীপত্রে যান

আন্দাজ করে নিয়ে—'আমার তো হয় নি—'

—'বড় তো জবাব দিলে, কোন সৌভাগ্যের কথা বলছি বল তো?'

—'কিশোর জীবনের চন্দ্রকান্তর মতন একটি প্রেমিক হৃদয়কে অধিকাব করার সৌভাগ্য।'

—'হ্যাঁ, সে কথাই বলতে চাচ্ছিলাম; এ সকলেব জীবনে হয না, কী বলো?'

—'বলা বড্ড দুষ্কর; জীবনের রহস্য অনেকখানি?'

—'কিন্তু হলেও-বা কী লাভ? কী লাভ হল? এদ্দিন পবে এসে তিনি দেখলেন তার বাড়ি-ভিটে জঙ্গলে ভরে গেছে, একটা কুকুর মবে আছে তার ওপর; কতকগুলো শকুন চবে বেড়াচ্ছে।'

—'তার হৃদযের লাভালাভেব আমার কী বুঝি? প্রেম শুধু মিলন নিযে নয তো; দীর্ঘ বিচ্ছেদ-ব্যথা শূন্যতা, সৃষ্টির অবিচাব অন্ধতা নক্ষত্রেব থেকে নক্ষত্রে, নক্ষত্রেব থেকে নক্ষত্রে আঁকাবাঁকা বহস্যময বিবাট সিঁড়িব রূপ দেয, প্রেমকে অপরূপ রূপ দিযে যায।'

—'শেষ পর্যন্ত প্রেমের সার্থকতা পবস্পরেব কাছাকাছি বসে নয?'

—'প্রায়ই না। অনেক দিনেব অদর্শন, নিষ্ফলতা, পবিহাস-হযতো মৃত্যুব মধ্যেই প্রেমের চবিতার্থতা। তুমি আমাব চেযে ভোল বোঝ এই সব—'

—'কী রকম?'

—'তোমাব রূপ ছিল, হৃদয ছিল তোমাকে ভালবেসে অনেকে তৃপ্তি পেযেছে।'

আঁচলের চাবিটা অন্ধকাবে মধ্যে খানিকক্ষণ ঘুবিযে-ঘুবিযে বাজিযে-বাজিযে অঞ্জলি শেষে-'তা, আমাব অবস্থাও এব মতই।'

—'আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

—'এই মেযেটি জানে না চন্দ্রকান্তব মতন এত বড় এক জন প্রেমিক পৃথিবীব কিনাবে তাব জন্য রযে গেছে। তাদেব জঙ্গল-ঢাকা ভিটেব ওপর মড়া কুকুব ও শকুন দেখে যাব হৃদয ভেঙেচুরে একশেষ হযে যায-কোনো দিনও এ-সব জানবে না সে। হযতো আজ এইবকম অন্ধকাবে বসে আমাবই মতন বিঙেব চাবি ঘোবাচ্ছে সে-ঘোবাচ্ছে-ঘোবাচ্ছে-। চাবিব বিং ঘুবিযেই দিন কাটে আমাদের-না-ঘষে-মেজে দিন চলে যায-অথচ দু দণ্ড যদি চুপ কবে ভাবি, বুঝতে পাবি, যে এই শাড়ি, সোনাব হাব, সিঁদুর, দিনবাত এই দেহেব পবিচর্যা, মনটাকে ঠকাবার অসংখ্য প্রযাস সমস্তই কি নিদারুণ ছেলেখেলা'। একটু চুপ থেকে অঞ্জলি বললে-'কোন এক অপোগণ্ড বিধবাব মযনাব মত বাধা-কৃষ্ণ নামই আওড়াতে হবে সাবা জীবন বসে, এই নিযে প্রতি মুহূর্তেব কাল্পনিক কৃষ্ণপ্রাপ্তি, দুটো দানা পেযে ইনস্টিঙ্কটকে ঠাণ্ডা বাখা; দিনবাত মযনার মত খেযে,ঘুমিযে অর্থহীন অন্ধ কথা নেড়েচেড়ে, সময কাটিযে দেই; অপমানকেও চিনি না, স্মবণ কবতেও ভুলে যাই জীবনেব উদ্দেশ্য কত গভীব ও সুন্দব ছিল, কত সুদূবে আলোর আযোজনেব ভিতব লুকিযে ছিল।'

অঞ্জলি কথা বললে, খানিকটা সময কেটে গেলে পব—'কী ভাবছ?'

—'অপোগণ্ড বিধবার ময়নাব কথা—'

—'আচ্ছা যাও-ঠাট্টা করতে হবে না,' মুখ টিপে হেসে, 'আচ্ছা, সে বিধবা কে বল তো দেখি—'

—'তাব একটা মযনা আছে-

—'বেশ তো, কিন্তু নিজে সে কী?'

—'একটি অপোগণ্ড বিধবা-'

—'অপোগন্ড বিধবা বলতে আমি কাকে বুঝেছি?'

—'মযনাব মালিককে।'

—'বা বে বাঃ খুব বং কবতে পাব দেখছি! আমি এই সৃষ্টির বিধাতাকে লক্ষ্য করে বলেছি, মানুষ তাব হাতে নির্বোধ মযনাব মত, নিজে তিনি অপোগণ্ড বোষ্টমী যেন একজন। আচ্ছা চন্দ্রকান্ত বিযে কবেছেন?'

—'না।'

—'ও-সব মানুষ বিযে করে না। তোমাব বড়-বড় বন্ধু আব-কজন আছে?'

চন্দ্রকান্তব মত?'

—'আছে আরো দু-চারজন। তাদেব অবিশ্যি আমি অনেক দিন দেখি নি; কী বকম ব্যবহার কববে আজ আমার সঙ্গে বলতে পারি না; হযতো চিনবে না।'

—'কেন? আমাবও ও-বকম অনেক বন্ধু আছে। কত চিঠি লেখে আমাকে। উত্তবও দিতে পাবি

বললে—'আজ তো তোমার বড়-বড় বন্ধুরা কেউ আসবেন না—?'

—'কী জানি, তাদের মর্জি।'

—'না, আসবেন না—রোজই কি আসে?'

তাকিয়ে দেখলাম বৌভাতেব সময় কেনা সেই হেলিট্রেপ শাড়িটা পরেছে, দু-কানে দুল ঝক-ঝক করছে, বিকেলে সাবান দিয়ে গা ধুয়ে ছিল টের পেলাম। শবীরের থেকে, নিঃশ্বাসের থেকে, স্নিগ্ধ গন্ধ বেরুচ্ছে, চওড়া কপাল, মুখ ঝর.ঝবে, অন্ধাকবে হাতিব দাঁতের গড়া রূপসী মূর্তির সঙ্গে আচমকা কেমন সাদৃশ্য বেরিয়ে পড়ে, সাদৃশ্য হারিয়ে যায়। সিঁথায়, কপালে, সিঁদুর; পান খায় নি—ঠোঁট পরিষ্কাব। কথা বললেই দাঁত ঝিকমিক করে উঠে, মুখের থেকে লবঙ্গের গন্ধ বেরয়।

—'বসো অঞ্জলি।'

বিছানার পাশেই বসল।

—'এখন যদি ওঁবা কেউ এসে পড়েন?'

—'কে? শ্রীবিলাস?'

—'কিংবা চন্দ্রকান্তবাবু-'

—'বাঃ চন্দ্রকান্তর নাম তুমি কী কবে জানলে?'

—'তিনি এসেছিলেন একদিন দুপুববেলা'

—'তুমি তো তখন এ ঘরে ছিলে না-'

—'ছিলাম না বটে কিন্তু গলাব আওয়াজ পেয়ে এসেছিলাম।'

—'চেনা গলা বলে মনেহয়েছিল বুঝি?'

—'দূর! অত চাপা গলায় কে কথা বলে শুনতে এসেছিলাম।'

—'চন্দ্রকান্ত শ্রীবিলাসেব মত চেঁচায় না।'

—'কোন্ এ মেয়েব কথা বললে না?'

—'কে? চন্দ্রকান্ত?'

—'হ্যাঁ। কে সেই যে?'

—'ও, সে একটি মেয়ে ছিল—বছব পনের বযস।'

—'পনেব বছব মোটে।'

—'কুড়ি বছব আগে তার তের বছর ছিল।'

—'তাহলে এখন তেত্রিশ হয়েছে।'

—'না, তা হয নি।'

—'হওযাই সম্ভব। চন্দ্রকান্ত তাব সম্বন্ধে যেমন করে বললেন বাস্তবিক বড় ভাল লাগল আমার।'

—'চন্দ্রকান্ত প্রেমিক মানুষ।'

—'ভারি কৌতুহল হয মেয়েটিকে দেখবাব জন্য।'

—'এখন দেখলে বীতশ্রদ্ধ হতে হবে।'

—'কেন, তুমি দেখেছ নাকি শিগগিব?'

—'না দেখতে চাইও না। কুড়ি বছর আগেব স্কুল-পথঘাট মাস্টাব-ছেলে-মেয়েদের দল এমন হৃদযেব জিনিস; বাইবের সংসারে তাদেব খুঁজতে গেলে একটা কদর্য ধাক্কা খেতে হবে। জীবনেব যা কিছু গোপন সৌন্দর্য আছে তা আছে। কিন্তু তাই বলে বাজারে গিযে তাব লোম ও লেজ দেখে আসবাব কৌতূহল নিতান্তই অসঙ্গত!'

অঞ্জলি খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে—'আমি তোমাব এ কথায বিশ্বাস কবি না—'

—'করো না?'

—'চন্দ্রাকান্ত করবেন না। আমি অবাক হয়ে ভাবি তাকে যেমন কবে খুঁজছেন চন্দ্রকান্ত আমাকেও কেউ তেমন করে খোঁজে নাকি?'

চুপচাপ। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে বইল সে।

পবে চোখ তুলে—'কথা বলছ না যে?'

আস্তে-আস্তে আমাব হাতখানা তুলে নিয়ে-'সে সৌভাগ্য সকলেব জীবনে হয় না-কী বলো?'

—'কোন সৌভাগ্যেব কথা বলছ?'

না-তারা আমাকে দেখলেই গলা জড়িয়ে ধরে কত আদর করে। সুলতা একজন-নিজে দেওয়ানের মেয়ে, বেশ ভাল বিয়ে হয়েছে তার, একজন ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসারের সঙ্গে,' অঞ্জলি নখ খুঁটতে খুঁটতে-'সাড়ে সাতশ টাকা মায়না পায় ওর বর।'

সতৃষ্ণ মুখে কয়েক মুহূর্ত জানালার বাইরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল, পরে বললে, 'উমার বিয়ে হয়েছে আরো ভাল, ওর বর জার্মানি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছে, এখন বারশ টাকা মায়না পায়—'

অন্ধকারের ভিতর দেখলাম চোখ দুটো লোলুপতায় চক্‌চক করছে বধুর। বললে—'বারশ মায়না পায়, দিল্লিতে থাকে, দুটো মোটর আছে ওদের। চিঠি লিখলে অবিশ্যি এখনও উত্তর দেয় উমা। কিন্তু কে যায় চিঠি লিখতে, আছে আছে বড় মানুষ, তাই বলে তার কাছে—'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

জানালার বাইরের সজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে একটু পরে—'গরিব হোক, ভিখিরি হোক, সকলেরই নিজের মনুষ্যত্ব আছে-দোকানের জিনিশের মত সে সব তো আর টাকা দিয়ে হাত বাড়ালেই বিক্রি করা চলে না।'

এক-আধ ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল।

অঞ্জলি আস্তে-আস্তে—'নইলে দিল্লিতে গিয়ে কয়েক মাস উমার সঙ্গে কাটিয়ে আসি এতে কি তার অসাধ? কিন্তু আমি যাব কেন? আমাকে কি পথের কুকুর বিইয়েছিল?' অনেক ক্ষণ অন্ধকারের ভিতর মাথা হেঁট করে বসে থেকে শেষে বললে—'আচ্ছা, তুমি চাঁদা তুলতে পারো না?'

—'কিসের জন্য?'

—'বিলেতে যাবে—'

—'বিলেত!'

—'হ্যাঁ, গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আসবে।'

—'ইঞ্জিনিয়ারিং কী করে পড়ব?'

—'কেন?'

—'আমি তো টেকনিক্যাল লাইনে যাইনি; বি-এ কিংবা এম-এ পড়া যায়।'

—'বেশ, তাই পাশ করে আসবে।'

—'সে জন্য চাঁদা? তা কেউ দেবে না।'

—'কেন?'

—'কেউ দেয় না।'

ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতর আমার পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় নোংরা জিরজিরে সুতির শাড়ি পরে আমাকে বললে—

'রান্না হয়ে গেছে, খাবে?'

—'না, তুমি রেঁধেছ বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আজ গা ধোও নি?'

—'নাঃ, অত বড়মানুষি শখ দিয়ে কী হবে!'

—'সাবানটা তোমার আছে, না ফুরিয়ে গেছে?'

—'কাপড়কাচা সাবান?'

—'না, গায়ে মাখবারটা।'

—'আছে খানিকটা।'

—'ওটা আর ব্যবহার করো না তুমি।'

—'কেন?'

—'ও একটা দু-আনা দামের সাবান-মেখে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়।'

—'তুমি নিজে তো কোনো সাবান মাখ না।'

—'না।'
—'দেখি, কাপড়-কাচা সাবান দিয়ে দাড়ি কামাও।'
—'হ্যাঁ, তাতেই চলে যায়।'
একটু বিমর্ষ হয়ে অঞ্জলি—'চলে তো যায়, কিন্তু আমার বাপের বাড়িব প্রসন্ন বিশ্বাসকেও দেখতাম সেভিং স্টিক ব্যবহাব করছে-আর আমার স্বামীর এই অবস্থা?'
—'প্রসন্ন বিশ্বাস কে?'
—'তিনি ছিলেন রেলেব গুদামের ক্লার্ক।'
একটু হেসে—'তবে কেন ব্যবহার করবেন না?'
—'কিন্তু লোকটা ফার্স্ট ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিল শুধু, তুমিতো এম-এ পাশ-কত বড় বড় বই পড়ো, সুন্দর কল্পনা তোমাব, ভাল লিখতে পার। মেটে সাবানে গাল জ্বলে না তো।'
—'না, সাবধানে কামালে কোনো অসুবিধা নেই তো।'
—'তোমার ঘরটা আজ ঝাঁট দেওযা হয়েছিল?'
—'হ্যাঁ-হয়েছিল বই কি।'
—'কে দিলে?'
—'কেন, তুমিই তো দিয়েছ।'
—'মিছিমিছি মিথ্যে কথা বলো কেন! আমি শিগগিব তোমার ঘরদোব ঘাঁটি নি তো—'
—'কেউ দিয়ে গেছে ঝাঁট—'
—'সত্যিই? না মিথ্যে বলছ?'
—'দেখো না তাকিয়ে-কী বকম পরিষ্কাব।'
—'অন্ধকাবে কী কবে দেখব?'
—'বাতিটা উশকে নাও।'
—'আমি ঝাড়ু নিয়ে আসি।'
আঁচল ধবে আটকে বেখে বললাম—'এখন একটু চুপচাপ বসেছি-এখন ধুলো উড়োতে পাববে না না।'
—'আচ্ছা বেশ, তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে—'
—'তখন ঝাঁট দেবে? ধুলোবালি যে তা হলে আমাব মুখেচোখে গিয়ে লাগবে।'
—'তুমি মশাবি ফেলে শুয়ে থাকবে তো।'
—'আচ্ছা বেশ, তাই কবো।'
—'আজ ভেবেছিলাম তোমাব ঘরে ধূপ দেব।'
—'ধুনুচিটা তো ভেঙে গেছে।'
—'পিসিমাব খাটেব নীচে আব-একটা পেয়েছি।'
—'সেটা তো পিসিমা ব্যবহাব কবেন।'
—'ইস, ব্যবহাব কবেন না ছাই-মাকড়সাব জাল জমে গেছে সেটাব ভিতর—'
—'তাই না কি?'
—'কতকগুলো টিকটিকিব ডিম ছিল, কুমরো পোকাব পাখনা, আবশোলা বয়েছে মবে।'
—'হুঁ?'
—'আমি সব ঝেড়েপুড়ে পবিষ্কার করে নিয়েছি-কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজে এক ছিটে ধূপ পেলাম না।'
—'চার পযসাব আনালে হয।'
—'ভাবছিলাম বাবাকে বলব, কিন্তু বলতে লজ্জা করে আমাব।'
—'আচ্ছা, কাল সময মতন বলব আমি।'
—'আজ তা হলে আর ধূপ দেওযা হল না।'
দেখলাম মুখখানা বাস্তবিকই চিন্তিত, বিষণ্ণ। অঞ্জলির যে কখন কী হয বুঝতে পাবা যায না।
—'তোমার বিছানার চাদবই-বা কী হয়েছে? ইস, কী ছিরি!'
—'কেন?'
—'চুরুটেব ছাইযে, ধুলোয, তেলে, মরা ছাবপোকাব বক্তে এ কী করেছ তুমি?'

সূচীপত্রে যান

—'না, এটা ধুয়ে নিতে হবে; শ্রীবিলাস সেদিন বসতেই কুণ্ঠিত বোধ করছিল আমার এ বিছানায়।'

—'ধুয়ে নিতে হবে, কে ধোবে শুনি?'

—'আমিই ধুয়ে নেব এখন; চানের সময় খানিকটা সাবান লাগিয়ে কয়েকটা আছাড় দিলেই তো হবে—'

—'বেশ, তুমি মনের সাধে যা খুশি তাই বলে যাও, কার প্রাণে গিয়ে কী রকম লাগে তার কোনো খোঁজখবরও নিতে যাও না। তুমি তোমার জামা-কাপড় কাচবে—আমি এ বাড়িতে কি সং হয়ে এসেছি? .বেশ, তাহলে একটা ফ্রেমে বেঁধে আমাকে বেড়ায় ঝুলিয়ে রাখ না কেন?'

আঁচল দিয়ে হাত মুখ কপাল মুছে নিতে-নিতে অঞ্জলি—'তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। কাল সকালবেলা তোমার বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় আর যা ময়লা কাপড়-গেঞ্জি-শার্ট আছে সব নিয়ে যাব কিন্তু আমি। তুমি সকাল-সকাল উঠে বিছানা খালাশ করে দিও।'

—'এত জিনিশ এক দিনে কেচে কী লাভ?'

—'একদিনেই কাচব আমি।'

—'তারপব, ঘুসঘুসে জ্বর হলে—'

—'তাই তো কামনা করো তুমি—'

একটু চুপ থেকে বলি—'তোমাব বই জোগাড় হল?'

—'না, কোথায় হল আর?'

—'পড়বে না?'

—'তোমবা তো আকাঙক্ষা করো না। গুদামেব একটা বস্তাব মত তোমাদেব সংসারেব এককোণে আবখুটি মেবে পড়ে থাকি, যে খুশি মাড়িয়ে যাক, সকলেব পায়েব তলে-তলেই জীবনটা উৎসর্গ কবে দেই,' একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'কিন্তু আমি তা হতে দেব না-পাশ না কবলে আমাব চলবে না—'

—'পাশ কবে মাস্টারি কববে?'

—'করব বৈকি। পাবলে পেশোযাবেও মাস্টাবি নিয়ে যাব।'

—'তোমাব কত টাকাব বই-এব দবকাব?'

—'কেন মিছেমিছি স্ত্রীর কাছে সাপের মত হাঁচি দিয়ে বেড়াও? টাকা দিয়ে বই কিনে দেবে তুমি? পাড়াব ছেলেদেব মধ্যে কযেকজন এবাব বি-এ-পাশ কবল। যোগ্যতা যদি থাকে তো ওদের কাছ থেকে জোগাড় কবে এনে দাও না!'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'পবীক্ষার ফল কবেই তো বেরিয়ে গেছে। এত দিনে বই কি আব আছে ওদেব হাতে? নিজেব হাতে না কবলে কিছুই হয না-স্বামীও যেন মানুষেব পব।'

অঞ্জলিই আবাব বললে—'কী গো, চুপ কবে যে?'

—'বাতিটা একটু আনো তো।'

—'কেন?'

—'খববেব কাগজ পড়ব।'

—'কাগজ পেলে কোথায?'

—'বাবা একটা কিনে নিযে এসেছেন।'

—'ইংবাজি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা, আমাকে দাও না-আমি পড়ি।'

বাতিটা সে নিয়ে এল।

বললে—'কী লিখেছে, দেখ তো।'

'দাঁড়াও, দেখছি।'

—'কোথাও চাকবি খালি আছে?'

—'সে খবব নিয়ে লাভ কী?'

—'কেন?'

—'চার-পাঁচ বছব ধরে এমনি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দবখাস্ত করেছি।'

—'তাবপর?'

—'একটা উত্তরও আসে নি।'

খবরের কাগজটা দেখতে-দেখতে বললাম—'ফ্রান্সি ফিল্ডসের নাম শুনেছ?'

—'সে কে?'

—'একজন ভাল নায়িকা।'

—'ইংরেজ বুঝি?'

—'হ্যাঁ, ল্যাঙ্কাশায়ারে বাড়ি।'

—'তার কী হয়েছে?'

—'একটা সিনেমা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে যে প্রত্যেকটা ছবির জন্য ফ্রান্সিকে তেইশ হাজার পাউণ্ড দেবে।'

অঞ্জলি চোখে কপাল তুলে—'তেইশ হাজার?'

—'টাকা নয়, পাউণ্ড—। একটা ছবির কাজে মিস ফিল্ডসের যতখানি সময় লাগে তাতে হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রত্যেক মিনিটে সে পাঁচ পাউণ্ড করে পাবে-মানে ত্রিশ টাকা।'

—'প্রত্যেক মিনিটে ত্রিশ টাকা?'

—'হ্যাঁ।'

—'যাক, এ-সব খবর আমি শুনতে চাই না।'

—'কেন?'

—'গান্ধীর কী হল?'

—'গান্ধীর কোনো খবর এতে নেই।'

—'এটা কী কাগজ?'

—'স্টেটসম্যান।'

—'বাবা স্টেটসম্যান আনলেন যে?'

—'এটা রবিবারের স্টেটসম্যান কি না।'

—'তাতে কি।'

—'মাসে-মাসে এই কাগজটা তিনি কেনেন। নানারকম খবর থাকে, একটা কাগজে তার ছ মাস চলে যায়।'

—'ছ মাস?'

—'হ্যাঁ, অবকাশ মত অল্প-অল্প পড়েন। দিনরাত স্কুলের কাজ করে অবসর পান না আর। এই তো আগস্টে একটা কিনলেন-আবার হয়তো ফেব্রুয়ারিতে একখানা কিনবেন।'

—'কিন্তু তবুও এ কাগজ কেনা উচিত নয় তাঁর।'

—'তা হলে আমার পড়া বারণ?'

—'তুমি পড়ো; কিন্তু আমাকে শোনাতে যেও না--'

—'খবরের কাগজে কাজ করেছি বলে সব খবরের কাগজের প্রতিই আমার একটা মোহ আছে অঞ্জলি? একটা ভালো আর্টিকেল দেখলে খানিকটা পরিতৃপ্তি পাই।'

—'ভালো আর্টিকেল মানে?'

—'আর্টিকেল-এর বক্তব্য বড় বেশি দেখতে যাই না; দেখি লিখবার রীতি।'

অঞ্জলি চুপ করে ছিল।'

বললাম—'এ কাগজে যদি আমার লেখা ছাপাতে পারি হয়তো পনের কুড়িটা টাকা দেবে।'

—'কী লেখা ছাপাবে তুমি এই কাগজে?'

—'অবিশ্যি রাজনীতি নয়-আরো কত রকম বিষয় আছে।'

—'লেখা পাঠালে এরা টাকা দেয়?'

—'লেখা ছাপালে দেয়।'

অঞ্জলি মাথা হেট করে নখ খুঁটতে-খুঁটতে, অবশেষে দ্বিধার সঙ্গে, 'দাও না পাঠিয়ে, যদি ছাপায়—'

একটু হেসে—'মাথা খুঁড়ে মরলেও ছাপবে না।'

—'কেন?'

—'বুঝবে যে, যে লেখা পাঠিয়েছে সে মানুষটির ঐকান্তিকতা নেই—নির্বোধ অবসাদে জীবন কাটাচ্ছে।'

সূচীপত্রে যান

অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে—'রবিবারের একটা দেশী কাগজও এনেছেন বাবা।'
—'আচ্ছা দেশী কাগজে লেখা ছাপাতে পাবলে টাকা দেয়?'
মাথা নেড়ে—'না।'
—'মাসিকে যারা গল্প লেখে তাবা টাকা পায়?'
—'পায় বোধ করি।'
—'কত?' .
—'এই কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ—'
—'তাহলে তুমি গল্প লেখো না—'
—'তা তুমি আমার চেয়ে ভালো লিখেতে পার।'
—'একথা তুমি বল কেন? আমি কি কোনোদিন লিখেছি?'
—'লিখবার রুচি আছে হযত তো তোমাব।'
—'তোমার নেই?'
—'না।'
—'আচ্ছা দেশী কাগজটায় থিযেটাবেব বিজ্ঞাপন দিযেছে?'
—'দেখি।'
—'কী দিযেছে?'
বিজ্ঞাপন দেখতে-দেখতে—'থিযেটাব মানে আজকাল টকি অঞ্জলি।'
—'কী টকি হচ্ছে?'
—'এই তো দেখছি চণ্ডীদাস হচ্ছে এক জাযগায—'
—'দেখেছ তুমি এটা?'
—'না।'
—'চণ্ডীদাসেব জীবনের ব্যাপাবটা কী?'
—'বামী বলে একজন রজকিনীব মেযেব সঙ্গে ভালবাসা ছিল।'
—'দু জনেই দু জনকে ভালবাসত?'
—'তাই তো বোধ হয—'
—'আচ্ছা পদাবলিব এই গানগুলো কি এই মেযেটিকে উদ্দেশ্য কবে লিখেছেন?'

—'মিলা হার্জলিসেব উদ্দেশ্যে গ্যযটে যে-বকম লিখে গেছেন, এ ঠিক সে জাতেব নয় অঞ্জলি। অথচ মিনার নামে সাদেব কবিতাগুলো পড়েই আমি তৃপ্তি পাই।'

—'কেন?'

—'সবল সাধু বিশ্বাসেব জীবন অনেক দিন হয হাবিযে ফেলেছি কি না। বাংলাব রূপকেও সব সময সবচেযে গভীর ও সুখেব বলে মনে হয না। আমবা অত্যন্ত চামাব হযে পৃথিবীব পথে ফিবছি—'

—'কিন্তু চণ্ডীদাস—'

—'আহা, কী যে সবল হৃদয ছিল মানুষটিব! বিধাতায শিশুব মত বিশ্বাস ছিল-নারীব প্রতিও; মানুষকে সব চেযে বড় বলে আখ্যাত কবে গেছেন। আমাব অনেক সময কিন্তু মনে হয একটা শালিখ বা চড়াইও অনেক মানুষেব চেযে ঢেব বড়—'

—'আচ্ছা, এই যে নাটক লিখে যাবা থিযেটাবে দেয তাবা পযসা পায না?'
—'যদি সে নাটক অভিনীত হয—'
—'কত টাকা পায?'
—'ঠিক আমি বলতে পাবি না; তবে—'
—'তুমি একখানা নাটক লিখলে পারো।'
কোনো জবাব দিলাম না।
একটু চুপ থেকে অঞ্জলি—'আবাব যে গম্ভীর হযে আছ? কী চিন্তা করছ?'
—'ভাবছি তুমি পুরুষ মানুষ হলে অনেক কিছুই কবতে পারতে; আমাকে দিয়ে কিছু হল না।'
—'এখানে কোনো টিউশনি পাওয়া যায?'
—'যে কটি পাওযা যায় তা স্কুলের মাস্টারদেরই একচেটে'—

সূচীপত্রে যান

—'স্কুলের মাষ্টারির জন্যও তো কত চেষ্টা করলে; থাক, আর চেষ্টা করে দরকার নেই। তারচেয়ে তুমি কলকাতায় কোনো কাগজে ঢুকতে পার না কি সেই দেখ।'

—'তাই চেষ্টা করব।'

—'ঝপ করে ওটা কী পড়ল?'

—'একটা ইঁদুর বোধ করি।'

—'মরে গেল না কি?'

—'না, পালিয়ে গেছে।'

—'ঘরে বড্ড বেশি ইঁদুর হয়েছে।'

—'দরমুশ দিয়ে মেরে ফেলতে পার।'

—'ছি, মেরে কী লাভ!'

—'কাল এক-আধটা ধরলে হয়।'

—'কেন?'

—'বেশ সাজা হবে তাতে।'

—'তাতে কি ওদের শিক্ষা হবে?'

—'যাতনা তো পেযে নেবে বেশ।'

—'এ-সব ক্ষুদ্র জীবদের যাতনা দিযে কী লাভ?'

—'বিধাতা তাতে অপ্রীত হবেন না।'

—'কী করে তা তুমি জানো?'

—'তুমিও কি তা জানো না! নিজের জীবনটার কথাই ভেবে দেখ না কেন?'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'বই ক-খানার জোগাড় দেখো তো।'

—'আচ্ছা।'

—'তুমি যা বলেছ তাইই ঠিক মনে হয়। নোটগুলোই পড়ব শুধু—কী বলো?'

—'হ্যাঁ, তাতেই সুবিধা।'

—'পাশ কবতে পাবব না?'

—'আশা-আকাঙ্ক্ষা কবতে দোষ কী?

—'কেমন যে উদাসীন তুমি।'

—'কেন?'

—'উৎসাহ দেবার নামগন্ধও নেই।'

—'তোমার হৃদযেই তো যথেষ্ট বযেছে।'

—'এই বলেই তুমি খালাশ?'

—'বইও এনে দেব বইকি।'

অঞ্জলি বিছানার এককোণে মাথা কাত কবে—'আচ্ছা আমাব জীবনটাকে কলে ধবা ইঁদুবেব মত বললে কেন?'

—'তেমনি বেদনা পাচ্ছ বলে মনে হয।'

—'কলের ইঁদুরের মত?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা আমাদের বেদনায় বিধাতা কষ্ট পান না?'

—'কলের ভিতরকার ইঁদুর দেখে শিশুরা কি কষ্ট পায?'

—'বিধাতা কি তেমনি না কি?'

—'সৃষ্টির নিদারুণ বেদনা ও নিষ্ফলতার চারদিকে তার আকাশ আলো-জলেব প্রসন্ন শিশুব মত হাসি দেখে সেই কথাই তো মনে হয়।'

—'আমাকে টেক্সট ও নোটগুলো কিনে দিতে হবে শিগগিরই।'

—'আচ্ছা।'

—'কী করে কিনে দেবে?'

—'বাবাকে বলব।

সূচীপত্রে যান

—'তিনি যদি বিরক্ত হন।'
—'আমার আংটিটাও বিক্রি করতে পারি।'
—'ছি, বিয়ের আংটি-কেন বেচবে?'
—'তুমি পাশ করে মাস্টারি করলে না-হয় আব-একটা গড়িয়ে দেবে।'
—'কিন্তু এব সঙ্গে একটা স্মৃতি মিশে বয়েছে যে।'
—'কিসেব স্মৃতি, অঞ্জলি?'
—'বাঃ আমাদেব বিয়েব!'
—'তা না-হয় আব-একটা বিয়ে কবা যাবে—আর-একটা আংটি পাওযা যাবে।'
—'কে আব একটা বিয়ে কববে?'
—'আমি।'
—'কাকে?'
—'অন্য আব-একজন মেযেকে—'
—'তা তুমি যা খুশি করো-'
—'কবব বই-কি, করাই তো উচিত। প্রেম জিনিশটাকে না বুঝে পৃথিবীব থেকে বিদায নেওযা কি ভাল?'
—'তা তুমি যা খুশি তাই বলো,' একটু চুপ থেকে, 'তুমি মনে কবেছ আব-একটা বিয়ে কবলেই প্রেমেব সাক্ষাৎ পাবে।'
—'প্রেমেব সাক্ষাৎ পেযে তবে তাকে বিযে কবব।'
—'এমনই যদি বুঝেছিলে, তাহলে অপ্রেম নিযে আমাকে বিযে কবলে কেন?'
—'আমি তো অপ্রেম আনি নি।'
—'ও, আমি বুঝি এনেছিলাম?'
একটু চুপ থেকে—'আমি মবলে পর তবে বুঝবে।'
—'কী বুঝব?'
—'বুঝবে যে দ্বিতীয বাব বিযে কবা কত বেদনাব জিনিশ।'
—'কেন, বেদনা কিসেব অঞ্জলি?'
—'আমি যে চাব বছব তোমাব সঙ্গে কাটিযে গেলাম এ স্মৃতি ইহজীবনেও মুছে ফেলতে পাববে না। দ্বিতীয কোনো নাবীব দিকে তাকানোও তোমাব পক্ষে সম্ভব হবে না। স্মৃতিই তো আমাদেব ব্যথা দেয, বাধা দেয।'
—'যে স্মৃতি বিবস তা ব্যথা দেবে কেন?'
—'কিন্তু আমাব স্মৃতি বিবস বলে মনে হবে না তো তোমাব?'
—'হবে না?'
—'সেদিন বুঝবে এ চাব বছব কত মমতায ভবে বেখেছিলাম আমি-প্রেম থাকুক আব নাই থাকুক—নাবীব অভিমান ও অহঙ্কাব এই বকমই।'
—'একশটা টাকা পেযেছি আমি অঞ্জলি—'
কাত হয়ে শুযেছিল, হয তো ঝিমুচ্ছিল, চোখ মেলে উঠে বসে চোখ বিস্ফাবিত করে বললে—'কী হযেছে?'
—'কিচ্ছু না।'
—'আ, বড্ড ঘুম আসছিল।'
—'ঘুমোও আবাব।'
একটা হাই তুলে ভুরু কুঁচকে—'টাকা পেযেছ?'
—'স্বপ্ন দেখলে না কি?'
—'কত টাকা পেযেছ বল?'
—'আলোটা আনো।'
—'এখানে আনতে হবে?'
—'হ্যাঁ, এই বিছানাব উপবই নিযে এসো।'

লণ্ঠনটা বিছানার উপরে রেখে—'ঘুমের চোখে শুনলাম একশ টাকা পেয়েছ-ফাঁকি দিচ্ছ না তো?'

—'আচ্ছা তুমি ক্ষেপেছ অঞ্জলি। একশ টাকা পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কখনো?'

—'তা হলে হয় তো ঘুমের চোখে নিজেব মনেই কী না কী শুনলাম; আচ্ছা, এ-রকম ঘুমের ভিতরেও টাকার কথা মনে হয় কেন?'

—'আমারও তো মনে হয়।'

.—'দীনতা আমাদের অনেক দূর পৌছেছে।'

—'তাই তো দেখছি।'

খানিকটা শূন্য, খানিকটা লুব্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি—'মাগো, আমার মন সায় মানছে না। স্বপ্ন আমি দেখি নি; তোমাকেই আমি বলতে শুনেছি।'

—'কী বলেছি?'

—'একশ টাকা পেয়েছি বললে।'

একটু হেসে—'ঘুমিয়ে-ঘুমিযে যখন শুনছিলে তখন লাখ টাকাব কথাই বা শুনলে না কেন? ছি, তোমার বড্ড ছোট নজর অঞ্জলি।'

—'স্বপ্ন আমি দেখি নি তো। আমি নিজেব মুখেই তোমাকে বলতে শুনেছি। আমি বেঁচে আছি এ যেমন সত্য, শুনেছি যে তাও তেমনি সত্য। টাকা পেযেছ ভালই; যে যারটা উপভোগ কববে; পরেরটায় কে ভাগ বসাতে যাবে! টাকাব বেলা স্ত্রী তো মানুষেব পব।' বলে বিমুখভাবে মুখ ফিবিয়ে বইল। খানিক ক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে—'কে পাঠাল টাকা?'

অন্ধকারের ভিতর চুপ করে ছিলাম।

—'তোমার বাবা তোমাকে দিয়েছেন?'

—'না।'

—'তবে বাইরের থেকে কেউ পাঠাল বুঝি?'

কোনো জবাব দিলাম না—

—'আমার বাপের বাড়িব থেকে পাঠিযেছে না কি? আমার নামে?'

—'না, তোমাকে কেউ পাঠায নি।'

একটা শূন্য নিঃশ্বাস ফেলে অঞ্জলি—'তা আমি জানি; বাবা মরে যাবাব পব আমাব খবব নেওযাব মতো লোক কেই-বা আছে পৃথিবীতে।'

চুপচাপ বসে রইলাম দু জনে।

অঞ্জলি—'শ্রীবিলাস চলে গেছেন?'

—'কোথায়? নাগপুরে? না।'

—'এখানেই আছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনিই টাকাটা দিলেন বুঝি তোমাকে?'

—'না, শ্রীবিলাস কেন দেবে? আমিই বা নিতে যাব কেন?'

একটু চুপ থেকে—'তাও তো ঠিক।'

খানিক নিস্তব্ধ থেকে—'শুনেছিলাম চন্দ্র তো এখানে নেই।'

—'না, সে চলে গেছে।'

—'যে-বকম ভালবাসা তোমাদেব দু জনেব, সেখান থেকেই পাঠাল বুঝি?'

—'কে? চন্দ্র? না—সে পাঠায নি।'

—'টাকাটা কি তা হলে আকাশ থেকে পড়ল?'

একটু হেসে—'অনেকের কপালে তাও তো পড়ে। কিন্তু আমাদের কি সে রকম কপাল আছে?'

—'আচ্ছা কলকাতায় খবরেব কাগজে যখন কাজ করতে তখন কি কিছু মাইনে বাকি ছিল তোমার?'

—'না তো।'

—'ঠিক মনে আছে তোমার?'

—'ঠিক।'

—'টিউশন তো মাসে-মাসে করতে?'

সূচীপত্রে যান

—'হ্যাঁ।'
—'কেউ টাকা ফেলে রাখে নি?'
—'না।'
—'কোথাও শেয়ার কিনেছিলে?'
—'না।'
—'কেউ টাকা ধার নিয়েছিল?'
—'মনে তো পড়ে না।'
—'লটাবিতে চার আনাব টিকিট কিনে পাঠিযে দিযেছিলে না কি? এখানে বসে লটাবি খেলছ?'
—'এইবার থেকে পাঠাব ভাবছি।'
—'টাকাটা তবে কোথেকে এল?'
—'ঘুমোচ্ছ না কি?'
—'না, ভাবছি-'
—'কী, ভাবছ?'
—'ভাবছি তুমি যদি টাকাও পাও তাহলেও আমাব ব্যক্তিগত কোনো লাভ নেই।'
—'কী রকম?'
—'তা তোমাব নিজেব উপভোগের জিনিশ শুধু।'
—'আমাব বিছানার চাদবেব দিকে তাকালেই আমার জীবন উপভোগেব কথা বুঝতে পাববে। তোমার চাদব-বালিশ কাপড়-চোপড় আমার চেয়ে ঢের পবিষ্কার-জীবনটাও খানিকটা পরিপাটি। কী বলো তাই না অঞ্জলি?'
—'নাও-টাকাটা দাও—'
—'তোমাকেই দিতে হবে?'
—'তবে আবাব কার কাছে দেবে?' হাত বাড়াল।
পকেট থেকে বজনীকান্তব চিঠিটা বেব কবে—'এইটে পড়ে দেখো।'
—'কী, এ তো নোট নয।'
—'না।'
—'চেক্?'
—'না। একখানা চিঠি।'
—'আমি তোমাব কাছে একশ টাকা চেয়েছি।'
—'চিঠিখানাই আগে পড়ে দেখো না।'
মনোযোগ দিযে চিঠিখানা পড়ে অঞ্জলি—'এতক্ষণ আমাকে বলো নি কেন? তুমি লাক্ষাব ব্যবসায ছিলে?'
—'না।'
—'একশ টাকা ওকে ধার দিয়েছিলে বুঝি?'
একটু চুপ থেকে—'না, তাও দেই নি।'
—'এই যে লিখেছেন।'
—'ও ভুল লিখেছেন।'
—'আবার রং কবতে আবম্ভ কবলে বুঝি?'
—'না, এ বেলা আমি ঠিকই বলছি।'
—'কিন্তু এ হাতেব লেখা তো তোমাব নয।'
—'হাতের লেখা বজনীকান্তব।'
—'এ-রকম ব্যবসাযী লোক সজ্ঞানে এ-বকম ভুল করবেন?'
—'করেছেন তো।'
—'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'
—'আসে যায না কিছু তাতে।'
—'টাকাটা কোথায়?'

সূচীপত্রে যান

—'দিচ্ছি।'

—'আরো ছত্রিশ টাকা পাঠাবেন তো—'

—'তাইতো লিখেছেন।'

—'সেটাও আমাকে দিতে হবে।'

—'পাঠালে দেব বইকি।'

—'এ টাকাগুলো আমি আমার কাছে রেখে দেব।'

—'দিও।'

—'দরকার মত খরচ করব। আমার কতকগুলো দবকাবি বই কিনব।'

—'বই তো ছেলেদের কাছ থেকে পেতে পার।'

—'যদি না পাই? আর তোমার জন্য একটা স্কট ইমালশন কিনতে হবে।'

—'আমার জন্য?'

—'হ্যাঁ, কী চেহারাটা হয়েছে তোমাব; একটা টনিক না খেলে চলবে না তো। আমাব মনে হয মাঝে-মাঝে তোমার জ্বর হয।'

—'একটা থার্মোমিটার কেনো।'

—'তা কিনব বইকি। তোমাকে দুটো-দুটো বালিশ তৈরি কবে দিতে হবে, আব একজোড়া কাপড় কিনে আনতে হবে তোমার জন্য। একেবাবে অমানুষের মতো দিন কাটছে যে।'

—'জুতো?'

—'জুতো ছিঁড়ে গেছে তোমাব?'

—'হ্যাঁ—'

—'আচ্ছা, ছত্রিশ টাকা এলে তা কিনে দেওযা যাবে।'

একশ টাকা দিলাম।

পরদিন অঞ্জলিকে [দিযেই বোধকবি] দেখলাম আমার কাপড়, শার্ট, নিজেব কতকগুলো বই, নোট, একটা শাড়ি, নাগরাই একজোড়া, ভাল সাবান, পাউডাব ও আমাব কডলিভাব অয়েল ইমালশনটা পর্যন্ত এনে হাজির।'

দুপুববেলা খাওয়া-দাওযাব পর নিজেই দুধ এনে ইমালশন তৈবি কবে আমাকে খাওযাল।

মাথা হেঁট কবে নিস্তব্ধ হয়ে ভাবছিলাম।

তাকিয়ে দেখলাম থার্মোমিটাব নিয়ে এসেছে। আমার টেম্পাবেচাব দেখছে। টেম্পাবেচাব অবিশ্যি সাতানব্বই ডিগ্রি উঠল।

—'কত টাকা খরচ হল অঞ্জলি?'

—'বেযাল্লিশ টাকা শোযা সাত আনা—'

—'তোমার জন্য একটা টনিক কিনেছ?'

—'আমার জন্য আবার কী?'

—'বাঃ, তোমারই তো দবকাব-সন্তান হবার পব থেকে সেই যে সূতিকা ধবেছে, কিছু হজম হয না, দড়ির মতো চেহারা হয়ে গেছে তোমাব, যে দেখে সেই আক্ষেপ কবে, পযসা ছিল না, আমি এতদিন চুপচাপ করেই ছিলাম-আজ আমাকে একটু আক্ষেপ কবতে দাও অঞ্জলি-বিকেলে বেড়িয়ে ফিববার সময একটা টনিক নিযে আসব।'

—'আমি যদি না খাই?'

—'তবুও আমি আনব।'

—'এনে পযসা নষ্ট করবে?'

—'পযসা নষ্ট হবাব ভযে-ভযেই ওষুধটা তুমি খাবে।'

অঞ্জলি মাথা হেঁট করে ছিল।

—'জীবনের সুস্থতা ও আনন্দকে আমরা চিনি না; কিন্তু পযসাকে তো চিনেছি। ওষুধটা খেলে শবীব ভাল হবে, শরীর ভাল হলে পৃথিবীটাও খানিকটা ভাল লাগবে, এ-সব বিচার আমবা বিলাসীদেব জন্য রেখে দিয়েছি। কিন্তু পযসা দিযে ওষুধ কিনে সেটাকে পচে যেতে দেখলে টাকার বেদনা আমাদেব কামড়ে আর আস্ত রাখবে না; না খেযে ওষুধেব শিশি ফেলে রাখার জো আছে আমাদেব?'

একটু চুপ থেকে—'আচ্ছা এনো টনিক; কিন্তু এত দুধ পাবে কোথায়?'

—'না হয় জল দিয়ে খেও।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে অঞ্জলি—'ঐ জামাটা দেখেছ?'

—'কোথায়?'

—'ঐ যে খাটের ওপর-শাদা খদ্দরের ওপর সবুজ-সবুজ ফুল কাটা?'

—'ওটা, খুকির জামা নয়?'

—'হাঁ-দেড় বছর বয়সের সময় এই জামাটা পরে সারা ঘর সে হেঁটে বেড়াত।'

—'কাঁদছ?'

—'আমার কাছে কত লজনচুশ চেয়েছে-দিয়েছি শুধু অনাদব আব অক্ষমতা; মাঝে-মাঝে চুবি কবে এনে এক-আধ টুকরো গুড়। আজ যখন এত জিনিশের ব্যবস্থা হচ্ছে তখন সে নেই। লক্ষ্মীটি, দেখো তো গিয়ে ঐ জামাটার ভেতর সে আছে কি না।'

চুরুটের ছাই, ধুলোবালি, ছাবপোকার বক্তমাখা আমাব বিছানাব উপব সাবাদিন সে উপুড় হয়ে পড়ে বইল।

সাবাটা দিন।

যেখন জেগে উঠল, তাকিয়ে দেখল জামাটা নেই সেখানে আব।

-[?] ডেলোরোজা যখন বিছানায় পড়েছিল, ধীবে-ধীবে জামাটা তুলে আমি আমাব বাক্সেব এক কোণে বেখে দিয়েছি। বাতে সবাই যখন ঘুমিযে থাকবে-মাঝে-মাঝে জামাটা খুলে এক-একদিন দেখব আমি; জীবনে এই এক গভীব ঐশ্বর্য বযে গেছে।

দু-তিন দিন পবে।

অঞ্জলিব একখানা বই-এব মধ্যে এই দুখানা চিঠি পেলাম।

দুখানা চিঠিতেই তারিখ দেওযা আছে, আট দশ দিন আগেব তাবিখ।

প্রথম চিঠিখানা অমলেব।

লিখেছে ঃ

তোমাব সঙ্গে প্রাযই তো দেখা হয—যখন খুশি তখন যেতে পাবি—কথাও অনেক দূব পর্যন্ত চলে।

কিন্তু তবুও এক-একটা ব্যাপাবকে আশ্রয কবে মানুষেব হৃদয মাঝে-মাঝে কেমন নিস্তব্ধ হযে উঠে—বড় নিগূঢ় হযে দাঁড়ায। সেই জন্যই মানুষ ডাযেবি লেখে; কবিতা লেখে; চিঠি লিখবাব প্রযোজন বোধ কবে। পৃথিবীতে অনেক গভীব বচনাব ইতিহাসেব পেছনেও...।

মুখে না বলে তোমাকে আজ আমি লিখছি তাই।

এ চিঠিখানা পড়ে তুমি কি বিস্মিত হবে—দুঃখিত হবে—কিংবা আঘাত পাবে? যদি পাও তাহলে আমাকে ক্ষমা কবো। অনেক বিবেচনার পব তোমাকে আমি লিখিছ। কযেকদিন সাবাবাত জেগে-জেগে বিচাব কবেছি, বসে-বসে একটুও ঘুম হযনি আমাব। আমাব পিতাকে দাহ কববাব জন্য নিয়ে যাবাব সময় তাকে মৃত ছাগল ভেড়া কুকুরেব স্তূপেব ভিতব ফেলে বেখে যাবাব আইন যদি আমাব উপব জারি হয, তাহলে মন যেমন বিচলিত হয, হৃদযেব শেষ লঘুত্বটুকুও বাষ্পেব মতন মিলিযে যায যেমন, সমস্ত বিরুদ্ধতাকেও উপেক্ষা কবে মন যেমন তাব গভীব আন্তরিক সম্বন্ধ নিযে প্রস্তুত হযে পড়ে, তোমাকে চিঠি লিখবার আগেও হৃদয আমাব সেই নিবিড় আশীর্বাদেব আস্বাদ পেযেছে। সেই আস্বাদেব ভিতব থেকেই এই চিঠিখানার জন্ম।

আমি নিবৃত্তিকেই ভালোবাসি; বযস আমাব ত্রিশেব কাছাকাছি হযে এল প্রায; কিন্তু মনের স্থিরতা আমার সত্তর বছব বযসের মানুষের মত, তাবই মতন, মনে হয, আকাঙক্ষাব সমস্ত বংই চেনা হযে গেছে যেন।

অখাদ্য মাংস খেযে উঠবার পর মনটা যেমন বিগড়ে থাকে, নিবপবাধ বৈরাগীর মুখ দেখতে ভাল লাগে, তাঁর গান শুনে আনন্দ পাওয়া যায, তাঁব একতাবা।

এ জীবনের পথে চলতে দিযে আমার অবস্থাও হযেছে তাই। মনে হয যেন পূর্বজন্মে বক্তমাংস নিযে যথেষ্ট যথেচ্ছাচাব হযে গেছে-এই জন্মে তাই হৃদয় জীবনের অন্য আব-এক পিঠ দেখবার অবসর পেল।

কোন পিঠ বড়, কোন পিঠ ছোট, আনন্দ ও সৌন্দর্যের পাদপীঠই-বা কোনটা সে সব বলবার ভরসা আমি রাখি না। এই শুধু বলতে পারি যে জীবনের পথে এবাব কোনো উত্তেজনা নেই, ধুলা কাঁকরেব দীর্ঘ অবৈধ পথে হেঁটে রক্তাক্ততা নেই, সে সব চিন্তা ও কল্পনা মাথার ভিতব কৃমিকীট জন্মায় নি। আমি আছি—আমার লম্বা ছিপছিপে আর্যাবর্তের সন্ন্যাসীর মতো এই শরীরখানা, তাই বলে কেদারেব পথে হাঁটবাব কোনো প্রবৃত্তি নেই, যদিও ছাদে পাইচারি করেই বুঝি—আমি রয়েছি, ঘাস রয়েছে, উষা বযেছে, আকাশ রযেছে, নক্ষত্র রযেছে; বিধাতাকে বিশ্বাস না কবেও মনের শান্তি নষ্ট হয় না, প্রার্থনা না করেও মৃত্যুকে জয় করবার জন্য কোনো অমৃত রচনা করবার দরকার হয না, অন্ধকারে একদিন ফুবিযে যাব যে, এই জেনেই ঢের গভীর আশ্বাস।

নিশ্চিন্তিকেই ভালবাসি আমি। কিন্তু এই যে চোখের সামনে দিনবাত ছেলেদের দেখি—শ্রাবণ রাতের—কী বলব? ব্যাঙেব মতন? হ্যাঁ, ব্যাঙের মতনই—শ্রাবণ রাতেব প্রান্তরের ভিতর ব্যাঙের মতন তৃষ্ণা ও আসক্তির জয়গান গাইছে একবার, অতৃপ্তি ও বেদনাব পবাজয়েব তিক্ততায় তীব্রতায় কলরব করে উঠছে আরেকবার। এদের আমি ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। হয়তো এরাই সত্য-আমিই মিথ্যা।

সত্য কী জানা বড় কঠিন।

কিন্তু তবুও শ্রাবণের কান্তারে প্রান্তরে পুকুরের পাড়ে, ধানক্ষেতে, উলুঘাসের ভিতর বর্ষার অবিরাম তীব্রতা ও বাদলের মর্মস্পর্শী কুয়াশার ভিতর ক্ষুধা ও খেদ, অধীবতা ও ব্যথা নিয়ে যে-জীবন—যে-জীবনপথের উপর আদিম যুগেব চুম্বন রয়েছে, মধ্যযুগেরও, আধুনিক যুগেবও, সেই জীবনেব পথে কোনোদিন চলি নি আমি, চলবার রুচি নেই আমার। এর আগে কোনো নাবীকে আমি চিঠি লিখি নি, এক সেই মেদিনীপুরেব কমললতা ছাড়া। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে কোনো নারীব সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক নেই আমার। কোনো বৈধ সম্পর্কও নেইঃ অনেক আগেই আমাব বিযে হওযাব কথা ছিল—কিন্তু এখনো তো আমি বিযে করি নি।

চেহারার ভিতব আমার শ্রীহীনতা আছে বলে মনে কবি না। নিজেব চেহারাব জন্য আমি লজ্জিত নই। আমার মন বিচার-ও কল্পনাবিমুখ নয হৃদয় প্রেমহীন নয।

পৃথিবীতে মানুষের ভিড়েব ভিতব নিঃসঙ্কোচে অনেকবাব গিযে দাঁড়িয়েছি আমি; যতদিন বেঁচে আছি বার বাব গিয়ে দাঁড়াব আশা কবি- নিঃসঙ্কোচেই। আমি তাদেব মধ্যে গিযেছি বলে কেউ লজ্জা ও গ্লানি বোধ করে নি কোনো দিন। কিন্তু তবুও অনেক বাবই আমাব মনে হয পৃথিবীব পথে বাববার গিযে কী লাভ—যে-জিনিশ সত্য সুন্দর জীবনের প্রয়োজনে সবচেযে প্রিযতম ও নিকটতম এমন কোনো জিনিশকে নিযে...কিন্তু এ-বকম জিনিশ বড় একটা পাওয়া যায় না।

এক পেযেছিলাম সেই মেদিনীপুবেব ভিখিরিনীর মেযে কমলতাকে। যখন তাকে দেখি তখন তাব যক্ষ্মা হযেছে। কিন্তু তাই বলে রুগিব মতন বিছানায শুযে থাকত না সে। যাক, সে অনেক দিন হয মাবা গেছে।

আর-একবার পেয়েছিলাম আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা কুকুবকে। শীতেব বাতে বাস্তা দিযে ফিবছিলাম, এমন সময দেখি একটা মিশন হাউসের থেকে একটা কুকুরকে ঠেঙিযে বের কবে দেওয়া হচ্ছে। কুকুবটা বিলিতি নয অবিশ্যি—পথেবই একটা কুকুর। আমাকে দেখেও সে ভযে খ্যাক করে পিছিয়ে গেল; চোখেব দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাব পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা আক্রোশ বা বিষ কিছুই নেই আব-আছে অবলোকিতেশ্বরের মতো মর্মস্পর্শী করুণা ও কাতবতা। কুকুরটাকে কযেক পযসার বিস্কুট ও রুটি কিনে দিলাম-কৃতজ্ঞ।

আমি তাকে সঙ্গে কবে আমাব বাসায নিয়ে গেলাম, দিনবাত আমার বাসাযই থাকত, কুকুবটাব গলায বগলেশ দিতে ভুলে গিযেছিলাম, বগলেশ জিনশটা ভালও বাসি না আমি; একদিন কুকুরটাকে অনেকক্ষণ দেখতে পেলাম না; বাস্তায পাযচাবি কবতে-কবতে দেখি মিউনিসিপ্যালিটির একজন ধাঙড় কুকুরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে-মড়া যে তা বোঝাও যায না-কিন্তু শুনলাম বগলেস ছিল না বলে গুলি করে মারা হয়েছে।

আর-একবাব পেয়েছিলাম মায়ের এক ফটোগ্রাফ-মা অনেক দিন হয মারা গেছেন। বাবাব ঘরে তাঁর যে ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট আছে বরাবাব সেইটে দেখার অভ্যাস। কাজেই একটা পরিত্যক্ত বাক্সেব এক কিনারে এই ফটোটা—মা যবে বিয়ে করে এসেছেন তখন, সেই সময়কার একটা ফটো—ফটোটা যখন পেলাম তখন মনে হল ঠিক এই জিনিশই আমি চেয়েছিলাম; জীবনপথের এই সংগ্রহটা আমার খুব

ভাল হল। যথেষ্ট সাহায্য ও সমবেদনা পাওয়া যাবে, সান্ত্বনা ও শান্তি। আর-একবার লাভ করেছিলাম আমাব ছোট বোন-তিন বছব বয়সের সময় সে মারা যায়-তার একজোড়া ছোট্ট জুতো; ঘবের এক কোণে অন্ধকারে খাটের নীচে অনেকদিন হয পড়ে ছিল, প্রায় দশ বছব, ধুলো-ময়লায বিরস, মাকড়সা ও পোকার বাসা, জুতো, না দুটো মরা ছুঁচো, তখন দেখে বুঝবাব জো নেই। কিন্তু ঝেড়েপুঁছে আলোর ভিতব এনে যখন বাখলাম তখন অনেকখানি লাভ হল। ঐ ঐশ্বর্যও চিবকাল আমার সঙ্গে থাকবে। দেখলাম, তাবপর এই বিশ বছব পবে, তোমাকে।

তোমাকে দেখলাম। আমার মাযের ফটোগ্রাফটা, মেদিনীপুবেব সেই কমললতা, সেই কুকুরটা, আমার বোনের জুতো জোড়া, তোমাকে দেখে জীবনেব এই সব বিগত জিনিশ আমাব ভেসে যায নি, কিংবা অর্থহীন হযে ওঠে নি, তাদেব সান্ত্বনা ও সৌন্দর্য আবো ঢেব বেড়ে গেছে বলে মনে হয।

কাজেই তোমাব মূল্য যে কত অকৃত্রিম গভীব ভাবেই বুঝতে পাবি আমি তা।

তুমি বলতে পারো, সবই তো শুনলাম, তুমি আমার কাছে আসছ-যাচ্ছ, কথা বলছ, বেশ এই রকমই থাক না কেন। আমি তোমাকে বাধা দিচ্ছি না। এ-বকম ভাবে চিঠি লিখবাব দবকাব তবে?'

এই সব তুমি বলতে পারো।

না, তুমি বাধা দিচ্ছ না; যখন খুশি তোমার কাছে যাচ্ছি; অনেক দিন দূব থেকেও তোমাকে দেখতে পাই কার্তিকের সন্ধ্যাব ধূসবতাব ভিতব পল্লীর দুঃখিনী রূপসীব উনুনেব খানিকটা নবম ধোঁযাব মত শাড়িব আঁচল তোমার ধীবে-ধীবে অন্ধকারে মিলিযে যাচ্ছে।

ঠিকই এই রকম যদি দেখতে পাবতমা চিরকাল—তা হলে এ চিঠি লেখাব প্রযোজন বোধ কবতাম না হযতো। কিন্তু জীবনের অন্ধ ব্যবস্থা বড় কঠিন; ভবিতব্যতা কাউকে কারো কাছে বেশিক্ষণ বাখতে দেয না; হৃদয ও হৃদযেব ভিতব যে, সামান্য সূত্রটি ব্যবধানের মত আছে, দেখতে-দেখতে তা সমুদ্রেব মতন অলঙ্ঘ্য ও ক্ষমাহীন হযে দাঁড়ায।

মানুষেব জীবনেব এই বীতি। অঞ্জলি, তুমি কি জানো না? নিশ্চযই জানো। হযতো তুমি বলতে পারো—অধীর হযো না, একটু শান্ত হযে অপেক্ষা করো। এই মানুষেব যত ব্যবধানকেই তাবপব একদিন স্বাভাবিক ও নিবাপদ বলে মনে হবে। এই বকম ব্যবধান হযে গেছে বলেই শান্তি বোধ কববে, আনন্দ পাবে; জীবন যে-বাস্তায চলে তাব নিগূঢ় মানে বুঝতে পেবে তাকে ক্ষমা কববে, ভালবাসবে এই বকম বলতে পাবো তুমি।

তোমাব আগেও অনেকে অনেককে এই বকম কথা বলেছে। আমি নিজেও অনেক সময ভাবি-জীবনে যখন এত অদ্ভুত জিনিশই ঘটে গেল তখন এই বকম বিপর্যযেব মুহূর্তও যে না আসতে পাবে তা তো নয।

একদিন হযতো এই বিপর্যযই হবে।

কিন্তু তবুও সেই শীত, [সেই] অন্ধ সমুদ্রেব দিকে তাকিযে শান্তি পাব না সেদিন, আনন্দ পাব না; জীবনেব ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত কবে নেবাব কোনো পথ খুঁজে পাব না।'

আমি তোমাকে বলি অপেক্ষা কবে, বিবেচনা কবে—এক দিন নয অনেক দিন বসে—আমাব এই কথাগুলো ভাল করে উপলব্ধি করে দেখো তুমি।

তুমি ভাবতে পাবো, বলতেও পাবো আমাকে, বেশ তো, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমরা যা আকাঙ্ক্ষা কবি সবই কি পাই? পাওয়া উচিত নয। অন্ধকারে মাথা হেঁট করে নিস্তব্ধ ভাবে চলে যাওযাই তো ভাল, অনেক দূবে চলে যাওযা। ভাল শুধু নয-তা খুব সুন্দর। আমার নিজেবও অনেক সময ইচ্ছা করে এই রকম স্নিগ্ধ উদাস পথে চলতে-চলতে অঘ্রানেব বিকেলে নবম ম্লানতাব মধ্য দিযে পৃথিবীর থেকে ফুবিয়ে যাই। এই রকম কথা সব বলতে পাবো তুমি।

যদি বলো, অসত্য বলবে না। অনেক মানুষ জীবনেব একান্তে গিযে এই বকম নিস্তব্ধ ভাবে দিন কাটাচ্ছে। তাদের বেদনা সুন্দর। কিন্তু তবুও অনেক সময তাদের নিস্তব্ধতা বড় স্থূল হযে ওঠে, কাদাব ভিতব শূযোরেব মত নিজেকে নিযে বড় ভযাবহ প্রতারণাব খেলা কবে তাবা।

আমার কেমন ভয করে।

আমি বড় দ্বিধা বোধ করি। শেষ পর্যন্ত এই পথেই কি ছেড়ে দেবে আমাকে?

তুমি হযতো বলতে পারো-আমাকে কেন খুঁজে বাব কবলে তুমি? (আমি কি জানি না আমি কত অন্ত:সারশূন্য?) তুমি হযতো আজ জানো না। কিন্তু একদিন বুঝবে—শিগগিবই বুঝবে একদিন সব।

ফুটো হাঁড়ির মত আমিই-বা তখন কোথায় যাব? তুমিই-বা যাবে কোথায়?

নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখি নি বটে কোনোদিন; কিন্তু চোখ বুজে হোক, মাথা হেঁট করে হোক এদের পরিচয় ঢের পেয়েছি আমি। একজন সুন্দরীকে দেখে—তার কথাবার্তা অভিমান ও আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করে আমার কেবলই মনে হয়েছে এই যে এর রক্তমাংসের পেছনে যে হাড় ক-খানা খটখট করছে একদিন চিতায় শুয়ে বেরিয়ে পড়বে যা সব, আজও যেন এর সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ, আত্মতৃপ্তি-যাকে এ প্রেম বলে, আনন্দ বলে, মমত্বের ভিতর থেকে সেই জিনিশই ফুটে বেরুচ্ছে শুধু; আমি ধারণাই করতে পারি না যে এর ভিতর অন্য কিছু আছে। বাস্তবিক, একদিন আমি এদের দেখে ক্ষুধাব উত্তেজনা মাঝে-মাঝে অনুভব কবেছি শুধু, কামনার কষ্ট পেয়েছি, অন্ধকারে অবাক হয়ে ভেবেছি এই হাড় ক-খানার এত বিক্রম? যেদিন সে-বিক্রমকে পরাজয় করতে পেরেছি সেদিনও শান্তি পাইনি। যেদিন পরাজিত হয়েছি সেদিন লাথি খাওয়া ঘেয়ো কুকুবেব মত জীবনেব মাটির পবিমাণের দিকে তাকিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছি। কিন্তু তোমাব সঙ্গে তো এতদিনেব পবিচয়, কোনো অন্ধকার রাতে তোমার হাড়ের কথা মনে হয় নি, তোমার জিভ বের কবে দেহকে জয় করবাব কোনো কথা উঠে নি, তাব কাছে পরাজিত হবার কোনো প্রশ্নও মনে জাগে নি। তোমার কথা মনে করলেই মনে হয়েছে জীবনে মাটির পরিমাণ ঢের কাম্য-হয়তো তখন মাটি ফুরিয়ে গেছে, জীবনটা কিছুতেই কোনো মুহূর্তেই মৃতপ্রায় কুকুরের মত শিঁটিয়ে পড়ে থাকতে পারে নি আর। সম্ভবত আশ্বিন কিংবা কার্তিকের বিকেলের প্রসন্ন টানের মত আমাদের দুজনেব জীবন, কিংবা চৈত্রেব সন্ধ্যায় আঙিনার অপরাজিতার জঙ্গলেব মধ্যে দুটো জোনাকির মত; চারদিকে তাদের অন্ধকাব ও শিশিরেব শান্তি, নিরপবাধ শান্তি; জীবনে এব চেয়ে বড় কথা নেই আর।

তুমি বলতে পাবো নিবপরাধ হল কী কবে? তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে [যাওয়া] যদি নিরপবাধ হয় তা হলে জীবনে অপধার কিছু নেই আব, এই বলবে তুমি।

আমাদের সেই সংসারেব মানুষদের আগাগোড়া ইতিহাস যদি বিচার কবে দেখি সেই আদিম কাল থেকে, বুঝব একটা কুৎসিত মাকড়াসার মত শূন্যের ভিতব দিয়ে ঘুরতে-ঘুবতে আমাদের জীবন-প্রণালী ভেসে চলেছে। এ জীবনপ্রণালীকে আমি কোনোদিনও শ্রদ্ধা করি না যদিও ব্যক্তিগত মানুষের বেদনা ও ক্ষতির কথা কী করে লঘু করা যায়, অনেক সময়ই নিঃসহায়ের মত ভাবি তাই। কিন্তু আমার কোনো কৃতকার্যে কারো ক্ষতি বা ব্যথাব বোঝা বাড়াচ্ছি আমি-আমাব বা তোমাব জীবন সম্পর্কে এ বকম ব্যবস্থা নিয়ে কিছুতেই তৃপ্ত থাকতে পারব না; যে-শান্তিব কথা বলেছি আমি তা আমাব নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই তোমার অভাবে তোমাব স্বামী যদি ক্ষতি ও বেদনা অনুভব করেন-অপর্যাপ্ত ক্ষতি ও ভূলুণ্ঠিত বেদনা—তাহলে এ জিনিসেব এই দিকটাকে বিচাব করে দেখতে হবে বই কি।

তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও তাকে আমি উপলব্ধি কবে দেখেছি।

'তুমি শুনলে হয়তো ব্যথিত হতে পার, হয়তো হবে না—কিন্তু আমি বুঝেছি, তিনি তোমাকে নিয়ে অতৃপ্ত। আমাব মুখে এ কথা শুনে তোমার অভিমান হতে পারে, অহঙ্কারে বিক্ষুব্ধ হতে পারো তুমি, খানিকটা সময়ের জন্য অত্যন্ত বিমুখ হয়ে উঠতে পারে তোমাব [মন] আমার প্রতি কিন্তু তবুও তোমার সঙ্গে এই চাব বছরের সম্পর্ক বেখে বিয়ের আগের সেই বিশুষ্ক জীবনেব কোনো সজীব আশাপ্রদ রূপান্তব হয়েছে বলে তাঁর মনে হয় না।

তা হবেই বা কী করে? তুমি তার জন্য নির্মিত হও নি—তিনিও তোমাব জন্য না। দেখেছি বাইবের ঘরে ঠেলে দিয়েছ তাঁকে, যে বিছানায় তুমি শোও সেখানে বিবাহেব পব ছ মাস মাত্র শুয়েছিলেন তিনি, ঝাড়ু হাতে রোজ তাঁকে নিজেব ঘর ঝাঁট দিতে দেখি, নিজেই বিছানা পাতেন, নিজেই কাপড় কাচেন, জামার বোতাম লাগান, ছেঁড়া জামাও সেলাই কবতে দেখেছি তাঁকে। তোমার মেয়েটি যতদিন বেঁচেছিল সেও তার বাবার কাছে থাকত। দেখলাম বিচ্ছিন্ন থাকতেই ভাল লাগে তোমার; জীবনেব নিষ্ফলতাকে একবার বোঝা বলে মনে হয়, একবার মনে হয়, সুন্দর বিমর্ষতা। যখন স্বামী কাছে আসেন বিষণ্ণতাও তোমাব কেমন স্থূল হয়ে ওঠে যেন। দিনান্তের অশ্বত্থের ভাঙা ডালে চাপা পড়া একটা বিকীর্ণ করবীর শাখার মত যখন সরে যান স্বামী, বিমর্ষতা তোমাব রূপের মত মর্মস্পর্শী হয়ে ফুঠে ওঠে। বিগত জীবনের স্বপ্ন দেখ তুমি। যা হয় নি, হল না, হয়তো হবেও না কোনোদিন—তাও হবে, কোনো-না-কোনোদিন হবে এই মিথ্যা আশ্বাসে কাল কাটাও তুমি।

তোমাদের দু জনের সম্বন্ধ এই রকম।

তোমার স্বামী সেদিন এই কটা লাইন পড়ে পড়ে আমাকে শোনাচ্ছিলেনঃ

I having a wife.....says she.

দেখলাম, তৃপ্তি তার আন্তরিক।

তোমারা যদি ইংলণ্ডের দিনমজুরেব ঘরে জন্মাতে, তা হলে তোমাদেব দু জনেব অবস্থা হত ঠিক এই রকম।

কিন্তু এদেশে এই অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ কবে তোমরা আজীবন পবস্পরেব সাথী থেকে কাটিযে দেবে–ডগডগে লাল পাড়েব শাড়ি পরবে, সিঁদুর পববে, আলতা পরবে, শাঁখা ভাঙলে কষ্ট পাবে, নোয়াকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবে, অন্তঃপুরেব ভেতব স্বামীব নাম উচ্চাবণ কবতে লজ্জা বোধ কববে, বাইরে ঘোমটা ও নতদৃষ্টিকে নারীত্বের সবচেয়ে গৌরব বলে উপলব্ধি কবে চলবে, বারবাব শিহরিত হযে নিজেকে জননী বলে বুঝবে অথবা বিধবার থান পরবে, পাথবের থালে খাবে, আমিষ খাদ্য বর্জন করবে, একাদশী চলবে, তীর্থে–তীর্থে ঘুরবে। বুড়ো বযসে রুদ্রাক্ষ ও নামাবলিও কি গলায জড়াবে না? একটা মযনাও পুষবে বটে। তারপব বৃদ্ধ বিধবা মৃত্যুশয্যায় শুযে কবিরাজেব বড়ি গিলবে হযতো; একদিন খাটেব থেকে উঠে কুলেব আচার ও আমচুব খাওযার ব্যর্থ স্বপ্নে আজীবনের দাম্পত্যের সমস্ত ব্যর্থতা ভুলে যাবে তুমি।

তাই তো, তোমাদেব স্বামী–স্ত্রীব সম্পর্ক কাদাব ভিতব দিযে, ধুলোব ভিতব দিযে, অন্ধকাবেব মধ্যে, কাঁকর ও কাঁটাব পথ দিযে, সাপেব গর্ত মাড়িযে, বক্ত ও অশ্রু মুছতে–মুছতে সেই পথ বেযে–বেযেই তো চলেছে–সেই পথশেষের দিকে।

তোমাদেব শিশুটি মবে গেছে; সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে এত কথা লিখবাব প্রয়োজন বোধ কবতাম না আমি, কোনো কথাই লিখতে যেতাম না, তাব কুযাশাবাত অস্পষ্ট জীবনের প্রসন্ন বিকাশের পথে কাঁটার মত দাঁড়াতাম না এসে।

কিন্তু সে নেই।

তোমাব স্বামীও তোমাব জীবনে নেই।

তুমিও তাব জীবনে নেই আব।

এক নিকট সান্নিধ্যে থেকেও তোমবা দু জনে পবস্পবেব থেকে দূবে, যেন বহু দূবদূবান্তরে; দু জন তোমবা দুই বিচিত্র জগতে বাস কব; এক নক্ষত্রেব থেকে আব–এক নক্ষত্রে যাওযাও সহজ, কিন্তু তোমাদেব হৃদযেব ভিতব কোনো বিনিমযেব পথ নেই। এত কষ্ট দিচ্ছ কেন তাকে? তুমিও–বা কেন কষ্ট পাচ্ছ? মানুষ হযতো ভাল বুঝেই সব কাজ কবে; কিন্তু আকাশে–বাতাসে কাবা থাকে–তার সমস্ত শুভবুদ্ধি ও কল্যাণেব আকাঙক্ষাকে পণ্ড কবে দিযে যায–যেখানে সহানুভূতিব প্রত্যাশা কবে সেখানে গিযে দেখে শুষ্কতা। যেখানে ভালবাসা চায সেখানে পায অভিনয; সেখানে স্বপ্ন আকাঙক্ষা কবে সেখানে দেখে অবৈধ কলববেব হাট বসে গেছে–শেষ পর্যন্ত অসাব মাটি এসে সমস্ত জীবনটাকে ভবে ফেলতে থাকে।

মাটি এসে তোমাব জীবনটাকেও যে ঘিবে ফেলেছে অঞ্জলি, এ কথা ভাবতে গেলে দুঃখ পাওযাব কোনো জবাব খুঁজে পাই না আমি।

চলো, কোনো এক প্রান্তবে চলে যাব আমবা, গভীব বাতে সবুজ ঘাসেব নিঃশ্বাস চাবদিকে, মাথাব উপব কখনো–বা গাঙশালিখেব দল, কখনো শবতেব নক্ষত্র। সেইখানে বাসা বাঁধব আমবা—

চিঠিখানা এব পব বাস্তব ঘব–সংসাবেব হিসাব–নিকাশ নিযে ব্যস্ত।

সাড়ে তিনশ টাকা সম্বল কবে অমল আপাতত এই নাবীটিকে নিযে চলে যেতে যায; দু–চাব মাসেব মধ্যে সাড়ে সাত হাজার টাকা আশা কবে; ভবিষ্যতে আরো দেড় লাখ টাক প্রাপ্তিব সম্ভাবনা বাখে।

অঞ্জলিব এই সুন্দব স্বপ্ন—তাব ভিতবেও এত টাকা–পযসার হিশাব? চিঠিখানার শেষের দিকটা মনকে বড় পীড়া দেয। প্রেমের পথে চলতে গিয়ে এত হিশেবেব হুচোট বাদ দিলে হত না কি? বললে হত না কি—সবই তো বলেছি—এখন চলো।

কিন্তু নারীব কাছে বড়–বড় অঙ্কেব হিশাবই যে সবচেযে সুন্দব জিনিশ, এই প্রেমিক ছেলেটি তাও জানে।

অঞ্জলির চিঠিখানা ঃ

ভাই অমল,

তোমাব চিঠিখানা পড়েছি। পড়েই এর এক উত্তর লিখে বেখেছিলাম, কিন্তু তুমি সেদিন আসনি—কাজেই তোমাকে তা দিতে পাবিনি। সে চিঠিখানা তারপব আমি ছিঁড়ে ফেলেছি; সে চিঠিখানা পেলে বড্ড আঘাত পেতে। মানুষকে আঘাত দিয়ে কী লাভ? বিশেষত তোমাব মত মানুষ, যাব দেড় লাখ টাকাব পৈত্রিক বিষয়ই শুধু নেই, বিচার-কল্পনাও বেশ আছে, লিখবার শক্তিটুকুও বেশ মানানসই।

বাস্তবিক শত চেষ্টা করেও তোমার মত লিখতে পারব না আমি। কবিব মত লেখ নি তুমি; লিখেছ হিস্টোবিযানদের মত; অবিশ্যি রদ্দি হিস্টোবিযানদের কথা বলছি না আমি—ফ্রুড নয়, কার্লাইলও নয়-ধরো যেমন গিবন, কিংবা মমসেন। আমাব মনে হয, লিখবার অভ্যাস বাখলে, খুব পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতাব সঙ্গে এ জিনিশ অনুশীলন করলে, বেশি বযসে তুমি কযেক ভলিউম চমৎকার ইতিহাস বেখে যেতে পারবে-ধরো, আমাদের দেশেব বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে কিংবা মুসলমান আমল, কিংবা মাবাঠি আমল সম্বন্ধে।

তোমার চিঠিখানা সম্বন্ধে আমি ভাবছি।

তুমি আমাকে অনেকবাব পড়তে বলছে; অনেক দিন বসে, অনেক দিন অপেক্ষা কবে উত্তর জানাতে বলেছ।

তোমার এই অনুরোধটুকু আমাকে রাখতে হবে। তুমি অনেক কথা লিখেছ—অনেক ভাববাব কথা; আমবা কল্পনা ঢের কম; উপলব্ধিও দুর্বল-তোমাব এ চিঠিখানাব নানা রকম প্রশ্নের উত্তব দিতে ঢেব দেবি লাগবে। তবে একটা কথা ঠিক। জীবনটাকে যদি গোলকধাঁধাব মত মনে হয কোনোদিন, তাহলে বুঝব সুন্দর শুভ কাম্য ও সহানুভূতিব পথ নিযে অমল দাঁড়িযে আছে—তাকে ডাকলে হয।

ডেকে বলব শতখানেক টাকার দবকাব, ধাব দিতে হবে, শোধ দিতে একটু দেবি হযে যেতে পারে কিন্তু অমল। কিংবা তুমি ততদিনে ডাক্তাব হযে বেরুবে, বলব, আমার স্বামীব এই-এই অসুখ, তোমাকে একটু বিনে পযসায দেখে দিতে হবে।

আশা করি প্রীত হযেই এমন করবে তুমি।

কিন্তু তবুও ভবিষ্যৎ তোমার জীবনে কোনো রূপান্তব আনবে বলতে পাবি না।

তুমি কোথায থাক তাই-বা কী কবে জানব।

আমার শুভ আশীর্বাদ জেনো।

ইতি
অঞ্জলি

আপাত দেড় লক্ষ টাকাব লোভ ছেড়ে দিযেছে অঞ্জলি; তাবও চিঠিব বাকি কথাগুলো তাব অভিমানেব কথা-অভিনযও নয, আন্তবিকতাও নয। কেন এমন অভিমান কবল অঞ্জলি? দাবিদ্র্য ও নারীত্ব নিযে অহঙ্কার-অভিমান আমাদেব এ দেশেব এক ধবনেব গৃহস্থবধূদেব খুব ভাল লাগে। হয়তো এ চিঠিখানা লিখে বালিশে মুখ গুঁজে সে অনেক কেঁদেছে অমলকে ভালবেসে, আমাকে ঘৃণা করে না, নিজেব নিঃসম্বল সংসার ও অজেয নারীত্বের আড়ম্বরে।

দুদিন পরে রজনীকান্ত খাসনবীশের একখানা চিটি পেলামঃ

ভুল-প্রমাদ সকলেরই হয। আমাবও তাহা হইযাছে। আমি কাগজপত্র পুনবায নাড়াচাড়া কাবতে গিযা দেখিলাম তোমাকে যে একশত টাকা মানি অর্ডাব কবিযা পাঠাইযাছি উহা আমার ত্রুটি বশত প্রেরিত হইয়াছে। লাক্ষার ব্যবসা সম্পর্কে যাহার নিকট একশত টাকা ধাব করিযাছিলাম সে অন্য ব্যক্তি। তুমি নও। তোমার একখানা পুরানো চিঠি আমাব দলিলপত্রের ভিতব মিশিয়া যাওযাতে—এবং বৃদ্ধ বযসে অনেক রাত্রি জাগিয়া কাজকর্ম করার দরুণ—কোনো কর্মচারী না থাকায—এই রকম প্রমাদ মাঝে-মাঝে যদি ঘটে তাহাতে বিস্মিত বা অপদস্থ হইবার কিছু নাই।

তুমি পত্রপাঠ সম্পূর্ণ টাকাটা পাঠাইযা দিযা বাধিত করিবা। কোনো বাধা করিবা না। বিলম্ব হইলে মহাজনী কারবারেব খানিকটা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

কিমধিকমিতি
বংশবদ রজনীকান্ত খাসনবীশ

সূচীপত্রে যান

এ চিঠির অবিশ্যি আমি কোনো উত্তর দিতে গেলাম না। বেয়াল্লিশ টাকা সেদিনই অঞ্জলি খরচ করে ফেলেছে। আরো দশ-বার টাকা খরচ হয়ে গেছে। একশ টাকা কোথা থেকে পাঠাব আমি? পাঠালে প্রথম দিনই পাঠিয়ে দিতাম।

এখন রজনীকান্তকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীবিলাসের বইখানা নিয়ে নিজের ঘরে বসেছিলাম।

বাবা এসে—তোমার একখানা চিঠি দেখলাম।'

—'আমার?'

—'হ্যাঁ-তোমারই তো।'

—'কোথায়?'

—'কেন পিয়ন তোমাকে দেয় নি?'

—'ওঃ, পোস্ট অফিসের চিঠির কথা বলছেন?'

—'রাস্তায় পিয়ন আমার কাছে দিয়েছিল-আমি তোমার কাছে দিয়ে আসতে বললাম।'

—'হ্যাঁ। সে চিঠি আমি পেয়েছি।'

—'পোস্ট অফিসের চিঠি আমি পড়ে দেখলাম।'

—'ও, আপনি দেখেছেন বুঝি?'

—'রজনীকান্ত কে? কে তিনি?'

—'লাক্ষা-তিসি-চা নানা রকম ব্যবসায় তার—'

—'তার সঙ্গে তোমার চেনা হল কোথায়?'

—'কলকাতায়।'

—'কী সূত্রে?'

—'এক সময় কয়েক দিনের জন্য আমাদের মেসে এসেছিলেন তিনি-আমার পাশের ঘরেই থাকতেন। তখন আলাপ হয়।'

—'তার ব্যবসায়ে কখনো তুমি সংযুক্ত ছিলে?'

—'না।'

—'একশ টাকা ধার নিয়েছিলেন তিনি তোমার কাছ থেকে?'

—'না।'

—'এ টাকাটা তুমি তার কাছ থেকে কোনো উপায়ে উপার্জন করেছিলে?'

আবার মাথা নেড়ে—'না।'

—'কিছুদিন আগে তিনি তোমাকে একশ টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠিয়েছিলেন?'

—'ইনশিওর করে পাঠিয়েছিলেন।'

—'একশ টাকা?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোনো চিঠি লেখেন নি?'

—'কভারের ভেতরে চিঠি ছিল!'

—'কী লিখেছিলেন?'

—'লিখেছিলেন, কলকাতায় লাক্ষার ব্যবসা করবার সময় বছর আটেক আগে আমার কাছ থেকে যে-একশ টাকা ধার নিয়েছিলেন এখন তা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।'

—'কিন্তু এ ত তাঁর হিশেবপত্রের ভুল?'

—'হ্যাঁ।'

—'টাকাটা পেয়ে তা হলে পাঠিয়ে দিলে না কেন?'

চুপ করে ছিলাম।

—'টাকাটা কোথায়?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'টাকাটা আমাকে দাও। আজই আমি পাঠিয়ে দেব।'

—'সে টাকা তো অনেক খরচ হয়ে গেছে?'

বাবা একটু বিস্মিত হয়ে—'কে খরচ করল?'

—'আমিই।'

একটু চুপ থেকে-'বৌমাকে দিয়েছিলে তুমি? সেও জানে তোমাব যা-পাওনা নয় সেই জিনিশই তাকে তুমি খরচ করতে দিয়েছ?'

—'না, তা সে জানে না।'

. বাবা তারপব খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, 'কী কিনেছ?'

—'অঞ্জলি কয়েকখানা বই কিনেছে।'

—'কীসের বই?'

—'বই ঠিক নয়, নোট, বি-এ পড়বে—'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে, 'এই শুধু-আর-কিছু কেনা হয় নি?'

—'না, প্রায় ষাট টাকার মত খরচ হয়ে গেছে।'

—'যে-টাকাটা তোমার উপার্জিত নয়, তা দিয়ে, সেটা, এ-রকম করে খবচ করতে গেলে কেন তুমি?'

একটু চুপ থেকে—'আর কী কিনেছ?'

—'কাপড় দু জোড়া।'

—'কার জন্য?'

—'আমাব জন্য।'

—'পাট ভেঙেছ?'

—'না।'

—'তা আমি ফিরিযে দেব।'

—'এক জোড়া জুতোও কিনেছি।'

—'তোমার জন্য?'

—'আমার জন্য, অঞ্জলিব জন্যও একজোড়া।'

—'ব্যবহার কবা হয়েছে?'

—'না।'

—'ফিবিযে দিতে হবে।'

—'শাড়িও পবে নি বোধ কবি, কিনেই বাক্সে বেখে দিয়েছি।'

—'এই সমস্তই গুছিযে আমার কাছে দিতে হবে। আমি বিকেলেই ফিবিযে দিযে আসব সব।'

মাথা হেঁট করে বসেছিলাম।

—'বাকি যে-টাকা বৌমার কাছে বেখেছ তাও এনে দিতে হবে আমাকে, আমি কালই রজনীকান্তকে মানিঅর্ডাব কবে পাঠিয়ে দেব।'

বিকেলে বাবা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে স্কুল থেকে ফিরে এলেন। কিছু না-খেযে কাউকে কোনো কথা না বলেই বেরিয়ে গেলেন।

অনেকটা রাত করে ফিরে এসে আমাকে ডেকে, 'শোনো।'

তাঁর ঘরে গেলাম।

—'জিনিশপত্র এনে গুছিয়ে রেখেছ সব?'

মাথা নেড়ে, 'না।'

—'বৌমার কাছে বাকি টাকাটা চেয়েছিলে?'

—'না, তাও চাইনি।'

—'ভালই করেছ। আমাব ভয হচ্ছিল, তোমাকে বলে যাই নি, হয়তো চেয়ে বসবে। যাক, কোনো দরকার নেই। বৌমাব কাছ থেকে তুমি শাড়ি বা টাকা ফিরিয়ে আনতে যাও নি যে, ভালই হয়েছে। যদি আমার নাম করে ফিবিযে আনতে সে আঘাত এই বুড়ো বয়সে আমি কখনো ভুলতে পারতাম না।

—'কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'

—'লোন অফিশে!'

—'কেন?'

সূচীপত্রে যান

—'আরো শতখানেক টাকা ধার কবতে হবে তার ব্যবস্থা করে এলাম।'

—'আবার ধার করবেন?'

—'ভয় নেই তোমার! সমস্তই আমি শোধ দিযে যাব। তোমাদের ঘাড়ে কিছু ফেলে যাব না। তিন হাজার টাকা ঋণ ছিল, এই পনের বছর বসে ষোল শ করে দিয়েছি, বাকি দিল চোদ্দ শ, বজনীকান্তর এই এক শ নিযে আবার হল দেড় হাজার, আমার বযস এখন বাহাত্তর-আমি আট-দশ বছরের মধ্যেই এ টাকাটা শোধ করে দিতে পারব।'

—'আরো আট-দশ বছর কাজ করবেন আপনি?'

—'বৌমা কোথায়?'

—'রান্নাঘরে।'

—'রাঁধছে?'

—'খাচ্ছে হয তো।'

—'তুমি খেযেছ?'

—'না।'

—'যাই, আমিও খেতে যাই। স্কুল থেকে এসে আব-কিছু খাওযা হয নি। সকাল বেলা শকুনের মত আমি যে-সব কথা বলেছিলাম বৌমাকে বলেছ না কি?'

—'না।'

—'খববদাব। কোনোদিনও বলো না-এ বুড়ো বযসে আমি তা হলে বড্ড কষ্ট পাব।'

—'অন্ধকাবেব মধ্যে বেবিযে পড়লেন?'

—'না, লণ্ঠন লাগবে না।'

—'বৃষ্টি পড়ছে যে।'

—'এই তো বান্নাঘবে গিযে উঠলাম বলে।'

বজনীকান্তব আর-এক খানা চিঠিঃ

তুমি মনে কবিযাছ আইন অনুসাবে কোনো স্টেপ না নিলে তুমি টাকা পাঠাইবে না। ভাবিযাছ হযতো আইনেব সুব্যবস্থা আমার হাতে নাই-তোমাকে টাকা পাঠাইযা দিযাছি, সঙ্গে তোমাব নিকট আমাব ধাব স্বীকাব কবিযা একখানা চিঠিব দলিলও দিযাছি-অতএব তোমাব কাজ সিদ্ধ হইযা গিযাছে। তাহা তুমি ভাবিতে পাব বটে, তোমার উকিলও তোমাকে নানা বকম কুপবামর্শ দিবে। কিন্তু তবুও জানিও পৃথিবী এত সহজ জাযগা নয। পবের বিষয হস্তগত কবিযা খাইতে গিযা রাজামহাবাজাবা কুপাকাত হইযা গেল, তুমি চুনোপুঁটি হইযা আমাব চোখে ধুলো দিতে চাও। সততাব কথা না-হয ছাড়িযাই দিলাম-বিবেক, চবিত্র, সাধুতা, ভগবান ও ধর্মের দোহাই দিযা তোমাদের মত মানুষের নিকট অনুবোধ-উপবোধ করিয়া কোনো লাভ নাই।

অন্য বহুবিধ অস্ত্র আমাব হাতে আছে। এই যে প্রত্যেকটি চিঠি তোমাকে লিখিতেছিঃ আমার বাঁ পাশে একজন পুলিশ অফিসার এবং দক্ষিণ দিকে একজন উকিল বসিযা-বসিযা প্রত্যেকটি চিঠির খশড়া স্ট্যাম্প দিযা রেজিস্টাবি কবিযা নিতেছে।

যাক, তোমার উপব অচিবেই নির্দয হইবার বাসনা কবি না। আবো কযেকদিন সময দিলাম। ইতিমধ্যে যদি আমাব প্রাপ্য এক শত টাকা না পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে আব কালক্ষেপ না করিযা আমাকে নিজেব হস্তেই আইন লইতে হইবে।

বজনীকান্ত খাসনবীশ

পবদিন লোন অফিস থেকে বাবা সন্ধ্যার সময় ফিরলেন।

—'টাকা পেযেছেন?'

—'না।'

—'দেবে না?'

—'দেবে বইকি।'

—'তবে?'
—'একটু ঘুবিযে দেবে আর-কি।'
—'কিছু মর্টগেজ রাখতে চায় বুঝি?'
—'হ্যাঁ, সেই রকমই ইচ্ছা; কিন্তু মর্টগেজ দেবাব মত কোনো জিনিশ তো আমাব নেই।'
—'কেন এই বাড়িটা?'
—'কত টুকুই-বা বাড়ি-আধা-আধি তো মর্টগেজ দেওযাই হযে গেছে।'
—'বাকিটা?'
—'তা হলে তোমবা দাঁড়াবে কোথায?'
বাবা দেওয়ালেব ওপর ছাযা ফেলে খানিক ক্ষণ-সেই ছাযার ভিতব থেকে সঞ্চাবিত মানুষেব মত বললেন—'না, তা হয না।'
—'আবার যে চাদর কাঁধে নিলেন?'
—'যাই, একটু তারিণীবাবুর কাছে।'
—'কেন?'
—'দেখি, কোনো বিলিব্যবস্থা হয কি না। এ বাড়ি আমি মর্টগেজ দিতে পাবব না। তা হলে তোমবা মাথা গুঁজবে কোথায?'
—'না খেয়েই যাচ্ছেন?'
কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর অন্ধকাবেব মধ্যে বাহাত্তব বছবের বুড়ো মানুষ বেবিযে পড়লেন সেই মাইল তিনেক দূরে তারিণীবাবুর বাসাব উদ্দেশে।
আমাকেও বেরুতে হয তা হলে।
আধঘন্টা পরে শ্রীবিলাসের আস্তানায গিযে হাজিব হলাম।
—'কী হে, বই ক খানা ফিরিযে দিতে এসেছ বুঝি?'
—'না, বই-এব জন্য না—'
—'বই রেখে দেবার জন্যে?'
—'না। ফিরিযে দিযে যাব।'
—'আমি ও-সব বই পড়িটড়ি না, তবু মিছিমিছি টাকাব মাল হাবিযে লাভ কী?'
—'তা তো বটেই।'
—'কাল সকালে এসে দিযে যেও।'
—'আচ্ছা।'
—'না যদি দাও, তা হলে আমাকেই মোটবে করে নিযে আসতে হবে।'
—'না। সে কষ্ট আব কববে কেন?'
—'করতে হয় মাঝে-মাঝে; দেনা-পাওনাব ব্যাপারে নানা রকম চামাবগিবি।'
—'তাই না কি?'
—'এ ক্ষেত্রে চামাব কিন্তু তুমি—'
—আমি—'কেন, আমি তোমার বই ঠেকিয়ে বেখেছি না কি?'
—'প্রথমত, জোর করে নিযে গেছ।'
—'জোর করে?'
—'আমাব দেবাব ইচ্ছা ছিল না তো।'
—'কই, তা তো বল নি।'
—'কেন, তুমি কি মানুষের মুড স্টাডি করতে পার না, সবই কি মুখ ফুটে বলতে হবে।'
—'ওঃ, সেই কথা!'
—'প্রথমে তো বই-এর কেস খুলতে চাইলাম না, তবু জোব করে খোলালে, তাব পর-'
—'যাক গে, আজ রাতেই না হয ফেবত দিযে যাব।'
—'চললে?'
—'হ্যাঁ চললাম।'
—'বই আনতে?'

—'হ্যাঁ ফেরত দিয়ে যাব।'

—'দিয়ে যাব বললেই তো হল না-আজ রাতেই চাই আমি।'

—'কেন, আজ তুমি চলে যাচ্ছ না কি?'

একটা পয়েন্টার দিয়ে জানালায় আঘাত করে শ্রীবিলাস-'সে কথা তো হচ্ছে না, আজ রাতেই বই চাই আমি।'

—'একখানা কবিতার আর দুখানা পলিটিকসের বই, না?' গুম হয়ে একবার আমার দিকে তাকাল শ্রীবিলাস।

—'বেশ বই; কবিতার বইখানা আমি পড়ছিলাম।'

পয়েন্টার দিয়ে জানালার গরাদে একবার আঘাত করল শুধু।

—'আচ্ছা যাই।'

অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু শ্রীবিলাসের কাছে এক শ টাকা ধার না পেলে কার কাছে পাব আর?'

মিনিট পনের পরে ঘুরেফিরে আবার এসে হাজির হলাম শ্রীবিলাসের কাছে-একটা নীল ঢাকনাওয়ালা উজ্জ্বল টেবিল ল্যাম্পের কাছে চুপ করে বসে-বসে সিগারেট খাচ্ছিল।

—'কে?'

—'আমি শচীন।'

—'বই এনেছ তুমি?'

—'না, এখনো আনি নি। এই তো তোমাদের বাড়ির কাছে বটতলায় দাঁড়িয়েছিলাম।'

একটা ঝাকুনি দিয়ে সিগারেটটা ঝেড়ে নিয়ে-'কী মতলব তোমার, বলো তো দেখি!'

—'আমি এসেছি এক শ টাকা তোমার কাছ থেকে ধার করতে।'

একটু হেসে—'তোমাকে বিক্রি করলেও এক শ টাকা পাওয়া যায়?'

—'বেশ, তোমার কাছে আমাকে বিক্রি করতেই রাজি আছি।'

—'বেশ, আমার জুতো বুরুশ করে দিতে পারবে?' পা বাড়িয়ে দিল।

একটু হেসে-'বুরুশ কোথায়?'

—'জুতোবুরুশকে তো তা বলে দিতে হয় না।'

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, আবার বসলাম।'

বললাম—'ব্যাপারটা কী হয়েছে শুনবে শ্রীবিলাস?'

—'কোনো দরকার নেই আমার শুনবার।'

—'শুনতে অবিশ্যি তুমি পারতে।'

—'কিছু দরকার নেই, আমি তোমাকে টাকা দেব না।'

—'আচ্ছা চন্দ্রর ঠিকানা কী বলতে পারো?'

—'চন্দ্র কে?'

—'চন্দ্র কে, চেনো না? স্কুলে পড়েছিলাম একসঙ্গে।'

শ্রীবিলাস একবার ভ্রূকুটি করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে—'আমি পড়িনি কোনোদিন।'

—'বাঃ।'

—'আমি নামও শুনিনি তার।'

—'চন্দ্র চৌধুরী।'

—'এখানে কি দালালি নিয়ে বসলে না কি?'

—'চেন না চন্দ্র চৌধুরীকে?'

—'ভদ্রলোকের মত কথা বললে তোমার কানে যায় না? চিরকাল মুখ খিস্তি শুনবার অভ্যাস বুঝি?'

—'যাক-এক শ টাকা তোমাকে দিতেই হবে।'

—'তোমাদের দুজনকে বিক্রি করে এর সুদও তো উঠবে না-'

—'দু জন কে?'

—'তুমি আর তোমার মানিকজোড়। তোমাদের ছেলেপিলে হয়েছিল?'

সূচীপত্রে যান

—'হ্যাঁ।'
—'কটি?'
—'একটি।'
—'সেই ছেলেটিকে আমাকে দাও-বাপের বদলে সেই না হয় আমার জুতো সাফ করে দেবে।'
—'ছেলে তো হয় নি-মেয়ে।'
শ্রীবিলাস কিছুক্ষণ চুপ থেকে—'আচ্ছা মেয়েটিকেও দাও।'
—'কী করবে তাকে দিয়ে?'
একটু হেসে—'বাড়িউলি বানাব।'
খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—'আমি তো বেশিক্ষণ বসতে পাবব না শ্রীবিলাস।'
—'এখনই উঠে যেতে পারো।'
—'টাকাটা আনো তা হলে?'
—'টাকা আমার পকেটেই আছে।'
—'দাও, আমি তোমাকে তিন-চার মাসে শোধ দিয়ে দেব।'
—'কত সুদ দেবে?'
—'কত চাও?'
—'মাসে আট টাকা কবে।'
—'আচ্ছা বেশ, তাই।'
—'গিন্নিকে ডাক দেই তা হলে?'
—'কেন, গিন্নি কেন-তুমি নিজেই দিতে পারো না?'
—'না, গিন্নির আসা দরকার।'
—'তিনি এসে কী কববেন?'
—'প্রথমত পরামর্শ দেবেন।'
—'আচ্ছা, এই ব্যাপারে তাঁব পরামর্শ নাই-বা নিলে।'
—'তা কি কখনো হয়? তার পর চাবিও তো তাঁব কাছে।'
—'বললে না পকেট টাকা আছে!'
—'এক শ টাকা পকেটে রেখে ঘুরব? আমি কি মর্গ?'
শ্রীবিলাস একটা শিস দিয়ে, হাত চাপড়ে, ডাকল-'ডালিং।'
দেখতে-দেখতে পাশের ঘবেব থেকে একটি লম্বা-চওড়া বিবাটকায় মেয়েমানুষ এসে হাজিব।
গায়ে পর্দার পর পর্দা রেশম শুধু-রেশমের দোকানই বাস্তবিক-মুখেব থেকে ঘামেব সঙ্গে মিশে পাউডার গলে পড়ছে-গলা ঘামে ও পাউডারে বীভৎস; বং মেটে ধরনের; সমস্ত শবীরটা মেদেব একটা বিরাট বেলুন-যে-কোনো মুহূর্তে দুই হাত ছড়িয়ে নক্ষত্রের দিকে যাত্রা করতে পাবে। মুখেব দিকে তাকিয়ে মনে হয়-রক্তমাংসের ব্যবহার এর খুব ভাল লাগেঃ আলো জ্বালিয়ে খাবাব টেবিলেব থেকেও বটে, বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে লুটিয়ে-লুটিয়েও তেমনি।
শ্রীবিলাস—'বসো অরুণা।'
—'না, বসব না।'
—'কেন?'
—'কিটিকে চিঠি লিখছিলাম।'
—'বাই দি ওয়ে, কিটির খবর কী?'
—'ওরা সব শ্বশুর বাড়িতে আছে।'
—'এই দুটিতে, না-হল পেঁয়াজ, না-হল পয়জার!'
—'ইনি কে?'
—'এক শ টাকা ধার চাচ্ছেন।'
—'কে? ইনি?'
—'হ্যাঁ।'

—'একে তুমি পিক-আপ করলে কোথায়?'
—'এই ঘবের মধ্যেই?'
—'এত রাতে!'
—'সিঁদেল চোব নয়! বা বার্গলার নয়।'
অরুণা চলে যাচ্ছিল।
শ্রীবিলাস—'দিলে না টাকা!'
—'তুমি ইচ্ছে করলে দিতে পারো-আমি দিতে পাবব না।'
—'তার মানে?'
খানিকটা ফিরে এসে অরুণা—'একে তো কোনোদিন চোখে দেখি নি আমি।'
—'আমি তো এই পনের মিনিট ধবে দেখছি।'
—'ইনি কী কাজ করেন?'
—'টাকা ধাব কবে বেড়ান।'
—'কোনো ব্যবসা আছে?'
—'এই তো ব্যবসা।'
একটা সিগাবেট জ্বালিযে নিয়ে চলে যাচ্ছিল সে।
শ্রীবিলাস—'প্রতি এক শ টাকায মাসে আট টাকা কবে সুদ দেবে।' অরুণা দু-তিন পা এগিযে এসে—'একশ টাকায আট টাকা সুদ দেবেন মাসে? বেশ, তা হলে এগ্রিমেন্ট লিখুন।'
কাগজপত্র আনা হল।
শ্রীবিলাস—'সিকিউবিটি কে হবে?'
অরুণা-'সিকিউবিটির দরকাব নেই; মর্টগেজ বাখলেই হল।'
শ্রীবিলাস-'কী, সোনাব ঘড়ি-টোনার ঘড়ি আছে তোমাব কাছে?'
—'না, বন্ধকি রাখবার মত্যে কিছু নেই।'
অরুণা—'বাড়ি ঘর-দোব?'
—'আচ্ছা, মোটবে করে না হয গিয়ে দেখে আসব সব।'
—'বাড়িঘব তো আমাব নয।'
—'কাব?'
—'বাঁধাও দিতে পাবব না।'
অরুণা সিগাবেটে এক টান দিযে—'এতক্ষণে তো কিটিব চিঠি শেষ কবতে পাবতাম।'
চলে গেল সে।
শ্রীবিলাসকে বললাম—'তোমার স্ত্রীব মেজাজ কিন্তু ঢেব শান্ত; সময তো অনেকটা নষ্ট হল হল; কিন্তু কই কাণ্ডজ্ঞান হাবালেন না তো।'
—'উঠলে?'
—'হ্যাঁ, চললাম ভাই।'
—'আমি তোমাকে একটা কথা বলি।'
—'কী বলো।'
—'অ্যানার্কিজমে ভিড়ে পড়ো।'
—'কেন, তাতে কী লাভ?'
—'একটা জবরদস্ত মার্ডাব করো।'
—'তার পর?'
—'তোমার মাথার পেছনে ৫০০ টাকা ডিক্লেয়ার্ড হোক।'
—'ও, সেই কথা।'
—'আমার কাছে এসে সারেণ্ডার করো। চারশ পঞ্চাশ টাকা ধার দেব তোমায।'
বড় মজার কথাই বলেছে শ্রীবিলাস-শুনে আমার পক্ষের থেকে হাসিটা আন্তরিকভাবেই ফেটে

সূচীপত্রে যান

পড়তে লাগল। শ্রীবিলাসের সঙ্গে একটু পাঞ্জা লড়তে গেলাম, সে আমাব হাত দিল জাহান্নম মচকে, টনটনে হাতটা নিয়ে অন্ধকাবের মধ্যে নেমে পড়ে দেখলাম, বেশ বৃষ্টি পড়ছে।

পর দিন সকাল বেলা খুব ভাল করে দাড়ি কামিয়ে, সাবান দিয়ে স্নান কবে, ঝাড়াঝাপটা হয়ে বাক্সেব নীচের থেকে ভাঁজ কবা লংক্লথের জামাটা বের করে গায়ে দিয়ে নিলাম। একটা চাদরের অবিশ্যি দরকাব! বাবার একখানা চাদর আছে বটে—কিন্তু ইস্কুলে বেরুবার সময় সেটা তাঁব লাগবে। মাব অনেক দিনেব পুবোন একখানা সিল্কের চাদব ছিল, ছিঁড়ে ফেঁড়ে যাওয়াতে অঞ্জলিব বাক্সেব এক কিনারে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু চাদবটা বেব কবে আমাব মনে হল ঢেকেঢুকে নিলে এ চাদব চলে যায়। একটু সতর্কতার সঙ্গে পবতে হয় বটে, পবে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়-অসাবধানতা, বাতাস, ফুর্তি কাউকে-কই বিশেষ আশকারা দিতে হয় না। চাদবটা গুছিয়ে নিয়ে পবা গেল।

শুনলাম কিছুদিন হল প্রতিমা এসেছে এখানে।

প্রতিমা আমার থেকে বছব তিনেকেব ছোট, এখানে মেয়েব স্কুলে একদিন সে পড়ত, সে আজ প্রায় বছব পঁচিশ আগেব কথা। সেই ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ কবে বেবিয়েছে তো প্রায় বাব বছব হল; আট ন বছর হল চাকবি করছে, ইনস্পেকট্রেস, বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমে। এখানে তাদেব জায়গা-জমি ঢেব আছে, সুন্দর একখানা দালান আছে; মাঝে মাঝে তাই সে আসে। বছব পাঁচেক আগে একবাব এসেছিল, তখন তাব সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

সকালবেলা আকাশটা ঢেকে আছে মেঘে। এই মেঘ-বৃষ্টি মাথায় কবে যাব কি না ভাবছিলাম-হয়তো এক ঝোড়ো কাক হয়ে গিয়ে উঠতে হবে। হয়তো বেচারি বাদলেব শান্তির ভিতব নিজের মনের সুন্দব খশড়া নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল এমন সময় এডগাব এ্যালেন পো-ব ব্যাভেন-এব মত গিয়ে হাজিব হবঃ 'নেভাব মোর!'

সন্ধ্যাব দিকেই গেলাম। আকাশ পবিষ্কাব। ভাদ্র মাস-চাবদিকে কেমন একটু নবম শবতেব আভাস, খালের কিনাবে ঘাসেব ভিতব সেই নীল ফুল; ইতস্তত ঘ্রাণ থেকে-থেকে ঘাসেব ভিতব ফেনিয়ে উঠেছে; উলুখড়েব ওপারে মাছবাঙা প্রিয়াবই বুঝি কেমন শূন্য বেদানাব কান্না, বিকেলেব শেষে পৃথিবীব ধান সোনালি, খড় বাদামি, খড় সোনালি, আবো ম্লান হয়ে পড়ে; অশ্বথেব পাতা খসে-থেকে-থেকে ছেলেবেলাকাব কথা মনে পড়ে যায়।

তাকিয়ে দেখলাম, মাঠেব বাঁ পাশে খানিকটা দূবে একটা মবা বাছুবকে ঘিবে কতকগুলো শুকুন।

ছেলেবেলাকার কোনো মৃত মুখেব স্মৃতির মত পঞ্চমীব জোৎস্না অনেক দূবেব বাঁশেব জঙ্গলেব পিছন থেকে ধীরে-ধীরে উঁকি দিচ্ছে। সে মুখ কি আমাবই? না, আমি যে-পৃথিবীকে ভালবেসেছিলাম, তাব? যাক-দুজনেই আজ মৃত।

আরো মিনিট-পনেব পরে প্রতিমাদেব দালানেব সিঁড়ি বেয়ে উঠে ধীবে-ধীবে খাশ কামবাব দবজায় ধাক্কা দিলাম। কোথাও কোনো জনমানব নেই; সিকি মাইল দূবে পর্যন্ত না। হিজলেব ডালপালাব ভিতব কয়েকটা ঘুঘু শুধু অনেকক্ষণ ধবে ডাকছে।

—'কে!'

—'আমি—'

ভিতব থেকে রুক্ষস্ববে জবাব এল—'তুমি কে?'

—'আমি শচীন-'

—'শচীন কে? মিস্ত্রি নাকি? আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, তুমি কাল সকালে এসো।'

—'না, আমি মিস্ত্রি নই।'

—'কাকে চাও?'

—'মিস সেন আছেন?'

—'আ, জ্বালালে দেখছি!'

—'ধীরে-ধীরে দরজা খুলে দিয়ে আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে প্রতিমা একটু অবাক হয়ে—'কে তুমি?'

—'যাক, আমাকে দেখে দু-হাত পিছিয়ে যাও নি-ঠিক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছো।'

—'আপনি কী চান?'

—'অন্ধকারের মধ্যে বুঝবে না; এই তোমাব বাবান্দাব এদিকে বেশ জ্যোৎস্না পড়েছে; এই দিকে এসো প্রতিমা, আমাকে তো চিনতেও পাবলে না-না পেরেছ?'

প্রতিমা অন্ধকারেব মধ্যেই দাঁড়িয়ে বইল।

—'আলোব ভিতরে একটু আসবে?'

নিস্তব্ধ।

—'বাবে, এ-রকম করে দাঁড়িয়ে আছো যে?'

—'অবাক হয়ে ভাবছিলাম কাব এত সাহস—'আমাকে নাম ধবে ডাকে।'

—'ভিতরেই এসো।'

—'এই বাবান্দায় তো বেশ জ্যোৎস্না ছিল।'

—'ভিতবেও বড় টেবিল ল্যাম্প আছে।'

—'এই তো কামিনী ফুলেব গাছের কাছে বেঞ্চ বয়েছে বাইবে, এখানেই বসা যাক, বেশ বড় বেঞ্চ, দু জনেই বসতে পাবব।'

—'না, ওখানে আমি কী করে বসি?'

—'কেন?'

—'তা বলতে পাবা যায় না-বাইরে বাস্তা দিয়ে কত লোক যাচ্ছে।'

—'কিন্তু ছেলেবেলায় এ বেঞ্চিতে কত বসেছি আমবা দু জনে, ঠিক এই বকম বাতে। কামিনী ফুলেব গাছে গোখবো আসে এই ভয়ে ঘেঁসতে চাইতাম না, তুমি জোব কবে বসাতে আমাকে; বলতে, পুরুষ মানুষেব এত ভয়। ভীরু ছিলাম, কিন্তু নাবালকও তো ছিলাম; পুরুষ মানুষেব দোহাই তুমি তখন না পাড়লেও পাবতে। এবই মধ্যে পঁচিশ বছর চলে গেলে প্রতিমা।'

নিস্তব্ধ।

—'এখন এখানে বসাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

এবাবও কোনো উত্তর দিল না সে।

—'আচ্ছা, তুমি না হয় এ বেঞ্চিব উপবে বসো, আমি একটু দূরে সবে ঘাসের উপব বসব।'

—'ভিতবে এসো, আমি কাজ কবছিলাম-উঠে এসেছি। এসো।' অগত্যা যেতে হল।

পিছনে যেতে-যেতে বললাম—'তোমাদেব বাড়িব আশেপাশে আধ মাইল দূরেও তো কোনো লোক দেখলাম না আমি। বাইবে বসলে কেই-বা দেখত।'

—'কেন, বামধনিয়াই তো দেখত।'

—'সে কে?'

—'আমাব বেযাবা।'

—'বেহারি বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে দেখলে এমন কীই-বা এসে যেত।'

—'তুমি বুঝতে পাব না শচীন, মর্যাদা অনেক জিনিসেই নষ্ট হয়; বিশেষত এই সব চাকববাকবেব সমানে আমাকে সব সময়ই বড্ড সতর্ক থাকতে হয়'-ঘবেব ভিতর ঢুকে একটা গদি-আঁটা চেয়াবে বসে প্রতিমা, 'বামধনিয়া—'

বামধনিয়া আসতেই প্রতিমা—'এই বাবুব জন্য একটা কুর্শি নিয়ে এসো তো—' আধ মিনিটেব মধ্যেই কুর্শি এল। বামধনিযা চলে গেলে চেয়াবে বসে—

—'আচ্ছা প্রতিমা—'

—'বলো—'

—'গদি-আঁটা চেয়ারে তুমি বসে নিয়ে তাবপব আমাব জন্য এই কাঠের চেয়াবটা আনাতে দিলে কেন?'

—'চাকরটাকে বুঝতে দিলাম যে তুমি আমাব সাব-অর্ডিনেট।'

—'আমি অবিশ্যি তোমার ডিপার্টমেন্টে কাজ করি না।'

—'এ নিয়ে কথা বললে কিছু লাভ আছে শচীন?'
—'না, লাভ অবিশ্যি কিছু নেই প্রতিমা।'
—'রামধনিয়া যদি আবার আমার ঘরের ভিতর ঢোকে—'
—'হ্যাঁ?'
—'তাহলে কিন্তু প্রতিমা বলে ডেকো না।'
জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম শিরীষগাছেব ওপব চাঁদ এসে উঠেছে-মুখখানা যেন এক বিমুগ্ধ দীন বধূর মত করে; কিংবা আমার মৃত সন্তানের মত।
—'রামধনিয়ার সামনে অবিশ্যি তোমাকে নাম ধবে ডাকব না প্রতিমা—'
—''মিস সেনও বলো না।'
—'না, কোনোকিছুই বলার দবকার নেই; এমনি কথাবার্তা বলব।'
ধীরে-ধীবে টেবিলের থেকে তুলে নিয়ে চশমা জোড়া চোখে এঁটে নিল প্রতিমা।
আমি-'বিনে চশমায়, অন্ধকারে, কী কবে চিনলে আমাকে তুমি?'
—'গলার আওয়াজে চিনেছিলাম।'
—'ওঃ।'
একটু চুপ থেকে—'চেহারা আমার বদলে গেছে বুঝি?'
—'হ্যাঁ, চেনা শক্ত।'
—'বৌ বলে, আমার থাইসিস হযেছে।'
—'বাস্তবিক, তোমার থাইসিস হযেছে নাকি?'
গদি-আঁটা চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল, স্প্রিঙের চশমা বুকের উপব ঝুলে পড়ল।
—'না, সে ভাবে, হযেছে। বাস্তবিক হয নি।'
—'হয় নি কী করে তুমি তা বুঝলে?'
—'জ্বর নেই। একটা ইমালশন এনে দিযেছে; কিন্তু আমি তার দবকার বোধ করি না—'
—'তোমাকে একটা কথা বলব শচীন—'
ধীরে ধীরে চশমা পরে নিযে—'যদি টিউবাবকিউলোসিস হযে থাকে তাহলে তো তুমি জানই তাব জার্ম কত সাংঘাতিক।'
—'তা জানি বই-কি—'
—'তা হলে এ ব্যারাম নিয়ে যেখানে-সেখানে যাওয়া তো তোমাব শোভা পায না।'
মাথা নেড়ে—'না। অবিশ্যি তোমাদের কাছে আসতে পারি।'
প্রতিমা ধীরে-ধীবে ঘাড় নেড়ে, 'না আমাদের কাছে না; আমরাও তো মানুষ।'
প্রতিমা যে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয সেটা সে এ-রকমভাবে মনে করিয়ে না দিলে সন্দিগ্ধ হতাম না।
—'তাও তো বটে প্রতিমা। কিন্তু তবুও মানুষের মনুষ্যত্বে সন্দিগ্ধ না হওযাই ভাল।'
—'তাহলে—'
—'অবিশ্য আমি উঠব না। এখানে একটু বসবাব জন্যই এসেছি। আমি ভালই আছি। তোমাব কোনো ভয় নেই প্রতিমা।'
—'মানুষকে মাঝে-মাঝে বড্ড দুর্দৈব সহ্য কবতে হয।'
—'তা হয় বই-কি; আমি চলে গেলে চেয়ারটা না হয স্টেবিলাইজ কবে নিও।'
—'সমস্ত ঘরটাকেই হাইজিনিক্যালি পরিষ্কার করে নিতে হবে।'
—'বেশ তাই নিও। ছেলেবেলা যে-সব দিন আমরা নিবপরাধ আনন্দে কাটিযেছি তাব স্মৃতিতে এইটুকু অন্তত, কারো।'
ব্যথিতভাবে আমার দিকে তাকিযে—'তারপর, কী জন্যেই বা এলে?'
—'শুনলাম তুমি এখানে এসেছ।'
—'কার কাছেই বা শুনেত পেলে?'
—'তোমার সন্ধান এ-কয় বছর আমি বরাবরই রেখেছি; তোমাদেব মালতী বলছিল, যে তুমি শিগগিরই আসবে।'
—'ও—'

সূচীপত্রে যান

—'প্রায ছ সাত বছর পরে এলে তো।'
মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ—'
—'এতদিন দেশে আস নি কেন?'
—'আমি মুসুরিতেই প্রায থাকি; গত বছর দার্জিলিং অব্দি এসেছিলাম-এ-সব দিক বড় একটা ভাল লাগে না।'
—'তোমার মা কোথায়?'
—'তিনি নৈনিতালেই আছেন; বীরুও সেখানে।'
—'তোমার মা তো অনেকদিন এদিকে আসেন না?'
—'না, তিনি আব আসবেন না।'
—'কেমন আছেন?'
—'ভালই। আমিও এবাব নেহাত এলাম এ জাযগাজমিগুলো বিক্রি করে ফেলব বলে।'
—'বারে, এই সব বিক্রি করবে? এমন সুন্দর দালানকোঠা, মাঠ, দিঘি
—'সামনের ঐ মস্তবড় মাঠটা-এটাকে প্রান্তব বলাও চলে প্রতিমা-এব জন্য যে আমি সমস্ত জীবন বিসর্জন দিতে পাবি! এই বাবান্দায় বসে ঐ প্রান্তরেব দিকে তাকিযে থাকা-দুপুরবেলায-এমনি জ্যোৎস্নারাতে—'
বাধা দিযে একটু হেসে—'কালিংপং-এ একটা বাড়ি করেছি, নৈনিতালে একটা, আলমোড়ায একটা, এ জাযগাজমি বিক্রি কবে দেব তাই।'
—'আমাব কাছে বিক্রি করো না।'
—'চল্লিশ হাজার টাকা দিলেই কবি।'
একটু চুপ থেকে-'তাহলে তোমবা এখানে আব আসবে না!'
মাথা নেড়ে—'না।'
—'দুঃখ কববে না?'
—'এখানে এসে যে কটা দিন রযেছি এতেই আমাব মবণান্ত হযে উঠেছে। তুমি বোঝে না, এ-সব দেশের ও মানুষেব স্বাদ আমবা অনেকদিন হয হারিযে ফেলেছি। এখানকার কিছুই ভাল লাগে না আমার।'
—'তোমাব জীবনেব পক্ষে এটা মস্ত ক্ষতি নয প্রতিমা?'
—'আমি তা মনে কবি না।'
—'বাংলাদেশের পাড়াগাঁকে তুমি নৈনিতালেব কাছে বিক্রি কবে ফেললে?'
—'তাতে আমার লাভই তো হল।
—'এই তুমি মনে কর প্রতিমা?'
—'আমি এখান থেকে পালাতে পাবলে বাঁচি যে!'
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ কবে রইলাম।
—'তোমাদের এ বাড়িটা কিনবাব শক্তি বিধাতা যদি আমায় দিতেন প্রতিমা!'
—'তোমাকে না-হয সাড়ে উনচল্লিশ হাজাব টাকায ছেড়ে দেব-কেনো-না।'
—'সাড়ে উনচিল্লশ পয়সাও তো আমার নেই।'
একটু চুপ থেকে—'একটু অপেক্ষা কববে?'
—'কিসের জন্য?'
—'এই পাঁচ-সাত বছর; তারপব এই বাড়িটাকে বিক্রি করো।'
—'তাতে আমার কী লাভ?'
—'তবুও মাঝে-মাঝে এ দেশে আসবে তুমি; তোমাকে—' একটু চুপ থেকে-'হ্যাঁ তোমাকে দেখতে পাবব আমরা।' মাথা নেড়ে-'সুদের টাকা কে আমাদের দেবে?'
—'কীসের সুদ?'
—'এই চল্লিশ হাজার টাকার কত সুদ হয ছ-বছরে?'
—'ও, সেই কথা ভাবছিলে তুমি।'
—'এ টাকটা যত তাড়াতাড়ি পাওযা যায় ততই ভাল, পেযেই লযেডস ব্যাঙ্কে রেখে দেব।'

সূচীপত্রে যান

—'তোমার সঙ্গে এখানে রামধনিয়া এসেছে শুধু?'
—'হ্যাঁ।'
—'এ বাড়িতে আর-কেউ নেই?'
—'না।'
—'বড্ড একা লাগে না তোমার?'
—'আমি তো দু-চার দিনের মধ্যেই পালিয়ে যাব।'
—'বাড়ি বিক্রির কোনো ব্যবস্থা ঠিকঠাক হল!'
—'হ্যাঁ, একজন মুসলমান জমিদার কিনবেন। কাল সকালেই তাঁর আসবার কথা।'
—'এসে কোথায় থাকবেন?'
—'এখানেই। টাকাটা পেলেই আমি চলে যাব।'
—'কালই টাকা পাবে আশা করছ?'
—'হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায় তা হলে আমি রওনা হব।'
—'ওটা কী ডাকছে?'
—'কই?'
—'ঐ যে শুনছ না?'
—'কী একটা পাখি—'
—'লক্ষ্মী পেঁচা বোধ করি। তোমাদের বকুলগাছে এসে বসেছে। অনেক কথা মনে পড়ে যায় প্রতিমা; সেই পনের বছর আগের-বিশ বছর আগের কথা সব।'

দেখলাম, সে আমার পাঞ্জাবির বোতামগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। বোতামগুলো নকল সোনার-কিন্তু সোনার মতই দেখাচ্ছিল হয় তো।

—'পাঁচ আনা দিয়ে কিনেছি।'
—'কী?'
—'এই বোতামগুলো।'
—'সোনার বোতাম নয়?'
—'না, গিল্টি।'
—'দেখাচ্ছিল কিন্তু সোনার মত।'
—'কয়েক দিন সে রকম দেখাবে বটে—'
—'মোটে পাঁচ আনা দাম?'
—'কী লিখছিলে?'
—'একটা আর্টিকেল।'
—'কী বিষয়ে?'
—'শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে।'
—'তুমি বিলেত থেকে এডুকেশন ডিগ্রি এনেছিলে?'
—'না, বিলেত আমি যাই নি; এখানকারই বি. টি।'
—'যাবে না কি?'
—''বিলেত! যেতে পারি। তবে ডিগ্রি আনতে নয়—'
—'তবে?'
—'বেড়াতে—'
—'কোন জায়গা ভাল লাগে তোমার?'
—'ইউরোপ? ফ্লোরেন্স, ভেনিস, রোম, জেনেভা, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড ঘুরতে পারি।'
—'হাইল্যাণ্ড ভাল লাগে না?'
—'স্কটল্যাণ্ডের কথা বলছ?'
—'হ্যাঁ, দেখবে কোনো এক দীর্ঘ হাইল্যাণ্ডার কোনো এক লেকের কাছে দাঁড়িয়ে বর্নি কাটছে হয় তো, নিরালা দুপুর কিংবা সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটা পিউইট পাখি কাতর ভাবে ডেকে যাচ্ছে হয় তো-কিংবা একটা দাঁড়কাকের অলস বিরস আওয়াজ; একটা গুউজ হয়তো হক হক গোব্যাক গোব্যাক

সূচীপত্রে যান

বলে চেঁচাচ্ছে-আর সেই কারলিউ পাখি, ইয়েটস-এর এক-একটা ছোট কবিতায় যার বিষণ্ণ আস্বাদ পাওয়া যায়-বাতাসে হয় তো সেই কারলিউ-এর নিরালা মর্মান্তিক গান ভেসে আসছে-আমাদের বিলদিঘির জলপিপির মত হয় তো অনেকটা; কিংবা কে জানে বর্ষার মাঠে বৃষ্টির কুয়াশার ভিতর মাছরাঙার অস্ফুট করুণ গলার মত হয় তো। এক হাঁটু ঘাসের ভেতর দিয়ে ওয়েড করে হাঁটতে হাঁটতে এই সব বেশ লাগবে কিন্তু—'

প্রতিমা মাথা নেড়ে—'না, এডিনবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে একবার দেখতে পাবি, কিংবা গ্লাসগোয়, তাছাড়া স্কটল্যাণ্ডে আর-কী আছে!'

—'নেই কিছু?'

—'না।'

—'কী জানি, এক-একটা বই-এ দেখি।'

—'স্কটরা নিজেদের তারিফ করে খুব লেখে। একটা শূন্য মরুভূমি ছাড়া ও-দেশে আর-কিছু নেই।'

—'শিশুর সাইকোলজি সম্বন্ধে লিখছ; ছাপাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায়?'

একটা ইংরেজি কাগজের নাম করল প্রতিমা।

—'শিশুদের খুব ভাল লাগে বুঝি তোমার?'

—'ভাল লাগা না-লাগার কিছু তো নেই এতে; তাদের সম্বন্ধে আমি গবেষণা করছি।'

—'ওঃ-এমনি একটা শিশুকে কেমন লাগে তোমার?'

—'এ সব প্রশ্ন করো না আমাকে।'

—'কেন?'

—'প্রশ্নগুলো বড্ড খাপছাড়া, আমার মনে হয় রুচিহীন, বলতে পারা যায় অবৈধ।'

—'তা ঠিক।'

—'এই আর্টিকেলটা আজকে আমাকে শেষ করতে হবে।'

—'ঐ আর্টিকেলটা তোমার? দু-দিনের জন্য এসেছ তাও এই সব লট-ঘট সঙ্গে করে?'

—'তা আনতে হয় বই-কি; তুমি টাইপ করতে জানো?'

—'জানি একটু-আধটু।'

—'আচ্ছা, আমার এই লেখাগুলো টাইপ করে দাও না।'

—'ক পৃষ্ঠা হবে?'

—'টাইপড পৃষ্ঠা তিনেক হবে বোধ করি; বার আনা পয়সা দেব।'

দেখলাম উৎকর্ণ আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখখানা গম্ভীর। বললে-পারবে না?'

—'না।'

—'কেন?'

—'তুমিই ভেবে দেখো।'

—'এর পর হয় তো বলবে পাঁচ সিকে!'

—'না, পাঁচ সিকে বড্ড বেশি হয়ে যায়—,' একটু চুপ থেকে, 'করলে আমি-বিনে পয়সায়ই করে দিতাম।'

সমস্ত শরীরে খানিকক্ষণ মোচড় খেয়ে নিয়ে—'আচ্ছা, পাঁচ সিকেই না হয় দেব। আমি নিজেও করলে করতে পারতাম; যাক-কেমন একটা আলসেমি ধরে গেছে। তা তুমিই করো; পয়সা পেলে তোমারও লাভই তো হবে।'

—'তোমার এ শুভ ইচ্ছার কথা কোনোদিন আমি ভুলতে পারব না প্রতিমা; কিন্তু-এ আমাকে দিয়ে উঠবে না।'

প্রতিমা একটু বিরক্ত হয়ে—'থাক। শেষে আমার সঙ্গে দর কষাকষি আরম্ভ করলে তুমি, তোমাদের এ দেশের মানুষ এ-রকমই হয়।'

—'না, দর কষাকষি করতে আমি একদমই চাই না।'

.—'তুমি হয়তো ভাবছ, এত কথার পর আমি তোমাকে দু টাকা ছেড়ে দেব!'
—'এই টাইপিঙের জন্য?'
—'হ্যাঁ।'
—'আমি এক পয়সাও চাই না—'
—'চাও না? দর দস্তর তো কবছ ফড়ের মতন? করছ না শচীন?'
—'তোমার-আমার সম্বন্ধের মধ্যে কোনোদিন.যেন কোনো মূল্যেব কথা না আসে প্রতিমা।'
খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ রইল।
পরে একটু হেসে—'আচ্ছা, বিনি পয়সাযই করে দাও তাহলে।'
—'বেশ তো, এক্ষুণি করে দিতে হবে?'
—'হ্যাঁ, ম্যানাসক্রিপ্ট প্রায় হয়ে গেছে। এসো, আমি ডিকটেট করি।' টাইপ বাইটাবের কাছে গিয়ে বসলাম।
প্রতিমা একটু হেসে বললে—'আচ্ছা থাক, তোমার করতে হবে না।'
—'কী হল?'
—'না, মানুষকে আমি বিনে পয়সায খাটাই না।'
—'সে তোমার দাক্ষিণ্য।'
—'কিন্তু দাক্ষিণ্য আমার দু টাকার ওপবে উঠবে না। তুমি যতই চাল দাও না কেন-এব ওপর চাব আনা পয়সাও আমি দিতে পারব না শচীন।'
চেযারটা সরিয়ে নিয়ে মাথা হেঁট করে—'আব-কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না প্রতিমা?'
—'কবে আবার?'
—'এমন কি কোনোদিন কি হবে না যখন আমি নৈনিতালে বাড়ি কবতে পারব?'
—'সে বিধাতার ইচ্ছা।'
—'যদি কবতে পারি, তাহলে কি তুমি নৈনিতাল থেকে সরে যাবে?'
—'না। কেন? তুমি কি আমাব শত্রু?'
—'আজ উঠি তা হলে!'
—'কেন এসেছিলে?'
—'একশটা টাকা ধার নিতে।'
—'এতক্ষণ বলো নি তো কিছু।'
—'এতক্ষণে বলেছি যে সেই জন্যই নিজেকে ধন্যবাদ-দেই। টাকাটা পেলে নিজেকে আশীর্বাদ করব-বুঝব যে এসব কথা একটু রযেসযেই বলতে হয-মানুষ হতে পেবেছি।'
একটু চুপ থেকে—'কেন ধার চাচ্ছ?'
—'মদ-গাঁজা কিছু খাব না-ভাল কাজই কবব।'
—'কিন্তু কালই তো আমি চলে যাচ্ছি।'
—'টাকাটা তোমাকে নৈনিতালের ঠিকানায পাঠিযে দেব।'
—'বসো।' আমি চাব আনা পযসা তোমাকে একবার দিযেছিলাম।'
—'কবে?'
—'সে প্রায কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা।'
—'তাই হবে। তাই নাকি? কিছু মনে নেই আমাব।'
—'বযেস তখন আমার সাত-কি-আট, দশ-পনের আনা পযসা শুধু জীবনের সম্বল।'
—'এত দরিদ্র তুমি ছিলে একদিন?'
—'হ্যাঁ। আট বছরের সমযে ছিলাম বই-কি। ভাল মনে কবে চাব আনা পযসা তোমাকে দিয়েছিলাম; কিন্তু সে পয়সা তুমি কোনোদিনও ফেরত দিলে না।'
—'দেই নি বুঝি?'
—'ভুলে গেছিলে বোধ করি। কিন্তু তখন ছেলেমানুষ আমি-জীবনের সেই চার আনার শোক অনেক দিন পর্যন্ত ভুলতে পারি নি আমি।'
—'আমাকে বললেই পারতে!'

সূচীপত্রে যান

—'না, আমি বলি নি। এই একশ টাকার বেলাও সেই রকম যদি হয়?'
—'এবার আর ছেলেমানুষ নও; হয় তো এ শোক শুধরে উঠতে পারবে। পারবে না প্রতিমা?'
প্রতিমা চশমাটা খুলে আলোর দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে বসে রইল।
—'বীরু ছাড়া তোমাদের সংসারে পুরুষ আর-কেউ নেই বুঝি?'
—'না, বাবা মরে যাওয়ার পর ঐ একমাত্র পুরুষমানুষ।'
—'খুব একা লাগে না তোমার?'
—'আমার? কেন?'
ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে খানিকটা হেসে নিল প্রতিমা।
—'তোমার মাইনে এখন কত?'
—'তাও জিজ্ঞেস করবে? ছশ টাকা পাচ্ছি।'
—'তুমি বাংলাদেশে এলেই পারতে।'
—'আমি পশ্চিমে হয়ে গেছি।'
—'তোমার সঙ্গে পরিচয়লাভ করতে পেরেছিলাম বলেই তো বাংলার রূপকে আমি চিনেছি। না-হলে এ পথঘাটে অন্ধের মত ফিরতে হত আমাকে।'
—'বাংলার রূপকে তুমি চিনেছ-সে তোমার হৃদয়ের গৌরবে। আমার তাতে কোনো হাত নেই কিন্তু শচীন।'
চশমা পরে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে বসল।
—'লিখবে?'
—'হ্যাঁ।'
চলে যাচ্ছিলাম—'আচ্ছা আমি যাই তা হলে।'
—'একটা কথা শুনে যাও শচীন।'
—'বলো—'
—'তোমার থাইসিস হয়েছে বোধ হয়?'
—'মনে তো হয় না।'
—'একজন ডাক্তার দেখিও।'
—'আচ্ছা।'
—'একজন ভাল ডাক্তারই দেখিও শচীন।'
—'চেষ্টা করব।'
—'কোনো এক জায়গায় চেঞ্জে তোমার যেতে হতে পারে কিন্তু। যেও। অবহেলা করো না।'
—'না, মিছেমিছি স্ত্রীকে বিধবা করে কী লাভ!' মাঠের পথে খানিকটা নেমে ফিরে এসে, আবার প্রতিমার কাছেই গেলাম।
——'কে, শচীন?'
—'হ্যাঁ।'
—'কেন?'
—'টাকাটা দিতে ভুলে গেলে যে তুমি।'
—'না, ভুলি নি।'
—'একশ টাকা ধার চেয়েছিলাম।'
—'হ্যাঁ, কিন্তু দিতে পারব না তো।'

বাড়ির কাছে এসে দেখি জ্যোৎস্নার ভিতর জামরুলতলায় অমল পায়চারি করছে।
—'কে, অমল?'
আমাকে দেখে সে সিগারেট জ্বালাল।
—'চলো একটু গল্প করি গিয়ে।'
—'কোথায়?'

—'চলো, আমার ঘরে।'
ইতস্তত করে—'না, এখন—'
—'অঞ্জলি কোথায়?'
—'তার নিজের ঘরে আছে হয় তো—'
—'চলো না সেখানে।'
—'না, থাক।'
সিগারেটে এক টান দিয়ে মাঠের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। দেখলাম অঞ্জলির ঘরের তিনটে দরজা আটকানো। মাঝখানের দরজাটায় আস্তে একটা ধাক্কা দিলাম।
—'কে?'
—'আমি—'
ধীরে-ধীরে দরজা খুলে দিয়ে টেবিলে বাতির কাছে গিয়ে বসল।
—'একেবারে দরজাটা বন্ধ করে বসেছ যে-রাত তো বেশি হয় নি।'
—'বাধ্য হয়েই বসতে হয়।'
—'কেন, কী হল?'
—'কেদারবাবু মুন্সেফের ছেলেকে চেনো?'
—'কে, অমল?'
—'হ্যাঁ, বড্ড বিরক্ত করে এসে।'
—'কী রকম?'
—'আমি তাকে বলেছি তুমি বরং দিনের বেলা আমার কাছে এসো-তবুও সে রাত করে আসবেই-বলে অমলের একখানা বই-এর ভিতর থেকে বের করে দু খানা চিঠি আমাকে দিল। চিঠিখানা পড়েছিলাম। আস্তে-আস্তে টেবিলের এক কিনারে রেখে দিয়ে—তুমি কী লিখছ?'
—'কতকগুলো হিশেবপত্র নিয়ে বসেছি।'
—'কিসের?'
—'এই টাকাকড়ির। আচ্ছা বায়স্কোপের জন্য সেদিন দু টাকা নিয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে, না?'
—'হ্যাঁ।'
—'দু জনের টিকিটে গেল আট আনা-আট আনা এক টাকা; গাড়ি ভাড়া আসা-যাওয়ায় পাঁচ আনা-পাঁচ আনা দশ আনা; এই হল এক টাকা দশ আনা—আর ছ আনা পয়সা বাকি থাকে তো?'
চোখ কপালে তুলে অঞ্জলি আমার দিকে তাকাল, বললে—'এই ছ আনা পয়সা অমল তো আমাকে ফেরত দেয় নি।'
—'হয় তো আর কিছু খরচ করে থাকবে।'
—'আবার কী হবে?'
—'কিছু খেয়েছিলে?'
—'ইন্টারভেলের সময় অমল আমাকে কাটলেট আর লেমনেড দিয়েছিল; কিন্তু তাতেই কি ছ আনা পয়সা খরচ হয়ে যায়?'
—'বেচারি নিজেও হয় তো কাটলেট আর লেমনেড খেয়েছে।'
—'কিন্তু সে কথা আমাকে বলা উচিত ছিল তার।'
—'ভেবেছে হয় তো না বললেও তুমি বুঝে নিয়েছ।'
—'ওসব মিষ্টি কথায় আমি মজি না, আমি তার কাছে ছ আনা পয়সার হিশেব চাইব।'
—'ছি, চাইতে যেও না অঞ্জলি।'
—'কেন চাইব না? ছ-আনা পয়সা ভেসে আসে?'

ধীরে-ধীরে জ্যোৎস্নার পথের মধ্যে বেরিয়ে গেলাম। এ-রকম চিরকাল চলতে পারা যায় না কি? মাঠ-প্রান্তর ভেঙে, জানা-অজানার ওপারে, জ্যোৎস্নার আকাশে-বাতাসে বুনো হাঁসের মতন, যে-পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত শেষ গুলি এসে বুকের ভিতর না লাগে!

সূচীপত্রে যান

বিরাজ

বিবাজ একটা হাই তুলে খবরেব কাগজটা কুড়িয়ে নিল আবার। খানিকক্ষণ এ পাতায় সে পাতায় চোখ বুলিযে' শেষে পড়তে শুরু কবল। 'বাংলাদেশে জনসংখ্যা অধিক বলিযা জনজঙ্গল ক্রমশ ব্যাপ্ত হইতেছে' আমাব দিকে অত্যন্ত গুরুতব মুখ নিযে তাকিযে—'এ কথা কতদূব সত্য?'

কোনো উত্তর দিচ্ছিলাম না।

—'তাব পব কী লিখেছে পড়।'

গলা খাকরে নিযে বিরাজ আবাব শুরু কবল—'বনজঙ্গল ক্রশম লুপ্ত হইতেছে। বাংলাদেশে বিশেষত পূর্ববঙ্গে জ্বালানি কাঠেব খুবই অভাব হইতেছে।' কটমট কবে আমাব দিকে একবাব তাকাল বিরাজ। তাবপব পড়ে-বলল—'কিন্তু জনসাধাবণেব প্রযোজনীয জিনিশপত্র ক্রয়ের ক্ষমতা কমিযা যাওযাতে কযলা তাহার স্থান পূর্ণ করিতে পারিতেছে না।' বিবাজ গম্ভীবভাবে মাথা নাড়ল—'জ্বালানি কাঠের স্থান?'

—'তারপব?'

—'ভবিষ্যতে গৃহস্থালির কাজে কযলাব ব্যবহাব অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এই সময়ে কযলা ব্যবসাযীগণ যদি এমন পোড়া কযলা বাহির কবিতে পাবেন, যাহাতে ধুঁযা হইবে না।'

—'কযলাব ধোঁযা হবে না? সে বেশ হবে তো তাহলে বিবাজ।'

—'যাহা সহজেই জ্বলিযা উঠিবে।'

—'বাঃ।'

—'যাহা সহজে ভঙ্গুব হইবে না।'

—'হুঁ।'

—'যাহা হইতে আগাগোড়া সমান উত্তাপ পাওযা যাইবে।'

—'বেশ বেশ।'

—'যাহাতে ভস্মেব পরিমাণ কম হইবে, যাহাব আকাব সুবিধাজনক হইবে।' খানিকটা শিকনি ঝেড়ে নিযে বিরাজ—'আকাবে সুবিধাজনক হইবে মানে? কি জানি আকাব

—'স্কোযাব হযতো।'

—'না অবলঙ্গ।'

—'তা একটা হবে, ওপরে স্বস্তিকা থাকবে।'

—'আচ্ছা স্বস্তিকা কি নর্ডিক?'

—'আমি তো জানি বৈদিক।'

বিরাজ কাগজখানা চোখের কাছে টেনে নিযে পড়ল—'তাহা হইলে গৃহস্থালিব কাজে কযলাব ব্যবহার খুব বাড়িয়া যাইবে।' বললে—'বেশ ভাববার মতো কথা লিখেছে এবা।'

বিবাজ—'কিছুদিন পূর্বে ইন্ডিয়ান [...] কোক গ্যাস কমিটি রন্ধনকারী কযলা জ্বালাইবার জন্য একটি সুবিধাজনক উনুন আবিষ্কাবের উদ্দেশ্যে একটি পুরস্কার ঘোষণা করিযাছেন।'

আমার দিকে তাকিযে—'কত টাকাব পুবস্কাব?'

—'কমিটিব কাছ থেকে জানতে পার।'

বিরাজ একটু ভেংচি কেটে—'ও যাবা [...] তে কাজ করে, তারা পাবে, যাককে চুলোয যাক।' পড়ে

সূচীপত্রে যান

বললে—'যদি একটি সুবিধাজনক উনুন আবিষ্কার হয় [...] নির্দেশিত গুণসম্পন্ন কয়লা বাজারে বাহির হয় তাহা হইলে বন্ধনকার্যের জন্য ঘরে ঘরে কয়লার প্রচলন হইবে।'

বিরাজ একটু স্থির হয়ে নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করে নিয়ে আবার পড়ল।—'এবং উহার দ্বারা বাঙালি পরিচালিত যত দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার খনি আছে তাহার মন্দা কাটিয়া যাইবে।'

—কেন প্রথম শ্রেণীব কয়লাব খনি বাঙালি চালায় না?'

—'না বোধ করি।'

বিরাজ কাগজের দিকে তাকিয়ে পড়ল—'এই বিষয়ে বিশেষভাবে বাঙালি কয়লা ব্যবসায়ীদের উদ্যোগী হওয়া উচিত।'

—'বাংলায় ব্যবসা আবম্ভ করলে কেমন হয় বিরাজ?'

বিরাজ কোনো উত্তর না দিয়ে কাগজখানা নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে—'গুজবাট অঞ্চলে বিরাট প্লাবন।'

—'তাই নাকি?'

—'প্রচুর প্লাবনেব ফলে নদীসমূহে অসম্ভব জলবৃদ্ধি।' একবার চোখ তুলে ফিবে—'গুজবাটে কি কি নদী আছে নাম করো।' উত্তর অপেক্ষা না করে—'বেলগাড়ি ও বিমান ডাক চলাচল বন্ধ।' আমার দিকে তাকিয়ে— '[...] যেতে পাবছে না, জাম হয়ে আছে সব।' পাতা উলটে নিয়ে বিরাজ—'খেলাব মাঠে বাঙালির বীবত্ব।'

—'ফুটবল খেলা বুঝি?'

—'বেফারিকে মারিবার জন্য উত্তেজনা।' বিরাজ নাক সিঁটকে ওপবেব কলামের দিকে তাকাল। [...]

—'কী লিখেছে?'

—'কারামুক্তির পর মহাত্মার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা—মাতার নিকটে পত্র-পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার মাতাকে লিখিয়াছেন যে, তিনি বিনা আড়ম্বরে কাবামুক্তি লাভ করিতে চাহেন।' জমকালো গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বিরাজ একটু থেমে তারপর পড়ল—'একান্ত কেহ আসিতে চাহিলে তাঁহাব মাতা কন্যা, পত্নী আসিতে পাবেন। প্রকাশ তিনি আবো কী লিখিয়াছেন যে কারামুক্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যারবেদা যাইযা একবাব মহাত্মা গান্ধীব সহিত সাক্ষাৎ কবিবেন।' বিরাজ পাশেব কলামেব দিকে তাকাল।—'যারবেদা কাবাগারে মহাত্মা গান্ধী অধিকাংশ সময় নিদ্রায় অতিবাহিত কবিতেছেন।' বিরাজ গলা খাকরে পড়ল—'মহাত্মার আত্মীয় শ্রীযুক্ত মথুরাদাস 'ত্রিকমজি'—চোখ ঘুবিয়ে আমার দিকে তাকিযে—'চেনো এঁকে?'

—'মথুরাদাস ত্রিকমজি? কই নাম তো কোনোদিন শুনিনি।'

বিরাজ একটু ভেবে—যাগ্ গে মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই।—'মথুবরাদাস ত্রিকমজি গতকল্য যারবেদা জেলে যাইযা মহাত্মাব সহিত দেখা করিয়াছিলেন।' কপালেব ঘাম মুছে নিয়ে বিরাজ—'জানতাম না আবার যারবেদা জেলে গেছে।'

—'জান না?'

—'প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন, গ্রেপ্তাবের পূর্বেকাব কয়েক সপ্তাহের গুরুতব শ্রমেব পর মহাত্মাকে ক্লান্ত দেখা গেল—ওই ক্লান্তি বিদূরণের জন্য মহাত্মা এখন অধিকাংশ সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেছেন। শারীরিক ক্লান্তি ব্যতীত শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইযেব সাহায্যে মহাত্মাকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল।' বিরাজ অবসন্নভাবে নিশ্বাস ফেলে কাগজের এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে—'কিন্তু অবসাদ তাঁর মুহূর্তের জন্য।' চোখ মুছে গলাটা পরিষ্কার কবে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল আবার।—'রাজা। [...] উইকলি গেজেটের লন্ডনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে বেগম শাহনাওয়াজের কন্যার সহিত কাম্বের রাজা নবাব মির্জা হুসেন জববের বিবাহ স্থির হইয়াছে।'

—'বেশ আশার কথা বিরাজ।'

—'রাজা মির্জা হুসেনের রাজ্যের আয়তন ৮৫০ বর্গমাইল, এবং তাহার জনসংখ্যা আশি হাজার।

নবাবের বয়স ১২ বৎসর। তিনি পারস্যের পরাক্রান্ত নৃপতিগণের বংশধর।' পৃষ্ঠার একদিকে তাকিয়ে বিরাজ পড়ল—'১০ই আগস্ট রবিবার অপরাহ্নের পাঁচ ঘটিকার সময় ৪/২নং কামারডাঙা রোডে ইটালি জীবনিক মিশন শালায় জন্মাষ্টমী বিষয়ে কথকতা হইবে। সাধারণের যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়। মাতৃজাতির পৃথক আসনের ব্যবস্থা আছে।'

একটু চুপ থেকে—'মাতৃজাতির লিখেছে বুঝি?'

—'মা বোন না লিখে মাতৃজাতি লিখেছে, সাধুভাষায় এইরকমই লিখতে হয়।'

—'মহিলা লিখলে হত না?'

বিরাজ—'না, সব সময় তা তো হয় না, নারী একটা কাঠখোট্টা ন্যাড়া পদ, নারী বলে গৃহলক্ষ্মী বলি কেন? মেয়েদের একটু আলাদা মর্যাদা দিতে হয়। পুরুষদের সঙ্গে এইখানে তাদের তফাত। আমাদের কেউ গৃহ গোবিন্দ বলে? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসে কেউ বলে পিতৃজাতির জন্য আড়াই হাজার কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি তৈরি আছে?' কাগজের দিকে তাকিয়ে বিরাজ পড়ল—'প্রতারণার অভিনব বন্দী।'

—'কীরকম?'

—'নিয়াগড় চক নং ৫ নামক একটি গ্রাম হইতে'—

—'সে কোথায়?'

—'তারিখ দিয়েছে সেখপুরার থেকে—'

—'সেই বা কোথায় বিরাজ?'

—'বোধহয় মাদ্রাজে।'

—'পাঞ্জাবে নয় তো?'

—'নিয়াগড় চক নং—একটি অদ্ভুত প্রতারণার কাহিনী সংবাদ আসিয়াছে। একটি লোক নাপিতের ছদ্মবেশে উক্ত গ্রামের একটি জাঠ রমণীর কাছে যাইয়া বলে—'

—'জাঠরমণীর—তাহলে হয়তো ইউ পি কিংবা পাঞ্জাব।'

—'জাঠরমণীর নিকট যাইয়া বলে কবিয়ল নামক গ্রাম হইতে তাহার ভগ্নি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছে।'

[অসমাপ্ত]

সূচীপত্রে যান

প্রেতনীর রূপকথা

—'কে?'

—'আমি।'

—'বসো।'

—'না, বসব না; দলিলপত্র নিয়ে সকাল থেকেই ভাবি ব্যস্ত আছেন দেখছি; মুবারিবাবুরা এসেছে, চারদিক থেকে লোকজন তাকে ছেঁকে ঘিরে ফেলেছে যে—'

—'আমিও দেখে এসেছি।'

—'কেন, কী হল!'

—'এই বাড়িটা বিক্রি কবে ফেলবেন।'

—'বিক্রি!' মুখখানা ছাইয়েব মতো হয়ে গেল (মালতীর)।

—'কেন, অনেকদিন ধবেই তো কথাবার্তা হচ্ছিল, শোনে নি?'

সে কোনো জবাব না দিয়ে মুহূর্তেব মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। দুপুববেলা বললে—'শুনেছিলাম জায়গাজমি আছে, জমিদারেব ছেলে, ভেবেছিলাম আবাব কপাল খুলল বুঝি, কিন্তু বিয়েব আগেই বুঝেছিলাম, অত সুখ কি আমাব সইবে! তা সইবে না—'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু এ-বকম মিথ্যা কথা প্রচাব কবতে দিলে কেন তোমরা?'

—'কী আবাব?'

—'সবাই বলেছিল জমিদাব বংশের ছেলে—'

—'কয়েক পুরুষ আমাদেব অনেক জায়গাজমি ছিল।'

হাতেব তেলোয় খানিকটা জর্দা ঢেলে পান চিবুতে-চিবুতে একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'আমি তো ইস্কুলেব পণ্ডিতেব মেয়ে—সমুদ্রে যাব শয্যা শিশিবকে সে কি আর ভয় কবে!—কিন্তু—'

একটা গল্পেব স্বব ছড়িয়ে নিয়ে বালিসে মাথা বেখে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পবে—'আচ্ছা, কেন বিক্রি করছেন বাড়ি?'

—'দেনা নাকি হাজাব বিশেক হয়েছে।'

—'এই বাড়ি বিক্রি কবে তাই থেকে দেবেন?'

—'তাই তো ইচ্ছা।'

—'কত টাকায় বিক্রি কববেন?'

—'মুরারিবাবুরা পঁচিশ হাজাব টাকা দেবেন নাকি—'

—'এই সমস্ত জায়গাজমি-দালান পঁচিশ হাজাব টাকায় বিক্রি হবে মোটে?'

—'না, জায়গাজমি তো আগেই বিক্রি হয়ে গেছে; এই দালানটা শুধু পঁচিশ হাজাব টাকায়—'

ছটফট করে আবার উঠে বসল; গালে হাত বেখে বিবর্ণ হয়ে আমাব দিকে তাকিয়ে—

—'জায়গা জমি কিছু আমাদের নেই?'

—'কিচ্ছু না।'

—'কবে বিক্রি হল?'

—'প্রায় বছর তিন-চাব আগে।'

আরো অনেক্ষণ পরে—'আমাকে আমার বাপের বাড়ি চলে যেতে বলো?'

—'সেখানে তোমার কেই-বা আছে?'

সূচীপত্রে যান

—'বাবা নেই অবিশ্যি, কিন্তু কাকারা তো সকলেই আছেন।'

—'সেখানে গিয়ে থাকতে ভাল লাগবে তোমার ?'

—'তারা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে ?'

—'হয় তো তাড়াবে না; আমরাও তো তোমাকে তাড়াতে চাচ্ছি না-'

—'অনেক ঘটা করে তো আমাকে তোমাদের বাড়ি এনেছিলে; এখন চুপেচাপে বিদায় করে দাও। একটা পাল্কিতে করে গ্রামের রাস্তায় তুলে দিলেই হবে; কোনো লোকজনেব দবকার নেই—দু'জন পাল্কি বেযারা হলেই হবে—'

'পাল্কিও তো নেই—'

শিশুর মত কাঁদতে লাগল বেচারি।

বিকেল বেলার দিকে দেখলাম মালতী চোখ বুজে বড় নিঃসাড় ভাবে পড়ে আছে—হয়তো ঘুমুচ্ছে; কিংবা কে জানে জেগে আছে হযতো।

সন্ধ্যার সময ছাদে পায়চারি করছিলাম; মা বললেন—'তুমি নাকি শুনলাম কলকাতায যাচ্ছ!'

—'হ্যাঁ।'

—'কিসের জন্য ?'

—'দেখি চাকবি-বাকরি পাই কি না।'

—'গিয়ে কোথায উঠবে ?'

—'মেসেই।'

—'মেসের খরচই-বা তুমি কোথা থেকে দেবে ?'

—'কতই-বা খরচ, দশ-বার টাকা তো মাসে ?'

—'ছ-সাত বছর ধরেই তো কলকাতায যাওয়া-আসা করছ—কই, চাকবি তো পেলে না।'

—'চাকরির জন্য যাব না তো।'

—'তবে ?'

—'যাব রোজগারেব জন্য।'

—'কোনো কিছুর দালালি করবে না কি ?'

শান্ত মাথা নেড়ে—'আমাকে দালাল বানিযে মানুষেব লোকসানই হবে শুধু।'

—'থাক, না-ই বা কবলে, মিছেমিছি হাড় কালি কবে কী লাভ! এম. এ. পাশ কবেছ, একটা মাস্টারি জোগাড় করে নাও গিযে-তারপর—'

—'একটা প্রাইভেট মাস্টারি চেষ্টা করলে পেতে পাবব আশা করি।'

—'কত দেবে তাতে ?'

—'দশ-পনের টাকা-কপাল ভাল হলে বিশ-পঁচিশও দিতে পারে।'

—'কোনো একটা ইস্কুলে পাকা মাস্টারি নিযে বসো; মফস্বলে হলেও হয।'

—'সে হয় না।'

—'কেন ?'

—'আমি অনেকবাব চেষ্টা করে দেখেছি। তা আমাকে দেবে না। ছোটবেলায় বৈষ্ণব পদাবলীব প্রতি কেমন আসক্তি জন্মাল আমার-সেই থেকেই জীবনটা আমাব নষ্ট হযে গেল।'

মা বিক্ষুব্ধ হয়ে ছাদের এক কোণায় গিয়ে বসলেন। এখন অবিশ্যি বৈষ্ণব কবিতা চাপা পড়ে গেছে; মাঝে-মাঝে ডন ভাল লাগে, মাঝে-মাঝে হুইটম্যান, এ্যালেন, পো, কিংবা শেকস্পিযার-এব সনেট-কিন্তু এই সব করেই সাংসারিক জীবনটা খোয়া গেল আমার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হলেও ভাল হত, কিন্তু পাশ কবলাম ইংরেজি লিটারেচারে এম. এ। এখন এই বযসেও আমার জুতো সেলাই শিখতে ইচ্ছা কবে।

তাকিয়ে দেখলাম মালতী এসে দাঁড়িযেছে।

দু-এক দিন পরে একদিন দুপুরের দিকেই ঠিক করলাম, কলকাতায় যেতে হলে আর দেরি কবেই-বা লাভ কী ? রোজগার শিগগির আরম্ভ না করতে পারলে বড্ড মুশ্‌কিল।

সূচীপত্রে যান

আজই কলকাতা যাওয়া ঠিক করে ফেললাম; সন্ধ্যার দিকে স্টিমার। জিনিস-পত্র গোছাতে শুরু করলাম।

—'আজই চললে তা হলে ?'

—'হ্যা-মা।'

—'সঙ্গে কী খাবার নেবে ?'

—'কিচ্ছু না।'

—'কিছু লুচি ভেজে দেই ?'

—'কী আর দবকার।'

—'বৌমা কোথায ?'

—'কই, বলতে তো পারি না।'

—'তুমি যে চলে যাচ্ছ তা সে জানে না ?'

—'না বোধ কবি।'

—'কেন, তাকে জানাও নি কেন ?'

—'এই তো যাব ঠিক কবলাম।'

—'এই দুপুব বেলাব সময কোথাযই-বা সে থাকে ?'

—'হয তো ঘুমুচ্ছে।'

—'আমি তাকে জাগিযে দেই গিযে ?'

—'কেন ?'

—'এ সব জিনিসপত্র সে এসে গুছোবে না ? এ তো তার কাজ।'

—'কী-ই-বা জিনিস; একটা ট্রাঙ্ক নেব শুধু; আব একটা বিছানা।'

মা একটু চুপ থেকে—'কিন্তু তবুও দাঁড়ানো উচিত নয় তাব, কাছে এসে ? কী ? তুমি চলে যাচ্ছ আব সে ঘুমোবে ?'

—'যেতে-যেতে আমাব সন্ধ্যা; ততক্ষণে সে—'

—'ততক্ষণে তার সঙ্গে একবার দেখা হবে এই সান্ত্বনা নিজেকে দিতে চাও ?'

—'হ্যাঁ আসবে বই-কি, 'চুপ কবে ট্রাঙ্কেব ভিতবটা মুছে নিচ্ছিলাম।'

—'ইস, নিবাবণ যখন বিদেশে যেত, দেখতাম বিভা কী ভীষণ কাঁদত, তিন দিন আগের থেকেই কান্না শুরু হত তার।'

—'নিবাবণ কাকাব কথা বলছ বুঝি ?'

—'হ্যাঁ। স্বামী-স্ত্রীর এই রকমই তো হবে। কিন্তু তোমাদেব দু'জনের মধ্যে সেই রকম বন্ধন নেই কেন ?'

—'সকলেই কি আর বিভা কাকিমাব মত কাঁদবে ? ভালবাসার পরিচয কান্নার ভিতবেই নেই শুধু'-একটু হেসে—'এক-একজন মানুষের নতুনত্ব এক-এক বকম।'

—'নাঃ, পরস্পবের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেই ভালবাস তোমবা।'

ট্রাঙ্কের ভিতরে একখানা একখানা করে বই বাখতে আরম্ভ কবলাম; কতকগুলো বই নেব; তাব ওপর কাগজপত্র খাতা; সব শেষে কাপড়-চোপড়।

—'তোমাদের ভবিষ্যৎ যে কী হবে আমি বুঝতে পাবি না।'

—'ভবিষ্যতে রোজগার করতে পাবব আশা করি; অন্তত না খেতে পেযে মবব বলে মনে হয না; আমি যতদিন বেঁচে আছি সিঁথিতে সিন্দুরের অভাব হবে না তাব; মরে গেলে বিধবাব থান পরবে; এব চেযে কী বেশি চাও তুমি আর ? অনেকে তো এটুকুও পায না।'

মা জিভ কেটে আমার দিকে তাকিযে রইলেন। হাসছিলাম।

—'এমন শ্রদ্ধাহীন কথা বল বুঝি ?'

—'স্বামী-স্ত্রীব সম্বন্ধেব ভিতর থেকে আমি অবিশ্যি কোনো বৈকুণ্ঠ প্রত্যাশা করি না, কোনো বিবেচক লোক করে বলেও বোধ কবি না।'

—'এইই বুঝি ভাব তুমি।'

সূচীপত্রে যান

—'নিবারণ কাকা মরে যাওয়ার পর বিভা কাকিমা বিষও খেলেন না, গলায়ও দড়ি দিলেন না, স্বামীর মৃত্যুর পর পনের বছর হয়ে গেল—হেসেখেলেই বেঁচে আছেন। সেদিন দেখলাম, মুগের ডালে একটু ঘি কম হয়েছে বলে ভাত না খেয়েই উঠে গেলেন। এই সবই তো স্বাভাবিক। একটা চড়াই চড়াইয়ের শোকে মরে যায়—সে হল আলাদা জগতের কথা। মরে যায় না কি ? আমার তো মনে হয় না মরে যায়। কে যেন বলছিল—মরে যায়। যেতে পারে; পাখিদের ভিতর অবিশ্যি অনেক রহস্য আছে।'

পো-র কবিতার বইটার জায়গায়-জায়গায় পোকায় কেটে ফেলেছে—বাক্সের এক কির্নারে [কিনারে বা কর্ণারে] সন্তর্পণে রেখে দিয়ে আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে কোনো এক জন্মে পক্ষীর জীবন পাব; হয় তো সিঙ্গাপুরের এক জঙ্গলে ময়না হয়ে জন্মাব; কিংবা তোমাদেরই এই আম-কাঁঠালের ডালে [টুনি] টুনটুনি হয়ে আসব

—দাম্পত্য না হোক, ভালবাসা ও জীবনের এক নতুন আস্বাদ পাব সেদিন।

হার্ডির 'ওয়েসেক্স পোয়েমস্' থেকে ছাতকুড়ো মুছে ফেলি।

—'যাবে না মা ?'

তাকিয়ে দেখলাম মা চলে গেছেন।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে বলেন—'যা ভেবেছিলাম তাই।'

—'কী।'

—'মালতী ঘুমোয় নি; জেগে বসে আছে।'

—'কোথায় ?'

—'একটা বাটা সমানে রেখে পান বানাচ্ছে আর খাচ্ছে—এমন ঘন্টার পর ঘন্টা—কাজ নেই কম্ম নেই হাসি নেই, তামাশা নেই, একটা কথা বললে তার জবাব পর্যন্ত দেওয়া নেই; শুধু পান বানানো আর খাওয়া, এক দুপুরে চার পয়সার পান উড়িয়ে দিল, দেখ গিয়ে।'

—'পান খেতে তো ওর ভাল লাগে না শুনেছিলাম; পান তো বড় একটা খায় না।'

—'বটে! পানের পোকা, দেখে এসো গে যাও।'

—'নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় বেচারি; জর্দাও খাচ্ছে বুঝি ?'

—'জর্দা ছাড়া পান তো কোনোদিনই খায় না।'

—'আমি চলে গেলে পান খেতে ওকে বাধা দিও না, অতিরিক্ত পয়সায় পান লাগলে কিনে দিও—যতক্ষণ খুশি বাটার কাছে বসে নিজেকে নিয়ে থাকতে পাবে যেন।'

—'কী রকম ?'

চুপচাপ বাক্স গুছাচ্ছিলাম—বইগুলো সাজানো হয়ে গেছে।

—'আমি তাকে বললাম সুকুমার আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছে, গ্রাহ্য করল না, ঘাড় গুঁজে পান ছিঁড়ে সাজাতে লাগল।'

—'এত যে বই নিলাম, লাগেজ হবে মনে হচ্ছে!'

—'এত বই নিচ্ছ কেন ?'

—'এ সবই আমার পড়া, দু-চার বার—'

—'তবে আর নিচ্ছ কেন ?'

—'কলকাতার মেসে আবার যে পড়া হবে তাও মনে হয় না।'

—'তাও নিচ্ছ ?'

—'টোমাস মান-এর একখানা বই নিয়েছি বাডেনব্রুক্স—বইটা কেমন লাগে জানো ?

—'আমাকে বলে কী আর লাভ ?'

—'বইখানা প্রথম পড়েছিলাম বছর খানে আগে—সেই তেতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় বসে, অঘ্রান মাস, ভারি মিষ্টি শীত ছিল তখন দেশে। হলুদ ধান আর শীত ভাল লেগেছে বেশি না বইখানা- আজও বুঝে উঠতে পারি না।'

—'যাই, তোমার জন্য লুচি করি গিয়ে।'

—'না, থাক, শোনো।'

—'আমি এ সবের কিছু বুঝব না তো বাছা—আমাকে শুনিয়ে কী লাভ!'

—'বইখানা জার্মান।'

—'ইংরেজি-জার্মান সবই আমার কাছে চাঁদের এপিঠ আর ওপিঠ।'

—'বেশ একটা অভিজাত বংশ কী করে নষ্ট হয়ে গেল, তারই ইতিহাস।'

—'আচ্ছা, ভাল, আমি তো আর দেরি করতে পারি না।'

—'শোনো, আনাতোল ফ্রাঁসের অনেকগুলো বই নিলাম।'

—'তিনি কে?'

—'একজন ফরাসি লেখক।'

—'তাঁর লেখা ভাল লাগে তোমার?'

—'নইলে এত বই নিচ্ছি মা? আজকালকার ছেলেরা পড়ে হার্ডি কিংবা টি. এস, ইলিয়ট। আমি সেই আনাতোল ফ্রাঁস, ভোলতেয়ার, ভিলোঁ, এইসব পড়েই ফুর্তি পাই।'

—'এ সব আলাপ যদি তুমি মালতীর সঙ্গে করতে তা হলেও একটা অর্থ থাকত, সে অন্তত ম্যাট্রিক অব্দি পাশ করেছে-কলেজেও নাকি পড়েছিল এক বছর।

—'এই যে আনাতোল ফ্রাঁস-এ লেখককে বড় আস্তে-আস্তে পড়তে হয়, সমস্ত ফরাসি লেখকদের মত এর লেখায় রঙের পিচকিরি ঢের, তোমরা হয় তো অনেক সময় মনে করবে কাদার পিচকিরি।'

—'কে আমরা? এ সব বই করেই—বা পড়ব!

—'যদি কোনোদিন পড়ো।'

—'কোনদিনও না।'

—'আমি না-হয় একদিন তর্জমা করে শোনাব খানিক?'

—'সে তোমার বৌকে শুনিও।'

—'মান-এর বইয়ের মধ্যে এমন অনেক জায়গা আছে যা তোমাকে শোনাতে ভাল লাগে।'

—'তোমার বাবাকে শুনিও।'

—'তিনি নিজেই ঢের পড়েছেন।'

—'আমার তো এখন সময় নেই।'

—'আজ অবিশ্যি নয়, কলকাতা থেকে ফিরে এসে কোনো এক শীতের রাতে এই জার্মানদের লেখা তোমাকে পড়ে শোনাব।'

—'বলছিলে না, লাগেজ হবে?'

—'হ্যাঁ, অনেক বই তো নিলাম।'

—'তা লাগেজ যদি হয়?'

—'তা হলে কতকগুলো পয়সা নষ্ট হয়ে যাবে বটে-'

—'তার চেয়ে বই কতকগুলো কমিয়ে নাও।'

—'সে হয় না মা; আমি সমস্তটা সকাল বসে ভেবে দেখেছি যা নিতে চাই তার ভেতর থেকে কোন বইগুলো বাদ দেয়া যায়; দেখলাম একখানাও বাদ দিলে চলে না।'

—'অথচ এ বই তো পড়বে না তুমি!'

—'বাক্সের নীচে পড়ে থাকলেও আমার ঢের সান্ত্বনা।'

—'তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ।'

—'পয়সা যা লোকসান হবে তা কলকাতায় গিয়ে আমি শুধরে নেব।'

—'কী করে?'

কয়েকখানা খাতাপত্র সাজাতে-সাজাতে কোনো উত্তর দিলাম না।

—'আমার কাছ থেকে চাপতে চাচ্ছ; আমি কি জানি না সব? বার টাকার মেসে থাকো, পাঁচ টাকা তোমার মাসিক হাত খরচ; চৌদ্দ টাকায় চালিয়ে দাও। আমাদের বাজার-সরকারও তো তোমার চেয়ে ঢের ভাল থাকেন।'

—'কষ্ট লাগে যদি তোমার তা হলে বিশ টাকার বোর্ডিঙে গিয়ে থাকতে পারি।'

—'সেই রকম থাকলেই তো ভাল হত।'

—'হ্যাঁ, বাবা যখন কলকাতায় যান, তখন পঞ্চাশ টাকার হোস্টেলে তো থাকেন।'

সূচীপত্রে যান

—'উনি খারাপ জায়গায় থাকতে পারেন না কি না।'
মাথাগুঁজে বাক্সটা গুছোতে লাগলাম।
—'বুড়ো মানুষ, যা-তা খাওয়াও সহ্য হয় না।'
—'তা ঠিক।'
—'তুমি যদি একটা ভাল চাকরি পেতে!'
একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'কত দিনে যে তোমার এই দুর্দশা ঘুচবে।'
—'বাবার কাছ থেকে শত দুই টাকা চেয়ে নিলে হয় না ?'
—'কিসের জন্য ?'
—'একটি মাস কলকাতায় একটু ভাল করে থাকব।'
—'কিন্তু এত টাকা তিনি এখন কোথায় পাবেন ?'
—'আচ্ছা তোমার মোটা [?] অনন্ত দু'টো দাও না মা, বেচে শত দেড়েক টাকা তো পাব নিশ্চয় ?'
—'আমাদের দুঃখকষ্টের দিনে এ সব গয়না কি হাতছাড়া করা উচিত, তুমিই বুঝে দেখ।'
—'ধুতি তিনখানা নিলাম, কী বলো, হয়ে যাবে না ?'
—'তোমার শার্ট নেই বুঝি ?'
—'না। ধোপার বাড়ি দেব না, নিজেই কাচব।'
—'কলকাতার মানুষকে পদেপদেই জীবনের ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতে হয় বাবা।'
—'পাঞ্জাবি শার্ট আমার অনেকগুলি আছে।'
—'কটা ?'
—'তসরের দুটো পাঞ্জাবি।'
—'ছেঁড়া নয় তো? এগুলো যে প্রায় দশ বছরের পুরনো।'
—'লংক্লথের পাঞ্জাবিও....আছে আর টুইলের শার্ট একটা।'
—'দেখ তো ছিঁড়ে যায় নি তো কোথাও ?'
—'ন্-না—'
—'বোতাম ঠিক আছে তো? না হলে লাগিয়ে দেই, কী বলো!'
চোখ বুজে-'সব বোতাম ঠিক রয়েছে।'
—'এ সব মালতী একটু দেখেশুনে গেলে পারত না ?'
—'তুমি বরং আমাকে এক রিল সুতো আর গোটা দুই সূচ যদি পাবো দিয়ে দিও।'
—'কিসের জন্য ?'
—'কলকাতায় যদি ভবিষ্যতে ছিঁড়ে যায় কিছু, তালি দিয়ে নেব।'
—'সুতো হয় তো মালতীর কাছে আছে; চেয়ে আনব ?'
—'তোমার কাছে সূচ আছে ?'
—'আছে।'
—'তাই দাও।'
—'আর সুতো ?'
—'আমি চেয়ে নেব।'
—'মালতীর কাছ থেকে ?'
—'হ্যাঁ।'
—'এখনই চেয়ে আনো না কেন, কাপড়-জামা যদি কোথায় ছেঁড়া থাকে সেলাই করে দেই।'
—'কিছু ছেঁড়া নেই, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'
মা দু হাত পিছিয়ে গিয়ে-'এমন পাপ করতে যেও না বাবা।' একটু হেসে—'কেন ?'
—'আমাকে ছুঁয়ে তুমি মিথ্যা কথা বলবে ?'
মা অবিশ্যি অন্তর্যামী—
মাথা হেঁট করে হাসছিলাম-
—'কই, কোথায় ছেঁড়া আছে দেখি তো।'

সূচীপত্রে যান

বাক্সটা তালা দিয়ে বন্ধ করে ফেললাম—

—'আমাকে দেবে না ?'

—'তা হলে আমার কলকাতায় যাওয়া হবে না।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন; খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—

—'আচ্ছা নাও, এই অনন্ত-দুটো।'

—'কেউ কোনোদিন তোমার কাছ থেকে নিতে চেয়েছে মা ?'

—'কী ?'

—'তোমার গায়ের গযনা ?'

মা মাথা নেড়ে—'না।'

—'কেউই না? দিদিও না? দাদাও না ?'

—'দিদির তো তোমাব খুব ভাল বিয়েই হয়েছে; আমাব গযনা দিয়ে তাব কী দরকাব ?'

একটু চুপ থেকে—'আমি অনেক সময অবাক হযে ভাবি কলকাতায তোমাব দিদিব এত ভাল বাড়ি আছে, অথচ তুমি মেসে থাক কেন ?'

—'আর দাদা ?'

—'কে, সুরেশ? সে তো কানপুরে মস্ত বড় চাকরি কবে; শুনেছি নাকি মেম বিয়ে করেছে; আমাব বিশ্বাস হয না। এই দশ বছব ধরে দেশে আসে না; তোমাব বাবা চিঠি লিখলেও উত্তর দেয না'

—অধোমুখে শাড়িব পাড় আস্তে ভাঁজ করতে-করতে—'সে বরাবর নিজের পাযে দাঁড়িয়েই চলে। সুবেশ এসে আমাব কাছে গযনা চাইবে এ কথা তো আমি কল্পনাও কবতে পাবি না।'

—'আমাকে কিছু মশলা দিতে হবে মা।'

—'কিসেব মশলা ?'

—'সুপুরিব কুচি, কযেকটা লবঙ্গ, আর যদি পাবো এক টুকরো দারচিনি।'

—'আচ্ছা। তুমি সুবেশকে লিখলেই পাবো।'

—'কিসেব জন্য ?'

—'তোমাকে যাতে কিছু টাকা পাঠায।'

—'না, তার আজকাল বড় খরচ-সাত-আট বছব হল মেম বিয়ে করেছেন—অনেক ছেলেপিলে হয়ে গেছে নাকি, পোষাতে পারছেন না।'

তাকিয়ে দেখলাম চোখে জল, অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে থেকে—'বিছানা বেঁধেছ ?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখনই যাবাব সময হয়ে এল ?'

—'এবার আর ঘোড়াব গাড়িতে করে স্টেশনে যাব না, পায়ে হেঁটেই যাব।'

—'তোমাব বাবাকে প্রণাম করে এসো।'

—'যাচ্ছি।'

—'আব মালতীর সঙ্গে দুটো কথা বলে যাবে না ?'

—'বলব বই-কি, তোমাদের সকলেরই প্রসন্ন মুখ দেখে যেতে চাই আমি; সে কোথায আছে ?'

—'বিধাতা জানেন; দেখলে তো একবার এদিক মাড়ালও না।'

—'আর এক ঘন্টা সময় আছে; তাকে খুশি করে যেতে পারব তো ?'

—'ছ বছর বসে পারলে না; এক ঘন্টার মধ্যে পাববে ?'

তাকিয়ে দেখলাম নিঃশব্দ পায়ে বধূ এসে দাঁড়িয়েছে।

মা ধীরে-ধীরে উঠে চলে গেলেন।

—'আমাকে দেখেই মা সরে গেলেন যে ?'

—'অনেকক্ষণ বসা হয়েছে তাই উঠলেন।'

—'বিছানা বেঁধে ফেলেছে দেখছি।'

—'কলকাতায় যাচ্ছি।'

—'গিয়ে চিঠি দিও।'

—'তা দেব বই কি।'
—'সময় তো হয়ে এসেছে প্রায়।'
—'হ্যাঁ, এক ঘন্টা বাকি আছে।'
—'বিশুর মাকে গাড়ি ডাকতে বলব ?'
—'না, আমি হেঁটেই যাব।'
—'তা হলে কুলি ডেকে আনুক বিশুর মা।'
—'আর-একটু পরে ডেকে আনলেই হবে; সময় আছে।'
—'কুলি তো তোমাদের সেই রামধন, তাকেই ডাকবে তো ?'
—'হ্যাঁ।'
—'তা হলে তাকে খবর দিয়ে আসুক এখন।'
—'আমি যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাব।'
'তখন যদি সে না থাকে ?'
—'তা থাকবে।'
—'স্টিমার মিস না করে তুমি ছাড়বে না দেখছি।'
—'আচ্ছা এখুনি আমি উঠছি; আমাকে কয়েকটা সেফটিপিন দিতে পাবো ?'
—'আমি কোথেকে পাব? আমাকে কিনে দিয়েছিলে সেফটিপিন ?'
—'এই তো তোমার ব্লাউজে কয়েকটা লাগানো আছে দেখছি।'
—'পযসায তো দশটা বিকোয, এও আমার ব্লাউজের থেকে ছিনিযে নিতে হবে ?'
—'আমার একটা হলেই চলবে।'
—'কী করবে শুনি ?'
—'এই শার্টের হাতেব বোতামটা ছিঁড়ে গেছে-এখানে লাগিযে নেব।'
—'আস্তিন গুটিযে নাও।'
একটু হেসে—'কিছু মশলা দিতে পাবো আমাকে ?'
—'যাচ্ছ কলকাতায, মশলা চাচ্ছ আমার কাছে ?'
—'কেন কলকাতায যাচ্ছি তাতে [কী] ?'
—'সেখানে তো খুব ভালো মশলা তৈবি হয।'
—'আমি চাচ্ছি পথে খাবার জন্য খানিকটা সুপুরিব কুচি, লবঙ্গ, দারচিনি।'
—'পথে তো তোমরা সিগারেটই খাও।'
—'সিগাবেট আমি অনেক দিন হল ছেড়ে দিযেছি।'
—'কেন, বিলেতি বলে ?'
—'পযসায কুলোয় না।'
—'বিড়ি খাও বুঝি ?'
—'কিচ্ছু না।'
তাকিযে দেখলাম মা এসেছে—'একটা ছাতা নিলে না ?'
—'না কোনো দবকার নেই।'
—'পথে যদি বৃষ্টি হয ?'
—'না, বৃষ্টি হবে না।'
—'বৃষ্টি হবে না—তুমি কি দৈবজ্ঞ ?'
মালতীর দিকে তাকিযে মা—'শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি হবে না—সুকুমাবেব জন্য বিধাতা আকাশ শুকনো করে রেখে দেবেন।'
আমাকে বললেন—'রাজমোহনের ভাটভাঙা ছাতাটা নিযে যেও।'
—'আচ্ছা।'
—'সেটা রাজমোহনের ঘরেই পাবে।'
—'নিয়ে যাব।'

সূচীপত্রে যান

—'আর আজকাল বৃষ্টি না পড়লে যে-রকম গুমোট হয়, একটা হাত পাখা নেওয়া ভাল।'

—'নদীর পাশে বিছানা করে নেব।'

—'তা কি হয়? ভিজে একাকার হয়ে যাবে যে।'

—'বৃষ্টি পড়লে চটের পর্দা টেনে নেব।'

—'গরমের চোটে মারা যাবে যে তখন' সেই জন্যই বলছি একটা হাতপাখা নিতে।'

—'পাখা কোথায় পাওয়া যায় ?'

—'বৌমার দু-তিনটা অতিরিক্ত পাখা আছে।'

মালতী মাথা নেড়ে—'যেটা ছিল সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না আর মবতে-মরতে ভাঙা কুলোর মতো পড়ে থাকে-টিকটিকির ল্যাজের মতো রয়েছে একটা পাখা।'

মা আমার দিকে তাকিয়ে—'আমার পাখাই নিয়ে যেও, আমাদেব পাখা সময় বুঝে হারায় না তো-মানুষেব উপকারেই লাগে।'

—'হ্যাঁ, দিন।'

মা উঠতে গিয়ে বসে পড়ে ভ্রুকুটি করে—'ষ্টেশনে পাখা কিনতে পাওয়া যায় না ?'

—'তা পাওয়া যায় বই কি।'

—'তা হলে তা কিনে নিও। সুবেশেব কথা শুনে অব্দি মন কেমন পাথব চাপা হয়ে আছে—না পাবলাম তোমার লুচি ভাজতে, না পাবলাম মশলা কুটতে। তোমাব বাবাকে প্রণাম কবে এসেছ ?'

—'যাই।'

কে যে তাকে প্রণাম কবল, কোন হিসাবেই বা, তাও বাবা তাকিয়ে দেখেত গেলেন না। চারদিকে অনেক লোকজন বসে বয়েছে তাঁব। খাস অম্বুবিব গন্ধ ও অব্যবস্থিত তামাসা ও বচসা চলেছে।

ষ্টেশনেব দিকে হাঁটতে-হাঁটতে শেষ পর্যন্ত এই বাড়িব নাবীদুটিব কথাই ঘুবে-ফিরে মনে পড়ে আমাব; তাদেব জন্য বেদনাও বোধ কবি আমি—এমন গভীব বেদনা! একটা জীর্ণ শীর্ণ দাঁড়কাক অমাবস্যাব অন্ধ স্রোতেব মধ্যে তাব অনেক দুবেব নিঃসহায় শিশুদের জন্য যেমন অনুভব করে আমিও কি তেমন অনুভব কবি না মা-তোমাব জন্য; তোমার জন্য মালতী?

স্টিমাবে উঠে দেখলাম শ্রাবণেব মেঘেব সঙ্গে বাতেব অন্ধকার এসে হাহাকাব করে মিশছে। মাথা হেঁট কবে ভাবলাম; আবাব ভোর হবে-হবে না কি?

বামধন বললে-দাঁড়িয়ে আছেন যে বাবু, জায়গা কববেন না ?'

—'হ্যা। কোথায় বিছানাটা পাতা যায় বামধন ?'

—'ভিড় একবাবে গিসগিস কবছে যে, আজ! হজ [?] নাকি ?'

—'কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই বুঝি ?'

—'না!'

—'আচ্ছা, তা হলে তুমি যাও-এই নাও বকশিশের পযসা-আমি দেখেশুনে এক সময়—'

—'মনে বড্ড কষ্ট রইল দাদাবাবু!'

—'কেন ?'

—'আপনাব জন্যে বিছানা পেতে দিয়ে যেতে পাবলাম না।'

—'দেখ রামধন, তুমি বড় আহাম্মক-খববদাব বাড়িতে যদি এ সব নিয়ে কথা বল!'

—'আপনাব পা ছুঁয়ে বলছি হুজুর আমি বলব না কিছু।'

—'যদি জিজ্ঞেস কবে ?'

—'বলব যে নদীর ধাবে সুন্দব বিছানা পেতে দিয়েছি-দাদাবাবু ঘুমোবাব উয্যুগ করছেন।'

—'আর বলিস যে ষ্টেশন থেকে একটা হাতপাখা কিনে নিয়েছি।'

—'যা হুকুম হয হুজুর।'

—'খববদাব, ভুলেও যদি এ ভিড়ের কথা বলিস! ভিড়ের ভিতব জাযগা না পেযে দাঁড়িয়ে চলেছি জানতে পারলে বাড়িতে তাদের ঘুমও হবে না কিন্তু!'

—'যেমনটি বলেছেন হুজুর।'

বামধন চলে

থার্ড ক্লাশ ডেকের একটু ছোট্ট জায়গা রয়েছে দেখলাম—সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের দরজাটার বাইরেই একটু উত্তর মুখ ঘেঁষে। স্টিমারের চোঙা থেকে বিস্তর কয়লার গুঁড়ো এসে পড়ে সেখানে—কে যেন একটু জলও ঢেলে রেখেছে।

কিন্তু জায়গাটা ডেকের একেবারে এক প্রান্তে—নদীর জলের গন্ধ ও অন্ধকারের বুকের উপর যেন। ঝির ঝির করে বাতাস দিচ্ছে, এই গুমোটের ভিতর এ জায়গাটা একটা নিস্তারের মতো। অবাক হয়ে ভাবছিলাম কেউ এই জায়গায় বিছানা পাতে নি কেন—কয়লার গুঁড়ি নামে বলে?

কিন্তু কয়লাল গুঁড়ি চোখে না এলেই তো হল!

বিছানাটা আস্তে-আস্তে পাতলাম, শতরঞ্চিটা মেঝের জলে ভিজে গেল-কিন্তু তোশকটা তত ভিজবে না। এগুলো জল না মানুষের পেচ্ছাপ? যাই হোক, বিছানার চাদরে লাগবে না তো, বালিশেও না; কাল কলকাতায় গিয়ে শত রঞ্চিটা ধুয়ে নেব, তোশকটা রোদে শুকিয়ে নেওয়া যাবে।

প্যাসেঞ্জারদের ভিতর অনেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে—পেচ্ছাপের উপরেই বিছানা পেতেছি তা হলে? মনটা কেমন থতমত খায়, উঠে যেতে ইচ্ছা করে, মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু পশ্চিমের আকাশটা মাইলের পর মাইল নবীন মেঘের পাহাড় বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে, পাহাড়ের একধার যেন আকাশের থেকে জন্ম নিয়েছে, তারই নীচে শহরের কিনার ধরে এক শৃঙ্গ চলে গেছে খ্রিস্টানদের গোরস্থান ছাড়িয়ে গির্জা ছাড়িয়ে—

এ আল্পস—নাশমুলি [?], কারকোরাম—না খণ্ডগিরি?

বিকেলের শেষে প্রশান্ত মহাসগারের কয়েক মুহূর্তের বিহ্বল জল মাইলের পর মাইল—আকাশে আকাশে হাত বাড়িয়ে—

হৃদয় যেন কিমোনো-অঙ্কে জাপানি বালিকার মতো মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যার বিরাট প্রান্তরের মতো নিস্তব্ধ সীমাহীন সমুদ্রের...

মনে হয় যেন কোনো চমরী কোনো নীল গাই, হিমালয়ের পথ ভেঙে-ভেঙে কোনো দিন আনন্দের এত গতি, ও স্থিরতার এত পরিতৃপ্তি বোধ করে নি।

রেনেসাঁসের ইটালির শিল্পীরা নারী প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যে সুন্দর দূব বিচ্ছেদেব দেশের কথা ভাবত, এই মেঘগুলোর ভিতরেই কি লুকিয়ে আছে সেই জায়গা? সেউত্তি বা ভালোযা স্বপ্ন দেখত—ঐ খানেই যেন তা। ঐ খানেই যেন দিদোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইলিযাসের একটা গুহার মোড়ে অন্ধাকারের কুযাশার ভিতর—যেন পুরুরবার সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর দিন কেটেছিল এই পাহাড়েরই কোনো এক চূড়ায়—মূর্খ অর্জুন উর্বশীকে প্রত্যাখান করে চলে গিয়েছিল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-ফ্রা এঞ্জেলিকো ম্যুরিলো মৃত্যুর পর ঐখানে যেন অলস অবসাদে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, নবীন রূপ দেখছে হয়তো, ছবি আঁকছে, ছিঁড়ে ফেলছে, বিকেলের শেষে রোদের সোনালি আভার ভিতর পা ছড়িয়ে তরমুজের রস খাচ্ছে হয় তো হেমন্তের টলটলে রক্তাক্ত রৌদ্রে মাছি যেমন...জীবনের রস পান করে, জমাট মোমের মত শাদা এক তরুণীর কাছে হৃদয় হারিয়ে ফেলেছে হয়তো—

মাইলের পর মাইল এই নীলাভ মেঘের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ভারতবর্ষের পর্বতগুলোর কথা মনে হয় না আমার। আজকের জীবনের কথাও, পৃথিবীর জীবনের কথাও পিছে সরে যায়—মনে হয় এগুলো যেন গ্রিক রোম্যান ভূমধ্য-সাগরের ওপারের জিনিস, মৃত স্মৃতি ও ছবির দেশ-নীল নরম বাল্টিকের ওপারে একদিন যা রয়ে গেছে-কিংবা ম্যুরিলোর [?] দেশ, ভিঞ্চির মনের ভিতর, র‍্যাফেলেব মনে—

দীর্ঘ নগ্ন দুধের মত শাদা শরীর, ঝাউয়ের শাখাপ্রশাখার ফাঁকে জ্যোৎস্নাহীন নক্ষত্রহীন নিস্তব্ধ বনেব মতো অজস্র কালো চুল একজন মানষী পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধূপের গভীর ধবল ধোঁয়ার মতো দাঁড়ায় একা-মিলিয়ে যায়—তাদের প্রেমিকেরা দেবতা না মানুষ? কী রকম মানুষ? থিসিউস-এব মত না মাইকেল এঞ্জেলোর মত? থিসিউস-এর মতই; রক্তমাংসকে আক্রমণ করে কিশোর-যুবক; মাংসবক্তহীন রূপকে আস্বাদ করে এঞ্জেলো; স্বপ্ন ও বেদনা তার একটা বিরাট আকাশের মত ওঠে।

খাকির সুট পরা একজন সাহেব চেকার এসে হাত বাড়াল-আমার টিকিট দেখতে চাচ্ছে।

স্টিমারে সাহেব চেকার এই প্রথম দেখলাম; হয়তো চেকার নয়, কোম্পানিব বড় অফিসার—ইনস্পেকশনে বেরিয়েছে।

এক টুকরা চুরুট ছিল পকেটের ভিতর; ধীরে ধীরে জ্বালিয়ে নিলাম। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যার ছবি মিলিয়ে গেছে, সেই মেঘের পাহাড় নেই আর, চারদিকে শাদাসিধে বাংলার পাড়া গাঁ।

স্টিমার ছেড়ে দিয়েছে।

মাঠ জঙ্গল খোড়ো ঘর সলতের প্রদীপ একে-একে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দেখা দিয়ে চলে যায়, মনের ভিতর বিক্ষোভ জমে ওঠে কেমনতর যেন এক, মনে হয় যেন স্পেন ও গ্রিস, রেনেসাঁস, এঞ্জেলো, -বিলো, সমস্তই সরে গেল, বাদলভেজা মাঠ অশ্বত্থ ও জঙ্গল যেখানে ময়নামতীর গান ও রূপচাঁদ পক্ষীর জন্ম হয়েছিল একদিন। বৃষ্টির ঘনঘটার ভিতর পথের সঙ্গিনী এই নদী। খোড়ো বনের ভিতর থেকে পাড়াগাঁর দুঃখিনী রূপমতীর উনুনের ধোঁয়া—পাশেই তার-বেল ও বাঁশের জঙ্গলের ভিতর থেকে ধূ ধূ মাঠের আনাচে-কানাচে যুগান্তের প্রেতিনীদের নিরবচ্ছিন্ন রূপকথা, কোথাও একটা চিতা, খানিকটা কাঠমল্লিকার গন্ধ-আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে জোনাকি, সজনে গাছের ডালে জোনাকি, লক্ষ্মী প্যাঁচার ডাক; বাংলার মাঠঘাটের পথ দিয়ে অনেক শতাব্দী ঘুরিয়ে আনে আমাকে, প্রান্তর ও নিশুতির ফাঁক থেকে অসংখ্য মুখ উঁকি দেয়, কিশোরী ও পুরলক্ষ্মীদের নিরপরাধ নরম ডৌলের নিবিড় মুখ সব কাছে এসে বলে—'চিনতে পার তো ?'

'হ্যাঁ চিনি বই কি—তোমরা আজ মৃত বুঝি সব ?'

'হ্যা, কিন্তু তোমার এ বেশ কেন ভাই ?'

'এই বেশই কি আমার চিরকাল ছিল না!'

'না না তোমার নাম যে সুলক্ষণ ছিল—নয়নপুরের মাঠে তিনশ বছর ধরে তুমি যে একটা ঝাঁকড়া ঝুড়িওয়ালা বটগাছ হয়ে ছিলে!'

'কে? আমি!'

'গ্রামের দেবতা হয়ে ছিলে, নিজেকে চিনতে পার না দেবতা ?' ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় সব—

অনেকদূর থেকে ডাক আসে-'ওগো গ্রামদেবতা ওগো গ্রামদেবতা!'...

অমাবস্যার মাঠকান্তার আম কাঁঠাল হিজল জামের জঙ্গল হারিয়ে যায় সব। একটা জেটির কামরায় কামরায়.... লাইট জ্বলছে। নদীর পারে অনেকগুলো লণ্ঠন ও আলো লোকজন ছুটোছুটি করছে। কলরব। স্টিমার অনেকখানি স্টিম ছেড়ে দিয়ে একটা স্টেশনের ধাপে এসে থামল।

চুরুটটা নিবে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিলাম আবার।

খানিক্ষণ টেনে কেমন পিপাসা বোধ হল। ধীরে ধীরে...ফার্স্ট ক্লাশ কেবিনের দিকে গেলাম। পাগড়ি চাপকান পরে বাটলার দাঁড়িয়ে ছিল-মুখ বসন্তের দাগে বিকৃত, শাদা দাড়ি শাদা চুল।

—'এক গ্লাস জল দিতে পারো।'

আপাদমস্তক আমার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার-বাঁ হাঁটুর পাশে ধুতির ফুটোর উপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার, বোতামছেঁড়া শার্টের হাতাটা, অপরিচ্ছন্ন জুতোজোড়া আধময়লা কাপড়-চোপড় সবই দেখতে হয় তাকে—

বললে—'দরজার কাছে এসে দাঁড়াবেন না।'

একটু সরে দাঁড়লাম।

—'আপনি কোন ক্লাশে যাচ্ছেন ?'

—'থার্ড ক্লাশে।'

—'ইন্টারে ?'

—'না। থার্ডে।'

—'সেখানে তো ট্যাঙ্কে কল আছে।'

—'ফুরিয়ে গেছে।'

—'আপনি কারি-ভাত খাবেন ?'

—'কত করে ডিশ ?'

—'এই চোদ্দ আনা বার আনা।'

মাথা নেড়ে—'না, ভাত আর খাব না এবার।'

—'চা চাই ?'

—'না চা-ও না—এক গ্লাস জল পেলেই হয়ে যায়।'

—'একটু দেরি হবে-বড় ব্যস্ত আছি।'

সহসা ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে কেবিনবয়দের সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করল।

খানিক, ঝাড়ুদারকে ধমকাল পাঁচ মিনিট বসে, জনমানবহীন অন্ধকার সেলুনেব দিকে বার দুই গেল, ফিরে এল, একটা বিড়ি জ্বালাল, মিনিট দুই টেনে আড়মোড়া ভেঙে একটা খানশামা ছোকরাকে বললে এক গ্লাস জল ঢেলে দিতে। জল কাচের গ্লাসে পেলাম অবিশ্যি।

পরিতৃপ্তি মন্দ নয়।

মা সঙ্গে খাবার দিতে ভুলে গেছেন; কী খাওয়া যায়? চুরুটই কিনে নেয়া যাক গোটা চাবেক।

বিছানায় শুয়ে ধীরে-ধীরে ঘুম আসে; সমস্ত আকাশ মেঘে ভবে আছে; বৃষ্টি নেই তবু বাতাস আসছে, বড় আরাম। প্রথম রাতেই শীত করতে লাগল—ইচ্ছে কবল গায়ে কম্বল টেনে নেই একটা—কিন্তু কম্বল তো আনি নি; জড়সড় হয়ে শুয়ে রইলাম।

মাঝে-মাঝে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি-সৃষ্টির ক্ষমাহীন বিবল মুখ চাবদিকে ভাসতে থাকে। বিছানার উপর উঠে বসে থাকি। চুরুট টানতেও ইচ্ছে কবে না।

ধীরে-ধীরে জুতো পরে ডেকের উপর পায়চাবি কবতে থাকি-যে যেখানে খুশি আখের ছিবড়ে ও থুতু ছিটিয়ে ফেলছে, কলাব বাকল, আমের খোশা সাবধানে এড়িয়ে চলতে হয়; এক-একটি জায়গায় জমাট পেচ্ছাপের গন্ধ; এক-একটি ক্যানভ্যাস পেচ্ছাপের গন্ধে জ্বলে যাচ্ছে যেন; মাথাব উপবে দরমার ছাউনির নীচে ইলেকট্রিক বাতি কেবোসিনের কুপিব চেয়েও অধম, এক-একবার জ্বলছে, এক-একবাব নিভে যাচ্ছে প্রায় জোনাকির জেল্লার মত, সমস্ত অভিষিক্ত করে বিড়িব গন্ধ, সব দিকে। সব সময়ই গুমোট।

এক-এক দল মানুষ মৌমাছির মত পাকিয়ে বয়লারের চাবপাশে ঘুমুচ্ছে; একনিষ্ঠ ঘুম; ঘুমেব ভান নয়-ঐকান্তিক একনিষ্ঠ ঘুম; সমস্ত শবীব ঘামে ভিজে গেছে-মুখ হয়ে আছে হাঁ-কাপড়-চোপড় খসে খুলে—

পাশেই বয়লাব। নীচের থেকেও হাপর ও পিস্টনের তাত মেরুদণ্ড সিদ্ধ কবতে থাকে, ফ্ল্যাটের ফাঁকে আলকাতরার পুডিং পর্যন্ত গলে যায়। অবাক হয়ে ভাবি এরা কী করে এমন জায়গায় এ বকম ঘুমিয়ে থাকে! আমাকেও মাঝে-মাঝে বয়লারেব পাশে শুতে হয়েছে বটে...আবার শ্রাবণেব গরমেব মধ্যে। কিন্তু ঘুমোতে পারি নি-সারারাত পায়চারি কবেছি।

এরা ঘুমুচ্ছে—

গভীর ভাবে এরা মানুষ।

জীর্ণ শীর্ণ ভীত প্রতারিত মুখ তুলে নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের জয়গান কবে চলে যাচ্ছে এবা অনেক দিন। বসে এদের দেখলাম আমি; মনে-মনে গভীব শ্রদ্ধা জানালাম!

নীচে চলে যাই। হাঁস-মুরগি খাঁচায় ঘুমিয়ে আছে—আজ বোধহয় গোটা কযেক বুড়ো মুরগি কাটা হয়েছে শুধু—কিংবা কে জানে একটাও কাটে নি, সেলুনে তো কোনো লোক দেখি নি আজ; তাকিয়ে দেখলাম এদের ঘুম নিবিবিলি নয়, সবাই ঘুমেচ্ছেও না—গলাগলি কবে পড়ে আছে-প্রতি মুহূর্তে অন্ধকারও প্রত্যাশা করছে-এদের সঙ্গে যারা এই বকম ব্যবহার করছে একদিন তাদেরও এই খাঁচায় ফিবে আসতে হবে নাকি? না আসলেই ভাল; জীবনেব থেকেও এরা যেন তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় সেই ভাল। মৃত্যুর পরপার কাব জন্য কী রেখেছে কে জানে! কিন্তু এদের জন্য এব চেয়েও অন্ধকাব কিছু রাখে নি আবাল্য।

কিন্তু মৃত্যুর পরে নেই তো কোনো স্মৃতিদেশ, নেই তো কোনো অনুভূতি-লোক—

এগিয়ে যাই-খালাশিরা সালুন খাচ্ছে; মাটির থালায় [?] করে খেতে ইচ্ছে করে; বড্ড খিদে পেয়েছে।

পকেট থেকে পোড়া চুরুট বের কবে জ্বালিয়ে নেই; স্টিমারের ঘড়িতে দেখি দশটা বেজে গেছে—আমাদের সাড়ে দশটার মতো তা হলে? নীচেব খাঁদলে দুইজন খালাশি স্তূপীকৃত জ্বলন্ত কয়লা

বারবার ঠেলে দিচ্ছে; টেনে বার করছে, নানারকম মেলাই খেলছে, দেখে-দেখে হয়রান হয়ে যাই অথচ সারা পথ এরা এই রকমই করবে, জীবনের সব পর্যায়েই এই রকম সব লোক রয়ে গেছে; এদের দিকে তাকিয়ে নিজের ভিতরের মনুষ্যত্ব ও অমানুষিক সম্ভাবনার কথাও মনে হয়, আমার সেই রকমই মনে হয়, বারবার মনে হয়। এদের কথাই মনে হয় না শুধু?

এগিয়ে চলি-নীচের ফ্লাটেও অনেক বিছানা পড়েছে। কেউ জেগে আছে, কেউ ঢুলছে; চারদিকে কেমন চামসে গন্ধ, শুঁটকি মাছ হয়তো—চটের বস্তায় চালান যাচ্ছে। নুনমাখানো কাটা ইলিশের কয়েকটা বাক্স দেখছি; কলকাতায় যাচ্ছে? মানুষের শখ তো অনেক রকম। অনেকগুলো চিকন পাটি, বেতের কাজ নানা রকম, ঝুড়িতে নানা রকম ফল, কতকগুলো কেরোসিন তেলের টিন ভর্তি অদ্ভুত গন্ধের কী এক জিনিস- অনেকগুলো তিসির বস্তা হয়তো, বস্তা-বস্তা চাল জাহাজ বোঝাই হয়ে চলেছে; পাশেই একটা হিলম্যান কার—কোন গুদামে গিয়ে থাকবে এ সব জানি না; হয়তো কলকাতায়ই, হয়তো কাছাকাছি কোনো স্টেশনে!

নদীর মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, নিরবচ্ছিন্ন গভীর বাতাস, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, শরীরের ভিতরে রক্ত। হেমন্তের গভীর রাত...স্টিমারের সার্চ লাইটের দিকে চীনা রেশমের মতো নরম ডানাওয়ালা অসংখ্য ধূসর পোকা উড়ে আসছে; এগুলোকে কী পোকা বলে! দু-একটা আমার হাতের উপরে মুখের উপর এসে পড়ছে—ডানার ভিতর থেকে নরম শাদা-শাদা গুঁড়ি-গুঁড়ি ঝরে পড়ছে—আলোর জন্য এরা পাগল—কচি শিশুর বুকের মতন পাখনা ধড়ফড় করছে, ডেকের চারপাশে এই সব মৃত পোকার দল মুহূর্তে-মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে, এক-একটা পাগলা ঢেউয়ের লেলিহান ঝর্ণায় সেই সব মৃত শরীর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আবার একটা মৃত পোকা তুলে নেই; মাখনের মতো শাদা পালক পাখনা, ছোট্ট শরীরের মধ্যে চোখ মুখ গলা বুক পা ডানা দেহের কারুকার্যে তাজমহলের শিল্পগুণের চেয়ে একটুও কম সহিষ্ণুতা কৌশল ও যত্ন দেখায় নি তো! লক্ষ লক্ষ বার এই রকম গভীর সাধনার পরিচয় দিয়েছে এই কীটনির্মাতা।

কিন্তু তবুও মৃত্যু ও অন্ধকারের মধ্যে এই অবর্ণনীয় প্রয়াস মুহূর্তে-মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও বিরাম নেই তো শিল্পীর!

উপরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার উপর দিয়ে জুতো মাড়িয়ে চলতে ভ্রূক্ষেপ করে নি কেউ; যেখানে সেখানে কাদা ও সুরকির ছাপ।

আস্তে-আস্তে ধুলোগুলো ঝেড়ে নিয়ে বসলাম।

তাকিয়ে দেখলাম একজন বুড়ো মানুষ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—'মশাই শুনছেন?'

—'আমাকে বলছেন?'

—'আপনাকেই।'

—'বলুন।'

—'এটা কি আপনার বিছানা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এখানে আমি একটু শুতে চাই।'

একটু হেসে—'সে আপনার অনুগ্রহ।'

—'না, ঠাট্টা নয়।'

—'আমিও ঠাট্টা করছি না।'

—'দেখছেন তো কী রকম ভিজে বিড়ালের মতো চেহারা আমার; আজ কম করে সাত ক্রোশ পথ হেঁটেছি—সেই হতচ্ছাড়া মিনসে জনার্দনটার পাল্লায় পড়ে', চোখ কপালে তুলে হাঁসের মতো ফোঁসফোঁস করে বুড়ো, 'মিনসে আবার হয় আমার সম্বন্ধী—মাগের ভাই—কাজেই...'

—'বুড়ো বয়সে অনেক হাঁটিয়ে ছাড়লে দেখছি!'

—'আমার ব্যাপারটা কী শুনুন।'

—'বলুন।'

আমার বিছানায় হাত বুলিয়ে জায়গা খুঁজে নিয়ে বসল। কাঁধে একটা চাদর শুধু—পরনের কাপড়

কোমরে জড়ানো আছে বটে, কিন্তু হাঁটু পর্যন্তও নামে নি। শনের মতন সাদা চুল, গালে মাসখানেকের সাদা দাড়ি গজিয়েছে, যেন অনেক দুঃখকষ্ট, শূন্যতা ও ধূসরতার ভিতর দিয়ে; কথা বলতে-বলতে বুড়োর মুখ যখন একটু প্রসন্ন হয়ে ওঠে, মনে হয়, হাঁড়ির থেকে এক থাবা দই নিয়ে মানুষটির গালে খুব বেমালুম ভাবে ঘসে দিয়েছে কে যেন। চোখ দুটো থেঁতলানো বেত-ফলের মত-জায়গায় জায়গায় মরিচের রং রয়েছে।

—'ঝাঁ ঝাঁ রোদের ভিতর দুপুরবেলা আমাকে আকড়াপুরের মাঠে নিয়ে গেল।'

—'কেন ?'

—'বললে সেখানে একটা তেঁতুল গাছে রোজ দুপুরবেলা নাকি আমার লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়।'

—'কী রকম ?'

—'মশাই, আমারও মাথা খাবাপ, নইলে ঐ ছাগলের কথা কেউ শোনে? আমাব স্ত্রী মরল বীবেন মুখুজ্যেদের পোড়ো বৈঠকখানার কড়িকাঠে ঝুলে, আকড়াপুরের তেঁতুলগাছের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ?'

—'তাই তো ?'

—'তবে শুনেছি পেত্নিরা নাকি এক-একটা গাছ আশ্রয় করে থাকে।' চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে—'তাই শুনেছেন বুঝি ?'

—'আজ্ঞে ধর্মে এই কথাই বলে।'

—'আপনার স্ত্রী পেত্নিও হয়েছেন মনে হয আপনার ?'

—'ভর সন্ধ্যার ডাকিনী সে; ইহলোকের মানবীর সঙ্গে তার কি আজ আর কোনো সম্বন্ধ আছে ?'

—'নেই ?'

—'নাবাযণ-নাবাযণ।'

বুড়োকে বড় কাতর দেখলাম।

—'কেনই-বা গলায দড়ি দিলেন ?'

—'এ সব আর জিজ্ঞেস করবেন না।'

—'একটা চুরুট খাবেন ?'

—'বিড়ি নেই আপনার কাছে ?'

—'না।'

—'চুরুটগুলো বড্ড কড়া।'

—'দেখুন একটা খেয়ে।'

—'দিন।'

একটা টিনের বাক্সেব মধ্যে চুরুটটা বেখে দিযে বুড়ো—'তা সেই আকড়াপুবেব তেঁতুল গাছে সে থাকবে কেন? তাকে তো সেখানে দেখলাম না।'

নীরব ছিলাম।

—'মিছিমিছি হেঁটে-হেঁটে আমার কোমর টনটন কবছে।'

—'শুযে পড়ুন।'

—'আমরা কিন্তু জেতে দ্বাদশ তিলি।'

—'বেশ।'

—'আপনাকে দেখে তো বামুন-বামুন মনে হয।'

—'আজ্ঞে সে যে নই!'

—'আপনি কাযেত ?'

—'বদ্যি।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বুড়ো—'সেও তো আপনার ঘুরেফিবে বামুনই হল।'

—'আমি নিজেকে চাঁড়াল মনে কবি।'

—'পৈতে নিয়েছেন ?'

—'আজ্ঞে না।'

—'এক বিছানায শোব; পাযে-পাযে ঠেকে যায যদি ?'

—'তবে না হয় নাই-বা শুনলেন ?'

—'রাধাবল্লভের নাম করে শুয়েই পড়া যাক। আপনিও শোবেন তো ?'

—'একটু দেরি আছে আমার।'

টিনের বাক্স থেকে একটা বিড়ি বের করে শুয়ে পড়ে।

—'বুড়োর গলায় যে কণ্ঠীর মালা আছে আমার সেদিকে বুঝি নজর পড়ে নি আপনার? দেশলাই আছে ?'

—'আছে।'

—'দিন-বিড়িটা জ্বালিয়ে নেই।'

দিলাম।

—'নামাবলীর বদলে চাদর পিঠে ফেলে বেরিয়েছি আজ—ফোটা-তিলকও কাটি নি—কিন্তু বৈষ্ণব হয়েছি আমি আজ প্রায় ৪০ বছর হল।' লোকটা বলে, 'আমাকে দীক্ষিত করেছিলেন কানুপ্রিয় গোঁসাই বাবাজী—নাম শুনে থাকবেন—এ অঞ্চলে কালা গোঁসাই বললে গরু-বাঘ সকলেই চেনে। সে কি আজকের কথা গোঁসাই ?'

বিড়িটা জ্বালিয়ে নিয়ে বুড়ো—'আমার নাম হর্ষনাথ, খুব ভালো খোল বাজাতে পারি। শুনেছেন ?'

—'আজ্ঞে না।'

ঈষৎ আহত হয়ে ওঠে-'বাস্তবিকই শোনেন নি? দল করেছিলাম, কত কীর্তনের দলে আমি গেয়ে বেড়াই।'

—'সেটাও পারেন ?'

পারি একটু-আধটু, খোলমৃদঙ্গেই আমার হাত বেশি। বাজাতে-বাজাতে দাঁড়িয়ে উঠে নাচতে থাকি; কার মাথা কার লেজ মাড়িয়ে যাই খেয়ালও থাকে না। খেয়ালের দরকারই-বা কী? দ্বাদশ তিলির সন্তান বলে বৃন্দাবনে আমি পরিত্যাজ্য নই তো ?'

—'না, তা নন।'

—'আপনিও যেমন বৃন্দাবনের অধিকারী আমিও তেমন।' আমি সমর্থন করে মাথা নাড়লাম।

—'কার পা কার গায়ে লেগে যায়, কানুর পাই তো রাধার গায়ে লাগছে—এই তো অবশেষে বিচার; কী বলেন ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বিড়ি টেনে—'তা হলে আমাদের দুজনের মধ্যে বৃন্দাবনের সম্বন্ধ হল!'

—'হলে তো ভালই।'

—'রাতের বেলা আমার পা যদি আপনার গায়ে লেগে যায় বৃন্দাবনের ধুলো বলে মনে করে নেবেন তা দাদা?

—'খুব।'

বিড়ি ফুকতে-ফুকতে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে—'আপনার ঘুম পায় নি ?'

—'না!'

—'বসেই থাকবেন ?'

—'কিছুক্ষণ তো—'

—'আমি তা হলে ঘুমিয়ে পড়ি ?'

—'নির্বিঘ্নে।'

—'কোথায় নামব জানেন ?'

—'কোথায় ?'

—'সেই ট্রেন ধরব গিয়ে; আপনি ?'

—'আমাকেও ট্রেন ধরতে হবে।'

—'কলকাতায় যাবেন ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আমিও কলকাতায়ই চলেছি।'

সূচীপত্রে যান

—'বেশ তো; কোন আখড়ায় ?'
—'এই স্টিমারটা ধরবে কখন খুলনায় ?'
—'আজ্ঞে হ্যাঁ ভোববেলায়।'
—'তা হলে সারারাত ইস্টিমারেই ঘুমোতে পারা যাবে ?'
—'আজ্ঞে।'
—'একটা অনুরোধ আপনার কাছে।'
—'বলুন।'
—'আমি যদি ঘুমিযে পড়ি—'
—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
—'তা হলে আমাকে আব জাগাতে যাবেন না।'
—'একটা হাত পাখা থাকলে আমি বরং আপনাকে হাওয়া কবেই বাত কাটিযে দিতাম, গোঁসাই!'
—'ঘুমোলে পবে গা-গতবও ঠেলবেন না। রাতটা একটু ঘুমিযে নিতে চাই। কাল তো আবাব কলকাতায গিযে আখড়াব গোলমাল সব!'

অতি সহজেই ঘুমিযে পড়ল।

বেলিঙেব্ব কাছে ট্রাঙ্কটার উপব বসলাম গিযে; কিন্তু দু-এক মুহূর্তেব মধ্যেই জুতো পাযে পাযচাবি করতে লাগলাম।

স্টিমাব বেশ ঝাঁকুনি খেযে চলছে—কতকগুলো ফাযাব ব্রিগেডের বালতি একটা লোহার আড়াব গাযে ঝুলছে, স্টিমারে কোনোদিন আগুন লাগে কি? পব পব অনেকগুলো লাইফবোয সাজানো; স্টিমাব যদি কোনোদিন ডুবতে বসে কিংবা অন্য কোনো বকম দুর্ঘটনা হয তা হলে প্যাসেঞ্জারবা এই সব বোযেব আশ্রযে জলের ভিতব থেকে সাঁতাব কেটে ডাঙায উঠতে পাবে। ছোটবেলা থেকেই এই সব স্টিমাবে আমার যাতাযত; দেখে এসেছি এই সব।

স্টিমাব অবিশ্যি ডোবেও নি কখনো, আগুনও লাগে নি কোনোদিন।

—'সুকুমাব নাকি ?'

পিছন ফিবে তাকালাম।

—'তাই তো। আমি এই আধঘন্টা ধবে তোমাকে নেকনজবে বেখে হযবান হযে গেলুম; কী মতলবটা তোমাব বলো তো দেখি।'

একটু এগিযে গিযে—'চোখে তেমন দেখি না, চিনতে পেবেছ ?'
—'বনবিহাবী নাকি ?'
—'বাযুচড়ার মতন ঘুবছ যে? বসো।'
—'আমাব ধাতই ঐ বকম।'
—'বাত এখন কম হয নি।'
—'কটা বলো তো ?'
—'গোটা বাব বাজে।'
—'তুমিও তো জেগে রযেছে দেখছি।'
—'কলকাতায যাচ্ছ ?'
—'হ্যাঁ।'
—'আমিও।'

একটা বিড়ি জ্বালিযে—'আমি অবিশ্যি খুলনায একদিন হল্ট কবব, একটা হোটেলে খেযে নেব, কিছু কাজ আছে, তুমি ?'
—'আমি সিধেই যাব।'
—'এক্সপ্রেসে ?'
—'হ্যাঁ।'
—'বিছানা করতে পাব নি বুঝি? যা ভিড়! এত মোছলমান যাচ্ছে কোথায়? হজে? অনেক বোষ্টমও তো দেখছি-একটা মহোচ্ছব টহচ্ছব আছে না কি হে নবদ্বীপে ?'

—'জানি না।'
—'কোথায় যে কী থাকে? তোমার বিছানা কোথায় ?'
—'উ-ই দিকে।'
—'পাততে পেরেছ তা হলে।'
—'হ্যাঁ।'
—'চাকির মতন ঘুরছ তা হলে-কী মনে করে ?'
—'এমনিই।'
—'ঘুম আসছে না বুঝি ?'
—'নাঃ!'
—'যা গুমোট মেঘ করে আছে, অথচ বৃষ্টি হয় না'—বিড়িতে একটা টান দিয়ে—'মনটা আমার থমকে আছে কয়েকদিন ধরে।'
—'কেন ?'
—'ফটকের বৌটা মাবা গেছে।'
—'কোন ফটিক ?'
—'আমার মাসতুতো ভাই ফটিক; বার্ন কোম্পানিতে কাজ কবত।'
—'ও-হোঃ! চারুলতা মাবা গেছে।'
—'হ্যাঁ।'
স্তম্ভিত হয়ে বসে বইলাম; অনেকক্ষণ পর্যন্ত বনবিহাবীর মুখেব দিকে তাকিয়ে চুপ কবে বইলাম।
—'ভাবছ কী ?'
মাথা নেড়ে-'না।'
—'হ্যাঁ, মাবা গেল—বড্ড আক্ষেপেব কথা; বিয়ের পর তিনটি বছব টিকল মোটে।'
অনেকক্ষণ চুপ থেকে—'আজ সকালেও আমাব মনে পড়ছিল, ভাবছিলাম, চৌদ্দ বছব বাড়ির পাশপাশি বইল, এক সঙ্গে ফড়িং ধরলাম, ফুল কুড়োলাম, সেই চারুলতা আজ কোথায় ?'
—'কেন ফটিকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—জানো না!'
—'জানতাম—হবাব কথা ছিল আমাব সঙ্গেই। অনেকদিন দেখি নি মেয়েটিকে।'
—'মৃত্যুব সময সে অবিশ্যি তোমাব নাম কবে নি; তোমাকে দেখতেও চায নি—'
অনেকক্ষণ চুপ থেকে—'উঠি বনবিহাবী।'
—'আবে বসো-না।
—'আমার একটা ট্রাঙ্ক পড়ে আছে।'
—'থাক না। কাব এত মাথা ব্যথা পড়েছে তোমার ফুটো ট্রাঙ্কেব জন্যে ?'
—'আমাকে আর এখানে বসিয়ে তোমাব কী লাভ ?'
—'কেন, বিছানায গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদবে? তোমাব কাছে কিব পযসা আছে ?'
—'না।'
—'এই সিকিটা ভাঙাতে হবে তো; তুমি একটু ভেণ্ডাবের কাছে গিয়ে ভাঙিয়ে আনবে ?'
—'এত রাত্রে সিকি ভাঙিয়ে কী হবে ?'
—'কাল খুব ভোরে খুচবো পযসা চাই যে।'
—'তা খুলনায ভাঙিযে নিলেই হবে।'
—'আচ্ছা, দেখ তো, এই সিকিটা তেলা কি না ?'
নেড়েচেড়ে—'চলে যাবে।'
—'ভাল করে আলোয নিযে দেখো।'
—'দেখছিলাম।'
—'মহারানীর মুণ্ডুটা মুছে গিয়েছে না ?'
সিকিটা ঘুরিয়ে ফিবিয়ে দেখে বনবিহারীকে ফিবিয়ে দিলাম।
—'কী, কোনো উচ্চবাচ্য করছ না যে।'

সূচীপত্রে যান

—'কী জানি, নাও চলতে পারে।'

—'এমনই বেল্লিক আমি! সাত হাজারবার নাকে দড়ি বেঁধে এই সিকি ঘুরিয়ে আনব আমি।'

বনবিহারী উত্তেজিত হয়ে বিড়ি টানতে লাগল।

উঠছিলাম; আমাব কাঁধে হাত রেখে বসিয়ে দিয়ে—'একটা সিকির দুঃখে মানুষের সঙ্গে অসদ্ব্যবহাব করে কী লাভ হবে আমার ?'

—'কার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার কবলে তুমি ?'

—'তুমি উঠে যাচ্ছ যে!'

—'এমনিই।'

—'গিয়ে ঘুমোবে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঘুম পেয়েছে ?'

—'বড্ড।'

—'কে প্রায় মাস তিনেক হল মরে গেছে; আজ রাতে তার জন্য কেঁদে নিজেকে হাস্যাস্পদ বানাতে যাও কেন সুকামাব? আঃ বিড়িটা নিবে গেল'—পকেট থেকে দেশলাই বেব করে বনবিহাবী।

—'ফটিকের চেয়ে তো নিকটতম কেউ নেই চারুর ?'

দেশলাইয়ের কাঠ ঘসতে-ঘসতে—'কী করেই-বা থাকে? যদি থাকে সে মেয়ে নয়, ডাইনি।'

বিড়িটা জ্বালিয়ে নিয়ে বনবিহাবী—'সেই ফটিক আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কথাবার্তা চলছে-আসছে বোশেখেই হয়তো দ্বিতীয় পক্ষে ঘবে আনবে, ছোকরাব তো পয়সাকড়িব অভাব নেই, অফিসাবের চাকবি তো আছেই-লটারিতেও হাজাব দশেক পেয়েছে না কি, গরু মবে নি, বউ মবেছে, ছেলেটিব খুব পয।'

তাকিয়ে দেখলাম খালাশিবা এসে ঝপাঝপ ক্যানভাসেব পর্দা টেনে দিচ্ছে—বাইবে বৃষ্টি পড়ছে বোধ কবি।

—'একটা বিড়ি নাও।'

—'না, ঘুমোবাব মুখে আব খাব না।'

—'শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাও সুকুমাব? আমবা কি জানি না? আমবা জানি সব। চারু আব তোমার চোদ্দ বছব বৃন্দাবন লীলাব এক তিলও আমাদেব কাছে গোপন নেই। ছেলে প্রসব করতে গিয়ে মাবা গেল মেয়েটি; তিন বছবেব মধ্যে দুটি সন্তান প্রসব-সব ধাতে প্রসব হয না। প্রথম ছেলেটি বিযোবার পবে একেবাবে কাঁকলাসেব মত হেয গেল বৌ-ডাক্তাব বললে দশ-বাব বছবেব মধ্যে এব যেন আর ছেলেপিলে না হয। কিন্তু ফটকে একটা জানোয়াব!'

বুড়োকে আস্তে-আস্তে খানিকটা একটু সবিয়ে দিয়ে একটু জাযগা করে নিয়ে শুলাম—আজ রাতে হর্ষনাথ আমাব সঙ্গী না হলেই ভাল ছিল।

চোখ বুঝে চুপ কবে পড়ে ছিলাম।

মিনিট পনের পবে মনে হল কে যেন আমাব বুকে হাত বেখেছে।

—'কে ?'

—'ঘুমোচ্ছ বুঝি ?'

—'বনবিহারী ?'

—'তোমাকে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম, উপরে-নীচে, তা এই তোমার শয্যা ?' উঠে বসলাম।

—'এই বুড়োটি কে ?'

—'ইনি বোধহয তীর্থে যাবেন কোথাও।'

—'তোমাদেব দেশের বাড়ি থেকেই এসেছে বুঝি ?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

—'তোমার ঠাকুর্দার তহশিলেই [?] কাজ কবতেন ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা তোমাদের জাযগাজমি তো সাফ হয়ে গেছে—এখন ইনি চলছেন কোথায ?'

সূচীপত্রে যান

—'বৈষ্ণব মানুষ—কোনো একটা আখড়ায় গিয়ে থাকবেন!'
—'একে তোমার শয্যার সঙ্গী করলে যে ?'
বাইরে অন্ধকার বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।
—'কই চোখ তো তোমার লাল হয় নি, চারুর জন্যে কাঁদনি তা হলে ?'
—'রাত তো অনেক হয়েছে ?'
—'তা একটা আন্দাজ বাজে।'
—'আর এই তিনটে ঘন্টা যে যার জায়গায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেই, কী বলো? চারটের সময় তো স্টীমার খুলনায় ধরবে।'
—'উঠে বসো।'
—'কেন ?'
—'কথা আছে।'
—'কাল সকালে হবে।'
শোবার চেষ্টা করেছিলাম; বনবিহারী আমার ন হাত ধরে হিড়হিড় করে খানিকটা টেনে নিয়ে—
—'রানী হয়েছে নাকি তোমার ?'
—'কেন ?'
—'পোঁদে হাঁটছ যে, পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে পার না ?' দাঁড়িয়ে—'কী মতলব তোমার ?'
—'চলো আমার বিছানায়।'
—'কেন ?'
—'চাঁট হবে।'
—'তুমিও তো কলকাতা চলেছে-একদিন না হয় তোমার বাসায় গিয়ে আড্ডা দেব। এখন আমার কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না বনবিহারী।'
—'পানের ডিবেয় ভরে গিন্নি এমন পশ্চিমি পান সেজে দিয়েছেন-কিমাম আছে, জর্দাও আছে, একা-একাই বসে খাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম সুকুমারকে দেওয়া হল না তো ?'
—'তোমার সহৃদয়তার কথা মনে থাকবে বনবিহারী; কিন্তু পান আমি ছোটবেলায় খেতাম, তারপর আর খাই নি।'
—'তামাকও খাও না ?'
—'না।'
—'বেশ ভাল স্টেট এক্সপ্রেস আছে—'
—'তুমিই খাও।'
—'তা হলে তুমি এসে দেখ আমি কী করে খাই'—আমার হাত ধরে আবার টান দিল বনবিহারী।
—'বাইরে বেশ শনশন করে বৃষ্টি পড়ছে-ফ্ল্যাটও প্রায় অন্ধকার; এর ভিতর একা চোখ বুঝে পড়ে থাকতে পারো না তুমি ?'
—'আমার বৌ তো কুলত্যাগ করে নি, ছেলেও মরে নি, ঘুম কিন্তু পালিয়ে যায় নি; অন্ধকারের মধ্যে তোমার বিচিত্রতা নিয়ে খেলা করে আমার কী লাভ ?'
ডিবের থেকে দুটো পান বের করে মুখে দিয়ে একটা সিগারেট জ্বালাল বনবিহারী।
বললে—'চলো ফার্স্ট ক্লাশের সেলুনে যাওয়া যাক।'
—'কেন ?'
—'কিছু হুইস্কি খাওয়া যাক।
—'এত রাতে? আজ রাতে আমাকে মদ খেতে বল ?'
—'কোনোদিনই কি মদ খাও নি তুমি ?'
—'খেয়েছি একটু-আধটু।'
—'তবে আর কী? সে-হতভাগিনীর কথা মিছিমিছি কেন ভাবতে যাও? যে কি না দু বছরের মধ্যে দুটি সন্তান বিয়োতে পারে, সে তোমার সব স্মৃতিই মনের থেকে মুছে ফেলেছিল-কী, এগচ্ছ না যে ?'
—'আমি ফিরেই যাই।'

—'আবার আঘাত লাগল ?'

সিগাবেটটা দাঁতের ফাঁক থেকে নামিয়ে বনবিহারী—'যে মানুষ মরে গেছে তার কাজকর্ম মতিগতি ঘেঁটে আমাদেব কী লাভ? শ্মশানের ছাইযের ভিতরে সে বেচাবি আজ কাদার চেয়েও অধম যে!'

—'এত রাত করে আমি আর কিছু খাব না।'

—'কী করবে তা হলে ?'

—'দেখি, হর্ষনাথ গোঁসাই জেগে বসে আছেন হয় তো!'

—'তার সঙ্গে গিয়ে মুখ খিস্তি করবে ?'

—'না, গোঁসাইযের পাশে একটু ঘুমব।'

—'তার চেয়ে আমাব টেবলের পাশেই এসে বসো-না কেন-মদ ববং নাই-বা খেলে।'

—'এত রাতে সেলুনে গিয়ে বসবে-বাতি জ্বালবে তো ?'

—'নাই-বা জ্বালল-একবার দেশলাই জ্বেলে দেখে নেব লেবেল ঠিক আছে কিনা।'

—'ফার্স্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জারদেব ঘুম ভেঙে গেলে বিপত্তি আছে।'

—'ফার্স্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জার নেই।'

—'বাটলারকে ঘুম থেকে জাগাবে ?'

'সে-হাবামজাদা পাগড়ি মাথায় দিয়ে ফিবছে, দেখছ না ?' সেলুনে গিয়ে বসলাম।

হুইস্কি-সোডার হুকুম দিয়ে বনবিহাবী—'চারুর এ দুটি ছেলে তাব ইচ্ছার সন্তান নয়। কিন্তু ফটিককে চেনো তো-সুন্দর সবুজ মাঠকেও সে মূলোব খেত না বানিয়ে ছাড়বে না, এমন!'

সোডা এল।

হুইস্কি এল।

সোডার বোতল ভাঙা হল।

হুইস্কিব কর্ক খুলতে-খুলতে বনবিহাবী-'জীবনটা এই বকমই উচ্ছৃঙ্খল, কথা ভাবতে গেলে ক্ষোভই জাগে শুধু মনে। মিছিমিছি আত্মপীড়ন করে কী লাভ! প্রতিটি মুহূর্তকেই সুন্দর ভাবে এড়িয়ে চলতে শেখো সুকুমার। বারাঙ্গনার মত জীবনটাকে নিয়ে খেলা কববাব কৌশল ছকে নাও; সাধু সেজে যদি পৃথিবীব পথে বেড়াতে চাও তা হলে দেখবে হৃদয ইন্দুবের গর্তের মত শুকনো শিকড়েব [....] নীচে হাঁ করে পড়ে আছে।'

পবদিন ভোব সাড়ে চাবটের সময ওযেটিং রুমের বাবান্দায় স্টিল ট্রাঙ্কেব উপব বসে ছিলাম। সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘ আর অন্ধকাব।

কাঁধের উপর একটা হাত পড়ল তাকিয়ে দেখলাম বনবিহাবী।

—'এখানে বসে আছো বুঝি ?'

সিগারেট জ্বালযে নিয়ে—'আমার জিনিসপত্তব হোটেলে বেখে এসেছি সব।'

—'আজ তুমি কলকাতায় যাবে না বুঝি ?'

—'আমি যাব কাল।'

—'পথেঘাটে আবার একদিন দেখা হযে যাবে।'

—'তিনদিন থাকব মোটে; দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

ওযেটিং রুমের বারান্দায নানা জাতেব মোটঘাটেব ভিতব একটা মোটা বেডিং বেছে নিয়ে বসল বনবিহারী, বললে—'কলকাতায যাবাব আগে তোমাকে একটা কথা বলে দিতে চাই—পকেটেব থেকে একটা নোটবুক বের করে নেড়েছেড়ে পকেটেব ভেতবেই বেখে দিল আবাব।'

বললে—'কাঁকুলিয়া রোড চেন তো?

—'চিনি।'

—'বালিগঞ্জের ট্রেনে চেপেই যেও—তাই তো সুবিধে।'

—'কার কাছে যেতে হবে ?'

একটা বাড়ির নম্বর দিয়ে বললে—'চারু আছে সেখানে। তোমার কথা বলছিল একদিন আমাকে। গিয়ে দেখা করো।'

সূচীপত্রে যান

বনবিহারীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

—'কাল রাতে তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছে; কিন্তু আজকের পবিতৃপ্তি তোমার কতখানি অটুট, ভেবে দেখ। এক রাতের বেদনার বিনিময়ে এ-রকম চরিতার্থতা কেউ কোনোদিন পায় না, যযাতিও পায় নি, পুরুরবাও না, এ-আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাচ্ছ, কলকাতা তোমার কাছে অলকা হয়ে উঠবে।'

সিগারেট ফেলে দিয়ে—'কিন্তু মরলেই ছিল ভাল, কী বলো?'

কিছু বললাম না।

—'অস্থিচর্মসার যা পেত্নি হয়ে দাঁড়িয়েছে চারু!'

কেস থেকে আর-একটা সিগারেট বের করে বনবিহারী—'ফটিকের লাঙলে তো মরচে পড়ে গেল; কিন্তু বেচারা যেদিকে তাকায় সে দিকেই বিছুটিবিড়াল আঁচড়ার জঙ্গল।'

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বনবিহারী—'পুরুষ মানুষের শরীর, বেশি দিন এ সব....সইবে না সুকুমার, দেবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে শাকচুন্নির গর্তে ঠেলে! তারপর চোদ্দ বছরের পর মনে এলে আবার সেই প্রথম থেকে পুজোপাঠ শুরু।'

বনবিহারী সিগারেট টানতে-টানতে চলে গেল।

কাল রাতে খুব বেধড়ক মদ খেয়েছিল।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম—কাঁকুলিয়া রোডে চারু বেঁচে আছে কি?

একদিন গিয়ে দেখে আসতে হবে তো!

আস্তে-আস্তে চুরুটটা বের করে জ্বালিয়ে নিলাম।

'নাঃ, চারুর সঙ্গে আর দেখা করে কী হবে!'

ট্রেন অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু ছাড়বে সেই সাড়ে ছ-টার সময়। অন্ধকারের মধ্যে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগলাম।

স্টিমারে ফিরে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে এলাম।

ট্রাঙ্কবিছানা নিয়ে ট্রেনের থার্ডক্লাশের ছোট কম্পার্টমেন্টে এসে বসলাম তারপর।

কম্পার্টমেন্ট এবার নতুন ধরনের—এক কামরা থেকে দরজা দিয়ে আরো বড়-বড় দুটো কামরায় যেতে পারা যায় কিন্তু গাড়ির কাঠকাঠামো সমস্তই ঢের বিবর্ণ ও পুরানো; এ গাড়িগুলো জোগাড় হল কোত্থেকে?

বৃষ্টি নেই—কিন্তু থমথমে বাদলের মেঘ আকাশ ভরে; সাড়ে পাঁচটা হয়তো বেজেছে-কিন্তু চারদিক অন্ধকার; রাত তিনটের সময় এক-একদিন যখন চাঁদ অস্ত যায়, তেমনি। আশাপ্রত্যাশাহীন শূন্য স্তিমিত মাঠঘাট ছড়িয়ে আছে সব চারদিকে—আবার ঘুমনো যাক তা হলে?

কিন্তু ঘুম আর আসতে চায় না।

বাদলভেজা অন্ধকার মাঠের আকর্ষণ বড় গভীর হয়ে ঘুমের ভিতর এসে লাগে। একটা শেয়াল ধীরে-ধীরে মাঠের উপর দিয়ে চলে গেল; মাঠে দুই জোনাকি উড়ছে।

সব ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারের কুজ্ঝটিকামাখা বনপ্রান্তরের দিকে আজীবন চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ঐ বাবলার জঙ্গলে একটা প্রেতের জীবন নিয়ে থাকলে হত না কি? আমার আর-কোনো কাজ থাকত না। [বাংলার] আষাঢ়-শ্রাবণের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম শুধু-আর ঐ নিঃসাড় কান্তারের মুখের দিকে? ঘুমাতাম, স্বপ্ন দেখতাম—গ্রামের তিন শ বছরের পুরানো সাদা পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম; অশ্বত্থের মুখ থেকে পাঁচ শ বছরের আগের কথা শুনতাম—নিস্তব্ধ নক্ষত্রের রাতে পথে-পথে ঠুঁটো ডালের দিকে তাকিয়ে না-জানি কোন অজ্ঞাত কারণে ভয় ও বেদনা অনুভব করতাম আমি, এ বেদনা ও ভয়ের রাজ্যের থেকে বিমুক্ত হতে চাইতাম না তবু; তুলট কাগজের মত ধূসর মেঘে ঢাকা মলিন জ্যোৎস্না রাতে ঝিঁঝির ডাকে-ডাকে ঘুম থেকে জেগে উঠে হয়তো কোনো প্রেতিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত—সে আজও তার চার শ বছর আগের পুরানো পৃথিবীতে বাস করে অতৃপ্ত কিশোরীর মুখ নিয়ে—আমাকেও বাস করতে বলে কিন্তু...তারপর বিবর্ণ জ্যোৎস্নার ভিতর ফড়িঙের পাখার মত মিলিয়ে যায়। তাকিয়ে দেখি আর-এক বুদ্‌বুদ্‌ ভেসে উঠেছে; কানাড়া ছাঁদের খোঁপা, অপরূপ মুখ, এক বিষণ্ন যুবতী আজকের পৃথিবীর কলরবের কোনো কথাই সে জানে না, সে যে-কাহিনী শোনায় আমাকে তাতে পৃথিবীর সমস্ত ভবিষ্যৎকে প্রীতিহীন

সূচীপত্রে যান

বর্ণহীন নীরস ধুলোর মত উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে-স্বপ্ন, প্রেম ও শিহরণের জন্য তিন শ বছর আগের ইছামতীর পারে একটা নিশুতি বটগাছের কাছে গিয়ে গেরুয়া রঙের ইঁট দিয়ে বাসা বাঁধতে ইচ্ছা করে।

নাকের সামনেই ল্যাট্রিনের অসহ্য দুর্গন্ধ আজকের পৃথিবীর বাস্তবতার দিকে ফিরিয়ে আনে আমাকে।

উঠে গিয়ে আর-একটা দূবের বেঞ্চে বসি আমি; ধীরে-ধীরে চুরুট জ্বালাই; জানালার ভিতব দিয়ে মাঠের দিকে তাকাই আবার; অনেক দূবে মাঠের এক কিনাবায জঙ্গলেব কাছাকাছি অন্ধকাবের মধ্যে সবুজ মাঠের ভিতর অনেকখানি জল জমেছে—তাবই উপর নক্ষত্রের আলো বোধ করি। তাকাতে-তাকাতে হৃদয আমার বেদনায় টনটন করে ওঠে। আস্তে-আস্তে বেঞ্চের উপব মাথা পেতে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি।

ঘুমিযেই ছিলাম; অনেকক্ষণ হযতো; কিন্তু গলার আওযাজে জেগে গেলাম। তাকিয়ে দেখলাম বনবিহারী। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছে—'তুমি এখানে ?'

—'কী খবর ?'

—'তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

—'এসো।'

—'সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে চট কবে চলে এলে কখন ?'

—'অনেকক্ষণ।'

—'ট্রেন ছাড়তে তো এখনো ঢেব দেরি।'

—'কটা বেজেছে ?'

—'সোযা ছটা।'

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম মাঠঘাট অনেকটা ফর্শা হয়েছে।

বনবিহারী—'স্টিমাবেই শুযে থাকলে পাবতে!'

—'স্টিমাবটা এখনো ঘাটে আছে বুঝি ?'

—'সারা দিনই থাকবে।'

—'তুমি হোটেলেই আছো বুঝি ?'

—'হ্যাঁ এগারটার সময কাছাবিতে যাব।'

—'কিসেব মোকদ্দমা ?'

—'কী একটা খুনি মোকদ্দমায সাক্ষী মেনেছে।'

—'তোমাকে? তবে কাল কী কবে কলকাতায যাবে ?'

—'মোকদ্দমার তারিখের এখনো দেরি আছে।'

—'কে খুন হল ?'

—'একজন মেযেমানুষ।'

—'কোথায ?'

—'এইখানেই।'

—'কী হযেছিল ?'

—'হয়েছিল অনেক কিছুই। কিন্তু ভালবাসা হয নি। আজ সে যে মবে গেছে বিচ্ছেদও বোধ করে না কেউ। আমার মনটা মাঝে-মাঝে ধোঁযায ভবে যায। বেচারি ধুনকী!'

—'ধুনকী! ছোটলোকের মেয়ে বুঝি ?'

—'না, ডাক নাম তার ধুনকী-ভালো নাম স্বর্ণলতা, ভদ্রলোকের মেয়ে।' দু জনেই চুপ করে ছিলাম।

বনবিহারী—'আচ্ছা, তুমি যখন কলকাতাব কলেজে পড়তে, আমিও পড়তাম-তোমাকে প্রত্যেকবারই দেখতাম পুজোর ছুটি গ্রীষ্মেব ছুটির সময় দুটি মেযেকে এসকর্ট করে নিযে যেতে-কাবা তারা ?'

—'কবেকার কথা বলছ ?'

—'তখন তুমি বি. এ. পড়ছ।'

সূচীপত্রে যান

—'ও, সে তোমার প্রায় ষোল-সতের বছব আগের কথা।'

—'ভুলে গেছ ?'

—'না ভুলি নি; মনে আছে আমার; এই লাইনেই তাদেব নিয়ে অনেকবাব যেতে-আসতে হয়েছে।'

—'তাদের মধ্যে একটি মেয়েব কথা তুমি আমাকে প্রাযই বলতে।'

—'হ্যাঁ, সেই বিনি; বিনতা নাম তাব; তাকে ভালবেসে জীবনেব গোড়াব দিকে বড় দুঃখ পেয়েছি আমি; আজ মনে হয় প্রেমেব চেযেও বিমূঢ় কবে বেদনাই [!] মানুষকে বেশি কষ্ট দেয। কিন্তু তবুও—'

জানালাব ভিতব দিয়ে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।

—'কী বলতে চাচ্ছিলে ?'

—'অনেক সময়ই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাব কথা মনে পড়ে যায আমার; কাউকে কিছু বলি না-চুপচাপ একান্তে হৃদয়ের ভিতব বিনতার মুখখানা-এ আমাব জীবনেব খুব একটা গোপন সঞ্চয়েব জিনিস। আজও হয তো আমাকে দেখলে উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেবে সে; কিন্তু তবুও দেখতে ইচ্ছা কবে তাকে—অনেকদিন দেখি নি।'

—'সে এখন কোথায ?'

—'শুনেছিলাম বি. এ. পাশ কবে বিলেত গিয়েছিল।'

—'তাবপব ?'

—'ফিবে এসে কী কবছে ঠিক জানি না।'

—'চাকবি নিয়েছে ?'

—'সেই বকমই শুনেছিলাম।'

—'বিয়ে কবেছে ?'

—'তা-ও বলতে পাবি না।'

—'আব-কী কবে ?'

—'সে পনেব-কুড়ি বছব আগে, বিপিনবাবু বলে একজন এ্যাসিস্টান্ট সার্জেন ছিলেন, তাবই দুটি মেয়ে-কলকাতাব কলেজে পড়ত।'

—'বিপিনবাবু এখন কোথায ?'

—'জানি না।'

—'বিনতাব সঙ্গে আলাপ ছিল তোমাব ?'

—'একবাব একটা চিঠি লিখেছিলাম—তাকে—'

—'তাবপব ?'

—'উত্তব দেয নি।'

—'মৌখিক আলাপ ছিল না ?'

—'না, কথাবার্তা হযনি কোনোদিন।'

একটু চুপ থেকে—'এ কথা আজ আমাকে জিজ্ঞেস কবছ কেন বনবিহাবী ?'

—'এই ওযেটিং রুমটাব দিকে তাকিয়ে মনে হল।'

—'ওঃ, তুমিও তো সেই সময মাঝে-মাঝে যাওয়া আসা কবতে!'

—'হ্যাঁ, একদিন দেখলাম মেয়েদুটি ওযেটিং রুমে বসে আছে, পার্শি ধাঁচে শাড়ি পবা, টেবলে একটা ক্রিসেনথিমাম·না কিসেব তোড়া' তুমি এদের দৃষ্টি এড়িয়ে বাবান্দায পাযচাবি কবছ-এবাও বোধ কবি তোমাব সান্নিধ্য চাচ্ছে না। চাচ্ছিল ?'

—'কী জানি!'

—'আজও তা রহস্য ?'

—'চায নি হযতো।'

—'ষ্টিমার সেদিন কুযাশাব জন্য দেবি করে ফেলেছিল এখানে আসতে।'

—'হ্যাঁ—'

—'সাড়ে ছটাব ট্রেন ধরতে পাবে নি—'

সূচীপত্রে যান

—'না—'

—'কাজেই সেই বেলা বারটার ট্রেন ছাড়া তোমাদের আর-উপায় ছিল না। এতক্ষণ পর্যন্ত এই মেয়েরা চুপচাপ বসে থাকবে? গিয়ে একটু আলাপ করলে হয় না এদের সঙ্গে-চা খাবে তো? নাইবে? ভাত খাবে? এই সব ভাবছিলে বোধ করি? এই সব ভাবনার মধ্যে তোমার ভালবাসা তো ছিলই কিন্তু উদ্বেগ দুশ্চিন্তাও কম ছিল না-আমি দেখছিলাম তাকিয়ে-তাকিয়ে সব,' বনহিবারী একটা বিড়ি জ্বালিয়ে বললে—'দেখলাম তুমি ঘরে ঢুকতেই তারা মুখ ফেরাল।'

—'হয় তো লজ্জায়—'

—'উপেক্ষায় নয় তো?'

—'তা হবে!'

—'ষোল বছরের মধ্যেও এই ব্যাপার মীমাংসা হল না?'

—'যতই বছর কেটে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে পড়ছে তারা ততই, তাদের হৃদয়ে লজ্জা ক্ষমা মমতা প্রেমের মত জিনিস দিয়ে সাজিয়ে দেখতে ভাল লাগে।

—'ঠিক কথাই—যাদের পায়ের শব্দ বহুদিন শোনা যায় নি, হয়তো কোনো-দিন শোনা যাবে না, আর তাদের স্মৃতিকে বিরসতা দিয়ে ঘিরে রেখে লাভ কী!'

—'বিনতার মত নারীর স্মৃতি কোনদিনই বিরস ছিল না বনবিহারী!'

—'আজ, অবিশ্যি খুব বিচিত্র?'

—'না; তবে সাদাসিধেও নয়।'

একটু চুপ থেকে—'ওয়েটিং রুমের জানালার কাছে কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকার গাছ দেখছিলাম সেদিন!-মনে নেই বনবিহারী?'

—'মেয়ে দুটির চন্দ্রমুখই দেখছিলাম সেদিন আমি।'

—'আর ঐ পাম গাছ দুটো সেদিনও ছিল-একটা কাঠমল্লিকার গাছ ফুলে ছিল ভরে; সমস্তটা সকাল বাতাসে সেই গন্ধ। এখনো যখন কাঠমল্লিকার গন্ধ পাই এই ওয়েটিং রুমটার কথা মনে পড়ে আবার, মেয়েদুটি নাইল না, মাথায় জল পর্যন্ত দিল না; কিছু খেলও না। সারাদিন শুকনো মাথায় শুষ্ক মুখে অনাহারে কাটিয়ে দিল; যেমন পুত্রশোকের প্রথম একলা-ভাবটা কেটে গেছে বলেই বিষণ্ণতা এ রকম নিঝুম-নিরবচ্ছিন্ন।'

পকেট থেকে বের করে চুরুটটা জ্বাললাম।

—'হোটেল থেকে যে-ভাত এনেছিলে তাদের জন্যে তাও কুকুরকে দিতে হল, অবশেষে কাকে-কুকুরে ছিটিয়ে গেল—'

—'এত সব কথা হঠাৎ জ মনে পড়ে গেল তোমার?'

—'এই তো সেদিন চোখের সামনে হল সব; তুমি ছিলে আমি ছিলাম, ওঁরা ছিলেন-মস্ত বড় একটা মুরগির জোড়া ছিল ওয়েটিং রুমের সেগুন কাঠের গোল টেবিলটার ওপর—এই পামগাছদুটো ছিল। এই ইটের দেয়ালে ও গাছ-পালার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পুরনো কথাটা মনে পড়ে গেল-আচ্ছা উঠি।'

—'আচ্ছা।'

—বিনতার মুখ, আমারও বেশ লেগেছিল বই-কি।'

—'তা লাগবারই তো কথা।'

—'নয়, ঘুরেফিরে যতবার এ-লাইনে গিয়েছি এ-মেয়েটির কথা মনে পড়েছে আমার, তিন-চার বছর ধরে এক সঙ্গে যাওয়া আসা করতে-করতে এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে যখন বিধাতা তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেলেন মনে হল এ লাইনটার এই স্টেশনগুলোতে রক্তমাংসের মানুষ একটিও নেই-না আছে কাঁকড়ার বুকের শাঁসটুকু, কড়কড়ে খোলা পড়ে আছে সব চারদিকে।'

—'ওঃ মনে-মনে নারীকে তা হলে এত পুজো করতে পার তুমি?'

—'পুজো আমি নারীকেই করি-ঈশ্বরকে করি না।'

বনবিহারী বললে—'তারপর দশ-বার বছর ধরে এই লাইনে যাওয়া-আসা করতে হয়েছে তো আমায়-মনে হয়েছে চশমা হারিয়ে ক্ষমাহীন অস্পষ্ট পৃথিবীর সঙ্গে দিনরাত ঠোকাঠুকি খেয়ে চলেছি।'

ধীরে-ধীরে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে চুরুটটা নিভে গেল।

সূচীপত্রে যান

—'মেয়েটি কোথায় এখন ?'

—'পশ্চিমে।'

—'আলমোড়ায় ?'

—'শুনেছিলাম মিরাটে।'

—'বেশ, ভাল থাকলেই ভাল। এ পারে আর দেখা হবে না ?'

—'না।'

—'তারপর ওপার-সে তো অন্ধকার।'

—'কী রকম ?'

—'অন্ধকার হোক আলো হোক-হিমানী কল্যাণী অনিতা বিনতাকে দেখবার প্রবৃত্তি সেখানে আর হবে না। এই আজও ওয়েটিং রুমটা দেখেই মনে পড়ল জীবনে যা হয়েছে, যা হয় নি, তারই এক টুকরো দিয়ে পাঁচ মিনিট তোমার কাছে বসে অন্ধের তবলচাটির মত হৃদয়টাকে নিয়ে একটু খেলা করে নিলাম। মন্দ হল কি ?'

—'না মন্দ কী আর ?'

হ্যাঁ এ মেয়েটির কথা আমারও অনেক সময় মনে হয়;—এই বিনতার কথা। আমি যখন কলকাতার কলেজে পড়ছিলাম-একবার ছুটিতে দেশে যাবার সময়-এই মেয়ে দুটিকেও তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার ভার আমার উপর পড়েছিল। এদের দেখি নি তখনও আমি। নারীর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিল না জীবনে। দুটি অপরিচিত জীবনে কথা ভাবছিলাম শুধু যাদের যত্ন করে নিয়ে যেতে হবে। মন বিরসতা ও অনিচ্ছায় উঠেছিল ভরে।

কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে মেয়েদুটিকে দেখলাম-বিনতাকে দেখলাম—সমস্ত অতীত জীবনকে এক মুহূর্তেই সাদা সাধারণ অন্ধ অভ্যাসের আবর্জনা বলে মনে হল। জীবনের এক প্রান্তের থেকে আর-এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম যেন। বিষয়ী বিচক্ষণ মানুষ হৃদয়কে সংসারের শত্রু মনে করে যে-তামাশার জীবন কাটিয়ে যায় তার নাগাল না পেলে অগত্যা অবশেষে সিদ্ধপুরুষ না হয়ে বেঁচে থাকার পথ নেই যে পৃথিবীতে সেই দিন থেকে প্রথম বুঝতে শুরু করলাম।

পথে পড়বার জন্য একখানা বই সঙ্গে করে নিয়েছিলাম—ওয়াল্টার পেটার-এর 'রিনাসান্স'—কিন্তু প্রিফেসের দু লাইন পড়তে পেরেছিলাম শুধু।

অথচ ট্রেনে আট ঘন্টা কাটাতে হয়েছিল—দু'টো লাইন আমাকে আটঘন্টা আটকে রেখেছিল। কলকতায় মাঝে-মাঝে এক-আধটা চুরুট খেতাম তখন। এক বাক্স সিগারেট নিয়েছিলাম সঙ্গে ট্রেনে ব্যবহার করবার জন্য; সমস্ত পথে একটা সিগারেটও বের করে খেতে পারলাম না তবু। ভবিষ্যৎ জীবনে চুরুট আমাকে সৌন্দর্য ও প্রীতির কল্পনা নিয়ে খেলা করতে সাহায্য করছে অনেক, কিন্তু সেই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের সময় সেদিনকার সেই ট্রেনে জীবনটাকে সহসা কেমন ঐকান্তিক বলে মনে হয়েছিল, জীবনের বিচিত্র রূপান্তরের পথে সিগারেটের প্যাকেটটা বাধার মতন খচখচ করছিল কেন যেন; বারাসত জংশনে একজন ভিখিরিকে প্যাকেটটা দিয়ে আমি নিস্তার পেয়েছিলাম। বহুদিন আগের এই সব কথা আজ মনে পড়ে আমার। ভাবতে গিয়ে কেমন আঘাত লাগে; জীবন যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পথে চলেছিল একদিন, একটি কুমারীর সংস্পর্শে এসে আবার তা সাধারণ বাজারের পথে ফিরে এল, বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা করতে শিখল, দেহকে জীবনের পরম সুন্দর পুরস্কার বলে মনে করে নিল, হৃদয়কে প্রত্যাশী ভিখারির মত সরিয়ে রাখবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সেই ষোল-সতের বছর আগে কলকাতার থেকে ট্রেন ঠিক এই স্টেশনে এসেই দাঁড়িয়েছিল। তখন সন্ধ্যা। স্টেশনের পাশেই কয়েকটা কেরোসিনের মশাল জলছিল-আজকাল আর জ্বলে না তা। এখন গ্যাসের আলো এসে পড়েছে; কিন্তু সেই অন্ধকারের ভিতর কেরোসিনের মশালের ম্লান রহস্যমাখা আলোর জগতে অপরূপ প্রেতিনীর মত সেই সতের বছর আগে সেই যে দাঁড়িয়েছিল বিনতা কয়েক মুহূর্তের জন্য, সে-ছবি ইহজীবনেও কোনো দিন ভুলতে পারব না আমি; পশ্চিমের আকাশে সূর্য একেবারে নিভে যায় নি তখন। অজস্র রক্তাক্ত....মতন থরে থরে মেঘ; বিষণ্ন দাঁড়কাকগুলো ঘরে ফিরছে; প্রান্তরের থেকে খানিকটা মুখর চঞ্চল বাতাস পথহারা বিভাগামিনীর [?] মত করুণ প্রতিধ্বনি তুলে দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে, বন-জঙ্গল

সূচীপত্রে যান

ঘেরা অপূর্ব দিগন্ত; দূরে অশ্বত্থ...অশরীরী দেবতার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে; তেলাকুচোর বনে-বনে জোনাকি; নদীর জলের স্নিগ্ধ ঘ্রাণ; কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ; এঞ্জিনের সান্টিং, লাইনসম্যানের চিৎকার, সবুজ নিশান; লণ্ঠন হাতে-হাতে এলোমেলো জোনাকির মত কুলিদের ছোটাছুটি; একটা বাঁকা নম্র মেঠো পথ বেয়ে বিনতাদের নিয়ে স্টিমার ঘাটের দিকে যাওয়া-তাদের ফিমেল ইন্টার ক্লাশে উঠিয়ে দেওয়া, থার্ড ক্লাশ ডেকে গিয়ে নিজের বিছানা পাতা।

একদিন কলকাতার থেকে এ-স্টেশনে সন্ধ্যার সময় একা-একা এসে পৌঁছেছি-সেই কেরোসিনেব মশালগুলো ধূ ধূ করে জ্বলে গেছে; কিন্তু এদের পাশে সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন নারী মূর্তিটিকে খুঁজে পাইনি আমি আর। মশালগুলোর দিকে তাকিযে-তাকিয়ে হৃদয় ধূম্রকালিমায় নিহত সূর্যের মত নিস্তব্ধ হযে রয়েছে; ঘন অন্ধকার-মাখা অলৌকিক অরণ্যের ভিতর যার হাতিব দাঁতের মত হলুদ ম্লান মুখখানাকে সবচেয়ে মানাত, যাকে এই বাংলার মাঠের কাঁচপোকা অন্ধকাব ও জোনাকিব ভিতর থেকে কোন এক যুগ জন্মে কুড়িয়ে নিয়ে বিধাতা আবার এক নদীমাঠের দেশেই ফিরিযে দিয়েছিল, এই অশ্বত্থ বট জাম বকুলে, কাল মুকুলে, মাখা বাংলাব বুকের থেকে যুগে-যুগে যে জন্ম নেবে, যাব গাযে রূপশালি ধান ও চালতা ফুলেব গন্ধ ছড়িয়ে থাকবে চিরকাল-সে আজ কোথায চলে গেল?

কেরোসিনের মশালগুলোব দিনও শেষ হয়ে গেছে-গ্যাসেব বাতি বসেছে-কিন্তু সে আর ফেবে নি, কোনোদিনও ফিরবে না আর সে। দশ-বার বছর আগে একদিন কলকাতাব ট্রেনের থেকে নেমে কুলিব মাথায় মোট চাপিয়ে এই স্টেশনেব পাশ দিযে সেই বাঁকা নবম মাঠের পথ বেযে স্টিমার ঘাটেব দিকে চলতে-চলতে সন্ধ্যাব বিষণ্ন দাঁড়কাকের কলববের ভিতব যা হযে গেছে—যা হতে পাবল না সেই সব কথা ভেবে-ভেবে অবসাদে গভীব ঘুম পেযে গেছে আমাব-মরণেব ঘুম কামনা কবেছি আমি।

স্টিমারে থার্ড ক্লাস ফ্ল্যাটে বিছানা পেতে কতদিন সেকেণ্ড ক্লাশেব সেই ছোট্ট মেযেদের কেবিনটা ঘুরে এসেছি যেখানে বিনতারা কতদিন আগে রাত কাটিযে গিযেছে। একটা ছোটখাটো ইলেকট্রিক পাখা কেবিনের কাঠের দেযালে স্তব্ধ হযে বযেছে। পাশেই মাকড়সাব জাল। নদীব দিকে জালিকাটা একটা জানালা; খোলাও যায না, বন্ধও করা যায না। বৃষ্টিব ছাঁটাও গাযে লাগে না, বাতাসও বড় একটা আসে না—ভারি অনতিপবিসব বেঞ্চি। এরই উপব বিছানা পাতত তারা। একটা মস্ত বড় আরশি, একটা তাক। সমস্ত ঘরটা গুমোট, পরিসর বড় কম, পুরনো কাঠ ও বিবর্ণ রঙেব গন্ধ।

এইখানে তাবা থাকত। কিন্তু সে-স্টিমাব নেই এখন আর; তাব জাযগায বড় নতুন স্টিমাব এসেছে; সেকেণ্ড ক্লাস এখন ঢের বেশি প্রশস্ত ও সুন্দর-অনেকগুলো ক্যাবিন রযেছে। কিন্তু সে-সব দেখতে যাই না আজ আমি আব। ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড ক্লাশের কথা মনেও হয না। থার্ড ক্লাশেব ফ্ল্যাটে বিছানা পেতে শুয়ে বিড়ি টানি-বাজাবের কথা ভাবি। মাঝে-মাঝে ডেকে পাযচাবি কবতে-কবতে অনেক দিন আগেব কথা মনে হয় আমার, যখন এ-স্টিমাবটা ছিলনা, আব-একটা স্টিমাব ছিল, সেকেণ্ড ক্লাশে একটা ছোট্ট ফিমেল ক্যাবিন ছিল, কলকাতাব থেকে যেতে-আসতে দুটি বোন মাঝে-মাঝে সেখানে উঠত কিন্তু সে-স্টিমারটি নেই এখন আর, সে-ক্যাবিনটিও নেই; জীবনেব আলাপহীন ধ্বনিহীন অন্ধকাব স্রোতেব ভিতব তারাও হারিযে গিযেছে আজ।

একটি কথা মনে হয আরো। বিনতাকে দেখবাব আগে কলকাতাব এক পানওযালিকে আস্তে-আস্তে চিনছিলাম। মেয়েমানুষ বলতে স্বজ্ঞানে তার কথাই মনে হত আমার। পানওযালিটি খুব অল্পদিন হয আমাদের মেসের পাশে এসে বসে ছিল। বযস বেশি নয়; মেয়েটি দেখতে মন্দ ছিল না একবকম। যেদিন সে আমার দিকে তাকিযে প্রীতিব সঙ্গে কথা বলত, মনে হত, ভালবাসাব পরিচয পেযে গেছি। কাজে সে নিজেকে বিকিয়ে দিত না সেইজন্যই মিষ্টি লাগত তাকে। তাকে নিযে হৃদযে একটু ঈর্ষাও জেগেছিল আমার; আমাকে উপেক্ষা করে অন্য কারো প্রতি যখন তার ঢের বেশি মমতা ও প্রসন্নতা গড়িয়ে পড়ছে দেখতাম; ব্যথা বোধ কবতাম। তখন আমার বযসছিল আঠার। তাবপব বিনতা এসে হৃদযের দৃষ্টিশক্তিকে কোথা থেকে কোথায যে তুলে নিয়ে গেল!

বিনতার পরিচয লাভ করে কলকাতায় ফিরলাম যখন-এই পানওযালিব মুখেব দিকে তাকিয়ে কেমন দুঃখ করত আমার; তাকতে-তাকাতে দেখতাম মুখের থেকে তাব কদর্য রেখা বেবিযে আসছে সব; মনে হত বিধাতা যেন হিংসা কবে টেনে-টেনে বের কবে দেখাতেন সব; কোথাও একটু গোপনতাব চেষ্টা

নেই—ক্ষমা নেই কিছু নেই—মেয়েটি অনেক কথা বলত। এক কামনালুব্ধা দুঃখিনীর পরিচয় পেতাম—বীজনে যে কোনো দিন প্রেম পাবে না; চাবেও না হয়ত। ধীরে-ধীরে জীবন থেকে বিদায় দিয়েছিলাম তাকে।

হ্যাঁ, এই স্টেশনটার কথা ঘুরে ফিরে মনে পড়ে; আমাব কলকাতাব থেকে দেশে যাতায়াতেব পথে মধ্যবর্তী এই স্টেশনটা।

তখনকার দিনে স্টিমারে একটা কি দুটো পিস্টন ছিল—বেশি জোবে চলতে পাবত না-কুয়াশায় প্রায়ই দেরিতে এসে পৌঁছাত। ভোরের ট্রেন ধরতে পারতাম না আমার—বারটাব ট্রেনেব জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হত। এই ওয়েটিং রুমে বিনতাবা কতদিন পার্শি শাড়ি ও সৌন্দর্যেব তীব্রতা নিয়ে দেযালের মাকড়সাব জাল ঘেঁষে শেষ রাতের স্তিমিত অন্ধকারের মধ্যে বসে বয়েছে। ‌ইবে কুযাশা ও কনকনে ঠাণ্ডা; অন্ধাকারের ভিতব শেযালেব কান্না; অনেক দূরে সন্ধ্যামণিব লাল পাপড়িব মত চিতার আগুন-না জানি কোন অভাগিনীব; হলদে ছড়ি ছড়িয়ে খেজুব গাছগুলো অন্ধকাবের মধ্যে বিস্মৃত যুগেব গাঁযের মোড়লের মতন পাশপাশি দাঁড়িয়ে আছে সব; জিজ্ঞেস করলেই অনেক রূপকথা বলে দিতে পারে।

এই সবেব ভিতব আমি পাযচারি করতাম, আজও কবি। কিন্তু যে-আশা একদিন বুকে বেঁধেছিলাম—সেই মেয়েটিকে সঙ্গিনী করে ভবিষ্যতে একদিন এই সব কুযাশা অন্ধকাব মাঠের মধ্যে বাংলাব প্রাণকে আমবা খুঁজে বেব কবব এই স্বপ্ন দেখতাম-সে মেয়েটি আজ আব নেই। আমার এই স্বপ্নেব কথাও সে কোনো দিন শুনবে না। জীর্ণ বাদামি তালেব পাতা, ঠুঁটো তালগাছ, ফণিমনসার জঙ্গল ও বঁইচির ঝোপ নিয়ে বাংলাব গ্রামে মাঠে মাঠে অন্ধকাব পড়ে বয়েছে আজও—

জীবনের বিগত ষোল বছব ধবে শেষবাতেব নিশুতিতে যখনই এই স্টেশনে এসে পৌঁছেছি, ট্রেনে উঠে জানালাব ভিতর দিযে মাঠ দিগন্তেব দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে-অনেকক্ষণ তাকাতে হযেছে-আবো অনেকক্ষণ-তাবপব অনেকক্ষণ আবাব। অবাক হযে ভেবেছি এতক্ষণ তাকিযে-তাকিযে যা দেখছি, তা কি অতীত জন্মে হযে গেছে কোনোদিন? না, ভবিষ্যতে হবে? যাই হোক, তাকিয়ে দেখবাব বেদনাব হাত থেকে আজও বক্ষা পেলাম না আমি; আজও অন্ধকাব কৃষ্ণপক্ষেও দেশেব প্রান্তব ও মাঠ আমাকে ছাড়ল না—না ছাড়ল বিনতা আমাকে। এই সব দিগন্ত নিশুতিব বুকেব ভিতবেই সে যেন শবীবী হযে ওঠে; মাঠেব ষঠি ফুলেব মতন ফিকে গোলাপি মুখখানা তাব, হৃদযে তেমনি নবম নিভৃত গন্ধ, সোঁদা ঘাস মাড়িয়ে চলেছে সে, সাপেব গর্ত এড়িয়ে, সাদা শাড়ি চোব কাঁটায ভবে যাচ্ছে, আঁচলের বাতাসে কাশ দুলছে, একটা বিষণ্ণ হলুদ কলাপাতাব পিছনে গ্রামেব পথে অদৃশ্য হযে গেল সে।

আহা, এই বকম যদি হত!

কোনোদিন হয়েছিল কি, কোনো বিগত জীবনে?

কে জানে? কিন্তু আজ স্মৃতি ও বেদনা নিযে কাল কাটিযে যেতে হবে। যদি পাবা যায এ স্টেশনে আসব না আর—তুমি চলে গেছে—এই শুনকো বাদামি তালের পাতা, জীর্ণ বাঁশেব জঙ্গলেব মড়মড় শব্দ, চিলেব পাখনার মত গেরুযা শূন্য ধানের ক্ষেত; এই সবেব ভিতব আমাব চোখ ও হৃদযকে নামিযে দিযে মিছেমিছি ব্যথা ও অশ্রুব খেলা খেলে কী লাভ!

কিন্তু তবুও বাববাব ফিবে ফিবে আসতে হযেছে; ব্যথিত প্রেতও এমনি কবে কবরেব কাছে বাব বাব ফিবে আসে।

অনেক দিন পর্যন্ত ওযেটিং রুমের পাশে সেই কাঠমল্লিকাব গাছটা ছিল; প্রত্যেকবাবই কযেকটা ফুল ছিঁড়ে নিযে যেতাম আমি; কলকাতায যেতে যেতে ফুলগুলো শুকিযে যেত; কিন্তু তবুও দু-তিন দিন পরেও সেই শুকনো ফুলের অতর্কিত গন্ধে হঠাৎ এক-একবার সেই ষোল বছরেব আগেব পৃথিবীর আবছায়া রূপ ভেসে আসত-গ্রামেব এক প্রান্তে শুষ্কপ্রায পদ্মদিঘিব জলে মৃত মাযেব মুখেব মত।

ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাশের ওয়েটিং রুম বছব ভরে শূন্য হযেই পড়ে থাকত; মাঝে মাঝে ভিতরে ঢুকে পড়তাম আমি; জানালার কাছে একটা বেতেব ইজিচেয়াব নিযে বসতাম, ধীবে-ধীবে কাঠফুলেব গন্ধে চোখ বুজে থাকতে হত। কোনোদিন গাছের ডালে এক-একটা ভোর রাতের দয়েল এসে বসত। কখনো গেছো মাছি চিড়বিড় করত। কখনো শীত, কখনো কুযাশা; শূন্য শাখাব থেকে অনেক দিন পর্যন্ত একটা চড়াই না কিসের বাসা ঝুলঝিল—

একদিন দেখলাম সেই কাঠমল্লিকা গাছটা নাই আর।

একদিন কুয়াশার জন্য স্টিমার দেরি করে এসেছিল আবার; ট্রেন মিস করলাম। স্টেশনের বারান্দায় একটা বেঞ্চির উপর বসে-বসে মনে হচ্ছিল কয়েক বছর আগে ঠিক এই রকম শীতের শেষরাতে ঐ পাশের ওয়েটিং রুমটায় তারাও বসেছিল-আজ সে ঘরটা শূন্য-(একেবারেই শূন্য)—দু-চারটা টিকটিকি ও কয়েকটা মাকড়সা আছে শুধু। সেদিনও এই স্টেশন মাস্টারকে এই রকম ব্যস্ত দেখেছি—এই রকম টেলিফোন করছেন; স্টেশনের টেলিগ্রাফ অফিসের কেরানি এই রকমই টকটক করছিল—স্টেশনের সেই মোটা ডাক্তার—আজও সে বেঁচে আছে-তার বিটে যাবার জন্য এমনি কলরব করে আয়োজন করছিল—এক-একটা ডাউন ট্রেন, গুদাম গাড়ি আসছিল, যাচ্ছিল, নীল জামা গায়ে কুলির দল হৈ রৈ করছিল এমনি আজকেরই মতন;—নিত্যদিনকার কাজকর্মের প্রতিটি অসাড় কলকব্জা ঘুরানোর জন্য আজও এদের কী গভীর উৎসাহ-কী অকৃত্রিম ব্যস্ততা; এরা কি জানে না, এখানে কতদিন যে প্রিয় জিনিস এসেছিল নিজের জীবনের নবীন গৌরব ও চরিতার্থতার কাজে যখন সে দূর দিকে আজীবনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায় তখন আমাদের খুব দীন দরিদ্র হয়ে পড়তে হয়। আমাদের নিজেদের জীর্ণ নবীনতাকে উৎসাহহীন প্রয়াসহীন হয়ে অন্ধকারের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয়। রাত্রিশেষের আবহাওয়ার ভিতর বেঞ্চির এক কিনারে বসে এই সব ভাবছিলাম আমি। কিন্তু এরা বিচিত্র জগতের লোক; যেন আর-এক উপগ্রহে বাস করে; কেরোসিন তেলের মশাল, বিড়ির গন্ধ, পার্শেলের হিসাব, টিকিট বিক্রি, খেঁকিয়ে চিৎকার ও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দৌড়োদৌড়ি এই এদের সব। বিনতার সান্নিধ্যে বসে এই সবও একদিন ভাল লেগেছিল আমার—কিন্তু আর ভাল লাগবে না।

কোনোদিনও ভাল লাগবে না আর।

ঐশ্বর্যময়ী রাত্রির মত এদের কথাবার্তা কাজকর্ম সমস্ত কিছুকে ঘিরে গোপন চারিণী নারীর বর্তমানতা ছিল সেদিন—নারীর জন্য পুরুষের হৃদয়ে ভালবাসা ছিল; গুদামের একটা সামান্য কেরোসিন কাঠের বাক্সও জোনাকির খেতের সহজ রূপ পেয়েছিল তাই সেই বিভবময়ী রাত্রির স্রোতের ভিতরে এসে এই স্টেশন মাস্টার, টেলিগ্রাফ কেরানি, সিগন্যালম্যান, স্টেশনের ডাক্তার নক্ষত্রের মত অভিনবত্ব যদি পেয়ে থাকে তো পেয়ে থাকবে সেদিন; কিন্তু আজ এরা গুদামের বাক্সমাত্র—সংসারের বারোয়ারিতলার ভিখিরির দল সব।

ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। বেঞ্চির উপর থেকে উঠে বারান্দায় কতক্ষণ পায়চারি করলাম। চারদিকে শূন্য খাবারের ঠোঙা, চীনে বাদামের খোলা, আখের ছিবড়ে, বিড়ির টুকরো; কতকগুলো কুকুর ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে—খাচ্ছে, শুঁকছে, লালসার উত্তেজনায় পরস্পরকে বিপর্যস্ত করে ছাড়ছে; এই তাদের ঋতুর সময়। লোম ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে, শরীরের নানারকম নিভৃত জায়গার মর্মান্তিক ঘা রোদের ভিতর দগদগ করছে, ল্যাংল্যাং শরীর, ভিখিরির মত মুখ, কিন্তু পুষ্ট মোহন্তের মত কামনা। কয়েকটা মাদি কুকুরের ঘাড় মুখ বুক পা নলীর মতন কিন্তু পেট জয়ঢাকের মত ফুলে উঠেছে—প্লীহাতে নয়, নেমন্তন্নের পাত চেটেও নয়, সন্তান—ধারণের আময়িকতা ও সহিষ্ণুতায়। এদের দীনতা ও দাক্ষিণ্য, কাতরতা ও উর্বরতা এমনি রোহর্ষক একটা লেড়ির [একটা নেড়ির] খুলির মত মাথায় একবার ঢাউসের মতন পেটে একবার একজন পয়েন্টসম্যানের লাথি এসে পড়ল; কেঁউ কেঁউ করতে-করতে জানোয়ারটা একটা মালগাড়ির নীচে গিয়ে ঢুকল—সেখানেই হয়তো রক্তারক্তি হয়ে গেছে, হয়তো আধা সিদ্ধ ছানা কয়টি বেরিয়েও এসেছে পেটের থেকে।

একটা চুরুট জ্বালালাম।

স্টেশনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম লাল কাঁকরের পথটা রৌদ্রে ভরে গেছে, স্টেশনের রাস্তা ইটের দেয়ালের উপরেও ভোরের বেলার খটখটে রোদ অপর্যাপ্ত হয়ে এসে পড়েছে, অনেক দিন আগে যখন বিনতাদের নিয়ে ট্রেন মিস্ করে ছিলাম সেদিনও ঠিক অন্ধকার কুয়াশার পর এই রকম গভীর রোদ উঠেছিল। স্টেশনের নির্জন দেয়ালের গায়ে বিমর্ষ মাছিদের গুঞ্জনভরা নিঃসঙ্গ রোদের দিকে তাকাতে-তাকেত হৃদয় আজ শুষ্ক শূন্য হয়ে ওঠে—মালগাড়ির নীচের কুকুরটার চেয়েও গাঢ় বেদনা বোধ করে যেন হৃদয়।

আর-এক দিনের কথা মনে পড়ে। বিনতাদের নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলাম: বর্ষাকাল তখন। রাত্রির

একটা সময় ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। বিছানা ছিল আমার থার্ড ক্লাশের ফ্ল্যাটে-একেবারে এক কিনারে-নদীর কাছাকাছি। ক্যান-ভ্যাস টেনে দিতে একটু দেরি হয়েছিল, আর ক্যানভ্যাস টেনে দিলেই বা কি-দারুণ বৃষ্টিতে সমস্ত বিছানাপত্র ভিজে গেল—কাপড়চোপড় পর্যন্ত। অবশেষে এক-জন ভদ্রলোকের একটা টিনের স্যুটকেশের উপর গিয়ে বসে রইলাম।

আমি যেখানে বসেছিলাম সেকেণ্ড ক্লাশ ক্যাবিন সেখানে থেকে ঢের দূরে—দেখতেও পাওয়া যায় না। অত রাতে মেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে এই-ই তো প্রত্যাশা করবার জিনিস। সেকেণ্ড ক্লাশ ক্যাবিনে ঝড়জলে কিছু এসে যায়না, বৃষ্টিতে ঘুম জমে ভাল। বসে-বসে ঝিমুচ্ছিলাম। এমন সময়ে কাঁধে একটা হাত পড়ল। তাকিয়ে দেখি ষ্টিমারের কেরানিবাবু। জিজ্ঞেস করলাম; 'কী ব্যাপার, টিকিট চেক করতে এসেছেন ?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তবে ?'

ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক।

—'আমাকে দিয়ে আপনার দরকার? ভুল করছেন না তো ?'

—'হ্যাঁ, আপনাকে দিয়েই—আপনার নাম সুকুমার মজুমদার, না ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভাবলাম ট্রাফিকের আইনকানুন কিছু ভাঙলাম নাকি, অতিরিক্ত লাগেজ নিয়ে এসেছি নাকি, নাকি আফিং কোকেন চালান দিচ্ছি এই সন্দেহ এদের!

—'আপনি সেকেণ্ড ক্লাশ ক্যাবিনে যান!'

—'কেন ?'

—'সেখানে আপনাকে যেতে বললেন।'

—'কে ?'

—'সেকেণ্ড ক্লাশ ক্যাবিনের একটি মহিলা।'

—'ওদের বিছানাপত্র বৃষ্টিতে ভিজে গেছে না কি ?'

—'না না।'

—'কিছু অসুখবিসুখ করেছে ?'

—'না—আপনি এ-রকম ভিজে গেছেন বলে আপনাকে যেতে বলেছে।'

—'ওঃ সেই কথা, কিন্তু মেয়েদের ক্যাবিনে আমি কী করে যাব।'

—'মেয়েদের ক্যাবিনে নয়-মেল ক্যাবিনে চলুন।'

গিয়ে দেখলাম মেল ক্যাবিনের একটা বেঞ্চিতে দুধের মত সাদা ধবধবে একটা বিছানা পেতে ঠিক করছে বিনতা। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি বালিশ দুটো সাজিয়ে একটা বিচিত্র মোলায়েম রাগ গুছিয়ে দিয়ে চট করে চলে গেল সে।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কী করে বুঝল আমার বিছানাপত্র ভিজে গেছে? কেরানিকেই-বা এত রাতে কোথায় খুঁজে পেল? নীচে গিয়েছিল? এ সুন্দর বিছানাটাও সে আমার জন্য ছেড়ে দিল, এ জন্য তার দিদি তাকে ক্ষমা করবে বলে বোধ হয় না। পাটাতনের উপরেই শতরঞ্চি পেতে আজ রাতে বোধ করি তার শয্যা?

কিন্তু তবুও নিবিড় চমৎকার ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। ঘুমিয়ে এত শান্তি ও আশ্বাস কোনোদিনও পাই নি আর জীবনে।

পর দিন ট্রেনে যখন গিয়ে উঠলাম, আমি থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্টেই চড়ে-ছিলাম, কিন্তু মিনিট পাঁচেককের মধ্যে কোথেকে কেরানিবাবু এসে হাজির হলেন, বললেন—'আপনার জন্যে কলকাতা অব্দি সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট করা হয়েছে তো।'

—'কে করলে ?'

—'এই তো এইমাত্র সেই মহিলাটি আমাকে করতে বললেন।'

—'কে? কে করতে বললেন ?'

—'ঐ যে কাল রাতে যিনি আপনার বিছানা তৈরি করে দিয়েছিলেন।'

সূচীপত্রে যান

—'তার দিদিও কি জানে?'

—'নাঃ, তিনি ঘুমুচ্ছেন।'

—'আপনাকেই-বা মেয়েটি কোথায় এমন সময়ে অসময়ে খুঁজে পায় কেরানি বাবু?'

মাথা চুলকে স্টেশনের কেরানি বললেন-'আমি এমনিই একটু প্ল্যাটফর্মে এসে ঘুরছিলাম; বাস্তবিক পাঁচ মিনিট ওঁর সঙ্গে আলাপ হলে চিরজীবন বাঁধা হয়ে থাকতে হয়। যতক্ষণ না ট্রেন ছাড়বে, এখান থেকে আমি নড়তেও পারব না।'

শেয়ালদায় অবিশ্যি ভাড়াটা চুকিয়ে দেবার জন্য বিনতার কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমার হাতের ব্যাগের দিকে নজর পড়তেই আচমকা আমার দিকে পিছ ফিরে সে একটা ট্রেন দেখে উঠে বসল, যেন ইহজীবনেও আমাকে চেনে না কোনো দিন।

একদিন বড়দিনের ছুটির পর কলকাতায় যাচ্ছি। ওরা দুজনও যাচ্ছে। যেমন অন্ধকার, তেমনি কুয়াশা, তেমনি শীত। এই ওয়েটিং রুমে এদের পৌঁছে দিয়ে স্টেশনের বারান্দার একটা বেঞ্চিতে আমি বসেছিলাম। ভুল করে আমার গায়ের আলোয়ানটা আমার বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিলাম। বেডিংটা আমার পায়ের কাছেই ছিল, কিন্তু খুলে নিতে ইচ্ছে করছিল না আর।

ঝুপ করে আমার কাঁধের উপর একটা মস্ত বড় শাল পড়ল। ছুঁড়ে ফেলেই ওয়েটিং রুমের পর্দার আড়ালে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম না কে ফেলেছে, বিনতা না মমতা? মেয়েটির সাদা নগ্ন হাতের পাঁচটি আঙুল ও কব্জি চোখে পড়েছিল শুধু। কব্জির পাতলা সোনার চুড়ি দু গাছি। এই চকোলেট রঙের শালটা অবিশ্যি মমতার গায়ে দেখেছি। আমার উপরে সহানুভূতি অবশেষে এই বড় মেয়েটিও করল?

শালটা গায়ে টেনে নিয়ে পরিতৃপ্তি পাচ্ছিলাম না তবু, অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে—পাঁচটি আঙুল ও কব্জি চোখে পড়েছে তা বাস্তবিক কার? এ জীবনে শীতের ব্যথাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, তার চেয়েও ঢের বেশি ব্যথা ও অস্বস্তি আছে। এক-একবার ইচ্ছে হচ্ছিল ওয়েটিং রুমের ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করি এ দাক্ষিণ্য বাস্তবিক কার কল্পনায় এসেছিল? সেই অপরূপ দক্ষিণ হাতের কব্জিটুকুই বা কার? বিনতার নয় কি?

যদি না হয়, এ শাল যেন তারা ফিরিয়ে নেয়।

চুপচাপ বসে থাকতে পারা যায় না। চারিদিককার কনকনে হিমকে অবাস্তব মনে হয়। এই শালটাকে নিয়ে কী করব বুঝে উঠতে পারি না।

শীতের বাতাসে অশ্বত্থের পাতা থরথর করে কাঁপছিল। বুনো ঢ্যাঁড়শের শাখায় একটা চড়াইয়ে সমস্ত শরীরের পালক ও রোম তুলোর বলের মতন খুলে-খুলে খসে আসছিল যেন, ছোট্ট জামগাছটার ডালে অনেক ক্ষণ ধরে কয়েকটা শালিখের কুয়াশাচঞ্চুরীর মত কলরব।

ওয়েটিং রুমের পর্দাটা উড়ে-উড়ে মাঝে-মাঝে ভিতরের নারীদুটির খবর বাইরের পৃথিবীর কাছে দিয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম। একবার পর্দা উড়ে যাওয়াতে ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঘিয়ের রঙের একটা শাল গায়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে মমতা রয়েছে ঘুমিয়ে আর নিরাভরণা বিনতা শাড়ির খুট গলায় জড়িয়ে থুতনিতে হাত রেখে পুবের জানলার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে।

এর পর শালটা গায়ে দেওয়া যায়। সমস্ত মন আত্মতৃপ্তিতে কেটে যায়। আরো এক দিন! একটা খুব সামান্য জিনিস মনে পড়ে।

সান্তহার স্টেশনে গাড়ি থেমে ছিল। প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখলাম বিনতা তাদের গাড়ির জানলায় চুপচাপ বসে আছে। কিন্তু আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি সে একটা বই হাতে তুলে নিল। দেখলাম বইয়ের মলাট একটা ইংরেজি খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া। কিন্তু ধীরে-ধীরে সেই কাগজের মলাটটা খসিয়ে ফেলল সে। তারপর বইখানা এমন ভাবে ঘুরিয়ে ধরল যে বইয়ের নামটা সহজেই আমার চোখে পড়ে যায়। দেখলাম বইখানা 'টেস': টমাস হার্ডির।

শিয়ালদা স্টেশনে ওরা ট্যাক্সি করল, আমি একটা রিক্সা করেছিলাম। ট্যাক্সিটা চলে গেল। রিক্সাঅলা আমার হাতে একখানা বই এনে দিল।-'আপকো ওয়াস্তে উ মোটর গাড়িকা মাইজি দিয়া।' দেখলাম

সূচীপত্রে যান

বইখানা 'টেস'। 'টেস' আমি তখনও পড়ি নি। কিন্তু সেদিন কলকাতা গিয়েই সারাদিন সাবা রাত জেগে বইখানা পড়লাম। ভোব চারটাব সময় শেষ হল বইখানা।

ভাবছিলাম, তাই তো!

আর-একটা দিনের কথা। দেশেব স্টেশন, বিনতারা তাদেব গাড়িতে গিয়ে চাপল, আমি একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া কবে নিলাম।

মালপত্র উঠিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য পথেব পবিচিত কয়েকটি ভদ্রলোকেব সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ফিবে এসে দেখি আমার গাড়িতে মস্ত বড় এক বেতের ঝুড়ি ভবা ফল আব সন্দেশ। অবকা হয়ে গাড়োয়ানকে বললাম—'এ কোথে কে এল বে ইয়াসিন?

বিনতাদেব চলন্ত গাড়িটাকে দেখিয়ে দিল সে।

বললাম—'কোন মেয়েটি দিয়েছে ?'

—'নীল কুর্তা গায়ে খপসুবাৎ মেয়েটি হুজুব।'

—'ও নীল ব্লাউজ গায ?' নীল শাটিনেব ব্লাউজ ছিল তাব গায়ে, তাব দিদিব গায়ে লাল শাটিনেব। সন্দেশেব ভিতব থেকে আতবেব গন্ধ আসছে। আম সন্দেশ, কমলা লেবুব সন্দেশ,....পাতায় মোড়া-সবুজ পাতায় মোড়া কত বকম কী?

পরদিন নদীব পাড়ে বিনতাব মামাব সঙ্গে দেখা, বললে—'আপনি এত হুঁশিয়াব লোক, কিন্তু মেয়েদেবই অপবাধ।'

—'কেন? কী হয়েছে ?'

—'ফলেব ঝুড়িটা পথে খোযা গেল।'

—'কে বললে ?'

—'বিনতা। ট্রেনেই খোযা গেছে। স্টিমারে সেটাকে সে দেখেও নি নাকি ?'

'টেস'—এব সঙ্গে জড়িত করেছি তাকে শেষে। আমাব নিজেবই মনেব কল্পনাব বিহ্বলতায় এক-এক সময় মনে হত 'টেস'-এব মতন বোধ কবি সে। হযতো তাই-ই হবে। হযত নয়। কিন্তু প্রথম যখণ বিনতাকে দেখেছিলাম দেহ ও মন সব দিক দিয়েই পদাবলিব কিশোবীব কথা বারবাব মনে পড়ত আমাব। সজনি ও ধনি, কী কব বাটে...গোবচনা গোবী...

প্রথম সাক্ষাতেব ছ মাস পবেই আমাব সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল বিনতাব। সম্বন্ধ এনেছিলেন তাব মামা। জিনিসটা ও-পক্ষেব থেকে কত দূব ঐকান্তিক, ঠিক বুঝতে পাবি নি। আজও ও-ব্যাপাবটাকেও বিনতাব অন্য সব জিনিসেব মতই বহস্যে ঢেকে বাখতে ভাল লাগে।

এদিকে আমাব কাকাবা এ সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন বিপিন বাবু গুরু মানে না, বিশেষ কোনো ধর্মও নেই নাকি তাব।

এ সব কথা আমি কিন্তু শুনি নি তখন, সম্বন্ধেব কথা পর্যন্ত না। অনেক পবে শুনেছিলাম। জীবন এই বকমই অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে চলেছে।

তাবপব অনেক দিন কেটে গেল। বিনতাবা অনেক দিন হয দার্জিলিং না জলপাইগুড়ি না কোথায় উঠে গেছে। সে খোঁজও কাবো কাছ থেকে জানবাব অবকাশ পাই নি। নিতেও যাই নি।

একদিন আমাদেব দেশেব বাজমোহন বোস আমাব মেসে এসে বললেন—'বিনতাব কথা মনে পড়ে তোমাব ?'

বাজমোহনেব মুখের দিকে নিস্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বইলাম।

—'তাব সঙ্গে কাল দেখা হল।'

—'কোথায ?'

—'বালিগঞ্জে পবেশের বাসায।'

—'সেইখানেই উঠেছেন, বুঝি ?'

—'হ্যাঁ! মেয়েটি বি.এ. পড়েছে। পবেশের মেয়েদেব সঙ্গে খুব ভাব। বিনতা বলছিল কাল। তোমরা তো পরস্পবকে খুব চেনে ?'

একটু হেসে—'কী করে?'

—'বাঃ বহুবার তো একসঙ্গে যাওয়া-আসা করলে। তোমার কথা জিগেস করেছিলাম তাকে।'

—'কে? আপনি? মিছেমিছি জিগেস করতে গেলেন কেন দাদামশায়?'

—'দেখলাম তোমার কথা মনে আছে তার।'

—'স্টেশন মাস্টার ও কুলিদের কথাও মনে আছে। যাকে একবার দেখা যায় তাকে মনে করে রাখাই সবচেয়ে সহজ। যে ভুলে যায় তাকেই আমি বাহাদুরি দেই।'

কর্ণপাত না করে রাজমহোন—'কাল রবিবার আছে, পরেশের বাসায় আবার আসবে সে। আমি বলে ঠিক করে রেখেছি। তুমি অবিশ্যি-অবিশ্যি সেখানে যেও কাল। এই কথাই তোমাকে বলতে এলাম। তোমাদের দু জনের মিলনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।'

রাজমোহন চলে গেলেন।

প্রাণের টানেই এসেছিলেন? শুভ ইচ্ছা নিয়ে? না, কারু হয়ে দালালি করতে? ব্যাপারটা যে-দিক দিয়েই ভেবে দেখা যায়!

সন্ধ্যার দিকে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম বিনতা সারাদিন ছিল, সন্ধ্যার মুখোমুখি চলে গেছে।

রাজমোহন—'যাক, শেষ পর্যন্ত এসেছিলে। এ কথাটি অন্তত তাকে বলা যেতে পারবে। আমরা সকলেই ভেবেছিলাম এ ক্ষেত্রে আসতেই তোমার অনিচ্ছা।'

—'তার দিকে থেকেও বিশেষ কিছু ইচ্ছার পরিচয় পেয়েছ? [পেয়েছেন?]'

—'কী জানি, তাকে বোঝা বড় কঠিন।'

যে-বোর্ডিঙে বিনতা থাকত, সেখানে থেকে কমলা বলে আমার একটি আত্মীয়াও কলেজে পড়ছিল। একদিন কমলাদের বোর্ডিঙে গেলাম। আমাকে দেখে সে খুব খুশি।

বললে—'আপনি আসেনই না একেবারে, আমরা যেন আপনার কেউ নই, পর! কেন এ রকম ব্যবহার বলুন দেখি তো।'

অনেক দেঁতো হাসি ও পালিশ কথাবার্তার পর একটু ভরসা করে বললাম—'আমার নাম বোর্ডিঙের কোনো মেয়ের কাছ থেকে শুনেছ?'

চোখ কপালে তুলে কমলা—'তার মানে?'

একটু দম নিয়ে—'না, এমন কিছু নয়। অবাক হয়ে ভাবছিলাম আমার পরিচিত কেউ এখানে আছে কি না?'

—'তা কী করে থাকে?'

—'কেউই নেই বুঝি?'

—'আমি তো থাকি।'

—'তুমি ছাড়া আর কেউ?'

—'এই বোর্ডিঙে? আপনার মন যে মাঝে-মাঝে কোন জগতে চলে যায়?'

—'সত্যিই নেই কেউ? কী বলো কমলা?'

—'ঠাট্টা রাখুন-আমাকে একটু লজিক বুঝিয়ে দেবেন?'

—'লজিক? আর-এক দিন। এই বিষ্যুদবার।'

একটু চুপ থেকে বললাম 'আচ্ছা উঠি।'

—'আচ্ছা। আর-এক দিন আসবেন কিন্তু!'

উঠবার আগে সাহস করে জিগেস করলাম—'বিনতা বলে কোনো মেয়ে থাকে এই বোর্ডিঙে?'

—'বি. রায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'হ্যাঁ আছেন। থার্ড ইয়ারের মেয়ে। অদ্ভুত রূপসী। কলেজে এ-রকম একটি মেয়েও নেই আর। টেবলোতে বিনতাদি মিশরের রানী সাজেন।'

—'মিশরের রাজা সাজে কে?'

—'সে আর-একটি মেয়ে, জাঁদরেল।'

সূচীপত্রে যান

অনেকখানি সাহস জুগিয়ে নিয়ে—'মিশনের রানীকে একটু ডেকে দিতে পারবে আমার কাছে?'

খানিকটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে কমলা—'নিয়মের কড়াকড়ি বিশেষ নেই, কিন্তু অপনাকে চেনেন তো তিনি?'

—'চেনেন বলেই তো মনে হয়।'

মিনিট পাঁচেক পরে কমলা ফিরে এসে বলল—'এই আধ ঘন্টা হল তিনি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বেরিয়ে গেছেন! আচ্ছা আপনার কথা বলব আমি তাকে।'

—'খবরদার, ভুল করেও কিছু বলতে যেও না কমলা।'

ঐকান্তিক ভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে—'বলো, বলবে না?'

একটু হেসে—'কেন?'

—'না। বলবার মত কিছু জিনিস নয়।'

পাঁচ-ছয় দিন পরে বিনতাকে একখানা চিঠি লিখলাম। বেশি কিছু নয়, দশ-বারো লাইন সাদাসিধে কথা শুধু। বক্তব্য: বোর্ডিঙে দেখা করা সম্ভব হবে?

চিঠির কোনো উত্তর এলো না। পনের-কুড়ি দিন চলে গেল। হঠাৎ একদিন মনে হল, হায় কপাল! কী করেই-বা উত্তর আসে? আমার মেসের ঠিকানা দিতেই ভুলে গেছি।

আর-একখানা চিঠি তৈরি করলাম। এবার ঠিকানা দেওয়া গেল কিন্তু অনেক ভেবে চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত পোস্ট করলাম না আর। ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। মাসখানেক পরে কমলার কাছে গেলাম আবার।

—'বিনতাদির বড্ড অসুখ।'

—'তাই নাকি?'

—'আজ সকালেও ভাল ছিল। কিন্তু দুপুর বেলা কয়েকবার বমি হল। তার পর থেকেই জ্বর এখন তো বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে।'

—'কেউ দেখছে না?'

—'সব মেয়েরাই তো তার কোঠায়। বাতাস দিচ্ছে, মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে, ওডিকোলন দিয়ে জলপটি দিচ্ছে, আমিও তো এতক্ষণ ছিলাম।'

—'ডাক্তার?'

—'তিন-চার জন ডাক্তার এসে গেছে, ওর বাবাও এসেছিল।'

—'আমার অবিশ্যি এখন আর যাওয়া সম্ভব নয়?'

—'কোথায়?'

—'বিনতার কাছে?'

কমলা মুখে কাপড় দিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে হাসতে লাগল।

—'আচ্ছা, কাল আসব।'

—'এসো।'

—'তোমাকে লজিক পড়াতে নয় কিন্তু, একদিনও পড়ানো হলনা কমলা, আমি একটু বিনতার খোঁজ নিতে আসব।'

—'বুঝেছি।'

পর দিন গিয়ে শুনলাম আজ সকালেই জ্বর ছেড়ে গেছে, বিনতা ভালই আছে। তবে নীচে নামতে নিষেধ।

খানিকক্ষণ নীরবে থেকে—'আমি উপরে যেতে পারি কি?'

—'সেখানে যে অনেক মেয়ের ভিড়।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে—'ভিড়ের ভিতর যথেষ্ট মজলিশ হয় তোমাদের, না?'

—'হ্যাঁ, সাতরাজ্যের গল্পগুজব চলে। পাঁচালি মেয়েদের মতো কেউ কুটতে পারে না।'

—'মানুষের কলঙ্কের কথা খুব বলে বেড়াও না তো?'

—'যারা কেলেঙ্কারি করে তাদের কথা বলব না কেন?'

—'আচ্ছা তোমাদের বোর্ডিঙের কোনো মেয়েকে কিছুদিন আগে কেউ চিঠি লিখেছিল?'

—'কী রকম?'

—'লিখে নিজের ঠিকানা দেয় নি, এমন একখানা চিঠির কথা শুনেছ ?'

—'কই না তো ?'

—'একেবারেই শোন নি ?'

—'নাঃ। আমাদেব নামে অনেক গুজবের সৃষ্টি হয। সব মিথ্যা। সে-বকম যদি চিঠি আসত তা হলে বিভাব কাছে থেকেই শুনতে পেতাম। বোর্ডিঙে একটা কুটো পড়লেও সে-খবব তার কাছ থেকে পাওযা যায।'

—'বিভা কে ?'

—'বিনতাদিব ফার্স্ট ফ্রেণ্ড।'

—'কিন্তু তোমাকে সব কথা সে বলবে কেন ?'

—'বা বে, আমি যে ফার্স্ট ফ্রেণ্ড তার।'

বুঝলাম চিঠিখানা বিনতা চেপে গেছে। বিভাব কাছেও বলে নি। এ নিয়ে সে মুহূর্তেব মজলিশ কবতে চায়নি। মনে-মনে ধন্যবাদ দিলাম নাবীকে। ছ-সাত দিন পরে কমলাব কাছে গিযে—'এতদিনে বিনতা ভাল হযেছে নিশ্চয।'

—'আপনি কালও যদি আসতেন।'

—'কেন ?'

—'কাল সে তাব বাবাব সঙ্গে দার্জিলিং চলে গেল।'

—'কবে আসবে আবাব ?'

—'কী জানি! দু-তিন মাসেব আগে আসবে বলে তো মনে হয না।'

মাস ছযেক পব বাজমোহন আবাব একদিন আমার মেসে এসে হাজিব হলেন। বললেন—'এখুনি চলো।'

—'কোথায ?'

—'পরেশবাবুব বাসায এনেছি তাকে।'

—'কাকে বাজমোহনদা ?'

—'বিনতাকে, আজ সাবা দিনই থাকবে সে সেখানে। তোমাকেও থাকতে হবে সেখানে। তোমাদেব দু জনের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীযতা হোক এটা বিধাতাব ইচ্ছা।'

—'কিন্তু আমি বিছানাব থেকেও তো নামতে পাবি না।'

—'কেন ?'

—'কাল সিঁড়িবি থেকে পড়ে পা ভেঙে গেছে।'

—'সে কি ?'

—'এই দেখুন, নাড়তে গেলেও ব্যথা, মাটিতে পা বাখতে গেলেই টনটন কবে ওঠে।'

—'একটা ট্যাক্সি কবে চলো তা হলে।'

—'মেসেব ছেলেদেব কোলে চড়ে ট্যাক্সিতে না হয গিযে বসলাম, কিন্তু পবেশবাবুব তেতলায উঠব কী করে ?'

—'বিপত্তি!'

একটু চুপ থেকে—'যাক, সেখানেও কোলে তুলে নেবাব অভাব হবে না। চাকববাকব ছেলেছোকবা ঢের আছে।'

—'আমি একজন সামান্য মানুষ, এ-বকম অসামান্যতাব ভিতব দিযে পরেশ-বাবুব বাড়িতে গিযে উঠব গ্রহনক্ষত্রেব এই রকমই বিপর্যয হযেছে না কি ?'

বাজমোহন নাছোড়বান্দাব মত—'তা হলে যাওযা সম্ভব হবে না ?'

—'গোটা দুই হাড় ভেঙে গেছে নাকি, আজ সকালে সার্জেন এসেছিলেন, আজই আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে হযতো! আজ আব—'

কিংকর্তব্যবিমূঢ়েব মত আমাব দিকে খানিকক্ষণ তাকিযে রাজমোহন—'আচ্ছা তা হলে সেবে উঠলে যেও। কিন্তু—'

তিনি চলে গেলেন।

সূচীপত্রে যান

ভাঙা হাড় ধীরে-ধীবে জোড়া লাগল বটে, কিন্তু বাজমোহন আর এলেন না। আমিও বিনতাদেব বাড়িতে গেলাম না আব। বোর্ডিঙেও না।

অনেক দিন পবে তাব কথা মনে পড়ল আবাব। সেই বিনতাব কথা। কলকাতায় তখন ফাল্গুন মাস, কতকগুলো, নতুন ইংবেজি কবিতাব বই পড়ে, নিজেব পুবনো ডাযবি নেড়েচেড়ে, বিনতাব দেওয়া সেই 'টেস'টাব দিকে তাকিযে-তাকিয়ে অবাক হযে ভাবছিলাম। মেয়েটি কোথায গেল?

ফার্স্ট ইযাবেব কমলা তখন ফোর্থ ইযাবে উঠেছে। বছব দুই পরে তাব সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া।

—'বিনতা কোথায আছে বলতে পাব ?'

—'হ্যাঁ, বিভাব কাছে একখানা চিঠি এসেছে সেদিন তাব।'

—'কোথে কে ?'

—'তাবা পুবীতে।'

—'বি. এ. পাশ করেছিল বুঝি ?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখন কী করে ?'

—'ঠিক বলতে পাবি না।'

—'স্বামী-স্ত্রী দু জনেই পুবীতে বুঝি ?'

মুখে কাপড় তুলেছিল কমলা—'কই, বিনতাদি তো বিয়ে কবে নি।' পাঁচ-ছয দিন পব পুরীতে চলে গেলাম। সমস্তটা দিন, অনেক বাত অব্দি সমুদ্রেব পাবে ঘুবলাম। কিন্তু তাদেব কাউকে দেখলাম না। অবাক হয়ে ভাবছিলাম কমলাব কাছ থেকে বিনতাব ঠিকানাটা জেনে এলে হত।

চাব-পাঁচ দিন অনেক খোঁজাখুঁজি কবেও তাদেব কোনো হিসাব-নিকাশ পেলাম না। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, আছে কি এখানে?

নাঃ নেই। থাকলে-ঐ পাশেব বনেব ভিতব বা সমুদ্রেব পারে একদিনও কি আসত না? কমলাব কাছে একটা টেলিগ্রাম কবে দিলে কিংবা চিঠি লিখে দিলেও এতদিনে খবব আনতে পাবতাম। অন্তত ঠিকানাটা তো পেতাম।

কিন্তু কিছুই করি নি।

পুবীতে আব অন্তত থাকা চলে না। যেখানে নীড় ছিল সেখানে শূন্য মগডালে শুকনো খড় ঝুলছে শুধু, হলুদ ঘাসেব ভিতব ডিমেব খোলা ছড়িয়ে বযেছে, চাবি-দিকে কুয়াশা, হিম, নিস্তব্ধতা।

বাজহংসেব বধূ এখানে থাকে না, ডাক-পাযবাকে উড়ে চলে যেতে হয। কলকাতায় গিয়ে শুনলাম পুবীতেই তাবা বযেছে। বাড়িতে ইনফ্লুযেঞ্জা হয়েছে বলে মোটেই ক দিন বেবয নি। আরো দু-তিন মাস থাকবে। ঠিকানা পাওয়া গেল।

পুবী যেতে-যেতে এবাব একমাস হয়ে গেল আমাব।

একজন লোককে দিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম তাবা দু-এক দিনের মধ্যেই কলকাতায যাবে: হযতো সেই সব আযোজনেই ব্যস্ত ছিল, সমুদ্রেব পাবে দেখলাম না আর তাই। মনেব ভিতরে কেমন একটা নিবৃত্তি ও অবসাদ এল। এই সমুদ্রেব পাবে অন্ধকারেব ভিতব ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা কবে-একা। আমাব পাশে কেউ এসে যেন কোনোদিন দাঁড়ায নি।

কিন্তু একদিন দুপুরবেলা একা-একা নিজের ঘরে বসে থেকে-থেকে কিছুই ভাল লাগছিল না আব। ভাবলাম, একেবারে দেশেব বাড়িতে চলে যাওয়া যাক। সেখানে এখন হেমন্ত, ধান ঝবছে-মাঠ হয়ে আছে হলুদ-শুকনো পাতা উলটিয়ে দোয়েলগুলো পোকা খুঁটে খায। খয়েরেব বঙের ডানা মেলে বিকালেব বিষণ্ন চিল উড়ে-উড়ে কাঁদতে থাকে। বেতের জঙ্গলেব ভিতব থেকে কোবার অর্থপূর্ণ ডাক ভেসে আসে। অপবাহ্ণেব বোদের ভিতব বিমর্ষ মাছিব দল গুঞ্জন কবে ধীবে-ধীবে অন্ধকারের ভিতব হাবিয়ে যায। দিগন্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। শুধু হাতের কাছে ফেরে দু-চারটা শালিক ও চড়াই, মাঠেব ঘাসে-ঘাসে ঠ্যাং ভাঙা দুঃখী ভিখিবিব মত লাফিয়ে লাফিয়ে—

বিছানা বেঁধে সুটকেস নিয়ে স্টেশনে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম বিনতা ডান হাত দিয়ে হাতল ধবে বাঁ পা বাড়িয়ে একটা সেকেণ্ড ক্লাশ ক্যাবিনেব

ভিতর ঢুকেছে। বাকি সব আগেই ঢুকেছে বোধ করি।

আমাকে সে দেখতে পেল না।

থার্ড ক্লাশের টিকিট কেটে গাড়িতে চড়ে ভাবলাম একেবারে সেই হাওড়ায় গিয়ে নামব। আর-কোনো স্টেশনে নামবার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু হাওড়ায় নেমে মাথা ঈষৎ অমায়িকভাবে নত করে হেসে বিনতাকে একটা নমস্কার জানাব। তারপর বলব।

কিন্তু পরদিন সকালে হাওড়ায় নেমে তাদের কাউকেই কোথাও দেখতে পেলাম না। সমস্ত লোকজন ভিড় প্রতিটি নারীর মুখ কঠিন উদ্বেগে খুঁজে বেড়ালাম; অনেকক্ষণ ধরে।

কিন্তু কোথাও বিনতাদের দেখতে পেলাম না। বিনতা কোথাও নেই। পরে শুনেছিলাম তারা খড়্গপুরে নেমে গিয়েছিল-সাত-আট দিন পরে আবার পুরীতে ফিরবে বলে।

বিনতাকে আমি আর দেখি নি।

কয়েক বছর কেটে গেলে। শুনলাম সে নাকি বিলেত গেছে। সেখান থেকে এডুকেশনে ডিগ্রি নিয়ে এল। পশ্চিমে কোথায় এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে। সেখান থেকে কলকাতায় আমার এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর কাছে অনেক চিঠি এসেছে তার। এক-একটা চিঠি আট-ন পৃষ্ঠা দীর্ঘ। পড়েছি, প্রথম-প্রথম পড়ে বিমূঢ় হয়ে থাকতে হয়।জীবনের অতীত দিনগুলো তাদের অন্ধ আক্ষেপ নিয়ে হৃদয়ের মধ্যে পিতৃমাতৃহীন পাখির ছানার মত হাহাকার করে ভেসে বেড়াতে থাকে।।

কিন্তু ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে দেখি, তারপর, বিমূঢ় হবার কিছু নেই। চিঠিগুলো কাজের কথায় ভরা শুধু, হৃদয়ের দিক থেকে কোনোই সাড়া নেই তো। যদিও-বা থাকত, আমিও-বা কী করব? জীবন পরিবর্তিত হয়। অনেক জীর্ণ পুরনো দলিলপত্র বাক্সে বোঝাই করে রেখে জমির উপস্বত্ব ভোগ করা চলে কিন্তু হৃদয়ের বেলা সে নিয়ম খাটে না তো।

বিনতাকে হয়তো আর-কোনোদিন দেখব না।

অনেকদিন দেখি নি। প্রায় সতের বছর।

কিন্তু তার সম্বন্ধে একটা কথা মনে হয়েছে আমার এই যে সে মেয়েটিকে একদিন পদাবলীর কিশোরীর মত মনে হয়েছিল আমার।

সে ক্রমে-ক্রমে যেন প্রেমহীন ক্ষমাহীন কঠিন....মতন হয়ে উঠেছে।

তার সঙ্গে-সঙ্গে সেই রকম সব হৃদয়হীন কঠিন অপ্রসন্ন এক দল মানুষ, প্রেম ও ক্ষমা, স্মৃতি ও দুঃখের চেয়ে কাজ ও ব্যস্ততা সফলতা, ও জীবনের বিচিত্র সমারোহ সাড়ম্বরকে যারা ঢের বড় জিনিস বলে মনে করে নিয়েছে।

•

তবুও আজকাল পদাবলী পড়ে, 'টেস' পড়ে, পুরনো ও আধুনিক সাহিত্য যেখানেই মানুষের হৃদয়ে এসে হাত দিতে পেরেছে সেই সব পড়তে-পড়তে আমার সেই বিনতাকেই মনে পড়ে। সেই সতের বছর আগে বাংলার একটা অখ্যাত স্টেশনে কোনো এক নির্জন সন্ধ্যায় কেরোসিনের মশালের বিচিত্র আলোর ভিতর যে হাতির দাঁতের মত হলুদ, ম্লান, পথক্লান্ত মুখখানা দেখেছিলাম আমি, সেই প্রেয়সীকে আমার। ছ-সাত বছর আগেও এই রকইম মনে হত আমার।

কিন্তু আজকাল কিছু মনে হয় না আর।

যদি কোনো ভবিষ্যৎ জন্ম থাকে, এই নক্ষত্রেই ফিরে আসতে যদি হয় আবার, ইছামতীর পারে, কোনো একটা নিশুতি বটগাছের পাশে গেরুয়া রঙের ইটের একখানা বাড়ির ভিতর বিনতাকে নিয়ে আমাকে একটা জীবন কাটিয়ে দিতে দিও বিধাতা।

সূচীপত্রে যান

জলপাই হাটি

'কে, কে, দবজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে?' আস্তে বললে জিতেন দাশগুপ্ত। আবার বললে, 'কে?'

বলে, টেবিলের ওপরকার নীলশেডেব বাতিটাব আলো খুব বেশি পড়েছে যেখানে, সেখানে, চোখ বাখল বেশ নিবিষ্টভাবে—দলিলপত্রগুলো দেখে নিতে লাগল, দবজায় ধাক্কা পড়ছে, কড়া নাড়া হচ্ছে সেদিকে খেয়াল থাকলেও ঝোঁকটা কাগজপত্রেব দিকে বেশি। দাড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ফাইল দেখছিল দাশগুপ্ত। বললে 'কে? কলিং বেল টিপলেই হত, কড়া নাড়ছে কে? ওরে মহিম'—বলতে-বলতে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে, সুইচ টিপে ঘবেব ভিতবে দু-তিনটে কড়া আলো পটাপট জ্বালিয়ে দিয়ে, বললে, 'কে? তুমি—'

হ্যা আমি। চিনতে পারছ? হয় তো পার নি. এবার অনেক দিন পরে তোমার এখানে এলুম। রাত বারটা বেজে গেছে। বড্ড দেরি হয়ে গেল। নীচে কী করছিলে? দাশগুপ্ত, তুমি বিয়ে করো নি তো? করেছ? এরকম গুজব শুনেছিলুম। বিয়ে যদি করে থাকো, তোমার এখানে দু-চার দিনের বেশি থাকব না আমি।'

'কেন?'

'ওসব মানুষ আমাব ধাতে সয় না।'

'তুমি নিজে তো করেছ বিয়ে।'

নিশীথ বললে, 'রাত দশটার সময় ট্রেন শেয়ালদা এসে পৌঁছল। স্টেশনের কাছেই একটা বোর্ডিঙে খেয়ে নিলুম। তারপর বাসে গড়িয়াহাট; সেখান থেকে বাস এ মোড়ে নামিয়ে দিল—কুলি পেলুম না, তবে সঙ্গে জিনিস বেশি নেই—একটা সুটকেশ আর—

'তোমার পরিবার কোথায়? বাপের বাড়িতে?'

'না, আমাব ওখানেই আছে, জলপাইহাটিতে।'

'কলেজ কি বন্ধ হয়ে গেল তোমার?'

'হয়নি এখনও; এক মাস ছুটি নিয়ে এসেছি। এ ছুটিটা তোমার এখানেই কাটাব, তুমি এ বাড়িতে একা আছো তো? আমি একটু নিরিবিলি চাচ্ছি জিতেন; তুমি এত রাতে নীচে কী করছিলে? দোতলাব দক্ষিণদিকেব সেই ঘবটায় থাকো না আজকাল?'

'হ্যাঁ। আমি ওপরে শুয়ে পড়েছিলুম। কড়া নাড়ার শব্দে নীচে নেমে এসেছি। এমনিও আসতুম। ঘুম হচ্ছিল না, কয়েকটা দরকারি ফাইল নীচে পড়ে ছিল—ওপরে নিয়ে যেতে হবে।' জিতেন দাশগুপ্ত ফাইলগুলোব দিকে চোখ ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, 'কাল সাতটার সময় অফিসে যেতে হবে, এখন বাত একটা। নিরিবিলি চাচ্ছে নিশীথ!'

জিতেন দাশগুপ্তের সমীচীন মুখ বেশ ভাল মানুষেব মতন দেখাচ্ছিল। মুখের গাম্ভীর্যেব ভিতব থেকে একটু হাসি চলকে উঠল।

'যত মফস্বলেব মানুষ কলকাতায় এসে আজকাল [নিবিবিলি] খোঁজে—'

নিশীথ সেন বাবান্দাব থেকে সুটকেশটা টেনে ঘবেব ভিতবে এক কিনাবে ফেলে বেখে বেডিংটা নিয়ে এল, বললে, 'না না আজকাল নয়, মানুষেব সঙ্গে চলব, ফিবব, মিশব, কিন্তু তবুও নিজেব মনে নিজে থাকব।'

'হ্যাঁ, তারই মানে তাই। আমাব বাড়িটা'—জিতেন দাশগুপ্ত ফাইল উল্টেপাল্টে বললে—'ভাবি গলদ তো, বড্ড irregular। তবফদারেব কাজ। কাল অফিসে এলেই ওকে আমি—'

ফাইলগুলো ঠেলে একপাশে সাজিয়ে বেখে নিশীথেব দিকে তাকাল দাশগুপ্ত। চোখেব থেকে চশমাজোড়া খুলে নিয়ে আধো অন্ধ চোখে নিশীথের দিকে খুব ভবসা ভবে তাকিয়ে জিতেন বললে, 'যা চাও তাই পাবে, আমাব বাড়িটা খুব ঠাণ্ডা। লোকজন নেই—আমি আব আমাব স্ত্রী।'

'তোমাব স্ত্রী!' নিশীথ যেন অন্ধকারে বুকে কিল খেযে নিজেকে সামলে নিযে সিধে মুখে বসে বইল নিজের সুটকেশটাব দিকে তাকিযে। অন্য কোথাও চলে যাবে কি সে?

'দাঁতকপাটি মারলে সে নিশীথ। আমি বিয়ে করব না? বযস আমার সাতচল্লিশ। আজ যদি না করি তো কবে করব আর? স্ত্রীলোক না হলে চলে পুরুষমানুষের? তুমি নিজে চালাতে পেরেছ?' যে-দরজাটা দিযে ঢুকেছে সেটা খোলাই আছে, তাকিয়ে দেখল নিশীথ। টং টং করতে একটা রিকশ চলে যাচ্ছে। মাল চাপিযে সেও চলে যাবে নাকি? সাতচল্লিশ বছরে জিতেন দাশগুপ্ত বিয়ে করল। একে-একে সকলেই তো করেছে। বাকি ছিল জিতেন; লেক বোডেব এ বাড়িটা জিতেনের। চমৎকাব একটা আস্তানা ছিল এটা নিশীথেব—কলকাতায এলেই। জিতেন যে ভাবুক মানুষ নয, তা নয—কিন্তু ভাবগ্রাহী বেশি বুঝদার বেশি; মানুষের কোথায খোঁচা লেগেছে, কী করে তা ঘুচিয়ে দেওয়া যায়, কি করে সুবিধে করে দেওয়া যায মানুষকে, জিতেন যেন তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে পাবত, নিজেরই গরজে যেন সুব্যবস্থা করে দেবাব ক্ষমতা বাখত; কিন্তু জিতেন তো বিয়ে করেছে। নির্মল, সোমেন, রথীন, মুকুটমণি, অনিমেষ ঘটক, বিজয মিত্তিব, পবেশ দত্ত—একে-একে সকলেই তো গেল, সে নিজেও তো প্রায বছর ত্রিশ আগে। বাকি ছিল জিতেন দাশগুপ্ত।

'কোনো খবর পেলুম না তো। কবে বিয়ে করলে?'

'কাউকেই খবর দিই নি। অফিসে গিযে রেজিস্ট্রারি করে বিয়ে, এস-সি মুখার্জির মেয়ে। চল, দেখবে এসো—'

হাত ইশারা করে তাকে থামিযে দিযে বললে, 'না, এখন নয। বড্ড ঘুম পেযেছে। ভারি ক্লান্ত লাগছে জিতেন, হাত পা না-ছড়িয়ে পারছি না আব। এই যে একটা খাট পড়ে আছে—এটা কার? ভারী চমৎকাব নেযারের খাট তো; আমি শুযে পড়ি।'

জিতেন শান্ত, সেযানা মুখে হাসি ছুঁযে নিযে একে-একে ঘরের কড়া বাতিগুলো নিভিযে দিল সব; টেবিলের ওপর নীল শেডের বাতিটা জ্বলছিল। জিতেন চেযারে ফিরে এসে বললে, 'যেন আমার স্ত্রী তোমাব বিজোড়!'

চশমা খুলে নিযে আড়ষ্ট চোখে নিশীথের দিকে তাকিযে হাসিমুখে উত্তরের প্রতীক্ষায হয তো এমনিই—বসে রইল সে। নিশীথ হোল্ড-অল খুলে বিছানাব তোশক বালিশ চাদর বার করে নিযে একটা মযলা কাপড় দিযে কেড়ে নিচ্ছিল।

'না বিজোড় হবে কেন? এখানে মশাটশা আছে?'

'আছে।'

'মশারি আনি নি তো—'

'তা হলে ওপরে চলো। রাতে বেশ বাতাস খেলে সেখানে। মশারি না টানালেও চলে।'

নিশীথ খাটের ওপর তোশক পেতে ফেলেছিল—একটা বালিশ খাটের এক কিনারে লক্ষ্যহীনভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিযে জিতেন দাশগুপ্তকে আশ্বস্ত করতে-করতে বললে, 'মশা তো আর বাঘ নয, উড়বে এখানে। আমরা পদ্মার পারের দেশ থেকে এসেছি। পদ্মার ওপারে ফেলে এসেছি যে-সব, কলকাতায সে-রকম জানোয়ার থাকে না।' বলতে-বলতে একটা সাদা পাতলা গাযের চাদর বেশ করে একটু ঝেড়ে, প্রজাপতির মত ছোট সাদা পোকার মরা ডানা ও ডানার গুঁড়ি, উড়িয়ে নিশীথ বললে, 'কাল তোমাকে সকালেই অফিসে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, সাতটার সময। উঠতে হবে পাঁচটায। দাড়ি কামিযে ল্যাট্রিন সেরে চান করে কফি, আলু ভাজা আর ডিমসেদ্ধ খেযে বেরিযে যেতে হবে—'

কফি আলুভাজা আর ডিমসেদ্ধ। ল্যাট্রিন সেরে। কী সব কথা জিতেন দাশগুপ্তের মুখে। এ-রকম ধরনের কথা, একটা আত্মতুষ্টি জিতেনের নাকে চোখেঃ এসব কী দেখেছে শুনেছে আগে নিশীথ যখন জিতেনের এখানে আসত?

'কফি আলুভাজা আর ডিমসেদ্ধ?'

'হ্যাঁ।'

'রোজ।'

'হ্যাঁ। যেদিনই সকাল-সকাল অফিস থাকে—'

'রোজই আলুভাজা কেন দাশগুপ্ত সাহেব? রোজই ডিমসেদ্ধ?'

'আমার ভাল লাগে।'

ঢং করে একটা শব্দ হল। পাশের কামরায় বড় ঘড়ি আছে। দেড়টা বেজেছে হয়ত। নিশীথ এক-আধটা মশা টের পাচ্ছিল। পাতলা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলেই চলবে। বিশেষ ঘুম হবে না আজ রাতে। কাল সকালবেলা কোন দিকে যাবে সে? জিতেন তো বেরিয়ে যাবে। নতুন জায়গায় এলে অদ্ভুত অবোলা হববোলা জিনিসগুলোর ভিতর ঘুম আসতে চায় না তার। পাশের কামরায় দেয়ালে আবার কিন্নরের বাচ্চা আছে, দেড়টা বাজিয়েছে এরপর দুটো আড়াইটে তিনটে সাড়ে তিনটে করে পাঁচটা অব্দি বাজিয়ে যাবে—শুনতে হবে নিশীথকে। খুব সম্ভব পাঁচটার সময় ঘুম আসবে (জিতেন দাশগুপ্ত বেরিয়ে যাবে তখন)।

পাঁচটায় ঘুমলে আটটার আগে উঠতে পারবে সে? ওপরে যে-মহিলা আছে জিতেন তাকে কী পরামর্শ দিয়ে যাবে? বারবার নিশীথের নিদালি দেখবার জন্যে ওপরের থেকে নেমে আসবে কি সে? তারপর ঠিক যখন আটটা-সোয়া আটটার সময় জেগে উঠে নিশীথ সুড়সুড় করে বেরিয়ে যাবে পূর্ব দক্ষিণ কলকাতার কোনো ঘাঁটির উদ্দেশে, কিংবা আরো দূরে উত্তর কলকাতার দিকে, তখন কি 'চা হয়েছে, চা হয়েছে, না-খেয়ে যাচ্ছেন? চা এনেছি—' পিছু ডাক শুনতে হবে মেয়েটির?

না, না, তা হবে না। সে সব মেয়ে আজকাল আর নেই, দশ-বার বছর আগে কলকাতায় সে-রকম দু-একজনকে দেখেছিল নিশীথ, আজকালকার এ-সব স্ত্রীলোকেরা আদিমানবের মত রোমাঞ্চে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আগুনের ব্যবহার যারা প্রথম শিখেছিল।

'এস-সি মুখার্জি কে?'

'কে এক মুখুজ্যে'—জিতেন দাশগুপ্ত বললে।

তারপর বললে, 'সলিল মুখুজ্যের স্ত্রী বার্মিজ; ওরা রেঙ্গুনে ছিল অনেকদিন। সলিলবাবুর স্ত্রীর নাম মা থিন। রং খুব ফর্শা, লম্বা পুরুষের মত দেখতে। আমি ওকে মার্টিন সাহেব বলি।' শুনতে-শুনতে নিশীথের ঘুমের আবেশ কেটে যাচ্ছিল।

'তোমার শাশুড়ি-মা-থিন কোথায় আছেন জিতেন দাশগুপ্ত?'

'ওরা আজকাল কলকাতায়ই আছে, পার্ক সার্কাসে থাকে। বড় দাঙ্গাটার সময়েও এখানেই ছিল। হেঁটে বেড়িয়েছে, হামলা দেখেছে; পুলিশের ট্রাকে ছুটে, রেডক্রশের গাড়িতে চড়ে দিনরাত একঠাই করে দিয়েছে। ঐ ওদের রকম। মানুষকে মানুষ খুন করেছে, ম্যানহোল থেকে আধকাটা মানুষ টেনে বের করে হাসপাতালে দৌড়ানো তাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে, মার্টিন মুখুজ্যে এই তো' করেছে দাঙ্গার সময়। মরা মানুষ আধ-মরা মানুষ, ডাক্তার আর হাসপাতাল, টেলিফোন আর ট্রাক চার্টার; মনে কোনো বিষ নেই, বেকুবি নেই, বজ্জাতি নেই, যারা মারছে তাদের ওপর হামলা নেই, ভয় নেই, লোভ লুট চঞ্চলতা নেই, মার্টিন সাহেব যে আমার শাশুড়ি এ কথা ভেবে মাঝে-মাঝে আমি খুব ঝুম হয়ে থাকি, হ্যাঁ বেশ লাগে।'

নিশীথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বেশ ভালো, মহৎ শাশুড়ি পেয়েছ তো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

জিতেন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ঘুম পাচ্ছে? তাহলে ঘুমোও।'

সাদা পাতলা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিশীথ বললে, 'লম্বা ফর্শা তোমার শাশুড়ি? অ্যাংলো ইনডিয়ানের মতন দেখতে? মা-থিন তো রেঙ্গুনের মেয়ে।

অথচ মেমের মতন—'

'ওর বাবা খাঁটি বার্মিজ, রেঙ্গুনের খুব বড় ব্যারিস্টার ছিলেন। মা-থিনের মা নরওয়ের মেয়ে—'

'ওঃ!' নিশীথ বললে, 'তোমার স্ত্রী দেখতে কেমন?'

'চলো দেখবে।'

'এখন তো রাত দুটো।'

'চলো ওপরে। পাঁচটার সময় অফিসে যেতে হবে। এ তিনঘন্টা জেগেই কাটিয়ে দিই। চলো, আমার স্ত্রী বাংলা বলতে পারে খাঁটি বাঙালি গিন্নির মতন, তোমার বাংলা লেখাটাও পড়েছে, পোলিটিকসেই উৎসাহ বেশি, তবে—' জিতেনের ঠোঁট গাল চোয়াল একটু বেঁকে কুঁচকে স্বাভাবিক হয়ে আসতেই সে বললে, 'সাহিত্যেও নজর আছে নমিতার—'

'নমিতার?'

'নমিতার। চলো যাই, তুমি সিগারেট খাও?'

'এক-আধটা, দলে পড়লে'

'আমারও তাই। ওপরে টিন আছে। শব্দ শুনছ?'

'কোথায়?'

জিতেন দাশগুপ্ত তার একহারা লম্বা কালো শরীরটা কেমন একটু উৎসাহের দুর্দমনীয়তায় আড়ষ্ট কঠিন করে চশমার ফাঁক দিয়ে সিলিঙের দিকে চোখ মেরে বললে, ' ঐ ঐ টক টক ডুব ডুক চক চক—'

'তার মানে?'

'পাঁয়তাড়া কষছে—'

'কেন?'

'ঘুম হচ্ছে না, ব্রোমাইড দিয়ে এসেছি।'

'অসুখ?'

'না, এমনিই—বিছানার একজন না-থাকলে আর-একজনের ঘুম ফেঁসে যায়। কয়েকটা মাস ধরে এই রকমই হচ্ছে। পরের কয়েকটা বছর হবে।'

খুব আশ্বাসের সঙ্গে বললে জিতেন দাশগুপ্ত। নিশীথ আড়চোখে জিতেনের দিকে তাকাল। জিতেন মানুষ খুব স্থির। বলছেও স্থিরতার কথা; কিন্তু কোনোদিনই মেয়েঘেষা ছিল না সে। আগুনের মতন মেয়েদের কাছ থেকেও অনায়াসে কেটে পড়ে অনেক দূরে একটা নির্বিকার গাছের মত আকাশে বাতাসে স্বয়ম্ভূ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার আশ্চর্য সহজশক্তি ছিল। কী বলছে আজ রাতে জিতেন দাশ? কেমন বসন্ত রাতে ধনেশ পাখির মতন দেখাচ্ছে তার চোখ। মাথা ঘেমে না-উঠলে হেসে ফেলত নিশীথ।

'হাসছ? নিশীথ?'

'ওপরে যাও তুমি দাশগুপ্ত।'

'তুমি যাবে না?'

'আমি ঘুমে ভেঙে পড়ছি, বসতে পারছি না। এ-রকম অবস্থায় ওপরে গিয়ে দাড়ালে সেটা ঠিক হবে না জিতেন।'

নিশীথ বিছানায় শুয়ে পড়ল।

'এক মাস তোমাদের এখানে আছি। কথাবার্তা হবে। খুব জমবে আলাপ।' ঘুমের চোখে জিতেনকে বলল।

'বেশ বেশ। মশারি আনো নি?'

'না।'

'অবস্থা দেখছি, ওপরের থেকে পাঠিয়ে দিতে পারি কি না—'

'না না এত রাতে আর ওপর-নীচ চলে না।'

'আমি সবই চালু করে রেখেছি, ভাই নিশীথ।'

'আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছি। মশারির চেয়ে ঢের ভালো। ভারী আরাম লাগছে। ওপরে যাবার সময় বাতিটা নিভিয়ে দেবে?'

'পেয়েছি', জিতেন বললেন, 'এই যে সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা দড়ি। তোমার নেয়ারের খাটের চারিদিকে চারটে লম্বা রড দেখেছ তো, বেঁধে ঠিক করে নাও'—ঘরের এক কোণে একটা মস্ত বড় আলমারি খুলে ধপধপে নেটের মশারিটাকে বড় একলতি সমুদ্রফেনার মত নিশীথের বিছানার দিকে ছুঁড়ে মারল জিতেন।

'তুমি ভেবেছিলে আমার স্ত্রীকে দিয়ে মশারি পাঠিয়ে দেব!'

'এত রাতে মিছেমিছি কাউকে বিরক্ত করা ভাল হত না। ভারি খাসা মশারিটা তো তোমার, চমৎকার লাকসের গন্ধ আসছে—' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিতেন দাশগুপ্ত। বিয়ে করেছে বলে সে দূরে সরে গিয়েছে—সরে যাচ্ছে—তার অনেকদিনের অন্তরঙ্গ মানুষরাও তাই মনে করে। এক কাপ চা চাইল না নিশীথ, একটা সিগারেট চাইল না। বোর্ডিঙে খেয়ে এসেছে মিথ্যা কথা বলে, না-খেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল—এর আগে যতবার নিশীথ কলকাতায় এসেছে নিশীথের দাবিদাওয়া মেটাতে গিয়ে ভালবাসার নেবুর কচলানিতে প্রায় তিতো হয়ে উঠত জিতেনের মন। কী রকম অনির্বচন হয়—বানির দিন গিয়েছে সে সব। আর এখন?

'কিছু খাবে নিশীথ? এক কাপ চা?'

'তুমি ওপরে যাবে না জিতেন?'

'যাচ্ছি। একটা সিগারেট?'

সিগারেট পেলে হত নিশীথের। কিন্তু সিগারেট চাওয়া মানে জিতেনকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে রাত

দুটোর সময় আমার চক্ষুস্থির, জিতেনের স্ত্রীরও। 'সিগারেট? না এমন খাব না দাশগুপ্ত। দলে পড়ে এক-আধটা খাই। খাওয়ার অভ্যেস নেই তো আমার।'

'মশারিটা টানিয়ে নাও। দিচ্ছি টানিয়ে—'

'আমি নিচ্ছি টানিয়ে।'

'তোমার বিছানার পাশেই সুইচ। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়েই পাবে; এ কামরার সবচেয়ে চড়া আলো জ্বলে উঠবে; দিনের মতন দেখাবে ঘরটাকে। নীল শেডের আলো জ্বলুক। দরকার হলে নিভিয়ে দিও। সুইচটা উত্তর দিকের দেয়ালে—ঐ যে হোঁৎকা টিকটিকিটা যেখানে—ঐ যে—আঃ—বাস—পোকাটাকে সাবড়ে দিল—'

'দেখেছি। জিতেন দাশগুপ্ত কলকাতায়?'

'না।'

'ঋতেন?'

'না।'

'ওদের স্ত্রীরা কোথায়?'

'ওরা সব ভাগলপুরে—'

'এখানে তুমি আর নমিতা, আর কে আছে?'

জিতেন দাশগুপ্ত চশমা খুলে জন্মান্ধের মত কেমন যেন নির্লিপ্ত নিরালোক চোখের মৃদু ঝলসানিতে নিশীথের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে, 'ঋতেন শিগগির এখানে আসবে না, তার স্ত্রীও না। হিতেন হয় ত একা একবার আসবে, কিন্তু মাস দেড়েকের আগে না। এখানে রইবে, না তার শ্বশুর বাড়িতে, বলতে পারি না। ওরা আজকাল আমার এখানে বড় একটা থাকে না। কলকাতায় এসে আমার এখানে উঠলেও তারপরে ছিটকে পড়ে।'

ওপরে ঢক-ঢক টাক-টিক ডক-ক্রক শব্দ হচ্ছিল ; ওয়াকিসুরে তো বটেই ঃ এক অধীর চেয়ার টানা, দেরাজ খোলা, লাথিয়ে সুটকেশ ঠেলে দেওয়া, দোর বন্ধ করা, ক্যাম্প খাট সরিয়ে ফোল্ডেবল চেয়ার গুটিয়ে মেঝের ওপর দড়াম ফোটানো, নিশীথ ওপরের কোজাগরী আওয়াজগুলোর রকমারি কৈফিয়ত ঠিক করে নিচ্ছিল খুব স্থির দৃষ্টিতে জিতেন দাশগুপ্তের অন্ধ চোখের দিকে, অন্ধকারে মাথার ওপরের বড় বিমটার চারিদিককার স্কাইলাইটগুলোর দিকে তাকিয়ে। চোখে চশমা আঁটছে, খুলছে, সাঁটছে, খুলছে জিতেন; এইবার সেঁটে নিল।

'ওপরে যাও জিতেন। রাত এখন আড়াইটে।'

'ঋতেনের তো এইরকম ভাব—' নিরাশায় হাত ঘুরিয়ে শূন্য অন্ধকারের ভিতর ছেড়ে দিয়ে জিতেন বললে, 'আগে তো দাদাই ছিল ওদের সব। এখন দাদাকে মজন্তালি সরকার বানিয়ে বড়-বড় হাতি পাঠিয়ে দিচ্ছে, যেন নিজের পেট ফাঁসিয়ে বেড়ালটা হাসবে আর ওরা হুলো বেড়ালের গল্প পড়ে হাসবে। দুশো মজা হবে, সাতশ হাসি, কী বল হে নিশীথ'—জিতেনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'কিন্তু ঋতেনের ঘানির তেল খেয়ে তো আর বম্যচক্র ঘুরছে না। ঘুরছে নিজের নিয়মে।'

জিতেন দাশগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে, 'আমার ভাইদের আমি খুব ভালবাসি, ওরা তা বুঝবে না। আমার মত ভালবাসতে পারবে না। মাঝে-মাঝে কেমন কঠিন হয়ে ওঠে মন ওদের কথা ভাবতে গিয়ে। থাক, মনটা নরম হোক, মৃদু হোক, স্নিগ্ধ হোক। নমিতা খুব সাঁচা মেয়েমানুষ। মশারি টানিয়ে নাও নিশীথ।' নীল শেডের বাতিটা জ্বলছিল। জিতেন দাশগুপ্ত চলে গেছে। নিশীথ দাঁড়াল। ঘরের ভিতর কয়েকবার পায়চারি করে বারান্দার দিকে খোলা দরজাটা বন্ধ করে, এল জিতেনের টেবিলের কাছে। কোথাও বাথরুম আছে কি না জিতেনকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। নীচের তলায় কোথাও চাকর-বাকর বা অন্য কেউ আছে কি না বলে যায় নি জিতেন। তাহলে এখন ঘুমোতে হবে। কিন্তু কী করে আসবে ঘুম। জিতেন বিয়ে করেছে শুনেই ঘুমের চটকা (এসেছিল একসময়) একেবারেই ভেঙে গেছে। বিয়েই শুধু করে নি। একটা ফিরিঙ্গি মেয়েকে বিয়ে করেছে। এরপর জিতেন দাশগুপ্তকে দিয়ে কিছু আর করে উঠতে পারবে না নিশীথ ঃ ও নাগালের বাইরে চলে গেছে। লেক-রোডে বাড়ি ছিল জিতেনের—হৃদয় ছিল মানুষটার—ভারি অন্তরঙ্গতা ছিল নিশীথের সঙ্গে। নিজেদের ভাইদেরও ভালবাসত জিতেন, কিন্তু ওর ভাইয়েরা উচ্চণ্ডে গোছের, দাদার কাছ ঘেঁষতে চায় না। নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে সব অনেকদিন থেকেই। বেশ বড়-বড় চাকরি ব্যবসা করছে তারা।

এ-রকম অবস্থায়—জীবনের শেষ কটা বছর জিতেন দাশগুপ্তের এখানে এসে কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল নিশীথের। পদ্মার ওপারের দেশটাকে তার খারাপ লাগে না, যেখানে একটা বড় প্রাইভেট কলেজে কাজ করছে সে, এ কাজে ভুয়ো মর্যাদা আছে, টাকাকড়ি নেই ঃ কুড়ি বাইশ বছর কলেজে কাজ করবার পর এখনও দেড়শ টাকা মাইনে।

কলেজের কাজটাকে মজুরির কথা বাদ দিয়ে, এমনি কাজ বা রুচি-রচনাব দিক দিযে দেখতে গেলে, কোনোদিনই ভাল লাগেনি তাব ঃ সঙ্গে-সঙ্গে লাইব্রেরিতে নতুন কিছু-কিছু বই, প্রকৃতিতে এসে পড়ত রৌদ্রের ফোযারা, নীল উজ্জ্বল চক্রবাল, আকাশে হরিয়াল, ফিঙে, বক, বড়-বড় সুন্দরী ওয়াক পাখি, কলেজের ময়দান পেরিয়ে খানিকটা দূবে গেঁযো রাস্তা ঘেঁষে টি টি তেপান্তর, ঝিল, কানসোনা মধুকূপী পবথুপি ঘাস, শবেব বন, শনেব হোগলাব ক্ষেত, অপবিমেয কাশ, হঠাৎ এক-আধটি নিখুঁত মুখসৌষ্ঠব, স্ত্রীলোকেরই, আবো দূরে বুনো হাঁসেব জলা মাঠ, স্নাইপ, সকালের উড়িসুড়ি নিস্তব্ধতা তখন ভাল লাগত নিশীথেব। ভাল লাগত বটে, কিন্তু কলেজেব, বিশেষত মফস্বল কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে বনের বেড়াল, ভাম, ভোঁদড়, সজারুব চরায-চরায ঘুরে বেড়ানো, বালিহাঁস, মরাল, ওযাক পাখিদেব ওড়াউড়ি আসা-যাওযা, ভালবাসা দেখবাব জন্য হাঁটুজল ভেঙে, সারাটা দিন ডুবজল গলাজলেব দিকে ভেসে যাওযা, সমস্তটা শবৎরৌদ্রেব—শালিধানেব—ববোজেব উড়ু-উড়ু পান বনেব ঝবঝবে দিনটাকে, বাতের নক্ষত্রনির্ঝবে এসে নিস্তন কবে বাখা, এ সব কাজ মোটেই সম্মানজনক নয, এ সব নিযে সচেষ্ট থাকলে অধঃপতিত বিবেচিত হবে সে; কারুবই সায পাবে না। এ সব কাজ মানুষেব পক্ষে সম্ভব, কিন্তু ওরা বলে অধ্যাপকের কাজ আলাদা, রুচি, ভিন্ন, দাযিত্ব আব এক বকম। অধ্যাপক যে মানুষ নয তা তো নয। কিন্তু ছাঁকা মানুষ, পবিস্রুত জলেব মত কুঁজো, কলসি বা ওযাটাব ফুলাবেব ভিতব। কী হবে ও-বকম জল হযে; নিশীথ হতে চাচ্ছিল নির্ঝবের জল, কিংবা জল, সমযসীমাব অব্যক্ত থেকে নিঃসৃত সাগবেব। কলেজেব কাজ ছেড়ে দেবে সে।

কলকাতাব চেযে মফস্বলেব প্রকৃতিলোক ঢেব ভাল লাগে তাব। সেই সব মানুষদেবও ভাল লাগে—মফস্বলেব গ্রামপ্রান্তব থেকে উপচে পড়ে যে-সব মানুষ—কার্তিকেব বিকেলেব বোদে, চোত-বোশেখেব শেষ বাতেব ফটিক জলের মত জ্যোৎস্নায। এসব মানুষ সব ঋতুতে সব সমযেই ভাল। এদেব অসুস্থতা নেই যে তা নয, অভাব অনেক। কিন্তু আধুনিক সভ্যতাব বিষক্রিয়া অনেক দূব পর্যন্ত ঠেকিযে বেখেছে ওবা। যে-প্রণালীতে রুখেছে তা বিজ্ঞানসম্মত নয; কিন্তু বিজ্ঞান কত দিনে মানুষকে কত বেশি আব দান কবতে? দেহেব সুবিধা ছাড়া কিছু কি পাবছে আব, দান কবতে? পাববে কি কোনোদিন? মানুষেব হৃদযেবও শুভ সংহতিব কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। সেটা হবে কি? সেটা হবে বলে মনে হয না। নিশীথ ঘবেব ভিতব পাযচাবি কবছিল। ঘন্টাখানেক হল জিতেন দাশগুপ্ত ওপবে চলে গেছে। নিজেব মনের—এমন-কি মাঝে-মাঝে পৃথিবীব মনেব সমস্যা নিযে এমন নিমগ্ন হযে পড়ছিল নিশীথ যে ঘবেব বাইরের অন্য কোনো দিকেই খেযাল ছিল না। মশারিটা টানাতে হবে। ঘুম হবে না। বক্তের কোনো কণিকাযই ঘুম নেই, কিংবা অনভূতিব, কিন্তু ঘুমুতে পাবলে ভাল হত। সঙ্গে ব্রোমাইড থাকলে ভাল হত। বেবিযে পড়বে না কি? কোনো একটা ফার্মাসিতে গিযে ঘুমেব ওষুধ কিনে আনবে? জলপাইহাটিব ডাক্তাব ঘোষেব প্রেসক্রিপশনটা আছে সুটকেশেব ভিতব; সেটা দেখিযে ওষুধ আনা চলে—এমনি যদি না দিতে চায। নাঃ শুযে পড়া যাক, মশাবিটা টানিযে নিতে হবে। বেশ মশা। দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে-মশার কামড় খাচ্ছিল নিশীথ।

জিতেন দাশগুপ্তেব দিকে মন ঘুবে গেল তাব—ওপবে নমিতা বযেছে; মাথাব ওপব শাদা ধবধবে কংক্রিটেব গাঁথুনি, মোটা বড় বিম দুটোব দিকে তাকাল নিশীথ। টেব পেল ঘট ঘট ডক ঠক টাক টকাস শব্দ হচ্ছে এখনো ওপবে। জিতেন কি জেগে আছে এখনও? কী করছে? ঘুমিযেছে জিতেন? এতক্ষণ তো নিশীথ মফস্বলেব কথা, কলেজের কথা, পদ্মার পারেব দেশেব প্রকৃতি, মানুষ, স্ত্রীলোকেব কথা ভাবছিল, ভাবছিল পৃথিবীব বোগের কথা, বোগেব উপশম সম্ভব কি না;—হঠাৎ উপলব্ধি কবল নিশীথ যে তার সমস্ত ভাবনার ভিতরেই এই একঘন্টা-দেড়ঘন্টা ধবে ওপবের তলার ঠক ঠক ঘট ঘট গিট ঘাট শব্দ শুনে এসেছে সে; এ শব্দ কমে নি তো কখনও, তবে জোব কমে গিযেছে, কিন্তু তবুও আছে, বযে গেছে এখনও, শব্দ হচ্ছে খুব আওয়াজ কবে নয, কিন্তু কল্কে ফুলের পাপড়ি ঝবাব মত হৃদযগ্রাহিতাবও নয।

নমিতা ছাড়া আব কেউ আছে কি ওপবে? জিতেন দাশগুপ্তেব বেশি বাতের খিদমৎ চলেছে? জিতেন তো কোনো দিন সিগারেট বা পানও খেত না। এখন কি গেলাশ ঠুকছে?

পিপাসা পেযে গেল নিশীথেব। ঘরেব চাবিদিকে তাকিযে কোথাও জলের ঘড়া কুঁজো কিছুই দেখতে

পেল না। এক গ্লাস জল চাই, খুব ঠাণ্ডা জল; দু গেলাস, তিন গেলাস, দশ গেলাস—ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কেমন যেন বোশেখ মাসের পোড়া মাটির মত লাগছে শরীবটাকে, জিভটাকে; কে যেন ভিয়েনে চড়িয়েছে, আঙুরের মত যত রক্ত ছিল শরীরেব ভিতর শুকিয়ে বালি হযে যাচ্ছে সব। নিশীথ তাকিয়ে দেখল ঘরেব দিকের বাফ রঙের খোলা দবজা পেরিয়ে সিঁড়ি ঘুবে বেঁকে দোতলাব দিকে চলে গেছে। উঠে গেলেই হল; দোতলার ঘর-দোর আনাচ-কানাচ সবই তো জানা আছে তার। জানে বেফ্রিজারেটাব কোথায় থাকত—বেফ্রিজেটাবের ভিতব বড় কাচের গাগরীতে জল, কমলালেবু, ক্ষীরেব সন্দেশ, পুডিং, ফালি কবা বাতাবি লেবু, পেঁপে, অরেঞ্জ স্কোযাশ, লেমন স্কোযাশ।

কিন্তু তখন তো জিতেন একা ছিল। নিজে সেধে নিশীথকে ফল মিষ্টি শববৎ খাওযাত গরমের রাতে।

নীচের তলায পাযচাবি করতে-কবতে নিশীথ মনে-মনে হাসছিল। জল যে ভাল জিনিস—ভাবী ঠাণ্ডা—জল আব ঘুম, দোতলার খোলা ঘরেব দক্ষিণা বাতাস আব সিলিঙ ফ্যানেব হাওযার চেযে স্নিগ্ধ জিনিস যে পৃথিবীতে কোথাও নাবীপ্রেমেও নেই—জিতেন দাশগুপ্ত তা বুঝিযে দিযেছিল একদিন। সেই জিতেনেব বাড়িতেই সামান্য এক গ্লাস জলের অভাবে আজ মাবা পড়ছে নিশীথ।

মার্টিন সাহেব তো খুব ভাল মানুষ—নমিতা খাবাপ মোটেই নয, কিন্তু তবু একটি নাবী যখন একজন পুরুষকে দখল কবে বসে, বিযে হয তখন, দুটো ভাল জিনিসেব থেকে তাদেব অজান্তেই বুঝি বেবিযে আসতে থাকে। বিবাহিতেবা সেটা বোঝে না। তাবা পবস্পবকে বুকে কোলে টেনে দৈবী স্ফটিকেব কাজ কবে বহিঃপৃথিবীব নিশীথ অসিত পবভৃৎ প্রভৃতিব চোখে, ক্রিস্ট্যালেব ভিতব দিযে তাকিযে চোখ মুড়োতে থাকে জীবনেব মরুভূমিকে চেবাপুঞ্জি বলে ভুল না হলেও। এ না হলে এই গবমেব বাতে নিশীথেব জন্য এক কুঁজো জলেব ব্যবস্থা না-কবে ওপরে চলে গেল জিতেন! দু-চাবটে সিগাবেট পর্যন্ত বেখে গেল না। জিতেনকে বলেছিল বটে নিশীথ যে দলে পড়লে এক-আধটা সিগাবেট খায সে; কিন্তু তাব মানে কি তাই? ওপবে সিগাবেটেব টিন বযেছে জিতেনেব' উচিত ছিল না একটা টিন নীচে নিশীথকে দিযে যাওযা—এ-বকম হাঁপ-ধবা গা-পোড়া বাতে অন্ধকাবটাকে পুড়িযে-পুড়িযে একটু—

কে?'

নিশীথ খানিক্ষণ সিঁড়িব দিকে তাকিযে বইল। না, কেউ নয। এত বাতে কে আব আসবে। কর্তা গিন্নি সর্পকুণ্ডলী পাকিযে শুযেছে দোতলায, কযেকটা ছুঁচো আব ইঁদব দাঁত খিঁচিযে ছুটে বেড়াচ্ছে, নীচে চাকব-বাকব কেউ নেই, কেউই নেই জিতেনেব, এখানে যতবাব এসেছে, থেকেছে, নিশীথ নীচেব তলাটাকে ঘাটিযে দেখতে যাযনি একবাবও। সবই ছিল তাব দোতলায। নীচে কী আছে, না আছে, জানেও না সে। এ ঘবে কোনো ফ্যানও নেই। নিশীথকে সাবাবাত এখানে উঠে, বসে, শুযে কাটাতে হবে। অথচ ফ্যানেব কোনে ব্যবস্থা নেই। নিশীথ ঘবেব কোণ একটা মযলা নড়বড়ে ড্রেসিং টেবিলেব কাছে মাথা হেঁট কবে দাঁড়িযে জিতেনেব নতুন অদ্ভুত পতঙ্গজীবনেব কথা ভাবছিল। না কি পাখা খুচিযে শুযোপোকা হযে গেল? ওপবেব থেকে একটা টেবল ফ্যান পাঠানো যেত না? কিন্তু ভেবে লাভ নেই। এ হবেই। একটা ভাল কথা মনে পড়েছে: কলকাতায আসবাব আগে আসামেব দিকে গিযেছিল নিশীথ। হাফলঙে গাড়ি থেমেছিল অনেক্ষণ,; একজন আসামি ভদ্রলোক নেমে গেলেন, চলে যাবাব সময নিশীথকে ধন্যবাদ জানিযে, (কেন, যে, ভুলে যাচ্ছে নিশীথ), তাব পকেটে এক প্যাকেট ভাল সিগারেট গুঁজে দিযে, চলে গেলেন। সে সিগাবেট কোথায বাখল নিশীথ?

নিশ্চযই ফেলে দেয নি। নিজে খাযনি, কাউকে খেতেও দেযনি—মনেই ছিল না তাব প্যাকেটটাব কথা। কিন্তু কোথায বযেছে? বাব কযেক পকেট হাতড়ে, বিছানা-বালিশ উলটে-পালটে, হোল্ডঅলটাকে তচনচ কবে, দেখল। নেই কোথাও। টস-টস করে ঘাম ঝবে পড়ছে, মাথাটাই ঘামিযেছে সবচেযে বেশি। কেমন গা বমি-বমি কবছে। ঘবেব জানলাগুলো খুলে দিল। সুটকেসটা খুলে ভাল কবে খুঁজে দেখতেই বেবিযে পড়ল প্যাকেটটা—

সিগাবেট হাতে কবে বিছানায় এসে বসল সে। কিন্তু দেশলাই তো নেই, দেশলাই কোথাও নেই এটা হলপ করে বলতে পারে সে। জলপাইহাটি ছাড়াব পব দেশলাইযেব কোনো রকম প্রযোজন হয নি; জলপাইহাটিতে দু মাসেব ভিতর দেশলাই ধবেছে সে; দেশলাইযেব অভাবে তাহলে সিগারেটও খাওযা যাবে না; অথচ এটা জিতেন দাশগুপ্তের বাড়ি; ওপরের ঘরে জিতেন যদি এ বকম নিঃসাড় হযে পড়ে না থাকত তা হলে টেবল ফ্যান, ঠাণ্ডা জল, দেশলাই সবই তো জুটে যেত তাব। সিগাবেটেব প্যাকেটটা

জানলার ভিতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

ওপরের সে সব শব্দ থেমে গেছে একেবারে; এইবারে চণ্ডীফুলের পাপড়িও ঝরছে না আর; এখন তাহলে লাল ঝুমকোর ঘুম কণ্টিকাবীকে বুকে জড়িয়ে। সময় হয়েছে তা হলে, ওপরে চলে যাবে নিশীথ।

জিতেন দাশগুপ্তরা দরজা খোলাই রেখেছে নিশ্চয়ই; একবার উঁকি মেরে দেখে নেবে। তারপর খুঁজে বার করতে হবে মিট সেফ; সেটা যদি বন্ধ থাকে তা হলে চাবিটা বের করে নিতে হবে, দেখতে হবে রেফ্রিজারেটরে কী কী রয়েছে। নিশ্চয়ই নতুন কিছু আমদানি হয়েছে। পুরনো হালচাল বাতিল হয়েছে কিছু তো বটেই; অদলবদল কতদূর গিয়ে দাঁড়াল দেখা যাক। খুব ঠাণ্ডা জল—বরফ দেওয়া সাধারণ কলের জল। কার্লসবার্ড সোয়াপ্পের জল পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, আগে যে-সব জায়গায় এগুলো থাকত, এখনও যদি সেখানেই রাখা হয়, তা হলে অন্ধকারে চোখ বুজে টেনে নেবে বোতলের পর বোতল। এতটা পিপাসা না পেলে, নীচে জলের পাথার ব্যবস্থা থাকলে নমিতা দাশগুপ্তের দোতলার ফ্ল্যাটে ঢোকবার কোনো দরকারই বোধ করতে না নিশীথ। কিন্তু জলের তাড়না তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। জলের তেষ্টা মিটলে মিটসেফ খুলে ক্ষিধে মেটাতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে দাঁড়াল নিশীথ। যেদিকে তাকায় সেদিকেই কার্পেট—দোতলার আদিগন্ত ভিত্তিচিত্রগুলোকে ঢেকে ফেলে পরিকল্পনা ও রঙের বাহারে নক্সায় অভিভূত করে রেখেছে সব। জয়পুরী গালিচা হয় ত এগুলো? ওগুলো মির্জাপুরী। দোতলায় সিঁড়ির মুখে মস্ত বড় হল ঘরটা। হল ঘরে একটু এগিয়ে পিছিয়ে বাঁ হাতি ডান হাতি করলেই ড্রেসিংরুম, ড্রয়িংরুম, খাবার ঘর, দুটো শোবার ঘর, গোশলখানা সবই চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় নিশীথকে। নিশীথও দেখে তাদের। এদের যদি গলা থাকত, কী বলত নিশীথকে? এ সব ঘর দোর তো নিশীথের পোশমানা জিনিস ছিল, তার জীবনের সেই সব বেতালসিদ্ধির দিনে। হলঘরে মাথার ওপরে বেশ একটা প্রকাণ্ড চৌকো সন্দেশের মত বাতি জ্বলছে। বেশ দেখাচ্ছে ঘরটাকে। গালিচার সমারোহ, সোফা, কুশন, এনসাইক্লোপিডিয়া মোটা-মোটা দামি বই-ঠাসা আলমারি—কিন্তু বাতিটা জ্বালিয়ে রাখবার কী দরকার ছিল সারারাত। কেউ দেখবে না, অথচ ঠাটটা জ্বলে যাবে, এই জন্যে? গোটা দুই বড়-বড় ফ্যান রয়েছে এই ঘরে। বাতি নিভিয়ে ফ্যান খুলে নিশীথ তা হলে এবার সোফায় শুয়ে থাকবে?

আগে জল চাই। খাবার ঘরে ঢুকলেই জল, ওয়াটার কুলারে—অঢেল জল। ভাবতে গিয়ে জলের তেষ্টা অনেকটা কমে গেছল নিশীথের। জল খাবে বটে কিন্তু জিতেন দাশগুপ্ত কী করছে? কিন্তু জল খেতে হল। রেফ্রিজারেটরের থেকে বোতল বের করে নয়—এমনিই খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল নিশীথ। ঘরটা খোলাই ছিল, সব দরজাগুলোই খোলা। খোলা সব জানালা, জিতেনের চোরের ভয় নেই—নমিতারও না। জানে না কি কলকাতার জানালা-ভাঙা চোরেরা, যে এখানে শিক ভাঙতে হবে না, কপাট ছুটিয়ে দিতে হবে না, দেয়ালের পাইপ বেয়ে উঠলেই আর- কোন সমস্যা থাকে না। মাল নিয়ে সারারাত চালানির কারবার চলতে পারে?

হাওয়া খেলছে ঘরে, ফ্যানও ঘুরছে। নিশীথ একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

গরমের রাতে দরকার বুঝে ব্যবস্থা করছে তারা। নমিতা অবিশ্যি আমেরিকান স্ন্যাকসটা পরতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু ঘুমে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। জিতেন ঝাড়াঝাপটা, শুধু চশমাটা খুলতে ভুলে গেছে। কয়েকটা মদের বোতল আর ডিকান্টার রয়েছে ঘরের একটা ঠাণ্ডা কোণে। জিতেন খায় না এ সব। নামিতাও না। হয় তো নমিতার কোনো-কোনো বন্ধুদের জন্য রাখতে হয়, কিংবা মার্টিন সাহেব এসে খেয়ে যায়। কিংবা মুখুজ্যে সাহেব। নিশীথ এগিয়ে দেখল দামি হুইস্কি, ব্রানডি, শ্যাম্পেনের বোতল সব, নামজাদা বিলিতি ফরাসি জিনিস। কার্লসবাডের জলও রয়েছে ওখানে, সোয়াপ্পেরও। আজকাল অবিশ্যি এ সব নামের নেশা নষ্ট হয়ে গেছে। সে সব আগের জিনিস নেই এখন আর। তবুও দুটো জলের বোতল আর একটা গ্লাস নীচে নিয়ে যাবে ভাবছিল নিশীথ।

এত সমৃদ্ধি থাকতে জিতেন দাশগুপ্ত আলু ভাজা খেয়ে মরে। দেখ, কেমন হাঁ করে পড়ে আছে লম্বা থুরকিসা মাছের মত। নাকে চশমা আঁটা, বাকি সমস্তটা—মন নয়, শরীরবৃত্তিও নয়; অচেতন ওষধির মত যেন—রাতের বাতাসে স্নিগ্ধ হচ্ছে। নিশীথ দুটো জলের বোতল তুলে নিল। মদের বোতলগুলের পাশে, এক গোছা চাবি চকচক করছিল। ঘরের সব দেরাজ বাকস আলমারির চাবি হয় তো এই গোছার ভিতর রয়েছে। অথচ এ-রকম হ্যাঁচকা পড়ে আছে। চাবি হাতে তুলে বোতল দুটো রেখে দিল নিশীথ। কয়েকটা দেরাজ খোলবার পর মানিব্যাগ পাওয়া গেল। তিন-চারটে ওয়ালেট, একশ টাকার সিলমারা নোট সব

প্রতিটি ব্যাগেই। দুই-একটা টাকা তুলে নেবে সে? টাকাব খুব দবকাব নিশীথের। কলেজেব কাজ ছেড়ে দিতে হবে। কলকাতায বাড়ি ভাড়া কবে পবিবাব আনা দরকাব। এই লেকপ্রদেশেব দিকেই থাকলে, অথচ চাকবি করবার দবকার নেই। কবেছে আজীবন মফস্বলে অধ্যাপনা, কলকাতায পাবলিক সার্ভিস কমিশন কী করে বড় চাকবি দেবে তাকে? বযসবৃদ্ধি থাকলেই তো হল না, শিক্ষা-সংস্কৃতিও ভুইচাঁপাব মত ধিমুগ্ধ কবে বটে। কিন্তু সুশিক্ষিতকে, অন্যদেব কাছেও তো ভুঁইফোঁড় ব্যাঙেব ছাতা ছাড়া আর-কিছু নয। এমনি বিদ্যে থাকলে হবে না, বিলিতি ডিগ্রি কোথায তাব—দিশি-বিলিতি এটা-ওটা টেকনিক্যাল জ্ঞানেব অভিজ্ঞান কোথায, বযস কোথায নিশীথের যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনেব সামনে গিয়ে দাঁড়াবে— দাঁড়াতেও যদি অনুমতি দেয তারা? কী করবে নিশীথ তা হলে? প্রাইভেট কলেজে মাস্টাবি? দেড়শ টাকাব জাযগায দুশ বা আড়াইশ টাকা মাইনেয়? ওকে লেক-কলকাতায পোষায না, উত্তব কলকাতাযও না। তাছাড়া মাইনেব জন্যেই শুধু নয, অন্য নানা কাবণেই কোনো কলেজে কাজ করবে না আব সে। ছেলে, অধ্যাপক বা গভর্নিং বডিগুলোকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। দোষ বাংলাদেশের বিশ শতকেব ভিতবে যে-ধ্বংসেব কীট বযেছে—দিনের পব দিন তা শ্রীবৃদ্ধিব। কিন্তু তবুও অদৃষ্টেব দোষে নয—খুব সম্ভব। কিন্তু কী করবে নিশীথ? সে তো ডাক্তাবি, আইন, ইঞ্জিনিযাবিং বা কোনো-বকম শিল্প-ব্যবসাযেব দিকেই যায নি। দেশেব ভিতর মাস্টাবিব চিতে জ্বলছে আজ দিকেদিকে: মাস্টারদেব কোনো বন্ধু নেই আজ আব। ছেলেবা গ্রাহ্য কবে না মাস্টাবদেব ঃ খুব সম্ভব তাবা কম মাইনে পায বলে। গভর্নিং বডি চোখ উল্টে কথা বলে ঃ খুব সম্ভব কম মাইনে দিয়ে এইসব নিবাহ তালকানাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এত সহজ এত চমৎকাব বলে। যাবা ঘর্মঘট চালিযে গবিব মানুষেব খাওয়া-পরা-মাইনেব সুবিধা করে দিতে চায তাদেব নজব, ফ্যাক্টবিব মজুব, কিসানদের দিকে: খুব ভাল জিনিস: কিন্তু একজন ওস্তাদ বাবুর্চি বা মোটব ড্রাইভাব যে-টাকা পায ইউনিভার্সিটিব একজন লেকচাবাব যদি তাব চেযে কম পায, তাহলে সাধাবণ স্কুল-কলেজেব মাস্টাববা কী পায, কী খায, সেদিকে কি নজর পড়বে না মার্ক্সিস্ট বা কংগ্রেসি বিপ্লবীদেব—কিংবা, যেখানে বসেই হোক না কেন, দেশেব, মানুষেব মঙ্গলচিন্তা যাবা করেন সেইসব স্বচ্ছ অনুধ্যাযীদেব? সবকাবি চাকবিতে যে যেখানে আছে তাদেব চাকবিব মেযাদ ও চুক্তি যে-বকমই হোক না কেন, তাদেব ছাটাই কবা চলবে না। খববেব কাগজগুলো এদেব সমর্থন করে লিখছে। খু ভালো কাজ কবছে। কিন্তু এই দারুণ বিশৃঙ্খলাব দিনে ইসকুল-কলেজেব মাস্টাববা যে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হযে চাকবি পাচ্ছে না, অন্ন পাচ্ছে না, বাড়ি পাচ্ছে না, তাদেব প্রতিষ্ঠানেব কোনো মর্যাদাশীল কেউই যে তাদেব বক্ষা কবছে না, আশ্রয দিচ্ছে না এ নিয়ে লিখতে হবে না?

পে-কমিশনেব টাকা পেযে গভর্ণমেন্টেব জোযান পেযাদাবা ম্যাগনোলিযা খাচ্ছে, এগবিজ্ঞশিনে যাচ্ছে। মেযেমানুষকে চোবা বাজাবেব মাল পৌঁছিযে দিয়ে, স্ত্রীকে, শেযালদাব বাজাবেব মাছ-তবকাবি: লাইফ ইনসিওবেন্স কবছে, সেভিংস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলছে। বেশ ভাল কাজ কবছে, এবা যদি এমন সমস্ত না-কবতে পাবে এদেব ওপবওযালাবাই কি ববাবব এ সব কববে? কিন্তু ছেলেমেযেদেব জন্যে গরু-মহিষেব দুধ কিনে দেবাব ক্ষমতা নেই, না-খেতে পেযে দুধেব বোঁটা শুকিযে গেছে স্ত্রীদেব, ঘব নেই, চাল নেই, কাপড়েব পেছনেব দিকে ছিঁড়ে গেছে মাস্টাবদেব, তাদেব স্ত্রীদেব, এবা বেজবকাবি জীব বলেই এদেব জন্যে কোনো কমিশন নেই—এ-বকম হতভাগা দেশে কোনো ইসকুল-কলেজ না থাকাই ভাল। সব পুলিশ হযে যাক, সেপাই হযে যাক।

প্রায হাজাব দশ-পনেব টাকা জিতেন দাশগুপ্তেব ব্যাগ খুলে সে নিয়ে যেতে পাবে। কাল যদি টেব পায জিতেন, নিশীথকে সন্দেহ নাও কবতে পাবে। সোনাব হাবেব গযনাব কতকগুলি বাক্স আছে, এও যদি সবিযে নিয়ে যায, নিশীথ দেবাজগুলো খুলে চাবি ঝুলিযে বেখে যায। তা হলে কাল বাতে যে কলকাতাব কালাকাবদেব হাতে জিতেনেব খোযা গেছে সব, এ বিষযে ওদেব কাবও মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না। নিশীথকে সন্দেহ কবেও তাকে ধবতে পাববে না। চাবিও হাওযা কবে দেবে সে, ব্যাগ-ট্যাগ সব। কোথাও হাতেব ছাপ বাখতে যাবে না। টাকাকড়ি এখুনি সবিযে ফেলবে সে। বসা বোডেব দ্বাবকা সাঁতাবাব জিম্মায বেখে আসবে। সাঁতবা হযত এতক্ষণে ঘুম থেকে জেগেও গেছে, সংসাবেব কাজ আবম্ভ কবে দিযেছে। এই তো পনেব কুড়ি মিনিটেব পথ এখান থেকে. ভোলা গিবিব শিষ্য সাঁতবাব বাড়ি। আশ্চর্য বকমেব সৎ মানুষ দ্বাবকা। তাকে গিয়ে বলবে। দেশেব থেকে এলুম, শেযালদা থেকে সোজা তোমাব এখানে, চাকরি-বাকবি স্ত্রীর গযনা এই গচ্ছিত টাকাগুলো তোমার কাছে রাখো দাদা। মেসে উঠেছি, আজ-কাল এক সময তোমার কাছে এসে টাকাগুলো নিয়ে যাব। এসব টাকাব কথা কাউকে কিছু

বলবে না। ববং ব্যাঙ্কের লোহাব সিন্দুক কথা বলে, কিন্তু দ্বাবকা সাঁতরা কখনোও না।

ভাবতে ভাবতে নিশীথ একশ টাকার নোটের মোটা-মোটা তাড়াগুলো সব কটা মানিব্যাগের ভিতব যেমন ছিল, ভরে ফেলতে লাগল। কী হবে এ সব টাকা নিয়ে? এ সব টাকা দিয়ে কী করবে সে? কলকাতার বাংলাদেশের বেকার মাস্টাব গরিব মাস্টার অধ্যাপকদের জন্যে দানসত্র খুলবে? কিন্তু এ ত শিশিব বিন্দু, সমুদ্রের প্রয়োজন। কোটি-কোটি টাকাব দরকাব এ দেশেব শিক্ষাকে সম্মান ও শক্তি দিতে হলে, যাবা শিক্ষা দেবে প্রাণশক্তি ও মর্যাদায তাদের স্বাধীন ও সবস সফল করে তুলতে হলে।

জিতেনেব টাকা সে নিতে পারে—উটপাখির মত চোখ বুজে নিতান্ত নিজেব দরকাবে। পৃথিবীর কথা ভাবতে গেলে চলবে না; পৃথিবী এব, ওব, তাব, নয়—ইতিহাসেব সকলেবই নিজেব জিনিস। যে-সূর্য নিভে যাচ্ছে, যে-সময় মানুষকে ধ্বংস করে ফেলবে একদিন—এইসব বড়-বড় ব্যক্তিব লীলাব জিনিস পৃথিবী। একজন মানুষ, একটা দল, একটা দেশ, বা মহাদেশ কী করে সুনিয়ন্ত্রিত কববার শক্তি পাবে পৃথিবীকে। মানুষের মন উন্নত হয়ে উঠতে পাবে কিন্তু দু-পাঁচ দুশ-পাঁচশ বছবেব মধ্যে তো নযই, কত সময় লাগবে কে জানে—কিন্তু সে সফলতা নাও লাভ কবা যেতে পাবে—মানুষের পৃথিবীতে কোনো দিনই। আজকেব পৃথিবীব এ-রকম ভয়ঙ্কব বিস্রস্ত প্রস্থানেব ভিতব ব্যক্তি নিজেব স্বার্থ ছাড়া আব কী কামনা কবতে পাবে—কী মানে আছে অন্য কোনো কামনাব? নিশীথ ভাবছিল, ব্যক্তি সে, অতিস্তনিত সমুদ্রের ভিতর ফেনাব গুঁড়িব মতন অনেকটা, প্রতিটি ফেনার গুঁড়িকে যদি দান করা যায ভেবে দেখবাব শক্তি, তা হলে ব্যাপাবটা যেরকম চাঁছাছোলা নিষ্ঠুব হয পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যক্তিব জীবন আজ সেই রকমই তো। এ অবস্থায কী কবতে পাবে, ফেনাব গুঁড়িব মত মানুষ, প্রতি মুহূর্তেই টালমাটাল সমুদ্রেব বাক্ষুসে শক্তিব আক্রোশ থেকে নিজেকে নিজেব পবিবাবকে সামলানো ছাড়া? সেটুকুও কি পারবে মানুষ? কে পাবছে? কত কম লোক পাবছে? কত কম ব্যক্তি নিজেকে বাঁচাতে, অল্পবিস্তব সুস্থ বাখতে পাবছে—পৃথিবীব বা রাষ্ট্রেব টাল সামলে সেটাকে সুস্থ করে তোলবাব শক্তি তাব আছে এ যদি সে মনে করে থাকে তবে মিথ্যে তাব মন। কে শুনবে এই বোকা মিথ্যার্থীকে। নিশীথেব মনে হচ্ছিল একটা বিষম শিংশপা সমুদ্রেব ঘূর্ণির অন্ধকাব বাতে ফেনাব গুঁড়িব মত উড়ছে যেন সে—এই তো এখনই উড়ছে: মফস্বলেব সেই কলেজেব কাজ নেই (ওটা ছেড়ে দেবে সে, না হয তাকে ছাড়িয়ে দেবে) কলকাতায কোনো কাজেব জোগাড় নেই, সম্ভাবনা নেই। নিশীথেব একটি মেয়ে কোথায যে, কেউই তো বলতে পারে না, ঘব ছেড়ে গেছে, না হাওয়া হয়ে গেছে এমনিই নিজেকে নিকেশ করে ফেলাব জন্যে, না অন্য কেউ সাবড়ে লাশ গুম করে ফেলল—যোল বছবেব চমৎকাব নিবপবাধ অসংসাবী মেয়েটি—কেউই কোনো খোঁজ-খবব দিতে পাবলে না। অথচ মেয়ে ঘব-ছেড়ে গেছে বলে একটা গ্লানি লেগে বয়েছে নিশীথেব পবিবারে, মুখে বিশেষ কিছু না বললেও বলি-বলি চোখ তুলে নিশীথকে আব তাব স্ত্রীকে জানিয়ে দিয়ে যায ব্যাপারটা, যে যখন যে-কোনো কারণেই কিছুটা বিমুখতা বোধ করে, একটু ঠাসাবাব দবকাব বোধ করে নিশীথ আব তাব স্ত্রীকে। আব-একটি মেয়ে দেশেব বাড়িতে মবছিল; থাইসিস হয়েছে; নিশীথ তাকে অনেক হিম্মৎ করে কাঁচড়াপাড়াব হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে কলেজেব প্রফেসব মহিমবাবুর মারফৎ; নিজে যেতে পারে নি, নিউমোনিয়া হয়েছিল তখন নিশীথেব। বাইশ বছব বযস নিশীথেব ছেলেব; মানুষ হল না। শক্তি ছিল কিন্তু বি-এ পাশ করে আব পড়ল না, ইয়াবদেব সঙ্গেই কাটায দিনবাত; চেনস্মোকিঙ করে; সিগাবেট ছাড়া অন্য কোনো কিছুব ধোঁয়া ওড়ায কিনা জানা নেই; মাঝে-মাঝে অনেক জায়গা থেকে নালিশ এসেছে যদিও, তা হবে; নিশীথেব চোখে পড়েনি। কিন্তু উত্তেজিক জলরস যে খায হারীত, নিশীথ জানে তা। কী করবে? উপায নেই। ছেলেব ওপব কোনো হাত নেই এখন আব। যথাসময়ে ছিল; বেশ ঠিক ভাবেই তো। কিন্তু তাতে ছেলে বিগড়ে গেল কেন, বলতে পারে না নিশীথ। তাব নিজেব পিতৃপুরুষের দিক দিয়ে (চাবপুরুষ অন্তত—যতদূব জানা আছে তাব) বেগড়াবাব কোন ইতিহাস নেই। হারীত প্রাযই বাড়িতে থাকে না, দেশেই থাকে না। নানা বকম জাতেব ইয়াব আছে তাব, নানা চক্রেব। কিছুদিন থেকে সে একদলেব সঙ্গে কলকাতায আছে, বেভল্যুশনের তোড়জোড় করছে কিন্তু কোথায আছে জানা নেই। নিশীথেব স্ত্রী মফস্বলের বাড়িতে এখন একেবাবেই একা; অবিশ্যি এক দিকে কলেজেব ফিলজফিব লেকচারাব মহিম ঘোযাল সপবিবাবে থাকে মহিম ঠিক তত্ত্বগ্রাহী নয়। সাংসারিক পলেস্তারায খুব সম্ভব ভিতবেবও সাত্ত্বিক নিশীথেব স্ত্রী সুমনা চালিয়ে নিতে পারবে—এই একটা মাস—মহিম ঘোষালেব পরিবারকে, অপরূপ সেই অর্চিতা ঘোষালকে, কাছে-কাছে রেখে। খুব শক্ত এনিমিয়া হয়েছে সুমনাব। নিশীথেব প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডেব বাকি সাতশ টাকা খসিয়েছে;

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে নেই কিছু এখন আর। দেখে এসেছে উকিল প্রকাশ মিত্তিরের ছেলে নরেন ছেলেটা বেশ সুস্থ-সমর্থ, মতি-গতি অবশ্যি ভালো নয়, খুব সম্ভব সিফিলিস নেই, ডাক্তার মজুমদারের মত স্বচ্ছ ডাক্তারের হাত থেকে বেরিয়ে তবে রক্ত দেওয়া তো; আরো কেউ-কেউ রক্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মজুমদারের পরীক্ষায় টেঁকেনি। যে-সব কাজে মাদকতা ও অনাছিষ্টি পরের কেবলই অপকার—মাঝে-মাঝে উপকারও হয়, সে-সব ব্যাপারে নরেনকে পাওয়া যাবে। মফস্বলের বাড়িতে আগুন নেভানো, কলকাতায় এসে হাবা-উদ্দেশে দমকল লেলিয়ে দেওয়া, বিনাটিকিটে রেলের ফার্স্ট ক্লাসে চড়া, যেখানে-সেখানে শেকল টেনে-টেনে থামানো, কলেরা-বসন্ত রোগির ডিউটি নেওয়া, চেক জাল করা, টাকা চুরি করা, শহর-গ্রামের ভদ্র-অভদ্র ঘরের ভিত ভাঙা। নরেন দিলদ রিয়াই, নারিকেলের খুব শক্ত কালো মালায় সিদ্ধির রস, পর্পটির রস, রক্তের রস, সুমনাকে রক্ত দিচ্ছে। কিন্তু নরেনের নামে বিশেষ বদনাম শুনে এসেছে নিশীথ এবার জলপাইহাটির থেকে। বাণুর ব্যাপারে নরেন দাগি। লোকেরা বলছে। সুমনা দেখতে ভাল ছিল, রোগে-রোগে কিছু নেই যদিও এখন, একটা গা-ঝাড়া দিলেই এখনও কেমন একটা ঝিলিক বেরোয়। নরেনের রক্তে কাজ যে না-হচ্ছে তা নয়। তবে পার্নিসাস এনিমিয়ার খুব দীর্ঘ পথ—অনেক বাঁক—নানারকম ছোবল—প্রতিনিয়তই নির্বিষ নির্মল করে রাখার প্রয়োজন। ডাক্তার মজুমদার ও তার কম্পাউন্ডারকে টাকা দিয়ে এসেছে নিশীথ, মহিম ঘোষাল আর তার গিন্নিকে, দেখবার-শোনবার ভার।

কলেজের একটি ছেলে হিতেনকেও বলে এসেছে দে- ‘-য়ে খোঁজ-খবর নিতে। দরকার হলে নিশীথকে লিখে জানাবে ওরা। জিতেন দাশগুপ্তের হাজার বার--চৌদ্দ টাকায়—টাকার দিক দিয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না নিশীথের। ঝড়ের সমুদ্রে একফোঁটা পদার্থের মত এই যে সে ছিটকে-লটকে ফিরছে, তার একটা উপায় হয়। যে-মেয়েটার যক্ষ্মা হয়েছে, কাঁচড়া পাড়ার হাসপাতালে আছে—বাঁচবে না মেয়েটা—তবুও যতদিন বেঁচে থাকে ভানু, তার খরচ পোষাতে পারে, নিশীথ, মাঝে-মাঝে কলকাতার থেকে ফল ওষুধ নিয়ে ভানুকে দেখে আসতে পারা যায়, স্ত্রীকে আনতে পারা যায় কলিকাতায়। হয় ত গিডনি ঝাড়গ্রামেও পাঠানো যেতে পারে কিছুটা সময়ের জন্যে। নিজেও সে কয়েকটা বছর হাঁফ ছেড়ে বসতে পারে—কোনো চাকরি নয়, কিন্তু তবুও টাকা আছে, স্বাধীনতা আছে, মনের স্বস্তি আছে, এমন কোনো ব্যাপারে হাত দিয়ে—ধরো, ইংরেজি-বাংলা প্রবন্ধ লিখে, দরকার হয় গল্প-উপন্যাস লিখে—প্রয়োজন হলে ইংরেজিতে লিখে—ধীরে-সুস্থে সুশৃঙ্খল হয়ে বসবার সময় পায়। ইতিমধ্যে মেয়েটা মরে যাবে খুব সম্ভব; স্ত্রীও মরে যাবে; কিন্তু তাদের মৃত্যু শয্যাকে খানিকটা স্নিগ্ধ করা যাবে এ টাকা হাতে থাকলে—মনে হচ্ছিল নিশীথের। নিজের ছেলেকে—হারীতকে, ফিরে পাবে না বটে কিছুতেই কোনোদিনও আর, কিন্তু স্বাধীনভাবে যথেষ্ট রোজগারের উপায় যদি পাকাপাকি করে নিতে পারে, তাহলে চেনাজানা কয়েকটা দুঃস্থ পরিবারকে দাঁড় করিয়ে দেবার পক্ষে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারে সে। চারটে পরিবারের কথা মনে হচ্ছিল তার, কলকাতার বুকের ওপরে বসেই ধনেপ্রাণে মরছে। এরা কি মরে যাবে? এদের মরতে দেওয়া সহজ। নিশীথ অবিশ্যি এদের খয়রাতির নেশা ধরিয়ে মাথা খেতে যাবে না, কিন্তু সে নিজে যদি শক্ত স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে, তাহলে এ পরিবার কটি যাতে ঠিক পথে চলে দাঁড়াতে পারে সে ভাবে ব্যবস্থা করা সহজ হতে পারে—নিশীথের পক্ষে। মফস্বল কলেজটার কাজে নিশীথের ফিরে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সে কাজটার ওপর—সত্যি বলতে কি— যবনিকা পড়ে গেছে। কলেজের প্রিন্সিপাল আর কলেজের গভর্নিং বডির সেক্রেটারি হরিলাল বাবুকে নিশীথ বলেছিলঃ দেড়শ টাকা মাইনের এ চাকরিতে পোষাচ্ছে না তার, অন্তত দুশ পঁচিশ-আড়াইশ না করে দিলে কী করে চালাবে সে? শুনে হরিলালবাবু আর জি-বির কয়েকজন মেম্বার বলেছিল, আপনার যদি কাজ করবার ইচ্ছে না থাকে করবেন না—কলেজের কাজ ফলারের হাঁড়ি নয়, এখানে টাকাকড়ির কথা নেই। নিশীথ বলেছিল, ‘বাইশ বছর তো হল সে সব; হয়রান হয়ে পড়েছি। এক মাসের ছুটি নিচ্ছি। দরখাস্ত লিখে দিলাম। কালই—যদি সম্ভব হয় আজ রাতের গাড়িতেই, কলকাতায় যাব।’ হরিলালবাবুরা বললে, ‘চাইলেই কি ছুটি পাওয়া যায়? কী গ্রাউনডে ছুটি নিচ্ছেন আপনি? আপনার তো কোন অসুখ-বিসুখ নেই, আপনার শরীর তো সুস্থ।’ নিশীথ বলেছিল, ‘আমার স্ত্রীর এনিমিয়ার জন্যে রক্তের দরকার হল, আমিই তো রক্ত দিতে চেয়েছিলাম, ডাক্তার মজুমদার আমাকে দেখেশুনে বললেনঃ আপনি যদি রক্ত দেন আপনাকে রক্ত দেবে কে নিশীথবাবু? প্রাণাচার্য অমিয়রতন চট্টখণ্ডী ভালমানুষ—সুস্থ মানুষ—মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়স—তেষ্টা পেয়েছিল—কাঁচের গেলাসে জল

সূচীপত্রে যান

খাচ্ছিল—হাতে গেলাস, মুখে জল, মরে গেল। স্ত্রীকে রক্ত দিতে-দিতেই মরে যাবেন আপনি। অবিশ্যি চট্টখণ্ডী মরে ছিল বলে মরবেন না। কিন্তু আপনি অসুস্থ। বিশ্রাম নিন।' হরিলালবাবু বললেনঃ 'এ তো কোন মেডিকেল সার্টিফিকেট হল না। তা ছাড়া ডাঃ মজুমদারের সার্টিফিকেট আমরা গ্রাহ্য করব না। তিনি সিভিল সার্জেন আছেন। তাতে আমাদেব কী? আমাদেব স্বাধীন কলেজ। আমাদের নিজেদের ডাক্তাব দেখে দেবে আপনাকে—যদি ছুটিব দবকার হয়।' কোনো সার্টিফিকেট জুড়ে না-দিয়ে এমনিই দরখাস্ত করে কলকাতায় চলে এসেছে নিশীথ। কলেজেব ও কাজ থাকবে না তাব। কলেজ কমিটিব পবেব মিটিঙেই চটকে যাবে। একটা রেজিগনেশন দিয়ে চলে এলেই ভালো হত, কারু মনেই কারুব প্রতি কোনো বিষ থাকত না তাতে।

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে কোনো টাকা নেই আব নিশীথেব; হাতে কোনো টাকা নেই, কলকাতায় চাকরি নেই; কলকাতায় চাকরিব চেষ্টা অনেকবাব হয়েছে; আর এ বয়সে তাব মত লোকেব জন্যে বাস্তবিকই কোনো সঠিক চাকরি নেই কলকাতায়। চাবদিককাব তাড়াতাড়ি কাড়াকাড়িব ভিতব অবিলম্বেই কিছু নেই—হয় ত স্থায়ীভাবে কিছুই নেই, কোনো দিনই নেই, অন্ধকার বায়ুভূত সমুদ্রেব সেই অচেতন ফেনার গুঁড়িটা ছিটকে পড়ছে; মনে হচ্ছে যেন খুব আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু ওটা ফেনা নয়—মানুষ—ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—পথ চায়, ঘব চায়, ওব যে মন আছে স্থিব স্বাধীন হয়ে একান্ত বসে তাব ব্যবহাব চায়। অনেক দূবে—সৈকতেব কী এক বিচিত্র সাধনোচিত ধামে জমানো ফেনাব মত স্নিগ্ধ হয়ে মিশে আছে জিতেন দাশগুপ্ত আব তাব স্ত্রী; মিশে থাকবে চিবদিন। ওরা পিতৃমাতৃযানেব মানুষ লোকায়ত হয়ে রয়েছে এই বিছানায়- ওদেব সঙ্গেই কারু কথা হয় না। সব নোটের তাল ব্যাগে চলে গেছে—দেবাজে ব্যাগগুলো যেখানে ছিল সেখানে রেখে, দেবাজে চাবি মেরে, মদেব বোতলগুলোব একপাশে চাবিব গোছা রেখে দিয়ে খালি হাতে বেরিয়ে গেল নিশীথ।

টাকা নেবাব খুব দবকাব ছিল তাব। পঁচিশ-ত্রিশ হাজাব সরিয়ে ফেললে জিতেনেব কিছু এসে যেত না। দেড় হাজাব-দু হাজাব টাকা মাইনে পায় সে, পবামর্শ দিয়ে আরো হাজাব-দুই। এ ছাড়া ঘুষ খেয়ে নেয়, এমনিই অন্য নানা রকম উপার্জন আছে তাব, ব্যবসা আছে। জিতেনেব ক্ষতি হত না, নিজের খুব উপকাব হত। এ বিশৃঙ্খলাব যুগে পৃথিবীকে উদ্ধাব কবা দূবেব কথা সমবায়কে ত্রাণ কবাও খুব শক্ত, অন্ধভাবে চালিত হয়ে সমবায়সুদ্ধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কাজেই ব্যক্তিব আত্মত্রাণেব পথ খোলা রাখা দরকাব। না-হলে সে যেখানে যে-অবস্থায় আছে একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। কিন্তু এ সব সফল মীমাংসাব পবেও জিতেনেব টাকাটা নিতে পাবল না নিশীথ। তবুও মনে হল, টাকা না-নিয়ে ভুল করল সে, ও জিনিসটা চুরি মনে করে ব্যর্থ সংস্কারেব প্রশ্রয় দিল। সংস্কারগুলো কিছুতেই মরতে চায় না, কিছুতেই আসতে চায় না সত্য উপলব্ধি, যদি আসেও-বা, কথা ভেবে নিয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে মন, তবুও কাজে অগ্রসব হতে গেলে অন্ধকারে অন্ধ সৈনিক আমবা সব যে যাকে মারছি, যে যাকে খাচ্ছি, পথ খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও। সব আলো নিভে গেছে।

জিতেনের ঘব থেকে বেরিয়ে একতলায় না-গিয়ে খাবাব ঘরে ঢুকল। ক্ষিদে পেয়েছে, বড্ড তেষ্টাও পেয়েছে নতুন করে আবার। খাবার ঘরে ঢুকে ডিনাব টেবিলেব ওপরেই জিনিস পেল নিশীথ। জিতেনেব খাবার ঢাকা আছে, চারটে ডিমসেদ্ধ, অনেকগুলো আলুভাজা। ঠাণ্ডা আলুভাজা খেয়ে যাবে জিতেন। খেতে বসবার সময় ফ্রাইপ্যানে চড়িয়ে গবম করে দেবে মিসেস দাশগুপ্ত। এ সব আলু কাল রাতেই ভাজিয়ে রেখেছে তা হলে; স্বামিনী কি আগে-ভাগে কাজ সেরে রাখতে চায়? জিতেন কি বাসি আলুভাজা চায়? কাঁচাখেকো নাকি জিতেন? কফি তৈরি করে রাখে নি অবিশ্যি। টোমাটো সস রয়েছে। নিশীথ আব দেরি না-করে খেতে আবম্ভ করল। চারটে ডিমই খেল সে। জিতেনেব ডিশে ডিমেব সঙ্গে মাখন রাখা হয় নি বটে। কিন্তু নিশীথ মাখনেব টিন পেড়ে এনে মিলিয়ে নিল, গোটা পাউরুটিটাই শেষ করে ফেলল, শিশিতে মাস্টার্ড ছিল, ঢেলে নিল বেশ ঢালাও হাতে, আলুভাজা, ডিম মাস্টার্ড মিশিয়ে; বেশ ঝাঁঝাল বাই—ক্ষিদেব পেটে সবই ভাবী চমৎকার লাগছিল নিশীথের। আর কী খাবাব আছে? মাখন আছে, পাউরুটি আবো আছে, মর্মালেড আছে, সস আছে, খেল যতটা পারল সব, টিনেব মাছ মাংস আছে, টিন খুলবাব হাঙ্গামাব মধ্যে গেল না সে। জল খেল। সব জলই ববফ মেশানো যেন। খেতে-খেতে একেবারে অন্তঃস্থল তলিয়ে স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে, কেবলই খেতে ইচ্ছে করে, কেবলই স্নিগ্ধ হয়ে পড়তে। খেল সে, জল খেতে লাগল অতল জলের মত যেন। কারুলসবাড, সোয়াপ্পে, বাযবনের জল হয়ে গিয়ে ববফ গালিয়ে। বসন্তেব রাতে সাদা ববফে ঢাকা হিমানীর মত লাগল নিজেব শরীরটাকে, নিজেব অন্তবাত্মাকে।

সূচীপত্রে যান

নীচে চলে গেল নিশীথ। মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়ল।

জিতেন পাঁচটার সময় তার ঘুমের মেয়াদ কাটিয়ে উঠল। যেন জেগেই ছিল সে। না তা নয়, খুব বেহুঁশ হয়েই ঘুমুচ্ছিল। কিন্তু এ সব লোককে ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে হয়। পাঁচটার সময় ঘুম না-ভেঙে পারে না তার। সাতটার সময় অফিসে যেতে হবে আজ; জিতেন একটা হাই তুলতে না তুলতেই দেয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। ঘরে মৃদু স্নিগ্ধ সবুজ বাতি জ্বলছে। সমস্ত শরীর বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল জিতেনের। রাত তিনটে-চারটের সময় মখমলের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলে হত, কিন্তু ঘুম ভাঙে নি। সমস্ত লম্বা আঁট ঠাণ্ডা শরীরটার দিকে নজর পড়ল। পাশে ছিমছাম দীর্ঘ ফর্সা শরীরটার দিকে তাকিয়ে দেখল।

নাঃ, আর দেরি করা যায় না। স্ত্রীকে জাগানো চলে না। ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। অনেক রাত জেগেছে। ডাইনিং হলে একটা শব্দ হচ্ছে না? ইঁদুর ছোটাছুটি করছে বটে। ইঁদুর মারবার জার্মান মেশিনের কথা ভাবছিল দাশগুপ্ত। ছোটবেলার তার ন-কাকা দুরমুস দিয়ে ইঁদুর সাবাড় করে ফেলত। জিতেনের বাবার চোখে সে সব পড়লে ন-কাকাকে রগড নাকাল হতে হত; মাছ-মাংস খেতেন না বাবা, কোনো প্রাণীকেই মৃত্যুব্যথা দিতে রাজি ছিলেন না। মাঝে-মাঝে কেবলমাত্র ছারপোকা মারতেন। তাও নিজের হাতে না। বাবাকে চেয়ার, কুশন, খাট, ক্যাম্পখাটের থেকে ছারপোকা ঝেড়ে ফেলতে দেখলেই জিতেন, হিতেন, ঋতেন গিয়ে হাজির হত সেখানে; এর চেয়ে মজার জিনিস তখনকার জীবনে খুব বেশি ছিল না তাদের; ছারপোকা ঝেড়ে খসিয়ে বার করে দিতেন তিনি, মারার পালা ছেলেদের হাতে।

'খাবারের ঘরে বেড়াল', বললে জিতেন দাশগুপ্ত, তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে, 'বেড়াল ছাড়া ও রকম শব্দ হয় না। ইঁদুরগুলোও খুব ধাড়ি হয়ে গেছে এ বাড়িতে।'

উঠে দাঁড়াল জিতেন। সোয়া পাঁচটা। বাথরুমে চলে গেল। পৌনে ছ'টার সময় ফিরে এল। ছ-টার ভেতর স্যুট-টাই এঁটে ফিট হয়ে গেছে সে। নমিতা উঠে নি এখনও; স্ত্রীর স্লাকসটাকে টেনে দিল কোমর অবধি। হ্যাঁ ঐ রকম থাক। আশেপাশের বাড়িতে সাধু বাবাজীরাই থাকে। দাশগুপ্তের কামরার জানালা সব খোলা বটে, তবে, নমিতা যেখানে শুয়ে আছে চারদিক-কার কোনো বাড়িরই কোনো দৃষ্টিকোণ এখানে ঠিক মতন কান্নিক মারতে পারে না। যাক গে—দাশগুপ্ত জানালার পর্দাগুলো টেনে দিল। বন্ধ করে দিল দুএকটা জানালা—না হলে রোদ পড়বে নমিতার মুখে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে ও। না, জাগিয়ে দেবে না। খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল জিতেন। হাত বাড়িয়ে খেতে গিয়ে দেখল, কোথাও কিছু নেই। বাঃ, টেবিলের ওপরেই ত খাবার ঢাকা থাকে তার। দু-তিনটে ডিশ পড়ে আছে। কিন্তু জিনিস কোথায়? ডিম কোথায়? চারটে ডিম? আলুভাজা কোথায়? ছটা নৈনিতাল কুচিয়ে ভাজা, ঘানির তেলে? ইঁদুর খেয়ে ফেলল সব?

কানাইবাবুর বাড়ির হুলো বেড়ালটা ঢুকেছিল?

টেবিলের উপর এলোমেলো ডিশগুলো ভাল করে সমঝে দেখবার জন্য জিতেন তার ঢ্যাঙা টিঙে শরীরটা তাড়াতাড়ি নোয়াল। লম্বা-লম্বা ঠ্যাং ও ওপরের ধড়ের মাঝখানে তলপেটের দিকে নব্বই ডিগ্রিই সার্কিট বেশ টাইট করে দেখতে লাগল জিতেন। চশমা-আঁটা মুখ ডিশগুলোর এত কাছে ঘনিয়ে এল, মনে হল ওগুলো শুঁকছে যেন সে। ক্ষীণ চোখ দিয়ে দেখে নিচ্ছিল ডিশগুলোর একেবারে গায়ের ওপর ডিমসেদ্ধ বা আলুভাজার কোনো ছন্নাংশ কোথাও পড়ে আছে কিনা; নেই যদি তাহলে এসব হলুদ দাগ কিসের, ওসব লাল দাগ বাদামি দাগ? রাই খেয়েছে কেউ? মর্মালেড খেয়েছে? টোমাটো খেয়েছে? দাশগুপ্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। চশমা খুলে অন্ধচোখে চারিদিকে তাকাল একবার। চশমা এঁটে ঘুরে-ঘুরে খুঁজে পেতে দেখল জোড়া-তাড়া দিয়ে পেটে চালাবার মত কোনো জিনিস কোথাও আছে কিনা।

নেই কিছু। গ্যাসের স্টোভ রয়েছে। কফি তৈরি করবে? না, সময় হয়ে গেছে। সিঁড়ি ভাঙতে লাগল জিতেন। অফিসে গিয়ে খাবার আনিয়ে নেবে। নিশীথ কী করছে? ঘুমুচ্ছে? ভিতরে ঢুকে দেখে এল জিতেন, মশারি টানিয়ে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে। গ্যারাজ থেকে মোটর বার করে নিজেই চালিয়ে নিয়ে অফিসে চলে গেল জিতেন।

সাড়ে আটটার সময় নিশীথের ঘুম ভাঙল। ঘুম আগেও বারবার ভেঙে যাচ্ছিল অদ্ভুত-উদ্ভুটে স্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙছিল, ঘুমিয়ে পড়ছিল আবার। ঘুমিয়ে পড়ছিল, ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল আবার। স্বপ্নে জিতেন দাশগুপ্তকে জার্মান সিলভারের কাঁটা-চামচ নেড়ে-চেড়ে মুখভরা শয়তানি ঘনিয়ে তুলে হাসি-হাসি মুখে ডিম খেতে দেখেছে নিশীথ। নিশীথের সমস্ত চালাকি ধরে ফেলেছে, বোতলের পর বোতল জেলি খেল, মর্মালেড খেল, আচার খেল, কিছুই খাওয়া হল না, বলে প্যাকিং পেপারে আলুভাজাগুলো মুড়ে, পকেটে ফেলে অফিসে চলে গেল। স্লাকস কোমর অব্দি উঠে গেল—খুব টাইট করে পরল, ঢল-ঢল হড়-হড়

সূচীপত্রে যান

করে খসে পড়তে লাগল আবার– মেয়েটি কে? শ্যামলী? শ্যামলী স্ল্যাকস পরছে? শ্যামলীই তো। কিন্তু মিসেস দাসগুপ্ত কী করে শ্যামলী হল? কী করে হল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তাগিদ নেই স্বপ্নের নিশীথ রাজ্যে, হয়েছে যে তা নিয়ে বিস্ময়ের বাষ্পও নেই; সবই ছায়া, আবছায়া, দিনের আলোর পৃথিবীর কাঠামোটার রেখে দিয়ে তাকে ঢেলে সাজিয়ে নেওয়া খুব ভরা আলোর ভিতরে—আর-এক দেশের, রাত্রির দেয়াল মেঝে ভিত্তিচিত্রের ক্ষেত-মাঠের বধির স্নিগ্ধতার ভিতর দিয়ে, বোশেখের ভরপুর রোদের সিঁড়ি জানালা বাতাস মির্জা-পুরী গালিচার পথ ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে। 'খোঁপা খসে যাচ্ছে তোমার—খসে যাচ্ছে তোমার, উঠিয়ে নাও নমিতা—কী বলবে দাশগুপ্ত এরকম দেখলে?' 'তুলে নিচ্ছি নিশীথ—এই তো আঁট করে বেঁধেছি—হয় নি? না ঢিলে হয়ে গেল? তুমি কবে এলে নিশীথ? কবে এলে?' বলছে শ্যামলী। হু হু করে বাতাস বইছে, কেমন অন্ধকার হয়ে গেল যেন সব। কেঁদে উঠছে ভানু। এই কি কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতাল—যক্ষ্মার? কাঁচড়াপাড়ার বেড? শোনো বলি, কে বলে দেবে আমায় এটা কাঁচড়াপাড়ার যক্ষ্মার হাসপাতালের বেড? ভানু কোথায়? অন্ধকারের মধ্যে দেখছি না তো। ভানু? এই যে বাবা, আমি এইখানে। ঐখানে ভানু? কোনখানে? কোন যে সুদূর মেঘ-আঁধারের প্রত্যন্তের থেকে সুর ভেসে এসেছিল ভানুর। কে আপনি? কী চাচ্ছেন? কথা বলবার অবসর নেই মশাই, নাকেদমে দৌড়ুচ্ছি; না না মশাই এটা যাদবপুরের টিবি হসপিটাল; এখানে বেড খালি নেই। ভানু? সে তো কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে—সে তো মরে গেছে কাল রাতে। ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল নিশীথ। কোথায় সে? জলপাইহাটিতে? লামডিঙে নেমে ট্রেন ধরেছে যাবার। না ওয়েটিং রুমে শুয়ে আছে? জলপাইহাটিতে? সুমনা কোথায়? নরেন রক্ত দিয়েছিল আজ? ওঃ, শহর কলকাতায়, লেক রোডে জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতে বুঝি? ভোর হয়ে গেছে।

ভোর হয়ে গেছে। জিতেন অফিসে চলে গেছে নিশ্চয়। ওর স্ত্রী ঘুমুচ্ছে। হয় তো ওপরে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই তো। কী হবে এখন জেগে উঠে। জিতেন ফিরুক। কিন্তু বারটার আগে ফিরবে কি জিতেন। কিন্তু ফিরুক জিতেন। কিন্তু দুপুরের আগে ফিরবে না তো। কিন্তু না ফিরলে কী করতে পারে নিশীথ? কোথায় যাবে সে? দেখা করবার মত লোকজন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু আছে কিছু কলকাতায়। মনটা কঠিন হতে থাকলে সংখ্যায় কমে যায় এরা, মনটা নরম হতে থাকলে বেড়ে যায়। কিন্তু মন যখন নরম কঠিন কিছুই নয়—শূন্য আচ্ছন্ন—তখন একটি বা অনেক শূন্যকে অনেক অস্তি দিয়ে পূরণ করে পূরণফলের অফুরন্ত নাস্তিকে কী দিয়ে ধ্বংস করবে মানুষ? কে আশ্বাস দেবে, সাহায্য করবে, বাস্তব সফলতার নিটোল নিপট ক্ষমতা দিয়ে ধ্বংস করতে দিতে, ভাবছিল নিশীথ।

ওপরে খাবার ঘরে ডিম খুঁজছিল জিতেন। ডিশগুলো ঘেষে ঘেষে নুয়ে, নিছিয়ে, হেঁদিয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে ব্যাপারটা বুঝে দেখতে চেষ্টা করছিল। ডিশের গায়ে এসব হলুদ দাগ কিসের? গেরুয়া বাদামি বাসন্তী লাল রঙের কিসের পোচড় এসব ঃ ডোরা ফুটকি? লোকটা দু হাজার টাকা মাইনে পায়, আরো দু হাজার কুড়িয়ে নেয় পরামর্শ দিয়ে। কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল ব্যাপারটা; কিন্তু সে যে বুঝেছে কে তা বুঝবে? ঠাণ্ডা চোখে নিঃসন্দেহে মেজাজ নীরবতার। জানে সব। বুঝেছে, নিশীথ ঘুমিয়ে পড়েছে আবার। অফিসে যাবার মুখে নিশীথকে দেখে গেল জিতেন; বললে ঃ 'খুব আরামে ঘুমুচ্ছে নিশীথ।'

কে যেন সিঁড়ির কিনারে দাঁড়িয়ে বলছে ঃ আপনার ঘুম ভাঙলে ওপরে আসুন। ঘুম তখনো ভাঙে নি নিশীথের। আধা ঘুমের ভিতরেই কথা বলছিল, কে যেন অব্যক্ত শীর্ষ থেকে বলছে ঃ আপনার কি ঘুম ভেঙেছে? আপনি জেগে উঠেছেন? উনি আপনাকে ওপরে আসতে বলেছেন। কোথায় কোন সিঁড়ির ওপর থেকে কে যেন কথা বলছে। জিনিসটা স্বপ্নের না বাস্তবের তা নিয়ে প্রশ্ন করার মত মনের অবস্থা ছিল না নিশীথের। ঘুম ভাঙে নি তার, স্বপ্ন দেখছে সেটা টের পাচ্ছে, টের পেতে পেতে ঘুম পাতলা হয়ে আসতেই সিঁড়ির কিনার থেকে কে যেন আবেদন জানাচ্ছে—হয় তো সত্যি পৃথিবীর দেশ থেকে—হয় তো স্বপ্নের নীড় অনীড়ের কুয়াশা থেকে ঠিক করে উপলব্ধি করে নিতে না-নিতেই ঘুমিয়ে পড়ছে নিশীথ আবার। ঘুম বেশ গাঢ় হয়ে গেছে ঃ জমানো বরফের আরো নীচে যে-বরফ জমেছিল গত বছরের শীতে, যে-বরফের মার নেই, যার জন্য দিন নেই, রাত্রির অবসান নেই—তেমনি ভাবে। বরফের ভাঙন দেখা দিচ্ছে, আবার চিড় খাচ্ছে, নড়-নড় করে উঠছে চাঙড়। গুঁড়ি বরফের ফোয়ারা ছিটকে পড়ছে, মুখে এসে পড়ছে এপ্রিলের নীল, কোকিল নীলকণ্ঠ, পিউ কাঁহা তড়পানো আকাশ—বড় রোদ, মেঝো রোদ, ছোট-ছোট ফুটকির রোদ...

ঘুম ভাঙলে আপনি ওপরে চলে আসুন—একেবারে সিঁড়ির নীচের ধাপ থেকে কে যেন বলছে নিশীথকে।

গা ঝাড়া দিয়ে জেগে গেল প্রায়—জেগে-জেগে—ঘুমোতে-ঘুমোতে জেগে উঠল নিশীথ। বাস্তবিকই জেগে উঠল আবার। বেশ খোলা গলায় বড় শব্দ তার কানে এসে পৌঁছেছিল—এই তো এখুনি—মিনিট দুই আগে? নিশীথকে ওপরে যেতে বলেছে। ডেকেছে মিসেস দাশগুপ্ত তা হলে।

নিশীথ উঠে মশারি গুটিয়ে বিছানা ঝেড়ে সাজিয়ে এক-আধ মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল খাটের কাছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কোথাও কথা বলেছে, কাউকে আহ্বান করেছে কোনদিনও মনেই হয় না। কেউ যেন নেই এ বাড়িতে। ঐ পেয়ারাগাছের ডালপালা পাতা রোদের ফাঁকে যে-কয়টা চড়ুই ঝাঁপাঝাঁপি করে ধ্বনির ফোয়ারা ফেনা ছুঁড়ে মারছে অনর্গল, এ ছাড়া এ বাড়িতে কোনো প্রাণী আছে বলে মনেই করতে পারছে না নিশীথ। কিন্তু তবুও মানুষের সম্পূর্ণ স্পষ্ট ভাষার মত এখুনি কে যেন ডেকে গেল নিশীথকে—কানে লেগে আছে—রক্তের বিমের ভিতর ঘুম ভাঙলে 'আপনি ওপরের কেমন একটা স্ফটিক নির্মলদ্যোতনা নিঃশব্দে সংক্রামিত হয়ে আছে। একতলার গোসলখানায় ঢুকে, হাত-পা-মুখ ধুয়ে, কী ভেবে চান করে নিল, পরিষ্কার কাপড়জামা পরে নিশীথ সটান ওপরে চলে গেল। নমিতা ড্রয়িংরুমে বসেছিল। চকোলেট রঙের গদি-মোড়া একটা সোফায় গিয়ে বসল নিশীথ—

'আপনাকে ডাকছিলুম—'

'আপনি? কই শুনিনি তো।'

'ঘুমুচ্ছিলেন।'

'নীচে গিয়েছিলেন আপনি মিসেস দাশগুপ্ত?'

'যাচ্ছিলুম। আপনার ঘরেই যেতুম একবার। কয়েকবার সিঁড়ির ওপর থেকে ডেকেছি।'

'সিঁড়ির থেকে?'

'শুনতে পেয়েছিলেন? প্রত্যেকবারই দু-এক ধাপ নেমে, শেষের বার সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপ থেকে ডাকছিলুম। ঘুমুচ্ছিলেন। শোনেন নি। কাল রাতে অনেক জেগেছেন আপনি। উনি বলছিলেন আপনি জেগে উঠলে—'

কখন গেলেন অফিসে—'

'সাড়ে ছটায়। আমি তখন জেগে উঠতে পারি নি।'

'ও'— নিশীথ বললে।

'গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে স্টার্ট দিচ্ছেন, ঘুমের ভিতর কানে গেল যেন আওয়াজটা—তবে আমাদের মোটর—না অন্য কারু—কোনো শিখ ড্রাইভার হয়তো গেটের পাশে এসে—কলকাতার ড্রাইভারগুলো বড্ড জ্বালাতন করে; ঘ্যাড়-ড়-ড়-ড়-ড়-ড়—এত সহজেই তাদের গাড়ির কল বিগড়ে যায়- আর শেষ রাতে যখন মানুষ ঘুমুচ্ছে তাদের চড়াও করে ফুঁড়তে-ফাড়তে না পারলে চলে না যেন আর। সাদাওয়ালা পিলাগ—আর—'

'পিলাগ?'

'মানে প্লাগ—সাদা প্লাগ—সাদা প্লাগে কিছু বিগড়েছে আর কি? বেশ তো বাবা বিগড়েছে, আমাদের কান টানছিস কি রে?'

'পি-সি রায়', নিশীথ শুরু করলে 'মাড়োয়ারিদের ঠিক ধরেছিলেন। ঠিকই বলেছিলেন, ঠিকই লিখেছিলেন আচার্য রায়, বাংলাদেশের অনেক কিছুই মড়োয়ারিদের কবলে চলে গেল। সকলেই নিচ্ছে খাচ্ছে। পুরনো ফিরিস্তি সব। তবে দিনরাত আমাদের বাসে চড়তে হচ্ছে, মাড়োয়ারি-ফাড়োয়ারির চেয়ে এ সব ড্রাইভার-কনডাকটারদের সঙ্গেই ঘেঁষাঘেঁষি। এক-একটা পদ্মার ইলিশ সাজিয়ে পাটাতন আটকে দেয়, খন্ড-খন্ড নুন বরফ মাখিয়ে চালান দিতে হবে। শক্তের হাতে নরম আমরা—এ-রকম অসাড়; এ-রকম অসাড় অপদার্থ বলেই দিনের পর দিন ওরা বড্ড বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করা উচিত।'

নমিতা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বাংলা খুব ভাল জানে সে। ভাল বাংলা বলতে পারে—ইংরেজির মতনই সহজে, তেমনি তরতর করে। কিন্তু নিশীথ কী বলতে চাচ্ছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, বুদ্ধি-অনুভূতি দিয়ে খানিকটা ধারণা করে নিতে চেষ্টা করল। বিশেষ সফল না-হলেও, মোটামুটি বুঝেছে সমর্থন করতে পেরেছে, মনে হচ্ছিল তার। পি-সি রায়কে জানে না নমিতা। অনেকদিন রেঙ্গুনে, ইউ-পি, পাঞ্জাবে থেকেছে। তা ছাড়া আচার্য রায়ের সূর্য যখন শূন্যে শীর্ষে তখন নমিতার জন্ম হয় নি, আচার্য যখন বাংলাদেশেই আবছা হয়ে পড়েছেন, তখন নমিতা পাঞ্জাবে।

সূচীপত্রে যান

'আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ সেন।'

নিশীথ কথা ভাবছিল।

'পি-সি কে?' নমিতা জিজ্ঞেস করল।

'পি-সি?' ওঃ নিশীথ নিবিষ্টভাবে নমিতার দিকে একবার তাকিয়ে বললে,

'ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। না, কেউ নয়।'

'তিনি মাড়োয়ারিদের কথা কী বলেছিলেন?'

একটু বেকুব মনে হচ্ছিল নিজেকে নিশীথের। সহসা উত্তর দিচ্ছিল না সে। মাথা হেঁট করে মেঝের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাথা তুলতেই দেখল একটা দেশলাই নিয়ে এসেছে নমিতা, এক টিন সিগারেট। 'খান আপনি?' একটা সিগারেট মুখে নিয়ে নিশীথকে জিজ্ঞেস করল নমিতা। জ্বালিয়ে নিল নিজের সিগারেট। নিশীথের দিকে টিনটা এগিয়ে দিল।

'খান?' জিজ্ঞেস করল নমিতা।

কোনো কথা না-বলে হাত বাড়িয়ে টিনটা কুড়িয়ে নিল নিশীথ।

'মাড়োয়ারিরা কী করেছিল?'

নিশীথ সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'না, কিছু করে নি।'

'পি-সি কী বলেছিলেন ওদের কথা?'

'সে সব কথা চুকে গেছে; ও অনেক আগের কথা।'

'কিন্তু কী বলছিলেন?'

'জিতেন কি কোন দিন বলে নি কিছু এ সম্বন্ধে আপনাকে?'

'না'। নিঃশব্দ নিটোল কারসাজিতে ফিকে নীল অজস্র ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে বের করতে-করতে মিসেস দাশগুপ্ত বললে।

'না। বলে নি তো আমাকে জিতেন।'

নমিতা একটু হেসে নিশীথের দিকে তাকাল। 'বলতে বাধছে আপনার। দেখছি তো। আচ্ছা জিতেনকে জিজ্ঞেস করব। পি-সি....' নমিতা হাসতে-হাসতে বললেন, 'পি-সি। জিতেনের এ-লেকার জিনিস কি পি-সি—'

'অনেকটা। জিতেন তো ব্যবসা পাড়ায়ই ঘোরে ফেরে—ওর কাজ করে, সদাগরি পরামর্শ দেয়। মাড়োয়ারিদের সঙ্গে তো ওর দিনরাত ঠোকাঠুকি।'

নমিতা উঠে দাঁড়িয়ে কোথেকে একখন্ড চকখড়ি তুলে নিয়ে কালো টিপয়ের উপর লিখল :

OPCADKSO,

'এই যে টি-পয়ের ওপর কী লিখেছি বলুন তো।'

'আচ্ছা ত্রিশ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে বলব।'

'তার মানে?'

'সেই চৌদ্দ পনের বছরের নিশীথ বলছে, ও পি সি এদিকে এসো।'

'মওকা' নমিতা হাসতে-হাসতে বলছে, 'আচ্ছা, আচ্ছা জিতেন এলেই ধরব তাকে আমি। আমার ভারী কৌতূহল বোধ হচ্ছে', নমিতার সিগারেটটা ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রায়। সেটাকে অ্যাশ-ট্রের ভিতর ফেলে দিয়ে নমিতা বললে, 'বাসে চড়েন আপনি খুব নিশীথবাবু?'

'খুব।'

'জিতেন আর আমি গাড়িতেই বেরুই। অফিস একটা গাড়ি দিয়েছে ওকে; সব সময়ের জন্যে, অফিসের কাজে অবিশ্যি। সে গাড়িটা আমাদের এখানেই থাকবার কথা। কিন্তু ও একটু বেশি খুঁতখুঁতে, সেটা অফিসেই রেখে দেয়। অফিসে গিয়ে কাজে লাগায়। বাড়ির জন্য একটা আলাদা সানবিম কিনেছে। নিশীথ শুনছিল। বেশ আত্মতুষ্টভাবে কথা বলছিল নমিতা কিন্তু কথাবার্তায় প্রসাদের স্নিগ্ধতা ততটা ছিল না। কেমন একটা মর্যাদাবোধে ফুলে-ফুল উঠছিল নমিতার নাকের ফোকা। আকাশ-বাতাসে স্বাধীনতা ও বেশি টাকার বিশেষ মর্যাদা পান করে খুব ভাল লাগছিল যেন মেয়েটির।

ঠিক ছিপছিপে নয়, একটু মুটিয়েছে। তবু বেশ ছিমছাম, গায়ের রং চীনে বা বার্মিজদের মতন হলদে, হলদেটে নয়, ইংরেজ মেয়েদের মত লাগছে। বা দিশি মেয়েদের মত ফর্সা ঠিক নয়, তবে খুব বেশি ফর্সা দিশি মেয়ের মতই যেন, মাঝে-মাঝে বিলিতি বলে ভুল হয়, শীতের দেশে থাকলে ওদেরই

সূচীপত্রে যান

মতন হয়ে যেত, সুযিমামার দেশে থাকতে-থাকতে এ-দেশী গৌরী হয়ে যাবে একদিন। নমিতার বেশ লম্বা চুলগুলো, সোনালি প্রায়। নাক খাড়া, মুখে মঙ্গোল ছাঁচ নেই বলেই মনে হয়। যেটুকু আছে, তা বিশেষ একটা সৌষ্ঠব দিয়েছে তার মুখশ্রীকে; যেমন চোখ দুটো ঈষৎ বাঁকাভাবে বসানো নমিতার মুখে—কিন্তু এমনই আর্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে ওর সমস্ত মঙ্গোল ধোঁয়া কেটে, কেমন একটা কুহকে অথচ পবিচ্ছন্নতায় মর্মস্পর্শী হয়ে আছে সমস্ত মুখের ছাঁচ—নাক-মুখের প্রতিভা। কাল রাতে ভাল করে তাকিয়ে দেখে নি নমিতার দিকে নিশীথ। আজ গোড়ার থেকেই—ভোরের আলোর রোদে—দেখছিল; কথা বলছিল কম, দেখে নিচ্ছিল বেশি। দেখা হয়ে গেছে। ব্যবহারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভাল জিনিসই পেয়েছে জিতেন; মেয়েটির ভিতরের সার্থকতা কেমন জানা নেই নিশীথের। দু-চারটে কথা বলে এখনো ও কিছু বুঝে উঠতে পারে নি।

'সেই সানবিমটা নিয়ে বেরিয়ে গেল বুঝি আজ সকালে?'

'না। অফিসের গাড়িটা কাল রাতে এনে রেখেছিল—খুব সকাল-সকাল অফিসে যেতে হবে বলে। জিতেনের অফিসে যাবার আগে ওরা গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আমাদের সানবিমটা গ্যারেজে আছে, বেড়াতে যাবেন?'

'এখন?'

'এই তো বেড়াবার সময়।'

'কোন দিকে?'

'চলুন লেকের ও-দিকটায়। তারপর সেখান থেকে ডায়মন্ডহারবার।'

'ডায়মণ্ডহারবার'—নিশীথ তাকিয়ে বললে, 'জিতেন ফিরবে কটার সময়।'

'আজ? চারটের আগে না। আমরা দুটো-আড়াইটের মধ্যেই ফিরে আসব। এখন সাড়ে আটটা। সাড়ে দশটা অব্দি এগিয়ে যাব যেখানে গিয়ে পৌঁছুই—বজবজ—ক্যানিং—'

টিনের থেকে একটা সিগারেট বের করে নিয়ে নমিতা বললে, 'যশোর রোডে গিয়েছেন?—ব্যারাকপুরে?'

ট্রেনে ব্যারাকপুরে গিয়েছে নিশীথ, বাসেও। পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে যশোর রোডে। কয়েক বছর আগে শীতকালে। জাপানিরা তখন কলকাতা আক্রমণ করে-করে। বেশ লাগত একা-একা বেড়াতে। দমদমে এক খুড়তুতো ভাইয়ের বাংলোতে থাকত। খুড়তুতো ভাই অযাবপ্লেসে কাজ করত।

'না, মোটরে চেপে বেড়াই নি যশোর রোডে—'

'যাবেন?'

'জিতেন এসে নিক।'

'জিতেন বেড়াতে যাবে না।'

'কেন?'

'অফিসের কাজের চাপ বেশি'—নমিতা ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের দিকে তাকিয়েছিল, জ্বালায় নি এখনো।

'বাড়িতে এসেও অফিস? সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতে পারবে না?'

'এ সাতদিন কাজের চাপ খুব বেশি। অনেক রাত অব্দি জাগতে হবে। চলুন'—নিশীথের দিকে তাকাল নমিতা—'সাড়ে দশটা অব্দি ছুটে তারপর ফিরে আসব, একটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাব।'

নিশীথের হাতের সিগারেট নিভে গিয়েছিল—অনেক ক্ষণ। সিগারেটটা হাতেই রয়ে গেছিল তবু। অর্ধেক পুড়েছে শুধু। জ্বালিয়ে নিলে হয়, কিন্তু অ্যাশ-ট্রের ভিতর ফেলে দিয়ে নমিতার দিকে সাত-পাঁচ ভেবে তাকাল নিশীথ। নমিতার চোখে নিরপরাধ প্রাণোচ্ছ্বাসের তাগিদ উপচে পড়ছে, খারাপ লাগল না তার কিন্তু। তবুও একটু ছিটেফোঁটা কিসের বাষ্প খেলে যাচ্ছে যেন, কিংবা নিশীথের নিজের চোখ থেকে প্রতিফলিত হল কি নমিতার চোখে?

'বাঃ, সিগারেটটা ফুঁকতে না-ফুঁকতেই ফেলে দিলুম। কেমন ভুলো মন আমার—'

টিন এগিয়ে দিল নমিতা। টিনের ঢাকনি এঁটে গিয়েছিল। জোর দিয়ে, মুগ্ধভাবে ঠোঁট-কুঁচকে, খুলে দিল।

সিগারেট—সিগারেটের টিনটাও, নিশীথের হাতে রয়ে গেল। তার অন্যমনস্ক হাতে কে যেন গছিয়ে দিয়েছে। নিজের সোফার পাশে রেখে দিল টিনটা।

সূচীপত্রে যান

কফি আর কেক নিয়ে দাঁড়াল এসে বাবুর্চি। তিন জনের আন্দাজ জিনিস। নমিতা নিশীথ—আর-কে খাবে? একটা বড় তেপয়ের ওপর সাজিয়ে দিতে লাগল।

'তিনটে পেয়[illegible] জিতেন যদি এসে পড়ে—'

'বলেছিলে[illegible] আগে আসবেন না—'

'তাই তো কথা। তবে বিশেষ বন্ধু কেউ বাড়ি এলে আচমকা উড়ে আসে জিতেন—বন্ধুকে ভালবাসে বলে—'

নমিতা বাবুর্চির দিকে তাকিয়ে বললে—'যাও, আর-কোনো দরকার নেই। বন্ধুকে ভালবাসে বলে। আমাকে দিয়ে হোস্টের কাজ করিয়ে খুশি নয় জিতেন। ও অনেকদিন আইবুড়ো ছিল কিনা, ধাঁচটা রয়ে গেছে—'

মধু ও দুধের মত একটা মধুরতা নড়ছিল নমিতার ঠোঁটের কোণায় যেন—হাসির; ফোটে নি হাসি; মাথা এক-আধবার নেড়ে নিল; কিন্তু আক্ষেপ খুব সম্ভব নয়; এমনিই—একটা সুন্দর মুদ্রাদোষের প্রেরণায়। নমিতাকে দেখাচ্ছিল শোনাচ্ছিল কেমন চমৎকার, যেন আর্যসুষমার কী-একটা রূঢ়তাকে ধুয়ে স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে—আকাশের হাওয়া।

'কই, আপনি ওয়াশিং বেসিনে গেলেন না তো!'

'আমি নীচের থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসেছি।'

'নীচের থেকে?' সুন্দর কালো চোখ পাকিয়ে গোল হয়ে গেল; বিক্ষুব্ধ হয়ে নিশীথের দিকে জবাব দিল নমিতা।

'জিতেন বলে দিয়েছে আমাকে, আপনার ঘুম ভাঙলেই দোতলায় বাথরুমে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে। সব ব্যবস্থাই তো করে রেখেছি সেখানে।'

'ব্যবস্থা কখনো মারা যায় না,' নিশীথ বললে, 'আপনার কথা শুনতে-শুনতে গ্রহণ করেছি। আরো একটু পরে আরো স্পষ্টভাবে কাজে লাগাবার দরকার হবে হয় তো। ধন্য হয়েছি। অনেক ধন্যবাদ।'

কফি ঢালতে-ঢালতে একবার নিশীথের দিকে দ্রুত চোখে তাকিয়ে নিয়ে নমিতা বললে, 'নীচের জল ঠাণ্ডা ছিল?'

'হ্যাঁ!'

'ভাল লেগেছে? ডাইনিং রুমে গিয়ে খাবেন?'

'এখানে অসুবিধে হচ্ছে আপনার?'

'না। জিতেন আর আমি মাঝে-মাঝে ড্রয়িং রুমে বসেই খাই।'

'কী খেয়ে গেল জিতেন, অফিসে যাবার আগে?'

'চারটে ডিম—আলু ভাজা—কফিও খেয়েছে নিশ্চয়। আমি উঠবার আগেই বেরিয়ে গেছে।'

'চারটে ডিম? সেদ্ধ? এত ডিম খায় কেন?'

'আপরুচি খানা। ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। খেতে ভাল লাগছে। খাচ্ছে তো কয়েক হপ্তা ধরে। এর পর অরুচি এলে মুখ বদলাবেই। চিনি লাগবে আপনার কফিতে?'

'না।'

'কফি না খেয়ে চা খেতেন হয় তো, কিংবা সরবত—এই গরমে।'

'কফি বেশ জিনিস। বেশ জিনিস।'

'ফ্যানের হাওয়া লাগছে তো ঠিক মত আপনার গায়ে? বড্ড গরম আজ। হাওয়া নেই। লাগছে তো হাওয়া?'

'ঠিক আছে।'

'একটু এগিয়ে বসুন—এই কৌচটায়, এখানে বেশি হাওয়া লাগবে। আমি আপনার কফির পেয়ালা ধরছি, আসুন; হ্যাঁ এইটায়ই, বেশ লাগছে না হাওয়া? স্পিড বাড়িয়ে দেব আরো?'

কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে যাচ্ছিল নিশীথ, মাথা নেড়ে বললে—'না-না সব ঠিক আছে। এর চেয়ে বেশি হাওয়া—বেশি ভাল কোথাও নেই কলকাতা শহরে।'

নমিতার দিকে না তাকিয়ে, খানিকটা বিভোর অথচ বিচ্ছিন্ন, অন্য বৃত্তান্তের পুরুষ মানুষের মত নমিতার সামনে নিজেকে বসিয়ে রেখে কফি খেতে লাগল নিশীথ—ড্রয়িং রুমের একটা ঘোরানো শেলফের মোটা-মোটা বইগুলোর সোনার জলের দিকে, ঘরের আনাচে-কানাচে রোদে একটা-আধটা

সূচীপত্রে যান

ফিনফিনে ওড়নার বহতা বাতাসের দিকে তাকিয়ে থেকে।

'জিতেন আজ অফিসে যাবার আগে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে।'

'কি করেছে?' ধীরে-ধীরে নমিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে সমাহিত ঋষি-পুরুষের গলায় জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

আজ ভোরে খাবার ঘরে ঢুকে জিতেন কী করেছে, না-করেছে, নিজের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সবই তো জেনে ফেলেছে নিশীথ। তবুও জিজ্ঞেস করল নমিতাকে, খড়খড়ে গিন্নিবান্নের মত নমিতাকে বলল, 'কী করল আবার?'

পাউরুটি, মাখন, জ্যাম, মর্মালেড, মিনারেল ওয়াটার, এমন-কি কুঁজোর জল অব্দি চেঁচে খেয়ে গেছে সব। এতটা হা-পিত্যেশ জিতেনের দেখি নি আমি কোনো দিন। আপনি দেখেছেন?'

বলতে-বলতে তরতাজা কৌতুকে তাকাল নমিতা।

তাকিয়ে দেখছিল নিশীথ—নমিতার দিকে নয়—বিষয়ের এই অপরূ অবতারণার দিকে; নিশীথই যে খেয়েছে সব, সেটা জানা না-থাকাতে ভাবী তাজ্জব বিষয়েই বটে ঃ বোতলকে বোতল জেলি, জ্যাম, আচার উড়িয়ে দিয়ে অফিসে চলে গেছে দাশগুপ্ত!

'বড্ড খিদে পেয়েছিল তাই খেয়েছে। জলও খেয়েছে বুঝি খুব?'

'খাবার ঘরের সব বোতল খালি করে গেছে। আজ সকালে একটু মিনারেল ওয়াটারের দরকার হয়েছিল আমার। পেলুম না। সব খালি। আপনি কেক খাচ্ছেন না? খান্দানি ভালো কেক, বাবুর্চিকে দিয়ে আনিয়েছি। কফির সঙ্গে কী খাওয়া যায়? এক টুকরো পাউরুটি অব্দি নেই—'

'নেই?'

'নেই।'

'ভারি বিপদ তো। তাই বলে দিনে বাড়ি এলে ওকে বলবেন না কিছু, লজ্জা পাবে। খিদে পেয়েছে, খেয়েছে, চুকে গেছে। তবে, একটা কাজ করতে পারেন—'

কেকের ক্রিম খেতে-খেতে নমিতা তাকাল নিশীথের দিকে।

'আজ রাতে যেন ভালো করে জোলাপ নেয়। তারপর, দু-চার দিন পরে কলেরার ইনজেকশন নিলে ভালো হয়।'

'আজকাল খুব বাড়াবাড়ি শুনেছি কলকাতায় রোগটার।'

'এখনও উঠতির মুখে, বাড়াবাড়ি শুরু হয় নি। কলেরার প্রতিষেধ খুব ভাল কাজ করবে।'

'আপনি নেবেন না টিকে?'

'আমার দরকার নেই।'

নমিতা কফির পেয়ালা শেষ করে তেপয়ের ওপরে রেখে দিয়ে বললে, 'কলকাতায় এপিডেমিকের ভিতর এসে পড়েছেন, কেন নেবেন না?'

'আমার দরকার নেই।'

'আমি নেব?'

নিশীথ উত্তর দেবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। জিতেনের শোবার ঘর দুটো; অফিসের যে-সব কাজ বাড়িতে বসে করা দরকার হয়ে পড়ে, তার জন্য ওরই একটা ঘর আলাদা করে রেখেছেন। নীচের তলায়ও অফিসের কাগজপত্র মজুত থাকে কিছু। টেলিফোন, দোতলার অফিস ঘরে।

মিনিট পাঁচেক পরে নমিতা ফিরে এসে বললে, 'উনি টেলিফোন করে ছিলেন।'

'কী হল?'

'অফিসের জরুরি কাজে জামসেদপুর যাচ্ছেন।'

'কবে?'

'আজই—এখনই। চলে গেছেন।'

'জরুরি বটে। কবে ফিরবে?'

'বললেন, চার পাঁচদিন হবে' আপনাকে থাকতে বলেছেন। ফিরে এসে বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে, জানাতে বললেন।'

পটে আরো বেশ খানিকটা কফি ছিল। নিশীথের পেয়ালায় ঢেলে দিতে দিতে বললে, 'কলেরার টিকে করে দেওয়া হবে?'

'জামসেদপুর থেকে ফিরে এলে।'

'আর আমার?'

'আজই নিয়ে নিন। আপনাদের ডাক্তার কে?'

'চক্রবর্তী।'

'ফোন করে দিন।'

'এখনই!'

'বিকেলের দিকে হলে ভাল হয়।'

'আপনি নেবেন না?'

'আপনি নেবেন?'

কী করতে নেবে কলেরার ইনজেকশন নিশীথ? কোনোদিন নেয় নি। নেবেও না কোনোদিন। এ সব রোগ খারাপ বটে, কিন্তু যেমন দূরে তেমনি নিরাকার—নিশীথের ভাবনা-কল্পনায় আঁচড় কাটতে আসে না মৃত্যু, অবাস্তব—তার ক্রমশ জীবনবিমুখ নিস্পৃহ মনের কাছে আজ পর্যন্তও।

'কলেরার ইনজেকশন খুব বিশ্রী জিনিস, বড্ড ব্যাথা হয়। সইবে না নিশীথবাবু আপনার?'

'হ্যাঁ, বেশ টানাটানি ওঠে নমিতা দেবী। আমার তো হাত ফুলে গিয়েছিল। কেমন বেজ্জৎ করে দেয়।'

'আপনি নিয়েছিলেন? কবে?' নমিতা কফির কাপ সরিয়ে রেখে, নিশীথকে নয়—তার ভিতর দিয়ে অন্য কিছুকে, দেয়ালকে আলোকে শূন্যটাকে, যেন পর্যবেক্ষণ করতে-করতে জিজ্ঞেস করল।

'কলকাতায় আসবার আগে, আট-দশদিন হল। আবার ইনজেকশন কী দরকার হবে?'

'না, তাহলে আর-দরকার নেই।'

কোনো কথা নেই মুখে, বসে রইল কিছুক্ষণ। নমিতা নিজের বাঁ হাতের দিকে তাকাচ্ছিল। হাতটা প্রসারিত করে। কিন্তু, হাতের দিকে নয়, অন্য কোথাও তাকিয়ে ছিল যেন তার মন। কোথায়—ধরতে চাচ্ছিল নিশ্চয়। ওকে না-জিজ্ঞেস করে—ওকে না-জানতে দিয়ে ওর মনের লেখন জানতে যাওয়ার ভেতর চৈতন্যের ঘনতা রয়েছে খুব; অনুভূতিটাকে ঠিক পথে চালিয়ে মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু তবুও ধরতে ছুঁতে পারা যায় না। আমি চোখ বুঁজে আছি, আমার এই হাতের তাসগুলোর ভিতর থেকে একটা তাস তুলে নাও তুমি—আমি বলে দেব কী নিয়েছ তুমি। কী নিয়েছ? নিয়েছ হরতনের টেক্কা। তাসের এ খেলায় দিব্যচক্ষু লাভ করেছিল নিশীথ। যা বলে দিত তাই হত। নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে যেত বড় বড় সঙ্ঘর মাস্টাররা। কিন্তু তাই বলে সব বিষয়ের দিব্যজ্ঞান লাভ করা কঠিন। নমিতার হাতে চিড়েতন না হরতন? হরতন? হরতনের কোন তাসটা?

'আমি উঠি নমিতা দেবী।'

'কোথায় চললেন?'

'এই কাছেই কয়েকটা জায়গায় যাব—ডোভার লেনে, একডালিয়া রোডে, বালিগঞ্জ স্টেশনে। আজ আর উত্তর কলিকাতায় যাওয়া হবে না।'

'ফিরবেন কখন?'

'দুপুরবেলা খেতে ফিরব।'

'কটার সময়?'

'কটার সময় সুবিধা আপনার?'

'দেড়টা না পেরুলেই ভাল—'

'আমি সাড়ে বারটার সময় এসে চান করব।'

'আমি পার্কসার্কাসে যাচ্ছি আমাদের গাড়িতে। চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই একডালিয়ায়?'

'বালিগঞ্জ স্টেশনে চলুন। পার্কসার্কাসে কোথায় যাচ্ছেন?'

'কাজ আছে সেখানে; নাম শুনেছেন হয় তো, মুখুজ্যে, সলিল মুখুজ্যে।'

নমিতা নিশীথের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, জিতেন বলছিল।'

'যাঁর নাম মা-খিন'।

নমিতা তার হাতের সিগারেটটা টিনের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে গেল। এখন খাবে না; খেতে ইচ্ছে করছে না।

'মা এখন ওখানে আছে কি না বলতে পারছি না। একটা মুশকিলের ব্যাপার হয়েছে। বাবা বেশ বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; অবিশ্যি বিলিতি ডিগ্রি নেই; কিন্তু এদেশে ট্রেনিং নিয়ে তিনি খুব ঝাড়া ওস্তাদ হয়েছিলেন। অনেক, অনেক রোজগার করেছেন, উড়িয়েছেন। এখন আর কিছু করতে পারেন না। প্যারালিসিসের মত হয়েছে। বিছানায়ই পড়ে থাকতে হয়। নামতেও পারেন না। নড়াচড়াও কঠিন,' নমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার মা মা-থিন নরওয়েজিয়ান মায়ের মেয়ে। শুনেছেন আপনি?'

টিনের ভিতর সিগারেটটা ঢুকিয়ে রেখে ঢাকনি এঁটে দিল। তেপয়ের ওপর রেখে দিল টিনটা।

'জিতেন তো তাঁকে মার্টিন সাহেব বলে ডাকে। বাবা নাম রেখেছিলেন মার্জাবিন অর্থাৎ মার্জারিণী— কিন্তু সংস্কৃতে তো মার্জারী? কখনো-কখনো মার্গারিন—মানে আমাদের মাখন—' নমিতা কথা বলতে-বলতে থেমে গিয়ে জানালার বাইরে অনেক দূরে বিশেষ কোনো কিছুর দিকে না-চেয়ে তবুও এমন ঠায় তাকিয়ে রইল যে মনে হচ্ছিল সমস্ত তাকাবার ভার গ্রহণ করেছে তার অন্তশ্চক্ষু; কী প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে—নমিতার বাইরের চোখের দিকে তাকিয়ে নিশীথ তার কোনো কিছু কিনারা করে উঠতে পারল না। নিশীথকে আধ খানা কথা বলে ছেড়ে দিল নমিতা। একটা মুশকিলের ব্যাপার হয়েছে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী সে মুশকিল—সলিল মুখুজ্যে সাহেবের প্যারালিসিস। না সেই পক্ষাঘাতটাকে জড়িয়ে আরো কিছু; পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেল না কিছুই।

'চলুন আপনাকে বালিগঞ্জ স্টেশনে নামিয়ে দিচ্ছি।'

'চলুন।'

গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে চলল নমিতা। পথে কোনো কথা হল না। বালিগঞ্জ স্টেশনে নিশীথকে নামিয়ে দিল।

'আপনি সাড়ে বারটায় ফিরবেন?'

'তাই তো ভাবছি।'

চান সেরে যখন খেতে বসল দু-জনে, তখন দেড়টা বেজে গেল। খাওয়া হচ্ছিল খাবার ঘরে। টেবিলটা খুব বড়। বাবুর্চি, ডিশ-গেলাশ কাটা চামচ লাগিয়ে, টেবিলের এক পাশে, নমিতার হাতের কাছেই খাবার জিনিসগুলো নামিয়ে গেল সব। বাবুর্চিকে ছুটি দিয়ে দিল নমিতা।

'পার্কসার্কাসে মুখার্জি সাহেব কেমন আছেন?'

'ভাল না।'

'প্যারালিসিস হয়েছে?'

'হ্যাঁ, খুব শক্ত।'

'দেখছে কে?'

'একজন জার্মান ডাক্তার।'

'কেন, জার্মান কেন? দিশি ডাক্তার নেই?'

'উনি স্পেশালিস্ট। রোজেনবুর্গ নাম। জার্মান ইহুদি।'

'ইহুদি?'

'উনি ভাল বলছেন না। সুবিধে করতে পারছেন না। বাবার বয়স বেশি নয়তো, মোটে বাযান্ন। খুব তাগড়া শরীর ছিল—ভেবেছিলুম টপকে যাবেন।'

আজ ডাল-ভাতই রান্না হয়েছিল, চপ ছিল, ফ্রাই ছিল, মুর্গি নয়—কী-একটা পাখির মাংস রান্না হয়েছিল। আলাদা একটা ডিশে টোমাটো শসা পেয়াজের কুচি, কাঁচা লঙ্কা, লেবুর সালাদ, মটরশুঁটি ছিল। আজ সকালে নিশীথ বনাম জিতেন দাশগুপ্ত সব সাবাড় করে গেছে বলে আচার, চাটনি, সসের নতুন তিন-চারটে শিশি, আনা হয়েছে। খুলে, টেবিলের ওপর রেখে গেছে বাবুর্চি।

দই-মিষ্টি আনা হয়েছে নিশীথের জন্যে; খুব সম্ভব জিতেনের পরামর্শে; ফোনে পাঁচ মিনিটের সব বলে গেছে; ভাবছিল নিশীথ। কিংবা হতে পারে নমিতা নিজেই সব ঠিক করেছে।

সংস্কারের জট খসাতে সময় লাগে নিশীথের—অথচ নিজেকে যে স্পষ্ট চৈতন্যের মানুষ বলে মনে করে। সচেতন হয়ে পড়ল হঠাৎ যেন তারপর;

এই চেতনাই তার নিজস্ব।

সূচীপত্রে যান

'আপনার মাকে দেখলেন?'

'পার্কসার্কাসের বাড়িতে?' অন্যমনস্কভাবে কাঁটা দিয়ে একটা ফ্রাই টেনে নিয়ে একটা ঢোঁক গিলে নমিতা বললে, 'মা-থিন সেখানে নেই।'

'কোথায় গেছেন তা হলে?'

'কী জানি—বাবা বলতে পারছেন না। মা হচ্ছে ঝড় কি বাতাসের মেয়ে, একজন প্যাবালিটিক রুগির সঙ্গে দু-বছর কাটানো বড্ড শক্ত তার পক্ষে। আমি বুঝেছি তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কোথাও তাস খেলতে চলে যান হয় তো। কিংবা অ্যাম্বুলেন্সের কাজে। টহল মারতে খুব ভালবাসেন; তাতে অনেক লোকের উপকার হয়। ওঁর উদ্দেশ্য অবিশ্যি বাঁই-বাঁই করে ছুটে বেড়ানো রেড ক্রশের গাড়িতে, স্ট্রেচারে মানুষ টেনে। দাঙ্গার সময়, বাপ রে, কী হুজ্জোতি! কাউকে মারা বা বাঁচানো লক্ষ্য নয়, যারা বড়-বড় ট্রাক চার্টার করেছে, তাদের সঙ্গে দিক্-বিদিকে ছোটা, রেডক্রশের গাড়িতে নরওয়ে-স্টীরের মত ছুটে বেড়ানো'—

'আপনি কিছু খাচ্ছেন না মিসেস দাশগুপ্ত।'

'ফ্রাই খাচ্ছি।'

ছুরি-কাঁটা দিয়ে সেই একটা ফ্র্যাই-ই ছিঁড়ে চিরকুট্টি করছিল নমিতা; মনটা যেন কেমন জোশ হারিয়ে ফেলেছে, পার্কসার্কাস থেকে ফিরে এসে।

'ভাত নিলেন না?'

'নিচ্ছি। ভাত খুব কম খাই আমি। এই যে একটু সালাদ খাওয়া যাক। সকালবেলা বলছিলেন পাটাতনের নীচে পদ্মার ইলিশের মত ঠেসে রাখে—

কলকাতার বাস কণ্ডাকটার কলকাতার বাঙালি প্যাসেঞ্জারদের। কেটে কুচিয়ে নুন বরফে চালান দেবার মতলব আর-কি। একটা বিহিত করতে বলছিলেন। সেই থেকে কথাটা ভাবছি আমি।'

নিশীথ কাঁটা চামচ দিয়ে ডালভাত খাচ্ছিল। চামচটা রেখে ছুরি তুলে নিল, কাঁটা দিয়ে মাছের ফ্রাইটা তুলে নিয়ে বললেন, 'মনে করে রেখেছেন। অনেকে ভুলে যায়। কিন্তু ওটা তো আমাদের একটা ছোটখাট আপদ। বড়-বড় বিপদগুলো পড়ে রয়েছে।'

'ছোটখাট? আজ মোটরে ঘুরেছি ঘন্টাখানেক নানা জায়গায়। দেখেছি বাসগুলো খুব ভাল করে নজর দিয়ে। এ যদি ছোটখাট ছিঁচকে হয়, তাহলে আমি নাচার নিশীথবাবু।'

নিশীথের খিদে নেই বেশি আজ? কী খাবে? মাংস খাবে?

'এ কি বালি হাঁসের মাংস মিসেস দাশগুপ্ত?'

'না। ঘুঘুর। খেতে ইচ্ছে করছে না? আপনি মাংস খান না? আচ্ছা দেখুন আজ খেয়ে—'

নিশীথ দেখতে লাগল খেয়ে। রান্না ভাল, মাংস নরম মাখনের মত; স্বাদ আছে। কিন্তু এ জন্যে পাখিটাকে মারা কি ঠিক হয়েছে। একটা কি দুটো ঘুঘুকে মেরে এই মাংস—এই ডিশ—এই রক্তের ফল ঝলসানি খেয়ে তৃপ্তি। এরপর মানুষের জীবনের ছোট-বড় নানারকম অতৃপ্তির কথা পেড়ে নমিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কেমন যেন অবাস্তবতা এসে পড়ে। মাংস খাচ্ছে নমিতাও। সেও কি এই রকম কথাই ভাবছে? নিশীথ একটু ব্যাহত হয়ে তাকিয়ে দেখল মাংস খেয়ে নমিতার মুখে যে-তৃপ্তি সেটা আশ্চর্যরকমে সৎ। নমিতা মৃত ঘুঘুর কথা ভাবছে না; মাংসটা নির্বিকারভাবে ভোগ করছে। বাস কনটডাকটার ও প্যাসেঞ্জারদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সে খুব নিখুঁত লোকায়ত।

'আপনাদের বড়-বড় বিপদগুলো কী বলবেন নিশীথবাবু?'

'আর-এক সময় বলব।'

দু জনেই খেয়ে চলছিল নিঃশব্দে—কাঁটা চামচ খটখট করে, কাঁটা ছুরি ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ।

'কাল রাতে আপনার ঘুম হয়েছিল নিশীথবাবু?'

'পাঁচটার পর হয়েছিল।'

'ওঃ, এত দেরিতে? জিতেন তো একটা-দুটোর সময় ওপরে এল—পাঁচটা অব্দি জেগেছিলেন নীচে?'

নিশীথকে টোমাটো সসের শিশিটা এগিয়ে দিল নমিতা। শিশিটার দিকে তাকাল একবার নিশীথ।

'নীচে তো ফ্যান ছিল না; মশারি টানাতে হল; ওপরে চলে এলেই পারতেন অত গরমে? জিতেনের খেয়াল হয় নি, মাথায় সব জিনিস সব সময় খেলা করে না। তা হলে ড্রয়িংরুমে বা হলে শোবার জায়গা করে দিত আপনার'—বলতে বলতে নমিতা ওয়াটার কুলারের জলভর্তি কাঁচের কুঁজোটার দিকে তাকাল

একবার। জল খাবে।

জল খাবে। তেষ্টা পেয়েছে বেশ। কিন্তু থাক, এখন না; পরে খাবে। এমনি জল খাবে, না রেফ্রিজারেটারের ভিতর থেকে বার করে এনে স্কোয়াশ খাবে? 'জল খাচ্ছেন না? দু গ্লাস ভর্তি জল রয়েছে। কিন্তু আমরা কেউই ধরছি ছুঁচ্ছি না নিশীথবাবু। কেন এ-রকম?'

'তেষ্টার অভাব হয়েছে আমাদের।'

নমিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে এল হাসিতে; নিশীথের কথা শুনে নয়—এমনিই। হাসলে কেমন একটি ঝিলিক এসে পড়ে নমিতার চোখে-ঠোঁট শানিয়ে ওঠে; ছুরির মতন; কেটে নিশীথের রক্ত বার করে দেবে মনে হয়। কিন্তু তা নয়, বুকে রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে, স্নিগ্ধ হয়ে থাকে। জল খাবে কি নিশীথ? মাঝে-মাঝে কী এক সংস্পর্শে এসে প্রকৃতির বড়-বড় সনাতন পাথরের আড়ালে তাদের ছায়ার মত যেন মন নিরাশ হয়ে থাকে। শরীরের পিপাসা চাপা পড়ে যায়।

'এই দু গ্লাস জল ওয়াটার কুলারের ভিতরে ছিল।' নমিতা বললে। তুলে নিল একটা গ্লাস সে; ঢক-ঢক করে খেতে লাগল।

'জিতেন জামসেদপুরে পৌঁছে গেছে হয় তো?'

'এইবারে পৌঁছবে।'

'গিয়ে টেলিগ্রাম করবে না?'

'কেন?'

'আপনার মা কি রাতের বেলা ফেরেন?'

'কে? মা-থিন? আমার বাবার কাছে?' নমিতা জল খাবার ছলে গেলাসের ঠাণ্ডা কাচ গালিয়ে খেয়ে ফেলছে যেন, মনে হচ্ছিল। গেলাসটা টেবিলে রেখে একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে গেল।

'ইহুদিদের ভিতর বড় ডাক্তার থাকে? আমি ভেবেছিলুম ওরা ব্যবসায়েই জমাতে পারে। ওদের মধ্যে অবিশ্যি বড় বিজ্ঞানী সাহিত্যিক রয়েছে।'

'ভারী বিচিত্র একটা জাত ইহুদিরা, বেশ বড় হাতে তৈরি। কী বলেন নমিতা দেবী?'

'তা ঠিক। কিন্তু ওদের মনের মধ্যে মোচড় রয়েছে, ঘুণ ধরে যায়। ওরা যা হতে পারত, তা হল না। ইহুদিদের ওপর আমি অবিচার করলাম?' নমিতা জিজ্ঞেস করল।

'না। ইহুদিরা অনেক বড়-ড় জিনিস দিয়েছে। কিন্তু অন্য সব জাতিকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে আহরণ করতে হয়েছে সে-সব জিনিস। ইহুদিরা যা দিয়েছে তার অনেক কিছুর ওপরই কেমন একটা বিষণ্ণতা, মৃত্যুর গন্ধ যেন।'

'ভালবাসেন সেটা আপনি?'

'আমি ভালবাসি। কিন্তু ইতিহাস তা ভালবাসবে কেন?'

'মৃত্যুকে কী রকম মনে হয়?'

'এগুচ্ছি মৃত্যুর দিকে। এইবারে আমি জল খাব।'

'অরেঞ্জ স্কোয়াশ আছে রেফ্রিজারেটরে। এনে দিই।'

'আমি নির্ঝরের জল খেতে ভালবাসি।'

'নির্ঝরের?'

'স্কোয়াশ তো ফ্যাকটরির জিনিস।'

নিশীথ হাত বাড়িয়ে, চোখ বুজে, ঠাণ্ডা কাচ স্পর্শ করে, এক ঢোঁকে গেলাসের সমস্তটা জল খেয়ে ফেলল।

'এটা কি নির্ঝরের জল?'

'নির্ঝরের খুব কাছে।'

শুনে নমিতা ডিশ, গেলাস, অনুভূতির দিকে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে নিশীথের কথাটা আন্দাজ করে নিচ্ছিল।

'সেই জার্মান ইহুদি ডাক্তার রোজেনবুর্গ; তার সঙ্গে কি দেখা হল যখন গিয়েছিলেন মুখুজ্যে সাহেবের বাড়িতে?'

'না। তিনি রোজ আসেন না।'

'বাযান্ন বছর মত বয়স আপনার বাবার। জাঁদরেল মানুষ। এ রকম শক্ত প্যারালিসিস হল।

সূচীপত্রে যান

প্যারালিসিস হয় কেন মানুষের?'

নমিতা, অনিমেষ, জলে ভর্তি ঠাণ্ডা একটা কাচের গেলাসের দিকে, তাকিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে গালে চেপে ধরল। তার পরে আবো ওপরে বাঁ দিকের রগের ডানদিকের রগের ওপর গেলাসটা চেপে রেখে নির্নিমেষ চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শরীরটাকে বেশি কবুল করলে হয়ে যায়। কিংবা মনটাকে।'

নিশীথ হাত বাড়িয়ে দিল আর-এক গ্লাস জল খাবে বলে। তাকিয়ে দেখল, সব গ্লাসের জল ফুরিয়ে গেছে। নমিতার হাতে জলভর্তি একটা গ্লাস আছে শুধু। নমিতার কপালের ডানদিকের বাঁদিকের রগ স্নিগ্ধ হয়েছে, ঠাণ্ডা হয়েছে কপাল, মাথা; ঠাণ্ডা জলের গেলাসটা গালে ছুঁইয়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিল।

'জল খাবেন আপনি?'

'আছে জল ঐ গেলাসটায়?'

'আছে। আপনি তো স্কোয়াশ খাবেন না। এই যে গেলাসটা রাখলুম এটা কি নির্ঝরের জল?'

'আঃ, কী ঠাণ্ডা।' গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে বললে, নিশীথ।

'রেফ্রিজারেটরে ছিল। তবুও এই গেলাসটার ভেতরে অনেকখানি বরফের গুঁড়ি ঢেলে দিয়েছে বাবুর্চি। দেখছেন কত বরফ—গলে নি বেশি।'

নিশীথ জল শেষ করে গেলাসের বরফের তলানির দিকে তাকিয়ে দেখল।

গেলাসের ভিতরে হাত ডুবিয়ে বরফের টুকরোগুলো তুলে নিল নমিতা; কপালে রগে ঘষতে-ঘষতে উঠে দাঁড়াল। নাকে-চোখে ঘষতে লাগল। টেলিফোন ডাকছে নাকি? তাড়াতাড়ি চলে গেল নমিতা। কেমন যেন মনপবনের মাঠে চড়িভাতির মত খাওয়া ওদের হয়ে গেছে।

নিশীথ ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসল, বেসিনে প্রায় মিনিট পনের ধরে ভাল করে হাত-মুখ ধুয়েছে।

নমিতা টেলিফোন ধরতে সেই যে চলে গেছে নিজেদের ঘরের দিকে—তারপর এ দিকে আসে নি।

নরওয়েজীয় কুলকিনারা থেকে নেমে এসেছে নমিতা—ও ঠিক এ দেশী মেয়ের মত নয়—দেখতেও নয়, খুব সম্ভব ভঙ্গি কিংবা অর্থতাৎপর্যেও নয়, যে-গেলাসে মুখ দিয়ে জল খেয়ে ফেলেছে নিশীথ, তার তলানির বরফের কুচিগুলো হাত গলিয়ে তুলে নিল, রগে ঘষল—ঠোঁটে-চোখে রগড়ে নিল। আমাদের দেশের মেয়েরা এ-রকম করত না। যদি করত, তা হলে সে একটা খেলা হত, সে খেলার নাম আছে। কিন্তু নমিতা নিশীথকে কোনো খেলায় আহ্বান করে নিশীথের এঁটো লোসের বরফ নিজের চোখে ঠোঁটে ঘষতে যায় নি; ঘষেছে এমনিই—কানের পাশের রগ দপদপ করছিল বলে। গেলাসে হাত ঢুকিয়ে বরফের গুঁড়ো তুলে নেবার সময় মনেও ছিলনা নমিতার যে ওটা এঁটো গেলাস, কিংবা খেয়ালে থাকলেও ও মানে যে বরফ এঁটো হয় না; কিংবা কোনো জিনিস এঁটো হলেও কিছু হয় না। শিশুর মনে, বালিকার মনে তুলে ঘষে নিয়েছে। রগড়াতে-রগড়াতে ভুলেই গেছে কী করছে না- করেছে।

নিশীথ ড্রয়িংরুমের ফ্যানটা খুলে দিল। চোতের বাতাস আসছিল বেশ ফুরফুর করে বাইরের থেকে, কিন্তু কিছু ক্ষণ হল থেমে গেছে; কেমন গুমোট।

'আপনাকে খাবারের ঘরে খুঁজছিলুম, কখন এলেন আপনি?'

'অনেক ক্ষণ।'

'খাওয়া না-হতেই টেলিফোন ধরতে উঠে গেলাম আমি।'

'খাওয়া তো শেষ হয়ে গেছল।'

'শেষ হয়েছিল?' নমিতা দূরে দাঁড়িয়ে বইয়ের শেলফের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললে, 'আমি ভেবেছিলুম শেষ না-হতেই উঠে গেলেন আপনি।'

'কে টেলিফোন করল?'

'মা করেছেন'-নমিতা নিশীথের মুখোমুখি খাকি রঙের একটা সোফায় এসে বসল, 'মা আমাকে দুপুরে নেমন্তন্ন করেছিলেন—'

'খেতে? আপনার তো খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে—'

'না খেতে নয়, তাঁর ওখানে তাস খেলতে যেতে। দুপুর, মানে আড়াইটে-তিনটে,' নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নমিতা বললে, 'এখন দুটো পঁয়ত্রিশ, আপনি তাস খেলতে জানেন?'

'খেলি মাঝে-মাঝে।'

নমিতা মাথা কাত করে একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'মা ইফতিকারউদ্দিন সাহেবেরে বাড়িতে আছে।'

'কে ইফতিকারউদ্দিন?'

'একজন বড় ব্যারিস্টার তিনি। বড় মানে অনেক টাকা আছে। ব্যারিস্টারি করেন না তিনি!'

'দুপুরবেলা তাস খেলেন?'

'মার নেমন্তন্ন ছিল ওখানে, তাই তাস খেলবার ব্যবস্থা হয়েছে হয় তো?' বলে ঘরের ঝকঝকে কাঁচের শার্সিগুলোর উপর তাকিয়ে দেখল, গরম উজ্জ্বল দুপুরের সূর্যখণ্ডগুলো এসে পড়ছে সব—পরিচিত আত্মাদের মত যেন, 'মাকে বলে দিয়েছি যে আমি এখন যেতে পারব না, পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায় যাব। বলেছি জিতেন এখানে নেই, জামশেদপুরে গেছে।—এই যে টিন,' বললে নমিতা।

নিশীথ তুলে নিল একটা। হাতের কাছে ছোট তেপয়ের উপর রেখে দিল নমিতা টিনটা, নিজে সিগারেট নিল না। দেশলাই দিল নিশীথকে। শার্টের বুক পকেটে দেশলাইটা রেখে দিল নিশীথ—জ্বালাল না।

'ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের বাড়ি গিয়ে তাস খেলব দুপুরবেলা আমি—সে হয় না। যদি কোথাও যাই দুপুরে—বাবার কাছে যাব। দু জন নার্স ঠিক করে দিয়েছি বাবার জন্যে—তারা আছে ওখানে, তবে আমি মাঝে-মাঝে গেলে—বাবা চান যে আমি যাই। আমিও চাই যেতে।'

'যাবেন নাকি আজ দুপুরবেলা?'

'না।'

'কেন?'

'এই তো ইয়ুসুফ সাহেবের কাছে টেলিফোন করে এলাম।'

'ইয়ুসুফ কে?'

'বাবা যে ফ্ল্যাটে থাকেন, পার্কসার্কাসে, তারই আর-এক দিকে থাকে ইয়ুসুফ তার তার স্ত্রী, খুবই ভাল লোক ওরা। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে আয়েষা। ফোন ধরল ইয়ুসুফ নিজে, বললে, মুখুজ্যে সাহেব ঘুমিয়ে আছেন, বাবা জেগে উঠলে—ওখানে আমার যাবার দরকার হলে, ইয়ুসুফ আমাকে জানাবে।'

'দরকার যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে।'

'সে সব তো নার্সদের হাতে। বেশি দরকার হলে ডাক্তার আছেন। ইয়ুসুফের ভাই জুলফিকার তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে। বাড়িতেই তার অফিস। দরকার হলে ডাক্তারকে ফোন করে দেবে জুলফিকার। বাবা দুপুর-বেলা আমাকে চান না।'—নমিতা বললে।

বুক পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ।

'দুপুর বেলা মোটর ড্রাইভ করে তার ওখানে যে আমি যাই সে হজ্জোতি মোটেই পছন্দ করেন না তিনি, বলেন এ-রকম করলে তোমার প্যারালিসিস হবে'—বলে বালিকার মত, মুখ-দুষ্ট নির্দোষ যুবতীর মত মুখে, একটু চোখ টিপল, হেসে নিল নমিতা, 'আজ সাড়ে পাঁচটার আগে বেরুব না।'

'কোথায় যাবেন?'

'মার ওখানে তাসের আড্ডা ভেঙে যাবে তখন না ভাঙলেও তাস খেলব না আমি। ওরা ফ্ল্যাশ খেলে।'

'ফ্ল্যাশ?'

'ফ্ল্যাশ খেলতে শুরু করে মার বার-ফটকা ভাবটা কেটে গেছে খানিকটা। বসে থেকেও যে নেশা করা যায় টের পেয়েছে; পান জর্দা কিমামও খাচ্ছে আজকাল। ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে বেশি 'মেলামেশা হচ্ছে—'

নিশীথ খুব আস্তে-আস্তে সিগারেট টানছিল।

'আপনি হলে শোবেন আজ রাত থেকে।'

হলে শোবে আজ রাত থেকে নিশীথ? কী করবে? সিগারেটের ছাই ঝেড়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিল। নিশীথ কিছু বলবার আগে নমিতা বুঝিয়ে দিল জিনিসটা তাকে, 'নীচে তো ফ্যান নেই, খুব বাতাস খেলে হলে-ফ্যাক্টরির বাতাস নয়—নির্ঝরের।'—বলে হাসল নমিতা, টিনের থেকে একটা সিগারেট বার করে নিল—'আর যদি ফ্যাক্টরির জিনিস চান, তা হলে হলের দুটো পাখা খুলে শুয়ে থাকতে পারেন।'

নিশীথ, কথা ভাবছিল।

'আমি ভাবছিলাম আমাদের শোবার ঘরের পাশে যে-ঘরটা আছে সেখানে ঠিক করে দিলে হয়। জিতেন মাঝে-মাঝে ওখানে বাড়ির অফিস করে—রাতে শোয়। ভারি চমৎকার হাওয়া ঐ ঘরে। মাথার উপর ফ্যান—টেবল ফ্যানও আছে। স্কাইলাইট অনেক। দরজা-জানালা বন্ধ করে শুলেও কোনো অসুবিধা

হবে না।

'বন্ধ করার কী দরকার?'

'আমরা করি না। কিন্তু কেউ-কেউ ভাবে দোর আটকে না-রাখলে চোর আসে—'

'তা আসে বটে। অফিসের দরকারি কাগজপত্র বুঝি সব? টাকা আছে?'

—নমিতাকে জিজ্ঞেস করল নিশীথ। নমিতা নিজের পা ঘেঁষে কার্পেটের নক্সার দিকে তাকিয়েছিল, নিশীথের চোখে চোখ পড়ল তার।

'ক্রশড চেক। চেক ছাড়া টাকা কে বাড়িতে রেখে দেয় আজকাল।'

সিগারেটের খানিকটা ছাই অন্যমনস্কভাবে কার্পেটের ওপরই ঝেড়ে ফেলে বললে নিশীথ, 'টাকা তো ব্যাঙ্কে থাকে।'

'কোন ঘরে শোবেন আপনি?'

'হলটা বড্ড বড় হয়ে পড়ে—ল্যাটা মাছকে সাগরে পাঠিয়ে লাভকী?'

'লাভ আছে বই কি'—হাতের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে নমিতা বললে—

'সেখানে তার হাঙর হয়ে পড়বার সম্ভাবনা।'

'আমি জিতেনের ওখানেই শোব।'

'জিতেন ফিরে এলে?'

'হলে।'

নমিতা নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'তিনটে বেজেছে। আপনার তো বিশ্রাম হল না—'

'ঘুম? ঘুমের সময় আছে, হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় বসে আছি, পাখা ঘুরছে, আপনার সঙ্গে কথা বলছি, ড্রয়িংরুমে বসে খুব ভাল লাগছে আমার।'

নমিতা সিগারেটের ধোঁয়া শেষ পর্যন্ত আত্মসাৎ করে কেমন একটা স্তম্ভনের ঘোরে নিশীথের দিকে তাকিয়েছিল।

'ঘুমোতে যাবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

'না। এখন না।'

দু জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নিভে যাচ্ছিল নিশীথের সিগারেট। কিছু-কিছু ধোঁয়ার ভগ্নাংশ ধীরে-ধীরে বেরুচ্ছিল নমিতার মুখের ভিতর থেকে। 'হানিফকে বলব জিতেনের ও-ঘরটায় আপনার জিনিসপত্তর রেখে দিতে?'

'হানিফ কে?'

'আমাদের বেয়ারার।'

'জিতেনের এ বাড়িতে আর্দালি চাপরাশি তো খুব কম।'

'হানিফ আছে, রফিক আছে, বিশু, মহিম আছে, বাবু-বিবি আছে। আমরা দু জন লোক তো শুধু, আপনার সঙ্গের লাগেজ সবই তো নীচে?'

'এই হানিফ!' ড্রয়িংরুমের জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক দিল নমিতা।

'হুজুর!' বলতে না-বলতেই দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে কুড়ি-পঁচিশ বছরের একজন পাঞ্জাবি মুসলমান ছোকরা ড্রয়িংরুমের দরজায় এসে হাজির হল। নিশীথের বিছানা, স্যুটকেস, সাহেবের দুসরি কামরায় রেখে আসতে বলা হল। 'লেকপাড়ায় দু'জন মুসলমান আর্দালি রেখেছে দেখেছি জিতেন। কোথাকার মুসলমান?'

'পাঞ্জাবের।'

''বিপদে পড়বে না তো?'

'না, এখন আর কিচ্ছু হবে না।'

'ওদের নিজেদের মনে কোনো ভয়ডর নেই?'

'কিচ্ছু না।' নমিতা বললে, 'একটা কথা আগের থেকে আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার, যে-ঘরে আপনি শোবেন'—দরজায় ছায়া পড়তেই চোখ খুলে তাকাল সে। হানিফ এসে বললে জিনিসপত্তর রেখে দেওয়া হয়েছে বড়-সাহেবের ঘরে। সে একটু পার্কসার্কাস যেতে চাইল ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের ওখানে। পাঁচটার সময় ফিরবে।

'কেন? সেখানে কী আছে? সাদি? যিতনা কুছ কোশিশ করো হানিফ—'

'হুজুর, কুছ নেই—লেকিন—হামেশা—'

'আচ্ছা যাও।'

যে-কথা পাড়ছিল নমিতা, হানিফ এসে পড়াতে ভেঙে গেল, কথাটি যেন পাড়বে না আর নমিতা—মনে হল নিশীথের। জানালার ভিতর দিয়ে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় যা-দেখাব তা ছাড়া আব-কিছু দেখছে না যেন। কোনো ব্যাথা নয়, দুবাশা নয়, ক্লান্তি নয়; কিন্তু নানা রকম কথা বলার অবক্ষয়ে যে-নিস্তব্ধতা এসে পড়ে মানুষেব চোখে-মুখে—পৃথিবীব সমস্ত জিনিসেরই অবসান যে-রকম নিস্তব্ধ (হয়তো নিষ্ফল) তেমনি নির্বাণ চক্রেব মতো তাকিয়েছিল যেন—কোন জিনিসেব দিকে নয়, অফুরন্ত সময়-কণিকাগুলোর দিকে।

'জিতেনেব ঘরে শোবেন আপনি আজ বাতে, কিন্তু ঘুমতে পারবেন তো?'

'কেন কী হবে?'

'সে ঘবে টেলিফোন বাজে!'

'তা বাজতে থাকবে।'

'ধবতে হবে তো।'

'জিতেন জামশেদপুবে আছে—টেলিফোন ধরে কী লাভ?'

'বড় ব্যবসায়ী মানুষেব কাছে নানা বকম জরুবি খবব আসে। জিতেন জামশেদপুর—সবাই কি তা জানে। সাহেব চলে গেলে তার স্ত্রী নেই? সাহবে তো হল। আমাব নিজের প্রাইভেট টেলিফোনও আছে; বাতে, অনেক রাতেও আসে।'

'অনেক বাতে যে প্রাইভেট ফোন আসে সেটা আমাব ধবা উচিত নয়।'

'সে ফোন আমাব অনেক বাতেব নিজেব জিনিস; যদি অনুচিত হয আমি নিজে বলে দেব,' নমিতা হেসে বললে—

নিশীথ সিগাবেট জ্বালিয়ে নিয়ে বলবে, 'জিতেন ধবে?'

'আমাব ফোন?'

'হ্যাঁ।'

'ওব ঘুম বেশি।'

নিশীথ চিমটেব মত করে ডান পাযেব আঙুল দিয়ে টেনে তেপাযটা আস্তে-আস্তে নিজেব দিকে নিয়ে এল: সিগাবেটেব কিছুটা ছাই তেপযেব অ্যাশ-ট্রেব ভিতব ঝেড়ে ফেলে তেপযটা আঙুলে ঠেলে আস্তে-আস্তে সবিয়ে দিল আবাব, 'বাত-বিবেতেব সমস্ত টেলিফোনই আপনাব ধবতে হয?'

'বেশি বাতে জিতেনেব কাছে ফোন আসে না।'

'আমি যদি ধবি আপনাব ফোন'—বলে নিশীথ চুপ কবল। আবো কিছু বলবে হয তো সে। কী বলবে, বলে নিক; শোনা যাক। নমিতা নিশীথেব মুখেব দিকে তাকিয়ে ছিল, নিশীথ কিছু বললে না আব।

'আপনি ফোন ধবে যদি ওদের কথাটা জেনে বাখতে চান ওবা তাতে ভড়কাবে না!'

'আপনি তখন ঘুমুচ্ছেন?'

'ঘুমুচ্ছি হয তো—'

'আপনাব কানেব কথা আমাকে বলবে?'

'শোনাব অনুমতি বযেছে বলেই তো কান পেতে আছেন-জানবে না তাবা?'

'কী ভাববে তাবা? নমিতা দেবীব সেক্রেটাবি?'

'হয তো জিতেন দাশগুকে বলছে। কিংবা—'

'কিংবা?'

'নিশীথ সেনকে।'

সিগারেটটা জ্বলে-জ্বলে নিশীথেব আঙুল পুড়িয়ে ফেলছিল প্রায়। তবুও সেটাকে ফেলে না দিয়ে আঙুলে আটকে রাখল নিশীথ। বেশি দগ্ধাচ্ছিল বলেই, নাকি অন্যমনস্কতায, হাতেব থেকে খসে পড়ে গেল সিগবেটটা—কার্পেটেব উপব। তুলে নিয়ে অ্যাশ-ট্রেব ভিতব ধীরে-ধীবে ডুবিয়ে রাখল নিশীথ।

'বেশি রাতে ফোন আসে আপনাব—বোজ রাতেই?'

'না, বোজ রাতে নয—তবে কোনো-কোনো সময বোজ রাতেই।'

'আপনাব ফোন ধবব আমি; জেগে উঠি যদি!'

'ফোন এলেও ঘুমোতে পারবেন?'

কোনো-কোনো ফোন খুব ভয়কাতুরে—দু-একবার ডেকেই ছেড়ে দেয়।'

'অত রাতে যারা চায় তারা ভয়কাতুরে নয়'; আমাকে না পেয়ে তাবা ছাড়বে?'

'আপনাকে না পেয়ে? কোথায় আপনি তখন? ঘুমিয়ে তো আছেন—'

'ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু কেউ না জাগলেও, আমাকে না-জাগিয়ে ছাড়বে না ওরা।'

নিশীথ ব্যাহত হয়ে বললে, 'এই রকম ডাকসাইটে?'

'কেন দুপুর রাতের ঘুমে এত কী মাযা?'

'মানুষের দুটো নিস্তব্ধতা আছে পৃথিবীতে—মৃত্যু আর ঘুম, এ ছাড়া আব-সবই শেষ পর্যন্ত অজ্ঞেয়।'

অনিমেষভাবে চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ পরে নমিতা বলল—'নিস্তব্ধতা আছে মানুষের জীবনে। কিন্তু তা ঘুম? মৃত্যু?' ঘরের ভিতর কোথায় যেন শব্দ হল—বেড়ালের? বাতাসের? লোকজনের?—'আমি তা মনে করি না।' নমিতা বললে যেন ঘুমের থেকে জেগে উঠে। তা মনে না-করাই স্বাভাবিক। সাদা সাধারণ পথে চলতে-চলতে সহজ কথাবার্তার ভিতর দিয়েই জটিলতা এসে পড়ে, কথাবার্তা বলতে-বলতে আজ নিবিড়তা এসেও পড়েছিল হয তো—সোজা সহজ পথে, কিন্তু সব গহনতাই নেশার মতন জিনিস। নেশায় ধবলে মন ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে চায, নিস্তব্ধতা আছে ঘুম আর মৃত্যুর—অগ্রসর হচ্ছে সেই দিক নিশীথের জীবন। অগ্রসবের সীমানায পৌছুলেই সমাধি, যে-সংস্কৃতি ও বুদ্ধির ভিতর থেকে জেগেছিল নিশীথেব জীবন চল্লিশ বছরেরও আগে, নৈষ্ফল্য ভেদ কবে সার্থকতায পৌছুবাব আশা সে পোষণ করেছিল বারবাব। আশাকে সফল কবে তুলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাও কবেছে কতবার সে। কিন্তু কিছুতেই ভেদ করা সম্ভব হল না। কিন্তু নমিতা আব-এক পৃথিবীব। তাব সফলতা কিংবা ব্যর্থতা অন্য রকম। ঘুম বা মৃত্যুর বাইবে সে এক অন্য কৈবল্যের স্তব। টাকা বযেছে সেখানে—টাকাই সব; মিলন রযেছে সেখানে, মিলনই সব; দেহ বযেছে—নানা বকম সুধা, ফেনা, সৈন্ধবেব স্বাদ উপলব্ধির ভিতবে পৃথিবীর মাটিকে নিকটতমের মত পায শরীব। আকাশের নক্ষত্রলোকের ব্যক্তির ভিতরে কামশবীবেব মত আলোকিত হযে ফেরে মন। কেন ঘুমোতে চাইবে ও জগতেব মানুষ? কেন মৃত্যু চাইবে? নমিতার মতন জীবন পাওয়া—কিংবা জিতেন দাশগুপ্তেব মতন; সম্ভব কি নিশীথের পক্ষে?

'খুব বেশি বাতে আসে টেলিফোন আপনাব। হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিযে অন্ধকাবেব ভিতব কান পেতে শোনেন? মানুষ মানুষেব অন্তবঙ্গ বলেই মেশিনের স্বাদ এত বেশি।'

'মেশিনের?'

'হ্যাঁ টেলিফোনেব'—নিশীথ বললে—'টেলিফোনেব ঘরেই শোব আমি।'

'অন্য সব দিক দিয়েই ঘবটা খুব ভাল। বেশ নিরিবিলি ঠাণ্ডা। কলকাতাব চাবি দিকের হাওযা এসে কথা বলে যায যেন; কিন্তু মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেবাব জন্য। জেগে-জেগে ঘুমিযে যাবে মানুষ, তাব পর সাত ভাই চাম্পার মত ঘুমিয়ে পড়ে—কেঁচে গুণ্ডুষ করে।'

'ও ঘরে জল আছে?'

'জল রেখে দেব'—বললে নমিতা যে জলসত্রেব মত মূর্তি ধবে।

ঘোমটা নেই, তবুও রয়েছে অনেক দূরে গলা অব্দি ঘোমটা টেনে—বাতেব ঠাণ্ডা ভরন্ত নদীব জল—ওর ঐ গলার স্বরের ভিতর, 'জল রেখে দেব বলে' ডাকছে—জোনাকিকে, নক্ষত্রকে।

'যদি বলেন, হানিফকে বলব আপনাব ঘরে ওযাটার কুলাবটা রেখে আসতে।'

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'কিছু ববফ রেখে দেয যেন, ওযাটার কুলাবেব দবকাব নেই।'

'অনেক রাতে টেলিফোন এলে—ঘুম ভেঙে গেলে—বিরক্ত হবেন না তো?'

'অসময়ে ঘুম ভেঙে দিলে খুব খুশি হব না, তবে অন্ধকাব ঘরে জেগে উঠে পৃথিবীব অন্ধকাব, পৃথিবীর হাওযা, পৃথিবীব মানুষের কাছ থেকে আবেদন আসছে টেব পেয়ে খাবাপ লাগবে না।' নিশীথ পায়ের আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ ঠুকল কার্পেট। অ্যাশ-ট্রেটা হাতে তুলে নিয়ে রেখে দিল।

সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুলে ভিতরের সিগারেটগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঢাকনি এঁটে বললে নমিতা, 'ভাল কথা খুব ভালভাবে আপনি বলতে পাবেন নিশীথবাবু।'

'আমাদের কলেজের জয়মাধববাবু পারতেন, আমি পারি না। আজ সকাল থেকেই মন দিয়ে আপনার কথা শুনছি আমি। এতদিন বাইরে-বাইরে থেকেও নিখুঁত বলে যাচ্ছেন কত সহজে; অনেক বাঙালিও এ-রকম পাবে না।' নিশীথ নমিতার দিকে তাকাল।

সূচীপত্রে যান

যেন নিশীথের কথা শোনে নি নমিতা, এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে আছে, সিগারেট জ্বালিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল—'আপনি কোথাও বেরুবেন বিকেল বেলা?'

'না, কোথাও না।'

'কেন?'

'আজ সকালে খানিকটা ঘুরে এসছি। কাল বেরুব। কোনো ভাল বই আছে?'

'আছে। আমি পছন্দ করে দিয়ে যাব। পড়ে আমাকে বলতে হবে কেমন লাগল। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'না।'

'খবর জানবার তাগিদ নেই আপনাব, দেখছিলুম আমি। জিতেনেব খুব আছে। আমার মাঝে-মাঝে থাকে—মাঝে-মাঝে হাবিয়ে ফেলি। পড়বেন খববেব কাগজ?'

'না'—বললে নিশীথ—'বিকেলবেলা ইফতিকারউদ্দিন সাহেবেরে বাড়ি বেড়াতে যাবেন?'

'ভাবছি কী করব,' নমিতা বলরে, 'দু-একদিন ফ্ল্যাশ খেলেছি ওদের সঙ্গে। ভাল লাগে না, টাকা নষ্ট হয় বলে নয়; ওদের ওখানে কেউ নেই যেন মনে হয়, কিছু নেই যেন; ভাবী ফাঁকা লাগে। অথচ খুব হৈ চৈ দিনরাত। আমি শান্তি ভালবাসি কিন্তু বোকার মতো নয়। তাব চেয়ে অশান্তি ঢেব ভাল। কিন্তু ওদেব ওখানে—যারা নিদবাত সবগরম হয়ে থাকতে ভালবাসে তাদেব খুব ভাল লাগবে।'

'জিতেন যায় না ইফতিকাবউদ্দিন সাহেবেব বাড়ি?'

'না।'

'সলিল মুখুজ্যে সাহেবেব ওখানে?'

'ক্বচিৎ যায়। নানা বকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।'

'খুব বেশি বাতে কাবা টেলিফোন কবে আপনাকে?'

'কযেকটা রাত ধবলেই তো বুঝতে পারবেন।'

'আমি ধবব? আপনি তো ঘুমিযে থাকবেন।'

'আমাকে যা জানাবার আপনাকে তা জানিয়ে দেবে।'

'যেন জানালেই হল, বড় বাজাবের মাড়োযাবিযা নাক বগড়ে কোটেশন জানাচ্ছে; সেই বকম বুঝি? কিন্তু তা তো নয—'ভাবছিল নিশীথ।'

'নমিতাকে ডাকলে নিশীথ সেন যদি হাজিব হয—'

'তা হলে এক মণ তুলোব থেকে এক মণ লোহা বেশি ভারী হবে বুঝি?—' নমিতা হাসতে-হাসতে বললে।

বাইবে পড়ন্ত বোদ, সমস্ত ড্রযিংরুম চৈত্রেব বিকেলেব বাতাসে ভবে গিযেছে, দু-একটা খোলা পাতলা বইযেব পাতা ফবফব করে উড়ছে। মস্ত বড় দেওযাল-ক্যালেণ্ডাব দুটো উল্টে-পাল্টে শিলাবৃষ্টিব মত ঝাঁপিযে পড়তে লাগল ছলাৎ-ছলাৎ কবে দেওযালের উপব। বাইবে পটকা ফলেব মত আলোর বং যেন—গাছ, পাখি, আকাশ ছুঁযে ঘরেব ভিতব ঢুকে পড়ছে; যেন কেউ ছিল না এখানে, তাকে তাবা সুজাতাব মূর্তি দিয়েছে, অন্যমনস্ক হযেছিল পুরুষ, তাকে তাবা বিপ্রতিভ কবে তুলেছে; কনে-দেখা আলোর কণিকাবাশিকে জ্বালিযে তুলে বিচলিত করে দিযে পুরুষটিকে, নিমেষনিহত করে বেখে নাবীকে হু হু কবে ছুটে আসছে চৈত্রের অবলাযিত বাতাস; ডানাব পালক ছিঁড়ে শাদা পাযবাব, উড়ন্ত কাকটাকে ধাক্কা দিযে কার্ণিশে কাত করে, শিমূলের তুলো উড়িয়ে কোথায় ছুটে চলে গেল তারা সব কমলা বঙের ঐ মেঘ—সুমাত্রা, শ্যাম, মালযের মত ছেঁড়াফোঁড়া মেঘেব আঁশ নিভিযে-নিভিযে ফেলে।

'না, আজ আর বেরুব না নিশীথবাবু।'

কী কববেন তা হলে?

'চলুন আপনাকে সেই বইটা দেব। আমিও একটা বই পড়ব এখানে ড্রযিংরুমে বসে।'

বই আনা হল। বাতি জ্বালানো হল। পড়তে বসল দু'জনে দুটো সোফায়। খুব কাছাকাছি নয়, দূরে নয়, নেহাত মুখোমুখি নয়, আড়াআড়ি-ভাবে মুখোমুখি।

'ভাগ বসালাম না তো আপনার নিরিবিলি বই পড়ার উপর নিশীথবাবু?' কোনো উত্তর দিল না নিশীথ। নিঃশব্দে পড়তে লাগল দু জনে, প্রায় দু ঘন্টা উতরে গেল। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের টিন থেকে বের কবে নিয়ে সিগারেট জ্বাললে—খেল—মাঝে-মাঝে তাকিযে দেখল নীল ধোঁযার সরু ফালির

সূচীপত্রে যান

দিকে-দেখল, বেড়ে বড় হয়ে শাদা নীল ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে সব। নড়ে-চড়ে বসল তারা—মাথা তুলে তাকিয়ে নেয়; পরের বার চোখাচোখির সময় ক্ষতিপূরণ করে কী যে বীতাশোক তিমিরাতীতভাবে, কিন্তু তার পরের বার চোখকে এড়িয়ে চলে চোখ, কোনো কিছু হয়েছিল স্বীকার করতে চায় না; উপলব্ধি করেছিল তাদের ভিতর একজন—নাকি দুজনেই তারা? কিন্তু তাও একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরল না কারো; নিজের সোফা ছেড়ে দু'মুহূর্তের বাইরের সন্ধানেও উঠে গেল না কেউ। কতদূর পড়া হল বই? শিখণ্ডীর মতন নয় বই, মনীষীদের লেখা; খুব ভাল জিনিস,—'কিন্তু ভাল জিনিসেরও বেশি খুব ভাল নয়,' বললে নিশীথ অনেক ক্ষণের নিস্তব্ধতা ভেঙে।

তার মানে? হাতের বইটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল নমিতা, ধিকি-ধিকি ভস্মস্নিগ্ধ হাসিতে, বই, নয়, কী-যেন অন্য কোনো কিছুর সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে অনুভব করে উঠে, ফিরে এল নিজের সোফায় নমিতা, হাতের বইটা বন্ধ করে রাখল নিশীথ।

কলকাতায় আসবার আগে নিশীথের জলপাইহাটিতে কয়েকটা দিন কী রকমভাবে কেটেছিল? জলপাইহাটি ছেড়ে নিশীথের কলকাতায় রওনা হওয়ার আগে সুমনার শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। জলপাইহাটি কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনেছে না নিশীথের—এখানে থেকে গড়িমসি করে লাভ নেই তার—কলেজের কাজ ছেড়ে দেবে ঠিক করেছিল নিশীথ—না-ছেড়ে দিলেও অবিলম্বে ছুটি তো নেবেই, ছুটি না দিলে কলেজে যাবে না সংকল্প করেছিল সে। এ রকম অবস্থায় দেশে পড়ে থেকে লাভ নেই কিছু—নিশীথের মন কলকাতায়—ঘুরে দেখে আসুক নিশীথ ঃ ভাবছিল সুমনা। নিশীথকে সুমনা নিজেই আশা-ভরসার কথা বলে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছিল কলকাতায়। সপরিবারে থাকা কলকাতায় গিয়ে? কোথায় পরিবার নিশীথের? কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে ভানু বাঁচবে না। ভানুর দিদি বেঁচে মরে আছে কোথাও, কোথায় যে বের করতে পারবে না কোনোদিন। কেউ কেউ বলে পদ্মা মেঘনার গ্রাম-জঙ্গলে বকের দ্বীপে, চিলের দ্বীপে মেয়েদের কান্নার সুর শোনা যায়—অনেক গভীর রাতে, কেউ-কেউ আরও দূরের খবর দেয়—করাচিতে, শিয়ালকোটে, পেশোয়ারে, লাহোরে, নিজামের দেশে হায়দ্রাবাদে? কোথায় নিয়ে গেছে রানুকে—অতদূরে নিশ্চয়ই নয়। কে কারা নিয়ে গেছে—তাও তো বলতে পারা যায় না। জলপাইহাটিতে কোনো চেনাজানা মানুষ সেই সঙ্গে সেই রাত্রে যে সরে পড়েছে তা তো শোনা যায়নি। কলকাতায় তখন দাঙ্গা হচ্ছিল বটে। কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা জলপাইহাটিতে ছিটকে পড়ে নি তো; কেউ শোনে নি। মনটা ছটফট করছিল সুমনার; কাঁচড়াপাড়ার ভানুর জন্যে; বাঁচবে না হয় তো; মরবে না হয় তো; কিন্তু ভানু এলাকার ভিতর আছে। মরে গেলেও ছাই হাড়, যে-জায়গাটায় দাহ করা হবে, নাগালের ভিতর চিহ্নের দেশে থেকে যাবে সব। কিন্তু বড়সড় সুন্দর মেয়েটি কেমন সুস্থ ছিল সূর্যতারার আগুনের মত, তার জন্যে দেশ নেই, সমাজ নেই, কেউ নেই, জীবন' নেই তার—মৃত্যু নেই।

কলকাতায় যাবার দু-একদিন আগে নিশীথকে বলেছিল সুমনা, 'তুমি তো যাচ্ছো কলকাতায়, রানুকে খুঁজে দেখো তো।'

'আচ্ছা দেখব'—বলেছিল নিশীথ। কিন্তু দেখবে না, খুব সমীচীন লোক নিশীথ, খুব আত্মস্থও বটে; মিছিমিছি মসজিদে ঢোকবার লোক নয় সে। ঢুকে কোনো লাভ নেই জানে সে ঃ নিশীথ সত্যিই জানে যে রানু নেই।

'আমি কলকাতায় চললাম, সুমনা।'

'কোথায় গিয়ে উঠবে?'

'জিতেন দাশগুপ্তের বাড়ি।'

'জিতেনবাবু বিয়ে করেছে শুনলাম—'

'কই আমি তো শুনিনি। কার কাছে শুনলে? ও বিয়ে করবে, আমাকে খবর দেবে না?'

'আমাকে যতীন হালদার বলেছিল। মগরাহাটির যতীন। কলকাতায় নানা রকম টুকিটাকি কাঁচামালের ব্যবসা করে; তা ছাড়া আরও কী বলছিল আমাকে'—সুমনা ছড়ানো ডান হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে মাথা হেঁট করে মনে করে নিয়ে বললে—'মনে পড়েছে, বলছিল ব্যাকেলাইটের ব্যবসা করে, ব্যাকেলাইট কী?'

'ব্যাকেলাইট। জানি না। তো যতীন কী করে জানল জিতেন বিয়ে করেছে?'

'দাশগুপ্ত সাহবের অফিসে যেতে হয় যতীনকে ব্যবসার কাজে। অফিসের লোকেদের কাছে শুনেছে হয় তো।'

সূচীপত্রে যান

শুনে, নিশীথ নিজেকে কেমন একটু কাবু বোধ করল যেন। কলকাতায় যাবার উৎসাহে একটু পোড় লাগল। জিতেন তা হলে বিয়ে করল—যেন। ভরতের বাটুল খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে হনুমান।

'আগে ভাল করে দেখেশুনে নাও।'

'খারাপ খবর কখনো মিথ্যে হয় না, লোকটি বিয়ে করেছে এত দিন পরে, শত্রুর ভালর জন্যে নয় নিশ্চয়ই।'

'সেটা খারাপ খবর হল। ভাল বন্ধুই বটে তুমি জিতেনবাবুর—'

অনেক যুদ্ধ করেছে জীবনে নিশীথ, কোনো যুদ্ধেই জয়ী হতে পারে নি। এখন আর লড়াইয়ে জেতবার আশা নেই তার। আচ্ছা শেষবারের মতো লড়ে দেখা যাক, এবার না-জিতে ছাড়াছাড়ি নেই। এ রকম কোনো সংকল্প উৎসাহ এখন নিশীথের হৃদয়ে নেই আর। কিন্তু স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছ্বাস রয়েছে; তা রয়েছে, সুযোগ পেলেই উপচে উঠতে চায়। নিশীথ সুমনার কাছে থেকে ঘুঙুর চেয়ে নিল; বানুর জন্যে কেনা হয়েছিল, বানু যখন ন-দশ বছরের। বানুর ঘুঙুর কোনো রকমে জোড়াতাড়া দিয়ে পায়ে এঁটে নিয়ে নিশীথ, কলকাতার এম্পায়ারে কী এক রাবণনৃত্য দেখেছিল এক-সময়, তেমনি দুর্দমনীয় ভাবে নাচতে-নাচতে বললেঃ 'সুমনা, যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন।'

'কে, বিলোচন কে? বিলোচন কে! নিশ্চয় দাশগুপ্ত সাহেব! তাই না? যবে বিবাহে চলিযা বিলোচন—দেবে না দেবে না যবে বিবাহে—বিবাহে—চলিযা.....দ্রুম দ্রুম—চোখ ঘুরিয়ে বাবরি উড়িয়ে রাবণনৃত্যে বাসুকির মাথা না থেঁতলে ছাড়ছিল না নিশীথ; কলেজের ফিলজফির প্রফেসর মহিম ঘোষাল এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। মহিমবাবুর সঙ্গে কথা সেরে এসে দরজা বন্ধ করে আবার নাচতে লাগল নিশীথ। সুমনাকে আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে নাচ থামাল। বললে, 'পারনিসাস এনিমিয়ার রুগি। এদের সঙ্গে ঘর করে মজাও করতে পারা যায় না একটু।'

'মজা কলকাতায় গিয়ে কোরো, দাশগুপ্ত সাহেবের বৌয়ের কাছে। তোমার এ-রকম নাচ দেখলে আমার মাথা যেন কেমন করে ওঠে।'

'কেমন আছে শরীরটা আজ?'

'বড় খারাপ লাগছে।'

'খারাপ!'

'খারাপ। মনে হচ্ছে যেন মরে যেতে বাকি নেই বেশি—'

নিশীথের হাত ধরে সুমনা তাকে নিজের বিছানার পাশে টেনে বসাল। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে বসল নিশীথ। অনিচ্ছাটাকে অতর্কিতভাবে চেপে রেখেছে ঠিক-কিন্তু তবুও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়ে স্বামীকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝে নিতে পারে কোনো-কোনো স্ত্রী। সুন্দর ছিল বটে সুমনা একদিন-কিন্তু কেমন হাড়-ফ্যাকাসে রঙ হয়ে গেছে—শরীরে হাড়গোড় ছাড়া কিছু নেই আজ তার। নিশীথ পণ্ডিত লোক, কিন্তু তবুও বিলাসী মানুষ, দেহরসিক আরো বেশি। কী করবে সুমনাকে নিয়ে আজ? স্ত্রীর শরীর একেবারে বাতিল। হাড়ের ভিতর দিয়ে চি চি করে যে-শব্দ বেরয়, নিশীথের মত মানুষের মনে খোরাক মেটাতে গিয়ে জাউয়ের মত কাজ করে তা, ভুসির মত ভুর হয়ে পড়ে থাকে।

'তোমাকে চেঞ্জে যেতে বলেছে ডাক্তার মজুমদার।'

'কোথায় যাব?'

'কোনো শুকনো জায়গায়ঃ কাছেই; দেওঘর, গিরিডি যেতে পারো, মিহিজাম, জামতাড়া, বাড়গ্রাম—'

'টাকা আছে চেঞ্জে যাবার?'

'ধার করে নিতে হবে।'

'প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে টাকা নেই?'

'সব নিয়েছি, আর নেই।'

'কার কাছ থেকে ধার করবে?'

'নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'জিতেনকে বলে দেখব।'

'কিন্তু জিতেনবাবু তো টাকা ধার দেন না।'

'সুমনার দিকে খানিকটা সরস বিস্ময়ে তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'কে বললে তোমাকে?'

'তুমিই তো বলেছ।'

'আমি বলেছি?' সুমনার মরুপুঞ্জে শালিখের মতো চোখের ঘোলাটে ভাবটা ভাল লাগছিল না

নিশীথের। একটা বেড়াল...ভারী ধবধবে সুন্দর তিব্বতি বেড়ালের মত মোটাসোটা সাদা ফনফনে লোমে লোমাচ্ছন্ন; বেড়ালটা মাদি; অর্জুন গাছের ছায়াকাটা রোদে বসেছিল; বেড়ালটার সুন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ সচকিত তাকিয়ে রইল নিশীথ; মুখটা বেড়ালের, না নারীর ছিল কোনোদিন! জীবনে সৌন্দর্যের প্রবেশ, নারীদের সঙ্গে অলিতে গলিতে ঘেঁষাঘেঁষি, নিশীথের জীবনে যে খুব বেশি ছিল কোনোদিন তা নয়—কিন্তু সম্ভাবনা ছিল, আবহাওয়া ছিল, প্রতিশ্রুতি ছিল।

'জিতেনের কাছে ভাল করে চেয়ে দেখি নি তো আমি কোনোদিন।'

'এবার দেখবে।'

'না দেখে উপায় কী?'

পাবে?

দেখা যাক, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের আরো সাতশ টাকা তুলে নিয়েছি। আরো তিনশ-চারশ আছে পি-এফ -এ' রেজিগনেশন না দিলে ও টাকা পাওয়া যাবে না। রিজাইন করলেও পাওয়া যাবে না। কলেজের লোন অফিসে আমার আটশ টাকা ধার আছে সুমনা।'

'সাতশ টাকা তুলেছ?'

'হ্যাঁ'

'কোথায সে টাকা?'

'তোমাকে দেড়শ দিয়ে যাব। মজুমদার আব তার কম্পাউণ্ডারকে পাঁচশ, আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে কলকাতায রওনা দেব।'

'ডাক্তারকে পাঁচশ দিতে হবে।'—কর্ণের চাকার মতো সুমনা আবো যেন বসে গেল খানিকটা মাটির ভিতর। এই চাকাটাকে উদ্ধার করে রথ চালিয়ে নিজেকে রক্ষা করবে নিশীথ? চারিদিক থেকে সমাজ সময়ের শয়তানরা যা চোখা-চোখা বাণ মারছে! কয়েকটা হাড়গোড় শুধু, কপালে সিন্দুর ঃ সুমনা জিভ কেটে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এ-রকম জিনিস খাটে চড়ে আসে! কত লক্ষবার দেখেছে তো নিশীথ ঃ আগুন জ্বলে ওঠে, সৎকার করে ওরা বাড়ি ফিরে যায। খাটে বেঁধে নিতে হবে; আগুন জ্বালতে হবে; দাহ শেষ হলে কলসি-কলসি জল ঢেলে দু-চারটে হাড় কুড়িয়ে এনে চান করে বাড়ী ফিরতে হবে। হাতভরা কাজ পড়ে রয়েছে সব। কিন্তু এ-সবের আগে সেই কাজও রয়েছে ঢের—যাকে বেশি দিন বাঁচালে বেশি টাকা খরচ হবে শুধু কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে না কিছুতেই, তাকে যত দিন সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এটা যে ভুয়ো সংস্কার নিশীথ জানে তা; কিন্তু তবু এ অসার জিনিসটার কাছে সেও জব্দ হয়ে আছে। রানু, ভানু, হারীত তিনজনেই শেষ করে গেছে সুমনাকে। তারপরে তত্ত্বাবধান করতে রেখে গেছে নিশীথকে। ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে নিশীথের আজ বেয়াইবাড়ি গিয়ে দুটো মিষ্টি কথা শুনবার সময় হয়েছিল কি—এদের দিকে না তাকিয়ে, জিতেনের কাছ থেকে ঋণ চাওয়ার ভাবনা মনের ত্রিসীমার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে হারীতের রোজগার খাওয়ার সময় হয়েছিল। কোথায় হারীত, কোথায় রানু-ভানুর শ্বশুড়বাড়ির ইসিইযার্কি ইষ্টকুটুম্ব সব, যে-পেঁচা ইস্ট কুটুম ঢুঢুম ঢুঢুম বলে উড়ে যায় সেই কুযাশা শ্মাশানের ভিতরে।

'তোমার ওষুধপত্র ইনজেকশন ডাক্তারের ভিজিট সমস্তই মুজমাদার আর তার কম্পাউণ্ডার জ্যোৎস্না সিকদার ঠিক করে দেবে। জ্যোৎস্না ছেলে ভাল, আমাদের কলেজে আই-এস-সি পড়ছিল, ছেড়ে দিয়ে কম্পাউণ্ডারি করছে।

মজুমদার খুব—'

'সাধু মানুষ। ঘোড়েল মানুষও বটে—'

'কেন বলছ সমুনা?'

'না হলে পাঁচশ টাকা নেয়—'

নিশীথ কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসেবে কষে দেখাতে গেল সুমনাকে, পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুমনা বললে,—'কোনো দরকার নেই হিসেবে আমার? জোচ্চোর যত সব—'

'তা হলে কি, টাকাটা ফিরিয়ে আনব?'

'দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে—সেই মুখে উল্কি কেটে শেয়ালের মতন?'

'তা মুখে উল্কি কেটেছি বটে। কী করব! কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করে দিই।'

সুমনা কিছুক্ষণ ঘরের কোণে-কোণে আট-দশ বছর আগের পুরনো শিশি বোতলগুলোর উপর

সূচীপত্রে যান

মাকড়সার পাতা জালের রাশি-রাশি নির্লিপ্তির দিকে তাকিয়ে থেকে অবসন্ন হয়ে বললে, 'কলকাতায় না-গিয়ে কী করবে এখানে বসে? কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়েছ না?'

'না দিইনি এখনো। ছুটি নিয়েছি।'

'নিয়েছ? মঞ্জুর করেছে?'

'এখনো জানতে পারিনি কিছু। দরখাস্ত দিয়েছি '

'তোমাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে।'

'দিক।'

'তা হলে এখানে বসে করবে কী? ভানুকে তো কাঁচাড়াপাড়ায় পাঠিয়ে দিলে। সে খরচ পোষাবে কী করে?'

'টাকা দিয়ে দিয়েছি কিছু। মাসখানেকের ভিতর দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

'আমার দেড়শ টাকা আমাকে দাও।'

টাকাটা হাতে নিয়ে একটু হাসি ফুটে উঠল সুমনার মুখে।—'কেন পড়ে থাকবে তুমি জলপাইহাটিতে। মুজমদার ডাক্তার ভাল, বুড়ো মানুষ অসৎ হবে না। পাঁচশ টাকা পেয়েছে—আমার একটা হিল্লে করবেই। আমার জন্যে ভেবো না। মহিমবাবুর স্ত্রী, ছেলে, ঘোষালমশাই নিজে, জ্যোৎস্না সিকদার, জিতেন সবাই তো রইল, তুমি কলকাতায় চলে যাও কালই। সুবিধে হবে সব দিক দিয়েই দাশগুপ্তের বাড়িতে। ওখানেই ওঠো। জিতেন দাশ-গুপ্তকে বলে একটা চাকরি বাগিয়ে নিতে হবে—যত তাড়াতাড়ি পাবো। ইচ্ছে করলে ও খুব বড় পোস্টে বসিয়ে দিতে পারে তোমাকে। ওর নিজের অফিসই তো আছে।'

নিশীথ পেটে-পেটে হাসছিল—আজকের পৃথিবীর লোকায়তের বল্গা রুখে তালপাতার সেপাইয়ের একই কথামৃত শুনতে-শুনতে। কিন্তু সম্প্রতি চোখ বুঝে স্ত্রীর দিকেই তাকিয়েছিল। বিন্দু-বিন্দু বিষণ্ন হাসিতে অন্তঃস্থল ঘামিয়ে উঠছিল তার, মৃত্যুশয্যায় মাথা পাতা সাদামাটা এই ঘোর বিশ্বাসী মানুষটির কথা শুনে।

'কলকাতায় গিয়ে আর-একটি কাজ করো তুমি। রানুকে খুঁজে বার করতে হবে'-সুমনা বললে।

রানু যে কলকাতায় নেই, কোথাও নেই যদিও-বা কোথাও থেকে থাকে সেখানে যে মনপবন ছাড়া আর কারোরই প্রবেশ নেই এ কথা সুমনাকে কী করে বোঝাবে নিশীথ।

'খুঁজে দেখব রানুকে।'

'আমাকে ছুঁয়ে বলো, বাপ যেমন মেয়েকে খোঁজে তেমনি করে খুঁজে বার করবে।'

'ছুঁয়ে বলছি বটে কিন্তু বাপের চেয়ে মায়ের মনই তো ছেলেমেয়েকে খোঁজে বেশি, মা যেমন মেয়েকে খোঁজে তেমনি করে, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, রানুকে খুঁজে দেখব আমি।'

কেমন একটা আশ্চর্য হাসি-হাসির ভিতরে এক-আধছিটে রক্তের কণাও যেন এল সুমনার ফ্যাকাশে মুখে—

'নাখোদা মসজিদে দেখবে।'

'কাকে?'

'রানুকে।'

'কে বললে সে সেখানে আছে?'

'অনেকে বলছে'।

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'ভুল বলেছে। কথা বলে নেশা জমিয়ে দিতে চায় ওরা। বড় সর্বনেশে লোক। ওদের চেয়ে আমি বেশি জানি।'

'কী জানো তুমি। 'রানু কোথায় আছে জানো?'

'আমি খুঁজে দেখব।'

সুমনা একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি কিছু জানি না। মেয়েকে হাত ধরে নিয়ে আসতে হবে দেশে। স্টেশন থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে তুমি ওকে রোজ সন্ধ্যায়; চোত মাসের মেলার থেকে হাতে ধরে ঝড়-বাতাসের, কু-বাতাসের থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে। আমি বলতাম মোমের আলো নাকি যে অত সন্তর্পণ। ও তো চাঁদ—কু-বাতাসে ওর করবে কী—' কিছুক্ষণ চুপ থেকে সুমনা বলল—'কিছু করেছে বটে কু-বাতাসে। ভানুর খবর কী?'

'এই তো যাচ্ছি কলতায়, কাঁচড়াপাড়ায় নামব একবার।'

'শনিবাব-শনিবাব যেও কিন্তু কাঁচড়াপাড়ায়। রববারটা থেকে এসো, ওর মামা আছে বটে ওখানে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ডেকে জিজ্ঞেস করত না; এখন কি গা দেবে?' নিশীথ চলে গেল একটু বাইরেব হাওয়া খেয়ে আসতে। কলেজের ফিলজফি-লজিকের অধ্যাপক মহিম ঘোষাল তাব পবিবার নিয়ে নিশীথদের ভাড়াটে বাড়িটার একটা অংশে রয়েছে। বাড়িটা এক তলা। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। সব নিয়ে ছটা ঘব—দুটো বান্নাঘর, দুটো স্নানের ঘর আছে। রান্না ও স্নানের একটা-একটা ঘবই ছিল। বাড়িটাব দক্ষিণ দিকের অংশে নিশীথবা দু বছর থাকে—উত্তবের ভিটেয় মহিমরা। দু বছর কেটে গেলে নিশীথদের উত্তবে যেতে হয়, মহিমদেব তখন দক্ষিণাযন।

এমনি করে বার বছর এ-বাড়িতে বেশ অজ্ঞাতবাসে কেটেছে নিশীথেব। দিনগুলো মন্দ ছিল না। কলেজেব কাজে মাইনে বেশি ছিল না, ঝঞ্ঝাটও তেমনি কি ছিল না। স্বাধীনতা ছিল এক রকম। মফস্বলেব উঠানের—মাঠেব ঘাসেব মতন একটা সহজ দিব্যতা ছিল হৃদয় শবীরেব নির্লিপ্তি ও শান্তিকে পরিব্যাপ্ত কবে। উত্তেজনা, উৎসব, মহৎ আকাঙ্ক্ষার দূবতায় ভাবুক নিশীথকে দিয়ে কথা ভাবাত, মাঝে-মাঝে দু-চারটে লিপি লিখিয়ে নিত—খুব সংক্ষেপেই। তারপব লৌকিক পৃথিবীব ব্যক্তিগত তুচ্ছতাব মৃদু সংঘর্ষের দেশে সে সব বড়-বড় বাতাসেব আক্ষেপ কোথাও কিছু আশ্রয় না পেয়ে নষ্ট হয়ে যেত। জলপাইহাটি ছেড়ে কলকাতায় যাবার সময় এই কথাগুলো ভাবছিল নিশীথ। জলপাইহাটিতে আব ফিবে আসা হবে না। সুমনা হয় তো মবে যাবে। বানুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; ভানুও যে ফুবিয়ে যাবে সেটাও নির্দোষ সত্য-কথনের অপব পিঠের মতনই সত্য ও নির্মল। অথচ জলপাইহাটিতে এদের সকলকে নিয়ে, হাবীতকে নিয়ে একটা যুগ—মানুষেব জীবনেব এক পুরুষ-কালই যেন কেটে গেছে নিশীথের। এবা আজ সকলেই প্রায় বিদায় নিয়েছে—নিচ্ছে; জলপাইহাটিব বাড়িও বিদায় নিয়ে গেল নিশীথের মন থেকে। বিদায়ের ভান কবেছিল এর আগে কযেকবাব। কিন্তু সে সব ভান ভেঙে ফেলবাব মত তোড়জোড় ছিল তখন চারিদিককার আবহাওয়ায়, জলপাই হাটিতে, পৃথিবীতে, নিশীথেব জীবনের ইতিহাসে। কিন্তু উনিশ শ আটত্রিশ উনচল্লিশ থেকে ইতিহাস যে-মোড় ধবেছে, চল্লিশ-একচল্লিশ-বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ-ছেচল্লিশে এসে কেমন যেন অস্বাভাবিক দ্রুততায় পুবনো পৃথিবীও স্বভাব শেষ কবে দিল সব। বানু যে হারিয়ে গেছে, সুমনা যে মবছে, ভানুব যে এই অবস্থা, হাবীত যে অলাতচক্রে ঘুবছে, এগুলো কোনো একটি বিশেষ পবিবারের বিচিত্র ব্যক্তিসর্বস্ব জিনিস নয়—আকস্মিক ঘটনা নয় এ সব—এ-বকম না হয়ে পাবত না। নিশীথের নিজেব জীবনদৃষ্টিও গত দু-তিন বছবেব ভিতব, সময়েব আগুনেব ভিতব নিজেকে ক্ষালন করে নিতে-নিতে অনুভব কবেছে পৃথিবীর স্থিব সত্যগুলো। স্থিব হয় তো, কিন্তু কেবলি নতুন ধারাপ্রপাতেব দ্রুততার ভিতব দিয়ে, নিজেদের স্থিবভাবে আবিষ্কাব কবে নিতে ভালবেসে তাবা—দ্রুত বিদ্যুতের চূড়োয-চূড়োয আকাশও যে বিদ্যুৎ ও ঝড়—এ-রকম বিভ্রম বিলাস জাগিযে তোলে আত্মহাবা মানুষেব মনে। কিন্তু ঝড়, বিদ্যুৎ, অন্ধকাব যখন সমস্ত শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে—তখন লক্ষ-লক্ষ মানুষেব দিশাভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নেই—হত, নিহত, নির্বাপিত হওয়া ছাড়া পথ নেই—ইতিহাসেব দু-তিন পুরুষ, ছ-পুরুষ, এক-পুরুষ যাবা এ-রকমভাবে ক্ষযিত হয়ে যায় তাবা ভবিষ্যৎ মানুষেব মনে জ্ঞান, হৃদয়ে অনুতাপ, শুদ্ধতা বাড়িয়ে দেয কিনা বলা কঠিন—কিন্তু নিজেদেব জ্ঞান সম্পূর্ণ করে যায এই জেনে যে মানুষের বিদ্যা বাড়লেও তাব জ্ঞান বাড়ে না, বাড়াতে গেলেও তা জ্ঞানপাপে দাঁড়ায গিযে। মানুষেব মন আলোকিত করতে পারে না (দু-একজন সৎ মনীষার মন ছাড়া) মানুষকে আশা, ভবসা, প্রতিশ্রুতি, শান্তি দিতে পারে না কিছুই। এ-রকম উপলব্ধিব কোনো যাথার্থ্য আছে বলে মনে করত না দু-চার বছর আগে নিশীথ। কিন্তু এখন কবে। এখন সে মানে যে এ যুগে এব চেয়ে যাথার্থ আর-কিছু নেই। এ যুগে ক্ষযিত হওযাই স্বাভাবিক—মৃত হওয়া, নির্বাপিত হওয়া—অবক্ষয় উত্তীর্ণ কবে ক্ষেম সূর্যেব মুখ দেখাকে অপর যুগের সুস্থিব সত্য বলে গ্রহণ করা চলতে পারে। কিন্তু সেই অপব যুগ কি এমনি-এমনি আসবে? ক জন লোক চেষ্টা করছে সেই যুগকে লাভ করতে? কী প্রণালী তাদের? কোথায সেই পদ্ধতি একটা শুদ্ধ বড় শতাব্দীকে নিয়ে আসতে হলে, পৃথিবীব্যাপী যে-সাড়া পড়ে যায। কোথায় সেই আশা ভবসা নিঃস্বার্থতা? আসল বোমাটা এর হাতে আছে বটে, কিন্তু ওব হাতে আছে কিনা এই তাড়নায তো আজকের পৃথিবী পঙ্গু। শুধু আমেরিকা বা রাশিয়া নয়—এশিযাব—আমাদের দেশেও পদ্মানদীর এপারে-ওপারে, রাষ্ট্র, সমাজে, পরিবারে 'ম'-কে ব্যাহত করবার কৌশল জানা আছে 'ক'-এর। জানা আছে কি 'খ'-এর-'ক'-কে বেচাল করবার কৌশল শুধু নয অস্ত্রসিদ্ধি? মনেব তপঃ-শক্তিতে মেশিনকে চালাতে পাবত হয

তো মানুষ, কিন্তু মানুষকে ছুটিয়ে চালাল মেশিন, মানুষকেই চালাল সে, যন্ত্রকে ব্যবহার করবার মত সততা ও মনীষা হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। এই সবই তরে আজকের পৃথিবীর নিহিত সত্য, কত কাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে থাকবে কে জানে।

তাই যদি হল তা হলে ইতিহাসে যে-সব আলোড়নের যুগ কেটে গেছে, বিলোড়নের দিনকাল আসবে বলে মনে হয়, সবই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু, দ্বেষ ও পতিতের ধর্মেই আবর্তিত হচ্ছে শুধু, তখন ইতিহাসের বিষ ও সোমরসের দিকে তাকিয়ে অতীত বা ভবিষ্যৎ সমাজের অমৃতত্ব ঘোষণা করে কী লাভ? কোনো বড় ঘোষণারই কোনো মানে নেই।

মনীষীরা অবিশ্যি ভাল বই লিখবে, নেতারা বিমিশ্র ভাষার কাঁচা বিবৃতি দেবে—পাকাতে পারবে, কবি-বিজ্ঞানীদের একটা বড় স্বৈরী অংশ সুখ-স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ মরে যাচ্ছে: পৃথিবীর থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে হিংসার পরিবর্তে হিংসা ফিরিয়ে দেবার বিজাতীয় লোভে দুর্বল ঠোঁট কেঁপে উঠছে কারু; রিরংসাকেই জীবনে সফল করে ভয়াবহ বৃষ-র্গদানের দোষে রক্তের চাপে মরে যাচ্ছে কেউ। আশেপাশ, 'এই তো তাকে দেখে ছিলুম, তাকে দেখছি না আর,' কারা যে বলে যাচ্ছে, দিনরাত দেয়ালে অনর্গল ছায়ার চারণায় তোমাকে আমাকে সকলকে মুহূর্তের মধ্যে ছায়ায় দাঁড় করিয়ে আছে, আলো আছে, ইতিহাসে কত বিখ্যাত যুগ কেটে গেছে, উদয় হবে না কি অতীতকে ভালো করে চিনে নিয়ে আবো বিশ্রুত সময়ে আবো ভালো আলোর। কিন্তু আজকের যুগের ইতিহাসের খাতায় যে-অঙ্ক লেখা আছে এর নিরেট সিদ্ধান্তকৌমুদীর পথে গরমিল লাগিয়ে ফূর্তি করতে গেলে, সেটা ফুর্তির ভুল—অঙ্কের ভুল নয়। তাই না কি নিশীথ?

ঠিক করে অঙ্ক কষেও কে তবু উৎসব আনতে পারবে? কোথায় সেই মহানুভব দিকনির্ণয়ীরা। সেই শিব অনির্বচনীয় প্রাণঘন আন্দোলন? কোথাও আছে বলে মনে হচ্ছিল না নিশীথের। কবি সে; বিজ্ঞানী মনের অতল উৎসের শ্রী ছাড়া কী আর কবির মন? নির্ভুলভাবে এ শতাব্দীর এ আবর্তের শোকাবহ অঙ্ক কষে—এরই ভিতর, যে-উৎসব রয়েছে তবুও, তাতে মজা করে জীবনের পথ থেকে একদিন সরে যেতে হবে তাকে।

জলপাইহাটি থেকে চলে যাচ্ছে নিশীথ, এখানে ফেরবার কথা নেই আর। জিতেনের ওখানে মাসখানেক থাকবে। জিতেনকে বলে ভাল চাকরি পাওয়া গেলে ভাল; পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। মোটা রকমের ধার পাওয়া যাবে না। দেখা যাক কী হয়। ডাক্তার মজুমদারের চিকিৎসার মেয়াদ কাটিয়ে সুমনা যদি বেঁচে থাকে তা হলে ফিরে এসে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। না হলে স্ত্রীর শ্রাদ্ধশান্তির জন্য হয় তো বা জলপাইহাটিতে দু-চারদিনের জন্য আসবে নিশীথ—হয় তো আসবে না।

এ-রকম অন্তিম অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে চলে যাচ্ছে কেন নিশীথ? এটা কি এ যুগের শোকাবহ অঙ্ক কষবার পথে একটা নিতান্তই ছোটখাট ধাপ নিকেশ করে নির্ভুল একটা যোগ কি বিয়োগ? ঠিক তাই।

কলকাতায় যাওয়া ছাড়া নিশীথের আর-কোনো উপায় নেই। নিশীথের হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, জলপাইহাটিতে কারু কাছে তেমন কিছু ঢালাও ধার পাওয়া যাবে না, পেলেও শোধ করে দেবে কী করে সে? কলেজের উপর নির্ভর করা চলে না এখন আর। অনেক দিন থেকেই কলেজের কর্তৃপক্ষকে সে কথা সে বলবে ভেবেছিল—কিন্তু দু পক্ষেরই শান্তি ও মেধাবৃত্তি ভাঙবার ভয়ে কিছুটা অবিচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও ব্যাপারটা চেপে-চেপে যাচ্ছে—সে কথাটা বাস্তবিকই এত দিন পরে তাদের বলে ফেলেছে সে—হয় তো অতিরিক্ত জোর দিয়ে। বলেছে ও দেড় শ টাকা মাইনেতে পোষাবে না তার, সোয়া দুশ-আড়াইশ, অন্তত দুশ কি দিতে পারবেন ওঁরা? না দিতে পারলে দুঃসময়ে নিজের পথ দেখা ছাড়া কী করবে নিশীথ? নিশীথ ছুটির দরখাস্ত দিয়েছে, কী কারণে দরখাস্ত, পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে নি; ডাক্তার সার্টিফিকেটও জুড়ে দেয়নি। কর্তৃপক্ষ মুখফোঁড় নিশীথকে কোনোকালেই বিশেষ পছন্দ করে না। এবারে নাকচ করে দেবে। দিক। যা করেছে ঠিকই করেছে নিশীথ।

সুমনাকে দেখবার জন্যে রইল ডাক্তার মজুমদার আর তার কম্পাউণ্ডার জ্যোৎস্না। ডাক্তারি করে মোটা টাকা পাচ্ছে বলে নয়, এমনিই ওর মন খুব পরিষ্কার—বেশ প্রশান্ত। ডাক্তারটি নিশীথের নিজের দাদার মত, কম্পাউণ্ডার জ্যোৎস্নার উপর ষোল আনা নির্ভর করতে পারা যায়; মজুমদার প্রায়ই বলে। সুপারিশটাকে নিশীথ খতিয়ে দেখেছে; অনুভব করেছে; হ্যাঁ; এতেই হয়ে যাবে; আর-কী।

মহিম ঘোষাল আর তার পরিবার তো সুমনার সঙ্গেই রইল এ বাড়িতে। মহিমের মাথাটা লজিক—মানে কলেজের লজিক দিয়ে, শানানো—বুদ্ধি দিয়ে নয়: বেকুব নয় তাই বলে মহিম: বিবেচনা

শক্তি—মনে হয় যেন আছে বেশ; খুব হাতে-কলমে না থাকলেও; ভিতরটা ভাল—তবুও সেটাকে যেন আরো ভাল করতে চাচ্ছে মহিম; এ জিনিসটা ফিটফাট ভালর চেয়ে ভাল।

মফস্বল কলেজের কর্তৃপক্ষ এ-রকম খানদানি মানুষকে ঠকিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিল—পনের বছরের সার্ভিস; মোটে একশ তিরিশ টাকা মাইনে। এ সব জিনিসের একটা বিধান হবে না এখনো? মহিমের মত বিবেচনা না-থাকলেও এর চেয়ে বেশি বুদ্ধি হবে না এখনো? মহিমের মত বিবেচনা না-থাকলেও এব চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে মহিমের স্ত্রী অর্চনার (তাকে অর্চিতা ডাকে নিশীথ), বুদ্ধিটা, নিজের স্বার্থকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু তাই বলে পরের ক্ষতি করবার কোনো মতলব নেই; পরের উন্নতি দেখলে তার খারাপ লাগে না। কুঁড়ে মানুষ; মাঝে-মাঝে কেমন গোরু-হরিণের মত চোখ তুলে তাকায; কেমন একটা বিসদৃশ সাদৃশ্য এসে পড়ে। কিন্তু একটা ঠিক—নিশীথের মত গাই-গোরু দেখার ছলে অবিনশ্বর কৌতুকে অর্চিতার দিকে তাকাবার মত লোক এ পৃথিবীতে কেউ নেই—কেউই নেই আর। অর্চিতাকে ভাল করে বলে দিয়েছে নিশীথ সুমনার কথা; সুমনাকে দেখতে-শুনতে বলে দিয়েছে।

'কিন্তু তবুও এ সময়ে তুমি থাকলে ভাল হত নিশীথদা।'

'আমি তো আছিই।'

'কেন, তুমি কলকাতায যাচ্ছ শুনলাম?'

'তোমরা চিঠি লিখলেই চলে আসব। দরকার হলে মহিম যেন টেলিগ্রাম করে—'

'বলেছ ওকে?'

'বলব।'

'কিন্তু কলকাতায কেন যাচ্ছ?'

'এখানকার কলেজের সঙ্গে বনল না।'

'ছুটি নিয়ে যাচ্ছ?'

'খুব সম্ভব কাজ ছেড়ে দিতে হবে।'

ছেড়ে দেবে? তা হলে আমাদের কী হবে? জলপাইহাটিতে সুমনাদি, হারীত—তোমরা থাকবে না আর!'

এর উত্তর কী দেবে নিশীথ? এতক্ষণ একটা ধূবস গোরুব, হয তো হরিণীর সান্নিধ্য অনুভব করছিল; গোরুটা বছরের পর বছর ধূসরতর হয়ে যাবে। নিশীথ অন্য দিকে মুখ ফিরিযে ছিল, অর্চিতার সঙ্গে কথা বলবার সময তার মুখের দিকে তাকায নি। মাঠের উপর শুযে আছি; শুযে আছি চোখ বুজে; কেমন একটা গন্ধ পাওযাতেই টের পাওয়া গেছে সাদাটে গোরুটা এসেছে—গোলাম কিউব্রিযাব; কাছেব। পুকুরে জল খাচ্ছে; কেমন একটা ফোঁস-ফোঁস শব্দ হচ্ছে; মাঠ-পুকুরে গাযের গন্ধ শব্দ—সবই যেন একটি মানুষের মধ্যে দানা বেঁধে কাছে দাঁড়িযে আছে; ভূতত্ত্বের প্রাণবিজ্ঞানের লক্ষ-কোটি বছরের ইতিহাস সত্ত্বেও জানিযে দিচ্ছে; মাটি মাঠ গোরু মানুষ একই জিনিস—একই সূর্যখণ্ডের থেকে জেগে উঠে একই বরফের দেশে লীন হয়ে আছে সব।

'একই জিনিস অর্চিতা।'

'কিসের কথা বলছ?'

'না, এমনিই, আমি ভেবে দেখলাম।'

অর্চনা একটু কাছে এগিযে এসে দু-এক পা পিছে সরে গিযে বললে—'কলকাতায যাওয়া আর না-যাওয়া? একই জিনিস। তা বটে তো। কেন যাচ্ছ তা হলে সে গাঁটকাটার দেশে। চার হাত পায়ে যেতে, ফিরে আসতে, কম-সে-কম পঁচাত্তর তো বটেই।'

'একই তো জিনিস, মাঠ আর গোরু।'

'মাঠ আর গোরু? নতুন শাস্তর বার করলে বুঝি। না, যাও তুমি, কলকাতায ঘুরে এসো, মাথায একটু হাওয়া লাগিয়ে এসো।'

অর্চিতার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল নিশীথ। এতক্ষণ অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে ছিল সে, এইবারে মাঠ দেখেছে, গোরু দেখে ফেলেছে। অর্চিতা নিশীথকে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল প্রায—হাসির হল্লায় দু-তিন পা পিছিয়ে গেল। ভাসা-ভাসা বড় চোখে গবাক্ষ পথ দিয়ে নিশীথের দিকে তাকাল, ঠোঁটের উপর একটু আঁচল টেনে, কি না-টেনে।

'হাসছ যে! হাসবার কথা কী হল। হেসে উড়ে গেলে দেখছি।'

নিশীথের হাসি থেমে গেল, বললে—'এই মাঠ ঘাট আকাশ বাতাস আর দেখব না' এখানে চল্লিশ বছর ছিলাম। চেনো কি গোলাম কিউব্রিয়াকে অর্চিতা?'

'সে কে?'

'আছে'—বললে নিশীথ, 'আছে একজন মুসলমান মহামন, পদা-এপারেব দেশে সম্প্রতি এসেছে—ওপারের থেকে—'

অর্চিতা নিশীথেব কথার ধারা লক্ষ্য করছিল; কী যে বলছে? কী না বলছে! তাব অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন ধরে থাকতে-থাকতে দু-চারটে ইংরেজি কথা সে শিখে ফেলেছে। এমনি অর্চিতা ক্লাশ নাইন অব্দি পড়েছিল। ভাবছিল লেগপুলিং কবছে না তো নিশীথ। মহিমের চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে অর্চিতা।

'কালিজিবা নদীব তীরে একটা মাঠ আছে, মাঠে একটা ধুলো বঙের গোরু থাকে। গোলাম কিউব্রিযার গোরু। মাঝে-মাঝে মাঠের উপব একজন মানুষ শুয়ে থাকে'—বলে নিশীথ অর্চিতাব দিকে তাকাল। মনে হল, নিশীথের ইঙ্গিত ধবে ফেলেছে যেন এই ক্ষমাহীনভাবে বুদ্ধিমহী মেয়েটি। কিন্তু তবুও ধবে ফেলেছে কি? গোরু দেখাব ছলে সারাৎসার কৌতুকে মাঝে-মাঝে অর্চির্তাব দিকে তাকায নিশীথ—আহা, জলপাইহাটিব এব একটা কী বকম চমৎকার ফলসানিব জিনিস ছিল। অথচ বার মাস এ দেশের আকাশ-বাতাস নদী-নক্ষত্র, কলেজেব কাজ, কথাবার্তা বাড়িতে। ফিরে এসে সুমনা রানু ভানুব সঙ্গে আলাপাচারি, তাবপরে ইংরেজি-ফারসি বই-নভেল নিয়ে ডেকচেযারে পড়ে থাকাব সঙ্গে নিখুঁতভাবে বিমিশ্রিত হযে। কী অপরূপা, কী অপরূপ গভীব ছিল সব—একই অন্তঃসারেব, তবু অনেক। বর্ণালির বারমাসের সব; নিববচ্ছিন্ন। সাবাৎসার। একে একে ছিঁড়ে গেল সব। শুকিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল। নিশীথ ইচ্ছে করেই ঘটিযেছে কি সব? না, ইতিহাস ঘটিযেছে? সমযেব হাতে আঁকিবুকি, অবোলা বাতাস, ধুলোব গুঁড়ো—নিশীথ আর তার পবিবাব-সকলের পরিবাব সমস্ত ব্যক্তির। সমস্ত পৃথবীর।

কিন্তু তবুও নিজে যতটা সে লুণ্ঠিত হযেছে, নির্মূল হযেছে, আবর্তিত-পরিবর্তিত হযেছে, মহিম-অর্চিতাদেব, বা কলেজের বা বাইবের জন্য সব নব-নাবীদেব বেলা সময ততখানি অশ্লীল অস্থিবপনায সক্রিয হয়ে ওঠে নি। এখনো যেন আট-দশ বছব আগেব পৃথিবীতে পড়ে আছে মহিম; সেই যুদ্ধেব আগেব জলপাইহাটিটাকে খুঁজে বাব কবে ঢেলে সাজাচ্ছে অর্চিতা। সাজাবাবও দবকাব নেই; কোনো প্রযাসেব প্রযোজন নেই যেন, নেই কোনো উদ্ভাবনা, এমনিই হযে যাচ্ছে সব।

নিজে নিশীথ এদেব মতন অচেতন থাকলেই তো পাবত। কেন দেখতে, বুঝতে, অনুভব কবে নিতে গেল। সমযেব আঙ্গুলেব নির্দেশে সেই বিস্মিসাবেব থেকে আজকেব স্ট্যালিন-ট্রুম্যানেব কবলিত মানুষেব মত পথ থেকে পথান্তবে স্ফুবিত, বিবর্তিত, নীত, নিঃস্ব হতে বাজি হযে গেল সে—যা নেই, সেই অমৃতেব নিরবচ্ছিন্ন বধিবতাব বিনিময়ে, ব্যক্তিকে বিক্রি কবে, অচেতন অন্ধকাব সমযকে মর্যদা দেবাব জন্যে।

'তুমি দাঁড়িয়ে আছো অর্চিতা এখনো। চলে গেছ ভেবেছিলুম।'

'কী যেন ভাবছিলে তুমি।'

'খুব লক্ষ্মী মানুষ তুমি'—নিশীথ বললে, 'আমি কলকতায চললুম, সুমনাকে দেখো তুমি আব মহিম। হাবীত যদি আসে'—থেমে গেল নিশীথ।

'হাবীত আসবে? কোথায় সে?'

'কোনো খোঁজখবব পাই নি। যদি আসে এখানেই থাকতে বলো তাকে। সুমনাব একটা এসপাব-ওসপার কিছু হযে না-যাওয়া পর্যন্ত।' নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'অন্তত আমি ফিবে না-আসা পর্যন্ত—'

'কোথায আছে হাবীত?'

'জানি না। তবে আমি বাড়িব থেকে- বেবিযে গেলে সে বাড়িতে ফিবলেই এক বাব। কত দিন আস্তানা গেড়ে থাববে বলতে পাবছি না। তবে আসবেই—আমি বেবিয়ে গেলে—শীতেব শেষে কুমোব পোকাব মতো একটা ছ্যাদা খুঁজে নিতে এ দেশে। ওকে বলে-কযে বেখে দিও তো ওর মার কাছে—' অর্চিতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে।

'মাব এ-বকম অবস্থা দেখলে এমনিই থাকবে। তুমি চলে না-গেলে ও ঘবে ফিরবে না, বাপে-ছেলেতে এই রকম সম্বন্ধ! আজীবন মাস্টারি কবে কী শেখালে—কী হল তোমাবা? কী ছেলে তুমি নিশীথদা।'

'এই তো হল, যা দেখছ সব হল।'

শুনে সুবিধার লাগল না অর্চিতার; অর্চিতার দুটো ভুরুর নীচে দুটো ভাসা-ভাসা শফরীকৃত পথে চারিদিককার আকাশ-বাতাস, ঝাউ, জারুল, শিশু, শিমুল তুলোব শাদা আকাশযান জ্যামিতির বাধা উপচে পড়া কেঁশরাশির মত ঘরদোর পুকুরের টলটলানি। চারিদিকে কাকের ডাক, কেবলই হাত থেকে ফসকে দোয়াতে কালি ছিটকে-পড়ার মত নষ্ট দিন। মৃত ভাঁড়ার, নতুন ফসল, সার্থক ঋজু অন্ধ বাত্রি, খেলে যেতে লাগল।

'ভানু কাঁচড়াপাড়ায় কেমন আছে?'

-'নাঃ বিশেষ ভাল না। বেঁচে উঠলেও আশান হওয়া কঠিন, আঠার ঘা লেগে থাকবে। যক্ষ্মারুগি তো।'—নিশীথ কথা বলতে-বলতে আধো হাঁ করে রইল—একটা ভবদুপুবের দাঁড়কাকের মত।

'যক্ষ্মার নতুন-নতুন ওষুধ বেরুচ্ছে, আগের মতন নেই—ও ঠিক হয়ে যাবে সব।'

নিশীথ কোনো কথা বললে না।

'তোমাদের তো কারো এই রোগ ছিল না কোনোদিন। বৌদিব বাপের বাড়ি ছিল?'

'কই জানি না তো।'

'রানুর কোনো খবর পেলে?'

'না।'

ঘাস খেতে-খেতে হঠাৎ চুনাপাথরের মত বঙেব এক-একটা গাভী যেমন নাড়ীব টানে চোখ তুলে, মুখতুলে, দাঁড়ায়, খুঁটোয় টান পড়ে, গলায় টান পড়ে দড়িটা একেবারে টান-টান হয়ে গেছে বলে, অর্চিতা তেমনি কেমন একটা নিস্তব্ধ অব্যক্তভাবে দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। গলায় দড়িতে টান পড়েছে প্রায়—খুঁটোটা মাটির ভিতবে অনেক দূব ডোবানো, খুব শক্ত; মুহূর্তেব মধ্যেই এই বিদঘুটে অস্বস্তিব ভাবটা ঢিলে হয়ে গেল—নিজের সহজ সত্তায় ফিবে এসে অর্চিতা বললে, 'আশ্চর্য—একেই বলে হাওয়া হয়ে যাওয়া। তুমি, আমি, কাকেব ডানা, ঘাসেব শিস কেউ কিছু জানল না, পুলিশে কোনো কিনারা করতে পারল না। জলপাইহাটি থেকে বেরুবাব দুটো তো পথ—একটা স্টিমাব লাইনে, একটা ট্রেন লাইনে। উনি বলেছেন এ দুটো দিয়ে স্টেশনেব কোনো লোকই বানুকে বেবিয়ে যেতে দেখে নি। বানু স্টেশন দিয়ে যদি যায় সে তো দেখার জিনিস; নদীব শুশুকগুলো অব্দি ঝুপঝুপুব করে চোখ পালটে দেখে যায়। কিন্তু কেউ দেখল না—'

'কে জানে গেছে কিনা। গেলে কি আব স্টেশন দিয়ে যাবে। নদীতে ডুবে গেলে কে খোঁজে পাবে তারে—'

'উঠবে তো গিয়ে কোথাও দেহটা।'

'কে জানে।'

আমি অবিশ্য একটা কথা শুনেছি, কাউকে বলবে না বলো।

'কার? বানুর কথা? কী শুনেছ?'

'এদিকে এসো—এই করমচা গাছগুলোর জঙ্গলেব ভিতব—ঐ দেযালটাব পিছনে, নিবিবিলি কথা বলবার জাযগা, কেউ দেখবে না।'

সামনে ঝুপসি তেপান্তব—নিশীথ নিস্পৃহ মুখে রোদেব বেলাব দিকে তাকিয়ে বলল,'না গো, কী বলবে এখানেই দাঁড়িয়ে বলো।'

'ওখানে কি কাঁটা ফুটবে। না গোখরো আছে?'

এখানেই দাঁড়িয়ে বলো—'

'আমাব কথা তুমি শুনবে না? কাল তো কলকাতায যাচ্ছ চলে।

আর-তো—'

দূবে মহিমেব ছায়া দেখা গেল, লম্বা-চওড়া, খালি গাযে, পিঠে পৈতে—লজিক হাতে। মহিম এদিকে আসতেও পাবে —নাও আসতে পাবে। নিশীথদের দিকে পিঠ ফিবিয়ে—একটা অদৃশ্য শুঁড় তুলে আছে যেন বাতাসের ভিতর। হাতির কাযদা। দল ছাড়া হাতিও বটে। নিশীথদের গন্ধ নাকে গেলে কী করবে বলা যায় না। তবুও এমনই বেকুব নিশীথ যে করমচা জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ঘন্টা দুই কাটিযে দেবার কথা ভাবতেও গেল না।

নিশীথ এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, মহিম ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার-চমৎকার স্যাণ্ডউইচের মশলা মনে করতে লাগল অর্চিতা নিজেকে (সুমনা তাকে বছর দুই আগে ডিম-পাউরুটির স্যাণ্ডউইচ

বানাতে শিখিয়েছিল)।

জিনিসটাকে খুব ক্ষমাব চোখে দেখলে নিজেকে মশলার পুব মনে করে একটা উড়ুঞ্চে তামাসা বোধ কবা চলে বটে। কিন্তু সে-চোখে সে দেখছে না। সমস্ত দোষ নিশীথেরই। বিষাক্ত চোখে সে নিশীথেব দিকে তাকাল। টের পেল নিশীথ।

মহিমের শুঁড়ও গন্ধ পেয়েছে যেন। অর্চনাও শাড়িটা ভাল করে জড়িয়ে-সড়িয়ে সাবধান হয়ে সরে দাঁড়াল।

'যেন তুমি সাপ বৌমা।'—অর্চিতাব দিকে তাকিযে নিশীথ বললে।

'তার মানে? আমাকে বৌমা বলছ কেন?'

'সাপও তো বলেছি। তাব চেযে বড় গাল হল বৌমা বলা?'

'সাপ?'

'সাপ।' চমকে গিয়ে-তেজ বেঁধে সবে দাঁড়ালে তো সাপেব মত খুব হুঁশিযার হযে? যেন ধুলো উড়ে আসছে অনেক দূবের থেকে। 'মহিম! ও মহিম।'—নিশীথ গলা ছেড়ে ডাক দিল।

কিন্তু অর্চিতা ও নিশীথ কেউই দেখেনি—লজিকেব বই হাতে নিয়ে মহিম অনেক দূরে চলে গিযেছিল। এই বারে মোড় ঘুবে বিশুদের কুল-তেঁতুলগাছেব ভিতবে অদৃশ্য হয়ে গেল; খুব সম্ভব বর্নবিহাবীবাবুব ছেলেকে লজিক বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছে। বর্নবিহাবীবাবু কলেজেব কমিটিব খুব ঠাঁটাবি মেম্বাব। তাঁব ছেলেকে লজিক-সিভিকস পড়িযে দেবাব সুবুদ্ধি মাঝে-মাঝে চেপে বসে মহিমেব মাথায়; বিনি পযসায পড়ায। বিনিময়ে সে কোনো পুবস্কাব আশা কবে না। পায ও না। অনেক বছব চাকবিব পবে মাইনে এখনো। এক শ ত্রিশ টাকা!

পড়িয়ে তৃপ্তি মহিমেব—কলেজ কমিটিব ঘোড়েল মেম্বাবেব ছেলে নিত্যেনকে পড়িয়ে তৃপ্তিটা নাভিব ভিতব থেকে ছড়িযে পড়তে থাকে, যেন সমস্ত শবীবে অনেকক্ষণ টিকে থাকে। বড়লোকেবা কাউকে কিছু দেয না, জানে নাকি মহিম? তবুও ও-সব মানুষকে নিষ্কাম খোশামোদ কবতে খুব ভাল লাগে।

'ওকে ও-বকম হাঁকডাক করে ডাকলে যে তুমি?' অর্চিতা বললে।

'তুমি আমি আকাশ বাতাস মহিম-এব ভিতব ডুকরে উঠতে ভাল লাগে ঐ নীল জলজঙ্গলেব ডাকপাখিটাব মত। শুনেছ সে ডাক; চকচকে বোদে, বেশি বাত্রেব নক্ষত্রে? কোথায় গেল মহিম?'

'নিত্যেনদেব বাড়ি।'

'লজিক পড়াবে?'

'পড়াবাব তাবিখ কাল। আজ হয তো এমনিই গেল। আগেব থেকে না জানিযে বাখলে নিত্যেন অনেক সময়ে ভুলে যায, তাই মনে করিযে দিতে গেল হয তো। গেল যখন, দু-এক পাতা পড়িযেও আসতে পাবে। তোমাকে বানুব কথা বলব বলেছিলাম।'

'বলো।'

'বোদ চড়েছে এখানে। চলো, কবমচার বনে।'

নিশীথ গড়িমসি কবতে লাগল আবার। বললে, 'আচ্ছা, যাচ্ছি। এসো এ ছাযায বসা যাক। জাম-তেঁতুলের ছাযা পড়েছে এখানে। লোকজন চলছে-ফিবছে বটে সব চাবদিকে—কিন্তু আমাদেব কথায কান দেবাব কে আছে। শান-বাঁধানো বোযাকেব উপর বসো তুমি, আমি এই গাছেব গুঁড়িটায—আঁ্যা—হ্যাঁ।'—বলে, একটা শব্দ কবে নিশীথ গুঁড়িটার উপব বসে পড়ল, 'নাও ন-বৌ, এখন বৌনি কব।'

অর্চিতা গোঁজ হয়ে বসে বইল কিছুক্ষণ।—'ন-বৌ কেন?'

'মহিম তো আমাব চেযে ছোট। যেন মহিম আমার ছোটভাইযের ন-দাদা। তাহলে তুমি ন-বৌ হবে না আমাব?'

'ও'—অর্চিতা একটু তেরছা কান্নিক মেরে বললে, 'কিন্তু লোকে দেখলে তোমাকেই ন-ভাই বলবে বড় দাদাব।'—মধুবিষ দৃষ্টিতে অর্চনা তাকাল নিশীথেব দিকে।

'কী হযেছে বানুব। কী শুনেছ তুমি বলো।'

'আমি শুনেছি—'

'চলো কবমচা বনেই যাই। ধ্বসা দেযালে ঠেস দিয়ে ঘাসের উপর বেশ আবাম করে বসা যাবে। কোথাও কেউ নেই—থমথম থিমথিম কবছে তেপান্তর।'

গাছের গুঁড়িরা নিশীথকে বিঁধছিল: নারকোলের গুঁড়ি, খোঁচা-খোঁচা এবড়ো-খেবড়ো, কোথাও এমন একটু জায়গা নেই যেখানে বসে স্বস্তি ' ওয়া যায় একটু-

'না, যাব না'—খুব বীতকাম দৃঢ়ং য় অর্চিতা বললে।

'কেন যাবে না? চলো যাই'—নিশীথ উঠে দাঁড়াবাব উপক্রম করল।

'সে হয না। তুমি যেতে পারো, আমি যাব না' সংকল্পের চেয়ে ওর গলাব কঠিনতাটা—নিশীথেব মনে হল—এমন অন্তিমে ঠেকেছে যে এবার আঁট শোনাপাপড়িব মতো চুর চুব করে ভেঙে পড়বে সব।

গুঁড়িটার উপর একটু সুবিধে করে বসবার চেষ্টা করে নিয়ে নিশীথ বললে, 'বলো দেখি, কার কাছে কী শুনলে?'

'স্টেশন দিয়ে যায় নি। রানুকে ওরা ফুসলেফাসলে গঙ্গাসাগবের মেলায নিয়ে গেছল। অন্ধকার বাতে গা ঢাকা দিয়ে নৌকোয বকচরের খাল দিয়ে। বলে পীববদরের কুদবস্তিতে পালিয়েছে।'

'ওরা?—ওরা কারা?' নিশীথ চারিদিকে তাকিয়ে অর্চিতার কাছ ঘেঁসে এসে বসল রোযাকের উপব।

'সেই গঙ্গাসাগরের মেলার থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল কলকাতায। কলকাতায তখন দাঙ্গা—বড়। দাঙ্গাটা—আগস্ট মাসের। রানু কাটা পড়ে নি। বাজাবাজাব জানবাজার বেকবাগান চিৎপুব হয়ে এখন কোথায আছে তা কেউ জানে না। কিন্তু আছে।'

নিশীথ খানিকটা সরে বসে, হেসে, বললে, 'এ-সব কে বললে তোমাকে?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'নাম বললে না তো কাবো।'

'যে বলেছে তার নাম দিয়ে কি হবে। কে করেছে দেখ।'

'কে করেছে? কার কথা বলে ওরা?'

অর্চিতা যেন তাব দুটো চোখ সামদান কবে তাকাল নিশীথেব দিকে, বললে, 'বলব তোমাকে। তোমাব কাছে তো না-বলার কিছু নেই আমার। জানি তুমি বলবে না কাউকে। কোনো কিছু কুলকিনাবা না কবে আমলা-হামলা করবাব মানুষ তুমি নও। নাম বলছি—চলো কবমচাতলায যাই—বড্ড রোদেব হল্কা এখানে।'

দূবে মহিমের ছাযা দেখা দিল—লজিকেব বই হাতে নিয়ে ফিবছে। লজিক কী, লজিক কেন, সমস্তই যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিয়ে আসবাব চেষ্টা করেছে।

'উনি এসে পড়েছে।'—অর্চিতা পা বাড়িয়েছিল করমচা বনে যাবাব জন্যে, ফিবে এল; রোযাকেব উপর বসল।

'উনি এসেছেন তো কী হয়েছে। চলো—।'

'না। ওঁর চোখে লাগে।'

'ঐ তো মহিম মোড় ঘুবল দেখছি। বাড়ি এল না। কোথায যাচ্ছে?'

'মুরলীবাবুর লাল ইঁটেব বড়ো দালানটাব দিকে যাচ্ছে। তুমিও তো দেখছ। এলাহাবাদ থেকে করালীবাবুর মেযে এসেছে- এখানে কাকাব বাড়িতে থাকে; প্রাইভেট বি-এ দেবে এবাব—'

'তাকে ফিলজফি পড়াতে হবে?'

'তা তো হবে। কিন্তু এটাও খুব সম্ভব অনাহাবী; আচ্ছা মানুষই বটে। আমাব কপালে আব ওঁর কপালে; একেবারে ধুলোর আটা দিয়ে। কোন খণ্ডন নেই।'

নিশীথ একটু হেসে বললে, 'গঙ্গাসাগবে কে নিয়ে গেছল রানুকে?'

'ববেন মিত্তির!'

'বরেন মিত্তির! নবেনেব ভাই?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নরেন মিত্তিবের মেজ ভাই।'

'কোন নবেন মিত্তিব? যে সুমনাকে বক্ত দেয়।'

'আস্তে-আস্তে। হ্যাঁ, সেই নরেন। কেউ-কেউ বলে বরেন-টরেন নয। এ নরেন মিত্তিরেব নিজের কাজ।'

নিশীথ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। হাঁ-টা বুজে দাঁতে দাঁতে খিল লেগে গেল যেন; চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ঢিলে করে দিতে চাইল চোয়াল, দাঁত। কিন্তু আবো শক্ত আবো সমগ্র হয়ে উঠতে লাগল সব; সমস্ত শরীর ছেয়ে পড়তে লাগল।

অর্চিতা এসে তার হাত ধরে টেনে বললে, 'কী হল তোমার। আচ্ছা মানুষ তো তুমি, নাও ধুলো ঝেড়ে ওঠো তো এখন।'

'কিছু হয় নি। ঠিক আছে। বসো তুমি।'

'এখনি তুমি কিছু করতে যেও না। এখন রাগ করলে ভেস্তে যাবে সব। পুলিশটুলিশ সব ওদের হাতে।·নরেনের বাবা বড় উকিল মানুষ। গর্নমেন্টের পি-পি'।

নিশীথ যেন আরেক রাজ্যে চলে গিয়েছে; ডুবুরির মত সমুদ্রের অনেক নিচের থেকে অন্ধকারের থেকে, যেন বললে, 'পি-পি-পি নয়তো?'

'সে আবার কী?'

'পারফোরেটেড পাবলিক প্রসিকিউটর।'

জানালার ভিতর দিয়ে উঁকি মারে সুমনা বলে 'কারা কথা বলছ গো এতক্ষণ ধরে। যেন টাপুর টুপপুর টুপুর টাপপুর টোপাকুল পড়ছে তো পড়ছেই—পড়ছেই—পড়ছেই, বোস মল্লিকদের খিড়কির পুকুরে। কে গো? ও তুমি আর অর্চিতা, মহিমবাবু কোথায়?

'মহিম পড়াতে গেছে। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?'

'আমি সুমন্ত্রর মার ওখানে গিয়েছিলাম—'

'বাপস, হেঁটে না রণপায়? নরেনের রক্তের জোর আছে বলতে হবে, কোথায় যাচ্ছ?'

'চান করতে যাচ্ছি, বিশুবাবুর দিঘিতে। তিনদিন চান করি নি... হাত পিঠ মুখে খড়ি উড়ছে'—চি চিয়ে-চিচিয়ে বলতে-বলতে চান করতেই বোধ হয় বেরিয়ে গেল সুমনা—উত্তরের দরজা দিয়ে—

নিশীথ গলা ছেড়ে চিৎকার করে বললে, 'দেখো আবার, বিশুবাবুর দিঘির চিংড়ি মাছে খেয়ে না ফেলে যেন।'

অর্চিতা চেঁচিয়ে বলল, 'দেখো সুমনাদি, আবার জলপিপিতে ভাসিয়ে না নিয়ে যায় যেন। আমরা এখানে স্থলপিপির কথা বলছি।'

সুমনা চলে গেছে । এসব হাঁক-হাঁকড় তার কানে পৌঁচেছে কি না সন্দেহ।

'নরেনের কলকাতার ঠিকানা তোমাকে আমি দিয়ে দেব। কোথায়, ফরডাইস লেনে, না কোথায় থাকত—গিরিবাবুর লেনে গিয়েছে। নাকি আগের জায়গাতেই আছে। আমি টুকে এনেছি সব—নরেনের কালুখুড়োর কাছ থেকে। নরেনের বাপটা যেমন জোচ্চোর—ওর খুড়ো তেমনি ভদ্র ভাল বিশ্বাসী মানুষ—'

'কলকাতায় যাবার আগে দিও নরেনের ঠিকানা আমাকে, কিন্তু কী হবে। যা নয়, তাই অর্চিতা।নরেনরা এর মধ্যে নেই। রানুর আর-কিছু একটা হয়েছে। তাকে ফিরে পাওয়ার কোনো কথা নেই।'

নিশীথের ও-সব বোকা কথা, ভাল কথা শুনবার কোনো প্রয়োজন আছে স্বীকার না-করে অর্চিতা বললে, 'বোশেখ মাসে নরেন কলকাতায় যাচ্ছে। ঠিক করে যাবে, গিয়ে ক-দিন থাকবে তোমাকে পরে জানাব আমি। কার বাড়িতে উঠবে তুমি কলকাতায়?'

'আমি খুব সম্ভব বালিগঞ্জে থাকব। জিতেনের ওখানে। মস্ত বড় সাহেব তো আজকাল জিতেন। বিয়েও করেছে। জিতেনের বাড়ি ক-দিন থাকা হয় বলতে পারি না।'

'কলকাতায় নরেনের বাড়িতে গিয়ে জিনিসটা নিয়ে কোনো হই-হল্লা করো না। জিতেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তোড়জোড় করে লোকজন মোতায়েন রেখে নরেনকে চা খাওয়াতে ডেকে নিয়ে যেও তোমাদের বাড়িতে।'

'কী করা যাবে তারপর?'

'তার পর কথা বের করে নিতেই হবে—যে-করেই হোক। ও সব জানে, ব্যাটা ছুঁচোর ব্যাটা। হাড় ক-খানা আস্ত থাকতে দেবে না। কথা না-বার করে ছেড়ে দেবে না।'

'আমার সঙ্গে তুমিও কলকাতায় চলো অর্চিতা।'

'চলো করমচাতলায়, উঃ বড্ড রোদ এখানে।'

লজিক হাতে মানুষটি কোনোদিকে নেই তো। না নেই। চারিদিকে ভাল করে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল তারা। নিশীথরা এগিয়ে পড়ছিল; কিন্তু খানিকটা দূর যেতে না-যেতেই অর্চিতাকে কেটে পড়তে দেখে নিশীথ পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখল জাম, তেঁতুল, সববতি লেবুর ঝাড়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে মহিম; নিশীথকে দেখে নি, অর্চিতাকে দেখে নি। না [?] দেখবার আগে পাশাপাশি দুটো অর্জুন

গাছের পিছনে সরে গেল অর্চিতা। তারপর সময় হলে বেরিয়ে নিরালা পথ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল কেমন যেন অপরূপ পিয়াসিনীর মতন। নিশীথ ছাড়া কেউ দেখল না তাকে।

নিশীথ নরেনদের বাড়ির দিকে যাবে কি না ভাবছিল। কলকাতা রওয়ানা হবার আগে রানুব সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সন্দেহ মনেব মধ্যে দানা বেঁধে না উঠলেই ভাল। এ সম্বন্ধে সে পরিষ্কার হয়ে নিতে চাচ্ছিল। বারবার নিজের মনকে বলেছে সে, তার স্ত্রীকে, আরো দু-চারজন লোককেও বলেছে যে, রানুকে কোথাও পাওয়া যাবে না, এ-রকম উপলব্ধি দিয়ে মনটাকে শক্ত করে বেঁধে নেওয়া ভাল, কারণ, যা নেই তাকে কী করে পাওয়া যাবে। এ পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে এই যে, এখানে ক্ষুরধারে শ্রীছাঁদের মনের সব স্নিগ্ধ জিনিস হারিয়ে যায়; হারিয়ে গেলে আর আসে না, কোনো সুবলয়িত সৎ প্রশ্নেরই সদুত্তর পাওয়া যায় না মানুষের জীবনে। কেউ বলে উত্তর পাওয়া যাবে সেবাযেতদের কাছ থেকে। কিন্তু এরা বা বিজ্ঞানীরা যে উদ্দেশ্যের ভিতর কাজ করে তার বাইরে অনেক দবকাবি নির্দেশের কোনো খোঁজ বাখে না তারা; বলে জানি না; অলৌকিকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে তাবা বলে, আমাবা নেই। নেই, এই কথাই ঠিক। নেই, কোনো উত্তর নেই। যা চাই তা নেই, যা শুভ্র ও শূন্য তাকে আহ্বান করে নিজের মনকে সুস্থ করে নেওয়া দরকার সুমনার-অর্চিতার; কিন্তু নিশীথেব মনেব সুস্থতাব দাবি আব-এক বকম। ভাবতে-ভাবতে হাসি পাচ্ছিল নিশীথেব। গা ঝাড়া দিয়ে নবেনদের বাড়ির রাস্তা ধবে চলল নিশীথ।

'কে আছে বাড়িতে? নরেন আছে?'

'নিশীথবাবু যে। আসুন। আজ কলেজ ছুটি বুঝি?' নবেনেব কাকা কালু মিত্তিব নিশীথকে বাড়িব ছোট বৈঠকখানায নিয়ে গেল। আব-কেউ ছিল না সেখানে, 'কলেজ আজ ছুটি?'

'জানি না তো আমি। নিজে ছুটি নিয়েছি আমি।'

'ছারপোকার চেযারে বসেছেন। বেতের ইজিচেযারটায বসুন। ওটাকে দু দিন ধরে ডিডিটি দিয়ে ঠিক করে নেওয়া হয়েছে।

'বেশ ফরাশেই বসা যাক না কেন। চমৎকাব ধপধপে ফরাশ কালুবাবু, দিব্যি বসেছেন আপনি—'

'বসুন বসুন- তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসুন। ভেবেছিলুম ইজিচেযাবে বেশি আবাম পাবেন।'

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসল নিশীথ। এ ভাবে বসবাব প্রযোজন হয নি কোনো দিন। কেমন একটা নবাবি জমিদাবির তেলচিটে ঠেকাবেব ফেনায, ফেনিলতায ফবাশ তাকিয়া উপচে উঠত তাব মনে, যখনই এ জিনিসগুলোর উপব দৃষ্টি পড়ত।

'আরাম পাচ্ছেন নিশীথবাবু?'

'পাচ্ছি। প্রকাশবাবু বাড়ি আছেন?'

'না। কেন বলুন তো'।

'পাবলিক প্রসিকিউটাব হযেছেন না তিনি?'

'সে তো প্রায দু বছব হতে চলল—'

'বরেন কোথায?'

'বরেন বাড়িতে নেই—জলপাইহাটিতে নেই' গোল্ডফ্লেক টিনেব মাথায দেশলাই চড়িয়ে নিশীথেব দিকে এগিযে দিয়ে কালুবাবু বিদবিব নলটা মুখেব কাছে নাড়তে-নাড়তে বললে, 'ববেন মেহেবপুব গেছে দিন দুই হল।'

'কবে ফিববে?'

'বলতে পারি না তো।'

'ও তো কলেজে পড়ছিল—'

'হ্যাঁ, বি-এ ফেল করল এবাব।'

'কী কবে আজকাল?'

নিশীথেব দিকে সুস্থ ধীব চিলের মত চোখে তাকিয়ে এক-আধ মুহূর্ত নল টেনে নিয়ে চুপ করে কথা ভাবল যেন কালুবাবু। 'করে? হিঁযাকা মাটি হুঁযা ফিকো, হুঁযাকা মাটি হিঁযা—এই করে আব-কি।'

নিশীথ হেসে বললে 'তা বটে। কলেজে পড়বে না আর?'

'পড়ে কী করবে? আপনাদেব চোখে ধুলো দিয়ে কত তোড়জোড় করে বি-এ পরীক্ষা দিল। আঙুলের বড়-বড় চওড়া নখে মিনে কেটে প্রশ্নেব উত্তব লিখে নিল, ঢাকাই মসলিনের মতন এক রকম কাগজ খুঁজে বের করেছে কোথেকে—হয় তো অর্ডার দিয়ে তৈবি করিয়েছে—একটা আফিমের গুলিব

মত পুটুলিতে এক মাইল কাগজ আঁটে—তাইতে আপনাদের বি-এ একজামিনে দরকারি যত শাস্ত্র ঝেঁটিয়ে লিখে নিল—ধরতে পেরেছিলেন আপনারা?'

নিশীথ অভিনিবিষ্ট হয়ে শুনছিল, জানাশোনা কথা তো সব; যে-ছেলেরা বছরের পর বছর পরীক্ষা দেয়, বাইশ-চব্বিশ বছর ধরে তাদের তো ঘাঁটিয়ে আসছে নিশীথ, তবুও একেবারে হালে যে-রকম রকমারি ধাড়ছে ছেলেদের। 'তারপরে ঘন্টায় একশ বার করে জল খেতে আর ফেলতে বাইরে গিয়ে নোট আর তোতাপুরী ছুটিয়ে জয়হিন্দ বলে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ত—কী করতে পেরেছিলেন আপনারা। পরীক্ষার সময়ে গার্ড দিয়েছিলেন তো এদের বডিগার্ড হিসেবে।'

কালুবাবু নলটা মুখে নিতে গিয়ে সরিয়ে রেখে বললে, 'আমাকেও গার্ড দিতে হয়েছিল আপনাদের কলেজের বি-এ পরীক্ষায়। আপনাদের প্রিন্সিপাল লিখে পাঠালে, আসুন একটু পাবলিক সার্ভিস করে যান। টাকা দিতে পারব না। কিন্তু, মিষ্টি খেতে দেব রোজকার ইনভিজিলেশনের পারিশ্রমিক হিসেবে। ওকালতি করে খাই, আজকাল মন্দা পড়ে এসেছে, ভাবলুম যাই-ই, একটু পাবলিক সার্ভিস করে আসি গে। যে-রুমে হরেন পরীক্ষা দিচ্ছিল সেখানেই গার্ড দেবার জন্যে ফেললে আমাকে। মিনিট পঁচিশেক পায়চারি করে দেখছিলুম। দেখলুম, সকলেই টুকছে, সকলেই গাঁট কাটছে, আমাকে দেখে চক্ষুলজ্জার খাতিরে হরেন সুবিধা করতে পারছে না। তবে হ্যাঁ, নখগুলো বার করে দেখছে, ঢাকাই মসলিনও মাঝে মাঝে বেরুচ্ছে।'

'কী করলেন আপনি?'

'কী আর করব। এক ছোঁয়ে দশ-বারোটা ছেলেকে বারকরে দিতে হয়। এদের তাড়িয়ে দিলে হরেনকে বাদ দেওয়া চলে না। ঘরের বারান্দার দিকে দরজার কাছে বেয়ারাকে বললুম চেয়ারটা রেখে দিতে। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে চেয়ারে গিয়ে বসলুম'—নিশীথ বিষণ্ণ নিস্তব্ধভাবে কালুবাবুর চোখের নাকের আদলে পরিস্ফুট রোগা রোঁ ঝরা চিলের দিকে তাকিয়ে রইল। যা বল্লেন কালুবাবু নিশীথ জানে সব। জেনে-জেনে এত ঘাগি হয়ে গেছে যে কালুবাবুকেই দেখছিল নিশীথ, তার কথাগুলোকে ততটা আর নয়।

'আপনাদের কলেজের একজন অধ্যাপককে দেওয়া হয়েছিল আমার সহযোগী হিসেবে। তিনিও ঐ রকম জোড়াতাড়া দিয়ে তিন ঘন্টা কাটিয়ে দিলেন আর কি—'

কালুবাবু নল মুখের থেকে নামিয়ে নিয়ে বললে, 'জানেনই তো নিশীথবাবু, সব। সে ঘরে প্রায় দেড়শ ছেলে ছিল—আমি ঘুরে-ঘুরে দেখলুম, ওদের মধ্যে সত্তর-পঁচাত্তর জনকে বের করে দিতে হয়, সার্জারির কাঁচি দিয়ে কান কেটে পাছার উপর ট্রেইটর লিখে। কে করবে তা? গোবেচারি প্রফেসররা না তাদের প্রিন্সিপাল? তবেই হয়েছে! জানেন না, কী ভীষণ ট্রেড ইউনিয়ন ওদের।'

'ট্রেড ইউনিয়ন?'

'সবচেয়ে দুর্বার ট্রেড ইউনিয়ন। ওদের ব্যাপারে বেশি নাক ডোবাতে গেলে ঘরে-বাইরে রাস্তাঘাটে হায়রান করে ছাড়বে মাস্টারমশাইকে—'

'সেঁটে ঘুষি জমিয়ে দেবে'—একটি বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে দোর-গোড়ার থেকে বললে।

'ওরে হরেন'—সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে কালুবাবু বললে, 'তোর নরেনদা বাড়িতে আছে নাকি রে?'

'না নেই'—ছেলেটি ফেঁসে খসে পড়তে-পড়তে বললে।

'কখন আসবে? কখন ফিরবে বাড়ি?'

নাগালের বাইরে চলে যেতে-যেতে গলা বাজিয়ে হরেন বললে, 'গোবাচাঁদ কখন বাড়ি ফিরবে, শুধোচ্ছে আমাকে। ভকত ভবনের ছ্যাদায় পাম্প না ঢুকিয়ে, পেট না ফুলিয়ে ও ফিরছে আর।'

'দেখলেন তো নমুনা'—কালুবাবু বললেন।

'প্রকাশবাবুর ছেলে বুঝি?'

'হ্যাঁ পিণ্ডির ছেলে বুঝি। পাম্প ঢোকাবার কথা বলছে।'

'ওর সাহস তো কম নয়। এ বাড়িতে কেউ নেই আর?'

কালুবাবু হাতের নলটার দিকে তরাসে পাখির মত খুব তাড়াতাড়ি তেরছা তীক্ষ্ণ চোখ মেরে বললে, 'আপনি মাস্টার মশাইয়ের মত কথা বললেন নিশীথবাবু। আজীবন ছেলে নিয়ে আপনাদের কারবার, অথচ চিনলেন না ওদের। হরেনের কথা কী বলছিলুম আপনাকে? আপনাদের প্রিন্সিপাল প্রফেসর— কে পেরেছেন তার সঙ্গে? হরেন তো তার ভাই—'

নল মুখে টেনে নিয়ে গোল্ডফ্লেকের টিনটা নিশীথেরর দিকে এগিয়ে দিয়ে কালুবাবু চোখ বুজে নল

সূচীপত্রে যান

টানতে লাগল। টিনের থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল নিশীথ।

'এ বাড়িতে আপনি বসে আছেন, প্রফেসর মানুষ। আমি আছি—তবুও হবেন মুখ খিস্তি কবে গেল। আপনারা যখন ছোট ছিলেন এ-বকম হত?'

সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ। তাদের ছোটবেলাকাব কথাই। পৃথিবীতে তখন নানা রকম অভাব-অসঙ্গতি ছিল বটে। কিন্তু মানুষেব মন ঢের বেশি স্নিগ্ধ ছিল; কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ ছব আগেকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল নিশীথেব।

'ববেনকে দিযে কী দরকার আপনার?'—কালুবাবু জিজ্ঞেস কবল।

'বরেন কী করছে সেটা আরো খুলে বলুন কালুবাবু।'

'ঐ তো এখানের মাটি ওখানে রাখছে—'

'মেহেরপুরে গেছে কিসের জন্যে? কিসেব ব্যবসা ওব?'

'ব্যবসা তা বাবাব হোটেলে খাওযার। পাড়ার মেযে দেখে বেড়াবাব—'

শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল নিশীথের রক্তেব ভিতব।

'মেহেরপুবে কেন গেছে বলতে পারি না'—কালুবাবু একটা ঢেকুব তুলে বললে।

'পাড়ার মেযেদেব দেখেই কি শুধু?'

'না, নিরেমিষ দেখে চোখ জুড়োবাব দিন নেই এখন ববেনেব, নবেনেব। সেটা হবেনেব এলেম হযে আসছে।'

'সিগাবেটেব ছাই কোথায ঝাড়ি—অ্যাশ-ট্রে দেখছি না।'

'চোখেব সামনেই তো রয়েছে আপনার।'

'কোথায?'

'এই যে আমাব কলকেটা, এরই ভিতব ছাই ঢেলে দিন।ববেন মেযে দেখতে মেহেবপুব গেছে কিনা আমি বলতে পারি না। তবে এদেব ভাগ্যে নানাবকম শিকে ছেঁড়ে বটে—'

'কী রকম?'

'টাকা পায, আদব পায। হ্যাঁ, উকিল সবকাবেব ছেলে বলে খানিকটা বটে। তবে নিজেদেবও কেরামৎ আছে—'

'মেযেরা ওদেব আমল দেয?'

কালুবাবু নল টানছিল। কলকেটার দিকে একবাব তাকিযে খানিকটা মিঠে ধোঁযা মুখ দিযে বাব কবতে-করতে ফেলে দিল নলটা ফরাশেব উপব। সেটা আবাব তুলে ধবে বললে, 'পৃথিবীতে সব জিনিসেবই জুড়ি বযেছে। বিযে কববার দবকাব নেই, নবেনকে নিযে একটু ফুর্তি কববে, এ-বকম মেয়ের অভাব এই জলপাইহাটিতে নেই, কলকাতাব কথা ছেড়ে দিন? সে তো সোনাব দেশ। ওবে হুকুম।'

হুকুম কবে উঠতেই চাকব এসে হাজিব হল। কালুবাবুব দিকে, নিশীথেব দিকে কোনোদিকেই তাকালে না সে, নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে কলকেটা খসিযে নিযে গেল।

'জলপাইটিতে নেই।'

'বাংলাদেশেব কোনো গাঁ-মহকুমায নেই। মেযে দরকাব আপনাব?'

'হ্যাঁ, স্ত্রী মরছে—এইবারে এক-আধটি দেখে রাখলে হত,' নিশীথ তাব নিস্তব্ধ নিস্পৃহ মুখে একটু হাসির আঁচ ফুটিযে বললে, 'নবেনেব সঙ্গে এই দবকাব ছিল—'

'কখন ফিববে তা তো বলতে পাবি না।—'

'এ বেলা ফিরবে তো?'

'সেটা বোতল না দেখলে বলতে পাবি না। ড্রাই জিনটিন হলে শীগগিবই ফিরবে, বেশি কিছু হলে দু-একদিন দেবি হতে পাবে।'—কালুবাবু বললে, টিনেব থেকে একটা সিগাবেট বার কবে তাব সিগাবেট জ্বালিযে নিতে-নিতে।

'জলপাইহাটিতে আছে?'

'হ্যাঁ এখানেই।'

হুকুম কলকেটা সাজিযে এনে বসিযে দিয়ে গেল।সিগাবেটটা নিভিযে ফেলে নল টেনে নিযে কালুবাবু বললে, 'একটা মোকদ্দমায আটকে পড়েছে। সই জাল কবে একটা মোটা চেক ভাঙিযে নেবাব

চেষ্টায় ছিল—ব্যাংক ধরে ফেলেছে। কিন্তু বড়লোকের ছেলে। জিনিসটা চাপা পড়ে যাবে। সে ব্যাঙ্কে দাদার প্রায় দু লাখ টাকা আছে। ডিরেক্টারদের মধ্যেও দাদা আছেন, তবুও তো ওকে ধরল ব্যাঙ্কের ছেলেরা। মোকদ্দমা অবধি করল। দাদা রোজগেরে মানুষ বটে কিন্তু হুঁশিয়ার নন। ওর ছেলেমেয়েরা ওকে নাকানি-চোবানি দিয়ে, একশেষ করল। কখন যে কোনদিকে টুঁসি মারবে— ভাবতে-ভাবতে ওর ইউরিন তো অমৃত হয়ে উঠল। ইনসুলিনে কিছু হচ্ছে না—ঘুম হচ্ছে না— রোজ করা ওষুধ খেয়ে ঘুমুতে হয়।'

মুখের সিগারেটটা ফেলে দিল নিশীথ। কালুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোক একটু চিন্তিত। অর্চিতা বলেছে, খুব সৎ সত্যাশ্রয়ী মানুষ কালুবাবু, সে যাই হোক। এর ভাইপোরা অন্য রকম, প্রকাশবাবুও।

'নরেনকে তো পাওয়া যাবে না এ বেলা—'

'কেন, আপনার স্ত্রীর জন্যে তো? তাকে রক্ত দিচ্ছে নরেন—'

কথাটা ভুলেই গেছল প্রায় নিশীথ, মনে পড়ে গেল। তবুও এমন একটা কী বিশুষ্কতায় মন ভরে গেছে তার—সে রক্তের বদলে নরেন যেন তার স্ত্রীকে রক্তশূন্যতা দিচ্ছে। কেবলই, এমনই একটা অদ্ভুত উপলব্ধিতে মুখটা কেমন যেন দেখাতে লাগল নিশীথের। কালুবাবু তাকিয়ে দেখল।

'হ্যাঁ, রক্ত দিচ্ছে বটে। কিন্তু আপনি কাউকে বলবেন না, দু-একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে—'

'খুব গোপন কথা? এদিকে একটু সরে বসুন। বলুন।'

'নরেনের রক্তে কোনো দোষ নেই তো?'

'সে তো ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন। দোষ থাকলেও ওর রক্তে চলল তো। ডাক্তার কে? সিভিল সার্জন? মজুমদার?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি দেখছেন, ঠিক আছে। না দেখেশুনে কিছু করবার মানুষ তিনি নন।

তা তো ঠিক। কিন্তু নরেন এত আঘাটা ঘাঁটিয়ে বেড়ায়—ডাক্তার যখন রক্ত পরীক্ষা করে নিয়েছেন তখন আমাদের কিছু বলার নেই।'

'না না রক্তের কথা নয়। কথাটা হচ্ছে কি—নিশীথ একটা সিগারেট বার করে নিয়ে বললে, 'আপনার ভাইপোরা কেমন তা লেবর তা আপনার চেয়ে বেশি কে আর জানে। সবই তো জানেন আপনি।কিন্তু তবুও বলছি আপনাকে—নরেনদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা কানে আসে যা সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে কোনো মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়ে নি ওদের কেউ কোনো দিন?'

কালুবাবু নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে 'পড়েছিল।'

'কেন, কী করেছিল?—'

'খুড়োর কী রটিয়ে বেড়ানো উচিত ভাইপোদের গুখখুরি'—কালুবাবু কিছু বলবে কি না-বলতে ইতস্তত করতে লাগল কিছুক্ষণ। পরে নিশীথকে এ সব জিনিসের থেকে আলগা গোবেচারি মাস্টার অনুভ করে নিয়ে বললে,—'গাঁয়ের মেয়েদের নিয়ে ধানক্ষেতে ছেলে কী করছে না-করছে জানি না। তা নিয়ে মোকদ্দমা হতে পারে নি। গোঁফ চেঁচে পিছলে এসেছে। জলপাইহাটিতে মেয়েদের অনুমতিতে তাদের সঙ্গে কাজকর্ম করে ওরা, জোর-জবরদস্তি করে না। কাজ শেষ হলে যে যার নিজের ঘর আলো করে বসে থাকে গিয়ে, আত্মীয়-স্বজনেরা, কখনো-কখনো সন্দেহ করে বটে, কিন্তু হাতে-হাতে ধরতে পারে না। এখানকার ভদ্রলোকেরা আজকাল খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছে—প্রায় কোনো বাড়িতেই ঢোকবার উপায় নেই নরেনদের', চোখ তুলে কালুবাবু জিজ্ঞেস করলেন নিশীথকে, 'আপনাদের বাড়িতে যেত?'

'যেত একসময়'—কিন্তু যখন যেত তখন তো কিছু শুনতে পায় নি নিশীথ। রানুকে ওদের সঙ্গে মিশতে তো দেখে নি কোনোদিন। কী জানি, কলেজের কাজে, লাইব্রেরির নতুন নতুন বই-জার্নালে, লেখায়-পড়ায়, নিজের মনে ভাবাবেগে এতই কি বিমুগ্ধ হয়ে ছিল নিশীথ যে কিছু টের পায় নি? চোখে পড়ে নি তো কিছু ওর কোনো দিন। তা ছাড়া কালুবাবুকে আসল কথা বলতে আসে'নি তো নিশীথ। কালুবাবুকে সে জানতে দেবে না, ঠিক কী সে জানতে চায়।

'নরেনরা যেত এক সময়। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারত না।'

'কেন?'

সূচীপত্রে যান

'মেয়েরা ভিতরে থাকত। বড্ড লাজুক। ছেলেদের দিকে ঘেঁষত না।'

'ও! দু-একটি মেয়েকে সরিয়ে ফেলবার চার্জে মোকদ্দমা হয়েছিল' কালুবাবু গর্দানে হাত বুলোতে-বুলোতে আস্তে-আস্তে বললে।

'কবে?'

'বছ দেড়েক আগে—'

'একটি বারুণীপুরের আর একটি জলপাইহাটির'—

'জলপাইহাটির? শুনি নি তো—'

'শুনবেন যদি তাহলে পাবলিক প্রসিকিউটার আছে কী করতে।'

নিশীথের হাতের সিগারেটের আগুনটুকু নিভে গেল নিশীথ টান দিতেই। দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে নিশীথ বললেন, 'এই সব চালানির কারবাব করে নরেন?'

'এখন করে কি না জানি না। তবে এক সময় ঐ কবে লাল হবাব চেষ্টায় ছিল।'

শুনে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন বসে গেল নিশীথের। কিছুক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারল না। ডান হাত তুলে বুকের উপর রেখে চেপে বসে থেকে বাঁ হাতের উপর ভব বেখে কাত হয়ে রইল। কিন্তু এ-বকমে তো চলবে না। শক্তি সঞ্চয় করে নেবার একটা অসাধ্য-সাধন সাঙ্গ করতে-কবতে নিশীথ বললে—

'গঙ্গাসাগরের চরে গিয়েছিল গত বছব?'

'নরেনরা? মনে নেই তো। সব জায়গায়েই তো যায়।'

'কলকাতার বড় দাঙ্গার সময় কোথায় ছিল?'

'কলকাতায় ছিল।'

হৃদযটা কেমন করে উঠল যেন আবাব, একটু সামলে নিয়ে সে বললে, 'গঙ্গাসাগবেব মেলা ছিল না তখন। মেলা হয় কী মাসে? না, মেলার ভীড়ে নয়, তখন চেনা লোক চোখে পড়ে যেতে পাবে। শুনেছি নরেনরা'—নিশীথ চুপ কবল। শার্টের পকেট থেকে বেব করে একটা ক্যাকটিনা পিল খেল। দু-তিন বছর খায় নি, গত কয়েকদিন থেকে পিলগুলো খেতে হচ্ছে আবার। হার্টে অসুবিধে।

কালুবাবু বললে,'মাঝে-মাঝে সাগর দ্বীপে নৌকা কবে যায় নরেনেব দল। সেটা আমি জানি। মেলা থাকে, মেলা থাকে না। খুব হৈ হৈ কবে গিয়ে সেখানে গা ঢাকা দিয়ে।'

'গা ঢাকা দেবার খুব ভালো ঘাঁটি বুঝি?'

'মেয়ে-টেয়ে ছিনিয়ে আনলে কত দ্বীপ আছে—কত ঘাঁটি আছে সমুদ্রে। সেখানে দিনকে রাত কবে দেওয়া যায়।'

কালু নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কোনো খোঁজখবর পেলেন?'

'কিসের?'

'বানু কোথায আছে বেব কবতে পাবলেন না এখনো?'

'কেউই বলতে পারে না।'

'নরেন হয় তো জানতে পাবে—'

'আপনাকে কে বললে?'

'আমি নিজেই অনেক বার ভেবেছি। আপনি নানা দিকে তদবিবে ছিলেন—'

তামাক টানতে লাগল কালুবাবু। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে হৃদযন্ত্রটা। নিশীথেব সিগাবেট খাওয়া ভাল নয়। সিগারেট খাবার কোনো রুচিও নেই তাব।

'গভীর জলের মাছ। আবার বেন্দাবনের ঘাটের কচ্ছপজিও বটে নরেন, নবেন-রানুব ব্যাপার নিয়েই অনেকদিন থেকে ওকে প্যাঁচে ফেলবাব চেষ্টা করছি। কিছুতেই পরছি না।'

'বানু কি বেঁচে আছে?'

'আছে হয় তো।'

'কী করে বুঝলেন?'

'ওকে তো কারু মেবে ফেলবার কথা নয—'

'ও সেই কথা,' নিশীথ হেসে বললে, 'কিন্তু মানুষ মুখ দিয়ে কথা বলে না আজকাল, চোঙে মুখ রেখে কথা বলে। যারা মেয়েটাকে এ-রকম ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তারা কী না পারে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আমি অনেক আগেই বুঝেছি যে শূন্যকে কোটি

কোটি দিয়ে গুণ করে সেই অদ্ভুত শূন্যের ভিতর থেকে কোটিকে ফিরে পেতে চাইছি। কিন্তু শূন্য কী করে কোটিকে দেবে? সে তো শূন্য।

মনোযোগ দিয়ে নিশীথের কথা শুনে কালুবাবু বললেন, 'আমি তো এককে কোটি দিয়ে গুণ করেছি, কোটিকে ফিবিযে দিচ্ছি একা। নরেনের বাবা কুড়িকে কোটি দিযে গুণ করছে কুড়ি কোটিকে ফিবিয়ে দিচ্ছে কুড়ি। নবেন তো পশচাশকে কোটি দিয়ে গুণ করছে, পঞ্চাশ কোটিকে ফিরিযে দিচ্ছে পঞ্চাশ। শূন্য নয, এক, দুই, কুড়ি, চল্লিশ, 'আছে' 'হবে', এগুলোকে স্বীকার করে নিযে কাজে নামতে হয। রানুকে পেতে হলে নবেনকে লোভী হতে দিতে হবে। আমি ওকে পাঁকালে আটকাব।'

'আমি কলকাতায যাচ্ছি—'

'কবে?'

'দু-একদিনের মধ্যেই।'

'কদিন থাকবেন?'

'সম্প্রতি এক মাস তো বটে—'

কালুবাবু ঠোঁট নল ছুঁইযে বাখল, তামাক টানছিল না, বললে, 'আমি আপনাকে জানাব। দিন পনের-কুড়ির ভিতবেই—'

এক বছবেব মধ্যে যে-জিনিসেব কোন কূল-কিনাবা হল না, পনের-কুড়ি দিনেব মধ্যে কালুবাবু তাব একটা কিনাবা করে ফেলবেন- এ-বকম কত প্রতিশ্রুতি কত মানুষের কাছে পেযেছে নিশীথ জীবনের কত পথে বাঁকে। প্রতিশ্রুতি পেযে ফলের জন্য অপেক্ষা করে-করে টেব পেযেছে ফল আব-এক জিনিস। মানুষের, বড় মানুষেব, সৎ মানুষেব মুখেব প্রতিশ্রুতিব সঙ্গে তাব কোনো সম্পর্ক নেই। কেন মানুষ এটা করে দেব, সেটা করে দেব, এ-রকম আশ্বাস দেয মানুষকে? আশ্চর্য, অনাযাসে, আবামে প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলে। তাকিযেও দেখতে যায না কী বিষম আলাখোলা সরলতায তাবা বসে আছে যাবা প্রতিশ্রুতি পেযেছিল।

'আমি উঠি কালুবাবু।'

'আচ্ছা আসুন'—নিশীথের দিকে না তাকিযে ফবাসেব উপব ছড়ানো কতগুলো নথিপত্রেব দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কভাবে হাত তুলে নিশীথকে বিদায দিল কালুবাবু।

বাড়ীর দিকে ফিবে যেতে-যেতে নিশীথের মনে হল বানুব সম্পর্কে নবেনকে সন্দেহ করে কথাটা কালুবাবুকে বলে মোটেই ভাল করে নি সে। অর্চিতা বলেছিল, কালুবাবু খুব খাঁটি মানুষ। অর্চিতা নিজেও কি খাঁটি? এই দুই খাঁটিতে মিলে নিশীথকে কেমন নিভৃম নিঝঝুম করে বাখে নি কি—হৃদযেব ভিতর কোটি দিযে গুণ করা শূন্য বললে তাকে।

পথ দিযে ফিবতে-ফিবতে মনে হল চোতেব বাতাসের মত তাকে ব্যজন করে চলেছে যেন সমস্ত ব্যক্ত নীলাকাশ; শেফালির জঙ্গলে বড়-বড় বোলতাব চাক সোনালি বোদে ছাযাব নক্ষত্রেব মত যেন; কত শত পতঙ্গ কেমন মিলে-মিশে প্রেমে, পবিকল্পনায, সমবেদনায উৎসাবিত হযে মানুষেব হাতে চূর্ণ নগবগুলোকে, মানুষের হাতে নিহত মানুষরাশিকে ঠাট্টা করছে। আকাশে ফিঙে উড়ছে, হরিযালেবা চলেছে চোখে ঠোঁটে জলেব গন্ধ নিযে কোনো নিকটতম জলের মহানুভব শান্তিব দিকে, যদি না, মানুষের গুলি-গুলতি এসে কাউকে-কাউকে উপড়ে অন্ধকারের দিকে ফেলে দেয। মাথাব উপরেব সূর্যেব দিকে তাকায নি নিশীথ কিন্তু দিঘিব পাড়ের খই বঙেব হাঁসটা চোখ পাঁজলে দেখে নিচ্ছে সূর্যকে; অপরূপ নাবীকামিতার মতো যেন; মস্ত বড় শিমুল গাছেব থই থই পাতার ভিতব কতগুলো স্নিগ্ধ নিঃশব্দ কবুতব বসে আছে, হঠাৎ ধপধপে শাদা একটা কবুতর উড়ে গেল। পাখিটাব ডানাব আলোর ঝিলিক নিশীথেব চোখে এসে লাগল—টের পেল সে, মহত্তব সূর্য কোথাও অদৃশ্য থেকে সেবা করে যাচ্ছে, সুধা দিচ্ছে, অমেয, শালীন আলোক দান করে চলেছে।

'তুমি কোত্থেকে এলে?'—হাসি মুখে বললে অর্চিতা।

'কালুবাবুর কাছে গিযেছিলাম।'

'কেন?'

'রানুর কথা জিজ্ঞেস করতে গিযেছিলাম—'

'আর নরেনেব?' অর্চিতা বিরক্ত হযে বললে, 'এক্ষুনি জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন?'

'কেন কী হযেছে? তুমি না বললে খুব ভালমানুষ কালুবাবু—'

সূচীপত্রে যান

'অর্চিতা ভ্রুকুটি করে হেসে বললে, 'তোমার চেয়ে ভালমানুষ তল্লাটে নেই। আচ্ছা যাও, যা-হবার হয়েছে—আমাকে গিয়ে ঠিক করে দিতে হবে। কিছু জানতে পাবলে বানুব কথা?'

'না।'

গোরু, তবে যে সব গাইগোরুর মুখ হবিণীর মত, অর্চিতা অনেকটা সেই বকম। তাকিয়ে দেখছিল নিশীথ, একটা হরিণী সেমিজ পরে মহিষের শরীবেব ভিতব দিযে, দেওয়ালেব ভিতর দিয়ে, অদৃশ্য হযে গেল যেন কোথায। না, অদৃশ্য হযনি তো, এই তো দাঁড়িযে আছে; হরিণীব শরীবেব ভিতব দিযে ছল-ছল করে উঠছে জল, শবীর, রাত্রিব, যেখানে সূর্য নেই, শুদ্ধ দেশের বাত্রিব জল ছল-ছল করে উঠছে—তাবাব ফাঁকে-ফাঁকে যে-অন্ধকার আছে সেগুলোকে জলোচ্ছ্বাসিত কবে—কত শত তাবাব শবীর, কত শত অন্ধকার নদীব এলোপাথাড়িব ভিতর জ-, শুধু এখন, বাত্রি শুধু—শ্বাশত বাত্রি।

নিশীথের কলেজ কমিটির সেক্রেটাবি হরিলালবাবুব বাড়িতে কলেজ কমিটিব প্রায সব মেম্বাবই এসে জড়ো হযেছিলেন। কলেজেব গভর্নিং বডির কোনো মিটিং নেই আজ। চাব-পাঁচদিন পবে মিটিং। হরিলালবাবু এঁদের ডেকে আনেন নি। এমনি সারাদিনেব কাজকর্মের পর বেড়াতে-বেড়াতে হবিলালবাবুব বাড়িতে এসে জুটেছেন তাঁরা।

হরিলালবাবুর সুন্দব চালতে ফুলেব বঙেব নতুন বড় দালানটার দোতলাব হল ঘবে বসে কথা হচ্ছিল। হবিলালবাবু এখানকার বার লাইব্রেবিব এক জন বড় বুড়োটে উকিল। যখন এদেশে উকিল-টুকিল বেশি ছিল না, তখন প্র্যাকটিস শুরু কবে, সঙ্গে-সঙ্গে নানারকম হোসিযাবি ব্যবসা চালিযে অনেকটা কামিযে নিযেছেন। কলকাতায বাড়ি আছে হবিলালবাবুব, ভুবনেশ্ববে আছে। হবিলালবাবু যদি আজকের দিনে ওকালতি শুরু করতেন তা হলে—লোকে বলে—এঁটোকাটাও জুটত না তাঁব, শামলা এঁটে বটতলায দাঁড়িয়ে দিন কাটিযে দিতে হত। কিন্তু যে-লোকটা ঠিক সমযে ঠিক কাজ কবে গুছিযে নিযে সকলেব ঘাড়ে পা লটকে বেড়াচ্ছে তাব সম্বন্ধে ধোঁযাটে কথা পেড়ে কী লাভ এখন আব।

কলেজ কমিটিব সেক্রেটাবী হবাব কথা কলেজেব প্রিন্সিপালেব। কিন্তু জলপাইহাটিতে কলেজেব প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করবাবু এখানকাব লোক নন। কিন্তু এখানকাব মানী মানুষকে মর্যাদা দেবাব জন্যে আগ বাড়িযে হাত কচলাবার মতো জুড়ি নেই এ দেশে কালীশঙ্করেব। কী কবে হবিলালকে একটু সুবিধে কবে দেওয়া যায, কী কবে এখন একটু পিছিযে থেকে নিজেব আখেরেব সুবিধা কবে নেওয়া যায, এ-জন্যে সব সময চোখ-কান খাড়া কালীশঙ্কববাবুব। বছব তিনেক আগে ছ-মাসেব জন্যে কলেজ কমিটির সেক্রেটারির কাজ চাপিযেছিলেন তিনি, কিন্তু দেখেছিলেন যে কমিটিব মিটিঙে গভর্নিং বডির মেম্বারেবা সকলেই প্রায হরিলালেব দোহাই দিযে কথা বলে, মুখ চেযে থাকে হবিলাল চাটুর্য্যের। মেম্বাবেবা সকলেই প্রায ষাটের কাছাকাছি—কেউ কেউ সত্তব ঘেঁষে। ইযং ব্লাডেব অভাববোধ কবছিলেন কি কালীশঙ্কববাবু? কী-জানি, এ বিষযে তিনি মনে-মনে কিছু স্থিব করে উঠতে পাবেন নি। ভাবছিলেন হয তো কমিটিতে উকিল ছোকরারা এলে অবস্থা আবো খাবাপ হবে। বাংলাদেশে মফস্বল কলেজ কমিটিতে অন্তত—বাব আনি-চোদ্দ আনি জাযগা উকিলদের ছেড়ে দিতে হবে। তুমি-আমি দিচ্ছি না, এটা অলিখিত চুক্তি অনেক দিনের—কিন্তু কার সঙ্গে? জানা নেই। কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে। কে চালাবে দেশ, উকিলবা ছাড়া? উকিলদের মামলা মিটিযে কলেজ কমিটির বাকি জাযগাটা মুখ চেনা ডাক্তাব বা জমিদারেব ঝাড়-বংশেব জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষাব ব্যাপাব—কিন্তু শিক্ষাদাতাদেব জাযগা কোথায, কলেজ কমিটিতে? ওদেব? ওদেব নিযে কী হবে? ওবা তো সোযাশ-দেড়শ টাকাব মাস্টাব। ওবা আব হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাই তো স্বাধীন ব্যবসা চালাচ্ছে দেশে—সব ঘাটেব জল খেযে তাবপব ছোট শিশিব জল ধবেছে। কেউ-কেউ কলেজে ঢুকে পড়ছে।

যখন একা চুপচাপ বসে থাকেন নিজেব বাড়িতে দোতলাব করিডোবে—ইজিচেযাবে—তখন তাঁর মনে এ-রকম দু-চারটে কথা নড়াচড়া করে বটে, কিন্তু তিনি নিজে তো চারশ টাকা মাইনে পাচ্ছেন—শিগগিরই পাঁচশ, হরিলাল বাবুকে একটু তাঁবে রাখলে সাড়ে পাঁচশ হযে যাবাব সম্ভাবনা—সোযা পাঁচশ হযে যাবে এই মে মাসের গভর্নিং বডির বাসন্তী-নিদাঘ বৈঠকে। কথা দিযেছেন হরিলালবাবু। বোকা হ্যাচকা ইশারাগুলোর গলা টিপে শেষ করে ফেলেন কালীশঙ্কববাবু। প্রিন্সিপাল তার নিজেব নিরালা কোযার্টার্সও পাবেন—মস্ত বড় কলেজ মযদানের একটেরে- নিম ঝাউ আমলকী জামগাছেব ছাযা-

বোদের ভিতর বেশ বড়-সড় সুন্দব একটা কাঠেব বাংলা বাড়িতে। অ্যাসবেসটরেব ছাদ। এক তলা বাড়ি—অনেক উঁচুতে মেঝের পাটাতন। চমৎকার চোঙেব মত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপবে উঠতে হয়—যেন সুখী স্বস্তিকাম শান্তিপ্রাণ শ্রমণ তার নির্জন আশ্রমমন্দিবে প্রবেশ কবছে। আঃ আ-হ্-হ্—হা-হা-হা। চোতের বাতাসে পিঠ-বুক জুড়িয়ে নিতে-নিতে ভাবছিলাম। কালীবাবু তো এই পদ্মাব পারের দেশেব লোক নন। তিনি এসেছেন বেহাব-বাংলাব প্রত্যন্ত থেকে, অথচ এ দেশেব লোকের মন মজিয়ে তিনি এদেবই মামা-মেসোর চেয়েও গলায়-গলায় আজ। সব সময়ই জলপাইহাটিতে নিঃশ্রেয়স (শব্দটি সম্প্রতি কলকাতার তাস-সিগারেট-বই-বুকনিব দু-চাবজন বৃত্তান্তপণ্ডিতেব কাছ থেকে শিখে এসেছেন) নিঃশ্রেযসের চিন্তা, মানে ঠিক কল্যাণকামনা করেন। কিছু নয—বোকা হবিলালকে হাতে বাখতে হয়। একটু তাইয়ে দিলেই টোপ গেলে হবিলাল। টাকা কবে নিয়েছিস, এখন তাব বড় কথা হচ্ছে মান। মানী হবি? বেশ তো হ না; কে তোকে বাধা দিচ্ছে হবিলাল? আমি পথ ছেড়ে তোকে কলেজেব সেক্রেটাবি কবে দিয়েছি। তুই যদি নামে 'প্রিন্সিপাল হতে চাস, বেশ তো হবি; আমাব কোনো আপত্তি নেই; সপ্তাহে এক-আধ ঘন্টা এসে হিন্দু-ল পড়িয়ে যাবি ফোর্থ ইযাবেব ছেলেদের; সে ঘন্টায আমাব ইংবেজিব ক্লাসটা আমি বাদ দিয়ে দেব; প্রিন্সিপালেব কামবায ইজিচেযাবে বসে থাকব—ফ্যান টিপে দিযে; আমাবে পাঁচশ টাকা মাসোযাবা দিলেই হবে।

মান! মানকচুপাতাব আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কত মানেব কাজই তুমি কবেছ হবিলাল' কোন কোন সধবা-বিধবাব কোন ছেলেটি-মেয়েটি তোমাব, জানা নেই বুঝি আমাদেব?

'হ্যাঁ, কালীশঙ্করবাবু—'

'আজ্ঞে বলুন।'

কালীশঙ্কব ভেনেস্তাব চেযাবটা একটু কাছে টেনে নিয়ে, হবিলালেব দিকে এগিযে, খুব বেশি ঘেঁষে নয- চেযারটাকে পেতে নিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে—কেন ছোট ছেঁদো কাঠেব চেযাবে বসেছেন আপনি। প্রিন্সিপাল মানুষ—আপনাব জন্যে একটা কেম্বিসেব ডেকচেযার জুটল না। মতিলাল! ওবে এই মোতে হাবামজাদা।'

'না-না—কিছু দবকাব নেই হবিলালবাবু—বেশ ভাল চেযাব—বিলিতি ভেনেস্তা—'

'ভেনেস্তা আবাব দিশি-বিলিতি আছে নাকি—'

'আছে দিশিও এক বকম! পাইন কাঠেব মতন; তবে খুব খেলো জিনিস'—জলপাইহাটি কোর্টেব হাজাব-দেড় হাজাব বাদীব উকিল হিমাংশু চক্রবর্তী বললে। হিমাংশুব বযস পঞ্চাশেব নীচে। কলেজ কমিটিব মেম্বাব হিমাংশু। 'আমার ডেকচেযাবটা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি স্যাব'—বললে হিমাংশু কালীশঙ্করবাবুকে।

'না না—ঠিক আছে, ঠিক আছে'—কালীশঙ্কব ডান হাতের পাঁচটি আঙুল উচিযে থামিযে দিলেন।

'আমবা সবাই তো সোফা-সেটিতে ইজিচেযারে বসেছি হবিলালদা'- উকিল ব্রজমাধববাবু বললেন, 'কালীবাবু কেন ভেনেস্তা বেছে নিলেন'—

'ভেনেস্তা হবাব জন্যে—হে-হে-হে'—হবিলাল তাব নাক-ঠোঁটেব কোণা খামচি খিচিযে হেসে ফেলে বললেন, 'মতিলাল! ওবে হারামজাদা হাবামিকা'-

শিবনলাল এসে বললে—'বাবা বাড়ি নেই, ইস্টিশনে গেছে দাদাবাবুব মাল খালাস কবে দিতে'—

'হারামিকা—শিগগিব একটা সোফা নিয়ে আয়।' শিবনলাল অন্দবেব থেকে সোফা আনতে গেল।

'সোফা-সেটি তো ছিল চারদিকে; আপনি নিজে কেন উটকো চেয়ারে বসতে গেলেন কালীবাবু?'

'বড্ড ছারপোকা কামড়াচ্ছে হবিলালবাবু'—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

'সত্যি, ছারপোকা হবিলালদা—বসা দায'—ব্রজমাধব বললেন।

'ঐ নতুন ভেনেস্তা চেযাবটায ছাবপোকা নেই। কালীবাবু ঠিকই বসেছেন।'—হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা হাসতে লাগলেন।

'যা ছাবপোকা দাদা, কী হবে সোফায বসে। বেশ আছেন আপনি যা হোক কালীবাবু'—ঘোষমল্লিক স্টেটের উকিল বঙ্কিম দত্ত বললে।

শিবলাল ও পূর্ণ ধরাধরি কবে একটা চমৎকার নতুন সোফা হল ঘবে এনে বসাতেই সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে গটগট কবে হেঁটে সোফাটার উপর ধপাস কবে বসে পড়লেন বারেব উকিল, কলেজ কমিটিব মেম্বার, ওয়াজেদ আলি সাহেব। কালীশঙ্কববাবু নিজের চেযাব থেকে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন সোফায।

হঠাৎ আলী মিঞাকে চোখে পড়ায় ভেনেস্তায় ফিরে এলেন। সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

'কেন কী হল—হাসবার কী হল'—জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি।

'কিছু হয় নি

শিবলাল [illegible] ডেক চেয়ার আনতে বললেন হবিলালবাবু, 'না কি সোফা আছে আরো অন্দরে?' চলে গেল শিব[illegible]

'ভাল তো মিঃ ওয়াজেদ আলি?'

'ভাল, ওয়াজেদ আলি সাহেব?'

'সেলাম ওয়াজেদ আলি সাহেব, তবিযৎ ভাল তো। আজ বার লাইব্রেরিতে দেখলুম না তো আপনাকে—'

'আদাব, মিঃ ওয়াজেদ আলি। মিঃ ইমাম হোসেন বেড়াতে-বেড়াতে আসবেন কি এদিকে এক বার?'

'এই যে জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব; আপনার কথাই ভাবছিলাম। আমি গেছলুম কাল আপনাব ওখানে। বাড়িতে পেলুম না; শুনেছিলুম আপনাব নিউরালজিক পেন হয়েছে—'

ওয়াজেদ আলি অত্যন্ত আপ্যাযিত বোধ করছিলেন। আপ্যাযিত করে যদিও ব্যতিব্যস্ত করে ফেলছে তাঁকে সব, কিন্তু তবুও খারাপ লাগছিল না তাঁর। তাঁব চারিদিককার এ সব মানুষদেব মৌখিক আন্তবিকতা তো খুব নিখুঁত—এই হলেই হল যেন ওয়াজেদ আলি সাহেবেব; ভিতবের আন্তরিকতা অন্ধকাবে ভুট্টার মত পুড়িযে খায ভুট্টার ক্ষেতেব পাশে বসে সাদামাটা দেহাতি লোকেরা; উপরের স্তবে এ জিনিসটা খুব কম। উপমাটা প্রকৃতিব থেকে নেওয়া—বেহাব অঞ্চলে। ওয়াজেদ আলি সাহেব বাঙালি মুসলমান—পদ্মার ওপারেব; কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন থেকে বেহারের কথা ভাবছিলেন—খুব বেশি। ভুট্টা নয—জওযাব জওয়ার—ওয়াজেদ আলি ভাবছিলেন।

'জনাব ইমাম হোসেন সাহেব? না তিনি আজ এ দিকে আসবেন বলে মনে হয না। বাব লাইব্রেরিতে আমাকে দেখেন নি? গেছলুম—খুব তাড়াতাড়ি বেবিযে পড়েছি। পুলিশ সাহেবেব মোটব লঞ্চে একটু ঘুরে বেড়ালুম। খানাপিনা খেয়ে ফিরতে সন্ধ্যে হযে গেল'—বললেন আব-একজনকে, 'নিউবালজিক পেন? হ্যাঁ, বড্ড কষ্ট পেয়েছি চাব-পাঁচদিন—দুটো মাড়ির দাঁত—মাড়ির দাঁতে বদ রক্ত জমে টনটনিযে উঠেছিল মনে হয। কনস্টিপেশনও আছে। ডাক্তার জোলাপ নিতে বলেছিলেন। কিন্তু আজ এ বাড়িতে ম্যাজবান, ও বাড়িতে গিন্নি-পাগল চালের পোলাও, আর মুর্গিব কালিযা বেঁধে বড় বিবিসাহেব যেতে লিখে পাঠিয়েছিল—কী করি, সামাজিক মানুষ হযে থাকতে হলে দুর্ভোঘ ভুগতেই হয—'

'জোলাপ নেওযা হল না'?

'না'।

'গিন্নি-পাগল চাল কাকে বলে আলি সাহেব?'

'খুব চমৎকার চাল।'

'বাসমতির মতন?'

'না না, খাবেন একদিন হরিলালবাবু?'—জিজ্ঞাসু ব্রজমাধবকে টপকে হবিলালবাবুব দিকে তাকিযে জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি।

স্নিগ্ধতা ও আত্মমর্যাদায হরিলাল আস্তে-আস্তে বললেন, 'আমার আব খাওযা-দাওয়া, দাঁত নেই, কী খাব আমি। মাংস খেতে পাবি না, কুচিযে কিমা বেঁধে দেয, সেটাই খাই বোজ'—

'রোজ?'—কে যেন জিজ্ঞেস করল। হবিলাল নিজেব কথা বলতে-বলতে অন্যমনস্ক হযে পড়েছিলেন। তিনি যে বোজ মাংস খান এ কথা শুনে ও-রকম দাঁত কেলিযে 'বোজ' বলে উঠল কে? নিজে কথা বলছিলেন, নিজের কথাব দিকেই কান পেতে ছিলেন তিনি। অন্যদিকে মন ছিল না তাঁর। কে মানুষটা বলে উঠল, 'বোজ'? হরিলালের কানের ভিতর দিযে মনে ঢুকে তাঁকে সচকিত করতে একটু দেরি করেছে বলেই হরিলাল বুঝতে পারছেন না, কে বলেছে। চোখতুলে চাবিদিকে তাকিযে সহাস্যে সমীচীনভাবে খতিযে দেখছিলেন, 'হ্যাঁ রোজ খাই', হরিলালবাবু দৃঢ়ভাবে বললেন।

কেউ কোনো কথা বলতে গেল না।

'রোজই আমার মাংস না খেলে চলে না! রোজ! আমি মাংস খাই, কিমা মাংস কুচিযে কিমা করে খাই। এ বেলা ও বেলা ঘিযে রসিযে। বোজ। কে জিজ্ঞেস করেছিল আমি রোজ মাংস খাই কি না?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

কে জিজ্ঞেস করেছিল? কেমন হাসিহাসি অমায়িক মুখে এর ওর, ওর তার, কালীশঙ্করের, সকলের দিকেই হরিলালবাবু চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছিলেন কেমন একটা কঠিনতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে তবুও। 'আমি রোজ মাংস খাই কি না, জিজ্ঞেস করল কে?'

'ক্ষ্যামা দিন হরিলালবাবু। যে জিজ্ঞেস করেছে সে যখন নাচার, তখন একটা কথা নিয়ে এ-রকম বাঘা তেঁতুলের সিন্নি পাকিয়ে তো কোনো লাভ নেই'—ওয়াজেদ আলি বললেন।

'ঠিক বলেছেন আপনি আলি মিঞা'—হরিলাল বললেন—'রোজ মাংস খাওয়া যে কী, হিন্দুর বাচ্চারা তা বুঝবে কী করে?'

ওয়াজেদ আলি জিভ কেটে হাত জোড় করে হরিলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না না, ওটা ঠিক হল না। কোনো রকম কম্যুনাল কথা বলবেন না হরিলালবাবু। হিন্দু মুসলমান কি আলাদা কিছু?'

'তা নয়', ব্রজমাধববাবু বললেন, 'আলাদা হতেই পারে না।'।

'মুসলমানদের একতা আছে; তারা জানে যে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে কী রকম চমৎকার বিসমাল্লা বাদাম উড়িয়ে নেওয়া যায়'—স্টিমার অফিসের উকিল অন্তিম দত্ত বললে।

'ঠিক কথা। আমরা এক'—আড় চোখে ওয়াজেদ আলির দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন নবকৃষ্ণবাবু। তাঁর অবশ্য অন্য নানা রকম কথা বলবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এ জায়গায় নয়—এখন নয়।

'আমাকে কাল ফকরুদ্দিন সাহেব বলছিলেন যে, এ দেশটা যদি মুসলমানের দেশ হয়, তাহলে হিন্দুরও দেশ, মুসলমান, হিন্দু—সব আলাদা-আলাদা নাম বটে, কিন্তু আসলে দেশটাকে ভাল উন্নত করার চেষ্টা-চরিত্রের ভিতর দিয়ে মুসলমান আর হিন্দু তো এক'—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

'এক, এক'—একটু অসহিষ্ণুভাবে বললেন নবকৃষ্ণবাবু। কেন যে এই নিরেশ ব্যাপারটা নিয়ে এরা এত কথা কপচাচ্ছে ভাল লাগছিল না তার। অন্য কত কাজের কথা পড়ে আছে। এত বেশি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন নবকৃষ্ণ-বাবু যে এক দমক হেসে উঠে ওয়াজেদ আলির দিকে তাকিয়ে নিলেন। ঢোক গিলে একটু কথা ভেবে নিলেন।

'কথাবার্তা বড্ড কম্যুনাল হয়ে পড়ছে হরিলালবাবুর'—বললেন ওয়াজেদ আলি।

'তাই তো দেখছি, সেই জন্যেই এই ফষ্টিনষ্টিতে যোগ দিই নি আমি'—হরিলাল বাবু পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে বললেন।

'কেন? কম্যুনাল হল কী করে?' বিস্মিত হয়ে নবকৃষ্ণ হরিলালবাবুর দিকে তাকালেন।

নবকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় কোনো কান না-দিয়ে হরিলালবাবু ওয়াজেদ মিঞার দিকে চোখ তুলে বললেন, 'ওরাই কথা বলে যাচ্ছিল, ওদের কথায় আমি যোগ দিই নি। ব্যাপারটা কম্যুনাল বটেই তো; হিন্দু আর মুসলমান এক কি আলাদা, তারা দুই জাতি কিনা, তাদের ধর্মের মত তাদের কালচারও আলাদা কি না—এ নিয়ে বড়-বড় লোকেরা কথা ভাববেন। ও-সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার তো কোনো কথা নেই'—চুরুটটা জ্বালিয়ে নিলেন হরিলালবাবু,—'অবশ্যি ওয়াজেদ আলি সাহেব বড় মানুষ। কিন্তু এ-সব বিষয়ে তাঁর কী মতামত সেটা তিনি পরিষ্কার করে বলে আসছেন অনেক দিন থেকে অন্য জায়গায়। কিন্তু আমার এ বাড়িটা তো কোনো পলিটিকসের হাট নয়; এখানে আমরা মিলেছি-মিশেছি—শিক্ষা-দীক্ষা, কলেজ-স্কুল, দু-চারটে ব্যাঙ্ক ফেল, জালিয়াতি, পার্টিশন সুট নিয়ে আলোচনা করতে। আমার সিগারেটের টিনটা ফুরিয়ে গেছে। আপনারা কেউ সিগারেট খাচ্ছেন না যে'—হরিলারবাবু চুরুটে দু-একটা টান মেরে, সেটাকে দাঁত থেকে খসিয়ে ছাই ঝেড়ে নিয়ে বললেন।

পকেট থেকে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বের করে ব্রজমাধববাবু দেশলাই বার করলেন—'এই যে ওয়াজেদ আলি সাহেব, সিগারেট নিন।'

ব্রজমাধববাবুর কাঁচি সিগারেট একটা খসিয়ে নিয়ে জ্বালিয়ে, দু-একটা টান দিয়ে ওয়াজেদ আলি পকেট থেকে নিকেলের সিগারেট কেস বের করে ব্রজমাধব, হিমাংশু সকলের ভিতর বিলি করে দিতে-দিতে বললেন—'আপনি চুরুট খাচ্ছেন হরিলালবাবু তাই সাধলুম না, দেখবেন খেয়ে?'

'কী সিগারেট ওটা?'

'নেভি কাট।'

'পরে দেখব। চুরুটটা খেয়ে নিই।'

ব্রজমাধববাবুও কাঁচি বিলি করছিলেন। এ দু-জন মানুষের সিগারেট জ্বলে উঠল সকলের মুখেই—

সূচীপত্রে যান

কালীশঙ্কর ছাড়া; সিগারেট খান না তিনি।

'ফকরুদ্দিন সাহেবের কথা বলছিলেন আপনি হিমাংশুবাবু, কিন্তু তিনি তো লিগের মুসলমান নন।'

'ফকরুদ্দিন সাহেব লিগের নন?'

'আমি জানি তিনি লিগের নন।'

'তিনি কি লিগের নন?'

'তিনি কি কংগ্রেসের মুসলমান?'

'ফকরুদ্দিন সাহেব লিগে ঢুকেছেন শুনেছিলুম—'

'ফকরুদ্দিন সাহেব কংগ্রেসের নন, কৃষক-প্রজার নন। আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে। আমার চেয়ে বেশি এ-বিষয়ে কেউ জানে না।'

'কে বলেছে ফকরুদ্দিন সাহেব লিগের? লিগে তিনি নেই।'

'ফকরুদ্দিন সাহেব কি মজাযেৎ-উল-উলেমার?'

'খাকসার পার্টিতে তিনি আছেন বলে মনে হয় না। না, না, মোমিন নন।'

'না না, কংগ্রেসের নন ফকরুদ্দিন সাহেব, কী বলছেন আপনি?'

'ফকরুদ্দিন কি কম্যুনিস্ট?'

'কম্যুনিস্ট ঠিক নয়। স্যোস্যালিস্ট পার্টির, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট নয়। আরো অনেক সোস্যালিস্ট পার্টি বেরিয়েছে আজকাল।'

'ফকরুদ্দিন কম্যুনিস্ট, আমি জানি।'

ওয়াজেদ আলি বিক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'ফকরুদ্দিন সাহেবের নিয়ে এত কথা। এক জন মানুষকে নিয়ে বড্ড কাটা-ছেঁড়া হচ্ছে কিন্তু হরিলালবাবু। জিনিসটা কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছে হরিলালবাবু'—

'আমিও তো তাই দেখছি। সেই জন্যই ওদের ডামাঢোল আমি যোগ দিই নি। আমি কোনো কথা বলি নি। ফকরুদ্দিন সাহেব এটা কী, ওটা কী সেটা, এক জন মানুষকে নিয়ে এত কথা হবে কেন? হেঁজিপেঁজি কথা সব!'—হরিলাল বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন।

'যদিও এটা পার্টিশন স্যেটের দেশ'—কে যেন শুরু করলেন।

'পলিটিকস থাক'—হরিলালবাবু থামিয়ে দিলেন।

'মুসলিম লিগ বলছিল কিনা যে শরিয়ত অনুসারে দেশ শাসন'।

'আবার পলিটিকস!' ধমক দিয়ে ফেলেই হরিলালবাবু একটু হকচকিয়ে উঠলেন। শরিয়তের কথা ওয়াজেদ আলিই আরম্ভ করছিলেন চাপা গলায়—ওয়াজেদের গলা থেকে দু-তিন রকমের সুর বেরোয়। চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন হরিলালবাবু, মনে হয়েছিল তাঁর, যেন ব্রজমাধববাবু শরিয়ত অনুসারে রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজিত হবার পূর্বাভাস দেখাচ্ছে। বেপরোয়া ব্রজমাধব। ব্রজমাধবকে কড়কে দেবার জন্য ধমক দিয়ে চোখ খুলেই দেখলেন, ওয়াজেদ আলি কথা বলতে-বলতে হরিলালকে কঠিন, শাদা বরফের মত দাঁত দেখিয়ে থেমে গেলেন।

'ব্রজমাধববাবু, আপনি শরিয়তের কথা-টথা বলবেন না। এ সব বিষয়ে মুসলিম লিগের নেতারাই ভাল বোঝেন, ঠিক বোঝেন। তাঁরা যদি কিছু বলতে চান আমরা শুনব। ওয়াজেদ আলি সাহেব রাষ্ট্রশাসনের কথা বলুন, আমরা শুনি। খুব মন দিয়েই শুনি। কিন্তু ব্রজমাধববাবু, কালীশঙ্করবাবু এঁরা এ সব শাসন-শরিয়তের জানেন কী? কেন ফোঁপরদালালি করতে যান'—বললেন হরিলালবাবু বেশ স্থির গলায়, ব্রজমাধববাবু ও কালীশঙ্করবাবুকে খুব ধমকে, কড়কে দিয়ে, ওয়াজেদ আলির দিকে আশ্রয়ার্থী জুনিয়র উকিলের মতন আস্তে চোখ মেরে।

হরিলালের এ দৃষ্টির নিস্তব্ধ মাহাত্ম্যকে—সাত-পাঁচ না ভেবে—ভাল জিনিস বলে মনে করলেন ওয়াজেদ। জলের মতন গলে গেলেন তিনি। বললেন, 'না-না, ব্রজমাধববাবু কিছু বলেন নি। শরিয়তের কথা আমিই পেড়েছিলাম।'

'রাষ্ট্রশাসন-শরিয়তের কথা আমি তো কিছু বলতে যাইনি হরিলালবাবু'—কালীশঙ্কর বিচলিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কেন—'

কিন্তু কালীশঙ্করের কথাগুলো চিলে খাচ্ছে—খেয়ে যাক- গ্রাহ্য না করে হরিলালবাবু তাজ্জব বনে গেলেন, যেন ওয়াজেদ আলির কথা শুনে 'ওঃ, আপনি! আপনি বলছিলেন শরিয়তের কথা। আমি ভেবেছিলুম ঠিক যেন ব্রজমাধববাবুর গলা; নাকি কালীশঙ্করবাবুর। ভাবলুম কলেজের প্রিন্সিপাল, তুমি

সূচীপত্রে যান

ছেলেদের নিয়ে থেকো হে, এ সব উজির-বাদশার ব্যাপার নিয়ে তোমার কী? ওঃ, আপনি বলছিলেন ওয়াজেদ আলি সাহেব! আপনি বলছিলেন কোরান শরিয়ত শাসন-টাসনের কথা! বলুন, শুনি, আমরা সকলে মিলে শুনি; কেমন একটা আবছা ভাব আছে আমাদের মনের ভিতব, জলের মতন পরিষ্কাব হয়ে যাবে সব'—কথাগুলো হবিলালবাবু পেটের থেকে ওগরাচ্ছেন বলে মনে হল না ওয়াজেদ আলির।

খুশিই হলেন ওয়াজেদ সাহেব। হাত জোড় করে বললেন হরিলালবাবুকে—'আজ থাক। আজ কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে সব, কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছে। আব একদিন হবে। ইমাম হোসেন সাহেব, মুস্তাক সাহেব, বফিক সাহেব ওঁদের সঙ্গে নিয়ে আসব।'

'বেশ তাই হবে। আমাদের জানিয়ে দেবেন কবে আসবেন। আমবা সকলে মিলে শুনব আপনাদের কথা'—হবিলালবাবু বললেন।

পকেট থেকে একটা ভাল চুরুট বের করে ওয়াজেদ আলির হাতে তুলে দিয়ে হবিলাল বললেন, 'আপনার কেসেব সব সিগারেট ত বিলিয়ে দিয়েছেন। চুরুটটা জালিয়ে নিন, ভাল জিনিস। আজ তো মঙ্গলবার, আগামী রববাব কলেজ কমিটিব মিটিং, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেব বাংলোতে। দুটো ভাবী কথা আপনাদের সকলকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি আমি। গভর্নিং বডিব প্রায় সব মেম্বারই তো এখানে হাজির আছেন। মুসলিম মেম্বার অবশ্য চার-পাঁচজন নেই এখানে, কিন্তু তাঁদেব মুখপাত্র ওয়াজেদ আলি সাহেব নিজেই আছেন—'

তাবিফ জানিয়ে অনেকেই হাততালি দিয়ে উঠল।

আলি সাহেব কিছু খুশি হয়ে, গোলাপছড়িব মত পোড় খেয়ে, মুখ কুঁচকে বললেন, 'ও সম্মানটা জনাব ইমাম হোসেনেব—জনাব সৈযদ আলি—জনাব'—থেমে গেলেন আলি সাহেব।

'আপনি যে খুব ইমানদাব তা তো দেখলুম! খুব ভাল কথা। আমবা সকলে অবশ্যি জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেবেব কথাই সবচযে আগে মনে কবি।'

হবিলালবাবু বললেন, 'আমাদের কলেজেব প্রিন্সিপাল কালীশঙ্কববাবু চাবশ টাকা মাইনে পাচ্ছেন। উকিলদেব একজন জুনিযব মুখফোঁড়ও তো এব চেযে বেশি পায। অথচ উনি দশ বছব ধরে কলেজে প্যাঁদাচ্ছেন। এত বড় একটা কলেজ, এত ছেলে, প্রিন্সিপাল সাহেবকে এত কম মাইনে দিলে চলে না ত'—

'তা তো ঠিকই'—ওয়াজেদ আলি বললেন, 'আমিও ভেবেছি এ সব কথা। আমাব মনে হয—আচ্ছা ওকে—সাতশ টাকা করে দিলে কেমন হয।'

এ-বকম কথা আব কারু মুখ থেকে বেরুলে তাব গালেই চড় মাতেন হবিলাল। সাতশ টাকা! বটে! সাতশ টাকা এক সঙ্গে কোনো দিন দেখেছে কি কালীশঙ্করের মুক্তি পাযবাব বাচ্চাবা, ধনা আব জনা? ওদেব ধাড়ি বাপ দেখুক গে; ওবা দেখেছে! আমাব ছেলেরা নাতিরা তো হাজাব-হাজাব টাকাব গিলে চটকাচ্ছে বোজ। ওয়াজেদ আলি কথাটথা বলে বেশ, তর্কবিকর্ত করতে পাবে। কিন্তু ফিনান্সের জ্ঞান নেই; না কি, আমাকে একটু জব্দ কবতে যাচ্ছে? ফিচেল ওয়াজেদ আলি?

'না আলি সাহেব। আমি ভেবেছি সাড়ে চাবশ টাকা কবে দেব।'

'মোটে!'-আলি সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, হাসতে-হাসতে বসে পড়লেন।

'আহা, আপনাদেব খানদানি চাল দিযে কালীশঙ্ককে বিচাব কবলে চলবে কেন, ও ত মাস্টাব।'

'মাস্টার, তাতে কী! খাবে না? পরবে না? একজন গোয়ানিজ বাবুর্চিব মাইনে—'

'আবে ছেড়ে দিন আপনার বাবুর্চির কথা। কালীমাস্টাবকে কোযার্টার্স দেওয়া হচ্ছে—'

'কোযার্টার্স?'

'হ্যাঁ। লিখবে, পড়বে, খাবে, আবামে থাকবে। ওঁদের অত বেশি টাকাও লাগে না। তিনশ-আড়াইশ হলেও হয। তবে এত বড় একটা কলেজ, এত ছেলে, কম মাইনে পেলে ছেলেদেব কাছে মর্যাদা থাকে না। মর্যাদা না থাকলে কাজ খাবাপ হয। কলেজেব ক্ষতি হয। ছেলেরা আজকাল মাস্টাবমশাইদের মাইনে খতিয়ে দেখে। বলে, একশ টাকাব বকনা, একশ পঁচিশ টাকাব বকবি, একশ ত্রিশেব বইল যাচ্ছে ঐ, এক-একজন মাস্টারকে দেখিয়ে—'

'বইল। বইল বলে?'

'বইল। বইল বলে।'

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব হরিলালেব দেওয়া চুরুটটা জ্বালিয়ে নিযেছিলেন। বসে-বসে

টানছিলেন। রাতে আজ ফকরুদ্দিন সাহেবের ওখানে যেতে হবে। প্রায় বছর খানেক কলকাতায় থেকে চার পাঁচদিন হল জলপাইহাটিতে ফিরে এসেছেন ফকরুদ্দিন। লিগে ঢুকছেন হয় তো।

'আপনার চুরুটটা হরিলালাবাবু, টেনে আরাম আছে। বাঃ। খাশা। কোথায় পেলেন আপনি?'

'কোথায় পেলেম। কলকাতায়, আবার কোথায়। কালবাজার ধুনে ধোনাদা করে তবে জুটল। আড়কাঠিদের কেষ্ট-বিষ্টুর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে। খান চুরুট আপনি?'

'আলবৎ।'

'দেখি। কিছু আনিয়ে দেব তাহলে কালীশঙ্করের সাড়ে চারশই ঠিক' ওয়াজেদের দিকে তাকিয়ে বললেন হরিলাল।

'কালীবাবু কী মনে করেন'—সিকিটাক সহানুভূতি-সমবেদনায় কালীশঙ্করের দিকে ওয়াজেদ আলি সাহেব তাকালেন।

হেসে হাত কচলাতে-কচলাতে কালীশঙ্কর বললেন, 'আপনারা ভাল বুঝে যা ঠিক করবেন, তাই তো মাথা পেতে নেব।'

'আচ্ছা, সাড়েচারশই হোক'—ওয়াজেদ আলি রায় দিলেন। ওয়াজেদের চুরুটের পুরু ছাইয়ের মুখোমুখি হরিলালবাবু বসে আছেন। ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন ওয়াজেদ। ছাইয়ের ফুলকি-টুলকি কারু চোখে গেল নাকি?

'সাড়ে চারশই হল তাহলে'—সকলের দিকে তাকিয়ে হরিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'সাড়ে চারশ ডি-এ নিয়ে? না,এমনি?'

'ওসব ছেঁদো কথা বলবেন না। চারশ ছিল, পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এক ডাকে'—বললেন, সেক্রেটারি হরিলাল।

'আমার একটা কথা আছে।'

'কী কথা আছে ব্রজমাধববাবু?'

'যে বেশি পাচ্ছে তাকেই কি আরো বেশি দেবেন আপনারা? চারশ পাচ্ছেন কালীবাবু, বেশ তো পাচ্ছেন। মাগগি বাজার বটে, কিন্তু সাদা-সিধে মাস্টার, খাঁই কম, একটা সিগারেটও তো খান না। এই দশ-পনের বছর তিনশয় চলেছে, আজ আবার একদিনেই ডিলিক মেরে—'

বাধা দিয়ে হরিলালবাবু বললেন, 'ব্রজমাধববাবু বড় বেশি বকেন। কত চারশ টাকা পাচ্ছেন আপনি আজকাল আর, ফৌজদারির আখমাড়াই মাড়িয়ে? নিজের পশার কমে যাচ্ছে বলে আর-একজনের ভাল হচ্ছে দেখে আপনার চোখ টাটাবে ব্রজমাধবাবু?'

ব্রজমাধবাবু ওৎ পাতছেন মনে হচ্ছিল। এখুনি কথা বলবেন? সিগারেটের দু-একটা টান দিয়ে। ওয়াজেদ আলি সাহবে একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, সহজ কথা আপনি বড় কঠিন করে বলেন হরিলালবাবু?'

'আমি বলছিলাম ওঁকে পঞ্চাশ টাকা বেশি না দিয়ে নীচের দিকের যে-সব প্রফেসররা কম টাকা পাচ্ছেন তাঁদের পাঁচ-দশ-পনের করে বাড়িয়ে দিতে'—ব্রজমাধবাবু নাছোড়বান্দার মত বললেন।

'ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন প্রফেসর। তাদের ভিতর পঞ্চাশ টাকার একটা লাড্ডু ছেড়ে দিলে কে খাবে? খেতে গিয়ে কামড়াকামড়ি করবে নাকি ব্রজমাধববাবু? আর যদি না করে, মাথা পিছু কে কত পাবে?'—খুব স্পষ্ট পুরুষ্টু ঠাণ্ডা গলায় বললেন হরিলালবাবু।

ব্রজমাধববাবু একটু ভেবে বললেন, 'কেন পঞ্চাশ টাকার চেয়ে বেশি বরাদ্দ হতে পারে না এদের জন্যে? পঁয়ত্রিশজন প্রফেসর, তিনশ পঞ্চাশ-সাতশ, ধরুন চোদ্দশ টাকার ব্যবস্থা, করতে পারি না আমরা মাসে-মাসে এঁদের জন্য ওয়াজেদ আলি সাহেব?'

'সে রকম আয় নেই তো কলেজের, ডোনেশন নেই বাইরের থেকে, সরকার থেকেও বেশি কিছু সাহায্য নেই—ভাল ফাণ্ড নেই—

'এস সব যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত নয়?

'কে করবে? এ নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। সব দিকেই ঝামেলা হামলা। কারুর মনে শান্তি নেই—ঘর নেই—বাড়ি নেই—না খেয়ে মরছে, ভেসে যাচ্ছে সব—কে কাকে দেবে? কে আদায় করতে বেরবে? কার কাছ থেকে আদায় করবে? কতগুলো কালবাজারের বজ্জাত ছাড়া টাকা আছে কারু কাছে? কালবাজারের পাজিগুলো টাকা দেবে কলেজকে? কেন, কলেজে খুব সুন্দর মেয়েমানুষ পয়দা হয় নাকি?'

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব সকলেব মুখের দিকে তাকাতে-তাকাতে বললেন, 'সরকাবের টাকা নেই? কাগজের টাকা নেই যে তা নয়। কোটি-কোটি বেরুচ্ছে রোজ। আরো কোটি-কোটি বেরতে-বেরতে এমন হবে যে, এ সব কাগজ জ্বালিযে চাযেব জল গবম কববে মানুষ। এগুলোর হিম্মতে কিছুই পাওয়া যাবে না খাওয়ার, পববাব।'

'বেশ রং চড়িয়ে তো বললেন ওয়াজেদ আলি সাহেব। সরকাবেব অবস্থা এত খাবাপ নয়, সরকারেব কাগজের নোট এখনও দিব্যি কথা বলে। যাবা মোটা বোজগাব কবে তাবা কী বকম খাচ্ছে, পরছে, ফুর্তি লুটছে আমাদেব চেযে ভাল জানেন আপনি। টাকার তেজ আছে। তবে ঝোঁক নানা জিনিসেব দিকে—ইস্কুল-কলেজের দিকে নয। দিনকাল খাবাপ হযেছে—এ বকম তো হবেই। পরকে লুটে খাওয়া, নিজেব ঘব সামলানো—এই দুটো কাজেই নিজেকে খবচ করে ফেলছে মানুষ; কাজেই পুলিশ চাই, সৈন্য চাই। আত্মরক্ষা কববার জন্যেও পবকে মাববাব জন্যেও। কলেজে স্কুলে পড়ে, প'ড়ে কী হবে? সেখানে কবিতা তারিফ কবতে শেখায, আকাশে নক্ষত্রদেব জন্ম-মৃত্যু-আলোকবর্ষেব ইতিহাস জানিযে দেয মাস্টাববা। এ সব শিখে জেনে যা পৃথিবীব সকলেই চাইছে সেই সবেব উপবে আমিকে, সব দেশেব উপবে আমাব দেশকে, সকলের শক্তিব চেয়ে বড়—আমাব লেত্তিব শক্তিশেলকে পাওযা যাবে কি? এ সব পেতে হলে এনতার সোনা কুঁকড়ো আব ধোনা মুর্গি চাই—'

'মুর্গি চাই? কেন মুর্গি কী হবে?'

'খাবে, একটাকে আব-একটা, লাখটাকে লাখটা। ভ্যালা চলছে মুর্গিব লড়াই বটে, বাস্তা-ঘাটে, দেশ-বিদেশে, আকাশে-বাতাসে—'

চুপ কবে বসেছিলেন হবিলালবাবু। কথা শুনছিলেন বটে মাঝে-মাঝে চোখ বুজে বা মেলে, চুরুট টানতে-টানতে-যাবা বলছিল তাদের বুদ্ধি-নির্বুদ্ধিতাকে ক্ষমা কবে।

'আপনাদের কথা শেষ হল?'

হবিলালবাবুর প্রশ্নেব উত্তব দিতে গেল না কেউ। যে-কথা চলছিল এতক্ষণ তাব জেব টেনে কথা বা অন্য কোনো নতুন কথাও পাড়া হচ্ছিল না।

'প্রিন্সিপালের মাইনে তো ঠিক হল। এখন আব-একটা ছোট জিনিস আছে। জলপাইহাটি কলেজে নিশীথ সেন বলে একজন প্রফেসব আছে, নাম শুনেছেন ওয়াজেদ আলি সাহেব?'

'নিশীথ সেন? নিশীথ সেন তো ব্যাবিস্টাব ছিল, না?

'না, সে নিশীথ সেন নয।'

'তা আব কে? কিসেব প্রফেসর?'

'ইংবিজিব। নাম শোনেন নি তাব। শুনবেন কী কবে? আপনি তো নতুন এসেছেন এখানে। কলেজেব মাস্টাবদের নামেব ফিরিস্তি তালিম কবা ছাড়া ঢেব দবকারি কাজ আছে আপনাব—'

'নিশীথ সেন মানে এন-এস?'—ব্রজমাধববাবু জিজ্ঞেস কবলেন।

'হ্যাঁ এন-এস'—বললেন হবিলাল।

'এন-এসকে চিনলেন কী করে আপনি ব্রজমাধববাবু?'

'এন-এসকে আমি চিনি—বঙ্কিম দত্ত বললে।

'এন-এসকে আমি চিনি'—বললে অন্তিম দত্ত।

'নিশীথ সেন প্রফেসরকে আমি খুব ভাল করেই জানি'—নবকৃষ্ণবাবু বললেন।

'কে, নিশীথ প্রফেসব? ও তো কত তাস পিটেছে আমাদেব বাড়িতে'—বলে হিমাংশু আবো কিছু ফাঁদবে ভাবছিল।

'আচ্ছা, নিশীথ সেন বলতে বুঝল না, এন-এস বলতেই ধবে ফেলল সবাই, ব্যাপাবটা কী বকম হল?'—হবিলালবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি একটু খটকায পড়ে।

'ও আছে এক কাযদা আলি সাহেব। একদিন কলেজে বেড়িয়ে আসুন না, বুঝতে পারবেন। করিডর দিযে হাঁটটে-হাঁটতে শুনবেন টি-বি, টি-বি কবে কান ঝালাপালা করছে। ব্যাপাবটা টিউবাবকিউলিসিস সম্পর্কে নয, টি-বি মানে প্রফেসর তারিণী বাড়ুজ্জ্যের কথা-হচ্ছে। দু-চাব পা এগিয়ে আর-এক ক্লাসেব ছেলেবা বি-বিকে নিযে পড়েছে, কোনো বিবি সাহেবেব দিকে লক্ষ্য নয, ছেলেবা বিনোদ বোস প্রফেসরকে ঠুকছে। এমনি এ-এম, পি-এম, ডি-ডি-টি, এল-সি-এম, ডি-ডি-টি, এম-জি-সি এ সবই আছে।'

ভারী তামাসা বোধ করছিলেন ওয়াজেদ আলি সাহেব। হরিলালবাবুর কাছে আর-একটা চুরুট নিলেন। জ্বালিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাহেব, 'জি-এম আছে।'

সকলে হো হো করে হেসে উঠল, ব্রজমাধব আর কালীশঙ্কর ছাড়া।

'আলবৎ আছে। গৌরী মিত্তির তো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুড মরো।'

'সকলে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল আবার। ব্রজমাধব ছাড়া।

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব এবারে তার স্ল্যাকসের পকেট থেকে একটা রূপোর সিগারেট কেস বের করে সকলকে সিগারেট বিলিয়ে দিলেন।

'এন-এসের কী হয়েছে?'

'নিশীথ সেন এ-কলেজের ইংরেজির প্রফেসর। দেড়শ টাকা মাইনে পাচ্ছে। বেশ তো আছে; এর চেয়ে বেশি আর কী পাবে মফস্বল কলেজে? এ তো কলকাতা নয় যে টাকার উপর পোকা পড়বার ফাঁক নেই। যা পাচ্ছে অমনি রাবণের চিতেয় ঢালো। দেড়শ টাকার বেশি যে-মাস্টার চায় মফস্বলে, তার বদখেয়াল আছে। এখানে টাকায় দু-তিন সের দুধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'কিন্তু চোদ্দ সের পাওয়া যেত। তিন টাকা ছিল চালের মণ—এখন পঁচিশ-ত্রিশ টাকা হয়েছে। কী যে দইবড়া বলছেন আপনি হরিলালাবাবু? দেড়শ টাকায় কী হয় একটা পরিবারের?' ব্রজমাধববাবু বললেন।

'হয়ে তো যাচ্ছে। সোয়াশ টাকায় তো হচ্ছে। একশ টাকায় হচ্ছে না? এ কলেজের যে-সব মাস্টার একশ টাকা পায় তারা কি আপনার কাছে থেকে বুদ্ধি ধার করে খাচ্ছে-দাচ্ছে? ছেলেদের পড়াচ্ছে?'—হরিলালবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন।

'খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে ছেলেদের কাছে উপস্থিত হওয়া চাই তো। মনে একটা সুস্থিরতা থাকা চাই, না-হলে কী করে ভাল করে পড়াবেন মাস্টারেরা? কী করে উপকার হবে কলেজের?' ব্রজমাধব বললেন।

'কলেজের কোনো অপকার হচ্ছে না। স্টাফে যে-টিচারেরা আছেন, তাঁরা ঠিকমতই পড়াচ্ছেন,' প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করবাবু বললেন, 'একশ-সোয়াশ টাকায় খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, কলেজ গুঁতোচ্ছেন হাঁড়িচাচা পাখির মতো চেঁচিয়ে। বেশ বেশ আছেন। কেন মাইনে বাড়িয়ে আমড়াগাছি শিখিয়ে মাথা খারাপ করে দেবেন তাঁদের?'

হরিলালবাবু হেসে মাথা নেড়ে ওয়াজেদ আলির দিকে তাকালেন, 'শুনলেন তো প্রিন্সিপালের নিজের মুখের কথা, কিন্তু ব্রজমাধববাবুকে কে বোঝাবে'। আক্ষেপ করে হাত ঘুরিয়ে, আঙুল নাড়িয়ে কয়েকটা রেখার আঁচড়ে-পোচড়ে কেমন কিম্ভূতকিমাকার করে রাখলেন মুখটাকে।

ওয়াজেদ আলি চুরুটে একটি টান দিয়ে বললেন, 'কলেজ কমিটিতে ব্রজমাধববাবু একটা হেলদি অপোজিশনের মত। এ না-থাকলে চলে না'। ব্রজমাধববাবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে ওয়াজেদ আলি বললেন, 'আচ্ছা ব্রজমাধব বাবু, মেঠো ইঁদুর কি সোনামুগের ডাল খায়?'

'কথার ধার ধারি না আমি। বোবা হয়ে থাকতে রাজি আছি যদি বুঝি'—ব্রজমাধববাবুর মুখে যে-কথাগুলো এসে পড়েছিল সে সব তোড় থামিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, 'মাস্টারদের হয়ে কথা বলবার লোক থাকা চাই তো। আছে বটে একজন স্টাফ রিপ্রেজেনটেটিভ, কিন্তু ওরকম ন্যাতা-জোবরা ভালমানুষ দিয়ে কাজ হয় না।'

'হয় না বুঝি তাকে দিয়ে,' ধোঁয়াটে দীনাত্মা চোখ তুলে হরিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে কলেজ কমিটিতে ঢুকেছিলেন ব্রজমাধববাবু?'

কোনো উত্তর দিলেন না তিনি।

'গার্জেনদের তো?'

এ রকম প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন স্বীকার করলেন না ব্রজমাধব। কিন্তু তবুও হরিলাল বড় বোয়ালমাছের মত তাকিয়ে আছে যেন, পুকুরের নরম মাটির কিনারা-ঘেঁষা কোনো কচি কেঁচো দেখে ফেলেছে যেন মনে হচ্ছিল ব্রজমাধবের। তাই বটে কি? তাই বটে হরিলাল?

'হ্যাঁ গার্জেনদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে এসেছি আমি। কী হল তাতে?'

'না, হয় নি কিছু—এর পরের কলেজ কমিটির ইলেকশনে—'

ব্রজমাধবাবু, 'অভিভাবকদের প্রতিনিধি হয়ে আমি দাঁড়াব ইলেকশনে—কলেজ কমিটি আমি ছাড়ছি

না, যতদিন আপনি আছেন, আমিও আছি হবিলালবাবু'।

হরিলালবাবু হেসে ফেললেন। জানে না যে কার সঙ্গে কে দেযালা করতে চাচ্ছে। হাতেব চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে চুরুটের মুখ লাল কবে নিচ্ছিলেন, হাসছিলেন। কেউ কিছু বলছিল না কোনো দিক থেকে। হরিলালবাবুব হযে দুটো কথা বলা উচিত নয় কি কারো? কালীশঙ্করবাবুও ঘাপটি মেবে চুপ করে আছেন, যেন তার পঞ্চাশ টাকা এমনি-এমনি আদব করে বাড়িযে দেওযা হল, কালীবাবু, হরিলালের নাতজামাই বলে।

'আপনি বড় তিরিক্ষে হযে উঠছেন ব্রজমাধববাবু'—ওযজেদ আলি বললেন। ব্রজমাধববাবুকে এখন এ কথা বলার জন্য যেন বাযনা দিযে রাখা হযেছিল ওয়াজেদ আলিকে—প্রিন্সিপাল সকলের অজান্তে বাইরে শূন্যের দিকে চোখ দিযে গাঁট্টা মেরে ভাবছিলেন।

'বড্ড বেঁকে আছেন ব্রজবাবু; ওটা হেলদি অপোজিশনেব হতে হয। নাহলে চুষিকাঠি কে দেবে? কোথায় পাবে?' চিপটেন কেটে বললে হিমাংশু চক্রবর্তী।

পথে এসো দাদাবা—ভাবছিলেন হবিলাল, কই, অন্তিম দত্ত, বঙ্কিম দত্ত কিছু বলছেন না যে।

কেউ কিছু বলবাব আগে ব্রজমাধববাবু বললেন, 'কলেজ ফাণ্ডে কত টাকা আছে?'

'সেটা ফিনান্স কমিটি বুঝবে। এখানে সে কথা কে জানে-কে বলবে আপনাকে?'

'আপনি সেক্রেটারি—আপনিই তো জানেন সব।'

ওযাজেদ আলি সাহেব ব্রজমাধববাবুর কাঁধে হাত রেখে চেপে দিযে বললেন, এখানে হবিলালবাবুব বাড়িতে এসে ও-সব কথা জিজ্ঞেস কবা তো ঠিক নয। যদি দরকাব হয—সাব কমিটিতে ফিনান্স কমিটিতে, আলোচনা কববেন'।

'ফিনান্স কমিটিতে একবাবও আমি জাযগা পাই না!'—ব্রজমাধববাবু খানিকটা তিক্ত, পীড়িত হযে বললেন।

'কেন?'

'হবিলালবাবু জানেন—'

'সবই তো জানে হবিলাল। হাঁসেব পেটে কেন ডিম আসে, ব্রজবাবুব পশাব যত কমে যাচ্ছে মেজাজ তত বেগড়াচ্ছে—পাছাব কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে—সবই হবিলালেব কাবসাজি'—বলে হবিলালবাবু চুরুটটার দিকে একবার তাকিযে নিযে টানতে আবম্ভ কবলেন।

'এবাবকার ফিনান্স কমিটিতে আপনাকে নেব ব্রজমাধববাবু'—ওযাজেদ আলি আশ্বাস দিযে বললেন।

'আমি একা গিযে কবব কী—সবই তো আমাব বিপক্ষে।'

'যাবেন, আবাব যাবেনও না, সে কীকরে হয।চলে যান ফিনান্স কমিটিতে, গিযে লড়বেন, একা লড়বেন। নিজেকে, সকলকে, আবহাওযাকে বেশ পবিষ্কাব ঝর্ঝবে করে দিযে আসবেন—'

'আপনি যাবেন আলি সাহেব ফিনান্স কমিটিতে?'

'আমি? না, আমি না—'

'কেন?'

'ও-সবের বুঝি না কিছু আমি। হবিলালবাবু মনে কবেন আমি কলেজ ফিনান্সেব হদিশ পাই না। প্রিন্সিপালেব মাইনে সাতশত টাকা করে দিতে বলেছিলুম, প্রফেসবদেব তো চারশ-পাঁচশ দিতে চাই। ওতে হয না। হরিলালবাবুব মতন একজন জানেওযালা মানুষ ব্রেক কষে না-ধবে থাকলে তা টেঁকে না।'

'ঠিক কথা বলেছেন ওযাজেদ আলি সাহেব'—অন্তিম দত্ত বললেন।

'হরিলালবাবুকে বুঝবার মতন আলি সাহেবের মতন একজন দরাজ, দববাবি মানুষ থাকা চাই। না হলে কী কবে জোর পাবেন হবিলালবাবু'—সহজভাবেই কথাটা বললেন বঙ্কিম দত্ত। ভাব গ্রহণ করে খুশিও হলেন হরিলাল। তবে বেশি নয। কথাটাকে আরো গুছিযে বাড়িযে আস্ফোট কবে বলা উচিত ছিল।

'ব্রজমাধববাবু যেন সব ভেঙে ফেলতে চান। জানেন না একটা জিনিস গড়ে তোলা কী বকম শক্ত। ত্রিশটা বছর ধরে, প্রাণপাত কবে এই কলেজটা সৃষ্টি কবেছেন হরিবাবু। ছাগল দিযে ধান মাড়িযে খান তো ব্রজবাবু, মানুষের পৃথিবীর খবর রাখেন না'—হিমাংশুবাবু বললেন।

চুপ করে বসে আছে কালীশঙ্কর, কোনো কথা বলছে না। আমার কলেজের নুন খেযে ওর পেট জাম্বুবানের মত, কিন্তু বাপের হাত-তোলা তুমি শুধু খাবেই বুঝি কালীশঙ্কর; বাপের সমুখে বসে দুটো

ভাল কথা শোনাতে পারবে না তাকে?

হরিলালবাবু প্রিন্সিপালের দিকে তাকালেন। হরিলালবাবুর ও-রকম চোখে চাউনির মানে জানা আছে কালীশঙ্করের। গলাটা খাকরে নিয়ে তিনি বললেন, 'ব্রজমাধববাবু গার্জেনদের নমিনেশন পেয়েছেন বলেই আমাদের মাথা কিছু কিনে ফেলেন নি। ফিনান্সের কিছু বোঝেন না তিনি। আমি তাঁকে ও-কমিটিতে ঢুকতে দিচ্ছি না। হরিলালবাবুব কোনো দোষ নেই। হরিবাবুর মত উদার মানুষ জলপাইহাটিতে নেই। বাংলাদেশে খুব কমই আছে। অনেক দেশে তো ঘুরেছি, অনেক লোক দেখেছি আমি ওয়াজেদ আলি সাহেব। জেনে শুনেই কথা বলছি। আমাদের ভাগ্য আমাদের মধ্যে ছিলেন উনি, ওঁকে আমরা পেয়েছি, সেই জন্যই এত গুলো লেকচারার প্রফেসরী করে খাচ্ছে। এ না হলে এদের গতি ছিল কী? কে পুছত এদের? তিনি যা করেন ভালর জন্যই করেন। বুদ্ধি প্রতিভা হরিবাবুর তো বাংলাদেশের সেরা মানুষদের মত। কলকাতায় থাকলে তিনি বড় মেজ মন্ত্রী হতে পারতেন। আমাদের জন্যেই স্বার্থত্যাগ করে এখানে আছেন। ব্রজমাধববাবু উড়ে এসে জুড়ে বসে আজ অনেক বারফটকা কথা বলেছেন। কিন্তু এ-রকম ঘোড়া ডিঙিযে ঘাস খাবার বুদ্ধি নিয়ে তিনি নিজেরও উপকার করবেন না, কলেজেবও না। যিনি ত্রিশ বছর ধরে হিতব্রত নিয়ে এখানে আছেন জলপাইহাটির কলেজের মানবতার কিসে উপকার হয তাব মতন কেউ তো তা বুঝবে না। হরিলালবাবুর প্রতিভা ও মহানুভবতা যে কতদূব অপূবণীয তিনি একদিন মবে গেলেই জলপাইহাটি আর বাংলাদেশ তা বুঝবে।'

কালীশঙ্করের এ-সব কথায কালীশঙ্করের নিজের বা অন্য কারো আন্তরিক সায় ছিল না। কথাগুলো অর্ধসত্য, হয়ত দশ আনি মিথ্যে, ছয় আনি সত্য।

হরিলালবাবু কী ভাবছিলেন জানা নেই, কিন্তু ভাষণ আর-কারো প্রাণেই বিশেষ কোনো সাড়া জাগাতে পারল না। প্রিন্সিপালের বাংলা ভাষাও যে বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর ছুঁয়ে আজকালকাব 'ডি পি আইযি' স্কুল-টেক্সটের প্রবন্ধের ভাষায কক্কে খুঁজছে! এরা কেউ ভাষা নিয়ে মাথা না ঘামালেও এদেব ভিতব এক-আধ জন অন্তত—নবকৃষ্ণ অন্তত-সেটা টের পাচ্ছিলেন। নবকৃষ্ণের মনে হচ্ছিল বাংলাটা কেমন জোলো, মাঠো, কেমন বোকাপানা পাত-মাস্টারি বাংলা যেন।

'আমি জানি কলেজের খুব মোটা ফাণ্ড আছে। প্রফেসবদের জন্যে মাসে-মাসে চোদ্দশ টাকা ববাদ্দ অনাযাসেই করা যেতে পাবে।'

'সেটা আপনি ফিনান্স কমিটিতে ঠিক করে নেবেন ব্রজমাধববাবু। ওয়াজেদ আলি সাহেব তো ঢোকাচ্ছেন আপনাকে সাব-কমিটিতে, আপনার কোনো আফশোস থাকবে না'—ধীব স্থিব গলায সুভাষিতের মতন হরিলালবাবু বললেন।

'আমি আরো জানি যে কলেজের সেই ফাণ্ডের টাকা থেকে হরিলালবাবু নিজেব খরচের জন্যে—,' ওয়াজেদ আলি মুখ চেপে ধরলেন ব্রজমাধববাবুর।

'কমিটিতে, কমিটিতে-ও-সব কমিটিতে হবে ব্রজবাবু, এখানে ভদ্রলোকেব বাড়িতে কি এই কবতে এসেছি—'

'কমিটিতে কী হবে? 'কমিটিতে কি রাহাজানি হবে?' হিমাংশু চক্রবর্তী জিজ্ঞেস কবলেন ওয়াজেদ আলিকে।

'এই যে হন্যে কুকুরের মতন আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে আমাদেরও, তাতে কাউন্সিলে না পাঠিয়ে ছাড়বে না ব্রজমাধববাবু। এ-সব পাগলামি আবার কমিটিতে সেধিযে লেলিযে দিতে হবে বুঝি'—বঙ্কিম দত্ত; অন্তিম দত্ত বললে।

'হে হে হে, হাউড্রোফোবিয়ার ভয়?' হাসতে-হাসতে বললেন ওয়াজেদ আলি সাহেব, 'নিন রাত হযেছে, ওঠা যাক।'

হারিলালবাবু বললেন 'সেই নিশীথ সেনের কথা বলছিলুম, দেড়শ টাকা পাচ্ছে আমাদের কলেজে, বললে সোযা দুশ-আড়াইশ, অন্তত দুশ না-করে দিলে কাজ করতে পাববে না সে। কী করে আমি তাঁকে দুশ আড়াইশ করে দিই আলি সাহেব?'

'কোন প্রফেসর? কী রকম পড়ায?'

'আছে, পাঁচ-পাঁচির মতন আর কি, তা যেমনই হোক না কেন, দেড়শ থেকে সোয়া দুশ-আড়াইশ কী করে হয়। এত দিন পরে প্রিন্সিপালের টাকা, পঞ্চাশ টাকা বাড়ল মোটে—না, তা হয কী করে, প্রিন্সিপালের ইনক্রিমেন্টের অনুপাত ডিঙিযে বাড়তে পারে না।'

সূচীপত্রে যান

'সে অনুপাতের আধা-আধিও বাড়াতে পারে না। সিকিটাও না। প্রিন্সিপালের পঞ্চাশ বাড়লে দশ-বার টাকার বেশি বাড়তে পারে না অধ্যাপকের'—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

'তা ছাড়া একজন মাস্টারের মাইনে যদি বাড়ানো যায় তা হলে অন্যেরা কী দোষ করল?' বঙ্কিম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রজমাধববাবু বললেন, 'এমন দশ-পনেরটা কেস আমার জানা আছে হরিলালবাবু যে আপনার পেটোয়া প্রফেসরদের মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনি, অন্যদের দাবি উপেক্ষা করে'।

'তাই নাকি?' ওয়াজেদ আলি সাহেব হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'লিস্ট আছে আপনার কাছে?'

'আছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট টাকা করে বাড়িয়েছেন, যারা ওর পেটোয়া নয় তাদের গলা কেটে দিনদুপুরে রাহাজানি করে। অনুপাত কষছেন হিমাংশু চক্রবর্তী প্রিন্সিপালের ইনক্রিমেন্টের সিকির ভাগ দেওয়া হবে বলে এক-একজন প্রফেসরকে। কেন? হরিলালবাবুর জামাই কামাখ্যা ঘোষালকে ষাট টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল এক লাফে এক ডাকে। আপনার শালা ধরণী মুজমদারকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল কেন হরিবাবুর এক কথায়, সেটা আমাদের খুলে জানাবেন কি চক্কোত্তি মশাই। হরিলালবাবুর গোমূত্র পান করার জন্য আপনারা মানুষ খুন করতে পারেন দিনে-দুপুরে—পৌষমাস করে বেড়াতে পারেন কার্তিক মাসের কুকুরগুলোর মত।' এক মিনিট-দু মিনিট নিস্তব্ধ হয়ে রইল সব।

'অত কাছে ঘেঁষে বসবেন না ব্রজমাধববাবুর। ওর মুখে লালা কুকুরের লালা হয়ে গেছে,আলি সাহেব। লাগিয়ে দিলে জলাতঙ্কে বিশ্বসংসার ঘুরেও জল তেষ্টার এক ফোঁটা জল পাবেন না। এ কুকুর কি এখনও গভর্নিং বডির মেম্বার থাকবে?' হিমাংশু চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করল হরিলালবাবুকে।

'সে জানে সরমার বাচ্চাকে যারা পাঠিয়েছে তারা—'

ওয়াজেদ আলি সাহবে একটু বিচলিত হয়ে বললেন, 'এ-রকম কথা বলছেন কেন আপনারা? কথাগুলো ভাল হচ্ছে না। এত গালাগালিতেও মোক্ষম হাড়ে বাতাস লাগিয়ে বসে আছেন ব্রজমাধববাবু'—ওয়াজেদ আলি ব্রজমাধব-বাবুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন—

'নিশীথ সেন বলেছে যে, সোয়া দুশ-আড়াইশ টাকা মাইনে না-দিলে কলেজে কাজ করবে না সে। দেড়শ পাচ্ছে, দশ টাকা বাড়ানোও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। নিশীথবাবু মাইনে বাড়বার কোন সম্ভাবনা না দেখে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছে। কিসের জন্যে ছুটি চাচ্ছে সেটা দরখাস্তে খুলে জানায় নি, কোনো ডাক্তারের সার্টিফিকেটও দেয় নি, ক্লাশ নিচ্ছে না, ঘুরে বেড়াচ্ছে'—হরিলালবাবু বললেন।

'দরখাস্ত কি মঞ্জুর হয়েছে?'

'না'।

'মঞ্জুর যে হয় নি তা কি সে জানে?'

'সে তো কলেজেই আসে না, কে জানাবে তাকে?'

'কী মতলব নিশীথ সেনের?' আলি সাহেব বললেন।

'কে জানে। কলেজে কাজ করবে না হয় তো আর। আমরা তার দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলেছি—'

'কেন?' ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রজমাধববাবু।

'ও-রকমভাবে কে করে দরখাস্ত দেয়? সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার না করে বোকার মত দরখাস্ত লিখলে—অন্তত ডাক্তারের সার্টিফিকেট না দিয়ে সেটা পেশ করবার মানে কী?'

'তাই বলে দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলবেন আপনি! মামুলি দরখাস্ত করেছে, কী তার মানে, সেটা আপনার বোধগম্য হয়েছে কি না, কমিটিকে না দেখিয়ে কী করে ঠিক করবেন তা? সেটা কমিটিতে পেশ করতে হবে। কমিটি বিচার করবে। আপনি কে? নিজেকে কী ভাবছেন আপনি?"

'কিছু মনে করি নি। ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি আমি।'

'ছিঁড়ে ফেলেছেন? কমিটির মিটিঙে পোষ্ঠাম্ব বাবার খাসির মত ছিঁড়ে ফেলা হবে।'

'কাকে?'

'আপনার এই বেকুবিটাকে।'....

'নিশীথবাবুকে ছুটি দেওয়া হবে না। ছুটি যে দেওয়া হবে না সে কথা সে নিজে এসে জানতে না চাইলে জানানো হবে না তাকে'—কালীশঙ্কর বললেন।

'কী করে জানবে? সে তো কলকাতায় চলে গেছে।'

'জানি না। আমাদের জিজ্ঞেস করে যায় নি।'

'দরখাস্ত তো দিয়ে গেছল।'

'কতবার বলব আপনাকে ব্রজমাধববাবু, যে সেটা কানকাটা দবখাস্ত—'

'কার কানকাটা—দরখাস্তের, না যাকে দরখাস্ত করা হয়েছে তার, সেটা কমিটি দেখেশুনে ঠিক কববে'—ব্রজমাধব বললেন।

'নিশীথ সেনকে ছুটি দেওয়া হবে না ওয়াজেদ আলি সাহেব। ছুটি না পেয়েও যদি কলেজে না আসে তা হলে তাব চাকরি থাকবে না।'

'চাকরি থাকবে না? কুড়ি-বাইশ বছর এ কলেজে কাজ করছেন তো নিশীথবাবু চাকরির উপব হাত দেয়া—ওটা জবরদস্তি হল'—ওয়াজেদ আলি বললেন, 'নিশীথবাবু যদি কলকাতায় গিয়ে থাকেন তা হলে তাঁকে ব্যাপারটা খুলে জানিয়ে দেওয়া হোক। লিখে নিন আপনি কালীশঙ্কববাবু। নিশীথবাবুব চিঠি না পেয়ে কিছু কবতে যাবেন না'।

'কমিটির মিটিং হলে তবে তো লিখব। নিশীথবাবুব দরখাস্ত দেখে কমিটি কী ঠিক কবে কে জানে। হয তো সাসপেণ্ড করবে। হয তো ববখাস্ত করবে। ছুটি না-নিয়ে কলকাতায় চ'লে গেল জববদস্তি কে করছে—নিশীথবাবু না আমবা?' কালীশঙ্কববাবু বললেন।

'সেটা কলেজ কমিটিব মিটিঙে বোঝা যাবে'-অমাযিক মুখে তবুও গম্ভীবভাবে বললেন ওয়াজেদ আলি, 'রববার তো মিটিং, হরিলালবাবু?'

'হ্যা, ওয়াজেদ আলি সাহেব, আপনাদেব কাছে দবকাবি চিঠিপত্র আজকালই যাবে।'

'কিন্তু এ বববাব তো এখানে থাকা হবে না আমার—'

'কেন?'

'শুক্কুববাব ঢাকা যাচ্ছি। দিন সাতেক থাকব। ফিবে আসতে শুক্কুর-শনি হয়ে যাবে। এব পবেব রববার মিটিং কবলে হয না?'

'সব ঠিক হয়ে গেছে তো। কালেক্টর সাহেব তাঁব বাংলোতেই মিটিং বসাবেন বলে দিয়েছেন। এ ববব়াবেব পবেব ববব়াবে তো তিনি থাকবেন না জলপাইহাটিতে। ওঁর তো মোটেও ফুবসুৎ নেই—মোটেই পাওয়া যায না মকবুল চৌধুবী সাহেবেকে। ওঁকে বাদ দিযে—'

'না, না, সাহেবকে বাদ দিযে হয কি? থাকেন তো না বেশি মিটিঙে। যখন নিজে বাজি হয়েছেন নিজের বাংলোতে, আচ্ছা দেখি আমি, দু দিন পিছিয়ে ঢাকায গেলে চলে কি না, আচ্ছা দেখি—'

সবাইকে আদাব জানিয়ে, হেসে, ছাই বেশ জমে উঠেছে চুরুটে দেখতে-দেখতে বেবিয়ে গেলেন ওয়াজেদ আলি সাহেব।

নিশীথ বিকেলেব স্টিমাবে কলকাতায বওনা হয়ে গেছে সেই রাতেই। সাড়ে দশটা এগারোটাব সময হারীত আস্তে-আস্তে এসে নিজেদের জলপাইহাটিব বাড়ির দরজায ধাক্কা দিয়ে দু-চাববাব আলগোছে কড়া নেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কে? কড়া নাড়ছে কে?' ভিতব থেকে বলল সুমনা।

'আমি, খুলে দাও।'

সে কথা কানে গেল না সুমনার। বললেন, 'মানুষ বিদেশে চলে গেল, আর রাত দুপুরে এসে দরজায কড়া-নাড়া—কে তুমি?'

'আমি। খুলে দাও না দবজা।'

'আমি কে রে?'

'আমি হাবীত।'

কী বলছে পরিষ্কাব শুনতে না পেয়ে সুমনা বললেন, 'হারীতেব গলা পাচ্ছি না? হাবীত এসেছে না কি? কে রে বাইরে—হারীত না কি?' বলতে-বলতে দরজা খুলে দিলেন সুমনা।

'বাপরে, এ যে হাবীত। কোত্থেকে এলি তুই?'

'বাবা বাড়ি আছেন?'

'এই তো চলে গেলেন আজ।'

সূচীপত্রে যান

'কোথায়?'

'কলকাতায়। অনেক চিন্তা মাথায় নিয়ে চলে গেলেন আজ।'

'কেন, কলকাতায় কেন? কিছু খাবার আছে?'

'কিছু নেই'—সুমনা অসহায়ের মত চারিদেক তাকিয়ে বললেন।

'কিচ্ছু না?'

'না। খুব খিদে পেয়েছে কি তোর? আমি মহিমবাবুদের ওখানে থেকে কিছু—'

'না না, না, সে-রকম খিদে-টিদে পায়নি কিছু। ওদের ঘুম ভাঙাবার দরকার নেই। এ-রকম চেহারা হয়ে গেছে কেন তোমার? অঘ্রাণ-পৌষ মাসের দিঘির জলের উপর দিয়ে তরতর করে হেঁটে যায় যে এক রকম বড়-বড় মাকড়সা, হাত-পা সব আঁশের মত, এত ফিনফিনে সেই মাকড়গুলো যে মনে হয় এদের পায়ের নীচের জল মলিদার মত পুরু, ভাবী, সেই মাকড়সা হয়ে গেলে তো তুমি মা'—বলে হারীত সুমনার কাঁধে হাত রেখে বিছনার উপর বসিয়ে দিল তাকে, নিজে বসল, বসে মায়ের বুকে মুখ গুজে রাখল।

আস্তে-আস্তে ছেলের মাথাটা সরিয়ে দিলেন সুমনা। বললেন, 'কেমন ধড়ফড় করছে আমার শরীর। ছেলেমেয়েদের দেখলে তাদের কথা ভাবতে গেলে, কেমন হয়ে যায় যেন সব—হার্টে গিয়ে লাগে।'

'তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে কলকাতায় গেলেন বাবা?'

'তুমি তো এসেছ।'

'আমার তো আসার কথা ছিল না।'

'বাবা চলে গেলেন, তুমিও এলে; কোথায় ছিলে তুমি হারীত; জলপাইহাটিতে?'

'এই তো আজ জলপাইহাটিতে এলুম। এতদিন কলকাতায় ছিলুম।'

'কলকাতায় ছিলে?'

'এই তো আজ এলুম।'

'সত্যি কলকাতায় ছিলি তুই? এমন টাইম-ঠিক করে এলি কী করে? উনি গেলেন, তুই এলি,' সুমনা বললেন, 'আমার বিশ্বাস হয় না, তুই এখানে ছিলি না' গলা ছেড়ে হেসে উঠতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু হাসি হল না। কেমন একটা বিস্ময় আওয়াজ বেরুল। সে স্বর শুনে আশেপাশে কেউ থাকলে লাফ দিয়ে উঠে এসে বলত, ওরে বাবা এ আবার কী হল?

'আস্তে মা, সোর করো না। মহিমদের ঘুম ভেঙে যাবে। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি স্ত্রীকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছে মহিম।'

'আরে নচ্ছার, তুই কত কী দেখলি, কত চুকলি কাটলি। নে হাত-পা ধুয়ে আয়। এখন ঘুমোবি তো? না কিছু খাবি?'

'এই যে বললে কিছু খাবার নেই—'

'নেই তো কিন্তু মতিলালের দোকানে কিছু মুড়ি-বাতাসা পাবি?'

'এত রাতে?'

'টেমি জ্বলছে না, এই তো দেখছিলুম?'

'ঝাপ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি দেখে এসেছি।'

'কী হবে তা হলে?'

'কিচ্ছু হবে না, জল খাব।'

পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিয়ে হারীত বললে, 'এটা খেতে দেবে?'

'কিছু যখন নেই খাবার, তখন না খাবি তো করবি কী রে বাছা—'

'তোমার সমুখে তামাক খাই নি কোনো দিন আমি। তুমি এ-সব পছন্দ কর না জানি। কিন্তু আজ তো ধোঁয়া ছাড়া খাবার কিছু নেই। এটা খেতেই হবে—' কিন্তু তবুও সিগারেট না-জ্বালিয়ে পকেটের ভিতর ফেলে রেখে দিল হারীত। সুমনা তাকিয়ে দেখলেন, কিছু বললেন না। একটা কাঁসার গেলাস দিয়ে জলের কুঁজো ঢাকা ছিল, তিন-চার গেলাস জল খেয়ে কুঁজোয় একটা ঝাকুনি দিয়ে হারীত বললে, 'কিচ্ছু নেই তো আর, এর পর জলতেষ্টা পেলে কী হবে? তুমি কী খাবে?'

'আমার তেষ্টা পায় না, তোর তেষ্টা পেলে মহিমবাবুদের কলসির জল খেয়ে নিস—শোবার ঘরের দরজা আবজানো আছে ওদের।'

সূচীপত্রে যান

শুনে মহিমবাবুদের জলভরা কলসিটা নিয়ে এল হারীত। বললে, 'এতেই হবে। কাল খুব ভোরবেলা দোয়েল শিষ দেবার আগে শ্যাওড়া তলায় আছাড় মেরে ফেলে আসব কলসিটা। সারাটা দিন অর্চিতা মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব কী ভাবে। কী নাম ওর অর্চিতা না অর্চনা?'

'অর্চনা।'

'তবে অচির্তা ডাকে কেন?'

'সে তোমার বাবা ডাকে।'

'কেন?'

'নানা ফিকিরে মানুষের সঙ্গে একটু টিটকিরি-পিচকিরি কেটে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখে, কথা বলে, কথা বলে, কথা বলে, বাপরে! কাজ করে বটে কথা থামিয়ে, না হলে মাষ্টার বলে? মেশে মেয়েদের সঙ্গে, কিন্তু আর-একটু বেশি মেয়ে-ঘেঁষা হলেই অর্চনা ওকে ধরে ফেলেছিল।'

'কলকাতায় গিয়ে থাকবেন কোথায়?'

'জিতেন দাশগুপের ওখানে।'

'কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে গেছেন?'

'ছুটির দরখাস্ত করে গেছেন। বলেছেন জলপাইহাটিতে ফিরবেন না আর, কলেজে কাজ করবেন না আর'।

'কাজ করবেন না, ফিরবেন না, তা হলে তোমাব কী হবে?'

'আমার কী হবে সেটা ঠিক করবার জন্যেই তো তুমি এখানে এসেছ হাবীত। কে তোমাকে টেনে আনল? যে-রাতে উনি চলে গেলেন, সেই রাতেই তুমি এলে এটা কেমন হল?'

এটা ঠিকই হল, তবে জিনিসটা আশ্চর্য কিছু নয়, তুমি তা মনে করতে পাব, কিন্তু নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। অসাধারণ কিছু নেই পৃথিবীতে, থাকলে মন্দ হত না। কিন্তু, তার (?) চিন্তাব সম্পর্কে বেশি কথা বলতে রাজি ছিল না তার মন আজ এই বাতে, সুমনার মত অসুস্থ সেকেলে আই-এ পাশ স্ত্রীলোকের সঙ্গে। 'আমি এসে পড়েছি বটে, কিন্তু দু-তিন দিন মাত্র থাকবার জন্যে এসেছিলুম, কলকাতায় এখন আমাদের খুব কাজ,' হারীত বললে।

'কিসেব কাজ? তুমি চাকরি কব?'

'না, আমবা একটা পার্টি গঠন কবেছি—'

'কিসের পার্টি? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে—'

'সুমনাকে সব কথা বলবার দরকার নেই হাবীতেব; সুমনা শুনতেও চায় না। বলছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। হারীত অঘ্রাণ-পোষ মাসেব দিঘিব মলিদাব মতন টলটলে জলেব উপব সেই বড়-বড় ফিনফিনে মাকড়ের হাত-পা-মাথা-পেট দেখতে লাগল মাব দিকে তাকাতে-তাকাতে। স্বাধীন হয়ে মাব তো এই হয়েছে! স্বাধীনতার জল-বাতাস লাগতেই হবিলালবাবুব কলেজের কাজে হয়ে গেল বাবাব, একটা দরখাস্ত মেরেই ছুটলেন তিনি কলকাতায়। কলকাতায় স্বাধীনতার আড়ে-দিঘে, সমস্তটা বালি-ধুলো হলকা-হাঁফের মিঠে চাকলি খেতে-খেতে, ঐ লোকটার হাড়গোড় যদি কালচে হয়ে পড়ে না থাকে সেই দুর্দান্ত মরুভূমিতে, তবে কী বলবে হারীত। এতো স্বাধীনতার কলির সন্ধ্যে।

সুমনার হাত-পায়ে কেমন একটা শাঁখচুন্নি যেন নড়ে-চড়ে উঠছে ঘবেব ভিতব। ঘবে কোনো বেডি-কোরোসিনের আলো নেই, চাঁদের আলো আছে, দেওযালেব উপরের দিকে ভাঙা খলফাব বেড়াব ফাঁক দিযে ভেসে আসছে। এত গরমের রাতে ঘরের দরজা-জানালা সুমনা বন্ধ করে দিয়েছে সব।

'শরীবে রক্ত নেই তোমার, তাই ঠাণ্ডা লাগে বুঝি সব সময়?'

'কেন? কী হয়েছে? ঠাণ্ডা দেখলে কোথায়?'

'দরজা জানলা সব বন্ধ কবে বসে আছ কেন? আমি জানলা খুলে দিচ্ছি—'

'চোর আসতে পারে কিন্তু হারীত।'

'আসুক। কী নেবে?'

সুমনাকে নিশীথ দেড়শ টাকা দিয়ে গেছে, তা দিযে দু-তিন মাস সংসাব চালাতে হবে। সে-টাকাটা সে লুকিয়ে রেখেছে ঘরের কোনো এক জায়গায। চোব ঢুকলে অবিশ্যি বার না করে ছাড়বে না। বলবে কি সুমনা হারীতকে সেই টাকাগুলোর কথা? আজ্জ থাক; বাতের বেলা টাকাকড়ির কথা বলতে নেই।

'তুমি কম্যুনিস্ট হয়ে গেছ হারীত?'

তিন-চারটে জানালা খুলে হাওয়ায় একটু ঢুলছিল হারীতেব বিছানার এক কোণায়; সব কথা কানে গেলনা তার।

'বলি, ও হারীত। হারীত।'

'কেন, বল।'

'শুদোচ্ছিলুম তুমি কি কম্যুনিস্ট হয়ে গেলে?'

'কম্যুনিস্ট? না। আমাদেব আর-এক পার্টি।'

'কী নাম তার?'

'কোনো নাম নেই,' হারীত বললে, 'বলতে পব সোস্যালিস্ট, কিন্তু কংগ্রেস সোস্যালিস্ট না। আরো আট-দশ রকমের সোস্যালিস্ট পার্টি দেখা দিয়েছে 'এ'র থেকে 'জেড' অব্দি ইংবেজি অক্ষব সাবাড় হয়ে গেছে পার্টিগুলোর নাম দিতে-দিতে। কাজে-কাজেই আমরা আব-কোনো বর্ণমালা ব্যবহার কবব না, কোনো নাম দিচ্ছি না পার্টির—'

'পার্টি শব্দটাও উঠিয়ে দাও। ও শব্দটা শুনলেই আমার কেমন লাগে। আমাদের গণেশ দিনরাত পার্টি-পার্টি বলে মাথার পোকা খসিয়ে ছাড়ত মানুষদের। বিভাকে নিয়ে পালাল। টাকাব খাঁকতি পড়তেই বিভা আর ছেলেকে ফেলে পার্টি ক্যাম্পে আছে, অনুকণা নামে একটি মেয়েব সঙ্গে সহবাস করছে, কেউ কিছু বলছে না।'

'তুমি এত কথা জানলে কী করে?'

'অর্চনা আমাকে বলেছেন।'

'অর্চনামাসি জানল কী কবে?'

'আমি জানি না। তুমি শুনেছে এ-সব?'

'না।'

'রাজনীতি করছ, টাকা পাচ্ছ কোথায়? খেতে পবতে দেয় কে?' সুমনা বললে, 'বলি অ হাবীত, হাবীত, হারীত!'

'কী গো?'

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? চাকরি করছ না, টাকা পাচ্ছ কোথায়? খাওয়াচ্ছে কে?'

'আমাব একা খাওয়াব জন্য আমি কিছু বোজগাব করি। ছেলে পড়াই, লিখি, মাঝে-মাঝে বাস কণ্ডাক্টাবি কবি, মোটর ড্রাইভারি শিখছি। কেরানিগিবি গোলাম-টোলামি কবব না আমি।'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুমনা বললে, 'গোলামি কবেই তো তোমাব বাবাব এই দশা হল। এর চেয়ে ঠিক সময়ে কলকাতায় গিয়ে মোটব ড্রাইভাবিও যদি শিখতেন। নিজে, পরে, ট্যাক্সি চালিয়েও যদি থাকতেন কলকাতয়, কত স্বাধীনতায় মর্যদায় কলকাতায় থাকতে পারতাম আমবা'।

'তুমি কী কবে জানলে এ-সব,' হাবীত একটু তামাসা বোধ করে। সুমনাব দিকে তাকাল।

'মাঝে-মাঝে হিতেন এসে বলে; এই কলেজের ফোর্থ ইয়াবের হিতেন। তোমাব বাবাব খুব ভক্ত। আমাদেব ভালটা দেখে, ভাল কবে, ভাল চায়, হিতেন, তা ট্যাক্সি চালালে ঐ রকমই নাকি, হারীত?'

'হ্যাঁ, প্রফেসাবিব থেকে ঢের বেশি পাওয়া যায়। হরিলালের মুখনাড়া খেতে হয় না—'

'কি ছেলে, হবে নাকি তুমি ট্যাক্সি ড্রাইভাব? না গভর্নমেন্টেব বড় চাকবি কববে? দেশ তো স্বাধীন। তোমার বাবাকে রেহাই দেবে কে?'

হাবীত দেযালে ঠেস দিযে জানলার ভিতর দিযে বাইবেব দিকে তাকিয়েছিল। একটা সাদা বেড়াল চলে গেল; সজনে গাছে, আমলকী গাছে বেশ দেখাচ্ছে বাইরের জ্যোৎস্না; বেশ ভাবী, খুব বড়, ওটাব চাপ বোধ করতে পারা যায় যেন, সাদা স্নিগ্ধ ওব বোঁযাব হৃদযে চোখ বুজে ঘসে সাদা কাবলি বেড়ালের অনাদি প্রতীকের মত ওর উজ্জ্বল সত্তাকে বেশ ভাল লাগে।

'আমাদের কলকাতায় নিয়ে যাবে কবে? হাবীত?'

মার কথার কোনো জবাব দিচ্ছিল না, হাবীতের মুখে এ-সবেব কোনো উত্তর জোগাচ্ছিল না। বাবাকে রেহাই দেবে, মা-দের কলকাতায় নিয়ে যাবে, এ-জন্য তো তার জীবন নয়। তার মা-বাবার চেয়েও ঢের হয়রান লোক আছে পৃথিবীতে। ব্যক্তিবিশেষকে নিস্তার দিতে হলে সেই সব ব্যক্তিদেরই প্রথম সুবিধা করে দিতে হয়। তাব মাব চেয়ে তাদের কি বেশি ভালবাসে সে? ভাল সে কাউকেই বড়

একটা বাসে না, মানুষের কষ্ট দেখেও প্রায়ই সে বিচলিত হয় না, তবে ছোটদের উপর বড়-বড় ধিঙ্গি লোকদের অত্যাচার সে হজম করতে পারে না। বোকা দুর্বল মানুষ কষ্ট পাচ্ছে বলে ততটা নয়, কিন্তু কেবলি টাকাকড়ি, ভুয়ো প্রসার-প্রতিপত্তি, কতকগুলো লোককে লুটতবাজে মাতিয়ে বাখছে অন্যদেব থেঁতলে ফেলে—এ-সব সে সহ্য করতে পারে না। পৃথিবীতে ভাল বক্ত আসুক—দবকার হলে খুব কঠিনভাবে নিকেশ করে দিয়ে যা খারাপ আছে তাকে। আসুক ভাল তেজ, সহনশীলতা, আলো।

'বলি, তোমাব বাবাকে বেহাই দেবে না?'

'তাঁব নিজেবই হাত-পা আছে—'

'তা তো আছে। তা দিয়ে জলপাইহাটিব কলেজ করা হল অ্যাদ্দিন। এখন এ বয়সে কলকাতায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে, না, চাকবি কবে পরিবাব খাওয়াবে?'

'তা পারবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে,' কেমন কঠিনভাবে বললে যেন হাবীত; কথার মধ্যে বসকষ, বিবেচনা, দয়া কিছুই নেই যেন। অথচ এও মনে হয় যে বয়ে যাওয়া খাবাপ ছেলে নয়, জিনিস আছে, কিন্তু খুব দূরের জিনিস—সুমনা, নিশীথ বা এই পুরুষেবও কাজে লাগবাব জিনিস নয়, কোন পুরুষে লাগে কে জানে, এক-আধজন ব্যক্তি নয়, সমস্ত ব্যক্তিরই যাতে সুবিধা সক্ষমতা হয় সেই দৃঢ়তাব আবছা কাজে মন ডুবে গেছে তার, ঈশ্বব থেকে আবম্ভ কবে মহাত্মা মোহনদাস পর্যন্ত যা পাবলেন না সেই ভীষণ কাজে আরো কত শত-সহস্র বছরেব ধোঁয়া-শূন্যতাব ভিতব এক ফোঁটা বক্ত, এক কণা শিশিবেব মত হারীত। সাজিয়ে গুছিয়ে না, কেমন বিশৃঙ্খল ভাসা-ভাসা ভাবে এই কথাগুলো বোধ কবতে লাগল।

হাবীত এসেছে, কিন্তু মাব জন্যে কোনো টান নেই তাব, ভানুব কথা জিজ্ঞেস করছে না, রানুব কথা না। লিকলিকে বেখায় দাগড়া-দাগড়া খাঁজে কপালটাকে অন্ধ ক'বে, কালো মুখে, জানালাব ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। এব চেয়ে ওব বাবাকেও তো বেশি সবেস, বেশি তরুণ দেখায়।

'ভানুব খোঁজ খবর বাখিস?'

'ভানুব তো থাইসিস হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। তাবপব কী হয়েছিল বলতে পাবিস?'

'না তো। কোথায় আছে ভানু? মবে গেছে বুঝি?'

সুমনা কিছুক্ষণ নিবেট হয়ে বসে থেকে বললে, 'তাই বুঝি মনে হয় তোব?'

অনেক চিন্তা কবছিল এত ক্ষণ হাবীত। সুইচ পুড়ে যাওয়া বাল্বেব মত হয়ে গেছে সে সব; সেটাকে খসিয়ে ফেলে দিয়ে মাব দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভানু মবে যায় যদি, কী কবতে পাববে তোমবা। কলকাতায় কত থাইসিসেব রোগী—কেবলই তো মবছে। কেউ ঠেকিয়ে বাখতে পাবছে না তো।'

'তা তো পাবছে না; কিন্তু ভানু বেঁচে উঠছে।'

'বেঁচে উঠছে? কোথায়?'

'কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে—'

'ও, সেই থাইসিস হোমে। বেঁচে উঠল বুঝি? কে বললে তোমাকে?'

'কেউ না। আমাব মন বলছে।'

'তোমার মন বলছে। তবেই হয়েছে,' হেসে উঠল হারীত।

যেন কিছু হয় নি, কিছু হলেও কিছুই হয় না এমনি অস্বাবিকভাবে হারীত হাসছে, কথা বলছে।

সুমনাব নাড়ী ছিঁড়ে হাবীত একদিন বেরিয়েছিল। সেই ছেঁড়াব ব্যথাটাকে টেনে হিঁচড়ে টনটনিয়ে দিতে এসেছে হাবীত।

'বানু-ভানুব কথা বলিস? ভাবিস? যে ওবা তোকে আসকে পিঠে পুড়িয়ে এনে খেতে দিয়েছে? কোনো দিনই ভালবাসতি না তো আসকে পিঠে। কিন্তু বানু-ভানু কি তোব নিজেব নয়?'

'বানু কোথায়?'

'কোনো খোঁজ নেই?।'

'আর-কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না তাহলে—'

'তুই তো কলকাতায় থাকিস, খুঁজে দেখছিস না?'

'কলকাতায় আছে তোমাকে কে বললে? যদিও বা থাকে এক কণা ভুষি হাবিয়ে গেলে কি এক মাঠ ভুষির ভিতব থেকে তা তুমি-খুঁজে বের কবতে পারবে?'

হারীতেব কথা শুনে ব্যাপারটাব অদ্ভুত রকমটা সুমনার চোখে ভেসে উঠল। একটা ছেঁড়া ঠ্যাঙেব

মত পড়ে থেকে আস্তে-আস্তে বুকের কঙ্কালে হাত বুলোতে-বুলোতে থেমে রইল।

'মসজিদে দেখেছিস?'

'কোথাকার মসজিদে?'

'কলকাতায—'

'কোন মসজিদে?'

'নাখোদায—'

শুনে ঝুম মেরে হারীত সুমনার দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ। 'কে বোকা বলে তোমাকে এই সব হিতেন বলেছে?'

'না, অর্চনা—'

'অর্চনামাসি,' হারীত একটু চুপ করে থেকে বললে, 'ঐ মহিমের সঙ্গে থেকে-থেকে মাসি মরছে। না হলে কখনো এই রকম কথা বলে?'

'কোথায় আছে বানু তাহলে?'

'ঐ তো ভূষির কথা বললাম।'

সুমনা একটু ক্ষেপে উঠে যেন বললে, 'তোর এত বড় বাড়! তুই কি হয়েছিস কী? যা তুই বেরিয়ে যা। তোর মুখ দেখতে ভাল লাগে না আমার। বেরিয়ে যা তুই। বেরিয়ে যা। বেরো আমার বাড়ির থেকে। জোচ্চোর বেল্লিক শয়তান কোথাকার।'

মুখে রক্ত উঠবার উপক্রম হল সুমনার। কিন্তু মাকে শান্ত ঠাণ্ডা করবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না হারীতের দিক থেকে।

সে বিছানার থেকে সরে দাঁড়াল—দরজা খুলে বেরিয়েই গেল—অন্ধকারের ভিতর—যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে।

সারা রাত একা কাতরাতে-কাতরাতে শেষ রাতে বাস্তবিকই যেন দিঘির ঠাণ্ডা মাংসের মত জলের উপর দিয়ে ফিনফিনে হাত-পায়ের একটা মাকড়ের মত চলে গেল, মিশে গেল, বন-জঙ্গলের অন্ধকারের কবেকার কী সে, পৃথিবীর অখণ্ড মাকড়ের জালের মত সুমনা।

শেষ রাতে জল খেতে উঠে অর্চনা দেখল যে জলের কলসি ঘরে নেই; রান্নাঘর ঘুরে এল। কোথাও নেই কলসি। তবে কি চোর ঢুকেছিল ঘরে? শুধু কি কলসির জল খাবার জন্যই ঢুকেছিল, তাই নিয়ে পালিয়ে গেছে?

সুমনার ঘরের দিকে গেল অর্চনা। আজ বিকেলে নিশীথ চলে যাওয়ার পর সুমনার ঘরে অনেকক্ষণ ছিল সে; প্রায় রাত এগারটা অব্দি ছিল। তারপরে মহিম তাকে ডেকে নিয়ে গেছে। কথা ছিল মহিমের সঙ্গে প্রথম রাতটা অর্চনা নিজের ঘরে ঘুমিয়ে নিয়ে, রাত একটা-দেড়টার সময়ে সুমনার কাছে ফিরে আসবে। একা মানুষ, রোগা মানুষ সুমনা, তার কাছে লোক থাকা চাই। নিশীথও বলে দিয়ে গেছে, সুমনা যেন রাতে একা না থাকে অর্চনা, তুমি থেকো, যদি মহিম তোমাকে মাঝে-মাঝে ছেড়ে দেয়। না হলে রাজেনের মাকে রেখো। অবসর পেলেই অর্চনা নিজের বালিশটা কাঁধে করে এনে সুমনার খাটে শুয়ে থাকবে—ফাঁকে-ফাঁকে শোবে; যতদূর সম্ভব দুপুর রাতের পাড়িটা সুমনাদির সঙ্গে কাটিয়ে দেবে সে। রাজেনের মার সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে; পাঁচ টাকা চেয়ে ছিল এ জন্যে, তিন টাকায় রাজি করানো গেছে। কাল থেকে শোবে। রাজেনের মা থাকলে অর্চনার নিজের ঝুঁকিটা অনেক কমে যাবে; নিজের সুবিধা মত তা হলে সুমনার কাছে আসবে সে। কোনো-কোনো রাতে একেবারে না এলেও চলবে হয় তো। আজ রাতে অবিশ্যি রাজেনের মাও ছিল না, সে নিজেও কেমন বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছে প্রায় সমস্তটা রাত; কোথায় জলের কলসি-কী হল সুমনাদির—অর্চনা ঘুমের আবেশ থেকে নিজেকে খসাতে-খসাতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সুমনার ঘরের ভিতর গেল। ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার কাছে গিয়ে দেখল মানুষটা কেমন নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে, হাত-চুল-কাপড়-ঠ্যাঙের দিকে তাকালে মনে হয় মরে গেছে যেন। কেমন ভেঙে গেছে নাক। মরে গেছে কি? অর্চনা আস্তে-আস্তে সুমনার হাতটা তুলে নিল—উঃ কী ভীষণ ঠাণ্ডা, লিকলিকে সাপে ছোবল দিয়ে ঠাণ্ডা বিষ ঢেলে দিয়েছে সুমানার প্রাণের ভিতর।

'মরে গেল দিদি। মরাই ভাল। বড় কষ্ট পাচ্ছিল। নিশীথদার থাকা উচিত ছিল জলপাইহাটিতে। সুমনাদির এ-রকম অবস্থায় কলকাতায় যাওয়ার কোনো মানেই হয় না তার।'

অর্চনা হয় তো কাতর না হয়ে বিছানার পাশে বসে ভাল করে বুঝে নিচ্ছিল সুমনার নাড়ী। না,

মরেছে বলে মনে হচ্ছে না, অনেক ক্ষণ নাড়ী হাতে বসে থেকে মনে হল যেন অর্চনার। তিরতির করছে নাড়ী। মেয়ে মানুষের প্রাণ, কি সহজে যায়? যাবেই বা কেন? নিশীথ চলে যাবে আর সুমনা মরে যাবে—সেই রাত্রেই? একটা কথা হল? কী ভাববে নিশীথ। তাড়াতাড়ি অর্চনা কাজের দিশপাশ স্থির করে ফেলল—মহিমকে অবিলম্বেই পাঠিয়ে দিল মজুমদার ডাক্তারের কাছে। তাঁকে না পেলে যে-কোনো কেজো ডাক্তারকে নিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি ষ্টোভ জ্বালিয়ে সেঁক দিতে লাগল, কী একটা কবিরাজি ওষুধ ব্যাহার করল অর্চনা (জিনিসটা হাতুড়ে হয়ে যাচ্ছেঃ নিশীথ, হারীত, বা সুমনা নিজেও, পাযে দাঁড়ানো থাকলে, বলে দিত অর্চনাকে)। সাড়া পাওয়া গেল, ষ্টোভে দুধ গরম কবে দু-চামচ দেওয়া গেল।

সাড়া পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কোনো শব্দ নেই, চোখ মেলানো যাচ্ছে না, শরীরের ঠাণ্ডা ভাবটা যেমন তেমনই।

মরে কি যাচ্ছে? এখনও মরে নি, কিন্তু আস্তে-আস্তে মরে যাচ্ছে কি?

ডাক্তার মুজমদার এসে তাড়াতাড়ি নানা রকম পরীক্ষা করে বললেন, 'না, ভযের নেই কিছু। কিছু না, কিছু হবে না। ঠিক আছে।'

ঐ রকম কথাই সব সময়েই বলেন মুজমদার সাহেব। যে রোগী পাঁচ মিনিট পরে মরে যাবে তার বিছানার পাশে দাঁড়িযেও বলবেন ঠিক আছে সব, কিছু হয় নি, ঠিক আছে। এ রকম কত বাব কত জায়গায় অর্চনা দেখেছে ডাক্তার মজুমদাবকে 'ঠিক আছে' বাৎলাতে; বিশেষত সদব হাসপাতালে। জলপাইহাটির সদর হাসপাতাল সংক্রান্ত মেযেদের একটা বড় কমিটির মেম্বার অর্চনা। অনেক সময তাকে সভা সমিতি তত্ত্বাবধান, তদারকের ব্যাপারে হাসপাতলে যেতে হয। দশ-বাব বছর ধরে যাচ্ছে সে। কত রোগীকে কত ওয়ার্ডে মরতে দেখল সে ডাক্তার মজুমদারের 'ঠিক আছে' কথামত কানপ্রাণ ভিজিযে নিযে। মৃত্যুর সময কোনো মন্ত্র হিসাবে ডাক্তার সাহেবের 'ঠিক আছে' খুব একটা মূল্য আছে বটে, বেশ একটা আশ্বাস উপকার আছে মরুঞ্চে রোগীব পাশে মজুমদারের দাঁড়িযে থাকা শান্ত ব্যক্তিসত্তাব; অর্চনা নিজেও যেন এই ভদ্রলোকটাকে সামনে দাঁড় কবিযে বেখে মরতে পারে।

'ঠিক আছে'? ঠোঁটে আচল রেখে জিজ্ঞেস কবে অর্চনা।

ডাক্তারের কী সব প্রক্রিয়া চলছিল—ইনজেকশন দিযছে নাকি? না, কী কবেছে? কবছে? ডাক্তাব তার সাত ফুট লম্বা শরীরেব চওড়া পিঠ ও নীচে প্যান্টের পাহাড় প্রমাণ মাংস দিযে সুমনাকে একেবাবেই আড়াল করে দাঁড়িযেছিল; ডাক্তারের পিছে দাঁড়িযে কিছু দেখছিল না অর্চনা। বাইবে খড়মেব শব্দ হচ্ছিল মহিমের ঃ পাযচারি কবছে। ভিতবে ঢুকতে সাহস যে নেই তার তা নয, রুচি যে নাই তা নয, তবে কী হবে ঢুকে—মজুমদার আছে—কাছে অর্চনা আছে; একা এক-শব মত। ডাক পড়ে যদি ভিতবে তা হলে ভিতরে যাবে মহিম; ওষুধ আনতে হলে নন্টুকে পাঠাবে; গুরুতব কিছু ঘটে থাকলে—

যদি সত্যিই তেমন কিছু হয় তা হলে আজ আব কলেজে যাওযা হবে না। এমনও হতে পাবে যে কিছুক্ষণ পরে খাট নামাতে হবে বাইরে, লোকজন, জিনিসপত্র, কাঠ-চন্দনের ব্যবস্থা কবতে হবে।

জেগে উঠে হাত-মুখ ধোয়ার অবসর পায় নি মহিম, ঘাটের দিকে যাবাব সুযোগ নেই এখনো; কখন কী হয়ে যায। যদি খারাপ কিছু না হয় তাহলে ঐ নিমগাছটার থেকে, ঐ যে কাকে বাসা বেঁধেছে ঐটের থেকে, একটা কচি ডাল পেড়ে দাঁতন করবে সে, নিমের পাতাগুলো অর্চনাকে ভাজতে দেবে—

কলেজের কাজে ও-রকম নিরুৎসাহ হযে পড়াটা ঠিক হযেছিল কী? ছুটি যখন কিছুতেই দিতে চায না ওরা তখন ছুটির দরখাস্ত দিযে কালীশঙ্কর আর হরিলালকে চটানো, সুমনাকে এ-রকম অবস্থায ফেলে কলকাতায যাওয়া ঠিক হয নি নিশীথের। হারীত কোথায়? গাল ফুলিযে নিশীথের জীবনেব গোলকধাঁধাব ভিতর নিজে মনপবনটাকে ফুঁসিয়ে-ফাঁসিযে দিতে গিযে চোখের পিচুটি পরিষ্কাব করতে-কবতে, পাইচাবি করতে-কবতে—কেমন অপ্রস্তুত হযে পড়ল সে।

'ঠিক আছে'—ডাক্তার মজুদার এইবারে নিজেকে টানটান দাঁড় করিযে নিযে বললেন।

'ঠিক আছে?'

'কিছু ভয় নেই, চোখ মেলেছে; এক্ষুনি কথা বলবেন, ঠিক আছে'—মজুদার বললেন, 'আমি প্রেসিক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো দেবেন। বুঝবেন তো আমার নির্দেশ?'

'বুঝব বৈকি—আমি হাসপতালের—'

'মেয়েদের কমিটির মেম্বার। হে হে হে। আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—'

প্রেসক্রিপশন লিখতে-লিখতেই বুঝিয়ে দিতে লাগলেন তিনি, অর্চনা ঝুঁকে পড়ে ঠিক করে নিচ্ছিল।

সূচীপত্রে যান

'নিশীথবাবু কি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। মহিমবাবু কোথায়?'

'বাইবে। ডাকব?'

'দরকার নেই। ঠিক আছে। বুঝলেন, উপরে লিখে দিয়েছি যে-ওষুধটা, সেটা একটা মিকশ্চাব, আনিয়েই একবার দেবেন, তার পর চার ঘন্টা অন্তব, দু বাবেব বেশি নয়।'

'মোট তিন বার তা হলে?'

'ঠিক আছে। আর এই যে-পাউডারটা দিচ্ছি—'

'মোট তিন বার তা হলে?'

'পাউডার?' উৎকণ্ঠিত হয়ে মজুদার তাকালেন অর্চনাব দিকে—

'না মিকশ্চার।'

'সে তো মিটে গেছে, ঠিক আছে। এই পাউডারটা দু বাব দেবেন মিকশ্চাব দেওয়া হয়ে গেলে এক ঘন্টা পর পর—'

মজুমদারের ভাষাটা খুব পরিষ্কার নয়, তবে হেঁয়ালির ভাষা নয়, অর্চনা বুঝে নিল; বুঝে নিয়েছে কি না অর্চনাব মুখে চোখ বুলিয়ে সেটা বিদ্যুৎক্ষিপ্রতায় একবাব খতিয়ে নিলেন কি না-নিলেন ডাক্তাব মজুমদার, 'এক ঘন্টা পর পব—দু বাব—বেশি হয না যেন। ঠিক আছে। আব এই পিলটা—বাতেব ঘুমেব আগে—একটা শুধু।

'একটা?'

'ঠিক আছে।'

'আজকেব রাতের জন্যে শুধু?'

'আজকেব বাত শুধু'।

'কালকে মিকশ্চার দেব?'

'কাল সকালে এসে ব্যবস্থা কবব আমি।'

'মিকশ্চার পাউডার দেব না তা হলে কাল?'

অর্চনাব কাঁধে নিজেব হাত কি হাতের ছাযাব, একটা আলতো চাপ দিযে ডাক্তাব বড় বসন্তবাউরি পাখিব মত অমাযিকভাবে হেসে বললেন, 'কালকেব কথা কাল। আজকে এই ওষুধগুলো দিন।'

'কী খাবে?'

'দুধ, ফলেব রস। কমলা। গ্লুকোজ। যেমন খাচ্ছিলেন—'

'ভাত খেতে পাবে?'

'যদি খেতে চান? নবম চাট্টি, মাখন, মাছেব ঝোল, দুধ দিয়ে—

'ঠিক আছে'—অর্চনা বললে।

ঠিক আছে-টা মজুমদার নিজেই বলতে যাচ্ছিলেন, অর্চনা সেটা ঠিক সময়েই বলে ফেলাতে ডাক্তার মজুমদাবেব চিন্তা ও অনুভূতিব প্রবাহ একটা সদগতি পেল, ভাল লাগে না তাব। সদাশয মুখে অর্চনাব দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'নিশীথবাবু যাবাব বেলায বলে গেলেন কিছু আপনাদেব?'

'কী কথা?'

'ওষধুপত্র আমার জ্যোৎস্নাব ডিসপেন্সারিব থেকেই আনিযে দেবেন।'

'সেখান থেকেই তো আনানো হয়।'

'ও নিযে মাথা ঘামাবেন না—নিশীথবাবু ভিজিটের টাকাকড়ি দিযে গেছেন—এক মাস-দেড় মাসের—' অর্চনা শুনছিল। ডাক্তারেব কাছ থেকে প্রেসিক্রিপশনটা হাতে নিযে তাকিযে ছিল সেটাব দিকে; কোনো কথা বললে না।

'ওষুধপত্রের দাম দিযে গেছেন নিশীথবাবু।'

'শুনেছি।'

'আমার মনে হয ছ মাসের ভিজিট, ওষুধ, পেটেন্ট ওষুধ সব চলবে যা-টাকা দিযে গেছেন, তাতে। পাঁচশ টাকা তো কম নয়।'

অর্চনা প্রেসক্রিপশন দেখছিল—আড়চোখে; চোখ তুলে তাকাল সে।

সূচীপত্রে যান

'তাছাড়া ওঁর আজ যে-রকম হয়েছে রোজই তো এ-রকম স্ট্রোক -স্ট্রোক ঠিক নয়—রোজই তো আর এ-রকম ইয়ে—আরে-কী বলে ওকে—কার্ডিয়াক গোলমাল হবে না, ঘন-ঘন ডাকতে হবে না আমাকে। তা ও পাঁচশ টাকায—বেশ—'

'ঠিক আছে'—অর্চনা বললে।

ডাক্তার প্রায় চোখ বুজে কথা বলছিলেন। একটু বিস্মিত, ব্যাহত হয়ে চোখ দুটো পুরোপুরি খুলে ফেলে অর্চনার দিকে তাকালেন।

একটু চুপ থেকে সুমনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে চোখ মেলেছেন; কথা বলছেন। কী বলছেন শুনুন তো। আমি কানে খাটো হয়ে পড়ছি, যা বয়েস। এক রকম আমেরিকান ইয়ারফোন বেরিয়েছে—খুব ছোট—আফিমের গুলির মত—না, সে আগের জিনিস নয়—কানে রাখলে সব অমন পরিষ্কারভাবে—কী বলছেন—হারীত?—হারীত কী?—ও—ওর ছেলে হারীত ঠিক আছে। হারীতকে দেখতে চাচ্ছেন? ঠিক আছে। এখন কথা বলবেন সব। ওষুধগুলো এখুনি আনিয়ে নিন। জ্যোৎস্নার ওখান থেকে। ভিজিটের, ওষুধের সব টাকা দিয়ে গেছেন নিশীথবাবু'। মজুমদার লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে যেতে-যেতে বললেন, 'বেশ পাকা কাজই করেছেন নিশীথবাবু—দু মাসের দাদন দিয়ে আমাকে লটকে রেখে গেছেন। হে-হে—তা দেড় মাসের তো হবেই'।

'আজ সন্ধ্যের সময় আসবেন আপনি এক বার?'

'আমি? না, আজ আর কী হবে। কাল সকালে আসব।'

'ঠিক আছে।'

'হারীত কোথায়?' সুমনা বললে।

'হারীত? আছে। আছে।'

'কোথায়?'

'কলকাতায় হয় তো। ঝুপ করে এসে পড়বে এক দিন।'

'না না, এসেছিল সে এখানে। কাল রাতে এসেছিল। তোমাদের খবর দিতে পারি নি। তোমরা তখন ঘুমুচ্ছিলে। তোমাদের ঘরের থেকে জলের কলসিটা নিয়ে এসছিল, কিছু খেতে দিতে পারি নি, খুব তেষ্টাও পেয়েছিল হারীতের। ঐ দেখ কলসিটা।'

কলসিটা দেখবার জন্যেই শেষ রাতে পা দিয়েছিল এই ঘরে অর্চনা। এতক্ষণে দেখা হল।

'হারীত এসে চলে গেল যে?'

'কোথায় গেল?'

'তোমাকে বলে যায় নি? বা রে! কেমন যেন এক রকম উচ্ছন্নে হয়ে গেছে হারীত। তোমার কথা না-শুনে চলে গেল দেখেই বোধ হয় তোমার এই হার্টের গোলমালটা হয়েছে সুমনাদি। তোমার এ রকম অবস্থা দেখে চলে গেল?' সুমনার কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল—কথাটা হারীতকে নিয়ে সেই জন্যে—হার্টের জন্যেও কিছু বটে, 'কেমন যেন হয়ে গেছে এক রকম আজ-কালকার ছেলেরা মেয়েরা সব। কী করবে এরা? দেশ স্বাধীন করবে? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে।'

'আমিও তো বলেছিলাম হারীতকে, এখন আবার ও-সব কী হারীত? এখন আবার ক্ষুদিরাম, গণেশ, অনন্ত সিং, মাস্টারদা কী যে! দেশ তো স্বাধীন হয়েছে'। 'হ্যাঁ, দেশ তো স্বাধীন হয়েছে'—সন্দিগ্ধভাবে ডান হাতের আঙুল মটকাতে-মটকাতে বললে অর্চনা।

'উনিশশ বেয়াল্লিশে তো হারীত কলেজে ছিল। দিনরাত সাইকেলে আর পায়দলে মেরে দিয়ে কত কাণ্ডই না করেছে। তখন বিশেষ কিছু বলতাম না ওকে, ওর বাবাও ওকে রেহাই দিয়েছিল, বলেছিল, আমি নিজে অবিশ্যি ঠিক ও রকম করতাম না, তবে, সকলের সঙ্গে মিলে বেশ একটা কাজ হাতে নিয়েছে বটে হারীত, করুক। জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি মরে? বলেছিল, মরতে হবে জেনেই তো এ কাজে নামা, মরছেও তো অনেকে। শুধু একা হারীত বেঁচে যাবে! বলেছিল। হারীত তো তখন কংগ্রেস ছিল। কত করেছে কংগ্রেসের জন্যে। ক্রিপসের সঙ্গে কথাবার্তার সময় থেকেই ওর কংগ্রেসিতে ভাঙন ধরে, বলে, কী হবে কংগ্রেস দিয়ে?'

'ঘুমোও সুমনাদি।'

'ঘুমোচ্ছি।'

'ওঁকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছি। এক দাগ মিকশ্চার দেব, এক ঘন্টা পরে পাউডার।'

সূচীপত্রে যান

'আর যে-সব ওশুধ আছে?'

'কিছু বললেন না তো, সে-সবের কথা। আজ লাগবে না, পরে খাবে। কাল আসবেন উনি।'

'হারীত চলে গেল—তার পর থেকেই কী যেন হল। মরে গেলেই তো ঠিক হত। ভেবেছিলাম। মরে গেছি ঐ বিমটা ঐ খোঁটাটাব সঙ্গে গলায় দড়ি বেঁধে। কে যেন আমায় ধরে গলায় দড়ির প্যাঁচ করে ঝুলিয়ে দিল—আমি তোমাকে ছুঁয়ে বলছি অর্চনা।—সাদা বিচ্ছিরি একটা লোক—।'

'নিজেই প্যাঁচ কষছিলে', হেসে বললে অর্চনা, 'মজুমদাব বোধ হয় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। কেমন লাগছে?'

'এখটু একটু ভাল।'

'ক্রমেই ভাল হবে।'

'এত বছব কংগ্রেসের কাজ করে তাবপর যখন দেশ স্বাধীন হল তখন সটকে পড়ল হাবীত। আবাব নতুন করে আরেক নতুন কংগ্রেসের জন্যে কাজ করতে হবে না কি—'

'নতুন কংগ্রেস? কোথায়?'

'হাবীতের মনের মধ্যে। আব কোথায়?'

সুমনা বললে, 'আবাব সেই বারীণ ঘোষ, অববিন্দ, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন, বাঘা, গান্ধীজির সেই ডাণ্ডি সত্যাগ্রহ, চৌবিচোবা, জালিয়ানওয়ালাবাগ—আবাব সেই ক্রিপস ক্যাবিনেট মিশন—আবাব সব'।

'না, তা আর কী করে হয়?'

' তা হলে নতুন কংগ্রেসের মানে কী?'

'নতুন যা, তা নতুন। তাব ভিতর এ সবেব কিছু ছায়া কিছু ছক-টক থাকতে পাবে, কিন্তু তবুও তা আলাদা জিনিস। দিন বদলাচ্ছে, দেশ বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে—'

'ঠিকই তো'—অনেক ক্ষণ পরে সুমনা বললে, 'কিন্তু যে জিনিসেব জন্যে অনেকটা বছব ধরে কাজ কবা যায় সেটার একটা সুভালাভালি হলেও তাকে ব্যর্থ মনে কবতে হবে এ কী বকম?'

'কিসের?' কী যেন কোনো এক নিহিত পৃথিবীব থেকে টলমল দুটো কালো চোখ ফিবিয়ে এনে জিজ্ঞেস কবল অর্চনা। পলিটিকসেব কথা সে ভাবছিল না, সুমনাব কথাব দিকে আধখানা কান ছিল কি না ছিল। কান মন সবে যাচ্ছিল তার, অন্ধকাব, অনেক জল এসে জীবনের সব চিন্তা ও ধ্বনিব তাগিদগুলি থামিয়ে মানুষের মনটাকে জলের মতন অচেতনে নিস্তব্ধ নিশীথ করে রাখছে যেখানে।

'সফল পরিণতি নয়? দিন বাত বক্ত ঢেলে লড়েছিল বটে কংগ্রেস, কিন্তু আমবা বেঁচে থাকতে-থাকতেই যে দেশটাকে স্বাধীন কবে দেবে তা ভাবতে পাবি নি।'

'দেশটাকে স্বাধীন কবে দিয়েছে'—অর্চনা বললে।

'স্বাধীন কবে দিয়েছে দেশটাকে।'

'প্যাটেল সেদিন বলছিলেন জওয়ার ক্ষেতেব থেকে হাততালি দিয়ে পাখি তাড়িয়ে দেবাব মতন করে ইংরেজদের খেদিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস?'

'তা তো বটেই, তা তো দিয়েছেই তো।'

'চলে গেছে ইংরেজরা?'

'আছে গুটিকতক দালালি কববাব জন্যে?'—সুমনা বললে, কিন্তু তবুও ঠিক বলা হল না মনে ভেবে উশখুস করে বললে, 'ও চলে গেছে সব। ইংরেজরা চলে গেছে। ইউনিয়নে নেই ওবা আর।'

'না, নেই ওরা আর। ব্রিটিশ চলে গেছে।'

'ব্রিটিশ গেছে।'

'দেশটা স্বাধীন হয়েছে আমাদের।'

'দেশটা আমাদেব স্বাধীন হয়েছে, ইস!'

'কী হল।'

'মাথাটা ঘুরে গেল কেমন, আমার হাতটা চেপে ধবো। একটু কাছে এগিয়ে এসো, অর্চনা।'

খানিক ক্ষণ পর ওষুধ, কমলালেবু, দুধ খেয়ে একটু জোর পেল যেন সুমনা। 'কাল রাতে হাবীতকে বকেছিলুম।'

'কেন?'.

'পনেরই আগস্টের পর দেশে যে আমাদের লক্ষ্মীব মত সূর্য জ্বলছে এ ও স্বীকাব করতে চায না।'

সূচীপত্রে যান

'ওর বাবা স্বীকার করেন , নিশীথবাবু?'

'তিনি কী করেন, না করেন, আমরা জানি না। তাঁকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। ওর বাবার মতন তো নয়, হারীতকে ধরা ছোঁয়া যায়। পনেরই আগস্টের পরেও ওর মনটা কেমন কালি মেরে আছে।'

'কেন?'

'কেন? যা-হয়েছে তাতে খুশি হয় নি।'

'কী চায় হারীত?'

'আবার পলিটিকস করছে।'

'কী রকম পলিটিকস? রিভলভার ধরবে?'

'কী জানি। স্বাধীন হয়েও শান্তি নেই। ছেলেমেয়েগুলোর এই দশা। উনি কলেজটাকে এক পাশে ফেলে জলপাইহাটির ঘর ভেঙে চলে গেলেন যা-নেই তার ভিতর হারিয়ে যেতে। আমার অসুখের জন্যে পরের রক্ত খেতে হয় আমাকে, তবুও শরীরে রক্ত থাকে না, তিল-তিল করে মরে তবুও ফুরোতে চায় না। বড্ড বেকায়দায় পেয়েছে দেশের স্বাধীনতা আমাদের ক-জনকে। তবুও'—সুমনা একটু আঁটসাঁট হবার চেষ্টা করে বললে, 'ইংরেজদের শাসন নেই সেটা আমি বোধ করছি। তুমি আর মহিমবাবু তো ভাল আছ, স্বাধীনতাটাকে বেশ—খুব—উপভোগ করছ না তোমরা।'

'হ্যাঁ আমরা বেশ ভাল আছি, খুব মাল টেনে খাচ্ছি দেশের স্বাধীনতাটাকে'—হাসতে-হাসতে বললে অর্চনা।

বেলা তিনটের সময় হারীত ফিরে এল। মুখ-চোখ-চুল ভারী খারাপ দেখাচ্ছিল তার।যারা আগে কোনোদিন দেখে নি তাকে, এ চেহারার দিকে তাকিয়ে মোটেই ভাল লাগবে না তাদের। চেহারার জন্যেই যদি মানুষকে আমল দিতে হয় তা হলে এ চেহারাকে এক ডাকে ফিরিয়ে দিতে হয়, কানে তুলতে হয় না এর কোনো কথা।

খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে, ওষুধ দেবার, দেখবার, শুনবার, তদারক করবার জন্যে সুমনার ঘরে এসেছিল অর্চনা! ওষুধ, কমলালেবু খাওয়া হয়ে গেছে সুমনার। অর্চনা বিছানার পাশে বসে নিজেকে খানিক, সুমনা'কে কিছু, হাওয়া খাওয়াবার জন্যে হাতপাখাটা নাড়ছিল, মাঝে-মাঝে দু-চারটে কথা বলছিল—স্বাধীনতা হল তবু সুখ হল না, শান্তি এল না। নতুন কি পলিটিকস করা যায়, শাড়ি-কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না, খাবার জিনিস না-পাওয়ার মত, সকলেই সহজেই ভাত কাপড় স্বস্তি পেতে পারে কী করে, ঐ নিম-জাম-বকুলের পাখিগুলোর মত দেশের জল-ফলফলি খেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে শান্তিতে কল্যাণে থাকতে পারে কী এই সুন্দর চোতের বাতাসে- কী সে টাকাকড়ির ব্যবস্থা, জননীতি, স্বাধীন দেশের সর্বভূমির জন্য কল্যাণনীতি—এই সব নিয়ে আলোচনা করছিল তারা। যে-গাইগোরু হরিণীর মত যেন অনেকটা, অর্চনাকে তেমনি দেখাচ্ছিল।

'কে রে বাপু, দুপুরবেলা ঘরের ভিতর, কে তুমি!'

'আমি এসেছি, ঘুমিয়ে আছো মা?'

'কে, হারীত নাকি?' অর্চনা তৃতীয় চক্ষু বার করবার চেষ্টা করে যেন বললে, 'কেমন বদলে গেছে হারীত! এ কী হয়েছে হারীত!'

সুমনা শুয়ে-শুয়ে প্রায় চোখ বুজে কথা বলছিল; চোখ মেলে উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল, 'কে হারীত, ও হারীত'।

হারীত এগিয়ে এসে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে বললে, 'আমি এসেছিলাম কাল রাতে জানো অর্চনা মাসি?'

'শুনেছি। কোত্থেকে এলে?'

'কলকাতার থেকে।'

'কাল রাতেই যে? কাল তো নিশীথবাবু কলকাতায় গেলেন—তিনি যাওয়া মাত্র তুমি এলে। কী করে এ যোগাযোগ ঘটালে হারীত।'

'মাঝে-মাঝে ঘটে যায় তো দেখছি।'

'কলকাতায় ছিলে তো তুমি, না আশেপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছিলে, নিশীথবাবু চলে গেলে

সূচীপত্রে যান

দেখা দেবে মনে করে?'

'তা মনে করতে পার। তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে।'

'আমাকে?'

ঠাট্টা করে বলছে হারীত, হারীত যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন তাকে না-চিনতে পেরে কেমন কটমটিযে তাকিয়েছিলাম সেজন্য কেমন একটু তামাসা করে কথা বলছে হারীত, অর্চনা ভাবছিল।

'আমি যখন জলপাইহাটি ছেড়েছিলাম তখন তো তোমাকে এত সুন্দর দেখি নি!'

'কী বলছে হারীত? কাকে বলছে?'—সুমনা আবার শুযে পড়ে চোখ প্রায় বুজে ফেলে বললে।

'অর্চনামাসিকে বলছি।'

'অর্চনা তো সুন্দবই, কিন্তু—'

'সেই সথাই বলছিলুম, দেখে খুব ভাল লাগল, যেন দশ-পনের ব২র বযস কমে গেছে অর্চনামাসির।'

অর্চনাব হাতে একটা বই ছিল। সুমনাব সঙ্গে কথাবার্তা বলাব ফাঁকে-ফাঁকে পড়বে ভাবছিল, এত ক্ষণ বন্ধ ছিল বইটা, এবাব খুলে দেখছিল।

'শোনো অর্চনামাসি—'

'খেযে এসেছ?' সুমনা বললে।

'হ্যাঁ।'

'চান কবেছিলে?' অর্চনা জিজ্ঞেস কবলে।

'আমায দেখে কী মনে হয?'

'দেখে কিছু বুঝতে পাবছি না আমি। অনেক দিন পরে দেখছি।'

'চেহাবা খুবখাবাপ হযে গেছে?'

'খারাপ তো হযেছেই' অর্চনা বললে, 'ঘবদোর ছেড়ে দিনবাত বাইবে হুজ্জোতি কবলে ভাল হবে চেহাবা?'

'আমাকে কি ঘুমেব ওষুধ দিযেছে অর্চনা?'

'কে? ডাক্তার? জানি না তো। কেন, ঘুম পাচ্ছে?'

'কেমন ঘুম-ঘুম লাগছে আমাব।'

'ঘুমিযে পড়ো।'

'তোমরা কথা বলো। হাবীত চান কবেছিলি? খেযে এসেছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায খেলি?'

'আমাদেব পার্টিব এক বন্ধুব বাড়িতে।'

'জলপাইহাটিতে তোদেব পার্টি আছে নাকি? ওরে বাবা বে। তুমি কম্যুনিস্ট নাকি হাবীত?'

'বলেছি তো তোমাকে, আমরা একেবাবে নতুন স্বাধীন সব কর্মী। কম্যুনিস্ট কংগ্রেস কোনো কারু সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

সুমনা তবু জিজ্ঞেস কবল, 'তুই কি কম্যুনিস্ট?'

হাবীত কথা না-বাড়িযে সোজাসুজি উত্তর দিযে বললে, 'না!'

'তবে যা! পার্টি-পার্টি কবছিস কেন কম্যুনিস্টদেব মত।'

'বাবা!'- হারীত যেন ধন্য মেনে বললে, 'মেযে লোকের এত তো দেখি নি আমি কোনোদিন।'

কিন্তু তবুও হারীত তর্ক করতে গেল না। সুমনার এই নির্বিবেকে জাত ক্রোধটাকে নিয়ে ঘাঁটাতে গেল না আর।

'বেশ পেট ভরে খেয়েছিস তো?'

'হ্যাঁ।'

'কাল রাতের—কাল রাতে তো তোমাকে দিতে পারলুম না কিছু হারীত—কাল রাতের না খাওয়ার শোধ তুলে একেবারে পেটে গলায় খেয়ে এসেছ বুঝি?'

'ও-রকম শোধ তুলে খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার, যেটুকু দরকার তাই খেয়েছি।'

'চান করেছ কোথায়?'

সূচীপত্রে যান

'জুলেখা বেগমের দিঘিতে।'

'জুলেখা বেগমেব দিঘি? সে কোথায়?'

'এই তো এখান থেকে মাইল পনেব হবে।'

'অদ্দুরে গিয়েছিলে চান করতে?'

'বাসে গিয়েছিলুম।'

'নাম শুনেছ জুলেখা বেগমের দিঘির, অর্চনা? আমাকে চান করতে নিয়ে যাবে একদিন হারীত? কত বড় দিঘি হবে? অর্চনা?'—ঘুমিয়ে পড়তে লাগল সুমনা! আবিষ্টভাবে কী যেন ভাবছিল, নিজের মনেব ভিতর থেকে উঠে এসে অর্চনা বললে, 'হ্যাঁ, বেশ বড় দিঘি। তা দেখে এসো গিয়ে একদিন হারীতের সঙ্গে। আমি দেখেছি—চার পাঁচ বছব আগেও গিয়েছিলাম একবার। জুলেখা বেগমের দিঘি এখান থেকে কুড়ি মাইলটাক তো হবেই—লালপুরেব পথে—বেশ সুন্দব জায়গায়—প্রান্তবেব ভিতব, চারদিকে, উঁচু-উঁচু গাছপালা, ওরা কী বলে হারীত—হ্যাঁ হ্যাঁ পহ্‌বিঘাসের দেশে, সুমনাদি, সুমনাদি—'

সুমনা ঘুমিয়ে পড়েছে।

'ঘুমিয়েছে মা?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ঘুমোক।'

'আমি উঠি।'

'বোসো। মহিমবাবু কি কলেজ থেকে ফিবেছেন?'

'না।'

'তা হলে বোসো তুমি। কথা বলা যাক। বসতে পাব নিশ্চয় তুমি'—হাবীতেব চোখে কেমন একটা সমীহ ও আকাঙ্ক্ষাব আন্তবিকতা। তাকিয়ে দেখল অর্চনা। কী বকম এই ছেলে? কী চায়।

'কাল রাতে রানুর কথা বলছিলুম; মা বিরক্ত হলেন—'

'কে, রানু? কোথায সে? কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে বানুব?'

'না। সেই কথাই মাকে বলছিলুম। এক কণা ভূষিকে কী কবে খুঁজে পাওয়া যাবে এক মাঠ ভূষিব ভিতর, বলছিলুম মাকে। শুনে, ক্ষেপে উঠে, আমাকে বাড়ির বাব না কবে ছাড়বেন না তিনি—'

'তাই বলে বেরিযে যেতে হয, ও-বকমভাবে ক্ষেপিযে দিয়ে এ-রকম মরাব মতন বোগীকে একলা ঘরে ফেলে? তোমার যে কবে কাণ্ডজ্ঞান হবে হাবীত?'

—বকছে বটে, কিন্তু তবুও বকুনির হুল নেই, হুলটা খাসিযে নিজেব গলা থেকে আওযাজ আর কথা অর্চনা বার করছে।

'ও-রকম মাবমুখো হযে উঠলে আমি কী করতে পাবি?'

'কিছু করতে পাব না? অথচ তুমি রিভলবাব ধবে কংগ্রেসকে মাবতে চলেছ?'

'কংগ্রেসকে মারতে চলেছি মানে? কী যে বল তুমি অর্চনামাসি। মা তোমাকে যা ভজিযেছে তাই বিশ্বাস করেছ তুমি। কংগ্রেসের ভিতর একদিন ছিলুম আমি। এখন আর নেই। দেশ তো বিমুক্তি পেল, কেন এ-রকম হচ্ছে এ নিয়ে আন্দোলন করছি, একটা নতুন পলিটিকসেব সাধনা করছি আমরা।'

'এও কি প্রফুল্ল চাকী, বিনয বোস, মাস্টারদার মত?'

'না। তা হবে কেন। সে ইতিহাস এত বেশি আমাদের চোখের সমানে যে এক্ষুনি ফিবে-ফিরতি হবে না। আর তা ছাড়া—'

'এত বেশি কচলানো থ্যাৎলানো হযে গেছে যে আন্দোলনের, যে বিরতি এসেছে।'

'হ্যাঁ। তাছাড়া ইতিহাস একই জিনিসকে একই বকমভাবে প্রশ্রয দেয না। মানুষের মনও চায না, সমাজের ও ইতিহাসের দাবিও তাতে মেটে না।'

'মার্কস কি এই কথা বলেছেন?'

'আমি মার্কস পড়ি নি।'

'তবে কোথেকে বলছ?'

'আমার নিজেরই যা মনে হযেছে তাই বলছি। মার্কস পড়ে দেখতে হবে। ইংরেজিতে পড়লেও হয়, তবুও হাইনের কবিতা পড়বার জন্য জার্মান শিখছিলুম; এখন দেখছি 'ডাস কাপিটাল' ঐ ভাষায়ই পড়া ভাল—'

মার্কস পড়েছে হারীত—আগাগোড়া ইংরেজি অনুবাদটা—কিন্তু অর্চনার কাছে সে কথা কেমন একটা অব্যয় খামখেয়ালির ঝোঁকে চেপে গেল হারীত।

'জার্মান শিখে ফেলেছ?'

'শিখছি। মার্কসকে নিয়ে যত নাচানাচি করা হয় সেটা তাঁব প্রাপ্য নয়—'

'তুমি এই কথা বল?'

'অনেক নতুন কথাই বলি আমি। কংগ্রেস অল লাগছে না। আমাদের দেশ স্বাধীন হল বলে কয়েকটি লোক ছাড়া আর-কেউ কিছু সত্যি টের পেল না, এই কথা যে আমাদের দেশেব আজকের প্রাঞ্জল সত্য, এই আমি বলছি; বেশ বিচারক্ষম পণ্ডিত লোকবাও আমাদেব দেশের প্রায় সব কিছু জিনিসকেই বাশিযার নিকটে ঘষে খাঁটি কিনা যাচই করে দেখেন। এটা আমাদেব কাছে গুরু নিপাতকী বলে মনে হয; ফ্রয়েডের স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা তাঁর কাজের ব্যাখ্যার চেয়ে অবিশ্যি বেশি ঠিক, কিন্তু তবুও আট আনির বেশি ঠিক নয়। আইন-স্টাইনের বিলেটিভিটিব—'

'আমাব কাছে কেন এ সব, আমাব কাছে কেন,' কাতরভাবে অনুনয় কবে বললে অর্চনা।

'যার কাছে মন খোলে তার কাছে বলি আমি, তোমাকে ভাল লাগে তাই বলি।'

হাবীতের গলায় ঘেবাটোপ ও সঙ্কোচ ঘুচে যাচ্ছে যেন। কী কববে অর্চনা? হারীতেব তাকে ভাল লাগে সে তো ভাল কথা। নিশীথ সেনের মত মানুষকে ভাল লাগে না যাব, অর্চনাকে তাব ভাল লাগে; কেমন যেন একটু অসঙ্গত কথা বটে। কিন্তু কোন দিক দিয়ে কী বকম চেতনা বৃত্ত হচ্ছে বলে অর্চনাকে হাবীতেব ভাল লাগে? হয তো কিছু নয জিনিসটা—অস্বাভাবিক কিছু নয—সবল সহজ স্নেহ-মমতাব ব্যাপাব। কলকাতার কাশি রক্তে আব পলিটিকসেব বত্রিশ তাতে ঝলসে গিযে—এখানে মাযের কাছে এসে মাতৃত্ব না পেয়ে, অর্চনাকে পেয়ে বসেছে যেন—মা মাসি বানু ভানু—এমন-কি পাড়াব বৌদি—দিদির দাবিও 'একা অর্চনাব মেটাতে হবে। পাতানো বৌদি বা দিদি আছে কেউ হাবীতেব—জলপাইহাটিতে? না নেই তো। নেই।—অর্চনা খুব নিড়িভাবে সমস্ত জলপাইহাটিতে জাল ফেলে কাউকে ধবে আনবার চেষ্টা করছিল, কোনো নাবীকে—বযসে বড়, সমান, ছোট—হাবীতকে যে টানে। না, কাউকেই মনে কবতে পাবছে না সে। ভাবতে-ভাবতে হাবীতেব উপর কেমন একটা মমতা বোধ হল অর্চনাব।

'কতদিন থাকবে এখানে?'

'বেশি দিন না। মা একটু ভাল হযে উঠলেই চলে যাব।'

'সময নেবে অনেক একটু ভাল হযে উঠতেও।'

'তাই মনে কর তুমি?' হাবীত তাব চুলেব ভিতব যেন মুক্ষিব জাঙ্গাল নেড়ে-চেড়ে ভেঙে আঙুল চালিযে নিযে বললে।

'আমি কিছু মনে কবি না, ডাক্তাব বলছেন।'

'কিন্তু অত দিন আমি কী করে থাকব জলপাইহাটিতে?'

অর্চনা কোনো কথা বললেন না; হারীতের দিকে তার চোখ ছিল না, কলকাতায কোথায গিযেছে নিশীথ, কী করছে, এবও অতিরিক্ত একটা ধীর নিস্তট ভাবনায় মনটা ভরে ছিল তাব।

'চলে যাবে কলকাতায? জলপাইহাটিতে থাকবে না?'

'এইখানেই তো থাকবার আমার ইচ্ছা।'

'তবে?'

'কলকাতায ঢের কাজ—'

'জার্মান শিখছ—'

হারীত হেসে বললে, 'সে তো বাতে ঘুমের আগে শেখা। সাবাটা দিন—মুশকিল হযেছে খোলাখুলিভাবে কিছু করবার নেই—কাউকে মন খুলে কোনো কথা বলবার সাধ্য নেই। যে-কাজে হাত দিয়েছি সেটা মোটেই জনপ্রিয় নয। উনিশশ বেয়াল্লিশে তখনকাব সরকারেব ঘব-বাড়ি উচ্ছেদ করে লোকলস্কর ভাগিয়ে দিয়ে, টেলিগ্রাফ ছিঁড়ে, রেল লাইন উলটে-পালটে, সরকারের নানা-রকম দপ্তরখানা কানা করে দিযে যা করেছিলুম আমরা, আমাদের কাজে সমস্ত দেশটাবই তো প্রায সমর্থন পেয়েছিলুম, কত উৎসাহ দিয়েছিলে তুমি। বাবাও বিষ নজরে দেখেন নি; উপর-উপর দেখে কিছু বোঝা যেত না তাঁর, কিন্তু তবুও উপলব্ধি করে বুঝেছিলমু মোটামুটি সায আছে বাবার; মা তো নিজেকে ঢেলেই দিয়েছিলেন'—বলতে-বলতে থেমে গেল হারীত—হ্যাঁ সবাই সেদিন আমাদের পিছনে দাড়িয়েছিল। কিন্তু

এখন যা করতে চাচ্ছি তা তো উনিশশ বেয়াল্লিশের পরিণতি নয়, এ একেবারেই নতুন জিনিস, কারুরই উৎসাহ নির্দেশ নেই।'

'না আমারও নেই।'

'কেন?'

জওহরলাল খুব বিপন্ন মানুষ। শক্তিশালী বড় মানুষ, কিন্তু তবুও তোমারা তাঁকে শক্তি দাও। তোমরা তাঁকে ক্ষমতাময় করে তোলো।'

কেমনভাবে বলে অর্চনা কীক-বা বলে—যা খুশি বলুক, তবুও তো নিরেস নয়। নিজের কী এক সংকল্পসাপেক্ষ প্রাণের নিয়মে সজীব—সেই সজীবতাটাকে অনুভব করছিল হারীত।

'আমার মনে হয় তিনি যা করবেন, চোখ বুঝে অনুসরণ করতে হবে তাই। খুব ভুল কববেন না তিনি। দেশের এখন যে-বকম টলমল অবস্থা, ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় নেই; জওহরলালের মতন নেতাকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলে—না-পাবলে সাবড়ে দিতে গেলে যে কোটালেব বান ডাক দেবে তাতে এত দিকচিহ্ন উড়ে যাবে, এত বেশি অন্ধকার এসে পড়বে যে আমাদবে পিতারা—আমরা শেষ হয়ে যাব সব; আমাদের সন্তানদেব মাথা তুলে দাঁড়াতে কত বছব লাগবে কে জানে।'

অর্চনাব কথা শুনে হারীত হাসি মুখে কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে কথা বলবার উপক্রম করতেই টেব পেল হাসি নিভে গেল।

'তুমি যা বলছ তাব ভিতর ঢের খিঁচ আছে। কিন্তু সবচেয়ে আগে আমরা যে মুভমেন্টটা চালাতে যাচ্ছি সেটা কী রকম তুমি তো তা বিচার করে দেখলে না!'

'কেউই তো তোমাদেব সহ্য করে না। আমি বিচাব না করেই তোমাদেব পছন্দ কবি না।'

'কেন?'

'কেবলই ভাঙবাব চেষ্টা ভাল না।'

হাবীত হেসে ফেলল, হাসিটা ভিতর থেকেই এসেছে, ভিতবের টানেই ফুরিয়ে গেল আবাব। হাবীত আস্তে-আস্তে বললে, 'গড়ব বলেই কোথাও-কোথাও ভাঙার দরকাব দেখছি, কে বলে আমবা ভাঙছি শুধু?'

'না-ভাঙো তো ওদের সঙ্গে মিলে সৃষ্টি কবো। গড়বার কাজে ওরা এখন খুব ব্যস্ত, অনেক লোক দবকার ওদের।'

'জলপাইহাটিতে আছ বলেই তুমি এই কথা বলছ। মহিমবাবু একশ তিবিশ টাকায় চাকরি কবছেন, তাকে নেবে ওরা? তোমাকে নেবে? আমাকে নেবে?'

'আমরা তো এক্সপার্ট নই। কী হবে আমাদেব নিয়ে?'

'তা হলে ওদের সঙ্গে মিলে সৃষ্টি কবব কী করে, ওদের বড়-বড় মালিক, মালিকানাব তাঁবে তাদেব পেটোয়া লোকেবা গা ঘেঁষে। মহামানুষবা থেকে-থেকে দেশটা চালাতে চাচ্ছে বটে, কিন্তু ধাড়ি মনিবরাই তো চালাচ্ছে আজকাল। এদের, এদেব সাঙ্গপাঙ্গদের সুবিধাবাদে, শিল্পাদবপনাব চূড়ান্তে দেশেব স্বাধীনতাব কোনো মানেই খুঁজে পাওয়া গেল না আজ পর্যন্ত। ব্রিটিশ ভাবতের অধীনতা-স্বাধীনতার পলিটিকস উড়িয়ে দিয়ে আমাদেব জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তান্ত্রিক ডাইনির হাতে বানানো গাছেব মত এমনই এক জায়গায় যেখানে শিখড় নেই, দেশ নেই, নেতাদেব শক্তি নেই, পলিটিকস নেই, কিছু নেই, সমস্ত পৃথিবী সমস্ত পৃথিবীকে গিলছে শুধু। অন্ধকাব অন্ধকাবকে খাচ্ছে—'

হারীত থেমে গেল। অর্চনা শুনে যাচ্ছিল। হাবীতেব শেষ হয়ে গেলে, অর্চনা তার মস্ত বড় কাল খোঁপায় হাত রেখে, একবার চাপ দিয়ে নিয়ে, হারীতের চোখে চোখ রেখে বললে, 'আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই এ রকম; আজ কেন—অনেকদিন থেকে। নিশীথবাবু সব বলেছেন আমাকে। তাঁর কাছে শিখেছি—জেনেছি অনেক কথা। তিনি বলেছেন, এই রকমই ছিল—এই বকমই প্রায় থাকবে। বরাবর এক দল লোক পৃথিবীকে শোধরাবার চেষ্টা করবে, বরাবরই খুব নির্দোষ মন নিয়ে—যেমন তুমি করতে চাচ্ছ—কিন্তু তা বলে অন্যেরা তো নির্দোষ নয়, তাদের জ্ঞানপাপ খণ্ডানোও শক্ত; আজকের এখনকাবই সুখ চায় তারা; নিজের সুবিধে সুখই চায় প্রতিটি ব্যক্তিই, যে-কোনো উপায়ে হোক; আজ যদি প্রায় সকলে মিলে ভাল হওয়া যায়, আত্মত্যাগ করা যায়, তা হলে তিন পুরুষ, ধরো, বড় জোর দশ পুরুষ, পরে যে বেশ সুস্থির শুভ ব্যবস্থা হতে পারে পৃথিবীর সকলের জন্যেই, এ প্রস্তাবে সায় দেবার মতন ব্যক্তি বা জাতিমন এত কম যে তা নিয়ে কোনো রকম বড় চূড়ান্ত কাজ কিছুতেই চলতে পারে না। চোখেব

সামনে সব সময়েই সৎ দৃষ্টান্ত জিইয়ে রাখা দরকার। সেখানে সবই প্রায় সহজ ও সরল—সেখানে স্বর্গের জন্যে অসাধ্য সাধনের সত্যিই বিশেষ মূল্য আছে; পৃথিবীকে একেবারে অন্ধাকারে গড়িয়ে পড়তে কেবলি বাধা দিয়ে চলেছে চার হাজার পাঁচ হাজার বছর আগের জানা ইতিহাসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত।'

'বাবা এই সব কথা বলেন, আমি, জানি,' হারীত বললে, 'আর তুমি তো তা-পড়ার মত সে সব বলে যাও আর বিশ্বাস করো?' অর্চনার দিকে সুসন্দিগ্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে হারীত বললে।

'নিশীথবাবুর চেয়ে বেশি ভাল, বেশি নির্ভব করা যায়, এ বকম কারো সঙ্গে দেখা হয় নি আমার।'

'কী হিসেবে ভাল?'

'তোমার কাছে অত খুলে বলতে পারব না আমি।'

'ভাল মানে ভাল মানুষ?'

'তা তো নয়ই। তোমাকে এক হাটে বেচে হারীত, আব এক হাটে কিনে আনতে পারেন তিনি।'

হারীত তাকিয়ে দেখল, কথা বলতে-বলতে কেমন একটা আভা এসে পড়েছে যেন অর্চনামাসিব মুখে। তা হলে সেই পুরুষ মানুষটিকে কি ভালবাসে অর্চনা-মাসি? না তাকে কামবিক্ত চোখে তাকিয়ে দেখতে পৃথিবীর সব বস্তুর চেয়ে সব চেয়ে বেশি ভালবাসে? এই শেষের জিনিসটার ভিতর থেকেও তো কামানার জন্ম হয। মুখ, কপাল, কেমন যেন গৌবী বৌদ্রে বক্তিক হয়ে আছে অর্চনামাসির—ছায়ার ভিতর বসে আছে অথচ। অনির্বাণ এই জিনিস। অর্চনাব দিকে তাকিয়ে রইল হাবীত। তাকিয়ে রয়েছে যে টের পেল অর্চনা। তার মুখে যে রক্তসঞ্চার কী এক শোভা এনেছিল—যে কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দেশ থেকে—খুব তাড়াতাড়িই যেন মিলিয়ে গেল তা।

কেন অর্চনার সঙ্গে এ রকম তির্যক ব্যবহাব করছে হারীত? জলপাইহাটিব কোনো যুবতী কি এ পথ পবিষ্কাব কবে দিয়েছে হারীতকে? না তো, এখানকাব প্রায কোনো মেয়েব সঙ্গেই তো তাব আলাপ নেই! কলকাতাব মেসে-মেসে থাকে সে—রাস্তায আড্ডায বস্তিতে ঘুরে বেড়ায—সেখানে চোখে পড়াব মত কাউকে দেখে নি; মাঝে-মাঝে ক্যাম্পে যায বটে, হাবীতেব ধর্মে বিশ্বাসী মেয়েরা আছে সেখানে; কিন্তু সেখানে হাবীতেব মোটামুটি কর্মী নাম; ভাল কবে তাকিয়ে দেখে না কোনো মেয়ের দিকে; কিন্তু তাকিয়ে দেখবার মত ছিলও কি কেউ? ভাবছিল হাবীত।

হারীতেব যা বযস, মনের যে অপূর্ব অস্বচ্ছ রুচিত, এতে কোনো দিকেব প্রায কোনো মেয়েই মনে ধরল না তাব; জলপাইহাটিতে এসে নজব পড়ল একজন বড় বিবাহিত মহিম ঘোষালেব ভাঁড়ার সংসারের এই দেবযানটিব দিকে। না, না এটা কিছু নয। ভাল লেগেছে দিদিব মত—হয ত বন্ধুর মতই অর্চনা-মাসিকে। তাব জীবনেব আসল জিনিস হচ্ছে, কলকাতায ফিবে যাওয়া, সেখানে গিয়ে কতগুলো দবকারি বই পড়া, কথা ভাবা—যা বইযেব অতিরিক্ত, সুস্থতা সুবিধা আনা যাবা তা পাচ্ছে না কোনোদিন সেই সব মানুষের জন্যে, খানিকটা ভাল কবতে চেষ্টা কবা—পৃথিবীকে, মানুষেব নীতিকে—খুব সম্ভব, মানুষেব মনটাকেও। অসম্ভবই সব—তবুও চেষ্টা করা দবকাব। হাস্যকরই সব। কিন্তু তবুও হাসি গম্ভীর হয়ে ওঠে।

'কলকাতায় তুমি সঙ্ঘের কাজ ছাড়া আর-কী কবছ হাবীত?'

'এ ছাড়া কী আব করবার আছে?'

'ওরা তোমাকে টাকা দেয?'

'ওবা কাবা? আমার কর্মীরা? কোত্থেকে টাকা পাবে?'

'তা হলে কী করে চলে তাদেব? কী করে চলে তোমাব?'

'ওরা এখনো বাড়ি খেয়ে,' হাবীত একটু হেসে বললে, 'আমাকে অবিশ্যি এটা-ওটা করতে হয। পড়াচ্ছিলুম একটা ইস্কুলে—ছেড়ে দিয়েছি। একটা কোচিং ক্লাস খুলেছিলুম কলেজের ছেলেদের নিয়ে। তাও ছেড়ে দিলাম। এক-আধটা প্রাইভেট ট্যুইশন ছিল, আর কবব না ভাবছি।'

'কেন, মাস্টারের ছেলে মাস্টারি করবে না?'

'না! নানা রকম ছেলে ঘেঁটে দেখলাম। ওরা পরীক্ষায পাশ করতে চায শুধু, শিখতে চায না, জানতে চায না। পরেব মুখেব ঝাল খেয়ে ঝেড়ে আসতে চায—ম্যাট্রিক থেকে আই-সি-এস অব্দি। কী হবে এদের পড়িয়ে? মাস্টারির বদ রক্ত বেব করে দিয়েছি সব। কলকাতায এখন আমি মোটর মেরামতি, ড্রাইভারি শিখছি,' হারীত বললে।

অর্চনা হারীতের দিকে তাকিয়ে, এক-আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, 'শিখতে পারলে ও-সব জিনিসে পযসা আছে বটে। কিন্তু তোমার শরীরে কি সইবে? এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজ নিয়ে বসেছ

সূচীপত্রে যান

তো হারীত।'

'গতবার যখন আমাকে দেখেছিলে তার চেয়ে ঢের খারাপ হয়ে গেছে আমার চেহারা?'

'ঢের খারাপ।'

'কবে এসেছিলাম জলপাইহাটিতে; কত দিন আগে?'

অর্চনা একটু ঘাড় কাত করে হিসেব করে নিয়ে বললে, 'প্রায় দেড় বছব আগে। গত বছব আশ্বিন মাসে এসেছিলে। এখন তো চোত মাস।'

'বাপ রে! সব হিসেব ঠিক। আমারও তো মনে ছিল না।'

হলেও হতে পাবে রক্তেব প্রতিভা গাণিতিক বামানুজমেব মত—ভাবছিল হারীত; কিন্তু তাবও অতীত কিছু রয়েছে অর্চনার। কেমন একটা সহানুভূতি এসে পড়েছিল অর্চনাব মুখে, একজন বিশেষ মানুষের জন্যে প্রায় তলদেশ থেকে সহানুভূতি। সে জিনিসেব থেকে আলাদা, ঢেব নিকটতব, একটা অনুভবে আলোকিত হয়ে বসে থেকে অর্চনার মুখের সহানুভূতিটাকে এমন নির্দোষ নির্মল মনে হল হাবীতেব যে, তার মাধব গোয়ালার কথা মনে পড়ল, এমনই ট্যাকটেকে টলটলে দুধ দিয়ে যেত মাধব, রোজ সকালবেলা, নিশীথ খেত নির্বিকার মুখে, কিন্তু দু-এক চুমুক দিয়ে সরিয়ে বাখতে হাবীত।

একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে হাবীত বললে, 'শবীর এত খারাপ হয়েছে, চেনা যায় না আমাকে?'

'কলকাতায নামলেই দানোয পায তোমাদেব। কী করে শরীর ভাল থাকবে সেখানে? কী খাওয়া হয? কী খাওয়া হয মেসে?'

হারীত একটা ফিরিস্তি দিল; যা নেই, খাওয়ানো হয না সেই সব মাছ মাংস ডিমের তালিকাও ঢুকিয়ে দিল। অর্চনাব বিশ্বাস হল না।

'দুধ খাও না?'

'হ্যাঁ। কিনে খেতে হয?'

'কী রকম দুধ?'

'জলপাইহাটির মাধব গোয়ালাকে মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ। ঐ যে ট্যাকটেকে দুধ দিত।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছে তুমি'—হাসতে-হাসেত বললে হাবীত। কিন্তু হাসিটাব উৎস যে মাধব নয়, অর্চনা নিজে, কে বলে দেবে তা অর্চনাকে—আলোকবর্ষের পথে—কবে কোন দিন?

'ও মা—কেন ও-রকম জোলো দুধ পয়সা দিয়ে কেন তুমি? খুঁজে বাব কবতে পাবলে কলকাতায খুব ভাল-ভাল দুধ পাওয়া যায। মাধবেব দুধ তো একেবাবে জল ছিল। সেই বকম জল—'

'দুধ খেতে চাইলে পৃথিবীর প্রায সব লোকই তো জল দেয,' বললে হারীত। হাবীতের কথায কোনো নিভৃত ইঙ্গিত আছে সেটা মনেও হচ্ছিল না অর্চনার। এমনি সে সাতপাঁচ ভাবছিল। অর্চনাকে নিস্তব্ধ দেখে হাবীত বললে, 'সুলেখা কোথায আছে বলতে পারো?'

'কে সুলেখা?' কেমন একটা ঘুম-বিঘুমের ভিতব থেকে উঠে যেন বললে অর্চনা।

'জলপাইহাটির শশাংবাবুর মেয়ে।'

'ও', অর্চনা একটু ভেবে বললে, 'ঐ যে লালপুরের রাস্তাব দিকে থাকে যাবা?'

'হ্যাঁ। এখানে আছে?'

'সুলেখাকে চেনো তুমি?'

'বিয়ে হয়ে গেছে কি সুলেখার?'

'কই শুনি নি তো।'

'তোমাকে সঙ্গে করে যাব একদিন সুলেখার কাছে।'

অর্চনা উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমি কোনোদিন যাই না ওদের বাড়িতে। শশাঙ্কবাবুব স্ত্রীকেও আমি চিনি না।'

'তা হলে যাবে না তুমি?'

'আমি কী করে যাই হারীত?'

ঘুমের ঘোরে সুমনা কেমন যেন গোন-গোন গোন-গোন শব্দ করছিল; শব্দটা মিইয়ে অস্ফুট হয়ে উঠল; ঘুমের ভিতবে খানিকটা তৃপ্তি পেলেও কেমন একটা ব্যথার আক্ষেপ যেন বোধ করছিল তার শরীর। হারীত আর অর্চনা নিস্তাপ নিঃস্বত্ব চোখে তাকিয়ে ছিল সুমনার দিকে, দু জনেই। সুমনা পাশ ফিরে ঘুমিয়ে

পড়ল আবার; নিঃশব্দিত হয়ে গেল সব।

'মাধব গোয়ালা কোথায় আছে আজকাল?'

'বলতে পারি না তো। জলপাইহাটিতে কিছু দিন এবার থাকছ তো হারীত?'

হারীত কী করবে না-করবে, কী ইচ্ছা অনিচ্ছা, মনের কথাটা ভাল করে স্থির করতে পারে নি এখনো; বললে, 'মার অসুখটা ভালর দিকে না গেলে কলকাতায় যাওয়া হয় না। তুমি বলছ সময় লাগবে। এর ভিতর বাবা এসে পড়বেন?

দূরের একটা জামরুল গাছের সাদা-সাদা ফলের দিকে তাকিয়ে অর্চনা বললে, 'তা তোমার বাবা জানেন। আমি কী করে বলব, আমার জানার কথা হারীত?'

'কে আর জানবে—আমি ভাবছিলুম-তুমি যদি না জান—'

সাদা-সাদা ফল, বাতাসে উড়ু-উড়ু জামরুলের বড়-বড় সবুজ পাতা, সৃষ্টির আগুনের উৎস থেকে যেন সদ্য উঠে আসা একটা তরতাজা হলুদ পাখির দিকে তাকিয়ে ছিল অর্চনা।

'তোমার বাবা চিঠি লিখতে বলে গেছেন।'

'কাকে—তোমাকে?'

'যখন খুব বেশি দরকার হয়, জানাতে বলেছেন। কিন্তু আমি লিখব না।'

'কেন?'

অর্চনা তাকিয়ে দেখছিল জামরুলের ঘন সবুজের ভিতর সেই পাখিটা ডালের থেকে ডালে লাফিয়ে যাচ্ছে, উড়ন্ত পাতার ঝালরে ঢাকা পড়ছে, বেরিয়ে আসছে আবার—

'দরকারের টানে নিজেই তো চলে আসবেন নিশীথবাবু। যদি না আসেন—'

পাতা আর বাতাসের আকাশের ফাঁকে কেমন যে জ্বলজ্বলন্ত প্রাণের হলুদ—ও-রকম হলুদ হয়ে চোতমাসের বৃহৎ বাতাসের ভিতরে নিজের শরীরকে পালকরণিত প্রাণের আধার বলে অনুভব করে নিতে পারত যদি মানুষ। উড়ে চলে যেত যেদিকে ইচ্ছা-

'না আসেন যদি?'

'তা হলে'—অর্চনা হারীতের মুখের দিকে তাকিয়ে না-তাকিয়ে বললে, 'কাঁঠাল পিটিয়ে পাকা করবার ভার তো আমার উপর নয়, সে তোমার মার উপর,' বলে অর্চনা ঠোঁটে দাঁতে হাসি মাখিয়ে একটু হাসতেই বুজে এল হাসি।

'তার মানে?'

'কলকাতায় যে গেছে তাকে চিঠি লিখে টেনে আনব কেন আমি?'

'কেন কলকাতায় কে উজিরি পেতে গেছেন?' হারীত হেসে বললে, 'এখানে ঘরদোরে নাজিরি ভাল ছিল না?'

'এই যা—পাখিটা উড়ে গেল', জামরুলের গাছের দিকে তাকিয়ে বললে অর্চনা। 'কী বলতে চাও তুমি?' ঘাড় ফিরিয়ে হারীতের মুখের দিকে চেয়ে অর্চনা বললে, 'কিসের উজিরি হারীত? নাজিরি কিসের?'

'আমার কথার মানে ধরা গেল না বুঝি?'

ধরা গেছে হারীতের কথার মানে, কিংবা ধরা যায় নি, কী যে হয়েছে ধরা না দিয়ে অর্চনা পড়ন্ত বেলার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে উঠি-উঠি করবে কি না ভাবছিল। উঠল না, বসে রইল সে।

'সুলেখাদের ওখানে যাবে?'

'হ্যাঁ। কবে যাবে?' হারীত বললে।

'কে। আমি? আমার যাবার কথা নেই তো।'

'কেন, ওরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি তো। বিনে নিমন্ত্রণেই যাব দু জনে। জলপাইহাটিতে এসেছি। চারদিকে একটু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে।'

'বেশ তো, বেড়াও।'

'একা? একা?'

'একা দরকার হলে একা। সঙ্গী পেলে তাই-ই সই। এই তো ছিল ওঁর হাল—'

'ওঁর কার? মহিমবাবুর?'

'না, নিশীথবাবুর।'

'অ'—হারীত বললে।

'কেন, তুমি ওঁর সঙ্গে বাইরে যেতে না মাঝে-মাঝে?' শুধোল হারীত।

'কেন আমি? আমাকে—কেন আমাকে সঙ্গে নেবেন তিনি?'

'তা নেবেন না। তা জানি আমি। ওকে চিনি না আমি? কিন্তু মাঝে-মাঝে মা যেতেনে, মাঝে-মাঝে তুমি যেতে সঙ্গ ধরে—প্রথম-প্রথম একটু পিছে থেকে। যেতে না? উনি যে রাত একটা-দেড়টা অব্দি বেড়াতে ভালবাসেন—তেপান্তরের দিকেই যেতে ভালবাসেন—একাই বেড়াতে যান—মোটের উপর এ সব মিলে বেশ একটা চৌখুপি ছক ছিল বটে।'

হারীত কোন এক দূরেব দিকে চেয়েছিল,—অর্চনার দিকে না তাকিয়ে দৃষ্টিটাকে তবুও নিকটতর পদার্থগুলোব দিকে ফিরিয়ে এনে হারীত বললে, 'যাব-যার জীবনে যা হয তাই-ই হয় তার-তার জীবনে। অন্য কারু জীবনে অন্য বকম হয়।'

বাইরে ভিতরে বাতাস ছিল খুব এতক্ষণ, বাতাসের তোড় কমে গেছে। ঘরের ভিতরটা একটু গুমোট হয়ে উঠেছে। অর্চনা কান পেতেছিল বটে হারীতের কথায়। কিন্তু ও-সব কথায যোগ দিয়ে কিছু বলতে গেল না সে।

'জলপাইহাটিতে এসেছ এত দিন পরে, ইচ্ছে করবেই তো বেড়াতে। হিতেনদের সঙ্গে বেড়াতে পারো।'

'হিতেনদের সঙ্গে?' হারীত হেসে বললে, 'ওরা তো খোকা'।

'খোকা?'

'কী আমার কাছে আর হিতেনরা?'

অর্চনা কেমন একটু মৃদু তামাসা বোধ করে ভাবছিল, জিজ্ঞেস করবে হারীতকে—অর্চনাব কাছে হারীত কী? খোকা? না, কর্তাব্যক্তি? জিজ্ঞেস করবে কববে করে, তবুও কবতে গেল না আর। হারীত ও তার সঙ্গে কেমন সেতু তৈবি হয়ে গেছে যেন ধোঁযার মতন; কাটা-ছাঁটা কথার ভাবনাব বিচাবের ছোঁযায সে-ধোঁযাটাকে অর্চনা একেবারে উড়িযে মুছে ফেলতে চায না। হাবীতকে সুমনাদিব ছেলে বলেই মনে করতে পারছে না, নিশীথেব ছেলে বলে তো মোটেই না; হিতেন পড়ে ফোর্থ ইযাবে। 'তুমি বি-এ পাশ করেছিলে কবে না।'

'উনিশশ আটত্রিশে।'

'ও মা দশ-এগাব বছব আগে! তোমাব বয়স এখন কত হারীত?'

'ত্রিশ-একত্রিশ।'

'নিশীথবাবুর কত?'

'আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ।'

'ওঁর আঠার-উনিশ বছরেব সমযে তুমি হযেছিলে?'

'অঙ্ক কষে তাই তো বেরয।'

অর্চনা হাত পাখাটা তুলে নিয়ে একটু বাতাস খেযে বেখে দিল সেটা। ঘবের ভিতর বাতাস এসে পড়েছিল জামরুল বনের বুকের ভিতর থেকে উছলে উঠে ঃ আ!—ভারি আবাম লাগছিল ঘবেব ভিতবেব জাগা ঘুমোনো মানুষ তিনটির। একটু মুখ আড়াল কবে কিছু একটা ভেবে নেবাব জন্যে অর্চনা হাতপাখানা তুলে নি[illegible]ছিল।

'তা হলে সুমনাদির বযস ছিল কত তখন?'

'পনের-ষোলো—'

'মাত্র?' বললে অর্চনা, 'কী রকম ভীষণ অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন নিশীথবাবু।'

'সেই জন্যেই আমি বিযে করে ফেলতে দেরি করছি। তোমাব বযস কত?'

'আমার চৌত্রিশ। নিশীথবাবুর থেকে চোদ্দ বছরের ছোট আমি।'

'তুমি আমার তিন বছরের বড়' হারীত বললে, 'আমি যদি ছ-বছব আগে জন্মাতাম তা হলে আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট হতে তুমি।'

সুমনা ঘুমের আকুতিতে কেমন কেঁদে উঠল, হেসে উঠল, বিড়-বিড় করছিল, ভোন-ভোন ভোঁ-ওঁ-ওঁ-করতে লাগল।

তারপর ঘরভরা অনেক আশ্রযদাতা আগলা বাতাসের ভিতর স্থাপিত হয়ে স্নিগ্ধ সমুদ্রেব নীচে

সূচীপত্রে যান

কানকোর ফুলকোর নিঃসাড়তা নিয়ে ডুবে রইল যেন মাছের মতন।

'এক মাস এ দেশে থাকো তুমি হারীত।'

'থাকব। একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার। কী বলো?'

'হ্যাঁ, ভারি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তোমার। কলকাতায় ও-রকম করে থাকলে—'

অর্চনা শরীর দিয়ে বাতাস পান করছিল—ঘরেব ভিতব এসে পড়েছে সব। কী যে নুন, ফেনা, আগাছার মত কত শত কথা অর্চনা ভাবছিল। ঘুমিয়ে পড়তে চায় শবীর। ঘুমেব ভিতর থেকে জেগে-জেগে স্থবির স্বপ্নের সংকল্পর প্যাঁচে জড়িয়ে যেতে থাকে একটা আবছা সমুদ্রের ঘনাল অন্ধকারের ভিতর।

'কেমন থাইসিসের রুগির মত চেহারা হয়ে গেছে আমার। যে দেখে সেই বলে।'

অর্চনা অন্য দিকে তাকিয়েছিল; হারীতের শরীরেব উপব চোখ বুলিয়ে নিল একবার; বাতাসের মত বাহিত হয়ে চলে গেল আবার অন্য দিকে তাব চোখ। 'তুমি এখানেই থাকো; আমি হাতে নিচ্ছি।'

'কী জিনিস?' হারীত বললে।'

'তোমার শরীরটাকে সারিয়ে দেবাব ভার।'

দিনগুলো যেন নিদাঘের দিকে চলে যাচ্ছে; বাতাস আসছে চার দিককার বিকালেব নিস্তেজ রোদ পাখপাখালি বনবনানীর উজান বেয়ে—কোথায় চলে যাচ্ছে আবাব। কাকের চেয়েও কাল কিন্তু তার চেয়ে ঢেব বেশি সুগঠিত পাখিগুলো চারদিক থেকে জানিয়ে দিতে আসছে; যা বাতাস, বোদ, জল, জামরুল, শিমুলের বন, মানুষেরও মনেব অবলম্বন, একাকী জানিয়ে দিতে পাবে না।

'জলপাইহাটিতে শরীব ভাল করে কলকাতায় গিয়ে আবার ভেঙে ফেলে দেওয়া। আবাব ফিবে আসা জলপাইহাটিতে। এই টানা-পোড়েনে কী তৈবি হবে? আমাব কলকাতাব থাইসিসেব শরীব আর বড়, বলবৎ সব স্ট্রাইক? না, আমাব জলপাইহাটিব সুস্থ মানুষেব মত শবীব আব চাবদিককাব ভরা মৃগযার চিৎকার সাবাদিন—মানুষেব মাংস খাবাব জন্য মানুষেব?'

'স্ট্রাইক করবে না কখনো; স্ট্রাইক কিছুতেই কবতে পাববে না। মোটেই কববে না।'

'না, এখন করবে না। আমি কবব না, অন্য দশজনে কববে। তাতে তোমাব কী লাভ?'

'তোমাব কি বাতে-রাতে জ্বব হয়?'

'না তো।'

'স্লো-ফিভাবেব মত হচ্ছে? টেব পাচ্ছ না?'

'টেব পাই জ্বব নেই।'

অর্চনা থুতনিব উপর হাতেব মুঠো বেখে হাবীতেব কথা শুনছিল। বললে, 'আমি তোমাকে একটা থার্মমিটাব দেব, যখন দবকার মনে কব, টেম্পাবেচাব নিযে দেখো; আমাকে জানিও; চার্ট কবে রেখো।'

'কই দাও থার্মমিটাব'।

'এখন নয়, পরে দেব। জলপাইহাটিতে তুমি থাকো। এ দেশটাকে ভালবেসে এইখানেই কাজ কবো তুমি। চৈত্রেব শেষ দিনগুলোর ঘবভবা বাতাসেব ভিতব বসে থেকে এ দেশটাকে দেখছ তো তুমি, আমিও দেখছি, কেমন চমৎকাব ঘাস, আকাশ, জল, ফসলেব দেশ। এখানে কাজ কবার অনেক কিছু আছে। অনেক প্রাযমরা-আধমবা মানুষদের উপকার হয় তাতে। স্ট্রাইকেব দরকাব নেই। আমি তোমাব সঙ্গে আছি।'

এই দুই তিন চার পাঁচ সাত আট দশ বাবো গুনতে পারা যায় যেন, অনেক ঝাঁকড়া চুলেব উজ্জ্বল শিশুদের মত অনেকগুলো বাতাস ঘবের ভিতব ঢুকে পড়েছে। জামা-কাপড়-আঁচল নিযে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। ভাঙ-ভাঙ করে অর্চনার খোঁপাটা ভেঙে পড়ল প্রায। না, অতবড় , জমাট, কাল খোঁপা কি ভাঙে, কিন্তু অনেকগুলো সাপের জিভেব মত শকশকে চুল উড়ে-উড়ে অর্চনার কপাল চোখ কেমন বিষকালি কবে দিযে যাচ্ছে। অর্চনা নিজেকে সামলে নিচ্ছিল।

'তুমি সঙ্গে থাকবে? কী রকম ভাবে সঙ্গে থাকবে?'

'তা দেখবে তুমি। পৃথিবীর ভাল করা কঠিন। পৃথিবীব ভাল করা যায না।'

'কে বলেছে তোমাকে? তোমার গুরু?'

'গুরু বলেছে বটে'—অর্চনা অল্পসল্প হাসতে গিয়ে না-হেসে উড়িয়ে দিল বাতাসের ভিতর হাসির অদৃশ্য গুঁড়োগুলোকে। নিশীথবাবুকে অর্চনাব গুরু বলছে হারীত? বাতাসে অর্চনার খোঁপাটা ভেঙেই পড়ল প্রায। এত বাতাস এ দেশে—অথচ ঝড়ের বাতাস নয়—নীল আকাশে রৌদ্রে কোনো মেঘ নেই।

সূচীপত্রে যান

দক্ষিণের ঐ জামরুল শিমুল জাম ঝাউয়ের কোকিল ফিঙে নীলকণ্ঠ মাছরাঙাদের পাখার ঝিলিক ডানার সূর্য ইতস্তত নিক্ষেপ করে; কোনো বিরাম নেই—বাতাসের আত্মদানের কোনো বিরাম নেই।

হারীত একটু ভেবে বললে, 'পৃথিবীর ভাল যে হয় না, সেটা বাবা পঞ্চাশ বছর বয়সে বুঝতে পেরেছেন। আমার তো একত্রিশ। আমি কেন তা স্বীকার করব।'

'আমি স্বীকার করেছি।'

'তা করেছ তুমি ওঁর শিষ্য বলে।'

অর্চনা খোঁপায় হাত দিয়ে সেটাকে ঠিক করে নিল। আলগা বেঁধেছিল অনেক ভারী চুলের মস্ত বড় খোঁপাটা। ঠিক করতে-করতে সেটাকে আলগা করেই রেখে দিল তবু। কোনো কথা বললে না।

'আমি ভেবেছিলুম—'

'থাম, তোমার বাবার কথা এখন থাক।'

কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিশীথের কথাই পাড়ল অর্চনা; বললে, 'তিনি তো কলকাতায় চলে গেছেন; চিঠি লিখলে আসবেন বলেছেন। তা তিনি আসবেন না।'

'কী করে জানলে?'

'এ যদি না-জানলাম—'

না, এর পর আর নিশীথবাবুর কথা পাড়বার দরকার নেই অর্চনার কাছে। বাতাসে-বাতাসে হারীতের মাথার চুলগুলো কাকের বাসা হয়ে গেছে। অর্চনা তার খোঁপা ঠিক করে নিচ্ছে। হারীত তাকিয়ে দেখল। খোঁপা জুত করে নেবার ছলে নিজের মুখ হারীতকে দেখতে দিচ্ছে না। কেমন যেন সেই মুখ নাকে ঘাম জমেছে, চোখে শিশির; সামনে একটা চনচনে উনুন রয়েছে যেন। 'তোমার স্লো ফিভার হয়, তুমি নিজে বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি টের পেয়েছি।'

'থার্মমিটার দিলেই মিটে যাবে, কী হয় না-হয়।'

'তুমি জলপাইহাটিতে থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলো।'

'থাকব ভাবছি। কত দিন থাকব?'

'রাতে-রাতে জ্বর হলে অনেক দিন থাকতে হবে।'

'কেন, এর বুঝি ওষুধ নেই কলকাতায়?'

'নেই।'

'নেই?'

'তোমার মতন লোকদের নেই—'

হারীত সুমনার অসাড় ঘুমের থেকে বাইরের পাতা, পাখি, বাতাস, সজীবতার দিকে চোখ ফিরিয়ে কেমন যেন এক রকম মনের হঠাৎ উজ্জ্বল্যে বললে, 'ঠিক, শরীরটাকে ভাল করে নেওয়া দরকার। কেমন অবসন্ন হয়ে পড়েছি। ভারী অসুখবিসুখ হয় নি, তবে দুর্বল হয়ে পড়েছি খুব। ভাল হতে হবে।'

'এইখানে থাকো। সেরে ওঠো, এ দেশটাকে যদি ভাল লাগে—থেকে যাও, কাজ করো—'

'ক দিন থাকবে তুমি এখানে?'

'আমি? মৃত্যু অব্দি।'

হারীত একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তা হলে আমি যদি থাকি, তা হলে একজন লোক হাতের কাছে পাওয়া যাবে তো আমার মৃত্যু পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, কাজে হাত দিলে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার যত দিন কাজ করবার ক্ষমতা আছে।'

'যেন তুমি ভালবাসো না কাউকে।'

হারীত জামরুলের অগণন পাতার ভিতর সাদা-সাদা ফলের দেশে বাতাসের আসা-যাওয়ার এখন খানিকটা নিঃশব্দ, তবুও সমুচ্ছল, ব্যবহারের দিকে তাকিয়েছিল। পাতাদের গুপ্ত রাজ্যে একটা ফিঙে বসেছিল; উড়ে গেল।

শিমুল জামরুলের ঘন ঘেঁষাঘেঁষির ভিতর কোকিলটাকে দেখেছিল একবার হারীত। আর দেখছে না।

'কিন্তু একজন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত; সে তো অনেক দিনের কথা। আমি মরব কিংবা তুমি মরবে—অনেক দিন পরে হয় তো। কিন্তু সেইদিন পর্যন্ত কি এই রকমই থাকবে সব?'

অর্চনা উঠে দাঁড়াল—'অত দূরের কথা ভাবি না আমি। মরার কথাও ভাবি না। এটা যেন নতুন

দেশ, তাও ভাবি না। শরীরটাকে ঠিক করে নাও। থাকো এখানে, কাজ করো। ভালবেসেছ কি কিছু?'

'ভালবেসেছি'—আরো খুলে পরিষ্কার করে বলতে গিয়ে, হারীত অনুভব করল অর্চনা জানতে চাচ্ছে না। উড়ো মবালের স্বৈরী আগ্রহে নয়, সেটাকে শান্ত করে নিবিড় নিবিষ্ট হয়ে হারীত যা বলতে চাচ্ছে সেটা বুঝে দেখতে চাচ্ছে না অর্চনা।

'সে যে জিনিসই হোক, ভালবেসে থাকলে কাজে প্রাণ পাবে, শান্তি পাবে কাজ করে।'

'শান্তি-টান্তি চাই না আমি। তবে মাঝে-মাঝেই কবমচাব বনে গিয়ে বসতে চাই—তেপান্তরের দিকে মুখ রেখে—ওখানে গিয়ে কথা বললে কেমন হয়।'

'ওঃ। নিশীথবাবু যা চাইতেন না।'

'চাইতেন না বুঝি তিনি?'

'না।'

'কিন্তু আমি তো চাই।'

'তুমি চাও?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আজকালই—'

অর্চনা যেন নিজেব সঙ্গে কথা বলছে এ-বকমভাবে বললে, 'কেনো তাড়াহুড়ো নেই এ দেশে।'

কলকাতায় পৌঁছে জিতেন দাশগুপ্তেব বাড়িতে এক বাত কাটিয়েছে নিশীথ। সে বাতে জিতেন ছিল তাব বাড়িতে। পর দিন সকালেই অফিসে চলে গেল জিতেন। তাবপব জামসেদপুব। সকালবেলার থেকে দুপুব অব্দি কেটে গেল নিশীথেব জিতেনেব বাড়িতে প্রথম দিনটা। দুপুরেব খাওয়া-দাওয়ার পব ড্রয়িংরুমে বসে কথাবার্তা হল নমিতাব সঙ্গে—তাব পব দু জনেই নিজ মনে বই পড়ে নিল ঘন্টা দুই-আড়াই। বাইবেব দিকে অবিশ্যি মন ছিল না কারুবই; অন্য অনেক কথা ভাবছিল তাবা; দু-এক পাতাব বেশি পড়া হল না। বই বন্ধ কবে সবিযে বেখে দিল; ঠিক হযে বসল; মুখোমুখি বসেছিল কেমন যেন নিঝঝুম হযে। ঠিক বুঝতে পাবছিল না। কী কথা বলতে চায—হয তো কোনো কথাব দবকার নেই তা হলে এখন আব; বাইবেব অন্ধকাব থেকে এমন একটা আশ্চর্য পবিভাষায অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে চৈত্রের বাতাস ঘবেব ভিতবে-ফিতবে আনাচে-কানাচে, দেযাল-ক্যালেণ্ডাবকে ঠক-ঠক কবে কাঁপিযে, খোলা বইযেব পাতা উল্টিয়ে-লড়িয়ে, যেখানে যা রেশমেব মত উর্ণা ছিল, মানুষেব সোনালি চুল, কাল চুল, শার্টের কলাব, শবীবের স্নায়ু হৃদয জিনিসটাকে বিস্রস্ত বিচলিত কবে নিস্তব্ধতাব ভিতব শুক্তি প্রসবেব মত কী এক অন্তশীল সাড়া নিয়ে উড়ে আসছিল—চলে যাচ্ছিল রাত্রিব বাতাস।

'জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। আপনি পড়বেন?'

বাইবেব আকাশে সাদা মেঘে কেমন আলো—'না পড়ব না, বাতিটা নিভিযে দেওয়া যাক।'

বাতি নেভাতেই চাবদিক থেকে ছুটে এসে স্থিব হয়ে বইল নানা বকম জ্যোতির্ময জ্যামিতিক খণ্ডের মত ভিতবের জ্যোৎস্নাগুলো।

'চাঁদটাকে তো দেখছি না'।

'উপরে উঠে গেছে।'

'উপরে? বেশি কি রাত হল?'

'না, আজ সপ্তমী তিথি কিনা। বিকেলবেলার থেকেই টঙে চড়ে আছে চাঁদ। কী খুঁজছেন; সিগাবেটের টিনটা? এই যে আমার সোফায আমাব কোলের উপব'—কোনো কথা না-বলতেই নিজেব সোফার থেকে উঠে একটু এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে টিনটা তুলে নিয়ে বললে 'কিছু মনে করবেন না, একটা সিগারেট খাচ্ছি। নিন আপনি একটা।'

'দেশলাই নিন।'

দেশলাইযের একটা কাঠি জ্বালিযে দুটো সিগারেট জ্বালাতে গিযে পবস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়ল; দুটো কাঠি জ্বালালেও তো হত একটার পর একটা ধীরে সুস্থে—দু জনের দুটো সোফার দূরত্বের ভিতর বসে থেকে; এ-রকম কথা ভাবতে গেল না কেউ। মনের অবস্থা তাদের পরস্পরকে কেমন যেন কাছে টেনে এনেছে।

টেলিফোন বেজে উঠল, নিশীথ শুনতে পেল প্রথম। বললে না কিছু। নমিতাও না শুনেছে যে তা

সূচীপত্রে যান

নয়; সহসা সাড়া দিচ্ছে না।

'আপনার টেলিফোন নমিতা দেবী।'

'শুনেছি। যাচ্ছি। বেরুবেন কি আজ?'

'না।'

'চলুন, মোটরে বেরিয়ে আসি।'

'কোন দিকে?'

'চৌরঙ্গিতে চলুন। আমার একটু মার্কেটিং করতে হবে'—নমিতা বললে।

'এত রাতে?'

'না, রাত তো বেশি নয়। কিছু পাখি আনা যাবে নিউ মার্কেট থেকে কিনে। বাবুর্চি ভাল জিনিস আনে না। পয়সা চুবি করে। মাখন আনতে হবে; প্যাস্ট্রি; কি পাখি ভালবাসেন আপনি?'

'সব পাখিই?'

'ভালবাসেন—সব পাখি?'

'ও, খেতে? না-না—?'

'তবে কি শুয়োরের মাংস? পর্ক?'

'শুয়োবের মাংস আমি খাই নি কোনোদিন—'

'খুব ভাল জিনিস। আপনি হয়তো মিষ্টি খেতে ভালবাসেন—'

নিশীথ এত সব কথাবার্তার বহর কবছিল না নমিতার কাছ থেকে। বই পড়ে না-পড়ে দু ঘন্টা নিস্তব্ধ হয়ে থেকে—তার পরে বই বন্ধ করে, বাতি নিভিয়ে, তাদের দু জনে নিরবসন্ন নিঃশব্দ নিবিড়তাব ভিতর রয়ে গেছে। নিশীথ মননঘানেব সেই বিদূব চৈত্ররজনীব নেপথ্যে থেকে শুযোরের মাংসের দেশের অবিমিশ্র বাচালতায় নেমে পড়েছে; দেখ, কি সহজ মানুষেব মন, এই নারীটির মন।

'টেলিফোন,' নিশীথ বললে, 'অনেক ক্ষণ থেকে ডাকছে; জিতেনকে?'

'শুনেছি।'

'এটা অবিশ্যি প্রথম বাতের ফোন।'

'বৌনি হল'—নমিতা একটু হেসে বললে।

'বেশি রাতে ভাল জিনিস আসবে। এখনকাব এ ডাকটাকে অগ্রাহ্য করতে পাবেন।'

'বুঝেছি।'

নমিতা উঠে ঘাড় কাত করে হাসতে হাসতে চলে গেল। কলিং বেল বেজে উঠল। নিশীথ বাতি নেভানো ঘরে একা বসে সিগারেট টানছিল। কে ডাকছে কলিং বেলে? কাকে ডাকছে? উঠে যাবে নাকি ভাবছিল। নীচে নেমে গিযে খোঁজ নিযে আসবে?

বিশু এসে বললে—'একজন ভদ্রলোক এসেছেন।'

'মেম সাহেবের কাছে?'

'না, আপনার কাছে। আপনি সেন সাহেব?'

'সেন সাহেব নয়—সেনবাবু। হ্যাঁ।' নিশীথ উঠবাব উপক্রম কবছিল।

বিশু বললে, 'ডেকে আনব তাঁকে?'

'আনবে?' নিশীথ চার দিকে একবার তাকিযে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা নিযেসো।' ড্রযিং রুমের বাতিটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ। বিশু সঙ্গে করে নিয়ে এল; খোলা গলা, হাফ শার্ট, ট্রাউজাব পরা ত্রিশ-একত্রিশ বছরের একজন ছোকবা। ভাল কবে তাকিযে দেখল নিশীথ। এ কে? এ লোকটিকে তো দেখে নি সে কোনোদিন; বিশু চলে গেল। ভদ্রলোক হাসি মুখে নমস্কাব জানাল নিশীথকে, প্রতিনমস্কার কবে নিশীথ একটু অবাক হয়ে বললে, 'আমাকে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই।'

'আমি তো নিশীথ সেন।'

'হ্যাঁ, প্রফেসর নিশীথ সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি—'

'আমি তো প্রফেসর নই। বসুন।'

ভদ্রলোক নমিতার খালি করে দেওয়া কৌচে বসে পড়ে বললে, 'আপনি জলপাইহাটি কলেজের ইংরেজির প্রফেসর নন?'

সূচীপত্রে যান

'ওটা কি একটা কলেজ। ওখানে প্রফেসর বলে না।'

'সে সব বিচার করবাব ভার তো আমাদের উপর নয়। ছোকরাটি বললে, আমার নাম সুবল মুখুজ্যে, আমি এম-বি পাশ ডাক্তার। আমার স্টেথিস্কোপটা হল ঘরে রেখে এসেছি, হারিয়ে যাবে না তো?'

'হল ঘরে? বসুন, আমি নিয়ে আসিছ।'

'আপনি বসুন, আমি আনছি।'

স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে-দুলিয়ে এবারে আব-একটা কৌচ বেছে নিয়ে বসে সুবল বললে, 'আমি কলকাতার মেডিক্যাল এম-বি, ট্রপিক্যাল ডিজিজেবও বিসার্চ করছি, আমি টিউবারকুলোসিসেরও স্পেশ্যালিস্ট—'

মানুষটির গুণপনা তা হলে কম নয়, দেখতেও মন্দ না। বেশ সুস্থ, সবল, সফল; একটা নির্দোষ ভাবও রয়েছে মুখের মধ্যে; রয়েছে বিবেচনা শক্তির কেমন একটা সহজ সজাগ সাধুতা যেন, নিশীথ অবহিত চোখে সুবলের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

'সিগারেট নিন।'

হাত জোড় করে সুবল বললে, 'মাফ কববেন, আমি খাই না।'

'জলপাইহাটি থেকে এসেছেন বুঝি? নাকি সাব-ডিভিশন থেকে—'

'না। আমি কলকাতায় প্র্যাকটিস কবি—'

'ও,' নিশীথ বললে; কী যে অন্যমনস্ক মন তাব; এই তো ভদ্রলোক বলছিলেন ট্রপিক্যাল ডিজিজের বিসার্চ করছেন—

'আমি আগে কাঁচড়াপাড়ায় ডাক্তারি কবতুম। আজকালও যাই মাঝে-মাঝে সেখানে—'

'ও শিগগির গিয়েছেন?'

'সেখান থেকেই ফিরেছি কাল কলকাতায়।'

'কলকাতায় কোথায় থাকেন আপনি?'

'আমি পার্কসার্কাসে থাকি।'

'সেখানে কি সুবিধে হয়?'

'বড্ড গোলমাল চলছিল। দাঙ্গাব সময় পার্কসার্কাসে ছিলুম। খুন কবে ফেললেও কবতে পরত। কয়েকবাব চেষ্টাও কবেছিল। ডাক্তাব বলে কেউ কেউ আমাব উপব সদয ছিল। কিন্তু ম্যাস-হিস্টিরিযার সময মানুষ তো আব কান্ডজ্ঞানে চলে না',। সুবল বললে, 'পার্কসার্কাসেব শাহাদৎ হোসেনেব পরিবাবই আমাকে বক্ষা কবেছে; বিশেষত, মেয়েদেব হিম্মতেই বাঁচা সম্ভব হয়েছে—সে এক ফিবিস্তিই বটে—'

'কী হয়েছিল, বলুন।'

সুবল হাতঘড়িব দিকে তাকিযে বললে, 'আব-এক সময বলব,' নিশীথেব দিকে মুখ ফিবিযে বললে, 'কাঁচড়াপাড়ার কথা বলছি।'

'সেখানে তো যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে।'

'আছে। দেখেছেন হয় তো।'

'নাঃ যাই নি। সেখানে আমাব শালা আছেন, শঙ্কর গুপ্ত, বড় ব্যবসাযী লোক, কযেক লাখ টাকা আছে।'

'তাঁকে চিনি আমি, কাল দেখা হযেছিল গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে। আপনাব মেযেকে কাব সঙ্গে পাঠিযেছিলেন কাঁচড়াপাড়ায় আপনি?'

'আমাব মেযেকে? ভানুকে?' নিশীথের বুকটা দুব দুব করে উঠল, বললে, 'ভানুব খবর কী? আপনি দেখে এসেছেন তাকে?'

'বলছি.' স্টেথোস্কোপটা সোফাব উপর থেকে তুলে হাতে দুলিযে সুবল বললে, 'কই আপনি বললেন না তো, মেয়েকে কার সঙ্গে পাঠিযেছেন?'

'কেন, কী হয়েছে, আমি নিজে যেতে পারি নি, আমার নিউমোনিযা হয়েছিল তখন, জলপাইহাটি কলেজের প্রফেসর মহিমবাবু ভানুকে কাঁচপাড়ায তার মামার বাড়ীতে রেখে এসেছিল। মহিম ফিরে এসে বলেছিল আমাকে, যে ভানুর মামা তাকে যক্ষ্মা হাসপাতালে রেখে দেবেন। ব্যবস্থা করছেন।'

সুবল বললে, 'তারপর আর-কোনো খোঁজখবর নেন নি আপনারা?'

'নিতে পারি নি। নিউমোনিযা থেকে সেরে উঠতে সময লাগল। স্ত্রীর খুব বেশি অসুখ হল। চলছে

এখনো, বাঁচবে কি না কে জানে। আমার ছেলে তো কলকাতা রানাঘা , রানাঘাট কলকাতার বাঁশবনে পলিটিক্স করে বেড়াচ্ছে। মফস্বলে মাস্টারি করে সব দিক সামলানো বড় ক ঠিন সুবলবাবু।'

'একটা চিঠিও তো লেখেন নি?'

'কাকে? শঙ্করবাবুকে? আমার স্ত্রী লিখেছিলেন। কোনো উত্তর পান নি।'

'শঙ্করদা তো বললেন না কিছু চিঠির কথা—'

'বলেন নি? নিজেও আমাদের জানান নি কিছু। কেমন আছে ভানু?'

'বেড পায়নি কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে—'

'বেড পায়নি; নিশীথ আকাট অন্ধকারে সুবলের দিকে তাকিয়ে রইল। 'কোথায় আছে তা হলে?'

নমিতা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে সুবলকে দেখে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'আমি যাচ্ছি, নিশীথবাবু।'

'কোথায়?'

'পার্কসার্কাসে।'

'আপনার বাবা ডাকছেন বুঝি? কেমন আছেন তিনি?'

'নমিতা একটু থেমে, বললে, 'আছেন এক রকম। আগের চেয়ে যে খারাপ তা নয়। কিন্তু মা ডেকেছেন ও-ফ্ল্যাটে, মার বড্ড অসুখ হয়ে পড়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'মাথায় যন্ত্রণা খুব, জুলফিকার ফোন করেছিল। আমাকে যেতে বলেছে.' আড়চোখে সুবলের দিকে তাকিয়ে নমিতা বললে, 'ইনি কে?'

'ইনি হলেন সুবলবাবু, ডাক্তার সুবলবাবু'।

'আজ্ঞে—'

ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্তা নমিতা দাশগুপ্ত, আমার বন্ধু গ্রাহাম অ্যাণ্ড গ্রাহামের শ্রীযুক্ত জিতেন দাশগুপ্তের স্ত্রী'—হাসির ঝিলিক, নমস্কার দেয়া-নেয়া শেষ হয়ে গেলে নমিতা বললে, 'আচ্ছা আমি উঠি। জুলফিকার আমাকে ডাকছে—'

'জুলফিকারের অসুখ?'

'না, সে ভাল আছে। অসুখ শুধু মার।'

'আপনার বাবার অবস্থাও একই রকম?'

নমিতার ভ্রূরু দুটোর মাঝখানে একটু খিঁচ এসে পড়েই মিলিয়ে গেল, বললে 'প্রায় সেই রকমই। একটু খারাপ হয়েছে হয় তো। ডাক্তারবাবু আসবেন।'

'ডাক্তার রোজেনবুর্গ?'

'রোজেনবুর্গ!'

'জুলফিকার'—নিশীথ থেমে গেল।

'জুলফিকারের কথা কী বলছিলেন? জুলফিকার দুবার ফোন করেছিল, আমাকে বললে। এবারে যে করেছে তার আধ ঘন্টা আগে আরেক বার।'

'কই শুনি নি তো। আপনি শুনেছিলেন?'

'না। শুনি নি তো। কী হল?'

'জুলফিকার নিজে বলেছে যে ফোন করেছিল?'

'নিজের মুখে বলেছে জুলফিকার'—নমিতা বললে।

'তা হলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয় না.' নিশীথ বললে।

নিশীথের মুখের গম্ভীর নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়েই কেমন যেন একটু হাসি পেল সুবলের। সুবলের মুখে যে-হাসির ভাব এসে পড়েছে নমিতার সেদিকে দৃষ্টি ছিল না; নিশীথ আন্দাজ করছিল হয় তো যে সুবল হাসছে। কিন্তু সে সুবলের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল না।

'জুলফিকার শব্দের মানে কী?' নিশীথ জিজ্ঞেস করল। নমিতা মানে জানে না। কোনো ইংরেজির থেকে ইংরেজি, বাংলার থেকে বাংলা কোনো অভিধানেই শব্দটির মানে পাওয়া যাবে না, সুবলও বলে দিতে পারে না। কোনো রকম ডিকশনারিই নেই এ বাড়িতে; কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল নিশীথ।'

'জুলফিকার—'

'কি বলছিলেন জুলফিকার'—সচকিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল নমিতা।

'জুলফিকার হয় তো ভুল করেছেন? আধঘন্টা আগে ফোন সে করে নি।'

'তবুও বলেছে ফোন করেছে এটা কি রকম ভুল?'

নিশীথ তার চোখ দুটো সুমুখের দেয়ালের ওপর—তারও উপরে বিমের দিকে তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'এ ধরনেরও এক রকম ভুল আছে বটে।'

'তা থাকতে পারে,' নমিতা তেরছা মাথায় আড় চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু কোনো রকম ভুল করবার ছেলে নয় তো জুলফিকার।'

'কখনো ভুল হয় না তার?'

'এ বয়সে কেন হবে?' নমিতা বললে, 'কোনো বয়সেই হয় না ওর মতন মানুষের।'

'সকলেরই ভুল হয়, শয়তান ছাড়া,' নিশীথ একটু দুষ্টুমি করে হেসে বললে। নমিতা ডোরাকাটা স্ল্যাকস পরে এসে ছিল, পায়ে উইমেনজ ওকসিলারি কোরের মিলিটারি জুতো, কিউই দিয়ে পালিশ করতে-করতে নিজের মুখ তাতে দেখে ফেলেছে হানিফ। বুট সমেত ডান পাটা খানিকটা উঁচিয়ে স্ল্যাকসের ডোরাগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নমিতা বললে, তা হলে শয়তান হবে জুলফিকার। কী মানে আছে স্বর্গের, যদি সেখানে জুলফিকারের মত শয়তান না থাকে।

হদিসের কথা। সন্ধ্যে বেলা মাঝদিঘির ঘাপটিতে যে-সব রুই-চিতল চরে বেড়ায় তাদের মুড়ো ল্যাজের তেল-চকচকে কথা।

'নিশীথ নিজের হাতের নেবানো সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল আবার।'

নমিতা সিগারেট জ্বালিয়ে নিল—'টেলিফোনে জুলফিকারের গলা বিসিভার ধরলেই আমি বুঝতে পারি। জিতেনের গলার চেয়ে ভাল করে চিনি আমি জুলফিকারের গলা।'

'কেমন ফ্যাসফ্যাস করে যেন টেলিফোনে জিতেনের গলা'—নমিতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে।

'না তা নয়; জিতেন পেটে আধখানা কথা রেখে দেয় কি না, সেই জন্যেই অস্পষ্ট। বেশ পরিষ্কার করে বলে সব জুলফিকার। আমি উঠি। আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

'কে? মা?'

'না, জুলফিকার।' নমিতা চলে যাচ্ছিল, নিশীথ ডাক দিয়ে বললে, 'শুনুন নমিতা দেবী।'

নমিতা ফিরে এসে খুব অভিনিবেশের সঙ্গে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি?'

'আমি বলছিলুম জুলফিকার'—নিশীথ বললেন না কিছু; নমিতা দাঁড়িয়ে রইল। নিশীথ বললে না আর-কিছু। কী বলবে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল নমিতা।

'জুলফিকার কি? কি বলছিলেন জুলফিকার?' নমিতা জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলছিলুম জুলফিকার কী সিরেফ জুলফিকার?'

'আচ্ছা', সুবলের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি চারিয়ে নিশীথের পিঠে টোকা মেরে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল নমিতা। যাবার সময়ে বলে গেল, 'খেয়ে নেবেন নিশীথবাবু। নটা-দশটার সময়, আজ রাতে যদি বাড়ি না ফিরি। ফিরব না হয় তো'।

'জুলফিকার কি সিরেফ জুলফিকার?' বেশ গলা ছেড়ে বলে উঠল নমিতা হল ঘরটা পেরিয়ে যাবার সময়। হো হো করে হেসে উঠল। 'My!' নেমে হানিফের স্ল্যাঙ, খানিকটা জোর উর্দু ঝেড়ে মোটর বার করে নিয়ে চলে গেল। খুব চিন্তিত মুখে সুবলের দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'কাঁচড়াপাড়ায় বেড পায় নি। কোথায় আছে ভানু তা হলে? একটা চিঠি লিখেও জানালেন না আমাদের শঙ্করবাবু—তা হলে তো আমি নিজেই কাঁচড়াপাড়ায় গিয়ে ব্যবস্থা করতাম।'

'তিনি তো আপনাদের দুষছেন। কোনো খোঁজ খবরই নিলেন না আপনারা।'

তা দুষতে পারেন বটে, আমাদেরই দোষ, স্বীকার করে নিল নিশীথ, কোথায় আছে ভানু?

'এত দিন তো শঙ্করবাবুর বাড়িতেই ছিল—তাঁর মোটেই ইচ্ছে নয় যে তাঁর ওখানে থাকে, নিজের বাড়িতে যক্ষ্মা রুগিকে রাখতে চান না তিনি।'

'তা জানি। ভানুর মামা হন তিনি, কিন্তু আমাদের কারু সঙ্গেই কোনো আত্মীয়তা রাখতে চান না। ডেকেও জিজ্ঞেস করেন না তাঁর সহোদর বোনকে, আমার স্ত্রীকে।'

সুবল স্টেথোস্কোপটা একবার শূন্যে নাচিয়ে নিয়ে বললে, 'বড় বিচ্ছিরি রোগ। কেউ, রাখতে চায় না থাইসিসের রুগিকে নিজের বাড়িতে, নিজের বাচ্চা হলেও রাখতে চায় না।'

সূচীপত্রে যান

নিশীথ তার হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল। পকেটের থেকে একটা কৌটো বার করে ক্যাকটিনা পিল গিলে ফেলে বললে, 'ঠিকই তো। কিন্তু এত বড় এক জন লোক শঙ্করবাবু, কাঁচড়াপাড়ায় একটা বেড যোগাড় করে দিতে পারলেন না। কেবিনও তো পারতেন ঠিক করে দিতে।'

'ভর্তি যে হাসপাতাল।'

'আর যাদবপুরে'?

'আমি নিজে গিয়ে চেষ্টা করেছি যাদবপুরে—'

'ভানুর জন্যে?'

'হ্যাঁ। ভর্তি একেবারে হাসপাতাল।'

নিশীথ বললে, 'আদ্যিকাল থেকেই ভর্তি হয়ে আছে? নতুন রুগি আর আসছে না? কথা হচ্ছে আমাদের রুগির জন্য বেড নেই। শঙ্করবাবু গা দিলে কোথাও না কোথাও বেড পাওয়া যেত। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে কি আর বেড জোটে? অবিশ্যি আমাব মেয়ে, দায়িত্বটা আমারই। কিন্তু আমি জানতে পারি নি তো এই রকম হয়েছে—'

'শুধু চিঠিফিটিতে হয় না, আপনি একবার গেলে পারতেন নিজে কাঁচড়াপাড়ায়, নিউমোনিয়া থেকে উঠে—'

'ভুল হয়ে গেছে। আমি উঠে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই কঠিন রোগ হল আমার স্ত্রীর। কিন্তু তবুও আমার যাওয়া উচিত ছিল। কেমন আছে ভানু?'

'শঙ্করদা আর রাখতে চাচ্ছেন না ভানুকে।'

'বাখতে চাচ্ছেন না? কেন, মবে যাচ্ছে ভানু?'

'আপনি কলকাতায় এনে বাখতে পারবেন না?'

'ভানুকে? কাঁচড়াপাড়ায় কি বেড পাওয়াই যাবে না?'

সুবল দেখে এসেছে, জেনেছে, সতর্কিতভাবে মাথা নেড়ে বললে, না 'শীগগির নয়।'

'যাদবপুরেও না?'

'বড়লোক দিয়ে বড়লোককে খোশামুদি না কবিয়ে নিতে পাবলে পাওয়া কঠিন। জানাশোনা আছে মন্ত্রীদের কারুব সঙ্গে আপনাব?'

নিশীথ অনেক জলে পড়া স্নিগ্ধ হাঁসেব মত সফলতাব, ঘবের অবিবাম বাতাসেব মধ্যে বসে থেকে বললে, 'মন্ত্রীদের সঙ্গে আমাব? না সে সব নেই কিছু।'

'ভেবে দেখুন তো ভাল কবে। আজ কাল তো স্বাধীনতাব নানা সুবিধে সব দিক দিয়েই।'

'স্বাধীন মন্ত্রীদের কাউকে চিনিনে আমি। কাউকেই না।' নিশীথ সুবলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, ব্যোমকেশ চক্কোত্তি গযনভি গজচক্র বলত সেই মিনিস্ট্রিতে সে সময়। গজচক্রের আমল থেকে আজ অব্দি কত মিনিস্ট্রি এল গেল, আমার বাবাও চেনেন নি কাউকে, আমিও না। স্কুল কলেজে পড়ি নি এদের কারুব সঙ্গে। বড় মানুষ হলে ইস্কুল কলেজের ইযাবদের কথা মনেও থাকে না কারু।'

'অ্যাসেম্বলি কোনো হোমড়াচোমড়াকে চেনেন?'

'কাউকেই চিনি নে।'

'কর্পোরেশনের—?'

'কিংবা বি-পি-সি-সি, অভযাশ্রম সোদপুব—কাউকেই চিনি নে দাদা। থাকি জলপাইহাটিতে, কী করে চিনব? কলকাতায় এলে বড়লোক ঘেঁষি না। জিতেন আমারই মতন ফর্দা লোক ছিল যুদ্ধের সমযও; ওর সঙ্গে মিশতে-মিশতে দেখতে- দেখতে ও বড় লোক হয়ে গেল।'

'দাশুপ্ত সাহেব হয তো চেনেন অনেককে?'

'তা চিনতে পারেন', চিন্তিত মুখে, কোথাও কোনো সমাধান আছে কি না সন্ধান করতে-করতে বললে নিশীথ, 'দাশগুপ্ত নেই তো এখানে।'

'নেই?'

'জামসেদপুরে গিয়েছেন।'

'মিসেস দাশগুপ্তকে বলে দেখলে হয়। অনেক বড়-বড়, চক্রে চলাফেরা, মানুষটিও বেশ দরদি, দরাজ, তাই তো মনে হল।'

নিশীথ সোফায ঠেস দিয়ে ঘাড়ে একটা ভাঁজ ফেলে ডান হাতটা তুলে আঙুলের নখের দিকে

তাকিয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল; নমিতাকে কী বলতে হবে নিশীথের, কাঁচড়াপাড়া যাদবপুরের টি-বি হাসপাতালের বেড বুক করা যায় যাতে কাউকে ধরে-টরে খুব তাড়াতাড়ি? আজ তো এই প্রথম দেখা নমিতার সঙ্গে। এ নামে কোনো স্ত্রীলোক আছে গতকালও তো জানত না সে। নিশীথকে যে কে ভাল করে জানত না নমিতা। নিশীথের পারিবারিক কথা জিজ্ঞেস করে নি, নমিতাকে বলেও নি কিছু সে। জিতেন দাশগুপ্তও তো জানে না রানু হারিয়ে গেছে, ভানুর যক্ষ্মা, সুমনা এই রকম, হারীত ঐ রকম, নিশীথের নিজের ব্যাপারটাও সব রকম; এ তো জিতেন জানে না, জানতে চায়ও না। যে-সৌহার্দ ভাঙিয়ে খেয়ে জিতেনের বাড়িতে এবারেও উঠেছে নিশীথ সে জিনিসের চেহারা এতদিনে কী রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক করে বুঝবাব অবসর না দিয়েই জিতেন তো জামসেদপুরে চলে গেছে।

যদি নিশীথ বোঝে যে ব্যাপাবটা ঠিক হচ্ছে না, তা হলে নিজেকে জোব করে এ বাড়িতে গছিয়ে দিয়ে থাকবে না সে। কলকাতায় আজ-কাল বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, গোযাল ।াওয়া যাচ্ছে না। তবুও কোনো গোয়ালে গ্যারাজে জোটে কি না আস্তানা খুঁজে দেখবে। না হলে জলপাইহাটি ফিরে যেতে হবে। মিছে কারু উপর অবিচার করতে চায় না নিশীথ। জিতেন ও নমিতা দু জনেই—যা দেখছে নিশীথ—লোক ভাল, কিন্তু এখানে অনাহ্বানে ববাহুত অতিথির মত এসে বেচাবিদের পাবিবারিক স্বাধীনতা নষ্ট করাব কোনো অধিকার নেই তো নিশীথের।

'ভানুকে অবিলম্বেই কলকাতা আনতে হবে?'

'আজ তো হবে না, কাল আনলেই ভাল হয।'

নিশীথ চক্ষুস্থিব করে থাকল—'দুটো দিনও আব সবুব সইবে না?'

ঘড়ির ডাযালের মত স্টেথোস্কোপটা দোলাতে-দোলাতে সুবল বললে, 'না, আর পারবেন না।'

'আমি যদি কলকাতায় না আসতাম এখন? আমি যে এখানে এসেছি তাঁকে তা কে বললে?'

'অনেক দিন থেকেই তো লোক পাঠাচ্ছেন এখানে আপনাব খোঁজে। কলকাতায এলে যে এখানে থাকেন আপনি, শঙ্কবদা জানেন তো। শুনেছিলেন আপনাব আজ-কাল কলকাতায আসবাব কথা।'

শঙ্কববাবুব কাছ থেকে এসে এ বাড়িতে আমাব খোজ কবত ভানুব ব্যাপাব নিযে? একটু অসুস্থ বোধ কবল নিশীথ—'কাকে পাঠানো হত?'

'আমিই তো এসেছি ববাবব।'

'কাব কাছে খোঁজ নিযেছেন আপনি?'

'দাশগুপ্ত সাহেবের কাছে। হানিফেব কাছে।'

'মিসেস দাসগপ্তেব কাছে?'

'না, ওঁব সঙ্গে আমাব দেখা হযনি। দাশগুপ্তকে আমি জিজ্ঞেস কবে যেতাম কলকাতায আপনি এসেছেন কিনা। এ ছাড়া আব-কিছু বলার দবকার হয নি তাঁকে, তিনিও জিজ্ঞেস কবেন নি কিছু।'

এই তো এইমাত্র ক্যাকটিনা পিল খেল, বুকেব ভিতর কেমন ধড়ফড় কবছিল বলে। হার্টে অসুবিধা, নিশ্বাসে কষ্ট। একটু ভাল বোধ কবতেই সিগাবেটের টিনটাব দিকে হাত বাড়িযে দিল আবার নিশীথ।

'কোথায আনি ভানুকে। কী কবি?' ক্লিষ্ট মুখে সিগাবেটেব টিন হাতে কবে নিশীথ বসে রইল।

'এ বাড়িতে তো আনা যেতে পাবে?'

'এটা তো আমার নিজেব বাড়ি নয—'

'নীচের তলায দূবে একটা আলাদা ঘবে থাকতে পাবে।'

'ও রকম রুগিকে নিজের বাড়িতে কেন বাখবে জিতেন? আমি কেন রাখতে দেব? জিতেন হয তো রাজি হযেও যেতে পাবে- কিন্তু না,' নিশীথ ঘাড় নেড়ে বললে, 'আপনি ডাক্তার মানুষ, সুচিন্তাও করছেন। বোঝেন তো সব দিক দিযেই জিনিসটা খারাপ—খুব খারাপ হবে।'

'তা হলে শঙ্করবাবুকে বেশি দোষ দিতে পারেন না। তিনি তো এতদিন রেখেছেন।'

নিশীথ বললে, 'তা ঠিক। যারা উপকাব করে তারা একটু চাঁট মারলেই আমরা হেলে পড়ি। অবিচার করি। শঙ্করবাবু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কে কাব জন্যে করে? কিন্তু তিনি করেছেন।'

'কিন্তু এখন কী করবেন?'

'কলকাতায যে-সব আত্মীয বন্ধু আছে আমাব তাদের বাড়িতে, উঠে বা এক বেলা থাকতে আমি নিজেই সঙ্কোচ বোধ করি। ভানু কী করে—'

'কালকের ভিতরেই একটা কিছু ঠিক কবে ফেলতে হবে তো। আজই গিযে বলতে হবে

শঙ্করবাবুকে।'

নিশীথ মরীযা হযে বললে, 'চার পাঁচদিন পরে জিতেন ফিরে আসবে। এ কটা দিন অপেক্ষা করতে পারবেন না শঙ্কববাবু?'

'ওঁরা কালই পুরী চলে যাচ্ছেন।'

'কালই।'

নিশীথের শার্টের গলার বোতাম খোলা ছিল, কেমন একটা হাঁফ.বোধ কবে আব-একটা বোতাম খুলে দিল সে; বললে, 'মিসেস দাশগুপ্ত আজ রাতে আর ফিরবেন বলে মনে হয না। না হলে তাকে বলে এই বাড়িতে কযেকটা দিনের জন্যে একটা ব্যবস্থা করে নেয়া যেত—'

'একটা ফোন করে দিন মিসেস দাশগুপ্তকে—'

'এখন এ বিষয নিযে তাকে ফোন করা চলে না।'

'কেন?'

'মিসেস দাশগুপ্ত জুলফিকারদের সঙ্গে একটু মজলিস কবতে গেছেন।'

বলে ফেলে কেমন একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। কথাটা বোধ হয, (ঠিক জানে না নিশীথ) মিসেস দাশগুপ্ত জুলফিকারেব সঙ্গে রাত কাটাতে গেছে। কিন্তু সে কথা সুবলকে সে তো বলতে পাবে না। যা বলেছে সেটাও বলা উচিত হযনি হয তো। মা-বাবাকে দেখতে গেছে। আজ ওখানেই থাকবে—এইটুকু কথা বলা উচিত ছিল সুবলকে।

'মজলিসে কি মদ খাওয়া হবে?'

নিশীথ মাথা নেড়ে শান্ত অব্যয মুখে সুবলেব দিকে তাকাল—'না মদ নয। মিসেস দাশগুপ্তের বাবাব প্যারালিসিস। মারও হঠাৎ অসুখ করেছে। তাঁদের দেখতে গেছেন মিসেস দাশগুপ্ত। জুলফিকাবেব স্ত্রী আগেব থেকেই ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিল। যদি সম্ভব হয় এক ফাঁকে সেটা বক্ষা করে মা-বাবাব তাদারকের জন্য যেতে হবে। ওঁবা পার্কসার্কাসে দুটো পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকে।'

সুবলকে গোটা ব্যাপাবটা বুঝিযে দিযে সুবলেব মুখেব দিকে নিশীথ তাকাল আর-একবাব।

'তা হলে উনি আজ রাতে আর আসবেন না। কাল সকালে কি আসবেন?'

'তা আসতে পারেন।'

'যদি না আসেন, কাল নিশ্চযই ফোন কবতে পাববেন আপনি।'

'কাল ফোন করে একটা ব্যবস্থা করে যদি পবশু ভানুকে এখানে আনা যায, তা হলে চলবে সুবলবাবু?'

সুবল একটু নরম হযে বললে, 'তা ববং হতে পারে। বলে-কযে এক দিন তারিখ সবানো যেতে পারে। পবশু পুরী যাবেন।'

'কিংবা কাল ওঁরা পুরী চলে যাবাব আগে যদি আমি কাঁচড়াপাড়া গিযে শঙ্কববাবুর কাছ থেকে তদারকি বুঝে নিযে চার-পাঁচটা রাত থাকি কাঁচড়াপাড়ায, তারপর জিতেন এলে ভানুকে নিযে এখানে চলে আসি?'

'সব ঘর-দোব বন্ধ করে যাবেন ওঁরা পুরী যাবাব আগে।'

'ভানু যে-ঘরে থাকে সেটাও?'

'হ্যাঁ। সেটা তো একটা ছোট খড়েব ঘব, ওদেব দরদালানের থেকে চাবশ হাত দূরে। সেটা পুড়িযে দিযে যাবে। ডিজইনফেক্ট করে যাবে সব।'

মুখ-চোখ কেমন কঠিন নিশব্দ হযে রইল। নিশীথেব কথা বলা দরকাব। কী ব্যবস্থা করবে তার একটা পরিষ্কার নির্দেশ, কিন্তু নিশীথ নির্দায় নির্বর্ণ হযে বসে বইল।

'আমি একটা কথা বলি আপনাকে। সেইজন্যেই এখানে এসেছিলুম। পার্কসার্কাসের ফ্ল্যাটে আমি আর মা আছি, আর কেউ নেই। ভানুর চিকিচ্ছে আমিই করেছি কাঁচড়াপাড়ায। আমার মনে হয না, দুটো লাঙ্গসেই ধবেছে। আবার এক্সরে করতে হবে। রোগ কঠিন খুব। কিন্তু আশা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভানুকে আমার ওখানে রাখতে চাই। আমার মার আপত্তি নেই। আপনার অনুমতি আছে?'

নিশীথ নিজের চিন্তা-সকল্পের ছেঁড়া-ছেঁড়া খড়গুলোর ভিতর থেকে অন্ধকারে অন্ধ চোখে কিছু গ্রথিত করে নেবার চেষ্টা করছিল—খুবই এক মনে দেযাল, কার্পেট, সোফা, বই, বাতাস, বাতি, সুবলেরও অস্তিত্বের উপর চার-আনি মনের—ক্রমায়ত নির্মনের সিট আবরণ টেনে দিযে যেন। সুবল কথা বলে যাচ্ছে

টের পাচ্ছিল সে, কী বলছে সেটা শুনে, না শুনে, বুঝে, না বুঝে সুবলের কথা শেষ হল যখন তার স্বরূপ অনুভব করে নিতে পারল; বাতাসে আলোয় চিন্তার সুস্থিবতার ভিতর নিশীথ ফিরে এসেছে যেন প্রায়।

'হ্যাঁ আছে'—নিশীথ বললে।

'তা হলে আজ রাতেই নিয়ে আসবে ভানুকে?'

'আজ রাতেই? তা কী করে হয়?'

'আমার মোটরে।'

ও মোটরও আছে তা হল সুবলের। নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'আজ থ. :। অত তাড়াহুড়ো—'

'আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। মাও জানে যে আজ রাতেই ভানু আসবে।'

'ভানুকে দেখেছেন আপনার মা?'

'না।'

'আপনার ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

'মা ছাড়া কেউ নেই।'

নিশীথ ইলেকট্রিক আলোর বাল্বের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চোখ থেকে সেই ঝাঁপটা ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে বললে, 'কিন্তু রুগিব ছেঁড়া-ছানার ভিতর এ-রকম ভাবে লেপ্টে পড়াটা ঠিক হবে না সুবলবাবু। আপনি তো ডাক্তার, এরই স্পেশালিস্ট বটে, কিন্তু তাই বলে কি এ জিনিস নিজেব ঘরেব ভিতর এনে রাখতে হবে?'

'ভানুর কাছে মা যাবেন না।'

'কিন্তু একই ফ্ল্যাটে তো। কী কবে এ কাজে সায় দিলেন আপনাব মা? তিনি কি আপনার হাল ছেড়ে দিয়েছেন?'

সুবল স্টেথোস্কোপটাকে ছড়িয়ে বিছিযে বললে, 'মা আমাব ছোটবেলার থেকে যা চেয়েছেন আমি সব সময়ই তা কবেছি। এখন এমন একটা অন্যায় বিশ্বাস হয়েছে আমাব উপব যে, আমি যা দাবি কবি তাতেই তিনি বাজি হন—'

'বিশ্বাসটা অন্যায আপনিই তো বলেছেন।'

'হ্যাঁ অন্যায় বই-কি'—সুবল বললে, 'এ-রকম যক্ষ্মারুগি নিজেব বাড়িতে রাখা বড্ড নিরেস।'

'তবে?'

সুবল স্টেথোস্কোপ ঘাড়ে ঝুলিযে কথা ভাবছিল, কিছু বললে না।

'ভানুকে, আমাকে বিপন্ন দেখ এ-বকম ব্যবস্থা করবাব মত মেজাজ-টেজাজ অনেক আগেই শেষ হযে গেছে তো আপনার বযসেব মানুষের। কিন্তু তবুও ভাল জিনিস আছে কিছু পৃথিবীতে। থাকে সব সময়ই।'

এবাবও নিজেব মনে স্টেথোস্কোপ নিয়ে নিস্তব্ধ হযে বসে বইল সুবল; বাতাসে শার্টের কলাবটাই উড়ে ঘুরে মিহি আওয়াজ কবছে; আব কোনো শব্দ নেই কোনোদিকে; নীববতা ভাঙবাব কোনো উপক্রম দেখা গেল না।

'কারো-কারো জীবনেব।'—বললে নশীথ আবার

'আমি উঠি, রাত হযেছে।'

'ভানুকে আপনাদের বাড়িতে বাখলে আপনাদের ক্ষতি হতে পাবে সেটা স্বীকাব কবেন তো?'

সুবল বললে, 'রোগ যে-রকম গড়ে বসেছে, তাতে খুব সাবধানে থাকলেও আমার না হোক, মার হয তো হতে পারে।'

'খুব সাবধানে থাকলেও?'

'ভানুকে দেখতে মা দিনে দু-চারবার যাবেনই, ঠেকানো যাবে না। আমি বাড়ি না-থাকলে আরো কী করবেন, না কববেন, বলা যায না। খুব বেশি স্নেহআর্তি—মাকে ভালবাসি আমি। এই পৃথিবীতে মা ছাড়া কেউ তো আমার নেই।'

'সুবলবাবু, জেনেশুনে কেন কেউটে ঢোকাচ্ছেন ঘবের ভিতর?'

পৃথিবীতে আহ্নিক গতির একটি ধ্বনিকণার মত বিলীন হয়ে যাবাঁব আগে বললে নিশীথ। সুবল উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দিল নিশীথকে— 'এই যে আমার ঠিকানা। ফোন নম্বরও আছে। কার্ড আপনি হারিযে ফেলবেন, ঠিকানা আপনার বইযে এক্ষুনি টুকে রাখুন নিশীথবাবু—' বলে,

চলে যাবার আগে ঘরের ভিতর রাতের ভরপুর বাতাসের ভিতর দাঁড়িয়ে সুবল বলবে ভাবছিল, ভানুকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু তবুও নিশীথকে বললে না কিছু।

প্রায় আন্দাজ করে ফেলেছিল যেন নিশীথ। কিন্তু বিশেষ কোনো তথ্য নেই তার হাতে—ক্রমেই বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছে তার মন। তেমন কোনো স্পষ্ট সম্বন্ধচিহ্নেব অভাবে সুবলেব মনের ভিতব প্রবেশ করতে চেষ্টা করল না সে। ছেলেটি অনেকক্ষণ হয চলে গেছে। বাতি নিভিযে রাখল। অন্ধকাব। দমকা বাতাসে মেঝের আনাচে-কানাচে মাথা কুটে মরছে ফোন নম্বর—নাম—কার্ড—

রাত দশটা-সাড়ে দশটাব সময়েও নমিতা ফিরল না। তা হলে ফিরবে না আর আজ বাত অনুভব করে নিয়ে নিশীথ চান করে খাওয়া দাওয়া সেবে জিতেনেব শোযার ঘবেব পাশে তার বাড়িব অফিস ঘরে ঢুকল। দিব্যি বিছানা তৈরি আছে। সোফা, কুশন, ইজিচেযার বযেছে। সিলিং ফ্যান, টেবল ফ্যানও। ঘবে যেরকম বাতাস খেলছে তাতে ফ্যানের দরকার হয না। ধবধপে মশাবি খাটেব এক দিককার দুটো বডেব সঙ্গে আটকানো রযেছে। দবকার হলে টানিযে দেওযা যেতে পাবে, কিন্তু এত বাতাসে মশা আসবে কোথেকে। নমিতা জলের কথা ভোলে নি। দুটো বড়-বড় সোরাই ভর্তি কবে জল বেখে গেছে, এ জল ওযাটারকুলারে ছিল, তা হলেও বড় আইস প্রুফ কাচের পাত্রে ববফেব কুচি রেখে গেছে ঢেব, রেফ্রিজাবেটরের থেকে বার কবে আট দশ বোতল স্কোযাশ, মিনারেল ওযাটার ইত্যাদি। এত বাতাস, এত জল, এত ঠাণ্ডা, এখন শরীবে একটা জিনিসেব দরকাব শুধু, ঘুমেব আবেশ। আজ বাতে খুব লম্বা চৌকশ ঘুম না দিলে চলবে না নিশীথেব। কাল সে ঘুমোতেই পাবে নি ভাল কবে। শরীবটাকে কেমন দুর্বল লাগছে। বযস বেশি হযেছে। অনাচার চলছে। হার্টেব অসুখে অতিবিক্ত চা-কফি-সিগাবেট খেযে চলছে সে। নিশীথেব মনে হল, তার শরীরের যে-রকম অবস্থা তাতে ডাক্তাব না দেখালেও খাওয়া-দাওযা চলাফেবার সংযমের দবকাব। কিন্তু জিতেনেব এ বাড়ি থেকে শবীব মনকে নির্লিপ্তি দান কবা কঠিন। নমিতাব বযস ঢের কম, জীবনবোদ একেবারেই অন্য বকম। বযেছে কেমন যেন এক অখল অবনমিত উত্তেজ নমিতাব হৃদযে শরীবে; কখনো ঝর্ণার মত ঠাণ্ডা, কখনো কড়া লবণেব ঝাঁঝেব মত, যেন নিঃসাগবিক দেশ থেকে আগত পথিকেব চোখে মুখে।

নমিতার সঙ্গে তাল বেখে চলা শক্ত নিশীথেব পক্ষে। জিতেনেব টাকা আছে, স্নাযু ও আযোজন আড়ম্বরে অক্লান্তি, সে নমিতাব পৃথিবীতে না চরলেও সেখানে মাথা ঠিক রেখে ঢোকে, নিজেকে মানিযে নিযে চলাফেরা করে, দবকাব মত বেবিযে পড়তে পাবে। তবুও জিতেন হয তো ঠিক এ-বকম জিনিস চায নি,নমিতাব চেযে বেশি আত্মস্থ, নিজেব চিন্তা আকাঙক্ষাব নিকট নিকটতম আত্মীযেব মত কোনো স্ত্রীলোককে পেলে ভাল হত তার?

এক গেলাস জল খেল নিশীথ। কোনো বোতল ভাঙতে গেল না। তেপযেব উপব দু-তিনটে সিগাবেটেব টিন, একটা টিনহাতে তুলে নিযে দেখল; ওযেস্টমিনস্টাব। সিগাবেট ঠাসা, চমকাব গন্ধ বেরুচ্ছে। ক্যাকটিনা পিলও খেতে হয, সিগাবেট তবুও খাবে সে? দুটো সিগাবেট বাব করে নিল নিশীথ। বড় তেপয়াটার উপব কতকগুলো বই; ইংরেজি উপন্যাসও আছে; বাংলা নভেল একখানা দেখল সে, বইটা পড়েছে সে; এ বইটা তা হলে গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহামেব বড় সাহেব জিতেন দাশগুপ্তেব অফিস ঘবেও ঢুকে পড়েছে! বেহুলার লৌহগৃহ ভেঙে কালনাগেব মতন বুঝি? নাকি এ বই বেহুলা নিজেই সেঁধিযেছে? কে দিযেছিল? জুলফিকাব? জহরলালের একখানা বই আছে; অরবিন্দব ইংবেজি বই একটা, আর-একটা ইংরেজি অনুবাদ। ইংরেজির বাংলা অনুবাদও পড়ে। কে পড়ে, নমিতা না জিতেন? না নিশীথের দরকার হতে পাবে সেই জন্য সকালবেলা যে বেড়িযেছিল নমিতা, কুড়িযে এনেছে চার দিক থেকে? একটা বাংলা বই তুলে নিল জিতেন; দু-চাব পাতা পড়ে বেখে দিল। ফযেকটভাঙ্গেবেব উপন্যাসটা তুলে নিযে দেখল ওটা ইংরেজি অনুবাদ নয—মূল জার্মান, জার্মান ফবাসি শিখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকে নিশীথের, কিন্তু জীবনের অনেক ইচ্ছাব মতই এও উখায হৃদি লাযন্তে; একটা নিঃশ্বাস ফেলে, দুর্বল শরীরে হার্টের অসুবিধা বোধ করে বইটা রেখে দিল সে, দুহামেলের একখানা বই, জিদেব একখানা। অনুবাদ? না, সনাতন ফরাসি। যত পাতা ওলটানো যায সবই অমব পরিষদেব ফবাসি। ইংরেজি বই যে-গুলোকে ভেবেছিল নিশীথ, তা হলে সেই বইগুলো এ-বকম; এই রকম ইংরেজি বর্ণমালায লেখা শুধু? চার দিকে জল, বরফ, বাতাস, বই, তবুও কেমন একটা অদ্ভুত তেষ্টায শুকিযে উঠেছে যেন প্রাণ, খাঁটি ইংরেজি ভাষায লেখা একটা উপন্যাস, গল্প, কবিতার বই নেই এই বইয়ের স্তূপের ভিতর? জওহরলালেব বই আছে, লুই ফিশারের, এডগাবসের, এডগাব ওযালেসেবও, না, ঠিক এ বইগুলো আজ এ

সময়ে চাচ্ছে না নিশীথ।

এ-সব বিদেশী ভাষায় লেখা উপন্যাস এখানে এনে জড়ো করেছে কে? নমিতা না জিতেন দাসগুপ্ত? নমিতা জার্মান জানে? ফরাসি জানে জিতেন? এরা জার্মান ফরাসি জানে নাকি দু-জনেই? শুধু জানা নয়; জেনে সাহিত্যও পড়া। জিতেনকে কোনোদিন ভাল একখানা ইংরেজি-বাংলা বই শুঁকতে দেখে নি নিশীথ। ব্যসার বিষয়ে নিত্য-নতুন টেকনিক বার করা ছাড়া আর প্রায় কোনো দিকেই কোনো দিনই মন খেলা করত না তার। জিতেনের তেপয়ের উপর তার অফিস ঘরের ভিতর ব্যবসা তো আজ কেঁচে গণ্ডুস করছে। তবে জিতেন থাকতে এই বইগুলো এখানে ছিল না হয় তো। আজই এনেছে নমিতা খুব সম্ভব। জিতেন দুহামেলের নাম শোনে নি, জিদের নাম শোনে নি, ফয়েকটভাঙ্গেরের না; টমাস মানের না; জার্মান সে জানে না নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায়; ফরাসি না, ইংরেজি বলতে-লিখতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ইংরেজি না। সাহিত্য কাকে বলে জানে না জিতেন। জানতে চায়ও না। নমিতা কতদূর কী জানে? একটা সিগারেট জ্বালল নিশীথ। ঘুম আসছে না। ফরাসি জার্মান বইগুলো নিয়েই বিছানায় গিয়ে শুল সে। বইগুলোই নেড়ে চেড়ে বিচিত্র অক্ষর ও শব্দ বাক্যের আবছায়া হাতড়ে কেমন একটা সরস-কঠিন অজ্ঞাতকুলশীল আমেজে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে তাকে। সোয়া এগারটা বেজে গেছে, দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। নীচের তলায় হানিফকে শুতে বলেছে, অনেক রাতে নমিতা যদি আসে, কলিং বেল টেপে, হানিফ দরজা খুলে দেবে।

জিদের বইয়ের ফরাসি পড়ে দেখছিল, ইংরেজি অক্ষর জানা আছে বলে পড়তে পারা যাচ্ছে, উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না, দু-চারটে শব্দের মানে ধরতে পারা যাচ্ছে ; অনেক আগে—কলেজে থাকতে এক সময় ফরাসি প্রাইমার কিনে দু-একদিনেই হারিয়ে ফেলেছিল নিশীথ। তাই মনে হচ্ছে ফরাসির সঙ্গে একেবারে যে মুখ চেনা নেই তা নয়। রেখে দিল বইটা। টমাস মানের জোসেফ বিষয়ক উপন্যাস এটা নয়। সেটা আমেরিকায় বসে লেখা, জার্মান, তাই না? কেমন আছে সুমনা? একাকী রয়েছে এত রাতে? অর্চিতাকে বলে এসেছে সব; ছেড়ে দিতে পারা যায় অর্চিতার উপর সব; জলপাইহাটির থেকে চলে আসবার আগে করমচার বনে ঢুকে, ভাঙা লোনাধরা গাঁথুনির সিঁড়ির উপর পা ছড়িয়ে বসে, তেপান্তরের দিকে চেয়ে থেকে দু-চার ঘন্টা কাটিয়ে এলে পারত নিশীথ। কলেজে কাজ তো করবে না সে। কলকাতায় কোথাও কিছু না-জুটলেও—চাকরি না-পেলে, বাড়ি না পেলেও কলেজের কাজে ফিরে যাবে না। কলেজের কাজে না ফিরলেও জলপাইহাটিতেও কি যাবে না আর? অর্চিতার সঙ্গে সেদিনই শেষ কথা সেরে এল বুঝি? সুমনার সঙ্গে দেখা হবে না আর? বানু কোথায়? পাওয়া যাবে কি সত্যিই বানুকে কোনো দিন? নরেনদের কোনো হাত আছে কি বাস্তবিক ব্যাপারটায়? এ-রকম আশ্চর্য ভাল ছেলে সুবল? ভানুর বেঁচে যাবে হয় তো। ভানু বেঁচে উঠলে সুবল কি বিয়ে করতে চাইবে তাকে? তা হতে পারে; অসম্ভব নয়, তা হতে পারে, সিগারেটটা নিবে যাচ্ছে বুঝি? না নেবে নি, সিগারেট নেবে নি, এখুনি না টানলে নিবে যাবে তবু। ভানুকে বিয়ে করবে সুবল? খুব ভাল হবে তা হলে, কিন্তু খুব গেড়ে বসেছে রোগটা—দুটো লাঙ্গস হয় তো—সুবল ভালবেসে মন দিয়ে চিকিৎসা করবে। কিন্তু ধন্বন্তরি নয় তো। মজুমদার ধন্বন্তরি নয়, অর্চিতার টান আছ নিশীথদের জন্যে। কী অপরাধ হত জলপাইহাটিতে ছোট আশা, সাদামাটা কাজ, খাঁটি শান্তি, বৃহৎ মমতার ভিতরে পড়ে থেকে এক দিন পৃথিবী থেকে অনুর মত বেণুর মত একটুখানি নাম মুছে ফেলে সময়ের নিরবচ্ছিন্ন গতি-অগতিসাগরের অচেতনায় হারিয়ে গেলে?

আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, বিছানার কাছেই দেয়ালে সুইচ, ডান হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ নিবিয়ে ফ্যানের সুইচ চালিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল নিশীথ। পৌনে বারটা বেজেছে।

দেড়টার সময়ে নমিতার মোটর আসে থামল। মোটর, গ্যারেজে ঢুকিয়ে কলিংবেল টিপতেই, হানিফ বেরিয়ে এল। গ্যারেজের দরজায় হানিফকে তালা মারতে বলে, নিচের তলায় সদর দরজা আটকে দিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে উপরে চলে গেল নমিতা। ঘুম পায়নি তার। নমিতার মার মাথার যন্ত্রণা সারিডন খেতে খেতেই কমে গেছে। বাবার অবস্থা একই রকম। একটু খারাপ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। নমিতার সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই খারাপ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছিল যেন সলিল মুখুজ্জে। রোজেনবুর্গ এসেছিল। নমিতার মা, মার চেয়ে নমিতার দিকে ঝোঁক বেশি ছিল তার, কথাবার্তা মিসেস দাশগুপ্তের সঙ্গেই বেশি হয়েছে; অনেক দূরের থেকে নমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছে, চশমা লাগবে আপনার, তবে চশমা না নিলেও হয়, একটা ওষুধ দিচ্ছি আপনাকে। প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে বলেছে, এই ওষুধটা খাবেন রোজ। এক মাস খেলেই চোখ ঠিক হয়ে যাবে। নমিতার কাছে এগিয়ে এসে তাকে বিছানার উপর চিত

করে শুইয়ে দিয়ে স্টেথিস্কোপ বাগিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করে, খুব গম্ভীর মুখে ভাল করে সব দেখে নিয়েছে ডাক্তার; নমিতার মাই দুটোর কাছে বুকের খালিটুকুর থেকে শুরু করে নাভি তলপেট অব্দি সব টিপে ঠেসে ঠুকে দেখেছে রোজেনবুর্গ; এমন সুড়সুড়ি লেগেছে নমিতার, কেমন কাতুকুতু বোধ করেছে সে,.... হিহিহি গ্লিব গ্লিব, গ্লিবল ক্লবল ক্লিব ক্লিব, বু বু বু.... হেসেছে সে, হেসেছে ডাক্তার। বলেছে, আছে মোটের উপর মন্দ নয়, তবে লিভারের দোষ আছে, কিডনিটাও খুব ঝরঝরে নয়। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে-দিয়েছে। তিন মাস সে ওষুধ খেতে হবে; তা হলে আর কোনো গলদ থাকবে না। ব্রাগুেনবুর্গের হের ব্রকমানের সাদা ঘুড়ির মত হাওয়া-ঝড় পিটিয়ে ছুটে বেড়াতে পারবে নমিতা। ব্রাগুেনবুর্গেব হের ব্রকমানের ঘুড়ির কথাটা অবশ্য নিতান্তই ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার, ডাক্তারেব জার্মানি বাসকালের জীবনের। কী সে ব্যাপারটা রোজেনবুর্গকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে নমিতা, মাথায় নানা রকম তাগিদ ছিল তার। রোজেনবুর্গ ওষুধের খুব ভক্ত নয়, বাব বার বলেছে নমিতাকে, ওষুধ বেশি কিছু ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছে, একেবারেই কোনো ওষুধ দিত না, জল বাতাস-রোদ প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিত। তবে মুশকিল, কলকাতা সমুদ্রের পারে নয়, চমৎকাব খোলা সৈকত নেই এখানে; নিসর্গের নিজেব ঝর্ণাও নেই, কলকাতাব জলবাতাস ভিজে বিশ্রী বিষাক্ত, এখানেও ও-রকম চিকিৎসা চালানো কঠিন; এখানে ন্যুডিস্টদেব মত খোলা খালি শরীব নিয়ে, বোদে নদীতে হাওয়ার ভিতর ফিরে বেড়ানোর তেমন কোনো মানে হয না। তা যদি হত, নমিতাকে তা হলে প্রকৃতিব সব পবিত্র উপাদানগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঘুবে বেড়াতে বলত বোজেনবুর্গ। কথাটা বেশ মনে ধবেছিল নমিতার। কলকাতা যদি নীল সমুদ্রের পারে রৌদ্রালোকিত প্রদেশ হত, ঝাউ শাল পিয়াল পিয়াশাল সিসু পাইন পপলারের বন উপবন থাকত যদি সে সমুদ্রের এপাশে-ওপাশে, এ বলয়ে কাছে-দূবে, বলযপরাৎপরে, তা হলে সে গাছের বীথির ভিতরে, রোদে, ছাযাগুচ্ছেব দেশে, খোলা সৈকতেব অফুরন্ত সূর্যে—কোথায কে আছে, না-আছে উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়াত—সুস্থ সম্পূর্ণাঙ্গ মেয়েশবীব নিয়ে—সমস্ত জামাকাপড়ের আববণেব ভিতর থেকে নিজেকে খুলে ফেলে।

রোজেনবুর্গ এ-রকম একটা আশ্চর্য উজ্জ্বল আকৃতি ফলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তাব বক্তেব ভিতর; বাত সাড়ে দশটার সময চলে গেল ডাক্তাব। তারপর জুলফিকারদের ওখানে গিয়েছিল সে। একটাব সময পাট শেষ করে মোটর নিয়ে একা-একা একটু ঘুবপথে ফিরেছে।

বাড়িতে ফিরবাব ইচ্ছা ছিল কি তার? সংকল্প; স্বপ্ন, প্রাণে নিয়ে গিয়েছিল কি সে পার্কসার্কাসেব ফ্ল্যাটে রাত কাটাবার? মাথা ধরেছে, ঘুম আসবার কথা নয়, যদি না ঘুমের ওষুধটা খাওয়া যায। ঘুম নেই শরীরে, নিজের ঘবের ভিতর ঢুকে, জুতো খুলে, ফ্যান চালিযে দিযে বিছানাব উপব লাফ দিযে পড়ে দু-তিনটে বালিশ আঁকড়ে চেপে ধরে, ছিটকে ফেলে, খানিকটা গড়াগড়ি খেযে নিল, তারপব নিঃসাড়ভাবে মিনিট পনের বিছানায় পড়ে থেকে কী ভাবল সে, কী কবল, তা অন্ধকাব জানে, আস্তে-আস্তে স্থিরতা এল মনে, শরীরটা ঠাণ্ডা লাগল, জামা-কাপড় সব খুলে ফেলে একেবারে উদল শরীরে বাথরুমে চলে গেল সে—প্রায আধ ঘন্টা পরে জলেব ভিতব থেকে উঠে এল যেন জলদেবীব মত, একটা মস্ত বড় টার্কিশ তোযালে গলায জড়িয়ে, সম্পূর্ণ শূন্যাম্বর আকাশ- বাতাসের মত শরীবে। বাথরুম থেকে ফিবতে-ফিবতে সেই অবস্থাযই, বড় তোযালে জড়িয়ে নিশীথেব ঘবে ঢুকে নিজে দেখতে গেল লোকটা এ ঘরে আছে কি না, ঘুমিযেছে কি না, ঘর অন্ধকাব, ফ্যান চলছে; নিশীথ ঘুমিযে আছে। নমিতা কুঁজোব থেকে এক গেলাস জল ঢেলে বরফকুচি মিশিযে খেয়ে নিল; মাথায, নাকে, চোখে, ঘাড়ে, পিঠে ঘষে নিতে লাগল রফেব কুচিগুলো, তাকাল নিশীথের দিকে একবার-দুবার; পাশ ফিরে শুযে আছে নমিতাবই মুখোমুখি। চোখ মেললেই ভূত দেখে বোবা বনে যাবে হয তো এই নিরেট মানুষের দেশেব লোকটা কিন্তু চোখ মেলবাব কথা নয—আইসক্রিমেব বোতলেব ছিপিব মত—লোহার চাবি দিয়ে চাড় না দিলে—এই ঘুমন্ত লোকেব। চাড় দেবে কী সে? কুঁজোর থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এন্তার বরফকুচি মিলিযে নিশীথেব মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে? হাসি পেল নমিতার। গঁ গঁ গঁ গঁ কবে উঠল যেন ঘুমেব ভিতরে নিশীথ। তোড়ে হাসি ছুটে এল নমিতার বুকে মুখে সমস্ত উদল শরীরের জলের ঝিরঝিরানির ভিতব; খিল খিল করে হেসে উঠল সে। নিশীথ কি চোখ মেলেছে? সে দিকে, কোনোদিকে, না-তাকিযে তেপযের উপব থেকে একটা সিগারেটের টিন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর থেকে বেব হয়ে গেল সে।

নিজের ঘরে ঢুকে টিনটা রেখে দিয়ে বড় একটা শুকনো, সাদা, চৌখুপি, পুরুষদের মত তোযালে বের করে সমস্ত শরীরটাকে ভাল করে বগড়ে মুছে নিল। একেবারে জলে জলসত্র হয়ে আছে। সমস্ত

শরীরটাই জল; বাথরুমের থেকে নাইতে-নাইতে জলের ভিতর থেকেই উঠে এসেছে সে। গা মোছা তো দূরের কথা, তোয়ালেটা অব্দি নিংড়ে নেয় নি। একেবারে ভিজিয়ে তিতিয়ে এসেছে নিশীথের ঘরটাকে নিশীথ যদি জেগে ওঠে—ভিজে ঘর-দোর, ভিজে বই-কাগজপত্র দেখে কোনো জলজিনী নারীর কথা ভাববে কি সে—ঢাকুরিয়া হ্রদ থেকে উঠে এসে রাতে হানা দিয়েছিল, নাকি ছাদ চুইয়ে বৃষ্টি পড়ছিল—জানালা দিয়ে জলদেয়াসিনী ঢুকেছিল ঘরের ভিতর বিশ পঁচিশটা জল পায়রা উড়িয়ে? এই সব মিলিয়ে যা হয়, নমিতা একাই সে জল, জলপায়রা, জলদেয়াসিনী, জলবৃষ্টি, হ্রদের জল। ঘষে রগড়ে ভাল করে নিজেকে মুছে নিয়ে পাউডার মেখে স্ল্যাক্স, লেডিস কোট পরে নিল নমিতা। চুল ব্রাশ করে নিল—আয়নার কাছে না দাঁড়িয়ে—ডান হাতে বাঁ হাতে আন্দাজে ব্রাশ চিরুনি চালিয়ে। ঠিকই হল, ঠিকই হল সব। কেমন হল দেখবার জন্য আয়নার কাছে দাঁড়াল না সে।

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে নিশীথের ঘরে ঢুকল সে, ঘড়িতে পৌনে তিনটে বেজেছে। ঢুকে দেখল নিশীথ ঘুমিয়ে আছে। বাতি জ্বালিয়ে পড়বে কি সে টমাস মানের জার্মান উপন্যাসটা? পড়লে ড্রয়িংরুমে গিয়ে পড়তে হয়, কিংবা হলে, অথবা তার নিজের ঘরে। এই ঘুমন্ত মানুষের উপর উপদ্রব করার কোনো অর্থ হয় না—এই শান্ত অন্ধকার ঘরটায় চড়া বাতি জ্বালিয়ে বই পড়ার অছিলায়। নিশীথবাবু জেগে উঠেছে মনে করে এই ঘরে নমিতা ঢুকেছিল। স্ল্যাক্স কোট সেই জন্যেই পরেছিল সে, নিশীথবাবু ঘুমিয়ে আছেন জানলে এ-সব জিনিস পরার দরকার হত না তার, আদুড় গায়ে নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ত সে। ঘুম আসবে না, কিছুতেই আসবে না আজ আর- কাজে- কাজেই ঘুমের ওষুধ—সব চেয়ে কড়া পিলটা খেয়ে...। কিন্তু জেগে ওঠে নি তো—ঘুমিয়ে আছে নিশীথ। নমিতার বাথরুম থেকে সোজা সুজি ও ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাবার সময় অনুভব করছিল, চোখ মেলেছে যেন মানুষটা। ঠিক সেই মুহূর্তে বাস্তবিকই যদি চোখ মেলে ফেলত নিশীথ তা হলে এখন এমন ঘোরে ঘুমুতে পারত না কিছুতেই। ঘুমুচ্ছে নিশীথ, মনের থেকে সব ময়লা কেটে গেছে যেন, এমনই নির্দোষভাবে। এ রকম পারত না কিছুতেই।

ও, নিশীথ জাগে নি, দেখে নি কিছু তবে। সিগারেটে তিনটে টান দিয়ে নমিতা ভাবছিল, ভেবেছিলুম নিশীথ দেখে ফেলেছে, কেমন একটা অভিমান শুরু হয়েছে, নাকি শেষ হয়েছে, মনে ভেবে বুকটা কেমন দুর-দুর করে উঠে ছিল ওর ঘরের থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল সে যখন। গা মুছতে- মুছতে, পাউডার ছিটিয়ে, জামা-কাপড় পরবার, চুল আঁচড়াবার সময় কেমন মজার একটা নেশা, ব্যথায় টুকুর-টুকুর করছিল যেন বুকের ভিতর, একটা জিনিস শুরু না-হতেই শেষ হয়ে ভালই হয়েছে বলে—নাকি কিছু ক্ষণ পরে শুরু হবে বলে?

বুঝে উঠতে পারছিল না যেন নমিতা। আস্তে-আস্তে খুব মৃদু প্রাণনায় সিগারেট টানতে লাগল। কোনো হেতু ছিল না। চানের ঘর থেকে সটান নিশীথের ঘরে ঢুকেছিল এমনিই সরল সবেস প্রাণের নির্লক্ষ্যে। নিশীথ জেগে আছে কি না -জেগে আছে—জেগে থাকলে ও-অবস্থায় তার ঘরে ঢোকা উচিত নয়, ঘুমিয়ে থাকলে ঢুকলেও ঢোকা যেতে পারে; এ সব কথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না তার, এমনই বেগে ও আবেগের ঘন আগুন ছুটে এসেছিল প্রাণের ভিতর নির্দোষ প্রকৃতির থেকে। কিন্তু তার পর থেকেই মনে কেমন একটু দোষ এসে ঢুকেছে যেন। সেই জন্যেই সতর্ক হয়ে পড়েছে সে। বেশ সাবধানে সাধুতায় সতর্কতায় উইমেনজ অকসিলিয়ারি কোরের মিলিটারি পোশাক পরে এসেছে সে। যুদ্ধের সময় ওয়াকেতে কাজ করত সে, সেই থেকে এ-রকম পোশাক পরার রেওয়াজটা রয়ে গেছে, আজকালও অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নেয় এই পোশাক।

সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছে নিশীথ। মনের মধ্যে নমিতার আফিমের গুলির মত একটা খুঁত এসে ঢুকেছে যেন, অনেক রাত-অব্দি-জাগা ডাক্তারের নির্গলিত নগ্নকান্তিবাদের লেকচার শোনা, পার্ক-সার্কাসের পেঁজপোলাও মাংস মদ খাওয়ার উত্তেজনায় প্রশ্রয় পেয়ে। এ ছাড়াও প্রশ্রয় পেয়েছে মন, এমনিই কোনো একটা সময়ে কোনো একটা জিনিস পেতে ভাল লাগে মনের। মনই যদি এ-কথা বলে, শরীর খোঁচা না-পেয়েও যদি শারীরিক হয়ে উঠতে চায়—যেমন আজ সন্ধ্যার সময় ড্রয়িংরুমে বসে বই পড়তে-পড়তে হয়ে উঠেছিল প্রায়, তা হলে—কঠিন। নমিতা আর-একটা সিগরাটে জ্বালিয়ে নিল। নিশীথ ঘুমুচ্ছে নাক না-ডাকিয়ে বেশ নিবিড়- ভাবে, বাইরে রাত দুটো-আড়াইটে অব্দি দুর্দান্ত বাতাস খেলে গেছে আজ ঘরের ভিতরটাকেও কাঁপিয়ে, নাচিয়ে, তৃপ্ত, স্নিগ্ধ করে গেছে। কিছুক্ষণ হল বাতাস থেকে গেছে বাইরে-ভিতরে, একটা গাছের পাতাও নড়ছে না, গরমের হল্কা ঠিকরে পড়ছে যেন সাদা

মেঘগুলোর ভিতর থেকে। অন্দরে ভীষণ গরম—যে ঘরের ফ্যান নেই। এ ঘরটাকে বড় জোরালো ফ্যানটা ঠাণ্ডা করে রেখেছে। ঘুমিয়ে আরাম পাচ্ছে তাই ঘুমানো মানুষ। কাল ভোরের আগে নিশীথ জেগে উঠবে বলে মনে হয় না। টমাস মানের জার্মান বই নিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে ভাবছিল নমিতা। মাঝে-মাঝে দোষ ঢুকে পড়ে তার মনে, শরীরটাকে মুখিয়ে রাখে—মাঝে-মাঝে আত্মদানও করে বটে সে—আবার নির্দোষভাবেও নিজেকে অর্পণ করে, ঝর্ণার জলকণিকারা যেমন পরস্পরকে করে—প্রকৃতির কোনো এক বৃহৎ আদিম নাদের ভিতব জেগে ওঠে, পটভূমিব নিঃশব্দতাকে প্রাণবীজ দান কবে নাদেব নীল নির্দোষ আনন্ত্যে পৌছবার জন্যে। নিশীথকে ডেকে জাগানো যায় অবশ্য কিংবা ঠেলে; কিংবা ফ্যানটা বন্ধ করে দিলে গরমে ভেপসে উঠে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই না-জেগে পাববে কি সে এই দারুণ গুমোটের রাতে? তা হলে মানের বই দুটোব তুলে নিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করেই চলে যাওয়া যাক—তাব পরে নিজের ঘরে গিয়ে ফ্যান, খুলে, পোশাক ছেড়ে, শুয়ে পড়বে সে। ঘুমিয়ে পড়লে, ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম না-পেলে নমিতা এ দিকে আবার খোঁজ নিতে আসবে—ঘুমের ওষুধ খাওয়ার মর্জিটাও যদি মবে যায়।

বই দুটো হাতে তুলে নিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করে দিল সে। এইবারে ঘব থেকে স্রেফ বেরিয়ে পড়বে, কেমন তামাসা বোধ হল, ঘবের আবছা আলোর ভিতবে আস্তে, ধীবে-সুস্থে, হাঁটতে গিয়েও কেমন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল হঠাৎ, তেপয়-বই-টিন-গেলাস নিয়ে একেবারে মেঝের উপর। বালিশেব থেকে মাথা তুলে ঘাড়টা ফিরিয়ে আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে দেখল নিশীথ, নমিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

'কে?'

'আমি।'

'আমি! আমি মানে?'—ধোঁযাটে চোখে বললে নিশীথ।

'ওঃ এই যে।' ভাল কবে নমিতার দিকে তাকিয়ে দেখল নিশীথ, আবাব তাকাল। আর-একবার তাকিয়ে দেখার দরকার অনুভব করে, নির্মল দৃষ্টি- শক্তিই যেন ফিরে পেল, উঠে বসল সে—'ভোব হয়ে গেছে?'

'এই হচ্ছে।'

'কিসেব যেন একটা শব্দ হল। আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, মনে হল, ধ্বসে ভেঙে গেল কী যেন সব।'

'না'—নমিতা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আওয়াজটা স্বপ্নে নয়, এমনিই হয়েছে। দুটো তেপযই হড়মুড় করে পড়ে গেছে ধাক্কা খেয়ে—'

'বইটই-গেলাস-টিন সব ছিটকে পড়েছে দেখছি'।

দু জনে মিলে কুড়িয়ে গুছিয়ে ঠিক কবে নিচ্ছিল সব। ঘরেব ভিতর জল ছড়িয়ে আছে চারদিকে। নমিতা হয় তো নিশীথকে জিজ্ঞেস করবে, কেন-এই জল—ভেবে নিয়ে নিশীথ জলেব সম্বন্ধে কিছু বলতে গেল না নমিতাকে। কোনো কুঁজো ভাঙে নি, বোতল ফাটে নি, কেমন কবে সমস্ত ঘবটাকে নিশীথ তবুও জলময় করে রেখেছে বুঝে উঠতে পাবছিলনা নিশীথ। তেপয দুটো দাঁড় কবিয়ে বইটই গুছিয়ে ঠিক করে নমিতা একটা সোফায গিয়ে বসল-নিশীথ আব-একটায।

'ফ্যান না খুলেই ঘুমোচ্ছিলেন নিশীথবাবু?'

নিশ্চল পাখাটার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে—'হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, মানের নভেলটা নাড়াচাড়া করতে-করতে।'

ফ্যানটা খুলে দিল সে।

'জার্মান জানেন আপনি?'

'না।'

'তা হল পড়ছিলেন?'

'দেখছিলুম। এ-সব জার্মান-ফারসি বই পড়েন আপনি?'

'হ্যাঁ, পড়ার জন্যে এনেছি।'

'খুব ভাল রপ্ত হয়েছে জার্মান হয তো?'

'না। ফরাসিটা হয়েছে খানিক। দেখলুম বোজেনবুর্গও ভালো জার্মান জানেন না।'

'তিনি তো জার্মান?'

'জার্মান ইহুদি।'

'কী করে আপনি শিখেছেন তা হলে জার্মান? নিজে-নিজে?'

সূচীপত্রে যান

'না রে বাবা!'—নমিতা একটু উত্তেজিত হয়ে হেসে বললে, 'স্কুল কলেজের পোড়োদের মত উবু হয়ে বসে কোনো কিছু শেখাটেখার সাধ্যি নেই আমার। মাস্টাব দেখলেও ভয় করে। আমি ভাষা শিখি মানুষেব সঙ্গে কথা বলতে-বলতে।'

'কোথায় জার্মান পাবেন কলকাতায় আজাকাল?'

'সেজন্যে একটু মুশকিল হচ্ছে।'

'কোথায় পেলেন খাঁটি ফবাসি, কলকাতায়?'

'দু জন ফরাসি মেমসাহেব পেয়েছিলুম পার্ক স্ট্রিটেব দিকে। তাঁবা এখনো আছেন কিনা জানি না। তবে শিখে নিয়েছি, বইটই পড়তে পারি। কিন্তু ফ্রান্সে-প্যাবিসে না গেলে, লোকজনের সঙ্গে কথা না বললে এ ভাষায—'

'চেকনাই থাকে না?'

'চেকনাইযেব ভাষা কি ফরাসি?'

'চিপটেন কাটাব ভাষা তো।'

'পড়েছেন ভিলোঁ আপনি?'

'না খুঁজেছিলুম বটে। পাই নি কোথাও। বদনাম আছে ভিলোঁব।'

'আমার কাছে আছে ভিলোঁ-'

'সে তো শাহি ফরাসিতে'

'কানে শুনে নেবেন সেই ফবাসি, বাৎলে দেব জ্যামিতিক ইংরেজিতে—'দীর্ঘছন্দ শবীরে একটু কুঁজো হয়ে হেসে বললে নমিতা।

নমিতা + ষ্ণিক = ন্যামিতিক? ভাবছিল নিশীথ।

'সাহিত্যটা জ্যামিতিক হয়ে যাবে না তো?'—নিশীথ বললে।

'কেন?'

'ইংরেজিটা ন্যামিতিক বলছেন?'

'টিন খসিয়ে সিগাবেট বাব কবে নিল একটা।'

জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'এটা তো চিপটেনেব ভাষা হল আপনাব। জিতেন কি আর সাহিত্যেব খোঁজ-খবব নেয়? সময কোথায তার? তা ছাড়া সুকুমাব বিদ্যেব পথ দিয়ে ও মানুষ হয়ে ওঠে নি। তবুও মনটা কুঁকড়ে যায নি ওব, বেশ সরস আছে। ভিলোঁ অবিশ্যি তর্জমা কবে শোনাই নি ওকে, তবে আনাতোল ফ্রাঁসেব কড়া ভিয়েনে মাঝে-মাঝে চড়িয়েছি।'

বলতে-বলতে নিশীথের দিকে বড়, ভবা চোখ মেলে তাকাল নমিতা। আনাতোল ফ্রাঁসের প্রায সব বই-ই পড়েছে নিশীথ। ফ্রাঁসেব কড়া ভিযেন এটা ওটা সেটা অনেক কিছুই তো হতে পারে। কিন্তু এ-গুলোর মধ্যে কোনটা সম্প্রতি লক্ষ্যস্থল নমিতাব, উপলব্ধি কবে নিশীথ টিনের দিকে হাত বাড়িযে সিগাবেট বাব কববাব, জ্বালিয়ে নেবার কাজে একটু নিমগ্ন হয়ে থাকতে চাইল।

কোনো ঘড়িব দিকে না তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'আরো বেশি অন্ধকার হয়ে পড়ছে যেন। বাইবে কি মেঘ?'

জানলার ভিতর দিযে তাকিয়ে নমিতা বললে, 'মেঘ নেই।'

'নেই?'

'সাদা মেঘ আছে। ওতে কি অন্ধকার হয?'

'না। কেমন গুমোট। বাইরে মেঘ নেই, ঝড়ের লক্ষণ নেই?'

'নেই তো। গুমোট কেন? ফ্যান চলছে তো!'

'বলছিলেন না ভোর হচ্ছে, কটা বেজেছে?'

'চারটে বাজতে দশ মিনিট। ঘড়িটা তো আপনার মুখোমুখি দেযালে।'

'একটার সময ঘর আলো হয়েছিল, চারটের সময অন্ধকাব হল কী করে?' জ্বালি-জ্বালি কবে সিগারেট না-জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

'চাঁদ ডুবে গেছে বলে অন্ধকার।'

'এত তাড়াতাড়ি ডুবে গেল?' নিশীথ জ্বালিয়ে নিল সিগারেটটা।

'আজ তো ডুববার কথাই তাড়াতাড়ি। দ্বাদশী চতুর্দশীর চাঁদ নয় তো। বাতাস ছেড়েছে। অনেক

সূচীপত্রে যান

দূরে একটা কালো মেঘ। সপ্তমীর রাত।'

ঘাড় তুলে নমিতার ডব্লিউ-এ-সি-র পোশাকের উপর চোখ বুলিয়ে নিল নিশীথ। নমিতার চোখের উপর চোখ রেখে বললে, 'এই কি এলেন নাকি আপনি পার্কসার্কাস থেকে?'

'আমি দেড়টার সময় এসেছি।'

'দেড়টার সময়? তা হলে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি পাশের ঘরে? কিন্তু এই পোশাকে গরম লাগছিল না? জুতো পরে?'

'হ্যাঁ জুতো পরেই ঘুমোই আমি।' নমিতা বললে, 'মিলিটাবি ধড়াচূড়ো পরেই তো ঘুমোই আমি। না হলে ঘুম হয় না আমার।' নমিতা কুজোব থেকে জল গড়িয়ে নিল গেলাসে, ববফের এই মুঠো কুচি মিশিয়ে জলের ভরা গেলাসটা হাতে ধবে কৌচে এসে বসল।

'জল খাচ্ছেন?'

'খাবেন আপনি?'

নিশীথ সিগারেটে একটা লম্বা টান শেষ কবে কথা বলার আগেই নমিতা ববফ-জলের গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বললে—'এই নিন।'

'না না, ওটা আপনি খান—আমি নিচ্ছি।'

'আপনি নিন নিশীথবাবু-আমি ঢেলে নিচ্ছি।'

'আপ পিজিয়ে মেমসাহেব।'

'আপ পিজিয়ে সেন সাহাব।'

গেলাসটা হাতে তুলে নিশীথ এক চুমুকেই শেষ করে ফেলবে ভাবছিল, তেষ্টা পেয়েছিল তার। কিন্তু এক টানে গেলাস সাবাড় কবে দিলে আর-এক গেলাস ববফ-জল অবিলম্বেই হাজির হবে, তার পবে বরফ স্কোয়াশ;—শেষ রাতের আবছায়ায় হাওয়া, বরফ আর নীরবতার ভিতব অন্তরঙ্গতার এই খেলা মন্দ নয়! কিন্তু খেলা ছাড়া আর-কিছু নয়, দু দিনেব জন্যেও বটে' জিতেন এলেই কেটে যাবে; জুলফিকাবদেব মতন আরো অনেকে মাঝখানে এসে পড়লেই মোড় ঘুরে যাবে, উবে যাবে সব। নিশীথকেও এমনিই শিগগিবই তো চলে যেতে হবে একদিন জিতেনেব বাসা ছেড়ে দিযে। নমিতাব হাতেব খোবানি তার প্রাপ্য নয়, তার ঠিক জায়গা হচ্ছে জলপাইহাটির করমচা বনের ভাঙা সিঁড়ির উপব পা ছড়িয়ে বসে অর্চিতাব কিংবা বারুণীদেবীব (কোথায় গেছে সে আজকাল?) কথা শোনা তেপান্তবমুখো হয়ে। নিশীথ আলতো চুমুক দিযে বসিয়ে-বসিয়ে খাওযাব ভান কবে খাচ্ছিল ববফজল, যেন যখন কাল মেঘ আসে এখখণ্ড, মরুভূমি তাকে জাপটে ধরতে চায না, ভদ্রতা বাঁচিয়ে আস্তে-আস্তে ঝিনুকে মেবে-মেরে খায। জিতেনের এ বাড়িতে কাল মেঘেব উদয হলেও নিশীথ যে মরুভূমি নয়—বরং চেবাপুঞ্জি, নমিতাকে সেটা বুঝিযে দিতে হবে ভরা গেলাসের ববফ ফোঁটা-ফোঁটা খেযে ফোঁটা-ফোঁটা গ্রহণ কবে নিশীথের জীবনেব এই আধো সত্য আধো মিথ্যে আশ্চর্য উত্তর-মেঘটাকে।

'কাল মেঘ করেছে?'

'হ্যাঁ। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। বেশি বড় নয।'

'ঝড় হবে মনে হচ্ছে?'

'খুব চেপে জল এলে ভাল হয। যা গুমোট।'

'ঝড় বিদ্যুৎ বেশি করে ঘনিযে এলে ভাল হয়; বৃষ্টি বেশি চাই না। অন্ধকার থাকবে, ঝড় থাকবে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব। বৃষ্টি কিছু-কিছু পড়ছে, সব সমযেই যেন আসছে-আসছে। কিন্তু বেহায়া বৃষ্টিব নাকানি-চোবানি নেই।'

'ঝমঝম করে খুব বৃষ্টি পড়ে অন্ধকার রাতে; ভাল লাগে না আপনাব?'

'লাগে, কিন্তু আজ নয, এখন নয, মনের অবস্থা এখন যে-রকম তাতে কেবলি অন্ধকার ভাল লাগে; মেঘের বাতাসের আর বিদ্যুতের জিত ভাল লাগে জলের উপর।'

'মানে ঝড় চাই?'

নিশীথ কোনো উত্তর দিল না।

'জল চাই না?'

'না।'

'ঝড়, অন্ধকার, বিদ্যুৎ চাই। যদি শিলাবৃষ্টি হয়? এখন চোত মাস তো।'

সূচীপত্রে যান

'কেমন হত সেই ঝড় তাহলে?'—কে যেন জিজ্ঞেস করল।

কেমন হত সেই অন্ধকার? অনেকদিন পরে জেগে উঠে তাব পর সূর্যেব মুখ? বাতাস নেই, মেঘ নেই, সমতল ভূমিতে অনেক পাহাড় এসে পড়েছে যেন চারি-দিকে—নিঃশব্দ অন্ধকারের। একটা আরশোলা সোঁ করে মাঝশূন্য দিয়ে উড়ে কোথায় দেয়ালেব আবছায়ায় ঠিকবে পড়ল। দেখল দু জনে। আরশোলাটা আবার উড়ে হাবিয়ে গেল অন্ধকারের ভিতর, কোথায়। চুপ কবে চুপ করে উত্তরোত্তর নিস্তব্ধতায় আঁকিবুকির শব্দহীন অসমতল ছড়ানো অনর্গল পাহাড়েব অন্ধকারেব ভিতর তাবা বসেছিল।

'ঝড় হচ্ছে না আজ বাতে। রাত কি ফুবিয়ে যাচ্ছে? কটা বেজেছে?'

'সোযা চারটে। সেই কাল মেঘটাকে দেখছি না তো এখন আব।'

'আকাশে মেঘ নেই তা হলে? আকাশে কি তাবা জ্বল জ্বল কবছে?'

'হ্যাঁ, সমস্ত আকাশটাকে কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে নিশীথবাবু। এক টুকবো মেঘ নেই কোনোদিকে, কেবলি আলো, কেবলি জ্যোতিষ্ক—'

'চলুন ছাদে উঠি গিযে, নক্ষত্র দেখব।'

'চলুন।'

'জিতেনের টেলিস্কোপ আছে?'

'নেই। জিতেনকে ছাদে নিযে গিযেছিলাম দু-তিনদিন বাতে। ডেক চেযাবে বসেছিলাম আমবা, ব্যবসা-টাকা কড়ি-ইনকাম ট্যাক্সের কথাই বললে জিতেন। আমি দু-একটা তাবা দেখাচ্ছিলাম তাকে, কিন্তু উৎসাহ দেখলাম না। আকাশে নক্ষত্রগুলো যে আছে সেটা সে জানে বটে, কিন্তু কখনো অনুভব কবেছে বলে মনে হয না।'

'জিতেন অনুভব কবেছে কিন্তু আপনাকে বলে নি।'

'কী কবে জানলেন আপনি?'—নমিতা উঁচু তালবীথিব কাঠকুড়োনিব মত চোখে নিশীথেব দিকে তাকিযে জিজ্ঞেস কবল।

নিশীথ কোনো উত্তব দিতে পাবল না। অন্ধকাবেব ভিতর জলেব মতন সহজ সত্য কোনো একটা জবাব হাতড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সে রকম স্বাভাবিক ও স্বীকার্য কোনো কিছু খুঁজে পাওযা গেল না।

'কী করে জানলেন আপনি?'

'আমি নিজে তো অনুভব কবি...বাতেব আকাশেব দিকে তাকিযে থাকতে-থাকতে।'

নমিতা জানলার ভিতর দিযে বাইবেব দিকে চোখ ফিরিযেছিল। বাইরে সমস্ত বাতাস নিঃশেষিত হযে গেছে। মেঘ নেই, অনেক তাবা আছে। ঘবেব ভিতবে খানিকটা বাতাস আলোড়িত কবে তুলবাব জন্যে মেশিন যথাশক্তি দানবীয কাজ কবে চলেছে তার।

'পৃথিবীব প্রথম মানুষ এক রকম ভাবে বুঝেছিল নক্ষত্রগুলোকে—শেষ মানুষেবা আব-এক বকম ভাবে বুঝবে। আকাশ-বাত্রি ও নক্ষত্রেবা বযেছে তবুও সকলকেই সব কিছু দেখবাব সুযোগ দিযে। আমবা দেখতে পাবি শুধু, তার চেযে খুব বেশি আব নয। কিন্তু যা দেখছি, হৃদয যা দেখাচ্ছে তাব চেযে আশ্চর্য কিছু নেই—এই অনুভব করি।'

'আপনি তো করেন নিশীথবাবু। বলছেন। কিন্তু কথা হচ্ছিল জুলফিকাবেব, জুলফিকাব কি অনুভব কবে?'

নিশীথ সোজা হযে বসতে-বসতে বললে, 'জুলফিকার নয তো জিতেনেব কথা হচ্ছিল।'

নমিতা ভুল শুধরে হেসে বললে, 'যাচ্চলে—জিতেনের কথাই তো হচ্ছিল।'

'পির সাহেব কি জিতেনেব মত?'

'পিব সাহেব?'—নমিতা নিশীথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিযে থেকে তাব পব বললে, 'না, তার নিজেরই মত। একদিন দেখনে তাকে, চলুন।'

'চলুন।'

'আচ্ছা, আমি ফোনে জুলফিকারের সঙ্গে দিন ঠিক কবে জানাব আপনাকে।'

—যেন জুলফিকারই পির সাহেব। খুব সেযানা নমিতা। ধবে ফেলেছে নিশীথের ইশারা। যেখানে সপ্তর্ষি তারাগুলো ঘুরে এসে স্থির হয়েছে, নিশীথ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, জানালার ভিতর দিয়ে সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে নমিতা। কিন্তু নিশীথ নিস্তব্ধ হয়ে আছে অনুভব করে পৃথিবীতে ফিরে এসে মাটির গন্ধে আসক্ত মৃত্তিকার নারীর মত ধুলোমাটির খোঁজে তাকাল।'

সূচীপত্রে যান

'ছাদে চলুন।'

'সিঁড়ি কোনদিকে? এর আগে যখন এ বাড়িতে এসেছি তখন ছাদে উঠবার কথা মনেই হয় নি কোনো দিন। জিতেনও বলে নি কিছু। ছাদ যে আছে খেয়ালই ছিল না আমাদের কারো।' নিশীথ বললে।

কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল নমিতা। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'সাড়ে চার। চলুন। আমি নিয়ে যাচ্ছি। চোখ বুজে চলুন।'—বললে নিশীথকে। কিন্তু নিশীথ বসেই রইল সোফাব উপর। ছাদে না গিয়েও এ ঘবেও এই মুহূর্তে মন যে-সব অন্তিম জিনিস চাচ্ছে, শবীরকেও সুপাত্র হিসেবে আহ্বান করে মনের সে সব দাবি মেটানো কেন যেন এখন আর দুঃসাধ্য বলে মনে হচ্ছে না নিশীথের। কথা অনেক বলা হয়েছে; কথা বলতে চাইবে না নারী আর, চাইবে না পুরুষ আর, একটু নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে চাইবে মানুষের যা প্রাপ্য নয় সেই নিঃসময়ের ভিতব, মানুষেব যা প্রাপ্য সেই খন্ড সময়কে অনুনয় করে সবে যেতে বলে। জানে তো নমিতা। নিশীথ যে জানে তাও জানে। কিন্তু তাও কথাই বলবে নিশীথ, নমিতাকে দিয়ে কথাই বলাবে, ছাদে যাবে-না, কিছু কববে না।

জল খাবে বলে উঠে দাঁড়াল নিশীথ।

'দিচ্ছি।'—নমিতা বললে।

যে গেলাসে এইমাত্র নিজে জল খেয়েছিল, না-ধুয়ে সেই গেলাসেই জল বরফ ভর্তি করে নিশীথকে দিল নমিতা। পৃথবীব কোনো দেবতা-দেবীবও এঁটো জল খায় না নিশীথ। কিন্তু আজ এই বাতে, এখন, সে-পৃথিবী ফুরিয়ে গেছে যেন। নমিতার হাতেব থেকে বরফেব গেলাসটা তুলে নিয়ে সোফায ফিরে গেল।

'আপনি তো খুব বসে, জিবিয়ে খাচ্ছেন। ছাদে যেতে দেরি কবে ফেলছেন নিশীথবাবু।'

'স্কোযাশ দিয়েছেন দেখছি। কখন খুললেন বোতল? টেব তো পাই নি।' নিশীথ বললে।

'পান নি?—নমিতা নিজের জন্যে এক গেলাস ভবে আনতে-আনতে বললে, কিন্তু তবুও খুলেছি তো। এবারে টেব পাচ্ছেন?'

নমিতা সোফায ফিবে এসে বরফ মেশানো ক্রাশড় রসেব গেলাসটায একটা চুমুক দিযে বললে, 'আমিও তা হলে তাড়াহুড়ো কবে খাব না। ছাদে উঠবার সিঁড়িটা দেখেন নি বুঝি কোনো দিন? স্পাইবাল সিড়ি।'

স্পাইবাল? নিশীথের মনে পড়ে গেল এইবার, 'ওঃ'!

'চড়েন নি? সিঁড়িটা বাইবেব দিকে, দালানটার পশ্চিমদিকেব দেযাল ঘেঁসে, সদব দরজা দিযে ঢুকবাব সময বড় একটা নজর পড়ে না। গাছপালার আড়ালে থেকে যায—'

'হ্যাঁ। ও-দিক দিযে দিন-বাত চাকব-বাকর ঝাড়ুদাব জমাদাবদেব তো চলাফেবা করতে দেখতাম—'

'নিশীথ স্কোযাশের গেলাসেব বরফ নাড়ল খানিকক্ষণ গেলাসটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে।

'ওদেরই তো সিঁড়ি ওটা।'

'ছাদে ওঠে গিয়ে?'

'উঠলে উঠবে। কোথায যাই আমি আর জিতেন ছাদে? যাক না ওবা ছাদে—জমাদাব, বফিক, হানিফ।'

নিশীথ সায দিযে বললে, 'তা নিশ্চযই যাবে। কিন্তু গিয়ে বিশেষ ভাল লাগবে না ওদের।'

'কেন?'

'সমাজ-সংসারে ভিত্তি নেই, ছাদে দাঁড়িয়ে কী সুখ পাবে আব? কত ক্ষণ পাবে? ওদেব সাংসাবিক গাঁথুনিটাকে শক্ত করে দেওয়া দরকার। জিতেনবা তাই করছে।'

নিশীথের ভাল মানুষি শ্লেষটা ভাল মনে গ্রহণ করে নমিতা বললে, 'একটা কিছু করা দরকার আমাদের। সমাজের নীচের দিকে যারা আছে, দিন রাত বেশি টাকার, বেশি সুখের খাঁই মিটিয়ে তাদেব আমরা গণ্যই করছি না। মাড়িয়ে, গালিয়ে, থেৎলে ছুটেছি, এই অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে নানা রকম পলিটিক্যাল কর্মীদের।'

নিশীথ চুপ করেছিল। নমিতা তার মুখের দিতে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করছে দেখে গেলাসের বরফগুলোকে একটা নাড়া খাইয়ে দিয়ে বললে, 'ঠিক তো বলে কর্মীরা। তাদের অভিযোগ আমার মত নিম্ন মধ্যশ্রেণীব লোকের বিরুদ্ধেও। ঠিকই বলে তারা।'

'বলে আমরা ক্যাপিটালিস্ট।'

'আপনারা তো ক্যাপিটালিস্ট।'

'আপনিও তো।'

'নিশীথ গেলাসের বরফ গলানির দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, আমি ক্যাপিটালিস্ট কী করে বলি নিজেকে? জিতেন হতে পেরেছে। জীবনের যুদ্ধে কী করব, না করব, কিছু ঠিক না করতে পেরে গা ভাসিয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আজ ক্যাপিটালিস্টের বন্ধু। অবিশ্যি জিতেনের ক্যাপিটালিজমের খোচা আমাকে দিতে আসে না সে। আমিও তার সঙ্গে বেশি মিশে-মিশে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আজ পর্যন্ত জিতেনের সঙ্গে মিলে-মিশে চলেছি।'

'তা হলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কী করে হল? ও, আমার সঙ্গে হল বুঝি? অনিচ্ছায়?

নিশীথ হেসে ফেলল, কোনো কথা বললে না। এ-রকম সহজ কথার কী উত্তর দেবে সে? কোনো রকম জলের মতন সোজা উত্তর খুজে পাচ্ছিল না; নেইও বুঝি সে রকম জিনিস কোথাও? নমিতা কেমন চিন্তিত দেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। হাতে গেলাসটা ধরে; বেশি বরফের ঠাণ্ডার গেলাসটা।

'ছাদে যাওয়া হল না।'

'না। নমিতা বললে।

'চলুন যাই'—নিশীথ বললে।

'না, পাঁচটা বাজে'—ঘড়ির তাকিয়ে বললে নমিতা

'কী হবে পাচটা বেজেছে বলে?'

'লোকজন উঠে পড়েছে।'

'আমরা ছাদে বেড়াব। ওরা দেখবে। দেখুক। কী হবে দেখলে?'

'না, সে জন্যে নয়। রাত দেড়টা-দুটো-আড়াইটের সময় ছাদে যেতে হয়; সব জিনিসের একটা সময় আছে; নক্ষত্র দেখবার, ঘুমিয়ে থাকবার, ছাদে ঘুমিয়ে থাকবার।' নিজের হাতের গেলাসের ফলের রস এক চুমুকে শেষ করে তেপায়ের উপর রেখে দিল নমিতা। কী একটা ফিকে কথা বলে ফেলেছে নমিতাকে, কোনো স্বাভাবিক সার্থক কথা ভাবতে-ভাবতে কেমন অস্বস্তিবোধ করেছিল নিশীথ।

আলো এসে পড়ছে। চারদিকে লোকজন জেগে উঠেছে। হানিফ এসে পড়ল। কাজেই রাতটাকে সার্থক করে তোলবার শেষ চেষ্টায় মনটা আলোড়িত হয়ে উঠলেও মাঝ পথেই অর্ধসমাপ্ত হয়ে রইল সব।

'কী চাই হানিফ?'

'জুলফিকার সাহেব আপনাকে যেতে বলেছেন।

'কোথায়?'

'তার বাড়িতে—পার্কসার্কাসের ফ্ল্যাটে।'

আজ? কখন?'

'আজ ছোট হাজরি খেয়ে যাবার সময়ে হবে আপনার?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নমিতা বলবে, 'কাকে দিয়ে খবর পাঠালে জুলফিকার?'

'তিনি নিজে এসেছিলেন।'

'এ বাড়িতে? কখন?'

'ভোর পাঁচটার সময়ে।'

'তারপর?'

'উপরে চলে এলেন আমার সঙ্গে।

'উপরে এসেছিল?' কেমন যেন ঝোড়ো হাওয়ায় ফিঙের মত শূন্যে হঠাৎ ডাক পেড়ে উঠে বললে নমিতা।

নমিতার মুখের দিকে নিঃস্বার্থ চোখ ফিরিয়ে হানিফের দিকে একবার তাকিয়ে ঘর-বাইরের আলো-রোদের দিকে তাকাল নিশীথ।

'উপরে কোথায় এল পাঁচটার সময়, কী আমি তো টের পেলুম না হানিফ।

'ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসেছিলেন।'

'কেন?'

'কী উত্তর দেবে? একটু ধাঁধায় পড়ে ঢোক গিলে চুপ করে রইল হানিফ।'

সূচীপত্রে যান

'জুলফিকার কি জানে না যে দাশগুপ্ত সাহেব বাড়িতে নেই?'

'তা জানেন, জরুব।'

'তবে? আমি যে জেগে আছি তা বলো নি তাকে?'

'বলেছিলুম, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন সেইজন্যে চলে গেলেন।'

নমিতা ঝনঝনিয়ে উঠে বললে, 'আচ্ছা।'

নিশীথ আর-একটা সোফাব কাছেই বসে আছে।

কাতরে উঠে নমিতা বলরে, 'আচ্ছা'।

'আচ্ছা! আচ্ছা!-বলতে বলতে সিগাবেট বার কবে নিযে ঘরটার চারদিকে ঘুরে এল একবার নমিতা, কিছুক্ষণ পরে বললে, 'আচ্ছা যাও, তুমি হানিফ। আমি চা খেয়েই ফোন কবে দেব জুলফিকাব সাহেবকে।' চলে গেল হানিফ। 'কী হয়েছে জুলফিকারেব?'

'জানি না তো।'

'আজ খুব ভোবে আসবার কথা ছিল তাব?'

'আমাকে বলে নি তো'।

'দাশগুপ্ত সাহেব থাকলে এ ঘরে আসে না বুঝি জুলফিকাব? হাতের সিগারেটটা তেপযেব উপব গড়িযে, সবিযে বেখে, নমিতা তেবছা কান্নিক মেবে নিশীথেব দিকে একবার দ্রুত তাকিযে, সিগাবেটেব দুটো তিনটে থেকে ওযেস্ট মিনিস্টাবেরটা বেছে নিযে, সিগাবেট বাব কবে টিনটা সবিযে বাখল খোলা মুখে—ঢাকনি আটকাবার কোনো চেষ্টা না কবে।

'কেন আসে না এদিকে জুলফিকাব; দাশগুপ্ত সাহেব বাড়িতে থাকলে?'

'ও-সব কথার কোনো খেই পাবেন না নিশীথবাবু।'

'কোনো কথারই খেই নেই পৃথিবীতে, জানেন কি?'

কিন্তু, নমিতার মন অন্য কোথাও যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নিশীথেব কথাব দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। সিগারেটটা জ্বালিযে নিল নমিতা।

'জুলফিকাবকে চেনেন আপনি?'

'একজন মুসলমান অফিসার তো? পার্কসার্কাসে থাকে।' নিশীথ বললে।

'এই কি একজন মানুষেব পবিচয হল?'

নিশীথ নিজেব ভুল ধবতে পাবে, রুমালে সিকনি ঝেড়ে ঠাণ্ডা হযে বললে, 'মোটামুটি হল।'

'নামটা পেলাম, এখন মুখস্থ কবলেই হযে যায়। প্রায মানুষেব এইই বুঝি পবিচয নিশীথবাবু?'

নমিতাব দিকে তাকাল নিশীথ—স্নিগ্ধ শ্রদ্ধায; জ্ঞানেব কথা বলেছে নমিতা। 'দাশগুপ্ত সাহেব জুলফিকারকে পছন্দ কবেন না। কিন্তু দু-জনেব মধ্যে বড় সাহেব কে?'

'তিনি মনে কবেন জুলফিকাবেব সঙ্গে আমি বেশি মিশি?'

'কিন্তু দাশগুপ্ত তো বড় সাহেব?'

'এটা, জীবনের কথা নয—ব্যক্তিগত জীবনবেদেব কথা'—নিশীথেব মুখেব দিকে তাকাতে গিযে চোখ ফিরিযে নমিতা বলল।

'কী করেছে জুলফিকার?'

'কী করেছেন আপনি নিশীথবাবু?'

'আমি? কী কবেছি আমি?'

'ভাব করে ফেলছেন আমাব সঙ্গে। কী বলবেন আপনার স্ত্রী জানতে পারেন যদি। কী মনে করেছে হানিফ? কী ভেবে গেল জুলফিকার?'

কী মনে করত অর্চিতা এখানে থাকলে? নমিতাকে ভাল লাগে নিশীথের, তাই সে মিশেছে; জুলফিকাবেবও ভাল লাগে নমিতাকে, আরো বেশি মিশেছে তাই নমিতাব সঙ্গে।

'আপনার মা কেমন আছেন?'

'মাথার যন্ত্রণাটা কমে গেছে সারিডন খেযে। ঘুমুচ্ছিলেন, যখন আমি চলে আসি। রোজেনবুর্গ একটা ওষুধ দিযে গেছেন—যদি দরকার হয।'

'কেমন আছেন মুখার্জি সাহেব?'

'বাবার একটু খারাপ হচ্ছিল। সামলে নিয়েছেন। আমি যেতেই দেখলাম প্রায স্বাভাবিক অবস্থায

সূচীপত্রে যান

ফিরে এসেছেন।'

'মুশলিক এই বয়সে এ রকম করিৎকর্মা মানুষের এ রকমভাবে টিকে থাকা।'

'কী হবে, চারা নেই' নিজের দোষেই হয়। বাবার তো সিফিলিস হয়েছিল,' নমিতা বললে, আমার জন্মাবার আগে'।

চোখে-মুখে বিশেষ কোনো ভাব দেখা গেল না নিশীথের; কিছু হয়েছে বা হয় নি—তা নয়: যা আছে তাই যেন রয়েছে সব, সমস্ত প্রস্থানের ভিতরে। 'মারও হল তাই।'

'কেন, রক্ত পরীক্ষা করে ইনজেকশন নেন নি? মুখার্জি সাহবে তো এত বড় তালেবর লোক। কিন্তু এটা করেন নি কেন? করেন নি?' আস্তে-আস্তে বললে নিশীথ।

'না, ইনজেকশন নেন নি' তিনি মনে করেছিলেন কোনো রোগই তাঁকে খেতে পারে না, তিনিই রোগ খেয়ে ফেলেন। এক-একটা লোকের কেমন ম্যানিয়া থাকে নিশীথবাবু। শত বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও জীবনের ভিতরে কলি ঢোকবার ছ্যাঁদাটা ঠিক করে রেখে দেন তারা। কারু সাধ্যি নেই ছ্যাঁদা বোজাবে। মাও ইনজেকশন নেন নি।'

'কেন?'

'বাবা তো রোগ স্বীকার করতেন না। মাও ব্যাধিটা পেলেন, আরো চার-পাঁচ-জনকে তো দিয়েছেনই, আট-দশজনও হতে পারে।'

ভোরের আলোয় মনে হচ্ছিল যেন কোনো নির্মল মেয়েমানুষের মত আত্মস্থ হয়ে নচিকেতার মত, বৃষ্টির মত, পাখির মত, আওয়াজে কথা বলছে নমিতা। বাবা-মা কী করছে সবই জানে, সবই সকলকে বলতে কোনো দ্বিধা নেই তার, বোধ বিচারের এমনই একটা সত্য ও কল্যাণে যেন সে পৌঁছেছে।

'মা যাঁদের খেয়েছেন তাঁরা সেরে যান। রোজই সাপের কামড় খেয়ে বেজির ওষুধ খেতে হয় তাদের। তাঁরা ঠিক আছেন। কিন্তু আমার রক্তে তো জন্ম থেকেই বিষ। কোনো ওষুধ আছে কি না বলতে পারছি না। আমার বাবার জন্যে'—নমিতা বললে।

সিগারেটের টিনের লেবেলের উপরকার ক্ষুদে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে দূর থেকে পড়বার চেষ্টা করছিল নিশীথ; চোখের শক্তি পরীক্ষা করে দেখছিল।

'আপনার কথা বলেছিলেন আপনাকে বাবা?'

'কাকে?'

'ডাক্তারকে।'

'না, আমাকেও বলেন নি' আমি নিজে অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারি নি কিছু।'

'অনেক দিন?'

জিতেনের সঙ্গে বিয়ের দেড় বছর আগে বুঝেছি।'

'ও।'

'ইনজেকশন নিচ্ছি। বিয়ে তো ছ মাস আগে হয়েছে।'

'জিতেন জানে?'

'আমি বলি নি কোনোদিন,' নমিতা বললে, 'জিতেনকে বলবেন না যেন নিশীথবাবু।'

কী করে বলবে নিশীথ। এ সব ব্যাপারে নিজের স্ত্রীর চেয়ে কর্তা তো কেউ নেই। কেষ্ট নিজে যদি মারে কেউ রাখতে পারবে না। যদি রাখে কে মারবে তবে আর?

'ইনজেকশন দিয়ে সেরে গেছে রোগ?'

'না, সারে নি এখনো। ট্রিটমেন্ট চলছে। সময় লাগবে সারতে।'

'রোজেনবুর্গ দেখছেন?'

'না। বিনয় কাহালি।'

'সে কে?'

'খুব বড় স্পেশালিস্ট; আমাদের কাউকেই চেনেন না। জানেন না আমি কে। জিতেন দাশগুপ্তের নাম শোনেন নি কোনো দিন।'

'আশ্চর্য, দাশগুপ্তের নাম শোনে নি এমন বাঙালি ডাক্তারও আছে কলকাতা শহরে?'

'বিনয় কাহালি?'

সিগারেটের টিনের লেবেলের উপরে লেখা কিছুতেই পড়তে পারছিল না নিশীথ; চোখ খারাপ

হয়েছে; দেখানো দরকার; ছানি পড়তে আরম্ভ করল না তো?

'জিতেন তো ফাঁদে পড়তে পারে—না, জেনে?'

'কিন্তু অন্য কাউকে নাশ করবে না।'

নমিতা একটা সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুব টাইট করে এঁটে নিতে-নিতে বললে, 'জিতেন খুব ভাল ছেলে।'

'কিন্তু রোগ হলে ওর নিজের পরিণাম তো ভাল নয়।'

'সেদিকে আমার দৃষ্টি আছে নিশীথবাবু, জিতেনের নুন খাচ্ছি বলে রক্তও খাব?' টাইট ঢাকনির সিগারেটের টিনটা দু-একবার খুলবার চেষ্টা করে, খুলে ফেলে আবার টাইট করে এঁটে দিতে-দিতে বললে নমিতা, 'এ সব বিষয়ে সব কথা আপনাকে কী করে বলি বলুন?'

নমিতা সব কথাই তো নিশীথকে বলে ফেলেছে।

ইয়ুসুফকে বলেছে হয় তো, জুলফিকারকে আরো বেশি বলেছে? আরো বেশি কী কথা থাকতে পারে যা সত্যিই বলবার মত? নিশীথ সে সব অন্তিম আর্যসত্যগুলোকে ভেবে দেখছিল। নাঃ, কিছু নেই আর; বাবা-মার সিফিলিস। নিজেও দূষিত বলেছে-সে একজন পুরুষকে সবই তো বলেছে। হয় তো কথা বলা শুধু, হয় তো সত্য কথা বলা, কিন্তু সব থিতিয়ে শেষ পর্যন্ত অমৃত রয়েছে; নমিতার সুস্থ সফল সুন্দর শরীরের দিকে তাকিয়ে অনুভব করছিল নিশীথ। 'যাবেন আজ পার্কসার্কাসে?'

'যাব'।

'কখন?'

'খেয়ে-দেয়ে দুপুর বেলা। আপনি কি কম্যুনিস্ট নিশীথবাবু?'

'না তো। আমার ছেলে একটা নতুন সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ছে, আমি কোনো দিকেই ভিড়লুম না।'

'আমি তো ক্যাপিটালিস্ট—'

'দেখছি তো।'

'আমাদের কি উচ্ছেদ করে দেয়া হবে?'

'চেষ্টা চলছে। তবে শিগগির সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

'এ চেষ্টায় আপনি কোন দলে?'

'সকলের যাতে ভাল হয়, সবার উপর সুবিচার হয়; আমি, আমার সেপাই, আমার বাধাচক্রের জয় হল কি না অন্য সব কাপ্তেনদের উপর—সেদিকে লক্ষ্য না রেখে—এ রকম একটা শিব সুস্থ, প্রাণঘান পরিণতিতে আজকের কোনো বিপ্লবই আমাদের নিয়ে যাবে বলে মনে হয় না' বলতে-বলতে থেমে গিয়ে, খানিকক্ষণ থেমে থেকে নিশীথ বললে, 'তা হলেও যারা মনে করছে তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য সকলের ভাল, কল্যাণের পথ সত্যিই সুগম করে দেয়া সকলের জন্যে—আমার ঝোঁক তাদের দিকে।'

'অনেক ক্যাপিটালিস্টই তো আজকাল এই রকম কথা বলছে', নমিতা বললে।

'তা বলছে বটে। সে জন্য এ সব কথার মর্যাদা কমে যাচ্ছে। কথা চাচ্ছে না এখন আর মানুষ কোনো শ্রেণীর কোনো নেতার মুখ থেকে। সব কথা শোনা হয়ে গেছে। এখন নমুনা চাই'—নিশীথ বললে, 'যারা সত্যিই পৃথিবীর ভাল হবে মেনে নিয়ে ভেবেচিন্তে কাজ করে আমার ঝোঁক তাদের দিকে। কিন্তু পৃথিবী কোনোদিন শুদ্ধ হবে না আমি জানি। যে-কোনো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে গিয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎ মানবের ভাল করতে গিয়ে সমসাময়িক মানুষকে শেষ করে দিয়ে যায়। কিন্তু তবুও ভবিষ্যৎ মানুষের ভাল হয় না। তিন হাজার বছর ধরে এই তো চলছে। আরো তিন-চার হাজার বছর এই রকমই চলবে।'

'এই কি আপনার ধারণা?'

'এর চেয়ে শ্রেয় ধারণায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিন না, আপনাকে শিরোপা দেব।'

'এক-একজন বড় মানুষের মৃত্যু হলে ওরা লেখে, সভা সমিতিতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলে যে শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি আস্থা কোনদিনও হারিয়ে ফেলেন নি তিনি। মানুষ যে অমানুষ সেটা তিনি দিন-রাত্তির দেখেছেন চারিদিকে বটে, কিন্তু স্বীকার করতে চান নি। চারদিকে সব ভেঙে পড়ছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে মানুষের হাতে, সেটা দেখতে পেলেও তিনি জানতেন মানুষের হৃদয় ঠিক জায়গায়ই আছে, মানবতার প্রতি বিশ্বাস শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল তাঁর,' নমিতা বললে, 'কেন এ রকম বলে, লেখে, যে-কোনো বিশেষ কবিৎকর্মা বা চিন্তাশীল লোকের মৃত্যু হলে?' নিশীথকে জিজ্ঞেস করল নমিতা।

'এ ছাড়া কী আর বলবে? এ ছাড়া কী আর লিখবে?' বললে নিশীথ, 'পৃথিবীর উন্নতি হবে, মানুষের

ভাল হবে, মানুষ ভাল—এটা ক্যাপিটালিস্ট বা কম্যুনিস্টদেরই নিজেদের কথা নয়, সকলেরই, পৃথিবীর মানুষ সাধারণেরই, এই ধারণা।'

'ধারণাটা দুর্বার?' নমিতা হেসে বললে, 'তবেই হয়েছে,' তবে একটা কথা নিশীথকে বললে, 'মানুষ যদি সত্যিই ভাল না হয় তা হলে সে যে ভাল, তার পৃথিবীর যে ভাল হবে, এ ধারণা এমন গেড়ে বসে কী করে তার মনের ভিতর?'

'কই আমার তো বসে নি।'

'আপনার কথা আলাদা—'

'খুব ভাল হবে মানুষের; মনে হয় আপনার? আজ কংগ্রেস, কাল কম্যুনিস্ট, পরশু স্যোসালিস্টরা সত্যিই সিদ্ধির স্তরে পৌঁছিয়ে দেবে পৃথিবীটাকে?''

'হতে পারে। অসম্ভব কী? কংগ্রেস তো প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে।'

'কম্যুনিস্টরাও তো প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।'

'কম্যুনিস্টরা? কোথায়?'

'কেন, তাদের দেশে রাশিয়ায়। আরো অনেক দেশে। আমাদের দেশেও তো।'

নমিতা তা জানে বটে।

'জিজ্ঞেস করেছিলুম আপনি কম্যুনিস্ট কিনা না।'

'আমি কোনো কিছুই নই।'

'ঐ কথাই বলে কম্যুনিস্টরা; বলে ওরা কোনো দলেরই নয়।'

'কোনো কম্যুনিস্টরা তো বলে না?'

'আধা কম্যুনিস্টরা তো বলে?'

'কাকে বলে আধা কম্যুনিস্ট নমিতা দেবী?'

নমিতা একটা সিগারেট নিল।—'কাকে বলে আমি ঠিক বলতে পারছি না। আমি নিজেই হয় তো একজন। জুলফিকারও হয় তো। সে তো মার্কস পড়ছে—'

'বড় বইটা? দাস ক্যাপিটাল?'

'হ্যাঁ, মূল জার্মান থেকে, মাঝে-মাঝে আমি বুঝিয়ে দিই তাকে। ইংরেজি অনুবাদটা পড়তে চাচ্ছে না তাই।'

জুলফিকার হয় তো ভেবেছে কায়কারবাদের উক্তি তার নিজের ভাষায়ই পড়া ভাল। 'ঠিকই ভেবেছে'—নিশীথ বললে।

'বেশ লিখেছে তো মার্কস। ঠিক কথাই লিখেছে। আপনি পড়েছেন দাস ক্যাপিটাল?'—নিশীথের দিকে আন্তরিক অমায়িক ঘাড় ফিরিয়ে নমিতা বললে।

'এইবারে পড়ব ভাবছি—'

'আমার জার্মান বইটা জুলফিকারের কাছে আছে। মাঝে-মাঝে নিয়ে আসতে পারি। তর্জমা করে শোনাতে পারি আপনাকে। আলোচনা চলতে পারে। তারপর আপনাতে-আমাতে—জিতেন থাকলে সেও বলবে যা বলবার। ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষ থেকে কিছু আত্ম-সমর্থনের উপায় আছে হয় তো জিতেনের। নিজেদের রাবটা বেজে গেছে এ কথা সে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবে না।'

'কে, জিতেন?' সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে বললে নিশীথ।

'বড্ড ঘোড়েল লোক' নমিতা হাতের সিগারেটটা ঠোঁটে আটকে নিয়ে বললে।

'খুব পরিব্যাপ্তি আছে আপনার মনের নমিতা দেবী। প্রায় কোনো স্ত্রীলোককেই এ রকম দেখি নি আমি, আপনার মতন এ রকম—'

'আমার মতন?' নমিতা সাত-পাঁচ ভেবে নিশীথের দিকে তাকাল।

'জার্মান দাস ক্যাপিটাল আর ফরাসি ভিলোঁ, কী করে একই মানুষের মনে প্রায় সমান ঠাঁই করে নেয়, সেটা আন্দাজ করছিলুম। মার্কসের কারণ-সাগরে যারা ডুবে আছে, তাদের আমি খুব শ্রদ্ধা করি কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের ভিতর কেউ যদি ভিলোঁর মতন শয়তানের কবিতার রসগ্রহণ করবার দুঃসাহস দেখায়, তা হলে—'

'কী হয় তা হলে?'

'তা হলে সে লোকের মনের চারণভূমির প্রসার দেখে বাস্তবিকই খুব আশ্বাস পাওয়া যায়।'

সূচীপত্রে যান

নমিতা নিজের মনের এ দিককার শ্রী সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল না, এবারেও বিশেষ কোন সম্ভ্রমবোধ করল না সে নিজের চিত্তবৃত্তির জন্যে। মার্কসের চিন্তাকূট অনুসরণ করে নিদারুণ জার্মান বাক্যগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে লেগেছে মন্দ না। ভিলোঁর ফরাসি কবিতা ভাল লেগেছে; এ কোনো বৃহৎ মনের পরিচয় নয়, মহৎ মনের তো নয়ই; তবে মনের রসিকতা আছে তাব হয় তো, রসিকতায় উদারতা আছে বটে।

'ভিলোঁর কবিতার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।'

'ভিলোঁর ফরাসি আবৃত্তি করে পড়বেন, শুনতে চাই। পড়ে তারপর তর্জনা। কবে সম্ভব হবে?'

নমিতা মুখ থেকে সিগারেট নামিযে বললে, 'আজ, কাল, যে-কোনোদিন। যখনই সুবিধে হয আপনার।'

'যে কোনোদিন—যখনই সুবিধে—আচ্ছা তা হলে—বইটা জুলফিকাবেব কাছে আছে। আনিযে নিতে হবে।'

নিশীথ কী যেন বলতে যাচ্ছিল—না বলে কুঁড়েমি অনুভব কবে নমিতাব ডান পাযেব উপর চড়ানো বাঁ পাযের যুগল শোভার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

'ভিলোঁ ফরাসিতে আরো ভাল লাগবে আপনার।'—নমিতা বললে। বলে সে নিশীথেব চোখ অনুসবণ করে নিজের ডান পাযের উপর চড়ানো বাঁ পাযের অনড় আবদ্ধতার দিকে তাকিযে দেখল একবাব।

'কিন্তু আমার তর্জমায তেমন জুত লাগবে না আপনাব নিশীথবাবু।'

বাবুর্চি এই ঘবে বড়-বড় তেপয এনে সাজিযে ঠিক কবে গেল। চা, প্যাস্ট্রি, ডিম, জ্যাম, মার্মালেডেব শিশি একে-একে রেখে গেল সব। দুপুর বাতে বেশ সাধ মিটিযে ঘষে মেজে বগড়ে সাফ করেছে নমিতা। হাত-মুখ ধুতে গেল না আর। নিশীথ মুখধোবার বেসিন থেকে পাঁচ মিনিটেই কাজ সেরে ফিরে এল। পউরুটির কাঁচা স্লাইসে মাখন মার্মালেড মাখাচ্ছিল নমিতা। হযে গেছে। নিশীথকে ফিরে এসে কৌচে বসতে দেখে বড় ঘন নীল টিপট থেকে চা ঢালতে লাগল।

চা দিযেছে আজ। নমিতা বললে, 'খাবেন কফি?' নিশীথকে জিজেস কবল।

'না, বেশ চমৎকার চা।'

'বিকেলে কফি হলে ভাল হয?'

'বিলেকে কি থাকবেন আপনি এখানে?'

'না থাকলে বাবুর্চিকে বলে যাব।'

'পার্কসার্কাসে যাবেন?'

'হ্যাঁ, জুলফিকার বলে দিযেছে।'

'আমিও বেরিযে পড়ব হয তো বিকেলে।'

'জুলফিকার ইযুসুফের ভাই'—একটা প্যাস্ট্রিতে কামড় দিযে বললে নমিতা। 'পশ্চিমবাংলা সরকারের একটা কী পজিশন অকুপাই কবে আছে। দাঙ্গাব সমযে সোবাবর্দি সাহেবেব গভর্নমেন্টেব একটা কী-পজিশন ধরেছিল। লোক ভাল। আমাব বাবা-মাকে তো দাঙ্গাব সময়ে কেটেই ফেলত পার্কসার্কাসে, বাঁচিয়েছে ফুলফিকার ইযুসুফ—'

চা খাচ্ছিল নিশীথ, খানিক খেযেছে; চাযেব পেযালাটা তেপযেব উপব রেখে দিযে একটা প্যাস্ট্রি বেছে নিতে-নিতে বললে, 'আপনাকেও তো বাঁচিযেছে, ছিলেন না পার্কসার্কাস সেই সমযে?'

'ছিলুম।'

'কে ইযুসুফ? ইযুসুফ বাঁচাল বুঝি আপনাকে?'

'না। তার ভাই। জলুফিকার নিজের ঘবে হাওযা করে রেখে দিযেছিল আমাকে দশ বাত—'

'ক বছব ছিলেন ওদেব ফ্ল্যাটে বিযের আগে?'

'পার্কসার্কাসে? বছব তিনেক ছিলুম।'

নিশীথ বললে, 'কোথায় দেখল আপনাকে জিতেন?'

নিশীথ খাচ্ছে না কিছু, চা খাচ্ছে শুধু, প্যাস্ট্রি খাচ্ছে না, পাউরুটি স্যাণ্ডউইচ যা [illegible], ডিম পোচ একটা খেযেছে শুধু। নিশীথকে ডিম প্যাস্টি স্যাণ্ডউইচ খেতে বললে নমিতা। 'গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহামে জিতেনের সঙ্গে দেখা হযেছিল আমার।'

'একেবারে সিংহের নিজের গহ্বরে?'

'একটা ব্যবসা চালাচ্ছিলুম ইয়ুসুফ আর আমি।'

'কিসের ব্যবসা?'

'সেটা আপনাকে বলব না নিশীথবাবু।'

'মিটে গেছে বুঝি ব্যবসা?'

'মিটিয়ে—চুকিয়ে-বুকিয়েই দিয়েছি বলে জানে জিতেন।'

খানিকটা স্যাণ্ডউইচ কেটে, ডিম পোচের খানিকটা মিশিয়ে নিয়ে, মুখে তুলবার আগে বলে নিল নমিতা; খেতে-খেতে বললে, 'কিন্তু চলছে ব্যবসাটা। সেটা নিয়ে, নয়, অন্য দু-দশটা ফাঁক-ফিকির সম্পর্ক দাশগুপ্ত সাহেবের পরামর্শ নেবার জন্য কয়েক দিন তাঁর অফিসে গিয়েছিলুম আমি আর ইয়ুসুফ—আরো চা খাচ্ছেন নিশীথবাবু? ডিম, মাখন, জেলি, কেক কিছু খাচ্ছে না। ও-সব খোকাবা খায় বুঝি? দিন, আমি ঢেলে দিচ্ছি।'

'দিন।'

টি-পটটা স্বামিনী নিজেব হাত নিয়ে নিশীথেব পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে লাগল।

'কথা হচ্ছিল ক্যাপিটালিস্ট, কম্যুনিস্ট, সোশ্যালিস্টদের নিয়ে। কথা বলতে-বলতে খেই হারিয়ে ফেলেছি আমরা। কয়েকজন বড় ঘরের মেয়ে ইদানীং আমাব বাড়ি প্রায়ই আসছে।'

'কেন?'

'চেনাজানা ছিল না তাদের সঙ্গে' নাম শুনি নি কোনো দিন। দেখছি তাবা সকলেই বেশ ভাল-ভাল সমিতিব মেম্বাব, সেক্রেটারি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার। সমিতিগুলো সবই প্রায দেশসেবার ব্যাপাব নিয়ে; কিন্তু দেশসেবার চেয়েও মানুষেসেবার দিকে ঝোঁক তাদের ঢের বেশি। ঝাড়ুদাব-জমাদাব হানিফ, কৃষাণ, ট্রাম-বাস, ফ্যাক্টবিব মজদুব; এদের নিয়েই তাদের সমিতিসভাগুলো ঢের বেশি ব্যস্ত।'

'আপনিও মেম্বাব হয়েছেন বুঝি?' নিশীথ বললে।

টি-পট থেকে নিজেব পেয়ালায চা ঢেলে নিতে-নিতে নমিতা বললে, 'হতে চাই নি আমি প্রথমে।'

'কেন?'

'আমি তো ক্যাপিটালিস্ট।'

'তাতে কি? যে-সব মহিলাবা এসেছিলেন আপনাব কাছে তাঁদেব ভিতব অনেকেই তো বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্ট।'

নমিতা চাযে চুমুক দিতে যাচ্ছিল, পেযালাটা সবিযে নিয়ে বললে, 'কে বললে আপনাকে?'

'আপনিই তো বললেন বড় ঘবেব মেবেযা সব এসেছিল, আপনাব কাছে। বড় ঘরেব মেযেবা কী করে কৃষাণ মজদুরবাজ হয?'

খেল না, চাযেব পেযালাটা হাতেও বাখল না নমিতা। তেপযের উপব বসিযে রেখে বললে, 'দেখলাম বেশ ভাল চেহারা, সুস্থ শাড়ি-কাপড় ঠিক-ঠিক। স্বামীরা বড়-বড় অফিসার, তাই বলেছি বড় ঘবের মেয়ে। কিন্তু তাই বলে এঁবা কি প্রলেতাবিযেতদেব বিপ্লব আনতে পাববে না।'

'তা আনতে পাববে'—নিশীথ বললে, চা-ই খাচ্ছিল শুধু; একটা স্যাণ্ডইউচ কেটে নিচ্ছিল।

'আপনি ভর্তি হযে গেলেন বুঝি ওদের দলে?'

'হযেছি তো।'

স্যাণ্ডউইচের ছোট একটা টুকরো মুখে নিল নিশীথ। আব খাবে না।

'ওবা কি শুধু চাঁদা নিযেই ছেড়ে দেবে আমাকে? মাঝে-মাঝে স্ট্রাইকের দবকাব হবে?'

'স্ট্রাইক দাঁড় কবাতে হবে, পরিচালনা করতে হবে। আপনাব যদি ঝোঁক থাকে, সেদিকে দিব্যি পাববেন আপনি।'

নমিতাব ওযাকি পোশাক ও সুস্থ সফলতার দিকে তাকিযে নিশীথ বললে, 'চমৎকার এলেম আছে মিসেস দাশগুপ্ত আপনার; গড়বাব ভাঙবার। কী করবেন? ভাঙবেন?'

'একটা কিছু কবতে হবে নিশীথবাবু। কী যে করব ঠিক পাচ্ছি না। ভাঙবেন বলছেন কেন? কেন, স্ট্রাইকের দবকাব নেই কি কোনোদিকেই একেবারে আব? স্ট্রাইক কবা মানেই কি ভাঙা? যে-যে জিনিস খাবাপ হযে গেছে সে গুলো না-ভেঙে ভাল সৃষ্টি করা যাবে কী করে? সে গুলোকে জুড়ে বসে থাকতে দিলে চলবে কেন?'

'পলিটিক্সেব আমি কিছু বুঝি না মিসেস দাশগুপ্ত।'

'অথচ আপনি পলিটিক্সের প্রফেসর নিশীথবাবু—'

'আমি ইংরেজির প্রফেসর।'

'বেশ তো ইংরেজির, ফিলজফির, কিন্তু আজকালকার দিনে পলিটিক্সের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকবার উপায় নেই কারু।'

'জিতেন কী বলে? স্ট্রাইক করতে বলে?'

'সে কেন স্ট্রাইক করতে বলবে।'

'গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহাম তো মস্ত বড় একটা বজ্জাত জায়গা। ওটাকে সব চেয়ে আগে ভেঙে ফেলা দরকার; যদি স্ট্রাইক করতে চান আপনি। জিতেনের অফিস ছেড়ে দিয়ে স্ট্রাইক করার কোনো অর্থ হয় না—'

হানিফ একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে এসে নমিতাকে দিল। দু জনকেই সেলাম ঠুকে চলে গেল সে। নিশীথ ভাবছিল এই হানিফদের কথা হচ্ছিল; এ রকম সেলাম ঠুকবার কী দরকার ছিল তার, এ রকম শশব্যস্তভাবে? কেমন করে ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা হেঁট করে চলে যাচ্ছে; যেন মাটির থেকে ওঠাতেই পারছে না মাথা। কৃষাণ কামিনদের অবস্থা বুঝি হানিফদের চেয়েও খারাপ?

'কে করেছে টেলিগ্রাম?'

'জিতেন।'

'কী খবর?'

'জামসেদপুর থেকে দিল্লি চলে যাচ্ছে জিতেন, দশ-পনের দিনের জন্য। আপনাকে থাকতে বলেছে এখানে। জিতেন ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও যেতে নিষেধ করেছে।'

'কেন যাচ্ছে দিল্লি?'

'ব্যবসায়ের দরকারে।'

'নিজের ব্যবসায়ের কাজে, না অফিসের?'

'গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহাম তো জিতেনের নিজের জিনিস হয়ে যাচ্ছে।'

নিশীথ ভারী আশ্চর্য, কেমন আলোড়িত বোধ করে বলল, 'সত্যি? কই শুনি নি তো। বলে নি তো কোনো দিন আমাকে জিতেন।'

বিশেষ উৎসাহ বোধ না করে নমিতা বলল, 'বলবার সময় পায়নি। গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহাম তো ওর নিজের–'

'কেন? সাহেব পার্টনারেরা কোথায় গেল?'

'বিলেত চলে যাচ্ছে গুডইউল বিক্রি করে দিয়ে।'

'একা জিতেনকে?'

'জিতেনকে।'

হানিফ এসে চায়ের পেয়ালা, ডিস, সরঞ্জামগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল সব। চা খাওয়া হয়ে গেছে। নমিতা দুপুরে এ বাড়িতে খাবে, না অন্য কোথাও, জিজ্ঞেস করল হানিফ।

'হানিফ, তুমি জুলফিকারকে ফোন করে দাও যে আমি আজ দুপুরে পার্ক-সার্কাসে যাব। একটা-দেড়টার সময় যাব।'

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

ফোনটা নমিতার হাতের কাছেই ছিল, ইচ্ছে করলে নিজেই করতে পারত কিন্তু কেন যেন গড়িমসি করে উদাসভাবে ঘরবারের দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে রইল সে। হানিফ বিসিভার ধরে দাঁড়িয়েছিল; কানেকশন হয় নি এখনো। 'হানিফ, জুলফিকার যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি ফোন করছ কেন, মেমসাহেব বাড়িতে নেই নাকি। তা হলে বলে দিও যে মেমসাহেব বেরিয়ে গেছেন।

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

'যদি জিজ্ঞেস করে যে বাড়িতে আর-কেউ আছে কি না, তবে বলে দিও যে সেনসাহেব আছেন, মেমসাহেব কোথায় আছেন, কী বলেছেন, না বলেছেন, সব জানেন সেনসাহেব। জুলফিকার সাহেব যদি চান সেনসাহেবকে ডেকে দিতে পার হানিফ,—বলো।'

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

জুলফিকার ডাকল না কাউকে। হানিফ ফোন করে চলে গেল।—'হানিফকে দিয়ে ফোন করালেন কেন?'

সূচীপত্রে যান

'আমি ফোনে গেলে কথায় কথা বেড়ে যেত ঢের জুলফিকারের।'

'ভালই তো হত।'

'যাচ্ছিই তো পার্কসার্কাসে।'

আটটাব সময়ে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। নিশীথ উঠে গেল, চান করে বেরিয়ে পড়তে হবে। নমিতা নিজের ঘরে ঘুমোতে গেল। এগারটা-বারটাব সময ঘুমের থেকে উঠে স্নান কবে পার্কসার্কাসে চলে যাবে। নিশীথ বাথরুমে চলে গেলে হানিফকে ডাকল নমিতা, বললে, সে ঘুমোতে যাচ্ছে, বারটায়ও যদি না জাগে তা হলে হানিফ তাকে জাগিয়ে দিয়ে যায় যেন।

জাগিয়ে দিয়ে যাবে? কিন্তু কাপড়-জামা খুলে ফেলে শুয়ে পড়বে তো নমিতা। অন্দরেব দিকেব দরজা-জানলা সব বন্ধ করে, বাইবের দিকে জানলাগুলোব উপব পর্দা টেনে দিয়ে ফ্যান খুলে ঘুমিয়ে পড়বে সে, খুবই হুঁশিয়াবি আছে তার; নানা জাযাগায নানা বকম কাজকর্ম তত্ত্ব-তদাবক তদ্বির-আমন্ত্রণ থাকে তাব'; এখান থেকে ওখানে—ওখানে থেকে সেখানে যাওযার ফাকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে ঘুমিয়ে নেয সে; কিন্তু বেকুবেব মত ঘুমোয না, সব জাযাগতেই সময মত হাজিব হয গিযে। নিশীথেব সঙ্গে কথা বলে সাবাটা রাতই আজ জেগে কাটিয়ে দিল। নমিতার এখন ঘুম পেয়েছে, ঘড়িতে আটটা বেজে দশ মিনিট—সাড়ে এগাবটাব সময কিংবা মিনিট পনেব-কুড়ি আগে বা দশ-পনের মিনিট পিছিয়ে জেগে উঠবে সে এই সংকল্প নিয়ে ঘুমোতে গেল। নিতান্ত যদি না-জাগে, হানিফ কলিং বেল টিপবে নীচেব তলাব থেকে—বেজে উঠবে তার ঘরেব ভিতব; হানিফ সাড়ে এগারটাব অ্যালার্ম ঠিক কবে গেছে বিছানাব কাছে তেপযেব উপর ঘড়িটাতে, বেজে উঠবে; এতেও না জাগলে দবজায ধাক্কা দেবে হানিফ। খুব জোবে কড়া নাড়বে, দবজা ভেঙে ঘবে ঢুকে পড়বার দবকাব হবে না হানিফেব। হানিফ ঘড়ি ঠিক কবে চলে গেছে। অন্দরের দিকেব দবজা জানলাগুলো বন্ধ কবে দিল নমিতা, ফ্যান খুলে ও-দিককাব জানলাগুলোব পর্দা টেনে স্ল্যাক্স কোট খুলে ফেলে শুযে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ওষুধ লাগে নি আজ।

বাথরুম থেকে স্নান সেবে ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি ধুতি পবে বেবিয়ে পড়ল নিশীথ। কাছেই একটা সেলুনে দাড়ি কামিযে নিল। জলপাইহাটিব থেকে পঞ্চাশ টাকা হাতে নিযে নেমেছিল, এখন কুড়ি-পঁচিশ টাকা হাতে আছে। সুমনাকে শিগগির টাকা পাঠাবাব দবকাব নেই, দেড়শ টাকায মাস তিনেক চালাতে পাববে একা মানুষ: ডাক্তারকে পাঁচশ টাকা দিয়ে এসেছে। মাস তিনেক চলবে ওষুধ, পথ্য, ভিজিট, ইনজেকশন। ভানুব জন্য কিছু টাকা দেওযা দরকাব নিশ্চযই সুবলকে, কিন্তু সেটা অবিলম্বে না দিলেও চলবে; কিন্তু ফলটল কিনে দেওযা দবকাব বটে ভানুকে। কিন্তু খানিকটা টাকাব যোগাড় না কবে কোনো দিক দিযেই কিছু কববার ভবসা পাচ্ছে না নিশীথ।

কোথায টাকা পাবে সে? চারদিককাব ট্রাম, বাস, মোটব, ট্রাকের দুর্নিবাব পৃথিবীতে অর্থসঞ্চযের কলাকৌশলটা দ্রুত, আযত্ত করে ফেলা দরকার তার, খুব তাড়াতাড়ি; তা হলেই সেও দ্রুত, একাত্ম হযে যাবে এই অপ্রকৃতিস্থ মহানগবীব এই অনর্গল অপবিস্রুত উল্লাসকে আশ্চর্য পরিস্রুত তাণ্ডবে পবিণত কববাব দুর্দান্ত সমযযন্ত্রের সঙ্গে। কিন্তু আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ বছবেও ঢেঁকুর তুলে হাঁটতে-হাঁটতে যদি তাকে নিজেব কাযদা-কানুন ঠিক করে নেবার কথা ভাবতে হয, তা হলেই হযেছে। চাব দিকে কুড়ি-বাইশ বছবের ছোকবাবা জিপে ছুট যাচ্ছে, ব্যাঙক লুটছে, কালবাজাব চিবিযে খাচ্ছে, বড়-বড় মনসবদারি জোগাড় করছে নতুন ইউনিযনে, জায়গা জমি কিনছে যাদবপুব বেহালায, টালিগঞ্জ বিজেন্টপার্কে, বালিগঞ্জে দিব্যি ভিলা তুলে ফেলছে সব, মেযেমানুষ নিযে কৃতকৃতার্থ হযে ফিরছে।

এই কলকাতায চাকবি জোগাড় কবতে হবে তাকে আটচল্লিশ বছব বযসে? চাকবি কবে পরিবার আনতে হবে। যেখানে ফুটপাতেও মাথা পাতবাব জাযগাব জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে, একটা গোযাল, ভঁইষেব আগাড়, শুযোবের খোঁযাড়, গ্যাবাজ-কিছু খালি নেই, সেখানে বাড়ি খুঁজে নিতে হবে তার—বাড়ি, ফ্ল্যাট, রুম—রুম দু-চারটে এক-আধটা, একটা রুমের আধখানা—সিকিটাক অন্তত। দাশগুপ্ত সাহেবেব ভিলার সোফা-কৌচে নমিতাব হাত তোলায থেকে-খেযে কী নিদারুণ অর্থব হযে পড়েছে সে একটা দিনেই; যুক্তিকে সরিযে দিযে সে বসিয়েছে স্বপ্নকে; সংকল্পকে সরিযে দিয়ে বাসনাকে। যেখানে কাজকববার কথা তার, মুখে রক্ত চাগিয়ে তুলে দেড়শ-দুশ টাকা মাসোহারা হাতড়ে পাবার জন্য, সেখানে সে লক্ষপতির রূপসীকে সমযেব বুক থেকে খসিযে সব সমযেব আশ্চর্য শূন্যে সৃষ্টির সাদা মরালীর মত ছেড়ে দিযেছে যেন; পাখিদের পরিভাষামদির অধীর কথোপকথনে বিলোড়িত হযে নিষ্পোষিত আহত ঝিলের জলকণিকার মত ছুটেছে সে আকাশ-হংসীর পিছনে নীলিমার থেকে দূর অগম নীলিমার দিকে।

সূচীপত্রে যান

কুড়ি-পঁচিশ টাকা হাতে আছে মাত্র। দু-তিন মাস পরিবারকে কিছু পাঠাতে হবে না তার বটে, কোনো কিছু অদ্ভুত আকস্মিক ব্যত্যয় না ঘটলে তার টাকার উপর দাবি জানাতে আসবে না কেউ শিগগির। কিন্তু যে-মানুষের আয় মাসে আট-দশ হাজার, তার বাড়িতে পঁচিশ-তিরিশ টাকা সম্বল করে আট ঘন্টাও কী করে থাকে সে? একটা পয়সাও অবশ্যি খরচ করতে হবে না নিশীথকে—থাকা-খাওয়া আপ্যায়িত হওয়ার নানা রকম ফেলাছড়ার ব্যাপার-গুলোতে। কিন্তু অনুভব করবে নাকি নমিতা অন্দরে-বাইরে, বাজারে, নানা রকম ব্যাপারে যে এ লোকটার হাতে হানিফের মতন সচ্ছলতাও নেই? জিতেন এসে কী বুঝে নেবে, কী আন্দাজ করবে? থাকতে দেবে কি নিজের বাড়িতে নিশীথকে এক মাস ফুরিয়ে গেলে আরো কিছু দিন—তার পরে আরো কিছু দিন, এত বড় একটা দিকপাল মানুষের বিবাহিত জীবনের সুখ স্বাধীনতা সুবিধেগুলোয় নিশীথের মত একটা ইঁদুরকে দাঁত বসাতে দিয়ে।

না রাখলেও হয় তো স্থির করে নিয়ে জিতেন তবুও রাখবে হয় তো নিশীথকে; জিতেন কী স্থির করছে উপলব্ধি করে নিশীথকে অনুভব করে নেবে নমিতা। আজও তো অনুভব করেছে নমিতা—সে দিনও করবে। কিন্তু এত দিন কি জিতেনের বাড়িতে থাকবে নিশীথ নমিতাকে তিলে-তিলে সেই আব-এক অনুভূতির নিরেস নাস্তিলোকের দিকে ঠেলে ফেলবার জন্যে?

হয় তো কিছুই, বিশেষ কিছুই, মনে করবে না এরা দু জন। গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহামের সর্বগ্রাসী প্রতাপে এত আলোড়িত হতে থাকবে জিতেন যে নমিতার দিকেও মন দেওয়ার অবসব পাবে না সে, তাগিদ থাকবে না তার। এখনই তো পাওয়া যাচ্ছে সেই ইঙ্গিত। এ ইশারা গ্রহণ করে ক্রমেই বিমোহিত হতে থাকবে হয় তো নমিতা, আইনের মারফৎ নয়, এমনিই, তার সাধ-সাধনাব দেশে, চেতনার দেশে তার, বিবাহিত জীবনের জাত, কুলশীল, সব নিয়ম নির্দেশের থেকে। আভাস-আভাসের চেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যাচ্ছে নমিতার অস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর থেকে এখনই যেন, সেই অনলোজ্জ্বল লিঙ্গ শবীবের নিজেকে বিমুক্ত করে নেওয়ার পিপাসার।

হয় তো এ রকমও হবে না কিছু। জিতেনকে নমিতাকে ঠিক করে বুঝতে পার নি এখনো নিশীথ। মিষ্টি অপভ্রংশে ভাতার হয়ে ভেঙে পড়তে না চাইলেও, আদি শব্দের মর্যাদাব ভর্তা হয তো থাকবে জিতেন, স্বামিনী হয়ে থেকে যাবে নমিতা জিতেনের বাড়িতে পরস্পরেব মৃত্যু পর্যন্ত।

ছক যেদিক দিয়েই ঘোরানো যাক না কেন, আসল কথা হচ্ছে মাসে দেড় হাজার, দু হাজাব, আট শ, ছ শ টাকা অন্তত রোজগার না-থাকলে, একটা ভদ্রলোকের মতন বাড়ি—হোক না ভাড়াটে-নিজের জন্যে যোগাড় করে উঠতে না পারলে, নমিতাদের আবহের ভিতর নিজেকে একটি আবির্ভূত প্রদীপেব মতই মনে হবে যেন নিশীথের—আলাদিনেব আমলে জেল্লা থাকলেও এই গ্যাস-বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানেব যুগে কোনো সঙ্গতি নেই, কোনো ব্যবহাব নেই সে জিনিসের আর।

নাঃ, নমিতাদের সঙ্গে বড় জোর এক মাসের বেশি থাকা যায না আব। এক মাসও না-থাকতে হলেই ভাল। পনের দিন, দশ দিন, সাত দিনই পবেও যদি সে নিজেব মাথা গোঁজবার মত কোনো একটা আস্তানায় সরে যেতে পারে সেইটেই ভাল হবে। দুটো জিনিসেব দরকাব এখন অবিলম্বেই; একটা ফ্ল্যাট, একটা রুম কিংবা আধখানা রুম হলেও হয; একটা চাকরি কিংবা বোজগারেব যে-কোনো একটা উপায বের করে নেওয়া, আব এক মুহূর্তও সময নষ্ট না করে।

বাইশ-তেইশ বছর জলপাইহাটি কলেজে কাজ কবেছে নিশীথ, তার আগে দু-তিন বছর কলকাতায় একটা কলেজে কাজ করেছিল, স্কুলে মাস্টারি করেছে। এখন যখন পেনশন নেওয়ার সময এসেছে জীবনে, হার্ট খারাপ হযে গেছে, রক্তের চাপ বেড়ে গেছে তখন নিশীথকে খালি হাতেই কাজ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, ও-কাজে পেনশন নেই, ও-অনটনের কাজে সংসারের টাল সামলাতে-সামলাতে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডেব সব টাকাই খরচ হযে গেছে, হাতে কিছুই নেই আর—জীবনের। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর অক্লান্তভাবে চাকরি করার পর—তেইশ টাকা সাড়ে ছ আনা ছাড়া। করি-করি করে একটা লাইফ ইনসিওরেন্সও করতে পারে নি সে। বয়স বেশি হযে গেল, মোটা টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে বলে খুব বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও লাইফ ইনসিওবেন্স করতেই পারল না আর নিশীথ।

জলপাইহাটি কলেজ ছেড়ে এসেছে, কলকাতার কোনো একটা কলেজে অবিলম্বেই-যদি কাজ জুটে যেত তা হলে মন্দ হত না। চব্বিশ-পঁচিশ বছর সে প্রফেসবি করেছে বটে, কিন্তু তাই বলে সরকারি কলেজে করে নি তো। সরকার তার নিজের কলেজগুলোর জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছে, পেনশন আছে, ভাল প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডেব ব্যবস্থা আছে; মোটা মাইনে আছে, এক কলেজে থেকে অন্য কলেজে বদলি হযে

যাওয়ার পথ খোলা আছে' চব্বিশ বছর কোনো সরকারি কলেজে কাজ করলে কী অবস্থা হত এখন নিশীথের। লম্বা ছুটি নিয়ে, তার পর পেনশন নিয়ে, কলকাতার এ সব জায়গায় কিংবা আরো দূরে টালিগঞ্জ, বেহালায়, যাদবপুরে, সোনারপুরে, লক্ষ্মীকান্তপুরে একটা রুম অন্তত যোগাড় করে নিরিবিলিতে থেকে যেত সে; বেঁচে থাকলে সুমনাকে নিয়ে আসত; লিখত-পড়ত, দেশ-দশের কাজে নিজের মনের আলোর নির্দেশ পেযে যতদূর সম্ভব করতে সে। এ রকম সুযোগ, অবকাশ, খানিকটা স্বস্তি, সম্ভব হত জীবনে। কিন্তু চব্বিশ বছর প্রাইভেট কলেজে কাজ করেছে বলে এখন সে পথে দাঁড়াল। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময—যৌবনের প্রৌঢ়তার চব্বিশটা বছর—যাদের জন্যে ভাল মনে দান করেছে নিশীথ, কোথায় সেই সব ছেলেরা আজ? কী করবে তারা—কী দেবে নিশীথকে? কোথায় সেই সব মনিবেরা যাদের কলেজের জন্যে প্রাণ ঢেলে, অন্য কোনো দিকে না-তাকিযে, অন্য সব জিনিসের প্ররোচনা প্রলোভন এড়িয়ে, জীবনটাকে একটা নির্দোষ কঠিন নিয়মাচরণের শান্তি ও স্বল্প দৃষ্টির নিখিলে পবিণত করেছিল নিশীথ? একটা সামান্য দরখাস্ত কী করম হবে, না-হবে, হরিলালবাবুদেব সঙ্গে নিশীথের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এতেই গিযে ঠেকল তবুও? নিশীথের যদি ভুল হযে থাকে তাকে ডেকে নিযে বুঝিযে দিতে পাবতেন তাঁরা, যদি অবসাদ এসে থাকে উৎসাহিত করতে পারতেন না কি তাঁবা নিশীথকে, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের চল্লিশ-পশ্চাশ টাকা কবে মাইনে বাড়িযে দিচ্ছেন, কিছু টাকা বাড়িযে দিতে পাবতেন না নিশীথকে, মহিমকে, মুরুব্বির অভাবে যারা উপেক্ষিত হযে আছে তাদের সকলকে? কলেজের মোটা ফাণ্ড আছে, লাখ-লাখ টাকা আছে হরিলালবাবুর নিজেব।

অন্য যে-সব সাধ ছিল যৌবনে, পড়বার-পড়াবাব, অধ্যাপনা করবাব, রাবণেব চিতায জ্বালিযে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে সে সব; মাষ্টারি কববাব শক্তি ছাড়া কিছু নেই এখন আব নিশীথদেব, অন্য কোনো দিকে রুচি নেই। এব জন্যেই কি টাকাব বেকাযদায ফেলে মাষ্টাবদের পথে দাঁড় করিযে দিতে হয?

তাই তো দেওয়া হযেছে। পথেই তো দাঁড় কবিযে দেওয়া হযেছে, তা যে কবা হযেছে—এত ক্ষণ পবে যেন হুঁশ হল নিশীথেব। যাবা দাঁড় কবিযে দিযেছে তাবাও যেন কেউ নয, শূন্যের ভিতবে শূন্য, যে-সব ছেলেদের চব্বিশ বছর ধবে পড়িয়েছে সেই সব শূন্য। নিশীথ আর নিশীথেব মতন যে-মাষ্টাববা আজ পথে-পথে ফিবছে, তাবা যদি সে-সব শূন্যকে আঘাত কবে গিযে একটা বিধি-ব্যবস্থা কবে দেখাব জন্য তা হলে শূন্য ঋণী ও ঋণী শূন্য ঋণী ও ঋণী শূন্য হযে মহাশূন্যেব ভানুমতীব খেলা দেখাবে মৃত্যুব দিন পর্যন্ত।

গভর্ণমেন্ট তাব নিজেব ইস্কুল--কলেজেব শিক্ষক-অধ্যাপকদেব স্বার্থ সংবক্ষণেব ভাব স্বীকাব কবে নিযেছে। খুবই উত্তমরূপে সংবক্ষণ যে কবা হচ্ছে তা নয। তবে সবকাবেব ইস্কুলে কলেজে পনেব-কুড়ি বছব কাজ কবলে সে সব মাষ্টাবদেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাষ্ট্রেব যে দাযিত্ব আছে সেটা মেনে নিযে সে দাযিত্ব পালন কবে আসছে গভর্ণমেন্ট। গভর্ণমেন্ট কলেজে কুড়ি-পঁচিশ বছব কাজ কবলে যা-হোক একটা ভাল ভাল গ্রেডেই পৌঁছে যায মাষ্টাব, গভর্ণমেন্ট তাকে পেনশন দিতে প্রতিশ্রুত, যে-প্রতিশ্রুতি ইংবেজেব আমলেও গভর্ণমেন্ট কোথাও ভেঙেছে বলে জানা নেই; পঁচিশ বছব গভর্ণমেন্ট কলেজে বা ইস্কুলে কাজ কববাব পব নিশীথেবই মতন হাত ঝেড়ে বেবিযে আসে মানুষ, তাব জন্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, সে পেনশন পাবে না তাকে নতুন কবে চাকবি খুঁজে নিতে হবে—কলেজ হোক, অন্য কোথাও হোক—এ বকম কোনো সাধু দৃষ্টান্ত গভর্ণমেন্টেব হাতে নেই। কিন্তু কোনো প্রাইভেট কলেজে বিশ-পঁচিশ বছব চাকবি কবলে (ভাঙা হার্ট আব ব্লাড প্রেসাব নিযে) সে মানুষ তো লাযেক হযে গেছে। তাব সম্বন্ধে তাব নিজেব কলেজেব কোনো দাযিত্ব নেই আব; অন্য প্রাইভেট কলেজগুলো তাব সম্বন্ধে কোনো চিন্তা কববে না, পাবত পক্ষে স্থান দেবে না তাকে নিজেদেব কলেজে, কিছুতেই দেবে না বলে অগত্যা পেটেব চিন্তায মাষ্টাবি লাইনটাই ছেড়ে দিযে তাকে চলে যেতে হবে অন্য কোথাও—অন্য কোনো বকম কাজেব সন্ধানে—পঞ্চাশ--পঞ্চান্ন বছর বযসে। খবরেব কাগজে ঢুকতে চেষ্টা কবতে হবে হয তো—কিন্তু সেখানে তাবা বলবে, আপনার তো এ-লাইনে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কী কবে পাববেন আপনি: অর্থাৎ মাষ্টাব নিতান্তই যদি পাবতে চায, তা হলে ভেকেন্সি থাকলে সাব-এডিটবি একটা দিতে পাবা যায তাকে আশি, নব্বই, একশ, একশ কুড়ি টাকায টেনে-মেনে, কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরেব কাজ—নীচের দিকে—দিতে পাবা যায সে কাজ খালি থাকলে, মাষ্টাবের মুরুব্বিব জোব থাকলে। ভাল খববেব কাগজেব সম্পাদনাব কাজ ভাল মাইনেয কে দেবে তাকে? দেওয়া হলেও সে দাযিত্ব খববেব কাগজেব এ-পক্ষ সে-পক্ষ সব পক্ষের মন পেযে মান রেখে মেটাতে পারবে কি সে নিজের মান বাঁচিযে। টাকাব জন্য সবই পারতে

সূচীপত্রে যান

হবে। না-পেরে যাবে কোথায় সে; এই হয় তো ভাবছে নিশীথ। সবই পারবে বটে সে, কিন্তু খবরের কাগজে ঢুকলে নিজের মান বাঁচাতে পারবে না। না-পারলে না-পারবে, কী হবে মান দিয়ে? কলেজ কি তার মান রেখেছে? কিন্তু খবরের কাগজের কাজটাও কে দিচ্ছে তাকে? খবরেব কাগজের সাব এডিটবি একশ-সোয়াশ টাকায কিংবা জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটবি দেড়শ-দুশ টাকায করবে কি সে নিজের ছাত্রদের অধীনে (তাদের কারু-কারু চোদ্দ-পনের বছবের চাকরি হযে গেছে সংবাদপত্রে, প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হব-হব কবছে কেউ-কেউ) দৈনিক কিংবা কোনো পত্রিকায়? কববাব ইচ্ছা আছে কি না নিশীথ ভেবে দেখছিল। যদি করতে চায়, তাহলে অমুক ঘোষ কিংবা তমুক মিত্তিরকে ধবলে হয়। কিন্তু তাদের তো চেনে না সে। তাদের ধরবে কাকে ধরে? তাদের ধবতে পারা যায় অমুক বোস বা তমুক দত্তকে ধরে। আর তাদেব ধববে কী করে। বোস বা দত্তকে কী কবে ধববে? ধববে দাঁ, দে, শুঁই, হুই-কে ধবে। ভারী দীর্ঘ পথ তা হলে খবরের কাগজেব ঘোষেব কাছে পৌঁছুনো, তারপব জুনিযর অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরি পাওয়া তার নিজেব ছাত্রদের নেকনজবে বসে থেকে, কিংবা সাব-এডিটবি? নিশীথ ভাবতে-ভাবতে থেমে দাঁড়িয়েছিল, আবার চলতে শুরু করল।

কলেজ, খববেব কাগজ, আর-কোথায কাজ কবতে পাবে সে? গভর্ণমেন্টেব চাকবিব বযস নেই তাব; কোনো কর্মার্সিযাল ফার্মে নেবে না তাকে, অভিজ্ঞতা নেই; কোনো ব্যবসা ফেঁদে বসা শক্ত, পুঁজি নেই কিছুই; ফাটকার বাজাবে ঘুববে কি সে; সেখানে খালি হাতে হয় তো ঘুবতে পাবা যায়; কিন্তু এই আটচল্লিশ বছরে একদিনও সে স্টক এক্সচেঞ্জে, লাযন্স রেঞ্জে, ক্লাইভ স্ট্রিটে, ক্যানিং স্ট্রিটে বা বড়বাজারেব হল্লাটায যায নি; যখন সে কলেজে পড়ত তখন এক-আধ দিন ঘুরে দেখেছিল বটে; কলকাতা শহরেব নতুন-নতুন জাযগাগুলো চিনে নিচ্ছিল যেন।

'কে, আপনাকে চিনি যেন মনে হয়'—একজন সাহেবি পোশাকেব ভদ্রলোক নিশীথকে বললে।

'আমাকে?'—নিশীথ আপাদমস্তক তাকিযে দেখলে মানুষটিকে। বেশ সুস্থ সুগঠিত চেহাবা, ভাল খায়, থাকে, পবে, মনে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, মুখে তাই বড় সফলতাকে ভেদ করে অমাযিকতাব ছোট হাসি।

আপনাকে চিনি-চিনি মনে হচ্ছে, ভুল কবলুম না তো'

'না ঠিকই আছে। মনে পড়েছে।'

'চিনতে পেরেছেন আমাকে? কোথায দেখেছিলুম আপনাকে বলুন তো।'

'কলেজে। স্কটিশে-'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি স্কটিশেব ছেলে। স্কটিশে পড়তেন আপনি। তাই ভাবছিলুম চিনি-চিনি, কোথায দেখেছি যেন।'

'আপনার নাম মনে আছে আমাব।'

'মনে আছে?'

তসবেব সুটেব লম্বা শবীবটা একটু নুযে এল, খাড়া হযে ঠিক হল তাবপব। খাড়া মানদণ্ডেব মতন নিশীথের মুখোমুখি দাঁড়িযে বইল সুট, বুট, মানুষ। কী নাম, তাব নিজেব, সেটা জানতে চায সে।

'রবিশঙ্কব মজুমদার তো—'

রবিশঙ্কর হাততালি দিযে হেসে বললে 'Hit! আপনারা কাঁচা খান নাকি? একেবাবে ব-বি-শ-ঙ্ক-ব-ম-জু-ম-দা-ব—lock, stock, barrel! Terrible লোক তো আপনি। স্কটিশে পড়েছিলাম কি আজ?'

'ত্রিশ বছব আগে।'

'সে যেন মহাসরীসৃপদের দিন ছিল এ পৃথিবীতে তখন, লক্ষ বছর আগেব কথা। বললেন তো ত্রিশ বছর,' বললে রবিশঙ্কর, 'মনের অনুভূতিতে ত্রিশ বছব আর লক্ষ বছর একই জিনিস হযে দাঁড়ায, যা অতীত একটু বেশি দিন কেটে গেলেই কোটি বছর আগের অতীত বলে মনে হয। নিন—'

সিগারেট কেস বেব কবে খুলে নিশীথকে এগিযে দিল, 'আপনাব নাম তো ভুলে গেছি। বেশ মনে করে রেখেছেন আমার নাম কিন্তু।'

'আমি নিশীথ সেন।'

'নিশীথ সেন। বা বেশ তো। সংক্ষেপে অনেকখানি। কিছুটা মেযেদেব নামেব মত যেন। আঃ-হাঃ-হা হা'—হাসতে লাগল ববিশঙ্কর, কোমরটা ভেঙে ধনুকেব মতন খানিকটা বাঁকা হয়ে গেল—'আ-

হা-হাঃ-হঃ। কলকাতায় থাকেন?'

'বেড়াতে এসেছি। আপনি তো এখানেই আছেন রবিবাবু?'

'আমি মাদ্রাজে আছি এখন।'

'মাদ্রাজে? সেখানে কী?'

'স্কটিশ থেকে বি-এ পাশ করেই তো বিলেত চলে গেলুম। বি-এ-তে অনার্স পাই নি। বিলেতে গিয়ে আই-সি-এস দিলুম। হল না, অ্যাকাউন্টসে গেলুম—ইনকরপোরেট-এখন মাদ্রাজে ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের পোস্টে আছি।'

রবিশঙ্কর তো একটা বোকা ছেলে ছিল। লম্বা-চওড়া মানানসই চেহারার নিরেট বালখিল্যতাই তো ওকে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করে রেখেছিল। স্কটিশ চার্চ কলেজ; ত্রিশ বছর আগে। ক্রিমজার সাহেব ক্লাশে এসেছেন, লেকচার দিচ্ছেন, চটাপট ব্ল্যাকবোর্ডে সাহেবের লেকচার লিখে ফেলতে লাগল রবিশঙ্কর শর্টহ্যাণ্ডে। ও তখন শর্টহ্যাণ্ড শিখছিল। মাঝে-মাঝে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। সাহেব দেখতে পেয়ে বের করে দিলেন রবিশঙ্করকে। খানিকক্ষণ পরে ঢ্যাঙা দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়ে বললে, May I come in, sir। ক্রিমজার ঢুকতে অনুমিত দিলেন। হাঁ করে ক্রিমজার সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মিনিট দশেক কেমন গম্ভীর অনৈসর্গিক মূর্ততায় বসে রইল নিজের জায়গায়, তারপর কেমন একটা চাড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল সাড়ে ছ ফুট উঁচু শরীরটা নিয়ে। পাঁচ সাত মিনিট এর ওর, তার, প্রফেসারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নিশব্দ নিরীহ কৌতুকরিক্ত মুখে। সাঁ করে এগিয়ে গিয়ে বোর্ডের শর্টহ্যাণ্ড লেখাগুলো মুছে ফেলে নিজের জায়গায় ফিরে এসে মাথা টান করে ঝিমুতে লাগল, টপ করে খানিকটা লালা ঝরে পড়ল ওর জিভের থেকে বইয়ের উপর, ভেঙে গেল ঘুমের চটকা, আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল কেউ দেখে ফেলেছে কি না রবি মজুমদারের মুখ থেকে লালা ঝরে পড়েছে। সে সময়ে, যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, ওর দিকে যে ফিরে তাকাত, তাকেই আঙুল দিয়ে নিজের ভিজ আর বই দেখিয়ে হি-হি করে হাসতে থাকত রবি।

এই সব কারণেই তো রবিকে চিনে রেখেছিল নিশীথ—ত্রিশ বছর পরে আজও ভুলতে পারে নি। সেই রবি আজ ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। কী করে নিজেকে শুধরে নিল রবি? রবি যদি ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হয়, তা হলে তো নিশীথের বিলেতের কনজারভেটিভ পার্টির প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার কথা। যে-সিগারেটটা দিয়েছিল নিশীথকে, পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালিয়ে দিয়ে, নিজের হাতের সিগারেটটাও জ্বালিয়ে নিল রবি। ভূতত্ত্বের লক্ষ-কোটি বছরের কথা বলছিল। লক্ষ বছরই কেটে গেল যেন, তা না হলে সে মানুষ কখনো এই রবিতে দাঁড়ায়।

'ক্রিমজারের কথা মনে আছে?'

'কে ক্রিমজার?'

'স্কটিশের ইংরেজির প্রফেসর ছিলেন—'

'খেয়াল নেই ভাই। আমি তো ফোর্থ ইয়ারে স্কটিশে এসেছিলুম, থার্ড ইয়ারে রিপনে ছিলুম।'

'শর্টহ্যাণ্ড শিখছিলেন তো কলেজের পড়বার সময়ে।'

'হ্যাঁ, কী করে জানলেন আপনি?' রবি মজুমদার নাদা পেটে দু-এক পা এগিয়ে-পেছিয়ে হাস-হাস কৌতুকে নিশীথের দিকে তাকাল।

'ক্রিমজারের একটা ক্লাশের কথাও কি মনে নেই আপনার?'

'বললুমই তো লক্ষ বছর আগে হয়ে গেছে সব।'

তা হয়ে গেছে বটে। স্কটিশের দিনগুলো।—একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবছিল নিশীথ। কোথায় সেই সব ছেলে—সেই হস্টেলগুলো, ডাণ্ডাজ ওয়ান, অগিলভি, টমরি.....সেই সব প্রফেসর? সেই ত্রিশ বছর আগের কলকাতা; এ হস্টেল সে হস্টেলে রাতে-রাতে মসলিস করে বেড়ানো, পরে মিনার্ভা-মনোমোহনে যাওয়া; সুরেন বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল, অ্যানি বেসান্ত, তিলক, গোখলের বক্তৃতা, পবিলটিক্স, রবীন্দ্রনাথের আলো, আলোকোত্তর হিরন আনন্ত্য, সত্যেন দত্তের নিরবচ্ছিন্ন নিজের টাল সমালানো; ভোর বেলা ডাণ্ডাজ হস্টেলের তিন তলার রুমে সারা রাতের বেশ একটা চৌকশ ঘুম থেকে শীতের রোদ মুখে মাখিয়ে জেগে উঠতে না—উঠতেই বিনয়েন্দ্র মুখুয্যের গলা শোনা যেত, করিডরে দাঁড়িয়ে গরম চা খেতে-খেতে বলছে—কাল সারাটা রাত মনোমোহনে ছিলুম। কী গলার আমেজ, কী বলবার দোরস্ত চাল। কাকে বলছে বিনয়? শুভ্রাংশুকে হয় তো। হয় তো নিশীথকেই শুনিয়ে-শুনিয়ে বলছে। বিছানা ছেড়ে, নেমে বাইরে,

করিডরে আসতে দেরি হয়ে যেত নিশীথের? যখন সে এসে পৌঁছেছে, বিনয় নেই, শুভ্রাংশু নেই, কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে সব, আজ ত্রিশ বছর পরেও তাদের দেখা কোথাও মিলল না। বেঁচে আছে? কী করছে? কোথায় গেছে আর-সব? আরো অনেকে। অনেক অনেক—বলে শেষ করা যায় না কত যে সব ছিল। এত সবের কোনো ছত্রাংশও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিনয়ের থিয়েটারে রাত কাটানোর রেশ কানে নিয়ে সন্ধ্যার সময়েই শোভনলাল ভটচাজের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত নিশীথ, তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখবার জন্যে। স্টারেই তো। বাংলা স্টেজে তখন গিরিশ ঘোষের আত্মাই কথা বলছে। শিশির ভাদুড়ী আসেন নি তখনো। সিনেমা বলে বিশেষ কোনো একটা জিনিসই ছিল না তখন। সিনেমা আজ থিয়েটারকে কোথায় যে ঠেসে রেখেছে।

'কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। কোথায় থাকেন নিশীথবাবু?'

'জলপাইহাটিতে।'

'জমিদারি আছে বুঝি? ওটা তো পাকিস্তানে গেল'।

'হ্যাঁ, পাকিস্তানে।'

'তা কী করম হবে নিশীথবাবু? ট্যাকবে কি জমিদারি? না ওরা উৎখাত করে দেবে জমিদারি-টমিদারি? কী রকম মুনাফা আপনাদের?'

'না, আমার নিজের কোনো জমিদারি নেই।'

'Oh! রবি মজুমদার সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে বললে, 'আমি করাচি গিয়েছিলুম, ওয়েস্ট পাঞ্জাব গিয়েছিলুম—'

'কবে?'

'এই তো, তখনো দাঙ্গা চলছে, দাঙ্গা তো এখনো চলছে। একজন সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম। একজন আমেরিকান জার্নালিস্টও সঙ্গে ছিলেন। তিনি মহিলা; বছর চব্বিশ পঁচিশ বয়স হবে, এঃ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে—'

দু-চারটে লাথি মেরে নিল রবি মজুমদার,হাত দুটো কোমরে ছিল, তুলে নিয়ে দু-দিকের দাবনার দিকের চালিয়ে চেপে মালিশ করে নিল।

'চলুন না এ-চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসি—' নিশীথ বললে।

'না। এ সব রাস্তার—কী নাম এটার?—রাসবিহারী এভেন্যু—না, এ সব পাড়ার চায়ে-টায়ে ঢুকি না আমি। মাঝে-মাঝে ফার্পোতে গিয়ে খাই। মন্দ নয় গ্রেট ইস্টার্ন, গ্র্যাণ্ড হোটেল—আসুন আমার গাড়িতে।'

'কোথায়?'

'এই যে মিনার্ভা কার—রাস্তায় পার্ক করে রেখেছি। এই যে এই! আপনার দাবনার কাছে: ও দিকে তাকাচ্ছেন কেন নিশীথবাবু?'

'ওঃ, এই তো।'

'এই তো? তাই তো! এত বড় মিনার্ভা গাড়ি আপনার চোখেই পড়ল না যেন মশা খুঁজছিলেন আঁকু-পাঁকু করে? দেখতে পেয়েছেন মশাটা?'

ফিকে নীল রঙের আশ্চর্য গাড়ি- দানবটার ঝর্ঝরে শরীরটার দিকে এবং তার চেয়েও বেশি তার কেমন একটা অটল মহানুভবতাকে অনুভব করে নিয়ে নিশীথ বললে, 'এই গাড়িটা তো এতক্ষণ এখানে ছিল না মজুমদার সাহেব।'

'সেই জন্যই তো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাপক্ষয় করছিলুম। এই তো এল। গাড়িটাকে একটু হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিলুম। আসুন।'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠেছি—'

'সেখানে যাবেন এখন?'

'না। এ পাড়ায় একটু কাজ আছে। কি হে হরদাস, দেখা হল মেমসাহেবের সঙ্গে?''—ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল রবিশঙ্কর।

'না হুজুর। এখনো ঘুমের থেকে ওঠেন নি।'

শুনে ডান চোখের ভুরু নাচিয়ে শিকেয় চড়িয়ে, বাঁ চোখের ভুরুটাকে নীচে স্থির নিরেট অবস্থায় রেখে হরিদাসের দিকে তাকাল রবিশঙ্কর। ভুরু দুটোর আশ্চর্য রকমারি দেখে নিচ্ছিল নিশীথ। ঠিক রবিশঙ্করের মত পারে কি না চেষ্টা করে দেখছিল। কিন্তু সে কি হয়, ও অনেক-অনেক বছর অ্যাকাউন্টস

ডিপার্টমেন্টে হিসেবে-নিকেশ সাহেব-মেমসাহেব চষে চেখে যোগসাধনা করার ফল।

'বড্ড মুশকিলেই ফেলেছে। কখন উঠবে ঘুমের থেকে?'

'আর কত ঘুমোবেন। এখুনি উঠবেন।' হরিদাস আশ্বাস দিয়ে বললে।

'ওখানে আর কে আছে?' জিজ্ঞেস করল রবিশঙ্কর।

'বেয়ারা আছে একজন—আর-কেউ নেই,' হরিদাস বললে।

'সাহেব তো কলকাতায় নেই।'

'না, তিনি বম্বে গেছেন।' হরিদাস বললে।

'দিল্লি গেছেন।' রবিশঙ্কর বললে।

'চলুন না, আপনি নিজেই মেমসাহেবের বাড়িতে চলুন—এই তো কাছেই। সেখানে গিয়ে বসলেই তো ভাল হয়,' নিশীথের দিকে একটু তাকিয়ে ওজন করে হরিদাস বললে, 'আপনার চিঠি দিয়ে এসেছি বেয়ারার কাছে।'

'না, আমি যাব না। আমি তাকে লিখে দিয়েছি গাড়ি দিয়ে ভাইপো হরিদাসকে পাঠালুম, কাছেই আছি।'

নিশীথের দিকে তাকিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'আসুন আপনি।' গাড়ির ভিতর ঢুকে ব্যাক সিটে গিয়ে বসল নিশীথ, রবিশঙ্কর ঠাকরুনকে নিয়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাবেন? নিশীথের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে একটু দেখে নিল হরিদাস।

'সম্প্রতি সেখানে যাচ্ছি, তারপর'—রবিশঙ্কর বেশি কথা বলে ফেলেছে অনুভব করে কথা বাড়াতে গেল না আর সংক্ষেপে বললে, 'দেখা যাবে। আর-একবার দেখে এসো তো তুমি হরিদাস। ফোন করলুম, কে এক ছোকরা ধরলে। বললে ঘুমুচ্ছেন, কখন উঠবেন বলতে পারে না' ড্যাম—নটা-দশটা অব্দি ঘুমোয় কলকাতার এই পচা ভ্যাপসা—কাছেই তো? একটু নোলা সেঁধিয়ে দেখে এসো তো। পা চালিয়ে যাও, মিনিট কুড়ি বসে দেখে এসো, জাগিয়ে নিয়ে এসো। আমি বসে আছি গাড়িতে।'

'নিয়ে আসব পায় হাঁটিয়ে?'

'আরে মল যা! এসে খবর দিলেই তো গাড়ি যাবে।'

হরিদাস চলে গেল।

'একটা ইডিয়ট!' রবিশঙ্কর বললে।

ত্রিশ বছর আগে রবিশঙ্করকে ইডিয়ট বলতে স্কটিশের ফোর্থ ইয়ারের ছেলেরা। কিন্তু সে তো সময় প্রস্থানের লক্ষ বছর আগের কথা, এর ভিতর কত পরিবর্তন হয়েছে প্রাণপ্রবাহের, মনের গতির।

'হরিদাসকে যে-মেমসাহেবের কাছে পাঠানো হল, কে সে?'

'কোথায় গেল হরিদাস?'

জবাব দেবার কোনো দরকার নেই; হরিদাস খবর নিয়ে এলে নিশীথকে গাড়ির থেকে নামিয়ে বিদায় দিয়ে নিজেই এবার গাড়ি নিয়ে যাবে সে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকবে না আর, মনে-মনে ঠিক করে নিচ্ছিল রবিশঙ্কর।

ট্রাউজারের পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বের করে তামাক পাতা পাইপে ভরে নিতে-নিতে বলল,—'করাচি আর ওয়েস্ট পাঞ্জাবে গেছলুম। সঙ্গে বেন্থাম সাহেব ছিলেন; মিস মিলফোর্ড সেই আমেরিকান জার্নালিস্ট মেয়েটির নাম। মিস মিলফোর্ড—মিলি—ওকে পেলে সেই সে কালের হোলকার-টোলকার বর্তে যেত—' পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'আচ্ছা সেন, বাওনা মার্ডার কেসের সেই মেয়েটার নাম মনে আছে তোমার?'

'না।'

'মনে নেই, বাওনাকে খুন করা হয়েছিল?'

'কী হবে ও-সব জিনিস মজুমদার সাহেব; ও-সব তো ভূতত্ত্বের লক্ষ বছর আগের কথা।'

পাইপ টানতে-টানতে একটু ফিকে হেসে হাসির মুহূর্তে মনটাকে একটু চাঙ্গা করে নিয়ে রবি মজুমদার বললে, 'মিলফোর্ডকে পেলে বর্তে যেত হোলকার। আমেরিকানরা বড্ড হুজুগে মাতে, মিলিকে আমি রাজি করিয়ে-ছিলুম আমাকে বিয়ে করতে—'

'নিশীথের হাতের সিগারেটটা পুড়ে-পুড়ে গাঁজের মত হয়ে গেছল, জানলার ভিতর দিয়ে ফেল দিল সে।

'কিন্তু আমি তো বিয়ে করেছি। আমার ছেলেপুলে আছে।'

'কবে বিয়ে করেছেন?'

'বছর কুড়ি আগে। স্কটিশ মেয়ে। ডাণ্ডির মেয়ে।'

'বিলেতে থাকতে বিয়ে করেছিলেন বুঝি?'

'ছটি ছেলেমেয়ে আমার। কী করে মিলিকে বিয়ে করি আমি?' রবিশঙ্করের একটা ভুরু নেবে উপরে উঠে গেল, নীচে সানুদেশের শান্ত রোমাঞ্চ নিয়ে রয়ে গেল আর-একটি, 'কিন্তু মিলি মুখিয়ে ছিল—'

'জানত, ছটি ছেলেপুলে আপনার?'

'খুব ভাল করেই। আমার স্কচ স্ত্রীকে দেখেছে সে তো। দেখে ঠোঁট উল্টেছে।'

'কেন?'

'বেঁটে তো, বেঁটে স্কচ।'

রবিশঙ্কর বড় চাকরি করে, বেশ সুখেও আছে বটে কিন্তু মুখে বিশেষ কোনো স্বস্তি দেখা গেল না তার, কেমন যেন কর্তিত, সোমকীটদষ্ট, বিষণ্ণ; ভূতত্ত্বের লক্ষ যুগ কেটে না-গেলে আগে কোনো পট পরিবর্তন আসবে না যেন বহু-প্রসবিনী ডাণ্ডিনীকে সরিয়ে দিয়ে মিলফোর্ডকে কোলে তুলে নেবার মত।

'আমেরিকানরা ও-সব গ্রাহ্য করে না। যদি আমার মন ঠিক করে মিলফোর্ডকে ঘরে নিয়ে আসি, তা হলে ওদের সবাইকে স্কটল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবে সে।'

'অনেক টাকা কড়ির ব্যাপার তো। কে দেবে টাকা?'

'স্কটল্যাণ্ডে পাঠাতে?'

'পাঠাতে। খোরপোষ দিতে।'

রবিশঙ্কর কাঁধ নাচিয়ে একটু হাসল। বললে, 'খেই পেলেন না আপনি জিনিসটার। কথা হচ্ছে মিলফোর্ডকে আমি আনব কি না। সেটা যদি ঠিক হয়ে যায় ডাণ্ডি সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে যাবে।'

'ডাণ্ডি চলে যাবে স্ত্রী? নিজের থেকেই?'

রবিশঙ্কর উদ্দীপ্ত হয়ে পাইপ টেনে যাচ্ছিল। বললে, 'কী হয়েছিল গান্ধীজির ডাণ্ডি সত্যাগ্রহে?'

'তখন কিছু হয় নি অবিশ্যি, কিন্তু—'

নিশীথকে কথা শেষ না-করতে দিয়ে রবিশঙ্কর বিলোড়িত হয়ে বললে—'কী হবে এদের ডাণ্ডি সত্যাগ্রহের ফলে?'

সেটা কী হবে, জানে না নিশীথ। সেটাকে সত্যাগ্রহ বলা যায় কিনা, তাও জানে না। গান্ধীর ডাণ্ডি সত্যাগ্রহের ব্যাপারটাকে নেহাতই একটা অনুপ্রাসের ভোজবাজিতে এ জিনিসটার সঙ্গে জড়িয়ে কী রকম হল, অনুভব করে নিচ্ছিল নিশীথ; এ যেন স্ক্রিমজারের ক্লাশের শর্টহ্যাণ্ড ঝাড়ার মতই হল; প্রফেসরের পিছনে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে।

'বিয়োতে-বিয়োতে বারটা বেজে গেল ওর। বছর-বিয়োনি বৌ। বেঁটে। ক্যাড। ঘর যাও, ঘর যাও গে, যাও পাকিস্তানের পাটের আঁশ বাছো মিসেস গ্রাণ্ডিদের সঙ্গে এক গাট্টা বসে। ও যাক। ওর জন্য আমি ভাবি না। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের জন্য মনটা কেমন করে। কিন্তু'-নিশীথের ঘাড়ের উপর এক হাতের কেঁদো থাবাটা চড়িয়ে দিয়ে, দু-এক দমক পাইপ টেনে নিয়ে, রবিশঙ্কর বললে, 'ও'রা সবাই আমারই ছেলে-মেয়ে কি না তাতে সন্দেহ আছে।'

রবিশঙ্করের কথাটা যেন শোনে নি নিশীথ, অন্য কথা পেড়ে বললে, 'হরিদাস আপনার ভাইপো?'

'হ্যাঁ!'

'নিজের ভাইয়ের ছেলে?'

'আমার সহোদর ভাইয়ের। আমার দাদার ছেলে হরিদাস।'

'আপনার নিজের দাদার ছেলে, তা হলে আপনাকে হুজুর বলে কেন?'

'হুজুর বলেছে বুঝি? ঐ ওর এক রকম, বোধনার ছেলে তো!' রবিশঙ্কর নিজের পাড়া কথাটার দিকে ফিরে গিয়ে বললে, 'আমার ছেলেপুলেরা কে কার ছেলে-মেয়ে বুঝে উঠতে পারছি না। আমার সঙ্গে কারুরই তো চোখ-নাকের মিল নেই'—কেমন একটা সমস্যার চোরাবালিতে ঠেকে কাতর হয়ে বললে রবিশঙ্কর।

নিশীথ তাকিয়ে দেখল কেমন যেন ছোট শুকনো মুখে বসে আছে।

'আমার সঙ্গে আমার ছেলে-মেয়েদের চেহারা-ফেয়ারার কোনো মিল নেই। মতি-গতি বোধ-

বিচারেও নেই'—রবিশঙ্কর বললে।

সাদৃশ্য যদি না থাকে তা হলে ফুরিয়ে গেল, এর পরের ছেলেপুলেগুলোর যাতে সেটা থাকে সেই ব্যবস্থা করা উচিত রবির, ভাবছিল নিশীথ।

'চেহারায় মায়ের আদল আছে কিন্তু কম বেশ সকলেরই—কিন্তু বাকিটা অন্য সহ সাহেবদের মত।'

শুনে সমঝোতা হল নিশীথের। রবিশঙ্কর যা বলেছে মিথ্যে হতে পারে, সত্য হতে পারে। যাই হোক না কেন, জিনিসটা মুজমাদারকে স্বস্তি দিচ্ছে না। তলিয়ে কথা ভাবতে গেলেই কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে হয় রবিশঙ্করকে। নিশীথ তার স্কটিশ চার্চ কলেজের সহপাঠীর গাড়িতে পাশে বসে উপলব্ধি করছিল। টাকা আছে, কিন্তু স্বাদ নেই যেন। সুখ আছে, কিন্তু সাহচর্য নেই, শান্তির অভাব, পদমর্যাদা আছে কিন্তু এই তো অপমান। অপমানের উৎসটা সত্যি কি মিথ্যে ঠিক করে বুঝে নেবার পথ নেই রবি মজুমদারের। কিন্তু বুঝে উঠতে না পেরে জিনিসটাকে গায়ে মেখে নিয়েছে সে—এতদূর পর্যন্ত—যে সে বলে যে তার কোনো সন্তানই তার নিজের নয়। তা হয় তো ঠিক নয়। কিন্তু মানা মানছে না রবিশঙ্করের মনটা, যেন কিছু দোর্দণ্ড সৌখিনতা ও সুখে উপচে পড়ছে মানুষটার শরীর। শরীরে এত সুখ নিয়ে কি মনে এত অসুখ থাকতে পারে? রবিশঙ্করের আঁতের একটা কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মনে যে অসুখের ছোঁয়াচটুকু লেগেছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলল নিশীথ। একটা পেটমোটা গন্ধগোকুলের কাছে নিজেকে নীলকণ্ঠ পাখির মত মনে হচ্ছিল নিশীথের।

'ভার্জিনিয়া এখানকার স্কচ আইরিশ সাহেবদের সঙ্গেবাড়াবাড়ি করছে। আমি অফিসে যাবার মুখে টুক করে ঢুকে পড়ছে এক-একজন, অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি আর-একজনের সঙ্গে গল্পগুজব করছে। যতক্ষণ অফিসে ছিলুম ততক্ষণ কী করেছে?'

'ওদের দেশের যে-সব মেয়েরা আমাদের এ দেশি ছেলেদের বিয়ে করে, সাহেবরা সে-সব মেয়েদের দিকে ঘেঁষে না বলেই তো জানতুম মজুমদার সাহেব।'

'না তা নয়, ওটা আপনার ভুল নিশীথ সেন, বড্ড খচ্চর ঐ আইরিশগুলো। কী করেছে ওদের সঙ্গে ভার্জিনিয়া, কী না করেছে!'—পাইপ কামড়াতে-কামাড়াতে রবিশঙ্কর বললে। পাইপটা জ্বলছিল না; সেটাকে দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরে পাতলুনের পকেটে ডানহাতটা ঢোকাল, হয় তো দেশলাই কিংবা পাউচ বার করবার জন্যে।

'আইরিশ না, স্কচরা?'

'আইরিশরা'—রবিশঙ্কর বললে।

'কিন্তু আপনার স্ত্রী তো স্কচ।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আইরিশরা—'

'এ দেশে এত—ওরা তো—'

'ওরা তো আমাদেরই থাকে না সব।'

'এখন তো এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে সব।'

'অনেকগুলো বাঁদর এখনো আছে নিশীথ; কিন্তু'—রবিশঙ্কর দেশলাই বার করে বললে, 'আমি তো অনেকের কথা বলছি না। আমার বড় ছেলের বয়স দশ বছর। এগার-বার বছর আগের থেকেই শুরু হয়েছে, চোখ বুজে, একেবারে মুখে পাথর বেঁধে, ধুনে সাফ করে দেবার খেলা।'

'বরাবর মাদ্রাজে ছিলেন?'

'কিছুদিন বোম্বেতে ছিলুম। বেশ ভাল ছিলুম বোম্বেতে। তারপর দিল্লিতে আসতেই মূলে হাভাত করে দেয় আর-কি। আবার বোম্বে গেলুম। সেখানে আরো বেশি শুরু হল। মার্কিন ড্রাইভে একটা খাসা ফ্ল্যাটে থাকতুম তিন-তলায়। একদিন রাতে,' দেশলাই জ্বালিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর পাইপ ধরাল, 'একদিন রাতে অফিস থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে দেখি আমাকে দেখে কেমন হক-চকিয়ে গেছে ভার্জিনিয়া। কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি যেই বাথরুমের দিকে চলেছি, অমনি ছোঁ মেরে আমাকে ধরে খাবার ঘরের দিকে নিয়ে গেল। খাবার ঘরে আমাকে বসিয়ে রেখে বললে, বোম্বেতে থাকো, এ যেন তোমার বিলেতে থাকার সামিল; বাংলাদেশের কোনো জিনিসই তো পাও না, এই দেখ, তোমার জন্যে কেমন বেঙ্গলি সুইটস তৈরি করেছি। বলে একটা ডিশ ভর্তি পুডিং-কেক-প্যাস্ট্রি দিয়ে গেল; এই হল বেঙ্গলি সুইটস। বললে, 'খাও, আমি একটু আসছি।' খুব খিদে পেয়েছিল; কাঁটা চামচ বাগিয়ে খাচ্ছিলাম, কিন্তু খানিক খেয়ে কেমন সন্দেহ হল আমার, আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাথরুমের দিকে যেতেই দেখি একটা

আইরিশ বাথরুমের জানালায় হাঁসের নলি গলিয়ে স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে ভোঁ ভোঁ।'

'কী করে বুঝলেন আইরিশ?'

'আমি চিনি সেটাকে। একেবারে বাজ পাখির মত থুবড়ে পড়লাম গিয়ে স্ত্রীর গায়ের উপর,' রবিশঙ্কর বললে, পাইপ নিবে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিতে-নিতে বললে, 'বার্লিতে ক্যাত ক্যাত করছে—'

'কী?'

'আর কী! স্কটল্যাণ্ডের ওট সেদ্ধ করে রেখেছে কে যেন কেভেন্টারের দুধ দিয়ে,' রবিশঙ্কর মরীয়া হয়ে পাইপ টানতে-টানতে বললে—'কোথায় পেলে এই পরিজ, তোমার গায়ে—জিজ্ঞেস করলাম আমার স্ত্রীকে'—বলে হো হো করে হেসে উঠল রবিশঙ্কর—'পরিজ বানিয়ে রাখলে কী করে? কে দিল পরিজ পয়দা করে তোমাকে? ও-হোঃ-হোঃ-হোঃ—'গাড়িব গদি নেচে উঠতে লাগল। রবিশঙ্করের আপাদমস্তকের, পশ্চাদ্দেশেরও, কেমন একটা উন্মাত্ত প্রফুল্লতায়। বেসামাল ভাবটা কেটে গেলে পাইপটা মুখে দিতে গিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে গদির এক দিকে, পকেট থেকে পাউচ বার করে নিয়ে বললে, 'আর-একদিন সাঁ করে দুপুরবেলা বাড়ী ফিরে এলুম অফিস থেকে'—পাইপের ভিতরে যা কিছু ছিল জানলা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে রবিশঙ্কর বললে, 'কোনোদিন দুপুরবেলা তো অপিস থেকে ফিরতুম না আমি। একেবারে বমাল ধরা পড়ে গেল।'

'কী হল?'

'একেবারে বমাল ধরা পড়ে গেল'—উত্তেজিত হয়ে বললে ববিশঙ্কব।'

নিশীথ বললে,—'স্ত্রী যদি এ রকম হয়, কী করে তাকে নিয়ে ঘর করা যায়।'

পাউচের থেকে তামাক বাব কবে পাইপে ভরতে-ভরতে ববিশঙ্কর বললে, 'পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে বম্বেব থেকে সান্টাক্রুজে গেলুম, ভার্জিনিয়াকে বললুম, সান্টাক্রুজে জুহুব সমুদ্রে বেড়িয়ে চান কবে লোনাভালা যাব, লোনাভালা থেকে বোম্বে ফিবতে আমার সাত দিনও দেরি হতে পাবে। কিন্তু সান্টাক্রুজে না গিয়ে বোম্বেব একটা ইবানি হোটেলে বিরিয়ানি মাংস, মদ, কিছুটা খেয়ে একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, খানকি ঠিক নয়, খুশকিব সঙ্গে, অনেক বাত কাটিয়ে, বোম্বের সেই পার্শি ছেনাল মেয়েটা—কী নাম ওর—পেরিন—পেরিন, পেরিনের বাবাব মখমলের জুতোটা পায়ে দিয়ে টিপিটিপি আমাব ফ্ল্যাটে ঢুকতেই দেখি দরজা-জানলা বন্ধও কবে নি, খানিকটা আবজে অন্ধকাবেব মধ্যে তিন জোড়া মানুষ আসকে পিঠে আব চাসকে পায়েসেব ভিতব হুটোপুটি খাচ্ছে। সব আইবিশ স্কচ ছোঁড়াছুঁড়ি। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে—এনতার মদ খেয়েছে।'

পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে দু-চারটে ফুরফুরে টান দিয়ে ববিশঙ্কব বললে, 'এব ভিতর থেকে আমাব নিজেব স্ত্রীকে খুঁজে বাব কববার কোনো প্রবৃত্তি হল না। তাব চেয়ে ঢেব ভাল জিনিস সেখানে ছিল—একেবারে মদে মালেতে একাকাব হলে লুটিয়ে, মবিন, সেই মেয়েটিব নাম—আইবিশ মেয়ে—নিশীথবাবু এমন জিনিস আব হয় না, মবিনকে পাঁজাকোলা করে তুলে আমাব ঘরে বিছানায় নিয়ে বাকিটা রাত ওর সঙ্গেই কাটিয়ে দিলুম—'

'সে তো বেহুঁশ হয়ে ছিল—'

'কিন্তু সদরে খিড়কিতে কোথাও কুলুপ মেরে যায় নি তো।'

'কিন্তু মনের যোগাযোগ না থাকলে ওতে কী লাভ?'

'যে মদ খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, তাব মন তো গোঁসাইকে সাক্ষী রেখে গুরুভাইয়েব ভোগে লাগাবার জন্যেই এমন চাদানিব মালপো হয়ে আছে। না হলে এমন গ্যাজ হয়ে পড়ে থাকে? এটা করি, ওটা করি, সেটা করি, যেন ব্রহ্মতত্ত্ববোধ স্তরেব থেকে স্তরে উঠে যাচ্ছে মরিনের। আঃ, সে কী ব্রহ্মাস্বাদ নিশীথ! সারাটা রাত। আমি দেখেছি ব্রহ্মাকে, আমি চিনেছি।'—কেমন যেন একটা দ্রিমি দ্রিমিকি হুঙ্কারে বলে উঠল রবিশঙ্কব। পাইপ টানতে গেল না আব। কোনো দিকে তাকতে গেল না। কোনো কথা বললে না। কেমন একটা যোগনিদ্রায় যেন নিবিষ্ট নিস্তব্ধ হয়ে বয়েছে তার মন—মনে হল, রবিশঙ্কব অনুভব করছে যেন।

রবিশঙ্কবকে দেখে নিশীথ কী ভাবছিল বুঝতে পারা গেল না,—'মরিন কি মিলফোর্ডের মত?'

'না, মিলফোর্ড আলাদা।'

'কী হল তারপব মিলফোর্ডেব?'

'হয় নি এখনো। হবে। খোদ ডেলিভাবিব আগে মেল ডেলিভারি চলছে নিশীথ। রোজ চিঠি পাচ্ছি।'

সূচীপত্রে যান

'কোথায় আছে এখন সে?'

'করাচিতে। পাকিস্তান স্টেট কী করম হল দেখছে, শুনছে, ঘুরছে। আমেরিকায় কতকগুলো পেপারের করেসপণ্ডেন্ট সে। করাচি পাঞ্জাব হয়ে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তনটা লেইড মেরে ঘুরে দেখবে। তারপর দিল্লি ফিরবে, কলকাতায় আসবে, মাদ্রাজে যাবে বড় বৃষ্টির সময়, আমি তখন মাদ্রাজে থাকব,' রবিশঙ্কর বললে, 'ভার্জিনিয়াকে নিয়ে পাবা যাচ্ছে না। দেখছেন তো, শুনলেন তো, কেমন পরিজের কারবার করে।'

'মজুমদার নিজেও কম যান না,' নিশীথ চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে-চালাতে বললে।

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর বললে-'ও আমার ব্রহ্মত্ববোধেব পথটা খুলে দিয়েছে বটে। কিন্তু ওকে স্কটল্যাণ্ডে চলে যেতেই হবে। একবার ভেবেছিলুম অনেক দিন তো ঘব কবেছি এক সঙ্গে, থেকে যাক, আমরা ভারত-বাসীরা নির্বেদী লোক, থেকে যাক, যা-খুশি করুক, ওকে দিয়ে আর কুইট ইণ্ডিয়া করিয়ে কী হবে—ইউরোপিযান চেম্বার অব কমার্সের বড়-বড় চাঁইরা তো এখনো চুষছেন আমাদের দেশটা, কিন্তু,' কেস থেকে বার করে নিশীথকে একটা সিগাবেট দিল ববিশঙ্কর, 'করাচিতে এক দিন বিকেলে কনে-দেখা-আলোত মিলফোর্ডকে দেখে আমার জীবনটাই বদলে গেল নিশীথ—'

'কিন্তু বেশি ব্রহ্মস্বাদ মানুষের জন্যে নয় রবিশঙ্কর—'

'সেটা মিলফোর্ড বুঝবে।'

'কী বলে সে? আমেরিকানদের তো মূলধন ঢেব; তাকে বিয়ে কবলে, সুচের ছ্যাঁদাব ভিতর দিয়ে গলিয়ে ধনীর স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবে তোমাকে?'

'নানা রকম কথা হযেছে। মিলফোর্ডেব তো এ দেশেই থাকবাব কথা আমেবিকান পেপারগুলোব ইণ্ডিয়াব করেসপণ্ডেন্ট হিসেবে—কযেকটা বছব। আমি মিলিকে বলেছিলুম যে স্ত্রীধন নিয়ে আমাব স্ত্রী বাড়িতেই থাকুক, ছেলেপুলেরা নানা বাপেব হলেও এক মাযেব তো, মাকে ঘিরেই থাকুক আমার বাড়িতেই, ঘর ভাঙা ঝামেলাব ভিতর গিযে লাভ কী; মিলি যে-কটা বছব এ-দেশে আছে তাব সঙ্গে সহবাস কবব, বিস্তর টাকা দেব সে জন্যে তাকে—প্রস্তাব করেছিলুম।'

'কী বলে?'

'তাতে সে রাজি নয়। বলে, ও-সব করে নি সে কোনোদিন—কববে না। বললে, আমাব মুখে ও-রকম প্রস্তাব শুনে তার কী যে খারাপ লেগেছে। ভাবতবর্ষেব ভগবৎগীতাব দেশেব মানুষ এ-রকম কথা বলে? আমাব দিকে বিতিকিচ্ছিবিভাবে তাকিয়ে বললে সে—বুঝলে নিশীথ?'

সিগারেটটা হাতেই ছিল; জ্বালিয়ে নিয়ে মুখ থেকে নামিযে চুপ কবে বইল নিশীথ!

নিশীথ সিগাবেট টানছিল, কথা ভাবছিল, সিগাবেটটাকে মুখ থেকে নামিযে নিযে বললে, 'মেযেটি তা হলে খুব ভাল। খুব ভাল তো মিলফোর্ড।'

'ভাল। মোটামুটি ভাল বটে। অবিশ্যি আমাব স্ত্রীকে সরাতে চায, ছেলে-পুলেদেব কথা ভাবতে দেবে না আমাকে; চারিদিক দেখে শুনে ভেবে খুব স্পষ্ট কবে কথা বলে সব সমযই। আমাব চেযে উঁচু স্তবের লোক সে। আমার পরিবারের একটা সুব্যবস্থা কী কবে হয সে বিষযে খুব মাথা ঘামাচ্ছে সে'—রবিশঙ্কর বললে।

'মিলফোর্ড তোমাকে বেশ ভালবাসে তো ববিশঙ্কব।'

'ভালবাসে? আমেরিকার মেযেরা মাঝে-মাঝে নিগ্রোদেরও তো ভজাতে চায। ওবা তো জলমুর্গিব মত আখখুটে, যা চায আব না-চায সে সব ব্যাপাব নিযে।'

নিশীথ একটু হেসে বললে, 'হ্যাঁচকা নিগ্রো ভজানো, সে আলাদা জিনিস—এটা হচ্ছে—'

'শুনুন, হঠাৎ কোনো একটা জিনিসকে কোনো অজ্ঞেয কাবণে মনে ধরে যায তাদেব,' বাধা দিযে ববিশঙ্কর বললে, 'ঝোঁকটা যত দিন থাকে তত দিন সে জিনিস, ডলাব, হলিউড, চীন, শিবলিঙ্গ, রবিশঙ্কর, যাই হোক না কেন সেটাকে নিযে ওদের উদোবুদো। আমাদেব দেশেব কোনো পোষা মুর্গিও গেরস্তের ধান খেয়ে এতটা কবুল করে না,' গাড়ির উইণ্ড গ্লাসেব দিকে তাকিয়ে তর্জনী ও মধ্যমায আটকানো সিগারেটটা একবার নাচিয়ে নিযে রবিশঙ্কব বললে, 'কিন্তু ঝোঁক কেটে যায।'

'কেন, নির্বেদিতার তো কাটে নি।'

'তিনি অন্য রকম ছিলেন। মিলফোর্ড কি সে জাতের?' ভুরুটাকে উসকে দিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল রবিশঙ্কর, 'নিবেদিতা চোখ খুলেই এসেছিলেন এরা চোখে নেশা লাগিয়ে মনে

সূচীপত্রে যান

ভাবে যে তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং’ এটা কি গীতার শ্লোক, নিশীথ?’

‘না। উপনিষদের,’ নিশীথ বললে, ‘মিলফোর্ডের মুখে শুনেছ এটা?’

‘না। কোথায় যেন শুনেছি; অনেক আগে; বাবার কাছে বোধ হয়; এ শ্লোকটার মানে খুব ভাল করে বুঝি না আমি।’

‘গীতা পড়েছ?’

‘কিছু-কিছু। মিলফোর্ডের মতন ও-রকম সাত সাগরের-পারের বেজাত কী করে এত গীতার ভক্ত হয়? একটা কি ভাল নিশীথ?’

‘নিশীথ রবিশঙ্করের হাতের রিস্টওয়াচে কটা বাজল দেখে নিতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু হাতটা কেবলি ঘুরছে, কোটের হাতা কেবলি ঝাঁকুনি দিয়ে হটিযে দিচ্ছে, রবিশঙ্কর, মুহূর্তের মধ্যে পড়ে ঝুলে ঘড়িটাকে গ্রাস করছে। সময় কত বুঝতে পারা গেল না। রবিশঙ্করকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে গেল না নিশীথ।

‘ইউরোপ-আমেরিকা বেজায কেমন একটা দুর্দান্ত তেজস্ক্রিয় মশালের ভিতরে, ঘুরে অতিশ্রান্ত শলভের মাংসে উজ্জ্বল এই অদ্ভুত অগ্নিসভ্যতার থেকে ছিটকে পড়তে চাচ্ছে। কিন্তু তবুও তাদেব ভিতবে অনেকে একটা কিছু চাচ্ছে তারা, একটা স্থিতি ভিত্তিও চাচ্ছে যা মৃত্যু নয, জীবন। উঠতিব মুখে বিজ্ঞান যে-সব বড়-বড় আশা দিয়েছিল প্রায সবই আজ ধুলিসাৎ। আমেরিকায ইউরোপে যাবা দিনবাত লোকাযত চক্রে উড়ে বেড়াতে না ভালবেসে একটু সুস্থিরতা চায, লোকাযেতেবই গভীরতর ব্যাপ্ত আস্বাদ চায, তারা গীতার ভিতর, কেমন একটা স্নিগ্ধ সুপরিসর নিশ্চযতা উপলব্ধি করে।’ আস্তে-আস্তে বলছিল নিশীথ, নিজের মুখের ভাষাবৈগুণ্য নিজেব কানে বাধছিল তার, ধবতাই বুলি ব্যবহাব কবে মনটা খারাপ লাগছিল।

‘মিলফোর্ড এই নিশ্চযতা চায?’

‘সে কী চায আমি জানি না। দেখি নি তো তাকে। তবে তাদের দেশের কেউ-কেউ এ বকম ঝুঁকে পড়ছে গীতা, চীন সভ্যতা, তিব্বতে নিসর্গ ও মানুষ, আমাদের দেশের পটেব ছবি এই সব নানা রকম জিনিসেব দিকে।’

‘এ-সবের কিছুই আমাকে টানে না তো।’

‘টানে না?’

‘কী আছে কালীঘাটেব পটে?’

‘সেটা ভাল করে উপলব্ধি করে দেখতে হয। চোখ উল্টে দেখলে চলবে না তো।’

‘ও আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি। পটেব মা দিদিমা সকলেরই যেন দশমাস চলছে। ডুলি ঢালা বাঁদর—হোক না পুরুষ—সকলেরই যেন পেট হযেছে—দশমাসি পেট। অবশ্যি ভুঁড়িব অশ্লীলতাকে স্নিগ্ধ করেছে পেট, রেখার নমনীযতা আছে, খুঁটে-খুঁটে দেখতে গেলে কটমটায না কিছু। কিন্তু কেমন একটা যেন নির্দোষ জলপ্রদ মঙ্গল উদবি রোগে ভুগছে পটেব ছবিগুলো। কী হিসেবে এ গুলো আমেরিকানদের পেটোয়া? কথাটা কি সত্যি? মিলফোর্ড পটের কথা বলে নি, চীনাদের কথা না, লামাদের কথাও না। গীতার একটা ভাল সংস্করণ বেছে নিতে হবে। জানাটানা আছে?’

‘কার গীতা আছে তোমার কাছে?’

‘গীতাটিতা কিছু নেই। বেদ-উপনিষদ আমি কোনোদিন রাখি নি তো ভাই। জানি না কী আছে ও-সবের ভিতর। মিলফোর্ডেব সঙ্গে মিষ্টি সম্বন্ধ পাতাতে গিয়ে ভগবৎগীতাব যদি দবকাব হযে পড়ে তা হলে তুমি আমাকে একটা ভাল তিলক-টিলক-রাধাকিষণ-গঙ্গারাম মুন্সী-টুন্সির এডিশন জোগাড় করে দাও।’

‘গঙ্গারাম মুন্সী কে?’

‘কেউ নয়, তবে ঐ ধরনেব মানুষেরা বেশ ফসকা গেরোয বাজের আটুনি মেরে ব্যাখ্যা করতে পারে।’

‘না, রাধিকিষণের তো গীতা নেই,’ নিশীথ বললে, ‘করাচিতে কী দেখলে?’

‘যা আছে তাই দেখলুম। মুশকিলে পড়েছিলুম ওযেস্ট পাঞ্জাবে। তখনো দাঙ্গা চলছে সেখানে। রোজই আমি বেন্থাম কিংবা মেরি মিলফোর্ডের সঙ্গে বেরতুম, আমাদেব কেউ বোঝে নি। কিন্তু মুসলমান বনে গেছি ভেবে একদিন একটা পাযবিচের সুট পরে বেরোলুম—পথে হেঁটে; দু জন মুসলমান এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ করলে—আমি যতই বলি যে আমি বাঙালি মুসলমান, আমার নাম লালন ফকির, কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, তখন একটা কথা মনে পড়ে গেল—একবারে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখোমুখি

দাঁড়িয়েও হাসি পেল। বললুম, আমি সারকামসিশন মানে সুন্নৎ করেছি, সেটা দেখালে বিশ্বাস হবে তো? কিছুটা নরম হল বটে কিন্তু তবুও দেখতে চাইল—'

'দেখতে চাইল? ভোগা দিয়েছে বুঝতে পারল, খুব সেয়ানা—বলতে হবে, লালন ফকিরের মত চেহারা তো তোমার নয়।'

'যদি অগ্রভাগ কাটা না থাকে আমার মাথা কাটবে। দু জনের হাতেই ছুরির কী দুর্গন্ধ, রক্ত টসটস করেছে; কয়েকটা তরতাজা খুন করে এসেছে,' রবিশঙ্কর বললে 'আমাকে একটা পাশের বাড়িতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে একটা চোরা কুঠরির ভিতরে ঢোকাল—'

'তারপর?'

'তারপর আমার শ্ল্যাক্স খুলতে বললে,' একটু কাঁধ নাচিয়ে হেসে রবিশঙ্কর বললে, 'তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আমাকে যাতে ছেড়ে দেয় রোখ চেতিয়ে দিলুম তাদের। লক্ষ্ণৌয়ানের মত সেঁটে উর্দু ঝেড়ে বললুম, আমার হাতে সময় নেই, জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে করাচি, সুবে বাংলার খুব জরুরি খবর পৌঁছিয়ে দিতে হবে—জিন্নার চেয়েও সুন্নতের কথা শুনেই মাথা ঠাণ্ডা হল তাদের। বললে, 'আলবৎ আলবৎ জরুর—'

'সুন্নৎ করলে কবে তুমি?

'করেছিলুম। দশ বছর আগে আমার ফাইমসিস হয়েছিল'—

'ফাইমসিস?'

'ফাইমসিস।'

'কাকে বলে ফাইমসিস?'

'জায়গাটার মুখের দিকের মাংস বেড়ে যেতে-যেতে এমন হয় যে ছ্যাঁদাটা একেবারে বুজে আসে, ভারি কষ্ট হয় জল খালাস করতে; অপারেশন না করলে, ছ্যাদাটা একেবারেই বুজে যায়।' রবিশঙ্কর কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে নিশীথকে দিল, দেশলাইয়ের মুখে সিগারেটটা জ্বলে উঠল নিশীথের। ঠোঁট চেপে ধরে নিজেরটা জ্বালিয়ে নিল রবিশঙ্কর।

'অপারেশন করতে হয়েছিল। ডাক্তার অবিনাশলিঙ্গম—এ সব ব্যাপারে স্পেশালিস্ট—তাকেই ডাকলুম। তখন ভারী গরম পড়ে গেছে মাদ্রাজে; অবিনাশলিঙ্গম বললে যে এ সব অপারেশনের ব্যাপার শীতকালেই ভাল হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বেগ এলে সেটা শীতকাল অব্দি মুলতুবি রাখব—সে-রকম অবিনাশলিঙ্গম নেই তো আমার। বললাম ডাক্তারকে। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাজির হলেন। ক্লোরোফর্ম করিয়ে অপারেশন করেছিলেন। তারপর থেকেই এই দশ বছর কী যে নিস্তার পাচ্ছি। এটা করছি, ওটা করছি, সুন্নৎ করে কী যে নিস্তার তা আপনি বুঝবেন না নিশীথবাবু।'

রবিশঙ্কর কখনো আপনি, কখনো তুমি বলছে নিশীথকে, কখনো তুমি, কখনও আপনি বলছে রবিশঙ্করকে নিশীথ।

'ঠিক সময়েই ঠিক জিনিসটা করা থাকে আপনার মজুমদার—যখন যে এসে হাঁক দেয়া অমনি নজির বার করে দেখান। ওনারা খিচড়ে উঠতেই এক পাসপোর্ট ঠুকে দিলেন আপনি।'

রবিশঙ্কর হাসতে-হাসতে বললে, 'অবিনাশলিঙ্গ যখন দশ বছর আগে অপারেশন করেছিল মাদ্রাজে, কে ভেবেছিল ওটা কাজে লেগে যাবে পাঞ্জাবে। আনডারওয়ার খুলতেই একটু নেড়ে-চেড়ে সমঝে দেখে তোবা তোবা বলে ছেড়ে দিল,' রবিশঙ্কর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার মুখ দেখে হিন্দু মনে করে ওরা জান উড়িয়ে দিতে এসেছিল, কিন্তু বাস্তবিকই জিনিসটার মুখ নেই দেখে ঠাণ্ডা হয়ে আদাব-আদাব করতে-করতে চলে গেল। কেমন যেন আমাদের এই পৃথিবী—ক্ষুরঘর্ষণ ক্ষুরবর্ষণ চিড়িক-চিড়িক পানি। এই পৃথিবীর মতিগতির কান টেনে মাথা পাকড়ে কাজ না করতে পারলে রক্ষা নেই মানুষর। সব সময়েই বান মাছের মত.সটকে যাচ্ছে পৃথিবীটা, লেজে টেনে হাতের মুঠোর ভিতর রেখে দিতে হবে।'

রবিশঙ্কর কথাগুলো বলে ফেলে খুব একটা লম্বা টানে প্রায় আদ্ধেকটা সিগারেট শুষে নিয়ে ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় লাট করে ফেলল গাড়ির ভিতরটা।

'এই তো গেল পূর্বপক্ষের কথা, এখন উত্তর পক্ষের কথা শোনো নিশীথ, দিল্লিতে যখন খুব গোলমাল চলছিল তখন প্রায়ই আমায় দিল্লি যেতে হত', রবিশঙ্কর বললে, 'আমার হেড-কোয়ার্টার্স ছিল আগ্রায়, কিন্তু রোজই প্রায় ট্রেনে চড়ে দিল্লী গিয়ে টাঙ্গায় ঘুরে বেড়াতে হত অফিসের নানা কাজে। আমার নিজের মিনার্ভা গাড়িটা তখন মাদ্রাজে পড়েছিল, ট্রেনে দিল্লীতে অবিশ্রাম হিন্দুদের মধ্যেই চলতে-ফিরতে

হত আমার, কিন্তু নিজেকে মোটেই নিরাপদ মনে করতে পারতুম না, অবিনাশলিঙ্গের মুণ্ডপাত করতে-করতে দুর্গা বলে ঝুলে পড়তুম রোজ।

'কেন? হিন্দুদের ভিতর ঘুরে-ফিরে কী ভয়?'

'দুটো মাস আমার জান খেয়ে নিয়েছে হিন্দুরা।'

'হিন্দুরা? হিন্দুর বাচ্চাকে?'

'কিন্তু অবিনাশ লিঙ্গের কারসাজির ফলে আমার হিন্দু অভিজ্ঞান তো পাচার হয়ে গেছে নিশীথ। একেবারে মরীয়া হয়ে ছুটে আসত গুন্ডাদের দল। এই খেলে—এই বুঝি খেয়ে নিলে—যদি মুখিয়ে জাপটে ধরত জয়হিন্দ হাকড়ে, এই শালা হারামিকা বাচ্চা মুসলমান, কী বলে বোঝাতাম আমি মুসলমান নই। লাহোরে তো বুঝিয়ে এসেছি আমি হিন্দু নই, দিল্লীতে বোঝাতে হবে আমি মুসলমান নই। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান দুটো জাত বলা হচ্ছে আজকাল; কিন্তু চেহারা তো একই রকম, এ দু জাতেব পার্থক্য শুধু এক-আধটা জায়গায়। তা তো লাহোর জয় করে এসেছে।'

রবিশঙ্কর সিগারেটে একটা টান মেরে সেটাকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'লাহোর জয় করে এসেছে, দিল্লীও জয় করতে হবে তাকে, একটা বেচারি কত পারবে? ওকে ঘুমোবাব আগে আগ্রাওয়ালিদের জন্য রিসার্ভ ফোর্স হিসাবে রেখে আমি কপালে ত্রিশূল তিলক কাটতে আবম্ভ করে দিলুম মাদ্রাজিদের মত, মাদ্রাজি পাগড়ি আঁটতে শুরু করলুম—ভেবেছিলুম বেশিদিন দিল্লীর দিকে থাকতে হলে দক্ষিণী খোঁপাটাও রপ্ত করে নেব, তা হলে আর মার নেই—লুঙ্গি পরলেও মার নেই। কিন্তু আগ্রাওয়ালিবা উল্লুরে মেয়ে, দক্ষিণী পুরুষ বলে যেতে দেবে না আমাকে, রোজ রাতে থুতু দিয়ে আমার ফোঁটা তিলক উল্কি চিতিয়ে ঘষে তুলে ফেলল সব। থুতুতে এ রকম আশ্চর্য চন্দনেব গন্ধ পেয়েছ তুমি কোথাও?'

'থুতুতে?' নিশীথ গাড়ির থেকে নেমে পড়ে নিজের চরকায় তেল দিতে যাবে কি না ভাবতে-ভাবতে জিজ্ঞেস করল, 'আগ্রাওয়ালি মানে?'

'আগ্রার হিন্দু শিখ মুসলমান মেয়ে।'

'মুসলমান মেয়ে? ঐ দাঙ্গার সময়?'

'হ্যাঁ হে নিশীথ, তাদের মুখে জিভে কেমন একটা হরিচন্দনের গন্ধ যেন'—রবিশঙ্কর বললে।

তারপর সে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল এমনি যে, কোনো কথা বলে বা ঠেলা দিয়ে তাকে জাগিযে দিতে ইতস্তত বোধ করতে লাগল নিশীথ।

'এখনো ফিরে এল না ড্রাইভার; আমাকেই যেতে হবে তা হলে।'

'ড্রাইভার কি তোমার দাদার ছেলে, রবিশঙ্কর?'

'আমার দাদার ছেলে। ড্রাইভারি করছে। ওর নিজের ছ্যাকড়া মোটর আছে। মন্দ নয়। দু পয়সা—আমি এবার তা হলে স্টার্ট দিই নিশীথ সেন! তুমি কি যাবে আমাব সঙ্গে?'

'কোথায়? গ্র্যাণ্ড হোটেলে?'

'না, ড্রাইভার যেখানে গিয়েছে, এই তো কাছেই—'

'কার বাড়ি?'

'চলো, দেখো-না এসে।'

'কার কাছে যাচ্ছ?'

'বাড়ির মেমসাহেবের কাছে। সাহেব বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছে সাহেব?'

'দিল্লীতে।'

'কী হবে মেমসাহেবকে দিয়ে?'

'আজ কিছু হবে না। তবে একটা-দুটো দিন—সময় ঠিক করে নিতে হবে।'

নিশীথ পা বাড়িয়ে দিযে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'আজ বুঝি মুখেভাত শুধু?'

'ওকে নিয়ে একটা বজবজ-ব্যারাকপুর-ডায়মণ্ডহারবারের দিকে—সমুদ্রের দিকে যেতে হবে।'

হরিদাসকে অনেকক্ষণ আগে একটা অজ্ঞাত বার্তা নিয়ে চলে যেতে দেখেছে নিশীথ। ব্যাপারটা সম্পর্কে মাঝে-মাঝে ভেবে দেখেছে। মেমসাহেবটা কে তাও ধরে ফেলেছে যেন; বললে, 'তোমবা দু'জনে যাবে বেড়াতে ডায়মণ্ডহারবারের সমুদ্রে?'

'হ্যাঁ বেড়াতে। তা ছাড়া এক জন ছেলে এক জন মেয়ে দু জনে সারাদিন বিভূঁয়ে বিদেশে মোটরে

ঘুরে কী করে আর? নিশীথ সেন?'

নিশীথ একটু গলা খাঁকরে বললে, 'কী করে আর রবিশঙ্কর, ভাগীরথীর বাঁধ ঠিক করে, ইঞ্জিনিয়ারিং করে, জুড়ি মিলবে তাদের?'

রবিশঙ্কর স্টার্ট দিচ্ছিল, নিশীথ দরজা খুলে রাস্তায় নামল, রবিশঙ্কর হেসে বললে, 'কোথায় মিলবে আর তাদের জুড়ি, চালের কন্ট্রোল, কাপড়ের কন্ট্রোল, ঘোষ মিনিস্ট্রি, রায় মিনিস্ট্রি—দুনিয়ার হালচালের হদিস কোথায় মিলবে আর, যে-সমস্যাটা হাঁ করে তার ভিতর ঢুকে পড়তে না পারলে। ঢোকবার তারিখটা—হেঁই এই—এঁই রে হই হোঁই হোঁই—ব্যাড়ড়ড়—ড় ড় ড় ড় মোটর কী রকম তড়পাচ্ছে দেখছ—কোথায় যাচ্ছ নিশীথ—'

'অনেক দিকে যেতে হবে।'

'তা যেও এখন। গাড়িতে চলো।'

'কোথায়?'

'মেমসাহেবকে দেখে আসবে।'

'আমার মুখ চেনা আছে।'

'বটে! বাড়িটা দেখে রাখবে, চলো। আখেরে কাজ দিতে পারে।'

'দেখা আছে বাড়ি' নিশীথ হাসতে-হাসতে বললে 'সেই বাড়ির থেকেই তো বেরিয়ে এলুম আমি।'

'বাড়ির গোমস্তা বুঝি'—ঠাট্টা করে বললে রবিশঙ্কর।

'গোমস্তা নিয়েই তো পড়ল মিলফোর্ড,' হাসতে-হাসতে বললে নিশীথ, 'নায়েব মশাইকে বাদ দিয়ে।'

'নায়েব মশাই কে?'

'কেন। কত তো আছে করাচিতে; কত তো ওয়েস্ট পাঞ্জাবে।'

রবিশঙ্কর তা হলে জিতেন দাশগুপ্তর বাড়ি যাচ্ছে নমিতার খোঁজে? অবিশ্যি অন্য কোথাও যে না-যেতে পারে তা নয়; মেমসাহেব যে নমিতাই তা নাও হতে পারে। রবিশঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেই নিশীথ জানতে পারত কার বাড়িতে যাচ্ছে সে, কিন্তু কিছুই জানবার দরকার নেই। নমিতা সম্বন্ধে যা জানে, যা অনুভব করছে নিশীথ, তার নিজের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। চল্লিশ বছর পেরিয়ে প্রায় পঞ্চাশের কাছে এসেছে পৌঁছেছে—মানুষের জীবনের ঢের কিছু না-দেখলেও কিছু-কিছু জেনেছে সে—উপলব্ধি করতে হয়েছে। না দেখে, বই পড়ে, অনুভব করে, মানুষের সঙ্গে মিশে, জলপাইহাটিতে যে-সব সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল, কলকাতায় বৃহৎ ক্ষেত্রে এসে এ পথ থেকে সে পথে ফিরে সেই সবেরই সমর্থন কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে। মূল তত্ত্বগুলো জানা ছিল মোটামুটি। উদাহরণগুলো মিলছে এখন কেমনসহজ সজীব কৌতুকপ্রভব রক্তে আঁধারে কৌমুদীতে। নমিতার তো আজ বেলা বারটা অব্দি ঘুমোবার কথা হানিফ বলছিল। হরিদাস বসে আছে হয় তো নমিতার ড্রয়িংরুমে, কখন মেমসাহেব জাগবে। জাগলে কাকা যে মোটর নিয়ে হাজির সে কথা জানাবে তাকে।

রবিশঙ্কর নিজেই ততক্ষণে পৌঁছে গেছে জিতেনের বাড়িতে। জাগিয়ে তুলেছে নমিতাকে? জুলফিকারের ওখানে যাবে না নমিতা? রবিশঙ্করের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার যাবে? কাঁচা ঘুমে জেগে কেমন লাগছে নমিতার? রবিশঙ্করের সঙ্গে কোথায় দেখা হল নমিতার? সম্পর্কটা কী রকম? রবি মজুমদারের চেহারা দেখেই ভাল লেগেছে নমিতার? বেশ লম্বাই-চওড়াই পুরুষালি আছে বটে মজুমদারের। মজুমদার সাহেবের মনটাও বেশ ভালই প্রতিভাত হয়েছে নমিতার কাছে। মজুমদার তার মনটাকে একেবারেই অন্য এক ভঙ্গিতে নতুন করে খুলে দেখিয়েছে নমিতাকে। নিশীথের চোখ দিয়ে দেখার কথা নয় তো নমিতার, ভার্জিনিয়া, মিলফোর্ড বা লাহোর দিল্লীর দাঙ্গার গল্পগুলো নয়, অন্য সব। বিচিত্র গল্প পাড়বে রবিশঙ্কর, অনেক দিন আগের থেকেই ভজিয়েছে হয় তো; গল্পে, রসিকতায়, কথা বলার, ঠাটে, প্রাণের খোলাখুলিতে মানুষের জীবনের তিন বিস্তার ছাড়িয়ে একটু চতুর্থ বিস্তারেরও অবতারণা করতে পারে যেন রবিশঙ্কর। সে যাই পারুক আর না-পারুক, শেষ পর্যন্ত ক্রিমজারের ক্লাসের সেই বিমূঢ় বেতাল ছাড়া রবিশঙ্কর কিছুই নয় আর। কিন্তু কে বুঝবে তা? রবিশঙ্কর সম্পর্কে ত্রিশ বছরের হিসেব কার হাতে আছে? অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে রবিশঙ্করকে তলিয়ে দেখবার অবকাশ, রুচি আছে কার। দশটা বেজে গেছে। চার-পাঁচ দিন কলেজ ছুটি, গভর্নমেন্ট অফিসগুলোও ছুটি। ছুটির দিনে নানারকম মানুষের কাছে যাওয়া যায়। বাড়ি বা চাকরির সুবিধে করে দিতে পারবে নিশীথের জন্য—এমন কোনো লোক অবশ্য কলকাতায়

কোথাও নেই।

তবুও কলকাতায় থাকতে হবে নিশীথের। সে পুরুষ। কাজেই তার কাছ থেকে যে পুরুষার্থ প্রত্যাশা করে নারীরা ও পুরুষেরা, সে তো স্বাভাবিক; তার নিজের নিঃসংস্কারী মনও যে তাকে সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না, কোথাও কারু কাছে গিয়ে কোনো একটা কিছু সংঘটিত করে নেবার জন্যে ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে সেটাই কৌতুককর।

তিন-চার বছর ধরে কলকাতার কলেজগুলোতে চাকরির চেষ্টা করছে সে। প্রথম বছর প্রাণান্ত প্রয়াস করেছিল, অতটা হয়রানি চাকরির দিক থেকে কোনো ব্যবসার দিকে ঘুরিয়ে দিলে দাঁড়িয়ে যেত ব্যবসাটা। শেষ পর্যন্ত নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। ফলে কলকাতার ডাক্তার বেশ মোটা টাকা মেরে নিল নিশীথের কাছ থেকে, কিন্তু কলেজের চাকরি হল না।

প্রথম বারের অত চেষ্টা-তদ্বিরে হতে-হতেও হল না যখন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না যখন নানা রকম কলেজ প্রতিষ্ঠানের নামী লোকেরাও কেমন একটা অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, নিরাশায় পীড়িত হয়ে উঠল তার মন। এর পরে দু-তিন বার মন খোলা চোখেই সে চেষ্টা করছে—কিন্তু হবে না জেনে, তবুও মনের মারাত্মক মুদ্রাদোষে, কলকাতার কলেজে উপযুক্ত অধ্যাপনার কাজ পাবার জন্যে। সঙ্গে-সঙ্গে খবরের কাগজে চেষ্টা করেছে, অন্য কয়েকটা দিকেও, কোথাও হয় নি কিছু। ভাল কিছু নেই কোথাও—তার জন্যে নেই। কলকাতায় চাকরি কেন চাচ্ছে নিশীথ? জলপাইহাটিতে না হোক, মফস্বলের অন্য কোনো কলেজে কাজের চেষ্টা করলেই পারে; পেয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু না। মফস্বলের প্রকৃতি সে ভালবাসে, লোকজনদেরও ভাল লাগে তার। কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে নানা রকম প্রাণবনতা ও গহনতার ভিতর অন্তঃপ্রবেশ করতে চায় সে, অনেক দিন একা থেকেছে, এককও থেকেছে, এবার নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জনমানুষদের আলোড়ন দেখবে সে, যদি পারে। মর্যাদা দিতে চেষ্টা করবে সে জিনিসটাকে, যেখানে-যেখানে সুযোগ হয়, সম্ভব হয়, যে-জিনিসের সহজাত শ্রী ও সম্ভার ও প্রতিভা দেখে নতুন করে হয় তো কিছু শিক্ষা করতে পারবে তার মন। একটা মহানগরের বিন্দু-বিন্দু অনন্ত মৃত্যুর থেকে জাত নিরবচ্ছিন্ন অব্যয় জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আগুনের থেকে আলোর দিকে, হয় তো কৃষ্ণতর অন্ধকারের ঘূর্ণির ভিতর, পথ খুঁজছে, খুঁজে দিতে সাহায্য করছে অন্যদের; চার দিকের জন-জনতার থেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্ষিপ্ত ইতিহাসের আশ্চর্য জননীগ্রন্থির সঙ্গে এক হয়ে চলতে চায় তার মানবাত্মা। সে যদি কলকাতার এত বড় মানব সমাজের ভিতরেও নিজেকে একা, নিরালম্ব, ক্ষিণ্ন মনে করত তা হলে বলতে পারা যেত যে একান্তে বসে ধীরে-সুস্থে কলকাতা নগরীকে দুধ, মধু, মদের মত ব্যবহার করবার জন্যে এসেছে সে এখানে।

কিন্তু সেটা কী রকম হাস্যকর ব্যাপার? সেটা রবিশঙ্কর পারে, নিশীথ কী করে পারবে তাব নিঃসার্থতার মন নিয়ে জীবনের ও উপলব্ধিব এই প্রায় নিঃস্বত্ব অবস্থায়?

চলতে-চলতে নিশীথ কংক্রিট সিমেন্ট শক্তি সাহস নীরবতা বিবর্ণতায় কেমন যেন পরাৎপব একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সে, ঘুরে দেখল এক তলায়; ঢেব বই, লাইব্রেরি, মানুষ নেই; আরো ভিতরে ঢুকবার জন্যে দোতলায় সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল।

'কে আপনি? কী চান? কোথায় যাচ্ছেন?' একটি ছেলে এসে বাধা দিল নিশীথকে।

'উপরে যাচ্ছিলাম, প্রফেসর ঘোষ কি ঘুমের থেকে জেগেছেন?' নিশীথ জিজ্ঞেস করল।

'এখন সোয়া দশটা বেজেছে, এখনও ঘুমোবেন?'

'আজ ছুটির দিন, তাই মনে হচ্ছিল—'

'ছুটির দিন বলে বেলা এগারটা অব্দি ঘুমোবেন?'

'দেখা হতে পারে কি সাহেবের সঙ্গে?'

'কোথে কে এসেছেন আপনি?'

ঘুমের থেকে এখুনি ওঠে নি হয় তো কিন্তু তবুও ঘোর-ঘোর চোখে নিশীথকে একটু মজুত করবার ঠাটে উর্দিপরা ছেলেটি জিজ্ঞেস করল। এ কি এ-বাড়ির ছেলে, সৌখিন বাবুটি স্টেনোগ্রাফার, ছেলেদের টিউটর, প্রফেসর সাহেবের কোনো গরিব আশ্রিত আত্মীয়? কে এ?—'আমি হাটখোলার থেকে এসেছি', নিশীথ বললে।

'হাটখোলার থেকে বালিগঞ্জ। কী দরকার আপনার প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে?'

'দেখা হবে কি?'

'কী দরকার বলুন?'

'উনি আছেন কি বাড়িতে?'

'আপনার দরকারটা না জানালে কী করে কী হবে?'

'উনি উঠেছেন কি ঘুমের থেকে?'

ছেলেটি একটু পিছে সরে হন্দ মেনে নিশীথের দিকে তাকাল। বললে, 'উঠেছেন সাড়ে আটটার সময়। দাড়ি কামানো হয়েছে, চান করছেন। কী বলব গিয়ে ঘোষ সাহেবকে? কে এসেছেন বলব?'

'উনি দোতলায় বসে চা খাচ্ছেন বুঝি?'

'চা খাওয়া হয়ে গেছে। চান করছেন।'

'এক তলায় তো থাকতেন আগে। বাড়িতে ঢুকেই সোজা চলে যেতুম ওঁর কামরায়—'

'সে আপনি আট-দশ বছর আগের কথা বলছেন। তখন তো ইনি'—ছেলেটি একটু থেমে গিয়ে বললে, 'উনি আজকাল দোতলায়ই থাকেন। এ সমস্ত বাড়িটাই তো ওঁর।'

'আচ্ছা তা হলে আমি উঠি দোতলায়।'

'কী দরকার আপনার বলুন।'

'দেখা করতে চাই ওঁর সঙ্গে, এই তো দরকার।'

'এই শুধু? কোনো বিশেষ দরকার নেই?' ছেলেটি চোখ ঘুরিয়ে নিশীথের হাত-পা মাথার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

'হ্যাঁ, বিশেষ দরকার আছে বই কি।' নিশীথ একটা দম নিয়ে বললে, আস্তে আস্তে দম ছাড়তে-ছাড়তে।

'কী দরকার সেটা?'

'ওঁর অসুবিধা হবে না তাতে।'

'ওঁকে গিয়ে জানাতে হবে তো আমার।'

'আচ্ছা, আমি নিজে গিয়েই জানাব। চলুন উপরে।'

'কী নাম আপনাব?'

'নিশীথ সেন।'

'হাটখোলার থেকে এসেছেন কলেজের কোনো কাজে?'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'ওঁর কলেজ-টলেজের কোনো ব্যাপার নাকি?'

'ওঁকে কি কার্ড পাঠিয়ে দেব আমার? যাঁরা দেখা করতে আসেন ঘোষ সাহেবের সঙ্গে কার্ড পাঠিযে দিতে হয ওঁকে?'

ছেলেটি এক পা পিছিয়ে গিয়ে নিশীথের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললে, 'না, সব সময়ে কার্ডের দরকার হয় না। কেউ-কেউ অবিশ্যি কার্ড দিযে দেখা কবেন, কিন্তু ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হলে কার্ড তো একটা কিছু কথা নয়, কিন্তু জানতে চান কে দেখা করতে চাচ্ছে, কেন দেখা করতে চাচ্ছে।'

নিশীথ বললে, 'শ্লেট পেন্সিল আছে এখানে?'

'না। স্লিপ চাইলে দিতে পারি। লিখে জানাবেন আপনার দরকারটা?'

'হ্যাঁ, সেইটেই ভাল। কাজের মানুষ ঘোষ সাহেব অযথা ওঁর সময় নষ্ট করে লাভ কি? আমার যা দরকার সেটা ওকে লিখে জানিয়ে দিই, যদি মনে করেন আমাকে ডাকবেন, না হলে চলে যাব আমার সেই হাটখোলায়।'

নিশীথকে একটা স্লিপ পেনসিল দিয়ে ছেলেটি বললে, 'হাটখোলার থেকে এসেছেন শুধু ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ। না দেখা হলে ফিরে যেতে। এই দশ-বার আনা পযসার মামলা তো শুধু, আর দশ-বার ঘন্টা টাইমের। সে জন্যে ওঁর টাইম নষ্ট করা ঠিক হবে না। ওঁর পাঁচ মিনিট তো আমাদের পাঁচদিনের সমান; কোনো-কোনো সময়ে মাসেও কামিয়ে নিতে পারি না, তুকতাক করে পাঁচ মিনিটে যা সেরে দেন ঘোষ।'

স্লিপ লিখছিল নিশীথ, নিজের নামটাই লিখল শুধু, আর-আব কী লিখবে? লিখল যে প্রফেসর ঘোষের

সঙ্গে দেখা করতে চাই। কী লিখবে আর? লিখল যে, সে জন্য বেলগাছিয়া থেকে এসেছে বালিগঞ্জ অব্দি। ব্যাস। ছেলেটির হাতে স্লিপ তুলে দিয়ে নিশীথ জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম আপনার?'

'আমার নাম রিপেন।'

'রিপেন?'

'হ্যাঁ, রিপেন।'

রিপেন, নিশীথ দু-এক মুহূর্ত মাথা খুঁড়ে ভেবে নিয়ে রিপেন, রীপেন, ঋপেন, কোনো কিছুর ভিতরেই কূলকিনারা না পেয়ে হয় তো রিপন ছেলেটির নাম, কিংবা রিপু+ইন্দ্র=রিপেন্দ্র—রিপেন ছেরেটির নাম—রিপেন—রিপেন— রিপেনের থেকে রিপেন হয়েছে—রিপেন—রিপেন ভেবে খানিকটা নিস্তার বোধ করতে লাগল।

'রিপেন আপনার নাম?'

'আমার নাম রিপেন।'

ছেলেটি স্লিপ পড়ে নিশীথকে বললে, 'প্রফেসর সাহেবের সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন তা তো লেখেন নি আপনি, আমাকে বলেছিলেন হাটখোলার থেকে এসেছেন কিন্তু এখানে তো লিখেছেন বেলগাছিয়ার কথা।'

'হাটখোলাব থেকেই এসেছি আমি, বেলগাছিযায আমি থাকি।' বিপেন নিশীথেব দিকে আড়চোখে একটু খটকায বেধে তাকিয়ে থেকে বললে, 'কী দরকাবটা আপনার লিখলেন না, ঘোষ সাহেব বড়-বড় প্রফেসর, অ্যাসেম্বলি মেম্বার, খানদানি অফিসার, মিনিস্টার ছাড়া কারুরই সঙ্গে দেখা করেন না আজাকাল। বড্ড ব্যস্ত কাজ নিয়ে—'

'কী কাজ?'

'কী কাজ তা আমি কী করে বলব; অনেক বই ঘাঁটছেন, পড়ছেন লিখছেন। লিখছেন—'

'ও-সব তো বরাবরই লেগে আছে।'

'না বরাবার নয়। এক নাগাড়ে লিখছেন। আগে তো পড়তেন শুধু; কোথায় লিখতেন?'

'বই লিখছেন?'

'না, শিক্ষা সম্বন্ধে কী একটা পরিকল্পনা লিখে দিতে হচ্ছে, চেয়েছে গভর্নমেন্ট থেকে।'

'এই গভর্নমেন্ট থেকে?'

'না, বোধ হয সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে।'

'টাকা দেবে বুঝি ওঁকে?'

রিপেন মাথা নেড়ে বললে, 'না মশাই, টাকা দিয়ে কী হবে ঘোষ সাহেবেব? মোটা রকম টাকাব জন্যেও ও কাজ কে করে? তবে হ্যাঁ, বড় পদ পেযে যাবেন হয তো। কত মান তাতে! কত মান। টাকা কী হবে? টাকা!'

'কোথায় পাবেন বড় পদ?'

'সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে-'

'ও তা হলে চলি আজ আমি রিপেন দা।'

'আপনি কি বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। কলেজের হাউস ফিজিসিয়ান আমি—বায়োকেমিস্ট্রির লেকচারার। ট্রপিক্যাল।'

'ওঃ—ওঃ—ওঃ', রিপেন হাত জোর করে বললে, 'ঘাট হয়ে গেছে ডক্টর সেন, আপনাব ধুতি-পাঞ্জাবি দেখে বুঝতেই পারি নি আমি। চলুন-চলুন—অনেক সময নষ্ট হল আপনাব। নানা বকম লোক এসে বিরক্ত করে প্রফেসরকে, সে জন্য আমার উপর কড়া হুকুম যে গোলা লোককে যেন পাশ না করে দিই'—

'আমাকে ফর্দা মনে হয়েছিল বুঝি?'

'হাউস ফিজিসিয়ান, ট্রপিকালের প্রফেসর, সুট পরে এলেই তো হত। আজকাল অবিশ্যি পনেরই আগস্টের পর থেকে ধুতি-চাদর পরছে অনেকেই, গভর্নর মন্ত্রী সবাই প্রায়—কিন্তু—যাদের কাজই হাসিল হয় নি এখনো তাদের সুট পরে বেরনোই সুবিধে; রাজাজির সঙ্গে ধুতি নিয়ে টেক্কা দিলে তো চলবে না। রাজাজির তো সব ফল পাড়া হয়ে গেছে, এখন বসে-বসে কাস্টার্ড পুডিং বানাবার সময়। চলুন, চলুন ডক্টর সেন—'

সূচীপত্রে যান

'ঘোষ সাহেব লিখছেন—'

'চলুন কোনো ক্ষতি হবে না।'

'ক্ষতি হবে না?'

'চলুন, আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে।'

'স্লিপটা রিপেন দা?'

'ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি। লাগবে না।'

নিশীথ পকেট থেকে ক্যাকটিনা পিলের কৌটো বের করে কয়েকটা বড়ি খেয়ে ফেলে বললে, 'বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই রিপেন। আমি বেলগাছিয়ায় থাকি বটে কিন্তু কলেজে নয়, অন্য জায়গায়। আমি কলকাতায় বেড়াতে এসেছি, আমি জলাইহাটিতে থাকি। সেখানকার কলেজের ইংরেজির লেকচারার আমি। ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আমাব কি দেখা হবে রিপেন?'

শুনে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল রিপেন। সিঁড়ির উপরে দু-তিন ধাপ উঠে গিয়েছিল সে, নীচে নেমে এসে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'আপনি কী যে তাই আমি বুঝতে পাবছি না। বললেন, হাটখোলার থেকে এসেছি, পরে লিখলেন, বেলগাছিয়া থেকে আসা হয়েছে। নিজেকে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলজের হাউস ফিজিসিয়ান, ট্রপিকাল স্কুল অব মেডিসিনের প্রফেসর, বলে চালিয়ে দিয়ে পরে বললে ও-সব কলেজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, অন্যত্র থাকেন।'

নিশীথের দিকে তাকিয়ে রিপেন বললে, 'কলকাতায় থাকেন না?'

'না।'

'বিশ্বেস করতে হবে? কোথায় জলপাইহাটি?'

'পদ্মার পারে।'

'পাকিস্তানে?'

'হ্যাঁ।'

'জলপাইহাটি কলেজের লেকচারার আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'বিশ্বেস করতে হবে?' রিপেন বললে, 'আর এক সময়ে আসবেন নিশীথবাবু। ঘোষ সাহেবেকে আজ বিরক্ত না করাই ভাল। উনি সত্যিই আজ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত আছেন।'

'আমার শুধু পাঁচ মিনটেব মামলা বিপেন।'

'কলেজ আজ ছুটি আছে। উনি সকাল থেকেই দোর বন্ধ কবে লিখছেন। বলে দিয়েছেন কেউ যেন কাছে না ঘেঁষে। আজ উপরে না যাওয়াই ভাল। আপনি আব-একদিন সময কবে'—

'আমি আব একদিন আসব বিপেন।' নিজেব মনেই খুশিতেই কেমন একটা সৌজন্য এসে পড়ল নিশীথেব মুখে, বললে, 'আজ শুধু দোতলা হয়ে ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করে চলে যাব।'

'এত কবে বলছি, তবুও মানছেন না আপনি, বড্ড নছোড়বান্দা আপনি নিশীথবাবু, সত্যিই উনি বিরক্ত হবেন আপনি গেলে। দু-কলম লিখতেই গাদাগাদা রেফারেন ডিকশনারি দেখতে হয় ওঁর। এখন লোকজন গেলে খেই হারিয়ে ফেলবেন।'

নিশীথ উপবে যাবার পথে পা বাড়িয়ে দিযে বললে, 'আমি এক জন কলেজ টিচাব, আর একজন কলেজ টিচারেব সঙ্গে দেখা কবতে পারব না?'

রিপেন মরীযা হযে বললে, 'কিন্তু দেখা কববাব জন্যে ঠিক সময বেছে না এলে চলবে কেন? এখন উনি—'

'বেলগাছিয়ার থেকে পাকা দেখাব সময় বেছে কেউ কখনো বালিগঞ্জে আসতে পারে? আমি বেশি কিছু করব না শুধু একটু বুড়ি ছুঁয়ে চলে যাব।'

'যাবেন না, যাবেন না। কী দরকাব আপনার ঘোষ সাহেবের সঙ্গে বলে যান। অসুন স্লিপ লিখে দিন।'

নিশীথ রিপেনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে, 'আমি একজন কলেজের টিচার, আর-একজন কলেজের টিচারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তিনি বাড়িতেই আছেন, ঘুমেব থেকে উঠেছেন, দাড়ি কামিয়ে চা খেয়ে চান সেরে পড়ছেন, কিংবা লিখছেন একটা খসড়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জন্যে। আমার

কাজ পাঁচ মিনিটের কিংবা মিনিট পনের–কুড়ি, বড় জোর। আমিও ঐ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের খসড়া সম্পর্কেই এসেছি।'

রিপেন কেমন নিরেট কটমট মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। নিশীথের মুখে শেষ কথাটা শুনে খানিকটা ধোঁয়া কেটে গেল যেন তার মুখ থেকে। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারছিল না সে।

'ঘোষ সাহেব তো দেশের এখনকার শিক্ষাব্যবস্থা বদলে সব দিক দিয়ে কী সব সুব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারা যায় সেই সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করবেন। জিনিসটার পক্ষে আমি খুব ওতপ্রোতোভাবে জড়িয়ে রয়েছি রিপেন। নতুন শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে ঘোষ সাহেবকে কিছু বলতে হবে আমার। কিছুই হবে না হয় তো; ঘোষ হয় তো বুঝবেন না, কিংবা কেন্দ্র গ্রাহ্য করতে চাইবেন না। কিন্তু তবুও বলে যাই কথাটা।' নিশীথ উপরে চলে গেল।

'কাকে খুঁজছেন আপনি?' প্রফেসরের স্ত্রী মোহিতা জিজ্ঞেস করল নিশীথকে।

'আমার নাম নিশীথ সেন। প্রফেসর ঘোষ কি বাড়িতে আছেন?'

'আছেন।'

'দেখা হতে পারে তাঁর সঙ্গে?'

'কোথে কে এসেছেন আপনি?'

'বেলগাছিয়া থেকে।'

'ও, বহু দূর থেকে। উনি একটু ব্যস্ত আছেন আজ।' মোহিতা নিশীথকে তার নৈতিক কর্তব্য বুঝে উঠবার জন্য বললে, বেশ লাগসই কমনীয়ভাবে।

'তা হলে'—নিশীথ নিজের কামানো দাড়ির গালে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তা হলে উঠতে হয় আমাকে মিস ঘোষ।'

মোহিতা নিশীথের ভেতর দিয়ে দেয়ালের ভেতর দিয়ে চোখ চালিয়ে একটু হেসে উঠে বললে, 'কী ভেবেছেন আমাকে আপনি। ও মা আমি কেন তা হব?'

নিশীথ মনের ভুলে নয়, মনের কী এক আকস্মিক সমুচ্চারণে কী বলে ফেলেছিল সেটা যে মোহিতা কানে তুলবে তা সে মনে করে নি। সে ভেবেছিল মিস ঘোষ সে বলবে বটে, কিন্তু উনি তা শুনেও শুনবে না। ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না এই বলেই গা–ছাড়া নমস্কার জানিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তা তো হল না। মোহিতা শুনে স্বীকার করলেন যে শুনেছেন। নিশীথ একটু তামাশা বোধ করে দাঁড়িয়ে, মোতিহার দিকে নয়—দেওয়ালের কয়েকটি দেশী–বিদেশী ছবি, ঘোষ পরিবারেব দু–একটি (খুব সম্ভব পরলোকগত) পুরুষ মহিলার ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট, দেখছিল।

'বসুন আপনি।'

'না, চলি। বেলগাছিয়া যেতে হবে।'

'বসুন। ওঁর সঙ্গে দেখা হবে আপনার।'

'উনি খুব ব্যস্ত আছেন বললেন।'

'ব্যস্ত আছেন। কাজের চাপ বেশি। লিখছেন হয় তো।'

'কলেজের নোট?'

'না।'

'বই লিখছেন বুঝি? ঘোষ সাহেব কোনো বই লিখলেন না এটা আমাদের অনেক দিনের আফশোষ। লিখুন, দু–একটা বই লিখুন উনি। ওঁর লেখার সময় এসে পড়লুম।'

নিশীথ সোফা থেকে উঠবার আগেই মোহিতা বলে ওঠেন, 'বসুন, ঠিক আছে। বেলগাছিয়ার থেকে বালিগঞ্জ এসেছেন প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে। তা না–দেখা করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। অন্য কোনো কাজ ছিল আপনার এ পাড়ায়?'

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'অন্য কাজ কী থাকবে আর এ পাড়ায়, এই একটা 'কাজই তো একশখানা।'

'তা হলে? উঠবেন না আপনি। ওঁকে বলছি আমি।'

'আচ্ছা—বসছি আমি—তবে—'

'ভিতরে দু জন লোক আছেন তাঁরা চলে গেলেই আপনার কথা জানাব।'

'কারা আছেন ভিতরে?' জিজ্ঞেস করেই নিশীথ নিজের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা চাপা দিয়ে বললে, 'লিখুন.

বই লিখুন প্রফেসর। ওঁর এক-আধখানা বই অনেক আগেই প্রত্যাশা করেছিলাম আমরা। তবে এই বয়সের লেখা আরো ভাল হবে। সমস্ত জীবনের বিদ্যে অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা তো।'

'বিদ্যে কি জ্ঞান?' মোহিতা জিজ্ঞেস করে।

'বিদ্বান মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের জন্ম হয়।'

'সব সময়েই হয়?'

'না তা হয় না। জ্ঞান বিদ্যের চেয়ে ঢের বড় জিনিস বলেই জানি। হৃদয়ে জ্ঞানের কোনো অবস্থান না থাকলে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো কেমন যেন অচল হয়ে পড়ে থাকে অদ্ভুত মূল্যনাশের ভিতর।'

'শুধু বিদ্যে থাকলেই হয় না বলছেন তো?'

'কী হয় না?' নিশীথ একটু আগ্রহভরেই জিজ্ঞেস করে মোহিতাকে।

'জিনিসের ঠিক মূল্য বোঝা যায় না।'

'না, তা বুঝতে বিদ্যের কী দরকার?'

'বিদ্যের চেয়ে বেশি কিছুর তো দরকার।'

'সেইটেই বলেছি আমি, তাকে আমি জ্ঞান বলেছি,' বলে নিশীথ বললে, 'কেমন বিমূঢ়ের মত কথা বলছি আমি।'

'কেন? ঠিকই তো বলছিলেন।'

'এমনভাবে কথা বলছিলুম যে জ্ঞান কাকে বলে সে জিনিসটা আমিই প্রথম আবিষ্কার করেছি যেন। যেন উপনিষদের ঋষিদের মত বাণী।'

নিবিষ্ট ভাবে শুনে নিয়ে বোধগম্য হল কথাগুলোর অর্থ, মানুষটির আত্ম-দর্শনের রকমটি তো বেশ নতুন—ভেবেছিল মোহিতা। বেশ সরল গহন আত্মবিশ্লেষণ।

নিশীথের দিকে তাকিয়ে মোহিতা বললে, 'উপনিষদের ঋষিদের বেশ আত্মস্থতা ছিল।'

'ছিল', নিশীথ বললে, বলে মুখ তুলে মোহিতার দিকে তাকিয়ে দেখল সে নিশীথের দিকে তাকিয়ে আছে, 'আজকালকার দিনে সে রকম আত্মস্থতা ফিরে পাওয়া কঠিন।'

'কেন? কিসের জন্যে এ রকম হল?'

'দু-একজনের মধ্যে অবিশ্যি বেশ একটা মনের প্রশান্তি আছে আজকালও, কিছুতেই তাদের অন্তিম মনের সুছন্দ নষ্ট হয়ে যায় না, নিজের ও চারদিককার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেক পরিমাণে ধ্বংস হয়ে গেলেও,' মোহিতার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে একবার-আধবার চোখে চোখ রেখে বললে নিশীথ, 'প্রফেসর ঘোষ এ রকম একজন মানুষ।'

'প্রফেসর ঘোষ এ রকম মানুষ?' সচকিত হয়ে নিশীথের দিকে তাকাল মোহিতা।

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।'

'অনেক দিনের চেনা পরিচয় আপনার সঙ্গে প্রফেসরের?'

'না। মাঝে-মাঝে এসেছি আমি তাঁর কাছে দু-বছর চার-বছর অন্তর। তিনি হয় তো প্রথম নজরেই আমাকে চিনতে পারবেন না। প্রতিবারই জিজ্ঞেস করেন কে আপনি?'

তারপর হেসে বললে, 'মানুষের মুখ মনে রাখার কথা তাঁর নয়। তাঁর কাজ হচ্ছে অতীতে কী বিদ্যা ছিল, আজকাল, ভবিষ্যতকে সে সম্বন্ধে সজাগ করে রাখা। আমাদের মুখ মনে রেখে ও-রকম কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। কিন্তু তবুও লোকজনের মুখ বারবার দেখলে ভোলা কঠিন, কিন্তু প্রফেসরের পক্ষে মনে রাখা কঠিন। মনের কোনো দোষ নেই। এটা গুণ। প্রফেসর ঘোষের মতন হয় না।'

মোহিতা শুনছিল, একটু হেসে বললে, 'তাই তো। নতুন কিছুর ভিতরে এসেই প্রফেসরের গোলমাল হয়ে যায়। তিনি অতীতের পক্ষে চলতেই অভ্যস্ত। কোনো কিছুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে দেখবার প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন যে তা অন্তত ত্রিশ বছর আগের অতীতের জিনিস হওয়া চাই, ত্রিশ বছর আগেকার সামাজিক সংস্থান বা রাজনীতি বা ধর্মের আন্দোলন।' মোহিতা প্রফেসরের ঘরের অটকানো দরজাটার দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে বললে, 'আর সাহিত্যের ব্যাপার হলে তা অন্তত পঞ্চাশ ষাট বছর আগের কবিতা প্রবন্ধ সাহিত্য হওয়া চাই। একশ বছর আগের হলেই যেন ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আজকাল একটু-আধটু দেখছেন।'

'আজকাল—খুব হালে?'

'হ্যাঁ, মানে উনিশশ সাতচল্লিশের সেপ্টেম্বর থেকে।'

'এর আগে ওঁর সাহিত্য তিনি পড়েন নি?'

'মন দিয়ে পড়েন নি, বলতেন জিনিসটা পাকুক—পাকতে থাকুক, পেকে নিক, পঞ্চাশ-ষাট বছর লাগে এক বোতল মদেরও তো ধাতস্থ হতে। রবীন্দ্রনাথ আজ যা লিখলেন আজই কি তাই পড়তে হবে!'

'ঠিকই বলেছেন, সাহিত্যের অধ্যাপক তো উনি।'

'ইংরেজি সাহিত্যের।'

'ঠিকই বলেছেন প্রফেসর। আমাদের মৃত্যুর পঞ্চাশ-ষাট বছর পর যারা পড়তে আসবে আমরা ধারণাও করতে পারি না এমনই একটা আশ্চর্য আস্বাদ পাবে তারা কবির সাহিত্যের থেকে। কেমন একটা অন্ধকার কোণে যেন পড়ে আছে মদের বোতলগুলো, মাকড়ের জালে ঢাকা পড়ে, একটা মস্ত ভাঁড়ারের দেশে নিরবচ্ছিন্ন ফুসলানি, খুনোখুনি, চশমখুরির ভিতর। বোতল টেনে,-টেনে খাচ্ছে বটে, যারই মর্জি হচ্ছে। কিন্তু সৎ-অসৎ সনাতনী নিপাতনী উল্লুক জিরিয়ে নেবে খানিক—পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে, মদের বোতলগুলো পেকে উঠবে—ভাঁড়ারের ঠাণ্ডা কোণে; যারা খাবে তখন—আঃ!'

নিশীথও ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ছে না আজকাল। মাঝে-মাঝে চেষ্টা করে দেখেছে। কয়েকটা কবিতা ছাড়া আর-কিছু ভাল লাগে না। তবে পঞ্চাশ-ষাট বছর পর ভাল লাগবে। কিন্তু তখন বেঁচে থাকবে না। প্রফেসর থাকবেন না। মোহিতাও নয়।

পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে—প্রফেসর তো চলে গেছেন তখন।—কেমন একটা ভারী নিঃশ্বাস পড়ল মোহিতার।

'আপনি নাগাল পাবেন নিশীথবাবু পঞ্চাশ বছর পরে?'

'আমার বয়স তো পঞ্চাশ বছরই প্রায়, উনপঞ্চাশ তো ওঁর?'

'উনপঞ্চাশ পেরিয়ে ছ মাস হল।'

'সাড়ে উনপঞ্চাশ, আমার আটচল্লিশ।' হারীত বলে, তাব বাবার বযস উনপঞ্চাশ; নিশীথেব হিসেবে আটচল্লিশ, সাতচল্লিশও হতে পারে, খুব সম্ভব আটচল্লিশই।

মোহিতা নিশীথকে দেখেছে এর আগে। এই ভদ্রলোকটির নাম যে নিশীথ, নিশীথ সেন, তাও জানা আছে তার। এ বাড়িতেই দেখেছে প্রফেসব ঘোষের সঙ্গে দেখা কবতে এসেছিল নিশীথ শেষবার যখন—উনিশশ ছেচল্লিশে, মে মাসে। মনে আছে মোহিতার। প্রায ঘন্টা দেড়েক ঘোষ সাহেবের ঘরে বসে ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছিল সেবাবে নিশীথ, সকাল বেলা তখন, আর কেউ ছিল না তখন ঘোষ সাহেবেব ঘরে। মোহিতা ছিল, নিশীথ ছিল, ঘোষ ছিলেন। কলেজে গরমের ছুটি তখন। প্রফেসরের লাগেজ বাঁধাছাঁদা চলছে। দু-তিনদিনের মধ্যেই মুসৌরি যাবেন সপরিবারে। মোহিতা মাঝে-মাঝে ঘোষের ঘরে ঢুকছে, মাঝে-মাঝে বেরিয়ে পড়ছে; আবার এসে মিনিট পনেব কুড়ি বসে যাচ্ছে, মোহিতা প্রফেসরের ঘরে ঢুকে সোফায বসলেই ঘোষের নজরটা মোহিতাব দিকে হেলে পড়ছে। নিশীথ যেন নেই। এই স্ত্রী-ঘেঁষা ভাব, বড়লোক-ঘেঁষা ভাবও বটে। মোহিতা ডিরেক্টর জেনারেলের মেয়ে আর নিশীথ মফস্বল কলেজের লেকচারার। এ সব বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল ঘোষ। কিন্তু জিনিসটা ভাল না। মোটেই ভাল না। একজন কৃতী মানুষ টাকাকড়ির দিক থেকে অকৃতী বলে তাকে উপেক্ষা কবা ঘোষেব মত অধ্যাপকের উচিত কি? কিন্তু তিনি তো তা করেন। নিশীথেব মুমুক্ষু চোখ ঘোষ সাহেবেব দিকেই শিকেয তোলা, তবু, অতি ক্বচিৎ কোনো কথার উত্তর দিতে মোহিতার দিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে নিশীথ, চোখ ফেরাচ্ছে না; কেমন একটা সম্ভ্রমের বোধে মোহিতার চেয়ে নিজেকেই হয তো বেশি সম্ভ্রান্ত করে তুলবাব চেষ্টা করে। সেটা যে রীতির ভুল, মনেরও অসঙ্গতির পরিচয বুঝেছিল কি তা নিশীথ? নাকি বুঝেও যা করেছে ইচ্ছে করেই করেছে। ঘোষ সাহেব সে প্রতিবারেই নিশীথের পরিচয জানতে চান, এমন ভাব দেখান যে তিনি নিশীথের মুখ চেনেন না, সেটা নিশীথের পক্ষে বাস্তবিকই একটা অত্যাচার। এটাকে কী নাম দেবে মোহিতা? এর কি কোনো সুনাম আছে? ভাঁড়ামো ছাড়া একে কী আর বলবে সে। ভণ্ডামিটাকে আড়াল করে প্রফেসরের আশ্চর্য অধ্যাপকীয় সুসঙ্গিৎ।

ঘোষের আত্মস্থতার কথা বলছিল নিশীথ। সে কী রকম আত্মস্থ। সত্যিই কতদূর মহৎ বোঝে হয তো নিশীথ, জানে সব, কিন্তু না-জানার ভানটাকে ঢেকে কেমন একটা মানানসই দীনতার আলো ছড়িয়ে। এ বিষয়ে প্রফেসর ঘোষের ঠিক উল্টো নিশীথ। না কি নিজেই অধীনস্থদের কাছে সে নিজেও একটি ঘোষ। না, তা হয তো না। নিশীথকে দেখে তা মনে হচ্ছিল না মোহিতার।

'আপনাকে তো এর আগে এ বাড়িতে দেখেছি আমি।'

'মাঝে-মাঝে ঘোষ সাহেবের কাছে আসি আমি। আমাকে দেখেছেন আপনি, মনে আছে আপনার?'

'বেশি তো আসেন না।'

'আমি তো কলকাতায় থাকি না।'

'গেল বছর আসেন নি। ঘন্টা দেড়েক ছিলেন প্রফেসরের ঘরে তার আগের বছর। আমরা তখন মুসৌরি যাচ্ছি, বাঁধাছাঁদার পাঠ চলছে। ঘোষ অবিশ্যি শালগ্রামের মত বসে আছেন তাঁর ঘরে। মোটরের পা-দানিতে একবার পা রাখবেন, রিজার্ভ গাড়ির ফুটবোর্ডে আর-একবার—'

'খুব বড় জ্ঞানস্থবির মানুষ—সকলে ধন্য বোধ করেন'—নিশীথ একটু নুনের ছিটে মেখে সদন্তঃকরণে হেসে বললে, 'প্রফেসবেব এ বাড়িতে ঢুকলেই যেন সেই আগেকাব প্রাচীন সভ্যতা খুঁজে পেয়েছি মনে হয়। কেমন একটা স্তব্ধতা প্রশান্তি এখানে; চারিদিককার বর্বরতার থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করে রেখেছে।'

'সেটা বেশি মিশলে বুঝতে পারবেন। বছরে, চার-বছরে একবাব উঁকি দিয়ে কী করে—' কিন্তু কথাটা শেষ করল না মোহিতা, হাসির ফোঁড় ঠোঁটের কোণায় আটকে রইল।

'উনিশশ চুয়াল্লিশেও আপনি এসেছিলেন প্রফেসবের সঙ্গে দেখা করতে'—

'চুয়াল্লিশে?' নিশীথ, মোহিতার সুচিমুখ হাসি মিলিয়ে যাচ্ছিল-তাকিযে দেখতে-দেখতে বললে, 'হ্যাঁ চুয়াল্লিশেও এসেছিলাম আমি।'

'মে মাসে?'

'হ্যাঁ মে মাসে। কী করে তারিখটা মনে রইল আপনার?'

'প্রফেসবেরও মনে আছে বটে, কিন্তু তিনি তা স্বীকার কবতে চান না।'

'মনে আছে? তা থাকতে পারে। গত চার বছরে আমি দুবার এসেছি এ বাড়িতে, দুবারেই দেখা হয়েছে প্রফেসরের সঙ্গে। আপনি তো দুবারই ছিলেন প্রফেসবেব নিজের ঘরে বসে। সকালবেলাই উনি পড়ছিলেন, লিখছিলেন। কলেজের গরমের ছুটি তখন।'

'হ্যাঁ আমরা তখন নীচের তলায় থাকতুম।'

'উপরে এলেন কবে?'

'গত বছরে।'

নিশীথ বললে, 'এবাবেও নীচে খুঁজেছিলাম'—

'নীচে আজকাল জিনিসপত্রেব গুদাম; ওঁর লাইব্রেরিব বেশিব ভাগই নীচে এখন।'

'খুব বড় লাইব্রেরি দেখলুম।'

'খুব সম্ভব বেনারস ইউনির্ভার্সিটিকে দিয়ে দেবেন।'

'সব বইগুলো? আমাদেব বাংলাদেশে থাকবে না?'

'সেটা বলেছিলুম ওঁকে, উনি নারাজ। অনেক বলতে শেষে বললেন, মাল-বীযাকে কথা দিয়ে এসেছি, কোনো লেখাপড়া নেই, মুখের কথা। পণ্ডিত মালবীয়া আর ঘোষ সাহেব ছাড়া জানেও না কেউ। মালবীযাজি তো মরে গেছেন। কিন্তু উনি কথার খেলাপ করতে পারবেন না।'

'কিন্তু উনি তো কলকাতা ইউনিভার্সিটির লোক।'

'কিন্তু বেনাবসকে দেবেন।'

'কিন্তু উনি তো বাঙালি?'

'কিন্তু হিন্দুস্থানী প্রদেশগুলোব দিকেই দেখেছি ওঁর ঝোকটা বেশি।'

'কিন্তু ওঁবা কি পড়বে বই? পড়ে বই?'

'আজকাল পড়ছে শুনছি।'

'কোথায় পড়ছে আর?' একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে নিশীথ বললে।

'ঘোষ সাহেব নিজেব মনকে পড়াচ্ছেন।'

'আপনি একটা কাজ করুন,' নিশীথ বললে, মোহিতাব দিকে তাকিযে, 'কলকাতা ইউনিভার্সিটিকে যদি উনি না দিতে চান ওঁর বইগুলো, ওঁর বাবার বা আপনার নামে এই লাইব্রেরিটা রেখে দিন না কেন, আপনাদের বাড়ির নীচের তলায়। এমন কোনো কোনো বই আছে ওঁর লাইব্রেরিতে যা আমাদের দেশে নেই, ভাবতবর্ষে নেই, কোথাও নেই। তা ছাড়া এমনিই লাইব্রেবিটা সাবালো, অন্তঃসারালো জিনিসে

ভরপুর। বাঙালি কি উপকার পাবে না?'

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি তো এখন কলকাতাতেই আছে নিশীথবাবু। পড়ে নিক বাঙালি,' মোহিতা বললে, 'আপনি যান ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে?'

'আমি কলকাতায় থাকি না।'

'যখন আসেন, গরমের ছুটি কাটাতে।'

'ও', নিশীথ বললে, 'ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আপনাব ভারি মজার সাঁট রয়েছে দেখছি তো।'

'কেন?' বড় হাসিটা আরো ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে খানিকটা বাধা পেল মোহিতার মুখে।

'বাঙালির জন্যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির দোহাই পেড়ে সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন ঘোষ লাইব্রেরি বাংলার বাইরে—আপনার স্বামীর সঙ্গে জোট পাকিয়ে?'

'তা হবে। আমাদের মনস্তাপ আছে।'

'কিসের?'

'ঘোষ সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন।'

'কেন, কলকাতা ইউনির্ভার্সিটি কোথাও কিছু কার্পণ্য করেছে কি, খুব ধনী ইউনিভার্সিটি তো নয়। কী দেবে আর এর চেয়ে বেশি, দেবার সামর্থ নেই।' '

'টাকাকড়ির কথা বলছি না আমি।'

'ওঃ!' নিশীথ চুপ করে রইল। টাকাকড়ির কথা নয়, মান-সম্মানের কথা তা হলে, পদমর্যাদার ব্যাপার। ভাল আমির-ওমরাহের পদ জুটছে না হয় তো সাহেবের।

ঘোষকে ভাইস চ্যান্সেলার করে দিলে হত? ভাবছিল নিশীথ।

'আপনাকে যা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কথার কোনো উত্তর দিলেন না তো?'

'কে আমি? কী জিজ্ঞেস করেছিলেন ?'

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কথা।'

'ওঃ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি—'

কলকাতায় থাকতে পড়ত মাঝে-মাঝে সে। কিন্তু অনেক দিন তো কলকাতা ছাড়া। বই-টই পড়ার চাড়ও কমে যাচ্ছে। নিশীথ মাথা নেড়ে বললে,—'না' ওখানে আমি অনেক দিন যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি বই পড়ি না, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাকে দিয়ে বাংলার পাঠকসমাজকে বিচার করলে তো চলবে না। তারা পড়ে। আপনাদের লাইব্রেরিটা এ দেশের লোকের কাছে কলকাতা শহরে থেকে গেলে ভাল হত।'

মোহিতা একটু ভেবে চুপ করে থেকে তার পরে নিশীথকে, পিছনের দেয়ালকে, সচ্ছ কাচেব মত যেন মনে করে, অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে নিশীথের চোখের ভিতর নিজের চোখ ফিরিয়ে আনল যেন, হঠাৎ কোনো এক সময় বললে, 'কেন তা সম্ভব হচ্ছে না বুঝতে পেরেছেন হয় তো?'

নিশীথ চিন্তিত মুখে বললে, 'হ্যাঁ পেবেছি, ঘোষ সাহেব যা চাচ্ছেন তা পাচ্ছেন না। কেন তিনি অন্যদের দিকে যাবেন যা তারা চাচ্ছে।'

'এই-ই তো কথা। ওঁর মনের কথা এই। এই মনের ভিতরই ঘোষ সাহেবের আত্মস্থতা।'

নিশীথ এক-আধ মিনিট চুপ করে থেকে বললে, 'টাকাকড়ি তো চাচ্ছেন না ঘোষ; সেটা আমি বুঝেছি—'

'বলেছিলুম টাকাকড়ি ততটা চান না,' মোহিতা কী বলবে না-বলবে একটু ইতস্তত কবে অবশেষে বলে ফেলল, 'চান। কিন্তু মান বেশি চান।'

'সম্মান তো প্রচুর পাচ্ছেন ঘোষ।'

'পাচ্ছেন', মোহিতা একটু থেমে বললে, 'সে রকম পাচ্ছেন না, ইউনিভার্সিটি সার্কেলেও—তেমন পাচ্ছেন কই আর।'

'নিজের কাজ নিযে নিমগ্ন হয়ে থাকবেন নাকি অধ্যাপক সাংসারিক অভাব অনটন মিটে গেলে?'

'আমি তো তাই ভাবতুম।'

'আমরাও তো তাই ভাবতাম, অধ্যাপক ঘোষ সম্পর্কে।'

'তিনি তো আত্মসমাহিত নন।'

'আজকালকার পৃথিবীতে সে রকম আত্মসমাধি ফিরে পাওয়া কঠিন।'

নিশীথ মোহিতার দিকে তাকিয়েছিল। এমন ভাবে যে মোহিতা হয় তো ভাবতে পারত, কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে তাকিয়ে আছে নিশীথ।

'পুরনো পৃথিবীর সেই অধিকার ফিরে পাওয়া কঠিন এখন।'

'সেই চীন সভ্যতার দিন নেই এখন, আর সব রকম বিশৃঙ্খলার থেকে মানুষের মনটাকে সংবরণ করতে জানা, সৌম্য চৈতন্যে সব সময়েই স্থির হয়ে থাকতে পারা; চীনের মতন আমাদেরও যা ছিল, নেই এখন আর।'

নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'নেই। কলকাতা ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে কোনো ডেপুটেশন এসেছিল ঘোষের কাছে?'

'না তো। কেন? আসবার কথা ছিল?'

'কেন আসবে? কী জিনিস সম্পর্কে?'

'আপনাদের এই লাইব্রেরির ব্যাপারটা নিয়ে।'

মোহিতা তার মুখোমুখি দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'না আসে নি। এলেও কিছু হত না। ওরা তা জানে।'

'ভাইস চ্যান্সেলার হ… চেয়েছিলেন কি ঘোষ?'

'কী চেয়েছিলেন তা জানা নেই ঠিক, মানুষ তো চ্যান্সেলার হতেও চায়'—

'সে জিনিস অবিশ্যি ইউনিভার্সিটি কাউকে দিতে পারে না।'

'বড় জোর কনভোকেশনের গাউন দিতে পারে চ্যান্সেলারকে। তাঁর লেখা বক্তৃতা পড়িয়ে শোনাবার জন্য মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে,' মোহিতা হাসতে-হাসতে বললে, হাসি নিবে এলে বললে, 'একটা কিছু হতে চাচ্ছিলেন ঘোষ, কিন্তু এখন কিছু চাচ্ছেন না আর।'

নিশীথ বললে, 'কেমন যেন হ্যাঁচকা মনে হয় আমার—এই ব্যাপারটার সঙ্গে ঘোষ সাহেব লাইব্রেরির ব্যাপাটা কেন জড়িয়ে ফেললেন—'

'তা তো করলেন। ঠিকই করেছেন হয় তো,' মোহিতা সত্যিই যেন নিজের মতের ভিত্তি থেকে একটু না নড়েচড়েই বললে।

'এর একটা বিহিত করুন।'

'আমার শক্তি নেই।'

দু কাপ চা নিয়ে এল রিপেন। দুখানা-দুখানা বিস্কুট। নিশীথেব মুখেব দিকে তাকালই না সে। প্রফেসর সাহেবেব স্ত্রীর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলছে লোকটা, যাকে সে নীচেব তলায় রুখে রেখেছিল অনেক ক্ষণ। কিন্তু রিপেনের মুখে বেকুবির কোনো লক্ষণই দেখতে পে না নিশীথ। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ছেলেটি। দুটো ছোটো তেপয দুজনের সামনে রেখে বেরিয়ে গেল আবার।

'কে এই ছেলেটি?'

'ও নৃপেন।'

'নৃপেন? আমাকে তো বলেছিল ওর নাম রিপেন।'

'নিজের নাম সংক্ষেপ করে নিয়েছে। এম-এ পাশ কবেছে নৃপেন।'

নিশীথ একটু চকিত হযে বললে, 'তাই নাকি? কী বিষযে?'

'ইকনমিকসে, ছেচল্লিশে, সেকেণ্ড ক্লাস পেযেছে, সেই জন্যেই মুশকিল।'

'কিসের মুশকিল?'

'কোনো কলেজে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে।'

'ঢুকিয়ে দিতে পারেন তো প্রফেসর?'

'ঢুকিয়ে তো দিযেছিল। পর-পর তিনটে কলেজে। দুটো গভর্নমেন্ট কলেজে, একটা প্রাইভেটে।'

'তারপর'

'কোথাও পাকাপাকি হল না কিছু।'

'কেন?'

'কী জানি। পড়াতে সুবিধা পায় না হয় তো। এখন মোটর ড্রাইভিং শিখছে।'

'সেটা শিখতে পারলে ছোটখাট প্রফেসরেব থেকে ভাল হবে,' নিশীথ চায়ে চুমুক দিযে বললে, 'প্রফেসর গভর্নমেন্ট কলেজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন রিপেনকে! বেশ তো সুযোগ তা হলে পেয়েছিল

ছেলেটি। প্রফেসরের মত একজন মুরুব্বি ছিলেন। বাঃ।'

দুটো বিস্কুটই খেয়ে ফেলেছে নিশীথ।

'দেখা হবে আজ প্রফেসরের সঙ্গে?'

'হবে।'

'কটা বাজল আপনার ঘড়িতে?'

মোহিতা কব্জি ঘুরিয়ে বলল, 'সাড়ে এগারটা।'

'কটার সময় উঠবেন প্রফেসর?'

'তিনটে নাগাদ। আজ ছুটির দিন তো।'

নিশীথ চায়ের পেয়ালাটা দু-তিনটে চুমুক দিয়ে শূন্য পেয়ালাটা তেপয়ের উপর রেখে দিল।

'আমি গত আট-দশ বছরের ভিতর কয়েকবার বলেছিলাম প্রফেসরকে' নিশীথ বললে, 'কলকাতার কোনো কলেজে আমার একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে।'

'কী বললেন উনি?'

'প্রত্যেকবার বললেন, আমি দেখছি। জলপাইহাটিতে ফিরে গিয়ে প্রফেসরকে মনে করিয়ে দিয়ে চিঠি লিখেছি, দরখাস্তের কপি পাঠিয়েছি কিন্তু কিছুই তো হল না।'

'কেন?'

নিশীথ হাসতে-হাসতে বললে, 'আমার মুখই তো চেনা হল না। অথচ আমারা একসঙ্গে পড়েছি।'

'একসঙ্গে। কোথায়?' মোহিতা একটু চমকে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে।

'একসঙ্গে পড়েছি বলেই তো কলকাতায় এলেই ঘোষের এখানে একবার আসি। খুব মিশুক নই বটে আমি। বেছে-বেছে মানুষ দেখে মেলামেশা করি যে তা ঠিক নয়। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই খুব বড়-বড় কাজ করে, তাদের কারো কাছেই যাই না আমি। ঘোষ কলেজ-ইউনিভার্সিটির কাছেই আছেন বলে তাঁর কাছে আমি আসি। ভারী উৎসাহ ছিল ঘোষ সম্পর্কে এক সময় আমার। খুব কম লোককেই এমন শ্রদ্ধা করেছি'—

'একসঙ্গে পড়েছেন অথচ ওঁকে সেটা মনে করিয়ে না দিলে মনে থাকে না? তাই?'

প্রফেসরের ঘরের আবদ্ধ দরজাটার দিকে মোহিতা তাকিয়েছিল, মোহিতার দিকে তাকিয়েছিল নিশীথ। বললে নিশীথ, 'ওর সঙ্গেই স্কটিশে প'ড়ছিলুম—ফোর্থ ইয়ারে। এক বছর। আগের তিন বছর ঘোষ হয় তো প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিলেন। স্কটিশ থেকে বি-এ পাশ করে আবার প্রেসিডেন্সিতে চলে যান। এক বছর পড়েছিলুম এক সঙ্গে। সেই জন্যেই হয় তো কেমন বাঁধো-বাঁধো ঠেকছে ঘোষেব। তবে স্কটিশে থাকতে বেশ মেলামেশা হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। বিনযেন্দ্র মুখুজ্যে, শুভ্রাংশু বরুন দত্ত, সীতেশ ভটচাশ, সোমেন মহলানবিশ, আমি—খুব মিশেছিলেন তো ঘোষ আমাদের সঙ্গে।;

'এই তো তিনবারের বার দেখা আমাব সঙ্গে'—মোহিতা বললে।

'কার?'

'আপনার।'

'সোজাসুজি মোহিতার দিকে না তাকিয়ে, তার মিহি ঘোমটাব আড়ালে খোঁপার দিকে তাকাল। তার ভুরুর দিকে, টিকলো নাকের দিকে। সমুদ্রফেনাব মত শাড়িটাকে প্রকৃতির সাদা জিনিসেব মত দেখাচ্ছিল, মানুষটির অন্য রকম রঙের প্রেতপরায়ণতার পাশে, প্রকৃতিতে এ রঙ নেই। 'হ্যাঁ গতবাব ঘোষেব ঘরে বসেছিলুম আমরা। অনেক কথা বলেছিলেন আপনি। ঘোষের স্ত্রী যে তা আমি বুঝতে পারি নি, অবাক হয়ে ভাবছিলুম ভারী চমৎকার; জমিয়ে রেখেছে সব-স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে; কেমন সুন্দব বাড়ন্ত গড়ন। বিশেষ কোনো কথা বলছিলেন না ঘোষ। চিনতে পারছিলেন না যেন আমাকে। আমতা-আমতা করছিলেন। বুঝেছিলেন সব আপনি, নিজের কলেজি সতীর্থের মুখোমুখি বসে যে-অস্বস্তি বোধ করছিলাম সেটাকে সহজ করে রাখবার জন্য সজলতার ঘের পরিয়ে দিলেন তো সে দিন আপনি। কথা বলে, হেসে, গল্প করে।'

'এর আগেরবার উনিশশ চুয়াল্লিশে, মে মাসে,' নিশীথ বললে, 'ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, ওঁর ঘরেই বসেছিলুম আমরা তিনজনে। সে দিন বেশি কথা বলেন নি আপনি। খুব চওড়া একটা বই-এর পাশে-পাশে মার্জিনে নোট টুকছিলেন। মাঝে-মাঝে প্রফেসরের কাছে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছিলেন। ভেবেছিলুম প্রফেসবের মেয়ে, কলেজে পড়েন। সকাল বেলা বেশ ঝড়বিদ্যুৎ, অনেক ঠাণ্ডাকালের মেঘ ছিল সে দিন। বৃষ্টি বেশি হয় নি।'

মোহিতা বললে, 'একটা কথা আমি ভাবছি নিশীথবাবু।'

নিশীথের মনে হচ্ছিল, বড় বেশি কথা বলে ফেলেছে সে। কী দরকার ছিল এত কথা বলবার? ঘোষের সহপাঠী যে নিশীথ সে কথা ঘোষ জানলেও তাকে তো এতদিনের ভিতরও একবার জানাতে যায় নি নিশীথ। যে-মানুষ মগডালে উঠে গেছে তাব লেজটা নিয়ে সামলাতে পারছে না বলেই কি তার লেজে হাত দিতে হবে; লেজে মোচড় দিয়ে তাকে টেনে আনতে হবে নীচের দিকে। ঘোষকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না নিশীথের। কেন বারবার করে স্কটিশে একসঙ্গে পড়েছিল সেই অছিলায় তাঁব বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকেও চমকিত করে দিতে আসে নিশীথ? এটা মানুষটাকে বেকায়দায় ফেলে দেওয়া।

যারা পাঁযে হেঁটে বড় লোকের বাড়িতে গিয়ে টুঁ মারে তাদের মত কেমন একটা বেকুব বেআব্রু অন্যায়ের ভিতর ধরা পড়ে গেছে যেন নিশীথ।

'একটা কথা আমি ভাবছি নিশীথবাবু।'

পকেট থেকে ক্যাকটিনা পিলের কৌটা বের করেছিল নিশীথ। মোহিতা এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে যে ঢাকনি খুলতে ইতস্তত করছিল, পিল এখন খাবে না সে। কৌটাটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়ে মোহিতার দিকে তাকাল নিশীথ।

'আপনি কলকাতার কলেজে কাজ চান?'

'চাচ্ছিলাম তো।'

'গভর্নমেন্ট কলেজে?'

'গভর্নমেন্ট কলেজে পাওয়া যাবে না এখন।'

'কেন?'

'বয়স বেশি হযে গেছে।'

'কত বয়স? সাতচল্লিশ? তাতে ঠেকবে না।'

'না, গভর্নমেন্ট কলেজে কাজ নেব না এখন আর।'

'কেন? এখন তো দেশ স্বাধীন। বিদেশী সবকাবেব গোলামি একে তো বলতে পাবেন না আব।'

'বাকি যে-কটা দিন বাঁচি একটু নিজের মনে থাকতে চাই। গভর্নমেন্টের চাকরিতে এখনো মানুষের হাত-পা ঢেব বাঁধা। কলকাতাব কোনো প্রাইভেট কলেজ হলেও চলবে। কিন্তু সেটাও দুর্ঘট।'

'যদি বলেন গভর্নমেন্ট কলেজে কাজ নেবেন, তা হলে প্রফেসরকে বলে দেখতে পাবি।'

'প্রফেসব প্রাইভেট কলেজে পাবে না কিছু?'

মোহিতা আঙুল মটকাতে-মটকাতে বললে, 'চেনেন তো অনককে। নৃপেনেব জন্যে বলেছিলেন। কিন্তু কেন, গভর্নমেন্ট কলেজে ভাল চাকবি পেলে আপনি নেবেন না?'

'ভাল চাকবি কী রকম মিসেস ঘোষ?'

'সুপিরিয়ব গ্রেডে।'

'পাওয়া যাবে কি?'

'প্রফেসর চেষ্টা করলে না-পাবার কিছু নেই তো। গভর্নমেন্ট কলেজে চাকরিতে পেনশন আছে, চাকরির নিশ্চয়তা রযেছে। একবার ঢুকতে পারলে সাংসাবিক দিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে মানুষ।'

নিশীথ তেপয়ের উপব থেকে ক্যাকটিনা পিলেব কৌটাটা তুলে নিলে বললে, 'তা তো ঠিকই', ঢাকনি খুলে একটা পিল খেয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'কিন্তু আমি তো সেকেণ্ড ক্লাস মিসেস ঘোষ।'

'কিন্তু আপনি তো প্রফেসরেব ক্লাসফেলো—অনেক অভিজ্ঞতা আপনাব। সেকেণ্ড ক্লাশেও ঠেকবে না।'

'গভর্নমেন্ট কলেজে চাকরি পাওয়া দুষ্কর।'

'প্রফেসরকে আমি বলবই আপনাকে একটা জুটিয়ে দিতে।'

'প্রফেসরের নিজের কলেজ তো নয়।' নিশীথ হেসে বললে।

'মিনিস্ট্রিতে বিশেষ খাতিরের লোক আছে।'

'প্রফেসরের?'

'প্রফেসরের। অ্যাসেম্বলিতে আছে। উপরে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে।'

ক্যাকটিনা পিলের কৌটোটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়েছিল নিশীথ। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে,

'কিন্তু এটা কি ভাল হবে, মুরুব্বি জুটিয়ে দরবার করে খাতিরের ব্যাপারে পিছু দুয়ার দিয়ে কলেজের সুপিরিয়র গ্রেডে ঢোকা? আর, কী ভাববে তারা, যাদের সঙ্গে কাজ করব আমি? কী মনে করবে প্রিন্সিপ্যাল—কী বলাবলি করবে ছেলেরা?'

মোহিতার চোখে কাচের আবরণের মতই যেন প্রতীয়মান হল ঘরের দেওয়ালগুলোই শুধু নয়, নিশীথ যে বাধা-বিপত্তিগুলোর কথা তুলেছে সেই সবও। সব ভেদ করে মর্মদৃষ্টি তার অনেকদূর চলে গেছে।

'জলপাইহাটির মনের জড়িবড়ি এ সব ভুলে যাবেন নিশীথবাবু।'

'এটা কি জলপাইহাটির মনোভাব?'

'পঁচিশ বছর দেশগাঁয়ের শান্তিতে কাজ করে এসেছেন, আপনি বুঝতে পারছেন না কলকাতা দিল্লির রকমটা। কলকাতায় যদি কাজ করতে চান তা হলে সোজা নাকবরাবর মুখিয়ে চলতে হবে। যা পাওয়া দরকার-টাকাকড়ির কথা বলছি—সেটা পেতেই হবে। দরকার হলেও দশজনের হাত থেকে ছিনিয়ে। নিজেকে রক্ষা করে পরিবারকে রক্ষা করতে হবে। অন্য পাঁচজনের কথা তো পড়েই রইল। নিজের স্ত্রী-সন্তানের চেয়ে নিজেকে বাঁচাতে হবে আগে। এ না হলে কোথায় তলিয়ে যাবেন আপনি নিশীথবাবু।'

নিশীথ বিস্মিত হয়ে মোহিতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অর্জুনের জড় মারবার—'

দরজা খুলে এ ঘরে ঢুকে দাঁড়ালেন প্রফেসর। মোহিতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি এখানে বসে আছ মোহিতা, আমি ভাবছিলুম কোথায় গেলে, বড্ড ব্যস্ত আছি।'

'লিখছ?'

'না, লেখায় এখনো হাত দিতে পাবি নি।'

'এখনো রেফারেন্স ঘাঁটছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, সারাদিনই আজ এই সব চলবে আর-কি।'

'চা?'

'হ্যাঁ চা। তাই ভাবছিলুম, মোহিতা কী করছে? মোটে তো দু কাপ চা খেয়েছি, আরো দু-চার কাপ দাও, ছুটির দিন, তিনটের আগে দরবার ভাঙবে না।'

'কারা আছেন ভিতরে?'

'আছেন, খুব শাঁশাল লোক আছেন। কৈকেয়ী আছেন, কিন্তু নন্দীগ্রামের ভবতও আছেন বাবা, শায়েস্তা করতে তাকে। রামচন্দ্রের চটিজোড়াও আছেন।'

প্রফেসর একবার আড় চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'কী যে এক রামধনু গান বার করেছে', স্ত্রীর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে একটু পিছিয়ে গেলেন প্রফেসর ঘোষ।

'এই যে নিশীথাবু এসেছিলেন তোমাব কাছে,' মোহিতা বলেল।

'কে, নিশীথবাবু', নিশীথের দিকে মুখোমুখি না তাকিয়ে ঘোষ সাহেব বললেন।

'এঁকে চেনো না তুমি, নিশীথ সেন এর নাম, মাঝে-মাঝে আসেন তোমার কাছে। ইনি জলপাইহাটি কলেজের প্রফেসর।'

'ও—'

'বসো, তুমি দাঁড়িযে রইলে কেন?'

'না, আমার বসবার সময় নেই। এখুনি যেতে হবে। তা কী আপনার? আমার কাছে কেন?' নিশীথের দিকে না-ফিরলে না-তাকালেও চলে, স্ত্রীর দিকে ফিরেই বললেন ঘোষ।

মোহিতা বললেন, 'তোমার আগে বসতে হবে, বলতে হবে এঁকে তুমি চেনো কি না।'

'এঁকে আমি দেখি নি তো কোথাও,' ঘোষ একটা সোফার এক কিনারে বসলেন, 'কী নাম আপনার?'

'নিশীথ সেন।'

'নিশীথ সেন?'

'এই নামে কেউ কোনো দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?'

'আমার তো মনে পড়ছে না,' ঘোষ মোহিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কপালে-মুখে দু-চারটে খিচ জাগিয়ে তুলে বললেন।

সূচীপত্রে যান

মোহিতা স্কটিশ চার্চ কলেজের কথা পাড়তে গেল না আর। বিনেয়ন্দ্র মুখুজ্জে, শুভ্রাংশু, সীতেশ ভটচাজের কথা বলতে গেল না। এদের কথা যদি মনে না থাকে ঘোষের, নিশীথকে সে যদি কোনোদিন দেখে না থাকে তা হলে, একচোখা হরিণের লাটের দিকে দাঁড়িয়েছিল পৃথিবীর এ সব জিনিস; দেখে নি এ সব ঘোষ।

মোহিতা বললে, 'নিশীথবাবু কলকাতায় আসতে চাচ্ছেন। কোনো একটা গভর্নমেন্ট কলেজে এঁকে ঢুকিয়ে দিতে হবে।'

'কাকে বলছ তুমি মোহিতা?'

'তোমাকে'।

'কাউকে কোনো কলেজে ঢুকিয়ে দেবার আমি কে?'

'এটা তোমার অতিরিক্ত বিনয়।'

'আমার নিজের কোনো কলেজ আছে?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে মোহিতা বললে, 'এঁর জন্য কারু কাছে তোমার খোশামোদ করতে হবে না। নিশীথবাবু কৃতী মানুষ।'

নিশীথ বললে, 'আমি সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ—'

প্রফেসর উঠবার উপক্রম করে বললেন, 'কলেজে কাজ করতে গেলে তো

আমাদের ইউনিভার্সিটির ফার্স্টক্লাস ডিগ্রি থাকা চাই-ই, তা ছাড়া—'

মোহিতা বাধা দিয়ে প্রফেসরের কথা কেটে ফেলবার চেষ্টা করে বললে, 'কোন ক্লাস পেয়েছে তা দিয়ে টিচারের গুণ যাচাই করবার মত মনের ঢিলেমি তোমার নিশ্চযই নেই।'

বাধা দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'আছে।'

'আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

মোহিতা বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'নিশীথবাবুব পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে কলেজের কাজ করবার—'

প্রফেসর মোহিতার কথা শেষ না-করতে দিযেই বললেন, 'বেশ ভাল জিনিস, কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পেলে আরো ভাল হত।'

'এ কেমন কথা হল? এ কথা আমাদেব কোন দিকে নিযে যায?'

'ফার্স্টক্লাশ ডিগ্রি থাকলেই ঠিক হত,' প্রফেসব বললেন, 'শুধু পঁচিশ বছরেব অভিজ্ঞতা আমাদের বিশেষ কোনো দিকে নিয়ে যায না।'

'কী মূল্য আছে এ সব ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাসের?' মোহিতা যেন সিংহের উপর লাফিযে দাঁড়িযে বললে, 'যেন মহিষাসুর এ সব ইউনিভার্সিটিব ফার্স্টক্লাশ ডিগ্রিগুলো।'

প্রফেসর হেসে বললেন, 'নেই? সেকেণ্ড ক্লাসের বুঝি বেশি জেল্লা?'

'মূল্যের কোনো যাচাই হয় না আমাদের দেশে।'

প্রফেসর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার ভিতরে কাজ আছে।'

'নিশীথবাবুকে তো তুমি কোনো কথা দিলে না।'

'নিশীথবাবু আর-একটা এম-এ দিন। ইংরেজির টিচার, হ্যাঁ, তবে ইংবেজিতেই দিন। একটা ফার্স্টক্লাশ জোগাড় করুন, ফার্স্ট না হলেও হবে।'

প্রফেসর কারুর দিকে না-তাকিয়ে নিজেরই জ্ঞান-শালীনতার হিম্মতে তৈরি বাড়ির বিচিত্র গালচেগুলোর দিকে, মেঝের ভিত্তিরেখাগুলোর স্বর্গীয় জ্যামিতির দিকে, তাকাতে-তাকাতে বললেন।

মোহিতা আগে একটু উত্তেজিত হয়েছিল, এইবারে ঠাণ্ডা স্থিরতায ফিরে এসেছে; আস্তে-আস্তে বললে, 'উনি কৌটো খুলে ক্যাকটিনা পিল খাচ্ছেন, আমি দেখলুম। হার্টে অসুখ নিশীথবাবুর। এই বয়েসে এই শরীর নিযে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্টক্লাশ পেলে তবে তোমরা ওঁর সম্বন্ধে চিন্তা করবার সুযোগ পাবে? তোমরা এক-একটা বড়-বড় প্রতিষ্ঠান অধিকার করে আছ বলেই এত,অবাস্তব হযে পড়েছ?'

প্রফেসর মোহিতার কথা শুনছেন বলে মনে হল না।

'আজকাল ইংরেজির দাম কমে যাচ্ছে,' প্রফেসর বললেন, 'কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজির বিশেষ কোনো দরকার থাকবে না। বাংলা তো রাষ্ট্রভাষা হল পশ্চিমবাংলায, নিশীথবাবু যদি সাহিত্যের টিচার

সূচীপত্রে যান

থাকতে চান তা হলে বাংলায় এম–এ দিয়ে ফার্স্টক্লাশ পেলে সুবিধে হবে তাঁর।'

নিশীথ খুব একটা তামাসা বোধ করে বলে, 'আমার নিজের জন্য আপনার কাছে আসি নি প্রফেসব ঘোষ। এসেছিলুম আর–একজনের জন্য। আমাদের কলেজের নয়ন দত্ত ইংরেজিতে ফার্স্টক্লাস্ব! কলকাতার কোনো কলেজে কাজ চাচ্ছে সে; আপনি তাকে ঢুকিয়ে দিলে বড্ড উপকার হয়।'

প্রফেসর মোহিতার দিকে তাকালেন; মোহিতার মুখে থমথমে প্যাঁচ কষার বা লেগ পুলিঙের কোনো আভাস দেখতে পেলেন না; নিশীথের দিকে তাকাতে গেলেন না তিনি। একটু তাল কেটে গেছে যেন; প্রফেসর একটা হাই তুলে বললেন, 'ফার্স্টক্লাস, কী পজিশন'?

'সেকেণ্ড'।

'ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হলেই তো ভাল হত নয়ন দত্তের,' মোহিতা একটু সুড়সুড়ি দিয়ে যেন বললে।

'ওদের বারে যে ফার্স্ট হয়েছিল সে সুসাইড করেছে,' নিশীথ আক্ষেপ করে।

'কেন, সে ট্রাভেলিং ফেলোশিপ পায় নি বলে?' কে যেন বললে।

'না ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল সেই উত্তেজনায়।'

মোহিতা বললে, 'যে ফার্স্ট হয়েছিল সে এখন নেই আর। নয়ন দত্ত তা হলে সত্যিই ফার্স্ট এখন। ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট নয়ন দত্ত। ওকে চোখ বুজে চাকবি দিতে পার তুমি। নিশীথবাবুকে কথা দাও তা হলে।'

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন, 'না, নয়ন দত্তকে ফার্স্ট বলতে পারা যায় না, যে ফার্স্ট, সে মবে গেলেও সেই তো ফার্স্ট হয়েছিল। নয়ন দত্ত সেকেণ্ড। নয়ন দত্ত যদি ফার্স্ট হতে চায়, তা–হলে আবার এম–এ দেবার দরকার তাঁর।'

মোহিতা নিঃসহায়ভাবে হাসতে–হাসতে বললে, 'মানুষ এইই করবে বসে–বসে? কেবল এম–এই দেবে।'

প্রফেসর কারু কথা কানে না তুলে কিছুই গায়ে না মেখে, কারুব দিকে না তাকিয়ে, চোখ দুটো সিলিঙের দিকে তুলে গম্ভীবভাবে, আস্তে–আস্তে বললেন, 'নয়ন দত্ত ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাশ। কিন্তু ইংরেজির গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। কযেক বছরের মধ্যে ইংবেজিব আর–কোনো টিচারের দরকার হবে না কলেজে। কলেজে কাজ করতে হলে নয়ন দত্ত ইকনমিক্সে কিংবা বাংলায ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হযে নিক।'

'তা হবে নয়ন দত্তর,' মোহিতা বললে, 'কিন্তু ইংরেজি নাকচ হতে এখনো দেরি আছে, নয়ন দত্তকে কলকাতার কলেজে একটা ভাল কাজ দাও তুমি।'

'নয়ন দত্ত ক বছর কাজ করেছে নিশীথবাবুদের কলেজে?'

'একুশ বছব।'

'এতদিন পড়েছিল কেন ও–বকম একটা কলেজে?'

'মফস্বলে শান্তি সুস্থিরতা আছে। ভাল মনে হয়েছিল সেটা।'

'কলকাতায় আসতে চাচ্ছে কেন?'

'মফস্বলে উন্নতি হচ্ছে না। জীবন বড্ড থোড় বড়ি খাড়া হযে পড়েছে। কলকাতায নানা রকম সম্ভাবনা আছে। বড়–বড় লাইব্রেবি, স্টাডি সার্কেল, সভা–সমিতি আছে—জীবনটাকে জ্ঞান, সংকল্প, সামাজিকতার দিক দিযে—'

'বাধা দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ভাইস চ্যান্সেলাবকে গিযে ধরুক।'

'কে?'

'নয়ন দত্ত।'

'কিসের জন্য?'

'কলকাতার কোনো কলেজে কাজ ঠিক করে নেবার জন্য। আমি তো ভাইস চ্যান্সেলার নই।'

'বেশ তো নয়ন দত্ত, যাবে নয়ন দত্ত ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে, তুমি নিশীথ–বাবুর জন্যে একটা কিছু ঠিক করে দাও।'

'নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম–এ।'

'কত সেকেণ্ড ক্লাশ এম–এ প্রফেসরি করছে, থার্ড ক্লাশ এম–এদের ভিতর প্রিন্সিপাল আছে,' মোহিতা বললে।

'নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম–এ,' বললেন প্রফেসব।

এর চেয়ে বেশি কিছু বলার মিছে পুনরুক্তির ভিতর গেলেন না তিনি। তারপর প্রফেসর উঠে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু নৃপেনও তো সেকেণ্ড ক্লাশ ছিল, তাকে তুমি কী করে ঢোকালে কলেজে?'

'আমি ঢুকিয়েছি? নৃপেনকে তো মিসেস কেসি কাজ ঠিক করে দিয়েছিলেন গভর্নমেন্ট কলেজে। নৃপেন মিসেস কেসিকে তো সেকালের পট ও অবন ঠাকুর আর তার স্কুল বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলা ছবির পটল-চেরা পীঠস্থানে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ফলে তিনি ঢুকিয়ে দিলেন বড় কলেজে নৃপেনকে।' .

'সে কলেজের কাজ যখন গেল নৃপেনের, তখন তো মিসেস চলে গেছেন ভারতবর্ষ থেকে। নৃপেনকে আর-একটা গভর্নমেন্ট কলেজে ঢুকিয়েছিল কে?'

প্রফেসর একটা ঢেকুর তুলে বললেন, 'সেটা নিজের চেষ্টা-তদ্বিরে জোগাড় কবে নিয়েছে নৃপেন।'

'নিজের তদ্বিরের জোরেই ঢোকে সকলে,' মোহিতা বিমুগ্ধ হয়ে বললে, 'যদি ঘোষ সাহেবের সঙ্গে চুক্তি করা থাকে। কী, হবে নাকি চুক্তি আমাদেব সঙ্গে?'

'কিসের চুক্তি?'

'নৃপেনের সঙ্গে যা হয়েছিল'—

প্রফেসব স্পষ্ট শান্ত মেজাজে বললেন, 'ভাইস চ্যান্সেলারেব সঙ্গে দেখা করুক নয়ন দত্ত।'

'আর নিশীথবাবু?'

'নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ।'

'তুমিও তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ,' মরীযা হযে বললেন মোহিতা।

'নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ,' প্রফেসর একটু কাঁধ নাচিযে হেসে নিজের ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন।

'উনি কি সেকেণ্ড ক্লাশ? প্রফেসব ঘোষ সেকেণ্ড ক্লাশ?' জড়বুদ্ধির মত নিশীথ মোহিতাকে জিজ্ঞেস করল।

'আপনারা তো একসঙ্গে পড়েছিলেন; জানেন না?'

'উনি আমাদের সঙ্গে এম এ পবীক্ষা দেন নি। সেবাব কী অসুবিধা হযেছিল। তৈবি করে উঠতে পাবেন নি। আমাদেব পবের বাব, নাকি তার পবেব বাব দিযেছিলেন। আমি তখন কলকাতা ছেড়ে চলে গেছি। তার পর থেকে ইউনিভার্সিটিব কোনো খোঁজখবর বাখি নি আমি। সেকেণ্ড ক্লাশ। আচ্ছা উঠি মোহিতা দেবী, দুপুব হযে গেছে। বেঁচে থাকলে আবার আসব। যারা নীচে পড়ে আছে, ঠিক সময ঠিক কাজ কবতে পাবে নি, দেবি করে ফেলেছে, সমযেব সঙ্গে নিজেদেব মানিযে নিতে পাবে নি, তাবা কুড়ি-পঁচিশ বছর পবে আজ একটা অদ্ভুত পৃথিবীতে পাক খাচেছ।'

'সে পৃথিবীটাকে কি ভাল কবতে হবে?'

নিশীথ একটু চমকিত হযে মিসেস ঘোষেব দিকে তাকাল। এ বকম কথা উনি জিজ্ঞেস করছেন মনেব বিলাসিতায নয, স্বাভাবিকতায। মোহিতা দেবীর চোখ, মুখ, গলাব আওযাজ অনুভব করছিল নিশীথ। মোহিতাকে ঘোষ হয তো বলবেন প্যাথলজিব কেস। কিন্তু তা নয। তা নয। প্যাথলজিব কেস ঘোষ নিজেই হয তো। কিন্তু নির্মল রাষ্ট্রসমাজেব দিকে চোখ বেখে শুদ্ধ মন নিযে কোথায সে বিজ্ঞানী, ঘোষ সাহেবেদেব যে পরীক্ষা করে দেখবে। দেখলে হত। ঘোষ ঘোষই থেকে যাবে হয তো, শিক্ষাদীক্ষা কলেজ-ইউনিভার্সিটির শীর্ষে বসে থেকে। কিন্তু শীর্ষে বসে থাকবাব জোব কমে যাবে ভবিষ্যৎ ঘোষদের। জোর বেড়ে যাবে ভবিষ্যৎ নিশীথ সেনদের। ক্রমে-ক্রমে বাষ্ট্রের গ্লানি কেটে যেতে থাকবে উত্তরোত্তর এই পরিচ্ছন্নতার পথে চলে; সত্যিই প্রাণ ঘন হযে উঠবে জীবন।

'পৃথিবীটাকে ভাল কবা কঠিন। সময সাপেক্ষ। পাঁচ, সাত, এক হাজার বছর তো লাগবেই। তারপব কী হবে বলতে পারা যায না। আমার ছেলে হারীত তো বিপ্লবের চেষ্টা কবছে।'

'কত বড় ছেলে আপনার?'

'উনত্রিশ-ত্রিশ হবে।'

'কী কাজ করছে?'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজ।'

'ও কোনো চাকরি করছে না?'

'না।'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড আপনার বাড়িতে বসে?'

'না, আমার সঙ্গে থাকে না।'

'কোথায় আছে?'

'কলকাতায়ই। জানি না। আমার সঙ্গে দেখা করে না।'

'কেন করবে? রক্ত বিপ্লব করছে। নিজেই মারা পড়বে রক্তে রক্তাক্ত হয়ে?'—মোহিতা গলা নামিয়ে নিয়ে বললে, 'ও-সব বারীন ঘোষ কানাইলালের দিন নেই তো আজকাল, দেশ স্বাধীন হয়েছে। বিপ্লবের দরকার নিশীথবাবু। দেখছেন তো ভাবগতিক সব চারদিকে। দরকার বিপ্লবের, বেশ বড় রকমের। কিন্তু মহাত্মাজির মত অহিংস বিপ্লব করুক হারীত।'

'কোথায় পাচ্ছি হারীতকে মোহিতা দেবী?'

'দেখাই দেয় না?'

'না।'

'দেখা হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন তো?'

'নিশ্চয়। নিশ্চযই পাঠিয়ে দেব,' নিশীথ বললে।

'পৃথিবীর ভাল হবে না নিশীথবাবু?'

'ঘোষ কী বলেন?'

'উনি বড় ব্যস্ত আছেন ক্যাবিনেটে কাজ পাবার জন্যে।'

'কোন ক্যাবিনেটে?'

'কোনো একটায়—'

নিশীথের পাঞ্জাবির গলা খোলা ছিল এত ক্ষণ। গলাব বোতাম আঁটতে-আঁটতে বললে, 'আমাব মনে হয় মানবসমষ্টির মঙ্গল হবে, এ রকম একটা ধারণা নিযে ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট দুর্দশা চলবে আরো অনেকদিন নানা রকম, তেজি মন্দি গভর্নমেন্টের মারফৎ, বিপ্লবের রক্ত বিপ্লবের মারফৎ। মানবের ভাল মুখে-মুখে চাইবে হয তো অনেকে। মনে চাইবে না মুখেও চাইবে না কেউ-কেউ। ব্যক্তি ধ্বংস হযে যেতে থাকবে অনেক দিন।'

'নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না ব্যক্তি?'

'অসম্ভব অসম্ভব।'

'কেন?'

'কী সে চায় তা জানে না; অব্যবস্থিত মন; তাব প্রতিনিধি হযে কেউ দাঁড়ায না; অন্যদের প্রতিনিধিকে ভোট দিযে আসতে হয। এ তো গেল স্থিতিভিত্তির সময়ে। রক্ত বিপ্লবের সময়ে ব্যক্তিও বিপ্লব করে; আগুন দেখে মাছি যেমন করে। দিনরাত ব্যক্তি নিপাত হযে যাচ্ছে। মানুষের শেষ দিন পর্যন্ত যদি একরম হয় তবে আশ্চর্য হব না।'

মোহিতা দ্বিধা প্রকাশ করে বললে, 'আপনি যা বলেছেন সেটা হয তো সত্য, হয তো তা নয। কিন্তু সত্য হলেও সেটাকে এ রকম কালি মাড়িযে দেখানো কি উচিত?'

'আপনার কাছে জিনিসটা অন্ধকারবাদ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তবুও চোখের সামনে অনবরত তো ব্যক্তি নষ্ট হচ্ছে; শেষ হয়ে যাচ্ছে। দেখে শোক করবার মত লোক কই। সেও তো রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে।'

'আমি আছি আর ঘোষ আছে; রক্তাক্ত হই নি এখনো,' মোহিতা হাসতে গিযে ভিতর থেকে আটকে রাখতে-রাখতে বললে, 'ব্যক্তি মানে কি ব্যক্তিসাধারণ?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো পার্টিতে নেই তারা?'

'কোন পার্টিতে, নেই, থাকতে নেই।'

'এ রকম ব্যক্তি হিসেবেই তো দাঁড়িয়ে আছেন আপনি?'

'হ্যাঁ,' নিশীথ বললে, 'আমাদের সংখ্যা পৃথিবীতে শতকরা পঁচানব্বই জন।'

'এ রকম ভাবে নিজেকে ধ্বংস হযে যেতে দেবেন?'

'শতকরা পাঁচ জন তো বাঁচছে,' নিশীথ বললে, 'বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব খুব। আমার এ চেষ্টা ব্যক্তিসাধারণেরই চেষ্টা সেটা অনুভব করি। বেঁচে থাকলে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে, হারীতের

মত নয়, অন্য ভাবে, দরকার হলে দৃঢ়ভাবে, কিন্তু রক্তারক্তি করে নয়; গান্ধীজির মত মনের মূল নির্মলতা ও নিরন্তর সৎ প্রেরণার দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়ে। ও জিনিস অনেকরই নেই, কোনো দিন হবে না। কিন্তু তবুও,' নিশীথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'ভাল জিনিস হতে পারে পৃথিবীতে।'

মোহিতা বলছিল না কিছু, নিশীথ আরো কিছু বলবে ভেবে প্রতীক্ষা করছিল।

'কিন্তু সময় লাগবে, আমরা বেঁচে থাকতে কিছু দেখে যেতে পারব না।'

'আপনি তো বলছেন এক হাজার বছরও লেগে যেতে পারে মানুষের ভাল হতে—'

'এক হাজার-দু হাজার-মিশরের ফ্যারাওদের সময় যে-লোকগুলো কষ্ট পাচ্ছিল তারা আজকের উনিশশ আটচল্লিশের পৃথিবীটাকে দেখবার সুযোগ পেলে ভাবত না কি! হাজাব-হাজার বছর পরেও এ রকম। কী হবে তবে মানুষের, কবে হবে?'

'কবে হবে তা হলে?'

বলবার ইচ্ছে ছিল, কথা বলবার ইচ্ছে ছিল আবো ঢের, কিন্তু নিশীথকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে মোহিতা বলল, 'হবে-হবে, আজই হবে এই কথাই ভাবে মানুষ, এই কথা ভেবেই জোর পেয়ে কাজ করে।'

প্রফেসর ঘোষেব বাড়ির থেকে নিশীথ যখন বেরিয়েছে তখন প্রায় একটা বাজে। কলকাতায অনেকগুলো ভাল-ভাল বড়-বড় কলেজ। ইচ্ছে কবলে ঘোষ তাকে কোনো একটা ভাল কলেজে ঢুকিযে দিতে পারত, খুব বেশি বেগ পেতে হত না ঘোষেব। পুরনো সহপাঠী হিসেবে নয়, কোনো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আশা করে নয়, এমনিই নিশীথের নিজেব কলেজি অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বেব গুণে প্রফেসর অভযেন্দ্র মোহন ঘোষের দক্ষিণমুখ নিশীথের দিকে ফেরানো হোক এটা আশা করেছিল নিশীথ।

খুব বড় ফার্স্ট ক্লাস বা বিলেতি ডিগ্রি না থাকলে শুধু পড়াবার গুণপনায কলকাতার কোনো কলেজে ভাল কাজে ঢোকা কঠিন—অসম্ভব—প্রফেসর ঘোষের মতন মুরুব্বি ছাড়া। কিন্তু প্রফেসব কিছু করবেন না। আর কোনা দিকপাল সহপাঠী নেই নিশীথের কলেজ ইউনিভার্সিটি লাইনে। মামা নেই, শ্বশুব নেই—কোনো মুবব্বি নেই এ দিকে; কলেজে ঢোকা কঠিন, অসম্ভব। ভবানীপুরের দিকে একটা বাস যাচ্ছিল, চড়ে কুলদাপ্রসাদেব বাড়ির কাছে গিযে নামল নিশীথ। ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে; কুলদাকে ডেকে পাঠাল।

'কে তুমি, নিশীথ নাকি? কলকাতায এলে কবে?' একটা আধমযলা সোফায আঁট হযে বসে কুলদা বললে।'

'এই তো কযেক দিন।'

'কোথায আছ আজকাল? কোন কলেজে?'

'মফস্বলেব কলেজেব কাজ ছেড়ে দিযেছি। কলকাতাব কোনো একটা কলেজে কাজ পেলে ভাল হয কুলদা।'

কুলদাপ্রসাদ নিশীথের সঙ্গে একেসঙ্গে পড়ে নি কোনোদিন, কুলদার সঙ্গে নিশীথেব আলাপ অনেকদিন—অন্য সূত্রে। নিশীথেব চেযে দু বছবেব ছোট কুলদা। কলকাতাব একটা বড় কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সে। কলেজের কলকাঠি সব কুলদার হাতে। প্রিন্সিপ্যাল হবাব সম্ভাবনা আছে কুলদার, গভর্নিংবডির খুব ঘোড়েল মেম্বার সে।

কুলদা হতচকিত হযে বললে, 'কেন কলকাতায আসতে হচ্ছে কেন, বেশ তো ভাল ছিলে মফস্বলে।'

'যাবে তুমি মফস্বলে কুলদা?'

'কেন, আমার যাবার কী?'

'খাওযা-দাওযা হযেছে কুলদা? বেলা করে তোমার বাড়িতে এসেছি, দেড়টা বাজে।'

'এই তো খেলুম, ছুটিব দিন আজ, দেরি হযে গেল।

নিশীথ খেয়েদেযে এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল কুলদা। কলকাতার এ সব লোক কতকগুলো বিশেষ জিনিস এই রকমই ভুলে যায—জানে নিশীথ। 'অথচ, ঠিক টাইম মত খাওযা না হলে চলে না আমাব।'

নিশীথ বললে, কুলদার অনাতিথেযতাকে বেশ সেযানাব মত তুড়ি দিযে উড়িয়ে দিযে, 'সাড়ে দশটার সময বেরিযেছি বাড়ি থেকে, ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, মাংসের চচ্চড়ি, আবার আমসত্ত্বের

টক—আর ছ্যাঁচড়া খেয়ে। ভাল খাওয়া-দাওয়া চাই, চব্বিশ-পঁচিশ বছর তো প্রফেসরি করলুম—'

কুলদা একটু ওজন করে নিশীথের দিকে তাকাল, আগাপাশতলা তাকিয়ে দেখল, লোকটা কিছু জমিয়েছে বটে মফস্বল কলেজে ভিটকেলেমি করে টিকে থেকে। মফস্বলে টাকা জমাবার সুবিধে ঢের, ভাবছিল কুলদা; কলকাতায় কত খরচ। মোটে সাতচল্লিশ হাজার টাকা আছে কুলদার ব্যাঙ্কে। তিনটে লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি আছে পঁচিশ হাজার টাকার। প্রফিডেণ্ড ফাণ্ডে আছে বটে কিছু টাকা। সব টাকাই তো কলেজের মাইনে থেকে নেওয়া নয়—আরো কত রকম ধড়িবাজি করতে হয়েছে তাকে।

'সাড়ে দশটার সময় বেরিয়েছ বদ্রিনাথের খ্যাঁট মেরে,' বললে কুলদা, ' ঐ ইজি-চেয়ারটায় উঠে বসো, দুদিন ধরে ডি-ডি-টি দিয়ে ছারপোকা মেরে চেয়ারটা ঠিক করেছি। কোথায় আছো কলকাতায়?'

ইজিচেয়ারে বসে নিশীথ বললে, 'আছি বৌবাজারে ফিয়ার্স লেনে।'

'ফিয়ার্স লেনে? জায়গাটা বেছে নিয়েছ বটে।'

'এখন তো দাঙ্গা নেই।'

'কী রকম হালচাল এখন ফিয়ার্স লেনে?'

'এখন আর-কী, সব সাপ কেঁচো হয়েছে।'

'আর যারা কেঁচো ছিল?'

'খুরকিনা মাছ হয়ে গেছে?'

'হয়েছেই তো। দেশ স্বাধীন হয়েছে।'

'স্বাধীন বলে স্বাধীন,' নিশীথ পায়ের উপর পা চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'বৌবাজারেব বাজারে যা কিনি তাই ঝাল, যা রাঁধে তাই খ্যাঁট। এমন খ্যাটনদার করে দিয়েছে আমাকে আমার বাবুর্চিবা।'

কুলদা একটা সিগারেটে মুখে দিয়ে বললে, 'এই তো ভাল, মফস্বলে কাজ কবে গবমেব ছুটিতে কলকাতায এসে ফুর্তি করা। কেন বার মাস কলকাতায এসে পচে মরতে চাইছ?' মুখের সিগাবেটটা জ্বালিয়ে নিল কুলদা।

নিশীথেব দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে কুলদা বললে, 'কী রকম বাঁধলে-টাঁধলে মফস্বলে কাজ করে?'

'পঁচিশ হাজার।'

'বাঃ, বাঃ, মওকা! বেশ ফেঁদেছ বেটাচ্ছেলে। কোথায বেখেছ টাকা, পাকিস্তান ব্যাঙ্কে?'

'না, কলকাতায। লযেডসে।'

'লযেডসে!' কুলদা একটা মিহি ছুঁচ ফুঁড়ে নিশীথেব দিকে তাকায, 'কেন, বিলিতি ব্যাঙ্কে বাখতে গেলে কেন? কী ইন্টারেস্ট দেয ওরা? সুদের জন্যেই আমাদের এত বড়-বড় দিশি ব্যাঙ্ক বযেছে সব।' কুলদা সিগাবেটে চোঁ-চোঁ টান মেরে ধোঁযাব হুড়োহুড়িব থেকে নিজেব চোখ দুটোকে বাঁচাবাব চেষ্টা কবতে-করতে বললে।

'লযেডসে রেখেছি তাব একটা কাবণ আছে। ওতে টাকাটা জমা থাকবে, টাকায হাত পড়বে না সহজে।'

'কেন?'

'ও-সব ব্যাঙ্কে ঢুকে টাকা তুলবার মত মনের জোব আমাব নেই। ঢুকতেই ভয করে। কী যেন কী মনে ভাবে, ব্যাঙ্ক লুট কবতে এসেছি নাকি। থমথমে ভাব। আমি আট-দশ বছব আগেব কথা বলছি। এব ভেতবে আর ঢুকিনি লয়েডসে। খুব বেশি মরীযা না হলে ও-সব ব্যাঙ্কে ঢুকে টাকা তুলবাব কোনো তাগিদ থাকে না। টাকাটা বাঁচে,' নিশীথ নিজের হাতের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল, 'এই বকম করে পঁচিশ হাজার টাকা জমিয়েছি। না হলে পঁচিশ টাকাও আমাব থাকত না। বড্ড খবচের হাত আমার। পথে দাঁড়াতে হত আমাকে।'

কুলদা বললে, 'ক-বছর চাকরি হল তোমার কলেজে?'

'চব্বিশ-পঁচিশ বছর।'

'কী-ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়েছ নাকি?'

'এইবাবে হব।'

'কত মাইনে ওখানে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের?'

'তিনশ, ডি-এ পঞ্চাশ।'

'বেশ তো, খুব ভাল তো, বেশ ঢালাও হাত তো তোমাদেব কলেজ কর্তৃপক্ষেব?' কুলদা আড় চোখে

তাকিয়ে বললে। কেমন যেন একটু মফস্বলিদের শ্রীসচ্ছলতায় কাতর বোধ করে। সিগারেট টানতে লাগল।

'এইবারে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হবে?'

'হ্যাঁ।'

'তার পরে প্রিন্সিপ্যাল?'

'সেটা বলতে পারি না।'

'কেন বলতে পারবে না নিশীথ? ভাইস হতে পারলে আপসে হয়ে যাবে; কে ঠেকাবে তোমাকে? কত মাইনে প্রিন্সিপ্যালের?'

'পাঁচশ টাকা—'

'ডি–এ?'

'পঞ্চাশ—'

'থাকো, মফস্বল কলেজে থাকো; কলকাতায় এসে কোনো লাভ নেই। আমি তো ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়েছি, মোটে চারশ পঁচাত্তর টাকা মাইনে আর একশ টাকা আন্দাজ অ্যালাউন্স আছে কলেজ পেটান দু-চারটে বকলম সেঁটে দিই বলে। ওতে কি আর চলে কলকাতার মত শহরে'—

'চালাচ্ছ তো বেশ তুমি, বাড়ি তো করেছ ভবানীপুরে।'

'এটা ভাড়াটে বাড়ি, আমার নিজের বাড়ি টালিগঞ্জে।'

'বাড়ি তো করেছ।'

'তা এতদিন কলকাতায় আছি, বাড়ি এমনই হয়ে যায়, চারশ পাঁচত্তর টাকা করে কাঠা কিনেছিলুম টালিগঞ্জে উনিশশ বত্রিশে, সে কাঠা এখন চার হাজার সাতশ বিবানব্বই টাকায় বিকোচ্ছে। বার হাজার টাকা লেগেছিল আমার বাড়ি করতে।'

'কেন, নিজের বাড়ি ছেড়ে এ বাড়িতে আছ?'

'আছি, কলকাতায় থাকতে হচ্ছে বলে।'

'তার মানে?'

'বদমায়েসি না করে কলকাতায় টিকে থাকা যায় না'—

'এ বাড়িতে বদমায়েসি করবার সুবিধে কুলদাপ্রসাদ?'

'লোচ্চামি? না, আমি সে কথা বলছি না, সে আলাদা; সে হবে এখন পরে; এই যে ললিতা'—

'কী বলছ কুলদা?'

একজন ফর্শা, লম্বা, ভারী নিখুঁত শরীরিনী ঘরে ঢুকে কুলদাকে ঘেঁষে দাঁড়াল; দাঁড়িয়েই কুলদার মাথার চুলের ভিতর হাত চলে গেল ললিতার; পাকা চুল বাছবার চেষ্টা হয় তো; নাকি বিলি কাটা হচ্ছে? নিশীথের দিকে তাকিয়ে দেখছিল ললিতা, মেয়েটি সপ্রতিভ তো নিশ্চয়ই-বেশ সহজও বটে।

কুলদাও কম স্বাভাবিক নয়, 'আমাদের দু জনকে দুটো পান এনে দাও তো ললিতা।'

'ইনি কে?' নিশীথের দিকে তাকিয়ে ললিতা বললে।

'আমিও ভাইস, ইনিও ভাইস।'

'ভাইস? কোন কলেজের?'

'মফস্বলের।'

'মফস্বলের? কোথায়, কেষ্টনগরের?'

'আহা, না ললিতা, সবাই কি কেষ্টনগরের জিনিস হবে, তুমি নিজে কেষ্টনগরের পুতুল বলে; আহা, চুলে টান মারছ কেন? আঃ ললিতা!'

'মফস্বলের কোন কলেজের?'

'আছে এক কলেজের। পদ্মার পারে। পাকিস্তানে। তুমি দেখেছ কোনোদিন পাকিস্তান?'

'আমি কি করে দেখব পাকিস্তান কুলদা? আমি ঘুঘুডাঙ্গা পেরিয়ে গেলুম না কোনোদিন। আমার খুব ইচ্ছে করছে, আমাকে নিয়ে যাবে পাকিস্তানে? এই ঝিমিয়ে পড়েছে—এই কুলদা।'

কুলদার কানের ওপর একটা মিঠে ঘুঁষি মেরে ললিতা বললে, 'চুল বিলি কাটছি আর ঘুমিয়ে পড়ছ, এই কালনাগ! বেহুলার ঘরে ঢুকে—'

'আমাকে দুধরাজ বলো ললিতা।'

সূচীপত্রে যান

'এই দুধরাজ! বেহুলার ঘরে ঢুকে—'

নিশীথ বললে, 'আপনি ঘুঘুডাঙ্গার বাইরে কোনোদিন যান নি?'

'আমি কেষ্টনগরের মেয়ে, কলকাতায় আছি আজ বিশ বছর ধরে। কোথাও যাব না আমি কলকাতা ছেড়ে।'

'পাকিস্তানে যাবে ললিতা?'

'তুমি নিয়ে যাবে?'

'নিশীথবাবু নিয়ে যাবেন। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, চাও তো ভোগবতী, ঘুরিয়ে আনবেন। ঝুলে পড় নিশীথবাবুর সঙ্গে।' কুলদা ঘাড় হেঁট কবে মাথার চুল সব ছেড়ে দিয়েছিল ললিতাব হাতে, 'মাথাটাকে ফিঙের ঠ্যাং ঝিঙের ক্ষেত করে ফেলেছে ললিতা।'

ধীরে-ধীরে মাথা তুলে খোঁয়ার ভাঙার মত চারিদিকে তাকাতে লাগল কুলদা। চাব-পাঁচদিন কলেজ ছুটি; এর পর গরমের ছুটি এসে পড়বে। কেমন যেন ছুটির, ঢিলেমিব, সোহাগেব বেশ কোকেনের মত কঁকিয়ে-ঝিমিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে কুলদাব শরীরে ও তার রক্তের কণিকাগুলোতে।

'এই দুধরাজ।' আর-একটা ফিনফিনে ঘুঁষির ফিনকি ভাইস-প্রিন্সিপ্যালেব কানেব উব গিযে পড়ল। একেবারে ভিরমি খেযে পড়বাব গতিক হতে-হতে সত্যই ভিবমি খেযে পড়ল যেন কুলদা, গ্যাজাখোবেব মত চোখ লাল কবে, গোলকবে, নক্সা কবে নিশীথেব দিকে ঠিকবে মারতে-মারতে।

'যাও প্যান ন্যোসো ন্যে সো ললিতা' বললে কুলদা শবীবটাকে একটু ছাউ নাচ নাচিযে, বর্ষাকালেব মিষ্টি কুমড়ো ক্ষেতের চিংড়ির চোখ মেবে ললিতার দিকে।

'না আমি পান আনব না, তুমি বলো পাকিস্তানে নিয়ে যাবে আমাকে'।

'নিয়ে যাব।'

'কবে?'

'কলেজ ছুটি হলেই।'

'নিশীথবাবু আমাদেব পথ দেখিযে দেবেন তো? সান্তাহাব পেবিয়ে গেছ কোনোদিন ও লাইনে?'

'সান্তাহার নয়, বনগাঁ দিয়ে, নাকি নিশীথবাবু? এ লাইনে বনগাঁব পবই তো পাকিস্তান আবম্ভ হল?'

'হ্যাঁ। বনগাঁ লাইনে না গিয়ে—'

'না। আমবা বনগাঁ লাইন দিয়ে যাব' কুলদাব চুলেব ভিতব হাত ঢুকিযে কেমন যেন হঠাৎ হাওযাব ঘর্ষণে বাঁশপাতার তবঙ্গ তুলে ললিতা বললে, 'নিশীথবাবু আমাদেব পথ দেখাবেন। তুমি আমাকে ভোগবতী দেখাবে।'

'ঠিক আছ, 'কুলদা বললে, 'পান দেবে না?'

'দিচ্ছি।'

'কটা পাকা চুল হল ললিতা?'

'একটাও না, তোমার মাথায সব পাকা চুল কেঁচে আমাব মাথায যাচ্ছে—'

'পাকা চুল নেই তোমার মাথায নিশীথ?' কুলদা জিজ্ঞেস করল।

'এই তো রয়েছে রগেব ধাবে কযেকটা—'

ললিতা কুলদার চুল বাছতে-বাছতে বললে, 'পান এনে দেব, কিন্তু সেই রকম কবে বল তো সেই—'

'য্যাও, প্যান ন্যাসো, প্যান ন্যাসো ললিতা,' কুলদা ব্যাঙবাজিব মত গলাটাকে বাজিয়ে নিয়ে বললে। খুব মজা লাগছিল বটে নিশীথেব। বাজা-বাজড়াদেব তাকিযা তাউসে গড়িয়ে একটু বেসামাল হয়ে আছে যেন, কলেজেব গভর্নিংবডির জাস্টিস তবফদারেব মোটরের হর্ণ গেটেব কাছে বেজে উঠলেই বেশ ঝেড়ে ঝর্ঝবে হয়ে যাবে কুলদা; ঝেড়ে ঝর্ঝবে হয়ে উঠে দাঁড়াবে। লোকটাব সর্বাঙ্গেব দিকে তাকালেই বোঝা যায় সেটা—বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, কিছু না, মাস্টাবমশাই ছুটির দিনে একটু ঘোড়া-ঘোড়া খেলছেন।

'তুমি কেন প্রিন্সিপ্যাল হলে না কুলদা?' ললিতা বললে।

'আমি প্রিন্সিপ্যাল হলে কী হবে তোমার?'

'তোমার কলেজে পড়ব আমি।'

'আমাব কলেজে মেয়েরা পড়ে না।'

সূচীপত্রে যান

'কেন, যে-কলেজে মেয়েরা পড়ে,' একরাশ রোদে বাতাসে ফুলন্ত শেফালির ডাঁটের মত ঝরে ঝাঁকুনি খেয়ে ললিতা বললে, 'কেন সে কলেজেব প্রিন্সিপ্যাল হলে না তুমি।'

'সে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তো হয়েইছি।'

'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে।'

'এই দুধবাজ,' কুলদার থুতনিব ওপর, গালেব ওপব, টোপাকুলেব মত ছিটকে পড়তে লাগল ঘুঁষি, ঘুঁষির পব ঘুঁষি। ললিতা সাঁ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'কে এই মেয়েটি?' জিজ্ঞেস কবল নিশীথ।

টিন থেকে সিগাবেট বাব করে নিযে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আমাব বিধবা শালি ললিতা।'

'তোমার এখানেই থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে বিধবা হল?'

'বছর তিনেক হয়েছে।'

'খুব যে কচি মনে হচ্ছে।'

'আমাব চেয়ে আটাশ বছবেব ছোট ললিতা।'

'তোমাকে কুলদা ডাকে কেন? নাম ধবে ডাকে?'

'ঠিকই ডাকে, কুলে-দাদা ডাকত আগে, তাব থেকেই কুলদা হয়েছে।'

'ঠিকই হয়েছে। দাদা ডাকে কি ঠাকুর্দা সম্বন্ধে? নাতনির মত ব্যবহাব কবল তো তোমাব সঙ্গে'—

কুলদা একটা সিগারেট বাব কবে জ্বালিয়ে নিযে বললে, 'মফস্বল কলেজে থেকে সব কিছু একেবাবে গোগ্রাসে গিলে বেখেছ নিশীথ। তোমাব কি শালি-টালি নেই? কী করে কাটে তা হলে ছুটিব দুপুব? শীত বাত কাটে কী কবে?' মাথাব চুলেব অপর্যাপ্ত এলোমেলা কাল স্বাস্থ্য নিযে নিশীথেব দিকে তাকাল কুলদা।

'বিধবা শালি নেই।'

'সধবা?'

'নেই।'

'কে আছে তা হলে?'

নিশীথ আস্তে টান দিযে সিগাবেটটা নামিযে এনে বললে, 'মফস্বলে প্রফেসবদেব আব-এক বকম। মেযেদেব দিকে ঘেঁষতে পাবে না। যাবা ঘেঁষে তাদেব বদনাম হয। সিনেমা-থিয়েটাব বেশি দেখা যায না।'

'এ সব দিক দিয়ে খুব লাট মাহিন্দাবি তা হলে তোমাব।'

'আছে বলেই তো মনে হয।'

'বেশ চুটিয়ে পড়াও ক্লাসে?'

'সেটা হয না। দম বেখে পড়াই।'

'নিজে টেব পাও না কিছু, কেমন পড়াচ্ছ?'

কুলদাপ্রসাদ ঘাড় কাত কবে কিছু ক্ষণ টেনে—এইবাবে নাক-মুখ দিযে ধোঁযা ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'মফস্বলে মাস্টাবকে চব্বিশ ঘন্টা মাস্টাবই থাকতে হয। ঐটে বড় অসুবিধে। পেট ফুলে মবে যেতে হত আমাব। কলকাতা একটা মহাদেশ, কোনো ঘুপসি ঘাপটিতে কে কী কবছে, কে খোঁজ বাখে তার। নাঃ, মফস্বলে আমাব চলত না। সাড়ে পাঁচশ টাকায সেধেছিল আমাকে—'

'কোথায?'

'একটা প্রিন্সিপ্যালেব কাজ নিযে সেধেছিল-কোযার্টার্স দেবে—হ্যান কববে ত্যান কববে—, গেলুম না আমি। কলকাতা ছেড়ে কে যায? চব্বিশ ঘন্টা মাস্টাব সেজে টঙে চড়ে বসে থাকব? পাহাবা দিতে হবে বুঝি কে কোথায় বজ্জাতি করছে তাকে শাযেস্তা কববাব জন্যে? ঘি খেলে লোম পড়ে যাবে বুঝি? রেড়ির তেল খেতে হবে, কিন্তু ভদ্দর-অভদ্দর দু-চারটে বাড়ি থাকবে না?'

'বাঁড়ি?'

'এখানে সে সব বালাই নেই গো; দিনের বেলা কলকাতাব উত্তব দিকে জয়হিন্দ বলে ধর্মতলার ম্যাজিনো লাইন পেরিয়ে—ব্যাস—কে টের পাবে গান্ধী টুপি জহব কোট পিঠে কোন কলকাতায় তুমি তলিযে আছ—'

'ব্ল্যাক মার্কেটিং করতে?'

'সব রকম বাঞ্চোতি।'

'করছ? কত কাল ধরে?'

'চিরটা কাল। কড়ায়া, চীনে টাউন, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট—'

'জুতো বাইরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ বুঝি? মাস্টার মশাইযের জুতোরও নাগাল পায় না ছেলেরা? ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে, চীনে টাউনে, মোঙ্গল নাক-চোখ ভাল লাগে তোমার?'

'সব ভাল লাগে, সব দেখতে হয। আমাদের ইউনিভার্সিটির খোদা বক্স সাহেব বলতেন।'

পান নিয়ে ঘরে ঢুকল ললিতা।

'সিক্সটিন ডিফারেন্ট ন্যাশন্যালিটিজ।'

'কী বললে কুলদা, কী ইংরেজি কথাটা বললে?' ললিতা পান বনের বাতাসের মত শাড়িতে শরীরে নির্ঝরিত হয়ে বললে।

বললাম, 'সিক্সটিন ডিফারেন্ট ন্যাশন্যালিটিজ,' চোখ পাকিয়ে গর্জন করে বলল কুলদা।

মুখে কাপড় দিযে হাসতে-হাসতে ললিতা ঘর থেকে বেবিযে গেল। খোদা বক্সেব ব্যাপারটা লতিরও জানা আছে তবে?

'তোমাব টালিগঞ্জের বাড়িব কথা হচ্ছিল; সেটি ভাড়া খাটিযে পরেব বাড়িতে পড়ে আছ কেন?'

'এ বাড়িতে আমি ত্রিশ টাকা ভাড়া দিচ্ছে মাত্র।'

'মাত্র?'

'সেই জাপানি বোমা হিড়িকের সময় এ বাড়ি ভাড়া নিযেছিলুম আমি কুড়ি টাকায। হিড়িক কেটে যাবার পর থেকেই আমাকে উৎখাত করতে চেষ্টা করছে, কিছুই কবতে পাবে নি। পাববেও না। তবে দোতলা বাড়ি—দুটো তলাই আমার, দযা কবে দশটি টাকা বাড়িযে দিয়েছি। কেন ছাড়ব এ বাড়ি?'

'টালিগঞ্জের বাড়িতে কারা আছে?'

'যারা ছিল তাদেব বার করে দিযেছি।'

'করেছ? কিন্তু নিজে হাঁসেব নলি কামড়ে আছ বোকা বাড়িওলাব, একেই বুঝি যুযুৎসু প্যাঁচ বলে। মাস্টাররাও এটা পারে?'

'না হলে কী কবে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয মাস্টার?'

মাথাব ওপর ফ্যান রযেছে, সেটা খুলে দেওযা হয নি। বাইবেব হাওযায উড়ে যায ঘবটা মাঝে-মাঝে, ঘব গরম হয়ে উঠছে বটে। এখন হাওয়া নেই। এই এবাবেই এসে পড়বে।

'কত সেলামি নিলে নতুন ভাড়াটের কাছ থেকে?'

ফ্যানটা খুলতে ভুলে গেছে কুলদা।

'পাঁচ হাজার টাকা।'

'তা হলে বেশ ভাল বাড়ি তোমার।'

'হ্যাঁ, দোতলা, ভেনেশ্যান পেন্টেব বড় বাড়ি; খোলা জাযগা চাব দিকে।'

'কত ভাড়া?'

'সাড়ে তিনশ টাকা-গোটা বাড়ির।'

'সাড়ে তিনশ!' নিশীথ চোখ খাড়া কবে কুলদাব দিকে তাকাল।

'চাবশ, সাড়ে চাবশ, পেতে পারতুম; কুমড়ো কেটে দু ফালি হবার মুখে তোবা-তোবা করে তুলে দিলে—'

'কুমড়ো কেটে দু ফালি হওযা কাকে বলে কুলদা?'

কুলদাব কথা শেষ হতে না-হতেই ঘরেব ভেতব ঢুকে পড়ে ললিতা বললে, 'এক ফালি হল পশ্চিমবাংলা, আর এক ফালি পাকিস্তান ও—আমি ভেবেছিলুম,' ললিতা বললে।

'কী ভেবেছিলে?'

'বলতে লজ্জা করে,' কুলদার গা ঘেঁষে তন্বী উমাব মত মুখে ঠোঁটে পাঁচি পটলির পোঁচড় মেবে কেমন বেঢপ হযে দাঁড়িয়ে রইল যেন ললিতা।

'লজ্জা কবে, তা হলে থাক এখন। তোমাতে আমাতে তোমাব দিদিতে বাতের বেলা শুনব এখন।'

'আমি বলি কুলদা? যা ভেবেছিলুম বলে ফেলি?'

সূচীপত্রে যান

কুলদা একটু বিব্রত হয়ে বললে, 'না থাক, দরকার নেই। তোমার শ্বশুর-বাড়ির লোক মুখোমুখি বসে আছেন, তোমার ভাসুর ঠাকুরের বড় শালা, ওদের সামনে এয়োতি হয়ে সরে থাকতে হয়।'

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ললিতা বললে, 'তোমার ইউনিভার্সিটির খাতার নম্বর গুনছিলাম আমি—দুটো ভুল বেরিয়েছে।'

'কটা খাতার ভেতর?'

'চাবটে দেখেছি। ভুল শুধরে দেব?'

'তুমি একটা দাগ দিয়ে রাখো, আমি দেখব গিয়ে।'

'আমাকে বিশ্বাস হয় না?'

'কিন্তু ইউনিভার্সিটির খাতায় তুমি আঁক কাটবে?'

'পাকিস্তান ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের থেকে ফাঁক হয়ে কুমড়োব মত গড়িয়ে পড়েছে, সেটা বনগাঁ গেলে টের পাওয়া যাবে? চলো আজই যাই, দুটো ফালি দু দিকে কেমন গড়াচ্ছে দেখে আসি,' ললিতা কুলদাব থেকে খানিকটা দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে।

'গড়াচ্ছে তো আমাদের মনে-মনে। কোথাও কিছু দেখবার নেই ললিতা।'

একটা পান মুখে দিয়ে ললিতা বললে, 'তা ঠিক। পৃথিবীর বুকে কোনো চিড় নেই। আমি চললুম।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমাব খাতার নম্বর গুনতে।'

'হ্যাঁ। বেশ যোগ বসাতে পার তুমি ললিতা'—

'যোগবল আছে আমার তা হলে—শিবকে পটিযে নেবার মত?'

'শিব তো পাযে পড়ে আছে,' কুলদা গলাব আওযাজে মযাম মাখিযে বললে।

'কটা খাতা দেখেছ তুমি?'

'তা দেড়শ হবে।'

'দেখি, নম্বরগুলো মিলিযে দেখি, তুমি যোগ দিতে বড় ভুল কব কুলদা।'

ললিতা চলে গেলে নিশীথ বললে, 'বাড়ি ভাড়া পেযেই তো তোমাব কলকাতাব খবচ পুষিযে যায়, কেন মিছিমিছি চাকবি কব?'

'তা হতে পাবত যদি সাড়ে চাব শ টাকার দাঁওটা মাবতে পাবমুত। ব্যাঙ্কে তো জমেছে হাজার পঞ্চাশেক, টেনেমেনে হযে যেত। গবিবানা চালে থাকতে হত। কী দরকাব সে বকম থাকবার। কলেজেব কাজ জলভাত হযে গেছে, ওটা না করলেই খাবাপ লাগে। ওটা তো গোলামি নয। ইযার্কি আড্ডা মেরে সাড়ে পাঁচশ টাকা পাওয়া।'

এতই সহজ? নিশীথ অবাক হযে ভাবছিল। কোন জিনিসে দাঁড় কবিযেছে ওবা প্রফেসরিকে? পড়াগুনো কবতে হয না? কোন আদিকালে একটা নোট লিখেছিল ইকনমিকসেব, সেইটেই কপচে চব্বিশ-পঁচিশ বছব কলেজ চালাচ্ছে, আর আছে। চেহাবাব ভাবিক্কেপনা আছে, গলাব জোব আছে। কাছেই ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কড়াযা, চীনে টাউন, ললিতা, কলেজ সবই এদেব দ্রাক্ষাক্ষেত্র—বিনে প্রতিভায, বিনে পবিশ্রমে। আশ্চর্য, আশ্চর্য, কী আকাশ-পাতাল তফাত কুলদাপ্রসাদ আব নিশীথেব জীবনে। কুলদা লক্ষ্মীর ঝাঁপি কোলে করে বসে আছে। মবীচিকার মত যার আঁচলেব পিছে ছুটেছে নিশীথ, সে লক্ষ্মী নযই, সবস্বতী নয, প্রফেসব ঘোষের নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাসেব নিরবচ্ছিন্ন একটা দেযালেব মত যেন। বিপ্লব, রক্তবিপ্লব, হাবীত, অর্চনা, মোহিতা, নমিতা থিওজফিব এস্ট্রাল প্লেনেব মত যেন। হাতের কুড়ি-বাইশটা টাকা চব্বিশ বছর কলেজে কাজ কবার পব উনিশ-কুড়িটা এক টাকার নোটে, বেশ খানিকটা দলে ভাবী হযে শেষ বক্ষা করছে—এই যা রক্ষা।

'আমাকে কলকাতার কলেজের একটা কাজ দিতে হবে কুলদা।'

'এত দিন পবে এ বযসে কলকতায কাজ নিলে সেই প্রথম থেকে শুরু কবতে হবে তো তোমাকে নিশীথ। ডুবে মরবে।'

'প্রথম থেকে কী রকম?'

'মফস্বলে তো তুমি ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।'

'তা তো আছি।'

'পাচ্ছ সাড়ে তিনশ। এখানে কত আশা কব তুমি?'

'কত দেবে?'

'কোন ক্লাস এম-এ তুমি?'

'সেকেণ্ড ক্লাস।'

কুলদা একটু দমে গিয়ে বললে, 'সেকেণ্ড ক্লাস—'

'তুমিও তো সেকেণ্ড ক্লাস কুলদা—'

কুলদা খানিকটা কৌতুক বোধ করে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে চব্বিশ বছর আগে এ কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট ক্লাসের বাবা তো আমি আজ। কিন্তু তুমি তো সেকেণ্ড ক্লাস'—

'কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের বাবা হলাম না কেন আমি! আমিও তো চব্বিশ বছর কলেজে কাজ করেছি।'

'তা করেছে, কিন্তু আমাদের কলেজে কর নি তো।'

'ওঃ, তুমি আমির, নিজেদের কলেজে তোমাদের?'

'বুঝেছ তুমি,' কুলদা সিগারেটের ধোঁয়া ঘনিয়ে ছাড়তে-ছাড়তে বললে।

'রিপনে না, প্রেসিডেন্সিতে না, স্কটিসে না?'

'ও-সব জায়গায় আলাদা উজির-আমির সব।'

'সেকেণ্ড ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে?'

'সেকেণ্ড ক্লাস—থার্ড ক্লাস—ফার্স্ট ক্লাসও আছে না।'

'ও-তা এই রকম বুঝি,' নিশীথ বললে, 'এর চেয়ে ঢের ভাল হতে পারত, কিন্তু এ যা হয়েছে এও খুব বেশি খারাপ নয়।'

টিনের থেকে একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে দেশলাই খুঁজছিল; সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'এ কলেজের ভাসুর ও-কলেজে কাজ নিতে গেলে ও-কলেজের ভাদ্রবৌদের মধ্যে ওরা ভিড়িয়ে দেবে বুঝি তাকে।'

'তাই তো দেবে, মফস্বলের ভাসুরদের একেবারে ন-বৌরা এসে চেপে ধরবে। নেবে নাকি কলকাতার কলেজে কাজ?'

'কী রকম মাইনে পাওয়া যাবে?'

'সকালে নেবে, না রাত্তিরে?'

'তার মানে?'

'মানে আমাদের কমার্স ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি।'

নিশীথ বিরক্ত হয়ে বললে, 'কমার্স ডিপার্টমেন্টে কেন কাজ করব আমি। এমনি জেনেরাল ডিপার্টমেন্টে চাই।'

কুলদা বাটার থেকে একটা পান তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে বললে, 'জেনেরাল ডিপার্টমেন্টে কোনো ভেকেন্সি হয় না। হলেও ফার্স্ট ক্লাস, বিলিতি ডিগ্রি, ডক্টর এ ছাড়া নেওয়া হয় না কাউকে।'

'কলেজের এক্স-স্টুডেন্টদের নেওয়া হয় না?'

'ফার্স্ট ক্লাস না পেলে—'

'গভর্নিং বডির শালা ভায়রা-ভাইদের নেওয়া হয় না?'

'সেকেণ্ড ক্লাস পেলে?'

'থার্ড ক্লাস না পেলে?'

'তা নেওয়া হবে বইকি। নানা রকম কোড আছে কলেজে। কলেজ তো একটা উচ্ছৃঙ্খল জায়গা নয়। তোমাকে এখন দুশ টাকায় আমাদের কলেজে ঢোকালে সেটা বিশৃঙ্খলা হবে।'

'কেন?'

'তুমি তো সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ নিশীথ।'

'তুমিও তো সেকেণ্ড ক্লাস কুলদা।'

'আ মল যা!' কুলদা একটু ঝেঁজে উঠে, 'তোমাকে এতক্ষণ তা হলে বোঝালুম কী।'

নিশীথ এক খিলি পান তুলে নিয়ে পানের লঙ্গটা খসিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে বললে, 'মানে তুমি মাগ-ভাসুর হয়ে গেছ কলেজের আর আমি যমপুকুরের ব্রত করছি- সেই কথাটা।'

কুলদা পান চিবুতে-চিবুতে একটু চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'সেই কথাটা। তাছাড়া কলেজের গভর্নিং বডির লাডলি চাটুজ্যে, লর্ড মুখুজ্যে, বোকা বাঁড়ুজ্যের কেউ নও তো তুমি? নাকি, কেউ

সূচীপত্রে যান

হও তুমি?'

'ওদের কে আমি?'

'তবে কী করে দু শ টাকায় ঢোকাব তোমাকে?'

'কত টাকায় ঢোকা যেতে পারে?'

'একশ টাকায়।'

'দেবে? জেনেরালে?'

'না। নাইটে; কমার্সে। টেম্পরারি হিসেবে।'

নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে থেকে, তারপর বললে, 'সব জায়গায়ই এই রকম কুলদা? কলকাতার সব কলেজেই?'

'সব কলেজেই। তোমাকে রেখে-ঢেকে কথা বলে ধোঁকা দিয়ে কী লাভ। একই দেশের মানুষ তো আমরা। আমি আজ করে খাচ্ছি কলকাতায়। তুমি গোঁফ চুমড়ে পথ খুঁজছ। কোনো পথ পাবে না কলেজে—একশ টাকায় কমার্সে কাজ নিয়ে মান খোয়াবে তুমি নিশীথ?'

কুলদা পান তুলে নিয়ে চিবুতে লাগল। বেশ পান বানিয়েছে ললিতা। ললিতার দিদি, কুলদার স্ত্রী, গেছে নর্থ ক্যালকাটায় ভাইয়ের বাড়িতে। আজ রাতে ফিরবে না হয় তো। শ্যালিকাকে গল্প শোনাতে হবে আজ বেশি রাত অব্দি। বেশ ছাই জমেছে চুরুটের মুখে; ভারি আমেজ লাগছিল কুলদার।

'খবরের কাগজের অফিসে দেখ তুমি নিশীথ। দেড়শ-দুশ পেলে ঢুকে যাও। নাঃ পাকিস্তানে গিয়ে আর কী করবে। কলকাতায় থাকো, কলকাতায় থেকে যাও।'

কুলদাপ্রসাদের বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছে নিশীথ তখন চারটে বেজে গেছে। সকাল বেলা চা, দু-একটা স্যাণ্ডউইচ-ডিম ছাড়া কিছু খায় নি; প্রফেসর ঘোষের বাড়িতে এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট, কুলদার এখানে কতকগুলো পান খেল নিশীথ। বেশি সিগারেট খেয়ে, চা খেয়ে, ভাত না খেয়ে শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছিল নিশীথের। এখন শুয়ে পড়তে হয়, কোথাও দাঁড়াতে পারা যাচ্ছে না যেন আর; কেউ যদি কিছু না মনে করে তা হলে ফুটপাথেও শুয়ে পড়তে রাজি সে। একটা বেশ ঝাঁকড়া গাছ দেখে নিয়ে তারই তলায় ফুটপাথের ওপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল, গায়ের থেকে পাঞ্জাবিটা খুলে একটু বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর মাথাটা রেখে। কিন্তু মুশকিল, তাকে কেউ ভিখিরিও মনে করবে না, পাগলও ভাববে না; কেন সে এ রকমভাবে শুয়ে পড়ল বুঝে দেখবার জন্য তার চারিদিকে লোক জড়ো হয়ে যাবে। শুলেই ভাল হত কিন্তু এটা সেটা ভেবে নিশীথ ফুটপাথের একটা গাছের গুঁড়ির উপর গিয়ে বসল। গুঁড়ি বলে ঠিক কোনো জিনিস নেই, দু-চারটে বেশ মোটা শেকড় ওপরে জাগিয়ে আছে; মাটি শেকড়ের ওপর বসে জিরিয়ে নিতে লাগল। গাছে ঠেস দিতেই ঘুম এল। মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যেই ঘুমের চটকা ভেঙে গেল নিশীথের। নানা রকম লোকজন ফুটপাথে গাছের চারদিকে এসে হল্লা করছে, কোত্থেকে একটা চারপাই নিয়ে এসেছে, সেখানে গড়াচ্ছে দেশোয়ালি দু-চারজন; নীচে ময়লা কাঁথা-কাপড় ছড়িয়ে দোসাদ, কাহার, মাহাতো মেয়ে, বুড়ি, ছোট ছেলেপিলেরা বসেছে, কাঁদছে, গড়াচ্ছে, ল্যাং মারছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, পেটে গিট মাজায় গিট মেরে বিশ্বকর্মা পুজোর ঘুড়ির মত পাতা ফচফচ্ বনবন্ করে তোলপাড় করে তুলছে সব। কেউ-কেউ শুকনো ডাল-পালা, রাস্তার এঁটো কাগজ, রাবিশ জোগাড় করে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করছে। বোধ হয় রান্নাবান্না চড়বে এখন।

নিশীথ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রফেসর ঘোষকে দেখা হল, কুলদাপ্রসাদকে দেখা হল, এখন কার কাছে যাওয়া যায়? কলেজের চাকরির কথা এখন আর ভাবা উচিত নয়। চার-পাঁচ বছর ধরে কলকাতার কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ঘুরে দেখেছে তো সে। বিশেষ কোনো আশা-আশ্বাস পাওয়া যায় নি কোথাও; দু-একজন গাছে চড়িয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত মই টেনে নিয়েছে; নিদারুণভাবে আশা ভঙ্গ করেছে।

ঠিকই বলেছে কুলদাপ্রসাদ, সেকেণ্ড ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে কোনো মুরুব্বির কেউ না হয় কলকাতার কলেজে ভাল চাকরি পাওয়া অসম্ভব; পেতে পারে একশ টাকায়, কমার্স ডিপার্টমেন্টে, রাতের বেলা। কুলদা কলকাতার সব কলেজের সব খবরও জানে। এ দিক দিয়ে কলকাতায় সত্যিই কিছু হবে না নিশীথের। কলেজে কাজ করতে হলে জলপাইহাটি ফিরে যেতে হয়, কলকাতায় থাকতে হলে অন্য কোনো চাকরির জোগাড় দেখতে হয়। কুলদা খবরের কাগজের কথা বলছে। কিন্তু কলকাতার খবরের কাগজের চাকরিতে মন উঠছে না নিশীথের। পলিটিকসে তার কৌতূহল আছে বটে, কিন্তু রোজকার

পলিটিকস নিয়ে এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মাথা ঘামাতে পারে না সে; যার ঘামায় তাদের কথাবার্তা শুনে বমি আসে তার। তা ছাড়া কাগজের সম্পাদনার ভার কে দিচ্ছে নিশীথকে? কে দেবে তাকে সত্যি স্বাধীনভাবে সম্পাদকীয় লিখতে? সহযোগী, না কি সহকারী, সম্পাদকের কাজ পেতে পারে সে নীচের দিকে-মূরুব্বির জোর থাকলে। সেই জন্য দিন-রাত তাকে গলা জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—পলিটিকসের পতরি পুকুরে— উদয়াস্ত কাঁথাকাচার গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে। বিদেশী ইউরোপ-আমেরিকার পলিটিকসও নয়, একেবারেই ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে কলকাতার কলতলার নিরেট আসর জমিয়ে বসতে হবে তাকে। রোজ যেতে হবে কাগজের অফিসে, রোজ লিখতে হবে; বাংলাদেশের রামমোহন-লালমোহন কী করছে, পদিপিসি কী ঘুষ্বল দিচ্ছে—যাদের কথা দিনান্তেও একবার প্রবেশ লাভ করতে পারে না নিশীথের জনে-নির্জনে বাস্তবে, আখ্যানিক জীবনে, তারাই হবে নিশীথের নিত্যনৈমিত্তিক লেখার বিষয়। তাদের তারিফ করতে হবে, যেটা কাগজের পলিসি।

নিজেরা খাওযাখায়ি করে মরে রামমোহনরা কাগজের পলিসি বদলে দেয়। কিন্তু জন-প্রযোজন রামমোহনদের উৎখাত করতে পারে না, এ দেশে অন্তত না, আজ পর্যন্ত না। খবরের কাগজও জনসাধারণের বিশেষ কেউ নয় আমাদের দেশে। এ হেন জিনিসের সেবা হবে কযেকটা টাকার জন্যে। লালমোহন-রামমোহন যদি সহচর হয় শূন্য-শূন্যান্তের অভিযানে তা হলে তাদের ঘোড়ার পিঠে মখমলের বালামাটির কাজ করতে হবে নিশীথকে—লালমোহনদের স্থূল পশ্চাদ্দেশকে প্রভূত আরাম দেওযার জন্যে সারগর্ভ সম্পাদকীয লিখে। গম্ভীর হয়ে ভাবছিল নিশীথ। কটা টাকা দেবে এ জন্যে নিশীথকে ওরা? দেড়শ দুশ সোযা দুশ। দেড় হাজার- দু হাজার টাকা পেলেও এ কাজে মন বসবে না নিশীথের। এ তার নিজের কাজ নয়, এ সব কাজের জন্য জন্মাতে হয মাযের পেটে থাকতে-থাকতেই; পেটের থেকে পড়ে শিখলে চলবে না।

নিশীথ পায়ে হেঁটে এগিযে যাচ্ছিল। কিন্তু কোথাও একটা কাজ জুটিযে নেওযা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি কিছু করে নিতে না পাবলে পকেটের কুড়ি-বাইশ টাকা দিযে কত দিন চলবে তার কলকাতায—কত দিন চালাবে সে মানব জীবনটাকে, সপরিবারে?

একবার শেষ চেষ্টার মত অমুক কলেজের সত্যিকারের বাবা জযনাথের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? জয়নাথের সঙ্গে এর আগেও কয়েক বার দেখা করেছিল নিশীথ গত পাঁচ-সাতবছরে। কলেজের কাজের ব্যাপার নিয়ে। জযনাথ আশা দিয়েছে সব সময়েই, কিন্তু আসল কাজের সময হয নি। সই করে দিযেছে, মুখে বলেছে, কিছু করে উঠতে পারি নি দাদা। বাবার হোটেলে বাবাই, যদি কিছু করে উঠতে না পারে তা হলে দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও দাঁড়াবে কোথায, এ রকম মুখের ভাব নিয়ে সে কলেজের প্রফেসররা জযনাথকে ঘিরে থাকে সব সময। তাদের সেই বাক্য নিজের নিশীথকে বারবার 'এই হচ্ছে' 'এই হল আর-কি' বলে, অবশেষে জযনাথবাবুর নিতান্তই সঙ্কটাবস্থার সময তাকে গোরু খোঁজা করে বার করতে পারলে আক্ষেপ করে বলত, আমার হাতে তো কিছু নেই, মতিমোহনবাবুর ছেলেকে নিতে হল কিংবা জস্টিস ভড় নিজে তাঁর মিনার্ভা কার হাঁকিযে এসে বললেন, আমি ধরণী ভড়কে না নিয়ে করি কী; ইদানীং বলেছিলেন,শহীদ বটব্যালের জামাই ফাঁসির রসিকলালের শালা এসে ধরে পড়েছিল, কী করি, শহিদদের ওপর তো একটা কর্তব্য আছে আমাদের (পনের আগস্টের পর থেকে), তোমাদের না দিযে ভন্টুকেই দিলুম। সেকেণ্ড ক্লাস, তা যাক, হোক ফাঁসির রশির উবগার, একসঙ্গে তো পড়েছিলুম আমি আর রমি। কিন্তু ভন্টুকে ষাট-সত্তর টাকা মাইনেয পাওয়া গেছে, নিশীথকে তো একশ সত্তর দিতে হত, কিংবা দেড়শ অন্তত; ফাঁসির রশি তো আসল কথা নয। আসল কথা হত যদি সেটা, জযনাথকে কুলদার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করত নিশীথ। কিন্তু এমনই মিনমিনে মিটমিটে জিনিস জযনাথ যে তাকে প্রফেসর ঘোষের চেযেও শ্রদ্ধা করে নিশীথ।

কিন্তু তবুও তার, তার বাবার এবং তার আধ্যাত্মিক খুড়ো-জ্যাঠাদের চেষ্টায কলেজটির উৎপত্তি। এতগুলো লোকের হাতে একটা জিনিসের জন্ম হলে সেটার ভেতরে খানিকটা অসঙ্গতির দোষ বুঝি না বর্তে পারে না, ভাবছিল নিশীথ। কিন্তু সে দোষকে শোধিত করে নিচ্ছে অহরহ জযনাথ, কলেজের জন্য নানা দিক থেকে চাঁদা তুলে, ডোনেশন সংগ্রহ করে, গভর্নমেন্ট ও ইউনিভার্সিটির আর্থিক ও পারমার্থিক সাহায্যে ও পরামর্শে, পরামর্শগুলো যদি বাতাসার মত বোধ হয় তা হলে আশ্চর্য প্রক্রিয়ায সেগুলো বাতাবি লেবুতে পরিণত করে সরবৎ বানিযে খেয়ে ফেলে। এখন জয়নাথই কলেজের একমাত্র পিতা। আগেকার পিতারা অনেকেই মৃত; যারা আছে তারা নিজেদের ঔরসের পূর্বস্মৃতি সম্বন্ধে সন্দিহান।

আজকাল পাকিস্তানের হিন্দু ছেলেরা দল বেঁধে কলকাতায় পালিযে এসে জয়নাথের বড় সুবিধে করে

দিয়েছে। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অধ্যাপকদের নিয়ে মাথা ঘামাবার খুব ইচ্ছে জয়নাথের; কিন্তু পথ পাচ্ছে না এবং হাজার-হাজার ছেলে বাড়ছে, পুরোন কলেজ-বাড়িতে আঁটছে না কোথাও আর, নতুন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হচ্ছে কলেজের; হাঁটতে-হাঁটতে রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখছিল নিশীথ। রাজমিস্ত্রিদের দেখতে-দেখতে নিজের অজান্তেই যেন জয়নাথের ঘরে এসে ঢুকল নিশীথ; কলেজের থেকে ঢের দূরেই তো জয়নাথের বাড়ি—ঢের নিভৃতে; একটা কলকাতার উত্তর দিকে, আর-একটা দক্ষিণে বালিগঞ্জে। এত তাড়াতাড়ি কী করে এল সে!

বালিগঞ্জের বাড়ির নীচের তলায় একটা কার্পেট-বেছানো সোফা-ছড়ানো চমৎকার কামরায় বড় গদি-আঁটা ইজিচেয়ারে বসেছিল জয়নাথ।

জয়নাথ চার-পাঁচ বছরের বড় নিশীথের চেয়ে। একান্ন-বাযান্ন হবে জয়নাথের। জয়নাথের কাছে বছর খানেক পড়েছিল নিশীথ—কোন কলেজে তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এই কলেজটায় নয়।এ কলেজে নিশীথ পড়ে নি কোনো দিন।

জয়নাথ একটা তাঁতের ধুতি পরে, স্যামুয়েল ফিটজের বাড়িব বেডিমেট শার্ট গায়ে দিয়ে বসেছিল, মুখে চুরুট, চুরুট আজকাল জয়নাথ চব্বিশ ঘন্টাই প্রায় খায়; নেড়েচেড়ে দেখছিল একটা মস্ত বড় ঢাউস বাংলা দৈনিক; স্টেটসম্যানও আছে, ভাঁজ এখনো খোলা হয নি; অমৃতবাজারও আছে।

'কে আপনি?' কাগজের শিটটা মুখের ওপর থেকে একটু সবিয়ে জয়নাথ বললে।

'রাতে কাগজ পড়ছেন?'

'দিনের বেলা সময হয় নি। সাবা দিন বড্ড ব্যস্ত ছিলুম।"

'আজ তো কলেজ ছুটি ছিল।'

'হ্যাঁ, কলকাতায় ছিলুম না। খুব ভোবেই বসিরহাট যেতে হল; গাড়িটাব সব্বনাশ হল আব কী। গাড়িটা না নিলেই পাবতুম, বাসই তো ছিল। এই তো এলুম বসিরহাট থেকে'—

'বসিরহাট গিযেছিলেন', নিশীথ শুরু কবতেই সে দিকে কান না দিযে নিজেব কথার জের টেনে জযনাথ বললে, 'ওরাই গাড়ি পাঠিযে নিয়ে যাবে বলেছিল, গবজ তো ওদেবই। কেন আর গরিব-গুববোদেব কষ্ট দেওযা, নিজের গাড়িতেই গেলুম, পেট্রোল খবচটা দিযেছে, জোব কবে গছিয়ে দিল।'

'বসিবহাটে টিচারদেব মিটিঙে'—

'না, না, ও-সব অনেকবাব করেছি। না, দেশ স্বাধীন হযেছে। এখন সকলেবই পাযা বাড়বে। অনেক মিটিঙ-ফিটিঙ হবে। আমবাও মিটিঙ করব। কিন্তু কিছু হবে না শিগগিব।'

জযনাথ চুরুটে একটা টান মেবে বললে, 'আসল জিনিসটা তো হযেছে। আমবা স্বাধীন হয়েছি। এখন ও-সব ফিচেল জিনিসগুলো ধরে টিচাবদেব স্টেটাস, টিচাবদেব মাইনে বাড়নো, টিচাবদের বেড়ানো-টেড়ানো, বিযের বাদ্যি বাজনা ও-সব কিছুদিনেব জন্য মুলতুবি থাকুক গে বাবা—'

জযনাথ কিছু ক্ষণ নিজের মনে চুরুট টেনে নিল। খববেব কাগজেব শিট পড়ে গেল কার্পেটের ওপব।

'না, বসিবহাট গেছলুম মেজ শালির মেযেব বিযেতে। আমবা বদ্যি। মেযেটির বিযে হচ্ছে মোড়লের ছেলেব সঙ্গে। ছেলেটি যদি বড় ডাক্তাব-ইঞ্জিনিযাব হত তা হলে বিশেষ কোনো গোলমাল ছিল না। কিন্তু স্বদেশী আমলে স্বদেশী কবেছে, দেশ স্বাধীন হযেছে, এখনো স্বদেশী কবছে সোদপুরে আর নোযাখালিতে। এ যাবৎ কানাকড়ি বোজগার কবছে না, ও দিকে জেতে চাঁড়াল! শালি তো কেঁদেই আকুল। বলে বমলার বিযেতে এ যাবৎ প্লেগের ইঁন্দুবেব মাছিও পড়ছে না আমার বাড়িতে। সব ভোঁ-ভোঁ! তুমি এস, তুমি এস, তুমি এলে সব সুড়সুড় কবে—একটা কলেজের মাথায তুমি, বহু বড় মর‍্যাল সাপোর্ট তোমাব। কেউ না এলে শুধু তুমি এলেই আমাদেব মব্যাল ভিক্টবি হবে।'

জয়নাথ চুরুটটা দাঁতে কামড়ে নিযে বললে, 'এই তো মব্যাল সাপোর্ট দিযে ফিবলুম বসিরহাট থেকে।'

'হয়ে গেছে বিযে?'

'হ্যাঁ। মোস্ট ডিসাইসিভ মব্যাল ভিক্টরি। আমি গিযে দেখলুম আট-দশজন ফ্যা-ফ্যা করছে বিয়ে বাড়িতে। আমি যেতেই সোরগোল পড়ে গেল। দু-তিন ঘন্টাব মধ্যেই লোকে তলিযে গেল বিযের আসর। ওরাই করল-কম্মাল সব, জিনিস কিনল, ভোজ লাগাল; দলে-দলে কুকুরের মত পাত চেটে জিগির দিচ্ছে- এখনো তো।'

'বেশ ভালই হল।' নিশীথ বললে।

'আপনি বদ্যি তো?'

'হ্যাঁ।'

জয়নাথ মুখের চুরুট নামিয়ে ঠোঁট চেটে একটু হেসে বললে, 'আমরাও বদ্যি। মজুমদার বদ্যি। লোকে বলে হ্যাঁঃ, ওরাও আবার বদ্যি, ওরা তো মহেশ্বরদির, ওরা তো চাটগাঁ সিলেটের, কালীকচ্ছের, সেখানে বদ্যি-কায়েতে বদ্যি-চাঁড়ালে, প্রতিলোম বিয়ে হয়।'

'হলে হবে,' নিশীথ বললে, 'জাত-ফাত দিয়ে কী হবে।'

'কিছু হবে না,' জয়নাথ চুরুট কামড়ে ধরে বললে, 'তবে জেনে রাখুন, যার সঙ্গে দেখা হবে, কথায়-কথায় ফাঁসিয়ে দেবার ইচ্ছে যদি হয় তবে দেবেন। বলবেন জয়নাথবাবুরা মহেশ্বরদির বদ্যি নয়। ওদের এক সঙ্গে সেনহাটির এক সঙ্গে ভট্টপ্রতাপের'—জয়নাথ বংশের গরিমায় রক্তের চাপ প্রায় দুশর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে নেবার প্রয়োজনে রয়ে-সয়ে আস্তে-আস্তে চুরুট টানতে লাগল, পেঁচার মত বড়-বড় বিষয়ী বিশেষিত চোখের কেমন একটা চিৎপ্রকটে নিশীথের দিকে তাকিয়ে।

'আপনার নাম আমার মনে আছে।'

'মনে আছে? এসেছিলাম কয়েক বার আপনার কাছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সব মনে আছে আমার', কার্পেটের ওপর থেকে কাগজের একটা শিট কুড়িয়ে এনে পাশে একটা মোড়ার ওপর রেখে দিয়ে জয়নাথ বললে, 'আপনার নাম তো নিশীথ সেনগুপ্ত।'

'হ্যাঁ, নিশীথ সেন।'

'সেন? গুপ্তটা কেটে কি বাহাদুরি হল? এমনি সেন তো ছোটকায়েত, শুদ্দুর, সোনার বেনে'—

'আমি ও-সব জাত-টাত নিয়ে মাথা ঘামাই নে, সবই তো সমান; অন্তত একই রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত সকলের। মানুষকে ছোট জাত বানিয়ে চেপে রেখে কী হবে?'

'না, ওতে কিছু হবে না। আমরা অন্তত মানছি না। মোড়লের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি। দিয়েছেন আপনারা?'

নিশীথ পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার কোনো মেয়েরই বিয়ে হয়নি এখনো। ভাল পাত্র পেলে দেব বই কি—মোড়লে আটকাবে না।'

জয়নাথ চুরুটের ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ মুখে বললে, 'সমাজ এই রকমই হচ্ছে। ভালই। আমিও তো ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁষা এ সব বিষয়ে; আমার বাবা তো ব্রাহ্মই ছিলেন। আপনি বদ্যি তো নিশীথবাবু?' কেমন একটা খটকায় বেঁধে নিশীথকে জিজ্ঞেস করলে জয়নাথ।

'জন্মেছিলুম তো বদ্যির ঘরে।'

'কোথাকার বদ্যি? সেনহাটির?'

'না।'

'মহেশ্বরদির?'

'না। আমরা কোথাকার বদ্যি আপনার বাবা গয়ানাথবাবু তো জানতেন।'

জানে জয়নাথ নিজেও। নিশীথদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে জয়নাথদের বাবাদের কী নিকট সম্বন্ধ ছিল সেটা গয়ানাথবাবুর মুখেই শুনেছেন এরা। শুনে ভুলে গেছে। (ও-সব কথা মনে করে রাখার দায়িত্ব অনেক)। এখন কিংবদন্তী হিসেবে মাঝে-মাঝে মনে পড়ে।

জয়নাথ একটু সতর্ক হয়ে সামলে নিয়ে অন্য কথা পেড়ে বললে, 'আপনারও সিগারেট খাওয়া অভ্যেস আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, খাই মাঝে-মাঝে।'

'আমি তো প্রিন্সিপ্যাল মানুষ,' জয়নাথ বেশ সদাশয়ের মত হেসে বললে, 'খান আমার সামনেও?'

নিশীথের খেয়াল ছিল না বটে, একবারে আত্মীয়ের মত জয়নাথ এমন ঘিরে বসতে থাকে যে এ সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে হুঁস থাকে না যেন মুহূর্তের তরে। মনে হয় যেন সমানে-সমানে বসা হয়েছে প্রায়-দুজন ঘাগি মাস্টার। কিন্তু জয়নাথ তো উঁচুআলা, সদরআলা।

'আমার কলেজের প্রফেসররা আমার সুমুখে সিগারেট খান না।'

'আচ্ছা আমি রেখে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে নিশীথবাবু।'

'কোথায় অ্যাসট্রে আপনার? দেখছি না ত?'

'ঠিক আছে নিশীথবাবু, ঠিক আছে, খান সিগারেট খান আপনি।'

জয়নাথের মুখের দিকে না তাকিয়েই নিশীথ উপলব্ধি করল যে বেশ সদন্তঃকরণে কথা বলছে জয়নাথ। এ রকম সনির্বন্ধ আশ্বাস পেয়ে বশে ভরপুর আত্মিকভাবে টান দিল সিগারেটটায় নিশীথ।

'এটা তো আমার কলেজের, প্রিন্সিপালের কামরা নয় নিশীথবাবু, আপনিও আমাদের কলেজের মাস্টার নন। কেন খাবেন না সিগারেট?'

'পড়েছিলুম এক বছর আপনার কাছে।'

'কে আপনি? কোন কলেজে?'

নিশীথের মনে পড়ছিল না। নিশীথ সিগারেটে আর-একটা মোটা টান মারবার ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রেখে মুখ এড়িয়ে ভেবে দেখছিল।

'এ কলেজে?'

'না, এ কলেজে না।' নিশীথ বললে।

'আপনি তো স্কটিশের ছেলে।'

'তা কী করে জানলেন আপনি?'

'বাঃ, জানব না। আপনার থেকে তো মাত্র বছর তিন-চারের সিনিয়র আমি। আপনি ইউনিভার্সিটির ফিফথ ইয়ারে যখন—তখন তো ইন্টারমিডিয়েট ল পড়ছি আমি, আমি নিজে তো স্কটিশ চার্চ কলেজের ছেলে। আমাদের পরে—পর-পর তিন-চার বছর কারা স্কটিশ চার্চ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে এল সে সব নতুন-নতুন ছেলেদের মুখ চিনে রাখতুম না আমি কলেজে পড়বার সময়?'

'সেটা কি সম্ভব?' নিশীথ একটু অবাক হয়ে ভাবছিল।

'তা ছাড়া' জয়নাথ কী যেন বলতে গিয়ে, না বলে, মুখে চুরুট গুঁজে দিয়ে দেয়ালের একটা নন্দলাল বোসের ছবির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

পরপর তিন-চার বছর স্কটিশ চার্চ কলেজের থেকে ক্রমাগত পোস্ট গ্র্যাজুয়েটি ছেলেদের মুখ চিনে রেখেছে জয়নাথবাবু এম-এ পাশ করে বেরিয়ে ইউনিভার্সিটির করিডরে বেড়াতে-বেড়াতে, এও বিশ্বেস করতে হবে? থাকতে পারে খানিকটা মুখ চেনা জয়নাথবাবুর।

নিশীথের সিগারেট নিভে যাচ্ছিল, আস্তে দুটো টান দিয়ে জয়নাথের বাবা গয়ানাথবাবুর কথা ভাবছিল, যিনি নিশীথকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন উত্তর কলকাতায় গয়ানাথবাবুর দোস্ত মহম্মদ লেনের বাড়িতে সকলের সঙ্গে তার আলাপ করাতে গিয়েছিলেন প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর আগে। দোস্ত মহম্মদ লেনের আধোভাঙা গলির গয়ানাথবাবুর বাড়িতে তারপরেও দু-তিনবার গিয়েছিল নিশীথ। গয়ানাথবাবুর মৃত্যুর পর সে বাড়িতে আর যায় নি সে। একুশ কাঠা জমির ওপর বালিগঞ্জ প্লেসের এই অনির্বচন বাড়ি যে দোস্ত মহম্মদ লেনের গয়ানাথের ছেলেরা একদিন সম্ভব করে তুলবে এমন দুঃস্বপ্ন গয়ানাথের ধারণার ত্রিসীমানায়ও কোনোদিন ছিল না। কিন্তু তা তো হল। গয়ানাথ বেঁচে থাকতে হল না। সেটা হলে খুব খুশি হত নিশীথ। গয়ানাথবাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় ঝালিয়ে দিয়েছিলেন নিশীথের; তাঁর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলেদের সঙ্গেও। গয়ানাথবাবুর স্ত্রী স্বামীর আগেই মারা যান, মেয়েদের কথা বিশেষ কিছু মনে নেই নিশীথের, ছেলেদের প্রকোপ এখনো কিছু-কিছু চোখে পড়ে; জয়নাথ, অজয়নাথ, বিজয়নাথ, সুজয়নাথ—এই চার ছেলেই তো গয়ানাথের। না আর-কেউ আছে?

'আপনার বাবা গয়ানাথাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।'

জয়নাথ চুরুটের মোটা ছাইটা ঝেড়ে ফেলে দিল। চুরুট নিভে যায় নি, জ্বলছে। 'তা শুনেছি আমি'—

'শুনেছে শুধু? চোখে দেখে নি? চোখে দেখা জিনিস মনে নেই জয়নাথবাবুর? আপনারা তখন দোস্ত মহম্মদ লেনের একটা বাড়িতে ছিলেন।'

ও-সব পুরনো কথা শুনতে ভাল লাগে না জয়নাথের। চার ভাইয়ে মিলে তারা রাতকে দিন করে দিয়েছে; জলের ওপর দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে গেছে; বালিগঞ্জে পঁচিশ-ত্রিশ কাঠা জমি কিনেছে, ডি-কে ব্যানার্জি কন্ট্রাক্টরকে লাগিয়ে চমৎকার জ্যামিতিক প্রাসাদ তুলেছে, চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে; পুরনো কলেজটাকে চার ভায়ে মিলে হাতড়ে নিয়ে সেটাকে নবরক্ত দান করেছে—এখনই সেই দোস্ত মহম্মদ লেনের কথা পাড়া?

'তা ছিলুম আমবা', ক্ষোভ, বিক্ষোভ, খানিকটা ভর্ৎসনাব বশে আগুনে গনগন কবছিল জয়নাথেব মনটা। ছাইচাপা আগুনেব মত অস্পষ্ট চোখ নিয়ে নিশীথেব দিকে একবাব তাকিয়ে দেখল জয়নাথ।

'অজয়নাথ কী কবছে এখন?'

'আপনাব চেয়ে ছোট বুঝি অজয়?'

'আমাব সমান; বিজয় আব সুজয় আমাব ছোট।'

'অজয় ইঞ্জিনিয়াবিং পাশ কবে এসেছে বিলেত থেকে। বিয়ে কবে শ্বশুবেব টাকায় বিলেত গিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়াবিং ফার্ম খুলে বসেছে।'

'বিজয়নাথও তো ইঞ্জিনিয়াব?

'না, সে ডাক্তাব, এখানকাব এম-বি, বিলেত যায় নি। পসাব জমিয়ে বসিয়েছে। বিলেত যাবাব দবকাব কবে না। কোনো-কোনো মাসে আট হাজাবও তো পায়। বোকামি কবেছে। যুদ্ধে গিয়ে নার্স বিয়ে কবে এসেছে। গ্রীক-ইহুদি। দেখতে বেশ সুন্দব, বেশ ছিমছাম, বেশ ঘবজোড়া; হেলেসপন্ট সমুদ্রেব মত। কিন্তু ও-সব ফিবিঙ্গি কি আমাদেব ঘবে মানাবে। আমবা চাব ভাইয়ে মাগ নিয়ে এক সংসাবে থাকতে চাই তো এক হাঁড়িতে।

'ফিবিঙ্গি কি কবে হল? গ্রীক তো! গ্রীস তো আমাদেব ইংবেজিব প্রফেসবদেব গয়াতীর্থ জয়নাথবাবু।'

'গ্রীক-ইহুদি।' জয়নাথবাবু একটু বিবক্ত হয়ে বললে। গয়ানাথবাবুব ছেলে তিনি। নিশীথেব গয়াতীর্থেব কথাটা কানে বেজেছে তাঁব।

'ইহুদি তো ফিবিঙ্গি নয়,' জয়নাথকে বলতে গিয়ে নিজেকেই যেন বললে নিশীথ।

'সুজয় ব্যাবিস্টাবি পাশ কবে এসেছে বছব দশেক হল।'

'হাতযশ জমিয়েছে হাইকোর্টে?'

'না। হ্যাঁ, যায় হাইকোর্টে। তবে হচ্ছে না কিছু হাইকোর্টে, পেটিকোটে একটু বেশি আটকে গেছে কিনা। আমি ওকে আমাদেব কলেজেব হিস্ট্রিব প্রফেসব বানিয়ে দিয়েছি। সাড়ে চাবশ মাইনে।'

'ল পাশ তো সুজয়নাথ।'

'ভাল পড়াতে পাবে হিস্ট্রি।'

'হিস্ট্রিতে ট্রাইপসও তো বটে?'

'না, ওখানকাব বাব-অ্যাট-ল সুজয়, আব-কোনো পবীক্ষা দেয় নি। ও কলকাতা ইউনিভার্সিটিব এম-এ, হিস্ট্রিতে।'

'গোল্ড মেডেলিসট তো হিস্ট্রিতে?'

'কে?'

'সুজয়।'

'সুজয়নাথ পড়ায় ভাল।' জয়নাথ বললে।

'ঈশান স্কলাব তো হিস্ট্রিতে?'

'কে?'

'সুজয়নাথ।'

'বেশ পড়ায় সুজয়। বেশ পড়ায়। স্যাডলাব কমিশন এখন এলে বড় সুবিধে হত সুজয়নাথেব। পবে মাইকেল স্যাডলাব', চুরুটেব আগুন নিভে গেছে জয়নাথেব, চুরুটটাও শেষ হয়ে গেছে আব, সেটাকে অ্যাশট্রেব ভিতব ফেলে দিয়ে একটা কড়কড়ে জাভা চুরুট বেব কবে ফেলে জয়নাথ।

'বেশ জমিয়ে বাখতে পাবে ক্লাসটাকে সুজয়নাথ,' সুজয়নাথ ঈশান স্কলাব কিংবা গোল্ড মেডেলিস্ট কি না সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য কবতে গেল না জয়নাথ। নিশীথও খোঁচাতে গেল না আব; প্রফেসব ঘোষকে খুঁচিয়েছে, কুলদাকে খুঁচিয়েছে, কেন খোঁচাতে যাবে জয়নাথকে মিছিমিছি আব। সুজয়নাথ হয় তো ফার্স্ট ক্লাস থার্ড কিংবা থার্ড ক্লাস ফার্স্ট; একই তো কথা, আব এসব আমাদেব দেশে ডিগ্রিদাব মাল পযদাব ব্যাপাবে। তবে আব কেন মিছিমিছি সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস কি না জিজ্ঞেস কবা। সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে প্রফেসব ঘোষ, কুলদাবা তো জাঁকিয়ে আছে। কত ফার্স্ট ক্লাস তো মোটা মাইনে পেয়ে মজতে-মজতেই কাটাল চিবটা কাল।

'গয়ানাথবাবুব সঙ্গে আমাব বাবাব খুব ভাব ছিল।'

সূচীপত্রে যান

জয়নাথবাবু চুরুট টানতে–টানতে অস্ফুট স্বরে বললে, 'শুনেছি।'

'গযানাথাবাবু যখন সস্ত্রীক ব্রাহ্ম হলেন তখন হিন্দু সমাজের আত্মীয়েরা তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল গযানাথবাবুকে। পথে বেরুলেই দুযো দিত স্বামী–স্ত্রীকে সেকালেব হিন্দুরা। কোনো চাকরি নেই বাকরি নেই, এক বস্ত্রে বেবিযে যেতে হল। আমার ঠাকুর্দা তখন হালিশহরে চাকরি করতেন; তাঁর বাড়িতে গিযে উঠলেন গযানাথবাবু, শুনেছি বাবার কাছে। গয়ানাথাবাবুব আত্মীযেবা হালিশহব পর্যন্ত ধাওযা করেছিল গয়ানাথবাবুকে, হানাবাড়ি হযে দাঁড়িযেছিল ঠাকুর্দার ঘব কখানা। তেড়িয়া হযে ছুটে এসে আত্মীয়েরা পচা মুর্গির ডিম নাকে–মুখে ছুঁড়ে গযানাথবাবুকে নাকাল করত; বলত, বেম্মো হযেছিল, নে খা হোমাপাখির ডিম খা; একদিন একশটা পচা ডিম দিযে গযানাথবাবুকে গঙ্গাস্নান কবিযে দিলে; তিনি দাঁড়িয়ে–দাঁড়িযে সহ্য করলেন সব। ঠাকুর্দা সে দিন বাড়ি ছিলেন না। আশ্চর্য, মহানুভব মানুষ বটে গযানাথবাবু। অহিংসা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রচাব করেছিলেন গান্ধীজিও সেকালের ব্রাহ্মবাও নিজেদেব জীবনে এ সব খুব দেখিযে গেলেন বটে।'

'কী হবে এ সব কথা বলে এখন?'

'শহিদদেব অগ্নিযুগেব কথা বলা হয, এও আব–এক বকম অগ্নিযুগেব কথা–নানা বকম সমাজ ও ধর্মসংস্কাবের দিক দিযে।'

'কী হবে এ সব কথা এখন আমাকে শুনিযে নিশীথবাবু?'

নিশীথ এক টিপ নস্যি নিযে বললে, 'গযাবাবুব কথা বলছিলাম। এমন লোক অনেক দিন দেখি নি।'

'আমি যা বললাম সে কথাব উত্তব দিন,' জযনাথ চুরুটটা তাব মুখেব কাছে তুলতে–তুলতে বললে, 'আমার বাড়িতে এসে এ সব কথাব পাট নিযে বসেছেন, নিশীথবাবু আপনি।'

'দু বছব রুখেছিলেন ঠাকুর্দা আব বাবা, গযানাথবাবুর ড্যাকরা আত্মীযদেব। পচা ডিম, পাঁকাল মাছ, কুকুব-শুযোবেব, মানুষেব বিষ্ঠা ছোঁড়া দেহজিপনা একা হাতে লড়ে শাযেস্তা করেছিলেন ঠাকুর্দা। সযুৎ হল, ঠাণ্ডা হল সব। দু বছর গযানাথবাবুদেব ভাত, কাপড়, সব কিছুব বাবস্থা করলেন ঠাকুর্দা তাঁব নিজেব বাড়িতে। আস্তে–আস্তে শান্তি এল তাব পব। গযাবাবু আব তাঁব স্ত্রী ব্রাহ্ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন। আপনি, অজযনাথ, মনোবমাদি, আপনাব বাবা–মাব সঙ্গে আমাব ঠাকুর্দাব বাড়িতেই ছিলেন তখন। দু বছব আমাদেব বাড়িতে থেকে গযাবাবুবা কলকাতাব ব্রাহ্ম সমাজে চলে যান। কলকাতাব ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে খুব নাম কবেন গযাবাবু। দোস্ত মহম্মদ লেনে থেকে খুব কঠিন সংগ্রাম করেন দাবিদ্রেব সঙ্গে। একটি ছেলে, আব একটি মেযে হযেছে তখন। দোর্দণ্ড লড়াই কবেন জীবনেব সঙ্গে গযাবাবুবা। সে সব ছেলেমেযেবা বেশ বড়সড় হযে খুব লাযেক হবাব আগে মরে গেলেন তিনি আব তাব স্ত্রী। বাঙালি কি সত্তব–পঁচাত্তব বছব বাঁচে না? না মবে গেলে বালিগঞ্জ প্লেসেব এ বাড়িতে এসে কত ভাল লাগত তাঁব! অজযনাথেব গ্রীক–ইহুদি বৌকে দেখে তিনি অখুশি হতেন না, কক্ষনো না। ভাবী একটা দামাল আহ্লাদে জাক্কর দিযে উঠতেন গযাবাবু। ওঁকে চিনি না আমি?'

নিশীথ ঘাড় হেঁট করে নিজেব মনে বলে যাচ্ছিলেন, সোফার ওপব আসন কেটে সে সাত্ত্বিক সবলপ্রাণাদের মত ভঙ্গিতে। শত্যার্থী আশ্রমে মানুষদেব তো এমনি কবেই কথা বলতে দেখেছিল নিশীথ। সে ভঙ্গি অনুকবণ করে নি নিশীথ, আশ্রমেব সে সব সবল সত্যাগ্রাহীদেব দেখবাব– শোনাব আগে এ বকম চালে সে আরো অনেক কথা বলেছে। নিজেরই একান্ত ধবন সবই তাব। গযাবাবুদেব কথা আরো বলতে যাচ্ছিল নিশীথ, জযনাথের কযেক বাব মোটা গলা খাঁকাবি শুনে ঘাড় তুলে প্রিন্সিপ্যালের চোখে বাঘের চোখে কেমন যেন মগডালেব মযূবেব চোখের মত তাকিযে রইল সে।

'তারপর, নিশীথবাবু। কী মনে করে?' খানিকটা লেজ নেড়ে চাপা গর্জ্জন করে বললে যেন জযনাথ।

'আমি জলপাইহাটি কলেজে কাজ করছি,' ওপবেব থেকে বললে যেন মযূব।

'তা জানি আমি।'

'কুড়ি–বাইশ বছর কাজ করেছি—সেখানে।'

'জানি আমি জানি সব।'

'কলকাতায় এলুম, মফস্বলে এখন আর মন টিকছে না।'

'কেন, সেটা পাকিস্তান হযে গেছে বলে?'

'না। চার–পাঁচ বছর ধরেই তো কলকাতার কলেজে কাজের ঘোঁৎ–ঘাঁৎ হাতড়ে দেখছি। তখন তো পাকিস্তানেব কোনো সম্ভাবনাও ছিল না।'

'আমার কলেজে কাজ চাচ্ছেন আপনি?' জয়নাথ বললে।

'শুনলুম পাকিস্তান থেকে পারানি পাখির ঝাঁকের মত ছেলে আসছে আপনার কলেজে। কলেজের নতুন ঘরদোর তৈরি করছে রাজমিস্ত্রিরা, দেখে এলুম তো'—

'এই-ই বুঝি দেখছে পাকিস্তানের ছেলেরা আর প্রফেসররা', জয়নাথবাবু চুরুটে ধীরে-ধীরে দুটো নিট নিঃঝুম টান মেরে বললে, 'নাঃ, বেশি কী আর ছেলে এসেছে পাকিস্তান থেকে আমাদের কলেজে; যত বব রটে তার আঁশ বাতাসে কিছু এসেছে। না, সে সব কিছু না।'

'কত এল?'

'বেশি হলে হাজার দুই-আড়াই। তাতে কি আর মাল হয়?'

'কত ছেলে আছে কলেজে?'

'কী হবে তা জেনে? ভাইস চ্যান্সেলারকে গিয়ে বলবেন যে পাকিস্তান থেকে চলে এসেছি, সঙ্গে দু হাজার ছেলে ঝেঁটিয়ে এনে জয়নাথের কলেজে ঢুকিয়েছি; ওকে কাজ দিতে বলুন, এই তো বলবেন?'

নিশীথ পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বার করে এক টিপ নস্যি নেবার জোগাড়ে ছিল। জয়নাথ নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে এক বার নিজের চুরুটের দিকে তাকাল, এ চুরুটটারও বাবটা বাজাচ্ছে প্রায়।

'না, ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে আমি যাব না।'

'হয়ে এসেছেন তো তাঁর কাছ থেকে।'

'না। আমি যাই নি।'

জয়নাথের সন্দেহ হচ্ছিল। অবিশ্যি ভাইস চ্যান্সেলাব কিংবা অন্য বড়-বড় লোক—এমন কি অ্যাসেম্বলিব—এমন কি মিনিস্ট্রির—জয়নাথের কলেজের ভেতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আসবেন না। দূর থেকে সামান্য একটু চাপ দিতে পাবেন হয় তো। দূর থেকে। সে চাপের কোনো অর্থ হয় না। জয়নাথের কলেজ তাব নিজের কলেজ। আর-এক রকম চাপ আছে বটে। দুয়ারে মোটব দাঁড় করিয়ে, বাড়িতে পায়েব ধুলো দিয়ে, ওপরওয়ালারা যা ছিনিয়ে নেন। কিন্তু সে প্যাঁচ নিশীথের হয়ে কষতে আসবে বুঝি কেউ? ও জানে কি কলকাতার! পোছে কে ওকে? ও তো মফস্বলে কুড়ি-চব্বিশ বছর পড়েছিল। নিশীথ আড়াই চাল মারবে ভেবেছে জয়নাথকে গয়নাথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে! খাজা। চারপেয়ে খাজা। মফস্বলেরই। নিশীথের ঠাকুর্দার বাড়ি দুটো বছর খেয়েছে-পড়েছে বটে জয়নাথের বাবা গয়ানাথ মজুমদার আর তাঁর পরিবার, তাঁদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল যখন। সেটা মিথ্যে কথা নয়। কিন্তু জয়নাথরা ব্রাহ্ম সমাজে আছে কি নেই ঠিক বলতে পারে না জয়নাথ। বিশ-চল্লিশ বছর আগে বাবার সেই আদর্শ, যেমন পচা ডিমের পিচকিরিতে পোঁদ ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, নিশীথের ঠাকুর্দার বাড়িতে খেয়ে-পরে ধর্মের লড়াই করা, এ সব জিনিসের বিষ মরে গেছে আজকাল; বাবা যদি আজ বেঁচেও থাকতেন তা হলে নিশীথকে জয়নাথের কলেজের কাজে ঢুকিয়ে দিতে বলবার মত মুখ থাকত কি আর তার? কিন্তু তিনি তো বেঁচে নেই, সমাজে জীবনে কলেজে কোথাও কোনো প্রতিপত্তি আছে কি তাঁর? দেখছে না তো কোনো দিকে তাঁর কোনো প্রভাব। দিন-রাত চুরুট সিগারেট টানছে জয়নাথ, নিয়মিতভাবে মদ খাচ্ছে জয়নাথ, কলেজের টাকা তিন ভাইয়ে মিলে পাচার করছে, তবুও জাঁকিয়ে রয়েছে কলেজটা। খুব বাহবা পাচ্ছে তাই তারা। পূব বাংলার কলেজগুলো ফতুর হয়ে পশ্চিমবাংলার কলেজগুলোকে ছেলেতে-ছেলেতে ফাঁপিয়ে তুলল, খুব ঢাকে কাঠি নাচছে জয়নাথদের; জয়নাথের মেজ শালির বড় মেয়ে, মোড়লের সঙ্গে বিয়ে হল যার, সে মেয়েটির বাবা তো জয়নাথ, মেসোও বটে, কিন্তু মেসোর চেয়ে বাবা বেশি বলেই নিজের কাজ, ঘরের কাজ, গুষ্টির কাজ, কলেজের একশ রকম দাঁও মারবার কাজ ফেলে, সেই ভোরে বাসি মুখে নিজের মোটর হাঁকিয়ে বসিরহাট গিয়েছিল তো সে। বিয়েটা ভাঙবার চেষ্টায়ই গিয়েছিল, পারল না, মেজো শালি সুনয়নী কিছুতেই দিল না। নানা কথা ভেবে দেখছিল জয়নাথ। জয়নাথের নিজের পরিবারের, সমাজের, কলেজের এ সব কোনো রকম ব্যাপারে বাবার কোনো গাঁউখুরি টের পাচ্ছে না আর জয়নাথ। নেই। নেই-ই তো। কিছুই নেই আর।

'গত বছরে আপনার কলেজে মাস্টারি কাজটা পেয়ে যাব ভেবেছিলুম।'

'পেলেন কোথায় আর', একটু চিন্তিতভাবে জয়নাথ বললে। নিশীথের বিষয়ে নয়, অন্য কথা ভাবছে জয়নাথবাবু। সুনয়নী কেমন বুড়ো হয়ে গেছে; তবুও মন্দ নয়। কিন্তু বালিগঞ্জ প্লেসে কিছুতেই আসতে চায় না। কিছুতেই এল না। এক রাতের জন্যেও না। রমলা কার মেয়ে সেটা একেবারেই ভুলে গেছে সু।

সূচীপত্রে যান

'সে কাজটা মতিমোহনবাবুর ছেলেকে দিতে হল।'

'মহিতমোহনবাবু কে?'

'আমার মাথা আর মুণ্ডু। শোরহাওয়ার্দি মিনিস্ট্রির সময় একটা বড় চাঁই ছিলেন। এখন তো গড়াচ্ছেন। দশ বাঁও জলের নীচে তলিয়ে গেছেন।'

'মতিমোহনবাবুর ছেলেকে রেখেছেন আপনাদের কলেজে?'

'নাঃ। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, পনেরই আগস্টের আগেই স্যাডো মিনিস্ট্রি হতে না-হতেই।'

'তাড়িয়ে দিতে হল!' নিশীথ একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে।

'সেকেণ্ড ক্লাস তো।'

'ঢুকেছিল কি ফার্স্টক্লাস ভাঁওতা দিয়ে?'

'চোখ মেলেই ঢুকিয়েছিলুম। কিন্তু স্যাডো মিনিস্ট্রির বাজ্যি; আব-একজন লোককে নিতে হল তাব শাশুড়িকে খুশি করবার জন্যে।'

'শাশুড়ি?' নিশীথ জয়নাথকে না বলে নিজেকেই যেন বললে আস্তে—কোনো উত্তব দাবি না কবে- শাশুড়ির সঙ্গে স্যাডো মিনিস্ট্রির কী সম্পর্ক?'

'তা হলে কি শ্বশুরের সঙ্গে হবে?' জয়নাথ চুরুটে আস্তে টান দিয়ে বললে, 'পিসশ্বশুব তো সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মাসিশাশুড়ির পেছনে।' নিশীথ নস্যিব কৌটোটা খুলে নাকেব বাঁ ছ্যাঁদায় ডান ছ্যাঁদায়, ডান ছ্যাঁদায় বাঁ ছ্যাঁদায়, বিদ্যুৎক্ষিপ্রতায ঘন-ঘন খানিকটা সাঁটিযে নিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিযে মাথাটাকে খাড়া কবে, লালচে চোখ পাকিয়ে, চারদিকে এক বার তাকিয়ে, রুমালে মুখ-নাক ঝেড়ে নিল।

'ছাযা মিনিস্ট্রি তো বাস্তব হল, ঘোষ মিনিস্ট্রি গিযে বায মিনিস্ট্রি এল। কী হল এই সব এলোমেলো ব্যাপারে সেই প্রফেসব লোকটির?'

'এক জন কি আর, কত প্রফেসব বহাল করছি, বিদায দিচ্ছি আমবা। আপনার ইংরেজি ডিপার্টমেন্টেব কথা বলছিলুম, ইংরেজির সেই প্রফেসবটি ভাল কাজ পেযে চ'লে গেছে ঘোষের আমলেই।'

'কেউ এসেছে সে জাযগায?'

'রাখতে হযেছে। লোক রাখতে হযেছে।'

'আবো তো লাগবে প্রফেসব আপনাদেব।'

'ছেলে বেড়ে গেছে, টিউটোবিযাল ক্লাসও বেড়েছে,' নতুন আব-একটা চুরুট হাতে নিযে জয়নাথ বললে। এখন তাব একটু ড্রাই জিন খাবাব সময।

'তা ছাড়া জেনারেল ক্লাসে এক-এক সেকশনে দুশ মেযে দুশ ছেলে, এটাও কি ঠিক?'

'দেখা যাক দেড়শ-দেড়শ কবে বাড়িযে দিতে পাবা যায কিনা। আরো প্রফেসব লাগে তাতে। বড্ড খবচ।' জয়নাথ চুরুটটা জ্বালিযে নিযে বললে।

'আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনাব কলেজে।'

'সত্যিই আসছেন কলকাতায?' চুরুটে টান দিযে সহানুভূতি সাজিযে বললে জয়নাথ।

'আপনার কলেজে কাজ পেলে তো গত বছরেই আসতুম।'

তাই মনে করে বুঝি লোকটা? ড্রাই জিনেব কটা বোতল তো ফুবিযে গেছে, না কি একটা আছে? হুইস্কি আছে- খুব ভাল স্কচ। সুজয়নাথ আসে নি এখনো, হয তো রাতেব বারফট্টাই শেষ কবে। এই পাড়ার, জয়নাথের নিজের এলেকার, কযেকটি মেযেকে যে লেত্তির মত হাতে বাগিযে বাখতে চাচ্ছে সুজয়নাথ সেটাব কী হবে? তাকে কী দেওযা হবে তা? বাষ্ট্র, সমাজ, কলেজ সব তো সব। সম্প্রতি খাগড়ার কথা ভাবছিল জয়নাথ।

'আপনি তো সেকেন্ড ক্লাস নিশীথবাবু।'

বাক্স থেকে সিগারেট বার করে জ্বালিয়ে নিযে নিশীথ বললে, 'কত তো সেকেণ্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস রযেছে কলকাতার প্রফেসরদেব মধ্যে। চারশ-পাঁচশ টাকাও তো পায তাবা।'

'অনেক আগে ঢুকেছিল তাবা।'

'এখনো তো ঢুকছে।'

'জুতে দিতে পারে এ রকম মানুষ সঙ্গে করে নিযে আসুন আপনি, আমি আমার কলেজে আপনাকে ঢুকিযে দেব। ঘোষকে আনুন না, চাকলাদারকে আনুন।'

'প্রফেসব ঘোষকে? প্রফেসর অভযেন্দ্রমোহন'—

সূচীপত্রে যান

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তিনি মোটরে এসে একটু চেপে ধরলেই তাঁকে চেপে ধরব আমি। আপনারও হয়ে যাবে, আমারও হবে।'

নিশীথ সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'ঘোষ কি ভাইস চ্যান্সেলার হচ্ছেন?'

'বেনারস ইউনিভার্সিটির?'

'কোন ইউনিভার্সিটির জানি না'—

'তা হতে পারেন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যেতে পারেন।'

'কে পাচ্ছে ঘোষকে? তাঁকে আমি পাব কী করে?'

'মোহিতা ঘোষকে বলে দেখতে পারেন।'

'কে মোহিতা ঘোষ?'

'জানেন না? ঘোষের স্ত্রী!'

নিশীথের হাতে সিগারেট জ্বলে যাচ্ছিল, একটু ঝাঁকি দিয়ে ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে, 'অনেক ওপরের লোক তো এঁরা এঁদের নাগাল পাওয়ার সাধ্যি আমার নেই।'

জয়নাথের এখন নিতান্তই এটা-ওটার দরকার—তামাকের ধোঁয়ায় সুঁটকি মাছের গন্ধ পাচ্ছে সে।

জয়নাথ কয়েকবার জোরে শুষে চুরুটটা টেনে নিয়ে বাশি-বাশি ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'প্রফেসর ঘোষের চেয়ে মোহিতা ঢের কঠিন। কিন্তু কেউ-কেউ তাকে বেশ হাত করে নিতে পারে। ওদের বাড়িতে নৃপেন বলে একটা ছোকরা থাকে। শুনেছি তার সঙ্গে মোহিতার কী সব অদ্ভুত সম্বন্ধ।'

জয়নাথ একটু চোখ টিপে, হেসে, মুখ ভার করে, চুরুট টানতে গিয়ে চুরুটটা নামিয়ে, কেমন নিঃশব্দ মাংসলোলুপ মুখে বসে রইল।

'কে বলেছে, কোথায় শুনলেন এ কথা জয়নাথবাবু?' নিশীথ তার পাঞ্জাবির গলার বোতামটা খুলতে আর-একটা বোতামও খুলে ফেলল।

'আপনি তো কলকাতায় থাকেন না। কী করে জানবেন। আমরা কেউ-কেউ জানতে পারি সব।'

এইবার জয়নাথ উঠবে হয় তো। নাকি আরো গেড়ে বসবে। কিন্তু নিশীথকে উঠতে হবে বোধ হয়। জয়নাথের এখন অন্য নানা রকম আয়োজনের সময় এসে পড়েছে। ধরাছোঁয়ার ভেতরে কিছু নেই যেন চারিদিকের আবহাওয়ার ভেতর, কিন্তু তবুও ধোঁয়াটা কেমন ফলাও করে পেকে উঠছে জয়নাথের চুরুটে। রাত বাড়ছে। ধোঁয়া পাকছে। একটা চুরুট চেয়ে নিলে হত জয়নাথের কাছ থেকে। চাকরি সে নিশীথকে কিছুতেই দেবে না, প্রফেসর ঘোষ বা মহিলাদের কাউকে সঙ্গে করে এনে তাকে দিয়ে জয়নাথকে বেশ ভাল করে মকরধ্বজ না মাড়িয়ে দিলে। খুব সম্ভব চেষ্টা করলে মিসেস ঘোষকে আনা যায় এ বাড়িতে নিশীথের কাজের সুরাহা করে দেবার জন্যে?

না, না, মোহিতা ঘোষের সঙ্গে আর দেখাই করবে না হয় তো নিশীথ। দেখা করলেও অন্য অনেক দূরের জিনিস নিয়ে। চাকরি-বাকরির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

'আমিও একটা সম্বন্ধ পাকাতে চেষ্টা করেছিলুম মোহিতা ঘোষের সঙ্গে, জয়নাথ বললে, 'কিন্তু কিছুতেই পারলুম না। ভারী চমৎকার মেয়ে। কিন্তু বড় কঠিন।' মোহিতার সঙ্গে বেশি মেশে নি নিশীথ। প্রফেসর ঘোষের চেয়ে উঁচুদরের মেয়ে মোহিতা। কিন্তু জয়নাথ তাকে নীচের দিকে ঠেলতে চাচ্ছে বুঝি? সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে কঠিন মনে হচ্ছে মোহিতাকে? নৃপেনের সঙ্গে মোহিতার কোনো সম্বন্ধের কথা সেই জন্যেই বুঝি জুড়ে দিচ্ছে জয়নাথ!

'একটা কাজ দিতে হবে আমাকে আপনার কলেজে।'

'আপনি তো সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ নিশীথবাবু।'

'কত সেকেণ্ড ক্লাস তো কলেজে প্রিন্সিপ্যালি করছে—'

'অনেক আগে ঢুকেছিলেন ওঁরা। আমাদের কলেজে কমার্সে কাজ নেবেন?'

'কত, মাইনে হবে জয়নাথবাবু? দুশ পাওয়া যাবে?'

'না, একশর বেশি দিতে পারব না আমরা; টেম্পরারি বেসিসে। তবে এখন কোনো ভেকেন্সি নেই। হতে পারে, শকুনের বাচ্চারা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে খোঁজ নেবেন আপনি, আচ্ছা?'

জয়নাথবাবু উঠে ভেতরে চলে গেল। সুজয়নাথ ঢুকে পড়ে নিশীথকে বাইরে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাল, ঘরে মেয়েরা আসবেন। নিশীথকে চেনে বটে সুজয়নাথ, কিন্তু চিনতে চাইল না। জয়নাথের মত বোকা সে নয়। দোস্ত মহম্মদ লেনের আবহাওয়াটা এখনো ভাল করে কাটিয়ে উঠতে পারে নি জয়নাথ,

সূচীপত্রে যান

কিন্তু কোনো মা ছিল না যেন কোনো দিন, জয়নাথের বৌয়ের মত, সুজয়নাথের। বালিগঞ্জ প্লেসের হল-ড্রয়িংরুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যেন সে। একে দিয়ে অন্তত 'কি নিশীথবাবু কেমন আছে, বসুন', বলিয়ে নেবার জন্যে মোহিতা ঘোষকে সঙ্গে করে এ-বাড়িতে এক দিন ঢুকতে ইচ্ছে করে নিশীথের। এই ছেলেটিকে দেখলে এমনই ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে মানুষের মন। কিন্তু তবুও মিসেস ঘোষ ছেলেমানুষ নন, নিশীথও নয়, সুজয়নাথও টেস্ট টিউব নয় এখন তার—জয়নাথের কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।

'দাদা ওপরে চলে গেছেন। এইবারে দরজা বন্ধ করব,' সুজয়নাথ বললে। 'হ্যাঁ যাচ্ছি,' নিশীথ বললে।

জলপাইহাটি মন্দ লাগছিল না হারীতের। কলকাতায় হারীতের মন যে-দিকে ঝুঁকেছিল সে সব বিপ্লবের, রক্ত-বিপ্লবের কোনো কাজ যে এখানে নেই তা নয়। তবে কোনো দল নেই, এমন কোনো বিশেষ লোককে সে দেখছে না যার কাছে গিয়ে নিজের মনের আগুনের ওপর আলোর কথাগুলো পাড়তে পারে হারীত। কলকাতায়ই হারীতের মনটাকে বুঝে দেখবার মত, মতটাকে অনুসরণ করবার মত মানুষ খুব কম ছিল। অনেক কষ্ট করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়েছে, কোনো-কোনো জায়গায় বেশ সহজেই যেন হারীতের বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছে তারা, অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য সাধন করতে হয়েছে হারীতকে—একে, ওকে, তাকে, নিজের কথাটা ধরিয়ে দেবার জন্যে। কাজে অবিশ্যি হয় নি কিছু, কবে কোনো দূর ভবিষ্যতে খুব বৃহৎভাবে কাজ হবে সেই জন্যে অল্প-অল্প সংগঠন চলছিল কলকাতায়। হারীতের অভাবে কলকাতায় তার হাতে গড়া মানুষগুলোর অবস্থা কী রকম দাঁড়িয়েছে কে জানে? ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে হয় তো সব। আজ কাল কেউই আর দেশের, ঠিক বলতে গেলে মানুষের, খাঁটি স্বাধীনতা ও শান্তির জন্যে নতুন করে স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। অনেকেরই মনের ভাব এই যে, স্বাধীনতা পাওয়া হয়ে গেছে, আবার কী, এবার সকলেই সবচেয়ে আগে যে-যাকে পারে, পায়ে মাড়িয়ে মুখে রক্ত তুলে, ছুটে আস্বাদ করবে, উপভোগ করবে চারদিককার সাতসুতরোর ভেতর অফুরন্ত ভালুকের মত। কিন্তু সেটা কি কোনো ভাল রাষ্ট্রব্যবস্থা হল? কিন্তু এও তো হচ্ছে না। আমাদের দেশে, আমেরিকায়, হয় তো এ রকম, কিন্তু পৃথিবীর প্রায় অন্য কোনো জায়গায়ই এ টুকু মজা লুটবারও অবসর নেই। বিশৃঙ্খল অপ্রতুলতায় মরছে না তারা, উচ্ছৃঙ্খল অভাবে নিকেশ হয়ে যাচ্ছে। দেখে এসেছে সে কলকাতায়—পশ্চিমবাংলায়- ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে। থামাবে কে এ সব? মানুষকে ফেরাবার সোজা পথটা নয় কঠিন, নইলে পথটা দেখিয়ে দেবে কারা? সত্যিই সুবিচার তৃপ্তি, শান্তি স্বাধীনতা এনে দেবে? জানা যাবে সেই জলপাইহাটিকে, যাকে নিজের আশা ভরসার পীঠস্থান বানানো সম্ভব নয় হারীতের পক্ষে। তাকে চলে যেতে হবে আবার কলকাতায়, কিংবা আরো দূরে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের অন্তস্তলের আবহাওয়ার ভেতরে, যা ভাল হয় তাকে শোধিত, বিবর্ধিত করবার জন্যে, যা ভাল তাকে সঞ্চারিত করে দেবার জন্যে। এখানে জলপাইহাটিতে কেমন একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তার ভেতর নিরবচ্ছিন্ন নিঃস্ব হয়ে ঘুরে ফিরছে সমস্ত অবুঝ ও বুদ্ধিমান। এদের অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে, রোজই যাচ্ছে— এখনো যাচ্ছে। এদের এখানে থাকতে বলেছে হারীত—রোজই একবার তার রোদে ঘুরে আসবার সময় এইখানেই এদের থেকে যেতে বলছে। হারীতের কথা শোনবার মত মনের অবস্থা এদের নয়। মন পশ্চিমের দিকে ছুটছে, এখন কি এরা আর পদ্মার পাড়ে পড়ে থাকবে? কি আশ্চর্য অবর্ণন সমৃদ্ধি আছে এই পদ্মা-মেঘনার দেশে, মানুষ যদি আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে একটু সুস্থির ভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করত, কাজ করতে শুরু করে দিত, এ-দেশের ও দেশের নয়, পৃথিবীর আশ্চর্য মানবধন্য নাট্যটাকে ভালবেসে; কিন্তু এরা আছে কি নেই, সেই হুঙ্কার শুনে, ছিটের ফতুয়া-জামা পরে, দেখ, ডোরাকাটা জেব্রার মত ছিটিয়ে-ছিটিকে হাওয়া দিচ্ছে সব। দুরন্ত জেব্রার মত এরাই না, না, সে রকম প্রাণবন্তভাবে ছুটে গিয়েছিল আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার ওজস্বী উপনিবেশীরা, এরা কীটপতঙ্গের মত আগুনের থেকে বড় আগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে চলেছে। কলকাতায় বাড়ি নেই, চাকরি নেই, খাদ্য নেই। মৃত্যু আছে—তবুও পেঁচোয় পাওয়া বাচ্চাদের মত মুখ থুবড়ে পড়ছে গিয়ে কলকাতার অলিতে-গলিতে ফুটপাতে।

তা হলে জলপাইহাটিতে হারীতের সচেয়ে বড় কাজ কি এখন এদের থামিয়ে রাখা? হারীত ভেবে দেখছিল কিছু কাল থেকে। এ কাজটা সে নিলেও নিতে পারত তার হাতে। কিন্তু তবুও নিচ্ছিল না। কলকাতায় যেন সবচেয়ে ভাল কাজ নিয়ে ডুবে ছিল সে। দেশ স্বাধীন হলেও তাকে সত্যিই স্বাধীন ও

সফল করে তোলা বড় বিপ্লবের ভেতর দিয়ে, দরকার হলে বিপ্লবকে অব্দি শুধরে সফল করে আশ-পাশে নিয়ে আসা। এখানে এসে বিশ্রাম করছে হারীত, কথা ভেবে নিচ্ছে, সবচেয়ে ছোট-ছোট জিনিসে হাত দিচ্ছে সে। সবচেয়ে প্রথম ছোট জিনিস, নিজের শরীরটিকে সারিয়ে নিতে হবে, মাকে সারিয়ে তোলার চেয়েও বেশি সনির্বন্ধ হয়ে। পরিশ্রমে, অখাদ্যে, রোগে হারীতের শরীর ভেঙে পড়েছিল কলকাতায়। প্লুরিসি হয়েছিল কয়েকবার। যক্ষ্মা হয়েছে বলে মনে হয় না। রোজই রাতে জ্বর হয় এখনো যদিও, তবুও এ উপসর্গটা কমে এসেছে, শরীরে আগের চেয়ে বেশি স্বাদ পাচ্ছে সে। কাল রাতে জ্বর হয় নি। অর্চনা যে থার্মোমিটারটা দিয়েছিল বার-বার জিভের গোড়ায় ঠেলে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে দেখে নিয়েছে সেটার টেম্পারেচার কয়েকবার কাল রাতে জ্বর হয় নি। টিউবারকুলোসিস হয়েছে কি না, এ বিষয়ে নিজের মনে সন্দেহ হয়ে গিয়েছিল তার, নরেন ডাক্তারেরও; কিন্তু দু-একদিন হল হারীতের মনে হচ্ছে যে টি-বি সত্যিই হয় নি তার; হয় নি যে এ বিষয়ে তার নিঃসন্দেহ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ভাল লাগছে তার। কথা ভাবতে-ভাবতে হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেল সে—লালপুরের রাস্তাব পাশে মস্ত বড় একটা দেশে, কাছেই ঘনিয়ে আসছে সুলেখাদের বাড়ি। কৃষ্ণচূড়ার গাছ আগুন জ্বালিয়ে উড়ছে রোদেব বোশেখের বাতাসে। এক রাশি বোলতা ভীমরুল মৌমাছি রোদে ঝিকমিক করে জিন পবীদের মত উড়ে বেড়াচ্ছে যেন; এদেরই রক্তের বিষাক্ত সুধার উষ্ণতা উছলে উঠে যেন অবাধ অঝোব বক্তিম ক্যানাফুলের উজ্জ্বলতায় সুলেখাদের বাড়ির সামনের অনেকখানি সবুজ ঘাসকে নিবিড় করে রেখেছে। আঃ, কী চমৎকাব এ পৃথিবীর বসন্ত ঋতু, গ্রীষ্ম ঋতু, কী চমৎকার ঐ খন্ড নীলে সাদা মেঘ। বড়-বড় সাদা মেঘ ডাবেব জলে মেশানো দুধের উষ্ণতার মত এই রৌদ্রের ভেতব—দুপুব এসে পড়েছে, জমে উঠেছে, দুপুব ফুবিযে যাচ্ছে যেন, বিকেল কথা বলছে যেন কৃষ্ণচূড়ার ছাযার ভিতর। কোনো বেদনা নেই, মানুষের হৃদযকে সৌরভ দিযে মৃত্যুর যে-ধ্বংসকীট রেখে যায, সময, থেকে-থেকে তার ছাযাপাত ছাড়া। শুঁড় আছে এই কীটেব; শুঁড় আছে, ছায়া পড়ে। কোনো বেদনা নেই, এই সবস নিঃশব্দ বিপদের কালিমা ছাড়া।

'তুমি যে আসছ আমি দেখছিলুম হারীত—'

'আমি ক্যানাফুল দেখছিলুম তোমাদের বাগানেব। কী চমৎকার সবুজ ঘাস ঘিবে বোলতা-মৌমাছিব হুলের জ্বলুনি-পুড়ুনির ভেতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে যেন এই সব ক্যানাফুল—ইস! কী লাল।'

'রক্ত রঙই ভাল লাগে তোমার হারীত। বিপ্লব কবছ।'

'কোনো রক্ত ঢেলে বিপ্লব না করতে পাবলেই তো ভাল। মানুষের ভাল কবাই তো উদ্দেশ্য, মানুষকে খুন করা হবে কেন তার জন্যে?' বললে হাবীত।

'ক্যানাফুল খুব ভাল লাগে তোমার?' সুলেখা বললে।

'কিন্তু দেখা গেছে যে অনেক মানুষই বিশেষত যারা গেড়ে বসেছে, সমাজ চালাচ্ছে, বাষ্ট্র চালাচ্ছে, লুটছে, তারা এত অবোধ যে তাদের হৃদযেব মোড় ঘুরিয়ে ঠিক দিকে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয। কী কবে উন্নতি হতে পারে তাদের ধ্বংস না কবে?'

'বাবা, কেমন মারমুখ হযে কথা বলছে, ছেনি-টেনি সঙ্গে নিযে এসেছ নাকি, হাবীত?'

সুলেখার দু বছরের বড় বোন মনোলেখা ওবফে জুলেখা এসে বললে, 'হুবির মত দুটি বোন। ভাই নেই, বাবা নেই, নেই কোনো আত্মীয়-স্বজন, শুধু মা আছেন, এক-আধটি চাকর আছে।'

'আমি আসছি হারীত, এখুনি আসছি, তুমি কিন্তু পালিযে যেও না,' বলতে-বলতে জুলেখা পাশেব ঘরে চলে গেল। পাশের ঘরের কিনারা দিয়ে সিঁড়ি চলে গেছে দোতলার দিকে—ছাদেব দিকে; সেই দিকে চলে গেল নাকি জুলেখা? চোত-বোশেখের রোদ বাতাস, বাতাস রোদের ঝাঁঝেব সঙ্গে সত্যিই কেমন মানিয়েছে এই ফুলগুলো। পাশে সবুজ ঘাস রযেছে, মাথার ওপরে নরম নীল, সব সময়ই হুড়-হুড় করে ছুটে আসছে অশরীরী বাতাস। বেশ দেখায কিন্তু এ সবের ভেতর এই আগুনের জাত ফুলগুলো—

'কলকাতায় এত বড় একটা দাঙ্গা হয়ে গেল বছর দেড়েক আগে। আমরা ছিলুম সে সময কলকাতায়। মা, জুলেখা, আমি'—

'জুলেখা তোমার দিদি তো'—

'ওকে আমি জুলেখা ডাকি,' সুলেখা বললে, 'তোমাকে তো হারীত ডাকি, জুলেখা আর আমি। কত বয়স তোমার?'

'আমার ত্রিশের কাছাছিল—'

'দিদির তো একুশ, আমার উনিশ। তুমি কি আমাদের চেযে অনেক বড় হারীত?'

'কী মনের হয় তোমার?'

'তোমাকে যদি খুব বড় মনে হত, কাছে ঘেঁষতে বাধো-বাধো ঠেকত, তা হলে তোমাকে হারীত কাকা ডাকতুম। কিন্তু তা তো নয়। তবে, তুমি যদি চাও তোমাকে হারীতদা ডাকতে পারি, জুলেখা তো মনে-মনে ডাকে,' সুলেখা বললে, 'কিন্তু তোমাকে হারীত ডাকি বলে তুমি আমাদের ভিতর এক জন হয়ে গেছ মনে করো না কিন্তু'—

'তোমাদের ভেতর এক জন হয়ে গেছি? মানেটা ঠিক বুঝলাম না সুলেখা।'

'তোমাকে হারীত ডেকে খেলো করছি না। তোমাকে আমরা মর্যদা দিচ্ছি।'

'জোর করে?' হারীত মুখ ভারী করে হেসে বললে।

'না। যা প্রাপ্য তার চেয়ে কম দিচ্ছি; আমি অনেক কম, জুলেখা আমার চেয়ে বেশি দিচ্ছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'তুমিও তো দাঁড়িয়ে আছ।'

'চল, ঘরের ভেতরে যাই।'

'এই বারান্দাযই ভাল, বেশ বাতাস, আলো, ঘাস, আকাশ, ক্যানাফুল। গোটা তিনেক বেতের চেযার এনে বসলে হয় এখানে।'

'তিনটে কেন? আমরা তো দু-জন।'

'জুলেখা তো আসছে বলে গেল।'

'সুলেখা একটু ঘাড় কাত করে দু-তিনটে লম্বা কাল চুল মাথার থেকে মুখের, গালের, ওপর দিয়ে নীচের দিকে টেনে বীণার তারের মত টান করে রাখতে-রাখতে বললে, 'ও, তার কথা ভাবছ বুঝি তুমি?'

'কোথায় গেল তোমার দিদি?'

'আমি দেখি নি তো!'

'এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও?'

'আমি দেখি নি'—বীণার তারের মত টান-টান রেশমি চুল কটা ছেড়ে দিয়ে মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সুলেখা বললে।

'আসবে তো জুলেখা?'

'তুমি যদি সকালবেলা আসতে—জুলেখা তো ছিল বাড়ি সমস্তটা সকাল।'

কেমন যেন অত্যধিক সারল্যে জুলেখার কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল হারীত; ঠিক ততটা সবল না হয়ে উত্তর দিয়ে হারীতের অতীত ঐ বাইরের পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল সুলেখা।

হারীত তাকিয়ে দেখল, অনেকগুলো বোলতা ওড়াউড়ি করছে রোদের ভেতর। বাতাসে টাল সামলাতে না পেরে হিল্লোলিত হচ্ছে, ছটকে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে, একেবারে সুলেখার মুখের ওপরই এসে পড়েছে যেন একটা; ঠিকরে পড়ল বাতাসের আর-একটা ঝটকায় সুলেখার গালের ওপর—

'ধরো না ধরো না সুলেখা, কিছু বলবে না, টিপে ধরো না।'

'উ-হু-হু-উ-উ—আমাকে হুল ফুটিয়েছে হারীতদা।'

'কেন ধরতে গেলে?'

'আ-আ, বড্ড জ্বালা করছে। আঙুলে কামড়েছে,' গালে আঙুল ঝাড়তে ঝাড়তে সুলেখা বললে, 'না, বেশি কামড়ায় নি, আমি একটা পাতার রস ঘষে আসি—'

'স্পিরিট আছে?'

'কেরোসিন আছে। আমি একটু পাতা ছেঁচে ঘষব, আচ্ছা ঐ ক্যানাফুলের ঝাড়ের পাশে এমন সুন্দর ঘাস—ঘষলে আরাম পাওয়া যাবে না? পাওয়া তো উচিত। ও-রকম স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা জিনিস কেন মানুষের জ্বালা জুড়িয়ে দেবে না?'

'কেরোসিন আছে বললে?'

'আমার ব্যথা কমে গেছে। আচ্ছা দেখো তো, আঙুলটায় হুল ফুটিয়েছে না কি?'

সুলেখার ডান হাতের অনামিকটা ধরতে গেল না হারীত। মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা তিনটেকেই হারীতের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল সে, যে-আঙুলে বিষ ঝেড়েছে সেটাকেই নির্দেশের মত ঝাড়ছে।

হারীত এগিয়ে এল না, মাথাটাও একটুও ঝুঁকে পড়ল না তার, যেখানে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে

সূচীপত্রে যান

থেকে সুলেখার আঙুলের ওপর চোখটাকে ঝুলিয়ে বিঁধিয়ে রেখে বললে 'না, হুল ফোটায় নি।'

'তোমার কি চিলের মত চোখ হারীত?'

'বেশি ফোটায় নি—'

'আঙুলটা ফুলেছে—'

'বেশি ফোলে নি।'

'কম ফুলেছে?'

'তোমার কি ব্যথা আছে?'

সুলেখা হাত সরিয়ে নিয়ে গ্লিব প্লিব ক্লিব্‌ল্‌ ক্লিবল খিখি ক্লিখি করে হাসতে লাগল।

'তোমার ব্যথা কমে গেছে,' হারীত যেন নিজেকে, কলকাতার ও বাইরের ব্যথিত পৃথিবীটাকেও, আশ্বস্ত করে শান্ত স্নিগ্ধ গলায় সুলেখাকে বললে। হাসি পেল সুলেখার।

সুলেখার ব্যথা কমে গেছে, বলছে কী হারীত? হারীতের কণ্ঠস্বরের ও মনের বড় বিচ্ছিন্ন ব্যাসভূমিটাকে উপলব্ধি করে সুলেখার আঙুলের প্রতীকভূমিতে কথাটা লেগে আছে যেন, রক্তমাংসের আঙুলে ব্যথাটা কমে বাড়ে বটে।

'চলো, ঘাসের ওপর গিয়ে বসি।'

'কোথায়? ঐ সব থোকা-থোকা বাধাফুলের পাশে?

'কোথায় গিয়েছে জুলেখা? হ্যাঁ, ক্যানাফুলের ঝাড়ের কাছে বাগানের ঘাসে। চলো।'

চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখে সুলেখা বললে, 'সকলের চোখ পড়বে ওখানে বসলে। ওটা তো একেবারে খোলা জায়গা। লালপুরের পথ এ দিকে। পুবে সদর রাস্তা। চারদিকে নানা ধাঁচের লোকের ঘরবাড়ি। দিন-কাল বড় খারাপ হারীত।'

'তা তো জানি,' হারীত বললে, 'মানুষ চাইলে কী হবে, মানুষই তাকে কিছু করতে দিচ্ছে না।'

'কোথায় বসবে তা হলে, বারান্দায়?'

'চলো, ভিতরে যাই,' ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে সুলেখা বললে, 'তুমি কি এখানেই থাকবে, জলপাইহাটিতেই থাকবে হারীত?'

'আমার আসল কাজ তো কলকাতায়—'

'ছোট কাজগুলো হয়ে গেছে?'

'না, শুরুও তো হল না।'

'সেগুলো শেষ করে কলকাতায় যাবে তো?'

'তাই তো হচ্ছে—'

'এই দিকে এসো—'

'ঐদিকে? দোতলায় যাবে?'

'হ্যাঁ, চলো, দোতলার চিলেকোঠায় বসি গে।'

'জুলেখাকে দেখেছিলাম দোতলায় যেতে? দেখেছিলে তুমি?' সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে-উঠতে হারীত বললে।

'না, দিদি অবনী খাস্তগিরের বাড়িতে গেছে'—

'অবনী খাস্তগির কে?'

'নাম শোনো নি? অনেক দিন তো দেশ ছাড়া! অবনীবাবুর কলকাতায় বাড়ী আছে, ভুবনেশ্বরে আছে, রাঁচিতে আছে, জামতাড়ায় আছে। পরিবারের লোকজন ওঁর সবই কলকাতায়, রাঁচিতে, জামতাড়ায় আর ভুবনেশ্বরে। উনি নিজেও কলকাতায়ই থাকেন, এখানে মাঝে-মাঝে আট-দশ দিনের জন্যে এসে নেতাগিরি করে যান। সাবইকে আশ্বাস দেন, ভয়ের কিছু নেই বলেন, স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করবার উপদেশ দেন-সত্য পথে চলে, শান্ত অহিংস হয়ে, নির্ভীক মনে, সকলেরই যাতে উপকার হয় সকলকেই সে দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে বলেন। ঘর-বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় বা ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে সরে যেতে দু-হাত তুলে নিষেধ করছেন সবাইকে অবনী খাস্তগির। সঙ্গে ওঁর সেক্রেটারি আছে। রোজই প্রায় খাস্তগিরের বিবৃতি পাঠানো হচ্ছে কলকাতার প্রেসে, প্রাণ ভরে ছাপাচ্ছেও তো প্রেস,' সুলেখা হাসতে-হাসতে বললে, 'কেন ছাপাচ্ছে হারীত?'

'ভাল কথাই তো বলছে খাস্তগির, কেন ছাপবে না?'

'ভাল কথাই বটে হারীত!' সুলেখা চিলেকোঠায় ঢুকে একটা বেতের চেয়ার হারীতকে এগিয়ে দিযে বললে, ভাল কথা হলে উনি নিজে থাকনে না কেন এখানে? দু-চারটে বোলচাল ঝেড়ে আট-দশ দিনেই তো হয়ে যায় খাস্তগিরের। কেন এ রকম? কেন এ বকম হারীত?'

হারীত চেয়ারে বসে বললে, 'ওদের কথা নিযে তুমি এত মাথা ঘামাও কেন? ওদের ওপর নির্ভর করলে কি আমাদের চলে? জুলেখা কি খাস্তগিরেব ওখানে গেছে?'

'কাদের ওপর নির্ভর করতে হবে?'

'আমাদের নিজেদেব ওপর।'

একটা কাঠের চেয়ার টেনে জানালার কাছে বসল সুলেখা। চিলেকোঠা এব নাম বটে কিন্তু ছাদের ওপরে এই ঘরটা বেশ বড়, আলো হাওযায ভবপুব, আকাশের কাছে যেন। বোশেখ আকাশের চিলের মত, খণ্ড নীল সাদা মেঘেব ভেতরে হাবীত এসে পড়েছে, যেন সময়েব আবো কাছে এসে পড়েছে।

'জলপাইহাটির ছোট-ছোট কাজগুলো শেষ কবে নিতে তোমাব বছবখানেক লাগবে?'

'লাগবে।'

'কাজ না সেবে তুমি তো যাবে না?'

'না।'

'কেমন আছেন তোমাব মা?'

'আগেব চেযে ভাল।'

'শুনেছিলাম নবেন মিত্তিবেব বক্ত নেওযা হচ্ছে।'

'সেটা আমি বন্ধ কবে দিযেছি।'

'কেন?'

'লোকটার সম্বন্ধে অনেক খাবাপ কথা শুনেছি। আমি দেখেছিও নিজেব চোখে। আমি আব-এক জন লোক ঠিক কবেছি।'

'বক্তেব জন্যে?'

'হ্যাঁ। এ দেশে একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক কবলে হত। কত লোকেব দবকাব তো বক্তেব। পথে-ঘাটে চাষাভুষোদেব ভিড়ে কত লোক হাঁস-হাঁস চেহাবা নিযে ধুকধুক কবছে। মবা ব্যাঙেব সাদা পেটেব মত হয়ে গেছে মুখ-চোখ; কত দেখলুম এ দেশেব দুটো জাতেব মধ্যেই, একটাব মধ্যে তো খুবই বেশি। কে কবে ব্লাড ব্যাঙ্ক। কোথায টাকা? কোথায কী?'

'হাবীত জানালাব ভেতব দিযে তাকিযে বললে, 'দুটো জাত নাকি সুলেখা?'

'বলছি তো।'

'বেশি বক্ত লাগবে না আব মাব।'

'কী কবেছিল নবেন মিত্তিব? দিচ্ছে না তো বক্ত—'

সুলেখাব চোখে চোখ বেখে হাবীত বললে, 'চেনো নাকি নবেন মিত্তিবকে?'

নাবেন মিত্তিরকে চিনতে হচ্ছে সুলেখাব। ইদানীং নরেন, ববেন মিত্তির—দু-জাতেব অনেকেই, একটু বেশি ঘোরাফেবা করছে সুলেখাদের বাড়িব আশে-পাশে। কোনো পুরুষমানুষ নেই তো সুলেখাদেব বাড়িতে। তবে অনেক দিনেব পুরোন বাবুরাম আছে—সুলেখাদের বাবাব আমলেব লোক—লোকটি বাড়ি কবে নি, বয়স ষাটের কাছাকাছি; যেন কেউ নেই এখন তাব; এখানেই সে থাকবে, এখানেই মববে। বাস্তবিকই যাদেব কোনো দবকাব থাকতে পাবে না বাড়ির ভেতবে—বাবুবামকে না ডিঙিযে তাবা ঢুকতে পাবে না; নরেনারাও পাবছিল না; এ ছাড়া কলেজ কমিটির ব্রজমাধববাবু খোঁজখবব নেন বোজই প্রায় সুলেখাদেব। একবাবে লাগাও বাড়ি ব্রজমাধববাবুদের। ডাক দিলেই শোনা যায়। এ বাড়ির খববদারি কবেন নবকৃষ্ণবাবুও, তাব চেযেও বেশি ওয়াজেদ আলি সাহেব। কাজেই নবেনবা বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না।

'চিনি নরেন মিত্তিরকে আমি। দিদিকে চিঠি লিখেছিল।'

শুনে একটু অবাক হয়ে হাবীত বললে, 'কবে?'

'এই তো কয়েক দিন হল—'

'কী লিখেছিল?'

'আমি দেখি নি। ছিঁড়ে ফেলেছে চিঠি দিদি।'

'কাকে দিয়ে পাঠাল চিঠি?'

'পোস্টে পাঠিয়েছে।'

'এইবারে লোক মারফৎ পাঠাবে,' হারীত জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'হয় তো নিজেই ঢুকে পড়বে। একটু েখশুনে চলতে বলো জুলেখাকে। অবনী খাস্তগিরের সঙ্গে দেখা করতে গেল?'

'তোমাকে বসিয়ে গেছে, হারীত। ও না এলে তুমি উঠবে না কিন্তু। কেন গেছে অবনীবাবুর কাছে কী করে বলব আমি। দিদির ঢের সদ্দারি আছে, কলকাতা থেকে নেতা এসেছে, ব্যস হয়ে গেল। নেতা কী না জেনে নাও আগে, কী বলে বুঝে দেখো, কী করে চেয়ে দেখো; নাকি নেতা এলেই নোলা সককস করতে থাকবে?'

'নেতাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। নেতাবা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। কোথায এখন আব নেতা,' হারীত একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'জুলেখা তো নেতা হয়েছিল বিয়াল্লিশে।'

'আমিও হয়েছিলুম,' হাবীত একটু আত্মধিক্কার দিয়ে হেসে বললে, 'ওটাকেই একটা বড় রুশ রেভ্যুল্যশনের মত দাঁড় করানো উচিত ছিল, শুধু ইংরেজ তাড়াবার জন্যেই নয়, আমাদেব দেশে যারা ইংরেজের চেয়েও অধিক তাদের নিঃশেষ করে ফেলবাব জন্যে। ইংরেজ গেছে, তারা আছে; তারা তো জাঁকিয়ে বসেছে! কেবলই সন্দেহ চারদিকে, কেবলই বিদ্বেষ, কেবলই তিক্ততা; যেটুকু সুবাতাস ছিল একেবারে কাল হযে উঠল তো স্বাযত্তশাসন আসতে না-আসতেই—কী হল কযেকটা সরকারি ঘববাড়ি পুড়িয়ে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে, রেলওযে ব্রিজ ভেঙে ফেলে'—

'তুমি কোন পার্টির?'

'কোনো পার্টিব না।'

'তুমি যে কম্যুমিস্ট তা আর বলে দিতে হবে?'

'কম্যুনিস্টদের কেউ আমাকে চেনে না।'

'তবে কি একলব্যের মত তাদের পূজো কবছ?'

'আমি কি স্ট্যালিনের মত কথা বলছি সুলেখা?'

'কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথা বলছে তুমি।'

হারীত সুলেখার দিকে তাকিয়ে অবসন্ন হযে বললে, 'ছিলাম তো কংগ্রেসে অনেক দিন। অহিংসার দিনেও হিংসে কবেছি। রিভলভাব হাতে নিয়ে ঘুবেছি-ফিরেছি তো অনেক দিন, বোমা তখনও আসে নি। অণু ফাটে নি। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তিটা যে অ্যাটম বোমার মতই, রিভলভারের মুখে সেটা উপলব্ধি কবেছিলাম দশ-বাব বছব আগেই। কিন্তু তবুও কি নিবেট আত্মশ্রদ্ধা ছিল। এইটেই দবকার—চোখ মেলে চেয়ে, সব বুঝে-শুনেও, বেহেড আত্মপ্রত্যযী হওয়া—নিজের জীবনটাকে পাযের নীচে রেখে; না হলে আজকেব দিকচিহ্ন ডিঙিযে, কালকের বড় কাজ কিছুতেই ঘটতে পাবে না ইতিহাসে। যাবা ঘটাচ্ছে তাবা এই বকম লোক।'

'ইতিহাস তো নিজেব বেগে চলেছে।'

'কে বলেছে তোমাকে? নিজের বেগে—মানুষকে বাদ দিয়ে?'

'ইতিহাস তো অ্যাটম বোমার মত। কী কবত মানুষ তার রিভলভার নিয়ে?'

হারীত হেসে বললে, 'তুমি আমার বাবার মত কথা বলছ সুলেখা,' হারীতের বাবা—নিশীথবাবুর কথা বলছে হাবীত। এ কলেজে নিশীথবাবুর ছাত্রী ছিল সুলেখা। প্রফেসরের মনোভাব যতটা সম্ভব অনুচিন্তন করে দেখেছে সুলেখা। কিছু প্রভাব পড়েছে বটে তাব জীবনে নিশীথবাবুব।

'বাবা চিন্তা করে উপলব্ধি করেন, কিন্তু চিন্তাই কবেন শুধু, এত বেশি তলিযে ভেবে কবেন যে শূন্যতা ছাড়া কোনো মীমাংসাই নেই তাঁর পৃথিবীতে।'

'নিশীথবাবু —সুলেখা একটু অন্যমনস্ক হযে বাইবেব দিকে তাকালে, 'শুনলুম নিশীথবাবু আমাদের কলেজ ছেড়ে চলে গেছেন।'

'তাই তো দেখছি।'

'খুব ভাল পড়াতেন আমাদের, কথাবার্তা তাঁর তোমার চেয়ে নরম ছিল হারীত।'

'তা হবে, তিনি বিদগ্ধ মানব, আমি তো'—

'প্রলেটারিয়েট?' সুলেখা হেমন্ত-শীতের, প্রফেসর সেনের, সেই আশ্চর্য ক্লাস-গুলোর কথা ভাবতে-ভাবতে চিন্তিত চোখে হারীতের দিকে ফিরে তাকাল।

'না না, তা হলে তো হতই। আমি হচ্ছি, ফরাসীরা যাকে upasle বলে তাই।'

'কী করে এত বেশি আত্মভজ্জা হতে পার তুমি, সেইটেই আশ্চর্য। বিশেষত এই যুগে। বই পড়ছ না আর, বলছ। চিন্তা-টিন্তা করে লাভ নেই, এইটেই তোমার মনের কথা দেখছি তো। এর সুফল তুমি পাচ্ছ—দশ কাহন বিশ্বাস, তোমার নিজের ওপরে। হাড় কালিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তোমার বিশ্বাস।'

'হাড় কালিয়ে দিচ্ছে আমার?'

'দিচ্ছে ছাড়া আর কী?'

'খুব বিচ্ছিরি চেহারা হয়ে গেছে আমার?'

সুলেখা ঘাড় কাত্ করে জানালার ভেতর দিয়ে মাঠের রক্ত ক্যানাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু ক্যানার দাউ-দাউ আগুন তার চোখের মণির ভেতরে মণিকর্ণিকা জ্বাললেও মনে কোনো দাগ কাটছিল না। কী ভাবছিল সুলেখা? হারীতের কথা নয়। হারীতের কথাটা মাটির নীচে পাইপের ভেতর জলের মত তার অজান্তেই যেন কানে ঢুকল তার, জলের মত কোনো দিক দিয়ে কোনো দিকে চলে গেল তার পর, টের পেল না সে। পাইপের মত হয়েছিল মনটা তার।

'কিছু বলছিলে আমাকে?'

'কী ভাবছিলে তুমি?'

'দেখছি তো ভেঙে পড়ছে তোমার শরীর।'

'আগের চেয়ে ভাল হচ্ছে জলপাইহাটিতে এসে।'

'ভাল হলেই ভাল,' হারীতের শরীর নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছিল না সুলেখার, 'বিশ্বাস তোমার দৃঢ়। কিন্তু বিশ্বাসটা কী? আমাদের দেশে স্বায়ত্ত শাসন কিছু হচ্ছে না, কিছু নেই আর কংগ্রেসে। ফোঁপরা হয়ে গেছে কংগ্রেস—এই তো।'

সুলেখার কথার কোনো উত্তর দিতে গেল না হারীত। এ মেয়েটি একান্তই একবগ্গা পলিটিক্সের। যদি কোনো দিন নির্বিশেষে মরে যায় কংগ্রেস, তা হলে তার শেষকৃত্য করবার জন্যে যারা রয়ে যাবে তাদের মধ্যে থাকবে, পাশে কোনো বৃহৎ বিরাট জীবনের দার্ঢ্যকেও জীবন বলে স্বীকার করবে না, মনে হয় যেন ঠিক এই রকম সুলেখা। তবে ভাবে বোঝা কঠিন। কথা বলতে-বলতে কোথায় চলে যায় সুলেখা, কী বলে, কী ভাবে, যা ভাবে তাই কি বলে, হোয়াইট হেডের ঈশ্বরের চেয়েও মাঝে-মাঝে অবতার মনে হয় সুলেখাকে।

'কংগ্রেস পথ খুঁজে পাচ্ছে না এখন আর,' হারীত বললে, 'কোন দিকে তোমার নিজের পথ?'

'সময় আমাদের যতটা জানতে, বুঝতে দেয়, তার চেয়েও বেশি উপলব্ধি করে পাবার মত কিছু হবে না। জিরিয়ে নাও, তাকিয়ে দেখো, প্রকৃতিকে আস্বাদ করো, যেমন ঐ ক্যানাফুল, সবুজ মাঠ, সাদা বাতাস, রোদ, বোলতা, মৌমাছিগুলোকে, মানুষকেও যেমন—ইতিহাসের তোড়ে মানুষ কেমন তলিয়ে যাচ্ছে কলকাতার কত জায়গায় নিঃসম্পর্ক হয়ে, তাকিয়ে দেখো।'

'এই সবের দিকেই আমার ঝোঁক এসে পড়ে মাঝে-মাঝে, টের পাই রক্তের সহজ টান কোন দিকে। কিন্তু এ সব, মুক্ত মানুষকে হটিয়ে দেবার জন্যে সময়ের আশ্চর্য চোখঠার ছাড়া আর-কিছু নয়, এটা স্বীকার করে নিয়ে এটাকেই শ্রেয় চিন্তা হিসেবে বুঝে নিতে হবে, মানুষের ভাল হবে বিশ্বাস করতে হবে; কাজ করতে হবে, পরিগঠন করতে হবে।'

'কিসের পরিগঠন হারীত? বাংলার গ্রামগুলোর?'

'না। এখন নয়।'

'তবে?'

'বলেছিই তো তোমাকে বড় আয়োজনটা চালাতে হবে বিপ্লবের জন্যে।'

'খুব একটা বড় বিপ্লবের জন্যে তো বটেই।'

'তাতে রক্ত এসে পড়বে না? এসে পড়বে তো প্রপাতধারায়।'

'পড়ে যদি তা হলে পড়বে। মানুষের উপকারই চাই আমরা। খুব বড় বীতরক্ত বিপ্লবে যদি সেটা হয় তা হলে তাইই চাই। রক্তের ওপর কে জোর দেয়, রক্তের দিকে মানুষের কোনো স্বাভাবিক ঝোঁক নেই।'

'বিপ্লবটা হবে ফরাসি ধরনে?'

'রুশ ধরনে বলো।'

'রুশ বড় ফরাসির চেয়ে?'

'বেশি সংহত; বেশি আধুনিক বলেও মনে হয় আমার।'

'তুমি কম্যুনিস্ট হারীত।'

'আমি কম্যুনিস্ট নই, যোশীর থেকে মুজাফফর আহমদ অব্দি কেউ আমাকে চেনে না, আমার নামও শোনে নি, আমাকে চোখেও দেখে নি।'

'তোমাকে স্ট্যালিনিস্ট বলেই তো মনে হচ্ছে?'

'স্ট্যালিনিস্ট আছে নাকি? জানি না তো। তাদের কাউকেই কোনোদিন দেখি নি আমি'—

'দেখো নি? কী তবে তুমি?'

'নিজেকে খাঁটি ভারতবর্ষীয় বলতে পারি না আমি। আজকালকার দিনে কেউই কোনো দেশের নেহাৎ স্বদেশবাসী হয়ে থাকতে পারে না। পৃথিবীব সাধাবণ একজন মানুষ আমি—তুমিও সুলেখা; সকলের ভাল চাচ্ছি আমরা, একটা বড় বিপ্লবে হাত দিচ্ছি—'

সুলেখা সবেগে হাত নেড়ে হাবীতেব কথা হটিযে দিযে বললে, 'না, না, আমি না। আমি ও-সবে নেই।'

'নেই তুমি?'

'না। নেই। কংগ্রেসে। আমি কংগ্রেসে।'

'হারীত একটু হেসে বললে, 'কংগ্রেস যদি বিপ্লব কবতে বলে?'

'তা বলবে না কখনো।'

'বলবে না?'

'খুব সুচিন্তিতভাবে কাজ কবে কংগ্রেস। আমবা নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি। প্রথম দিক দিযে একটু গোলমাল হবে, খানিকটা বিশৃঙ্খলা আসবেই তো। কিন্তু সে জন্যে আবাব ঘোষ ব্রাদার্সের মত বিভলবাব বোমা নিযে খেপে উঠতে হবে নাকি?'

'কে ঘোষ ব্রাদার্স?' একটু বিস্মিত হয়ে বললে হারীত।

'এই তো আজকালকাব ঘোষেবা; হালে মিনিস্ট্রি গেছে যাদেব—আবাব আসছে; সেই সব ঘোষ—'

হারীতের খুব কাছ এগিযে গেলে তাব চোখেব তাবায সুলেখাব মুখ দেখা যেতে পাবে। কিন্তু তবুও সে শখ মেটানো খুব কঠিন কিন্তু তবুও কেমন দেখাচ্ছে তাব মুখ হাবীতের চোখেব মণিব ভেতরে—ঘোষেদেব কথা বলতে কী বলছে ভুলে গিযে আবাব কথার খেইটা মনে পড়ল তাব।

'এঁবা তো গান্ধীজিব উত্তরমীমাংসাব দেশেব; পূর্বমীমাংসাব কথা বলছ তো তুমি। তুমি বলছ লালমোহন ঘোষ, বাসবিহারী ঘোষেব কথা,' দাঁত বেব করে হেসে বললে হাবীত। সোজা হাসি। কিন্তু হাবীতে খাঁড়া নাকেব ওপব একটা বাঁকা ভাঁজ এসে পড়ল। দেখল সুলেখা।

'কে ঘোষ ব্রাদার্স তবে হারীত?'

বাইরের প্রজ্জ্বলন্ত ক্যানাফুলগুলোব দিকে তাকিযে হাবীত একটু চুপ থেকে বললে, 'নাঃ, অরবিন্দ, বাবীনেব সে সব জিনিস ওদেব সমযে হযে গেছে। এখন অন্য জিনিস হবে।'

বাতাসে চুল উড়ছিল সুলেখার, খোঁপা বাঁধে নি; স্নান করা ঠাণ্ডা জলদেবীদেব মাথাব অফুবন্ত কাল সোনালি সাপ যেন তাব মাথার চুল সব। পৃথিবীব বাতাসে রোদে এখন ক্রমেই স্থলদেবীব চুলের মতন দেখাচ্ছে। গোছার চুল গালেব দিকে টেনে এনে মুখেব উপব বুকের ওপব দিয়ে কাল চুলেব অমৃতেব দিকে তাকিযে সুলেখা বললে, 'ও-সব কোনো জিনিস হবে না আমাদেব দেশে। এটা আমাদের ভাবতবর্ষ, এব প্রাণ আলাদা। এখানে রোবস্পিয়েরেব ছাঁদে লেনিন, স্তালিন, বুখাবিনেব জিনিস চলবে না। স্বাযত্তশাসন পেয়েছি; অনেক কাজ এখন দেশের মানুষেব হাতে। কোনো একটা গড়বার কাজ হাতে নিতে হবে তোমায় হারীত। কোম্পানি বাগানে মাস্টাবদাব, অনন্ত সিংদের, উনিশশ বেযাল্লিশের ভাঙনেব দিন নেই এখন আব, সত্যিই নেই। কংগ্রেস চারদিক থেকে গঠন কববাব, নির্মাণ কববাব জন্যে, শীতেব শেষে কুমোর পোকার মত কেমন বুঁ বুঁ করছে শুনছ না?

'হাসছ কেন সুলেখা?'

'হাসছি, তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছ কেন হারীত?'

'শীতের শেষে কুমোর পোকার মত বুঁ বুঁ করছে?' হাসতে-হাসতে চোখ ঠিকরে ঠিকরে উঠছিল হারীতের, 'ভারী মজার কথাই বলেছে সুলেখা; শীতের শেষে কুমোব'—

'বড় বিপদেই পড়েছে কংগ্রেস,' সুলেখা বললে, 'এমনি তো ভালই হচ্ছিল সব, জোযাব ক্ষেতেব

থেকে ব্রিটিশদের পাখির মত তাড়িয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল,

প্যাটেল বললেন, কিন্তু কাশ্মীর বড্ড গোলমালে ফেলল'

'কেন ইউনোর কাছে ধরে দেওয়া হল কাশ্মীরকে?'

'তার পবে হাযদ্রাবাদ—'

'এর মীমাংসা কি হওয়া উচিত ছিল না এত দিনে?'

'তারপরে এই কম্যুনিষ্টদেব লঙ্কা বজ্জাতি।'

হারীত চুপ করে ছিল।

সুলেখা বললে, 'এই বাবে আঁতে ঘা পড়েছে হাবীতেব। যেই কম্যনিষ্টদেব কথা বলেছি অমনি মুখে বড়াপিঠে গুঁজে বসে বইল। তুমি তো কম্যুনিষ্ট হাবীত।'

'আমি নই। কিন্তু কম্যুনিজমের দিকে চলেছে কংগ্রেস—'

'কংগ্রেস? কে বললে তোমাকে?'

'জযপ্রকাশ নারাযণ সে দিন সি-এস-পি-কে—'

বাধা দিযে সুলেখা বললে, 'ও-সব কংগ্রেসি জিনিস নয।'

'জওযাহবলাল মনেপ্রাণে কম্যুনিজমকে সার্থক কবে তুলতে চান। কিন্তু চাবদিক থেকেই সবাই আটকে বাখছে তাকে। কিন্তু তবুও বিশোধিত হযে আজ হোক কাল হোক মার্কসিজমেব দিকে না গিযে পারে না কোনো দেশেব কোনো সৎ প্রতিষ্ঠান'—

'কম্যুনিস্টদেব কথা হচ্ছিল, তুমি চলে গেলে কম্যুনিজমে, দুটো এক জিনিস নয; এখন মার্কসিজমেব কথা বলছ। ওটা আবো আলাদা ধবনেব। জওযাহবলাল মনে প্রাণে কী তা আমি জানি না; এলাহাবাদ যাই নি কোনোদিন। কৃষ্ণা হাতী সিং-এব সঙ্গে একবাব দেখা হযেছিল, জিগ্যেস কবি নি পণ্ডিতজিব কথা; তিনি তো অনেক দিন থেকে দিল্লিতে; কিন্তু আমি যখন গিযেছিলুম পাই নি তাঁকে। দিল্লিতে আছেন, না বাইবে গেছেন, জিগ্যেস কবতে ভুলে গেছলুম। কম্যুনিজমেব দিকে কংগ্রেস চলেছে বড়-বড় শিল্পপতিবা বেঁচে থাকতে? নেহরুব স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতৃত্ব পাচ্ছে না তো কংগ্রেস। পেলেও রুশ কম্যুনিজম বা যোশি কম্যুনিজম আসত না কোনোদিন কংগ্রেসে। কংগ্রেস নেতাদেব ভেতব মহানুভব লোক আছেন এখনো, যেমন....যেমন,' সুলেখা এটু ঢোক গিলে বললে, 'যেমন....এঁবা শ্রেণীবৈবম্য চান না। মালিক-মনিবদের বদমাযেসি সত্যিই ভালবাসেন না। যাবা বড়দেব পাযে চাপা পড়ে নীচে পড়ে আছে তাদেব বাঁচিযে উন্নত কবে সকলেব জন্যে সুবিচাব, সুব্যবস্থা, কল্যাণ, আলো আনতে চান। কংগ্রেসেব প্রকৃত প্রাণ এইই তো চায। এটা কি রুশ কম্যুনিজম-সংগীত। না। তাব ভেতব আবো অনেক ঝাঝালো খামির বযে গেছে।'

'কাজেব প্রণালীও আলাদা। একটা ক্যাবিনেট মিশনেব কাছ থেকে তাবা স্বাধীনতা পায নি, বড়-বড় বাষ্ট্র-বিপ্লবের আগ্নেযগিবি ঠেলে বেরুতে হযেছে।'

'ওব কোনো মানে নেই।'

'নেই?'

'না। স্বাধীনতাব কী সদ্ব্যবহাব কবা হচ্ছে, না হচ্ছে, সেইটেই আসল। কংগ্রেস তা হলে রুশ কম্যুনিজমেব থেকে ঢেব দূবে তো হারীত?'

'ঢেব দূবে।'

'কংগ্রেসেব সদাত্মা এ-দেশী কম্যুনিজমেব থেকেও দূবে তো?'

হাবীত একটু ভেবে বললে, 'কংগ্রেসেব সদাত্মা? সেটা মার্কসিজমেব খুব কছাকাছি।'

:গান্ধীবাদের সঙ্গে একাত্ম হযে তবুও?'

দুই জনে কিছু ক্ষণ চুপ কবে বসে রইল। হাবীতেব এ কথাটায সুলেখাবও সায আছে মনে হচ্ছিল।

'মার্কসিজম। পড়েছ ডাস কাপিটাল তুমি?'

'পড়েছি,' হাবীত বললে।

'ঐ গোটা বইটা? আমিও পড়েছি বটে। বিশ্বজ্ঞান মার্কস যা লিখেছেন।

দর্শন। আমাদেব আদি ভাবতীযদের থেকে শুরু কবে কারু কোন্যে দর্শনই আজ পর্যন্ত গ্রহণ কবতে পারলুম না আমি।'

'ঠিকই তো।· যে ভাবতে শিখেছে, এমন কি যে মনে করে যে সে ভাবতে শিখেছে, তাব দর্শন তাব

নিজের কাছে, কিন্তু নিজের দর্শনটা পৃথিবীর ওপর আরোপ করে লাভ নেই। পৃথিবীটাকে গান্ধীর মত, কিংবা মার্কসের মত, এক জন বড় মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল?'

'কিছু দিনের জন্যে অন্তত।'

'কিছু দিনের জন্যে।'

'এর পরে কী হবে?'

'জীবনের ইতিহাসের আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হবে মনে হয়। আরো স্পষ্টতর জ্ঞানীর হাতে। কিন্তু তাই বলে সাধারণ মানুষের জীবনের আরো উন্নতি হবে কি না আমি বলতে পারি না, হারীত চকিত হয়ে বললে, 'শ্রীযুক্ত সেনের মত কথা বলছি আমি।'

'সেন কে?'

'আমার কথাটা প্রত্যাহার করছি। বলেছি সাধারণ মানুষেব উন্নতি হবে কি না বলতে পারি না।'

'বলেছ তো।'

'উন্নতি হবে। ইতিহাসেব ব্যাসকূট নিবসন হোক, বা না হোক, সৎ কর্মীদের হাতেই উন্নতি হবে।'

'সেন কে? তোমার বাবা নিশীথবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় তিনি?'

'কলকাতায়।'

'কলকাতাব কলেজে চাকরি করছেন? আমাদেব কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন কেন?'

'কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে বনে নি শুনেছিলাম।'

'কেন বনে নি?'

'টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে। বাবা আরো পঞ্চাশ টাকা বেশি চেয়েছিলেন।'

সুলেখা বলল, 'হবিলালবাবুবা দিলেই তো পাবতেন। কলেজেব তো অনেক টাকা আছে। হরিলালবাবুর জামাই কামাখ্যাবাবুকে তো পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কলেজ কমিটিব হিমাংশু চক্রবর্তীর শালাকেও চল্লিশ-পশ্চাশ। প্রিন্সিপ্যাল কালীশঙ্করবাবু যদি পাঁচশ পান তা হলে নিশীথ-বাবুও তো পেতে পারেন। না-দেওয়া হয যদি, তিন শ সাড়ে তিন শ দেওয়া হোক। দেড় শ পাচ্ছিলেন, দু শ চাচ্ছিলেন তাও দেওয়া হল না। ওয়াজেদ আলি সাহেবেব এটা কবে দেওয়া উচিত ছিল।'

হারীত বললে, 'কে কী কববে কার জন্যে? কলেজ তো একটা দৃষ্টান্তস্থল শুধু। যে আচাব-ব্যবস্থায় কালীবাবু পাঁচ শ টাকা পান, আব সবাইকে এক শ দেড় শ টাকায গড়াতে হয সেটাব গিঁট কোথায? কলকাতাযও ঠিক এ বকম, সব জাযগাতেই তো। গোঁড়টাকে উৎখাত না কবতে পাবলে এখানে ওযাজেদ আলি সাহেব কী করবেন?'

'কলকাতার কলেজে ঢুকেছেন নিশীথবাবু?'

'কী জানি বলতে পাবি না।

'চিঠিপত্র পাচ্ছ না?

'না।'

সুলেখা মাঠের ঘাস, ক্যানাফুল, বোলতা, বৌদ্র সমস্ত চক্রবলযটা পেরিযে অনেক দূব তাকিযে বইল। কলেজেব ক্লাসে তিন বছব পড়েছে সে নিশীথবাবুব কাছে। নানা রকম কথা-কথিকা মনে পড়ে লেকচার রুমেব, রুমের বাইবের নিশীথ সেনের। এই সে দিন তো, কিন্তু এক হাজাব বছর আগে যেন—আজ দুপুবে কত শত নিঃশব্দতাব ভেতরে এসে পড়ে মনে হচ্ছে।

'কে কত মাইনে পায, কাব কত বেড়েছে না-বেড়েছে এত বৃত্তান্ত জানলে কী করে তুমি?'

'জেনে ফেলেছি তো,' সুলেখা জিভ দিযে একটু টাগবা টিপে হেসে বললে, জানেওযালা মানুষের মত রহস্যেব কৌটো নিজের আঁচলেব আঁধাবে লুকিয়ে রেখেছে যেন।

'কে বলে যায়, ওযাজেদ আলি?'

সুলেখাব দৃষ্টি অবাক দূবেব থেকে গুটিযে কৃষ্ণচূড়াব লাল ফুল ডালপালার বাতাসেব ভেতব ঘুবছিল, 'ওযাজেদ আলি, ইয়ুসুফ, সেরাজুল হক, নুরুল হুদা, সুজন খাঁ, বসিরুদ্দিন, মুনার গাজি, মমতাজ আলি, মহম্মদ ইসমাইল, গোলাম হোসেন, আবদুস সত্তর, আবদুল করিম—অনেকেই তো এখানে আসেন। এঁদের কাছ থেকে নানা রকম খবর পাওয়া যায।'

কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকাল হারীত চোখ তুলে—কেমন থলো-থলো সারৎ সার রক্তের অবদানের মত ফুলের রাশি সব—বাতাসের অবিরাম শুশ্রূষার ভেতর।

'তোমার তো এবার ফোর্থ ইযার সুলেখা? কলেজ ছেড়ে দিলে যে?'

'নাঃ, আর যাব না কলেজে, কেমন ভাঙন ধরেছে যেন।'

'কোথায়? কলেজের প্রফেসরদের ভেতর? নাকি তোমার মনে?'

'প্রাইভেট পবীক্ষা দিযে দেব। এবাব যদি না হয়, পবেব বাব দেব।'

'এক তো বাবা চলে গিয়েছেন, এ ছাড়া প্রায সব প্রফেসবই তো আছেন কলেজে।'

'জানি না। যাই না কলেজে,' বিরস ভাবে বললে সুলেখা, 'নিশীথবাবুর এটা বড় অন্যায হল।'

'কেন?'

'পাকিস্তান হতে না-হতেই তিনি ইণ্ডিযান ইউনিযনেব চলে গেছেন।'

'একটা চিঠি লিখে দাও বাবাকে।'

'কে, আমি?'

'লিখে দাও আপনি না এলে আমি ক্লাসে যেতে পাবছি না, চলে আসুন।'

পৃথিবীব চাবদিকের সমস্ত বোদ শুষে এনেছে যেন কৃষ্ণচূড়া গাছটা, ঝিলমিল কবছে ফুলগুলো কড়া দুপুবেব রোদের ভেতব। রোদের ঝিলিক এসে পড়েছে ঘবেব আনাচে-কানাচে মানুষের বুকে কানে, মেযেলোকেব হাতে চুলে। বাইরে ঝাঁ ঝা বোদ মাঠে, বাড়িতে, জলের শব্দে, ভীমরুলেব চাকে, তেপান্তরেব ধোঁযার মত আকাশটাব মাথায়-মাথায উড়ন্ত বক, ফিঙে, হবিযাল, ওয়াক পাখিদের ডানা-ঠ্যাঙেব অফুরন্ত আঁকিবুকির ভেতব। সুলেখা টেবিলেব থেকে তাব সানগ্লাসটা পেড়ে এনে বললে, 'চোখে পববে হাবীত?'

'তুমি পবো। যে জাযগায বসেছ সুলেখা সেখানে সূর্যেব তাপ বেশি।'

ধোঁযা বঙের চশমাটা চোখে এঁটে নিযে সুলেখা বললে, 'মা-ও গিযেছেন অবনী খাস্তগিবেব বাড়ি। দিদি যাব-যাব করছিল। আমাকে একা ফেলে যেতে পারে না তো, বাবুরাম বাড়ি নেই। তোমাকে আসতে দেখে কেমন বান মাছেব মত সটকে পড়ল, দেখলে তো!'

'তোমাবও যাওযাব ইচ্ছে ছিল, আটকে বাখছি।'

'ক্ষ্যাপা নাকি! আমি যাব অবনী খাস্তগিবেব বাড়ি! ওদেব দালানোয পেযেছে। দুড়দাড় কবে ছুটে যায আব আসে। আসে আর যায, মনকে বলে, সাবাস। অবনীবাবু স্ত্রীকে এনেছেন শুনলাম।'

'ক-দিন হল এসেছেন?'

'দিন ছ-সাত। পাঁচ-ছয দিন থাকবেন আবো হয তো।'

'দুপুবে কি ফ্ল্যাশ খেলা হয অবনীদাব বাড়িতে?'

'হতে পাবে। কী করে না হলে সময কাটাবে।'

'কাটাচ্ছি তো।' সুলেখাব মুখ খুঁজে নিযে সেদিকে তাকিযে হাবীত বললে।

'এ বকম কবেই রক্তবিপ্লব কববে তুমি হাবীত?' এ বকম একটা প্রশ্ন তুলে হারীতকে যে জব্দ কবে দেওযা যায সে খেযালটাব বিশেষ কোনো মূল্য বইল না হঠাৎ যেন সুলেখাব কাছে, নিমেষে মুছে গেল তাব মনের ভিতর থেকে, চারদিকেব পৃথিবীর থেকে নির্লিপ্ত হযে বইল না হঠাৎ যেন সুলেখাব কাছে, নিমেষে মুছে গেল তাব মনেব ভিতব থেকে, চাবদিকেব পৃথিবীব থেকে নির্লিপ্ত হযে বইল এর চোখ ওব চোখকে বিষযাসক্তিব জিনিস বলে মনেব করে আধ মিনিট, এক মিনিট, দেড় মিনিট—

সানগ্লাস খুলে ফেলল সুলেখা, টেবিলেব কেসে আটকে রেখে এল।

'বোদ সবে গেছে এখান থেকে হাবীত। বাইবে কেমন?'

'খুব ঝাঁঝ বাইরে।'

'ঘবেব ভেতবটা এখন ঠাণ্ডা।'

'জুলেখারা বাজি রেখে বসে খেলছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। বেশ কড়কে জুযো না খেললে ভাল লাগে কি এমন দুপুরে। একটা মোটা নেশা চাই তো. বিকেলে চা খেয়ে মহড়া দেবে সকলে মিলে। আজ বিকেলে মিটিঙ তো হবে। রোজই তো হচ্ছে। যাও না তুমি? মিটিঙে কে কী বলবে, কী বলা উচিত, তার আলোচনা চলবে চাঁয়ের বৈঠকে।'

'কোথায় হবে মিটিঙ?'

সূচীপত্রে যান

'মহম্মদ মতিজেদ হলে।'

'যাবে নাকি সুলেখা?'

'ইচ্ছে করে না মিটিঙে যেতে আমার। খাস্তগির মশাই তো ডামাডোল করে আমাদের এখানে থাকতে বলে চার-পাঁচ দিন পরেই সস্ত্রীক কলকাতায় চলে যাবেন, সুবিধে বুঝে ফিরবেন হয় তো আবার ন-মাস ছ-মাস পরে; না হলে ফেরবার দরকার নেই। এ সব লোকের মিটিঙ তো চেঁচিয়ে কথা বলা। অনায়াসেই বলে যায় কিছু তেজী, কিছু ভাবিক্কে, ডারডেলার কত কথা সব। কিন্তু শুধু কথা বললে তো হয় না-চরিত্র কোথায়?'

'অবনী খাস্তগিরের স্ত্রীও বলবেন নাকি?'

'জানি না, ওয়াজেদ আলি সাহেব হয় তো বলবেন। খাস্তগিরের চেয়ে বেশি জিনিস আছে জনাব ওয়াজেদ আলির ভেতর।'

হারীত চোখ বুঁজে সায় দিয়ে, চোখ মেলতে, হুড়হুড় করে বেশ বাতাস ঘরের ভেতর ঢুকে পড়তেই, চোখ বুঁজে-বুঁজে বললে, 'কী করে আলাপ হল ওয়াজেদ আলির সঙ্গে তোমার?'

'এলেন তো এক দিন আমাদের বাড়িতে; এসে আলাপ করলেন আমাদের সকলের সঙ্গে। পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে নিষেধ করলেন, কোনো মুশকিল হবে না আশ্বাস দিলেন, কোনো রকম অসুবিধে হলে তাঁকে, মহম্মদ ইয়ুসুফকে, আমির আলি সাহেবকে জানাতে বললেন। অনেক মানুষকে বিশ্বাস করা কঠিন,' সুলেখা বললে, 'কিন্তু আলি সাহেব ওদের মতন নন।'

'ওয়াজেদ আলি সাহেব? তাঁকে দেখি নি আমি কোনো দিন।'

'এ দেশে ছিলেন না।'

'কেন? এখানকার মানুষ নন?'

'না। কলকাতার ওদিক থেকে এসেছেন।'

'ওয়াজেদ আলি সাহেবের সঙ্গে এক দিন আলাপ করতে হবে আমার।'

'জনাব মহম্মদ ইদরিসের সঙ্গেও করো, জনাব ইয়ুসুফ আলির সঙ্গে, জনাব সাহাদাত হোসেন সাহেবের সঙ্গে, জনাব বরকতুল্লা সাহেবের সঙ্গে, জনাব মোবারক আলির সঙ্গে, জনাব আমির চৌধুরীর সঙ্গে, চাঁদ মিঞা সাহেবের সঙ্গে, মানিক মিঞা, লাল মিঞা, সোনা মিঞা সাহেবের সঙ্গে; জনাব—'

হারীত উঠে দাঁড়াল।

'উঠছ তুমি?'

'এইবারে উঠি, বাবুরাম এসে বসে আছ রোয়াকে। আধ-ঘন্টাটাক হল এসেছে; আমি দেখছিলুম। দেখ নি তুমি?'

'বসো তুমি। তোমায় বসতে হবে। কোথায় যাবে এই ঝাঁ ঝাঁ রোদে। এ বাড়িটা তোমার খুব নির্জন লাগছে না কি হারীত?'

'নির্জন?'

'মা নেই, জুলেখা নেই। জুলেখা নেই—সে জন্যে একটু ফাঁকা লাগছে হয় তো তোমার হারীত।'

'হারীত ঘরের ভেতর দু চারবার পায়চারি করে বেরিয়ে চলে যাবে ভাবতে-ভাবতে চুপচাপ আটকে বসে রইল তবু।

'নির্জনতাই আমার ভাল লাগে। কলকাতায় এটা একেবারেই নেই। কত-জনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছি আমিই তো, কত মানুষের শান্তিভঙ্গ করেছি। এমন একটা জায়গা খুঁজে পাই নি কলকাতায়, এমন এক জন মানুষ পাই নি, যার কাছে বসে সময় নেই জেনেই সময়টাকে ভাল লাগে। শেষ পর্যন্ত সময় নেই তো সুলেখা, সময় নেই কোথাও—এই বাড়িতে এ রকম দুপুরের নিঃশব্দতায় এসে বুঝতে পারি যে বহতা সময়ের বয়ে যাবার চেয়ে তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পরিসর কত বেশি, আস্বাদ কত বেশি উজ্জ্বল। তবুও যতটা দিন বেঁচে আছে মানুষ, প্রতি মুহূর্তে সময় আছে, ছুটে চলেছে এ রকম একটা উদ্বেগে অতিষ্ঠ হয়ে ভয়াবহভাবে ধ্বংস করে ফেলছে সময়কে, নিজেকেও।'

সুলেখা একটু হেসে বললে, 'এ কি তোমার নিজের কথা হারীত?'

'তবে কার কথা বলছি আমি?'

'নিশীথবাবু তো এই রকম বলতেন।'

'হারীত নিজের চুলের ভেতর দু-একবার আঙুল চালিয়ে নিয়ে বললে, 'বলতেন বুঝি? বলবেনই

সূচীপত্রে যান

তো, আমার বাবা তো। সন্তান যা ভাবে, পিতাতেও তা বর্তায় না।'

'কথা তো। কিন্তু দেখছিলুম তো তাঁর চেয়ে তুমি একেবারেই আর-এক রকম। এখন আবাব দেখছি তুমি অনেকটা তাঁরই মতন?'

'আমরা দু জনেই এক রকম। দু জনেরই মনে দুটো ধাবা আছে, বাবা একটার ওপর ঝোঁক দিয়েছেন আমি অন্যটার ওপর। কোন দিকের ঝোঁকটা ভাল লাগে তোমার?'

'আমার মনেব মিল মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে—তাঁব কাছে থেকে সব শিখেছি, যা শিখেছি ভালবেসেছি।'

'কেন? তা তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।'

'কলকাতায় তুমি যে রেভল্যুশন ফাঁদছ, সেটা সফল হবে?'

'সফল হবে।'

'নিশীথবাবু কুড়ি-পঁচিশ বছব আমাদের যা পড়ালেন, আজীবন যা কবলেন, সেটা ব্যর্থ?

'ব্যর্থ।'

'এত সহজেই মীমাংসা হয়ে যায় সব কিছুর?'

'হ্যাঁ, সহজেই,' হারীত বললে, 'জুলেখাও কি নিশীথবাবুকে'—কথাটা শেষ করল না হারীত।

'আমি উঠি সুলেখা।'

'তোমায় বসতেই হবে।'

'এখন তোমার বই পড়ার সময়।'

'আমি এবার বি-এ এগজামিন দিচ্ছি না।'

'সে সব বই নয়, বাইরের বই পড়বে তো তুমি এখন—'

'আমি রুটিন করে পড়ি বুঝি হারীত? এটা আমার পড়বার সময় কে বললে তোমাকে?'

হারীত বাইরের বাতাসের বড় সাড়া শুনছিল, অনেক পাতাব গুচ্ছে অনেক পাখির ডানাব পালকে, নীচে, দিকে-দিকে জলেব বাশির ভেতবে, পৃথিবীব টনক নাড়িয়ে আঘাত কবছে, বাতাস যেন নীলিমাব বুকে গিয়ে ফেটে পড়ছে দক্ষিণ পূর্ব উত্তব বাতাসেব আনন্দে, পৃথিবীরই জননীনিকুঞ্জেব ভেতরে আবাব।

'তোমাব সানগ্লাসটা আমাকে একটু দাও তো।'

'কেন, এটা চোখে এঁটে খাঁ-খাঁ রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে তো?'

'না, আমি এখানেই রয়েছি। বাইরেব কড়া রোদেব দিকে তাকিয়ে চোখ কেমন ধাঁধিয়ে উঠছে। সাদা-সাদা বড় মেঘগুলোও কী ভীষণ জ্বলন্ত কাচের মত উজ্জ্বল।'

'এদের পেছনে সূর্য রয়েছে।'

'ভাবী চমৎকাব দেখাচ্ছে কিন্তু মেঘগুলোকে। যেন ভেঙে গেছে সূয্যি; বাশি-বাশি সাদা মেঘে জ্বল-জ্বল কবে বেড়াচ্ছে। আমাদেব ছেলেবেলায় দেখেছি এ রকম। আমাদেব মৃত্যু হয়ে গেলেও থাকে ওবা। দেশ থেকে দেশে চলে যায়; কেমন অতিমানবেব মত মনে হয় যেমন সব। আমবা ওদের মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়ে আমরাই মিথ্যে হয়ে উড়ে যাই; ওবা টিকে থাকে কী রকম স্বচ্ছ আগুনেব অন্তঃশীল আনন্দে।'

সুলেখা ভর্ৎসনার সুরে হেসে উঠে বললে, 'এ কেমন স্ট্যালিনেব মত কথা হল?'

'স্ট্যালিন?'

'এ কেমন বুখারিনের মত কথা বললে তুমি হারীত?' নিজেকে শুধরে নিয়ে সুলেখা বললে।

'বুখারিনের মত? কথাটা বলেছি হোরেস্তেব নিজের মত নিশীথ সেনের মত, লুক্রোসিয়সের মত; এরা বুখারিনদেব এলাকার বাইরে। সে যা হোক, বুখারিনেব কথায় অন্য কথা মনে পড়ে গেল—বিপ্লব করতে গিয়ে একটা মস্ত ট্র্যাপেব পাকে জড়িয়ে পড়তে হয় বুঝি মানুষকে সব দেশে সব কালেই?'

সুলেখা কথা বলবার আগে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখল এক-আধ মুহূর্ত, তার পব ঘুরিয়ে এনে একটু চুপ থেকে পরে বললে, 'সব কালেই সব দেশেই। ভাবতবর্ষেও তুমি যদি বিপ্লব কব, সবাই যদি বিপ্লবী হয়েও যায়, তা হলেও ওদেরই হাতে তোমার, তোমাদেব মত লোকের বিচার হবে। তাতে তুমি টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হারীত আকাশের চিলের ডানাব সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে, চোখটাকে স্থির করে আনতে-আনতে বললে, 'তা হবে খুব সম্ভব। তা আমি জানি। বুখারিনদের ভাগ্যের জন্য আমি প্রস্তুত আছি।'

'তা তো প্রস্তুত আছ। সানগ্লাসের দরকাব?'

সূচীপত্রে যান

'না।'

'মেঘ দেখছ তো।'

'মেঘ আরো জমাট বেঁধেছে।'

'সূর্য আছেন মেঘের পেছনে?'

'মেঘেব সামনে তো সূর্য, একটা মস্ত বড় সাদা মেঘের মতন।'

'কে মেঘ, কে সূর্য বুঝতে পারছি না—'

'আকাশের এ-পার ও-পার জুড়ে মেঘটা সূর্যের মতন,' বললে হারীত।

'এত জ্বলন্ত?'

'তুমি নিজে উঠে দেখ সুলেখা,' হারীত বলে উঠল।

'আমি তো সূর্য পূজারী নই হারীত।'

'চোখ বুঁজলে যে?'

'ভেতরে সূর্যটাকে দেখছি। তুমি সানগ্লাস নাও হারীত।'

হাত বাড়িয়ে চশমাটা সুলেখার হাত থেকে তুলে নিয়ে হাতেই বেখে দিল হারীত; ক্যানাফুল, কৃষ্ণচূড়া, বোলতা, মৌমাছি, হরিয়াল, ওয়াক, রৌদ্র-নীলের দিকে খোলা চোখেই তাকিয়ে রইল সে। এর পরে কলকাতায় গিয়ে বড় মুশকিলে পড়তে হবে, হারীত ভাবছিল। খুব ভাল লাগছিল তার, খুবই খাবাপ লাগছিল। সুলেখার কাছে বসে থেকে চোত-বোশেখ বসন্ত ঋতুর এই সুদূব নীলিমাব বাতাস, বোদ, পাখি, ছাদ, নিস্তব্ধতার ভেতর—ঘড়ির থেকে সময়কেই খসিয়ে নিয়ে এ রকম অমৃত হয়ে বসে থাকবাব কী অধিকার আছে তার। সময় যে বাস্তবিকই একটা ওতপ্রোত নিববচ্ছিন্ন বাধাবিমুখ বিবাট ঘড়ির আবর্তন, কী অধিকার আছ হারীতেব—নিজেকে বাদ দিয়ে পৃথিবীব দীন-দুর্বল মানুষগুলোকে সেই অকৃতার্থ সমরোৎসবের ভেতরে ছেড়ে দেবার? যে-লোকগুলোকে কলকাতায সে জড়ো করেছিল তাব আত্মার সহোদর হিসেবে—কিংবা সৎ ভাই সৎ বোন হিসেবে হয তো তার নিজের আত্মাব—বিপ্লবেব সেই সব কর্মীরা কী কবছে এখন এমন দুপুরে, তার অভাবে? জোট পাকাচ্ছে কি তারা আগেব মতন এখনো, আলোচনা কবছে, কথা ভাবছে, দল বাড়াতে পারছে ঠিক কবতে পারছে কার্যসূচি, নেতাব অভাব বোধ করছে, না কি তারা ছত্রখান হযে ভেঙে পড়ছে?

একটা দুটো তিনটে চারটে বালি হাঁসের মত হারীত নিজেই যখন উড়ে চলে এল জলপাইহাটিতে, তখন বাকি হাঁসগুলো কেমন অদ্ভুত যূথসংস্কারের বশে ঘুরে উড়ে হারিযে যাবে না কেন শূন্যের ভেতব? হারিয়ে গেছে হয় তো সব। এত দিন বসে যা সে ঠিক-ঠাক করে আনছিল, কলকাতায় ফিরে গেলে—এক বছর পরে ফিরে যাবার কথা তো তার—সে সবেব খড় উড়ছে, মাটি ঝবছে, দেখতে পাবে সে। কোথাও কোনো মানুষ খুঁজে পাবে না। কলকাতায় গিয়ে তা হলে নতুন করে আরম্ভ কবতে হবে আবার সব—এক বছর পরে। তাই হোক।

হারীতের অনুভূতি মননেব দুটো ধাবার যে-দিকটাব ওপর নিশীথ সেন ঝোঁক দিয়েছিল—ও-দিকে হঠাৎ নীল আকাশকে নাকচ করে দিয়ে আরো বড় আশ্চর্য আকাশ, এই দিকে রৌদ্র, ভীমরুল, ক্যানাফুল গাছের ছাদের এই নিটোল মণিকা-দুপুরের ভেতর বসে থেকে প্রকৃতি, ও প্রকৃতির চেয়ে এক তিল বেশি বিশোধিত আরোপিত জিনিসের মতন নারীর, আবহাওযাব সঙ্গে একাত্ম হযে, সেই দিকেই ঝোঁক পড়ল হাবীতেব।

আরো পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাঁচবে হয তো সে, কিংবা পনেব, দশ। বছবগুলো জাবদা খাতায হাড়ের কালি দিয়ে কালো করে লিখতে-লিখতে মাঝ-মাঝে রক্ত দিয়ে ধুযে পরিষ্কার করে নিতে হবে; এই রকম সব বছর পড়ে আছে হারীতের সামনে। জলপাইহাটির এই একটা বছর শুধু অন্য বকম হবে। যা হচ্ছে এখানে এখন তাই হবে। সাদা মেঘের দিকে তাকাল হারীত, ঘাস, রোদ, কৃষ্ণচূড়াব দিকে। খারাপ ভাবটা কেটে যাচ্ছে—চোখ বুঁজে আসছে তার, মনের ওপর শরীরেই যেন বেশি ভাল লাগা তর্কাতীত তার।

'তুমি গগ্‌লস পরছ না হারীত?'

'না। এখন আর দরকার নেই।'

'সূর্যের আচ খুব ভাল লাগে তোমার। স্কাইলাইটের ভেতর থেকে রোদ আসছে এবার—'

'একটা পুরু মেঘের নীচে চাপা পড়েছে সূর্য। নীচের মেঘেব ওপরে আর-একটা পাতলা মেঘ ছড়ানো রয়েছে তোমার এই চশমার রঙের মত।'

সূচীপত্রে যান

'কী করে টের পেলে তুমি? জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না তো।'

'জানালার ভেতর দিয়ে সাদা মেঘের পাকিস্তানের দিকটাকে দেখা যাচ্ছে, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের দিকটা ছাদের ওপরে,' হারীত বললে।

'ইউনিয়নকে ছায়ায় ঘিরেছে?'

'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।'

'এক টুকরোও কালো মেঘ নেই তো আকাশে। গুমোট নেই। নীল আকাশ থেকে বাতাস লাফিয়ে-লাফিয়ে বেশি নীল, বেশি মধুর করে ফেলছে যেন সব। কী করে বৃষ্টি হয়,' সুলেখা বলতে-বলতে চোখ বুঁজে কথা বলা শেষ করল। 'আজ হবে না বৃষ্টি। অবনী খাস্তগিরের মিটিঙও তো রয়েছে।'

'আকাশ যদি কালো করে আসে সেটা ভাল লাগে, কিন্তু এখন নয়।'

'কেন এখন নয়?'

'এখন এই রোদ, বাতাস, ঘন নীলের হরিয়াল ভীমরুলদের নিঝুম দুপুরটাকে ভাল লাগছে আমাব। ক্যানাফুলদের দুপুর এমন আশ্চর্য নিরালা—এখন যদি ডেকে ওঠেন তিনি—'

'তিনি?'

'আর কে? যিনি কালো মেঘ ফাটিয়ে কথা বলেন—'

'ডাকবেন না। আজ ওয়াজেদ আলি সাহেবের কথা বলবার কথা।'

হারীতের কথাটা কানে গেল না যেন সুলেখার। সে অন্যমনস্ক হয়ে অনেক দূরের একরাশি জলের দিকে তাকিয়েছিল। উঁচু-উঁচু গাছের ফাঁকের ভেতব দিয়ে দেখা যাচ্ছে—বাতাসে-বাতাসে ছুটে চলেছে জলগুলো, কোনোদিন যেন শেষ হবে না এমনি একটা শাশ্বত ইশারাব ঝিলিক, কোনোদিন যেন নিভে যাবে না এমনি এক অবিনশ্বর সূর্যের। সূর্য নয়, সূর্যদেবীরই যেন প্রেমিক হারীত। তাব নিজের মনও তো, ভাবছিল সুলেখা, এমন উজ্জ্বলন্ত দিনের সঙ্গে—দিনেব নক্ষত্র আগুন জল সূর্য নীলিমার সঙ্গে মিশে যেতে চায় যেন মানুষের মন।

'কটা বেজেছে সুলেখা?'

'একটা হয় তো।'

'আন্দাজে বলছ? ঘড়ি নেই তোমাদের বাড়িতে?'

'কেন, সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা বলে দিতে পাব না তুমি?'

'হাঁসেদেব মত? পাব তুমি? দেশ গাঁয়ের লোকেরা পাবে। আমিও কলকাতার লোক নই।'

'শালিধানের চিড়ের মত ধূসর ডানা-পালকের একটা গেরস্তের হাঁসের মত আকাশেব দিকে চোখ তাকিয়ে হারীত বললে, 'দেড়টা তো বেজেছেই, বেশিও হতে পাবে।'

'তাকালে তো ওপবেব দিকে, সূর্যটাকে দেখলে কোথায়? এ জানালা ও জানালা কোনোদিক দিয়েই তো সূর্য দেখা যাচ্ছে না। কী করে বেলা ঠিক কবলে তুমি হাঁসেব মত ঘাড় কাত করে আকাশেব দিকে চোখ মেরে?'

'সূর্য দেখা যাচ্ছে না বলেই তো বুঝতে পাবলুম দেড়টা বেজেছে। দুটো আড়াইটে হলে, পশ্চিম দিকেব কৃষ্ণচূড়াব ওপরে দেখা যেত সূর্যটাকে।'

'মেঘে ঢাকা পড়ে নি তো সূর্য?'

'মেঘ তো সব পুবদিকে এখন। এ দিকে যা ছিল সব সবে গিয়েছে।'

জানালাব ভেতর দিকে তাকিয়ে সুলেখা বললে, 'পশ্চিম-দক্ষিণেও তো মেঘ আছে—'

'আছে, অনেক দূবে। ও-দিকে যাবে না তো সূর্য।'

সুলেখা আবার আকাশের দিকে তাকাতে-তাকাতে বললে, 'বাঃ, এই তো কত মেঘ পশ্চিমের দিকে, কত সাদা মেঘ—প্যাটরাভরা মেঘ সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলছে পশ্চিমের দিকে। পুবের দিকের মেঘগুলো তো সাদা ঠাণ্ডা।'

'আর মাথার ওপরের মেঘগুলো?'

'সাদা, চুপচাপ।'

'হ্যাঁ', হারীত ভাল করে তাকাতে-তাকাতে বললে, 'ঐ মেঘগুলো, আমরা কথা বলতে-বলতে, এই মাত্র এসে পড়েছে। হ্যাঁ, আছে সূর্য এ দিকেই। খুব জ্বলছে তো অনেকখানি আকাশের মেঘ।'

'সূর্য তা হলে পশ্চিমে এসে পড়েছে?'

'ঠিক পশ্চিমের নয়।'

'মাথার ওপরও নয়।'

'এই দেড়টা-দুটো বাজাল পশ্চিমে এসে পড়েছে বটে সূর্য,' সুলেখা একটু টিটকারি দিয়ে হেসে বললে 'আকাশ-ঘড়ি দেখে টাইম বলে দিল বুঝি পাখি?'

'কে পাখি?'

'কত পাখিই তো টাইম বলে দেয় দাঁড়িয়ে থেকে, উড়ে যেতে-যেতে, সূর্যকে চোখ ঠাব দিয়ে।'

'কিন্তু হাঁস যেমন টাইম বলে কেউ আর তা বলতে পারে না ভাবছ বুঝি সুলেখা? আমি একটা পাখির কথা বলব তোমাকে, সে পাখি—হাঁস, কিন্তু দময়ন্তীর হাঁস নয়। কিন্তু দময়ন্তীব হাঁস যদি বল তাকে, তা হলে বলব সে জুলেখার হাঁস, সুলেখার হাঁস নয়।'

'মানে? কেমন ভাঁড়ের মত কথা বলছ তুমি হারীত,' খুব মনোযোগ দিয়ে হাবীতেব মুখের দিকে তাকিয়ে হারীতের কথার তাৎপর্যটা বুঝে নিতে চেষ্টা কবছিল সুলেখা। কথা-ভাবা চোখ নিয়ে মশালেব আগুনের মত ক্যানাফুল-গুলোব দিকে তাকাল সে।

'দময়ন্তী হাঁসটাকে ভালবেসেছিল বটে, কিন্তু বেশি ভালবেসেছে কাকে?'

'যে হাঁস নয় তাকে,' ক্যানাফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে সুলেখা, 'সব ক্যানাফুলগুলোই লাল কেন, এ রকম মানুষের ছুবি-বসানো মানুষেব বুকের রক্তেব মত লাল, গত আগস্টেব আগেব আগস্টের কলকতার? তার আগের এক আগস্টেব বাংলাদেশের?'

কিন্তু এ কী ভাবছে সুলেখা—মানুষেব মারাকাটা বোকা রক্তেব সঙ্গে এব কখনো তুলনা হয? এ বড় ভাল জিনিস, বড় জিনিস, সৃষ্টিব নিহিত অর্থের কাছের জিনিস এই লাল, এক দিন মানুষ বক্ত শোধিক হযে-হযে এই স্থির পবিত্র রূপ পাবে।

'জুলেখাও হাঁসটাকে দবকাবি মনে করে, কিন্তু তবুও ভালবেসে কাকে?' বললে হাবীত।

'অবনী খাস্তগিবকে তো নয়। কী হবে তাদেব সঙ্গে কন্ট্রাক্ট ব্রিজ খেললে? মিলেমিশে বক্তৃতা দিলে? কী হবে অবনীবাবু জুলেখাকে সত্যিই ভালবাসলে?' জীবনের চল্লিশ-বেযাল্লিশ বছর যে দেখেছে তেমনি একটি বযস্ক মহিলাব অভিজ্ঞতাব আঁটসাঁটেব ভেতব থেকে বললে যেন সুলেখা, খুব স্থিব মনোভাবে অল্পস্বল্প হেসে।

'অবনীবাবু জুলেখাকে ভালবাসে কে বলেছে তোমাকে?'

'ইয়ুসুফ বলেছে।'

'ক্যানাফুলগুলোব দিকে তাকিয়ে হারীতের মনে হচ্ছিল, হলদে ফিকে গোলাপি ফুটফুটে ক্যানাব ঝাড় চাব দিকে থাকলে কেমন হত? নিস্তার পেত না কি তাতে চোখ? সঙ্গতি অনুভব কবত না কি সুলেখা, জুলেখা, তাদেব মা আব হারীতেব অনুভূতি? কেবল এক বগগা জিনিসই থাকবে?

'আর ওযাজেদ আলি সাহেব কী বলেছে?'

'কী বললেবন তিনি? তাড়াহুড়ো নেই আলি সাহেবেব। চাব-পাঁচদিনেই কলকাতাব গাড়িতে চড়বার কথা নয়। এখানকার মানুষ তিনি।'

'আসছেন যাচ্ছেন?'

সুলেখা একটু গালে টোল ফেলে হেসে বললে, 'কে, উড়ে গেল নাকি দময়ন্তীব হাঁস, তার কথা বলছিলে না?'

'বলেছিলাম দময়ন্তীর মতনই জুলেখা হাঁসটাকে পিঠ চাপড়াচ্ছে। কাজ তাব অন্য মানুষকে নিয়ে। কিন্তু সুলেখার কোনো হাঁসটাস নেই, কাজ তাব মানুষটাকে নিয়ে।'

'কী মানে হতে পারে তাব?'

'কী মানে হতে পাবে?'

'এ সব হচ্ছে রাতের—বেশি শীতেব রাতের হেঁযালি-জেযালির মত; এখন কোনো মানে বেরুবে না।'

'শীত এসে নিক পৃথিবীতে, তাব পর মানে বোঝা যাবে?'

'বেশি শীত বেশি রাত হয়ে গেলে এ সব কথা ভাবা যাবে এক দিন হারীত।'

'এখন তো গরমের কাল, চোত-বোশেখ। একেবারে অঘ্রান-পৌষ না এলে কথাটার তল পাওযা যাবে না বুঝি সুলেখা?'

'আরো দেরি হতে পারে।'

'আরো দেরি? কত দেরি?'

'ঢের দেরি। এক একটা জিনিস বুঝে ওঠা বড় কঠিন।'

'সানগ্লাসটা সুলেখাকে ফিরিয়ে দিয়ে হারীত বললে, 'আসছে শীতে বোঝা যাবে?'

সুলেখা কেমন যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলে আস্তে-আস্তে বললে, 'আসছে শীত কি আজই এল দেশে?'

'কিংবা তার পরের শীত?'

'সে তো আরো পরের কথা। আজ তা দিয়ে কী হবে,' সানগ্লাস চোখে এঁটে বললে সুলেখা, 'তুমি তো চান করে এসেছ দেখছি। খেয়ে এসেছ?'

'না, আমি তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি গিয়ে খাব।'

'তার মানে?'

তার মানে, রাতে আর খাবে না হারীত। এক বেলা ভাত খাচ্ছে। রাতে দুধ খায়, দু-একটা দেশী ফলপাকড় যোগাড় করে আনে। কোনো রোজগার করছে না হারীত। নিশীথ তো দেড়শ টাকা দিয়ে গেছেন সুমনাকে। তাই দিয়ে মাস তিনেক অন্তত চালাতে হবে তো। কোনো একটা উপায়ের পথও দেখতে হবে জলপাইহাটিতে। বছর খানেক থাকবে তো সে এখানে। দিনে এক বার খেয়ে শরীর ভালও আছে তার, টাকাও কম খরচ হচ্ছে।

'কলকাতার নিয়মটা ভাঙি নি। কলকাতার আস্তানায় ফিরে খেতে-খেতে সাড়ে তিনটে-চারটে বেজে যেত। কেমন হয়েছে, তার আগে ক্ষিদেও পায় না। নিয়মটা বদলাতে সময় লাগবে।'

'ক্ষিদে পায় না তিনটের আগে?' কেমন একটু আস্বাদ বোধ করে বললে সুলেখা।

'না।'

'তা হলে রাত কটার সময় ভাত খাও?'

'এগারটা-বারটা।'

'অত দেরি? তা হলে খুব দেরিতে রান্না চড়ে তো!'

'হ্যাঁ। বাতিও অনেক ক্ষণ জ্বালিয়ে রাখতে হয়।'

শুনে সুবিধে বোধ করছিল না সুলেখা। সকাল বেলা তাদের সাড়ে দশটা-এগারটায় খাওয়া শেষ হয়ে যায়, রাতে সাড়ে আটটা-নটায়। এর ব্যতিক্রম কি স্বাস্থ্যেরও ব্যতিক্রম নয়? বিশৃঙ্খলা তো খুব। কেমন শরীর ভেঙে পড়েছে হারীতের; নিশীথবাবুর চেয়েও বয়স্ক দেখায় যেন হারীতকে আচমকা তাকিয়ে দেখলে, নিশীথবাবুর দাদার মত মনে হয় পৌঢ়তায়, জীর্ণতায়। অথচ চার বছর আগে কী আশ্চর্য চেহারা ছিল হারীতের।

'এই সব অনিয়মে শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছে তোমার।'

'এখন ভাল হবে।'

'কলকাতায় মদও খেতে তুমি?'

'কে বলেছে?'

সুলেখা হেসে চিপটেন কেটে বললে, 'সব কথাই তো আমাকে ওয়াজেদ আলি সাহেবেরা বলে। কিন্তু এটা বলে নি।'

'মদ খাব ভাবছিলাম কলকাতায়, কিন্তু পয়সায় কুলল না। ইকবালের হিন্দুস্তান হামারা, সারে জাহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা গানটা বেশ একটা নাম করা পাড়ার মেয়ে গাইছিল, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে শুনেছিলাম। পয়সা ছিল না বলে বাড়িতে ঢুকে সে মেয়েটার সঙ্গে রাত কাটাতে পারলাম না।'

'খুব ইচ্ছে করছিল?'

'গানটা গাইতে পার তুমি?'

'লক্ষ্ণৌর মুসলমানিদের মত পারি না,' সুলেখা নিজের অন্তকর্ণকে শুনিয়ে গানটা গাইবার চেষ্টা করতে-করতে একবার হারীতের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'এখানে গলা ছেড়ে গাইতে হলে হিন্দুস্তানের জায়গায় পাকিস্তান বলতে হবে।'

হারীত কুঁড়েমি ভাঙতে-ভাঙতে বললে, 'গানটা লিখেছেন তো পাকিস্তানের কবিগুরু ইকবাল, তিনি কী বুঝে হিন্দুস্তান লিখেছেন তিনিই জানেন, তুমি জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেবকে না জিজ্ঞেস করে পাকিস্তান করে দিও না।'

সুলেখা গুনগুন করে অন্য একটা উর্দু গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে থেমে গেল। 'বোস তুমি, চা করে আনছি।'

'তুমি খাও। আমি এখন খাব না। তিনটে সাড়ে তিনটের সময় তো ভাত খেতে হবে। এমনি ক্ষিদে কম। চা খেলে ক্ষিদে একেবারে মরে যাবে। কত বাকি তিনটে বাজবার বলতে পার?'

'নীচের বড় ঘড়িটা তো বন্ধ হয়ে আছে। হাতঘড়ি দুটো ওরা নিয়ে গেছে। আমাদের চেয়ে তো ওদের দরকার বেশি, ওরা মিটিঙ করছে। তোমাকে বলব আমি সময় হলে। কেন সাড়ে তিনটের সময় ভাত খাওয়া; ব্যবস্থাটা বদলে ফেল হারীত।'

'আস্তে-আস্তে বদলাচ্ছি।'

'ভেবেছিলুম রাত অব্দি এখানে থাকবে।'

'কটায় ফিরবে ওরা?'

'মিটিঙ হবে, মিটিঙ আরো টেনেটেনে হবে, ভেঙে গেলে ওখানে বসেই আরেকটা বৈঠক হবে; অবনীবাবুর বাড়িতে ফিরে আসা হবে, কথা হবে, খাওয়া-দাওয়া হবে, আবাব কথা হবে, তাব পর বাড়িতে ফিরে আসার কথা। রাত বাবটার এ দিকে হবে বলে মনে হয না।'

হারীত মাথা হেঁট করে একটু চিন্তা করে বললে, 'তা হলে আমি অবনীবাবুর বাড়িতে তোমাকে দিয়ে আসি, চলো।'

'না। ওখানে আমি যাচ্ছি না তো।'

'কোথায় যাবে তা হলে?'

'এখানেই থাকব।'

'একা থাকবে?'

'ভাত খেয়ে ফিবে আসবে তুমি এখানে?'

'কে, আমি?' হারীত একটু চিন্তিতভাবে হেসে বললে, 'আজ আব ফিরতে পারব না। আমাব একটু কাজ আছে বাইরে।'

'কী কাজ?'

'কিছু-কিছু ছোট কাজ করতে এসেছি জলপাইহাটিতে আমি। আজ বাড়িতেও ফিবতে পারব না।'

'কী কাজ হারীত?'

'আমি একটু সাহাদেব আড়তে যাব চালেব জোগাড় কবতে। শুনলাম চামাব-পট্টির ও-দিকে ছোটলোক ভদ্রলোক অনেকেই না খেয়ে আছে। দেখি কতদূব কী কবা যায়'—

'কেন, সাহাদের ওখানে যাবে কেন, ডিস্ট্রিক্ট-অফিসাবকে বললে না কেন?'

'বলেছি। গভর্নমেন্টের তো সব ফাইল, পোর্টফোলিও ব্যাপার। সময় লাগে। বিরাজ সাহাব কাছ থেকে বোধ হয চট কবে জিনিস পাওয়া যাবে।'

'টাকা দিতে হবে না?'

'সে পরে বোঝা যাবে।'

'কে দেবে টাকা?'

যতটা ভাল হারীত নয়, সুলেখাও নয়, সে সবেব চেয়েও যথার্থই একটা ভাল নিরপরাধ হাসি হেসে হারীত বললে, 'পরে বোঝা যাবে।'

'তা ছাড়া আর-একটা জিনিস ভুলেই যাচ্ছিলাম,' হারীত সুলেখার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এখানে তো শাড়ি কাপড় একদম পাওয়া যাচ্ছে না, ইউনিযন থেকে জিনিস এনে ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে। কিন্তু কালবাজারে কাপড় কিন বার শক্তি আমার নেই, রুচিও নেই, এখানকাব কালবাজার শায়েস্তা করতে গেলে যে অনেক বড়জাল-বেড়াজালে গিয়ে হাত পড়বে। এক দিনেব কাজ নয়, এক জন মানুষেবও নয়, ক জন মানুষের কত দিনের কাজ সেটা অঙ্ক কষে বার করো তুমি; এক জীবন বসে কষতে হবে। শুনলাম, অনেক ছোটঘরের মেয়েরা কাপড়ের অভাবে হেঁসেলে ঢুকে থাকে কোথাও যেতে পারছে না, লোপাট হবার জোগাড় সব'—

'ছোটঘরের মেয়েরা? আর ভদ্রদের কী?'

'ভদ্রঘরের মেয়েদের কে আর হাতে পাচ্ছে,' সুলেখার বেনারসির দিকে তাকিযে চোখটা একটু ঝিকিয়ে নিয়ে হারীত বললে।

'ছোটঘর বলছ কাদের, মাস্টারদের বৌদের ঝিদের?'

'তা তো আছে। আরো নীচে—'

'তার নীচে তো মুচি, মুদ্দফরাস, কামার, চামার, জোলা, তাঁতি, ধোপা, নাপিত, জেলে, চাষাভূষো। এদের অনেকে মাস্টারদের চেয়ে বেশি কামায়। মাস্টারদের মত অত ভব্যতা রক্ষা করবার দবকাবও হয় না এদের ঝি-বৌদের। কাদের শাড়ি দেবে তুমি হারীত?'

'চাষা-চামারদের পরিবারদের দেব।'

'আর মাস্টারদের ঝি-বৌদের কী হবে?'

'সেটা পরে দেখা যাবে।'

'চাল কাদের জন্যে যোগাড় করছ?'

'যাদের কাপড় দেওয়া হবে তাদের জন্যেই।'

'খুব ভাল কথা তো। কিন্তু নিশীথবাবুর দেড় শ টাকা ফুরিয়ে গেলে তুমি নিজে কী খাবে?'

কোনো উত্তর দিল না হাবীত। একটা উত্তরের জন্যে হারীতের দিকে শক্ত কপালে থুতনি কঠিন করে তাকিয়ে থেকে সুলেখা বললে, 'এ তো গেল কলেজের মাস্টারদের কথা। কিন্তু ইস্কুলেব মাস্টারদের কী হচ্ছে না হচ্ছে, কী খায কী করে, সে হিসেব বেখে আর কী হবে তোমাদেব; কিষাণ-মজদুরের বন্ধু তোমবা। কলকাতাব মত বড়-বড় শহরের মজদুরদেব চেয়ে মফস্বলেব বেসবকাবি সেকেণ্ডারি প্রাইমাবি স্কুলেব মাস্টারদরে অবস্থা ঢের খারাপ। অথচ দেশ তাদের কাছ থেকে, খাওয়ার না হোক, পরার ভদ্রতা বেশি দাবি করে, আর পড়াবার মর্যদার পাণ্ডিত্যের। এত বড় বেইজ্জতেব জিনিস পনেরই আগস্টেব পরেও টিকে আছে ইউনিযনে আব পাকিস্তানে। মাস্টাবদের শিক্ষা-দীক্ষা চরিত্র স্বার্থত্যাগের সঙ্গে যাদেব কোনো তুলনাই হয না তারা তো তারা, তাদের পিওন পেযাদারা পে-কমিশনেব দৌওলতে ডার্বি টিকিট কিনছে, রেঞ্জার্স টিকিট কিনছে, বেসে বাজি ধরছে, ইনসিওবেন্স করছে, ক্যাশ সেভিং সার্টিফিকেট কিনছে, কলকাতাব সেক্রেটাবিয়েটের ক্যান্টিনে মেযেমানুষ নিয়ে ঢুকে খেযে ডিসপোজাল থেকে শখেব জিনিস কিনে দিচ্ছে তাকে—আমি নিজেব চোখে দেখেছি হাবীত—হয তো কোনো মাস্টাব কেরানির মেযে বা শালি হবে—পিওনের পে-কমিশন খাচ্ছে এখন; ব্ল্যাক মার্কেট থেকে শাড়ি-সাযা-ব্লাউজ-ফলনা-দফনা কিনে দিযে পেযাদারা স্ত্রী ভজাতে ছাড়বে কেন, দেখছে টাকায় ভাল স্ত্রীদেরও ভজানো যায, হাতিবাগান আব শেযালদা বাজাব থেকে ডাল-মাছ-তবকাবি-দুধ খেযে শবীবটাকে চাঙ্গা কবে নিলে পে-কমিশন পিঠ চাপড়ে লেলিযে দিলে কেন সে সব স্ত্রীলোকদেব হাতড়াবে না তাবা, এদেব স্বামীরা শিক্ষিত উন্নত হলেও টাকাব অভাবে বৌকে খাওযাতে পারছে না, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরতে দিচ্ছে। এ তো গেল পেযাদা পিওনেব পে-কমিশন। তাদেব মাথাব ওপরে যারা পে-কমিশন পাচ্ছে তাবা তো মাচায চড়ে খাচ্ছে। কে পে-কমিশন বসাল? কেন বেসবকাবি ইস্কুল-কলেজেব মাস্টাববা পে-কমিশনেব সুবিধে পাচ্ছে না। কেন বেসরকারি ইস্কুল-কলেজ আজও টিকে আছে? সেগুলোকে হামান-দিস্তায ছেঁচে ফেলা হচ্ছে না কেন? কেন সব ইস্কুল-কলেজে স্টেটেব হাতে নেওযা হচ্ছে না? গভর্নমেন্টের কেবানি তো ভাল, গভর্নমেন্টেব পিওন-পেযাদাদেবও আজ ধনে-মানে মাস্টারদেব চেযে বড় কবে দেওযা হচ্ছে। কী প্রমাণ করা হচ্ছে? ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে যাবার পর এ কাদের হাতে রাজত্ব দেওযা হযেছে। তাবা লোকের সামনে মুখ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু ভাল করে তাদেব মুখ দেখে নেবে সে বকম লোক নেই বুঝি দেশে? সব ইস্কুল-কলেজ ভেঙে ফেলে পুলিশ হযে যাওযা উচিত তোমার বাবাদের। সমস্ত ইউনিযন ভরে পুলিশ আর সেপাযের ছাউনি উঠুক, বরবাদ হযে যাক সমস্ত ইস্কুল-কলেজ।'

'সে হবে। সে সবেব তোড়জোড় চলেছে। আমরা আছি সব; মেশিনগান ভেঙ্গে ট্র্যাক্টর বানিয়ে হলাযুধের মত চষে ফেলব সব; সব সব—ইস্কুল-কলেজ সব চেযে আগে। ট্রাক্টর ভেঙে মেশিনগান বানিয়ে উড়িযে দেব সব; ইস্কুল-কলেজ সব চেযে আগে। চেনো না আমাদেব। তোমাব কাছে কযেকটা শাড়ি চাই,' হাবীত বললে।

সুলেখা কিছু ক্ষণ গম্ভীর হযে বসে থেকে শেষে হাসতে-হাসতে বললে, 'লেত্তিটা ঠিক ধরে আছে হারীত। মাস্টারের ছেলে হযে আজ-কাল পিতৃরক্তে তর্পণ করার দিন; এ যদি তুমি না করবে হারীত!'

'কটা শাড়ি দিতে পারবে সুলেখা?'

সুলেখা মাথা নেড়ে বললে, 'শুধু কিষাণ মজদুরের হবে না; কিষাণ মজদুর মাস্টার এদের জন্য আমাদের লড়াই—এ জিনিসটা সি-পি-আই-এর হাই কমাণ্ডের থেকে পাস কবিযে দস্তুব মত কাজে না

সূচীপত্রে যান

লাগালে তোমাকে আমি কিছু দেব না।'

'সি-পি-আই-এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তবে তুমি কোথাকার?'

'আমি কোথাওর নই। কলকাতায় একটা সঞ্জর মতন গড়েছিলাম, সেটা ভেঙে গেছে হয় তো আমি চলে আসার পর। এখানে আমি লিগ, কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট পার্টি সুস্থ অবস্থায় যেটা যে-রকম দাঁড়িয়ে আছে নেড়েচেড়ে দেখতে পারি—সত্যিই তাতে যদি কিছু উপকাব কবতে পারা যায় রাস্তবিকই যাদের উপকারের দরকার তাদেরকে। বড় চালে কিছু করতে পারা যাবে না। এখানে-ওখানে তালি মারা কাজ চলবে কিছু-কিছু।'

'এখানে তালি মাবাব ঘুনচি চাই না, কেন বিপ্লব কবছ না? এখানে নয়, ইউনিয়নের বড় বিরাট ভাগাড় পড়ে রয়েছে। পে-কমিশন যারা ফাঁদল তারা মাস্টারদের পথে ছেড়ে দিল—সরকারি আই-সি-এস থেকে পিওন অব্দি যারা রক্ত জল করে পুষছে, বেসরকারি ইস্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠানের দিকে ফিবেও তাকাচ্ছে না, তারা কি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে?'

'সেটা তারা জুতো না খুললে কী করে বোঝা যাবে সুলেখা?'

সুলেখাদেব ওখান থেকে ফিবে হাবীত বাড়ি পৌছাল প্রায চাবটেব সময।

সুমনা বললে, 'কোথায ছিলে এতক্ষণ, সেই তো সাত-সকালে বেবিযেছ।'

'কত রকম কাজ থাকে।'

'কাজ থাকে! নাওযা নেই, খাওযা নেই—'

'চান কবে বেবিযেছি তো। ক্ষিতে পায না, খাব কী?'

'তোমাব ক্ষিদে পায না, আমাব তো পায। কী বোগ হযেছে তোমাব যে ক্ষিদে পায না?'

'তুমি খেযেছ? কী খেযেছ মা? বাঁধল কে?'

'কী রোগ হযেছে তোমার, হাবীত, যে বেলা চাবটে না বাজলে ক্ষিধে পাবে না। এতে মানুষ বাঁচে?' সুমনা অপ্রীত হযে বললে, 'এখন ভাত খেলে বাতেব বেলা ক-টাব সময খাবে?'

'রাতে খাব না।'

'সাবা দিন বাতে শুধু এক বাব খেযে বেঁচে থাকবে তুমি? এই কবতে তুমি কলকাতায?'

'আজ শরীরটা কেমন লাগছে তোমার? আগেব চেযে ভাল লাগছে?'

সুমনা বললে, 'আমি যা জিজ্ঞেস কবলাম সে কথাব উত্তর দিলে কোথায? এক বাব কবে খাচ্ছ কেন? এখন কি তোমার বমজান মাস চলছে হাবীত? কলকাতায এ বকম ছিল? কী ব্যাপাব?'

'ব্যাপার কিছু নয', হাবীত তার বাবার পুবনো চেযাবটা টেনে বসে বললে, 'আমাব ক্ষিধে পায না। পেলে খাব।'

'ক্ষিধে পায না। এ তো বিষম বোগ। কেন ক্ষিদে পায না? সোমত্ত বযস তো তোমাব, এ বযসে ক্ষিধে পায না? তোমাবও কি ন্যাবা হল নাকি হাবীত? দেখিযেছিলে ডাক্তাবকে?'

'ন্যাবা হয নি, ন্যাবা হয় নি, আমি নযনবাবুকে দেখিযেছিলাম তাঁব ডিসপেন্সারিতে গিযে। তিনি বললেন,' হারীত কথা শেষ না করে সুমনার খাটেব থেকে হাতপাখাটা খুঁজে নিযে বাতাস খেতে লাগল, 'কেমন গুমোট হযেছে মা, বৃষ্টি পড়লে বাঁচি।'

'কী বলেছে নযন ডাক্তার?'

'বলেছে, ও কিছু না, ও-বকম হয মাঝে-মাঝে, তাব নিজেবও তো হয়েছে কত বার। বলেছে বাঙালির আবার ক্ষিধে!'

'কেন, বাঙালির ক্ষিধে পেতে নেই? দেখ না গিয়ে নরেন্দ্র মিত্তিররা কী রকম খায়। এই মহিমবাবু আর তার ছেলে আর অর্চনা কী রকম গুষ্টির পিণ্ডি গিলছে দেখ না গিয়ে। তোমাব বাবাও খেতে পারতেন বেশ; তোমার এ রকম হল কেন?'

'হল তো', হাতপাখাটা রেখে দিয়ে বললে হারীত। নিম, জাম, জামরুল নাচানো চোত-বোশেখের বাতাসে ঘরদোর ভবে গিয়েছে হারীতদের। হারীত উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা ভাত, ডাল আর খানিকটা উচ্ছে-আলুর তরকারি খেয়ে এল।

সূচীপত্রে যান

'দুধ খেয়েছিলে হারীত?'

'না, রাতে খাব।'

'কী দিয়ে?'

'এমনি গরম করে খেয়ে নেব। রাতে খিদে পায় না একদম।'

'অর্চনা একটা পেঁপে দিয়ে গেছে, সেটা কেটে খাস দুধের সঙ্গে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার বাবার তো কোনো চিঠি পেলুম না।'

'লেখেন নি বুঝি তোমাকে?'

'আমাকে না, অর্চনাকে না।'

'তা হলে আর-কাকে লিখবেন?'

সুলেখাকে হয় তো লিখলেও লিখতে পারতেন নিশীথ সেন। হারীত কাঠের চেয়ারে বসে জামরুল বনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, যদি তিনি জানতে পারতেন যে তাঁর এ রকম এক জন মহাজন জলপাইহাটিতে লালপুলের রাস্তার পথে সেই আশ্চর্য দেড় তলা ঠাণ্ডা চালতে ফুলের রঙের বাড়িটার ভেতর রয়ে গেছে। কী নির্জনতা সেখানে, কী সান্ত্বনা। পৃথিবীর রক্তে, ইতিহাসের রক্তে, নিজের ব্যক্তিজীবনের মূর্খতায়, আর মহাজনদের কৃতঘ্নতায় যারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাদের যেতে হয় কলকাতায়? তারা এখানে ফিরে আসুক, এখানে ফিরে আসুক; উপলব্ধি, বেশি উপলব্ধি বেশি নিস্পৃহতা, কেমন একটা নিষ্কাম স্বস্তিকামনার হাতে আত্মদান, খানিকটা শান্তি—এই সব সাধ সিদ্ধির জন্যেই তো নির্মিত তাদের জীবন। কোথায় পাবে এ সব কলকাতায় নিশীথ সেন? কী করছে সেখানে সে? খুব সম্ভব ভাল নেই। নাকি ভাল আছে? কাজ পেয়েছে এবং কোনো মহিলাকে? বাবাকে চেনে নি বুঝি হারীত? কপাল ফুঁড়ে হঠাৎ আর-একটা চোখ বেরিয়ে পড়তে পারে এ রকম একটা প্রচ্ছন্ন আভাস নিয়ে-নিয়ে নিশীথ সেন যেন সব সময়ই ঘুরে বেড়াত ঃ নিম আর জামবনের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবছিল হারীত। সুলেখাকে বলে এসেছে হারীত, সে একটু চামারপট্টির দিকে যাবে যাহাদের ওখান থেকে কিছু চালের জোগাড় করবার জন্যে। যেতে ইচ্ছে করছে না আজ; শরীরটা ভাল নেই। ভাল নেই। কিন্তু গত তিন বছরের ভেতর করে ভাল ছিল শরীর? এই প্রায় টি-বি রুগির মত শরীর নিয়ে কত দুর্দান্ত কাজ সে করেছে। যাবে চামারপট্টিতে সে, আগে বিরাজ সাহার কাছে যাবে, জোগাড় করে নেবে চাল ডালের। একটু রাত হবে যেতে। বেশি বেলায় বাসি জিনিসগুলো খেয়ে কেমন যেন অম্বল হয়েছে হারীতের। ঢেকুর তুলছিল।

পিওন পেয়াদা পে-কমিশন মাস্টারদের সম্বন্ধে যা বলেছে সুলেখা সেটা কেমন হিংস্র বাঘিনীর মত লাফিয়ে উঠে বলেছে, অথচ সুলেখাকে বিপ্লব করতে বললে কংগ্রেসের শান্তি আর সংহতির ভেতর গা-ঢাকা দিয়ে হারিয়ে যাবে সে। মিথ্যে কথা বলে নি সুলেখা, কিন্তু সত্যি কাজ করবে কি সে?

'উনি চিঠি লিখছেন না কেন হারীত?'

'তোড়জোড় করছেন।'

'কী বলছ বুঝছি না।'

'কোথায় আছেন কলকাতায়?' একটা ঢেকুর তুলে জিজ্ঞেস করল হারীত।

'বলেছিলেন তো জিতেন দাশগুপ্তের ওখানে থাকবেন কিছু দিন। গিয়ে একটা পৌঁছ-সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল না? কী হল, কলকাতায় যেতে পারলেন কী না?'

হারীত বললে, 'কলকাতা ছাড়া এ গাড়ি বেশি জিরোয় না কোথাও। বেশি না জিরোলে তিনি কি গাড়ি থেকে নামেন?' হারীত বললে, 'কলকাতায় জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতেই আছেন।'

'লিখছেন না কেন?'

'লিখবেন। কলেজে কাজ জোগাড় হলেই লিখবেন।'

'কোন কলেজে?'

'যে-কোন কলেজে, কলকাতার যে-কোনো কলেজে।'

'হবে কাজ?'

'উঠে-পড়ে লেগেছেন বলে মনে হয়। হওয়া আশ্চর্য নয়! না হওয়াও অস্বাভাবিক নয়,' হারীত বিকেলের বড় আকাশের মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে।

'কী যে হেঁয়ালিতে তুমি কথা বলছ হারীত।'

সূচীপত্রে যান

'আচ্ছা তা হলে ভেঙে বলছি,' হারীত বললেন, 'কলকাতাব কোনো কলেজে বাবাকে ভাল কাজ জুটিয়ে দেবার মত কোনো মুরুব্বি নেই, খবরের কাগজে পারবেন না, সবকাবি চাকরির বয়স কই, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ডাকবে না বাবাকে, দাশগুপ্ত সাহেব পিঠ চাপড়ে বিদায় দেবেন—না, হবে না কিছু।'

'বড্ড কুবাতাস ছড়াচ্ছ হারীত।'

'জলপাইহাটিতে ফিরে আসতে হবে বাবাকে।'

'হরিলালবাবুদের কলেজে?'

'হরিলাল, কালীশঙ্কর, হিমাংশু চক্রবর্তী, এই নিয়েই তো দেশ। কলকাতায় গিয়ে এদের এড়াবেন? সেখানে তো আরো চেকনাই বেড়ে গেছে এদের। এদেব বিশেষ কোনো দোষ নেই। অনেক সময়ই সজ্ঞানে পাপ করে না এরা। অনেক দিনেব বাসি রক্ত জমেছে এদেব—চারি দিকে এত দিন ধরে এত অসদ্ব্যবস্থা বলে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তাই। নাকে কাপড় দিয়ে সবে গেলে লাভ নেই; বদ রক্তগুলো বের কবে দিতে হয়।'

'বের করে দিতে হয়? রক্ত?' সুমনা বিবক্ত হয়ে বললে, 'ও-সব কথা আমাকে বলো না। কলকাতায় থেকে কেমন গুণ্ডাব মত হয়ে গেছ যেন তুমি।'

হারীত অবাক হয়ে ভাবছিল এই লোককে নিয়ে ঘর কবতে হয় নিশীথ সেনেব মত মানুষকে। একটা অদ্ভুত অনিন্দ্য কুয়াশার ঘুমের ভেতব দিয়ে যেন বিশ পঁচিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে তার বাবা তাব মাকে নিয়ে জলপাইহাটিতে; এখন নিস্তাব চাচ্ছে, কিন্তু যে-পথে গিয়েছে সেখানে নিস্তার নেই, সেখানে এক রাত্তিরের সুলতানি থাকতে পারে হয় তো, কিন্তু আজীবনের শান্তি তৃপ্তি নেই; নিস্তাব যে-পথে আছে সেটা ভারী ভয় ও বিমূঢ়তা ও শোকেব পথ মনে হবে নিশীথের মত মানুষের কাছে এই বয়সে আজ।

'এখানে আসতে বলছ, তুমি তোমাব বাবাকে খাওয়াবে?'

'কলকাতায় পথ কেটে নিতে পারলে, বেশ তাই হোক; এখানে যে আসতেই হবে এমন কিছু নয়। এখানে যে-ভাবে ঘোবে বাইশ-চব্বিশ বছব কেটে গেছে তাঁব, সেটা টেঁসে গেল যেন। নতুন করে এখানে মন বসানো কঠিন। ওসব মানুষেব টনক সহজে নড়ে না, কিন্তু এক বার টলে উঠলে মনেব মতন কোনো নতুন আশ্রয় না পেলে মৃত্যুকেও ভাল মনে হয় জীবনের চেয়ে। বেশি বিদাবক বিশৃঙ্খল অশান্তিকেও ভাল মনে হয়, জলপাইহাটিব বোকা নিবেস শান্তিব চেয়ে।'

'আমি তোমার কোনো কথাব কোনো মানে বুঝি না হাবীত। তুমি পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল। বলি, তুমি খাওয়াবে আমাদের—কলকাতায় তোমার বাবার সুবাহা না হলে?'

'হ্যাঁ। খাওয়াব বইকি?' হাবীত আস্তে-আস্তে বললে।

'এখানকাব কলেজে একটা চাকবি জুটিয়ে নাও তুমি। দেখা কবো হরিলাল-বাবুদেব সঙ্গে।'

'দেখা কবব।'

'কী রকম চাকরি পেতে পাব?'

'আমি তো এম-এ দিই নি। একটা লাইব্রেবীয়ানেব কাজ হয় তো দিতে পাবে। কিংবা টিউটবেব কাজ।'

'দেখা করো, দেখা করে ফেল হারীত মেম্বাবদের সঙ্গে, প্রিন্সিপ্যালেব সঙ্গে।'

'এই তো যাচ্ছি', হারীত বললে, 'তোমাকে বাবা দেড়শ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, সোয়াশ আছে এখনো। আমিও কিছু এনেছিলাম টাকা, কিন্তু গচ্ছা দিচ্ছি।'

'কী করে গচ্ছা গেল?'

'এই চাষাভুষো মেথবদের দিয়ে দিয়েছি।'

সুমনা ক্লান্ত হয়ে বললে, 'আমাব টাকাটা আমাকে ফিবিয়ে দাও।'

'আমার বাক্সে আছে; এক্ষুণি দেব?'

'হ্যাঁ। এখনই।'

টাকা হাতে নিয়ে, সোয়াশ টাকা গুনে, নোটগুলো আঁচলের খুঁটে বাঁধতে-বাঁধতে সুমনা বললে, 'তুমি নাকি ডাক্তার মজুমদারের কাছে কী একটা বফা করতে গিয়েছিলে?'

'কে বলেছে তোমাকে?'

'কানে আসে। নরেন বলছিল।'

'কোন নরেন? নরেন মিত্তিব?'

সুমনা মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ'।

'নরেন আবার এখানে এসেছিল। এত বড় পায়া বেড়েছে তার।'

'কেন আসবে না? আমাকে যে-রক্ত দিয়ে ঋণে বেঁধে রেখেছে। আমার পেটের সন্তানরা যা করে নি আমার জন্যে, সে তা করেছে। কী করছ তোমরা আমার জন্যে, পেটের ছেলেমেয়েরা? কী করছ তোমার বাবার জন্যে, তিনি তো কলকাতায় থুবড়ি খেয়ে একশেষ হচ্ছেন। নরেনের মত ছেলে থাকলে ও-রকম হত তাঁর?'

অম্বলই হয়েছে হারীতের, পেট জ্বলছিল, বুক জ্বলছিল, গলা জ্বলছিল। ডাল খাওয়াটা উচিত হয় নি, বেশি খেয়ে ফেলেছে, উচ্ছের তরকারিটায় একটু ঝাল ছিল। নিজেই তো বেঁধে গিয়েছে তারকারিটা সকালবেলা। কেন ঝাল দিতে গেল হারীত? নাকি, অর্চনা এক ফাঁকে এসে ঝাল মিশিয়ে গেছে রান্নায়?

'কী বলেছে নরেন?'

'যা বলবার তাই বলেছে,' সুমনা বললে, 'আগেই শুধোই তোমাকে, কেন নরেনের রক্ত নিচ্ছ না?'

হারীত একটু অবাক হয়ে বললে, 'কেন, রক্ত দেবার কথা বলছিল নাকি? রক্ত দিতে চাচ্ছে? সেধে দিতে চাচ্ছে?'

'তা চাচ্ছেই তো। কেন চাইবে না। সে তো দিচ্ছিল। তোমার বাবা ঠিক করে গেছলেন। আমার উপকার হচ্ছিল। তুমি বদলাবার কে হারীত?'

হারীত সুমনার দিকে তাকিয়ে বললে, 'উপকার হচ্ছিল? এখন যে দিচ্ছে তার রক্তে কোনো জোশ নেই মনে হচ্ছে তোমার? উপকার বোধ করছ না?'

'কেন নরেনের রক্ত বন্ধ করা হল? সে আমার কাছে এসে বলে গেছে। শুনছ হারীত? নরেনের রক্ত নেয়া হোক। সে আমাকে নিজের দিদির মত মনে করে।'

'কিসের মত মনে করে?' একটু খোঁচা খেয়ে বলল হারীত।

'আমার এই খাটে এসে বসেছিল, বললে, আমাকে আপনার নিজের দেওরের মত মনে করবেন বৌদি। নিশীথদা ঠিক করে গেলেন সব। আর হারীত এসে পাল্টে দিলে—'

'কখন এসেছিল নরেন?'

'দুপুর বেলা।'

'আজ?'

'হ্যাঁ। তুমি তখন জুলেখাদের বাড়ি গিয়েছিলে।'

'জুলেখাদের বাড়ি গিয়েছি কে বললে তোমাকে?'

'নরেন দেখে এসে বলে গেছে। নরেন, আজিজুদ্দিন, আব্দুল গনি, বরকত আলি, রজ্জক মিঞা, ইসমাইল, চাঁদ মিঞা, মোনতাজ সব্বাই দেখছে কদিন ধরে ওদের বাড়িতে তুমি ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছ হারীত। এই তোমার কাজ জলপাইহাটিতে এসে? এর চেয়ে ভাল কাজ ছিল তোমার কলকাতায়। জুলেখাকে মুখোমুখি বসিয়ে মাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি তোমার সব আগড়মবাগড়ম মনুষ্যত্বের কাজ হাসিল করে ফিরছ বুঝি এই রকম, জলপাইহাটিতে এসে?'

শুনে চিন্তিত হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল হারীত। নিস্তব্ধ হয়ে আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ছিল সে। শোক নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই, রাগ নেই, কেমন একটা গহ্বরের মতন অবস্থা মনের ভিতর, বাইরের লোকচলাচলের দেশে; বাইরের প্রকৃতিকেও যেন নষ্ট করে দিতে চাচ্ছে। নিম, জাম, জামরুল বন, ছোট-ছোট পাখি, চোত-বোশেখের বাতাস—অনবচ্ছিন্ন বাতাসের ভিতর মাঝে-মাঝে একটা মৌমাছির মত উড়ে যেতে দেওয়া মানুষকে; সব সময়ই যে সে মানুষের মত বসে থেকে জীবনের সমস্যাগুলো ঘাঁটাবে সেটা ঠিক কথা নয়। চারদিককার অবচেতনার আকাশ-পৃথিবীকে তবুও তার পর কী এক সুচেতা নারীজিনিসের মত লক্ষ্য করে যেন রসিয়ে উঠল তার মন আনন্দে, কেমন একটা তামাসারত চেতনায়। ঠোঁটের কোণায় হাসির রেখা দেখা দিল হারীতের।

'আমি ঠিক করে ফেলেছি নরেনের সঙ্গে।' সুমনা বললে।

'কী ঠিক করেছ?'

'আমাকে রক্ত দেবে।'

'রক্ত চাইলে বুঝি তার কাছ থেকে?'

'না, সে নিজেই এসেছিল, আমি তো ডাকি নি তাকে। মনটা আমার কেমন কেমন করছিল যেন,

নরেন এল না, নরেন এল না, হারীত এসে বড় অন্যায় করল নরেনের ওপর। ভেবেছিলুম, মনটা ভাবছিল ছেলেটাকে। এল তো!'

'টেলিপ্যাথি বলে একে,' মনের পীড়িত ভাবটাকে চাপা দিয়ে একটু হেসে নেবার চেষ্টা করে হারীত বললে, 'কিন্তু—'

'তা হলে কথাটা রইল?'

'কোন কথাটা?'

'নরেনের সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেলেছি।'

কেমন একটা লোলুপতা যেন সুমনার চোখে। নাকি অনির্মল দৃষ্টি তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখছে হারীত। সমীচীনতা নেই সুমনার কোনোদিন, মনের দিক দিয়ে বিকাশের বৃত্তান্ত বিশেষ কিছু নেই। হৃদয়ের বিশৃঙ্খলার তাড়না রয়েছে সব, নিশীথের জীবনটাকে কেমন পিছনের দিকে টেনে হয়রান করে ফেলে। কিন্তু এ ছাড়া আর-কিছু বাড়াবাড়ি নেই। না, ওটা নেই, ওটা কিছু নয়।

'তুমি একা কী করে ঠিক কর কাউকে জিজ্ঞেস না করে?'

'ডাক্তারকে বলে এসেছে নরেন।'

'রক্ত দেবে আবার?'

'কাল থেকে দেবে।'

'ওরই রক্ত চাই তোমার?'

'তাতে ভাল হবে। তাড়াতাড়ি সেরে উঠব। কেমন তাগড়া ছেলে তো নরেন। নতুন যেটিকে জুটিয়েছ তুমি সে তো ভিজে বেড়ালের মত, হারীত। যাকে যার ভাল লাগে তার জিনিসেই তার তিলে তাল মিলে যায়, শাকের কণায় পঞ্চশস্য।'

'কী বলেছেন ডাক্তার?'

'তার সায় আছে।'

'জিজ্ঞেস করে দেখব এক বার ডাক্তারকে।'

'কাল তো রক্ত লাগবে।'

'আজ যাব ডাক্তারের কাছে।'

'নরেনকে আমি কথা দিয়েছি।'

'আজ যাব ডাক্তারের কাছে।'

'যেখানেই যাও খোদার ওপর খোদকারি করতে পারবে না। ব্যবস্থা উনি করে দিয়ে গেছেন। ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি কে হে?'

কোথাকার একটা নিচু ঝোপের থেকে উড়ে এসে বেশি বাতাসে-বাতাসে বড় শিমুল গাছটার লম্বা পাতা আঁকড়ে ধরবার জন্যে দুটো বুলবুলি কী রকম উড়ছে-ঘুরছে, তাকিয়ে দেখছিল হারীত।

'নরেনের সঙ্গে যে-সব হিন্দু-মুসলমান ভাইরা এসেছিল তারা কি আমাদের ঘরে ঢুকেছিল?'

'ঢুকেছিল।'

'আমি ছিলাম না, তবুও ঢুকল?'

'আমি তো ছিলাম।'

'কোথায় বসল তারা?'

'আমার খাটে এসে বসেছিল চার-পাঁচজন, বাকিরা তোমার বাবার তিন-চারটে চেয়ারে বসেছিল।'

'এত লোক সব? গনি বসেছিল কোথায়? আব্দুল গনি?'

'গনি খাটে এসে বসেছিল, আমার পাশেই তো; বড্ড প্যাঁজের গন্ধ পাচ্ছিলাম।'

'জলপাইহাটি কলেজের বেয়ারা তো গনি।'

'তা জানি আমি। তোমার বাবা থাকতে গনি আমাদের ঘরে ঢুকত না। কিন্তু এখন ঘরে ঢুকে আমার খাটে এসে বসল তো।'

'কেমন হল সেটা? তুমি খাটে বসে আছ, অথচ—অবিশ্যি সব মানুষই এক,' হারীত বললে, 'বসলে বই কি, কিন্তু পুরুষরা চিরকাল পুরুষদের সঙ্গে বসলেই ভাল। বিড়ি-টিড়ি চাইল গনি?'

'আমার কাছে? না, তা চায় নি তো।'

'অর্চনা মাসির কাছে চেয়েছিল—'

'কে? গনি?'

'না, মোনতাজ।'

'কোন মোনতাজ? ঐ যে ঘড়ি-আলা আস্তাবলের গাড়োয়ান?'

'ইস। মহিমবাবু তখন কলেজে গেছেন, ছেলে ইস্কুলে গেছে—মোনতাজ সজনে গাছের পাশের সদর রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে, সওয়ার নামিয়ে দিয়ে, এদিকে চলে এল, সোজা মহিমবাবুর ঘরে ঢুকে, চেয়ারে বসে, জিজ্ঞেস করল বিড়ি আছে কি না'—

'জিজ্ঞেস করল মোনতাজ?'

'কেন জিজ্ঞেস করবে না, বিড়ির দরকার তার।'

'চেয়ারে চড়ে বসেছিল?'

'চেয়ার তো মানুষের জন্যে, মানুষ তো চেয়ারের জন্যে নয়'। এটা বুঝতে চাচ্ছে না সুমনা, বোঝানো বড় কঠিন, ভাবছিল হারীত।

'কী করল অর্চনা?'

'বলছি তোমাকে', হারীত একটা বিড়ি জ্বালিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা নিভিয়ে সরিয়ে রাখল। কী বলছে, কী করছে, কোথায় আছে—খেয়ালই ছিল না। কিছু তার।

'কবে হল এ সব?'

'এই তো পরশু দুপুরবেলা। আমি বাড়ি ছিলাম না, তুমি ঘুমুচ্ছিলে'—

'কী হল তার পর- বিড়ি চাইল মোনতাজ?'

'মহিমবাবু তো তামাক খান না। কিন্তু মহিমবাবুর ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে, সে একতাল চাঁদ-তারা মার্কা বিড়ি কিনে এনে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে ব্যাঙের আধুলির মত রার করে খেয়ে নেয়, বাপ তো টেরই পায় না, মা সেটা বুঝতে পেরেছে, রামাল ধরেও ফেলেছে। তবে পয়সার মাল, ফেলে দেয় নি, নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রেখেছে। সেখান থেকে বের করে দুটো বিড়ি দিয়ে দিল মোনতাজকে।'

'এ রকম দিচ্ছে আজকাল ভদ্রঘরের বৌরা, শুনছি তো!' সুমনা জানালা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুরফুর করে যে-বাতাস আসছিল সেটার দিকে তাকিয়ে নিল যেন একবার, 'কী করলে মোনতাজ?'

'বিড়ি জ্বালিয়ে ধোঁয়া ওড়াল, অর্চনা মাসিকে জিজ্ঞেস করল তার কোনো বোন-টোন আছে না কি মোনতাজের ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার মত।'

'ও মা। ও মা! তাই বললে মোনতাজ? ও মা! এ আবার কী রকম ঘটকালির ছিরি!'

'এ রকম ঢের সম্বন্ধ হচ্ছে তো আজকাল।'

'ও মা! জলপাইহাটিতে?'

'সব জায়গায়। অর্চনা মাসির মেয়ে-বোন-টোন কেউ নেই বলাতে মোনতাজ বিড়ির ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় মনসার মুখে-চোখে ধুনো সুগন্ধ ছড়াতে-ছড়াতে বেরিয়ে গেল। জিনিসটা মকবুল চৌধুরী সাহেব কিংবা শাহাদাৎ হোসেন সাহেবকে জানাবে কি না জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে অর্চনা মাসি। আমি "না" করে দিয়েছি। মোনতাজরা ছেলেমানুষ। স্বাধীনতা পেয়ে ছেলেমানুষি একটু বেড়ে গিয়েছে হয় তো, কিন্তু সে সব গুনা-টুনা নিয়ে রাও করে কোনো লাভ নেই। যখন দেখা যাবে যে যারা ভদ্র-টদ্র শিক্ষিত সমীচীন, তারাও গোলমাল করছে, তখন অবিশ্যি চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু তারা কিছু করবে না। সত্যিই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে দেশটাকে সব দিক দিয়ে উন্নত সভ্য করে তোলবার জন্যে তাদের চেষ্টা খুব আন্তরিক, তা আমি জানি।'

'কিন্তু দুপুরবেলা ভদ্রবৌদির ঘরে ঢুকে বিয়ের সম্বন্ধ পাড়া—এটা চৌধুরী সাহেবকে জানালেই ভাল হত।'

'মোনতাজদের হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু আর-এক দল আছে মোনতাজ গনির চেয়ে বেশি ভাবে কাটে, বুদ্ধিও আছে খানিকটা, কিন্তু বিশেষ কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই; হোসেন সাহেব চৌধুরী সাহেবদের মত বিজ্ঞতা প্রবীণতা নেই, তারা যদি একটু বেসামাল হয়ে উঠতে থাকে তা হলে চৌধুরী সাহেব, আমির আলি সাহেব, শাহাদাৎ হোসেন সাহেবকে জানিয়ে দওয়া দরকার। গনির কাছে বিড়ি ছিল? খেলে খাটে বসে-বসে?'

'দেশলাই চেয়েছিল আমার কাছে।'

'কে, গনি?'

'হ্যাঁ গনি আর চাঁদ মিঞা।'

'চাঁদ মিঞা?' হারীত একটু ভেবে বললে, 'ওঃ, দপ্তরির দোকান আছে চক বাজারে। কী এত্তেলা ছিল এদের তোমার কাছে?'

'দু–দফা ছিল। এক হচ্ছে নরেনের রক্ত নিতে হবে—'

:চাঁদ মিঞাও তা চায়?' কেমন একটু কৌতুক বোধ করে বললে হারীত।

'চাঁদ মিঞা, গনি, ইসমাইল, সুজন খাঁ সব্বাই তাই চায়।'

'কেন, এতে তাদের কী স্বার্থ?' হারীত কোনো কিনারা না চেয়ে সুমনার ডান হাতের মুঠোব দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে থেকে বললে।

'নরেন, বরেন, চাঁদ মিঞা, বরকত আলি, সুজন খাঁ, গনি ওদেব একটা দল তো। নরেনের কোনো অমান্যি হলে ওদেরও অমান্যি, দোলো ব্যাপার; এত দিন পলিটিক্সে থেকে সে তোমার বোঝা উচিত ছিল হারীত। দশের খাতিরে এসেছিল ওরা সব।'

'রক্ত দেওয়াটা একটা মানের ব্যাপার; না দিলে অমান্যি হয়? মান–অপমানের বেশ চেকনাই বেরুচ্ছে নরেনের—সুজন খাঁ, চাঁদ মিঞা, আশু দত্ত, নিমাই হাওলাদাবদের সঙ্গে মিশে।'

'মেলা চেঁচিও না হারীত। আগেব সে দেশ–গাঁ নেই, কিন্তু লোক বদলেছে, হাওয়া বদলেছে। তুমি শত্রু বানাচ্ছ খুব হারীত।'

'বানাচ্ছি, তা তো দেখছিই। কী করতে হবে? যা ভাল বুঝি তাই তো করি। কারু সাতে–পাঁচে অনিষ্টে থাকি না। মানুষের ইষ্ট করতে চেষ্টা করছি, দু জাতের মানুষেরই। আমাকে নাকে ধরে ঘুরিয়ে দেখাবে নাকি নরেন, আশু দত্ত, চাঁদ মিঞা, সুজন খাঁ?'

'আঃ, কী কবছিস, ঝামেলা কেন করছিস হাবীত। ওদেব আক্রোশ, তুই জুলেখাকে হাত করতে চেষ্টা করছিস। কেন করছিস? কী দরকার তোর? আমার গা–ছুঁয়ে বল, যাবি না আর জুলেখাদের ওখানে।'

'কেন যাবে না জুলেখাদের ওখানে হাবীত?' বললে অর্চনা; এই মাত্র কখন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে অর্চনা টের পাযনি হারীত। সে বাইরের পৃথিবীব দিকে তাকিযেছিল, দেখছিল, খুঁজছিল খুব উঁচু শিমুল গাছটার হাজাব–হাজাব বাতাসি পাতারাশিব ভেতব থেকে সেই উড়ন্ত বুলবুলি দুটোকে; নেই এদিকে তারা; কোথায চলে গেছে; জামরুল বনের ভেতব দিযে ওড়া একটা মাছ–বাঙা যদি রেডিওতে পাখির স্বর নেওয়া হত, তেমন একটা তালেব সুস্থতা দিযে শুরু করে, সমস্ত মেশিনের এরিযালের অতীত কী একটা প্রাকৃতিক নিবিড় শব্দের অনন্তের ভেতব দিযে কোথায মিলিযে গেল।

'বসো অর্চনা,' সুমনা বললে।

'জুলেখাদের বাড়ি গিয়েছিল হারীত?'

'হ্যাঁ, সমস্তটা দুপুর সেইখানে।'

'আজ প্রথম গেল বুঝি?' জেনেশুনেও জিজ্ঞেস কবল অর্চনা।

'না, ক দিন ধরেই তো যাচ্ছে। যাওয়াও যাওযা, সমস্তটা দুপুব সেখানে মেবে দিযে চারটে সাড়ে–চারটের সময় ভাত খেযে আসা হয।'

হারীত অর্চনার দিকে তাকিযে বললে, 'তোমাকে আমাব সঙ্গে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তো যেতে চাইলে না।'

'তোমাব সঙ্গে গেলে এক রকম ছিল ভাল, কিন্তু হাবীত একা গিযে শত্রু বাড়াচ্ছে,' সুমনা বললে।

'কে শত্রু হল সুমনাদি?'

'নরেনরা শত্রুতা করছে। সুজন খাঁ, চাঁদ মিঞা, গনি, ইসমাইল, আশু দত্ত, গণেশ সব নরেনেব দলে। আমাদের বাড়ি এসেছিল ওরা আজ দুপুববেলা, তখন তুমি কোথায ছিলে অর্চনা!'

'দুপুববেলা আমি বাড়ি ছিলুম না। একটু হাসপাতালে গিয়েছিলুম। মেয়েদের হাসপাতাল কমিটির একটা মিটিং ছিল আজ। এই তো এলুম।'

'হাসপাতালে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল তোমার?'

'মজুমদারেব সঙ্গে? হ্যাঁ হয়েছে।'

'নরেন কিছু বলেছে তাকে?'

'তা তো আমি জিজ্ঞেস করি নি। কিছু বলবার কথা ছিল?'

'নরেন আমাকে রক্ত দেবে কাল থেকে আবার। ঠিক হয়ে গেছে। ছেলেটাকে যাই বল তাই বল, খুব মনে ধরেছে ওকে আমার। বৌদি সম্বন্ধ পাতাল তো আমার সঙ্গে। নাঃ, ওর রক্ত ছাড়া আমার ভাল লাগবে না, ভাল হবে না। হারীতকে রাজি করিয়েছি।'

অর্চনা হারীতের মুখের দিকে তাকাল, 'রাজি হয়েছ নাকি?'

'কী কবব—না হলে রুগি টেঁকে না।'

'মজুমদারও রাজি?'

'আজ জিজ্ঞেস করে আসব। বেরুতে হবে বাতে নানা কাজে।'

'এটা কেমন হল হারীত। আবার নবেন রক্ত দিচ্ছে?'

'দিচ্ছে তো। বেশি দিন দিতে হবে না।'

'কেন?'

'না। বেশি রক্ত লাগবে না আর। মা ভাল হয়ে উঠেছেন। নিশীথ সেন নাকি নরেনকে ঠিক করে গেছলেন?'

অর্চনা সুমনাব দিকে তাকাল। সুমনা পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে। চোখমুখ দেখা যাচ্ছে না তার। হয় তো ঘুমিযে পড়েছে, কিংবা এগিযে গেছে ঘুমেব পথে খানিকটা দূব।

'নিশীথবাবু তাড়াতাড়ি কলকাতায চলে গেলেন। এ দিকটার কোনো ব্যবস্থা করে যেতে পাবেন নি। কিন্তু তিনি তো নরেনের ওপব ববাত দিযে যান নি—আমি যতদূর জানি,' অর্চনা বললে।

সুমনা এড়িয়ে-এড়িয়ে বললে, 'ঘরেব ছেলে ঘবে ফিবে এসেছে, ঘবেব মেয়ে ঘরে। এখন তোমরা দু-জনে কথা বল, আমি একটু ঘুমোচ্ছি,' বলতে-বলতে ঘুমিযেই পড়ল সুমনা।

'জুলেখা না কি, ওর নাম?'

'ওব নাম মনোলেখা। ওব বাবা ওকে জুলেখা ডাকত, সুলেখার সঙ্গে মিল দেবার জন্য; না কি জুলেখাব সঙ্গে মিল দেবার জন্যে সুলেখা নাম রাখল ওব বোনেব।'

'ওদেব বাবা তো নেই এখন?'

'না, তিন-চার বছব হল মারা গেছেন।'

'ভাই-টাই নেই তো শুনেছি।'

'নেই বলেই তো জানি, মা ছাড়া কেউ নেই।'

'কী কবে চলে তা হলে ওদেব?'

'এখানে বাড়ি রেখে গেছেন ওদের বাবা, লাখ দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে। কলকাতাযও ওদেব বাড়ি আছে শুনেছি—পার্কসার্কাসে। অনেক দিন সে বাড়িটা বেহাতেব মত হযে ছিল, এই বারে হাতে এসেছে। ভাড়া পাচ্ছে।'

'জুলেখাদেব বাড়িতে রোজই যাচ্ছ?'

'তোমাকে তো নিযে যেতে চেযেছিলুম, গেলে না কেন?'

'আমাব তো এক দিন যাবার কথা ছিল, রোজ তো নয। তুমি তো'—বলতে গিযে থেমে গেল অর্চনা উঁচু শিমুল গাছটার উডু-উডু পাতাব দিকে তাকিযে। বুলবুলি দুটো আবাব এসেছে বাতাসেব নিববচ্ছিন্ন প্রাণচারণার বিচবণাব সঙ্গে প্রবাহিত হযে শিমুল গাছটার ভেতবে।

'আমি তো—কী?' হারীত বললে।

'বোজ দুপুবেই তো সুলেখাদের ওখানে কাটাচ্ছ।'

'সেটা ঠিক। আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। একটা নিযমেব ভেতবেও আসতে পাবছি না'—ঠিক এই জন্যে—অন্য কোনো একটা অব্যক্ত কাবণেও, অর্চনাব মুখোমুখি বসে একটু অস্বস্তি বোধ করে হারীত বললে।

'কী কাজ করবে ঠিক করেছ জলপাইহাটিতে?'

'তোমাকে তো বলেছি সব। কোনো বিপ্লবের কাজ এখানে হবে না।'

'কেন, কাজের ক্ষতি হচ্ছে কেন সুলেখাদের ওখানে গিযে? সুলেখা তো বেশ বড়-সড়-লেখাপড়া জানা, এবার তো বি-এ দিচ্ছে। নানা রকম ভাল সহজ মিহি পরামর্শ দিতে পারে সে।'

হারীত একটু অবাক হযে অর্চনার দিকে তাকিয়েই সুমনার দিকে তাকাল, ঘুমিয়ে আছে; বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকাল; ঘরে ঘুমিযে আছে লোক, কথা বলছে লোক, বাইরে অবাধ প্রকৃতি—কী গভীর

সূচীপত্রে যান

আহ্লাদে অপর্যাপ্ত চৈত্র-বৈশাখ, বিকেলের শেষ রোদ-বাতাসে, ছিটে মেঘের মত উড়ন্ত শিমুল তুলোয়, বড় তুলোর মত উড়ন্ত ধূসর মেঘে, বাতাসে, আরো আকুল অনাকুল চৌষট্টি বাতাসে, সাদা কালো পাখির ডানাগুলোকে ছিটকে ফেলে। ভীমরুল উড়িয়ে, উঁচু-উঁচু গাছের বনের ভিতর কোথাও হারিয়ে গিয়ে কোথায় চলে গেছে প্রকৃতি, সময় নেই, দেশ নেই, জলপাইহাটি নেই এমন এক স্থির নিবিড় সদর্থের ভিতরে তবুও।

'রোজ যাই না আমি সুলেখার কাছে।'

'রোজ যেতে না করে নি তো কেউ তোমাকে। কেন যাবে না হারীত?' হারীতের দিকে তাকিয়ে অর্চনা বললে।

'তুমি তো যেতে নিষেধ কব না। কিন্তু মা আমাকে তার গা ছুঁয়ে শপথ রতে বলছিল। সুলেখাদেব বাড়ি যাই সেটা মা পছন্দ করে না।'

'মায়ের প্রাণ, তা তো হবেই,' অর্চনা হাত পাখাটা তুলে নিয়ে আঁচলে বাতাস লাগিয়ে বললে, 'ঘরের ছেলেকে ঘরেই রাখতে চান তিনি।'

'ছেলে থাকবে। কী হিসেবে তোমাকে এ কথাটা বললে মা? শুনেছিলে তুমি?'

অর্চনা দিই-দিই করে তবুও এ জিজ্ঞাসাব কোনো উত্তব দিল না—'বি-এ দিচ্ছে না সুলেখা এবাব?'

'না।' হারীত বললে।

'কেন?'

'তৈরি হয নি।'

'আসছে বার দেবে?'

'সেই রকমই তো ইচ্ছে।'

'কেন, তুমি পড়িয়ে তালিম করে দাও না। এবারই দিক। কেন মিছিমিছি একটা বছর নষ্ট করবে?'

'নষ্ট আর কী', হারীত চিন্তিতভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওবা তো আর পাশ করে চাকরি নিচ্ছে না। বাঃ, আমি পড়াব সুলেখাকে? সে কত পড়াতে পাবে আমাকে।'

'কী যে বল তুমি হাবীত।'

'সত্যি বলছি তোমাকে। আমি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন। ও তো রোজ বই কিনছে, পড়ছে।'

'কেমন লাগে সুলেখাব মাকে তোমাব হাবীত?'

হাবীত একটু বিচক্ষণভাবে অর্চনাব দিকে তাকিয়ে বললে, 'সুলেখার দিদিব মত দেখায তাব মাকে। বযস বছর চল্লিশের বেশি হবে না। কিন্তু জুলেখাব চেয়ে বড় মনে হয না। আশ্চর্য সব পটেব মত ওবা।' এ রকম নাকি কলকাতায়, ইণ্ডিয়ান ইউনিযনে কোথাও দেখে নি, কে কাব চেযে বেশি সুন্দর হঠাৎ দেখে বলা কঠিন, আস্তে-আস্তে বুঝতে পাবা যায সুলেখাই সবচেযে বেশি, নাকি জুলেখা? জুলেখা আব তাব মা একই রকম।

বলতে-বলতে অনেক কথা অর্চনাব মত মেযেমানুষকে বলে ফেলেছে হাবীত। যা বলা দবকাব ছিল তার চেযে বেশিই বলেছে যেন, নিজেকে সামলে নিয়ে হাবীত বললে, 'সুলেখাব মাব সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয নি আমাব। কেমন লোক বুঝতে পারছি না। প্রাযই তো বাইরে থাকেন।'

'বাইবে থাকেন! কেন বাইবে থকেন?'

'নানা কাজ নিয়ে ফেরেন। সংসারের ভার তো তাঁব ওপর। নানা বকম মেযেদের কমিটিব মেম্বাব তো তিনি। হাসপাতাল কমিটিতে আছেন সুলেখাব মা?'

'না।'

'ওঁর কথা জিজ্ঞেস কবলে কেন তুমি?'

'এমনিই।'

হারীত তাকিযে দেখল সুমনা ঘুমিযে আছে, ও-পাশ ফিরে আছে, ঘুমের নিশ্বাসে শরীর আস্তে-আস্তে উঠছে পড়ছে। ঘুমনো জিনিসটিব দিকে তাকিযে হারীত বললে 'আমি যেমন চেযেছিলুম, আমাব নিজের মাকে তেমন করে পেলাম না কোনো দিন। মার ভেতবে প্রকৃতিব সরসতা, সবলতা বা মানুষের হৃদ্যতা, নিপুণতা নেই। আজকের এ যুগে খাড়া বড়ি থোড়ের ওপব খাঁড়াব ঘা পড়ছে সব সময়ই যেন মার মাথার ভেতরে, কিন্তু থোড় বাড়ি খাড়া হয়ে ছিটকে পড়ছে তবুও সব। তোমার ছেলে ঠিক ষোল

আনা মায়ের মত করে পেয়েছে তোমায়।'

'কেন এ কথা বলছ?' হারীতের চোখে চোখ রেখে বললে অর্চনা। অর্চনা সুমনার পাশে বসেছিল খাটের ওপর পা ছড়িয়ে—হারীত একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিল। পা দুটো আস্তে-আস্তে টেনে নিয়ে উড়ন্ত সারসের পায়ের মত পিছনের দিকে গুটিয়ে নিয়ে বসল অর্চনা।

'এমনিই বললাম', হারীত বললে। পরে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'তোমার বাবার চিঠি পাও নি?'

'এখনও আসেনি তো।'

'তোমার মাকে লেখেন নি?'

'না। তোমাকেই তো লেখবার কথা।'

'দাশগুপ্ত সাহেবের বাড়িতেই আছেন তো?'

'থাকার তো কথা। তোমাকে তো বালিগঞ্জের ঠিকানাই দিয়ে গেছেন। কেন চিঠি লেখ না তাঁকে তুমি।'

অর্চনা একটু ঠোঁট কাঁপিয়ে উঠতি হাসিটাকে নিভিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার বাবা যদি কলকাতায় চাকরি পান, তা হলে তোমরা এখানকার পাট উঠিয়ে চলে যাবে না কি হারীত?'

'মা যাবেন। আমি থাকব।'

'থাকবে? কতদিন?'

'চুক্তি করেছিলাম তো তোমার মৃত্যু পর্যন্ত, না কি আমার মৃত্যু পর্যন্ত, ঠিক মনে পড়ছে না—'

'আমার মৃত্যু পর্যন্ত—'

'তাই করেছিলাম বুঝি, কিন্তু সেটা কি হবে? অত দিন জলপাইহাটিতে থাকতে পারবে তুমি?'

'আমার যাবার কথা উঠল? আমি থাকব না কে থাকবে?' অর্চনা তার আকাশের উড়ো সারসীর প্রণালীতে বিন্যস্ত পা দুটি নিয়ে সুমনার একটু গা-ঘেঁসে বসে বললে।

'না, কেউই অত দিন এখানে থাকব না। আমাদের মৃত্যু জলপাইহাটিতে হবে না তো।'

'হবে না? যেন মানুষের হাতের রেখা পড়তে পার তুমি,' অর্চনার মুখ থেকে একটু ছোট্ট আবিষ্ট হাসির শব্দ বেরুল, 'মানুষের কপাল দেখেই বলে দিতে পার না কি হারীত।'

'আমার মৃত্যু ইউনিয়নে হবে—কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে। হাতের রেখা দেখতে হয় নি, কপাল দেখতে হয় নি। এটা আমি, যে বাঁচে যে মরে সেই মানুষেরই নিজ গুণে, অনুভব করেছি। পাখিরা অক্লান্তভাবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে অনেক দূর থেকেই মাটির গন্ধ পায়—'

'পায় বুঝি? তা পেতে পারে। কিন্তু শেষ কাজ তোমার ইউনিয়নে হবে বলছ; কেন?'

'আমি জানি কাশী মিত্তিরের ঘাটে গিয়ে আমার মাথা রাখতে হবে। ঘাটের বালিশ তৈরি হতে-হতে কুড়ি পঁচিশ বছর কেটে যাবে।'

'বালিশ পছন্দ না হলে পঞ্চাশও তো হতে পারে?'

'না। নিজের কাজ ফুরিয়ে গেলে তার পর বেঁচে থেকে কী আর লাভ। পঁচিশ বছর তো বেশ খানিকটা সময়। এর ভেতর যা হবার হয়ে যাবে।'

অর্চনা বড় বেশি ঘেঁষে বসে সুমনার দিকে। নিজকে আস্তে-আস্তে খসিয়ে নিয়ে সরে বসল সে, আরো একটু সরে বসল। ঘুমের ভেতর সুমনা আস্তে আস্তে আলগোছে নড়েচড়ে উঠে আগের মতন নিশ্বাসের নিয়মিত ওঠাপড়ার ভেতর স্থির হয়ে আরো স্থিরতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

'তুমি আমার চেয়ে ক বছরের ছোট?'

'তিন-চার বছরের।'

'আমি ভেবেছিলুম বেশি।'

'তিন-চার বছরের ছোট-বড়র কোনো মানে হয় না। হয় অর্চনা?'

অর্চনা কোনো কথা বললে না।

'তোমাকে আমি অর্চনা মাসি ডাকব না।'

'ডাকবে না তো,' অর্চনা বললে, 'কিন্তু এ সব কী রকম কথা হচ্ছে হারীত। কথা বলতে-বলতে কোন শাখায় কোন পাতায় এসে পড়েছি, পাতারও আবার শিরা থাকে; থাক, দেখে কাজ নেই; আমি এখন উঠি।'

সূচীপত্রে যান

'বসো-বসো', হারীত বললে।

'না, না, উঠি আমি।'

'বসো।'

'না, উঠতে হয় এখন,' অর্চনা উঠতে-উঠতেও বসে রইল তবু, 'সুলেখাদের বাড়ি আছে পার্কসার্কাসে—কেমন বাড়ি?'

'বেশ বড় দোতালা বাড়ি—সুন্দর।'

'দেখেছ বুঝি?'

'বাড়ির ফোটোগ্রাফ আমাকে দেখিয়েছে জুলেখা।'

অর্চনার মাথাটা খালি ছিল, ঘোমটা খোঁপার ওপব ঠেকেছিল অনেক ক্ষণ, সেটাকে খোঁপার থেকে খসিয়ে নিয়ে গলার আঁচলের মত অর্চনা জড়িয়ে নিল।

'পার্কসার্কাসের বাড়িটা ওদের নিজেদের?'

'হ্যাঁ। ওদের বাবা করে গেছেন।'

'কী ছিলেন তিনি?'

'ইঞ্জিনিয়ার।'

অর্চনা বললে, 'কলকাতায় এমন চমৎকার বাড়ি থাকতে সুলেখারা এখানে আছে যে!'

'কলকাতায় পার্কসার্কাসে গোলমাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে তো অনেক দিন। এখন সব ঠাণ্ডা হয়েছে বটে। এটা নিজেদের দেশ তো সুলেখাদের।'

'কিন্তু এখন তো পাকিস্তান হয়ে গেল এ দেশ।'

'তা তো হল,' হারীত তাকিয়ে দেখল বাইরের পৃথিবীর থেকে আলো যেন কাক, চিল, মৌমাছির পাখা উসকে উড়িয়ে ফালি তরমুজের রঙের মত নিঃশব্দে বর্ণে এক-আধ মুহূর্ত স্থির হয়ে আছে, টনক নড়ছে না, কোনোদিকে ঠিকরাচ্ছে না কিছু, মন্ত্রসিদ্ধির মত যেন নিজেকে ধবে আছে সময় ঃ বিকেলের রোদ নেমে এসে জারুল, হিজল, জামরুলের বনের এই মাযাঘন তবুও সৃষ্টির অন্তিম প্রতিভায় স্বচ্ছ দেশের ভেতব।

'পাকিস্তান হয়েছে এ দেশ। মানিয়ে নিয়েছে সুলেখারা। তাদের এ জায়গাটা ভাল লাগে।'

'ভাল লাগে। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক কলকাতায় চলেই যেতে হবে।' অর্চনা বললে।

কী করে জানলে তুমি?'

'কী বলে সুলেখা?'

'সে তো এখানে থাকতে চায।'

'আমিও তো থাকতে চাই। কিন্তু দুটো কি এক রকম?'

সুমনা ঘুমের মধ্যে কাতরে-কাতরে চুপচাপ হয়ে পড়ছিল আবাব। হাবীতের চোখের দিকে তাকিয়েছি অর্চনা, শেষ বিকেলের ছাযার ভেতর একটা বড় জামফলের নীলিমা, কালিমার মত যেন অর্চনার চোখের তারায়, অর্চনার সমস্ত সত্তায়, পরিব্যাপ্ত হয়ে, ছাযা-বিকেলের জামবনানীব মত, কোনো এক নিস্তব্ধ নদীর পাবের, ছেলেবেলায় সে-সব নদী, ছাযা, নীববতা, জামের বন দেখেছিল হারীত। তার পর আর দেখে নি অনেক দিন। আছে যে তাও ভুলে গিয়েছিল। যে-জ্ঞান বিদ্যামাত্র, যে-বিদ্যা শুধুই শব্দের ব্যসন, যে-শব্দ বাক্য-প্রগতি অফুরন্ত বিশৃঙ্খলার সর্বব্যাপ্ত বুদ্ধিনাশের একটা বিরাট বিনাশ প্রস্থানের দিকে টানছে মানুষকে, কলকাতা তাকেই মনে করিয়ে দেয় শুধু; বলে, দেশ নগর হবে; নগর হবে কলকাতা; কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, হারিয়ে যাচ্ছে, তলিযে যাচ্ছে, অন্ধকারেব বক্তহিমানীব দিকে যাচ্ছে সব; বলে এইই সভ্যতা, এই উপগ্রহে এইই অন্তিম অবরোহণ মানুষের। হারীত নিজেও নির্জন সন্ধ্যার নদীর পাবের শাল, জামরুল, শিশু বনানীর শান্তি, সত্যতা, মহানুভবতাকে স্বীকার করে নি তো, সে কলকাতার মানুষ, সভ্যতার মানুষ, কলকাতা ভেঙে কলকাতাকে সৃষ্টি করবে আবার, এই বিষ সভ্যতাকে বিনাশ করে নতুন সভ্যতা আনবে—যদি হয় তাও বিষ—মানুষের সৃষ্টিরই মর্মকুহরে কীট রয়ে গেছে বলে—তা হলে কী করবে সে? না, না কীট নেই, কাজ ছাড়া কোনো কথা নেই, বেশি ভাবার কোনো দরকার নেই, নদী জাম বন সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা বলে কোনো জিনিস নেই; নিশীথ সেন আর হোরুস্তেরলিন আর লুক্রেসিয়সের বিষণ্ন নিঃশব্দতার ভেতরে নিজেকে ছেড়ে দিলে চলবে না। পৃথিবীটা মহাভারতের পৃথিবী, কিংবা দান্তের নরকের নরকাতীত একটা আশ্চর্য শুদ্ধশীল প্রবাহের অজ্ঞান্তে জনতাসংস্থান, কেমন আধো আলোকিত কেমন রক্তের রাত্রির রঙে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে বিশাল দিনের রং

পেতে যাচ্ছে।

'আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না তো হারীত।'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যেন।'

'দেখছিলুম তো।'

'কী দেখছিলে?'

'যেন বাইরে তাকিয়ে উষা-অনিরুদ্ধের আকাশ আলো দেখছ; তোমার দিকে দেখছিলুম আমি।'

'অনেকটা সময় কেটে গেছে?'

'হ্যাঁ—মিনিট পনের-কুড়ি হবে—'

'কেমন একটা তন্দ্রার মতন এসে পড়েছিল। নিজেকে কাজেব মানুষ করে তুলতে চাই, অথচ কাজ ফেলে কথাই ভাবি।'

'আমিও তো ভাবি; ভেবে নিলে কাজের সুবিধে হয়।'

হারীত বললে, 'তোমার মনে হয় সুলেখারা এখান থেকে চলে যাবে?'

'তোমাকে বলে নি তারা কলকাতায় যাচ্ছে?'

'না তো। যাচ্ছে, কারো কাছে শুনেছ বুঝি?'

'অনেকেই তো চলে যাচ্ছে,' অর্চনা বললে।

'ওঃ, সেই কথা,' হারীত একটু নিস্তার বোধ করে হেসে বললে, 'না, অনেকেব সঙ্গে সুলেখাদের মা তলিয়ে যাবার লোক নন। চলে যাবে হয় তো এক দিন, কিন্তু দেবি আছে। আজ নয়, কাল নয়, কথাটাই তো উঠে নি এখন।'

'তোমার কাছে জুলেখার মা পাড়ে নি কথাটা, বলতে চাও তুমি হারীত?'

'জুলেখার মার সঙ্গে কথাবার্তা হয় না আমার—'

'তা হলে কী করে পাড়বে?'

হারীত সুমনাব একফালি জ্বালানি কাঠের মত শুকনো জ্বলজ্বলে শবীবের দিকে একবাব চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তোমার কাছে বলেছে বুঝি জুলেখার মা?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয় না, আলাপ নেই বনলেখার সঙ্গে আমাব।'

হারীত একটা নিশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে, ঘবেব ভেতবে ছাযায কোথায অর্চনা বসে আছে চোখ দিযে তাকে খুঁজে বাব কবে, বললে, 'তা হবে। মন ঠিক করতে পাবে নি হয তো এখনো। কাউকে বলছে না কিছু তাই। চলে যাবে হয তো তিন বোন। কিন্তু তুমি তো এখানে আছ।'

'তিন বোন?' অর্চনা ঘাড় কাত করে, মুখ এড়িয়ে, মাথার মস্ত বড় খোঁপাটা ভেঙে ফেলে বললে, 'সুলেখাব বোন বলছ সুলেখার মাকে? বোন হল? মানুষের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব।'

হারীত তাকিয়ে দেখল আরো আবছাযা হয়ে পড়েছে জামরুল বনটা, এ দিকেব ফালি আকাশটা, ও-দিকের ও আকাশটা। যারা পাখায ভব দিযে উড়ছিল এত ক্ষণ সেই চিলেব থেকে কুমোর পোকা অব্দি সকলেই প্রায সোঁদা আকাশটাকে একা ফেলে গেছে, চলে যাচ্ছে।

মানুষের সম্বন্ধ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলেছে অর্চনা। অর্চনার দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'চেয়ে দেখ বাইরে, কেমন আশ্চর্য এখন শান্তির সময। এই সমযেই সত্য উদঘাটিত হয। মানুষের ঠিক সম্বন্ধ স্থির হয এই সময—'

'কী স্থির হল?'

হারীত কোনো কথা বললে না, একটা বোলতা বাইবের বাতাসেব ভেতব মিলিয়ে যাচ্ছে—একটা দোয়েল সেটাকে ধরতে গিয়ে তাক ভুল কবে সজনে গাছের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল—তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

'কী স্থির হল সুলেখা আর তাব মার সম্বন্ধ?'

'সুলেখার কথা বলছিলুম না।'

'তবে কার?'

'তোমাব আমার।'

'ওঃ, এইবারে আমি—সুমনাদি ঘুমের থেকে জাগল না তো, আমি উঠি এবারে।'

হারীত বাধা দিতে গেল না, সুমনার দিকে চোখ নেই তাব, অর্চনার দিকে নেই, বাইরে পাখিদের

সূচীপত্রে যান

ভেতর একটা ঘুমতাড়া বসে পড়েছে, পতঙ্গদের ভেতরেও, কেমন ছায়া এসে পড়েছে, দেখছিল হারীত।

না, চলে যায় নি অর্চনা। বসে আছে। কেন যেন বিমুগ্ধ বিষধরের মত বিড় পাকিয়ে বসে আছে কেমন ঘনিল, নিবিড়, শ্বেতাঞ্জনেব মতন। কিন্তু বিষ নেই, ভেতরে সুধা আছে, সুধা ক্রমে-ক্রমে বেশি জমে উঠেছে যেন অর্চনাকে ছাপিয়ে, হারীতের আত্মাকে অতিক্রম করে, হারীতের শরীরের ভেতরেও যেন। এবং বিষ নয়, কলকাতায়, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে বিংশ শতকে, ইতিহাসের অনেক স্তবে অনেক বিষ দেখেছে সে। অমৃত উপলব্ধি করা যাক বাইরের প্রকৃতির দিকে চোখ রেখে, সে চোখ না ফিবিয়ে, আব . মানুষ মানুষকে যা কোনোদিন দিতে পারে না শরীরে একটা অবাধ বিলোড়ন ছাড়া, সেই ব্যথিত সুধা, শরীরকে গ্রহণ করতে না দিয়ে চোখের ভিতরে সঞ্চিত কবে।

অর্চনা বসে আছে খাটের দূরের কিনারে, সুমনা ঘুমিয়ে আছে, চেয়ারে বসে বাইরেব দিকে তাকিয়ে আছে হারীত। যে সুধা মানুষের স্নায়ুর অবলম্বন চাচ্ছিল, তাকে আজকের এই অসুস্থ সংস্কার, কীটনষ্ট সমাজ সংস্থিত আধার, গ্রহণ করতে পারবে না বলে, মননের বৃহৎ সুস্থতার দেশে একটা প্রকাণ্ড সাদা পাখির মত সঞ্চারিত করে দিল হারীত। কেমন অদ্ভুত স্বর্গীয় বিমোহ। এ পাখির আসা-যাওয়া আত্মার (যদি তা বলে কোনো জিনিষ থাকে); আত্মার থেকে মনে; মনের থেকে শবীর থেকেও মাঝে-মাঝে— শরীরকে ছেড়ে দিয়ে শুক্র সূর্যে আবাব, অনুগত স্বচ্ছতায় স্পর্শতায়, অনন্ত যেখানে নেই তার সুধাব সেই অন্তিম নির্জনতার দেশে।

'কী ঠিক হল?' অর্চনা বললে, 'কী ঠিক হল?'

'কিসের?' কোথায় ছিল যেন সে, যেখানে এখন বসে আছে সেখানে নয়, চমকে উঠে বললে হারীত।

যে খোঁপাটা ভেঙে ফেলেছিল সেটাকে ঠিক করতে-করতে, যে-কথা সোজাসুজি বলতে ইচ্ছা কবছিল অর্চনা সেটাকে গড়িমসি করে, প্রায় সোজাভাবেই বললে অর্চনা, 'এখন তো শান্তির সময় বলছিলে তুমি, সত্য উদঘাটনের সময। মানুষের সম্বন্ধে এলোমেলো হয়ে যায না এই সময়, বলেছিলে তুমি? সত্য সম্বন্ধ স্থির হয বলছিলে। কী সম্বন্ধ তা হলে'—বলতে-বলতে নিজেকে শুধবে নিয়ে অর্চনা বললে, 'আচ্ছা, ঐ যে নারকোল গাছে পাখি দুটো থাকে—রাতে প্রহবে-প্রহবে ডেকে ওঠে—ওবা কি বাজকুড়ুল?'

'কী সম্বন্ধ ঠিক হল অর্চনা?'

'তুমি অর্চনা ডাকলে আমাকে।'

'হ্যাঁ, পাখি দুটো বাজকুড়ুল,' হারীত বললে, 'একশ বছব বাঁচে। এক সঙ্গে থাকে।'

দুজনেই চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

পা দুটোকে বুক পালকের কাছে টেনে মরাল-সাবস-বক-বাজপাখি যে-রকম আকাশ দিয়ে উড়ে যায সেই রকম পা গুটিযে বসেছিল অর্চনা; ডান পাযেব ওপব পা চড়িয়ে বসেছিল হারীত আকাশ-বাতাসের দিকে তাকিযে।

'তুমি এক বছর এখানে থাকা ঠিক করেছ হাবীত?'

'হ্যাঁ, ঠিক করেছি।'

'কবের থেকে এক বছর?'

'এই আজ থেকে—'

'তারপর, বছর ফুরিযে গেলে থাকবে না আর?'

'এই তো সবে শুরু হল,' হারীত বললে, 'এক বছব ফুরোবার আগে তুমিই তো এখান থেকে চলে যাবে।'

'কে বললে?' বিশেষ কোনো মনোযোগ না দিয়ে অর্চনা বললে।

'কলকাতায় মাস্টারি জোটাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তো মহিমবাবু।'

অর্চনার ঘুম পাচ্ছিল যেন, সুমনার ঘুম শেষ হচ্ছে না, বাইরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘুম পাচ্ছে না হারীতের। কেমন সোজা খাড়া হযে বসে আছে সে।

'মহিমবাবু পেয়ে যেতে পারেন। তিনিতো ফার্স্ট ক্লাস। ঢাকা ইউনিভার্সিটির অবিশ্যি। হোক তা ঢাকা ইউনিভার্সিটির, ফার্স্ট ক্লাস তো; কলেজের কর্তৃপক্ষরা ফার্স্ট ক্লাসটাই দেখে। ফার্স্ট ক্লাস থার্ড তো মহিমবাবু? নাকি থার্ডক্লাস ফার্স্ট? তোমার ঘুম পাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ছ অর্চনা।'

'তোমার ঘুম পাচ্ছে না হারীত?'

'না। আমাব বেরুতে হবে রাতে। সারা রাতই বাইরে থাকতে হবে। বাড়িতে ফেরা হবে না বোধ হয় আজ রাতে আর।'

'কোথায় যাবে?' ঘুমে জড়িয়ে যেতে-যেতে অর্চনা বললে।

'যাব বিরাজ সাহার আড়তে। সেখানে থেকে চালেব জোগাড় করে চামাবপট্টির দিকে যেতে হবে।'

'চাল? কী চাল? আমি বলছি কত মণ চাল?'

'পনের-কুড়ি মণ।'

'কে দেবে তোমাকে অত চাল?' অর্চনা ঘুমোতে-ঘুমোতে জেগে উঠে বললে।

'ঠিক করে এসেছি।'

'কালবাজাবেব দবে? খুব গলাকাটা দবে ঠিক কবেছ তুমি? আজ কাল চাল পাওয়া যাচ্ছে না এখানে।'

'পাচ্ছি তো।'

অর্চনা চোখ রগড়াতে-বগড়াতে হেসে বললে, 'দেখ কেমন পাও—রাত-বিবেতে আড়তে-আড়তে ঘুরে। টাকা কিছু আগাম দিয়েছ? নিয়েছে টাকা কিছু?'

'না, দিই নি।'

'তা হলে আব পেয়েছ তুমি চাল।'

'না পেয়ে আমি ছাড়ব না অর্চনা। আজ বাতে কিনে আজই বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে আসব সব।'

'এত চালেব টাকা পেলে কোত্থেকে?'

'কলকাতা থেকে কিছু টাকা এনেছিলাম আমি, তাই দেব; বাকি-বকেযাটা বিবাজদাকে পবে এক সময দিলেই হবে!'

'পবে মানে কবে?'

'দিন পনেব কুড়িব মধ্যেই।'

'কোত্থেকে পাবে এত টাকা এত অল্প সময়ে?'

'কেন, দবকার হলে তুমি দেবে।'

অর্চনা গাযেব থেকে আবো খানিকটা ঘুম ঝেড়ে ফেলে বললে, 'কেমন ঘুম পাচ্ছিল, ঘুম পাচ্ছিল, ভাবী মিঠে বাতাস দিচ্ছে। সন্ধে হয়ে গেছে। কাদের ভেতর বিলোবে চাল তুমি?'

'চামাবপট্টিতে অনেকেই আট-দশ দিন ধবে জাউ-টাউ খেয়ে আছে। তাও পাচ্ছে না। তিন-চাবদিন কিছুই পাচ্ছে না। এ কিস্তিটা তাদের মধ্যে চাবিয়ে দেব।'

'চালের জন্য কত টাকা দিয়েছে সুলেখা তোমাকে?'

'চাই নি সুলেখাব কাছে আমি?'

'কেন, তাদের দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে, পার্কসার্কাসে বাড়ি আছে, তাই বুঝি চাওযা হল না তোমার?'

'তোমার কিছু নেই। তোমাব কাছে তো চেয়েছি। আমাকে যদি থাকতে বল এখানে তোমাব মৃত্যু পর্যন্ত, তা হলে এ বকম চাইতে হবে অনেক বাব আমায। তা নয তো, সুলেখার কাছে টাকা চেয়ে, তোমার কাছে রাতে-বাতে নিবিবিলি বৃত্তান্ত বর্ণনা কবে, তোমাব মৃত্যু পর্যন্ত পঁচিশটা বছব কাটিয়ে দিতে হবে জলপাইহাটিতে আমাব?'

অর্চনা ঘুমোচ্ছিল, জেগে ঘুমোচ্ছিল, ঘুমিয়ে জাগছিল—আধা শোযা অবস্থায। তেমনি ভাবেই জামরুল বন, জাম বন পেবিয়ে গেল তাব চোখ; কোথাও লগ্ন হল না—দূর থেকে—দূরতাব দিকে—আকাশ নয—শূন্য নয—কেউ থামাতে পাবে না তাকে। তবুও ঘুমেব ভিতব ককিয়ে ওঠে সুমনা, খেপে যায। ঘুমিয়ে পড়ে আবাব।

অর্চনাব দিকে তাকিয়ে আছে হারীত। কী কবে টেব পেল অর্চনা, সে তো এ সময় পেবিয়ে চলে গিয়েছিল স্রোতেব ভেতর—সৃষ্টির সনাতন সময়েব। উঠে বসল অর্চনা।

'আমাব ঘুম একেবাবে ভেঙে গেছে,' অর্চনা বললে, 'এই রাতের বেলা বেশ ঘুম আসে। খোকা আর উনি ফিরেছেন টেব পেয়েছ?'

'না তো। কোথায় গেছেন মহিমবাবু?'

'কলেজের ছেলেবা একটা থিয়েটার করছে। রাত দশটার আগে ফিববেন না হয তো। এখন কটা

সূচীপত্রে যান

রাত?'

'সাতটা হয় তো। কলেজে থিয়েটার হচ্ছে। অবনী খাস্তগিরের লেকচার আছে মতিজেদ হলে। রাত-বিরেতে সাহাপট্টির থেকে চামারপট্টি, চামারপট্টি থেকে সাহাপট্টি, পায়ে হেঁটে মেরে দিতে হচ্ছে আমাকে। বাইরের দিকে তাকালে মনে হয় মফস্বল শহরটা যেন চিতে নিবিয়ে খেংড়াখেংড়ির শ্মশানে থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে রাত দুপুরে। কিন্তু তবুও বেশ জম-জম করছে, বেশ মরে বেঁচে আছে টাউনটা, যাই বল তুমি অর্চনা। মরতে-মরতেও যে-জিনিষ মরে না সেটাকে খুব ভাল লাগে আমার, খুব ভাল লাগে বাঁচাতে সে জিনিসটাকে—আশার আলোয় লক্ষ্মীমন্ত করে তুলতে।'

'উনি আর আমি কলকাতায় চলে যাব, মাথায় ঢুকেছে তোমার?'

'উনি কাজ নিয়ে কলকাতায় গেলে তুমি যাবে না?'

'উনি কলকাতায় যাবার আগে তুমিই তো জলপাইহাটি ছেড়ে চলে যাবে হারীত?'

'কোথায়, পরলোকে?' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল হারীত।

'উঠলে?'

'হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়ছি আমি। সারা রাত আমার কাজ অনেক দিকে আজ। বাড়ি ফেরা হবে না আজ রাতে আর। তোমাদের ঘরদোর বন্ধ করে এসে মার কাছে একটু বসে থাকো তুমি। আজ রাতে মার সঙ্গেই শুয়ো। তোমার কর্তা ফিরে এলে তাঁকে সেটা বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে না,' জুতো আঁটতে-আঁটতে বললে হারীত, 'এক কথায়ই বুঝে যাবেন তিনি।'

হারীত অর্চনার দিকে হাসির স্বচ্ছ শুশ্রূষায় তাকিয়ে অন্ধকারের ভেতর বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনের পরেই হারীত ফিরে এসে দেখল, অর্চনা তেমনি হাঁটু ভেঙে গুটিয়ে চুপচাপ করে আছে। শরীরের সমস্ত সাদা শাড়িটা বাতাসে কাঁপছে উড়ছে ঃ এখুনি যেন একটা বড় পাখির মত উড়ে যাবে অর্চনা রাত্রির আকাশের অভিজিৎ, লুব্ধক, সপ্তর্ষি নক্ষত্রগুলোর দিকে।

'তুমি ফিরলে যে?'

'পিছু ডাকলে, না ফিরে কী করি?'

'টাকা ফেলে গেছ তো?'

'কী করে বুঝলে তুমি?'

'যাবার বেলায় তোমাকে টাকা নিতে দেখলাম না তো।'

'সে টাকা ট্যাকে বেঁধে রেখেছি ভেবেই তো রওনা দিয়েছিলাম। খানিক পথ গিয়ে দেখি টাকা নেই—'

অর্চনা একটু ঠিক হয়ে বসে বললে, 'ট্যাকে যে টাকা নেই তা তো আমি দেখছিলাম—'

'তুমি দেখছিলে? কী করে দেখলে?'

'ঐ যে সুমনাদির বালিশের নীচে নোটের তোড়া, বালিশ সরে গেছে, নোটগুলো বেরিয়ে আছে; ঘন্টাখানেক ধরে তো এই রকম। তোমার চোখে পড়ে নি? তুমি যে দেখ নি, তা কী করে বুঝব আমি?'

'আমি দেখি নি, তুমি দেখেছ। বেরিয়ে যাবার সময় আমাকে বললে হত না অর্চনা?'

'তোমাকে কি আমি বেরিয়ে যেতে বলেছি?'

বালিশের নীচের থেকে নোটের তাড়া খসিয়ে এনে সাজিয়ে নিচ্ছিল হারীত।

'টাকাটা গুনে দেখো।'

'আবার কি গুনব?'

'টাকার ব্যাপার, গুনে দেখবে না?' অর্চনা আঁটোসাঁটো করে স্নিগ্ধ চোখে বললে।

না গুনে নোটের তাড়া পকেটে রেখে হারীত বললে, 'সব টাকাই বাক্সে ছিল, মা যখন বিকেলে তাঁর টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বললেন, তখন সব টাকাই বের করেছিলাম, মার টাকা মাকে দিয়ে চালের টাকাটা বালিশের নীচে রেখে দিয়েছি।'

'বেরুবার সময় কী ভেবেছিলে?'

'ভেবেছিলাম টাকা সঙ্গে নিয়েছি।'

অর্চনা হেসে বললে, 'এ রকম ভুল বড়-বড় বিষয়ী মানুষেরও হয়। মনটা এলোমেলো হয়ে থাকলে এ রকম হয়।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এলোমেলো হয়ে উঠল বুঝি আমার মন? বেশ, শান্তির সময় তো

এসেছিল সন্ধের সময়। জানা গেল সত্যি কী। তোমার সঙ্গে তো স্থির সম্বন্ধই পাতানো হল। তারপরেও এলোমেলো হয়ে থাকে কী করে আমার মন?'

'একটা কথা হারীত—'

'কী, বলো?'

'সত্যিই তোমার-আমার স্থির সম্বন্ধ—'

অর্চনাকে থেমে যেতে দেখে হারীত বললে, 'তোমার সুমনাদির কাছে যা পেলাম না, সুলেখা যা আমাকে দিতে পারবে না, তার চেয়ে স্থির।'

'স্থির?' অর্চনা চারিদিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'রাত হয়েছে, কেউ কোথাও নেই। চলো আমার ঘরে—সেখানে বেশি অন্ধকার।'

কিন্তু হারীত নিজের ঘরেই বসে রইল। হারীতকে বসে থাকতে দেখে বসে রইল অর্চনা।

'আমার ভাঙা শরীরটাকে একটু তালি মেরে ঠিক করে দেবে তুমি?' হারীত বললে, 'জলপাইহাটিতে ছোটখাট নানা রকম কাজে আমাকে সাহায্য করবে- টাকার সাহায্য চাই না, পরামর্শ দেবে তুমি। যদি বল আমাকে, তা হলে এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখানে থাকব আমি—তুমি বলছ থাকব—কেন দরকার তা জিজ্ঞেস করব না—এই সব স্থিরতা।'

হারীতকে নিয়ে নিজের অন্ধকার ঘরে যেতে চেয়েছিল অর্চনা। বোকার মতন চেয়ারে বসে থেকে বেকুবের মতন কথা বলছে হারীত। সমস্ত মন গ্লানিতে ভরে গেল অর্চনার; উঠে চলে যেতে ইচ্ছা করছিল; কিন্তু চুম্বকে আটকে আছে যেন তার প্রকৃতির দৃঢ় মিহি সব স্নায়ু এই ঘরেরও অন্ধকারের ভেতর। কিন্তু যে- আলো এসেছিল, আস্তে-আস্তে কেটে যেতে লাগল, মনের অস্তিত্ব ফিরে পেতে পেতে আর-এক রকম ভাবে ভাল লাগল তার। নিস্তার অনুভব করে, শান্তি অনুভব করে, তবুও সৃষ্টির অন্ধকারের অন্তর্লীন সোমরসের দিকে আর-এক বার তাকিয়ে অর্চনা বললে, 'কে জানবে আমাদের সম্বন্ধের কথা?'

'কাউকে জানাবার দরকার নেই। নিশীথবাবুকে জানতে চাও অর্চনা?'

'তাঁকে চিঠি লিখে দেবে?'

'সেটা দরকার মনে কর?' ঘরের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে হারীত বলল। অর্চনা কিছুক্ষণ সুমনার দিকে তাকিয়ে রইল। কী রকম অকাতরে ঘুমুচ্ছে। কী মনে করে নিশীথ সেনকে বিয়ে করেছিল এক দিন এই স্ত্রীলোকটি—হারীতের জন্ম দিয়েছিল?

'না,' অর্চনা বললে, 'নিশীথবাবুকে জানাবার মত আশ্চর্য কিছু ঘটে নিতো। কোনো দরকার নেই তাঁকে জানাবার।'

'আশ্চর্য জিনিস ছাড়া তিনি আর-কিছু জানতে চান না?'

'তাঁর ছেলের শরীর সারিয়ে দেব, তাঁর ছেলেকে বলে কয়ে এক-আধ বছর জলপাইহাটিতে রেখে দেব, এ শুনে খুশি হবেন তিনি। কোনো সংবাদ দিয়ে তিনি তো আমাকে খুশি করেন নি, কেন খুশি করতে যাব তাঁকে আমি। নাঃ, এ নিয়ে তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর কাছে নিজেকে সুমনাদির মত ভাল মানুষ বানিয়ে তুলে কোনো লাভ নেই।'

হারীত টের পেল অর্চনার সঙ্গে যে-স্থির সম্বন্ধ ঠিক করেছে সে, সেটাকে অর্চনা সম্বন্ধ বলে স্থির বলে মনে করে নিতে পারছে না, স্থিরতর কিছু চায়, জিনিসটার নিজের গুণের জন্যেই খানিকটা হয় তো, খানিকটা নিশীথ সেনকে আহত করবার জন্যে। খানিকটা সুলেখাকেও ব্যাহত করবার জন্যে হয় তো। তেমন স্থির জিনিস অর্চনাকে দিতে পারবে কি হারীত?

হারীত জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে বললে, 'আজ রাতের কাজটা থাক, আজ থাক। কী বল অর্চনা?'

'কেন, সাহাপট্টির দিকে যাবে না?'

'ইচ্ছে করছে না। শরীরটা ভাল লাগছে না', হারীত বললে।

'এই তো বেশ বেরিয়ে পড়েছিলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শরীর খারাপ হয়ে গেল?'

হারীত জুতোর ফিতে খুলে জুতো দুটো ঠেলে সরিয়ে রেখে বললে, 'কাল রাত একটার সময় বাড়ি ফিরেছি, সকাল বেলার থেকে রাত বারটা অব্দি ঢাউস ঘুড়ির নাটাইয়ের মত পাক খেয়েছি চামারপট্টি, কামারপট্টি, চকবাজার, খ্যাংড়াখেংড়ির শ্মশান—অনেক জায়গায়। নানা রকম সুরাহা হয়েছে কাল। কিন্তু

ঘুম হল না আর রাতে।'

'দিনের বেলা ঘুমুলে পারতে আজ।'

'গেলুম সুলেখাদের ওখানে।'

'তোমার মায়ের পাশ দিয়ে শুয়ে পড় এখানে হাবীত। খেয়েছ?'

'বাতিটা জ্বেলে দেবে?'

বাতি জ্বেলে সলতেটা ডিম করে তেপয়েব ওপর রেখে দিয়ে অর্চনা বললে, 'কী খাবে তুমি?'

'পেঁপে দিয়েছ তো তুমি। সেটা কেটে খাওয়া যাবে কিছু, গরম দুধ খাব এক পেয়ালা। এখন নয়, রাত দশটা-এগারোটায়। বসো তুমি।'

'টেম্পারেচার ওঠে তোমার মুখে আজকাল কিছু? নিজের জায়গায বসে পা গুটিয়ে নিয়ে অর্চনা বললে।'

'উঠত বোজই। একশ, একশ পয়েন্ট চার, ছয। তবে বগলে ওঠে নি।'

'কাল তো সারারাত বাইরে ছিলে, দেখলে কখন?'

'থার্মোমিটার আমি সঙ্গে নিয়ে ফিরি।'

'তুমি তো কাজে ঘোব। থার্মোমিটার তো না শুয়ে-বসে নেওয়া যায না। কাজের ধাঁধায ঘুরতে-ঘুরতে থার্মোমিটার জিভে সাঁটাবার ফিকিবটা কী তোমার হারীত?'

'দেখে নিই টুক করে!' হারীত অম্লে সেবে দিয়ে বললে, 'পরশু জ্বর হয নি। পবশু বাতে বাড়ি ছিলুম আমি।'

হারীত একটু ভেবে বললে, 'বাবাকে লিখে দিতে পার; তোমার ছেলের শরীর মেরামত করে দিচ্ছি আমি'—অর্চনার দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'কিন্তু কোনো ভেলকি না ঘটলে বাবাকে তো তুমি চিঠি লিখবে না। এ চেয়ারে তো বাবার বসবার কথা ছিল, আমি বসে তোমাব সঙ্গে কথা বলছি এব চেযেও বড় ভানুমতীর খেলা চাও তুমি?'

বলে হারীতের মনে হল অপূর্ণ কথা বলেছে সে, কথাটাকে সম্পূর্ণ করে দেওয়া উচিত ছিল। অর্চনা হারীতের থেকে তিন-চাব বছরেবই বড় নয শুধু, এক শতাব্দীর বড় যেন; কী করে সে তৃপ্ত হবে সম্পূর্ণ জিনিস ছাড়া? কিন্তু তবুও যে-কথাটা বলেছে সে, সেটাকে চাপা না দিয়ে অর্চনাব মুখেব দিকে তাকিযে রইল, কী বলে সে তাই শুনবাব জন্যে। তাকাতে-তাকাতে হাবীতের মনে হল ভেঙে যায়, বদলে যায়, নতুন হয়ে ওঠে সব, অর্চনার চেয়ে হারীত নিজেই বড় যেন; হয তো এক শতকেব; দিদিমাব মত মনে হয়েছিল অর্চনাকে এক সময, তাব পর মাসিব মত, বোনের মত, তাব পর কেমন নাতনিব মত মনে হচ্ছে, শিশুর মত তাকিয়ে আছে, থই পাচ্ছে না। যেন পৃথিবীতে, কী ভযাবহ সরল দৃষ্টিতে সুমনাব দিকে একবার, হারীতের দিকে একবাব, তাকিয়ে দেখছে। মনটাকে ঝাড়া দিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে হারীত ফিরে এল; ঠিক আছে; অর্চনা ঠিকই আছে। দিদিমা, মাসিমা, নাতনি নয—নিজেব প্রতিভা ফিবে পেযেছে অর্চনার মুখ, দৃষ্টি, আঁচল, কাল বেণীর খোঁপা তাব।

'আমি চেয়েছিলুম তুমি ববাবর এখানে থাকবে।'

'বরবার? আমার কলকাতার বিপ্লবেব কাজগুলো কে কববে তা হলে?'

'কলকাতায় গিয়ে বিপ্লব করবার কোনো দরকাব নেই তোমাব।'

'কেন?'

'ও-সব জিনিসে কিছু হয না কোনোদিন। বুখারিন, ববোডিন, কামেনেভ, রাইকভ তো মাঝপথে সরে গেল। স্ট্যালিন শেষ পর্যন্ত রইল, কিন্তু আমেবিকা বোমা দিয়ে সমস্ত রাশিযা শেষ কবে ফেলবে, না, রাশিযা সমস্ত আমেরিকাটাকে উৎখাত করে দেবে এতেই এসে দাঁড়াল তো সব বিপ্লব। ওতে নেই, কিছু নেই।' হারীত শার্টের পকেট থেকে নোটগুলো বেব করে খাটের তোশকেব নীচে ঠেলে দিতে-দিতে বললে, 'পলিটিকসেব কথা বলো না তুমি। ও-সব তোমার মুখে শুনতে চাই না। সমস্ত পলিটিকসেব থেকে তোমাদের কাছে আসি, ওরা যা পারে না, তুমি তাই দিতে পার বলে। তুমি তা দিতে পাব বলে বরাবর জলপাইহাটিতে থাকব আমি।'

হাররীত দরজার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে চোখেব স্নায়ুগুলোকে একবাব ঘুরিয়ে এনে ঘরের ভেতরে ছেড়ে দিল, স্নায়ুর অতীত দৃষ্টির আলোর ভেতর।

'বাবা আর ফিরে আসবেন না জলপাইহাটিতে।'

'এ কলেজে তিনি আর কাজ করবেন না। আসতে পারেন তোমার মাকে নিয়ে যেতে। কলকাতায় চলে যাবার সময় আমাকে বলেছিলেন, সুমনাদি যদি মারা যান তা হলে শ্রাদ্ধশান্তি করতে এখানে ফিরতেও পারেন তিনি, নাও পারেন।'

আকাশের একরাশি শান্ত নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'আশ্চর্য, আমি দেখেছি তো, তোমরা পরস্পরকে কী রকম শ্রদ্ধা করতে। তার পরে কী করে একজনকে ফেলে আর-একজন এ রকম ভাবে চলে যায়। বাবা তো তুখোড় রসিক মানুষ, জ্ঞানীও, জ্ঞানপাপীও—বোকা তো নয়, স্থূল ওঁচা রক্তাক্ত তো নয়—একটা আধা ভুয়ো বিপ্লবীর মত! আশ্চর্য, ফিরবেন না আর?'

'না!'

'তুমিও যাবে না, মহিমবাবু যদি কলকাতায় চাকরি পান তা হলে নিশীথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ, সোম গ্রহে মানুষ যদি থাকে, তা হলে যেতে হবে সেখানে এক দিন পৃথিবীর মানুষকে। সোম বলছি—আমি মঙ্গল বলতে চাইছিলুম হারীত।'

হারীত আকাশের তারাগুলোর দিকের তাকিয়েছিল, একটু হেসে কোথায় মঙ্গল তারাটি আছে আস্তে-আস্তে চোখ ঘুরিয়ে খুঁজে নেবার চেষ্টা করছিল এমনিই। কিন্তু জানালা-দরজা দিয়ে যে-খন্ড আকাশ দেখা যায় তাতে সে গ্রহ খুঁজে পাওয়া গেল না।

'বাবা ফিরে আসবেন এ দেশে।'

'কে বললে?'

'আমি জানি।'

'যেন তোমাকে ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দিয়েছেন হারীত.' রাতের বাতাসের ভেতর অর্চনার নিশ্বাস মিশে গেল অন্ধকারের ভেতর এই সব মানুষের নিশ্বাস মেদুর করে রাখতে রাতের বাতাসকে; অনুভব করছিল হারীত; কিন্তু থাকছে না কিছু; দূর অন্ধকার অনন্তের দিকে চলে যাচ্ছে মানুষের নিশ্বাস, মানুষের বসে থাকা, রাতের বাতাস।

'ফিরে আসবেন, এ দেশে।'

'কে?'

'নারকেল গাছে রাজকুড়ুল পাখি ডাকছে। শুনছ অর্চনা?'

'শুনেছি। কটা পাখি?'

'দুটো।'

'অনেক দিন থেকেই ওদের ডাক শুনছি।'

'একশ বছর বাঁচে। এক সঙ্গে থাকে।'

'একশটা শীত ঋতু? খুব গভীর তো হারীত।'

'খুব গভীর।'

'যাবে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে তুমি?'

'কে, আমি?' হারীত বললে, 'না। আমি আছি এখানে।'

'এক বছর?' তার পর?'

'তার পরেও থাকব।'

'কত দিন থাকবে? রাজকুড়ুলের মত একশ বছর? অর্চনা হাসতে-হাসেত বললে।

'মা আজকের রাতের মতন ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'তোমার চোখে আলো লাগছে। বাতিটা নিভিয়ে দিই। এই যে নিভিয়ে দিয়েছি।'

'এখন বেশ অন্ধকার। শান্তি।'

চার দিক ঘিরে অন্ধকার, মাইলের পর মাইল, পৃথিবীতে মৃত্যু ঘটে প্রতিফলিত হয় যে অমৃত্যুর দূর অপৃথিবী লোকে, সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ও শান্তি।

'এখন ঘুমোও—আমি চললাম—'

'কোথায়? ওরা তো কেউ আসে নি। আজ রাতে আসবে না।'

'হারীত,' অনেকক্ষণ পরে অর্চনা বললে।

'আর এক বছর কেটে গেল?'

'হ্যাঁ. রাজকুড়ুল ডাকছে। যেন একশ বছরের ভেতর চলে গেছি আমরা।'

সূচীপত্রে যান

রাত আড়াইটায় মহিমাবাবু আর তাঁর ছেলে ফিরে এলে, সুমনার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, তাকে ঘর-দোর বন্ধ করতে বলে, অর্চনাকে জানান দিয়ে, বেরিয়ে গেল হারীত সাহাপট্টির দিকে।

টেরই পেল না সুমনা, কোথায় চলে যাচ্ছে হারীত। আটটা সাড়ে আটটার সময় ঘুমের থেকে জেগে উঠেছে তো সুমনা, তার পর খেয়েদেয়ে ওষুধ খেয়ে রাত দুটো-আড়াইটে অব্দি ঘুমিয়ে, একটু জেগে, আবার ঘুম পেয়ে গেছে তার। কী বলছে হারীত, কোথায় যাচ্ছে, ঘুমের চোখে, জ্ঞানচেতনারও কেমন একটা বিহ্বলতায় বুঝে উঠতে পারছিল না কিছু সুমনা। হারীত চলে গেল। অর্চনা দুটো দরজা একটা জানালা আটকে দিয়ে, বাতাসের আসা-যাওয়ার জন্য দুটো জানালা খোলা রেখে, চলে গলে। খেয়ে এসে সুমনাদির সঙ্গে সে শোবে।

'হারীত আজ রাতে আর ফিরবে না এই কথাই তো বলে গেল অর্চনা!' 'বলে গেল না?' জিজ্ঞেস করল সুমনা কেমন যেন অজ্ঞানে আবছায়ায় ডুবে যেতে-যেতে। ব্যথা-ভর্ৎসনা-অচেতনার অন্ধকার আঁকিবুকির ভেতর স্বপ্ন দেখতে লাগল সুমনা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে—তারপর স্বপ্নেরাও সরে গেল তার মাথা আর রক্তের ভেতর থেকে কেমন একটা জড়িবড়ির মত বহতা ঠাণ্ডার দেশে।

এ রকম চার-পাঁচ রাত কেটে গেল সুমনার, হারীতের, অর্চনার, তার পর আরো এক বাত বাইরে-বাইরেই কাটিযে দিল হারীত।

পর দিন বেলা বারটার সময হারীত ফিরল। হারীতের দিকে তাকিয়ে সুমনার মনে হচ্ছিল সারা বাত কড়িকাঠে ফাঁসিতে ঝুলে, মরে হেজে, অনেক বেলায প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছে ছেলেটা।

'কোথায় ছিলে তুমি সারা রাত? এতটা বেলা?'

'খুন করে এসেছি নরেনকে, আশুকে, গনিকে, মোনতাজকে, সুজন খাঁকে।' হারীত হাসতে-হাসতে বললে।

'খুন করেছি বেশ করেছি, চার হাত-পা নিয়ে ফিরেছিস তো বাড়িতে। এখন একুট চান করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

'আগে রান্নাটা সেরে নিই—'

তোমার জন্যে বসে আছে রান্না। সব হযে গেছে—যা এখন চট করে চান করে আয। অবিনাশবাবুদের দিঘিতে যাস নি; সে দূর পাল্লা। মহেশসাগর থেকে চান করে আয।'

'কে রেঁধেছে?'

'অচর্না, আবার কে?'

'কী রেঁধেছে?'

'পাঠ মুখস্থ করে রেখেছি আমি। খেতে বসে দেখবি।'

'হারীত মাথায তেল মাখতে-মাখতে বললে, 'কেন আবাব তাকে রাঁধতে বললে তুমি—'

'বলার দরকার করে না। আটটার মধ্যেও তুমি বাড়িতে ফিরলে না দেখে নিজেই তো মাছ-তবকারি বঁটি নিয়ে বসল।'

হারীত চান করে ফিরে এসে দেখল সুমনা কেমন দাঁত বার করে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। বাতাস নেই, দু-একটা মাছি তাড়না করছে। কপালে আস্তে একটা টোকা দিতেই জেগে যাবে মা। কিন্তু থাক, জাগিয়ে দিয়ে লাভ নেই। বিশ্রাম চাচ্ছে হয তো—চাচ্ছে হয় তো শরীর। দিন নেই, রাত নেই, কেবলই যে ঘুমিয়ে পড়ছে মানুষটা। এ জিনিস ভাল কি খারাপ, জাগিয়ে দেয়া উচিত না ঘুমোতে দেযাই ঠিক, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখবে সে, ভাবতে-ভাবতে সন্দিগ্ধ মনে রান্নাঘরের দিকে গেল।

অর্চনা কোথায়, নেই বুঝি বাড়িতে। কিংবা গরমের ছুটিতে নিবালা দুপুরে মহিমবাবুর কবলে আছে হয তো।

বান্না ঘরে ঢুকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে খেল সে। নানা রকম জিনিস রেঁধেছে অর্চনা, নিজের পযসা খরচ করে নিশ্চযই, ভাল রেঁধেছে, ঝাল কম দিয়ে ভাল করেছে; বেশ ক্ষিধে আছে আজ হারীতের। অনেক কিছু খেল সে, খুব বেশি করে খেল। হারীতের সাড়া পায নি অর্চনা হয তো, ঘুমিয়ে আছে, বাড়িতে নেই বোধ হয। অনেকক্ষণ বসে খেল যদিও হারীত, কিন্তু তার খাওয়ার ভেতর হঠাৎ এসে পড়ল না সুমনা কিংবা অর্চনা তদারক করবার জন্যে। ভালই হয়েছে। যখন ক্ষিদে পায় একা খেতে ভাল লাগে, নিজের ক্ষিধের রাক্ষসটাকে অন্যের কাছে ফলাও করে না দেখানো ভাল; যখন ক্ষিদে থাকে না, কেউ কাছে থাকুক, দেখুক মানুষটা কেমন কঠিন, কেমন সাত্ত্বিক ঃ ভাবতে-ভাবতে

দেবতাদের থেকে অনেক দূরে গড়িয়ে সত্যিই বেশ সেঁটে-সাপটে রাক্ষসের খোরাক খেয়ে ফেলল যেন সে।

হারীত তার ক্যাম্প খাটে তার বাবার ঘরে গিয়ে শুল—দরজা-জানালা খুলে দিয়ে এক দিককার এই বোশেখ দুপুরে পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গচারী বাতাসের ভেতর।

একেবারে পাঁচটার সময় ঘুমের থেকে উঠে—কেমন অসাড় অনিঃশেষ ঘুম পেয়ে বসেছিল তাকে, নড়ে নি চড়ে নি, একবারও ঘুম ভাঙে নি, স্বপ্ন দেখে নি কিছু, কোনো অভাব-আক্ষেপ, ব্যথা-খিঁচ অনুভব করে নি ঘুমন্ত শরীর তার—পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে, হারীত তাকিয়ে দেখল, ক্যাম্প খাটের কাছেই তার বাবার কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, বাঁ পায়ের ওপর জয়পুরী চটি মোড়া ডান পা চড়িয়ে দিয়ে, একটা খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে চলেছে জুলেখা। জুলেখা? কখন এসেছে? জুলেখা, তাদের বাড়িতে? হারীত চোখ রগড়াতে-রগড়াতে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল; হারীতেব যে ঘুম ভেঙেছে টের পায় নি জুলেখা। হারীতের খাট থেকে হাত-তিনচার দূরে ক্যাম্প খাটের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে বসে আছে। মুখেব পাশের দিকটা দেখা যাচ্ছে তার; খাড়া নাক আরো খাড়া মনে হচ্ছে; খোঁপা দেখা যাচ্ছে; মুখের সামনেটা দেখা যাচ্ছে না। জুলেখা ঘুরে না বসলে হাবীতের সঙ্গে চোখাচোখি হয না।

নিশীথবাবু তো জুলেখাদেব মাস্টার ছিলেন, কিন্তু তাঁব আমলেও দু-চাব দিনের বেশি এ বাড়িতে আসে নি জুলেখারা। অবশ্যি কয়েক বছর এখানে ছিল না হারীত। তখন কী রকম এসেছে না এসেছে জানে না সে? কী করবে হারীত? ঘুমের নিকেশ হয নি তার—আবো ঘুম চাইছে শবীব। ঘুমোবে? পাশে এক জন বিশেষ দরকার নিয়ে বসে আছে বলে ঘুম যদি না আসে হারীতের চোখে, তা হলে মটকা মেবে পড়ে থাকবে? জুলেখা যেন খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে একটা আলতো ঝাকুনি দিয়ে হারীতের দিকে মুখ ফেরাবার উপক্রম করল, অমনি চোখ বুজে ফেলল হারীত। চোখ বুজে সে ভাবছিল, বড় অতিথি এসেছে তার ঘবে অথচ কাছে কেউ নেই, সুমনা নেই, অর্চনা নেই; সামান্য একটু সৌজন্য দেখাবার জন্যেও ওরা কেউ আসতে পাবল না এ ঘবে, কাছে এসে বসতে পাবল না ওর—ভাবতে-ভাবতে চোখ মেলে হারীত বললে, 'তুমি!'

'হ্যাঁ আমি। আরো ব্রোমাইড চাই তোমাব হাবীত?'

'ব্রোমাইড়? বড্ড বেশি ঘুমিযে পড়েছি আজ,' হারীত বালিশের থেকে তুলে ডান হাতের ওপব মাথাটা রেখে দিযে বললে।

লেডিজ ব্যাগের থেকে একটা শিশি বার করে জুলেখা বললে, 'এর ভেতব ঘুমের ওষুধ আছে, ব্রোমাইডের চেযে অনেক ভাল, জার্মান ওষুধ, বেশ কনসেনট্রেটেড। তুমি কাল সন্ধেব থেকে আজ পাঁচটা অব্দি ঘুমোলে। কিন্তু ও ওষুধ খেলে আব ডানে-বাঁযে না তাকিয়ে ঘুমিযে থাকতে পাববে চার-পাঁচ দিন।'

'এতই কি ঘুমোবার দরকার তোমার জুলেখা?'

'কেন, আমার কেন? আমাব কথা বলছি?'

'ব্যাগে তো ঘুমের ওষুধ সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে ফিরছ তুমি। নিজেব জন্যে নয়? মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে বেড়াবার জন্যে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে ঘুমতাড়ানি বুড়ি ঠাওবালে না কি। সে হব এক দিন যখন দেখব সকলেই ঠাণ্ডা মেরে ঘুমিয়ে আছে। আজ কাল অনেকেই জেগে ঘুমোচ্ছে, ইউনিয়নে, পাকিস্তানে কোথাও কলকে পাচ্ছে না—আহা বেচারি সব!...আমি তাদের ঘুমের মাসি।'

'কলকে তোমরা আমাকে না দিয়ে ছাড়বে না জুলেখা—পাকিস্তানে যখন এসেই পড়েছি,' হারীত বিছানায উঠে বসে বললে, 'কখন এলে তুমি?'

'ঘন্টাখানেক হল।'

'বাব্য, তা হলে তো এসেছই। মার সঙ্গে দেখা হযেছিল?'

'হ্যাঁ হয়েছে। খুব অসুস্থ দেখলাম তাঁকে। কী, অ্যানিমিযা বুঝি? বেশি কথা-টথা বলতে পাবলেন না। শুয়ে আছেন। খুব খারাপ দেখলাম তো শরীর।'

'কী কথা বললেন?'

'না, বললেন না কিছু।'

'কিছুই না?'

'এক-আধটা কথা কী বলতে গেলেন—জিভ জড়িয়ে গেল। বড্ড এলিয়ে পড়েছে শরীর দেখলাম

তোমার মার। কে দেখছে?'

'মজুমদার নিজেই দেখছে।'

'ভাল ডাক্তার তো মজুমদার, এই দিককার সব চেয়ে বড় ডাক্তার—কোনো উপকার হচ্ছে না?'

'হচ্ছে কিছু-কিছু। যা দেখেছ তুমি, এর চেয়ে খারাপ ছিল।'

'খুব তো খারাপ দেখলাম আমি,' জুলেখা খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'আজকের স্টেটসম্যান কিনেছিলুম। পড়েছ আজকের স্টেটসম্যান, হারীত? পড়ে দেখ। রেখে গেলুম তোমার জন্যে। তোমার মার পার্নিশাস অ্যানিমিয়া মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই বলেছে তো ডাক্তার। চেঞ্জে গেলে ভাল হত। রক্ত দেওয়া হচ্ছে।'

'খুব দরকার রক্তের,' জুলেখা ঘর-দোরের বেশি বাতাসের ভেতর শাড়ির আঁচলটা আঁট করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'কে দিচ্ছে রক্ত?'

'দিচ্ছিল তো নরেন মিত্তির। মাঝখানে তো আর-এক জনকে ঠিক করেছিলাম। আবার নরেন দেবে। আজ দেবার কথা ছিল, ডাক্তার বললেন আজ নয়, কাল নেওয়া হবে।'

'নরেন মিত্তির?' জুলেখা কেমন একটু চমকে নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'ছেলেটি কেমন যেন—শুনেছি।'

'আমিও শুনেছি, দেখেছিও। কিন্তু তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন ডাক্তার। ভাল আছে, মার কাজে লাগবে।'

'বড্ড খারাপ রোগ অ্যানিমিয়া—এই পার্নিশাসগুলো মার একবার হয়েছিল। দশ-বার হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল বাবার। পুরীতে নিলেন, রাঁচিতে নিলেন, শেষে মুসৌরি পাহাড়ে গিয়ে ভাল হল।'

হারীতের দিকে তাকিয়ে জুলেখা বললে, 'নিশীথবাবু কোথায়?'

'তিনি তো কলকাতায়।'

'সুলেখা আমাকে বলছিল। পনের-কুড়ি দিন হয় গিয়েছেন শুনলুম। কলেজ তো ছুটি হয় নি। ছুটি নিলেন প্রফেসর সেন?'

'না, কাজ ছেড়ে গেছেন।'

কাজ ছেড়ে? শুনেছিল জুলেখা বটে, কিন্তু অন্য লোকের কাছে। হারীতের মুখে শোনে নি, একটু বেটাল ধাক্কা খেয়ে বললে, 'ছেড়ে দিয়ে গেলেন!' হাতের ব্যাগটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরিয়ে সেটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে হারীতকে বললে, 'কোনো কাজ পেলেন কলকাতায়?'

'না।'

'এটা ছেড়ে গেলেন কি এদেশ পাকিস্তান হয়ে গেছে বলে? ইউনিয়নে যেতে চান?'

'না, বোধ হয় তা নয়, ইউনিয়নে যাবার জন্যে নয়।' চার-পাঁচ বছর ধরেই কলকাতায় কাজ খুঁজছেন তো তিনি, ভাবছিল হারীত, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। চুপ করে রইল।

'কে ভেবেছিল এ রকম পাকিস্তান আর ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন—এত সব হবে। হয়ে পড়ল তো সব। ভালই হল। অনেকে মনে করছে নিশীথবাবু ছেড়ে গেলেন, আমাদের একটু জিজ্ঞেস করে গেলেন না।'

'কী করতে তোমরা?'

'রেখে দিতাম তাঁকে।'

'কে, তুমি আর অবনী খাস্তগির?'

খাস্তগিরকে নিয়ে হারীতও টিটকিরি দিচ্ছে তাকে, কিন্তু মিছেই দিচ্ছে। গায়ে মাখতে গেল না জুলেখা; ভাল মনে হেসে বললে, 'হ্যাঁ আমি, ওয়াজেদ আলি, মকবুল চৌধুরী, ইদরিশ, ইয়ুসুফ—'

জুলেখা অনেক দূরের একটা সিসু গাছের ওপরের ডালপালার ভেতর পাখি, পাতা, বাতাস, বিভুঁয়ের সূর্যোজ্জ্বল লুটোপুটির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

'আমাদের চার বছর তো পড়িয়েছে নিশীথবাবু এ কলেজে। বেশ ভাল পড়াতেন তিনি। নিশির ডাকে একটা স্নিগ্ধ তনুবাত পরিমণ্ডলের দিকে চলে-ছিলুম যেন সে চার বছর। ওপরের কথাটা কিন্তু নিশীথবাবুর মুখে শুনে—ছিলুম ঠিক এই রকম বলেছিলেন? না, বলতে গিয়ে অদল-বদল ভুল করে ফেললুম। আমাকে শুধরে দাও তো হারীত।'

'ঠিক আছে।'

'আজকাল তো অনেক বই কিনছি-পড়ছি—দেখছি-শুনছি। কিন্তু এই তো দু-এক বছর আগে

সূচীপত্রে যান

কলেজ জীবনের যে পাট ফুরিয়ে গেল, সব চেয়ে সেইটাই ভাল ছিল। একটা পুরোপুরি জীবনবেদের মত, সে আর আসছে না।'

সেই সিসু গাছটার দিকেই তাকাল আবার জুলেখা। এ ঘব থেকে নিম, জাম, জামরুল বনটা দেখা যায় না। তা দেখতে গেলে সুমনাব ঘরে যেতে হয। কিন্তু একটা আশ্চর্য তেপান্তর, বেশ সুন্দব সববতি লেবুব ঝাড়, চার-পাঁচটা বৃন্তনিবিড় তালগাছ, দেখা যায এ ঘব থেকে-অনেক দূবের উঁচু-উঁচু গাছগুলো দেখা যায।

'একটা অন্যায করেছেন নিশীথবাবু।'

'অন্যায অনেকগুলো কবে ফেলেছেন তিনি,' হারীত বললে।

'তোমার মাকে এ অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হয-নি তাঁব।'

'আমার ওপব ভার দিয়ে গেছেন।'

'ভাব দিয়ে গেছেন। কবে ফিরবেন?'

'তিনি ফেববার আগে তোমরা কলকাতায চলে যাবে।'

হাবীতেব কথা শুনে জুলেখার মুখ সংকল্প সক্রিয়তায ভবে উঠতে লাগল; সে বললে, 'আমরা কলকাতায় যাব কে বলেছে তোমাকে? আমরা তো মানুষদের এ দেশে থাকতে বলছি। আমাদের কথা শুনছে না, অনেকেই চলে যাচ্ছে। হারীতদা, তুমি ক-দিন থাকছ জলপাইহাটিতে?'

'বাবা বলে গেছেন আমাকে মাব শ্রাদ্ধশান্ত অব্দি এখানে থাকতে।'

হারীতের, মুখে না হোক, অন্যদেব মুখে এ ধরনেব কথা শোনার অভ্যেস আছে জুলেখার। তবুও কথাটা সুবিধেব লাগল না তাব। এ রকম কথা হাবীত না বললেই পাবত, ভেবেছিল জুলেখা।

'নিশীথবাবুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি,' জুলেখা বললে, 'কিন্তু আমার দুটো নালিশ তাঁর কাছে।'

বাইরে তালপাতাব দিকে তাকিযেছিল হাবীত, দুটো প্রজাপতি উড়তে-উড়তে সেই সবুজ নীলিমার ভেতবে ঢুকে পড়ছিল প্রায; বাতাসেব ঝটকায কোথায হুমড়ি খেযে পড়ল।

'হারীতদা, তিনি স্ত্রীকে ছেড়ে দিযে সত্যিই চলে গেলেন! যাব সঙ্গে জীবনের পঁচিশ-ত্রিশটা বছব কাটল তাঁকে এ রকম অবস্থায ফেলে চলে যায বটে কেউ-কেউ, কিন্তু—চলে গেলেন প্রফেসবেব মতন মানুষও। এটা কি তাঁব অপবাধ, এ দেশেব অপবাধ, না কি এ যুগেবই—ঠিক বুঝতে পাবছি না আমি। ঢেব রক্ত, গ্লানি, বিশৃঙ্খলায ভবে আছে এ যুগ, এ যুগে প্রফেসব সেনেব মতন ও-রকম মানুষকেও হয়তো তাই এই রকম হতে হয।'

জুলেখা আলোড়িত মুখে হারীতেব দিকে তাকাল, খুব আন্তরিকতা না থাকলে মানুষের মুখ, চোখ, মূল্যবিনাশেব চেতনায নিপীড়িত হযেও এ বকম স্পষ্ট, স্নিগ্ধ দেখায না, মনে হচ্ছিল হাবীতেব।

'ঠিকই বলেছ জুলেখা, এ শতাব্দীটা ব্যাধিতে ভবে আছে, মানুষ কী কবে সুস্থ থাকবে। কিন্তু তোমাদেব মাস্টাবমশাই স্বৈচাবে বেড়াচ্ছেন মনে হয না; সমুদ্রে শোযা অভ্যাস আছে, সম্প্রতি শিশিবে শুযেছেন। স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেছেন বলে মনে হয না। তোমাদেব জলপাইহাটি কলেজটাই ওঁকে মেরেছে; ভেতবের খবর সুলেখাব কাছে জিজ্ঞেস কোরো। যে মানুষ আজীবন দর্শনের মত করে, তাব চেযেও বেশি ধর্মের মত কবে একটা কলেজ সংস্থান নিযে কাটাল সেটা যে বাস্তবিকই কোনো সত্য দর্শন প্রস্থান নয, তাতে ঠাণ্ডা থাকে না, মনের খাদ্য নেই, পেটের খোরাকও পাওযা যায না, মনের চেযে পেটের দাবিই বেশি হযে ওঠে, এত যে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে, এই সব অধঃপতনের থেকে সরে পড়বার জন্য তিনি চলে গেছেন, মাকে—ডাক্তার-অর্চনা-মহিমবাবুব কাছে বেখে গেছেন; ঠিক ফেলে গেছেন বলতে পারা যায না।'

পর দিনও জুলেখা এল।

কথায়-কথায় নিশীথের কথা এসেছে আবার।

জুলেখার দিকে তাকিযে হারীত বললে, 'বলতেও পার নিশীথবাবু তাঁর স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছেন। আজীবন গোলকধাঁধাঁয ঘুরে তার পর যখন সত্যি একটা বেরুবার পথ খুঁজে পাওয়া গেছে তখন তিনি তাজ্জব কাণ্ডই করলেন, বেরিয়েই গেলেন দেশ থেকে, কলেজ থেকে, স্ত্রীর কাছ থেকে। বেরুবার পথ খুঁজে পেলেও অনেকে তো গোলকধাঁধাঁয ঢোকে আবার,' হারীত জুলেখার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু সেনমশাই বাজকুড়ুলের মত দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন।'

'তার মানে?'

সূচীপত্রে যান

'মানে জীবনের একশটা বছর কেটে গেছে তার। ফুরিয়ে গেছে—ব্যস।'
'তাঁর স্ত্রীও কি গোলকধাঁধার মতন ছিল?'
'তাই তো মনে হচ্ছে।'
'বাপকে সাফাই করবার জন্যে বলছ বুঝি?'
'না, আমি জেনেই বলছি, আমি তো তাঁর স্ত্রীর ছেলে।'
'ও, দক্ষিণ সমুদ্রে যাবে পুরুষ কোড়াল, আর কোড়ালি পিছে পড়ে থাকবে। স্ত্রীরা কি গোলকধাঁধার মত?'
'সব স্ত্রীরা?' হারীত বাঁ চোখটা প্রায় বুঁজিয়ে ডান চোখ দিয়ে জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললে, 'না তো। তা কী করে হয়। স্ত্রী-বিদ্বেষী নই আমি। স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্বেষে পুরুষ মানুষকে সমর্থন করা হয়েছিল, তাই বুঝি মনে করেছে তুমি। না, তা নয়। আমি স্ত্রীলোকের ভক্ত। আমার বাবা খুব সম্ভব আমার চেয়েও বেশি ভক্ত, কিন্তু তবুও টিকতে পারলেন না তিনি।'
জুলেখা তার ব্যাগের ভেতব থেকে একটা কৌটো বের করে কয়েকটা খুব ছোট-ছোট পিল খেয়ে নিল।
হয় তো ক্যাকটিনা পিল খাচ্ছে, হারীত ভাবছিল। বেশ সুস্থ তো দেখায জুলেখাকে, হার্টের একটু-আধুটু অসুখ আছে হয় তো। বসে থাকে না বড় একটা, খুব দৌড়ঝাঁপ কবে; আজ গুটিয়ে বসে আছে দেখছি। না, ওগুলো ক্যাকটিনা পিল নয়, কেমন একটা সুন্দর গন্ধ বেবিয়েছে।
'খাবে হারীতদা?' কৌটোটা এগিয়ে দিয়ে জুলেখা বললে।
'কী জিনিস?'
'এলাচি দানার মত, কিন্তু আরো অনেক মসলা মেশান হযেছে। পাকিস্তান থেকে বের কবেছে। ওযাজেদ আলি সাহেব দিলেন সে দিন।'
কযেকটা দানা মুখে দিযে হারীত বললে, 'বেশ তো লাগছে।'
'ভাল লাগছে? কৌটোটা বেখে গেলাম তোমার টেবিলে।'
'কেন?'
'খাবে তুমি।'
'হ্যাঁ, তা বেখে যাও জুলেখা। স্বচ্ছন্দে। যখনই দরকাব হয খাব, বিলোব, বেশ বড় কৌটো তো। এটা রূপোর কৌটো মনে হচ্ছে।'
'জার্মান সিলভার।'
'এ জিনিস পাওযাই তো যায না আজ কাল। কবে কিনেছিলে?'
'আমাকে মহম্মদ ইদরিশ সাহেব দিযেছিলেন।'
'কে সাহবে? ঠিক পেলুম না।'
'পাকিস্তানের এক জন বড় অফিসাব কৌটোটা নাও তুমি। ওটায কবে দানা খেতে ভাল লাগবে।'
'ইদরিশ তো তোমাকে দিযেছিল।'
'আমি তোমাকে দিলুম।'
'কিন্তু আমি কাউকে দেব না। সুলেখাকে দিতে পাবি।'
'তা হলে তো ইদরিশের কাছেই ঘুবে যাবে জিনিসটা আবাব।'
'কেন?' তেরছা চোখে একবাব জুলেখাব দিকে তাকিযে নিযে হারীত বললে।
হারীতের চকিত ভাবটা লক্ষ্য কবছে জুলেখা; ভেবে দেখছিল সে, সুলেখা টানে বুঝি হাবীতকে? টানুক, ভালই তো, কোনো ঈর্ষা নেই তার মনেব ভেতর। নিজে কি টানে হারীতকে সে? কী রকম টানে? কিন্তু এ সব বিষযে বেশি কথা ভাববার ইচ্ছা ছিল না তার। অনেক কাজ তাব হাতে! সুলেখার মত ভাবুনে মেয়েমানুষ সে নয।
'তা দিয়ে দিতে পারে ইদরিশকে। যে যে-রকম জিনিস দেয সেই জিনিসই তাকে ফিরিয়ে দেবার অভ্যেস ওর। যাবা নতুন, অভ্যাগত, দূরেব, তাদের এটা-ওটা-সেটা না দিযে পারে না। যারা একটু কাছের হযে গেছে, কিছু দেয না তাদের। বাপের মেযে ও। আমি এ বিষযে মাযের মেজাজ পেয়েছি।'
'তা হলে আমি এই কৌটোটা তোমার মাকে দেব।'
'আমার মাকে? তাঁব সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয়? হাসছ কেন হারীত?'

'কথাবার্তা হলে ভাল হত। এ কৌটোটা সুমনাকে না দিয়ে বনলেখা দেবীকে দিতাম আমি। এ বিষয়ে আমি আমার বাড়ির মেজাজ পেয়েছি জুলেখা।'

শুনে ঘাড় কাত করে হারীতের ডাঁটো রসিকতায় একটু গলা ছেড়ে হেসে নিল জুলেখা।

'আচ্ছা মানুষই তুমি হারীত! নিশীথবাবুর বিরুদ্ধে আমার প্রথম নালিশটা তেমন টিকল না। টিকেছে কিছু। বৌও যদি মানুষের গোলকধাঁধা হয়, তা হলেও বৌয়ের এত বড় অসুখে জলপাইহাটিতে থেকে একটা কিছু হয়ে-টয়ে গেলে তার পর তিনি চলে গেলে ভাল করতেন। কিন্তু আমার দ্বিতীয় নালিশটার কী উত্তর দেবে হারীত?'

'কী তোমার নালিশ?'

'এ দেশ পাকিস্তান হতে না-হতেই তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে চলে গেলেন কেন?'

'তোমারাও তো চলে যাচ্ছ।'

'আমার যাচ্ছি? কে বললে? কলকাতায় আমাদের বাড়ি আছে তবুও যাচ্ছি না।'

'বাড়ির ভাড়াটেদের তাড়াতে পেরেছ?'

'কেন, তাড়াতে যাব কেন?'

'ইউনিয়নে ভাড়াটে তাড়ানো অসম্ভব। তাড়াতে পার নি, কী করে নিজেদেব বাড়িতে গিয়ে থাকবে কলকাতায়?'

'সেই জন্যেই আমবা কলকাতায় যাচ্ছি না, এখানেই থাকছি, কে বলে তোমাকে এ সব কথা? অবনীবাবুবা অর্গানাইজ করেছিলেন, আমি তো তিন দিন সে সব মিটিঙে সবাইকে বলেছি তোমরা এ দেশ ছেড়ে যেও না, বাড়িতে-বাড়িতে গিযে বলেছি। এত সব বলা-কওযা, সাবইকে ধোঁকা দিয়ে কলকাতায় পালিয়ে যাবার জন্যে? কী খাচ্ছ আজ কাল তুমি হারীত? কোন ঘানির তেল খাচ্ছ?'

'এত সব বলা-কওযাব পর অবনীবাবু তো চলেছেন।'

'তিনি তো এখানকাব লোক নন।'

'এখানকার লোক নন, তা হলে ওপর-পড়া হয়ে ইয়ার্কি দিতে আসেন কেন? কে শুনতে চায তাঁব কথা। মানুষ দেখতে চায তার কাজ।'

জুলেখা একটু কাঁধ নাচিযে হেসে বললে, 'তাঁর বাড়ি, ঘর, ব্যবসা, সব ইউনিযনে। সব ছেড়ে দিযে তিনি এখানে বসে থাকবেন এটা আশা করা অন্যায; কিন্তু এ দেশেব লোক হযে, একটা নেতাব মত মানুষ, নিশীথবাবু চলে গেলেন কেন ইউনিযনে?'

হারীত জুলেখার দিকে তাকিযে বললে, 'তুমি ও-দিক ফেবো, একটা কথা বলব তোমাকে জুলেখা।'

'বল।'

'নিশীথবাবু যে পাকিস্তান ছেড়ে ইউনিযনে চলে গেছেন এটা আমাদের আবিষ্কাব, তিনি নিজে জানলেন না যে তিনি ইউনিযনে গেছেন, তিনি যে পাকিস্তানে ছিলেন সে ধারণাও তাঁব নেই। পাকিস্তান বা ইউনিযন বা কোনো পলিটিকস নয়, অন্য জিনিস তাঁকে বাযুভূত কবেছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার অনেক আগে গত চার-পাঁচ বছব ধবেই তিনি কলকাতায কাজেব চেষ্টায আছেন। তাঁব কলেজ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দেয নি, তাঁর পরিবারও তাঁকে ঠকিযেছে, এ সব বিষযে শেষে দিকে তিনি খুব হদ্দ হযে উঠেছিলেন। কলকাতায় কেউ তাঁব ঢেঁকি কলে পাড় দিতে আসবে না—পড়ে থাকেব ঢেঁকিটা। এখানে বসে আমরা তাঁকে ইউনিয়নের শ্রীখোল মনে করে তবলায চাঁটি মারছি। এ সব মানুষ আজকেব পৃথিবীতে প্রাপ্য তো দূরের কথা কোনো পথই খুঁজে পান না। কী ধারণা ছিল নিজের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে নিশীথবাবুব? দেড়শ টাকা মাইনে পাচ্ছিলেন, দুশ টাকা চাচ্ছিলেন, সাতশ টাকা দাবি কবতে পারলেন না? কী দোষ হত তাতে? কিন্তু তবুও পৃথিবীব দেনেওযালারা সব সময়েই ভালমানুষ। তাই তাঁকে দেড়শ টাকাই দেওযা হচ্ছিল তো; ছেলেমানুষি করে এত বড় টাকাটা ফেলে তিনি ইউনিযনে চলে গেলেন আরো বেশি টাকা পাবাব আশায়? না কি কম পেয়ে বেশি মর্যাদা চাইছেন বলে?'

'কী ঠিকানা নিশীথবাবুর?'

'চিঠি লিখবে তাঁকে তুমি?'

'এ কলেজে তাঁর জন্যে অবিলম্বেই বেশ ভাল পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে তাঁকে জানাতে হয়।'

'কে ব্যবস্থা করবে?'

সূচীপত্রে যান

'আমরাই।'

'তোমরা? ওয়াজেদ আলি সাহেববা। হরিলালবাবুদের তো কলেজ।'

'সে হবে। দুশ টাকা চাচ্ছিলেন তো? সে ব্যবস্থা করা হবে। তুমি ঠিকানা দাও তো ওঁর। তিনশ চারশ পেলেই তো ঠিক হত আমাদেব দেশে; ও-দেশে হলে হাজাব-দেড় হাজার পাওয়া যেত, বেশিও পাওয়া যেত হয় তো। ইস, কি বিশ্রী মাইনে প্রফেসরদের।'

ব্যাগেব ভেতর থেকে একটা ছোট নোট বুক আর ছোট চেকনাই আমেরিকান পেনসিল বের করে জুলেখা বললে, 'প্রফেসরদের এই বকম। আমি অনেক দিন থেকেই ভেবে আসছি অসামাজিক বেসামাজিক কাজ ইংরেজের আমলে হয়ে গেছে। এখনো যদি কর্তৃপক্ষরা কিছু না কবে তা হলে মাস্টাব-প্রফেসরদের খুব শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়া দরকার।' নোট বুকটা কোলের ওপর রেখে পেনসিলটা বাগিয়ে নিয়ে জুলেখা বললে 'আমাকে ঠিকানা দাও নিশীথবাবুর—'

'কিছু হবে না।'

'কেন, মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে তাঁব।'

'তিনি আসবেন না আর এ কলেজে।'

'যা চাচ্ছিলেন তাই তো দেওয়া হবে তাঁকে।'

'হারীত কোনো উত্তর দিল না, নোটবুক-পেনসিল ধবে খুব বিশেষ আগ্রহে বলেছিল জুলেখা, কিন্তু ঠিকানা জানাবার মত কোনো তাগিদ ছিল না হাবীতের।

সত্যিই আসবে না?'

'অর্চনাকে বলে গেছেন আসবেন না আর।'

'অর্চনা কে?' জিজ্ঞেস করল জুলেখা, 'ও, বুঝেছি, চিনি আমি।'

'প্রফেসর ঘোষালের স্ত্রী।'

'হ্যাঁ, জানি,' জুলেখা বললে, 'ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে হয। কলেজ তা কবছে না বলেই এই সব হচ্ছে।'

'কলেজেব গভর্নিং বডিতে তুমি গিযেছ না কি জুলেখা?' হারীত বললে, 'মনে হচ্ছে কলেজ কমিটিতে ঢুকেছ তুমি। কর্তৃপক্ষেব কানে কিছু জল ঢুকবে তুমি থাকলে।'

জুলেখা মাথা নেড়ে বললে, 'ওয়াজেদ আলিরা আছেন। তাদের দিয়ে একটা কিছু করানো যেতে পারত। না, আমি নেই কলেজ কমিটিতে। ঢুকে পড়তে পারা যায় হরিলালেব এক জন নমিনি হয়ে, কিন্তু সে রকম ভাবে গিয়ে কোনো লাভ নেই, হাত-পা বাঁধা থাকবে। কেমন পেটে-পেটে কচ্ছপের মত যেন হরিলাল, পিঠের খোলা চিড়িয়ে রোদে আরাম খাচ্ছে, পাশে-পাশে গুগ ল শামুকদের নিচ্ছে সব, হিমাংশু চক্কোত্তি, অন্তিম দত্ত। গার্জেনদের প্রতিনিধি হযে ঢুকতে পাবা যায় কলেজের গভর্নিং বডিতে, কিন্তু?' জুলেখা একটু থেমে বললে, 'আমার হাতে এমনিই ঢেব কাজ, ও-দিকে যাব না আমি আব'—হাবীতেব দিকে তাকিয়ে জুলেখা বললে, 'ঠিকানাটা তবু তুমি দাও আমাকে।'

'লিখতে পারবে না তাঁকে যে আমার কাছ থেকে ঠিকানা পেযেছ।'

'ক্ষ্যাপা তুমি হাবীত, সে কথা সেধে তাঁকে লিখতে যাব কেন?'

হারীত চোখ ছোট করে নিয়ে মেঝের দিকে তাকিযে ভাবতে-ভাবতে বললে, 'মনে পড়ছে না ঠিকানা, সুলেখাকে জিজ্ঞেস করো তুমি, সে জানে।'

'তুমি জান না? চিঠি লেখন না তোমাকে নিশীথবাবু?'

'না।'

'তুমি লেখ না তাঁকে?'

'না। কী লিখব?'

'অর্চনা লিখছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'অর্চনার কাছে চিঠি এসেছে তাঁর?'

'দেখি নি তো? চেন তো তুমি অর্চনাকে! মুখ চেনা শুধু? না কি মেলামেশি হয়েছে বেশ?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জুলেখা বললে, 'শুনেছি অর্চনা নিশীথবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করে। কিন্তু নিশীথবাবুর বিশেষ কোনো ভাব নেই স্ত্রীলোকটির ওপর।'

'শুনেছ?'

জুলেখা শুনেছে, আরো অনেকে হয় তো, কিন্তু সে নিজে বিশেষ কিছু শোনে নি অনুভব করে আস্তে-আস্তে বললে হারীত।

'শুনেছি তো। কাদের কাছে শুনেছি সেটা তোমাকে জানাতে পারি, কিন্তু জানবার আগ্রহ নেই তোমার।'

খুব আস্তে-আস্তে কথা চলছিল তাদের। ইচ্ছে করে নয়, চেষ্টা করে নয়, স্বাভাবিকভাবে নিচু ঠাণ্ডা গলায় জুলেখা কথা বলে, তেমনি গলায় উত্তর পাচ্ছিল হারীতের কাছ থেকে।

'অর্চনা মাসি বাবাকে শ্রদ্ধা করে এটা আর এমন-কি আশ্চর্য ঘটনা জুলেখা।'

'অর্চনা—মাসি বল না কি তাকে তুমি?'

'হ্যা, অর্চনা মাসি বলে ডাকি।'

'কেন, বেশি বয়স তো নয় অর্চনার। তোমার সমান তো অর্চনা। না তোমার চেয়ে ছোট?'

'অর্চনা মাসি বলেই তো ডাকি আমি,' হারীত মুখ ভারী করে দূর সিসুবনের দিকে তাকিয়ে বললে।

'শুধু শ্রদ্ধা করে বলেই তো নয়'—ঝাউ সিসুবনের দিকে জুলেখাও তাকাতে-তাকাতে বললে, 'অর্চনা নিশীথবাবুকে কী যেন করে—কী বলব তোমাকে হারীত—জিনিসটা একটু আশ্চর্য ঠেকেছে অর্চনার কাছে।'

কাঠের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে, নিশীথবাবুর একটা ভাঁজ করা ক্যানভাসের ডেক চেয়ার খুলে, দামি শাড়ির আঁচল দিয়ে ক্যানভাস ঝেড়ে নিয়ে, জুলেখা বললে, 'বসো তুমি এখানে হারীত। কিছু ক্ষণ বসো তুমি এখন ওটায়, পরে দরকার হলে আমি বসব।'

'আমি এখন তোমার চেয়ারটাতে বসছি জুলেখা।'

ডেক চেয়ারটাকে তেপান্তর মুখে ঘুরিয়ে নেওয়া হল, চেয়ারটাকেও খানিকটা, কিন্তু তবুও প্রায় মুখোমুখিই বসল দু-জনে। প্রায় আড়াআড়িভাবে মুখোমুখি। 'অনেকের কথা বলছ। অনেকেরই চোখে পড়েছে বাবা আর অর্চনার ব্যাপার?'

'খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে নি হারীত, তবে ব্যাপারটা একটু দশ কান ঘুরেছে বটে।'

'সুলেখা শুনছে?'

'জানি না আমি। কিন্তু এমন তো কিছু খারাপ জিনিস নয়, অর্চনা ভালবেসেছে নিশীথবাবুকে—দরজাটা আবজে দিচ্ছ কেন? কেউ আড়ি পাতবে?'

'না, ও-ঘরে মা শুয়ে আছেন।'

'ঘুমুচ্ছেন তো তিনি।'

'পাতলা ঘুম, মার কান খুব পরিষ্কার। আরো ও-দিকে অর্চনা মাসিরা আছে।'

'তাদের কান খুব নিশপিশ বুঝি, এতদূর থেকে শুনে ফেলবে? কানের চেয়ে মনের টেলিপ্যাথিই বেশি, দরজা আটকালে কী হবে—'

দরজাটা তবুও খিল এঁটে আটকে ডেক চেয়ারে ফিরে এসে বসল জুলেখা।

'দরজা বন্ধ করে ফেললে?'

'আবজে রেখেছিলে তো তুমি। খুলতে দেবে না যখন—ভেবে দেখলুম একে—বারে আটকে ফেললেই ঠিক হবে।'

'আমি একটা সিগারেট খাব। অর্চনা মাসি ভালবেসেছে নাকি বাবাকে?'

'সেটা মাসিকে জিজ্ঞেস করো। আমি যা শুনেছি তাই বলছি।'

টেবিলের দেরাজের থেকে সিগারেটের বাক্স-দেশলাই বের করে নিয়ে হারীত বললে 'নাম খারাপ হয়েছে নিশীথবাবুর এ জন্যেই।'

'নিশীথবাবু তো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে চলে গেছেন।'

'ইউনিয়নে চলে গেলে মানুষের সুনাম বাড়ে?' সিগারেট ঠোঁটে আটকে নিয়ে হারীত মুখের আনাচে-কানাচে ভেঙে একটু হেসে বললে। সিগারেটটা পকেটে রেখে দিল সে, রেখে দিল টেবিলের ওপর দেশলাইটা, বাক্সটা।

'ইউনিয়নের চলে গেছেন, ভুলে গেছে মানুষ। তা ছাড়া এতে নাম-খারাপের কী আছে। একটু ঘুরপথের মানুষ নিশীথবাবু। ভালবাসেন। কিন্তু কাকে ভালবাসেন বোঝা কঠিন। হয় তো যাকে

ভালবাসেন, সে নারীকে দেখেন নি এখনো। না-দেখে আপসোসও নেই, খুব অশান্তিও নেই মনে, বিশেষ শান্তিও নেই। যাকে ভালবাসে, সে পুরুষকে দেখেছে বটে অর্চনা; সোজাসুজি চলেছে, কাজ করেছে, কথা বলেছে। কেমন লাগে অর্চনাকে তোমার হারীত?'

হারীত আকাশের চার-পাঁচটা সাদা ঝলমলে উড়ন্ত বকের দিকে তাকিয়ে, সেগুলো অনেক দূরে প্রায় মিলিয়ে গেলে, জুলেখার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে, 'আমাকেও তো ভালবাসে অর্চনা।'

'তোমাকেও? অর্চনা?'

'বাবার মতন অতটা নয়, কিন্তু,' হারীত শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না।

'আমি বুঝেছি হারীত, তোমাকে ভালবাসে তোমার বাবার কান টেনে তাঁর মাথাটাকে খুঁজে বার করবার জন্যে,' জুলেখা হাসতে লাগল।

'সেই জন্যে?' হারীত চোখের সামনে, শূন্যে, এক ফিনকি, রোদের ভেতর এক আধটা মাছির ওড়া-উড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ও-ছাড়া এমনিই টানে; এমনিই টান আছে।'

'আছে। কিন্তু কী মূল্য—কী রকম—পেতে চাও তুমি তোমার মাসির কাছ থেকে?'

'আমার মাসি নয়।'

'অর্চনামাসি তো।'

'ডেকেছি তাকে মাসি আমি, কিন্তু আজকাল আর ডাকি না।'

'ডাক না? এই তো খানিক আগে বলছিলে ওকে। আমার সঙ্গে খেলা চলেছিল কথা চেপে রেখে?' জুলেখা খানিকটা নিভৃত হয়ে বললে, 'চেপে রাখলেই ভাল করতে হয় তো হারীত, কিন্তু তুমি তো সব বলে ফেল।'

অনেকটা দূরে একটা গাছের কোটরে একটা পেঁচাকে নিয়ে কাকগুলো মেতে উঠেছে, সে দিকে চোখ ফিরিয়ে জুলেখা বললে, 'অর্চনাকে ভাল লেগেছে তোমার; এ ঘাটে, সে-ঘাটে তার ঘাটেও কথা বাঁধছ হারীত?'

কাকগুলো উড়ে চলে যাচ্ছে, নিজের নীড় খুঁজে পেয়েছে ঠোকর-খাওয়া পাখিটা হয় তো; দেখছিল দু-জনে।

'তা হবে', হারীত বললে, 'কথা যদি বেনেতি হয়, তা হলে বেনেতি জিনিসের মতই তার চার দিকে ঝরতি-পড়তি হবে।'

পকেট থেকে সিগারেট বার করে টেবিলের থেকে দেশলাই হাতড়ে নিয়ে জ্বালতে গিয়ে না-জ্বালিয়ে হারীত সরিয়ে রাখল দেশলাই, পকেটে সিগারেট রেখে দিল।

'সিগারেট খাবে?'

'তুমি বসে আছ তো সামনে।'

'ওঃ, বসে আছি,' জুলেখা একটু হেসে বললে, 'এ সব ধুনোর গন্ধ বপ্ত হয় নি বুঝি অর্চনা মাসির? কিন্তু সুমনা মাসির ছেলে তো চাঁদ সদাগর'—

'চাঁদ তো বটেই,' হারীত হেসে বললে, 'কিন্তু ধুনোর গন্ধে কিছুই বলে না সনকা। তুমি মিছেই বদনামটা করলে জুলেখা।'

জুলেখা একটু ঠাট্টা করে বলতে চেয়েছিল, অর্চনা কালী মনসার মত; হারীত অর্চনাকে একেবারে সনকা বানিয়ে ফেলেছে তাই। হারীতের কথাগুলো কানেই গেল না জুলেখার—উষ্মার কথা বলেছে হারীত, অন্তরের থেকে নয়। উপলব্ধি করে, অবিচলিত মনে বাইরের অনন্তব্রহ্মাণ্ডের ওপর দিনের আলোর অসৎ আবরণীর দিকে সোজা সাদা চোখে তাকিয়ে রইল জুলেখা।

'খেলে না সিগারেট?'

'না।'

'আমি বসে আছি—তাই?'

'না, এমনিই ইচ্ছে করছে না।'

'মনসা আর চাঁদের কথা বলছিলাম—একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, সনকার কথা পেড়ে আমিই ছেড়েছিলাম। কিন্তু, জিনিসটা ও-রকম ঠিক নয়। কী রকম—তুমি বুঝবে জুলেখা। শেষ পর্যন্ত তোমাকেই সব কথা বলি—আর কাউকে নয়।'

'অর্চনার কথাটা বল নি?'

সূচীপত্রে যান

'কাকে? সুলেখাকে?' বাইরে তালপাতার ব্যজনের শব্দ হচ্ছিল, আকাশ-বাতাস তালবৃন্তের দিকে হারীতে চোখ চালিয়ে নিয়ে বললে, 'না।'

'অর্চনাকে বলেছ সুলেখার কথা?'

'ভাবে-প্রকারে বুঝে নিয়েছে কিছু হয় তো, আমি খুলে বলি নি।'

নীল তালপাতাগুলোর দিকে জুলেখা তাকিয়ে ছিল, শুনছিল কেমন বাতাসে নড়ে-চড়ে পাতাগুলো দিকবিদিকের কথা বলে, দৃষ্টি ঘরের ভেতর ফিরিয়ে এনে, আবার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বললে, 'কী চায় তোমার কাছে অর্চনা?'

'সে আমাকে এখানে থাকতে বলে।'

'বেশ ভাল কথাই তো। আমরাও তো সবাইকে থাকতে বলছি। কিন্তু অর্চনা শুধু তোমার বাবাকে থাকতে বলেছিল, তিনি চলে গেলে তোমাকে শুধু থাকতে বলছে। আমাদের মিটিং-ফিটিঙে আসে না তো অর্চনা। ইউনিয়নে যেও না, পাকিস্তানে থাকো, পাকিস্তানে কাজ করো, ঠিক এটাই যে তার লক্ষ্য আমার তা মনে হয় না।'

'মৃত্যু পর্যন্ত সে এখানেই থাকবে ঠিক করেছে। আমাকেও থাকতে বলছে; আর সঙ্গে-সঙ্গে থেকে কাজ করতে বলছে।'

'মৃত্যু পর্যন্ত?' জুলেখা ভুরু তুলে হেসে বললে, 'এ বড় দূর পাল্লা দাবি, যাই বল হারীত। কে কবে মরবে—পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে'—বলতে-বলতে গম্ভীর হয়ে হারীতের দিকে তাকিয়ে জুলেখা বললে, 'ঠিক বলেছে অর্চনা। যেন দেখেছি আমি সব মনে হয়, তোমাদের মৃত্যু হল, তার পর আমাদের মৃত্যু হল এই জলপাইহাটিতেই।'

শুনে কেমন যেন লাগল হারীতের, বললে, 'জিনিসটাকে তুমি বড় বাড়ের ভেতর নিয়ে চলেছ।'

'অর্চনার খেইটা তো বড় হারীত। তার চেয়ে বড় ভাবছ তাকে?'

'না, ওরটা বড় নয়, যে-রকম হাত ছড়িয়ে তুমি মেঘনার এ পার ও-পার ধরছ-সে রকম নয়, অন্য রকম। তোমারটা বড়।'

জুলেখা একটু হেসে বললে, 'আমারটা বড়? কে-কে আর আমার বড় চৌহদ্দির ভেতর? অর্চনার একেবারে ছোট, তারই-বা কে আছে?'

সাঁই-সাঁই সোঁ-সোঁ শব্দ হতেই হারীত আর জুলেখা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, অনেক ওপরে মেঘেরও ওপরে, যেন কী রকম বিদ্যুতের গতিতে অসংখ্য পাখি। হয় তো হরিয়াল, বুনো হাঁস, নানাশির মরালী, ছুটে চলেছে।

পাখিগুলো শূন্যে মিলিয়ে গেলে জুলেখা বললে, 'আমার মনে হয় অর্চনা তোমার বন্ধুর মত নয় হারীত।'

'কী করে বলছ?'

'আমি টের পাচ্ছি।'

'পাখিদের মত বুঝি?'

'কুবাতাস দেখতে পায় তারা দূর থেকে বুঝি?'

'হ্যাঁ, সে আকাশ ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তারা।'

'তুমিও ছেড়ে দিয়ে চয়ে যাও হারীত।'

হারীত দুটো বোলতার আপ্রাণ ওড়াউড়ি ছোটাছুটির দিকে তাকিয়েছিল। এক বার ঘুরে ঢুকে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হয়ে হয় তো, এমনিই, বিদ্যুতের গতিতে সমস্ত ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যে-পথ দিয়ে ছুটছে-ঘুরছে সে সব স্থান নির্দেশ করে যদি আলোর রেখা টেনে দেয়া যেত, তা হলে আশ্চর্য বিদ্যুতের আঁকি-বুঁকিতে সমস্ত ঘরটা কী রকম ঝলমল করে উঠত। বাইরে ছুটে যাচ্ছিল বোলতাগুলো, সরবতি লেবুর ঝাড়ের ভেতর ঢুকে সাঁ করে করমচা বনের দিকে—তেপান্তরের পানে।

'মেয়ে মানুষের কর্তৃত্বপ্রীতি নিয়ে সে তোমাকে আত্মস্থ করেছে হারীত। যে-সব ছেলেরা দূর বিদেশ থেকে অবসন্ন হয়ে ফিরে আসে তারা মাকেই আগে ভালবাসে, বন্ধুকে পরে। সুমনা মাসি বিশেষ কেউ নয় নিশীথবাবুর কিংবা তোমার জীবনে। অর্চনা অনেকটা দ্রৌপদীর মত হতে চাচ্ছিল নিশীথবাবুর, হতে পারে নি; অনেকটা মায়ের মত সে তোমার, তবুও মুনির বৌটি অনেকটা অহল্যার মত, হারীত।'

বোলতাগুলো তেপান্তর থেকে, করমচা বন থেকে, সরবতি লেবুর ঝাড়জঙ্গলের ভেতর থেকে,

অনির্বাচনীয় হলুদ জিনিসের মত ঝট করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে আবার; কিন্তু বোশেখের পড়ন্ত বিকেলের শেষ আলো-বাতাসের ভেতর বসে থেকে প্রকৃতি সে সব ছোট্ট শ্রীমতীদের দিকে ফিরে তাকাতে গেল না এবারে আর হারীত; যে-মেয়েটি তার ঘরের ভেতরে এসে বসেছে সে সব সময়ই এখানে বসে থাকবে, সব সময়ই তাকে কাছে পাওয়া যাবে, মনে ভেবে হারীত নিজের চিন্তার ও প্রকৃতির আলো-নিরালোর ভেতরে চলতে-চলতে জুলেখার থেকে অনেকখানি দূরে যেন সবে গিয়েছিল; তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জুলেখার কথা শেষ না হতে—তার ঠোঁট-মুখ-চোখের ইঙ্গিত, জিহ্বা ও দাঁতেব পবিষ্কার নির্ঝরের মত উচ্চারণের দিকে, শরীরেব দিকে মেয়েটিব, বিমুগ্ধ হয়ে ঝুঁকে বইল যেন খানিক-তাব মনেব ভেতরে প্রবেশ করতে-করতে।

জুলেখা তাড়াহুড়ো করে কথা বলবাব দবকাব অনুভব কবে নি, যদিও কাজেব মানুষ সে। এখন, কাজের মানুষ ও অবসরের মানুষ একই সঙ্গে, একটি মধ্য-রাত্রিব নক্ষত্রের মত, অকৃত্রিমভাবে।

কথা শেষ করে থেমে থেকে জুলেখা হাবীতেব দিকে তাকাল; বিকেল শেষ হযে আসছে, এ যুগেব জীবনও বিকেলের বড় ছায়াব দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

'অর্চনা আমাব চেয়ে চার-পাঁচ বছবের বড়, তুমি আমাব চেয়ে ঠিক যেটুকু দরকার ততটুকু ছোট। আমাদের দেশে পুরুষের সঙ্গে মেয়েমানুষের সম্পর্কেব দিক দিয়ে অর্চনাব চেয়ে তুমি ভাল জাযগায দাঁড়িয়ে ভাল কথা বলছ। তোমাব কথা ভাল লাগছে আমাব।'

যে-বোলতাগুলো প্রকৃতিব ভেতব হাবিয়ে গেছে তাদেবই এক-আধটা হল যেন হারীতেব কথার ভেতব জুলেখাকে বিঁধবাব জন্যে, হয তো নিজেব মনেব সব চেয়ে আন্তরিক কথাগুলো হুলেবিষে জড়িয়ে পড়ে হারীতের এমনিই; ভেবে দেখছিল জুলেখা।

'তোমাব মা কে, চিনেছ তো তাকে তুমি?'

হাবীত সচকিত হয়ে জুলেখাব দিকে তাকাল। সুলেখাব ঈষৎ মোলায়েম নাকেব তুলনায কী তীব্র উন্নত নাক জুলেখার, থুতনি কড়িব মত সাদা, কঠিন। কিন্তু স্নেহগুণ সব সময়ই ছিল, বাইবের বাতাস পেয়ে আস্তে-আস্তে স্নিগ্ধই হয়ে উঠছে। কেমন বিচিত্র বিতিকিচ্ছিবি কথা প্রযোগ কববাব পবও কী কবম আশ্চর্য সবসতা; পৃথিবীর সব দিকেই তো বাত এখন—তবুও যেন ভোর হল এমনই আলোকপ্রসবা আলোব মতন মুখ।

'মাকে চিনেছি জুলেখা। কিন্তু চোদ্দ-পনেরতে এই মাকে তো পাওয়া উচিত ছিল আমাব। এখন বযস আমার ত্রিশের কাছাকাছি, অর্চনাবও কাছাকাছি ত্রিশের, কী কবে পাব আমি অর্চনাকে?'

শুনে কোনো কথা বললে না জুলেখা। কথা বলবাব কোনো আযোজন নেই তাব হৃদযে—কেমন একটা অস্পষ্ট ঝোঁক লেগে ছিল জুলেখাব মুখে—স্বাভাবিক হয়ে গেছে চোখমুখ—বাইবের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে হবে,' হাবীত বললে।

'আমার হাতে কোনো পথ নেই।'

'পাকিস্তানে আমার এক বছব থাকাব কথা ছিল। অর্চনা বলেছিল আবো অনেক দিন থাকতে। কিন্তু ইউনিযনে যাদের আমি জড়ো করেছিলাম তাবা তো ছিটকে পড়বে চাব দিকে, আমি এত দিন এখানে পড়ে থাকলে। আমার জীবনেব সবচেয়ে বড় কাজ ইণ্ডিযান ইউনিযনে। সেখানে গিয়ে—দশ-পনেব বছব পরে সফল হলেও—এখন থেকে কাজকর্মেব আযোজন কবতে হবে আমাকে।'

'তা হবে। কিন্তু নিশীথবাবু সরে যেতে না যেতেই যা ফেঁদেছ তোমাবা দু-জন—আগে তাব মীমাংসা না হলে কী করে বিপ্লব কববে তুমি।'

'আমার বিপ্লবে আসবে তুমি?'

'কোথায় ইউনিযনে? না, আমি এখানকার মানুষ, আমি কোনো বড় রেভল্যুশনেব প্রযোজন দেখছি না এখন, কংগ্রেসও তা চাচ্ছে না।'

'আমি কম্যুনিস্ট নই।'

'জানি, কিন্তু আমি কংগ্রেসের। কোনো মরণান্ত রেভল্যুশনের দরকার দেখছি না আমবা।'

'কংগ্রেস তো পকিস্তানে থাকছে না?'

'তাই বলে ইউনিয়নে গিয়ে আমি তোমার সঙ্গে বিপ্লব কবব? কেন, ও-দেশে চিঁড়ে খেতে কালীঠাকুরের দল ছাড়া আর কেউ নেই?' একটু নিশ্বাস নিয়ে জুলেখা বললে, 'তুমি ইউনিয়নে গিয়ে

রেভল্যুশন করছ, আর এখানে জলপাইহাটিতে এসে যা তোমার দরকার নয়, যে-জিনিস তোমার বাবা পর্যন্ত ভয় করতেন তার ভেতর জড়িয়ে পড়ছ। তোমার মাকে চিনেছ তুমি হারীত!'

'ও-রকম অধীর হয়ে তুমি কথা বলছ, একটু থেমে থাক, ভাল করে ভেবে দেখ,' আস্তে-আস্তে বললে হারীত। জুলেখার দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজতে গিয়ে, মেলে দিয়ে, মাথা নাড়তে গিয়ে অনড় হয়ে থেকে তবু হারীত বললে, 'মাকে চিনেছি আমি। কিন্তু চিনে ফেলে বুঝতে পেরেছি যে তার জীবনে যে-রকম বিপত্তি এসেছে আমার জীবনে তা তো আসে নি।'

'কেন, তোমার জীবনেই তো বেশি সঙ্কট।'

'কী, করে জুলেখা?' হারীত ঘরের ভেতর পায়চারি করতে-করতে বললে। তার পর ঘাড় হেঁট করে দু-চার পা এগিয়ে দূরে একটা জানালার গরাদের কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তো আমার সঙ্কটে তোমার অমূল্য পরামর্শ পাচ্ছি, অর্চনা কী পাচ্ছে?'

'আমার অমূল্য জিনিস নিয়ে আমি তোমাদের বাড়ি ঢোকবার আগে নিশীথবাবুকে চিঠি লিখেছে তো অর্চনা। জান না তুমি?'

'হ্যাঁ, সব চিঠিই পাশ করে দিই আমি। কিন্তু এটা ধরা পড়ে নি,' হারীত চোয়ালের থেকে হাতের মুঠো সরিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'কী লিখেছে?'

'লিখেছে হারীতকে নিয়ে পারছি না আর, তুমি এসে একটা ব্যবস্থা করো।'

হারীত ঘাড় হেঁট করে পায়চারি করতে-করতে এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বাইরের উড়ন্ত পাখিদের সাদা-কাল-খয়েরি-খইরঙা ডানাগুলোর দিকে অবহিত হয়ে থেকে অনেকটা সময় কেটে গেলে ঘরের বেশি আবছায়ার ভেতর জুলেখার খাড়া নাকটাকে প্রথম দেখতে পেয়ে তার চোখের দিকে তাকাল তারপর।

'অর্চনার সঙ্কট হচ্ছে এই যে নিজের দায়ে সে তো আসে নি, তা সে আসতও না কোনোদিন, হয় তো নিশীথবাবুর দিকে তেমনি ভাবে গিয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে আমার দিকে তাড়িয়ে এনেছি, কলকাতার থেকে এস কেমন অব্যবস্থিত হয়ে ছিল জীবন যেন। সে পরে সাড়া দিয়েছে; বেশি সাড়া দিচ্ছে এখন। কিন্তু ঠিকই বলেছ-তৃতীয় পাণ্ডবের দ্রৌপদীই সে; তাদের জন্যে তৈরি হতে-হতে অর্চনার যখন উপচে উঠবার সময় তখন তারা কেউ নেই, আমি দৈবক্রমে উপস্থিত।'

বলতে-বলতে চেয়ারে এসে হারীত দু-এক মুহূর্ত বসে রইল। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে হারীত বললে, 'কিন্তু নিজেরই পথ ধরে যা ত্রিগঙ্গা, তার ভোগবতীর জলও আমার ভাল লাগে। সে জিনিস সহজে নিজের টানে চলে আসে এ রকম কিছু—এ রকম কোনো জল'—

জুলেখা আবছায়ার ভেতর নিজের ডান হাতটা ছড়িয়ে সে দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ভোগবতীর জলও—'

হারীত ফিরে তাকাল জুলেখার দিকে, জুলেখা চোখ ফিরিয়ে নিল, নী-কালো তালপাতাগুলোর ওপর অনেক অঝোর বাতাসের দিকে—প্রকৃতির ধ্বনি নানা রকম সব আশ্চর্য নিমিত্তের পানে।

'কোনো বিবাহিত পুরুষকে কোনো দিন তোমার নিজের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করেছে?'

'এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ তুমি?'

হারীত পায়চারি করতে-করতে জানালার কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তা থাকলে আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে তুমি।'

'ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।'

'বাতি জ্বালাতে হবে।'

'ল্যাম্প কোথায় এ ঘরে?'

'মার কোঠায় আছে।'

'তা হলে দরজা খুলে ও কামরায় যেতে হবে? থাক। এখন আটকানো থাক। আমি চলে গেলে খুলে দিও।'

'অন্ধকারে থাকবে?

'আমাদের তো কোনো দলিল পড়াবার দরকার নেই।'

'আমার জীবনটাকে খুলে ধরেছি তোমার সামনে, অর্চনার কথা বলেছি তোমাকে, সুলেখাকে বলি নি, কাউকে বলি নি, সুলেখার কথা বলেছি তোমাকে, অর্চনাকে বলি নি; তোমার জীবনের পুরুষদের কথা

আমাকে বললে না তো তুমি—'

'আমার জীবনে কোনো অর্চনা নেই। থাকলে কোনো জুলেখা আগাগোড়া সব নাড়ী টিপে বুঝে নিয়ে আমার জীবনে এসে পড়ত, হারীত?'

'কারো স্বামী-টামিকে ভাঙিয়ে তোমার দিকে টেনে নাও নি তুমি, তারা এমনিই তোমার দিকে গিয়েছে?'

'ওরা তো বয়সে আমার চেয়ে ছোট নয়।'

'ওরা সকলেই তোমার চেয়ে বয়সে বড় বুঝি? কিন্তু—'

'আমার চেয়ে বয়সে ছোট কোনো ভাগনে বা ভাইপো,' জুলেখা বলতে আরম্ভ করেছিল।

'বুঝেছি,' হারীত বললে, 'তাদের মাসি তুমি, যেমন অর্চনা আমার মাসি—সেই হিসেব ভালবেসেছে। স্ত্রীলোকের মন নিয়ে ভালবাসনি সে সব পুরুষকে।'

'অর্চনার তো স্ত্রীলোকের মন তোমার সম্পর্কে?'

হারীত বললে, 'এক-এক জন স্ত্রীলোকের মনের প্রসার খুব বেশি। সেই হিসেবে। না হলে আমি কে?'

'তোমার কি পুরুষের মন জেগে উঠেছে?'

তালপাতার টড়্-টড়্-টড়ক-টড় শব্দ হচ্ছিল আবার অফুরন্ত বাতাসের ভেতর; বড়-বড় ছড়ানো প্রাণয়ন বৃন্তগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাল হারীত।

'তোমার পুরষের মন?' জিজ্ঞেস করল জুলেখা।

হারীত চিন্তিত মুখে কিন্তু তবু যেন খানিকটা নিস্তার বোধ করে বাইরের কীট-পতঙ্গ আকাশ-বাতাসের দিকে তাকিয়ে কোনো কিছুকেই গ্রহণ না কবে জুলেখাব প্রশ্নের সৎ উচ্চারণের বলযস্পর্শে বিমুগ্ধ হয়ে চুপ করে রইল।

'কে জাগিয়েছে তোমার মন তা হলে?'

কোনো উত্তর দিল না হাবীত।

চলন্ত আত্মস্থ এক মেঘের মত বেশি আলোর দিকে এগিয়ে হারীত বললে, 'সববতি লেবুর ফুলের ভেতর কারা নিবিষ্ট হয়ে আছে সেই ভোরবেলার থেকে, দেখেছ জুলেখা?'

'ওরা তো মৌমাছিই। ওগুলো মৌমাছি নয হারীত?'

'হ্যাঁ, মৌমাছিই তো। এতদিন জলপাইহাটির কোলে মানুষ হয়ে তুমি মৌমাছি চিনছ না?'

'চিনেছি তো, বলেছিই তো মৌমাছি।'

হারীত একটু হেসে দরজাব কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'কতকগুলো কালো মেঘে বাইবেটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, ঘরেব ভেতরটা এত বেশি অন্ধকাব দেখিযাছিল, ভেবে ছিলাম সন্ধে হয়ে গেছে, বাতি জ্বালাবার কথা বলছিলাম। মেঘগুলো সরে গেছে। বাইরে আলো কী রকম দেখেছ জুলেখা?'

'ঘরেব ভেতরেও তো আলো। এ আলো নিভে যাবে শীগগিরই। বোলতাগুলো কোথায় চলে গেল।'

বোলতাগুলো কোথায় চলে গেল খুঁজছিল দু-জনে; কোথাও নেই বোলতা, বাতাস নেই; ছায়া জমেছে। এতক্ষণ আকাশ ছিল চার দিক ঘিরে। আকাশ মুছে যাচ্ছে। তাবপব নেমে এসেছে আকাশ—সময়ের দেয়াল—যেন অনবরত দেয়াল ও অবাধ পরিসরের ভেতর দু-জনকে নিবিষ্ট করে রেখে।

এইবার অন্ধকার হচ্ছে। মৌমাছিরা উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মধু নিয়ে চলে গেল, ওরাই তো মৌচাক সৃষ্টি করবে। আজকাল যে সব স্টেট গড়ছি আমরা, উড়িয়ে দিচ্ছি, তার চেয়ে বেশি স্নিগ্ধ, পরিষ্কার। বেশ প্রিয় জিনিস মানুষের জ্ঞানের চেয়ে প্রকৃতির সফলতা, সাধ বেশি উজ্জ্বল হল তো—

'কোথায় উড়ে গেছে মৌমাছিরা?'

'কালো মেঘ নেই কোথাও আর। কিন্তু তবুও অন্ধকার হয়ে আসছে।'

'এইবারে সন্ধে হল। বাতি জ্বালানো হবে?'

'কোথায় হারিকেন তোমার? তোমার মার ঘরে? দরজা-খুলে নিয়ে আসি আমি হারীত।'

'থাক, খুলো না দরজা, বন্ধ থাক।'

'না, এখন আর আটকানো থাকবে না, আমি খুব একটা নিস্তার বোধ করছি। খুব ভাল লাগছে আমার।' জুলেখা বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এল।

আমাদের পৃথিবীতে অনেক দিন আগে, অনেক সাগর ঘুরে তার পর সমুদ্র প্রবাসীদের জাহাজ

সূচীপত্রে যান

অন্ধকারে ধর্মাশোকের নির্জন চক্রস্নিগ্ধ সৈকতে—ঢের দূরে প্যালেস্টাইনের পাশে স্বাতী পুনর্বসু নক্ষত্রেব নীচে এসে থামত। রাতের বাতাসের ভেতর বসে থেকে তেমনি একটা আশ্চর্য শান্তি অনুভব করছিল হারীত।

কিন্তু তাই বলে হারীত অতীত পৃথিবীর মানুষ নয়—আজকের পৃথিবীর অশান্তি ও অপশান্তির চেয়ে আগেকার পৃথিবীর কোনো-কোনো সময়ে শান্তি অনেক ভাল হলেও প্রবীণোত্তর কল্যাণ ও শান্তির মর্ম পাওয়া যায় কি না, ভাবছিল সে নিজের, নিকট সাময়িক পৃথিবীর জন্যে।

'আমার খুব ভাল লাগছে; কেমন নিশব্দ হয়ে আছে মানুষের পৃথিবী এখন। মানুষ মানুষের ভাল চাচ্ছে যেন এমনই গভীর সহানুভূতি, শান্তি, এই রাত্রির বাতাসে হারীত—'

'কোনো অতীত পৃথিবীর কথা মনে পড়ছে তোমার?'

'অতীতে এ রকম শান্তি ছিল বুদ্ধদেবের সময়—আমাদের দেশের কোনো কোনো জায়গায়। তারো আগে—চীনে। জেরুজালেমে—'

'এখনকার পৃথিবীর চেয়ে সে সব দেশ বিদ্যায় পিছিয়ে থাকলেও জ্ঞানে বড় ছিল, বেশি শান্তি ছিল তাই—'

'পৃথিবী তো এখন বিদ্যায়ও পিছিয়ে পড়ছে—চালাকি বেড়ে যাচ্ছে।'

'এই রকমই কি থাকবে মনে হয় তোমাব?'

'কিছু কাল থাকবে,' বাতাস ও রাত্রির অন্ধকাব স্নিগ্ধতার দিকে তাকিয়ে থেকে জুলেখা বললে।

চমৎকার এই রাত্রির বাতাস। দুঃখ লোপ করা কঠিন, হয় তো অসম্ভব। কিন্তু দুঃখবাদ—হারীত অন্ধকার ও বাতাসের অক্লান্ত অমিতাভ নৈরাজ্যের দিকে তাকিয়ে রইল; অসাধ্য সাধনের যুগ পৃথিবীর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে কি না অবাক হয়ে ভাবছিল।

জুলেখা মনে-মনে ভাবছিল, কী অনির্বচনীয় এই বাত্রিব বাতাস, আমি অদিতি যেন—অনেক দেবতার মা, হাতে অনেক কাজ আমার, আমার প্রেমিকের, আমার সন্তানদের, আমাদের পৃথিবীর।

'পৃথিবী আমাদের চেয়ে বড়, সময় আবো বড়, তবুও আমরা আছি, চিন্তা করছি, ভাল চাচ্ছি।'

স্নিগ্ধ বাতাসের ভেতর বসে থেকে নিরবচ্ছিন্ন আকাশের অনেক তারার ভেতর কাকে খুঁজছিল জুলেখা? স্বাতীর দিকে যেন তাকিয়ে আছে হাবীত; অত বড় আকাশের পথে জীবনের অকিঞ্চিৎকর কণিকার মত স্বাতী তারাটাকে খুঁজে পেয়েছে হাবীত?

মানব সফল হতে চাচ্ছে বলেই মানুষকে সফল কববার জন্যে আছে একটা ইচ্ছা, চেষ্টা, জুলেখা বললে, 'খুব সম্ভব হাজারে এক জন কি দু-জন হলেও এটা চাচ্ছে মানুষ, আমাদেব মতন এ বকম ভয়ঙ্কর পতনেব যুগেও। ওরা দু-এক জন হতে পারলে বাকি আবো অনেকে হতে পারবে হারীত?'

'অনেকে? যা হচ্ছে তাব চেয়ে বেশি হবে। দেবিতে হবে। সময় দেরি কবিয়ে দেয মানুষকে। কিন্তু সময ঢের বড় হলে সুসময়েব সাধ বয়েছে মানুষেব হৃদয়ে'—হারীত খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে তাব পব বললে, 'সেটা খুব সম্ভব সময়ের চেয়ে বড়।'

বলে মনকে চোখ ঠাব দিচ্ছে মনে হল হারীতেব। মানুষেব ভেতরের চেহারা তো আবছা, খুব সম্ভব সেখানে কোনো আলো নেই; এইই বলা উচিত ছিল, সত্য তো এই। কিন্তু আজকে এ রকম বাতে জুলেখাকে এ ধরনের কথা বলতে চাইল না হারীত।

'মানুষের ভেতরের আলো ঘিরে মাছি অনেক, হারীত। আজকাল ঢের বেশি মাছি পড়ছে—'

'মাছি?'

'হ্যাঁ। অন্ধকার হয়ে পড়ছে আমাদের দিনকালের মানুষদের ভেতর-বার এসব—'

'ও!' বললে হারীত।

ঘোর কেটে যাবে, তবুও, জুলেখা বললে, 'মানুষদের কথা আর বলতে গেল না কেউ তাব পর—রাত্রি, নক্ষত্র, বাতাসের ভেতর বসে থেকে। বাতাস আসছে,' জুলেখা বললে, 'প্রান্তরের থেকে, প্রান্তরের ওপরের এক সমুদ্রের থেকে। কেমন গভীর, গভীর।'

'বাইরে কে হোঁচট খেল অন্ধকারে, শব্দ হল না জুলেখা? কে মানুষ এই বাতে। কে?' অনেক ক্ষণ পরে বললে হারীত।

'আমি নিশীথ এসেছি—ওঃ, তুমি হারীত,' ঘরের ভেতরে ঢুকে নিশীথ বলল।

'কলকাতার থেকে এলে বাবা?'

'ভানু মরে গেছে। তোমার মা কেমন আছে?'

'এইমাত্র মারা গেছেন,' অন্ধকারের ভেতর থেকে বললে অর্চনা, নিশীথের দিকে তাকিয়ে। মারা যাবার পর খবর হারীতকে দিতে এসেছিল সে, এসে দেখল নিশীথ এসেছে।

'জুলেখা তুমি এখানে?' রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বললে।

'আমার খোঁজে কী করে এখানে এলে তুমি?'

'আমার সঙ্গে ওয়াজেদ আলি সাহেবও এসেছেন। আমি তাঁকে মত দিয়েছি। কথাটা তোমাকে জানাতে এসেছি আমরা।'

'আচ্ছা, বাড়ি যাও', জুলেখা আস্তে-আস্তে বললে, 'আমি যাব না। আমার এখন এ বাড়িতে অনেক কাজ।'

সুলেখারও এ বাড়িতে খুব কম কাজ ছিল না, কিন্তু অর্চনাকে, হারীতকে—হঠাৎ নিশীথের মতন এক জন প্রামাণিক মানুষকে, চোখের সামনে দেখতে পেয়ে হক-চকিয়ে উঠে এক কোণায় সরে দাঁড়িয়ে, তাঁর পর আস্তে-আস্তে চলে গেল সুলেখা।

'সুলেখা ওয়াজেদ আলিকে বিয়ে করছে?' নিশীথ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'আমাকেও তো বিয়ে করতে পারত,' একটু হেসে বললে নিশীথ, 'এই তো মরে গেল আমার স্ত্রী।'

'আশ্চর্য মানুষ আপনি নিশীথবাবু'—রাতের বাতাস খুব বেশি শব্দ করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে শুনতে-শুনতে জুলেখা খুব নিচু গলায় বললে।

নিশীথের কথা শুনতে পেল সুলেখা, দরজা পেরিয়ে অন্ধকারে যাব কি না-যাব করছিল সে। ফিরে এল।

'ওয়াজেদ আলি সাহেবকে আর রাত করতে দিলুম না। সাহেবকে চলে যেতে বলেছি। আজকেই সৎকার হবে?' নিশীথের দিকে তাকিয়ে সুলেখা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আজ রাতেই। থাকবে তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি আলি সাহেবকে দাঁড় করিয়ে রাখলুম না আর।'

'তা হলে আমি বাড়ি যাই সুলেখা- মা একা আছেন,' জুলেখা বললে।

নিশীথের কাছে এগিয়ে গিয়ে বসল সুলেখা, জুলেখা বাড়ি গেল না। অর্চনা দাঁড়িয়ে রইল।

এ সব জিন-পরীদের ব্যাপার দেখবার জন্য ঘরানা মেয়ে সুমনা কোথাও নেই—নিশীথ নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল। খুবই নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল—তাকিয়ে দেখল ওয়াজেদ আলি সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিশীথের; সারা রাতই হয় তো; দরকার হলে চির রাত। কে কার জন্যে থেকে যাচ্ছে সেটা বলা কঠিন, কিন্তু এরা সকলেই যেন সময়ের শেষ হিরণ্যগর্ভ রাত অব্দি রয়ে যেতে পারে এ ঘরে—জীবনের মানে নিয়ে। সুমনাও।

নিশীথ সুমনাকে দেখবার জন্যে ভেতরে ঢুকে গেল। নিশীথের সঙ্গে-সঙ্গেই সুলেখাকে ভেতরে চলে যেতে দেখে অর্চনা বাইরের ঘরেই দাঁড়িয়ে রইল। হারীত এ ঘরে—এক কিনারে; কেমন যেন লেপটে রয়েছে জুলেখা আছে বলে—টের পেয়ে সে নীরবাসীন গাছের দিকে তাকাতে গেল না আর অর্চনা। যেন চেনা সময়র মৃত্যু হচ্ছে অন্ধকার পৃথিবীতে; কিন্তু তবুও রাতের বাতাসে সারাৎসার তারার আলো উজ্জ্বল, চোখ বুঁজে মহিমান্বিত দার্শনিকের মত ওয়াজেদ আলী সাহেব দাঁড়িয়ে।

সূচীপত্রে যান

সুতীর্থ

এক

লেখা-টেখা সুতীর্থ অনেকদিন হয় ছেড়ে দিয়েছে। এর মানে এ নয় যে লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের ইতিহাস নেড়ে-চেড়ে দেখলে অবিশ্যি জানা যায় যে বিখ্যাত লেখকরাও তাঁদের প্রতিভার তুষ-তাপও আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি—কয়েক বছর লিখে অনেকেই হার মেনে কলম থামিয়েছেন, কিংবা যা লিখেছেন তাকে সাহিত্যলেখা বলা চলে না। সুতীর্থ এ জিনিসটার মানে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার ধারণা সৎ লেখক অবসর খুঁজে নিয়ে নিজের ভাবে বসবার সুযোগ পেলেই (জীবনের যে কোনো অধ্যায়ে) ধীরে ধীরে বড় জাতের লেখা সৃষ্টি করতে পারে।

নিজে অনেক দিন থেকে কিছু লিখছে না বটে কিন্তু সেটা অক্ষমতার জন্যে নয়, অবসরের অভাবে। অর্থের সচ্ছলতা নেই। এই নিরেট পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিন-রাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মনের শান্তিসমতা যায় নষ্ট হয়ে ; চাকরির থেকে ফিরে এসে হাতে সময় যে না থাকে তা নয়, কিন্তু তখন শরীর অবসন্ন, মন ধাতে নেই। সে মনকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব নয়, কিন্তু সময় লাগে, সহিষ্ণুতা চাই, সুযোগেরও প্রয়োজন। পিতৃপুরুষ কোনো দিক দিয়েই এমন কোনো সংস্থান করে যাননি সুতীর্থের জন্যে যে অফিস থেকে সন্ধ্যায় ভাড়াটে ফ্ল্যাটে ফিরে মন তার সমস্ত দিনের অপব্যবহার ও সমস্ত রাতের দুশ্চিন্তার সংযোগগুলোকে দু চার মুহূর্তের জন্যে এমন একটা সহজ স্বাভাবিক আশ্রয় খুঁজে পাবে যেখানে শিল্প-সাহিত্যের আলো আসে মনে, লিখলেও তা হয়ে দাঁড়ায় যা চাওয়া যায় মোটামুটি তাই। এ কি সম্ভব কখনও? এক আধবার অবশ্য চেষ্টা করে দেখেছে সে, টের পেয়েছে ক্ষমতা আছে কিন্তু অনেক সহিষ্ণুতার সুযোগ তৈরি করে নিয়ে দু-চার লাইন লিখবার পরেই তাকে অনুভব করতে হয়েছে যে সে একা মানুষ নয় আজ আর, যা লিখেছে সে তা আত্মরতি, কুঁড়ে গোরুর গল্প, এতে চলবে না, এরকম অপবাদ শুনতে হবে তাকে সাহিত্যের নানারকম অপ্রাসঙ্গিক দ্বারপালদের কাছ থেকে ; ওসব অবিশ্যি গ্রাহ্য করে না সে, কিন্তু তার নিজের মনও গ্রাহ্য করছে না যেন আজকাল তার নিজের লেখাকে। তার নিবিদ মন কি বলছে? বুঝতে পারছে না সে। কোনো জিনিস রয়েছে সাবাৎসার মন বলে?

'কি হয়েছে, সুতীর্থ?'

'এই যে চা খাচ্ছি।'

'চা তো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে রয়েছে। গালে হাত দিয়ে বসে আছ যে—'

চায়ে এক চুমুক দিয়ে সুতীর্থ বললে, 'একটু গরম চা পেলেই ভাল হত মণিকা দেবী, গলায় একটু ব্যথা মনে হচ্ছে—'

'ঠাণ্ডা লেগেছে বুঝি। আচ্ছা, আমি চার গরম করে দিতে বলছি। তুমি এই চা-টাই খাবে তো।'

এক আধ মুহূর্ত ইতস্তত করে সুতীর্থ বললে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খাব। কাপসুদ্ধ চা ফেলে দিয়ে আমাকে নতুন চা তৈরি করে দেবে রামচরণ? আজকাল এক পেয়ালা চায়ের দাম তো—'

'আচ্ছা, আমিই উঠি, নিয়ে আসি ঠিক ক'রে। উনুনে কিছু চড়েছে নিশ্চয়, সেই তো মুশকিল; তুমি বড় দেরি করে ফেল ঘুম থেকে জেগে উঠতে—' বলে মণিকা দেবী বসেই রইলেন তবু।

বললেন, 'আমার বাড়ির ভাড়াটা, সুতীর্থ—'

'দিচ্ছি। আমারই দোষ হয়েছে। ও মাসেরটা দেয়া হয়নি বুঝি। এ মাসও তো ফুরিয়ে এল প্রায়। তা ছাড়া আগের আট দশ মাসেরও বাকি আছে, সেগুলো পরে দেব। টাকা যে নেই তা নয়, কিন্তু—'

চায়ের কাপটা ছিল পুরোনো একটা খুব সম্ভব টিক কাঠের চেয়ারে ; কাপটাকে মেঝের ওপর

নামিয়ে রেখে মণিকা বললেন, 'এইখানেই বসি। গিট ধ'রে গেছে রে বাবা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব। বড্ড শীত পড়েছে আজ-'

বসে পড়তে পড়তে কিছুটা সময় লাগল দোহারা বিলাসী শরীরের মানুষটির। চেয়ার উল্টে পড়েছিল প্রায়, সামলে নিতে গিয়ে চায়েব কাপটা হঠাৎ মণিকা মজুমদারের পায়ের ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে গড়াতে লাগল।

'ও কিছু না, হকচকিয়ে যেও না তুমি। ঠিক করছি—আমি ঠিক করছি সব—' বলে সুতীর্থ পা বাড়িয়ে পেয়ালাটাকে একটু দূরে ঠেলে সরিয়ে দিল মাত্র। কাপটা আগে ভাঙে নি, এবাবেও ভাঙল না, ভাঙলেও কারুব কিছু এসে যেত না ঃ এমনই চা চায়ের কাপ চায়ের নেশার শীতের সকাল সুতীর্থ গুপ্তের ভাড়াটে ঘরে।

'তোমার কপালে চা নেই, সুতীর্থ—'

মণিকা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন-সম্বিৎ ফিরে পেযে চুপ হয়ে গেলেন। বয়স তাঁর চল্লিশ হয়েছে ; চেহাবা অনির্বচনীয় তবু, যেন চল্লিশ ফিবে যাচ্ছে ত্রিশে, ত্রিশ ঠেকছে গিয়ে কুড়ি পঁচিশে। অথচ সত্যিই বযস হয়েছে ঃ তেমনি মর্যাদা; চল্লিশটাই ঠিক, কুড়ি-পঁচিশের ইচ্ছাস্বর্গ যেন ঘিরে রযেছে তাঁকে—খুশিমতন ঢুকে পড়লেই হয।

'আগের দশ মাসের হিসেব পরে হবে, তা ছাড়া তোমার তিন মাসের ভাড়া বাকি।'

সুতীর্থ মেঝের ওপর চায়ের ছড়াছড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, 'তা বুঝি। তা হবে। হিসেব তোমারই ঠিক তো।'

'কেন, তোমার খেযাল নেই? কাকে কি দিতে হবে সেটা ভুলে গেলে মন অবিশ্যি বেশ ঝাড়াঝাপ্টা থাকে। কেউ কেউ স্বভাবতই ভুলে যায়—তারাই জ্ঞানী কবি। অন্যদের টনটনে বুদ্ধি আছে বলেই তাবা ভোলে। সুতীর্থ, তুমি যে তিন মাসের ভাড়া দাও নি সেটা যে লুকোচুরি করে দাওনি তা' আমি বলতে চাই না। সত্যিই তোমার খেযালই নেই হযতো। কিন্তু—'

মণিকা সুতীর্থের শার্টের বোতামের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হযে রইলেন ; বোতামের ওপরেব মানুষটির মুখের দিকে সহসা তাকাতে গেলেন না আর।

'কবি, জ্ঞানীর জাত আলাদা, তোমার মতন নয়।'

'কি বকম?'

'সে আবেক দিন বুঝিযে দেব।'

তোমার মুখে শুনে ভালো লাগবে, জ্ঞান বাড়বে ; বোলো একদিন ; এখন এই হিসেবটা বুঝে নাও।' বলতে বলতে সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলে যে টাকাটা মণিকাব হাতে দিল, তাতে পুরো দু'মাসের ভাড়াও দেয়া হয না।

'এখুনি রসিদ দিতে হবে?'

'দিয়ে দেবে যখন সুবিধে হবে, এখুনি কি দরকার।'

'দু মাসের ভাড়ার বসিদ দেব? পনেবো টাকা বাকি বইল যে।'

'দিয়ে দেব টাকাটা—আজ কালই—'

'উঠি সুতীর্থ।'

'আচ্ছা, এসো।'

দু পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়িযে সুতীর্থের দিকে ঘাড় ফিবিয়ে মণিকা বললেন, 'সুতীর্থ, আজকাল লিখছ-টিকছ না?'

'না তো।'

'কেন?'

'যখন আবার লিখব—তখন বলব তোমাকে।'

'কবে লিখবে আর?'

'এই পালাটা শেষ হলে।'

'হেঁয়ালির মত কথা বলছ। পালা? কিসের পালা?'

'আছে একটা', সুতীর্থ বললে, 'সেও পরে বলব তোমাকে মণিকা-দি।'

'আমি দিদি হলাম কি হিসেবে—আমি তো তোমার চেয়ে ছোট।'

'বয়সের উনিশ-বিশ আছে আমাদের। কিন্তু বয়সটা তো খুব সামান্য জিনিস। অন্য সব দিক রয়েছে।'

সূচীপত্রে যান

মণিকা সোজা সুতীর্থের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তুমি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছ যে তুমি আইবুড়ো, তোমার বয়স পঁচিশ, অফিসের মাইনে পাঁচশো টাকা। কিন্তু মিছে কথা তো সব সুতীর্থ। তোমার শ্বশুড়বাড়ি তো পাশগাঁয়ে।'

সুতীর্থ ছেঁড়া সোফাটার এক কিনারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'পাশগাঁ আমাকে টানে না তা তো তোমাকে বলেছি।'

'টানে না, ফি মাসে অফিসের মাইনেটা সেখানে যাচ্ছে তো।'

'টাকা না পাঠালে কি খাবে তারা?'

'তারা ক'জন?'

'আমাব স্ত্রী, ছেলে মেয়ে দুটি–'

মণিকা কোনো কথা বললেন না কিছুক্ষণ, দেয়ালে হাত লাগিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'কোথায় চলেছি? বড় অন্ধকার তোমার ঘরটা–'

'জানালা খুলে দিচ্ছি। বসো, মণিকা দি।'

'না, থাক।'

'কাল সারারাত হাঁপানির বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুঝি অংশুবাবুর?

'না, কেন।'

'ভাবছিলুম রুগীর শিযবে বসে বসে শরীর এলিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন কাহিল দেখাচ্ছে—'

'ভাল আছেন। এমনিই ঘুম হয়নি আমাব।'

'ঘুমের ওষুধ আছে আমার কাছে।'

'দেখি আরো দু এক দিন ; না হলে ওষুধ খাব। কি ওষুধ আছে তোমাব কাছে ঃ খুব কড়া? বিলিতী?'

মণিকা ওপরে চলে যাবেন, না কিছুক্ষণ বসে কাটাবেন ভেবে দেখছিলেন।

'রসিদ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু পুবো দু'মাসের হিসাব দিতে পাবব না।'

'পনেবো টাকা বাকি ; আচ্ছা, এক মাসেব বসিদ দিলেই হবে।'

চলতে চলতে মণিকা বললেন, 'একটা কথা আমি ভাবছি। পঁযতাল্লিশ টাকায চারখানা ঘব তোমাকে আমি দিয়েছি। তিন বছর তুমি আছ। এ চাবখানা ঘবের জন্যে দুশো আড়াই শো টাকা পেতে পারি আমি আজ; তা ছাড়া হাজাব চারেক টাকা সেলামী তো দেবেই।' মণিকা কথা বলতে বলতে থেমে দাঁড়ালেন। 'বুঝলে, সুতীর্থ? এত কমে তোমায আমি কেন দেব? চাব চাবটে ঘব তুমি আমাব আটকে বেখেছ। অন্য কোথাও দেখ তুমি এখন। আমার কি টাকার দবকার নেই?'

'বাড়ি পাচ্ছি না তো কোথাও।'

'খুঁজে দেখেছ?'

'আমার নিজের বড় দুধেল গাইটা হারিয়ে গেছে আমি খুঁজব না? দিন রাত তো এই নিয়েই আছি।'

'ভাড়াব টাকা ছাড়া আমাদেব তো আর কোনো আয নেই। লেনদেনেব কাববার নেই। বাজাব খরচ চলছে না। বাড়িব অভাবে মানুষ কলকাতার ফুটপাতে নাকে খৎ দিচ্ছে আজ। ডাশা ভেঙে যাচ্ছে নাকেব। হাঘরে কুষ্ঠে খসে পড়ছে।'

বলতে বলতে মণিকা ওপরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বাড়ি ভাড়ার রসিদ এল—পুরো দুমাসেবই রসিদ কেটেছেন পনেবো টাকা বকেয়া নেই। বসিদটা হাতে নিয়ে সুতীর্থ পা দুটো টেবিলের ওপর চড়িয়ে দিয়ে দূবে একটা তেতলা বাড়ির ছাদে লাল ট্যাঙ্কের ওপর এক ঝাঁক কাকের ওড়াউড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মণিকা দেবীর চাকর রসিদগুলো পৌছে দিয়ে গেছে, আগের মত অমলাকে পাঠায নি সে।

দুই

বিকেলটা কাটছিল বিরূপাক্ষদের আড্ডায। বিরূপাক্ষ লোহালক্কড় কাপড় চাল কাগজ ঘড়ি পেন থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনের লেখা সম্পাদকীয় লেখা—সব জিনিসই সর্ববরাহ কবে (যে চায তাকেই) তবে তাব দরদাম ঠিক করা আছে; কালো বাজারের চেয়ে কম রেটে ব্যবসা চালাতে জানে সে ; কাজেই তার ব্যবসা চলছে মন্দ না।

সূচীপত্রে যান

'বিরূপাক্ষ, কি করে হাতিকে হাঁটিয়ে নেয়া যায়?' সুতীর্থ বললেন।

'সর্দার হাতিকে? কোথায়? করাতীদের কাঠ মাথায় চাপিয়ে নদীর দিকে?' বিরূপাক্ষ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রের ভেতর রেখে দিতে দিতে বললে।

'হ্যাঁ, নদীর দিকে, উজানে ভাসিয়ে দেবে।'

'তোমার দুয়োরে গিয়ে ঠেকবে, আর তুমি কাঠের সওদা ক'রে লাল হয়ে যাবে,—সে কি আর রাতারাতি হয় দাদা।'

'তোমার পাঞ্জার ছাপ পড়লে রাতারাতি হয় বৈকি', সুতীর্থ বললে, 'একটা বাড়ি চাই আমার—নিজের ; তিন কাঠা জমির ওপর হলেই চলে—পাঁচ সাত কাঠা হলে ভাল হয়, বালিগঞ্জে টালিগঞ্জে বেহালা চেতলা যাদবপুর সোনারপুরে—'

বিরূপাক্ষ আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কোথায় পাবে তুমি অত টাকা?'

'কত টাকা?'

'তা চাই কিছু ; বেশ ধবধবে ভাগলপুরী চাই—একবার বিইয়েছে।' বিরূপাক্ষ বললে। সুতীর্থ এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'তা হোক, লাখ খানেক লাখ দেড়েকই হোক না হয়। কি ক'রে টাকা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা তুমি ক'রে দাও, বাড়ির ব্যবস্থা কর।'

বিরূপাক্ষ চার জনের জন্যে কফি তৈরি করছিল। ডিশ ভরতি মাখন রয়েছে। আর তিন চারটে ডিশে প্যাস্ট্রি। পাউরুটি স্লাইস ক'রে কাটতে কাটতে বিরূপাক্ষ বললে, 'তুই এত সব চাচ্ছিস তো সুতীর্থ, কিন্তু কোন বাজারেই তো তোর নাম নেই রে—'

অসিত একটা বিড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'একটা বদনাম থাকলেও হত সুতীর্থবাবু। লোকে এক ভাবে মানুষটাকে চিনে ফেলত।'

বিজন একটু মাচার কুমড়োর মত বিকেলের রোদে গা এলিয়ে বসেছিল। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে কিছু বললে না সে।

'আমাকে তুমি বাজারে নামতে বল বিরূপাক্ষ?'

'হ্যাঁ, টাকা পেতে হ'লে।'

'কিসের বাজারে?'

'তিলের তিসির, তামাকের টিকের। তোতাপুরী আম চেন? তোতাপুরী আমের।'

'মাটির ভাঁড়ের, টিনের, ক্যানেস্তারার' অসিত বললে 'পুরোনো কোম্পানীর কাগজের-সের দরে—'

'কিম্বা রতি হিসেবে বেনামী খবরের', বিজন তার চুরুটটাকে একটু জিরোতে দিয়ে বললে, 'না হয় ভরি হিসেবে ছাড়বেন, সুতীর্থবাবু, সোনার চেয়ে ঢের বেশি পড়তা।'

'সরকারের পেটের খবর ফাঁসিয়ে দেবার ব্যবসাটাই সবচেয়ে ভাল', বিরূপাক্ষ বললে, 'আর লাইমজুস, মৌসম্বির রস আর জিন—ড্রাই জিনের—'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ব্যবসার ঘাঁৎঘোঁৎ এমন জলের মত সোজা করে বুঝিয়ে দিলে তোমরা—আমার আর তর সইছে না, তা' একটু বয়ে সয়ে চলতে হবে তবুও—সম্প্রতি আমাকে কিছু জমি কিনে দাও বিরূপাক্ষ, বালিগঞ্জে না হোক ঢাকুরিয়া, নিতান্ত না পাওয়া গেলে বেহালা যাদবপুর হলেও চলবে। টাকা আমি কিস্তি হিসেবে দেব।'

বিরূপাক্ষ চার পেয়ালা কফি প্যাস্ট্রি মুচমুচে টোস্ট সবাইকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিস্তি-বন্দিতে টাকা নিতে আমি অবিশ্যি রাজি আছি। আর কেউ ও সব কথায় কানও দিতে যাবে না। এই হাঙ্গামাটার পর থেকে কলকাতার এ সব জায়গা জমির ওপর সোনার মাকড়ি কানে এঁটে দিনরাত গিন্নীশকুন লাফাচ্ছে।'

'কয় কিস্তিতে টাকাটা দিয়ে দেবে, সুতীর্থ?' বিরূপাক্ষ বললে, 'কলকাতার থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে জায়গার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি সুবিধে দরে।'

'তা হয় না বিরূপাক্ষ, ট্রাম বাসের শেষ ডিপো পেরিয়ে এক মাইল দু মাইলের বেশি যেতে পারব না।'

বিজনের নিভু নিভু চুরুটটা নিভে যাচ্ছিল, এক টান দিয়ে বললে, 'জমি কিনবার, বাড়ি তৈরি করবার এত শখ কেন আপনার, সুতীর্থবাবু?'

'আমি ভাড়াটে হয়ে আর লেপটে থাকতে চাই না,—বড্ড দেমাক আমার বাড়িউলির।'

সূচীপত্রে যান

'তা দেমাক থাকবেই তো। কলকাতার দক্ষিণ পাড়ায় বাড়ি, অথচ বন্ধকী নয়–' বিজন বললে, 'আমাদের বাড়ি আছে বটে, কিন্তু এমন কিছু ভাল বাড়ি তো নয়। কবতে চেয়েছিলুম বালিগঞ্জে, কিন্তু স'রে যেতে হ'ল ঢাকুরিয়ায়। অসিতের বাড়ি অবিশ্যি টালিগঞ্জে, ভালো জায়গায়। বিরূপাক্ষের তিনখানা বাড়ি, দুখানা গাড়ি ঃ একখানা কি জীপ না কি তোমার, বিরূপাক্ষ?'

বিজন নেভা চুরুটে টান দিচ্ছিল; চুরুটটা ভাল কবে জ্বালিয়ে নিয়ে বললেন, 'এ সবের ভেতব এখন আর তুমি নাক ডোবাতে পাববে না, সুতীর্থ। সে সুযোগও নেই আজ আর, সে শক্তিও তোমার নেই। তুমি তো ছড়া লিখেছ এক সময়। হ্যাঁ, বিরূপাক্ষ, সুতীর্থ যখন ছড়া লিখত, তখন আমবা কলেজে পড়তুম না? সুতীর্থের ছড়া পড়েছ তো?'

'পড়েছি', বিরূপাক্ষ বললে, 'ছড়া নয় ও কবিতা লিখত। লিখে-টিখে ও সুবিধে করতে পাবেনি। কে পড়ে ওর পদ্য আজ? ও সব কবিতাব লেখক হিসেবে কে চেনে ওকে?'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আমাব নিজেব অবিশ্যি ভাল লেগেছিল ওর কয়েকটা কবিতা।'

'আমারও ভালো লেগেছিল,' বিজন বললে, 'লেখাব চর্চাটা বাখলে পারতে তুমি সুতীর্থ ; কবিতা নয়, গল্প লিখলে মন্দ হত না। ব্যবসাবিলির ফাঁকে ফাঁকে আমি মাঝে মাঝে গল্প পড়ি। হ্যাঁ হে বিরূপাক্ষ, তুমি পড় না?'

'আমি পড়ি,' বললে বিরূপাক্ষ।

'আমিও পড়ি।' কফির শূন্য পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অসিত বললে।

'সুতীর্থ, তোমাব শ্বশুববাড়িব খবব কি? শুনেছিলাম তোমাব স্ত্রীব খুব কঠিন অসুখ, কি হয়েছিল?'

'কিছুই হয়নি, বেশ ভালোই আছেন।'

'ছেলেপুলে সেই দুটিই তো, না আবও হয়েছে?'

'ওবা তো বলে আর হয়নি।' সুতীর্থ কফি টোস্ট প্যাস্ট্রি বেশ নিজেব হাতে ছেনে ছিঁড়ে ঢেলে চিবিয়ে খেতে খেতে বললে।

শুনে বিজন বিরূপাক্ষ অসিত চোখ টেনে একবাব তাকিয়ে দেখে নিল সতীর্থকে। মুখে কেউ কিছু বললে না, কফি খাচ্ছিল, বাববার তৈবি কবছিল, ঢালছিল, খাচ্ছিল।

'কফি আরো খাবে অসিত? ঠাণ্ডাব দিনে লাগে বেশ। অভয় এলে আবো বসিয়ে ঝালিয়ে ক'রে দিত। সিনেমায় গেছে 'রোটি' দেখতে। আজকাল ঠাকুবচাকবেব গোলাম আমবা বিজন, ওবা আমাদেব মুনিব। তিন বছব ধ'রে তুমি কলকাতায় আছ সুতীর্থ, পবিবাব আনছ না কেন?'

'আমাব পবিবাবকে দেখেছ, বিরূপাক্ষ?'

'না, কেমন দেখতে?'

'তুমি দেখেছ, অসিত?'

'না, কি বকম দেখতে তোমাব স্ত্রী? সুন্দব? দেখাও আমাদেব।'

'তুমি দেখেছ, বিজন?'

'তোমাব স্ত্রীকে দেখিনি আমি, কবে বিয়ে কবেছ?'

'আমাব স্ত্রী ঠিক বলতে পাববে।'

'কাকে বিয়ে করেছে, তাও বলতে পাববে বটে।' বিরূপাক্ষ পটেব থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বললে।

কফিব পেযালাটা নামিয়ে বেখে অসিত বললে, 'তবুও আমবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে থাকি—কিন্তু সুতীর্থবাবু শুধু তাঁর পুরুষার্থক কেবল টেনে বেশ ফুঁকে দিলেন দশটা বছর।'

'কোথায় আছে সুতীর্থ?' বিজন জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষকে।

'কাছেই লেক রোডে না কি লেক ভিউ রোডে—কোথায় সুতীর্থ?'

'গুলজারটা বাঁচিয়েছিলুম তো মন্দ না, কিন্তু এখন তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।'

'তা তো দেবেই, আজকাল সেলামীর বাজাব। দুশো তিনশো টাকায় এদিককার এক একটা ফ্ল্যাট। তুমি কত দিচ্ছ? দু কুড়ি টাকা। তুমি এক কাজ কবে সুতীর্থ'—বলতে বলতে থেমে গেল বিরূপাক্ষ।

'কোথায় আছে পরিবার?'

'পাশগাঁয়ে।'

'কেন আনো নি কলকাতায়? শ্বশুর বড়লোক?'

'এক সময় তালুকদার ছিল বটে, এখন প'ড়ে গেছে—'

'শ্বশুরবাড়ি যাও না, বউকে কলকাতায় আনো না, মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছ কেন মিছেমিছি আর? তোমার টাকা তারা পোঁচে? মন কষাকষির টাকা তো।' বিরূপাক্ষ সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

বিজন হেসে বললে, 'আমি এক বাটিতে চিনি আর এক বাটিতে টাকা রেখে দেখেছি পিঁপড়েগুলো চিনি ফেলে টাকা খাচ্ছে। সুতীর্থের টাকা তার স্ত্রী খাবে না? কি বল তুমি বিরূপাক্ষ? কি হ'ল তোমার মাথা ভালো বাজার চোলাই ধোলাই করে? ধুন্দুলের বিচির মত হড় হড় করছে বুঝি মাথার ভেতর, হড় হড় করছে?'

'পোঁচে তোমার টাকা তোমার স্ত্রী?' বিরূপাক্ষ চুরুটেব ছাইয়ে টোকা মেরে বললে। খানিকটা ছাই উড়ে বিজনের চোখে গিয়ে পড়ল। ঘুষি জমিয়ে দেবে বিরূপাক্ষেব চোয়ালে কপালে বিজন? জমিয়ে দেবে? সাত পাঁচ ভেবে চুপ করে রইল সে। রুমাল বাব করে চোখে ভাপ দিতে লাগল।

'পোঁচে। রসিদ তো পাওয়া যাচ্ছে ঠিক মতনই। আমার স্ত্রীর সই। স্ত্রীকে কলকাতায় আনা সম্ভব হবে না। ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসব এক সময়। জান বিরূপাক্ষ আমাব স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে—' বলে বিরূপাক্ষকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সুতীর্থ।

'লোকটার মাথা খাবাপ হয়ে গেছে-'

সুতীর্থেব সমস্ত উত্তাল উল্লোল শরীরেব কঠিন বাঁধন থেকে নিজেকে ধীবে ধীবে খুলে নিতে গিয়ে আরো বেশি লটকে প'ড়ে বিরূপাক্ষ, বাব বাব বলতে লাগল, 'কী আশ্চর্য, তোমার স্ত্রী তো তোমাকে ভালবাসবেই। এর ভেতব মজার কি আছে বলো তো দেখি। তোমাব স্ত্রী-অন্য কারু তো নয়। কী মুশকিল ও রকম আছড়ে পিছড়ে গোঁত্তা মাবছ কেন হা হা বাঁটেব বাছুবেব মত হাসছে না কাঁদছে, শোন বলি—দেখ না বিজন অসিত—ছাড়বে না তুমি আমায়, ছাড়বে না, সুতীর্থ' তু-মি-আ-মা-য-ছা-ড়-ড়-ড়- ছা-ড়-যে-না-আ-আ-আ-' খুব একটা প্রবল ঝটকায় বিরূপাক্ষ ছিটকে পড়ল সমস্ত তেপয় ও কফিব পেয়ালা পিবিচ নিয়ে আলমাবিটাব ওপব ;-সুতীর্থ তাব মস্ত বড় লম্বা শরীর ও এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলেব ফিঙের ঠ্যাং ডানাব ঝটপটানি নিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে বইল দু এক মুহূর্ত। ওদের তিন জনেব দিকে তাকিয়ে বিষম শীতে আক্রান্ত মানুষেব মত হি হি ক'বে কাঁপতে কাঁপতে ঘব থেকে বেবিয়ে গেল সে।

তিন

দু তিন দিন পবে সন্ধ্যেব সময় বেশ শীত পড়ছে; একটা ছেঁড়া পুবোনো ওভারকোট গায়ে দিয়ে সুতীর্থ ব্যাগ হাতে করে চলছিল। লোকে দেখে মনে কবতে পাবে খুব ব্যস্ত ডাক্তাব হয়তো চলেছে জরুবী কেসে; গলায় একটা স্টেথোস্কোপ জড়িয়ে নিলেই হত। চেহাবাটা ভাবিক্কেব চেয়েও বিষণ্ণই দেখাচ্ছিল। ওভাবকোট কাঁধে ফেলে অফিস থেকে বেবিয়েছে তিনটের সময়। বিকেলেই কোট গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল—তবুও বাস্তায় রাস্তায় ঘুবে বেড়াচ্ছে সে। কী সে চায়? ব্যাগেব ভেতব কী আছে তাব?

'এত ঘুবছ কেন, ট্রামে উঠে পড়ে সুতীর্থ। কে যেন ভিড়েব ভেতব থেকে বললে তাকে।

'ওঃ তুমি—ঘুবেফিরে তোমার সঙ্গেই আজ বাববাব দেখা হচ্ছে কেন, ভবতোষ।'

'আমিও তোমাবি মতন ঘুবছি যে—'

'এই যে বললে সিনেমায যাচ্ছ—'

'না ভাই, যাওয়া হল না।'

'টিকিট তো কেটেছিল—'

'চলো একটা চাযেব দোকানে ঢুকি গিয়ে—'

'আমার সময় নেই, দাদা।'

'কোথায যাচ্ছ তুমি?'

'কোথাও না, এমনি ঘুরছি।'

'তবে সময়ের অভাব কি হল—'ভবতোষ সুতীর্থের ওভারকোটেব কলাবে টান মেরে বললে, 'চলো, শেফালীদের কাছে যাই।'

সুতীর্থ কটাক্ষে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে সংবেদিত করে নিচ্ছিল ভবতোষকে নিজেকে সমস্ত

সূচীপত্রে যান

পৃথিবীটাকেই যেন ঃ কাদের কাছে নিয়ে যাবে ভবতোষ? কারা তারা? কোথায় থাকে? সে তো তাদের কথা ভাবছিল না। ইহ পৃথিবীর কারো কোনো কথা মনেই ছিল না তার ঃ এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

'হল তো? এইজন্যই তো রাতবিরেতে তোমাদেব ঘোবাফেরা। রাতচরা রকমারি সে একদিন ছিল, সুতীর্থ, কোথাও গেলে কি আজ আর পাওয়া যায়—নখদর্পণ ছিল আমাদের মত জলি ওল্ড ডাণ্ডাজদের—'

'জলি ওল্ড ডাণ্ডাজ?'

'আরে ডাণ্ডাজ হস্টেল—উনিশ শো ষোলো-সতেরো—ভুলে গেছ সব?'

'উনিশ শো ছেচল্লিশ তো এখন—'

'তা হোক, ত্রিশটা বছর কেটে গেছে বুঝি হে। কেটে যাক—কাটুক, আমাব কাটেনি—আমার কাটবে না ; একটা চুল পাকেনি, দাঁত নড়েনি। সময় আসছে যাচ্ছে, কিন্তু আরে' একটা সময় আছে যা দাঁড়িযে থাকে সব সময়—যেমন তেল সিঁদুর আসছে যাচ্ছে মুছে যাচ্ছে ; কিন্তু শিবলিঙ্গ—যেদিন চাও যখন চাও তখনই। চলো, ট্রামে উঠি—'

'কোথায যাবে, ভবতোষ—'

'কফি হাউসে চলো—'

'কোনটায?'

'বড়টায—চৌরঙ্গী প্লেসে—'

'না, অত দূর যেতে পারব না। মাফ কবতে হবে। কাছেই একটা চা-কফির দোকানে—'

'সে হয না,—ওরা সব আসবে কফি হাউসে, আমার আব তোমাব জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে সব। স্কার্ফ, শাল, কাশ্মীবী, মির্জাপুবী-সিগারেট খায কেউ কেউ-ক্যামেল সিগাবেট-আমরা গিযে বসলেই হল—'

সুতীর্থ তামাশা বোধ কবছিল। হাত ঘড়িটাব দিকে তাকিযে বললে, 'আচ্ছা, চলো।'

'চলো ট্রাম এসে নিক।'

'কিন্তু কফি হাউসে বাত হযে যাবে, ট্রামে বাসে ফেববার উপায থাকবে না তো। সাড়ে সাতটা আটটাব সময তো ট্রাম বন্ধ হযে যায—'

'কফি হাউস থেকে ফেববার দরকার হবে না। ওদিকে ওদেবি কারু বাড়িতে কাটিযে দেব রাতটা। বেশি বাতে ট্যাক্সি...ফিটনে...কবে বালিগঞ্জে ফেরবার কি দবকার। আসবে না কি ফিবে?'

ভবতোষ গলা খাঁকরে বললে, 'কই টিন বার কব।'

'সিগাবেট খাওয়া ছেড়ে দিযেছি, ভবতোষ।'

'আচ্ছা, তবে এই নাও—' বলে নিজেব মুখেব থেকে ব্রাযাব পাইপটা নামিযে সুতীর্থের হাতে গুঁজে দিতে গেল ভবতোষ। জিনিসটা প্রত্যাখ্যান কবলে সেটা বাস্তায গড়াগড়ি খেত, কাজেই পাইপটা হাতে তুলে নিল সে।

'খাও, তামাক খাও, সুতীর্থ।'

'নিবে গেছে যে।'

'জ্বালিযে নাও, এই যে দেশলাই—'

'এই যে ট্রাম এসে পড়েছে—'

পাখিদের ডানা গজায যেখানে সুতীর্থদেব শরীবের সেই জাযগাটা আঁকড়ে টেনে ফুটপাতে তাকে চড়িযে দিযে ভবতোষ বললে, 'নাও, পাইপটা জ্বালিযে নাও আগে। ঘাবড়ে যেও না—আকচাব ট্রাম আসছে ; পালিযে যাচ্ছে না। ধাঁই কবে একটায চড়ে পড়লেই হবে।'

ট্রামটা চলে গেল।

'তোমাব মুখের পাইপ আমি কি করে খাই?'

'দাও তাহলে', ভবতোষ ঘনবর্ষার কুমড়ো ক্ষেতের কাঁকড়াব মত গাঢ় চোখে তাকিয়ে বললে, 'তুমি দেখবে আমার মুখের কফি তিনি কি করে খান।'

পাইপটা জ্বালিয়ে নিল সে। দ্বিতীয় ট্রামটাও চলে গেল, দু-তিনটে বাসও।

'যাবে যদি তবে চলো।'

'সবুব-' পাইপ টানতে টানতে ভবতোষ কথা বলবার সময় পাচ্ছিল না। নিজেকে চাঙ্গা করে নিচ্ছিল, কথা ভাবছিল।

সূচীপত্রে যান

'এই যে বাস—'সুতীর্থ বললে।

'ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে', মুখের থেকে পাইপ নামিয়ে বললে ভবতোষ, 'বাসে-ট্রামে চড়ে কেউ কখনো দক্ষকন্যাদের সভায় যায়?'

'জলি ওল্ড ভবতোষ-'

'জলি ওল্ড সুতীর্থ, ত্রিশটা বছর কেটে গেছে, একটি মুহূর্তও কেটে যায়নি। আমরা এই ছিলাম ডাওাজ হোস্টেলে, অগিল্ভিতে ওয়ানে—চোখের পলক না পড়তেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি বাসবিহারী এভেন্যুতে। একই তো সময়, একই প্রবাহ ঃ রয়ে গেছে, বইছে ; আমরাও আছি সমস্ত সময়ের সঙ্গে চিৎ হয়ে, কাৎ হয়ে. তেবছা কান্নিক মেবে।'

ভবতোষ পাইপটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধবে টানতে আবম্ভ করল।

'কবে তোমাব সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, সুতীর্থ? স্কটিশ থেকে বেবিয়ে দেখা হয়েছিল কি আর?'

'মনে পড়ে না তো।'

'আমাকে চিনলে কি কবে-চেহাবাব কোন বিষটিষ মবেনি তো? এখনও বেশ লেজে দাঁড়ায়?'

'হ্যাঁ, পুরনো মানুষ দেখলেই চিনতে পাবি। এই যে ট্যাক্সি—'

'এনতার আসবে ট্যাক্সি—' ভবতোষ সুতীর্থেব আস্তিন ধরে টেনে তাকে দাঁড় কবিয়ে দিয়ে বললে, 'এনতার আসবে জিপ—ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন!'

'রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'মেযেবা উড়ে যাবে কফি হাউস থেকে বেশি রাত হলে? এই ভয়? সুতীর্থ?'

'আমি তো কাজে যাচ্ছিলুম, মিছিমিছি ঠেকালে কেন আমাকে।'

সুতীর্থ ভবতোষেব চোখ এড়িয়ে চাবদিকে তাকাতে তাকাতে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিল; কোথাও সেলুনে কামিয়ে নেবে কি না ভাবছিল।

'কাজে যাচ্ছিলে, আমি ল্যাং মাবলুম আর পেঁচোয় পেল বুঝি লাল-গোপালকে—হেঃ হেঃ ধনগোপালকে—বেশ তো আমি সবে দাঁড়াচ্ছি— যেখানে খুশি চলে যাও-' সুতীর্থ লম্বা শবীবে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সাত-পাঁচ ভাবছিল।

'কী কাজ তোমাব—কী কাজ আছে এই ব্যাগেব ভেতব? পবিবাব নিয়ে আছ কলকাতায? যাচ্ছিলে কোথায শীত-বাতেব লক্ষ্মীপেঁচাব মত ঃ কলকাতাব কালপেঁচাবা ধাড়ি ইঁদুবেব ঘ্যাট বেঁধে বেখেছে বুঝি? লে ঝপাঝপ কবে ঝাঁপিয়ে না পড়লে মূলে হাভাত কবে দেবে?'

পাইপটা নিবে গিয়েছিল ভবতোষেব, ফুটপাতেব ওপব খানিকটা তামাকেব ছাই ঝেড়ে ফেলল সে।

'আমি চলি, ভবতোষ।'

'যাও।'

'নাকি ট্যাক্সি কবব?'

'করতে পার।'

'বাঃ, বেশ চুকলি কাটছ তুমি, ভবতোষ।'

পকেট থেকে পাউচ বার কবে খানিকটা তামাকপাতা তুলে পাইপেব ভেতব ভবতে ভরতে ভবতোষ বললে, 'সাধনা কবে ও-সব জিনিস পেতে হয়, আমি তোমাকে এমনিই দিয়ে দেব? ট্যাক্সি কববে কব ; বেড়িয়ে আসতে চাচ্ছি-চলো। কিন্তু মেয়েদেব কাছে নিয়ে যাওয়া হবে না।'

'চলো একদিকে—বেড়িয়ে আসি—' নিজের গলাব শিথিল অনিশ্চযতা অনুভব কবে একটু অপ্রীত হয়ে সুতীর্থ বললে।

'চলো, তোমার স্ত্রীর কাছে যাই।'

সুতীর্থ ভবতোষের চোখ ছুঁয়ে একবাব তাকাল, একটা চলন্ত ট্রামেব দিকে তাকিয়ে বললে, 'সে তো এখানে নেই।'

'কোথায গেছে তা হলে?'

'বাপের বাড়িতেই থাকে। এখানে আসে না।'

'এখানে আসে না? কেন, ছেলেপুলে নেই তোমাদের?'

'এক ছেলে, এক মেয়ে!'

'তবে?'

'সে আমাকে ভালবাসে না।'

ভবতোষ পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'বুঝেছি আমি। আমারও ওই রকমই। তবে আমি শ্বশুরবাড়ি ফেলে রাখিনি, এখানেই আছে ; আছে বটে তবুও না রাত চরলে চলে না আমার। তোমার তো চলবেই না—কি করে চলবে তোমার। চলো, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে যাই-'

'যাবে কফি হাউসে?'

'যেতে পারি', ভবতোষ পাইপ টানতে টানতে বললে, 'কিন্তু সেখানে ওরা অপেক্ষা করবে না আমাদের জন্যে এত রাতে-ওই হামলাটার পর।'

সুতীর্থের কাঁধের ওপর হাত রেখে তার বুকের ওপর আঙুল বুলোতে বুলোতে ভবতোষ বললে, 'তা ছাড়া, ওদের দিয়ে এখন আমাদের চলবে না। আমরা চাই সহৃদয় মহিলা। তোমার কথা শুনে আমার মন ভিজে গেছে। ডাকো ঐ ট্যাক্সিটাকে। ভালো ঘরের সুন্দর প্রকৃতিস্থ মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাতে রাত জমানো যায় সে ব্যবস্থা আমি তোমায় করে দিচ্ছি, ওই যে ট্যাক্সি—'

ট্যাক্সিটা দূরে ছিল—তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে গিয়ে সেটাকে ডেকে এনে সুতীর্থ এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল যে ভবতোষ নেই কোথাও; পাইপের ধোঁয়ার গন্ধ হাওয়ার থেকে মিলিয়ে যায়নি যদিও, তবুও মানুষটাকে খুঁজে পেতে হলে আবার তিরিশটা বছর অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

চার

ব্যাগ হাতে করে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল সে—কোন পথিক তাকে দেখলে বুঝবে লোকটা অন্যমনস্ক। কিন্তু কি নিয়ে যে সে কথা ভাবছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে নিজেই সে তার কোন সদুত্তর দিতে পারত না। একটা শূন্যতা আধো-শূন্যতায় নিমেষনিহত হয়েছিল তার মন, সেখানে বিশেষ কিছু নেই। বিশেষ কিছু থাকবার প্রয়োজনও নেই। মনটাকে স্থিরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল তবুও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বলয়।

সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায় যে সে বিয়ে করেছে, তার ছেলেমেয়েও আছে, তার বয়সও চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু পাশগাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়ি আছে বলে মানুষকে যে সে অহরহ ভাঁওতা দিয়ে চলেছে সে নামে কোন গ্রাম আছে পৃথিবীতে? আছে তার স্ত্রী? কবে সে বিয়ে করল যে তার স্ত্রী সন্তান থাকবে?

ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ কেমন যেন একটা ধ্বন্যালোক বোধ করছিল, চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে;—সেটা না আলো, না অন্ধকার কেমন একটা আবছায়ার দেশে মৃত্যুকে তার আধো প্রবঞ্চিত করতে ইচ্ছে করছে—জীবনটাকে ভাল লাগছে আধাআধি। হাঁটতে হাঁটতে এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে, কোন গলির ভেতর দিয়ে কোন্ সুড়ঙ্গের দিকে চলেছে খেয়ালই ছিল না তার ঃ ট্রামের শব্দ অনেক দূরে, বাসও কাছে কোথাও নেই। কোথাও এঞ্জিনের হুইসল্ শোনা যাচ্ছে—মহিষ ডাকছে—এক-আধটা মোটর হু হু করে উড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ট্রামের রাস্তায় গিয়ে পড়ল সে আবার। অন্যমনস্কভাবে যে হাতটা চেপে ধরল সেটা রোগা নোংরা মড়ার মত ঠাণ্ডা।

'কে রে তুই?'

ছেলেটা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করাতে সুতীর্থের সম্পূর্ণ মনোযোগ ফিরে এল তার দিকে।

'ছেড়ে দিন বাবু, আমি করব না আর তোমার পায়ে পড়ছি বাবু।'

'কি নাম তোমার?'

'আমার নাম হারান।'

'বাপের নাম কি?'

'শোভান।'

'শোভান? মুসলমান? আবদুস শোভান?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'শোভান ঘোষ।'

'শোভান? শোভন বল্, শোভনলাল। শোভনলাল ঘোষ।'

ছেলেটা কেঁচোর মতো পাক খেতে খেতে বললে, 'শোভান ঘোষ।'

'পকেটে হাত দিয়েছিলে কেন?'

সূচীপত্রে যান

'সুতীর্থ ছেলেটির হাত চেপে ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছিল; পোয়াটাক মাইল হেঁটে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল নিজের বাড়ির কাছেই সে এসে পড়েছে।

'তোর বাবা কোথায়?'

'নেই।'

'কেন, কি হ'ল তার?'

'ছুরি মেরেছিল বাব্বাকে, ম'রে গেছে।'

'কে মারল?'

'ঐ দাঙ্গার সময় বেরিয়েছিল একদিন শেয়ালদ'র বাজার থেকে মাছ কিনে বৌবাজারে বিক্রি করবে বলে, আমরা সবাই না করেছিনু, শুনল না–'

'তোরা ক' ভাই?'

'এক বোন আছে আমার, আব কিছু নেই। মুকে ছেড়ে দাও বাবু, পাযে পড়ি তোমাব, কলকাতার মনিষদের ভয লাগে আমার। আমি তো তাদের কোনো অমান্যি করিনি, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে। আজ রাতেই মজিলপুর চলে যাব, আর কারুব পকেটে হাত দেব না। কজনকার কাটনু পকেট আমি? বাবু?'

'এই দশ–বাবো জনের কেটেছিস। মজিলপুর যাবি আজ বাতেই? পাযে হেঁটে?'

'হ্যাঁ কত্তা, সেখানে আমার মা বাবা আছে?'

'এই যে বললি তোর বাবা মরে গেছে।'

ছেলেটি কেমন একটু ভয পেযে বললে, 'বাবা তো ম'বে গেছে, মজিলপুবে আমাব মা আব বাবা থাকে।'

'তার মানে?'

তার মানে অনেক কিছুই হতে পাবে। ছেলেটি কিছুই বোঝাতে পারল না, কোন কথাই সে বলতে পারল না আর।

'কাঁদছিস? তোর বোন কোথায়?'

'তাকে চুবি ক'রে নিযে গেছে।'

সুতীর্থ যে রকম ছেলেটিব মাংসের ভেতব আঙুল বসিযে দিযে তাব হাত চেপে ধবেছিল সেটাকে ঢিলে ক'বে নিয়ে বললে, 'তোব সবটাই আজগুবি হাবান। তোব বাপ মবেছে, তবুও মা বাবা মজিলপুরে। বোনকে কে চুবি করলে বে?'

'আমাব বোনকে মনুবাবু।'

'সে কে?'

'মনুবাবু।'

সুতীর্থ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আচ্ছা, বুঝেছি।'

'মনুবাবু এল মেদিনীপুর থেকে। মন্ত্র পড়ে কড়ি উড়িয়ে দিল, কড়ি মাথায আটকে গেল আমাব বোনেব। গোখরো সাপেব মত কড়ি মাথায মনুবাবুব সঙ্গে চলে গেল বোন মেদিনীপুব'।

'তারপর কি হল?'

'দিন ছেড়ে। আপনাব পাযে পড়ি হুজুর। আমার হাতটা ছেড়ে দিন, একটা মজাব জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে–'

সুতীর্থ তাকে ছেড়ে দিতেই ছেলেটা ভোঁ দৌড় দিযে পালিযে গিযেছিল প্রায ; ছেলেটাব পিছু পিছু ছুটে তাকে ধ'রে এনে দাঁড় কবিয়ে সুতীর্থ বললে, 'তুই এই রকম হারান?' ছেলেটিব পিচুটি ও চোখেব জলে অবসাদ ও নিরাশা এসে পড়েছে ঃ একটা লিকলিকে ছিপছিপে বানরেব বাচ্চাকে কেউ যেন মানুষের শাবকে পবিণত করতে গিযে হযবান হযে ফেলে রেখেছে।

'তুই ঘুমুচ্ছিস, হারান?'

'মাথা নেড়ে সে ইশারায জানাল জেগে আছে।

'ঘুমুবি?'

'না।'

'খাবি?'

সূচীপত্রে যান

'না।'

'কি করবি তা হ'লে?'

'আমাকে ছেড়ে দিন, এখন যাব আমি মিঞা সাহেবের ওখানে।'

'মিঞা সাহেব? সে আবার কে রে?' সুতীর্থ কৌতুক বোধ করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হারান একটা ঢোঁক গিলে বললে, 'শোভান মিঞা।'

সুতীর্থ দাঁড়িয়েছিল, চলতে চলতে বললে, 'শোভান ঘোষ না বললি?'

'মিঞাও বলে কেউ কেউ।'

'কোথায় থাকে?'

'আগে মদনপুর থাকতুম আমরা, তারপর আলিপুরে তারপরে বেকবাগানে টালিগঞ্জে, এখন থাকি জানবাজারে–'

মনে মনে এই সব নিরবচ্ছিন্ন ব্যাসকূটের মীমাংসা করতে করতে সুতীর্থ বললে, 'তবে মজিলপুরের কথা বলেছিলে কেন?'

'সেখানে আমার মা থাকে ; মা বাবা।'

'আর জানবাজারে?'

'বাবা।'

সুরসাল এই পৃথিবী ; পাঁচমিশেলি সব আলোড়ন এসে বিধ্বস্ত করে একে ; প্যাঁচালো মানুষের মন ; বিচিত্র এই পৃথিবীর শিশুরা ; ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমার হাত ছাড়ুন, পকেট থেকে পয়সা বের করছি।'

'পয়সা কোথায় পেলি?'

'গীট কেটে দু টাকা মতন হয়েছে।'

সুতীর্থ ছেলেটির হাত ধ'রে থেকে বললে, 'আজ ক'দিন বসে এই রোজগার হ'ল? আজ একদিনেই সব পেলি বুঝি?'

'হুঁ' বলে সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বললে, 'পাঁচ সিকে দিতে হবে শোভান মিঞাকে, আর বারো আনা মার জন্য রেখেছি এই বারো আনা তোমাকে দেব বাবু?'

হারান সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

হারান—যদি কোনো প্রাণের গভীর থেকে থাকে তার, তা হ'লে সেই গভীর থেকেই কথা বলছে, (সুতীর্থের চোখের দিকে তাকিয়ে) মনে হচ্ছিল সুতীর্থের। কোনো নারী পুরুষ বা শিশুর কাছ থেকে এরকম আশ্চর্য, অকপট তলদেশ থেকে আবেদন এসেছিল কি সুতীর্থের কাছে? এসেছিল একবার—একটা ইঁদুরকে কলে আটকে যখন সে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল; একটি শিশু তাকে বাধা দিয়েছিল, একটি নারী পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল ; ইঁদুরটা নিজেও শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকলকেই ব্যর্থ করেছিল সুতীর্থ।

সুতীর্থ 'বারো আনা পয়সা তোর মাকেই দিস, হারান', বললেও হারানের বিশ্বাস হ'ল না। সে আবার কবুল করল।

সুতীর্থ বললে, 'আমার পকেটে তো হাত দিয়েছিলি, ওখানেও কিছু ছিল, যাঃ তোর মাকে দিস্–'

'দেব মাকে?' অবুঝ অবিশ্বাসী ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে কেমন নাক মুখ চোখের বিশ্বস্ততায় পরিণত হতে লাগল হারানের।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে চল, আমি তোকে পুষব। তুই তো বানরের সঙ্গে বানরের বিয়ে দেখেছিস ; দেখতে দেখতেই শোভান ঘোষের ঘরে জন্মালি। এবার আয়, আরো কিছু দেখবি–' বলতে বলতে সুতীর্থের মন পরিবেশ ছেড়ে অনেক দূরের প্রত্যন্তে চলে গিয়েছিল হাত আলগা হয়ে গিয়েছিল তার, ছেলেটি দাঁড়াল না আর ; বান মাছের মত সাঁ করে সটকে হঠাৎ কখন ঘাই মেরে অন্ধকারের সময়প্রসূতির ভেতর ডুবে গেল—সুতীর্থ আর খুঁজে পেল না তাকে।

যাক, চলে যাক।' সেই যে সে একদিন কলে আটকে ইঁদুরটাকে নদীর জলে ডুবিয়ে মেরেছিল সেটা এমন কিছু বৃহৎ নিষ্ঠুরতার কাজ নয় ; সেই শিশু যে বাধা দিয়েছিল, সেই বয়স্ক মেয়েটি যে শোভন বিষণ্ন চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল, তারাও এমন কিছু প্রেমাত্মা পুণ্যাত্মা নয় ; এই হারান—এও বা কি। এরা চলে যায়।

তোমরা তোমাদের আধুনিক ও যা আধুনিক নয়—সময় ও কাজ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হও বা না হও সেটা তোমাদের নিজেদের জিনিস। সেই সুন্দর ক্ষুরধার নিশীথ পথে এরা কে? কেউ তো নয়। কেউই কি নয়।

পাঁচ

কয়েকদিন কেটে গেছে।

সুতীর্থ সেলুনে ঢুকতেই হেড নাপিত তাকে 'আসুন' বলেই আবার তার দিকে তাকিয়ে তৃতীয়বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'বসুন আপনি, এই এখুনি হয়ে যাবে।'

রৌদ্রের দিনে হঠাৎ এক ঝাঁক ধাধাবর কাকাতুয়া উড়ে এসে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লে যে রকম বুক ধড়ফড় করে তেমনি কেমন একটা আশ্চর্য স্পর্শে চমকিত হয়ে হেড নাপিত মধুমঙ্গল ভাবছিল ঃ

'এ সুতীর্থ না? এর সঙ্গে তো গালিফপুর ইস্কুলে পড়েছিলুম। এতদিন পরে এর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। হয়তো চিনতে পারছে না আজ আমায় ; আমিও ধরা দেব না।'

সেলুনে আটটা সিটের সাতটাই খালি ছিল—কিন্তু অসময়ে নাপিতরা কেউই প্রায় হাতের কাছে ছিল না। একজন বাজারে—একজন টাকা ভাঙাতে—একজন চা খেতে গেছে। ব্রাশ ক্ষুর কাঁচি পাউডারের বাটি লাইমজুস তেল, পাফ, চুল ছাঁটবার ক্লিপের ছড়াছড়ির ভেতর একটা বড় আয়নার সামনে গিয়ে বসল সে। সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে 'বলব না আপনি অসময়ে এসেছেন,' বলে ফেলে নিজের মনের গহনে একটু জিভ কেটে কি না কেটে মধুমঙ্গল চৌধুরীবাবুদের বাড়ির ছেলেটির টাক মাথার চুলে আরো কিছু কারসাজি প্রায় শেষ করে আনতে লাগল।

'অসময় বই কি তোমাদের খাওয়া-দাওয়া আছে তো—' সুতীর্থ বললে।

'আমরা জোট বেঁধে খাই না। ঐ যে সুবোধ এসে পড়েছে। কি রে, চলতে ফিরতে বুড়ো হয়ে গেলি যে। টাকা ভাঙিয়েছিস্? নে হাত চালা, চৌধুরীবাবুর ড্রেসিংটা করে দে, আমি এই বাবুকে দেখছি।'

সুতীর্থের কাছে এসে হেড নাপিত বললে, 'আমার নাম মধুমঙ্গল।'

'ওঃ।'

'কেমন নাম?'

'ভালই তো।'

মধুমঙ্গল সুতীর্থের সঙ্গে গালিফপুর ইস্কুলে পড়েছে, এমনিও ফক্কুড়ি করতে ভালোবাসে খুব, মাঝে মাঝে ঠোঁট কাটা হয়ে পড়ে—যার তার সঙ্গে। সুতীর্থ মধুমঙ্গলের সহপাঠী ছিল, কিন্তু সে সব ইস্কুলী ইয়ার্কি এখন আর চলে না। টেনে মেনে যা চলে যতটা চলে হিসেবে রেখে মধুমঙ্গল বললে, 'কেমন নাম মধুমঙ্গল বললেন?'

'কিন্তু তোমার মুখে বিড়ির গন্ধ মধুমঙ্গল।'

মধুমঙ্গল সুবোধের দিকে ফিরে বললে, 'একটা কথা সুবোধ, বিপিন যদি বাজারে না গিয়ে থাকে তাহলে তাকে বলিস—' বলে সুবোধের কানের ভেতর একটা কথা ছেড়ে দিয়ে মধু সুতীর্থকে বললে, 'তামাক টানি দিনরাত, বড় বদ অভ্যেস—কিন্তু বিড়ির গন্ধটা খুব নিরেস লাগছিল আপনার?'

'তোমার কাজে মন দাও, মধু।'

'এগুলো তো সুগন্ধি বিড়ি, নাপতেনীরা খুব পছন্দ করে ; সুখটান দিয়ে যে যায় তাকে আর ফেরায়না, স্বর্গের গলা জলে দাঁড় করিয়ে গোন বেঁগোনের জল হয়ে ছলছল করে ঘিরে থাকে সারা রাত। আপনার চুল ছাঁটতে হবে?'

'কথাই তো বলছ তুমি। বেলা চড়ে গেছে, চার দিককার সেলুনগুলো বন্ধ, সেই জন্যেই তোমার খুব পায়া ভারি—চুল ছাঁট, চুল ছাঁট—'

বেশ নিপুণ ও মোলায়েম হাতে সুতীর্থের বুক পিঠ ঘাড় চাদর দিয়ে মুড়ে নিল, ঘাড় ঘেঁষে কান ঘেঁষে পাউডার পাফের আঘাত করতে করতে মধুমঙ্গল বললে, 'এখন আমাদের নাওয়া খাওয়ার সময়, এ সময় মুরুব্বিরা কেউ আসে না। দোকানটা এখন বন্ধ করেই রাখতুম, তা আপনি এসেছেন বলেই খুলে রেখেছি। ফাউ কাজে কথা বলবার সময় সারা দিনরাতের ভেতর নাই, কিন্তু এই সময়টিতে মুখ নেড়ে বড্ড সুখ, আ হা হা। মুখ নাড়লেই পব্বত।'

'চুল ছাঁটবে?'

সূচীপত্রে যান

'ছাঁটছি।'

'দেখো।'

'দেখছি।'

'কেমন যেন মেজাজ বিগড়ে আছে তোমার।'

মধুমঙ্গল কোন কথা না বলে প্রথমে কাঁচি চালাতে চেষ্টা কবল, নিল ক্লিপ হাতে, সেটাকে এক আধ মিনিট চালিয়েই আবাব কাঁচি, এবাব একটা নতুন ঝকঝকে—

'কোন্ ইস্কুলে পড়েছিলেন?'

'আমি? গালিফপুর ইস্কুলে। কেন ইস্কুলের কথা জিজ্ঞেস কবছ কেন?'

'এমনই—' মধুমঙ্গল বললে।

গালিফপুর ইস্কুল! রোদের ভেতরে পালকের ঝাড়ে এক ঝাঁক আশ্চর্য চন্দনা পাখি আগেই তার ঘবের ভেতবে এসে পড়েছে—এবারে পক্ষীমাতা নিজে এল যেন অনেক বোদ ছড়িযে বাতাস উড়িয়ে। গালিফপুব ইস্কুলেব সেই সুতীর্থ না, এই যাব চুল ছাঁটছে সে? মধুমঙ্গলকে চিনছে না সে, কিন্তু তবুও সেই ইস্কুলের কবেকার সূর্য বাতাস আসা ভালোবাসা শযতানী চিপটেনীব নিদেন মানুষটা তো কাছেই বসে আছে;—সুতীর্থ এল ত্রিশ-পঁযত্রিশ বছর আগেব ঘুমেব ভেতর থেকে গা ঝাড়া দিযে উঠে, আজকেব দিনগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে, যা অনেক আগে ছিল এখন নেই, সে সবেব চমৎকাব আখ্‌খুটে কোলাহলে উনিশ শো এগাবো উনিশ শো বাবো উনিশ শো তেবো-কেই পৃথিবীব শেষ সত্য বলে প্রবাহিত করে। একটা দুটো তিনটে অভিভূত নিঃশ্বাসে মধুমঙ্গল যা গ্রহণ কবল তা মাটি ঘাস রৌদ্র মাস্টার লক্ষ্মী ছেলে আব লক্ষ্মীছাড়াদের সুরভিত এক পঁযত্রিশ বছব আগেব পৃথিবী, পঁযত্রিশ হাজাব বছব বেঁচে থাকলেও উজ্জ্বলভাবে সমসাময়িক হয়ে থাকবে যাব সঙ্গে মধুমঙ্গলেব মন।

'মধুমঙ্গল।'

'বলুন।'

'বেশ ছাঁটছ তুমি।'

'হুজুব খুশি হলেই ভালো।'

'কি মিঠে তোমাব হাত, কোন নাপিতটাপিত নয়, আমাব মাথাব চুল যেন হিজল শিরীষেব পাতা চোত মাসেব বাতাসে। চোতেব বাতাস তুমি মধুমঙ্গল-'

হেড নাপিত কোন কথা বললে না। চৌধুবীবাবু কিছুক্ষণ হয চলে গেছে। সুবোধও বেবিযে গেছে। ঘবেব ভেতব কেউ ছিল না আর। মধুমঙ্গল এক মনে চুল ছেঁটে যাচ্ছিল ঃ যাব সঙ্গে সে পড়েছে একদিন, যে তাকে চেনে না আজ সেই মানুষটিব। এত অবেলায, কিংবা কোন সুবেলাযও এত ভাল কবে এত মন দিযে কারু চুল সে বকম ষষ্ঠেন্দ্রিয দিযে ছেঁটেছে মনে পড়ছিল না মধুমঙ্গলেব।

'একটা সিগাবেট বেব কবে নিতে দাও তো হেড নাপিত। এতদিন পবে তোমাব কাছে চুল ছেঁটে আমাব পাড়াগাঁব কথা মনে পড়ল। সেখানে ছিল আমাদেব উমাচবণ নাপিত। তার হাত, চিরুনিব আশ্চর্য যাদু—সে জিনিস উনিশ শো দশ সালেই নষ্ট হযে গেছে আমাদের পৃথিবীর থেকে—এখনো যেন আমাব চুলে লেগে আছে। ওস্তাদেব পোকে খুঁজে না পেযে ঘুমিযেছিল যাদুটা—পঁযত্রিশ বছব ; তুমি এসে তাকে উমাচবণেব মত জাগিযে দিযেছ আবার। তোমাব হাতে আমার বগেব চুল আর চাঁদিব চুল, আমার আজিডাঙাব চুল কাজিডাঙাব চুল কথা বলে উঠছে মধুমঙ্গল—'

'কি হল উমাচবণের?'

'উমাচবণ নেই।'

'কোথায গেল?'

'মবে যেতে দেখি নি তাকে, তবে উনিশ শো দশেই আমাদের গাঁ ছেড়ে কোথায যে সে চলে গেছল, আমবা দেশে থাকতে আব ফেরে নি। এখন কোথায আছে কে জানে। উমাচরণ আমাকে সুতীর্থ বলে ডাকত।'

'আপনাব নাম-'

'হ্যাঁ। সুতীর্থ।'

'আপনি আবশিব দিকে তাকিযে দেখুন তো কেমন হল।'

'দরকাব নেই, আমাব ভেতরে হয়েছে।'

মধুমঙ্গল বোধ হয় চিরুনির ছুঁইয়েই চুল ছাঁটছিল বিনে কাঁচিতে, মনে হচ্ছিল সুতীর্থের।

'আপনার চুল ছাঁটতে বেলা শেষ হয়ে যাবে আমার দেখছি।'

'তা হোক, উমাচরণেরও হাত। তুমি ছাঁটছ, মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের পারে অশোক স্তম্ভের পাশে ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মন্দিরে একা বসে আছি খুব বেশি রাতে ; আমাকে ঘিরে দেবদাসীদের নাচ, চুপচাপ, তাদের চুল নিঃশ্বাস ননা মাংস তাদের হাত–'

'বিড়ির গন্ধটা,' গলা খাকরে নিয়ে মধুমঙ্গল বললে, 'মিইয়ে এসেছে বুঝি, সুতীর্থবাবু?'

'কই, পাচ্ছি না তো আর'

পাবেন না মধুমঙ্গল চুলে হাত দিলেই বাবুদের সিদ্ধির নেশা চড়তে থাকবে।'

'মধুমঙ্গল।'

'ঠিক আছে।' সুতীর্থের ঠোঁটের সিগারেটটা জ্বালিয়ে দিয়ে মধুমঙ্গল বললে, 'একটা কথা আপনার কাছে।'

সুতীর্থ সিগারেট টানছিল, কিছু বললে না।

'বলছি আপনাকে', মধুমঙ্গল বললে, সুতীর্থের মাথার চুলের দিকে নিজেকে সে ন্যস্ত করে রাখল কিছুক্ষণ, কাঁচি নেই ; চিরুনিই নেই যেন, হাত দিয়ে বিলি কেটে চুল ছাঁটছে মধুমঙ্গল। মনে হচ্ছিল সুতীর্থের।

'মধুমঙ্গল—এই নামটা আপনার চেনা চেনা লাগছে?'

সুতীর্থ দু এক মুহূর্ত সিগারেট টেনে, নাপিতের চাদরের ভেতব থেকে হাত বার করে ছাই ঝেড়ে সিগারেট টানতে লাগল, কোন কথা বললে না।

'শোনেন নি এ নাম আগে কোনদিন?'

'তোমার কাছেই তো শুনলাম আজ।'

ভুলে গেছে সুতীর্থ। মধুমঙ্গল বুকের ভেতরে একটা ভারি নিঃশ্বাস পাতলা কবে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারি হযে বেরিয়ে এল। তার এই নাম নিয়ে সুতীর্থও যে তাকে ঠাট্টা করত, ঠাট্টা কবে সকলেব সামনে তাকে ছিঁড়ে ফেলে তারপরে কি মনে করে কাছে ডেকে প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিতে পুকুরেব পাড়ের গাছ থেকে তার জন্যে অহেতুক অকপট পাৎ বাদাম পেড়ে আব জলের ভেতর থেকে পানফল উপড়ে এনে সে সব পুকুর দীঘির দেবাংশী মাছ আর জলঠাকরুণদের মত চোখে মধুমঙ্গলেব দিকে তাকিযে তাকে হাতের কাছে টেনে নিত। এ সব আজ ত্রিশ বত্রিশ বছব আগের কথা। সময ও সংসাবের হাতে নিরবচ্ছিন্ন মার খেয়ে মধুমঙ্গলের নামের এই ঠাণ্ডা জল ফলের মত ছিটেটুকু ছাড়া কি আর আছে সেই সাবেক কালের? সেই ইস্কুলের ছোকরা মধুমঙ্গলকে যদি এখানে এনে দাঁড় করানো যেত, কপালের ডান দিকেব আবটা দেখেও এই হেড নাপিতকে সে চিনতে পারত না আজ। এইটেই দুঃখ কষ্টেব কথা—এই কুশ্রী কঠিন পরিবর্তন—বালকের কাছে প্রৌঢ়ের এই নিরেট উৎখাত। মনটা ঠিকই আছে মধুমঙ্গলের হৃদয ঠিক জায়গায় আছে, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে শ্রীচেহারার কোন মিল নেই যে। এদিক দিযে বেশ খানিকটা মিল মিশ রয়েছে সুতীর্থের ভেতরের ও বাইরের। সুতীর্থ বড় হযেছে বটে, বুড়ো হযেছে, কিন্তু তবুও সে নিজের যৌবন নিজের কৈশোরের থেকেই বেড়েই বড় হয়েছে ; এরা চেনে সুতীর্থকে ; কিশোর সুতীর্থকে ধরে আনলে আজকের এই বড়টাকে সে মুহূর্তের মধ্যেই নিজের প্রতিচ্ছবি বলে চিনে নিতে পারত কিন্তু মধুমঙ্গল তো নিজের যৌবন কৈশোরকে কাল নাগের দাঁতে কেটে ফেলে ভেলায় করে পাঠিয়ে দিয়েছে ত্রিস্রোতায়—পচা মাংসের ঢোল নিয়ে ফিরে এসেছে ভেলা। কোথায় গেল পঁচিশ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের পৃথিবী? মনটা তো ঠিকই আছে, কিন্তু, আহা, সেদিনকার সমাজ সংসার দিন ক্ষণ রূপ যৌবন এ রকম পচে ছিবড়ে হযে গেল।

'তুমি রসিয়ে রসিয়ে চুল ছাঁটছ হেড নাপিত, আস্তে আস্তে। ভালো। কিন্তু আমার উঠতে হবে তো।'

'বসুন, সন্ধ্যের সময় গিয়ে নাইবেন। চৌবাচ্চায় ধরা জল আছে?'

'না।'

'পাম্পে জল আসে?' ইলেকট্রিক পাম্প?'

'হ্যাঁ।'

'পাম্প কার?'

'বাড়ীওলার— সুতীর্থ বললে।'

সূচীপত্রে যান

'বসুন তাহলে', মধুমঙ্গল বললে, 'চুল ছাঁটি আপনার। এত বেলায় কলকাতার বাড়ীওলা পাম্প চালাতে দেবে না।'

'যদি বাড়ীউলি হয় সে!'

'নাঃ', মধুমঙ্গল কাঁচিটা রেখে দিয়ে আর একটা কাঁচি তুলে নিয়ে বললে, 'সে সৎগুষ্টির মেয়েও দেবে না। বসুন। এই যে চেঁদো মাথার ভদ্রলোক বসেছিলেন ওর নাম মহীন চৌধুরী, ওর টাকা সুদে আসলে পুষিয়ে দিয়েছেন আপনি। এত চুল আপনার, অথচ পাকা চুল কোথায়। বয়স কত হল?'

'চল্লিশ পেরিয়ে.গেছি', সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, তোমার নিজের খাওয়াদাওয়া নেই, মধুমঙ্গল—কেমন লটকে পড়লে যে তুমিও আমার চুল ছাঁটার অছিলায় মধুমঙ্গল?' মধুমঙ্গল অনেকক্ষণ হয় ক্লিপ ছেড়ে দিয়েছে। ক্লিপ সে বড় একটা ব্যবহারই করে নি আজ। পাড়াগাঁয়ের উমাচরণের মতন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে যাচ্ছিল—ধীরে ধীরে—শান্ত মোলায়েম নিপুণতার সঙ্গে।

'দাড়িটা আপনার না কামিয়ে ছেঁটে দিলে ভালো হয়?'

'কেন?'

'এ তো এক মাসের দাড়ি আপনার গালে। সবুর করুন, কাঁচি দিয়ে ঢঙের দাড়ি বানিয়ে দিই।'

'না, না, নূর নয় তো কামাতে হবে। আমি দাড়ি রাখি না কখনো।' সুতীর্থ একটু ঝেঁঝে উঠে বললে।

'কলকাতাব নাপিতের ক্ষুবে দাড়ি কামাবেন?'

'কি হবে?'

'আজই তো দিন চাবটে গরমির রুগীকে কামিয়েছি।'

'কে তুমি?' সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে, কি করে জানলে, তুমি তাদের ও রোগ হয়েছে?'

'সে আমার জানা আছে। আমিও তো রুগী। আমাদের নিজেদের মুখ চেনাচিনি আছে।'

সুতীর্থ আরশির ভেতবে মধুমঙ্গলেব কালো নীল মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওটা বুঝি বাস্তু সাপ, ঘরে ঘবেই আছে?'

'আছে বই কি, আমার সাপ আমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু আপনাকে কাটতে পারে। ক্লিপের আঁচড়ে ছিড়ে যেতে পারে, ক্লিপ ধরিনি তাই ; ঘাড়ের ক্ষুর লাগাব না আপনার। দাড়ি এখানে আপনি বরং নাই বা কামালেন।

সুতীর্থ সেলুনেব দেয়ালেব চাবদিকের কিমাকৃতি সব ছবিগুলোব দিকে তাকাচ্ছিল, ক্যালেণ্ডারের ছবি আছে, বিলিতি আর্ট আছে, দিশী মহাভাবত ও ভাগবত যে সব ছবিতে বিকণ্টকিত হয়ে উঠেছে তাও মনের ভেতর নেশা কেলাসিত করতে না পারলেও উথলে তুলতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে, তন্ত্রে, সুতীর্থ ভাবছিল, সাবাৎসাবের উপমা প্রতীক হিসেবে প্রথম ও অন্তিম বস কেমন সনির্বন্ধে এসে দাঁড়িয়েছে।

'মধুমঙ্গল আমি দাড়ি কামাব।'

'নাপিতের ক্ষুরে? যদি রক্তে দাঁত হয়?'

'হোক। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।'

'এটা বোকার মত কথা বলা হল।'

সুতীর্থ দেয়ালের একটা ছবিতে মেয়ে পুরুষের খোলাখুলি কেমন একটা আকাট তাৎপর্যের দিকে দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, 'বোকা তুমি আমাকে বলতে পার। কিন্তু সম্প্রতি আমি কোনোদিকেই মন দিতে পারছি না। চলো আমাকে নিয়ে কোন জায়গায়—চলো, আমি টাকা দেব। এখানে চানের সুবিধে আছে?'

'আছে বই কি।'

'ভালো সাবান আছে? ক্ষিধেও পেয়েছে। খেয়ে-দেয়ে কোথাও ঢুকে পড়ে দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্—রাতটাও। দু'তিন দিন থাকতে পারলে তো ভালোই। খুব অন্ধকার চাই—খুব চুপ চাপ। যেন জীবনটা একটা শীতের ঘুমটানা রাত ছাড়া আর কিছু নয়-দেশ গাঁয়ের শীতের চারদিকে খেজুর গাছ কুয়াশা পেঁচা ; রাত কোনদিন ফুরুবে না। ঘুমের থেকে অন্য ঘুমের ভেতর চলে যাবার পথে মাঝে মাঝে একটু জেগে ওঠা—এই স্বাদ ; এ ছাড়া ঘুমের কোন শেষ নেই। এই সব—যা চাচ্ছি-কয়েকটা দিনের জন্যে দেবে তুমি আমাকে।'

সুতীর্থ তার কথা শেষ না করতেই ভেতরের ঘর থেকে খন খন করে বেজে উঠল যেন কাব গলা ঃ

'হো রে মদু মঙ্গইলা, হো মউধ্যা, তর হইল কী রে—'

'এতক্ষণে বুঝি তোর ঘুম ভাঙ্গল' মধুমঙ্গল গায়ের জ্বালা ঝেড়ে বললে।

'তর সঙ্গে কথা কয় ক্যাডা রে?'

মধুমঙ্গল মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করে চুল ছাঁটতে ছাটতে বললে, 'তুই ভাত খেয়েছিস বিপনে?'

'তুই খাইলে তবে তো খাইমু।'

'যা, যা চান করে আয় গে যা, দিক করিস নি–'

'তর লোগ পাগলের লাহান কথা কইছে ক্যাডা? কথাব লওন আছে থোওন নাই মানুষটা ক্যাডা? এই দুফুইবডার সময নি চুল ছাঁটে। চুল ছাঁটতে আইছে না চুলেব আঁটি বাঁধতে—দল ঘাসের আঁটি—ছলিমদ্দি সইসেব লাহান?'

'তুমি যদি ফের কথা বলিস বিপনে—তা হলে ক্ষুব নিয়ে আসছি।'

'কি করবি তুই' আমাব । রোজই তো ক্যাল্লা ছুটাস। তুই আমার বাপ কর্ণ, আমি হইলাম গিযা রঞ্জাবতীর ছাওয়াল। আয আয় দাতা কর্ণ আয়, করাত দাও, কুড়াল যা হাতেব কাছে পাস হেইযা দিযা দে গলা দু ফাঁক কইরা। বাইচ্যা থাইকা আর সুখ নাই।' কাঁচি চিরুনি দেরাজেব ওপব ছুঁড়ে ফেলে মধুমঙ্গল ঝট করে ও ঘরে ঢুকতেই লোকটা আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিযে গড়াগড়ি খেতে খেতে কিল চড় ঘুষি লাথি হজম করতে লাগল—একটা টু শব্দও কবল না।

ফিরে এসে মধুমঙ্গল দেখল, সুতীর্থ একটা ঝকঝকে কাঁচি তুলে নিযে তাব হাঁটা চুলেব ওপব বাহাব কাটবার চেষ্টা করছে।

'এটা ভাল করছেন না, সুতীর্থবাবু।'

'কেমন একটা ঝুঁটি রেখেছ তুমি সমস্ত মাথা জুড়ে। এই কি ভাল চুল ছাঁটা হল, মধুমঙ্গল—'

মধু একটু বিক্ষুব্ধ হযে বললে, 'লোকে দেখে কি বলে সেটা আমাকে শুনিযে যাবেন–'

'লোকে কি বলে? আব আমি কি মনে কবি সেটা কিছু নয?'

চুলে ড্রেস কবতে কবতে মধুমঙ্গল বললে, 'দাড়ি থাক তা হলে আজ।'

'দাড়ি কামাতেই তো এখানে এসেছি মধু! যে আফিং খায তাকে খেলে কাল–দাগ 'লাল' হযে যায—' সুতীর্থ লালের ওপব জোব দিযে ঠাট্টা করে এক আধ ফোটা হাসি ছিটিযে বললে, 'কী কববে আমাকে তোমার বোগ?'

'না, পঞ্চ রং–এ মাতাল আর সাপেব বিষে কি-করবে।'

'নাও, ড্রেসিং চটপট সেরে নাও। দাড়ি কামাও। তাবপব যাব।'

'কোথায?'

'ঐ যে বললুম।'

'সে গুড়ে অনেক দিন হয বালি প'ড়ে গেছে, স্যাব। আমাদেব কোনো চেনা বাড়িউলি নেই, বাড়িই নেই, লোকের মাথা পাতবাব জাযগাই নেই। মন্বন্তব দাঙ্গা হাঙ্গামা দুটো যুদ্ধ কালোবাজাব মিলিটাবিবা সেঁটে চিবিযে খেযে গেছে সব ; হাড়গোড়েব ছিবড়ে শুঁকতে আবশোলাবা শুঁড় নাড়ছে, তাদেব ঠ্যাং ফড়ফড় করছে, ফড়–ফড় করছে। চান সেই ঠ্যাং ? দিতে পাবি তবে। সে ঠ্যাং তো আপনাব নিজেবি। কাব বক্ত–মাংস চাইছেন আপনি? কাব আছে? কে দেবে আপনাকে?'

দাড়ি কামানো শেষ হলে মধুমঙ্গল বললে, 'দশ বছব ধবে এখানে কাজ কবছি, আপনাকে তো দেখিনি কোনোদিন। এ পাড়ায় থাকেন নিশ্চযই সেলুনে চুল কাটাবার দাড়ি কামিযে নেবার বেশ এলেম তো আপনার ; এ পাড়ায সবাই তো আমার সেলুনেই আসে–'

'এখানে আমি আসিনি আগে আর।'

'এখন থেকে আসবেন তা হলে—

'কি মনে করেই আজ শোভাবাজারে এসে পড়েছিলুম, মধুমঙ্গল ভূতেই টেনে এনেছে মনে হয। আমি থাকি বালিগঞ্জে ; ওদিকে একটা ব্রাঞ্চ খুলতে পার তোমার ঘাট–কামানোব দোকানের?'

সুতীর্থ পালিশ গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'পযমন্ত নাপতেনীর হাত গো তোমাব,—সুবিধে পেলেই আসব ; মোক্ষম ; আমার আর কিছু সুবিধে করে দাও না, যা বলছিলুম—'

'মানে উমাচরণকে চাই?'

সূচীপত্রে যান

'না, উমাকে!'

'সে হয় না।' মধুমঙ্গল কিছুতেই ধরা দিল না!

সুতীর্থ চলে গেল। দাম দিতে ভুলে গেল মধুমঙ্গলকে। সেও চাইল না। দামের জন্যে নয়, দামতে কিছুই নয় লোকটার জন্যেই তার ঠিকানাটা জেনে রাখলে পাবত মধুমঙ্গল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও জিজ্ঞেস করতে পারল না। বালিগঞ্জে যাবে? উত্তবে মানুষ সে—সমস্ত দক্ষিণ দিকটার নামই তো বালিগঞ্জ ; ওখানে কে কাকে খুঁজে পাবে? দশ বছরের মধ্যে একবারও গিয়েছে ও মুল্লুকে মধুমঙ্গল? পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেব ইস্কুলেব সেই সব ফোর্থ থার্ড সেকেণ্ড ক্লাসের ইয়ারদের কথা মনে কবে ঝুম হয়ে থাকবার মত মন মধুমঙ্গলেব নয়! কিন্তু তবুও চান নেই—খাওয়া দাওয়া নেই—মেঝেব ওপব কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল সে। ঘুমোতে দেবী হ'ল।

ট্রামে উঠে সুতীর্থ ভাবল, মধুমঙ্গলের দামটা দেওয়া হল না, আর একদিন এসে দিযে যেতে হবে; ওকে চিনি আমি ও তো সেই গালিফপুর ইস্কুলের মধুমঙ্গল চক্রবর্তী, ওকে ভাল লাগত আমার খুব খেয়ালী ছেলে ছিল, পড়াশুনো তাস ক্রিকেট অ্যাক্টিং যাতে হাত দিত—বেশ সেঁটে—পাঞ্জা জাঁকিয়ে। ভাবি ডাঁটেব মাথায চলত ফিবত, কথা বলত, ভারি তালেবব ছেলে ছিল ; নাপিত হযেও তাই আজ হয়েছে হেডনাপিত, মধুমঙ্গল কি অ্যাসেম্বলির স্পিকার হতে পারত না, কিংবা মন্ত্রী? দু'মাস তালিম কবে নেবাব সময় দিলে ও সে সব কাজ ঠিক চালাতে পারবে ; ও সবই পাইযে দিত আমাকে ইস্কুলে পড়তাম যখন। সব জানে সব পাবে ; এখনও ওব মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল সর্বসিদ্ধিদাতাব হাতীব শুঁড় নড়ছে যেন—এমনই নাড়া দিয়েছিল আমাকে যে ওকে বলেছিলাম বেশ একটা নিবরলীন অন্ধকাবের দেশে আমাকে কয়েকদিন কাটিযে দেখাব সুযোগ দিতে পারে কি না। সেখানে কিছুকাল থাকলে ফিবে এসে তারপব এই সব বাতাসে বোদে কী উৎসাহ পেতুম আমি, কী আলোকোৎসাবিত মনে হত এই পৃথিবীকে। কিন্তু মধুমঙ্গল তা হতে দেবে না ; ওব বিশ্বাস, যে তা হলে বোগ হবে, নষ্ট হযে যেতে হবে ; তা হয বই কি, কিন্তু সে রোগ হতে দেব কেন, আজ না হয অকৃতী সমাজেব দোষে নেশাব সঙ্গে বোগেব নিবেট নিষ্ফলতা মিশে আছে, কিন্তু একদিন এমন নিয়ন্ত্রণ আসবে না কি যখন অন্ধকাব ও আলো, মৃত্যু ও জীবন ব্যবহাবেব সে ঢের অতল গভীব আনন্দেব প্রবাহকে কোনো রোগ কোনো অনাবোগ্য অপদর্শন এসে অসফল কবে দিতে পারবে না আব। আজই তো সতর্কতা আছে, ওষুধি আছে ; নিবেস গণিকাবৃত্তিও আছে। ওরা যে নাবী মা বোন এ বকম মন--সাফাই মনোভাবও আছে। এ সব পথে নয, কোনো ওষুধেব প্রযোজন হবে না শবীরেব বা মনেব জন্যে, শবীবই শুধু তাগিদ বোধ কববে না, হৃদযও–দু'জনেবই ; কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট জীবনকালেব জন্যে নয—হযতো এক রাত্রিব জন্যে, কিংবা সাতটি আলোকিত দিনেব জন্যে। কিন্তু মানুষেব মন ঢেব বেশি নির্দোষ—রাষ্ট্র খুব বিশেষভাবে উজ্জ্বল না হলে এ জিনিস সম্ভব নয। কি, অসাধ্যসাধনের জিনিস মধুমঙ্গলেব মত বেচাবাব কাছে চেয়েছিল সে। যে মাত্রাবোধ চাপা পড়ে গিযেছিল—ধীবে ধীবে ফিবে আসছে। সাদা চেতনায মন স্থিব হযে উঠলে আবো বেশি স্থিব হযে পড়ে—আজকের এই অপজাত পৃথিবীতে সে স্থিবতা বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয ; সুতীর্থেব মুখেব প্রতিফলিত কেমন যেন তপঃকৃশহাসিব পেছনে প্রকৃত মুখটাকে অর্থস্থলকে দেখা যাচ্ছিল তার ; কিন্তু ট্রামেব কোন যাত্রীরা দেখতে পেল না কিছু।

ছয়

অন্ধকাবের ভেতব দিযে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপবে উঠতে সুতীর্থেব সঙ্গে প্রায গা ঠোকাঠুকি হযে গেল। মণিকা সিঁড়ির কিনাবেই দাঁড়িযে ছিলেন, চাকরটাকে পাঠিযেছিলেন একটা ওষুধ কিনতে, কিন্তু সে বড় দেরি করে ফেলেছিল ; মণিকা নিজেই একবাব নিচে গিযে দেখে এসেছেন, ফিবছে না চাকর ; ওষুধ নিযে না ফিরলে ওপবে যেতে পাবছেন না তিনি।

'এই যে মানুষ যে—'সুতীর্থ বললে।

'তাই তো দেখছি, এত রাতে তোমার উদয যে!'

'চোখ বুঝে চলেছিলাম, তোমাব গাযে লেগে গেল বুঝি।'

'তুমি ভেবেছিলে পাথর দাঁড়িয়ে আছে বুঝি।'

'রাত কটা হবে?'

চাকর ওষুধ নিয়ে সর সর করে ওপরে চলে গেল, মণিকা দেখলেন ; সুতীর্থের চোখে পড়ল না। সুতীর্থ সিঁড়ির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

'দয়া করে যে রাস্তার দরজাটা বন্ধ করে দাও নি, ওটা আটকে রাখলে আমাকে দেয়ালের পাইপ বেয়ে উঠতে হত। বড্ড রাত হয়ে গেছে আজ। চলো আমার ঘরে। ঘর খোলা যে?' দু' এক পা এগিয়ে গিয়ে সুতীর্থ বললে।

'খোলা রেখে গিয়েছিলে বলেই এতক্ষণ আমাকে আগলে বসে থাকতে হল, এবার আমি চলি–'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ওপরে।'

অংশুবাবু কি ফিরেছেন?'

'খেয়ে-দেয়ে ওর এক ঘুম হয়ে গেছে।'

সুতীর্থ হঠাৎ প্যাসেজের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বললে, 'রাত হয়েছে তবে। আচ্ছা, ওপরে যাচ্ছিলে যাও। অংশুবাবুর হয়তো কিছু দরকার হতে পারে।'

'কি আর দরকার হবে এত রাতে।'

'এক ঘুম তো হয়ে এল প্রায়, তারপরেই তো দরকার।'

মণিকা দাঁড়িয়েছিলেন, মাথার ওপর থেকে ঘোমটা ঠিক নয়, আঁচলটা খসে গেছে খোঁপার ওপর, আঁচল চড়াতেই বাতাসে খসে গেল আবার; গলায় জড়িয়ে নিলেন আঁচল ; সুতীর্থের সামনে ঘোমটা দেবার কি দরকার তাঁর ; সুতীর্থ দু এক বছরের বড় হতে পারে মণিকার চেয়ে, কিন্তু নিজের ছোটর মতনই তো তাকে দেখেন তিনি। তাই অনুভব করেন না? ভাবছিলেন।

সুতীর্থ নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকে বললে, 'বোস।'

'বসব না, ভয় আমার মেয়েটার জন্যে।'

'কে অমলা? ঘুমোয়নি?'

'ঘুমিয়েছে, কিন্তু ছ্যাঁৎ করে জেগে ওঠে তখন আমাকে কাছে না পেলে কাণ্ডই করবে।'

'নিশির ডাকেও হেঁটে চলে না কি অমলা?'

'কাকে বলে নিশির ডাক?'

'ঘুম চোখে যে মানুষ হেঁটে বেড়ায়, মাঠ, ঘাট, প্রান্তর পেরিয়ে যায়, তবুও ঘুম ভাঙে না, জান না, শোন নি?'

মণিকা গালে হাত দিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, তেমন ঘুম থাকে না কি আবার। কই, শুনি নি তো কখনো দেখি নি তো কাউকে। তুমি দেখেছ?'

মণিকার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'নিশিতে পাওয়া মানুষ? কত কত দেখেছি। আমি নিজেই তো হেঁটে চলে যেতাম এক সময় মাঠ, ঘাট, ঝিল, জঙ্গল তেপান্তর ভেঙে—পাড়াগাঁয়ে থাকতাম তখন—'

'তারপর কি হ'ত?'

'হঠাৎ ঘুমের ঘোরটা ভেঙে গেলে টের পেতুম সব।'

'বড্ড ভয়ঙ্কর জিনিস তো ; ঘুমের নেশায় হেঁটে চলা ; এখনো আছে নাকি এ রোগ তোমার?'

'না, কলকাতায় এসে সেরে গেছে, পনেরো বিশ বছর আগে দেশ গায়ে থাকতে নিশির ডাকে চ'রে বেড়াতুম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছ মণিকাদি বোস—জলচৌকীতে কেন কুশনে বোস।'

কুশনে নয়, একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে প'ড়ে মণিকা বললেন, 'চা খাবে?'

'না।'

'টিনটা তো বের করেছ সিগারেটের অনেকক্ষণ। খাও, আমি উঠি।'

'বোস, সিগারেট রেখে দিচ্ছি। ও আমি খাই না, এমনিই নাড়ছিলুম টিনটা।' সুতীর্থ সিগারেট বের করল না, দেশলাইটা সরিয়ে রাখল, লঙ কোটের দু পকেটে হাত ডুবিয়ে মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে লাগল।

'শীত করছে না তোমার?'

'কই না তো, গরম হয়ে আছি।'

'কলকাতায় বেশ একটু শীত পড়েছে এবার।'

'কলকাতায় শীত নেই' সুতীর্থ পকেটের ভেতর থেকে হাত বার করে এনে বললে।

'কোটের নিচে শার্ট নেই তোমার?'

'না এ লঙ কোট।'

সূচীপত্রে যান

'গরম?'

'গরমের দিনে পরা যায়।' সুতীর্থ বললে।

মণিকা বেতের চেয়ার থেকে উঠে একটা সোফায় ঠিক হয়ে বসে বললেন, 'হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্বনাশ ঘটাতে পার। তুমি অন্তত একটা চাদর গায়ে দাও না কেন? বোস, তোমার জন্যে একটা ধোসা নিয়ে আসছি।'

'এখন তো ঘরে ফিরেছি। বেশ গরম লাগছে ঘরের ভেতর। যখন বাইরে বেরুব তখন দিও ধোসা।'

'তোমার লেপ নেই?'

'কম্বল আছে।'

'লেপ তৈরি করাও না কেন?'

'আগে পরিবার এসে নিক।' সুতীর্থ সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে নিল।

'রাত হয়ে গেল উঠি।'

'অংশুবাবু তো ডাকবেন জেগে উঠেই, তখন গেলেই হবে। পৌঁছে দেব তোমাকে-'

'তার মানে?'

সুতীর্থ সিগারেট জ্বালিয়েছিল, কিন্তু না টেনেই নিবিয়ে রাখল, টানবার ইচ্ছে ছিল না তার, মণিকা দেবীও মুখোমুখি বসে আছেন ; টানবার রুচি নেই ; সিগারেটটা কোটের পকেটে রেখে দিল।

মণিকা বললেন, 'মুটিয়ে গেছি, শরীরে বাত ধরেছে, ওঠানামার পথে একজন লোক চাই বুঝি আমার? তোমার আগে কুতবমিনারের মাথায় চড়ব গিয়ে আমি, সুতীর্থ তুমি নিচে পড়ে হাঁপাতে থাকবে। চলো, যাবে নাকি!'

'কোথায়-কুতবে?'

'চলো অক্টারলোনিতে।'

'ওঠা যায় নাকি ওটায়?'

'চলো দেখে আসি—কে আগে ওপরে ওঠে—মোটা না রোগা, ঢেমনা না লাউডগা ; কে কাকে ছাদে পৌঁছিয়ে দেয়, মাটিতে নামিয়ে আনে-রকমটা দেখে আসা যাক আশ মিটিয়ে-'

'চলো, দেখে আসি', সুতীর্থ বললে, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মণিকা মজুমদার। তুমি ভেবেছ, আমি তোমাকে বেতো বলেছি, তা নয় ; তোমার বাত নেই, বেশ সুন্দর ছেঁচো শরীর, বেশ লম্বা ছাঁদ। ছিপছিপে চেহারা হলেই অনেকের ভালো লাগে। আমার দেখে শুনে রয়ে সয়ে লাগে ঃ খুব খারাপ হতে পারে, আমাদের দেশে প্রায়ই মড়াদের ওরকম চেহারা হয়। সুস্থতা না থাকলে সুন্দরী হওয়া যায় না কোনো দেশেই, আমাদের এ দেশে তো নয়ই। তোমাকে ওপরে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলুম—অন্য কারণে। চলো, তাহলে—'

'কোথায়?'

'অক্টারলোনি মনুমেন্টে-'

'এত রাতে?'

'তুমি যাবে বলছিলে?'

'ট্রাম বাস তো চলছে না এত রাতে।'

'ট্যাক্সিতে চলো।'

'ওপরে একটা শব্দ শুনছ না?'

'কই না তো।'

'আমার মনে হয় জেগে উঠেছেন-'

'সুতীর্থ মণিকার চোখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করে নিচ্ছিল সে চোখে ঘুম ঘনিয়েছে না আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকার ইচ্ছে—ওপরে না গিয়ে সুতীর্থের এই নিচের ঘরে বসে থেকে।

'নাকি অমলাই দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠল। শুনলে না তুমি?' মণিকা বললেন।

'ও কিছু নয়, তোমার মনে ধাঁধা। এই বারে শীত পড়েছে।' সুতীর্থ র‍্যাকের থেকে একটা জহর কোট নামিয়ে গায়ে চড়াল।

'সারা রাত তোমাকে জাগতে হয় বুঝি মণিকা দেবী, অংশুবাবুর হাঁপানির টান, তোমার মেয়ের—'

সূচীপত্রে যান

'মেয়ের জন্যেই আমার ভাবনা বেশি। কি যে সব বাজে বকে ঘুমের ঘোরে সারা রাত। তা ছাড়া ওর হার্ট ভাল না লাংসও খারাপ। একটুতেই সর্দি–কাশি ধরে যায়, একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না, অ্যাঞ্জার্স খাওয়াচ্ছি।'

'অ্যাঞ্জার্স তো পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। পেলে আমিও খেতাম।'

'তুমি? কি রোগ হল তোমার? সর্দি–কাশির ধাত নয় তো। অ্যাঞ্জার্স কালো বাজারে পাওয়া যায়। আমি অবিশ্যি কন্ট্রোল যোগাড় করে দিতে পারি। তোমার চাই?'

'অংশুবাবুর ধরে অ্যাঞ্জার্সে?'

'ধরা ধরি' একটা ক্লান্ত রক্তকণিকা যেন আস্তে মোচড় খেতে না খেতেই নিটোল দিব্য হয়ে বেরিয়ে এল মণিকার নিঃশ্বাসে ; বললেন, 'উনি ও–সবের বাইরে চলে গেছেন।'

'ওর হাঁপানি কি কিছুতেই সারানো যাবে না?'

'এ তো সারবার রোগ নয়। ও'র যা বয়স, ও বয়সে এ রোগ সাবে না আর। সব রকম চিকিৎসাই হয়েছে, দৈবী ওষুধও যেখানে যা খোঁজ পাওয়া গেছে—মানুষ সেধে দিয়ে গেছে। মানুষের হাত পা ধরেও কত কি যোগাড় করে নিতে হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, তিতিয়ে গেছে সব—' বলতে বলতে কেশে উঠলেন মণিকা। মনে হল, পাঁজরের ভেতর থেকে একটা গলিত ব্যাং হাঁকড়ে উঠেছে; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গায়েব হয়ে গেল সেই কুৎসিত ক্লিষ্ট প্রাণী, পটের সৌন্দর্য নিয়ে বাংলার পটের অন্তঃকৌমুদীর আলো নিয়ে ফিরে তাকালেন মণিকা দেবী।

'তোমারও ঠাণ্ডা লাগল'—সুতীর্থ বললে।

'না, এটা ঠাণ্ডার কাশি নয়।'

'তা নয় হয়তো ; অংশুবাবুর জন্যে বা আর কারো জন্যে সত্যমিথ্যা আবেগে অভিভূত হতে থাকলে শরীরের ভেতর কাজকর্মে একটু বাধা পড়ে, বুক ভারি হয়ে ওঠে কিছুটা গলায় শ্লেষ্মা আটকে যায়, কাশতে হয়, ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমার এই কম্বলটা গায়ে দিয়ে বসো।'

'দাও, কিন্তু তুমি',—কম্বল জড়িয়ে নিয়ে মণিকা বললেন, 'তোমার শীত করছে না? লং কোট জহর কোটে মানাচ্ছে?'

'খুব। আমি তো এখন ঘুমুচ্ছি না', সুতীর্থ বললে, 'তোমার মেয়ে অমলাকে আমি একদিন দেখেছিলুম। তুমি কিছু মনে করবে না চমৎকার চেহারা ওর, কিন্তু ভেতরে যে জিনিস থাকলে পাঁচী পটলীও ছোকরাদের গুণ করে রাখে—' সুতীর্থ কোটের পকেট থেকে সিগারেট বার করে নিয়ে বললে, 'অমলার তা নেই। ওর বাপের কাছ থেকেই এ সব পায়নি বলে মনে হয়।'

মণিকা দমে গেছেন মনে হল না, অপ্রীতও কি হয়েছেন? সুতীর্থের এসব কথা গায়ে মাখবার মতো মনে করেন বলে মনে হয় না। বললেন, 'ওর বাবা আমার চেয়ে ঢের উঁচুদরের মানী লোক ; যা জান না সে বিষয়ে কথা বলতে যাও কেন?'

'সিগারেটটা কোটের পকেটে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ একদৃষ্টে মেঝের একটা অকিঞ্চিৎকর ছকের দিকে তাকিয়ে ছিল।

'তুমি উঠলে?'

'তোমার কম্বলে বড্ড বেশি গরম।'

'তাই তো এরই মধ্যে ঘামিয়ে উঠেছ দেখছি।'

কম্বলটা সরিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছতে মণিকা বললেন, 'মেয়ে কি মার কিছু পায়নি?'

'পেয়েছে বই কি।'

'কি পেল?'

'তোমার রূপের অনেকটা। সবটা নয়। গোড়ার দিকটা অন্তত। ভবিষ্যতে এ রূপ কেমন হয়ে ওঠে দেখবার জন্যে আমি থাকব না। সত্যি গরম লাগছে। বড় নচ্ছার এই কলকাতার শীত। শীত যাকে বলে তা তো নেই—'

'কোটটা খুলে ফেলল?'

'আমাকে এক কাপ চা করে দিতে হবে।'

'এত রাতে? কিছু খাবে না?'

সূচীপত্রে যান

'না।'

'আমি তো তোমার জন্যে খাবার করে রেখেছি।'

'কোথায়?'

'আমাদের রান্নাঘরে ; চাপা আঁচে চড়িয়ে রেখে এসেছি সব। বেশ গরম আছে।'

'কি আছে খাবার?'

'ভাত ডাল মাছের তরকারী—সবই—

হাত পা খানিকটা কালিয়ে আসছে অনুভব করে সুতীর্থ কোটটা আবার এঁটে নিতে নিতে বললে, 'না, খাব না বেশি জিনিস কিছু। দেরাজে কমলা লেবু আছে ; এক কাপ চা চাই।'

দই আর চা খেলে হয় না, সুতীর্থ?'

'কম্বল গায়ে দিচ্ছ যে আবার? শীত করছে?'

'কটা বাজল?'

'সাড়ে এগারো। একটার সময় চা হলে চলবে।'

'অত রাত অব্দি কার উনুনে আঁচ থাকে?'

'ইলেকট্রিক স্টোভটা—'

'কিচেনে নেই। সেটাকে তো সরিয়ে নিয়েছি।'

'কোথায়?'

'অমলার বাবার বিছানার কাছেই একটা তেপয়ের ওপর রেখে দিয়েছি। রাতে ও'র পিঠে কোমরে সেঁক দিতে হয় ; সারা রাতই। একটার সময় তুমি কেন চা খাবে?'

'তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করা যাক। একটা দেড়টা নাগাদ।'

'আমাকে এখুনি উঠতে হবে—'মণিকা বললেন। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মণিকা দেবীর চোখের ভেতর কতখানি উঠবার উপক্রম রয়েছে, কতটুকু আরো দু-চার মুহূর্তে বসে থাকার সঙ্কল্প—

'ভাড়ার কথা বলব ভাবছিলুম তোমাকে। পনেরো টাকা বাদ দিয়ে দু-মাসের ভাড়া দিয়েছ তুমি। কিন্তু আগেকার আরো কয়েক মাসের ভাড়া বাকি আছে।' মণিকা বললেন।

'এই রকমই বাকি পড়ে থাকবে আমার।' সুতীর্থ মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'দু শো আড়াই শো টাকায় ভাড়াটে বসাতে পারি সেলামী পেতে পারি। আজকাল আমাদের টাকার দরকার। ওঁর ভালো চিকিৎসা করাতে হবে-হয়তো চেঞ্জে যেতে হবে। ভাড়ার টাকা ছাড়া আমাদের তো উপায় নেই কিছু ; কোনো দিক দিয়ে কোন আয় নেই আর।'

এবারেও সিগারেটটা নিবিয়ে ফেলবার জন্যেই যেন জ্বালিয়েছিল সুতীর্থ, কিন্তু নিবিয়ে দিল না, ধীরে ধীরে টেনে যেতে লাগল। মণিকা বসেই ছিলেন—সুতীর্থ কোনো কথা বলবে কি না বলবে সে সবের প্রতীক্ষায় নয় হয়তো-এমনিই একটা অপরূপ হেতুপ্রভব অহেতুকতার পরিমণ্ডলের ভেতর।

'আমি তা হলে চলে যাই মণিকা দেবী—'

'কোথায়?'

'কলকাতা ছেড়ে।'

'কলকাতা ছাড়তে হবে কেন? চাকরী ছেড়ে দিয়েছ নাকি? দেও নি? তা হলে কি—বাড়ির অভাব? তা কলকাতায় কে বাড়ি পায় আজকাল। একটা কাজ কর তুমি। মণিকা হাতের পাশের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললেন, উনি আজকালই অমলার বিয়ে দিতে চান, তুমি একটি ছেলে যোগাড় করে দাও।'

সুতীর্থ সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে চুপ করে ছিল, নিষ্ক্রিয়তায় রাতের ঠাণ্ডায় নিবে গেছে সিগারেটটা। সেটাকে হাতের কাছে দেরাজের ভেতর ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, 'ও রকম ঘটকালি করে কি ভালো বিয়ে হয়?'

'আমাদের তো হয়েছিল।'

তা হয়নি যে তা সুতীর্থ জানে ; মনকে চোখ ঠার দিয়ে অংশুবাবুর সঙ্গে বনিবনাও করে নিয়েছেন মণিকা দেবী। এঁদের দু'জনের বিবাহমিলন তাসের বাড়ি নয়, তবে খুব শক্ত বাড়িও নয়। নানারকম ভূমিকায় চিড় খেয়ে আসছে ; সে রকম কোন বিষম ধাক্কায় কি হয় কে জানে। সে সব ধাক্কা আসে না

অবিশ্যি আমাদের দেশের এই সব ঘরানা মহিলাদের জীবনে। এলেও তা নিয়ে আড়ালে ভাপে রান্না তৈরি হয়—মৃত্যুঞ্জয় সূর্যে কোন শস্য ফলায় না।

'তোমার আর অংশুবাবুর বেলায় খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে, মানতে হবে ; কিন্তু আগেকার সে সব দিন কোথায় এখন আর? তারপরে তো আরেক পৃথিবী এসে পড়েছে—'

সুতীর্থের কথায় কান না দিয়ে মণিকা বললেন, 'অমলার জন্যে ভালো বর জুটিয়ে দেবে। পারবে তুমি। এ বিয়েতে উনি এত খুশী হবেন যে, এ তিনটে ঘর তোমাকে আগেকার প্রি-ওয়ার রেটে ছেড়ে দেবেন ; দু-চার মাসের ভাঙা বাকি পড়ে থাকলেও খুঁৎ-খুঁৎ করবেন বলে মনে হয় না।'

জানালা দিয়ে হু-হু ঠাণ্ডা আসছিল—শীতের রাতের হাঁকরা মুখ থেকে উদগাবিত ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। কখন যে খুলে ফেলেছে গায়ে কোট ছিল না সুতীর্থের হাড়ে কাঁপুনি লেগে গেল যেন তাব ; বললে, 'আমি কি করে অমলাকে বিয়ে কবি মণিকা দেবী, সে কি আমাকে ভালোবাসে?'

উত্তর দিকের দুটো জানালাই বন্ধ করে দিতে গেল সুতীর্থ। ফিরে এসে মণিকাব মুখোমুখি দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'ভালোবাসে না যে তাব কোন প্রমাণ পেয়েছ সুতীর্থ?'

'ওর বয়স কুড়ি আমার চল্লিশ বেয়াল্লিশ পেরুল। কি কবে ও আমাকে ভালোবাসবে?'

'তুমি তো ওকে ভালোবাস।'

'তাও তো বলতে পারি না। আমাব পবিবার রয়েছে।'

ঘণ্টা খানেক পরে সুতীর্থের জন্যে চা এল ওপর থেকে খুব ভাল চা অবিশ্যি ; টি পট সুদ্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে ; দুধ চিনিও যা চাই সবই আছে। কিন্তু যে চাকরটা দিয়ে গেল তাকে হয়তো লাথি মেবে ঘুম থেকে ওঠানো হয়েছে—এমনই বিরস বেপরোয়া মুখ তাব।

কী করবে সুতীর্থ। সারা রাত বসে চা খেল সে। ঘুমিয়ে পড়ল বেলা সাতটায়।

সাত

বেলা দুটোর সময় সুতীর্থ জেগে উঠল।

অফিসে যেতে হবে। বেশ চেপে দাড়ি গজিয়েছে, কিন্তু সে সব গ্যাজ ট্যাজ কামানো দবকাব মনে করল না। চান করল না। মাথা ধুয়ে মুছে চুল আঁচড়ে কাপড়-চোপড় বদলে নিল ; ঘবদোর খোলা বেখেই বেরিয়ে যাবে ঠিক করল ঃ কী আছে তাব ঘবে। দু একটা লেখাব খাতা ছাড়া ; আব যদি কিছু চুরি যায়, বাজাবে কিনতে পাওয়া যাবে সে সব, কিন্তু মাঝে মাঝে মন স্থিব কবে জীবনেব খুব পবিষ্কাব মুহূর্তে যা সব লিখেছে সুতীর্থ সেগুলোকে কেউ সবিয়ে নিয়ে গেলে—কিন্তু কে সবাবে?—কিন্তু কেউ সরিয়ে নিলে—কিন্তু কেউ সরাবে না—কিন্তু কেউ সবিয়ে যদি নেয তাহলে ওবকম সব পরিচ্ছন্ন প্রকাশেব সুযোগ আসবে কি তাব জীবনে আবার ; আসতে পারে হয়তো ; কিন্তু যা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে ; সেটা আর ফিরে আসবে না ; নতুন কিছু আসবে ; কিন্তু পুরোনোটাবও দবকাব ছিল।

নীচে নামবার সময বাবান্দায় বেরিয়ে এসে সিঁড়িব দিকে চলেছে, এমনিই তেতলাব দিকে চোখ পড়তেই অমলাকে দেখা গেল—রেলিং ধবে দাঁড়িয়ে আছে ;—সুতীর্থকে দেখেও সবে গেল না ; চোখে চোখ পড়ল ; মেয়েটিব অবসর ছিল-হয়তো ফুবোবাব নয়। কিন্তু সুতীর্থকে কাজে যেতে হবে ; মেয়েটিব মা যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে কাজে ফাঁকি দেবাব কথা ভেবে দেখতে পাবা যেত। কিন্তু মণিকা কোথায়, সে কি আর শীগগির দেখা দেবে। সংসাব ও সময়েব নিয়মে স্ত্রীলোকটি আজ মা, অংশুবাবুর স্ত্রীও, কিন্তু বয়সে মনের গড়নে সুতীর্থেব নিকটতম আত্মীয় তো মণিকা ; সময়ের কণিকাগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু প্রবাহে খানিকটা তাল কেটেছে, তা না কাটলে কুড়ি বছর আগে মণিকাকে আরেক নির্ণয়ের ভেতর পাওয়া যেত খুব সম্ভব—সময়ের সব বকম সমাবেশ একই আনন্ত্যে নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে যদিও। অমলাকে কেন গেঁথে দিতে চায সুতীর্থেব সঙ্গে মণিকা? আঠাবো উনিশও হয়নি অমলার ; আঠাবো উনিশের অনেক মেয়ে অবিশ্যি ষাট বছরেব প্রবীণ পুরুষকেও হাঁচিয়ে ছাড়ে ; অব্যর্থ, অলঙ্ঘ্য বিষযবুদ্ধি তাদের ; কিন্তু অমলা সে জাতের মেয়ে নয়, ওর মন দশ বাবো বছরেব শিশুব মত।

অমলাব সঙ্গে কথা বলে দেখেছে সুতীর্থ? না, তা দেখেনি। দবকার বোধ কবেনি। সহমিলনের জন্যে এ মেয়েটিকে খানিকটা স্পষ্ট মাঝে মাঝে মনে হতে পারে, কিন্তু অন্য কোন অন্তরঙ্গতার জন্যে নয়। কিন্তু সবরকম মিলনের স্পৃহা যে চরিতার্থ করতে না পারে তাব সঙ্গে কি কবে প্রেম হয।

বাস ধরতে হবে। পোয়াটাক মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। সুতীর্থ হন হন করে হাঁটতে লাগল।

কাল অফিসে সে যায় নি, আজ যাবার কথা ছিল এগারোটার সময়, কিন্তু এরি মধ্যে আড়াইটে বাজিয়ে দিয়েছে। যেখানে বাস দাঁড়ায় সে জায়গাটা কি যে অখাদ্য ; পাশের ফুটপাতে সিমেন্ট নেই, সবই কাদামাটির ; কাছেই একটা মস্ত বড় বিশ্রী সরকারী কিচেনের উটেব মত উনুনগুলো দিনরাত জ্বলছে, কিংবা ক্রমাগত নতুন কয়লা খেয়ে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। ফুটপাতের ওপর টিনের চেয়াবে বসে চব্বিশ ঘণ্টা শিখদেব আড্ডা, চা খাওয়া, সৎ শ্রীআকালের একান্ত উপলব্ধির মত স্থিরতা কখনো—সেটার জিগিবের মত কেমন একটা বিদঘুটে কটকটে ভাব মুখে চোখে অন্য অন্য সময় ; দড়ির খাটিয়ায় বসে শুয়ে এদিকে শিখদের ওদিকে পশ্চিমাদের হল্লা। অনবরত কিচেন থেকে ফেন নোংরা জল পচা রাবিশ গড়িয়ে ছিটকে সমস্ত জায়গাটাকে প্যাচপেচে আস্তাকুড় করে রেখেছে। কলকাতার বিরাট হিক্কাব থেকে ওগরানো গরু মহিষ ষাঁড়ের নিরবচ্ছিন্নতা এখানে প্রবল। এই ভাগাড়ের ভেতর দাঁড়াবাব মত কোনো এক্‌টা জায়গা বেছে নিলেও এদের তাড়নায় সেখান থেকে হড়কে পড়তে হয়—নোংবা বাঁচিয়ে কাদা বাঁচিয়ে। অথচ বাসগুলো ঠিক এই জায়গায় এসেই দাঁড়ায়। এই সব বাবিশ ভেঙ্গে একটা মস্ত বড় গলগলে নর্দমা টপকে বাসে উঠতে হবে।

সমস্ত কলকাতা শহরটাকে খুব ভাল করে ঢেলে সাজানো দরকাব ; কলকাতাব সব কিছুই তো হচ্ছে, কিন্তু একটা খাণ্ডবগ্রাসী অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে না—লণ্ডনে যেমন হয়েছিল ; তরপব উদয হল ক্রিস্টোফার রেণেব নতুন শহরেব। এখানে অগ্নিকাণ্ড অতিবিলম্বিত হচ্ছে ; স্বাধীনতা আসছে হয়তো, কিন্তু খুব বড় আগুন বা বড় বিপ্লব না এলে রেণ আসবে না কলকাতার রাস্তা ঘাট অলিগলি ঘরবাড়ি ব্রণ খচিত এই বিরাট দুর্মুখেরও পতন হবে না তা হলে। বীথি—ঝাউ দেওদার শাল বকুল সিসু শিবীস অর্জুন সাগুদানাব গাছেব বীথি—পবিচ্ছন্নতা দেখাব নিঃশ্বাস ফেলার ব্যাপ্তি নিবিবিলিভাব শত শত মাইল জায়গা নিয়ে বিভিন্ন ঝর্ঝরে নির্ঝল নগরীগুচ্ছের ভেতর বিতবণ একটি নগবীর,—এ রকম হলে হত, (মন্দেব ভাল হিসেবে অন্তত) মনে হচ্ছিল তার। বাসস্ট্যাণ্ডের নিঘৃণ আবর্জনার থেকে দূরে সবে একটা চলন্ত বাসে উঠতে চেষ্টা করল সে। পড়েই যেত—চাপা পড়ে হাড় মাংস ছিবড়ে হয়ে যেত, কিন্তু হাতল চেপে ধযে ছুটন্ত বাসটাব সঙ্গে কাযদা বেকাযদায় অদ্ভুতভাবে পড়ে হঠাৎ কখন সার্কাসেব ওস্তাদেব ডিগবাজিতে শরীবটা তাব বাসেব ভেতব ঢুকে গেল—কতগুলো প্যাসেঞ্জাব হা হা কবে তার পিঠ চাপড়ে তাকে সব বুঝবারই অবসবই দিল না।

'বড্ড বেঁচে গেছেন ভট্টচার্য্যি মশাই।'

'এই যে আসুন, যাত্রামোহনবাবু।'

'যাত্রাভঙ্গবাবু বল।'

'পরমাইব জোব আছে—'

'তা আছে বটে, তবে একটু অদলবদল হল।'

'লালমোহনেব আগা কেটে মোহনলাল হল।'

বাস হু হু কবে ছুটে চলল ; হু হু কবে ছুটে চলল।

বাসে ক্বচিৎ বসবাব সুযোগ পায সুতীর্থ। আজও হন্তদন্ত গলদঘর্ম ভিড়েব মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাকে। বাসে যারা দাঁড়িয়ে থাকে সে সব মানুষদেব সকলেবই তিনটে হাতের প্রযোজন। এক হাতে মাথার ওপর বড ধবে আছে, আব এক হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ পোটলা সিগাবেট খাওযা, কিম্বা সে হাত নিজের জামা, চাদব, বিশেষ করে, পকেট বাঁচাতে ব্যস্ত ; তৃতীয হাতে তবু যথাস্থানে ঢুকিয়ে যথাসময়ে পযসা বেব কবে দিতে হয কণ্ডাক্টাবকে টিকিটের জন্যে। বিড়িব গন্ধ, সিগাবেটেব ধোঁযা, আগুনের দানা কণা,—ভাল চাদবটা বুঝি গেল, পাঞ্জাবিটাকে ঝবঝবে করে দেবার ফুটকি ফুলকি জ্বলছে চাবদিকে। ও লোকটাব সমস্ত মুখে সদ্য বসন্তের দাগ—খোসা উড়ছে। এ লোকটাব গা ঘেঁষে দাঁড়ানো যায না, এমনই দুর্গন্ধ মুখে না গাযে না কোথায, তবুও লেপটে দাঁড়াতে হচ্ছে লোকটার মাংস ঠেসে-পেছন থেকে ঠেলা খেযে, মানুষের গাযেব ঘষায। ভারী আরাম পেযে শিব দৃষ্টিতে বাসের চাতালের দিকে তাকিয়ে আছে ও লোকটা। ডান দিকেব মানুষটাব গরমির রোগ, সমস্ত গাযে মুখে দাঁতের মাড়িতে কি সব চাকা চাকা দাগ ; মাড়ি কেলিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে লোকটা, হাসলেই মাড়ি বেরিযে পড়ে, হাসছে কারুর কথার ফোড়নে নয হযতো—এমনিই, জীবনের সৌকর্য উপলব্ধি করে ; বাসের মেয়েমানুষদের শ্রী ছন্দও হাসি জোগাল তার? এ পাশেব এই ফড়ফড়ে টিকি ওড়ানো লম্বা বেহারী কুর্মী না মাহাতোর সমস্ত শরীরটা কম্প জ্বরে ভেঙে পড়ছে ; পুরু কালো ঠোঁট, ইঁদুরের মত ব্যাঙের মত কালো দাঁতগুলো উঁচিয়ে আছে, কোনোটা আছে, কোনোটা নেই, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, লালা ঝরছে—কী রোগ এই মানুষটার?

দেহাত ছেড়ে কেন কলকাতায়? কেন বাসে চড়েছে?

মেয়েদের সিটে মেয়ে দুটিকে অসুন্দর বলা যায় না। এদের ভেতরে একজনের অন্তত চেহারার গড়নে ভারী মনোরম মোড় রয়ে গেছে ; চোখে লাগে ; তাকিয়ে থাকলে কিছুটা চঞ্চল হয়ে ওঠে মানুষের নাড়ী, মানুষের মন। কিন্তু এই মেয়েটিকে অন্তশ্চক্ষে সত্যিই অবদানের মত পাওয়া সহজ হলেও এর সঙ্গে মৌখিক আলাপ করা কঠিন—এমনই অন্তর্বিরোধ রয়ে গেছে সমাজের—মানুষের মনের লেনদেন বিনিময় বিশ্বাসও ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে। এ মেয়েটির সঙ্গে কোনোদিন আর দেখা হবে না। মণিকা দেবীর চেয়ে মেয়েটি বরনীয়া নয় অবিশ্যি, অমলার চেয়ে সুন্দর নয়, পথে ঘাটে যে নারীর সঙ্গে দেখা হয় তাকেই ভালো লাগে, সে রকম আবেগ সাচ্ছল্যেব একেবারে উল্টো অন্য এক পৃথিবীর মানুষ হয়েও এই মেয়েটিকে দেখে সুতীর্থের ভালো লেগেছে—সত্যিই, মনে হয়েছে এর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে এলে জীবনের দু একটা আবছায়ার ঘোরে আলো এসে পড়ত। অন্য কারু কারু নানারকম সব খোড়লে, খিচে আলো ফেলছে হয়তো মেয়েটি। সেখান থেকে যুগপৎ সুতীর্থকেও আলো দেবে? সমাজসম্মত হবে না, সুসঙ্গত হবে না। সব মানুষের সঙ্গেই সব মানুষের কথা বলবার নিয়ম নেই। ভাবতে ভাবতে মেয়েটিকে ছেড়ে অন্য দিকে তাকাল সুতীর্থ। আরো ভিড়, ঠেলাঠেলির ভেতবে এমন জায়গায় গিযে পড়ল যে মেযেটি বাসে আছে কি নেই বুঝবারও উপায় রইল না তার। মেযেটি চোখেব আড়ালে যেতেই চুম্বকের টান কমে গেল বুঝি তার ; তা হলে বযসই হযেছে সুতীর্থের ; মেযেটিব সম্পর্কে বিতর্কশক্তিও ঢিলে হযে যেতে লাগল সুতীর্থের মনে। এ মেয়েটি কিছু নয়, মনে হল তাব ; একে এখুনি ভুলে যাবে সে। চলাফেরাব মত সহজ স্বাভাবিকতা ছাড়া আব যে কোথাও কিছু ছিল সে কথা মনেই পড়ে না। কে যেন পা মাড়িযে দিল, আবো চেপে মাড়িযে দিযে গেল সুতীর্থের বাঁ পাযের গেড়টা ; পাঁজরের ওপব কনুইটা এসে পড়ছে যেন কাব বারবার ; আস্তে সরিযে দিতে গেলে সে লোকটাই চোখ বাঙায ; পিছু থেকে যারা ঠেলছে সুতীর্থকে তাবা মেয়েমানুষ নয়, কিন্তু সুতীর্থের সামনে যে কালো ঢ্যাঙা বদমাযেশটা সুট পরে দাঁড়িযে আছে (অফিস পাড়ার একজন খানদানী অফিসার হবে) সুতীর্থ ছাড়া কেউই আব তাকে ঠেলছে না যেন এমনই ভাবে দাঁত কিড়মিড় কবছে সে ; লোকটার বিবাট পশ্চাদ্দেশে বলাৎকাবজনিত উল্লাস দেওযা ছাড়া সুতীর্থেব আব কোন কাজই নেই যেন পৃথিবীতে অনুভব কবে কী ভীষণ মরীযা হযে উঠেছে লোকটা।

কযেকজন লোক নেমে গেল, সুট পরা ধুমনো সামনেব সিটে জাযগা পেল। বাসটা পার্ক স্ট্রিটের মোড়েব কাছাকাছি থামতেই মেযে দুটো নেমে গেল। দুপুব বেলা এই বাঙালী মেযেবা এদিকে কোথায যাচ্ছে? যুদ্ধ শেষ হযে গেছে, বিদেশী সৈনিক ও নাবিকেবাও আজ সবে পড়েছে অনেকেই—হয়তো সকলেই—নিজেদেব সাগর পারে। মন্বন্তব মিলিটাবী ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রায সব ব্যাপাবেই মৌতাত অনেকদিন হয মিইযে গেছে। মেয়ে দুটো পার্ক স্ট্রিট দিযে হেঁটে চলছিল। তাদেব চলে যাওযাব স্ট্রিম লাইনের দিকে তাকিযে মনে হচ্ছিল নিতান্ত জীবনমবণের কাজেব ব্যাপাবেই চলেছে, কোন নিরবলম্ব চাবণায নয।

মেযে দুটিব পরিত্যক্ত জাযগায সুতীর্থ গিযে বসেছিল। বাস কন্টিনেণ্টাল হোটেলের পাশে এসে দাঁড়াতেই—এইখানেই বাস প্রতিদিন দাঁড়ায কিছুক্ষণেব জন্যে—এই ভীষণ মানুষঠাসা গাড়িব ভেতব যাত্রী প্রবেশ করতে লাগল—একজন সাহেবও ঢুকল। সাহেবটি যুবক, বোধ হয স্কচ—ছিপছিপে ছোট মানুষ-সুট টাই হ্যাট সবই রযেছে, ক্লাইভ স্ট্রিটের মহাজন না ভেবে সুতীর্থ একে পাদ্রী বলে ঠিক কবল তবুও—স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রফেসর—একে সুতীর্থ আগেও দেখেছে যেন কোথাও। অধ্যাপক পাদ্রীব মত মুখে একটা সঙ্কুল স্বযংতুষ্টির ভাব এর সম্প্রতি কেমন যেন একটা বিমর্ষ নিষ্ফলতাব ধরন-ধাবণে নিঃশব্দ হয়ে আছে। এর কারণ সুতীর্থের কাছে অস্পষ্ট মনে হল না। আজ সকালবেলাব খবরেব কাগজেই সে পড়েছিল যে বিলেতের শ্রমিক গভর্নমেন্ট জওহবলাল ও জিন্নাকে মেলাতে পাবল না। কংগ্রেস ও লীগ যে পবস্পরের অমৃতত্ব নিয়ে সমান্তবাল সেটা টের পেয়ে তারা থ হয়ে গেছে ; বযটাব খবব দিযেছে যে,

দ্য ব্রিটিশ ফীল হেল্পলেস অ্যাণ্ড থরোলি ডিজঅ্যাপযেণ্টেড; সেই অন্তবেদী বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের সৎ সহজ সূচিমুখ নিয়ে হাজির এই সাহেব। কিছুক্ষণ আগেই এই বাসের ভেতবেই একটি মেযে ঈষৎ অভিনিবিষ্ট করে রেখেছিল সুতীর্থকে, এইবারে এই সাহেবের দুটো কটকটে রাঙা কান থিতোনো কেমন একটা বিমর্ষতায় বিভোর হয়ে আগেকার কথা একেবারেই ভুলে গেল সুতীর্থ। হোটেল কণ্টিনেণ্টালেব কিনার ঘেঁষে উঠেছে সাহেব-চলেছে ডালহৌসি স্কোয়ারে—অথচ কাজ তার স্কটিশ চার্চ কলেজে নয় কি?

'আপনাকে আমি এগজামিনার্স মিটিঙে দেখেছি হযতো'—সাহেবকে বললে সুতীর্থ—' ইংরেজিতে।

'আমাকে!' সাহেবটি বিস্মিত হয়ে আপাদমস্তক সুতীর্থের দিকে তাকাল, বাংলায কথা বললে, উচ্চারণও অস্পষ্ট নয়—

'আপনি ভুল করেছেন—'সাহেব বললে।

এগজামিনার্স মিটিঙ কাকে বলে সুতীর্থকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এগজামিনার্সদের মিটিঙ', বললে সুতীর্থ।

'ওঃ, সেই কথা' কানের নাকেব গালেব মুলো পীচ টোমোটোর মত রক্তাক্ততার কণিকাগুলোকে আস্তে মুচড়ে হাসিয়ে সাহেব বললে, 'আমার ভ্রাটা স্কটল্যাণ্ডের গ্ল্যাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, আমি নই, আমাব ভ্রাটার সঙ্গে হনেকে আমার আকৃটির ভুল কবে ঠাকে।'

'আপনি কি স্কটিশচার্চ কলেজেব অধ্যাপক নন্?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা গ্ল্যাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিযার, বর্টমানে গ্ল্যাসগোটে আছেন।'

'আপনি কি ফাদার ফরদিঙ্গেল ফার্গুসন ম্যাক কার্কম্যান নন্?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা—'

সাহেব সুতীর্থকে অবিলম্বেই বললে, 'ফাদাব ফার্গুসন নামে কোনো ফাদাব কলিকাতায আছে বা ছিল বলিযা আমি জানি না। আমার ভ্রাটার নাম হোরেস উইলিযামসন, তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক নন, তবে অধ্যাপক বটেন—'

'আপনি কি অধ্যাপক নন মিঃ উইলিযামসন?'

'আমি অধ্যাপক নহি, উইলিযামসন নহি, হামার নাম ব্যামসে ম্যাকগ্রেগব।'

'ম্যাকগ্রেগর?' সুতীর্থ ঠিক বুঝে উঠতে না পেবে বললে, 'তা হলে আপনাব ভাই কি কবে উইলিযামসন হন?'

'বাই দ্য বাই, স্কটিশচার্চ কলেজ আজকাল কি বকম চলছে?'

'বেশ ভালোই।'

'আপনি অধ্যাপক আছেন।'

সুতীর্থ বললে, সে ক্লাইভ স্ট্রীটে যাচ্ছে, সেখানেই কাজ করে।

'আমিও ক্লাইভ স্ট্রীটে যাচ্ছি। By the by, these professors—I mean British professors in Indian colleges—'

'Are you one of them?'

'Of course, not. I have already told you as much. There's is a peculiar lot—'

'The British feel helpless & thoroughly disappointed.'

yes, they do'.

'I hope you have seen today's paper.'

'I have. The British have done all that they had to do in the circumstances. They can't do any more.'

সহসা একটা প্রবল ধাক্কায সমস্ত বাসটা ধেনে-কেটে ধিড়িঙ্গেটড়ে উঠল কেন—বাঁই বাঁই, করে ঘুরে নেচে শূন্যে লাফিযে কী যে হযে গেল বুঝবার আগে সাহেবেব সঙ্গে সুতীর্থের আলিঙ্গন সহমরণ শীৎকার দুর্দান্ত হামলাব আকার ধাবণ কবল। টুপি ছিটকে পড়েছে—চশমা উড়ে গেছে—

ফুটন্ত গবম জলের ডেকচিটা যেন জীবন্ত হাঁস মুরগি হরিযাল মরাল নিযে আট খেযে চীৎকার ক'বে উঠছে-একটা বাস হযে গেছে ডেকচিটা ; ঝলসে পুড়ে সেদ্ধ হযে চিৎকার কবে উঠছে মানুষেব মাংস রক্ত কঙ্কাল সৃষ্টির অপর পিঠের বিবাট অন্ধকাবে মিশে যেতে যেতে। সুতীর্থ গলা ছেড়ে বোল করে উঠল, 'পাকড়ো পাকড়ো—'

'পাকড়ো পাকড়ো শালা শূয়ারকা বাচ্চাকে পাকড়ো'-ম্যাকগ্রেগর সাহেবের গলা কেমন যেন বিকট বখাটের মত হাউ-মাউ করে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল ম্যাকগ্রেগর ভয যা পেযেছে তার চেযে তামাশা অনুভব করছে ঢের বেশি; বাসে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে নিশ্চযই, কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটামুটিভাবে বুঝে নেবাব কোন তাগিদ তার না থাকলেও জিনিসটাকে পুরোপুরিভাবেই স্বাযত্ত করে ফেলেছে সে: কিন্তু তবুও নিজের মনের খেযাল-খুশিতেই যেন জিনিসটাকে নিযে শেয়াল বেড়াল হাযনার রগড়ে গর্জন কবে উঠবার সাধ জেগেছে তার স্কচ কেল্টিক হৃদযে—

একটা দুর্বার দামাল খোকার মত ম্যাকগ্রেগবের চিৎকার শুনতে শুনতে সুতীর্থ হতবুদ্ধি হযে ভাবছিল

ঃ ব্রিটিশের স্বভাব তো এরকম নয়, এ রকম কি? এ লোকটা কি খাঁটি ব্রিটিশ? মজা করছে? বিপদের মুখে এমন ফুর্তিবজ্জাতি হয়তো স্পেনিশরা করে কিংবা ফরাসীরা—ব্রিটিশরা থাকে তো একটা দানবীর নেঃশব্দ্যে পাথরের সানুর মতন উচিয়ে।

একটা মিলিটারি লরীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল সুতীর্থদের বাসটার। দুজন লোক মারা গেছে ; জখম হয়েছে কজন এখনও তার হিসেব পাওয়া যায়নি। আর্তের মতন চিৎকার করে উঠেছে অনেকেই ; কাঁদছে; বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে—ভয়ে না বিভীষিকার অভিজ্ঞতায়, না হাড়গোড় হৃদয়, ভেঙে গেছে বলে—বোঝা কঠিন।

ম্যাকগ্রেগরের কিছু হয় নি—সুতীর্থেরও না। সাহেব সুতীর্থের বগলের ভেতর তার নিজের হাত ঠেলে চালিয়ে দিয়ে বললে, 'চলো-'

'কোথায়?'

'হেঁটে যাওয়া যাক। বাস ঠেকে হামরা খি করে বাহিরে এলাম-'এডেব মট আমরাও টো মরে যেটে পারটাম—'

'দুজন মরেছে শুধু, মরেছে কিনা ডাক্তার না এলে বোঝা যাবে না। আপনার হাড় মাংস কার্টিলেজ সব ঠিক আছে তো ম্যাকগ্রেগর?'

'ঠিক আছে-'

'ডুজন প্রাণী মরে গেছে আই বিলিভ'-ম্যাকগ্রেগর 'মৃত' লোক দুটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ভয়ে—হার্ট খারাপ ছিল—শক-মে বি ব্রেণ হেমাবেজ—'

'এ গাড়িতে কোন মেয়ে ছিল না?'

'না।'

'কোন শিশুও নেই?'

'থ্যাঙ্ক গড, নো।'

'আগুন জ্বলে উঠেছে!'

'এখনি ফায়ার ব্রিগেড আসবে।'

'এইসব লোকদের কি হবে?'

'নন অব আওয়ার কনসার্ন—রেডক্রস টেকস আপ—'

সুতীর্থকে তবুও অনর্থক এইসব মড়া আধমড়াদেব সেবা শুশ্রূষা সঙ্গতির একটা বিমূঢ় প্রয়াসের ভেতর জড়িয়ে পড়তে দেখে ম্যাকগ্রেগব সাহেব চলে গেল ; যাবাব আগে সুতীর্থকে নিজের কার্ড দিয়ে গেল, সেই ঠিকানায় যে কোনোদিন—সনডে একসেপটেড—সুতীর্থের সঙ্গে রাত আটটার পব সে দেখা করতে রাজি।

অতএব আজ আর অফিসে যাওয়া হল না। পরদিন তাড়াতাড়ি তৈবি হয়ে অফিসে গিয়ে নিজের টেবিলে বসতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুতীর্থেব ঘরে ঢুকে বললে, 'আপনি আজ এসেছেন দেখছি।'

'ঠিক সময়েই এসেছি ; না আজও দেরি হয়ে গেল? বসুন।'

'বসব না আমি।'

'সিগারেট?'

'সিগারেট সাধছেন আপনি আমাকে, বেয়াদবী হচ্ছে।'

'আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বেকুবি হচ্ছে আমাব মল্লিক সাহেব।'

'তার মানে?'

'এ ঘবে এত চেযার থাকতে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর চারদিকে তাকিয়ে একখানা চেয়ারও দেখল না, বসবে না বটে সে, দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাঁচ কষবে আর বাগড়া দেবে ব্যাটাচ্ছেলে—কিন্তু তবুও—চেয়াব নেই কেন?

সুতীর্থ উপলব্ধি করে কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল।

'বেছে একটা ছারপোকা টারপোকা নেই এরকম একটা চেযার নিয়েসো তো হে মনোমোহন।'

'চেয়ার নেই কেন এ ঘবে সুতীর্থবাবু?'

'আনছে মনোমহোন।'

'চেয়ার নেই কেন আট দশটা এই ঘরে!' হাঁকড়ে উঠল মল্লিক।

'আনছে মনোমোহন।'

'মনোমোহন কটা আনছে?'

'কটা চাই আপনার?'

'কটা চাই আমার? আমার চাই কটা?' মল্লিক টেবিলের ওপর দমাদম ঘুষি মারতে মারতে বললে, 'আমার কটা চাই? এটা আপনার অফিস? আপনি দিচ্ছেন?'

'অফিস আপনার। আপনি আমাকে দিচ্ছেন।'

'পথে আসুন। তাহলে কী করে আপনি আমাকে চেয়ার দিচ্ছেন?'

'আমি দিলুম কোথায় মনোমোহন দিচ্ছে।'

'মনোমোহন দিচ্ছে?' কেদোর মত চোখে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে মল্লিক দাঁতে দাঁত ঘষার ভাব দেখিয়ে বললে, 'আর আপনি কি করছেন?'

'আমি আপনাকে বসতে বলেছি।'

'আমাকে বসতে? আপনি?'

'এই যে মনোমোহন চেয়ার এনেছে। বসুন। খুব বেশি ছারপোকা আছে এই চেয়ারে মনোমোহন?'

'হুজুর না—' গালে হাত দিয়ে মাথা কাৎ করে হেসে ভেঙে পড়ল মনোমোহন।

সুতীর্থ বললে, 'মনোমোহন তুমি যাও, অত হেসো না তুমি। মনোমোহন। কি আছে হাসবার? আমরা বড্ড গলদঘর্ম হচ্ছি। যাও যাও যাও—'

মনোমোহন চলে গেলে সুতীর্থ বললে, দাঁড়িয়েই তো রইলেন মল্লিক সাহেব—'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করব আমি।'

'কেন?'

'এটা আমার অফিস, মুখ সামলে কথা বলবেন সুতীর্থবাবু—'

'কি বলেছি আমি?'

'মুখ সামলে কথা বলতে বলেছি আপনাকে।'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করবার—'

'একথা এখন থাক, ওটা আমার জিনিস—'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করবেন, তা করুন, কাল আবার তাকে কাজে বহাল করে দিলেই হবে।'

'কে করবে?'

'আপনার অফিস, আপনিই করবেন। বসুন।'

ঘরের ভেতর একবার পায়চারি করে নিয়ে সুতীর্থের টেবিল থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললে, 'যাকে আমার অফিস থেকে তাড়িয়ে দিই, তার কান কেটে তাড়িয়ে দিই। সে দুকান কাটাকে আবার কাজে বহাল করব আমি? কে দু কানকাটা আছে এই অফিসে মনোমোহনের সঙ্গে এক জোয়ালে না যুতে দিলে পেট ফুলে ওঠে?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়ে দেবেন?'

'ওর সঙ্গে যোগসাজসে কাজ না করলে যার পেট ফুলে ওঠে তার কটা কান কাটা সুতীর্থবাবু?'

'দুটো কান।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর পকেট থেকে চুরুট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আর তার যদি গণেশের মত ছটা মুখ থাকত, তাহলে কটা কান কাটা হত সুতীর্থবাবু?'

'বারোটা। রাবণের মত দশটা মুখ থাকত যদি তার তাহলে কটা কান কাটা হত?'

সুতীর্থের এ প্রশ্ন যেন বাতাসে উড়ে গেছে কানে পৌঁছয়নি এমনিভাবে চুরুট টানতে টানতে মনোমোহনের চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়াল মল্লিক।'

'এটা আমার অফিস, আমি যাকে খুশি রাখব, তাড়াব, যখন খুশি বসব, দাঁড়িয়ে থাকব। এসব বিষয়ে কারু কোন হাত দেবার অধিকার নেই আমার অফিসে।'

'আপনি তাহলে দাঁড়িয়েই থাকবেন?'

'আমার খুশি আমি দাঁড়াব। আমার যখন নিজের মর্জি তখন বসব। আপনি আমাকে বসতে বলতে পারেন না তো?'

সূচীপত্রে যান

'বসুন।'

'সুতীর্থবাবু।'

'আজ্ঞে—'

'কি বললেন আপনি এইমাত্র?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়েই দেবেন? তাই জিজ্ঞেস করছিলুম—'

'আমাকে বসতে বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ, বসুন।'

মল্লিক কব্জি ঘুরিয়ে হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিল। চুরুট টানছিল, চুরুটের মুখে পুরু ছাই জমেছে সেটাকে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে ফেটে পড়ে বলল, 'ভদ্রতা করে আপনাকে আমি আপনি বলি। আপনি আমার অফিসে আমার তাঁবে কাজ করেন। আমাব তাঁবেদার—আমার অফিসের গোলাম আপনি।' বলতে বলতে খানিকটা রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে অনুভব করে, আর বাড়তে দেয়া উচিত নয় বুঝতে পেবে মল্লিক সংক্ষেপে সেরে দিয়ে বলল, 'সাব-অর্ডিনেট আপনি, মুখ ছোট আপনার, গালবাদ্যি বাজবে না। অথচ সেটাই বাজাতে চান আপনি। বড্ড বদ রোগ আপনার। বিদ্বান মানুষ হতে পাবেন, কিন্তু আমার অফিসের গোলাম ছাড়া কিছু নন তো আপনি। বিদ্যে ধুযে বাইরে গিয়ে জল খাবেন, এ অফিসে নয়-'

সুতীর্থ নানারকম ফাইল নিয়ে বসেছিল। ফাইল নাড়ছে, চাড়ছে, লিখছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরেব কথা তবুও তার কানে যাচ্ছিল, কিছু বলতে গেল না সে। মল্লিক চুরুট টানতে টানতে পাযচাবি করছিল ঘরের ভেতর ; কি যেন বলবে বলবে ভাবছিল, কিন্তু বলা হযে উঠছিল না তার। চিঠি লিখতে লিখতে মুখ তুলে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'এই যে মিঃ মল্লিক, আপনি আছেন এখনও, আমি ভেবেছিলুম চলে গেছেন—'

'আমার সামনে আপনি সিগারেট খাবেন না সুতীর্থবাবু।'

ছাইদানিতে ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে 'এই তো—হয়ে এল।'

'দেখছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি?'

'দাঁড়িয়ে আছেন, জীউকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন মিঃ মল্লিক। বসুন।'

'সিগারেটটা ফেলে দিন।'

'দিতে পারি ফেলে, কিন্তু ফেলে দেযার চেয়ে মনোমোহনকে দিলেই তো ভাল হয। আস্ত সিগারেটটা ফেলে দেব?'

'আপনাব মুখের সিগাবেট খাবে কেন মনোমোহন?'

'খাবে না মনোমোহন? মনোমোহন যদি না খায তাহলে আব কাউকে তো দেখছি, না, কে খাবে আমার মুখের সিগারেট আমার নিজের মুখ ছাড়া?'

'সুতীর্থ কথার ফাঁকে ফাঁকে—হুশ হুশ করে নয়, বেশ আস্তে, আবাম কবে পেটের ভেতবে শিবেব জটায ঘুরিয়ে এনে নাকমুখ দিয়ে জোবে ধোঁযা বার কবতে কবতে সিগাবেট টানছিল। সিগাবেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দেবার সময এসে পড়েছে।

'আসুন, চলুন—'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'আমার ঘবে ; কথা আছে।'

সুতীর্থ গড়িমসি করে বললে 'বেয়াবা না পাঠিযে নিজে এসেই আমাকে তলব করছেন। ফলাফল যাই হোক না কেন, আপনার এই—'

'আসুন, কথা বলবেন না।'

'আপনি আপনার খাস কামরায যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যান তাহলে—' সুতীর্থ নিজেব কাগজপত্র নিয়ে বসল।

নয়

সুতীর্থ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাজল সাড়ে এগারোটা। যান আপনার ঘরে গিয়ে অবসর মত একজন বেয়াবা পাঠিয়ে দেবেন আড়াইটার পর-'

'আড়াইটার পর?' বিজনহরির চোখে আগুন ঠিকরে উঠল, নিজেকে তবু সামলে নিল সে, চেয়ারটা

নিয়ে বসে পড়ে বললে, 'এটা কি তোমার শ্বশুরবাড়ি সুতীর্থ?'

সুতীর্থ কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, 'আমাকে তুমি বলে ডাকে আমার বড় সম্বন্ধী—বেযাইও তুমি বলে—বেয়ানও—আমার কানে খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু পারবেন বেয়ানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে?'

মুখ বিষণ্ন হয়ে উঠল মল্লিকের।

'এই তো আমাকে আপনি বলছিলেন—'

'বিজনহরিবাবু, আপনাকে আমি তো আপনি বলছি।'

'আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

সুতীর্থ টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললে—'সকলেই সকলকে আপনি বললে ঠিক হয, কিংবা সকলেই সকলকে তুমি। তুমি-আপনিব পার্থক্যটা রাখা ঠিক নয়। তুমি আমাকে তুমি বলতে পার মল্লিক, কিংবা আপনি আমাকে আপনি বলতে পাবেন। মনোমোহন তোমাকে তুমি বলতে পারে বিজনবাবু, কিংবা মনোমোহনকে আপনি বলতে পারেন আপনি। আমার মনে হয আপনি বাদ দিয়ে স্রেফ তুমি চালানোই ভাল হয, আয পিজিযের দিন চলে গেছে— তুমি এসে পড়েছে।'

ডাইরেক্টরির একটা পৃষ্ঠায এসে থেমে সুতীর্থ বললে, 'আমি অবশ্য আপনাকে আপনিই বলব মিঃ মল্লিক, তবে মাঝে মাঝে তুমি এসে পড়বে— যেমন এই একটু আগে এসে পড়েছিল তোমার। বাস্তবিক তুমির দিন এসে পড়েছে, তাই মনে হয না তোমার?'

'ছাগল দিযে যব মাড়ানো হচ্ছে, এই তো মনে হচ্ছে আমার—'

'রামছাগল খাবে বলে গোল্লায যাচ্ছে যব।'

'গোল্লায় যাচ্ছে যব?'

'হুঁ।'

'জবারিব কাঁধে চড়ে গোল্লায গিযে উঠেছে যব?'

'জবারিব কাঁধে?'

'সব বকম হারামজাদাবা জড়ো হয যেখানে সেখানেই জাল পেতে বসে জবাবি।'

'জাল পেতে বসে?'

মিঃ মল্লিক চুরুট টেনে যাচ্ছিল, সুতীর্থ কি বলেছে তা সে উপলব্ধি কবেছে মেজাজ গরম করতে গেলে, একটা কিছু হযেই যাবে। —এক্ষুণি এই মুহূর্তেই

—কিন্তু ছুঁচোবাজিব মতনও মেজাজ দেখাতে গেল না মল্লিক।

চুরুটে আবো দু-চাবটে টান দিযে বললে, অফিসের কাজে আপনাব হাত আছে। বেশ সাফাই আছে মনে কবেন আপনি। আপনাকে পেযে সুবিধা হযেছে অফিসের, মাথায ঢুকেছে আপনাব। এ বিষযে পবে কথা হবে। কিন্তু অফিসেব বাইবে আপনাব কথা নিযে বলাবলি কবে ওবা। বলে চবিত্র নেই।'

সুতীর্থ একটা ডেমি অফিসিযাল চিঠি ফেঁদে বসেছিল ম্যানেজিং ডিবেক্টরেব দিকে না তাকিযে বললে, 'ওবা কাবা?'

প্যাডের থেকে একটা পেনসিল তুলে নিযে দু-চাববাব খট খট কবে টেবিলটা ঠুকে মল্লিক চুপ কবে রইল, বললে, না কিছু।

'চিঠিটি খামে ভরতে ভবতে সুতীর্থ বললে, 'ওবা মানে ওবা। ওবা আব কেউ নয। আমি অফিসেব কাজে গাফিলতি কবি বলে আমার চরিত্র খাবাপ বলে ওরা?'

'অফিসেব কাজে আপনি কি খেসারত কবছেন তার মীমাংসা আমাব ঘরে গিযে হবে। ওবা বলে যে আপনার কারেকটব খাবাপ।'

'মদ আমি কিনে খাই না, কোনদিন খাইনি, কবে স্নব নিউজ এজেন্সিব ধবণী মজুমদার, উনি, মতিস্থিব, মতামত কাগজেরও সম্পাদক, মাঝে মাঝে আমাকে বিলিতি হোটেলে নেমন্তন্ন করে দেখিযে দেন কি কবে পাঁচ পাগড়ী মদ মেবে মাথা ঠিক বাখতে হয। ওবকম মাথা না হলে খোকা খুকুর কাঁথাব নীচে ঠেসে দেবার মত এরকম সম্পাদকীয পেতাম না আমরা।'

সুতীর্থ আর একটা ডেমি-অফিসিযাল চিঠি শুরু কবতে করতে বললে, 'রকমটা হচ্ছে-পাঁচটে সাদা-গেরুয়া-বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পাগড়ী ভরা মদ থাকবে-মজুমদার বান পারতেই পাগড়ী শুদ্ধু মদ পেটের ভিতর চলে যাবে মজুমদাবের, কিন্তু তক্ষুণি স্বর্গদ্বাব দিযে বেরিযে আবার টেবিলে এসে হাজিব

সূচীপত্রে যান

হবে পাঁচটে কড়কড়ে পাগড়ী—আরো পাচ পাইট মদের জন্য। মদে ভর্তি হযে মুখের ফাঁদল দিযে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসবে স্বর্গদ্বার দিয়ে। এই রকম খেলা চলবে সারাদিন—কচ দেবযানীব খেলা।'

'মতামতের ধরণীবাবু মদ খান তা আমি জানতুম, কিন্তু মাতলামো করেন না।'

'না, বলেছিই তো আমি কচের মত ব্রহ্মচারী।'

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'ধরণীবাবুর মতন লোকের কাছ থেকে আমরা মনুষ্যত্ব চাই, সত্যি উনি অমানুষ নন, অত মদ মানুষ ছাড়া কেউ খেতে পারে না।'

'কেন, ভামকে মদ খাওয়াতে দেখলে সঙ্গে মদ ছাড়া আর কিছু খাবে না। মাছ ফেলে মদ খাবে।'

'ভাম কি?'

'ভাম, ভোঁদড়, জানেন না আপনি'?

'মাছ ফেলে মদ খাবে ভাম?'

'তবে কি?'

'মাছ ফেলে মদ খাবে ভাম?'

'তবে কি?'

'মাছ ফেলেও?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নোলা ডুবিযে।'

'ভাম, বেড়াল খাবে ওরকম? তাহলে ধরণী আব খেলেন কি? কিন্তু'—সিগাবেটে দু-চাবটে টান দিযে সুতীর্থ বললে—'আছে একদল মেযেরা মজুমদারকেই পুরুষ মানুষ বলে মনে কবে ভাব-বেড়ালকে নয।'

'ভাম বেড়ালকে তো দেখেনি সে সব মেযেবা, শুধু মজুমদারকে দেখেছে যে গো।'

ম্যানেজিং ডিরেকটর খানিকটা দূবত্বের ব্যবধান বেখে চুরুট টানছিল, তেমনি টেনে যেতে লাগল; সুতীর্থের ঘরে ঢুকবার আগে দু-চার বোতল হযত নিড়িযে এসেছে—বসটা কাজে দিচ্ছে এখন।

ভামের কথা, মদের কথা, মাছের মেযে পুরুষ মানুষের কথা বেশ বসিযে বলছে বিজনহবি।

'বাংলা দেশে আজকাল বড় মানুষ নেই।'

'নেই।'

'সাহিত্যেও নেই হয়তো।'

'সাহিত্য তো পাত নাড়া, জীবনেব সঙ্গে কি সম্পর্ক ওব, কি কবে থাকবে সাহিত্য 'ঝি, ঠাকুরঝি, বরফ চাই বাবু বাড়ীউলি, বাসড়াদেব পাত নাড়া ছাড়া আর কিছু?'

'ম্যানেজিং ডিরেকটর বললে, 'আপনি বড় খেই হারিযে ফেলেন সুতীর্থবাবু। কথা হচ্ছিল চবিত্র নিযে, আপনার ব্যক্তিগত চরিত্র নিযে। সাহিত্য, মেযেমানুষ, মদ, মজুমদাবেব কথা এল কোথেকে?'

মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'মদ খাওয়া কাকে বলে জানেন?'

'আমি মজুমদাবের সঙ্গে হোটেলে হোটেলে ফিবি। জানি না।'

'হোটেলবয় আপনি! ও কোন ছাব। আমার সঙ্গে একদিন আসবেন।'

'আচ্ছা যাব।'

সুতীর্থ ফোন করবার জন্যে হাত বাড়াতেই তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে ঘুরিয়ে দিযে মল্লিক বললে, 'কোথায ফোন হবে।'

'হনুমান প্রসাদের কাছে।'

'কিসের জন্যে?'

'সেই হুণ্ডিটা সম্বন্ধে।'

'আবো কোথাও হবে?'

'হ্যাঁ শ-ওয়ালেসে।'

'কেন?'

'সেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিযে।'

'কি বলে ওরা?'

সুতীর্থ ভ্রূকুটি করে বললে, 'ফোন করে বিশেষ কিছু হবে না অবিশ্যি। আমার নিজেরই একবাব যেতে হবে।'

সূচীপত্রে যান

'দরকার নেই।'

'সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল, চেয়ারেব হাতল ধরে ঝুকে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেকটরেব দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেন?'

'কদিন অফিস কামাই করা হয়েছে?'

'চাবদিন।'

'আমাকে জানানো হয়েছিল?'

'সময় পাইনি।'

'সময় পাননি—কাজে ফাঁকি দেবার সময় আছে গোলামেব মালিককে কৈফিয়ৎ দেবাব সময় নেই?'

'হাতে অনেক কাজ আমার মিঃ মল্লিক, সময় নষ্ট কবতে পাবি না।'

সুতীর্থ কাজে মন দিতে দিতে বললে, যে গরু সত্যিই দুধ দেয়, ওস্তাদ গয়লাকে চাঁট মাবে না সে, কিন্তু আমাকে মাবছে কেন?'

'কে গরু?'

'দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে গরুটার, ফুকোব ব্যবস্থা হচ্ছে?'

'কাব গরু? কোথায় গরু? কে—গরু কে?'

'এই অফিসটাই।'

মল্লিক বাঘ হলে সুতীর্থকে চিবিয়ে ছিবড়ে কবে ফেলত ডান বাঁয়ে না তাকিয়ে এই মুহূর্তেই। অত ব্লাড প্রেসাব না থাকলে নির্ঘাৎ বাঘ হয়ে যেত সে। কিন্তু ব্লাড প্রেসাব খুব বেড়ে গেছে—রক্ত তো নয়, মৃত্যুরক্ত চড়ে গেছে মাথায়। মল্লিক নিজেকে ঠাণ্ডা করে নিতে গেল।-

'ম্যানেজিং ডিরেকটবই তো অফিস?' মল্লিক বললে, 'আমিই তো অফিস। অফিস আমি। অফিসটা গরু? ফুকো দেবাব ব্যবস্থা হচ্ছে? গরু'টা যে এঁড়ে বাছুব বিইয়েছিল, সেই বুঝি ফুকো দেবে তার মাকে? এঁড়ে বাছুর কি ধর্মের ষাঁড় হয় কখনও, সুতীর্থবাবু, না বলদ হয়ে ঘানিগাছে ঘোরে?'

সুতীর্থ অফিসেব প্যাডে দু'পাতা লিখে শেষ করেছে, আবো লিখছিল, একটা জরুরী অফিসী চিঠি ; লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে অবিলম্বেই—তিন কপি—তিন ঠিকানায়।

লিখতে লিখতে সুতীর্থ বললে, 'আবাব চার ঠ্যাঙে দাঁড় করাতে চাই আমি গরুটাকে। ফুকো-টুকো দিয়ে নয়—আলো, বাতাস, ঘাস, ভাল জাবনা খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠুক। অফিসটাকে দাঁড় কবাব আমি।'

সুতীর্থ চেয়াব ছেড়ে উঠে গিয়ে ডানদিকের ব্যাকেব থেকে একটা ব্লু-বুক নিয়ে এল।

'আমিও দাঁড় কবাব আপনাকে। কার্ত্তিক মাসের কুকুরের মত দু ঠ্যাঙে দাঁড় কবাব। কাল থেকে এ অফিসে আসতে হবে না আব; আজই চলে যেতে পারেন—ইচ্ছে হলে—এক্ষুণি।'

'তাই আজ্ঞা হোক—' সুতীর্থ চেয়াবে ফিবে এসে ফাইল নাড়তে নাড়তে বললে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সে। কলমটা পকেটে নিয়ে ম্যাকিনটোসটা কাঁধের ওপব ফেলে, ঘাড় কাৎ করে বিনে বাক্যব্যয়ে সে চলে যাচ্ছিল।

'ব্যাপারটা বড় রাজকীয় হচ্ছে হে,' মল্লিক বললে।

সুতীর্থকে কোন উত্তর না দিয়ে চলে যেতে দেখে মল্লিক গলা খাঁকবে বললে 'সুতীর্থবাবু,'

'এপাব গঙ্গা, ওপার গঙ্গা—মধ্যিখানে চর—' সুতীর্থ এগিয়ে চলছিল।

'চাকরিব হল কি আপনার?'

'কাল আসব একবার বিজনহবিবাবু।'

'কাল কেন, আজ কি হল? চাকবি কবছেন, কাজ করবেন না? বাকি পড়ে আছে দশ বিশজন ইন-চার্জের কাজ—একা সামলাতে হবে আপনাকে—দেখুন তো ফাইলের ডাঁই। পাওযাব অব অ্যাটর্নির ব্যাপার আমি নিজে গিয়েই ঠিক করেছিলাম। আসুন।'

'না, আজ আর নয়।'

'আজ নয়? আজ কি সাঁইবাবা কাজ করে দিয়ে যাবে? এটা কি চীনে চন্নুর গুল্লিচা বাড়ি নাকি সুতীর্থবাবু, কমার্শিয়াল ফার্ম নয়? আসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটা বোতল চাই আপনার?'

'একটায় হবে আপনার?'

'কেন? আছে আমাব কাছে। অফিসেই আছে।'

'হুইস্কি?'

সূচীপত্রে যান

'খুব পুরোনো স্কচ।'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'না—আমি মাঝে মাঝে একটু মোসুম্বীর রস খাই, ড্রাই জিন দিয়ে।'

'ভিমটো খান আপনি—খোকা আমার। আসুন, আমাতে আপনাতে দোর বন্ধ করে-এই ঘরে বসে।'

'আপনি খান,' সুতীর্থ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বললে।

'আমি আন্দাজ মত মিশিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

মল্লিক কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল, হুজুরকে সেলাম করতেই তিনি বললেন, 'দু গ্লাস জল চাই।'

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল। মল্লিক ডেকে বললে দুটো সোডাই বরং নিয়ে এসো।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, সুতীর্থ বললে, 'সোডা নয়, জল দু গ্লাস।'

দুটো সোডা এনেই হাজির করল বেয়ারা, দরকার মত গ্লাস, পেগ।

'ছিপি খুলব?'

'না, যাও।'

লোকটা চলে গেলে মল্লিক বলে, 'কাজ ঢের আছে, কিন্তু আগে মৌতাতটা হয়ে নিক।'

'কাজ হোক তবে, মৌতাতটা থাক।'

'আগে মৌতাত হয়ে নিক।'

'তাহলে মৌতাত হোক, কাজ হবে না।'

'জোর মৌতাত হবে, জোর কাজ হবে।'

'জোর মৌতাত?'

'দশ বারো পেগ হবে—বছর চোদ্দ আগে বড়দিনের সময় কিনেছিলাম বোতলগুলো, অফিসেই আছে সেই উনিশশো বত্রিশ থেকে। বেশ পেকে উঠেছে এখন।'

'বেশ, মৌতাত হোক তাহলে' সুতীর্থ বললে, 'কাজ চুলোয় যাক। দুটো ঘাঁৎ সামলাবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি একটা দিক দেখতে পারি। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে—আপনি একটু সরে যাবেন বিজনহরিবাবু, আমাকে কাজ করতে দেবেন?'

সুতীর্থ নিজেই চেয়ারে এসে বসে বেল টিপতেই মনোমোহন এল।

'এই যে মনোমোহন এই সোডার বোতলগুলো নিয়ে যাও তো।' সুতীর্থ বললে।

'তুমি এখান থেকে চলে যাও মনোমোহন, সোডার বোতলগুলো এই টেবিলেই থাকবে।'

মনোমোহন চলে গেল। সুতীর্থ কাগজ পত্র টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসতে গিয়ে টের পেল কাজে মন নেই তার, কোনদিকেই মন নেই, কিছুই ভাল লাগছে না। যখন অফিসে এসে ঢুকেছিল আজ সাড়ে দশটার সময়, তখন তো এরকম ছিল না, খুব বিশেষ উৎসাহ নিয়ে কাজে বসেছিল আজ, সন্ধ্যে অব্দি-দরকার হলে বেশি রাত অব্দি-রুদ্ধশ্বাসে একটানা কাজ করবার সংকল্প নিয়ে এসেছিল সে—করত সে—পারত সে—অনেক অফিসি দায়িত্বের বোঝা লাঘব করবার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল তার। কিন্তু হল না কিছু। সুতীর্থ কলমটার ক্লিপ বুকপকেটে আটকে নিয়ে, কাগজপত্র দেরাজে ফেলে দিয়ে চাবি মেরে উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'যাচ্ছি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে—'

'অফিসের কাজে?'

'তারপর পাবলিক লাইব্রেরিতে যাব।'

'এই অফিসের কাজে?'

'আমার মনপবনের অফিস করবার সময় হয়ে গেছে বিজনহরিবাবু,' ম্যাকিনটোসটা কাঁধে চড়িয়ে সুতীর্থ বললে, 'চলি।'

'আজ আর কাজ হবে না?'

সুতীর্থ দেরাজ খুলে দরকারী প্রাইভেট চিঠিপত্রগুলো পকেটে ফেলে দেরাজ বন্ধ করে দিল।

'এত জিনিস যে বাকি পড়ে রইল—'

'সব কাল এসে ঠিক করে দিয়ে যাব।'

'আপনি মনে করেছেন আপনাকে না হলে আমাদের চলে না!' মাঝপথে টায়ার ফাটিয়ে দুরন্ত ট্রাকের মত ফেটে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলল।

সুতীর্থ কোন কথা না বলে, কোন দিকে না তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করে চলে যাচ্ছিল। সোডার বোতল আর একটু হলেই তার মাথার ওপর পড়ত গিয়ে। কিন্তু সেটা—দ্বিতীয় বোতলটাও দেওয়ালের ওপর এসে ভেঙে চুরচুর হয়ে পড়ল। সুতীর্থ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়েছিল। ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে বললে, 'এইবারে আমি কাজ শুরু করতে পারি মল্লিক।'

'আপনি কি মনে করেছেন আপনাকে ছাড়া এ ফার্মের কোন গতি নেই?'

'তা আছে। বোতলভাঙা কাঁচ সরিয়ে নে রে মনোমোহন—'

সুতীর্থ বেল না টিপে পাড়াগাঁর নদীর এপার থেকে ওপারের পথিক মনোমোহনকে ডাকল যেন, কেমন একটা আশ্চর্য হুঙ্কার তুলে। সমস্ত অফিস স্তম্ভিত হয়ে শুনল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর লর্ড কোর্টের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে—আস্তে আস্তে বের হয়ে গেল।

দশ

যুদ্ধের বাজারে বিরূপাক্ষ বেশ লাভ করেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সকলেই যখন সতর্ক হয়ে গেল, তখন তার মাথায় আবো বেশি লাভের খেয়াল চেপে বসতে সে ইদানীং লোকসান দিয়ে যাচ্ছিল। লোকসানের হার খুব বেশি নয়— নিয়মিত লোকসানও নয়। তবুও প্রায় সব রকম ব্যবসায়েই তার মন্দা পড়েছিল। কলকাতায় ও আশেপাশে বেশ কিছু জমি কিনে ফেলেছে সে। বালিগঞ্জে তার একটা বাড়ি, লেকের কাছাকাছি আর একটা ; দুটোই দোতলা। টালিগঞ্জের বাড়িটা বড় বেশ সুরূপা, ভারি স্নিগ্ধ, অনেকখানি জায়গা নিয়ে ; বাড়িটা একতলাই, কিন্তু ছাদে যে ঘরটা আছে সেটাকে চিলে কোঠা বলা যায় না। চমৎকার কারু কারসাজির কামরা সেটা। পরিসরেও খুব বড়, সোফাসেটির অভাব নেই। একটা খাকী রং-এর সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল বিরূপাক্ষ। হাত পাঁচেক দূরে একটা কমলা রং-এর গদীআলা কোচে ছিল জয়তী।

জয়তী বললে, 'আমার এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছ তুমি, ভালো করে জিজ্ঞেসও করিনি কোনোদিন, —ইস্কুলেই কি তোমার বিদ্যে শেষ, কলেজে ঢোকনি কোনদিন?'

'কি ক্ষতি হয়েছে না ঢুকে?'

'না, ক্ষতি আর কি। যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা দাঁতে খড়কে দিয়ে তোমার পা চেটে বেড়াচ্ছে কমার্শিয়াল ফার্মে সিধুবাবর জন্যে। কিন্তু তবুও তোমার নিজেরও একটা ডিগ্রি থাকলে ভালো হত।'

'আমার নেই, আমার ছেলের থাকবে।' সামনের একটা গদীর ওপর পা চড়িয়ে দিয়ে ডাহা আরামে বললে বিরূপাক্ষ।

'তুমি তো ইউনিভার্সিটির সামনে থুবড়ি খেয়ে পড়লে, কলেজে যেতে পারলে না ম্যাট্রিক পাশ করলে না—'

'কিন্তু আমি তো এম এ এফ পাশ করেছি জয়তী।'

'এম এ এফ কি? আমেরিকান ডিগ্রি? যে টাকা দেয় তাকেই দেবে—সেই?'

'না, এদেশেরই ডিগ্রি।'

'এ দেশেরই? কি এম এ এফ?'

'ম্যাট্রিক অ্যাপিয়ার্ড বাট ফেইলড!' বললে বিরূপাক্ষ।

শুনে জয়তীর হেসে উঠবার কথা, কিন্তু হাসল বিরূপাক্ষ নিজেই, জয়তী অনড় হয়ে রইল।

বিরূপাক্ষ বললে-'ম্যাট্রিক দিইনি আমি, কিন্তু উঠেছিলুম বেশ খানিকটা দূর-ক্লাস এইট অব্দি। তবে, ইংরেজি খবরের কাগজ ফি রোজ পড়ে বি-এ এম-এর ইংরেজি আমার রপ্ত হয়ে গেছে।'

'সেই জন্যেই তো এত টাকা করেছ। কত লাখ টাকা হল?'

'এই পঁচিশ লাখ, লেবেনচুষ হল আর কি—হি-হি হি হিহি'—

'তা হল বটে। তা হল।'

জয়তী টাকার মর্ম জানে। কিন্তু বিরূপাক্ষ যে প্রায়ই belongs to বা belong to না বলে is belonged to বলে, বিরূপাক্ষের সেই ব্যাকরণ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার আছে কিনা তা জানতে চাইল।

বিরূপাক্ষের মনে কোনো খটকা ছিল না। ইংরেজি যা সে বলে তা বলে বটে এমনই একটা সেয়ানা মাহাত্ম্যে জয়তীর দিকে তাকাল সে, 'is belonged সিঙ্গুলার হলে যেমন—This house is belonged to me—প্লুরাল হলে are—'

'আমি ভাবছি যারা লেখাপড়া শেখে তারা প্রামাণিকও বটে কিন্তু অসারও বটে। বানান ঠিক রেখে দলিল লিখতে জানে তারা, অফিসে ড্রাফট তৈরি লেখে খবরের কাগজে বড় জোর বই বার করে—' জয়তী বলছিল।

'বই? সে বই পড়ে কে?'

'আমি অবিশ্যি তাদেরই বই পড়ি মাঝে মাঝে। কবিতা, গল্প, ইতিহাস, মেসমেরিজম, আইনকানুন, ইকনমিকস, দর্শন, কত কি। পড়ে খারাপ লাগে না। তবুও ওসব মানুষদের আমি চাই না।'

আকৃষ্ট হয়ে জয়তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'বই লিখলে হবে কি—ওরা পরের বাড়ির ভাড়াটে। নিজেদের বাড়ি নেই-গাড়ি নেই।'

'না, ওরকম গরীব মানুষ দিয়ে কি হবে? লেখাপড়া কি হবে কাপড়ে ফুটো বেরুতে থাকলে? তালি মেরে মেরে মরে যায় মানুষের মন। তার চেয়ে is belonged ঢের ভালো। ব্যাঙ্কে তো লাখ পনের কুড়ি আছে—' জয়তী একটু ঝাল মিটিয়ে হেসে বললে।

সেটা সে কিসের ঝাল বিরূপাক্ষের খেয়াল ছিল না সম্প্রতি।

'কিন্তু লেখাপড়া-অলাদের সকলেই কি গরীব জয়তী?'

'খুব বেশি গরীব হয়তো ওদের সবাই নয়। কিন্তু তোমার মতন বড়লোক ওদের ভেতরে কজন?'

জয়তী ভাবছিল ; এ লোকটা সকাল থেকেই মদ খাচ্ছে। ভোরবেলা মাটির ভাঁড়ে দিশি মদ দিয়েই শুরু করেছে। ঘরে হুইস্কি ছিল, পোর্ট ব্রাণ্ডি ছিল, কিন্তু নির্বিঘ্নে মন ওর কঞ্জুষ ওর আত্মা—ও তো সবদিক দিয়েই একটা গাড়োল—বেওয়ারিশ—শুধু টাকার দিক দিয়ে নয়। টাকা ওর লক্ষ্মী, ও হাত পাতলেই ওর এঁটো কাঁটা আস্তাকুড় লক্ষ্মীর ঘড়ায় ভরে ওঠে।

'তুমি বড়লোক দেখেই তো তোমাকে আমি বিয়ে করেছি', জয়তী বলল।

'বিয়ে করেছ?' বিরূপাক্ষ বললে, 'বিয়ে করেছ জয়তী তুমি আমাকে? সব সময় সব কথা খেয়াল থাকে না। আমাদের বিয়ে হয়েছিল ওতোরপাড়ায়-না? গঙ্গার ধারে? সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে? যেন মাঘ মাস—না জয়তী? সেটা মন্বন্তরের বছর। কালোবাজারে চাল ছেড়ে বড়লোক হচ্ছিলুম—কিন্তু আমি তোমাকে কি করে বিয়ে করলুম?'

পরদিন বিরূপাক্ষের মদের নেশা কেটে গেছে। মাথা অনেকটা পরিষ্কার। টালিগঞ্জের বাড়ির দোতলার ঘরে জয়তীকে নিয়ে বসেছিল সে।

'আজ আমার মনে পড়েছে। তুমি এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজিতে এম এ পড়ছিলে—সেটা মন্বন্তরের সময়। অত পড়াশুনো করেও ডানাকাটা পরীর মত চেহারা ছিল তোমার। আমি পড়েছিলুম ক্লাস এইট অব্দি—চেহারা আমার বেশি লম্বাচৌড়া নয়, এই কোঁৎকামাছের মত-খুব কালোকালো নয়, ঘাড়ে গর্দানে খানিকটা—যাকে বলে হোঁৎকা—সেই জন্যই আমার বেগ পেতে হয়েছিল—'

জয়তী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে আর্ট ও থিয়েটার সম্বন্ধে একটা বিশেষ বই কিনে এনেছিল আজই, পড়ছিল; খুব মন দিয়ে পড়েছিল; বইটা ভাল লাগবার কথা। কিন্তু বুকের ভেতর কেমন ঢিবঢিব করছিল তার।

'কিন্তু জয়তী—'

জয়তী বইটা বন্ধ করল।

'আজকে কেন এসব কথা মনে পড়ছে আমার?' বিরূপাক্ষ বললে।

জয়তী বই খুলে পাতার দিকে তাকিয়ে রইল।

'শোন বলি জয়তী—'

'বই রাখ শোন—' বিরূপাক্ষ বললে।

'আমি শুনেছি তোমার কথা।'

'আমি একটা জিনিস প্রমাণ করতে চাই।'

'সে আমি জানি—সে তো অনেকবার প্রমাণিত হয়ে গেছে—'

'তুমি আমার স্ত্রী—'

'কুড়ি পঁচিশ লাখ তোমার ব্যাঙ্কে, ইনসিওরেন্সে। আমার স্ত্রীত্বের প্রমাণ তো সে সব দলিলেই আছে। কটা ইনসিওরেন্স? ছটা তো? না নতুন করেছ আবো?'

'না, ছটাই।'

'পাঁচটা অ্যাসাইন কবেছ আমাকে। কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকাব ইনসিওবেন্সটা তো অ্যাসাইন কবা হল না এখনো। কাকে করবে?'

'তোমাকে।'

'আমি চাপ দিচ্ছি না তোমাকে।'

'চাপ খাওযার ছেলে আমি? ব্যাঙ্কে সব টাকা তোমাব নামে জমা দিযে বাখতে বিযেব পরই তো বলেছিলে তুমি ; গত বছরও বলেছিলে ; কিন্তু এ বছব আব বলছ না কেন?'

'ব্যবসা তোমাব, ব্যাঙ্ক তোমার, ব্যাঙ্কেব ওভাবড্রাফট তোমাব, আমাব কাছে চেক বই রেখে কি হবে?'

পাঁচ লাখ টাকার অ্যাকাউণ্ট তো তোমাব নামে বয়েছে লয়েডসে।'

'কিন্তু পঁচিশ লাখ তো তোমাব।'

'সে তো লাইফ ইনসিওবেনসের টাকাগুলো ধবে। ব্যবসা মাব খাচ্ছে, ব্যবসা চালাতে হচ্ছে আমাব ; ইনসিওরেনসেব মোটা মোটা প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। ব্যবসাগুলো তোমাব হাতে গুছিয়ে নিলে সব ব্যাঙ্কের সব টাকাগুলো তোমাব হিসেবে লিখিয়ে নিও—' বিরূপাক্ষ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি যে আমাব স্ত্রী ব্যাঙ্ক ইনসিওবেনসের দলিলে তাঁব প্রমাণ বযেছে তুমি বলছ আমরা হিন্দুমতে বিয়ে করেছিলুম, হিন্দু আইন কি বলে তোমাব স্ত্রীত্বেব কথা?'

'যা বলবাব তাই বলে।'

বিরূপাক্ষ একটা সিগাবেট জ্বালিযে নিযে বললে, 'ইনসিওরেন্সেব চেযে বড় দলিল হিন্দু আইন?'

'বড়ই তো।'

'ব্যাঙ্কেব চেযে?'

'হ্যাঁ—বড়।'

'বিরূপাক্ষ এই সব কথা শুনতে চায শুনে কেমন একটা পরিতৃপ্তিব সপ্তমে গিযে বসে থাকতে চায সে—নিবিড়ি ও নিস্তব্ধ হযে নয সে শক্তি বিরূপাক্ষেব নেই—কিন্তু এমনিই নড়ে চড়ে, কাত হযে উবু উটকো হযে জযতী যে তাব স্ত্রী সেই স্ত্রীত্বের কি যেন একটা মর্মান্তিকভাবে গোপন মধুব মন্ত্রসিদ্ধিকে দুবপনেয কীটশক্তিমত্তায—একা কীট সৃষ্টির ভেতবে, একা কীটই যেন সে—একাই পান কবতে চায সে। জযতীকে যখন সে প্রথম বিযে কবেছিল বছব তিনেক আগে তখন জযতী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকেব কথাও ভাবতে পারত না বিরূপাক্ষ। এ তিন বছবে নানাবকম স্ত্রীলোকেব কাছে গিয়েছে বটে সে, কিন্তু তিন বছবেব ভেতব দু বছবেবও বেশি নিজেব বাপেব বাড়িতে কাটিযেছে জযতী ; গত ছ'মাসও জযতী বাপের বাড়িতে ছিল, মাত্র তিন-চার দিন হল বিরূপাক্ষেব এখানে এসেছে। দুর্দমনীয আসক্তিশক্তি ফিবে পেযেছে কীট আবার—অমেয উল্লোল সৃষ্টিব।

'তুমি হিন্দু স্ত্রী, আমাকে ছেড়ে যাবাব কোন ক্ষমতা আছে তোমাব?'

জযতী বইযের দু-এক পাতা উলটে বললে, 'আমি কি ছেড়ে যেতে চাচ্ছি?'

'বাপের বাড়িতেই তো থাকছ, আড়াইটে বছব কাটালে—'

'এখন তো এসেছি।'

'এসেছ তো আসছ যাচ্ছ। চলে যেতে বাধা কি তোমার?'

'কোথায় চলে যাব?'

'কেন, তোমার বাপেব আস্তানায। গবীবেব মেযে তো তুমি নও যে আমাব টাকা তোমাকে ঠেকিযে রাখবে। তোমার বাবা শুনলুম ও-বি-ই পেয়েছেন—'

'হ্যাঁ।'

'ও-বি-ই মানে কি?'

'মানে ওব্।' জয়তীর ঠোটেব কোণে দু-চারটে বেখা—হাসি নয—দেখা দিযেই মিলিয়ে গেল।

'ওব্?'

'এন-আই-ও-বি ই কি হয?' সেই গ্রীক মহামারেব নাম মনে পড়াতে জয়তী বলল

বিরূপাক্ষকেই।

'দাঁড়াও বলছি তোমাকে—'দাঁড়াও—কি বললে, এন-আই? তারপর?

'এন আই ও বি ই।'

'বলছি তোমাকে—এন আই ও জি ই—নিয়োগী তো নিয়োগী।'

'জি নয় বি, নিয়োগী নয়—। তোমার কুড়ি লক্ষ যদি আমার জন্যে খানিকটা কথা বলে তা হলেই হবে, এটাকে নিয়ে আর ঘাঁটিও না। কি বলছিলে তুমি হিন্দু আইনের কথা?'

'বলেছিলুম তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইতে পার—ঘাঁতঘোৎ তোমার সবই জানা;—কিন্তু প্রত্যেক ঘাটে আইনে ঠেকবে।'

'ঠেকবে, না ঠেকবে জানি না কিছু আমি। কিন্তু আমি বিয়ে ভেঙে দিতে চাচ্ছি কে বললে তোমাকে?'

জয়তীর মুখ চোখ প্রশ্ন সত্য স্বচ্ছ ঠেকল বিরূপাক্ষেব কাছে। মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে না—এখন তো নয়; বিরূপাক্ষের টাকার জন্য—বিরূপাক্ষের নিজের জন্যেই হযতো টান আছে জয়তীর। স্ত্রীর মুখের দিকে আবার তাকাল বিরূপাক্ষ! মুখের ওপর কেমন একটা সত্যার্থের আভাস দেখে ভরসা পেল সে।

'তুমি এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজিতে এম এ পড়ছিলে, বি-এ-তে ইংরেজীতে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছিলে। তুমি উত্তর কলকাতার বনেদী ঘরের মেয়ে, দক্ষিণ কলকাতার বড়লোকের ভাগনী, তোমাকে কে পায় বলো তো দেখি—'

হাতের সিগারেটের আগুনে আর একটা নতুন সিগারেট ধরিযে নিতে গিয়ে এক আধ মুহূর্ত চুপ করে রইল বিরূপাক্ষ। বাইরে রোদ, নীলিমা, ঘরের ভেতরে মেঝের ওপর দেওয়ালের গাযে ডানার ছাযা ফেলে অদূর দিগন্তের পুরুষ চিল ও মহিলা পাখির চংক্রমণ ; অনেক দূরে একটা অ্যাকেশিয়া গাছে ফুল ধবেছে। অ্যাকেশিয়া না চেরী অবাক হয়ে ভাবছিল জযতী। হযতো অন্য কোন গাছ। এত শীতে তো অ্যাকেশিয়ার ফুল ধরবার কথা নয়। কবে ফুল ফুটবে, সাদা মেঘ আব নীল মেঘের মত নীল আকাশেব গাযে বিছানো সবুজ কৃষ্ণচূড়ার? বাইরে অপবিমেয় রোদ, প্রিয মহানুভবের মত মুখচ্ছবি কত বড় বিশাল আকাশেব পৃথক নিঃশব্দতার মত ; মহাপ্রলযের সৃষ্টিতে উৎসারিত কবে চলেছে মুহূর্তেব পব মুহূর্ত।

আশ্চর্য কোন সংস্রবই নেই যেন বিরূপাক্ষের ঘবে ভেতবেব মানুষদের সঙ্গে বাইরের সচ্ছল স্বাধীনের ; তিল ধারণেব তিল অধিকার করে চাবদিক্কার তিলাতীত যত তিল-আলো-মেঘ-পাখি এখানে—ওখানে—সবখানে; ভাবছিল জযতী।

আমি তোমাকে পেয়েছি। পেয়েছি বই কি। আইনেও পেয়েছি—এমনিও। তোমার সঙ্গ—টঙ্গ চাই। তুমি আইনত স্ত্রী তো, দিচ্ছ টিচ্ছ কিছু ভালবাসাও চাই। কিন্তু চাইলেই হল? তুমি হওযালে তো।'

বিরূপাক্ষ আজো যে এনতার জল খেযেছে শুধু, মদ খাযনি, বিশ্বাস হচ্ছিল না জযতীব। পেটে নির্মল জল ভজভজ কবে না কোনদিন এই লোকটার ; আজ একটু বেশি গেঁজে উঠেছে। কোন দিশপাশ খুঁজে পাচ্ছিল না জয়তী। নিজের হাতের বইযের দিকে ফিরে তাকাল সে।

'আমার মন বলেছে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

'দিশী মদ চাচ্ছে তো তোমান মন; এখন?'

'আজ আমি মদ খাব না।'

'কেন? খোঁয়ারি ভাঙতে হবে?'

'তুমি আবার বাপেব বাড়ি চলে যাবে না তো?'

'তা আমি এখন কি কবে বলি?'

'কি বলতে চাচ্ছ বুঝিযে বল।'

'দবকাব হলে চলে যাব।'

'তিন বছব তো আমাদেব বিয়ে, আড়াই বছব তো কাটালে শশধরবাবুব নেকনজরে। এই তো ছ'মাস কাটিয়ে এলে আবাব চলে যেতে চাচ্ছ আবার। কেন, আমি কি তোমাকে বিয়ে করিনি?'

বিরূপাক্ষ সিগারেটে টান মেরে ঘর ভর্তি ধোঁযা জমিযে তুলে বললে, 'তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?'

'আমি?'

জযতী নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'কৈ না তো।'

'মনে হচ্ছিল, তোমাকে হাঁপাতে দেখলে আমার ভয় করে।'

'মিছে ভয়।'

'আমি সিগারেট খাই তাতে কি তুমি দুঃখ পাও?'

'কেন পাব?'

'প্রথম প্রথম তো বাধা দিতে আমাকে সিগারেট খেতে দেখলেও। তাড়ি তো খাচ্ছি; বিলিতি দিশি জল সবই; আজকাল যে মুখ বুজে থাক তুমি সব দেখে শুনেও? এটা ভাল লাগছে না আমার। মেঘ যখন জমতে থাকে, আকাশ চুপ করে থাকে। চুপ করে আছ তুমি, মদ খাচ্ছি আমি, মদ খাওয়া ছাড়ব না। কিন্তু মদ খাওয়ার সময় তুমি এনে নথ নেড়ে বাধা দেবে সেটা আমি প্রত্যাশা করি। মদ খাওয়ার সময় তোমার খ্যাংরা খেতে ভাল লাগে আমার—এ হে-হে-হে-হে।'

বিরূপাক্ষ হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটাকে শেষ দু'চারটে টানের থেকে রেহাই দিল, অ্যাশট্রেতে না ফেলে মেঝের কার্পেটের ওপর ফেলে পা দিয়ে পিষতে লাগল। এ ঘরের এই চমৎকার জয়পুরী কার্পেটের ওপর ধূলো, সিগারেটের ছাই তো দূরের কথা, এক চিলতে পরিষ্কার কাগজও উড়ে এসে পড়তে দিত না জয়তী একদিন,—আড়াই বছর আগে। কিন্তু সিগারেটের আগুন দিয়ে গালচেটাকে পুড়িয়ে নেয়া হচ্ছে সিগারেটের কালি মেড়ে দেয়া হচ্ছে? কি বলতে চায় জয়তী? কিছুই বলছে না। বিরূপাক্ষের আগের কথারও কোন উত্তর দিল না সে। একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে গালচের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল বিরূপাক্ষ।

'মদ খেয়ে শরীর সুস্থ আছে তো তোমার।' জয়তী বললে।

'তা আছে। এ কার্পেটটা ইনসিওর করিনি আমি।'

দুটো দেশলাইয়ের কাঠি একসঙ্গে জ্বালিয়ে কার্পেটে ছড়িয়ে দিল বিরূপাক্ষ।

'বাতাসে নিভে যাচ্ছে তো তোমার দেশলাইয়ের আগুন।'

'অনেক জায়গায় পুড়ে গেছে গালচে, কেমন দেখাচ্ছে?'

'বেশ নতুন ধরনের একরকম হল।'

'পুড়িয়ে ফেলব কার্পেটটাকে?'

'কেরোসিন ঢেলে নিতে হবে দুচার টিন।'

'তাহলে তো বাড়িটাও পুড়তে থাকবে। ফায়ার ব্রিগেড আসবে। পুলিশ আসবে।'

'আসুক, আসবে।'

'কিছু হবে না তাতে?' জিজ্ঞেস করে একটু থেমে বিরূপাক্ষ বললে, 'বাড়ি তো ইনসিওর করা নয়। বাড়ি তো ইনসিওর করিনি এখনও।'

না করেছে, মিটে গেছে। বাড়িটাকে ইনসিওর করলেও হয়, না করলেও হয়, সেটা বিরূপাক্ষ বুঝবে ; জয়তীর মনের প্রেম যেন অন্য কোথাও, অন্য কোন পুরুষ বা বাড়ি আশ্রয় করে না হলেও, এই পুরুষটি ও তার বাড়ির ত্রিসীমার নয় যেন, অনুভব করতে করতে মনের প্রশান্তি ফিরে পেল জয়তী। কিন্তু এও সে জানে, এ বাড়িটা পুড়বে না, গালচেটাও না। বাড়িটা পুড়লেও বীমা করে রেখেছে বিরূপাক্ষ। করেছে।

'মদ খাচ্ছি। খাওয়াটা খারাপ নয়?'

'তোমার শরীর তো সুস্থ থাকছে। কেন খারাপ হবে?'

'সুস্থতার কথা নয় ; এম্নিই, ওটা ভালো?'

'খুব সম্ভব ভালো—তোমার পক্ষে।'

'কেন?'

জয়তীর কিছু বলবার ছিল না। বইটাও পড়া হচ্ছে না। বুজিয়ে রেখেছে হাতের ভেতর। খুলে পড়বে কিনা ভাবছিল।

'মদ খেয়ে আমার লিভার পেকে উঠবে, এই তো চাও তুমি।'

'তোমার লিভার আছে? না থাকলে তা পাকবে কি করে?'

বিরূপাক্ষ একটু হেসে বললে, হাঁ জী, হাঁ হাঁ জী, হাঁ, ইয়ে আচ্ছি বাৎ হ্যায়। যে সব মেয়ের জ্ঞান পবন আছে, তারা স্বামীর মদের গেলাস ভাঙতে যায় না, কিন্তু মোলায়েম হাতে কান টেনে মাথা নিয়ে আসে। তুমি আমার কর্ণমূল ধরে টান দিয়েছ জয়তী। আমি বুঝেছি তুমি আমার মদ খাওয়া পছন্দ কর না। আমি বুঝেছি। গুরুমা তার ছেলেদের ধমকে পিটিয়ে একরকম কথা বলে। মা গোঁসাই তার বড় চেলাকে নিজের ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে আর এক ধাঁজে কথা বলে—এই যেমন তুমি বললে। বুঝেছি আমি। কিন্তু মদ ছাড়া খুব কঠিন, কিন্তু মদ ছাড়ব আমি। ছাড়ব আমি। মন্মথ, অ-মন্মথ!' বিরূপাক্ষ গলা

ছেড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

'হুজুর!' বলে মন্মথ হাজির হতেই বিরূপাক্ষ বললে 'দু বোতল সোডা, গেলাস, ডিকান্টার, পেগ আর ঐ একেবারে কোণার ঘরটার থেকে খুব ভাল বিলিতি যা হাতের কাছে পাও—বিয়ার, ভেরমুথ, জিন, রাম আব রামছাগল ছাড়া—নিয়েসো তো চট করে। আমি আজ খাব মদ কাল খাব, পশু খাব, তারপর খোঁয়াড়ি ভাঙব, তারপর থেকে আস্তে আস্তে মদ খাওয়া ছেড়ে দেব ভাবছি মন্মথ। জয়তী চাচ্ছে তাই। মদ দিয়ে ধোলাই করে আমার লিভার পাকিয়ে দিচ্ছে জয়তী। বুঝলে মন্মথ—বলি বুঝলে হে মিটমিটে মন্মথ—'

বিরূপাক্ষ মন্মথের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে চোখ নাচাল—ডানে বাঁয়ে কান্নি মেবে দুমড়ে তুবড়ে ঠাস করে একটা চড় মারল মন্মথকে।

মন্মথ ভিরমি খেয়ে—নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে দোবগোড়ায় গিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল ঃ হা হা হা হা কবে হেসে উঠল বিরূপাক্ষ।

এটা বিরূপাক্ষ মন্মথর একটা খেলা ভালো লাগছে না-জীবনটা কেমন যেন লিম্বু হয়ে গেছে মনে হল—হো হো হো হো করে একদল হায়নার মত হেসে ওঠে এরা দুইজন।

এগারো

পরদিন সকালবেলা ছাদের ঘরে বসেছিল বিরূপাক্ষ। কালকের সেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসেব আর্ট ও থিয়েটারের ওপর বইটা পড়ছিল জয়তী ; গ্রীক থিয়েটাব সম্পর্কে কি লিখেছে দেখছিল।

বিরূপাক্ষ দূরে একটা কৌচে বসে সিগারেট টানছিল ; বললে, আমি তোমাকে যা বলছিলুম—'

মন্মথ গড়গড়ায় তামাক সাজিয়ে দিয়ে গেল বিরূপাক্ষকে। সিগারেটটা ফেলে দিল বিরূপাক্ষ জানলাব ভেতর দিয়ে বাইরের রাস্তায়। গড়গড়ায় নলটা আড়ষ্টভাবে টেনে নিয়ে মুখে ছুঁইয়ে দু-একটা আলতো টান মেরে জয়তীর দিকে ভাল মনে করে তাকাতে গেল সে;-কামনার চেয়ে শুভেচ্ছার প্রেরণায়। কিন্তু সে চোখে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে বোবা রসিকতায় লিপ্ত—পাড়াগাঁর বাড়িব আত্মপ্রসাদ ছাড়া আব কোনো বংই ধরা পড়ল না...অনুভব করে কেমন যেন লাগল জয়তীর, ঘাড় ফিরিয়ে জানালাব ভেতর দিয়ে দূরেব রৌদ্র প্রাণবত্তার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'আমি তোমাকে আমাব পেড়াপেড়ির গল্পটা শোনাতে চাচ্ছিলুম আবার। গল্পটা যতবাব বলা যায়—পুরোনো হয় না—শোন তুমি বি-এতে সেকেণ্ড ক্লাস অর্নাস পেলে। আমি অত শত জানতুম না। আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটির ছেলেদেব ফেডারেশন না কি—তারি একটা মজলিসে তোমাকে দেখতে পেয়েছিলুম—' বলে তামাক টানতে লাগল বিরূপাক্ষ।

গড়গড়ায় জলতরঙ্গ, হাওয়ায় অম্বুরি তামাকেব গন্ধ।

'আমাকে নিয়ে গিয়েছিল শৈলেন। শৈলেনের কথা মনে আছে? তোমাদেব সভাসমিতিব ছাত্রছাত্রীদের সে তো একজন বড় স্পনসব ছিল—'?

'স্পনসর?'

'না, কি বলে ওকে? স্পনসব নয়?'

'সভাসমিতির স্পনসর হতে পারে-ছাত্রছাত্রীদেব নয—'

'তা হলে চাই বলব?'

'বলতে পার।'

'চাঁই আর স্পনসর এক নয়?'

'না। তুমি বরং ইংরেজি শব্দ নাই ব্যবহাব করলে, আমি তো বাংলা জানি—'

'ঠিক বলেছ।' গড়গড়াব নল মুখে না দিয়ে সেটাকে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত সাপছেনালি খেলিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'তুমি এত ইংরেজিনবিশ, অথচ আমি কিছুই জানি না। আমাকে শেখাবে? তোমাব মত শেখাতে পারে কে আর বল?'

'ও জিনিস শেখানো যায় না—'জয়তী এক কথায় সেরে দিয়ে বললে, তার পরে কথা একটু বাড়িয়ে ফেলে বললে, 'যে নিজেই মুন্সী তাকে শেখানো যায় না।'

বিরূপাক্ষ তামাক টানছিল, একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে তামাক টানতে লাগল আবার ঃ যেন হোঁদড় হরিণীতে শীত-সকালেব কথিকা তৈরি হচ্ছে নদীর এপার-ওপার থেকে।

'শৈলেন আমাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেছল বলেই তো তোমাকে দেখতে পেলুম। পরে জানতে

পেরেছিলুম তুমি ইউনিভার্সিটির জয়তী পণ্ডিত। কিন্তু সেজন্যে নয়, তোমাদের বনেদী ঘরের জন্যেও নয়, তোমার নিছক নিজের জন্যেই তোমাকে আমি দেখেই ভালবেসেছিলুম। সেদিনই সঙ্কল্প করেছিলাম পৃথিবীতে যদি বেঁচে থাকতে হয় তা তোমার মত মেয়েমানুষের মিষ্টি জুতো খেয়ে। সে সঙ্কল্প আমি কাজে ফলিয়েছি।'

'কিন্তু যেরকম চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করতে চেয়েছিলাম', জয়তী একটু হেসে বললে, 'সে চামড়া তো গোরু-ছাগলের পিঠে পাওয়া গেল না-একটু নিরেস লাগছে না জুতোটাকে তাই?'

জয়তীর বাঁকা কোঁকড়ানো কথাটা একটু সোজা সরল করে নিয়ে বুঝে দেখতে চাইল, কিন্তু কি বলতে চাইল জয়তী ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না বিরূপাক্ষ।

'কিন্তু মানুষের চামড়ায় তো জুতো বানানো নিষেধ'-জয়তী বললে।

জয়তীর মুখ চাপা আঁচের অঙ্গারের মত হয়ে উঠল। বিরূপাক্ষ তা টের পেল না। তার অনুভূতি উত্তাল লিঙ্গশক্তির প্রকর্ষে জায়গাজমি ঘরদোর গাড়ি তৈরি হয়, মেয়েমানুষও দখল হয়, কিন্তু সে সব মেয়েমানুষের আত্মা যে শরীরটাকে খোলসের মত ফেলে বিদায় নেয়। যখনই বিরূপাক্ষের মত একজন লোকের সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়—তা জানে না বিরূপাক্ষ। না জেনে লাভই তার।

শীতের এ কটা রাত শুয়োরের মত সঙ্গ সুখ খুঁজেছে বিরূপাক্ষ ঃ না পেলে আহত হয়েছে-শুয়োরের মত, মানুষের মত নয়।

'তুমি সাইকোলজিতে এম-এ পড়ছিলে। আমাদের দেশে এত রূপ থাকে? তা থাকে—আমাদের দেশেই থাকে—অন্য কোথাও না, বাঙালীঘরের সেই রূপ তোমার। সকলে বলছিল তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাবে। তোমার ছাঁচি মিছরি খেতে মাছি মশা বোলতা বিষ পিঁপড়ে গাঁধিপোকা ফড় ফড় করছে, কিন্তু—তবুও কি করে মাইফেলে তোমাকে আমি পেলুম জয়তী। এ সংসারে এরকম সফলতা পেতে দুটো জিনিসের দরকার—এক টাকা, আর এক জুঁকের নাগান লাইগ্যা থাকা—'

বিরূপাক্ষ বলতে লাগল, 'টাকা অবিশ্যি আমার চেয়ে কারু-কারু আরো ঢের বেশি ছিল। কিন্তু কালোবাজারে আমি কামিয়ে নিচ্ছিলুম। মন্বন্তরের সময় তখন, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মাথায় খুন চড়ে গেল ; মানুষের হাড়ের—' বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে এক টান মেরে সেটা ফেলে দিল লোক কোলাহলের চলাচলের রাস্তা তাক করে।

'কিন্তু শুধু টাকা দিয়ে তোমাকে তো আমি কিনে নিতে পারিনি। ওয়ার কন্ট্রাক্টে, ব্ল্যাক-মার্কেটে যত টাকাই করি না কেন, আমি তো ভাগাড়ের শকুনির বাচ্চা—মফঃস্বলে জমিদার সেরেস্তার মুহুরী ছিলেন—মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে পেতেন। বাবার কথা বলছি।'

নল মুখে দিল বিরূপাক্ষ।

'তোমার সে সব ধর্মভাইদের ভেতরে এমন অনেক বনেদি ছোকরা ছিল যে আমার আজকের সমস্ত ব্যবসার গুডউইল কড়ে আঙুল দিয়ে কিনে নিতে পারে।'

'কে ছিল সে রকম?'

'তুমি জানতে না?'

'আমি শুনিনি তো কোনোদিন—শমীন, রবি, মনোতোষ, সুব্রত নীরেন—কার কথা তুমি বলছ?'

'এদের কারু আমার চেয়ে বেশি টাকা আছে জানলে তাকে বিয়ে করতে তুমি?'

'কার আছে সেরকম টাকা এদের ভেতর?'

'এদের সকলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জানা আছে তোমার?'

'চার-পাঁচ লাখের বেশি নেই শমীনদের। স্থাবর-অস্থাবর সব নিয়ে লাখ দশের বেশি হবে না। কিন্তু শরিক তো অনেক। শরিক সকলেরই।'

'বাস্তবিক, একেবারে প্রাণে এসে হাত দিয়েছেন শশধরবাবু-যাই বল তুমি। মা বাপ ভাই বোন কেউই তো নেই আমার। আমি ভেবেছিলুম সেইটে আমার দোষ বিয়ের বাজারে। কিন্তু সেইটে আমার গুণ হল। আমার সম্পত্তিটা যে এজমালী নয়। আমার যে শরিক নেই সেটা আমার চেয়েও আগে বুঝে ফেলেছেন শশধরবাবু আর তার মেয়ে। সত্যিই এদিকে মাথা খেলেনি এতদিন আমার। তাই তো—' বিরূপাক্ষ নল মুখে দিয়ে বললে, 'আমি তো একা, কোন শরিক নেই তো আমার।'

'আমি তো আছি।'

'তুমি তো আমার স্ত্রী—শরিক তুমি? শরিক নও তো।'

'তোমার ভাই থাকলে শরিক হত? স্ত্রী হিসেবে সম্পত্তির শরিক-টরিক আমি নই, ঢের বেশি ; ওটা

সূচীপত্রে যান

আমারও—পুরোপুরি।'

'তা তো ঠিক'? তামাক টানতে টানতে বিরূপাক্ষ বললে, 'আমি মরে গেলে আমার কোন ওয়ারিশ না থাকলে আমার সমস্ত সম্পত্তি হয়তো তুমিই পাবে—'

'কারো বাঁচামরার কথা হচ্ছে না ; কিন্তু আর কোন ওয়ারিশ নেই, আমিই পাব সব।'

জয়তী প্রাণের গরমে কথা বলছে টের পাচ্ছিল বিরূপাক্ষ ; এরকম নতুন টাকার মত চনচন করে বেজে উঠে জয়তীকে কথা বলতে প্রায়ই শোনা যায় না—আজকাল তো একেবারেই না ; কিন্তু তবুও আজ বেশ বোল তুলে কথা বলছে জয়তী। টাকা মানুষকে কথা বলায়, প্রেম নয়, প্রণয় নয়, লালসাও নয়। বিরূপাক্ষ চোখ বুজে নল টানছিল, বললে, 'না কেউ পাবে না আর তুমি ছাড়া। তবে ভাবি গোলমেলে এই সংসারটা, ভাবি গোলমেলে আইন আদালতগুলো-'

'কি করবে আইন-আদালত আমার নামে সব লিখে ঠিক করে রাখলে—'

'হয়তো পঁচিশ লাখের পনের কুড়ি লাখ তোমাকে দিল, বাকি টাকা আটকে রাখল—'

'কি করে আটকাবে?'

'নানারকম ফ্যাকড়া বেরিয়ে পড়ে আইনের। যে মানুষ বেঁচে থেকে লাখ লাখ টাকা জমিয়ে মরে যায়, সে মরে গিয়ে আর বেঁচে উঠতে পারে না তো। কিন্তু সে বেঁচে ফিরে না এলে আইন খানিকটা গোলমাল করবেই—'

'করবেই? তুমি লিখে দিয়েছে কাউকে সম্পত্তির কিছু?'

'কাউকে না।'

'আমি ছাড়া তোমার ওয়ারিশ আছে কেউ?'

'কেউ না। আমাদের ছেলেপুলেও তো নেই।'

জয়তী বললে, 'শমীন, মনোতোষ, নীরেন—ওদের সকলেরই তো ভাগের টাকাকড়ি, সম্পত্তি; ভাগ তো বেড়েই যাচ্ছে, শরিক বাড়ছে কেবলই। ওরা তো চাকরী করে, ভাল ব্যবসা নেই কারু, যা ছিল যুদ্ধের বাজারে সে সব গুটিয়ে ফেলতে হল, এমনই বাঁচার কাররারি সব। না, ওদের টাকা নেই, কিছু, দুতিন লাখের বেশি মাথা পিছু কারুর নেই, অথচ তুমি বলে দিলে তোমার ব্যবসা মেরে নিতে পারে ওদের যে কেউ। মদ তো খাচ্ছ, কিন্তু কোন আড়তের চাল খাচ্ছ বল তো দেখি?'

'বিরূপাক্ষ বললে, 'ওরা যদি আমার চেয়ে বড়লোক হত, তাহলে ওদের কাউকে বিয়ে করতে তুমি?'

জয়তী নিজের ঘাড়ের ওপর একটা আঁচিল খুঁটতে খুঁটতে বললে, 'শুধু রকলম সেঁটে এত বড় বেনে হয়ে ওঠোনি তুমি, এ ধাঁধাটা তুমি কষে দেখবে।'

'আমি দেখেছি'—বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'কি বার হল কষে?'

'তুমি শমীনকে বিয়ে করতে তার ত্রিশ লাখ থাকলে।'

'এটা বোকার মত কথা হল।'

বিরূপাক্ষ সিগারেটে একটা দুটো টান মেরে জানালার ভেতর দিয়ে বাজার গুলজারের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা—কিন্তু গুলজার তাতে আরো বেড়ে উঠলো বলে মনে হল না। কারু চেদো মাথায় গিয়ে পড়েনি সিগারেট, কারু সিল্কের শাড়ি পুড়িয়ে দেয়নি।

'বোকা কথা বলেছি?'

'তোমার তো পঁচিশ লাখ আছে। শমীনের যদি পঁচিশ লাখ থাকত, চব্বিশ লাখ, কুড়ি লাখ থাকত তাহলে আমি কি করতাম এই হল ধাঁধা।'

'আর আমার যদি কুড়ি লাখ থাকত, শমীনের পঁচিশ লাখ?'

'কি করতাম তাহলে আমি?'

'কি করতে?'

'কষে বার কর', জয়তী বললে।

'বার করেছি'—বিরূপাক্ষ নতুন আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে। 'তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল টাকার জোরে, আমার জোরে নয়। আমাকে শিখণ্ডীর মত দাঁড় করিয়ে তুমি বাপের বাড়ি গিয়ে কি করেছ এ দু বছর আড়াই বছর, বলবে আমাকে?'

সূচীপত্রে যান

জয়তী অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের বইটা তেপয়ের ওপর থেকে তুলে নিয়েছিল ; সেটাকে বন্ধ করে সরিয়ে রেখে বললে, 'আমাকে বিয়ে করার পর থেকে এ তিন বছর তোমার হালচাল কি রকম জিজ্ঞেস করিনি তো তোমাকে কিছু আমি।'

'না, তা করনি বটে।' বিরূপাক্ষ ঠোঁট চেপে হেসে ভেতরে তেজ দমিয়ে রাখতে রাখতে বললে।

'টাকা তোমাকে শিকেয় টেনে নিয়েছে। আমাকেও দু কান কাটা করেছে তো টাকার লোভ।' জয়তী বললে।

বিরূপাক্ষ আর তর্কবিতর্ক করতে গেল না, ব্যাপারটা বুঝল সে। বুঝে বিশেষ কোন অস্বস্তি এল না তার মনে। বিয়ে করার আগের থেকে পরের থেকে জয়তীকে বুঝে আসছে সে। জয়তী বিরূপাক্ষকে ভালবাসা বা শ্রদ্ধা করার ধার দিয়ে চলাচল করে না। কালক্রমে করবে কিনা বলা কঠিন। বিরূপাক্ষকে সমীহ করে—মনে মনে একটা দিক দিয়ে প্রশংসা করে খুব জয়তী ; একা হাতে লড়ে নিজেরি হিম্মতে পঁচিশ লাখ টাকা বিরূপাক্ষ কামিয়ে ফেলেছে বলে;—কিন্তু বিরূপাক্ষের টাকার চেয়ে শমীনদের টাকাকেও ভালবাসে জয়তী-একই কাগজের গভর্নমেণ্ট প্রমিসরি নোট যদিও টাকাগুলো। শমীনদের দোষ এই যে তাদের হিসেব চার পাঁচ লাখ টাকার বেশি উঠতে পারল না। তা যদি উঠত—একটু বেশিই যদি হত—সবই তো হতে পারত তবে। পারল না। হল না সেটা।

'ওরা আসে-টাসে আজকাল তোমার বাবার বাড়িতে?'

'আসে মাঝে মাঝে।'

'কে কে আসে?'

'মনোতোষ, সুব্রত, শমীন—সকলেই।'

'প্রায়ই আসে বুঝি?'

'কেউ না কেউ রোজই।'

'সিগারেটটা খাচ্ছিল বিরূপাক্ষ, গড়গড়ার, নলটা হাতে ছিল, নলটা নেড়ে-চেড়ে বললে, সময় বেছে কখন আসে তারা?'

'সন্ধ্যার পরে।'

'তারপর কতক্ষণ কেটে যায়?'

'অনেক রাত অব্দি গল্পগুজব চলে—'

বিরূপাক্ষ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'এই রকমই চলবে?'

জয়তী আকাশের রোদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে বিয়ে করেছি বলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ করতে পারব না—একটা কথা হল। আজকাল এরকম কড়াকড়ি কিছু নেই।'

'তুমি কি চাও?'

'তা তো বলেছি। কোন ওয়ারিশ নেই ; বেঁচে থাকলে সম্পত্তিটা আমি পাব।'

বিরূপাক্ষ দুতিন ঘণ্টার ভেতরেই একটিন সিগারেট ফুরিয়ে ফেলেছে ; যে সিগারেটটা পুড়ে গেছে তার আগুনে আর একটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ওটা তো বিষয়-আসয়ের কথা হল। তবে সব কথাই অবিশ্যি টাকাকড়ির কথা।'

বিরূপাক্ষ একটা ঢেকুর তুলে বললে, 'টাকাকড়ির কথা ছাড়। আর কি কথা থাকতে পারে?'

'আছে।'

'আছে?'

'আমি বেঁচে থাকতে চাই—বিষয়-টিষয় আছে, বেশ;—কিন্তু আরো কিছু নিয়ে, তা পেতেই হবে।'

বিরূপাক্ষ দু এক মুহূর্ত হতবোধের মত চেয়ে থেকে তারপর জয়তীর কথার ভাবটা বুঝে নিল।

'কিরকমভাবে বেঁচে থাকতে চাও?'

'যেরকম চলেছে।'

'শতকরা নব্বই দিন বাপের বাড়িতে থেকে?'

'সেটা থাকা দরকার তো।'

'বিয়ে করেছে শমীনরা?'

'করেছে কেউ কেউ।'

'তবুও আসে তোমার কাছে? কেন? বিরূপাক্ষকে তুমি বিয়ে করেছ বলে?'

সূচীপত্রে যান

'তাতে তাদের কি লাভ?'

'পঁচিশ লাখের কিছু কিছু তো লাভ।'

জয়তী বললে, 'বেশ ল্যাজে গোবরে কথা বলা হল–'

'তা তো হল, বিরূপাক্ষ সিগারেটটা জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে 'কত রাত অব্দি থাকে তারা?'

'আমি কত রাত অব্দি থাকি তোমার ঘরে?'

'তার মানে?'

'তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করলে, আমিও করলুম তোমাকে একটা। এসব ধাঁধার এ ছাড়া কোন উত্তর নেই। এসো—ওঠো—'

'কোথায় যেতে হবে?' চিতল মাছের ঘাই মেবে অন্ধকারে জলের মত পাক খেয়ে বিহ্বল হয়ে বললে যেন বিরূপাক্ষ।

'চলো নিউ মার্কেটে যাই—অনেক জিনিস কিনতে হবে।'

বিরূপাক্ষ মোটরটাকে ঠিক করবার জন্যে নীচে চলে গেল। নিজেই মোটর চালিয়ে নিল বিরূপাক্ষ, জয়তীকে নিজের পাশে বসবা'র জন্যে অনুরোধ করল সে। কিন্তু পেছনেব সীটে, একা—বেশ আবাম কবে গিয়ে বসল জয়তী।

বার

পরদিনও জয়তীকে সেই ঘবে দেখা গেল। কমলা বঙের গদী আঁটা সোফায় বসে। বিরূপাক্ষ তেমনি খাটেব ওপব শুয়েছিল।

'আজকাল আর স্টক একসচেঞ্জে যাই না বড় একটা।'

'এক্ষুনি গিয়ে লাভ নেই', জয়তী বললে, 'বাজার অবিশ্যি খুব খাবাপ নয়—তবে বাই কুড়িয়ে তাল পাকাতে হবে আর কি।'

'কি হবে চুনোপুঁটিব দলে ভিড়ে। আমার হাঙবেব খাঁইও মিটে গেল বুঝি। বাজাবেব ভাল আব মন্দ। আর কেন?'

'আমার টাকা চাই।'

'তোমার নামে উইল করতে বল ; সে তো রেজিস্টার্ড হয়েছে।'

'ক'লাখ হল?'

'বেশি নয়, লাখ দশেক। বাকি পনেবো লাখ আমি কয়েকটা স্কুল কলেজ হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটিকে দেব ঠিক করেছি।'

'দশ লাখ ক্যাশ? স্কুল কলেজ হাসপাতালে যা দেবে ভালোই–'

'না ক্যাশ নয়, জমি, জমা, বাড়ি মোটবকাব সব নিয়ে—'

'অ্যাটর্নির সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই—'

'তা বলো, উইল তো আমি তোমাকে দেখিয়েছি।'

'দেখেছি। একটু আধটু বদলানো দরকাব।'

'কি রকম? কোন দিক দিয়ে?'

খাটের ওপর গা ছড়িয়ে বসে ঘাড় কাৎ করে বিরূপাক্ষ সিলিঙের দিকে তাকিয়েছিল।

'দশ লাখকে পঁচিশ লাখ করতে হবে।'

'কি করে তা সম্ভব হবে জয়তী?'

'যে দশ পয়সাকে দশ লাখে উঠিয়েছে সে তা পারবে।'

'তা বটে', বিরূপাক্ষ বললে, 'তা দেখব আমি। কিন্তু তাহলে তো আমাব দিনরাত বাজার ঘুরতে হয়—'

বিরূপাক্ষ জয়তীর দিকে তাকাল, সে তাকাল হাতের বইটাব দিকে। নিজেকে বললে জয়তী, 'ও নিজের পায় দাঁড়িয়ে মানুষ কিনা সেটা, ঠিক বলতে পাবা যায় না ; তবে, অনেকটা তাই বটে। ওব টাকার সৌভাগ্য আছে। ও ভাবে ওর জীবনে পরীভাগ্যেও আছে, কিন্তু তা নেই। কিছুটা দিতে হয়েছিল বটে ওকে—কিন্তু আর দেব না। আমার হৃদয়ও কোন দিনই পায়নি—এখন তা সবচেয়ে দূরে চলে গেছে। তবুও ওকে আহত করা ঠিক হবে। ওকে টাকার বাজাবে নামিয়ে দেওয়া উচিত আমাব ;

লোকসান দেবে, লাভে হাবুডুবু খাবে, ভাল লাগবে বিরূপাক্ষের সেই তো ওর পৃথিবী। ও যার উইল রেজিস্টারি করেছে বলছে তাতে আমার বিশ্বাস নেই। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজকে পনেরো লাখ টাকা দেবে বলছে বিরূপাক্ষ ; পনেরো টাকা ও দেবে কিনা সন্দেহ। ও দেবে ইউনিভার্সিটিকে টাকা, হাসপাতালকে? তবেই হয়েছে। সে টাকা খেতে গেলে হাসপাতালে রুগী বাঁচবে না আর—ছেলেদের মাষ্টারদের আর ভাত খেতে হবে না বিরূপাক্ষের টাকা চিবিয়ে খেয়ে। ও আমাকে একটা জাল উইল দেখিয়েছে জানি আমি। ওর নিজের অ্যাটর্নি যে কে—আসল উইলটা যে কোথায় জানাবে না আমাকে—জানতে পারাও যাবে না। খুবই সন্দেহ বিরূপাক্ষ কোনো টাকা দেবে কিনা আমাকে ; জানতে পারাও যাবে না। খুবই সন্দেহ ওর টাকা পেতে হলে বারো মাস ওব বাড়িতে থাকতে হবে, হবে ওর সঙ্গে শুতে বসতে। কিন্তু তারপরেও জানতে পারা যাবে যে বেশ কযেকটি হস্তেল ঘুঘুনীর ভোগে উইলের টাকাটা বিলি করে দিয়েছে বিরূপাক্ষ। অনেক ভদ্রঘরেব স্ত্রীলোকদেব কাছে যাওয়া-আসা করে তো বিরূপাক্ষ—বেশ বড়ঘরের মেয়েদের সঙ্গে ওর কাববাব। বিরূপাক্ষকে বিয়ে কববাব সময এসব কথা ভেবে দেখিনি। টাকার কথাই ভেবেছিলুম শুধু। কিন্তু যে মানুষ পাই পযসাব থেকে পঁচিশ লাখে উঠতে পারে তার টাকা যে তাব স্ত্রীবও প্রাপ্য নয়, সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। এসব লোকেব স্ত্রী থাকে না তো ; কাউর স্ল্যাকস খুলতে হয আঁটতে হয শুধু—সারাদিন নানা রকমারি জাযগায।

জিভ আর পেটেব ব্যবহার বযেছে। অন্য সব লোকের বেলায বলা হয চিন্তা ভাবনাব চালনা রয়েছে ; সূত্র সংকল্পেব সন্ধান বযেছে, কিন্তু জিভ ও পেটেরই নিত্যনিমিত্ত রযেছে এ কথা বিরূপাক্ষদের দাড়ি কামিয়ে মুখ পালিশ কবে ঘুবতে ফিরতে দেখলেই মনে হয। অন্য কারো বেলা এমন বেযাড়াভাবে মনে হয না। মাথারও ব্যবহার আছে বিরূপাক্ষদেব ; স্টক একসচেঞ্জেব সেই বাড়িটায ঢুকে একটা অব্যক্ত পরিভাষায চিৎকাবেব ভেতব ; বাঘের গর্জন সিংহেব গর্জনও নয ; যেন নিববচ্ছিন্ন মড়ার দেশে কালে কালে শেযাল হায়নাব হুল্লোড়। খুবই খাটুনি বটে এতে মানুষের মাথাব। খুবই।

ওব সঙ্গে বেশি দিন থাকব না আমি। তবে চলে যাবাব আগে কিছু টাকা নিয়ে যাব ; ও দিতে চাইবে না কিছুই। তবুও নিতেই হবে। ওকে বিয়ে কবে অসাধ অরুচি ঘেঁটেছি। ওব টাকা নিয়ে চলে যাওয়া সেই জিনিসেবই জেব। কিন্তু কি করব, একটা জিনিস আরম্ভ কবে মাঝপথ অবধি এসেছি; মাঝপথও ছাড়িয়ে গেছি, এখন মুড়ো দেখে নিতে হবে ; না হলে কোনো ভালো নতুন সূচনাব দিকে চলে যাওয়া সম্ভব হবে না।

'শুধু টাকাব জোরেই নয, ধূনোব গন্ধেব মত মা মনসাব মুখে আমি লেগে লেগে থেকে তবে তোমাকে দখল কবেছি। দু'বছর তুমি আমাকে কুকুবেব মত দূব দূব কবে তাড়িয়েছ যেখানে সেখানে যখন তখন যার তাব সামনে-মনে নেই তোমাব?'

জযতী কুরুশ কাঁটা দিয়ে কার্পেট বুনছিল, হাতেব নকশাটাব দিকে তাকিযে থেকে কাজ করতে কবতে বললে, 'কেন থাকবে না বিরূপাক্ষ—'

'তুমি আমাকে বিরূপাক্ষ বলছ যে—'

'ও কিছু না, সুবিধের জন্য বলেছি।'

'তুমি তো আমাব চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট।'

'বেশ, ডাকব না বিরূপাক্ষ তাহলে।'

'না না, একা ঘরে ঐ নামেই ডেকো যখনই দবকার হয। জিনিসটা তুচ্ছ নয। জযতী আমাকে ডাকছে বিরূপাক্ষ—আমরা স্বামী-স্ত্রী তো বটেই, কিন্তু তুমি যখন আমাকে বিরূপাক্ষ ডাক, মনে হয় গোরানী ফিবিঙ্গি, মানিক জোড়া আমরা। সেবার এক গোবানী পর্তুগীজ ছুঁড়িকে ধবেছিলুম—'

—বলতে বলতে বিরূপাক্ষ টের পেল বেফাঁস হাওয়া সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সে, কোনো দরকার নেই তো তার।

জযতী কোনো কৌতূহল বোধ করল না, মনটা আরো বেশি হাতের কার্পেটের নমুনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে তার, জিনিসটাকে খুব সুন্দব জটিল শুভ্র করে তুলতে হবে।

'একটানা দু-দুটো বছর আমার ছায়া মাড়ালেও তোমার বমি আসত। মানুষ মানুষকে তাড়িয়ে দেয যেটুকু দম খরচ করে, সেটুকু তাগিদও তোমার ছিল না। —আ হা হা হা হা-?' বিরূপাক্ষ বললে।

'তোমাকে বিয়ে করেছি তো তবুও—?' নিজের জীবনের ফাঁকা কথাটাকে একটু মুখের রস দিয়ে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা কবে জয়তী মনে মনে হাসতে হাসতে বললে।

সূচীপত্রে যান

'আমি করিয়েছি।'

'তা হবে ; তোমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলুম আমি—ঘড়ির দোলক যেমন একদিক থেকে আর একদিকে দোলে।'

'ঘড়ির দোলক? তোমার কথাটা বুঝলুম না—'

'আচ্ছা, তেজী মন্দা বাজারের উপমা দিই নইলে, তুমি ক্লাইভ স্ট্রীটের মানুষ।'

'উপমা থাক', বিরূপাক্ষ জানালার বাইরের কলকাতার হায়রানি-কলতানির দিকে তাকিয়ে বললে, 'এমনি মুখের ভাষায় পরিষ্কার করে বল।'

'আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

একটা কথা তবুও বলতে চাই আমি, অনেকবার বলেছি, তবুও বলি। কিছু মনে কোরো না। মনে যা ভাবি মুখে তা না বলে পারি না। তুমি ভয় পেতে আমাকে দেখে—ঘেন্না করতে। রাত দুটোর সময় তোমাদের বাড়ির দেয়ালের পাইপ বেয়ে তোমার ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তুমি ঘুমোচ্ছ। তোমার সমস্ত ঘরের ভেতর জ্যোৎস্না, জানালার শিক না ভেঙে ভেতরে ঢোকা যায় না ; কিন্তু আমি তো রাহাজানের মত ছেনি হাতে ঢুকিনি ভেতরে ঢোকাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তখনও ভাবতুম ও জিনিস আমার মত মুহুরার ছেলের জন্য নয়। তোমাকে ছোঁয়াটোয়া নয়, কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে ত।'

শুনে জয়তী কেমন একটা সেঁকো তিক্ততায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

'তুমি জেগে উঠলে জানালার খড়খড়িতে বিশ্রী শব্দ হচ্ছে বলে ; চোখ চেয়ে দেখলে—ভাবলে চোর নাকি চিমড়ে, চীৎকার দেবার ক্ষমতাও হারিয়েছে, এমনই ভয়। তারপর যখন বুঝলে আমি তখন তোমার কোদার নাহান ভয় গোদার নাহান ঘেন্নায় গিয়ে দাঁড়াইল—হ্যা হ্যা হ্যা ঝযোথি। কিন্তু তবুও—

বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললেন, 'যখন তোমাকে বললুম জানালার ভেতর দিয়ে একটা চেক রেখে যাচ্ছি আপনার জন্যে, তুমি ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করেছিলে—কত টাকার?'

সিগারেরটা হাতে রগড়াতে রগড়াতে বিরূপাক্ষ বললে, 'বলেছিলুম পাঁচ হাজার টাকার—'

জয়তী নিজের মনে নিজেকে বললে, 'সেইজন্যই আমি নিয়েছিলুম। কিন্তু নিয়ে হাত পুড়ছিলো আমার। কিন্তু থোক অতগুলো টাকা পেলে নেব না? আমার কি দোষ? আমি কি দোষী নারী? একজন অঢেল টাকা নিয়ে দিনরাত গ্রহণে চড়াতে চাইলে কোথায় সে চাঁদ সূর্য যে এড়িয়ে যেতে পারবে...'

বিরূপাক্ষ বললে, 'চেকটা ভালো করে দেখে নিলে ক্রসড চেক নয় দেখে খুশী হলে ডিজঅনার্ড হবে না তো ঐ উচ্চিংড়ীর মত চোখের ড্যালা নেড়ে জিজ্ঞেস করলে ; ক্যাশ দিতে পারি কিনা তখুনি, সেই অনুরোধও জানালে ; আমি শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। এক্কেরবারে তাজ্জব মাইরা ভাবছিলাম যে আমিত্তির নাহাম্ন প্যাঁচে প্যাঁচে বস সেই জিনিসের হেইযার নাম ট্যাহা।'

বিরূপাক্ষ এই পূর্ববঙ্গীয় ভাষার অর্থ জয়তীকে ব্যাখ্যা করতে যেত না, বুঝতেও চাইত না জয়তী এ ভাষাটা বিরূপাক্ষের নিজের জন্যে, স্বগত, একান্তই আত্মরক্ষার ভাষা।

'সেদিন পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকও দিতে পারতুম। ক্যাশও দিতে পারতুম। তোমার ঘরে কেউ ছিল না। পড়ি কি মরি করে দোতলার শিক ধরে, দেয়ালের পাইপ আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলুম—যে কোন মুহূর্তে টপকে পড়ে যেতে পারতুম-কাছেই ও দেয়ালে একটা দরজা ছিল, তুমি খুলে দিতে এলে না। ভালোই করেছিলে। টাকা তো পাঁচ হাজার দিয়েছিলাম মাত্র। পঁচিশ হাজার দিলেই দরজা খুলে যেত-তোমার বিছানায়ও জায়গা পেতুম—'

'ছি! ছি!'

'তুমি আমার স্ত্রী জয়তী।'

'ওখান থেকে উঠতে হবে না তোমার। কাছে এসো না। এসো না। বলছি। তাহলে এই জানালার ভেতর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব—'

'লাফ দেবে? জানালার তো শিক রয়েছে। কী হল তোমার!' জয়তী গালে হাত দিয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। সমস্ত শরীর মন তার লেলিহান আগুনে কঠিন ধাতু পদার্থের মত গলে গিয়ে, বিশৃঙ্খল বরফের গহ্বরে কঠিন নিঃস্পন্দ হয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে আবার।

'ও, মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল বুঝি। আমি তো কোন অন্যায় কথা বলিনি। তুমি যদি আমার স্ত্রী না হতে কথাটা তাহলে বলে ফেলে লজ্জায় আমি ইঁদুরের গর্তে সেঁধুতাম গো। কিন্তু এখন তো তা হতে পারে না, তুমি যে আমার ঘরের বউ গো।'

সূচীপত্রে যান

বিরূপাক্ষ হেলে দুলে ভঙ্গি করে বরফের দেশের সাদা ভালুকের মত উল্লাস করতে গিয়ে কালো ভালুকের কবলিত ভালুকীর মত হাউমাউ করে উঠল। এ একটা বিশেষ বিশ্রুত খেলা তার বটে—অবসরের সময় চিত্ত তোষণের জন্যে। কিন্তু তবুও জয়তীর কোনো মন বা মুখের পবিবর্তন দেখা গেল না। বিরূপাক্ষের কথা—লীলালাস্য কি তার কানে পৌঁচুচ্ছে না? কিসেব ভেতব ডুবে গিয়েছে সে?

'এ তিন বছরে তোমাব সঙ্গে বসবাস কবে আমার তিনটি ছেলেপুলে হেসেখেলে হতে পারত। আমিও ভাবছিলুম একে একে হবে সব—কিন্তু তুমি কি কবছ কে জানে, যাক, ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। তবে ছেলেপুলে হলে ভাল হত। আমার পাওনা ছিল-খুব মোটা সুদেই। কসুব তো কিছু করা হয়নি—কোনো পক্ষেব থেকেই।'

জয়তী বেবিয়ে যাচ্ছিল।

'আমিও যাচ্ছি—ক্লাইভ স্ট্রীটেব দিকে। যাবার আগে তোমাকে একটা চেক দিলে নেবে—'

জয়তী পাশ কাটিয়ে সবে যাচ্ছিল।

'পঁচিশ হাজার টাকার চেক-'

কানে তুলল না জয়তী। নিশিব ডাকে বিমূঢ়ের মত কোথাও এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

'আচ্ছা পঞ্চাশ হাজার টাকাবই কেটে দিচ্ছি। আমাব চেক কোনো দিন মাব যায় না। এখুনি ক্যাশ করে নিতে পারবে চ্যাটার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিযা। অস্ট্রেলিযা চাযনাব—যদি চাও।'

বিরূপাক্ষ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল জয়তীর গতিপথেব সীমাবেখা দেখা দিয়েছে—সে আব চলছে না, থেমে আছে।

চেক বই হাতে নিযে কাটতে কাটতে বিরূপাক্ষ বললে, 'এই নাও পঞ্চাশ হাজাব, কিন্তু একটা কথা আছে—'

জয়তী হাঁটতে হাঁটতে ছাদেব কিনাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আবো হাঁটতে গেলে ছাদ থেকে পড়ে যেতে হয ; অন্য দিকেও মোড় ঘুবতে গেল না সে : চেকটা নেবে কি সে ; জয়তী কিছু মীমাংসা কববাব আগেই তার হাতে গুঁজে দেওযা হযেছে-এমনভাবে যে হাত ঢিল কবে ছেড়ে দিলে বাস্তায় উড়ে গিয়ে পড়বে চেকটা গুঁজে দিয়েই সবে গেছে বিরূপাক্ষ ; পঞ্চাশ হাজাব টাকাব চেক—বেযাবাব চেক—

'আজ রাতে আমাব ঘরে শুতে হবে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'তুমি আমাকে জাল উইল দেখিযেছ।'

'কে বললে?'

'পাকা উইলে কি আছে আমি দেখতে চাই—তোমাব অ্যাটর্নি আর আমাব অ্যাটর্নির সামনে বসে। দবকাব হলে বদলে দিতে চাই।'

'বদলাবে তুমি?—কেন তোমাকে তো দশ লাখ লিখে দিয়েছি।'

পাঁচশ লাখ পেলেই যথেষ্ট, কিন্তু পাওযাটা পাকা কিনা সেটা বুঝে দেখতে হবে। আমাব অ্যাটর্নিব সামনে।'

'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? পঞ্চাশ হাজার টাকাব চেক যে এক্ষুনি দিলুম তোমাকে; মিথ্যে চেক? চলো ক্যাশ নিয়ে আসি।'

'আমি নিজেই ক্যাশ করে আনতে পারব।'

'আচ্ছা বেশ, খেযেদেযে মন্মথকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিযা চাযনা থেকে ভাঙিযে আনো। যদি চেক ডিজঅনাব না কবে পঞ্চাশ হাজাব টাকা দেয তাহলে আজ বাতে আলাদা ঘবে না শুয়ে, আমার ঘবেই ঘুমোবে।'

জয়তী বললে, 'কাল আমার অ্যাটর্নি আনব, তোমার অ্যাটর্নি থাকবে, পাকা উইলের কোথায় কি বদলানো দবকার ঠিক করে নেযা যাবে।'

তেরো

রাত দশটাব আগে সব দিকের সব ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে শেষ হয়ে গেল, বিরূপাক্ষ দেখলে জয়তী তাব ঘরে এসে কুশনে বসে আছে ; ঘুমোযনি ; কোনো সঙ্কল্প নেই জয়তীর মুখে।

গত ছ'মাস ধরে এ জিনিস ঘটিয়ে ওঠানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাপের বাড়িব থেকে তিন চার দিন হল ফিরে এসেছে, কিন্তু এ তিন চার দিন জয়তী নীচে একটা আলাদা কামরার ভেতর থেকে সব

সূচীপত্রে যান

দবজা বন্ধ কবে দিযে শুযেছে। বিরূপাক্ষ কেমন একটা ছাযা ছাযা মর্যাদায আচ্ছাদিত হযে কিছু কবে নি—কিছু বলেনি জযতীকে। কিন্তু আজ টাকা দিযে কথা বলিযেছে ; এত বাতে বিরূপাক্ষেব ঘবে আজ, কাল, একটানা মাস ছযেক তো খুবই থেকে যাবে জযতী। মাঝে মাঝে ধনবৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ না দেখালে মানুষ কি কবে স্ত্রীধন পায ক্লাইভ স্ট্রীটে একটা মোটা বকমেব লোকসান দিযে এসে চিন্তিত ও চমৎকৃত হযে ভাবছিল বিরূপাক্ষ। শুযে পড়ল সে।

পবদিন বিরূপাক্ষ আব ক্লাইভ স্ট্রীটে গেল না।

দুপুববেলা আজ সে একটা মাছবাঙা বঙেব সোফায বসেছিল—জযতী মুখোমুখি কমলা বঙেব সোফায।

জযতী, কি বই পড়ছ?'

'আর্ট আব থিযেটাবেব একটা বই।'

'ইংবেজি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বুঝব?'

'এবকম বই কি সকলে পড়ে?'

'ইংবেজি জানি না বলে বলছ?'

'না তা নয', জযতী বললে, 'ভাষা জানা না জানাব জন্যে নয—' বলতে বলতে থেমে গেল।

'আমাকে বুঝিযে দিলে বুঝব না?'

জযতী বইটাব দিকে তাকাল। কোথায পড়ছিল সে? গোড়াব দিকেই তো ; বেশি এগোতে পাবেনি; সেই গ্রীক থিযেটাব—

'তর্জমা কবে শোনাবে আমাকে?'

'শোনাতে পাবা যায। কিন্তু আমি যা বলছিলাম—এ বইযেব ভাষায তোমাব বাধবে না তর্জমা কবে দিলে। কিন্তু ভাষা কাকে নিযে?'

'মানে? কি বলছ, বুঝিযে দিল।'

'একটা বইযেব ভাষাই কি সব?'

'তোমাব এ প্রশ্নেব মানে কি হল?'

জযতী দূবে শেলফেব ওপব সংস্কৃত আলঙ্কাবিকদেব ওপব একখানা আব অ্যাবিস্টটলেব পোযেটিকস দুটো পাশাপাশি বইযেব দিকে তাকিযে বইল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বই দুটো। এগুলো এখানে এল কি কবে? নিজেই এনেছে সে হাতে কবে কোনো এক সময—এবাবে নয, এব আগেব বাবে যখন এ বাড়িতে ছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষেব সাহিত্যিক স্থূলতা থেকে মুক্তি পাওযাব জন্যে আলঙ্কাবিক, আবিস্টটলদেব দিকে তাকানো দবকাব ছিল না। আবিস্টটল ; এ যেন মশা মাবতে কামান দাগানো হল। কিন্তু কামান ওখানে নির্গুণভাবে পাতা বযেছে ; সগুণ হচ্ছে মশাটা। চক্কব মেবে মেবে কি যে ধ্বনন দিচ্ছে। ভনভন কবে বলছে বিরূপাক্ষ, 'ও উপন্যাসটা এখন থাক।'

'পাতা থাকুক।'

'যে কোন পুরুষ মানুষ যে কোন স্ত্রীলোককে পেতে পাবে, জানো জযতী, দুটো জিনিস থাকা চাই সে পুরুষেব—'

অগত্যা বইটা খুলতে হল আবাব জযতীকে।

চাকব তামাক সেজে দিযে গেল।

মেযেটি দেখতে শুনতে খুবই ভাল হতে পাবে; একটা হ্যাংলা ফোকলা মিনসে তবু তাকে লটকাবে, খুব বড় পণ্ডিত মেযেকে একটা বোকা পাঁঠা এসে চাব দিযে খসিযে নিযে যাবে জযতী, বড় জাতেব মেযেকে ছোট জাতেব ন্যাকা ক্যাবলা এসে গুণ কবে ফেলবে, এমন কি সে রূপসী বযসেও বড়—গুরুস্থানীয—শিং ভেঙে এঁড়ে বাছুবেব সঙ্গে ভিড়ে যাবে সে। না গিযে কববে কি সে। কোনো মানুষ যদি কড়া তাগিদে একটি মেযেমানুষেব ছাযায ছাযায দিনবাত ঘোবে, তাহলে নিত্য নধব মাছ কাটতে কাটতে এমনই জেল্লা খুলে যাবে আঁশবটিব যে পবস্পবকে ছাড়া তাদেব আব চলবে না—চলবেই না—'

বিরূপাক্ষ নলটা মুখে তুলে নিযে না টেনে হাত ঝেড়ে পর্বতেব মত সেটাকে মেঝেব ওপব ফেলে দিল।—শবীবটা সাপ খেলিযে নাচিযে নিল বেশ এক দমক ; কেমন একটা আমেজ বোধ কবেছে যেন,

ভারি ভাল লাগছে। স্নিগ্ধ, রসিক উন্মুক পুরুষের মত চোখ দুটো ঘুরিয়ে নাচিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'প্রেম ছাড়া আর কি শিবরাত্তিরে জয়তীর বিরূপাক্ষের মন্দিরে যাওয়া? ডাকবে পাখি, ডাক ডাক—ডেকে ওঠ। গা রে পাখি, গান গা, গান গা; কোন গান ভালো লাগে তোর?—গু-গু-গুণমণি দ্-দা-দাসী তব পায়! গুণমণি দাসী তব পায়।'

বিরূপাক্ষ মাথায় একটা প্রবল ঝাঁকি দিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে বসে নল তুলে নিয়ে তামাক টানল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে আস্তে আস্তে বললে, 'একটা পাখি লক্ষ বছরে একবাব এসে একটা পাথরে ঠোঁট ঘসে যেত। কিন্তু কোটি কোটি বছর পরে দেখা গেল পাখির ঠোঁটঘষায় সে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে। তাই যদি হয় তাহলে আজ একটা—কাল একটা—পর্শু একটা—তারপর দিন একটা—ছোট ছোট প্রমিসরি নোটের ঘষায় মেয়েমানুষের বিমুখতাব ক্ষয় হবে না কেন? তোমাকে বিয়ে করবার আগেও আমি জানতুম যে কোন একজন স্ত্রীলোকের পেছনে লেগে থাকলে মেগে খেতে হবে না-সেই মেয়ে লোকটিই হবে আমানি। কিন্তু জেনেও ওযাকিবহাল ছিলুম না। কিন্তু তোমাব বাবা মত দিলেন, তুমি মত দিলে আমাদের বিয়ে হল, হিন্দু মতে হল, হিন্দু আইনে হল, হিন্দু নাবীর বিয়ে হল, সবই মুঠোর ভেতর এল, আমি বুঝতে পাবলুম আমি যা ভেবেছিলুম তাই-ই ঠিক'—বলে মেয়েটির দেবী শবীরের চেযেও অপরূপ একটা কাম শরীবের দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ দুটো লুব্ধ হয়ে উঠল বিরূপাক্ষের। লোলুপ চোখে গড়গড়ায় নল কুড়িয়ে নিযে চোখ বুজে নিজেব স্নায়ু শিরায রক্তের তিরতির ঝিবঝির তিবতিব ঝিরঝিব স্রোত অনুভব করতে করতে বিরূপাক্ষ আস্তে আস্তে তামাক টানতে লাগল।

'বর্ণভেদ আমি মানি, তুমি অবিশ্যি মান না। কিন্তু তুমি ধনী বামুনেব ঘবের মেযে, আমি হচ্ছি শূদ্রের ছেলে ; তবুও তোমাকে পেতে হল আমার।'

নল ফেলে দিয়ে বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালাল। গড়গড়াব কলকিতে তামাক হয তো পুড়ে নিভে গিয়েছিল।

বিরূপাক্ষ সিগাবেটে দু'একটা টান দিযে সেটাকে অ্যাশট্রেব ভেতব চেপে দুমড়ে ঠেলে দিযে বললে, 'তোমার বাবা জানতেন আমি শুদ্দুব তুমিও জানতে, কিন্তু আমার উপাধি বায, আমাকে সকলেব কাছে বামুন বলে ভাঁড়িয়ে হিন্দু মতে বিয়ে দেওয়া হল। এটা যে কী ল্যাজে গোবব হল বুঝতে পাবলুম না। কেন, রেজিস্টারি করে কবলেই হত। আমি তো তাই বলেছিলুম। আমি ইস্ট বেঙ্গলের লোক, নমঃশূদ্র, তোমরা এদিককাব বনেদী বড় ঘবেব বামুন, তোমাদের আত্মীয বন্ধুবা আমাকে দেখেননি কোনদিন চেনেন না জানেন না—জানতেও চাইলেন না, তোমবাও ভোগা দিলে বেশ কিন্তু—কালোবাজারেব পঁচিশ লাখ ট্যাহা এমন ঘন বাইয্যার খানালোব ব্যাঙেব নাহান জাইঈব দিযা কথা কব ঝোযথি!'

চাকর ঘরে ঢুকল।

'হুজুর'।

'তামাক সেজে নিযে আয।'

'হুজুব' বলে সে গড়গড়া নিযে চলে গেল!

'অবিশ্যি আজকাল বর্ণভেদেব কোন মানে নেই। এ যুগটাও সব দিক দিয়েই মথিযে চলেছে। দাও ধোলাই চোলাই কবে সব ; একটা ফলাও বিপ্লবের কত্তা আমি। রুধিরের গন্ধে বাঘের মত হয়ে গেছে মন, একটা দুর্দান্ত দিকশূল না ছেড়ে আমি ছাড়ব না। এই পচা সমাজকে পচিযে দিতে হবে আরো—লাথি মেরে লৌলাট করে দিতে হবে—শুরু হবে এইটিনথ ইণ্টারন্যাশনাল। থার্ড ফোর্থ ফিফথে কিছু হবে না—এইটিনথ।'

চাকর তামাক দিযে গেল।

'দোরটা বন্ধ কবে যা। মন্মথ কোথায? বাজারে? দোবটা বাইরে থেকে বন্ধ কবে দিস শশী।'

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করা কাকে বলে শশী তা জানে। সে কুলুপ এঁটে চলে গেল।

'এরকম আটকানো থাকবে?' জয়তী বললে।

'থাকুক না।'

'এখন তো দিনের বেলা। আমার বেরুতে হবে তো।'

'কোথা যাবে? এ বাড়িতে কে আছে?'

জয়তী জানালার ভেতর দিয়ে দূর কৃষ্ণচূড়া দেবদারু কলকাতার রাস্তার বড় ধোঁয়াটে চক্ষুস্থির গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে রইল। যা খুশি বিরূপাক্ষ করুক—করে যাক। কিন্তু এ সব আর বেশিদিন

সূচীপত্রে যান

চলবে না। অ্যাটর্নি অবিনাশবাবু খুব বুঝদার মানুষ। বিরূপাক্ষ লোকসান দিয়ে দেউলে হবার আগেই অবিনাশবাবুর দপ্তরে বসে আইন ঠিক করে নিয়ে গুছিয়ে সরে পড়বে সে। ভাবছিল এই সব জয়তী। কিন্তু তবুও বাইরের পৃথিবীতে নিজের প্রাণের ত্রিসীমায়ও কোথাও কোন উৎসাহ খুঁজে পেল না সে। কী হবে জীবন চালিয়ে। টাকা দিয়েই বা কী হবে। বয়সের সবচেয়ে ভালো সময়টাকেই একটা পাখি বানিয়ে আকাশে ছেড়ে না দিয়ে চোখ উপড়ে মাটিতে ফেলে দিল জয়তী ; গাইয়ে পাখিটাকে খুপরীতে ঠেলে দিল তারপর ; অন্ধকারে ভাল গান হবে বলে। ভাল্লো গান হবে বটে—কিন্তু অধিকতর অন্ধকারের দরকার—মনস্থিরতর শূন্যতার; বিরূপাক্ষের ছোঁযাচেব থেকে অনেক দূরে ; তার বাবার ওখানেও নয় ; অন্য কোথাও ; মৃত্যু এসে মানুষকে তার মনস্থিরতম শূন্যতা দান করবার আগে।

'দেয়ালের পাইপ বেয়ে প্রথমবার তোমাব সঙ্গে সেলামী দিয়ে দেখা কবতে হয়েছিল। তাবপব আরও দশ বারো বার উঠতে হয়েছিল আমাকে ঐ পথ ধবেই। অথচ এমনি দুর্দান্ত তুমি যে একদিনেব জন্যেও দোর খুলে দাও নি। তোমার এই বুনো ওলের মত ঠেকাব দেখেই আমাব এই বাঘা তেঁতুলেব মত কামড়। জানোয়ারের মতন কিংবা দেবতাব মত। দেবতাব মতই-তাই তোমার মত দেবীকে—মানে, ইয়ে—দেবিকা রাণীকে লাভ কবেছি আমি। নাও এসো বিছানায়।'

বলে খুব সুভদ্রতা বজায় রাখবাব চেষ্টা করে তাকিযায ঠেস দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল বিরূপাক্ষ। অশ্লীল আগোছালো সে হবে না—যদিও তাব শবীবেব সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার অজ্ঞাতসারেই শালীনতাব নিগূঢ় অভাবেব ভেতব থেকেই জন্মলাভ করেছে—মনকে জন্ম দিয়েছে তাব।

'তোমার পরমাইদের কথা মনে পড়ছে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'পরমাই' মানে, প্রেমিক—বিরূপাক্ষেব ভাষায ; জযতী শব্দটা শোনেনি: মনে পড়ল তাব ; অর্থও মনে পড়ল।

শশী দরজায তালা মেবে গেছে—রাত আটটা-ন'টাব আগে খুলবে কিনা সন্দেহ। আফিং খাওয়া সিংহীর মত ঐ শেযালের লালসায জারিত হওয়াব সময তার এখন ; সিংহীর মতই প্রতিবোধ কববাব সময।

'তোমার পরমাইদের মধ্যে একজনেব নাম ছিল সুতীর্থ মনে পড়ে?'

সুতীর্থের কথা মাঝে মাঝে ভেবেছে জযতী। বিরূপাক্ষেব মুখে সুতীর্থেব কথা শুনে মনে পড়ে গেল আবার। নিজের মনকে বললে জযতী ঃ আমাব চেয়ে বযসে এত বড় সুতীর্থ? কী কবে তা হলে তাব সঙ্গে আমাব—থেমে, ঠেকে থেকে, জযতী তাবপব আবার ভাবছিল ঃ আমি তো ইউনিভার্সিটির ছেলেদের সঙ্গেই মিশতুম, কেউ কেউ আমার থেকে ছোট,' কেউ কেউ দু'চাব বছরেব বড়। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগত সুতীর্থের কাছে বসে থাকতে, কথা বলা হত, চুপচাপ বসে থাকা হত, সত্যি সে সব নিস্তব্ধতাব ভেতর ওব মাতৃ আর আমাব পিতৃগ্রন্থি আব সব নীড়, নক্ষত্র কথা বলে উঠত যেন—সে সব অভিজিৎ চিত্রা সপ্তর্ষির ভাষা এ পৃথিবী থেকে হাবিযে গেছে আজ। কোথাও নেই আব। আমি বুঝতাম একদিন, সুতীর্থ বুঝত।

'আমি তো তোমার চেয়ে কুড়ি বছবের বড়। আমি অবিশ্যি তোমার পরমাই ছিলুম না জযতী, ওসব ভিটকেলেমি আমার ছিল না ; খোকাব বাবা হতে চেয়েছিলুম কিনা।' বলে বিরূপাক্ষ একটু চুপ করে থেকে যেন বললে, 'কিন্তু সুতীর্থ তোমার জন্মে জন্মে ধান খেয়েছে জযতী ; ওব এক আলাদা মায়া। বছর পনেরো কুড়ির বড় হলেও সে যেন তোমার বাপের চেয়ে ভাইযের চেয়ে গর্ভের ছেলের চেয়ে বেশি এমনিভাবেই মিশেছে তাব সঙ্গে। সুতীর্থ কবিতা লিখত।' বিরূপাক্ষ বললে।

'লিখত তা কি হত। ছড়া কবিতা দিয়ে কি হবে।' 'আমাব কিছু হবে না, কিন্তু পরমাইযেব তো হয়। আজকালকার পৃথিবীতে বোলতা, পিঁপড়ে, মৌমাছি সকলেই প্রমিসরি নোট খায, চেক খায, চিনি মিশ্রি খেতে চায না, তবুও মাঝে মাঝে গায়েন বাযেনদের ওখানে উড়ে যায একটু আধটু সরুচাকলি খাবার জন্য—'

'সুতীর্থের কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করছি কেন তোমাকে জান জযতী?'

জয়তীর দিকে তাকাল না বিরূপাক্ষ। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে অবশেষে ঘরের ভেতব বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণের একটা সুদীর্ঘ ফলার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, ভাবছি তাকে নেমন্তন্ন করে একদিন আনব এখানে। অনেক দিন তোমার পুলক দেখিনি। সুতীর্থের সঙ্গে কথায় কথায় লেগে গেলে বুলবুলির লড়াই করে কি রকম লাল হযে উঠতে তুমি—সে লাল এই তিন বছরের ভেতর কই একদিনও

তো দেখি নি আর। অবিশ্যি সেটা ছিল ঝগড়ার—ইয়ে, বিবিছাড় ঝগড়ার পুলক ঝুটিয়াল বুলবুলেব সঙ্গে। আমার সঙ্গে তোমাকে পুলকিত হতে হয়েছে বর্ষাকালের নাউক্ষেতের কাঁকড়ানীর মত, আমি ক্যাঁকড়াদের বাজা গো।'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালাল।

চৌদ্দ

ম্যানেজিং ডিরেক্টব সুতীর্থকে ডেকে বললে, 'বসুন'

'আমাব ঘরেই চলুন।'

'না, সেদিন গিয়েছিলুম।'

'হাতে অনেক কাজ বিজনহরিবাবু, চলুন আমাব ঘবে, কাজ করতে কবতে আপনাব সঙ্গে কথা হবে।'

'কাজের মালিক কে বলুন'ঃ—নিজেবই চেষ্টায এখন গলাব স্বব স্থিত, ঠাণ্ডা ম্যানেজিং ডিবেক্টবের।

'মালিক অবিশ্যি আমি নই, আপনিও নন, মজুর, মুদ্দোফবাস আর্দালি বেয়াবা থেকে শুরু করে আমবা সকলেই মালিক। এটা মেনে না নিলে কাজ কবতে পারব না।'

'পাববেন না? এই তো সম্প্রতি একটা স্ট্রাইক চলছে'—

'স্ট্রাইক? কোথায?' সুতীর্থ চেযাব টেনে টেবিলের ওপব কনুই পেতে মনোযোগ দিয়ে ম্যানেজিং ডিবেক্টরেব দিকে তাকাল।

'অত ব্যস্ত হবাব কিছু নেই', ম্যানেজিং ডিবেক্টব সতর্কভাবে বললে, 'আমাদেব কারু কিছু লাভক্ষতি নেই তাতে। এই তো সেদিন ট্রাম স্ট্রাইক হল—'

'ট্রাম স্ট্রাইক-ও!'

'আবাব হচ্ছে। ওতো গৃহিণী রোগ, ও সাববে না। ও-সব বাজ-বাজড়াব কাববাব—আমরা তো—কিন্তু শুনেছেন কি আমাদেব ফার্মে স্ট্রাইকেব সম্ভাবনা—'

সুতীর্থ শুনেছিল বইকি। সে তো এ নিয়ে বক্তৃতাও দিয়েছে, পবামর্শ দিয়েছে, ধর্মঘটেব দাবিদাওযা ঠিক কবেছে কিছু কিছু।

'নিন সুতীর্থবাবু।' সিগাবেটের টিন এগিযে দিল সুতীর্থকে।

'শুনেছি বইকি। তা শুনলাম নাকি শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট হবে না—' সুতীর্থ সিগাবেটটা জ্বালিযে নিল।

'কে বললে?'

'যাবা স্ট্রাইক করবে তাবাই বলছিল—'

'শুনলাম আপনাব পবামর্শে ওবা ওঠে বসে।'

সুতীর্থ মাথা নেড়ে বললে, 'না অতটা নয, আমি তো ট্রেড ইউনিযনের কেউ নই। কোনোবকম পোলিটিক্যাল পার্টিব সঙ্গেও আমার কোন সংস্রব নেই। আমি একজন নিতান্তই বাইরেব মানুষ। আমাব কথা কে শুনবে?

'কিন্তু আপনি কথা বলতে যান তো।'

'যা দবকার মনে কবি তা বলি।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বেল টিপতেই বেযারা এল। 'হুইস্কি—'

'ও আমি খাব না—' সুতীর্থ বললে।

'আপনাকে আমি তো ঘুষ দিচ্ছি না যে খাবেন না। ঘুষ খাবাব লোক আপনি নন। তবে মন্ট্ হুইস্ক খেতে পাবেন।'

সুতীর্থ জ্বলন্ত সিগাবেটটা সিলিঙের দিকে ছুঁড়ে মেবে বললে, 'না, ও আমি খাব না।'

মল্লিক একটু চকিত হয়ে বললে, ওটা ওদিকে ছিটকে ছুঁড়লেন যে। এই তো অ্যাশট্রে ছিল। এই তো চাযের পেযালা ছিল—'

'একটু মজা দেখলুম—'

'ওদিকে অনেক কাগজপত্র—অগ্নিকাণ্ড না হয, দেখুন তো সিগারেটটা কোথায গিয়ে পড়ল—'

'পড়েছে কোথাও। আগুন লাগবে না। লাগতেও পাবে!'

'আমি কি এ ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নই?'

সূচীপত্রে যান

সুতীর্থ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের টিন থেকে আর একটা সিগারেট বার করে নিয়ে দেশলাই খুঁজছিল। কোনো কথা বললে না।

'আপনি ধর্মঘটিদের কি পরামর্শ দিয়েছেন?'

'বলেছি তোমাদের খাওয়া পরা থাকার যা দুরবস্থা, তাতে ধর্মঘট করে এই নচ্ছার ফার্মটাকে ন্যাজে মুচড়ে আছাড় মারা ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপায় নেই—'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফুটন্ত নলেন গুড়ের পায়সের মত মুখে ধ্বকটা দমিয়ে রাখতে রাখতে বললে, 'এর জন্যে তো আপনার এই মুহূর্তেই চাকরি যেতে পাবে।'

'যাক।'

চন করে মাথায় রক্ত উঠেছে বলেই মাথাটা ঠাণ্ডা করে নেয়া দরকার। কিছুটা ঠাণ্ডা করে নিল; দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে, তারপরে আস্তে আস্তে মল্লিক বললে, 'স্থিরভাবে কাজ করবেন, সব দিক থেকে দেখে শুনে স্থির হয়ে—'

'তাই তো করছি তা না হলে রিসিভিং এণ্ডে বসে এখানে কি বসে থাকা সম্ভব হত আজো আমাদের। আমরা তো বেশ সুখাসনে বসে আছি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

'ওদের কোনো কিছু পরামর্শ দেবার আগে ডিরেক্টর বোর্ডের সঙ্গে আপনার কথা বলে দেখা উচিত ছিল। আপনি তা করেন নি, আমাকেও কিছু বলেন নি। অথচ দাবি-দাওয়া ঠিক করেছেন স্ট্রাইকারদের। আপনি এই ফার্মের একজন অফিসার নন?'

সুতীর্থ বললে, 'এ সব প্রশ্নের কোনো মানে হয় না মিস্টার মল্লিক। আমি তিনশো টাকা মাইনে পাই বটে, কিন্তু এই শীতের রাতে আমার চাকরীটাকে গরম কোটের মত গায়ে দিয়ে বেড়াবার শখ আমার নেই। যত দিন এই ফার্মের কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাইনের লোকগুলোর কোন সুবাহা না হয়, ততদিন আমার চাকরী—'

বাধা দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললে, 'এ-সব কথা আমাকে আগে বলা উচিত ছিল আপনার।'

'আমি কেন বলব? ওদের ডেপুটেশন কি সারাটা বছর আপনাকে বলেনি?'

'তা বলেছে।' মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে ব্লু-বুকগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপরে বললে, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে, এ নিয়ে বোঝাপড়ার সময় কেটে যায় নি আমাদের—আপনি মাঝখান থেকে ওপর-পড়া হয়ে কি করে এলেন? এলেন কোত্থেকে? আপনি তো টি-ইউ-সির মেম্বারও নন। কোনো পোলিটিক্যাল পার্টির ধার ধারেন না। অথচ চাকরী ছাড়া চলে না। বিনে চাকরীতে তটের ওপর দিয়ে আপনার নৌকো চালিয়ে নেবে আপনার শ্বশুরের মেয়ে?

মল্লিক চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিতে লাগল: কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে জ্বালিয়ে নিতে সময় লেগে গেল; দেশলাইয়ের আগুনে ছোলা মাংসের চাঙ্গড়ের মত দেখাচ্ছিল মল্লিকের মুখটাকে। মেজাজ সহজ স্বাভাবিক করে নিতে হবে, উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে কথা বলতে চেষ্টা করার ইতিহাস তার দশ বারো বছর ধরে চলেছে, কিন্তু এখনও সময়ে অসময়ে বারুদে আগুন লাগিয়ে বসে বুদ্ধি সুদ্ধি গলার আওয়াজ। নানা রকম করে হবে না।

'আপনার এসব চলবে না সুতীর্থবাবু।'

'না যদি চলে কাজ ছেড়ে দেব।'

'ছাড়িয়ে দেব।'

'আমি ওদের দলে—'

'বেশ। চলে যান।'

'সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল।'

'কিন্তু চলে যাবার আগে'—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজের শরীরটাকে একটু বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে খেজুরের রসে পাকানো গোলাপছড়ির মত মোচড় খাইয়ে নিল বার কয়েক; চোখ দুটো ভাসিয়ে, ঘুরপাক খাইয়ে নিল সমস্ত মুখে—কানে কপালেও যেন বিদ্যুতের গতিতে।

হঠাৎ একটা গা ঝাড়া দিয়ে মল্লিক বললে, 'আপনি মি: ম্যাক গ্রেগরকে চেনেন?'

'কোন্ ম্যাকগ্রেগর?

'কোনো ম্যাকগ্রেগর?'

সূচীপত্রে যান

সুতীর্থ দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে প্রায় দেয়ালে পিঠ রেখে কপালের চামড়ায় চামড়ায় একটু ভেবে বললে, কৈ, না তো।'

'মনে করতে পারছেন না। আজ হল শুক্কুরবার। মঙ্গলবার রাত আটটাব পর রাসেল ষ্ট্রিটে যে সাহেবের সঙ্গে আপনি ডিনার খেয়েছেন, দুচার পিপে হুইস্কি বরবাদ করেছেন তাব নাম কি?'

'ওঃ' সুতীর্থের মনে পড়ল। 'তা, আপনি কি করে জানলেন?'

'সে সব আমাদের জেনে নিতে হয।'

'হ্যাঁ, ওর নাম ম্যাকগ্রেগরই তো। দেখি, ওর কার্ড তো ছিল আমাব পকেটে।'

সুতীর্থ তার ওভাব কোটের অগুণতি পকেট খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে লাগল।

কনকনে শীতের ভেতরেও মুখচোখ কপাল ঘেমে গেছে দেখে মল্লিক নবম গলায বললে, 'যাক যাক, সুতীর্থবাবু কার্ড কি হবে। ও আমাদের দেখা আছে। শুনুন, ম্যাকগ্রেগারের সঙ্গে আপনার বেশ দহবম আছে শুনলাম।

'না এমন কিছু নয।'

'ওর মেমসাহেবের সঙ্গে?

'মেম সেদিন ছিল বটে টেবিলে। ভালো মানুষ। এব চেয়ে বেশি আব কি। এব বেশি পরিচয ওদের সঙ্গে আমার নেই।'

'শুনলাম আপনাকে আবার ডিনারে ডেকেছেন ওঁরা।'

'ওটা ভদ্রতা—কিংবা বেশি কিছু—হতেও পাবে। মানুষ ওবা গুড সর্ট। আমিই পাল্টা ডিনাব দিতে ভুলে গেলুম। বড্ড বেকুবিই হযেছে—'

সুতীর্থ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আনাচে কানাচে চোখ বুলিযে শানিযে এক আধ মুহূর্ত তাকিযে থেকে বললে, 'কিন্তু চালচুলো নেই, কোথাযই বা ডাকি ওদের ।'

'বেশ তো, ফার্মেব হোটেলে ডাকুন না। আমিও যাব—আমি টাকা দেব— আমি যত লাগে দেব আপনাব নাম কবে—'

'কেন ব্যাপাব কি?'

'বসুন।'

বেযাবা হুইস্কি নিযে এল।

'ভাঙব? খাবেন?'

সুতীর্থ বিরক্ত হযে হেসে মল্লিকের চোখ এড়িযে দেওযালের একটা ক্যালেণ্ডারেব চিত্রিত সমুদ্র—নীলিমাব এপাব-ওপাবেব দিকে তাকিযে—ওপাব এপাবের দিকে বেশি নিবিষ্ট হযে তাকাতে যাচ্ছিল যখন, মল্লিক বললে, মানে ম্যাকগ্রেগর সাহেবকে ধবে খুব একটা বড় কন্ট্রাক্ট নেব।'

'কন্ট্রাক্ট? কিসের?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাকি সুরে বললে, 'ধনা চোবেব আব মনা চোবের। হাঁ করে দাঁড়িয়ে তেলো চাটলেই কি আর সব কথার—ইযে—আসুন—চলুন—ফার্পোতে যাই, খাওযা দাওযা মদ মালের ভেতব কি হবে না হবে নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাবেন।'

'মদ, মাল?'

'এল কোত্থেকে?'

'ও কিছু নয়; কথার প্যাঁচ। আগামী মাস থেকে আপনাব মাইনে হবে পাঁচশো টাকা। যান—কাজ করুন গিয়ে। ভেরি হেভি ডে। বাই দা বাই জযতীকে চেনেন আপনি?'

'জয়তী? কে সে?'

'বিরূপাক্ষকে চেনেন?'

সুতীর্থ উত্তর দিতে একটু দেরী করে ফেলল, 'এক বিরূপাক্ষকে চিনতুম বৈকি।'

'তারই স্ত্রী।'

'না, তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ নেই।'

'স্টক এক্সচেঞ্জে দেখা হযেছিল বিরূপাক্ষের সঙ্গে সেদিন। আপনার কথা বললে অনেক। ওর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার মিষ্টি সম্পর্ক ছিল বললে।'

'ওর স্ত্রীকে কোনদিন দেখিনি আমি।'

সূচীপত্রে যান

কারু স্ত্রীর কথা নয়—আকাশ বাতাস চারিদিককার এপক্ষের কথা ভাবতে চিন্তিত ও বিষণ্ণভাবে সুতীর্থ নিজের কামরার দিকে চলে গেল।

পনেরো

'কে তুমি সুতীর্থ? এতদিন ছিলে কোথায়?'

সুতীর্থেব কুশনে বসেছিলেন মণিকা। সন্ধ্যে উতরে গেছে, বাতি জ্বালানো হয়নি। শীত কমেছিল বটে, কিন্তু আজ আবার পড়েছে বেশ। মণিকার গায়ে সুতীর্থের রাগ।

'বা: বেশ তো তুমি, এতদিন কোন ঘাপটিতে ছিলে? আসনি কেন সুতীর্থ?'

আগন্তুক সহসা কোনো উত্তর দিচ্ছিল না।

'এতদিন কি কলকাতাব বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন নাকি? দেখ, তোমাব চবিত্রে সন্দেহ হয আমার—তুমি এরকম করছ কেন সুতীর্থ—তুমি কি জান না—?'

কেমন একটু অস্পষ্ট প্রেরণায় টলমল করে উঠে কোনো এক কথা বুদ্ধিকে ঠকাচ্ছে বলে প্রাণকে ঠকাতে চেষ্টা করে মণিকা ঢোক গিলে বললেন, 'বযস হয়েছে আমার। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ আছে। কাঁহাতক তোমাব হয়ে ঘরদোব সামলাতে পাবি আমি। তুমি যে কোথায বেবিয়ে যাও-'

'আমি-'

'ওমা, এ কে?' ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন মণিকা, তাড়াতাড়ি মাথায ঘোমটা টেনে নিয়ে অস্ফুটে বললেন 'এ তো সুতীর্থ নয। কে আবাব এল।'

সাঁ কবে উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে বাতি জ্বালিযে বিরূপাক্ষেব মুখোমুখি এসে স্তম্ভিত হযে মণিকা বললেন, 'কে? কে আপনি?'

'আমি—বিরূপাক্ষ—সুতীর্থেব খোঁজে এসেছিলাম—'

বিরূপাক্ষের আগাগোড়াব দিকে তাকিযে মণিকাব মনটা কেমন একটা বিবক্তি, উপেক্ষা নৈবাশ্যে ভরে উঠল।

'তাই তো আমি মনে করেছিলুম সুতীর্থ এসেছে বুঝি। কিন্তু কে—'

বিছানাব কিনারে সবে দাঁড়িয়ে মণিকা বললেন, 'সুতীর্থ তো সাত-আটদিন ধবে বাড়িতে আসেনি।'

'বসুন।'

'না, আমি এখন ঘবে যাব। আপনাব কি দবকাব বলুন তো—' মণিকা বললেন।

'কোথায় গিয়েছে সুতীর্থ?'

'বলে যায না।'

'এখানে থাকে তো?'

'আজকাল? হ্যাঁ, থাকে অবিশ্যি, তবে চালা বেঁধে থাকে না। কোথায উবে যায—দশ-পনেবো দিনের ভেতর দেখাই পাওয়া যায না। কোথায যায—কোথায থাকে—কি কবে— কিছুই জানতে পাবি না। আপনি কে? দেনদাব?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'আমি সুতীর্থের অনেক কাল আগেব পবিচিত মানুষ।'

'বন্ধু? বসুন। দাঁড়িয়ে বইলেন যে।'

'বসব বলেই তো এসেছিলুম।'

ঘবের একটা কৌচের ওপব বসে বিরূপাক্ষ বললে, 'বন্ধু আমি নিজেকে বলতে পারি না। ওবা ছিল বিদ্বান মানুষ—ওদের সঙ্গে কি আমাদের মত দ্বারপণ্ডিতের বন্ধুত্ব সাজে।'

বিরূপাক্ষের গলায কেন যেন কেমন একটা আন্তরিক নালিশের আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল। সুতীর্থ যদি এখানে থাকত তাহলে অবিশ্যি অনুভব করত কিরকম অহেতুক ও অসার বিরূপাক্ষের এ গলার আওয়াজ—কথাবার্তা।

'গত তিন-চার বছরের মধ্যে ও আমার বাড়ি মাড়ায়নি। এই মাস তিনেক আগে মিনিট কুড়ি পঁচিশের জন্যে একবার পায়ের ধুলো দিয়েছিল মাত্র; তাও রাস্তায় দেখা হয়েছিল—ঘাড় ধরে নিয়ে গেছলুম বলে। ভেবেছিলুম আমার স্ত্রীব সঙ্গে ওব আলাপ করিয়ে দেব—'

'আপনি পরিবার নিয়ে এখানে থাকেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'আজকাল কলকাতায় ছেলেপুলে সংসার নিয়ে থাকা। বাড়ি পাবেন কোথা? এও তো ব্লাকমার্কেটে চড়েছে! মুদি-মোদ্দাফরাসের না, ওটা হচ্ছে কসায়ের কালোবাজার—' আস্তে করে বললেন মণিকা।

সে কথায় কান না দিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে সুতীর্থের আগের আলাপ খাতির-টাতির ছিল। কিন্তু ও জানে না যে জয়তী আমার স্ত্রী। ওকে তা জানিয়ে দেবার জন্যেই ধরে বেঁধে নিয়ে গেছলুম, কিন্তু ওর সবুর সইল না। একটা কেলেঙ্কারী করে বেড়িয়ে গেল সেদিন। আর দেখা নেই—'

মণিকা খানিকটা নিবাদ হয়ে বললেন, 'কি কেলেঙ্কারি?'

'আমার মনে হয়েছিল মদ খেয়েছিল।'

'মদ? সুতীর্থ? মদ তো ও খায় না।'

'তা হবে। আমাকে তেড়ে এসে জড়িয়ে ধরলে—বললে, আমার স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে বিরূপাক্ষ—'

'কার স্ত্রী?' বিচক্ষণভাবে বিরূপাক্ষের দিকে তাকিয়ে মণিকা জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওর স্ত্রী; সুতীর্থের স্ত্রী।'

'সুতীর্থ কি বিয়ে করেছে?'

'তা না হলে স্ত্রীর কথা বলবে কেন? বিরূপাক্ষ আস্তে আস্তে বললে—নম্র সুজন চোখে ঠোঁটে একটু হাসি ছড়িয়ে।

মণিকা খোঁপার ওপরে আটকানো ঘোমটা মাথার দিকে— কপালের দিকে খানিকটা টেনে নিয়ে আবার কিছুটা সরিয়ে দিয়ে কি যেন বলবেন মনে করেও বললেন না। তৎক্ষণাৎ—কিন্তু তবুও বললেন 'আপনারা তার ছেলেবেলার বন্ধু জানেন না সুতীর্থ বিয়ে করেছে কিনা?'

'গত তিন-চার বছরের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। কি করেছে না করেছে জানি না। এর আগে বিয়ে করেনি।'

'ঠিক জানেন?'

'জানি বৈকি।'

'তাহলে আর করেনি।'

মণিকার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে বিরূপাক্ষ তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। প্রথম দেখেই তাক লেগে গিয়েছিল বিরূপাক্ষের, এখন সে 'হয়নি, এরকম হতে পারে না' অনুভব করতে করতে নিঃশেষ নিহত হয়ে বসে রইল। সুতীর্থের খোঁজে এসেছিল বিরূপাক্ষ। জয়তীকে যে বিয়ে করেছে বিরূপাক্ষ সে যে বাস্তবিকই তার ঘরের বৌ, এই সত্যের ময়ূরপুচ্ছ তার কাকের পালকে গুঁজে সুতীর্থের সঙ্গে কোনোদিন সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পায়নি। সেটা দরকার। মেনে যখন চারদিক দিয়ে ফুর্তিতে ভাঁটা এসে পড়েছে তখন যাদের জীবনে সম্ভাবনা ছিল ঢের, কিন্তু হল না কিছু সেই সব লোকগুলোকে নিজের টাকা এবং অনির্বচন স্ত্রীর গন্ধে একটু মাথা গুলিয়ে দেবার শখ জেগেছিল বিরূপাক্ষের। শখটা দু'চার মুহূর্তের কর্পূরের মতন টেকসই। কিন্তু তবুও শখের মানুষ বিরূপাক্ষ। সেই জন্যই সুতীর্থের কাছে আসে। এসেছে সে। ভালোও বাসে সুতীর্থকে এত বেশি যে জয়তী যদি স্বামীকে সত্যিই ছেড়ে যেতে চায়—তাহলে সুতীর্থের নির্দেশ—যাই হোক না কেন—বিরূপাক্ষ ও জয়তীর পথ কেটে দিক।

কিন্তু কে এই নারী? বিরূপাক্ষ অনড় অতল হয়ে ভাবছিল। এর বয়স কত হবে? সুতীর্থের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? সুতীর্থের সোফায়; অন্ধকার—শীতের সন্ধ্যায়—র‍্যাগ গায় দিয়ে; ভাবতে ভাবতে বিরূপাক্ষের শিশু ও প্রৌঢ় মনের সন্ধিসত্তায়—যেখানে সংসর্গদানের সম্ভাবনা হিসাবে স্ত্রীলোকের ওপর চোখ পড়ে—কেমন যেন বাড়াবাড়ি হচ্ছে টের পেয়ে নিজেকে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ঠিক করে নিতে হল বিরূপাক্ষের।

ভাবছিল: জয়তীকে আমি কোনদিনই পাইনি। সবচেয়ে বেশি করে পেয়েছি বলে ভুল করেছিলুম যখন তখনই যদি জয়তী আমার ভুল ভেঙ্গে দিত, তাহলে পরস্পরের শরীরের ওপর যে আকাট অধিকার করেছি আমরা তার কোনো প্রয়োজন হত না তো।

বিরূপাক্ষর সাদা অনুভূতি সিধে চেতনা এরকমভাবে ব্যাপারটার মীমাংসা করে নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সমস্যার ছক অন্য রকম; জয়তী প্রতি মুহূর্তেই বিরূপাক্ষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না, সে প্রথম

থেকেই বিরূপাক্ষের থেকে এত বেশি দূরে যে প্রকৃতির অথবা হৃদয়লোকের আইনজ্ঞানী বিশ্বের সেইটেই শেষ সীমা। (বাহির বা অন্তরের) বিশ্ব যেখানে আপেক্ষিক মণ্ডল নয় আর— সেখানে অবিশ্যি এদের দুজনের দূরত্ব ক্রমশই দূরতর হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের চেনাজানা নিসর্গ ও সংসারের প্রয়োজন সম্পর্কে সময় ও দেশ যে অশেষ, অনি:শেষ, কে এসে তা প্রমাণ করে পরিষ্কার করে দেবে বিরূপাক্ষকে; খুব সজাগ চেতনায় নয় একটা সংস্কারের আবেগে সে ধরে নিয়েছে অবিশ্যি যে জয়তী ও তার যোগাযোগের ব্যবধান এত বেশি নয় যে কোনো দূরত্বের মাপক স্পান দিয়ে তাকে মাপা চলে না।

'আপনি কে?' সোজা প্রশ্ন করে বসল বিরূপাক্ষ।

'আমি? কেন?' মণিকা চলে যাবেন না দাঁড়াবেন ভাবছিলেন। 'আমি কেউ নই।'

'আমি ভেবেছিলুম সুতীর্থের নিকট আত্মীয়—'

মণিকা বিরূপাক্ষের দামী শিল্কের কাপড়-চোপড় সোনাব ঘড়ি বোতাম মির্জাপুরী শাল জুতোব চামড়া ও রকমাবি তলিয়ে দেখছিলেন। এত সব চটক আছে বলেই খানিকটা ভদ্রতা অন্তত করতে হয—মধ্যবিত্ত মেয়েদের এই রক্তের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে না পেরে এতক্ষণ তিনি আছেন। এ না হলে হয়তো আগেই উঠে চলে যেতেন।

মণিকা একটু সাপের মন্ত্রেব ধূলো উড়িয়ে হেসে বললেন, 'সুতীর্থ; না, তাঁব সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমি ভেবেছিলুম আপনি তার বিশেষ আত্মীয়।'

'যাবা ঘাড়ে চড়ে থাকে সেইরকম একজন?'

'মানে?'

'সাপ্লাযেব ছোকবাদের, কন্ট্রাক্টের ছোঁড়াদের হাতে জল খেযে, যাদের দিন কাটে; এমন কত মেযে-পুরুষ কলকাতায় আছে—'

'না, না, তা কেন?—তা নয় সুতীর্থের বন্ধু আপনি। আপনি অনেকক্ষণ বসে আছে। আপনাকে চা দেওযা হল না তো।'

'না, না, আমি চা খাই না। আপনি বসুন।'

মনের ভুলে সিগাবেট কেস বার কবে পকেটে তখুনি ঢুকিযে বাখল বিরূপাক্ষ। মণিকা জিনিসটা দেখলেন; সিগারেটের প্রযোজন লোকটার, কিন্তু তবুও কোন উচ্চাবাচ্য কবতে গেলেন না তিনি। কেন করবেন? কেন এই মানুষ সামনে বসে তামাক টেনে বেযাদবি কববে?

'সুতীর্থেব কোন পাত্তাই নেই?'

'না।'

'কোথায় গেলে পাওযা যেতে পাবে কোন বকম একটা আন্দাজ দিতে পাবেন কি?'

'আমাকে বলে না কিছু।'

'অফিস করে আজকাল?'

'জানি না।'

'সেদিন বিজনহরি মল্লিকের সঙ্গে দেখা হযেছিল, তিনি সুতীর্থকে চেনেন বললেন, মল্লিকেব অফিসেই কাজ কবত নাকি, কিন্তু অফিস ছেড়ে চলে গিযেছে বললেন। অন্য কোনো অফিসে গেছে?'

মণিকা অবিশ্যি একটা অফিসের ঠিকানা জানতেন, ফোন নম্বরও জানা ছিল তাঁব, ফোনও কবেছেন কযেকবার; কিন্তু কোন সদুত্তব পাননি। অন্য কোথাও গেল সুতীর্থ? সুতীর্থেব অফিসে আজকাল নাকি স্ট্রাইক চলেছে। এ মানুষটাকে এ সব কথা বলে কী হবে; ভাবছিলেন মণিকা। সুতীর্থকে তিনি ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা কবেন, কিন্তু এটা কত দূর মমতা, কত দূব সুপ্রিযতাব আকর্ষণ সহসা ঠিক কবে উঠতে পারেননি। জিনিসটা ঠিক করে ফেললে আজ হোক, কাল হোক কিছুটা ছাঁদ কেটে যাবে, ছক মুছে যাবাব ঘরানা পৃথিবীর আর ঘবণী মানুষের। সেটা কি হতে দিতে হবে? হলে ভাল হবে?

'আপনি সুতীর্থের শুভানুধ্যায়ী—'

'শুধু তাই যদি হতাম তা হলে সব কাজ ফেলে এখানে আসতাম? আমাদেব সম্পর্ক আরো—'

বিরূপাক্ষ ভাষা খুঁজছিল, কিন্তু যে রকম শব্দ বা পবিভাষা যে চাচ্ছিল তা পাচ্ছিল না; 'আমাদের সম্পর্ক জল ঠিক নয়, জলের সঙ্গে স্পিবিট মিশিযে', এই রকম বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এই মহিলার সামনে ও সব বুলি অব্যবহার্য।

'আরো বেশি কিছু; অনেক বেশি। জানি আমি।' মণিকা বললেন, 'সেই জন্যেই, বলছি; একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।'

'বলুন।'

'সুতীর্থ হয়তো দেনার পাকে জাড়িয়ে গেছে।'

'কেন?'

'বে-থা করেনি বটে, সংসার পোষণ নেই, কিছু নেই, কিন্তু বেহিবেসী বড্ড-তা ছাড়া অফিসে স্ট্রাইক চলেছে।'

'স্ট্রাইক? কোন ফ্যাক্টরী বলুন তো?'

'ফ্যাক্টরী নায। কি একটা ফার্ম। ওদেব নিজেদেব ফ্যাক্টরী আছে কিনা আমি জানি না। সুতীর্থ ধর্মঘটীদের দলে ভিড়ে গেছে নিশ্চযই। চাকবি গেছে ওব—ভাত জুটেছে কিনা স৲দহ—'

বিরূপাক্ষ সিগাবেট-কেসটা আবাব বার কবে বললে, 'বটে, তা হলে তো বড় মুশকিল হল। ও এখানে চলে আসে না কেন? আপনি তো ওর নিজেব মানুষ।'

'ভাত খেতে সে এখানে আসবে না। খিদিবপুবে মেটেবুরুজে মজুবদের মঙ্গে মিশে খাবে।' 'আপনি বাস্তবিক সুতীর্থের কে হন?'

'কেউ নয। আমি বাড়িউলি—' বলে বিরূপাক্ষের তেরছা চোখ এড়িয়ে অন্য দিকে মুখ ফিবিয়ে ঘাড় হেঁট কবে সাতপাঁচ চিন্তা করতে লাগলেন মণিকা। বিরূপাক্ষ এইবাব একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে আটকে নিল।

দক্ষিণ কলকাতাব এ পাড়ায় কোনো বাড়িউলি থাকে না, থাকে বাড়ির মালিক। ইনি মেয়েমানুষ নন—মহিলা; তবুও ঐ বিচিত্র শব্দটা ব্যবহাব করলেন কেন। হযতো অজ্ঞতায অসতর্কতায অজ্ঞাতসাবে শব্দটা বোবিযে গেছে মুখ দিযে। কাজেই বিরূপাক্ষেব সিগাবেটও আর দেবি না কবেই জ্বলে উঠল।

'বেশ ভাল বাড়ি; সুতীর্থ দোতলাব সমস্ত ফ্ল্যাটটা ভাড়া কবে আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। ভাড়া দিচ্ছে না।'

কণ্ঠে নালিশেব সুব, কিন্তু ততটা জমেনি; নালিশটা যেন সুতীর্থের বিরুদ্ধে নয ঠিক, নিজের অদৃষ্টেব বিরুদ্ধে, আজকালকাব দিনকালেব—হযতো বিরূপাক্ষেবও বিরুদ্ধে।

'আহা কেন—ভাড়া দিচ্ছে না কেন? আপনি কি ছেড়ে দিযেছেন?'

'না, না, আমি ছেড়ে দেব কেন। সেলামী ভাড়া নিযে কত হাজাব হাজাব টাকা পাওযা যায এ বাজাবে। আমি ছাড়ব কেন। আমাব টাকাব বড্ড দবকাব।'

বিরূপাক্ষের মনে হল, এই কথাটাব জন্যেই এতক্ষণ যেন সে অপেক্ষা কবছিল: 'টাকাব বড় দবকার' এই আওযাজটাব জন্যে। কলকাতাব যে কোনো ফটফটে ঝবঝরে বা এঁদো ঘিঞ্জি আস্তানাযই যাওযা যাক না কেন, যে কোনো দেবা-পিশাচীর সঙ্গেই দেখা হোক, 'টাকাব বড় দবকার' শেষ পর্যন্ত এই আবেদনেই কান শানিযে ওঠে তার, হৃদযে দোলা লাগে, কর্তব্য পথ ঠিক কবে নেয সে; বক্ত যদি বাস্তবিকই খোঁটা দিযে ওঠে বাস্তবিকই চেক কাটে সে। 'কত টাকা চাই? ক' মাসেব ভাড়া?'

মণিকা দেবী একটু চমকে চেযে দেখলেন বিরূপাক্ষ পকেট থেকে চেক বই বেব কবছে-

'না, না, আপনি দেবেন কেন? আপনাকে আমি দিতে বলিনি তো।'

'সুতীর্থের জন্যে আমি দিযেই থাকি। ও তো আমার-এক হাজাব টাকায হবে, না আবো বেশি?' ফাউণ্টেনপেন বার করে মণিকাকে জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষ।

বিরূপাক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ আহত দৃষ্টিতে তাকিযে মণিকা হতমান মলিনতাব কেমন বেমানানো ভাবে যেন দাঁড়িযে রইলেন।

'এক হাজারে মন উঠছে না হযতো—'

'মন উঠছে না' বলছে লোকটা; বেল্লিক, আহম্মক হযতো, আনাড়ি, ভাষার ব্যবহার জানে না। সে যা হোক, অত্যন্ত বেযাদবিব কথা বলা হযেছে; এর পর আর এক মুহূর্তও এই ঘরে থাকা উচিত মণিকাব? কি যেন বলতে গিযে কথা আটকে গেল তবুও তাঁর; নড়ি-নড়ি করে কেমন একটা শীতকম্পে কেঁপে উঠল তাব পাযের নখ থেকে মাথার তালু অবধি; কিন্তু ঘর থেকে বেরিযে গেলেন না তিনি।

'তিন হাজার করে দিলুম।'

বিরূপাক্ষ উঠে দাঁড়াল। মণিকার দিকে তাকিযে বা না তাকিযে এতক্ষণে সিগারেট জ্বালাবার অবসর হল

সূচীপত্রে যান

তার। চেকটা সে মণিকার হাতে দিল না। বিছানার ওপর রেখে দিল। বললে, 'এই চেক' তাই বলে চেকটা হাতে তুলে যে নিতে হবে বিরূপাক্ষেব সাক্ষাতেই তার কোন প্রযোজন নেই। মণিকাকে সে রকম দীন-দৈনতার ভেতর নামিয়ে রসগ্রহণ করবার মানুষ বিরূপাক্ষ নয়। এখন নয়। মণিকার বেলা নয়। মানুষের আত্মা আছে-আত্মার দক্ষিণ মুখ—খুব সম্ভব অনেক দিনের জন্যে—মণিকার মত এরকম নারীর সম্পর্কে।

'আজ বড্ড শীত।'

চেক বইটাব দিকে আড়চোখে তাকিয়েছিলেন মণিকা, বিরূপাক্ষ তার দিকে ফিরে তাকাবার আগেই চোখ আর একদিকে সবিযে নিয়েছিলেন, তিনি; বললেন, 'শীত খুব।'

'আমি তো সিল্কের পাঞ্জাবি পরে এসেছি, ভেবেছিলুম এইবার কলকাতায় বসন্তের হাওযা ছেড়েছে বুঝি—'

'মাঘ মাস তো শেষ হতে চলল।'

'রাত ন'টা।'

'চললেন?'

'হ্যাঁ, সুতীর্থের কোনো খোঁজখবর পেলুম না তো।'

'শুনুন—মণিকা চেকটা ফিরিযে দেবার জন্য হাত বাড়ালেন।

'ওটা সুতীর্থের—'

'কিন্তু সে তো আসবে না।'

'দরকার নেই। ভাড়াব টাকা নিযে নেবেন। চেক ডিজঅনার্ড হবে না। কালই ক্যাশ কবে নেবেন। বেযারার চেক দেব?'

'ওটা কি ক্রসড?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ব্যাঙ্কে তো কোনো অ্যাকাউন্ট নেই আমাদের—'

'কোন ব্যাঙ্কেই নেই? এটা অবিশ্যি ইম্পিবিযাল ব্যাঙ্কেব।'

মণিকা ঘাড় নেড়ে বললেন—'না।'

'ও হো:'—বিরূপাক্ষ বললে, 'চেকটাতো সুতীর্থের নামে লিখে দিযেছি'— চেক বই বাব কবে বিরূপাক্ষ লিখতে লিখতে বললে, 'আপনার নাম?

ও: মণিকা মজুমদাব, এই যে আপনার আঁচলে সোনালি জবি দিযে লেখা আছে দেখছি-'

মণিকা আঁচল সামনে নিযে ঠিক হযে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বিরূপাক্ষ চেক কেটে মণিকাকে বললে, 'এই যে তিন হাজার টাকার-আপনাব নামে—' বিছানার ওপব বেখে দিল চেকটা বিরূপাক্ষ।

'এটা চাটার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিযা অস্ট্রেলিযা অ্যাণ্ড চাযনাব—খুব বড় ব্যাঙ্ক এশিযাব। ক্লাইভ স্ট্রিটে পাঠিযে দেবেন আপনাদেব বেযাবাকে।'

বিরূপাক্ষ হেসে উঠে বললে, 'আমিও যেমন! এবাবও ক্রসড চেক কেটেছি। বেযাবাব চেক দেব—বেযারার চেক দেব মণিকা মজুমদাবকে।'

ক্রসড চেকটা বিছানার ওপর থেকে তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়াবার আগেই মণিকা আলগোছে কুড়িযে নিযে যেন কিছুই হযনি এমনিভাবে গাযেব শালটা বেশ আঁট করে জড়িযে নিতে লাগলেন।

ষোল

বা:, কী অপরূপই দেখাচ্ছে মণিকাকে; ভাবছিল বিরূপাক্ষ; যেন ভবা নদীর তীবে জঙ্গলের অন্ধকারে রাতেব বাঘিনী সহসা অনির্বাণ মানুষী হযে দাঁড়িযেছে—অথচ বাঘিনীও বটে সে, তেমনি সাহসিকা সুদৃঢ়া মহিযসী। এবই মমতা ষোলকলায পেযেছে সুতীর্থ: অথচ দামাল হযে ফিবছে বুঝি বাইরে? আহাম্মক, দামাল হযে ধর্মঘটে নাচাচ্ছে।

'চেকটা আমি সুতীর্থকে দিয়ে দেব।'

'কেন, আপনাব নামে তো কেটেছি।'

'সই কবে দিযে দেব।'

'আচ্ছা।' বিরূপাক্ষ বললে, 'কিন্তু আপনাকে ভাড়া দিচ্ছে না, ওকে দেবেন? আপনার নামেই জমা করে নিন না।'

সূচীপত্রে যান

'বললুমই তো ব্যাঙ্কে আমার কোন কারবার নেই, সুতীর্থেরও নেই। কিন্তু ওকে দিলে সে ভাঙিয়ে সমস্ত টাকাটাই আমাকে এনে দেবে। যদি না—'

বিরূপাক্ষ চোখ তুলে তাকাল মণিকার দিকে। ডান চোখের ভুরু উঠে গেছে-যত দূর ভুরুদের ওঠাব শক্তি—বেশ পরিপূর্ণ সনির্বন্ধে।

'স্ট্রাইকে যদি মেতে থাকে তা হলে ও চেক সুতীর্থকে দেব না আমি—'

'তা দেওয়াও উচিত নয়। এটা আপনারই। আমি কি ভাবছিলুম জানেন?'

সিগারেট জ্বালিয়েছিল বটে, কিন্তু টানার অবসর পায়নি বিরূপাক্ষ। নিবে গিয়েছিল সেটা। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের কবে বিরূপাক্ষ বললে, 'আমি ক্যাশ নিয়েও ফিরি। এই দেখুন না—' বলে পোর্টফোলিও ব্যাগেব ভেতব থেকে একশো টাকাব নোটেব কয়েকটা তাড়া বেব করে বললে, 'বরং এগুলোই রেখে যাই—'

মণিকা খানিকটা বিপর্যস্ত হযে ঘরবাবের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর বিরূপাক্ষের চোখের ভেতর দিয়ে তার আতলস্বচ্ছ অন্তরাত্মাকে দেখে নিতে লাগল এমনি নীরব নির্মমভাবে যে বিরূপাক্ষ দাঁড়াবে কি চলে যাবে কথা বলবে না থ হয়ে থাকবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে এই মেয়েমানুষটিকে—এই দেবাংশ উজ্জ্বল চিতল মাছটাকে হায়রান কববাব আগে বেশ কিছু কাল সুতো ছাড়বার প্রযোজন বটে উপলব্ধি করে বলে উঠল, 'আমি চলি।'

'বসুন। এই টাকাগুলো?'

'সুতীর্থকে দেবেন!'

'এই চেক?'

'চেকটাও।'

'কোথায় পাব তাকে?'

'পাওযাব দরকাব নেই তার পাওনা তো আপনাব প্রাপ্য।'

মণিকা হেসে বললেন, 'বেশ। মেনে নিলুম। কত টাকা আছে? আপনি কে? এত টাকার ছড়াছড়ি—'

'আমি উঠি।'

'কটা বেজেছে আপনাব ঘড়িতে?'

'প্রায দশটা।'

'কত দূর যেতে হবে?'

'ও—সেই রিজেন্ট পার্কের দিকে—'

'রিজেন্ট পার্কেব বিখ্যাত মানুষকেই অতিথি করেছি আজ আমার ঘরে।'

'আমি কালোবাজারে বড় মানুষ।'

'হলেনই বা। বড় মানুষ তো। কালোবাজারে সবাই কি বড় হতে পেরেছে? রিজেন্ট পার্কে কি আপনার নিজের বাড়ি?'

'আছে একটা।'

'চোরাবাজারে চুরি কবে বড় হযেছেন স্বীকার করছেন। সকলে তো কবুল কবে না। কেউই কবে না!'

'যার কাছে খাঁটি থাকা দবকার সেখানে তাঁড়িয়ে লাভ কি?'

—শুনে—সামলে নিয়ে মণিকা কথা বাড়াতে গেলেন না।

দরজাব দিকে যেতে যেতে এক-আধ পা ফিরে এসে বিরূপাক্ষ বললে. 'আজ বেশি রাত হয়ে গেছে।'

'দেখছি তো।'

'গাড়ি আনিনি, ভুল হয়ে গেছে। সুতীর্থের বিছানায় রাতটা যদি কাটিয়ে দিই তাহলে তেতলায় আপনাদের কোন আপত্তি হবে না তো? বাড়িটা তো আপনার—'

'আমার নয় ওঁর। কিন্তু উনি কেন আপত্তি করবেন। আপনি থাকুন।'

'আপনি এক্ষুণি চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'আমি খেয়ে বেরিয়েছি; শীতের সন্ধ্যায় আমি খেযে দেযে সফরে নামি।'

'চাও খাবেন না?'

'না', বিরূপাক্ষ বাতিটা নিবিয়ে দিল।

মণিকা সন্ত্রস্ত হলেন না, অপ্রতিভ হলেন না। সহজ গলায় বললেন, 'নিবিয়ে দিলেন, আমার একটু কাজ বাকি আছে।'

বলেই বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষের একশো টাকার কুড়িটা নোট সুতীর্থের বালিশের ওপর থেকে গুছিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বিরূপাক্ষের জন্যে চা ফল মিষ্টি নিয়ে চাকর এসে হাজির হল। মণিকার অবিশ্যি নিচে নামবার কথা নয়। কিন্তু তবুও অনেক রাত উসখুশ করে উচাটন হয়ে রইল বিরূপাক্ষের মন—উৎখাত—উৎসাদিত হয়ে যেতে লাগল বিরূপাক্ষের শরীর ও মন। কিন্তু বিরূপাক্ষ তো আজকের নয়াল পাখি নয়, অনেক দিনের পুরোনো ভিটের হক্তেল ঘুঘু, কিন্তু তবুও ঘুমিয়ে পড়তে বেগ পেতে হল তার।

রাত পাঁচটার সময়ে মণিকা টের পেলেন যে এতক্ষণে দোতলার মানুষটি হোঁস হোঁস ঠোঁস ঠোঁস ফোঁস ফোঁস করছে; নাকই ডাকাচ্ছে বটে; এ কি মানুষ না পাঁকাল গজালের নাক ডাকানো? আস্তে আস্তে নিচে নেমে চক্ষুস্থির করে দেখে গেলেন একবার। সুতীর্থের ঘরে ঘুমন্ত বিরূপাক্ষের পালঙ্কের পাশ দিয়ে এক আধবার পায়চারি করে গেলেন। তেতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলেন—না চাইতেই লোকটা টাকা ঢেলে দেবে—কত যে ওগরাবে ওর কুমিরের টাকা;—কিন্তু বিনিময়ে কিছু তো দিতে পারবেন না মণিকা। না দিয়ে টাকা নেওয়া কি উচিত হবে তাঁর? টাকা নেবেন মণিকা অথচ কিছু দেবেন না, এ একবগগা খেলা কতদিন চলবে?

বিরূপাক্ষের সঙ্গে দেখা হবার পনেরো কুড়ি বছর আগের থেকেই নিজের মূল্য মণিকা খুব ভাল করে জানতেন। বাইরের ভালো পৃথিবীর বড় পৃথিবীর নানারকম ভালো—মাঝারি জায়গায়ও যদি তিনি নামতেন—বাজে খারাপ জায়গা না মাড়িয়ে—তাহলে—

তেতলায় উঠতে আর দু এক ধাপ বাকি—মণিকা একটু থেমে দাঁড়ালেন।

তাহলে কি হত? কি যে হত না সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি। ভেবে ভয়াবহভাবে লোভার্ত হয়ে উঠতে পারত তাঁর মুখ। কিন্তু তেমন কিছু হল না। বুকের ভেতর অবিশ্যি কেমন একটা ঢিবঢিব করতে লাগল। কিন্তু কি যে শীতের দেশের দেবদারু মাংসের মতন দৃঢ়তা তাঁর নিজের চরিত্রের; বিমুগ্ধ হয়ে ভাবছিলেন মণিকা, নিজের বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে কোন দিনও যান নি কোথাও—বিরূপাক্ষের মতন মানুষেরা এসে সেধে—বিনিময়ে কিছুই পাবে না জেনে তবুও উজাড় করে ঢেলে দিতে চায়। বাংলার নদীর ধারে আম-জাম-নিম-জামরুলের গ্রামে একদিন জন্মেছিলেন তিনি, কিন্তু আজকে হয়ে দাঁড়িয়েছেন শিলঙ-টিলঙের পাইন গাছদের মত উঁচু, ঝাড়াঝাপটা, কঠিন, নিরবচ্ছিন্ন নক্ষত্রের নিচে বারান্দায় হিম রাতের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করছিলেন মণিকা।

পরদিন সন্ধ্যের সময় বিরূপাক্ষ এল।

সুতীর্থ আসবে কিনা সেই অপেক্ষায় হয়তো মণিকা দোতলার ঘরে বসেছিলেন। ঘরটাকে পরিষ্কার করে সাজিয়েও রেখেছিলেন সেই জন্যে। সন্ধ্যে হয়েছে—বাতি জ্বালানো হয়নি।

'কে?'

'আমি।'

বিরূপাক্ষ বললে, 'বিরূপাক্ষ, আমি বিরূপাক্ষ।'

'বাবা, আমি ভয় পেয়ে গেছিলুম। আপনি কি বেড়ালের থাবার জুতো পায় দিয়ে হাঁটেন নাকি?'

'আমার থাবা ভিজে বাঘের মত, জুতো আমার বাছুরের চামড়ার। কেন এসেছি জানেন?'

মণিকা বাতি জ্বাললেন সুইচ টিপে। বিরূপাক্ষ তাকিয়ে দেখল; প্রসাধন যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এ সাজগোজের ভেতর কোনদিক দিয়েই কোথাও কোন ইঙ্গিত নেই; নিজেকে ধুয়ে নির্মল করেছেন; মনটা যেন কোন ধোঁয়াটে জিনিসের সংস্পর্শে এসেছিল—তাকে ধুয়ে পাখলে মণিকা নিজেকে সফল, ঝরঝরে করে তুলেছেন।

'সুতীর্থ এসেছে?'

'না।'

'কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল তার?'

'না।'

'না? বড় মুশকিলেই পড়েছি।'

'বসুন।'

'কাল কি এই সোফাটা দেখেছিলাম?'

'ওটা এক কিনারে ছিল। আমি যে কৌচে বসেছি সেটা নতুন; তেতলার থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে।'

ইলেকট্রিক বাল্‌বের চারদিক ঘিরে একটা রাত প্রজাপতি উড়ছিল সেদিকে এক আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিরূপাক্ষ বললে, 'আপনার সময় হবে?'

'কিসের জন্যে?'

'গোটা কতক কথা আপনাকে বলতে চাই মণিকা দেবী।'

মণিকা হাত ঘুরিয়ে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাত দশটা অবধি সময় আছে আমার। তারপর ওপরে যেতে হবে। এখন সাতটা। আপনি আজ গাড়ি এনছেন?'

'গাড়ি এনেছিলুম কিন্তু মোড়ে বিদায় দিয়েছি।'

'দশটা নাগাদ এসে হাজির হবে?'

'না, কিছু বলে দিইনি। তা ছাড়া এ বাড়িতে যে আছি তাতো জানে না ড্রাইভার। না জানানোই ভালো। নানা রকম ফিচেল আছে চারিদিকে—সবাইকে সব জিনিস'—বিরূপাক্ষ পাউচ বাব করল; পরে পাইপটা বের করবে হয়তো—কিন্তু কি যেন ভেবে রেখে দিল পাউচ পকেটের ভেতর। 'দশটা অব্দি? তাবপরে ওপবে যাবেন বুঝি খাওয়া-দাওয়া করতে?'

'আমি রাতে বিশেষ কিছু খাই না। ওদের খাওয়া হয়ে গেছে।'

'তেতলাটা খুব নির্জন মনে হচ্ছে। ওরা কারা?'

'আমাব স্বামী, আমার মেয়ে। ওরা ঘুমুচ্ছে, তাই চুপচাপ সব; দোতলায়ও সুতীর্থ নেই। সুতীর্ত হইচই করত না বটে, কিন্তু তবুও সারা রাত এটা-ওটা সেটা নিয়ে জেগেই থাকত।'

'সবে তো শীতেব বাত শুরু। এখনই ঘুমুচ্ছেন ওবা; এই সোয়া সাতটার সময়?'

বিরূপাক্ষ সিগারেটেব প্যাকেট বাব করে একটা সিগাবেট টেনে নিল।

'উনি অসুখেব মানুষ—'

'ও:।'

'এই সময়েই একটু ঘুম হয। রাত দশটাব পব থেকেই টান উঠতে থাকে।'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'তা হলে তো বড়—' সিগাবেটে এক টান দিয়ে বললে, 'সারা বাত জাগতে হয আপনাকে?'

'আমি হাঁপানির খুব ভালো ওষুধ পেয়েছিলুম' বিরূপাক্ষ বললে। 'এক সন্ন্যাসীব কাছে—অরুণাচলে। ওঁকে দিন। সেবে যাবে।'

'অরুণাচলে?' মণিকা একটু জেগে উঠে যেন তাকালেন, 'কাব অসুখ সারল সে ওষুধে?'

'আমার নিজেবি।'

'হাঁপানি ছিল বুঝি?'

'খুব মরাত্মক ধরনের ছিল; কার্ডিয়াক হাঁপানি।'

মণিকা নিজেব মনে নিজেকে বললেন, দেখ এই লোকটা কেমন চমৎকার মাইফেল মিথ্যে কথা বলছে। ওর টাকা আছে সেই জন্যে ওর হাঁপানি ছিল ওর আরও টাকা আছে, অরুণাচলের ওষুধে কার্ডিয়াক হাঁপানি সাবাতে পেরেছে অইই, তার চেয়েও বেশি টাকা আছে ওব, সেই জন্যে আমার স্বামীব অসুখ সারিয়ে দিতে পারবে বলছে, এই সমস্ত কিছুব চেয়ে ঢের বেশি টাকা বিরূপাক্ষের এত বেশি টাকা যে, যে কোনো রকম ছকের যে কোনো পথে পথে ও বুঝি আমাকে হাত করবে; সব দুয়োরেই ওর সঙ্গে আমার নাকি দেখা হবে, আমাকে হাত করে, 'এসো, খুকি' বলে নিয়ে যাবে বিরূপাক্ষ।

ভাবতে ভাবতে ধ্যান নিরেট রসিকতায় মুখের আনাচকানাচ ছিটেফোঁটা হাসিতে কুঁচকে উঠছিল মণিকার।

'সে ওষুধ আপনার কাছে আছে বিরূপাক্ষবাবু?'

'আছে বলেই তো মনে হয়, আমি খুঁজে দেখব।'

'কিন্তু এ রুগীর বয়স তো পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কোন জ্ঞানবিজ্ঞান দৈবী ওষুধ কিছুতেই তো কিছু হল না– বিরূপাক্ষবাবু—'

বিরূপাক্ষের মনে হল মেয়েমানুষের এ ঢং তার চেনা— এত ভড়কাবার কিছু নেই।

'ঠিক আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে—' বিরূপাক্ষ বললে।

মণিকার মনে হল, লোকটা টাকার জন্য কেয়ার করে না বটে কিন্তু নিজের কাজ গোছানো হলে পৃথিবীতে কারুর মূর্তিই বিশেষ সৌম্য থাকে না আর; এরও থাকবে না; কার কাছে কি বলেছে না বলেছে সে সব নিয়ে কেউ খুঁট বেঁধে থাকে না তখন আর। কাজ হাসিল হলে এও দুচাবটে পালক খসিয়ে ডানা মেলে দেবে ধাড়ি লক্কার মত। কিন্তু দেব কি হাসিল হতে? এ লোকের কাজ হাসিল করে দেব আমি? ভেবে ভাঙা কাঁচের করাতে মত হাসিতে মুখ ভরে উঠল মণিকার। অথচ বিরূপাক্ষ যে মুখের দিকে তাকিয়েছিল, মণিকার সে মুখ হাসির কম্পহীন সমুদ্রপারের ঘন বুনোনো ফর্সা শঙ্খের মত নিটোল।

'চেকটা ক্যাশ করা হয়েছে, বিরূপাক্ষবাবু।'

'উনি ভাঙালেন বুঝি: আপনার স্বামী? তিন হাজার টাকার চেক ছিল তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওটা ক্রসড চেক ছিল—'

'তাতে কিছু বেগ পেতে হয়নি। আমাদের এখানকাব ব্যাঙ্কের শিশিরবাবু তাঁর নিজেব অ্যাকাউণ্টে জমা দিয়ে নিয়েছেন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আমাকে?' মণিকা বললেন, 'কেন?'

'একটা ঋণ শোধ করবার দাবি মঞ্জুর করলেন বলে। সকলে তো করে না।'

বিরূপাক্ষের কথা শুনে এক আধ মুহূর্তের জন্য একটু স্তিমিত মন্থর হাসি এল মণিকার মুখে; যেন কেমন হাসি? প্রশ্রয় দিচ্ছে যেন অবোধ বালককে, কৃপা করছে যেন অধম মুখফোঁড়িকে। মণিকাকে টাকা দিযে— যারা অনেক দূরের থেকে আসে মানুষকে টাকা গছিয়ে দেবাব জন্য, মানুষের মুখ্যত গায়ের গন্ধ শুঁকবার জন্যে সেই সব শুয়োরদের ভেতব নিজেকে খুঁজে পেল যেন বিরূপাক্ষ।

উঠে গিয়ে বিরূপাক্ষ দক্ষিণ দিকের জানালা দুটো বন্ধ কবে দিযে এল: ঠাণ্ডা হাওযা আসছে।

'জানালা দুটো ও বাড়ির ঠিক মুখে ওপর।'

'ও:, ওদের জানালাও বুঝি খোলা ছিল? মানুষ ছিল ও ঘরে– ওদের ঐ জানালার ঘরে?' মণিকা জিজ্ঞেস করলেন।

'দু–চারজন তাকিয়েই থাকে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'কলকাতার মানুষের এরকম চোখ মাবার অভ্যেস আছে– খুব বেশি। ভারি নিঘিন্নে মানুষ সব'— বলতে বলতে সিগারেট জ্বালাল বিরূপাক্ষ।

'ভালই করেছেন জানালা বন্ধ করে।' মণিক বললেন, 'ঠাণ্ডা হাওযা আসছিল। খুব শীত করছিল।'

'শীত? শীত তো বটেই। তা ছাড়া বাড়ির খোলা জানালা, মানুষেব চোখের নজরে আপনি বিশ্বাস করেন না বুঝি?'

'শালটা ভুলে ফেলে এসেছি।'

আলনার থেকে সুতীর্থের একটি ধোসা টেনে ভালো কবে গাযে জড়িয়ে নিযে মণিকা বললেন, 'আমার মত মেয়েমানুষের শীতবোধ বড় বেশি বিরূপাক্ষবাবু, শীত ছাড়া আর কিছুতেই আমাব এসে যায না। পাড়াপড়শীর চোখ তো আমার লক্ষ্মী।'

'কোথা যাচ্ছেন?'

'জানালা খুলে দিই।'

'কি দরকার? থাক।'

'এখন কটা রাত।'

'সাড়ে আটটা।'

'বিরূপাক্ষ সিগারেটটা ঘরের ভেতর কোনো একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিযে পকেট থেকে পাউচ বার করল, পাইপ বার করল। পাইপে তামাকের পাতা ভরতে ভরতে বললে, 'কলকাতায আমার তিনটে বাড়ি আছে—'

কলকাতা যখন বাড়ির শহর, তখন সে সব বাড়ির মালিকও রয়ে গেছে। কারু তিনটে বাড়ি আছে— কারু ত্রিশটে বাড়ি। কিন্তু এ সব বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে নিজের ঘরে আটক মণিকার বড় একটা দেখা হয় না। দেখা হলেও এমন কিছু হয়েছে এমন কেউ এসেছে মনে হয় না তার।

'কোথায় বাড়ি আপনার বিরূপাক্ষবাবু? রিজেণ্ট পার্কে তো একটা—'

'হ্যাঁ, ঐ টালিগঞ্জে, বালিগঞ্জে, ঢাকুরিয়ার।'

'বাঃ, বেশ ভালো জায়গাই তো সব।'

'ব্যাঙ্কে লাখ পনেরো-কুড়ি টাকা আছে।'

বিরূপাক্ষ তাকিয়ে দেখল মণিকা শুনলেন, কিন্তু শুনে কিছু হল না যেন পৃথিবীতে এল গেল না কারু কিছু। ব্যাঙ্কের টাকার কথা যেন মণিকা দেবীকে না বললেই ভালো হত। আমার একটা মাটির ঘোড়া আছে, একটা সোলার বাঁদর আছে, বাবা মেলার থেকে কিনে দিয়েছেন; এইসব কেচ্ছা আরম্ভ করেছে যেন বাচ্চা, এমনই নির্বিকার বয়স্কার আত্মস্থ মুখ প্রতিভা। তবুও ঝুড়ির সব জিনিসই দেখাতে হবে, না দেখালে হচ্ছে না বিরূপাক্ষের; বললে, 'পছন্দ কবে বিয়ে করেছিলুম।

'ভালোই হয়েছিল', মণিকা শীতেব জন্যে ধোসাটা একটু আঁট কবে নিয়ে বললেন, 'দেখে শুনে কাজ করলে বেশ ভালো।'

'বাঁজা কিনা তা তখনও যে রূপ ছিল, এখনও তাই আছে, কিন্তু—'

বিরূপাক্ষ পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'মনে কোন শান্তি নেই আমাব।'

পাইপ টানতে টানতে নীরব হয়ে নিবিদ হয়ে মণিকাব দিকে তাকিয়ে বইল সে। মণিকা উঠে যেতে পাবতেন, কিন্তু বসে বইলেন বিরূপাক্ষের দিকে তাকিয়ে নয়, বিরূপাক্ষ যে আছে সে কথাটা থেকে থেকে ভুলে যাচ্ছিলেন তিনি। বিগত পনেরো কুড়ি বছরের জীবনের নানা বকম ঘটনা উকি মেরে যাচ্ছিল মণিকাব মনে। যে পুরুষ যে স্ত্রীলোককে ভালোবাসে, যে স্ত্রীলোক যে পুরুষকে—তাদেব মিলনামিলন কি মহাশূন্যেব অন্তহীন নির্মোহেব অন্ধকাবে ফেঁসে গিয়ে শীতেব রাতেব শহরেব ঘবে এই বিরূপাক্ষের মতন কৃকলাসদেব জন্ম দেয়? মণিকা নিজে এখন এখানে বসে আছেন কেন—উঠে যাচ্ছেন না কেন? পবিভাষা শিখে ফেলেছে সে কাকলাসদের? স্বর্গীয় অনবনমন ভালো নয়, মাঝে মাঝে অবনমিত হয়ে সৃষ্টিব সামলানো টালটাকে টালিয়ে দেবাব ভেতব যে নির্জন বস আছে সেটা উপলব্ধি কবে দেখতে হয—সেই জন্যেই মণিকা এখানে বসে আছেন এখন ; মুখোমুখি বিরূপাক্ষ। কথা বলছে—

দুজনেই মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে বসে বইল। তারপরে বাতি নিবিয়ে মণিকা ওপবে চলে গেলেন—তাড়াহুড়ো করে নয়, স্বাভাবিক সুস্থতাব যেমনই কবে বাতি নিবিয়ে মানুষ বসবাব ঘর থেকে খাবাব ঘরে শোবাব ঘবে চলে যায়।

ওপবে যাবার আড়ে মণিকা আলো নিবিয়ে গেলেন কেন ভোব পাঁচটা অবধি শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে ঝিমিয়ে আকচার প্যাঁচ কষে এ সমস্যাব যখন কোন জট খসল না তখন একটা ভেবামন, তারপরে আর একটা ভেবামন খেয়ে অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ল বিরূপাক্ষ।

শেষ বাতে জেগে উঠে তেতলাব বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বিরূপাক্ষ ঘুমিয়ে পড়েছে টের পেলেন মণিকা। নিচে নেমে এসে লোকটাব গায়ে সুতীর্থেব কম্বলটা আলগোছে ছড়িয়ে ধীবে ধীরে ওপরে উঠে গেলেন তিনি।

সতেরো

কেমন যেন কি যেন একটা মিলে গেছে—ঘুবে ফিরে পবদিন সন্ধ্যায় আসতে হল বিরূপাক্ষকে আবার। সন্ধ্যা উতবে গেছে—খানিকটা রাত হয়েছে। মোটরটা মোড়ে বিদায় দিয়ে তাকিয়ে দেখল ড্রাইভাব গাড়ি নিয়ে সবাসবি চলে যাচ্ছে, না গড়িমসি করছে। গাড়িটা যখন অনেক দূবে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, তখন বিরূপাক্ষ তাড়াতাড়ি তাব চেনা পথ ধবে সুতীর্থেব ঘবে এসে হাজিব হল।

'ভেবেছিলুম আপনি এখানে থাকবেন না—' মণিকাকে বললে বিরূপাক্ষ।

'ছিলুম না, এই এক্ষুণি এসেছি। সুতীর্থের একটা খবর না পাওয়া পর্যন্ত বড্ড অস্বস্তি বোধ করছি। শুনলুম পুলিশ গুলি চালিয়েছে—'

'কোথায়?'

'কলকাতার নানা জায়গায়—'

বিরূপাক্ষ অতশত খবর রাখে না। সারাটা দুপুর সে ঘুমিয়েছে, নেশা করেছে, মদের নেশা কিছু কিছু আছেই। আরো নানারকম নেশা। চৈতন্য তারা সারাদিনই আচ্ছন্ন হয়েছিল। অনেক দিন থেকেই সে আধো চেতনা-অচেতনার ভাগাড়ে কবরে হায়নার মত অন্ধকারে অন্ধকারে দিন কাটায়।

'গুলি চালিয়েছে? কই আমি তো শুনিনি।'

'আমি শুনেছি।'

'গুলির শব্দ? এ পাড়ায়?'

'কোন্ পাড়ায় কে জানে। মারাত্মক শব্দ কানে এসে পৌঁছয়—মানুষ কি স্থির থাকতে পারে! কেমন লাগে যেন।'

'ঠিক কথাই তো'—ভাবছিল বিরূপাক্ষ কিন্তু মুখে এই কথা মণিকার ; সেই মুখেই আবার সাজগোজের ছিটে একেবারেই যে কিছু পড়েনি তা নয়।

বাতিটা জ্বালানো ছিল—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। কোথাও পাউডার—ক্রিমের আঁচ পাওয়া যায় না অবিশ্যি, কিন্তু কেমন ঘন কালো চুলে কি সিঁথিই বটে—ওরই ফাঁকে একরত্তি সিন্দুরের বিন্দুটুকু দেখ ; কী ত্রৈলোক্যচিন্তনীয়।

'আমার মনে হয় দিশি পটকার শব্দ শুনেছেন।'

'কে, আমি? কি যে বলছেন বিরূপাক্ষবাবু।'

'অনেক নচ্ছার ছেলেছোকরা থাকে লুকিয়ে পটকা ফাটিয়ে মানুষকে ভয় দেখায়।'

'কোন্টা গুলির শব্দ, কোন্টা ভুঁই পটকার সে তো শিশুও বোঝে। আমি আশ্চর্য হলুম কলকাতায় এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল—আপনি কোথায় ছিলেন।

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালাল আজ। মাথা নেড়ে ভারিক্কি চালে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল আবার ; ভালো করে ধরেছিল না।

বললে, 'না, কিছু হয়নি। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। কলকাতায় দিনরাত কত রকম শব্দ হয়। কে আপনাকে বলেছে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। আপনার স্বামী অবিশ্যি বাইরে যান নি। কোনো ছেলে-ছোকরাও নেই এ বাড়িতে রাস্তার সোরগোল হই হল্লায় কত গুজবের—

'না হলেই ভালো। সুতীর্থ কোথায়?'

'সুতীর্থ খুব সেয়ানা ছেলে। এতদিন তো খুব ভালো জায়গায়ই ছিল?

'কোথায়?'

'আপনার এখানে।'

'আমার এখানে—আমি তার কি উপকার করতে পেরেছি?'

মণিকার গলা কেঁপে উঠল ; এটা ভান—না সাচ্চা—চুরুট টানতে টানতে সহসা কিছু ঠাহর করে উঠতে পারল না বিরূপাক্ষ। হয়তো সত্যি—সৎ—কিন্তু কি আসে যায় তাতে। সুতীর্থ যা না চাইতেই পেয়েছে বিরূপাক্ষ তা চেয়ে আদায় করে নেবে ; এর ভেতর ভেবে দেখবার কি আছে যদি সে হাত পেতে নিতে চায় ; সুতীর্থের চেয়ে ভাগে কিছু কম পাবে হয়তো—নির্মলতায়ও কিন্তু বস্তু হিসেবে বস্তা ওজনে বেশিই পাবে ; কালোবাজারের কারবারী সে, এই জিনিসই তো সে চায়। এ নারীটিকে বশে আনতে হলে আরো ঢের সাধনার দরকার—না আজ রাতের ভেতরেই কোন একটা রফা হয়ে যাবে?

পুরুষ ও মেয়েমানুষ সম্পর্কে এসে কাজে কারবারে হামেশা মিথ্যে কথা বলতে হয় বিরূপাক্ষকে। কখনো সাজিয়ে মিছে কথা বলে, কখনো সোজা সিধে মিথ্যে কাজ দেয় বেশি। কিন্তু কি নিয়ে কার সম্পর্কে কি রকম মিথ্যে বলবে সে এখন? যাতে মণিকার মন গলে যাবে? কি বলবে এখন কোন বলাবলিরই দর নেই যেন, মিথ্যে কথার কোন প্রশ্নই ওঠে না—মিথ্যে হোক, সত্য হোক, খানদানী কারবার করতে হবে বটে, রাত হচ্ছে, প্রথমেই প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলবার জন্যে বিরূপাক্ষ বললে, 'সুতীর্থদের অফিসে খোঁজ নিয়েছিলুম আমি—' এটা মিছে কথা।

'গিয়েছিলেন সেখানে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর কোনো পাত্তা পাওয়া গেল?'

'স্ট্রাইক হয়নি।'

'আমি যে শুনেছিলুম সুতীর্থই স্ট্রাইকের ব্যবস্থা করছে।'

'সুতীর্থ কলকাতার বাইরে চলে গেছে।' মিছে কথা সব বিরূপাক্ষের ; মণিকা দেবী ধবি ধরি করেও ধরতে পারলেন না।

'কেন? গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে নাকি?'

'আমি জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু, আছে বলেই বোধ হচ্ছে—'

অনেক দূবে কিছু ঘনিয়েছে বোধ করে ডাকপাখিনীর মত সূর্যের ঝিলিকেব ভেতর অস্বস্তি বোধ কবে মণিকা একটু ডাক পেড়ে বললেন, 'ও পাগল বাইরে চলে গেল কেন?'

'এ ছাড়া কী করবে?'

'আমাব এখানে এলে আমিই তো তাকে লুকিয়ে রাখতে পাবতাম—'

'সুতীর্থের নিজের ঠিকানায় তাকে লুকিয়ে রাখবেন আপনি?'

'না, না, এখানে নয়—অন্য জায়গায় বাখবার ব্যবস্থা করতুম—'

'ও সব এখানে বসে বলছেন তো, ওতে কাজ হয় না। নাঃ, সুতীর্থ যা করেছে ভালোই করেছে।'

'যাক, বেঁচে থাকলেই সব। ভেবেছিলুম কোনো অঘটন হয়ে গেল নাকি—কলকাতার বাইরে কোথায়?'

'টালিগঞ্জে।'

'টালিগঞ্জে। সব্বোনাশ। সেটা হল কলকাতাব বাইরে?'

'কি হবে টালিগঞ্জে থাকলে? এমন কি দোষ করেছে? খুন জখম তো কবেনি? যদি জেলে যায় দুচাব মাসেব জন্যে যাবে হযতো—'

মণিকা কি যেন বলতে গিযে থেমে গেলেন। তারপরে নিজের বাঁ হাতের কররেখার দিকে তাকিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন, 'জেলে যাবে—কেন খাবার কি দরকার? কি কবেছে যে যাবে? একজন মানুষের দু'চাব মাস জেল কিছু নয়—দেখতে দেখতে ফুরিযে যায়?'

'দু'চার বছবেবও হতে পাবত—'

'করেছিল কি?'

'ধর্মঘটীদেব নাচাচ্ছিল।'

'কি কবতে?'

'মারামাবি হয়েছিল। খুন হয়নি।'

চুরুটেব মুখে বেশ খানিকটা ছাই জমে উঠেছিল বিরূপাক্ষেব। সেদিকে তাকাতে তাকাতে বিরূপাক্ষ বললে, 'খুন হযনি তাই বাঁচোযা। কযেক দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকুক, তাবপব বেরিযে এলেই হবে। কিছু হবে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আমি নিজেই বলে দেব—'

'ভালোই করেছিল।' বিরূপাক্ষ চুরুটেব ধোঁযাব মিহি ঘুবপাকের দিকে তাকিয়ে বললে স্ট্রাইক কববে না কেন? আমাদেব দেশটা যা হওযা উচিত ছিল তা হযনি বলেই তো কেষক—টেষকের এই দুর্দশা—'

শুনে মণিকা বললে নিজেকে ঃ এই লোকটা ম্যানেজিং ডিরেক্টবেব কাছে অন্য রকম কথা বলে এসেছে। ধর্মঘটীদের গাল দিয়েছে, কর্তৃপক্ষকে তাতিয়ে এসেছে। আমাব এখানে এসে ঝাড়ছে দেশিকতা ও গণসাম্যের চাল। এদেব চিনি আমি—এদেব কি উদ্দেশ্যে তাও জানি। এঁটিলির মতন লেগে থাকে মানুষটা রাতেব পব বাত। টাকাব দবকাব অবিশ্যি আমার। এ সব মানুষেব কাছে না নিলে কোথায পাব? নেব—কিন্তু যা চায ও কি জানে যে কিছুতেই তা পাওযা সম্ভব নয়।

'আমি এইবাবে একটা ফার্ম খুলব ভাবছি। খুলে সুতীর্থকে কবব ম্যানেজিং ডিরেক্টব আব আপনাকে—'

এ লোকটা কি বকম যে গ্রহতিথিব মত এসে পড়েছে কোথেকে যে আমাব জীবনে। আমি চাঁদ হতে পাবি ; আমি সূর্য হতে পাবি আমি সূর্য দেবী—আঃ, কী জ্বলন্ত বোদ চারদিকে আমাব—মকব সংক্রান্তিব ভোরের—কিন্তু—, মণি... দেবী ভাবতে ভাবতে কোথায চলে গিযেছিলেন যে, কিন্তু বিরূপাক্ষ তাকে চমকে জাগিযে দিযে যেন বললে, 'সুতীর্থ ঠিক কোথায় আছে শুনুন তাহলে, আছে—টালিগঞ্জে—আমার—'

কিন্তু টালিগঞ্জ কি কলকাতাব বাইরে হল? সে তো বিপদের এলাকা।'

'কে অত খোঁজখবর নেয। আম বকুল ঝাউ দেবদারু নিম জামরুলেব একটা উপবনেব ভেতর টালিগঞ্জে আমার বাড়ি। তাই বলে আকাশ রোদ বাতাসের অভাব নেই। কিন্তু ওখানে কে যাবে—কে

সূচীপত্রে যান

সন্দেহ করবে?'

'কিন্তু ঘাপটির ভেতর লুকিয়ে থাকবার মানুষ নয় তো সুতীর্থ। আপনার বাড়িতে আছে ভালো মানুষ সেজে?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর হেপাজতে।'

উৎসুক হয়ে তাকাল মণিকা।

ওবা, দু'জন অনেক দিন থেকেই এ-ওকে চেনে। প্রায় কুড়ি বছরের আলাপ। জয়তীর জন্ম থেকেই তো। ভাই-বোনের মত গা ঘেঁষে চলেছে। এখন অবিশ্যি অন্য রকম। সুতীর্থের মতন লোকের কাছে আমার স্ত্রীকে আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি, যতদূর যায় ওরা দু'জনে যাক, আমাব কোন আফসোস নেই—' চুরুটের আগুন নিবে গেছে বিরূপাক্ষের, কথা বলা শেষ হয নি ঃ দু'একবাব হ্যাঁচকা টেনে দেশলাই বার করল।

'নাঃ, ওতে আমার কোন খিঁচ নেই', বিরূপাক্ষ বললে, 'একটা জিনিসের ভালো মীমাংসা হয ওতে। অন্য পাঁচ রকম না হযে সুতীর্থকে যদি জযতী নিযে নেয, তাহলে মন্দেব ভালো হল—নাকি ভালোই হল।'

মণিকা ঘাড় কাত করে পাযের নিচে মেঝের একটা ভারি সুকুশল কালো স্বস্তিকা ছকের দিকে—মহাশূন্যের দিকে যেন চিরনারীর মত তাকিযে ছিলেন—কোনো কথা বললেন না।

বিরূপাক্ষ দেশলাইযের কাঠি জ্বালিয়ে নিল চুরুট জ্বালবাব জন্যে। কিন্তু চুরুট না জ্বালিযে মণিকাব মুখের দিকে নিজের চোখেব মণির নিঃশব্দতায নিষ্কম্পতায কযলাখনির সমস্ত অন্ধকাব আর্তির মত যেন কোন অদেখা সূর্যের দিকে তাকিযে রইল। দেশলাইযের আগুন নিবে গেল।

মণিকাব মোমের মত নেই কিছু—সীসের মত নেই—কেমন যেন কঠিন গোমেদ মণিব মত অন্তরাত্মার দিকে তাকিযে বইল বিরূপাক্ষ, কিছু ভেদ করতে চাইল যেন সে।

'আমার আজ শরীর খাবাপ', মণিকা বললেন।

'আচ্ছা, আমি উঠি।' বললে বিরূপাক্ষ।

'না। আপনি বসুন।'

'মাথা ঝিমঝিম করছে? আমার কাছে ওষুধ আছে—শবীরেব যে কোনো রকম অসুবিধে অস্বস্তি দূব কবে দেবে এ ওষুধ—ওযাবেব আগের—খুব ভালো—জার্মান—' বিরূপাক্ষ পোর্টফোলিও ব্যাগেব দিকে হাত বাড়াল।

যেন কিছু হযনি এমনিভাবে মুখ কবে—এ ভান ধবা পড়লে পড়বে, কি আব কবা যাবে—এমনই মুখভঙ্গিতে হেসে ফেলে মণিকা বললেন, 'একটা সংসাব সঙ্গে ফেবে-ওষুধ-বিষুধ সব কিছু? আমাব ওষুধেব কোন দবকার নেই বিরূপাক্ষবাবু—'

'একটা বড়ি শুধু খেযে দেখুন—'

'না।'

'থাক তাহলে।' চুরুটটা জ্বালানো দবকাব। কিন্তু না জ্বালিযে নিযে বিরূপাক্ষ বললে, 'উঠি। মানুষ নেই। কোথাও কোন প্রাণ নেই।'

মণিকাব প্রাণে বেশ বড়, ফলসা উজ্জ্বলতা আছে। শরীরে আছে রূপ। রূপের অহঙ্কার আছে। মাঝে মাঝে মণিকার এই নির্বিশেষে তীক্ষ্ম জ্ঞান যে কোন মানুষের জন্যে হৃদযেব যে কোন কোমল সক্রিযতাকে কেটে ফেলে আত্মস্বাতন্ত্র্যে এমনই একাকী করে তোলে তাকে—সব কিছুর আব সকলেব মনে এমন একক—যে এই পৃথিবীতে নারীসত্তমা বলতে তিনি ছাড়া যে আব কেউ আছেন সে কথা স্বীকাব কবতে চান না মণিকা—বিশেষত তাঁব স্তাবক পুরুষমানুষদেব সামনে।

মণিকা আহত হয়ে সুতীর্থের স্খলন বৃত্তান্তের কথা ভেবে দেখেছিলেন। ব্যথাকে তিনি ব্যথার পথে গভীরে না নামতে দিয়ে পাশ কাটিযে ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন অন্য কোথাও—হযতো অস্বস্তিতে, ক্ষযভঙ্গুর ক্ষণিক অস্বস্তির ভেতরে। তবুও ব্যথাই বড়, কিন্তু তবুও তিনি বয়সী মেয়েমানুষ কাঁচা নন। ব্যথাকে তিনি স্তম্ভিত করে রাখতে পারেন, যেন ব্যথা নেই অন্য কোন মুহূর্তের জন্যে ; আছে ; তারপবে সময আছে ঃ মানুষকে রেহাই দেয—চুম্বকের মত টেনে নেয সব ব্যথা নিজের বুকে সময। অস্বস্তি বোধ করছিলেন, বাধা পাচ্ছিলেন, ভাবছিলেন সব মণিকা। হঠাৎ বিরূপাক্ষের কথা শুনে তিনি আরেক পৃথিবীতে নেমে এলেন, দুঃখ যেন মুহূর্তেই সরে গেল মর্যাদাকে স্থান দেবার জন্যে, ব্যথা লঘু, ফিকে হয়ে গেল

বিরক্তিতে। নিজের মনকে বললেন মণিকা ঃ কোথাও প্রাণ নেই যাবার জায়গা নেই ঃ এ কথা আমাকে শোনাতে আসে কেন বিরূপাক্ষ। প্রাণ যে সমুদ্র তা সুতীর্থ টেব পেয়েছিল, কিন্তু ধনুক তুলে শাসন করল না, মর্কটের মত শিলা জলে ভাসল কে জানে। প্রাণ নেই—বলছে বিরূপাক্ষ, কোথাও যাবার জায়গা নেই—আমার কান ছার পোকা খসাবার মত আর কোন জায়গা নেই বুঝি মানুষটাব।

'সুতীর্থকে ভালোবাসতুম বলেই আজ ক'রাত ধরে এখানে আসছি—' বক্তব্য শেষ করবার আগে চুরুটেব দিকে নজর পড়ল বিরূপাক্ষেব।

'কিন্তু আজ রাতে সুতীর্থ তো আপনার বাড়িতে'—মণিকা বললেন।

তবুও কেন বিরূপাক্ষেব এ বাড়িতে আসা? মণিকার মনে হল, বিরূপাক্ষ এবার মণিকাপীঠে ঢেলে দিয়ে ঢেব মর্মভেদী কথা বলবে ঃ সে সব কথা মণিকার গ্রহণযোগ্য না হলেও বেশ চমৎকাব শোনাবে কিন্তু।

'কিন্তু সুতীর্থের সঙ্গে আমাব স্ত্রীর এই সব হল আর কি।' বললে বিরূপাক্ষ।

মণিকাপীঠে মাথা খুঁড়ে কোনো কথা বললে না সে—কোনো কথাই বললে না—নিজেব স্ত্রী কি কবেছে না কবেছে সেই গুমরে অভিভূত হয়ে জড়বুদ্ধিব মত যেন বিরূপাক্ষ ঃ মণিকা যে সামনে বসে আছেন খেয়ালই নেই যেন। নিজেকে এক আধ মুহূর্তের জন্যে কেমন ছেঁদো মনে হল মণিকাব, ওপবে গিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল তার। শীত বেড়েছে—ঘুমও পেয়েছে। ঘুমেব ভেতরে চিন্তার কোনো স্থান নেই— কোনো বিক্ষোভ নেই—মণিকা নেই, মণিকাপীঠে নেই, পীঠে এসে যে তান্ত্রিক সেবক নিজেব মূঢ়তাব জন্যে দেবীকে তৃপ্ত করতে পারল না সেই অপবিতৃপ্তিব কোনো তিতকুট নেই শীতেব বাতেব সমস্ত বর্ণালিব শেষে এক, নিঃশব্দ অন্ধকাব বর্ণেব ঘুমেব ভেতব।

'আপনাব স্ত্রীকে চিনি না আমি, কি কবেছে জানি না। আপনি দেখুন শুনুন সুতীর্থ যদি এদিকে আসে কোনো দিন তা হলে আমি এ সব বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলা দবকাব মনে করি না তাব সঙ্গে—আপনাব সঙ্গেও না। হুজুকে মেতে খুন করে নি তো সুতীর্থ?'

'না।'

'আপনাব বাড়িতে আছে তা কেউ জানে?'

'কেউ জানে না।'

'কেউ জানে না, ভালো কথা। জানতে পারে হয়তো কেউ। ষ্ট্রাইকে বা অফিসে, কোথাও আব কাজ কববাব ফাঁক নেই সুতীর্থের—শীগগির নেই। মণিকা এখন হাত ঝেড়ে বাতাসে হাত ধুয়ে ওপবে চলে যাবেন ভাবছিলেন। পা বাড়াচ্ছিলেন প্রায় যাবার জন্যে ; বিরূপাক্ষকে কিছু না বলে, নাক উঁচু কবে ওপবে চলে যাওয়াটা হয়তো অভদ্রতা হয় ; অনেকে ঐ বকমই সটান চলে যায়—ভদ্রতার বালাই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, কিন্তু তবুও চলে যাওযাব ওবকম ঢঙটা পছন্দ কবেন না মণিকা। বিরূপাক্ষ অপবাধ নেবে কি না নেবে—মণিকা শালীন ঘরেব মেয়ে না অন্য বকম ঘবের—এ সব কাবণে নয়, এমনিই বিরূপাক্ষেব মতন একজন আলপটকা আপাতভদ্র মানুষেব সঙ্গে ভদ্রতা বজায় বেখে শিষ্টাচাবে সুস্থতাব কথা বলে বিদায় হওযাব বকমটা ঠিক ; এটাই ঠিক মনে হয তাব।

মুখে হেসে ভদ্রতা করে মণিকা বললেন—'আচ্ছা, উঠি আমি—'

'আমাব বাড়ি তিনটেব সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা কবতে চাই।'

'বাড়ি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা—' মণিকা অন্য কথা ভাবছিলেন।

'আমি নিজেব জীবনটাকে ঢেলে সাজাতে চাই মণিকা দেবী—আপনার সহাযতা ছাড়া কি করে চলবে আমার। চাবদিককাব এই বিশৃঙ্খলাব ভেতব আব একজন মানুষকেও আমি দেখছি না।' বললে বিরূপাক্ষ।

মণিকা জানালাব বাইরেব বাত্রির দিকে তাকিয়েছিলেন—লোকটা তাঁর খোশামুদি কবছে—সমগ্র মন দিয়ে বোঝাই যায, কিন্তু তবুও সে মননেব উৎপত্তি মন, নয়, মাটি—বিরূপাক্ষ নলিনাক্ষ কমলাক্ষের হযবরল সত্তাব। তবুও মন যে ভিজল মণিকার তা নয়, কিন্তু দু'এক মুহূর্ত আগেই যে আত্মমূল্যকে সবচেয়ে বড় জিনিস মনে হয়েছিল—এখন কেমন যেন ফাঁকা মনে হল সেটাকে। হল নাকি? মনের দ্রুত পরিবর্তন ; কিন্তু কোনো পবিবর্তনই তাকে আযত্ত করতে পাবে না। মণিকা আযত্তের ভেতব আসতে চাচ্ছিলেন—সুতীর্থের—এমনকি বিরূপাক্ষেব মত মানুষেবও মনেব কোন নাবীকূট নারীজননীকূটের নির্মল ঐকান্তিকতার সূত্র ধরে।

'এই তিনটে বাড়ির ট্রাস্টি কবতে চাই আপনাকে।'

'বাড়ির ট্রাস্টি?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ির ট্রাস্টি আ-াকে? তাতে আপনার কি লাভ?'

'আপনি নিজে রয়েছেন আমার জিনিস দেখে শুনে ঠিক রেখে,—বুঝে দেখবার জন্যে ট্রাস্টিদের বোর্ড ডিরেক্টরদের বোর্ড গলদঘর্ম হচ্ছে না, কোনো বোর্ড নেই কিছু নেই—শুধু আপনি আর আমি—'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালতে গিয়ে দেখল তার হাত কাঁপছে, সমস্ত শরীর একটা আশ্চর্য শীত উত্তেজনায় কাঁটা দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার।

'আপনি আমাকে এতটা বিশ্বাস করবেন না বিরূপাক্ষবাবু।'

'আপনাকে ছাড়া কাউকেই—বড্ড শীত—'

'সুতীর্থের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন।'

'না কম্বল লাগবে না আমার।'

'আজ শীত নেই তো।'

'শীত নেই তো, শীত করছে বড্ড।'

'দিনটা তো আজ গরম—'

'কিন্তু আপনি তো শীত পুকুরের বর্ত করেছেন বিরূপাক্ষবাবু।'

'শীতটা কমছে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'কমবে, বাড়বে, ওটা শীতরাতের শীত নয়।'

'তবে?'

'ওটা নাভীব শীত।'

বিরূপাক্ষ বিস্ময়ে একটা বেড়াল শেয়ালের মত অবোল মিনি মণিকা দেবীব মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললে, 'শীতটা যে ভেতরেব সেটা সত্যি।'

শীতের কাঁপুনি কমে গেল বিরূপাক্ষেব। কিন্তু বিরূপাক্ষেব মুখে যে কথা এসেছিল, কিছুক্ষণেব জন্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল—জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল তাব।

মণিকা দয়াপববশ হয়ে বললেন বাতিটা আপনার চোখে লাগছে।'

কোনো সাড়াশব্দ করল না বিরূপাক্ষ বাতিটা নিভিয়ে দিলেন না মণিকা, এমনিই ওপরে চলে গেলেন।

আঠারো

পরদনি রাতে সুতীর্থের ঘবে ঢুকে চড়া বাতিটায বড্ড অস্বস্তি বোধ কবল বিরূপাক্ষ।

'সুতীর্থের যা বকম, একটা নব্বই ওয়াটের বাতি এনে বেখেছে ঘবে। কি দবকাব এটা জ্বালিয়ে রাখার?' বললে বিরূপাক্ষ।

'জ্বলছে তো' মণিকা বললেন, 'মানুষ আলোই ভালোবাসে।' 'হ্যাঁ। মানুষ তো বেড়াল নয—' বলে বিরূপাক্ষ একটা সাদা কথা বলে ছেড়ে দিল ; আবো ঘোরালো করতে পাবত বুঝি কথাটাকে।

'দশ পনেবো ওয়াটের একটা সবুজ বালব দেয়া যাবে এই ঘবে—সুতীর্থ যতদিন না ফেবে—'

'কোথায় ফিরছে। ওকে তো গুণ কবে বেঁধে রেখেছে।'

'কে?'

'জযতী।'

'জযতী?'

'আমাব স্ত্রী। গুণী মেযেমানুষ। সুতীর্থ বড়সড় হলে হবে কি—ওব নাকে এখনও ছেলেবেলার দুধ।'

নিজের রিস্টওয়াচেব দিকে তাকালেন মণিকা ; কাঁটা—ঘড়িব সময—থেকে থেকে ভেসে উঠছিল তাঁর চোখে ; এতটা বেজেছে ; একটা বেজে এত মিনিট। কিন্তু মানুষের ছোট্ট সময়টা তলিয়ে যাচ্ছে যেই সময়ের ভেতর, সেইখানে মনোনিবিষ্ট হয়ে থেকে আবার ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল তাঁর।

'জোর বরাতে মানুষ এরকম এযোতি পায, আমিও পেয়েছিলুম।' বিরূপাক্ষ বললে, 'আশ্চর্য, কী করে রং ছুট হযে গেল। দুজনেব মন দুদিকে হেলে পড়ল।'

'তাই কি হয কখনও?' মণিকা বললেন, 'দুঘাটে বসে স্বামী-স্ত্রী কখনও নিজেদেব মজা দেখে'

সূচীপত্রে যান

'আপনি ভদ্রলোকের স্ত্রী, সেইজন্যই এই কথা বলছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে।' বললে বিরূপাক্ষ ; বলবে কি না বলবে—কিন্তু তবুও এরপর আস্তে আস্তে বললে, 'কিন্তু কথা বলার মধুরতাও তলানির দিকে তিতো হয়ে আসে, তখন চুপ করে থাকাই ভালো।'

মণিকা কব্জি ঘুবিয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালেন আবার। সেকেণ্ডের কাঁটা কেমন মৃদুকম্পনে ঘুরে চলেছে ; কাঁচ কাঁটা সোনা, সব উজ্জ্বলতার অতীত একটা সময় ও সমাধির খোঁজ পাওয়া যাবে বিরূপাক্ষ এ ঘর থেকে চলে গেলে ;—একে তাড়িয়ে দেবেন না মণিকা—যতক্ষণ আছে অভদ্রতাও করবেন না ; মাঝে মাঝে আলাপচারিতে একটু আস্বাদও আছে।

'আমি ভেবেছিলুম তলানিব দিকেই মধুরতা বেশি', মণিকা বললেন, 'তা নয়'।

'তা হলে সে তিতো মদ। আদ্যোপান্তই তিতো,'

'তা হবে।'

বিরূপাক্ষেব চোখ আমেজে কুঁকড়ে আসছিল, বললে 'আহা, বড় সুন্দব কথা তো ; কি বলছিলেন?'

মণিকা পাঠ অপাঠের ওপারের থেকে যে কল ঘোরাতে জানেন তাই ঘুবিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই মানুষেব কথাবার্তাব মধুরতা বেশি—' মণিকা ভাবছিলেন ঃ বিরূপাক্ষের কাছ থেকে আমি কযেক হাজাব টাকা নিয়েছি ; আমাব খুবই দায়ের সময় টাকা দিয়েছে। টাকাটা ওকে ফিবিয়ে দিতে পারব কিনা বলতে পাবছি না। ওঁব সময় নেই, আমাদের কোন আয় নেই, সুতীর্থের কাছ থেকে ঘব ভাড়া পাচ্ছি না। নিচেব তলায় যাঁরা আছেন জাপানী বোমার হিড়িকেব সময ভাড়া নিয়েছিলেন, মোটে ষাট টাকা পাওযা যাচ্ছে তাদেব কাছ থেকে; এতে কি সংসাব চলে আজকাল? রোগের চিকিৎসে হয়? ভদ্রভাবে থাকতে পাবে মানুষ? বিরূপাক্ষ বিপদেব সময টাকা দিযেছে, দিয়ে কোন দলিল পর্যন্ত রাখেনি, টাকা সে ফেরৎ চাযও না ; কী চায? শীত রাতে স্ত্রীলোকের মুখে কথিকা শুনে তৃপ্ত হয ওর মন, কিন্তু এব চেযেও বেশি কিছু ও চায ; সে সব পাবে না কিছু, কিন্তু যা দিচ্ছি, সে সব ভালো কথা সাজিযে দিচ্ছি আমি—যেন একজন বিশেষ স্ত্রীলোকেব মত—এটা দেব বিরূপাক্ষকে—যদি চায আরো কুড়িযে বাড়িযে দেব। শীতেব খুব বেশি রাতে মনে পড়ে আমাদেব ছেলেবেলাব বনঝাউ গ্রামে কোকিল ডাকত ; গত বছবও গিযেছিলাম গাঁযে, তেমনি ডাকছে কোকিল পউষের মাঝবাতে কোকিল যখন ডাকে তখন তাব চাবদিকে লোচ্চারা কান পেতে শুনছে বলে কোকিলেব চরিত্র নষ্ট হয না। কোকিলেব কথা কথিকা শোনাব আমি (কাকে চাচ্ছে কোকিল, কোথায ; বিরূপাক্ষেব সম্পর্কে সেটা অবান্তর) শীতেব বেশি রাত অব্দি বিরূপাক্ষকে ; কিন্তু পাঁচ সাত হাত দূবে থাকবে ওব নিজেব কৌচে, আমি এই পূর্বদিকেব সোফাটায। ও যদি উঠবার উপক্রম কবে কিংবা এগিযে আসে আমার দিকে—ওপবে চলে যাব আমি। ওর স্ত্রীকে ও কি করে পেযেছে সেটা বোঝা শিবের অসাধ্য—কিন্তু বিরূপাক্ষেব ঘাট বুঝে টাকা ওড়াবাব বাতিক থাকলেও ও বড়জাতেব মানুষ নয—কোনো স্বাভাবিক মহত্বই নেই—ওব হালচাল ; ধাষ্টামো আছে, শরীবেব তাগদ—তেল যাকে বলে—হেঁড়ে বেল্লিকপনা এইসব আছে ; এই সবের থেকেই টাকার উৎপত্তি হয, আমাদের ব্যাঙ্কগুলো বেঁচে থাকে।

'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই কথাবার্তাব মধুবতা বেশি' বলছিলেন মণিকা দেবী। কিন্তু শুধু কথাবার্তা।—আবে কিছু নয? কিবে এসে ঠেকে কথাবার্তা।'

'নিজেব নামে।'

বিরূপাক্ষ অস্বস্তি বোধ কবে বললে, 'না, না, আর কিছু নেই কথাবার্তার পরে?'

'আর কিছুতে তলানি নেই।'

'মধুবতা তো আছে?'

পৌঁছে গেলে মধুরতা কোথায? কখনো পৌঁছতে হয না, সব সময চলেছি মনে কবে—রণপাযে নয—এমনিই সহজ পায চলতে হয। আজ নয—আব একদিন—একটু একা বসবার সুবিধে হলে কার্তিক পৌষ মাসে আমার কথা ভেবে দেখবেন ; সত্য বলেছি—এইসব বলতে চাচ্ছিলেন মণিকা ;—কিন্তু বিরূপাক্ষকে ঠিক নয—অন্য কাউকে।

'তলানি?' ভাবি গলায কেমন বিকৃতভাবে বললেন বিরূপাক্ষ।

'প্রথমে ভূমিকা দিয়ে শুরু। তারপরে পবিচযের সময়। পবিচয ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে। তখন কথা জমে।'

'সেটা হল তলানি? কাদের কথাবার্তার?'

'পুরুষদের মেয়েদের?'

'সুতীর্থের আর জয়তীর?'

'যে অন্যদের কথা ভাবে সে পরলোকে পুরস্কার পাবে, কিন্তু ইহকাল তো আমাদের নিজেদের নিয়ে ; আমরা নেই?'

বলে মনে হল যেন বিরূপাক্ষের কয়েক হাজারের ঋণ শোধ হয়ে গেল তাঁর। মণিকা দেবী তিনি। তেতলার থেকে দোতলায় নেমে বিরূপাক্ষের মতন একজন লোককে নিজেব মুখে শীতরাতের পরম আশ্চর্য, নব ময়ূরী কথা ও মরালী রলরোল কথিকা শুনিয়েছেন তিনি। অবিশ্যি মুজরো দিয়ে শুনেছে বিরূপাক্ষ ; সুতীর্থ এমনিই শুনেছে ; বয়সে কথা আরো দুচারজনকে নিজেরই তাগিদে শুনিয়েছেন ; কাজেই টাকার তাগিতে বিরূপাক্ষকে শোনাতে গিয়ে একটু তাল কেটে গিয়েছে। কিন্তু তবুও কেমন বিলোড়িত হয়ে উঠেছে বিরূপাক্ষ। সে যেন ব্যাটারি খুইয়ে অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ কী যে অনির্বচনীয় ভোল্টেজে আলো বিদ্যুতের ভেতর জেগে উঠল। মানুষটার দিকে তাকিয়ে টের পেলেন মণিকা যে এর ভেতর আবছা অজগর মোচড় দিয়ে উঠেছে। সেটাকে মুহূর্তেই পাটের দড়িতে বদলে ফেলতে ফেলতে মণিকা বললেন, 'আপনার তিনটে বাড়ির ট্রাষ্টি যদি আমাকে কবতে চান তাহলে আমার জন্য একটা অফিস তৈরি করে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'কোথায় হবে অফিস?'

'যেখানে চান আপনি—ধাকুড়িযাব বাড়িতে।'

'বাড়িগুলো কি খালি?'

'না, দুটো ভাড়া দিয়েছে, আর একটায আমি থাকি।'

'অ্যাটর্নিকে নিয়ে আসবেন তাহলে কাল?'

'নিশ্চযই। কিংবা আপনাকে নিয়ে যাব গাড়িতে করে। কিন্তু আজ?'

'আজ তো সময় নেই আইন আদালতেব?' কেমন যেন নাক্ষত্রিক দূবত্বে মাটিকাদাব মানুষকে এড়িয়ে গিয়ে মণিকা বললেন, 'আপনার স্ত্রীর কথা ভেবে খাবাপ লাগল।'

মণিকা ধরা দিচ্ছেন না আর। চাঁদে চড়তে চড়তে মই পিছলে যেন পড়ে গেল বিরূপাক্ষ ; 'আস্তে আস্তে একটা সিগাবেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কেন, বাড়ি তিনটেব ট্রাষ্টি আমার স্ত্রীকে করলে ভালো হত?'

'সেটা বিচাব করে দেখবেন। আমি অবিশ্যি এসব ভাবছিলুম না'। মণিকা থেমে গিয়ে বললেন, 'আপনার স্ত্রীকে ভরণপোষণেব বেশি খুব কিছু দিলেন বলে মনে হচ্ছে না। দিয়েছেন খুব বেশি কিছু?'

বিরূপাক্ষ অস্বস্তি বোধ করেছিল, এতদিন সাধ্যসাধনা করে সে যা পাবেনি সেই প্রত্যক্ষ নিজেবই অন্তিম মাধুর্যে বিরূপাক্ষকে ডাক দিয়েই ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মণিকা আবাব। এই সব ট্রাস্টিফস্টি টাকাকড়ি ভাগ-বাঁটোযারায় ছিঁচকে কথা দিয়ে কী হবে। একেবারে বুকে হাত দিয়ে মোক্ষম কথা তো একটু আগেই পেড়েছিলেন মণিকা। তাবপবেই ঘুষি বসিয়ে দিলেন বুকেব ওপবে! বিরূপাক্ষ ঘামিয়ে উঠে কেমন যেন তলিয়ে যেতে যেতে বললে, 'আমাব পনের লাখ থেকে তাকে দেব কযেক লাখ—'

'কযেক লাখ!'

'কেন? কি?—'

'আমি ভাবছিলুম টাকাটা কি আপনার স্ত্রীব ভোগে লাগবে না যার সঙ্গে—'

'যাব সঙ্গে কেটে পড়েছে তাব ভোগে? সে তো সুতীর্থ।'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালাল।

'হ্যাঁ। সতীনকাঁটা সেঁধিয়ে দিয়ে সতী বটে জযতী ঃ না হলে এ বকমভাবে আদায় করে নিতে পাবে? ওর ঢেব অপবাধ, তবুও আমি ভালোবাসি আমাব স্ত্রীকে। ছাড়াছাড়ি হবে। লোকেরা বলাবলি করবে 'ডিভোর্স' 'লিগ্যাল সেপারেশন' যাব যা মুখে আসে ; ঐ জিনিসটাকে ভয কবছিলুম। থাক গে লোকের বলা—হেহে—কিন্তু ছাড়াছাড়ি তো হবে, এক সঙ্গে থাকবো না ; কি কবে দিন কাটাব ভাবছি ; কেটে যাবে।'

বিরূপাক্ষ একটা বড়, অবসন্ন হাই তুলে বললে, 'যত বড় বোযালই হোক না কেন জযতী, আমার মতন বড়শীর কেঁচোর কাছেও তাকে আসতে হয়েছিল—ভালোবেসেছিলুম বলে।'

কযেকটা বেপবোয়া বেশ বড় বকমের হাই ছাড়ল বিরূপাক্ষ ; 'আ!—আ—আ! মা—মা!—মা!'

সূচীপত্রে যান

বলে চারদিককার চাতাল কাঁপিয়ে ডুকরে উঠল করেকবার।

'ক লাখ দেবেন তাকে?'

'এখনো ঠিক করিনি কিছু। তবে সবচেয়ে শাঁসালো মুড়োটা নিজের বিয়োতি স্ত্রীর পাতে পড়া উচিত নয় কি—ন্যাজার দিকটা আর পাঁচ রকমের জন্যে?'

মণিকা সায় দিলেন কিংবা সেই ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ; বিরূপাক্ষের মনে হল মাথাটা কেমন মন কালো সোয়ানা খোঁপায় সাজিয়ে রেখেছেন মণিকা।

'বাকি টাকা কোথায় কোথায় দেবেন?'

'সেটা বুঝে দেখতে হবে।'

হাঁসমুর্গির ঘ্রাণে নিবিড় অন্ধকারের ভেতর শেয়ালের মতন, চিমসে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'বাতিটা নেবানো যায়?'

'না।'

'কেন?'

'আব একটু অপেক্ষা করুন।'

'কিসের জন্যে?'

'বেজেছে সাড়ে নটা। আপনাব ঘুম পেয়েছে বিরূপাক্ষবাবু?'

'না। আমি বলছিলুম—'

'চোখে লাগছে নাকি?'

'আপনার লাগছে ভাবছিলুম।'

'না তো।'

'ঘরটাকে অন্ধকার রাখলে ভালো হত না?'

'আমি এক্ষুণি উঠব। আচ্ছা উঠছি। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

'না না, বসুন। দশটাব সময়ে উপরে যাবেন বলেছিলেন।

'ওঃ' বিরূপাক্ষ বসলে, 'আপনাকে উইল দেখানো হয়নি ; আলোয আলোয দেখিয়ে নিই।'

বিরূপাক্ষ ব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাল ; মণিকা বললেন, 'কাকে কি দেবেন ভালো করে ঠিক কবার আগেই উইল কবছেন?'

'এটা খসড়া।'

'এটা খসড়াব দরকার কি—অদল বদল যখন কবতেই হবে?'

'হ্যাঁ, আজকালই কবব। আপনাকে চিনতাম না তো ; দেখা হল, ভালো হল, উইলের সম্বন্ধে আমি অন্যরকমভাবে চিন্তা করছি। আপনাব সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করব না আব।'

'কত টাকার উইল?'

'পনের লাখ টাকাব—পঁচিশ লাখও বলতে পারেন।'

'অত টাকার ব্যাপারে আমার ফোড়ন না কাটাই ভালো।'

'সে কথা যদি বলেন—' বিরূপাক্ষ বললে, 'এক বোতল সোডা আনিয়ে দিতে পারেন? এখানে এক আধটা বোতল আছে? সুতীর্থ রাখে না?'

'না, ও রাখে না, সুতীর্থ খায় না কিছু। মুশকিল যা চাচ্ছেন তা আমাদের এখানে খেয়ে দেখেনি কেউ, রসদ নেই। এত রাতে আনিয়ে দেওয়াও অসম্ভব। চাকরকে দিয়ে সোডা আনিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অন্য জিনিসটা কোথায় পাবে সে। এ পাড়ায় কে রাখে এসব জিনিস।'

'কিন্তু আমার না হলে চলবে না।'

মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন।

'অন্তত বাতিটা নেবাতে হয়।'

মণিকা বসেছিলেন। এক্ষুণি বাতিটা নেবাতে গেল না বিরূপাক্ষ। বের কবে ফেলে বললে, 'এই নিন—'

মণিকা বললেন, 'এবার ওপরে যাব।'

'হ্যাঁ আটকে রেখেছি অনেকক্ষণ—আমার নিজের দিকটাই দেখছি শুধু—কষ্ট দিলাম ঢের—'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালিয়ে দুএকটা টান মেরে আবার একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে প্রথমটাকে

সূচীপত্রে যান

জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব আমি। কিন্তু ঘরে কোন মানুষ নেই—একটা বোতল অব্দি নেই—এ রকমভাবে ঘুমোবার অভ্যেস নেই তো আমার।'

'অভ্যেসকে চাবুক মেরে শেখাবার দরকার যাদের তারা তা করে। লাখ লাখ টাকার মালিক আপনি, ও সব দবকার আপনার নেই।'

বিরূপাক্ষ উঠে গিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। মণিকা মনে মনে ভাবলেন, 'আমি এক্ষুণি উঠে যেতে পারি। কিন্তু বসে আছি তো। বিরূপাক্ষ যা ভাবে তা যে নয় সেটা বুঝিয়ে দেখার জন্য আলোয় নয়—এই অন্ধকারের ভেতরেই কিছুক্ষণ বসে থাকা দরকার আমাব।'

'কটা বাজল?' বিরূপাক্ষ বললে।

'ঘড়ি দেখে বলতে হয়—'

'ঘড়ি হাতে?'

'আছে।'

'রেডিয়াম ডায়াল তো?'

'একবার অন্ধকার হয়ে পড়লে আমি আর ঘড়ি দেখি না।'

চমকিত হয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'দেখবাব দরকারই বা কি?'

অন্ধকারের ভেতর, শীতের ভেতব মণিকা কোন কথা বলতে গেলেন না আব। বিরূপাক্ষ বলছিল না কিছু।

মণিকা নিজেকে ঠিকভাবে গুছিয়ে বসে বললেন, 'এমন অন্ধকার যেন কোনদিন দেখিনি আমি। মনে হয় অন্ধকার যেন বিরাজ করছে।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিল বিরূপাক্ষ। আস্তে আস্তে টানতে লাগল, মানুষটার চেয়ে বেশি আগুনটা, আগুনেব চেয়ে বেশি মানুষটা জ্বলছিল যেন অন্ধকারের ভেতব। মণিকাব থেকে হাত পাঁচেক দূরে একটা সোফায বসে বিরূপাক্ষেব মনে হচ্ছিল ব্যবধান রয়েছে;—কিন্তু থাকবে? মণিকার হাতে ঘড়ি আছে ; অন্ধকারে—ঘড়ি দেখবার ছলে এগিয়ে যাওয়া যাবে ; ঘড়ি দেখবার আগে কাঠিটা নিভে যাবে ; আর একবাব জ্বালাবাব আগে সোফায ওর পাশাপাশি বসা চলবে হয়তো—দেশলাই জ্বালাবাব—ঝুঁকে পড়ে ঘড়ি দেখবার অজুহাতে? মানুষ তো কুকুব নয়—দেবতাও নয়—, মানুষ ; অন্ধকাবের ভেতর বিরূপাক্ষের চুরুট জ্বলতে লাগল।

'সোডা চাই?'

শুনে বিরূপাক্ষেব বুক ঢিবঢিব কবতে লাগল—তামাশাব—ঢের বেশি উত্তেজে, কিন্তু উত্তেজক প্রশ্রয় দেবে না সে। যা আসছে তা স্বাভাবিকভাবে এলেই সবচেয়ে ভালো।

'সোডার কথা বলছিলেম আপনি'—মণিকা বললে।

'হ্যাঁ, আছে বুঝি মজুদ অংশুদার ঘবে—ঐ সব বোতলও আছে?'

'কোনো কিছুই নেই—সোডা চান তো বাযবনের সোডা আনিয়ে দিতে পারি—আমি তা হলে চাকরকে পাঠিয়ে দিই।'

'আপনি ওপবে যাচ্ছেন?'

'এখান থেকে চাকরকে ডাকাডাকি কবা চলে না তো—'

'না, সোডার দরকার নেই আমার।' বিরূপাক্ষেব পাযের গুমরে জুতোটা মচমচিয়ে উঠলো। 'হুইস্কি তো পাব না। আপনিও চলে যাবেন। আমি তো সাধুবাবা নই, গোঁসাইও নই, ওরকম গোমসা অন্ধকাবে চুপচাপ বসে থাকব কী করে?'

মণিকা মনে মনে ভাবছিলেনঃ জানালা সব বন্ধ, ঘরটায কোনো দিক দিয়েই আলো ঢোকে না। বড় রাস্তার গ্যাসের আলো এর ওর বাড়িব আলো সব দিক থেকেই বেগতিকভাবে নিজেকে রক্ষা কবে অন্ধকারের ভেতব থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে। আমার নিজের সাদা হাত দেখা যাচ্ছে। আমার ফর্সা মুখ দেখছে হয়তো বিরূপাক্ষ—ওর চুরুটের আগুন দেখছি আমি—এ ছাড়া কি আর দেখা যাচ্ছে।

বিরূপাক্ষ খুব তালেবর বটে, কিন্তু মণিকার সম্পর্কে কতদূর সেয়ানা হয়ে ওঠা সম্ভব তার? না, বিরূপাক্ষের সংক্রান্ত কোনো কথা ভাবছিলেন না তিনি এখন আর ; কাল সারাটা বাত জেগেছেন মণিকা, আজ সারাদিন নাকে দমে খাটতে হয়েছে, শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছিল তাঁর প্রবলভাবে। বিরূপাক্ষের স্ত্রীর, সুতীর্থের নতুন খবরটা শুনে মনটা ঝিমিয়ে পড়েছে, কথা ভাবতে ভাবতে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল—নিজে টের পাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন মণিকা, সোফার এক দিকে ধীরে ধীরে মাথা কাত হয়ে

পড়ল তার ; থুতনিতে হাত লাগানো ছিল—হাতটা ঢিলে হয়ে বুকে পড়ে গেল।

বিরূপাক্ষের মনে হল—কেমন যেন এলিয়ে আছে শরীর, আর একটু নিজেকে মানিয়ে নেয়া উচিত ছিল মণিকার,—কি ভাবছেন মণিকা? সম্ভ্রম হারিয়ে ফেললেন? এই রকমই কি?

চুরুট শেষ হয়ে এসেছিল তার ; আরো কিছু টানলেও হয় ; কিন্তু টানতে গেল না, আলগোছে মেঝের ওপর ফেলে দিল, জুতো দিয়ে আগুনটা পিষে ফেলে বিরূপাক্ষ শুধাল—'আমি বলছিলুম—মিসেস মজুমদার—'

কোনো উত্তর এলো না।

'মণিকা দেবী?'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু মানুষটা ঘুমোয়নি নিশ্চয়। এ সব মানুষ ঘুমোয় কি কখনও?

'একটা কথা আপনাব সঙ্গে—' বর্ষারাতে পাড়াগাঁর খাটালে বেড়ালের চোখ যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি নিবেট নিঃসৃত চোখে মণিকার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বসে রইল, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

'উইলটা কি আপনাকে দিয়েছি?'

জবাব দিল না কেউ। ঘুমিয়েছে? এত সহজে এরকম অসাধারণ মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে পারে কখনও? আবেশে কিসের আবেশে—ডুবে আছে মণিকা ঃ বিরূপাক্ষ ভাবছিল।

যেন কোনো আকস্মিক উত্তুরে বাতাসে বেতসতন্বী আত্মার আঘাতে তাব সমস্ত স্থূল মাংসকালিমাকে ধুয়ে পাথলে উজ্জ্বল করতে গিয়ে বিরূপাক্ষ টের পেল অঙ্গাব সে—রিরংসাব আগুন ছাড়া আর কিছুতেই মুখ উজ্জ্বল হয় না তার।

'আপনার সঙ্গে বেযাদবি কববাব মত মানুষ আমি নই। আশা কবি মার্জনা করবেন। এব চেযে কি বেশি ভবসা কবতে পাবি আপনাব কাছ থেকে—'

মণিকা যদি জেগে থাকতেন বিরূপাক্ষের এ সব কথা শুনে কি করতেন তিনি? কি বলতেন? বলা কঠিন। কিন্তু ঘুমিয়ে আছেন। বিরূপাক্ষ তা টেব পেল না ; স্বীকারও করল না ; এ সব নারীদের চেনে সে ; নিরবচ্ছিন্ন ভান আব ভাঁড়ামোয প্রায কোন পুরুষেব কাছেই এবা শিং ভাঙে না, কিন্তু সে ব্যাটাচ্ছেলের টাকাটা টাকার মত হলে বেশ এলিয়ে আগ বাড়িয়ে থাকে।

মণিকাকে সে সবটা চেনে না—কিন্তু তবুও এতক্ষণ পাম্পেব জলেব তোড়ে তেতলায চলে যাওযা উচিত ছিল মণিকার। কিন্তু যখন তা করেনি, তখন ছক কেটে কাজ কবেছে—বিরূপাক্ষেব সব টাকাটাই নেবে মণিকা—নেয যদি মণিকাকেই দিয়ে দেবে সেঃ টাকাকড়ি জাযগাজমি ঘবদোব ; এ শীতে দেবে তো ; তাবপব সামনেব শীত ; এক আধ মাঘে পালাবে, বলে মনে হয না, বেশ জাপটে ধরেছে শীতটা—কথা আর নয়, কথা ভাবা নয আর, এখন কাজ করার সময বিরূপাক্ষের। বিরূপাক্ষ উঠে মণিকাব পাশাপাশি সোফায গিয়ে বসল। এখুনি মণিকাব গাযেব ওপব হাত দিতে ভবসা হল না তাব। কিন্তু অন্ধকারের ভেতব বিরূপাক্ষের মনে হল খানিকটা গা ঘেঁষেই যেন বসা হযেছে—ভারি একটা সুন্দর দামী শাড়ির চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছিল। শাড়ি ঘেঁসে বসেছে সে—এই শাড়ির ফাঁসে যে মানুষ আছে তারই রূপে বাসে বাসমতী যেন এই শাড়ি।

বিরূপাক্ষ টের পেল মণিকা ঘুমিযে পড়েছে। ঘুমেব কাতরতায অন্ধভাবে অন্ধকারেব ভেতব কালো কালো কড়ির মত মাথা খোঁপা—ঠাণ্ডা শক্ত—জবাকুসুমের গন্ধ—বিরূপাক্ষেব কাঁধে এসে ঠেকল।

কি করবে বিরূপাক্ষ? মণিকাকে জাগিয়ে দেবে? কেন জাগাতে যাবে? জাগাতে তো হবে এক সময।

আপাততঃ এই অনির্বচন ভূমিকার ভেতর নিমগ্ন হয়ে রইল সে। এব পর অন্য রকম সময আসবে ; কিন্তু তাব জন্যে সমস্ত রাতটাই তো পড়ে আছে। এমনই নিবিষ্ট হয়ে রইল যে শীতের রাতে তাব বুকের ওপর ছড়ানো শালের অনুভূতিব নিস্তব্ধতার ও খানিকটা ব্যবধানে যে ঘুমিয়ে আছে তাঁকে নিয়ে কি করা যায এই নিদারুণ মাথা ঘামানো—অশক্তি ও অসাড়তার আবেশে অসংখ্য বাতেব ভূমিকা হিসেবে এ রাতটাকে গ্রহণ করে কেমন যেন কুঁড়েমিব ভেতব তলিয়ে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল টেবই পেল না সে।

উনিশ

রাত একটা বেজে গেছে। নিচের দরজা খোলা ছিল। নিচের ভাড়াটেদের দুজন চাকর সিনেমা না কোথায় থেকে ফিরে রোযাকে বসে সিগারেট টানছিল, সুতীর্থকে দেখে একেবারে তাজ্জব মেরে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল তারা।

সুতাথ দোতলার সিঁড়ির শো ধাপ পৌঁছে দেখল যে কোলাপসিবল গেটে তালা মারা নেই—খোলা আছে। এত রাত অব্দি ঘরদোর খোলা পড়ে থাকে সব? দিন পনেরো যে তার এ ফ্ল্যাটে ফেরেনি ; ফিরে হয়তো দেখবে খাটখানা ছাড়া আর কিছু নেই ; অবিশ্যি মণিকা দেবী আছেন, তিনি একটা ব্যবস্থা হয়তো করে রাখতেও পারেন।

সুতীর্থের পায়ে জুতো ছিল না, চান করেনি তিনদিন, পরনেব জামাকাপড় ছেঁড়া, ময়লা, রক্ত মাখানো। মারপিট সে অবিশ্যি করেনি, কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় এ ছাড়া আর কিছুই করেনি সে, অনেক লোকের সঙ্গে অনেক রাত ধরে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করেছে।

সুতীর্থ প্রায় বেড়াল পায়ের নিঃশব্দ পাযে হেঁটে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল তার ঘর শূন্য নয়, শূন্য তো নয়ই বেশ সরগরম। দুজন মানুষ পাশাপাশি এক সোফাযই বসে আছে—ঘুমিয়েই আছে হয়তো—কিংবা আমেজে আড়ষ্ট হযে আছে। হযতো ঘুমিযে আছে। এমন শীতের রাতে কতখানি আবেগের দুধ মেরে মেরে সর করতে পারলে—উতরোল রক্তকে খোরাক জুগিযে জুগিয়ে অবশেষে শান্ত করে নিতে পারলে মানুষ এমন অদ্ভুত নিঃঝুম হযে পরস্পরের গা ঘেঁষে ঘুমিযে পড়তে পারে সোফার ওপর!

ঘরের ভেতর ঢুকে গেল না সুতীর্থ ; তার ঘরে অপরের নীড় নিজে সে বাতনীড় আজ। অন্ধকাবেব ভেতর একবার চোখ বুলিয়ে সুতীর্থ অনুভব করল টেবিল চেযার বাক্স বিছানা সবই ঠিক জায়গায রয়েছে। নতুন ভাড়াটে কেউ আসেনি।

দুয়ারে দাঁড়িযে থেকেই সে বুঝতে পারল মণিকা দেবীর মাথা ঘুমে না কিসের তাড়সে এসে পড়েছে। পুরুষটির বুকের ওপর প্রায-কার হাত কার হাতে মিশে গেছে—কোন আঙ্গুলের সঙ্গে মিশে গেছে নারীটির শাড়ির ভাঁজ, নারীটির চুলের সঙ্গে পুরুষের শালেব জবি ঃ কে তার হিসেব করবে। মণিকা এখানে এরকম অবস্থায এত রাতে? সুতীর্থের অনেকদিনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিযে হয়তো এই ঘরটাকে তার নিজের কাজে ব্যবহার করবার জন্যে ঠিক করে রেখেছেন তিনি। বেশি বিরক্ত বা বীতশ্রদ্ধ বোধ করল না তবুও সুতীর্থ। কিন্তু তবুও মনের ভেতর কেমন একটা কৌতুকের সুড়সুড়ি এসে পড়লেও হাসতে পারছিল না ; আজ রাতে সুতীর্থও মণিকাকে লক্ষ্য করেই এখানে এসেছে—এত বাতে পাযে হেঁটে সেই চেতলা থেকে। দশটাব আগেই এসে পৌঁছবে ঠিক করেছিল। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে দেবি হযে গেল। মণিকাকে আজ রাতে সুতীর্থও খুব হৃদ্যতাব সঙ্গে চেযেছিল বটে ; কিন্তু ঠিক এরকমভাবে চায়নি। কিংবা এরকমভাবে পেলেও মন্দ হত কি? কিন্তু কে এই লোকটা সুতীর্থেব ইচ্ছাস্বর্গের অপবিসব ধোঁযা কেটে ফেলে নিজেব সপরিসর বস্তুস্বর্গ রচনা করে বসেছে এমন রাতে—এমন পাপবিক্ত অতল অণিমেষ শীতের রাতে। মানুষটাকে দেখে ফিবে এসে সুতীর্থ স্তম্ভিত হযে বারান্দায পাযচাবি করতে লাগল। বিরূপাক্ষের মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছে মণিকার ব্লাউজের ওপর। কেউ কাউকেই টেব পাচ্ছে না, কিছুই টের পাচ্ছে না, দুজনেই ঘুমে কাঠ হয়ে আছে।

দোতলার বারান্দা থেকে অনেকখানি আকাশ দেখা যায। আকাশ ভর্তি আগুনের গুঁড়ির মত নক্ষত্ররাজ্যের দিকে একবার চোখ বুলিযে নিযে—ফাঁকা জাযগা থেকে ভেসে আসা খানিকটা ঠাণ্ডা হাওযা পান করে নিল সুতীর্থ।

ঘুমিয়ে আছে বটে—এমনি নিঃস্পন্দ ঘুম যে সুতীর্থ চেঁচালেও জেগে উঠবে না ওরা। কিন্তু এ গুম তো একটা অতল উপসংহার—এর আগে যে আশ্চর্য অগম অভিনয হযে গেছে কি খোঁজ রাখে সুতীর্থ সে সবের? কিন্তু বিরূপাক্ষকে নিয়ে? মণিকার মতন একজন? পুলিশের হাতে হতভাগা সেবকদের মরে যেতে দেখেও শরীর ও অন্তঃশীল মন বোধ এরকম উৎখাত হয়ে মোচড় দিযে ওঠেনি কোনোদিন বুঝি তাব। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না, ঘরের ভেতব ঢুকল সে আবার ; লাইট জ্বেলে দিল ; বিরূপাক্ষই তো ; চেহারা আরো খারাপ হয়ে গেছে ; কেমন চোয়াড়ের মত দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু তবুও লালা ঝবে গেছে—ফুরিযে গেছে—শুকিয়ে গেছে ; মুখের ভেতর যে কেমন একটা সুধীর সুস্থির জীবনবেদই যেন ফুটে বেরুচ্ছে ওর। এ দুঃসাধ্য জিনিস বিরূপাক্ষ কোথায় পেল যদি মণিকা ওকে দিয়ে থাকে।

মণিকার দিকে ফিরে তাকাল সুতীর্থ। ভাবতে ভাবতে মনে হল অতি বিষম অঘটন ঘটে যাবে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে ঃ বিরূপাক্ষের লাস লুটিয়ে থাকবে এই মেয়েমানুষটির পাযের নিচে, আর নিজের বিছানায় কি নিদারুণ রিরংসার আলিঙ্গনের ভেতর খুঁজে পাবে না সে মণিকাকে ও নিজেকে কি ভীষণ মৃত্যুর নাগপাশের ভেতর শেষ হয়ে যাবে সব।

কিন্তু মানুষকে আশ্বাস দেওয়াই ভালো ; হিংসা করে কি আর হবে ; যে যাতে সান্ত্বনা পায় তাই

পেতে থাকুক ; মজুমদার দেবীকে অবিচার করে কোনো লাভ নেই। বাতিটা নিভিয়ে দিল সে।

বারান্দায় পায়চারি করছিল সুতীর্থ ঃ ভাড়ার টাকা দিইনি, ঘর আটকে রেখেছি, সেলামী বন্ধ করেছি। বিরূপাক্ষ অনেক দিয়েছে নিশ্চয়; সবই বিকিয়ে দিয়েছে হয়তো ; কেন নেবে না মণিকা।

যেন বিরূপাক্ষ মণিকার জীবনে নেই, বিরূপাক্ষের টাকা মণিকা গ্রহণ করেনি, কোনরকম রাত্রিবাস হয়নি বিরূপাক্ষের সঙ্গে মণিকার—ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ তার টালমারা বইয়ের ঘর ভেতরে ঢুকল। এ, ঘরটা তার বসবার, শোবার ঘরের চেয়ে অনেক দূরে ; এখানে কোন খাট ছিল না ; অন্ধকারে আরসোলা ইন্দুরের আনাগোনার ভেতর খানিকটা জায়গা ঠিক করে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। আজ তারো খুব ঘুম পেয়েছে—গত সাত-আট রাত সে ঘুমোতেই পারেনি।

এমন নিখাদ নিঃস্বপ্ন ঘুম অনেকদিন ঘুমোয়নি মণিকা। রাত দশটার পর থেকেই তার স্বামীকে পরিচর্যা করতে হয়। সারা রাতের মধ্যে ঘুম হযেই ওঠে না। দিনের বেলা একটানা ঘুমের বাধা অনেক—সব কিছু দেখবার শোনবার তত্ত্বাবধান করবাব মানুষ বাড়িব ভেতব সে-ই তো একা। আজ বিরূপাক্ষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত দশটা পেরিয়ে গেল। ঘুম তাকে অতর্কিত আক্রান্ত করেছিল! অতর্কিত, কিন্তু খুব স্বাভাবিক ঘুম, সমস্ত দিনের অত পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর ঘুম না এসে পাবে না। এ জন্যে বিরূপাক্ষ দাযী নয ; বিরূপাক্ষের কথাবার্তার অসারতায় ঘুম যে না পায তা নয়, কিন্তু জেগেও থাকতে পারা যায়—কিন্তু কেমন একটা হ্যাঁচকা ঘুমে চোখের পাতা ভাবি হয়ে উঠল তার ; তারপর কী হল কিছুই মনে নেই। এরকম ঘুম আগেও সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়েছে বটে, কিন্তু সে সব পরিবেশে বিরূপাক্ষের মত কোন মানুষ কোনদিন বর্তমান থাকেনি। মণিকা হঠাৎ যখন ঘুমের ভেতর থেকে জেগে উঠলেন, তখন রাত দুটো বেজে গেছে। সে স্থিরই করতে পারল না কোথায় সে রয়েছে—এরকম গভীর নিঃসাড় অন্ধকারের মানেই বুঝে উঠতে পাবল না। তেতলায় তাদের ঘরে সারারাত সবুজ শেডের নিচে একটা খুবই মৃদুশক্তি শান্ত বাতি জ্বেলে—ঘরটাকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করে মিহি মৃদু জ্যোৎস্নার মতন ছড়িয়ে থাকে সারারাত। কিন্তু এখানে সে জ্যোৎস্না নেই তো ; এ তো মুখে চোখে শরীর অন্তহীন কাটাকুটি মেঘডুমুরের পাক, সর্ষের ঝাঁক কালো কালো বাশি রাশি বেড়ালেব ছোটাছুটির মত অন্ধকার।

সে তাব নিজের ঘবে নেই—অন্য কোথাও আছে—কোথায়? কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে, না কোনো দূব আত্মীয়ের রোগশয্যাব পাশে অনেক বাতে ঘুমিযে পড়েছে সে? নাকি এটা হাসপাতাল—কোনো অঘটন ঘটেছে তার? স্ট্রেচারে কবে এখানে এনেছে তাকে সবাই মিলে? মণিকার চেতনা এত বেশি আচ্ছন্ন হযে পড়েছিল যে পব পর সব কিছু বুঝে নিতে কিছুটা সময লাগল তাব জেগে উঠে অনেকক্ষণ পরে তার কাছে একজন মানুষের সান্নিধ্য অনুভব করল মণিকা। এমন কি প্রথমে সে বিরূপাক্ষকে মনে করেছিল সুতীর্থ বুঝি—শালটা ভালো করে জড়িযে দিল তাব গাযে—চুলের ওপব হাত বুলোতে গিযে আড়ষ্ট হয়ে থেমে গেল—এ তো সুতীর্থ নয। আগাগোড়া ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হযে এল তার কাছে।

কিন্তু বিরূপাক্ষ কখন এসে সোফায তার পাশে বসেছে? মণিকা তো ওকে বসতে বলেনি। গা ঘেঁষে বসেছে, ব্লাউজটা যে একদিক দিযে ভিজে গিযেছে সে কি ঘামে না ওর মুখের ঝরানিতে?

ঘামেনি তো মণিকা—এত বেশি শীতের রাতে কি করে ঘামবে? মণিকার মন রি রি রি রি করে উঠল।—কিন্তু তবুও নিজেকে ধিক্‌কৃত কবল না সে—বিরূপাক্ষকেও না। এমন অনেক কিছুই ঘটে থাকে পৃথিবীতে যার জন্য আমাদের তোলা সংসার-সমাজের মধ্যে একটা বিরাট ভূমিবিপ্লব হয়ে গেল বলে মনে হয—ধসে গেছে পৃথিবীর মাটি যেন পাযের নিচে থেকে ; কিন্তু ভূমিকম্পটা কি মানুষ ইচ্ছে করে করে। কিন্তু তবুও কেউ কাতরে পড়ে ভূমিকম্পে—বিশেষত, যাতে দোলা লাগে, কিন্তু চাপা পড়তে হয় না? ভাবছিল মণিকা।

দশটা থেকে দুটো অব্দি আমি বেহুঁশেব মত ঘুমিয়েছিলুম। আমাকে নিস্তব্ধ দেখে বিরূপাক্ষ হয়তো মনে করেছিল আমার কাছে এসে বসা চলে। বসেছে তাই। কিংবা কে জানে ঘুমিয়ে পড়েছি বলেই এসেছে। জাগা মানুষের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় না, তার ঘুমন্ত শরীরের কাছে আবেদন করে তা পাওয়া যায় ভেবেছিল? ভেজা ব্লাউজটা শীতের ভেতরে বড় ঠাণ্ডা লাগছিল মণিকার ; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল তার।

মণিকা ভাবছিল ; পাওয়া যায় হয়তো ; কিন্তু একজন ঘুমোনো মানুষের শরীরের ওপর দিয়ে পিঁপড়ে উঠে যায়, ইঁদুর চলে যায়, মাছি ওড়ে, মানুষ সেখানে হাত দিলে সে মানুষ মাছি আর পিঁপড়ে। কে জানে বিরূপাক্ষ কি করেছে।

সূচীপত্রে যান

মণিকা ওপরে চলে গেল।

ওপরে উঠে দেখল অমলা অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে বটে, কিন্তু অংশু টানে কষ্ট পাচ্ছেন।

'কোথায় ছিলে তুমি মণিকা এতক্ষণ?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'এমন তো ঘুমিয়ে পড়না কোনোদিন।'

'তুমি কখন জেগে উঠেছ?'

'অনেকক্ষণ—অনেক—'

'আমাকে খুঁজেছিলে বুঝি।

'হ্যাঁ। অমলাকে ডাকলুম, কিন্তু সে কোন সাড়া দিলে না। ভাবলুম, যাক গে, আমার তো বাঁধা এ জিনিস, কে কি করবে এর, মাঝখান থেকে মানুষকে কষ্ট দেওয়া। কোথায় ছিলে তুমি মণিকা?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—'

'কোথায়?'

'নিচে।'

দোতলায?'

'হ্যাঁ।'

'সেই সুতীর্থ ছোকরা কি আজো ফেরেনি?'

'না।

'ওকে তুমি এত টান কেন।'

'কই, না তো। তার ঘরদোর খোলা রেখে গেছে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে একটু দেখে আসি।'

'আমি মাঝে মাঝে গিয়ে একটু দেখে আসি? হে-হে-হে—'

হ্যা হ্যা—হা হা করে হেসে উঠল অংশুবাবুঃ কপাল নাক চোখেব চার-দিকের ঢিলে মাংস বার বার কুঁচকে উঠতে লাগল তার।

'আমাদেরও সময় ছিল মণিকা ; আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে-টেখে আসতুম। সে সব দিন কোথায় গেল?'

পর পব গোটা তিনেক বালিশ সাজিয়ে বুকে করে বসে আছে লোকটা। জানালা দিযে কলকাতার রাতের কালো ফর্সা ডোরাকাটা আদিম টিকটিকির ঝলমলামিব দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললে, কি চাও তুমি বলো তো?'

'আমি? কেন?'

'দরকার আছে।' মুখে কিসের যেন জড় মবছে না—মণিকাব দিকে তাকাল অংশুবাবু।'

'যা চেয়েছি, তা তো পেয়েছি।'

'ও সব ঠোঁটনাড়া মৌচূষকির কথা আমি শুনতে পাই না।'

'তার মানে? কি বলছ তুমি?'

'মানে, খোলাখুলি কথা বলতে হবে।'

'সব সময়ই তাই বলি আমি।'

'আমি কিন্তু বেশি দিন বাঁচব না—মরবার আগে তোমার নিজের মন—যে মনটা দশ বাঁও জলের নিচে লুকিয়ে থেকে তোমার নিজেরই সত্য মন—তাকে আমি দেখে যেতে চাই। আমাকে ধোঁকা দিয়ে ঠকাবে কেন তুমি?'

'আমি ঠকাচ্ছি বুঝি?'

'হাঁপানি রুগীর অন্তিমকাল এলে কে না ঠকায় তাকে?'

'তাই যদি হয কি আব করবে তুমি?'—মণিকা টেবিল থেকে একটা কাঁচের গেলাস তুলে সোরাইয়ের থেকে জল গড়িয়ে খেতে লাগল।

শরীর ঠাণ্ডা হল তাঁর, বললে, 'আমার ইচ্ছে সুতীর্থ তার নিজের ঘরে ফিরে আসুক।'

'কোথায় গিয়েছে সুতীর্থ?'

'জানি না।'

'ফিরে আসবে কেন?'

'ওর জীবনটাকে নিয়মের ভেতর আনা দরকার। শুনলুম ধর্মঘট করছে—করুক, যদি দরকার হয়। শুনেছি আর একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যে জিনিসটাকে আমি সবচেয়ে কম বুঝি তা হচ্ছে মিছেমিছি এ-পথে সে-পথে—কোন স্ট্রাইক নয়, কারুর স্ত্রীর ব্যাপার নয়—এমনি কলকাতার গলিঘুঁজি রাস্তা বাগানে ঘুরে বেড়ানো। ও ঘুরে বেড়ায়।'

'কে সেই ভদ্রলোক, যার স্ত্রীর সঙ্গে—'

'সে ভদ্রলোক অংশুবাবু ছাড়া আর কে'—বললে মণিকা, গলার আওয়াজে শ্লেষ ও হাসির বিন্দু বিন্দু খামির ছড়িয়ে আন্তরিকতারওঃ—অতএব খানিকটা আশ্বাস অনুভব করতে দিয়ে অংশুবাবুকে ; ঘরের ভেতরে কেমন একটা গ্রহণ-তিপি-উত্তীর্ণ গ্রাসযুক্ত চাঁদের মত হেঁটে বেড়াচ্ছিল মণিকা, তাকিয়ে তাকিয়ে, দেখছিল অংশু ; তেপয়ের থেকে ছোট শিশিটা তুলে নিয়ে মণিকা বললে 'এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছ দেখছি এফিড্রিন ঃ একটা আস্ত বড়িই খেয়ে ফেললে—'

কোন জবাব দিল না অংশুবাবু।

'আমি বলেছিলুম তো তোমাকে আধখানা করে খাবে।'

মণিকার সাধু মননে ও সত্যার্থে আশ্বাস—আরো খানিকটা আশ্বাস বেড়ে গেল অংশুবাবুর? না, তা একই জায়গায় রয়েছে, তার কোন বাড়া কমা নেই? গান্ধীর কাছে মণিকা হয়তো সাধু ও তার স্রষ্টার কাছে সত্য ; কিন্তু ওরকম প্রেম ও ক্ষমায় জ্ঞানী হলে মানুষের ক্লান্তিব অতীত হতে পারত অংশুবাবুঃ তা হতে পারেনি। তবুও খানিকটা ভালো লাগছিল, কেমন বিষণ্ণতা বিলাসে নিজেকে ছেড়ে দিল সে, মণিকার দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রইল।

প্রকৃতি সময় ও নারী যদি এ সবের প্রতীক হয়—সকলেরই অন্তর্ভেদী এই মূর্তি। কিন্তু এসব দেখে অভ্যস্ত বলেই হোক, কিংবা নিজেকে সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত করে রেখেছে সেই জন্যেই হোক, মণিকা অংশুবাবুর বিছানার পাশে বসে ধীরে ধীরে তার পিঠ বলিয়ে দিতে লাগল, পিঠের আড়ালে মুখ নুইয়ে রেখে উপলব্ধিব নদীব ভেতর ছিটেফোঁটা ঢিল ছুঁড়তে লাগল সে—হাসির, পরিহাসের, নৈরাজ্যের সহানুভূতিব, সংকল্পেব, ব্যথা মহত্ত্ব ও ক্ষমার কেমন একটা যোগনিদ্রার যেন—সমস্ত পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে যেন।

অংশুবাবু অনর্গল বকে যেতে লাগলেন আবার—

'মিছেমিছি কথা বলছ কেন?' মণিকা শাসাল তার স্বামীকে, 'কথা বললেই তো শ্লেষ্মা ওঠে তোমার, কাশিব ধকল বেড়ে যায়।'

'টাকা দিয়ে বকনার দুধও পাওয়া যায়। টাকা আজকাল সবারই হাতে। যাদের নেই তাদেরও পেতে হবে। কে মাথা ঠিক রাখবে।'

'তোমাকে ওষুধ দেব?'

'সুতীর্থ ফিরেছে?'

'না।'

'কদিন হল?'

'দিন পনেরো।'

'আজো ফিরল না? তবে এই রাত দুটো অব্দি নিচে কোথায ঘুমিয়েছিলে তুমি?'

'ওর ঘরে।'

'খালি ঘরে একা ঘুমোবার কি মানে হতে পারে বুঝি না আমি। ও ভাড়া দিয়েছে?'

'না, দেবে হযতো শীগগিরই।'

'ক' মাসেব বাকি?'

'আমি হিসেব করে বলছি—ছ'মাসের অন্তত।'

মণিকা বিছানার কিনার থেকে উঠে ঘরের ভেতর পায়চারি করে, ঘুমন্ত অমলার চুলের ওপর হাত বুলিয়ে, অবশেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভেব না তুমি, ও বিপদে পড়েছে। টাকা দিয়ে দেবে।'

'নিচে কাব গলা শুনছিলুম?' অংশুবাবু তার সুন্দর অথচ কিছুটা বেখাপ্পা কটা চোখ তুলে মণিকাকে জিজ্ঞেস করল।

'কখন?'

'রাত দশটা সাড়ে দশটা অব্দি।'

'ও—বিরূপাক্ষের।'

'বিরূপাক্ষ কে?'

'সুতীর্থের চেনা লোক—তার খোঁজে এসেছিল।'

'এত রাত অব্দি ছিল কেন?'

এরকম প্রশ্নের কয়েক রকম জবাবের মধ্যে কোনটা বেছে নেবে। আন্দাজ করতে করতে মণিকা বিছানায় গিয়ে বসল আবার। অংশুবাবুর মনই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল যে ভুল বুঝবার সুযোগ মণিকার কথার যে-কোন রকম মার-প্যাঁচের ভেতর থেকেই বের করে নেবে। ঠিক এই জন্যেই নয়—এমনিই সত্যি কথাটা বলে দিতে চাইল মণিকা—সহজভাবে। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত অংশুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হিং টিং ছট ছড়িয়ে দিয়ে বললে 'ভদ্রলোক আজ আসাম মেলে এসেছেন।'

'ওঃ, আমি ভেবেছিলুম বাঙালী।'

'তা বাংলা কথা বলতে পারেন।'

'সে যাক গে। তারপর?'

'এসে কোথায় এক হোটেলে উঠেছিলেন। কিন্তু সেখানে সুবিধে হল না, তাই সুতীর্থের এখানে এসেছিলেন ; এসে পেলেনও না, আমি ছিলুম তখন দোতলায়। সুতীর্থের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্তেও অনেক দরকার ছিল ওর—সমস্ত শুনে বুঝে নিতে হল। সুতীর্থ ফিরে এলে তাকে জানাতে হবে সব।'

'ভদ্রলোক চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কটার সময়?'

'এই দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ—'

'কোথায় গেলেন?'

'বড়লোক মানুষ গাড়ি হাঁকিয়ে কোথায় গেলেন আমি তাকে তা জিজ্ঞেস করিনি।'

'সুতীর্থ তোমার কে জিজ্ঞেস করেছিল?'

'না।'

'এমনই খাজা আহাম্মক? এই মাথা নিয়ে ব্যবসা করে ও।' অংশুবাবু হঠাৎ একটা সুন্দর ভিন জঙ্গলের বাঘিনীকে দেখে বুড়ো দক্ষিণ রায়ের মত চোখ তুলে মণিকার দিকে তাকাল। মণিকার কথা কতদূর বিশ্বাস করেছে অংশুবাবু বুঝতে পারা গেল না। করেছে হয়তো পুরোপুরিই বিশ্বাস মনের ভেতর একা তেতো ঝাঁঝ—আর্সনিকের মত—যতই মিইয়ে আসতে লাগল অংশুবাবুর ততই ঝিমিয়ে পড়তে লাগল সে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অংশুর পাশেই দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল মণিকা। পৃথিবীটা কি এমন হতে পারত না যে, ভালো মনে করে যে কাজ করে যে কথা বলে তেমনি শুদ্ধচিত্তেই অন্যকে তা জানানো যায়? মণিকা একজন নিবিড় নিশীথঠুঁটী স্বর্গীয় পাখির মত নিমেষনিহত হয়ে ভাবছিল যে তাই যদি হত, তা হলে কি এ ঘরে থাকবার প্রয়োজন হত তার—কিংবা এই নগরীতে—এই পৃথিবীতে—এই গ্রহে? মহাশূন্যের অন্ধকারের ভেতর দূর আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্য পেরিয়ে অপর কোন আলো ঋতুর দেশে হয়তো চলে যেতে হত তাকে। বাইরে গিয়ে আকণ্ঠ ঠাণ্ডা বাতাস পান করবার ইচ্ছে হল তার—এই শীতের রাতেও। মাঘঋতুর শিশির পাখলানো নক্ষত্রতন্বী নিস্তব্ধ আকাশটাকে দেখে আসবার সাধ জেগে উঠল।

'ওঠো ওঠো মণিকা, এসো, কত কোটি কোটি তারা জ্বলছে, দেখ এসে ঃ কত সাদা কালো কমলা ডানার লাল নীল ঠোঁটের পাখিরা যেন বাইরের শূন্যে পাখনার ঝাপটায় বলছে তাকে ঃ এখনই সব মাঘ শেষের ফাগুনের বাতাস ফুর ফুর উড় উড় করে ঢুকে পড়তে লাগল ঘরের ভেতর। কিন্তু তৎক্ষণাৎই নিচের—মাটির সংসারগ্রন্থিতে ফিরে আসতে হল তাকে ; অংশুবাবু শীগগিরই মরে যাবে, মেয়েটার রূপ থাকলেও সে উৎরোবে না, এ বাড়িটা মর্টগেজে বাঁধা আর একজন লোলুপ মাড়োয়ারী কালোবাজারীর কাছে (বিরূপাক্ষ তাকে চেনেও না) ঃ সুতীর্থের দায়িত্ব সুতীর্থের নিজের চেতনা প্রেরণার কাছে শুধু ঃ সেগুলোকে সে জ্যামিতি ট্যামিতির মতন অব্যর্থ মনে করে। কিন্তু জ্যামিতি নিজেই ছিল ; মানুষ হাতড়ে পেয়েছে তাকে ঃ মানুষ দুর্বল, জ্যামিতি অব্যর্থ। এটাই বোঝে না সুতীর্থ?

বিরূপাক্ষের সঙ্গে মণিকার সবচেয়ে বড় ফাঁড়া আজ রাতেই কেটে গেছে আশা করা যায়। বিরূপাক্ষ ঘুমিয়েছিল। তার ব্যাগের ভেতর তার উইলের খসড়া সেদিনকার চেক ও টাকা সব ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে

মণিকা। বিরূপাক্ষকে মণিকা ঘৃণা করে না, বিষাক্ত ব্যবসায়ী হলেও ওর হৃদয় হয়তো ঠিক সে অনুপাতে কঠিন নয়, মনটা সর্দার, কিন্তু সমীচীন নয়—স্থির নয়, এখনও রাধাচক্রে ঘুরছে। যদি বুঝতে পারা যেত ও সত্যিই ঘোড়েল, ওর হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই, তাহলে মণিকা কি ওর জন্যে এত কটা রাত খরচ করত? ওকে দেখা মাত্র বিদায় করে দিত, না হলে হয়রানি বেড়ে যেত,—এর চেয়ে ঢের বেশি হয়রানি।

অংশুবাবু হঠাৎ জেগে উঠল কেমন জ্বলজ্বলন্ত দুটো কটা চোখ মেলে, গির জঙ্গলে চিতে বাঘ জেগে উঠেছে যেন দিনের আলোয় দিনের আলোর ঘুম থেকে যেন ঃ মনে হচ্ছিল মণিকার বেশি শীতের অন্ধকারের ভেতর বসে থেকে।

'কোথায় তুমি?'

'এই তো আমি—তোমার কাছেই।'

'হ্যাঁ। মণিকাকে সাপ-বেজীর ভেল্কিতে নামিয়েই ছাড়ত তাহলে বিরূপাক্ষ। কিন্তু বিরূপাক্ষ সে জাতের মানুষ ঠিক নয় ; শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি নিজের চাওয়া জিনিসকে অধিকার না করে ও-ও ছাড়তে চায় না। কিন্তু আমি জাত-বেজী হই না হই ও জাত-সাপও নয়—অন্তত আমার সম্পর্কে সে সব কিছু হবারই ক্ষমতা যে ওর নেই—সেটা বুঝেই ঢুঁটো বাস্তুসাপের মত ওকে আসতে দেখে ছেড়ে দিচ্ছি আমি। ও যদি ওর জন্য আরো কয়েকটা রাত খরচ করতে রাজি আছি আমি ; কিন্তু আলো নেভাবার কোন অধিকার থাকবে না, রাত 'দশটার পবে বসে থাকবার কোন তাগিদ থাকবে না কারু। এ বাড়িটা যেন কেমন ছমছম করে। আমার একজন নিতান্ত গুরুমুখী ও মোটামুটি নিরীহ স্তাবকের সঙ্গে প্রথম রাতটা আড্ডা মেরে নিলে মন্দ লাগবে না। লোকসমাজে বেরুলে অবিশ্যি অনেক পারিষদ উপাসক জুটে যায় ; আরো কত কি। কিন্তু বাইরের বড় সমাজের ঘেঁষাঘেঁষিতে বেরুবার রেওয়াজ তাদের বংশে নেই, অংশুবাবুব বংশেও না। যারা দেউড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে তাদের সঙ্গেই কারবার করতে হয। এখানে কৃতিত্বের অভাব হয তো—যদি না একটি বালুকণাব ভেতর ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা লুকিযে থাকে। থাকে নাকি?

'কোথায়! কোথায়!!' বাজপাখি যেন চিতেবাঘকে মেরে ফেলছে এমনই একটা অদ্ভুত বিকট চীৎকার করে উঠল অংশু।

'এই তো আমি তোমার কাছেই আছি।'

মণিকা উঠে বসল। অংশুবাবু একটু ঝিমিযে পড়লে ঘবের ভেতব পাযচারি করতে লাগল সে।

মুখার্জির সঙ্গে অবিশ্যি পনেরো বছর আগে এক অভিজ্ঞতা হযেছিল মণিকার। কিন্তু তাকে দ্বিতীয় বাতেই বাড়ি থেকে বাব কবে দিয়েছিল মণিকা ; সে ঘরে একটা চাবুক ছিল বিভূতি রাযের ; সেই চাবুক মুখের ওপর কষেছিল মুখার্জির। ওটা বাড়াবাড়ি হযে গিযেছিল। এখন মানুষকে হাসিমুখে মিষ্টি সরুচাকলি খাইযে মানে মানে বিদায করে দেওয়াটাই ঠিক মনে করে মণিকা। কেননা মানুষ সব—শেষ পর্যন্ত ; মানুষ ; মানুষ—; ভাবনা বেদনা আছে ; মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করলেই সবচেযে ভালো।

কুড়ি

সুতীর্থ ঘুম থেকে জেগে উঠল প্রায গোটা দশেকের সময। তাকে বুঝে নিতে হল কোথায সে আছে। কালকে রাতে কি হযেছিল জেগে উঠেও সহসা সে সব কথা মনে পড়েনি তার ; আস্তে আস্তে স্মৃতি ফিরে এল;—একে একে সব পরিষ্কার ; বিচারবোধ ফিবে এল। কিন্তু এজন্য মনে খুব বেশি খোঁচা লাগছিল না তার। সমস্ত শবীরটা কেমন একটা ব্যথায টাটিযে উঠেছিল। দিন পনেরো ধরে নানারকম অত্যাচাব চলেছে শবীরের ওপর ; কালকেব দিনটা সব চেযে বেশি হাঙ্গামার ভেতব কেটেছে ; তারপরে অনেক রাতে এসে এই ঠাণ্ডা মেঝেব ওপর শুযে ঘুমিযেছে। খুব ভালো করে চান করে নিতে হবে—বেশ করে তেল মেখে—না হয় সাবান রগড়ে।

সুতীর্থ আস্তে আস্তে নিজের শোবার ঘরে চলে গেল। এ ঘরটা গোছানো ঝকঝক তকতক করছে। মিসেস মজুমদারই করেছে সব। একটা নতুন তেপয এসেছে—একটা নরম কুশনে আঁটা বড় ইজিচেযার, নতুন একটা আতরদান, ওয়াল ক্লক, ক্যালেণ্ডার দুটো মাত্র, কিন্তু খুব বড় এবং বড় জাতের, এদের আভিজাত্যের দিকে তাকালে বেশ লাগে মোটামুটি ; দুটো সোফাই বেশ কোলভরা, ঘরজোড়া নতুন বৌযের মত—পরিপাটি, দুটোই আনকোরা।

বিরূপাক্ষের জন্যেই কি এত সব। সুতীর্থের মন কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। মণিকাকে—এতদিনেও যদি সে না চিনে থাকে তাহলে কবে চিনবে আর? এক-একটা বড় ফ্যাক্টরিতে

দেখেছে সে যে চাকার ভেতর কত যে চাকা খাঁজ নাট কাজ করে যাচ্ছে, সমস্ত মেশিনটা কেমন সহজে স্বাভাবিকতায় নড়ছে ঘুরছে ঃ—মেশিনের সম্পূর্ণতাকে ধ্যান করা যাক—একটা বিসদৃশ খাঁজের দিকে তাকিয়ে থেকে কি হবে? সুতীর্থকে সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে মহিলার—মণিকার।

মণিকাকে চেনেনি কি সে? না যদি তার সম্পূর্ণ নারী সত্যার্থকে উপলব্ধি করে থাকে সুতীর্থ তাহলে কার অপরাধ?—মণিকার?—না সুতীর্থের নিজের যুক্তি ও ধ্যানের?

ঘরের ভেতর মাঝ মাঘের সকালের আশ্চর্য রোদের চুমকি এসে পড়েছে বড় রোদের সঙ্গে-সঙ্গে—দেয়ালে জানালার মেঝের মোজেয়িকে স্বস্তিকা আল্পনায়—উড়ু উড়ু উড়ুক্কু সব চিল চড়াই শালিখের পায়রার পাখনায়। পূবের দিকে প্রকাণ্ড দুটো জানালা খোলা ; তাকালেই সূর্যকে দেখা যায়—যদিও সে দূর দক্ষিণাশ্রয়ী এখন; কোনো উজ্জ্বল অনুভূতির মত সূর্য ঐ মানুষের সময় ও ইতিহাসবৃত্তান্তের সারাৎসার আলোকশীর্ষের মত; যারা আগুন বাঁচিয়ে রেখেছে—'যারা আগুন—যারা আগুন নয়, বিকেলের নদীর মত স্নিগ্ধ, যারা আগুন নিবিয়ে ফেলে নক্ষত্রের রাত্রির মত দীনাত্মা—মানবসত্তার সেই সব আত্মার মত সূর্য ঐ। কাটা সুতোর অবিরল এলোমেলো পাঁজের মত নদী চলেছে—সেই নদীর জলের ভেতর থেকে মাঘের দুপুরে রাজহাঁস যেমন করে তাকায় তেমনি করে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে হয় সূর্যকে—কিংবা আদি মানবের মত—কিংবা নিঃস্বত্ব, বিশুদ্ধ করে নিতে পারে যদি আজকের মানব নিজেকে তাহলে তার গভীর বোধিশক্তির দৃষ্টি নিয়ে সূর্যের দিকে—সূর্যের ইঙ্গিতের দিকে নিজেকে ফিরিয়ে নিতে হয়।

সুতীর্থ যে তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছে টের পেয়েছে ঐ সুদূর সূর্য। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণশক্তির নিবিড় পানিপীড়ন বোধ করেছে সুতীর্থ—চারদিকে মাঘনীলিমার সমস্ত পরিমণ্ডলের নীল ঝরে পড়ছে—শূন্যে শূন্যে—কন্যা পৃথিবীর কোলে—আলোর নির্ঝরে। একি প্রকৃতির শক্তি না সূর্য দেবী নিজে? সুতীর্থের সমস্ত শরীরকে ঝিমানো বাঘের মত পড়ে আছে দেখে দাউ দাউ করে উঠছে, ঝর্ঝরে ঝাউবনানীর মত আলোর চারদিকে পৃথিবীর প্রথম বাঘিনীর দুর্বার স্নিগ্ধতা।

স্বর...শরীরই শুধু নয় আত্মার প্রতিটি স্নায়ু শিশুসূর্যদীপ্ত হয়ে নিজেকে পিতার মত মনে করছে—মিশে যেতে চাচ্ছে কোন মহান নারীর সঙ্গে। সাদা আগুনের প্রবাহের ভেতর গান ঝরে ধোঁয়ায় ধবল হয়ে উঠে উজ্জ্বলন্ত জলস্রোতের মত চোখ বুজে বসে রইল সুতীর্থ।

ঘরের ভেতর এসে মণিকা যে দাঁড়িয়েছিল সে খেয়াল ছিল না তার। 'রোদ পোয়াচ্ছ?' বললে মণিকা।

কোন কথা বললে না সুতীর্থ, কাপড় পর্দা বইয়ের মলাটে ছোকছোক ছাক খটাস হওয়ার কোন কথা বললে না সুতীর্থ, আওয়াজে মণিকার গলা হয় তো তার কানেও পৌছয়নি।

'কখন ফিরলে?' মণিকা আবার বললে, 'চোখ বুজে আছ?'

কাল রাতে নিজে যে সোফায় বসেছিল, সেইখানেই গিয়ে বসল মণিকা। সুতীর্থের কাছ থেকে কোন উত্তরের প্রতীক্ষা করে এক আধ মিনিট চুপ করে বসে থেকে নিজেই সে নিস্তব্ধতা ভেঙে বললে, 'কখন এলে সুতীর্থ?'

'কে,—তুমি—'

মণিকা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল—'সুতীর্থও—তাদের দুজনের দৃষ্টি অনেক দূরে একটা ছোট টিপের ভেতর এক হয়ে মিশে গেছে—উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধির ভেতর নিস্তব্ধ হয়ে থেকে।

'এইমাত্র এলে সুতীর্থ?'

'হ্যাঁ, এই তো ; এই ঘরে।'

'এ কি চেহারা হয়েছে? কোথায় ছিলে?'

'অনেক জায়গায়।'

'কোথায়? খুব মার খেয়েছ মনে হচ্ছে।'

'দেখাচ্ছি তোমাকে।' সুতীর্থ বললে।

'থাক থাক কি দক্ষিণা দিয়েছ পেয়েছি দেখাবার জন্যে ছেঁড়া জামা খুলতে হবে না আর।'

'জামাটা খুলতে হবে, এখন খুলব কিনা ভাবছি। আমার ট্রাঙ্কে আর জামা আছে?'

'আমি কি করে বলব?'

'নেই। বড্ড গরীব হয়ে পড়েছি।'

'যত টাকা পেটায় তত গরীব—অফিসের ধাড়ি আইবুড়ো।'

'আইবুড়ো ছিলাম ছেলেবেলায়', সুতীর্থ বললে, 'তারপরে আর এক রকম হল—'

'ও-সব রূপকথা এখন আর চলবে না।'

'পাশগাঁয়ে তুমি যাবে আমার সঙ্গে?' সুতীর্থ বললে, 'চলো নিজের চোখে দেখে আসবে।'

'কি আছে সেখানে?'

'স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ী ছেলেপুলে—'

'বেয়ান নেই? শালী? শালাবউ?—স্ত্রী আর শাশুড়ী আছে বুঝি শুধু?' নদীর মত গলায় মণিকা বললে।

'তোমার চেয়ে শাশুড়ীর বয়স কমই হবে হয়তো।'

সুতীর্থ পূবের দিকেব একটা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে গেল।

'ওটা আবজে দিলে কেন?'

'বড্ড কড়া রোদ আসছে।'

'তোমার চোখের ওপর?'

'তোমাব মুখ টসটস করছে—যেন জ্বব-জ্বালা হল—'

'হল, বেশ হল', মণিকা চোখ বুজে বললে, 'সূর্যের ছ্যাঁকা জ্বব-জ্বালায় আরাম। বেশ ছিল তো—কেন জানালাটা টেনে দিলে বাপু—'

'সব জানালাই খোলা আছে, একটা ছাড়া—' সুতীর্থ নিজের মনেব স্বাদে প্রীত, খানিকটা উদগত ও সমাহিত হয়ে বললে, 'প্রাচীন মিশরীয় মেয়েদেব কথা মনে পড়ছে আমাব। এও যেন সেই মিশবের নীলিমা। নীল নদের পারে শেষ শীতেব রৌদ্রে বসে আছি আমি—' জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থ' হয়ে রইল সুতীর্থ।

'আর আমি?'

'তুমি। তুমিও বসে আছ, সেই গীর্জেব মূর্তির কাছে যেন,' ঢোক গিলে বললে সুতীর্থ ; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গলায় মিশর বোদের ডাকপাখি ডেকে উঠল যেন তার—'কোন এক ভোরের, কোন নীলের বাতাস পাচ্ছি আমি ঃ তিন হাজাব বছর যে পাটে চলে গিয়েছিল সেই সূর্য আবার ফিরে এলে যে বকম বাতাস ভেসে আসে ; কি গভীর সেই নীল আকাশ, সত্যিই খুব বেশি নীল—সেই সাধ-সংসর্গের মত রোদ আশ্চর্য নদী ক্ষেত প্রান্তর জন্মমৃত্যুব অনন্ত বক্তপাতেব মতন সেই আলো ; নীলের অনেক নীচে বড় বড় সহজেব কালি ব্যথা উদ্যম নিস্ফলতার কত শত প্রবঞ্চের ফাঁকে ফাঁকে নীল—ব্যাজন শুনছ না মণিকা? ওগুলো কি খেজুব গাছ গান গাইছে? তরতর করে জল চলে যাচ্ছে চাবদিকে—'তিন হাজার বছব আগের রোদের সঙ্গে হুড়হুড় কবে ছুটে চলেছে আজকেব দিনেব ভেতর' সুতীর্থ আকাশেব দিকে তাকিয়ে রইল, কলকাতা—পৃথিবীর দিকে।

'তিন হাজাব বছর আগেব আজকের দিন ঃ বলেছ তুমি', মণিকা বললে, বাইবে অনেক দূরে যেখানে দুজনেব দৃষ্টি একটা তিলের মতন বিন্দুতে মিশেছে গিয়ে সেই একাত্মতার ভেতর থেকে চোখ ফিবিয়ে এনে মণিকা বললে, 'সময় বলে কেউ যে নেই আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।'

'সময় কেটে যায়, তবুও কাটে না?'

'না, না। তা নয়, আমার মনে হয় সেকালের একালেব সব সময়েব সমস্ত ইতিহাসই এক সাময়িক।'

কথাটা শুনে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন, খুব আশ্চর্য লাগল সুতীর্থের—মণিকাব দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে রইল সে ; বললে, 'আমার তো অনেক সময় মনে হয়েছে এরকম। কিন্তু গণিতের হিসেবে এ কি টেঁকে?'

'গণিত কি বলে জানি না, কিন্তু গাণিতিক তুমি বটে ; তার চেয়েও বেশি একটা জিনিস তুমি সুতীর্থ—এই তো বললে তিন হাজার বছব আগের আজকেব দিনের ভেতব। তা হলে সব সময় সমসাময়িক। তুমিও তো তাই বললে।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে চলে গিয়ে বললে, 'কিন্তু বিজ্ঞান অন্য কথা বলে। বিজ্ঞানকে অমান্য করে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?'

'বিজ্ঞানকে সত্যিই জ্ঞানে দাঁড় করাবে। বিজ্ঞান তো এখনও আধা সত্য। সত্য হবে, হেঁয়ালিকে

সেই তো গিয়ে ধরবে একদিন। বলে মণিকা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

মণিকা বললে, 'কিন্তু আমাদের জন্যে অনেক কিছুই হেঁয়ালি রইল।'

সুতীর্থ আলো আবছায়া চোখে তাকিয়ে নিজের সোফায় ফিরে এল।

সুতীর্থের দিকে তাকালো না মণিকা। সুতীর্থ তাকিয়েছিল দূর আকাশের শাখা আগুনের দিকে ঃ সেটা কি সূর্যের, না সূর্য সরে গেছে তার শূন্য স্থানের? মণিকার মুখে কোন আলো পড়ল কিনা—কিংবা ছায়া—কোন ইঙ্গিত এসে মিলিয়ে গেল কিনা তাকিয়ে দেখবার কথা হয়তো সুতীর্থের ; কিন্তু বিদ্যুৎ নেই—তবুও বিদ্যুৎ রয়েছে—নারী নেই তবুও দুর্বার রেতঃক্ষরণ ঐ সকালের, দুপুরের নীলিমায়—অনুভব করতে করতে অপর কোন মানবের মত হয়ে গিয়েছিল সুতীর্থ ঃ অনেকক্ষণ পরে উঠে সে বাকি জানালাটা খুলে দিল।

'ঐ জানালাটা আবজে রাখলেই ভালো হত সুতীর্থ।'

'সরে গেছে সূর্য। এখন আর তোমার মুখে রোদ পড়বে না।'

'না সে জন্যে নয়, আমি সরে বসেছি—'

'সোফাটাকে আরো ভালো জায়গায় ঘুরিয়ে দিই?'

'দাও।'

'সমস্ত আকাশটাকে দেখা যায়। কী ভীষণ দানবীয় চেয়ে দেখ—'

'দানবীয়?'

'উর্বশী লক্ষ্মীর চেয়েও সুন্দর ; ঐ আকাশেব মত।'

কথা বললে না কেউ—অনেকক্ষণ।

'তুমি আমার এই সোফায় এসে বস সুতীর্থ।

'আসছি।'

'আমার পাশে বস।'

রোদের ভেতর দূর আকাশে চিলের কান্নাও শোনা গেল। কেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে চায় মানুষের মন ; অথচ প্রকৃতি সুপরিসরের ভেতর সুস্থির, কেমন আশ্চর্য প্রাণবত্তায় সুচালিত ; মহানুভব।

'কি দেখছ তুমি?'

'এই রোদ নীল আকাশ শহরের মিনার দালান সাদা বিছানা বস্তি ব্যথা জন্ম-মৃত্যু ভেদ কবে উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি রোজই থাকে। তুমিই তো বলেছিলে এক-দিন—বেবিলনেও ছিল। বেবিলনে ছিল, আমরাও দেখেছি। কিন্তু তবুও দুজনে মিলে দেখবার সময় বেশি পাই না।'

সুতীর্থ মণিকার সোফায় এসে বসল ; পাশাপাশি, কিন্তু গা ঘেঁষে নয়। ঘেঁষাঘেঁষি যাতে না হয় সেই জন্যেই একটু সরেই বসল এদের ভেতর একজন।

'সবই আছে, অথচ কিছুই নেই, মহানগরীর ওপরেও এত বড় আকাশ, এবকম রৌদ্র, অথচ সমাজ নষ্ট, রাষ্ট্র পঙ্গু, মানুষের হাতে মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বোন মরছে ভায়েব হাতে।'

সুতীর্থের কাঁধের ওপর হাত রেখে মণিকা বললে, 'চান কবে এসো, এখন গেলে কলে জল পাবে। চৌবাচ্চায়ও আছে। আমি জ্যোতিকে বলে দিচ্ছি, দু বালতি জল এনে তোমার চানের ঘরে রাখতে। হবে দু বালতিতে?'

'ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তোমার জামা ছিঁড়ে গেছে হয়তো। কিন্তু জামায রক্তের দাগ কিসের?' মণিকা জামার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে।

মণিকা বললে, 'এ তো অনেক রক্ত ; তোমার নিজেব গায়ের? না অন্য কারু—'

সুতীর্থ শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বললে, 'না আমার না। কি করে শার্টটা মাড়াল তাই ভাবছি।'

'বোতাম খুলতে খুলতে থেমে গিয়ে ভ্রূকুটি করে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, রক্তটা কালি মেরে গেছে। তাজা রক্ত নয় নিশ্চয়ই। এ কবে হল। সত্যিই রক্ত তো?'

'আঃ ছি, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছো কেন?'

সুতীর্থ শার্ট খুলে ফেলল, বারান্দার দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে, মনে পড়েছে।'

'তোমারই তো রক্ত?'

'সে গল্প শুনবে? তাহলে বসো তুমি।

সুতীর্থ ইজিচেয়ারটা মণিকার সোফার দিকে ঘুরিয়ে একটু কাছে টেনে এনে বললে, শার্টে যা রক্ত

সূচীপত্রে যান

দেখছ, এই নিচের গেঞ্জিতেও তেমনি,—তার নিচেও—'

'মানে তুমি জখম হয়েছ ; কখন হলে?'

'কাল রাতে।'

'কাল রাতে! হাসপাতাল যাওনি কেন?'

এখানে কি হাসপাতাল নেই ঃ তোমার এ বাড়িতে?'

'কাল রাতে তক্ষুণি হাসপাতালে যেতে পারতে তো তুমি'—

দাঁত কড়মড় করে বললে মণিকা, 'ওঠো। জ্যোতিকে গাড়ি ডাকতে বলছি ; এক্ষুণি চল।'

সুতীর্থ কুঁড়েমি ভাঙতে ভাঙতে আস্তে হেসে বললে, 'যে ফেরারী সে যাবে হাসপাতালে। কী ডায়েরি করব আমি বল তো দেখি।'

'ফেরারী! কাকে খুন করলে!'

মণিকা জ্যোতিকে ডাকবার জন্যে তেতলার দিকে যাচ্ছিল ফিরে এসে খাটের কিনারে দাঁড়িয়ে সুতীর্থের দিকে তাকাল কিন্তু কি মনে করে তৎক্ষণাৎ তেতলায় চলে গেল। মুহূর্তেই অনেক কিছু ওষুধপত্র ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদিব সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে এসে বললে, 'কই জামাটা খোলো দেখি।'

কিন্তু জামা খুলে দেখা গেল সুতীর্থের গা একেবারে পরিষ্কার—একটা মশার কামড়ও নেই কোনদিকে—

মণিকা গালে হাত দিয়ে সোফার এক কিনারে বসে বললে, 'তাহলে বিরূপাক্ষ যা বলেছিল সেই কথাই ঠিক?'

'বিরূপাক্ষ? তাব সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমাব?'

'দেখা হয়েছিল। তুমি ফেরারী কাকে খুন কবলে?'

'তাকে কি করে চিনবে তুমি?'

'কোন বড়মানুষকে করোনি তো?'

এ প্রশ্ন শুনে মূলো কলা আব ঘণ্টা নাড়ার পুজোব পুরুতের মত মনে হল মণিকাকে—নিজেকেও—নিজের সংগ্রামটাকে। এক আধ মিনিট চুপ করে থেকে বড় কাজকর্মেব আসরে অগ্রদানী বামুনের মত যেন—একটু বিষদাঁত ঘষে সুতীর্থ বললে, 'বড় মানুষরা তো আমাদেব দলে।'

'ও কি, বক্তমাখা জামাটা কখন তুলে আনলে? জানালার গরাদে বেঁধে কি করছ সুতীর্থ ঃ রক্তের নিশান ওড়াচ্ছো?' বলতে বলতে খুব বিরক্ত, পীড়িত হয়ে মণিকা দবজা বন্ধ করে দিয়ে এল, বাস্তার দিকেব দুটো জানালাও।

'না, কোন বড় মানুষকে খুন কবিনি।'

'করো না।'

'কেন কবব না বল তো দেখি? আমি হেঁয়ালি সাধছি ; তুমি কষে বলো। তুমি ছাড়া কেউ প্যাঁচ খুলতে পারবে না।'

'হেঁয়ালি টেঁয়ালি নয়—যেন মিছিমিছি বিপদ বাড়াতে যাবে?' 'বিপদ আছেই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কুলিকামিন এক আধটাকে খুন কবলেই হয়ে যায়, ওতেই বেশ গেঁজে ওঠে ; বেশ খাসা লপসি লিসপিস পয়দা হয়। ওরা বিপ্লব করতে জানে না, ওদের সকলকে কেটে ফেললেও না। কিন্তু কী হবে একটা মল্লিক, মুখার্জি, হীরাচাঁদ, হুকুমচাঁদকে মেবে।'

সুতীর্থের কথাবার্তা বকমসকমেব কেমন একটা বেচাল বিসদৃশতায় মণিকাব সমস্ত অন্তবেন্দ্রিয়েব মধ্যে আস্তে আস্তে বিষ সঞ্চিত হচ্ছিল যেন ঃ টন টন কবে উঠল তাব।

'হীরাচাঁদ কে?'

'তাকে তুমি চিনবে না।'

'কি করেছিল সে?'

'কিচ্ছু না।'

'এ রক্তের দাগ কিসের?'

'তা পরে শুনবে। আগে বল আজকেব এই যুগে আমাদের মতন লোকের পক্ষে ধরে ধরে হেঁসো দিয়ে ঝাড় সাফ করে ফেলাই ভালো—'

'না, তা আমি কি করে বলি। আমার মতে খুন করাই খারাপ।'

সূচীপত্রে যান

'কিন্তু যদি খুন করতে হয় তাহলে কাকে করব?'
'কাউকেই না।'
'বরং গয়ানাথ মালোকেই, তাই না মণিকা?'
'গয়ানাথ মালো কে?'
'নাম শুনতেই তো বুঝেছ একটা কেষ্টো-বিষ্টু কেউ নয়। কিন্তু তবুও ছেলেপুলে নিয়ে ওর একটা মস্ত পরিবার। পরিবারটা স্বামী স্ত্রীরই এক জোটে না, আরো কেউ নাক ঢুকিয়ে বংশ বাড়িয়ে গেছে তা জানি না। যা হোক, পরিবারটা না খেতে পেয়ে মরছে।'
'আমরা কি করব', মণিকা বললে, 'আমরা তো নিঃসহায়।'
সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল ; পায়চারি করতে করতে বললে, 'ঠিকই বলেছ তুমি।'
মণিকার দিকে ফিরে সুতীর্থ বললে, 'আমি গয়ানাথ মালোকে মেরেছি। এ তারই রক্ত।'
'তার রক্ত?'
সুতীর্থ জানালা দুটো খুলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, বড়দের কারো নয় ; ভয় করবার কিছু নেই।'
'স্ট্রাইক হয়েছিল?'
'কিছুটা হয়েছিল।'
'তোমাদের ফার্মে?'
'আমাদের ফার্মে নয়।'
'তাহলে?'
'এই শহরেই— কোন কোন জায়গায়।'
'তুমি কি কলকাতার বাইরে ছিলে এতদিন?'
'না।'
'ধর্মঘটের ব্যাপারে কিছু করেছিলে তুমি?'
'যাতে জেল হয় এমন কিছু করিনি হয়তো।'
সুতীর্থ উঠে গিয়ে বন্ধ দরজাটা খুলে দিল। ফিরে এসে বললে, 'কিংবা করে থাকিই যদি, জানবে কে? এই তো এই লোকটাকে খুন করেছি আমি। কি হয়েছে তাতে? খুন যে করা হয়েছে তা বের হবে একদিন। কিন্তু এ নিয়ে গাঁইগুঁই করবার মত একটা কুত্তাও থাকে না এসব লোকের।'

একুশ

চান করে খেয়ে দেয়ে সুতীর্থ বেরিয়ে পড়বার যোগাড় করছিল। খাবার অবিশ্যি ওপরের থেকে এসেছিল। সুতীর্থের চাকর চলে গিয়েছিল—এরকম উড়নচণ্ডে লোকের চাকর কদিন টিকে থাকে। খাবার দিয়ে গেল জ্যোতি। কিন্তু মণিকা আর এল না। বাসে করে সুতীর্থ যে জায়গায় নামল সেখান থেকে হেঁটে আরো মাইলটাক যেতে হয় ; জায়গাটা কলকাতার বাইরে। তবে বেশি দূর নয়। নানারকম ফ্যাক্টরি রয়েছে, অনেক কুলিমজুর খাটছে। এরই ভেতর একটা ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট চলছিল। সুতীর্থকে দেখতে পেয়েই কতকগুলো লোক হইহই করে উঠল—হয়তো মারবেই তাকে—কিংবা হতে পারে তার কাছ থেকে সাচ্চা কিছু পাবে বলে কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কি যে হবে কিছু বলা যায় না। জনতা যখন উত্তেজিত তখন সে কোনো মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মৃতদেহ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। ওরা দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই সম্রাটও বানিয়ে ফেলতে পারে মানুষকে ; সম্রাট যদি মনের ভুলে কথা বলে কিংবা বেকুবি করে, তাহলে তার গর্দান নিতে সময় লাগে না, লাগা উচিত নয় সেটাও হাড়ে হাড়ে জেনে নিয়েছে।
'আজ আমি তোমাদের কাছে বক্তৃতা করব না।' সুতীর্থ বললে।
'ও সবের দরকার নেই দাদা', হৃদয় ভৌমিক বললে, 'বালি খুব তেতে আছে। আকাশের সূর্যের চেয়ে তার ঝাঁঝ বেশি। আর কত ঝাঁঝালো করে তুলবেন তাকে সুতীর্থবাবু—'
'তোমাদের ফ্যাক্টরিতে ফিরিঙ্গি মজদুর আছে নাকি শুনলুম—'
'আছে বইকি, মজদুর নয়', বঙ্কু বললে।
'মজদুর নয়, ইঞ্জিনিয়ার,' বলে বিহারী।
'কজন আছে?'

'ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান, অ্যাসিসটেণ্ট—সে আছে অনেক। কেন বলুন তো সুতীর্থবাবু?'
'তারাও তো ধর্মঘট করছে।'
'না, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা করবে না। কেন করবে? এদের—'
ইয়াসিন একটু সতর্ক হয়ে বললে, 'তাদের না করলেও চলে। দিন কেটে যায়।'
'তোমাদের মতলব কি?'
'আমরা চালার' সকলেই প্রায় সমরোলে বলে উঠল।
'কেমন চিমসে হয়ে যাচ্ছে—গোলগাল চেহারা ছিল ইযাকুবেব এ হল কী। বিড়িই বুঝি টানছে সারাদিন মকবুল। দানাপানি পেয়েছে আজ? শুধু জল খেয়ে আছ?'
'ফতিমা আপনাকে ডেকেছে।' মকবুল বললে।
'আমাকে?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।
'হ্যাঁ, আপনাকেই।'
'কেন বলো তো?'
'যান, গিয়ে দেখে আসবেন।'
'আজ যাব না—সময হবে না।'
কবে সময় পাবেন তাহলে?'
সুতীর্থ হাতঘড়ির দিকে তাকিযে বললে, 'আজ আব হবে না। সময নেই।' মকবুল মুখ বেজার কবে চলে যাচ্ছিল।
'কোথায় যাচ্ছ মকবুল?'
একটা বিড়ি জ্বালিযে মকবুল বললে, 'আবে রাখুন মশাই।'
'কি হল রে তোর মকবুল—ইয়াসিন বললে।
'এই সুতীর্থবাবু প্রমিস করেছিলেন, আমার কাছে যে একবেলা আমাদের সঙ্গে বসে নুন ভাত খাবেন—'
'কিন্তু এখন কি কবে খায। এখন তো তোবাই খেতে পাচ্ছিস না।' হামিদ বললে।
'খেতে যে পাচ্ছি না, পবতে পাবছি না তাই নিয়ে গিদ্ধোবের মত ফেউ ফেউ করবি—না চোখ তাবিযে বেটাচ্ছেলেবা দেখবি সব, নগদানগদি যা হয একটা কিছু ব্যবস্থা কবে দিবি ফেউ ফেউ না কবে—'
'ঠিকই বলেছে, মকবুল মোক্ষম বলেছে ইযাসিন। তোমাদেব ধর্মঘটের ক'দিন হল?'
'এই দশ দিন আজ নিযে।'
'কর্তাদের মন উঠছে না।'
'অত সহজে কি আর তা হবে। দেখুন সুতীর্থবাবু, আমাব মনে হয এই ধর্মঘট জিনিসটাব বিশেষ কোন ভবিষ্যৎ নেই আমাদের দেশে।' বঙ্কু বললে।
সুতীর্থ বিষ ঝাড়বাব ওঝার মত চোখে ক্ষতটার দিকে তাকাল যেন বঙ্কুব দিকে তাকিযে। কিন্তু সে দৃষ্টির আবেদন শাসন সব অগ্রাহ্য করে বঙ্কু বরং হামিদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কত পার্টি আছে। আমাদের দেশে, কত পোলিটিক্যাল পার্টি ও সব পার্টির সুনাম যে নেই তা নয়। সুনাম আছে। সুনাম ছিল একদিন। কিন্তু সে সব ভাঙিযে খাবার মত পেটোযা লোকেব অভাব আমাদেব এই সোনার দেশে নেই সাহেব। এবা আসে যায—সভা কবে—বক্তৃতা দেয—কাগজে লেখে—নিজেদের ভেতর কথা কাটাকাটি—পবে কামড়াকামড়িও কবে। এদেব ভেতব কে ছোট—কে বড়—কে আমাদের সত্যিই ভালো করল—কাব বা ভালো করাব প্রয়াসটা স্রেফ বদমাযেসি—এ সব পাঁচরকম দশরকম সব ভিযেনে চড়িযে কারো ঘোড়ার সঙ্গে সাদা ঘুড়ী মিশিয়ে লেলিযে দেয ওবা, ঘুড়ীব মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ঘোড়াগুলো, আবার আস্ত রেখেও খায়—ঘুড়ীটাকে বেশ ঝড়ে গোছে ফনফনে রেখে। এ সবের মানে কি হে হামিদ—এ সবেব মানে কী আপ বাতাইয়ে মুঝকো—' বঙ্কু বিড়ি জ্বালাল।
হামিদ বললে, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন সুতীর্থবাবু?'
'এই মাটির ওপরেই বসে পড়ুন ; এ ছাড়া আমাদেব আর কোন ফরাস নেই দাদা।' বঙ্কু বিড়িতে টান দিয়ে বললে।
সুতীর্থ বললে তোমার কথার উত্তব আর একদিন দেব বঙ্কু। মোটামুটি তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

আমরা নিজেদের ভেতরই মন কষাকষি করি—'

'আমরা বলছেন, আমরা কারা? ধর্মঘটীদের কথা বলছি না তো সুতীর্থবাবু।'

'তা বলছ না অবিশ্যি তা আমি জানি, কিন্তু—' অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে বঙ্কু বললে, 'আমি বলছি তাদের কথা যাদের ফুসলানিতে আমাদের ধর্মঘট করতে হয়—'

'যা রে, তুই বড় ভালোমানুষ হামিদ, তুই জানিস না আমাদের দেশে কতগুলো কালো পাঁটা আর ধলো পাঁটা আছে।'

'হিন্দু পাঁটা আর মুসলিমের নয়াল মুর্গির আণ্ডা আছে ইয়া ইয়া।'

'লালপাগড়ি লকলক করছে মোরগটার যে ভিজিয়ে তিতিয়ে ডিম পাড়ায়—

'আর সাদা ডিম সকসক করছে মুর্গিটার যে ভিজে পুড়ে ডিম পাড়ে—

'হে—হে—হে—'

সুতীর্থ দাঁড়িয়েছিল—পাযচারি করছিল, একটা মরা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল এবার। বসেই তার মনে হল ওরা সব মাটিতে বসেছে—এরকম গুঁড়ির ওপর বসা তার ঠিক হবে না, ওরা হযতো ভাববে এইটুকুর ভেতরেও সুতীর্থবাবু ভোদভেদ করছেন। সে মাটিতে গিয়ে বসল একেবারে অনন্ত আর গোলাম মহম্মদের গা ঘেষে—

সুতীর্থ বললে 'হামিদ, ইয়াসিন, মকবুল, বিপিন শোন তোমরা। বঙ্কু বলতে চায় যে ধর্মঘটেব অছিলায় আমাদের মতন বাবুরা নাম কিনি। আশ মিটিয়ে কথা বলবার খবরের কাগজে লিখবার শখ মেটাই। এত সব বজ্জাতি কবেও আমাদের তেল মরে না, শখ মেটে না, নিজেদের ভেতর এঁটোর ভাগ নিয়ে কুকুর বেড়ালের লড়াই শুরু করে দিই। ঠিকই তো। বঙ্কু যা বলেছে একেবারে মিথ্যে নয়।'

'একেবারে শব্দটা বাদ দিন সুতীর্থবাবু।' বঙ্কু বলল।

'বলব : মিথ্যে নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হবে। কিন্তু তুমি যা বলেছে বঙ্কু, একেবারে সত্যও নয।'

বঙ্কু তার জ্বলন্ত বিড়িটা সুতীর্থকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মাববে ঠিক করেছিল। কিন্তু টের পেল হামিদ এবং টের পেযে ইশারা করে বঙ্কুকে উত্তেজিত হতে বারণ করছে। কাজেই নিস্তব্ধ হয়ে রক্তাক্ত মুখে বিড়ি টেনে চলল সে।

সুতীর্থ বললে, 'বঙ্কুর বক্তব্য হচ্ছে পোলিটিক্যাল পার্টির লোকরা এসে নিজেদেব লাভ লোকসান হিসেব করে একরোখা বোকাদেব তাতিয়ে ধর্মঘট বাধায়। ধর্মঘটীবা নিজেদের তাগিদে ধর্মঘট কবে না—এই তো?'

কথা শেষ করে বঙ্কুব দিকে তাকাল সুতীর্থ। বঙ্কু বাস্তবিকই এবার বিড়িটা ছুড়ে মাবল, কিন্তু ঠিক সুতীর্থকে তাক করে নয় ; কিন্তু কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে অসম্মান করতে হলে যেরকম ভাবে মাবা উচিত তা তার অব্যর্থ হযেছে—যে যাব মুখ চাওযাচাযি করে সকলেই সেটা জেনে নিল। ব্যাপাব মেনে নিল না অবিশ্যি সকলে।

'নিজেদেব তাগিদে আমরা ধর্মঘট কবি না, একথা খুসকি খানকিরা বলে—

'হতে পারে আমি খুস—'

কষে একটা গাট্টা মারল অনন্তরাম বঙ্কুর মাথায়। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল বঙ্কু ঘুবে পড়েছে।

'ওটা কি হল তোমার অনন্ত? এ কি করলে তুমি? তোমরা নিজেদের ভেতরেই যদি এরকম কর—'

বঙ্কু মুখের মাথার ঘাস ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দুপাটি পানসে দাঁতের খানিকটা রক্তথুতুর পিচকি কাটল, আরো দুতিনবাব পিচকি কেটে বললে, 'আমবা নিজেদের মধ্যে ঠিক আছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, কোথায় থাকেন আপনি?'

'বালিগঞ্জে।'

'কোন রাস্তায়?'

'লেক রোডে।'

'লেকের পারে আইভরি টাওয়ার সুতীর্থবাবুর—' কে যেন কিছুটা শিক্ষিত সাহিত্য-পড়া ওদের মধ্যের থেকে একজন বললে।

'গজদন্ত মিনারে—লেকের পারে—' সেই বললে আবার।

এসব জিনিস নিয়ে সাহিত্য পত্রিকার প্রবন্ধট্রবন্ধ লিখেছে হয়তো মানুষটি।

'আমার নিজের বাড়ি নেই, আমি ভাড়াটে।' সুতীর্থ বললে।

'কোন তলায়?'

'দোতলায়।'

'কটা কামরা?'

'তিন—চারটে—'

'তিনচারটে কামরা বালিগঞ্জের এক পরিবারের জন্যে। এটা খুব নবাবী হচ্ছে তো সুতীর্থবাবু। আমরা তো গোয়ালে আস্তাবলে গ্যারাজে যারা আছি তারা ভালো আছি। গোসলখানায় পায়খানায় আরসোলার মত ফড়ফড় করে উড়ছি যারা নুন-চিনির বদলে আপনাদের ডি ডি টির গুঁড়ি খেয়ে তাদেব দেখেছেন কোনদিন আপনি? ভালো আছে তারা, আরসোলারা বেশ আছে। কিন্তু আমাদের বস্তিতে এসে দেখেছেন কি আমরা কেমন আছি?'

'আমি তো এসব সাতসতেরোব ভেতর নতুন এসেছি ভাই, ভালো করে দেখবার শোনবার সময় হয়নি আমার।' সুতীর্থ বললে।

'সময় হয়নি! মধু আর মকরধ্বজ দিযে মেড়ে না দিলে এসব লোকের সময হয় না কোনো কিছু করবার—কথা বেচে নেতাগিরি করা ছাড়া।'

'বস্তিব ফোটো দেখলেই সুতীর্থবাবুদের হযে যায।'

'শ্রমিকসভার ব্লুবুক দেখেই সুতীর্থবাবুদের—' নিকুঞ্জ শুরু করলে।

'ব্লুবুক নয, ব্লুবুক নয—আমাদের কোন ব্লুবুক নেই নিকুঞ্জ—' রতন বললে।

'আমি বলছিলুম'—নিকুঞ্জ একটু গলা খাকড়ে নিযে বললে 'আমবা একটা বিষম ভুল করেছি। প্রলিটারিয়েটদেব নেতা প্রলিটারিয়েটদের ভেতর থেকেই হওযা উচিত। বুর্জোযারা আসে কেন আমাদেব কাপ্তেনী করতে? সুতীর্থবাবু তো বালিগঞ্জের লণ্ড্রির ইস্ত্রিকরা বুর্জোযা ; বস্তি দেখেননি কোন দিন, শ্রমিকদের চেনেন না, কিষাণদেব চেনেন না, আন্দোলনের ইতিহাস জানা নেই , মানুষকেই দেখেননি তিনি এমনই মহামানুষ—' নিকুঞ্জ একটা বিড়ি জ্বালিযে হামিদের দিকে তাকিযে বললে, 'এইসব পাতিমানুষ কেন ফোপলদালালি করতে আসে হে হামিদ?'

হামিদ ঘাড় কাত করে কথা ভাবছিল, বললে,'প্রাণে সাড়া পেযেছেন বলেই এসেছেন সুতীর্থবাবু। এসে একদিনে অনেক কাজ করেছেন। পবামর্শের মূল্য আছে সুতীর্থবাবুর, মাথা ঠাণ্ডা আছে ঃ তোমরা যা চাচ্ছ প্রলিটাবিটেরা সবি হবে—কিন্তু রাতাবাতি হবে না। এই তো এলেন সুতীর্থবাবু। বুর্জোযা ছিলেন, এখনও আছেন, কিন্তু বোঁটকা গন্ধটা নেই তেমন আর—দুদিন সবুর ভাই সব—ঠিক হযে যাবে। ঠিক হযে যাবে।'

'আরসোলা রাতাবাতি কাঁচপোকা হযে যায না হামিদ?' বঙ্কু বললে, 'তা হতে পাবে।'

'কিন্তু তবুও মানুষ হয না। কি বল? একটু সবুব করতে হবে সুতীর্থবাবুব জন্যে আমাদেব?' বঙ্কু বললে।

'একটু ভোমবাগাছি কবতে হবে।' নিকুঞ্জ বঙ্কুব দাবনায ছোট একটা ঘুষি মেবে হেসে বললে।

মকবুল অনেকক্ষণ ধরে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কে কি বলছিল না বলছিল সেদিকে কান ছিল না তার ; সুতীর্থকে বললে, 'আপনি চলুন—'

'কোথায?'

'আমার বাড়ি।'

'যাব আমি।'

'আজই যেতে হয।'

'আজ পারা যাবে না মকবুল।'

'এই এতক্ষণে কি হযে আসতে পাবতেন না?'

'তোমার বাড়ি তো এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে। সেখানে বাস যায না। আমার মোটর নেই—'

শুনে কয়েকজনে হো হো হো করে হেসে উঠল।

'আপনার মোটর শালিমার গিয়েছে।'

'সেখান থেকে শালী নিয়ে আসতে।'

'আমার কাছে মবিল অয়েলের টিন আছে সুতীর্থবাবু, তিন গ্যালন, দু-গ্যালন। আপনার মোটর এলেই ভক করে ঢেলে দেব—'

'কিন্তু আসবে কি করে, আপনার গাড়ির স্পেয়ার পার্টি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ভুশণ্ডির মাঠে বানচাল হয়ে পড়ে আছে তাই মোটর—রিষড়ে পেরিয়ে।'

'ভুশণ্ডির মাঠে কি খাচ্ছে মোটর?'

'মানুষ খাচ্ছে গোরু খাচ্ছে; আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে যে পাখিগুলো হেগে যায় তাই দিয়ে পানচুন বানিয়ে খাচ্ছে আর কি।'

একটা হাসির হল্লা পড়ে গেল। সুতীর্থের 'আমার মোটর নেই' সম্প্রতি ভুলে গেল তারা। এক একজনে এক একটা পার্টির নাম ও তাদের চাঁইদের নিয়ে কেচ্ছা খিস্তি শুরু করে দিল। সকলেই অবিশ্যি এ উদ্দীপনার যোগ দিল না।

কেউ দাঁত দিয়ে কেটে কুটো ছিঁড়ছিল, কেউ বিড়ি টানছিল, মাথা হেঁট করে বা ঘাড় কাত করে অথবা শূন্যের দিকে চেয়ে নিরুত্তর থেকে ; কেউ বা হাত গুটিয়ে বসেছিল, সাত চড়ে মুখে কোন রা নেই এমনি মুখ করে ; অতি অথর্ব যারা তারা ঝিমুচ্ছিল, অল্পবয়সীদের ভেতরেও একরকম কয়েকজন অতি স্থবির ছিল ঃ আবার বুড়োদের মধ্যেও দুশমন গোছের কয়েকজন কেউ কোনদিকে লেলিয়ে দিলেই দুনিয়া ছাতু করে দিতে পারে এমনিভাবে একবার ফ্যাক্টরির দিকে—সুতীর্থের দিকে—নিজেদের পরস্পরের পানে তাকাচ্ছিল কটমট করে। ধর্মঘটীদেব সকলেই যে এই দলটার ভেতরে যোগ দিয়েছে তা নয় ; অনেকে আসেইনি। বিচ্ছিন্ন হয়ে মাঠের এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে অনেকে।

পরদিনও ধর্মঘটীরা সেই জায়গায়ই সেইরকমভাবে বসে শুয়ে দাঁড়িয়ে ছড়িয়েছিল। সুতীর্থকে দেখে বিশেষ কিছু বললে না কেউ আজ আর। কাল অনেক রাত অব্দি সুতীর্থ ছিল এখানে, আজ হয়তো সারা বাতই থাকবে। সুতীর্থের বিশেষ কাজগুলো (সলা-পরামর্শেব চেয়ে ঢেব বেশি দামী যেগুলো) হামিদ অনন্ত রামদের সঙ্গেই নিস্পন্ন হয়, নিকুঞ্জদেব সঙ্গে নয়। একই দলে যে দুতিনটে চিড় থাকবে সেটা সুতীর্থ বা হামিদ কেউই ভালোবাসে না, কিন্তু সম্প্রতি বন্ধুদের না চটালেও একেবারে কোলে টেনে নিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কে জানে হামিদ অনন্তরামও হয়তো সুতীর্থকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে অন্যরকম সুর ধরতে পারে—যে কোন মুহূর্তে—আজো হয়তো—কাল পরশু হয়তো।

'আমি যাব তোমাদের বাড়ি মকবুল।' সুতীর্থ বললে।

'আজই?'

'জরুর।'

'শুনে ভবেশ সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'ও পাড়াটা যে সবই তোমাদের মকবুল?'

'তাব মানে?'

'মানে ওখানে সবাই তো মুসলমান।'

'কী হল তাতে?'

'মানে দাঙ্গা কিছুদিন হয থেমে গেছে বটে। কিন্তু তবুও বলা যায না কিছু। লাগ লাগ করে লাগে যদি আবার—'

'সুতীর্থবাবুকে আমাদেব পাড়ায় নিয়ে লাশ গুম কবে ফেলব সেই কথা বলতে চাও তুমি ভবেশ?'

মকবুল বললে, 'বাঁট দেখে বলে দেবে বুঝি কোন্‌টা কোন্ ধর্মের গোরু? হিন্দু গোরুর বাঁট কেটে রেখে দেবে মুসলমানদের এলেকায় গেলে?'

শুনে ভবেশের আগে সুতীর্থ হেসে উঠল ঃ 'গোরুই বটে, গোরুই আমি মকবুল। গোরু ছাড়া কি আর। কিন্তু রাস্তার বড় বড় ভাগলপুরী গাইগুলোকে দেখে কলকাতার আর্দ্ধেক মানুষকেই বকনা বাছুর বলে মনে হয। আমি নিজে অবিশ্যি কলুর বলদ ছিলুম।'

কেউ কোন কথা বলছিল না। সুতীর্থের এ সব কথার রস সঠিকভাবে আস্বাদ করবার মত মনোযোগ, মনের মর্জি ছিল না তাদের। এমন কি বঙ্কুও বিশেষ উৎসাহিত বোধ করল না।

'ধর্মঘট তোমাদের এই দশদিন ধরে চলছে। দিন আনা দিন খাওয়া যাদের বিধান এই দশটা দিনে তাদের যে কি অবস্থা হয়েছে তা তো চোখের সামনেই দেখছি। কিন্তু তবুও কি নিরেট প্রাণশক্তি তোমাদের। তোমাদের সকলেই যে এক পার্টির তা নয়! তোমাদের মধ্যে নানা পার্টির লোকই হয় তো

আছে ; এমন কেউ কেউ আছে যে কোন পার্টির সঙ্গেই তাদের কোন সম্পর্ক নেই; তারা জানে তবুও ভাত কাপড়ের মনের স্বাধীনতার মর্যাদা—সকলের জন্যেই স্বাধীনতার রুজি রোজগারের সচ্ছলতায় দরকার এটা বেপরোয়াভাবে জানে তরা।'

(বলে ফেলেই সুতীর্থ মনে মনে অপছন্দ করতে লাগল ; এই শব্দ, এই ভাষণ, ভাষণের এই রীতি তার মুখে ঠিক খাপ খাচ্ছে না যেন) ; 'কাজেই কোন বিশেষ নিশানের নিচে দাঁড়িয়ে সকলে মিলে মানুষের মত সকলের হয়ে আকাশের নিচে দাঁড়াতে হবে তোমাদের—অনাথ আর্ত-আহম্মকদের ভিড় যাতে সফল হয়—'

বাধা দিয়ে বঙ্কু বললে, 'আর বক্তৃতা দেবেন না সুতীর্থবাবু বক্তৃতা আমরা চাই না। ওটা আপনার রোগ হয়ে দাঁড়াল দেখছি।'

শুনে দাঁত কেলিয়ে রইল অনেকে ; হাসছে, না কাঁদছে, না টিটকারি দিচ্ছে বুঝতে পারা গেল না। গলা ছেড়ে হাসির শব্দ নেই কোনোদিকে।

'বেল্লিক তুমি বঙ্কু, ভদ্রলোক বলছেন, শুনতে দিচ্ছ না।'

'আমি কি তোমাকে কানে আঙুল দিয়ে থাকতে বলেছি হামিদ। যা বলছে সুতীর্থবাবু এই যদি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলত, সে মাইক পয়দা করে দিতুম আমি। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছ্যাঁদায় তুলো দিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাকতে বলিনি হামিদ। শোন যা বলছেন। কই বলছেন না তো কিছু আর আমাদের ভাগ্যিদাদা। বারোটা তেরোটা বেজে গেল বুঝি। দাও তো হে দেশলাইটা সিপতি।'

'আমার ভুল হয়ে গেছে বঙ্কু কথা বলতে গেলে এক সের লোহায এক মণ হয়ে গুলিয়ে যায় সব।' সুতীর্থ বললে।

'হ্যাঁ, মনে হয় যেন মুখটা লাউডস্পীকার, কথাটাও ভাড়া খাচ্ছে। কে খাওয়াচ্ছে ভাড়া?' মকবুল বললে।

ঘনশ্যাম বললে, 'বড় বাম খাওযাচ্ছে পাতিরামকে। চলবে না ও সব ছেঁদো বাকচাল সুতীর্থবাবু। কাজ কি করেছেন তার হিসেব দিন। আপনি তো সব পোলিটিক্যাল পার্টি ভেঙে ঝাণ্ডা গুটিয়ে মানুষের মত একঠায়ে আমাদের দাঁড় কবাতে চান। কিন্তু কে দাঁড় করাবে শুনি? যে হড়বড় কথা বলে যাবে সে? এ ক'দিন কথা আর কথা আর কথা বলা ছাড়া কি জোটালেন আমাদের জন্যে? আমি আই এস-সি পাস করে যাদবপুবে কিছুদিন পড়েছিলুম, আজ এখানে মিস্ত্রি, আমাদেব ভেতর কেউ কংগ্রেসের, কেউ সোস্যালিস্ট, কেউ কম্যুনিস্ট, ফরওযার্ড ব্লক, ডিমোক্রাট, রেভল্যুশনারি, রিপাবলিকান—কিন্তু আজকের এই ধর্মঘটে আমাদের সকলের সব আলাদা আলাদা পোলিটিকস মিলেমিশে এক ভোগান্তি ইকনমিকস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিক দিযে কি করতে পাবেন অবিলম্বে সেই চেষ্টা করুন। আছে কতকগুলো চ্যাংড়া—মজুরের গায়ের গন্ধ শুঁকবে আর জিভ চুকচুক করবে—অমানুষ যে মানুষকে শোষণ করছে, সাম্রাজ্যবাদ—যে বড় বালাই, দুনিয়ার সর্বহারাদের গা-ঝাড়া দিযে জেগে উঠতে হবে—শালা ওলাউঠো যত সব—আপনাবা কি কেবল মুখ নাড়বেন, কাজ কববেন না?'

'এ মুখ নাড়ার চেযে মেযেদের নথনাড়াও ভালো। তাতে ঢের পাকা কাজ হাঁসিল হয়।' অনন্তরাম বললে।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিও তো ওই মিটিংই করলে ঘনশ্যাম।' বঙ্কু বললে, 'কি পথ বাতলালে তুমি নিজে? কথা ছাড়া আছে কিছু ট্যাকে?'

'আছে বইকি। দেখবি চ। গয়ানাথ মালোর কি হল বল তো দেখি—'

শুনে অনেকে একসঙ্গে ঘনশ্যামকে ছেঁকে ধবল।

'কী হল বল তো—গযানাথ কোথায?'

'গয়ানাথ খুন হযে গেছে।'

'খুন হযে গেছে! কোথায়?'

'লাস পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না? লাসটা অব্দি পাওযা যাচ্ছে না।'

যারা উঠে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বসে পড়ল আবার।

'কে খুন করল?'

'পুলিশ কোন কিনারা করতে পারছে না।'

'তা তো পারবেই না।'

'কে খুন করল?'

'সে জানে চৌধুরীসাহেব আর তার শ্বশুর। আলবৎ জানে।'

'কে খুন করল! কে খুন করল!!' অনেকগুলো গলা দশ আনি উত্তেজিত ছ' আনি উৎকণ্ঠিত, নাকি ছ' আনি উৎসুকিত দশ আনি উদ্দীপ্তি—ছ' আনি চার আনি ব্যথিত হয়ে উঠল,—মনে হল সুতীর্থের।

সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল, 'গয়ানাথ কি করেছিল যে খুন হল?'

'সে আমাদের সর্দার ছিল তাই।'

'মোটরে জীপে চড়ে সব পার্টির লোক আসে, ফিরিস্তি গেয়ে জীপে করে ফিরে যায় আবার। না, না, গয়ানাথ ও-সব ভজভজে বাঁজা আঁটকুড়ের বাচ্চাদের মত নেতা ছিল না। মুখে খই ফুটত না, সে গাঁইতি নিয়ে কাজ করত।'

'গাঁইতি?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'ওটা হল রূপক ঃ কাস্তে হাতুড়ি গাঁইতি। কাস্তে হাতুড়ির তো দশ মাস চলছে, একটু কষ্ট হচ্ছে। এবার গাঁইতি একটু কাজ চালিয়ে দিক—গাঁইতি, তুরপুন, করাত, কুড়ুল। গয়ানাথ মালোর মত লোক যদি কর্তাদের নেকনজরে না পড়ে তা হলে পড়বে কে। আচ্ছা, আমরাও দেখে নেব!'

'তোমরা বড় তড়পাচ্ছ হে ঘনশ্যাম—' সুতীর্থ বললে।

'আমরা গুম হয়ে যাচ্ছি—আর ওরা এর ওর মা-বোন নিয়ে স্ট্রিমলাইন হাঁকাচ্ছে। ওদের ধান খেয়ে ওদের পাঁশগাদার হোঁৎকা মূর্গির মত কথা বলবেন না সুতীর্থবাবু।'

'ছোলা মুর্গি হয়ে পড়ে থাকব আমি ঘনশ্যাম, ওদের ধান খেয়ে কথা বলি যদি।'

'বেশ মানলুম। এখন গয়ানাথের একটা কিনারা করুন। কর্তাদেরও জানান দিন যে ফ্যাক্টরি কুঁকড়ে চামচিকের ছা হয়ে যাবে, তবু একজন ধর্ম—ঘটীকেও বাগে পাবে না তারা যদি আমাদের পঁচিশ দফা দাবি অক্ষরে অক্ষরে মেনে না নেয়।'

ঘনশ্যাম বললে, 'এটাও জানিয়ে দেবেন যে সব দল একজোট হয়েছে। ভাঙানি চলবে না। মরিয়া হয়ে চালাতে চাচ্ছে। কিন্তু কি হচ্ছে চোখের সামনে দেখছেন তো।'

'না ভাঙাচি-টাঙাচি চলবে না', সুতীর্থ বললে, 'আজকাল ধর্মঘটের জোর বাড়ছে। মানুষকে মানুষ বলে মনে করে প্রায় সকলেই। কাজে তার প্রমাণ দিতে না গেলেও একটা ট্যাকটেকে চক্ষুলজ্জার খাতিরে ভাঙানি দিতে সকলেই দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু তবুও তোমাদের সত্যাগ্রহ চলতে থাকুক।'

'তা চলবে। কিন্তু পুলিশ তো সত্যাগ্রহী নয়। ধর্মঘটীরা জেলে যাচ্ছে, মার খাচ্ছে।'

'আজ কি পুলিশ আসবে?'

'আসবে বই কি।'

'কখন?'

'এক আধ ঘণ্টার ভেতরেই।'

'আচ্ছা বেশ, ধর্না দেব সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে। মার খাব, কিন্তু এখুনি জেলে যেতে রাজী নই—'

'কেন?'

'তা হলে গয়ানাথের ব্যাপারে গিঁট খসানো শক্ত হবে।'

'সুতোগুলো জড়িয়ে জড়িবড়ি পাকিয়ে গেছে বুঝি সুতীর্থবাবু? কত বড় ন'টাই বেবাক সুতো লাট খেয়ে গেল? গিঁট খসাবেন তো? গিঁট খসাবেন সুতীর্থবাবু হ্যাঁ হে করালীচরণ—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ খসাবেন।'

'তা খসাবেন, তার আর কি—'

সুতীর্থ বললে, 'কর্তাদের সঙ্গে দাবি-দাওয়া সুপারিশের ব্যাপারটা তোমরা কি খুব ভালো করে চালাতে পারবে? যদি পার তা হলে বল আমি কয়েকদিন জেলে দাড়ি গজিয়ে আসি—এখানে ফিরে এসে ঘাট কামাবার আগে।' সুতীর্থ তার গালের পাঁচ-সাত দিনো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সকলের দিকে তাকাচ্ছিল।

'আর আমাদের ঘর আর বার—আমাদের জল আর জেল ; ও সব একঠাঁই হয়ে গেছে আমাদের—' খুব একটা কালো নিশ্বাস ফেলে পীতাম্বর বললে।

'হাঁড়িতে ভাত নেই বলে ঘরে গিয়ে দেখব পরিবার মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে, তার ফাঁড়ি যাওয়াই

ভালো। আমরাই যাই—পেটে কিছু চামচিকের দানা পড়বে তো ফাঁড়িতে গেলে—' একবার মুখ তুলে আবার তিন-চার ঘণ্টার জন্যে মুখ বুজে রইল খোসাল দত্ত।

'আপনি সুতীর্থবাবু চালু হয়ে যান।' অনন্তরাম বললে, 'যা কববার করুন। হয় আমাদের সঙ্গে মিশে বেধড়ক মার খেতে শিখুন—জেলে চলুন। না হয় অ্যাডজুডিকেশন বোর্ডকে শায়েস্তা করে দিয়ে জেনে আসুন গয়ানাথকে কে মারল আর আমাদের পঁচিশ দফা অক্ষরে অক্ষবে দু-হপ্তার মধ্যে মেটানোর কদ্দূর কি হচ্ছে, কি হবে।'

বাইশ

সুতীর্থ ধর্মঘটীদের সঙ্গে মিশে সত্যাগ্রহ শুরু কবে দিল। শীতেব অপরাহ্নের রোদেব তেজ কমে যাচ্ছিল ক্রমেই। এই পিঠে রোদে মুখ-পিঠ পুড়িয়ে ধুলোয় ঘাসে চিত কাত উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে মন্দ লাগছিল না। একেই কি বলে ধর্মঘটেব তাড়সে ধর্না দেওয়া। কিন্তু পিকেটিঙের এ তো কলির সন্ধ্যে সবে। তা ছাড়া সে আইবুড়ো মানুষ, শরীরও শক্ত আছে তার, মনেও বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই, বড় একটা দায়িত্ব নেই এক-রক্ত-দাবি কবা কোনো গলগ্রহীদের কাছে।

'কি গো হামিদ, শুয়ে বসে লাভ কি যদি ওরা না আসে?'

'ওরা কি আজ আসবে?'

'ওবা কাবা? পুলিশ?'

'না। যারা তোমাদের বুকেব ওপর দিযে হেঁটে গিযে ফ্যাক্টবিতে কাজ কববে—

'আজ আর আসবে না।'

'কাল?'

'সে সব বলা যায না কিছু। তবে এখন থেকে ক্রমেক্রমে কিছু আসবে। ক্রমেই ওবা দলে ভাবি হবে।'

'কাবা? যে সব কামিন স্ট্রাইক ভেঙে দিতে চায?'

'হ্যাঁ, এই দশ দিন হয়ে গেল, অনেকেবই শিবদাঁড়া বেঁকে পড়ছে।'

'তোমবা শুয়ে থাকলে তোমাদেব গাযের ওপব দিয়ে হেঁটে যাবে ওবা ; তোমাদেব সত্যাগ্রহ ওবা মানবে না ; ওবা আব স্ট্রাইক কববে না—কাজে যাবে—তোমাদেব বুকের ওপব দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। ওদেব চোখ মুখ হাত ঠ্যাং তো মাকড়সার মত হয়ে পড়ছে ইযাসিন ; মাকড় যাবে মাকড়সাব জালেব ওপব দিযে ধেই ধেই কবে নেচে।'

'আমবা হলাম মাকড়াব জাল?'

'মাকড়াব জাল ছাড়া আব কি আমবা? মানুষ তো নয—মানুষেব পিত্তি। শবীবেব পিত্তি কফ বাযু ঠিকবে যে আঁশ বেবিযে আসে তাব ফ্যাকড়া তুমি আমি অনন্তবাম, ঘনশ্যাম—'

'আব ওবা হল মাকড়সা?'

'মাকড়সা। ওদেব সঙ্গে বক্তেব সম্বন্ধ আমাদেব। ওদের পেটের থেকে সূতোর মত বেবিযে এইছি—' হ্যাচ হ্যাচ কবে হাসতে লাগল কালু ওস্তাগর। হেসে মজা পেযে একসময় এমনই গযের খালাস কবতে লাগল যে তার চারদিকটা মাছি নোংবামীতে ঘিনঘিন করতে লাগল।

'সূতোব লালায লেপটে রইছি ডিম কি বলিস ভূপাল—'

'তাই তো বংছ বিদ্ধি হল ওদের ; তুই ঘুমোচ্ছিছ ইযাসিন?'

'আবে না—'

'মকবুল কোথায গেল?'

'ও চলে গেছে?'

:সুতীর্থবাবু কোথায?'

'ওই যে মড়া গুঁড়িটা ঠেস দিয়ে শুয়ে আছে—'

'ও থাকবে তো?'

'কি জানি, ওর ঢং আছে ; ঢঙের মানুষ। কখনো এখানে এসে বসে—কখনো ওখানে গিযে শোয। আকাশ পাতাল ভাবে। ঐ একরকম। ঐ যে আসছে।'

'মকবুল কোথায গেল ইযাসিন?' সুতীর্থ এসে জিজ্ঞেস করল।'

সূচীপত্রে যান

'ও চলে গেছে।'

'যাবার সময় আমাকে জানিয়ে গেল না?' সুতীর্থ ইয়াসিনের দুটো ছড়ানো ঠ্যাঙের ফাঁকের ভেতরেই এসে যেন বসল। দেখে ইয়াসিন মাথাটা ওপরের দিকে চাড় দিয়ে ঠেলে ঠ্যাং গুটোতে গুটোতে বললে, 'কী আর জানাবে?'

'আমায় নাকি ফতিমা ডেকেছিল?'

'কী আর হবে ঃ আপনি তো পিকেটিং করছেন।'

'তা বটে, কিন্তু মকবুল আফশোস করছিল। ও ভেবেছে আমি ওদের সঙ্গে ফ্যানভাত খেতে নারাজ।'

'ওতে কিছু হয় না দাদা। ও কিছু মনে করেনি। ভাত খেতে নাবাজ মানে? ভাত কোথায় পাবে যে আপনি গিয়ে খাবেন?'

'আমাদের কারুর—ঘরেই ভাত নেই।' বিশ্বম্ভর বললে।

'ফ্যান আছে, নুন আছে।' বললে নেপাল।

'কিন্তু কদিন থাকবে আর? কিন্তু তাই বলে লুকিয়ে চৌধুরীসাহেবদের খিড়কী দিয়ে ঢুকে কবুল করতে যাবে না বিনোদ সরখেলেব মত কেউ।'

'আর বিনদে সরখেল ; ওর পরিবার হাঁচি দিলে ও তো কাপড় নোংরা করে ফেলে—' বললে অনন্তরাম।

শুনে হাসল কেউ কেউ ; হাসি মুখে ফুটে উঠতে না উঠতেই মিশিয়ে গেল—শুকিয়ে গেল। বিড়ি যে নেই তা নয়, কারু কারু ট্যাকে কিছু কিছু আছে, কিন্তু দেশলাই-এরই বড্ড অভাব। একটা মাত্র দেশলাই হাতে হাতে ঘুরে ফিরছিল। দু-চারটে কাঠি বাকি আছে তার। ফুরিয়ে গেলে দেশলাই পাওযার জো নেই—এ মুল্লুকে—খাস কলকাতাযও সহসা কোনো দোকানে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু দেশলাই আনবার জন্যে কলকাতায় যাবে কে? বাস-ট্রাম আব একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। এ তল্লাট থেকে ট্রামবাস ধরতে হলেও বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয। ফ্যাক্টরির ভেতর অবশ্যি আগুনের অভাব নেই—আছে অঢেল দেশলাইও। কিন্তু কোনো মানেই হয না। তবুও বিড়ি জ্বলে উঠলো অনেকেব।

'আর চারটে কাঠি আছে কিন্তু রসুল।'

'মাত্র চারটে। এই নিয়ে সারা রাত কাটাতে হবে। আর কারু কাছে মাচিস আছে নাকি ধর্মঘটীরা—' হামিদ কলকী বাজিয়ে হুঙ্কার দিয়ে শুধোল।

'আছে আমার কাছে—' অনেক দূর থেকে জানান ছিল বিশ্বম্ভব।

একটা মরা গুঁড়িব আড়ালে বসে পেচ্ছাপ কবছিল সে। কিন্তু ভালো মানুষ, জল খালাস কববাব অবস্থাতেই হামিদের ডাকের জবাব না দিয়ে পারল না।

সুতীর্থ মিহি সুরে ভাবছিল ঃ বিশ্বম্ভরেব কাছে থাকবে না? ও তো বিশ্বকেই ভবে রেখেছে। সুতীর্থ অবাক হযে ভাবছিল ঃ এ কি ভাবছি আমি, এ কি বোকার মত কথা ভাবছি।

'খুব মাটির মানুষ বিশ্বম্ভর। কালো-বোগা-ঢ্যাঙাখোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি সব সমযেই গাল জুড়ে থাকে। আট দশটি ছেলেপুলের বাপ—স্ত্রী আবার পোযাতি। পবিবারসুদ্ধ সকলেই ম্যালেরিযায় ভুগছে। এত কাচ্চাবাচ্চাব মালিকানা অবিশ্যি বিশ্বম্ভবের—কিন্তু এদের সকলেরই জন্ম দেওয়ার দায়িত্ব যে তার একাব নয় সেটা সকলেই প্রায় জানে। জানুক, তাতে বিশ্বম্ভবের এসে যায না কিছু। সে তার স্ত্রীকে অবিশ্বাস করে না ; সে জানে, যে তার স্ত্রীব সঙ্গে তাব শোযাবসা—বোজ রাতেব ; ছেলেপুলে অপরেব হতে যাবে কি করে? অনেকে তার স্ত্রীকে বাঁড়ি বলে খোঁটা দেয—বিশ্বম্ভবেব মুখেব ওপব রাঁড়ি আব ফড়ে বলে জেরবার করে দেয তাদেব দুজনকে। দিকগে, তাতে স্ত্রীর ওপব আসক্তি তাব বেড়েছে বই কমেনি ; এই তো এই মাঘ ফাল্গুনেই বিশ্বম্ভবের স্ত্রীর হযে যাবে একটা কিছু। সুতীর্থ জানে এই সব। তাকিযে দেখল বিশ্বম্ভর পেচ্ছাপ করে ফিবে আসছে।

'আমার কাছে দেশলাই আছে হামিদ—' হেঁটে আসতে আসতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিল বিশ্বম্ভর।

'আহা, এই সব বেচারী মানুষের ভিড়। কি অবিস্মরণীয এদের নিববচ্ছিন্ন অন্ধকারেব ভেতর প্রাণপাত ; পাড়াগাঁর বিশ্রী বিদঘুটে বর্ষায খালুয়ের ভেতর ল্যাটামাছেব মতন। কোনো সূর্য নেই, নক্ষত্র নেই।' সুতীর্থের মনে হল।

'ক'টা দেশলাই আছে বিশ্বম্ভব?'

সূচীপত্রে যান

'একটা শুধু।'

'ক'টা কাঠি হবে?'

'গুণে দেখতে হয়—'

বিশ্বম্ভর কাঠিগুলো বাঁহাতের চাটির ওপর ঝেড়ে নিয়ে এক এক করে গুনছিল।

'আরে দূর দূর! আন্দাজে বলতে পার না? রেখে দাও—রেখে দাও বাক্সর ভেতর—হিমে মিইয়ে যাবে বিশ্বম্ভর—' চীৎকার করে উঠল অনন্তরাম।

'এই গোটা পঁচিশেক কাঠি হবে হামিদ—' হেসে মাড়ি বের করে বললে বিশ্বম্ভর।

'আচ্ছা বেশ, চটপট ভরে ফেল সব। নাও, এখন দাও বাক্সটা আমাকে।' বললে অনন্তরাম।

'তোমাকে দেব অনন্তরাম?' হামিদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কি নির্দেশ আসে না আসে, কি করবে না করবে—এ জীবনে কে'চোমাটি ওগরানো ছাড়ানো ছাড়া আর কিছুই যেন করা যায় না—এমনিভাবে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বম্ভর।

'দিয়ে দাও অনন্তরামকে।' ফতোয়া এল হামিদের।

'চট করে দিয়ে দাও অনন্তরামকে, না হলে তুমি লগ্‌গি করেই মাচিসের জান খেয়ে নেবে—' বঙ্কু বললে।

'আর কার কাছে মাচিস আছে?' হাঁক দিল হামিদ।

আর কারু কাছে নেই।

সুতীর্থ বললে, 'এ জানলে আমিই তো কলকাতার থেকে আসবার সময় দু ডজন নিয়ে আসতে পারতুম।'

'ঠিক আছে সুতীর্থবাবু।' ইয়াসিন বললে, 'বিলকুল।'

সুতীর্থ বললে, 'তোমরা কি সারা রাত এখানে থাকবে হামিদ?'

'হ্যাঁ।'

'এই খোলা মাঠে?'

'থাকব।'

'সারা রাত থাকবার কি দরকার?

'দরকার নেই অবিশ্যি, আমরা একটু বাড়াবাড়িই করছি। তবে ফ্যাক্টরির কাজ তো সারা রাত চলে। নাইট শিফটে কাজ করবার জন্যে আমাদেরই কেউ কেউ হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে ঝুলে পড়বে কিনা আন্দাজ করে নেবার জন্যেই সারা রাত থাকা দরকার। আমরাই আমাদের নজরবন্দী করে রাখছি।'

'ওঃ—' সুতীর্থ বললে। পকেটের থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে হামিদের দিকে ছুঁড়ে মেরে বললে, 'বিলিয়ে দাও হামিদ।'

'আপনি চলে যেতে পারেন সুতীর্থবাবু।'

'না। আমি থাকব।'

'পুলিশ আজ রাতে আসবে না আর।'

'তা আসবে না হয়তো।'

'আপনি কেন আমাদের খাতায় নাম লেখালেন সুতীর্থবাবু? আপনি তো কুলিকামিন নন—মিস্ত্রি প্লাম্বার নন—'

'আমি খেয়ালী মানুষও নই। অবিশ্যি আমি নাম লেখাইনি। নাম লিখিয়েছে বিশ্বম্ভর, লিখিয়েছ তোমরা সকলেই। আমার আজকাল হাতে খড়ি।'

ঘনশ্যাম (আই এস-সি পাস, যাদবপুরেও কিছুদিন পড়েছে) বললে, এটা সুতীর্থবাবুর তা দেবার সময়। সেটা ভালো কথা। কিন্তু আপনি তো আমাদের মেসো-পিসে চাচা ফুপো নন, আপনি আমাদের নিজের বীটের লোক আমাদের এখানে বক্তৃতা করতে আসেন বক্তৃতা ফলাও হলে বক্তারা চলে যায়, কিন্তু আপনি এখানে থেকে যান মশাই। কেন থাকেন? আমাদের টানে নয়, নামডাকের জন্যেও নয়, আপনি এখানে থাকলেই স্ট্রাইকটা উতরে যাবে সে ভরসায়ও নয়। এখানে থাকতে খুব ভালো লাগে না আপনার ঃ কেন মিছিমিছি মার খাচ্ছেন নিজের মনের কাছে? কেন ঘুরছেন? কেন ত্রিশঙ্কুর মতন কড়িকাঠের সঙ্গে হাওয়ায় দুলছেন—'

কেউ কোন কথা বললে না। কিন্তু সুতীর্থকে তারা হামিদ অনন্তরাম ঘনশ্যাম ইয়াসিনের মাথার

ওপরে পাণ্ডা মনে করে নিতে কেউই রাজি ছিল না কিছুতেই। ত্রিশঙ্কুর মানে এরা কেউ কেউ জানে, অনেকেই জানে না।

ওরা ভাবছিল : ত্রিশঙ্কু তো বটেই, এ লোকটা স্পাইও হতে পারে। এ মানুষ স্পাই নয় হয়তো, কিন্তু ঘোড়েলও নয়। একজন বদমাশ শাঁসালো লোকের দরকার আমাদেব—এ সব গান্ধীগিরি দিয়ে আমাদের হবে না কিছু।

সুতীর্থ অবিশ্যি গান্ধীধর্মী নয়—বিশেষ কোন বাঁধা ছক নেই তার, কেবলি জীবনটাকে বুঝে দেখতে চায় সে সুতীর্থ এ ধর্মঘটীরা তারই একটা উপলক্ষ্যে, দার্শনিকতায় বিজ্ঞতর হয়ে উঠলে বস্তুপুঞ্জের এসব অস্পষ্ট বিমূঢ়তাকে যে পায়ে পিষে চলে যাবে সে—হামিদ প্রভৃতি সামান্য মানুষও যেন সুতীর্থের এই চালাকি ধরে ফেলেছে। এই বিরূপ বিমুখ ভিড়ের সামনে বসে—তবুও বসে থাকতে হবে তাকে, বসে থাকতে হবে, শুয়ে থাকতে হবে, মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে, জেগে উঠতে হবে; মরে যেতে হবে। এ না-হলে একজন হতে পারবে না সে। হামিদ অনন্তরামরা 'হতে পাবত' চেষ্টা করছে না, তারা 'হচ্ছে', সুতীর্থের মত সংকল্প করে তাবা আবর্তের ভেতর এসে পড়ছে না. ছোট থেকে বড় হোক, অসাব হোক নিষ্ফল হোক, সময যেখানে তাদের এনে দাঁড় করিয়েছে সেখানে আজকের এই ধর্মঘটের (কালকের বৃহত্তর বিপ্লবের) সব চেয়ে স্বাভাবিক নায়ক তারা ; সমাজেব সমযেব যে স্তরে যেরকম-ভাবে লালিত হয়েছে সুতীর্থ তাতে ওরকম নিদারুণ স্বাভাবিকতার তাগিদ নেই তার : আজকেব এই ক্ষুদ্র আলোড়ন কিংবা কালকের বড়—বেশি বড় সব রক্ত বিপ্লবের সূচনা ও পবিণতি সম্পর্কে : সে বকম বিপ্লবের সম্পূর্ণ প্রয়োজন অনুভব করছে না সে, সে রক্তোৎসবের সহজ দৈন্য হযে দাঁড়াবাব মত বিশেষ কোন প্রেবণা নেই তার, তার বুদ্ধি ও জিনিস সমর্থন করে না। অবিশ্যি বুদ্ধি প্রেবণা সমবেদনা সংকল্প সবই তাব, যারা বিপ্লব না ঘটিযে পাবছে না তাদের জন্যে—মনে মনে ; একটা দার্শনিক প্রস্থানে দাঁড়িযে। কিন্তু স্থূলে বিপ্লব না ঘটিযেও মানুষেব ভালো হতে পাবে ; জনসাধাবণ হযে উঠতে পাবে সত্যই সফল মহাসাধাবণ ; বিপ্লবটা শান্তিতে শান্তভাবে পরিচালিত হতে পাবে, পাবে নাকি? সে রকম হলেই বুদ্ধি স্বপ্ন সংকল্পের একটা স্বাভাবিক ভূমিকা মিলত সুতীর্থের, নিতান্তই দর্শন প্রস্থানেব একটু বেসামাজিক উচ্চভূমি থেকে নেমে শান্ত অথচ অনবনমনীয সমাজবিপ্লবেব স্বাভাবিক কাজে সোজাসুজি হাত দিতে পারত সে ; কবি নয দার্শনিক নয শুধু আব—অক্লান্ত অপরিমেয কর্মী হযে উঠতে পাবত সে।

কিন্তু আজকেব অব্যবস্থাব মানুষ—সব মানুষই শুভার্থী মানুষেবাও এখনও খুব স্থূল, ভালো কাজ করতে গিযেও রিরংসা খুযু স্বাভাবিক, কল্যাণেব জানালা খুলতে গিয়ে জননীকে নিরবচ্ছিন্ন হত্যা করা শোকাবহ বা অপ্রাকৃত মনে হয না কিছু, সোজা চোবকাঁটা বেছে ফেলবাব কাজ যেন : আজকেব পৃথিবীর ইচ্ছা ও কর্মের মর্মার্থ তো এই। ইচ্ছা ও কর্মকে লালিত করা নয়, এ পৃথিবীতে চিন্তা ও অনুধ্যান ছাড়া বিশেষ কিছু সে কবতে পারবে বলে মনে হয না। কাজ করতে পাবে সে—কিন্তু আবো একশো দেড়শো সুতীর্থকে সঙ্গে নিযে, ঘনশ্যাম, বঙ্কু অনন্তবামদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিযে নয। ওদেব সঙ্গে হাত মিলিযেও কাজ করবাব চেষ্টা করতে পাবে সে—যেমন কবছে ; কিন্তু এ পবিবেশের আশ্চর্য দুর্বোধ্যতা ও প্রতিকূলতার জন্যে নিজেব সবচেযে উত্তম জিনিসগুলো দান করা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে। যে তথ্যকে সে সত্য বলে স্বীকার কবে না, যে অনুমানকে ভুল বলে জানে, যে প্রণালীকে সমর্থন করে না—মনকে চোখ ঠার দিয়ে আজকেব কালকেব আরো পবের ভবিষ্যতের একটা অস্পষ্ট কল্যাণেব প্রত্যাশায সেই অস্বীকার্য অপমানবীয জিনিসগুলো গ্রহণ কবেছে সে। এ ছাড়া এ যুগে সকলেব সঙ্গে মিলে কাজ করবার উপায় নেই—উপায নেই আর ; কাজ কবা ছাড়া পথও নেই এ যুগে ; নিজের সত্তা যুক্তিতর্কেব চিন্তা অনুশীলনের প্রভাবে অপবদেব যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ করে নেবাব চেষ্টা কবে (ব্যর্থ সে চেষ্টা) নিদারুণ অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার বলযেব ভেতর কাজ করা ছাড়া উপায নেই—উপায নেই এ যুগে।

তেইশ

এর পর সুতীর্থের চিন্তার মোড় ঘুরে গেল : চিন্তা রইল না আর কেমন নিদ্রালু ভাবালু হয়ে পড়ল সে : ওদের একজন হয়ে পড়ার ভেতর বিশেষ কোন মানে নেই। কি হবে অনন্তরাম হামিদ ঘনশ্যামের মতন হয়ে? মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গীন ব্যবহার ও লক্ষের কাছে এরা ও এদের এই প্রাণান্তকর ধর্মঘটেব সার্থকতা নিতান্তই স্থূল—ম্যাড়মেড়ে। কিন্তু তবুও নানারকম আঘাটার ভেতর দিয়ে চলতে হয় মানুষকে দৃষ্টি শুদ্ধ করে নেবার জন্যে, জীবন ঠিক করে তৈরি করে নেবাব জন্যে। এই দার্শনিক সত্যেব

জন্যেও—কিন্তু তার চেয়ে বেশি ব্যক্তির কল্যাণেব চেয়ে অর্থনৈতিক কল্যাণস্থাপনার কেমন যেন একটা অব্যয় উত্তেজনায় এই ধর্মঘট নিয়ে পড়েছে সে। প্রাণকল্যাণের সমুদ্র রচনা করতে গিয়ে এখানকার এই ছোট্ট সংগ্রামটুকু তো এক ঝিনুক জল ; ঝিনুকটাকে স্বাতীর শিশিরের মত সেই জলে ভরে ফেলতে হবে। সৃষ্টির বড় সময়ের পাবে দাঁড়িয়ে পৃথিবীব ছোট সময়ের দিকে তাকালে পৃথিবীর বেড় সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিককার প্রাদেশিক ছোট সময়েব ছিটোফোঁটার দিকে চাইলে, ওদের ভেতর একজন হয়ে পড়ার কোন মানে নেই ঃ কি হবে হামিদ ঘনশ্যাম ইয়াসিন অনন্তরামের মত হয়ে?

কিন্তু তবুও এখানকাব এই এক ঝিনুক প্রাণপ্রবাহী জল সংরক্ষণ উৎসাবণ করা দরকাব প্রাণকল্যাণের সমুদ্র সৃষ্টি করতে গিয়ে। দরকার? এইসব এক কড়িব ছাঁদার ভেতর থেকে সমুদ্র বেরুবে বুঝি?

'আপনি শুয়ে পড়লেন সুতীর্থবাবু?' হামিদ বললে।

'একেবাবে চিত হয়ে মাটিব ওপবে যে, একটা চাটাই এনে দিই—'

বঙ্কু বললে।

'তোমার তো সর্দি হয়েছে বঙ্কু—'সুতীর্থ অন্ধকাবের ভেতব চোখ বুজে থেকে বললে, 'গলা ভারি হয়েছে তোমার। নাক ফোঁসফোঁস কবছে। ক'রাত জাগলে?'

বঙ্কু কোনো কথা না বলে উঠে চলে গেল। সত্যিই সর্দিতে ঠাণ্ডায় সে বড় কাবু হয়ে পড়েছিল।

'ঘুমিয়ে পড়লেন সুতীর্থবাবু।'

'আকাশেব তারা দেখছি।'

'যদি ঘুমিয়ে পড়েন হোথা ঐ ক্যাম্পে বেখে আসব আপনাকে পাঁজাকোলা কবে—'

'ওটা কাদের ক্যাম্প?'

'আমাদেরই ; ধর্মঘটীদেব।'

'না। এইখানেই থাকব আমি।'

'নিমুনিয়া হবে—ঠাণ্ডা লেগে—শিশিরে শুয়ে—

'সমুদ্রে যাব শয্যা, তার আবাব শিশিবে ভয়,' দূবেব থেকে বললে বঙ্কু। চুপচাপ পড়েছিল। সকলেই—বাত আব একটু থমথমে হলে একজন দুজন কবে উঠে চলে যেতে লাগল, কে কোন্‌দিকে যায় অনন্তবাম আব হামিদ কড়া নজবে পাহাবা দিয়ে দেখছিল।

সুতীর্থ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আধঘণ্টা পবে দূবে টর্চলাইট দেখা গেল।

'হ্যাঁ পুলিশই আসছে হামিদ', অনন্ত বললে।

'ঘনশ্যাম কোথায়?' হামিদ জিজ্ঞেস কবল।

'দেখছি না তো। এই বঙ্কু' বঙ্কু!'

'অত জোবে ডাকিসনেবে অনন্ত।'

'আমরা কি লম্বা দেব নাকি হামিদ?'

হামিদ মাথা নেড়ে বললে, 'ঘ্যাট হয়ে বসে থাক যে যার জায়গায় আছিস।'

'তাবপর?'

'পেটালে পড়ে পড়ে মাব খাবি ; গ্রেপ্তাব কবে নিয়ে গেলে যাবি সঙ্গে চলে, কাঁদুনে গ্যাস যদি ছাড়ে তবে কাঁদবি—'

'আর গুলি করে যদি—'

তাহলে পিস্তুত থাকবি—'

'পিস্তুত?'

'স্ট্রেচাব আছে, হাসপাতাল আছে, মরলে আধপোড়া হয়ে গঙ্গা পাবি তো;—মোচলমানকে মাটি দেওয়া হবে ; এ সবের জন্যে ভাবনা করিসনে। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।'

কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ গ্যাস-গুলিব ধার দিয়েও গেল না। হেসে খেলে কয়েকজনকে ধবে নিয়ে গেল শুধু, সুতীর্থকেও।

বাকি সবাইকে পুলিশেব হেপাজতে চালান দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টব মুখার্জি সুতীর্থকে নিয়ে ফ্যাক্টরির তেতলায় তার খাস কামবায় গিয়ে উঠল।

'আসুন, বসুন, আপনিই তো সুতীর্থবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি তো কমার্শ্যাল ফার্মে কাজ করেন?'

'কাজ করতুম—'

'আপনার চাকরি তো বহাল আছে—'

'আমি ছেড়ে দিয়েছি—'

'নিজে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলে আমি নাচার। কিন্তু আজো ফোনে মল্লিক আপনার কথা বলছিলেন—'

'কি বলেছিলেন জিজ্ঞেস করতে গেল না সুতীর্থ। কোন ঔৎসুক্য ছিল না তার।

'আপনি অফিস অ্যাটেণ্ড করলেই পুরো মাইনেতে আপনাকে এ কদিনের ছুটি দিতে রাজি। মল্লিক বললেন। আসুন—'

সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুলে সুতীর্থের দিকে এগিয়ে দিয়ে মুখার্জি বললেন—'আসুন, নিন, আপনিই বেঙ্গল সাপ্লাই কর্পোরেশনের সুতীর্থবাবু। সাপ্লাই কর্পোরেশনের সঙ্গে আমাদের এই ফ্যাক্টবির কি সম্পর্ক সুতীর্থবাবু?'

'আমি তা জানব কি করে বলুন।'

'ওটা হল কলকাতাব এক প্রান্তে, এটা হল আব এক কিনারে। প্রায মাইল দশেকের ব্যবধান দুটোর মধ্যে। আপনি হলেন সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন ডিপার্টমেণ্টাল হেড-ম্যানেজিং ডিবেক্টর মল্লিক সাহেবেব—ইয়ে—মার্গ সঙ্গীত ; আবার আপনিই এখানকার কুলিকামিন হামিদ অনন্তবামের গোঁসাই। এ সব দশঘাটের জল এক পীরের ঘাটে কি করে আনলেন দাশগুপ্ত মশাই?'

'ঢল নেমেছে বলে এক হয়ে গেল সব।'

মুখার্জি একটু চুপ করে থেকে বললে, 'মল্লিক সাহেব আপনাকে সমীহ করেন কেন জানেন? আপনাব কাজের নিপুণতাব জন্যেও বটে, তাছাড়া গভর্নমেন্টের একজন বড় মিনিস্টাব আপনাব ডাকসাইটে ইযাব!' মুখার্জি বললে।

'আমার ইযার? না তো কোন ডাকসাইটে পৃথিবীতে আমার লোভ নেই। কোনো মিনিস্টাবকে আমি চিনি না ; তাদের কেবানীদেরও কৃপার পাত্র আমি মুখার্জি সাহেব। এগুলো কি?'

'বোতল। হোযাইট লেবেল।'

'হোয়াইট লেবেল? এ সব ডুমুরফুল পেলেন কোথায আপনি? এ বাজাবে তো এ অপযাগুলোকে চোখেই দেখা যায না। দুজনেব জন্যে সবঞ্জাম দেখছি—'

'আপনি আর আমি—'

'আমি না—আমি ও সব খাইনে কোনোদিন।'

'এখন নয—এক্ষুণি নয সুতীর্থবাবু। গলা শুকিযে এলে ভিজিযে নেবেন গলা। যদি না শুকোয নাই বা ভেজালেন। বমি হবে না, বন্দোবস্ত করে দেব। যদি তিতো লাগে, ম্যাজম্যাজ করে, মানুষ কি মেযেমানুষকেও ছুঁতে যায? এ তো হোয়াইট লেবেল শুধু। ভোগেব জিনিস আনন্দ দেবে বইকি।'

মুখার্জি বললে, দু' হপ্তা ধরে এই স্ট্রাইক নিয়ে কুঁদছেন কেন আপনি—'

'বেছে বেছে আপনাদেব ফ্যাক্টরিব ওপবই যে আমাব বিদ্বেষ তা নয মুখার্জি সাহেব। আমাদেব নিজেদের ফার্মেই ধর্মঘট হবাব কথা ছিল। কিন্তু সেটা হল না।'

'কেন?'

'সেটা পরে হবে। দৈবচক্রে এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম আমি—'

'কবে বলুন তো?'

দিন পনেরো ষোল আগে।'

'সাহেবী পোশাক?'

'হ্যাঁ, বেশ জাঁকালো সুট পরে।'

'মাথায় হ্যাট ছিল তো? বলুন তাবপর' মুখার্জি বললে।

সুতীর্থ সিগারেটটা পুরোপুরি না খেয়েই অ্যাশট্রের ভেতর ফেলে দিল।

'একটা জিনিস হয়তো আপনি লক্ষ্য করেননি সুতীর্থবাবু।'

'কি, বলুন তো।'

সূচীপত্রে যান

'আপান আম্যার মতন লম্বা।'

সুতীর্থ আপাদমস্তক মুখার্জির দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'ঘাড়েগর্দানে একটু বেখাপ্পা হয়েও আপনি লম্বা বইকি মুখার্জিসাহেব—খুব লম্বা। মুখার্জিসাহেব—খুব লম্বা।'

'আমি সব সময়েই সাহেবি পোশাকে চলিফিবি। আপনি হ্যাটকোট পরে যখন ঠাঁটে চলেন পেছন থেকে ঠিক আমাবই মতন দেখায় আপনাকে।'

'কবে দেখলেন?'

'মুখের ছাঁদও আপনার কতকটা আমার মত। কিন্তু তাকালেই পার্থক্য ধরা প'ড়ে। কারু মতে আপনার মুখ বেশি সুন্দর, আমার বেশি পুরুষোচিত। এই দেখুন আমার ফোটো।'

সুতীর্থ ফোটোর দিকে তাকাল না। 'আপনাকেই তো দেখছি।'

'নানা মানুষের নানারকম মত থাকে বইকি। কিন্তু সে যাকগে আসল কথা হচ্ছে সাহেবী পোশাকে মেজাজী চালে চললে আপনাকে যদি কেউ মুখার্জি সাহেব বলে ভুল করে থাকে, তবে তাকে দোষ দেযা যায না। নিন, আসুন, এইবারে শুরু করা যাক।' মদের বোতলেব দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মুখার্জি।

সুতীর্থ মাথা নেড়ে বললে, 'না খাই যে তা নয়, কিন্তু খোঁযাড়ি ভেঙে খাঁই নেই আজ আর।'

'নেই আজ? সাধব না তবে। আমি যদি একা পেরে না উঠি দযা কবে সাহায্য কববেন এই ভরসায থাকব।'

বোতল ভেঙে খানিকটা মদ ঢেলে নিল সাহেব, খেল না, রেখে দিল এক পাশে সরিয়ে। 'সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন অফিসাব আপনি। এখানে এসে মুদ্দোফবাসদেব সঙ্গে মিশে তাদের মড়ার ফ্যান খেয়ে বাড়ির ইজ্জৎ বাঁচিয়ে স্ট্রাইক কবছেন আপনি। লোকে শুনলে বলবে কি!'

সিগাবেটেব খোলা টিনটা টেবলেব ওপব কাত হযে পড়েছিল। একটা সিগাবেট খসিযে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'আমি ওদেব ধর্মঘটে যোগ দেওযাতে এটাব খুব জোব বেড়েছে মনে করেন?'

যাবা সব সমযেই নিজেদের গা বাঁচিযে চলতে চায সে সব বিজ্ঞ ভদ্রলোকদের চাবদিকে বসিযে বেশ ঘোড়া ঘোড়া খেলা দেখাচ্ছেন আপনি। কিন্তু আপনাব মাথা আছে—আবেগ আছে—আপনি ঝামেলা যে না বাধাতে পাবেন তা নয।'

'দুর্ঘটনাব কোনো লক্ষণ দেখছেন? ফ্যাক্টবির ক্ষতি হবে মনে কবছেন?'

'ক্ষতি! ফ্যাক্টরিব জীবনমরণ নির্ভব কবছে এই স্ট্রাইকেব মীমাংসার ওপব।'

মুখার্জি বললে, 'এ সব গুহ্য তত্ত্ব আপনাব জানবাব কথা নয। কিন্তু আপনি তো আমাদেব লোক। আপনাব কাছে বেখে ঢেকে কি আব লাভ।'

চুরুট জ্বালিযে নিয়ে মুখার্জি বললে, 'অন্তবাম, হামিদ ইযাসিনও জানে।'

'কি করে?'

'ওবা সব জানে।'

'শুনে সুতীর্থ ভবসা পেল খানিকটা, দেশলাইযে সিগারেটটা জ্বেলে নিল।

'ঘুষ কবুল কবছি, কিন্তু বাগে আনতে পারছি না কাউকে?

'কাকে চান বাগে আনতে?'

'মুখার্জি মদেব গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে না খেযে নামিযে বেখে বললে, 'একে একে সকলকেই। আপনাকেও। আপনাকেই প্রথম। কান টানলে তবে তো মাথাশুদ্ধ চলে আসবে। মাবপিট কবব না, মন মেজাজ ভেঙে দিতে যাব না। চেষ্টা কবলে দুটোই পারি ; কিন্তু সেবকমভাবে কতগুলো ন্যাঙন্যাঙে মানুষকে দিয়ে ফ্যাক্টরি চালানোও যা অন্ধকাব রাতে একটা বালিশকে ধানজমি ভেবে ক্ষেত্র প্রস্তুত কবাও তাই। সে সব করে কে আর সোনাব সন্তানদেব বাপদাদা হতে পেরেছে—'

এবারে এক চুমুকে গেলাসটা শেষ কবে ফেলে মুখার্জি বললে, 'তাছাড়া আধুনিক যুগের মানুষ মানে মানুষবাদ আমাব ভালো লেগেছে। ওরাও মানুষ। তাই তো।'

'কি করবেন তাহলে?'

'ওদেব বাইশ দফা দাবি আপনিই বেঁধে ঠিক করে দিযেছিলেন?'

'ওদের সবায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে খসড়া তৈরি করেছি।'

'ওদের সকলেব সঙ্গে পরামর্শ করে শীলমোহর সেঁটে রেখে দিন।'

'তাহলে কি করে স্ট্রাইক ভাঙে?'

সূচীপত্রে যান

'ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলো আমরা মেটাব, কিন্তু অনেক দাবিই অন্যায়।'

'এ আমরা মনে করি না। আমরা ভালো করে বিচার-বিবেচনা করেই দাবিগুলো ঠিক করেছি।'

'কিন্তু বাইশটা দাবি থাকলে যদি এগারোটা মেটে সেই কি যথেষ্ট নয়?'

সুতীর্থ বললে, 'আখখুটে ছেলের বায়না হলে তা হত, আমি বুঝি মুখার্জি ; কিন্তু এতো তা নয়, নুন-ভাতের—বাঁচা মরার জিনিস—'

'তাহলে আমাদের কি করতে বলেন সুতীর্থবাবু?'

সুতীর্থ তৎ নগদ কোন উত্তর দিল না।

মুখার্জি কিছুক্ষণ চুরুট টেনে তার পরে বললে, 'কোন্ পথে যাব আপনি দয়া করে নির্দেশ দেবেন নাকি? ওদের যারা মা গোঁসাই তারাই আমাদের গুরু গোঁসাই। তাই বলছি একটা পথ বলুন।'

'পথ চান, মেনে নিন দাবিগুলো।'

'কটা?'

'সব কটাই।'

'এই মন নিয়ে আপনি পলিটিকস করছেন সুতীর্থবাবু?

'আমি পলিটিকসের বাইরে।'

'তাই বুঝি? খিড়কীর ছ্যাঁচা দিয়ে একেবারে সদরে প্রবেশ করেও এই কথা? হেঃ হেঃ হেঃ—' মুখার্জি পাইপ বের করে বললে, 'অগত্যা এটা আপনার না বুঝলে চলবে না যে কিছু খেতে হলে কিছু ছেড়ে দিতে হয়। কমপ্রোমাইজ ছাড়া পলিটিকস ইকনমিকস সামাজিক জীবন কিছুই চলে না।'

'একথা আমি মনে প্রাণে স্বীকার করি মুখার্জি। কিন্তু ঐ বাইশটে দফাই তো কমপ্রোমাইজ—দাবিগুলোকে পঞ্চাশের কোঠায় ওঠাতে পারতুম।'

পঞ্চাশের কোঠায়—একশোর কোঠায়—মানে ইয়াসিন হামিদ অনন্তরাম বিশ্বম্ভর—সকলের জন্যেই এক একটা বাগানবাড়ি করে দিতে হবে, সাতটা করে বাঁদী রেখে দিতে হবে, চৌদ্দটা করে বেশ ফর্সা রায়বেঁশে দারনা—ভদ্দরঘরের থেকে যোগাড় করে—'

'আমি উঠলুম।'

'শুনুন আরো কথা আছে।'

চব্বিশ

মুখার্জিসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত পেছনে বেঁধে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে করতে বলেন, 'শীত পড়েছে।'

ফিরে এসে গেলাসে ভর্তি করে মদ ঢেলে নিয়ে এক-আধ চুমুক খেয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল গেলাসটা।

'উঠছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবেন ভাবছিলেন? স্ট্রাইকের চাঁইরা তো সব চলে গেছে। এখন একা গিয়ে মাঠে শুয়ে থেকে কি লাভ?'

'না শুলে ঘুমোব কি করে?'

'এইখানে ঘুমের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। গয়ানাথ মালোকে আপনি চেনেন?'

শুনে সুতীর্থ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

'গয়ানাথ মালোর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, শুনেছি বইকি।' সুতীর্থ আর একটা সিগারেট বার করে নিল টিনের থেকে।

'গয়ানাথ মালো খুন হয়ে গেছে?' মুখার্জি জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে। তার খুনের খবর তো আমাকে দিয়ে যায় নি।'

'মানুষটাকে চিনতেন তো আপনি?'

'ঘটনাচক্রে চেনা হয়ে গিয়েছিল।'

'শুনে সুখী হলুম যে, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না। আপনি কি করে গয়ানাথকে চিনলেন ওরা—মানে ধর্মঘটীরা তো মনে করে যে, সে খুন হয়েছে—আমরাই করেছি তাকে খুন।'

সূচীপত্রে যান

সুতীর্থ চুপ করে সিগারেট টানতে লাগল।

'গয়ানাথের সঙ্গে শেষবারের মত দেখা কার হয়েছিল?'

কোনো কথা বললে না সুতীর্থ ; কথা বলাব মাছি হয়ে মাকড়সার জালেব দিকে উড়ে গেলেই যে সে আটকে পড়বে, কিংবা আটকে পড়লেই যে আকাশ ভেঙে পড়বে মাথাব ওপর—তা কিছু নয়;—সুতীর্থ এমনিই কথা বলবে না এখন আর। কথা যা বলার তা বলাও হয়ে গেছে ; কথা বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই আব।

'বলুন।'

'বলবাব কিছু নেই আমাব।'

মিঃ মুখার্জি পায়চাবী করতে কবতে কথা বলছিল ; চেয়াবে এসে বসে বললেন, 'কোর্টে ; তো জবাব না দিয়ে পাববেন না।'

'আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে সুতীর্থবাবু। জলের মত পরিষ্কাব সব। আজ থেকে ষোলো দিন আগে আপনি একটু সকাল সকাল অফিস থেকে বেবিয়ে হ্যাট কোট পবে একেবারে এই এলাকায় এসে হাজিব হয়েছিলেন।'

সুতীর্থ শুনছিল।

'কেন এসেছিলেন তাও জানি। তখন বেলা চারটে হবে। আপনি এসেছিলেন হামিদ আব সত্যকিঙ্কবেব সঙ্গে দেখা করতে। হামিদেব কাছ থেকে খবব পেয়েছিলেন যে, আমাদেব ফ্যাক্টবিতে স্ট্রাইক চলেছে। আপনাব কাছে কিছু টাকাব সাহায্যেব জন্যে গিয়েছিল হামিদ। সে ভাবতেও পাবেনি যে, গায়েপড়ে এবকমভাবে সাহায্য করতে আসবেন ওদের! আপনি একেবাবে দড়িটড়ি ছিঁড়ে বাছুরদের ভেতব ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে স্ট্রাইক কববেন—এতে ওবা নিশপিশ নিশপিশ কবছিল।' বলতে বলতে মুখার্জি উঠে দাঁড়াল। ঘবেব ভেতর পায়চারী কবতে কবতে বললে, 'হামিদেব সঙ্গে আপনাব কতদিনেব আলাপ?'

'অনেক দিনেব।'

'কি কবে হল—আলাপ?'

'হামিদ কলেজ স্ট্রিটেব পুবোনো বইয়েব দোকানদাব আলতাফেব ছেলে। সে দোকানে প্রায়ই যেতুম আমি বই নিতে। কুড়ি পঁচিশ বছব আগেব কথা সব ; হামিদ তখন ছোট ছিল।'

'আমাদেব ফ্যাক্টবিতে যে ও কাজ কবছে তা জানতেন?'

'শুনেছিলুম ভালো মিস্ত্রি হয়েছে। কিন্তু কোথায় কাজ কবছে জানা ছিল না আমার। অনেকদিন দেখা হয়নি ওব সঙ্গে। আমি কোন খোঁজখবব নিতে পাবিনি।'

'আপনি যে সাপ্লাই কর্পোরেশনে কাজ কবছেন কি কবে জানল হামিদ?'

'অনেকদিন আগে বাসে দেখা হয়ে গিয়েছিল একবাব। তখন বলেছিলুম।'

মুখার্জি টেবিলে ফিরে এসে এক চুমুকে গেলাস শেষ কবে ফেলে দেবাজ থেকে একটা চুরুট বেব কবে জ্বালিয়ে নিল। ইজিচেয়াবে বসে বললে, 'আপনি যে আমাকে এ সব কথা বলছেন এ কোন কোর্টেই আপনাব প্রামাণ্য বক্তব্য বলে স্বীকৃত হবে না। কোন সাক্ষীসাবুদ তো—কেউই নেই ; আপনি আব আমি শুধু। মনে হয়, অবিশ্যি যে জেবা করছি আমি ব্যাবিস্টাবেব মত, আবহটা হাইকোর্টেব মতই। কিন্তু হাতে-কলমে নথিপত্রে সেঁধুচ্ছে না কিছুই। আমাব কাছে বলছেন একবকম ; যদি বলেন গিয়ে আবেক বকম আর এক জায়গায়, বাধা দেবাব কেউ থাকবে না তা হলে—কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে তাব কোনো সাধু প্রমাণ থাকবে না!'

'সত্য কথা ছাড়া আমি বলি না কিছু।'

'মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজন হলে ববং চুপ কবে থাকেন। তা আমি জানি। সে যা হোক, এখানে আপনাব দ্বিধার কোন কাবণ নেই। আপনার কোন কথাই আপনাব বিরুদ্ধে ব্যবহার করবাব মতলব নেই আমার। আপনি আপনার খাঁটি গল্পটা পরিষ্কাব কবে বলে গেলেই আমি খালাস—আপনিও। তাবপর ঘুমোবেন গিয়ে পাশের ঘরে।'

'পাশের ঘরে কেন?'

'কোথায় যাবেন তবে এত রাতে?'

'বাড়ি গিয়েই ঘুমোব।'

'কোথায় আপনাব বাড়ি? বালিগঞ্জে। ওঃ, আমি নিজেই গাড়ি করে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব

আপনাকে।'

মুখার্জি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিন ষোলো আগে আপনি বিকেল চারটে নাগাদ—এ পাড়ায় এসেছিলেন?'

'এসেছিলুম।'

'হামিদের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে কিছু টাকা দেবেন ভেবেছিলেন?'

'ভেবেছিলুম। তাকে শুধু নয়, সমস্ত ধর্মঘটীদের সাহায্য করবার জন্যে—'

'স্ট্রাইকটা যাতে খুব জোর চলে?'

'সেই জন্যেই তো টাকা দিলুম, নিজে এলুম—'

মুখার্জি বললে, 'এ জন্যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন কবতেও ছাড়েননি আপনি। মল্লিক সাহেবেব দেরাজ ভেঙে পাঁচশো টাকা নিয়েছিলেন—'

'ভেঙে নয়, তার দেরাজ খোলাই ছিল—'

'খোলা ছিল? না, চাবি দিয়ে খুলেছিলেন?'

'খোলা ছিল।'

'দেরাজ খুলে সোদপুরে গিয়েছিলেন তিনি আশ্রম দেখতে?'

'তিনি কাছেই বসেছিলেন। আমি তাকে দেখিযেই বলেছিলুম যে আমার মাইনে—দু দিন বাকি ছিল মাস শেষ হতে—দু দিন আগেই নিচ্ছি। স্যালারি বিল তৈরি হযেছিল ; আমি তাতে সই কবে টাকা নিয়েছিলুম—'

'উনি রাজি হলেন?'

'তক্ষুণি, এক কথায।'

'মানে গররাজি হলেন না।'

'স্যালারি বিলে সই কবে উনিই আমাকে টাকা নিতে বললেন।'

'আপনার মাইনে তিনশো টাকা তো ছিল—'

'পাঁচশো টাকা হযেছে গত মাস থেকে—'

'মল্লিক আমাদের কাছে বলেছেন যে, আপনি টাকা চুবি কবেছেন ওব দেবাজ থেকে—'

'চোর তো ও নিজেই।'

'আমিও জোচ্চোব নিশ্চয়ই?'

মুখার্জি সাহেব টেবিলের ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িযে নিল। নিবে গিয়েছিল, চুরুটেব মুখে ছাই জমে গেছে ; টোকা দিযে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'চাবটে নাগাদ এদিকে এলেন। পবনে অফিসের স্যুট—স্যামুয়েল ফিটজেব বাড়ির!'

সুতীর্থ একটা মশা তাড়িয়ে বললে, 'একরকম চীনে ধূপ দিযে মাঝে মাঝে মশা মেরেছি আমরা। আজকাল নানা রকম স্প্রে বেবিয়েছে। এ ঘরে মশা নেই বললেই হয, তবে একেবারেই যে নেই তা নয়।'

'সেদিন বিকেলবেলাই দিকবিদিক অন্ধকাব হযেছিল। সমস্ত আকাশ ছিল মেঘে ভবে ; অনেকক্ষণ ধরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল—একনাগাড়ে। পথঘাট বেশ পেছল হযেছিল।'

বেশ তো বলে যাচ্ছে মুখার্জি। কী করে বলছে? কোথায ছিল সে সেদিন? সুতীর্থেব খটকাব ঘোবটা কেটে উঠছিল না। অবাক হযে সে একবার তাকাল, কিন্তু হতবাক হল না। কিন্তু তবুও বললে না কিছু—বলবার ছিল না কিছু তার ; মুখার্জি তো নিজেই সাফ কথা বলে যাচ্ছে।

'নিন, এইবার আসুন।' আর একটা বোতল ভাঙল মুখার্জি।

'আর একদিন এসে খেয়ে যাব—'

মুখার্জি গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললে, 'কথা বইল তা হলে, মনে যেন থাকে।' গেলাসে একটু ছোট্ট চুমুক দিযে বললেন, 'আপনি সেই মেঘলা অন্ধকারে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ভেতর পেছল পথ ভেঙে যাচ্ছিলেন হামিদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে। ফ্যাক্টবিটা বন্ধ ছিল সেদিন। এখন চলছে দ্বিতীয় দফার স্ট্রাইক দশ দিন ধবে তখন চলছিল প্রথম দফার ধর্মঘট ; ধর্মঘটীদের সঙ্গে আমাদেব মিটমাটও হযে

গিয়েছিল প্রায়। স্ট্রাইকাররা কাজেও এসেছিল শেষ পর্যন্ত কাজ চলেও ছিল দু-তিন দিন। কিন্তু আপনার নির্দেশে এই দফার ধর্মঘটটা শুরু হল।'

মুখার্জি গেলাসে আর এক চুমুক দিয়ে বললে, 'কিন্তু সেদিন হামিদের দেখা পাননি আপনি। ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল, হামিদ চলে গেছল মেটেবুরুজে নাকি খিদিরপুরে—দু জায়গাযই ও রাঁড় আছে।'

'রাঁড়?'

'ও তো সিফিলিসের রুগী ঃ সিফিলিস হয়, ইনজেকশন নেয়। সেই জন্যেই তো ওদের এত ধর্মঘটের ঘটা। বাজারের স্ত্রীলোকদের ধর্মরক্ষা করছে ওরা, তারা ধর্মপুত্র দিচ্ছে, সিফিলিসের ডাক্তারকে দিয়ে সে সব সারিয়ে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে এসে ধর্মঘট ; ঘুরছে ধর্মচক্র।'

মুখার্জি চুরুট জ্বালিয়ে নিল।

'মালিকের গলা টিপে ধর্মের নামে এই যে টাকা আদায় করে নেওয়া একেই বলে ধর্মঘট—'

মুখার্জির মুখে কোন হাসি নেই, বিষও নেই। সংকল্প আঁটা হচ্ছে, আঁটা হচ্ছে, ফেঁসে যাচ্ছে এমনিই একটা ভাব তার মাথার ভেতর খুব কেজো বটে ; কিন্তু চোখে মুখে কোন বাষ্প নেই সে সবের, কোন জঞ্জাল নেই।

'হামিদের দেখা না পেয়ে আপনি পেছল পথ দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছিলেন।'

'চলেছিলুম বটে, কাউকে হাতের কাছে পাবার জন্যে।'

'কিন্তু জনমানব কোনদিকেই কেউ ছিল না। দুচারজন মজুর মিস্ত্রি অবিশ্যি তক্কে তক্কে ছিল আমাকে খুন করবার জন্যে নয় ঠিক—তবে বাগে পেয়ে একটা কিছু করে ফেলবার জন্যে। এদের মধ্যে গযানাথ মালোই ছিল সবচেয়ে বেশি কাপ্তেন। দেখতে ভিজে বেড়ালের মত, বেঁটে ঠুঁটো লিকলিকে; হাতে পাযে মাথায় গিজগিজ করছে ভাল্লুকের মত চুল, মাংস নেই, হাড্ডি নেই, রক্ত নেই, দাঁতের মাড়ি অবধি নেই ; চামড়া ফুঁড়ে রাশি রাশি যেন সাদা শনের জঙ্গল বেরিয়েছে। ময়মনসিং-এর ম্যাস্তা ক্ষেতের ভূত।'

'শুনেছি গযানাথ মালো—'

'ম্যালেরিয়ায ভুগছিল—সাত বছর ধরে ম্যালেরিয়া। কিন্তু ম্যালেরিয়ায ভুগে মানুষ এ রকম ভোম হয়ে যায়! ওকে দিনের বেলা দেখলেও আমার মন খারাপ হয়ে যেত। কেমন যেন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকত খিড়কির পুকুরের উদবেড়ালের মত ; হ্যাঁচকা চোখে পড়ে গেলেই সেদিনটা বেশ শুভে লাভে কেটে যেত দাদা—আঁদাড় পাঁদাড় তুকতাক দিয়ে জেরবার করার মতলব মশাই চব্বিশটা ঘণ্টা।'

মুখার্জি চুরুটের মুখে ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে রেখে দিল টেবিলের ওপর চুরুটটা ; টেবিলের কিনারে এসে দাঁড়াল।

সুতীর্থ বললে, 'যদি বলি গয়ানাথ আপনাদের ফ্যাক্টরিরই তৈরি জিনিস—আপনাদের কমটাটকা মাল—তা হলে ঠিক বলা হবে না। কিন্তু তবুও ওর চেহারা ছাপিয়েই আপনাদের ফ্যাক্টরির গালামোহর তৈরি করা উচিত ; আমি যদি এখানে কাজ করতুম এই মোহরই বুকে লটকে ফিরতুম—'

'আপনাদের ফার্মের কি মোহর?'

'এইটেই। এই সব কারখানা ডক কুলি মজুর নিয়ে যে পৃথিবী সেটার হুণ্ডি হ্যাণ্ডনোট হ্যাণ্ডবিলের ফাঁদলে আঁটবার মত মোহর এ ছাড়া আর নেই।'

'সেই মেঘলা অন্ধকারের ভেতর পেছল পথে বেশ ডাঁটের মাথায় হেঁটে চলেছিলেন আপনি। এ পাড়ার যে কেউ তখন আপনাকে দেখলেই মনে করত মুখার্জি সাহেব চলেছেন। গযানাথ মালো আপনার পেছনে ছিল, হিসেব আছে আপনার?'

'বাসিমুখে হেঁটে চলেছিলুম মনে আছে আমার। গযানাথ পেছনে ছিল?'

'গযানাথ মালো চলছিল আপনাকে খুন করতে—ভেবেছিল মুখার্জি সাহেবকে বানাতে চলেছে। আর একটু হলেই হয়ে গিছল—'

সুতীর্থ বললে, 'কেমন বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিলুম সেদিন।'

'কি রকম?'

'মনে হচ্ছিল আমি চলেছি গযানাথ পেছনে পেছনে আসছে আমার—আর উযের ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের আর বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে চৌধুরী ফ্যাক্টরির বামছাগলটা।'

মুখার্জি বসেছিল। চুরুটে টান দেওয়া হয়নি শীগগির। এইবারে টান দিয়ে দিয়ে চুরুটের মুখে আগুনের ফুলকি বার করে বেশ একরাশ ধোঁযা ছেড়ে আমেজ লাগিয়ে বললে, 'গযানাথ সাঁ করে

আপনাকে ছোঁরা মারতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের একটা খাদের মধ্যে। কিন্তু তাই বলে সে ছোরা তার নিজের পেটের ভেতর সাঁধল কি করে?' মুখার্জি একটা ঝাড়্‌ঝাপটা উত্তর চেয়ে সুতীর্থের দিকে তাকাল।'

পেটে সেঁধেছিল?'

পেটে না কলজেয় না হৃৎপিণ্ডে ; কোথায় সেঁধেছিল সুতীর্থবাবু? আপনিই তো সবচেয়ে ভালো করে জানেন—'

'রাত হয়ে গেছে মুখার্জি সাহেব—'

'আপনি তো ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছিলেন। আপনার কোট শার্ট টাই রক্তে ভিজে গিয়েছিল সব।'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে আন্দাজ করছিল। গযানাথ মালোর খুনের দাযিত্ব তার ঘাড়েই চাপাবার যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট ; এ চেষ্টা আইনেও টিকবে হযতো। টিকুক—যদি টেঁকে। কিন্তু সে তো খুন করেনি।

'গযানাথ মালোকে আমি দেখিনি কোন দিন—নামও শুনিনি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ দেখলাম একটা লোক দৌড়ে এসে হুমড়ি খেযে আমার সামনে একটা খাদের ভেতর পড়ে গেল। এমনই অদ্ভুত বেকাযদায পড়েছিল যে, ওর হাতের ছোরাটা ঘ্যাস-ঘ্যাস করে ঢুকে গেল ওর পেটের ভেতর—'

'পেটের ভেতর ঃ বুকে নয়?'

'শরীরের নীচের দিকে ঢুকেছিল। কিন্তু লোকটার খুব বাহাদুরী বলতে হবে। আমাকে এগোতে দেখেই ছোরাটা সে অসাধ্যসাধনে টেনে বের করল।'

'টেনে বের করল? চোখে দেখেছিলেন?'

'তাই তো মনে হল।'

'ছোরাকে পেটে ঢুকতেও দেখেছিলেন আপনি?'

'দেখেছিলুম বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'আর কি দেখেছিলেন?' মুখার্জি হাসতে হাসতে বললে।

'আমাকে বিশ্বাস করুন আপনি—আমি যা দেখেছি তাই বলছি।'

'চর্মচক্ষে দেখেছিলেন সুতীর্থবাবু? পেট থেকে ছোরা খসিযে আপনাকে মারবার জন্যে রুখে এল বুঝি?' মুখার্জি ঘাড় হেঁট করে হেসে চুরুটটা জানালার ভেতর দিযে ছুঁড়ে ফেলে দিযে গম্ভীর হযে গেল।

'আমাকে বোঝেনি। কি করে রুখবে ও? তবে চেয়েছিল তাই। ও আমাকে মুখার্জি সাহেব কিংবা তার দলের কোন ত্যাঁদড় মনে করেছিল হযতো কিন্তু ওর নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছিল। আমি যখন ওকে কোলে তুলে নিলুম—'

'কেন? কোলে নিলেন কেন?'

'কোথাও ডাক্তার হাসপাতাল রেডক্রস টেলিফোন—যা হোক কাছাকাছি কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে। তখন ও ছটফট করে আমার দিকে তাকিযে বললে, 'আপনি তো এই ফ্যাক্টরির কেউ নন—' বললুম, 'না তো—আমি এ পাড়ার লোক না', বললে, 'আমার নাম গযানাথ মালো, যদি দযা করে সত্য—কিঙ্করের কাছে আমার কথা বলেন, আমার ছেলেপুলে পরিবারকে যদি দযা করে আগলে থাকতে বলেন। আমাকে বললে, অনেক দযা আপনার, আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম ওদের সব—'

'ওর পরিবারকে আপনার হাতে দেওযা হল?'

'সত্যকিঙ্কর কে?'

'জেলে আছে।'

গযানাথ মালো কথা বলতে পারল না আর। কাৎরাতে লাগল। আমি তাকে খুব আলগোছে আগলে চলেছিলুম। সমস্ত জামাকাপড় আমার রক্তে ভিজে চটচট করছিল। একটা জনপ্রাণী দেখলুম না কোথাও।'

'না দেখে ভালোই হযেছিল।'

'আর এগোতেও পারা গেল না। মানুষটা মরছিল—ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিল। আমি তাকে ঘাসের ওপর শুইযে রাখলুম। তখনই সে মরে গেল। আমার কোলে থাকতেই মরেছে বোধ করি।'

'তারপর?'

'এ খবর আমি দেব—কে বিশ্বাস করবে—যে মরেছে সে তো মরেই গেছে—পরে এসে এক সময তা পরিবারের জন্যে ব্যবস্থা করা যাবে। ভাবতে ভাবতে আমি কলকাতার দিকে ফিরে গেলুম।'

'যদি বলা যায়, গয়ানাথ মালোকে আপনি খুন করেছেন!'

'তা বলা যেতে পারে অবিশ্যি। মোকদ্দমা সাজালে পেরে ওঠা কঠিন আমার পক্ষে।'

'হ্যাঁ, জলজ্যান্ত প্রমাণ সবই আমার কাছে রয়েছে। আপনার কোট নেকটাই জুতো রক্তে কাঁই কাঁই করছে সব। সবই আমাদের কাছে। সবই আপনার নিজেব জিনিস। সবই গয়ানাথ মালোর রক্ত। অস্বীকার কববেন আপনি?'

'এখন তো অনেক রাত হয়ে গেল।'

'কিন্তু খুনের দায়ে পড়েছেন যে।'

'গয়ানাথ মালোকে আমি খুন কবিনি!' সুতীর্থ বললে, 'সে তো নিজের হাতেই নিজে মরেছে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আপনাকে?' মুখার্জি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পাযচারী করতে কবতে বললে, 'বড় জঞ্জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন মশাই—'

'কোট টাই সবই আমার। কিন্তু বক্ত যে গযানাথ মালোব তাব প্রমাণ কি?'

মুখার্জি হে হে হে হে করে হেসে চুরুট জ্বালাল। 'কার বক্ত তা হলে?'

'যে কোন জীবিত মানুষেব।'

'তা হলেও তো ব্যাপাবটা বাহাজানি।'

'আমার নিজের গায়ের রক্ত।'

'নিজের গাযেব?' কিন্তু সেজন্যে এখন যদি নিজেকে কেটে ছিড়ে ফেলেন তা হলে ডাক্তারী পবীক্ষায টিকবে কি? নাকি আগেই শরীবে ছুরি মেরে ঠিক করেছিলেন? তাও টিকবে না।'

'উঠি এখন।'

'বসুন। আপনার কোট টাই সবই গযানাথ মালোব লাসটার কাছে পড়েছিল। আমরা এসে দেখলুম সব। যাদের দেখবার দবকাব একে একে সকলেই দেখেছি। অনেক ফোটো উঠে গেছে—প্লেট আছে সব আমাদেব কাছে।'

সুতীর্থ বললে, 'ফোটোগ্রাফের প্লেট কি মানুষকে খুনী বানায। সিগাবেট জ্বালিযে নিযে বললে, 'তা বানাতে পাবে—আইনেব চোখে। আমাব নিজেব চোখে তো আমি খুনী নই।'

'চোখ তো আইনেবই। মানুষ কে? আইনেব পযজার। মানুষেব কোন চোখ নেই।' মুখার্জি চুরুট টানতে টানতে বললে।

চুরুটটা টেবিলেব ওপব বেখে দিযে মুখার্জি বললে, 'কোন খুনী বলেছে কোনদিন যে সে খুন কবেছে? আপনি খুন কবে কবুল কববেন?'

'খুন করে এতদিন বেহাই পেলুম কি কবে আমি, সাহেব?'

'আমবা চাপা দিযে বেখেছি এ কেসটা।'

'কি মতলবে?'

'আপনি এসব ছেড়ে চলে যান। মল্লিক সাহেবেব ডিপার্টমেণ্টাল চেযাবে গিযে বসুন। যা নিযেছিলেন চিরদিন তারই চর্চা করুন গে যান। আমবা আপনাকে বলব না কিছু আর।'

সুতীর্থ কথা ভাবছিল, কিন্তু কথা ভাবতে গিযে সিগাবেটটা পুড়ে যাচ্ছিল শুধু কোন মীমাংসা হচ্ছিল না ; সুতীর্থ সিগারেটটা ফেলে দিযে বললে, কিন্তু গযানাথ মালোকে তো আমি খুন কবিনি।'

'আমবা তা জানি। আপনি নিজেও বলেছেন, অন্য লোকেব কাছ থেকেও শুনেছি আপনি মাবেন নি।'

'কে বললে? কেউ তো সেখানে ছিল না।'

'ছিল, আপনি দেখেন নি। বঙ্কুকে চেনেন?'

'বঙ্কু তো ধর্মঘটীদেব সর্দাব—।'

মুখার্জি হাঁটতে হাঁটতে ট্রাউজারেব পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বার কবে দুটো পিল ঢেলে নিযে বললে; 'সর্দাবও বটে, আমাদের পোদ্দারও বটে। ও যাতে সর্দাব হতে পারে এই কড়াবে ওকে আমাদের দালাল করেছি। বঙ্কু সেদিন গযানাথ মালোকে পাহারা দিচ্ছিল। গযানাথের কাছ থেকে অনেক আগেই জেনে নিযেছিল যে, আমাকে খুন করার তক্কে আছে সে। ছোবা ছিল না মালোব। আমবা বঙ্কুকে বললুম তকে তকে থাকতে। আমাব উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। কিন্তু আপনি এসে গযাসুরটিকে নিকেশ করে যা সাজিযে দিলেন ব্যাপাবটা ওরকম করেও বিছানা সাজিযে বসে থাকে নতুন বউ।'

মুখার্জি বললে, 'মড়াটাব গাযেব ওপব আপনার কোট টাই জুতো পড়ে বইল, আপনি চলে গেলেন

কলকাতায়—'

সুতীর্থ দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'আপনাদের মতে এটা বেকুবি।'

'আমাদের কোন মতটত নেই।' পিল দুটো সোডা দিয়ে গিলে ফেলল মুখার্জি। খানিকটা সোডায় মদে মিশিয়ে গেলাসটা সরিয়ে রাখল।

'কেমন যেন নিশির ডাকে হেঁটে চলেছিলুম।'

'কেউ কি ওরকমভাবে চলে? চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও চলে?'

'সচরাচর চলে না।'

'তবে কেন চলেছিলেন আপনি?'

'গয়ানাথকে কে খুন করেছে?'

'আপনি।'

সুতীর্থ হেসে বললে, 'গয়ানাথেব ভূত যদি উঠে এসে আপনাকে বলে যে, আমি তাকে মেবেছি তা হলে বিশ্বাস করবেন আপনি? আপনি তো জানেন আমি গয়ানাথকে মারিনি, কে খুন করেছে তাও জানেন আপনি।'

সুতীর্থ যখন কথা বলছিল মুখার্জি জল খাচ্ছিল। জলের গেলাসটা তেপয়ের ওপব রেখে দিয়ে মুখার্জি বললে, 'কিন্তু আইন বলছে সুতীর্থ গুপ্তের জামা জুতো রক্তে ভিজে ক্কাথ হয়ে গযাবামের লাসের ওপর পড়েছিল। কি বলবেন আইনকে আপনি?'

'কিছু বলবার নেই আমার।'

'আমাদেরও বলবার নেই কিছু। যা বলবার গয়ানাথ এসে বলবে।' টেবিলে ঠাণ্ডা জল ছিল কুঁজোর ভেতর। খেতে ইচ্ছে করছিল সুতীর্থের মুখার্জিরও তেষ্টা পেয়েছিল; জল। কুঁজোর থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছিল সুতীর্থ।

মুখার্জি বললে, 'ভুল সকলেরই হয়। শযতানেব হয না অবিশ্য। কিন্তু জামা জুতো লাস সব ছত্রখান করে ফেলে গেলেন এত ভুল আপনাব।'

সুতীর্থ জলের গেলাসটা শেষ কবে মেঝেব ওপর পাযেব কাছে রেখে দিয়ে বললে, 'অনেক দিন পর্যন্ত আমার নিশিতে পাওয়া রোগ ছিল। এ কয বছর ভালো ছিলুম। রোগটা আবার ফিবে আসছে মনে হচ্ছে। গয়ানাথ যেদিন মাবা যায তাব মৃত্যু অবদি হুঁস ছিল আমার তাব মববাব পর কি কবেছি না কবেছি কি হয়েছে না হযেছে কিছুই মনে কবতে পাবছি না। অনেক ট্রাম বাস বদলে- অনেকবার ঠিকানা ভুল করে খুব বেশি রাতে বাড়ি পৌছেছিলাম—'

'তা হবে' মুখার্জি বললে, 'সব কিছুবই সব রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সবগুলোই কি আর আইন আদালতে টেঁকে। শাশুড়ীব কাছে রামকানাইযের বায়নাও টেঁকে—রামকানাই তাব জামাই বলে। কিন্তু আদালত কার শাশুড়ি।'

ভর্তি গেলাসটা পড়েছিল টেবিলে; মদটা খেযে নিল মুখার্জি।

'বঙ্কু আপনাদের স্পাই?'

'এ কথা বলে বেড়াবার কোনো অনুমতি নেই। তবে আপনাকে বলা যেতে পারে আপনি আমাদের হাতের মুঠোর ভেতব এবার। ঘনশ্যামও আমাদেব স্পাই।'

'ঘনশ্যামও?' সুতীর্থ একটু চমকে উঠল। 'আব কে কে?'

'আরো আছে কেউ কেউ।'

'হামিদ?'

'না হামিদ নয।'

সুতীর্থ বললে, 'আমি তাহলে উঠি এবার—'

'কলকাতায় যাবেন?'

'হ্যাঁ অনেক বাত হযেছে-'

'চলুন, গাড়ি ঠিক আছে। আমাবও একটু যাবাব দরকার আছে ওদিকে।'

'এত রাতে।'

'আমাদের রাত বিরেত নেই।'

সূচীপত্রে যান

মোটরে উঠে সুতীর্থ বললে, 'আমার জামাজুতোর ব্যাপার আপনি একটা জানেন শুধু?'
'বঙ্কু জানে। সে তো কাছেই ছিল।'
'আর কেউ?'
'না।'
'ফোটে তোলা হয়েছে বুঝি ও সবের?'
'তুলে রাখতে হয়। ফোটোর বিশেষ কোন মানে নেই।'
'বঙ্কু বলে বেড়াবে?'
'তাহলে তার সর্বনাশ হবে বলে দিয়েছি।'
'জামা জুতো ফিরে পাওয়া যেতে পারে?'
'বেশ দামী নতুন জিনিস তো ওগুলো? মুখার্জি একটু ভেবে বললে, 'ব্যবহা্ করবেন?'
'না এমনই।'
'এখন পাবেন না।'
গাড়ি সাঁ সাঁ করে চলছিল। চালাচ্ছিল মুখার্জি নিজেই।
সুতীর্থ বললে, 'আমি যদি স্ট্রাইকে আবার এসে যোগ দিই কি কববেন?'
'গাযানাথ মালোর খুনের খবব বেরিযে পড়বে—ওবা আপনাকে ধরে জরাসন্ধেব মত ছিঁড়ে ফেলবে দুই দাবনার মাঝখান দিযে।'
'একটা মিথ্যে কথা বটিযে দিযে আমাকে ঠেকাবেন আপনাবা?'
'আপনাকে ঠেকাবার দরকার যে।'
'বাইশ দফা দাবির কটা মেনে নিতে বাজি আপনাবা?'
'না মেনে নিলেও চলে। না হয এক আধটা মেনে নেব।'
'ভাঙবে স্ট্রাইক তাহলে?'
'হামিদকে হাত করতে পারলে হবে সব।'
'পাববেন করতে?'
'টাকা দিযে পাবব না, কিন্তু আপনি সবে গেলে পারব।'
সুতীর্থকে তার আস্তানায নামিয়ে দিযে মুখার্জি যেন বিদ্যুতেব তাবে হাত দিযে ধাক্কা মেবে বললে, 'ও এই বাড়ি।'
'হ্যাঁ। এই তো।'
'এটা কার বাড়ি?'
'অংশুবাবুব।
'অংশুবাবু?' মুখার্জিব মুখটা কেমন ছুঁচোলো হযে উঠল—নাকটা আবো লম্বা আরো ছুঁচোলো—শীত রাতের অন্ধকারের ভেতর—সুতীর্থকে বললে, 'এখানে মণিকা দেবী বলে কেউ থাকতেন না?'
'অংশুবাবুরই তো স্ত্রী তিনি।'
'অংশুবাবুর স্ত্রী?' মুখার্জি সুতীর্থের আগাপাস্তলা সবদিকে ভালো কবে চোখ ছানিযে নিযে মোটর ঘুরিযে চলে গেল।

পঁচিশ

জয়তীর স্তাবক ও প্রেমিকের মধ্যে ক্ষেমেশ চৌধুরী ও আরো দু-একজন এখনো অবিবাহিত ছিল ; বাকি সকলেই বিয়ে করে সংসাবে তলিযে গেছে এরা কেউই বিরূপাক্ষেব বাড়িতে জযতীব সঙ্গে দেখা কবতে যায না বড় একটা।
.বিরূপাক্ষের সঙ্গে জয়তীর বিযেব ঠিক পবেই—মাঝে মাঝে যেত বটে, কিন্তু ইদানীং দু-এক বছর মোটেই আসা যাওয়া নেই আর। বিরূপাক্ষের টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে ক্ষেমেশ চৌধুবীর বাড়ি অনেক দূরে—বেলগাছিযায। বেলগাছিয়ার বাড়িতে ক্ষেমেশ একাই থাকে ; ক্ষেমেশের আত্মীযস্বজন নেই বিশেষ কেউ, যাবা আছে কেউ কলকাতায থাকে না বড় একটা। ক্ষেমেশের বাবা বেঁচে নেই, মা দেশেব বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় আসা-যাওয়া ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন, এবারের শীতে কলকাতায আসেননি আর ফাল্গুনের বাতাস ছাড়লে আসতে পাবেন হযতো, কিংবা আসবেন বর্ষাকালে।

সূচীপত্রে যান

নিজের বাড়িতে ক্ষেমেশ আজকাল একাই ছিল। জয়তীর সেসব দিনের পরমাইরা আজ যখন সম্পত্তি ও সন্তানের বহর বাড়িয়ে চলেছে, ক্ষেমেশই তখন আধবুড়ো একা, সাংসারিক চালচলনও ক্রমে পড়ে যাচ্ছে তাব সংসারের।

'ভালো করেছ জয়তী তুমি এখানে এসে।'

'চা খাচ্ছ তুমি। আজ সকালটা কিরকম রোদে বাতাসে ঝরঝবে দেখছ।'

'মাঘ মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার এ বাড়িটা তো ঝাড়জঙ্গলের মত বানিয়ে বেখেছ তুমি—'

'হ্যাঁ, খুব চুপচাপ ; গাছগাছালি ঢের, নানারকম পাখি আসে।'

'আমি পাখি খুব ভালোবাসি।'

'কিন্তু কটা পাখির নাম বলতে পাব? নানারকম নতুন পাখি আসে—নিবেশী পাখি—উপনিবেশী—ঝাঁকে ঝাঁকে—আমি ওদেব চিনি—কিন্তু ওদেব অনেকেবই কোন দিশি নাম আছে বলে জানি না—কেন দাঁড়িয়ে? বোস—বোস।'

'বসব বইকি। তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ—'

'আমি?' ক্ষেমেশ একটু হেসে বললে, 'পবে বলছি। নানাবকম লতাপাতা' উঁচু উঁচু গাছ দেখা যায়। সে সবের দিশি নাম কি বলতে পাবি না আমি। তুমি জান?'

চশমাব ভেতব দিয়ে খানিকটা চুম্বকেব টানে যেন জয়তীর দিকে তাকাল ক্ষেমেশ।

'একেবারে না জানি তা নয়।'

'আমাকে বলে দাও তো ঐ গাছটার নাম কি—ঐ যে উঁচু হয়ে উঠেছে—যাব ডালপালার ফাঁক দিয়ে বাইরের সাদা মেঘ দেখা যাচ্ছে। দেখেছ?'

অনেক উঁচু উঁচু গাছ তো আছে।'

'আমার আঙুলের সোজাসুজি যেটা—ডালপালা বেশি—পাতা কম—কাজেই জাফবি কাটাব কথা এল—মেঘ থাকলে কেন সাদা—না হলে নীল জানালাটা চোখে পড়ে বড় আকাশের।'

জয়তী খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'কি জানি, নাম তো আমি বলতে পারব না।'

চোখ ঘুবে গেল জয়তী পবক্ষণে অন্য একদিকে ক্ষেমেশেব, ঠোঁটে তাব হাসি লেগে ছিল।

'তোমারও আমাব মত দেখছি। আমাব মনে হয় আমাদের দেশেব অনেকেই নানাবকম গাছপাখিব দিশি নাম জানে না।'

'এত নাম নেইও হয় তো।'

আমাদেব দেশের লোকেবা কেবল ভেতবেব দিকেই তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসে বলতে চাও তুমি? গাছপালা পাখপাখালিব দিকে তাকিয়েই নিজেব ভেতবটাই দেখে—ওদেব দেখে না ঃ এই বুঝি?'

'অনেকটা তো তাই।'

'তাই তো। ম্যাক্সমূলার থেকে কীথ অলডজ হক্সলি, ইশার উড এই নিয়েই তো আটখানা। কিন্তু ভেতরে ডুব দিয়ে রেশমী জাল বানায তো আমাদেব দেশেব লোকেবা—রেশমী জাল—ইন্দ্রজাল—মাকড়সাব জাল—বাইবেব পৃথিবীব খোঁজখবব বড় একটা বাখে না?'

'তুমি আজ পাখিটাখিব খুব ভক্ত হয়ে পড়েছ দেখছি ক্ষেমেশ। এও তো বহিবাশ্রয় নয়—বারফটটা কেমন একটা জিনিস যেন এত পৃথিবীর কল্যাণে লাগে না, তোমাব নিজের মন খুশি—'

'না, না, আমি যা বলতে যাচ্ছি তুমি সেটা এড়িয়ে গেলে।'

'বুঝেছি।' জয়তী সোফায এসে বসল। 'কিন্তু কোন্ জিনিসের কি নাম না জেনেও জিনিসেব আস্বাদ পাওয়া যায়—'

'তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নাম জানা থাকলে মন চবিতার্থ হয বেশি। তোমাকে চা দেযা হয়নি তো—'

'আমি চা নিজেই বানিয়ে খাব। তোমার মা কি এখানে?'

'না।'

'দেশের বাড়িতে?'

'কাল চিঠি পেলুম তিনি বর্ধমান থেকে এলাহাবাদে গেছেন বুড়ো সরকারের সঙ্গে প্রয়োগে চান করবার জন্যে। এত শীতে যাওয়া ভালো হয়নি—'

সূচীপত্রে যান

'কে আছেন এখানে?'

'কেউ না।ঃ

'একেবারে একা তুমি?'

'রঞ্জন আছে।'

'সে কে?'

'আমার চাকর।'

'ওঃ আমি ভেবেছিলুম—। খুব মালদার নাম, হরির চেয়ে তুলসী পাতার হরির নামের দাম বেশি। সেই রূপচাঁদ পক্ষীর গান ঃ মনে আছে তোমার? আমি তোমাব এখানে কযেকদিন থাকব ক্ষেমেশ।'

'বেশ থেকে যাও, ওদেব মতামত—তোমাব বাবুব মত আছে তো?' যেন সবই আছে ঠিক, সবই ভালো—এবকম স্থির সুনিশ্চয় চোখে জয়তীর দিকে একবার তাকিয়ে নিল ক্ষেমেশ।

'তুমি কোথা থেকে এসেছ জয়তী?'

'সেইটেই তোমার প্রথম জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আমাকে দেখেও তুমি পাখি আব তিত্তিরাজ গাছ নিয়ে পড়লে—'

ক্ষেমেশ ঠাণ্ডা চাযে চুমুক দিয়ে বললে 'তুমি তো বিরূপাক্ষ রাযকে বিয়ে কবেছিলে?'

'কেন, বিয়ের আসরে তুমি উপস্থিত ছিলে না?'

'তোমার স্বামী আজকাল কোথায? কলকাতায তো? তোমাদেব ঢাকুরিয়াব বাড়িতে আমি কযেকবাব গিয়েছিলুম। এখনও কি সেইখানেই আছ তোমবা?'

'টালিগঞ্জে উঠে গেছে।'

'তোমাব স্বামী কোথায? তাকে দেখছি না তো'—ক্ষেমেশ বললেন, 'কলকাতায নেই বিরূপাক্ষবাবু?'

'আছে বইকি। তুমি কোনদিন বাড়িব চৌকাঠ মাড়িয়েছ বিরূপাক্ষ রাযের, যে সে তোমাব এখানে আসবে?'

'বললুমই তোমাকে। বার চারেক তো খুবই গিয়েছি তোমাদের ঢাকুরিযাব বাড়িতে, কিন্তু বিরূপাক্ষবাবু তো একদিনও আমার এখানে আসেন নি—'

'এলে তুমি খুশিও হতে না ক্ষেমেশ। তুমি ঢাকুরিযায গেছ কযেকবার কিন্তু বিরূপাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা কবতে ঠিক নয, তাব সঙ্গে একটা কথা বলেছ কোনদিন?'

'না'। নিশ্চিত সত্যকথনেব মত নির্ভাবনায বললে ক্ষেমেশ। ক্ষেমেশ ঠাণ্ডা চাযেব পেযালাটাব দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কিছু মনে কোরো না জযতী। ঐ লোকটাকে আমি চিনতে চাইও না।'

'মনে কববাব কিছু নেই আমাব।'

'তুমি কার সঙ্গে এলে?'

'একাই।'

'এখন তো ট্রাম স্ট্রাইক চলছে।'

'বাস তো বাদুড় ঝুলিযে উড়ে বেড়ায দিন বাত। সেই টালিগঞ্জ থেকে দশ পাড়া ভেঙে অ্যাদ্দুর আমার মতন কোন মেযেমানুষেব একা বাসে চলাফেরা কবা অন্যায—'

'অন্যায কেন হবে?' ক্ষেমেশ চশমাটা খুলতে চেয়ে তবুও না খুলেই জযতীর দিকে তাকিয়ে বললে, তবে বাঙালী মেয়েদের পক্ষে পেবে ওঠা কঠিন।'

ক্ষেমেশ তাব ডানহাতের মুঠো সম্পূর্ণ খুলে প্রসাবিত কবে কবরেখাব কুটিল বিন্যাসেব দিকে একবাব ভালো কবে তাকিয়ে নিয়ে জযতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'বাসে এসেছ? ট্রাম স্ট্রাইকটাকে বাঁচিয়ে দিযে? তুমি সবই পার। তুমি কি না পার আমাকে বলে দেবে জযতী?'—সাত আট বছরের আগেব সেই চাঁদ নক্ষত্রাবিষ্ট মানুষের স্বর শোনা গেল যেন ক্ষেমেশের গলায। কিন্তু তবুও গলা আজ কত অভিজ্ঞ ও আত্মস্থ।

'বিরূপাক্ষবাবুব দুটো গাড়ি আছে?' বললে ক্ষেমেশ।

'আছে।'

'আমি একটা ক্যাডিলাক কিনেছিলুম, বিক্রি করে দিতে হল—'

'কেন?'

'খরচ পোষায় না। আমি তো বাস্তবিক কিছু করছি না—'

'কিছু করছ না? আজকাল তো সমস্ত পৃথিবীই মুখ চেয়ে আছে। দুটো দুটো যুদ্ধে সব ঘাঁটি উড়ে গেল—ভাবুক লোকেরা কাজের লোকেরা কোথায়—এসো ; যা ভালো হবে খুব ভাঙবে না আর, সেই সব সৃষ্টি করে যাও,—তাতে সকলেরই তো হাত দিতে হবে। তোমাদের তো বিশেষ করে। তুমি তো গিফটেড ক্ষেমেশ—'

'আমি?' আড়চোখে জয়তীর দিকে একবার তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'উৎখাতের জের চলছে এখনও। তৈরিটৈরি কিছু আরম্ভ হয়নি। সে সবের পরিকল্পনাও ধোঁয়াটে। এখনও কে কোথায় ভাগ বসাবে,—কে কার গ্রাস কেড়ে খাবে—এ নিয়েই হাটরা হাটবি।

'তোমার ঘরে এত সব বই ক্ষেমেশ—চোখে ধাঁধা লেগে যায়।'

'বইগুলো কিনেছিলুম,—আমাব বাবার কোন লাইব্রেবী ছিল না। তিনি আজীবন জমিদারি ঘেঁটে গোঁসাই মালপো কেত্তনেব কুদরতি করে শেষে টেব পেলেন ওটা তাঁব নিজেব জমিদারি নয়—'

'কি রকম?'

'সে অনেক আইনের মার প্যাঁচ আছে। আমিও বুঝি না—তুমিও বুঝবে না। সমস্ত সম্পত্তিই ছেড়ে দিতে হল তাঁর সৎভাইয়ের নামে। এক ফাঁকে কলকাতার এ জায়গাটা কিনে রেখেছিলেন, তাই মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা আছে।'

'দেশের বাড়িও তো আছে?'

'সেটা বাবার সব নয়—সিকিভাগ বাবার—'

'তিনচার বিঘে?'

'বিঘে দশেক হবে ; একটা দেড়তলা বালিরঙের—বালিহাঁস রঙের দালান আছে—এ ছাড়া মফঃস্বলে আমাদের আর কোথাও কোন জায়গা জমি নেই। ছিল ঢের, বাবাব তত্ত্বতদাবকে বেড়েও ছিল খুব, কিন্তু মোকদ্দমায় টিকল না কিছু।'

'এই নিয়ে আফসোস?'

'আফসোস কোথায়? 'বড় বড় চুলের ভেতর হাত চালিয়ে সমস্ত মাথাকে বসন্ত বাউরাব বাসা বানিয়ে স্থির চোখে জয়তীর দিকে একবাব তাকিয়ে পলকের মত মাথাব চুলগুলো পাট কবতে কবতে ক্ষেমেশ আকাশ বাতাসেব দিকে চোখ ফেবাল আবার ; 'তুমি জিনিসটা ঠিক ধরতে পাবলে না। বাবা যা যা করে গেছেন সেটায় মশকরাব কোন মানে হয় না; করতেও হচ্ছে না ; ভালোই হল, আমি বেশি স্পষ্ট কিছু করবার সুবিধা পেয়েছি।'

'সেটাই মিথ্যে কথা।'

'কেন?'

'দশ বিঘে জমি দবদালান মফস্বলে—কলকাতায় এত জায়গা জমি ঢালাও ইট সিমেন্টেব এই পুবী—এটা সামন্তি আমলের ধ্বংস? সকলের সঙ্গে মিলে যাবাব এইটেই যদি সোজা বাস্তা হয় তা হলে অস্পষ্ট অসাধ্য বাস্তাটা কোথায় ক্ষেমেশ? তোমার দেশটা খুব স্নিগ্ধ। স্বপ্ন ভালো ; কিন্তু ভিযেনে চড়লেও সত্যেব দরকার বেশি। আমাদেব মনে লোকের পক্ষে সত্যেরই দবকাব সবচেয়ে বেশি।'

'সত্য কি?' জানতে চাইল ক্ষেমেশ। চোখে চশমায় কেমন একটা ভাবনা সন্তাপে খানিকটা আলোড়িত হয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'তুমি কোন্ পার্টিব জয়তী?'

'কিচ্ছুর না।'

'নও? হওয়া তো উচিত ছিল, তেতলাব ড্রয়িং রুমে বসে যাবা বস্তিব লোকেদের জন্যে লড়াই করছে তাদের মতনই তো কথা বলছ তুমি। বিরূপাক্ষবাবুর তিনটে বাড়ি আছে—দুটো গাড়ি—কলকাতার চেম্বার অব কমার্সেব তিনি চাঁই। মাথায় খদ্দরেব টুপি—হাতে হুণ্ডী—বাজনীতিক সভাসমিতিতে গেলে মাইকেও যেতে হয় না, মুখের মুচকি হাসি দেখেই সকলে হাসি মুখে এটকা মেরে থাকে ঃ এ হেন লোকের টাকায় খেয়ে—দেয়ে মুখ মুছে তুমি যদি না এ সব কথা বল তা হলে কে বলবে?'

'কি সব কথা?'

'এই যে সব সত্য অসত্যের কথা আমি অসত্যের পথ ধরে চলেছি বলছিলে—'

'নির্জলা সত্যের পথ ধরে চলেছ কি তুমি ক্ষেমেশ? আমি কি চলেছি?'

'সত্য কি? বললে না তো। বলতে পাব?'

'সত্য কি তা তুমি জান ক্ষেমেশ।'

'যা জানি তারই দিকে নাক বরাবর চলেছি। এ ছাড়া কোন উপায় আছে?'

'বাপের টাকায় খাও-দাও পাখি দেখ।?'

ক্ষেমেশ তাকাল জয়তীর দিকে। জয়তীর মনে হল ক্ষেমেশ হয়তো বাস্তবিকই নিজের পথ বেছে নিয়েছে। যখন নিজের সবচেয়ে ভালো সাধনার ফলগুলোকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে মানুষের নিজেরই বিজ্ঞান বা সভ্যতা, তখন দুচারটে লোক যদি এই আত্মমন্থন ও আত্মলোপাটের হইচই ও আহাম্মকির থেকে খানিকটা দূরে সরে তাদের বাড়ির পৃথিবীতে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে তা হলে সত্য কোন্ দিকে আছে—কিই বা সত্য—আমাদের আজকের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে—সেটা নির্ণয় করা কঠিন—বলা কঠিন। কিন্তু তবুও এ উদঘাতী সভ্যতাকে নিজের ভুল বুঝিয়ে দিয়ে ঠিক পথে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করা উচিত। ক্ষেমেশ হয়তো মনে করে ভুলটা স্বাভাবিক ; শোধরাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না ; সেই বিরাট টিকটিকিরা যেমন করে মরে গেল, নিজের মৃত্যুবীজের স্বতসিদ্ধতায় মানুষও মরতে চলেছে—খুব শীগগির মরতে চলেছে হয়তো। সে যা বিশ্বাস করে সেইটেই তার কাছেও সত্য নয়, হয়তো—কিন্তু ক্ষেমেশের মন খুবই শিক্ষিত স্বাধীন মন যা সত্যিই বিশ্বাস করে সেইটেই তার কাছে সত্য হয়তো?

জয়তীর চোখে মুখে সকালবেলার রোদের ধ্বক এসে পড়েছিল। কেমন একটা আলোর সাগরে বারুণীর শাশ্বতী রূপসীর মত দেখাচ্ছিল তাকে। শাড়ির নীচের দিকটায় যে অংশে ছায়া পড়েছে—নীল সাগর শঙ্খ বুদবুদ ফেনা গন্ধ আলো গতি সচ্ছলতার কেমন ভেজা, ঠাণ্ডা, নিরবচ্ছিন্ন অনিমেষ—দেশ সৃষ্টি করেছে—উপলব্ধি করছিল ক্ষেমেশ।

'পাঁচমিশেলি নিয়ে আমাদের জীবন', ক্ষেমেশ বললে, 'কেউ কি ছাঁকা পলিটিকস করছে, কিংবা নিছক সাহিত্য? যে যার নিজের দলের মোটামুটি নিয়মগুলোর কাছেও কি সত্য ও সার্থক? তা নয়—সবই সুবিধের ব্যাপার—তাড়াহুড়োর জোড়া তাড়ার জিনিস। কোথাও কারু হাতে সময় নেই—সব দিকেই দিনরাত পড়ি কি মরি হুজ্জোতে—তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে নিতে হবে—এই হল আজকের যুগের ঘরপোড়া গোরুদের কথা। এখনও চারদিকে তাদের সিঁদুরে মেঘ। মেঘটা ঘনাতেও পারে।'

'তুমিও ঘরপোড়া ক্ষেমেশ এত বড় ঘরবাড়ি নিয়ে?'

'ঘরবাড়ি এক্ষুণি পুড়ে যাবে। যেটুকু সময় আছে আমি পাখি দেখেই দিন কাটাচ্ছি।'

'এর পর তেল মেখে বাঁশের লাঠি পাকাবে হয়তো সমস্তটা শীতকাল।' জয়তী একটু হেসে বললে।

'বাঁশের কাজ করলে আড়বাঁশী তৈরি করব, কিংবা বেত আর বাঁশ দিয়ে চেয়ার টেবিল, চায়ের টেবিল, আরামচেয়ার বানাব। তুমি তালপাতার ব্যাগ তৈরি করতে পার?'

'তুমি পার?'

'দেখছিলুম সেদিন—'

'একা মানুষ ; এত জিনিস তোমার। কিন্তু কি সদ্ব্যবহার করছ এদের? তালপাতার ব্যাগ নয়—মানুষ তৈরি হবে না?'

'মানুষ ঃ মানে যারা মারণমন্ত্র, শেল তৈরি করতে পারে? তার চেয়ে যারা তালপাতার ব্যাগ তৈরি করতে পারে তারা বেশি মানুষ। যারা একশোবার করে ইউরোপ আমেরিকায় এশিয়ায় কনফারেন্স পাতায় আর ভাঙে, পরস্পরকে বজ্জাৎ বলে গালাগাল দেয়—একেবারে উৎখাত করে ফেলবার ফিকিরে থাকে, তারাই তো মানুষ এখনকার পৃথিবীতে ;—আর তাদের তাঁবেদাররা—ব্যাঙ্কে অফিসে—ডিপার্টমেণ্টাল চেয়ারে বসে পৃথিবীর সর্বত্র। এর চেয়ে বেশি মানুষ মনে করি আমি যারা নদীর পারে হোগলার ক্ষেতের পাশে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কি করে বাবুই পাখিগুলো বাসা তৈরি করে, তেমনি শান্তিতে তেমনি নীড় মানুষের জন্যেও তৈরি করবার প্রেরণা পায় তারা, কিন্তু তারপরেই উপলব্ধি করে মানুষ তো মারীবীজ হাঁকিয়ে চলেছে পৃথিবীতে—বাবুইদের সঙ্গে মানুষের তো কোনো মিল নেই—কি করে স্থিরতা পাবে মানুষ পৃথিবীতে—কি করে শান্তি পাবে?'

ক্ষেমেশ বললে, 'এত জিনিস আমার? তা বলতে পার। এই বাড়িটাকে তুমি প্রাসাদ বলেছ ঃ তা হতে পারে। কিন্তু বাড়িটা তো ধ্বংসে পড়ছে। খুব বেশি দিন অবিশ্যি বাঁচব না আমি, মরবার আগে বাড়িটা ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যাবে মনে হয় না ; প্রকৃতির দোহাত্তা মার বাংলাদেশে হয় না : সমাজে রাষ্ট্রে হবে কিনা সন্দেহ ; আমার নিজের মনেও ঘরবাড়ি ফাঁসাবার তেমন কিছু ডাকসাইটে নেশা আছে বলে টের পাচ্ছি না। তা হলেও একটা বড়—কিন্তু বড় ভাঙা বাড়িতে আছি—এ বাড়ির কোন অংশও কাউকে

ভাড়া দিচ্ছি না আমি। কেন দিচ্ছি না? কেন? কেন দু বিঘে জমি নিয়ে কলকাতায় আছি? আমিও অবাক হয়ে ভাবি কেন করছি—এ সব? অনেকে দশ বিঘে একশো বিঘে জমি নিয়ে আছে বলে? দশ জায়গায় দশখানা বাড়ি ফেঁদে রয়েছে বলে? পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সভ্য লোকেরা সবচেয়ে বেশি সুখে লালসায় মত্ত বলে? চারদিকে সবাই সকলকে উচ্ছন্ন করছে বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ; তাই। আমি ওসব মানুষের পাল্টা ঘরের মানুষের মত মৃত্যু হিংসা কামে নয়—খানিকটা পরিসর ও শান্তি খুঁজছি প্রকৃতির ভেতর ; এটা কি অন্যায়? খুব বেশি আত্মপরতার প্রমাণ দিচ্ছি আমি! আমারও মনে মাঝে মাঝে খটকা বেধেছে জয়তী। এতদিন নিজের ধর্ম বলে বিশ্বাস করেছি যেটাকে—সেই পাখি আকাশ ঘাসের ওপর শুয়ে থাকাকে সত্যিই অবিশ্বাস করব যখন তখন সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব আমি।'

ক্ষেমেশের এ সব দূর, অব্যয় কথা জয়তীর কানে ঢুকল না হয়তো। জয়তীর মনের ধাঁচ অন্য রকম ঃ তাতে নিবিড়তা আছে হয়তো কিন্তু পরিসর নেই, নিবিড়তাও বেশি নেই, সেটা নলকূপের ; অর্জুনের বাতা বাণমুখের নয় যা ভোগবতীকে এনেছিল ; কপিল সগরের মত নয় যাদের বড় কোলাহলের ভেতব থেকে গভীরতার আনন্দ নিয়ে সাগবের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তবুও খুব খাঁটি কথা বললে জয়তী।

'কলকাতায় এমন জাযগা আছে', জয়তী বললে, 'যেখানে একটা কলে একশো পরিবাবের জল সংস্থান করতে হয ; তুমি যে ঘরে বসে একা একা চা খেয়ে লম্বা ছাড়ছ এরকম কামরা পেলে পঁচিশটে পরিবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে হেঁসেলে হাঁসফাঁস হযে মড়কের ইঁদুরেব মত সাবাড় হতে হতে ভাগাড়ের শকুনের মত ঝাপটা মেরে নেচে ওঠে আবাব। এ তো মৃত্যু—কিন্তু তবুও জীবনও বটে। জীবন ছাড়া এ আর কী? এ জীবনকে জাযগা দিতে হবে।'

'তা দিতে হবে ; কিন্তু এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি—যা মুখে আসছে তা-ই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি?'

'বাংলা আমার ঠিকই আছে—ওর জন্যে আমি মাথা ঘামাইনে।'

'কাদের সঙ্গে মিশছ আজকাল তুমি?'

'যারা মানুষের সঙ্গে মেশে তাদের সঙ্গে।'

'তারা কি এ রকমভাবে কথা বলে?'

'তুমি অনেকদিন কারুর সঙ্গেই মেশনি। ভাষা ও চিন্তা কি রকম হযে দাঁড়াচ্ছে টের পাও না তুমি। পরে হবে সে কথা। আমি তোমাব বাবার জমিদাবির কথা বলছিলুম—'

'মড়াটাকে তো ঘেঁটেছ ঢের—আর কি হবে?'

'কোথায় আব মবল। তেলও কি মবেছে খুব? অনেক আগেই নিকেশ হবে কথা ছিল—তোমাব আমাব শুধু নয—সকলেব সব জমিদাবি—'

'নিকেশ হোক। আমিও তো তাই চাচ্ছিলুম। জমিদারেবা দুঃখ কবছে না কি কবছে জানিনে। কিন্তু আমি জমিদাব নই, দুঃখ নেই আমাব।'

'সুখ নেই। তোমাকে দেখে মনে হয, ক্ষেমেশ, তুমি যদি লুক্রেশিযসেব মত কবিতা লিখতে পারতে, কিংবা রিলকেব মত, আমাদের দেশেব কৃষ্ণ মজুমদারের মত, কিন্তু কিছুই লিখতে পাব না। যদি পারতে তা হলে এই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে তোমাকে গাল দিতে যেতুম না আমি। ও সব জিনিস তোমার কাছেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠত তখন, মনে অন্য বোধ আসত, বিষাদ বেড়ে যেত হয়তো, কিন্তু আরেক মূর্তি নিত। মরা জমিদারিব জন্যে দুঃখ কবতে না তুমি। এমনি মানুষের যা দুঃখ সেখানে তোমার দর্শনের আলো পড়ত—হয়তো তোমার কবিতার—সহজ ভাষায়, তবুও তোমার নিজেবই ভাষায় ; সেই জন্যেই তোমার মৃত্যু হত না। লোকেরা পাত না নেড়ে পড়ত ওষধির মত শান্তি দিতে তুমি, শান্তি পেতে।'

দু কাপ বেশ ঘন চা দিয়ে গেল রঞ্জন।

'তোমাব চাকব আমাকে ঠকিয়েছে ক্ষেমেশ।'

'কিছু বিস্কুট দাও রঞ্জন। সন্দেশ নিয়ে এসো—এক হাঁড়ি এনো—বড় হাঁড়ি। রকমারি আনবে ; এসব নাম তো তোমার মুখস্থ। কি একটা আছে রঞ্জন যা বেলগাছিওযালা। খাওযায় বালিগঞ্জিনীর প্রাণ ঠাণ্ডা হয, নাকি টালিগঞ্জওয়ালী জয়তী তুমি? মফস্বলের জাযগা জমি বাড়ি মা বামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে বলেছি কলকাতার এ বাড়ির কোন অংশই কাউকে ভাড়া দিই না আমি।'

'কেন?'

'দিলে ভাড়া দেব না, এমনিই ছেড়ে দেব।'

সূচীপত্রে যান

'কাকে?'

'যাদের খুব দরকারী বেশি।'

'এমন বহু লোক তো আছে কলকাতায়—'

'আছে। মানুষকে ভালোও বাসি আমি। কিন্তু ভেবে দেখছি কয়েকটি পরিবার এনে আমার এখানে বসালে আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'কেন?'

'যে রকম জীবন আমি চালাচ্ছি সেটা সম্ভব হবে না আর।'

'তুমি কি একেবারেই একা থাকতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'একেবারেই একা?' জয়তী আবার জিজ্ঞেস করল—ক্ষেমেশেরই শুধু নয়—'পৃথিবীর সমস্ত নিঃসঙ্গ লোকদেরই প্রাণের কাছে এসে পড়ে কেমন দায়ভাগিনীর মত যেন।

'কেঃ আমি?' ক্ষেমেশ একটা আকাশগামী হাঁসের মত বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় পাশের মরালীকে দেখে নিল যেন একবার, তার পরে ডানার বেগে উড়ে যেতে লাগল আবার ঃ নীলিমা-কণিকা বাশির ভেতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে চলেছিল যেন তারা দুজনে।

জয়তী বললে, 'আছে মানুষ আছে খুব শ্রদ্ধা করবার ভালোবাসবার মত। তবে এও একরকম মন্দ করনি তুমি, পাখি দেখছ, আকাশ নক্ষত্র দেখছ। কিন্তু কোন সময়ই কি কাছে গিয়ে বসবার মত একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয় না?'

'এই তো হয়েছে ; আজ হল, অনেকদিন পরে।' ক্ষেমেশ বললে। কথাটাকে একবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তার পরিণতি অনুসরণ করতে গেল না ক্ষেমেশ, জয়তীর মুখের দিকেও তাকাতে গেল না ; দূরের ঝাউগাছে একেবারে উঁচু ডালপালায় একটা কাককেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল—অবাক হয়ে দেখছিল।

'শুনেছি তুমি তোমার বাবার বাড়িতেই বেশি থাকতে? বিয়ের পরেও?'

'হ্যাঁ, এবারেও যেতুম বাবার ওখানে, কিন্তু চলে এলুম তো বেলগাছিয়ায়।'

'বিয়ে তো তোমার বছর তিনেক হল হয়েছে?'

'তা তুমি গুণে ঠিক কর ক্ষেমেশ।'

'কতদিন ঘর করলে বিরূপাক্ষের সঙ্গে?'

'মাস পাঁচ-ছয়।'

'মোটে? কেন?' ক্ষেমেশ বললে, 'সেদিন গান্ধী কলকাতায় এসেছিলেন। আমাকে ঘাড় ধরে নিয়ে গেল রঞ্জন। গেছলুম। দর্শনের জন্যে যে ভিড় জমেছিল তার ভেতর তোমাকে দেখলুম মনে হল, গিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ গিয়েছিলুম, তুমি কোথায় ছিলে? দেখিনি তো তোমাকে। ওমা, আমাকে দেখেছিলে! আমাকে দেখলে তো কাছে এলে না কেন? কোথায় বসেছিলে তুমি?'

'গান্ধীকে দেখতে যেতুম না, রঞ্জন আমাকে টেনে নিলে। না হলে সেদিন আমার ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাবার কথা ছিল। শুনেছিলুম নতুন পাখি এসেছে ওদিককার জঙ্গলে।'

'পাখি দেখা হল না তবে?'

'না। গান্ধীকে দেখাবেই রঞ্জন। আমি তো দেখেছি একবার এর আগে। আবার কেন? বলছিলুম রঞ্জনকে। কিন্তু যেতে হল।'

'একবার দেখেছ মাত্র?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'কোথায়?'

'ক্ষেমেশ মনে করতে চেষ্টা করে বললে, 'অনেক জায়গায় দেখেছি, কোথায় ঠিক মনে পড়ছে না।'

'ছবিতে দেখেছ ক্ষেমেশ।'

'তা হবে। সেদিন গেলে সোদপুরে ; আলো পেলে জয়তী?'

'আমি তো তোমার মতন বলছি না যে, কোথাও মানুষ নেই। মানুষ আছে, অনেক আছে।'

'সোদপুরে আলো পেলে?'

'মাঝে মাঝে আলোর উৎসের কাছে যেতে হয়। আমাদের নিজেদের বিচার হয়তো অন্য রকম,

কাজ আলাদা প্রকৃতি আলাদা। কিন্তু তবুও যে সব মানুষ এরকম অশান্ত পৃথিবীতে এতদূর শান্তি, সত্য পেয়েছে তাদের কাছে গেলে ভালো হয়। হয়তো কিছু পাওয়া যায় কিংবা পাওয়া যায় না। কিন্তু গান্ধী নিজে উপকার পেয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর পথে চলে অনেকে ; —বুঝতে পেরে আশা আসে মনে। সেটা লাভ। চারদিককার পৃথিবী তো বলছে আশা নেই। সেটা ক্ষতি।'

'বিরূপাক্ষকে বিয়ে করেছিলে বলে সোদপুরে যাওয়ার দরকার হয়েছিল তোমার।'

ঝাউগাছের অনেক উঁচুর ঝিরঝিরানির দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'কোনো পাখি নেই সেখানে এখন আর।'

'তার মানে?'

'তা না হলে তুমি যেতে না যে তা নয়, কিন্তু এতটা তাড়া থাকত না। বড্ড খাবাপ হয়ে যাচ্ছিল সব, এত বেশি ভালো লাগল তাই।'

'যেন মহাত্মার নিজের কোনো আকর্ষণ নেই?'

'তা আছে। প্রভাব আছে। সব আছে। সোরহাবর্দ্দিও তা বোধ করছেন। আমি যা বলেছি তা অস্পষ্ট নয়।'

ছাব্বিশ

জয়তী ক্ষেমেশেব বাড়িতেই কিছুদিন থাকবে ঠিক কবেছে। একদিন তো কাটল। পরদিন সকালবেলা ক্ষেমেশেব পড়ার ঘরে, (এইটেই বসার ঘরও ক্ষেমেশেব) বসে চা খাচ্ছিল জয়তী আর ক্ষেমেশ।

'বাড়ি ভাড়া দাও না, তোমাব কোন আয় নেই তা হলে?'

'না।'

'চলে কি কবে?'

'ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে এখনও।'

চাকর বিস্কুট ও সন্দেশের হাঁড়ি ও দুটো বড় দুটো ছোট চীনেমাটির বেকাবি একটা তেপযেব ওপব সাজিয়ে জয়তীব কাছে বেখে গেল। চাযে টাগরা গলা টনসিল পুড়িয়ে (ভালো লাগল জয়তীর, ঠাণ্ডায় কেমন ব্যথা কবছিল গলাব ভেতবটা) একটা দুটো চুমুক দিযে জয়তী বললে, 'ব্যাঙ্কে কত টাকা?'

'হাজাব পঞ্চাশেক হবে।'

'সুদ খাচ্ছ?'

'আসলে হাত দিতে হয।'

'প্রতি মাসেই।'

'হ্যাঁ। বিরূপাক্ষেব তো পঁচিশ লাখ আছে।'

'কি জানি।' অনেক দূবে যে নির্ঝব ঝরে পড়ছে সে তো বক্তের, আমি জলেব খোঁজে যাচ্ছি ঃ মনে হল যেন জয়তীর কণ্ঠ শুনে।

'ক্ষেমেশ, তোমাব নিজের রোজগাবেব কোনো পথ নেই?'

'না, কোন ব্যবসা-ট্যাবসা করছি না। চাকরি করব না।'

'ইচ্ছে ক'রে কি মানুষ চাকরি করে? তোমার চেয়েও অনেক বড় প্রতিভাবান মানুষেব চাকরি কবে খেতে হচ্ছে। অবোধ অবুঝের গোলামী কবে জীবন পণ্ড হয়ে যাচ্ছে তাদেব। ঈশাকেও ভেড়াব পাল চরাতে হয়েছিল। কি করবে—এ ছাড়া উপায় নেই তো। খাওয়া—পবাব স্বাধীনতা চাই তো মানুষেব।'

'স্বাধীনতা আছে আমাব', ক্ষেমেশ জয়তীর মনকে ঠেক ধার দিয়ে বললে, 'ব্যাঙ্কেব টাকা আছে। দায় পড়লে আমাবও চাকরি করতে হত। সে রকম দায়ে এখনও পড়িনি আমি। পড়তে হবে একদিন ; তখন ঠিক করে নেব পথ। চা খাচ্ছ না? সন্দেশ রেকাবিতে সাজিয়ে দাও।'

'তুমি খাবে?'

'খাব বইকি! তুমি কি একাই খাবে সব?'

'কটা এনেছে?'

'গোটা পঞ্চাশেক হবে। একা খেতে পারবে?'

'এত সন্দেশ কি হবে?'

'ও-বেলা খাব, রঞ্জনকে দেয়া যাবে, কালও খেতে পারা যাবে, এক—আধ দিনে সন্দেশ নষ্ট হবে না!'

রেকাবিতে সন্দেশ সাজাতে সাজাতে জয়তী মনে মনে ভাবছিল ঃ কেমন একটা ভাঙা সোঁদা সোঁদা জমিদারি মেজাজ এখানকার সবদিকেই। বড় হাঁড়ি—অঢেল সন্দেশ—নিঃসাড় ঘরদোর পুরী—মুনাফা নেই, ব্যাঙ্কের টাকা আছে, তবুও নেই ; ব্যবসা নেই, চাকরীর মত গোলামী কে করে ; পাখি উড়ছে ; বাড়িটা এত বেশি বন—জঙ্গল আগাছায় ভরে আছে যে, সে সবের ভেতর দিয়ে একটা গোরু বা বাছুর চলে গেলে বিদ্‌ঘুটে সবজির গন্ধ ছড়ায় চারদিকে, বিশৃঙ্খলভাবে জন্মেছে সব গাছপালা, এবড়ো-খেবড়ো ফসল, অদ্ভুত সব আগাছার চাঁদমারি ; সবুজ বটে, কিন্তু তবুও এগুলো সত্যিই কি সেই সবুজ? প্রকৃতি বটে, কিন্তু তবুও কি প্রকৃতি? ক—খ লাহাব বা গ—ঘ পালচৌধুরীর সাজানো বাগানবাড়ির প্রকৃতির ভক্ত নয় অবিশ্যি জয়তী, কিংবা শিবপুরেব বোটানিক্যাল গার্ডেনেব, কিন্তু তবুও ক্ষেমেশেব বাড়িতে কোনো সুযোগই দেওযা হয়নি যেন প্রকৃতিকে ; অরণ্যের মাহাত্ম্য নেই এখানে, বাগানবাড়ির কাঁচিছাঁটা শৌখিনতা নেই। প্রকৃতি নেই। আছে? ভালো কবে তাকাল আবাব অনেক গাছ, অনেক লতা, আগাছাব বিস্তর সমৃদ্ধির ভযাবহতাব শোকাবহতার দিকে ; কেমন যেন মনটা লাগল জযতীর। জীবনের গল্প ফুরিযে গেলে এ—সব ঝোপ—জঙ্গলের দিকে তাকিযে এদেরই ভেতব মিশে যেতে হয একদিন ; সময কাজ কবতে থাকে তারপর, নিওলিথ মানুষের কথা আর মনে থাকে না কারু।.....ক্ষেমেশ তো আট বছব আগেও অক্‌সফোর্ডে যাবে ঠিক কবেছিল, ডিগ্রী আনবাব জন্য। গ্র্যাজুয়েট হযে ফিবে এসে একটা কলেজে প্রফেসারি পেত হযতো। সেও তো এই জিনিসেরই বকমফের ; কিংবা ব্যারিস্টারি পাশ করে এলে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার হযতো বড় জোর পাঁচ লাখে দাঁড়াত। কী হত তাতে। জীবনে একটু অদ্ভুত বলাধান হত হযতো ; মন আকাশেব বিদ্যুতেব মত নয—এ-সি ডি-সি ক্যারেন্টের মত চমকে হুমকি দিযে বসত ; বেশি দৌড়-ঝাঁপ কবলে কবিতকর্মা পুরুষ হযতো ওরা বলত ক্ষেমেশকে ; কেউ কেউ বলত লোচ্চা বদমাযেশ—ক্ষেমেশের ব্যক্তিক জীবনেব এক ঝুড়ি কেলেঙ্কাবি রটিয়ে বেড়াতে ওবা। কী হত এই সবে।

পবেব দিনেব সকালবেলা এল। ক্ষেমেশেব বসবাব ঘবেই বসেছিল দুজনে। বিশেষ কোনো ব্যক্তির হতচ্ছাড়া নষ্টচন্দ্রেব দিকে তাকিযে নয—এই অনেক দিনকাব উইযে কাটা ঘুণে খাওযা ভালো খাবাপ সুন্দব কাতব পৃথিবীটাব কথা মনে কবে নিঃশ্বাস ভাবি হযে এসেছে। ক্ষেমেশ যাতে টেব না পায় এমনি কবে হাল্কা নিঃশ্বাস ছাড়তে চেষ্টা কবল জযতী ; কিছু পাবল, কিছু পাবল না।

'তোমাকে কেমন গম্ভীব দেখছি।'

'আমি কথা ভাবছিলাম ক্ষেমেশ; এক—আধটা কথা এসে পড়ল—দেখছি—হাসিমুখে ভাবতে পাবি না।'

'কথা ভেবে কোনো কিনাবা পাবে না দেখ কেমন চমৎকাব রূপশালি ধান—দূবোব পাড়াগাঁব মত বোদ চাবদিকে ; আকাশে কত যে সাদা মেঘের পাল চিকচিক করছে। সূয্যির হাতে থোকা থোকা বকফুলেব পাপড়িব মত ছিঁড়ে পড়ছে গোটন পাযরাগুলো। ভোগবতী দেখনি কোনোদিন, দেখবে না। কিন্তু আকাশ—গঙ্গা দেখ। আকাশেব দিকে তাকিযে দেখ জযতী। কবেকার কথা মনে পড়িয়ে দেয এজন্মেব ওজন্মেব কত দেশের দূর দেশেব।'

'কই, তুমি তো অক্‌সফোর্ডে গেলে না?'

'না, সে আব যাওযা হল না। বাবা মোকদ্দমায আটকে গেলেন—'

'চাকবি না কব ব্যবসায আপত্তি কি?'

'টাকা নেই।'

'পঞ্চাশ হাজার তো বযেছে।'

'আজকালকাব বাজাবে ওতো চণ্ডুব পাশে তামাকেব ছিলিম, ওতে কোন কাজ হয না। ব্যবসাব কথা পাড়লে যখন, আমি একটা কথা তোমাকে বলি—'

ক্ষেমেশের মস্ত বড় সোফাটাব এক কিনাবে গিযে বসল জযতী, দু' বেকাবি সন্দেশ সাজিযে তে—পযটায রাখল দু'জনেব মাঝখানে। সন্দেশ নিয়ে সাধতে গেল না সে ক্ষেমেশকে। নিজে তুলে নিল গোটা দুই। চাযে চুমুক দিযে বললে, আমি বুঝেছি কি করতে হবে আমাকে। বিরূপাক্ষেব লাখ পাঁচেক টাকা বার করে ক্যাপিটালের জোগাড় করে দিতে হবে তো?'

ক্ষেমেশ এক সঙ্গে দুটো সন্দেশ মুখে পুবে একটা উড়ন্ত পাখিব পানে—পাখি ফুবিযে গেলে—নীল আকাশেব দিকে তাকিযে বইল। 'তোমবা তো দু'তিন বছব ধবে এ জিনিসটাই চাচ্ছ।'

'আমরা কারা?'

'আমার বিয়ের আগে আমাদের বাড়ি যারা আনাগোনা করত, তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে মাঝে মাঝে ; কিন্তু তাদের সমস্ত কথাবার্তাই শেষ পর্যন্ত বিরূপাক্ষের তিন-চার-পাঁচ লাখে গিয়ে দাঁড়া, পঁচিশ লাখের ভেতর পাঁচ লাখের দাবি তাদের ; বিরূপাক্ষের ভাণ্ডারী আমি ; আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্কে খাজাঞ্চির সঙ্গে মাছির যা। মাছি মধু খায়? না খাজাঞ্চিকে?'

ক্ষেমেশ একটা সন্দেশ মুখে গলিয়ে দিল (আগের দুটো হয়ে গেছে তাব), একটু সময় কাটিয়ে আর একটা ; বললে, 'খাজাঞ্চিকে খায় মাছি।'

জয়তী মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে, 'কেন?'

'তবে কি খাজাঞ্চিকে ছেড়ে মধু খাবে মাছি? মাছি কখনো টাকা ছেড়ে মধু খায় শুনেছি কি?'

ঘরের পাশেই বুনো বেগুনের ছড়ানো পাতার ওপর একটা ছোট্ট পাখি এসে বসেছিল ঃ এত হাল্কা যে পাতাটা নুয়ে পড়ছিল না, কাঁপছিল না। পাখিটার দিকে তাকিয়েছিল ক্ষেমেশ ঃ কি নাম পাখিটাব ? খুব গাঢ় সবুজ, লাটিমের মত ছোট ; শীতের সকালে খুব চমৎকাব আনকোরা সবুজ মখমলেব জামা পরে এসেছে মনে হয়। কি নাম? উড়ে গেল পাখিটা।

ক্ষেমেশ বললে, তুমি বিরূপাক্ষের খাজাঞ্চি হযে দাঁড়িয়েছিলে বুঝি? ওবা সেইজন্যেই তোমাব কাছে যেত? যেত, একেবাবে কেটে পড়েনি তো ; সম্পর্ক একটা রেখেছে শেষদিন পর্যন্ত তোমাব সঙ্গে।'

'তা রেখেছে ক্ষেমেশ। বঞ্জনকে আব এক কাপ চা করে দিতে বলবে?'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?' ক্ষেমেশ এক টি-পট চাযেব হুকুম দিল।

'এক টি-পট বলেছি আমি? চাকব বাকরেব সামনে গেঁজেল বানিযে ছাড়বে দেখছি।'

'বঞ্জন গেঁজেলদেব খুব শ্রদ্ধা কবে।'

'খুব বড় টি-পট তো তোমার। ওবকম তাউস টি-পটের গেঁজেল আমি নই।'

'তুমি খাবে, আমি খাব, বাকি থাকলে রঞ্জন খাবে। চা-খাও, চা-খাও। শীতের সকালে চা।'

'চা এল। জযতী ক্ষেমেশেব কাপে ভবে দিল, নিজেব পেযালাও ভবে নিল।

'টি-পটে অনেক চা আছে ক্ষেমেশ।'

'খাচ্ছি। ওটা পবে খাব।'

চাযে দুবাব চুমুক দিযে ক্ষেমেশ বললে, 'রোজগাব কববই এবকম একটা হন্তদন্তভাবে না চলে মানুষ যদি খুব স্থির মনে ধীরে সুস্থে টাকা উপাযেব পথে যায়, তাহলে তাব অভাব হয না। মন দিযে ভালো করে লিখে একটা ইংবেজি আর্টিকেল তৈবি কবতে আমার তিনচাব দিনেব বেশি সময লাগে না। এজন্যে আমি পঞ্চাশ, পঁচাত্তব একশো টাকাও পাই, বেশিও পাই।'

'ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখ, বাংলায লেখ না?'

'লিখব ভাবছি।'

'এইবার শুরু করে দাও। বিরূপাক্ষের কাছ থেকে কি পাঁচ লাখ চাইছ তুমিও?'

'যোগাড় কবে দিতে পারলে সুবিধে হত।'

'কি কবতে?'

'গোটা চারেক প্রেস কিনতাম।'

'এত টাকা লাগে তাতে?'

'শুধু জব প্রিন্টিঙের প্রেস তা নয।'

'ওঃ বির্লাটির্লার চালে ; খবরের কাগজও বেরুত একটা?'

'ক্ষেমেশ চাযে চুমুকে দিতে গিযে পেযালাটা ডান হাতে ধবে রেখে বললে, 'না, না, খবরেব কাগজ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। আমি পড়ি না ও-সব।' তাচ্ছিল্য বেদনা করুণা ঘেন্নায় কেমন কঠিন হয়ে উঠল যেন তার মুখ। ক্ষেমেশেব পেযালার চা ফুরিযে গেছে টের পেযে জযতী টি-পট থেকে চা ঢেলে দিতে দিতে বললে, 'বল কি হে খবরের কাগজ পড় না, আমি তো চাযেব পেযালা মুখেই তুলতে পারব না একদিন কাগজ না পেলে।'

'পৃথিবীর সব খবরই আমার জানা। মানুষ সভ্যতা গড়ছে ভাঙছে ; ক্রমেই বেশি ভাঙার দিকে তার রোখ, অশান্তির দিকেই ঝুঁকে পড়ছে বেশি। তবুও উৎরে যাবে—হয়তো শ্মশানের শান্তিতে কিংবা অন্য কোনো এক ঠাণ্ডা—আগেরটার চেয়েও ঢের ঠাণ্ডা ইণ্ডাজ ভ্যালির সভ্যতায। মানে মৃত্যুতে? না, জীবনেই ; ভালো সত্য শান্ত স্নিগ্ধ জীবনে। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে ও-সব হবে না কিছু। আমাদের আজকের

হইচই যা নিমেষে চোখ ধাঁধিয়ে মনে হয়, সে সভ্যতাব কোন রং নেই—অর্থ নেই—কিন্তু শান্তি আছে।'

নিজের পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে জয়তী বললে, 'কাগজও বেব করবে না, এত প্রেস কিনে চাচ্ছ?—'

'পাঁচ লাখ যোগাড় করে যদি দিতে পার আমাকে—'

'না অসম্ভব। কাউকে দিই না।'

'তাহলে—'

'তোমার এখানে থাকব বলেই আমি এসেছি।'

চাযে চুমুক দিতে গিয়ে পেযালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'বিরূপাক্ষ কলকাতায আছে? তুমি যে এখানে এসেছ তা জানে? না কি না জানিয়ে এলে। অবিশ্যি তোমাব নিজেব ব্যাপাবে কেমন যেন শিশুব মতন ঠেকছে ভদ্রলোককে আজকাল।'

'তুমি ওকে আমল দিতে না, তবুও বিয়ে কবলে। বিয়ে কবে ঘব সংসাবে ঢুকে গেলে বলেই তো মনে হল ; একদিন নয—কটা বছর। এ-সব কি কবে সম্ভব হল আমাদের কুশপুতুলেব মত গ্লাথা ঘামিয়ে যদি তা বুঝে দেখতে চেষ্টা কবতুম—' বললে, ক্ষেমেশ।

আবো বলত, কিন্তু বাইবে শূন্যেব ভেতবে কি যে কি দেখে চুপ কবে থেমে গেল।

'কি হত তাহলে?'

'সমস্ত বাত ভযে যেখানে ছাযাপথ ছিল—ক্ষেমেশ জানালাব ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডেব সেই কোটি কোটি শতাব্দীর কোটি কোটি মাইল আকাশেব দিকে চেয়ে থেকে পৃথিবীর—জয়তীর দিকে ফিরে বললে তাবপব, 'জযতী এসেছ।'

ক্ষেমেশেব গলায অনেকদিনকাব আগের মোমশিখাব কাঁপুনি যেন—কেমন যেন গভীব, স্নিগ্ধ শাদ্বল এবং সংকল্প উজ্জ্বল ; কিন্তু অভিজ্ঞ ও সমাহিতও বটে ; তবুও একটু চিড় খেতে আপত্তি নেই। সেই ছ্যাদার পথ ধরে যে বালি ঢুকে পড়তে পাবে সেদিকেও লক্ষ্য যে নেই তা নয।

জযতীব চোখ ঠোঁট থুতনি আঁটিসাঁটি হয়ে উঠল খানিকটা।

'আমি এ বাড়িতে এসেছি।'

'তা তো দেখছি।'

ও-পাড়ায বিরূপাক্ষ আছে তাব নানান গরম নিযে ; আমি চলে এসেছি বলে যে সে আমাকে ছেড়ে দেবে তা মনে হয না। দেখে নেবে সে। ব্যাপাবটা মোটেই সোজা নয। তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি। তুমি না থেকে কোন শক্ত লোক যদি এ বাড়িব ছেলে হত, তাহলেই স্বস্তি পেতাম।'

জযতীব কথা শুনে ক্ষেমেশ ভালো বোধ কবল না, কেমন একটা আক্ষেপেব হাসি ফুটে উঠল তাব মুখেব ভেতবে। ক্ষেমেশ যে শক্ত মানুষ নয—নবম মানুষ নয—মানুষ—তা জানে জযতী। অন্যদেব সঙ্গে কথা বলতে গিযে (এক সুতীর্থ ছাড়া), মিতভাষী জযতী। কিন্তু ক্ষেমেশেব সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে ক্ষেমেশের মত মিতভাষী নয। এই মেয়েটি যদি ক্ষেমেশের যৌন ও জীবন সাহচর্যে এসে পড়ে—যেমন ক্ষেমেশেব মা এসেছিল তাব বাবাব জীবনে তাব চেয়েও প্রাণঘন ও ধীসবস গভীবতায—তাহলে তা আর কি—ভালোই হয—খুব ভালো হয। এব চেয়ে বেশি ভালো—এক ঝাঁক সাগরগামী হরিয়াল সাবস যদি আজ সকালবেলা এখানে এসে পড়ে, তাতেও হবে না। ক্ষেমেশ কে কি বিয়ে কববে—শুধু কাঁচা শুধু কালো—বাত্রির অপবিমেয প্রহবেব মত চুলেব গুচ্ছ নিয়ে যে মেয়েটি বসে আছে বাত্রিকে যা দেবার দিনেব উজ্জ্বলতাকে যা দেবাব ঃ কারণ শবীবে ভেতর থেকে যা দান করে? ভাবতে ভাবতে সাগযানী হাওয়া আলোর—হবিযালদের কথা মনে পড়ল আবার ক্ষেমেশেব। সে সব হরিযালের রৌদ্র কোলাহল যদি এসে পড়ে এখন—

'তোমাকে একটা আলাদা ঘব ছেড়ে দিচ্ছি জযতী ; যেটা খুশি। কিন্তু কি কবে একা থাকবে তুমি? একজন ঝি আনিয়ে নেবে? আমি তোমাকে যোগাড় করে দেব?'

'ঝির ব্যবস্থা পরে করা যাবে। এক্ষুণি না পেলে জলে পড়ব না আমি। জ্যান্ত বা মড়া ভূত চিমড়ে মামদোর ভয নেই আমার। সন্দেশ খাচ্ছ না তো?'

'আমার গোটাদশেক হয়ে গেছে। তুমি এখানে থাকছ তবে।'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন—'

'বুঝেছি।'

'বসবাস করতে এসেছি তোমার এখানে। বিরূপাক্ষের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছে ক্ষেমেশ।'

'কেন হল?'

'হয়ে গেল।'

'আর যাবে না ওখানে?'

'বোকার মত কথা বলছ কেন ক্ষেমেশ?'

'একেবারেই ছেড়ে এলে, অথচ বিয়ে করেছিলে। বিয়ে কববাব সময মানুষের মন সমুদ্রের ফিনফিনে কাঁকড়ার মত পথ খুঁজে পায় না—ফেনাবাতাস ওড়ে?'

'সেই রকমই উড়েছিল ক্ষেমেশ, দেখছ তো।'

'টি-পট থেকে খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে জয়তী বললে, 'চলে এসেছি। চলে এসেছি কিন্তু এব চেয়ে বেশি কিছু আইনের মারপ্যাচ আপাতত সম্ভব হয়ে উঠছে না। কিন্তু আইন বেআইন সবের ওপরেই মানুষের মন। আমি ওখানে আর যাব না।'

ক্ষেমেশ চায়ের পেয়ালা একবার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আবার কি মনে করে টেবিলের ওপব রেখে দিয়ে জানালার বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রইল। মাথায় ঘুবছিল যেন অনেক পাখি, অনেক ছবি ক্ষেমেশের। সেই সাত সকালে রানী সাবসদেব কথা মনে পড়েছিল তার। মনে হতেই কেমন বোশেখী বিদ্যুতের মত মিলিয়ে গেছিল তারা, অন্য সাংসাবিক দশ কথাব চাপে পড়ে। ছ্যাঁৎ করে রাজসাবসদেব কথা মনে পড়ল ক্ষেমেশের আবাব। এখানে যদি একপাল বানীসারস চলে আসে এখন! তা যদি হয়, তাহলে আর কিছুই চায না, কেমন যেন এক মন্ত্রসিদ্ধি জানা আছে ক্ষেমেশের যাতে সে সমুদ্র হতে পাবে, হতে পারে সিন্ধু ফেনা, উজ্জ্বল সূর্যের দিন, কত শত সাবস শবীব মনের কত বিশ্বস্তর আগুনে বাতাসে নক্ষত্রে বর্ণালিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

জয়তী চা খাচ্ছিল—টি-পটেব থেকে শেষের তলানিটুকু ঢেলে নিয়ে—মাথা হেঁট করে। ক্ষেমেশেব মুখেব দিকে তাকাবার কথা মনেই ছিল না তাব। নিজেবই নিতান্ত সব—কি যেন ভাবছিল জযতী। ক্ষেমেশ এখনও সারসদের কথা ধ্যান কবছিল—জযতীরও কথা। ও সব রানী সাবস বাংলাব পাখি নয, কিন্তু আলোকসামান্য পাখি ঃ জঙ্গল পাহাড় ভেদ কবে যে সব বহতা নদীর জল ছলকে জলছানি দিযে নীলিমাকণিকা সূর্যগুড়িব উচ্ছ্বাসে উৎফলিত হয়ে পাথব উল্টে, শ্যাওলা ছিঁড়ে পাযবাচাঁদা চাপেলী নাচিযে শববন কাঁপিযে কলবোল কবে চলেছে, সে সব অবিবল জলঠাণ্ডাব দেশে জলগন্ধেব দেশে—জলঠাকুবাণীব—জলদেবীব—নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ প্রবাহের ভেতর এই সব পাখি থাকে। ভাবতে ভাবতে ভাবনাব মোড় ঘুবে গেল ক্ষেমেশের অর্থ অন্তঃসাবাব বদলে গেল, এতক্ষণ যে ক্ষেমেশেব ভাবনা-তন্ময়তা অবাস্তব ছিল তা নয়, কিন্তু আমরা যাকে বাস্তব বলি প্রায সেই প্রদেশে ফিবে এল ক্ষেমেশেব মন। সাগব সূর্য পালক পশম কি এক দিব্যি ফোকাসেব আলো অন্ধকাব থেকে উদগত হয়ে যে জযতীব সঙ্গেও মিশে যাচ্ছে হঠাৎ তা টের পেযে মনের ভাবনাব খেইয়ে একটা ঝাঁকুনি লাগল— একটু শব্দ কবে হেসে ফেলল ক্ষেমেশ।

জয়তী ঘাড় হেঁট কবে নিজের মনের পথে হেঁটে অনেক দূর চলে গিযেছিল যেন—ক্ষেমেশেব হাসিব শব্দ শুনতে পেল না সে হযতো ক্ষেমেশের দিকে ফিবে তাকাল না। কেমন সুন্দব সব পাঁচটিকে— এমন কি ছটিকে ছাড়িয়েও কেমন যেন এক সপ্তম ইন্দ্রিয় দেখাচ্ছিল যা এতক্ষণ ক্ষেমেশকে সুন্দব জযতীও: ভাবছিল ক্ষেমেশ; কিন্তু তবুও দুটো মনচ্ছবি যদি ওবকম ওতপ্রোতোভাবে মিশে যায (জযতীব শাড়িটা রোদে ছায়ায যে রকম কমলা বাসন্তী সাদা গেরুয়া আভাব দেখাচ্ছে তাতে না মিশে পাবে না আব।) জযতীকে তাহলে পাখিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার শক্তি থাকে না আব— দৃষ্টিভঙ্গির গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায ক্ষেমেশেব এমনই স্খলন হয সে সুন্দর জিনিস দেখেও হাসি পায তাব, হাসি মুছে যায আস্তে আস্তে ছাযা পড়ে হৃদযে— কেমন যেন করুণাব পাত্র মাঠ বন পাহাড় মৃত্যুব পাখি— আব এই জয়ন্তী পাখি— দেখ, কেমন মাথা উপুড় করে চুপচাপ কথা ভাবছে। হাসল না এবাব ক্ষেমেশ, মন করুণ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তাব। তবুও তারপর আগাগোড়া এই সব পাত্রপাত্রীব দিকে এবং এই সকলেব দিকে তাকিযে আছে যে ক্ষেমেশ তাব দিকে তাকিযে পরিহাস বিশুদ্ধি পেল তার— দুর্নিবাব ব্যাপ্তি পেল হাসিব বলয। এই সচ্ছল, অনুপম বিমুক্তি না থাকলে করুণ। এসে মানুষকে বেশি নিস্তব্ধ করে ফেলে- নিজেকে এই পৃথিবী গ্রহেব উপযুক্ত মনে হয না আব।

'আমি মাকে এলাহাবাদ থেকে এখানে নিযে আসব। তোমবা এক সঙ্গে থাকবে। আমি আজই যদি এলাহাবাদে যাই বঞ্জন তোমার ঘরের রোযাকে শোবে।'

'না, মাসিমাকে এখানে আনতে পারবে না।'

'কেন?'

'ওঁবা হলেন সেকালেব লোক। মুখ দেখাতে পাবব না।'

'কিন্তু মুখ দেখাবার দরকার হবে তো—পৃথিবীতে থাকতে হলে। চেড়ী-রাজ্যে অশোকবনে ছিলে—চলে এসেছ। তোমাকে ঘিরেছে কেমন একটা আচ্ছন্ন অশোকবনগ্রন্থি—সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।'

জয়তী একটু হেসে বললে, 'সত্যি কোনো গ্রন্থি নেই আমাব—পণ্ডিতরা যেহ বলুন না কেন। মাসিমাকে এখন এলাহাবাদ থেকে আনাব দবকাব নেই।'

'এক-একটা পুরোনো দালানে নাগকন্যা থাকে। চোখে না দেখলে বুঝতে পারা যায না যে রূপ মানে কত রূপ। কিন্তু চোখে তাকে দেখা যায না। জয়তী, তোমাকে তো দেখেছি। তুমি কি করে মানুষেব চোখ এড়িয়ে নাগকন্যা হয়ে থাকবে?'

'চোখে তো দেখছ,' রোদেব ভেতব ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে ঘুম এল না— আলাদা পটভূমি এল আলাদা সূর্য জেগে উঠল জয়তীব মনে; কিন্তু পৃথিবীব লৌকিক সূর্যেব থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন নয়, এই সূর্যেই তো; আকাশের দক্ষিণ কিনাবে— দূবত্বে— কাছেই; জয়তী আস্তে আস্তে বললে, 'সুতীর্থ কোথায?'

'সুতীর্থ কে?'

'সুতীর্থ গুপ্ত—চেন না?'

'ওঃ, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। কোথায থাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম।'

'বিরূপাক্ষেব একটা বাড়ি আমাব নামে লিখিয়ে নিয়েছি।'

'কটা বাড়ি ওর?'

'গোটা তিনেক।'

'এব ভেতব একটা তোমাব?'

'হুঁ, আইনত, দলিলপত্র আমাব কাছে আছে।'

কথাটা ক্ষেমেশেব কানেই গেল না যেন— কাছেই একটা সজনে গাছেব হালকা ডালে ঘাসেব চেয়েও বেশি গাঢ় সবুজ একটা পাখি বসে বসেছিল। সচবাচব একবকম পাখি দেখা যায না— কেমন একটা হেমন্তগভীব দৃষ্টিলাবণ্য নিয়ে পাখিটাব দিকে তাকিয়েছিল ক্ষেমেশ: কি নাম এই পাখিটাব? বাংলা নাম কি?

'পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে এসেছি।'

'ব্যাঙ্কে তোমাব নামে বেখেছিল বিরূপাক্ষ?'

'বাখিয়েছিলুম।'

'কোন্ ব্যাঙ্কে? গিয়ে খতিয়ে দেখেছ তো নিজেব চোখে-'

'লযেডসে, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিযা অস্ট্রেলিযায, ইম্পিরিযাল ব্যাঙ্কে আরো আছে এদিকে সেদিকে। ঠিক আছে।'

ক্ষেমেশ চাযে চুমুক দিয়ে বললে, 'বাড়িটা ভাড়া দিয়েছ?'

'না। ভেকেন্ট পজেশন।'

'বাড়িটা কোথায?'

'বালিগঞ্জে। ভাড়াটে বসাব নিচেব তলায। ওপবে তিনটে কোঠা আছে— আমি থাকব।'

ক্ষেমেশ জানালাব ফাঁক দিয়ে একটা উড়ন্ত আগন্তুক পাখিব দিকে নিঝুম হয়ে তাকিয়েছিল; কি প্রগাঢ় নীলেব তেজ কেমন ফিকে নীলে মিশে গেছে; কমলা লেবুব রং সোনালী হয়ে যাচ্ছে; বুকেব কাছে দুধের মত সাদা পালক। কী নাম এই পাখির?

'বিরূপাক্ষেব টাকা তুমি না নিলেও পাবতে হযতো জয়তী।'

'কেন?'

'টাকাই কি সব?'

'সব নয়? মাস্টারি কবে খেতে বলছ হযতো আমাকে, অথচ নিজে তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে তোমাব বাবাব পঞ্চাশ হাজারে তো চালাচ্ছ।'

'বিরূপাক্ষের মতন একটা মানুষ— ওর টাকা তো ভদ্র অভদ্র সব ঘবেব ঝাঁট টেনে আদায কবা।'

'তাব মানে?'

'মানে— ওটা আমার একটা উপমা।'

'উপমাটা বেল্লিকের মত হল। বিরূপাক্ষের টাকা ছুলে আমার কুষ্ঠ হবে না। পঁচিশ লাখ টাকা—তিনটে বাড়ি—বাড়িগুলো—সমস্ত সম্পত্তিই তো আমার প্রাপ্য। টিকে থাকলে পেতুম সব— কিন্তু সবই প্রায় ছেড়ে দিয়েছি: মানুষের প্রাণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায় বলে।'

জয়তীর কথা শুনে সেই পাখিটার দিকে ক্ষেমেশ ফিরে তাকাল আবার। পাখিটা একা কেন? ক্ষেমেশের বাড়িতে—সমস্ত বেলগাছিয়া তল্লাটে—সময়ের প্রবাহের ভেতরেই কেমন একটা অপরিচিত যেন পাখিটা। এসব পাখি তাহলে জন্মলাভ করে! হাওয়ার ভেতর থেকে? কেউ আছে? কাছে লুকিয়ে? সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

'তুমি বড় ভালোগাব ক্ষেমেশ।'

ক্ষেমেশ চমকে উঠে জয়তীর দিকে তাকাল। 'আমি? কেন, কি করেছি বলতো জয়তী'?

'কি করেছ তুমি? যা করতে পার তাই করেছ। ভেবেছিলুম বড় হবে,—এড়িয়ে যাবে। ছি, ছি, বড্ড নোংরা। গা ঘিন ঘিন করছে আমার।'

'কিন্তু কয়েকটা বছর বিরূপাক্ষের সঙ্গে কাটিয়ে এলে তো তুমি। তা যদি সম্ভব হল—'

জয়তীর কান্নার সাড়া—খুব অস্ফুট—টের পেয়ে ক্ষেমেশ কথা বলতে বলতে থেমে গেল।

সাতাশ

অনেক রাতে মুখার্জি সুতীর্থকে তার বাড়ির ফটকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। নিচের সদর দরজা খোলাই ছিল—দোতলার কোলাপসিবল গেটও। ওপরে উঠে সুতীর্থ দেখল তার ঘরে বাতি জ্বলছে। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল মণিকা সুতীর্থের সোফায় বসে আছেন।

'এতো রাতে তুমি এখানে।' সুতীর্থ বললে।

'তুমি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে; মণিকা বললে, 'একবার বললেও না কোথায় যাচ্ছ—'

'আমি তো গ্রেফতার হয়েছিলুম-'

'পালিয়ে এলে বুঝি তারপর?'

মনটা কেমন জোর হারিয়ে ফেলেছে: কেমন হয়ে গেছে যেন—'

'তা তো দেখছিই। মুখ পুড়ে কালি হয়ে গেছে, খুব কড়া রোদে ধর্মঘট করেছিলে বুঝি।'

'অনেক কথা আছে। জ্যোতি কি জেগে আছে?'

'না।'

'অংশুবাবুর টান ওঠেনি তো?'

'আজ রাতে একটু ঘুমুচ্ছেন।'

'ব্রোমাইড দিয়েছিল বুঝি?'

'না, ডাক্তার এসে একটা মিক্সচার দিয়ে গেছেন। তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াচ্ছি। আগে ইনজেকশন দিয়ে গেছলেন।'

'বাড়াবাড়ি হয়েছিল কি আমি চলে যাবার পর?'

'ডাক্তার তো ডাকতে হল।'

'সারারাত তুমি জেগে আছ?'

'রোজই তো জাগি। চা দিতে বলব জ্যোতিকে। যাই উপরে। বলি—'

'অংশবাবুকে ওষুধ দেবার সময় হয়েছে?'

'না। এই দিয়ে এলুম। আর তিন ঘণ্টা পরে।'

'তাহলে এইখানে তোমাকে বসতে হবে। আমার চায়ের দরকার নেই।'

মণিকা উঠে দাঁড়িয়েছিল—সোফার এক কিনারে—শীত ধরেছে বলেই খুব সম্ভব আঁট-সাঁট হয়ে বসে বললে বসছি। তুমি ওদিককার সোফায় বস। উনি যদি জেগে ওঠেন, টের পাবে তুমি। আমি কানে কম শুনতে শুরু করেছি। তাছাড়া, তুমি আমার চেয়ে হুঁশিয়ার সুতীর্থ। উনি জেগে উঠলে আমাকে খবর দেবে। তুমি মোটরে এলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, তুমি তো এই ঘরেই ছিলে?'

'না। দরজায় মোটর থামল, তাই নেমে এলুম। ওপর থেকে দেখেছি আমি সব। ও লোকটাকে তুমি

কোথেকে জোটালে সুতীর্থ?'

'কার কথা বলছ?'

'যে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।'

'ও তো মি: মুখার্জি।'

'চিনি আমি।'

'তুমি চেন!'

'এ বাড়িতে ভাড়াটে ছিল—'

সুতীর্থ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'তাই তো তোমাব কথা জিজ্ঞেস কবছিল।'

'জিজ্ঞেস কববেই তো; ওর মুখে আমি চাবুক মেবেছিলুম।'

'বটে? কেন?'

'চাবুক হাতে ছিল— তাই।'

সুতীর্থ মণিকাব নিরবচ্ছিন্ন চুলেব কালকেউটে জড়ানো মাথাব দিকে মুখেব দিকে তাকিয়ে বলে, 'ক বছর আগে হল এসব?'

'বছব পনেরো হবে।'

'তখন তুমি না জানি কি রকম ছিলে, মুখার্জিব কি অন্যায়?'

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'আজো তোমার কথা জিজ্ঞেস কবে। অংশুবাবু তোমার স্বামী শুনে কেমন কেমন যেন হয়ে গেল। কেন, ও কি জানে না যে অংশুবাবুকে বিয়ে কবেছ তুমি?'

'কেন, কি বলছিল?'

'অংশুবাবুকে চেনে না মনে হল।'

'তা না চেনাবই কথা।'

কেন, এ বাড়ির ভাড়াটে তোমাকে চেনে, চিনে চাবুকও খেয়েছে। আব অংশুবাবুকে চিনবে না?'

মণিকা বললে, এত বাতে মুখার্জিব সঙ্গে মোটবে ঘুবে কোথায় কি কাণ্ড বাধিয়ে ফিবলে সুতীর্থ?'

'আমি যা জিজ্ঞেস করলুম—'

'অংশুবাবুকে ও দেখেনি? না যদি দেখে থাকে সেটা আমাব ববাত : ও: তাকে না চিনলে আমি কবব বল।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এটা কোন উত্তব হল না। পুবেব জানালা দুটো খুলে দিই। বড় গুমোট।'

'তাহলে তো বাস্তার লোক টেব পাবে এত রাতে ঘবে আলো জ্বলছে। এত বাতে এখানে বসে থাকা—কথা বলা—চাবদিকে নানা বকম নমুনাব লোক আছে—'

'যা খুশি বলুক গে, আমার কিছু এসে যায় না।'

'তুমি তো স্বযংসিদ্ধ, কিন্তু আমি তো আমাব কথা না ভেবে পারি না।'

'বা:, বেশ ফুবফুবে হাওয়া দিচ্ছে বাতে তিনটেয: মাঘ গেল— ফাল্গুন এসে পড়েছে—'

'মুখার্জির মত একটা বদমায়েসেব সঙ্গে মোটবে টহল দিয়ে বেড়ানো হচ্ছিল বাতবিরেতে। মুখার্জিব বাঙালীয়ানা তো অনেক দিন হয় ঘুচে গেছে। ও তো দালাল— সাহেবপাড়ার দালাল।' মণিকা জানালাব ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'এ বাড়িতে ভাড়াটে থাকতে ছত্তিবশগড়িয়া ভাষায কথা বলত কে একটা মেয়েকে নিয়ে—'

'ওব বউ?'

'না। মেয়েটার ধবল ছিল।'

'ধবল? ধবলকুষ্ঠ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায?'

'মুখে নয—অন্য কোন জাযগায।'

'ও, ধবল ছিল বুঝি', সুতীর্থেব জানালার কাছে গিযে বাইবেব কলকাতার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোমাকে দেখিয়ে গেল বুঝি সেই ছত্তিশগড়িয়া মেয়েটি?'

'আমাকে দেখাবে না? আমাকে না দেখালে চাবুক খাবে কি করে তার মিনসে?'

সূচীপত্রে যান

'সুতীর্থ মোটা সোজা রাস্তাটায় দুধারি ঘন গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে শেষ গ্যাস লাইটগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, কোন কথা বললে না।

'ফিরিঙ্গি মেয়েরা আনাগোনা করত এ বাসায় তখন। মদ খেতে গোরু শূয়োরের মাংসের মৌতাতে ড্যাকরা মিনসেগুলোর সঙ্গে মিশে। কথা বলত চিড়িয়াখানার টিয়ে চন্ননাগুলোর মত ডাকসাইটে চীৎকার পেড়ে—'

সুতীর্থ জানালার পাশেই বসেছিল, মণিকার কথা শুনছে কিনা বুঝতে পারা গেল না, কোন উত্তর দিল না ; চিন্তিত হয়ে নেহাতই কোন মন্ত্রগুপ্তির সাত পাঁচ ভাবছিল মনে হচ্ছিল।

'সুতীর্থ, তোমার স্ট্রাইক বুঝি এখন পাতালে ভোগবতী?'

'কি করতে বল স্ট্রাইক সম্বন্ধে তুমি?'

'আমি কিছু বলি না।'

'পরামর্শ দেবে না?'

'আমি কি দেব?'

'স্ট্রাইকফাইক ভেঙে ফেলে আমাকে আবার কুণ্ডু মল্লিকের সাপ্লাই কর্পোরেশনের ডিপার্টমেণ্টাল ইন-চার্জ হয়ে বসতে বল তুমি?'

'আমি? কেন? তোমার যা ভালো মনে হবে তাই করবে।ঃ

'কেন, মুখার্জির সঙ্গে রাতে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে তো আমার। কফি হাউসে গেলুম, ফার্পোতে গেলুম, চীনে টাউনে টহল দিলুম, হুমায়ুন প্লেসে গিয়ে ক্যাসানোভা হয়ে তারপর অলিগলিতে ঘোরা গেল। নানারকম নিউম্যাটিক বুননে গিয়ে বসলুম বাঙালী চীনে ইহুদি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের —বেশ ভালো লাগল আমার—'

সুতীর্থ ঝোঁকের মাথায় কথা বলছে টের পেল মণিকা ; কিসের থেকেই বা থিতিয়ে উঠছে এই ঝোঁক? সুতীর্থের মনের নির্থিতির থেকে? কিন্তু সেই নির্থিত মনকেই নির্মাণ করছে সুতীর্থ আবার। ঢেলে সাজিয়ে যা ইচ্ছে তাতে ওর মনের আগেকার সেই বর্তমান দৃঢ় বয়স্কতা ভেঙে যাচ্ছে, সেই সময়কার দুচারটে বিহ্বলতারও জড় মরছে না। বলছে বটে, কিন্তু তবুও মুখার্জির সঙ্গে অবিশ্যি মিশ খেতে পারেনি সুতীর্থ ; সেটা অসম্ভব।...কথা বলতে বলতে সুতীর্থ নিজের সোফায় এসে বসল।

মণিকা কিছু বলতে যাচ্ছিল সুতীর্থকে, কিন্তু বলা হল না, গায়ের লেডিজ কোটটার বোতাম আঁটতে আঁটতে মণিকা বললে, 'আমার সময় নেই। কি কথা তোমার বলে ফেলো। রুগী মানুষ ওপরে রেখে এসেছি।'

'স্ট্রাইকটা হামিদের হাতে ছেড়ে দিলে কেমন হয়?'

'তুমি বেরিয়ে আসবে?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তুমি বুঝে দেখ।'

'মনটা তোমার কেমন ভারি হয়ে আছে মনে হচ্ছে মণিকা দেবী।'

সুতীর্থ বললে, 'আমি অফিসে অনেক দিন কামাই করেছি। কিন্তু আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মল্লিক আবার কাজে ডেকেছেন আমাকে। তাঁর অফিসের চাকরিটা নেব আবার? কি বল তুমি?'

মণিকা কোন কথা না বলে আলস্টার খুলে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রেখে আবার উঠবার উপক্রম করল। কিন্তু বসে থেকে বললে, 'সারা রাত বিছানায় শুয়ে বসে মীমাংসা করতে পারবে সুতীর্থ তুমি? শীতের রাত আছে—লম্বা রাত আছে—?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মণিকা—

'বিরূপাক্ষ আজ রাতে এসেছিল?'

'বিরূপাক্ষ?' মণিকা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'বিরূপাক্ষ কে?'

'কেন, আমার বন্ধু ; তার কথা বলিনি আমি তোমাকে?'

'কার স্বামী বিরূপাক্ষ?'

'পত্নী পরিচয় তো জানা নেই। কিন্তু পরশু রাতে ক'টার সময় সে চলে গেল?'

'মণিকা এক নিমেষের জন্যে নিজের মহৎ সম্বিতের ভাবটা হারিয়ে ফেলল। দুচার মুহূর্ত কেটে গেলে পরেও স্বাভাবিক অবস্থা আসতে সময় লাগছিল তার ; মণিকা উপলব্ধি করল যে দু মিনিট আগেও মনের যে অবস্থা ছিল তার সেটা ফিরে পেতে কত সময় লাগবে তা সুতীর্থের ওপর নির্ভর করে অনেকটা ঃ কী

দেখেছে সুতীর্থ? দেখে কী ভেবেছে? বিরূপাক্ষ ও মণিকাকে পাশাপাশি একই সোফায় অত রাতে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে সুতীর্থ যে মতামতে পৌঁছেছে সেটা ছেলেমানুষী হবে না—ভালো জিনিসই হবে ক্রমে ক্রমে আস্তে সুতীর্থের দিকে চোখ তুলে তাকাল মণিকা।

'তুমি দেখেছ?' সুতীর্থকে বললে। 'কটার সময়ে এসেছিলে রাতে?'

'অনেক রাতে।' সুতীর্থ বললে।

'কোন কথা বলবার নেই আমার', মণিকা দাঁড়িয়েছিল ; সোফাব এক কিনাবে বসে বললে, 'তুমি তো দেখেছ ; আমি শুধু এই—' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণিকা বললে, 'না, কিছু আর বলবার নেই আমাব।'

'পবশু রাতে ঐ জায়গায় ঐ সময়ে আমি না এলেও পাবতুম। মানুষকে অপ্রস্তুত করে যে জ্ঞান—তাতে আলোব চেয়ে আলোর মাছি ঢের বেশি।'

'তুমি এসে পড়াতে—সেদিন অত রাতে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে এসে ' ড়াতে—' মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে আলস্টারের পকেট থেকে একটা লবঙ্গ বেব কবে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতে ফেলতে বললে, 'তোমাদের কাছে আমি খালাস হয়েছি।'

'হয়েছ?' সুতীর্থ আড়চোখে মণিকাব দিকে একবাব তাকিয়ে নিয়ে বললে।

কোটেব পকেট থেকে কয়েকটা এলাচ ও লবঙ্গ তুলে দিল সুতীর্থকে মণিকা। সেগুলো জানালাব ভেতব দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুতীর্থ।

মণিকা একটু হেসে বললে, 'বিরূপাক্ষ নাক ঢেকে খেলা কবতে চায় মানুষেব বাড়িব ভেতর ঢুকে পড়ে। কিন্তু তবুও বাইবের সমাজে তার বিবেক বলে কোন জিনিস নেই ; যা তা বটিয়ে বেড়াতে পাবে যেখানে সেখানে—কিন্তু তুমি এসে নিজেব চোখে দেখলে তো সত্য কি? তুমি পবশু রাতে ছিলে—দেখেছিলে—ও জানে? না জানলে ওকে জানিয়ে দেবে।'

সুতীর্থ ঘাড় হেঁটে করে ঘরেব ভেতর পায়চাবি কবতে কবতে কোন এক জায়গায় এসে থেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'বিরূপাক্ষ কাউকে কিছু বলতে যাবে না। বিদ্বান বুদ্ধিমান নয়—কিন্তু নাড়ীজ্ঞান আছে। ওর টাকা তো এই সবেব জন্যেই, নিজেব আসল ভাঙিয়ে খেতে যাবে বিরূপাক্ষ?'

'তুমি কি বলছ সুতীর্থ?'

'আমাব কিছু বলার দবকাব নেই। বিরূপাক্ষ আমাব কাছ থেকে হুঁশিয়াবি শিখবে? তবেই হয়েছে! সে নিজে জানে কত।'

কটকটে সূর্যেব ঝাঁঝ যেন হঠাৎ চোখে এসে লেগেছে এবকম মাছেব মত সচকিত হয়ে সুতীর্থ জলেব ভেতর ডুব দিল আবার নিস্তব্ধতাব ভেতব।

'তুমি আমাকে অবিশ্বাস কব?'

'কবি যদি কি এসে যায় তোমার?'

'তোমাব নিজেব কিছু এসে যায়?'

সুতীর্থ মাথা হেঁট করে বললে, 'আমি তো পাশগাঁয়েব সুতীর্থ গুপ্ত। আমাব স্ত্রী আছে, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। এইবাবে তাদের কলকাতায় আনতে হবে। কিন্তু এ বাড়িতে কি থাকব আমি? এ বাড়িতে তো গন্ধগোকুল ঢুকেছিল ; জুঁই ফুলের পাপড়ি শুঁকে সেটা বোঝা শক্ত হবে ; কিন্তু মুশকিল হবে ঘেঁটু ফুলেব বেলা। তাব তিতো গন্ধটা তার নিজেব না পবেব কে কবে কতবাব কবে তা ঠিক কবে দেবে?'

'এ কি কথা—কি হিজিবিজি পবিভাষা তোমাব সুতীর্থ?'

'কথাব ভেতব ডুবে যেতে হবে তোমাকে। তুমি—'

মণিকা বাধা দিয়ে বললে, ধোঁয়াব মত কথা বানিয়ে বলো না। তুমি বিরূপাক্ষকে জিজ্ঞেস কবো।'

সুতীর্থ হাঁটতে হাঁটতে জানালাব দিকে সবে গিয়ে বললে, 'কি দবকাব আমাব জিজ্ঞেস করবার। তুমি যা বলেছ তার চেয়ে বেশি কি বলবে বিরূপাক্ষ আমাকে? সব শুনে বিরূপাক্ষ কি বলে শুনতে হবে আমাকে?'

'কি শুনেছ তুমি। আমি যা বলেছি তা যদি শুনে থাক, তা হলে তো আমাদেব কথা ফুরিয়ে গেল। এখন অন্য কথা পাড়।'

সুতীর্থ নিজেব সোফায় ফিরে এসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে দু-চাব পা হেঁটে জানালাব কাছে গিয়ে দাঁড়াল আবাব।

'তুমি এক জায়গায় স্থিব হয়ে বসতে পাবছ না সুতীর্থ।'

সূচীপত্রে যান

সুতীর্থ পূবের দিকের জানালা ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ; শীত রাতে কোন বাতাসের প্রত্যাশায় নয় ; এমনিই। বসতে পারছিল না সে।

'ওটা কি তোমার অভ্যেস? ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

'বসে আছ তুমি মণিকা দেবী ; বেশ তো বসে আছ তুমি। আমি পিরালি বামুনদের পরিবেশন করছি। বসে বসে কি করে তা করব?'

'কি পরিবেশন করছ ; মনের সন্দেহ? সন্দেহ ছাড়া কি আর দেবে তুমি কাকে। তোমার মনের সন্দেহ ঘুচল না—'

'এইবারে ঘুচিয়ে ফেলছি', সুতীর্থ বললে। 'বিরূপাক্ষের চোখে লাগছিল বলে সে আলো নিভিয়ে দেবে—আর সেই অন্ধকারের ভেতর বসে থাকবে দুজনে বাত দুটো অবধি?'

'বলেছিল তার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমোবার আগে ঘরটাতে অন্ধকার থাকলেই ভালো। আর ভালো মন্দতে অবিশ্যি এসে যাচ্ছিল না আমার। সুতীর্থ—'

আঠাশ

সুতীর্থ যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল, অস্পষ্ট চোখ তুলে মণিকার দিকে তাকাতে তাকাতে পরিষ্কার হয়ে উঠল যেন তাব চোখ—সন্দেহে না সাহসে পৃথিবী মিথ্যে এই ব্রহ্মোপলব্ধিতে—না সবই সত্য এই সঙ্কল্প স্থিরতায়?

'খুব বেয়াদবি হল বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিরূপাক্ষের। কিন্তু মানুষকে কখনো শিশুর মতন মনে হয়। আমরা নারীরা মায়ের মতন—' মণিকা বললে, 'বিরূপাক্ষ যে মতলব নিয়ে আমার কাছে এসেছে সেটা প্রথম রাতেই তার চেহারা দেখে বুঝেছি আমি। বাতিটা নেভাও সুতীর্থ।'

বাতি নেভাতে গেল না সে।

ঘরের বারান্দার সবদিকেব সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে সোফায় ফিরে এসে খুব বেশি অন্ধকাবের ভেতব মণিকা বললে, 'আমি তোমাকে সেদিনকার কথা বলব শোন। এর ভেতব কিছুই নেই বলেই না বললেই ভালো হত ; কিন্তু তবুও তোমার শোনা দবকাব। তুমি সে রাতে এমন সময়ে এসে এমন অবস্থা দেখেছ যে, নিজের কাণ্ডজ্ঞান বা মর্মজ্ঞানে যখন কিছুই বুঝলে না—অগত্যা সবই তোমাকে পরিষ্কাব কবে বলতে হচ্ছে আমার।'

সেদিনকার ব্যাপারটা সত্যিই জলেব মত পবিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল মণিকা। মণিকা যে সত্য কথা বলছে উপলব্ধি কবল সুতীর্থ। কোথাও কোন খিচ রইল না আব।

মণিকা তাবপবে বললে, 'আমায় উইল দেখিয়েছে, উইল শুধরে দিতে বলেছে, ওর বিষয়সম্পত্তির ট্রাস্টি হতে বলেছে বিরূপাক্ষ। চেক কেটেছে, ভাঙিয়ে টাকা পেয়েছি। আমি মানুষকে সহজে বিশ্বাস কবি না। কিন্তু বিরূপাক্ষ নিজের কাজ হাসিল করবাব জন্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে। আমরা বলি ঃ চাকরটা খুব বিশ্বাস, নায়েবমশাই বেশ বিশ্বাসী মানুষ। বিরূপাক্ষের কথাবার্তা কাজকর্ম দেখে সব সময়ই প্রায় আমাব মনে হয়েছে চাকরটা খুব বিশ্বাসী। কিন্তু তবুও বুঝেছি চাকবটা মোটেই বিশ্বাসী নয়।'

মণিকা হাই তুলে কুঁড়েমি ভেঙে বললে, 'আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলে ছিল ওসব। যেমন নীলু চাকর—বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী, রামচরণ খুব ধর্মভীরু। কোথায় গেছে সে সব।'

মণিকা আগে তুড়ি দিয়ে তাবপর আলসেমি ভাঙতে লাগল; হাই ছাড়তে লাগল একটাব পব একটা ; অনেক আলসেমি জড়ো হয়েছে শরীরে।

'তুমি ঘুমোলে তোমার সোফায়, গেল বিরূপাক্ষ?'

'তাই তো গেল, না হলে এল কখন? আমি জেগে থাকতে আসেনি তো।'

'ঘুমোলে কেন?'

'ওকে দিয়ে কোন পাপ হবে না জেনেই ঘুমিয়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম এসে পড়ে আমাব, সেদিনও তাই হয়েছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষ মুখার্জিব মত হলে ঘুমেব আগে ওপরে উঠে যেতুম আমি।'

'যে পাপী তাকে দিয়ে পাপ হবে না নিষ্পাপিনীরা কি তাই মনে কবে? কে বললে, তাই মনে করে?'

'তুমি ওরকমভাবে প্রশ্ন করলে আমি কথা বলব না।'

'অনেক নিরপরাধিনী তো আমি দেখেছি।'

কোনো কথা বলল না মণিকা।

সূচীপত্রে যান

'তারা তোমার মতনই সতর্ক।'

সুতীর্থ অপোগণ্ডের মত কথা বলে ভাবছে সেটা শ্লেষ—ভাবছিল মণিকা ; কি উত্তর দেবে—মিছে উত্তর খুঁজে মরছিল না তার মন।

'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন?'

অন্ধকারের ভেতর ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না মণিকাকে। সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে? সুতীর্থের প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে গেল না, বলেছে যা বলবার। আব কিছু বলবার নেই।

'বিরূপাক্ষকে সামনে রেখে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে।' মণিকা উঠে দাঁড়াল।

'বিরূপাক্ষের লালা তোমার ব্লাউজের ওপর লেপটে পড়েছিল সেদিন। তার মাথা তোমার বুকের ওপব গড়িযে পড়েছিল।'

'কিন্তু ঘুমন্তকে যদি ঘুমন্ত বিষ খাওযায় কিংবা অমৃত তাতে কার কি অপরাধ?'

'দেখেছি আমি—তুমি খুব বেহুঁশ হযে ঘুমুচ্ছিলে সেদিন।' মণিকা দাঁড়িযে বইল। মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঘরের ভেতর নিঃশব্দে নিজ মনে পাযচারি করছিল—

'এত ঘুমের ভেতর কেউ যদি কিছু কবে ঘুমন্তের সেটা অজ্ঞাত থেকে যায। থেকে যায়?'

'আর কিছু বলবে না ভেবেছিল সুতীর্থ, কিন্তু তবুও মুখ দিয়ে তার এই কেমন একটা প্রশ্ন বেরিযে গেল বলে একটু কুঁকড়ে গেল সে। সে জানে, মণিকা কিছু করে নি। তার স্বচ্ছ ধারালো অন্তর্ভেদী চোখ সত্য দেখেছে ; সে সত্য সৎ। মিছিমিছি তবু কথা বাড়াচ্ছে সুতীর্থ?

'কি করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই। আমার কাছে বেশি কথা শুনতে চাও তুমি, বারবার শুনতে চাও। কিন্তু যা বললুম এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার নেই আমার।' বলতে বলতে মণিকা শীতের রাত ভেঙে বনঝাউযের মত শিশিরে পাতায় কেঁপে উঠে অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে উঠে গেল যেন যেখানে কোনো অভিজিৎ নক্ষত্র নেই সে তেতলার অন্ধকাবের ভেতর।

হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল সুতীর্থেব—অনেকক্ষণ আগে। সে জ্বালাল না আর। অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আড়ষ্ট করুণাব সদ্যোজাত শিশুর মত, শীতাক্রান্ত জননীর মত সেই শিশুর, বসে রইল সে। মোটামুটি এইরকমভাবে বসে রইল সে অনেকক্ষণ। তারপর আর খারাপ লাগছিল না তার। ভালো না লাগবার কথা নয। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল সুতীর্থের ঘরের ভেতব যেন একটা রাধাঠুটী পাখি ঘিযেব মত ডানা পালক মেলে ঝরঝব জলজল ঝবঝর জলজল বসন্ত রাতের হিজল বনের নদী নির্ঝরেব মত শব্দে কথা বলে গেল। স্বচ্ছ জল সেই নদীর নির্ঝবের শব্দ—নির্মল, শাশ্বত।

তন্দ্রায় ঢুলে ঢুলে পড়ছিল সুতীর্থ। যেমন আমরা বলি, মাস্টার মশাই খুব বিশ্বাসী মানুষ—চাকবটা খুব বিশ্বাসী। যেমন বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী ; রামচরণ খুব ধর্মভীরু ; কোথায গেছে সে সব? অনেক ওপবের হাওযাব থেকে কে যেন বলছে এই সব তন্দ্রায ঢুলে মনে হল সুতীর্থের। মস্ত বড় রাত্রির মযদানে—নিশুথির তারাটা স্বাতী সপ্তর্ষি অভিজিৎ লুব্ধক বিশাখা—কী স্থিত দাঢ্য নিবিড় অনন্ত আকাশ সন্ধির অবিবল হাওয়া—অনেক স্বর্গীয় পাখি উড়ছে ঢের ওপরে—তার মধ্যে সবচেয়ে অনির্বচন পাখিটিই মানুষী। কি অসংস্থিত পৃথিবীর নিচের কয়লার গুঁড়ি উড়িয়ে ঘুবছে। কিন্তু সুতীর্থ যেখানে বসেছে সেখানে বাতাস ঠাণ্ডা নয, কিন্তু বরফের মত শাদা, বেলফুলের মত ঝর্ঝরে পাখিদের পালক, জুঁয়ের মতন গন্ধ স্নিগ্ধতা, অথচ কোন রক্ত নেই এমনই আশ্চর্য পরমাত্মার এক মেযেমানুষের নিবিড়তর বাতাসের ভেতর বাতাসের মত যেন মিশে গেছে সুতীর্থ—কোন শরীব নেই সেই নির্ঝরের ভেতর—কোন সময নেই সেই অপরিমেয় আলোয়—অনালোকিত অনন্ত বাতাসের ভেতর।

পরদিন সকালবেলাও নিজের ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে রোদের ভেতর নিস্তব্ধ হযে বসেছিল সুতীর্থ।

'কটা বাজে সুতীর্থ? মণিকা জিজ্ঞেস করল।

সুতীর্থকে নিরুত্তর দেখে মণিকা বললে, 'তোমার হাতঘড়িটা দেখছি না তো।'

'আছে।'

'কোথায়?' মণিকা দেরাজ খুলে বললে, 'এখানেও তো নেই।ঃ

'তাহলে চুরি হয়ে গেছে।'

'স্ট্রাইক ফণ্ড ছাড়া আর কোথাও চুরি হবার জায়গা তো দেখছি না। অমন দামী জিনিসটা দিয়ে দিলে?'

সূচীপত্রে যান

মণিকা কাল রাত্রের সেই সোফার ঠিক নির্দিষ্ট কিনারা দখল করে বসল। আকাশ পৃথিবীর সমস্ত রৌদ্রের অদ্ভুত জেল্লায় ঘর বার ভরে গিয়েছিল সব। ফাগুন আসেনি এখনও—তবুও বাতাসে তার অস্পষ্ট দিব্যতা—কেমন স্নিগ্ধ আগুনের ঘ্রাণ—মাঝে মাঝে করুণ আগুন। রোদ এড়িয়ে কিছুটা ছায়ার কিনারা বেছে বসেছিল মণিকা। কিন্তু তবুও রোদের অনেকগুলো চুমকি শাড়িতে গালে চুলে ছড়িয়ে ছিল। যার অর্ধেক নারী সেই মূর্তির নারীর দিকটার মত দেখাচ্ছিল মণিকাকে—বাকি সব বিশ্বম্ভর প্রকৃতির ; রৌদ্রের বাতাসের নীল শাড়ীর নীলাম্বর যেন।

'হাতঘড়ি মানুষের কব্জিতে খুঁজতে হয় নাকি?'

'সুতীর্থের ঘড়ি তার শার্টের আস্তিনের নিচে হারিয়ে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'কাল রাত থেকে বড় মনের ধাঁধায় আছি সুতীর্থ। সবই কেমন বেভুল হয়ে যাচ্ছে।'

'কি ধাঁধা?'

'এখন কটা বেজেছে?'

'নটা।'

'এই ঘুমের থেকে উঠলে বুঝি?'

শার্টের হাতার বোতাম খুলে ফেলে আস্তিন গুটিয়ে নিতে লাগল আস্তে আস্তে সুতীর্থ। 'সাত মিনিট বাকি আছে নটা বাজতে।'

'আমি তো দেখেছি, তুমি সারারাত ঘুমোওনি। আমি চলে গেলুম। তুমি ঠায় বসে রইলে ; এখনো বসে আছ। কেন?'

'তোমার কথায় মনে পড়ে গেলঃ ঘড়িটা খাঁটি সোনার—অনেক দাম হবে এখনকার বাজারে। দেব ধর্মঘটীদের?'

'ওটা কোন কাজের স্ট্রাইক নয়—'

'ওরা বোকা, তা আমি জানি। কিন্তু ওদের পরিবার তো না খেতে পেয়ে মবছে—'

'সে সব ভাবনা মুখার্জির হাতে ছেড়ে দাও। ও-ই তো ফ্যাক্টরির মালিক। মানুষ নয়, কিন্তু মিটমাট করবার শক্তি মুখার্জির আছে, তোমার নেই।'

'তার মানে?'

'তুমি তো চাঁদের বুড়ীর চরকার বাতাস—'

'রূপকের কথা বলছ মণিকা—'

'এ রূপকের কোনো মানে নেই বুঝি?'

'কি মানে?'

'তুমি যা চাও তা কি করে পাবে? কেউ কস্মিনকালেও তা পায় না। স্থান কাল জিনিস বিচার করে কাজ করতে হবে তো। এ সব ধর্মঘটীরা কে? কেমন হৃদয় মন? কি শিখেছে তারা? কতদূর জানে? না খেতে পেয়ে সুকটি মরেছে, তবুও কথা বলে বলে ওদের মন মজানো হচ্ছে এমনিই, যেন কথা খেয়েই থাকতে পারবে এই-ই মনে করা ওরা। মুখুজ্যে যদি আরো কিছুদিন গোঁ ধরে থাকে, কিংবা ওদেব পিঠে হাত বুলিয়ে এখুনি যদি কিছু রফা করে নেয় তাহলে কথা-গেলা হাড়গিলের বাচ্চাবা ঝাঁপিয়ে পড়বে মুখুজ্যের কোলে আদর খাবার জন্যে। মুখুজ্যে ছাড়া ওদের কোনো মিটমাট হতে পারে না।' মণিকা বললে, 'মিছেমিছি কেন বক্তৃতা দিতে যাও?'

উঠে গিয়ে একটা জানালা বন্ধ করে এল। কড়া রোদ এসে পড়েছিল তার মুখে। 'তোমার বক্তৃতা শুনিনি কোনদিন আমি। কেমন দাও?'

'আমার নিজের কানে তো মন্দ শোনায় না।'

'মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বল?'

'এমনি, খালি গলায়। থাকে মাইক মাঝে মাঝে—'

'বক্তৃতা দিতে পার, কোনো পার্টিতে ভিড়ে গেলেই তো হয। যদি বিশেষ কোন বাধাই না থাকে তোমার মনে তাহলে তো সুড়সুড় করে ওপরে উঠে যাবে। সেই-ই তো সবচেয়ে সোজা পথ—টিট পাখিদের পক্ষে। কাজ করবে চাকরবাকর চেলা চেংড়ীরা; পল্লী-সংগঠন, ধর্মঘট, শিল্পবিপ্লব, রক্তবিপ্লব—ওদের হাতে ছেড়ে দাও সব। কথা বলে হন্দো মাত করে রাখ।'

'তোমার চেয়ে ভালো কথা আমি বলতে পারি?'

সূচীপত্রে যান

'তোমরা বাইরের পৃথিবীর মানুষ।'

'তুমিও বাইরে চলো না আমার সঙ্গে।'

'সে রকম একটা রক্তবিপ্লব হলে আমাকেও নামতে হবে।'

'বড় বিপ্লব হবেই তো।'

'হলে হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে সে বিপ্লব আমি নাল ঠুকতে যাব কেন?'

'না আমার সঙ্গে নয়—আমি ভাড়াটে—' সুতীর্থ হেসে বললে। 'বিপ্লব হলে আমিও কারো ভাড়াটে হতে যাব না। নিজে একটা দিক নিয়ে দাঁড়াব।'

সুতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মেঝের রোদে দক্ষিণ দিকের জানলার লোহার গরাদের বিচিত্র নকশার ছায়া পড়েছে। সূর্যকে মা বলে অনুভব করে তাবি স্বচ্ছ শিশু সন্তানদের মত যেন বোদ। কত মাছি উড়ছে রোদে। সুতীর্থ আবার তাকিয়ে দেখল চায়ের পেয়ালার সোনালি কিনার ঘিবে মাছি ; রোদের ভেতর পেয়ালাগুলো হ'রেকষের ধূসরতা পেরিয়ে হঠাৎ হীরে হয়ে ঝিকমিক করে উঠছে।

'কোন পার্টিতে যাবে বললে?'

'সে তুমি জান। এটা নিজের ঠিক করে নিতে হয়।'

'আমার তো মনে হয় আমি কংগ্রেসরই চার আনা সদস্য হতে পারতুম যদি—'

সুতীর্থের যদিটা শস্যের মত ফলে উঠছিল যেন, কিন্তু বুলবুলিরা এসে খেয়ে গেল ; কিছু বললে না সে আর, চুপ করে বসে রইল সতৃষ্ণ বিষণ্ণভাবে অনেক দূবের একটা গ্যাসের বেলুন—হাওয়া অফিস থেকে ছেড়েছে হয়তো—সেই দিকে তাকিয়ে।

'সোসালিস্ট পার্টিতে যেতে পার।'

'আমার মনে হয় আমার কোন পার্টিই সইবে না।'

মণিকা রোদের ভেতর ঝিমুতে ঝিমুতে জেগে উঠতে উঠতে বললে, 'তা সয় না আত্মারাম চিড়িযার। কোন পার্টিই ধাতে সয না, অথচ সবই সয়ে যায। পার্কে ময়দানে একটা ভিড় জমলেই হাতেব ভেতর একটা লেত্তি খুঁজে পাওয়া যায—পৃথিবীটাকে চমৎকাব লাট্টু ঘোবাবার জায়গা বলে মনে হয় ; পাঁচটা পার্টিব স্বতোবিরোধেব ওপরে উঠে নিজেব মর্যাদায় দাঁড়িয়ে কথা বলা বক্তৃতা দেওযা—।'

জ্যোতি চা নিয়ে এল।

আপাদমস্তক জ্যোতির দিকে চাযেব ট্রের দিকে বিরস কটাক্ষে তাকাল মণিকা ; কেমন অশ্রদ্ধাব ব্রন ফুটে উঠল যেন সমস্ত মুখ ভরে।

'এত দেরিতে চা এল যে মণিকা দেবী?'

'চা তো ও এনেছে। আমি তো ওকে চা তৈবি কবতে বলিনি ; জানতে বলিনি।'

'কেন?'

'কেন, তোমার চাকর নেই?'

'তুমি জান না সে পালিয়ে গেছে?'

'আমাকে বলে পালিযে গেছে, আমাকে না জানিয়ে তোমার কুটুম্ব পালায?'

জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল, তাব দিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'চাযের সঙ্গে পাঁপড় এনেছিস কেন? একশোবার তো তোকে বলেছি ওসব কাশীর পাঁপড় ডাক্তারবাবুব জন্যে রেখে দিযেছি। সুতীর্থবাবু তো পাঁপড় খেতে ভালোবাসে না।'

'ফাঁপর এনেছে জ্যোতি—এটা খেতে ভালোবাসি আমি—' সুতীর্থ একটু মুখ মিঠিযে হেসে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল।

'নিয়ে যা এসব পাঁপড় জ্যোতি। নাকি তুমি খাবে সুতীর্থ?' জ্যোতিকে পই পই করে বলেছি এসব পাঁপড় কাশ্মীর ডাক্তারের জন্যে।'

'ডাক্তার কাশ্মীর?'

'না না, কাশ্মীর পাঁপড় ডাক্তারকে খাওয়াব ভেবেছিলুম।'

'আরো তো আছে, সব পাঁপড়ই কি ভেজে নিয়ে এসেছে জ্যোতি? ডাক্তারটি কে? চাটুয্যে? অংশুবাবুকে দেখছেন যিনি?'

'হ্যাঁ।'

'ভিজিটা নিচ্ছেন না?'

'কেন নেবেন না? আমরা প্রত্যেকটি কলে ভিজিট দিই ; দিনে চারবার এলে চারবার—'

'তবে আর পাঁপড় কেন?'

'মণিকার ঠোঁটের কোন মুচড়ে উঠল কেমন একটা হুলে বিঁধে যেন ; গম্ভীর হয়ে মণিকা বললে, 'আমরা ডাক্তারকে দিতে ভালোবাসি।'

'দিচ্ছই তো ভিজিট দিনে চারবার করে।'

'যার যা বরাত। কই আর দিতে পারলুম, ডাক্তারের পাঁপড় তুমিই তো খাচ্ছ।'

জ্যোতি চলে গিয়েছিল, হয়তো বিড়ি টানতে ; আবার এল—কেউ তাকে ডাকেনি যদিও।

মণিকা বললে, 'বাবু কি ঘুমুচ্ছেন জ্যোতি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।'

'আর দিদি?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'এখনও!' সামনের শূন্যতাকে চোখ দিয়ে একটু আস্তে ঠোকর দিয়ে সুতীর্থ বললে।

জ্যোতি চলে গেল।

'ঘুমুচ্ছে তো। জীউ নিয়ে শুধু বেঁচে থাকা যেমন আমার স্বামীর, তেমন আমার মেয়ের।'

সুতীর্থ চায়ের পেয়ালায় চুমুক না দিয়ে পিরিচের ওপর সেটা রেখে দিল। মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার মেয়েকে তো বেশ ভালোই দেখায়। অসুখ আছে? কি অসুখ?'

'হার্ট খারাপ,' মণিকা বললে, 'এই অল্প বয়সে এতটা যে খারাপ হতে পারে,—হল তো।'

'কে বললে?'

'কেউ বলেনি, মনে হয় আমার।'

'মনে হলে মনেই রেখে দিও মণিকা ঘোষাল! পাঁপড়ের একটা কিনার ভেঙে টোকা দিয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে সুতীর্থ বললে।

'ঘোষাল কেন?'

'অংশু মজুমদাররা নাকি আগে ঘোষাল ছিলেন ; তোমার নিজেব হার্ট কেমন?'

সুতীর্থের এ প্রশ্নের একটা বাঁকা উত্তর দেবে ঠিক করেছিল মণিকা, অপারেশন টেবিলে ছুরিব মত কাজ করে এমনি একটা জবাব মুখে এসে পড়েছিল প্রায় মণিকার, কিন্তু ভালো লাগে না, চোখ বুজে আসে, উৎসাহ বুতে যায়, মণিকা বললে, 'আমাকে তো থিওগার্গিনাল খেতে হয়। যখন তখন। হার্টের জন্যে।'

'দেখিনি তো খেতে তোমাকে কোনদিন।'

'খাই। হার্ট খারাপ।'

'তোমার চেয়ে ভালো হার্ট মুখার্জির আছে?'

'মুখার্জির চেযে সুস্থ মানুষ বুঝি তোমার চোখে পড়েনি আর?'

'ও তো ঢ্যাপসা নয়—দোহাবা।ঃ সুতীর্থ বললে, কিন্তু তোমার পাযের নখে ওগুলো কি পড়ে আছে? চাঁদ? কিন্তু মুখার্জি চাঁদ নয বলেই ওখানে নেই। ওখানেও নেই।'

যে শিশু মাকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলে—এবং যে মা জানে যে চাঁদ পেড়ে দেওযা যায় না, তাদের আকুতি ও অভিজ্ঞতায় কয়েক মুহূর্ত জড়িত হয়ে থেকে তাবপবে আস্তে আস্তে নিজের স্বতন্ত্র জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় ফিরে এল সুতীর্থ।

মণিকা একটা পাঁপড় তুলে নিয়ে কামড়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল আধাআধি, চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললে, মুখুজ্যের গাড়িতে চড়ে আমাদেব ফটকে নামলে রাত তিনটের সময। কি ব্যাপার বল তো সুতীর্থ—'

'ওরা স্ট্রাইকটা ভেঙে দিয়েছে।'

'জবরদস্তি করে?'

'হ্যাঁ। আমি দলের সর্দার নই অবিশ্যি—তবুও আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওদের মুখপাত্র হিসেবেই। ওদের অনেককেই গ্রেপ্তার করে হাজতে নিয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলুম আমারও জেল হবে—কিন্তু তা হল না আপাতত—'

মণিকার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'বড্ড বিশ্রী বেকাযদা যাচ্ছে।'

'কি হয়েছে?'

সূচীপত্রে যান

'গয়ানাথ মালোর কথা তোমাকে বলেছিলুম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে ধর্মঘটী খুন হয়েছে?'

'প্রমাণিত হয়েছে আমিই নাকি ওকে খুন করেছি।'

মণিকার চোখেমুখে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ পেল না। মনে হচ্ছিল যেন একটু দমে গিয়ে মুহূর্তের ভেতরেই সাব্যস্ত হয়েছে। ওর শরীরের ভেতরেই যেন সঞ্চিত আছে সে জিনিস যাতে নিজেই নিজেকে শুশ্রূষা করে স্থির করে নেয়—স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

'কিন্তু তুমি তো তাকে খুন করনি। করেছ?'

সুতীর্থ বললে, 'ব্যাপারটা আমি তোমাকে বলছি মণিকা দেবী—'

'গয়ানাথ মালোর মৃত্যু সংক্রান্ত আগাগোড়া ঘটনাটা খুলে বললে মণিকাকে সে। এর ভেতর মুখার্জির কতখানি হাত, মুখার্জির চেহারার সঙ্গে সৌসাদৃশ্য মানুষ যা ভাবে বলে করে সে সমস্তকে অতিক্রম করে সময়পুরুষের ভিন্ন রকমের সিদ্ধি সমস্তই মণিকার কাছে পরিষ্কারভাবে আনুপূর্বিক বিবৃত করল।

'কিন্তু এ তো বড় অদ্ভুত।'

'মনে হয় যেন বানিয়ে বলছি।'

'না, তা নয়। তবে—'

'গয়ানাথকে কি আমিই খুন করেছি মণিকা?'

'কথা বলছ সহজভাবে—কিন্তু মনটা তোমার আড় ভাঙছে না। একটা কথা তোমাকে বলব আমি—' মণিকা সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

'বল।'

'গয়ানাথ তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল না।'

'কি করে বুঝলে?'

'গয়ানাথ তোমাকে মুখুজ্যে বলেও মনে করেনি, মুখুজ্যের চেহারার সঙ্গে তোমার কোন সাদৃশ্য নেই—'

'নেই?' সুতীর্থ মণিকার চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, 'আমার নিজের চেহারা আমি নিজে তো দেখি না, আরশিও নেই আমার ঘরে। মুখার্জির সঙ্গে আমার কোন দিক দিয়ে কতদূর কি সাদৃশ্য বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি বলছ আমাদের চেহারায় কোন মিল নেই—'

'নেই,' মণিকা বললে, 'আছে মনে করে ছোরা বাগিয়ে তোমার দিকে সে ছুটেছিল একথা যারা বলে তাদের বেকুবির সঙ্গে পারবে না তুমি। কিন্তু বেকুবি নয়—' মণিকা একটু থেমে বললে, 'অভিসন্ধি স্পষ্ট না হলেও সোজা ধরা পড়ে যায়। তোমার কাছে আবছা ঠেকছে?'

'কেন ছুটেছিল তবে গয়ানাথ।'

'তুমি বলেছিলে না বন্ধু ওর পেছনে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বন্ধুই ছোরা মেরেছে ওকে—তোমার সামনে খাদের ভেতর থুবড়ি খেয়ে পড়ে গেছে তাই লোকটা—'

'কি যে বল তুমি। তা হলে বন্ধুকে দেখতুম না আমি—'

'তুমি পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলে?'

'কোন দিকেই তাকাইনি আমি-যে খাদে পড়ে গেল তার দিকে ছুটে গেলুম আমি—'

'জায়গাটার আশেপাশে ঝাড়জঙ্গল ছিল?'

'দেখিনি আমি—তবে মাঠজঙ্গল নিয়েই জায়গাটা। আচ্ছা আমি আরেকবার ঘুরে দেখে আসব। তুমি যা বললে তার—কিন্তু জায়গাটা দেখে আসব আমি।'

'গেলে হবে কি? যে জায়গায় হয়েছিল এসব তো তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না; সব জায়গাই একই রকম মনে হবে তোমার কাছে ; চেলেটেলে বের করতে পারবে না কিছু—গুলিয়ে যাবে সব। কাচাছাড়া ভাবের মানুষ তুমি, মুখুজ্যের মতন কাজের মানুষ তো নয়—'

'কিংবা বিরূপাক্ষের মতন। না, তা নই।'

'বিরূপাক্ষ কাজের লোক বইকি ; বাড়ি-মোটর পঁচিশ ত্রিশ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে তার। তোমার মতন ভাড়া না দিয়ে পরের বাড়িতে থাকার অভ্যেস নেই তো তার—'

সূচীপত্রে যান

মণিকার কথাটা যে তার পেটের থেকে বেরুচ্ছে, হৃদয়ের থেকে নয়, মাথার থেকে নয়—উপলব্ধি করেও পাল্টা রগড় করতে গেল না, কেমন নিঃশব্দ হয়ে রইল সুতীর্থ।

'ক' মাসের ভাড়া বাকি তোমার?'

'সাত-আট মাসের তো বটেই—'

'তোমাকে দশ মাসের ভাড়া দিয়ে দেব আমি—'

'অতটা পাওনা কিনা বলতে পারি না।'

'সেলামিও দিয়ে দেব।'

'দেবে তো বেশ করবে—' মণিকা বললে, 'কিন্তু মুখ লম্বা করে আছ কেন? তুমি যখন এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলে তখন সেলামির রেওয়াজ ছিল না তো। তবুও দেবে—এক কান কাটলেই দু-কান কাটা হয়—নিজেরই হয়। আর কার কি হবে। তা দিও—দিয়ে দিও দশ মাসের ভাড়া—সেলামী—' মণিকা হাসতে হাসতে বললে। 'ভাড়া দেও না বলে অবিশ্যি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারা যেত ; নতুন ভাড়াটে বসানো যেত। কিন্তু অংশুবাবু আর আমি তো চড়কের গাজন গেয়ে গেয়ে মাথা খারাপ করিনি—আমাদের ঠাণ্ডা মাথা ; তুমি এরকম বিগড়ে যাচ্ছ কেন?'

মণিকার কথা, গলার আওয়াজ কানের পটহে গিয়ে আঘাত করে, আঘাত করবার অনুমতি দিলে মনে হয় মর্মেও। কিন্তু কারু অনুমতিসাপেক্ষ মেয়ে মণিকা নয়, যদি হত তা হলে এরকম ষোলো আনা মানুষ হতে পারত না সে। মণিকা নিট ষোলো আনা নয়, তবুও খাদ আছে বলেই নিখাদ সোনার মত। সুতীর্থ যা চায় ঠিক সেরকমভাবে কথা বলছে না। বটে মণিকা, কিন্তু তবুও খুব খারাপ লাগছে সুতীর্থের?

উনিত্রিশ

'জানালাটা খুলে দাও সুতীর্থ, বোদ পড়ে গেছে, এখন একটু হাওয়া আসুক।'

জানালাটা কে খুলে দিল টেরই পাওয়া গেল না যেন। হাওয়া আসছিল। শীত কমে গেছে একেবারে ; হাওয়া না থাকলে ঘরের ভেতরটা কেমন গুমোট।

ফুরফুরে হাওয়ার ভেতর বসে থেকে মণিকা বললে, 'দেবে তো বলেছ, কিন্তু কবে দেবে ভাড়া?'

'আজ কালই দিয়ে দেব।'

'দশ মাসের নয়, তবে মাস আষ্টেকের নিশ্চয—আট মাসের ভাড়া পাওনা আছে তোমাব কাছে।'

'আমি পরশুই দিয়ে দেব।'

'পরশু পেতে আমাব আপত্তি নেই। টাকাব ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠেনি আমার মন, কিন্তু পরশু তুমি ভাড়ার টাকাটা দেবে না জানি। তুমি তো ওয়াদা দিচ্ছ—'

'ওয়াদা?' সুতীর্থ একটু হাঁফের অসুবিধা বোধ করে যেন বললে, 'আমি পরশুই তোমাকে টাকা দিয়ে দেব।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'আচ্ছা আমি এক্ষুণি তোমাকে চেক দিচ্ছি—একটা সিগারেট জ্বালিয়ে সুতীর্থ বললে।

'চেক নেব না আমি।'

'কেন?'

'ক্যাশ চাই। কেমন যেন বাজে মনে হচ্ছে তোমাব চেক বইটাকে—'

শুনে সুতীর্থ কলকাতার একটা বড় সিডিউলড ব্যাঙ্কের চেক বইটা সরিয়ে রেখে দিল।

'ধর্মঘট করছ সত্যকে ছাপাতে না দাঁড় করাতে! দাঁড় করাতে তো! কিন্তু জীবনের অন্য সব ব্যাপারে মিথ্যে ফেঁদে স্ট্রাইকটাকে সত্য করবে তুমি। তা কি কবে হয়?' মণিকা বললে, 'এখানে ধর্মঘট করছ মুখুজ্যের সঙ্গে ওখানে বড় হাতের পোলিটিকস্ চালাচ্ছ সিঙ্গি রুখে—ধর্মের ওপর নির্ভর করে, সত্যকে সহায় করে, যেন সব সত্যেই তোমাদের দিকে এরকম প্রাণবল সংগ্রহ করে। কিন্তু সব সত্যই কি তোমাদের দিকে? যে বাড়িতে থাকা হয় সেখানে আট দশ মাসের ভাড়া বাকি পড়ে থাকলে ছ্যাঁচড়ের সঙ্গে কোথায় প্রভেদ কর্মকর্তার? সমাজেব, অফিসের শাসনের বড় বড় ব্যাপারে তো বটেই, সাংসারিক খুঁটিনাটিতেও এ সব বিষে বিষিয়ে উঠল সব।'

যা অনুভব করেছে সেইটেই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছে মণিকাব মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সুতীর্থের। কেমন অমৃতের পুত্রের মত তাকিয়ে আছে মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে সুতীর্থেব মত বিষ

কন্যার সম্পর্কের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

'তোমার দশ মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারি সে টাকা আমার কাছে আছে।

'আছে? এইখানেই?'

'এইখানে—এই ক্যাশ বাক্সে। কিন্তু তবুও তোমার বক্তৃতায় মন ভিজল না আমার। এ টাকা তোমাকে আমি দেব না।'

মণিকা নিরুপায়ের মত হাসতে লাগল, হাসতে লাগল আজকের বিশৃঙ্খল লৌকিক পৃথিবীর ক্ষতের ছ্যাঁদাটার গভীরতার দিকে তাকিয়ে নিঃসহায়ের মত। কিন্তু তবুও হাসিটা নিস্ফল নিরুজ্জ্বল নয়।

'হাসছ?'

'তোমাকে একটা খৎ লিখে দিতে হবে ; তোমার হয়ে লিখে দিচ্ছি আমি।' মণিকা বললে।

'কিসের খৎ?'

'তোমার মনিবকে লিখে দেব। লিখে দেব ঃ কুকুরটা এইখানেই থাকবে খাবে—এঁটিলি কামড়াবে—আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে বেড়াবে ;—বেড়াক—কোনো চাবা নেই।'

'লিখে দিও কুকুবের বাচ্চা পাঠিয়ে দেব সামনের শীতে।'

মণিকা গম্ভীর হয়ে বললে, 'ক্যাশ বাক্সে টাকা আছে, আমাকে দেবে না, ও টাকাটা দিয়ে কি করবে?'

'যাদের দিতে হয় তাদের দেব।'

'ধর্মঘটীদের পরিবারদেব? কিন্তু স্ট্রাইক তো ভেঙে গেছে—'

'জেনে গেছে ওরা। কিন্তু ধর্মঘট চালাতে হবে, পবিবারদেব খেতে পরতে হবে—' সুতীর্থ কেমন যেন নালার ওপারেব চিতেবাঘেব মত তাকাল মণিকার দিকে।

নালার এপাবের সেয়ানা হরিণীব মত তাকিয়ে মণিকা বললে, 'তা হবে বইকি। কিন্তু আমাব খযরাতেব টাকা দিযে ওদের খাওয়ানো? আমি তো মুখুয্যের দিকে। আমি কেন টাকা দেব মুখুজ্যেকে যারা রুখছে সে সব মিনসে মাগীদের ফ্যানভাতের জন্যে?'—ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল মণিকাব দৃষ্টি ; জ্যোৎস্না রাতের নদী বনের ভেতর কালো ডোবাকাটা সোনালী রঙের সুন্দর জিনিস যেন তাব প্রিয়কে না দেখে একটা ইতর বাঘকে দেখেছে এমনই নিদারুণ হয়ে উঠল মণিকাব ঠোঁট। 'কোনো পুরুষমানুষ এমন কবে! বিরূপাক্ষ করত না নিশ্চযই, মিঃ মুখার্জিও না।'

সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলে এক হাজার টাকার একটা চেক লিখে দিল মণিকাকে। মণিকা তাকিয়ে দেখল ক্যাশ বাক্সের আনাচে-কানাচে একতলায় দোতলায় দু'চাব টাকার খুচরো ছাড়া ক্যাশ আব কিছু নেই—একটা পাঁচ টাকার নোট অবধি না। চেক সে সুতীর্থেব কাছ থেকে নেবে না ঠিক কবেছিল, কিন্তু না নিয়েই বা করবে কি? কাঁচা টাকা দেবে কোত্থেকে সুতীর্থ। টাকা ও জমাযনি কোনদিনই—সেটা জানে মণিকা ; সম্প্রতি চাকরিও নেই ; যে চেক দিয়েছে সেটা হয়তো কোন সমিতি বা পবিষদের ফাণ্ডেব টাকা ; পবিষদেব সম্পাদক সুতীর্থের হোক না হোক, চেক কাটবার পবোযানা আছে তাব। এ চেক ডিজঅনার্ড হবে না। চেকটা ব্যাঙ্কে নির্ঘাত মার খাবেই জেনেশুনে মণিকাকে তা গছিয়ে দেওয়া—, অত দূব অধঃপতন হয়নি সুতীর্থের। অধঃপতন তাব হয়ইনি, কিছুটা চন্দ্র চাঞ্চল্য হয়েছে ভাবছিল মণিকা ; তুয়োলে—বুযোলে কিছু হবে না, যখন সারবে নিজের থেকেই সেরে যাবে। আর যদি না সারে ঃ—মণিকার নিঃশ্বাস খুব ভেতরের থেকে এল গাছেব পাতার থেকে না এসে সমুদ্রেব বাত্রির নিজেব নিঃসুপ্তি কোটরেব থেকে চলে আসে যেমন বাতাস।

'এটা তো বেযাবাব চেক, এটাকে ক্রসড করে দাও।'

'কেন, তাতে তোমার কি সুবিধে?

'কখন ভাঙাব তা তো জানা নেই, চেকটা হারিযে যেতে পারে।'

'এক্ষুণি ক্যাশ করে নাও, ঐ তো রাস্তাব ওপারেই তো ব্যাঙ্ক।'

'আমিই ক্রস করে নেব।' চেকটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিযে ফেলল মণিকা।

'মুখার্জি তোমাকে খুনে প্রমাণ করে ছেড়ে দিল যে তবুও?'

'কড়ার করে নিয়েছে। আমাকে ধর্মঘটেব সংস্পর্শে থাকতে দেখলে স্ট্রাইকাবদেব বলে দেবে যে, আমি গযানাথ মালোকে খুন করেছি। ওরাই তখন খুন করবে আমাকে।'

'ওরা কি বিশ্বাস করবে?'

'হাতে হাতে প্রমাণ দেখিয়ে দেবে বিশ্বাস করবে না?' বিশ্বাস না করলে পুলিশ তো আছেই ; আমার জামাজুতো গয়ানাথের লাসের কাছে পড়েছিল রক্তাক্ত অবস্থায়। কেন, তা তুমি জানো। সমস্ত রকম দরকারী ফোটোগ্রাফ ওদের আছে। ফোটো তোলবার আগে কর্তারা স্বচক্ষে দেখে গেছে সব—ডায়রি করে রেখেছে।'

'মোকর্দমা করবে তুমি?'

'না। কি লাভ করে। করব না আমি।'

'স্ট্রাইকের নেশা ঘুচল তা হলে এবার তোমার?'

'দেখা যাক ওরা কি করে।'

'ওরা? কারা?'

'মুখার্জি আমাকে খুনে প্রমাণ করলে হামিদরা কি চষে ফেলবে আমাকে?'

'কিংবা সরকার কি ফাঁসি দেবে? বড় বেল্লিক তুমি?'

মণিকা বললে, 'তোমার জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়ে গেছে। আর একটা আরম্ভ করবার জন্যে তোমার বেঁচে থাকা দরকার। দেখ, দেশের হাওয়া কোনদিকে যাচ্ছে। স্ট্রাইকের দরকার হবে—বিপ্লবেরও—হযতো খুব বড় বিপ্লবের—হয়তো শান্তভাবে নয়, ফ্রান্সের মত, রাশিযার মত। কিন্তু তার আগে নিজেকে উপযুক্ত করে নাও। বযস তো তোমাব কম হয়নি। কিন্তু এখনও তুমি মোটেই তৈবি হতে পারনি।'

সুতীর্থ বিড়ি জ্বালিয়ে বললে, 'আমার তো লেখার দিকে, সাহিত্যের দিকেই বেশি নজব দেবাব কথা ছিল। তুমিই তো আমাকে হল্লায নামালে।'

'আমি?'

'তোমাকে আমি চাই।'

'আমাকে?'

'এখন নয়। বড় বিপ্লবের সময।'

শুনে মরুভূমির মতন কেমন একটা লু-চলাচলেব রূঢ়তা এসে পড়ল যেন মণিকার নিবিড় মাতা পৃথিবীর মত মুখে ; সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বিড়ি খাচ্ছ কেন? দিশি বলে? কিন্তু বিড়িব গন্ধে আমার বমি আসে, চলি তা হলে এখন।'

তেতলা যেন মহা নেপথ্য ; যাত্রিনীকে দ্রুত নিবিড়তায় উঠে যেতে দেখল সুতীর্থ।

'কোথায় ছিলে কাল সারাটা দিন—সমস্তটা রাত?' জিজ্ঞেস করল মণিকা।

'নানা জাযগায়। এক্ষুণি মুখার্জিব কাছ থেকে এলুম।'

'মিটমাট হল কিছু?'

'না।'

'কোনো ভরসাও দিল না মুখুজ্যে?'

'কি করে দেবে, আমার তো বাইশ দফা দাবি।'

'ওগুলো কমিয়ে দাও, কেটেছেঁটে ফেলো তেজও গুটিযে নাও। ওরকম মাবমুখো হয়ে সংসাবে কোনো কাজই চলে না। তুমি দিনের পর দিন বড় লোহার কার্তিক হযে পড়ছ।'

'তোমার লক্ষ্মীর মূর্তি খুলছে তো দিনের পর দিন—'

'কেন খুলবে না? নাভিব বদলে মৃগ নাভি নেই তো আমাব—'

'আমাদের আছে। সেটা মানি। সেই জন্যেই বিশৃঙ্খল হয়ে গেল জীবন, কোন শান্তি নেই, দিকনির্ণয় নেই, ধরবার মত কিছু পাচ্ছি না।' কিন্তু এ খুনের সমস্ত প্রয়াস রক্তাক্ততা নিষ্ফলতা কিছুই ছোঁযনি বুঝি ওকে, প্রশান্তির মত দাঁড়িযে আছে, মৃগনাভি তো ইতর মানুষদের নষ্ট করছে ; নিজেব সমাহিত নিয়ে কতশত সাগরতীরের সভ্যতার উষানারীদের দিব্যতায় জেগে রযেছে মণিকা—ভাবছিল সুতীর্থ।

সুতীর্থ বললে, 'যে দেখে তার চোখেই এত ভালো লেগে যায় তোমাকে।'

সুতীর্থ ঠোঁটে হেসে বললে, 'তোমার কাছে খবর পৌঁছিয়ে দেবার নির্দেশ পেয়েছি—

'কার কাছ থেকে?'

'মুখুজ্যে বলছিল—

মণিকার সমস্ত শরীর ঘিরে একটা ফণা জেগে উঠছিল—দেখছিল সুতীর্থ।

'আমি ধর্মঘট করতে চাই–ই—'

'করবে। তাতে আমার কী।'

'করলে আমার খুন ধরিয়ে দেবে মূখার্জি।'

'দিক, আমার কী এসে যায়।'

'কিন্তু একটা কড়ার করে নিতে চায় মূখার্জি।'

মণিকা আঁচল দিয়ে গলায় বেড়ি পরতে গিয়ে আঁচলের চাবিটা ঝনঝন করে বাজাল একবার। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আছে, নাকের ছ্যাঁদা কাঁপছে না এখনও, কিন্তু মণিকার সমস্ত ফর্সা সুন্দর সত্তা কালকেউটের মতন কালো আগুন হয়ে রয়েছে যেন ; সে ঝাঁঝের দিকে তাকানো যায় না যেন ; সুতীর্থ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'সেদিন মূখার্জি এসে দেখে গেছে আমি এই বাড়িতে থাকি। এ বাড়ির ভাড়াটে ছিল সে একদিন। তখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাব। বললে আমাকে।'

'বললে বুঝি? ভগবান ঠাকুরেব মত পণ্ডিত এ তল্লাটে আর পেলে না বুঝি মুখুজ্যে—কাকে বলবে ভগা ঠাকুরকে ছাড়া?'

'কিন্তু কাজ হাঁসিল কবতে হবে তো—'

'কোন কাজ?'

'স্ট্রাইকটা—'

'তার সঙ্গে ওর পূর্বপ্রেমেব খবব নেওযাব কী সম্পর্ক?'

'তা আছে।'

'আছে?'

চড়িযে দাঁত ভাঙতে এগিযে এসে মাথায় খুব বেশি বক্ত চড়ে গেছে অনুভব করে মণিকা স্থির হযে দাঁড়িযে রইল। মনেব ভেতব আগুন পুড়ে গেছে। ববফও গলে গেছে মণিকাব—একটা সুস্থ, ঠাণ্ডা আত্মস্থতায সে পৌঁছে যাচ্ছে।

'তুমি চাকবি ছেড়ে দিযেছ ঠিকই?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে কি কবছ এখন?'

'চাকবি–বাকবি শীর্গগিব কিছু কবব না আব।'

'কি করে চলবে তা হলে?'

'ও নিযে আমি মাথা ঘামাই নে।'

'আমি তোমাকে খাবার দিতে পারব না।'

'দিও না।'

'মাঝে মাঝে তুমি এমন পাণ্ডবুড়ো হযে এ বাড়িতে ফিবে আস যে ছেলেমেযের মা হযেছিলুম বলে তোমার তত্ত্বতলব না করে আমি পারিনে। কোন উচ্ছন্নে জিনিস দেখতে আমাব ভালো লাগে না। তুমি ফের যখন এ বাড়িতে ঢুকবে ভদ্রলোকেব ছেলের মতন ঠাঁট বেখে ঢুকতে হবে তোমাকে—'

'তোমার এ বাড়িতে আরো কিছুদিন থাকব আমি।'

'ভাড়া না দিলে থাকতে দেব না।'

'ভাড়া দেব।'

'এক সঙ্গে কতগুলো ভজাবে, তারপর দেবে, তা হলে চলবে না। ফী মাসে চাই ; গোড়ার দিকে দিতে হবে।'

'বেশ তো, মাস পয়লাই দেব। আমাকে মূখার্জি সাহেব বলেছে ধর্মঘট যদি করতেই চাই এমন, তাতে তার আপত্তি নেই। আমি খুন করেছি তা প্রমাণ করতে পারলেও ও নিয়ে প্যাঁচে ফেলে স্ট্রাইক পণ্ড করতে যাবে না। এমনি লড়বে আমার সঙ্গে—সোজাসুজি কোন আকস্মিক উটকো ঘটনাব সুবিধা নিয়ে নয়—'

'ওব সঙ্গে এই চুক্তি ঠিক করে এলে?'

'আপাতত।'

'ওকে মানুষ বিশ্বাস করে?'

'এত বড় ফ্যাক্টরির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছে তো ; অনেকেই বিশ্বাস করেছে বলে।'
'ও তোমায় ডেকেছিল বুঝি?'
'আমি নিজেই গিয়েছিলুম।'
'গরজ তোমারই বেশি—'
'আমাকে আজকালই ডাকত অবিশ্যি'—সুতীর্থ বললে, 'কই জ্যোতিকে দেখছি না।'
'কি-দরকার?'
'চা দিয়ে যাবে।'
'আমি তাকে বারণ করে দিয়েছি।
'ও, তা বেশ করেছ। আমি একটা চুরুট জ্বালাই তা হলে। চা দুপুরে খাওয়া যাবে ; বাইরে।'
'সুতীর্থ চুরুট বের করে ধরিয়ে নিয়ে মণিকাকে বললে, 'লড়তে যখন নেমেছি তখন শেষ না করে ছাড়ব না, এরকম কথা বলতে পারতুম, কিন্তু ওসব জেদের কথা কাজের কথা নয়।'
'কাজ করতে নামলেই জেদ বেড়ে যায়—পেট থেকে চাঁচাছোলা কথা বেরুতে থাকে। সে কথা ঠেকাবে কার সাধ্যি। বাছুরের মা গোঁসাই মার মত তেরিয়া হয়ে উঠলে খাটালের লোকদের যেমন হয় আর কি—তোমার সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে তেমনি ঝামেলা হয়েছে মুখুজ্যেদের।'
সুতীর্থ চুরুট টানছিল, কোনো কথা বললে না।
মণিকা সোফায় বসে বললে, 'এ ধর্মঘটে জিতে যদি তুমি মুখার্জিকে কাবু করতে পার, সেটাও বিশেষ কোনো কাজের কথা হবে না।'
'আবার প্যাঁচ কষবে, তা জানি, ভাবছিল সুতীর্থ।
'আজ ঘাড় নোয়ালে ওবা কালই গর্দান উঁচু কবতে জানে আবার।'
'আমরাই করতে দিই বলে।'
'বুদ্ধি–সুদ্ধির সঙ্গে আহম্মকির লড়াই তো। কেন জিতবে না মুখুজ্যে?'
সুতীর্থের চুরুটটা নিবে যায়নি একেবারে, কিন্তু যে আগুন আছে তা নিয়ে ফোঁকা অসম্ভব। ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চুরুটটাকে ভালো করে জ্বালিয়ে নিতে লাগল।

ত্রিশ

'তোমার বাইশ দফার দশ দফা মেনে না নিলে যদি খুশি না হও, বাইশ দফাই মেনে নেবে, কিন্তু কালই প্রমাণ করে দেবে যে আইন ওদের দিকে—তোমাব দিকে নয়।'
'বড় বেগতিক জীবন আমাদেব—রাষ্ট্রে সমাজে সব দিকেই। এ অবস্থায় কিসের দরকার?'
'বিপ্লবের। যা কোনোদিন ভারতবর্ষ দেখেনি এমনি একটা বিপ্লবেব।'
'জলের, না রক্তের?'
'রক্তের যাতে না হয সেই চেষ্টা কবাই দবকাব। খুব বড় বিপ্লব, অথচ খুব শান্তভাবে হচ্ছে—এ জিনিসটা যে একেবারে অসম্ভব তা নয়। কিন্তু কে করবে? উপকরণ কোথায়? গান্ধীজী নিবাশ নন। কিন্তু তিনি একা ছাড়া কেউই তো আব গান্ধীজী নন।'
'এসব লোক একক থেকেই বেশি কাজ কবতে পারে। পথে ঘাটে গান্ধী জন্মালে কারু কোন লাভ নেই। তা ছাড়া খুব বড় কেজো রেভল্যুশান গান্ধীদের দিযে হবে না। ওঁরা সে সবের ঢের ওপরে—মানুষ ওঁদের চেযে নিচে বলতে পাব, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মানুষ ওঁদেব চেযে ঢেব আলাদা রকমেব।'
জ্যোতি চা নিয়ে এল।
'কে চা আনতে বলেছে জ্যোতি?' জ্যোতি ইতস্তত করছিল।
'বাবু কি করছেন?'
'ঘুমুচ্ছেন।'
'ডাক্তারবাবুর ওখানে গিয়েছিলে?'
'হ্যাঁ—হযে এলুম তো এই।'
'কখন আসবেন?'
'একটা নাগাদ।' জ্যোতি চলে গেল।
'তোমার ঘড়িতে কটা বেজেছে সুতীর্থ?'

'ঘড়িটা আমি বিক্রি করে ফেলেছি।'

'মণিকা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল ; তরল গরম জিনিসে গলা পুড়িয়ে নিতে ভালো লাগছিল ; টনসিলে কেমন ব্যথা। গলায় আঁচলের পাক জড়িয়ে নিতে নিতে বললে, 'আমার কাছে বিক্রি করলেই পারতে—,

'তোমার ঘড়ি কি হবে—তোমার তো টাকার দরকার।'

'তোমার ঘড়িটাকে আরো চড়া দামে বিক্রি করে কিছু কাঁচা টাকা পাওয়া যেত।'

নাও হতে পারে খাঁই, সত্যিই কেবলই টাকাব দরকাব মণিকাব ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ বললে, 'চেকটা ভাঙিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। ওষুধ আর ডাক্তারের ভিজিটের বড় বাড়াবাড়ি চলছে আজকাল। আমাদেব তো রোজদাব নেই, ব্যাঙ্কেও টাকা নেই। নিচের তলার ভাড়াটেদের টাকাই খেতে হয।'

সুতীর্থ চিন্তিতভাবে চুরুট টানতে টানতে বললে, 'তোমার কথা কযেকবার জিজ্ঞেস করলে মুখার্জি। আমার সঙ্গে যাবে একদিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আসতে?'

'আমি? কেন?'

'আমরা তিনজনে মিলে কথাবার্তা বলব—আমার সঙ্গে চলে আসবে আবাব।'

আজকাল পৃথিবীটাই এমন অন্ধকাব, আঁশটে যে নির্মল মন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে ; তা পুড়ে যাবাব আগে খুব উজ্জ্বলতা ফলিয়ে যায়, খুব তেজস্ক্রিয় তাপ ; কিন্তু তাবপরে কালো ছাই পড়ে থাকে। কালো ছাই ছড়াবে না মণিকা, মনকে উত্তেজিত করবে না, মূর্খদেব সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করাই লিখন যখন এই ভীষণ দুর্ঘটনার গ্রহে তখন নিজেকে জ্বালিয়ে চড়িয়ে মনটাকে পীড়ন করতে যাবে না সে। শান্ত ঠাণ্ডা হয়ে থাকার চেয়ে ভালো জিনিস এই অন্ধকার আঁশটে পৃথিবীতে থাকতে পাবে না কিছু আব ; বেশ তিরিক্ষে তামাসাবোধ ছাড়া কেউ শান্ত স্নিগ্ধ হযে থাকতে পারে না এই কাদা রক্ত আগুন বিষেব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'মুখার্জির গাড়ি তোমাকে নিতে আসবে তাহলে মণিকাদি?'

গাড়ি আসবে না—মণিকাকে যেতে হবে না ; গাড়ি এলেও যেতে হবে না ; জানে মণিকা। আগে বেশ পরিষ্কারভাবে চিন্তা করত সুতীর্থ, কিন্তু স্পষ্টভাবে আবার চিন্তা করতে পাববে সুতীর্থ,—এ যুগের বাঙালী ও ঠিক নয—আগেকার যুগেব বাঙালীব বেশি ভালো জিনিস আছে ওব ভেতব।

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমাদেব শীগগিরই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে—'

'কি কথাবার্তা হবে?'

'এমনি—ধর্মঘট সংক্রান্ত—'

'ওখানে কে কে থাকবে?'

'আমরা তিনজন—'

'অ্যাডজুডিকেটর কাবা?'

'অনেকেই আছে—কিন্তু মুখার্জিই সব।'

'তুমি কথাবার্তা চালাবে তোমার নিজের প্রতিনিধি হযে?'

'না, না, তুমি আর আমি ধর্মঘটীদেব প্রতিনিধি—'

'আমার কথা ছেড়ে দাও—স্ট্রাইকাববা তোমাকে তাদের সর্দাব মেনে নিযেছে?'

'মেনে নিযেছে বলেই তো মনে হয।'

'মনে হয? তারা সব জেলে, আর তুমি জেলের বাইবে ; তাদেব স্ত্রী—সন্তান খেতে পাচ্ছে না, আর তুমি খ্যাঁট মেরে প্রতিনিধিত্ব করছ। এ তো চারপেযেদের প্রতিনিধি। হামিদ যদি ওখানে থাকে তা হলে তো তোমার জুতো ছিঁড়ে খুর বার করে নাল ঠুকে দেবে—'

সুতীর্থ ঈষৎ মুখ ফাঁক করে হেসে বাগেশ্বরীব দিকে তাকাল—ভাবের আশ্চর্য ঈশ্বরীর দিকে ; মণিকা মুখ চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে চুপ করেছিল। অনেকক্ষণ পরে সুতীর্থ বললে, 'আমাকেই ওবা প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছে—'

'মুখার্জির ওখানে মদেব ব্যবস্থাও থাকবে?'

'তুমি গেলে মুখার্জি মদ খাবে না।'

'এসব স্ট্রাইকভাইক ব্যাপারের কিছু বুঝি না আমি। অ্যাডজুডিকেটরের সঙ্গে আমি কি কথা বলব।'

'তুমি যতক্ষণ থাকবে তোমার ইচ্ছে না হলে স্ট্রাইকের কথা বলব না আমবা—'

সূচীপত্রে যান

'তবে?'

'পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ে তোমার রুচি আছে তাই নিয়ে কথাবার্তা হবে। বেশি কিছু বলবার ইচ্ছে না যদি থাকে তোমার, বসেই থাকবে না হয়, আমাদের কথা শুনবে।'

'তোমাদের কথা তো বেড়ালেও শোনে না—'

সোফার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে করতে সুতীর্থ বললে, 'চলো আমার সঙ্গে ওর এখানে ;—দিনখন ঠিক করে-নেয়া যাক।'

'তোমার মেয়েকে স্ত্রীকে নিয়ে যেও সুতীর্থ।'

'আমি বিয়ে করলে তো নিয়েই যেতুম আমার পরিবারকে।'

'তুমি বিয়ে করনি?'

'কবে করলুম?'

'এতদিন তো বলে আসছ তোমার শ্বশুরবাড়ি পাশগাঁয়ে—'

'পাশগাঁ বলে কোনো জায়গা আছে পৃথিবীতে?'

'নেই?'

'তুমি জান যে তা নেই।'

'নেই? মা, মেয়ে, স্ত্রী নেই?'

'নেই।'

'কিন্তু ছিল একদিন সব। আমরা যে জায়গার থেকে রওনা হই চলতে চলতে সে জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছই আবার। পৃথিবীটা গোল বলে নয়—আমাদের সমস্ত আশা—ভরসা বাঁকিয়ে চলে বলে যা ভোগ করেছে—অনুভব করেছে সেই জায়গাতেই ফিরে আসতে চায়। তুমি সুমুখে তো চলেছ সুতীর্থ—কিন্তু ক্রমেই কাছে ঘনিয়ে আসছ ঃ যা দেখেছিলে বুঝেছিলে সেই সীতা—নাকি সেই সোনার সীতার দিকে।'

সুতীর্থ পায়চারি করতে করতে থেমে গিয়েছিল ; আবার পায়চারি শুরু করে বললে, 'খুব আশ্চর্য কথা বলেছ তুমি। এরকম কথা সেকালের গ্রীসে সিবিলিয়া বলত। সফিংস বলত। ঈডিপাস ছাড়া কেউ সফিংসের হেঁয়ালির উত্তর দিতে পারেনি। তুমি যা বললে তার মানে বার করতে হলে অনেক দিন বসে চিন্তা করতে হবে।'

'কর চিন্তা।' মণিকা আস্তে আস্তে বললে।

'কিন্তু আমি কি ঈডিপাস?'

'তা তুমি জান।'

সুতীর্থ সোফায় এসে বসে যে সব বই অনেক আগে সে পড়েছিল, যে সব ছবি প্রতিনিয়তই চোখে এক সময় ভাসত তার, ইসকাইলাস সোফোক্লেসের যে সমস্ত কোরাস প্রবহমান রোদমীর সবচেয়ে বড় বিশেষত্বের মত তার কানে ক্রন্দন করে বেজে উঠত, তার চিন্তা চেতনাকে প্রসৃতি ও সুগভীরতা দান করতে এক সময় সেই সব কথা ভাবছিল। কোথায় থেকে সে কোথায় চলে এসেছে। অন্তরপীঠ ছেড়ে সে বাইরে এসেছে—বস্তু পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে? সত্তার বেশি বিকাশ হচ্ছে তার? বেশি সত্যকে পাচ্ছে সে? না তা নয়। বরং আগেকার সেই অধ্যয়ন ভাবনা সংকল্পনার পৃথিবীতেই বস্তুকে বুঝি পেয়েছিল সে—বস্তুর অবচ থেকে একেবারে অন্তিম উঁচু অব্দি সমস্ত নিরতিশয় বিকাশের ভেতর ; বস্তুর উচ্চ, নীচ, নীচকে মনে রেখে উঁচু মর্মমঙ্গলা ভিত্তিই যে যথার্থ সত্য ও উপলব্ধিকে ধারণ করবার মত নির্মল ও নিবিদ আধার হিসেবে নিজের মনকে পেয়েছিল সে ; এ মন নিয়ে এতদিন মহাভাবতের বড় অব্যয় গল্পকার হয়ে উঠবার কথা তার, সোক্রাতেস, সোফোক্লেস ও প্লেটো আইনস্টাইনের বিমিশ্র এক আশ্চর্য আত্মা হয়ে উঠবার কথা। কি হয়েছে সে? কি বলছে? কি করছে?

'যেতে হবে কখন?' জিজ্ঞেস করল মণিকা।

'কোথায়?' চারদিককার সময় ও পরিসরের ভাসমান বিশৃঙ্খলার ভেতর একজন নারী একটি কথা জিজ্ঞেস করেছে ওকে টের পেল সুতীর্থ যেন হঠাৎ।

'মুখুর্য্যের ওখানে।' মণিকা বললে।

'যাবে তুমি?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

সুতীর্থ উপলব্ধি করল যে আবার যেন সে ধূলোর পৃথিবীতে এসে পড়েছে ; ধূলো কাদা রক্ত পৃথিবীকে জয় করে আলোর পৃথিবী বার করবার জন্যে কে তাকে বাছের বাছ মর্দ চিনে এনেছে। কোঁৎকা

গাছে হেলান দিয়ে এই তালপাতার সেপাইগিরিই ভালো লাগছে তার, এই একটু আগের আশ্চর্য হিরণ মেঘগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে মাটি পৃথিবীতে নেমে তিতু মীরের তাড়স লাভ করতে লাগল আস্তে আস্তে সে ; মনে হয় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে।

'হ্যাঁ চলো মৃখার্জির ওখানে, কি করবে, বেড়ালের পায়েও তো ধরতো হয়।' সুতীর্থ বললে।

'কেন?'

'গলায় কাঁটা ফোটে যদি বেড়ালের পায়ে ধরতে হয়।'

'আমার গলায় কোথায় ফুটল?'

'আমার ফুটেছে।'

গয়ানাথ মালোর খুনেব ব্যাপার নিয়ে স্ট্রাইক চালানো নিয়ে সুতীর্থেব গলায় কাঁটা ফুটেছে, উপলব্ধি করছিল মণিকা ; চৈতন তো সুতীর্থ ; মুখুজ্যে হযতো চৈতনকে বলেছে, মণিকা দেবীকে মুখুজ্যের রাতের বৈঠকে নিয়ে গেলে সুতীর্থের গলার কাঁটা বের করে দেবে সে। যাবে কি সে? চৈতন বটে—তবুও চৈতনকে ভালোবাসে মণিকা ; ভালোবাসে কি সুতীর্থকে? সত্যিই গলায় কাঁটা ফুটেছে—তুলে দেবে কি মুখুজ্যে? কাঁটা তোলবার অন্য কোনো উপায় নেই? বেড়ালের পায়েই ধরতে হবে গিয়ে?

'কখন যেতে হবে মৃখুজ্যেব ওখানে?'

'রাতের বেলায়।'

'দিনে হবে না?'

'না। বড্ড ব্যস্ত থাকে সারাদিন। অনেক লোকজনের হল্লা। রাত দশটা অব্দি নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায না।'

'কটা আন্দাজ যেতে হবে?'

'এই সাড়ে দশটা এগারোটা—'

'ফিরব কখন?'

'আড়াইটে তিনটের সময়—ওর গাড়ি নেই।'

মণিকার বক্ত ঠাণ্ডা হযে আছে। নিজের অনুভূতিকে বিদ্যুতের বাহক বানালে রক্ষা নেই আজকের এ পৃথিবীতে। প্ররোচনা ও উত্তেজনার হাত এড়িয়ে, সৎ রসিকতার আশ্রয় নিয়ে কখনও কখনও বা নিজেবই স্থিবতায সহিষ্ণুতায শান্ত হযে থাকতে হবে—সিদ্ধ হযে থাকতে হবে।

'তোমাব সঙ্গে আমি যদি যাই মুখুয্যের ওখানে যা চাচ্ছ পাবে তুমি সুতীর্থ?'

'গযানাথ মালোর ব্যাপার চাপা পড়ে যাবে। কথা দিয়েছে আমাকে মৃখার্জী।'

'যে মানুষকে তুমি খুন করনি, খুন করেছে মৃখুয্যে, সেই ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য তুমি দেবে ঘুষ?'

'তুমি তো ইতুপুজোর ঘট ভাসিযে দিয়ে কথা বললে, কিন্তু ব্যাপাবটা কিরকম গড়িয়েছে দেখছ না—'

'আমি কেন দেখতে যাব? আমি কে? আমি এ সবের ভেতর নেই তো।'

'নেই? মৃখার্জিকে এখানেও ডেকে আনতে পারি। আনব? এ বাড়ির থেকে তুমি অবিশ্যি তাড়িযে দিয়েছিলে তাকে।' সুতীর্থ বললে।

সুতীর্থের কথাব মর্মভেদী ছেলে-মানুষী শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে চোখ বুজল মণিকা। কিন্তু বিষয়ই বিষ, বিষয মাতায় মানুষকে, বিষয নিয়ে মেতে দেখ, কেমন বড় গড়নেব মানুষ কি বকম চিমসে হয়ে যায—কি বলে, কিভাবে, কি করে।

'এ-স্ট্রাইক আমার চালাতেই হবে। তুমি সাহায্য করলে ভালোই হত। হযতো কুড়ি দফাতেই রাজি হয়ে যাবে মৃখার্জি। কিংবা তুমি যদি আর কিছু বেশি খুশি কবতে পার তাকে—'

মণিকা সোফায এক কিনারে মাথা কাত কবে চোখ বুজে ছিল। ধীবে ধীরে মুখ তুলে সুতীর্থকে স্বচ্ছ জিনিসের মত দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করে দূরতর কোনো কিছুর দিকে যেন তাকিযে মণিকা বললে, 'খুশি করতে পারি যদি? কি দিয়ে?'

'বিরূপাক্ষকে কি দিয়ে করেছিল অন্ধকারের ভেতর? আমি তো সেখানে ছিলুম না।'

'কিছু যে করেনি, কিছু যে হয়নি, বিরূপাক্ষের ব্যাপারটা যে কিছু নয় সেটা খুব ভালো করে জেনেও সুতীর্থের রক্তে গোত্রান্তরের বিষ ঢুকেছে বলেই সে যা বললে সেই কথাটা বলা সম্ভব হল তার পক্ষে। কিন্তু নিজের রক্ত নির্মল—শুদ্ধ ছিল মণিকারও স্নিগ্ধ ছিল—ঠাণ্ডা ছিল ; সে চুপ করে রইল।

সূচীপত্রে যান

'সেদিন সেই বেশি রাতের অন্ধকারের ভেতরে কি হয়েছিল—কিনা হয়েছিল তুমি হয়তো জান না, কিন্তু তোমার সুপ্ত শরীর জানে। এবারেও আধার—আধেয় নয়। তোমাকে নিজেকে কিছু জানতে হবে না।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সুতীর্থ।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে দেখল মণিকা সেই জায়গাতেই সেইরকম ভাবেই কেমন যেন একটা সাদা নারী সারসের ছায়ার মতন নিঃশব্দ হয়ে বড়, গোল, রৌদ্র পরিবেষ্টনীর ভেতর বসে আছে।

'এখনও বসে আছ তুমি।' মণিকাকে বললে সুতীর্থ। মণিকার মুখোমুখি সোফায় বসে সুতীর্থ বললে, 'ছেড়ে দেব এসব। মল্লিকের কাছে যাব আজ—আমাদের ফার্মের। তাকে গিয়ে আমি বলব আমাকে কাজে বহাল করে নিতে। নেবে বলেই মনে হয়। না, যদি নেয় তাহলে কোনো একটা কলেজে ঢুকে পড়ব।'

'স্ট্রাইক হয়ে গেল?'

'যারা বড় লীডার ব্যক্তিকে নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই। কিন্তু আমার মতন চুনোপুঁটিব তো সব সময় স্ট্রেচার নিয়ে হাজির থাকবার কথা ঃ ওটা কে গেল? ইয়াসিন বুঝি, এটা? লছমন, আর ওটা বড়নাম সেটা মাকুরাম, এই লাসটা। পাঁচীর, ওটা খোকনার। কিন্তু মানবকে তরাতে গিয়ে মানুষগুলোকে গণ্যই করছি না আমি আজকাল। এটা খারাপ হচ্ছে। অবিশ্যি একটা বেশ ঘনিয়ে ফাটিয়ে বিপ্লব এলে কেউ বা থাকবে ব্যক্তি, কোথায় থাকবে মানব। কিন্তু সেরকম বিপ্লবের একটা মাছিকেও তো উড়তে দেখা যাচ্ছে না এখনও ; মিছে-মিছি তবে কতগুলো ঘরপোড়া গরু নাচিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে আজকের হাতের কাছের মানুষগুলোর দুঃখ দবদ সম্বন্ধে কাঠ হয়ে থাকলে চলবে কেন! বিনিময়ে সে বিপ্লবের উজ্জ্বল উপকারগুলো পাওয়া যাবে না।'

সুতীর্থ বললে, 'সত্যিই কাঠ হয়ে যাচ্ছি আমি। এই ধর্মঘটীদের বা তাদের জেনানাদের ছেলেপুলেদের দিনরাত্রির বস্তির দুঃখ—কষ্টের ওপরে চলে গেছি যেন,—কিংবা নিচে তলিয়ে গেছি ; সেখানে মানুষ মরলে বাঁচলে কিছু এসে যায় না, কিন্তু মানুষের ভালোর জন্যে চিন্তা—মানে ভাবনা গ্রন্থির সরসতাটা ঠিক থাকা চাই নিতান্তই নিজে চরিতার্থ করবার জন্যে। দেখলাম ও আমার ধাতে সয়না। হওয়া উচিত ছিল হয় তো অন্য কিছু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি মানুষ আমি মানুষ, আমরা মানুষ মণিকা।'

সুতীর্থ চুরুট জ্বালাচ্ছিল—একটা দুটো তিনটে দেশলাই কাঠিতেও কিছু হল না।

'তুমি, গযানাথ। ইয়াসিন, হামিদ, মকবুল, বিশ্বম্ভর—সব—'

'তুমি নিজেও তো?'

হ্যাঁ, সে নিজেও তো ব্যক্তি মানুষ। চুরুট জ্বালিয়ে দিয়ে কিছু বললে না সুতীর্থ, যা বলবাব একটু আগেই তা বলেছে।

'এদের সকলকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে? একথা যদি মনে করে থাক তুমি তাহলে থুক কেটে চলে যাবে বুঝি?' মণিকা বললে।

'হ্যাঁ, মানুষদের নিকেশ করে মানবতাকে মঙ্গল করবাব মত ফরাসী রুশ বিপ্লবেব নাযক হবার সে দাবী আমার নেই ; মহাত্মার অপর পথ আমি মোটেই ধ্যান—সাধ্য মনে করতে পারছি না। কোনো তৃতীয় পথ দেখছি না। মানুষ নিয়েই থাকতে হবে আমাকে। মানবতাকে এগিয়ে কিংবা তলিয়ে দেবাব জন্যে লোহার কার্ত্তিকের দরকার কিংবা মাযা কাজলের ঃ লেনিন গান্ধী কল্কীর।'

একত্রিশ

দু তিন দিন পরে মণিকা সুতীর্থকে বললে, 'তোমার কোনো সুবিধে হত তোমার সঙ্গে আমি মুখুজ্যের বাড়ি গেলে?'

'মনের এরকম অবস্থা নিয়ে তুমি ওসব জায়গায যেওনা।'

'মনকে আমি তৈরি করে নিতে পারি।'

সুতীর্থ কাজে ব্যস্ত ছিল, বললে, 'আচ্ছা, আরেক সময়ে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হবে।

পরদিন মণিকা বললে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?'

'ছেড়ে দিযেছি, বলেছিই তো তোমাকে।'

'আর এটা?'

'স্ট্রাইক? হামিদের হাতে ছেড়ে দেব।'

'তারপর কি করবে তুমি?'

সূচীপত্রে যান

'কিছু টাকা হাতে আছে—কয়েকদিন লিখব পড়ব, ঘুরে বেড়াব, চিন্তা করব। এক সময় আমি আদি গ্রীকদের লেখা খুব পড়তুম আর আমাদের দেশের জীবন মনীষীদের, পড়তে হবে আবার এই সব। আজকাল অনেক নতুন বই বেরুচ্ছে ঃ দেখব কিছু কিছু নেড়ে ; ফ্রয়েড ওপর ওপর পড়েছি, মার্ক্স দেখেছি, ফরাসী শিখছিলুম, বোদেলেয়র, ভিলো, প্রুস্ত, ভার্লের ফরাসীতে পড়া দরকার। অনেক দিন হয় লেখা ছেড়ে দিয়েছি, কিছু লিখব।'

'তোমার লেখা পড়িনি আমি কোনোদিন।'

'পুরনো পাণ্ডুলিপি হাতের কাছে কিছু নেই। নতুন কিছু লিখলে শোনাব তোমাকে।'

'কোথায় যাচ্ছ? বেরুবার যোগাড় করছ বুঝি?'

'বেলগাছিয়ায় যেতে হবে ঃ ক্ষেমেশ চৌধুরীর কাছে।

'সে কে?'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল ; সোফার হাতলেব ওপরে বসে বললে, 'বিরূপাক্ষ আর আসেনি এখানে?'

'এলেও পারত। আমি নিষেধ করিনি।'

'না এলেই তো ভালো হত।'

'সেটা যেদিন সে বুঝবে সেদিন আসবে না।'

'বুঝবে কি?'

'ও বুঝে ফেলেছে, সেই জন্যেই ভিড়ছে না আর। আসবে না আর। আমাব কথাবার্তা হাবভাব মিষ্টি চারের মত জলের ভেতর ঝরে পড়েছিল। ও তো বোয়াল—গন্ধে গন্ধে টোপ খেতে এসে দেখল হ্যাঁচকা খাওযার মত কিছু নেই—মৃত্যু ছাড়া খাদ্য নেই—কেঁচোটা বঁড়শিতে গাঁথা।'

'কেঁচো কে?'

'ও যা চাচ্ছিল সেটা।'

'ন জিনিসকে ভিঁলো কেঁচো বলে না।' সুতীর্থ একটু হেসে বললে।

'ভিলোঁ কে?

'একজন ফরাসী কবি।'

'ফবাসী কবিদেব পড়া নেই আমাব।'

'পড়লে পারতে ভিলোঁ অবিশ্যি যদি ফরাসী জানতে।'

'তুমি তো কেঁচো মনে কব?'

সুতীর্থ চুরুট টানছিল; কোনো উত্তব দিল না।

চুরুট নামিযে বললে, সেই দশ—বারো বছব আগেব পৃথিবীতে ফিবে যাচ্ছি যেন আবার—সেই গ্রীকদের, ফরাসীদের আমলের সেই নাবিকে, ও তাব পবেব সময়ের মনীষীদেব, এই সেদিনকাব বাংলাব পটের আমলের পৃথিবীতেও—কিন্তু আগের চেয়ে খানিকটা বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমাব মনেব একগুঁযেমি—প্রাণের সেই এখন আর—মনটা জল, চিলেব ডানা, আগুনেব মত হযে উঠেছে।

'তুমি তো কেঁচো মনে কর জিনিসটাকে।'

'তা কবি।' সুতীর্থ বললে।

'বিরূপাক্ষ টোপ খেতে এসে দেখল কেঁচোটা বঁড়শীতে গাঁথা। ঘুরে ফিরে ঘুবে ফিরে কানকো কাঁপিয়ে লেজ নেড়ে জল গিলে বুড়বুড়ি কেটে উপুড় চিত ফলিকাত প্যাঁচ কষে যখন দেখল কোনো ফযসালা নেই, তখন ভুস করে বারো বাঁও জলে ডুব দিযে গেল বোয়ালটা।'

'এত বেশি জল ওর পৃথিবীতে?'

'বেশি টাকায বেশি জল, বেশি তেল, বেশি হাঁসফাঁস ; ও এক আশ্চর্য নিদেন পৃথিবীতে থাকে।'

'বিরূপাক্ষের স্ত্রী কোথায় গেছে? নিজেই তো বলছিল যে ছেড়ে গেছে না যাচ্ছে?'

'ক্ষেমেশ চৌধুরীর ওখানে আছে। বিরূপাক্ষ কাকে বিয়ে করেছে আমি জানতুম না। ক্ষেমেশ বললে জযতীকে বিয়ে কবেছে।'

সুতীর্থ চুরুটে দু-তিনটে টান দিয়ে বললে, 'আমি জযতীকে চিনি।'

'বেলগাছিয়া থেকে কখন ফিরবে?'

'রাত হয়ে যাবে। নাও ফিরতে পারি।'

'তোমার ঘর সংসারের জন্যে একটা চাকর যোগাড় কববে না?'

সূচীপত্রে যান

'আমি টাকা দেব—আমার খাওয়ার ব্যবস্থাটা তোমাদের সঙ্গেই হোক।'

'কত দেবে?'

'যা চাও।'

'আজ রাতে ফিরবে? ফেরবার সময় একটা চেক আনতে পারবে?'

'কত টাকার।'

'চেক বই তো এখানেই আছে তোমার? ক্যাশ আনলেই ভালো হয়।'

সুতীর্থ একটু ভেবে বললে, 'এক্ষুণি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি তোমাকে।'

সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলছিল ; মণিকা বললে, 'এত টাকা পেলে কোথায়? ঘড়ি বিক্রি করে?'

'আমার উপায়ের কি অন্ত আছে? কাল আর পাঁচশো টাকা দেব।' টাকাগুলো হাতে নিযে মণিকা বললে, 'কিন্তু ওদের ছেলেপুলেদের জেনানাদের কি ব্যবস্থা হবে?'

'এ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাব না'

'গয়ানাথ মালোকে যে মেরেছে সে তোমাকেও মেরেছে বটে।'

'হামিদ ইয়াসিন সত্যকিঙ্কর বিশ্বনাথ—লোক ঢের ভিড়ে গেছে ওদিকে। আমি কিছুদিন আত্মবিচারের—'

'আত্মবিচার—' মণিকা নদীর জলে কুল জলপাই পড়ার মতো এক ধরনের শব্দে হেসে বললে, 'ওটা বোধ হয় মনের অগোচরে পাপ—নাকি ধর্ম সুতীর্থ—অনেক দিন ধরে বাঙালীর ছেলেদের? তাহলে মুখুজ্যেই জিতল! কত টাকা ঘুষ দিয়েছে তোমাকে?'

'সবই ক্যাশ বাক্সে আছে—খুলে দেখ।'

'আমাকে যে পাঁচ শো টাকা দিলে তাও তো ঘুষের টাকা?'

সিদ্ধার্থের মত গাম্ভীর্যে ও আন্তরিকতায় মাথা নেড়ে সারিপুত্রকে যেন বললে 'না না, ও আলাদা টাকা।'

'কেন ঘুষ দিয়েছে তোমাকে? কেন ঘুষ খেলে?'

সুতীর্থ নেবা নেবা চুরুটটা ভালো করে জ্বালিয়ে নিযে বললে, 'তোমার তাতে কি ক্ষতি হযেছে? তোমাকে তো যেতে হচ্ছে না মুখার্জি সাহেবেব ডিনারে।'

'কত টাকা দিয়েছে আপাতত?'

'পাঁচ হাজার। এ টাকার সঙ্গে তোমার যাওযা—আসার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাব কথা মুখার্জি কোনদিন বলেওনি আমাকে।'

'আমরা ভাবুকরা' সুতীর্থ বললে, 'কাজের মানুষদের মত সোজা মোটা পথে চলতে পারি না। এই স্ট্রাইকের ব্যাপারটা হাতে নিযে তোমাকেও জড়িয়ে নিতে চাচ্ছিলুম ; থাকতে তুমি আমাব সংগ্রামটাকে ঘিরে। কিন্তু মসলিন যাবা তৈরি কবত, যে সব রূপসীরা তা পরত কেউই অশুদ্ধ নয—যাদের চোখ টাটাত সেই লোকগুলো ছাড়া। হয়তো আমাদের পৃথিবীই খারাপ—কোনো চিন্তা বা কাজের মিহি মসলিন জমিন এখানে স্বাভাবিক নয তাই ভালো নয়, ঠিক নয়।'

মণিকা সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু কথাব দিকে নয়, কোনো কথা শুনেছে' বলে মনে হল না।

'কি হিসেবে ভাঙল স্ট্রাইক?'

'ভাঙেনি এখনও। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মুখার্জি আমাকে সরিয়ে দিয়েছে।'

সুতীর্থ সোফায় বসেছিল উঠে গেল, চুরুট টানতে টানতে ফিরে এসে বললে, 'কোনটা চাকরির টাকা, কোনটা ব্যবসার আর কোনটাই বা ঘুষের সেকালের মানুষেরা টাকার উপর একটা পাঁচনের বাড়ি মেরে সেটা ঠিক করে নিতে পারতেন। ঘুষের টাকাটা সরিয়ে রাখতেন তাঁরা মদ, মাগাই ইত্যাদি সাঁইত্রিশ রকম মাধুরীর জন্যে। সে পাঁচন এখনও আমাদের আছে, কিন্তু পাঁচন দিয়ে টাকার ওপর বাড়ি মারলে পাঁচন বলে যে সব টাকা ঘুষের আর জোচ্চোরির—সব সব টাকা ; রসের মালপো হবে—দেশ দশের পাল চরানো হবে এ টাকা দিয়ে ; ইস্কুল-কলেজ সাহিত্য জ্ঞান জিজ্ঞাসা নিরীক্ষা—ও সব কোনো জিনিসই হবে না। ও সব জিনিস হয়ে গেছে—আর হবে না। এখন থেকে টাকা হবে শুধু—না হলে মানুষের মৃত্যু হবে।'

'সে টাকাটা নিলে তুমি?' মণিকা বললে। 'ঘুষ হিসেবে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'ঘুষ ছাড়া টাকার চলাচল নেই ; আজ কেউ কাউকে টাকা নিয়ে গুরুদক্ষিণা দেয় মণিকা?'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'বেলগাছিয়ায়।'

খুব আস্তে আস্তে চাপা গলায় কথা বললে মণিকা মিনিট চারেক ; তারপর গলা খাকরি দিয়ে সহজ গলায় বলতে আরম্ভ করল। শুনে সুতীর্থ সাবধান হয়ে বললে, 'ওঃ—'

'কখন কি হয় বলা যেতে পারে না।'

'আমাকে আগে বলনি কেন তুমি?'

'না, না, এখন তখন কিছু নয় তবে বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষের থাকা দরকার।'

সুতীর্থের চুরুট নিবে গিয়েছিল। জানালার ভেতর দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছিল ; মাঘ শেষ হয়ে যাচ্ছে ; অনেক দূরে পাড়াগাঁর পানবন খই মৌরীর ক্ষেত, রঙ বেবঙের পালক কলমী কাঞ্চন নতুন দুধ সোনামণি শরৎকালের ফুল চারদিককাব চাঁদাকাঁটা কেয়াকাঁটা দল ঘাসের জল উচ্ছল করে উড়ে যাচ্ছে নীলেব থেকে নীলের দিকে, রোদের থেকে মেঘের কণাকণিকার উজ্জ্বলতা ভেদ করে কোন দিগন্তের মাতৃগণের দিকে ফাগুনেব বাতাস। এদিকে ট্রাম লাইন চকচক করে উঠছে, কোনো ট্রাম নেই, ফুটপাথে চীৎকার করে উঠছে গাধাটা ; গায় তার একজন ইমানদার নেতার নাম চক দিয়ে লিখে গিয়েছে কে যেন, রাস্তায় জিলিপি কচুরি ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছেলেটাব ঠোঙায় চিলে ছোঁ মেরে গেছে বলে, সামনের লাল রঙের বাড়িটার ছাদে সাদা সাদা জামা কাপড় উড়ে পড়ছে, ছাদের দড়িতে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল সব, ইলেকট্রিক তার কাঁপছে, পাশের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল, কি একটা আশ্চর্য সম্ভাবনা আছে যেন ; ঘোড়েল নেতাটির নাম পিঠে ঝাঁকিয়ে গাধাটা হাঁকড়াচ্ছে আবার, যেন নামটা মুছে না দিলে বেচারী ককিয়ে কূল পাবে না আর। বেঘোর হুল্লোড়ে ফাল্গুনেব বাতাস উড়ে এসে পড়ছে মণিকাব চোখে চুলে, সুতীর্থেব দেশলাইয়ের আগুনে, যে ট্রামটা হুস কবে ছুটে গেল তার আগে কোথায উধাও হয়ে চলে গেল—থেমে গেল বাতাস। পর মুহূর্তেই ফিরে এল আবার।

সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল তার দেশলাইযে শুধু একটা কাঠি আছে। ঘবেব দরজা জানালা সবই বন্ধ করে দিতে লাগল সে তাই।

চোখ বুজে কুমারী মেয়ের ধ্যানের মত শান্তিতে বসেছিল মণিকা। শীত প্রথম যখন আসে দেশে তেমনই একটা আশা আমেজ চমকিত ভাবে টের পাওয়া যায শীত প্রথম যখন ছেড়ে যায় দেশ থেকে।

অন্ধকাবেব ভেতব দেশলাইটা জ্বলে উঠল সুতীর্থের ; আগুনেব ধ্বকে লাল হয়ে উঠতে লাগল চুরুটের মুখ। ভালো করে চুরুট জ্বলে উঠলে দরজা জানালা খুলে দিতে দিতে সুতীর্থ বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

'না।'

'মনে হচ্ছিল ঘুমোচ্ছ।'

মণিকা সেন স্বর্গের থেকে হাবিয়ে স্বর্গে ফিবে এসেছে আবার, এমনই চোখে সুতীর্থের দিকে একবাব তাকিয়েই ওপরে চলে গেল।

নাঃ, বেলগাছিযায যাওয়া হবে না আজ আর। সুতীর্থ ঘণ্টাখানেক পবে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই নিয়ে বসল, তারপবে একটা ইকনমিকসেব—একটা উপন্যাস টেনে নিল—একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করল—কিন্তু কাকে?

একটা দীর্ঘ কবিতা ফেঁদে বসল—কিন্তু কেন?—ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুই হল না তাব।

স্ট্রাইক অনেক দূবে কাঁদছিল। মণিকা তেতলার ঘরে নাক ডাকাচ্ছিল।

কয়েকদিন পবে ক্ষেমেশের বেলগাছিযার বাড়িতে আকাশে বাতাসে পাখির পালকে সকালবেলাব রোদ এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সুতীর্থ গিয়ে পৌছল।

'এই যে তুমি এসেছ সুতীর্থ—বোস—বোস—'

'আমি তোমাব চেয়ে পনেরো বছরের বড় ক্ষেমেশ—'

'তাই কি? আমি তো ভেবেছিলুম, তুমি আর আমি শিবের গুরু রাম'— ক্ষেমেশ একটু তেরচা কান্নিক মেরে বললে, 'রামের গুরু শিব।'

'তুমি আমাকে সুতীর্থ বলে ডাকবে আমার চেয়ে এত ছোট হয়ে. তা ডেকো। আমাকে সেদিন তুমি

সূচীপত্রে যান

বলেছিলে বেলগাছিযার এই বাড়িতে আছ—নিরিবিলিতে—এর চেয়ে বেশি কোনো দাবি তোমার নেই, চাকরি-বাকরি করবার দরকার নেই, অবসর আছে, রোদ পাখি মাটি ঘাসের কোলে সময় কেটে যায় ; এমনি নির্লিপ্ত নিকাজের ভেতর দিয়ে যদি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়—শান্তিতে—তা হলে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই তোমার—বলেছিলে—'

'এর চেয়ে বেশি সাধ কার আছে?'

'সকলেরি প্রায়—তোমার মত দু-একজন ছাড়া।'

'থাকা কি উচিত?'

সুতীর্থ গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আকাশের নীল ফিকে ধূসরতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ তো থিসিয়ূসের এথেনস নয়—এমন কি পট এঁকেছিল যে খুশি মানুষেবা আমাদেব দেশে—সে দিনও নেই। তুমি দেখছ তো কি রকম পৃথিবীতে আছ। তোমার বাবার বাড়ি ব্যাঙ্কেব টাকা আকাশ আলো পাখি ফড়িঙের ভেতর ঘুরে ফিরে জীবন কাটানো খারাপ নয়। খারাপ নয়, খুব ভালো। কিন্তু চারিদিকের পৃথিবী এমনই বেয়াড়া যে এ রকমভাবে মৌচুষকির নীড় বানিয়ে শান্তি চর্চা কবতে দেবে না তোমাকে—'

'কি করবে? নীড় ভেঙে দেবে?'

'শীগগিরই। এখুনি তো' ভেঙে পড়ছে—'

'ভেঙে পড়ছে, আমি টের পাচ্ছি না তো।'

'এক—আধটা পাখি থাকে, তাদেব বাসার থেকে ডিম চুবি গেলে কিংবা পিছলে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেলেও টের পায না।'

'কি ভেঙে যাচ্ছে আমার?'

'এই তো আমিই এসে তোমার মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছি। আমার মতন আরো অনেকে অনেক দিন থেকে তোমার পেছনে লেগে আছে। ভবিষ্যতে আমবা সবাই মিলে এমন দল বেঁধে আসব যে এখন থেকেই নিজেকে যদি তুমি তৈবি করে না নাও বড় অঘটন হবে তোমাব।'

'অঘটন? মবে যেতে হবে?'

'মবে যাওয়া সহজ জিনিস যদি শান্তিতে মরা যায়। কিন্তু খুব অশান্তিতে মরতে হবে। কত ভালো মানুষ রুশ বিপ্লবে জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মবেছে, আমবা বাঙালীবা মন্বন্তরে যাচ্ছি। খুব খাবাপ। কিন্তু এর চেযেও সব বিকট রকমের মৃত্যু ঘনিযে আসছে চাবদিক থেকে। এদিকেও আসবে।'

সুতীর্থ পকেট থেকে চুরুট বার করে জ্বালিযে নিল।

'ফেরারি যদি না হতে চাও তা হলে মানুষেব ভেতর মিশে যেতে হবে তোমাব, গঠন করতে হবে ; একদিকে বিরূপাক্ষের মতন ভাম আব একদিকে তোমাব মতন খরগোশকে দেখে সুন্দববনেব পবীবা তামাশা বোধ করতে পাবে, কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে গুলি খেযে মবতে হবে তোমাদেব—'

'ভামটাকে মাবা কঠিন।'

'কেন?'

'কি করে মাববে তুমি নিজেকে?'

'তা হবে। কিন্তু তুমি তো খরগোশ।'

'তা হবে। কিন্তু খুব লম্বা কান নেড়ে নেড়ে কথা বলছ তুমি আজ সকালবেলা থেকে ধোপাবাড়িব ছাঁদন দড়িটা গলায় ঝুলিয়ে। তুমি তো এ রকম ছিলে না। রুচি বিকাব হয়েছে তোমার ; চবিত্রে বিকার দেখা দিয়েছে। আমাকে গুলি করবার কথা বলছিলে তুমি—'

'হ্যাঁ বলেছিলুম—'

'নিজের হাতে করবে?'

'দরকাব হলে কবব।'

'তোমার চাকব কাকে গুলি করবে?'

'আমার চাকর নেই—'

'আমার আছে। আমাব কুকুরও আছে কিন্তু আমাব কুকুরও আমার গুণীমানী বন্ধুকে গুলি কবতে লজ্জা বোধ করে।'

'কুকুরটা আশ্রমে থাকে বুঝি? মোহনভোগ খায়?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পূর্বাশ্রমের কথা আমাকে বলতে চায না তোমার কাছেও ঘেঁষে না ; কি ছিলে তুমি ওর?

শুনেছি খুব মিষ্টি সম্বন্ধ ছিল নাকি?'

'ও যতদিন বাচ্চা ছিল ততদিন ছিল ; একটু সোমথ হতেই তোমার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি ক্ষেমেশ—'

নরম, স্নিগ্ধ গলায় বলছিল সুতীর্থ ; গলায় আরো আন্তরিক আকুতি এসে পড়ল ; সুতীর্থ বললে, 'এটা তোমার বাড়ি ছিল একদিন, এখন আমার বাড়ি। আমি যাদের থাকতে বলব এখানে তাদেব বাড়ি। এখানে ছ'হাজার লোক অনায়াসেই থাকতে পাবে। কলকাতাব পথে ঘাটে ফুটপাথে ভাগাড়ে লেজ খসবার আগে ব্যাঙাচির মত কাতরাচ্ছে তারা। এইখানে জায়গা দিতে হবে তাদের'—সুতীর্থ বললে।

'দেখ। পুলিস কমিশনার কি বলে?'

'পুলিশ কমিশনাবের দোহাই দিচ্ছ?'

'দেখ। মন্ত্রীবা কি বলে—'

'মন্ত্রীরা?'—

'জনসাধারণেব প্রতিনিধি তো তাবা।'

'বাড়ি রেকুইজিশনের অফিসার হিসেবে আমি আসিনি ক্ষেমেশ।'

'এসেছ স্বাধীনভাবে, কিন্তু শাসন কর্তাদেব ডিঙিয়ে তো কিছু কবতে পারবে না। কলকাতার প্রায় সব লোকই তো আজ সাদা দাঁত কেলিয়ে ঘোড়া হয়ে গেছে—ছ্যাকড়া গাড়ির। দিন বাত ছুটছে—নাদছে—কর্পোরেশনের চামচ দিয়ে শায়েস্তা কবতে পারছে কি ঘোড়ার নাদগুলো ঝাড়ুদার? কর্পোরেশন ভেঙে পড়ছে—দানা পাচ্ছে না ঘোড়াগুলো। আমাব বাড়িতে তো ঢের ঘাস, কিন্তু রি-হ্যাবিলিটেশন অফিসারকে ডিঙিয়ে ঘাস পাবে সেই ঘোড়াগুলো? কই, নোলা দেখা যাচ্ছে না তো সে সব ঘোড়ার। আসুক না অফিসার সাহেবের সার্টিফিকেট নিয়ে। আমি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেহাতে চলে যাব—'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে চুরুটের মুখে বেশ অনেকখানি ছাই জমিয়ে ফেলেছে ; চুপ করে বসেছিল সে, কোনো কথা বললে না।

'তুমি উদমহবের ঘোড়ার মত এসে দাবনা ঝাপটালে কি হবে সুতীর্থ—তোমাব ডমফাই ঘোড়ারা কোথায়? পথে পথে না চেঁচিয়ে না নেদে, দলঘাস আর বুটের বদলে হাওযা না চিবিযে সমস্ত ঘোড়াগুলো যদি একটা নিদারুণ হ্রেযাগর্জনে জেগে উঠত, তা হলে বেছে বেছে আমাকে এসে গুলি কবতে চাইতে না তুমি, কাদেব গুলি খেযে তুমি নিজেই লাট মেবে পড়ে থাকতে ভেবে দেখেছ নিশ্চযই। তুমি বোকা বলেই আজ সকালবেলা আমাব বেলগাছিযাব বাড়িতে এসে লেজ নাড়ছ। তোমার মাথায আগে ঢেব জিনিস ছিল সুতীর্থ—কিন্তু আজকাল এই বকম হযে যাচ্ছ? যারা কাজের মানুষ তাবা অন্য জাযগায অন্যভাবে কাজ করছে।'

'বক্ত ছাড়া বিপ্লব কবতে পাবলে খুব ভালো হত। কিন্তু সে রুচি বা ওজন শক্তি এখনও লাভ করেনি তো মানুষ।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিযে নিতে নিতে বাতাসে বাতাসে কযেকটা কাঠি পুড়ে গেল—বাতাস থেমে গেলে বললে, 'কিন্তু কিই বা হবে রক্ত বিপ্লব করে। অনেকবার তো সে সব করা হল। কিছু হল না তো। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, স্পেন চীনের বড় বড় বিপ্লব সব এল গেল—কিন্তু কোনো দিকনিরূপণ মন পরিবর্তন হল না তো মানুষের। আরো খারাপ হল তো। এর চেযে আগেকার পৃথিবী ঢের ভালো ছিল ঃ লাওৎ-সে, কনফুচ, মিঙ যুগেব চীন, অশোক চক্র, হোযেন সঙ ফা হিয়েন শ্রীজ্ঞানের ভাবত আবো আগেকার স্নিগ্ধ ভাত কাপড়ের, মিহি চেতনাব মহৎ চিন্তার ভাবতবর্ষ থিসিযুস পেবিক্লিসেব গ্রীস—মানুষ তখন পৃথিবীর আকাশ বাতাস আলোতেই খেলা করত, কাজ কবত, কথা ভাবত ; মাটি খুঁড়ে ইঁদুব ছুঁচো শেয়াল ভোঁদড়ের মত থাকবার দবকার হযনি তো তার মারণ শিল্পেব ভযে।'

'হ্যাঁ, মৃত্যুশিল্পী হযে দাঁড়াল মানুষ, ভযেব আকর সে শিল্প বটে সুতীর্থ, কিন্তু তবুও পবস্পরেব ভয। মারণশিল্প খাবিজ করলেও মানুষকে মাটি খুঁড়ে পালিয়ে পালিযে বেড়াতে হবে মানুষেবি ভযে—' ক্ষেমেশ বললে, 'তোমার চুরুটটা বড্ড কড়া সুতীর্থ; অত ধোঁয়া ছেড়ো না ; গাঁজা না কি?'

'মিঠে গ্যাজা ; কড়া বলেই মিঠে।'

'চা খাবে?'

'দাও—নেবুব রস দিযে।'

'রঞ্জন এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি হয়তো। উঠলে চা হবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'রঞ্জন কে?'
'আমার চাকর।'
'এত বেলা অব্দি ঘুমুচ্ছে যে?'
'রাত জাগতে হয।'
'তুমি তো একা মানুষ। অনেক রাত অব্দি জাগিয়ে রাখ চাকরকে?'
'না, তা নয়। ও রোজই প্রায় সিনেমা—থিয়েটার যায়। ন'টার শোতে যায। ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করে। আমি অবিশ্যি আগেই খেয়ে নিই। ও এসে গান গায়, গাজন গায়, ডালপাতায পিরভু কাঁপে দেখে, তারাবনের তারা দেখে রাতের আকাশে, শিন্তাইয়ের কথা ভাবে—'
'শিন্তাই কে?'
'ওর আছে একজন। রাঁঢ় বলে ও। মেয়েটা বাঙালী নয়, বেহারীও নয় ঠিক—'
'যায় তার কাছে?'
'যায়, সে আসে ; প্রায়ই তো।'

বত্রিশ

'ও, এই সব বুঝি? এই সব রকমারি বুঝি?'
'এই হচ্ছে একবকম—'
'তা, এর চেয়েও ভালো হবে। সবুর কর না তুমি।'
সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে, 'এই যা হচ্ছে একেবারে তটের ওপব দিয়ে নৌকো চালিযে নিতে পারবে।'
'আমি নিজে সিনেমা থিয়েটারে যাই না, ও যায়, আমি টিকিটেব পযসা দিই; সীজন টিকিট কিনে দিই ওকে নাচগান জলসা আসরে মজলিস দেখবার জন্যে—'
সুতীর্থ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে—পরে গম্ভীব হযে বললে, 'যেখানে তোমাব অন্তত একটা নাইট স্কুলে খোলা উচিত তোমার বাড়িতে, সেখানে তুমি এই সব করছ, ক্ষেমেশ—রঞ্জনকে নিয়ে। সেখালে কলকাতার বনেদী ঘবের বাবুরা বেড়ালের সঙ্গে বেড়ালেব বিয়ে দিত খুব ঘটা করে। তুমিও তাই-ই করছ দেখছি। রক্তটা রয়ে গেছে এখনও তোমার নাড়ে—'
সুতীর্থের বুদ্ধিবিবেকের দৌড়ে কেমন যেন তামাশা অনুভব করছিল ক্ষেমেশ, ক্লান্ত লাগছিল, করুণা বোধ করে বললে, 'মিছেই তুমি কথা বলছ সুতীর্থ। রঞ্জন তুচ্ছ, ছোটলোক মানুষ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে শখ থাকবে না তার?'
'থাকবে বই কি। শখ না থাকলে বেঁচে থেকে লাভ কি। আমার তো মাঝে মাঝে শখ হয রাশিয়ায আবার জারের এলেম ফিরিযে আনি—'
'স্ট্যালিনই তো জার—'
'খাঁটি জার নয। ইচ্ছে করে আমি জার হই, রাসপুটিন হযে মেয়েদেব নিয়ে ফুর্তি করি, এদের সকলকে রুখবার জন্যে হযে দাঁড়াই লেনিন, চার্চিল হয়ে বলশেভিক শায়েস্তা করি, রুজভেল্ট ট্রুম্যান হয়ে শাঁখের করাতে কেটে ফেলি চার্চিলকে ইংরেজদের—এই সবই তো শখ, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না;—কিন্তু এইবার হবে, শখের খিদমতদারদের সঙ্গে আমার বেশ লটকাচ্ছে—'
জয়তী কখন ঘরের ভেতর ঢুকেছিল সুতীর্থ দেখেনি। ঘরের ভেতরে সোফা সেটি কৌচ কুশনের ঠাসাঠাসি ; এরই একটায় গিয়ে বসেছিল জযতী। সুতীর্থ ঘাড় কাত করে অন্য দিকে তাকিয়েছিল, জযতীকে দেখল না ; সুতীর্থের থেকে খানিকটা দূরে—আড়াআড়িভাবে—একটু পিছিযে বসেছিল জয়তী।
'খুব বেশি কথা বলা অভ্যেস নয় তোমার—' জযতী বললে। ঘরে যে আরেকজন লোক এসেছে বুঝল সুতীর্থ। কিন্তু জয়তীর দিকে মুখ না ফিরিয়ে যেমনিভাবে জানালার ভিতর দিয়ে আকাশ পাতা পালক আলোর দিকে তাকিয়েছিল তেমনিভাবে চেয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'বেশি কথা বলছি আজকাল। কম কাজ করছি—।'
'বাটখারাটাকে টাযটোয় রাখতে পেরেছ তাই!'
'হ্যাঁ। তুমি বেশি কাজের বহর দেখতে চাও জয়তী?'
'তোমার তরফ থেকে? আমাকে দেখিয়ে লাভ কি?'

জয়তী বললে, 'কি কাজ করছ তুমি আজকাল?'

'কিচ্ছু না।'

'দেশের কাজ করছ?'

'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে।'

'স্বাধীনতা এল—অথচ তুমি—আমি—খানিকটা নিবাশ হযে পড়েছ মনে হচ্ছে।' জযতী একটু হেসে বললে। গালে টোল পড়তে না পড়তেই হাসি ফুবিয়ে গেল তার।

'স্বাধীনতা এল—অথচ তুমি আমি আমরা ভেল্কি লাগাতে পেরেছি বলে এল না। এল কতকগুলো লোক প্রাণপাত করেছে বলে। স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়েছে তারা অনেকেই আজ মৃত। দেশ দু ভাগ হযে যাবে খুব সম্ভব। স্বাধীন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তারাই মোটা মাইনে মুনাফা পাবে—আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তাবাই মোটা মাইনে ও বড় বড় সিধে পাচ্ছে। দেশ যতদিন অধীন ছিল এরা ব্রিটিশদের যেমন বাজভক্তি দেখিযে এসেছে—দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীনতা নিযে এরা ঠিক তেমনই মাতামাতি করবে। স্বাধীনতা ও তাব নিযমানুগত্য নিযে এদের মাতামাতিব কেলেঙ্কাবিতে কোনো ভদ্রলোক রাস্তায মুখ দেখাতে পারবে না আর।'

'এই সব হবে?' জযতী বললে।

'আমি দিব্যচক্ষে দেখছি।'

'স্বাধীনতা তো উনিশ শো আটচল্লিশেব জুনে আসবে।'

'শুনেছি আগেই আসবে—সাতচল্লিশের আগস্টেই', ক্ষেমেশ বললে।

'কে বলেছে তোমাকে ক্ষেমেশ?'

'আমি খববেব কাগজ পড়ি না, তবুও আমাব কানে আসে।'

'তাহলে এ বছবই আসছে স্বাধীনতা? সুতীর্থ?'

'আসছে। জওযার ক্ষেতের থেকে পাখি তাড়িযে দিচ্ছে নাকি নেতাবা।'

'তোমাব নিবাশাব একটা কারণ হচ্ছে এ স্বাধীনতায তোমাব কোনো লেনদেন নেই ; পাচ্ছ অথচ দাওনি কিছু ; এই তো বলতে চাও তুমি? কিন্তু আমাদেব কারুবই কোন দান নেই। ক্ষেমেশের আছে? নেই। আমার নেই। কোটি কোটি লোকের নেই। তাই বলে যাবা এ জিনিস সম্ভব কবে তুলেছে তাদের ধন্যবাদ জানিযে খুব কৃতার্থ তো আমবা।'

'জযতী সুতীর্থেব দিকে তাকিযে বললে, স্বাধীনতায তোমার কোনো দান নেই? কিন্তু তুমি তো কযেকবার জেলে গিযেছ সুতীর্থ?'

'শখেব জেলে যাওযা। কোনদিন পিস্তল না ধবেই জেলে গিযেছি আমি।'

'গিযেছ তো। উদ্দেশ্যও মাবাত্মক ছিল তো?'

'শুধু উদ্দেশ্য দিযেই কি আমাদেব যাচাই হবে ক্ষেমেশ?' সুতীর্থ জিজ্ঞেস কবল।

'ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি ওবকমভাবে যাচাই করত, তা হলে মুনিদেব মধ্যে বেছে বেছে জবৎকারু মুনি আমার বেলগাছিযাব বাড়িতে এবকম ঢুকে পড়তে পাবত কি আজ?' ক্ষেমেশ বললে সুতীর্থেব দিকে তাকিযে ; 'পনেবো কুড়ি বছর আগে খতম হযে যেতে।'

'দিশী সবকাবও অগাধ জলের মীন নিযে মাথা ঘামাবে না—তাদেব অনেক সরকারী শহীদ আছে।'

'শহীদ হতে চাযনি কোনদিন,' জয়তী বললে, 'হতেও পাবল না, সেই—জন্যেই তো ক্ষেমেশ খুব স্বাধীনতা বোধ কবছে।'

'হ্যাঁ, তুমি আমি বিরূপাক্ষ—আমাদেব এইবকম ধাত জযতী। আমবা গোড়াব থেকেই স্বাধীন—সবরকম ফসকা গেবোব পাযজামাযঃ- পাঁচ দরজিতে মিলে আমাদেব কি আব নতুন স্বাধীনতা দেবে।'

'সাতচল্লিশের আগস্টে স্বাধীনতা আসছে তুমি তো বললে ক্ষেমেশ।'

'সেইরকমই শুনেছি আমি।'

সুতীর্থ বললে, 'প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন কানাইলালের মত শহীদ হতে চেযেছিলুম আমি, কে তোমাকে বলেছে জয়তী? ঘোষ কতবার আমাকে পিস্তল দিতে চেযেছিল—,সেই বাবীন-অববিন্দুদের সমযেব কথা—মহাত্মা গান্ধীব নামও শোনেনি কেউ তখন— কিন্তু আমি কিছুতেই পিস্তল নিলুম না। কিছুতেই মন উঠল না আমার। ওবকম ধরনের বিপ্লবের জন্য কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করতে পারিনি। আশ্চর্য

পিস্তল না ছুঁড়ে দু-চারটে সাহেব না মেরে দেশ কি করে স্বাধীন করতে পারা যায় সে কথা ভাবতেই পারত না কেউ তখন। এমনই, একটা দুর্বার সন্তাপ ছিল— এত মুখিয়ে চলছিল সব যে, কেউই না ভেবেই পারত না যে, দু-চারশ পুলিশ জজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের (চা-বাগানের ক্লাইভ স্ট্রীটের বা মিলিটারির সাহেবদের কে চায় কে পায় এইরকম ভাব) খুনের সরগরম পথেই স্বাধীনতার রণপায়ে ছুটে আসবার কথা। কিন্তু তবুও আমি পিস্তলের-অপূর্ব —জেল্লা— স্বীকার করতে পারিনি সেই দিনও।'

'তারপরে পেরেছ?'

'না।'

'কোনদিন পারবে না আর?'

'সে কথা বলতে পারছি না এখন।'

'তখন তোমার বয়স কত?

'সাত আট।'

'এত অল্প বয়সে এসবের ভেতর জড়িয়ে পড়েছিলে?'

'আমার বাড়ন্ত গড়ন ছিল: তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মত দেখাত আমাকে। বারীন ঘোষ তো তাই মনে করেছিল। আমি পিস্তল সরবরাহ করতুম। নানারকম জায়গা থেকে চুরি বাটপাড়ি, মাঝে মাঝে জবরদস্তি করেও পিস্তল যোগাড় করতে হয়েছে। ভারী জিনিস তো পিস্তল। বেশ গায়ে জোর ছিল তখন আমার এক একটা ধু-ধু ফাঁকা জায়গার চখাচখীর ধানী জমিতে গলায় দড়ির মাঠে বৌবাতাসির চরে গাছগাছালি চাঁদমারি তাক করে পিস্তল ছুঁড়ে ছুঁড়ে বেশ হাত পাকিয়ে নিয়েছিলুম। কিন্তু তবুও কোন প্রাণী মারিনি, মানুষ খুন করিনি। যে-সব ইংরেজরা তখন আমাদের দেশ শাসন করতে আসত, তাদের দু-চারজনকে মেরে গভর্নমেন্টকে তরাসে বানিয়ে দিয়ে কিছু ধকল হয় বটে— কিন্তু যুদ্ধ না করে, স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব এই আমার ধারণা ছিল—'

'এই ধারণার জোরে সুতীর্থ শহীদ হতে পারল না আর,' ক্ষেমেশ সরতে সরতে লম্বা সোফাটার কিনারে সরে গিয়ে বললে, 'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে কিন্তু সরকারী শহীদদের ভেতর সুতীর্থের নাম নেই।'

'কাদের নাম আছে সেখানে?'

'প্রায় সবারই আছে— অনেক পর্ব—অনেক পর্যায়— তোমাকে দেখাব জয়তী একদিন।' ক্ষেমেশ বললে।

'শহীদদের অনেকেই তো মরে গেছে— জয়তী বললে।

'সকলেই,' একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'মেয়ে মরা চাই, না হলে শহীদ হয় না কখনো—'

'কেন, বারীন ঘোষ তো বেঁচে আছেন, উল্লাসকর আছেন। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী আছেন। শহীদ কাকে বলে সুতীর্থ?' জিজ্ঞেস করল জয়তী।

'খুব সম্ভব অধীন দেশে যারা দেশের প্রভুভক্তদের নষ্ট করবার জন্য লড়াই করে মরে, কিংবা বেঁচে থাকে, মরে বেঁচে থাকে— তাদের শহীদ বলে। যেসব শহীদ মরে গেছে দেশ স্বাধীন হলে তাদের লিষ্টি তৈরি করা হয়— খুব ভালো করে চেক করা হয় যাতে কারুর নাম বাদ না পড়ে; পুরোপুরি তালিকা তৈরি হলে তাদের ফোটো, ছবি, অস্থি পাওয়া গেলে অস্থি পাওয়া গেলে অস্থি চিতের ছাই এটা-ওটা সংগ্রহ করা হয়। সভাসমিতি মিছিল-টিছিল বেশ জাঁকিয়ে তুলতে পারা যায় শহীদদের নিয়ে। স্বাধীনতা পেলে আমাদের দিশী সরকার তাই করবে মনে হচ্ছে।

'বেশ আঁটঘাট বেঁধে করবে সব; দেখে আমাদের খুব ভালো লাগবে।' ক্ষেমেশ বললে।

'কিন্তু যেসব শহীদ বেঁচে আছে তাদের সম্বন্ধে কি হয়?' জয়তী বললে, 'তাদের নাম লিষ্টিতে থাকে খুব সম্ভব। থাকে না ক্ষেমেশ?'

'তা তো তুমি জানো সুতীর্থ। নেই তোমার নাম লিষ্টিতে?'

সুতীর্থ জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাদের নামও থাকে, কিন্তু তারা বেঁচে আছে বলে দেশ তাদের সম্বন্ধে খানিকটা চক্ষুলজ্জা বোধ করে— দেশের জন্য রিভলবার হাতে লড়েছিল এইসব শহীদরা; দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে; এসব শহীদরাও বেঁচে আছে। বেঁচে থেকে কি করছে? ঘিয়ের ব্যবসা করছে: কিম্বা পুরানো ক্যানেস্তারা বিক্রির কাজ; করুক; মরে যাবে তো একদিন। তারপর সব হবে।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'শহীদ কাকে বলে জিজ্ঞেস করছিলে জয়তী। এইসব

সূচীপত্রে যান

লোকদের শহীদ বলে।'

'তা হলে ভারী বিচিত্র তো।'

জয়তীর কথা কানে গেল না সুতীর্থের চুরুট টানতে টানতে নিজের কথার জের টেনে সুতীর্থ বললে, 'এরা শহীদ।'

'শহীদের লিস্টিতে তোমার নাম নেই সুতীর্থ?'

'না'। সুতীর্থ বললে।

জয়তী বললে, 'নেই কেন? তুমি তো কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে লড়াই করছ। কয়েকবার জেলে গেলে দমদম সেন্ট্রাল জেলে ছিলে— প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলে— হিজলী ক্যাম্পে ছিলে—বক্সার ক্যাম্পে ছিলে—'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে, 'আমি নিজের মনের খুশিতে লড়াই করেছি, ওরা ভালো বুঝে আমাকে জেলে দিয়েছে। রিভলভার চুরি করেছি, পৌঁছে দিয়েছি ঢের, কিন্তু রিভলভার উচিয়ে মানুষ মারি নি, চেষ্টাও করিনি। তখনকার সেসব দিনে কিরকম দিনকাল ছিল তা তুমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না। পিপাসা পেলে আমরা জল খাই, ঠিক সেরকমভাবে চোঁ চোঁ বোমা পিস্তল ছুটত তখন। পিপাসায় ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ হত, অথচ আমার কোন তেষ্টা নেই— এক ফোঁটা জল খাওয়া নেই তখন। বোমা দালান দিচ্ছি, রিভলভার যোগান দিচ্ছি খুব সাত্ত্বিকভাবে, কাউকে মারছি না দেখেশুনে ষড়যন্ত্রীদের ভেতরে কেউ কেউ আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিল, আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিনি বিশেষ কিছু, কিন্তু তবুও তো বেঁচে আছি আজ পর্যন্ত—।'

সুতীর্থ চুরুটের দিকে মন দিল, বার কয়েক টেনে জয়তীকে বললে, কেন মরিনি কেন মরিনি—এতগুলো বছর নিশির ডাকের ভেতর দিয়ে বারীন ঘোষের আমল থেকে বিনয় বোস দীনেশ গুপ্তদের চাটগাঁ আমারি রেড—তারপর গান্ধীজির— তোমরা তো সোদপুর নোয়াখালির কথা বলবে— আমি বলছি সেই অদ্ভুত-ডান্ডি-চৌরি— চৌরার ভেতর দিয়ে কোথায় থেকে কোথায় চলে এলুম— কিসে বিশ্বাস ছিল আমার— কিসে অবিশ্বাস ছিল— ভালো করে বুঝবারও সময় পাইনি।'

বলতে বলতে হঠাৎ মনে হল সুতীর্থের বেশি কথা বলে চলেছে সে, এটা তার স্বভাব নয় ঃ অনেকদিন পরে জয়তীকে দেখে এইরকম হচ্ছে; সুতীর্থ নিজেকে থামিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে বললে, 'এইবারে বুঝে দেখতে হবে সব।' তারপর চুপ করল।

'কি বুঝে দেখবে?'

'এক বছর আমি বিদায় নেব সব কিছুর থেকে।'

'তার মানে?'

'আমার গত তিরিশ বছরের বৃত্তান্ত তুমি তো জান।''

'এইবারে ভালো করে শুনতে হবে সব।' জয়তী বললে।

'সুতীর্থের বৃত্তান্ত আমার চেয়ে বেশি জানা ছিল তোমার জয়তী। আমি বিশেষ কিছু জানি না। তুমি?' ক্ষেমেশ চশমা খুলে নিয়ে জয়তীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে।

'কিছু কিছু জানি।'

তেত্রিশ

সুতীর্থ ঠাণ্ডা চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'প্রায় সাত-আট বছর বয়সে আমি কাজে নেমেছি। নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য সব জায়গায় চলে যেতুম। আমার বাপ-মা ভাই-বোন নয়, আমাকে ঘিরে অন্য যেসব ছেলেমেয়েরা থাকত তাদের কাছ থেকে আমি মন্ত্রগুপ্তি পেলুম যে, ইস্কুল কলেজ কিছু নয়— বাঙালী ছেলের পক্ষে দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। আমাদের দলের তিরিক্ষে সবপুটির মত রূপমতী একজন মেয়েও এই কথা বলেছিল আমাকে দলের তিরিক্ষে সবপুটির মত রূপমতী একজন মেয়েও এইকথা বলেছিল আমাকে-বলবার কি ঠাট! কি ওজন! আহা! প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ বছর আগে গুলি খেয়ে সেই মেয়েটি মরে গেছে— আজো যখন তার কথা মনে হয়—' সুতীর্থ ক্ষেমেশের জয়তীর চার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়েও আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বললে, 'আমি তখন খুব ছোট ছিলুম, আট নয় বছর বয়স হবে, সেই মেয়েটির পনেরো ষোল, আমাকে চুমো খেয়ে খেয়ে পুদিনা পাতা মরীচ তেঁতুল আর লবণের যে পাঞ্জাবী চাটনী বানাত— উফ! যখনি এর পরে একা পড়ে যেতুম, আমাকে কোলে টেনে মাইয়ের ওপর নিয়ে যেত সে; এমনই ন্যাতা জোবড়া মনে হত, এত

বিরক্তি লাগত, এত রাগ হয়েছিল একবার— যে নখ দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছিলুম তার নাক মুখ—'

সুতীর্থ একটা ঢোক গিলে বললে, 'মানুষের ইচ্ছা খুব দেরিতে আসে, তার ভালোবাসাও; আট ন' বছরের একটা কুকুর তো ছেলেপুলের ঠাকুর্দা, কিন্তু ন'বছর বয়সে সেই মেয়েটিকে আমি ভালোবাসলেও ওরকম টানাহেঁচড়া পছন্দ করতুম না। শিবের মাথায় সিন্দুর ছিলুম। তিনচারজন বেশ রায় রায়ান গোছের পুরুষও ছিল সেই বিপ্লবীদের দলে, খুবই শ্রদ্ধা করতুম তাদের; ভালোবাসতুম মেয়েটিকে, কিন্তু তবুও লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রিভলভার চালিয়ে ইংরেজ খুন করে দেশকে স্বাধীন করবার যে সব পথ দেখিয়ে দিত তারা, যে সব মোক্ষম জবানী ঝাড়ত— আমি সে সব মোটামুটি বিশ্বাস করলেও প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করিনি কিছু ক্ষেমেশ—'

'সেই মেয়েটির কি নাম ছিল?'

'দুটো নাম ছিল; একটা রন্তা, আর একটা কিনা গোতমী। অদ্ভুত নাম। গোতমী বলে ডাকত তাকে কেউ কেউ। কেউ কেউ কিশা বলত।'

'কে গুলি করেছিল তাকে?'

'বিপ্লবীদেরই কেউ।'

'কেন?'

'সন্দেহ করেছিল কিশাকে। যে একজন ছোকরা ডেপুটিকে ভালোবেসে ছিল— বটে গিয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যে। কথাটা সত্যি কিনা আমি জানি না। কিশা ষড়যন্ত্র সব ফাঁস করে দেবে আশঙ্কা করেছিল ওরা।'

'নাগার্জুনের মত স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, কোনদিকেই কোন পিঠ খুঁজে পেলে না বুঝি সুতীর্থ? তবুও তো দলে ভিড়লে তাদেরই।' জয়তী বললে।

'হ্যাঁ, কিন্তু দলের জন্যে সব দিলুম না তো, ইস্কুল কলেজ তো ছাড়লুম না।'

'জেলে তো গেলে বাববার।'

'কিন্তু পরীক্ষায়ও পাশ করতে লাগলুম। হিজলী ক্যাম্পেও গিয়েছি, বি-এ অনার্সও যুতেছি, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে রিভলভারও জুগিয়েছি, খুব মন দিয়ে পড়ে এমন-এ পাশও করা গেল—কিন্তু রিভলভারে বিশ্বাস ছিল না আমার—ইউনির্ভাসিটিতেও না। এক সময় আমি ছড়া কবিতা গল্প লিখতুম ; বেশ সাড়া পড়ে যাচ্ছে আমার লেখা নিয়ে—দেখছিলুম। তবুও অনেক দিন হয় লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্যে আমার বিশ্বাস যদি থাকত তাহলে এরকম হত না।'

'বিপ্লব করলে, জেলে গেলে, ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী নিলে, সাহিত্য করলে, কিন্তু কিছু হল না বলতে চাও?'

'কিছু হল না জয়তী, আমার ধর্ম নেই' বলে।'

'ধর্ম নেই মানে? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই? ঈশ্বরে বিশ্বাস তো আমারও নেই।'

সুতীর্থ বললে, 'পৃথিবী যে খারাপ নয়, মানুষ যে সত্যিই ভালো, প্রাণের গঙ্গা যে রক্তে নাওয়াবে না মানুষকে আর, কোনো বিপ্লবেরই দরকার হবে না একদিন সমাজ যে সুস্থ ও শুভ হয়ে উঠবে সকলের জন্যে, জীবন যে বাস্তবিকই আশা-ভরসার, এসব জিনিসে কোন আপ্ত বিশ্বাস নেই আমার। সেটা থাকলেই ভালো হত; এ যুগে বিশ্বাস কাঁচিয়ে গেলে অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়ে তাকে ফিরে পাওয়া যায় না আর।'

আজকালকার বাজারে দিনরাত লেনদেন চলছে যে সব ব্যাপারের ব্যাঙ্কগুলিকে সাক্ষী রেখে—গাদা বাজারকে ঘুষ দিয়ে ওপরওয়ালাদের সার্টিফিকেট যোগাড় করে, দরকার মত অসংখ্য মেয়েমানুষের মাংস খেয়ে নতুন মাংসের জন্যে বেড়াজাল পেতে রেখে ; এসব যখন একটা মস্ত বড় কালান্তক ঢেউয়ের মত উনিশশো সাতচল্লিশ আগস্টের পিঠের ওপর গিয়ে থুবড়ি খেয়ে পড়বে মত উনিশশো সাতচল্লিশ আগস্টের পিঠের ওপর গিয়ে থুবড়ি খেয়ে পড়বে তখন তো আমরা স্বাধীনতা পাব। মানুষ যদি খুব ভালো মনে কাজ করে তাহলে পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে এতকালের ঘোলা আঁশটে মলমাংস ঝেড়ে কিছু নির্মলতা লাভ করতে। কিন্তু মানুষ কি ভালো বুদ্ধি প্রেরণার কাজ করবে—একটানা পঞ্চাশ বছর করবে? আমি শুনিনি তো কোনদিন কোন ইতিহাসে এরকম হয়েছে—' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে।

'হয়তো খুব দূর ভবিষ্যতে করতে পারে, কিন্তু এক্ষুণি করবে বলে মনে হয় না।' জয়তী সুতীর্থকে বললে।

'তাহলে কি দলিলে স্বাধীনতা পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পাবে মানুষ?' ক্ষেমেশ তার পোড়া সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'দেখা যাক। —উনিশশো সাতচল্লিশ এসে নিক।'

দশ বারো বছর আগে আমি শবরমতীতে গিয়েছিলুম একবার', সুতীর্থ বললে, 'মনে কোন প্রত্যাশা, সংকল্প কিছুই ছিল না আমার ; কঠিন মন নিয়ে গিয়েছিলুম ভেবেছিলুম, গান্ধীজীকে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু নিতান্ত অন্ধ ভক্তি ছাড়া কেউই বিশেষ কিছু ভাবে না তাঁর সম্বন্ধে মানুষটার খুব বাইরের সুখ্যাতি আছে বটে, কিন্তু এত বড় সুখ্যাতি কেন এ সন্দেহ বাইরের পৃথিবীতেই শুধু নয়, খুব সম্ভব ভারতবর্ষেও সব জায়গায় প্রায় দানা বেঁধে আছে—একটু আঁচড়ালেই টের পাওয়া যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। তিনচার দিন ছিলুম আশ্রমে। সত্যিই একটা আশ্চর্য বিশ্বাস জাগল মনের ভেতর—মন নয় আত্মার ভেতরেই যেন—ভারতবর্ষের, পৃথিবীর আজ না হোক, কাল পরশু যে ভালো হবে মানুষের মানে যে খারাপ নয়, সত্যিই ভালো ঃ সেটার প্রতি। তারপরে কলকাতায় ফিরে ছ'মাস খুব বিশ্বাসের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করেছিলুম আমি ; গ্রামে গ্রামে গিয়েছিলুম গান্ধীজীর নির্দেশ অনুসারে কাজ করবার জন্যে। কিন্তু টিকল না ; কাজেই শুধু অবিশ্বাস হল না ; মানুষকেই শুধু না, মোহনদাস করমচাঁদকেও বিশেষ কোনো সারাৎসার হিসেবে উপলব্ধি করতে পারলুম না আমি।'

'সে রকম সারাৎসার কে আর থাকে পৃথিবীতে?' জয়তী বললে।

কে আর থাকে পৃথিবীতে ঃ পৃথিবীর মানুষ তো সব।' ক্ষেমেশ ভুরুর উস্কানিতে জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে।

ক্ষেমেশের মুখ ভুরুর দিকে তাকিয়ে দেখল জয়তী, হাসলেও হাসতে পারত ; কিন্তু গম্ভীর হয়েছিল তার মন, সুতীর্থ ঠিকই বলেছে, হয়তো সারাৎসর কেউ নেই, কিছু নেই, খুব ছোট তিলের মত পরিসরেরও ভেতর প্রতি মানুষের নিকটতম পরিজনটি ছাড়া।

'কিন্তু ছ'মাস—এত অল্প সময়ের মধ্যে—এত বড় একটা প্রভাব—তোমার মনে বেল কুড়িয়ে বাইয়ের সামিল হয়ে গেল—এটাও খুব আশ্চর্য সুতীর্থ।'

'বেল কুড়িয়ে বাইই বটে', বললে সুতীর্থ, 'বেশ বলেছ তুমি ক্ষেমেশ।'

'তুমি গিয়েছিলে আর শবরমতীতে?'

'না, আর যাইনি।'

'শুনেছিলুম তুমি পর্ণকুটিরে গিয়েছিলে বছর কয়েক আগে—' ক্ষেমেশ বাইরের চারদিককার উজ্জ্বল ঝলসানির আর ঘরের ভেতরের একজন নারীর কোথায় যেন সৃষ্টির ঢলের ভেতর বোদে স্পর্শে শব্দে মিল হয়ে গেছে অনুভব করে আলোবাতাসে চোখ বুজে বসে থেকে সুতীর্থকে বললে।

'না, যাইনি।'

'এই তো সেদিন সোদপুরে এসেছিলেন—গিয়েছিলে?'

'না।'

'কেন?'

'বিশ্বাস নিজের ভেতর থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হয়—বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস, চলাফেরা চিন্তা অর্থের আমার মনে হয় আমার জীবনের ছোট আধারের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা জমিয়েছি সব। এখন ব্রহ্মাণ্ডের ঝাঁপি এলেও ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। কী দেবে তা? যা দেবে জানা আছে আমার। মোহনদাস করমচাঁদজীকেও আবার দেখবার দরকার নেই। দেখেছি। এখন বছরখানেকের জন্যে তোমাকে বলছিলুম জয়তী, গ্রামে চলে যাব আমি। ভেবে দেখব সব। অভিজ্ঞতার থেকে কি বেরুবে আমার? বিশ্বাস না অবিশ্বাস? দেখব, বুঝব, এর পরে কি করতে হবে ঠিক করব।'

'কোথায় কোন গ্রামে যাবে তুমি?'

'ঠিক করিনি।'

'কবে যাবে?'

'আজকালই।'

'তুমি তো অফিসে চাকরি করতে?'

'ছেড়ে দিয়েছি।'

'শুনেছিলুম একটা স্ট্রাইক নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলে?'

'ছিলুম। আমার চেয়ে ভালো হাতে তুলে দিয়েছি বিধান ব্যবস্থা সব।'

'স্ট্রাইকটা ক'দিন চালিয়েছিলে?'

'মাসখানেক।'

'ও, তারপব ব্যাঙের আধুলি দেখিয়ে চলে এলে বুঝি। তোমার বয়স হয়েছে সুতীর্থ—এখন চুপচাপ বসে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতী পড়া উচিত তোমার।' ক্ষেমেশ বললে।

'একত্রিশটা দাঁত আছে তোমার ক্ষেমেশ', সুতীর্থ বললে, 'আমি যদি কঙ্কাবতী পড়ি—'

'তাহলে বত্রিশটা দাঁত হবে ক্ষেমেশেব?' জয়তী একটু তামাশা বোধ করে বললে, 'ভাবি মজার কথাই তুমি বলতে চাচ্ছ সুতীর্থ।'

'ক্ষেমেশের লাইব্রেরী থেকে ও বইগুলো যোগাড় করে দেবে আমাকে জয়তী', সুতীর্থ বললে, 'ক্ষেমেশের লাইব্রেরীটা বেশ ভালো, অনেক রকম বইই নেই, কিন্তু যা আছে রঞ্জনেরও ভালো লাগবে।'

'তুমি কোথায় থাক আজকাল?' জয়তী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

'লেক বাজারের দিকে।' সুতীর্থ বললে।

'ফ্ল্যাট ভাড়া করে? ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে গ্রামে? তাহলে ফিরে এসে তো বাড়ি পাবে না আর কলকাতায়।'

'কলকাতাযই যে ফিরে আসব এমন তো কোনো কথা নেই।'

'এখানে না ফিরলে কাজ করবে কোথায়?'

'কাজের জায়গা দেশগাঁয়ে নেই?' সুতীর্থ একটু তেরছা চোখে জয়তীর দিকে তাকাল।

'কিন্তু তোমরা তো বড় কাজ করবে। গাঁযে কাকে নিয়ে কাজ করবে? গাঁযে লোক কোথায়?'

সুতীর্থ পকেট থেকে একটা নতুন চুরুট বার করে বললে, 'তুমি পাড়াগাঁ দেখনি কোনো দিন জয়তী—'

চৌত্রিশ

'আমি হালিশহর, সোনারপুর, মজিলপুর, লক্ষীকান্তপুব—গিয়েছি তো অনেক জাযগায়।'

ক্ষেমেশ—চা আসছে না রঞ্জন আসছে না, দাড় কামাবার ক্ষুরটুর আসছে না, একটু বিবক্ত হয়ে, 'এই রঞ্জন—এ—ই—এই—ই' বলে গলাজলে দাঁড়িযের গানেব গলা সাধবাব মত চিৎকার করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে, 'বালিগঞ্জ গিয়েছি, টালিগঞ্জ গিয়েছি, ঢাকুরিয়া গিয়েছি, চেতলা গিয়েছি, বেহালা গিয়েছি—তুমি কার গাড়ি হে বুইক? আমি আগে ছিলাম মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ; এখন কার? এখন বিরূপাক্ষ রাজবংশীর; আরে কার গোরব্যাটা! কাব? আজ্ঞে জয়তী দেবীর। তবে চল, চল, আমাকে খিদিরপুর, মেটেরবুরুজ, আলিপুব, পাকপাড়া নিযে চল—আমি বাংলাদেশেব গ্রামগ্রামালি দেখব—আমি গাঁয়ের ডাক শুনেছি—আমার হিলম্যান মিংকস—এর ডাক—দশ গ্যালন পেট্রলে হবে?—না বেশি লাগবে ধনদা ঠাকুর?—বেশি লাগবে?—আবার কালোবাজারের শেযারের ডাক শুনিযে ছাড়বে দেখছি—'

ক্ষেমেশ উঠে দাঁড়িযে বললে, 'আমি একটু ওপরের থেকে আসছি জযতী।'

'কেন?'

'আমাব ভোরাইটা সেবে আসি।'

'তোমার ঘড়িতে কটা ক্ষেমেশ?'

'সাড়ে আটটা, এইবারে মুখ ধোব, দাড়ি কামাব, বাথরুমে যাব, রঞ্জনকে ওঠাব ঘুমের থেকে, চায়ের ব্যবস্থা হবে—'

'ক্ষেমেশ, কাল রাত চারটা অবধি বাইরে ছিল রঞ্জন?' জযতী জিজ্ঞেস করল?'

'কড়া নাড়ার শব্দে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বুঝি? তখন পাঁচটা। এই তো সবে বাবান্দাব শান চেলে সাত পাক খেযে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিযে শুযেছ—চলো জযতী আমার সঙ্গে ওপরে—'

'কেন?'

'বারোটার আগে রঞ্জন ঘুম থেকে জাগবে বলে মনে হয না—হিটারে চা করে নেবে চল।'

'আমি চা খেযে এসেছি।' সুতীর্থ বললে।

'তোমাকে তো ভোর পাঁচটায চা করে দিলুম—তুমিও এসো ক্ষেমেশ, আমি যাচ্ছি। মুখ ধুযে দাড়ি কামিযে ঠিক হযে নিতে তোমার ঘণ্টা দেড়েক তো লাগবে—তারপবে নিচে এসো—আমি চা ঠিক করে

রাখব।'

ক্ষেমেশ চলে গেল।

'বিরূপাক্ষের সঙ্গে কয়েক দিন আগে আমার দেখা হয়েছিল।'

'কোথায়?'

'তার বাড়িতে—সে যে তোমাকে বিয়ে করেছে তা তো আমি জানতুম না। কবে বিয়ে হল?'

'বছর তিনেক আগে।'

খানিকটা চুরুটের ছাই সুতীর্থের শার্টের ওপর ঝরে পড়ল ; জামার ছাইটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা না করে, চুরুট না টেনে—কথা ভাবছিল সুতীর্থ—কি কথা সে নিজেও ঠাহর করে উঠতে পারছিল না। অনেক দূরে একটা বটগাছের ডালপালার ভেতর একটা কালো পাখিকে আবিষ্কার করল তার চোখ। সুতীর্থ ভাবছিল, আমার চোখের বাহাদুরি আছে বটে ; কিন্তু তবুও কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সে, কেমন একটা ব্যথা ঃ স্নায়ুর ভেতরে না মনোময়তার রক্তে না হিরন্ময়তায় রক্তে না হিরন্ময় কোষে? জয়তী তাকিয়ে আছে সুতীর্থের দিকে। চোখ জয়তীর দিকে ফিরিয়ে নেবার উপক্রম করে তবুও কালো পাখিটার দিকে তাকিয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'ক্ষেমেশের এখানে বেড়াতে এসেছ?'

'না।'

'তবে?'

'আমি বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি। আইন আদালতে তো যেতে হবে এ জন্যে।' জয়তী বললে।

'কেন?'

'বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি—বললাম তোমাকে—শোননি?'

'শুনেছি।'

'আমি আলাদা থাকতে চাই এখন থেকে। সেটা আইন দিয়ে ঠিক করিয়ে নিতে হবে না?'

'তা হলে তো ক্রিশ্চান হয়ে নিতে হয়; ক্রিশ্চান—মুসলমান—'

'হতে রাজি আছি আমি।'

'কি জানি, আইনের মারপ্যাঁচ আমার জানা নেই। খুব কঠিন হবে', সুতীর্থ বললে ; ডান হাতটা খানিকটা তুলে নিয়ে দেখল চুরুট নিবে গিয়েছে, জ্বালাতে গেল না, চোখ দিয়ে দেশলাই খুঁজল দুচারবার ; চোখে পড়ল দেশলাই সুতীর্থের, কিন্তু চোখে যে পড়েছে সেটা টের পেয়ে দেশলাইটা কুড়িয়ে নেবার আগে অন্য বিষয়ের দিকে চলে গেল চোখ—জয়তীর দিকে নয় ; স্ট্রাইক, মণিকা, মল্লিক, মূখার্জির কথা ভাবতে ভাবতে জয়তীর কথা মনে পড়ল আবার। সুতীর্থ বললে, মন যখন তোমার বিরূপাক্ষের দিকে নেই, আইন ওর দিকে থাকলেও কি আর হবে।'

'কিছু করতে পারবে না?'

'কিছু করতে চাইবে না।'

'আমার ওপর সব সত্ত্ব ছেড়ে দেবে ও?'

চুরুট নিবে গিয়েছে টের পেল সুতীর্থ।

সোফাগুলোর আনাচে কানাচে কি যেন খুঁজে তাকাতেই দেশলাইটা চোখে পড়ল তার ; জ্বালিয়ে নিল চুরুট।

'পাঁচ লাখ টাকা আমি নিয়ে এসেছি। বালিগঞ্জের বাড়িটাও আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি। আইনে পাকাপাকি করে নিয়েছি।'

'ভালোই তো।' সুতীর্থ বললে। বটগাছটার দিকে তাকিয়ে চুরুট টানতে লাগল সে। পাতা—অনেক ঘন পাতা ছায়ার আড়ালের কালো পাখিটাকে কোনো অনুমান বলে ঠিক করে নিতে পারছে না, বুঝতে পারছে না ওটা কি পাখি ঃ কোকিল না নীলকণ্ঠ না কি ; কোকিল যদি হয় মকর সংক্রান্তি কেটে গেলেও এমন চুপ করে আছে কেন? ওটা পাখি তো? একটা ছোট কালো মেরজাই নয় তো দেশোয়ালীদের? পাখী না হয়ে মেরজাই? পাখি হোক।

'আমি এখন কি করব?'

'কে—জয়তী কথা বলছে? সুতীর্থ চুরুট ফুঁকছিল। ঘাড় ফিরিয়ে জয়তীর দিকে তাকাল।

'আমি ভেবেছিলুম তুমি ওপরে চলে গেছ স্টোভ জ্বালতে।' 'স্টোভ তো নিচেও জ্বালানো যায় ; সুতীর্থ ঘরের চারদিকের প্লাগের ছ্যাঁদাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে, চলো তুমি আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'গ্রামে যাবে চলো।'

গ্রামে কোনদিন যায়নি জয়তী ; গ্রামের নিমিত্ত নিধান কাকে বলে জানে না। গ্রামগুলো মরছে ; তুইয়ে বুইয়ে নতুন গ্রাম নির্মাণের ব্যাপারটা ভেবে দেখতে যায়নি। গ্রাম কোথায়—কি রকম—কি করতে হবে এই সব গ্রাম নিয়ে—এ সম্বন্ধে কোনো স্বভাব—কৌতূহল কোনদিন ছিল না, তাব। কিন্তু সুতীর্থ তাকে গ্রামে যেতে বলেছে। হঠাৎ যেন অনেক চাপা জলোচ্ছ্বাসে শুকনো ফাঁকা একটা প্রান্তব ভরে উঠল। এটা কি প্রান্তর? না সমুদ্র?

'কোন গ্রামে যাবে সুতীর্থ?'

'ঠিক করিনি এখনো।—তবে কোনো একটা গাঁয়ে নয়—অনেক গ্রামে যাব।'

'ভারতবর্ষকে তো এখনও দুভাগ করা হয়নি। কিন্তু হবে শুনছি। ওদের ভাগে যে অংশ পড়বে সে সব গ্রামেও যাবে?'

জয়তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'শুধু বেড়াতে যাওয়া নয়, অনেক কঠিন কাজ কবতে হবে গ্রামে গিয়ে। শহবে তো অনেক বোকা লোক আছে ; তার চেয়ে ঢের বেশি বোকা মানুষ গ্রামে থাকে। কিন্তু বোকা বলে বজ্জাতিব কসুব নেই। তাদের ওপরয়ালা আছে, আরো খারাপ। আবো ওপরে—সমস্ত দেশ জুড়েই কেমন একটা নিবেস অর্থহীন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দেখবে এরা সকলে মিলে আমাদের দুজনকে পালে চাপা দিয়ে লাট করে ফেলতে চেষ্টা করছে—'

'এবা সকলে মিলে নয় এদের অনেকে—'

'কলকাতা দিল্লিরও চাঁই লোক আছে ওদের মধ্যে।'

আমরা তো কোনো খারাপ কিছু কবতে যাচ্ছি না—ভালো কাজ করব।

আমাদের দিকেও লোক থাকবে। আমি যাব গ্রামে।

'কদিন থাকবে?'

'যতদিন তুমি থাকতে বল।'

সুতীর্থ চুরুটে টান দিয়ে শেষে বললেন, 'এতদিন তুমি থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'গ্রামে গ্রামেই থেকে যাব—কলকাতায় ফিরব না আব। মহা সরীসৃপেব মত বিরাট পাথরেব গায়ে আঘাত কবে জল নিজের জলের দেশে ফিবে যাচ্ছে এমনই একটা আশ্চর্য আদি পৃথিবীরই নাদ যেন বেজে উঠক সুতীর্থেব কথায়।

সেই জলের শব্দ শুনল জয়তী।

কলকাতায় তোমাব বাড়ি আছে, টাকা আছে, মানুষ আছে, যাবা তোমাকে টানে।' সুতীর্থ বললে, 'গ্রামে গিয়ে ববাবব তুমি থাকতে পাববে না।'

'সুতীর্থ চুরুটেব মুখের আগুনেব দিকে তাকিয়ে নিল একবাব—টানবাব আগে। আস্তে আস্তে টানছিল।

মাঝে মাঝে এক-আধ মাসেব জন্যে যদি আমি কলকাতায় আসি তাতে তোমাব আপত্তি আছে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জয়তী বললে।

'ঠিক করেছ গ্রামে যাবে?'

'আমি কিছু বেখে ঢেকে বলেছি সুতীর্থ?'

'আমাদেব সঙ্গে গেলে দু-চারটে শর্ত আছে।'

'বললেই তো।'

সব শর্তগুলোব কথা কি বলেছি তোমাকে?'

'কেন? বলবার কি দবকার? এটা কি দুপক্ষের ব্যাপার।'

'তাহলে বুঝেছ তুমি সব।' খুব বিশ্বাসভরে বললে সুতীর্থ। মানুষেব গুলি এড়িয়ে আকাশের অন্তহীন নিরাপদের ভেতর বুনো হাঁস—দম্পতিব মত নিঃশ্বাস বেবিয়ে এল জয়তীর বুকেব ভেতব থেকে।

'গ্রামে গিয়ে আমি বিয়ে করব তো জয়তী'—সুতীর্থ চুরুটেব আগুনের দিকে তাকাল আবার চুরুটটা অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছে ; জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'কেন, বিয়ে করবে কেন এত বয়সে?'

মাথার ওপরে দোতলার ঘরে ড্রররর–ঠটক টক ঠক ঠট্রাক ট্রাক—শব্দ হচ্ছিল ; কেউ চেয়ার টেবিল টানাটানি করছে মনে হল।

জয়তী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে না থাকলে কোন কিছুতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে না তুমি। সেরকম বিশ্বাস না থাকলে, সুতীর্থ এ যুগকে সাহায্য করতে পারবে না তুমি। খুব বিপন্ন আমাদের এই যুগ, তোমার মতন লোকের সাহায্য চায়।'

'তা চাইতে পারে, কিন্তু আত্ম বিশ্বাস আমার নেই।'

'জানি, বললে তুমি কোনো রকম বিশ্বাসই নেই তো?'

সুতীর্থ হাল্কা চোখে আলো রোদের দিকে তাকিয়েছিল, চোখে গভীরতা আসছিল তার ক্রমে ক্রমে। জয়তী দেখছিল মস্ত বড় ঝাড়নটা পূব দিকের দেয়ালে কাঠ হয়ে আছে ; আনাচে কানাচে ময়লা আছে ; অনেকদিন ঝাড় সাফ করা হয়নি।

পঁয়ত্রিশ

'আছে।' জয়তী বললে, 'না হলে ওরকম স্ট্রাইকটায় হাত দিতে যেতে না তুমি।'

'স্ট্রাইক। আমি তো ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় কাজ করতে সুতীর্থ?'

'সাপ্লাই কর্পোরেশনে।'

'কত মাইনে পেতে?'

'পাঁচশো।'

'আরো উন্নতি হচ্ছিল নাকি?'

'টাকাকড়িব? তা হত।'

'কেন ছেড়ে দিলে সব?'

'আমরা জোট পাকিয়ে পরিশ্রম করে মল্লিকদেব ফার্ম দাঁড় করিয়ে দিলে ধনী–মানী লোকদের তো সুবিধে হবে, যারা না খেতে পেয়ে মরছে সে–সব কেরানী মজুর মাস্টার বেকারদের কোন লাভ হবে না।'

'এই তোমার বিশ্বাস?'

চুরুট খেতে গিয়ে—চুরুটটা ফেলে দিয়েছে মনে পড়ল সুতীর্থের। আর একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিল, কোথায় রেখে দিল যেন তারপর দেশলাইটা জয়তীর কথা শুনেছে বলে মনে হল না, চুরুট না টেনে বাইরের রৌদ্রের বড় ঝিলিকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'ধন্য সত্য তোমার সুতীর্থ। অথচ সত্যে অবিশ্বাসীর বদনাম তোমার?'

যে হাঁস আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তার মত চোখে যে গহন জলে সাঁতার কেটে চলেছে মাঝগাঙের সেই গৃহ বলিভুক রাজ–হাঁসিনের দিকে তাকাল সুতীর্থ।

নিবে গেছে চুরুট, সুতীর্থের চোখ দেশলাই খুঁজে ফিরছিল ; নেই ; আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু সহজ চোখের পথে কোথাও নেই ; আচ্ছা পরে দেখা যাবে।

'কলকাতায় একটা লোককেও তুমি খুঁজে পাবে যে এ–জন্য পাঁচশো টাকার চাকরি ছেড়ে দেয়?'

'কেন, তুমিই তো ছেড়ে দিচ্ছ জয়তী।'

'আমি?' সুতীর্থের নেবা চুরুটটার দিকে তাকিয়ে জয়তী বললে, 'তুমি দেশলাই খুঁজছিলে? পেয়েছ?'

'না।'

'কোথায় গেল দেশলাইটা?'

'লাখ টাকার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ তো তুমি ; আমার সঙ্গে গ্রামে যাবে বলছ। এত শ্রদ্ধা তোমার পৃথিবীর ওপর? এত বিশ্বাস মানুষকে?'

জয়তীর চোখ দেশলাই খুঁজছিল; কোনো কোণে খামচি—কোনো দিকে দেখতে পেল না সেটা।

'অথচ আমার কি মারাত্মক অবিশ্বাস দেখ। আমি জানি যে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।' বলে আস্তে আস্তে চুরুটটাকে মুখে তুলে টানতে গিয়ে সুতীর্থ টের পেল নিবে গেছে ; অনেক আগেই নিবে গেছে, দেশলাই খোঁজা হচ্ছে, এত সব ভুলে গিয়েছিল সে। দেশলাই পেল কি জয়তী?

জয়তী রোদের ভেতর চোখ বুঝে কেমন গাঢ় লাল বর্ণের সুধা স্রোতটাকে খানিকটা তিতোর মত

অনুভব করে চোখ মেলে বললে, 'আমি এই ক্ষেমেশের বাড়িতেই থাকব তবে?'

'থাকো। এ বাড়িটা খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, ইঁটের ওপর ইঁট চড়িয়ে বেশ গেঁথেছে, কিন্তু আমার মাটির দেয়াল হলেই হবে।'

'কোথায়?'

গ্রামে। আজই চলো।'

'আজই?

দেশলাইটা খুঁজে পেয়েছে জয়তী, দিই দিই করে সুতীর্থকে দেওয়া হল না। চুরুট নাই বা জ্বালাল সুতীর্থ। না ; জ্বালাবার কোনো তাড়া নেই। দেশলাইটার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'পেলে খুঁজে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিল?'

'গদির কিনারে ; ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।'

সুতীর্থ নেবাচুরুটের ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আজ হবে না, তবে আজ—কালই যাব গ্রামে।'

'কোন্ গ্রামে যাবে ঠিক করেছ?'

'স্টেশনে গেলে ঠিক হবে।'

'তা হবে। সব গ্রামই গ্রাম, একরকম অন্ধকার, একটা সম্ভাবনা, একই রকম শূন্যতা। আলোও আছে?' জয়তী বললে, 'সুতীর্থ, ওদিকে পাকিস্তান হচ্ছে নাকি?—আমাদের যশোর খুলনা চাটগাঁ নোয়াখালির দিকে যাবে?'

'চলো!' সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল জযতী হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা দিচ্ছে। হাতেব থেকে দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'একটি কি দুটি সন্তানেব দবকার আমার।'

কোন কথা বললে না জযতী ; মুখের ভেতর তার কোনো ভাব নেই ; যেন কেউ নেই, কিছু নেই, কেউ কোনো কথা বলেনি যেন।

সুতীর্থ চুরুটেব মুখের থেকে সাদা ঠাণ্ডা ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'আচ্ছা থাক, কোন দরকাব নেই।

'কেন?'

'এক—আধটা চাষাভুষোব ছেলেকে আমাদের ঘবে এনে মানুষ কবলেই হবে।'

চুরুট জ্বালাল সুতীর্থ।

জযতী একটু হেসে বললে, 'পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক চাষাভুষোর ছেলেগুলোকে নিজেদের ঘবে নিয়ে সন্তানের সাধ মেটাচ্ছে বুঝি? তাই যদি কবে তাহলে আমবাও তা কবব। কিন্তু না করে যদি তাহলে পৃথিবীর লোকেরা যা করে সেই নিযমে চলব আমরা। সেই নিযমে চলবে তুমি সুতীর্থ?'

'পৃথিবীর শীত ঋতুতে খুব গভীব তো সেই নিয়ম—।' সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুরুট হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। বললে, 'তুমি আমার সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে গ্রামে?'

'পৃথিবীর শীত ঋতুতে গভীব সেই নিযম। কি যে গভীর। পৃথিবীতে আরো চল্লিশটা শীত ঋতু বাঁচব আমরা—তুমি আর আমি।'

জয়তীর মুখে একথা শুনে তার মুখেব দিকে তাকিয়ে বইল সুতীর্থ, তারপর অন্য চিন্তা এল, সুতীর্থের মনে—অন্য ভাব ; চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রোদের বেলাব দিকে তাকিয়ে বললে, 'পৃথিবীটা আজকাল খুব খারাপ, আমাব মতন মানুষের মন সেই পৃথিবীর মতই খাবাপ। মনটাকে স্নিগ্ধ, সত্য করে নিতে হলে চাষাভুষো হয়ে থাকতে হবে গিয়ে গ্রামে। আমবা একটু বড়—প্রামাণিক চাষা হব বলে, বেশি সাহস, বেশি বুদ্ধি, বেশি সহানুভূতি নিয়ে কাজ করব—যত বেশি লোকের জন্যে সম্ভব করব। কিন্তু কোনো নতুন সূর্য সমাজ আর পুবোনো সমাজেব আকাট ভাঁওতার কেলেঙ্কারি থাকবে না আমাদের রক্তের ভেতর কোনো বিষ থাকবে না কোনো বিষ থাকবে না কোনো কিছুর বিরুদ্ধে ; কাজ করব, উপলব্ধি কবব—সেবা করব—সন্তানেবা আসবে—শেখাব তাদের ; ফুবিয়ে যাব পৃথিবীর থেকে।'

'এই তো পৃথিবীব কথা।' জযতী বললে।

'না, পৃথিবীর কথা এর চেয়ে ঢের খারাপ।'

'সব সময় না ; যা বলেছ তুমি এইবকম ভালো অনেক সময়—'

সূচীপত্রে যান

জয়তীর শরীরে রোদ এসে পড়েছে তার ভেতরে বসে থেকে সে বললে, বলে ভালো লাগল তার ; কথা ভেবে, বলে, ভালো লেগেছে মুখে হাসি রয়ে গেছে তাই জয়তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে এসেছি এবার ; যা এত চেষ্টা করে পারনি এতদিন—আমি এসেছি বলে সব পারবে।'

শুনে মন খানিকটা আতস কাচের বোদেব মত স্থিত, অক্ষুণ্ন হয়ে এল, কাঁচে সূর্য ফলিত হয়ে চলেছে, সুতীর্থ বললে, 'আমবা যদি পারি—' বলতে বলতে তবুও চুপ করে বইল সে।

'তুমি পৃথিবীকে ভালো মনে কর সুতীর্থ। আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাসী তুমি।'

'আমি?'

'কেউ তোমাকে বলেনি এই কথা এতদিনেও, তেমনভাবে বলেনি।' জয়তী নিজেকেই আস্তে আস্তে বলছিল যেন। 'জীবনের ভালো জিনিসগুলো আমি তোমাকে দিয়ে প্রমাণ কবাব।' বললে জয়তী—এত চাপা গলায়—যে একটা ফিসফিস শব্দ হল শুধু ; নিজেকেই বলতে চাচ্ছিল জয়তী, আব কাউকে নয়। কিন্তু তবুও শুনতে পেল সুতীর্থ ; বললে, 'আমাদেব জীবন প্রমাণ নিয়ে নয়। প্রমাণ ট্রুমান নিয়ে নয়। না।'

'তবে?'

'যে জিনিস নিজের থেকে হয় তাই নিয়ে।'

'কি জিনিস?'

বিরূপাক্ষেব টাকাকড়ি, বাড়ি যা তুমি নিয়েছ তার কাছ থেকে, ফিবিয়ে দিতে হবে তাকে। চলো ফিবিয়ে দিয়ে আসি আজ—' জয়তী কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললে, 'কি ফিবিয়ে দেবে?'

'দলিলপত্র সব।'

'তোমার নিজেব হাতে টাকা আছে?' অনেকক্ষণ পরে বললে জয়তী।

'না। নেই।'

'কি করে চলবে তবে সব?'

সুতীর্থ হাসতে লাগল। 'আমি একা মানুষ। তুমি তো নেই জয়তী—সে সব গাঁয়ে। আমি একা তো।'

অনেক ভেবেচিন্তে অনেক চেষ্টা চবিত্র কবেও জয়তী বিরূপাক্ষেব সব জিনিসই তাকে ফিবিয়ে দিতে বাজি হতে পারল না। অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা সে রাখতে চাইল, আব বালিগঞ্জেব বাড়িটা। এ বিষয়ে জয়তীর মতামত স্থিব তো। আবো ভালো করে বুঝে দেখবার জন্যে একমাস বা অনন্তকাল সময চায় না সে ; তাতে মত বদলাবে না। সে জানে তা ; সুতীর্থও জানে। মানুষের জীবনেব এইরকম সব ধবণ ধাবণ, নির্ধাবণ।

'সুতীর্থ, কিছু হাতে বেখে তোমাব সঙ্গে চলি আমি;—তেমন বেশি কিছু নয়, আমি বলছি তোমাকে—'

'তা হতে পাবে না', সুতীর্থ বললে।

কিন্তু বিরূপাক্ষকে টাকাকড়ি সব ঝেড়েপুছে দিয়ে আপোসে আসতে হবে সুতীর্থেব সঙ্গে? বিরূপাক্ষকে সেরকম কবে সব ফিরিয়ে দিতে পারবে না জয়তী।

'তুমি ক্ষেমেশের এ বাড়িতে থাকো। ক্ষেমেশেব তাঁবে নয—নিজেব মনে। সেটা সম্ভব হবে। পাখিটাখি নিয়ে ক্ষেমেশের ঘব-বার। যেন সব মানুষ পাখি হযে গেলে ভালো হত, স্বচ্ছমনের সাদা পাখি সব—' বলতে বলতে জানালা আলো বাতাস সূর্যে চমৎকাব দিঙমণ্ডলেব দিকে তাকাল সুতীর্থ।

সুতীর্থ আবার দেশলাই হাবিয়ে ফেলেছে। কোথায রেখেছে সেটা? নিবে গেছে চুরুট। নিজের সোফা জযতীব সোফা চাবদিকে তাকাচ্ছিল সে। পেল না দেশলাই। পেল না যে সেটা টেব পেল না জযতী ; সে মেঝেব দিকে ঘাড় হেঁট কবে তাকিযেছিল।

দেশলাই উড়ে যাযনি, ছিল; খুঁজে পেল সুতীর্থ ; চুরুট জ্বালিযে বললে, 'না, বিয়ে কবব না আমি। শীতকালে গাঁযে একা থাকাই সব থেকে ভালো। একা থাকা। শীতকালে। পাড়াগাঁযে।'—চোখের সামনে যেন সবুজ ঘাস—ফর্সা ধূলোর পথ—ফসল—শীতের আমেজ—বিকেলের সূর্য দেখা যাচ্ছে—এমনিভাবে বলল সুতীর্থ। কিন্তু চোযাল কঠিন হয়ে উঠল তার ; গ্রাম মানে—গ্রামেব নাড়ীনক্ষত্র—যা অন্ধকারে ও হালকা ও অতল—সেই সব নিয়েই তার কাজ—যতদূর সম্ভব সঙ্গতি আনতে পারা যায—সেইজন্যেই যাচ্ছে সে।

সূচীপত্রে যান

'ক্ষেমেশের এখানে আমি থাকব না।' জয়তী বললে।

'কোথায় যাবে তাহলে?'

'বাবার ওখানে গিয়ে থাকব। আমি টিচারি করব।'

'ও—সুতীর্থ যেন লিকলিকে ট্রাম লাইনের পৃথিবীতে ফিরে ফিরে এসে বললে, আচ্ছা উঠি জয়তী।'

'আজই তুমি গ্রামে যাবে?'

'হ্যাঁ, আজই।'

'আজই?' জয়তী কি যেন এক ভাবনার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে পেয়েও পাচ্ছে না এমনি চোখে দেয়াল মেঝে চারিদিককার ঘাস গাছ পৃথিবীর মানুষের শেষ আশার মত সমস্ত সূর্যের পিণ্ডের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'জিনিস—টিনিস কোথায় তোমার?'

'গাঁয়ে গিয়ে যোগাড় করব।'

'এখন বুঝি টিকিটের টাকা হাতে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

সুতীর্থ চলে গেল।

মানুষের চোখ সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না। চোখ ঝলসে পুড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল জয়তীর সূর্যের দিকে তাকাতে তাকাতে। কিন্তু তবুও তাকিয়ে রইল সে; কোন অশেষ প্রণিধান, অজেয় অমেয় স্থিরতা অমর আশা লাভ করবার জন্যে নয় ; কেউ কারো কাছ থেকে কিছু লাভ করতে পারে না—পৃথিবী বলছে, সুতীর্থ চলেছে—সূর্য জ্বলে—এইসব মেধাবী গভীর মর্ত্যের থেকে কয়েক বছরে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল তার মন ; ফিরে আসতে চাচ্ছিল এসবের দিকে;—কিন্তু পারছে না—সূর্যের চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার—।

ঠাণ্ডা হাত এসে লাগল জয়তীর চোখের ওপর। কারা যেন ঢুকে পড়েছে ঘরে—ক্ষেমেশ—সঙ্গে কে—বিরূপাক্ষ—

কী করেছিলে জয়তী—সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলে যে!—'

ছত্রিশ

'আমি কিছু দেখছি না ক্ষেমেশ।'

'ঝলসে গেছে তোমার চোখ। খানিকক্ষণ পরে দেখতে পাবে।'

'কে হাত রেখেছিল আমার চোখের ওপর?'

'আমি।'

'ওদিকে দাঁড়িয়ে কে?ঃ

'রঞ্জন।'

'আর কে?'

'আর কেউ নেই।'

'ও—' না বিরূপাক্ষ নেই। এক ঝলক স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল জয়তীর।

'আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জয়তী?' খানিকটা দূরে একটা সোফায় বসে ক্ষেমেশ বললে।

'ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। একটু দেরি হবে—'

'তোমার তো গ্লুকোমা ছিল। ওরকম কটকটে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলে জয়তী—'

'আকাশে মেঘ করেছে ক্ষেমেশ?'

'মেঘ? না তো, খুব কড়া রোদ ; মেঘ নেই, খুব নীল।'

'ও—' জয়তী বললে, 'হ্যাঁ, রোদ গায় লাগছে—কিন্তু—'

ক্ষেমেশ জয়তীর গরম রসস্থ চোখের দিকে তাকিয়ে রইল—সূর্যের দিকে—কয়েকটা পাখির দিকে তারপর। ভুলেই গিয়েছিল জয়তী ঘরের ভেতরে বসে আছে ; অনেকক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, তোমার খুব পুরু লেনস চাই।'

শাড়ির আঁচল মাটিতে পড়েছিল, উঠিয়ে নিয়ে একটু ধূলো ঝেড়ে জয়তী বললে, 'অনেকদিন থেকেই চশমার দরকার। কিন্তু খুব পুরু না হলেও চলবে।'

'চশমা নাও নি কেন এতদিন?'
'এইবারে নেব।'
'মোটা পাথর লাগবে তোমার।'
'কেন, আমি ছানি কাটিনি তো। পুরু লেনস কেন লাগবে?'
'ছানি নয়—'
'চোখের শিরা শুকিয়ে যাচ্ছে আমার—'
'তারপরে অন্ধ হয়ে যায়।' ক্ষেমেশ বললে, 'এর কোন ওষুধ নেই জয়তী?'
'না। ক্ষেমেশ।'
'আমি ভাবছি কোন ওষুধ আছে কিনা—'
'তোমার ঘড়িতে কটা?'
'একটা বেজেছে।'
'আমি গ্রামে যাব ভেবেছিলাম।' জয়তী বললে।
'সময় হলে যাবে—'
'রঞ্জন চা নিয়ে এল।
'বড্ড রসিয়ে চা করেছি আজ—' রঞ্জন বললে, 'সুতীর্থবাবু গরম গরম চেখে গেলে পারতেন। এ জিনিস হবে কি আর কোনদিন।'
চা সাজিয়ে রেখে রঞ্জন চলে গেল। চায়ের কাপ শেষ করে টিপইযের ওপর সরিয়ে রেখে ক্ষেমেশ খুব তৃপ্তির সঙ্গে মুখ মুছছিল।
'লিপটন বুঝি?'
'না খুচবো সব—এ পাতা সে পাতা মেশানো—কোথে কে বেছে আনে রঞ্জন।'
দুপুর। ফিকে নীল ছিল, এইবাবে গাঢ় নীল হয়ে পড়েছে সমস্ত আকাশ—কানায় কানায় ; সাদা মেঘগুলো আরো বেশি সাদা, ফুরফুরে বাতাস ভেসে আসছে।
দু'এক চুমুক খেযে জয়তী আর চা খাচ্ছে না দেখে ক্ষেমেশ জয়তীব পেয়ালাটা তুলে নিয়ে আকাশ রোদেব দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ভুলে যেতে লাগল সব—কোথায় সে আছে, ওদিককার সোফায় কে বসে আছে—হাতের তার ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালা জয়তীর না তার নিজের। হঠাৎ তাব মনে হল পেয়ালাব ডাঁট খুব শক্ত কবে ধবে আছে সে—পেয়ালার ভেতরে চা নেই আর। সমস্ত চা খেয়েছে সে? কখন খেল?
'আমার পাইয়োরিয়া আছে।'
'তোমার?' ক্ষেমেশ চোখ তুলে একবার তাকিয়ে বললে 'মাড়ির দাঁতে?'
'হ্যাঁ, বিয়ের পর থেকে। আমার মুখেব চা তুমি না খেলেই পারতে।'
'চাই তো খাই আমি—চেছে বেছে মুখ সম্বন্ধে খেয়াল রেখে।' হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে।
চারদিকে খুব বেশি নিঃশব্দতা। মেঝের ওপর দিয়ে মড় মড় করে এক চিলতি কাগজ বাতাসে উড়ছে-ঘুরছে—
'আমার পাইয়োরিয়া নেই—' জয়তী চোখ তাবিযে হেসে উঠে বললে। এবার সে আগেব চেযে পরিষ্কার দেখছে।
'একটা দাঁতে পোকা কুরছে। তামাকের ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে ভালো হবে—'
'খেয়ো দাঁতটা নড়ছে?'
'স্টপ করিয়ে নিলেও খাবে ক্ষেমেশ?'
'আর একটা দাঁত ধরবে।'
'আমি তো বেশি মিষ্টি খাই না। কেন পোকা হচ্ছে?'
'তা হয়।'
'স্বভাব?'
ক্ষেমেশ উঠবে ভাবছিল ; রঞ্জনকে বলে আসতে হবে—আরো চা করে দিতে। কি জিজ্ঞেস করেছে জয়তী ঠিক শুনতে পেল না ; উঠল না ; রঞ্জনকে কিছু বলবার দরকার নেই ভাবছিল ক্ষেমেশ, যা করবার

নিজেই করবে ও, চা দিতে হলে দেবে।

দাঁতের কথা হচ্ছিল, স্বভাবেরও কথা, অন্য এক আধটা কথা মনে হল ; জয়তী বললে, 'কেউ আমাকে বলেনি যে মানুষের স্বভাব ভালো—তাই শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে মানুষের—'

ক্ষেমেশ বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, ঘরের ভেতরে চোখ ফিরিয়ে টেনে বললে, 'এর পরে বলবে।'

'পরে?—কবে?—'

যে প্রশ্নের দুরকম উত্তর চলে আসছে অনেকদিন থেকে, সেইটে জিজ্ঞেস করেছে জয়তী ; কোন উত্তরটা বেশি সত্য এখনও ঠিক করেনি ক্ষেমেশ ; তবুও এটা ঠিক যে এখন কিছু হবে না, পরে হবে ; ক্ষেমেশ আস্তে আস্তে বললে, 'আমাদের মৃত্যুর পরে।'

'কটা বেজেছে?'

'চা খাবে?'

'আমাদের মৃত্যু—আমাদের এই যুগের?'

'আরো আসছে কয়েকটা যুগের—'

'ও—' জয়তী বললে, 'কিন্তু তখনও ক্ষেমেশের মত হয়তো কেউ বলবে, এখনও হল না, আরো কয়েক যুগ পরে হবে।'

'বুঝেছ তুমি।' বলে ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, চশমা খুলে নিয়ে চোখের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে নিল; 'একেই জানা বলে', বোজা চোখের ওপর আঙুলের আলতো চাপ রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'কিন্তু তবুও তুমি জ্ঞানী নও।'

'জ্ঞানীর দুঃখ সুতীর্থ অনুভব করেছে? কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে পারছি না।' বলতে বলতে চশমা পরে নিল ক্ষেমেশ।

'ওর কথা আর না বলাই ভালো।'

'কেন?'

'কেন নেই।' জয়তী বললে, 'চায়ের কথা বলেছিলে—'

চায়ের জল চাপিয়েছে হয় তো রঞ্জন।

সুতীর্থ ষ্টেশনে পৌঁছে গেছে? পূর্ববঙ্গের দিকে যাবে হয় তো ; আসামের দিকে যাবে, নাকি ঢাকার দিকে, না খুলনা রূপসা পেরিয়ে—

'মৈত্রেয়ীর কথা মনে হচ্ছে আমার—' জয়তী বললে, 'তোমার কাছে উপনিষদ আছে?'

'না। চায়ে মাঝে মাঝে বেশি মিষ্টি দেয় রঞ্জন। কিন্তু সব সময়ই দেখছি তোমার মিষ্টির হাত ঠিক থাকে—'

'কেউ কেউ বিনে চিনিতে চা খায়—'

'আমি নেবুর রস দিয়ে চা খাচ্ছি মাঝে মাঝে—বেশ ভালো লাগছে।'

'নেবুর রস দিয়ে কাঁচা চা? চিনি নেই?'

'জয়তী কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে আস্তে আস্তে বললে, 'সুভাষ বোস কি সত্যিই নেই আর ক্ষেমেশ?'

'হ্যাঁ, কালো রঙের চা ; চিনি কম ; মৈত্রেয়ীর কথা কেন মনে পড়ল তোমার জয়তী?'

'নেবুর রস দিয়ে চা বানিয়ে দেখিনি কোনদিন আমি।'

'কিছুই না—শুধু নেবুর রস দিয়ে চা বানানোভ'

'সহজ—কিন্তু নেবুর রস উনিশ—বিশে নষ্ট হয়ে যেতে পারে চা।'

'তোমাব হাতে চায়ের চিনির কোন উনিশ-বিশ হয় না তো জয়তী ; কেন নেবুর রসের হবে?'

'কটা বেজেছে ক্ষেমেশ?'

কিন্তু ক্ষেমেশ ঘড়ি না দেখে দূরে পাঁচিলের শ্যাওলার দিকে তাকিয়েছিল ; সবুজ মখমলের মত পুরু হয়ে উঠেছে ; রোদ এসে পড়েছে।

'এটা কার চুরুট?'

'সুতীর্থ ফেলে গেছে—'

ক্ষেমেশ বললে, 'আমি জ্বালিয়ে নিচ্ছি!'

সূচীপত্রে যান

ক্ষেমেশ চুরুট খাচ্ছিল নিঃশব্দে। কোনো কথা বলবার ছিল না জয়তীর।

'চুরুটের মুখে সাদা ছাই জমেছে সেগুলো—'

'সেগুলো? ফেলে দেব না আমি—যদি নিজের থেকে পড়ে না যায়।'

'নিজের থেকেই পড়ে যাবে—কিন্তু অনেকক্ষণ পরে পরে।'

'ও'—ক্ষেমেশ বললে।

'ব্যাঙ্কে যাবার সময় আছে?'

'না—' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে। 'ব্যাঙ্কে যেতে তুমি জয়তী?'

'দরকার ছিল—'

'আগে বলা উচিত ছিল তোমার।'

'কেন আজই উঠে যাবে বুঝি সব, কোনো ব্যাঙ্ক থাকবে না আর কাল?'

ক্ষেমেশ চশমা খুলে মুছছিল, মুছতে মুছতে বললে, 'যারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তাদের অদল-বদল হবে খানিকটা ; কিন্তু মানুষের হাতে টাকার কোনো মানহানি হবে না কোনদিন। জান তুমি। খুব জ্ঞানের কথা আর শান্তির কথা এইসব।'

চশমা মুছে ঠিক করেছে, পরল ক্ষেমেশ।

'আমিও তাই বলছিলাম ক্ষেমেশ। বেশ শান্তিতে আছি। আজো আমাদের চীনের মত অবস্থা হয়নি।'

'প্রথমে দেশ স্বাধীন হবে।'

'তারপরে?'

'চীনের মত অবস্থা? ভাবছি আমি তাই। কিন্তু কি হবে চীনের মতন হলে? যারা মানুষকে মেরেছে সেই সব মানুষ শায়েস্তা হবে হয় তো। কিন্তু টাকা মার খাবে না কোনোদিন। এই দেবতাই ব্যাধি। মানুষের বিদ্যা বাড়ছে কিন্তু জ্ঞান নেই।'

'কিন্তু প্রতিটি শতকই আশা করে যে এইভাবে জ্ঞান হবে। চীন কি আশা করছে না? তোমার চুরুট নিবে গেছে ক্ষেমেশ—' কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সত্যি একটা আশ্চর্য উপলক্ষ্যের মত। গিয়েছে। মরুভূমির বালিতে যে ঘাস গজায় না এই থাক টিপাইয়ের ওপর—এখন জ্বালাব না আর।'

'আমরা আশা করছি? সুতীর্থ নিজে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সত্যি একটা আশ্চর্য উপলক্ষ্যের মত মরুভূমির বালিতে যে ঘাস গজায় না এই জ্ঞান নিয়ে ঘাস গজাতে গেল—' জয়তী বললে, 'আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী তাই সুতীর্থ আমরা দু'একদিনের হিসেবে জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখি ও হাজার বছরের হিসেবে।'

'খানিকটা চাপা আগুন রয়েছে চুরুটের ভেতর, এখুনি নিবে যাবে।' চুরুট হাতে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে।

'জ্বালাবে?'

'তুমি উঠলে—?'

'হ্যাঁ, এইবারে—'

জয়তী আস্তে অত্রস্তভাবে বললে, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?' ক্ষেমেশ বললে, 'বিরূপাক্ষের ওখানে নয় ; সুতীর্থের কোনো ঠিকানা নেই—'

'না। বাবার ওখানেও যাব না আর ; আমি নিজে কিছু কাজ করব, নিজে যা ভালো বুঝি সেই হিসেবে।'

'কি কাজ?'

'এই যে তোমার চুরুট—'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—'

'দেশলাই পাচ্ছ না ক্ষেমেশ—'

'কাজ নিয়ে কলকাতায় থাকবে?'

'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে গ্রামে যাবার দরকার নেই। আমার কাজ অন্যরকম ; একজন মানুষের নিয়ে শুধু, কিন্তু তবুও সঙ্গি করতে সময় লাগবে—'

সূচীপত্রে যান

'ও—' জয়তীর হাত থেকে দেশলাই তুলে নিল ক্ষেমেশ।

'বিরূপাক্ষের বাড়ি টাকাকড়ি সব ফিরিবে দেব। আজই ফিরিয়ে দিলে ভালো হত—কিন্তু কোনদিন দিতে পারব কিনা সেই নিয়েই সংগ্রাম—একজন মানুষের ; সাহায্য করবার কেউ নেই ; এতে সমাজের কোনো উপকার হবে না, পৃথিবীর তো দূরের কথা। কিন্তু আমার মনে হয় আমার নিজের উপকার হবে। মানুষের জীবনের ওপর এখন মানুষদের নানারকম দাবি ; কিন্তু আমি টাকাওলা মানুষ বলে এই একটা পরীক্ষা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবার সুযোগ আমার আছে। তাড়াতাড়ি এর একটা রফা হতে পারলেই ভালো হয় ; অন্য কাজ করবার অবসর পাওয়া যাবে। কিন্তু জানি না কতদূর কি হবে। হয় তো সত্তর বছর টাকাকড়ি আঁকড়ে থাকতে পারি—হয়তো সত্তর দিন'—জয়তীর চোখ অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছে এখন। 'দেশলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে ক্ষেমেশ—'

'সুতীর্থের সঙ্গে এই সব কথা হয়েছিল বুঝি তোমার?'

'ক্ষেমেশ বললে ; মেঝের ওপর দেশলাইটার দিকে তাকাল সে, তুলল না।

'চীন আমাদের চেয়ে বেশি জেগে উঠেছে।' বলে বাঁ-হাতি জানালার শার্সিগুলোর দিকে তাকাল ক্ষেমেশ। রোদ ছিল ওখানে, নেই এখন আর।

'তা হতে পারে—'

'সমস্ত এশিয়াই জেগে উঠবে।'

'কিন্তু কিরকমভাবে? কি হিসেবে?—'

'সেটা ভারতবর্ষ স্থির করবে? ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে 'এই বেলা বোধ হয় ভারতবর্ষেরই স্থির কবা উচিত। কিন্তু এ সব আন্দোলন থেকে আমি ঢের দূরে সরে রয়েছি।'

'আন্দোলনও এখনও ঢের দূরে। চীন আজকাল দুঃখের দেশ। অবশ্য পুরস্কার পাবে শীগগিরই—আমার মনে হয়। কিন্তু রাশিয়ার হাতে পুরস্কার না নিলেই ভালো হত—' জয়তী বললে।

একটু থেমে বললে, 'মানুষের খাঁটি মঙ্গল মানুষেব হাতে মানুষ যদি নেয—আমার বলবাব কিছু নেই অবশ্য তাহলে—'

'চীনের নিজেরও 'আত্মা আছে।' জয়তী বললে।

'ছিল একদিন।'

'আমাদেরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৃথিবী এক হয়ে যাবে হয তো।'

জয়তী বললে, 'চীন রাশিয়ার কাছ থেকে কি নিচ্ছে—বাশিযা ভারতের কাছ থেকে কোনো জিনিস—তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা থাকবে না তখন। কিন্তু খুব দেবিতে হবে এ সব জিনিস—যদি হয়। আমাদের মাথা ব্যথা সত্যিই রাশিয়া বা আমেরিকা বা অন্য কেউ—কে আমাদেব বিপদগ্রস্ত করবে তাই নিয়ে। কেমন একটা অন্ধকারের যুগে আছি আমরা—'

'রাশিয়া আলো পেয়েছে, চীন পাচ্ছে তার কাছে। আমেরিকা নিজেই আলোকিত।' বলে, চশমাটা খুলে ফেলল ক্ষেমেশ; চশমার পাথরের ওপর রোদ ঝলসাচ্ছে—তাকিয়ে দেখছিল।

'ভারতবর্ষও'—জয়তী হেসে বললে, 'অন্ধকারটা এইরকম।'

মেঝের থেকে কুড়িয়ে ক্ষেমেশের হাতে দেশলাই তুলে দিযে জয়তী বললে, 'এটা খেযো, চুরুট; এক বাক্স ভালো কিনে নিও তুমি।'

দেশলাই নেবার সময় জয়তীর হাতটা নিজের হাতের ভেতর আটকে নিবিড়ভাবে চেপে দিল ক্ষেমেশ।

জয়তী ঘনিয়ে এসে ক্ষেমেশের হাত তুলে নিয়ে চাপ দিয়ে গেল।

চুরুট জ্বালাল ক্ষেমেশ।

জয়তী চলে গেল।

মাল্যবান

সারাদিন মাল্যবানের মনেও ছিল না; কিন্তু রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে অনেক কথার মধ্যে মনে হল বেয়াল্লিশ বছর আগে ঠিক এইদিনেই সে জন্মেছিল—বিশে অঘ্রাণ আজ।

জীবনের বেয়াল্লিশটা বছর তা হলে চলে গেল।

রাত প্রায় একটা। কলকাতার শহরে বেশ শীত, খেয়ে-দেয়ে কম্বলের নীচে গিয়েছে সে প্রায় গোটা দশেকের সময়; এতক্ষণে ঘুম আসা উচিত ছিল, কিন্তু এল না; মাঝে-মাঝে কিছুতেই চোখে ঘুম আসে না। কলেজ স্ট্রিটের বড় রাস্তার পাশেই মাল্যবানের এই দোতলা ভাড়াটে বাড়িটুকু; বাড়িটা দেখতে মন্দ নয়—কিন্তু খুব বড়-সড় নয়—পরিসর নেহাত কমও নয়। ওপরে চারটে ঘর আছে—তিনটে ঘরেই অন্য ভাড়াটে পরিবার থাকে—চিক দিয়ে ঘেরাও করে নিজেদের জন্যে তারা একটা আলাদা ব্লক তৈরি করে নিয়েছে—নিজেদের নিয়েই তারা স্বয়ংতুষ্ট—এ দিককার খবর বড় একটা রাখতে যায় না।

ওপরের বাকি ঘরটি মাল্যবানদের; স্ত্রী উৎপলা ঘরটিকে গুছিয়ে এমন সুন্দর করে রেখেছে যে দেখলে ভাল লাগে। ধবধবে দেওয়ালে গোটা কয়েক ছবি টাঙানো; একটা ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট; প্রৌঢ়ের, উৎপলার বাবার হয়ত, তার মা-র একটা অয়েলপেণ্টিং; মাল্যবানের শ্বশুর পরিবারের আরো কয়েকটি লোকের ফটোগ্রাফ—কয়েকটা হাতে-আঁকা ছবি (কে এঁকেছে?)—ঘরের ভেতর একটা পালিশ মেহগনি কাঠের খাট, খাটের পুরু গদির ওপর তোশকে বকপালকের মতো শাদা বিছানার চাদর সব সময়েই ছড়িয়ে আছে। দুজন মানুষ এই বিছানায় শোয়; উৎপলা (তাকে 'পলা' ডাকে তার সমবয়সীরা আর বড়রা প্রায় সকলেই) আর তার মেয়ে মনু। মেয়েটির বয়স প্রায় নয় বছর। মাল্যবান ও উৎপলার এই বার বছরের দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে এই একটি মেয়েই হয়েছে। কোনোদিন আর-কিছু হবে না যে তাও ঠিক। দোতলার এই ঘরটা বেশ বড়, মেঝে সব সময়েই ঝরঝরে, এক টুকরো কাগজ, ফিতে, সেফটি-পিন, পাউডারের গুঁড়ি পড়ে থাকে না কখনো; ঘরের ভেতর টেবিল চেয়ার সোফা কৌচ রয়েছে কতকগুলো; সবই বেশ পরিপাটি নয়, ছিঁড়ে গেছে, ময়লা হয়ে গেছে, কিন্তু উৎপলার যত্নের গুণে খারাপ দেখাচ্ছে না। এক কোণে একটা অর্গ্যান রয়েছে; তারই পাশে একটা সেতার আর একটা এস্রাজ; উৎপলার আলোর জিনিস; গাইতে ভালবাসে, বাজাবারও সাধ খুব, প্রায় গুনগুন করে সব সর্কর্মতার ভেতর কোনো-না-কোনো একটা সুর ভাঁজছে, মাঝে-মাঝে কীর্তনের সুরও; এক-এক সময়, বিশেষত বাথরুমে ধারাস্নানের সময়, বেশ জোরে গান গায় পলা। গান-টান মাল্যবান কিছুই জানে না, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত খুব সহিষ্ণুভাবে স্ত্রীর ষড়জ ঋষভ গান্ধার-টান্ধার সহ্য করে যাওয়াই তার অভ্যাস, না হলে তা হয়ে উঠবে দুষ্ট সরস্বতী, তখন রক্ষা থাকবে না আর। কিন্তু তবুও বড় একঘেয়ে লাগে তার, স্ত্রীর গান বলেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত গান-বাজনার ওপর অত্যন্ত হতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে তার মন; কী করবে যে সে কিছুই ঠিক পায় না। মুখ চুন করবে, সঙ্গে-সঙ্গেই কান ঝাঁ ঝাঁ করবে, চোখ জ্বলে উঠবে উৎপলার তাকে থামতে বললে, গান থামাতে বললে। এমনিতেই বৌয়ের বিশেষ স্নেহশ্রদ্ধার মানুষ নিজেকে সে করে তুলতে পারে নি। মাল্যবানের স্বভাব ফটফটে ফিটকিরির মতন; সে নিজের মনে থাকা মানুষ; মানুষকে ক্ষমা করে যাওয়া অভ্যাস, অযথা হৈ রৈ হিংসার ছোব ভাল লাগে না তার। শান্তি ভালবাসে; নিজের সুখ-সুবিধে অনকেখানি ছেড়ে দিয়েও। গানের সম্পর্কে সে স্ত্রীকে কোনোদিন কিছু বলে না বড়-একটা; বেশি ঝালাপালা বোধ করলে অবিশ্যি 'গান খুব ভাল করে শিখতে হয়,' 'অনেকে খুব মন খুলে গায়, ভাল লাগে; মন খুলেছে বলে ভাল লাগে—' এ-রকম এক-আধটা ইশারায় অনুযোগ জানায় মাল্যবান। এ-ধরনের ইঙ্গিতের জন্যে স্ত্রীর কাছ থেকে সে সত্যিই শাস্তি পায়; কাজেই পারতপক্ষে স্ত্রীকে কিছুই বড় একটা বলতে যায় না। নিজে মাল্যবান গানমুজরো না ভালবাসে তা নয়। যখন সে কলকাতার চাকরিতে

বাঁধা পড়ে নি, পাড়াগাঁয়ে ছিল, সেই ছোটবেলা এক-এক দিন শীতের শেষ রাতে বাউলের গান শুনতে তার খুব ভাল লাগত; কোনো দূর হিজল বনের ওপার থেকে অন্ধকারের মধ্যে সে-সুর ভেসে এসে তার কিশোর আঁতে ব্যথা দিয়ে যেত। কত দিন—যখন দিন শেষ হয়—দাণ্ডাগুলি খেলে যখন সে কাঁচা-কাঁচা কালিজিরা ধানশালি রূপশালির খেতের আলপথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে, ভাটিয়াল গান শুনে মনটা তার কেমন করে উঠত যেন; সারা দিনের সমস্ত কথা কাজ অবসন্ন শোল-বোয়ালের মত দিঘির অতলে তলিয়ে যেত যেন, ঝির-ঝির ফটিক-ফটিক ঝিক-ঝিক ঝর-ঝর করে উঠত ওপরের জল; যে-জল গানের মত, যে-গান জলের মত চারদিককার খেজুরছড়ি, নারকোলঝিরঝিরি ঝাউয়ের শনশনানি ছায়া অন্ধকার একটি তারার ভেতর; এক কিনারে চুপ করে বসে থাকত সে। বাপ-মাঝে ফাঁকি দিয়ে কত রাত সে যাত্রা শুনতে গেছে—তারপর সেই সব গানের সুর এমন পেয়ে বসেছে তাকে যে পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করতে-করতে এক-একবার টেবিলের ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ নিঝঝুম হয়ে পড়ে থাকত; কোথাও মেঘ নেই, বৈশাখ-আকাশের বিদ্যুৎচমকানির মত ভরে যেত মন এ-কানা থেকে সে-কানায়; বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠবার পূর্বাভাসের মত; কিন্তু তার আগেই সে মাথা খাড়া করে অন্য পৃথিবীতে চলে যেতে চেষ্টা করত, ফোঁপাতে যেতন না। মণিভূপকণ্ঠ চক্রবর্তী বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন—সত্যিই কি তাঁর নাম মণিভূপকণ্ঠ?—কী মানে এই নামের?—কিন্তু তবুও সকলেই তো তাঁকে এই নামে ডাকত; মণিভূপের গানের কথা মনে পড়ে; শমনহরা বোস—ঝুনু—ঝুনু বোস-চৌধুরাণী নামেই বেশি খ্যাত—তার গান; সে-সব দিন কোথায় গেছে যে আজ! পাড়ায়-পাড়ায় গানের বৈঠকের লোভে পড়াশুনো ফেলে যেমনি সে আসরের এক কিনারে গিয়ে বসেছে, অমনি কাকা তাকে কান টেনে-হিঁচড়ে বাসায় নিয়ে গেছেন; তবুও তার মায়ের সঙ্গে ষাট করে ফের আবার পালিয়ে যেতে ইতস্তত করে নি সে।

পলাকে এ সব কথা কোনোদিন বলে নি মাল্যবান।

ওপরের ঘরটায় পলা (উৎপলা) আর মনু শোয়। একতলার ঘরে মাল্যবানের বিছানা বৈঠক—সমস্ত। এখানেই সে থাকে, কথা বলে, কাজ করে, বই পড়ে, লেখে, শোয়, ঘুমোয়। নিজে ইচ্ছা করে স্ত্রীর কাছ থেকে এ-রকম ভাবে বিচ্ছিন্ন হয় নি সে। দোতলার ঐ একটা ঘরেই পলার ভাল করে কুলিয়ে ওঠে না তেমন, কাজেই সে স্বামীকে নীচের ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করতে বলেছে। অথচ দোতলার ঘরটা একতলার ঘরের চেয়ে ঢের বড়—আলো-বাতাস, রৌদ্র, নীল আকাশের আনাচ-কানাচ-কিনারা, মূল আকাশেরও বড় নীলিমার বেশ মুখোমুখি প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে; একতলাব পাশেই প্রকাণ্ড ছাদের একটা আশ্চর্য প্রসৃতি রয়েছে, সিঁড়িটার দু ধাপ মাত্র গেলেই একতলার সমস্ত ছাদটা, আকাশ রোদ, কলকাতার শহরটাই তোমার; যদি ভেবে নিতে পারো, তা হলে পৃথিবীর নগরনাগরের ইতিহাস বাবণাবত বেবিলনও তোমাব চোখে ফুটে উঠেছে।

দুটি প্রাণী—ওপরে নীচে এই দুটি ঘরে আলাদা রয়েছে। মাল্যবানের বিয়ে হয়েছে প্রায় বার বছর হল। বিযেব পর দু-তিন বছর পলা ঘুরেফিরে বাপের বাড়িতেই প্রায়ই থাকত; তাব পব শ্বশুরবাড়িতে বছরখানেক থাকে, মনু হয়, মনুর ছমাস বয়েসের সময়েই বাপের বাড়ি চলে যায় আবার, সেখানে বাবার মৃত্যু পর্যন্ত বছর-দুই আরো কাটিয়ে এই বছর-সাতেক ধরে কলকাতায় স্বামীর কাছেই রয়েছে।

রাত একটা। ডান কাত ফিরে মাল্যবান একটু ঘুমুতে চেষ্টা করল; নানা রকম কথা মনে হয়—ঘুম দূরে সরে থাকে। তারপর আস্তে-আস্তে বাঁ কাত ফিরে মনে হল এইবারে ঘুম এলে বেশ ভাল লাগবে। কিন্তু ঘড়িতে দেড়টা বাজল, তারপরে দুটো, ঘুম এল না; এক-একটা রাত এ-রকম হয়।

কম্বলটা ঠোঁট অব্দি টেনে নিয়ে চোখ বুজে আবার পাশ ফেরা গেল। কলকাতার রাস্তার নানা রকম শব্দ কানে আসে; রাত তো দুটো, শীতও খুব হুজ্জুতে, কিন্তু কাদের ফিটন যেন বাস্তার ওপর দিয়ে খটখট করে চলেছে; গাড়ির ভেতর মেয়েদের হাসি, বুড়ো মানুষের মোটা গলা, ছোটদের চেঁচামেচি। মাল্যবান কম্বলের নীচে ফলি-কাত হয়ে থাকতে-থাকতে ভাবছিল; তাই তো, কোথায় যাচ্ছ তোমরা মুনশিরা, ফিরছ কোথে কে? ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনেক দূর অব্দি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, এমন সময় এঞ্জিনের বিকট তড়পানিতে চারদিকের সমস্ত শব্দ গিলে খেল। এল, চলে গেল একটা লরি। মাল্যবানের মনে হল লরির এই লবেজান আওয়াজেরও একটা সার্থকতা আছে; যেমন বালির থেকে তেল বার করতে পারা যায়, সে-রকম; একে যদি চাকা-টায়ারের শব্দ না মনে করে বাদল রাতের ঝমঝম আওয়াজ ভেবে নেওয়া যায় তবে বেশ লাগে লরির—খানিকটা চুনবালি খসে পড়ল চাতালের থেকে মাল্যবানের নাকে-মুখে; বাড়িটার ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে, বাপ রে, একেবারে নিপ্পনের টাইডাল ওযেভের মত ছুটে গেছে

সূচীপত্রে যান

লরিটা: নাকমুখ থেকে চুনকাম ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে মাল্যবান ভাবছিল। রাস্তা দিয়ে কাহার-মাহাতোরা একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। কার যেন প্রাইভেট মোটর মাল্যবানদের বাড়ির কাছেই এসে থামল—গাড়িটা কী-রকম বিগড়ে গেছে যেন; দু-চারজন মিস্ত্রি সেটা মেরামতের চেষ্টায় আছে; মবিল-অয়েলের গন্ধ মাল্যবানের নাকে ঢুকল, মন্দ লাগল না তার; একটা ষাঁড় ফুটপাথ দিয়ে যেতে-যেতে ঘঁগ-ঘড়ম করে উঠল এবার; সামনেই কাদের যেন দোতলার থেকে একটা বড় অস্পষ্ট কান্না ও ঝগড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, মাল্যবানের ঘরের পাশেই ড্রেনের কাছে একটা নেড়ি কুকুব ঘুর-ঘুর করে রাবিশের ভেতর থাবা নখ চালিয়ে বালি-ঘড়ির বাজনা বাজিয়ে চলেছে যেন অনেকক্ষণ থেকে; কী চায় সে? কী পাবে? খানিকটা দূরে একটা বাড়ির ভেতরমহলে—হয়ত কলতলায়, ভাঁড়ার ঘরে, গুদোমে দুটো বেড়াল মরিয়া হয়ে ঝগড়া করছে অনেকক্ষণ ধরে; তাদের একটি নর ও একটি মাদি নিশ্চয়ই; এই শীত রাতে এই আশ্চর্য শীতে নিদারুণ কপট ঝগড়ার আড়ালে হলো আর মেনিব এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস কাম নিয়ে জীবনের যৌনঋতুর, যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে—মাল্যবান দাঁত ফাঁক করে ভাবছিল, বেড়ালেরা লুটোপুটি ঝুটোপুটি কান্নাকাটি করে; বেশি বয়সে বিয়ে করেছিল একজন সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো প্রফেসরকে ঠিক এই রকমই করতে দেখেছিল মাল্যবান প্রায় বছর-সাতেক আগে—সন্ধ্যারাতেই; গলাখাকারি না দিয়ে প্রফেসরমশাই-এর ঘরে রবারসোল জুতো-পায়ে ঢুকে পড়েছিল মাল্যবান; কিন্তু এ-রকম মইমারণ হইমারণ ব্যাপার যে হবে তা তো ধাবণা কবতে পারে নি সে; কিন্তু সেই থেকে উপলব্ধি করছে মাল্যবান যে সমস্ত ইতর প্রাণীকে বিশ্লেষণ করে যে-মহৎ সংশ্লেষে উপস্থিত হওয়া যায় তারই আশ্চর্য সন্তাপ, উচ্ছ্বাস ও পুঙ্খানুপঙ্খ ইতবতাকে ভাড়িযে চারিযে জ্বালিয়ে নাচিযেই মানুষ তো হযেছে মানুষ। ভাবতে-ভাবতে অবসন্ন হয়ে মাল্যবান কাত হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। ঘড়িতে বাজল আড়াইটে, কিন্তু ঘুম তো এল না।

আজ ছিল তার জন্মদিনের তারিখ। বেযাল্লিশ বছব আগে—এমনি অঘ্রাণ মাসের বিশ তারিখে কলকাতার থেকে প্রায দেড়শ মাইল দূবে বাংলাদেশেব একটা পাড়াগাঁয়ে সে জন্মেছিল। সেখানে খেজুরের জাঙ্গাল বেশি, তালের বন কম, সুপুরির গন্ধ হয়তো সবচেয়ে বেশি। এমনি শীতে খেজুবগাছেব মাথা চেঁছে একটা নল বসিয়ে গলায় হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া হয, সমস্ত শীতেব বাতে ফোঁটা-ফোঁটা রস ঝবতে থাকে, মাছি-মৌমাছি ছোট ছোট রেতো প্রজাপতি, বড়গুলোও, সেই হাঁড়ির রসে সাঁতার কাটছে, পাখনা নাড়ছে, মরে আছে; কুযাশানির্জন ঠাণ্ডানিবিড় শেষে বাতে দেখা যায এই সব। এমনি শীতেব বাতে ধানেব খেত শূন্য হযে পড়ে আছে—হলদে নাড়ার গ্যাঁজে সমস্ত মাঠ রযেছে ছেযে, শীত পেযে দু-একটা বাঘ নেমে আসে; এমনি উদাস বাতে ফেউগুলো অন্তত খুব হাঁকড়ায; শ্মাশানে 'হবিবোল' যেন কোন দূর কুয়াশাপুরুষদেব রলরোল বলে মনে হয; লক্ষ্মীপেঁচা ডাকতে থাকে, ঘুম ভেঙে বাইবে গিযে দাঁড়ালে দেখা যায় শীতেব কুযাশার সে কোন অন্তিম পোচড়েব ফাঁকে-ফাঁকে বৃহস্পতি কালপুরুষ অভিজিৎ সিরিযাস যেন লণ্ঠন হাতে কবে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে কোন সুদূরযানেব পথে চলেছে, কেমন একটা আশ্চর্য দূর পরলোকের নিক্বণ শোনা যায যেন। কোনোদিন কুশায়া কম—শাদা মেঘ আছে—একফালি গড়ানে মেঘের পাশে—নিজের কেমন যেন একটা বৃহৎ আলোর শবীর নিযে থেমে আছে চাঁদ। পঁচিশ সাতাশ বছব বযস পর্যন্ত পাড়াগাঁয় সে ফিরে ফিবে যেত, এই সব তাব দেখবার শোনবার জিনিস ছিল, কিন্তু তাব পর পনেরটা বছর কেটে গেল, এই শহরই হল তার আস্তানা, একটা কাঁচপোকা, মৌমাছি শামকল মৌচুষকি জোনাকির কথা মনেও পড়ে না তার, আকাশের নক্ষত্রগুঁড়িগুলোর দিকে ফিরেও তাকায না সে।

ভাবতে-ভাবতে আকাশেব রুপালি সব্জালি আগুনগুঁড়িগুলোর কথা ভুলে গেল সে। পনের বছব চাকরিব পব গত মাসে আড়াইশ টাকা মাইনে হয়েছে, এব আগে মাইনে ছিল একশ পঁচানব্বুই; প্রায পাঁচ বছর ধরে একশ পঁচানব্বুই টাকাই মাইনে ছিল; তার আগে মাইনেব ব্যাপারে বড় গরমিল ছিল। শাহেবদেব অফিস বটে, কিন্তু এক সময অফিসেব অবস্থা এত খাবাপ ছিল যে, যে-নামমাত্র মাইনেয মাল্যবান ঢুকেছিল অনেক বছর পর্যন্ত তার দুর্ভোগ তাকে সহ্য করতে হযেছে। এই সময কোনো-কোনো কেরানি অফিস ছেড়ে চলে গিযেছিল, কিন্তু মাল্যবান যায নি; বরং যত্ন কবে এই অফিসেই খেটেছে সে; আজ রাতে তার মনে হয তার অনেক দিনের খিদমদগারির পুবস্কার সে পেয়েছে।

খিদমদগারি? কী আর বলবে সে। পূর্বপুরুষেবা তাকে যেমন শক্তি সুযোগ দিযেছেন তাতে দেশের, মানুষের, আইনেব, চিকিৎসাবিজ্ঞানেব জন্যে, এমন-কি পড়াশোনাযও নিজেকে উৎসর্গ করবার কোনো পথ তার নেই। সে-সব পথে যদি যেত কেউই তাকে মানত না; মানত কি? লক্ষ্য উঁচু রাখলেও যে নীচে পড়ে ল্যাংচায় কে মানে তাকে? কাজেই এই পনেরটি বছর বসে ধীরে-ধীবে বটমলি বিগল্যান্ড ব্রাদার্সের

সূচীপত্রে যান

অফিসের জন্যে খেটেছে; কী করবে সে আর, কী করতে পারে?

বি-এ পাশ করে আইন পড়েছিল, কিন্তু তখনই এই অফিসের চাকরিটা পায়; চাকরিটা নিল সে।

মাঝে-মাঝে মনটা ঝুমুর দিয়ে ওঠে বটে; উকিল হলে মন্দ হত না, হযত, বেশ স্বাধীনভাবে থাকতে পারত, কারু তক্কাই রাখতে হত না, ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারলে মানুষের কাছ থেকে ঢের মর্যাদাও পাওয়া যেত। মনে হয় এক-এক সময়ে এই সব। কিন্তু মফস্বলের বার লাইব্রেরিগুলোর দিকে তাকিযে.... কলকাতার বড়-বড় এম-এল, ডি-এল, কী করে টাকা রোজগারের ব্যাপারে জেলা শহরের কমিটিপাশ পি-এল এর কাছে হেরে যাচ্ছে কোথাও কোথাও—দেখে-শুনে মনে-মনে মাঝে-মাঝে হাসে—অহঙ্কারে নয়, আত্মসৌকর্যে নয়, কিন্তু নিজের ক্ষমতার খর্বতা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করে। মাল্যবান বুঝতে পেরেছে যে-কাজ সে করছে এর চেয়ে খুব বেশি ভাল কিছু কোনাদিনই সে করতে পারত না; হযত নিমকির দারোগা হত কিংবা সুপারিনটেন্ডেন্ট, গভর্নমেন্টের চাকরির ছকে পড়ে গেলে একেবারে সবচেয়ে বড় কেরানিশাহেবও যে সে না হতে পাবত তা নয়; টাকাব দিক দিযে খানিকটা লাভ হত বটে, টাকা সে চাযও, খুবই চায়, কিন্তু আরো অনেক জিনিস চেযেছিল সে; বিদ্যা সবচেযে আগে। অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করবার সাধ ছিল, অনেক জিনিস শিখতে ইচ্ছা, বুঝতে ইচ্ছা; নিজেব মনটা যে নেহাত কেরানির ডেস্কে-আঁটা নিখেট, নিরেস কিছু নয়, মানুষকে সেটা বোঝাবার ইচ্ছা। নানা বকম ইচ্ছা—মনে অনেক রকম ভাল সুশৃঙ্খল কাঠকাঠামোর কথা জেগে ওঠে সে তবে, মানুষকে সে তা জানাতে চায; এক-এক সময় মনে হয় অফিসের কাজ ছেড়ে নিজের জীবনটাকে সে কোনো মহৎ কাজেব ফেনশীর্ষে—ধবো কোনো উত্তেজনাময কর্মীসংঘের মধ্যে নিয়ে ফেলুক; জীবনটাকে এ বকম অফিসে চেপে সাপটে মেবে লাভ কী? টাকা—পারিবারিক সচ্ছলতা—এগুলোকে এমন ঘাসের বিচি, ধুন্দলের বিচি, রামকাপাসের আঁটি বলে মনে হয এক-এক সময। স্টিক হাতে নিযে গোলদিঘিতে ঘুবতে-ঘুরতে মনে হয়, একটা বড় বাজপেযে সভায বেশ মার্জিত ভঙ্গিতে আবেগেব বিবাট অকূলপাথারে নিজেকে আশ্চর্যভাবে নিযন্ত্রিত কবে বক্তৃতা দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার; পলিটিকসে বাঙালিরা আজকাল গুজবাটি মাবাঠি মাদ্রাজি ইউ-পিঅলাদেব কাছে পদে-পদে ভুডড়ু খেযে ফিরছে—ভাবতে-ভাবতে বক্ত কেমন যেন হযে ওঠে তাব, বাঙালিব মান-সম্মান ফিরিযে আনবার জন্যে বড় নযাল আগুনের মত দাউ-দাউ কবে উঠতে ইচ্ছা কবে তাব—বিপ্লবেব থেকে বিপ্লবে—ফ্রান্স, রুশ, স্পেন, চীন সমস্ত বিপ্লবের—ইযে—স্তনাগ্রচূড়ায নতুন দুগ্ধেব উল্লাসে নবীন পৃথিবীব জন্যে। ভাবতে-ভাবতে বাঙালিব কথা ভুলে যায সে। অনেকক্ষণ পবে মাল্যবানেব মাথা ঠাণ্ডা হয; গোলদিঘির একটা বেঞ্চিতে ধীবে-ধীবে চুপ করে গিযে বসে সে তখন; একটা বিড়ি জ্বালায। খিদে পেযে ওঠে, বাড়ির দিকে রওনা হয।

একটা কথা ঠিক; মাটির নীচে গেঁড় আর কন্দ খাওযা শুযোরেব মত (আপার গ্রেডের) অফিসগিরিই তাব সব নয়; এক জোড়া বেশমি স্টকিঙ, বার্নিশ করা নিউ কাট, তসবেব কোট, পরিপাটি টেরি, সিগারেট কেস ও ফুটবল গ্রাউণ্ডেব বেঞ্চি দিযে নিজেকে চোখ ঠার দিতে সে ভালবাসে না। এই সবেব চেযে সে আলাদা।

খবরের কাগজ সে রোজই পড়ে; কিন্তু স্পোর্টস রেস রাহাজানিব দিকে একটু বেশি ঝুঁকে পড়ে নয়; কোথাকাব অন্তঃপুরে, আদালতে কী কবম হাঁড়ি ভাঙল, বাযোস্কোপে কী থিযেটারে কী আছে—এ সব সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ বা আস্বাদ এ বেযাল্লিশ বছবের মধ্যে এখনও সে তৈরি কবে নিতে পাবেনি। খবরের কাগজে তবুও সে আশাতীত প্রযোজনীয নানা জিনিস খুঁজে পায়; অফিসেব থেকে ফিরে চুরুট জ্বালিযে অনেকক্ষণ সে খবরের কাগজ নিযে বসে থাকে; একে-একে মনেব ভেতর নানা রকম সাধ-সংকল্প খেলা কবে যায়; ভেঙে চুবমার হয। তারপর অবসন্ন হযে পেপারটা সে বেখে দেয; মনে থাকে না বিশেষ কিছু; কোনো কিছু সত্যিই শিখেছে বলে উপলব্ধি করতে পারে না। বিছানায শুযে-শুযে ভাবে নিজে সে অবিশ্যি পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন হতে পারবে না—কোনোদিনও না—কোনো প্রক্রিযাযও না—কিন্তু পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন বাঙালির মধ্যে আজকালই যদি না জন্মায তা হলে এ জাতের ভরসা খুব কম। উনিশশ উনত্রিশ সালের একটা রাত্তির; শুযে-শুযে এই সব কথা ভাবছিল যখন মাল্যবান; সেই জন্যেই সে এই রকম ভাবছিল।

ঘড়িতে প্রায় সাড়ে তিনেট বাজল; মাল্যবান দেখল বিছনানায চিত কাত হযে ভেবেই চলেছে ক্রমাগত; এত ভাবায় হৃদয শুকিযে যায শুধু, কোনো তীরতট পাওযা যায না, আসে না চোখে এক পলক ঘুম। আস্তে-আস্তে সে উঠে বসল; বিছানায ছারপোকা আছে—কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ছারপোকার জন্যে নয়; এর চেয়ে ঢের বেশি আরশোলা, ইদুর, মশা, পিসুর ঘাঁটিতে লম্বা নির্বিবাদ চৌকশ ঘুমে কত রাত কাটিয়ে দিযেছে। রাস্তার একটা গ্যাসল্যাম্পের আলো ঘরে ছিটকে পড়েছিল খানিকটা; স্লিপার খুঁজে নেওয়া

গেল, পায়ে দিয়ে লাল-নীল-চেককাটা কম্বলে সমস্ত শরীরটা মুড়ে সে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে উঠল—নিঃশব্দে খানিকটা এগিয়ে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল, নেটের মশারির ভেতর মনু ও পলা কেমন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমুচ্ছে—কেমন শান্ত, প্রীত নিশ্বাস তাদের। একটা ভারী নিশ্বাস প্রাণের ভেতর প্রচুর চুম্বনে টেনে নিল সে, সমস্ত শরীরকে আস্বাদস্নিগ্ধ করে আস্তে-আস্তে নিশ্বাস ছাড়তে লাগল সে; ভাল লাগল তার। ভালই লাগল তার ঘুমন্তদের দিকে তাকিয়ে; স্ত্রী সন্তানকে সচ্ছলতায় রাখা তাদের জীবনে খানিকটা সুখ-সুবিধে-শান্তির ব্যবস্থা করা—মাঝারি জীবনের এ উদ্দেশ্য এ শীত রাতে মাল্যবান সিদ্ধ দেখছে বলে। নিজের ঘুম হচ্ছিল না তার—এরাই-বা এই শীতেব মধ্যে কী করছেঃ ঘুমিয়ে? জেগে? দেখবার জন্যেই সে ওপরে এসেছিল। দেখা হল। মাল্যবান সুস্বাদ পেল, কেমন স্নিগ্ধ শারীরিক মনে হল তার রাত্রিটাকে, রাত্রির এই নিঝোর সময়টাকে। এখন নীচের ঘরে যেতে হয়। কিন্তু তবুও মাল্যবান গেল না সহসা। মশারির খুঁট তুলে এদের খাটের পাশে পাড়াগাঁর পৌষরাতের নিশ্চুপ ডানার পাখির মত এসে স্নিগ্ধ নৈঃশব্দ্যে—এদের জাগিয়ে?—বসে থাকতে চায়। কিংবা বসবেও না; মনুর কপালে আলতো হাত বুলিয়ে দেবে—কম্বলটা স্ত্রীর বুক থেকে সরে গেছে, তুলে গুছিয়ে দেবে আলতো। তারপর নিজের ঘরে চলে যাবে সে।

কিন্তু নেটের মশারি তুলতেই ব্যাপারটা হল অন্য রকম। উৎপলা জেগে উঠে প্রথম খুব খানিকটা ভয় খেলে; তারপর বিছানার ওপর উঠে বসে তার সমস্ত সুন্দর মুখের বিপর্যয়ে—মুহূর্তেই সে-ভাবটা কাটিয়ে উঠে মরা নদীর বালির চেয়েও বেশি বিবসতায় বললে, 'তুমি!'

'এসেছিলাম।'

'এ সময় তোমাকে কে আসতে বললে।'

'দেখতে এলাম, তোমারা কী করছ।'

'যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে যাও, কাল থেকে এ আমার সঙ্গে আর শোবে না। মেয়েটার দাবনা ঘেঁষে, বাপ রে, একটা ডান যেন।'

'কে, আমি?' মাল্যবান দাঁড়িয়ে থেকে বললে। খাটে বসল না, একটা কৌচে বসে বললে, 'না, মেয়েটিকে শুধু দেখতে আসি নি, আমি—'

'আ, গেল যা! বসলে! রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গাযেন। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখ। ও মা। ও মা!—ও মা! বেবোও! বেবোও বলছি!'

'তুমি ঘুমুচ্ছিলে—তোমার ঘুম ভাঙাতে আসি নি তো আমি—'

'বলি, বলির কুমড়ো, দু-ফাঁক হবে, না এখানে থাকবে?'

'ঘুমুচ্ছিলে, ঘুমোও।'

'ঘুমুচ্ছিলে ঘুমোও! আব, গোঁসাইয়ের কুমড়ো—'

'কেন কুমড়ো-কুমড়ো করছ, উৎপলা—'

'এখানে বসে থাকা চলবে না এখন।'

'আমি একটু বসে আছি, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। আমি এই কৌচে বসে আছি, মনু ঘুমুচ্ছে: ঘুমিয়ে পড়ো।'

উৎপলা গলাটা পরিষ্কার করে নিল, একটানা ছঘণ্টা ঘুমিয়ে বেশ সজীব সুস্বাদ হয়েছে শরীর, সরস কঠিন গলায় বললে, 'দরমুজ দিয়ে ইঁদুর মেরে ফেলেছি সব আমার ঘরের। তবুও যদি এক-আধটা থাকে জার্মান কল পেতে রেখেছি। ও-সব চালাকি চলবে না। ঘুম বড় বালাই আমার। চাও তো নীচে চলে যাও।'

মাল্যবান চুপ করে বসেছিল। সে চলে গেছে না কৌচে বসে আছে সে দিকে না তাকিয়ে অন্ধকারে কিছু না বুঝতে পেরে উৎপলা বললে, 'ইশ, একেবারে ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি মস্ত বড় একটা ড্যাকরা মিনসে কম্বল জড়িয়ে খাটের পাশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত বুকের রক্ত ঝিম-ঝিম ঝাকর-ঝিম করে উঠল আমার।'

'কিন্তু দেখলে তো, আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

'এ রকম ভাবে ফের যদি আমাকে ভয় দেখাতে আস—'

'ভয় দেখাতে তো আমি আসি নি, উৎ—'

'না, এসেছেন রূপ দেখাতে। ফের আমার ঘরের ভেতর ঢুকেছ কি রাত বিরেতে—' দাঁতের ওপর দাঁত চেপে কেমন একটা অদ্ভুত নিরেট নিগ্রহময়তায় বললে উৎপলা।

সূচীপত্রে যান

মাল্যবান শীতের রাতের নিঃশব্দতা ও অতিদীর্ঘতা, যে-দীর্ঘতা নিঃশব্দতা, যে-নিঃশব্দতা স্নিগ্ধতা হতে পারত (কতবার পাড়াগাঁর রাতে হয়েছি) সে-সব সুর কেটে যাচ্ছে উপলব্ধি করে, উৎপলা যে-গুমোটের সৃষ্টি করেছে সেটাকে হাল্কা করে দেবার জন্যে সরু গোঁফে তা দিয়ে একটু হেসে বললে, 'রাত বিরেতে ওপরে চলে এলে উচ্চিংড়ের কাবাব বানিয়ে দেবে নাকি আমাকে, পলা!' বলে নিজেই হাসল মাল্যবান; হাসিটা এক-বগ্গা টের পেয়ে থেমে গেল; খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললে, 'আমি আজ এসেছিলাম-আমার আজ কেমন ঘুম চটে গেল—ঘুম চটে গেল—আমার আজ ঘুম হচ্ছিল না কিনা—'

'ঘুম হচ্ছিল না বলে পরের ঘুমের নিকুচি করতে হবে?'

'তা নয়।'

'তবে আবার কী।'

'আমি এসেছিলাম—' মাল্যবান মাথা হেঁট করে খতিয়ে, কী বলবে অনায়াসে সেটা স্থির করতে না পেরে কিছু বলতে গেল না আর।

উৎপলা বললে, 'এই যে আমার ঘুমটুকু নষ্ট করে গেলে এর ঝক্কি পোয়াতে আমি বেলা আটটা-নটার আগে উঠতে পারব না।'

'তা উঠো। যখন ঘুম পোষাবে তখন উঠবে, এর আব কী কথা।'

'কাল সমস্তটা দিন মাথা ধরে থাকবে।'

'সকালে উঠে গরম-গরম চা খেয়ো।'

'চা খেলেই মাথা ধরা সেরে যায়? এমন বেকুব!'

'তোমার তো স্মেলিং সল্ট আর মেনথল রয়েছে—'

'তাইতেই মাথা ধরা সারে! হু! ঘানিগাছে ঘুরতে-ঘুরতে মুখ ফাঁক করে বলেছে ঝুঝি জয়নাথের বলদটা?'

উৎপলার গায়ের ঝালে মশারির ভেতরটা বেশ গরম হয়ে আছ, খড়ের উমের ভেতর যেন শুয়ে আছে মনু আর পলা; মানুষ না হয়ে সে যদি সারস হত তা হলে কৌচে না বসে কোন যুগে ওদের ঐ নীড়ে জাপটে বসে থাকতে সে; ভাবছিল মাল্যবান।

'এক-আধটা অ্যাসপিরিন খেও; কিন্তু ওগুলো বিশেষ ভাল জিনিস নয়, না খেলেই ভাল।'

'এই যে ঠাণ্ডা লাগল আমার তরাসে রাতে জেগে উঠে, কতকগুলো ন্যাকড়া ছিঁড়ে ছোট-ছোট সলতের মত পাকিয়ে নাকের ভেতর সেঁধিয়ে হাঁচতে হবে; কাল সমস্তটা দিন এই আমাব কাজ; ভাবতে গেলেও মনটা খিচড়ে যায়; ছোঃ!'

মাল্যবান কৌচের থেকে উঠে এসে খাটের পাশে ভাঙা হাতলেব হাল্কা চেযাবটা টেনে চুপ করে বসল গিয়ে।

'অ্যাসিপিরিনের শিশিটাও তো ফুরিয়ে গেছে, একটা পিলও যদি থাকে—'

'কাল এক ফাইল কিনে আনতে হবে।'

'কাল সকালে চা আমাকে করে দিতে হবে।'

'করে দেব।'

'তিন-চাব কাপ চা লাগবে আমার।'

'গরম-গরম চা সর্দি-মাথাধরায় বেশ কাজ করে।'

'হ্যাঁ, সর্দি জমেই তো এই মাথাধরা।'

'এখনই ধরল?'

'না, তত ধরে নি; তবে ভোরের বেলা হবে, খোযা-পাথরেব ওপর হাতুড়ি পেটাচ্ছে যেন ঝগড়ুর বৌ—সেই কালো হয়ে লম্বা হযে সোমত্থ মাগিটা। বাবারে!' আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে আশ্চর্য আবাম বোধ করে আক্ষেপে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে উঠে উৎপলা বললে, 'হাতুড়ি পেটাবে মাথার ভেতরে, এই হয়ে এল আর-কী। আমি বিছানার থেকে উঠতে পারব না। তুমি চা এনে আমার খাটেব পাশে, রেখে দিও তো বাপু।'

'মনু কি ঘুমিয়ে আছে?'

'ঘুমিয়ে আছে ওর ঠাকুরের থানে।'

'তার মানে?'

'ঠাকুরের থানে দশায় পড়ে আছে।'

'জেগে আছে?' মাল্যবান বললে, 'ডাকব মনুকে?' কিন্তু মনুকে ডেকে দেখবার কোনো চেষ্টা না করে মাল্যবান বললে, 'আজ সারারাত ঘুমের টিপই এল না আমার চোখে; কেমন যেন হয়ে গেল; এক ফোঁটা ঘুম হল না।'

'কাল তোমার কটার সময় অফিস?'

'সাড়ে-দশটায়।'

'আমি তো উঠব খুব দেরি করে; হয়তো আটটা-নটা; তখন আমাকে চা করে দিতে পারবে?'

'ঠাকুর দেবে। আমি দেব না-হয়।'

উৎপলা সমস্ত শরীরে লেপ মুড়ি দিয়ে বালিশে মাথা পেতে বললে, 'নাও, মশারিটা গুঁজে দাও তো মনুর পায়ের দিকে।'

'মশা তো নেই, মশারি টাঙাবার এক বাতিক তোমার।'

'মশা নেই, ইঁদুর আছে, মশারি না গুঁজলে পা কেটে খেয়ে যাবে।'

'মশারি ঠিক করে দিয়ে মাল্যবান চেয়ার থেকে উঠে দূরে একটা ময়লা তেলচিটে সোফায় গিয়ে বসল। উৎপলা বালিশে মাথা গুঁজে হাত-পা খিঁচিয়ে আলসেমি ঝেড়ে হাই তুলল, তুড়ি দিল, লেপটা ভাল করে জড়িয়ে নিল সর্বাঙ্গে। তারপর মাল্যবানের দিকে আন্দাজি নজরে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'বসলে? বসলে যে বড়?'

'কী করব?'

'যাও, নীচে যাও।'

'সেখানে গিয়ে কী হবে?'

'এ রকম কতক্ষণ বসে থাকবে শুনি—'

তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলব—'

'দাঁতে ঠেকে যাবে জিভ, বেশি কথা বলতে গেলে। দাঁতকপাটি হয়ে যাবে। দাঁতে চামচে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে—ঢেঁকির পাড় দিয়েও খুলতে পারা যাবে না আর—নাও, সুড়-সুড় করে সবে পড় দিকিন—' উৎপলা পাশ ফিরে শুল।

মাল্যবান বসে রইল কনকনে ভিজে শীতে কেমন ন্যাতাজোবরার মত। কাজ নেই, কথা নেই, চোখ বোজা নেই, নড়াচড়া নেই, কোনো কথা সে ভাবছিল বলেও মনে হচ্ছিল না।

'কী রকম মানুষ তুমি।'

'বসে তো রয়েছি শুধু।'

'এতে আমার ঢের অস্বস্তি।'

'কী করতে হবে তা হলে?'

'চলে যাও।'

'ঘুমোবে এখন?'

'মুখে নুড়ো ঢেলে দেব আমি বেহায়া মড়াদের! ঘুমোবে? ঘুমোবে! রাত তিনটের সময়—' কেঁদে ফেলল হয়তো উৎপলা। কিন্তু তবুও সে তো বালিকা বধূ নয়—প্রায় তিরিশ পেরিয়ে গেছে। মাল্যবান একটা দমে যাওয়া নিশ্বাস ফেলে বললে, 'যা—ই।'

একটু পরে ফিরে তাকিয়ে চড় খেয়ে সেঁটে চড়িয়ে দেবার মত গলায় উৎপলা বললে, 'তবুও বসে রইলে!'

'কই, তোমার চোখেও তো ঘুম নেই আর।'

'তোমার জিভে আছে; নীচে নেমে যাও শিগগির; যাও—নামো—'

'যাচ্ছি, কিন্তু রাত তো ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রায়।'

উৎপলা বিছানার ওপর উঠে বসল। এবার সে কথা বলবে না আর, একটা বিষম কিছু করে বসবে মনে হল। কিন্তু মাল্যবান নিজের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল; উল্টোপক্ষ কী করছে, না-করছে দেখল না সে, চোখেই পড়ল না তার কিছু। বললে মাল্যবান, 'কাল তো বিশে অঘ্রাণ গেল; ঠিক এই অঘ্রাণ মাসের বিশ তারিখে আমার জন্ম হয়েছিল। তোমাকে হয়ত এক-আধবার বলেছি—মনে আছে তোমার? নিজেরই বলে কিছু মনে থাকে না। এই দিনটায় ঢের ভাববার কথা ছিল; বেয়াল্লিশটা বছর চলে গেল জীবনে।

সুবাতাস আর কুবাতাসের কত কাটাকাটি হল। কাটাকাটি এখনও চলছে—চলবে যে-পর্যন্ত না মাটিতে মাথা রাখি। কিন্তু লালকমল নীলকমল কালোবাতাস শাদাবাতাস মনপবন ভাব চাঁদের বুড়ি মিলে কেমন যেন অপার্থিব করে তুলেছে জীবটনটাকে। আমি মাটির মানুষ তো—মাটি ছাড়া টাল সামলাতে পারব না—হাওয়ার চেয়ে সোনার শরীর ভাল, তার চেয়ে মাটির শরীর; চালে গুড়ে, নারকোলের ঝাঁঝে, কপ্পুরে ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মত তুমি আর আমি; তোমার কাছে এসেছি তাই, বসেছি তাই। দাও। দেবে না?'

একেবারেই দিতে যে না পারে উৎপলা তাও নয়, দিয়েছে মাঝে-মাঝে, গোড়ার দিকে খুব মন মজিয়েও দিয়েছে বটে, কিন্তু তারপরে টান কমে গেছে, খুব বেশি কমে গেছে—দুদিক থেকে সমান অনুপাতে যদিও নয়; উৎপলা জানে সব; মাল্যবানও জানে দাম্পত্যজীবনের অনেকগুলো দিক না হলেও চলে আজ উৎপলার, শাড়ি-গয়না খাওয়া-দাওয়া আরামবিরাম ফেলা-ছড়া বিলাস-স্বাধীনতা হলেই হল তার, মাল্যবানের কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ দিক এখনও চাই-ই যেন, অনেক দিনের ভেতরে এক-আধ দিন অন্তত চাই, মাটির দিকটাই চাই, সোনার দিকটাও নয়, মাটিই চাই, কিন্তু নিজের সোনার ঝিলিক মাঝে-মাঝে মাল্যবানকে দেখালেও গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে মাটির সঙ্গে কোনো যোগ নেই উৎপলার—সে তো আকাশের মেঘ, জলভারানত নীল মেঘ নয়—শাদা কড়কড়ে মেঘ—দূরতম আকাশের।

উৎপলা চুলের সিঁথি অব্দি লেপ টেনে শুয়ে পড়ল। মাথায় রক্ত উঠেছিল তার, কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হবে—ঘুমোতে হবে; নায়েব, গোমস্তা চাকর-বাকর রাক্ষস-খোক্কস লালকোমল-নীলকমল ভ্যাক-ভ্যাক করেছে—তার ভেতর সে ঘুমিয়ে পড়েছে—এ রকম ব্যাপার কতবার তো ঘটেছে তার জীবনে, আজ ঘুমোতে হবে।

'আজ বিশে অঘ্রাণ', মাল্যবান বললে, 'পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্ম তো দিলেন; ঢের ভাল ব্যবহার হতে তো পারে জীবনের; তা হয়েছে; হয়নি? হবে? বোঝা কঠিন; মাঝে-মাঝে তুচ্ছ বেনে-বৌ পাখির চেয়েও বেশি বেনেতি বলে মনে হয় সব, খাচ্ছি-দাচ্ছি সংসারের বেনেগিরি করছি। আছে অনেক ফাঁক, আলো, নানা রকম বড় আকাশ ঘাস ও-সব পাখিদেরও; কিন্তু সালতামামি আর সালপাহলির গোলকধাঁধা ছাড়া কিছু কি আছে মানুষের?'.... এই সব, আরো অনেক সব বলতে চাইল মাল্যবান; কিন্তু বলাটা তার না হল সাহিত্যের ভাষা, না হল নিজেদের মুখের ভাষা; মানুষের জল রক্ত অশ্রু ঘামের মধুসুধার ভাষা তো এ-রকম নয়। মাল্যবান টের পেল। এবারে সে না সাজিয়ে-গুছিয়ে একেবারে রক্ত ঘাম সুধা স্বাভাবিক প্রাণের ভাষায় কথা বলবে। কিছুক্ষণ দেঁতো কথা ছেঁদো কথার পর সত্যিই যখন বারোয়ারি বাজাবের বাসরঘরের কথা মুখে এল তার, নাক ডাকার শব্দ শুনে মাল্যবান টের পেল উৎপলাকে নিয়ে তার চলবে না কিছুতেই, তবুও চালাতে হবে মৃত্যু পর্যন্তই। বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জন স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই এই নিস্ফলতা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রীরাই সেটা ঠিক মাল্যবানের মত উপলব্ধি করতে পারে না; যে-সব স্ত্রী-স্বামীরা সেটা করে, একটা ভাঙা গেলাশের কাচগুলোকে জড়ো করে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রত্যেকবারই জল খেতে হয় তাদের; নারী-পুরুষের সম্বন্ধ, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, বিয়ে জিনিসটা, শ্রেষ্ঠ কারিগরের কাচের গেলাশের মতই সহজ ও কঠিন, ভাঙবেই; জল খেতে হবেই; একটার বেশি গেলাশ কাউকে দেওয়া হবে না; সে যদি তা জোর করে বা চুরি করে নেয় সেটা অসামাজিকতা হল। দর্শনী বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে বিয়ে বদ, বিয়ে খণ্ডন করে আবার বিয়ে, যদৃচ্ছা বিয়ে করবার কথা পেড়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু টাকাওয়ালা জাতিগুলোর টাকাওয়ালা মানুষদের সম্পর্কে এ-সব সমাধানের কিছু-কিছু মানে থাকলেও বেশি কোনো মানে নেই, মাল্যবানদের মত গরিব জাতির গরিবদের পক্ষে কোনো মানেই নেই কেবলই বিয়ে-খণ্ডন ও যদৃচ্ছা বিয়ের। গরিব জাতিদের সমাজগুলো মজন্তালি সরকারের মত হেসে পেট ফাটিয়েই মরে যাবে কেবলি বিয়ে খসিয়ে নতুন বিয়ে সম্পর্কের ভেতর মানুষকে ঢুকে পড়তে দেখলে, কিংবা বিবাহসম্পর্ক তুলে দিয়ে মেয়ে-পুরুষের স্বাধীন সেয়ানা মেলামেশায় রাষ্ট্রকে হিতার্থী বিজ্ঞানধর্মী পরিচালক হিসাবে ঘুরে বেড়াতে দেখলে। সেয়ানা স্বাধীন মেলামেশার অন্ত খুঁজে পাবে কি বিজ্ঞান—আকাশের তারা, পাতালের বালি যদিও গুণে ঠিক করেছে বিজ্ঞান। সেয়ানা স্বাধীন মেলামেশার কল্যাণের অন্ত খুঁজে পাবে হিতার্থী বিজ্ঞানী রাষ্ট্র? কোনোদিনও না। কিন্তু সে-রকম হিতার্থী বিজ্ঞানী রাষ্ট্রই-বা আসছে কোথায়? কোনোদিকেই না। খুব একটা গরিব জাতির মানুষ মাল্যবান। তার চেয়ে ঢের দুঃস্থ নিষ্পেষিত মানুষ আছে; তাদের অবস্থা আরো ঢের খারাপ—কিন্তু তাদের পেটের সমস্যা এ-সব সমস্যাকে অনেকটা চেপে রেখেছে; এ-সব সমস্যার সমাধানেও তাদের

সূচীপত্রে যান

বেশি বেপরোয়া বা মরিয়া বা সাহসিকতা সচ্ছলতা আছে—যেমন অন্য এক হিসেবে উঁচু শ্রেণীর ভেতরে আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাল্যবানের মত মধ্যশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে। মাল্যবান কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর—না, মধ্যমধ্যশ্রেণীর? খুব সম্ভব নিম্নমধ্য বিভাগের লোক সে। কিন্তু সমস্যাটা সমস্ত মধ্য শ্রেণীতেই কেমন দুর্বিসহভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, অথচ বাঙালি মধ্যশ্রেণীরা অন্তত ভাতকাপড় পেলে কেমন সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করতে পারে দেখবার জিনিস। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ তো দূরের কথা—স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কেও সৃষ্টির কারণকরণশালিকার ভেতর কোনো সুখশান্তির নির্দেশ নেই তো। কিন্তু বাঙালি স্বামী-স্ত্রীদের প্রেম ও যৌন জীবনে সুখ আছে, শান্তি আছে, শতকরা একশ জনেরই তো; ভাবছিল মাল্যবান একটু বিষণ্ন শ্লেষে হেসে উঠে। উৎপলা শীত রাতের কী এক পরমত্বের ভেতর ডুবে গিয়ে নাক ডাকাচ্ছে—মাল্যবানকে কেমন সহজ দিব্যতায় বিদায় দিয়ে, অথচ মাল্যবানকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে, অপ্রেমে, কামনার টানে, বেশি লালসায় রিবংসায় উৎপলার মতন একজন ভাল বংশের সুন্দব শরীবের নিচু কাণ্ডজ্ঞানের নিরেস মেয়েমানুষেব কাছে ঘুরে-ফিরে আসতে হবে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কী নিদারুণ ভাবে, কেমন অধমের মত, কেমন হাতে-পায়ে ধবে মেয়েটির কখনো-বা ঘরের শান্তি কখনো বা বাইরের সুনাম রক্ষা করবার জন্যে, কখনো- বা লালসা, অতিরুচিৎ প্রণয় এসে উৎপলার দিকে মাল্যবানকে হিঁচড়ে টানছে বলে।

আকাশে অনেক তারা, বাইরে অনেক শীত, ঘরেব ভেতর প্রচুর নিঃশব্দতা, সময়েব কালো শেবওয়ানির গন্ধেব মত অন্ধকার; বাইরে শিশির পড়ার শব্দ, না কি সময় বয়ে যাচ্ছে; কোথাও বালুঘড়ি নেই, সেই বালুঘড়ির ঝিরি-ঝিরি শিরি-শিবি ঝিরি-ঝিবি শব্দ : উৎপলার ঠাণ্ডা সমুদ্রশঙ্খের মত কান থেকে ঠিকরে— মাল্যবানের অন্তরাত্মায়।

দোতলার ঘরটার লাগাও বাথরুম ছিল। বাথরুমটার থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা ছাদ পাওয়া যায়। সমস্ত ছাদটা বড় মন্দ নয়। কিন্তু অন্য ভাড়াটে পবিবারটি ছাদেব বেশিব ভাগটাই প্রায নিজেদের জন্যে আলাদা করে বেখে দেওযা দবকার মনে করেছে। কযেকটা বেশ সুন্দব সবুজ তার্পুলিন টাঙিযে ভাবি চমৎকাব একটা পার্টিশন করা হযেছে। পার্টিশনের ও-দিকে থাকে ওরা; এ-দিকে একটা ডেকচেযার, গোটা-দুই বেতেব চেয়ার, তেপয, জলচৌকি, সেলাইয়ের কল, মনুব পড়াশুনোর বই। কোনোদিন-বা একটা হাবমোনিযম বা সেতার নিযে সমস্ত সকালবেলাটা গড়িমসি করে কাটিযে দেয় উৎপলা।

এ-জায়গাটা তাব খুব ভাল লাগে।

দুপুববেলা বোদ খুব চড়চড় কবে ওঠে বলে খানিকটা সময বাধ্য হযে তাকে ঘরেব ভেতর থাকতে হয। কিন্তু সূর্যটা যেই একটু হেলে পড়তে থাকে, তার্পুনিলেব ছাযায ডেকচেযাবটা টেনে নিয়ে বসে গিয়ে উৎপলা : গুনগুন করে, অথবা সেলাই; পড়ে নভেল, মনুকে পড়ায, এস্রাজ বাজায়।

মাল্যবান সন্ধের সময মাঝে-মাঝে ছাদে আসে; একটা চেযারে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। মাঝে-মাঝে মনুকে ডেকে ইতিহাস-ভূগোল-পৃথিবীর কথা, ধর্মের কথা, মনুষ্যত্ব, মানুষেব জীবনের মানে—প্রথম মানে—মাঝাবি মানে—বিশেষ করে অন্তিম অর্থ সম্পর্কে অনেক জিনিস একে-একে শেখাতে যায সে। মেয়েটির সব সময়ই সে-সব খুব ভাল লাগে না—মেয়েটিকেও ভাল লাগে না মাল্যবানের; কিন্তু অনেক সময মেয়েটি খুব নিরিবিলি শোনে; ভাসা ভরা চোখ তুলে কী ভাবে কেউ কি তা বলতে পারে। উৎপলা বলেঃ মেয়েটা একেবাবে বাপের গোঁ পেযেছে। শুনে ভাল লাগে মনুব। কিন্তু নিজে মাল্যবান মেযেকে যে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসে তা নয; স্ত্রীর জন্যেও প্রমাণ শ্রদ্ধা ভালবাসা বযেছে তার। কিন্তু এদের জন্যেই সে প্রাণে বেঁচে ফিট সার্থক হযে রয়েছে, সে কথা ভাবা হয় তো ভুল। মনটা তাব অনেক সময়ই একটা মুনিয়ার বা মেঠো ইঁদুরের মত আকাশে-আকাশে ফসলে-ফসলে ভেসে যেতে চায। বেশিক্ষণ এ-ছাদে বসে না সে; ধুতি-চাদর পরে বেরিয়ে যায়—ময়দানে গেলেই ভাল হত; কিন্তু গোলদিঘিতেই যায; ছড়ি হাতে করে অনেক রাত অব্দি পাক খায সে—অনেক কথা ভাবে—কেবানিব ডেস্ক ও উৎপলার স্বামিত্ব থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে—(কিন্তু কোনোটাই খুব নির্বিশেষে দানা বাঁধা নয)—সে অনেক রকম আলতো জীবন যাপন কবে। তার পর অবসন্ন হয়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে, একটা চুরুট জ্বালায; খিদে পায; বাড়িতে ফিরে আসে।

দোতলার বাথরুমে মাল্যবানকে চান করতে দেয় না উৎপলা।

'অফিসে যাবার সময় সাত-তাড়াতাড়ি চান করে তুমি জল ময়লা কবে ফেল—তুমি বাবু নীচের চৌবাচ্চায়ই নাইবে—'

'কিন্তু যে-দিন অফিস নেই?'

'হ্যাঁ, সে-দিনও।'

অতএব নীচেই চান করে মাল্যবান; এক-এক দিন তবু গামছা-কাপড় নিয়ে দোতলার স্নানের ঘরের দিকে যায়।

'এক টব আন্দাজ জল ধরে রেখেছি— ও-সব ফুরিয়ে যাবে—'

'এখনও তো কলে জল আছে,' বলে মাল্যবান।

'এই তো এখুনি মনু চান করতে যাবে।'

'আচ্ছা, বেশ, সে তৈরি হয়ে নিক, ওর মধ্যেই আমার হয়ে যাবে।'

'নীচের চৌবাচ্চার কী হল?'

'কেন, পাশের ভাড়াটেরাও তো সেখানে চান করে না, দোতলায় তাদের একটা বাথরুম আছে, সেখানেই তো তাদের সকলের কুলিয়ে যায়।' 'আরে বাবা, ঢেঁকির সঙ্গে তর্ক। তাদের তো পুকুরের মত বাথরুম। তাদের আর আমাদের—'

'লোকও তো তাদের অনেক; কিন্তু, নীচের চৌবাচ্চায় তবুও তো কেউ চান করতে যান না।'

'ওদের বাড়িতে পুরুষ মানুষ আছে যে যাবে? যে-কটি আছে, তাও তো মেয়েদের পাশে-পাশে ফেরে। না হলে মেয়েমানুষের গোসলখানায় কখনো মিনসেরা ঢোকে?'

মাল্যবান একটু উইঢুই করে নীচের চৌবাচ্চায় চলে গেল।

একদিন আবার স্নানের সময় উৎপলাকে বললে, 'দেখ, নীচের জল বড় ঠাণ্ডা।'

'এত শীতে জল গরম পাবে কোথায় তুমি,' বললে উৎপলা, 'ঠাকুরই তো রয়েছে, তাকে দিয়ে এক কেটলি জল গরম করিয়ে নিতে পার না?'

'তা পারি বটে,' মাল্যবান অবসর মত একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'কিন্তু ও-রকম ভাবে গরম জলে চান করলে বড্ড বদ-অভ্যেস হয়ে যায়। শরীরও খারাপ হয়।'

'কী চাও তা হলে।'

'তোমাদের টবের জল একটুও ছোঁব না, ট্যাপের নীচে একটু বসব।'

'দিক করো না বাপু, মনু এই চানে যাচ্ছে—'

'তা আসুক-না, আমার সঙ্গেই আসুক।'

'তোমার সঙ্গে আসবে!' উৎপলার চোখদুটো পাক খেয়ে ঠিকরে উঠল, 'বুড়ো ধাড়ির দেইজিপনা দেখ। না, না, ও-সব হবে না। নীচে যাও—নীচে যাও তুমি?

'এই কথা বলো তুমি?'

মাল্যবান একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে নীচে চলে গেল। অফিস যাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা বলতে গেল না—অফিস থেকে ফিরে এসেও না। কিন্তু দেখা গেল তাতে কারুরই কিছু এসে যায় না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে আড়ি ভাঙতে হল। আড়ি ভাঙতে গিয়েও দেখে স্ত্রীর মানই বেশি। কাজেই আড় ভাঙবারও প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

মাল্যবানের তবুও পথ কাটা হয় না।

ছুটির দিন একদিন বললে, 'নাঃ, নীচে আমি আর চান করতে পাবব না।'

উৎপলা সে-কথায় কানও দিতে গেল না।

'পঁচিশ দিনের মধ্যেও একদিনও যদি জল বদলানো হয় নীচের চৌবাচ্চার? পচা জলে চান করে অসুখ করবে আমার!'

'শালগ্রামের কথা শোন', উৎপলা বললে, 'কানে ধরে কাজ করিয়ে না নিলে পচা জল বেনো জল, সাতঘাটের জল এসে খায় মানুষকে। চোখ-কান বুজে ঠাকুর-চাকরের ঘাড়ে চান করা চলে কি? ফাঁকি দেওয়ার অভ্যেস তো ওদের আঁতুড়ের থেকে। জল কেন বদলাবে, কী দায় ওদের!'

'আমি নিজে তবে বাসি জল খালাস করে চৌবাচ্চায় ঝাড়ু লাগাব রোজ? নতুন জল রাখব?'

'চাকরকে নাই দিলে তাই করতে হয়। এটা তো কোনো অপমানের কাজ নয়—' উৎপলা সেলাই করতে-করতে বললে, 'তোমার নিজেরই তো সুবিধে।'

'কিন্তু এ দু-বাড়ির এত চাকর-ঝির সামনে চৌবাচ্চার বাসি জল নিকেশ করব আমি চৌবাচ্চার ছ্যাদার ন্যাতা খসিয়ে?' মাল্যবান পায়চারি করতে-করতে থেমে দাঁড়িয়ে একটু বিলোড়িত হয়ে উঠে বললে।

সূচীপত্রে যান

'খসাবে তো।'

'ঝিগুলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসবে?'

'কেন, বল তো? এ-রকম হ্যাংলা ঝি কোথায় দেখলে তুমি?'

'আমি দেখেছি। তুমি দেখবে কী করে। সংসারের তুমি বড় জান কি না। কত রকম জীবন আছে! কী দেখেছ তুমি!'

'থাক, ও-সব জেনে আমার কী দরকার!'

মাল্যবান বললে, 'তাই বুঝি? সংসারের বার তুমি?'

উৎপলা শেমিজ ঢাকতে-ঢাকতে কোনো উত্তর দিল না।

'এই যে আমি চান করি', মাল্যবান আবার পায়চারি করতে-করতে বললে. 'তুমি মনে কর এতে তোমার খুব নামডাক?'

উৎপলা ঠোঁটের ভেতর সুচ গুঁজে শেমিজটা নেড়ে-চেড়ে দেখছিল; বললে, 'বড্ড ছিঁচকে তুমি।'

'আমি?'

'একটা কথা নিয়ে এত বাড়াতে পার—'

'ওপরে কল রয়েছে, বাথরুম রয়েছে, অথচ আমি চৌবাচ্চায় চাকর-বাকরদের মত দিনের পর দিন চান করি— ওদিকের ভাড়াটেরাই-বা কী মনে করে।'

উৎপলা ঠোঁটের থেকে সুচ নামিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'এ সব ন্যাকড়া তারা দেখতেও যায় না। বড় মন নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে। একটা ঢ্যাঙা মিনসেকে চৌবাচ্চার সামনে দাঁড়াতে দেখলেই তারা হেসে শুয়ে পড়বে? নিজের বাপকে দেখে চোখ ওল্টাবে?'

মাল্যবান পায়চারি করতে-করতে এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে বললে. 'সে-দিন শুনলাম মেজগিন্নি বলছেন, 'চাকরবাকরদের চৌবাচ্চায় কেরানিবাবুটি চান করেন, জল কি কলকাতায় সোনার দরে বিকোয় না কি মেজদি—এই সব, এই সব, ছ্যাঃ, শুনে চন করে উঠে মাথার লোম খাড়া হয়ে পড়ে—'

'কে বলছিল এই কথা?'

'মেজঠাকরুন।'

'তা সৎগুষ্টির মেয়ে তো এই রকমই বলবে।'

'ঠিকই তো বলেছিল।'

'ঠিকই যদি বলেছিল, তুমি মুখে কোঁচা গুঁজে চোরের মতন চলে এলে যে?'

'আমি কী করতে পারি। পরের বাড়ির ঝি-বৌদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব? কী বল তুমি উৎপলা?'

উৎপলা সেলাই করে চলেছিল, সুচটা আবার ঠোঁটে-দাঁতে আটকে নিয়েছে, বললে, 'পরের বাড়ির বৌ তো বললে, কিন্তু বাড়ির ভাতার-ভাসুরদের শুনিয়ে-শুনিয়ে যারা এই রকম কথা বলে—'

মুখের কথা না শেষ করে থেকে গেল উৎপলা।

মাল্যবান এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল, একটা ছেঁড়া তেলেময়লায় ঘামানো-চেমানো কৌচে বসল সে, আস্তে-আস্তে বললে, 'যাক। আসল কথা হচ্ছে এক গা লোক নিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বৌ-ঝিদের আনাগোনা চোখমারা মুখটেপার ভেতর চান করতে জুত লাগছে না আমার। এক-একটা বৌ ওপরের রেলিঙে ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আমার চান দেখে—যেন শিবলিঙ্গের কাকস্নান হচ্ছে— সমুদ্রস্নান হচ্ছে।'

উৎপলা কল চালাতে-চালাতে বললে, 'তা হলে তুমি কি বলতে চাও, দরজা-জানালা বন্ধ করে এক হাত ঘোমটা টেনে তুমি ওপরের বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে আর মেয়েমানুষ হয়ে আমি নীচের চৌবাচ্চায় যাব—ওপরের বারান্দায় ভিড় জমিয়ে দিয়ে ওদের মিনসেগুলোকে কাম্‌খ্যে দেখিয়ে দিতে?'

'না, তা কেন?' ছেঁড়া কৌচের ছারপোকার কামড় খেতে-খেতে একটা বেশি কামড়ে যেন অস্বস্তি বোধ করে মাল্যবান বললে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রকম হলেই তো ভাল হত।'

'আমার কথাটা তুমি বুঝলে না।'

'আরে বাবা, সব বুঝি আমি। দেখেছি অনেক জমিদারের ছেলেদের আমি, আঘন-পোষের শীতে একটা পুকুর-ডোবা পেলেই ঝাঁপিয়ে জাপটে চান করছে। চোখ জুড়িয়ে গেছে দেখে। এক ফোঁটা জলের

জন্যে মেয়েমানুষের কাছে এসে হামলা!'

মাল্যবান উসখুস করে উঠে গেল।

ছুটির দিন ছিল; চৌবাচ্চা ছাড়া আরো অনেক কথা বলবার ছিল। কিন্তু বলবে কাকে? শোনবার লোক কই? অনুভূতির সমতা নেই, সরসতা নেই; ছাদে খানিকক্ষণ টুইমুই-টুইমুই করে হেঁটে, থেমে, বসে থেকে মাল্যবান ঘরের ভেতর ঢুকল; একটা চেয়ারে বসে বললে, 'জীবনের সাতাশ-আটাশ বছর আমিও তো পুকুরে চান করেছি।'

'বেশ করেছ।'

'জমিদারের ছেলেদের কথা বললে কি না। কিন্তু কলকাতায় পুকুর পাব কোথায় বল তো দেখি।'

'চৌবাচ্চাই কলকাতার পুকুর।'

'বলেছ। কিন্তু গামছা পরে চান করতে হয়—চারদিকে মেয়েরা থাকে—'

'হাঁচতে-কাশতে রূপও বেরিয়ে পড়ে রূপলালবাবুর। মেয়েরা হেঁসেলের ছ্যাঁচড়া পুড়িয়ে আড়ি পেতে থাকে রূপলালবাবুকে দেখবার জন্যে। হেঁসেলে দুধ ধরে যায়—গায়ে-গায়ে ঠাসাঠাসি মাছপাতরি হয়ে রূপই দেখে মেয়েরা রূপসাগরের—'

মাল্যবান আস্তে-আস্তে নীচে নেমে গেল। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবল : আজ অফিস ছুটি ছিল, কথা বলবার ছিল ঢের, কিন্তু উৎপলা মনে করবে, ঝুড়ি খুলে বসেছি—পুরুষমানুষ হয়ে। মেয়েমানুষ-পুরুষমানুষের অন্তঃসাব ও ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে ধাবণাও বটে এই মেয়েটির! কোথায় পেল সে এ-ধারণা? কে শিক্ষা দিয়েছে তাকে? আপ্রেম—হয়তো অপ্রেমই শিখিয়েছে উৎপলাকে।

একটা চুরুট জ্বালিয়ে মাল্যবান ভাবল, 'পুরুষমানুষ' হয়ে এ-সব মেয়েদেব কাছে জীবনের বড়-সড় হাড়ামদড়াম কথা ছাড়া কোনো মিহি কথা বলতে যাওয়া ভুল; কোনোদিন যদি তারা সেধে শুনতে আসে সেই অপেক্ষায় থাকতে হয়। সেটা সুফলা জিনিস হয়? চুরুটে কয়েকবাব টান দিয়েই মাল্যবান ভাবল—কিন্তু সে রকম ভাবে উৎপলা আসবে না কোনোদিন। বারটা বছর তো দেখা গেল। এই স্ত্রীলোকটি মিষ্টি হোক, বিষ হোক, ঠাণ্ডা হোক, আমার জীবনের রাখা-ঢাকা সবুজ বনে আতার ক্ষীরেব মত কথাগুলো শুনতে আসবে, সে পাখি ও নয়। ওর চেহারা যদি কালো, খারাপ হত, তা হলে তো চামারের মেয়েরও অযোগ্য হত। একটা মোদ্দাফরাসকে নিয়ে ঘর করছি আতাবনের পাখির মত—নেই-সেই পাখিনীকে চেয়ে আমি—

কিন্তু নিজেব চিন্তাধারণা ও উপমার কেমন একটা আলঙ্কারিক অসহজতায়—অস্বাভাবিকতায়ও বিবক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল মাল্যবানেব মন। জিনিসটা ঠিক এই রকম নয়, অন্য বকম। কিন্তু কী রকম? যে-রকমই হোক, কোনো সহজ স্বাদ নেই জীবনে—খাওয়া-দাওয়া শোওয়া ঘুমনোর স্থূল স্বাদগুলোও সূক্ষ্ম হতে চেয়ে গোলমাল কবে ফেলল।

'তোমার মাইনে তো আড়াইশ টাকা হল—এমন একটা কেলেঙ্কাবি ঘোচাও তো।'

'কী করতে হবে?'

'ছাদে পাতপিঁড়ি পেতে খাওয়ার পক্ষপাতী আমি নই;' উৎপলা বললে।

'দিব্যি তো গায়ে বাতাস লাগিয়ে আলোয়-আলোয় মাছের কাঁটা বেছে খাওয়া হয়', মাল্যবান যেন নাকের আগায় চশমা ঝুলছে তার, এমনিভাবে একদৃষ্টে, সনির্বন্ধতায় উৎপলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আন্ধি ঘুপসির থেকে বাঁচোয়া না? ছাদের আলোয়? ছাদে খাওয়াটা তো বেশ। আমাব তো বেশ ভাল লাগে।'

'ছাদটা একটা আঁস্তাকুড় হয়ে থাকে।'

'সে আর কতক্ষণ?'

'নিজে তো অফিসেব মুখে দিব্যি চাকলা গিলে হুট করে গাছের মাথায় চড় গিয়ে বিঁধ না—কী দিয়ে কী হয়—ঝামেলা হামলা আমি একা বসে পোয়াই আর কী।'

'এঁটো গড়াতে থাকে অনেকক্ষণ?'

'ঠাকুরের সঙ্গে ঝি পিরিত করবে, ঝির হাতে ঠাকুব খইনি টিপবে—তারপরে তো এঁটোর কথা মনে পড়ে—'

'এই রকম?' মাল্যবান মুখে দু-একটা কালমেঘ ঘনিয়ে এনে বললে, 'কতক্ষণ ফেলে রাখে? দু-তিন ঘণ্টা?' একটু চুপ থেকে মাল্যবান বললে 'বড় বেযাদব তো তা হলে—' আবাব খানিকক্ষণ তাকিয়ে

থেকে কথা ভেবে ঠিক করে নিয়ে মাল্যবান বললে, 'এ-ঝিটাকে উঠিয়ে দিতে হয়।'

'না, সে-সবের কোনো দরকার নেই।'

'এই না বললে ঠাকুরের সাথে পিরিত করে?'

'তা করুক, আমাদেব তাতে ক্ষতি কী?'

'কিন্তু সে সব ভাল নয় তো।'

'আমাদেব কাজ নিয়ে কথা; ওদের অন্তর্জলীব ভেতব নাক ঢোকাতে যাব কেন?'

'কিন্তু ভাদুরানীর স্বামী রয়েছে—তবুও ঠাকুবেব সঙ্গে এই বকম।'

'তুমি তো আচ্ছা বেকুব দেখছি!'

'কেন?'

'ছোট জাতের ভেতব কত বকম কাণ্ড হয়!'

'ছোটোজাত? ভাদুরানী তো বামুনেব মেয়ে।'

'তা হবে। বেশ তো—ঠাকুরও তো বামুন—'

ঠাকুরও বামুন : মাল্যবানের কাছে ব্যাপারটা এক মুহূর্তেব জন্যে চীনে প্রবাহেব মত সরল অথচ কঠিন, কঠিন অথচ সবল বল মনে হল; কী যে এই সহজ ব্যাপাবটা—কী এব মানে কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারল না। তামাকের ধোঁযায নোংবা দাঁতগুলো বেব করে—সেই দাঁতগুলোব মত আকাট অবর্ণনীযতায উৎপলাব দিকে তাকিয়ে রইল সে।

ছাঁদে না খেযে এখন থেকে ছাদেব উত্তবদিকের ঘরটায খেলে হয—বেশ ফটফটে ঝবঝবে ঘরটা—'

'কিন্তু ওটা তো ও-ভাড়াটেদেব—'

'না গো, ওরা ও-ঘবটা ছেড়ে দিযেছে।'

'কবে ছেড়ে দিল?'

'কাল।'

মাল্যবান একটু ভেবে বললে, 'ওটাব ভাড়া তো কম হবে না'—

'পঁচিশ টাকা চায—আমি বলে কযে কুড়ি টাকা কবতে পারব,' বলে একটু ঝিকমিক কবে হেসে মাল্যবানেব দিকে তাকাল।

মাল্যবান ভুরু উঁচকে বললে, 'কুড়ি টাকা অতিরিক্ত খবচ আবার?'

'কিন্তু তোমার মাইনেও তো বেড়েছে।'

'কিন্তু দশ রকম খবচও তো বেড়েছে। এটা আবার কেন?'

'কিন্তু ছাদে খাওয়া অসম্ভব—'

মাল্যবান ভাবছিল : নাকেব আগায যেন তাব চশমা ঝুলে পড়েছে, এ-বকম কেমন এক অথৈ শূন্যতার ভেতব থেকে নিশ্চুপ একনিষ্ঠতায ও সনির্বন্ধতায উৎপলাব দিকে তাকিযে।

'খেযে উঠতে-না-উঠতেই কাক চড়াই এসে সমস্ত এঁটো চারদিকে ছড়াবে, ছাদে যে-কাপড়গুলো শুকোতে দিই তাব ওপর মাছের কাঁটা, আলু-মশলার হলুদের ছোপ, পাখিব বিষ্ঠা; রাধাব কলঙ্কের চেযে কেষ্টোর কলঙ্ক বেশি : ক্যাঁকড়ার গাঁধি, চিংড়িব দাঁড়া, ছিবড়ে পিঁপড়ে, মাছি সমস্ত ছাদে মই-মই করছে বে বাবা!'

'রান্নাঘরে গিয়ে খেলে হয না?'

উৎপলা ডান হাতের চাঁটি মেরে বাঁ গালের জুলপির ভেতবে একটা মশা না কী পিষে ফেলে বললে, 'কুড়ি টাকা ভাড়া চাচ্ছে, ঝনাৎ করে টাকাটা ফেলে দেবে, না কি ফড়েব মত কথা বলছ তুমি। রান্নাঘব হয়ে এসেছ কোনোদিন?'

'না, কী আছে ওখানে?'

'আমার বাজু আছে আর তোমার পাযেব মল।'

এক সারি নোংরা দাঁত কেলিযেই মুখ বুজে ফেলল তৎক্ষণাৎ মাল্যবান; হাসল এক ঝিলিক, না, নাক সিঁটকাল, বুঝতে পারা গেল না।

ছাদের উত্তরের দিকের ঘরটা ভাড়া করা গেল। চুনকাম করা ধবধবে সুন্দর দেয়াল, নতুন সবুজ রঙ মাখানো জানলা দরজা-দিব্যি।

সূচীপত্রে যান

'তোমার মেজশালার তো কলকাতায় আসবার কথা; যদি আসে, তা হলে এই ঘরটায় আমি আর মনু থাকতে পারি—বড়ঘরটা তাদের ছেড়ে দিতে পারি—'

মাল্যবান ঠোঁটের ওপর ছাঁটা গোঁফের গ্যাজে আঙুল বুলিয়ে কথা ভেবে নিচ্ছিল, কোনো উত্তর দিল না।

আপাতত একটা লম্বা টেবিল এই ঘরটার মাঝখানে এনে রাখা হল—চারদিকে তিন-চারটে চেয়ার। সকালের চায়ের থেকে শুরু করে রাতের খাওয়া.অব্দি সবই এই টেবিলে চলছিল।

উৎপলা একদিন একটা চিলতি চিঠি পড়তে-পড়তে বললে, 'মেজদা আসবেন।'

'কবে?'

'আসতে অবিশ্যি দেরি আছে।'

'এ-মাসে?'

চিবকুটটা রেখে দিয়ে উৎপলা বললে, 'মাস দেড়েকের মধ্যেই: পরিবার নিয়ে।'

'মেজশালার ছেলেমেয়ে কটি না?'

'তিনটি।'

'তিনটিই তো বেশ বড়-বড়।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে জায়গার টানাটানি হবে তো।'

'ঐ খাবার ঘরটায় গিয়ে আমরা থাকব।'

'তুমি আর মনু?'

'আমরা দুজন তো বটেই,' উৎপলা সমীচীন কচ্ছপের চামড়ার মত কঠিন একটা ভাব দেখিয়ে তবুও বললে, 'তুমিও আসতে পার, দেখি কী হয়।'

মাল্যবান খুব আগ্রহে একটা কথা পাড়তে গিয়ে নিজেকে শুধরে নিয়ে অন্য কথা পেড়ে বললে, 'অতটুকু ঘরে তিনজন কী করে আঁটবে?'

'তা আমি বন্দোবস্ত করে দেব। দুটো খাট পাড়লেই তো আমাদের তিনটি প্রাণীর হয়ে যায়। আমাদের একটা সেলের মত ঘর হলেই হয়ে যায়। দেখেছ তো দমদম জেলে।'

সত্যাগ্রহের আসামী মনে করে একটা বিশৃঙ্খল ভিড়ের ভেতর থেকে অন্য অনেকের সঙ্গে মাল্যবান ও উৎপলাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখা হয়েছিল—দিন দুই—মাস ছয়েক আগে।

'দেখেছি তো,' মাল্যবান বললে, কিন্তু দোতলার বড়ঘরটায় এতদিন মাল্যবানকে চৌকি—একটা ক্যাম্পখাট অব্দি, পাততে দেওয়া হয় নি কেন? না হোক, উৎপলার অত বড় খাটে মাল্যবানকে শুতে দেওয়া হয় নি কেন?

মাল্যবান নিজের দাম্পত্যজীবনের আকাশপ্রমাণ ব্যর্থতাকে তিলপ্রমাণের ভেতর মজিয়ে এনে তিলের ভেতরে তবুও ব্রহ্মাণ্ড দেখতে-দেখতে একটু বিষণ্ণভাবে হেসে ভাবছিল, কাঁকড়েশ্বরী, পরমেশ্বরী জেলে তো ক্যাঁকড়ার গর্তেও আমাদের এঁটে গেছে। তোমার মেজদা এলে খাবারের ঘরটায়ই হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি আর আমি শুধু থাকি যখন এ-বাড়িতে, দোতলার এ বড় ঘরটায় আমার জায়গা হয় না কেন, নীচের ঘরে বকনাবাছুর রামছাগলের কান টানে, কান-টানের না প্রাণ-টানের খুঁটে আমাকে না বেঁধে রাখলে আমার রাখালি ঘুমটা পাকে না বুঝি ওপরের তলায়?

ঠিক হয়ে গেল ছাদের উত্তর দিকের খাবারের ঘরে এরা তিনজনে থাকবে, বাকি দুটো বড়-বড় ঘরই মেজদা আর তার পরিবারকে ছেড়ে দেবে।

'মেজবৌঠান মানুষ মন্দ নয়' উৎপলা বললে, 'কিন্তু আমি ভাবি, মেজদার জন্যে। মেজদা একটু সুখী মানুষ কি না—'

'পদ্মার ইলিশের মত সুখী বটে তোমার মেজদা।'

'কী রকম?'

'সূর্যের একটা ঝিলিক দেখলেই লাট খেয়ে পড়ে মাছ—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে' উৎপলা বললে, 'আমি যা বলছিলাম, একটা আড়ে-দিঘে প্রমাণ ঘর নিজের জন্যে না পেলে মেজদার চলবে না।'

মাল্যবান বললে, 'ঐ দোতলার বড় ঘরটায় তিনি একাই থাকবেন বুঝি? ঘরটা বেশ বড়—আলো-

হাওয়াও খুব। থাকুন।'

'ঐ ঘরটাই দেব দাদাকে—'

'তোমার বৌঠান থাকবেন কোথায়?'

'তিনিও ঐ ঘরেই।'

'তোমাব দাদার সঙ্গেই?'

'শোন কথা, রামকানাইয়ের সঙ্গে তবে?'

'মেজদি তো নীচের ঘরে থাকলেও—'

'বৌঠান নীচের ঘরে থাকবেন? কেন? তোমাব খচখচ কবছে কোথায?

মাল্যবান বললে, 'যে-রকম সুখী মানুষ তোমার দাদা, তাতে একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিযে অন্য এক ঘরে শোবার ব্যবস্থা যদি করেন বৌঠান, তা হলেও সাবাটা দিন দাদা তো তাঁব কাছে গিযে থাকতে পাবেন, কিংবা তিনি দাদার কাছে এসে বসতে পাবেন। এতে তো কোনো অসুবিধে হয না কারু—'

'কিন্তু বাতের বেলা?'

'তখন অবিশ্যি যে যাঁর ঘরে গিয়ে শোবেন।'

'তা হয না।'

'কেন?'

'বৌঠান কাছে না থাকলে মেজদার ঘুম হয না। এ নিযে মেজদাব শ্বশুববাড়িব লোকেবা তাকে ঠাট্টা করে।'

'ঠাট্টা চলে বটে।'

'কী রকম?' বললে উৎপলা। তাব মুখেব আত্মতুষ্টিব ঝিলিক নিভে গেল।

'কোনো অসুখ আছে মেজদাব?'

'কিছু নেই।'

'সুস্থ মানুষ?'

'মেজদা-মেজদি দুজনেই। ওবা এক জোড়! প্রথম থেকেই হযে এসেছে। তুমি এখন ভাঙবে?'

'খুব ভাল শাঁখার ব্যবসায়ী ছিলাম আমি,' মাল্যবান একটু হেসে বললে, 'তোমার হাতও ননীব মতন নরম ছিল, কিন্তু কোনো শাঁখাই পরাতে পারলাম না কেন?'

মাল্যবানের কথা উৎপলার কানে অপ্রাসঙ্গিক চবিত্রের স্বগতোক্তিব মত শোনাল; ও-রকম গোপনীয়তার ছাযা মাড়াতে চাইল না সে। শোনে নি যেন মাল্যবানকে, নিজেরই কথাব জের টেনে উৎপলা বললে, 'এক চিলতি চিঠি এসেছে তো মেজদিব কাছ থেকে পণ্ডিচাবির থেকে। দেড় মাস পরে পণ্ডিচারির থেকে আসবেন মেজদা-মেজদি; ছেলেমেযেবা পণ্ডিচারি নেই—কাছেই আছে—সেখান থেকে তাদেব কুড়িয়ে নিয়ে আসবেন। আমাদের বাড়িঘব চুনকাম কবিযে নিলে কেমন হয।'

মাল্যবান চুপ কবে ছিল; তার খুব তাজা কথাটার কোনো উত্তবই দিল না উৎপলা; কথাটা শুনেছে বলেও স্বীকার করল না।

'জানালা দবজা সব আগে থাকতেই বেশ রঙ করিযে নিলে ঠিক হবে,' উৎপলা বললে।

'আমাদেব নিজেদেব খবচে?'

'তবে আবার কার খরচে? বাড়িওযালার?'

'না, না, সে তো তাকিযে-তাকিযে দেখবে আব হাসবে।'

'হাসবে?'

'জামাই-এর শালা আসছে বলে শালার বোনাই গবাদে বঙ মাখাচ্ছে; হাসবে না?'

চুনকাম রঙ করিয়ে নিতে খরচের ঠ্যালা আছে। ও-সব জিনিসেব দরকাবও নেই এখন। দেযালগুলো বেশ পরিষ্কার, দরজা-কপাটও খাবাপ নয। এ-সব জিনিস নিয়ে মাথা খারাপ করবার মত বেশি টাকার রস মাল্যবানেব নেই এখন, কিন্তু উৎপলাকে কিছু বলতে গেল না সে। বললে, বুঝবে না। মেজদা এলে তাঁকে দিযে বলালে বুঝবে বটে কিংবা মেজদিকে দিয়ে; তাদের মাথা ঠাণ্ডা আছে; প্লাগ-টাগও বেশ ভালই কাজ করছে তাদের অন্তরেন্দ্রিযেব এঞ্জিনের। বেশ চমৎকাব দাম্পত্যজীবনই জমিয়ে বসেছে বটে মাল্যবানরা; কুয়াশার ভেতর থেকে কুয়াশাব দিকে তাকিয়ে যেন উৎপলার দিকে তাকিযে

রইল মাল্যবান।

'তা হলে এরা দুজনেই এই বড়ঘরে থাকবে শোবে?'

'হ্যাঁ।'

'আর ছেলেমেয়েরা?'

'নীচে শোবে।'

'একা-একা নীচে থাকবে?'

'দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে ভয় নেই কিছু।'

মাল্যবান কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি গিয়ে সেখানে শুতে পারি না?'

'ছেলেপুলেদের মধ্যে?'

উৎপলার মুখের অসাধ দেখা দিল সময়ের শূন্যতার ভেতর একটা ছ্যাঁদার মত যেন।

'না, অত আঁটবে কী করে? অত ঘুজিঘুজিতে ওদের কষ্ট হবে।'

'তা হলে তুমি তো পার শুতে ওদের সঙ্গে', মাল্যবান বললে।

'আমি অবিশ্যি শুতে পারি গিয়ে। তাই করতে হবে হয়তো। বৌঠান তো রাত হলে ওপরের থেকে আর নামতে পারবেন না।'

একটা কীর্তনের সুর গাইতে-গাইতে উৎপলা ছাদের দিকে চলে গেল। মাল্যবান খানিকটা হতচকিত, আড়ষ্ট, তারপরে অবহিত হয়ে অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর বসে রইল; দুটো কীর্তন সাঙ্গ হল; তারপরে মাল্যবানের বাঁশ-বনে-ডোম-কানা ভাবটা কেটে গেল অনেকখানি। কীর্তন শুনে অবিশ্যি নয়! এমনিই।

একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে সে গোলদিঘির দিকে চলে গেল।

দিঘির চারপাশে পাক খেতে-খেতে সে অনেক কথা ভাবল, তারপর বেশি কথা ভাবতে-ভাবতে চারদিকের নটেগাছগুলোকে ঠুঁটো হয়ে মুড়োতে দেখে একটা বেঞ্চিতে এসে চুরুট জ্বালাল।

দু-তিন দিন পরে মাল্যবান বললে, 'তোমার মেজদাবা তো থাকবেন অনেক দিন।'

'হ্যাঁ।'

'বছর খানেক?'

'না, মাস ছয়েক।'

'একটা কথা আমার মনে হয়', মাল্যবান বললে, 'এ-বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে একটা নতুন বাড়ি দেখলে মন্দ হয় না। দোতলা কিংবা তেতলায় বড়-বড় কয়েকখানা ঘর থাকবে।'

শুনে উৎপলা নাকে-চোখে খুব খুশি হয়ে বললে, 'তা হলে তো খুব ভাল হয়।' গুনগুন করে গাইতে-গাইতে বললে, 'তুমি সে-রকম বাড়ি দেখেছ কোথাও?'

'না?'

'পাওয়া বড্ড শক্ত।'

'আমি খুঁজছি।'

'পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার মধ্যে পেতে হবে তো?'

'ধরো, গোটাদশেক বেশিই না হয় দিলাম।'

কয়েক দিন পরে মাল্যবান এসে বললে, 'একটা বাড়ির খোঁজ পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'পাথুরেঘাটার দিকে।'

'বাবা, অদ্দুরে গেলে?'

'কিন্তু বাড়িটা বেশ।'

'কটা ঘর আছে?'

'পাঁচটা। দোতলায় চারটে, তিনতলায় একটা।'

'বেশ বড়?'

'হ্যাঁ।'

সূচীপত্রে যান

'কত চায়?'

'পঞ্চাশ।'

'তা পঞ্চাশ টাকা বড্ড বেশি।'

'কিন্তু পাঁচটা ঘর।'

'তা বুঝলাম—'

'ঠোঁটে পানের রঙ শুকিয়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল উৎপলার ঠোঁট। ঠোঁট নেড়ে সে বললে, 'কিন্তু মেজদার কাছ থেকে কিছু তো চাওয়া যায় না।'

'তা আমি জানি।'

'এমন-কি সেধেও যদি কিছু দেন, তা হলেও তা নিতে পাবি না আমরা।' সে-বিষয়ে মাল্যবানের খানিকটা মতভেদ ছিল।

একটা হাই তুলে মাল্যবান বললে, 'তাই তো, আড়াই শ টাকায় চলে কী করে, পঞ্চাশ টাকাই যদি বাড়িভাড়ায় দিয়ে ফেলি—'

উৎপলা চাপা গলায় ভরসা দিয়ে বললে, 'চালাতে পারি আমি অবিশ্যি—'

'নাঃ, সে আর তুমি কী করে পাব! লোকও তো কম নয়—'

'তোমার সোনার ঘড়িটা যদি বিক্রি করে ফেল, তা হলে টেনে-মেনে এক রকম চলে—'

'আমার সোনার ঘড়িটা বিক্রি কবে ফেলব!' মাল্যবান দম ছাড়বার আগে, দম ছাড়তেই পারবে না যেন সে আর, এমনি ভাবে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'ঐ, বিয়ের সময় যেটা পেয়েছিলে—' মাল্যবানের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে উৎপলা।

কিন্তু মাল্যবানেব আর-এক রকম—কেমন যেন, পাট ভেঙে গেছে, এই ছিল এই এখুনি ইস্ত্রি লাট হয়ে গেছে— এরকম মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্রী লাগল উৎপলার—বিরক্তি বোধ করল সে।

'বাবা তিনশ টাকা দিয়ে তোমাকে ওটা কিনে দিয়েছিলেন। সেই বাপের জন্যে আমি তোমাকে বিক্রি করতে বলছি, আমার ভাইয়ের সুবিধের জন্যে এ না করে এ-ঘড়ি দিয়ে কাঁচাপোকা টিপ পরবে তুমি!'

'আয় রোদ্দুর হেনে ছাগল দেব মেনে'-র মত একটা বিলোড়িত মন্ত্রে যেন উৎপলার চোখ রৌদ্রের মত হেনে পড়ল মাল্যবানের চোখে' কথা বলতে-বলতে এগোতে-এগাতে মাল্যবানের মুখের ওপর প্রায় পড়ল গিয়ে উৎপলা। আস্তে-আস্তে নীচে নেমে গেল, পরটা-চা খাবার জন্যেও ওপরে ফিরে এল না আর মাল্যবান।

খানিকক্ষণ পরে মনু নীচের থেকে ফিরে এসে বললে, 'বাবা বেরিয়ে গেছেন, মা।'

'চা না-খেয়েই গেল যে,' বলে চায়ের বাটিটা একটু কাতকরে চাটুকু ছাদের এক কিনারে ঢেলে দিল।

মনুকে বললে, 'পরটা খাবি?'

'না, মা, আমার কেমন অম্বল হয়েছে।'

'এতটুকু বয়সেই তোদের অম্বল হয় শুনলেও হাসি পায়,' পরটা দুটো ছাদের ওপরে গোটা তিনেক কাকের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল উৎপলা, মনুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'অম্বল! কথাটা শেখাল কে তোকে-'

'বুক জ্বলে যে।'

'তাকে অম্বল বলে তা ঠিক। কিন্তু কার কাছে শুনলে?'

'কেন তোমরাই তো অনেক সময় বল।'

'আমি বলেছি?'

মনুর দিকে চোখ শানিয়ে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'আমার বাপের বাড়ি কারো কোনোদিন অম্বল হয়েছে যে, বলব?'

মনু চুপ করে রইল।

'ঠিক করে বল তো কোথায় শুনেছিস কথাটা?'

'ধ্যাৎ আমার অত মনে নেই—'

'মনে নেই। এলি গেলি, বাপের বিদ্যেয বর্তালি, মনে নেই। যেমন দেখতে, তেমন লিখতে, কী যে

বাপের গোঁই পেয়েছ বাছা।'

মাল্যবান যতই অভিমান করুক না কেন, রাতে খাবার সময় ঠিক হাজির হল। উৎপলা তিন জনের ভাত সাজাতে-সাজাতে বললে, 'তোমার বড্ড ক্ষুদে মন—ক্ষুদিরামের মত—ফাঁসির ক্ষুদিরাম নয়—ভারি নচ্ছার মন তোমার—'

'আমার?'

'চা না-খেয়ে বেরিয়ে গেলে যে বড়?'

'ওঃ—চা—' মাল্যবান নাকের ভেতর দিয়ে খানিকটা হাসল—যেন কিছুই হয় নি; চায়ের কথাটা কিছুই মনে ছিল না যেন তার।

'চা পরাটা পড়ে রইল—শেষে কুকুর-বেড়ালে খায়—গতব খায় গতরখেকোর রাগ।'

'না, না, রাগ নয়—খাবারের ওপর মানুষে আবার রাগ করে না কি— অত আহাম্মক আমি নই!' বলে মাল্যবান বুদ্ধিমান নিরাগীর মত ভাব দেখিয়ে পাঞ্জাবিব আস্তিন খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে বললে, 'দেখি ভাতের থালাটা—'

উৎপলা ছুরি দিয়ে একটা লেবু কাটতে-কাটতে বললে, 'আহাম্মক হবার বাকিও রাখ নি কিছু—'

মনুর মাথায় একটা চাঁটি মেরে উৎপলা বললে, 'ট্যালার মত এই খাবারের জিনিসগুলোব কাছে থুবড়ি খেযে পড়ে আছিস যে! হাভাতে মেয়ে, বোস গিযে—ট্যাক-ট্যাক কবে তাকিয়ে আছে। গুষ্টিব খাঁই এখন থেকেই দমকে-দমকে চাড় দিয়ে উঠছে পেটে।'

মাল্যবানের ইচ্ছা হচ্ছিল এবারও সে উঠে যায়। কিন্তু তাতে কাবো শিক্ষা হবে না। যে যা হবে না, তাকে তা করা যাবে না। মাঝখানে থেকে না খেযে উঠে গেলে খিদের পেটে নিজেরও কোনো লাভ হবে না। মাল্যবানের সঙ্গে উৎপলা যদি টিকে থাকে মাল্যবানের মৃত্যু পর্যন্ত—এই বকম ভাবেই টিকে থাকবে; কোনো সংশোধনী বিজ্ঞানী বিদ্যে নেই এ-সব স্ত্রীলোকদেব শোধরাবে— আমেবিকা বা রাশিযার হাতেও; কোনো লক্ষ কোটি অব্যয কাল নেই ব্যক্তি মানুষের হাতে কযলাকে যা হীরে কবে দিতে পাবে।

মনু চেযারে এসে বসল বাপের মুখোমুখি। মাল্যবান তাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভবসা পাচ্ছিল না। মেয়েটির দিকে তাকাতেও গেল না সে। মেয়েটিব পাশে বসে আছে—কেমন কানাভাঙা খোনা খেমটা উত্তেজেব অবসাদে মাল্যবানের মন ভাবি হয়ে উঠতে লাগল। নিজে সে বাপ হয়েছিল— বিযে করেছিল—হীন কুৎসিত উচ্চুণ্ডে জীবনবীজ ছড়িয়েছিল ভাবতে-ভাবতে মন তার চড়-চড় করে উঠল। একটা পাখি সৃষ্টি করে তাকে যদি ইঁদারার অন্ধকারে ফেলে দেওযা হয—কোন ছটফট করে উঠতে লাগল মাল্যবানেব ভেতরটা। মাল্যবান ভাবছিল : উচিত ছিল তাব একা থাকা, খবরেব কাগজ পড়ত, অফিসে যেত, গোলদিঘিতে বেড়াত, সভা-সমিতিতে সামনের বেঞ্চে গিযে বসত, বেশি করে যেত থিওজফির সভায়, ফ্রিম্যাসনস হত, রাত জেগে ডিটেকটিভ উন্যাসের থেকে কলকাতা উইনিভার্সটিব মিনিট, নানা বকম কমিশনেব রিপোর্ট, ব্লু বুক, হাতেব কাছে যা-কিছু আসত, তাই পড়ত, ভাবত, উপলব্ধি করত—কেমন চমৎকাব হত জীবন তা হলে।

জীবনের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোককে জড়িয়ে নিযে—এ জড়িযে নেওযাব সমস্ত নিহিতার্থেব ছোব--পোচড় গায়ে মেখে দধিতে কাদায মূর্খতায ওগরানো অম্বলে আগুনে অতৃপ্তিতে মণ্ডিত হযে কী হল সে।

খানিকক্ষণ থালায়-বাটিতে চুপচাপ ভাত-ডাল-তরকারি সাজিযে উৎপলা পবে বললে, 'ছোটবেলায বাপ-মা তোমাকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছিল বেশ—'

'কেন, কী হয়েছে, কী দেখলে তুমি?'

'না হলে এ-রকম হ্যাংলামো কেউ কবে?'

'হ্যাংলামো?' ভাতের থালাটা উৎপলার গায়ে ছুঁড়ে মারতে গিযে কোন বৈষ্ণবী শক্তিব জোরে যে বিরত হল মাল্যবান, দু-এক মিনিট খুন-চাপা রক্ত-চড়া মাথায কিছুই বুঝতে পাবল না সে।

আস্তে-আস্তে ঠাণ্ডা হচ্ছিল তার মন।

'তা নয তো কী—' উৎপলা বললে।

'কী করেছি আমি?'

'খুব যে আস্তিন টেনে ভাতের থালা কিলিয়ে পাকাচ্ছিলে—দেখছিলেই তো ভাত-ডাল-তরকারি মাছের বাটি তখনো তৈরি হয় নি। ঘাড়ের রোঁ শাদাটে মেরে গেল, এখনও ন্যালা কুকুরের মত খুব যে গুঁই-গাঁই-খুব যে গুঁই-গাঁই!' মাল্যবানের এক রাশি কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু খুব অল্পে সেরে দিযে

সে বললে, 'আমার খিদে পেয়েছিল, থালাটা চেয়েছিলাম তাই।' 'খিদে তো ঘোড়ারও পায়; তাই বলে মানুষের টেবিলটাকে আস্তাবল করে তুলতে হবে,' ভাতের থালাটা মাল্যবানের দিকে ঠেলে দিয়ে উৎপলা বললে, 'কুড়ি-পঁচিশ পেরিয়ে গেলেই সব কাপ্তেনি ফুরিয়ে যায়—ব্যাটাছেলেরা দিব্যি পুরুষ মানুষ হয়ে ওঠে—দিব্যি। সতের-আঠার বছর বয়সেই মেয়েরা স্ত্রীলোক হয়—কিন্তু বেয়াল্লিশ বছর বয়সেও ঢেস্কেলে কী থাকবে আর, ঢেঁকি ছাড়া?'

মাল্যবান ঘাড় ঝুঁকিয়ে খানিকটা দক্ষিণায়নে রেখে খাচ্ছিল।

উৎপলা এক গেরাস মুখে তুলে বললে, 'কপালে যদি হবার নয় লেখা থাকে, তা হলে সে-লেখা কপালের ঘামে মুছে যাবার নয় তো, ও-সব লেখা ঘামে-রক্তে মোছে না।'

মনু বুঝছিল না বিশেষ কিছু; মাল্যবান বলছিল না কথা কিছু; খাবার ঘরে নিস্তব্ধতা খানিকক্ষণ; যে যার মনে নুন মাখিয়ে, লেবু টিপে, জলের গেলাশ মুখে তুলে, তরকারির বাটি কাত করে খেয়ে যাচ্ছিল।

'কিন্তু অফিস থেকে এসে কী হয়েছিল শুনি?' বললে উৎপলা; গায়ের ঝালটা কিছুতেই মরছিল না যেন তার।

মাল্যবান খাওয়ার ধরন-ধারণ খানিকটা বদলে ফেলে একটু ভদ্রভাবে খেতে-খেতে বললে, 'কিছু হয় নি।'

'ঝপ করে অমনি মিথ্যে কথা!'

'কী হবে আবার।'

'চা না খেয়ে চলে যাওয়া হয়েছিল যে।'

'চা আমি বাইরে খেয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'দোকানে।'

'কে খাওয়াল?'

'কে খাওয়াবে আবার—'

'গাঁটের পয়সা ভেঙে খেলে তো?'

'সেই রকম খেতেই আমি ভালবাসি—'

'তোমার বন্ধুদেরও আশান হয়। কে আবার ট্যাকের পয়সা খরচ করে ডিমের বড়া খাওয়াবে ধরা-গণেশকে,' উৎপলা বললে, 'পয়সা খরচ করে তারা—খুব খরচ করে—কিন্তু মানুষ বুঝে—মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে—'

উৎপলা কঠিন নিঃশব্দ দৃষ্টিতে মাল্যবানের আপাদমস্তক কিছুক্ষণ প্রদক্ষিণ করে দেখল।

'এক পেয়ালা চা নিয়ে সাধে না; কেন, ঘরের বাইরে জলচল নেই তোমার?'

'চা নিয়ে সাধে না বাবাকে', মনু বললে, 'দই-মিষ্টি?'

মাল্যবান নিঃশব্দে একটা আলু টিপছিল।

'আহ্বান যা আসে তাও শ্বশুরবাড়ির থেকে। লোচনা ডোমেরও জামাইষষ্ঠী হয়—সেই রকম আর-কি। বেয়াল্লিশটা বছর বসে এত বড় পৃথিবীর ভেতরে থেকে মানুষসমাজে মানুষটা কানা—একেবারে ছুঁচো-চামচিকের পারা—'

উৎপলা খানিকটা জলে গলা ভিজিয়ে নিল, 'কোথাও ডাক নেই, কেউ পোঁছে না, হৈ-হল্লা নেই, ঘরে আড্ডা-মজলিশ নেই—খোল-করতাল কেত্তন-মুজরোর বালাই নেই—কোনো মানুষই আসে না—ডাকলেও আসে না। কিন্তু বয়ড়াকে কানে শোনাবে কে? ড্যাবড়াকে ডান হাত দেখিয়ে দিলে লাভ আছে?'

মাল্যবান খাচ্ছিল। মনু শুনছিল, হাসছিল, ভুলে যাচ্ছিল, মানে বুঝছিল না ফেলাছড়া করে অরুচি মুখে মাঝে-মাঝে আবার খুঁটছিল খাচ্ছিল—'

'সেই বিয়ের পর থেকেই দেখছি কেরানিবাবুর নীচের তলার ঘরটিতে দুটো চেয়ার; একটাতে তিনি নিজে বসেন, আর একটাতেও তিনি নিজে বসেন। হাফ-আখড়াই কে যেন আসত মাঝে-মাঝে—ওঃ অভিরাম সরখেল; হামলা হচ্ছে বলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।'

একটা ঘোলা নিশ্বাস ফেলল উৎপলা। কিন্তু ব্যথাটা লাগল মাল্যবানের বুকে গিয়ে বেশি—বন্ধুবান্ধব নেই বলে নয়—মাল্যবানের জীবনের নিঃশব্দতার খানিকটা যে সূক্ষ্ম মানে আছে, তার ওপর এ রকম

সূচীপত্রে যান

খিচুনি-খোঁচা এসে পড়ল বলে। অথচ উৎপলা মেজাজে থাকে না যখন আর, স্থির হয়—তখন আজীবন যে-সব বিচিত্র বেচাল কথা বকে গেছে সে সবের বেকুবি তাকে নিঃশব্দ করে রাখে—এমনই নিঃশব্দ, মনে হয় যেন সমুদ্রের ওপারে পৃথিবীর পারে সকলের নাগালের বাইরে অন্তহীন 'হচ্ছি' 'হব' পেরিয়ে, কেমন শাশ্বত 'হয়েছি'র নিবিড়তার ভেতর বসে আছে সে। কিন্তু এখন অন্য রকম উৎপলার, দুঃখের বিষয়, এইটেই তার আটপৌরে রকম।

একটা কাচের রেকাবি থেকে এক টুকরো লেবু নিয়ে ডালের সঙ্গে টিপতে-টিপতে অসাধ অসফলতার বাহনের মত কেমন একটা নিশ্বাস ফেলল উৎপলা; নিশ্বাসটা নিজের নিয়মে ঠিক—এত নিরাভরণ ভাবে ঠিক, যে মনে হয় অনেক অতল থেকে উঠে এসে নিজেকে মোটা ব্যবহারে খরচ করবার আগেই মিলিয়ে যায় সে; শুনলে মানুষের প্রাণ কেঁপে ওঠে।

পাতের কিনারে কাঁচা লঙ্কাটা ফেঁড়ে ঘষে-ঘষে ডালের স্বাদ বাড়াবার চেষ্টা করতে গেল না মাল্যবান আর। খাওয়া এখন অপ্রাসঙ্গিক। এই নারীটিকে নিয়ে কী সে করবে। উৎপলার এই সব ফাড়ন-ফোড়ন, শূন্যতা, দীর্ঘশ্বাস, আড়াআড়ি মাল্যবানের নিষ্ফলতা ও অব্যয় নিশ্বাস (মাল্যবানের মারাত্মক কফের মত বুকের ভেতর বসে গেছে, বাইরে তার প্রকাশ নেই, উৎপলা কোনো সময়ও টের পায় না) ঘরদোরের নিশ্চুপ বাতাসে ঘাই মেরে ফিরছে। কী হবে এই বাতাস ঘরদোর দিয়ে। এই নারী নিয়ে কী করবে সে।

'যে দু-চারজন লোক তোমার কাছে আসে, তাদের মুখের দিকে তাকাতে পারা যায় না।'

'কেন?'

'দেখতে তারা খুব খারাপ নয়, কিন্তু চুনো গন্ধ আসে রক্তের ভেতর থেকে। কোনো বিহিত-টিহিত নেই?'

'জানি না।'

'আমি তাদের সঙ্গে কথা বলি না তাই।'

'মানকচুর পাতার আড়ালে বসে আমার সঙ্গে কথা বলে ওরা। তোমাকে কোনোদিন দেখেছে বলে মনে হয় না।'

উৎপলা বললে, 'মানকচুর পাতার আড়ালেই বর্ষাকালটা তোমার জন্মে বেশ দু-চারটে ক্যাকড়া চড়িয়ে। ওদেরই মত তুমি। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?'

'কী হবে আলাপ করে?'

'আমি তা জানতাম। তোমার বন্ধুদের সম্পর্কে আমি যা ভাবি, পরের স্ত্রীরাও হয়তো তোমার সম্বন্ধে সেই কথাই ভাবে,' বলে উৎপলা এঁটো হাত দিয়ে জলের গেলাশটা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বললে, 'ছি, কী ঘেন্না!'

'না, এমন ঘেন্নার কিছু নয়—আমাদের দুজনের জীবন দুই রকম, এই যা।'

'এত বড় পৃথিবীতে একজন মেয়েলোকও তোমার সঙ্গে খাতির করা দরকার মনে করল না, না ভালবাসা, না স্নেহশ্রদ্ধা, না মমতা-সহানুভূতি—কোনো কিছু কেরানিবাবুটিকে দেবার মত নেই কারো। ওঃ, আমার একারই বুঝি দিতে হবে সব। লক্ষ্মীর ঝাঁপি!' উৎপলা বললে। বলতে-বলতে বলার মাথায় উৎপলা গলা চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এক জন বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমানভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তা হলে একটা দম আটকে আসত না আমার—'

শুনে মাল্যবান চমকে উঠল না, হেসেও উঠল না; খিদে ছিল; মাল্যবানকে খেতে না দিতে চায় না উৎপলা; কিন্তু অবস্থা তো এই রকম। টেবিলে যা জিনিস আছে, তাতে চার-পাঁচ জনে খেতে পারে, কিন্তু মনু নিজেরটুকুই খেয়ে উঠতে পারছে না; আর দুজনের তো খাওয়া বন্ধ; চমৎকার কবিয়ালি লড়াই শুরু করেছে সময় বুঝে তারা।

টেবিলে মাথা রেখে মনু ঘুমিয়ে পড়ছিল। মাল্যবান একটা লেবুর খোসা নিয়ে আঁক কাটছিল থালার ওপর চুপচাপ।

'আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, বাধ্য হয়ে অনেক কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হয়—'

মাল্যবান লেবুর খোসা দিয়ে থালার ওপর স্বস্তিকা আঁকছিল—একটা—দুটো—তিনটে—কোনো কথা বললে না।

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারে সব মানুষই স্বাধীন—কিন্তু এমন পাকা ঘরে জন্মে বেটপকা ঘরে পড়েচি যে সে-স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছি—'

'বাধ্য হয়ে কী বিশ্বাস করতে হয় তোমাকে?'

'এ বিয়ে আমার হত, কিছুতেই ঠেকাতে পারতাম না, এই বিশ্বাস—'

'ওঃ, এই বিশ্বাস—' থালার স্বস্তিকাগুলো মুছে ফেলে জেঙ্গিস খাঁর নিশানের বাবটা পুচ্ছ—ইয়াকের উদ্যত পুচ্ছ, আঁকবার চেষ্টা করছিল মাল্যবান।

'কিন্তু এটা সংস্কার,' উৎপলা বললে, 'সত্য নয়। কিছুতেই সত্য নয়।'

'যেন গ্যালিলিও বলছে, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না পৃথিবীটা চৌকো, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না পৃথিবীটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেঙ্গিসের ইয়াকের লেজ আঁকতে-আঁকতে একবার মুখ তুলে অবনমিত গ্যালিলিওব দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত লাগল মাল্যবানের—কেমন একটা আভা যেন উৎপলাকে ঘিরে—বিজ্ঞানের পরাসত্যের জন্যে তপস্যা করছে সে—সংগ্রাম করছে।

'তোমাকে আমি না বিয়ে করেও পারতাম। সেইটেই সত্য।' উৎপলা বললে।

'আমারও তো তাই মনে হয়। পাখিটাকে ফাঁদে ফেলে সেই ফাঁদটাকে সত্য বলে নির্দেশ দেবার কোনো অর্থ হয় না। আকাশ সত্য নীড় সত্য পাখির আছে—'

উৎপলা এবাব ভাত-তরকারির দিকে মন দিয়ে বললে, 'আমি তাই বলছিলাম—'দুই-এক গ্রাস খেয়ে সে বললে, 'অনুপম মহলানবিশকে তো বিয়ে করতে পারতাম আমি—'

লেবুর খোসা দিয়ে নখ দিয়ে, জেঙ্গিসের ইয়াকলাঙ্গুললাঞ্ছিত নিশান এঁকে ফেলেছে মাল্যবান—বাবটা লেজই এঁকেছে—থালাব ওপব; চোখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'কে অনুপম মহলানবিশ?'

'ঐ বকম এক জন লোককেই বিয়ে করার কথা আমার। সেইটেই সত্য হত কিন্তু পৃথিবীতে সত্যের মুখ দেখতে পাওয়া কঠিন।'

থালাব ওপর জেঙ্গিসেব লাঙ্গুলেব দিকে তাকিয়ে মাল্যবান বললে, 'ও, হ্যা, অনুপম মহলানবিশ; মহলানবিশেব কথা শুনেছি আমি। অনুপম মহলানবিশ, ধীবেন ঘোষাল, নসু চৌধুরী—যেন বালেশ্বর যুদ্ধের, মেছোবাজাব বোমার, কাকোবি মামলাব, চাঁটগাঁ আবমাবি বেডেব শহিদ সব; কিন্তু তা নয়, এরা অন্য লোক, বিষয়ী লোক—এদের কথা আমাকে অনেক বাব বলেছ তুমি। এদেব কারুব সঙ্গে তোমাব বিয়ে ঠিক হত, দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু তা হয় নি। কিন্তু তাই বলে, তুমি হিন্দুঘবের মেয়ে বলে যা হল না সেটা সংস্কাব, যা হয়েছে সেটা সত্য—এটা তুমি না মেনে পাবছ না বলছ?'

খাবাব থালাব থেকে মুখ তুলে উৎপলাব দিকে তাকিয়ে মাল্যবান বললে, 'না মেনে পাবছ না বলছ। কিন্তু সত্যিই মানছ না। তোমাব বক্তেব ব্যাধি-জীবাণুগুলো হয়ত মানছে, কিন্তু শ্বেতকণিকাগুলো মানছে না, তোমাব আত্মা মানছে না।'

উৎপলা একটা ভাল নিশ্বাস ছেড়ে বলতে-বলতে গিয়ে বললে না কিছু। মাল্যবান পার্শে মাছেব ঝোল দিয়ে ভাত চটকে লেবুব রস নিংড়ে নিচ্ছিল, লেবুব খোসাটা ফেলে দিয়ে বললে, 'হিন্দু বৌদেব বোঝাবে কে যে এর চেয়ে স্থিব বৈজ্ঞানিক সত্য নেই কিছু আব। এক হাজাব বছব কেটে গেলেও বুঝবে কি তাবা?'

মীমাংসাটা ভাল লাগল উৎপলাব, বললে, 'টেববিস্ট বলত সবাই অনুপম মহলানবিশকে। ডাকগাড়ি রেলগাড়ি লুট, ব্যাঙ্ক লুট, আর্মাবি লুট, কত কী করেছে অনুপম—কত জেলে পচেছে দেশকে স্বাধীন কবতে; একবাব ফাঁসির হুকুম হয়ে গিয়েছিল অনুপমের, কিন্তু কী কবে তা বাতিল হল টেববিস্টদের দলে থেকে আমিও তা টেব পেলাম না।'

জেঙ্গিস খুব বড় খাঁ ছিল, ভাবছিল মাল্যবান, দুর্দান্ত লোক ছিল মোঙ্গলগুলো, কিন্তু কারণকর্দমেব ভেতর মৃণালেব মত ছিল কুবলাই খাঁ।

'কই, কখনো বল নি তো আমাকে তুমি সন্ত্রাস-ষড়যন্ত্রেব ভেতবে ছিলে?'

'বলে কী হবে,' উৎপলা বললে, 'এখন তো আব নেই। ছিলাম অনেক আগে'

'ফাঁসি বাতিল হয়ে গেল অনুপমবাবুর? আন্দামান হল?'

'না।'

'তাও হল না? তা কী করে হয়?'

'তা ইণ্ডিয়া-সেক্রেটারি বলতে পারেন। জেলও তো হল না।'

'জেলও হল না?' থালার ওপব থেকে সমস্ত লাঞ্ছনা মুছে ফেলে পার্শে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে-খেয়ে শেষ করে এনেছিল প্রায় মাল্যবান; থালাটা আবাব পবিষ্কাব হয়ে এসেছে প্রায়; আবার ছবি আঁকা

যাবে—আর-এক জন বড় খাঁর বড় আঁকবে সে—কুবলাইয়ের ছবি।

'জেলও হল না, অ্যাপ্রুভার হয়েছিল বোধ হয় অনুপমবাবু?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু অ্যাপ্রুভার হয়েছিল বলে তার জন্যে টান কমে নি তোমার?'

উৎপলা ঘাড় বাঁকিয়ে ছুরি দিয়ে একটা লেবু কাটতে-কাটতে বললে, 'টেররিস্টরা বলেছে অনুপম স্পাই ছিল। হয়তো ছিল। হয়তো ফাঁসি হলে না বল ঐ কথা বলেছে।'

স্পাই?' মাল্যবান একটু বিলোড়িত হয়ে বললে, 'সে তো অ্যাপ্রুভারের চেয়েও খারাপ। না কি অ্যাপ্রুভার স্পাইয়ের চেয়ে খারাপ। স্পাই?'

'অনুপম স্বদেশী করছে, না স্বদেশীদের লাটেব কিস্তিতে চড়াচ্ছে, সে সব ভেবে তাকে ভালবাসি নি আমি। সে স্পাই বুঝি?' উৎপলা নিজের দৃষ্টিব ভেতব থেকে কুয়াশা সরিয়ে নিয়ে পরিষ্কাব চোখে মাল্যবানের দিকে তাকিযেই চোখ ফিরিয়ে নিযে একটু ঠাট্টা, বিষণ্ণতা ছিটিয়ে হেসে বললে, 'হবে স্পাই। অ্যাপ্রুভার হলে হবে। আমাব তাতে কিছু এসে যায় না। মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোর নিয়ম আমাব আর-এক রকম। জল নিয়ে কথা নয়, পুকুর, নদী, সাগরে, ঢাউস জল তো আছে; কিন্তু সেই জল কি আছে—ফটিক জল?'

না, তা নেই। অনুপম অ্যাপ্রুভার বলে নয়, অনুপম বলেই মেঘজল। মাল্যবান মাথাব উপবে খুব বেশি পাওয়ারের আলোটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ধাঁধিযে ভাবছিল, বাঙালি হিন্দু পরিবাবেব উৎপলা আর সে রয়েছিল বলে দুজনের এই দাম্পত্য সম্পর্ক টিকল বার বছর। এই বারটা বছব উৎপলার অনিচ্ছা-অরুচির বঁইচি-কাঁটা চাঁদা-কাঁটা বেত-কাঁটার ঠাসবুনোন জঙ্গলে নিজের কাজকামনাকে অন্ধ পাখির মত নাকেদমে উড়িয়েছে মাল্যবান। কত যে সজারুব ধাষ্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়েব কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল, আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির। কিন্তু সে-থাবাব সামনে হরিণ বা বনগোরু না হযে রাযবাঘের মত রুখে দাঁড়ালে মযূবীব মত উড়ে যায ডাল থেকে ডালে অদৃশ্যলোকের ঘরপাতাব ভেতর কোনো এক জাদুব জঙ্গলে এই মেযেটি; না হলে মযনাব মত পাযেব কাছে মরে পড়ে থাকে—হলুদ ঠ্যাং দুটো আকাশেব দিকে। জীবনটা আমার যা চেয়েছিলাম তা হল না, যা ভয করেছিলাম তার চেযে বেশি ভযে, বেশি শোকে গড়িযে পড়ল—ভাবছিল মাল্যবান। কিন্তু আমি—ভেবে-চিন্তে—আমি পুরুষমানুষ একটা পথ কেটে নিতে পাবি, কিন্তু একটা দার্শনিক প্রস্থানে আমি পৌছতে পাবি বলেই নয,—এমনিই, উৎপলাব জীবনেব বিতিকিচ্ছিবি নিষ্ফলতা, ব্যথা আমি পাই নি। মনু ও উৎপলা খেযে মুখ ধুযে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেল। মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালাল। খাবাব ঘব ছেড়ে হাঁটতে-হাঁটতে— ছাদের ওপব দু-মুহূর্ত দাঁড়িযে, শীত বাতেব আকাশেব আগ্নেয গুঁড়িগুলোকে এক নজবে একটা সুপরিসব চিলদৃষ্টিব ভেতব কবলিত কবে— উৎপলাব ঘবে গিযে ঢুকল। টানতে-টানতে চুরুটটা যখন বেশ জ্বলে উঠেছে, খুব ধোঁযা উড়ছে, রাশি-রাশি ধোঁযা বেরুচ্ছে মাল্যবানেব নাকমুখেব ভেতর থেকে—মাল্যবানেব মন কোথায যেন চলে গিযেছিল, এখন আবাব অবহিত হযে উঠল। দেখল স্ত্রীর ঘবের বাতি নিভে গেছে—চাবিদিক অন্ধকার; মশারি টাঙিয়ে উৎপলা শুযে পড়েছে, ঘুমিযে পড়েছেও হযতো। উৎপলার মশারির ভেতর লেপের ভেতর শুযে পড়তে ইচ্ছা কবছিল মাল্যবানেব। কিন্তু এ-ঘরেব চমৎকাব শীত ও অন্ধকার ছেড়ে নীচেই যেতে হবে তাকে।

চুরুটেব মুখে ছাই জমেছে, টোকা দিযে ঝেড়ে নীচে নেমে গেল।

পরদিন সকালে টেবিলে চা খাওযাব সময উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'কাল চাযেব দোকানে কী খেলে?'

'চা আর বিস্কুট।'

'আব কিছু না?'

'না।'

'বাবা যে সোনাব ঘড়িটা তোমাকে দিযেছিলেন, তার দাম তিনশ নয—চারশ টাকা, আমাব নোটবুকে লেখা ছিল দামটা, দেখছিলাম। আজকাল সোনাব দাম বেড়ে গেছে—হযত দুশ টাকায বিকোবে। টাকাগুলো হাতে থাকলে—মেজদাবা আসছেন—সুবিধে হত তাদেরও, আমাদেরও। কিন্তু তবুও তুমি তো নিজের ঢেঁকি ছাড়া পাড় দেবে না।'

উৎপলা এতক্ষণ চাযে চুমুক দেয নি। এবার চার-পাঁচটা চুমুকে আধ পেযালা চা শেষ কবে

পেয়ালাটা একটু সরিয়ে রেখে বললে, 'শুধু কি তাই, ঘড়িটা তোমাকে বেচে দিতে বলেছিলাম, তাই রাগ করে চায়ের দোকানে গিয়ে খেলে। এ আবার কী রকম—হিগলে পিগলে—হিগলে পিগলে—মেয়ে-মানুষের মত নোলা ছব-ছব করছে ঘড়িটা বিক্রি করাব কথা পেড়েছিলাম বলে— এ আবার পুরুষ? কী রকম পুরুষ তা হলে। এ সব পুরুষ মানুষের ভরার মেয়ে বিয়ে করা উচিত।'

ঠাণ্ডা শান্ত করুণ ভাবে কথা বলছিল উৎপলা। একটা চাপা ঝাঁঝ যে না ছিল তা নয়। মাল্যবানেব চোখে ভাব এলঃ উৎপলার হৃদয়টা বাস্তবিকই বেশ, ভাইয়ের জন্যে এই সুচিন্তাটুকু আগাগোড়াই সৎ; আমার বদলে অন্য কোনো মানুষকে—উৎপলার শাদা রক্তকণিকা যাকে চায়, তাকে যদি পেত সে, তা হলে নারীটিব মনেব প্রাণের স্পষ্ট প্রবণতাগুলো শত পথ খুলে যেত যেন—সরলতায়, সবলতায়—

ভাবতে-ভাবতে মাল্যবান চোখ বুজে কেমন একটা শামকল পাখির মত মুখে নিগূঢ় হয়ে বসে রইল : অনেক মন্ত্রগুপ্তি রয়েছে যার, সোনাব ঘড়িটা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না সে। নিজেকে যে এই রকম দেখাচ্ছে, তাও টেব পেল মাল্যবান।

'আমার সোনার নেকলেসটাই বিক্রি করতে হবে। বাপেব বাড়িব মানুষদেব আমাদের রকম এই যে, দশ জনেব কাজে লাগলে কোনো জিনিসকে পুঁজি কবে রাখি না আমবা—ছড়িয়ে দিই চাবিয়ে দিই। কিন্তু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছি। বার বছব বাপেব ঘর ছাড়া। গোরুব মুত লেগেছে দুধে—কেন কাটবে না?'

মাল্যবানেব ভাবপ্রাধান্য—যা তাকে আবেশ দিয়েছিল—সময় মত ভাটাব টানে সেটা পড়ে যাচ্ছিল আবার; উৎপলা যা বলছিল, কিছু তার কানে ঢুকছিল শব্দতরঙ্গেব মত; মন উৎকর্ণ হয়েছিল—উৎপলা নয়, মাল্যবান নিজেও নয়, কিন্তু মাল্যবানেব মনেব অবচেতনা নির্ঝুমেব দিকে : কী বলছে সে? ঘড়িটা বিক্রি করো না, ঘড়িটা বিক্রি কবো, কবো না বিক্রি, করে দাও; কবো না করে দাও, কবে দাও। ঘড়িটা কি আজ বিক্রি করেছে সে? প্রায় তিন বছর আগে উৎপলাবই একটা টাকার খাঁই মেটাবার জন্যে বিক্রি করতে হয়েছিল ঘড়িটাকে। খুব ভাল করেই জানত তা। কিন্তু তবুও না-জানবার ভান করে-সোনার দর বাড়লেই সেই সোনাব ঘড়িটাকে বিক্রি করবার জন্যে তোলপাড় কবে; অন্য কোনো মানিকজোড়ের থেকে বিচ্ছিন্ন পাখিনীব মত এমনই বিজোড় এই মেয়েমানুষটি মাল্যবানেব জীবনে।

হাতে আব-একটা ঘড়ি আছে বটে মাল্যবানের, সেটা সোনাব নয়। সেটা বিক্রি করাতে হবে? না তা ঠিক নয়। শ্বশুব যে সোনাব ঘড়ি দিয়েছিল জামাইকে, সেটাই বাববাব বিক্রি করে, শ্বশুরেব ছেলে-পবিবারকে একটু তবিবতে বাখতে হবে মাল্যবানেব বাড়িতে, শ্বশুবেব মেয়ের বাপের টাকাতেই যে সব হচ্ছে, সে-উপলব্ধি নির্বিশেষে ভোগ কবতে দিতে হবে শ্বশুবেব মেয়েকে।

ব্যাপাবটা এই বকম তো? একে কী বলে? পিতৃগ্রন্থি? না কি, জোড়ভাঙা পাখি কূল পাচ্ছে না অথৈ শূন্যেব ভেতব, তাই সামাজিক সাক্ষীগোপালটিব চেয়ে ভাইকে নিকট মনে হয—পিতৃগ্রন্থি সক্রিয় হয় ওঠে? না, তা ঠিক নয়, মাল্যবান ভাবছিল, কোনো বিজ্ঞানেব ছকে ধবা যায় না। উৎপলা বিজ্ঞানাতীত।

পাথুবেঘাটাব বাড়িটা উৎপলা নিজেই একদিন মাল্যবানের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে দেখতে গেল। দেখে পছন্দ হল না তাব। অন্য কোনো বাড়িও সুবিধে মত পাওয়া যাচ্ছিল না। কাজেই ঠিক হল, মেজদাব পবিবাব এলে মাল্যবান নিজে কিছু কাল মেসে গিয়ে থাকবে।

মাল্যবান তার হাতের অবশিষ্ট ঘড়িটা, কতকগুলো সোনার বোতাম (লুকিয়ে রেখেছিল বাক্সেব ভেতর) বিক্রি করে শ-চারেক টাকা উৎপলাকে দিল। সোনার নেকলেসটা তাই আব বিক্রি করতে হল না।

এই সব নানা ব্যাপাবে উৎপলার মনটা খুশি হয়েছিল। এক দিন রবিবাব সে মাল্যবানকে বললে, 'মনু অনেক দিন থেকেই বলছে চিড়িয়াখানা দেখতে খুব ইচ্ছে কবে তার। আমিও তো শিগগির যাই নি। চলো-না, আজ যাই।'

তিন জনে ট্রামে উঠল। খিদিরপুরের ব্রিজের কাছে এসে মাল্যবান তাব পরিবাব নিয়ে ট্রাম থেকে নামল।

'বাঃ, আলিপুর-বা কোথায়, তুমি পথের মাঝখানে নেমে পড়লে যে—'

'এই বাজারটুকুর ভেতব দিয়ে যেতে হবে, মিনিট তিনেকেব পথ।'

খিদিরপুর বাজারেব পথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে উৎপলা নাক সিঁটকে বললে, 'ছি, মুর্গি-খাসিব বাজরেব ভেতর দিয়ে—। কলকাতা শহবে কি আর-পথ ছিল না!'

মনু বললে, 'রামছাগলেল বোঁটকা গন্ধ বেরুচ্ছে, বাবা। ইস, কী পেচ্ছাপেব গন্ধ, ছ্যাঃ! ঐ দেখ

সূচীপত্রে যান

একটা ছাগল কাটছে—'

'ও-দিকে তাকিও না মনু—'

'আমাদের যদি একটি ছোট অস্টিন গাড়িও থাকত, তা হলে এই নালা-নর্দমা পচা কাদা আর মুতের গন্ধ কি আমাদের নাগাল পেত, মনু?'

'আমি বড় হলে বাবা গাড়ি কিনবে,' মনু বললে।

'একেবারে চিড়িয়াখানার গেটের কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াত,' উৎপলা বলল, 'সেইখানে নামতাম।' উৎপলা একটা নিশ্বাস ফেলল, কিন্তু এ-নিশ্বাসটা চিংড়ি মাছ ঠোকরালে ফাত্‌না যে-রকম করে নড়ে, তেমনি হালকা আলতো উদ্দেশ্যহীন। চিড়িয়াখানার ভেতর ঢুকে উৎপলা বললে, 'এমন ঠাণ্ডা কেন গো, একবারে হাড়গোড় কেঁপে ওঠে যেন।'

'শালের ভাঁজ খুলে ভাল করে জড়িয়ে নাও, পলা।'

'না, এ পাট করা শালটা হাতেই থাক। শাল গায়ে দেবার মত শীত দুপুরবেলা কলকাতায় কোথাও পড়ে নি,' হাঁটতে বললে, 'এ-সব জিনিসের বাজে খরচ করতে হয় না। কেনই-বা এনেছিলাম, হারিয়ে যায় যদি!'

'আমার হাতে দাও।'

'না, থাক আমার কাছে।'

মনুর দিকে ফিরে উৎপলা বললে, 'বাঁদর দেখবি, মনু—'

ঝাঁকড়া মাথাটা নেড়ে উঠল, 'হ্যাঁ, দেখব।'

'তুই নিজেই তো একটা বাঁদর। তোকে এবার খাঁচায় আটকে রাখতে হবে। মনু, তুই আমার মেয়ে হয়ে জন্মালি রে!'

মাল্যবানকে বললে, 'চলো, বাঁদরের ঘরে যাই।'

গেল সকলে মিলে সেখানে।

মনু বললে, 'দেখেছ মা, কলার জন্যে হাত পাতছে; মা, কিনে দাও।'

'কলা দেবে না হাতি। যা খাচ্ছে, তাই হজম করে নিক।'

'কেন, হজম করতে পারে না? অম্বল হয়?'

উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'এ জানোযারগুলোর মুখ তো নড়ছেই-নড়ছেই, পেটে আলসার-টালসার হয় না?'

'কী জানি!'

মনু খুব অনুভাবাক্রান্ত হয়ে বাঁদরের খাঁচাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল; হঠাৎ উৎপলা মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরে টান মেরে বললে, 'তোকে এর মধ্যে পুরে দিলে বেশ ভাল হয়।'

আর-একবার একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'মানুষের পেটে জন্মেছিলি কেন বল তো দেখি।'

মাল্যবানের দিকে ফিরে উৎপলা বললে, 'চলো, বাঘ দেখতে যাই।'

কিন্তু, দুর্গন্ধে বাঘের খাঁচার থেকে অনেক দূরে পিছিয়ে থাকল সে। বাঘগুলোর দিকে তাকাতেও গেল না। নাড়ি উল্টে বমি আসছিল উৎপলার। বললে, 'চিড়িয়াখানার ঢের হয়েছে। চলো, এখন বেরিয়ে যাই।'

মনু বললে, 'বাঘ আমার মোটেই দেখা হল না। বাঘ দেখতেই তো এসছিলাম চিড়িয়াখানায়।'

কিন্তু, তার কথা কেউই গ্রাহ্য করল না।

মাল্যবান স্ত্রীকে বললে, 'এই তো এলে চিড়িয়াখানায়; এখুনি বেরিয়ে যাবে? চলো, পাখি দেখে আসি।'

'পাখি আবার একটা দেখে না কি। ও তো দিন রাত দেখছি।'

'না, না, সে-রকম পাখি নয়—'

'পাখি আমি সব দেখে ফেলেছি। ও আমার দেখবার পিবিত্তি নেই।

'কলকাতায় তো দেখ কাক আর চড়াই; সরাল, তিতির, কাকাতুয়া, ম্যাক্ক, কত রকম হাঁস, বক, ফ্ল্যামিঙ্গো, ধনেশ, শামকল—দেখবে এসো—দেখবে এসো—'

'যে-ধনেশ দেখাচ্ছ তুমি দিন-রাত।'

'আমি?'

'আরশোলা যে-রকম কাচপোকা হয়, তেমনি শামকল হয়ে যাচ্ছে তো ধনেশটা—' বলে ফির-ফির ফুর-ফুর ফিঃ-ফিঃ ফুঃ-ফুঃ করে হেসে উঠল উৎপলা।

তিনজনে মিলে সিন্দুঘোটক দেখতে গেল।

মনু অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে, 'সিংহ দেখা হল না আমার,' বার-বার মরিয়া হয়ে বাপ-মাকে সে তার আবেদন জানাতে লাগল, 'সিংহ দেখব। সিংহ কোথায়? ঐ যে সিঙ্গি ডাকছে!'

কিন্তু কেউ তার কথা কানেও তুলতে গেল না।

সিন্ধুঘোটকগুলো রয়েছে একটা পুকুরের মধ্যে—ঢের নীচে। চারদিকে দেয়াল। একজন শাহেব ছুঁড়ে-ছুঁড়ে হেরিং মাছ, না কী, দিচ্ছিল তাদের। উৎপলা চেঁচিয়ে বললে, 'উঃ, কত মাছ খাচ্ছে।'

'তা খাবে না-হাতির মত গতর।'

'গা কেমন—কেমন করে ওঠে যেন।'

'কেন?'

'এ যে বালতি-বালতি মাছ খেয়ে ফেলল।'

'তা খাবে বৈকি।'

'ডিসপেপসিয়া হবে না।'

মাল্যবান ঠোঁট চুমড়ে একটু হেসে বললে, 'হ্যাঁঃ, ডিসপেপসিয়া!'

মনুর মাথা দেয়ালের নীচে পড়ে থাকে; সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। বারবার নাকিসুরে বাবা-মাকে ডেকে-ডেকে বলছিল, 'কই, মাছ কোথায়? কী রকম করে মাছ খায়? কুমিরের মতন নাকি সিন্ধুঘোটক? কই, সিন্ধুঘোটক কোথায়?'

কিন্তু, রাজযোটকে যাদের বিয়ে হয়েছিল, সেই বাপ-মা এই মেয়েটির কোনো কথা খেয়ালের ভেতর আনল না।

উৎপলার কপালে গালে এমন সব খাঁজ ফুটে উঠল যে, কুৎসিত দেখাতে লাগল তার সুন্দর মুখটাকে; বোঝা গেল, তার বয়সে হয়েছে; অবসাদে বললে, 'এই তোমার চিড়িয়াখানা!'

'কেন, মন্দ কী।'

'নাঃ, এখানে আর-কোনোদিনও আসা হবে না।'

'আমার তো বেশ লাগে।'

'দেখবার ভেতর দেখতে চেয়েছিলাম তো বাঘ আর সিংহ। তাও, বাবা কী ভক-ভক করে গন্ধ আসে—কে এগোতে পারে!'

'বাঘ কেন, দেখতে হয় পাখি।'

'তোমার রুচি তো আমার নয়। শামকল পাখির চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখব আমি? তা হলে তো পাখিই সবচেয়ে ভাল মনে হত—সবচেয়ে ভাল লাগত শামকল পাখি—'

'তা হলে মন্দ হত কি?' প্রতীক পৃথিবীর সে-এক আলাদা নিগূঢ়তার ভেতরে যেন দাঁড়িয়ে বললে মাল্যবান বস্তুপৃথিবীর নারীকে।

'হল না তো।'

'আসছে জন্মে হবে।'

'আসছে জন্মে আবার শামকল! ওরে বাবা!' উৎপলা ধড়-ফড় কেঁপে উঠে বললে 'না রে বাবা, তার চেয়ে কোনো জন্ম না-পাওয়াও ভাল। জন্ম দিলে ময়ূর হয়ে উড়ে যাব আমি সেই গোরক্ষপুরের দিকে জঙ্গলে—'

'সেখানে সরবতি দই বিক্রি করছে বুঝি মহলানবিশ মশাই। বেশ, বেশ, যেও, চলো, চন্দনা, তিতির দেখে আসি—'

'মনু বললে, 'তিতির কী বাবা?'

'মাল্যবান কোনো উত্তর দিল না, উৎপলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'চলো, দাঁড়িয়ে যে, চলো। ডাকপাখি, বাজ, শিকরে বাজ, খানদানি শামকল দেখে আসি সব—দেখে আসি সব।'

কিন্তু একেবারেই কোনো তাড়া ছিল না উৎপলার। মাল্যবানের দিকেও তাকাতে গেল না সে, 'আমার একটু জিরোতে হবে রে বাবা। পাদুটো ধরে গেছে—মাজা ভেঙে গেছে—বাপরে!'

তিনজনে একটা গাছের নীচে ঘাসের চাবড়ার ওপর বসল।

বসতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ঘাসের ওপর যে বড় বসলে সবাইকে নিয়ে; ঐ তো বেঞ্চি ছিল।'

'বেঞ্চির চেয়ে ঘাসে বসতে ভাল লাগে আমার।'

মনু বললে, 'বেঞ্চির চেযে ঘাসে ভালা লাগে আমার।'

'ঘাসে আমার কুট-কুট করে,' উৎপলা বললে, বেঞ্চিতে গিয়ে একাই বসল সে, বসে বললে, 'কত লোক তো বেঞ্চিতে বসে আছে; বসতে ভাল লাগে বলেই তো,' উৎপলা নিজের মনেই তাবপর বললে, 'এত সব লোক চারদিকে; তাদের সঙ্গে বেশ তো খাপ খায় আমার, অথচ ঘরের মানুষদের সঙ্গে ঝাঁড়াঝাঁড়ির কোটাল। ঘাসে গা ছড়ে যায়, আমার শাড়ি নোংরা হয়, মুচি-মোচলমানের চন্নামৃতে গড়াগড়ি খেতে হয়—অথচ ঘেসুড়ে সেজে বসেছেন সব ওঁরা—ঘাষ!—ঘাস না হলে হবে না। আঁটি-আঁটি ঘাস বাঁধবে না কি তোমরা বাপ-বেটিতে মিলে—'কথা বলে যেতে লাগল উৎপলা—

মাল্যবানের থেকে উৎপলা হাত দশেক দূবে একটা বেঞ্চিতে বসেছিল, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই মাল্যবানের মনে হতে লাগলঃ এইটুকু ব্যবধান ঘোচাতে—সত্যিই যদি ঘোচাতে পারা যায়—উৎপলাব তরফ থেকে আহ্বান আসবে না কোনোদিন। তা ছাড়া, বেঞ্চিতে তো ঘাসের ভেতবে ঘাস নয়, মনু আর আমি ঘাস—ঘাসের ঢেউযে; বেঞ্চিটা ঘাসগাছের কাঠেও তৈরি নয়—ধানগাছেব কাঠেও নয়; সে-রকম কাঠ নেই কোথাও; কেঠো কাঠ আছে; এত ঘাস থাকতে কী ভীষণ কেঠো কাঠেব বেঞ্চি চারদিকে সব।

উৎপলা বললে, 'চলো, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি; প্রকাশবাবুব আজ সন্ধের সময়ে আসাব কথা ছিল।'

'পাখি দেখবে না।'

'আমি সিংহ না দেখে যাব না,' মনু বললে।

'আচ্ছা, ঐ যে একটা টেবিলের চাবদিকে বসে কযেকটি লক্কা মেযে চা খাচ্ছে, ওরা কাবা?'

'চিনি না তো, দেখি নি কোনোদিন!' মেয়েদের দিকে না তাকিয়েই মাল্যবান বললে।

'কেমন এক বিঘত পেট বার কবে শাড়ি পরেছে; কেমন কানের পাশে জুলপি ঝোলাবার কায়দাটুকু। নিশ্চযই আইবুড়ো এবা সব। বাস্তবিক, যাবা বিযে করে নি, তাদেবই রগড়—' বলে উৎপলা মুখ ফিরিয়ে চোখ দিয়ে গিলতে লাগল যেন মেযেকটিকে।

মাল্যবানের ভাল লাগল না, 'ওদের দিকে চোখ দিও না, বাপু। ওরা চা আর স্কোন খাচ্ছে। কেন চোখ লাগাচ্ছ পলা।'

মাল্যবান কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হযে ঘাসেব শিষেব শাদাব দিকে তাকিযে রইল; কিছুক্ষণ মনুব কোঁকড়া চুল নিযে খেলা করল; তারপব উৎপলাব দিকে ফিবে তাকিযে দেখল, তেমনি কবেই মেযেকটিব দিকে গোগ্রাসে চেয়ে আছে সে!

'এখানে এসে বসো তুমি—এই নবম ঘাসে।'

'চলো, এখন উঠি।'

'কোথায যাবে?'

'এখানে বসে কী আর লাভ।'

'তোমাব পা ব্যথা করছে, বলছিলে—চা খাবে?'

'না। ব্যথা কমে গেছে।'

'চলো-না, ঐ মেয়েদেব পাশে আব-একটা টেবিল খালি আছে—'

'না। ব্যথা কমে গেছে।'

'চলো-না, ঐ মেয়েদের পাশে আর-একটা টেবিল খালি আছে—'

'না, তুমি আমাকে আর-এক দিকে নিযে চলো।'

মেয়েকটির দিকে পিছন ফিবে হাঁটতে-হাঁটতে উৎপলা বললে, 'ভেবেছিলাম, আজ কপালে সিঁদুর-টিপ পরে আসব না—'

'কেন?'

'সব সমযেই এ-সবের কী দবকার।'

'হ্যাঁঃ, রেওযাজ উঠে গেছে,' মাল্যবান বললে, 'ও-সবের টিপ-টাপ ফেঁদে কী হবে।'

'যদি না সিঁদুর ধেবড়ে আসতাম, তা হলে এই মেয়েরা কী মনে করত, বল তো দেখি—'

মাল্যবান এ-কথা সে-কথা ভাবছিল, বললে, 'মনে করত একটা কিছু। মনে করার বালাই নিযে মবি আমি।'

'তোমাকে হয়তো মনে করত আমার মেসো কিংবা মামাশ্বশুর—'

'আমাকে যদি ওরা তোমাদের বাড়ির খাজাঞ্চি কিংবা সরকার মনে করতে পারত, তা হলে হয়তো খানিকটা লাভ ছিল—'

মাল্যবান হাঁটতে-হাঁটতে একটা চোরকাঁটা ছিঁড়ে খড়কে বানিয়ে বললে, 'সেই যে বিলতে গিয়ে মাখন-তোলা শিখে এসেছে—সব সময়ে শাহেবি পোশাকে থাকে, শাহেবি করে বেড়ায় সেই যে মাখন-তোলার শাহেব আমাদের মতীন চৌধুরী গো—তাকে যদি সঙ্গে করে আনতে পারতে, তা হলে তোমাকে ওরা ছো-ছো করে চিলের চোখ দিয়ে দেখে নিত বটে। ওদের ঐ রকমই তো স্বভাব। আমার মতন ধনকৃষ্ণের সঙ্গে চিড়িয়াখানা রোঁদ দিতে এসেছ—এ আবার একটা দেখবার কী। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবে কে!'

'মতীন চৌধুরী কে?'

'আহা, বললাম যে বিলেত থেকে মাখন তুলতে শিখে এসেছে।'

'দুধের থেকে মাখন তুলতে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাখন তোলার সাহেব—'

'তার সঙ্গে আমি চিড়িয়াখানায় আসতাম—মানে?'

'এমনি বলছি—কথার কথা—'

'তুমি বড্ড বেকুব।'

'আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলাম—'

কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে চলছিল না তারা, কোনদিকে যাচ্ছিল খেয়াল ছিল না, এমনি শীতের বিকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল চিড়িয়াখানার চিলতি-চিলতি মাঠ ঘাসের ভেতর-বাস্তায়-বেরাস্তায়।

'তোমার মাইনে তো আড়াইশ হল। রিটায়ার করবার আগে কত হবে?'

'দুশ পঁচাত্তর—তিনশ—'

'এর বেশি না?'

'না।'

উৎপলা ভাবছিল। চিন্তার মাঝপথে থেমে বললে, 'আড়াইশ টাকা মাইনেতে কি গলাবন্ধ কোট ছাড়া আর-কিছু পরা যায় না?'

'কেন যাবে না? ধুতি-পাঞ্জাবি পরা যায়! আজ-কাল অনেকেই তো তা পরছে।'

'তা নয়, আমি বলছিলাম হ্যাট-টাইয়ের কথা। কেন পর না তুমি? পরলে মানায় না বটে তোমাকে? কেমন যেন খাপছাড়া দেখায়। এ-রকম হল কেন?'

'কেন হল?' মাল্যবান তার হাতের ঘাসের শিষটা দাঁত দিয়ে কাটতে-কাটতে বললে, 'চিনি মিষ্টি আর নুন নোনতা কি না উৎপলা—সেই জন্যে হল।'

খানিকটা দূর নিঃশব্দে এগোল তারা। মনুর কথায় কেউ কান দেয় না, নালিশ কেউ শোনে না, সেই জন্যে সে অনেকক্ষণ থেকেই চুপ মেরে গিয়েছিল।

উৎপলা বললে, 'খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে—চেঁচে এলে না কেন?'

'হঠাৎ তোমরা সকলে বললে, চিড়িয়াখানা দেখবে—সময় পেলাম কোথায়?'

'তাই তো! কী দিয়ে চাঁচবে—জিনিস পাবে কোথায়!'

'দাড়ি যারা সত্যিই চাঁচে, প্রথম পক্ষের মাগকে শ্মশানে পোড়াতে-পোড়াতে গালে হাত বুলিয়ে নেয়—'

'তাই নেয় বুঝি।'

'দাড়িটা কামানো হল কি না দেখে নেয়।'

চিড়িয়াখানার থেকে বেরুচ্ছে না—কিছু দেখছে না—বসছে না কোথাও—পয়চারি করার মত আস্তে-আস্তে হাঁটছে—ঘাসের ওপর দিয়েই বেশি। কোথায় চলেছে—কেন চলেছে—খেই-খেয়াল না হারালেও শুধোচ্ছে না কেউ কাউকে। মনু কোনো কথাই বলছি না। তার পা টাটাচ্ছিল, বুক ধড়ফড় করছিল, জিভ শুকিয়ে আছে অনেক্ষণ। কিন্তু তার কোনো কথায়ই কেউ সাড়া দেয় না, সায় দেয় না বলে কাউকেই সেই কিছু বলতে পারছিল না। মনু খানিকটা পিছে পড়ে গিয়েছিল; তার জন্যে দুজনে খানিকক্ষণ থেমে দাঁড়াল। মনু এল।

সূচীপত্রে যান

মাল্যবান ঠিক উৎপলার মনের মত ঠাঁটে পা ফেলে হাঁটতে পারছিল না। পাদুটো কিছুতেই আড় ভাঙতে চায় না যেন উৎপলা যা চায় মাল্যবানেব পাযে—পদক্ষেপে সে সৌন্দর্য, মাত্রা, দৃঢ়তা কিছুতেই ধরা পড়ে না। হাঁটতে-হাঁটতে তারা বাঘের ঘরের কাছে এসে পড়ল আবার। খাঁচার ওপর থেকে থপাস-থপাস করে ছুঁড়ে কাঁচা মাংস দেওয়া হচ্ছিল জানোয়ারগুলোকে—

'কী রকম করে এরা মাংস খায়, দেখবে এসো।'

উৎপলা মাথা নেড়ে বললে, 'এখন বেরিয়ে যাব।'

হাঁটতে-হাঁটতে নিজেকে সান্ত্বনা দিযে উৎপলা বললে, 'আমার দাদা, মেজদা, ছোড়দা, এ-রকম নয। কখনো ন্যাং-ন্যাং করে হাঁটে না তারা।'

সামনে তাকিয়ে দেখল দুটো মস্ত হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে—আশেপাশে অনেক ডাল-পালা কেটে রাখা হযেছে, হাতিগুলো ক্রমাগত শুঁড় দিয়ে সেগুলো টেনে-টেনে খাচ্ছে।

মনু বললে, 'দেখলে বাবা, কী বকম শুঁড় দিয়ে কলা টেনে নিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে দেয!'

একটা মুসলমান ছেলে কলা দিচ্ছিল—পাঁচ-ছটা হাতি, কিন্তু কলা মাত্র দশ-বারটা; কিন্তু হাতিগুলোর হায়া আছে, নিযম মেনে চলাটা দেখবার মত; পাশাপাশি কটাতে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কেউ কারো ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে না, যার কপালে যেটুকু প্রসাদ পড়ছে, তাই নিয়েই তৃপ্ত; তাবপব ডালপালার দিকে মন।

মাল্যবান বিমুগ্ধ হযে দেখছিল; বললে, 'মানুষেব চেয়ে জীবনটাকে এরা বেশি বোঝে। জীবনের কষ্ট ও একঘেযেমি সহ্য করবাব ক্ষমতাও এদেব চীনেব বা ভারতের জ্ঞানভিক্ষুদেব মত। বাস্তবিক, হাজার-দুহাজার বছব আগে এরা ভারতে-চীনে সমাজের বড়-বড় জায়গায দাঁড়িয়ে দেখেছে, শুনেছে, বক্ষা করেছে—ধর্ম-কর্মেব বিধান দিয়েছে বলে মনে হয।'

শুনে উৎপলা কোনো সান্ত্বনা পেল না। হাতিব কুলোর মত কান ও বুড়ো দিদিমার মত মুখ দেখে কেমন যেন কৌতুক, অসাধ, নিরেস অস্বস্তি বোধ করছিল সে। বললে, 'থাক, অনেক হয়েছে; এখন চলো।'

হাঁটতে-হাঁটতে মাল্যবান বললে, 'একবার বেবিযে গেলে ঢুকতে পাববে না কিন্তু আব।'

'আমি ঢুকতে চাইও না আব। এ-জাযগায কোনোদিনও আব আসা হবে বলে মনে হয না।'

'চলো, ছোলা কিনে নিয়ে কাকাতুযার ঘবে যাই; দানা খাবে আব পড়বে কা-কা-তু-যা।'

'এক-আধটা পাখি বেশ পড়ে। সবগুলোই পারে?'

'পড়ালেই পাবে। চলো।'

'থাক।'

'নানা বঙেব কাকাতুযা আছে, বেশ পশমেব মত পালক; ডানাব দিকে তাকিযে মনে হয যেন আগুনেব থেকেই উৎপত্তি হযেছে ওদেব সব—আগুনের ভেতর খেলা কবছে সব—আগুনে-আগুনে খেলা করে একদিন আকাশে নীলিমায মিলিযে যাবে—চলো-চলো'—

উৎপলা দাঁড়িয়ে রইল; আঙুল দিযে দেখিযে দিযে বললে, 'ঐ তো টেবিলটা, সেই মেযে চাবটি ওখানেই বসেছিল? ওখানে?'

মাল্যবান কিছু বলবার আগে উৎপলা বললে, 'কোথায গেল তারা?'

'চলে গেছে।'

'চিড়িযাখানার ভেতব কোথাও তো তাদেব দেখলাম না।'

'বেবিযে গেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি বেরুল যে?'

'ঢুকেছিল আমাদের ঢেব আগে। দেখা-শোনা মজামারা হযে গেল—বসে থাকবে কেন। বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন কি সারাদিন বসে খাবে?'

মাল্যবানের অন্নপ্রাশনের কথাটা কোনো কথা নয; একবার দাঁত দিযে চিবিযে চোযাল শক্ত করে কথাটা তারপর ঝেড়ে ফেলে দিল উৎপলা; বললে, 'দেখলাম, মেযেকটির প্যাঁচে-প্যাঁচে বেশ জিগিপির রস। হাত তুলে ফুর্তি কবছে। আগা-পাশতলা মিঠিযে-ঝিকিয়ে কী ফুর্তির তোড়—সারাটা সময; টেঁসে যাচ্ছে না তো—আমার ও-রকম হয না তো।'

'বেঁচে যেতে বুঝি ওদের মত ফুর্তি করতে পাবলে?'

'হলে কেমন হত?' একটা বীতকাম নিশ্বাস ছেড়ে উৎপলা বললে।
'ফুর্তি মানে আমোদ—'
'আমোদ বলছ তুমি?'
'সত্যিকারেব আমোদ—'
'মানে, আনন্দ?'
মাল্যবান ঘাসের ওপর পিচ কেটে বললে, 'ওঃ, ঐ সব মেযে! ওরা তো ছেনাল—আনন্দ-আমোদের ইষ্টকুটুম আমার সব। ওদের কথা ভাবে মানুষে! ওদেব ঘাঁটিযে আবাব কথা বলে!' মাল্যবান দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পিচ কাটল ঘাসের ওপর আবার।
'তবে কী; ছাগল দিযে ধান মাড়িয়ে দশ মুখ করে সেই ছাগলেব কথা বলে বুঝি?'
চলতে-চলতে মাল্যবান থেমে গেল, 'কোথায যেতে চাচ্ছ তুমি?'
'এবার চিড়িয়াখানা থেকে বেরিযে যাব,' উৎপলা বললে।
'আমি তা বলছি না। তুমি বাখালি করে ধান খেতে চাচ্ছ তো ছাগলকে সরিযে দিযে। ঐ মেয়েগুলোব মত পাটে এসে বসতে চাচ্ছ তো—'
'কে না চায পেতে বসবার পাট। কিন্তু দেবার ভার তো শামকলেল ওপব নয। মনু, এদিকে আয। কেউ কারু ওপর বরাত দিতে পাবে না। ধনেশ পাখি ঠোঁট কেলিযে বসে থাকবে-মাড়োযাবি কবে তার তেল নিতে আসবে, সেইজন্যে-চন্দনা নিজেব পাটে উড়ে যাবে। মনু!'
মাল্যবান চিড়িযাখানার থেকে বেরিযে যাবাব গেট এড়িয়ে অন্য পথ ধবে চলতে লাগল। উৎপলা বুঝতে পাবল না। অনেকক্ষণ হেঁটে বললে, 'কই, এ-গোলক ধাঁধা ফুবোয না দেখছি—'
'বেরুতে চাও?'
'মনু কোথায গেল—'
'চলো ঘুবি।'
'ঘোরো তুমি।'
'তুমি কী কববে?'
'একা তো বেবিযে যেতে পাবব না,' কাছে একটা বেঞ্চিতে গিযে চোখ বুজে বসল উৎপলা!
'পা টাটাচ্ছে?'
একটা খালি বেঞ্চি—আলগোছে তাব এক কিনারে বসে পড়েছে উৎপলা—একটা হাত তাব বুকে-আব—একটা কোলেব ওপব ভাটাব টানে সমুদ্র সবে গেলে ভিজে ঝিনুক, পবগাছাব ঠাণ্ডাব মত করুণ হযে পড়ে আছে। খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক উঁচু-উঁচু গাছেব মাথায আকাশেব মেঘ আলোব দিকে তাকিযে কী যেন কেমন একটা অন্তিমপ্রতিম অর্থ অবধান কবে তারই কাছে শান্ত নিস্তব্ধ হযে নিজেকে নির্বিশেষে ছেড়ে দিল উৎপলা; একটু কাত হযে ডান হাতেব ওপব মাথা পাতল; চোখ বুজে এল।
মনুও ঘাসের ওপব ঘুমিযে পড়েছে।

পরদিন উৎপলা আগ বাড়িয়ে বললে, 'সিনেমায চলো।'
অফিস ছুটি ছিল সে-দিনও, তিনটেব শো-তে গেল তারা। ট্রাম থেকে নেমে উৎপলা বললে, 'বক্সে বসবে তো?'
'না, সে ঢের খবচ।'
'তা হলে কোথায় যাবে আবার। ছবিতে বক্সে না বসলে ভাল লাগে না।'
'কেন, নীচেব গদিতে বসেও তো বেশ আবাম।'
'আরামের জন্যে বলছি না আমি—'
'তবে?'
'বক্সে বসলে নীচের লোকেবা হাঁস-হাঁসিনের মত ঘাড় বাঁকিযে আমাদের দিকে তাকায, দেখতে বেশ লাগে।'
মাল্যবান হেসে বললে, 'ওঃ, সেই কথা; দু-তিন ঘণ্টার জন্যে তো শুধু, তার পর সিনেমা ভেঙে গেল কেউ কি আর বক্সের মানুষদের কথা মনে রাখে।'

'তা রাখে বইকি। যদি কোনো চেনা মানুষ নীচের থেকে আমাদের দেখতে পায়, তা হলে জনে-জনে বলে বেড়াবে কথাটা। আচ্ছা রগড়ই হবে! খুব কি খারাপ জিনিস হবে কথাটা চার হাত-পায়ে চতুর্দিকে ছুটে বেড়াবে—'

কেমন যেন নির্দোষ শয়তান মেয়ের মত হাসি—ডেঁপো ইশকুলের—উৎপলার পাউডার-ক্রিম মাখানো চমৎকার মুখখানাকে আঁকড়ে ধরল। হি—হি করে হাসতে লাগল সে।

মাল্যবান আড় চোখে একবার উৎপলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, তা নয়—তবে এতে আমাদের কী আর লাভ।'

'বেশ রগড় হয়।'

'ও-রকম রগড়ের কী আর মূল্য আছে।'

'মূল্য নেই? তুমি বললেই হল নেই? নিশ্চয়ই আছে। না থেকে পারে না।"

হাঁটতে-হাঁটতে উৎপলা বললে, 'সে দিন তো সোনার ঘড়ি বেচেছ, তিনশ পঁচাত্তব টাকা পেলে—বক্সের টিকিট কিনতে তোমার এত ভয়—'

'মিছেমিছি পয়সাবাজি করে কী লাভ।'

'মিছেমিছি হল?'

'চেনা মানুষ কে এমন থাকবে নীচে যে বাক্সে আমাদেব দেখে ঈর্ষায় বাতে ঘুমোতে পাববে না আর,' বলেই মাল্যবান একটু দাঁত বার করে হাসল।

উৎপলা বললে, 'ঝপ করে মিথ্যে কথা বলে ফেললে।'

'কেন, মিছে কথা কী হল?'

'ঈর্ষার কথা বলেছিলাম আমি?'

'বেশ মজা হবে, বেশ পাঁয়তারা কষা হবে, বলেছিলে তুমি। তা তো হবে, কিন্তু অন্যেবা ঈর্ষায় না পুড়লে রগড় ফলাও হয় কী কবে?'

'বেশ তো পুড়ুক হিংসায়!'

'বেশ। পুড়ুক।' মাল্যবান টিকিট ঘবেব দিকে এগিযে গেল।

মাল্যবান অবিশ্যি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটল—ম্যাটিনিব সমযে আদ্ধেক দামে পেলে-তিন-চাব টাকাও খবচ হল না তার।

'যাক, আমি বাড়ি ফিবে যাই—'উৎপলা প্লাগ ঢোকাতে গিযে বিদ্যুতের ঘা খেযে যেন বললে।

'কেন?'

'দেখব না সিনেমা।'

'তুমিই তো সকাল থেকে তাড়া দিলে সিনেমায আসবার জন্যে।'

'ঢেব হযেছে, আর কোনোদিন আসতে চাইব না।'

'কিন্তু এখন তো চলো।'

'তুমি আর মনু যাও।'

'আব তুমি?'

'ঠিক আছে। যাও তোমরা।'

'হুশ, এ-রকম ছেলেমানুষি কবে না কি, পলা।'

'কী টিকিট কিনেছ, দেখেছি আমি,' ঝামটা মেরে উৎপলা বললে,'ছেলেমানুষি? আমার? নাম ডোবালে তুমি। ধনমান খোয়ালে টিকিট কিনে। ওমা, থার্ড ক্লাসেব টিকিট!'

'কে বললে তোমাকে?' টিকিটগুলো উৎপলার চোখের সামনে ধরে মাল্যবান, বললে, 'সেকেণ্ড ক্লাস—'

'তবে দেড় টাকা নিলে কেন-সেকেণ্ড ক্লাসে তো তিন টাকা দু-আনা নেবার কথা—'

'ম্যাটিনিতে অনেক দিন পবে এলাম, তাই ভুলে গেছ দর-দস্তুর সব। এটা ম্যাটিনি—আদ্ধেক দাম—'

উৎপলা দু-এক পা হেঁটে মুখিযে এসে বললে, 'তা হলে ফার্স্ট ক্লাস করলেই পারতে।'

'ভেবেছিলাম, কিন্তু তাতে সিট বড় পেছনে পড়ে যেত।'

'আ মল! সিনেমায় পেছনে বসেই তো ভাল দেখা যায—'

সূচীপত্রে যান

'কিন্তু, তুমি চোখে তো কম দেখ—'

'কে, আমি?' উৎপলা মাল্যবানের দিকে সাঁ করে তার গালে চড় মারবার মত চোখ তুলে তাকাল, 'আমি চোখে কম না দেখলে সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেনার ওজর টেকে না? না কি?'

'তাই বুঝি তাই? গতবার যখন তোমাকে ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে গেলাম, তুমি সমস্তটা সময় আমাকে বললে, কিছু দেখছ না, ঝাপসা দেখছ—তুমি তো সামনে এগিয়ে বসতে চাইছিলে সে দিন'—বলতে বলতে মাল্যবান উৎপলার দিকে সোজাসুজি মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বললে, 'দাঁড়িয়ে রইলে যে—'

'আমি বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে একটা বাস ধরে চলে যাব।'

'ছবি দেখবে না?'

'উৎপলা মুখ ফিরিয়ে রইল।

মাল্যবান বললে, 'বেশ বাড়ি চলো তা হলে—'

'এ-টিকিটগুলো পাল্টে টাকা নিয়ে এসো।'

'এখন ফেরত নেবে কেন?'

'তা হলে বিক্রি করে দাও কারু কাছে।'

'কে কিনবে?'

'গলাবন্ধ ছিট, খোঁচা দাড়ি দেখলে কেউ কিনবে না বটে।'

আজ অবিশ্যি মাল্যবান একটা তসরেব পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছিল-, দাড়িও কামিয়ে ছিল।

একটু কাঠ মেরে গিয়ে, হেসে, হাসিমাখা দাঁতে কুণ্ঠায় সঙ্কোচে মাল্যবান ইতস্তত তাকাতে লাগল। কার কাছে চিকিট বিক্রি করা যায়। দু-চার জায়গা ঘুরে সুবিধে হল না। তাবপব একজন ভদ্রলোক টিকিট নেড়ে-চেড়ে বললেন, 'আজকের তারিখ তো? কলকাতা শহবে নানা রকম চোট্টা থাকে; যাক, তাবিখটা আজকেরই; হ্যাঁ, এই সেন্টারের সিটই আমি চেয়েছিলাম—আমি আর আমাব দুই মেয়ে। তা বেশ, টিকিটের মাথায় দু-আনা দু-আনা কম নেবেন, একুনে ছগণ্ডা পয়সা কমিয়ে দিতে হবে। আপনাব তো সবই ভাগাড়ে গড়াচ্ছিল—'

পকেট থেকে ব্যাগ বার কবে ভদ্রলোক বললেন, 'আট আনাব টিকিট ফুবিয়ে গেছে কিনা সাব। এসেছিও সেই চেতলার থেকে কলকাতায় ছবি দেখতে। ফিরে যেতে তো আর পারি না; নইলে আমি ও হাতির শুঁড় ব্যাঙেব লেজ সব অফিস থেকেই কিনি। তা এই একটা টাকা নিন, টিকিট তিনটে দিয়ে দিন আব-কি।'

উৎপলা মাল্যবানেব পাঞ্জাবির ঝুল ধবে এক টান মেবে বললে, 'কই, ভেতরে তো ঘণ্টা পড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল, তবুও তোমার ন্যাকড়া ফুবোয না দেখি।'

শুনে মাল্যবানেবা পা চালাতেই ভদ্রলোকটি বললেন, 'ও মশাই, ও মশাই, শুনছেন, দেড টাকাই দিচ্ছি, নিন, আসুন, নিন। ও মশাই, ও দাদা!'

আব ও দাদা! তিন জনে ভেতরে ঢুকল। মনু মাঝখানে, দু পাশে দু জন; গদি-আঁটা চেযাবে অন্ধকারেব মধ্যে বেশ লাগছিল মনুব—মাল্যবানেরও। 'বই' আরম্ভ হয়ে গেছে।

উৎপলা পর্দাটাকে অগ্রাহ্য করে ওপবেব দিকে তাকাতে লাগল বেশি। বক্সে কে কোথায় বসেছে ঠাহর করতে পারা যায় কি না, কোনো চেনা মুখ চোখে পড়ে কি না; ফার্স্ট ক্লাসেব সিটেই-বা কারা; এই সব নিয়ে অনেক কটা মুহূর্ত কেটে গেল তার। কিন্তু অন্ধকাবেব মধ্যে বিশেষ কিছু বুঝল না সে। তাবপব নিশ্বাস ফেলে অবসন্ন হয়ে ছবির দিকে তাকাল। একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুরুষ উৎপলার পাশেব সিটে বসে সিগাবেট টানছিল; মন তাব বিচ্ছিরি লাগছিল তাতে।

মাল্যবানকে বললে, 'তুমি এখানে এসো, আমি তোমাব চেযাবে গিয়ে বসি।'

সিট বদলে যখন বসেছে, 'উৎপলা দেখল তাব পাশে একটি অ্যাংলো-ইন্ডিযান মেয়ে চকোলেট খাচ্ছে আর কাশছে—

অনববত কাশছে—

ব্যতিব্যস্ত বোধ কবল উৎপলা, পব পর চার-পাঁচটি ফিরিঙ্গি মেয়ে বসে গেছে। উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'এ পাঁচ জন কি বি-এন-আর-এর মেয়ে না কি টেলিফোনেব—'

'আস্তে।'

মেয়ে কটি নিজেদের বাড়ির খবব, হাঁড়ির খবব, মাঝে-মাঝে ছবিব তাৎপর্য নিয়ে গল্প ছেড়ে

হাঁকড়াবার জন্যেই হাজির হয়েছিল। যখনই ঘরোয়া কথা বলবার তাগিদ জুড়িয়ে যাচ্ছিল, হেসে, হল্লা করে চিৎকার পেড়ে, পর্দার ছবিটাকে তারাই তো জিইয়ে রাখছিল—

'কিছু জানে না, বোঝে না, কলির সন্ধ্যায় কী করবে আর, চেঁচাচ্ছে—' একটু নড়ে-চড়ে বসে কৌতুকে ও বিমর্ষতায় বিমিশ্র একটা নিশ্বাস ফেলে উৎপলা বললে।

'কাদের কথা বলছ?'

'ফিরিঙ্গি মেমদের, গুল ছাড়ছে শুনছ না?'

'কেন ঘাঁটাচ্ছ ওদের?' মাল্যবান উৎপলার কাঁধের ওপর এক বার হাত রেখে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে।

কিন্তু, তবুও কথা বলবার দরকার আছে ঢের উৎপলাব। চাপা গলায় বললে, 'ছবি তো আমরাও দেখছি, বাপু, তোমারাও দেখছ। ছবি তো চিত্তিব; তা তো দেখছিই! কিন্তু তাই বলে দিক-বিদিকে নয়াল আভা ছুঁড়ে একবারে ঝোল বের করে দেবে না কি? পর্দায় এক জনে একটা ছেঁড়া ট্রাউজাব পরে এসেছে—অমনি হি-হি করে হাসি; একটা গাধা দৌড়ে গেল— অমনি হু-হু হু-হু; পকেটের থেকে এক জনে এক জোড়া নকল গোঁফ বের কবল—অমিন ফ্যা-ফ্যা; বাস্কেটের থেকে একটা ইঁদুব লাফিয়ে পড়ল তো আমাদের মাথাযও চাতাল ফাটল। হাতিবাগানে আগুন লেগেছে, না কি দমকল ছুটেছে, না কি শোভাবাজবেব দামোদর বাবুরা সব খুন হয়ে গেল—এ কী সব মাগীদেব কোলে কবে বসেছি আমি!'

মাল্যবান ঘাড় কাত করে একটা সিগারেট জ্বেলে নিল। উৎপলা বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদেব দিকে সে ফিরে তাকাল না। ছবিটা তাকে আকৃষ্ট করে নি। মাল্যবান ছবি দেখতে-দেখতে নিজেব সত্তাব ভেতরেব অঙ্গারশিল্প ও কাঠখোদাইয়ের আবছায়া মতন অনুপম ছবিগুলো দেখে নিচ্ছিল—চোখ বুঝে। বাস্তবিকই চোখ বুজে ছিল সে।...ঘুমোচ্ছিল না, কথা ভাবছিল; কারা যেন কোথায়—অনেক দূরে সঙ্গত কবছে। এক মনে শুনছিল সে।

মাল্যবানকে একটা ধাক্কা দিয়ে উৎপলা বললে, 'বেলি ব্রার্দাসেব, না, পোর্ট কমিশনের? বিয়ে করেছে, না, রাঁড়ি?'

মাল্যবান যেন অপরাশেন টেবিলের ক্লোবোফর্মেব ঘোব আস্তে-আস্তে কাটিয়ে উঠতে-উঠতে চোখ মেলতে-মেলতে বললে, 'কে?'

'এই যে মেমশাহেব কটি, আমাব পাশে যারা বসে আছে?'

'ওরা?' মাল্যবান অনেক খানি জেগে উঠে আবো জেগে উঠতে চেয়ে, তারপবে বললে, 'ওদেব দিয়ে তুমি কী কববে?'

'আমাকে ছবিটা দেখতেই দিচ্ছে না।'

'ওদের মনে ওরা থাক। ছবি দেখতে দিচ্ছে না বলছ। দেখ ছবি; দেখলেই তো দেখা হল!'

'বলে দিল কথা! আর বাপু, কী রকম গুল মারছে শুনছ না। হাড়হদ্দ ঘাঁটিয়ে বাব কবছে।'

'কিসের?'

'না কিসের?'

'ওদের কথায় কান দিও না।'

'কান টেনে মাথা টেনে নিয়ে যায়-যে-'বাপ, রে,' উৎপলা ধড়-ফড় চন-মন করে উঠল, 'আমাকে চেপে বসেছে। ধরছে-উঃ!'

'দেখ না, ছবিটা দেখো-'

'এই জন্যেই আমি বলেছিলাম বক্সের কথা। উঃ! ধবো ধরো—হাতিমুখো গণেশ এসে আমার কোল ঠেসে বসেছে বে বাবা—গেল—গেল—হয়ে গেল—হয়ে গেল আমাব—'

'ছবিটা দেখো, ছবিটা দেখো-'

মাল্যবানের সিটে এসে বসল উৎপলা।

মাল্যবানকে যেতে হল তার স্ত্রীর চেয়ারে। সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুরুষটি রইল উৎপলার পাশে। কিন্তু লোকটা চুপচাপ, উৎপলার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

খানিকক্ষণ স্ক্রিনের দকে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'খুব হিজিবিজি বই, না?'

'ছবিটা ভাল মনে হচ্ছে না।'

'খারাপও লাগছে না তোমার। আড়ি পেতে তাকিয়ে আছ তো বাপু।'

'কী করব, আট গণ্ডা পয়সা দিয়েছি—'

মনু ঘুমোচ্ছিল।

উৎপলা তার মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বললে, 'দেখ, ছবি দেখ—তোর জন্যেই তো গচ্চা গেল দেড় টাকা। খা-খা—গঙ্গার ইলিশ খা—না খাবি তো সুঁটকি মাছ খা। চারদিকে সব বকনা বাছুর হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাদের কানে ডাঁশ উড়ছে। কী খাবি খা—কী খাবি খা—' বলে গাঁট্টা মারতে-মারতে মনুকে জাগয়ে দিল উৎপলা।

মনু চোখ কচলাতে-কচলাতে এ-দিক সে-দিক তাকিয়ে অবশেষে ছবির দিকে ফিরে চুম্বক পাহাড়ের দিকেই ফিরল যেন—এমনই লেপটে রইল ছবির গায়ে যে, কিছুই দেখল না আর। দেখশুনে তবুও গাঁট্টা মারতে গেল না আর মনুর মাথায় উৎপলা। সময়ের ভিতরে নয়—নিঃসময়ে নয়, নিজের প্রাণে অথবা অপরের হৃদয়েও নয়—অথচ এই সবেরই পরিচিত-আধোপরিচিত কেমন একটা আপতিত নিরবচ্ছিন্নতার ভেতর ঘাড় হেঁট করে ডুবে যেতে লাগল উৎপলা অনুপম অপর দেশের জীবন, অন্ধকার, মৃত্যু, নির্দায়ের ভেতর।

চার-পাঁচ দিন পরে উৎপলা পিওনের হাত থেকে কার্ড নিয়ে পড়তে-পড়তে উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'বড়বৌঠানের সংবাদ লিখেছে।'

মাল্যবান সর্ষের তেল গায়ে মাখছিল, 'এই বয়েসে আবার সংবাদ—' বলে নিরেস চোখে-মুখে তেল মাখতে লাগল আবার।

'তা হবে তো। কেন হবে না?'

'বড়বৌঠানের বয়েস না কত?'

'চুয়ান্ন।'

'এ-রকম বুড়ো গিন্নীদের যে ছেলেপুলে হয়, তা আমি জানতাম না।'

উৎপলা কার্ডটা ব্লাউজের ভেতর গলিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি কি বলতে চাও ভেঙে বল তো দিকি—'

'তা নয়, আমি বলছিলাম—' মাল্যবান চুপচাপ তেল মাখতে লাগল।

'না বললেও বুঝেছি আমি, পেটে-পেটে তুমি কী বলতে চাও—'

'না, না আমি ভাবছিলাম—'মাল্যবান থেমে গিয়ে হঠাৎ এক ফাঁকে ঝপ করে বলে ফেলল, 'আবার এই বয়েসে ছেলেপুলে—'

'সে কি বাবা, ছেলেটা না আসতেই মারমুখো হয়ে পথ আটকে দাঁড়াবে না কি?'

'আমি দাঁড়ালেই-বা শোনে কে—' দাঁতে কেটে-কেটে হাসতে-হাসতে মাল্যবান বললে।

উৎপলা গুনগুন করে গাইতে-গাইতে ছাদের দিকে গেল-বড়বৌঠানের সন্তান হবে বলে ছায়ানট—ছায়ানটের পরে ভীমপলাশি—তারপরে বাগেশ্রী—কিন্তু প্রত্যেকটা গানেরই এক-আধ লাইন মাত্র। পিঠে তেল মাখতে-মাখতে মাল্যবান ভাবছিল: নিজের বেলা তো উৎপলা এই বার বছর পরে ষষ্ঠীকে দেখিয়ে গেল, একটি সন্তান যা হল, তাও মেয়ে; এই প্রথম, এই-ই শেষ; বংশে ছেলে না হলে নাই-বা হল—এই তো ভাবে উৎপলা। কিন্তু পরের বেলা সে তেরটির পর চৌদ্দটিকে দেখ কেমন বেহাগ ভৈরবী কীর্তনের সুরে ফলাও করে ফলাচ্ছে ছাদে-ছাদে। এটা কী কাজ করছে উৎপলা, ঠিক কাজ করছে? ঠিক নয় অবিশ্যি। মোটেই ঠিক নয়। কিন্তু, তবুও, এইটেই ঠিক।

পায়ে তেল মাখতে-মাখতে মাল্যবানের মনে হল; কী জানি, আমার বদলে অন্য কোনো দশাসই পুরুষের স্ত্রী হলে এত দিনে উৎপলাও আট-দশটি সন্তানের মা না হয়ে ছাড়ত না হয় ত।

. মাথায় তেল মাখতে-মাখতে কড়া রোদের আকাশটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মাল্যবান; আমার প্রতি সে যতখানি বিমুখ, অন্য কোনো পুরুষ-মানুষের জন্যে ঠিক ততখানি আগ্রহ তার থাকতে তো পারত; তা হলে কী হত? বেশ ঝরঝরে নদীর পাশে তরতাজা সবুজে-সবুজে ফন ফন করে উছলে উঠত পানের বন তা হলে, উৎপলার পানের বন, নীল কালো সাপশিষের মত রোদে বাতাসে—হাওয়া বৃষ্টি নিঝোর ফলসানির ভেতর।

উৎপলা কীর্তন গাইতে-গাইতে ছাদের থেকে ফিরে এল—

'তোমার দাদার বয়েস কত হল এবারে?'

'চৌষট্টি।'

'চোষট্টি!'

'তা তিনি কি আজকে জন্মেছেন—'

'খুব বুড়ো হয়ে গেছেন তো তা হলে—'

'আজকের মানুষ তো নয়—'

'তাই তো, খুব বুড়ো তো—'

'বুড়ো-বুড়ো করে মুখে গ্যাঁজলা উঠল যে বুড়ো খোকার আমার! ঢং,' উৎপলা বললে, 'নাও, এখন বড় বৌঠানের জন্যে কী জিনিস পাঠাবে বলো।'

মাল্যবান গায়ে তেল, পাযে তেল, মাথায় তেল মেখে ভরা রোদে একটা বিচিত্র সরীসৃপের মত চিকচিক করছিল। ছাদের রোদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধাঁধিয়ে উঠছিল উৎপলার চোখ; সীরসৃপকে সে একবার দেখছিল ঝিকমিক আঁশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নুযে পড়ছে, হাত নাড়ছে, চোখ পাঁজলাচ্ছে, আর-একবাব মিলিয়ে যাচ্ছিল সব—অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত অন্ধকারের ভেতর কাউকেই, কিছুকেই আর দেখছিল না উৎপলা।

মাল্যবানকে যথেষ্ট হিংস্র, অথচ আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছুই না, বরং বেশ চকচকে মনে হচ্ছিল হয়ত উৎপলার; ঠিক বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তার মানে হয তো এই নয যে, উৎপলা বেশ কাতব হয়ে পড়ছিল; এবং মাল্যবান বেশ প্রখব হয়ে উঠছিল। হলে হয়ত ভাল হত না।

'আমার মনে হয়, যদি কিছু দিতে যাও, তা হলে তাঁরা লজ্জা পাবেন।'

'কেন?'

'এ-রকম ব্যাপার যে হচ্ছে, এতে এখুনি লজ্জা পাচ্ছেন—'

'তুমি যখন তোমার মাযের পেটে ছিলে, লজ্জায আড়ষ্ট হযে পড়েছিলেন তিনি! না কি? ম্যাদা মাদার, ঠেলে বেরুল তো তবুও, লজ্জাবতীব ঝাড় থেকে। বেরুল তো। কী হল তাতে? ইঁদুরেব গর্তে ঢুকে পড়ল পৃথিবীব জনমনিষ্যি সব! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা!'

মনের বিষ ঝেড়ে কথা বলে ছাদে এক চক্কর ঘুরে এসে উৎপলা বললে, 'তেমন হোক না-হোক, একটা বেনাবসি শাড়ি অন্তত কিনে দিতে হবে পঞ্চাশ-ষাট টাকাব মধ্যে আব রুপোর সিঁদুর কৌটো একটা। আমার ইচ্ছে ছিল সোনার কৌটো দিই একটা। চল্লিশ বছর স্বামীর সঙ্গে ঘব কবল তো পযমন্ত এযোতি—এই চুয়ান্নতেও তো ফল দিচ্ছে—'

'তোতাপুরি আমের গাছটা?' মাল্যবান খ্যাঁক করে একটু হেসে, বেশি হাসিব চাড় সামলে নিযে একটু সরে দাঁড়িযে বললে, 'বড়বৌঠানকে চিনি আমি—'

'কেমন, বেনারসিতে তাঁকে মানাবে না?'

তা আমি বলছি না,' মাল্যবান তেলেব বাটিটাব কাছে ফিবে এসে বাটিটাব দিকে এক নজব তাকিযে বলল, 'এ-রকম একটা ব্যাপার নিযে কেউ যে ঘটা কবে, সে-ইচ্ছে তাঁর একটুও আছে বলে মনে হয না।'

দূরের রৌদ্রে সরীসৃপটা চিকচিক কবে জ্বলে উঠেছে। উৎপলা পুডিঙেব কামড়ে কঠিন কংক্রিটের মত হযে গিযে তাকিযে দেখল একবাব। মিলিযে গেল ছবিটা.; রোদে বিহ্বলতায চোখ ছটফট করে উঠেছে উৎপলার; অন্তশ্চক্ষু উপড়ে পড়ছে যেন অন্য বকম আগুনে—বৌদ্রে।

'আসল কথা হচ্ছে, কিছু খসাতে চাও না তুমি; আপন লোককে পব মনে করো। শাক দিযে মাছ ঢাকবার ভাঁড়ামো, চিনি নে আমি তোমাকে!'

তেলের বাটিটা উৎপলা ছাদের ওপর ছুঁড়ে ভাঙল!

'তেল পড়েছে, টাকা আসবে,' মাল্যবান হেসে বললে, 'যাই, চান করি গে।'

অফিস থেকে ফিরে এসে সে বললে, 'চলো, বেরুই।'

'কোথায়?'

'কী কিনতে-কাটতে হবে, চলো দেখি গিয়ে—'

উৎপলার মনের থেকে কিছু ধোঁয়া কেটে গেল, 'তা তো বলেছিই, বেনারসি—'

'কিন্তু আমি ও-সব জিনিস একা কিনতে ভরসা পাই না। এসো আমার সঙ্গে—'

'ষাট-সত্তবের কমে হবে না শাড়ি; যে তিনশ পঁচাত্তর টাকা মেজদার বাবদ আমার কাছে আছে,

তার থেকে কিছু তো খরচ করতে পারি নে—'

'তার দরকার নেই—'মাল্যবান রুমালে মুখ মুছে বললে, ।

'তবে কোথায় পাবে টাকা?'

'প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তুলে এনেছি।'

'কত?'

'পচাত্তর'।

নাক-মুখের চেকনাইয়ে চনমন করে হেসে উঠে উৎপলা বললে, 'বা, বেশ গুড বয় তো তুমি। সত্যিই এমন না হলে—। আ গেল, তুমি তো চাও খেলে না।'

চায়ের প্রতীক্ষায় মাল্যবান চেয়ারে বসল গিয়ে। খানিকক্ষণ পরে উৎপলা ফিরে এল, পরটা ও চা নিয়ে নয়, মার্কেটে যাবার জন্যে পোশাক-আশাকে তৈরি হয়ে।

মাল্যবান একটু হতচকিত হয়ে বললে, 'চা খেয়ে গেলে হত না?'

'ঠাকুরটা আজ বড় দেবি করে এসেছে,' উৎপলা মাল্যবানের ছাড়া-চেয়ারে ডান পাটা চড়িয়ে দিয়ে জুতোর পালিশে যে কিউটিকিউরা ট্যালকামের গুঁড়ি পড়েছিল, রুমাল দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে বললে, 'আমিই ভাত চড়িয়ে দিতে বললাম তাই। সকালবেলার সেই পরটাগুলো ঠাণ্ডা মেরে গেছে—লোনার মাকে দিয়ে দিলাম; ওর ছেলের কুষ্ঠ হয়েছিল, কিছু খেতে পায় না।'

উৎপলার সেলাইয়ের কলটা অনেক দিন ধরে পড়েছিল—অবিশ্যি অযত্নে নয়, জিনিসের যত্ন করে সে—কিন্তু অব্যবহারে। কলটার ডাকনি সাফ করা, ঢাকনি খুলে ঝেড়েপুছে ঝকঝক করে রাখা—হাতে কাজ না থাকলে এটা তার খুবই সোহাগের কাজ।

একদিন সকালবেলা পাশের ভাড়াটেদের একটি ছোট্ট মেয়ে এসে বললে, 'পলা মাসিমা, আপনার সেলায়ের কল আছে?'

'আমি যে তোমার মাসিমা, তা তোমাকে কে বললে?'

মেয়েটি উৎপলার দিকে টলমল করে তাকিয়ে রইল—কোনো কথা বললে না।

মাল্যবান বললে, 'আঃ, ওকে আর ও-রকম শুধচ্ছ কেন?'

'কোনোদিন এদের গ্যাঁজও দেখা যায় না,' উৎপলা বললে, 'আজ কল নেবার সময় পলা মাসিমা! আচ্ছা!'

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে-ফিনিয়ে ফ্রকের কাপড় তুলে চিবতে লাগল।

'তুমি কার মেয়ে গা?'

মেয়েটি তার বাবার নাম বললে।

'ও সেজগিন্নির মেয়ে তুমি বুঝি?

মেয়েটি চিবনো কাপড়ের এক কিনার থেকে দাঁত বের করে বললে, 'হ্যাঁ।' উৎপলা মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সব জল ভরে গড়ায় কি না। ওপরওয়ালার কল এমনিই নড়ে। এই সেজগিন্নিই তো একদিন বলেছিলেন, কলকাতার জল সোনার দরে বিকোয় না কি। খুব মনে আছে আমার।

সেকথা আমি ভুলব কোনোদিন!'

'কী লাভ ও-সব মনে রেখে!'

'না, না, তুমি কেন মনে রাখতে যাবে। তোমার দরদে তো মলম ঘষা হচ্ছিল সেজবৌয়ের সে-দিন, আমাকে তাঁবায় চড়িয়ে—'

'তাঁবায় চড়ালেই কি ফোস্কা পড়ে?'

'তা আমাদের পড়ে। এই রকম কথা শুনলে গায়ে জলবিছুটির জ্বালা হয়। ইশ!'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'তোমরা কে হে বাপু, পাশের ভাড়াটে ঘরে থাকো; তোমাদের আমরা খাই না পরি, তোমাদের তেউড়ি-খেসারির খেত মাড়াই, না, বকের বিষ্ঠা দিয়ে বড়ি-খেসারি মেখে দিয়ে ভোগা দিই—তোমার মা যে—'

মাল্যবান উৎপলাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ছোট্ট মেয়েটির পিঠে-ঘাড়ে গোটা দুই চাপড় মেরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমিও পার বাপু! ও কী জানে, ওকে নিয়ে ঘাঁটানো—কী হবে।'

'কিন্তু কল আমি দেব না।'

সূচীপত্রে যান

'সে হল আলাদা কথা।'

'আর ঐ সেজগিন্নি বড্ড অপয়া। পর-পর চারটি মেয়ে বিয়ল। পর-পর চারটি মেয়ে বিয়ল—'

ছোট মেয়েটি ফ্রক কামড়াচ্ছিল; আরো জড়সড় হয়ে কামড়াতে লাগল।

'সে-দিন তোমার একটি বোন হয়েছে, না খুকি?'

'হ্যাঁ'

'তা আমি জানি। সাধে আমাদের বললে না। অথচ দশ মাইল দূর থেকে লোক ডেকে খাইয়েছে। মানুষ যে কী রকম বোকা শয়তান হতে পারে—'

উৎপলা কথা শেষ করতে না করতেই মাল্যবান বললে, 'খুকি তো দাঁড়িয়ে রইল, ওকে যা দেবার দাও না হলে বলে দাও—'

'অথচ এক ফালি বাড়ির ভেতব পাশাপাশি দু-পবিবাব থাকি— তবুও এটুকু গোয়ালাব আক্কেল নেই।'

'তুমিও কি ওদের ডাকো-টাকো না কি কোনো কাজকম্মে?'

'কেন ডাকব? ওবা ঝিনুক ভরে মধু নিয়ে সুব কবে ডাকছে দিনবাত—'

'এক পক্ষকে প্রথমে শুরু করতে হবে তো—'

'আমি একা মানুষ, গুষ্টি ডেকে খাওযাব? ওদেবই তো ববং উচিত আমাদেব তিনটিকে ডেকে একটু মিষ্টিমুখ করানো অন্তত। এই মনুকেও তো একদিন ডেকে জিবেগজা, শোনপাপড়ি যা-হোক একটা কিছু হাতে তুলে দিতে পাবত। আমবা তো দিই ওদের ছেলেমেযেদেব,ওবা একটা পিপাবমিন্ট লজেনচুসও দিতে পারে না?'

'যাক গে, মরুক গে, তুমি এখন—'

'অথচ কত বড় পরিবার; জমজম করছে; কাকে খাচ্ছে, ঘুনে খাচ্ছে, ফোঁপড়ায খাচ্ছে; চোট্টা শয়তান ওপরপড়া হয়ে খ্যাঁট মেরে উজোড় কবে দিচ্ছে সব।'

'কলটা দেবে না কি, দিযে দাও।'

'কিন্তু মনটা ওদের লাউয়ের মাচায কেলে হাঁড়িব মত। সে-হাঁড়িতে তো ভাত ফোটে না, বালি তাতে; জনপ্রাণী পাখপাখালি পালিয়ে যায সে-হাঁড়ি দেখলে। ভাল কেলে হাঁড়ি পেতে বসেছে বটে সেজবৌবা—'

'এই মেযেটিব সামনে তুমি অনেক কথাই তো বললে—'

'শুনিযেই বললাম যাতে ওদেব আঁতে লাগে!'

মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়েছিল।

মাল্যবান বললে, 'খুকি, তুমি ফ্রক চিবিও না আর।'

ফ্রকটা সে মুখেব থেকে ফেলে দিল। দেখা গেল, দাঁত দিযে বক্ত বেরুচ্ছে।

মনু বললে, 'পানসে দাঁত।'

'তোমার পানসে দাঁত,' উৎপলা বললে, 'তোমার বাপ-মা ডাক্তাব দেখিযেছেন?

'না।' মেয়েটি (উৎপলাব কেন যেন মনে হল শামকলের বাচ্চাব মত) মাথা নেড়ে বললে।

'না'? উৎপলা মাল্যবানের দিকে তাকিযে বললে, 'কেমন ফ্রক চিবুচ্ছে দেখছ, শোথ হয়েছে এই মেয়েটার, শরীরে চুনখড়ি নেই; অথচ বছব-বছর না বিযলেও চলবে না। ওদেব বার মাসই কাতিক মাস, বাবা!' মেয়েটি নিজেব অজান্তেই আবার ফ্রক চিবুতে শুরু করেছিল; উৎপলা ফ্রকে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে বললে, 'দূ ধুমসি, খাসিব রক্ত মাখিযেছিস—মেড়েছিস—দূ—দূ—'

মেয়েটি আস্তে-আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছিল।

'শোনো খুকি,' ডাক দিল উৎপলা।

এসে দাঁড়াল মেয়েটি।

'সর্ষের তেল আর নুন দিয়ে দাঁত ভাল করে ঘষে-ঘষে মেজো দিকিন বোজ। মাজবে?'

শামকলের বাচ্চার মতন তুড়বুড় মাথা নেড়ে মেয়েটি বললে, 'হ্যাঁ।'

'তোমাদেব তিনটি বোনকেই তো দেখি আমি, একেবারে লিকপিক কবছে; বাঁশপাতা মাছের মতন; চেহারাও তেমনি বিচ্ছিরি। তোমাদের ছোটবোন কেমন হল দেখতে?'

'বেশ সুন্দর।'

'রঙ কেমন?'

'খুব ফরশা।'

'কালো ফরশা তো কথা নয়,' বড় শামকলটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট দিয়ে লাল লঙ্কা কেটে খেতে-খেতে বললে যেন চন্দনা, 'মগরাহাটার কুচোচিংড়িব মত হল তো দেখতে। মনে হয় যেন গলার নলী শুকিয়ে খোড়ে আঁশের মত হয়ে রয়েছে। বড্ড দুঃখ কবে। বাস্তবিক মানুষেব পেটে এ কী টোনা টেংড়ি বল তো দিকি—'

মনু একটা ফিক করে হেসে উঠল।

'যে-ফবশা রঙ বলছ খুকি ও তোমাব বোনেব গায়ে রঙ নেই বলে। দুধে-আলতায় বং— সে এক রকম।'

আবাব শামকলেব গা মাথা নাড়ল, 'না, আমার বোনেব রক্ত আছে।'

'আছে? তবুও শাদা?'

'খুব শাদা।'

'তা হলে ন্যাবা হয়েছে।'

'না, ন্যাবা হয়নি' ফবশা বঙ। কেমন সুন্দব দেখতে! ইশ্, ন্যাবা হবে আমার বোনেব?'

উৎপলা বললে, 'কই, দেখালে না তো তোমাব বোনকে।'

'আসুন না, দেখে যান।'

'এখন দেখতে যাব কেন। খাইয়েছিল? সাধে? যে-দিন হয়েছিল সে-দিন খবব পাঠিয়েছিল?'

মাল্যবান একটু জ্বলে উঠে বললে, 'আ মল যা! ভাল বিপদেই পড়া গেছে দেখছি। সোমত্ত গাইগোরুর মত একটা বাছুবেব ঘাড় মটকাবার জন্যে চাট মাবছ সেই থেকে! কী হল তোমাব।'

মেয়েটিব চোখেব ভেতরে যেন তলিয়ে গিয়ে তাকিয়ে থেকে উৎপলা বললে, 'কিন্তু, সেলাইয়ের কল নেবাব সময়ে ঠিক মতন হাজিব হয়েছ তো—শামকলেব বাচ্চা।'

শুনে সচকিত হয়ে কেমন চমকে উঠে তাকাল মেয়েটিব দিকে, উৎপলাব দিকে, মাল্যবান।

'তোমাব বোন যে-দিন হল, সে-দিন চাবটে উলু দিলে কেন?'

'আমি তো দিই নি উলু।'

'উলুব যা ঘটা! ভাবলাম, এবাব বুঝি বাজপুত্তুব এসেছেন?'

মেয়েটি শুকনো রৌদ্রডাঙায় পাখিব বাচ্চাব মত এক-আধ ফোঁটা মেঘেব জল পেয়ে তিড়বিড় কবে উঠল উৎপলার কথা শুনে।

'তোমাব মা কল চেয়েছেন কাব কাছে?'

'আপনাব কাছে।'

'কী বলে দিয়েছেন?'

'বলেছেন তোর পলা মাসিব কাছ থেকে সেলাইয়ের কলটা চেয়ে নিয়ে আয় তো—'

উৎপলাব খানিকটা ভাল লাগল, জ্যৈষ্ঠেব মাটিতে কিছু আষাঢ়ের মেঘের বস এসেছে যেন, এমনি ভাবে মেয়েটিব কোঁকড়া চুল নিয়ে নাড়াচাড়া কবতে-করতে বললে, 'মাসি হলাম কোন সুবাদে?'

'মা বলে দিলেন তো।'

'তোমার চুলেব ভেতব ঢের উকুন, খুকি।'

'হ্যাঁ, দিদির মাথার থেকে এসেছে।'

'কেউ বাছে না তোমাব মাথাব উকুন?'

'না।'

'উৎপলা বুড়ো আঙুলের নখে একটার পর একটা উকুন টিপে মাবতে-মাবতে বললে, 'এই যে মাথা বেছে দিচ্ছি তোমার, বেশ আরাম পাচ্ছ, না?'

মেয়েটি উৎপলার কোলে মাথা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে রইল।

'তোমার মা কল দিয়ে কী করবেন?'

'জামা সেলাই।'

'কার জন্যে?'

'ছোড়দি, আমি, বোন— তিনজনের জামা।'

সূচীপত্রে যান

'তা, তোমার মা এখনও তো আঁতুড় ঘরে।'
'না, বেরিয়েছেন।'
'কবে?'
'এই তিন-চার দিন হল—'
'নাড়ী তো এখনও বড্ড কাঁচা, সেলাই করবেন কী করে? নাড়ী টনটন করে উঠবে যে।'
'চাইলেন তো।'
'লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ক্ষীর এসেছে—খাবে খুকি?
মেয়েটি মাথা নেড়ে বললে, 'খাব।' শামকল শাবকের মাথা কেমন তুড়বুড় করছে, চাঁদির ওপর জলের ফোঁটা রোদে শুকিয়ে গেছে যেন।
উৎপলা হাত ধুয়ে এসে মেয়েটিকে খানিকটা ক্ষীব দিল তাবপর কলটা ভাল করে দেখে, মুছে. মনুকে বললে, 'যা মনু, কলটা সেজমাসিকে দিয়ে আয়। তোমার ক্ষীর খাওয়া হয়েছে, খুকি?'
'হ্যাঁ।'
'কেমন লাগল?'
'বেশ—'
'তোমার নাম কী?'
'নোরা। নোড়া, ভেঙে দেব দাঁতের গোড়া।'
'কী পড়ো?'
'আমি এখনও— ক অক্ষর—'
বলে এঁটোহাত জামায় মুছতে-মুছতে মেয়েটি দৌড় দিল।
পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি আঁতুড়েই মারা গেল।
'আমি তো তখনই বলেছিলাম, এই বকম হবে—'
দুই-তিন দিন উৎপলা কেমন একটা শোকগ্রাহিতায় আচ্ছন্ন (না, বিমুগ্ধ?) হয়ে কাটাল।
বললে, 'আমি একটু দেখতেও পারলাম না, আমাকে একটু ডেকে দেখালও না।'
'কী করতে তুমি দেখে?
'এই তো পাশাপাশি বাড়ি—মানুষ জন্মায—মবে যায—যেন ঘড়িব কাঁটা ঘুরে চলে, মববাব সময়ে একবার ডাকলেও তো পারত। পরশু রাত তিনটেব সময় মাবা গেছে বললে।'
'হ্যাঁ।'
'কী করছিলাম তখন আমি?'
'ঘুমুচ্ছিলে,' মাল্যবান বললে, 'কত শিশুবাই তো মরে যাচ্ছে।'
'খুব কেঁদেছিলেন সেজগিন্নি?' উৎপলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাত-পা নিঝুম কবে ছাদেব এ-পারে ও-পাবে পরপারে শূন্যতাব বড় একটা রৌদ্রচাঙাড়ের দিকে তাকিয়ে বইল।
'বড় বৌকে শাড়ি পাঠালে—কোনো খবব-টবর দিল না তো', মাল্যবান বললে।
'খবর দেবার সময় হয়েছে কি?'
'বাঃ দশ-পনের দিন হয়ে গেল।'
'দাদা নিশ্চয় জবাব দিয়েছিলেন,' উৎপলা বললে, 'কিন্তু পথে চিঠি মাবা গেছে।'
'তা নয়,' মাল্যবান একটু কাঁধ নাচিয়ে বললে, 'পোষ্ট অফিসেব চিঠি ওঝার বাটির মত চলে। তিন পযসাব একটা পোষ্টকার্ড ঝেড়ে দিলে যে মুল্লুকে পাঠাও, ঠিক গিয়ে পৌছবে।'
বড় শামকল কেমন ঘাড়ের রোঁ ফুলিয়ে-ফুলিয়ে কথা কইছে শোন—মাল্যবানেব দিকে তাকিযে ভাবছিল উৎপলা। কিন্তু চিঠি সম্পর্কে কথা বাড়াতে গেল না সে আর।
'আঁতুড়ের মেয়েটাকে বাক্স করে শ্মশানে নেওয়া হয়েছিল।'
'হ্যাঁ।'
'কী রকম বাক্স?'
'প্যাকিং বাক্স—পাইন কাঠের—'
'ভেতরে আটকে নিলে? পেরেক ঠুকে?'
'তবে কি বাক্সেব বাইবে লেপটে নেবে গঁদেব আঠা দিযে লেবেল মেরে?'

সূচীপত্রে যান

'কী করলে তারপর?'

'শ্মশানে নিয়ে গেল—'

'দাহ তো হয় না ছোটদের?'

'না।'

'না? পুঁতি ফেলে তবে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর কী হবে?'

'কীসের পরে?'

'আমি বলছি, মাটির নীচে কী হবে ওর?'

মাল্যবান এবার চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'ও-সব কথা কেউ ভাবে না। হবেই একটা কিছু। শেয়ালে মাটি খুঁড়ে না খেলে পচে গলে যাবে—কৃমি হবে।'

'কলকাতায় শেয়াল কোথায়? পচে মাটি হয়ে যাবে—'

শুনতে-শুনতে সামনের চেয়ারটায় না বসে মেঝের ওপরই ঝুপ করে বসল উৎপলা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে, বসে রইল।

মাল্যবান চুরুট টানতে টানতে ভাবছিল; কী বোকা! কী বোকার মত কথা জিজ্ঞেস করে। কত বাজি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উৎপলা ফ্যাকড়া নিয়ে বসে আছে, তারপর একেবারেই নয়; একটি সন্তানের মা হয়ে— ও যেমন ভাবে মা হতে চেয়েছিল বহু সন্তানের, তা হতে পারে নি; সেই সব নিহিত তেজ উৎপলার আপাতমূর্খতার অতৃপ্তিতে ঝড়ে পড়ছে।

'আচ্ছা, মরে যাওয়ার পর বড়-বড় মেয়েদের মাটিতে পুঁতলে তারপর কী হয়?'

'মাটিতে পুঁতবে কেন? দাহ হয়।'

'না, আমি বলছি, যাদের ভেতর দাহ-টাহ করার চল নেই, তাদের কথা—'

'ওঃ', মাল্যবান একটু পুরুষোচিত তীক্ষ্ণ ভাবে উৎপলার দিকে তাকাল।

'আমি শুনেছি, একজন খুব রূপসী কুড়ি-একুশ বছর বয়সেই সুস্থ শরীরে হঠাৎ কেন যেন মারা গেল। বিকেলবেলাতে তাকে মাটি দেওয়া হল। তারপর সবাই চলে গেল, যে যার গাঁয়ে। সেখানে আট-দশ মাইলের মধ্যে জনমানব কেউ ছিল না। সন্ধের পরেই একটা লোক এসে মাটি সরিয়ে সেই মড়াকে চুরি করে নিয়ে গেল। কেন নিল, বল তো?

'কুড়ি-একুশ বছরের মেয়েমানুষ?'

'হ্যাঁ, বেশ সুন্দরী ছিল, বেশ সোমত্ত; শবটাকে মাটি খুঁড়ে বার করবার পরও গা ফুটে রূপ বেরুচ্ছে; আর গতরের সে কী পুষ্টতা।'

'এই জন্যেই চুরি করা হয়েছিল—' মাল্যবান বললে।

মাল্যবানকে খুব বেশি জাগিয়ে দিয়েছে উৎপলা, কথায়-কথায় নিজেও খুব বেশি জেগে পড়েছে আজ।

নীচের ঘরে আর যেতে দেওয়া হল না মাল্যবানকে আজ রাতে। এ-রাতটা মাল্যবান ও উৎপলার বেশ নিবিড় ভাবেই কাটল। সমস্ত রাত—সমস্তটা শীতের রাত।

মাল্যবান যা-ই মনে করুক না কেন, স্ত্রী-সন্তানের পাট চুকিয়ে দিয়ে একা-একা আইবুড়ো থেকে জীবন কাটানো খুব শক্ত হত তার পক্ষে। গোলদিঘিতে ঘুরে-ঘুরে বার-চৌদ্দ বছর সে অনেক হাওয়াই ফসল ফলিয়ে গেছে; সমাজসেবা, দেশস্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা, বিপ্লবের তাড়নাতেজ, নির্বৈপ্লবিক মনের চারণা, উনিশ শতকের নিশায়মান সমুদ্রতীর : সাহিত্যের, ধর্মের, মননের; বিশ শতকের উপচীয়মান আবহমান রক্ত, রৌদ্র, ছায়া, জ্বালা, সমুদ্রসংগীত—নানা রকম অপর রকম জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে ঈর্ষা করেছে—নিজের জীবনটাকে অনেক সময়েই অসার ও নিষ্ফল মনে হয়েছে তার। কিন্তু, তবুও, এই পাকা চাকরিটুকু, স্ত্রী ও মেয়ে, কলেজ স্ট্রিটের ঘর তিনখানা, এর চেয়ে অন্য কোনো সাফল্যের উত্তমর্ণতা তার জীবনে কোনোদিন ঘটে উঠত কি?

সে নিজে যখন খুব স্থির হয়ে ভাবে, বোঝে— জীবনের কাছ থেকে যথাযথ প্রাপ্য সে পেয়েছে। সে

সূচীপত্রে যান

জানে, জীবনটা তার এর চেয়ে ঢের খারাপ হতে পারত। যদিও মৃগনাভিব গন্ধে মাঝে-মাঝে অধীর হয়ে উঠে গোলদিঘিতেই এই নিজের একতলার ঘরের রাতের বিছানায়ই সে পাক খেয়েছে সব চেয়ে বেশি, কিন্তু তবুও সে বুঝেছে যে, তার নিজের সাংসাবিক জীবনটা কস্তুরীমৃগ নয়, বেসংসারীও নয়; সাংসারিক সফলতার চূড়ান্তে উঠে যে-সব লোক টাকাকড়ি যশ মদ মেয়েদের নিয়ে সন্তপ্ত হয়ে আছে দিনরাত, তারা কি জানে তারা কী, কে, চলেছে কোথায়! তারা জানে না। তাদের অন্তঃশীলা আত্মা ঠিক নয়—তাদের নিম্ননাভির গন্ধ এ-দিকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে তাদের; মাঝে-মাঝে মাল্যবানের মতন পথের পাশের একজন লোককেও সচকিত, আলোড়িত করে তুলছে। কিন্তু মাল্যবান জানে, এ-নাভি তার নিজের নয়—এসব ওদের।

একদিন মা বেঁচেছিলেন। মা খুব স্নেহ সবসতার মানুষ ছিলেন; কিন্তু তখনই কলকাতায় প্রথম চাকরি শুরু করে মার সঙ্গে শ্যামবাজারের একটা একতলা বাড়িতে এক কোঠায় যে-দিনগুলো কাটিয়েছে সে—প্রত্যেকটা দিনের কথা মনে আছে তার : সহজ কঠিন মৃদু নিরেস, কেমন নির্জলা জলীয় দিনগুলো জীবনের। ভাবত, মাকে মানুষ সূতিকাঘরেব থেকেই পায় কি না—রোজই পায়—অনেক পায়—জননীগ্রন্থি কেটে যায় তাই শিগগিরই—নতুনত্ব হারিয়ে যায়। ভাবত, মানুষেব জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন মায়ের মমতা সজলতা এত স্বাভাবিক বলেই আলো-জল-বাতাসের মত সুলভ মনে হয়; একজন অপবিচিত মেয়েকে মনে ধবলে তাব সহজ স্বাভাবিক সত্তাকে পাযেব নীচেব মাটিব, মেটে খুরির জলেব মত সহজ ভেবে নিতে সময় লাগে; কাছে থাকলেও দূব—তার স্বচ্ছ সরল প্রকাশ ভানুমতীর খেলার মতই আপতিত হচ্ছে কী সহজে—কিন্তু তবুও কী রকম আঁধাব, কঠিন, নিবিড়।

এইসব ভেবে-ভেবে কেমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ত মাল্যবানের মন; মাব কাছে ঘাট হযেছে বলে তাব প্রতি শ্রদ্ধায়, পথে-ঘাটে মনে-ধরে গেছে নাবীটির প্রতি উদাসীনতায এবং নিজের প্রতি ধিক্কাবে নিজেকে সে সাজাগ করে রাখত।

মাল্যবান যখন বিয়ে কবে নি, নিজের অফিসের বিবাহিত কেবানিদের হপ্তাকাবারি অভিযান দেখে মন এমন গুমরে উঠত তার। উৎপলাকে নিজের ঘবে আনার থেকে আজ পর্যন্ত যখনই কোনো মানুষেব স্ত্রীবিয়োগের কথা শুনেছে, মাল্যবান, সে মানুষটিকে জাদুঘরেব কূলকিনারায দেখা অতীব মৃত জিনিসেব মত অতীতেব আনন্ত্যেব কুযাশা-ঘবে লীন হযে থাকতে দেখছে সে—অনুভব করেছে, ও-মানুষেব কোনো ভবিষ্যৎ নেই; সে-জীবনের শূন্যতা কল্পনা করে, অস্বস্তি বেদনার অভিজ্ঞতায কেমন যেন অন্য আব-এক বকম ধাব শানিযে উঠেছে তার। নিজেব স্ত্রী যে বেঁচে আছে, এ-সান্তনা ভেতবে-ভেতবে গুছিযে নিযে সারাদিন আফিসেব ডেস্কে, সারাবাত নীচেব ঘবেব বিছানায কম্বলেব নীচে, নিশ্চুপ শান্তিব ভেতর একটার-পর-একটা বিদায দিযেছে—গ্রহণ কবেছে।

এই সব হচ্ছে মাল্যবানেব জীবনের ভিতবেব কথা, ভিত্তিচিত্রেব কথাও। সে একা থাকতে পারে না, মাব সঙ্গে থাকে তাই; কিন্তু তবুও মাযের ভালবাসা সান্নিধ্য তাব কাছে কালক্রমে একা থাকাব সামিল বলে মনে হয; বিযে না কবলে তাব চলে না; স্ত্রীকে ঘুচিযে দিযে একা পথ চলবার কোনো শক্তিই তার নেই।

কিন্তু জীবনেব খুঁটিনাটি ব্যাপারে এই দাম্পত্যজীবনেবও নানা রকম খাঁকতি দেখছে সে। ঝড়তি-পড়তি নষ্ট ফসল, পচা হাড়মাংসের গন্ধে ভরে উঠছে সব। উৎপলাব উদাসীনতা ঠিক নয়, খুব সম্ভব অপ্রেম—দিনের পর-দিন স্বচ্ছ হযে আসছে যেন। অতল স্বচ্ছলতায যে-রূপ দেখা যাচ্ছে তার, তাতে মনে হচ্ছে, কোনোদিনই প্রেম-প্রীতি ছিল না মাল্যবানেব জন্যে উৎপলাব। না থাকলে না থাকবে। অন্যদের জন্যে প্রীতি? অন্য কারো জন্যে প্রেম? তাই হোক। কিন্তু তবুও উৎপলাকে বহন করে বেড়াতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত? উৎপলাও তাকে তাই করবে বুঝি? চোখেব সামনে অন্যদের প্রতি উৎপলাকে স্পষ্ট অনুবক্ত হযে পড়তে দেখে—সে-জাযগা থেকে একটু গা বাঁচিযে সরে যেতে হবে বুঝি মাল্যবানকে? আলখাল্লাপরা একজন চীন, একজন গ্রীক দার্শনিকের মত আকাশের তারা, পাতালেব বালি, মানুষের জীবনের মিছে সমারোহকে যে নিমেষেই গ্রাস করে চলেছে সেই উপলব্ধিতে স্থির হয়ে নিতে আবার—তারপব বেশি রাত হলে টেবিলে খেতে বসে খোশগল্প করতে হবে স্ত্রীব সঙ্গে আর মেযেব সঙ্গে?

বিয়ের আগের দিনগুলোকে তার শীতের আগে হেমন্তেব, হেমন্তের আগে শরতেব খেতে, মাঠে, রোদে মানুষের মুখে পাখির কথায যে অধিনশ্বর সম্ভাবনা থাকে হেমন্তেব, যে মহাপ্রাণ কুহক থাকে আসন্ন শীতের রাতের, সেই রকম মনে হয়েছে—

চলে যেতে পারে সে কি আবার বিয়ের আগের সেই পৃথিবীর দেশে? প্রশ্নটা পাড়া মাত্রই তার উত্তর মেলে : মানুষ তো মৃত্যুর দিকে এগচ্ছে, পিছে ফিরে যেতে পাবে না তো সে আব। তবে উৎপলা মনুকে বাদ দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগতে পারা যায় বটে—একা। মাব আমলে পারে নি, বৌ পাযে দাঁড় করিয়ে দিযেছে তাকে : সজ্ঞানে হেঁটে চলে যেতে পাবে সে অন্ধকাবের ভেতর দিয়ে—অজ্ঞান মৃত্যুর দিকে। পারে।

কিন্তু সাময়িক এই সব ইচ্ছা, চিন্তা। মাল্যবানেব মনেব ভেতব কোনো পৃথিবী ঘুরে বিদ্রোহী বা ভাবুক নেই যে তা নয; শয়তান জোচ্চোর অমানুষও বযেছে, কিন্তু সবের ওপরে মানুষ সত্য হয়ে বয়েছে; একজন সাধারণ ধর্মভীরু ও ভীরু মানুষ। একটি সাধারণ স্নেহশীল ধর্মভীরু ভীরু বৌ যদি সে পেত, তা হলে এ-দুটি শাদাসিধে জীবন পৃথিবীতে বিশেষ কোনো সফলতা বা নিষ্ফলতার দান না বেখে শান্ত ভাবে শেষ হয়ে যেতে পাবত একদিন। কিন্তু তা তো হল না, না, নম্র বশ্য ঘবজোড়া স্নিগ্ধতা হল না, খড়খড়ে আগুন কড়ের চমৎকার অগ্নি-ডাইনির মত হল মাল্যবানের বিয়ে আর বৌ, আব বিবাহিত জীবন।

উৎপলা দেখতে বেশ; শুধু বেশ বললে হয় না—এমনিই বেশ। সুস্থ। রুচি ও বুদ্ধিব ধার মাঝে-মাঝে বেশ স্পষ্ট হযে ওঠে; হৃদযের বিমুখতা ও কঠিনতাও তার এক-এক জাযগায এক-এক জন মানুষের তাপ বা জ্ঞান-পাপেব ছোঁযায মোমের মত গলে দাম্পত্য আবহে ফিরে এসে মোমের মত শক্ত ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে আবার। কুমারী হিসেবে এই মেযেটিব বেশ দাম ছিল—নারী হিসেবেও। কিন্তু মাল্যবানেব মত এ-বকম একজন লোকের বৌ হযে ঠিক হল না তাব। উৎপলাব বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। বাপেব বাড়ির দেশেব ঢেব লোক তাকে চেনে—ভালবাসে—কাছে আসে তাব; কলকাতায় এসে এদেরই মাবফত আবো অনেকেব সঙ্গে পরিচয় হযেছে তার; দশ-পঁচিশ মিনিট উৎ, পলা, উৎপলা, ইত্যাদিব সঙ্গে একশ বকম মানুষ একশ বকম ভাবের কথা বলে যাবার প্রযোজন প্রাযই বোধ কবে; এই সব বিমিশ্র ভিড় এক সময খুব বেশি আসত; আনাগোনা এখন খানিকটা কমেছে বলে মনে হচ্ছে; শিগগিরই বাড়বে আবার তাও মনে হচ্ছে। যাবা যাওযা-আসা করে এ বাড়িতে—কেউ থাকে পনের মিনিট, কেউ দু-তিন ঘণ্টা। সটান দোতলায উৎপলাব কাছে চলে যায প্রায সকলেই তাবা; মাল্যবান নীচেব ঘবে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, চুরুট টানছে, দেখে বা না দেখে তাবা সবটুকু দেখে নিয়েছে অনুভব কবে, কৌতুক বা ক্লান্তি বা কঠিনতা বোধ কবে। কিন্তু মাল্যবানেব সঙ্গে বিশদ আলাপচাবিব আবশ্যকতা কেউই বড় একটা বোধ কবে না। কেউ-কেউ এ-ও জানে যে, এ-মানুষটিকে এব স্ত্রী একেবাবেই গ্রাহ্য করে না। এবকম উপলব্ধিব পব সমযেব, পৃথিবীব স্তনাগ্রচূড়ায অনতিদূব শঙ্খিনীকে ঢের বেশি সবস বলে মনে হয—ভীরু দুরুদুরু বুকেব সাহস ও কাম নিয়ে তার দিকে এগিযে যেতে-যেতে। মাল্যবান দেখেছে, জেনেছে, উপলব্ধি কবে দেখেছে সব দেখেছে, তার চেনা-আধোচেনা মানুষেরা কী কবম অনিমেষ বিদ্যায ওপবে চলে যাচ্ছে—তাদের কী বকম তাগিদ—কত তাড়া! সে যে নিজে একজন প্রাণী নীচের ঘবে বযেছে—এ বাড়িটাও যে তার সেটা কোনো কথা নয-কথাটা সত্যিই খুব ঠিক।

যারা ওপরে যায, তারা কেউ লজ্জিত হযেও ফিরে আসে না তো? কেউ-কেউ অনেকক্ষণ তো বৈঠক জমায; হাসি তামাশা রগড় গুণা ছিটোফোঁটায ফেনায ছিটকে আসে নীচের ঘবে; মাল্যবান মাঝে-মাঝে অবাক হযে ভাবে—কথা ভাবে। কথা ভাবা কালোধুমসো পাখিদেব নীড় তার মাথাটা। আচমকা একটা সিগাবেট জ্বালিযে বা দড়াম করে জানালাব কপাটটা খুলে ফেলে পাখিগুলোকে উড়িযে দেয সে। যারা ওপবে যায, তাদেব পেছনে-পেছনে সে ওপবে যায না কোনোদিন; কাউকেউ কিছু বলতে যায না। যখন দোতলার ঘরে আসর খুব জমে উঠেছে, তখনও ওপরে যেতে কেমন দ্বিধা বোধ হয় তার; যখন বাত বেশি, উৎপলার ঘবে লোক কম—দুটি কি একটি—খুব সম্ভব একটি—তখন সে কিছুতেই ওপবে যায না; মন দিযে করেছে, চোখ দিযে সকলের জীবনেব সব তলানি আবিষ্কাব কবতে চায না।

চৌবাচ্চায় স্নান কবে ঠাকুরের কাছ থেকে ভাত নিয়ে খেয়ে সে অফিসে চলে যায। কিংবা সন্ধেবেলা যখন ওপরের আড্ডা জমে, তখন আস্তে-আস্তে স্টিক হাতে গোলদিঘির দিকে চলে যায। হাঁটতে-হাঁটতে ভাবে; কটা দিন আর? এই স্কোযারে পাক খাচ্ছি— চোখের পলকেই কুড়িটা বছব সাঁ কবে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে আমাব, উৎপলার; দেখতে-দেখতে চুল পেকে যাবে ওর, দাঁত পড়ে যাবে, তাবপরে সব ভোঁ-ভোঁ। ভাবতে-ভাবতে কুড়ি বছরেব পাল্লা সত্যিই, দেখ, পেবিয়ে গেছে সে—জীবনটা এখন বেশ নিরালা, নিঃশব্দ; একটা অতিরিক্ত কাক, একটা ওপরপড়া বেড়াল নেই কোথাও; রোদে বাতাসে নির্ভাবনা ছড়িয়ে আছে চাবদিকে; যত চাও, তত! কত নেবে? ভাবতে-ভাবতে ক্ষমার

ক্ষমতায় বোশেখ-জ্যৈষ্ঠের মাটির শিবায়-শিরায় শ্রাবণের রস এসে পড়ে যেন। চুরুট জ্বালিয়ে নেয় মাল্যবান।

কুড়ি বছর তো পেরিয়ে গেছে সে আর উৎপলা। গত কুড়ি বছর যে-সব আতিশয্যচক্র হয়ে গেছে উৎপলার জীবনে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নই এখন আর। গোলদিঘির রাতে, শীতে মাল্যবানের চুরুট তার মনের ভেতরে সেই ছেলেবেলার শীতরাতে শান্তর মাব আগুনে খাপড়ার মত কেমন একটা নিঃশব্দতা নিশ্চযতা শান্তির অবতারণা করছিল। বাড়িব দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে পড়ে মাল্যবান বলেছিল, কাকে যেন বলছিল; 'কী গো, গোলামবা সব চলে গেছে—রঙের গোলামও—বল। বিশটা বছর হস্‌কে গেছে চোখ না পাঁজলাতেই। মনু শ্বশুরবাড়ি, আব আমাদের বাড়ি সাযেব বিবি ওপরের ঘরে—বলো! বিছানাটা বেশ দুজনের মতন উম্-উম্, কুসুম-কুসুম, শীত-রাত আর শেষ নেই বলো?' দুপুব-বাতে ঠাণ্ডা নদীর পারে শামকলের মাথাটা যেন ঢেঁকিব পাড়ের মত উঠছিল পড়ছিল, যখন 'বলো-বলো।' বলছিল মাল্যবান। কথা বলতে-বলতে মাল্যবান হি-হি করে নিজের ঘরে ঢুকে লেপ টেনে নেয়; খুব বেশি অন্ধকারে খুব বেশি ঘুমের ভেতবে মানুষেব শবীর বলে কোনো জিনিস থাকে না, মনটাও কাঠ হযে যায, হঠাৎ জেগে উঠলে কাঠে আগুন লেগে যায; আচমকা জেগে-জেগে ওঠে সারারাত, পুড়তে-পুড়তে সকালবেলা মাল্যবান জাগ্রত চেতনাব অন্য আবেক রকম আগুনেব ভেতব জেগে উঠল। এখানে 'বলো-বলো'-র চালাকি চলবে না শামকল শালাব; প্রতিটি সেকেন্ড-মিনিট গুনে-গুনে অগ্নিকৃকলাসকে রূপকের মিথ্যে বলে বিদায দিযে, আগুনকে সত্যিই আগুন বলে গ্রাহ্য করে পদে-পদে এগিযে যেতে হবে। এ ছাড়া কোনো উপায নেই, কোনো পথ নেই আব।

একদিন মাল্যবান অফিসে গিযে শুনল যে, অফিসের কেবানি মনোমোহনবাবুব স্ত্রীব ভযঙ্কব অসুখ—মেডিক্যাল কজেলেব হাসপাতালে তাকে আনা হযেছে।

'ঘাবড়াবেন না মনোমোহনদা, সেবে যাবে—,' বললে মাল্যবান।

কিন্তু সেদিন সমস্তটা দিন অফিসে মনটা তার উৎপলাব জন্যে কেমন অসুবিধে অস্বস্তি বোধ কবতে লাগল।

সন্ধের সময়ে বাসায গিযে পোশাক না ছেড়েই সে ওপবেব ঘবে চলে গেল। গিয়ে দেখল, উৎপলা আর মনু ছাদে বসে আছে—কাব অসুখ, কোথায?

'তুমি ভাল আছ তো উৎপলা? আমাদের অফিসেব মনোমোহনবাবুব স্ত্রীব বড্ড অসুখ—'

'কী অসুখ, বাবা? 'মনু জিজ্ঞেস করল।

'সে কী-এক বকম অসুখ, স্টোন হযেছে—'

'সে আবাব কী?'

'কী জানি।'

মাল্যবান খানিকক্ষণ আলো-আবছা চোখে বাইবের দিকে তাকিযে ভারি ভাবুক হযে পড়ল; একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'মনু, যা আমবা খাই, তাব ভেতবে নানা বকম জিনিস থাকে, হজম হয না, ভেতরে-ভেতবে স্টোন হয—'

'পেটে হয স্টোন?'

'না, পেটে না, কিডনিতে হতে পারে— গলব্লাডারে হতে পারে—'

'কিডনি কী, গলব্লাডাব কী—?' জিজ্ঞেস করাতে মাল্যবান হাত দিযে নিষেধ জানিযে বললে, 'ও-সব তোমার জানবার দবকার নেই—'

'ভাতেব ভেতর যে—কাঁকব থাকে, সেগুলো জমে গিযে বুঝি কিডনিতে?' মনু বললে।

'না, তা নয, তা ঠিক নয—'

'ও তো আমার পেটেও হতে পাবে—' উৎপলা বললে।

'না, তা কী কবে হবে, উৎপলা—'মাল্যবান শিশুব মুখে ভূতের গল্প শুনে একটু হেসে উড়িযে দিযে বললে।

'হবে না? তোমাব ঠাকুর খুব দেখে-শুনে চাল ধোয় আর ভাত রাঁধে, উৎপলা বললে, 'এক-একদিন খেতে বসে দেখি কাঁকর পাথরের কাঁড়ি। গ্রাসে-গ্রাসে পেটে হকাচ্ছে, স্টোন হবে না তো কী

হবে—'

'ওতে স্টোন হয় না—ওটা—'যা-হোক মাল্যবান ঠাকুরকে ডাক দিল।

'ভাতে কাঁকর থাকে কেন?'

ঠাকুব আপত্তি করতে যাচ্ছিল, মাল্যবান বললে, 'ফেব যদি কাঁকব পাথব নুড়িকুচি কিছু দেখি, তা হলে তোমার মাইনে কেটে তোমাকে তাড়িয়ে দেব আমি। খবরদার।'

ঠাকুর চলে গেলে উৎপলা বললে, 'ওকে বকে কী লাভ। যারা চাল নিয়ে বজ্জাতি করে সে-সব ওপরওয়ালাদের পেটের ভাত চাল করে ছাঁকব আমাদেব চালুনিতে; নাও, সে-সব পেটোয়া চাল কযেক বস্তা নিযেসো দিকি। পাববে? মাঝখান থেকে ঠাকুবটাকে ঝাড়লে। কী বকম বেকুব তুমি।'

'এবাবে আমি চালওযালাকে কড়কে দেব,' অফিসেব ধবাচূড়া-পবা মাল্যবান একটা হাই তুলে বললে।

যে-আগ্রহ ও উদ্বেগ নিয়ে উৎপলাকে সে দেখতে এসেছিল, তা তার ধীবে-ধীবে ধোঁযাব ভেতব মিলিযে যেতে লাগল যেন। মনোমোহমনেব স্ত্রী অসুস্থ হযে পড়েছে বলে সমস্তটা দিন অফিসেব কাজকর্মেব ভেতর উৎপলার জন্যেও যে দুশ্চিন্তা হযেছিল, বৌযের সঙ্গে কিছুক্ষণ খিটিমিটি কবে সেই বিষণ্ণ, ভাল জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল একেবাবে। খাবাপ হল—খুব খাবাপ হযে গেল সব। অফিসের থেকে এ-রকম হ্যাঁচকা ছুটি নিযে বাড়িতে না এলেই ভাল হত।

'স্টোন হযেছে—তাবপর কী হল—মরে গেল?'

'না মববে কেন? তা হলে বেচাবির চলবে কী কবে?'

'কোন বেচাবিব?'

'মনোমোহনদাব।'

'মনোমোহনবাবু তোমাদেব অফিসেব কেরানি?'

'হ্যাঁ, নীচের দিকেব; মাইনে পঞ্চান্ন টাকা; বড্ড মুশকিল মনোমহোনদাব।'

'মনোহোমনাবাবুব বৌযের জোব কপাল বলো—'

'কেন?'

'পাবানির দিকে চলেছে—বৈকুণ্ঠে যাবে—কেরানিব টাকায টিকছে না আব—'

উৎপলা হাঁসফাঁস কবে বললে, 'পেটে আমার কী যেন হযেছে, মনে হয—'

'কী হল?'

টিউমাব হযেছে মনে হয—'

'কে বললে?'

'বলবে আবাব কে? টেব পাচ্ছি। এব অষুধ কী? অপরাশেন কবতে হবে?'

মাল্যবান সন্দিগ্ধ চোখে তার স্ত্রীব দিকে তাকালঃ সত্য কথা বলছে? কী কবে বুঝবে, কথাটা অসত্য? সুবিধেব লাগছিল না তাব। কোনো কিছু স্থিব কবে নয, এমনই কথা একটা-কিছু বলতে হবে বলেই মাল্যবান বললে, 'ও টিউমার নয। ও কিছু নয। ও তোমার মনেব ধোঁকা।'

উৎপলা কথা খবচ কবতে গেল না আব। মেঝেব ওপব বসেছিল—বসে-বসে হাঁসফাঁস কবতে লাগল; উঠে দাঁড়িযে হাঁসফাঁস কবতে লাগল।

চাব-পাঁচ দিন কেটে গেছে। মাল্যবানের কেমন যেন—কেন যে, কিছুই ভাল লাগছিল না।

'চলো, আজ একটু বেড়িযে আসি-'

'কোথায?'

'চলো, আজ একটা গড়েব মাঠে দিকে যাই—' মাল্যবান বললে।

'থাক।'

'চলো, ভরসাঁঝে এ-বকম একা-একটা ছাদে বসে থাকলে মন খারাপ লাগবে—'

উৎপলা উঠে দাঁড়িয়ে বড় বাতাসে ফুল ধবা বাবলার মত হুড়মুড় কবে কেঁপে পাক খেয়ে উঠে বললে, 'এই যে ছিবঙ্গ-ঠাকুরপো একটা বেহালা এনেছ দেখছি—' শ্রীবঙ্গ বললে, 'হ্যাঁ, কিছু দিন থেকে শিখছি –আচ্ছা, দেখ, কেমন বাজাই—'

'আচ্ছা কেত্তনের সুরই ধরছি।'

'কোচে বসো ঠাকুরপো। বাঃ, দাঁড়িযে কেন?'

'আমি দাঁড়িয়েই সুবিধে পাই; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নবনী মল্লিক বেহালা বাজায়। আমায় শিখিয়েছে সে।'

'নবনী? পুরুষ, না মেয়ে?' মাল্যবান জিজ্ঞেস করল।

'অবনী যদি পুরুষ হয়, তা হলে নবনী কী হবে?' আড়চোখে মাল্যবানের দিকে একবার তাকিয়ে বিদুতের ভরা ব্যাটারির মত সম্পন্ন সফল দৃষ্টিতে উৎপলার দিকে তাকাল শ্রীরঙ্গ।

'অবনী নবনী দুভাই? নবনীবাবু আপনার দাদা?' মাল্যবান বললে।

'আমি তো মল্লিক নই।'

'তবে?'

'পলা বৌদি জানে আমাব কুলের খবর—'

'ওরা রামবাগানের দত্ত,' উৎপলা বললে।

উৎপলা শ্রীরঙ্গকে জিজ্ঞেস করলে, 'নবনী কি মল্লিকবাড়ির মেয়ে, রাজেন মল্লিকের—'

'হবে এক মল্লিকের; ব্যাটাছেলে নয় নবনী, মেয়ে বটে। পলা বৌদি, বেহালাটা বাজাই তা হলে?' ঘাড় কাত করে গোলাপজাম কামরাঙা লটকান বনের কেমন এক অমায়িক হলুদ পাখিব মত জিজ্ঞেস করল শ্রীরঙ্গ।

'বাজাও-বাজাও।'

'কেত্তনের সুর?'

'বাজাও।'

'না, কেত্তনেব সুর নয়—'উৎপলা নিজেকে তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললে।

'কেন?'

'বেহালায তা বাজবে না। তুমি একটা অন্য সুর বাজাও শ্রীবঙ্গঠাকুরপো। যাকে বলে বেহালাব সুব-'

শ্রীরঙ্গ বেহালা কাঁধে গুণীর মত দাঁড়িয়েছিল। এবারে এক পাযে ভর দিযে দাঁড়াল-বাঁ পা পিছনেব দেযালে ঠেকিয়ে, 'ব্যযলার সুব মানে?'

'মনোমোহন ব্যযলাদারকে চিনতে তুমি' উৎপলা বললে।

'না তো। কোথাকাব?'

'চব্বিশ পরগনার। আমি তাকে প্রাযই একটা চমৎকাব সুব ভাঁজতে বলতাম। কোনো গানেব সুব সেটা নয। সেটা ব্যযলাব সুব। মনোহোমন মন্ত্রী লোকটাব নাম।'

'ঐ একই সুর বাজাত?'

'একই সুব।'

'ববাবব?'

'বার মাস। আমাদের দেশেব বাড়িতে শীত পড়লে আসত। কার্তিক মাসটি কাটিযে যেত। লোকটাব নাম যা বললাম, মনে আছে তোমাব?'

একটা শামুক; না, কী যাচ্ছে, দেখাবাব জন্যে হাঁসের মত ঘাড় কাত কবে শ্রীবঙ্গ ঘাড়টাকে আবাব সোজা করে নিয়ে বললে, 'মনে আছে, মনোমোহন মন্ত্রী। এইবার বাজাই?'

'বাজাও। বাজাও। আয মনু, আয। নবনী মল্লিক বাজেন মল্লিকেব বাড়িব, না?'

'না।'

'তবে?'

'ওদের বাড়ি জলপাইগুড়ি না কোথায যেন ছিল; এখন কলকাতাযই থাকে। ও হল কেষ্ট মল্লিকেব মেয়ে, টালিগঞ্জের।'

'বড়-সড় মেয়ে?'

'মনুর চেয়ে বড়, তোমার চেয়ে ছোট, বেশ সোমথ মেয়ে। ভারি সুন্দর। টলটলে মাকালের মত যেন তেল চুয়ে পড়ছে চামড়ার থেকে; হাত বুলিযে নিলে ঘাসের শিশিব উঠে আসে যেন ভোরবেলার। ভাল বাজিয়ে। মোক্ষম গাইছে, মাইরি। আমি ওকে আমার গাইযে বৌ বলি—'

'ওকে বিয়ে কবেছে তুমি''

'না। এমনিই মশকরা করে বলি।'

শ্রীরঙ্গ বললে, 'বেযালাব আর্টিস্ট কাউকে বিয়ে করবে না। অবিশ্যি তোমার মতন কাউকে পেলে বিযে

করে, কি, না করে—বছরে কত দিন শনি-মঙ্গলবার টের পাইয়ে দিত আমাকে—কিন্তু কাউকে কোথাও পেলুম না-দেখলুম না তো তোমার মত।'

এ-রকম কথা শুনে নাক-মুখ লাল হবার বয়েস না থাকলেও সেই বয়েসের যে রক্ত এখনও আছে উৎপলার, চলকে উঠেছিল।

'সেই মাঠকোঠা, নেবুতলা, শোভাবাজার, পাথুরেঘাটা, কুমারটুলি, আহিরিটোলা, বৌবাজার, চিৎপুব, হাতিবাগন, রাজাবাজার, ধর্মতলা—সমস্ত কলকাতা আমাব পায়ের নীচে পলা বৌদি—কিন্তু তোমার মতন এমন হাতি খেতে কাউকে তো দেখলুম না।'

উৎপলা একহাত পেছিয়ে চমকে উঠে বললে, 'হাতি খেতে?'

'হ্যাঁ, সে অনেক দূরের সমুদ্রে শ্রীমন্ত সগাগব যেমন দেখেছিলেন—'

উৎপলা খানিকটা বিলোড়িত হয়ে উঠে বললে, 'তুমি বুঝি শ্রীমন্ত সদাগব?' বেহালায় একবার ছড়ি টেনে উৎপলার দিকে চোখ তুলে শ্রীরঙ্গ বললে, 'আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ পথের ওপরে, কিন্তু হাতি খাচ্ছ কেন, বলো তো কামিনী—'

'কমলে কামিনী বলো,' উৎপলা ফোঁড়ন দিয়ে বললে, 'কামিনী নয়। দেখছ না ওঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন-'

একটু এগিয়ে চাপা গলায় বললে শ্রীরঙ্গকে।

শ্রীরঙ্গ বেহালায় এবাব একটা সুরই ভাঁজতে লাগল—খুব মন দিয়ে, কিন্তু তাব চেয়েও নিবিদ নিবেশে মননেব অপর বস্তুতে লেগে থাকতে চেয়ে; বুঝছিল উৎপলা; অনুভব করছিল একটু দূবে দাঁড়িয়ে থেকে মাল্যবান। কিন্তু বাজাতে-বাজাতে হঠাৎ মাঝখানে থেমে গেল শ্রীবঙ্গ।

'অনেক দূবের এক সাগর; দেখা যাচ্ছে নিবালা জল, রোদ। সেখানে পদ্মেব ওপর দাঁড়িয়ে আছে—শ্রীমন্ত সদাগর দেখলেন,' শ্রীবঙ্গ চোখ বুজতে-বুজতে চোখ মেলে ভাল কবে তাকিয়ে একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি হাতি খাচ্ছ কেন, পলা?'

'কী খাব তা হলে?' শ্রীরঙ্গেব দিকে তাকিয়ে, মাল্যবান যে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা জানতে না চেয়ে নিজেকে একটু বেশি ছেড়ে দিয়ে বললে যেন উৎপলা।

'শ্রীবঙ্গ হঠাৎ চাবদিকে চোখ ফিবিয়ে বললে, 'ওঃ এই যে মাল্যবানবাবু; এখানে দাঁড়িয়ে আছেন দেখছি; আমাব চোখেই পড়ে নি। আচ্ছা, আমি বাজাই বেশ দুর্দান্ত একটা গৎ। শোন মনু, শোনে মনুর মা, শুনুন মাল্যবানবাবু।'

বাত দুটোর সময খুব কাছাকাছি কোন বাড়িব ভেতব বড় কান্নাকাটি পড়ে গেল; মাল্যবানেব ঘুম গেল ভেঙে। তাড়াতাড়ি বিছানাব থেকে উঠে কম্বল গায়ে দিয়ে সে দবজা খুলে রাস্তায নামল। তাকিয়ে দেখল ধীবেনবাবুদের সদব দবজার কাছে ভিড় জমে গেছে। ঢুকে দেখল, একটি মেযেমানুষের শব নীচে নামানো হযেছে—মেয়েটির বযেস পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে হযেতো, এমন সুন্দর শান্ত নিরিবিলি মুখ—কপাল চুল সিন্দুবে মাখা-মাখা—দেখে তার প্রাণের ভেতর কেমন যে কবতে লাগল! অন্ধকার শীতেব ভেতবে সে চুপে-চুপে নিজের ঘরে ফিরে এল আবার; খানিকটা সময অবসন্ন হযে নিজের বিছানাব ওপব বসে রইল; তারপর আস্তে-আস্তে সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে ওপরে গিযে দাঁড়াল।

মাল্যবান দেখল, উৎপলা আর মনু বিছানায় উঠে বসে আছে। একটা চেয়ারে বসে মাল্যবান বললে, 'আমিও ভেবেছিলাম, তোমাদেব ঘুম ভেঙে যাবে—'

'কারা কাঁদছে?'

'ঐ ধীবেনবাবুদের বাড়ি—'

'কী হল?'

'সত্যেনের স্ত্রী মারা গেছে।'

'আহা, সেই রমা!'

'হ্যাঁ।'

'কীসে মরল?'

'জানি না তো।'

সূচীপত্রে যান

'বাঃ, আমরা জানতেও পারলাম না।'

'হঠাৎ হয়ত মারা গেছে—কোনো রোগ হয়েছে বলে শুনি. নি তো।'

'হার্ট-ফেল করল। কিন্তু ওর স্বামী তো পুরুষমানুষ যাকে বলে। গলায় গামছা দিয়ে মেয়েমানুষকে ও-রকম জামাই টেনে আনতে দেখি নি তো কোথাও—অনেক জামাইষষ্ঠী তো দেখলুম—' উৎপলা বললে।

'এবারকার জামাইষষ্ঠী হয়ে গেছে, মা? কী মাসে জামাইষ্ঠী হয়, মা?'

মনুকে কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে উৎপলা বললে, 'সুখের পায়রার ঘাড়ে সোহাগের পাযরা করে রেখেছিল তো বৌকে। মেয়েটা এ-রকম ভিরমি খেল কেন গা।'

'কীসে কী হয়েছে, কে জানে', চানের সময সমস্ত মুখে সাবান মাখতে-মাখতে মানুষ যেমন সংক্ষেপে কথা সারে, তেমনি ভাবে বললে, মাল্যবান।

'আহা, দুটো কচিকাঁচা মেয়েও তো রয়েছে, ওদের কী হবে।'

'সকলে মিলে দেখবে। অমন বাবা আছে। ঠাকুমা, পিসিমারা রয়েছে, যেন চোখে সাবান না যায় সে দিকে দৃষ্টি রেখে কটাকট-কটাকট কথা বলছে মাল্যবান—চানের সময যেন—মনে হচ্ছিল।

'তা পাড়াপড়শি মরেছে, যেতে নেই?'

'আমি গিয়েছিলাম।'

'গেলে তো চোরের মত, চলে এলে আবার?'

'তোমাদের একা ফেলে এ-বকম অবস্থায় বেশিক্ষণ তো সেখানে থাকা যায না।'

আহা-হা, শিমুলের তুলো উড়তে-উড়তে মাদাবকাঁটায গিযে ঠেকেছি আমরা। ধনেশপাখি এসে ঠোঁট নেড়ে খসিযে দেবেন—' উৎপলা এক গা. জ্বালাতন ঝেড়ে দাঁতে দাঁতে ঘসে বললে।

'আহা-হাঁ!—আহা-হা!—' বলতে লাগল উৎপলা।

'বিছানার থেকে নেমে আলনার থেকে একটা ধোসা পেড়ে গাযে বেশ আঁটোসাঁটো জড়িয়ে নিয়ে উৎপলা বললে, 'আয তো মনু কোটটা গায়ে দিয়ে।'

মনুকে নিয়ে ধীবেনবাবুব বাড়ির দিকে রওনা দিল সে।

লৌকিকতা রক্ষা করছে, ভালই, ভাবছিল মাল্যবান; কিন্তু মনুকে সঙ্গে নিচ্ছে? কেন? সমাজিকতা রক্ষার জন্যই শুধুই যাচ্ছে না উৎপলা—যাচ্ছে দশ-পাঁচ বকম দেখবে বলে: হৃদয আধাব উৎপলাব, বাইরের পৃথিবীটাও খুব সক্রিয় (আজ দুপুর-রাতেও), কযেক ঘণ্টাব খোবাক জুটল উৎপলার। মাল্যবান অন্ধকারের ভেতব একটা বিড়ি জ্বালাল। কিন্তু তৎক্ষাণাৎ সেটা ফেলে দিযে নীচে নেমে সদব দবজায তালা মেরে ধীরেনবাবুদের বাড়িতে যাবার মাঝবাস্তায উৎপলাকে পেযে বললে, 'এই নাও চাবি।'

'চাবি আমি কী কবব?'

'নাও। আমি শ্বাশানে যাচ্ছি।'

উৎপলা ঠোঁট রসিয়ে বললে, 'পাড়ায আর বামুন নেই, কাশীঠাকুব চিড়ে খাবে—'

'নাও, চাবিটা নাও, ধরো—'মাল্যবান চাবিটা গছিয়ে দিয়ে বললে।

'শ্মাশানে যাবে মশানে যাবে, সেই একদিন যাবে, যাবে তো। নাও, পথ ছাড়ো—পথ ছাড়ো দিকিন, চৌখুপ্পি কম্বল জড়িয়ে রমাদের বাসায ঝঁ-অলা রাঘববোযালের মত হোঁৎ কবে উড়িয়ে উঠবার কোনো দরকার নেই তোমার—'

'কতা শোন। কতা?' মনটা একটু বঙে চড়ে ছিল বলে মাল্যবান 'থ'-কে 'ত' বানিয়ে দিয়ে বললে, 'রাঘববোয়াল আবাব ঝঁ-অলা হয না কি। কতা শোনো! কতা!' হি-হি করে কাঁপতে-কাঁপতে এগিযে গেল সে; যেন বীরজননীর ছেলে—দেশের শত্রুদেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে; এ না হলে উৎপলাকে চমৎকৃত করে দেওয়া যাবেনা।

কেমন যেন একটা প্রবল ছেলেমানুষি বীরপুরুষি ঝাপটা পেযে বসল তাকে; চমৎকৃত করে দেবাব কী দরকার, ভাবতে গেল না সে; তার চেয়ে শীতরাতে নীচেব ঘরের বিছানা-কম্বল যে সত্যিই ঢেব পরিচ্ছন্ন সত্য শান্ত—মূল্য-মীমাংসার পৃথিবীতে সেটা ভুলে গেল।

মড়া পুড়িয়ে বেলা দুটোর সময়ে বাড়িতে ফিরে এলে উৎপলা বললে, 'আজকে অফিসটা বাদ দিলে তা হলে?'

'কী করব, পাড়াপড়শি যদি মবে যায়।'

সূচীপত্রে যান

'কী করলে শ্মশানে গিয়ে।'

'যাই, চৌবাচ্চায় চান করে আসি—' বলে মাল্যবান দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পিঠে গামছা ঘষতে লাগল।

'সত্যেনবাবু গিয়েছিলেন শ্মাশানে?'

'ও মা, তিনি যাবেন না!'

'ও মা, চোখ পাল্টালে যে! শুদোচ্ছি। কতক্ষণ ছিলেন তিনি?'

'কোন এক সময় কেটে পড়লেন, টেব পেলাম না।'

'কেটে পড়লেন' কথার রকম দেখ। ওকে তো সবাই ধবাধরি করে শ্মাশান থেকে নিয়ে এসেছে। খেদার হাতির মত কেমন অবলা উতলা হয়ে পড়েছিলেন শুনলাম। খুব কেঁদেছেন?'

'হ্যাঁ, কেঁদেছেন বটে। দু-চাব বাটি।'

'খুব লেগেছে ভদ্রলোকের,' উৎপলা বললে, 'তবু পুরুষমানুষ তো। লেজ দিয়ে ডাঁশ উড়িয়ে আবার কলাগাছ খেতে শুরু করবে; এই তো হয়ে এল বলে। বনেব হাতি পোষা হাতি হবে এবাব, দোজবরে সত্যেনেব বৌয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে কলাব পাত পড়ল বলে।'

'এ বৌ তোমার বাপেব বাড়ির দেশের বুঝি? নিত-কনে হয়ে আসব জাঁকিয়ে বসবাব শখ?' মাল্যবান শবীবটাকে, মুখটাকে (যেন তা ফোকলা হয়ে গেছে।)একটু নাচিয়ে হাসিয়ে বললে, 'সত্যেনের বিয়েতে কলাব পাত দিয়ে কববে কী তুমি। হাতি হয়ে সত্যেন কলাগাছ খাবে, বলছিলে, তো তুমি; কামিনী হয়ে সেই হাতিকেই খাবে তো তুমি। বাঃ, কেমন কামিনীব মত পদ্মের ওপব দাঁড়িয়ে আছে উৎপলা!'

উৎপলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বললে, 'বেশ তিরিখ-তিরিখ জবাব দিচ্ছ তো তুমি, যে যাই বলুক, এই ভব-সন্ধ্যেবেলা। নাও, চান কবে এসো, চা খাবে এসো।'

একটি মৃতা—খুব অল্প বয়সেই-দগ্ধ হয়েছে শ্মশানে। একটি স্বামীব শোক খুবই জায়াকেন্দ্রিক, এখনও গভীব। কিন্তু এখনই তরল হয়ে যাচ্ছে সব; সচ্ছল সফল সময় ব্যথা, বাচালতা, সরলতা, নষ্টামি, ভয়, বক্ত, বিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতাব ভেতব মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তি জীবন নয়, অফুরন্ত অনির্বচনীয় সময়—সময় শুধু।

বমা মাবা যাওযাব পব থেকেই মাল্যবান মাঝে-মাঝে কেমন সব মৃত্যু ও দাহের স্বপ্ন দেখত বাতেব বেলা। একদিন সে দেখল, নিজে মরে গেছে, তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল; সেখানে সে খুব অমাযিক ভাবে সকলেব সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, সকলকে নমস্কাব জানাচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে বলছে; আপনাদেব সঙ্গে আব তো দেখা হবে না, কোথায় যাই, কে জানে।

জেগে উঠে তার মনে হল; এ কী অদ্ভুত! হলই-বা স্বপ্ন, কিন্তু স্বপ্নেব ভেতরেও মবে তো গিয়েছিল সে; মবে গিয়ে মানুষ আবাব বসে-বসে জীবিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলে কী কবে! বাস্তবিক, স্বপ্ন এমন হিজিবিজি—মানুষের বুদ্ধি, বিচার, চেতনাব দু-কান কেটে ছেড়ে দেয়। অনেকে বলে স্বপ্ন সত্য হয়। বাস্তবিক, মবে যাবে কি সে? শীতেব গভীব বাতে অন্ধকাবকে মিশ-কালো করে দিয়ে বেশি অন্ধকাবেব প্রবাহেব ভেতব—ভাবতে-ভাবতে-ভাবতে গিয়ে কেমন যেন ন্যাতা জোবড়ার মত হয়ে পড়ল সে। নিজেব জন্যে ততটা নয়—কিন্তু সে মবে গেলে উৎপলার উপায় হবে কী? মনু আর উৎপলাব জন্যে মনটা তার নিজের চেয়ে ঢেব বুড়োমানুষেব মত গুঁইগাঁই কবে উঠল। বিছানায় উঠে বসল; চটি পাযে দিয়ে কম্বল জড়িয়ে আস্তে-আস্তে ওপরের ঘবে গেল সে। গিয়ে দেখল, উৎপলা ঘুমিয়ে আছে—পাশে মনু—সেও ঘুমিয়ে। বেশ শান্ত নিবাময় নিশ্বাস তাদের। ওরা অন্তত কোনো দুষ্ট স্বপ্ন দেখে নি। বেশ। এদের দিকে তাকালে আশ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু, তবুও, এর স্বামী আব ওব বাবা যদি মরে যায়, তা হলে এ-রকম কবে দুজনে ঘুমোতে পাববে কি আর? জেগেও উঠতে পাববে না আব, জাগবীতে ঘুরেফিরে বেড়াতে পাববে না আব সহজ সফল ভাবে।

কিন্তু, তবুও, শেষ পর্যন্ত সত্যিই মরে সে তো যায় নি, বেশ সুস্থ হয়ে বেঁচে আছে। আছে। আমাদের জীবনের নদীর নাম—অনুত্তরণ, মাল্যবান ভাবছিল, কোথাও কেউ উত্তীর্ণ হতে পাবে না, কোনোদিন এ-নদীর পথে; কিন্তু তবুও, কত লোক ব্যাথা বিপদ বিফলতা মৃত্যুব বলে প্রতিদিন ওতড়াচ্ছে; উৎপলা, মনু পারবে না কেন? মানুষ হয়ে জন্মালে নানা বকম দুর্নিবাব শাস্তি ভোগ করতে হয—করতেই হয; মনু উৎপলা বাদ যাবে না; মাল্যবান মরে গেলে মানুষেব সে-পাওনা বুঝে নিতে হবে স্ত্রী-সন্তানকে; কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয; চুপ হয়ে যায সব, শান্ত নিশ্চুপতা রয়েছে। প্রথমে

সূচীপত্রে যান

মাল্যবানের মৃত্যু—তারপরে অনেকদিন পরে হয়তো তার স্ত্রী আর সন্তানের মৃত্যু; এই ত্রিমৃত্যুতে নিস্তব্ধ হয়ে যাবে সব। সময়ের কাছে মাল্যবানের দাযিত্ব ফুরিয়ে যাবে। ভাবতে-ভাবতে এখনই যেন ফুরিয়ে যাচ্ছিল সব—এই রকম একটা অনুভব ঘিরে রাখছিল মাল্যবানকে।

কিন্তু, আরেকদিনের স্বপ্ন সব-চেয়ে ব্যথা দিল তাকে। দেখল, উৎপলা মরে গেছে। স্বপ্নের ভেতর মনে হল, উৎপলা সত্যেনবাবুর স্ত্রী—সমস্ত পৃথিবীই তা জানে—মাল্যবান নিজেও খুব ভাল করেই জানে যে, দশ-বার বছর ধরে এরা পরস্পরের বৈধ স্ত্রী-স্বামী; এদেব এ-রকম সম্পর্ক নিয়ে কোনো খটকার বাষ্প নেই মাল্যবানের মনে। কিন্তু তবুও, সেই সঙ্গে সেই স্বপ্নেই উৎপলা মাল্যবানের স্ত্রী-ই—আর কারু কিছু নয়; এ-রকম সব খাপছাড়া জিনিস স্বপ্নের ভেতরে খুব সত্য ও স্বাভাবিক বোধ হচ্ছিল। দেখা গেল, উৎপলা মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে—সমস্ত চুল এলোমেলো, কপালে-মাথায় সিঁদুর ধ্যাবড়া, পরনে—আশ্চর্য!—বিধবার থান। মড়ার খাটিয়াব ওপর শুযে মবা নারী মনের, মাংসপেশীর নানা রকম নম্র, উদ্দাম আক্ষেপে নিজের মৃত্যুর বেদনা সত্যেনকে জানাচ্ছে, কিন্তু শূন্যতা ও হাহাকার বিঁধছে মাল্যবানকে মর্মস্নায়ুতে।

ঘুম ভেঙে গেল তার।

তখন শেষ রাত।

কম্বলের নীচে সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে মাল্যবানের। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে খালি পাযে ওপরেব ঘরে চলে গেল। গিয়ে দেখল, মনু বিছানায় উঠে বসে আছে—উৎপলা নেই। নেই, থাকবে না, বলে দিযেছে তো স্বপ্ন। তাব সঙ্গে গাঁথা এই নাস্তিত্বটা বুঝি। নেই।

'তোর মা কোথায়, মনু?'

'বাথরুমে গেছে।'

আছে তা হলে; কিংবা হযতো নেই; কী মানে আছ এত বেশি শীতে শূন্যতায় প্রপন্ন রাতে দূব বাথরুমের অন্ধকারে মানুষের অস্তিত্বেব, মনুব মুখেব 'বাথরুমে গেছে' নির্দেশের।

'কখন গেল?'

'এই তো, এখুনি।'

'এতক্ষণ বিছানায় শুযে ঘুমোচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো অসুখটসুখ করে নি তো?'

'কার? মাব?' মনু মাথা নেড়ে বললে, 'না তো।'

'কোনো অসুবিধে হযেছিল? কাঁদাকাটি করেছিল?'

চোখের ওপর থেকে চুলের গোছা সবিযে নিযে মনু বললে, 'না তো। আমি দেখেছি, কাঁদে নি। কে বললে মাকে-তুমি বলছে কাঁদতে?'

'না রে।' মাল্যবান দাঁড়িযে-দাঁড়িযে কথা বলছিল, চেযারে বসল এবার।

মাল্যবান সদ্য স্বপ্নছুট বিতর্কাসক্ত মনকে বলছিল, সত্যেনবাবুর কাছে খিঁচে-দুমড়ে দীনতায দাবনা কাঁপিযে সে কী আক্ষেপ, কান্না—নিজে মরে গেছে বলে! বাস্তবিক, স্বপ্ন বড্ড ফিচেল—নিরেট জিনিস; খ্যাঁট মেবে বদহজম হলে ও-সব বিলকি-ছিলকি স্বপ্ন দেখা যায, এই যারা ভাবে, তারা কি কিছু জানে? স্বপ্ন হচ্ছে অন্তিম জিনিস—এর পর আর-কিছু নেই; ছোট অন্ধকাব আব বড় অন্ধকাবের টানা-পোড়েনে রাতের আলোয অন্তিম ঘনিযে উঠলে স্বপ্ন দেখা যায—দুঃস্বপ্ন; ভাল স্বপ্নও আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ স্বপ্ন সব—

'এখন কটা, বাবা? ভোর হয়ে গেছে না?'

'না। ঘুমুবে না কি? ঘুমোও, ঘুমোও।'

'ময়লার গাড়িগুলো ঘিনঘিন করছে; ওগুলো মযলার গাড়ি, না? কাক ডাকছে তো। এখন কটা রাত, বাবা?'

'কটা রাত? বলছি তোমাকে।' মাল্যবান বললে। কিন্তু ধারাপাত প্রথম ভাগ নিয়ে মন তার বসে পড়তে চাচ্ছিল না। অমেয় অব্যয় স্বপ্নকূট—ও জ্ঞাননির্জ্ঞানগ্রন্থি নিয়ে খুব চিন্তিত হযে ছিল তার মন—বৃহত্তর উৎপলা গ্রন্থি পবিধির ভেতর। সব রকম গ্রন্থিকে অতিক্রম করে একটা স্বাভাবিকতার মহত্ত্বে পৌছুবার জন্যে।

উৎপলা বাথরুমে থেকে ফিবে এসে বললে, 'তুমি এখানে বসে যে—

'তুমি এখন ঘুমুবে?'

'মতলবটা কী তোমার?'

'না, কিছু না। মনে হল, কোনো অসুখটসুখ করল না কি?'

'কার? আমার?'

'সারারাত বেশ ঘুম হল?'

মাল্যবানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার তাকিয়ে নিয়ে উৎপলা বললে, 'এখানে এখন কীসের জন্যে?'

'এমনিই এসেছিলাম। রাতে অনেকক্ষণ বইটই পড় বুঝি?'

'অনেক কাজ করি—'

'তুমি মনে করো, আমি বুঝি তোমার কাজের ফর্দ চাইতে এসেছি। না, তা নয়, এমনি কতথাবার্তা বলতে এলুম।'

'এখন আমার সময় নেই,' উৎপলা বললে, 'ভাল মানুষের মত নীচে গিয়ে ঘুমোও তো।'

'তুমি এখন আর-এক দমক ঘুমিয়ে নেবে বুঝি?'

'আমার আজ উঠতে দেরি হবে। নিজে চা করে নিও।'

'নেব। দোকানেও খেয়ে আসতে পারি। আজ রাতে তোমার ঘুম হয়েছিল ভাল? আমি কেমন বিদকুটে স্বপ্ন দেখেছিলুম সারাটা রাত।'

উৎপলা লেপের ভেতর চলে গিয়েছিল; শেষ রাতে আর-একটা ঘুম জড়িমার আশ্চর্য ঢেউ এসে পড়েছিল ঠিক বাথরুমের যাবার আগে;এখনও আবেশটা কেটে যায় নি; কিন্তু নীচের থেকে মানুষটা ঠিক এই সময়েই উঠে এল বাদ সাধবার জন্যে!

'তুমি যাও।'

'আজকে রাতে স্বপ্ন দেখেছিলুম, তুমি মরে গেছে।'

'তুমি নীচে যাবে?'

'নীচে আমি যাব বটে,' মাল্যবান কম্বলটা আঁটি করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, নীচে যেতে হবে। কিন্তু বিচ্ছিরি সব স্বপ্ন দেখছিলুম সারারাত। পোষ মাসের রাত; পোষলা বলে পাড়াগাঁয়—ধুম পড়ে গেছে সব। পোষলার গাঁজলা বলেন স্বপ্নকে ফ্রয়েড। কিন্তু কী জানেন স্বপ্নের ফ্রয়েড? হ্বিয়েনার যত মৃগী রুগি আসত তো তাঁর কাছে; তাদের কফিসেদ্ধর গরম-গরম সুরুয়া বানিয়ে তো আর মানবজীবনের তত্ত্ব বেরয় না।'

মনু বললে, 'মা মরে গেছে, এই স্বপ্ন দেখেছিলে রাত্রে?'

'আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, তোর বাবা উল্টোগাধায় চড়ে সিধে নিয়ে চলেছে—রাজেশিবপুরের ব্রহ্মমোহনবাবুকে দেবে। চলেছে—চলেছে—চলার আর শেষ নেই—উল্টোগাধায় চড়ে চলেছে কোথায়? রাজেশিবপুরের নকড়ি খোসাল বটব্যালের কাছে—'

মনু ফিকফিক করে হেসে উঠল, বললে, 'ভোম্বা! রাজেশিবপুর—রা-জে-শি-ব ন-কড়ি খো-সা-ল—'

অন্ধকারের ভেতর একটা বিড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে মাল্যবান ঠোঁট ভেঙে হাসছিল। বেশ ভাল লাগছিল তার; চারদিকে অন্ধকার—হয় তো একটু পাতলা হয়ে এসেছে; তবুও বেশ ভাল, নিশ্চুপ, উচ্ছিষ্ট অন্ধকারে ভরে আছে ঘরটা; খুব শীত; গায়ে গরম পট্টুর ওপর বেশ চৌখুপ্পি কম্বল জড়িয়ে বসেছে সে শীতের ভেতর। ডিমপাড়া নীড়ের দুটো কোলঘেঁষা পাখির মতন উষ্ণ হয়ে রয়েছে যেন তার একা মানুষের শরীর। বাইরে জীবনের সাড়া, চলাচল আরম্ভ হয়ে গেছে—তবুও মুখের নিস্তব্ধ অমরতাও অনেকখানি। ঘরের ভেতর লেপ মুড়ি দিয়ে ভারি আরামেই শুয়ে আছে উৎপলা আর মনু; মরে নি পলা, মনু বেশ ভালই আছে; উল্টোগাধার পিঠে চড়ে রাজেশিবপুরে যাওয়ার কথাটা পলা যা বলেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে—এই-ই তো বোঝা যাচ্ছে যে, স্থির ঠাণ্ডা তার মাথা। যাক, ভাল আছে ওরা। রাত পোহাতে বাকি আছে খানিকটা সময়। ঘুমোক। মাল্যবান উঠবে, ভাবছিল। বিড়িটাও ফুরিয়ে এল। নীচে গিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে বসবে এবার।

পর দিন সন্ধের সময় অফিস থেকে ফিরে চা-জলখাবার খেয়ে মাল্যবান ওপরে এল।

'সেদিন সেই পরটাগুলো কাকে দিয়েছিলে?'

'কোন দিন?'

সূচীপত্রে যান

'ঐ যেদিন বৌঠানের জন্যে বেনারসি কিনতে গেলাম?'
'ওঃ, লোনার মাকে।'
'লোনার মা এসেছিল আর?
'না।'
'তার ছেলের কী হয়েছে যেন?'
'কুষ্ঠ।'
উৎপলা বললে, 'কেন জিজ্ঞেস করছ?'
'কুষ্ঠরুগি—তাই ভাবছি—'
'লোনার মাকে আমি বলেছিলাম রোজ এসে ভাত ডাল মাছ নিয়ে যেতে।'
'তা বলেছে, ভালই করেছ, উনুনের আগুনে নিজেকে জ্বালিয়ে তবে এ-সব মানুষকে হাঁড়ির ভাত সেদ্ধ করতে হয়। বড় সন্তাপ এদের—'
'কই, এল না তো আর।'
'কুষ্ঠরুগি কী না, কী হয়েছে—'
'না, বুড়ির কোনো রোগ হয় নি,' উৎপলা বললে।
'আমি বলছি, ছেলের কথা—'
'তা অবিশ্যি, হয়ত কোনো আশ্রমে গেছে।'
'তা হতে পারে।'
বেশি নয়—একটু—আলোড়িত হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছিল মাল্যবান। ঘন-ঘন কয়েক বার চোখের পলক ফেলে বললে, 'আমাকে সেদিন উপোসি রেখে লোনার মাকে পরটা তো দিয়েছ—'
'চেয়েছিল, কেন দেব না?'
'দিয়েছ, ঠিক করেছ। ভালই করেছ। ভালই করেছ—'
মাল্যবান আর কথা বাড়াবে না, ভাবছিল। সেদিনকার সেই পরটার কথা বলবার জন্যেও প্রধানত আসে নি সে; অন্য সব বিশেষ অন্তরঙ্গ কথা বলার তাগিদ; কিন্তু তবুও বললে, 'ওকে দিয়েছ, ভালই করেছে, কিন্তু আমাকেও কিছু দিলে পারতে, সমস্ত দিন অফিস খেটে আসি—'
করেকার পরটার কথা কপচাতে এসেছে মাল্যবান, উৎপলার গলায় ঝাঁঝ এল, বললে, 'তুমি বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে নিলেই পারতে—'
ভবিষ্যতে আনাতেই হবে। না হলে আমি ঠকব। কিন্তু তোমাকে বলছিলাম—'
'আমার শুনে দরকার নেই।'
মাল্যবান একটু কঠিন হয়ে বললে, 'কেন, তোমার মাথার দুদিকে দুটো তো কান।'
কঠিনতর হয়ে মাল্যবানের স্ত্রী বললে, 'আমার কান সকলের যা-তা কথা শোনবার জন্যে নয়।'
মাল্যবানের মনে হল, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সে ভুল পথে চলেছে। সে হেসে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বললে, 'যা বলতে চাই, তা বলা হয় না। অন্য পাঁচ রকম বলে ফেলি। নিজেকে ঠিকভাবে প্রকাশের শক্তি আমার নেই। তুমি কিছু মনে করো না।' উৎপলা একটা চিরুনি তুলে নিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল—চুল বাঁধবে বলে নয়—এমনিই। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে সে চুপ করে রইল।
'সেদিনের মত ঘরোয়া আলাপ শেষ হয়ে গেল। নীচে চলে গেল মাল্যবান। কিন্তু সেদিনকার বিকেলের পরটা—জলখাবারের কথা নিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিতে সে চায় নি তো; অভিপ্রায় ছিল তার সূক্ষ্ম গভীরতর অনেক কিছুর কিনারা ঘেঁষে কথা বলার।
কথা শেষ হলে স্বাদ। অন্য সফলতা।
কিন্তু হল না কিছুই।

মাল্যবান প্রাণধারণের ব্যাপারে কেমন যেন খাবিজ হয়ে নীচে নেমে গেল। কিছুই ভাল লাগছিল না তার।
স্ত্রীর গরজের কথা হচ্ছিল এতক্ষণ—মাল্যবান নিজের ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল, বাস্তবিক, বাড়ির গিন্নির স্পৃহার সম্পূর্ণ অভাবের জন্যেই এই ঘরটা একেবারে হতচ্ছাড়া হয়ে রয়েছে—ওপরের ঘরের পরিপাটির পাশে এ-ঘরটা কেমন থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে।
মনটা তার সেকেন্ডখানেকের জন্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল, কেন, সে এমন ঘরে পড়ে

থাকবে? সমস্ত ঘরগুলোর ভাড়াই কি সে দেয় না? সমস্ত সংসারটাই তো তার টাকায় চলছে। কিন্তু তবুও—

সে ঘর গোছাতে মন দিল।

কেরোসিন কাঠের টেবিলগুলো বাইরে বার করে দিল, আলমারিটা ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করল, ঝাড়ু মেরে চারদিকের ঝুল ঝেড়ে নিল, মাকড়শার জাল সাফ সরল, অনেক আরশোলা ঝেঁটিয়ে বার করলে, (ফ্লিট, ডি-ডি-টি হাতের কাছে ছিল না কিছুই), পায়ে পিষে মেরে ফেলল, ধোপার জন্যে অপেক্ষা না করে কাপড়ের ডাঁই সে নিজে কাচবে ঠিক কের ফেলল, জারুল কাঠের ছোট্ট টেবিলটার ওপর পরিষ্কার খবরের কাগজ পাতল, ভাবল, বিকেলে একটা কালো জমকালো টেবিলক্লথ কিনে আনবে, একটা ফুলদানি আনবে, কতকগুলো ফুল, দেয়ালে টাঙানোর জন্যে, একটি-কি দুটি, ছিমছাম ছবি।

তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে অফিসে গেল পরদিন সককালবেলা। অফিস থেকে ফিরে আসবার সময়ে দরকারি জিনিসগুলো কিনে আনল; টেবিলের কাপড়, ফুলদানি—

ঘরটাকে ঘণ্টা দুই ধরে সাজাল সে। বাইরে তাকিয়ে দেখল, রাত বেশ অন্ধকার। এই শীতের ভেতর চান করার চৌবাচ্চাটা এখন কেউ ব্যবহার করতে আসে না। ওখানে গা-ঢাকা দিয়ে যদি সে কাপড় চাকতে বসে, তা হলে বড় একটা কেউ টের পাবে না। রাত দশটা পর্যন্ত প্রায় কাপড় কাঁচা হল। উৎপলার ঘরে হিমাংশু, শ্রীবঙ্গ ইত্যাদি কয়েক জন এসেছিল; বেহালার গৎ বাজছিল; উৎপলা নিজে গান শোনাচ্ছে—আরো শোনাবে— বেহালা আরো বাজবে—ওরা (কোরাসে) গাইবে; মাল্যবানের কাছে এ একটা নিস্তারের মত মনে হল; গান-বাজনা যত রাত অব্দি চলে, ততই তার লাভ—কাপড়গুলো কেচে, খাবার আগে, সে একটু জিরিয়ে নিতে পারবে। কেচে, নিংড়ে, কাপড়গুলো সে গোটা দুই বালতি ঠেসে রেখে দিয়ে, চান সেরে, টেরি কেটে, বিছানায় এসে শুল। একটা চুরুট দাঁতে আটকে নিয়ে সুশৃঙ্খল সংযমী জীবনের শান্তি ধীরে-ধীরে উপভোগ করছিল। কিন্তু একটা চুরুট—দুটো চুরুট ফুরল—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে, তবুও খাবারের ডাক পড়ল না। আরো অনেকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে হল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। মাল্যবান ধড়মড় করে উঠে পড়ল তারপর, বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ, উঠে বসল তারপর, ঠাকুরকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, 'কই, এখনও গান চলছে যে-'

'গান আমাদের বাড়িতে নয়।'

'তবে?'

'পাশের বাড়িতে কোথাও—'

মাল্যবান একটু কান পেতে শুনে বললে, 'ও, তাই তো, এ যে কলের গান।'

ওপরের ঘর নিথর পাথরের মত চুপ হয়ে আছে বটে। মাল্যবান সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যাচ্ছিল।

ঠাকুর বলল, 'দিদিমণি আর মা ঘুমিয়েছেন।'

'তাই নাকি? তুমি তো আজ অনেক রাত অব্দি আছ, ঠাকুর। ব্যাপার কী? ওরা খেল না?'

'খেয়েছেন।'

'কখন?'

'দুটো বাবুর সঙ্গে খেয়ে নিয়েছেন—'

মাল্যবান একটু চুপ থেকে বললে, 'আমার ভাত আছে তো?'

'তা আছে। আপনাকে এখানে এনে দিই?'

'বেশি কিছু দিও না। কেমন গা বমি-বমি করছে—'

অল্প কয়েক গ্রাস খেয়ে সে উঠল। ঝি এঁটো নিকিয়ে থালা বের করে চলে গেল। ঝি, ঠাকুর বাড়ি চলে গেল।

মাল্যবানের কেমন উল্টো বমি এসেছিল। সে দরজা বন্ধ করে কতকগুলো কাগজ পেতে অনেকক্ষণ ধরে হড়হড় করে বমি করল, অনেক বমি।

মাকে মনে পড়ছিল শুধু তার। অবাক হয়ে ভাবছিল : এই ঘরেই আছেন তিনি—এই অন্ধকারের ভেতরেই দাঁড়িয়ে আছেন বোধ করি; হয়ত আমার বিছানার পাশে এসে বসেছেন; গায়ে, বুকে, পিঠে, হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন; দিচ্ছেন হয়ত—

মাল্যবানের মনে হল : উৎপলাও তো মনুর মা—মা তো সে; মাল্যবানের মায়ের মতন বড়ও হয়ে উঠবে একদিন। নিজের মায়ের সঙ্গে এই মাকে মিলিয়ে ফেলে বৃষ্টির ছিপছিপে ছটফটে জল যেমন

পুকুরের সমাহিত সঞ্চিত জলের শান্ত স্বরূপের ভেতর মিশে যায়, তেমনি একটা অব্যাহত মাতৃত্বের সদাত্মাকে চাচ্ছিল যেন সে। তার নিজের মা—যে নেই আজ, দশ-বার বছর আগে নিমতলা ঘাটে যাকে ছাই হয়ে যেতে দেখেছিল মাল্যবান—মাল্যবানের মায়ের অব্যক্ত ইঙ্গিতের মৃত্যু হয় নি তো তবু— ধারণ বহন করবার জন্যে অপর নারী এসেছে এই ঘরে; মা হয়েছে মনুর মা। মাল্যবান আজ মনুব মার স্বামী ঠিক নয়; মাল্যবানের সেই মৃত মা ও জীবিত উৎপলা—এই দুটি নাবীকে এক জনের মতন—মায়ের মতন—তার ঘরেব ভেতর খুঁজে পাবাব জন্যে কেমন অদ্ভুত বিশালাক্ষ অস্বস্তিতে সে চাবিদিকে তাকাতে লাগল; আসুক নিজেব মায়ের মূর্তিতে, কিংবা আসুক উৎপলাব বেশে-দুজনের ভেতরেই দুজনকে খুঁজে পাবে সে—পাবে একজন মাকে—মাতৃত্ব : যা এখন মাল্যবান পাবে তার কামস্পর্শহীন জায়াঘ্রাণহীন আনন্ত্যকে। মাল্যবান কয়েকবাব ডাক ছেড়ে অস্পষ্ট ভাবে ডাকল—মাকে, ঠাকুবকে, ঝিকে—মনুব মাকে, না, উৎপলাকে, ঠিক বোঝা গেল না।

আস্তে আস্তে কমে গেল— থেমে গেল বমিব চাড় মাল্যবানের।

মাল্যবান একটু ভড়কে গিয়ে তাকিয়ে দেখল, উৎপলা এসে দাঁড়িয়েছে।

'ঠাকুর বাড়ি চলে যাবার সময়ে আমাকে বলল, তুমি বমি কবছ। মি হল কেন?'

'কী জানি।'

'কী খেয়েছিলে?'

'কিচ্ছু না, শুধু ভাত।'

'বাজাবের খাবাবটাবাব?'

'না তো।'

উৎপলা বললে, 'আর বমি হবে বলে মনে হচ্ছে?'

'না বোধ হয।'

'পেটে ব্যথা আছে?'

'না, সে-সব কিছু নেই।'

'আচ্ছা, শোও, শুযে পড়। আমি বাতাস করছি।'

মাল্যবান খানিকক্ষণ বালিশে মাথা রেখে বাতাস খেয়ে বললে, 'ভাল লাগছে এখন।'

'যে মা হযেছে', মাল্যবান বললে, 'সে মানুষেব শিযরে না এসে পাবে না। তুমি মনুব মা বটে, আমাব স্ত্রী। কিন্তু সময়েব কোনো শেষ নেই তো, সেই সময়েব ভেতব আমাদেব বাস; সময়েব হাত এসে এখানে এ-জিনিসটা মুছে দেয—সেখানে সে জিনিসটা জাগিয়ে দেয়; মানুষেব স্ত্রী তুমি; নিজেও তো মানুষের মা, মানুষ, সময়েব নিববচ্ছিন্ন বহতাব ভেতব তোমাব মা-রূপ ফুটে উঠল তো; দেখছি। সময়ের দু-একটা ঘূর্ণিকে কেমন অভিবাম গ্রন্থির বলযে নিয়ে এসে গড়ে তুললে, দেখছি তো। এই তো নীচে নেমে এলে হাড়-কালিয়ে শীতেব বাতে, সিঁড়ি বেয়ে। না এলেও তো পাবতে। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আশাও করি নি যে, তুমি আসবে। কিন্তু তবুও তো এলে—'

উৎপলাব বাঁ হাতেব দু-চারটে আঙুলেব দিকে ঝোঁক গেল মাল্যবানেব! কিন্তু সে আঙুল কটি বিশেষ কোনো সাড়া দিল না। নিজের ভাবুকতা আন্তবিকতার আত্মমন্যতা নিয়ে মাল্যবান এত বেশি তলিয়ে গিয়েছিল যে, স্ত্রীর আঙুল কটিব বহস্য ছাঁকবাব জন্যে কোনো তাড়া ছিল না তার। রহস্যকে কঠিন আলোর মত পবিষ্কাব কবে বুঝে দেখবাব শক্তি ও সময় পুরুষ তাকে দেয নি; অনেক বিষয়েই বেচাবি অন্ধ অবোধ বলে পোড়ো ঘরের চামচিকেব মত হর্ষকম্পান্বিত। কিন্তু মাল্যবানেব অবকল্পনা আছে, অবপ্রতিভাও; সে-জিনিসটা খুব-নিয়ন্ত্রিত নয যদিও। কাজেই চেতনাব একটি সূর্যেব বদলে অবচেতনাব অন্তহীন নক্ষত্র পেয়েছে সে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের ওপর আবো একটি ইন্দ্রিয় আছে খুব সম্ভব মাল্যবানেব। বিজ্ঞানেব যাকে বলে চতুর্থ-বিস্তাব, সেই চাতুর্যের দেশেও বাস করে সে। কাজেই মা ও মাতৃত্বের ঐ দিব্য কেন্দ্র তাব নজবে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও-সব শিখবে বেশিক্ষণ থাকতে পাবে না সে, শিগগিবই ধসে ভেঙে পড়ে গেল সে তার ছোট সংস্কারেব ছোট সংসারে—স্বামী-স্ত্রী কামনা লিপ্সা হতাশাব ঘূর্ণিফেনাব ভেতর।

উৎপলার হাতপাখা আবেগে নড়ে নি কখনো; সবেগে নড়ছিল কিছুক্ষণ আগে। এখন ক্রমে-ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসছিল।

'মাঝে-মাঝে আমাব মনে হয়, একা থাকলে বেশ হত। কেউ-কেউ একা থাকে বটে, যেমন

আমাদেব হেমডমাস্টারমশাই চিরটা কাল কাটিয়ে গেলেন, কিন্তু শেষ বয়েসে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল। মেয়েদের দর্শন দিতেন বটে, কিন্তু সাধুপুরুষ, স্ত্রীলোকের দর্শন পাবার জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। লালসা জন্মাল। মেয়েরা ভাল মনে কবে সেবা করবাব জন্যে হেডমাস্টাবমশাইর হাত-পা টিপে দিত রোজ, উনিও ক্রমে-ক্রম গোপনে সুবিধে পেয়ে তাদেব গাল টিপতে আবম্ভ কবে দিলেন। গড়াল কেলেঙ্কারি অনেক দূব। বিয়ে হল না তবু ছেলে হল, মেয়ে হল। তবুও সিদ্ধপুরুষ বইলেন। হেডমাস্টারমশাইর চিতের ওপর ও-অঞ্চলের সব চেয়ে বড় মঠ। নৌকোব ছইযেব ওপর বসে কত মাইল দূরের থেকে সে মঠ দেখা যায়?...'

মাল্যবান কথা বলে যাচ্ছিল গভীব বৃষ্টিব বাত কিছুক্ষণেব জন্যে বীতবর্ষণ হয়ে পাড়াগাঁব নালায়, পুকুরে, খালে, কলকল শব্দে চলে যেতে যেতে নিজেব সাথে নিজে যেমন কথা বলে চলে, জল।

বাতাস করতে-করতে উৎপলার হাত ব্যথা হয়ে উঠল, কিন্তু মাল্যবানেব দিক থেকে কোনো নিষেধ নেই। বেশি কথা বলে মাল্যবান বেশি ফেনিয়ে ওঠে, মাঝে-মাঝে গ্যাঁজায, নিজেকে নিয়ে নিজেকে উপভোগ কববাব দুর্ভোগ ভোগাবাব বেশ ক্ষমতা আছে; ধ্বেৎ, ভাল লাগে না আমাব; এক-এক সময অবিশ্যি আমাকেও অবশ করে ফেলে—যেমন মনু হবাব আগে। কিন্তু ভাল লাগে না আর আজকাল, ধ্বুৎ।

পাখাটা বিছানার পাশে বেখে দিযে উৎপলা বললে, 'বমি তো কবলে, কিন্তু এখন ওষুধেব ব্যবস্থা কী কবা হবে?'

'সে জন্যে তোমাব কোনো ভাবনা নেই, পলা।'

'ওষুধ আছে?'

'না।'

'তবে?'

'ওষুধ আমাব লাগবে না। কেমন পেটে মোচড় খেল, বমি হয়ে গেল, ব্যস। সে-রকম বেশি কিছু হলে শবীরের আক্ষেপটা এত তাড়াতাড়ি পড়ে যেত না।'

'বলা যায না কিছু। ওষুধ নেই। ডাক্তাবেব ব্যবস্থাই-বা কে কববে?'

'না, না, অসুখ নয তো, একটু হযবানি হযেছিল,' মাল্যবান একটু আলোড়িত হয়ে উঠে বসবাব চেষ্টা কবে শেষমেশ শুযে থাকতে-থাকতেই বললে, 'সেবে গেছে। তোমাব সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'এ বাড়িতে কোনো পুরুষমানুষ নেই,' টক বিবস মুখে উৎপলা বললে, 'অসুখ-বিসুখেব সময়ে নানা বকম অসুবিধে। ডাক্তাব ডাকে কে-বাত জাগে কে।'

মাল্যবান স্ত্রীব মুখেব খিঁচুনিটাকে ইস্ত্রি কবে পালিশ কবে দেবাব জন্যে খুব স্নিগ্ধ ভাবে বললে, 'এবাব একজন সরকাবেব মতন বাখব ভাবছি; ফাইফবমাস—সবই চলবে।'

'কিন্তু, আজকেব বাতে কে জাগে-'

'বসো, তুমি খানিকটা সময বসে যাও; নিজের থেকেই ঘুমিযে পড়ব।'

উৎপলা হাত গুটিযে গুম হযে বসে বইল।

কেটে গেল খানিকটা সময। কেউ কোনো কথা বলছে না। কাবো কোন কাজ করতে হবে মনে হচ্ছে। ভাল লাগছে না কাবোরই। কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। সময কেটে গেল আবও।

'চুপচাপ যে?'

'কী করতে হবে?'

'বাতাস করছিলে তো—'

উৎপলা উঠে দাঁড়াল। বাতি জ্বালিযে ঘরেব চাবদিকে তাকিযে বললে, 'এ বালতি দুটো ভিজে কপড়ে ঠেসে রেখেছ কে?'

একটা বালতি তুলে সমস্ত কাপড় মেঝের ওপব ঢেলে ফেলে দিযে চৌবাচ্চাব দিকে চলে গেল।

'ওগুলো-কাচা কাপড় ছিল, মাটিতে ফেলে দিলে—' মাল্যবান তাকিয়ে দেখল নোংরা কাদায মাটিতে গড়াচ্ছে কাপড়গুলো, পাযে মাড়িয়ে-মাড়িযে উৎপলা চলে গেছে। চৌবাচ্চাব থেকে এক বালতি জল এসে হিস্‌সো করে ছড়িয়ে দিল উৎপলা; আরো এক বালতি ঢেলে ছড়িয়ে মবিযা হয়ে তাকিযে দেখল, বমি সাফ কবতে আবো অন্তত দু-বালতি জলেব দবকার। উৎপলার লোকাযত মন, আব যা লোকায়ত নয, অথচ গভীরতার যা—লোকায়তকে চালাচ্ছে—এই শীতেব দুপুব-রাতে হাত-পাযেব

চেয়েও ঢের বেশি টনটন করে উঠল সে সব জিনিস।

শেষ বালতি জল এনে ঘরের ভেতর ঢেলে দিল উৎপলা; তারপরে মাল্যবানের একটা সাবানে কাচা ভিজে ধুতি নিয়ে জায়গাটা নিকোতে লাগল।

'কেন তুমি নিকোচ্ছ তোমার নিজের হাতে, আহা, থাক না!' বাল্যবান বললে। আনাড়ি ছেলের হাতে কলাপতাব বাঁশির মত কেমন কাহিল ভাবে কেঁপে-কেঁপে চিরে গিয়ে বেজে উঠে মাল্যবান আবার বললে, 'ঠিক হল না, ঠিক হল না, আমাব ধুতিটা তুমি রেখে দাও—আমি নোংবা মুছবার জন্যে তোমাকে জিনিস দিচ্ছি।'

কলাপাতার বাঁশি কেঁপে ফেঁড়ে গিয়ে বললে, 'বাঃ, উৎপলা, আমার ধুতিটা লোপাট করলে—এই তো আজ সন্ধেবেলা খিদিরপুরের সাবান দিয়ে কেচেছি।'

উৎপলা ঘাড় গুঁজে মেঝে পরিষ্কার করতে-করতে ঘরেব কোণের একটা ড্রেনের দিকে সমস্ত বের করে দিচ্ছিল—হাত দিয়ে নয়, মাল্যবানের ধুতিটা পায়ে খানিকটা জড়িয়ে নিয়ে পা চালিয়ে কাজ করছিল সে; কাজ করে যেতে লাগল, কোনো জবাব দিল না। এ-রকম সব কাজ তার করবাব কথা নয়, শীতের বাতে তো নয়ই; কিছুতেই কবত না সে এ-কাজ। কিন্তু কেমন যেন ভূতে তাড়িয়ে এনেছে তাকে। তাই নীচে নেমে এসেছে সে এমন একটা বিশ্রী ছোঁয়াছানার কাজ করছে-হোক না পায়ে দিয়ে—স্বাভাবিক অবস্থায় যা মেরে পিটিয়েও কেউ করাতে পারত না তাকে দিয়ে। ভূতেই পেয়েছে তাকে, চিমড়ে ভূতে পেয়েছে; স্তম্ভিত হয়ে পা ডলছিল আর ভাবছিল উৎপলা।

উৎপলাব (মন্থদণ্ডেব মত) পায়ে জড়ান ধুতিটার কাদা বমি লোকসানিব দিকে তাকিয়ে মাল্যবান কী যেন কেমন যেন, হয়ে গিয়ে বলতে লাগল, 'কবিম ভাই মিলের সুন্দর ধুতিটা—এই দিন পনেব আগে কিনেছি—তাব তুমি এই অবস্থা করলে—এ তো পবাও যাবে না আব।'

কিন্তু ধুতি আরও একটা লাগল উৎপলাব—সেটা ক্যালিকো মিলেব। মাল্যবানেব ভেতরেব শাঁসটাই মোচড় দিয়ে উঠল। এক মাসের মাইনেব চেয়ে যে-সব লোকেব একটা ধুতি বা চাদরকে এক-এক সময়ে ঢেব বেশ দামি, দরকাবি মনে হয়, মাল্যবান সেই ধবনেব মানুষ। কাজেই, অনেক কুণ্ঠা, আক্ষেপ, কাতরতাব পরিচয় দিল সে, অনেক ছোট ছেঁদো কথা বললে; কিন্তু সব সময়েই গলা তাব হেমন্তেব দুপুরে একটা নিঃসঙ্গ উড়চুঙোর মত মিনমিন ফিবফিব ঝিনমিন করছিল, কাতর করুণ, ঝাঁঝ নেই, উষ্মা নেই।

উৎপলাব হাসি পাচ্ছিল—মাঝে-মাঝে দয়া হচ্ছিল তাব লোকটাব জন্যে, মানুষটাকে খানিকটা নিষ্পেষিত কববার জন্যই আর ভাল-ভাল দুটো ধুতি দিয়ে নোংরা জায়গাটা সে নিকিয়েছে—এ-কথা মনে করে নির্যাতন করবার শখ এখন তাব খানিকটা কমে গেল যেন—কাপড় দুটো লাথিয়ে-লাথিয়ে ঘর থেকে বার করে দিল উৎপলা।

'যা হাবার হয়ে গেছে,' মাল্যবান মনে খুব বল, খুব সৎ সাহস সঞ্চয় কবে নিয়ে বললে, 'এ নিয়ে তুমি মন খাবাপ কবতে যেও না।' যেন কঠিন যত্নে নিয়ন্ত্রিত জীবনেব দীনতা ও আত্মশুদ্ধিব গম্বুব থেকে (মনে হচ্ছিল উৎপলার) মাল্যবান কথা বলছে।

কুলুঙ্গির থেকে সাবান নিয়ে উৎপলা হাত কচলাচ্ছিল—হাত পা ঘাড় মুখ ধুয়ে আসবে সে।

'কোথায় সরালে কাপড় দুটো? চুরি যাবে না তো?'

'এ-দিককার দরজা তো বন্ধ; তবে পাশেব বাড়িব ঝি-চাকর ছাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করে সারা-রাত। দেখতে পেলে ওরা নিয়ে যাবে হয় তো।'

'নিয়ে যাবে?—ঘরের ভেতব রেখে দেবে না তুমি ধুতিগুলো?'

কোনো কথা না বলে চৌবাচ্চার থেকে হাত-পা ঘাড়-মুখ খুব ভাল কবে ধুয়ে এল উৎপলা। মাল্যবানেব বাক্সের থেকে একটা ধোপাবাড়ির ফেরত তোয়ালে বের করে উৎপলা বেশ তোয়াজ কবে বগড়ে-রগড়ে হাত-পা মুখ-পিঠ মুছে ফেলতে লাগল। তাব পব স্লিপার পায়ে গলিয়ে ওপরে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল।

'আমার বিছানার পাশে এসে বসো-না।'

'না, আমি আর বসব না। এ কি, এ যে তোমার স্লিপার পায়ে দিয়েছি!

আমার জুতো কোথায় গেল? ইশ, মশা কামড়াচ্ছে! যাক,চলি—' উৎপলা বললে।

'আচ্ছা, এসো—ঘুমোও গিয়ে।'

শেষ রাতের একটা বসন্তবউরি পাখির মত একরাশ নক্ষত্র ও অন্ধকাবের দিকে তাকিয়ে আবার

ঘুমিয়ে পড়বার আগে, একটু চলকে উঠে, হেসে, জেগে উঠবার, বেঁচে থাকবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অতিক্রম করে (মাল্যবানের মনে হল) কে যেন উৎক্রান্ত হয়ে গেল। সে কি উৎপলা? একটা চুরুট জ্বালিয়ে মাল্যবান নিজেকে বললে, না, সে উৎপলা নয়; উৎপলাতে মাল্যবান যে-জিনিস আরোপ করেছে, সেই অশরীরী আত্মটা—নেই; ছিল না; এই মুহূর্তেই সরে গেল তবু; ওপরেব দিকে, ওপরের ঘবে যাবার অছিলায় আরো ওপরে, বড় বাতাসে, শীতরাতেব ঘুরনো সিঁড়ির শীর্ষে, নক্ষত্রে মিশে গেল কোথায়।

পব দিন রাতে ওপবের ঘরে মাল্যবান বলছিল উৎপলাকে, 'তোমাব এই খাটটা ঢেব-বড়।'

'হ্যাঁ, বাবা দিয়েছিলেন। আমাদের বিযের সময়ে। বরপক্ষকে ঠকাবার মতলব ছিল না তো তাঁর।'

'আমি তা বলছি না।'

উৎপলা ধোপদুরস্ত বিছানার চাদবটা পাট-পাট কবে পাতছিল—কোন কথা না বলে হাতের কাজ কবে যেতে লাগল।

'আমি ভাবছিলাম, দুজন বাড়ন্ত লোক এ-খাটে বেশ এঁটে যায়।'

'তা যায়, তাতে কী।'

'আজ রাতে এ-খাটে আমি শুলেও তো পাবি; পারি না?'

'তা হলে আমাকে নীচেব ঘবেব খাটে যেতে হয়।'

'কেন যাবে?' মাল্যবান উৎপলাকে ভেদ করে কোনো শ্রেয়োতব আত্মাব দিকে তাকিয়ে যেন বললে, 'আমাব পাশে শুযে থাকবে।'

'যা নয়, তাই,' শান্ত দৃঢ়তায বললে উৎপলা; কৃতী অভিভাবিকাব মত ঠোঁট চেপে, দাঁত চেপে।

'তোমাব মেজদা আর বৌঠান তো এ-খাটেই শোবে দুজন।'

'তা তাবা শুযে শান্তি পায।'

মাল্যবান একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'আমবা পাব না?'

'চাইলেই ভোগে লাগে না,' উৎপলা মনুকে নয়, মাল্যবানকেই বললে।

'তা বটে। মাল্যবান হাতে পানটা মুখে তুলবার ভবসা পেল না আব। সিগারেটটাও না খেযে জানালাব ভেতব দিযে ছুঁড়ে ফেলে দিল—জ্বলন্ত সিগাবেটটা—

বললে, 'এ-বকমই যদি হল, তা হলে ফুটপাথে গিযে শুযে পড়ে থাকলেই পাবি।'

পবিপাটি বিছানা পাতা শেষ কবে উৎপলা বললে, 'ফুটপাথে তুমি কোনোদিন শোবে না। তবে একদিন শুযে দেখলে পাবো. যাও-না, আজই যাও।'

'আমি ফুটপাথে শুলে খুব উজ্জ্বল হযে উঠবে তোমাব মুখ।'

'তুমি তো নিজেই বলছ, ফুটপাথে আব ভদ্রলোকেব বিছানায কোনো তফাত নেই—'

'দেখছি তো নেই। কেন নেই? কেন নেই, সেটা তুমি আমাকে নিজেব বুকেব ওপর হাত বেখে বলবে?'

'বলবাব যখন, তখন বলা হবে,' উৎপলা বললে, 'কিন্তু ফুটপাথে শোযাব কী হল?'

'যা হযে দাঁড়িয়েছে, তাতে শুতে আমাব খুব আপত্তি নেই।'

উৎপলা মশারি টাঙিযে বাতি নিভিযে বিছানায শুযে পড়ে বললে, 'আপত্তি নেই, তা হলে বাধাটা কীসেব?'

মাল্যবান চকমকি ঠুকে আবার একটা সিগারেট জ্বেলে নিয়ে বললে, 'যাচ্ছি আমি শুতে—'

'কোথায়? তোমার নিজেব ঘরে?'

'না-'

'ফুটপাথে? যাও—' বললে উৎপলা; ঘুমের লতায-পাতায-তন্তুতে জড়িযে যেতে-যেতে কাছের থেকে দূবে চলে যেতে-যেতে যেন।

'এসো, দেখে যাও। দেখবে না?'

'সে আমার দেখা আছে,' বলে পাশ ফিরল; ফিবে শুযে লেপটা ভাল করে জড়িয়ে নিতে না-নিতেই ঘুমিযে পড়ল উৎপলা।

নিশ্বাস পড়ার শব্দ শুনে মাল্যবান টের পেল: একটা নিবিড় বেড়ালেব চেযেও গভীব আরামে ঘুমিযে পড়েছে মেয়েমানুষটি-তুলোর গবম আর শীতেব ঠাণ্ডা খুব প্রবল ভাবে মিশ খেলেই হল—কোনো পুরুষমানুষের স্পর্শের দরকার নেই, উৎপলাব—

সূচীপত্রে যান

মাল্যবান নীচে চলে গেল।

এক ঘুমের পর মাঝরাতের শীতে—গরমে—নিজের বিছানাটা মন্দ লাগছিল না তার। মাল্যবানের মনে হল, মানুষের মন সারাটা দিন—রাতের প্রথম দিকটাও—বোকা হ্যাংলার মত চায়—অপেক্ষা করে সাধনা করে, যেন নিজের কিছু নেই তার, অন্যে এসে দেবে তাকে, তবে হবে। কিন্তু গভীর রাতে বিছানায় শরীরই তো স্বাদ। শরীরটাই তো সব দেয় মানুষকে। মন কী? মন কে? মন কিছু নয়। বেশ নিবিড় শীতের রাতে চমৎকার শরীরের স্বাদ পাচ্ছিল মাল্যবান।

পুরুষের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘুচিয়েছে বটে উৎপলা; কিন্তু তাই বলে শরীবেব স্বাদের সঙ্গে নয়। দোতলায় গভীর রাতে তার নিজের বিছানায় আশ্চর্য স্বাদ উপলব্ধি করছিল সে।

মাল্যবানেব ঘরের জিনিসপত্র ব্যসস্থা আবার আগেব মতন দাঁত খিঁচিযে উঠল; নোঙবা হলদে কাগজেব স্তূপ চারদিকে, জানালার ভেতর দিযে ক্রমাগত বাস্তার ধুলো, ধোঁযা, অঝোব গোলাপায়রাব বাসা, মেঝের চারদিকে চুরুটের টুকবো, থ্যাঁতলানো চুরুট, তামাকপাতা, ছাই, দেশলাইযেব কাঠি, পাখিব পালক বিষ্ঠা, পুরনো বাতিল লণ্ঠনের টুকবো-টাকবা, ভাঙা চিমনিব কাচেব বাশ; তেল, অ্যাসিড, ওষুধেব নোংরা শিশি-বোতলেব জাঙ্গাল, হাঁড়িকুড়ি, কলসি, বস্তা ও ঝুড়ি ও একগাদা, আট-দশ জোড়া ছেঁড়া থ্যাবড়া প্যানেলা আর ক্যাম্বিসের জুতো, ময়লা জামা, মশাবিব নুড়ি—আশ্চর্য দৈববলে কোনো শব্দ হচ্ছে না, কোনো-কিছুকে নড়তেও দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সমস্ত ঘরের ভেতব সুটকি বুড়ি, ডাইনি বুড়ি, থুপি বুড়িদেব কান্নাকাটি হামলা বলাৎকার চলছে যেন দিনবাত—মাল্যবান টের পাচ্ছিল, উপলব্ধি করছিল।

ফুলদানিটা সে ঘরের এক কোণে ফেলে রেখেছিল। উৎপলা যখন এ-জিনিসটাকে পছন্দ করল না, তখন থেকেই এটার ভেতব কেমন একটা শ্রীছাঁদেব বাপান্ত গবমিল বেরিয়ে পড়েছে যেন—এক বাশ হাঁড়িকুড়ির ভেতর ফুলদানিটাও কানা ভেঙে গড়িযে পড়ে বইল।

এই ঘরেব ভেতরেই এক দিন একটা ভেড়ালেব ছানা আশ্রয নিল। বাত্রে ঘুমিযেছিল, ঘবেব ভেতব মড়াকান্না শুনে উঠতে হল, উঠে বসল। বুঝতে পাবল, নিশ্চযই এই খোলা জানালাব ভেতব দিযে বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিযে গিযেছে কেউ। মানুষ যে-জিনিস নিজে সহ্য কবতে পাবে না, পবের ঘাড়ে তা চাপাতে তার এত লোভ—এমন কৌশল; ভাবছিল, মাল্যবান; কিন্তু বাচ্চাটাকে নিযে কবা যায কী? যে-রকম ভাবে বেনো হাওযার মুখে হাঁ করে কাঁদছিল বাচ্চাটা, তাতে ওপরের ঘরেব মানুষেবও ঘুম ভেঙে যেতে পাবে।

রাস্তাব দিকেব জানালা দিযেই এটাকে আবাব ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারা যায—তার পর জানালা দিতে পাবা যায বন্ধ করে। বেড়ালের ছানাটাব তাবপরে কী হবে, সে-কথা ভেবে মাথা ঘামিযে কী দবকাব। পৃথিবীতে বেড়াল-কুকুবেব বাচ্চাবা পথ কেটে নেয—কিংবা যায মবে। মৃত যে, তার তো বফা হযে গেল; গোলকধাঁধাটা সামনের থেকে সরে গেছে; নির্দেশ চাই না, সমানুভূতি সমাশ্রযেব দবকাব নেই আর; সব চেযে শান্তি; বেঁচে থাকার ব্যথা, বৈভব নেই। কিন্তু তবুও সে-রকম শান্তি বেড়াল ছানাটাকে পাইযে দিতে ভবসায় কুলিযে উঠল না মাল্যবানেব।

রাত দুপুর—কোথাও কোনো দুধ নেই, খাবাব নেই; বাচ্চাটাকে কিছু দেওযাব উপায নেই এখন; বিছানায বসে-বসে অনেকক্ষণ এর কান্না সহ্য কবতে লাগল মাল্যবান। মাল্যবান-পর্বত যেন সহ্যাদ্রি হযে গেল তবুও কান্না থামবে না—এমনই আনন্ত্য এব। একে-একে অনেক কথা ভেবে যাচ্ছিল মাল্যবান; ভাবছিল, এই বাচ্চাটার বাপ-মাব কথা, কেমন হাত-পা ঝেড়ে জীবনকে ঝাড়ছে তাবা; এই বাচ্চাব ঝাড়টাকে জন্ম দেবাব আগে কালোকিষ্টি রাতে আব জ্যোৎস্না বাতে পবীতে পেযেছিল সেই ধাড়ি বেড়াল দুটোকে; কী না কবেছিল তারা; কিন্তু আগামী ঋতুব ছানাগুলোকে জন্ম দেওযাব আগে আবার তারা দুর্নিবার ভাবে জোড় মেলাবে এসে, কিন্তু এখন তাবা গত ঋতুর, সমস্ত বিগত ঋতুব, কৃতকর্মেব দায়িত্বের থেকে খালাশ। জীবনকে তাবা এ-বকম করে ফাঁকি দেয, তবুও প্রশ্রয পায জীবনের কাছ থেকে নব-নব ঋতুসমাগম হলেই—বারবাব—বারবার। মানুষকে তো এ-রকম আচার-ব্যবহারেব জন্যে ঢের গভীব শাস্তি দিত জীবন। থাক, তবুও এর বাপ-মাকে কোনো শাস্তি দিতে চায না সে।

মাল্যবানের ভাবনাব মোড় ঘুরে গেল, পরীতে পাওয়া মিথুনেব কথা ভুলে গেল সে; মনে-মনে বললে, কথায়ই বলে কুকুর-বেড়ালের জীবন—বাস্তবিক, সে-সব জীবনের এমনিই ঢের কষ্ট। হয়ত দু-

চার মাস বয়েস এই ছানাটির, মা নেই, ভাই-বোন কিছু নেই, জবালার ছেলের পিতৃপরিচয় নেই বলে কোনো উদ্বেগও নেই বটে—মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে ভাবছিল—

কিন্তু, মড়াকান্নায় তোলপাড় হয়ে উঠছিল; চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে ভাবছিল; এমন শীতের দুর্বার রাতে কোথাকার একটা মিকড়ে হাবামজাদা জানালাব ভেতর দিয়ে অন্ধকার খুপবির ভেতব এটাকে সটকাল।

সে এক সময ছিল বটে, মাল্যবান উপলব্ধি কবল, যখন মানুষেব শিশুব এ-বকম ব্যাপার হলে এতক্ষণে কত দিক দিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যেত, কিন্তু মানুষেব পৃথিবী তো আজাকল পাগলাগারদ—সেখানে মানুষেব শিশু আর বেড়ালের' ছানার একই অবস্থা।

মশা নেই ঘবে; ইঁদুবে কামড়াতে পারে সেই ভযে মশাবি টানিযে শুযেছিল মাল্যবান; মশাবিটা তুলে বালিশে ঠেস দিয়ে চুরুট মুখে বসে রইল সে।

একটু পবে উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাল।

মানুষের নড়াচড়ার শব্দে, আলো দেখে, ভয পেযে, বাচ্চাটা একটু থামল। কিন্তু মাল্যবান বিছানায এসে বসতেই আবার সেই কান্না। সমস্ত ট্রাম-বাস-লরির নটখটি ঘড়ঘড়িব চেয়ে এ-কান্না ঢের আলাদা জিনিস; এ-জিনিস সহ্য করতে হলে সৃষ্টিটাকেই বুঝে দেখতে হবে, উপনিষদেব ও আইনস্টাইন হোয়াইটহেডের ঈশ্বরের হিসেবেব মিল-গবমিলটাকে; অনেক সহানুভূতি সহিষ্ণুতাব দরকাব। মাল্যবান কেমন অসময়ে তা হারিয়ে ফেলল।

বিছানার থেকে লাফিযে উঠে তেরিযা হয়ে সে বাচ্চাটাকে তাড়া কবল। এত জঞ্জাল এই ঘরেব ভেতর—এমন সব অসম্ভব জাযাগায লুকোয—এমন ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে—বিছানায ফিরে আসতে না-আসতেই আবাব ভবসা পেযে এমন প্যানপ্যানানি শুরু কবে যে, মাল্যবানের ঘেন্না ধবে গেল একেবারে।

এবাব সে বাচ্চাটাকে ধবলই।

ধরে, এমন জোবে তাকে দেযালে আছড়ে মাবল যে, দুই মুহূর্তের ভেতবেই সেটা কাতবাতে-কাতবাতে মবে গেল।

এর পর পাঁচ-ছদিন মাল্যবান কাবোব সঙ্গে কথাও বলতে পারল না আব। স্ত্রীব কাছে, অফিসে চোব; সংসাবের সমাজে পৃথিবীব ডাঙাব ওপব দিযে নৌকো চালিযে নেয যে-মনপবনেব আশ্চর্য দেবতা, তাব কাছে, তামাকের হুঁকোব জলেব ভেতর জোঁকেব মত, যেন নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল মাল্যবানের মন।

উৎপলা যে তাকে এত উপেক্ষা কবে, এটা তার ভাল লাগে; বাঘেব মাসি বেড়ালকে মেরে ফেলেছে মাল্যবান, ঘরেব ভেতর নারীসোনালিব্যাঘ্রেব হিংস্রতায হৃদযহীনতায কেমন একটা নিপট নিগূঢ় তৃপ্তি পায সে। নীচের ঘবেব সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও দুর্গতিব ভেতব স্ত্রী-পবিত্যক্ত নচ্ছাব মানুষ বলে নিজেকে সে বাববার প্রতিপাদন করে দেখতে চায,এ তাব ভাল লাগে; নিজেকে অবিচাবিত, অভালবাসিত, বিড়ম্বিত মানুষ বলে খতিযে নিতে-নিতে মনটা লঘু হযে ওঠে তার; জীবনের থেকে কুবাতাস, দুর্ভাগ্য, অবিচাব, অভালবাসা যদি শুকিয়ে যায, তা হলে পথ থাকে না আর।

'তুমি কদিন থেকে মাছ খাচ্ছ না যে?'

'কেমন আঁশটে গন্ধ,' মাল্যবান বললে।

'কেন, পেঁয়াজ-মশলা দিযে বেশ তো বাঁধে ঠাকুব।'

'ভাল করে ভাজে না—' বলে দিল একটা কথা মাল্যবান।

'তুমি কি পুড়িয়ে খেতে চাও?'

'না, না—' মাল্যবান আঙুল ছড়িয়ে, হাত মুঠো কবে, আঙুল ছড়িযে, হাত মুঠো করে বললে, 'বরফ-দেওয়া মাছ কি না, কেমন কাঠের মতন। খেতে ইচ্ছে কবে না।'

'বরফ-দেওযা মাছ এ মোটেই নয। বেশ তো জিনিস। টাটকা। পুকুবের। নিজে কিনে আন, অথচ নিজে বুঝতে পার না?'

মাল্যবান কোনো কথা বললে না।

'কই মাছ খেতে পার। বেশ তো লাগে খেতে।'

কিন্তু মাল্যবান বিনে মাছেই চালাতে লাগল। কোনোদিন দই খায; কোনো দিন খায় না; ফেলাছড়া

করে খায়। বৌয়ের ন্যাওটা নয় আর। খুব কম কথা বলে। কোনো নালিশ নেই, আপত্তি নেই, মাথার চুলে তেল নেই, টেরি নেই। অন্য অনেকে হলে মাল্যবানকে চেপেই ধরত, 'খুলে বল তো,' 'হচ্ছে কী সব,' 'টেঁসে গেলে কোথায়,' 'সাপটে না খাবে তো জাপটে ধরব' বলে তোলপাড় কবে তুলত তাকে; কিন্তু উৎপলার চোখে কিছু পড়ল না যেন; ভালই হল; মাল্যবানের রক্তের মনের শান্ত সাত্ত্বিকতা নষ্ট করবার জন্যে কেউ হাত কচলাল না। সে যা চাচ্ছিল, সেই পটনিশ্চযতা বিনিঃশেষে দেওয়া হল তাকে; বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে চায়? সাপুড়ের চুবড়িতে থাকতে চায়? থাকুক। কেউ বাধা দিতে গেল না। কোনো গোলমাল নেই।

কিন্তু একটা বেড়ালছানা খুন—মাল্যবানের মতন মানুষের জীবনেও এ-ব্যাপাবটাব অখাদ্য অপরাধের তীক্ষ্ণতা দিনরাতেব ঘষা খেতে-খেতে নষ্ট হয়ে ক্ষয পেযে গেল। সে তার আগের জীবন ফিরে পেল। বেড়াল-ছানাটার কথা মাঝে-মাঝে মনে হয বটে, কিন্তু তাব নিজের জীবনেব আবেদন ঢেব বেশি। মাছ, মাংস, ডিম, অফিস, খবরেব কাগজ, টাকাকড়িব চিন্তা, বৌয়ের একটা-ওটা-সেটা উনপঞ্চাশটা, বাতাস, গোলদিঘি, চুরুট—নানা রকম স্রোতের ভেতব হাবিযে গেল সে। সাধারণ সাংসারিক মানুষ হয়ে উঠল আবার। এক-একদিন খুব বেশি রাত বিছানায জেগে থেকে-থেকে মাল্যবানেব মনে হয়, কাদাপাঁকের ভেতবে একটা শুযোরেব মত সমস্ত দিন জীবনটা যেন তার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ কবে বেড়ায; বেড়ালের ছানার মৃত্যু তাকে বেশ একটা চমৎকাব মুক্তি দিযেছিল; স্ত্রীব মমতাবিমুখতার ঢের ওপরে চলে গিযেছিল সে, অফিসের কাজে যে-কোনো মুহূর্তে ইস্তফা দিযে চলে যাবার মত একটা সহজ স্বাধীনতা এসেছিল মনের ভেতর, বক্তমাংসের শবীবে পাখির মত লঘুতা এসেছিল যেন তার, যেন সে অনেক ওপবে উড়ে চলে যেতে পাবে, জীবনেব উপেক্ষা আকাঙক্ষা লোভ কিছুই যেন নাগাল পায না তাকে আব; চোত-বোশেখে পাড়াগাঁব দুপুবে বিকেলের অনির্বচনীযতাব ভেতব প্যাট-প্যাট করে ফাঁড়া ওড়া শিমুলের তুলোর মতন আশ্চর্য ধীবমুক্তির স্বাদ পেযেছিল সে নীলিমা-নীলিমায়, সূর্যে, রৌদ্রে, আকাশপথেব পাখির পালকেব, মৌমাছিব পাখনায, তাবপবে কোন নীলিমা নিঃঝুম পরলোকের দেশে। কিন্তু দিনেব বেলা এ-সব কথা মনে থাকে না বড় একটা তাব; মনে পড়লেও দাগ বসাতে পারে না তেমন।

এই-ই হওয়া উচিত। মাল্যবানেব মতন মানুষেব পক্ষে সমস্তটা দিন অফিস বা সংসাবেব অন্য যে-কোন মানুষের মতন জীবন কাটানোই স্বাভাবিক। রাতের বেলাটাও তার তাদেব মতই কেটে যেত, যদি উৎপলার মত এক জন 'সত্তমা' স্ত্রী এসে বাদ না সাধত। উৎপলাব সম্পর্কে এসে জীবন ধাক্কা, আঘাত, উপলব্ধির ভেতর দিযে চলেছে। এ না-হলে সে তাব অফিসেব মাইতি-দে-গড়াগড়ি-গুঁইবাবুদের মত এড়িগেড়ি বাচ্চায ঘব ভবে ফেলে, সিঁদুব-ধ্যাঁবড়ানো ফোকলাদেঁতো শাকচুন্নিদের নিযে ঘর কবত। কিন্তু উৎপলাকে নিযে তার জীবন সে-বকম নয় তো। ওদের মতন নয-আব-এক রকম।

রববার সকালবেলা মাল্যবান ঝিকে বললে, 'মাকে একটু ডেকে আনো তো।' তিন-চাব বাব ঝিকে ওপবে পাঠাতে হল।

উৎপলা নীচে নেমে এল; বললে, 'তোমাব লজ্জা করে না?'

'কেন?'

'ঝিকে দিযে আমাকে ডেকে পাঠাচ্ছিলে?'

'তোমার কাছে লোকজন ছিল, আমি তো নিজে গিযে ডাকতে পারি না।'

'লোকজন চলে যাওয়া পর্যন্ত তব সইল না? আমি ওপবেব ঘরে কী করি—না-করি, নীচের ঘবে বসে তুমি সে-সব গণেশ ওল্টাবে! আচ্ছা পেটোয়া গণেশ তো বাবা—'

'যাক, ওবা তো চলে গেছে—'

'তুমিই তো তাড়ালে—'

'যে-জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম-আমার এই ঘরটাব কথা তোমাকে কদিন থেকেই বলব-বলব ভাবছি। ঘরটা কেমন থুবড়ি খেযে পড়ে আছে দেখছ তো।' ঘবেব দিকে না তাকিযেই উৎপলা বললে, 'তার আমি কী করব!'

'তোমাকে একটু গুছিযে দিতে বলছি—'

মাল্যবানের আতলস্পষ্ট বেকুবির দিকে তাকিযে উৎপলা কোনো কথা বললে না আর।

'ওপরে যারা ছিল, তাবা চলে গেছে?'

এ-কথার জবাব না দিয়ে উৎপলা ওপরে চলে যাবার উপক্রম করছিল; পা বাড়াতেই কী যেন একটা জিনিস টপ করে টস করে উৎপলার পায়ের ওপর পড়ে ভেঙে ঝোল ছড়িয়ে দিল, শ্লিপার বাঁচিয়ে, উৎপলার পায়ের মাংসে চামড়ায়। দুহাত পেছিয়ে গিয়ে আলসের দিকে তাকাতেই পাখিটাকে চোখে পড়ল; মাল্যবানের জুড়ির মতই বোকা-বোকা বেকুব পাখিটার দিকে কেমন যেন লেগে থাকতে চায় চোখ; কেমন অদ্ভুত জায়গায় ডিম পেড়েছে, ডিমটাকে ফেলে দিয়েছে হয়ত নিজের অজান্তেই বেশি নড়াচড়া, ঘোরাফেরা, ডানা ঝাপটাতে গিয়ে, পা নাড়া দিয়ে; কী যে হয়ে গেছে, ডিম যে পড়ে গেছে, ভেঙে গেছে, সে-দিকে খেয়াল নেই পাখিটার, হারানো নষ্ট ডিম সম্বন্ধে কোনো চেতনা নেই; কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে আলসের ওপর, গলা ফুলিয়ে বক-ব্রকম-ব্রুকম-ব্রুক ইব্-ববম্-বিরম-বরম্-রুক করছে পাখিটা। উৎপলা জোরে-জোরে হাততালি দিতেই আরো একটা পাখি বেরিয়ে এল বিমের প্যাড়াল থেকে; উড়ে চলে গেল পাখি দুটো।

মেঝের ওপর পাখির বিষ্টা, পালক-ভাঙা ডিমের লালায় নিজের আঁশটে এঁটো পায়ের দিকে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'খুব আগুনদার সোনার দরে গুদোম ভাড়া দিচ্ছে বুঝি জংলি পায়রার ঝাড়—'

'তা দিচ্ছে,' উৎপলার কথা ফুরোবার আগে মাল্যবান বললে, বেশ সমাহিত শান্ত ভাবে বললে, 'পাখিরা আর কদ্দূর কী করবে; মানুষরা পাখিদের চেয়ে শয়তান; না-হলে পৃথিবীটা এ-রকম পৃথিবী হয়! নাঃ, ও-পাখিগুলোকে আমি কিছু বলি না।'

'আমি জাল পেতে রাখব। এক-একটা করে ধরে ঠাকুরকে দেব। এ-সব কোঁদো পায়রার মাংস খেতে বেশ—'

'একটা বেড়ালের ছানা মেরে ফেলেছিলাম এক দিন,' মাল্যবান বললে, উৎপলার কথা সে শুনেছে কি না-শুনেছে, বোঝা গেল না, 'সেই থেকেই এ-সব বিষয়ে খুব সাবাধানে চলতে আরম্ভ করেছি। এ-সব প্রাণীদের কিছু বলি না আমি।'

'বেড়ালের ছানা কে মেরেছিল?'

'আমি।' মাল্যবানের চোখ খানিকটা বুজে এল।

'করে?'

'এই দিন পঁচিশেক আগে।'

'কোথায়?'

'এই ঘরেই।'

'কই আমি দেখি নি তো।'

'সে রাত-দুপুরে হয়েছিল; কে এক জন ক্যাঁক করে ছেড়ে দিয়ে গেল। বাচ্চার কান্নায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। তার পর—' বলে সে থামল।

'সেটাকে চাড় দিয়ে থেঁৎলে দিলে তুমি—'

মাল্যবান উৎপলার মুখের দিকে তাকাল একবার; পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে নিয়ে চোখ বুজে ভেতরের দিকে তাকাল মাল্যবান; ভিজে পর্দার ওপর কামলণ্ঠনের ছবির মত এসে পড়ল সব; সেই রাত্রি, সেই বেড়ালের ছানা, ছানাটাকে (ছবি চলতে আরম্ভ করল) কেমন বিশ্রী ও নিকষ অপকৌশলে ধরে ফেলেছিল সে—কেমন অন্ধ হয়ে দেয়ালে আছড়ে মেরেছিল, কেমন কাতরাতে-কাতরাতে মরে গেল বাচ্চাটা—সেই সবের দিকে আপ্রাণ করুণায় দাঁত-মুখ খিচিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাল্যবান বললে, 'মানুষ হওয়া হবে কবে, তাই ভাবছি; কোনো দিক দিয়েই হতে পারি নি তো আজও। চেষ্টা করছি; করছি? পাখিদের কিছু বলি না আমি; ময়লার লপসি করছে ঘরদোর; খুব ভোগান্তি বটে, কিন্তু তাতে আর কী, আমি নিজের মনে থাকি; ওদের চাল-চিঁড়ে দিই, যব খেতে ভালবাসে, মেঝের ওপর ছড়িয়ে রাখি, খায় আর হাগে, হাগে আর খায়; মানুষের ভেতর দু-চার জনকে ছেড়ে দিলে প্রায় মানুষই এদের চেয়ে ঢের খারাপ কাজ করে।' বলতে-বলতে মাল্যবান লজিকের সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে অবশেষে উৎপলার পায়ের দিকেও না তাকিয়ে পারল না, পাখির ডিমের লালায় ঝোলে নষ্ট হয়ে গেছে পাটা—

'কিন্তু এই পাখিগুলো', উৎপলার আগাপাশতলায় চোখ দুটোকে বেশ খানিকক্ষণ পাক খাইয়ে নিয়ে মাল্যবান বললে, 'একেবারে বেহেড হয়ে ডিম পাড়ে। যেন পাৎবাদামের গাছ থেকে বাদাম টপাটপ করে ঝরে। দিন-দিন মাল লোকসান করে—'

মাল্যবান কিছুক্ষণ চুপ মেরে থেকে হাতের চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে আকাশ-পাতালের অনেক

বিশৃঙ্খল ঢেউ গুনে দেখল, তাদের সাজিয়ে নিয়ে কোনো নির্দেশের মত মুক্তাপ্রবাল দেখল যেন জ্বলে উঠে জলের শিখরচূড়ো হয়ে যেতে, এবং বেশ খানিকক্ষণ পরে সেই আলোটিকেই ব্যাখ্যা করে বললে, 'কিন্তু, তাই বলে গুলতি ছুঁড়ে ওদের মারা উচিত কি? উচিত নয়।'

তারপরে স্পষ্ট হয়ে বললে, 'তোমার নীলাম্বরীটা ঠিক আছে তো—ভিজিয়ে দেয় নি তো?'

'আহা, কী মানিয়েছে তোমাকে এই ময়ূরকণ্ঠী নীলে—', মাল্যবান ভাবছিল, 'যেন উত্তরাকে নেত্য শেখাচ্ছেন বৃহন্নলা। নাচের ঘোরে মিলেমিশে গেছে উত্তরা-বৃহন্নলা—কে উৎপলা কে বৃহন্নলা—' অনির্বচনীয় দেখাচ্ছে উৎপলাকে'—অথচ দাঁড়িয়ে আছে, সত্যিই তো আর নাচছে না, নড়ছেও না; অথচ দেখাচ্ছে উৎপলাকে যেন ক্ষুরধারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—পুরুষের যে-তিলোত্তম পেলে মেয়েমানুষকে মহানারীর মত দেখায়, সেই রকম।

'আমাকে কযেকটা বালিশেব ওযাড় তৈবি কবে দেবে? বলো তো কযেক গজ মার্কিন নিযে আসি।'

উৎপলা যাবার জন্যে তৈরি হল, 'থাক, দর্জির বাড়িই দেওযা যাবে।'

স্ত্রীব সঙ্গে সেও ওপরে চলল।

গিয়ে বললে, 'আমাকে একটা পান দিতে পাবো? ভেবেছিলাম, ছেড়ে দেব। কিন্তু লোভ সামলতে পারি না।'

'কিন্তু, উৎপলা নড়ছিল-চড়ছিল না; ছাদেব ওপর বোদে-বাতাসে একটা ডেকচেযারে বসে ঘাড় কাত করে বেণী খসাতে লাগল! খুব আমেজ এসেছে উৎপলাব শরীরেব রসে উপলব্ধি করে নিজেবও গ্রন্থিতে মাংসে একটা মন্থর, সুখ্যাত, মদিব সুখানুভব ছড়িয়ে পড়ছিল মাল্যবানেব। কিন্তু ওপরে থেকে লাভ নেই কোনো, মাল্যবানের মনে হল; এখন নীচে চলে যাওযা উচিত।

নীচে গিযে মাল্যবান ঠিক করল, ঘবদোব সে নিজেই গোছাবে। তার পর মনে হল, ঝিকে দিযে গুছিযে নেবে। ঝি রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। মাল্যবান একটা বিড়ি জ্বালিযে ভাবল, গুছিযে কী লাভ!

কিন্তু পবক্ষণে সে নিজেই গোছাতে লাগল। বিশৃঙ্খলা ও নোংবামির ভেতব মনটা কেমন খিচখিচ করে ওঠে; কিন্তু সেদিনকার মতন পর্বত ঝেড়ে নিখুঁত ভাবে গোছাতে গেল না; ঘরটা ঝাঁট দিযে, জিনিসপত্র ঠিকঠাক বেখে দিযে, বিছানার চাদর বদলে, নোংবা কাপড়গুলো কাছেই একটা লন্ড্রিতে ফেলে দিযে এসে কাজ সাঙ্গ হল তার।

বাতের বেলা বড্ড শীত; মোজাগুলো সব ছেঁড়া, একটা পুলওভাব কিছুতেই কেনা হয না, গাযেব আলোয়ান তেলে, জলে, বোদে বাতাসে ছাই হযে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়েছে, কযেকটা তালিও মেবেছে সে, বড় বিশ্রী লাগে, একটা নতুন আলোযান কিনতে ইচ্ছে করে, ডোবাকাটা কালো মশারিটাব ছ্যাঁদাব অন্ত নেই, নোংরা পচা ছারপোকা গুঁইগুঁই কবছে, একটা মস্ত বড় ছিপড়ের জঙ্গল হয়েছে মশাবিটা।

রাতের খাওযা-দাওযাব পব নীচেব ঘরে একটা ঠাণ্ডা টিনের চেযাবে বসে মাল্যবানেব মনে হচ্ছিল, দূব, এ-রকম জোড়াতালি দিযে জীবন কাটিযে কী লাভ, কার লাভ!

বিছানায এসে বসে মনে হল, জীবনটা এই বকমই হ্যাঁচকা ব্যাপাব। বিছানায শুযে পড়ে, 'কেই-বা এখন শুতে যেত' ভাবছিল মাল্যবান; বসে-বসে কথাবার্তা, গল্প—তাব পব শীতেব বাতে—তার পর সারাটা শীতের রাত; এমন স্ত্রী কি আমি পেতে পারতাম না। হড়পা বানেব ঠাণ্ডা স্রোতে যেন মুর্গি আমি হাঁসেব মত সাঁতাব কাটতে চাচ্ছি, বাজপাখিব মত উড়ে যেতে চাচ্ছি। আমার জীবনের বানচালের ব্যাপারটা এই রকম। কিন্তু বড় বেশি আত্মপ্রেম হযে পড়েছে তো আমাব; যেন একটা ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবীতে আর-কেউ নেই, যেন ব্যক্তিসমুদ্র নিযে যে-মানুষেব ও সময়ের ইতিহাস তৈবি হচ্ছে সেটা কিছু নয। লেপ মুড়ি দিয়ে শীতের খুব গভীব রাতে আজকের আবহমানেব ও ব্যক্তিসমুদ্রের রোল-যা নির্ব্যক্তিত্বে বিশোধিত হয়ে ফেনার কণার মত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অন্ধকারেব থেকে খুব সম্ভব আরো ব্যাপক অন্ধকারের ভেতর—সেই সুব শুনতে পেল সে; অতএব আলোকিত হয়ে উঠল যেন তার মন; আস্তে-আস্তে সময়ের আশ্চর্য সমগ্রতাব কাছে আত্মসমর্পণ করে স্থির হযে উঠতে থাকল তাব মন।..

এত বেশি স্থির হল যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পৌষ মাসের শেষাশেষি মেজদার পরিবার এল।

মাল্যবান একটা মেসে গিযে উঠল। মেস ঠিক নয়—মাঝারিগোছের একটা বোর্ডিং। একটা আলাদা

সূচীপত্রে যান

কামরা বেশ গুছিয়ে নিল সে। মেজদা আর বৌঠান কিছুতেই ছাড়তে চায় নি মাল্যবানকে, কিন্তু তবুও সব দিক ভেবে সুবিবেচনা করে মেসেই যেতে হল তাকে।

মেসের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না তার। অফিস থেকে এসে নিজের জীবনের বিপর্যয়ের কথাই সে ভাবত—যে পর্যন্ত না ব্যক্তিঅতিক্রমণার দূর সমুদ্রসুর শুনতে পেত সে; সে-শব্দ শুনতে গিয়ে রাত বেশি হয়ে যেত—ঘুম আসত তার আগে; সে-সুর প্রায়ই আজকাল শোনা যেত না, আসত না, স্পষ্ট করে ধরা দিতে চাইত না। গোলদিঘি কাছে ছিল—বেড়াতে যেত। এক-একদিন নিজেব বাড়িতে গিয়ে তত্ত্বতলব নিয়ে আসে-চারদিকে ঘুরেফিরে দেখে মেজদা ও বৌঠানের অমায়িক মুক্ষিমিষ্টত্ব উপভোগ করে। তাঁবা এমন চমৎকার মানুষ—হয়ত খুঁটিনাটি নিয়ে দুজনে বচসা করছেন, কিন্তু তাব ভেতরেও পবস্পরেব জন্যে এক নাড়ীরই টান যেন, এক জোড়া বসন্তবউরির মত নীড়ের বাইরে, মুহূর্তেই নীড়ের ভেতবে যেন মানুষেব মত শবীব ও বোধ নিয়ে—প্রত্যেক কথার ভেতর দিয়েই যৌনসম্বন্ধের মিছরি মাখানো ভালবাসার মর্ম ফুটে উঠছে। দেখে মাল্যবানের লাগছে মন্দ না, মানে খারাপ লাগে, কেমন বিশ্রী লাগে যেন; ব্যক্তিজলরাশি ভুলে গিয়ে ব্যক্তিকে, নিজের কী হল না-হল, সেটাকেই সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয বলে।

এ-জিনিসটা উপলব্ধি করে ব্যক্তিজলরাশির নিশ্চিহ্ন জলরৌদ্রবাশিব ভেতর মিলিয়ে যেতে চেয়ে ঈষৎ ভাঙ খেয়ে কেমন ভাল লেগেছে যেন তাব, এমনই একটা আস্বাদে, মিষ্টি গলায় মাল্যবান বলে, 'মেজদা, আপনাদেব শুতে তো কোনো কষ্ট হয না?'

'না। এই তো বেশ বড় ছাপ্পব খাট রয়েছে।'

'ওখানে একাই শোন বুঝি আপনি?'

'না।'

'ছেলেপুলেবা শোয় বুঝি আপনাব সঙ্গে?'

'ওবা নীচে শোয—পিসিব কাছে।'

মেজদা বললেন, 'উনি আব আমি শুই এখানেই। একা বিছানায ঘুম হয না-পাশে, যা হোক অন্তত, একটা-শাড়িব খশখশানি উশখুশানি না থাকলে চলে না। বুঝলে কি না..'

মাল্যবান নিজেব কপাল থেকে একটা ডাঁশ উড়িয়ে দিল।

মেজদা গলা খাকবে বললেন, 'বিছানাব চাবদিকটা বেশ উম হয়ে থাকা চাই তো.... হা হা...'

মেজবৌঠান হামানদিস্তেয় পান ছেঁচতে-ছেঁচতে ঘবেব ভেতবে ঢুকে ছেঁচা পানেব বড়ি পাকিয়ে বিরাজবাবুকে দিয়ে গেলেন। তাব পব হাত ধুয়ে বিবাজাবুর দাবনা ঘেঁষেই যেন বসলেন—কোনো সঙ্কোচ নেই। মাপলাবটা বিরাজের গলায ভাল কবে জড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'বড্ড শীত'; বালিশেব নীচেব থেকে এক জোড়া চকোলেট রঙেব মোজা বের কবে বিরাজ মিত্তিরেব বাঁ পাযেব গোদে, সরু ডান ঠ্যাঙে পবিয়ে দিলেন মাঝবযেসি আঙুলেব সুকুশল সক্রিযতায—মোমেব ঝবানিব থেকে বেশি মধুব ঝবানিব থেকে উঠে এসে যেন।

মেসে এসে মাল্যবান—যেন ফাঁপরে পড়ে গেলে, কেউ নেই তাব, কিছু নেই। এখানে ছোকবারা থাকে, আর থাকে এমন সব লোক—বিশেষ এক বকম শাবীবিক সুখেব জন্যে যাদের সব সময়েই লালা ঝবছে; রাতের বেলা বেরিয়ে যায তারা; কোথায থাকে—কী কবে? কোনোদিন শেষ বাতে ফিবে আসে, কোনদিন আসে না। মেসেব যাদেব এ-বকম রাত করা বাতিক নেই, তাদেবও লাল ঝবছে বিশেষ এক বকম শরীবগ্রন্থির সুখেব জন্যে মেসের বাতের বিছানায শুয়ে থেকে। বছবেব পব বছব সাবাটা জীবন এরা মেসেই কাটিয়ে দেয। এ ছাড়া গতি নেই—কিছু নেই—সংসাব কববাব শক্তি নেই—

বিছানায শুয়ে পড়ল সে; কিন্তু সেই মুহূর্তেই উঠে বসল। বাবান্দায পাযচাবি করতে লাগল। গোলদিঘিতে গেল। ফিবে এল সেখান থেকে। খবরেব কাগজ নিল; বেখে দিল; চুরুট জ্বালাল; নিভে গেল; ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল?

পরদিন সকালবেলা মাল্যবানের মেসেব ঘবের কাছে রেলিঙেব ওপর কতকগুলো কাক এসে ডাকছিল। মাল্যবান তার স্ত্রীব মুক্ষি-ওড়ানোর মত ঝটপট হাততালি দিয়ে হা-হা কবতে-করতে উড়িয়ে দিল সেগুলোকে। পাশের ঘরের একজন ভদ্রলোক বেবিয়ে এসে বললেন, 'দেখলেন মশাই, কী রকম বিরক্ত করে! কাল আট আনার কচুরি-হালুযা এনে টেবিলে বেখে একটু মুখ ধুতে গেছি, এরই মধ্যে ঘরের ভেতব ঢুকে খাবাবেব ঠোঙা লোপাট—'

সূচীপত্রে যান

'এই কাকগুলো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বড্ড বেয়াদব তো—'

'কিন্তু মাল্যবানের ইচ্ছে হচ্ছিল, এই কাকগুলোকে ডেকে সে কিছু খেতে দেয়—এগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছে বলে কেমন একটু খালি-খালি লাগছিল তার। রোজ সকালে সে ঘুমের থেকে উঠবার ঢের আগেই পুবের দিকের এই রেলিঙের ওপব বসে কাকগুলো ডাকতে থাকে। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তার পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ে—মা-র কথা; সেই খড়ের ঘর—এমনি শীতের ভোর—এমনি কাকের ডাক। কোথায় গেল সে সব!

মাল্যবান ঘরের ভেতর ঢুকে টেবিলের কাছে বসে এই সব কথা ভাবছিল। এমনি সময়ে কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা একটা কাক উড়ে এসে মাল্যবানের ঘরের পাশে ট্রামরাস্তার দিকের রোয়াকের রেলিঙের ওপর বসল আবার। মাল্যবান অনেকক্ষণ এক ঠাঁই বসে থেকে কাকটাকে দেখতে লাগল—তার ডাক শুনছিল। পাড়াগাঁয় দাঁড়কাক থাকে, পাতিকাক থাকে; কলকাতায় পাতিকাক;—দাঁড়কাক দেখছে না তো। অনেকদিন দাঁড়কাক দেখে নি; একটা দাঁড়কাক দেখেছিল বড় রাস্তার একটা মস্ত বড় বিজ্ঞাপনের ছবিতে; একটা মদের বোতলের টাইট ছিপি ঠুকরে খুলতে চাচ্ছে—ফ্রান্সের বিখ্যাত মদেব গন্ধে এমনি তোলপাড় হয়ে গিয়েছে প্রাণীটি। মদের বোতলের বিজ্ঞাপনেব দাঁড়কাক, কিন্তু তবুও চোখ তুলে দেখবাব মত; এক ঝলকে জীবনের অনেক কটা বছরের আকাশ-বাতাস পাখি-প্রাণী সমাজ-উপলব্ধি উজিয়ে দিয়ে গেছে।

কাকটা উড়ে গেল কুয়াশার ভেতর দিয়ে—গোলদিঘির দিকে—একটা নিমগাছেব ভেতর। এমনি উড়ে যেতে ভাল লাগে।

পাড়াগাঁর বাড়িতে প্রকাণ্ড বড় উঠোন ছিল তাদের, ঘাসে ঢাকা, কোথাও-বা শক্ত শাদা মাটি বেরিয়ে পড়ছে, তারই ওপর সারাদিন খেলা করত রোদ, ছায়া, মেঘেব ছায়া, আকাশের চিলেব ডানাব ছায়া—রোদে দ্রুততায় চলিষ্ণু হীরেকষেব মত তাব ছটকানো। শালিখ উড়ে আসত উঠোনে; খড়ের চালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত বক—এই সরোবর থেকে সেই সবোববে যাবার পথে, ডানায় তাদেব জলেব গন্ধ, ঠোঁটে বঙের আভা, চকিত চোখ দূবের দিকে, নীলিমাব দিকে। কত উঁচু-উঁচু গাছ ছিল উঠোন ঘিবে; সারাটা শীতকাল ঘুঘুর ডাক জারুল ঝাউ পাৎবাদাম আমের বন নিম হিজলেব জঙ্গল কেমন ফুকরে-ফুকবে উঠত—বোদের দিকে পিঠ রেখে নিজের শবীবটাকে একটু এলিয়ে দিযে সমস্ত শরীব ঘুমে ভরে উঠত সেই পাখির ডাকে। মাঝে-মাঝে উঠোনে এসে পড়ত ঘুঘু, কেমন কলেব মত, পাখিদের দেশের খুদে ঢেঁকির পাড়ের মত ঘুঘুদের লেজগুলো উঠত-পড়ত উঠত-পড়ত—ঘুব-ঘুব ঘুব-ঘুব কবে ছুটে যেতে তারা মাঠে ঘাসে—কী খুঁজত—কী চাইত? সেই পঁচিশ-তিরিশ বছব আগেব শীতেব ভোবের কুয়াশার ভেতর সেই সব পাখি যেন পৃথিবীব মনে কোনো দিন ছিল না; আজকের পৃথিবীটা কলকাতাব বাণিজ্যিশক্তির গোলকধাঁধা নিযে এমনি অদ্ভুত অপৃথিবী। ফিকে কফির কোকোব মত রঙেব গলা ফুলিয়ে কত পাতিকাক উড়ে আসত খড়ের চালে, উঠোনে; শন-শন কবে উড়ে যেত ঠাণ্ডা জলেব ওপব দিযে ছুঁই-ছুঁই করে কোনো নদীকে কোনো দিঘিকেই না ছুঁয়ে, জলেব ভেতর ঝাপসা প্রতিফলিত হয়ে, শাঁ-শাঁ করে কোথা থেকে উড়ে যেত, তাবা কোথায; সকালের কুয়াশার দিক থেকে দূর বিদিকের পানে উড়ে যেত সেই কাকগুলো পৃথিবীটাকেই টেনে বার কববার জন্যে, উজ্জ্বল সূর্যটাকে সবাইকে পাইয়ে দেবার জন্যে—যারা কাক নয়, পাখি নয়, তাদের জন্যেও—ক্ব-ক্ব-ক্বক্ব—কেমন শতচেতনার হাঁকডাক, সালিশি, নির্জনতা।

সরস্বতীপুজোর দিন মাল্যবানের ঘরেব পাশেই বোর্ডিঙের কযেকজনে মিলে খুব মদ খেল। বোর্ডিঙেব একটা হলের মত ঘরে বাঈনাচ হল। বোর্ডিঙেব ঝি বাবুদেব সঙ্গে পাশপাশি চেযাবে বসে নাচগান দেখল-শুনল; মাল্যবান অবাক হয়ে দেখছিল, ঝি একটুও সঙ্কোচ বোধ করছে না—এ যেন তাব পাকাপাকি অভ্যাস; বাবুদের মায়ের মতন কখনো তার ঠাঁট, কখনো কারো-কারো বিশেষ গিন্নি যেন সে, তেমনি ভাবগতিক, কখনো-কখনো সকলের অন্তরঙ্গ বন্ধু যেন—নম্র অমাযিক, সকলকে হাতের ভেতর গুছিয়ে নেবার জন্যে ব্যস্ত, নানা রকম সহজ সুলভ ছেনালিতে সরস। কাল সকালেই গিয়ে তো আবাব বাসন মাজতে বসবে। তখন এর ন্যালাভ্যালা মুখের দিকে মাল্যবান অন্তত তাকিয়েও দেখতে যাবে না। এই বাবুরাও কোনো তক্কা রাখবে কি? কিন্তু আজ রাতে একে দিযেই আসর জামানো। আসর জমাচ্ছেও

মন্দ না। পান চিবোয়—সিগারেট টানে—গালগল্পের পাট নিয়ে এর কাছে তার কাছে ফেরে—একে না পেলে কয়েকটি বাবুর অন্তত আজ রাতের অনেকখানি ফুর্তি মাটি হয়ে যেত।

মাল্যবান সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ভাবার মাথায় ভাবছিল; সরস্বতীপুজোর সঙ্গে এ-সবের কী সম্পর্ক! মদ বাঈনাচ ঝি—এ-সবের কী দরকার! কিন্তু এ-আসরের মধ্যে এমন কথা সে হয়ত একাই ভাবছিল। একাই সে কেমন এক! নিস্তব্ধ—কেমন যেন ঝক মেরে গেছে অন্য সবাইয়ের হল্লা জৌলুশের তুলনায়। কিন্তু এ-কথা ঠিক, এদের কারো ওপরই কোনো বিমুখ ভাব ছিল না তার।

মদ খেল না অবিশ্যি, আজ কেন যেন সিগারেটও টানতে গেল না, দু-একটা পান চিবুল মাত্র, কিন্তু আসর থেকে উঠে গেল না তো; বসে-বসে নাচগান দেখছিল-শুনছিল। গযমতী (মানে কী, এ-নামের?) ঝিকে নিয়ে সবাই ফুর্তি করছিল, কিন্তু এই মাকড়ের ঠ্যাং, ফিঙের ঠ্যাং, কাঁতলের মুখ, ভেটকির মুখের মত মেয়ে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে ভাবি দুঃখ হচ্ছিল মাল্যবানের। ইলেকট্রিক লাইটের আলো মাঝে-মাঝে মেয়েটির টিমটিমে চোখে এসে পড়ে, বাতির কড়া কড়কড়ে ঝাঁঝে সে কষ্ট পায়, এমন দুঃখ হয় মাল্যবানের; মাথার থেকে ঘোমটা খসে পড়ে মেয়েটির, ছোট্ট খুকিদেব মত এতটুকু খোঁপা বেরিয়ে পড়ে—বড় কষ্ট লাগে মাল্যবানের; একটা ভাঙা চেযাবেব খোঁচা খেয়ে মেয়েটির শাড়ির অনেকখানি ছিঁড়ে যায়, নিজে সে তা বুঝতেও পারে না, কিন্তু মাল্যবানেব সংবেদনায় গিয়ে লাগে খুব,—খুব; মেয়েটি সিগারেট টানতে-টানতে প্রায়ই বুকে হাত দিয়ে কাশে—সুবিধের লাগে না মাল্যবানের; কাশে যখন মেয়েটি তখন তার চোখ দুটো মাছেব মত গোল হয়ে ওঠে—বড় বিশ্রী দেখায়—মাল্যবানের খারাপ লাগে, কেমন দুঃখ করে এই অদ্ভুত হাড়িডসাবের জন্যে, এই ব্যক্তিটির জন্যেই। মাল্যবান খুব ভাল বোধ কবছিল না, অবাক হয়ে ভাবছিল, এত সিগারেট টানছে, এতে কি সুখ পাচ্ছে গয়মতী, টানছে আর কাশছে, এই কাশছে তবুও এ-রকম খিঁচে সিগারেট টানছে, 'খুবই অদ্ভুত ভারি মজার বোধ হত জিনিসটাকে, কিন্তু দুঃখ হতে লাগল মাল্যবানের।

চার-পাঁচজন বাবু মিলে ঝিকে আলাদা একটা কামরায নিয়ে গেল। মাল্যবান নিজের ঘবে চলে যাচ্ছিল, তাকিয়ে দেখল ঝিকে সবাই মিলে মদ খাওয়াচ্ছে।

মাল্যবান হাঁটতে-হাঁটতে ভাবল; এ কী-রকম ফুর্তি! কিন্তু তবুও প্রতিবাদ করতে গেল না; প্রতিবাদ করবাব মত চোপা নেই তার, সে-শক্তি ও ঔশ্বর্য নেই; সে তাগিদও নেই; সে জানে, পৃথিবীর অনেক দিকেই এ-রকম অনাচার চলেছে, কেউ বোধ করতে পাবে না, কারুর রোধ মানে না।

তেতলায় উঠে অন্ধকাবেব মধ্যে বাবান্দায় খানিকক্ষণ সে পাযচারি কবল। তার পর রেলিঙেব কাছে এসে নীচেব দিকে তাকাল একবাব; দেখল, সেই ঝি কলতলার পাশে বসে মুখ থুবড়ে বমি করছে; তাব আশেপাশে দুজন সঙ্গী শুধু। মেসের ঠাকুর বামদেব—লম্বা হিরগিরে মানুষ—মুখটা অনেকটা স্যাব ত্রৈলোক্যের মত—ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং চড়িয়ে খানিকটা দূরে দেযালে ঠেস দিয়ে নিবাসক্ত ভাবে খইনি টিপছে—মাঝে-মাঝে মাকড়শাব জালের মত জড়িত চোখের দৃষ্টি তুলে ঝিব দিকে তাকাচ্ছে। ঝির কাছে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ছাপরা জেলার পূর্ণ কুর্মি। লোকটা বেঁটে, কালো, মুখে বসন্তের দাগ, উঁচু-উঁচু শাদা, দাঁত থেকে তবুও বিশ্রী গন্ধ বেরয; কিন্তু হাসি-হাসি মানুষ; এই মেসে সব চেয়ে এই ঝিকেই ভালবাসে সে। ঝি কাকে ভালবাসে? পূর্ণকে নয়, ঠাকুরকে নয়, কাকে, জানে না মাল্যবান। উঠে-পড়ে ভালবাসাব ব্যাপারে লেগে গেছে পূর্ণ আজ; ট্যাঁকে আজ কিছু টাকা আছে তার; ঝির সঙ্গে আজ রাতে কাজ হবে তার।

ওপর থেকে হঠাৎ এক সঙ্গে কয়েকটা রোশনচৌকি বেজে উঠল যেন; 'পূর্ণ! পূর্ণ! পূর্ণ!'

ওপরে মাল খাস্ত পড়েছে হয়ত মদের কিংবা মাংসেব অথবা সোডা ওয়াটারের; এখুনি দোকানে ছুটতে হবে পূর্ণকে।

গযমতী বললে, 'তুই যা পূর্ণ, বামদেব আছে, হুই বসে আছে—ওই ওতেই হবে—দেড়টা নাগাদ আসিস তুই।'

পূর্ণ আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বসে বাঁকিয়ে নতুন মাটির কেঁচোর মত শরীরটাকে পাক খাওয়াল কিছুক্ষণ। তারপরে ধাঁ করে হাওয়া দিল।

বামদেব বললে, 'পরকাল ঝরঝরে করে রাঁড়ি তো হয়েছিস। কিন্তু আমি চক্কোত্তি বামুন, মনে রাখিস, পয়সা-টযাসা পূর্ণর মত আমি দিতে পারব না।'

'তুমি বামুন আছ, আমি হাড়ির মেয়ে নই, আমার বাপের নাম সিধু সরকার—'

'গোবরার সেই সিধু না কি রে? ঐ যে আসত, আর তুই পাত পেড়ে দিতি।'

'কসবার সিধু সরকার, তুমি দেখো নি তাকে।'

'সরকারও এক রকম কায়েত বটে,' বামদেব একটা ঢেকুর তুলে বললে, 'যাক গে, শোন বলি কায়েতের মেয়ে বমি করলি যে!'

'ওসব খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার।'

'একটু বেসামাল হয়ে গেছিস, গয়া; আর বমি করবি?'

'না।'

'বমি-বমি করে যদি বল আমাকে, আমি তো তোর পিঠে হাত দিলেই বেরিয়ে যাবে সব হড়-হড় করে—'

'নাঃ। শান্তি হয়েছে,' গযমতী বললে, 'হাড় নড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে শরীবের ভেতর।'

'তবে চ—'

'কোথা?'

'আর কোথা, বাবুদেব খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে সব। তুই তো খেযে আঁশবটি হাতে করে উগরে ফেললি সব ভ্যান-ভ্যান করে, দেখে-দেখে আমার হযে গেছে, আর খেযেছি আমি!'

'নাও, নাও, খেযে নাও গে,' গযা বললে খুব আত্তি দেখিয়ে, 'খইনি টিপছ তো পিপছই, নাও ওঠো।'

'পিবিত্তি নেই,' মুখটা কেমন যেন ভেঙেচুরে ফেলে বামদেব বললে, 'সাবাদিন কড়া আগুনে রাঁধতে-রাঁধতে, তোর বমি দেখতে-দেখতে খাবাব হাঁড়ি পেটের ভেতর শুকিযে আমার শালকাট হয়ে গেছে, গযা!'

কলতলায় বসেছিল এতক্ষণ, মাথায় একটা আলতো ঝাঁকুনি দিযে উঠে দাঁড়িযে গযা বললে, 'এও বলি বাপু, ভাল ঠেছকে না আমাব; কেমন যেন ঠ্যাকার তোমাব, বাপু, ভারি ঠ্যাকাবে হযেছ! তোমাব নাম ধবেই ডাকছি তোমাকে, বামদেব—খাবে না? সত্যিই, কিছুই খাবে না!'

'নাঃ, অন্ন খাব না আজ আর, মেষ্টান্ন খাব!'

'আচ্ছা! আচ্ছা!' একটা মরুঞ্চে শ্যাওড়াগাছেব মত বাতাসেব ঝাপটায় হুমড়ি খেযে পড়ল যেন হাসতে-হাসতে গয়া। বোযাকেব ওপরে বামদেবের কাছেই এসে বসল সে।

'পূর্ণ কি দেড়টার সময়ে আসবে বলেছে?'

'কে জানে কী বলেছে,' ভাবি বিপদ গুনে, বামদেবকে সালিশ মেনে,ক্লান্ত মলিন চোখ দুটো বামদেবের চেনা চাওয়ায় সে খানিকটা স্পষ্ট করে তুলে গযা বললে 'বড্ড হুজ্জোৎ কবে পূর্ণ। ওসব দেইজিপনা হবে না আজ।'

'বাঃ, কী করে হবে, তোমাব তো একটা মেযেমানুষেব গতব, গযা। ও চায সেটাকে পাঁচখানা কবে নিতে।'

বামদেব শিবিরাজার আশ্রিত পাখিকে ভরসা দিযে বললে, 'ওসব কালকেউটেব জন্যে বেউলাব বাত জাগতে হবে না, গয়া। আমি তোমাকে এমন জাযগায নিয়ে যাব, ও বিষদাঁত সেঁধতেই পাববে না।'

শুনতে-শুনতে মাল্যবান নিজের ঘরে গিযে ঢুকল।

বোর্ডিঙের খাওয়া-দাওযা মাল্যবানের ভাল লাগছিল না। কী কতকগুলো ডাঁটা খোসা চোকলা-চাকলা দিয়ে একটা ঘ্যাট বানায়, রাঁধতে পারে না, তেল-মশলা খরচ কবে না, বাজারের থেকে ভাল মাছ-তরকারি আনতে পারে না; 'এ-রকম হলে এ-বোর্ডিং ছেড়ে যাব আমি।'

একদিন বোর্ডিঙেব ম্যানেজার গোটা তিনেক পাঁঠা এনে নীচেব ঘব একটা গুদামে বেঁধে বাখল সারাদিন পাঁঠাগুলো চেঁচায, মাল্যবান কেমন একটু অস্পষ্ট অমানবসাধাবণ্য ভাবে চিন্তা করে ভাবেঃ এই যবক্ষার শীতে বেচারিদের কী কষ্ট! হযত এরা টের পেয়েছে, মরতে হবে শিগগিরই; আমিষ গন্ধ যেন পেযেছে, নিজেদের মৃত্যুর; মানুষের হাতে তৈরি যে সেটা, তাও বুঝেছে। সৃষ্টি, মাল্যবান ভেবে যেতে লাগল, প্রকৃতি এদের এত মোক্ষম কামপ্রবৃত্তি দিল কেবলই সন্তান বানিযে কেবলই সেগুলোকে ধ্বংস করবার জন্যে। এদের লালসার বাড়াবাড়ির সুবিধে নিযে এদের দিযে কেবলি এদের ঝাড়বংশ বাড়াচ্ছে কাটছে—খাচ্ছে মানুষ। মানুষের চেয়ে বড় শয়তান কে আছে এই সৃষ্টির ভেতর! শযতান। শযতান।

মাল্যবানের মন বেঁকে দুমড়ে গেল কেমন যেন, ইচ্ছে হচ্ছিল ম্যানেজারকে গিযে বলে, 'এগুলোকে

আপনি ছেড়ে দিন আচায্যিমশাই, টাকাটা আপনাকে দিয়ে দেব আমি।' কিন্তু, ছেড়ে দিলে কী হবে, অন্য কেউ ধরে খাবে। নিজেদের সুমাংস নিয়ে এরা মানুষ-সমাজ থেকে অক্ষত হয়ে এড়িয়ে যাবে? কোথায়? কোন অজব্রহ্মাণ্ডে? তা তো নেই।

ম্যানেজার মনোহাব আচায্যি তিনটি বেশ পুরুষ্ট তেলচুকচুকে পাঁঠা এনেছে। বোর্ডিংয়ের সকলেই পাঁঠার মাংস খাবার জন্যে খুব ব্যস্ত, কবে পাঁঠা কাটা হবে এ নিয়ে চারদিকে এমন একটা প্রবল তাগিদ, সব্বাইয়েরই জিভে এত জল যে মাল্যবান এদেরই মধ্যে একজন মানুষ, ভাবতে গিয়ে মনে হল, সহজ বিবেকেই মাংস খায় মানুষ, যেমন ফল-ফসল খায় সহজ বিবেকে; কেবলমাত্র তার মতন এক-আধজন মানুষের বিবেকে এসে খোঁচা লাগে; মানুষ হিসেবে সে হয়ত অস্বাভাবিক; নিজেকে খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হল তার—মানুষ হিসেবে। মাল্যবান ঠিক করল, এ-পাঁঠাব মাংস সে খাবে না।

কিন্তু চার-পাঁচ দিন পরে ম্যানেজার পাঁঠা তিনটি বিক্রি করে ফেলল; ঠাকুর পলতার তরকারি, ট্যাংরা মাছের ঝোল আর কলাইযের ডাল দিয়ে সাজিয়ে ভাত নিয়ে এল। মাল্যবানের মনটা কেমন একটু বিরস হয়ে উঠল, বললে, 'ঠাকুর, মাংস আর আমাদেব কপালে জুটল না।' কিন্তু, খেতে-খেতে মাল্যবান নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বলল : ছি, তিনটে প্রাণীর জীবনের চেয়ে আমাব মাংস খাওয়া হল বেশি?

পরদিনই গুদামঘরে দুটো পাঁঠা দেখা গেল আবার; মাল্যবান একটু ধাক্কা খেল; ভাবল : এ আবার কী। ভাত খেতে-খেতে ভাবল; ও মাংস আমাদের খাবাব জন্যে নয়, হযত পাঁঠার ব্যবসা ধরেছে ম্যানেজার। ভেবে—খানিকটা ঠেসে গেল তার সাত্বিক উপলব্ধির সমস্ত তোড়জোড়।

সন্ধের সময ম্যানেজার, নিকুঞ্জ পাকড়াশিকে বলছিল, 'না, না, এ-পাঁঠা আমি কালই কাটব।'

শুনে কেমন একটু ভরসা পেল যেন মাল্যবান। গোলদিঘিতে ঘুবতে-ঘুরতে ভাবল; জীবনে এমনি নোংরা হয়ে পড়েছে আজ—কযেক টুকরো তো মাংস, সেজন্যে দুটো প্রাণীর মৃত্যু আমার কাছে এমন আশা-ভরসার জিনিস হয়ে দাঁড়াল! কিন্তু, এ তো স্বাভাবিকতা, শেয়াল-বেড়াল, চিতে বাঘ, কেঁদো বাঘের মত মানুষ হিংসাত্মক তো। মানুষ হয়ে স্বাভাবিক ভাবে অহিংসা করে বেড়াবার মত নেই তো তার। কিন্তু, তবুও মাল্যবান সংকল্প কবল, এ-মাংস সে খাবে না।

এবং খেল না বটে, কিন্তু মাংসেব বাটি ফিরিয়ে দিতে ভাবি বেগ পেতে হল তার, রাবড়িব তিন চামচে ঝোল মোটেই সরস লাগল না, খুব সক্রিয় আক্রোশে ম্যানেজার ঠাকুরের ওপব মারমুখো হয়ে উঠল তার মন। মানুষের জীবন সহজ সুন্দর মোটেই নয়, মাল্যবানের নিজের জীবনটাও সরল নয়, সত্য নয়, অনুভব করছিল সে।

মেসের বিছানায় শুযে সমস্ত লম্বা শীতের রাত এক-একদিন বেশ ঘুম হয তার। এক-একদিন ঘুম তেমন হয় না—বাবান্দায পাযচাবি করতে থাকে। ইচ্ছে হয, পরেব দিনই বাড়িতে চলে যাবে সে; সকালবেলাও সেই ইচ্ছে থাকে। কিন্তু বেলা যত বাড়তে থাকে, ততই সেই ইচ্ছেব অস্বাভাবিকতা বুঝতে পাবে সে, মেসের জীবনের থোড়-বড়ির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। এক একদিন শেষ-বাতে গভীব অন্ধকার শীতের ভেতর ঘুমের বিছানা এভ ভাল লাগে, জীবনের হৈ-হুটপাট কলরোল এত নিবর্থক মনে হয যে, ভোরের আলোর কথা মনে করে ভয় করে তার।

মাঝে-মাঝে সে খুব সুন্দব স্বপ্ন দেশে।

বোর্ডিঙের অনেকগুলো রাত তার বেশ চমৎকার কেটে গেল। একটা জিনিস খুব ভাল লাগে : একজন ছিপছিপে লম্বা সুন্দর যুবক রোজ শেষ বাতে নানা রকম ইংরেজি বাংলা কবিতা আওড়াতে-আওড়াতে রাস্তা দিযে হেঁটে যায; মাল্যবান আলোড়িত হযে ভাবে—এর জীবনে সমারোহ আছে বটে, কিন্তু সেটা ফিচেল জিনিস নয, সত্যিই গভীব; ওর মতন জীবন পেলে হত।

সকালবেলা কুয়াশার ভেতর দিয়ে এক-একটা কাক মাল্যবানেব বাবান্দাব বেলিঙের ওপব উড়ে আসে, কুয়াশার এলোমেলো ছেঁড়া-ছেঁড়ার ভেতর দিয়ে ডানা মেলে গোলদিঘির দেবদারু নিমগাছেব দিকে মিলিয়ে যায; প্রকৃতির দিঙনির্ণযী মন নড়ে ওঠে যেন। কুহক অনুভব করে মাল্যবান। কিন্তু তবুও অতিপ্রাকৃত নয—কী স্বাভাবিক ভাবে নিবিদ, এই আলো, পাখি, আকাশেব ভাষা।

একদিন সকালে একটা কাক মাল্যবানেব রেলিঙের ওপর এসে বসল। কাকটা ঘুরে বসে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে অনেকবার ডাকার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই গলার ভেতব দিয়ে আওয়াজ বেরল না পাখিটার। গলায হিম লেগে স্বর বসে গেছে। আবাব যে, আওয়াজ ফিরে পাবে পাখিটা হযত তা বোঝে

সূচীপত্রে যান

না। নিজের গলার আওয়াজ হারিয়ে না জানি কী সে ভাবছে। মাল্যবান তাকে একটা বিস্কুটের টুকরো ছুঁড়ে দিল। কাকটা ঘরের ভেতর ঢুকে বিস্কুটের টুকরোটাকরা খাচ্ছে, কাগজপত্রের ভেতর খচখচ করে লাফাচ্ছে। মাল্যবানের ঘরে অনেকক্ষণ রইল কাকটা—কয়েক টুকরো বিস্কুট খেল।

হপ্তা-খানেক পরে বোর্ডিঙের বারান্দায় পায়চারি করতে-করতে মাল্যবান দেখল, গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে একজন ভদ্রলোক বোর্ডিঙের একটা বড় অন্ধকার দুর্গন্ধ কামরায় চুপচাপ বসে আছে। যেমন কামরা, তেমন তার মানুষ—এ দুজনের দিকে তাকালে জীবনের প্রত্যাশা, ভরসা, ভুঁইপটকা হয়ে ফুরিয়ে যায়। মাল্যবান কয়েকদিন দেখল, ভদ্রলোক চুপচাপ বসেই থাকেন শুধু, কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, কিচ্ছু না। মাঝে-মাঝে চশমা এঁটে এক-আধটা বই তুলে নেন, কিন্তু পড়া যে বেশি দূর এগোয়, তা মনে হয় না।

একদিন ভদ্রলোকটির ঘরের ভেতর ঢুকে মাল্যবান বললে, 'কেমন আছেন?

নাকের ডগা থেকে চশমাটা কেমন একটা এলোমেলো টুনটুনির ঠ্যাঙের মত খসিযে নিয়ে, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দুটো চোখ কচলাতে-কচলাতে বললেন ভদ্রলোক, 'আমার শরীর বিশেষ ভাল নেই।'

'কী হয়েছে?'

'এই কদিন থেকেই জ্বর—'

'তা, এ-ঘরে থাকেন কেন—'

'কোথায় থাকব আর?'

পকেট থেকে জড়িবড়ি একটা ন্যাকড়ার নুড়ি বার করে চোখের পিঁচুটি পরিষ্কার করতে-করতে ভদ্রলোকটি বললেন, 'স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই বাসা ছেড়ে দিযেছি—'

'ওঃ!'

'এই মাস-পাঁচেক হল মারা গেছেন; পঁচিশ-তিরিশ বছর এক নাগাড়ে ঘরসংসার করেছি। ছেলেপুলে নেই। এখন আর পোড়োবাড়িতে মন টেকে না। পয়মন্তদের ঘুম দেখতে চলে এলুম তাই-আপনাদের পাঁচজনের।'

মাল্যবানকে শুধোলেন, 'আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন তো?'

'আছেন—আছেন—' মাল্যবান কেঁপে-কেঁপে মন্ত্রপড়ার মত করে বললে।

'বাপের বাড়ি গেছেন বুঝি?'

মাল্যবান একটু থতমত খেযে বারান্দার রেলিঙের দিকে, যেখানে কাকগুলো এসে বসত সেদিকে, কুযাশার যে-শুঁড়িপথের ভেতব দিয়ে গোলদিঘির নিমগাছে উড়ে যেত তাবা সেদিক পানে, তাকিযে রইল।

'বাস্তবিক, আমাদের অবস্থা আপনি বুঝবেন না', ভদ্রলোক কাঁচাপাকা দড়িব ওপর হাত রেখে বললেন, 'কেউ বোঝে না। আমাব স্ত্রী একটা শাদা উলেব গোলা হাতে করে হাসতে-হাসতে চলে গেলেন—'

'উলের পেটি?'

'হ্যাঁ, ভেস্ট বুনছিলেন আমার জন্যে—'

'ওঃ!'

'বুনছিলেন আশ্বিন মাসে—দেশে শীত পড়বার আগে। গেল শীতে গরম জামার অভাবে খুব কুঁদেছিলুম; না, তত বেশি কুঁদি নি বটে, আমি তো ছেলেমানুষ নই, তবে কোঁ-কোঁ করতুম খুব, সত্যিই ভারি শীতকোঁৎকা হযে গিছলুম, টের পেয়েছিলেন উনি। কাজেই এবাবে উলের জামা বানিযে দিচ্ছিলেন—'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমাকে বলেছিলেন যে তোমাকে দুদিনেই ভেস্ট বুনে দোব; বলে দিনরাত 'কুরুচ' কাঁটা চালিয়ে যেতে লাগলেন। একুনে চাবটে হাত, বুঝলেন মশাই, দুহাতে ভেস্ট বোনো, দুহাতে সংসারের ব্যাগার ঠ্যালো, বাটনা-কুটনো রান্না, আমার চানের জন্যে গরম জল, আমার বাতকোমবে তেল মালিশ—ধনেশ পাখির তেল—আমাব নাম বিপিন ঘোষ—'

বিপিনবাবু বললেন, 'সে আব-এক হিষ্ট্রি, আপনাকে পরে বলব কী করে ধনেশ পাখির তেল জোগাড় হল; রাস্তায় যে ফিরি করে বেড়ায়, সে-জিনিস নয়, খাঁটি মাল; এতেও আমার গিন্নিব হাত ছিল-'

'গিন্নি বটে', বিপিন ঘোষের দিকে তাকাতে-তাকাতেই মাল্যবান তার চোখ দুটোকে হোঁৎ করে

কড়িকাঠ ঘুরিয়ে এনে খুব একটা সার্থকতা বোধ করে বললে, 'এখেনে-সেখানে পাঁচি খেঁদি, এর বউ ওর বউ—সব ডাঁটো তোতাপুরি তো। আপনি হাড়েমাসে কিষেণভোগটা পেয়েছিলেন, দাদা, আহা-হা, চলে গেলেন!'

'আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে পেয়েছিলুম', বিপিনবাবুর কাঁচা ঘায়ে খোঁচা লাগলেও নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'চলে গেছেন আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় করে-'

মাল্যবান অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, এ-কথা বলতে গিয়ে বিপিনবাবু একটুও টসকালেন না, কারখানার থেকে শিরা, গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড তৈরি করে এনেছে যেন লোকটা।

'উলের জামা দুদিনেই শেষ করে এনেছিলেন প্রায়—এই এত বড় প্রমাণ সাইজের ভেস্ট, দেখছেন তো আমার কেমন দশাসই চেহারা—'

বিপিন ঘোষ পকেট থেকে এক বাক্স কাঁচি সিগারেট বার করে মাল্যবানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন, স্যার,-'

নিজে একটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ভেস্ট বোনা শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়, আমি তাঁকে সাত-পাঁচ একটু বিশেষ ঘরোয়া আলাপ—মানে, আমিই তাঁকে সেদিনকার রাত্তিরটার জন্যে আগে থেকে বায়না দিয়ে রাখছিলাম; কথায়-কথায় ওঁর কেমন বুননের ঘর ভুল হয়ে গেল—সমস্ত জামাটাকে খুলে ফেলতে হল আবার—'

'আহা!'

'আবার মরিয়া হয়ে আরম্ভ করলেন। তার ওপর রাতে কিছুটা অত্যাচার হল সেই বায়নার কাজে; কাজটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল—প্রায় শেষ রাত অব্দি। রক্তের চাপ বেড়ে গেল খুব। সকালবেলা একটু দেরিতে উঠে রোদে গিয়ে দাঁড়ালেন সেই উল আর 'কুরুচ' কাঁটা নিয়ে। আমি একটা জলচৌকিতে বসেছিলুম মুখোমুখি। আমার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলতে-বলতে, ব্যস, ভিরমি খেয়ে পড়ে গেলেন। তখুনি হয়ে গেল—'

বিপিন ঘোষ আর-কোনো কথা বললেন না। একটা সিগারেট, দুটো সিগারেট, তিনটে সিগারেট শেষ করলেন তিনি। তারপরে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে নিজের গলার কণ্ঠটার ওপর হাত রাখলেন বিপিন ঘোষ। চোখ দুটো অনবরত নাচতে লাগল তাঁর। একটা জহরকোট গায়ে এঁটে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন তার পর।

মাল্যবান অবিশ্যি সেই দিনই অফিস থেকে ফিরে উৎপলার কাছে গেল। গিয়ে বললে, 'না, মেসে আর না।'

'কেন?'

'আমি আজই চলে আসছি।'

'কোথায় থাকবে, শুনি?'

'যে জায়গায় ছিলাম—নীচের তলা—'

'সেখানে জায়গা নেই।'

মাল্যবান বললে, 'এ-বাড়ির কোনো ঘাপটিতে পড়ে থাকবে, সে-জন্যে ভাবতে হবে না—'

'খেপেছ?' উৎপলা একটু মেজাজে-মেজাজে বললে, 'আড়ি পাতবার জায়গা নেই বাড়িতে; তুমি বেশ রঙে আছ খুব যা-হোক। সঙ্কুলান হবে না, তোমার মেসেই থাকতে হবে; ওদের তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না।'

'কিন্তু, এটা তো আমার বাড়ি।'

'তা যদি বলো, তা হলে মেজদাকে নিয়ে আমরা অন্য ফ্লাট ভাড়া করি—'

'না, না, সে-কথা আমি বলছি না—' একটু বলার বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে অনুভব করে মাল্যবান বললে, 'তুমি চলে গেলে এ-বাড়িতে এসে কী হবে আর। সে তো মেসের মতনই হয়!'

একটা কথা বলতে হবে বলে মাল্যবান বললে, 'মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে এক-একদিন রাতে বড় ভরসা হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয়, যদি মরে যাই, তা হলে তোমার সঙ্গে আর-কোনোদিন দেখা—'

উৎপলার মুখের দিকে তাকিয়ে মাল্যবানের জুত লাগল না তেমন; যে-কথাটা পেড়েছিল, সেটা শেষ

করতে গেল না আর, বললে, 'ঐ যা, আমার লাইফ ইনসিয়োরেন্স প্রিমিয়ামগুলো দিয়ে দিয়েছ তো। টাকাকড়ি তো তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম—

'খরচ হয়ে গেছে।'

'খবচ হল! তা হবেই তো, আজকাল তো রাবণের চিতে জ্বলছে কি না এই বাড়িতে।'

'মেজদা বলেছেন, তোমাকে আর-একটা পলিসি নিতে।'

'তা আর হয় না।'

'কেন, বযেস তো তোমার আছে।'

'না, বয়েসের জন্যে নয়।'

'মেজদা বলেছেন, মেডিকেল টেস্টে ঠেকবে না, তিনি পাশ করিয়ে দিতে পারবেন।'

'তিনি এজেন্ট, তাঁর গরজ ঢের', মাল্যবান এঁচড়ে পাকা ছেলের মত একটু ঠাট্টা-অমান্যির হাসি, (মনে হচ্ছিল উৎপলার), ছড়িয়ে বললে। কেমন সেযানাব মত মুখ করে বসে রইল, আসল জাযগায় মাল্যবানকে ধরা যত সহজ মনে করেছিল উৎপলা, তা নয় যেন।

'মেজদার কম্পানিতেই তোমার করা দরকার।'

'তা আমি জানি। করবার সাধ্যি থাকলে করতাম বই-কি। যে-দুটো আছে তা, ল্যাপ্‌স্‌ না কবলেই আমাদের কুলিয়ে যাবে—'

'না, না, করে ফেলো।'

'টাকা নেই!'

'সে আমি বুঝব।'

'তা দেখো। কিন্তু আমি যা বলছিলাম, মেসে থেকে কেমন ঢল শুকিয়ে যায়—এক-একদিন রাতে; বিয়ে করার আগে তো মেসে থাকতাম, কিন্তু এখন পারছি না, কিছুতেই পারছি না। মেসেব বাবুরা বলে, বেশ বনে-জঙ্গলে তো চরছেন দাদা হাতির মত, আবার খেদাব হাতি হবার সাধ!'

'বলে না কি?'

'আমি তো বাড়ির হাতি', মাল্যবান বললে, 'বন দিয়ে আমি কী করব?'

'বল নাকি তুমি? রাজবাড়ির হাতি বল নাকি নিজেকে?'

'বলি, শিববাড়ির হাতি—'

'কেন, শিববাড়ির কেন?'

'ঐ যা মুখে আসে, তাই বলি। আমি কাল মেস থেকে উঠে আসব।'

'মেসে গিয়ে তোমাব শবীর সেবেছে', উৎপলা বললে, 'হুট কবে কিছু করে বসো না। থাকো মেসে কিছুদিন। মেসেই তো বরাবব ছিলে, মেস-মেস ধাত হয়ে গেছে তোমার, ঘর-সংসার মানাচ্ছে না ঠিক। সেদিন আমাব ভাইপো-ভাইঝিদেব জন্যে নীচের ঘবটা গোছাচ্ছিলাম, মেজ বৌঠান বললে, ঘরটাকে শালগ্রামটি মেসের কামবার মতই করে রেখেছে দেখছি—'

'তাই নাকি? তুমি কী বললে?'

'বলব কী আর। বুদ্ধি খরচ করে কথা বলত হলে চুপ করে থাকতে হয়।'

মাল্যবান চারদিকে চোখ পাকিযে তাকালে, একটা ঢেকুর তুলল, গোঁফেব কোনায একটা মোচড় দিয়ে বলল, 'মেজ বৌঠান যা খুশি তা বলুন। আমার স্ত্রী-সন্তান নিযে নিজের মনের ভাবে থাকবাব অধিকার আমার রয়েছে। আমার যা খাসদখল, তা ফেলে মেসে গিয়ে আমি থাকব?'

মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিযে নিযে বললে, 'স্বামীকে কি মেজ বৌঠান মেসে পাঠিয়ে সুখ করছেন?'

উৎপলা ঢিলে খোঁপা খসিযে ফেলে চুলের গোছা হাতে তুলে আঁট করে খোঁপা বাঁধতে-বাঁধতে বললে, 'ওদের তো আর আমাদের মত নয়—'

'হয়েছে, হয়েছে', মাল্যবান শিংশপা রাক্ষসীকে কাছে না পেযে দাঁত দিয়ে কামড়ে চুরুটটাকে সেপাট করতে-করতে বললে, 'পাঁচ রকম দশ রকম, সব রকম জানা আছে আমার। ল্যা-ল্যা করতে-করতে আমি পরের বাড়ি চড়াও করতে যাই না তোমার ভাজের ভাতারের মত। আমার নিজের রকম নিযে আমি নিজের বাড়ি থাকব—শালগ্রাম হব, শিবলিঙ্গ হব—যা খুশি হব— ওদের কী—'

উৎপলা মেজাজ না চড়িয়ে ঠাণ্ডা ভাবেই বললে, 'ঠিক কথাই তো। তবে কালকে হবে না। আট-

সূচীপত্রে যান

দশটা দিন পরে এসো, নীচের ঘরটা তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে—'

শুনে মাল্যবানের মনের গরমটা স্নিগ্ধ হয়ে এল; 'আট-দশদিন পরে?'

'হ্যাঁ।'

'নীচেব ঘরটা খালি করে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে?'

'তা হচ্ছে।'

'কে করছে ব্যবস্থা?'

'আমরাই।'

ব্যবস্থা তো হচ্ছেই তার জন্যে, উৎপলাই ব্যবস্থা করছে, মিছেই চুরুটটাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে সে। লোকসানি চুরুটটাকে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে একটা টাটকা চুরুট বেব করে মাল্যবান বললে, 'আমি ও-সব তেমন মানি-টানি না, তবে তথ্য হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়—'

'কোন জিনিসটা?'

'ঐ যে-আমাদের রাজযোটকে বিয়ে হয়েছিল-তোমার মেজদা ঠোঁট ওল্টালেও তোমার বড়দা-সেজদা খুশি হয়েছিলেন—তোমার বাবা তো খুবই—'

মাল্যবান খুব গনগনে আগুনে বেশ বানিয়ে ফেলল চুরুটটাকে, কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে, চুরুটটাকে বেশ প্যাঁচ মেরে টেনে-টেনে। কড়া গলায় একটু চাপা হাসি হেসে উৎপলা বললে, 'কে? বলেছিল তো পরেশ ঘটক।'

'হ্যাঁ, তিন বাত্তির মাথা ঘামিয়ে তিনি স্থির করেছিলেন।'

'রাজযোটক', উৎপলা ফিক করে হেসে উঠল শঙ্খিনীর মত চনমনে গলায়, 'রাজযোটক—বিযেব ফলাফল ফ্যাকড়া টেঁগড়ি বলো গিয়ে পরেশ ঘটককে তার নির্বন্ধের বাইরে।'

'তুমি পণ্ডিতকে উড়িয়ে দিতে চাও!'

'পাণ্ডিত্য দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই, আমি যা অনুভব করি, তাই বলি।'

'কী করো তুমি—অনুভব?'

'কথা বাড়াতে পারি না', উৎপলা তুষের আগুনে যেন বাতাস লাগিয়ে একটু ধিক-ধিক করে উঠে বললে, 'এখন তোমাকে মেসে থাকতে হবে। আট-দশদিনে নীচেব ঘরটা খালাস করে দেযা যাবে হয়ত, বলেছিলাম; কিন্তু তা হবে বলে মনে হয না, মাস দেড়েক তো লাগবেই।'

উৎপলা এক পাটি সুন্দর দাঁত বের করে হাসবাব মত মুখ করে, তবুও না হেসে, গম্ভীর ভাবেই বললে। দেখতে-দেখতে দাঁতেব পাটি অদৃশ্য হয়ে গেল তার। ঠোঁটের ওপব ঠোঁট মিশ খেযে কঠিন হয়ে বইল খুব আঁট সিঁদুরের কৌটোব মত।

'মেসে কদিন থাকব?'

'যদ্দিন দবকার।'

'মেজদাবা কবে যাবেন?'

'তা আমি কী করে জিজ্ঞেস করব তাঁদের?'

'তাঁদের নিজেদেরও তো একটা বিবেচনা থাকা দবকার।'

উৎপলা মাল্যবানের থেকে কযেক ধাপ ওপবে দাঁড়িয়ে থেকে যেন বললে, 'সেটা কি তুমি তাঁদের শিখিযে দেবে?'

হাতেব চুরুটটার দিকে চোখ পড়ল মাল্যবানেব। চুরুটটা দাঁতে আটকে নিয়ে টানতে লাগল। টেনে-টেনে বেশ ছাই জমেছে যখন চুরুটের মুখে—তখনও, সে কী কববে আব, চুরুটটা টানতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলে মনে পড়ল মাল্যবানের। বিপিন ঘোষের গল্পটা উৎপলাকে বলতে শুরু করল! মুখবন্ধ শুনেই উৎপলা বললে, 'দুধপোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে না?'

'কই, না তো।'

'এই যে, আমি পাচ্ছি।'

'না, না, গল্পটা শোনো, ও, পাশের বাড়িতে দুধ উথলে পড়েছে হযত—'

পাশের বাড়িতে যে, তা টের পেল উৎপলা; নাক আছে তার, কান আছে, আরো নানা রকম সূক্ষ্ম পক্ষীসংস্কার পশু অনুভূতি রয়ে গেছে তার, পাশের বাড়িতে ঠাকুরটা যে হেঁসেল থেকে সরে গিয়ে পানের দোকানে গল্প করছে, তা তো চোখ-কান খাড়া করে টের পেযে নিচ্ছিল সে, তবুও একটা খিচ রয়ে

সূচীপত্রে যান

গিয়েছিল উৎপলার মনে, 'আমাদের দুধ পুড়লে সব্বোনাশ—মেজদার—'

'তোমার উনুনে দুধ নেই। আমি জানি। এই তো হেঁসেল থেকে ঘুরে এলাম, রাঙি ছ্যাঁচড়া রাঁধছে—' মাল্যবান চুরুট নামিয়ে বললে।

উৎপলা তার ঘন কালো চুলের (বেণীর ভেতরে কোনো ট্যাসেল জড়ানো নেই) মস্ত বড় আবদ্ধ খোঁপার ওপর হাত রেখে চাপ দিতে-দিতে বললে, 'না রে বাপু, তোমার বিপিন ঘোষের কেচ্ছা শোনবার সময় নেই আমার। তুমি নিড়বিড়ে বলেই ওসব বিশ্বাস কর। খুব ভোগা দিয়েছে বিপিন ঘোষ; কিছু টাকা খসিয়েছে নিশ্চয়!'

মাল্যবান বিক্ষুব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'টাকা যদি কিছু চাইত আমার কাছে, আমি দিতাম বই-কি। কিন্তু টাকা চাইবার লোক বিপিন ঘোষ! তা নয়। তুমি তার সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারতে। লোকটার বাস্তবিকই সব গেছে। দশ মিনিট বসে পব-পর তিনটে সিগারেট খেল—আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না— তারপর একটু গলায় কণ্ঠায় হাত দিতেই চোখ-মুখ একেবারে, পাঁশগাদাব কুঁকরোটাকে কোথাও দেখতে না-পেয়ে মোচলমানের ধেড়ে মোড়গের মত, ভেঙে পড়ল যেন বিপিন ঘোষের। কোনো কথা না বলে একটা জহরকোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

মাল্যবান বিপিন ঘোষের সঙ্গে একশোযাসে হয়ে গেছে; যেন তারই স্ত্রী মরেছে, ঘর ভেঙে গেছে, কিন্তু তবু তো অন্তর থেকে সহ্য করবার শক্তি শানিয়ে নিতে হচ্ছে তাব, এমনই একটা ভাঙা কাসি জোড়া দেবার মত ভরাট, সাহসিক মুখে উৎপলার দিকে তাকাল তার স্বামী।

'এমন উল্লুকও থাকে, তোমার ঐ বিপিন ঘোষের মত?'

'উল্লুক বললে, উৎপলা?'

'তোমার ট্যাঁক থেকে খসায় নি তো কিছু?'

'কেন খসাবে? তুমি ভেবেছ কী বল তো দিকি—'

'ভোগা দিয়ে খসায় নি তো কিছু তোমাব মতন ঢ্যাপঢেপে মানুষের কাছ থেকে?' উৎপলা চোখে-মুখে চিনি-মিছরির দানা ছড়িয়ে মাল্যবানের কোমরে একবার নিজেব হাতটা জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'ভালই করেছ তা হলে। কিছু লাগবে আমার কাজ। কত আছে সঙ্গে!' মাল্যবানের গলায় একবাব হাতটা জড়িয়ে নিয়ে মিষ্টিমুখে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'যা আছে, তাই দাও।'

মাল্যবান গড়িমসি করতে-করতে বললে, 'দিচ্ছি। কিন্তু আজ আব মেসে ফিবে যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানে একটা রাতের ব্যবস্থা হতে পারে।'

টাকা হাতে নিয়ে উৎপলা বললে, 'খেতে তো পার এখানে এ-বেলা।'

'না, না, খাওয়ার কথা নয়; একটু ঘুমোবাব ব্যবস্থা হতে পাবে?' কোথায শোও তুমি?'

'আমার পঞ্চাশটা টাকার দবকার।'

'আচ্ছা, ধার করে দেব—'

'কবে!'

'কালই। আজ পঁচিশ টাকা দিচ্ছি। কোথায ঘুমোয মনু? আর তুমি?'

পরদিন মাল্যবান এসে বললে, 'ভেবেছিলাম, শিগগিব এদিকে আসব না আর।'

উৎপলা কোনো কথা বলছিল না।

'কই, না এসে পারলাম না তো তবু', মাল্যবান একটা চেয়াব টেনে বসল।

'ওখানে বসলে যে?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'দেখলে, আমি নিরিবিল একটু কাজ করছি।'

শুনে মাল্যবান একটু তাড়া দিয়ে বললে, 'তা কাজ কবো—কাজ করো—আমি তো বাধা দিতে আসি নি। কার জন্যে ব্লাউজ সেলাই করছ?'

সেলাই-এর কলের হাতলটা আলগা মুঠোয ধরে ঘোরাবে কি না ভাবছিল উৎপলা। জামাটাকে কলের সুচে ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে উৎপলা কল চালাতে লাগল।

'সেলাই-এর কল তোমার লক্ষ্মী। কেমন বনবন করে ঘুরছে তোমার হাতে বিষ্ণুর চাকাব মত একেবারে সতীদেহ কেটে ফেলে : বাঃ ! বাঃ!' বললে মাল্যবান; সতীদেহ কেটে ফেলার কথা বলে সুভাষিতই বলেছে মনে হল মাল্যবানের; নিজের মনের বিজ্ঞান-নির্জ্ঞানে যে-অপর উৎপলাকে কাঁধে নিয়ে

ফিরছে, সে টুকরো-টুকরো করে কেটে দিচ্ছে এ-উৎপলাকে।

উৎপলা বেশ কল নিয়ে থাকতে পারে, এস্রাজ-সেতার নিয়েও। 'বড্ড একঘেয়ে লাগে রাতের বেলা মেসে; এস্রাজ শিখে নিলে হত।'

'তুমি বাজাবে এস্রাজ?'

'কেন, হবে না আমার?'

'বলে হরিকাকা কাছা দাও; হরিকাকা বলে, কাছা আমার খসল কোথায় যে দেব—' উৎপলা কল ঘোরাতে-ঘোরাতে ঘুরিয়েই চলল, পট করে সুতো কেটে যাওযায়, একটু থেমে নেড়ে-চেড়ে, বললে, 'না, কাটে নি, ঠিকই আছে।'

'ববিনে সুতো আছে?'

'আছে, ঠিক আছে, হাওড়ার ব্রিজ হয়ে আছে; নাও, সরো—দিক করো না।'

মাল্যবান উৎপলার হাতের চাকা-ঘুরুনির দিকে তাকিযেছিল বটে, কিন্তু মনটা চোত মাসের ফলকাটা তুলোর মত কত শত বাতাসে—শতধা নীলিমায যে উড়ছিল!

'ছেলেরা রাস্তায় সাইকেল হাঁকিযে যায়—বেনেটোলা, নবীন পালের লেন পটলডাঙা, কলেজ স্ট্রিট, কলাবাগান, হাতিবাগান, গোয়াবাগান—চৌরঙ্গির চৌমাথা। ভারি রগড়, কিন্তু এক-একটা জিনিস কিছুতেই শিখতে পারলাম না—বাইক করা, উর্দু বলা, পায়জামা চপ্পল শেরওয়ানি কিংবা সায়েবি স্যুটে পাড়ায়-পাড়ায় ল-ল করে বেড়ানো—'

উৎপলা চুপচাপ কল ঘোরাতে-ঘোরাতে আরো বেশি নিঃশব্দ নিঃসম্পর্ক হয়ে পড়ল।

'কেবানির চাকরি আমাকে জুতিয়ে মারল। ইচ্ছে কবে এই সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটু নিজের ভাবে থাকি, তুমি সেতার বাজাও, আমি শুনি—সাবাটা দিন এই রকম।'

উৎপলা কলের দাঁতের ভেতর থেকে ব্লাউজটাকে বেব করে এনে একবার চোখের সামনে ছড়িযে দিয়েছিল; সেলাই-এর এখনো ঢের বাকি। মাল্যবান যে অনর্গল পাঁচালি পেড়ে চলেছে, সে-দিকে কান না দিলেও অবচেতনার পথ দিয়ে মনের কানে কিছু-কিছু শুনেছিল।

'ধবো, আর কুড়ি-পঁচিশটা বছর তো সামনে রয়েছে। জীবনের একটা বকমারি হবে নাকি এর মধ্যে? কী বলো তুমি, রকমাবি হবে তো বটে? ভাল হবে-সুভালাভালি কেটে যাবে? কী বলো গো?'

'আরো কুড়ি বছর বাঁচবে বলে আশা কব?'

'বেঁচেও তো যেতে পাবি।'

'অত বেশি বেঁচে কী লাভ?' উৎপলা ব্লাউজের দিকে মন রেখে তবুও নিজের কথাব দিকে মন দিয়ে শান্ত ভাবে, 'আমার নিজের কথাও বলছি—জীবনের আমাদেব কী সম্ভব অসম্ভব বুঝলাম তো অনেক দিন বসে; এখন শান্তিতে সরে পড়লেই তো বেশ—'

উৎপলার কথা শুনে মাল্যবান খানিকটা বিবক্ত বিচলিত হল, পকেট থেকে মনেব ভুলে বিড়ি বের কবে জ্বালিয়ে ফেলছিল, প্রায়, কিন্তু স্ত্রীর সুমুখে বিড়ি সে আজকাল খায় না, সিগাবেটও বাব করলে না, বললে, 'বিদায় নিলে আমিই নেব, বেঁচে থেকে তোমার ঢের লাভ আছে। আমি এক-একদিন রাতে মেসের বিছানায় শুযে ভাবি; ভাবি তোমার কথা। বাস্তবিক বেশ পড়তা নেই বটে কি তোমার জীবনে? কত লোকজনেব সোবগোল তোমার ঘবে দিনরাত। তুমি নরকে বসলেও আশেপাশে একশটা নষ্ট চন্দ্র। তোমার মেজদা আর বৌঠান— এঁরা তোমার কাছে থেকে যত সুখী, তুমি নিজে তাব চেয়ে ঢের বেশি সুখী এঁদের পেযে। কী বলো?

মাল্যবান চোখ বুজে কথা বলছিল। চোখ মেলে উৎপলার দিকে তাকাল। কাজ করছিল, কথা বলবার কিংবা মুখ তুলে তাকাবার সময় ছিল না উৎপলার।

'সত্যিই, তোমার জিনিস ছিল ঢের, সদ্ব্যবহারও ছিল—' বলতে-বলতে মাল্যবানের মনে হল নিজের বলিযে মুখটাকে দেখতে পেয়েছে সে; নিজের মুখটাব মুখোমুখি এসে পড়েছে, মুখটা মুখ নেড়ে চলেছে শুধু, উৎপলার হৃদযে প্রতিফলিত হতে গিয়ে প্রতিহত হযে ফিরে এসে কী ভীষণ মুখ নেড়ে চলেছে সে, চিড়িয়াখানার একটা বানবের আকচার ছোলাভাজা চিবোবার মত। এই হল তার কথা বলা? ভাব প্রকাশ করা?

উৎপলা এক মনে কল চালাচ্ছিল। এর যে টনক না নড়ে, তা নয়, কিন্তু অন্য-কোনো যৌন-পরিস্থিতিতে অন্য-কোনো মানুষের সঙ্গে? আচ্ছন্ন সাবস-বকের মত নিজেব বুকের পালকে মুখ গুঁজে

সূচীপত্রে যান

সমাধান খুঁজছিল মাল্যবান, কিন্তু কিছু বের করতে পারল না সে।

বুকের পালক মাংসের ভেতর থেকে মুখটা খসিয়ে এনে যেন মাল্যবান বললে, 'থাক, মৃত্যুর কথা আমরা কেউই না বলি যেন আর। বেঁচে যাক, যতদিন সময় বাঁচিয়ে রাখে। দেখা যাক, কী হয়। ভরসা রাখাই ভাল। আমাকে একটা বাজনা শিখিয়ে দাও না—এই এস্রাজ—'

'হিমাংশুবাবু ভাল এস্রাজ বাজাতে পারেন, তাকে ধরো।'

'তাঁকে ধরব'? আমি কি হিমাংশুবাবুর ঘাড়ে এস্রাজ শিখতে চেয়েছি?'

'কেন,খুব তো সহজ, তিনি তো প্রায়ই আসেন।'

মাল্যবান উৎপলার হাত, পেট্রোলিয়মের গন্ধ, সেলাই-এর কলের ঢাকা, ব্লাউজ তৈরির দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাকিয়ে শেষে বললে, 'নাঃ, বাজাতে কি সবাই পারে, মিছিমিছি বলছিলাম।'

এস্রাজের কথা সে আর তুলতে গেল না। 'মনুর শরীর কেমন দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে দেখলাম! কী হচ্ছে?'

'দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে।' উৎপলা বললে।

'কী খায়?'

'কী জানি।'

'পেটে সয় না হয়ত যা খায়, পেটের রোগ হয়েছে, শুকিয়ে যাচ্ছে তাই। না কি কিছু খেতেই পারে না, ভাল কিছু খেতে পায় না?'

উৎপলা একটা সেলাই-এর বই খুলে কতকগুলো নকশার দিকে মন নিবিষ্ট করছিল, মাল্যবান কী বলছে, না বলছে, তা সে বুঝছে কী না, বোঝা যাচ্ছিল না, কোনো উত্তর দিল না উৎপলা।

'মনুর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'হচ্ছে না কি।'

'আদ্ধেক হয়ে গেছে, টের পাচ্ছ না তুমি?'

'রোগে ধরেছে হয়ত,' উৎপলা বললে, 'হয়ত ওর বাপের মনের রোগে ধরেছে ওকে—'

মাল্যবান তাকিয়ে দেখল সেলাই-এর বইটা ইংরেজি বই নয়—একটা জার্নাল হয়ত; জার্নালের পাতা নেড়েচেড়ে দেখছে উৎপলা। একেবারে ঝুঁকে পড়েছে পত্রিকাটার ওপর। উৎপলা সেলাই-এ এম-এ পাশ করবে, ডক্টরেটও পাবে হয়ত, কিন্তু মনু তো, সুতোশাঁখ সাপ হয়ে যাচ্ছে—কেমন সরু—কী ভীষণ সিটে—মরুগ্ধে। এই হালে চললে মাল্যবান মেসে থাকতে-থাকতেই—এ বাড়ির হালচালের ভেতর মনুকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। কঠিন হবে।

'মনুর লিভাব খাবাপ—সেই পিলগুলো দাও লিভারের?'

'না।'

'কেন।'

'কোথায় হারিয়ে গেছে ওষুধটা।'

'হারিয়ে গেল! তা হলে তো আজই কিনে দিতে হয়।'

'তা দিও।'

মাল্যবান কথাবার্তায় রকম-সকমে একটু নষ্টামির আঁচ ধরতে পেবে বললে, 'মিছিমিছি কিনে কী লাভ—যদি না খাওয়ানো হয়!'

'তাও তো বটে।'

এ-পথ নয়, ও-পথ নয়, ঠিক পথটা ধরা দরকার, অনুভব করে মাল্যবান বললে, 'তুমি তো বলছ এ-বাড়িতে কোনো জায়গা নেই।'

'তাই তো জানি।'

'ছাদে একটা ক্যাম্পখাট ফেলে শুয়ে থাকলে কেমন হয়?'

'তা তুমি নিজে বুঝে দেখো।'

'তোমার কী মত?'

'আমরা বাড়ি দেখছি।'

'কেন?'

'কিছুকাল বাপের বাড়ি থাকব গিয়ে। বড়দা আসছেন কলকাতায়—সেজদা আসছেন।'

বাড়িও দেখা হচ্ছে না, কেউই আসছেন না, জানে মাল্যবান। বিচিত্র জ্ঞানপাপের বোঝাটা পিঠে ফেলে সে উঠে দাঁড়াল। উৎপলা ব্যস্ত হয়ে কল চালাচ্ছিল।

মাল্যবান চলে গেল।

মাল্যবান গোলদিঘিতে গেল। গোলদিঘিতে অনেকক্ষণ ঘুরল। তারপব মেসে এসে গেল।খাওযাদাওযার পর বিছানায় শুতে গিয়ে মাল্যবানের মনে হল মনুর জন্যে পিল কিনে দেওয়া হয নি তো।

রাত কম নয। তখনো দু-একটা ফার্মাসি খোলা ছিল। এক ফাইল লিভারের পিল কিনে নিয়ে উৎপলাকে দেবার জন্য একেবারে ওপরের ঘরে গিয়ে উঠল। গিযে দেখল, মেজদা, মেজ বৌঠান আর উৎপলা তিনজনেই খাওয়াদাওয়ার পর ছাপরখাটের ওপর পা ছড়িয়ে, হাসি-তামাশা দোক্তা-পানের মজলিশ বসিয়ে দিয়েছে। ওষুধের ফাইলটা উৎপলাকে দিয়ে মাল্যবান নীচে নেমে যাচ্ছিল। মেজদা বললে, 'ও জামাই, পালালে যে—ও জামাই!'

মাল্যবান একেবারে নীচের ঘরে নেমে এল। দেখল, ছেলেমেয়েরা সব ঘুমুচ্ছে। মনুব খাটের কাছে এসে দাঁড়াল; ছোট্ট মেযেটার ধঞ্চের কাঠির মত শরীরটা পড়ে আছে—ফুঁ দিলে উড়ে যাবে যেন—এ-শরীরে মাংস লাগবে এসে কোনো প্রক্রিয়ায়—কোনো রকম প্রক্রিযাযই-সেটা সম্ভব বলে মনে হয না; ওষুধে, ভাল জাযগায চেঞ্জে গেলে যে-কাঠামোব শবীর সাবতে পাবে আশা কবা যায, মেয়ের শরীরে সে-কাঠামোটুকুই নেই। হাড়ের মতন নয়—শুকনো সেলাহাকাঠির মত কযেকখানা হাড় আছে শুধু।

মশায খাচ্ছে; বাতাস করে মশারিটা ফেলে দিল মাল্যবান। মনুর বুকের ওপর কম্বলটা টেনে দিল।

মাল্যবানেব মন শুকিয়ে যেতে-যেতে ভরে উঠল—কী জিনিশে? তা কামনা নয়—স্ত্রীলোকের জন্যে পুরুষেব ভালবাসাও নয়; মনুর জন্যেও—তাব এই একমাত্র সন্তানটির জন্যেই একটা নির্বিশেষ পিতৃস্নেহ শুধু নয়, কেমন একটা সর্বাত্মক করুণা এসেছে—মনুর জন্যে, যে-সব ছেলেমেয়েরা এখানে ঘুমিযে আছে, বিপিন ঘোষের স্ত্রী বিপিন ঘোষ, মেজদা, বৌঠান, এমনকি নিজের স্ত্রীর জন্যে। এ-মুহূর্তে কোনো তিক্ততা বিরসতা বোধ করল না। সে, কোনো যৌন আকর্ষণ বা যৌনাতীত গভীর ভালবাসা-নারীকে ভালবাসা—এ-সব স্তর ও ফাঁদ উতবে গিয়ে একটা নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিব্যাপী দযাব উজ্জ্বলতায কযেক মুহূর্তের জন্যে যেন অতিমানুষেব মত হযে উঠল মাল্যবান।

বাস্তায নেমে মাল্যবানেব, মহাপুরুষদের মত, মনে হল ভালবাসা বা কামনা নয, করুণাই মানুষকে সমস্ত সৃষ্টিব অগ্নিকারুকার্যেব ভেতবে আপতিত শিশির-ফোঁটাব মত খচিত কবে বাখে।

প্রেম খুব বড় জিনিস বটে, নটীর প্রেমের চেযে নাবীব প্রেম বড়, নাবীব প্রেমের চেযে বড় সন্তাযেব জন্যে ভালবাসা, পুরাণাপুরুষের জন্যে নিবিড় আকর্ষণ। কিন্তু করুণা? একটা কীট, সেই মড়া বেড়াল-ছানাটা, মনু, বিপিন ঘোষেব স্ত্রী, বিপিনবাবু নিজে, এমন-কি মাল্যবানের নিজেব স্ত্রী—সকলেই তো মাল্যবানের হৃদযের করুণায় অভিষিক্ত হযে পুবাণপুরুষের প্রিযপাত্র হযে উঠবে।

মাল্যবান মেসের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে থমকে দাঁড়িযে বললে, 'ছি-ছি, এ-জন্যে অভিমান জেগেছে না কি আমাব হৃদয়ে? আমার প্রাণে সৃষ্টির বড় করুণা এসেছে বলে অহঙ্কাব বোধ কবছি? না, না, —করুণার সঙ্গে অভিমানের কোনো সম্পর্ক নেই; এই প্রেম নয় তো, এ সব চেয়ে দীনতম জিনিস, তুচ্ছতম। আমি সবচেযে নিকৃষ্টতম—সবচেযে নিকৃষ্টতম—আমি সবাই-এর কৃপাব পাত্র, সকলেই পরমপুরুষের করুণাভাজন, অতএব সকলেই সেই পুরুষেব প্রিযপাত্র—এই যে অনুভাব, এটা করুণা।

কিন্তু মেসের বিছানায শুযে, করুণা, শীতেব বাতের তুলোওঠা গবম লেপেব ভেতর স্খলিত হতে-হতে যখন নারীপ্রেম নাগবীপ্রেম, এমন-কি, গ্রন্থি-মাংসে গিয়ে, আঘাত করতে লাগল, তখন মাল্যবান পাড়াগাঁযে ছেলেবেলার কত ছোলাব খেত, বড় দিঘি, চাঁচেব বেড়ার ঘর, শীতের রাতে পোযালের গবম খড়ের গাদি, ফোড়নের মত চাবদিকে শিশিব ভেজা মাঠ, পেঁচাব পাখাব খসখসানি, দূবে সুভাবনীযতম কাল পাখির ডাক—সমযের ভাঁড়ার ভেঙে-ভেঙে মাল্যবান, বাব করতে লাগল এই সব। মিনিট দশ-পনের পরে মনে হল মাল্যবানের অনেক মুখের হামলা, অনেক ঝামেলা, কী ভীষণ ওতপ্রোত ভাব—কী হট্টগোল!

আরো কয়েক মিনিট পরেঃ যদিও আব-কযেকটি মুখের দাবিও কম নয, তবুও আজকেব নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজনের জন্যে নেহাতই আকস্মিক ঘটনার মত একটি মুখ বযে গেল তার বুকের ভেতর; সে

মুখ তার স্ত্রীর নয়।

রাত তিনটের সময় মেসের চৌবাচ্চার থেকে ফিরে এসে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাল্যবান ভাবছিলঃ তার জীবনের সারাৎসার মহূর্তে তার স্ত্রী কোনো কাজে লাগে না।

মেজদারা যতদিন রইলেন শরীর ও মনের নানা রকম অরুচি ও অস্বস্তি নিয়ে মাল্যবানকে মেসে থাকতেই হল।

এই রকম করে সাত মাস কেটে গেল। তারপর মেজদারা চলে গেলেন। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসেও মাল্যবান বিশেষ সুবিধে পেল না এবার আর। কোনো ওষুধপথ্য কিছুই গায়ে লাগে না, মনুর শরীর দিনের পর দিন কেমন যে হয়ে যাচ্ছে—এ কথা ভেবে মাঝে-মাঝে দাম্পত্যজীবনের অমৃত্ত যে বিষফল, কিংবা বিষফল নয় বঁইচির ফল; বঁইচির ফল—তা যে বিষফল নয় কিংবা বিষফল, এ ধোঁকাটা ভুলে যেতে হয়; প্রণয় আশঙ্কার চেযে দয়া জিনিসটাকে ঢের বড় বলে মনে হয় আবার।

অমরেশ বলে একটি মানুষ—মধ্যবিত্ত, বা হয়ত আর একটু ওপরের সমাজের—প্রায়ই আসছিল উৎপলার কাছে আজকাল। অমরেশের বঙ ফর্শা বলতে পারা যায় না—লম্বা চেহাবায ঠাট আছে বেশ, মনের উৎকর্ষ তাব শরীরের প্রতিভার মত অতটা চোখে না পড়লেও সাংসারিক বুদ্ধিতে সে কৃতীকুশল—প্রায় সিদ্ধির স্তরে পৌছেছে। বযস পঁযত্রিশ-ছত্রিশ বছর হবে। বিযে কবেছে আট-দশটা বছর হল-তিনটি ছেলেপুলে আছে। উৎপলার সঙ্গে কবে, কোথায তাব পরিচয হযেছিল—হয়ত এখানেই এখনই প্রথম পরিচয, জানা নেই মাল্যবানেব কিছু। অমরেশ ও উৎপলা দুজনে মিলে অনেকটা সময গান-বাজনা নিযে থাকে—দুজনের মেলামেশা শালীন স্বাভাবিক কি না এই বিতর্কে অফিসে বাসায অনেকটা সময মাল্যবানের মন অভিভূত হযে থাকে—মনুর কথা ভুলে যায সে—দযা জিনিসটাকে ঢের অকিঞ্চিৎকব বলে মনে হয। এই রকম ভাবে দিন কাটছিল। মনু আকজাল নীচের ঘরে মাল্যবানের সঙ্গেই শোয়। অমরেশ সাইকেলে চড়ে আসে। সাইকেলটা নীচে রেখে ওপরে চলে যায; রাত নটা-সাড়ে নটা-দশটাব সময বেরিযে যায। তার পর মাল্যবান ওপরে খেতে যায। দিযে দেখে, উৎপলা এমনই নিজের ভাবে বিভোব হযে আছে যে কথা বলে তাকে বাধা দিতে ভয কবে। খেতে-খেতে মাল্যবান ভাবে, উৎপলার অন্য-সমস্ত চেনা-পরিচিত লোকের চেয়ে এই অমবেশে ঢেব আলাদা জীবঃ অন্য সবাই যেখানে হাতছেড়ে, ঘাঁৎঘোঁৎ খুঁজে ফিরেছে, অমরেশ সেখানে টিক 'শাদাওযালা পিলাগে'র ওপব হাত বেখেছে পাকা মিস্ত্রির মত।

ভাবতে-ভাবতে থালার ভাতগুলো নোংরা কড়কড়ে শুকনো চিড়েব মত মনে হয় যেন মাল্যবানের; ইটেব কুচির মত চিড়ে খেতে হবে ডাল দিযে মাছেব ঝোল দিযে; সব মিলেমিশে সুরকি হযে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও কী যেন কিসের একটা ভযে—কাকে ভয, কেন ভয ঠিক উপলব্ধি কবতে পাবে না সে, সে—আস্তে-আস্তে চিবুতে-চিবুতে নিঃশব্দে গলাব ভেতব দিযে চালিযে নেয সব। কিন্তু তবুও অমবেশ সম্বন্ধে একটা কথাও স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস কবতে ভরসা পায না মাল্যবান।

বুঝতে পারল, নিজের মনটা তাব স্বাতীব শিশিব হলেও শরীরটা তার শুক্তি নয়, কিন্তু শামুক-গুগলির মত ক্লেদাক্ত জিনিস। শরীরটার খাঁজে-খাঁজে যে বযেছে মাংস—মাংসপিণ্ড, সেগুলোকে অনুভব করে মাল্যবান। একটা অদ্ভুত গলগণ্ডের মতন যেন শবীর—তাব মন এক চিমটে সমযেব কিনার থেকে দুদিনের জন্যে ঝুলে আছে এই সৃষ্টির ভেতবে।

মনু খাচ্ছে; কিন্তু খেতে-খেতেই টেবিলে মাথা বেখে ঘুমিযে পড়েছে। মুনকে জাগিযে দেবে কি না ভাবছিল মাল্যবান, না উৎপলা মনুকে কানে ধবে ঘুমের মিথ্যের থেকে ঘরের সংসারের গুমোট মিথ্যের ভেতর জাগিয়ে দেবে?

মনু ঘুমিযে আছে, কেউ তার দিকে নজর দিচ্ছে না।

অপরূপ চিত্রিনী যেন আজ শঙ্খিনী হযে উঠেছে—টেবিলের এক কিনাবে বসে—খাচ্ছে না কিছু উৎপলা; চিনে মাটির ডিশ একটা সামনে রযেছে, তার, কিন্তু তাতে ভাত নেই, চোখ তার ছাদের ওপারে অনেকখানি খোলা পৃথিবীর দিকে ফেলাতে পারত সে, কিন্তু ছাদের দিকে পিঠ রেখে দেয়ালের পানে তাকিয়ে আছে সে—কিন্তু তবুও দৃষ্টি তার অনেক দূরে চলে গেছে—মাঝখানে দেয়ালটা কোনো বাধা নয়—চোখে তার ব্যথা নেই—উদ্দীপ্তিও নেই কিছু—আছে, কেমন আলোর প্রতিফলনের থেকে টের

পাওয়া যায় যে—আলোর উৎসকে, সে-সবের আসা-যাওয়ার মত একটা ঠাণ্ডা নিঃশব্দ ভাবনাময়তা; মনের এ-রকম আশ্চর্য পরিণতির ভেতর নিশ্চুপ হয়ে থাকতে উৎপলাকে তো দেখে নি কোনোদিন মাল্যবান। এ কি ভাল, না মন্দ?

এর মানে কী?

'তুমি খাবে না, উৎপলা?' মাল্যবান গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে।' 'তুমি খাবে না?' এবার একটু জোরে বলতে হল তাকে।

ঈষৎ নড়ে উঠে উৎপলা বসবার ভঙ্গি একটু ঠিক করে নিতে গেল। সে কী ভাবে বসেছিল? ধরনটা তো ঠিক এই মুহূর্তের উপযুক্ত নয়। ঘণ্টাখানেক আগে এ-রকম ভাবে বসলেও চলত; কিন্তু এখন তো এ-রকম ভঙ্গি চলে না। তা ছাড়া শাড়িটা কোমরে কেমন ঢিলে হয়ে আছে—খুবই ঢিলে—একেবারেই খুলে গেছে তো—উৎপলা দাঁড়াতে গেলেই সমস্ত শাড়িটাই খসে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়বে।

'এখন কটা রাত?'

'বেশ রাত হয়েছে, দশটার কম তো নয়।' মাল্যবান বললে।

'আজ খেতে দেরি হয়ে গেল।'

'না, এমন কিছু নয়, আমাব খিদে ছিল না।'

'শীতের রাত-দশটা কম নয় তো।'

'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? এতক্ষণ? কে?' আস্তে-আস্তে একটার-পব একটা প্রশ্ন পেড়ে উত্তবের জন্যে থেমে রইল মাল্যবান।

'ও একজন লোক।' উৎপলা কোমবে হাত দিয়ে শাড়ি ঠিক করে নিচ্ছিল।

মাল্যবান না দেখল যে তা নয়, খানিকটা রাতের ঠাণ্ডা টেনে নিতে-নিতে দেখল আব-একবাব; উৎপলা দেখল যে মাল্যবান দেখল; মাল্যবানের টনটনে জ্ঞান নেই, বৌ তা জানে; কিন্তু তবু মাজার কাপড় আঁটসাট করে নিতে-নিতে উৎপলাব মনে হল; মানুষটা তো ঘোড়েল কম নয়, আমার দিকে নজর পড়েছে তাব; কিন্তু আমি কী করেছি, আমি তো কিছু কবি নি।

'ও একজন লোক যে, তা তো আমিও দেখেছি—'

'তবে আর কী—দেখেই তো ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, যখন ওপরে উঠছিল, দেখেছিলাম মানুষটিকে। নীচে সাইকেল রেখে গেল।'

'তাব পব?'

'আমি ওকে চিনি না তো। এ-বাড়িতে দেখি নি কোনোদিক এব আগে।' উৎপলা নিজেব ডিশেব ওপব খানিকটা জল ছিটিযে হাত বুলিযে নিযে দু-চামচে ভাত রেখে বললে, 'আমাব কাছে যারা আসে, সকলকেই কি তুমি চেন?'

'অল্পবিস্তর মুখচেনা হয়ে গেছে।'

'কাবা আসে বলো তো?'

'তাদের নাম বলতে পারব না, তবে রাস্তায় দেখা হলে ভুল হবে না।'

'চেনা আছে বুঝি সকলের—'

'তা আছে,' মাল্যবান আসল কথার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কিন্তু, এ কে?' ভাতেব সঙ্গে অল্প মাখন মেখে নিযে একটু নুন আর কাঁচা লঙ্কা ঘষতে-ঘষতে উৎপলা বললে, 'কী উদ্দেশ্য নিয়ে আসে তারা?'

'তা আমি কী করে বলব। সেটা তোমাব নিজের নির্বন্ধেব কথা। সেখানে তো আমি হাত দিতে যাই নি কোনোদিন।'

'উৎপলা কাঁচা লঙ্কার বিচিগুলো বেছে বেছে ফেলে দিচ্ছিল, বললে, 'ভালই করেছ, কিন্তু আজ হাত বাড়াচ্ছ কেন?'

'মনু ঘুমিযে পড়ছে।'

'তা তো দেখছি।'

'জাগিয়ে দেব?'

'এখন না।'

'ভাতগুলো তো চিঁড়ের মত।'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কড়কড়ে লাগছে তাই।'

'ঠাকুর এ-রকম বেলাবেলিই রেঁধে চলে যায় কেন?'

'শীতের রাত, কতক্ষণ বসে থাকবে; হাতের আবো দু-পাঁচটে কাজ সেবে বাড়ি যেতে চায়—সেই চেতলায়—' বলতে-বলতে খেতে আরম্ভ করল উৎপলা এবাব; কাঁচার লঙ্কার কিছু-কিছু বিচি আছে এখনও ভাতের ভেতর; অনেকগুলোই সে বেছে ফেলে দিয়েছে।

'আমি অবিশ্যি বসিয়ে রাখি নি তাকে।'

'আমি তোমাকে বলি নি তো যে তুমি দায়ী—'

মাল্যবানের মনে হল উৎপলার কথাবার্তায় আগের সেই খড়খড়ে ভাবটা কেটে গেছে যেন, কথা স্বাভাবিক, গলা নরম, আলাপচারির তাৎপর্যে মমতা না থাকলেও ভাবগ্রহণ আছে, আছে ষত্ব-ণত্বের চেতনা—মাল্যবানের সৌকর্যের জন্যে।

পরদিনও সন্ধেব সময অমবেশ এল। অমরেশ তাব সাইকেলটা মাল্যবানের ঘবেব এক কোনায তালা মেরে আটকে রেখে গেল। মাল্যবান অফিস থেকে ফিবে বিছানায শুযেছিল। তাব দিকে একবার ফিরে তাকিযে অমরেশ বললে, 'কী কবছেন আপনি?'

'শুয়ে আছি।'

'অফিস থেকে এলেন?'

'এই এলুম।'

'আপনার স্ত্রী আছেন?'

'হ্যাঁ, ওপরেই আছে উৎপলা।'

অমরেশ ওপরে চলে গেল। মাল্যবান ঘরের বাতি নিভিযে দিল। কিন্তু বাইবেব একটা আলো ঘবের ভেতর ঠিকরে পড়ছে, অমবেশের সাইকেলটা ঝিকিঝিক কবে উঠছে তাই। যখনই সাত-পাঁচ ভাবে মাল্যবান—অন্ধকাবের ভেতর চলে যায; সুফলা ফলার মত অন্ধকাবটা কেটে সাইকেলটা ঝলসে ওঠে আবাব; মাল্যবানের মনে হল এ হচ্ছে উপচেতনাব সঙ্গে চেতনাব ঝগড়া, অবচেতনা ঘুমের দিকে টানে—মৃত্যুর দিকে; চেতনা অবহিত হতে বলে, ঢেলে সাজাতে বলে; আচ্ছা ঢেলেই সাজাবে সে।

চা খাওয়া হয নি তো। চা খাবে কি? ঠাকুব এসে জিজ্ঞেস কবে গিযেছিল বাবু চা-জলখাবাব খাবেন কি না—তাকে না করে দিয়েছে মাল্যবান।

গোলদিঘিতে যাবে কি? না, কই যাওযা হচ্ছে কোথায? মাল্যবান শুযেই ছিল। ওপবে এক-আধটা গান হযে গেছে। এস্রাজও বেজে গেছে কিছুটা সময। গান সহজে আসে—শীতের শেষে পাতা যেমন আসে শিমুলেব, জারুল-পিয়ালেব ডালে—ছেলেটিব গলায; খুব স্বাভাবিক ভাবে খুব ভাল গাইতে পারে সে; কোনো এক জাযগায গিযে তার পব ব্যক্তিত্বের দিব্য স্পষ্টতা আছে ছেলেটিব (ছেলেটি কেন বলছে অমরেশকে সে? চেহারায সকালবেলাব সবসতা এখনও খানিকটা লেগে আছে বলে?)—সে কি স্বরকৌশলের সিদ্ধি শুধু? আন্তবিকতা? আত্মা? বুঝতে পারছিল না মাল্যবান। অমবেশেব চেযে ভাল গান শুনেছে সে অবিশ্য, কিন্তু এটাও আঘাত কবে এসে—দুবকম ভাবে যদিও—শিল্প-শেফালির আঘাতটাই তবুও নিবিড়তর যেন। এস্রাজ বাজাল কি উৎপলা? তার পব এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা চুপ মেবে আছে সব—উপরে কোনো লোকজন আছে বলেই তো মনে হয না। সাইলেকটা খুব বেশি ঝিকচিক চিকঝিক করছে; এবং মালিকও আঁশটে দুধবাজেব মত ঝিকিযে উঠছে দোতলাব ঘবে? সাইকেলেব তালা খসিযে রাস্তায নামিযে প্যাডেল ঘুরিযে ছুটে যেতে ইচ্ছে কবে মাল্যবানের—এর মালিক যেমন সন্ধে না হতেই দিকবিদিক জ্ঞান হারিযে বত্রিশ নম্বর বাড়িতেই উপস্থিত হয তবু—ছাযা যেমন সাবা দিন দেহের আগে-পিছে ছুটে নাগাল পায না, বাতে অন্ধকারে শবীরেব সঙ্গে বিনিঃশেষে মিশে যায তবু, তেমনি ভাবে এসে পড়ে অমবেশ; তেমনি ভাবে কোনো বত্রিশ, বত্রিশশ, বত্রিশশ—অনন্তের দিগন্তে চলে যাবে না কি মাল্যবান।

বত্রিশশ-অনন্তেব দিগন্তে না গিযে শেষ পর্যন্ত গোলদিঘিতে বেড়াতে গেল; বেড়িয়ে যখন ফিরছে তখন প্রায সাড়ে-নটা—এসে দেখে অমবেশেব সাইকেল তখনো দেযালে কাত হযে রযেছে।

'বাবু, আপনাকে ভাত এনে দিই?'

'কেন?'

'মা দিতে বলছেন।'

'দাও।' মাল্যবান ঠাকুরকে বললে।

ভাত খেয়ে নিজের ঘরের ভেতর অনেকক্ষণ পায়চারি করল সে, কিন্তু সাইকেল গেল না।

মনু বিছানার একপাশে ঘুমিয়ে আছে। মাল্যবান ঘড়িতে দেখল প্রায় এগারটা বেজেছে; ওপরে গানবাজনা এক-আধবার দু-চার মিনিটের জন্যে তড়পে উঠে অতলে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে যেন।

মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে বিছানায় এসে বসল। ঢং করে একটা শব্দ হল, পাশের বাড়ির ঘড়িতে সাড়ে এগারটা। এই বারে হয়ত ছেলেটি নেমে চলে যাবে। —কিন্তু, কই, নামল না তো সে। মাল্যবান ভাবল, গান-বাজনা আবার শুরু হবে হয়ত। কিন্তু, তাও তো হল না। যতক্ষণ গান সবোদ হাসিতামাশা চলছিল অন্ধকারে ঢিল মেরে নিজেকে তবুও খানিকটা ব্যস্ত রাখা চলে। কিন্তু সব থেমে গেছে তো এখন—বেশি রাত, বেশি অন্ধকার, বেশি শীতঃ এখন কী? কী হচ্ছে এখন? যা হচ্ছে, তা হচ্ছে; মনের হেঁয়ালির কাছে মার খেয়ে কোন লাভ নেই। মনটাকে সে খুব হালকা করে নিল; যেন খুব মজাই হয়েছে ওপরের ঘরে, মনে করে হাসতে লাগল সে; সাইলেটাকে মনে হল অমরেশের নেপালি বয়ের মত, সাইকেলের ঝিকমিকানিটাকে ভোজালির ঝলসানির মত; কোমরে ভোজালি গুঁজে অমরেশের নেপালি চাকরটা যেন বেশি রাতের নিবেট শীতে থুপি বুড়ির মত বসে আছে, মনিব ওপরের থেকে না নামলে রক্ষা নেই তার, কিছু নেই; কিন্তু তবুও একটা আশ্চর্য প্রতীকের মত যেন এই নেপালি, এই বোকা নেপালি ভোজালি—আজকের পৃথিবীর। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক, মানুষ-মানুষে সম্পর্ক, মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধ, সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলেছে—সফলতাও সরলতাও; হারিয়ে ফেলেছে সরসতা; আজকের বিমূঢ় পৃথিবীতে সমস্ত পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক-গ্রন্থিকে ছেদ করে অপরিমিত গণ্ডমূর্খের অপরিময়ে মনোবল পথ কেটে চলেছে একটা বোকা নেপালি ভোজালির মত। সময়কে প্রকৃতিকে পুরাণপুরুষকে (যদি থেকে থাকে কেউ) তবে কী হিসেবে ধ্যান করা যাবে আজ? প্রভু হিসেবে? সখা হিসেবে? পত্নী হিসেবে? না, তা নয়। স্বামী স্ত্রী বা সখা ভাবে নয়, সাধা হবে নেপালি ভোজালি ভাবে; ঘুম আসছে না মাল্যবানের।

মাল্যবানের নিজের দোষ নয়; ঘুমেরও দোষ নয়; এই পৃথিবীরই দোষ, শতাব্দীর দোষ; কিন্তু তবুও রাত তিনটের সময় জেগে উঠল যখন সে, তা হলে ঘুমিয়ে পড়েছিল কোনো এক সময়।

সাইকেলটা নেই।

রাস্তার দিকের খোলা দরজা দিয়ে হু-হু করে শীত আসছে। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল মাল্যবান।

পরের দিন সন্ধেরাতেই বেরিয়ে ফিরে মাল্যবান ঠাকুরের কাছে শুনল যে অমরেশবাবু ওপরে বৌঠাকরুনের ঘরে ঢুকেছেন।

মাল্যবান খেল-দেল, খবরের কাগজ পড়ল, চুরুট টানল; তার পর কথা ভাবল সে; ভাবতে-ভাবতে কথাই ভাবল দু-তিন ঘণ্টা।

রাত বারটার সময় অমরেশ নীচে নেমে এল।

'আপনি এখনও জেগে আছেন চাঁদমোহনবাবু—' মাল্যবানকে একটা হ্যাঁচকা ডাক দিয়ে লেপের নীচে আড়ষ্ট অবস্থার থেকে জাগিয়ে তুলে বললে, অমরেশ। মাল্যবানের নাম চাঁদমোহন নয় তো। অমরেশ একটু জিভ নেড়ে লাট মারতে চাইছে নামটা নিয়ে, সেই নামে মাল্যবানকে ডেকে। তা হোক। মাল্যবান মুখের থেকে লেপ সরিয়ে নিয়ে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়ছিলুম।'

'তার পর?' সাইকেলের তালা খুলতে-খুলতে অমরেশ বললে।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আহিরিটোলা'।

'এত রাতে?'

'আহিরিটোলার গঙ্গায় নামেত হবে।'

'এত রাতে?'

'সাঁতার কাটব।'

মাল্যবান এবার আর-কিছু বললে, না। বালিশে শিরদাঁড়াটা ঠেস দিয়ে একটু উঁচু হয়ে বসল।

'সে আমাদের একটা দঙ্গল আছে। চার হাত পায়ে নিমকের বস্তার মত ভুশ করে পড়ে এক-একটা

সাঁতারু মুনিষ আহিরিটোলায় গঙ্গায়।'

'মুনিষ' কেন বললে অমরেশ 'মানুষ' না বলে ভাবতে-ভাবতে মাল্যবান বললে, 'এত রাতে গঙ্গায় নাওয়া হবে?'

'নাওয়া না, মশাই। গঙ্গামৃত্তিকার তেলক কাটবার জন্যে আমদের জন্ম হয় নি, দাদা। সাঁতার—দেখি কে কত দূব যেতে পাবে, কার আগে যেতে পারে—'

'ওঃ,' মাল্যবান বললে।

ছেলেটি সাইকেলটি খুলে রেখে মাল্যবানের টেবিলে এক কিনারে বসল।

'চেয়ারে বসুন।'

'এই বেশ বসেছি। আমাদেব সাঁতাব দেখতে যাবেন, চাঁদমোহনবাবু?'

'এখন? এত রাতে?'

'আচ্ছা, বেশ, বুড়োমানুষ আপনি, তা হলে বারুণী স্নানের সময় যাবেন। যখন গরম পড়ে যাবে।'

মাল্যবান বললে, 'কিন্তু, সত্যিই কি আহিবিটোলাব ঘাটে সাঁতার কাটা হবে আজ?'

'কী বলছি তবে আপনাকে। মেয়েরা অব্দি দেখতে যাবে—'নিজের ডান পায়েব কড়া পালিশের নিউকাট উঁচিয়ে নিয়ে অমবেশ বললে, 'এই ভগবতীর চামড়া ছুঁয়ে বলছি ভদ্দবলোকের মেয়েরা যাবে সব দল বেঁধে আমাদের খেলা দেখতে, বেশ্যেবা যাবে, ওদিককাব পাড়ায-পাড়ায যেখানে যত বেশ্যে আছে—'

মাল্যবান চুরুট জ্বালাল।

'বাঁড়েদেব সঙ্গে ভদ্রঘবেব মেয়েদেব কোনো হামলা হবে না, সাব্, কেউ কাউকে দূব-দূর বলে তাড়িয়ে দেবে না। এরাও যে মানুষ, ওবাও তা অকপটে স্বীকার করবে, সার্।'

মাল্যবান অবাক হয়ে ভাবছিল, এই সেই অমরেশ? একে নিয়ে উৎপলার বাত বাবটা বাজে? থুতু না ছিটোলেও—কথা বলতে-বলতে জিভে-দাঁতে থুতু জমে যায যাদের—সত্যি-সত্যি না অবিশ্যি, রূপক হিসেবে—সেই রকমই অসার, অবুদ্ধিমান, উচ্ছ্বাসসর্বস্ব তো এই ছেলেটি, চেহাবা লম্বা; গড়নপেটন ভাল; মুখ সুন্দর পুরুষ মানুষের মত; এ সব বলে, ভুশি, হীবে হয়ে গেল উৎপলার কাছে। তাই তো হয়। সৃষ্টিটা সংখ্যানবিশ বটে কিন্তু হিসেবতন্ত্রী নয়, কী রকম মাবাত্মক ভুল বিষেব মতন মিশে বয়েছে নিখিলেব বক্তেব ভেতব, তাব নিরবচ্ছিন্ন মন্ত্রণাব প্রবাহেব মধ্যে!

'কিন্তু, স্বীকার কবলেই তো শধু হবে না,' মাল্যবান বললে, 'ওদেব মানুষ কববার পথ বাতলে দিতে হবে তো।'

'সে একটা মস্ত সামাজিক সমস্যাব কথা হল—'

মাল্যবান চুরুট টানতে-টানতে বললে, 'সবই সব হল। তা বটে, সাঁতাব কাটা দেখতে গিয়ে কি আর সামাজিক হেঁযালি মেটে। তবে হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন বেশ একটু ভ্রাতৃপ্রেম—ভগ্নীপ্রেম—ভাইব্রাদাবি—কিন্তু ওদেব তো ঢেব খাবাপ বোগ আছে।'

'আছে বটে, কিন্তু মেযেবা তো মেয়েদেব বোগ দিতে পাবে না। খুব হৃদ্যতাব সঙ্গেই মেলামেশা, কিন্তু মেয়েরা তো পুরুষ নয—'

'মাল্যবান মুখের দিকে চুরুটটা নামিয়ে কিছুক্ষণ চর্মচক্ষে এবং মনশ্চক্ষে—চাব চোখ মিলিয়ে নিয়ে অমরেশের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পর বললে, 'ওখানে ছোকরাদেব দলও তো বেশ ভারি।

'তাদের ভেতর দু-কানকাটা খুব কম।'

শুনে মাল্যবান ঘাড় বাঁকাল; ঘাড় সোজা কবে চুরুট টেনে-টেনে ঘাড় বাঁকিয়ে অমরেশেব দিকে তাকাল একবার। কিন্তু যে-কথাটি বলবে ভেবেছিলে তা বললে না, বাজে কথা পেড়ে মাল্যবান বললে, 'এত ঠাণ্ডায সাঁতাব কেটে নিমোনিয়া হবে না তো।'

'হবে—সেরে যাবে। না হয় মরে যাবে।'

'আরে কী বলে! মরে যাবার কী আছে! তা, আমার স্ত্রীকে কী করে চিনলেন?' মাল্যবান বেড়ালের থেকে চিতে বাঘ, চিতে বাঘ থেকে বেড়াল সত্তায় আসা-যাওযা করতে-করতে বললে।

'এখন চলি, মাল্যবানবাবু, বাত হয়ে গেছে।'

মাল্যবান চুরুটটা নিভে গিয়েছে টের পেল। দেশলটাই জ্বালিয়ে চুরুট ধরিয়ে মাল্যবান একটা বড় হুড়াড়েব ছানার মত হঠাৎ উজিয়ে উঠে বললে, 'স্যাইকেল এনে সটান যে ওপরে চলে গেলেন, আমার

সূচীপত্রে যান

স্ত্রীর সঙ্গে কবে কোথায় পরিচয় ছিল আপনার, বলবেন না?'

খুব সোজা কথা জিজ্ঞেস করেছে মাল্যবান, সহজ উত্তর, এক্ষুনি স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর না দিতে পারে যে অমরেশ তা নয়, কিন্তু তবুও সে বললে, 'আমি আরও তো আসব আপনাদের এখানে। আর-একদিন না হয় বলব।' অমরেশ ওভাবকোটেব পকেট থেকে সিগারেটের টিন বাব করল। একটা সিগারেট জ্বালিযে নিয়ে বললে, 'সেই যে সামাজিক সমস্যাব কথা বলছিলেন, সেটার বিশেষ কিছুই কবা যাবে না আমাদের সকলের আর্থিক জীবনের সুবিধে না এলে। এদিক দিয়েই প্রথমে চেষ্টা করা দরকার। অবিশ্যি সমাজভাবনা সম্বন্ধে অন্ধ থাকলে চলবে না।'

মাল্যবান নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির নীচে অমবেশের কথাগুলো পুরনো নোংরা খবরের কাগজের মত চেপে বেখে দিয়ে বললে, 'আপনি নিজে তো খুব সচ্ছল—'

আপনাব স্ত্রীও তো খুব। দেখছি তো।' বলে অমবেশ যেন কোনো ইঙ্গিত করে নি, কোনো খাবাপ ইঙ্গিত করেই নি এমনই স্নিগ্ধ নির্দোষভাবে হাসল। কিন্তু হাসিটা কেটে গেল, অমবেশেব মুখের চেহাবা হল আবেক বকম যেন; অনুধাবন কবে অস্পষ্টতাব ভেতব থেকে তবুও কোনো স্পষ্টতা খুঁজে পেল না মাল্যবান, হাতেব চুরুটেব আগুন অঙ্গাবেব দিকে তাকিয়ে বইল। ঘবটা নিস্তব্ধ হয়েছিল। দুজনের চুরুট, সিগারেটের ধোঁযা, পবস্পরকে কাটাকাটি কবে কথা বলছিল শুধু।

'আমাব স্ত্রীটি তৃতীয পক্ষেব, আমার চেহাবা দেখে তা মনে হয, মাল্যবানবাবু?'

অমরেশ বললে, 'প্রথম পক্ষের স্ত্রীটি এখনো আছে, বাপের বাড়িতে থাকে, আমি তাকে নিযে ঘর করব না। দু-নম্ববেব কাত্যাযনী মরে গেছে। এই তিন নম্বব। এ স্ত্রীর ছেলেপুলে তিনটি। আব-একটি এই মাঘে হচ্ছে।'

মাল্যবানেব মনে হল অমরেশেব গলার সুব, শবীবের বাঁধ, সমস্ত অন্তবাত্মার থেকেই কেমন—একটা সুদৃঢ়, (কিন্তু) সুলভ আত্মতুষ্টি চুঁইযে পড়ছে। আজকালকাব এই শিশ্নোদবতন্ত্রী এবং যা শিশ্নোদব নয কিন্তু তবুও উচ্ছৃঙ্খল—এই সব মূল্যবিশৃঙ্খলাব পৃথিবীতে অমরেশেব এই কথাগুলো বেশ স্বাভাবিক; স্বাভাবিক অতএব ভাল? ভাল না মন্দ? সে নিজে কী বকম? মাল্যবান নিজের চুরুটেব ছাইচাপা আগুনেব এক-আধটা কণিকার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। মূল্যবিশৃঙ্খলা? বিশৃঙ্খলবা একেই শৃঙ্খলা মনে কবে। মূল্যশৃঙ্খলা কী? কী জিনিস মাল্যবানেব মতে? সে নিজে যদি মূল্যশৃঙ্খলা চায, তা হলে তার নিজেব বাড়িতেই সে জিনিস এ-বকম সুসদৃশ ভাবে অনুপস্থিত?

'বাত তো কম হয নি।'

'বাবটা বেজে গেছে।' অমবেশ বললে।

'শীতেব রাত বাবটা...আমাব স্ত্রীব কাছে কী দবকাব ছিল আপনাব?'

'কথা বলতে-বলতে বাত তো হবেই—'

'দেখছি তো হচ্ছে। এতদিন তো আপনাকে দেখি নি ওখানে।'

সিগারেটেব ধোঁযা ছাড়াব ধোঁযা ঘোবার সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটা নেড়েচেড়ে নিযে অমবেশ বললে, 'আপনাবা যে এখানে আছেন তা তো জানতুম না আমি।'

'কী করে জানতে পারলেন তবে?'

'চাঁদমোহনদা, চিনি তো পিঁপড়েব গন্ধ পায না। পিঁপড়েকেই খুঁজে পেতে বার কবতে হয,' অমবেশ খুব উল্লাস বোধ করে বললে, 'আপনারা বেশ ঝাড়াঝাপটা থাকতে চান, ছোঁযাছানা বাঁড়িযে খুব যা হোক; কিন্তু তা হয না; পিঁপড়েতে চিনিতে ধুল পরিমাণ হয়ে যায, চিনি পিঁপড়েকে বেছে খায; দেখেছেন?'

মাল্যবানের মনে হচ্ছিল, অমবেশের কথার কোনো ঝাঁজ নেই, যেন দুটো ঠ্যাঙের বদলে আটটা ঠ্যাং অমরেশের, মাকড়সাব মত, কেমন ল্যাং-ল্যাং, ল্যাং-ল্যাং করছে সব সময়েই; কখনো গাঢ় সবুজ, কখনো গাঢ় লাল মাকড়সানিদের দেখছে বলে—সমস্ত জীবনভবে। চেহারাব চেকনাই আছে, টাকা আছে বলে বিগড়ে গেছে সে—অনেক মেয়ের হাতেই। উৎপলাও ইন্ধন দিচ্ছে?

মাল্যবান মুখের থেকে চুরুটটা নামিযে আন্দাজ করছিল ইন্ধনটা কত দূর—কী ধরনের—

ভাবতে-ভাবতে কেমন যেন সমাধিভূত হচ্ছিল; মুখে সে বলছিল, 'বসুন, বসনু, অমরেশবাবু, বসুন।' কিন্তু অনেকক্ষণ হল ঠোঁট-জিভ নাড়া স্তব্ধ কবে দিযেছিল তার মন নিমেষনিহত হযেছিল; চুরুট নিভে গেছে—

'চলি, মাল্যবানবাবু।'

'আচ্ছা—'
'কাল আসব।'
'আসবেন। আসবেন।'

দিনসাতেক পরে রাত দশটার কিছু আগেই অমরেশ বেরিয়ে গেলে পরে মাল্যবান খাবার জন্যে ওপরে চলে গেল।

ওপরে উঠে সে দেখল উৎপলা খাবার টেবিলের এক কিনারে নিঃসাড় হয়ে বসে আছে; টেবিলের ওপর মাথা রেখে মনু ঘুমোচ্ছে।

'আজকাল খেতে বড্ড দেরি হয়ে যায়।' মাল্যবান বললে।

'কটা বেজেছে?'

'দশটা।'

'দশটা কি বেশি রাত?'

'সকলের কাছে বেশি নয়,' মাল্যবান বললে, 'মনু তো না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশি রাত হয়েছে বলে ঘুমোয় নি, খুব শীতে কাতরে ঘুমিয়েছে হয়ত।'

উৎপলা বললে, 'তুমি তো আগে খেলেই পারো। রান্নাঘর তো তোমার নীচের ঘরের লাগাও। খাবার সময় মনুকে নিয়েও তো বসতে পাবো—'

'হ্যাঁ, কাল থেকে একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে। যে-লোকটি তোমার কাছে আজকাল খুব ঘন-ঘন আসছেন তাঁর জন্যেই খানিকটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়েছে পরিবারের ভেতর। ও কে?'

'চিনি না।'

'তার মানে?'

'মানে যে—' উৎপলার কথা কপচাবার ইচ্ছে ছিল না, বললে, 'চিনি না। এই মানে। মানে—কোচড় ভরে নিয়ে যাও, চিবিয়ে খাও মানে। এই মনু! মনু!' বলে ডাক পেড়ে উঠল উৎপলা।

'ওকে তুমি জাগিয়ো না, থাক—তুমি জাগিয়ো না ওকে।'

'খাবে না?'

'না।'

'রোজই তো না খেয়ে ঘুমুচ্ছে।'

'ওকে এখন জাগিয়ে খাওয়াতে গেলে খাবে না কিছু, আমাদেরও খেতে দেবে না।' মাল্যবান মনুকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় রেখে এল।

উৎপলা একটা তোয়ালে দিয়ে টেবিলটা মুছে নিয়ে দুটো চিনেমাটির ডিশ, কাচের গেলাশ, একটা বড় পিরিচে নুন লেবু কাঁচালঙ্কা সাজিয়ে নিচ্ছিল। একটা পারুল ফুলের মত প্রকৃতির থেকেই যেন উৎপন্ন জমিনের তাঁতের শাড়ি সে পরেছিল—চওড়া লাল পাড়ের। আশাতিরিক্ত ভাবে পরিতৃপ্ত কেমন একজন সীতা, সরমা, দ্রৌপদী, চিত্রসেনীর মতন অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে।

'এসো—খেতে এসো—' উৎপলা বললে।

মাল্যবান চেয়ারে বসে বললে 'অমরেশ কখন এসেছিল?'

'সন্ধের সময়।'

'আমি অফিস থেকে ফেরবার আগেই?'

'তুমি কখন ফিরেছ, তা তো আমি জানি না।'

'হ্যাঁ, অফিস ফিরেই ওর সাইকেলটা আমার ঘরে দেখলাম।'

'সাইকেল আসে না কি?' উৎপলা বললে, 'জানি, না তো।'

'আজ রাত দশটার আগেই চলে গেল! একদিন তো দেখলাম এগারটা-বারটা না বাজলে নড়েচড়ে না। কে লোকটা?'

'আমি চিনি না ওকে।'

উৎপলা খানসাতেক লুচি মাল্যবানের পাতে দিল, খানতিনেক নিজে নিল। দু-তিনটে বাটিতে বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, আর আলুর তরকারি ছিল। একটি সসপ্যানে দুধ ছিল—ঠ্যাণ্ডা হয়ে গেছে।

সবই মিইয়ে গেছে, লুচি কড়কড় করছে; কারুরই পেটে খিদে ছিল না যেন, কিন্তু তবুও এ-জিনিসের কিনার ভেঙে, ও-জিনিসটা খুঁটে, সে-জিনিসটা টিপে খুব গাফিলি গড়িমসি করে খেতে হচ্ছিল—খেতে-খেতে দু-একটা কথা বলবার জন্যে থেমে পড়ছিল।

'চেনো না—তা হলে কী করে ও তোমার ঘরের ভেতর ঢোকে?'

'এটা কি আমার বাড়ি?'

মাল্যবান বললে, 'এতদিন তাই তো জেনে এসেছি। আজ অমরেশ এখানে আসছে যাচ্ছে বলে আমার ঘাড়ে মালিকানার বোঝা ঠেলে তুমি ওর গতিবিধির কৈফিয়ত আমার কাছ থেকেই নেবে ঠিক করেছ?'

উৎপলা তিনখানা লুচির আধখানা খেয়েছিল এতক্ষণে, বাকি আড়াইটে দিয়ে কী করবে ঠিক করতে না পেরে আপাতত হাত গুটিয়ে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার বাড়ি হোক, তোমার বাড়ি হোক, তোমার নাকের ওপর দিয়েই তো আমার ঘরে পাত্তা পাচ্ছে রোজ অমরেশ। কী করতে পেরেছ তুমি তার। কী করতে পারবে।'

মাল্যবান দুখানা লুচি শেষ করেছিল, কিছু ছোলার ডাল, একখানা বেগুনভাজা। জলের গেলাশে চুমুক মেরে ঠোঁট জিভ ভিজিয়ে দাঁত ঠাণ্ডা করে নিয়ে বললে, 'আমি তো জানতাম না যে ওকে তুমি চেনো না।'

'কী মনে করেছিলে তুমি?'

'ওকে তুমি চেনো না?'

'চিনি না বলেছি তো।'

'তোমার বাপের বাড়ির কেউ না?'

'না।'

'কলেজে তোমার সঙ্গে পড়েছিল?'

'আমি তো মেয়েদের কলেজে পড়েছি—সেকেন্ড ইয়ার অব্দি। তুমি দিশে হারিয়ে ফেলছ।'

'কেউই না—কোনোদিনই দেখো নি ওকে এর আগে আর?' স্তম্ভিত হয়ে মাল্যবান বললে, 'তবে?'

'তবে মানে?' ভ্রূকুটি করে উৎপলা মাল্যবানের দিকে তাকাল।

'তবে তোমার দিনের পর দিনই খুব খুলছে মনে হচ্ছে,' মাল্যবান কোমল-কঠিন চোখে উৎপলার দিকে তাকাল; কী একটা দাবি জানিয়ে অথচ তা প্রত্যাহার করে তাকিয়ে রইল অনড়, অক্লান্ত চোখে কিছুক্ষণ। বললে, 'ও আসার পর থেকেই তোমার চেহারার ভেতর এমন একটা সরস-সরসতা—যা আগে আমি দেখি নি বড় একটা। তোমার কথাবার্তা ব্যবহার বিয়ের জল পেয়েছিল কি একদিন? মেঘের জল পাচ্ছে কি আজ? এখনকারটাই তো ভাল মনে হচ্ছে।'

গড়িমসি করছিল এতক্ষণ, উৎপলা এবার খেতে শুরু করল। ঠোঁট একটু নড়ল কি নড়ল না, হাসি ফুটে উঠতেই মিলিয়ে গেল মুখে, সে হাসিটা আমোদের—ব্যাথার—হয়ত গ্রন্থিমাংসপেশীর কেমন একটা অচেতন আক্ষেপের—

আধখানা লুচি খাওয়া হয়েছিল উৎপলার, বাকি আধখানা খাচ্ছিল।

'অমরেশ তো দিন পনের হল আমার কাছে আসছে। চার-পাঁচ-ছঘণ্টা রাত কাটিয়ে যায়, বাতি জ্বলে ঘরে; বাতি নিভেও থাকে অনেকক্ষণ; আমরা মাঝে-মাঝে ভাবি তুমি হয়ত ওপরে আসছ; ওপরে এলে একটা কাণ্ডই বাধাতে তুমি—'লুচির বাকি টুকরোটুকু খেয়ে ফেলে উৎপলা বললে, 'তুমি বাধাতে কি না জানি না, তবে মানুষ তো মানুষ, ঝামেলা না হয়ে যায় না; বেধে যেত এত দিনে; অমরেশও চুপ করে থাকত না।'

'কেন কী হয় ওপরে?'

'আমি কেন তা বলব?'

'তা হলে পরের ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে যাব আমি?'

'কেন তুমি নিজে ওপরে এসে নিজের চোখে দেখে যেতে পারবে না? পনের দিন তো হল। নীচের থেকে তরতর করে লোকটাকে ওপরে উঠে যেতে দেখেছ তো রোজই। নীচের ঘরে বসে মাঝে-মাঝে কথাও বলেছে তোমার সঙ্গে। কথাবার্তা শুনে কেমন মনে হয়েছে অমরেশকে তোমার?'

মাল্যবান কিছু খেতে গেল না আর। এঁটো হাতে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'লুচি খেলে না যে—'

'খিদে নেই।'

'অমরেশ কাল আসবে?'

'আসবে বইকি,' উৎপলা আর-একখানা লুচির কিনার ভেঙে খিদে জাগিয়ে তুলবাব সাহসিক চেষ্টায় নিজেকে আলোড়িত করে তুলে বললে, 'ওকে এ-বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিতে পারবে তুমি?'

উৎপলা উঠে দাঁড়াল।

'কী হল?'

'ঘুম পেয়েছে।'

'বসো, বসো, কথা আছে—'

'না, না, বসতে পারছি না, দুটো পাযেব গিটে ব্যথা কবছে। কী বলবে বলো, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছি—'

মাল্যবান সিগারেটটা টানতে গেল না আর। জলের গেলাশেব ভেতর সেটা ফেলে দিয়ে বললে, 'অমরেশের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা কববে বলো।'

উৎপলা নিজের জলেব গেলাশটা মুখে নিয়ে খানিকটা জল খেল, বাকি কুলকুচো কবে ছাদেব দিকে ফেলে দিল। টেবিলে ছোট পিরিচে কয়েকটা পান ছিল। দুটো পান মুখে দিয়ে মাল্যবানের দিকে বিলোড়িত—ক্রমে-ক্রমে শান্তিমণ্ডিত, কেমন একটা স্থির মমতায, তাকিয়ে, হেসে বললে, 'কোনো কিছু ব্যবস্থা করবার নেই।'

'কী বলছ তুমি!' উৎপলাব দৃষ্টিশক্তিব ওপর একটা পাখসাট মেরে যেন মাল্যবান বললে, 'খেযাল আছে, কী বলছ তুমি!'

'যা বলছি, তাই বলছি,' তেমন দৃষ্টিতৃপ্তিতে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে একটু ঝক না মেবে উৎপলা বললে, 'তুমি না-হয কাল ওপরে এসে একটা বিহিত কবে যেও—'

মাল্যবান উৎপলার মুখেব ওপর থেকে চোখ নামিয়ে, মনেব ঢের বেশি চোখেব আলোকপাতেব কড়া ঝাঁঝ দিয়ে, সমস্ত ঘবটা ভরে ফেলতে লাগল; ধীবে-ধীবে মনে আলো এল তার; দেখল, আলোটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; মাল্যবান ভাবছিল, সে নিজে বিহিত কিছু করতে পারবে না; অন্ধকাব রাতে পাঁচিল ডিঙিয়ে নিজেব গাছেরও ফল চুবি কবা বা যে চুরি কবেছে তাকে ঠ্যাঙানো তার ধাতে নেই; ভাল হোক মন্দ হোক, কেমন একটা ধাত যেন তার; বন্ধুবান্ধব ডেকে হামলা কববাব রুচি নেই; বটে যাবে সব, যেটুকু-বা সাংসারিক শান্তি আছে তাও ছটকে ছত্রিশখান হবে। কিন্তু উৎপলা কি তাকে সাহায্য কববে না?

মাল্যবান গেলাশটার জল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোটার থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে নিজে ঢক-ঢক করে গিলে খেল—হাত-মুখ ধুয়ে ফেলল। ভাল লাগল, খানিকটা ঈশার শান্তি সংস্থাপিত হল পৃথিবীতে যেন, কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের ঘোড়া ডিঙিয়ে সান্ত্বনাব ঘাস খাবার প্রবৃত্তি মাল্যবানেব ছিল না, সে ভেবে দেখল, উৎপলা আর অমবেশেব সম্পর্ক সম্বন্ধে সে যা সন্দেহ কবেছ স্বামীব চল্লিশ বছব পেরিয়ে গেলে—আজকালকার পৃথিবী যা তাতে আটাশ বছবের রূপসী শঙ্খিনী স্ত্রী সম্পর্কে সে বকম সন্দেহ সে না করতে পারে যে তা নয়। কিন্তু উৎপলা মোটেই সে জাতেব মেয়ে নয়, তাকে অবিশ্বাস করা ঠিক নয়। অমরেশ আসে রোজই বটে, কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যায, কিন্তু ওরা বোন-ভাইয়েব মত; বড় জোর জামাই-শালীর মত সম্বন্ধ ওদের, এব চেয়ে বেশি কিছু নয়—জীবনেব সৎ ও অসৎকে নিয়ে মাল্যবানেব নিরবচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ ঘিরে মাক্রোপোলো সিগারেটেব নীল ধূসব ধোঁয়াব নীলাঞ্জন মাল্যবানকে কেমন একটা আশ্চর্য নিশ্চিন্ততার ভেতর সমাধিপ্রীত কবে রেখে দিল, কোনো কথা ভাববার দবকাব বোধ করল না সে আর।

'অমরেশের খুব টাকা আছে?'

'না। বিশেষ কিছু নেই।'

'তবে, আমাদের চেয়ে বড়লোক?'

উৎপলা অত্যন্ত ছাড়া-ছাড়া গা-ছাড়া ভাবে বললে, 'বলতে পারছি না। তা হতে পারে।'

'দেখে তো মনে হয় বনেদি ঘরের ছেলে।'

উৎপলা টেবিলের ও-কিনারে দাঁড়িয়েছিল, এ-কিনাবে এসেছিল, কখন ও-দিককার কিনাবে চলে গিয়েছে আবার, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ছিল, বসছিল না, বললে, 'ও, তুমি, কেবল টাকা আর বংশেব কথাই ভাবছ। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাই না। ওদের খুব বড় জমিদারি ছিল, অনেক শরিক হয়ে

পড়েছে। জমিদারিতে ভাঙন ধরেছে—এখন বিশেষ কিছু নেই—'

'বয়স কত অমরেশের?'

'এই ছত্রিশ-সাঁতাইত্রিশ হবে—'

'স্ত্রী কেমন?'

'সেকেলে জমিদারদের যে-রকম হয়—' যেন বার্তা বহন করেছে, আর-কিছু নয়, শান্ত ঠাণ্ডা ভাবলেশহীনতায় উৎপলা বললে, এক-আধ ফোঁটা রক্তকণিকায় তবু নিজেকে, নিজের কথাকে, চারদিককার শীত রাতের আবহকে কেমন একটা বার্তাতীততা দান করে।

'ও তো সেকেলে নয়—ও তো এখনকার—'

'হ্যাঁ, ও নিজে মনে ভাবে যে ও আগামী যুগের,' উৎপলা ঢিলে হাসি হেসে খানিকটা গ্রন্থিমাংসপেশীর আক্ষেপে কেঁপে উঠে, অবিশ্বাসে, অথচ শিশুকে প্রশ্রয় দেবার মত একটা হতবল অকপট হাসিতে কাতর হয়ে উঠে বললে, 'ওর মাথায় অনেক বিদ্যে। কিন্তু ওর পরিবারটা ওকে পিছে টানছে, ওর ছেলেপিলে তিনটে, এই মাঘে আর-একটি একটি হবে?'

'এত কথা তুমি জানতে পেরেছ,' অন্ধকারের ভেতর কেউটের মত নড়ছে একটা মহিষের লেজ, তার মুখোমুখি যেন এসে পড়ে বললে মাল্যবান।

উৎপলা পানের পিরিচের থেকে একটা পান তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে রেখে দিল আবার। পিরিচে মশলা ছিল। আঙুল দিয়ে সেগুলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ঘেঁটে একটা লবঙ্গ তুলে নিল। লবঙ্গটা দাঁত দিয়ে কাটতে-কাটতে বললে, 'অমরেশ তো আমার এখানে রোজ আসে। আমার এখানে অনেক রাত অব্দি থাকে। সব কথাই বলে আমাকে। কেন জানতে পারব না সব?'

মত কী রকম উম আমাদের দুজনের। আমায় দেখবে কী রকম লম্বা এ-সব রাত,

মাল্যবান চিতাবাঘের মত মুখ খিঁচোতে গিয়ে গৃহবলিভুকের মত ক্লান্ত ক্লিষ্ট চোখে বললে, 'ও কি নিজেই সব বলে—সব করে? তুমিই তো ওকে দিয়ে বলাচ্ছ। রাত বারটা-একটা অব্দি ও এখানে থাকে—তুমি আছ, তাই, তুমি ওকে থাকতে দিচ্ছ বলে। এর কোনো বিহিত করবে না?'

'এর কোন বিহিত নেই।'

'নেই?'

'নেই। কোনো নালিশ করো না তুমি।'

উৎপলা অন্তর্ভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে মাল্যবানের দিকে তাকাল, এমন মমতার সঙ্গে তাকাল সে-ভালবাসার এমন গভীর আবেশ!—মাল্যবান উৎপলার চোখের দিকে তাকিয়েছিল—তাকাতে-তাকাতে তাকাতে পারল না সে আর।

'শোনো।'

মাল্যবান উৎপলার চোখের দিকে ফিরে তাকাল আবার। কিন্তু তাকিয়েই রইল সে। উৎপলাও মাল্যবানের চাখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। দু-জনেরই খুব ভাল লাগল। কিন্তু এ তো পরলোকের এঁযোতি নিবিড়তা—জীবন-নদীর ওপারে—হয়ত হবে কোনোদিন—হয়ত হবে না।

'বলো।'

'বলেছিই তো।' বললে উৎপলা

'অমরেশের মতন একটা অচ্ছুৎ—'

'অচ্ছুৎ মানে? ও তো বামুনের ছেলে—'

'বেশ্যাটা এখনও আসবে তোমার কাছে?'

'তুমি বড় বিশ্রী কথা বল,' কোথাও আগুন নেই, যেন ছাই-এর ভেতর, তবুও সর্বব্যাপ্ত আঁচ রয়েছে সেই নিশ্চল উনুনের মত তাপ ছড়িয়ে উৎপলা বললে। শীতের রাতে তাপটা খারাপ লাগছিল না মাল্যবানের। উৎপলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাপ বিকিরণ করে কোনো-একটা অপরিচিত অন্যতম কুহর থেকে তাপ সঞ্চয় করে বললে, 'ও তো দশটা-এগারটা অব্দি থাকে। এখন দুটো। শীতের রাতটা পেকেছে এখন—'

'পেকেছে?' উৎপলার ইচ্ছুক অনুগত শরীরের দিকে তাকিয়ে মাল্যবান নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'কাকে বলে পাকা শীত রাত?'

'এই তো এই সময়টা—'

'কিন্তু, এই সময়টা তো সব সময় থাকবে না, ভেঙে যাবে তো সব কালকে ভোরবেলা।'

'ভোব হবে না আর।'

'কী কবে বলছ তুমি?'

মাল্যবান উঠে দাঁড়াল। স্লিপারের ভেতর গা গলিয়ে গায়ের চাদর আঁট কবে নিয়ে ঘরের চারদিকের অন্ধকারেব দিকে চোখ বুলিয়ে নিতেই দেখল উৎপলা তাব আরো অনেক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুজনে বিছানায় শুল গিয়ে। উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'ভোব হবে না আব, জানতে হবে না। দেখো শীতেব বাত কী বকম শীত, খড়ের বিছানায় হাঁস-হাঁসিনেব শীতেব বাত সত্যিই কী যে চমৎকাব, লম্বা বলে আরো ভাল। সত্যি, কোনোদিন শেষ হবে না আর।'

মাল্যবানের আশ্চর্য লাগছিল। কোনোদিনও যে জেগে উঠতে হবে না আব, শীত, যা সব চেয়ে ভাল, এই বিশৃঙ্খল অধঃপতিত সময়ে সমাজে বাতেব বিছানা, যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই শীত বাতেব কোনোদিন শেষ হবে না আর, উৎপলা সব সময়ই মাল্যবানের সময় ঘেঁষে থেকে যাবে অনিঃশেষ শীত ঋতুব ভেতব। এই সব অপরূপ লাগল তাব। কিন্তু তবুও কী কবে তা হয়? ইতিহাস নেই? বিচ্ছেদ কবে চলে যেতে দিয়েছে মাল্যবানকে নিয়ে উৎপলাকে? সময় তো আছে? সময় নেই? ছেদ কবে চলে গেছে, তাকে নিয়ে, সকল সময়কে উৎপলাকে? গভীব গভীর এই শীতেব বাত। অনির্বচনীয়—যখন নদীর থেকে নয়, শুকনো শক্ত চুনি-পান্নাব ভেতর থেকে জল ঝবছে; সেই জলদেবীকে নিয়ে এ-বকম শীতেব বাতে শুয়ে থাকা।

কোনোদিন শেষ হবে না রাতের?

না।

কোনোদিন শেষ হবে না আমাদেব বাতেব, উৎপলা?

হবে না। হবে না।

শীতেব বাত ফুরুবে না কোনোদিন?

না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, বাত, আমাদেব ঘুম?

না, না, ফুরুবে না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, বাত আমাদেব ঘুম?

ফুরুবে না। ফুরুবে না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, বাত, আমাদেব ঘুম?

না, না, ফুরুবে না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, বাত, আমাদেব ঘুম?

ফুরুবে না। ফুরুবে না। কোনোদিন—

আলোড়িত হয়ে কথা বলতে-বলতে কেমন আলো-অন্ধকাব, সূর্য, শিকবে বাজ, বড় বাতাস, মাতৃগণ, গণিকাগণ, উৎপলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, বক্তশব্দ, মৃত্যুশব্দ, অফুবন্ত শীত বাতেব প্রবাহেব বোল শুনতে-শুনতে মাল্যবানেব ঘুম ভেঙে গেল। টেবিলেব ওব মাথা বেখে ঘুমুচ্ছিল সে। তাকিয়ে দেখল ঘব অন্ধকার; টেবিলেব থালা বাসন সমস্ত সরিয়ে এঁটো পরিষ্কার কবা হয়েছে কখন যে সে তা টেবও পায় নি; টেবিল ফিটফাট পবিচ্ছন্ন—কাল সরীসৃপেব পিঠের মত চকচক কবছে। মাল্যবান বুঝতে পাবছিল না কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল। এই যে এইমাত্র উৎপলকে দেখছিল, বিছানায় শুয়েছিল, কথা শুনছিল—এ সব তা হলে ঘুমেব ভেতব দেখা, নির্জ্ঞান পবলোকের কণ্ঠে শোনা? জেগে থেকে তা হলে সে কোন আদি শুনেছিল। মাল্যবান ঘাড় হেঁট কবে অন্ধকাবে বুঝে নিতে চেষ্টা কবছিল।...

মনে পড়ল তাব। মনটা তার বড় খাবাপ হয়ে গেল। কিছু হবে না, কিছু সে কবতে পাবিবে না বলে উৎপলা তার পর মাল্যবানকে এঁটো টেবিলে ঘুমিয়ে পড়তে দেখল; এঁটো পরিষ্কাব কবল; মশাবি ফেলল; বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ল,—কিন্তু মাল্যবানকে জাগিয়ে দেওযাও উচিত মনে কবল না?

সূচীপত্রে যান

বাসমতীর উপাখ্যান

দুপুর রাতে সিদ্ধার্থ ঘুমের থেকে উঠল। আজ একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিল সে; শোবা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা ঘুম হয়েছে। রাত একটা বেজেছে হয় তো? ঘড়িটা দেরাজের ভেতর। পাশের কোঠায় সুনীতি ও তার ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে। নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে তাদের। ঘর একেবারে অন্ধকার নয়; রোজ রাতেই কেরোসিনের হ্যারিকেনটা ডিম করে জ্বলিয়ে রাখা হয় ঘরের এক কোণে-একটা পুরনো বই বা খাতার আড়ালে; তারই খানিকটা আলো ঘরের ভেতর। মফস্বলের এই শহরে ইলেকট্রিক বাতি আছে কারো-কারো বাড়িতে, কিন্তু সিদ্ধার্থ টাকাকড়ির অভাবে ইলেকট্রিক কানেকশন আনতে পারেনি; আজকাল আর কানেকশান দেওয়া হয় না-খুব বেশি তদবির করতে না পারলে। তা ছাড়া-থোক টাকা নেই তার হাতে-তদবির করার কথা ভাবতেই পারে না সে। বাড়িটাও তার পাকা নয়; মেঝেটা পাকা অবিশ্যি। কিন্তু ছনের চাল, খলকার বেড়া। বেড়া ভেঙে গেছে অনেক জায়গায়; সেখানে হোগলা দিয়ে মেরামত করা হয়েছে । হোগলার বেড়াও আছে-এইটেই কায়েমি হবে বোধ হয় আস্তে-আস্তে। মুলি বাঁশের বেড়া, দরমার বেড়া, দু-এক জায়গায় টিনের পাতের বেড়া-বেড়ার বহুরূপই আছে এ ঘরের ভেতর। পঞ্চাশের বন্দ দু'খানা ঘর-পশ্চিম পোতায় আর দক্ষিণ পোতায়। দক্ষিণ পোতার ঘরে সিদ্ধার্থরা থাকে; অন্য ঘরটায় আত্মীয়স্বজনরা থাকত। কিন্তু একে-একে তারা সকলেই কলকাতায় বিহারে আসামে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে, ক্বচিৎ আসে এদিকে।

চার বিঘে জমি নিয়ে বাড়ি। দু'টো পুকুর আছে। দু'টোই প্রায় মজে এসেছে। জাপানি হিড়িকের সময়-ওরা এলে বা এসে পড়ল-পড়ল এই উদ্বেগে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে, শহরের জলের কল ঘায়েল হয়ে জল সরবরাহের অভাবে বেশি বিপদ হতে পারে, এ বাড়িতে তখন অনেক মানুষ ছিল, এই জন্য একটা মজা পুকুর নতুন করে কাটিয়ে নিয়েছিল আবার সিদ্ধার্থ-নোয়াখালির মুসলমান কামিনদের দিয়ে। কিন্তু সে-পুকুরটাও আগাছা জঙ্গলে, পাতার রাবিশে, তাল-নারকোলের গুঁড়ি, কাঠের তক্তা ও গোঁজে কেমন যেন জলকঙ্কালের মত রূপ ধরেছে আবার। কী করবে সিদ্ধার্থ? টাকা নেই, কাটাতে পারবে না আর। জল সে খুব ভালবাসে-নদীর জল, দিঘির জলের মতন একটা ঠাণ্ডা শ্যামলা বা নীলচে গভীর বিথার সাদা-সাদা জলের ফেনায় চঞ্চল- কিন্তু হাতে টাকা নেই, পুকুর আবার কাটাতে পারবে না। কিছু মাছ আছে দু'টো পুকুরেই-বড় মাছ দু-চারটে থাকতে পারে হয়তো, এর বেশি নেই; ফলি পুঁটি খলসে চিংড়ি আছে কিছু এখন। ছেলেবেলায় ছিপ পেতে মাছ ধরত সিদ্ধার্থ মাঝে-মাঝে কিন্তু সে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের কথা। আজকাল দুলে চাঁড়াল নমশূদ্র দিশি গরিব খ্রিস্টানরা এসে বঁড়শি ফেলে, 'ছাবি' বা 'চাই' পেতে, বা জলে ছেঁকে সাজি ডুবিয়ে মাছ নিয়ে যায়- প্রায়ই কিছু বলে না সিদ্ধার্থ। এ সব পুকুরে ত্রিশ বছর সিদ্ধার্থদের নিজেদের জাল পড়েনি। বর্ষাকালে, প্রথম বর্ষার দিকে, মাঝে-মাঝে জাল পড়ে-খুব গভীর রাতে। গরিবগুরবো বদমায়েশরা এসে মাছ চুরি করে নিয়ে যায়। কিছু বলবার নেই সিদ্ধার্থের। মাঝে-মাঝে দরজা খুলে বাহিরে এসে দাঁড়ায়;- জাল ফেলার শব্দ থেমে যায়; অন্ধকারে টের পাওয়া যায় না কারা কোথায় রয়েছে, কেউই রয়েছে কিনা, বাস্তবিকই জাল পড়ছে কিনা, না সবই মনের ভুল। পুকুরের চারদিক ঘিরে সুপুরির জঙ্গল, বুনোলতার ঝাড়, কাগজি লেবুর জঙ্গল, বড়-বড় লিচু জামরুল গাছের বিরাট অন্ধকার পাহাড় যেন সব। এরই ভেতর থেকে চোর খুঁজে বের করতে হবে? একজন চোর নয় নিশ্চয়ই, একটা দঙ্গল, কাল কুচকুচে শরীর, ন্যাংটো, সারা গায়ে তেল মেখে এসেছে। মাছ শুধু নয়-সবই চুরি করবে একে-একে, গাছের সুপুরি, ডাব, ঝুনো নারকোলের কাড়ি, সুবিধে পেলে ঘরে ঢুকবে-সিদ্ধার্থেরই ঘরে শুধু নয় (তার ঘরে জিনিস বেশি কিছু নেই), যে-ঘরেই টুকিটাকি জিনিস

রয়েছে, হলে-হবে সোনাদানা আছে, সিঁদ কেটে বা বেড়ার বাঁধ খসিয়ে ঢুকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। ভাবতে-ভাবতে ... ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লেই আবার জাল ফেলার শব্দ। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ত সিদ্ধার্থ- আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ত। থেকে-থেকে জেগে উঠে গলার খাঁকারি আর হুমকি। সজলা সশব্দা কাল ভয়ঙ্কর পৃথিবী ভাল লাগত সিদ্ধার্থের, ঘুমের আবেশে শরীর চোখ ভরে উঠত। খানিকটা উদ্বেগের খামির এসে মিশেছে ঘুমের ভেতর; স্বাদটা আপরূপ তাই।

এমনি করে বাসমতী ক্ষেতে(শহরটার নাম; কেউ-কেউ 'চল্লিশ ক্ষেত' বা 'বাসমতী'ও বলত; শহরটা পূর্ব বাংলায়) এক-একটা আশ্চর্য অভিঘাত বোধ করত সিদ্ধার্থ। আরো অনেক রকম স্বাদ ছিল।

বাড়িটার মস্ত বড় উঠোন। অনেক আগে অবিশ্যি গোবরজল দিয়ে নিকানো হত; কিন্তু সে সিদ্ধার্থের শিশুকালের কথা। যে-সব মহিলাবা এ কাজ কবত তাদের মুখ আবছা হযে ভেসে ওঠে মাঝে-মাঝে সিদ্ধার্থের চোখে; অনেক দিন থেকেই তারা নেই। আজকাল উঠোনে ঘাস গজিয়ে বেশ একটা সবুজ শ্রী ফলেছে-প্রায় আধবিঘে জমি নিয়ে। এত চমৎকার, কখনো-কখনো মনে হয, এক হিসেবে এই ঘাসের অবলেপ ও নিস্তব্ধতা আগেব চেয়ে ঢের ভাল। কোনো ঘাসকাটা কল নেই অবিশ্যি, তবে মাঝে-মাঝে আমিন শিকদারকে ডেকে আনা হয কিংবা তাব ছেলে বহিমকে, আগাছা পবিস্কাব কবে দিযে যায, কাস্তে দিয়ে খুপ-খুপ ঘাস কেটে ছালায় ভরে নিযে যায আমিনের গরু আব বহিমেব আস্তাবলের জন্যে। উঠোনটা প্রাযই বেশ ঝরঝবে দেখায, তাই। কিন্তু আগাছা খুব তাড়াতাড়ি জন্মায, বর্ষাকালে চোরকাঁটায ভরে যায়, কাশ গজায়, শীতে চোরকাঁটা কাবু হযে পড়লেও আগাছাগুলো লক লক কবতে থাকে-আমিনকে আসতে হয আবাব। বছর ভরে উঠোনটা পবিস্কাব বাখতে হলে বেশ কিছু টাকাব দবকাব। হেমন্তে-শীতে আমিন নিড়িযে কেটে ঝেড়ে ঠিক করে দিযে গেলে অনেকখানি সাদা মাটি বেরিযে থাকে উঠোনের, কিন্তু তবুও বেশির ভাগ জমি জুড়েই সবুজ ঘাস। পাড়ার ছেলেমেযেবা খেলা কবতে আসে, কুলেব আঁটি, ফলপাকড়ের চোকলা-ছোবলা, মাটির ঢেলা, ন্যাকড়া, কাগজেব টুকরো উড়িযে-ছড়িযে আঘাটা কবে বাখে উঠোনটাকে। সিদ্ধার্থ নিজেই পবিস্কাব করে, ছেলেপিলেদেরও সাহায্য করতে ডাকে মাঝে-মাঝে। সুনীতি ভেতবের কাজে ব্যস্ত থাকে, আদিনাথের (চাকর) অন্য ঢের কাজ অন্য অনেক দিকে। চোত-বোশেখে মাসে উঠোনেব সাদা মাটি ফেটে যায, পৃথিবী জখম হযেছে। খুব বড্ড গভীর ফাটল নয অবিশ্যি, সে-সব ধানের ক্ষেতে দেখা যাবে, সেখানে ফাটল আব নাড়া ধূ ধূ কবছে এখন- কত যে ধান জমি জুড়ে। উঠোনের ফাটল অনেকটা মিহি -পৃথিবীর কবকোষ্ঠী বেখাব মত যেন। কী যেন সব ভবিতব্যতা লুকিয়ে রয়েছে ঐ বেখাগুলোর ভেতর। কাদের ভবিতব্যতা? মানুষের? পৃথিবীরই যেন।

উঠোনেব পশ্চিম পোতার ঘরে মাটির মেঝে, শাল-সুন্দবী-গবানের খুঁটি, আসাম থেকে আনানো হয়েছিল, এক কাকা এনেছিলেন-প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হযনি তখন। খুঁটিগুলো এখনো নিবেট তরুদানবেব মত দাঁড়িযে রযেছে যেন; তবে আলকাতবাব পোঁচড় খেয়েছে খুব-গোড়াব দিকে-না হলে উঁইযে চিবিযে সাবাড় করে দিত। গত চাব-পাঁচ বছব আলকাতরা পড়েনি-টাকা নেই সিদ্ধার্থেব। মাটির নীচে নীচে খুঁটিগুলোর কী হচ্ছে টের পাওয়া যায না, তবে ওপরে লোহার বিমেব মত শক্ত, অব্যর্থ। কাঠেব দেযাল, কাঠের তক্তার শিলিং, টিনেব চাল। চাল আর শিলিঙের মাঝখানেব খোলা জাযগাটায পাখিরা বাসা বাঁধতে পারে বটে, কিন্তু বাঁধে না বেশি, ইঁদুর গড়িযে ফেবে, ধাড়ি-ধাড়ি ছুঁচো চিৎকার কবে ছুটে বেড়ায, শুকনো সুপুরি হড়গড় করতে থাকে ইঁদুরগুলোর গড়ানি খেযে, মাঝে-মাঝে ভোঁদড় আসে। অনেক লোকজন থাকত এক সমযে এই ঘরে, অনেকে মরে গেছে, বাকি সব ছড়িযে পড়েছে দেশেবিদেশে, অনেকেই কলকাতায গিযে কপাল ফিরিযে নিয়েছে, বাসমতীব কথা বড় একটা মনে পড়ে না তাদেব, কেউ-কেউ অরে দূরে পশ্চিমে চলে গেছে । ভাবতে-ভাবতে ঘুমিযে পড়ল আবাব সিদ্ধার্থ।

তিনটি প্রাণী শুধু আছে এখন পশ্চিমের ঘরে-একজন সিদ্ধার্থের বুড়ো পিসিমা, বযস প্রায সত্তর হয়েছে তার। সরোজিনী ঠাকরুণকে পিসিমা ডাকে সিদ্ধার্থ, বাইরের লোকেরা সরোজিনীদি তাকে কিংবা দিদিও ডাকে অনেকে, মাসিমা ডাকে বিস্তর লোক, যদিও সিদ্ধার্থের মাসিমা নন সবোজিনী পিসিমা। মিসেস বোস ডাকে কেউ-কেউ-প্রায পঞ্চান্ন বছর আগে শ্রীধব বোস নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিযে হযেছিল পিসিমার। ছ'মাস পরেই শ্রীধববাবু মারা যান। কথাটা কবো-কারো খেযাল আছে বলে এখনও মিসেস বোস বলে ডাকে সিদ্ধার্থের পিসিমাকে। পিসিমার অসবর্ণ বিয়ে হযেছিল। সিদ্ধার্থরা কাযেত নয়-সেনগুপ্ত--সিদ্ধার্থ গুপ্ত কেটে ফেলে শুধু সেন লেখে। সরোজিনী পিসিমা বিধবা হবার পর এণ্ট্রান্স পাস

সূচীপত্রে যান

করেছিলেন, ফার্স্টআর্টস পড়ছিলেন কিন্তু বাসমতীর বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেটদের পরিবারে ধারাবাহিকভাবে ছেলেমেয়েদের ইংরেজি-মানে ইংরেজির থেকে বাংলা তর্জমা- ও বিশেষ করে বংলা পড়াবার কাজে বহাল হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। মাঝে-মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করেছিলেন অবিশ্যি এম-এ পরীক্ষা দিতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিমবাবু, ভূদেববাবু, চন্দ্রনাথ বোসের বাংলাই পিসিমার লেগেছিল ভাল-পরে রবীন্দ্রনাথ কিছু-কিছু পড়েছিলেন। বাসমতীর গার্লস স্কুলেও কাজ করেছিলেন অনেকদিন-শিক্ষক হিসেবে ঠিক নয়-রেকটর গোছেব কী একটা কাজ ছিল তাঁর, প্রায় কুড়ি-বাইশ বছব, বেশ মানসম্ভ্রম ছিল সেই কাজে, মাঝে-মাঝে ক্লাসও নিতেন; থার্ডক্লাস-সেকন্ডক্লাস মেয়েদের বাংলা পড়াতেন। ফার্স্ট ক্লাসের বাংলা পড়াতেন হেডমিস্ট্রেস, লেডি প্রিন্সিপ্যাল বলা হত তাঁকে বাসমতীতে-অবলা কাঞ্জিলাল। অবলা দেবী এম, এ পাস কবেছিলেন, খুব সম্ভব অঙ্কে। থার্ড ক্লাস পেয়েছিলেন, কিন্তু খুব ভাল ইংরেজি জানতেন, তাব চেয়েও ভাল বাংলা। সবোজিনী পিসিমার সেকেলে বাংলা নিয়ে অবলা দেবী একটু ঠাট্টা কবতেন। কিন্তু পিসিমা তাই বলে সাধুসমাজি বাংলা ছাড়েননি, পরে রবীন্দ্রনাথ নয় শিবনাথ শাস্ত্রীর বাংলা খানিকটা রপ্ত কবে নিয়েছিলেন। প্রটেস্টান্ট স্কচ, ইংবেজ পাদ্রিদের বড় আস্তানা ছিল বাসতমতীতে, মস্ত একটা মিশনবাড়িও গড়ে তুলেছিলেন তাঁবা। সেখানকার ফাদাব-সিস্টারদেব জন্যে বাংলা শেখাবাব লোকেব দবকার হলে মাঝে-মাঝে সরোজিনী পিসিমাকে ডেকে নিতেন তাঁরা। খুব বেশি টাকা দিতেন না, কিন্তু তখনকাব দিনে টাকার মূল্য ছিল। কিন্তু অনেকদিন ধরে নানাবকম বোজগাবি কাজ কবেও টাকা জমাতে পাবেননি পিসিমা। খুব যে হাতখোলা তা নয়-তবে এলোমেলো ধবনের লোক। খারচের জন্যে টাকা, মন্ড বাঁধবাব জন্য নয়- সিদ্ধার্থদের পরিবাবের সকলেরই প্রায এ-রকম ধারণা ছিল এক সময় । টাকা এনেছেন, ধবিয়েছেন জরা। কাজেই বাসমতীতে যাবা আছে, তাদেব থলি ঝেড়ে কিছু পাওয়া যায না এখন আর। কলকাতায় যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা নতুন আওতার ভেতব হুঁশিযাবি শিখে এখন বড়মানুষ, তাঁদের সঙ্গে বাসমতীব এ বাড়ির ফতুব লোকদেব টাকাকড়িব দিক দিয়ে কোনো তুলনা হয না। সরোজিনী পিসিমা ডাহা ফতুর। তবে কলকাতার বড়লোকদেব কাছ থেকে মাঝে-মাঝে মনি-অর্ডার, ড্রাফট, চেক ইত্যাদি আসে-গড়পড়তা মাসে সত্তব-আশি টাকায দাঁড়ায। আশি টাকাব এক সময়ে দাম ছিল বটে, বাসমতীব মতন মফস্বল শহবে, কিন্তু দ্বিতীয মহাযুদ্ধ এসে সে-সব মুছে দিয়েছে। তাবপরে এখন-উনিশশ পঁযতাল্লিশ-ছেচল্লিশে সত্তর-আশি টাকার কী কিস্মত আব? এ দু-বছব ধরে বাসমতীতেও চালেব মণ বত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকায ঘোবাফেরা কবছে; চল্লিশেব ওপবেও ওঠে মাঝে-মাঝে। সবোজিনী পিসিমাব জীবনযাপনার মান বেশ মানানসই ছিল একসময়ে-তাঁব বেক্টব, গার্ডিযান টিউটব, পাত্রীদের মুন্সিগিরির কাজের সময়ে। এখনো অনেকটা সেই মানই বজায বাখবার সাধ তাঁব, কিন্তু উপবি বোজগারেব কোনেব উপায নেই। বযস সত্তব হযেছে-এইবাবে আশির দিকে মোড় ঘুববে।

সিদ্ধার্থেব ছাতুকাকাও এ বাড়িতে থাকেন। সিদ্ধার্থেব বাবাব সবচেযে ছোট ভাই। ছোট কাকা ইস্কুলে সেকেন্ড ক্লাস অবধি পড়েছিলেন, পড়াশোনা আব হল না, চাকরি-বাকবিও ভাল লাগল না, চাকবিতে হাতই দিতে গেলেন না। বিয়েও করলেন না, কেউ মেয়ে দিল না বলে ঠিক নয-এমনিই। ছাতু কাকা সাদামাঠা মানুষ; একা পৃথিবীতে চবে বেড়াতে হলে অনেক আগেই মাবা পড়তেন। কলকাতার বিদ্যাবুদ্ধি আর টাকাকড়িব গরম ঝাপটায ডাঙাব মাছের মত কষ্ট পান-সেজন্যেই বাসমতীতে থাকতে ভালোবাসেন। খুব শান্ত নিস্তব্ধ এই দেশ নয বটে, কিন্তু কলকাতাব চেয়ে ত ঢের। কলকাতায, দর্জিলিঙে, জলাপাইগুড়িতে তার বিশিষ্ট সব দাদাবা বযেছেন বড়-বড় বাংলো, জমি, জাযগিরি নিযে। কিন্তু বাসমতীতে-সবোজিনীদি আছেন বলা ঠিক নয-একটা নিবিবিলি নম্র গবিবানাব ধাঁচ, কথাবার্তা চালচলনে বড়লোপনার হৃদযগ্রাহী অবর্তমানতা এই সবই ঠিক জিনিস মনে হয়েছে তাব। এখানে সব সময়ই সময়-শুযে পড়বাব, উঠে বসবার, ঘুরে বেড়াবার; কেউ বাধা দেবে না; ঠিক চাযের সময়ে চা পাওয়া যাবে, খিদের সময ভাত; কাউকে তাগাদা দিতে হবে না। তাগাদা দিলেও সবোজিনীদিকে দিতে হবে, কিংবা সিদ্ধার্থেব বউ সুনীতিকে, কিংবা আদিনাথ চাবটাকে। এরা ঘরোযা মানুষ সব, খানিকটা গরিব বলেই ঘবোয়া। করকাতায় না-গিযে বাসমতীতে বযেছে বলেই এসব সততা সম্ভব হয-ছাতু কাকা চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে হেমন্তের বিকেলের বোদে উঠোনের কিনাবে বড় আমগাছটাব নীচে ঘাসের চাবড়ার ওপর বসে এইসব ভেবে দেখতেন। সিদ্ধার্থকে মাঝে-মাঝে বলতেনও এসব

কথা—কলকাতায় যেতে নিষেধ করতেন সিদ্ধার্থকে। যাবার বিশেষ কোনো সমম্ভাবনাও ছিল না অনেকদিন সিদ্ধান্তেব— যদিও মাঝে-মাঝে কোলাহল, কামনা, চেতনার একটা নিবেট রসুনচৌকি বেজে উঠত যেন আত্মিক লোক থেকে- অন্ধকারে দীপ্তির ভেতর ডাঙা সাগরের জলে স্থলে-তাকে দূরে, কালকাতায়, ডেকে নেবার জন্যে।

বইটই পড়তে বেশি ভাল লাগে না ছাতু কাকুর; তবুও খাওযাদাওয়াব পর দুপুরবেলাটা বই পড়েই কটিযে দিতে হয। বসমতীর ব্রক্ষ্মসমাজ লাইব্রেবির থেকে বই নিযে আসেন তিনি। বেছে আনবাব ভেতরে কোনো শৃঙ্খলা বা ধারাবাহিকতা নেই- যা হাতের কাছে পাওযা যায বা মনে ধবে তাই নিযে আসেন ধর্ম সম্পর্কে সব বইই মনে লাগে তাঁব; বিছানায ছড়িযে আছে তাঁব 'ব্রক্ষ্মধর্ম' কিংবা রামমোহন বাযেব চটি জীবচবিত, অথবা শিবনাথ তশাস্ত্রীব 'হিস্ট্রি অবদি ব্রাহ্মসমাজ' অথবা অঘোব প্রকাশ' কিংবা কেশব সেনের 'জীবনবেদ' কিংবাশাস্ত্রী মশাযের 'রামতনু লাহিড়ী'। মাঝে-মঝে দু-চাবটে ইংবেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস দেখা যেত-সাবেক কালেব দাদাবা যা ফেলে চলে গিযেছেন, লোহাকাঠের আলমাবিতে পচছিল, বের করে নিযেছেন ছাতু কাকা। ইংবেজি পড়তেই ভালবাসে বেশি, সিদ্ধার্থেব ইংরেজি খববেব কাগজের আটটি পৃষ্ঠা নেড়েচেড়ে পড়েন-কোনো খববই বাদ যায না তাঁব, বিশষ কোনো খববই মনে থাকে না কাগজটা সবিযে বেখে দিযে। খুব বেশি ইংজেদ্বেষী ছাতু কাকা— এত বেশি যে সেই বাবীন ঘোষ-প্রফুল্ল চাকীর আমল থেকে ১৯৪৭ অব্দি ছাতু কাকাব ফাঁসি, জেল, আন্দামান, বিনা বিচারে আটক সব কিছুই হতে পবত যদি তিনি কাজে ভিড়ে যেতেন। কিন্তু কোনো দলেব সঙ্গে যোগ ছিল না তাঁর, ছাতু কাকাকে নিযে কেউ দল গড়বাব কথা ভাবতে পাবত না। ইংবেজেব জেলে ন-মাস ছ-মাস হয তো কাটাতে পাবতেন তিনি, কিন্তু দলের আবহাওযায পাঁচ মিনিটের চাপে মরে যেতেন- আজকাল দেশ খুব সম্ভব স্বাধীন হতে চলেছে, কিন্তু বিশষ সুবিধে পাচ্ছেন না, বিশেষ দ্বেষী লোক নন তিনি, কিন্তু তবুও ইংবেজ তাকে দ্বেষ শিখিযেছিল। সে-বিষ অস্থানে কুস্থানে বেখে আসতে গিযে আজকের নানারকম পীঠস্থানেব শিলায আঘাত খাচ্ছেন।

ছাতু কাকা বাসমতী কলেজেব কযেকজন বাছা বাছা প্রফেসবেব সঙ্গে মেশেন- যাঁবা নম্র, ধর্মভীরু এবং বামকৃষ্ণ মিশনেব চেযেও ব্রাহ্ম সমাজেব দিকে বেশি ঘেঁষা, সেই সব প্রফসবেব সঙ্গে। সে-সব প্রফেসর দু-তিনজন আছেন বাসমতীতে, ব্রাক্ষ্মসমাজকে ভালোবাসেন তাঁবা, কিন্তু বামকৃষ্ণ মিশনকে বেশি ভালোবাসেন তবুও, ধবতে পারেন না ছাতু কাকা। ধবতে পাবলেও বিশষ কিছু এসে যেত না অবিশ্যি, তবে একটু তাবতম্য হত- শেষ পর্যন্ত ছাতু কাকাব চোখে। ব্রাহ্ম সমাজেব ষোল আনা মানুষ না হলে মানুষ নিখাদ হতে পাবে না-ভাবতেন তিনি। আজকাল অবিশ্যি ধাবণা বদলাচ্ছে ছাতু কাকাব। ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে সে ভক্তি নেই এখন আব, কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে ভক্তি আবো ঢের কম। বাসমতীব ব্রাহ্ম সমাজে ফি ববিবাব যান ছাতুকাক—দু' বেলাই। তাছাড়া বিশষ ব্যাপাব উপলক্ষে যেতে হয, অন্য নানা কাজ নিযেও সমাজে বোজই প্রায যেতে হয তাঁকে।

যাঁবা বামকৃষ্ণ মিশনেব দিকে ঘেঁষেছেন সে-সব অধ্যাপকদেব সঙ্গে মিশতে পাবলে ভাল বোধ করেন আধ্যাপক জাতেব ওপব একটা শ্রদ্ধা আছে তাঁব। এঁবা জ্ঞানী মানুয সব; মানুষকে জ্ঞানী কববাব কাজে লেগে আছেন, চবিত্রে কোনো খাকতি নেই; এ-বকম একটা ধরতাই সিদ্ধান্তে চালিত হযে খুব সম্ভ্রমের চোখে দেখেন ছাতু কাকা বাসমতী কলেজেব অনেক প্রফসরকে। কিন্তু সকলেব নয; এঁদেব অনেকে তাসপাশা খেলে, চাযেব দোকানে ঘুবে বেড়ায, আরে কী সব বিসদৃশ কাজ কবে · বলে দিযেছেন তিনি সিদ্ধার্থকে। ব্রাহ্মসমাজেব মত অধ্যাপক সমাজেব ওপবও ভক্তি অনেকটা নষ্ট হযে যাচ্ছে তাঁব। এই সবই ত আদর্শ জিনিস ছিল, বাকি সবই ত আস্তাকুঁড়। কিন্তু ধর্ম, কলেজ সবই ভাগাড়ে হযে যাচ্ছে যেন। স্বাধীনতা পেতে গিযেও অস্বস্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। যেন ক্যালোমেল খেযেছেন এমনিভাবে দাঁতগুলো পড়ে গেল। বাতারাতি চুল পেকে গেছে, দাদাবা সকলে মিলে আশি টাকা পাঠাতেন, এখন সত্তর টাকা পাঠাচ্ছেন। স্বাধীন সূর্য আসছে, আব-একটু বেশি জ্বললে পঞ্চাশ পাঠাবেন? সরোজিনীদিব কোনো বোজগার নেই। যে-কোনো রাতে বিছানাব চাদরে লেপটে মরে থাকতে পাবেন দিদি, দশ বছব ধবে ব্লাড প্রেসাব-তেমন তাঁকে থাকছেন না এখন আব।

বাসমতীব নদীর পাড়ে বেড়াতে যান ছাতু কাকা-রোজ বিকেলে। নদীর কিনাব দিযে ঝামা সুবকির নীলচে লাল রাস্তা চলে গিয়েছে তিন-চাব মাইল-উঁচু-উঁচু ঝাউগাছ রাস্তাব পশ্চিম কিনার জাঁকিয়ে অনেক

দূর পর্যন্ত বাঁক ঘুরে-ঘুবে নিরালা বীথির মতন সব। হাতের কাছে নদী পুবেব আকাশ ঘেঁষে, উত্তর-পুবে তাকালে নদীর জল বেশি দেখা যায় না-ইস্টিমার, জেটি, গাধা বোট, গ্রিনবোট, পানসি ডিঙি, জেলে নৌকো, পালোযারি, হাটুরে, বজরায় ছেয়ে ফেলেছে সব। কিন্তু তাব পরেই জিরেন কাঠের রসের মতন রঙের অগাধ জলের কী উতরোল আলো- সূর্য চলে যাওযাব পব শিশু সূর্যেরা জেগে উঠেছে যেন অন্ধকাব নামবাব আগে-ছাতু কাকা ধানী নদীব দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, ব্রাহ্মসমাজে যেতে হবে- সরোজিনীদি উপাসনা কববেন। একটা লেকার থাকলে ভাল হত- বাসমতী কলেজের শ্রীপতিবাবু যদি আধুনিক কাল ও ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলতেন কিংবা আমাদের এই নতুন স্বাধীনতা সম্বন্ধে। কিন্তু দেশ ত দু-টুকরো হবে শোনা যাচ্ছে, এ দিকটা ত পাকিস্তানে পড়বে, আগেব মত জিভ নেড়ে সব কথা বলা সম্ভব হবেনা তখন আর। তবে-সরোজিনীদি উপাসনা কববেন, বিশেষ এই, এইটুকু শুধু। ছাতু কাকাব নিঃশ্বাসে খানিকটা ছাতকুড়ো ঝরে পড়ল যেন।

টিনি মজুমদারও থাকে এই পশ্চিম দিকেব টিনেব ঘবটায। সিদ্ধার্থেব সঙ্গে কোনো বক্তেব সম্পর্ক নেই এই মেয়েমানুষটিব। টিনির বয়স পঞ্চাশ, চুল পেকেছে, বযস ভেঙে পড়েছে, টাকা থাকলে শবীর জোড়া লাগাতে পারত হযতো কিন্তু টাকা নেই টিনিব, অথবা সরোজিনীব কিংবা সিদ্ধার্থেব। এখানে একটা স্কুলে টিচাবি কবে টিনি কযেকবাব বি-এ পবীক্ষা দেবাব চেষ্টা কবেছিল। তাবপব দেশে স্বাধীনতা এল বুঝি-টাল সামলাতে গিযে বি-এ পাশ কবা হল না আব। বাপ-মা নেই—কলকাতায এক বোন থাকে। বোনেব অবস্থা ভাল। কিন্তু কলকাতায গিযে পবেব ভাঁবে থাকবে না সে। তা ছাড়া কলকাতা ভালই লাগে না তাব। এক সময়ে চেহাবা মন্দ ছিল না, কিন্তু এখন মুখেব দিকে অনেকক্ষণ না তাকিয়ে থাকলে কিছুই বুঝতে পাবা যায না। কিন্তু মেয়েদেব মুখেব দিকে কখনো তাকান না ছাতু কাকা। টিনিব মুখেব দিকে তাকাবাব কোনো দবকার বোধ কবে না সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থের মুখেব দিকে চেয়ে দেখবাব কোনো প্রযাজন নেই টিনিব। সবোজিনীব ঘবে একটা ঢাউস আর্শি আছে, অনেক জাযগায পাবা চটে গেছে, কিন্তু তবু সে আর্শিতে মুখ দেখতে গিয়ে জোড়াতাড়া দিযে মোটামুটি ঠিক মুখটাই অনুভব কবতে পাবা যায, বুঝতে পেবেছে টিনি। চিরুনি হাতে নিযে মুখ দেখে। চুল আঁচড়াবার সময় সবোজিনীবও মুখ দেখতে হয। এ কাজে এঁবা সাবা দিনবাত্তিব ভেতর দু-তিন মিনিটেব বেশি সময নষ্ট কবেন না। একদিন সমস্ত দিন আর্শি লুকিয়ে বেখে টেব পেয়েছিল সিদ্ধার্থ, ইস্কুলে যাবাব মুখে সে আর্শিটা এক-আধ মিনিট খুঁজেছিল টিনি, সন্ধ্যাব দিকে সমাজে যাবাব সময দু-এক মিনিট সবোজিনী। ছাতু অথবা কসুনীতি নিজেদেব দবকাবে কোথাও নিয়ে গেছে হযতো- ভেবে মাথা ঘামাযনি আব। সিদ্ধার্থ যে লুকিয়ে বেখেছে সে-কথা ভাবতেও পাবেনি ববং কিসা গোতমী ও সুজাতা, তথাগত সম্পর্কে খাবাপ কিছু ভাবতে পাবত। ভাবি আশ্চর্য স্ত্রীলোকদেব কানঘেঁষেই বাসমতীতে বযেছে সিদ্ধার্থ। গভীব বাতে জেগে উঠে এই সব কথা মনে পড়ছিল সিদ্ধার্থেব । ঘুমিযে পড়বার আগে কলেজেব ফোর্থ ইযাবেব ছাত্রী বমাব কথা এক- আধ মিনিটেব জন্যে - এমনিই আচমকা মনে পড়ে গেল তাব; ঘুমিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থ

বমার বযস উনিশ-বাসমতী কলেজে বি-এ পড়ছে। খুব চমৎকার ধানকেই বাসতভী বলা হয- রমাব চেহাবা ও ফলন্ত মন এই গভীব নিবিড় ধানেব মতন -এই চালেব মতন। এব চেয়ে বেশি সুন্দব কী থাকতে পাবে পৃথিবীতে? কলকাতা গেলে বমা শিবোপা পেতে পাবে অনাযাসেই মহাবাণী হিসেবে, কিন্তু বাসমতীতে থাকাই তাব ভাল। নগব তাকে নষ্ট কবে ফেলবে, বিকাশেব বিশুদ্ধি-ক্রমেই আবো বিশুদ্ধি, শেষ পর্যন্ত একটা ঔশী সার্থকতা, বাসমতীতেই সম্ভব হবে। বমাব কথা মাঝে-মাঝে মনে হলে এ-বকম ভাবে মন নাড়া খেযে যেত সিদ্ধার্থেব, কিন্তু তবুও মেয়েটিব থেকে নিজেব মনটাকে স্বভাবতই একটু দূবে সবিযে বাখাব ক্ষমতাটা কৃত্রিম না হযে ক্রমেই যাতে সহজ হযে পড়তে পাবে- সেদিকে সাধনা বযেছে সিদ্ধার্থেব। বযস ত তাব পঞ্চাশের দিকে চলেছে, কুড়ি-পঁচিশ বছব আগে- এমনকি পনেব বা দশ বছব আগেও যদি বমা তার জীবনে আসত তাহলে অন্যরকম ভাবে হযতো কথা ভাবত সিদ্ধার্থ। অথবা আইবুড়ো থাকত যদি সিদ্ধার্থ, তাহলে এই মেয়েটিব জন্যেই যেন- চুযল্লিশ বছবে ঠেকে-বসমতীব আকাশ-বাতাস, কলেজ, বাজাব-কালেকটরেট্ ও ক্রিমিন্যাল কোর্টেব পৃথিবীতে।

মা নেই বমা অধিকাবীব। বড় বোন বযেছে একজন, নাম ক্ষমা; সে আব তাব স্বামী কলকাতায থাকে। স্বামী- অভয, কলকাতায কারেন্সিতে কাজ করে, ক্ষমা নার্সেব কাজ শিখছে নাকি -শুনেছিল

সিদ্ধার্থ। ক্ষমার বাবা প্রভাসবাবু বাসমতীর পোস্ট অফিসে কাজ করেন। পোস্ট অফিসটা বড়। খুব সম্ভব ইন্সপেক্টর প্রভাসবাবু-কিংবা ঐ রকমই একটা কিছু, বাসমতী ছেড়ে প্রায় ট্যুরে বাইরে বেরিয়ে যেতে হয় তাঁকে। বাইরে যখন যান, মেয়েটিকে কার জিম্মায় রেখে যাবেন এই নিয়ে সমস্যায় সময় খুইয়েছেন অনেক। যাদের কাছে রেখে যেতেন তাদের কাউকেই সুবিধার মনে হল না –প্রভাসবাবুর চোখে রমা খুব সুন্দর নয় হয়তো, কিন্তু অন্যদের চোখে অন্য রকম এবং সন্তানটি তাঁর স্ত্রীজাতীয় সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন, চট করে বোঝেননি, ঠেকে শিখতে হয়েছে। না, আর-কারো কাছে রমাকে রাখা চলে না- স্থির করে ফেলেছেন তিনি। টুরে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো ভাবছিলেন, দু-একবার নিয়েও ছিলেন, সেখানেও ঠেকে শিখলেন আবার। লটবহরের মত কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে না অবিশ্যি রমা, প্রভাস বাবুকে কোনো চলাচলতির বাধা বিড়ম্বনায় ঠেকে যেতে হয় না, সুবিধাই হয় তাঁর, রমা অনেক কাজই এগিয়ে দেয় প্রভাসবাবুর। গুছিয়ে ঠিক করে রাখে সব-কিন্তু তবুও পৃথিবীতে পুরুষ মানুষ কি কম?

একটি মেয়েমানুষের মতন ত রমা, আর ওরা ব্রহ্মার এক মুহূর্তে যে-সব বীজ জন্মায় তাদের মত-সংখ্যায়, প্রাণশক্তিতে।

দেখেছেন প্রভা-বাবু, রমার দিক দিয়ে কোনো অপরাধ, কোনো স্খলনপতনের ঈষৎ অমেজও বুঝি নেই এখন পর্যন্ত। খুব বিচক্ষণভাবে বাইফোকাল চশমা নাকের ডগায় আটকে রেখে মনশ্চক্ষে, নির্মনেও নেমে গিয়ে, বুঝে নিতে হয়েছে। কিন্তু তবু অপরাধ ত মীমাংসা নয় যে প্রথম থেকেই উপস্থিত থাকবে, অপরাধ ত জীবাণু, রমা কি আধার নয়? একটা চুরুট জ্বলিয়ে নিলেন প্রভাসবাবু। টুর থেকে ফিরছিলেন রমাকে সঙ্গে নিয়েই। তারপর চলেছিলেন আবো দূরের একটা টুরে কাজ সেরে আসতে। স্টিমারের ডেকে বসেছিলেন সকালবেলার রোদে-চারদিকে পুব বাংলার সরু-সরু উঁচু-উঁচু অগাধ সুপুরিশ্রীর নীলচে বনানী। আরো গাছ আছে ঢের: জারুল, জামরুল. সিসু, শিরিষ, আম, মহানিম, ঝাউ- প্রকৃতির বিরাট পরিভাষা, শক্তির মত। রোদের ভেতরে অলোকিত হয়ে কথা বলছে নদীগুলো- ঘুরে চলেছে নদীদের শাখা। কিন্তু কথা কার সঙ্গে যারা স্টিমারে চলেছে তাদের ভেতর এক-আধজন মানুষের সঙ্গে খুব সম্ভব। আরো ঢের মহত্তর মন আছে- পৃথিবীতে, অদৃশ্য শূন্যেও হয়ত, তাদের সঙ্গে। রমা কী করছে? তাকিয়ে দেখলেন। সকালের রোদে উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। চা খাচ্ছে। অপরাধ কোনো সিদ্ধান্ত নয়- প্রতি মুহূর্তেরই উচ্ছ্বিত জীবাণুর মত ওটা। নিজের যুক্তির খেই ধরলেন চুরুটের ভেতর থেকে খানিকটা কিছু শুষে নেবার চেষ্টা করে; গাল দু'টো কেঁপে উঠল তাঁর, নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল।

চুরুট তুলে নিলেন –নিভে গেছে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে তক্ষুণি না জ্বালিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রমাকে বললেন, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে টুরে চলাফেরা করব না আমি আর।'

'আমার পড়ার ক্ষতি?'

'ততটা হয় না। যা হয় সেটা শুধরে নিতে পার তুমি। স্টিমারে নৌকোয় বই পড়বার সুযোগ যে নেই তা নয়-পড়েছ ত তুমি 'দেশলাই জ্বলিয়ে দু-হাতের বেড় দিয়ে ফাঁপা আবডালে চুরুট জ্বালিয়ে নিলেন। 'এখন থেকে তোমাকে বাসমতীতে রেখে আসব।

'কার কাছে?'

'তাই ভাবছি।'

'এই ত বেশ ছিল,' রমা বললে, 'নানারকম দেশ-গাঁ দেখে ফিরতাম।'

'না।'

ঠোঁটে একটু হাসি লেগে রইল রমার, ভাল বা খারাপ কিছুই লাগেনি- প্রভাসবাবুর কথাটাকে 'তথাস্তু' এর ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু দিনের আলো যেখানেই একটু মৃদু- পৃথিবীর সে-সব পথ দিয় চলে যেতে হলে সব সময়ই ত মশা; যত বড় লক্ষ্যই থাক না কেন, ওদের ভনভনানি এড়ানো কঠিন। মেয়ে মানুষের শরীর নিয়ে এসছে পৃথিবীতে, (খুব রূপসী মেয়ে মানুষের কিনা-সে কথাটা খেয়ালের ভেতর ছিল না এখন রমার). শরীরটা একটা ক্ষত যেন, মাছি এসে পড়বেই। কিন্তু তাই বলে মশামাছির রাজত্বে থাকবে না সে, ওরা এসে তার রাজত্বে উঁকি দেবে, তা দিক। বাড়াবাড়ি করলে চামরের মুখে উড়িয়ে দেবে, না হয় ফ্লাই-পেপার, না হয় ফ্লিট,ডি-ডি-টি-জানে সে সে-সব। প্রভাসবাবুর অজান্তে নানারকম অভিজ্ঞতার কাঠামোর ভেতরে কুমোরের চাকিটুকু পরিকল্পনার মত তাঁর মন, তারপরে একটা কিছুর গৈবী আবির্ভাবের মত তার বিশেষ চেতনা। তবে মাছি হটিয়ে দিতে গিয়ে এক সময়ে হয়তো পাখনায় ঠেকে যেতে পারে

সূচীপত্রে যান

সে- আচমকা একটা নীলকণ্ঠ পাখির; আজকালই নয় হয় তো- আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে-কবে ঠিক বলতে পারা যায় না, তবে জীবনের শেষ পর্যন্ত শেষ হবার আগে নিশ্চয়ই। চারদিকের এই সব নদী যখন মনের ভেতরে এসে স্থান ঠিক করে নিয়েছে তাদেব- নদী, আকাশ, মানুষ, সমাজ যতখানি বিচলিত করতে চাইবে তাকে তাদের নিহিত অর্থ ততদূর ধরে ফেলে বিচলিত হবার মত লৌষ্ট্রপাথর থাকবে না যখন সে আর, শবীর ছাড়া তার ভেতর স্ত্রীত্ব থাকবে না আব-কিছু, কিন্তু তাব চেয়েও ভাল জিনিস থাকবে, যাকে সে ভালবাসবে। সে পুরুষ-মানুষ হিসেবে বিখ্যাত হোক বা না হোক সেটা অসার, চলিত অর্থে প্রেম যে নেই এবং টাকা যে মূল্যহীন, জ্ঞান যে পাত্র হিসেবে নিজেকে পন্ড করে কিংবা সফল সার্থক- এই সব শেষ শান্তির কথা তাদের জানা হয়ে গেছে যখন, এই সব জানা হয়ে গেছে বলে কোনো আধবযসীর সঙ্গে প্রেম হতে পারে, হযতো আজই; কিংবা কোনো ছোকবাব সঙ্গে একটা প্রচলিত সম্বন্ধে আটকে যেতে পাবে সে, কিছুদিনেব জন্য অন্তত, পনের-কুড়ি বছব পবে। কিন্তু এই কথাগুলো-ভাবনাগুলো সবই তার নিজেব নয়। মোটামুটি শিখিয়েছিলেন তাকে ভক্তিদি আব বিনতাদি। একজন দু'বাব বিয়ে কবেছিল, এখন চুয়াল্লিশ বছরের বিধবা। আব-একজন বিয়ে করেনি বটে, কিন্তু অনেক দেখেছে-মিশেছে। এতদিন কলকাতায ছিল, আবার চলে যাবে হযতো কলকাতায়; কেউ আছে সেখানে।

রমা উঠে দাঁড়াল।

'কোথায নামতে হবে-স্টিমাবে ওঠাব সময জিজ্ঞেস কবিনি তোমাকে—'

'দেবি আছে ঢেব।'

'নটা বেজেছে।'

'এখনও ঘণ্টা চাবেক।'

'কী যে বলছ তুমি; সত্যি বলছ?'

'কেন, খারাপ লাগছে-এই নদী, বাতাস-? ফার্স্ট ক্লাসেব ডেক ত এটা। আমাব সেকেন্ড ক্লাস পাশ-কিন্তু সেখানে বার্থ খালি নেই বলে ফার্স্ট ক্লাসে জাযগা পেলুম।'

বমা বসতে-বসতে বললে 'কিন্তু আমাব টিকিট?'

'তোমাব টিকিট তোমাকে দিইনি বুঝি? বেখে দিযেছি ব্যাগে তাহলে। আছে আমাব বুকপকেটে।'

'ইন্টাব ফিমেলেব?'

'না ফার্স্ট ক্লাসেব—' প্রভাসবাবু চুরুটেব ছাই ঝেড়ে ফেলে বিরক্ত হযে বমার দিকে তাকালেন। বমাব ঠোঁটেব ওপব রোমেব লক্ষণ যে একেবাবেই নেই, তা নয; কিন্তু কোন স্ত্রীলোকেবই-বা নেই? কোনো স্ত্রীলোককেই ঘাটাননি জীবনে প্রভাসবাবু-কিন্তু অনেক মেয়েদেব সম্পর্কে আসতে হয়েছে তাঁকে। বোমবাজি আছে তাদেব সকলেবই,তাঁব বাইফোকাল চশমায ধবা পড়েছে সবই। কিন্তু না, সে জন্যে নয়, অন্য অনুসন্ধানে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু ঠেঁটেব ওপব ঈষৎ উদগমের দিকে চোখ পড়ায চোখ নিবিষ্ট হয়েছিল কিছুক্ষণ সেখানে। ফলে, মন সাঁতবাচ্ছিল বমাব জন্মের আগেব নানাবকম নাবীদের শৈবাল ও স্মৃতিব পৃথিবীতে।

চুরুটটা তুলে নিলেন।

'তুমি কি করে মনে কবলে আমি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটিনি তোমাব জন্যে?'

বমা কোনো উত্তব দেবার আগেই প্রভাসবাবু বললেন,'আমাকে সন্দেহ হচ্ছে তোমাব? আচ্ছা, আমি ব্যাগ বার করে দেখাচ্ছি—' কিন্তু ব্যাগ বাব করবাব আগে চুবটটা জ্বালিযে নেযা দবকাব, দেশলাই কুড়িযে নিলেন।

'ভুল বুঝলে তুমি-আমি বলেছিলাম ইন্টাব ক্লাসেব টিকিট কেটে একসেস্ দিযে আমাকে ফার্স্ট ক্লাসে আনলে বুঝি—'

ব্যাগের থেকে টিকিট বের করে রমার দিকে ছুঁড়ে মাবলেন প্রভাসবাবু।

বাতাসে উড়ে ছিটকে বমার স্লিপারের চাপে আটকে গেল।

'পা দিযে চেপে ধবলে?'

'না-হলে টপকে পড়ছিল ত—'

'কোথায? নদীতে? তাহলে ঐ গুণচটগুলো আছে কী করতে?'

টিকিটটা কুড়িযে ফিরিযে দিল রমা-কোটের ভেতরের পকেটে আটকে রেখে দিল প্রভাসবাবু।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা? ধর্মপুর?'

ডেকের ওপর খানিকক্ষণ পায়চারি করে ফিরে এস রমা বললে, 'ভারি চমৎকার বাতাস, রোদটা গরম দুধে মেশানো ডাবের জল আর-কি ! তোমাকে যে ডাক্তার খেতে বলেছিল-সেই রকম। আকাশ বেগুনি নীল নয়, কিন্তু সে রকম আকাশ কি কোথাও আছে পৃথিবীতে? এ আকাশটা নীলচে— কিন্তু কোথাও মেঘ নেই । কিন্তু নীলচের চেয়ে বেশি নীল, তোমার বাইফোক্যালে ধরা পড়বে । আমার চোখ আগের মত ভাল নেই। সত্যিই বেশ নীল, শরৎকাল?'

প্রভাসবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। পাশের তাল-নারকোলের জঙ্গল থেকে একটা চিল সাঁই সাঁই করে উড়ে- এসে জাহাজের আগে এগিয়ে মুখিয়ে গেল- দেখলেন প্রভাসবাবু । সেটা পিছিয়ে পড়ে গেল।

'কোথায় চলেছি আমরা?'

'নিশিন্দা।'

'এ লাইনের শেষ স্টেশন?'

'হ্যাঁ। ওদিকে স্টিমার যায় না। এই এক মাসের জন্যে যাচ্ছে তারপরে বাতিল করে দেবে।'

'নিশিন্দা পৌঁছুব ত সেই একটার সময়?'

'যদি চরে না ঠেকে জাহাজ—'

'কী করে ঠেকবে- ফট্‌ফটে রোদে চলছে -কুয়াশা নেই ত—'

'সে-সব সারেঙ মন্ত্র পড়ে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গাজির হুকুমে বালির চর পোষ মানে না, ভর দুপুরের সূয্যিতেও না, তার নিজের এলাকা বুঝে কাজ করে'

'না, চরে ঠেকবে না।

'চাকা ভাঙে মাঝে-মাঝে।' প্রভাসবাবু বললেন, 'স্টিমারই বটে। এ-সব স্টিমার তৈরি হয়েছিল কবে জানো?' মেয়েকে জিজ্ঞেস করছিলেন প্রভাসবাবু। কী যেন কী মনে করে অবচেতনার থেকে উত্তর জুইয়ে গেল তাঁর, চুরুটটা দিয়ে দূর রৌদ্রের দিকে নিরূপণ করে আস্তে-আস্তে বললেন। কী যেন বললেন, শুনল না রমা।

রমা বাটলারকে ঢুকতে দেখে নিজেদের দু'জনের জন্য এইবারে আর-দু' কাপ চা এবং পরে, ভাত-মাংস ইত্যাদির ফর্দ ঠিক করে দিয়ে স্টিমারের চাকায় কাটা জলের শব্দের দিকে কান পেতে রইল।

গায়ের ওপর যে-খাড়া রোদটা এসে পড়ছিল তার থেকে খানিকটা দূরে একটু ছায়ার দিকে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে রমা বসল।

চুরুট নিভে গেছে ; পরে জ্বালিয়ে নেবেন।

এ রকমভাবে শূন্যে মিলিয়ে যাবার কথ নয়, কিন্তু তবুও মিশে গেছে, খুব কম জিনশই টিকে থাকে—' প্রভাসবাবু মাইলটাক নিঃশব্দতার ওপারে বিন্দু রেখার মত একটা বাজকুড়ুলের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'কার কথা বলছ?'

জাহাজের চাকার জলকাটার শব্দ খুবি ভাল লাগছিল রমার, বেশ ভাল লাগছে রোদের ঠিকরে আসা আঁচটুকু। এতক্ষণে বাতাস বাইরের রোদে-রোদে খানিকটা গনগনে হয়ে সকলের একটু শীত-শীত ভাবটাকে মানুষের প্রাণের দাবির অনুপাতে স্নিগ্ধ করে রাখতে পেরেছে।

প্রভাসবাবু চুরুটে টান মেরে চলেছিলেন, সেটাকে নামিয়ে রেখে বললেন. 'আকাশ সেই সকাল থেকেই নীল, চারদিকে উঠতি রোদ, জলে ঝরঝরানি, সাদা সূয্যি তার্পুলিনের পর্দাটা সরালেই দেখতে পাওয়া যায়, বাতাস আর বাতাস, জাহাজ চলেছে নিশিন্দার দিকে, দুটো বাজকুড়ুলকে দেখলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।'

'জাহাজ দেরি করে আজ নিশিন্দায় পৌঁছবে মনে হচ্ছে আমার।' রমা বললে।

প্রভাসবাবু চুরুটে টান দিয়ে বললেন, 'চরে ঠেকে যাবে আন্দাজ করছ?'

'না- না'

'তবে, চাকা ভেঙে যেতে পারে?'

'না। এমনিই বড্ড ঢিমে।'

'লাইন ত নিশিন্দার—হাঃ হাঃ—খুলনা যাচ্ছে ত—ঢাকা যাচ্ছে না —ত'

'চা আনতে বাটলার বুড়ো হয়ে গেল দেখছি

সূচীপত্রে যান

নিশিন্দার লাইন ত।'

মাদারিপুরে কী-রকম জোরে যায়?'

'তেরছা কান্নিক মেরে মনপবনে উড়ে যায়।'

'নিশিন্দার চেয়ে ভাল?'

'চড়ে দেখবে একদিন!'

'এ দিক দিয়ে স্টিমার তারপাশার দিকে যায়?'

'ঐ যে বাজকুড়ুল—দেখেছ তুমি?'

রমা প্রভাসবাবুর তর্জনীর দিকের নীল আকাশের খোলা বহরটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'চিলের মত পাখি। নিশিন্দায় গিয়ে ডাকবাংলোয় উঠবে?' বাজকুড়ুলের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রভাসবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'ডাক-বাংলো নেই। দেখেছ ত দু'টো বাজকুড়ুল। খুব পরমাই ওদের—দু'টো পাখি একসঙ্গে থাকে—একশ বছর। তুমি ভাবছ, একটা মরে গেলে বিধবা বিবাহে আপত্তি আছে কি না মেয়েটার? ওদের একবারই বিয়ে। প্রায়ই মেয়েটা মরে যায়—পুরুষ পাখিটাই শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে—একা—আমার মতন। মরবার সময় হলে দক্ষিণ সমুদ্রে দিকে উড়ে যায়।' প্রভাসবাবু তাকিয়ে দেখলেন রমা ঘুমিয়ে পড়েছে। এ রকম সরস কথার ভেতর? মনটা দমে গেল তাঁর । বাজকুড়ুলের কথা ভাবতে গিয়েছিলেন তিনি—ওরা ত আকাশ, নক্ষত্রযানের জীবসব; মাটির সঙ্গে ওদের কী সম্পর্ক? প্রভাসবাবু চোখ বুজে একটা বেদী খাড়া করলেন—নিজের চেষ্টায় আচার্য বসে আছেন বেদির ওপরে; বেদিটা ইউয়ূনিভার্সিটির না ব্রাহ্মসমাজের? আচার্য মশাই শান্ত হতে বলছেন—'শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল', গানটা আগেই গাওয়া হয়ে গেছে—কিন্তু কেমন একটা বৃহৎ অশান্তি ডুকরে উঠছে তাঁর গলায়; কিন্তু-প্রভাসবাবুর মনে হচ্ছিল গলাটা মোলায়েম তবুও—

'ও তুমি! চোখ মেলে বিস্ফরিত করে বললেন প্রভাসবাবু—'ও তোমার গলা?'

'হ সাইব। চা-বিস্কুট আইন্যা দাঁড়াইয়া আছি। টোস্টফোস্ট পাওয়া যাইব না, নিশিন্দার লাইন—বোঝেনই ত। আপনারা ত হিন্দু মানুষ—খাসি আছে, খাইবেন?'

'খাসি?'

'মোরগের মধ্যে খাসি আছে এক পদ; হোনেন নাই?'

'পাখি আবার খাসি হয় না কি?

'হয় কত্তা, ভয় নাই, পাখিই খাওয়াইমু—তবে হিন্দুর দাঁত আর জিভ—আব মোছলমানের জিভ আর দাঁত—ব্যাসকম আছে কত্তা—জিন্না সাইব—'

'শক্ত মাংস হবে?'

'খাসি শক্ত হইব না? দাঁত নাই বুঝি?'

'আছে, তবে—'

'লকল দাঁত?' বাটলার হাত কচলাতে-কচলাতে হেসে বললে,. 'ঠ্যাকব না এরফান সাইব লকল দাঁত লাগাইয়া টাইন্যা ছিড়্যা খাইল না?'

'মুর্গি আছে?'

'মুর্গির কথাই ত কইলাম, ছাগল খাসির কথা হয় নাই।'

'না। আমি বলছি মাদি—ডিম পাড়ে যে-পাখি—'

. কথা শেষ হবার আগেই জিভ দিয়ে চক্‌চক্‌ শব্দ করে বাটলার বললে, 'কান হালায় মিথ্যা কথা কয়—হেই পদ থাকলে হিন্দুরে আমি খাসি খাওয়াইমু ক্যা?'

'মাছ আছে?'

'ক্যা? মাংসের কী হইল?'

'আত শক্ত মাংস খেতে পারব না।'

'আপনার মাইয়া, হ্যাও খাইব না?'

'মাংস?'

'হ, গোস্তের কথাই জিগাইছি কত্তা। খাসি না খাইলে রুঠা পদ আছে—কোনোটাই জাঠ্‌ঠি হইব, কিন্তু মাইয়ার দাঁত ত লকল না হুজুর, সব তার লাহান কইট্যা জাঁতি দিয়া ছেইচ্যা খাইব—দুই মাড়ির

দাঁত দিয়া হাবড়াইয়া। আপনার মাইয়া ত খুব জুয়ান—খপসুরাতই বা কম কিসে—' রমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বাটলার বললে,'এহ রকম চিজ হামেশা পয়দা হয় নাকি মনে করছেন আপনে?' চুরুটটা মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে নিলেন প্রভাসবাবু।

'পাকিস্তান হইব নাকি কত্তা?'

'হবে শুনছি।'

'আউজগাই?'

'হ্যাঁ—শিগগিরই।'

'আপনারা পাকিস্তানে থাকইয়া না কত্তা?'

'দেখা যাক্—'

'থাইক্যা যায়ন মাইয়াপোলা লইয়া, আণ্ডাবাচ্চা আরামে থাকব।'

প্রভাসবাবু চুরুটে টান দিয়ে বললেন, 'মিলেমিশে সুখে থাকতে পারলেই ভাল; মাছ খাওয়াও বাটলার—

'মাইয়া গোস্ত খাইব?'

'না।'

'ক্যা? জাঠ্ঠি? কইতরের মাংসের কিমা খাইবেন বুঝি কত্তা? মাঝগাঙে পাইবেন কই? বাসনা কি আছে খাইবার? ইলসা?'

'আছে ইলিশ?'

'আইছিল ত দুই নাও—ভোরডার সময়।'

'দুই নৌকো ইলিশ? কিনে রেখেছ নাকি?'

'দুই নাও ইলশার কি কামডা কত্তা? রাত পোয়াইল না—ক্যাডা গা তোলে? গা তোলোনের নি কথা তখন? জুত্তা মারি ইলশার মুখে; আইলো-দুই নাও ইলশা বেয়ানডার মুখে। মাইনষে ঘুমাইব—না হালাগো সঙ্গে দর কচকচি করব—হালার কুত্তার জাত'

'কে?'

'মাঝি হালা গো কথা কই, হালার জাইল্যা—'

'কেন, দরে বনল না?'

'ক্যাডা দর করে? ফুটানি ঝাড় গিযা মির্জাপুরের হাটে—আমাগো সঙ্গে কথা কইতে আসিস না। বিলশা কাঁটার ইলশা গোদার ফুটানি সারেঙ বাটলারের সঙ্গে—নিশিন্দার জাহাজের। জাইল্যাব ডিম, প্যাট গাইলা দিমু না?'

'কী নাম তোমাব বাটলার?'

'আইজ্ঞা, কত্তা , গফফুর আলি—'

'ইলিশ মাছ কেনা হল না?'

গফুর একটু ওজন করে প্রভাসবাবুর দিকে তাকিযে বললে,'ঐ চামার গো থন?'

'চামার ত বটেই। কিন্তু খুচরো কিছু কিনে রাখলে মন্দ হত না, কত চেযেছিল?'

'দরদাম হইল কই; দবদাম কববার মাইনেষেরে পাইল কই? মাসুদ চাচা ত বেহুঁশ ঘুমে।'

'মাসুদ চাচা কে?'

'জাহাজের বড় চাচা—'

'সারেঙ?'

'আইজ্ঞা না—সারেঙ বাটলাব না,পাক্কা বুইড়া, প্যাডে-প্যাডে কাছিমের লাহান না—কথাডা কইলে ফ্যালাইন্যা না বুইড়ার; বেশি ফরমান দেওইন্যা মানুষ না বুইড়া, কিন্তু যা দিব—'

গফুর একবার গোঁফের ওপর আঙুল চালিয়ে নিয়ে বললে, 'তামাম জাহাজ মানব বুইড়াকে—'

'মাসুদ চাচা ঘুমিযেছিল ভোরবেলা?'

'হ। রাইত জাগে চাচা। জাহাজের খোলডা প্যাঁচাইয়া চাক্কির লাহান ঘোরে দিনরাইত—ঘোরেঘারে দ্যাহে—হুকুমের কথা কইয়া খালাস না—কাজ পয়দা করাইয়া ছাড়ব। বুইড়া কম না—আঠালির ঠাল আব বদনা হাতে লইযা হাবাড্ডা বেইল এমুন—যেন টাট্টিতে চলছে! কিন্তু কোথায়

সূচীপত্রে যান

টাট্টি? হালার টাট্টি !.... বুইড়া–'বলতে বলতে গফুর নিজেকে টেনে গুটিয় নিয়ে বললে , 'হ। বড় রাত জাগাইন্যা দোষ আছে বুইড়ার।'

কেন, মাসুদ চাচা ছাড়া ইলিশ মাছের দর আর কেউ করতে পারবে না?'

'পারব না ক্যানে হুজুর? কিন্তু ঐ নক্সায় পারব না। কথার একটা ভারি বাহাইরা ডাইল্ আছে চাচার। লেখাপড়ি না জানলে হইব কী? দমভারি মুনসি গো কয়; ওদিক থাক!'

'ও, খুব গুণী লোক ত তাহলে—'

'জবর গুণী! আমার মনে লয়—হাতেমতাই রাইতে-রাইতে কিছু দিয়া থুইয়া যায় বুইড়ার কানে—।'

প্রভাসবাবু চায়ের পেয়ালার দিকে একবার তাকিয়ে নেব। চুরুটটার দিকে তাকালেন। বাইরের রৌদ্রের দিকে তারপব। চায়ের যে চেহারা—খেতে ইচ্ছা করছিল না। রমা ঘুমিয়ে আছে।

'কথাডা কি হারামির হইল?'

'কোন কথাটা?'

'ঐ যে কইলাম হাতেমতাইর কথাডা? ঐযা না কইয়া খোদার কথা কইলে পারতাম—কী কয়ন কত্তা? খোদা তালাই বানাইছে শিখাইছে মাসুদ চাচারে—কী কয়ন?'

'হ্যাঁ—' চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে প্রভাসবাবু বললেন,'আল্লাতালা রাগ করবেন না, মানুষের মুখের কথা তিনি শোনেন না, মন ঠিক এক জায়গায় থাকলেই হল, ঠিক আছে তোমার—'

গফুর একটু অবেশে ঝুম মেরে রইল; বুজে-বুজে আসছিল তার চোখ; তারিয়ে-তারিযে বললে, 'কথাডা কি লালন ফকিবেব হুজুর? যেইডা কইলেন আপনে?'

'ফকির সাহেব আরো ঢের ভাল করে বলেছেন আমি যা বললাম—'

'হাচা কথাডা।'

গফুর বললে, ইলশা দুইটা-চারটা রাখছিল নাকি আকবব মিঞা—ক্যাডা কয়? মাসুদ চাচা না জাগলে ইলশার কথা কওনেব জো নাই—'

'এখনও ঘুমুচ্ছে মাসুদ চাচা?'

'আইজ একটু বেশি ঘুমাইব। কাইল রাইতে রাইত পোযানোর যম ইলশার নাওগুলা পাড়াপাড়ি বাজাইল না? ঘুমের বিষ মাইরা গেল মাসুদ চাচার খোয়াইয়া উঠব ত—এগারটা বাজাইযা ছাড়ব—'

'ও—'

'আকবর গিযা কয়েকটা মাছ রাখছিল'

'কটা?'

'আটদশটা হইব—

'আছে মাছগুলো?'

'আছে না? যাইব কোথায়? খাওনের চিজ । কিন্তু কোথায় রাঁধাইয়া রাখছে চাচা, খোদা ছাড়া ক্যাডা কইব। গা তোলনের নাম নাই—একটা বাজাইয়া ছাড়ব চাচা। ভোগাইয়া ছাড়ব।'

প্রভাসবাবুর চুরুটটা তাঁর দু আঙুলের ফাঁকের ভেতর জ্বলছিল; প্রায় পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে; সেটা না টেনে গফুরকে তিনি বললেন,'আর কোনো মাছ আছে?'

'পাঙাশ আছে-খাইবেন?'

'না—' প্রভাসবাবু রমার দিকে একবার তাকালেন,বেশ ঘুমুচ্ছে, 'পাঙাশ খাবার অভ্যাস নেই গফুর।'

'খাইয়া দ্যাখেন না, গরম গরম পাকইয়া দি, মোটা-মোটা মিষ্টি ভাত হইব আউশের, বালাম কয়ন বালাম দিতে পারি, বগা লেমুখালির খুব সরস চাউল অছে, পাকাইয়া দি—পাঙাশেব রসা—হালার ঝিঙা ট্যাড়শ শসা কুইচ্যা, ছিটকি মরিচ বাইট্যা, চোখ নাক জিভ দিযা জল বাইর কইরা ছাড়ব, জীবনে পাঙাশ ছাড়া কিছু খাইতে চাইবেন না আর; গফুরের লাহান পাঙ্গাশ পাকাইয়া না দিতে পারলে হেই বিবিরে তালাক দিবেন এমুনি খুন চড়ব কত্তার মাথায়—'

প্রভাসবাবুর মনে হল খুব সিধে কথা বলছে গফুর, বেশ প্রাণের গরমে। কিন্তু তবুও পাঙাশ মাছ কোনোদিন খাননি তিনি, নানারকম আমিষেরই গন্ধ সহ্য করতে পারেন না, দু-এক রকমের মাংস শুধু খান—মাছের বেলা বাছবিচার ত আরো বেশি, ইলিশ মাছও একটু নরম হলে ভাল লাগে না, অনেক

ঋতুতে টাটকা হলেও ভাল লাগে না, পাঙাশ ত কোনোদিনই কোনোক্রমেই বরদাস্ত হয়নি।

'ডিম আছে?'

গফুর হাসতে লাগল।

'কেন, হাসছ কেন?'

'দেখি মাসুদ চাচারে জিগাইয়া—'

'কী জিজ্ঞেস করবে?'

'আণ্ডা ত আছে হুজুর, কিন্তু পাকাইব ক্যাডা? নিশিন্দার জাহাজে আণ্ডা পাকাইবার মানুষ কই? আমরা ত পাঙাশ মাছ আর ইলশা পাকাইয়া হাত মিঠা কইরা ফেলাইছি—এগুলার থনে ভাল খাবার ক্যাঁক ক্যাঁকের আণ্ডা? হাসাইলেন কত্তা—' গফুর মাথা কাত করে চিন্তিত মুখে একটু ভেতর থেকে হেসে বললে,'আণ্ডার মামলেট বানাইয়া দিমু?'

'না। ডিমের ডালনার কথা বলছিলাম আমি—'

'আণ্ডা সিদ্ধ হইযা যাইব ত কারি পাকাইলে। আণ্ডার চামড়া হইব রবাটের লাহান, আর কুসুম বালির মণ্ড, খাইয়া সুখ পাইবেন? পাঙাশ না খাইযা সিদ্ধ আণ্ডার সালুন—এই পদ চায়ল নাকি আপনে?'

'হ্যাঁ, রেঁধে দিতে পারলে ভাল হয।'

'আপনার মাইয়াও আণ্ডার কারি খাইব?'

'তা খাবে—বেশি ঝাল দিও না।'

'কয়ন ত—মোটেই দিমু না। আদা প্যাঁজ দিয়া পাকাইয়া দিমু। গরম মশলা কিছু দিমু। গোলমরিচ দেওনের কথা কী কয়ন?'

'দিতে পারো—বেশি না।'

'হ। বোঝলাম। হাঁসের আণ্ডা?'

'হাঁসমুরগি-যা খুশি।'

গফুর হেসে উঠল।'কত্তার কথার একটা ভাইল্ আছে। আণ্ডা পাইলেই হইল, কাক কইত্তরে ঠ্যাহে না।'

হাসি শুষে ফেলে মুখ গম্ভীর করে বললে, 'আচ্ছা দিমু-হাঁসের আণ্ডাই।'

গফুর কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে দেখল রমা ঘুমুচ্ছে; প্রভাসবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারপর বললে, 'হারা রাইত জাগল বুঝি মাইযা? ঘুমে ত হুঁশ নাই। রাইত উজাগর করে? হাদি কবছে?'

'না।'

'কযন কি? জুয়ান মাইয়া ত আপনার; জৈবন ফারাক গেলে হাদি দিবেন আপনে?'

'দেব আজকালই।'

'লাগাইযা দেন। নইলে মাইনষে কইব কি আপনেরে! বাহারেব মানুষ কইব। মাইয়রে পাঙাশ রাইধা দি?'

'মিছেমিছি কেন কষ্ট করবে তুমি গফুর; খাবে না,অভ্যাস নেই। ঐ ডিমেব ঝোল রেঁধে দিও আমাদের দু'জনের—যদি থাকে আলু একটু বেশি দিও ডুমো-ডুমো করে কেটে।'

গফুর একটু নিরাশ হয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে,'হ। হিন্দুর ডিম অনেক পাকাইছি। কওয়া লাগব না।'

রমার দিকে আর-একবার তাকিয়ে প্রভাসবাবুকে বললে,'আব কী খাইবেন? ডাইল?'

'তা দিও।'

'কোন পদ খাইবেন—মুগ না মাসকলাই? চাঁদপাশাব মুসুরি কিছু আছে আকবইরার কাছে। তামাম মুল্লুকে অমন ডাইল পাইবেন কত্তা?'

'চাঁদপাশার ?'প্রভাসবাবু একটু উশকে উঠে বললেন, 'তাহলে ত ফতে করেছে আকবর। হ্যাঁ, মুসুরিই হোক।'

'আর? আণ্ডার মামলেট?'

'দিও—দিও—'

'চাউল খাইবেন কোন পদ? মোটা—বেশ মিষ্টি হইব।প্যাটে থাকব কয়েক ঘণ্টা; নিশিন্দা গিয়া খাড়াকখাড়ি খাবার না পাইলে প্যাট জ্বালা করব না; প্যাটে আউশ আছে, প্যাট ঠাণ্ডা থাকব।'

'মোটা চাল খেয়ে হজম করা কঠিন—'

গফুর তেরছা চোখে চেয়ে হেসে বললে, 'জুয়ান মাইয়াও পারব না? এইটা কী কইলেন"

প্রভাসবাবাবু বললেন,'দেশগাঁয়ে থাকত যদি, দৌড়ধাপ করত, ঢেকিতে পাড় দিত দুমদাম করে, তাহলে পারত।'

'রয়ন, রয়ন,' গফুর দু'আঙুল দিয়ে বাঁদিকের গোঁফের কোণে দু-চারটে মোচড় দিয়ে বললে, 'ঢেকিতে পাড় দেওয়া লাগব না, সোনার মাইয়া, মাইয়ারে সরস চাউল খাওয়াইমু আমি—রমজাইনার কাছে লেমুখালির খুব চিকণ ইলাহিপদ আছে, পোলাউ খাবার লইগ্যা গুইজ্যা রাখছে হালা, হালারে ফেউল্যাইয়া বাইর করতে হইব।'

'না, না,অতটা দরকার নেই,' প্রভাসবাবু চুরুটটা ফুরিয়ে গেছে টের পেয়ে নদীর ভেতর ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'মোটামুটি বালাম পেলে হয়ে যাবে আমাদের।'

'ক্যান? রমজাইনা দিব না ক্যান?' গফর গলা খাঁকারি দিয়ে বললে, 'আপনারে লইয়া ত কথা না, মাইয়ারে লেমুখালির বস্তার থেউকা খুইলা খাওয়াইমু আমি—লগে-লগে আপনেও বাদ যাবেন না কত্তা; নিশিন্দা জাহাজের বাটলারের কথা মনে থাকব মাইযার। রমজাইনা ট্যাডনের কথা হুইনা ডর লাগল আপনের। হালা ট্যাডন!'

প্রভাসবাবু পকেট থেকে আর-একটা চুরুট বের করে বললেন, 'খুব ভালবাসো তুমি আমাদের। কিন্তু আজ তুমি এমনি শাদামাঠা বালাম চালই দাও। এসব লাইনে প্রায়ই ত যাওয়া-আসা করতে হয় আমার। লেমুখালির চাল খাওয়া যাবে আর-এক সময়।'

'আপনার কথার মুড়া পাইলাম না আমি হুজুর—' গয়ুর তার সাদা চাপকানের পিঠে একবার ডান হাত ঘষে নিয়ে বললে।

'কেন?'

'না।'

'খুব মিহি চাল খাবার দরকার নেই আমাদের ।'

'মাইযারও দরকার নাই?'

প্রভাসবাবু বললেন, 'আমরা বছর ভরেই ত মাঝারি চাল খাই।'

সে কথায় কান না দিয়ে গফুর বললে, 'চাউলডা রমজাইনার ক্যাডা কইল আপনেরে ? হালার লগে একটা গোস্তাগুস্তি হইব ঠাওরাইযা নাপাট দিলেন বুঝি আপনে?'

'চালটা রমজানের নয়? তবে কার?'

'মাসুদ চাচার হইতে পারে, আকবইরার, সারেঙের, আমার, মাইয়া ত একপো চাউলের ভাত খাইব, আপনে আধ পো চাউলের, এই দ্যাড় পো চাউলে বগা লেমুখালি ফতুর হইযা যাইব কত্তা?'

প্রভাসবাবু পকেট থেকে দেশলাই বার করলেন, নতুন চুরুটা জ্বালাতে হবে।

'ইস্টিমারের বাটলারের দুইটা-চাইরটা শখ থাকে, রমজাইনা খালাসি হেই শখের মুড়া পাইব না। চাউলের আড়ত আর দিলের শখ এক জিনিস না কত্তা।'

দেশলায়ের বাক্সটা হাতের ভেতর নাড়াচাড়া করতে লাগলেন প্রভাসবাবু; টিপ দিয়ে খুলে কাঠি বের করতে গেলেন না সরাসরি।

'আণ্ডা খাইবেন ক্যান— ইলিশ মাছই দিমু।'

'কোথায় পাবে?'

'আকবইরার সাধ্য নাই, ঘুমাইলে সারেঙের ডর লাগে মাসুদ চাচার গায়ে হাত দিতে। আমিই দিমু চাচার গায়ে হাত; মাইযারে মাছ খাওয়াইমু।'

'ও—' প্রভাসবাবু দেশলাইটা পকেটের ভেতর ডুবিয়ে রেখে আবার আস্তে-আস্তে বাইরের আলোব ভেতর বের করে এনে বললেন,'মাসুদ চাচা। এখন ঘুমুচ্ছে?'

'হ। একটা জাইক্কর দিয়া গা তুলব। দশ বাও পানির নিচে গেলেও ট্যার পামু, কান পাতা লাগব না। জাগে নাই এখনও,ঘণ্টা-দুই আরো গড়াইব।' গফুর বললে-'আকবইবা, কী কমু আপনেরে কত্তা, রাইত চাইরটা তখন, ইলশায় নাও লাগল আইয়া জাহাজে, আমরা ঘুমাইছি সব, মাসুদ চাচা ঘুমের মধ্যে মইবা আছে, মইরা কাঠ, দশ ঘণ্টার আগে জাগব না, মাসুদ চাচা ছাড়া নিশিন্দার জাহাজে ইলশার দরের প্যাচ বোঝে ঘেটির উপুব হেই ক্যাল্লাড়া আছে কোন হালার?' গফুর একটু দম নিয়ে বললে, 'আকবইরা হালার আছে। দুই নাও

ইলশা জাইল্যারা বাহাত্তের ট্যাহা চাইলে তিহাত্তের ট্যাহা দিয়া কিইন্যা নিবার মুরাদ আছে হালার।'

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালিয়ে নিলেন।

'ষাইট ট্যাহা দিয়া হেই বাহাইত্তর ট্যাহার মাল কিনবার পারে সারেঙ, পঞ্চাশ ট্যাহা দিয়া আমি, পঁচিশ ট্যাহা দিযা চাচা। চাচা কইব,পঁচিশ; জ্যাইল্যারা কইব,হ,হ, বিশ টাকায় লিবা না চাচা? দাঁত নাই, মাড়ি দিযা চাবাইয়া খাইবা না? না, চাচি চাবাইয়া দিলে পাতের ছাবা খাইবা? বুইড়া ইলশা খায! লগি দিয়া জাহাজের পাটাতনে বাড়ি মাইরা হুম হুম কইরা ভাইস্যা যাইব নাও, মকিবপুরের বাজারের ফাইড়াগুলার কাছে মাছ বেইচ্যা ফেরোনের পথে তবু এক নাও মাছ দিয়া যাইব চাচারে—'

'কারা?'

'ঐ হালারাই।'

'কত টাকায়?'

হেই পঁচিশ।আবার কত? এউক্কা আধলাও বেশি না। হালারা ঢাইল্যা দিয়া যাইব। চাচা,বগল দিয়া চাবাইয়া খাইও,কইব, কিন্তু মাছ লইয়া পাইজামি করব না, দব লইযা খ্যাচাখ্যাচি লাই।;

প্রভাসবাবু চুরুটে টান মেরে-মেরে গফুরের কথা শুনছিলেন; আস্তে-আস্তে শাদা ছাই জমে উঠেছে চুরুটের মুখে, 'একটা নৌকোয় কত মাছ থাকে?'

'আগে বেশি থাকত, আইজ কাইল কম—'

'কী রকম মাছ? টাটকা?'

'একটু বাসি না হইলে ইলশা খাইয়া সুখ?'

প্রভাসবাবু টোকা মেরে চুরুটের ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন। ভুল হযে গেল মনে হল তার। ছাই-এর আস্তরটা থাকলে বোধকরি চুরুটের আগুন টেনে সুখ আছে; অবিশ্যি চুলচেরা হিসেব কবে দেখেননি কোনোদিন।

'ভাইয়া ব্যাঙের লাহান ফাল মারল।'

'কে?'

'আর কে—আকবইরা। বেইন্না রাইতে তখন মাসুদ চাচা ঘুমাইযা, সারেঙ ঘুমে,আমি ঘুমে, রহিম চিৎকার পাইড়া কইল, 'যাইছ না আকবইরা, ইলশাব নাও আইব-যাইব, দব কবব কাল মাসুদ চাচা, ইলশা খুব উজায় রে আইজকাইল,নাওযে-নাওযে ছাইযা গ্যাল দ্যাশ, তুই ফ্যাল দ্যাছ ক্যা? কিন্তু কে কার কথা হোনে? তেলাচোবারে ঠেহাইযা বাখব নি টুনটুনি? হালারা আটটা মাছ গড়াইযা দিল বোকচন্দ্রবে, চাইবডা ট্যাহা ছিনাইযা লাইযা গেল আকবইরাব দাড়ি মোচড়াইযা।'

আটটা ইলিশ মাছ চার টাকায়৭ প্রভাসবাবুর কাছে সস্তাই মনে হল আজকালকার বাজাবে। কিন্তু কিছু বলতে গেলেন না তিনি। এবা হযত কমে পায। মাসুদ চাচা ঘুমিযে আছে,জেগে থাকলে একবাব আলাপ করে আসবেন নাকি ভাবছিলেন প্রভাসবাবু। সাবেঙ বাটলাব খালাশি জেলে সকলকে অনুগত কবে রাখবাব সহজ প্রাধান্যে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে হয তো চাচাকে—গফুর বাটলাবেব?

'আপনে আব মাইযা নিশিন্দায যাইবেন ত?'

'হ্যাঁ।'

'বেড়াইতে?'

'না। একটু অফিসের কাজ আছে।'

'দুই-চার দিনে হইব কাজ?'

'তা হবে।'

'এই জাহাজে ফিববেন না কত্তা—না অফিসের বোটে?'

'আপিশের কোনে বোট নেই, বাসে ফিরতে পাবি।'

'তা ফেরা যায বটে, গইনার নৌকোয়ও ফেরা যায. কেরাযা নৌকোযও', গফুরকে একটু দমে যেতে দেখা গেল।'

'হুজুব যদি বাটলাবের কথা মনে না রাখেন, মাইযাও মনে না রাখে আমি কইব না কিছু—আপনাব ধম্মে যা লয। আমি কচি মুরগি ঠিক কইরা রাখুম, লেমুখালির এক লম্ববের চাউল আর টাটকা ইলশা খাইবেন না আইযা আপনে আর মাইয়া ফেরোনেব পথে?'

'দেখি—' প্রভাসবাবু খুশি হয়ে হেসে বললেন। গফুরের মুখের দিকে তাকিয়ে পর্যালোচনা করে তারপরে বললেন, 'বাসে যা গাদাগাদি; স্টিমারে ফার্স্ট ক্লাসে ফিরতে পারলে কথা আছে কী আর। তাড়াতাড়ি ফেরা যায় বাসে—কিন্তু আমার তাড়া নেই। স্টিমারেই ফিরব, তবে খোদার হাত।'

নিজের মনের খুশি মুখে উপচে পড়ল না গফুরের, কিন্তু প্রভাসবাবুর সিদ্ধান্তটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে বাটলারের—তার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলেন তিনি। না, খুশিই হয়েছে বাটলার—দুই চোখের কপালের কোঁচকানো রেখাগুলো একটু আলগা হাসির টানে পালিশ হয়ে এসেছে।

'আইবেন কত্তা, ভুলবেন না, ধম্মের কিরা।'

'কিরার দরকার নেই, মুখের কথায় বলেছি,যদি বেঁচে থাকি।'

'না বাঁচনের কী হইল? মাইয়ার সোমখে বইয়া এইটা কী কুডাক পাড়বার চাইলেন আপনে। আরে ধম্মো—'

'না, এমনিই বলছিলাম, তবে মানুষের সুখদুঃখের মালিক সে ত নিজে নয়, আমি—'

বাধা দিয়ে গফুর বললে, 'ধম্মো, কত্তারে অদৈন্য কইরা দিও, আঁধাইরা কথার খই ফুটাইতে চায় কত্তা, ও সব কথা থাউক এ্যহন, ছ্যাক দ্যান, হকের কথা হইল, আইজ সোমবার, নিশিন্দার থনে ফিরবেন তো বুধবার আমার জাহাজে।'

বুধবার না হলেও বিষ্যুৎবার ফিরব, দেরি হয়ে গেলে শুক্কুরবাব নিশ্চয়ই।'

গফুর ডান হাতটা নিজের মুখের ওপব একবাব বুলিয়ে নিযে বললে, 'হইল। বুঝলাম। একটু গোস্‌সা করলেন নাকি কত্তা?'

'কেন?'

'গলায চাদর প্যাচাইয়া গফ্‌ফুইরা টান দিল আপনারে, নিশিন্দা জাহাজে, হেইডা ভাবলেন নাকি?'

প্রভাসবাবু মুখের থেকে চুরুট নামিযে একটু হেসে বললেন,'তা তুমি না থাকলে নিশিন্দা জাহাজে আমি ফিবতাম কিনা বলা যায না। নদীর পথে চলতে আমাব ভাল লাগে, এ-রকম নিবিবিলি জাহাজে, বাসভাড়া ঢের কম—চলেও তাড়াতাড়ি। কিন্তু তুমি টানছ, তোমার ধর্ম টানছে আমাকে, জাহাজেই সবচেযে ভাল লাগে আমার, আমি প্রাণের কথা বলছি বাটলার।

'হ, হ,' গফুব চোখে দাঁতে মিট মিট করে হেসে বললে, 'কথাডা প্রাণের থন গোথ্‌লাইয়া উঠছে কত্তাব।'

ঠাণ্ডা চাযে একটু চুমুক দিযে দ্বিতীযবার চুমুক দেবাব আগে পেয়ালাটা টিপযের ওপর বেখে দিলেন প্রভাসবাবু।

'মোছলমানেব বাচ্চা হইযা আল্লাতালা না কইযা কইলাম ধম্মো— মাসুদ চাচা হুনলে—'

'কী কবত?'

'খুব তরজুত কবত কত্তা, যাতে চ্যাগাইযা হাঁটতে হয হেই ব্যবস্থা কবত।'

'ও—'প্রভাসবাবু বললেন চাযে চুমুক দেবেন কিনা ভাবছিলেন খুব ফিকে হযেছে চা, মিষ্টি বেশি, পাতাটা সুবিধের নয।

'কোনো হালারে ডরাই না আমি। মাসুদ চাচা টিকব না, চাচার মাটির উপুর তাল-নাইরকোল গজাইব,হেইযার পিডা আর লাড্ডু খাইব তামাম দ্যাশ, চাচা কোথায তখন? কিন্তু ধর্ম আছে। একটা কথার 'অ'কার 'আ'কার ব্যাসকমে কী আসব যাইব? খোদাও যা ধম্মও তা—'অ'কার 'আ'কার ব্যাসকম।

ব্যাকরণের মতে 'অ'কার 'আ' কাবের পার্থক্য নয শুধু, তাব চিত্তের ব্যাকরণের কথা বলছে-গফুব, ভুল হযনি হয়তো সেখানে তার।

'এই লাইনে চলেন না আর কত্তা?'

'না।'

'কেমন নদীজঙ্গল দেখলেন? চাইয়া-চাইযা দেখলেন ত বেযালডাব থন ভাল ঠেকল?'

প্রভাসবাবু কিছু বলবার আগেই গফুব বললে, 'মাইযা রইল ঘুমাইযা। নিশিন্দার থন জাহাজ বাইতে ছাড়ব।'

'রাতে? কটার সময়?"

'আটটা, নযটা, দশটার সোম ছাড়ে মাঝে-মাঝে—ঠিক নাই।'

'ও—তাহলে ত সেটা সুবিধে হবে না।'

'ক্যা? আইবেন বইবেন,বাতচিৎ করবেন আমার লগে, আকবইরার লগে, মাসুইদা আসব না, খাইবেন মাইয়ারে লইয়া, খাসি না , নয়ান মুর্গি আর তাজা ইলশা প্রাণ ঠাণ্ডা কইরা, আণ্ডার মামলেট হইব, চাটনি চায়ন তো চাটনি, ফুলবাহাইরা চাউল লেমুখালির—আর চাঁদপাখার গরম-গরম মুসুরি, লবারের লাহান। বেজুত লাগব ক্যা? কী কয়ন আপনে?'

প্রভাসবাবু বললেন,'আমি ভেবেছিলাম দিনের আলোয় ফিরলে সুবিধা হবে, এই যেমন চলেছি ভোর দুপুরের আলোয় বেশ, রোদে,বাতাসে।'

'ক্যা? রাইত কি কামড়াইব কত্তারে? রাইতে হুলাগ নাই?'

'ইলেকট্রিক বাতির কথা বলছ?'

'আছে না নিশিন্দার জাহাজে? জাহাজভর্তি দরমার সিলিঙ ফুইরা-ফুইরা কোম্পানির বাল্. টিপি দিলেই আলো জ্বলব। এই যে বেয়ানডার আলোর কথা কইলেন—এইয়ার থন বালের আলো হুলাগ দিব বেশি।'

সুইচে টিপ দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে প্রভাসবাবুকে দেখিয়ে দিল গফুর—ফার্স্ট-ক্লাসের ডেকে দু'টো পয়েন্ট আছে, দু'টো আলোই জ্বলে উঠেছে। সুইচ নিবিয়ে দিয়ে এসে গফুর বললে, 'ঢাকা-খুলনা লাইনের থিইকা নিশিন্দার লাইনডা খারাপ, বিলাতি কোম্পানির মাথাও খারাপ কত্তা, কিন্তু জেলাপির প্যাঁচে-প্যাঁচে রসের লাহান হালাগো কেরামতিও আছে দুইডা-চাইরডা।'

তা আছে বটে। চাটা খেতে হবে। একবারে না খেলে মাথা ধরবে বিকেলের দিকে। একটু কড়া চা খাওয়ার অভ্যাস প্রভাসবাবুর, ঠিক মতন দুধ মিশিয়ে, ফ্লেভারের চেয়েও পাতায় রসের দিকে নজর রেখে বেশি।

'বাসমতী থেকে নিশিন্দা যেতে কয়টা স্টেশন গফুর?'

'ছয়ডা।'

'কই, একটাতেও ধরল না ত এতক্ষণে।'

'আইলে তো ধরবে।'

'বাস এতক্ষণে মাঝপথ ছাড়িয়ে যেত।'

'হ। নিশিন্দার লাইনডা ক্যাজা।' গপর অন্য কথা কী যেন ভাবছিল, প্রবাসবাবুব মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটার পুনরুক্তি করে গফুর বললে, 'লাইনডা পচা বাঁশের ঘুণ—গোনে—বেগোনে বাসাতে (বাতাসে) ঠনঠন ঝুরঝুর করবার লাগছে। ভেট্‌কি মাইরা পাছাড় খাইব হালা।'

'লাইনটা উঠে যাবে শুনেছি,ঠিক নাকি?'

'হ। ওঠোনের কথা ত আছে।কয়লা কম কত্তা। বাসও আবার পাল্লা দিবার লাগছে। কিন্তু হেইডা একটা কথ না—কয়লাডাই কম।'

'শিগগিরই উঠে যাবে লাইন?

'হ। মাসাবধি আছে।'

'খুলনার লাইনে চাকরিতে চলে যাবে নাকি তুমি?'

'আমি কইমু আব হইব?' গফুর আস্তে-আস্তে গোঁফে প্যাঁচ দিতে-দিতে বললে,'কোম্পানীব মর্জিতে যাওন আর থাকোন। ঘেটিতে লাথি মাইরা পেরির মধ্যে ডাবাইব, না,তকমা পরাইযা ঢাকা-খুলনার বাদশা বানাইব হালারা জানে। চা খাইলেন কই?'

'খাচ্ছি।'

'পাতাডা ভাল ছিল না।'

'কোথে কে কেনা?'

'নিশিন্দার থন। এইবার বাসমতীর থন লাল মাক্রা বুকবণ্ড কিনুম এক টিন—ফিরবার পথে খাইবেন—চিনি হইছে নি?'

'চাযে? হ্যাঁ চিনি ঠিক আছে।'

'দুধ পাওয়া গেল না—বকরির দুধ যা বাকি ছিল কাইল রাইতেই মাসুইদা থুইছে হোধ দিযা। আমি গুইজা রাখছিলাম আগে ভাগে খানিক কত্তা—জাহাজে চিকিন কেলাসের পাসিন্দারগো চা খাওনের লইগ্যা। খাওয়া হোধ দিছে সব। জাহাজে রয়না দিতেই হোধ। আট্টো পেযালা চা বানাইতে হইছে দুই ছটাক বকরির

রস দিয়া। ডাক্কাইত্! কী চুসাচুসি পাছড়াপাছড়ি হেই ছাটুরনি খাইব—হেই গতিকে। হালা—উটকাল চ্যাঙের লাহান ফাল দিয়া মরছি না হারা বেয়ানডা পাসিন্দারগো চায়ের তান্না মিটাইতে —হালা!'

জোব্বার খুতির বেতর থেকে একটা ছোট্ট ময়লা গামছা বের করে মুখ মুছতে-মুছতে গফুর মাথা নেড়ে ইশারায় রমাকে নির্দেশ করে দিয়ে প্রভাসবাবুকে বললে,'মাইয়া যখন আবার চা চাইল ফাঁপরেই পড়লাম। আকবইরা কইল ঘাবড়াও ক্যান মিঞা, যা দুই চামচ দুধ আছে পানি মিশাইয়া পিলাইয়া দেও। কী করুম কত্তা—তাই ত দিছি। চা ভাল হইব কইথন? ধর্মের নাম লইয়া চোখ টিইপ্যা গলায় টান দিয়া চুমুক ত মারলেন দুইটা—চাইয়া-চাইয়া দেখলাম। জুত লাগল না আপনার—পরানডা হেই গতিকে একটু ক্যাজা-ক্যাজা আমার। মাইয়া না ঘুমের থেইকা উইঠ্যা হাউশ কইরা এই চাতে আবার চুমুক মারে!' বলতে-বলতে রমার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে তারপর প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে গফুর বললে—'ঘুমাইয়া সুখ হইল মাইয়ার। জাগাইবেন না; হাউশ মিটলে নিজের থন জাগব।' গফুর একটু গোঁফে হেসে বললে—'হাবিজাবি চা খাইয়া আমারে ফ্যারে ফেলাবার মন নাই মাইয়ার, হেই গতিকে ঘুম, খুব চাঁদপাইলা ঘুম, খুব জবর ঘুম—'

'এই ত চা খাওয়া হয়ে গেল আমার—'শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে প্রভাসবাবু বললেন।

'শুভেনাভে হইল একরকম—' গফুর ময়লা গামছাটা দিয়ে ডান হাতের কব্জি ঘষতে-ঘষতে বললে 'চা খাইয়া আমার কান কাটলেন কত্তা, ফেরোনের পথে আমার হাতের চা খাইয়া জোড়া লাগাইয়া দিয়া যাইবেন। এই গতিকেই নিশিন্দার জাহাজে ফিরতে হইব—আপনার আর মাইযার।'

প্রভাসবাবু হেসে উঠলেন।

'তোমার পাল্লায় পড়ে আমার কানও আস্ত থাকবে না দেখছি—'

'ক্যান?'

'আমি ত টাকাপযসা দিয়ে দাম মিটিযে দেব গফুর—কিন্তু আরো কি পাওনা থাকে তোমার।'

গফুর গামছা দিয়ে কনুই ঘষছিল, গামছাটা বাঁ কাঁধের ওপর ফেলে বললে, 'হেইডা আপনারা খুশি হইযা আমাগে মুল্লুকে থাকলেই মিটব আমার।'

'তোমাদের মুল্লুক?'

'পাকিস্তানের কথা কইছি। হইব না?'

প্রভাসবাবু চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে মুছতে-মুছতে বললেন,'শিগগিরই হবে শুনেছি।'

'হইলে দৌড় বাজাইবেন নাকি কইলকাত্তায? কইলকাত্তা হইযা উইড়া বিহারীগো মুল্লুকে?'

প্রভাসবাবু চুরুটটা নিভে গেছে দেখে দেশলাই বের করে বললেন,'না, কোথাও না।'

গফুর চুপ করে ছিল।

'কেউ-কেউ চলে যাবে হয তো। আমি থাকব ভাবছি।'

'জবরদস্তির কথা কইমু না। কইলকাতার দিকে দৌড় বাজাইতে খুব ফুর্তি হইব অনেকের, কিন্তু এই দ্যাশে না-থাকোনের কিছু নাই,ভালোবাইস্যা থাকোন লইযা কথা।'

প্রভাসবাবু চোখে চশমা এঁটে গফুবের বাঁ কাঁধের নোংরা গামছাব দিকে, তারপর তার চোখের দিকে তাকিযে বললেন,'মানুষ যাবে-আসবে, ঠেকে শিখবে, ধানচালের দরদস্তুব, কাযদাকানুনের কথাগুলোও ভালোবাসার কথা হতে পারত, কিন্তু—'

'কিন্তু কী কত্তা?'

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালিযে বললেন, 'সময লাগবে ঢের।' কিছুক্ষণ চুরুট টেনে গফুরকে প্রভাসবাবু বললেন 'কটার সময নিশিন্দা পৌছবে গিযে জাহাজ?'

'একটা-দুইটা—'

'কোনো ষ্টেশনে আসেনি ত এখনও?'

'না।'

'এত দেরি কেন?'

'হ-দেরি ত হইলই, পাটাতন রৈদে-রৈদে ভাইস্যা গেল, চরকাশিম ছাড়াইয়া যাওনের কথা, ছাড়াইল কই? কয়ডা বাজল কত্তা;

'দশটা,' হাতঘড়ির দিকে তাকিযে বললেন।

'ডাক্কাইত! পয়লা টিশিনেরও লাগাল পাইল না নিশিন্দার জাহাজ। আঁধারকোঁদার নাই, খাড়া ঝিলকি নাই, কুয়া নাই—হাল চকচকাইয়া রৈদে নতুন বৌয়ের লাহান আল্লাদ-আল্লাদ লাগাইল, মাউচ্ছা নৌকোর লগে পাল্লা বাজাইল জাহাজ—' বলতে-বলতে কাঁধের থেকে গামছাটা নামিয়ে কনুই ঘষতে-ঘষতে গফুর একবার নদীখাড়ি, চারদিকের চর, আকাশের রোদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই কমবে চললে চার বজাইব; না বাজাইলেও ভোগাইব। আল্লা!

'কী হল?'

'চাক্কি ভাঙভে।'

'কে বললে?'

'চাইয়া দেখেন—হেই জল,হেই চর,হেই রৈদ—জাহাজ আউগ্যায় কই?

কাউয়া উইড়া যায়, জহাজ চাইয়া-চাইযা দেখে; হট ছুইড়া কাউয়াগুলোরে নদীর পানিতে চুবানি খাওয়াইতে মন লয়।'

প্রভাসবাবু কাকের ওড়াউড়ির দিকে একবার তাকিয়ে গফুরকে বললেন, 'এই-সব পক্ষিরাজ ঘোড়ার লাথি খেয়ে ডেবে গেল বুঝি জাহাজ?'

'হ। খুব জোরেই লাথি মারছে। চ্যাগাইয়া-চ্যাগাইযা উড়বার লাগছে তাই। পছন্দ হইল পাছ দিয়া ভেটকি মাইরা যাইব সারেঙটারে। নতুন সারেঙ!'

'কবে এসেছে?'

'দিন পনের হইল। ফালতু সারেঙ।'

'আগের লোক কোথায়?'

'গোয়ালন্দ লাইনে। মতলব হইল নিশিন্দা লাইন টিকাইব না—' গফুরের নিঃশ্বাসে নিশ্চয়তা না সংকল্প থমথম করছে ঠিক ধবতে পারলেন না প্রভাসবাবু।

'জাহাজ চরে ঠেকল তাহলে—'

'হ। মোড় ঘুবাইয়া চরে হাঁধাইল সাবেঙ, খাড়াকখাড়ি বাইব হইব না; বাইত দশটাব এইকূলে নিশিন্দা পাইবেন না কত্তা—'

'রাত দশটা?' প্রভাসবাবু চক্ষু স্থিব কবে গফুরের দিকে তাকালেন—'সত্যি রাত দশটা?'

'আটটা-লটার এইকূলে না। আমি চললাম।

'কোথায়?'

'আরাম কইরা বহেন কত্তা; জাহাজ এখন জিরাইব, নাস্তা খাইব। মাইয়া জাগল না। ঘুমাউক, ঘুমাউক, আপনাগো নাওনখাওনেব একটা জুত কইরা আহি। নাইবেন না? গোসলখানাব টবে পানি নাই—কবিম দিযা যাইব, কইয়া দিমু। দু-দণ্ড দাঁড়াইযা কথা কইমু যে আপনেগো লগে হেই জুইত নাই। চিকিন কেলাশেব পাসিন্দারগুলা মাক্ষামাক্ষি লাগাইছে—পায ত বাটলাররে ধইরাফাইড়া তামুক কুচি করে—,' বলে ময়লা গামছা দিযে ঘাড় গর্দান ঘসতে-ঘষতে গামছাটাকে জোব্বার খুতির ভেতব ঠেলে দিযে রমা ও প্রভসবাবুর দিকে একবার তড়িৎ চোখে তাকিযে হেসে সাঁ করে পিরিচপেযলাগুলো তুলে নিল গফুর—'তিনপ্যাইখার চরে ঠেকাইল, দণ্ড চাইরের ঢুসাঢুসি, হেইযার পর পীর বদরেব খাসির লাহান ছুটব জাহাজ, চল্লাম কত্তা, ব্যাজার হইবার কিছু নাই, কইবেন মাইযাবে। আইমু।'

গফুর চলে গেল।

এ-সব দেশ স্বাধীন হবার কিছুকাল আগে হযেছিল। নিশিন্দাপুরে সন্ধের সমযই পৌছেছিলেন প্রভাসবাবু। জাহাজ ঘণ্টা দুই চলে আটকেছিল। নিশিন্দাপুবে দু'দিন ছিলেন। ফিরবাব পথে বাসে না চড়ে—গফুরদের জাহাজেই ফিরেছিলেন। খাওযাদাওযা আবামতরজুত—চমৎকার হযেছিল সব। কিন্তু তারপরে ও-লাইনে আর যাওয়া পড়েনি প্রভাসবাবুর। টুরেই বেরনো হয় না বড় একটা। নিশিন্দাপুরেব লাইনটা আছে না বাতিল হযে গেছে খবরটা জোগাড় করে উঠতে পারেন নি। মাঝে-মাঝে মনে হয় বটে গফুর আর তার জাহাজের কথা, কিন্তু নিজেই গিয়ে একদিন সাত নম্বর ঘাটে খোঁজ নিয়ে আসবেন ভাবতে-ভাবতে ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ে যায়, নানারকম কাজকর্ম চিন্তাভাবনা, সাতরকম ধান্দা এসে জোটে, যাওয়া হয় না সাতনম্বর ঘাটে।

সম্প্রতি আবার টুর বাড়িযে দিযেছে সরকার—নিশিন্দাব দিকে নয, অন্য নানাদিকে। প্রভাসবাবু

দু'দিন বসমতীতে বসে কাজ করেন ত তিন দিনের দিন বিছানা বাঁধতে হয়। চামড়ার বড় সুটকেশটা ছিঁড়ে ঢলঢলে নড়বড়ে হয়ে গেছে—কাজ চলে না, মাঝারিটা চুরি গেছে, ছোটটা বেশি ছোট, জিনিসপত্র আঁটে না। একটা টিনের মাঝারি সাইজের ট্রাঙ্ক কিনে গুছিয়ে নিতে হয়েছে কিন্তু সেটাকে নাকচ করে হ্যাভারস্যাক আর বোচকা ঠিক করলেন। এতেও মন খুঁতখুঁত করতে লাগল, পরে বেচু মিস্ত্রি পাইন কাঠের একটা বাক্স তৈরি করে কী যেন কী এক রকম রাফ রং মাখিয়ে দিল, জিনিসটা একটু বেখাপ্পা দেখাল বটে রমা ও বাইরের লোকদের চোখে, বেচু কারিগরের নিজের চোখেও—কিন্তু বেশ পছন্দ হয়ে গেল প্রভাসবাবুর। ঐ বাক্স, বিছানা,একটা ফ্লাস্ক, আর বেশি টুর হলে, একটা ঝুড়ি, এই রকম ব্যবস্থা হল।

দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি, হবে শিগগিরই, জোর বৈঠক হচ্ছে সব চারদিকে,স্বাধীন হবে, দু'টুকরো হবে, কাটাছেঁড়া না করে স্বাধীনাতা ভোগ করাব সম্ভাবনা খুব কম।

প্রভাসবাবুকে এত টুরে যেতে হচ্ছে বলে রমার সম্বন্ধে অবিলম্বেই একটা ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়ল তার। গোড়ার দিকে রমাকে সঙ্গে নিয়ে স্টিমারে নৌকোয় মোটরবাসে ফিরেছেন তিনি; কিন্তু বাসমতীতে রেখে যাওয়াই ভাল—অবিশ্যি যার-তার কাছে রেখে যেতে পাবেন না।

রমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কাছে থাকতে চাস, বল্‌ত!'

'আমি এই বাড়িতেই থাকতে পারব', রমা বললে,'আমাব ভূতের ভয নেই।'

'এটা ত আমাব বাপের ভিটে নয—বাড়িটা ভাড়া করেছি রাযমল্ল মিত্তিরের কাছ থেকে। একতলা দালান, ছাদে একটা ঘব আছে। নোনা ধরেছে,খসে যাচ্ছে ইট, বাইবে থেকে গাঁইতি দিযে চাট মারলেই পাঁচখানা ইট খসে পড়বে। আমি যখন নিজে এ বাড়িতে থাকি তখনই তোমার কথা ভেবে আমাব রাতে ঘুম হয না।'

প্রভাসবাবু চুরুটে টান দিযে বলনেন,'কী বকম উটকো জাযগায বাড়িটা,দেখেছিস?'

বমার দিকে তাকিযে বললেন' কাছেপিঠে কোনো লোকজন নেই, প্রায আধমাইলটাক হেঁটে যেতে হবে—তাবপবে সেনগুপ্ত মশাই, মহেন্দ্র বোস, অবিনাশ ঘোষালদের ভদ্রাসন।'

'কেন, তুমি আগেই পুব দিকে যাবে কেন? এই ত হাতেব কাছে—আম জামরুল নিমগাছগুলোব ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে মোছলমানপাড়া, দক্ষিণে পশ্চিমে—'

'তা দেখা যাচ্ছে বটে।'

'দু মিনিটেব পথ ত—'

প্রভাসবাবু গোঁফে একবাব হাত বুলিযে নিয়ে নাকের ওপব থেকে একটা মশা উড়িযে দিযে বললেন, 'পঁচিশ-ত্রিশ ঘব মোছলমান রযেছে ওখানে, তা আছে বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনোরকম লেনদেন নেই ওদেব, ওখানে কোনো মুন্সিমোল্লা, কোনো গ্র্যাজুযেট ছোকবা নেই, ওদেরে ছেলেবা ইস্কুল-কলেজে পড়ে না, মেযেবা বোবখা এঁটে আবডালে পড়ে থাকে; ওদেব ভেতব গফুবের মত কেউ একজন নেই কিংবা থাকলেও এখনো তাকে আবিষ্কাব করতে পাবিনি আমরা।'

'গফুর কে?' প্রভাসবাবুর দিকে তাকিযে বমা বললো।

'নিশিন্দাব জাহাজের বাটলাব—মনে নেই?'

'ও, গফুব, মাংস ইলিশ খাওযাল, ফেববাব পথে পোলাওটোলাও অনেক কিছু খাওযাল—নিশিন্দার বাটলাব গফুর! অমন লোটি হয না—'বমা বললে, 'এ পড়ায সে-বকম মানুষ পাবে কোথায তুমি?'

'বাসমতীতেও পাওযা কঠিন,' প্রভাসবাবু বললেন।

'এবা খুব সম্ভব কাঁচা চামড়ার যোগানদার, খুচরো যোগানদাব।'

'হ্যাঁ, গন্ধেব চোটে টিকতে পরি না এক-এক সময। ওদিককার জানালা দু'টো বন্ধ করে রাখতে হয।'

'পাদ্রিদেব মিশনও ত কাছে—উত্তরপূবে দশবাব মিনিটেব পথ। তুমি যাওনি কোনোদিন?'

'না। দিশি পাদ্রি সব?'

'ফাদার চক্রবর্তী-কে—একজন আছেন—নিশ্চযই বাঙালি হবেন; নাকি মাদ্রাজিদের ভেতরও চক্রবর্তী হয?'

পদবী হিসেবে হয বলে শুনিনি ত। পদবীটা রাজাগোপাল—নাকি আচারিযা? কী জানি? মিশনে গেছলে একদিনও তুমি?'

'না। কাউকে চিনি না ত। কার কাছে যাব? কে নিয়ে যাবে?'

সূচীপত্রে যান

'আমি গিয়ে কী করব? আমার এসব ওঁকে বেড়াবার বাতিক নেই—'

রমা সেলাই করতে-করতে একবার মুখ তুলে প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে নিল। চুরুট খাচ্ছেন, চোখের চশমা চকচক করছে—পাথর দু'টোর ভেতর চারদিককার সবুজ গাছপালার ছবি এসে পড়েছে।

'দিশি লোকদের নিয়েই মিশন, কয়েকজন সায়েব মেমও আছেন।'

'এই আখড়াটায়?'

'হ্যাঁ, দেখ না তুমি? আমাদের ঐ সব বাঁশ জামরুল বাসক মানকচুর নিরিবিলি পথ দিয়ে প্রায়ই ত ওরা আসা-যাওয়া করে।'

'দেখেছি,' প্রভাসবাবু বললেন,'ওরা কি এই মিশনর মেম নাকি?'

'মেম বলা ঠিক হবে না—সিস্টার। সিস্টার আর ফাদার। হ্যাঁ. এই মিশনের ।'

'বাসমতীতে আর-একটা বড় মিশন আছে ত, শহরের ভেতর গিয়ে—'

'সেটা অক্সফোর্ড মিশন; সেখানে বড়-বড় ময়দান, পুকুর,গির্জ, বোর্ডিং সব সয়েছে, বেশ জায়গা, বড়-বড়- সব ঝাউ, দেবদারুগাছ, রক্ত হলদে নীল গোলাপি ক্যানার জাড়, পোয়া মাইল, আধমাইল ঘিরে সব ক্যানার কেয়ারি, যখন ফুলে-ফুলে থইথই করে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়; তা ছাড়া কত রকম বিলিতি সিজনের ফুল, দু-চারটে দিঘি, সব মিশনের ফাদারদের ছনের চালের ছোট-ছোট ঘরগুলো,কেমন একটা সবুজ স্বাভাবিক শান্তির মতন যেন; অবিশ্যি আমি জানি না ফাদাররা সত্যিই কী ধরনের মানুষ। অ্যাসবেস্‌টসের ছাউনির বোর্ডিঙের বহর রয়েছে সব দিশি ছেলেমেয়েদের জন্যে। গির্জেটা গথিক ধরনে তেরি করেছে—' রমা ছুঁটটা দাঁতে আটকে নিয়ে বললে।

'কবে তৈরি করেছে?'

'অনেক দিন আগে।'

'গথিক কাকে বলে?'

'ইমারৎ তৈরি করবার এক ধরনের পদ্ধতি।'

'খুব লাল রঙের গির্জার বাড়িটা?'

'হ্যাঁ, ছিল এ সময়। কিন্তু লাল ইটের ছকটা চোখে পড়ে না—' ছুঁচটার দিকে একবার তাকিয়ে সেলাই করতে-করতে বমা বললে, 'আছে ছক—কিন্তু ট্যাব-ট্যাব করে চেয়ে নেই—ফৌজদারি আদালত আর জিলা ইস্কুলের বাড়িগুলোর মতন। লাল মার্বেল দিয়ে তৈরি মনে হয় গির্জাটাকে, বেশ পালিশ।'

'রোজই ত প্রায় চোখে পড়ে গির্জাটা আমার, কিন্তু তোমাব মত খুঁটিযে খুঁটিযে দেখতে যাইনি।'

'ভেতরে যাওনি?'

'গিয়েছি দু-চার দিন।'

'মনে হয়েছে বুঝি কাশ্মীরের মত জায়গা?' সেলাইটা চোখের সামনে ছড়িযে উঁচু করে তুলে ধবে এক-আধ মুহূর্ত নজর দিয়ে দেখে নিয়ে রমা বললে, 'বড়-বড় সিসু, নিম, ঝাউ, বেনট্টি, দেবদারু গাছ, নানারকম পাখি ঝাঁক বেঁধে এস পড়ে ওখানে- চিল, বক, টিয়া, শালিখ, লালশর, বালিহাঁস , নীলকণ্ঠ, ফিঙ্গ, পায়রা, হরিয়াল ত আছেই, আরো ঢের, নাম জানি না—'

মনে -মনে ভাবছিল, 'মাছরঙা পাখিরা, বউকথা কও, কোকিল, হাড়িচাচা, এ ছাড়া আরো কত রকম পাখি—'

'দিঘির পাড়ে একটা নারকোলগাছে বাজকুড়ুলও দেখলাম।'

'ও-' প্রভাসবাবু বললেন, অন্য কথা ভাবছিলেন তিনি।

'সেই যে নদীতে ওপারের তালবনের বাজকুড়ুল দেখিয়েছিলে তুমি—নিশিন্দার জাহাজে?'

'হ্যাঁ দেখিযেছিলাম—' প্রভাসবাবু বললেন না আব কিছু। রমা একটু আশ্চর্য হযে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে সেলাই করতে-করতে আবার বললে, 'কিন্তু পাদ্রিরা ঠিক সন্নেসি নয়। মিশনটা বেশ বড় আশ্রমের মত—শান্তি আছে; কিন্তু পরিপাটি রয়েছে বেশ—পাদ্রি হলেও ওদেশের সাহেবদের ও-সব না থাকলে চলে না। চলাফেরা ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়ায় আছাড়িপিছাড়ি নেই, কিন্তু জুতসই ভাবটা আছে। আমি যদি ওখানে সিস্টার হতাম' রমা বললে, 'তাহলে প্রতিটি দিন দু-তিন ঘণ্টা অন্তত ওদের গাছপালার পাখিদের দিকে তাকিয়ে থেকেই আমি সাধনপথে এগুতে পারতাম, এই ত মনে হয আমাব।'

প্রভাসবাবু কী যেন কী ভাবছিলেন এতক্ষণ, এইবারে রমার দিকে ফিরে তাকালেন। রমার শেষের

সূচীপত্রে যান

কথাগুরো কানে ঢুকে পড়েছে তাঁর, তারপরে কেমন একটা ঢেউ তুলেছে যেন ভেতরে। কিন্তু কিছু বলতে গেলেন না তিনি, চুরুট টেনে চললেন আগেরই মতন চুপ করে।

'কিন্তু ঐ ফাদাররা আর-একরকম। একটু ছকের বাইরে গেলেই হয়েছে; একতিল বেশি জ্বালাতন বোধ করলে গাদা বন্দুক দিয়ে পাখি সবাড় করবার কাজে লেগে যায় তিন-চারজনে মিলে, একটুও দ্বিধা নেই-Thou shall not kill এখানে খাটে না, গ্রহণীয় নয় সবই ফাউল মাটন বিফ আর-কী। গাছের পাখিগুলোকে উজাড় করে মানুষের খাদ্য ছাড়া আর-সব ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে কাজকর্মে চলে যায়—মিলিটারি ব্যারাকের না—যিশুখ্রিস্টের গির্জার।'

'ও-তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ রমা।'

'কেন?'

'আমরাও কি কাটিছিঁড়ি কম?'

'আমাদের মধ্যে যারা আশ্রমে থাকি? কেন, বুদ্ধদেবের—

'বুদ্ধদেবকে ত আমরা তাড়িয়ে দিলাম, আমরা শাক্ত হয়েছি, তান্ত্রিক হয়েছি।'

'কে?' প্রভাসবাবু একটু কঠিন ভঙ্গিতে বললেন।

'কোথায় কে?'

'দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না?'

বমা একটু কান পেতে বললে, 'না, ওটা বাতাসের শব্দ। ছিটকিনিটা একটু আলগা হয়ে গেছে।'

'ও—' প্রভাসবাবু বললেন, 'কিন্তু ছিটকিনিটা এঁটেই-বা রেখেছ কেন?'

'তুমিই ত আটকে রাখলে!'

'আমি?' প্রভাসবাবু ছিটিকিনি, কার্নিশ, জানালার দিক তাকিয়ে পরে বললেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আমাদের।'

'অনেকদিন থেকেই ত বলছ, কিন্তু মনের মতন বাড়িই ত পেলে না।'

চুরুটটা নিভে গিয়েছে। দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে নিয়ে বললেন, 'বাড়ি আছে, কিন্তু মিত্তির মশায়ের দশ মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে, ভাড়াটা মিটিয়ে ত বাড়ি ছাড়তে হবে—'

'মিটিয়ে দিলেই পার।'

'ব্যাঙ্কে বেশি কিছু ত নেই। একসঙ্গে অতগুলো টাকা তুলব? আব—মিত্তিরমশাই গা করেন না।' প্রভাসবাবু বললেন আবার।

'কোনোদিনই চাইবেন না বুঝি তিনি?'

'আমার বদলি হবার কথা—বাসমতী ছাড়বার আগে মিটিয়ে দেব।'

'কোথায় বদলি হবে?'

'কলকাতায় দেবে খুব সম্ভব। কিন্তু গিয়ে লাভ নেই। বাসমতীতেই থাকা যাক। ওপর থেকে চাপ দিলে অবিশ্যি চলে যেতেই হবে। ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত হবার সময় মিত্তিরের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে যাব।'

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালিয়েছিলেন, কিন্তু ভাল করে জ্বলেনি, কথায়-কথায় নিভেই যেন গেল আবার। মন দিয়ে খুব ভাল করে পুড়িয়ে -পুড়িয়ে জ্বালালেন।

'এই সব ভেবেই এ বাড়িটাও ছাড়তে পারছি না, নতুন বাড়িও ভাড়া করতে পারছি না। বেলা দশটার সময় আমি চলে যাই আফিশে, তুমি চলে যাও কলেজে। আফিশ থেকে ফেরবার সময় তোমাকে কলেজ থেকে নিয়ে আসি রোজ-আফিশ থেকে ফেরা পথেই ত কলেজ পড়ে। ঠিকে ঝিটা ঠিকের নাম করে সারাদিনই ত এই বাড়িতে থাকে-ওর মেয়েটাও থাকে। তোমার ছুটির দিনে আমি আফিশে চলে গেলে ওদের জিম্মায় তোমাকে ফেলে যেতে তবুও কেমন ভরসা হয় না আমার, অবিশ্যি দু'জন লোক আছে বলে খানিকটা স্বস্তি—কিন্তু—'

'আজ আফিশে যাব নাকি—একটা-দু'টোর সময়?

'না, আজ ছুটি। আরো তিনচার দিন ছুটি নিয়েছি। ছুটি ফুরিয়ে গেলে তোমাকে এ-বাড়িতে বাখব না আর ।

'কোথায় রাখবে?'

'কলেজের মেয়েদের বোর্ডিঙে।

'কলেজের বোর্ডিঙে?'
'হ্যাঁ, সিট ঠিক করে এসেছি।'
'বোর্ডিংটা ত এখান থেকে ঢের দূর। '
'এ বাড়ির সঙ্গে তোমার ত সম্পর্ক রাখবার দরকার নেই।'
'এখানে একা থাকবে তুমি?'
'আমি ত টুরেই থাকব প্রায়।'
'যখন ফিরে আসবে?'
'আমি ছাদের ঘরে শোব।'

রমা সেলাইটা একটু হাঁটুর ওপর নামিয়ে রেখে প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'যদি বলো যে রাতের বেলা ওখানে শুতে তোমার এটুও গা ছমছম করবে না, তাহলে বলব তুমি কেমন যেন একটু আলগা হ্যাঁচকা মানুষ।'

'গা ছমছম করবে কেন—চোর আসবে বলে? কী জিনিস আছে আমার ঘরে যে চোর ঢুকবে?'
'চোরের জন্য গা ছমছম করে?'
'কিসের জন্যে তবে?'

প্রভাসবাবু চুরুটে টান দিতে গিয়ে সেটাকে শূন্যে সরিয়ে রেখে বললেন, 'ও—সেই কথা। তা আমি ও-জিনিস দেখিনি কোনোদিন।'

'কেউই প্রায় দেখে না—কিন্তু দেখা যেতে পারে এই বলেই ত ভয়।'
'ও দেখা যায় না।'
'কী রকম? নেই?'
'থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের চোখে পড়বে না।'
'কেন?'
'খুব সম্ভব নেই—সেই জন্যে। এ জীবনে অনেককেই দেখতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না।'
'নেই বলে নয়—আমরা ভয় পাব বলেই হয় তো দেখা দেয় না তারা।
নেই—প্রমাণ কবতে পেরেছ তুমি?'
'না।'
'তবে?'
'অস্বাভাবিক মানুষ নই আমি—ভয় আছে আমার। কিন্তু বেশি নেই।'
'ভয়ের অস্তিত্বটা বড় খারাপ।'
'মানুষ তাতে মারা পড়ে'''

তাই ত—কথ্যা বলতে-বলতে কোথায় এসে ঠেকেছে রমা। এ জাতীয় কথা—এই লোকের সঙ্গে এর আগে এতদূর টেনে এনে বলেনি সে কখনো। সেলাই করতে-করতে কথা বলছিল, মাঝপথে ছুঁচ থেমে গেচে, ছুঁচটাকে আবার চালাবার আগে প্রভাসবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'আমাদের বাড়ির পাশের পাদ্রিরা শুনেছি ক্যাকথলিক মিশনের।' এটা কী বকম একটা খাপছাড়া কথা হল—পরলোক আর ভূতের আলোচনার মাঝপথে। কিন্তু রমা অন্য কথা বলতে চাইছে, অন্য বিষয়ে মন ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে অনুভব করে চুরুটটা মুখের থেকে নামিয়ে প্রভাসবাবু বললেন, 'ক্যাথলিক মিশনের? আর ওরা বুঝি প্রটেস্টন্ট?'

'হ্যাঁ; ওরা চার্চ অব ইংলন্ডের।' নিঃশ্বাসটা নির্মল হাল্কা বাতাসের মত ধীরে-ধীরে অন্তরাত্মার থেকে বেরিয়ে গেল তাঁর। মৃত্যুর না, ভূতের না, আস্তী তলোকের শান্তিসান্ত্বনার কথা হচ্ছে।

'শুনেছ নাকি ওরা ক্যানেডার মিশনের।'
'ক্যানেডার? এই এরা—আমাদের পড়শিরা?
'হ্যাঁ—'
'ইংরেজ?'
'না। বলছিল ফরাসি—'

'কে বলছিল?'

'ফাদার বার্থেলো—বার্থেলোই ত তাঁর নাম বলছিলেন সেদিন। তিনি এসেছিলেন আমাদের এখানে।'

'কবে?'

'আসেন মাঝে-মাঝে।'

'কই, আমি ত দেখি নি!'

'তুমি আফিশে থাক তখন।'

'ও—' চোখের থেকে চশমা খসিয়ে নিয়ে প্রভাসবাবু। ডেকচেয়ারে বসেছিলেন, চশমাটা ধুতির ভাঁজে রেখে দিলেন—কোলের ওপর।

'কত বয়স হবে বার্থেলোর?'

'ত্রিশ-বত্রিশ হবে।'

ধুতির খুঁট দিয়ে আস্তে-আস্তে চশামা ঘষছিলেন প্রভাসবাবু। কিছু বললেন না, চশমা পরলেন না, পরিষ্কার করা হয়ে গেলে চোখ বুজে আঙুল দিয়ে মোলায়েমভাবে টিপে-টিপে চোখে বুলোতে লাগলেন।

'এরা কজন আছে?'

'তিনজন মিশনারি আছেন এখানে।'

'বার্থেলো কি মিশনারি?'

রমার ছুচ হঁচোট খেয়ে থেমে গেল। বাবাকে বলেনি কি সে এরা ক্যানেডিয়ান মিশনের পাদ্রি, কয়েকবারই ত বলেছে, তবে আবার জিজ্ঞস করছেন কেন তিনি, 'হ্যাঁ ফরাসি ক্যানেডার। মিশনারি-ত তোমাকে বলেছি আমি।'

'দাড়ি আছে?'

আবার থেমে গেল রমার ছুচ। এর পরে হয় তো জিজ্ঞেস কববেন দাড়ির রং কী রকম—মেরুন না বাদামি। 'আছে অল্প-অল্প কটা দাড়ি-লাল নয়। ভাল করে তাকিয়ে দেখি নি; মনে হল সোনালি।'

'ইংরেজিতে কথা বললে তোমার সঙ্গে?'

'ইংরেজি তেমন বলতে পারে না।'

'ওবা ফরাসি তুমি কী কবে বুঝলে?'

'বাংলা জানে মন্দ না।'

'ও-' প্রভাসবাবু চোখ মেলে চশমা এঁটে নিয়ে চুরুটটা খুঁজে বার করলেন। নিভে গেছে। ফুরিয়েও ত গেছে প্রায়। জানালা দিযে চুরুটটা ছেঁড়ে ফেলে দিলেন। পকেটই আছে আর-একটা চুরুট। বেব কবে বললেন,

'দুপুরবেলাই আসে বুঝি এদিকে?'

'পর-পর কযেকবার দুপুরেই ত এল।'

'আমি না-থাকলেই আসে?'

রমা দাঁত দিয়ে সেলাইয়ের খানিকটা সুতো কেটে বললে,'দুপুবেই অবসর পায, নানারকম নিয়মকানুন আছে ওদের । অনেকে কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা, নতুন এসেছে, মিশনটা গড়ে তুলতে হবে।'

'সেই নিযে তোমার সঙ্গে পরামর্শ?'

ছুচটা ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে রমা বললে, 'ওদের মিশনের লাগাও ভদ্রলোকের বাড়ি দেখেই আমাদের এখানে এসেছে। এদিকে ত আর জনপ্রাণী নেই। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যই এসেছিল। বাংলা শিখতে চাচ্ছে।'

'ইংরেজি তো শেখা হল না, বাংলার ওপর দখল তুমি বলছ ইংবেজির চেয়ে বেশি বার্থেলোর। আরো পাকাপাকি করে নিতে চায়?'

'হ্যাঁ—'

'তোমাকে পেয়েছে বুঝি?'

রমা সেলাইয়ে ডুবে থেকে খনিকক্ষণ পরে উত্তর দিল, 'আমি ত সোরাবজি হস্টেলে যাচ্ছি।'

প্রভাসবাবু আস্ত চুরুটটা জ্বালান নি—হাতের ভেতরেই রেখে দিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে সেটাকে

দিয়ে পেনসিলের মতন আঁকিবুঁকি কাটছিলেন, জামার ওপরে, ধুতির ভাঁজে, হাতের তেলোয়, কপালের রগ ঘেষে।

'এ মিশনে মেমসাহেব নেই?'

'আছে।'

'বার্থেলোর স্ত্রী?'

'না, উনি বিয়ে করেননি, মেম হচ্ছেন ভালোরির স্ত্রী।'

'আমি তোমাকে সোরাবজি হস্টেলে যেতে বলেছি বটে—কিন্তু তোমার নিজের ইচ্ছা কী সেটা জিজ্ঞেস করিনি। তোমার যদি ইচ্ছা করে তাহলে এখানে তুমি থাকতে পার,' বললেন প্রভাসবাবু, 'এখানে কোনো শক্ত শিক্ষিত পুরুষ মানুষ নেই, সেই কথা ভেবে এতদিন ভয় হচ্ছিল আমার। কিন্তু বার্থেলো আছেন, ভালোরি আছেন তা ত জানতাম না আমি। এখন দেখছি এরা আমাদের ঘরের ছেলের মত।'

মুশকিল প্রভাসবাবুকে বুঝে ওঠা। শাদামাঠা গলায় কথা বলছেন বটে কিন্তু তাৎপর্যের নানারকম ইতরব্যাসকম থাকে বলে গলার সরলতার নির্দেশ নিয়ে কথার ইঙ্গিত ধরা অনেক সময়ই কঠিন।

হয়তো ভাল মনে ভালো কথাই বলছেন ভদ্রলোক। রমা সেলাইয়ের দিকে চোখ রেখে-ভেবে দেখছিল। বেশ নিপুণভাবে চলেছে বটে সেলাই, কিন্তু কী বলতে চাচ্ছেন উনি?

'সকাল বিকেল নানা ধান্দায় ঘুরতে হয় ওদের, দুপুরবেলাই মঠের অবসর। সেইটেই ভাল হয়েছে।'

'কী হিসেবে?'

'বাংলা শিখতে চাচ্ছে, শিখুক।;

'কে পড়াবে?'

প্রভাসবাবু বললেন, 'তুমি পড়াতে পারো, পাল্টা ফরাসিটা শিখে নেবে।'

'আমি হস্টেলে যাচ্ছি।'

চুরুট জ্বালিযে নিযে প্রভাসবাবু বললেন, 'তোমাকে আমি খুশি মনে এখানে থাকতে বলছি।'

'না, আমি হস্টেলে যাব।'

চুরুটে টান দিযে মরীযা হয়ে উঠবার মত কোনো খারাপ কাজ না করে সহজ স্বাভাবিকভাবে উনি বললেন, 'তুমি ভেবেছ, টাকাকড়ির লোকসান হবে তুমি হস্টেলে না গেলে। কিন্তু তোমার সিটের ভাড়া দিই নি তো এখনো আমি। সে-রকম পাকাপাকি কিছু ঠিক করিনি, তুমি এখানেই থাকো।'

'এখানে থাকা ঠিক নয আমার', রমা বললে, 'তোমার মনে একটা সন্দেহ হয়েছে বার্থেলো সম্পর্কে।' রমার এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তটাকে কেটে ফেলে একটা জবাব দেবার আগেই রমা বললে, 'এটা-ওটা-সেটা নিয়ে সময কেটে গেল ঢের, শিগগিবই এগজামিন আছে, হস্টেলে না গেলে আমাব পড়া হবে না।'

দরজায় একটা ধাক্কা পড়ল।

'কে?'

'কেউ এসেছে,' রমা বললে।

'বার্থেলো হয তো—'

'না—' রমা সেলাইটা টুলের ওপর রেখে দিযে দরজার ছিটকিনি খুলে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল। সিদ্ধার্থ ঘরের ভেতর ঢুকে একটা চেযার টেনে বসে প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে 'আপনি আছেন বাড়িতে যা-হোক। আমি ভেবেছিলাম নাও পেতে পারি, অফিসটফিস থাকতে পারে।'

'আজ ব্যাঙ্ক হলি-ডে ত—'

'ও—তাই নাকি! আমাদের কলেজেও ত ছুটি।'

'পোস্টাল হলি-ডেও আজ,' সিদ্ধার্থের দিকে নাক ফিরিয়ে প্রভাসবাবু বললেন, 'তোমাকে ত আজকাল দেখিই না সিদ্ধার্থ। নানারকম ঝঞ্ঝাট চলেছে?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সিদ্ধার্থ এক কথায় সেরে দিয়ে বললে, 'না।' রমার দিকে তাকিযে বললে 'হাতে সেলাই করছ দেখছি। ওটা কী টাকছ? কী হবে?'

'দেখি ব্লাউজ হয না পাঞ্জাবি হয়ে দাঁড়ায়!'

'আমি, তোমার কলেজের নয়, ব্যক্তিগত কোনো মুস্কিলটুস্কিল চলেছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'না, কিছু নেই,' অত্যন্ত সাদা কথায় সিদ্ধার্থ বললে।

'তুমি তাহলে এদিকে আসছ না কেন?'

'কোনোদিকেই আমার যাওয়া হয়ে উঠছে না আজকাল আর অধিকারী মশাই।'

'খুব পড়াশোনা করছ বুঝি? মাস্টারমানুষ, করবেই ত।;

'মফস্বলে মাস্টারি নিয়ে ত পড়াশোনা ছেড়ে দিলুম, কলেজে যে দু-চাটে বই পড়াতে হয় কলেজ টাইমেই সেগুলোর পাতার ছাতকুড়ো ঝেড়ে তারপর সারা দিন রাত্তিরে কী থাকে আমাদের আর পড়বার—খবরের কাগজ ছাড়া?''

'ও, তাই বুঝি?'

'পুরো দস্তুর তাই।'

'ভাল লাগে?'

'লাগাতে হচ্ছে, উপায় নেই।'

প্রভাসবাবু বললেন, 'কেন, কলকাতার কলেজে চেষ্টা করতে পার না?'

বার্থেলো সাইকেলে চড়ে মিশনের দিকে ফিরছিল, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। প্রভাসবাবুদের বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে সে মিশনের দিকেই চলে গেল—এদিকে ভিড়ল না। বার্থেলোকে দেখছিল সিদ্ধার্থ—জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যায়। এ কে, কোথাকার সাহেব, জানে না সে। জারুল. শিরীষ, জামগাছ, লেবুর ঝাড় ও ঘন মেহেদি জঙ্গলের আড়াবে অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা।

রমা পিছু ফিরে ছিল, দেখেনি বার্থেলোকে।

প্রভাসবাবু ডান হাত উঁচিয়ে তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁকে নিজের চুরুটটার দিকে তাকিয়ে চুপ করেছিলেন, বার্থেলোকে চোখে পড়ল না তাঁর।

'কলকাতায় গিযে কী হবে। বেশি মাইনে পাব?;

'না, মাইনব কথা বলছি না আমি—'চুরুটটা মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে নিয়ে প্রভাসবাবু বললেন,'কী রকম মাইনে দেয়?'

'সে-মহাভাবত শুনে মন খুশি হবে না আপনার। ব্রিটিশি সরকাবি চাকরিতে আছেন, ভালই আছেন,' পকেট থেকে একটা লবঙ্গ বের করে দাঁত দিয়ে কেটে সিদ্ধার্থ বললে, 'পঞ্চাশ-ষাট থেকে একশ-সোযাশ দুশ-আড়াইশ—যে-মূর্খকে যে-রকম ভাবে বাগাতে পারে তার জন্যে সেই মাইনের ব্যবস্থা কবে।'

'কলকাতার কলেজগুলো?'

'হ্যঁ। পেশা ত। শিক্ষাদীক্ষার কোনো কথা নেই। মাড়োযারি-ভাটিযাদের সঙ্গে বুদ্ধিফন্দি পবিশ্রমে পেরে না-উঠে বাঙালির ফন্দিবুদ্ধি এখন কয়েকটা গোযাল সামলাচ্ছে। সেই গোযালগুলোই তাদেব ইস্কুল-কলেজ—চাঁদা তুলে দুর্গোপুজো, কালীবাড়ি, জমিদারি,লগ্নীর কারবার—এই আর-কি।'

প্রভাসবাবু চুরুটটা মুখে দেবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সিদ্ধার্থের কথা শুনে ভুলে গেলেন চুরুটের কথা। মাড়োয়ারি ভাটিযাদের মত ফন্দি ইস্কুল-কলেজে? ভাবতে-ভাবতে চুরুট নিভে গেল তাঁর। বলত-বলতে আবার বললেন, 'তুমি কলকাতার কলেজগুলোর কথা বলছ?;

'হ্যাঁ, মোটামুটি, দু-চারটে অবিশ্যি ভাল কুলীন কলেজ থাকতে পারে, মিশনারিদেব কলেজ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানাশোনা নেই।'

'মফস্বলের কলেজগুলোও এই রকম?'

গোটা লবঙ্গ আস্তে-আস্তে দাঁত দিয়ে কাটছিল সিদ্ধার্থ, লবঙ্গের ঝাল ও সুগন্ধ জিভে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল তার, রমা সেলাইটা ফেলে রেখে সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়েছিল, প্রভাসবাবুব দিকে চোখ চেয়ে সিদ্ধার্থ বললে—'কোন বিষযে বলছেন?'

'মাইনে দেওয়া-নেওযার ব্যাপারে।'

'অনেক মফস্বল কলেজই ফাণ্ড কম, নিরুপায়তা আছে কিছু—নানারকম বিশৃঙ্খলা রযেছে। কিন্তু মাস্টারদের ভেতর টাকাকড়ির বিলিব্যবস্থার ব্যাপারে কলকাতাব সঙ্গে টেক্কা দেযার সাধ্য এদেব নেই।'

'আরো কয়েক জন্ম বুঝি শিখতে হবে।' রমা বললে।

'শিখুক— সিদ্ধার্থ বললে;'কিন্তু কলকাতার মত ঘোড়েল কলকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ হতেও

পারবে না কোনোদিন।'

'তুমি কলকাতা-বিদ্বেষী।'

'আমি ভালবাসি শহরটাকে।'

'বাসমতী খারাপ লাগে তোমার?'

'না।'

'কাকে বেশি ভাল লাগে?'

লবঙ্গের ঝাল আস্বাদে মুখের ভেতরটা স্নিগ্ধ হয়ে আছে, মেহেদির ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'প্রাণের দিক দিয়ে বাসমতীকেই বেশি—কিন্তু—;

প্রভাসবাবুর চুরুট নিভে গিয়েছে, পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালিয়ে নেবেন কিনা ভাবছিলেন। রমা থুতনির ওপর হাত রেখে দক্ষিণের জানালার দিকে তাকিয়েছিল, বার্থেলোদের যাওয়া-আসা উত্তর -পুবের জানালার দিকে না তাকালে দেখা যায় না। রমার চোখ ছিল না সেদিকে। একটা মিশন আছে? সাহেব আছে?—ভুলে গিয়েছিল সে।

'জীবনের কয়েকটা দিক দিয়ে খুব আশ্চর্য একাগ্রতা আছে—কলকাতায়, কয়েকজন মানুষের। সে জিনিসের সংস্পর্শে থাকা দরকার।' সিদ্ধার্থ বললে।

'তুমি কি ইয়ুনিভার্সিটির কথা বলছ?' প্রভাসবাবু বললেন।

'তুমি শ্রেষ্ঠ লোকদের কথা বলছ আমার মনে হয়—রাইটার্স বিল্ডিঙের।' আস্তে-আস্তে বললে রমা!

'তুমি কি ইয়ুনিভার্সিটির'—প্রভাসবাবু আবার শুরু করলেন।

'না। ইয়ুনিভার্সিটির কথা আমি বলিনি—'

'তবে তুমি নিশ্চয়ই কর্পোরেশনের কথা বলছ—' নিজের মুখের হাসি রমা শুষে নিতেই চোখের ভেতরে বুঝি সেটা ধরা পড়ল রমার; তাকিয়ে দেখল সিদ্ধার্থ। প্রভাসবাবু একটু বিরক্ত হয়ে ভাবছিলেন। তাঁকে কথা বলতে দিচ্ছে না সিদ্ধার্থের সঙ্গে। কথা কি তিনি বলবেন? না রমা? রমাকে ছাদের ঘরে চলে যেতে বলি-বলি করেও বলতে পারলেন না তবুও। উত্তর পুরুষের মুখপাত্রের মত দেখাচ্ছে যেন সিদ্ধার্থকে। নিজেকেই একটু খর্ব করে নিতে হবে বুড়ো মানুষের। কর্পোরেশনের কথা অনেক শুনেছেন তিনি; সেক্রেটারিয়েট তো উজ্জ্বল, ইয়ুনিভার্সিটি আরো উজ্জ্বল; কলকাতার কলেজগুলো উজ্জ্বলতম—সিদ্ধার্থ ত বললে। কিন্তু কলকাতা ত এই-সব নিয়েই। না —সিনেমা নিয়ে?

'সায়ন্স রেঞ্জের সেই বাড়িটা সিদ্ধার্থ—'

'কোনটা?'

'ঐ যে-ঐটেই ত শেয়ার মার্কেটের হদ্দো?'

'না, সেখানে ঢুকি নি আমি।'

'কোনোদিনই না?'

'তুমি মনে করছ ঐটেই বুঝি হেস্টিঙসের কলকাতার হারানো চাবি!' প্রভাসবাবুকে বললে রমা।

'হেরম্ববাবুর কাছে সিটি কলেজে পড়েছিলাম। এ ছাড়া কলকাতার বিশেষ কিছু জানি না আমি।' প্রভাসবাবু চোখ বুজে বললেন।

পকেট থেকে আর -একটা লবঙ্গ বের করে সিদ্ধার্থ ভাবছিল চুরুট সিগারেট নস্যি সবই ছেড়ে দিয়ে লবঙ্গের নেশায় ধরল কি তাকে?

'হাইকোর্টও কি উজ্জ্বল?'

'হাইকোর্টের হাট ভেঙে গেছে।'

'সি, আর দাসের পরে?;

'সি, আর দাসের পরেও ছিল কিছুকাল, কিন্তু এখন নেই বিশেষ কিছু।'

'কী আর আছে সিদ্ধার্থ—মাড়োয়াড়িদের গদি?'

'কলকাতার ট্রাম ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল—' রমা তার ঘন কালো আট খোপাঁটার ওপর হাত রেখে আস্তে একটু চাপ দিয়ে একটা চুলের কাঁটা বের করে নিয়ে বললে।

'ট্রাম শুধু? একটা শহর তার ট্রাম দিয়ে বড় হবে—এইটুকু মাত্র?' প্রভাসবাবু আহত হয়ে বললেন।

'ট্রামেরও ত স্ট্রাইক লেগে আছে প্রায়ই সিদ্ধার্থদা।'

'দেখছি ত।'

'তাহলে ট্রাম নিয়ে বড়াই করাও কঠিন।'হেয়ার পিনটা আবার গুঁজে রেখে বললে রমা।

কলকাতা এখন বাংলাদেশের রাজধানী,কিন্তু প্রভাসবাবু যখন কলকাতার কলেজে পড়তেন তখন সেটা ভারতবর্ষেরও রাজধানী ছিল। কলকাতার নামডাক ছিল খুব—নানা দিক দিয়ে। কালে-কালে নাম আরো বেড়ে গিয়েছিল, মাঝে-মাঝে অফিসের কাজে দু-এক দিনের জন্য গিয়েছেন কিন্তু ভালভাবে দেখবার মতন করে অনেকদিন কলকাতায় যাওয়া হয়নি তাঁর, কিন্তু অনেকটা কাছেই এত বড় একটা নগরী রয়েছে—এত নাম তার—এ নামের সঙ্গে বাংলভাষীদের পিতৃপিতামহপুরুষদের নাম জড়ানো ভেবে ভালই লাগত। সেই কলকাতা এই রকম হয়ে গেছে? তার গৌরব এখন ট্রামের খেলনায় গিয়ে ঠেকেছে? কলকাতায় যখন ঘোড়ার ট্রাম ছিল, তখন মানুষ মহত্তর ছিল—ভাবছিলেন প্রভাসবাবু।

'তুমি, হেস্টিংসের কলকাতার কথা বলছিলে রমা?'

'হ্যাঁ। হেস্টিংস হাউসটা রয়েছে হয় তো এখনো?'

'আপনি দেখেছিলেন বাড়িটা?' সিদ্ধার্থ বললে।

'সে অনেক আগের কথা।;

'ভেতরে ঢুকে দেখেছিলেন?'

'কম্পাউন্ডে গিয়েছিলাম, বাড়ির ভেতরে মাড়াতে দেয়নি। পরোয়ানা পাইনি। তখন ত পুরোদমে ব্রিটিশ আমল চলছে ।'

'হেস্টিংস হাউস নিয়ে অনেক ভূতের গল্প আছে।' রমা বললে।

'আছে।'

'দু-চারটে বলো ত।'

'আমি একটা জানি', রমা শুরু করলে, 'তুমি যা জান আগে বলে নাও সিদ্ধার্থদা।'

প্রভাসবাবু বললেন, 'সিদ্ধার্থ ত তোমার মাস্টার রমা।মনে হচ্ছে তুমি যেন তার সমানে-সমানে চলেছ। তা চলো, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাকে তুমি ওভাবে শুধোচ্ছ কি হিসেবে?' প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালাবার জন্যে দেশলাইয়ের কাঠি বার করলেন, দু-এক বারের ঘষায় কাঠি জ্বলল না,বাক্সে আছে মাত্র দু'টো কাঠি।

'তোমার বয়স কত সিদ্ধার্থ?'

'চিরদিনই ত এই বয়স ছিল না।' রমা বললে।

'সাত বছর আগের কথা মনে করো বাবা।'

'তার মানে?'

'তুমি যখন তিনপাঞ্জা অফিস থেকে বদলি হয়ে প্রথম বাসমতীতে এলে!'

'কী হয়েছিল তখন?'

'বাসমতীতে এসে রায়মল্ল মিত্তিরের বাড়িতেই ত উঠলে তুমি।'

'হ্যাঁ, তিনপাঞ্জা থেকে প্রথম দিনই এ-বাড়িতে উঠেছিলাম; সাত বছর পাঁচ মাস এগারো দিন আগের কথা। মিত্তিরের সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি হয়েছিল তিনপাঞ্জা থেকে। এ বাড়িটা খালিই পড়েছিল—একটু ঝেড়েপুঁছে রাখিয়েছিলেন; স্টেশনে লোক পাঠিয়ে আমাদের এখানে মোতায়েন করে দিয়েই সটকে পড়লেন তিনি—তিনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু প্রফেসর সেনকে পাঠিয়ে দিলেন, মনে আছে তোমার?'

চুরুটের দিকে তাকিয়ে কাঠির দিকে মন গেল। দু'টো মাত্র কাঠি আছে দেশলাইয়ের বাক্সে, বাক্সের বারুদের জায়গাটা চটে গেছে,ছিঁড়েও গেছে জায়গায়-জায়গায়,আরো দু-তিনবার ঘষে টের পেলেন হাতের কাঠির বারুদ ঝরে গেছে।

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'তখন ঘোর-ঘোর হয়ে গেছে, ঘরে বাতি নেই, চাঁদের বাতি এসে পড়েছে, প্রফেসর সেন ঘরে ঢুকতেই তুমি বললে, 'মিত্তির মশাই বুঝি পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমাকে? তুমি ছেলে মানুষ পাববে সব?' মাস্টারমশাই হেসে বলেছিলেন, সব পারব না, তবে আপনার আজ যাতে খেতে শুতে পাবেন সেটা দেখছি।'

'ও সে-সব কথা—' ডেক চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে একটা নতুন দেশলাই পেড়ে এনে প্রভাসবাবু বললেন; 'হ্যাঁ, ছেলেমানুষ মনে হয়েছিল ওকে, বেশ লম্বা মানানসই ছিল বটে, কিন্তু ভেবেছিলাম কলেজে

পড়ে বুঝি।;

'সিদ্ধার্থ!' চেয়ারে এসে বসে প্রভাসবাবু বললেন, 'সাত বছরে তুমি বদলে গেছ ঢের—'

'মানুষ আরো ঢের বদলায়, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি শুধু।;

'বুড়ো না। বড় হয়ে গেছ।' রমা বললে।

'সেদিন তুমি আমাকে কেন বললে সিদ্ধার্থ, যে তোমার কুড়ি বছর বয়স?' প্রভাসবাবু দেশলাইয়ের বাক্সটা খুলতে-খুলতে বললেন।

রমা তার বাবাকে বললে,'তুমি বারবার যাচাই করেও টের পেলে না কেন সাঁইত্রিশ? মাষ্টারমশাই ত রাত বারটা অব্দি পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে কাজ করছিলেন।'

নতুন দেশলাইয়ে ফস করে আগুন জ্বলে উঠল। এত সহজে আগুন জ্বললে এখুনি চুরুট জ্বালাবার কোনো দরকার নেই। বাক্সভরা কাঠি রয়েছে। তাকিয়ে দেখলেন প্রভাসবাবু।

'তুমি টের পেয়েছিলে ওর সাঁইত্রিশ?' প্রভাসবাবু রমাকে জিজ্ঞেস করলেন। দেশলাইয়ের কাঠির আগুন জ্বলে জ্বলে নিভে গেল প্রভাসবাবু হাতে।

'মানুষের বয়স নিয়ে অনেক হয়েছে, যেন অঙ্কের কেলাশের ঘণ্টা পড়ল'. রমা সুতোঅলা ছুঁচটা কুড়িয়ে নিয়ে জামার ভেতর ফুঁড়ে রেখে দিল, এখন আর সেলাই করবে না সে।

নতুন দেশলাইয়ের বাক্সের দ্বিতীয় কাঠিটা জ্বালালেন প্রভাসবাবু, এইবাবে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিতে হবে, কাঠিটা টিকল অনেকক্ষণ, বেশ ভাল করে ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে আগুনে গনগন করে নেয়া গেল চুরুটের মুখটা।

'তুমি বার্থেলোকে কী বলে ডাক?'প্রভাসবাবু বললেন রমাকে।

'বার্থেলো কে?' সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল।

'একজন মিশনারি সাহেব।

'ফরাসি মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ফরাসি।'রমা সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

'অক্সফোর্ড মিশনের?'

'না, উনি ক্যানেডার ফারসি। এখানে ক্যানেডার মিশনের কাজে এসেছেন ওরা কয়েকজন। আমি বার্থেলোকে বার্থেলো সাহেব ডাকি, কিম্বা মিস্টার বার্থেলো; উনি ফরাসি হলেও ওকে মঁসিয়ে ডাকি না।'

প্রভাসবাবু চুরুট কয়েকবার টান মেরে নিয়ে বললেন,'সিদ্ধার্থেব বেলাও একটা এটিকেটের কথা বলছিলাম আমি; তোমরা সমাজের জীব—সেখানে কী আদবকায়দা চলে তোমাদেব—জানতে চেয়েছিলাম। সমাজের বাইরে এসে নিজেদের পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে কী বলে ডাকে সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিচার বাসনার জিনিস।;

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাহলে অনেক ঘুরপাক খেয়ে মহাভারতেব কথা এতক্ষণে ফুরিয়ে গিয়েছে তোমার বলো। আমি যখন ফ্রক পরে ইস্কুলে পড়তাম তখন যে ভদ্রলোককে 'দাদা ডাকতে শুরু করেছি- তাব কলেজের ক্লাসে পা দিয়ে 'স্যার' ডাকতে বাঁধছে কেন আমার বার করতে গিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল আমাদের—হেস্টিংস হাউসের গল্পটাও মাঝপথে মারা গেল—'

'গল্পটা জিইয়ে তোলো—'

'একটা গল্প নয়—'

'একে একে বলতে থাকো।'

'থমথমে নিশুতি রাত ছাড়া ও-সব গল্প জমবে না।'

'কিন্তু অতটা রাত অবদি তুমি কি আমাদেব বাড়িতে থাকবে সিদ্ধার্থ?'

'আজ না—আর-একদিন।;

'কেন? আজ কী হল'

'আজ কলেজ ইউনিয়নের একটা মিটিং আছে—প্রফসরদের।'

'কখন?'

'সন্ধ্যের সময়।'

'ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন বুঝি?'

'আসবেন অনেকেই।' সিদ্ধার্থ কথা বলতে-বলতে রমার দিকে তাকাতেই দেখল সে তার ডান হাত

বাড়িয়ে দিয়েছে সিদ্ধার্থের দিকে, হাতে কয়েক টুররো দারুচিনি আর ছোট এলাচির দানা। কুড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'যাব না ভেবেছিলাম। কিন্তু পর-পর তিনটে ইউনিয়নের মিটিঙে যাই নি।'

'এ-সব মিটিঙে না গেলে তোমার চাকরি যাবে?'

'মফস্বলে অত সহজে যাবে না, কলকাতার মত গলকাটা হাতসাফাই নেই এখানে, তবে কথাবার্তা হবে ক্লিকের ভেতর। কিন্তু সেজন্যে আমার ভাবনা নেই। এই দারুচিনি কোথায় পেলে রমা?'

'বাসমতীতে এ জিনিস পাবে না তুমি।'

'চারমাস আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম আমি। আমি অনেক ঘুরে দেখেছি—এরকম দারচিনি কোথাও পাই নি ত।'

'সিদ্ধার্থ যে দারচিনি ভালোবাসে তা তুমি কি করে বুঝলে রমা?'

'প্রায়, দারচিনিই ত কাঠ', রমা বললে, 'জারুল কাঠের ছিবড়ে, সিদ্ধার্থদা মাঝে-মাঝে আমাকে বলেছে ছেলেবেলায় কখনো-কখনো আসল দারচিনি মিলেছে, তারপব ত্রিশ বছরের মধ্যে আর পায় নি। যেটা দিলুম কেমন লাগছে তোমার?'

সিদ্ধার্থ দারচিনির টুকরোগুলো পকেটে রেখে দিয়ে বললে,'একটা নেশা ধরিয়ে দিলে আর-কি, পান পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু কোথায় এ দারচিনি পেলে রমা?' চুরুট নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রভাসবাবু।

'বার্থেলো সেদিন দিল আমাকে।'

'ও—' চুরুটটা মুখের দিকে আস্তে-আস্তে তুলে নিলেন প্রভাসবাবু, কিন্তু মুখে দিলেন না।

'ক্যানেডার সাহেব—'সিদ্ধার্থ তিন-চারটে এলাচির দানা বেছে দাঁতে মেড়ে নিয়ে বললে 'ওরা আমেরিকানদের সামিল, অনেক ভেলকি জানে।'

'আমি রেখে দিয়েছি তোমার জন্যে?' সিদ্ধার্থকে বললে রমা।

'কী?'

'দারচিনি।

'ঢের।'

'ক্লিকের ভেতব কথাবার্তা হবে—' রমা বললে, 'সে-জন্য তোমার ভাবনা নেই?

'না।'

'কটা ক্লিক প্রফেসারদেব মধ্যে?'

'আছে তিন-চারটে।?'

'তামাব নিজের ক্লিক নেই?

'অন্যদের ক্লিক ভাঙতে চাই ত আমি।'

'কিন্তু মনে-মনে ভেঙে শেষ করে দিচ্ছ। কাজে কী করছ?'

সিদ্ধার্থ হাতের দাবচিনির বড় টুকরোটা টোকা মেরে শূন্যে উড়িযে দিযে বললে, 'তাহলে নিজেব দল গড়তে হয, আমার ধাতে তা পোষায না।'

'তা ত দেখছিই।' রমা বাঁ-হাতেব কাচের চুড়িব ওপর ডান হাতের তর্জনি দিযে আস্তে-আস্তে ঘা দিচ্ছিল, চোখ তুলে বললে, 'আছে ত কতগুলো পকেটের ভেতব।'

'আছে বটে', একটু দমে গিযে বমা বললে. 'কিন্তু হয তো এ বাড়িব থেকে নেমেই পথে ফেলে দেবে।'

'তোমাকে চুরুট দেব সিদ্ধার্থ?' জিজ্ঞেস কবলেন প্রভাসবাবু।

সিদ্ধার্থ তাকিয়ে দেখল রমার মুখে বিমর্ষতা ঠিক নয, কেমন একটা চিন্তা যেন নিজের বযঃপ্রাপ্তিলোকে পৌছে গিযে মানুষের সীমা দেখতে চেযে পেরিয়ে গিয়ে সমযেব সীমা দেখে ফেলে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছি।

'তুমি চুরুট খাবে সিদ্ধার্থ ?'

'চুরুট? না—এখন না।'

'কখন তাহলে?'

'রাতে, ঘুমেব আগে।'

সূচীপত্রে যান

'সিদ্ধার্থের কোনো নেশা নেই রমা।'

রমা চিন্তার কুণ্ডলীর নিস্তব্ধতা ভেঙে বললে, 'ইউনিয়নের মিটিঙে যাচ্ছ তাহলে তুমি। যাওয়াটাই ঠিক, সবে থাকাটা খারাপ হবে। পরের কাজ করছ, বেশি ব্যক্তিস্বাধীনতা ভাল নয।'

'তাতে বুদ্ধির স্বাধীনতা নষ্ট হয় বুঝি? তোমার তা হয়নি। দেখছি ত।'

'রমার বুদ্ধি?' প্রভাসবাবু বললেন, 'ভেবে হিসেব করে কথা বলতে জানে।'

'আমি দেখেছি প্রিন্সিপ্যাল আর শাঁসালো প্রফেসাররা ডিসিপ্লিনের কাঙাল, সব সময়ই তাঁরা চান এ-সব মিটিঙে সব প্রফেসাররাই যোগ দিক। যাব আমি, হোক ওদেব ডিসিপ্লিন চরিতার্থ।'

'তাহলে কোমর বেঁধে যাচ্ছ আজ?'

'মনটা ঝুঁকেছে খানিক।'

'ক্লিকগুলোর জন্যেও বেশ টান আছে তোমার।' রমা হাসতে-হাসতে বললে,

'উঠি।'

'কেন?'

'চা করব।'

'না, আজ চা খাব না।'

'ও-ইউনিয়নে এক টি-পট খেতে হবে তোমাকে?'

'এক টি-পট কফিও খেতে হতে পারে।'

প্রভাসবাবু কথা বলছিলেন না, নিজের জীবনের ধান্দা নিয়ে ভাবছিলেন হয তো. ওবা ভুলে গিয়েছিল যে তিনি আছেন।

'এক টি-পট কফি মাথা পিছু?' একটু ডাক পেড়ে বললেন তিনি এতক্ষণ চুপ কবে থাকবাব পব, 'তোমাদের ইউনিযনেব তেল বেড়েছে দেখছি।'

'কোথায় কফি? তুমি স্বপ্ন দেখছ?'

'আমাদেব সমযে প্রফসরদেব ইউনযন-ফিউনিযন ছিল না, সিটি কলেজেব হেরম্ববাবু—'

'ও-সব পছন্দ করতেন না?' সিদ্ধার্থ বললে।

'খ্যাঁট ভালবাসতেন না বুঝি তিনি?' প্রভাসবাবুকে জিজ্ঞেস কবল রমা।

'গোলদিঘির পাড়ে মির্জাপুরেব ঐ আলমাবিব মত বাড়িটায কলেজ বসত তখন, বাড়িটা আছে সিদ্ধার্থ?'

'আছে?'

'কলেজ ত আমহার্স্ট স্ট্রিটে গিযেছে শুনেছি।'

'হ্যাঁ, অনেকদিন।'

'মির্জাপুবেব ও-বাড়িটা কাদেব এখন? মাড়োযাড়িব?'

'না, ওখানে কমার্স ক্লাস বসে।'

'কমার্স? মাড়োযারিদেব সঙ্গে পাল্লা দেবাব জন্যে? সেটা কি ক্লাসে গিযে লিখে পড়ে এলেম হবে?'

'কাঁচা মাল নিযে' সিদ্ধার্থ বললে, 'কমার্স জমছে বেশ, ফেঁপে উঠছে।'

'হুঁ?'

'আমি ছেলেদের নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁপে ওঠাব কথা বলছি না। ছেলেরা ত আখেব ক্ষেত আজকাল, কার ক্ষেত কত বড় সেই নিয়ে চিনিব কাববাবগুলোব রেশাবেশি।'

প্রভাসবু বললেন, 'ও? এ-সব চিনি আব জিরেন কাট রসের কারবাব চলেছে বুঝি? আমি কলকাতায যাই মাঝে-মাঝে। কিন্তু দু-এক দিনেব বেশি থাকি না, শেযালদার একটা মেসে অফিসেব কাজ নিয়ে ঘাড় গুঁজে থাকতে হয, ট্রামে চড়ে হেডঅফিসে গিয়ে জবানবন্দি। ওকি কলকাতায থাকা!'

'কলকাতায় ভালও লাগবে না আপনাব।'

'কী করে লাগাব? ট্যাঁকে জামবাটিব মতন ঘড়ি নিয়ে ঘুবি। ও অনেক মিহি চেক ওড়াতে হয কলকাতার রস পেতে হলে।'

জমেছিল এসে বুকের কোনো জায়গায় নিঃশ্বাসটাকে আস্তে-আস্তে বার করে দিয়ে প্রভাসবাবু বললেন.—'কলকাতায অনেক চেনালোক আছে, কিন্তু দেখা হয না কারো সঙ্গে।'

সূচীপত্রে যান

চুরুটের ছাইয়ে ছুঁই-কি-না ছুঁই একটা টোকা মেরে প্রভাসবাবু বললেন, 'তাদের ভেতর মহিলাও দু-চারজন আছেন।'

'কী করে তাদের সঙ্গে দেখা হবে শেয়ালদার মেসে পড়ে থাকলে?' রমা একটা উড়ন্ত কুমড়ো পোকার—কুমড়ো পোকাই ত—ওড়াওড়ি ও জীবনের মধুর ছটফটানিব দিকে তাকিয়ে বললে।

'তাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে দেখা করা?'

'তোমাকে মেসে এসে তাবা দেখা দেবে?'

'অফিস গলায় ঝুলিয়ে কলকাতায় গিয়ে ফুরসতই পাই না। কোনদিক দিয়ে কোথেকে যে সময় চলে যায়!'

'সময়ের কানমলাটাই ভাল।' রমা কুমরো পোকাটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে বললে, 'না হলে—'

'না হলে?'

'না হলে কী হয় বলে দাও সিদ্ধার্থদা।'

'আমি উঠি।' সিদ্ধার্থ বললে,'ইউনিয়নের মিটিঙে—'

'ইউনিযনব ভোজ ত তোমাদের সন্ধের সময়, এখন ত মোটে চাবটে।'

বলে কুমরো পোকাটা ফিরে এসেছে তাকিয়ে দেখল বমা।

খুব আলতো টোকা মারলেও চুরুটেব মুখেব ছাই ঝবে যায়, এমনই ভঙ্গুর জিনিস চুরুট, মানুষেব জীবন-ছাই-এর গ্রন্থি: মানুষের কথা কাজ সংকল্প—ভাবতে-ভাবতে তবুও হঠাৎ সংকল্পে বলীযান হয়ে উঠে প্রভাসবাবু বললেন,

'এইবারে যাব।'

কিন্তু কোথায যাবে জিজ্ঞেস কবল না কেউ। ইউনিযনেব মিটিঙে দু-চারটে মনেব কথা প্রেসিডেণ্টকে শুনিযে-শুনিযে বলবে নাকি ভাবছিব সিদ্ধার্থ,বলে কী লাভ? কিছু হবে না, কিন্তু তবুও বলা দবকাব, ওপরওযালাদেব উপলব্ধিটাকে আযত কবে তোলবাব প্রযাস ভাল; কিন্তু তবুও এ যেন রবাবের ফিতে ধরে টানা, টানাটানি ছেড়ে দিলেই নিজেব নিরেট সঙ্কোচনে ফিবে যাবে ফিতেটা। রমা হস্টেলে যাবে কিনা ভাবছিল। কড়াকড়িব ভেতব নানাবকম সচ্ছলতা থাকবে না বটে তার, কিন্তু নানারকম দীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ, আজও স্বাধীনতা মোটেই অবাধ নয তাব, কিন্তু সেটাকে আবো অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করে দিলে গলানো ধাতুর মতন (সোনা বা লোহাই হোক না কেন) নমনীযতায সার্থক হয়ে উঠতে পাবে যদি সে-তরেই পথ খুলে যাবে ভবিষ্যতেব প্রাণ শিল্পেব, জ্ঞানশিল্পেব, চেতনা-শিল্পেব—মানুষেব জীবনের খাঁটি পবিণতি শিল্পেব।

'হ্যাঁ, যাব এইবার।'

'কোথায?'

'কলকাতায ওদেব সঙ্গে দেখা কবতে।' প্রভাসবাবু বললেন।

'ও—'বমা বোর্ডিঙেই থাকবে মনস্থিব কবে চিন্তাব ভেতব থেকে উঠে এসে তার বাবাব দিকে তাকিযে বললে, 'যাবে এইবাবে কলকাতায? দিদি -জামাইবাবুদের সঙ্গে দেখা করতে?'

'তা ত আছেই—' প্রভাসবাবু এই মোটা কথাটাকে বেশি আমল না দিয়ে বললেন,'আবো অনেকেব সঙ্গে দেখা করব ভাবছি।'

এই রকমই দেখা করে আসছেন অনেক দিন থেকে। কলকাতাযও ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে প্রাযই। মানুষেব সাধ অনেক, সংকল্প কম না, কিন্তু সিদ্ধিব কথা বলে কী আব লাভ। বাসমতীতেই একটানা পেনশন নেয়া অবদি থাকতে হবে ভদ্রলোককে, তাবপব থকাতে হবে পেনশন নিযে। তবে তিনপাঞ্জায না মবে বাসমতীতে যে মরতে হবে এইটেই লাভ। হয়ত কলকাতায বালিগঞ্জে-ভবানীপুরে না মরে বাসমতীতে যে-মরা, তাতেও লাভ, হ্যাঁ লাভ খুব। সিসু গাছে বাতাস উড়ছে মহানিমের শাখায একটা বাজপাখি এসে বসেছে, জিরাফেব মাথায় জিরাফ দাঁড়িয়ে আছে যেন, উঁচু-উঁচু ঝাউগাছগুলোব দিকে তাকালে মনে হয। ঝাউদেব ডালপালাব ফাঁক দিয়ে বেশি আকাশ দেখা যায; ওপবেব ডালগুলোব ফাঁক দিয়ে ওপরের আকাশ বিকেলের দিকের রোদ্দুর, শাদা পাঁশুটে, ধোযা সাজিমাটিবমত মেঘ, সাদাই বেশি, সূর্যেব বুকের ওপরে বড়-বড় সাদা শান্তি ও নিস্তব্ধতার মতন উজ্জ্বল—ভাবছিল, দিখছিল রমা।

'সিদ্ধার্থ।'

সূচীপত্রে যান

'আজ্ঞে?'

'কলকাতা একট কসমোপলিটান শহর আজকাল'

ঘুরে ফিরে আবার সেই কলকাতার কথা?—রমা খানিকটা বীতশ্রদ্ধ অথচ শান্তভাবে প্রভাসবাবুব দিকে তাকাল। যারা বেড়াতে, ব্যবসা করতে, ছুটি কাটাতে এসে মাঝে-মাঝে বাসমতীতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায়, কলকাতার অলিগলির সে-সব উঠতি বাঙালিদের কথাবার্তা শুনে-শুনে কান পচে গেছে রমার। ইনি বুড়ো মানুষ, তাদের চেয়ে ঢের আলাদা, প্রাণের অন্যরকম টানে কলকাতার জন্যে এর পড়ন্ত বয়সে কেমন একটা প্রীতি বুঝি জন্মেছে, তা চাগিয়ে ওঠে থেকে-থেকে, কিন্তু মনে-প্রাণে-ভবিতব্যতায় ইনি যে বাসমতীর সে সম্বন্ধে এঁর চেতনা পরিষ্কার ও প্রসন্ন হতে পারলে .... কিন্তু সে প্রসন্নতা লাভ করা সহজ নয়, বাবার আমার, এমন-কি সিদ্ধার্থদারও।

প্রভাসবাবুর নাকের ডগা রুমালে চেপে রেখেছেন তিনি। হাঁচি দেবেন হয় তো. সেদিকে তাকিয়ে রমা বললে, 'কলকাতাকে ত বার ভূতে বার জাতে লুটে খাচ্ছে, কোনো-কোনো বাঙালি বলে এটা বাঙালির হৃদয়ের পরিচয়। হৃদয় বা বুদ্ধি কোনো কিছুরই পরিচয় নয়। পৃথিবীরই হৃদযবান হতে ঢের দেরি, কলকাতার বাঙালি কী করে তা হবে। তবে বঙালির চেয়ে অন্য জাতদের কাণ্ডজ্ঞান বেশি। দেশ স্বাধীন হলে কলকাতা কোন এলাকায় চলে যায় কে বলবে?

'ও—তুমি ভেবেছ পাকিস্তানে যাবে?' প্রভাসবাবু এতক্ষণে হাঁচিটা খালাস কবে ফেলে বললেন।

'বাসমতী ত পাকিস্তানে পড়বে'

'কিন্তু কলকাতাও?'

তারপর ক্রমাগত হাঁচতে লাগলেন তিনি।

'বাঁধা পড়েছে রমা,' সিদ্ধার্থ বললে, 'কলকাতা পকিস্তানে যাচ্ছে না।'

'তাহলে দিল্লি-পাটনা গোটা হিন্দি হিন্দুস্তান ওটাকে বগলদাবা করবে', বমা বললে 'এখনই ত করেছে।'

'বাঙালিও একদিন গেটা হিন্দুস্তান চরে বেড়িয়েছে।'

'হ্যাঁ,কলকাতা এথেন্সের মত হয়ে উঠেছিল প্রায়,' রমা বললে, 'কিন্তু এথেন্সেব চেয়ে ঢেব নীচে রইল, এখন ত পড়ে যাচ্ছে, আর-কোনো সম্ভাবনা নেই।'

মাথা নেড় সিদ্ধার্থ বললে, 'আঠার-উনিশ -বিশ শতক যোগ দিলে এথেন্সের চেয়ে কম নয়।'

রমা গালে কপালে লেখনের মত দু-তিনটে আঙুল বুলিযে নিয়ে বললে, 'অনেক বড় বাঙালি কাজ করে গেছেন বটে কলকাতায, বাংলায়, কিন্তু এথেন্স খুব নিটোল ছিল।'

'গ্রীসকে খুব ভালবাস তুমি,' সিদ্ধার্থ বললে,'এই বয়সে গ্রীসকেই, আমাদের ব্রিটিশ শিক্ষাবিধানে থেকে তবুও সত্যিই মানুষ হচ্ছে যারা -ভাল লাগবে তাদেব। আমারও লেগেছিল!'

সিদ্ধার্থ বললে,'তুমি গ্রীক দেবী ছিলে—মাঝে মাঝে মনে হয না তোমার?'

'নিজেকে মাঝে-মাঝে ডায়োনিসিয়াস মনে হযেছে তোমার?'

'আমি তোমাকে জলদেবী বিটপীদেবী বলেছি কে বললে তোমাকে?'

'কী বলেছে—আর্টিমিস?'

'না—এথনা।'

'এথেন্সের কথা বলেছি বলে?' রমা সিদ্ধর্থেব শার্টের বোতামের দিকে তাকিযে বললে, 'এথেনাকে আমার আরাধ্যা মনে করে ভুল বুঝেছ তুমি।'

'ফজলুল হক বলেছিলেন—' প্রভাসবাবু দাঁতে চুরুট আটকে বেখে বললেন, কিন্তু কাশি এসে পড়ল তাঁর, কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি, চুরুট টানাও থেমে রইল কিছুক্ষণ।

'মানুষের মধ্যে না হোক, প্রকৃতির ভেতর যে ডাযনোসিযাস রযেছে তাকে জানি আমি, উনি চিনতে পারেন নি।'

'ডাযনোসিযাস?' সিদ্ধার্থ লেবু মেহেদি বনের দিকে তাকিযে বললে, 'কেন প্লেটোর কথা বলছ না কেন?'

'প্লেটোকে', রমা সেই কুমরো পোকটাকে আবার উড়ে আসতে দেখে একটু হেসে বললে, 'মার্কস এসে সরিযে দেয, কিন্তু ডায়োনিসিয়াস টিকে থাকে।'

সূচীপত্রে যান

'প্লেটোকে সরানো কঠিন, আমাদের লাইব্রেরিতে গ্রীক সাহিত্যের ওপর কোনো নতুন বই এসেছে?'

'কই দেখি নি ত!'

'গ্রীক দর্শনের ওপর?'

'বলতে পারি না। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'একটু নেড়েচেড়ে দেখতে হবে, গল্পচ্ছলে অনেক সত্য আছে । আমাদের মহাভারতে এ্যাযোনিসিয়াস কে?'

'নেই। শ্রীকৃষ্ণ অন্যরকম।'

'আমার মনে হয় আদিম নাদ যখন মানুষের প্রযোজনেব দিক দিয়ে অনেকটা শুদ্ধ হয়ে এসেছে,তখনই সেফোক্লেস ইসকাইলাস বই লিখেছিলেন, উপনিষদও তৈরি হযেছিল, উপনিষদের নিবিড় শ্লেকগুলো ডাযেনিসিয়াসের মতন।' শুনে রমা সিদ্ধার্থের মুখেব দিকে তাকাল, ভাবছিল, ধরতে পারে নি, কিংবা আমার কাছে ধরা দেবে না, হয তো ইউনিযনের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, বাবা এত কাছে আছেন বলে প্রতীকে কথা কলছি আমি, পবিভাষায উত্তর দিতে গিযে ডায়োনিসিয়াস আর উপনিষদে এ-রকম ভাবে জট পকিয়ে ঘুলিয়ে ফেল্লল কেন, ওর মত বয়স হলে আমিও ওরই মতন টসকে যাব হয তো, অনেকটা এই রকম পরিস্থিতির ভেতর আফ্রোদিতের কথা উঠলে, মীবাবাঈয়ের কথা পাড়ব? কে জানে, নিজের অপ্রাপ্তবযসের পৃথিবীতে এখনো রয়েছে তাহলে বুঝি রমা, সিদ্ধার্থদার অভিজ্ঞতা ও বয়সের সঙ্গে সেতু বেঁধেছে মনে ভেবেছে, কিন্তু তবুও বাঁধতে পারেনি?

'রমা—'সিদ্ধার্থ বললে।

প্রভাসবাবু—রমার বাবার দিকে তাকিয়ে বললে সিদ্ধার্থ।

'তুমি আমাকে ডাকছিলে না?'

'একটা চুরুট দিন আমাকে।'

'তুমি আমাকে কী বলতে যাচ্ছিলে সিদ্ধার্থদা?'

'তোমার কাছে লুক্রেসিযাস আছে?'

'এই যে চুরুট সিদ্ধার্থ ।'

'না, ওর বই কলকতাযও পাওযা দুষ্কর।'

'ঠিক জান আমাদের লাইব্রেরিতে নেই?'

'কলকাতায ইযুনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে পেতে পার। তুমি ত ইয়ুনিভার্সিটির রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুযেট?'

'না। কিচ্ছু হই নি, কিচ্ছু করি নি।' সিদ্ধার্থ বললে, কিন্তু গলার ভেতর তার অনুতাপেব বিমর্ষতা নেই, সংসার বযস ও পবিবাবেব চাপ খেযে প্রতি মুহূর্তেই কেতমপুরুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যেন আবার, অনেক সময মনে হযেছে বমার; বুক বাঁধবাব আশা কিংবা সংকল্পেব সবল সরলতা নেই সেনের কিন্তু কথাবার্তা আচারে স্বাভাবিকতাব টনক রযেছে।

'এক আধটা অন্তত বই লেখার দবকার ছিল আমার।' সিদ্ধার্থ বললে।

'কী ধরনেব বই?'

'ছেলেপেলে পরিবারের টানা হেঁচড়ায মফস্বলে মাস্টারি করে বই লেখার কাজে হাত দেয কঠিন।'

'হযতো তাই হবে, কিংবা নাও হতে পারে, কিন্তু লেখা হচ্ছে না।;

'আস্তে-আস্তে একটার পব একটা হয',

রমা বললে,'মানুষ তাবপবে এক সময়ে লিখতে আবম্ভ করে।'

'লিখব। পড়েছি অল্পসল্প। না লিখে পড়াব দিকে বেশি ঝোঁক।'

'প্রবন্ধ লিখবে না ত. কী লাভ হবে তত বেশি পড়ে? লুক্রেশিযাস কিন্তু আমার কাছে নেই।'

'বাসমতীতে বসে কলকাতা ইয়ুনিভার্সিটি বেজিস্টার্ড গ্র্যাজুযেট হযে কী লাভ?'

'সিদ্ধার্থ, তুমি চুরুট জ্বালালে না ত।'

'আপনার দেশলইটা অধিকারী মশাই?'

'সিদ্ধার্থদা, তুমি প্রবন্ধের নামে উপন্যাস লিখবে? নিজের জীবন আশ্রয করে উপন্যাস যদি লেখ গল্পের চেয়ে মন্তব্য বেশি থাকবে তাতে?'

'তুমিও একদিন উপন্যাস লিখবে মনে হচ্ছে আমাব। তাহলে কলম ধবি না আমি, অনেক ভাল

লিখবে তুমি আমার চেয়ে। নিজের কথা, বাসমতীর কথা লিখলে হত, কিন্তু হল না; আমাদের তুমি জুড়ে দিও তোমার কোনো এক বইয়ে।'

'যদি লিখি, করে লিখি, জীবন কোথায় তখন গড়িয়ে গেছে কে জানে। আমার লেখার পণ্ডশ্রমে নিজেকে মাটি হতে দেখে বুড়ো বয়সে কষ্ট হবে তোমার। আমি তোমাকে বলছি প্রফেসর সেন এখুনি কলম ধরো। লুক্রেশিয়াস খুব ভাল জিনিস, কিন্তু তিনি নিজেদের দেশ সময়ের আওতায় বসে কথাই বলেছিলেন, তুমিও তাই বলো।'

'দেশলাই দিয়েছি ত তোমাকে অনেকক্ষণ সিদ্ধার্থ।'

'ও, আমি চুরুট জ্বালিনি।'

'ফজলুল হক বলেছিলেন' প্রভাসবাবু বললেন, 'যে, কলকাতার বাড়িগুলো মোছলমান রাজমিস্ত্রিবা তৈরি করেছে, অতএব কলকাতা শরহরটা মোছলমানদের।'

চুরুট জ্বালাল সিদ্ধার্থ।

'তোমাদের ত সন্ধের সময় ইউনিয়েনের মিটিং—এখনই উঠলে যে?'

'ইউনিয়েনের ফাংশনে আমি যাব কিনা ঠিক বলতে পারছি না।'

রমা মনে মনে হোঁচোট খেয়ে ধীর শান্তভাবে তবুও বললে, 'যেও।'

'কেমন লাগছে চুরুট সিদ্ধার্থ?'

'ইউনিয়নে যেতে আমার বাধা নেই, কিন্তু দু-চারটে কথা বলব, তাতে বচসা হবার কথা।;

'কাব সঙ্গে?'

'যে গায়ে মাখবে তার সঙ্গে।'

'গায়ে না মেখে করবে কি, তুমি ত আলগোছে ছেনে দেবে না সিদ্ধার্থদা?'

দেখি কিছু বলে কিনা,' সিদ্ধার্থ জানালার ভেতব দিয়ে তাকিয়ে বার্থেলো সাহেবকে সাইকেলে চড়ে পাল্লার দিকে চলে যেতে দেখে মেহেদি ঝাউ বনের স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতাব দিকে তাকিয়ে পাবত পক্ষে বললে, 'বলব না কিছু কলকাতার কলেজ কর্পোবেশন এসেম্বিতে যে মানুষ ছুঁচও চালাতে পাবে নি, মফস্বলের একটা নিরীহ কলেজ নিয়ে মাথা গবম কবে কী হবে আব তার।'

'সিদ্ধার্থ, তোমাব চুরুট নিভে গেছে, একটা দেশলাই সঙ্গে নাও।'

'এই জ্বালিয়ে নিচ্ছি আমি, আব নিভাব না।'

ইউনিযনের মিটিঙে যাবাব মুখে লুক্রেশিযাসেব কবিতা চেয়েছিলে কেন তুমি প্রফেসব সেন?' বমা জিজ্ঞেস করল।

'অনেক দিন থেকেই ভাবছি পড়ব, হঠাৎ মনে পড়ে গেল-মিটিঙেব সঙ্গে কাকতালীয যেটা লুক্রেশিয়াসেব কবিতার ওরা এ বই-এব নাম শোনে নি। দেখি যোগাড় করতে পাবি কি না।'

'কাব কাছ থেকে?'

'বার্থেলোর থাকতে পারে। অনেক বই এনেছে বললে।'

সিদ্ধার্থ চুরুট টানছিল, দাঁতের থেকে খসিয়ে নিয়ে বললে, 'এই বই থাকবার কথা নয়।'

'হ্যা, পাওযা যায় না কোথাও বড় একটা, তা জানি আমি। কিন্তু বড় বড় বাক্স করে বই এনেছে-এখানো খোলে নি।'

'খুলবে আজ-কাল?'

'এই বইটাব জন্যেই খোলাব বার্থেলোকে দিয়ে। বইটা আছে আমাব মনে হচ্ছে।'

লুক্রেশিযাসের কবিতা কী রকম জানি না—' সিদ্ধার্থ আব একবার দেশলাই দিযে চুরুটটা জ্বালিযে নিয়ে বললে, 'কিন্তু মেয়েটির অন্বেষণ কবিতাব চেয়েও গভীর।'

'সিদ্ধার্থ চলে গেছে?' প্রভাসবাবু বললেন।

'হ্যাঁ ইউনিযনেব মিটিঙে গেল।'

'তাহলে লুক্রেশিযাস কে বল দেখি।'

'শুনলেই তো, একজন কবি।'

'কেমন লেখে?'

অনেকদিন আগের কবি; ওর লেখা আমি পড়ে দেখি নি এখনো। শুনেছি নিজেব যুগেব জ্ঞানবিজ্ঞান

সূচীপত্রে যান

সম্মত উপায়ে লিখেছেন।'

'শেলীর মতন?'

বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রভাসবাবুর দিকবিদিকের দিকে একবার তাকিয়ে একটু বিমর্ষ ক্ষমামধুর হাসি মুহূর্তেই ঠোঁটের ওপর শুকিয়ে নিয়ে রমা বললে, 'না। শেলী অন্যরকম। লুক্রেশিয়াস ভিন্ন জাতের। ঠিকে ঝিটা আসেনি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'চা করে আনি।'

'বাসমতীতে কফি পাওয়া যায় না?'

'হ্যাঁ, আছে বৈ কি।'

'আমি ইণ্ডিয়ান স্টোরে খুঁজে দেখব।'

পরের দিনই সিদ্ধার্থকে প্রত্যাশা করছিলেন যদিও প্রভাসবাবু,অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিলেন কয়েক দিনের সারাটা দুপুর বিকেল বাড়িতেই রয়েছেন কিন্তু দশ বারো দিনের ভেতরেও এল না সিদ্ধার্থ। পায়ে একটা বাতের ব্যাথা করেছিল প্রভাসবাবুর, নিজে সিদ্ধার্থের বাড়িতে যেতে পারেননি। কলেজে রমাদের ক্লাসে যেদিনই প্রফেসর সেনের ক্লাস সেদিনই একটা না একটা কারণে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। যেদিন নেহাৎই কলেজ বসেছে সেদিনও থার্ড পিরিয়ড অবদি কলেজ হয়েছে, ফিফ্‌থ পিরিয়ডে সিদ্ধার্থ ক্লাস নেবার আগেই হয় ফুটবল,না হয় কলেজ ডিবেটিং-এর জন্য,না হয় কোনো পর্বে অথবা বিশেষ কেউ কলেজে এসেছেন বলে ক্লাস হয়নি আর।

সিদ্ধার্থের অবিশ্যি প্রভাসবাবুর বাড়ি ঘন ঘন যাবার কথা নয়—বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আড্ডা মারবে, তাস খেলবে অথবা বাসমতীর দু-চারটে বিশেষ সাগরেদি চায়ের দোকানে প্রফেসরদের সঙ্গে ঢুকে গল্প জমিয়ে কাটাবে, মফস্বলের সে জাতীয় প্রফেসর নয় সিদ্ধার্থ। জানে এ-সব রমা। প্রভাসবাবুর বাড়িতে সেদিন প্রায় সাত আট মাস পরে গিয়েছিল সেন। 'আসবে বলেই আমাদের বাড়িতে আসেনি হয়তো— অন্য কোন দিকে যেতে যেতে আমাদের বাড়িটা হয়তো পথে পড়ে গিয়েছিল—'প্রফেসর সেন তাদের বাড়িতে আসবার নাম মাত্র করছে না দেখে ভেবে ঠিক করে রেখেছিল রমা। সিদ্ধার্থের বাড়িতে গিয়ে অবিশ্যি খোঁজ নিয়ে দেখতে যায় নি; কিসের খোঁজ নেবে? খোঁজ নেবার কোনো কথা নেই। কোনোরকম কথাই নেই—কালেভদ্রে দেখা হলে তাদের মনের ভেতরে যে-সব কথা আস্তে আস্তে উদয় হয় সেই-সব সাদাসিদে মর্যাদাগুলো নিয়ে একটু নড়চড়া করা ছাড়া।

ইণ্টারমিডিয়েটেই পড়বার সময় প্রফেসরদের রুমে বেশি যেত রমা, তিন চার জন মেয়ের সঙ্গে দল বেঁধে যেত-অন্য কোনো বিষয় নিয়ে নয়,এক আধটা অঙ্কের খটকা মেটাবার জন্যে। বি.এ ক্লাসে উঠে ওদের ওখানে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে; ইংরেজিতে অনার্স নিয়েছে, নিজেই সামলাতে পারবে. অন্তত মনে করেছে যে ভালই হচ্ছে, ফোর্থ ইয়ার হল তো তার' মত বদলাবার কোনো কারণ দেখছে না।

এই কয়দিনে তবুও প্রফেসরদের কামরায় গিয়েছিল একবারেরও বেশি; প্রায় তিনবার তো। শেষবার অবিশ্যি ঢুকেই বেরিয়ে এসেছে, মুখোমুখি দেখা হয়েছিল সিদ্ধার্থের সঙ্গে; হেসে এগিয়ে গিয়ে কী একটা কথা বলবে গিয়েছিল যেন সিদ্ধার্থ, লক্ষ্য না করবার ভান করে সোজাসুজি হেঁটে গিয়ে দরজা ঠেলে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে চলে গিয়েছিল রমা। পিছে পিছে খানিকটা এসে ফিরে গেল সিদ্ধার্থ। প্রিন্সিপ্যাল একাই ছিলেন, বললেন,'তুমি খুব হাসছ দেখছি। কী হল? এই ধর আমার টাক নেই—একটা হ্যাঁচকা টাকের কথা ভেবে হাসছ না তো রমা? প্রিন্সিপ্যাল হবার বিপদ অনেক. টাক পাকাচুল ভবিষ্যে পানা, ছেলেরা একটা ছুতো পেলেই প্রিন্সিপ্যালকে এ-সবের অবতার বলে মনে করে। কিন্তু শরীর মনের দিক দিয়ে আমি ওদের চেয়ে ঢের তাজা, মেয়েরা বরং আমাকে বুঝতে পারে।'

রমা আবার প্রফেসর্স রুমের দিকে ফিরে যাবে ভাবছিল। কিন্তু কেমন যেন সৌজন্যকূট এসে নিবস্ত্র করল তাকে, কোনো কথা বললে না সে, নড়ল না,কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল।

'বোসো তুমি—'

'না, আমি একটা কাজে এসেছিলাম।'

'বোসো, বোসে নাও—' প্রিন্সিপ্যাল প্রায় তার পাশের চেয়ারে বসবার জন্য ইশারায় নির্দেশ দিল রমাকে। 'কাজ আছে, তাতে বলতে বাধা কি। বোসো।' আকটু দূরে প্রিন্সিপ্যালের মুখোমুখি একটা

চেয়ারে বসল রমা। 'আমার এক মিনিটের কাজ—এখুনি হয়ে যাবে।'

'কি হয়েছে বলো?'

'কাজটা অবিশ্যি আমার এলেকার নয়।'

'নাই বা হল, তাতে ইতস্তত করবার কি আছে? আমি যদি কিছু করতে পারি—'

'ব্যাপারটা লাইব্রেরি নিয়ে।'

'ও-লাইব্রেরিতে ছেলেরা বড্ড গোলমাল করে?'

'না তা নয়। গোলমাল সয়ে গেছে আমাদের—'

বাধা দিয়ে মজুমদার বললেন, এটা তো সেঁকো ওষুধ নয়। খুব খারাপ কথা কলেজের দিক দিয়ে। কেন মেয়েরা বোকা বজ্জাত ছেলেগুলোর উৎপাত চোখ কান বুজে সইবে? আমি আবার নোটিশ দিয়ে দেব যেন লাইব্রেরিতে টু শব্দ না হয় আর, বিশেষত মেয়েরা যখন থাকে।'

প্রিন্সিপ্যাল কাগজ টেনে লিখতে বসে কাগজটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'টাইপিস্ট চলে গেছে ব্যাঙ্কে। ফিরে এলে ওকে ডিক্টেট করব।'

রমা উঠে যাবে ভাবছিল। কিছুই বলতে আসেনি প্রিন্সিপ্যালকে সে। তবে প্রিন্সিপ্যাল তাকে বসতে বলবার সময় একটা কথা ছ্যাঁৎ করে মনে পড়েছিল রমার,সেই কথাটা মজুমদার সাহেবকে বলবে মনে করেছিল।

কিন্তু এখন, রমা ভাবছিল,কোনো কথা না বললেও নয়; ব্যবহারের কোনো অসঙ্গতি থাকবে না তাহলে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে, তিনি ভাববেন লাইব্রেরির গোলমালের কথা জানাবার জন্যেই রমা ঢুকেছিল এ ঘরে। শেষ বিশ্লেষণে এ জিনিসটাও একটু খাপছাড়া বটে—মেয়েরা অনেকে মিলে না এসে রমা একা এল যে এ ব্যাপারটা জানাতে? কাঁচা কাজ হল; কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত মানুষ প্রিন্সিপ্যাল মজুমদার, এই-সব ছোটখাট ব্যাপারের কী হল না হল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তার নেই। তিনি মেনে নিয়েছেন যে একটা সঙ্গত কারণেই রমা ঢুকেছে তার ঘরে—টাইপিস্টকে ডিক্টেট করে নোটিশ পর্যন্ত চালু করে দেবেন জানিয়ে দিয়েছেন। প্রিন্সিপ্যালকে ঘাড় নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে ঠোঁটে হাসি টেনে নিয়ে এখন উঠে যেতে পারে সে। সেনকে এড়াবেই, এড়াতে গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে অবদি উটকো খেয়ালের চাপে ঢুকে পড়বে, এমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না রমার। কিন্তু মুহূর্তের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় হল তো তাই। রমা টের পেল প্রিন্সিপ্যাল তার দিকে তাকিয়ে আছেন, সে উঠতে পারছে না, মজুমদার সাহেব এত ভাল যে আচমকা মানুষটার স্থির নিখাদ দৃষ্টিসেতুর ওপর মিত্রশক্তির বোমা মেরে উঠে চলে যেতে রমার সেজন্য বাধছে।

'আমি দৃষ্টি রাখব। লাইব্রেরিতে কোনো অসুবিধা হবে না এবার থেকে আর মেয়েদের।'

'কিন্তু ছেলেরা—'

'বড্ড দুর্দান্ত?'

'আমি বলছিলাম—'

'আমার নোটিশ ওদের কাছে ঝুটো চিরকুটের মত হবে মনে হচ্ছে তোমার রমা?'

'তা কেন হবে? আমি—'

'তুমি জান না আজকালকার কলেজের ছেলেরা এক একটি কী বোমার টুকরো। তাছাড়া ওদের ট্রেড ইউনিয়ন আছে। আমরা তো ছাই, কলকাতার মিনিস্টাররা পর্যন্ত হয়রান হয়ে গেল ওদের বাগে আনতে গিয়ে।'

'বাগে এনে কি আর হবে? দেশ তো স্বাধীন করে দিল—'

'কারা? এই ছেলেরা?'

'না হয় তাদের বাপের কালের ছেলেরা। গোটা স্বদেশী যুগ আর বাবোআনি গান্ধিযুগ তো বাংলাদেশের কলেজের ছেলেরাই চালিয়েছে।'

'তাদের মনুষ্যত্ব এরা পায় নি।'

'আজকাল হুজুগে মেতে কেমন যেন বিতিকিচ্ছিরি হয়ে যাচ্ছে সব। দেখছি আমি। কিন্তু স্বাধীনতা পেলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'আরো খারাপ হবে,' মজুমদার সাহেব কামানো গোঁফের ওপর দু-চারটে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে বললেন, ''এ জেনারেশনের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। আমার ভাবনা হচ্ছে এর পরে যারা আসবে আরো খারাপ না হয়।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'স্বাধীনতা ত তারা অর্জন করবে না, কুড়িয়ে পাবে।'

নেকটাই-এর সোনার পিনে একটু চাপ দিয়ে হেসে বললেন, 'আজকালকার গোয়াল খাটালের সর্দার পোড়োরাও কুড়িয়েই পাচ্ছে; এত সব বেলেল্লাপনা যে হচ্ছে তার এও একটা কারণ।' একেবারে মিছে কথা বলেন নি প্রিন্সিপ্যাল, মনে হচ্ছিল রমার; তবে বেলেল্লপনাদেরও নিজেদের তরফ থেকে দু-চারটে কথা বলবার আছে হয়তো।

'তুমি এ মাসের স্কলারশিপটা পেয়েছ, রমা?'

'কোনটা ? গভর্নমেন্টের?'

'না, কলেজেরটা?'

'ও—'রমা তার বাঁ হাতের চুড়ির ওপর একটা টোকা দিয়ে হেসে বললে,'ওটা আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

প্রিন্সিপ্যাল থ হয়ে রমার মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর বললেন, 'ছেড়ে দিয়েছ মানে?'

'থার্ড ইয়ারে নিয়েছিলুম, ফোর্থ ইয়ারে উঠে ভাবলাম ওটা অন্য কাউকে দিয়ে দিলে হয়, আমার টাকার অভাব নেই।'

প্রিন্সিপ্যাল বিরক্ত হয়ে বললেন, 'টাকার জন্যেই ত নয়—স্কালারশিপের অন্য মানেও আছে; তোমাকে আমি কী শেখাব? ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় এ কলেজে থেকে ছেলেমেয়েদের ভেতর যে ফার্স্ট হয় সে ওটা পাবেই। ত্রিশ বছর ধরে এ রেওয়াজ চলে আসছে—একটা বিশৃঙ্খলা হতে দেওয়া ভাল নয়। একটা খারাপ প্রিন্সিডেন্ট হবে।' টেবিলের ওপর একটা ফাইলের ফিতে খুলতে গিয়ে সেটা সবিয়ে রেখে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'স্কলারশিপ তুমি ছেড়ে দিয়েছ বললে? কী করে ছেড়ে দিলে? কার মারফতে হল? আমাকে না জানিয়ে? আমি তো প্রিন্সিপ্যাল।'

'দিন পনের আগে,' রমা বললে, 'আমি দরখাস্ত করেছি।'

'কই আমি পাই নি তো।'

'ফাইলে আছে নিশ্চয়ই।'

'দেখব আমি,' রমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমাব হাতে দাও নি ত বুঝি।'

'আমি আপনার বড় কেরানিকে দিয়েছি—'

'ও রাজীবের কাছে আছে তাহলে। হয়তো ও দবখাস্তেব কোনো দিসপাশ না পেয়ে ফেলে রেখেছে। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে ওরকম আর্জি এই প্রথম পেল কিনা—'প্রিন্সিপ্যাল শ্রদ্ধা বিরক্তিব কেমন যেন একটা ভিযেনে তড়পে উঠে হেসে ফেলে বললেন। শ্রদ্ধা বেড়েছে ওপর মাসে পঞ্চাশ টাকাও স্কালারশিপের সম্মান মেয়েটি স্বভাবতই ত্যাগ করতে পারে বলে, কিন্তু তবুও মেয়েটি প্রথা প্রচলনের বিশুদ্ধি মানছে না বলে মনে একটা তাপ ছড়িয়ে পড়েছে প্রিন্সিপ্যালেব।

'রাজীব বাবুর উচিত ছিল দবখাস্তটা আপনাকে দেওয়া।'

'মাঝে মাঝে নিজের মাথা খাটায় রাজীব।' রমা একটু আতঙ্কিত হয়ে বললে, 'খুব দাযিত্ব নিয়ে কাজ করতে হয় রাজীব বাবুর, কিন্তু এটা তো ঠিক হল না। আমরা বিশ্বাস হারিযে ফেলব বাজীব বাবুর ওপরই শুধু নয়—পরিচালনার ওপর, সমস্ত কলেজটার ওপব।'

'বিশ্বাস হারাতে হবে না।' প্রিন্সিপ্যাল হেসে আশ্বাস দিযে বললেন।

'আবিশ্যি রাজীব বাবুব কোনো দোষ নেই—'

'আমি বকব না, ভয নেই তোমাব।'

'আমার দরখাস্তটার কী হবে?'

'তুমি চাও ত কমিটিতে পেশ করতে পাবি।'

রমা ঘাড় একটু কাত করে সিঁথির ডান দিকে ঘন চুলে ডান হাতেব কযেকটা আঙাল ছড়িযে বেখে আস্তে আস্তে প্রিন্সিপ্যালকে বললে, 'আমি ভাবছিলাম আমাদের ক্লাসের সীমা চক্রবর্তী, সেকেণ্ড হয়েছে, সীমা খুব ভাল মেযে কিন্তু বড্ড গরিব। ওকে যদি স্কলারশিপটা দেওযাব ব্যবস্থা করা যায—'

'ও তো ফার্স্ট হয়নি। এ স্কলারশিপ ফার্স্ট ছাড়া আব কাউকে দিতে পারা যাবে না।'

'যে ফার্স্ট হযেছে সে যদি দাবি ছেড়ে দেয?'

'তাহলে বোধ হয স্কলারশিপটা মূলতুবি থাকবে।'

'সেকেণ্ডকে দেওযা যাবে না?'

সূচীপত্রে যান

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'সেটা কমিটি বিচার করে দেখতে পারে সীমা তো মেয়েদের মধ্যে সেকেণ্ড হয়েছে, তাতে তো হবে না, ছেলেমেয়ে সকরকে ডিঙিয়ে ফার্স্ট হওয়া চাই। তোমার দরখাস্তটা কমিটিকে দিতে বলছ?'

'আপনি প্রিন্সিপ্যাল, আপনি নিজে কিছু কবতে পারেন না?'

'ইচ্ছে করলে পাবি, কিন্তু আমি তো ছিড়ে ফেলে দেব এ দবখাস্ত।'

'ও—'রমা ওঠবার উপক্রম করে বললে, তাহলে কমিটিও তাই করবে।'

প্রিন্সিপ্যাল নিরুপায়তায় একটু মুখ কাচুমাচু করবাব ভান কবে বললেন, 'এ ছাড়া কী আব করতে পারে বলো? আমি ত নিয়মের চাকর, ওবাও ত; নিয়মের মুনিবগিবি কমিটিতে কেউ কবতে চাইলে আমাকে বাধা দিতে হবে।'

বসেছিল রমা।

'তুমি টাকা নিযে অন্য কাউক দিযে দিতে পাব।' কামানো গালে গোঁফেব উপর হাত আঙুল বুলিযে মুখেব ওপর ঈষৎ নিঃসহাযতাব কেমন একটা ভাঙাচোরা ভাঁজ এনে প্রিন্সিপ্যাল বললেন।

'ওরকম ভাবে দিলে সীমা নেবে না।'

'সীমা ছাড়া আবো তো অনেকে আছে—' আগেব মতনই কেমন একটা খটকা বিবাগেব ধ্বক লেগে আছে প্রিন্সিপ্যালেব মুখে; 'মাসে পঞ্চাশ টাকা হাতে নিযে নিজেব খুশিতে ভাল কাজে বিলিযে দিতে পাবা যায়। কিন্তু সে পরামর্শ দিই না তোমাকে আমি। নিজেব পড়াশোনাব কাজেই লাগাও স্কলারশিপটা। এডুকেশনের কাজে লাগাবাব জন্যেই বায সহেব অমৃত দত্ত মশাই ট্রাস্টিদেব হাতে টাকা দিযে গিযেছিলেন। এ টাকা তুমি নার্সিং হোম বা বাসমতীব জেনেবেল হাসপাতালের বেড অথবা ভিখিবি টিখিবিদেব দিযে দিলে আমাদেব কাবোবই নৈতিক সমর্থন পাবে না। গোপনে অবিশ্যি যা খুশি তাই কবা যায়। কিন্তু সেটা কি নীতি?'

'কমিটির অ্যাজেণ্ডায ঢুকিযে আব কী হবে তাহলে দবখাস্তটাকে?' বমা প্রিন্সিপ্যালেব সেক্রেটাবিযেট টেবিলেব প্রকাণ্ড কাঁচেব ঢাকনিব পালিশেব দিকে তাকিযে বললে, 'কমিটিব মনেব কথা টেব পেলাম ত; আপনাব নিজেব মতামতও জানতে পারলাম।'

'দবখাস্তটা তবে বাজীবের কাছেই থাকুক।'

'কেন থাকবে? ও—'রমা একটু ভুরু তুলে হেসে বললে, 'তাব ওযেস্ট পেপাব বাস্কেটে থাকবে।'

বমা উঠবাব আগে একটা কথা বলা দবকাব মনে কবল প্রিন্সিপ্যালকে; বললে, 'বাজীব বাবুকে কি আপনি পাওযাব অব অ্যাটর্নি দিযেছেন?'

'কেন?'

'যাই লিখে থাকি না কেন—আমাব অ্যাপ্লিকেশনটা পনেব দিন আগে আপনাব হাতে আসা তো উচিত ছিল।'

প্রিন্সিপ্যাল টেবিলেব পুরু কাচেব এক কিনাবে নীল সবুজ স্মেলিং সল্টেব শিশিটাব দিকে তাকিযে আস্তে আস্তে কুড়িযে আনলেন সেটা, ছিপি খুলে দু-চাব বাব টেনে নিযে মুখটা এঁটে শিশিটা সরিযে বেখে বললেন, 'তুমি যা বললে তাব একটা বিশেষ দিক বযেছে। ও কী জবাবদিহি দেবে জানি না আমি। কিন্তু বাজীবেব বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন নালিশ কবেনি।'

'খুব ভালো কাজ করেন নিশ্চযই বাজীব বাবু—'স্মেলিং সেল্টেব শিশিটা কুড়িযে এনে নাকেব কাছে ছিপি খুলে দেখবার ইচ্ছোটাকে দমিযে রেখে বললে, 'কিন্তু আমাব ব্যাপাবে মন দিলেন না উনি; আমাব পিটিশনটা কলেজেব ব্যাপাব, কমিটিব ব্যাপাবে গিযে দাঁড়াত যদি আপনাব এখানে এসে ও বিষয সম্পর্কে খোলাখুলি কথাবার্তা না হত। 'এ কথাবার্তা দৈবাত ঘটে গেছে, কিন্তু যে অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই সাধাবণ নিযমে আপনাব হাতে আসবে সেটা এখনো এল না।'

'না, কোনো পাওযার অব অ্যাটর্নি নেই। গম্ভীবভাবে বললেন প্রিন্সিপ্যাল। 'আমাব নামের দরকাবি অদবকারি সমস্ত কাগজই আমাকে দেখাবাব কথা। তোমার দবখাস্তটা টিনেব্‌ল্‌ নয়. কিন্তু সেটা আমি হাতে পাব না কেন? ও শিশিটা—'

'ভারি চমৎকাব নীল রঙের' বমা বললে।

'স্মেলিং সল্টেব—'

'আপনাব কাছে একটা অনুরোধ—'

'কী বল তো?' প্রিন্সিপ্যাল যেন বুঝে ফেলে হেসে বললেন,'এই শিশিটা শুঁকে দেখবে তুমি?' মাথায় গিয়ে ঝিম করে হাতুড়ি মারবে কিন্তু খুব কড়া ঝাঁক। কালকে পার্সেলে এসছে, ভীষণ টাটকা সল্ট।'

তাহলে শিশিটা কুড়িয়ে নিজের দিকে আনতে পাবা যায়। মত দিয়েছেন, বেয়াদবি মনে করবেন না আর প্রিন্সিপ্যাল; কিন্তু শিশিতে হাত দেবার আগে রমা বললে, 'আমারি কথার মূর্খতায় রাজীব বাবুকে বড্ড বেকায়দায় ফেলেছি আমি। ওর কোনো দোষ নেই। ওকে যাতে কিছু না বলা হয়।'

· এ মিনতি প্রিন্সিপ্যাল রাখবেন কিনা—যাতে রাখেন সেই-সব সাত পাঁচ ভেবে নতুন কোনো মূর্খতা বা বেয়াদবি করবে না ঠিক করে স্মেলিং সল্টের শিশিটা সরিয়ে রেখে দিল। শুঁকে দেখতে গেল না আর।

'সাহসে কুলোল না বুঝি তোমার?' প্রিন্সিপ্যাল কাগজপত্তরের ফাইলটা কাছে এগিয়ে এনে বললেন।

'কিসের কথা বলছেন?'

'বোতলটার কথা বলছিলাম। ভেতরে সিয়ানাইডই আছে বুঝি?'

'রাজীববাবু সম্বন্ধে আমাকে কথা দিন দয়া করে। ওর কিছু নয়—আমারই দোষ, ক্ষমা করুন।'

'অনেক স্টেট সিক্রেট জেনে নিয়েছ এর মধ্যে। সব জানতে পারবে না।'

সল্টের বোতলটা একটু চিন্তিত মুখে এগিয়ে এনে ঢাকনা খুলে একবার টানতেই পাঁচ বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল রমার। কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় ছিল তখন তারা মোহিত বাবুর বাড়িতে; অন্য নানারকম সুন্দর,সৌষ্ঠবের জিনেসের সঙ্গে স্মেলিং সল্টের একটা বোতলও মোহিত বাবুর পরিপাটি টেবিলের কিনারে দেখেছিল সে আর বাড়ির ছেলে হারীত। প্রায়ই নেড়ে চেড়ে ছিপি খুলে দেখত দু'জনে। মোহিত বাবুর বাড়ি-হারীত-কলকাতার হেমন্তের দিনরাত হঠাৎ মনে পড়ে গেল রমার, রাসমতী কলেজের এই ঘরটার কথা মনে পড়বে আবার সাতবছর দশবছর পরে হঠাৎ অন্য কোথাও সল্টের বোতল নাকের কাছে টেনে ভির্মি খেয়ে। বোতলটা হাতে রইল তার, ছিপি এঁটে রেখেছে। প্রিন্সিপ্যালের কাছে একজন লম্বা ধ্যাড়ধেড়ে চাপরাশি এসেছে, চুটিয়ে তকমা পরে, পিওন বুক নিয়ে, হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এসেছে। পিওন-বইয়ে নাম সই করে চাপরাশিকে বিদায় করে দিলেন মজুমদার সাহেব। একটা বড় খামের ভেতর থেকে বার করে চিঠিপত্র এক মিনিটের ভেতর পড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের এক কিনারে।

'রমা, ফোর্থইয়ারের মেয়েদের একটা আলাদা অনার্স ক্লাস নেব বলেছিলাম। সেটা করে?'

'আজ শুক্রবার, আমাদের ফার্স্ট আর থার্ড পিরিয়ডে দু'টো অনার্স ক্লাস হয়ে গেছে।' তা তো হয়ে গেছে, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল করে অনার্স ক্লাস নেবেন বলছিলেন মনে নেই রমার।

দেরাজ থেকে তিনি রুটিনের চার্ট খুলে দেখছিলেন, 'আজ শুক্রবার বললে?'

'হ্যাঁ—'

'এটা কোন পিরিয়ড?'

'ফোর্থ পিরিয়ড চলছে।'

'ও'দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফিফ্‌থ্ পিরিয়ডে ক্লাস নেব তোমাদের।'

'কোন ঘরে?'

'আমার এই ঘরেই। জানে তো মেয়েরা?'

সঠিক কিছু বলতে পারল না রমার শুক্রবার ফিফ্‌থ্ পিরিয়ডে তার নিজের ঘরে অনার্স ক্লাস নেবেন বলেছিলেন বুঝি প্রিন্সিপ্যাল? সীমাকে জিজ্ঞেস করলে কোন বইয়ের কোন প্যারাগ্রাফ থেকে পড়াবেন তাও বলে দিতে পারত; কিন্তু ক্লাসের পড়ার দিকে কোনো মন নেই রমার, ঠোঁট নাড়িয়ে মাস্টারের দল পড়িয়ে যাচ্ছে, দিনের চাকা ঘুরছে, আর রাতের চাকা, কিন্তু হচ্ছে না কিছুই; মাঝখানে রাজীব বাবুর মতন ভাল মানুষকে বদনাম, মুখপাত্র তাকেই সাজতে হল; কী করবেন প্রিন্সিপ্যাল বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কিন্তু মজুমদার যেরকম লেফাফাদুরস্ত তাতে রাজীব বাবুকে বেশি বিপদে পড়তে না হয়।

কে এই রাজীব চক্রবর্তী?

সীমা চক্রবর্তীর বাবা।

ছটফট করতে লাগল রমা। স্মেলিং সল্টের শিশিটা প্রিন্সিপ্যালের নিজের দরকারে লাগবে হয়তো; শিশিটা রমার হাতের ভেতর, প্রিন্সিপ্যাল আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে এইবারে ও শিশিটা তার লাগবে, মনে হচ্ছিল রমার, কিন্তু তবুও সঠিক কিছু বোঝার আগে নিজের কাছেই রেখে দিল শিশিটা।

সূচীপত্রে যান

ইশারা ইঙ্গিতে পরিভাষায় নয়—সোজা ভাষায় চাইলেই সেটা প্রিন্সপ্যালকে সে ফিরিয়ে দেবে।'

'তোমার কি মাথা ধরেছে?'

'না।'

'খুব টানছ দেখছি স্মেলিং সল্ট—'

বোতলটার ছিপি আটকাতে আটকাতে রমা বললে, 'রাজীব বাবু তো সীমা চক্রবর্তীর বাবা।'

'ওর মেয়ের নাম সীমা?' কলেকটরের চিঠিটা আর একবার পড়ে শেষ করে টেবিলে রেখে দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'তা জানি না—হবে। তোমার সর্দি হয়েছে?'

'না। ঠিক আছে। সল্টটা চাই আপনার?'

'এখুনি না। থাকুক তোমার কাছে। অনার্সের মেয়েদের এখন অফ? বলতে পার?'

'হ্যাঁ। পাঁচ মিনিট তো বাকি আছে বেল পড়বাব। এই বেলা চিরকুট পাঠিয়ে দিলে খবর পাবে ওরা।'

'কিন্তু কোনদিকে পাব দপ্তরীকে? কোথায় আছে ওরা?'

'মেয়েদের কম্পাউণ্ডে,' স্মেলিং সল্টের শিশিটা টেবিলের কাচের ঢাকনাব ওপর রেখে দিয়ে বললে, 'কলেজের ঠাণ্ডা ঝিলটার কিনারে সিঙাড়া ফলগুলোর কাছাকছি একটা পেযারা গাছের ছায়ায বসেছে দেখে এসেছি।'

'সিঙাড়া? পানফল?' দপ্তরীকে ডেকে স্লিপ দিয়ে স্মেলিং সল্টের শিশিটা একবার খুলে নিয়ে একটু নাকে ছুঁইয়ে রেখে দিলেন টেবিলে। প্রিন্সিপ্যালের চোখ জলে ভরে গেছে।

'আমাদের লাইব্রেরিতে লুক্রেশিয়াসের বই দেখলুম না তো।'

'লুক্রেশিয়াস?—সেই কবির কথা বলছ?'

'তাছাড়া আর কে আছেন?'

'কোনো আধুনিক লেখকের ছদ্মনামও তো হতে পারে।'

'আছে নাকি? শুনি নি তো।'

'আমি আধুনিক লেখা বেশি পড়িনি।'

'আমাদের লাইব্রেরি বাজেটে শ'পাঁচেক টাকা খরচ করা হবে তো এবার-ইংরেজি বই—এর জন্য?'

'না। তিনশো।'

'গতবার তো সাতশো হয়েছিল।'

'এবারে প্রফেসাররা অনেক বই কিনিয়ে নিয়েছেন আগেই—এখন দেখছি সবই প্রায বাজে বই।' বাজে কি-না সে বিষযে মত প্রকাশ করাবার দবকার ছিল না রমাব। প্রিন্সিপ্যাল প্রাযই টেকসট বই ভালবাসেন—এবং টেক্‌সট্‌ জাতীয় নানারকম বই আধিকাংশ প্রফেসাররাই তাই। রমা এ কলেজে মাস্টাব নয়, কেউ নয়; ছাত্রী হিসেবে লাইব্রেরির বই কেনাকাটার নিয়ন্ত্রণ কববার অধিকার তাব নেই, কিন্তু ভাল বই পড়বার ইচ্ছা আছে। তা ছাড়া সেনকে লুক্রেশিযাস পড়াবে না সে? বার্থেলো বাক্সোগুলো খোলেনি এখানো; আটদশ দিন হল কলকাতায় গিযেছে, আরো দু-এক সপ্তাহ থাকবে।'তিনশ টাকা তবে ইংরেজি বইযের বাজেটে বরাদ্দ হল এবার?'

'হ্যাঁ-দু'শো পঁচাত্তর টাকার অর্ডার চলে গেছে, এখন মোটে পঁচিশ টাকা বাকি—সল্টের শিশিটা এক জায়গার থেকে উঠিয়ে আর এক জাযগায় বসিযে রেখে প্রিন্সিপ্যার বললেন, 'আমাদের এখুনি আড়াইশো টাকার বইয়ের দরকার আরো, তবুও কিছুই করতে পারছি না।'

দপ্তরী ফিরে এসে বললে,'মেয়েরা আসছেন।'

'এখনো ঘণ্টা পড়ে নি—'

'এইবারে পড়বে।'

'আমাব এ ঘড়ি পাঁচ মিনিট ফার্স্ট।'

'কলেজের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে রাখলে সুবিধা হত।'

'অনেকবার মিলিযে দেখেছি কি এ ঘড়িটা প্রগ্রেসিভ।' রমার লুক্রেশিয়াস বাতিকটাকে একটু লজ্জা দেবার জন্যে প্রিন্সিপ্যাল মুখ টিপে হেসে বললেন, 'কিন্তু মনে পড়ে গেল প্রগ্রেসিভ নয়, লুক্রেশিয়াস তো পরনো রোমান।'

সূচীপত্রে যান

'কোন দোকানে পাওয়া যাবে?'

'লুক্রেশিয়াস? বলছি, কিন্তু রাজীব বাবুকে একটু দেখবেন দয়া করে— বরং আমার লুক্রেশিয়াস না হল—'

কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের দার্ঢ্য ভাঙতে পারা গেল না যেন; কোনো কথাই বললেন না তিনি রাজীব চক্রবর্তী সম্বন্ধে, বরং ক্ষেপে উঠে স্টিম ঝেড়ে দিতেন যদি ভাল হত সেটা, কিন্তু কেমন থমথমে হয়ে আছেন যেন।'

'কলকাতায় পাওয়া যাবে লুক্রেশিয়াস?'

'হু?' আড়চোখে রমার দিকে তাকিয়ে বললেন মজুমদাব সাহেব, 'অথচ বিলেতে অর্ডাব দিয়েও অনেক বই পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। বইটার কি ইণ্ডিয়ান এডিশন বেবিয়েছে নাকি হে কিতাবিস্থান থেকে?'

'সেদিন আমাদের দেশে আব সূয্যি উঠবে না।'

'কেন? কেন?'

'নিজের লক্ষ লক্ষ বছরেব অপকর্মে বেচারী লজ্জায় মুখ লুকোবে।'

স্মেলিং-এব শিশিটা তুলে নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন,'কিন্তু কিতাবিস্থান থেকে বই বেরুচ্ছে তো ঢের; সূয্যিও ধর্মসাক্ষী হয়ে জেগে আছে, মানুষ খাচ্ছে-দাচ্ছে শান্তি পাচ্ছে। তোমার বইটা কি হে যে, আমাদের দেশেব কোনো প্রেস কুল্লে সাতশো কপি ছাপাতেও সাহস পাচ্ছে না?'

'সাতশো?' প্রিন্সিপ্যালেব খাস তালুকেব চুল পাকে নি, দু'দিকে রগের ধাবে পেকেছে শুধু,পেকে আরো খুলেছে চেহারা; একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বমা বললে, 'বিলেতি এডিশনও সাত কপিব বেশি এদেশে পাঠায় না, ভাবে সাত দশ ওদের এতেই চলবে।'

প্রিন্সিপ্যাব নিজেব প্যাডটা বমাব দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কল্কাতায় হবে না, বিলিতি পাবলিশাবের নাম লিখে দাও।'

'কে পাবলিশাব জানি না আমি।'

প্রিন্সিপ্যাল ভেবে বললেন, 'কলকাতায় হ্যাঁচকা অর্ডার দিলে পাওয়া যাবে?'

'অক্সফোর্ডে ম্যাকমিলনে পাওয়া যেতে পারে—হয়তো একটা নির্দেশ দিতে পারে ওবা।'

'আচ্ছা আমি লাইব্রেবিয়ানকে বলছি আজই অর্ডাব দিতে।'

নীল শিশিটা বাখলেন তিনি টেবিলেব ওপব। বাজিব বাবু একবাশ নথিপত্র নিয়ে হরতবাস হয়ে ঢুকে পড়লেন প্রিন্সিপ্যালেব ঘবেব ভেতব। বমা বিপদ গণল, কী যেন কী হবে।

'এই তো এতক্ষণ হাতখালি ছিল,' প্রিন্সিপ্যাল ভুরু কুঁচকে বললেন,'এখন তো আমার ক্লাস-এখন এ-সব নিয়ে এসেছেন?' রাজীব বাবুব কাগজপত্রেব দিকে নিবেট বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধায় তাকালেন তিনি।

'আমি আগেই আসতাম' রাজীব বাবু বললেন, 'কিন্তু অডিটর এসেছিলেন, তিনি আবাব কানে শোনেন না—'

'কোন অডিটর ? কে?'

'ভূপতি বাবু—ভূপতি চট্রবাজ। ওই যে বিলেতী ডিগ্রি আছে—'

'তিনি এলেন, চিনি না ত। কেন আমাদের প্রফুল্লবাবু কোথায়?'

'প্রফুল্লবাবুই পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

প্রিন্সিপ্যাল দেবাজ থেকে চশমার খাপটা বেব কবে টেবিলেব ওপর বেখে বললেন, 'চট্রবাজ কি ছোকরা?'

'আপনি দেখেছেন তাকে, তিন মাস আগে অডিট কবতে এসেছিলেন—প্রফুল্লবাবু আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন—মনে নেই হয়তো আপনার—'

'কার মনে থাকে?' প্রিন্সিপ্যাল একটু মনেব গবমে বললেন, কলেজেব পরিচালনা, শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ ও যাবতীয় বিষয় সম্পর্ক ওয়াকিবহাল থাকাব ব্যাপরে একান্ত একক তো তিনি, সকলেই জানে; কিন্তু কেউ কেউ ভুলে যায় মাঝে মাঝে।

'না বেশি বয়স নয় চট্ররাজ সাহেবের-ত্রিশ বত্রিশ হবে।'

'কানে শোনেন না?'

'খুব কম শোনেন।'

সূচীপত্রে যান

'তবে কি ইয়ারফোন লাগিয়ে কাজ করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে প্রফুল্লবাবু?'

এ কথার কোনো জবাব নেই রাজীব চক্রবর্তীর হাতে চার-পাঁচদিন হল দাড়ি কামানো হয় নি রাজিব বাবুর, তিনি দাড়িতে আস্তে-আস্তে নখের খোঁচা দিয়ে আমতা-আমতা করছিলেন।

'অডিটরের ত এখানে আসার কথা নয় বারবার—'

'এসেছেন ত নিজের গাড়িতে চড়ে—'

'খুব দযা করেছেন,' মজুমদার সাহেব বললেন, 'কিন্তু বাজীব বাবু বলে দেবেন ভূপতি বাবুকে—এখানে এসে কিছু অডিট কবার দরকার থাকে যদি তার তাহলে কলেজেব প্রিন্সিপ্যালের অজ্ঞাতে যেন সে কাজটা না হয়।'

'আপনাকে খবর দেওয়া হয়েছিল ত। বেনি দপ্তরি এসে বলেনি?'

'বেনিকে কে পাঠিযেছিল?'

'আমিই ত।'

রমা তাকিয়ে দেখল প্রিন্সিপ্যালের সমস্ত মুখে যা ছুটে এসেছে তা ভাল জিনিস নয়; নিঃশব্দ বটে, কিন্তু তবুও তোড়টা বক্তেব। কিন্তু তবুও নিজেকে সামলে নিলেন প্রিন্সিপ্যাল: মুখের কঠিন লালিমা আস্তে আগের মত গৌর হয়ে, ফ্যাকাশে হয়ে গেল তারপব।

'বেনি আমাকে কোনো খবব দেযনি।'

'বাজীব বাবু কিছু বলতে পাবলেন না।'

'বেনি কোথায?'

'নীচে আছে।'

'তাকে পাঠিযেছিলেন- সে এল না কেন?'

'বেনি বলতে পারে।'

'রমা,' প্রিন্সিপ্যল তার দিকে মুখ ফিরিযে বললেন,'অনার্স ক্লশেব মেযেবা এসেছে?'

'আসেনি এখনো।'

'ওয়ার্নিং বেল পড়েছে, ফাইনাল বেল পড়েনি?'

'এখনো পড়েনি।'

'আমি একটু এদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি,' তিনি বললেন, 'অনার্স ক্লাশ আজ নেব কি-না বলতে পারছি না।'

'আমি উঠব তাহলে?' চেযাব ছাড়াৰ উপক্রম কবে রমা বললেন।

'না বোসো, মেয়েরা এসে নিক।'

বেনিকে ডেকে পাঠব?' রাজীব বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

না। প্রিন্সিপ্যাল মাথা নেড়ে বললেন, 'সে ত সাতটা অবদি আজ কলেজে থাকবে —'

'আজ শুক্কুববাব,' রাজীব বাবু বললেন, 'বেনিব আজ সাতটা-সাড়ে সাতটা অবদি থাকাব কথা।'

'আমাব কাছে পাঠিয়ে দেবে তাকে সাতটার সময।'

'আপনাব বাড়িতে?'

'না, কলেজেই থাকব আমি।'

স্মেলিং সল্টের শিশিটা টেবিলের এক কিনারে জড়সড় হয়ে পড়েছিল এতক্ষণ, কেউই ফিবেও তাকাচ্ছিল না শিশিটার দিকে। প্রিন্সিপ্যালেব মাথায অনেক ধান্দা, কিন্তু সস্নেহে তাকালেন শিশিটাব দিকে। সসম্মানে ডান হাতে, তারপব ছিপি না খুলে প্রায নাকের কাছাকাছি তুলে নিয়ে আস্তে-আস্তে,গালেব চামড়ায় ঠাণ্ডা নীল কাচের পালিশ ঘষতে-ঘাষতে রাজীব বাবুব দিকে তাকিযে তিনি বললেন, 'বেনিকে না পাঠিয়ে নিজে এসে আমাকে খবব দেওয়া উচিত ছিল আপনাব।'

'আমি উঠি—' রমা বললে।

'বোসো। অনার্স ক্লাশ নেব না বলি নি ত।'

'মেয়েরা কি খবব পেল না নাকি?' রমা নিজেকে যেন বললে।

পেযেছে; আসবে,' প্রিন্সিপাল বললেন, ফাইনাল বেল পড়ে নি ত!'

'বেনি যে এমন কববে তা ত আমি বুঝতে পারি নি।' প্রিন্সিপ্যালেব চেহাবার স্পষ্ট, সুন্দব, দৃঢ়

চেকনাইয়ের দিকে তাকিয়ে রাজীব বাবু নিজের অপরাধে, অকিঞ্চিৎকরতায় কেমন যেন একটু মরে গিয়ে বললেন।

'বেনির কথা এখন থাক; সাতটার সময় কথা হবে তার সঙ্গে; তার দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হবে।'

কথাটা লাগল রাজীব বাবুর; তাঁর চেয়ে বেনিব ওপরই তাহলে বেশি বিশ্বাস প্রিন্সিপাল মজুমদার মশাইযেব" কুড়ি বছর আগে ঢুকেছন এ কলেজেব অফিসের কাজে, চৌত্রিশ বছব কাজ করেছেন তিনি এখানে, বেনি ত সেদিন এল। কেমন যেন চলকে উঠল বাজীব বাবুব লো ব্লাড প্রেসারের রক্তের মারাত্মক নম্রতা; কিন্তু থামিয়ে রাখতে হয় কোনো উপায নেই। প্রিন্সিপাল তাকে যে বিষয নিয়ে আটকেছেন আজ সেটাব ভিতর স্থির যুক্তিও নেই। বেনি প্রিন্সিপালকে কী বলবে আন্দাজ করতে পারছেন না রাজীব বাবু; তবে যাতে নিজে সে সাফাই হতে পাবে সেই কথাই বলবে। বেনিব কথাই খুব সম্ভব বিশ্বাস কববেন প্রিন্সিপ্যাল। অডিটর এল, প্রিন্সিপালকে খবর দেওয়া হল না, গাফিলতিটা আজকে এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বাজীববাবুব ছাড়া আর কারো নয়।

আগে এবকম ছিল না। চুযান্ন বছর বযস হযেছে, গবিব বাঙালিব সংসাবে অনেক ভাল কবে ফোঁটা ফোঁটা রস ঢেলে ছিবড়ে হয়ে গেছেন তিনি। বেনিকে ডেকেছিলেন তিনি,দু-তিনবার ডেকে বলেছিলেন, বেনি বেবিযেও গেল; কিন্তু রাজীববাবুব হুকুমের ভনভনানি শুনতে পাযনি নাকি সে? না আধখানা শুনে ওস্তাদি কবে বাকি আধখানার হাবা-উদ্দেশ্য চলে গেছে? প্রিন্সিপালের কাছে আসেনি ত বেনি।

দোষ রাজীববাবুব নিজের।

বেনিকে জেবা কবলে বাজীববাবুর মিথ্যাচাব নয, কিন্তু কাজকর্মে পানেব থেকে চুন খসবাব মত খানিকটা অসাধ অমনোযোগ ধরা পড়ে যাবে; গ্রাহ্য কববাব মত দোষ নয সেটা, কিন্তু প্রিন্সিপাল নিজেব খুশিতে সেটা বড় কবেও দেখতে পারেন।

'ভূপতি চট্টবাজ অডিট কবছিলেন, তিনি অডিটব ও—'

প্রিন্সিপাল বললেন, 'আপনাকে দিযে কী দবকাব ছিল তাব?'

'অনেক কথা বুঝিযে দিতে হচ্ছিল তাকে।'

'কে বলেছিল আপনাকে বুঝিযে দিতে?'

'প্রফুল্লবাবুকেও কোনো-কোনো কথা বলে দিতে হত, কলেজের হিসেব-নিকেশেব তো অনেক বকম জট বযেছে, ওবা জেবা কবেন।'

তা কবেন বটে, প্রিন্সিপাল জানেনও তা; নানাবকম ঝড়তি-পড়তি গলতি আবছাযা ও দুর্ধর্ষ হিসেব-নিকেশেব অদ্বিতীয কর্ণধাবও বাজীববাবু, অডিটবেব সঙ্গে ও-সব জিনিস নিযে আলোচনায প্রিন্সিপালেব মর্যাদায ঠেকে, ভাইস প্রিন্সিপালেবও; জাবড়া কাজগুলো বাজীববাবুব ববাতে ছেড়ে দেন তাঁরা, জানেন লোকটা টাকাকড়ি হিসেবকিতেবেব সব রকম চোবাবালি উৎবে কলেজের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পাববে। মান খোযাবাব মত কোনো কাজ কবেনি বটে কলেজে, প্রিন্সিপাল-ভাইস প্রিন্সিপালেব গোচবে তেমন কিছু কোনোদিন কবেছে বলে মনে পড়ছে না মজুমদাব সাহেবেব। কিন্তু একটা অথই সমুদ্রেওব মত যেন টাকাকড়িব নিত্যনিতান্ত বিষযের বিবাট জমাখরচ নিযে কলেজেব, বোর্ডিঙের, ছেলেমেযে হিন্দু-মুসলমান হোস্টেলহদ্দোগুলোব হিসাবনিকাশের ব্যাপাবটা। বাজীব বাবু পনব বছব ধরে এই-সব কাজে হাত পাকিয়ে এখন অব্যর্থ হযে উঠেছেন প্রায। ও কাজে প্রতিভা লাগে না কিন্তু একাগ্রতা ও পবিশ্রমেব দবকাব; পারতপক্ষে প্রিন্সিপাল বা বড় প্রফেসববা ও জিনিশে অতিবিক্তভাবে নাক ঢোকাতে যায না; ছোট প্রফেসারদের কাবো-কাবো অবিশ্য এদিকে কৌতূহল আছে ঢেব; তাদেব ভেতব যাবা তাসটাস খেলা তেমন পছন্দ কবে না, কোথাও বাইরে গিযে চটে বসবার বা অন্দবমহলে ঢুকে পর্দা টেনে দেবাব, নিদেন পক্ষে কোনো পড়বার মত বইও খুঁজে পায না, ছুটির দিনে দুপুবগুলো তারা কলেজেব অফিসে এসে হিসাবকিতাবের ঢাউস বাঁধানো খাতাগুলো তারা কোলে তুলে নেয, কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে নয, কলেজেব সব ব্যাপারেই ষোল আনা এলেম থাকা দবকার, কলেজটা ত তাদেরই এই হিসেবে। রাজীববাবু তাদেব কাছে আশ্চর্য ধাতুশক্তি; দ্রোণাচার্যের মত কত শিষ্য তৈরি কবেছেন। তিনি জুনিযর প্রফেসবদেব মধ্যে সকলকেই সব বুঝিযে দিয়েছেন। কলেজে ভারিক্কে অডিটর এসে যা-কিছু জানবার বোঝবাব জিজ্ঞেস করবার সবই নিখুঁতভাবে পেতে পারেন ছোটতরফের এই-সব মাস্টাবদেব কাছ থেকে। কিন্তু অডিটরদের

সূচীপত্রে যান

আজকাল বিশেষ কিছু জানতে জিজ্ঞেস করতে হয় না, গত আট-দশ বছর ধরে নীরবেই প্রায় কাজ করে যেতেন তাঁরা, দু-একটা গুরুতর ব্যাপারে প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালকে এক-আধটা কথা পরিবারের বন্ধুর মত জিজ্ঞেস করতে হত, মোটামুটি সহজেই মিটে যেত সব। রমেনবাবু প্রফুল্লবাবুব আমলে এই রকমই হয়েছে। কিন্তু ভূপতি চট্টরাজ ইদানিং আসছে। ছোকরা মতন অডিটর, প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখন-হাসির মতন একবার উঁকি দিয়ে দেখা করে যায়; কাছে বসে দু-চার কথা বলবার প্রয়োজনীয়তাই বোধ কাবে না। তাছাড়া কলেজের হিসেব অডিট করতে এসে রাজীববাবুর কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক কথা জিজ্ঞেস কববার অছিলায় দশরকম অবান্তর জিনিস আদায় করে জেনে নেবার দিকে বিশেষ তৎপরতা আছে এই ছেলেটির; প্রিন্সিপালের কাছে গিয়েছে সে খবর। রাজীববাবু সৎ লোক, কিন্তু সমীচীন লোক নন যে, জানেন তা প্রিন্সিপাল। অবিশ্যি লেখাপড়া-খেলাধূলা, কিংবা চট্টবাজেব যেটা চৌহদ্দি, সেই হিশেব-নিকেসের ব্যাপারে, কলেজেব কোনো গুমর নেই—কী ফাঁক করবে চট্টরাজ রাজীব আহম্মককে হাত কববাব চেষ্টা করে।

নীল শিশিটার ঢাকনা খুলে নাকের ভেতব দিয়ে মাথার তালুটা আস্তে একটু ঝাঁকিযে নিলেন প্রিন্সিপাল। ঢাকনাটা সট করে এঁটে দিলেন। কিন্তু চট্টরাজেব এই কলেজেব খুঁত বাব করবাব জন্যে তক্কেতক্কে থাকাটাই ত নচ্ছার বেল্লিকপনা, প্রফুল্লবাবু বেশি ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন, আসতে পারেন না; কিন্তু কী হিসেবে এই লোকটাকে পাঠাচ্ছেন?'

ফাইনাল বেল কিছুক্ষণ হয বেজে গেছে; শোনেন নি হয়তো প্রিন্সিপাল; রমা শুনেছে; মেযেরা কেউ এখন পর্যন্ত এল না ত; মেযেরা এলনা বলে নয়,এমনি কেমন একটা উদ্বেগে দবজার দিকে বাববাব তাকাচ্ছিল রমা; সীমা এসে আবাব এই অবস্থায তার বাবার মুখোমুখি না পড়ে যায! বাজীববাবু ত এখন কাঠগড়ায। প্রিন্সিপালেব অবচেতন মনে ডুব দিযে এসে টেব পেয়েছে রমা যে অনেকটা তাবই বোকা পিটিশনও বেকুবের মত কথাবার্তা বলাব ফলে রাজীববাবুর এই অবস্থা, অডিটব দিযে তর্কাতর্কি একটু ফালতু ফোড়নেব ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয।

'ভূপতি চট্টরাজ কানে কম শোনেন, কী কবে বুঝেসুঝে নিলেন তবে?'

'তাব কানের কাছে চিৎকার কবে কথা বলতে হয।'

'ও—তবু ভাল—' প্রিন্সিপাল আড়চোখে একবার বমার দিকে তাকিযে নিযে হেসে বললেন,'দশজনেব সামনে চেঁচিয়ে বগচটা কথা ছাড়া আব কিছু বলা যায না; একটু মাখামাখি কবে কথা বলতে হলে—'বমাব দিকে চোখ ফিবিযে নিযে বললেন, চট্টবাজমশাই কানে খাটো, কিন্তু তবুও সব কথাই শুনতে চান।'

'দরকারি কথাগুলো।' বাজীববাবু বললেন।

'দরকারের একটু বাড়াবাড়ি হযে যাচ্ছে। আপনাকে বলেছিলাম কি যে আজ আমাব ফিফ্‌থ পিবিযডে ক্লাশ আছে?'

'না।' রাজীববাবু বললেন।

'ফোর্থ পিরিযেডে আজ অপ্‌সব্‌ আছে তাও জানতের না? আমাব রুটিনেব চার্ট এক কপি বযেছে ত আপনার কাছে।'

'আছে। জানতাম। কিন্তু চট্টবাজ—'

'গলায় গামছা বেঁধে আটকে রাখলেন? বাজীববাবু,' প্রিন্সিপাল নীল শিশিটা টেবিলেব ওপব বেখে দিয়ে বললেন। কিন্তু মনের কথাটা আপাতত সরিয়ে বেখে বললেন,'আপনাব এই-সব কাগজপত্র?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখুনি দেখে দিতে হবে?'

'আপনি যদি এখন সই কবে দেন, তাহলে তাড়াতাড়ি ডিসপাচ করতে পাবি।'

'কিন্তু না পড়ে সই করব কী করে?'

'মিনিট পনের-কুড়ি—'দেযালের ঘড়ির দিকে একবাব ঝাঁ করে তাকিযে বাজীববাবু বললেন, 'হয তো লাহবে চোখ বুলিযে যেতে।'

'না, চোখ বুলোলেই হবে না শুধু; শিশিটা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমার ভয হচ্ছে আজকে ডিসপাচ করতে পারবেন না আপনি। ঘণ্টাখানেক আগে আসা উচিত ছিল আপনার।'

বাজীববাবু দাঁড়িযে আছেন অনেকক্ষণ, চেয়ারও আছে এ ঘরে আট-দশখানা কিন্তু প্রিন্সিপালেব কাছ

থেকে বসবার নির্দেশ পান নি এখনো; নির্দেশ না পেলে বসাটা বেযাদবি হবে। আজ যদি ডিসপাচ করা না হয় তাহলে দলিলপত্রগুলো নিয়ে চলে যাবেন কি-না ভাবছিলেন তিনি; টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে সব, কিন্তু সেগুলির সম্বন্ধে কোনো বিধিব্যবস্থা করবাব তাগিদ দেখা যাচ্ছে না মজুমদার সাহেবেব, স্মেলিং সল্টটা শুঁকছেন তিনি। সল্টের শিশি ও প্রিন্সিপালেব নাকের দিকে তাকাতেই সীমাকে চোখে পড়ে গেল রাজীববাবুর। প্রিন্সিপালেব ঘরেব দরজায উঁকি দিয়েই পিছিয়ে গেল সীমা, খুব সম্ভব ঘবটা থমথম কবছে দেখে ঢুকতে সাহস হল না তাব।-তা ছাড়া তাব বাবাকে যে অবস্থায দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সেটা স্বাভাবিক মনে হয়নি তার; খুবই খাবাপ কিছু হয়েছে, হচ্ছে, তার বাবা রাজীববাবু সাক্ষীগোপালের মতন দাঁড়িয়ে আছেন, বেহাই নেই তাঁব ভাবতে-ভাবতে সীমা ঘবে পা দিতে-না-দিতেই পিছিয়ে গিযে বাইবের বিশাল আলোর অন্ধকাবে মধ্যে নিভে গেল যেন।

সীমাকে দেখেছিল রমা। স্মেলিং সল্টেব শিশিটা হাতে তুলে, সাধ করে নয়—বাজীব-প্রিন্সিপাল-সিদ্ধার্থ-লুক্রেশিযসেব কথা ভাবাব ভীষণ নিসর্পিসানির থেকে সবে গিযে নিজেকে খানিকটা ছড়িয়ে নেবাব জন্য শিশির ছিপি খুলবে- খুলবে ভাবছিল। খুব আঁট কবে আটকে রেখেছেন এবাব প্রিন্সিপাল। ছিপিতে মোচড় দিতে গিযে রমার ঠোঁট কী বকম কুঁচকে উঠছে সেটা দেখছিলে। সীমাকে দেখতে পেল বমা, কিন্তু তাকে ডাক দেবার আগেই সে পালিয়ে গেছে।

স্মেলিং সল্টের শিশিটা খোলা গেল না। টেবিলের ওপব রেখে দিল বমা।

'খুলতে পারলে না বুঝি?'

'না, খুলতে চাইনি—এমনিই তুলে নিয়েছিলাম।'

'খুব শক্ত কবে আটকে বেখেছি।'

'হ্যাঁ,' শিশিটার নীল কাঁচের নিঃশব্দ ডেলাটাব দিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপাল বললেন 'আমাদেব আব দবকাব নেই—আজকেব মতন।'

'কিসেব?'

'সল্টেব। আমাব চেয়ে বেশি টেনেছ তুমি।'

'সীমা এসেছিল—'

'সল্ট বেশি টানলে কী হয জানো? রাতে ঘুমনো কঠিন। আমি ভুক্তভোগী।'

'আমি বসতে না বললে কি বসবেন না আপনি রাজীববাবু?'

প্রিন্সিপাল কলেজেব 'সি' ডিপার্টমেন্টেব বড় কেরানির দিকে তাকিয়ে বললেন; 'আপনাব ঠ্যাং ব্যাথা হল যে। বসুন,বসুন, বসে পড়ুন।'

'এই কুড়ি বছব ধরে সল্টের শিশি কাছে বাখছি আমি।' বমাব মুখেব দিকে চোখ বেখে তিনি বললেন, 'এ জিনিসেব নানারকম কেবদানি জানা আছে আমাব। তোমাব বযসে এই শিশি নিয়ে এই বকমই করতাম আমি। তুমি ত ছোট। আমি তোমাব চেয়ে বেশি বড় না হলেও কম বড় নই।' তিনি তাকিয়ে দেখলেন বাজীববাবু চেযাবে বসেছেন। চেযারটা বমার একেবাবে গাযেব ওপব টেনে বসেছে যে রাজীববাবু, রমা একটু সরে যেতে পাবে; তিনি বলতে পাবেন রাজীববাবুকে একটু সরে বসতে। মুখে কিছু না বলে চোখ দিয়ে বললেন, কিন্তু কোনো ফল হল না রাজীবেব ওপর। আ—রমা নিজেই চেযাবটা টেনে সরে বসেছে।

'বেশি টেনো না সল্ট। নিজেব কাছে বেখে দিও। কিন্তু এ জিনিস যে বযেছে তোমাব কাছে সাবাদিনের মধ্যে ভাবতে যেও না; তাবপবে ত বাত এল। বাতেব এক-আধ মুহূর্তে বেশ কাজে দেবে।'

নিজেব কাছে রেখে দিও, বললেন তিনি। এই শিশিটা? না আমার সল্টেব শিশি আছে ভেবেছেন? অথবা.কিনে নেব মনে করেছেন? ভাবছিল বমা। কিন্তু প্রিন্সিপাল এ নিয়ে এখুন আর কোনো কথা বলতে গেলেন না।

'ফাইনাল বেল বিছুক্ষণ হল পড়েছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ ফিফথ পিরিযড শুরু হযে গেছে।'

'মেযেরা কেউ এল না—'

'আমি ছাড়া আর দু'জন ত ফোর্থইযারের অনার্স ক্লাশে। সুমিতা আব ঋক ছেড়ে দিয়েছে, সবিতা বেখেছে এখনো, কিন্তু তাকে আজ ক্লাশে দেখলুম না, সে খুব সম্ভব কলেজেই আসেনি।'

'তুমি ছাড়া আর দু'জন? কে কে?'

'সবিতা আব সীমা। সবিতা আজ কলেজে আসেনি। সীমা ত মিনিট পাঁচেক আগে—'

'মিনিট পাঁচেক আগে কী হল?'

'এই ঘরে ঢুকল মনে হল।'

'আপনি দেখলেন না তাকে?' রাজীববাবুর দিকে ফিরে রমা বললে।

'হ্যাঁ এসেছিল।'

'চলে গেল?' প্রিন্সিপাল বললেন,'এসে চলে গেল? আজ অনার্স ক্লাশ আমাব ঘবে, জানে ত! দপ্তরিও বলে এসেছে।'

'রাজীবকাকার মেযে সীমা।' রমা বললেন।

'তা জানি—'প্রিন্সিপাল মজুমদাব বললেন,'আমাব ক্লাশ না করে চলে গেল?'

'হয তো ভেবেছে আপনি অফিসের কাজে ব্যস্ত আছেন।'

'আমাব কলেজেব ছেলেমেয়েরা কি ঘোড়া ডিঙিযে ঘাসেব কথা ভাবতে যাবে? তুমি বলো।'

'আপনি কী বললেন বুঝতে পারছি না।'

প্রিন্সিপাল হাসতে-হাসতে বললেন,'গত সপ্তাহে তোমাদের ক্লাশে আমি বলে এসেছি, আজও দপ্তরিকে দিযে বলে পাঠিযেছি আমি ক্লাশ নেব। না ভেবে বলেছি? কিন্তু ওবা এত বেশি অনিযমেব ভেতরে মানুষ যে কোনোবকম শৃঙ্খলা বা স্পষ্টতাব কথা ভাবতেই পাবে না।'

প্রিন্সিপল বেশি কোনো কড়া কথা বলেননি, নির্বুদ্ধিতাব জন্যে পবে কী সাজা দেবেন সীমাকে বলতে পারা যায না, হয তো দেবেন না কিছু, কিন্তু এখন আর একটু বেশি বকলেও খাবাপ হত না, অনুভব করছিলেন রাজীববাবু।

'সীমা বোকা, ওকে মাফ করুন।'

'বোকা?' বাজীববাবুব মুখের বদলে তাব জামার বোতামেব দিকে তাকিযে প্রিন্সিপাল বললেন, 'ক্ষমা করেছি, তবে বোকা বলে নয।'

'বোকা কী করে বলেন আপনি? মেযেটি সেকেণ্ড হযেছে শুনেছি, বমা?' প্রিন্সিপাল বললেন।

'মেযেদেব ভেতর সেকেণ্ড হয়েছে' বাজীববাবু গলা নবম কবে বললেন, 'বমার মত ছেলেমেযে সকলেব ওপরে ফার্স্ট হযনি।' নবম গলায একটু ঝাঁঝ এনে বাজীববাবু বললেন,'সত্যিই বোকা। তবে এখন দেখছি নিযম মানবার মত আক্কেলটুকুও নেই।'

বিশেষ কিছু ভিজলেন না প্রিন্সিপাল,'আপনি বাজীববাবু অসময়ে এসে কত রকম তছনছ কবলেন দেখুন ত। এখন ত আপনাব আসবাব কথা নয।' টেবিলের জিনিসপত্র হাটকাতে-হাটকাতে একটু গর্জন করার মত কবে বললেন।

'সীমা আছে হয তো কলেজে, দপ্তরি পাঠিযে ডেকে আনাব তাকে?' বাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'অনার্স ক্লাশ হবে তাহলে—আজ?' বমা প্রশ্ন করল।

'সবিতা আসে নি?'

'না।'

'ঋক ছেড়ে দিয়েছে অনার্স?'

'দেখছি ত তাই।'

'কেন ছাড়ল?'

'পেরে উঠছে না হয তো।?'

'কেন, টাকাকড়ির টানাটানি?'

'না, পড়াশুনোর চাপ। সেটা সইছে না মনে হচ্ছে?'

'ছেড়ে দেবার আগে আমাকে একবার জানালে পারত।'

'ঋকের মেনিনজাইটিস হয়েছিল।'

'ও—কবে?'

'গরমের ছুটিতে।'

সূচীপত্রে যান

'বাসমতীতে ছিল?'

'না, কলকাতায় গিয়েছিল ওরা।' রমা প্রিন্সিপালের জামার বোতামের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সেই থেকে শরীরটা কেমন ভেঙে পড়েছে,বি. এ দেবে না ঠিক করেছিল, এখন পাস পরীক্ষাটা দেবে শুধু বলছিল সেদিন।'

বেনি দপ্তরি দরজা দিয়ে ঢুকেই বেরিয়ে গেল, প্রিন্সিপাল পিছু ফিরেছিলেন, দেখেন নি তাকে; আর দু'জনে দেখল। পাখা ঘুরছে সময় কাটছে।' নিঃস্তব্ধতা।

'সুমিতার পড়াশুনোর দিকে মন নেই।'

'অনার্স পেত।'

'ছেড়ে দিল ত; কী হল?'

'ও নানারকম কাজ করে বেড়ায়।'

'পোলিটিক্‌স?'

সিংহ নিজেই জানতে চাচ্ছেন বুঝি শশকেরা পোলিটিক্‌স করে কি-না। নিজের মাথার পেছনে খোপার ওপরে চুলের ওপর ডান হাতটা ঘুরিয়ে নিয়ে আঙুলে দিয়ে আস্তে-আস্তে চাপ দিয়ে বুলোতে-বুলোতে রমা বললে, 'এখন পোলিটিক্‌স্ হোফ পাখির পোলিটিক্‌স—দেশ ত স্বাধীন হচ্ছে।'

'তা হচ্ছে,' প্রিন্সিপাল একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'অনার্স ছেড়ো না তুমি।'

'সীমাও ছাড়বে না। সীমা আমার চেয়ে ভাল করবে।'

'বাসমতীর মত ছোট জায়গায় কি পোষাবে তোমাকে?'

'আমাকে?'

'তুমিও ত সুমিতার মত নানারকম কাজ করে বেড়াও।'

'আমাদের দেশে কাজ মানে পোলিটিক্‌স্', বললেন বিনয়তোষবাবু প্রফেসর। কী একটা দরকারে এইমাত্র প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকে নড়াচড়া করছিলেন তিনি। শেল্‌ফের থেকে ইয়ুনিভার্সিটির একটা ক্যালেণ্ডার তুলে নিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'আর পোলিটিক্‌স্ মানে পার্টি।'

'ঐ কম্যুনিস্ট পার্টিটা আর কি।' বলে রমার দিকে উৎফুল্ল আগুনের মত দপ করে তাকিয়ে মেয়েটির কাছ থেকে নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূলে ষোলআনা সায় আদায় করতে পেরেছেন মনে করে ঝা করে বেরিয়ে গেলেন।

'বিনয়তোষ কী নিয়ে চলে গেল?'

'একটা ক্যালেণ্ডার', রাজীববাবু বললেন।

'বিনয়তোষ চলে গেছে? না কবিডরে?'

'ডাকব তাকে?' রাজীববাবু বললেন।

'আ,কী মুস্কিল!'

'চলে গেছেন প্রফেসার্স রুমে।' রমা বললে।

'আমার কথার ত কোনো উত্তর দিলে না তুমি?'

রমা তাকিয়ে দেখল রাজীববাবু মাথা চেয়ারের কাঁধের ওপর কাত করে ঝিমিয়ে পড়েছেন।

'সুমিতা কম্যুনিজম নিয়ে আছে। ওর সঙ্গে মতে বনে না আমার।'

'আমি ভেবেছিলুম তুমিও কম্যুনিস্ট।'

'সেটা ভুল ভেবেছিলেন।'

'তুমি কংগ্রেসের?'

'না।'

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম,' প্রিন্সিপাল খানিকক্ষণ পরে বললেন, যেন কংগ্রেস-কম্যুনিজম ছাড়া আর পৃথিবীর নেই।

'আছে, সেখানে পোলিটিকস্‌ও আছে হয় তো—কিন্তু আজকালকার চারদিককার সব চালু পোলিটিক্‌স্ নেই।'

রমার মুখে কথাটা শোনা অবধি ভাবছিলেন তিনি; এইরকম কথাই খুব সম্ভব যুক্তি ও কামনার মিলনভূমিতে প্রায় কুড়ি বছর আগে শুনতে চেয়েছিলেন। যাক শোনা হল। পোলিটিক্‌স্ অবশ্য পোলিটিক্‌স্

সূচীপত্রে যান

তা থাকবে, মানুষ যা তাতে দরকারও রয়েছে তার। কিন্তু সে-সব স্বীকার করেও, হয় তো স্বীকার করেই, রমার ঐ কথাটা একটা অপূর্ব নির্দেশ।

'স্বাধীন হচ্ছে ত দেশ।'

'স্বাধীন হচ্ছে।'

'বড় পৃথিবী তোমাদের।'

'বড় পৃথিবীর খোঁজ পাওয়া যাবে হয় তো দেশ স্বাধীন হলে,' রমা বললে। 'হয় তো পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতাকেই চার অক্ষরের অমৃত মনে করলে পাওয়া অসম্ভব। আমার ভয় হচ্ছে অনেকেই মনে করবে তাই।'

বিনয়তোষবাবু ক্যালেণ্ডারটা ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

'কিছু দরকার আছে বিনয়তোষ?'

'আপনার সঙ্গে ? না । অনার্স ক্লাস নিচ্ছেন?'

'নেওয়া হল না।'

বড্ড বেকায়দায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন রাজীববাবু।'

'দেখেছি। মাথাটা ঠিক করে দেওয়া যাবে না। তাহলে ঘুম ভেঙে যাবে।'

বিনয়তোষ চালাক মানুষ, প্রিন্সিপাল যখন বসতে বলেননি তাকে তখন অন্য কাজ আছে প্রিন্সিপালের; সে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চলে গেলেই খুশি হবেন তিনি।

'শরীর ভাল আছে আপনার?'

'হ্যাঁ খুব, মাথার চুল আবার ফিরে কাঁচা হল মনে হচ্ছে।'

'বিনয়তোষ আর দাঁড়ালেন না।'

'চলে গেছে—না করিডরে?'

'কে?'

বিনয়তোষবাবু।' প্রিন্সিপাল নীল শিশিটা কুড়িয়ে ছিপির আঁটসাঁট একটু ঢিলে করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললেন।

'চলে গেছেন।'

'আমরাও উঠি, আজ আর ক্লাশ হল না। সামনের শুক্রবার এই পিরিয়ডে এই ঘরে হবে। বলে দিও সীমাকে। আর কে আসবে?'

'আর কেউ না।'

'বলে দিও সবাইকেই তবুও, যদি আসে—'

'আমি উঠি তাহলে', রমা বললে।

'এই এক মিনিট, এই রাজীববাবুর সঙ্গে একটা কথা।'

'উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'আমি জাগিয়ে দিচ্ছি। ওকে আগেই ছুটি দিয়ে দেব আজ। বাড়িতে গিয়ে বেশি বিশ্রাম নিতে পারবেন।'

'রাজীবকাকার শরীর ভেঙে পরেছে।'

'একটু লম্বা অবসর নিলে ভাল হয় ওর?' প্রিন্সিপাল একটু থেমে টেবিলের আনাচকানাচ কাগজপত্র বই ফাইল পোর্টফোলিও ব্যাগ সব দিকে একবার চোখ চালিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি ও ভাবছিলুম তাই।' কিন্তু অবসর নেওয়ার মানে নানারকম হতে পারে; অবিশ্যি প্রিন্সিপাল ভাল জিনিসটাই লক্ষ্যের ভেতর রেখে রাজীবকাকার অবসরে কথা পেড়েছেন।

কিন্তু তবুও একটু উশখুশ করে রমা বললে, 'না, একা মানুষ সংসার চালাচ্ছেন; কাজ ওঁকে করতে হবে।'

'ছুটি পাওনা থাকলেও?'

'আছে?'

'নিশ্চযই,অনেক।'

'পুরো মাইনেতে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

সূচীপত্রে যান

'তাহলে চেঞ্জে গিয়ে একবার দেখলে পাবেন'; তার এরকম ধরনের কথায় কোনো দুর্লক্ষ্য মাকড়সার জালে কিছুই আটকে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই, অনুভব করে ফেলে রমা বললে, 'কিন্তু পরিবার সঙ্গে নিতে হবে; অনেক টাকা-কড়ির ব্যাপার,পেরে উঠবেন কি উনি?'

'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে লোন নিতে পাবেন।'

'বেশি টাকা আছে?'

'পি.এফ-এ? না। উনি ত চোদ্দ আনির বেশি ধার করে নিয়েছে, মোটা সুদ দিতে হয় ফি-মাসেই।'

'তাহলে ত বড় পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে দু-একটা চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন,'কলেজে কোঅপারেটিভের কাছ থেকে কিছু ধার করতে পারেন'

'কেবলই ধার—'

'কোনো উপায় নেই, শরীর সজুত না হলে কাজ করবেন কী করে। কিন্তু শরীরের চেয়েও রাজীব চক্রবর্তী মশাইর মন-মাথা একটু কাহিল হয়ে পড়েছে বেশি।'

ব্যাগটা সরিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'বেশি কিছু খরচের দরকার নেই- শিমুলতারা-মিহিজাম নয়,এই কাছেই ত কক্স্ বাজার আছে, স্টিমারে বেশি কী খরচ হবে আর, সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে আসুন।'

কথাগুলো ভালই বলছেন প্রিন্সিপাল, কিন্তু কথার বক্তব্যের সঙ্গে সমতা রেখে ভঙ্গিটা তার ঠিক সেরকম দুর নয়, লক্ষ্যটাও ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে রাজীববাবু সম্পর্কে একটা সংকল্প ঠিক করে রেখেছেন, কোনো নড়চড় হবার জো নেই যেন তার, সংকল্পটা অনুভূতি ক্ষমায় আর্দ্র নয় বুঝেছে রমা। বিপদের কথা। কিন্তু তবু এ নিয়ে প্রিন্সিপালকে কিছু বলতে যাবে না আর সে। বিপদের ভবিতব্যতা প্রতিটি মানুষের মাথায়ই ঝুলছে। এই বাসমতীতেই ক্লাশ ঘর রাজীব চক্রবর্তী আছে—তার অজানা নেই। যা হবার হবে। হয় তো ভালই হবে। হয় তো প্রিন্সিপাল খারাপ মনে করে কিছু বলেননি; কালো দিকটা নিজের মনের দোষে উজিয়ে দেখেছে খুব সম্ভব সে; রাজীববাবুর যাতে ভাল হয় সেইটেই চাইছেন বুঝি উনি।

'রমা—'

'উনি ঘুমুচ্ছেন।'

'জাগিয়ে দেব।'প্রিন্সিপাল বললেন।

'আপনি কী খুঁজছেন? নীল শিশিটা?'

'হ্যাঁ। ছায়া পড়েছে। স্কাইলাইট দিয়ে রোদ পড়েছিল টেবিলে—কিরকম তাড়াতাড়ি নিভে গেছে দেখছ। ছায়ার ভেতরে টেবিলের ঢাকনাটা কেমন নীল মনে হচ্ছে না?'

'কেমন কালো দেখাচ্ছে—'

'এটা নীলচে,' প্রিন্সিপাল নাক খাড়া করে হেসে বললেন, 'সন্টের শিশিটা কেমন বেমালুম ভাবি মিশে গেছে টেবিলের কাচের সঙ্গে।'

আচমকা তাকালে শিশিটা চোখে পড়ে না, দেখছিল রমা।

'নেচারে এরকম লুকোচুরি রয়েছে।'

'দেখলে ত মানুষের কারবারেও আছে, সকলেই তারপরে এক সময়ে গা ঢাকা দিতে ভালবাসে।' প্রিন্সিপাল রাজীববাবুর ফাইলটা খুলতে-খুলতে বললেন।

'রয়েসয়ে টেনো। তুমি নিয়ে যাও শিশিটা।'

'আমি?'

'দেরাজে রেখে দেবে; সারাদিনের ভিতর ঘেষবে না ওর কাছে। তবে দুপুরে, গরমে, বেশি গরম-টরম পড়লে একআধ বার। রাত বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল-একবার।'

'ও—'

'কিন্তু তাই বলে ফি-রোজ নয়। এক হপ্তার ভিতর এক বারও নয়, পনের কুড়ি ত্রিশ দিন কেটে গেলেও না, শিশিটা আছে যে সেটা একেবারে ভুলে গেলে নিরালা সময়ে এক-এক দিন মনে পড়বে যে রয়েছে, তাতে কাজে দেবে।'

শিশিটা তুলে নিল রমা।

এই ঘরে ঢুকে প্রিন্সিপালের টেবিলে স্মেলিংঙের শিশিটা দেখে সত্যিই লোভ হয়েছিল তার; দোকান

থেকে এবকম স্মেলিঙ সল্টের একটা শিশি কিনে নিলে হত, কিন্তু প্রিন্সিপাল নিজেই দিয়েছেন তাকে, জিনিসটার মূল্য বেড়ে গেছে তাতে। নাকি কমে গেল? কারো অন্তরের আগ্রহে জিনিসের মূল্য কমার কথা নয়, প্রিন্সিপাল এ ক্ষেত্রে আন্তরিক এ কথা কেউ বলবে না। কিন্তু যে দিচ্ছে ও যে নিচ্ছে তাদেব ভেতর শূন্যে বেসেছে—দ[illegible]ই জীবনমর্ম দু-রকম বলে। কিন্তু তবুও এখনকার এই আদান-প্রদানের ব্যাপারে প্রিন্সিপালের দিক থেকে টসকায নি কিছু রমা খুশি হয়ে শিশিটা নিল।

'রাজীববাবু—'

প্রিন্সিপাল আবো দু-বার হাঁকডাক দিতেই ঘুম ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সীমার বাবা।

'বসুন।'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'হ্যাঁ দেখেছি। আপনার ফাইলের কাগজপত্র এইবাবে দেখছি আমি।'

'আজ আর ডিসপাচ হতে পারবে না—' ঘড়িব দিকে তাকিয়ে বাজীববাবু বললেন।

'না। বসুন। বমা একটা দবখাস্ত করেছিল?'

'রাজীববাবু চেয়াবে বসে বললেন, 'কোন বমা?'

'এই-যে বসে আছে আপনাব পাশে।'

'ও-বমা অধিকাবী?'

'অধিকারী কি তুমি?' বমাব দিকে ফিবে প্রিন্সিপাল বললেন, 'ঠিক মনে নেই আমার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—অধিকারী।'

'হ্যাঁ, একটা দরখাস্ত করেছিল মনে আছে আমাব', রাজীববাবু আবাব একটা নতুন বিপদ গণে বললেন।

'কবে করেছিল?'

'দিন বাব-চোদ্দ আগে।'

'বমা বলছে পনেব দিন।'

'তা পনের দিনই হবে—'বাজীববাবু তাব গলার নিবেট কণ্ঠাব ওপব আস্তে আস্তে আঁচড় রাখতে-রাখতে বললেন।

'কিসেব দরখাস্ত—জরুবি?'

রাজীববাবু টেবিলেব ওপব বাঁ হাতের কব্জিটা আস্তে-আস্তে ঘষে-ঘষে বললেন, 'না, জরুবি মনে হল না, আমাব পড়বাব কথা নয়; কিন্তু বমা কবেছে বলে পড়ে দেখলাম।'

'বেশ হল, ' প্রিন্সিপাল ফাইলটা একটু সরিয়ে বেখে বললেন, 'কী লিখেছিল পড়ে দেখলেন?'

'এই কলেজ থেকে মাসে-মাসে যে-বৃত্তিটা পাচ্ছে বমা সেটা—' বাজীববাবু ইতস্তত কবছিলেন।

'বলুন বাজীবকাকা, আমি যা লিখেছি সেটা বলুন।'

'সেটার আর দরকাব নেই লিখেছিল রমা।' বাজীববাবু প্রিন্সিপালের চোখ এড়িয়ে বমার চোখ মুখেব দিকে তাকাবাব তাগিদ দমিয়ে রেখে চোখ বুজে বললেন। রমা তাহলে তাকে বলতে বলছে দবখাস্তে যা সে লিখেছিল সব কথা। এই প্রিন্সিপালকে? রমাব দিকে একবাব তাকিয়ে নিয়ে ঢোক গিলে বাজীববাবু বললেন, 'সে-ই বৃত্তিটা সীমাকে দেবার অনুবোধ জানিয়েছিল।'

'ভালই করেছিল, 'প্রিন্সিপাল ফাইলটা কাছে টেনে এনে খাপেব ভেতর থেকে লঙ সাইটের চশমাটাবেব করে বললেন, 'কিন্তু সেই পিটিশনটা কি প্রিন্সিপালেব নামে কবা হযেছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু প্রিন্সিপালকে দেওয়া হল না যে?'

'বাজীববাবু কোনো বেফাঁস উত্তর দেবার আগেই বমা বললে, 'পিটিশনটা চেপে বাখেন নি রাজীবকাকা—'

'প্রিন্সিপাল একটু থমকে গিয়ে রমার দিকে তাকালেন।

'কী বলছ তুমি?'

'পিটিশনটা দেবার পরদিনই আমি রাজীবকাকাকে বলেছিলাম, থাক ওটা প্রিন্সিপাল মজুমদারেব কাছে পেশ করে দরকার নেই।'

সূচীপত্রে যান

শুনে রাজীববাবুর সততায় নিদারুণ ঘা লাগলেও তিনি চুপ করে রইলেন একটা বেশি বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে তাকে রমা। রমার দিকে চোখাচোখি তাকাবার চেষ্টা করে প্রিন্সিপাল বললেন,'তুমি এই কথা বলেছিলে রাজীববাবুকে?'

কিন্তু প্রিন্সিপালের দিকে আর তাকাতে পারছিল না রমা, টেবিলটার দিকেও না; চোখ বুজে আসছিল তার কোনো রকমে ঈষৎ ফাঁক করে ঘরের মেঝের ওপরে কেমন একটা বাষ্পের দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, হ্যাঁ, এই কথা বলেছিলাম ওকে।'

'তুমি যখন মুখ ফুটে বলেছ, তখন তোমার কথা সত্য। কিন্তু—' প্রিন্সিপাল চশমা পরবেন-পরবেন করেও না পরে হাতে রেখে দিয়ে বললেন,'রাজীববাবু আসবার আগে তুমি ত আমাকে এতক্ষণ অন্যরকম বুঝিয়েছিলে।'

প্রিন্সিপালের কথা শুনে রাজীববাবু রমার দিকে তাকালেন; রাজীববাবু পিটিশনের কথা রমা তাহলে প্রিন্সিপালের কাছে আগেই বলেছে; রাজীববাবু এ ঘরে ঢোকবার আগেই কথাবার্তা হয়ে গেছে তাহলে, কে পাড়ল কথাটা, রমাই নিশ্চয়; প্রিন্সিপাল ত জানতেন না কিছু দরখাস্তের ব্যাপারটা। রাজীববাবুকে না জানিয়ে রমা প্রিন্সিপালের কাছে পিটিশনের বিষয়টা তুলে সীমার বন্ধুর মত কাজ করেনি ভাবছিলেন রাজীববাবু। রমার ওপর খানিক আগেই শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল তার, এখন কমে গেল খানিকটা। কিন্তু রাজীবাবুকে বাঁচাবার জন্যে প্রিন্সিপালের কাছে মিছে কথা বলে রমা যে বিশেষ অনর্থে পড়েছে সেদিক দিয়ে বড় একটা ভাবতে গেলেন না তিনি; এই শুধু ভাবলেন যে বাকপটুতা ও সাহস থাকলে সব কূল রক্ষা করে এ বিপদের একটা সমাধান খুব সম্ভব করতে পারতেন তিনি, কিন্তু সে-সব গুণ কিছুই নেই তার, চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই; নিঃসহায়, নির্গুণ,বিরস হয়ে চুপ করে রইলেন।'

'তুমি যা বলছিলে তাতে আমি ভেবেছিলাম, আমার কেরানি বুঝি তোমার পিটিশনটা চেপে রেখেছে।

রমা চুপ করেছিল। দেখল রাজীববাবুও চুপ করে আছেন। ভালই হয়েছে, উনি মুখ খুললে ব্যাপারটা আরো ঘুলিয়ে উত্তরই ক্ষতি হবে। রমার নিজের যা হয়েছে তা হয়ে গেছে, তার আর কোনো রদ নেই, তা নিয়ে কথা ভাবতে গেলে কোনো কিনারা পাওয়া যাবে না। 'এ মেয়েটিকে চিনেছি আমি, এর সঙ্গে খারাপ ব্যাবহার করব না, কিন্তু একে চিনেছি আমি—' এই ত ভাবছেন প্রিন্সিপাল, কিন্তু এ চেনাকে পাল্টে দেবার মত কোনো অস্ত্রই রমার হাতে নেই, হাত তার একেবারে খালি; প্রিন্সিপাল বিশ্বাস করতেন তাকে; বিশ্বাসের ভান করে করুণা করবেন এখন থেকে।

'আমার একজন বড় কেরানি সম্বন্ধে আমার কাছে এসে ওরকম কথা বলা কি ঠিক হয়েছিল তোমার?'

বড় কেরানি বা রমা কেউ কিছু বললে না।

'আমাকে কী মনে করেছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন প্রিন্সিপাল।

'ওঁকে ক্ষমা করুন।' রাজীববাবু বললেন।

'সত্যিই কি তুমি পিটিশন করেছিলে? আমার সন্দেহ হয়।'

'হ্যাঁ, করেছিল। আমি নিজে দেখেছি।' রাজীববাবু বললেন।

'আপনি নিজেই ছিঁড়ে ফেললেন?'

'না, আছে ফাইলে। আপনাকে দেখাতে পারি।'

প্রিন্সিপাল আস্তে-আস্তে বললেন,'না। আপনি ছিঁড়ে ফেলে দিন।'

'কী করতে হবে এই-সব কাগজপত্রের?'

'আমি দেখছি। আমি আজ রাত আটটা-নটা অব্দি কলেজে আছি: আপনাকে আমি তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিচ্ছি রাজীববাবু—' লঙ সাইটের চশমাটা ঐকে নিয়ে বললেন,'ছেলেদের আমি প্রায়ই সে রকম বিশ্বাস করি না, কিন্তু মেয়েদের করি।'

রমার দিকে চেয়ে থেকে তিনি বললেন, 'স্বভাবতই মেয়েদের করি। কেন করি? ওরা বেশি বিশ্বাসী বলে। এতদিন সত্যিই তাই মনে করেছি আমি। কিন্তু—' প্রিন্সিপাল কাগজপত্র নিজের দিকে টেনে নিলেন,'এ কী হল? তুমি এটা কী করলে?'

'আমি?'

খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি সত্যিই বিচলিত হয়ে ওঠবার অভিনয় করছেন বলে মনে হচ্ছে না রমার। এ বিচলিত ভাব প্রিন্সিপালের তবুও কেটে যাবে শেষ পর্যন্ত, রমাকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা

সূচীপত্রে যান

করার যে স্বভাবের কথা বলছেন তিনি সেইটেই টিকে থাকবে; আগে অবশ্য এ স্বাভাবকে প্রিন্সিপালের যুক্তির বল এসে সাহায্য করত, এখন ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করব, ফলে ওর বিশ্বাসটা এই সাতান্ন বছর বয়সে যে বিশ্বাস প্রবণতায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেই বিচিত্র ও বিমিশ্র ভূমি এক দিক দিয়ে তৃপ্তি জাগালেও অন্য দিক দিয়ে দুঃখকারী, রমা ভাবছিল।

'মানুষেব যুক্তিরই দরকার।' রমা বললে।

'কেবল যুক্তির?'

'না, তা নয়।'

'খুব বেশি যুক্তির?'

'যার যেরকম ভাণ্ডার রয়েছে, তার পূরণেব অনুপাতে।'

'ও—' প্রিন্সিপাল চশমার জ্বলজ্বলে কাঁচেব ভেতব দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি দেখছি যুক্তিদেবী।'

শুনে একটু চমকে উঠল বমা। কযেক দিনের আগেব কথা মনে পড়ল, তাকে 'আথেনা' বলেছিল সিদ্ধার্থ সেন, তারপরে ঠিক এই শব্দটাই ত ব্যবহাব কবেছিল সেন? শব্দটা কি কলেজে চলে? কে চালিযেছে প্রথম? প্রফেসর সেন হয তো আলগোছ চিপ্‌টেন কেটে শুরু কবেছিল কোনো মেয়ে অধ্যাপক সম্বন্ধে, তারপর ছড়িয়ে পড়েছে।

'আজ্ঞে–'

'আপনি একটু ভাইস প্রিন্সিপালকে সেই কলকাতা ইয়ুনিভার্সিটিব সার্কুলাবেব কথা জানিযে আসবেন?'

'যাচ্ছি।'

'তিনি কলেজে নেই খুব সম্ভব। কোযার্টার্সে গেছেন, এখন আব দবকাব নেই তার আপনি জানালেই হবে।'

'আজ রাতে গিযে জানিযে আসব। কাগজগুলো দেখছেন আপনি, আমি পাঁচ মিনিটের জন্যে একটু নীচে ভবেশবাবুর কামবার থেকে আসছি।'

'আচ্ছা।'

রাজীববাবু চলে গেলে প্রিন্সিপাল বললেন. 'খামখেযালিভাবে পিটিশন কবে ঝোঁকের মাথায় আবাব মানা করে দিলে রাজীববাবুকে, বিশ্বাস হয না আমার।'

'কেন রাজীববাবু ত অবিশ্বাস করেন নি,' বললে বমা। তর্কেব সোজা বাস্তায না গিযে কেমন যেন একটা বেটপকা গলির ভেতর ঢুকে পড়ে সে।

'তিনি ভুক্তভোগী', প্রিন্সিপাল একটু হেসে বললেন, 'কী করে অবিশ্বাস করবেন? কিন্তু আজকাল তুমি বড় হযেছ।' প্রিন্সিপাল চশমাটা না খসিযে রমাব দিকে না তাকিযে বললেন।

'কী হযেছে তাতে?'

'পৃথিবীটাকে দেখছ।'

বমা বললে,'যে যত ভাল কবে দেখে সে তত পবের বিশ্বাস হারায।'

'তুমি হাবিযেছে আমাব বিশ্বাস?'

প্রিন্সিপালেব মাথাব ওপবে ফ্যানটা আস্তে-আস্তে ঘুবছে, কমানো স্পিড, হেমন্ত ঋতু এসে পড়েছে বলে। কিছু শব্দ করছিল পাকাটা, ঘড়িটাও, চাবদিক ওদের চেযেও বেশি নিঃশব্দ হযে পড়েছে বলে।

'রাজীববাবুব ব্যাপাবটা সম্বন্ধে একটা কিছু ভেবে বেখেছেন আপনি,' রমা বললে,' 'আমাব পিটিশন-ফিটিশন সম্পর্কেও। ফলে আপনি রাজীববাবুও আমি পবস্পবের সম্পর্কে যেখানে ছিলাম এব আগে, সেখানে ফিরে যাওযা আমাদেব পক্ষে অসম্ভব।'

'ও—'প্রিন্সিপাল মোটা নীল পেন্সিলটা তুলে চশমার ফাঁক দিযে বমার দিকে তাকিযে বললেন, 'কিন্তু ফিরে গিযেছি ত—'

'কে?'

'আমি। তুমি যদি না গিযে থাকতে পাব সেটা আমার দোষ নয।'

'আর রাজীববাবু?' প্রিন্সিপাল নীল-লাল পেন্সিল দিযে টাইপ-কবা কাগজে দাগ কাটতে-কাটতে মন্তব্য লিখতে-লিখতে বললেন, 'তিনি আসুন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা যাবে।'

সূচীপত্রে যান

'আমাদের সম্পর্কে মনে-মনে তাঁর ভূমিকা বদলেছে কি না?'

'এটা ঠাট্টা করা হল, বেচাবি মানুষ পেয়ে,' রমা হাসতে গিয়ে থেমে-থেমে বললে।

প্রিন্সিপাল লাল পেনসিল দিয়ে কাগজগুলোর আনাচে-কানাচে, নীচেব দিকে আরো দু-একটা স্বাক্ষর বসিয়ে নিয়ে বললেন, 'ঠাট্টাব মত শোনাতে পারে, কিন্তু আমি বাজীববাবু সম্বন্ধে ভাল মনে করে বলছি, যতদূর সম্ভব ঠিকভাবে চিন্তা কবে। কিন্তু উনি কি কিছু ঠিক কথা বলবেন আমি জিজ্ঞেস করলে? সকলের কাছে সকলে আমবা মন খুলি না। উনি ভবেশেব কাছে মন খুলতে গেলেন। আর আমি—' প্রিন্সিপাল ফাইলের ভেতর ডুবে গেলেন। এইবাবে তাহলে উঠতে হয রমাকে। সে বুঝি স্লিপারের ভেতর পা ডুবিয়ে দিয়েছে। 'সীমাকে খুব ভালবাস তুমি, সীমাব বাবাকে খুব শ্রদ্ধা কব দেখলাম। তার জন্যে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পাব,' রমা বাঁ পা চালিযে ডান পাটাও সেঁধিয়ে দিয়েছিল স্লিপারেব ভেতর, এইবারে উঠত, কিন্তু প্রিন্সিপালেব কথা শুনে একটু থেমে বইল। বাজীববাবুর জন্য একটা কিছু করেছে বটে সে, সেটা কম নয়; কিন্তু জিনিসটা প্রিন্সিপালেব ধরে ফেলবার কথা? অবিশ্যি ধরে যে ফেলেছেন সেটা আগেই বোঝা যাচ্ছিল, এখন একটু নাদা, সাত্ত্বিকভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

'উঠলে?'

'হ্যাঁ, চলি।'

'ক্লাশ হয না, নানা গোলমালে সময কেটে গেল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আটকে বাখলাম তোমাকে।'

'আপনি আজ রাত আটটা অব্দি কলেজে থাকবেন?'

'আটটা—নটা—'

কোনো মিটিঙ আছে বুঝি?'

'না, তা কিছু নেই। গভর্নিং বডির মিটিঙেব এখনো দশ-বাব দিন বাকি। নানাবকম কাজ জমে গেছে, বাড়িতে গিয়ে আব কলেজের জেব টানতে ভাল লাগে না, এখানেই সেরে যাই।'

'অনেক খাটুনি,' বলে শুরু কবতেই দপ্তবি এসে সুইচ টিপে লাইট জ্বালিযে দিযে গেল, দেখল বমা, 'বোজই বাত করে বাড়ি ফেবেন?'

'না, এই তিন-চাবটে দিন শুধু একটু চাপ বেশি; আমি এমনি চাবটে-পাঁচটেব সময বোজ চলে যাই।'

'রাজীববাবু ত ফিবলেন না।'

'এখুনি আসবেব। শুক্রবাব এই ঘবে আমার অনার্স ক্লাশ হবে, বলে দিও মেযেদেব।'

বলে দেবে রমা।

'লুক্রেশিযসেব অর্ডাবটা আজ গেল না। কোথায় বেখেছি কাগজটা—ও, এই পোর্টফোলিও ব্যাগেব ভেতব আছে।'

'বমা—'

'আজ্ঞে—'

'এই নীল শিশিটা ফেলে বেখে গেলে তুমি।

'ও—'বমা চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল শিশিটা নেবাব ইচ্ছা ছিল না তাব। কী হবে স্মেলিং সল্ট দিযে, কিন্তু প্রিন্সিপালের মুখেব দিকে তাকিয়ে ফিবতে হল তাকে। ফিরে এসে শিশিটা কুড়িয়ে নেবার সময টেব পেল তাকিযে আছেন। কিন্তু যেন অনেক কালেব পৃথিবীব মতন সহজ স্বাভাবিকতায মাথা কাত করে মেঝেব ওপব চোখ বেখে প্রিন্সিপালেব চোখেব দিকে তাকাতে গেল না বমা।

'বাজীববাবু, এসেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বমা চলে গেছে?'

'অনেকক্ষণ।'

'আমিও রাত আটটা অবদি থাকব আপনাব সঙ্গে।'

'আমাব কাজ ফুবোতে—' প্রিন্সিপাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাত নটা—দশটা বেজে যাবে।'

প্রিন্সিপাল কিছু ইশাবা-ইঙ্গিত না কবলেও নিজেব চেযাব টেনে বসে পড়ে রাজীববাবু বললেন: 'সীমাকে আপনাব কেমন লাগে?'

'খুব ভাল।'

'রমা তার পিটিশনে লিখেছিল তার বৃত্তিটা দিতে পারা যায় কি-না।'

প্রিন্সিপাল কাজে ডুবেছিলেন; কোনো উত্তর দিলেন না।

'কিন্তু ওরকম ত কোনো নিয়মটিয়ম নেই—' রাজীববাবু প্রিন্সিপালের দেখা, সই করা কাগজগুলো নিজের দিকে গুছিয়ে আনতে-আনতে বললেন।

'সেই জন্যেই', কথা বলতে-বলতে হঠাৎ হুঁস হল রাজীববাবুর, থেমে গেলেন।

'রাজীববাবু,' মিনিট পনের পরে প্রিন্সিপাল বললেন।

'আজ্ঞে—'

'কোথাও চেঞ্জে ঘুরে আসুন।'

'চেঞ্জে?' প্রিন্সিপাল যখন মিনিস্টিরিয়েল অফিসারদের চেঞ্জে যেতে বলেন সে ত আন্দামানে পাঠাবার শমিল। রাজীববাবু সীমার তিন টাকা দামের ফাউন্টেন পেন দিয়ে নানারকম মুসাবিদা লিখছিলেন, একটু টেঁসে গেলেন অতিব্যস্ততার মাঝখানে।

'কিছু টাকার দরকার, কো-অপারেটিভ থেকে ধার নিন; অসুবিধে থাকলে আমি সুপারিশ করে দেব।'

'সীমা বি.এ.টা দিয়ে নিক।'

'সীমা এইখানেই থাকবে।'

'আমি একা যাব?'

'মানুষ ত একা পরলোকেও যায়, এ ত চেঞ্জ।'

শুনে রাজীববাবুর সুবিধার লাগল না।

আট-দশ দিন পরে সিদ্ধার্থকে রমাদের পাড়ার ওদিকে যেতে হল; প্রভাসবাবু বা রমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঠিক নয়, অন্য কাজ ছিল।

আরো কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছেন প্রভাসবাবু, বাড়িতেই ছিলেন তিনি। কলেজেও চার-পাঁচ দিন ছুটি। দুপুরবেলা জানালার পাশে খবরের কাগজ পড়ছিল রমা। কলকাতার দৈনিকগুলো এখানে বেলা এগারটা-বারটার সময় এসে পৌঁছয়, কলকাতার সোমবারের কাগজ এখানে মঙ্গলবারে আসে। এইমাত্র দিয়ে গিয়েছিল কাগজ রমার হাতে সাইকেল থেকে নেমে খবরের কাগজওয়ালা। এ বাড়িতে খবরের কগজ যে প্রথম কুড়িয়ে পায় সেই পড়ে; যেদিন রমার হাতে এসে পড়ে প্রথম, সেদিন রমাই পড়ে নেয়, প্রভাসবাবু অপেক্ষা করে থাকেন; প্রভাসবাবুর হাতে এলে রমা সরে থেকে অপেক্ষা করে বটে, তবে কাগজের মোটা খবরগুলো যেন বাবা হাঁকডাক পেড়ে আগেই তাকে বলে না দেয় এই অনুরোধ রয়েছে।

প্রভাসবাবু আর-একটা জানালার পাশে খাটের ওপর বসে একটা মোটা বইয়ের ওপর ডাককাগজ রেখে চিঠি লিখছিলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে দূরে রমার হাতে খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন কি-না ভাবছিলেন,কিন্তু মেয়েকে খুব নিবিষ্ট হয়ে পড়তে দেখে কিছু বললেন না।

রমা পড়ে নিক, তারপর পড়া যাবে। চিঠিগুলো জরুরি; সেরে ফেলেছেন প্রায়, আরো খানিকটা সময় লাগবে অবিশ্যি, এই শেষের চিঠিটা বেশ ভেবে লিখতে হবে। শুরু করেছেন, কিন্তু কলম এগচ্ছে না। যা মনে আসে সে কথা লিখলে চলবে না এ-চিঠিতে, মনের সবচেয়ে যুক্তিগম্ভীর কথা লিখতে হবে সবচেয়ে সহজ স্পষ্ট কুমলতায়। কিন্তু সাহিত্যিক তিনি নন, অভিজ্ঞ সংসারী মানুষ, লেখার মান ওদের চেয়ে আলাদা; মনে ওদের মত অতটা খুঁতখুঁতানি নেই; লিখতে বেশি কিছু বেগ পেতে হচ্ছিল না তাই তাকে।

কীই-বা খবর থাকবে কাগজে আজকাল আর।

দেশ ত স্বাধীন হচ্ছে।

মুখ তুলেছিলেন, মাথা কাত করে নুইয়ে চিঠি লেখায় মন দিলেন আবার কেমন বোবার মত লিখে যাচ্ছেন তিনি, কেমন নিরেট বোবার মত খবরের কাগজটা পড়ে যাচ্ছে রমা। পৃথিবীর চাকা ঘুরছে। বনবনানির পাতা ও বাতাসের সাড়া ছাড়া এইখানে বাসমতীর দুপুরের চরাচরে কেমন একটা নিরাবিল নিঃশব্দতা।

ভালেরির সাইকেলটা মাটিঘাসের রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল; চাকা যে চলছে, প্যাডেল ঘুরছে, মানুষ সাইকেলে চড়ে দিগন্তের দিকে রওনা হয়েছে—এই মন নিয়ে একটা 'টুঁ' শব্দ পর্যন্ত নেই। অথচ খুব ছোট কাজ হাসিল করতেই চলেছে কি ভালেরি? অতদূর পৃথিবীর থেকে এখানে এসে একটা খ্রিস্টীয় মিশন আস্তে-আস্তে গড়ে তুলে দাঁড় করিয়ে রাখবে। রোদের ভেতর ভালেরি ও তার সাইকেলের ছায়াটা

কেমন এবড়ো-খেবড়ো পথে দুমড়ে মুচড়ে পালিশ হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল, মনের ভেতর একটা চিত্রখণ্ড রয়ে গেল তবু। দেখছিলেন, পোষণ করছিলেন প্রভাসবাবু।

'রমা—'

'কী বলছ?'

'বার্থেলো কি ফিরে এসেছে?'

'আজ-কালই ত আসবার কথা।'

'এসেছে কি-না ঠিক বলতে পারছ না?'

'না।'

'মাদাম ভালেরি আছেন?'

'জানিনা।'

'বার্থেলো কি কলকাতায় গিয়েছিল?'

'কলকাতার থেকে ভিজিগাপট্টম, মাদ্রাজে যাবার কথাও ছিল, আমাকে বলেছিলেন, ফেরেন নি হয় তো।'

'তুমি যাওনি ওদের মিশনে?' প্রভাসবাবু বললেন।

রমা খবরের কাগজের দিকে চোখ ফিরিয়ে আস্তে-আস্তে বললে না—মিশনের ঘরবাড়ি ওঠেনি এখনো, কতগুলো খড়ের ছাউনি। খড় ঠিক নয়, সুন্দর নতুন ছনের চাল। বেশ সোনালি দেখায়, খুব পুরু ছাউনি, দূর থেকে দেখেছি আমি।'

'ভেতরে ঢোকনি এখনো?'

'না, মাদাম ভালেরির সঙ্গে একদিন যাব ভাবছি। কিন্তু ওরা ত আসছেন না আজকাল আর এদিকে—'

'কেন?'

'বার্থেলোই আসত। কিন্তু সে ত নেই বাসমতীতে। ভালেরিরা বোধ হয় নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত।'

'তাছাড়া সাহেবরা আদানপ্রদানের রেওয়াজ মানে, মানে না?' প্রভাসবাবু হাতের চিঠিটা শেষ করবার আগে এতক্ষণের টানা নিঃশব্দতার মৌরসি বাঙবার প্রয়োজনবোধ করে বললেন, 'ওরাই আসবে, আমরা কেউ যাব না—এরকম একতরফা চালচলন ওরা পাদ্রি হলেও মানবেন কেন? আমাদের কারো যাওয়া উচিত।'

'তুমি যেও।'

'আমি গিয়ে কী করব?'

'ওরা বাংলা জানে।'

'ইংরেজি জানি না আমি?'

'ইংরেজের সঙ্গেও ইংরেজি বলা কঠিন, কিন্তু ওরা ত ফরাসি। বলতে পারবে?'

প্রভাসবাবু এক লাইন লিখে একটু থেমে দেড় লাইনের কথাটা শেষ করলেন চিঠির কাগজের ওপর। ঘাড় তুলে বললেন, 'কিন্তু বার্থেলো আর-এক রকম মানুষ!'

রমা কাগজ পড়ছিল; কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না তার দিক থেকে।'

'বার্থেলো এখানে ফিরে এলে—'

'আমার পড়া হয়ে গেছে। পড়বে তুমি কাগজ?'

'আমি বলছিলুম বার্থেলো ভালেরিদের মত নয়। এখানে এসে প্রথমেই আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।'

'ও—এ বাড়িটা বাসমতীর বনবিবিতলা বুঝি?'

'বাজে মানসম্মানের কোনো ভেকটেক নেই ছোকরার। কিন্তু ফালতু নয়, লেখাপড়া করেছে, মর্যাদা আছে, কিন্তু গুমর নেই ঐ মেয়েমানুষটার মত।'

'কে মেয়েমানুষ?'

'মাদাম ভালেরির কথা বলছি—'

'কোথায় আলাপ হল তার সঙ্গে তোমার?'

'হয় নি। ও আর ওর কর্তা যেচে আলাপ করে না কারো সঙ্গে। সাহেব হাঁ করে মঝে-মাঝে বোকা ধনেশের মত হাসে বটে, ইংরেজি রপ্ত নেই, বাংলা শিখছে সবে, কী করবে দিশে পায় না; মানুষ খারাপ

নয়। কিন্তু ওর গিন্নিটা নাক উঁচু করে চলে।'

'ফিরেও তাকায না বুঝি তোমার দিকে?'

'না, সে কথা হচ্ছে না।'

'আমার সঙ্গে ত বেশ আলাপ জমায', রমা খবরেব কাগজটা নামিযে বেখে বললে, 'মাদাম ভালেরি।'

'তা জমায বটে—' প্রভাসবাবু ডাককাগজের ওপর কী লিখবেন কী লিখবেন কিছু ঠিক করতে না পেবে যা লিখলেন, সেটা কেটে ফেলে রমার দিকে তাকিযে বললেন,'সেটা তুমি মেযে বলেই সম্ভব হযেছে। আমাব মনে হয মাদাম ভালেরি ফরাসি নয।'

'কেন?'

'ফরাসি মেযেরা অন্যবকম।' যেন প্যারিস ঘুরে এসেছেন এইবকম জ্ঞান-গম্ভীব মুখে বাইরেব মেহেদি-শিশু-জামরুলের ভেতরে-ভেতবে ঘাসধূলোয মানুষের পাযে চলা পথে, পাযের চেযে সইকেলের, বার্থেলো-ভালেবিদেব সাইকেলেব, ববাব টাযাবেরই ছাপ বেশি, কেটেকুটে কত রকম আঁকিবুকি হয়ে কত--যে রিবনের মত কত দিকে চলে গিয়েছে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার চিঠির দিকে মন ফিরিযে এনে বললেন।

'ফবাসি মেয়েদেব কথা কে বললে তোমাকে?'

'আমি জানি।'

'সিটি কলেজে ত পড়েছিলে, সে-চৌহদ্দির বাইবে জীবনে কোথাও যাও নি ত কোনোদিন। ফবাসি মেযেদের জান তুমি? তুমি ত হেবম্ববাবুর প্রিযপাত্র ছিলে?'

'প্রিযপাত্র হতে চেষ্টা কবেছিলাম এক সময, কিন্তু হতে পেবেছিলাম কি-না, হওযাব সার্থকতাই-বা কী', প্রভাসবাবু বললেন।

'ইউরোপ-টিউবোপ ঘুরেছেন তিনি। প্যাবিসেও বেড়িয়েছেন, আমাদেব দেশেব শিক্ষা ও ধর্মেব সেবক হিসেবে। কিন্তু ফোর্থ ইযাবের টিউটোরিযাল ক্লাশেও প্যারিসের মেযেদেব কথা বলবার লোক নন তিনি।'

কী তিনি আর কী নন সেটা ক্রমে-ক্রমে বেশ ভাল কবেই জানা আছে প্রভাসবাবুব। ও নিযে বমা যেন কথাটথা বলে না।

'তোমাব কাগজ পড়া গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'নতুন খবরটবব কিছু আছে?'

'পাকিস্তান হবে মনে হচ্ছে।'

'পাকিস্তান না হযে দেশ স্বাধীন হতে পাববে না?'

'না। এদেশে ত কোনো লিংকন নেই।'

'লিংকন?' প্রভসবাবু চিঠি লেখায মন দিযেছিলেন আবাব, চশমাব ফাঁক দিযে রমাব দিকে এক মুহূর্ত চেযে থেকে বললেন, 'কেন, গান্ধি আছেন।'

'আছেন।' রমা কাগজ কুড়িয়ে নিল আবাব। প্রভপাসবাবু ছুঁইযে দিযেছিলেন, কিন্তু তর্কেব সূত্রটা ধবল না সে।

প্রভাসবাবু কথাটাকে ফুরোতে না দিযে বললেন,'তাছাড়া কংগ্রেসেব ওঁযাবা ত সকলেই আছেন।'

'আছেন।' কাগজটা টেবিলে নামিযে বেখে দূবেব জাম-কাঁঠাল-নিমের ভেতবেব চিলতি ধূলোঘাসের রাস্তাব ওপব দিযে একটা সাইকেল এগিযে আসছে, মাদাম ভালেবির; মিশনেব দিকে। তাকিযে দেখে, ভালেবিকে না দেখবাব ভান করে প্রভাসবাবুর দিকে মুখ ফিবিযে রমা বললে, 'কিন্তু লিংকনের পদ্ধতি অন্যবকম ছিল।'

'ঘরোযা লড়ায় দেশ জ্বালিয়ে দেবাব?'

'কিন্তু আমেবিকা ত এক।'

'বাইরে এক, কিন্তু ভেতবে কিবকম?' এ-সব পোলিটিকসের কচকচানি না করে চিঠি কাটাকুটি কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন কাগজে চিঠিটা লিখে শেষ করাবাব সংকল্প করতে-করতে প্রভাসবাবু বললেন,'ও-সব রক্তের সমুদ্দুর ডিঙিযে এক হযে থাকবার দরকার নেই।'

সূচীপত্রে যান

'নোয়াখালি, কলকাতায় কি কম রক্ত ঝরছে?'

'তোমার কাগজ পড়া হলে দিও আমাকে।'

'হয়েছে।'

'চিঠি লিখে শেষ করে নিই।'

'ভালেরিকে খুব চিন্তিত দেখলাম।'

'কত্তাকে?'

'না, মাদামকে—'

'কোথায়?'

'এই ত সাইকেলে মিশনে ফিরলেন। আমি ওদিকে তাকিয়েছিলাম চোখে চোখ পড়তেই আমাকে কী যেন বলবেন মনে হল, কিন্তু আমি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতে বলা হল না। উনি তাড়াতাড়ি প্যাডেল করে মিশনে চলে গেলেন। জিনিসটা খারাপ হল। ভাবলেন হয় তো তাচ্ছিল্য করলাম। আজ রাত্রে মিশনে একবার যাব ভাবছি।'

'কে তুমি?'

'হ্যাঁ, এতদিনেও একবার যাওয়া হল না, সেটাও খারাপ হল।'

'যাবে, যাও, কিন্তু ওকিছু মনে করে নি। যদি মনে করে থাকে তাহলে ক্যানাডা থেকে এত দূরে মিশনারি হয়ে এসে ও মিছেই খেলা করছে। ওর হয়নি তাহলে কিছু, কোনো আত্মিক লাভ হল না।'

'আমাদের সেই হ্যারিকেনটা আছে?'

'সেই ক্ষমার বিয়ের সময় যেটা কিনেছিলাম?'

'দেখছি না সেটা।'

'উঠিয়ে রেখেছি। আছে।'

'ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আলো হাতে ওদের উঠোন গিয়ে উঠতে হবে। অন্ধকারে ওরা চলাফেরা পছন্দ করে না। বার্থেলো একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে।'

'টর্চ নেই বার্থেলোর?'

'আছে হয় তো; কিন্তু এদেশে একটা কুপিপিদিম লণ্ঠন নিয়ে চলাফেরার নিয়মটাই আমাদের নিজেদের। এখন ত বুঝেছ; সেইজন্যই দিশি মানুষের মত লণ্ঠন হাতে করে খুব চুপচাপ ঠাণ্ডা একগ্র হয়ে আসে।'

'রমা বলে', ওকে যদি বলা যায় যে রাতের বেলা কেরোসিনের কুপ হাতে করে চলাফেরা করলে এ দেশের অন্ধকার দেশাত্মাকে আরো ভাল করে বুঝবে তুমি বার্থেলো—তাহলে তাই করবে।'

'হুঁ?'

'বার্থেলোর একটা রকম আছে।'

প্রভাসবাবু বললেন, 'যা বললে তাতে খাঁটি সন্ন্যেসি বলে মনে হয়।'

'সব দিকেই খুব পরিষ্কার বুদ্ধি খেলে। এমন-কি ঘোড়েল পর্যন্ত বলতে পারা যায়; কিন্তু তবুও—'রমা বললে, 'কোনো চেষ্টাচরিত্তির না করেই বার্থেলো বড় ভাল লোক।'

'আজ রাতে যাবে তুমি মিশনে?'

'হ্যাঁ—যাচ্ছি।'

'বার্থেলো যদি ফিরে থাকে, তাহলে কাল একবার তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলবে?'

'বলব।'

'মাদাম ভালেরি বাপের দিক দিয়ে সত্যিই ফরাসি কি-না সেটা জেনে আসতে পারবে ত রমা?'

না জেনে যদি ফিরে আসে তাহলে আজ রাতে রমার ক্যানাডিয়ান মিশনে যাওয়া ততটা সার্থক ঠেকবে না বুঝি প্রভাসবাবুর চোখে; মানুষের মনের কাছে কোনো জিনিসই অবাস্তব নয়, ঐ মহিলার সঙ্গে কোনোদিন কথাও কইবে না বাবা, কিন্তু তবুও জেনে আসা দরকার মেয়েটি ফরাসি কি-না; ফরাসি নয় বলেই ত ধরে নিয়েছেন, রমা ফিরে এসে তার বাবাকে বলবে যে চেক বা বুলগার বা পোলিশ, ফরাসি ভদ্রলোককে বিয়ে করে প্যারির সালঁর থেকে তাকে কানে ধরে টেনে এই ব্যসমতীর জঙ্গলে এনে ফেলেছে। শুনে খুশি হবেন; কিন্তু এর কমে খুশি হবেন না। মেমসাহেবটিকে প্রথম দৃষ্টিতে যা ভালবেসে ফেলেছেন তার বাবা!

'হ্যাঁ, জেনে আসব,' রমা বললে, 'তোমার সঙ্গে আলাপও করিয়ে দেব।'

'কার?'

'ঐ ফরাসি স্ত্রীলোকটির।'

'না,কোনো দরকার নেই, প্রভাসবাবু একটু ক্ষেপে উঠে যেন বললেন। তারপর চিঠিতে মন দিয়ে বললেন, 'স্ত্রীলোকটি ফরাসি হলেও-বা পারে; কিন্তু বাস্তবিকই যদি তুমি বাজি ধরে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও আমি বলব ও ফরাসি নয়। বেশ ধরো, আমার চেয়ে যদি বেশি মুন্সী হয়ে থাক এখুনি দশটা টাকা পেয়ে যাবে', বলতে-বলতে চিঠির কাগজ সরিয়ে ব্যাগ থেকে দু'টো কড়কড়ে পাঁচ টাকার নোট হাতের কাছের তেপয়ের ওপর দোয়াত-চাপা দিয়ে রেখে রমার দিকে যেন তার পিঠোপিঠি ভাইয়ের মত কেমন একটা সন্তপ্ত কটাক্ষে তাকিয়ে রইলেন।

'বাব্বা! এত।'

'ও সাহস হল না বুঝি?'

'টাকা সাজিয়ে রেখেছ, লোভ হয়;কিন্তু কী করেছিল বল ত মেমসাহেব, এত খাপ্পা তার ওপর?'

'কিছু করেনি। কিন্তু কাউকে-কাউকে দেখেই হয়ে যায় আর-কি।'

'আচ্ছা আমি জেনে আসব উনি ফরাসি কি-না।'

'তারপর বার্থেলোকে জিজ্ঞেস করব আমি,' প্রভাসবাবু বললেন', টাকা দশটা তুমি নিয়ে নাও।'

'এখনি কেন? দেবি আছে ত বার্থেলোর কলকাতার থেকে বাসমতীতে ফিরে আসতে।'

'নিয়ে রাখো টাকা; পরে মীমাংসা হলে সময় বুঝে ব্যাবস্থা করা যাবে। আর কিছুর জন্যে নয়, ফরাসিরা শুনেছিলাম মানুষের মত। মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা, ও-সব বড় কথা। কোনো জাতিই তা পারেনি, কোনোদিন পারবেও কি-না সন্দেহ। দু-চারজন প্রেমিক মানুষ অবিশ্যি তা পেরেছেন। কিন্তু প্রায়ই সাদাজাতিরা অন্যদের ঘৃণা করবার ব্যাপরে যে সিদ্ধিলাভ করেছেন, শুনেছি ফরাসিরা ততটা পারেনি। কী শুনেছ তুমি?'

'কানাঘুষোর মতন শুনেছিলাম ওরকম একটা কথা,ঠিক জানি না কিছু—'

'আমি শুনেছিলাম। সেই জন্যই ফরাসি ক্যানেডিয়ান মিশনের কথা যখন বললে ভাল লাগল আমার। কিন্তু মেমটাকে দেখে সুবিধার লাগল না; কিন্তু আমি কি মেয়েদেরই বরদাস্ত করতে পারছি না আজকাল? হৃদয় মন-টনই বদলে যাচ্ছে।'

বলা শক্ত—' রমা খবরের কাগজটা ভাল করে ভাঁজ করে রাখতে-রাখতে বললে, 'শিগগির কোনো স্ত্রীলোকের সম্পর্শে আসনি তুমি। আমার মনে হয় ফরাসি মেয়েটিকে ক্রমে-ক্রমে ভাল লাগবে তোমার। না ভাল লাগলেও এতটা অশ্রদ্ধা থাকবে না। নিতান্তই চোখের শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার ওপর আজকাল খুব বেশি নির্ভর কর তুমি। চোখ নয়। আমাদের মন—' রমা কথা বলাবার মাঝখানে খোলা দরজার ভেতর দিয়ে সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়াল ঘরের ভেতর;সে যে বাইরের থেকে ভেতরে আসছে, সিঁড়ি বেয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকছে, কোনোরকম শব্দই পায়নি রমা। সেন কি ঘাসের ওপর থাবা ফেলে হাঁটে, না বাবাকে লক্ষ্য করে রমার নিজের স্বগত কথা বলা-টলা মাঝে মাঝে বেশ জমে ওঠে, খানিকক্ষণের জন্যে তাকে কালা করে রাখে।

'এসো সিদ্ধার্থ,' হাতের চিঠি সরিয়ে রেখে প্রভাসবাবু বললেন,তোমার কথাই ভাবছিলাম। দাঁড়িয়ে রয়েছ?'

সিদ্ধার্থ ভাবছিল সে এখনই এখানে বসবে কি-না, না পাশের মিশন থেকে আগে একটু ঘুরে আসবে; মিশনের পাদ্রীদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলা দরকার, মনে-মনে সংকল্প করেছিল, রমাদের বাড়িতে ঢোকবার আগে। মিশনে যায়নি সে কোনোদিন, পাদ্রিদের কাউকে চেনেও না; তবে একটা দরকারে আজ যাবে ভেবেছিল। চলেছিলও মিশনের দিকে; জানালার ভেতর দিয়ে প্রভাসবাবুকে দেখা গেল, কী যেন লিখছেন; কেমন যেন একটা শান্ত আত্মগত ভঙ্গিতে কথা বলছে রমা টের পাওয়া গেল, কোনো রোগীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে মনে হল; এ বাড়িতে কারো অসুখবিসুখ করেছে নাকি? প্রভাসবাবুকে ত বেশ সুস্থ স্বাভাবিক দেখা যাচ্ছে। ভাবতে-ভাবতে মিশনের যাবার পথে আগেই রমাদের বাড়িতে একবার উঁকি দিয়ে দেখবার জন্যে ঢুকে পরেছিল সিদ্ধার্থ। 'তুমি সেই যে চলে গেলে—' প্রভাসবাবু বললেন, 'আর এই কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে, আমরা আছি কি নেই, একবার খোঁজ খবর নিতে হয় না?'

'পোস্ট অফিস ছুটি আজ?'

'বোসো। আমি ছুটি নিয়েছি।'

'শরীর অসুস্থ হয়েছে?' সিদ্ধার্থ হাতের কছে একটা জারুল কঠের চেয়ারে বসে বললেন।

'না, ততটা নয়। তবে হাঁটতে-চলতে কষ্ট হয, বাতে কষ্ট পাচ্ছি দু-পাযে বাত; বাতেব কোনো ওষুধ জান তুমি?'

'হ্যাঁ, যা ধন্বন্তরির মত কাজ করে।'

সিদ্ধার্থ হেসে বললে,'শুনেছি ধনেশ পাখিব তেল আছে—শুনেছ নাকি রমা?'

'না ত। সে আবাব এক রকম পাখি আছে নাকি?' রমা বললে।

'হ্যাঁ শুনেছি,' প্রভাসবাবু বললেন,'কিন্তু কোথায পাওয়া যাবে সে তেল?'

'এই ত বছর পাঁচেক আগেও ত এমনি দুপুরবেলা বাসমতীব বাস্তায ফিরি করে বেড়াত, কিন্তু সে-সব লোকদের অনেক দিন ত দেখি না,' সিদ্ধার্থ বললে,'হয তো কোনো মাড়োয়াবি ওদের ব্যবসা কিনে ফেলে পেটেণ্ট করে নিয়েছে।'

'মানে ভেজাল চালাচ্ছে? সেঁটে?'

'তা আব বলতে।'

'খাঁটি জিনিস পৃথিবীতে পাওযা যাবে না এখন আব।'

'না, পৃথিবী ঢের সেযানা হযে গেছে,' সিদ্ধার্থ বললে, 'এই ত্রিশ বছর আগেও আমাদেব ছেলেবেলায় মাবাত্মক বকমের সবল ছিল। আমি বাসমতীব কথা বলছি। কিন্তু সে বাসমতী নেইএখন আর।'

'কলকাতা হযে উঠছে।'

'হ্যাঁ। তাই ভাবছি এ আখড়া ছেড়ে দিযে সেই পীঠস্থানেই চলে যাই।'

'কলকাতায যাবে তুমি?' বমা বললে।

'ভাল কাজ পেলে চলে যেতাম। এখন ত ব্রিটিশ আমল চলছে, আমাব জন্য কোনো কাজ বসে নেই।'

'শিগগিবই ত দেশ স্বাধীন হবে।'

'সে ভিড়েব মধ্যে আমাদেব কোনো স্থান হবে না।'

'এই বলছ? কী কবে বুঝলে?' বমা বললে, 'চোখে বুঝি দূবেব জিনিস দেখতে পাও?'

সিদ্ধার্থ কাঠেব চেযারে বসেছিল, ছাবপোকায কামড়াচ্ছে মনে হল, পাল্টে ডেকচেযাবে বসল।

'স্বাধীনতাব ভিড়ে চাপা পড়ে যাবে মনে কবছ?'

'হ্যাঁ, নির্ঘাত। মিলিটাবিতে চেষ্টা করলে অবিশ্যি কমিশন পাওযা যেত, মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাব বযস নেই। অন্য কোনো কাজ পাওযা যাবে না। যে-সব ছেলেদেব পরীক্ষাব খাতা দেখে ঘেন্না ধবে গেছে, চাকবিও ব্যবসাব বাজাবে ওদেব ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল:কনুই দিযে গুঁতো মেবে ওবা পথ কেটে নিতে জানে, স্বাধীন ভাবতে ওদেব সুবিধা হবে।'

'ওদেব সুবিধে হবে বলতে চাও বুঝি তুমি?' বমা যেন অবহিত হযে স্ফটিকেব ভেতব দিযে গ্লানিকর ভবিষ্যৎটাকে দেখে, তবুও সেটাকে অবিশ্বাস কববাব চেষ্টা কবে বললে।

'হ্যাঁ, ওদেব ; আব ওদের মতন ছোকবা আব বুড়োদেব। কিন্তু আমাদের কোনো মীমাংসা হবে না। মীমাংসাব ভাব যাদেব ওপরে বাংলাদেশেব সে-সব অন্ধদেব ত এখনই দেখছি আমি; বাতারাতি ভোল বদলাবে এবা! এদের আওতায সমস্ত দেশ অন্ধ, খোঁড়া, নুলো, বোবায ভরে যাবে টাকা চাকবি ব্যবসা, সবই ওদেব; দেশ স্বাধীন হল বলে ভালা লাগবে আমাদেব, কিন্তু অন্য সব দিক দিযে খুবই খাবাপ লাগবে। সপবিবাবে মরেও যেতে পারি। বাসমতীতে কলেজেব কাজে থাকলে খেযে বেঁচে থাকাব খানিকটা সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু কলকাতায গেলে সপবিবারে শেষে মারা যাব কিংবা টি-বিতে না খেতে পেযে; স্বাধীনতার কোনো সেবকও আমাদেব দিকে ফিবে তাকাতে যাবে না।'

শুনে প্রভাসবাবুর খুব খাবাপ লাগল, কিন্তু বিশ্বাস কবতে চাইলেন না তিনি। কী হবে, না হবে সিদ্ধার্থ এত আগেব থেকে কী কবে তা বলে। ভবিষ্যৎ দেখবার বিশেষ শক্তি কোনো সাধুমহাত্মার থাকতে পাবে বটে, কিন্তু সিদ্ধার্থ ত সহজ সিধে পথেব মাস্টাব।

'তুমি মিছে ঘাবড়াচ্ছ সিদ্ধার্থ,' প্রভাসবাবু বললেন,'ওরকম কিছু নয। দেশ স্বাধীন হলে সবই খুব ভাল হবে।'

'তা হবে—' রমা হেসে বললে, 'তুমি ব্রিটিশ সরকারে নিমক খেয়েছ এতকাল, স্বাধীন কর্তারা এসে তোমার পেনসন কেড়ে নেবে না। পুলিশ সেক্রেটারিয়েট সবই বেশ জুতিয়ে সুখে থাকবে।'

'জুতিয়ে?' প্রভাসবাবু বললেন, 'তাহলে দুঃখ হবে কাদের?'

'যারা দুঃখের জন্য জন্মেছিল তাদের।'

'ওরকম করে বললে বুঝব না রমা, একটু তাকিয়ে বলো।'

'ব্রিটিশ আমলে যারা ঘাড় পেতে দুঃখ সহ্য করছিল এবারেও বহন কববার ক্ষমতায় খুব সম্ভব আরো বেশি দুঃখ সহ্য করতে হবে তাদের; কিন্তু আরো খানিকটা চোখ খুলে যাবে তাদের, মানুষের জীবন সম্বন্ধে, আশাও আশাবাদ সম্বন্ধে যা ভুল বুঝেছিল শুধরে নিতে পারবে, আরো স্পষ্ট একটা দার্শনিক সংস্থানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে মনে হচ্ছে।'

'তাতে কী সুখ হল?'

'সুখ এদেব জন্য নয়।'

'তাহলে শান্তি।'

'না, তা নয়।'

'তবে?'

রমা বললে,'এরা যা দেখলেন—বুঝলেন সে-সম্বন্ধে যদি কিছু লিখে রেখে যেতে চান তাহলে আমাদের দেশের আগের কালের পণ্ডিতেরা যা বেখে গেছেন,কিংবা ইউবোপেব স্পিনোজা, ফ্রয়েড, মার্কস, আইনস্টাইন-সে-সবের চেয়ে নতুন কিছু লিখে যেতে পারবেন বলে মনে হয় না; এও এক বিষম দুঃখ। কিছু লিখে রেখে যেতে পারবে তুমি সেন?'

'কে? আমি? কিছু বিবৃতি লিখে যেতে পাবি। কিন্তু যা দেখেছি, বোধ করেছি, তা গুছিয়ে লিখতে পারলে আমাদের এই শান্তিব দেশে বসেও একটা ওযব অ্যাণ্ড পিস লেখা যেত।'

'অথবা অ্যানা ক্যাবেনিনা?' বমা বললে।

'ক্যাবেনিনা লেখবাব মত অবস্থান অভিজ্ঞতা আমাব নেই।'

'পরে হবে।'

'হতে পারে,' সিদ্ধার্থ তাব প্রিয়পাত্রের মত এদিককাব জানালাব বাইবেব পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু টলস্টয় ত আব কলম আমাকে দেবে না।'

'আমাব একটা চুরুট আমি তোমাকে দিচ্ছি,' প্রভাসবাবু বললেন।

'কিংবা আজ অবদি ইউরোপে বিজ্ঞান দর্শন যতদূর এগিয়েছে,' প্রভাসববাবু হাত থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিতে-নিতে সিদ্ধার্থ বললে,'তাব ওপব ভিত্তি কবে শিগগিরই নতুন দর্শন তৈবি হবে। আমবা কেউ তাব প্রথম খসড়া লিখে যেতে পারতাম । অনুভব করেছি, বুঝেছি, কিন্তু কলমের শক্তি নেই।'

'শক্তি আছে।' রমা বললে।

'আছে?'

'কিন্তু অবসর নেই।' রমা বললে,'টাকা নেই, লাইব্রেবি নেই;ব্রিটিশ মিউজিযামের মত লাইব্রেবিব দরকার ত।'

'এ-সব থাকলে হত কিছু?'

'আইবুড়োও থাকতে হত তোমাকে। টাকার কথা ত আগেই বলেছি। লিখতে বসে পারিপার্শ্বিকেব বাধাবিপত্তির বাইবে থাকতে হত।'

'ওযর অ্যাণ্ড পিস তৈরি হত বুঝি তাহলে?'

'তুমি এ যুগের ফিলসফির নতুন খসড়া তৈরি কববে বলছিলে—' চুরুটটা ধবাবার জন্যে দেশলাই জ্বালিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'অ্যানা কারেনিনার কথা বলছিলে ত বুঝ,' কাঠিটা জ্বলে উঠে একটা উড়ো বাতাসে নিভে গেল।

'তুমি সিদ্ধার্থকে আইবুড়ো থাকতে বললে কী হিসেবে বমা?'

কুড়ি বছর আগে রমার কুড়ি বছব বয়স থাকলে হিসেবটা বাবাকে বুঝিযে দিতে পারত রমা। কিন্তু এখন অন্যবকম ভাবে হিসেব কষে দিতে হবে, বুঝবেন না হয় তো তিনি।

'যাবা বড়-বড় বই লেখে তাদের পারিবারিক জীবন প্রাযই থাকে না, কিংবা থেকেও থাকে না—'

রমা প্রভাসবাবুকে খুব সম্ভব তার অজ্ঞাত এক রকম সত্যের মোটামুটি একটা আভাস দিয়ে বললে।

'ও-সব মানি না আমি,' প্রভাসবাবু বললেন।

'সেন ত মানেন।'

'মানবার ইচ্ছে ছিল,' সিদ্ধার্থ বললে,' কিন্তু শক্তিতে কুলোল না।'

'কিন্তু তুমি শুধু পারিবারিক মানুষ?' সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করল রমা।

'হতে হয়েছে ত,' সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'তবে পরিবারের প্রতি টান রয়েছে বলে যে এরকম হয়েছে, তা নয়। হয়েছে, ভেসে চলেছি বলে; সেটা খারাপ কি ভাল জানি না। মানুষের মন গতিবান বলেই আমাদের জীবনের বাস্তবতা নদীর মত নয়। নদী তৈরি করতে চেষ্টা করে আমরা প্রায়ই রক্তের নদীই তৈরি করেছি।'

'একটা কথা সিদ্ধার্থ।'

'বলুন।'

'পরিবারের ওপর টান আমারও কমে গিয়েছিল,' প্রভাসবাবু বললেন, 'ওরকম হয়।'

অঙ্কের ভেতর হাল্কা গর্ভাঙ্কের মত মনে হল প্রভাসবাবুর কথাটাকে রমার, কিন্তু সিদ্ধার্থের আগের কথার উত্তরে মনের গাম্ভীর্যে সে কিছু বলতে যাবার আগেই প্রভাসবাবু বললেন,'কিন্তু সকলের বেলা হয় না, কারো-কারো হয়,যেমন আমার হয়েছিল, তোমার হয়েছে। আমি অবশ্য অনেক স্ত্রৈণ পুরুষ দেখেছি, বিয়ের পরে আট-দশ বছর কেটে গেলেও স্ত্রৈণ, কিন্তু সাধারণত ও-সব সময়ে বৈষ্ণবদের পরকীয়া সাধনাই ভাল লাগে।'

এ-সব কথা রমার কানে গিয়েছেই বলে ভাব দেখাল না, কিন্তু তবুও বললে,

'যেমন মাদাম ভালেরিকে লেগেছে তোমার?'

'না, ওকে নয়,' প্রভাসবাবু বেশি কথা না বলে এক কথায় রমাকে জব্দ করে দিয়ে বললেন,'ও ত আমার মেয়ের মতন।'

'ভালেরি কে?'

'মাদাম ভালেরি।'

'ও, এই মিশনের।'

'হ্যাঁ, ক্যানেডিয়ান মিশনের পাদ্রি ভালেরি সাহেবের বউ।'

'ও,' সিদ্ধার্থ বললে।'

'আমার মনে হয় বউ নয়,'রমা বললে।

'তবে?' প্রভাসবাবু চুরুটে টান দিয়ে তাকালেন রমার দিকে।

'ক্যাথলিক মিশনের পাদ্রিরা কি বিয়ে করে?'

'জানি না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'আঁবি ভালেরির বোন হতে পারে।'

'বোন হলে ত ও খাঁটি ফরাসি,' প্রভাসবাবু বললেন,'কিন্তু ওকে তা ত মনে হয় না।'

সিদ্ধার্থ বললে,'এই মিশনেই যাচ্ছিলাম আমি এখন, সেই জন্যেই এদিকে এসেছিলাম আজ।'

'মিশনে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ, মিশনারিদের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার ছিল। এখন দুপুরবেলা পাওয়া যাবে ওদের?'

'বার্থেলো ত নেই বাসমতীতে; বাকি দু'জনকে পেতে পাব। কী দরকার ওদের সঙ্গে?'রমা বললে,'আমিও ভাবছিলাম আজ রাতে মিশনে যাব।'

'তুমি যাবে?'

'রাতের বেলা,' রমা বললে, 'ও, তাহলে মিশনে যাবার পথে আমাদের এখানে আটকে গেছ তুমি?'

'জীবনে কি রকম ভেসে চলেছি তাই বলছি রমা—' সিদ্ধার্থ হাতের চুরুটটা পাশে সিমেণ্টের মেঝের ওপর আস্তে রেখে দিয়ে বললে, 'কলেজ ছুটি, আজ সকালে একটি বই নিয়ে বসেছিলাম, কিন্তু চুয়াল্লিশ বছরের গরিব মাস্টারের সংসার, ঘরের ভেতরেরই নানা রকম অসুবিধায় অন্ধকারে দুপাতার বেশি এগতে পারলাম না। দুপুরবেলা মনে হল সবাই ঘুমিয়েছে—কিংবা এ পাড়ায় ও পাড়ায় চলে গেছে, অন্তত ঘণ্টাখানেক নিরিবিলি পাওয়া যাবে ভেবে কলম নিয়ে লিখতে বসেছি।'

সূচীপত্রে যান

'কলেজের নোট?

'না, ব্যক্তিগত মতামতের মত একটা কিছু, প্রবন্ধ নয়, গল্পও নয়, শ্লেষ থাকলেও ভারিক্কে—এমনি সময় রজনী এসে বললে, সিদ্ধার্থ আমার গরুটা পাচ্ছি না—'

'বজনী কে?'

'আমার কলেজের এক বন্ধু।'

'রজনী নান্? কেমিস্ট্রির লেকচারার?' রমা বললে।

'হ্যাঁ। রজনী আমার বাড়ির পাশেই থাকে, দশটি ছেলেপিলে, একটা গাই রজনীর; গরুব দুধের ওপর নিরেট শ্রদ্ধা; বলে দুধ না খেলে ছেলেরা বাঁচবে কী করে। গরু হাবিয়ে লোকটা পাগল হবার জোগাড়। কলম ফেলে উঠতে হল আমাকে। কিন্তু কোথায় গেছে, কী করে খুঁজে বার কবব গরু?'

'খুঁজতে-খুঁজতে আমাদের বাথানে এলে বুঝি?'

সিদ্ধার্থ মেঝের ওপর থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে বললে, 'হিন্দুমহাসভার অনন্ত বিশ্বাস বললে যে গরুটা শালিখডাঙার দিকে যে নতুন ক্রিশ্চান মিশন হচ্ছে সেদিকে গিয়েছে—'

'শালিখডাঙা কোনটা?'

'এই পাড়াটা।'

'এটাকে ত জিরানডাঙা বলে।'

'শালিখডাঙা বলে কেউ-কেউ।'

'তারপবে?

'রজনী বললে, অনন্তবাবুর কথা মত আজ সকালেই সে মিশনে গিযে জিজ্ঞেস করে এসেছে, কিন্তু মিশনের লোকেরা বলেছে যে তারা কোনো গরু দেখেনি, রজনীকে মিশনেব সব ঘাট ঘুরিযে দেখিয়েছে তাবা, অত বড় গরু কোথাও লুকিযে রাখবাব জো নেই, রজনীর বিশ্বাস মিশনে গরু নেই।'

'পরের গরু লুকিয়ে রাখবার মানুষ ওরা নয়,' রমা বললে, 'মিশনে গরুর খোঁজে তুমি যেও না সিদ্ধার্থদা।'

'তবে ভালেবির মেম সাহেবকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পাব,'প্রভাসবাবু বললেন।

হাতের চুরুটে আগুন রয়েছে, না টানলে নিভে যাবে, দু-চাব বাব টেনে আগুনটাকে চৈতন্যে ফিবিযে এনে সিদ্ধার্থ বললে, 'হিন্দুমহাসভার শরৎ ভৌমিকের সঙ্গে পথে দেখা, মহাসভার লোকেবাই দেখেছি এক-আধটা কিনারা বাতলে দিতে পাবেন, শবৎবাবু বললেন, শালিখডাঙাব ক্রিশ্চান মিশন ত এই বসেছে, ওরা এখনই অত বড় একটা গাই দিযে কী করবে, বেঁধে রেখে দুধ খাওয়া ছাড়া? তা ত খাচ্ছে না, রজনী ত নিজের চোখে দেখে এল। গরুটা জিবানডাঙার মোছলমানরাই বেহাত করেছে, মেবেছেও হয তো, মাংস খাওযাব জন্য ওবা দুধেল গরুও মানকচু থোড়েব মত খেযে ফেলে, ওখানে কুড়ি-বাইশ ঘব কশাই আছে, চামড়াব ব্যবসা করে।'

'ও, এই কশাইরা?'

'হ্যাঁ, এদেরই জিবানডাঙার কশাই বলে।'

'গরু খুঁজলে কশাইপাড়ায?'

'হ্যাঁ, গিযেছিলাম, আমি আব রজনী।'

'কোনো খোঁজ পেলে?'

'না। ওরা বললে যে ওরা গাই বলদ আবাল গরু বকবি সব পযসা দিযে কিনে কাটে, কোনো সড়কের গরু কাটে না। রজনীব গাইগরু যে পথ ভুলে ওদের ওখানে এসে পড়তে পাবে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই তুলতে দিল না। যতবার কথাটা পাড়লাম ততবার বললে সড়কেব গরু জিবান-পাড়ার কশাইরা কাটে না।'

'হুঁ?'

'দু-চাববার দা নিয়ে তেড়ে এসেছিল।'

'তা ত আসবেই', রমা বললে,'আমি হলেও দা মাঝখানে বেখে কথা বলতাম। ওরা তবু ছেড়ে দিয়েছে তোমাদের; আমি জিরানডাঙার কশাইবাড়ির ছেলে হলে—;

'কেটে ফেলতে সিদ্ধার্থকে?'

'হিন্দুমহাসভার শরৎ ভৌমিকের কথায় কী করে তোমরা না জেনেশুনে মোছলমানদের কাছে গিয়ে তাদের কাজকর্মের সময় তোমাদের গরু হারিয়েছে বলে হাঁড়িমুখ করে গিয়ে দাঁড়ালে?'

'শুনে দা নিয়ে তেড়ে এলে?'

'হ্যাঁ, বোঝা গেল আমি আর রজনী নান, আমাদের চেয়ে মোটের ওপর ওরাই ভাল। আমাদের কথাবার্থাতাব সব ব্যাকরণ ঠিক ছিল না তখন, অবিশ্যি ভালভাবেই কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম, অনেকেই ওরা মন দিয়ে শুনল, ভাল মনে উত্তব দিল। দলশুদ্ধ দা: নিয়ে ছুটে এলেও অস্বাভাবিক হত না , কিন্তু দু-তিন জন হেঁকে এসেছিল শুধু। কিন্তু বাকি কশাইরাই মাঝখানে পড়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখল, থামাল। দা বাগিয়ে এসেছিল যারা তাবা ঠাণ্ডা হয়ে তামাক খেতে বসল।' সিদ্ধার্থ বললে; 'আমাদেব ফিরে আসা উচিত ছিল তখন, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলাম।'

'কেন?'

'এই একমুর্হুত আগেই ত পাড়া সরগবম হয়ে উঠেছিল, আমাবও বক্ত গরম হয়েছিল খানিকটা। কিন্তু এখন,' সিদ্ধার্থ কী বলবে ভাষা খুঁজতে গিয়ে কিছুই খুঁজে পেল না যেন, বলা হল না তার, শুধু বললে টিপাইযেব মেঝের ওপর চুরুটটা রেখে দিয়ে, 'মনে হল, সমস্ত কশাইপাড়াটাকে আগের চেয়ে ভাল করে বুঝলাম।'

মেঝের ওপর সিদ্ধার্থেব নিভন্ত চুরুটটাব দিকে তাকিয়ে রমা বললে 'কী বলতে চাচ্ছ?'

'এই ত বললাম।'

'প্রকাশ কবে বলো।'

'তুমি বলো।'

'আমি ত দেখি নি তাদের।' রমা বললে।

কেউ কিছু বলবার আগে প্রভাসবাবু বললেন,'দা নিয়ে তেড়ে এসেছিল।ওদেব মাতব্ববরা মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দিল। তাবপব একটা কিছু ঘটল, ওদেব মনে। চাবদিককার আবহাওযাব ভেতরেও, মানুষেব ইতিহাসের ভেতরেও যেন, যার পরে ওবা আর-এক বকম জিনিস হয়ে গেল। ঠাণ্ডা হয়ে তামাক খেতে বসল তাবপব, এটা হল সমস্ত ব্যাপাবটার যা পবিণাম, তাবই বাইরের অভিব্যক্তি।'

প্রভাসবাবুব দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ খানিকক্ষণ পবে বললেন,'হ্যাঁ এই বকমই। হুঁকো, কল্কি, মানুষ, তাদেব সাদামাঠা বসবার ভঙ্গি, হঠাৎ এমন একটা পটভূমি খুলে গেল এব ভেতব, সেবকম আমি দেখিনি কোনোদিন। জীবনে দেখবও না আব। আমি দাঁড়িয়ে বইলাম।'

'বজনী নান?'

'আমাব কাছেই ছিল।'

'কী কবছিল সে?'

'সে কিছু দেখেনি।'

'এই পৃথিবীবতে, এই সৃষ্টিকেই ধরুন, যে একটা বিশেষ অর্থেব বাহন হয়ে এসেছে মানুষ সেটা তাব কেবলি আত্মঘাতের ইচ্ছা, কী সেন?' বমা বললে, 'কিন্তু তবুও পুবোপুরি আত্মঘাত করেনি সে, অনেকখানি কবেছে, বাকিটুকুও সেবে ফেলবার বিশেষ তাগিদ রয়েছে। তার, পৃথিবীব নানা জায়গায়ই এই জিনিসেব ছায়াছবি এসে পড়েছিল। তুমি বক্তমাংসেব মানুষগুলোব দিকে তাকাতে-তাকাতে টের পেয়েছিলে চাবদিককার চৈতন্য বিশুদ্ধ হয়ে যেন ছবিতে ফলে উঠেছে। প্রথমে আত্মঘাতেব ছবি, তারপবে আত্মবক্ষার, তারপরে ভবিতব্যতাব কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর অতীত পর্যন্ত খোঁজার ইহলোক বা পবলোক নয় অন্য কোথাও, ঠাণ্ডা হয়ে বসে তামাক খাবার। এটা কশাইপাড়াব ছবি শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবীবই। উদ্যম হল, নিরুদ্যম হল, যেখানে বেঁচে থাকা বা মৃত্যু নেই সেই সঙ্গমস্থলে শান্তি হল। পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ, চেষ্টাই হচ্ছে উদ্যম, তাবপরে আত্মবিচারে সময়, নিরুদ্যাম, এই সবেব অতীত কোনো এক জায়গায় আমাদের মৃত্যুব আগের শান্তি। পৃথিবী বস্তু নির্দেশ করে শান্তি পেতে চাচ্ছে, রাষ্ট্রে বা সমাজে, কিন্তু সেটা অসম্ভব।'

'মনে হচ্ছে অসম্ভব।'

'নানারকম দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে তবুও যুক্তিব হাব মানিয়ে এক-আধ মুহূর্তের যে শান্তি আসে সেটাকে চিবস্থায়ী কবতে চাচ্ছে তবুও ত মানুষ—'

'দেখা যাক মানুষ কতদূর পারে।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'এ পর্যন্ত ত ঠকেছে মানুষের হাতেই।'

'পরে ঠকবে না হয় তো। কিন্তু প্রকৃতির হাতে ঠকবে?'

'প্রকৃতি ত মানুষের হয়ে মানুষকে নাশ করে।'

গরুর কোনো খোঁজ পেলে না সিদ্ধার্থ ?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন?'

'না। রজনী এখনো খুঁজছে।

'একবার বিইয়ে ছিল নাকি গাইটা? ক সের দুধ দিত? কত টাকা দিয়ে কিনেছিল?'

'কিন্তু প্রভাসবাবুর প্রশ্নের উত্তব দিতে ভুলে গেল সিদ্ধার্থ। বমাব সঙ্গে আব-এক বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল, কিন্তু রমা কিছু বলছে না এখন আব; কী যেন চিন্তাকূটে জড়িয়ে গিয়ে চুপ করে আছে।

'হ্যাঁ এই রকম একটা ছবি দেখেছিলাম আমি—' সিদ্ধার্থ বললে,'মনে হল যেন মানুষের জীবনের ভেতরে হাত রাখতে পেরেছি। সেই জন্যই জিবানডাঙাব কশাইদের মুখেব দিকে তাকিয়ে বইলাম, চট করে চলে আসতে পারলাম না।' সিদ্ধার্থ মেঝের টিপাইযেব ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে ছাই-এব দিকে একবাব তাকিয়ে চুরুটটা হাতে রেখে দিল; ডেক চেযাবের ক্যানভাসে মাথা এলিয়ে দিযে মাথাটা টান করে খাড়া কবল তাবপব।

'খুবই সাধারণ মনে হবে তোমাদেব, জিরানডাঙাব সেই-সব মোছলমান কশাই-কামিনদেব দিকে তাকিয়ে থাকা, সাধাবণ ত বটেই,' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিন্তু আমি ভেবে শেষ কবতে পাবছি না, কিবকম ধরনেব অসাধাবণ। আমার খুব বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাব আব কল্পনাব জীবন। কোনোদিন দেখিনি কিছু, দূব পাড়াগাঁর জঙ্গলে মাঠে গভীব রাতে ঘুবেছি ঢের। কিন্তু আজ ফটফটে বোদেব ভেতর এত সব মানুষেব ভিড়ে আমার মনে হল এক মুহূর্তের জন্য যেন আদি মর্ম পৌঁছেছে আমাব হাতে। কী সে জিনিস,কী মর্ম আব তোমার বাবা ভাল করে বোঝাতে চেষ্টা কবেছ; আমি এ সম্বন্ধে পরে লিখব, আজ কিছু স্পষ্ট করে বলতে পাবলাম না।'

'তুমি ভূত দেখ নি কোনোদিন?'

'না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'আছে?'

সিদ্ধার্থ চুরুটেব ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চুরুটটা না জ্বালিয়ে প্রভাসবাবুব দিকে তাকিয়ে বললে,'ভূত দেখা, তাসের খেলা, ও-সব মোটা কথা। আমি যা দেখাব কথা বললাম সেটা আমার মনে হয সময সম্বন্ধে একটা নতুন জ্ঞান, জীবনের মানে সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অর্থ, প্রতিদিনেব দেখা জিনিসকে অন্য জিনিসে দাঁড় করিয়ে স্বরূপেব ছবি দেখতে-দেখতে হঠাৎ সত্যস্বরূপকে দেখা ধ্যান কবে স্থিব কবতে যাওয়া এক জিনিস, চোখ মেলে স্পষ্ট দেখে ফেলা অন্যরকম। আমি সাধারণ জিনিসকে পাঁচজনেব মত চোখ মেলে কি বকম অসাধাবণ হয়ে উঠল দেখলাম আজ।

'ঈশ্বর আছেন?'প্রভাসবাবু বললেন।

'সত্যস্বরূপ বলতে ঈশ্বর বুঝিনি আমি।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি আছেন?' সিদ্ধার্থ একটু হেসে বললে,'তিনি থাকুন।'

'তার মানে?'

'আপনার নিজেব জিনিস ত তিনি; আপনি বুঝে দেখুন। আমাবটা আমি নিজে বুঝে দেখব।'

'তুমি মান না, জানি আমি,' প্রভাসবাবু বললেন, 'তুমি কিছুই মান না, তবু জিবানডাঙায তোমাব চোখেই পড়ল ব্যাপারটা। আমবা কোনোদিন ওরকম কিছু দেখিনি।'

'কিছুতেই যখন গরুটা পাওয়া গেল না তখন কশাইদেব ভেতর দাঁড়িয়ে রজনী কেঁদে ফেলল।'

'হুঁ?' প্রভাসাবু চুরুটটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়ে বললেন, 'আমি মাকে খুব ভালবাসতাম। কিন্তু আমার বাবা আগে মারা গেলেন। এত কেঁদে- ছিলাম তখন যে কিছুকাল পরে মা যখন মারা গেলেন আমি কাঁদতে পারলাম না আর। রজনী নানের বাবার কী হল, গরুর জন্যে কাঁদছে?'

'আপনি পারেনও অধিকারী মশাই।' প্রভাসবাবু তেপযের ওপর চুরুটটাব দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন,'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ওর বাপমার কোনো খেসারত হযনি ত?'

সূচীপত্রে যান

'আজ সকালে ওর মাকে যে রকম দেখলাম,' সিদ্ধার্থ বললে,'তাতে ওর বাপের অমঙ্গল হয়েছে বলে মনে হল না।'

প্রভাসবাবু তেপয়ের থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিলেন; নিভে গেছে বলে মনে হচ্ছে না, আধ ইঞ্চি ছাই জমে আছে মুখে। চুরুটটা মুখে দিতে গেলেন না তিনি, হাতেই রইল। ধূলোর রাস্তার ওপর দিয়ে একটা সাইকেল চলে গেল। ক্যাথলিক মিশনের একজন বাঙালি কর্মচারীর; নাকি মাদ্রাজি লোকটা? শার্ট আর সাদা ট্রাউজার্স পরেছে, খুব বেশি কাল, মাথার চুল অল্প বয়সেই পেকে গেছে-আধাআধি, ভাল করে মানুষটাকে দেখতে-না-দেখতেই সাঁ করে চলে গেল।'রজনীকে কাঁদতে দেখে জিবানডাঙার একজন কশাইয়ের কেমন যেন মন কেমন করল—' সিদ্ধার্থ প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুড়ো রজনীকে জিজ্ঞেস করল আপনার গরুর কি রকম রঙ ছিল, রজনী বললে সাদা; ফয়জুদ্দি বললে কয়েকটা সাদা গরু মেরেছি আমরা, চামড়া ছুলে শুকোতে দিয়েছি, আসুন কত্তা আপনার গরুর চামড়া দেখে চিনে নিতে পারেন ত চামড়া মুফতে দিয়ে দেব আপনাকে। কয়েকজন মুফত চামড়া দেবে কোন হিশেবে। ফয়জুদ্দি বললে, কত্তা চামড়া চিনে নিতে পারলে তবে ত দেব,"মাক্রা" দেখিয়ে চিনিয়ে দিতে হবে কোন চামড়া আপনার, এখানে দাঁড়িয়ে বলে দিতে হবে আপনার গরুর চামড়ার ওপর কি রকম "মাক্রা" ছিল; চামড়া পরে দেখা আপনাকে, আগে "মাক্রা"'র মুশাবিদা হোক।'

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালালেন।

'রজনী বললে, আমার গরুর গায়ে কোনো মার্কা ছিল না, পালিশ চামড়া ছিল। কশাইরা একসঙ্গে হেসে ধুম্বল দিয়ে উঠে বললে, তা হতেই পারে না, গরুর চামড়ার দাগ থাকে, দাগি থাকে, চাকচিক্কর থাকে,দগদগে ঘা,কাটা ঘা, নালি ঝাড়ু পাচনের কালশিটে থাকে, সেগুলোর রকমফের থাকে এক-এক রকরির গায়ে এক-এক রকম,বকরির সালিক দেখেই চিনতে পারে। ফয়জুদ্দি কোমরে জোর পেয়ে বললে, আসুন দেখে যান, কোন চামড়া। আপনার কি রকম"নসকা"—কি রকম "মাক্রা" রজনী থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর কনুই দিয়ে আমাকে আস্তে ঠেলে বললে, চলো সিদ্ধার্থ, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই, এরা একবার বলছে আমার বকরির কথা, আর-একবার বলছে, 'আপনার চামড়া, অবিশ্যি বকরিটা উহ্য, কিন্তু এখন থেকে ওটা আর আমার মাঠে চরবে না বুঝতে পারছি। সব সময়ই উহ্য থেকে যাবে; বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে উহ্যটাও উঠে যেতে পারে। তখন আমার নিজের গায়ের চামড়া বাঁচানো দায় হবে।'

'ও-গরু তালাশ করতে চামড়া বাঁচিয়ে চলে এল বুঝি রজনী নান,' প্রভাসবাবু চুরুটের গ্যাঁজটা জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এরই জন্যে কেঁদেছিল আবার।'

'আমাদের কাঁদা আর হাসা।' সিদ্ধার্থ বললে।

'একটা নতুন চুরুট বের করে প্রভাসবাবু বললেন, 'ফিরে এলে তোমরা?'

'না। ফিরে আসছিলাম, তবে থেমে গেলাম।'

'কিনারা পেলে গরুর?'

'না। শুনলাম ওদের বস্তিতে কলেরা লেগেছে।'

'বেশি?' রমা বললে।

'তিন চার জনের হয়েছে। জিবানডাঙার বস্তিতে দু'শ-আড়াই'শ লোক আছে, রোগটা ছড়িয়ে পড়লে খারাপ হবে।'

'বিশেষ কিছু করবার নেই,' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিংবা করতে হলে দিনরাত আগলাতে হয়। ওরা ডাক্তার দেখায়নি, সুধাংশু ডাক্তারের বাড়ি জিরান-ডাঙার বস্তিটার চেয়ে বেশি দূরে নয়, মিনিট কুড়ির পথ হবে। তাকেই আনালাম, তার ভিজিট আজকাল আট টাকা হয়েছে।'

'নিলে ভিজিট?'

'কলেরা কেস যে—' সিদ্ধার্থ বললে 'নেবেই ত।'

'কে দিল টাকা?'

'রজনী দিয়েছে।'

'কি রকম অবস্থা রুগিদের?'

'খুব খারাপ।'

খুব ভোগ?'

'বাঁচবে না। সুধাংশু ডাক্তার চলে যাবার সময় বলে গেল সে আর আসতে পারবে না।'

'কেন?'

'কিছু করবার নেই, বললে, এক-আধ ঘণ্টার ভেতরেই মরে যাবে; অনেক আগে ডাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারত।'

'খুব খারাপ জাতের কলেরা?'

'তাই ত মনে হচ্ছে।'

'জিরানডাঙাটা ত আমাদের বাড়ির কাছেই— প্রভাসবাবু বললেন, 'ও-দিককার জানালা দু'টো বন্ধ করে দেবে?'

'জল ফুটিয়ে খান, দুধ নাই-বা খেলেন কয়েকটা দিন। ঘরদোর সমস্ত বাড়িটায় ক্লোরিন দেয়া থাক; ক্লোরিনই ত রমা?'

'আছে ক্লোরিন তোমার কাছে সিদ্ধার্থ?'

'ক্লোরিন কি হবে?' রমা বললে।

'তবে?'

'চলো, জিরানডাঙায় সিদ্ধার্থদা।'

'কেন?'

'আমাদের দেখতে হবে ব্যারামটা ওদের মধ্যে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে।' সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'ব্রহ্মারও সাধ্য নেই যে কিছু করে, তুমি আর আমি? এখন উশকে কথা ভাবলে চলবে না, একটু শক্ত হতে হবে। আমি কলেজের কয়েকজন ছেলেকে খবর দিয়েছি, মুসলমান ছেলেরাও আছে তাদের মধ্যে, বলে দিয়েছি ওদের যে, রুগিরা মরে গেলে তাদের কাপগচোপড় বিছানাপত্তর সব যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়, কশাইরা যাতে বাঁধা না দেয়। তাদের জিনিসের জন্যে কশাইদের আমরা ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দেব। সমস্ত কশাইপাড়াটায় অ্যান্টিসেপটিকের ব্যাবস্থা করতে বলেছি, যতদূর পারা যায়, বেশি কিছু পারা যাবে না, বাসমতীতে আজকাল ওষুদবিষুদের চালান খুব কম।'

'ছেলেরা আসবে?'

'যারা সত্যিই আসবে, তাদেরই বলেছি।'

'ওষুদবিষুদ কোথায় গেল?'

'আমদানি কম, এই অজুহাত দেখায়।

'এটা পৃথিবীর ব্যাধি', রমা বললে,'আমাদের দেশে এতদিনে সত্যিই গেড়ে বসেছে কালবাজার এখন; সাদা হবে না আমরা বেঁচে থাকতে আর।'

'কোনোদিনই সাদা হবে কি এর?' প্রভাসবাবু জিরানডাঙার কশাইপাড়ার দিকদিগন্তের দিকে তাকিয়ে বললে।

'তোমার কলেজের ছেলেরা ডিউটি দেবে?'

'যা বলেছি সেই-সব করবে। কশাইদের ভেতর নতুন কোনো কেস হলে সেখানে ডিউটি দেবে; এ তিনটি রুগি মরে গেছে এতক্ষণে।' 'আমার মনে হয় সুধাংশুবাবু বারবার আট টাকা ভিজিট পাবেন না বলেই খুব সম্ভব বলেছেন যে রুগিরা শিগগিরই মরে যাবে। কশাইপাড়া ত একটা দুখের বস্তি, ওখান থেকে মোটা টাকা শুষবার উপায় নেই ত, মিছেমিছি মেহনত করে কী লাভ।'

'ডাক্তাররা কি এত শক্ত।'

'সকলেই নয়; তবে অনেকেই হচ্ছে আজকাল; এটাত রাখি-টাকার ওপরে বসে টাকা কামাবার যুগ।

'না—' সিদ্ধার্থ বললে,' সুধাংশুবাবু ওরকম লোক নন।'

'নন? আটটি টাকা ফিরিয়ে দেয়া উচিত ছিল তাহলে রজনী নানকে,' প্রভাসবাবু বললেন,'কিছুইত করলেন না সুধাংশু ডাক্তার।'

'এসে দেখে গেলেন ত! ডাক্তারের দিক দিয়ে তার দাম রয়েছে। জিরানডাঙার কশাইপাড়ার কলেরার ইঞ্জেকশান দেয়া দরকার; আমি জানিয়েছিলাম মিউনিসিপ্যালিটিকে, ওরা বলেছে ওদের কাছে ওষুধ নেই এখন, কলকাতায় অর্ডার গেছে।'

'কবে আসবে?'

সূচীপত্রে যান

'সাত দিনে হতে পারে, সাত মাসেও হতে পাবে। কলকাতা থেকে ওষুধ আনিয়ে নেবার অসুবিধা রয়েছে, কিন্তু আমাদেব এখানকার কর্তাদেরও অব্যবস্থা ঢের।'

'ইঞ্জেকশনের কোনো সরঞ্জাম নেই?'

'সিরিঞ্জ আছে,' সিদ্ধার্থ চুরুটটা তুলে নিযে বললে।

'তাহলে জল ভরে ফুঁড়ে দিলেই ত হল,' প্রভাসবাবু বললেন, 'জিবানডাঙা ত বালিগঞ্জ নয়, কতকগুলো খাজা কশাইয়েব একচালা। কী দিযে কী কবা হল জানতে চাইবে না, কর্তাবা বিলিতি ওষুধ দিযেছে আশ্বাস পেয়ে মনের আতঙ্ক কমলে রোগের প্রকোপও কমে যাবে মনে হয। এদের বোগ আতঙ্কে বেড়ে যায অনেকখানি।'

'পঁচিশ-ত্রিশ জনের ইঞ্জেকশন দেওযাব মত ওষুধ আছে।'

সিদ্ধার্থ বললে,'কসাইরা আড়াইশ।'

'তাহলে কী করা যেতে পাবে ? শিগগিরই একটা কিছু ভেবেচিন্তে ঠিক করা যায কি-না বিশেষভাবে বোধ কবে বমা বললে।

'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি কোথাও ত কিছু সুবিধার হল না। ডাক্তাবদের নিজেদেব কাছে কী আছে না আছে সেটা জানবাব জো নেই, সুবিধেও নেই, আমি ভাবছি একবার এই মিশনটায যাব।

'ওষুধ আছে কি-না খোঁজ নিতে?'

'সিদ্ধার্থ উঠে চলে গেল।

'কুড়ি পঁচিশ মিনিট পবে ফিরে এসে বললে,'পাদ্রি সাহেব বললে অনেক জিনিস আছে ত তাদেব সঙ্গে, কিন্তু বাক্সে প্যাক করা আছে, বার্থেলো ফিরে না এলে কিছু বলতে পাববে না।'

'বার্থেলো কবে আসবে?'

'তিন-চাব দিন ধবে রোজই আসবাব কথা,কিন্তু এল না ত; আজ বিকেলের স্টিমাবে আসবে মনে কবছে।'

'আজ বাতে আমি মিশনে যাব,' বমা বললে,'তোমাদেব সঙ্গে ভালেবির স্ত্রীব দেখা হযনি?

'হযেছে। দু'জনেই পাশাপাশি বসে ছিল। ওবা জিজ্ঞেস কবল আমাকে জিরানডাঙার লোকগুলো কী ক্রিশ্চান, ক্যাথলিক ক্রিশ্চান কি-না। আমি বলে এসেছি, হ্যাঁ ক্যাথলিক ক্রিশ্চান বলেই মনে হয।'

'সে কী কথা!' বমা যেন একটা ব্যাটাবিব ধাক্কা খেযে বললে।

'ওবা বললে যে এত কাছে ও যে এতগুলো ক্যাথলিক ক্রিশ্চান আছে, তা ওবা জানতই না, এদেশে অনেক ক্যাথলিক আছে তাহলে। বাসমতীতে নতুন এসেছে, কোথায কী আছে না আছে, কী দেশ কী রকম ব্যাপাব কিছুই জানে না, আমি সাহায্য করলে খুবই উপকার হয। বললে, বার্থেলো কিছু-কিছু জানত, কিন্তু সে চলে গিযে একটু মুশকিল হযেছে, ওরা দু'জনে কিছুই জানে না বললে।'

'কিন্তু তুমি জিরানডাঙাব কশাইদের ক্যাথলিক ক্রিশ্চান বলে চালিযে দিযে এলে।'

'ভালোরিরা বললে ওদেব ওষুধ ওদেব থাকলেও ওষুধ মিশনের জন্যে। যদি কিছু বাড়তি থাকে তাহলে সেটা অন্যদেব দেযা যেতে পরে—কিন্তু সবচেয়ে আগে ক্যাথলিকদেবই পুরোপুবি দাবি না মিটিযে আর কাউকে কিছু দেযা যেতে পারে না বলে দুঃখ জানাল। সব মানুষই সমান—সকলের দাবিই হল মাদারের নিজের—সেটা স্বীকার কবেও বললে যে সব ধর্মেবই নিজেদের নিজেদেব সেবাব্রতীরা সব বযেছে, নিজেদেব উপরওযালারা আছেন, সরকার আছেন—এবাই দেখবেন এদের নিজেদেব মিশনটা প্রধানত ক্যাথলিকদেব জন্যে—'

'কিন্তু তুমি ত বলে এসেছ জিবানডাঙার মানুষগুলো ক্যাথলিক।'

'হ্যাঁ তা ত বলে এসেছি।'

'এতে কোনো লাভ হল না সেন,' বমা বললে 'ওরা কি টেব পাবে না কশাইবা ক্রিশ্চান নয?'

'আজ রাতেই টের পাবে হযত।'

'আজ রাতেই কি ওবা কশাই বস্তিতে যাবে?'

'হ্যাঁ, কশাইরা ক্যাথলিক শুনে একটু মন কেমন কবছে যেন ভালোবিদের। হাভভাব দেখে মনে হল খুব সম্ভব শিগগিরই ওষুধ নিয়ে যাবে—আমিও জিরানডাঙার থাকব তখন। আমি নির্মল আর অমূল্য তিনজনেই ইনজেকশন দিতে পারি—রজনীও পারে; চার পাঁচটা সিরিঞ্জ ফিরিঞ্জ নিযে আমরা তৈরি হযে থাকব।'

'ভালোবিরা যাবে আজ রাতে জিবানডাঙায?' রমা বললে, 'বাস্তবিকই কি ওষুধ রযেছে ওদের— থাকে

যদি—অত ওষুধ নিয়ে সত্যিই যদি যায় মিথ্যা কথা বলে সে ওষুধটা কাজে ঃ গান ঠিক হবে কি তোমাদের?' সিদ্ধার্থ পকেট থেকে এক টুকরো দারচিনি বের করে বললে 'কিন্তু কোনটা ঠি ' বলে দাও তুমি—এরা সকলে মরবে না, কোনোদিন কোনো ক্যাথলিক রুগ্নী না পেয়ে ওষুধগুলো ভালোরিদের বাক্সে পচবে?'

রমা একটু ভেবে বললে 'পচুক।'

'প্রভাসবাবু চুরুটটা মুখে নিতে যাচ্ছিলেন, বদলে ছাই ঝেড়ে হাত নামিয়ে 'আবার ছাই ঝেড়ে জিরানডাঙার পড়ন্ত রোদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন,'তা কি-করে হয়।'

'তুমি মিশনারিদেব কাছে আবার যাও সেন।' রমা বললে।

'আবার যাবে কেন? কেন? আবার যাবে কেন?' রমার বাবা জিজ্ঞেস কবলেন।

'যাও—গিয়ে বল যে জিরানডাঙাব কশাইরা ক্রিশ্চান নয়।'

সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'আচ্ছা তুমি গিয়ে বলে এস রমা, যে, জিবানডাঙার লোকগুলো ক্রিশ্চান নয়—পনেব মিনিটেব মধ্যে হয়ে যাবে তোমার। প্রভাসবাবু আব আমি এইখানে অপেক্ষা কবছি।'

'রমাব কথাই তাহ'লে মেনে নিলে তুমি সিদ্ধার্থ ।'

'হ্যাঁ,' সিদ্ধার্থ আব একবার কাঠি জ্বালিয়ে চুরুটটাকে ভাল কবে জ্বালিয়ে নিতে নিতে বললে, ঠিক কথাই, মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েও লাভ নেই।'

'কিন্তু মিথ্যে কথা কাকে বলে?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন। উনি একেবারে সৃষ্টির প্রথম কথা নিয়ে নাড়া দিয়েছেন বটে, সামাজিক সত্য যে একটা দেশ কাল সন্ততির জিনিস নয়; কিন্তু সময়েব প্রত্যেকটি নতুন চাবণায় চারণায় বদলে গিয়ে মানুষেব অন্তিম উপকারের জন্যে, সে হিসেবে সেন হয়ত সত্য, আমি মিথ্যা—কিন্তু তবুও সত্যের একটা চির-পদার্থও বইল কোথায়? ভাবছিল বমা।

প্রভাসবাবুর কথাব কেউ উত্তর দিল না

'মিশনে তুমি যাও সেন।'

'তুমিই যাও। আজ সকাল থেকে অনেক ঘোবাঘুবি করে বড্ড গা ছেড়ে দিয়েছে। বাতে জাগতে হবে জিবানডাঙায।'

'রাতে আমিও যাব জিরানডঙা—নিয়ে যেও আমাকে।'

'না, তোমাব আজ বাতেই দবকাব নেই, পবে দেখা যাবে। আজ আমরা অনেকে আছি।'

'আমি যেতে পারি মিশনে—কিন্তু তুমি গেলেই ভাল হত।'

'মিশনের—আমাব নিজেব দিক দিয়ে ভালই ত হত, ব্যাপাবটা ত আমাবি একটা মিথ্যাকে নিয়ে,' সিদ্ধার্থ বললে, 'আমার মিথ্যা শোধরাবার ভাব তোমাব ওপব ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে থাকা—এ ত ঠিক হল না কিন্তু, আমি ওপবে উঠতে পাবছি না আর; শবীবে আর একেবারেই কিছু দিচ্ছে না—এই চেযাবটাব থেকেই উঠতে পাবছি না।'

সিদ্ধার্থ উঠবার উপক্রম কবল।

'না না নড়াচড়া কোর না' বমা বললে, 'শুয়ে একটু ঘুমোবাব চেষ্টা কব ডেকচেযাবটায; বিছানায যাবে?'

'না।'

'তোমাব ব্লাড প্রেসাব বেড়েছে সেন? বড্ড ধকল গেছে বুঝি কদিন থেকে? হাই ব্লাড প্রেসার? কত দুশো সোয়া দু'শো?' প্রভাসবাবু বললেন।

'না—লো প্রেসাব' বমা বললে,'গত বছব যে রকম হযেছিল। ব্লাডপ্রেসার মাপবার জিনিসটা কোথায বাবা।?

'সেটা পোস্টাল সুপাবিন্টেণ্ডেন্ট খগেন বোস ত নিয়ে গেলেন প্রায মাস তিনেক হল, ফিবিয়ে দেননি আব।'

'না বেশি কিছু হয়নি,' সিদ্ধার্থ বললে 'একটু ডেকচেযারে শুযে জিবিয়ে নিলেই হবে। আমি সন্ধ্যাব সময মিশনে যাব রমা, ভালোরিকে গিয়ে বলে আসব।'

'মানুষেব সব জায়গায়ই পায়ে হেঁটে যাবাব দবকার নেই,' বমা বললে,

'আমার একটা খটকা ছিল—সেইজন্যেই যেতে বলেছিলাম তোমাকে । কিন্তু নিজের কাছে তুমি পরিষ্কার হয়েছ। যাচ্ছি আমি মিশনে।'

রমা মিশনের দিকে চলে গেল।

মিনিট পনের কুড়ি পরে ফিরে এসে বমা কললে, 'সে কি কথা সেন—তুমি নাকি ভালোরিদের বলে এসেছ জিবানডাঙার কশাইরা মুসলমান?'

সূচীপত্রে যান

সিদ্ধার্থ লো ব্লাড প্রেসারের জন্য আস্তে আস্তে চুরুট টানছিল। চুরুটটা আলগোছে নামিয়ে বললে, 'তুমি আবার বলে এসেছ নাকি ক্যাথলিক ক্রিশ্চান?'

'ওখানে যেতেই ওরা আমাকে বললে, কাছেই মুসলমানদের বস্তিতে কলেরা লেগেছে, আমি কোনো খবর পেয়েছি কিনা।' আমি বললাম যে জিরান ডাঙার কশাইরা যে মুসলামান তা কে বলেছে আপনাদের, তখন তোমার কথা বললে, নাম টুকে রেখেছে তোমার সাহেব, নোটবুক খুলে নামটা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে পড়ে বললে চীনেও অনেক সেন আছে, কিন্তু সেটা সেখানে নাম—আর এখানে পদবী।'

'জিরানডাঙার কলেরার কথা কী বললে?'

'তোমাকে ওরা বলে দিয়েছে ত যে ওদের কাছে ইনজেকশনের ওষুধ নেই?'

সিদ্ধার্থ চুরুটটা বেশি আলগোছে টেনে টেনে নিভিয়ে ফেলেছে, যাক গিয়ে নিভে, নেভা চুরুটটা দাঁতে আটকে রয়ে সয়ে টানতে টানতে বললে, 'তুমি আবার আগের থেকেই গায়ে পড়ে ওদের জিজ্ঞেস করতে যাওনি ত ওষুধ আছে কি না—কতখানি আছে—আড়াই শ কশায়ের চলবে কি না।'

'ব্লাড প্রেসারে চুরুট খাওয়াটা খারাপ সেন।'

'খাচ্ছি না ত—নিভে গেছে।'

'সেই কথাই বলছিলাম আমি—নেভা চুরুট খাওয়া খুব খারাপ।'

সিদ্ধার্থ চুরুটটাকে দাঁতে ধরে রেখে আস্তে আস্তে বললে, 'কেমন একটা বিষ তৈরি হয় যেন—বুঝতে পারছি—জ্বালিয়ে নেয়া যাক '

'ওরা ত জিরানডাঙায় যাবে না।'

'জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'তোমার কাছে ত জিরানডাঙায় যাওয়ার কোনো কথা পাড়েনি ওরা।'

'ভালোরি বললে বুঝি তোমাকে?'

'কোথায় জিরানডাঙা তাও জানে না।

'দেখলে ত সব কিছু থেকেই খানিকটা আলগা?'

রমা বললে, 'আলগা—নাকি—তা একদিনেই ত বোঝা যাবে না। এই ত সবে এসেছে। তৈরি হচ্ছে মিশন, বসতে না বসতেই যজ্ঞি শেষ করবে কি করে-এই ত ধোঁয়া উড়ছে সবে। কিন্তু তুমি ত মিশনে গিয়ে সব কথাই সেরে এসেছ প্রফেসর—আমাকে কি করতে পাঠালে বল ত দেখি।'

খুব তির তির করে টেনে টেনে চুরুটে একসময়ে আগুনের আঁচ পেল না আর সিদ্ধার্থ, নেভানো তামাক পাতার গ্যাস টেনে নিল খানিকক্ষণ, চুরুটটা তারপর মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে বললে, 'মিশনে গিয়ে ভালই করেছ। ওরা মানুষ ভাল, কথাবার্তা বলে সুখ আছে ওদের সঙ্গে।'

'সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে কথাবার্তা?' একটা পুরনো খবরের কাগজ একটু ঝেড়ে নিয়ে ভাল করে ভাঁজ করতে করতে রমা বললে। মেঝের ওপর থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে সিদ্ধার্থ হসতে হাসতে বললে, 'সে রকম কথা আমার রজনীর সঙ্গে চলে, ভালোরির চেয়ে রজনীকে অনেক বেশি নিজের জিনিস মনে হয় বলে—'

রমার হাতের পুরনো কাগজটার গায়ে কোনো ময়লা নেই, তবুও হাত দিয়ে আস্তে আস্তে সেটা বুলিয়ে বুলিয়ে ঝাড়তে সে বললে, 'রজনীবাবুকে বলেছ বুঝি যে ক্যানেডার মিশনের কর্তারা মুসলমান?'

'না, সে কথা বলি কি করে!'

'তাহলে কি আর মিথ্য কথা বললে তাকে। সত্যমিথ্যায় মিশিয়ে কথাবার্তা বেশ জমে তার সঙ্গে' বললে সিদ্ধার্থ। চুরুট জ্বালাবার ফিকিরে রয়েছে। দেশলাই পাচ্ছে না। দেশলাইয়ের খোঁজ এদিক সেদিক তাকিয়ে পরে বললে, 'তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করেছিলে যে ভালোরিকে আমি বলেছি যে জিরানডাঙার কশাইরা ক্যাথলিক ক্রিশ্চান?'

'তুমি কি দেশলাই খুঁজছ?'

'দেশলাইটা কোথায়?'

'দেখছি না।'

'প্রভাসবাবু ঘুমুচ্ছেন—'

'চেয়ারের বেতে হেলান দিয়ে বসে বসে একটু ঝিমু এসেছে বাবার—এখুনি ভেঙে যাবে চটকা।'

'কোথায় হয়ত রেখেছেন উনি—'

'উনি না জাগলে একটা দেশলাই, পাওয়া যাবে না।' রমা ভুরু কুঁচকে হেসে বললে, 'বড্ড ঠেকে

রইলে ত তুমি।'

'আমি কি ভালোরিকে বলতে পারি এরকম কথা যে জিরানডাঙার কশাইয়া ক্যাথলিক ক্রিশ্চান? তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করেছিলে আমি বলেছি?

'মিশনে গেলাম ত বড় একটা বিশ্বাসের ভরে।'

'কী বিশ্বাস করে?'

'কশাইরা খুব বিপদে পড়েছে—তাদের ওষুদ পত্রের জন্যে। মিশনের সঙ্গে সত্যিই একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে এসেছ তুমি, মরিয়া হয়ে জিরানডাঙার মানুষদের ক্যাথলিক পর্যন্ত বলে এসেছ, এটা, ঐ লোকগুলোর বড় বিপদের সময় আমি—' রমা হাতের কাগজটা পরিপাটি করে ভাঁজ করে জানালার ভেতর দিয়ে বস্তির একচালাগুলো ঢেকে ফেলে গাছগাছালি, জঙ্গল;দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে–সেইদিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি সত্যি বিশ্বাস করেছিলাম সেন।'

'কিন্তু ওরা যে ক্যাথলিক সেটা নাকচ করতে তুমি ত মিশনে গেলে।'

'সে কথা তোমাকে মুখে বলে গেলাম বটে কিন্তু ওদের কাছে সত্যি বেশি ওষুধ আছে এবং সেটা ওরা ক্যাথলিকদের উপকারে জন্যে বিলিয়ে দেবে একথা বুঝতে পারলে জিরানডাঙায় কশাইদের কী ধর্ম কী জাত সে–সব আমি ভাঙতে যেতাম না আর।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'অক্সফোর্ড মিশনে একবার যাব।'

'ওষুধের জন্যে?'

'আছে ওষুধ, বলতে পাবো?'

'নেই,' রমা হাতের ভাঁজ করা কাগজটা সিদ্ধার্থের কেম্বিসের হেলান চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর ঠিক করে গুছিয়ে পেতে রাখতে রাখতে বললে, 'থাকলেও বেশি নেই, তা ছাড়া ওদের নানরকম নিয়ম–টিযম আছে; বড় ফাদার, মেজ ফাদাব, ফাদারদেব সব কর্তা ব্যক্তিবাই কলকাতায চলে গেছেন, মাদার সুপিরিযরও এখনে নেই; কলকাতার থেকে ওরা ফিবে না এলে পাওয়া যাবে বলে মনে হয না।'

'কাগজটা এখানে পাতলে কেন?

'ওর ওপর চুরুট রেখো, মেঝের বদলে এইটে ভাল হবে।'

'পুড়ে যাবে ত কাগজ!'

'কত আব পুড়বে?'

'সিগারেটের এক–আধটা ফুলকিতে এক–একটা বড় থিযেটাব পুড়ে যায ত।'

প্রভাসবাবু চোখ মেলে আড়ামোড়া ভেঙে চোখ তাবিযে তাকালেন সিদ্ধার্থের দিকে, 'কিছু বললে আমাকে?'

'আপনার দেশলাইটা চেয়েছিলাম।'

'আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম?'

'ঝিমুচ্ছিলেন।'

'জিবানডাঙায কলেরা লাগল তাহলে—' পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে সিদ্ধার্থেব হাতে গুঁজে দিয়ে প্রভাসবাবু বললেন,'কোনো ব্যবস্থাও করা গেল না—ইনজেকশন ফিনজেকশনেব?'

'না। ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সিবিঞ্জই পাওয়া যাচ্ছে বুঝি শুধু?'

'পঁচিশ–ত্রিশ জনের ইনজেকশন দেওযাব মত জিনিস রয়েছে ত?' রমা বললে।

'তা আছে।'

'তাহলে কলেজেব যে–ছেলেরা ডিউটি দিচ্ছে তাদেরই প্রথমে ইনজেকশন দিয়ে দিলে কাজে লাগবে—'

'রজনী নান আর আমি আট দশজন ছেলেকে ফুঁড়ে ঠিক করে রেখেছি।' সিদ্ধার্থ দেশলাইযেব বারুদের ওপর কাঠি ঘষতে-ঘষতে বললে।

'তোমরা নিজেরা ফোঁড় খেয়েছ ত?'

'রজনী খেয়েছে, আমি খাব এইবারে,' সিদ্ধার্থের হাতের কাঠিটা জ্বলে নিভে গেল; 'তোমাদেব দু'জনকে ইনজেকশন দেব রমা—জিনিস এনেছি।'

'কোথায?'

'বারান্দায় আমার ছোট অ্যাটাচিতে রেখে এসেছি।'

'দাও, ইনজেকশন দিয়ে দাও।' প্রভাসবাবু বললেন, 'রমাকে এবারে হস্টেলে পাঠাতে হবে।'

'হস্টেলে যাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এই মড়কটা কমে না গেলে যেতে পারব না।'

'কেন?' আমার জন্যে চিন্তা?' প্রভাসবাবু বললেন, 'আমি টুরে বেরিয়ে যাব।'

'চাইলে ত তোমাকে টুর দেবে না সরকার। গত তিনমাসে একদিনও ত বাসমতীব বাইরে কোথাও পাঠাল না, নদীর ওপারে ঐ ছঘাড়া বকচরে অব্দি না।'

'আসছে সপ্তহে আমার টুর আছে,' প্রভাসবাবু তেপয়েব ওপব থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিযে বললেন, 'আজ শুক্করবাব—সোমবার যেতে হবে নিশিন্দায।'

'নিশিন্দায়?' একটু চমকে উঠে রমা বললে।

'হ্যাঁ, নিশিন্দায।'

'স্টিমাবে?'

'স্টিমারে।'

সেই লাইনটা এখনো আছে?'

'বেখেছে তা দেখছি।'

'বমা বললে—'গফুর আছে?'

'প্রভাসবাবু চুরুটটা জ্বালিযে নিয়ে বললেন,'বলতে পারি না। আছে বলেই ত মনে হয। অনেকদিন কোনো খোঁজখবর নিতে পাবিনি; আমাব অন্যায হযেছে। আমাব ঠিকানাও জানেনা গফুব' না হলে এখানে এসে দেখা কবত নিশ্চযই।'

'গফুব কে?' সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা কবল।'

'বাটলাব—নিশিন্দাব জাহাজের।'

'নিশিন্দাব জাহাজ?' দেশলাইযের কাঠি জ্বালিযে সিদ্ধার্থ বললে, 'ওদিকে আবার জাহাজ যায নাকি?'

'খুব চমৎকাব নদী জঙ্গল আছে ওদিকে', প্রভাসবাবু বললেন, 'যাবে বেড়াতে? চল—এই সোমবাব।'

'কে? আমি?' সিদ্ধার্থ বললে, 'না, এখন নয—এই ত জিবানডাঙায কলেবা লাগল।'

'তুমি যাও টুরে,' বমা বললে,'আমি এখনই হস্টেলে যেতে পাবব না। বাড়ির পাশে এবকম মড়ক লাগল, আমাব এখনই কববার নেই হযত কিছু—তবুও দেখি কিছু করা যায কি-না। এখন হস্টেলে যাবাব চেযে নিশিন্দা যাওযাও ভাল। কিন্তু এ বাড়িব থেকে নড়তেই ইচ্ছা করছে না আমাব।'

'এখানে ঠিকা ঝি, আব তার মেযেব সঙ্গে থাকবে তুমি?'

'বেশ ত থাকা যাবে।'

'বাতে ওবা থাকবে?'

'খেতে দিলেই থাকবে।'

'বেশ ত—' প্রভাসবাবু চুরুটের পেটে দু'টো-তিনটে টোকা মেবে বিবক্ত হযে বললেন,'আমি সোমবাব চলে যাচ্ছি। বদবদল নেই, কিন্তু যা দেখছি শেষ মুহূর্তে তুমি বাগড়া না দিযে ছাড়বে না।'

'জিবানডাঙায কলেবার ডিউটি তোমাকে দিতে হবে না' সিদ্ধার্থ বললে,

'এর পবে যদি বাসমতীতে ঝড়িয়ে পড়ে, তাহলে দবকাব হলে তোমাকে আমি এসে ডেকে নিযে যাব। তোমাব বাবা টুরে গেলে হস্টেলে চলে যাও কিংবা ওঁর সঙ্গে নিশিন্দায ত যেতে পাব?'

'আমাকে এসে ডেকে নিযে যাবে?'

'হুঁ,' কাজে ডেকে নেব,' সিদ্ধার্থ বললে, 'বাসমতীতে যদি মড়ক ছড়ায।'

'কশাইদের ব্যাপার তোমরা সামলাবে?'

'হ্যাঁ', চুরুট না জ্বালিযে, দেশলাইযেব কাঠিই জ্বালিযে যাচ্ছে সিদ্ধার্থ, কিন্তু এবাব ভাল কবে চুরুট ধবিযে নিল,'আমাব মনে হয কশাইদের বস্তিতেও কলেবাটা ছড়াবে না, কেটে যাবে শিগগিরই, বড় জোব আঠার-কুড়ি জনের হলে হবে।' সিদ্ধার্থ বললে।

'আমি এই বাড়িতেই থাকব, সেন!'

সেনেব মন অন্যদিকে ছিল, রমার কথা শুনতে পেযেছে বলে মনে হল না।

'নিশিন্দাযও ত যেতে পাবি।'

সূচীপত্রে যান

সিদ্ধার্থ বারান্দার থেকে অ্যাটাচি কেস এনে বললে, 'হ্যাঁ, যেতে পার নিশিন্দায়।'

সিদ্ধার্থ সিরিঞ্জ বাব করে সাজসরঞ্জাম করতে-করতে প্রভাসবাবুকে বলল, 'আপনি টুরে যাচ্ছেন; নেবেন ত ইনজেকশন? জ্বরজারি হতে পারে কিন্তু অল্পসল্প—নদীখালের পথে; খুব বেশি গা ব্যথা হতে পারে।'

'খানিকটা অস্বস্তি হবেই?'

'তা হবে বলেই ত মনে হয।'

'হলে ত সোমবারের আগেই হবে।'

'তা হবে।'

'শেষ মুহূর্তে টুর বন্ধ করা,' প্রভাসবাবু চুরুটটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'কিন্তু বাড়িব কাছে আর বলি কেন? মড়কটা ত একেবারে চৌকাঠের ওপব আমাদেব, কিছু প্রতিষেধক না নিলে—আচ্ছা, দাও।'

প্রভাসবাবুকে, রমাকেও,ইনজেকশন দিযে দিল সিদ্ধার্থ।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি সেন?'

'তুমি চা তৈরি করে রাখো—আমি আসছি।'

'জিরানডাঙার দিকে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, দেখি গিয়ে বজনী-টজনী আছে নাকি ওখানে।'

'সিদ্ধার্থ অ্যাটাচি কেশটা বন্ধ করে চাবি এঁটে, একটা চামড়াব স্ট্র্যাপেব সঙ্গে জুতছিল সেটাকে-হ্যাভারস্যাকেব মত কাঁধে ফেলে নেবে।

'সকলকে দিলে—তুমি নিজে ত ইনজেকশন নিলে না সেন?'

'হ্যাঁ', হ্যাভারস্যাকের মত পিঠে ফেলে বেল বেঁধে নিতে পেরেছে অ্যাটাচি কেসটা।

'ওখানে রজনীবাবু ছাড়া আর-কেউ ইনজেকশন দিতে জানে না?' বমা বললে।

'জানে, ছেলেদের ভেতর দু-চাবজন, তারা রাতে আসবে।'

বলতে-বলতে সিদ্ধার্থ বেবিয়ে গেল—জামরুল সববতিলেবু মেহেদিব ঝাড় জঙ্গল পেবিয়ে গেল প্রায।

'জিবানডাঙায বজনীবাবু থাকলে তুমি এখুনি ইনজেকশন নিযে নিও সেন,' বমা জোবে হাঁক পেড়ে বললে।

'আচ্ছা', উত্তর এল সিদ্ধার্থেব, সিসু জারুল মেহেদির জঙ্গলের ওপার থেকে; আওয়াজ শোনা গেল শুধু, আওযাজটা নিজে পটান্তবেব ভেতব সেঁদিযে ফেলেছে নিজেকে।

কিন্তু চা খেতে এল না সিদ্ধার্থ।

চাবটে বেজে গেল, পাঁচটা বেজে গেল, প্রথমবারেব চা ঠাণ্ডা হয়ে সব পড়তে সেটা ফেলে দিযে দ্বিতীযবারেব জন্য চা কবল রমা-সেন হযতো এখুনি এসে পড়বে।

কিন্তু সাড়ে পাঁচটাব সময়ও সে এল না। পৌনে ছটার সময না।

'কী করা যায বাবা।'

'আটকে পড়েছে হযত জিবানডাঙায।'

'আমি গিয়ে দেখে আসব?'

'তাকি একটা কথা? কাব সঙ্গে যাবে তুমি?'

'দিনেব আলো থাকতে-থাকতে তুমি ত নিয়ে যেতে পাব।' না, একটা

হারা-উদ্দেশ্যে জিরানডাঙায যাবার মত শরীরেব অবস্থা নেই প্রভাসবাবুর। পাযে বাতেব বাড়াবাড়িতে হাঁটতেই ত পারেন না, মনে তেমন তাগিদ নেই; সিদ্ধার্থ ও-বস্তিটায় সত্যিই বযেছে এখনো সঠিক জানতে পাবলে একটা রিকশ ডেকে যেতেও পারতেন হযত, কিন্তু প্রভাসবাবুব মনে হচ্ছিল নানা দিকেব দিশাবি মানুষ হযে দাঁড়িযেছে ত আজকাল সিদ্ধার্থ, অন্য কোথাও চলে গেছে নিশ্চযই। এখানে এসে চা খাবে বলে গেছে বলেই যে ফিরে আসবে আজই, বা দু-চাব দিনের মধ্যে, সিদ্ধার্থেব সে-বকম কাজের কম্মের হিড়িক-টিড়িক দেখা যাচ্ছে আজকাল, তাতে সেটা বম্ভব বলে মনে হয না।

'আমি ত যেতে পাবি না, পাযেব বাতে আমি নড়তে পাবছি না।'

'নিশিন্দায যাবে ত!'

'সে ত আজ নয-সোমবার। মঙ্গলবাবও হতে পারে।'

'তাড়াতাড়ি বাত সেরে যাবে দেখছি তাহলে।'

'স্টিমার স্টেশন ত আমি রিকশ চড়ে যাব, ঐ ত মিশনের পাশ দিয়ে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে। জিরানডাঙার দিকে কোনো রাস্তা নেই, পথই নেই, কেবল বড়-বড় গাছের শেকড়, জঙ্গল, গর্ত, ওদিক দিয়ে সাইকেল রিকশ যেতে পারবে না, হেঁটে যাওয়াও কঠিন, আমি এই পা নিয়ে কী করেই বা যাই?'

প্রভাসবাবুর কথার দিকে অতটা নজর ছিল না রমার—অন্য কথা ভাবছিল। আস্তে-আস্তে নিজের স্থিরতায় ফিরে এল তার মনটা, স্থির, শীতল হল।

'দিনের আলো থাকতে থাকতে আমি নিজে, গিযে একবাব দেখে আসতে পারতাম—' রমা বললে, 'ওখানে আমাদের কলেজের দু'জন প্রফেসর রয়েছেন ত, পাড়াটাও বিপন্ন এখন, কিন্তু এখনই একা-একা আমার যাওয়ার কোনো দরকার নেই। পরে যেতে হতে পারে। সময় আছে। আমার সময় আসবে, ঠিক সময়ে।'

'বার্থেলো থাকলে তাকে সঙ্গে নিযে যেতে পারতে হযত।'

'আমি যেতাম না—তবে তাকে বললে একবার খোঁজ নিয়ে আসতে পারত।'

'ভালেরি ত যাবে না?'

'আমার মনে হয় ওরা জিরানডাঙার নেই এখন।' প্রভাসবাবু বললেন।

'বলা যায না কিছু, কিন্তু খুব বেশি জড়িয়ে গেছে যেখানেই থাক-না কেন,' রমা বললে।

'কযেকবার তা চা করলে. তুমি নিজে খেযেছ রমা?'

'তুমি আর-এক কাপ চা খাবে নাকি?'

'দিতে পাবো।'

'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে আমিও খেযে নেব', বমা বললে, 'তবে এটা সেটা নানারকমও হতে পাবে, জিবানডাঙায় রজনীবাবু নাও থাকতে পারেন, সেন গিযে অসুস্থ হযে পড়তে পারে—ব্লাডপ্রেসাব ছিল ত। সেই জন্যেই একবার খোঁজ নেযা দরকার ভাবছিলাম।'

'ভালেরি ছাড়া আর কেউ ত নেই এদিকে।' প্রভাসবাবু বললে, 'কাকে বলি? কে যায?

'ভালেরি যাবে না—'

'মিশনে দু-চাবজন মাদ্রাজী বযেছে।'

'ওবাও যাবে না—' বমা আঙুল মটকে দ্বিতীয আঙুলটা মটকাল না দেখে একটু অপ্রস্তত হযে বললে; 'ওবা বুঝবেই না কিছু। নিতান্তই যদি বুঝিযে দেয যায, পাঠানো সম্ভব হবে না, তাহলেও হবে না কিছু, পাববে না। বার্থেলো পারত।'

আলোটা জ্বালা হয নি।

রমা চা কবে আনল।

'অন্ধকাব হযে গেছে,' সে বললে, 'আমার আগে খেযাল ছিল না, আলোটা জ্বালা হযনি।'

'জ্বালাবে?

'হ্যাঁ, জ্বালি; কেন অন্ধকাবে বসে থাকবে?'

'এই বেশ লাগছিল,' চাযেব পেযালা তুলে নিযে প্রভাসবাবু বললেন, 'একটু শীত পড়েছে। আকাশে এত তাবা উঠে গেল। ঐ কে আসছে না?'

'কোথায?' আলো জ্বেলে এনে টেবিলের ওপব রেখে বমা বললে।

'রমা আছো বাড়িতে?' বলতে-বলতে রাজীববাবু ঢুকে পড়লেন।

'ও, আপনি? বসুন, রমা বললে, 'সীমা এসেছে?'

'না, আমি একাই।' রাজীববাবু বললেন, 'কেমন আছেন প্রভাসবাবু?'

'ভালই। সব ভাল ত? বসুন। রাত করে এলেন, আবার ত যেতে হবে সেই দানাপুবের দিকে, এখান থেকে তিন মাইল ত হবে।'

''বসতে না বসতেই যাবার কথা! চা দিই আপনাকে বাজীবকাকা?'

'না, আমি সেই সকালে একবার চা খাই, খুব পাতলা করে; পেটের ভেতর কেমন একটা ব্যথা ওঠে, চা আমার সহ্য হয় না। বিকেলে খেযে এসেছি, কিছু খাবার দরকার নেই। তুমি বোসো। একটু কাজে এসেছি তোমার কাছে।'

'আমার কাছে?' রমা একটা চেয়ার টেনে বসে বললে, 'এই কেম্বিসের ডেকচেয়ারটায় আপনি বসুন বাজীবকাকা।'

হেলান চেয়ারটায় বসে রাজীববাবু বললেন, 'কয়েকদিন কলেজ ছুটি আছে, সকালবেলার দিকে বা দুপুরে তোমাদের এখানে এলে ঠিক হত; বাড়িতে নানারকম ঝক্কিঝামেলা—আমি সকালে দুপুরে না থাকলে চলে না। কাজটাজ সেরে, একটু রোদ পড়তেই রওনা দিয়েছি এখানে আসব করে, তিন চার মাইলেব পাল্লা, দেরি হয়ে গেল আসতে—'

'হেঁটে এলেন বুঝি?' প্রভাসবাবু বললেন।

'প্রিন্সিপালের ঘরে সেই যে সেদিন তুমি গিয়েছিলে, মনে আছে? শুক্রবার ওর ঘরে অনার্স ক্লাশ হবার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ছিলেন ত সেদিন,' রমা বললে।

'তোমার পিটিশন নিয়ে নানরকম কথাবার্তা হয়েছিল সেদিন।'

'কীসের পিটিশন?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আছে একটা।'

'সেই পিটিশনের ব্যাপাব নিয়ে বড্ড গোলমাল চলছে।'

'কাদের ভেতর?'

'প্রিন্সিপাল আর দু-চাবজন বড় কর্তাদের।'

'পিটিশনটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন আপনি।'

'না। ফাইলে রেখে দিয়েছিলাম। তুমি সেদিন চলে যাবার পব উনি চেয়ে নিয়েছেন।'

'ও।'

'সেই ব্যাপাবটাব ত মিটমাট তখুনি হয়ে গিয়েছিল,' রমা বললে,'আবার উনি ওঠালেন কেন?'

'সে আমি কী করে বলব! আমিও ত ভেবেছিলাম মিটে গেছে। তুমি নিজে প্রিন্সিপালকে বললে যে তুমি পিটিশনটা তাব কাছে পেশ করতে নিষেধ করেছ আমাকে। এর পব ত আব কোনো কথা থাকতে পাবে না।'

হাতে ধরে বসেছিল চাযেব পেয়ালাটা, চুমুক দেয়া হয়নি এখন পর্যন্ত, পেয়ালাটা নামিযে বেখে বমা বললে, 'বিষযটা একেবাবেই চুকে গেছে—এই ত ভেবেছিলাম আমি।'

'তুমি চা খেলে না ত।'

'মেঝেব ওপব চাযেব পেয়ালাব দিকে একবার তাকিয়ে রমা বললে, 'কী হিসেবে পিটিশনটা চেয়ে নিলেন উনি আপনাব কাছ থেকে?'

'প্রথম যখন চেয়ে নিলেন,' রাজীববাবু বললেন, 'তখন আমি মনে করেছিলাম ওটা একবাব পড়ে দেখবেন, তাবপরে, কিছু কববাব নেই. ত পিটিশনেব, ছিঁড়ে ফেলে দেবেন ভেবেছিলাম।'

'কমিটিতে পেশ করেছেন কি তিনি আমাব দবখাস্তটা?'

'না, এখনো করেন নি।'

'পরে করবেন শুনেছেন?'

'কথা উঠেছে আমি নাকি ওটা ঠিক সময়ে মজুমদার সাহেবেব কাছে পেশ না করে চাপা দিয়ে বেখেছি।'

বমা মেঝেব ওপব থেকে চাযেব পেয়ালাটা তুলে নেবে ভাবছিল, কিন্তু ঘাড় নুইয়ে সেটা ধবতে গিয়ে ছুঁয়ে ছেড়ে দিল তবুও, মাথা তুলে বাজীববাবুব দিকে তাকিয়ে বললে,'প্রিন্সিপাল তাহলে বিশ্বাস করলেন না আমাকে।'

'নাও, চা-টা খেয়ে নাও।' রাজীববাবু বললেন।

'প্রিন্সিপালকে আপনাব সামনেই ত আমি বললাম যে আমিই ও-দবখাস্তটা আপনাকে প্রিন্সিপালেব কাছে পাঠাতে নিষেধ করেছি,' রমা একবার প্রভাসবাবুব দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে,'তিনি তক্ষুণি মেনে নিলেন সেটা. একটুও ইতস্তত করলেন না ত, কথাটা শেষ হল ত সেখানে।'

রমা রাজীব বাবুব গোছা-গোছা এলোমেলো চুলের মাথা ঘাড়েব দিকে চেয়ে থেকে বললে,'এখন আবাব কী হল?'

'আপনি চুরুট খান বাজীব বাবু?'

'সিগারেট পেলে খেতাম একটা।

'চুরুট সিগাবেটেব চেয়ে ওৎরাবে ভাল, আস্তে-আস্তে টানবেন, খেয়ে সুখ হবে।'

'দিন।'

প্রভাসবাবুব হাতের থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে রমাব দিকে ফিবে বাজীব বাবু বললেন, 'প্রিন্সিপাল

সূচীপত্রে যান

কী করবেন না করবেন প্রথম থেকেই ঠিক করে ফেলেন। তুমি হয়ত মনে করেছিলে তোমাকে বিশ্বাস করেছেন, পিটিশনের ব্যাপারটা চুকে গেল। কিন্তু দেখেছ?'

চুরুটটার দিকে তাকিয়ে সেটাকে ঘুবিয়ে-ফিরিয়ে আবার সেদিকে তাকিয়ে রাজীববাবু বললেন, 'জিনিসটা তুমি আমি আর প্রিন্সিপাল জানতেন, অন্য কারুব কানেই যাযনি। প্রিন্সিপাল ইচ্ছে কবলে ব্যাপাবটা সেদিনই ত চুকিয়ে দিতে পারতেন, তুমি নিজেই ত যা বলবার বললে, আমি বললাম, কিন্তু কিছুই হল না আমাদের কাউকেই একবারও বললেন না যে দবখাস্তেব ব্যাপাব নিয়ে তার আরো ঢের কথা আছে। বুঝি নি ত আমরা। প্রিন্সিপাল মানুষটাকে বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের কাউকেই কবেননি। তোমাকে পর্যন্ত করলেন না।'

'চুরুটটা জ্বালিয়ে নিন রাজীব বাবু।' জিরানডাঙার থমথেমে শূন্যতাব দিকে তাকিয়ে প্রভাসবাবু বললেন। শূন্যের ওপরে আকাশে অনেকগুলো তাবা জ্বলে উঠেছে। প্রভাসবাবুব চুরুটেব ধোঁযা এঁকেবেঁকে সেই সব নীচের ও ওপবেব কী যেন কী বকম কৃতকর্মে নিঃশব্দে বিবাট অন্ধকারও আবছা পরিষদেব ভেতর চুপেচুপে মিলিয়ে যেতে লাগল। বাজীব বাবু ও রমার কথা শুনছিলেন সবই তিনি, কিন্তু নিজে কোনো কথা বলা দবকাব মনে করছিলেন না। হয়ত, পরে কিছু বলতে পারেন।

বমা চাযের পেয়ালাটা তুলে নিল। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এবাবকাব চা-টা পাতলা হয়েছিল; এতক্ষণে খানিকটা ফিকে সবেব মত ভেসে উঠেছে। চুমুক এক-আধটা দেবে বলে পেয়ালাটা তুলে ধবেছে, কিন্তু জানালার ভেতব দিযে বাইরেব দিকে তাকিয়ে বইল, জিবানডাঙা বা ক্যাথলিক মিশন কোনোদিকেই নয যেন, এমনি একটা অব্যবহিত শূন্যেব দিকে।

বাজীববাবুকে দেশলাই দিয়েছেন প্রভাসবাবু। চুরুটটা জ্বালানো হযনি। চুরুটেব মত দেশলাইটাও নড়াচাড়া কবতে-করতে রাজীববাবু বললেন, 'প্রিন্সিপাল কলেজ সম্পর্কে সব ব্যাপাবেই খুব কড়াকড়ি নিযমেব ভক্ত, খুব সম্ভব একটা চাল বাজায বাখতে চান। সেটা জানে ত সকলে।' নিযম, মানে প্রাযই ওব ভাবনায যেটা নিযম বলে মনে হয তাই। অনেক সময দেখেছি সেটা অন্য সকলেব দিক দিয়ে মোটেই সঙ্গত বলে বোধ হয না, কিন্তু উনি নিজে যেটা ঠিক মনে কবেন সেটাই সব সমযেই সকলের জন্যে ঠিক, এ-বকম একটা নিবেট ধাবণা রযেছে ওর; কাজেই অনেক দুঃখ কষ্ট হয আমাদেব। আমাদেব কাউকেই বিশ্বাস করেন না।'

'কমিটিব মেম্বাবদেব বিশ্বাস কবেন?'

'বাধ্য হযে কবতে হয প্রেসিডেন্টকে, ওপবেব দিকেব আবো দু-চাব জনকে। কিন্তু মনে-মনে ওদেব কাউকেই যে বড় একটা শ্রদ্ধা বিশ্বাস কবেন না সেটা ওব কথাবার্তায হাবভাবে অনেক সমযই টেব পেয়েছি আমবা।'

'প্রফেসবদের বিশ্বাস করেন?'

'তা কয়েকজনকে কবেন বলে মনে হয। বমা—' বাজীব বাবু বললেন, 'এসব ব্যাপাবে আমি কিছু বলতে পাবি না। মানুষেব মনেব কোথায যে কিছু আছে তবে প্রিন্সিপাল খুব কঠিন লোক; মানুষের ওপব ওব কোনো শ্রদ্ধা নেই। উনি নিজে ভেতবে-ভেতবে কী মনে কবেন জানি না, বাইবেব আচাবে আচবণে দেখেছি কোনো-কোনো সিনিযর প্রফেসবকে নিয়ে গোপনে-গোপনে দবজায খিল এঁটে পবামর্শ কবেন। তাদেব কি বিশ্বাস করেন?' বাজীববাবু চুরুট জ্বালিয়ে বললেন, 'বলতে পাবি না। কবেন হযত। হয়ত করেন না।' চুরুটটা মুখেব থেকে নামিয়ে সেটাব আগুনেব দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন।

ঠিকা ঝি মানকুমারেব মা উঁকি দিতেই বমা বললে,'এই চা টা একটু গবম কবে আনবে মানুব মা?' চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঝি চলে গেলে বমা বললে, 'আমাব মনে হচ্ছে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামান না আমাদেব কলেজের প্রিন্সিপাল। উনি নিজেব পদে টিকে থাকতে চান। নানাবকম মানুষ ওব সম্বন্ধে নানা কথা ভাবলেও একটা পোশাকি সুনাম আজ পর্যন্ত বযেছে যে-পদের বসে আছেন সেটাব, সেটা যাতে কোনোবকমে না টেঁসে যায়!'

মানকুমারেব মা চা গবম কবে দিয়ে গেল; পেযালাটা হাতে তুলে নিয়ে বমা বললে,'তা যাবে না। সুনামেব বান না-ডাকিয়ে ছাড়বেন না। আমি জানি।'

'ও।' প্রভাসবাবু বাতে ঝিমঝিম পাটাকে আস্তে-আস্তে সামনে একটা কাটেব চেযারে ওপব তুলে দিয়ে বললেন। 'তোমাব পিটিশনটা, ছিঁড়ে ফেললেই পাবতেন তিনি', বাজীব বাবু এক-আধটা টান দিয়ে চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে হাতে ধবে বেখে বললেন,'তুমি আমি আব তিনিই ত জানতেন-অন্য কেউই ত

সূচীপত্রে যান

জানত না কিছু, না ছিঁড়ে জিনিসটা দশ কানে তুলে কী সতর্কতা হচ্ছে?'

'ওঁর দিক দিয়ে ঠিক কাজই করেছেন উনি।'

কেন?'

'প্রিন্সিপাল মনে করেন দরখাস্তটা ওঁর হাতে দেবার আগে অন্য অনেককে দেখিয়েছেন আপনি—'

'কাউকেই দেখাইনি আমি। এ সম্বন্ধে কারুর সঙ্গেই কোনো কথা হয়নি আমার।'

'সেটা সত্য। কিন্তু উনি প্রিন্সিপালের কাজ করেছেন, অনেক কিছু ভেবে দেখতে হয় ওঁকে।'

'তা হবে', রাজীব বাবু বললেন,'কিন্তু এর আগের প্রিন্সিপাল এ-রকম ছিলেন না, তার আগে মল্লিক মশাই ছিলেন। তিনিও এরকম ছিলেন না। এরা অফিসের সব ব্যাপারে পুরোপুরি আমাদের বিশ্বাস করতেন, কোনোদিন ত কোনো গোলামাল হয়নি, মল্লিকের আগে শ্রীধর চাটুয্যে প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি নির্বিচারে আমাদের বিশ্বাস করেছেন, আমরা শৃঙ্খলা রেখেছি, কলেজের সুনাম আরো বেশি ছিল তখন—দেবতার মত মানুষ তিনি—'

চায়ে চুমুক দিয়ে রমা বললে,'সে সব দেবতার দিন নেই এখন আর। কলেজের ছেলেমেয়েরা সব খুদে শয়তান, বাইরের বড় বসমতীটায় নানরকম ঘোড়েল লোক থাকে, প্রিন্সিপাল সতর্ক না হয়ে করবেন কী?'

প্রভাসবাবু বাতে টনটনে পা-টা একটু নেড়েচেড়ে বললেন, 'কী, হল কী তোমাদের, ব্যাপার ভাঙছ না রমা?'

'কিছু না, একটু বাতচিত হচ্ছে,' বমা বললে। টের পেল পাতলা চা-টা গবম করে নিয়ে আরো খারাপ হয়েছে।

'তবে হতে থাকুক বাতচিত। মানকুমার ছোকরা এসেছে?'

'হ্যাঁ, পেয়ারা গাছে চড়েছে।'

'ওকে ডাক দাও ত। আচ্ছা ওরা কি ক্রিশ্চান?'

'মানকুমার বলে কিন্তু মানোয়েল নাম, ক্রিশ্চানই ত,' রমা বললে,'খুব সম্ভব নামটা ইম্যানুয়েল।'

'ক্যাথলিক?'

'জিজ্ঞেস করিনি। মানোয়েলকে দিয়ে কী দরকার তোমার?'

'আজ বোধহয় একাদশী,পা-টা টাটাচ্ছে, বারান্দায় তারপিন তেলের বোতলটা আছে, আনতে বলো, মালিশ কবে দেবে।'

'মানোয়েলকে ডেকে রমা বললে,'দেরাজে উইণ্টোজেনো আছে তোমাব; তার্বপিন কেন, সেইটেই দিক।'

'দিক।এস ত মানোয়েল, তোমাকে আনা চারেকেব পয়সা দিচ্ছি বাবা,এই মলমটা আমাব বাতের জায়গাটায় সেঁটে মালিশ করে দাও ত,' পা বাড়িয়ে দিলেন প্রভাস বাবু।

'ফ্লানেলেব সেঁক দেবে?' বমা বললেন।

'না, অতটা না।'

'আচ্ছা ব্যথা না-কমলে বাতে আমি মালিশ কবে দেব। হ্যাবিকেনেব ওপর মার সেই পুবনো দু'টো ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট গবম করে নিয়ে পর-পর সেঁক দিয়ে দেব।'

'এখুনি কমে যাবে' প্রভাস বাবু চুরুটটা মুখেব দিকে তুলে নিতে-নিতে বললেন,'তোমাব মার ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট হ্যারিকেনে কালি কবে দবকার নেই। বেশ টিপছে মানোয়েল।'

বমা রাজীববাবুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে,'প্রিন্সিপালকে ধরে নিতে হয়েছে যে আমাব পিটিশনটার কথা আমিও দশজনের কাছে বলে বেড়িয়েছি।'

মজুমদার প্রিন্সিপালের আমলে কলেজ দরখাস্ত-টরখাস্ত চাপা দেয়—আবো কত কী করে—এই সব বদনাম আমি রটিযেও বেড়াতে পারি আন্দাজ কবে তিনি নিজেব কর্তব্য ঠিক করে গিয়েছেন।'

রাজীববাবু চুরুট নামিয়ে রেখে বললেন,'কিন্তু তোমার সম্বন্ধে এ-বকম সব কথা—এতটা দূর—ভাবতে পারলেন, তিনি?'

'আপনার সম্বন্ধেও ভাবলেন, কলেজের পুরনো বিশ্বাসী মানুষ আপনি।' রমা পাতলা মিযনো চাযে কোনোরকমে আর-একবার চুমুক দিযে বললে,'আমাকে আব ক'দিন চেনেন উনি।'

'কিন্তু খুব ত বিশ্বাস করেছেন এর-আগে তোমাকে।'

'আমাকে?'

'কলেজের সব ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশি। দেখছি তা। তুমিও টের পেয়েছ যে প্রিন্সিপাল নিজেকেই সবচেয়ে ভালবাসেন বলে তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন সেটা এত খারাপ হল।'

চায়ের কাপের আধাআধি অবদি শুষে ফেলেছে আস্তে-আস্তে রাজীববাবুর সঙ্গে বলতে-বলতে রমা। চায়ের কাপের দিকেই তাকাল আবার সে, আরো খাবে। রাজীব বাবু সেদিন যখন প্রিন্সিপালের কামরা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে নীচে ভবেনবাবুর ঘরে চলে গিয়েছিলেন তখন রমাকে একা পেয়ে প্রিন্সিপাল যে-কথাগুলো বলেছিলেন, পোশাকি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিনিময়ের চেয়ে যা ঢের বেশি প্রাণঘন, সেইসব মনে পড়ল রমার। সে সব ত সেই সব।

কিন্তু রমার পিটিশনটা নিয়ে দু-চারজন প্রফেসর ও মেম্বারের সঙ্গে ব্যাপারটা পাকিয়ে তোলবার আগে রমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে পারতেন তিনি। অন্তত কী তার সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য একটা বিবৃতির মত রমাকে সেটা জানালে প্রিন্সিপালের সম্বন্ধে মন এ-রকম বিরস হয়ে উঠত না। প্রিন্সিপালের ওটাও বাইরের ঠাট হত বটে, কিন্তু ঠাটেরও অন্তরঙ্গতার একটা মূল্য আছে। ভানের ভেতর থেকেও আন্তরিক মানুষের ক্রমে ক্রমে প্রাণ ফুটে ওঠে কিন্তু বাসমতী কলেজের প্রিন্সিপাল মাড়িয়ে যেতেই ভালবাসেন যেন, কলেজের কেরানী মাস্টার ছেলেমেয়েদের প্রাণের ওপর দিয়ে, নিজের সুবিধার জন্যে।

অথচ রমাকে ঘরে একা পেয়ে স্মেলিং সল্টের শিশিটা ঘনিয়ে দিয়ে দেয়া, কথায়-কথায় ছোট ছোট ছেঁড়া-ছেঁড়া কথায় প্রাণের পরিচয় দেবার অদ্ভুত পটুতা, যেন প্রাণ নেই লোকটার, বদলে প্রাণের কলকাটিটাতে আশ্চর্য প্রাণশক্তি রয়েছে।

'তোমার সঙ্গে তারপরে আর দেখা হয়েছিল প্রিন্সিপালের?' রাজীব বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'কেন? অনার্স ক্লাশ আর হয়নি?'

'একটা ক্লাশ হতে পারত। কিন্তু সেদিনও তিনি ক্লাশ নেন নি, অন্য সব জরুরী কাজ ছিল।'

'তারপর আর হল না?'

তারপর শুক্কুরবারগুলো কেবলি ত কলেজ ছুটি হয়ে যাচ্ছে—ওঁর অনার্স ক্লাশ আর হয়নি। ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।'

'প্রিন্সিপাল কি এর মধ্যে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কোনোদিন?'

'না।'

'তোমার ঐ পিটিশনটা নিয়ে যে এত ব্যাপার হচ্ছে, তোমার কানে যায়নি কিছু?'

রমা পেয়ালার ভেতরে, চায়ের পরিমাণের দিকে চোখ তুলে চামচ দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে বললে,'না, কিছু না। এই ত আপনার কাছে শুনছি আমি। আমার দরখাস্তটা প্রফেসরদের দেখিয়েছেন বুঝি? এ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে? কমিটিতেও তুলবেন ঠিক করেছেন?'

'ও—' রাজীববাবু চুরুটটা মুখের থেকে নামিয়ে ডান হাতের থেকে বাঁ হাতে রেখে দিয়ে বললেন, 'তুমি তাহলে এর মানে কিছুই জানতে পারনি? বলেনি কেউ তোমাকে?'

'না।'

'তোমাকে জানানো উচিত ছিল এসব।'

'আমি ত ওঁর কাছে দোষী হয়ে আছি, কেন জানাবেন?' রমা চায়ে আরো এক চুমুক দিয়ে বললে। যে-দেশে চায়ের নামও কেউ কোনোদিন শোনেনি, সে-দেশের স্টেশনে ট্রেন থেমেছে যেন, রমাকে এই পেয়ালার চা-টা কেউ অনেক কষ্টে কী করে কোথেকে যেন জোগাড় করে দিয়ে গেছে, এই স্টেশনে চা বলতে এইটুকুই যেন ছিল, এই রকম ভেবে নিলে এই চা-ও ভাল লাগে। 'আমি যে বলেছিলাম পিটিশন করে পরদিনই রাজীববাবুকেই সেটা প্রিন্সিপালের কছে পেশ করতে বারণ করেছি, আমার সে মিথ্যা উনি ধরে ফেলেছেন।'

'সঙ্গে আমার ডবল মিথ্যাটাও ধরেছেন। আমি ত সেদিন কোনো প্রতিবাদ করিনি তোমার সৎ মিথ্যা কথাটার।

রমা হেসে বললে,'মিথ্যা কথার সৎ অসৎ আছে?'

'নিশ্চয়ই, তুমি যা-বলেছিলে তা মিথ্যাও না সত্যও না, একটা সৎ জিনিস। একটা চশমখোর ঘোড়েল লোকের হাত থেকে তুমি ত আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলে।'

'চশমখোর কি উনি?'

'ও রকম চশমখোর আমাদের কলেজের কর্তৃপক্ষের ভেতরেও এক অমিয় সেনশর্মা আর অরুণ সেনশর্মা

সূচীপত্রে যান

ছাড়া আর–কাউকে দেখিনি কোনোদিন। আমি ত চল্লিশ বছর ধরে এই কলেজের নাড়ীনক্ষত্র দেখছি।'

আরো চার পাঁচ চুমুক আন্তাজ চা আছে পেয়ালাটার ভেতর। খুব বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মিষ্টিও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

রমা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'কিন্তু তবুও এই রকম সব ত হল রাজীব কাকা, প্রিন্সিপালেব কাছে মিথ্যা কথা বলেও পিটিশনের ভূত ত তাড়ানো গেল না।'

'মিথ্যা কথা বলেছিলে প্রিন্সিপালের কাছে?' প্রভাসবাবু মানোযেলকে বাঁ পা–টা মালিশ করতে বললেন,'সিদ্ধার্থ যে–রকম ভালোরিকে বলতে চেয়েছিল জিরানডাঙার লোকগুলো ক্যাথলিক? সৎ উদ্দেশ্য ছিল সিদ্ধার্থের, কিন্তু তুমি ত তাকে চেপে ধরেছিলে।'

'সিদ্ধার্থদা মিথ্যা কথা বলেন নি শেষ পর্যন্ত, কোনো কারণও ঘটেনি বলবার। দরকার হলে বলত কি না জানি না। কিন্তু আমি ত বলেছিলাম। কিন্তু হল না ত কিছু—কোনো উপকার হযত হল না আপনার,' রাজীব বাবুর চোখ,চুল জামা, বোতামের দিকে তাকিযে বমা বললে,

'পিটিশনাটা নিয়ে এ–রকম ছেঁড়াকাটা হচ্ছে যখন, তখন এর পরিণাম—'। রমা বললে— 'বাজীব কাকা।'

রাজীব বাবু কথা বলতে–বলতে, কথা ভাবতে–ভাবতে একটা নিঃশব্দ অন্ধাকারের খোড়ল ফাটলের ভেতব ঝিমিযে পড়েছিলেন। রমাব কথা শুনে সাড়া দেবার জন্যে নড়েচড়ে উঠলেন।

'আমার দরখাস্তটা আপনি চেপে গেলেন কেন?'

'কেন?'

'আমি দেখলাম দরখাস্তটা তুমি ঝোঁকেব মাথায লিখেছ।'

'ও দরখাস্তের কোনো মূল্যই দিইনি আমি।'

'কী মনে করে? মাসে পঞ্চাশ টাকা করে বৃত্তি তোমাকে কলেজ দিচ্ছে, তুমি ফার্স্ট হযেছ বলে। তোমাব কোনো বিশেষ নৈতিক অধঃপতন না ঘটলে সে বৃত্তি রদ কবে দেবার তা কোনো কথাই ওঠে না। তোমাব ও–দরখাস্ত প্রিন্সিপালই ছিঁড়ে ফেলে দিত, না–হলে গভর্নিং বড়ি হেসে উড়িযে দিত।'

'এ–বকম একটা দরখাস্ত করেছিলে নাকি রমা?' প্রভাসবাবু বললেন। অনেকক্ষণ চুরুট খাননি, পুরনো আধ–খাওয়াটা জানালা দিযে ছুঁড়ে ফেলে একটা নতুন চুরুট বেব কবে নিলেন কার্ডবোর্ডেব বাক্স থেকে। কই আমাকে তুমি বলোনি ত।'

'আমি বুঝতে পাবলাম—' রাজীব বাবু চুরুট টেনে নিযে বললেন,'তোমাব ও–দবখাস্ত ওপরওযালাদের টিপ্পনী–ছ্যাবলামি হবে। বড় প্রফেসবরা, কমিটির মেম্বাবদেরও অনেকে, কলেজেব মেযেদেব নিযে এমনিই ত কত কেচ্ছা করে, মাঝে–মাঝে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয। তোমাব দবখাস্তটা নিয়ে অনেক রগড় চিপটেন চলত!,

উপলক্ষ্য ছাড়িযে তারপর পাত্রীর ওপর গিযে সেটা উপচে পড়ত?'

'এখানে পাত্রের চেয়ে পাত্রীকে নিয়ে বসালো গল্প জমে বেশি, সেটা চার বছব এই কলেজে পড়ে কিছু–কিছু বুঝেছ হযত;'বাজীববাবু বললেন,'এই সব ভেবেই দবখাস্তটা চেপে গেলাম আমি।'

খুব তাড়াহুড়ো ছিল না,' চুরুটটা নিভে যাচ্ছে প্রায, নিভুক ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে আলগোছে সেটাকে ঠেকিযে রেখে রাজীব বাবু বললেন, 'বমাকে সব বুঝিযে বলব ভাবছিলাম, কিন্তু তার আগেই প্রিন্সিপাল জেনে ফেললেন।'

'কী করে জানলেন তিনি?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আমিই জানতে গিযেছিলাম তাঁর কাছে দবখাস্তটার কী হল।' বমা চাযে চুমুক দিয়ে বললে, 'ফলে কি যে সব সন্দেহ আর হিংসা জাগিযে দিলাম তাঁব মনে! এরকম কী করে হয আমি বুঝতে পারি না।'

বাইরে রাত্রি বাড়ছে, অন্ধকার জমে উঠছে বেশ। বমার কথাটাকে ঘবের ভেতরেব দু'জন বযস্ক পুরুষ নিজেদের বিচারবুদ্ধির আলোয সমাধান কবতে চাইছিলেন, কিন্তু ঠিক করতে পারছিলেন না কিছু। পৃথিবী আর আগের মত নেই—দ্রুত পটভূমি বদলে যাচ্ছে বাড়ি, ব্যাঙ্ক, শেয়ার মার্কেট, সাপ– খোপ কুমির বাঘেব জঙ্গল, কলেজ, সবই মুক্তোর মতন টলমল করছে যেন, একই সুতোর ভেতব,—একটা অব্যর্থ মুক্তের মালার।

'সীমার কথা লিখেছিলে তুমি তোমার দরখাস্তে,' রাজীব বাবু বললেন, 'তা নিযেও পাঁচালি জমেছে খানিকটা ওদের মধ্যেও।'

সূচীপত্রে যান

'কী লিখেছিলে সীমার কথা?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'লিখেছিলাম ঐ পঞ্চাশ টাকার বৃত্তিটা। দিযে আমার আর কোনো দরকাব নেই, সীমা সেকেণ্ড হযেছে, কাজেই সীমাকে—'

'মেয়েদের মধ্যে সেকেণ্ড !' রাজীব বাবু বললেন।

'কিন্তু তখন তোমার দরখাস্তটা রাজীববাবুকে বাইরে ডেকে তাব কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে চলে এলেই ত ভাল করতে তুমি,' প্রভাসবাবু বললেন।

'তা কী করে বলা যায়?' রাজীববাবু ছোট্ট কাগজেব মোড়ক খুলে এক টিপ নস্যি নিযে বললেন,'তাহলে ত চাকরি যেত আমার।'

'কোনো নৈতিক অপরাধ হত না? শুধু চাকবি যেত?'

'দুইই হত। নৈতিক অপরাধে যেত।' নস্যির ঝাঁঝে হাঁচি দিলেন রাজীব বাবু, একটা মযলা রুমাল বেব কবে ভাল কবে নাক ঝেড়ে রগড়ে লাল কবে ফেললেন নাকটা।

প্রভাসবাবু চুরুট জ্বালিযে বিরস মুখে বললেন,'এসব কলেজে চাকবি টিকিযে বাখাই প্রধান কথা— যাবা না-খেতে পেযে মবছে সেই সব বাঙালিরা যারা বেশি মাইনে পাচ্ছে কলেজেব সে সব ওপবওযালাদের নীতি ঠিক থাকলেই আপনারা হেসে ধুম্বল দিতে তাদের কাছা ধরে স্বর্গে চলে যেতে পারবেন।' বাজীববাবুর দিকে ফিবে প্রভাস বাবু বললেন 'তবে এখনো পথ আছে আপনাব।'

'কীসের কথা বলছেন?

'সেই কানুব কথা বলছি, তিনি ছাড়া আব গতি নেই দেখছি কোথাও বাসমতীতে,' প্রভাসবাবু বললেন, 'প্রিন্সিপাল আপনার চাকরি নিযে টানাটানি কবতে চাইলে আপনি বলবেন যে দরখাস্ত পাবাব পবদিনই আমি রমার হাতে দরখাস্তটা আপনাব কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—'

'তাবপর?'

'তারপর বমা বুঝবে।'

'বমা চুপ কবে বইল। প্রভাসবাবু মানোযেলকে ডান পাযেব আবো খানিকটা মালিশ লাগিযে আর পাঁচ-সাত মিনিট টিপলেই হযে যাবে বললেন। বাজীব বাবু নেভানো চুরুটটা জ্বালাবেন কিনা ভাবছিলেন, দানাপুরে ফিরতে- ফিবতে বেশি রাত হযে যাবে, এদিককার পথঘাট যে-বকম, মাইল খানেকের ভেতবেও কোনো লোকজন পাওযা যাবে না। অতবাতে চাবদিকে ঝোপ-জঙ্গল ঘাঁটি উঁচু-উঁচু গাছেব মত উপবন, জ্যোৎস্না বাতে বেশ দেখায। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষেব বেশি অন্ধকাব রাত আজকাল, চুরুটের আলো জ্বালিযে পাড়ি দিতে হবে, এই চুরুটটার আধাআধি শেষ হযেছে, বাকি অর্ধেক থাক তাহলে পথেব সম্বল বইল, উঠবার সময ভাল করে জ্বালিযে বওনা দেবেন। চুরুটটা জ্বালাতে গেলেন না এখন আব।

'আমাকে চাকরিব থেকে সাসপেণ্ড কবেছে,' রাজীব বাবু বললেন।

'কে?'

'প্রিন্সিপাল। তিন মাসেব জন্যে দাঁত দিযে ঠোঁট কমড়ে তাকিযে বইল বমা। প্রভাসবাবু চোখ বুঁজে তলিযে দেখছিলেন।

'তিন মাস? তারপব?'

'তাবপব কী হবে এখুনি বলতে পারছি না। তবে মনে হয বরখাস্ত হবাব সম্ভাবনা। খুব খোশামুদি সুপারিশেব ব্যবস্থা করলে খুশি হযে কাজে রাখতেও পারেন' কিন্তু বাজীব বাবু কাতবে উঠে বললেন 'একেবাবে নিরেস হযে গেছি, আব-কোনো হযরানি কববার মতন অবস্থা নেই।'

'কেন সাসপেণ্ড করল আপনাকে? কার কী ছিল?'

'গ্রস নেগলিজেনসিব জন্যে, একটা জরুরী পিটিশন চেপে বেখেছি বলে, বমার পিটিশনটা।'

'প্রিন্সিপাল কি একাই সাসপেণ্ড করতে পাবেন?'

'হযত গভর্নিং বডিব প্রেসিডেণ্টকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছেন, নিজেব অধিকারেও পারেন হযত।'

'প্রেসিডেণ্ট কে?'

'বাসমতীর কালেকটর সাহেব।'

'ও,' প্রভাসবাবু বললেন,'সাসপেনশন কি চালু হয়েছে?'

'আজ ত পঁচিশে, ও-মাসেব পযলাব থেকে হবে।'

রাজীব বাবু বললেন, 'প্রিন্সিপাল একটা কড়ার দিয়েছেন এই যে বমা যদি প্রিন্সিপাল ও কয়েকজন

সূচীপত্রে যান

সিনেযর প্রফেসর শিগগিরই যে-একটা বৈঠব হবে, সেখানে গিয়ে মুখে বলে আসে যে দরখাস্তটা রাজীব বাবুকে দিয়ে পরদিনই তাকে বলে এসেছে যে সেটা উইথড্র করা হল, প্রিন্সিপালের কাছে পেশ করবার আর কোনো দরকার নেই—তাহলে আমাকে সাসপেণ্ড করবে না,তবে একটু ওয়ার্নিং দিয়ে কাজে বহাল করা হবে!'

'ওয়ার্নিং?'

'ওটা হয়ত অফিসি দপ্তর, বিশেষ কোনো মানে নেই ওর।' রাজীব বাবু বললেন।

'আপনাকে সাসপেণ্ড করেছে আমারই দোষে রাজীব কাকা,' রমা বললে, 'কী যে করা যায় বুঝে উঠতে পারছি না, কিন্তু প্রিন্সিপাল প্রফেসারদের কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না।'

শুনে কেমন থমকে গেলেন রাজীব বাবু, যেন নাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, আস্তে আস্তে নিজেকে গুছিয়ে নিতে খানিকটা সময় লাগবে তাঁর । তাবপর বললেন 'প্রিন্সিপাল আর তিনজন সিনিয়র প্রফেসব শুধু থাকবেন সেখানে যাবে রমা?'

'না।'

চুপচাপে কেটে গেল খানিকটা সময়।

রাজীব বাবু বললেন, 'প্রিন্সিপাল আবো বলেছেন যে তুমি যদি কথাটা কমিটিতে গিযে বলে আসতে চাও, তাহলে প্রিন্সিপাল নিজের গাড়িতে কবে খুব খুশি হযে তোমাকে কমিটি মিটিঙ নিযে যেতে বাজি আছেন। কলেজ কমিটিব মিটিঙ সামনেব শুক্কুরবাব হবে।'

'কলেজ কমিটি মানে, কলেজেব গভর্নিং বডিব কথা বলছেন? গভর্নিং বডির মিটিঙ?' প্রভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ।'

'আসছে শুক্কুরবার ত আটাশ তারিখ।'

'আটাশ তারিখেই মিটিঙ হবে।'

'কোথায়?'

'কলেজে হবার কথা ছিল, কিন্তু কালেকটব সাহেব সেদিনই টুব থেকে ফিবরেন বাসমতীতে, তিনি আর আসতে পারবেন না।, কাজেই তাঁব বাংলোয মিটিঙ হবে—'

'সকালবেলা?'

'না, সন্ধের পব। রমাকে শুধু দু-মিনিট বসে কথাটা বলে আসতে হবে মিটিঙে। তারপবে প্রিন্সিপালের নিজের গাড়িতে তক্ষুণি তোমাকে জিবানডাঙায এ বাড়িতে পাঠিযে দেবেন তিনি, প্রিন্সিপাল সে-সব ব্যবস্থা কবে রেখেছেন—

প্রভাস বাবু মানোয়েলকে বিদায দিযে দিযেছেন। পাযের ব্যথা কমে গেছে ঢের। বাইবে বাত্রি, তারা, আফ্রিকার বন যদি উপবন হযে যায, তেমনি সব উঁচু উঁচু গাছগাছালি, তবে ঝোপজঙ্গলের বিশৃঙ্খলাও রয়েছে মাঝে-মাঝে। ফুর ফুর কবে বাতাস আসছিল । শীত নেই, শীত পড়েনি এখনো দেশে, কিন্তু গরমও নেই, ভাল লাগছিল প্রভাসবাবুব।

'তুমি যাও গাড়িতে যাবে আসবে' দু-মিনিটের জন্যে হযে এসো,' প্রভাস বাবু বললেন রমাকে,'এখানে সত্য মিথ্যার কোনো কথা ওঠে না। কোনোবকম দোষক্রটি না কবে একজন মানুষ ধনেপ্রাণে শেষ হতে চলেছে, এব ভেতর তুমি নিজেও খানিকটা জড়িযে রযেছ। তোমার মুখের কথায রাজীব বাবুর উপকার হবে।' 'না,' রমা ঘরেব ভেতবেব আলো, ঢের মহওব পশ্চাতভূমির মত বাইরেব রাত্রির উঁচু উঁচু গাছ ও তারাগুলোর দিকে তাকিযে বললে 'আমার কিছু বলবার নেই।'

প্রভাস বাবু কোনো কথা বলতে গেলেন না আর। তাঁর যা বলা কওযার বলে শেষ কবেছেন তিনি সব। কোনো মানুষকে বেশি অনিচ্ছায কাজ কবাতে ইচ্ছুক নন। রমা কেন আপত্তি করছে বুঝতে পারলেন না। লাগল খুব প্রভাসবাবুর। ছ'মাস আগেও রমার এ-রকম ধরনের ব্যবহারে তিনি সহজে ছেড়ে দিচ্ছেন না মেয়েকে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে সব, দূরে সবে যাচ্ছে—খুবই তাড়াতাড়ি; একই সাগরের ভেতব সব দ্বৈপ অস্তিত্বের মত।—সাগরটা কোনো সেতুর মত নয়।

রাজীব বাবু মুষড়ে না পড়ে জোর করেই খানিকটা প্রাণসংগ্রহ করে বললেন, 'তুমি প্রিন্সিপালকে একটা দরখাস্ত লিখে দাও যে তোমার পিটিশনটা আমি চেপে রাখিনি, লিখে দাও যে তুমি অ্যাপ্লিকেশন করবাব পরদিনই আমার কাছে এসে বলেছিলে যে তোমার মত বদলেছে, ও-রকম দরখাস্তের কোনো অর্থটর্থ হয় না, ওটা প্রিন্সিপালের কাছে পাঠাবার কোনো দরকার বোধ করছ না তুমি, ওটাকে ছিঁড়ে ফেলা দেয়া হোক,'—রাজীব বাবু

সূচীপত্রে যান

ট্যাঁকের থেকে কাগজের মোড়কটা বের করে ছোট এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল বলছিলেন যে মিটিঙে রমার মুখের একটা কথাও হবে, একটা দলিল রাখতে চান ওঁরা। কী বল তুমি?'

'আমার যা-বলবার তা ত হয়েছে; বার বার জিজ্ঞেস করে ওলটানো যাচ্ছে না, আমারও খারাপ লাগছে, রমা বললে, 'আমি দরখাস্তও লিখতে পারব না।'

'এখানে বসে লিখে দাও, প্রভাস বাবু বললেন, রাত হয়ে যাচ্ছে রাজীব বাবুর।' রাজীব বাবুকে রমা বললে, 'প্রিন্সিপালকে সেদিনই আমি সব বলেছি, আপনিও ছিলেন সেখানে, কিন্তু বিশ্বাস করেননি তিনি। কিন্তু সেই একই কথা পাঁচজনের সামনে মিটিঙে বললে বিশ্বাস কববেন, অথবা লিখে সই করে দিলে দলিল হিসেবে সকলে মিলে বিশ্বাস করবেন, প্রিন্সিপালেব এ-রকম ধরনেব বিশ্বাসভাজন হয়ে কোনো দরকাব নেই আমার।'

'বমা'—

'আপনি নিজে খুব ধাক্কাটা খেলেন রাজীব কাকা,' রমা বললে,'কিন্তু অন্য কোনো রকমে এর বিধান হয় কি না সেটা চেষ্টা করে দেখতে হবে—'

'অন্য কোনো রকমে?' প্রভাস বাবু থমকে ঠাণ্ডা মেবে গিয়ে বললেন,'ওটা ত প্রায় পরলোকেব কথা হল।'

'প্রিন্সিপাল যা চাচ্ছেন সেটা পারা গেল না।' তেপযেব ওপব হ্যারিকেনের আলোটা একটু ডিম করে দিযে রমা বললে।

'আমি উঠি,' রাজীব বাবু ঘরের ফিকে আলোয দেযালের ওপর বাইরের বাবলা গাছের ছাযাটাকে আবছা হয়ে যেতে দেখে বললেন।

'অনেক রাত হয়ে গেল আপনার', প্রভাস বাবু বললেন।

'আমি যাব আপনাদের বাড়িতে দু-এক দিনের মধ্যে,' রমা বললে রাজীব-বাবুকে।

'আচ্ছা যেও।'

'দমে যাবেন না রাজীব কাকা, প্রিন্সিপাল কিছুতেই সাসপেণ্ড কবতে পারবেন না আপনাকে।'

'তিনি কবেছেন ত, নোটিশ দিয়েছেন।'

'ও নোটিশ পাল্টাতে হবে, আপনাকে কিছুতে ববখাস্ত করতে পাববেন না।' রাজীব বাবু ট্যাঁকের থেকে ঘড়ি বেব কবে একবার সমযটা দেখে নিয়ে বললেন, 'শ্রীধব চাটুজ্যে মশাযের সামনে সে-কথা বলতে পাবতে; কিন্তু দিনকাল বদলেছে, মানুষরাও অন্যবকম হয়েছে। এই কলেজে সবই কিছু ভাল দেখিনি এই চল্লিশ বছর ধবে চাকরি করে। কিন্তু সবই যে এত বেশি খাবাপ হয়ে যাবে সে কথা ভাবতে পাবিনি।'

'তুমি চেনো না—' রাজীব বাবু অনেক দিনেব বরফে মৃত একটা মাছেব মত একটু ফ্যাকাশে হাসির ওপর ভব দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু চেনো না বলি কী করে, খুব চিনেছ এখন। প্রিন্সিপালকে আমার চেয়ে কম চেনোনি তুমি। উনি আমাব একটা ব্যক্তিগত সর্বনাশ কবেছেন বলে মনটা আমার খুব তিতো হয়ে আছে, তাই বেশি কিছু বলব না আমি। কিন্তু আমাব নিজেব স্বার্থে তোমাকে যে কমিটিতে গিয়ে একটা কথা বলতে বলেছিলাম কিংবা দরখাস্ত লিখে সই কবে দিতে। তোমাকে সেদিন তিনি সত্যিই বিশ্বাস করলেন না, অথচ আজ আবার বিশ্বাসের একটা অদ্ভুত মাখামাখির পাতে নেমতন্ন কবছেন, ওসব লোকেব থেকে একটু আলগা থাকাই ভাল। তুমি যেও আমাদের বাড়িতে বমা, সীমা অনেকবার কবে বলে দিয়েছে।'

'বাইরে ত খুব অন্ধকার রাজীব কাকা।

'অন্ধকারে চলাই অভ্যাস আমাব।' চুরুটটা খুব ভাল কবে জ্বালিযে নিয়ে বাজীব বাবু বললেন।'

'হ্যাবিকেনটা ধবছি।'

'না, কিছু দরকার নেই। এই যে আমার টর্চ,' বলে দূবে অন্ধকাবেব ভেতর থেকে কযলামণ্ডেব মত জ্বলন্ত চুরুটটা উচিযে দেখালেন বমাকে। বমা হ্যাবিকেন নিয়ে গেল পেছনে-পেছনে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা অবদি, এবং আরো অনেকটা দূর।

'আমাকে ত অন্ধকারে রেখে গেলে,' প্রভাস বাবু বললেন,'কিন্তু নিজেও তুমি একা অন্ধকারের ভেতব দিয়ে চলে এলে দেখছি।'

'অন্ধকারে মুস্কিল হল তোমার? এই ত ভালয ভালয আমি চলে এসেছি। আমাদের এক বাণ্ডেল মোম

সূচীপত্রে যান

আছে।'

কিন্তু হ্যারিকেন্টা তুমি রাজীব বাবুকে গছাতে পারবে সেটা আমি ভাবতেই পারিনি।'

'কেন?'

'দরখাস্তে একটা সইই পর্যন্ত দিতে চাইলে না। ও হ্যাবিকেন ত তোমার মুখে ছুঁড়ে মারল ঠিক কাজ করতেন তিনি।'

'কিন্তু উনি খুব ভাল মানুষ।'

'প্রভাস বাবু চুরুটটা নামিয়ে রেখে বললে,'ওঁর সম্বন্ধে এখুনি ব্যবস্থা করতে হবে। তোমায় গভর্নমেণ্ট স্কালারশিপ ও কলেজ স্কলারশিপের টাকাগুলো, আমিও কিছু-কিছু দেব ওঁকে না জানিয়ে, কখনো যেন জানতে না পারেন সীমার সঙ্গে কড়ার করে মাসে-মাসে দিয়ে আসতে হবে সীমাব হাতে তোমাকে, যে-পর্যন্ত না কলেজেব ব্যাপারেব একটা কিছু বফা হয।'

'কিন্তু টাকা নেয়াতে পারব—সীমাকে কিংবা বাজীব বাবুকে দিয়ে?'

রমা অন্ধকারে মোমের বাণ্ডিল খুঁজতে-খুঁজতে বললে,'যদিও-বা সীমার বাবাকে টাকাটা বাঁকা পথ দিয়ে পাইযে দেযা যেতে পারে, কিন্তু সীমা খুব হুঁশিযার, ওকে নিযে বিপদ। এও সেই দরখাস্তে সই দেবার মতই কঠিন।'

মোম খুঁজে পাচ্ছিল না রমা। প্রভাস বাবু চুরুটটা তুলে নিযে বললেন, 'রাজীব বাবুর সুবিধাব জন্যে একবার মিথ্যা কথা বলে দ্বিতীযবার তাব উপকাব হবে জেনেও মিথ্যা কথা বলতে রাজি না হযে ব্যাপারটাকে তুমি খুব ঘুলিযে ফেলেছ। এ কাজ তোমায করতেই হবে।'

বমা মোম জ্বালল।

কিন্তু মোম বাইরের বাতাসে নিভে নিভে যাচ্ছিল। মোমেব আগুনে চুরুটটা ভাল কবে জ্বালিযে নিলেন প্রভাস বাবু।

'মানোয়েলের মা চলে গেছে?'

'না ওরা সব ঘুমিযে পড়েছে।

'কাজকর্ম হযে গেছে সব।?'

'হ্যাঁ, যাবে তুমি?'

'একটু পরে। কিন্তু এ বাতি টিকবে বলে মনে হচ্ছে না। টেকাতে গেলে সব জানালাগুলো বন্ধ করে দিতে হবে।'

ঘর গরম হযে যাবে তাতে।' রমা বললে, দিদির বিয়ের সময যে লণ্ঠনটা কেনা হযেছিল সেটা কোথায?

প্রভাস বাবু কোনো কথা বলবাব আগে উড়ো হাওযাব মোমেব বাতিটা নিভু-নিভু হযে কোন রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে জ্বলে ওঠে, প্রভাস বাবু ও রমার দিকে একবার উজ্জ্বল ভাবে তাকিযে নিযে খস করে নিভে গেল তারপর। এ বাতিটা জ্বালান হযেছিল বলেই বোধহয সব কটি জানালা দিযে বাতাস ঢুকে পড়ছে এই ঘরে। এই বতাস আগেও কি ছিল, মোম জ্বালিযে এখন নজবে পড়ছে? ভাবতে-ভাবতে বমা দেশলাই দিয়ে জ্বলিয়ে নিল মোমবাতিটা।

'সেই লণ্ঠনটা কি হাবিযে গেছে?'

'না, আছে।'

মোমেব বাণ্ডিলের ভেতব থেকে আর-একটা মোম বের কবে রমা বললে, 'আছে? কোথায আছে খুঁজে দেখতে হবে। না কি তুমি জানো?'

'তুমি কি পারবে নিয়ে আসতে? অনেক দিন থেকে ত পড়ে আছে বাতিটা। ছাদে যে আমাব ঘরটা আছে, সে-ঘবে ছাদের ওপর একটা বড় কেরোসিন কাঠের বাক্সের ভেতর লণ্ঠনটা আছে। সে-বাক্স নানাবকম গেলাস, বোতল, বইম ছেঁড়া জুতো, পুরনো জামা, নাট বল্টু লোহাব গজাল, প্রেরেক -ভাঙা কাচ, কত কী যে আছে—'

'রমা হাতের মোমটা জ্বালিযে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা আমি দেখে আসছি। বাক্সের ঢাকনি খোলা ত? না, পেরেক মেরে প্যাক করে দিয়েছিলে বেচু মিস্ত্রিকে দিয়ে?'

'খোলা আছে। কিন্তু ভয় হয় ওর ভেতর সাপটাপ বাসা বাঁধে নি ত?'

'সাপ ওখানে গিয়ে কী করবে?'

'অসম্ভব নয। কাঁকড়া বিছে কিলবিল করছে। রাতের বেলা তুমি ওখানে যেও না। মানোযেরে মা

সূচীপত্রে যান

একটা ঝাঁটা নিয়ে যাবে কাল সকালে—'

'কিছু হবে না। ঠিক আমি এই যাচ্ছি আর আসছি,' রমা বললে। তুমি আগে আস্তে বাক্সের ঢাকানিটা তুলে মোম ঘুরিয়ে ভাল করে ভেতরটা দেখে নিও, লণ্ঠনটা এক কিনারে আছে নিচের দিকে, আলগোছে তুলে এনো। কিছু নাড়াচাড়া দিও না।'

'আচ্ছা-হবে সব।' রমা বললে।

'তুমি যাবেই , তুমি করবেই,' প্রভাস বাবু সময়ের বহমান, নিরেট সম্ভাব্যতার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার কোনো ব্যাপারে হাত দেবার জো নেই ত আমার। রমা—'

'এই যা, আমার হাতের বাতিটা নিভে গেল আবার। একটা দেশলাই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।'

'চিলেকোঠার ছাদে ওঠবার সিঁড়িটা কিন্তু জায়গায়-জায়গায় ধসে গেছে। মেরামত করাব-করাব ভাবছিলাম, কিন্তু কিছু করানো হয়নি এখনো। সাবধানে পা ফেলে উঠো।'

রমা নিজের হাতের মোমটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে.'এই দেশলাইটা সঙ্গে নিলাম। আর খালি দেশলাই বাক্সটার কয়েকটা কাঠি রেখে যাচ্ছি তোমার জন্যে।'

'চিলেকোঠার ছাদটা কিন্তু একেবারে খোলা, কোনো পাঁচিল নেই, কিনারে যেও না।'

আধঘন্টা পরে লণ্ঠন নিয়ে ফিরে এল রমা। আকাশে চাঁদ এসেছে, খুব সম্ভব কৃষ্ণা দশমীর ঝাউ সিসুর ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন একটা ভাঙা ধোঁয়টে চিমনির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে আলোকখণ্ড অথচ আকাশে কোনো মেঘ নেই। কৃষ্ণা তিথির চাঁদটাকে আলোর পয়জারে মানুষ ও সৃষ্টির কেমন যেন একটা সম্ভাব্য অন্ধকারে প্রতীক বলে মনে হয়, লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রেখে অদ্ভুত নিঃশব্দ চাঁদখণ্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল রমা।

ভাল করে বাতিটা পরিষ্কার করে নিল সে; চিমনিটা সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে সাফ করে নিল।

'দেখছ, কী রকম ঝকমক করছে লণ্ঠনটা' তার বাবাকে বললে রমা,'এই বারে এ আলো জ্বালালে বাইরের থেকে শ্যামা পোকা উড়ে এসে পড়বে সব, ফড়িং আসবে, টাকা প্রজাপতি আসবে—;

'প্রজাপতি? ইংরেজিতে ওগুলোকে কি বলে?'

'মথ।' রমা বললে,'মথ নয়?'

'কী জানি।'

বাতি জ্বালানো হল না, বোতলে এক ফোঁটাও কেরোসিন তেল নেই। অনেক দিন থেকেই কেরোসিনের কন্ট্রোল চলছে বাসমতীতে, আরো অনেক দিন চলবে বলে মনে হয়। স্পিরিটের বোতলের দু-তিন বোতল আন্দাজ তেল পাওয়া যায় মাসে, অনেক সময় তাও জোটে না। ক্যানাডিয়ান মিশনের পাদ্রিদের কাছে হয়ত কয়েক ক্যানেস্তারা তেল রয়েছে, এক বোতল ধার চেয়ে আনলে হয়। কিন্তু কে যাবে সেখানে এত রাতে? মোম জ্বালিয়ে ক্যানেডিয়ান ক্যাথলিক মিশনের দিকে রওনা দেবে রাত বারটা-একটার সময়?

এইবার চাঁদের আলোটা খুব ভাল লাগল। সবকটা জানালা খুলে রাখলে সারারাত আলোটা ঘরের ভেতর টিকে থাকবে—মানুষের কোনো দূর অন্ধকারে অস্পষ্ট ভাগ্য বিধাতা বলে মনে হয় না আর; এখুনি আজকের প্রয়োজনে স্বাগত কেমন যেন সত্য পারমিতা দেবীর মত মনে হচ্ছিল তাকে।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল প্রভাসবাবুদের।

'ভালোরিবা ঘুমিয়েছে?'

'ঘুমিয়েছে হয়ত' রমা বললে,'জেগেও থাকতে পারে। মানুষের পৃথিবীতে ঢের কাজ। ওরা ত পরোপকারে মিশন নিয়ে এসেছে।'

'মানোযেলের মা চলে গেছে।'

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।'

'এই জানালাগুলো সারারাত খোলা থাক।'

'হ্যাঁ, থাকবে।'

'মোমের বাতিটা নিভিয়ে দাও।'

'দেব।' রমা বললে।

'বই পড়ছ তুমি?'

'একটু লিখছি।'

'চিঠি?'

'না, এমনিই।'

অনেকটা সময় কেটে গেল। প্রভাস বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'রমা আছ?'

'কে?' আঁতকে উঠে ছটা খোলা জানালার ওপরেই চোখ বুলিয়ে ঘুরিয়ে নিল রমা।

একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের পেছনে আকাশে মিশরের দেবীর আধুনিক রেডক্রস সংস্করণের মত চাঁদ, মেহেদির বন, উঁচু সিসু আর ঝাউগাছগুলোও এদিকে।

'প্রভাস বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ, এই ঘুমুলেন। এখুনি মশারি ফেলে দেব।'

'না,না, দরজা খুলতে হবে না,' বমা কয়েক পা হেঁটে দরজার খিলে হাত দিতেই সিদ্ধার্থ বললে,'আমি এই জানালায় দাঁড়িয়ে বলছি তোমকে। মোম জ্বালিয়েছ দেখছি।'

'লণ্ঠনটা কেমন বিগড়ে গেছে।'

'নিভে যাবে না মোম? আজ রাতে বাতাস আছে।'

'ওদের মিশন থেকে তুমি আমাকে একটু কেরোসিন তেল এনে দিতে পাবো সেন?'

'দিচ্ছি,' সিদ্ধার্থ বললে,'কিন্তু আমার চা খাওযার কথা ছিল ত এখানে। ফ্লাস্কে আমার চা রেখে দিয়েছ ত?'

রমা একটু পিছিয়ে গিযে হাসতে-হাসতে বললে—'এ'

এগিয়ে জারুল কাটের চেয়ারটার ওপর এসে ডান পাযের হাঁটু ভেঙে বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রমা বললে, 'ভাগ্যিস বাবা টুরের জন্যে এই গেল হপ্তায় একটা ফ্লাস্ক কিনেছিলেন, না-হলে কি করে তোমার চা এত রাত অব্দি গরম রেখে দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

'ফ্লাস্কটা দাও তাহলে আমাকে।'

'ভেতরে এসো।'

'না, ভেতরে যাব না, জানালা দিযে গলিয়ে দাও।'

'এই শিকের ফাঁক দিযে ফ্লাস্ক যাবে না।'

'ও' সিদ্ধার্থ বললে,'আচ্ছা তাহলে ফ্লাস্ক থাক। একটা পেযালায চা ঢেলে জানালার ভেতব দিযে চালিযে দাও। তোমাদের পেয়ালা ত ট্যাঙ্কার্ডের মত নয়, শিকে আটাবে না। দাও, একটু গবম চা খাওয়া যাক।' বমা সিসু জাম মহানিম ঝাউয়ের পেছনে চাঁদটার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থের মুখেব ওপর চোখ বেখে বললে,'চাযেব পেয়ালা ত বান্নাঘরে তালা মেরে আটকে রেখে গেছে মানোযেলেব মা। শেষ রাতে এসে খুলবে, তখন আমরা কেউ ঘুম থেকে উঠি না, সেইজন্য চাবি।'

'সেই জন্যে চাবি ওব কাছে চেয়ে দিয়েছ বুঝি? বেশ লোক তোমরা' এসো ঘরেব ভেতর, ফ্লাস্ক থেকে খাবে। কাচের গেলাস আছে এ ঘরে দু'টো। কুঁজোয জল আছে।'

'কাঁচের গেলাসে চা ঢেলে দাও তাহলে, আমি এই ধবছি।'

খুব চওড়া গেলাস সেন, শিকের ফাঁক দিয়ে যাবে না। চামচে দিয়ে চলবে? যদি বলো, সেটা আমি করে দেখতে পারি। কিন্তু তুমি ত বারবাব ক্লাশের লেকচারে বল যে জীবনে কোনো দিক দিয়েই স্পুন-ফিডিঙের পক্ষপাতী নও।'

'জিরানডাঙাব খবর ভাল।' সিদ্ধার্থ বললে।

'কী রকম?'

'ওরা তিনজনই মবে গেছে। মুসলামানদেব কবরখানায নিয়ে মাটি দেযা হযেছে। কাপড়চোপড় সব কিছু পুড়িয়ে ফেলা হযেছে। যতদূর সম্ভব ডিজইনফেক্ট করেছি আমরা সমস্ত বস্তিটাই। যে-আটজন ছেলেকে আসতে বলেছিলাম তাবা সবাই এসেছে, এদের ভেতব তিনজন মুসলামন ছেলে আছে। বেশ খেটেছে পিটেছে সবাই মিলে। আমি ওদের চারজনকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।'

'বাকি চারজন রয়েছে জিরানডাঙায়?'

'হ্যাঁ।'

'রজনী নান?'

'রজনী অনেকক্ষণ ছিল, কাল আসবে আবার।'

সূচীপত্রে যান

'ইনজেকশনের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলে?'

'না। চেষ্টা করছি। আর কোনো নতুন কেস হয় নি।'

'ভালয় ভালয় এখন আর বেশি জেরবার না-হলেই ভাল। এতরাতে সাইকেল রিকসা পাবে? নেই হয়ত কোথাও। নেই'—রমা অনেক দূর-দূরান্তের দিকে তাকিয়ে বললে।

'রিকসা কী হবে?'

'এই বারে জিরিয়ে নাও। এই ঘরে দুধ আর পাঁউরুটি চিনি আছে, ফ্লাস্কে চা নেই সেন, তুমি এলে না, বাসি চা রাখতে গেলাম না আর। এসো'—, রমা দরজা খুলতে গেল। সিদ্ধার্থ বললে, না গো, আমার সময় নেই, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে কথা বলছি, দরজা খুলো না তুমি রজনী হ্যাভারস্যাকে অনেক খাবার এনেছিল. জিরানডাঙায় বসেই খেয়ে নিয়েছি আমরা দু'জনে।'

'কিন্তু এইবার জিরতে হবে তোমর সেন, আমি কোনো কথা শুনব না। ছাদের চিলেকোঠায় একটা খাট রয়েছে, আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি।

'আমার এখুনি জিরানডাঙায় যেতে হবে।' সিদ্ধার্থ বললে, 'তোমার ফ্লাস্কটা আমাকে দাও

'কেন?'

'ছেলেরা চা তৈবি করে ভরে রাখবে। মাঝরাত জাগতে হবে ওদের। বারবার চা তৈরি করবার সুবিধা নেই জিরানডাঙায়। তোমাদের ফ্লাস্কটা ত বেশ বড়'—সিদ্ধার্থ খানিকটা দূরে চাঁদের আলোয একটা জাতসাপ চলে যাচ্ছিল সড় সড় কবে, সেটার দিকে তাকিয়ে বললে,'অনেক চা আঁটবে।' সাপটা চলে গেল, দেখতে পাযনি রমা; পকেটে একটা ছুরি আছে সিদ্ধার্থের, কিন্তু আবো ত অনেক জিনিসের দবকাব, শক্ত গিঁটবাঁধবার দড়ি, পাবম্যাঙ্গানেট পটাশ, হয়ত লেকসিন, একটা বেজী, ঝড়বার জন্যে একদল ওঝা, কাটা জায়গার বিষটা শুষে নেরাব জন্যে জ্যান্ত মুরগির রেকটামের দিকটা, যদি সম্ভব হয দাঁত দিয়ে শুষে নেবাব জন্যে রমাকেই—

'সাপখোপের বাস্তায এত অন্ধকাবে ভেতর হেঁটে যাবে আবার?'

'সাপ কোথায?' সিদ্ধার্থ মোমের আলোয প্রভাসবাবুর জবুথবু শরীরও রমাব মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শুনেছ কখনো কোনো লোককে সাপে কেটেছে জিরানডাঙায? শুকনো কলাপাতার ফ্যাকড়ার ওপব পা দিলাম, আর অমনি সাপে ছোবল দিল, তাহলে ত এক রাতে একশ বার কবে মানুষকে সাপে কামড়াত জিরানডাঙার থেকে শালিকডাঙায চলাফেবাব সময।'

'কেউ চলে এত রাতে? কেউ না।'

'চলছি ত।'

'কেন যে-তা তুমিই জান।'

'ফ্লাস্কটা দাও।'

দরজা খুলে ফ্লাস্ক দিতেই কাঁধে ঝুলিযে অন্ধকারের নেমে পড়ল সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ কলেজ থেকে তিন সপ্তাহের ছুটি নিল। তিনি-চার মাসের নেবে ভেবেছিল, পনের দিন ছুটি পাওনা ছিল তার, কিন্তু বেশি লম্বা ছুটি প্রিন্সিপাল দিতে রাজি হলেন না, প্রিভিলেজ লিভও দিলেন নাম ছুটি যখন পাওনা আছে সিদ্ধার্থের, নিজেও সে নিতান্তই ছুটি পাচ্ছে এবাবে, তখন সিদ্ধার্থেব, দরখাস্তেব তিনমাসের জায়গায তিন সপ্তাহ মঞ্জুর করলেন, সিদ্ধার্থেব কাছ থেকে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেটও চাইলেন তিনি।

'কিন্তু আমি ত প্রিভিলেজ লিভ চাইছি—' সিদ্ধার্থ বললে।

'সেটা এখন দিতে পারা যাবে না।'

'আমার ত দেড় বছরের প্রিভিলেজ লিভ জমা আছে।'

'সেই জন্যে দেড় বছরের ছুটি নেবেন নাকি আপনি—' প্রিন্সিপাল তাঁর নতুন স্মেলিঙ সল্টের শিশিটার টাইট ছিপি না খসিযে সেটাকে নাকের কাছে এগিয়ে এনে বললেন, 'বড় জোর ছ'মাস দিতে পারা যায়, কিন্তু উইথদাউট পে—গরমের ছুটির মাইনেও পাবেন না।'

সিদ্ধার্থ মনের ধীরতা টিকিয়ে রেখে একটু হেসে বললে, 'ঢের ছুটি পাওনা আছে সে কথা বলছিলাম

সূচীপত্রে যান

এ জন্যে যে তাতে কি আমি অন্তত তিন মাস পুরো মাইনের ছুটি পেতে পারিব না।'

'কেন চাচ্ছেন ছুটি?'

'বাসমতী ছেড়ে একটু চলে যাব, একটু বিশ্রাম চাই।'

'শরীর খারাপ হয়েছে?'

'আছে লো ব্লাড প্রেসার, কিন্তু সেটা তত মারাত্মক নয়, একটু নিয়মে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।' কিন্তু সিদ্ধার্থ প্রিন্সিপালের ঘরের দেওয়ালের সান লাইফ অব ক্যানডার ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে বললে। ক্যালেণ্ডারটা পুরনো, কিন্তু উজ্জ্বল রয়েছে এখনো বেশ। এদিকে একটা মানচিত্র ঝুলছে ভারতবর্ষের; কোন কোন এলাকা পাকিস্তান হতে পারে জিবে সর্ষের মত কালো কালো ফুটকি দিয়ে ঘেরাও করে সে সবের একটা আন্দাজি নির্দেশ দেয়া আছে।

কিন্তু মোটের ওপর একটু বিশ্রামের দরকার' সিদ্ধার্থ বললে।

'মনের জন্যে?

'না,' সিদ্ধার্থ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রিন্সিপাল বললেন,'মন বাসমতীতেই ভাল থাকবে, কাজের ভেতর আরো বেশি ভাল থাকবে। তবে আপনার কাজের চাপ যদি বেশি পড়ে থাকে, দু'একটা টিউটোরিয়াল ক্লাস বাদ দিয়ে দিতে পারি।'

মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীই যে হাসতে পারে না, পিঁপড়ের থেকে হাতি অবদি কেউ না, সেই কথা মনে পড়তে ঠোঁটে একটু হাসি দেখা দিল সিদ্ধার্থের। মানুষ হাসতে পারে—কিন্তু ভোগ করতে পারে না কেন?

'লেকচারের ক্লাশগুলো থাকুক,ও যেমন চলছে তেমনই চলবে,'তবে তিনি দেয়ালে ঝোলানো কলেজ টাইম টেব্‌লটা খসিয়ে আনতে বললেন দপ্তরীকে। টাইম টেব্‌লটা প্রিন্সিপালের টেবিলের ওপর রাখতেই তিনি লাল পেনসিল হাতে নিয়ে সিদ্ধার্থের দিকে তাকালেন।

'দেখুন ত সিদ্ধার্থবাবু টাইম টেবিল মিলিয়ে আপনার কোন টিউটোরিয়ালটা আমি নিতে পারি।'

'আপনি নেবেন? কেন আপনি'—?

'আমি ছাড়া কে আর নেবে? সকলেরই ত বাঁধাধরা কাজ,' তারপরে 'বোঝার ওপরে শাকের আঠি'বা 'ছাই ফেলতে আমি আছি ভাঙা কুলো' এসব উপমা দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবার কোনো রকম অন্তরঙ্গ প্রয়াসের দিকে একটুও না ঘেঁষে তিনি বললেন,'সকলের, সাতাশ, আটাশ পিরিয়ড করে ক্লাশ, রাজেনবাবুর ত ত্রিশ পিরিয়ড- আপনার পঁচিশ পিরিয়ড সিদ্ধার্থবাবু, পঁচিশ নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে—' টাইম টেবলটা সরিয়ে রেখে বললেন,'আরো দু এক পিডরয়ড কমিয়ে দেবার দরকার আছে মনে করেন?'

'না। নেই। তবে আমার সবই ত লেকচার, টিউটোরিয়াল খুব কম। সেইজন্যেই গড় পড়তায় মেহনতটা কম নয় কারো চেয়ে' সিদ্ধার্থ দেয়ালে হবু পাকিস্তানের আন্দাজি বেষ্টনীগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে,'না, আমার কোনো ক্লাশ আপনাকে নিতে হবে না। কিন্তু—'

'ফোর্থ ইয়ারের অনার্স আছে আপনার?'

'আছে।'

'মেয়েদের?'

'আমি ত অনার্সের ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে বসিয়ে পড়াই।'

'কদিন পড়ান ওদের সপ্তাহে?'

'দু'টো ক্লাশ নেই।'

প্রিন্সিপাল বললেন,'কতদূর হয়েছে আপনার বইটার?'

'প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, আর দু-একটা লেকচার।'

প্রিন্সিপাল স্মেলিঙ সল্টের শিশিটার ছিপি খসাতে গিয়ে, একটু থেমে, দোমনা হয়ে, ছিপিটাকে বরং আটকেই রাখলেন। টেবিলের ওপর শিশিটা নামিয়ে রেখে সিদ্ধার্থকে বললেন,' 'তাহলে এ সপ্তাহেই ত বই শেষ হয়ে যাবে আপনার। আসছে সপ্তাহ ও-দু'টো পিরিয়ড আমাকেই দিন। আমি বিনিয়ন পড়াব, সেটা শুরুই করতে পারিনি এতদিনে। আমি মেয়েদের পড়াব, আমার এই ঘরে এনে। মেয়েদের শুক্রবার অনার্স পড়াচ্ছিলাম; সে ক্লাশটা বাদ দিয়ে বরং আপনার এই দু'টো পিরিয়ড নেব। আপনি

তাহলে এই দুই পিরিয়ড থেকে রেহাই পেতে পারেন সিদ্ধার্থবাবু। আপনার তেইশ পিরিয়ড হল তাহলে'

সিদ্ধার্থ বললে,'এ ত রুটিন অদলবদলের ব্যবস্থা—কিন্তু আমি ত ছুটি নিতে এসেছিলাম।'

প্রিন্সিপাল বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি ত তিনমাসের ছুটিব দরখাস্ত করেছেন।'

'হ্যাঁ, প্রায় তিন সপ্তাহ হল দরখাস্ত কবেছি। যে তাবিখ থেকে ছুটি চেয়েছি তার পরেও এক সপ্তাহ কেটে গেল।'

'আপনি হয তো ভাবছেন আপনাব দরখাস্ত কলেজেব কেরানী চেপে রেখেছে।'

বাজীবাবুর ব্যাপারটা কিছু-কিছু শুনেছিল সিদ্ধার্থ। বমা বা রাজীব বাবুর কাছে নয় অবিশ্যি, প্রফেসবদের আলাপ আলোচনার থেকে। মোটামুটি কী যে হয়েছিল না হয়েছিল ভাল করে জানে না। একটা খুব ছোট্ট এফিড্রিনের শিশি পকেট থেকে বের কবল সে, শিশিটা কাত কবে খানিকটা নস্যি বাঁ-হাতের তেলোয ঢেলে নিয়ে সিদ্ধার্থ বললে, 'না না তা কেন, তা ত নয। দরখাস্তটা ত আপনার হাতেই দিযে গেছি 'আমি।' প্রিন্সিপাল আগেই অন্য নানারকম কাগজপত্রের ফাইল খুলে বসেছিলেন; সিদ্ধার্থের কথাটা স্বীকার না অস্বীকার করে কিছু বলতে গেলেন না তিনি। একটু নিজের ভেতর সবে গেছেন মনে হল। গম্ভীর চোখে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন আজকের ডাকেব চিঠিপত্র, নথি, দলিল, সব।

এক সময়ে চোখ তুলে তিন বললেন,'কিন্তু কী জন্যে ছুটি চাচ্ছেন আপনি সে আমি বুঝতে পাবলাম না।'

বিনযতোষ ঘবেব ভেতর ঢুকে পড়ে চাবদিকে চুনমুন-চুনমুন করতে ঘুরতে-ঘুবতে বললে,'বা, একটা এফিড্রিনের শিশি দেখছি টেবিলেব ওপর, ওটা কাব? স্যাবের ত নয় নিশ্চযই—' প্রিন্সিপালকে লক্ষ্য কবে বিনযতোষ বললে,'ওঁর আইডিযাল ফিজিক, শবীব মনেব দিক দিযে উনি আমাদেব সব কটি প্রফেসবকে বসিযে বসিয়ে মহাভাবতেব আচার্যদেব মত অস্ত্রশিক্ষা আর ধর্মশিক্ষা দিতে পাবেন।'

'বিনযতোষ আমাকে আমাব জন্যেই ভালাবাসে,' প্রিন্সিপাল বললেন, 'কোনো তপস্যার ফলেব দিকে লোভ নেই ওব। শুনলেন ত সিদ্ধার্থববু কী বকম কথা বললে। বসো।'

'এক্ষুণি ক্লাশ আছে আমাব—আজ ছয পিবিযড।'

'সেই সকাল থেকেই সাঁটাচ্ছ বুঝি। বেশ বেশ' প্রিন্সিপাল মুগ্ধ উজ্জ্বল চোখে নীল শিশিটার দিকে তাকালেন।

'আপনাব হাঁপানিব টানফান উঠছে নাকি আজকাল স্যাব?' মমতাময়ী মাসিব মত সাগ্রহে গলা বাড়িযে প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞেস কবল বিনযতোষ। সিদ্ধার্থেব মনে হল বিনযেব জিজ্ঞেসটিজ্ঞেসেব উচ্ছেদে একটা লবঙ্গকনিকা বিনযেব দাঁতেব থেকে ঠিকবে প্রিন্সিপালেব চোখেব কোনায গিযে যেন পড়ল। টেবও পেল যেন বিনয, কিন্তু তখুনি অভদ্র সেজে রুমাল দিযে চোখটা মুছে ফেলতে গেলেন না প্রিন্সিপাল, বিশেষত বিনয এমন-কি সিদ্ধার্থও টেব পেযেছে সেটা টেব পেলেন তিনি; এ-সব সূক্ষ্ম বিষযেও এ মানুষটি কেমন পবিপাটি দেখছিল সিদ্ধার্থ। বিনযেব জন্যে একটা বিশেষ টান অবশ্য বযেছে প্রিন্সিপালেব—সেটা কখনো স্বাভাবিক, কখনো কপট আকাব ধাবণ কবে যেন। বিনযেব শালা বাসমতীব বড় পুলিশ সাহেব। বিনেযব শ্বশুব কলেজ গভর্নিং বডিব ভাইস-প্রেসিডেণ্ট (এ বকম কোনো একটা নির্ধাবিত পদ নেই যদিও)। কালেক্টবেব অবর্তমানে, এমন-কি তিনি উপস্থিত থাকলেও, লোচনবাবুই ধর্মত প্রেসিডেন্টের কাজ কবেন। তাছাড়া বিনয নিজে প্রিন্সিপাল ও তাব স্ত্রী ও শালীদেব এবং পবিবারের সব কটি খাড়ি ক্ষুদির হাভেব কাছেব খুব ভাল গোছালো জিনিস।

'না না টানফান নেই আমার?' প্রিন্সিপাল বললেন,'আমাব বুক দেখে বিধান বায বলেছিলেন আপনি মবলে আপনাব কলজে দিযে হসপাতালের আযবন লাংসেব কাজ হবে।'

'ও বাবা—' ফড়কে উঠে বিনয বললে; লবঙ্গেব কুচি এবাবও যাতে দাঁত থেকে ছিটকে প্রিন্সিপালেব চোখে গিযে না ঢোকে সে জন্যে একটু দূরে সবে বসেছিল সে। তড়বড় কবে কথা বলতে গিযে একটু হুঁশিযাব হয়ে থেমে রইল।

'খুব শীতেও আপনার ব্রঙ্কযাল কাট্যাবও হয না বুঝি?' বিনযতোষ দূরের থেকে লবঙ্গ সম্বন্ধে একটু সাবধান হযে বললে।

'না। কক্ষনো না। একটু কাশি অবদি না।' প্রিন্সিপাল বললেন, 'ববাবব ঠাণ্ডা জলে চান করতুম। আজকাল শালীদের পাল্লায় পড়ে ঠাণ্ডা গরমে মিশিযে করছি।'

কথাটার দু-বকম অর্থ থাকতে পারে—ভাবছিল সিদ্ধার্থ। বিনয অবিশ্যি মোটামুটি মোটা অর্থটাব সাহায্যে একটু বিভোর হয়ে প্রিন্সিপালের মুখেব দিকে তাকিযে বসে আছে।

সূচীপত্রে যান

'এই শিশিটা তোমার সিদ্ধার্থ?'

'ঐ স্মেলিঙ সল্টের?'

'না, এই এফিড্রিনের।'

'আমার।'

'তোমার হাঁফানি হল?'

'এর ভেতর নস্যি আছে।' বিনয়কে বললে সিদ্ধার্থ।'

'ও' মাইনাস সাত পাওয়ারের চশমাটা খুলে তক্ষুণি এঁটে নিয়ে বিনয় বললে, 'চোখে কম দেখছি আজকাল; নস্যিটা দেখিনিতি।' শিশিটা একবার তুলে ধরে ঘুরিয়ে দেখে নিল বিনয়তোষ।

'এফিড্রিন কে খেল? তোমার পরিবার?'

ফাইনাল বেল পড়ল।

'ওরে ব্বাবা, আমার যেতে হবে সেই সায়েন্স বিল্ডিঙে, গ্যালারিতে, ইকনমিকস পড়াতে, এদিকে রুম খালি নেই আর, চললুম স্যার, তোমার স্ত্রীকে এফিড্রিন দিও না, খারাপ জিনিস খুব, তাগা তাবিজের ব্যবস্থা করো, আমাব নজরে-টজরে পড়লে কিছু মিলেটিলে গেলে তোমাকে জানাব সিদ্ধার্থ—' পায়ে ছুটতে-ছুটতে কথা বলতে-বলতে অদৃশ্য হয়ে গেল বিনয়। রুমাল বাব করে চোখটা আস্তে-আস্তে ঘষে রগড়ে মুছে নিলেন প্রিন্সিপাল—কী যে তাকে একটা লবঙ্গের কুচি উপহার দিয়ে গেল বিনয়—বদলে তিনি শিবের দত্তক লিঙ্গের মত অনড় হয়ে বসে রইলেন একটা মিছে সৌজন্যেব খাতিবে। পাশের ঘবেই প্রিন্সিপালের নিজের প্রাইভেট ল্যাভেটরিতে কলে জল ছিল, বেসিন ছিল, ভাল কবে চোখমুখ ধুযেমুছে চেয়ারে এসে বসলেন তিনি।

'আপনার আজকেব ক্লাশ সব হয়ে গেছে সিদ্ধার্থবাবু?'

'হয়েছে।'

প্রিন্সিপাল ফাইলে হাত দিয়ে বললেন,'কী জন্যে ছুটি চাচ্ছেন আপনি বুঝতে পারলাম না ত।'

'ডাক্তার আমাকে দেখলে বলবে যে ব্লাড প্রেসাবের বাড়াবাড়ি চলছে. কিন্তু আমি নিজে সেটা মানতে রাজি নই।'

'নিজে কী মনে করেন আপনি?'

'আমি গত চার বছর একদিনও ছুটি নিইনি—ক্যাজুয়াল লিভ অবদি না। নেই নি-কোনো দরকার বোধ করিনি। মাঝে-মাঝে শরীব মন খুব খারাপ হয়েছে, কিন্তু তবুও কলেজ কামাই কবিনি। কিন্তু এখন আমি কযেক মাসেব অবসরের দরকাব খুবই বোধ করছি। আপনি যদি মনে কবেন সবই ঠিক আছে, আমাকে ছুটি না দিলেও চলে তাহলে আমার দরখাস্তটা অগ্রাহ্য কবতে পারেন। করুন তাই। তাহলে আমি কলেজে যে রকম যাচ্ছি-আসছি তাই করব।'

'গত চার বছর কোনো ছুটি নেন নি আপনি বলেছেন, কিন্তু সেটা মহীনকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

সিদ্ধার্থ একবার প্রিন্সিপালের দিকে একটু চোখ কঠিন করে তাকিয়ে তাবপর নরম গলাযই বললে, 'আচ্ছা জিজ্ঞেস করে দেখুন, অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার আছে ত কলেজে সব, মহীনবাবুকে দিয়ে আনিয়ে নিজেও সে-সব দেখে নিতে পাবেন।'

'দেখব। গত চাব বছবের আগে শ্রীধরবাবুর আমলে এই কলেজে কাজ করতেন ত আপনি। তখন ছুটিফুটি নিতে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ বছর পাঁচের আগে নিয়েছিলাম একবার। শ্রীধরবাবু প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁকে গিয়ে বলেছিলাম মাস তিনেকের ছুটির দরকার হবে। তিনি বললেন, দবখাস্ত করো, দরখাস্ত কবলাম, তিনি মঞ্জুর কবে দিলেন।'

'আচ্ছা,' প্রিন্সিপাল স্মেলিঙ সল্টেব শিশিটা কাছে কুড়িয়ে এনে বললেন, 'রেকর্ডে আছে ত সব। দেখব আমি।'

চোখ নয়, মাথার স্নায়ু শিরা নয়, লো ব্লাড প্রেসারের রক্ত নয়, এবাবে মনটাই যেন কেমন শক্ত হয়ে উঠল সিদ্ধার্থের। প্রিন্সিপাল সমস্ত রেকর্ড দেখতে চাচ্ছেন, ভাল কথা, মহীনবাবুকে ডাকিয়ে রেকর্ড আনিয়ে তন্নতন্ন করে দেখে নেবেন সব। কিন্তু মানুষকে সত্যি বিশ্বাস করবার ঠাটে অবিশ্বাসের কথাগুলো বলবার কী দরকার ছিল প্রিন্সিপালের। এ কলেজের অল্লাধিক পুরনো মাস্টার সিদ্ধার্থের সামনে? যাক, বলেছেন বলেছেন। অনেকেই সেয়ানা হয়, কিন্তু এক আধ জনের বেশি জ্ঞানী হয় না,এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু এই প্রিন্সিপালও শুধু যে সেযানা তা নয়, মাঝে-মাঝে একেও প্রায জ্ঞানীদের ভেতর একজন

অনুভব করে-করে তবুও সত্যি জ্ঞানী বলে স্বীকার করে নিতে পারেনি আজ পর্যন্ত সিদ্ধার্থ। কোথায় যেন এক তিলে আটকে যায় জ্ঞানী ও গুণীমানীর ভেতরে পার্থক্যটা । কিন্তু সেই তিল ভেবে দেখতে গেলে-সত্যিই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

'রেকর্ড দেখে কোনো ভুল ত্রুটি না পেলে ছুটি পাওয়া যাবে?'

'ক মাসের ছুটি?'

'তিন মাসের চেয়েছি।'

'পুরো মাইনেতে তিন মাস?'

'ছুটি ত পুরো মাইনেতেই তিন-চার মাসের পাওয়ার কথা, আমরা অনেক দিন কাজ করছি।'

প্রিন্সিপাল বললেন,'দেখি রেকর্ড, আপনার একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে।'

'কেন?'

'তাছাড়া ছুটি মঞ্জুর হবে না।'

'কে? কমিটির কথা বলছেন?'

'দিলে আমি নিজেই ছুটি দেব; দরকার বোধ করলে কমিটির কাছে সুপারিশ করব।'

'ক মাসের?'

'একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। পুরো মাইনেতে আমি তিন সপ্তাহের বেশি ছুটি দিতে পারব না আপনাকে।'

সত্যসুন্দর ঘোষকে অবিশ্যি চার মাসের ছুটি দিয়েছেন প্রিন্সিপাল। পুরো মাইনেতে, কোনো মেডিকেল সার্টিফিকেটও লাগেনি। গত বছরও সত্যসুন্দর ছুটি নিয়েছিলেন তিন চার মাসের । কিন্তু কী হিসেবে এ-রকম হয়? খুব সম্ভব প্রিন্সিপাল ঘোড়েল বলেই এ-রকম ঘোড়েল লোক রয়েছে বলেই কলেজটাকে বেশ ঠাটে চালাচ্ছে। কী ঠাট? ঘুন প্রথম ঢুকলেই বাঁশটাকে খারাপ দেখায় না কিন্তু নিজের কাজ সেরে এ প্রিন্সিপাল যখন চলে যাবেন তখন কলেজের পঁচা বাঁশের মত চেহারা এখুনি যেন চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে সিদ্ধার্থ। চিরন্তন সান্যালকে আড়াই মাসের ছুটি দেয়া হয়েছে, ত্রিদিব সরকারকে তিন মাসের, পুরো মাইনেতে। ছুটির মুখে তাদের পঞ্চাশ টাকা করে মাইনেও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কীসের জন্যে এ-সব? যতদূর মনে হয় এরা উদ্যোগ করে এই প্রিন্সিপালকে এ কলেজে আনিয়ে ছিলেন বলে, এদের টাকা ও লোকবল আছে বলে, কলেজ ক্লাশে না হোক বাইরে দেশ জায়গায় এরা বেশ কইয়ে-বলিয়ে লোক বলে। অথচ প্রফেসর সরিৎ মুখুজ্জের ছেলের টি-বি হয়েছে কলকাতায় কোন এক মেসে, ছেলেটাকে দেখবার কেউ নেই সেখানে, তাকে চিকিৎসা করতে হবে, তার জন্যে হাসপাতালের বেড ঠিক করতে হবে, বেড না পেলে কোথায় রাখা যাবে তাই নিয়ে দিনরাতের ধান্দায় ঘুরতে হবে বাপকে কিন্তু কিছুতেই প্রিন্সিপাল তাকে ছুটি দিতে চাচ্ছেন না। সরিৎ নিজের সৎ বিচারবুদ্ধির আলোয় চলে, মনিব বলেই মনিবের তাঁবেতে থাকতে চায় না, সিধে অথচ বিচক্ষণ মানুষের সঙ্গে বাঁকা ব্যবহারের নানারকম ঠোকাঠুকির ভেতর দিয়ে এ জিনিসটাকে বিশেষভাবে বুঝতে হয়েছে প্রিন্সিপালেব। কিন্তু এবার খুব কায়দা করে আটকাতে পেরেছেন সরিৎকে। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর দেড় মাসের ছুটি দিয়ে রাজি হয়েছেন। কিন্তু হাফ-পেতে। কিন্তু হাফ-পেতে কিছুতেই ছুটি নেবে না মরিৎ,কেন নেবে, পুরো মাইনেতে ছুটি পাওনা রয়েছে তার। গভর্নিং বডি বলেছে প্রিন্সিপালেব নির্দেশেব ওপব তাদেব আর কিছু বলবার নেই। সরিৎ চাকরিতেও ইস্তফা দেবে ঠিক করেছিল কিন্তু দু-চারজন প্রফেসর তাকে বুঝিয়ে থামিয়ে রেখেছে। সরিতের, ছেলের এই বিশেষ বিপদের সময এখুনি চাকবি ছেড়ে দিলে সবংশে মরতে হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে হাফ-পেতেই দেড় মাসের ছুটি নিযে চলে গেছেন সরিৎ। দেড়মাস উৎরে গেলে ছুটি মঞ্জুর হতে পারে বিনে মাইনের কিংবা সাসপেনসন হতে পারে—সরিৎ কলকাতায় যাবার সময় সেটা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন প্রিন্সিপাল তাকে।

এই-সব হচ্ছে আজকাল কলেজে।

কলেজের তিনজন প্রফেসর পলিটিক্যাল প্রিজনার হিসেবে বন্দী ছিলেন চার-পাঁচ মাস। স্বাধীনতা ত আসছে দেশে বছর খানেকের ভেতরেই পাওয়া যাবে, প্রফেসরদের ছেড়ে দিয়েছে গভর্ণমেণ্ট। প্রিন্সিপাল তাদের একজনকে কাজে বাহাল করেছেন—বিনয়তোষের শ্বশুর, গভর্নিং বডির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট লোচনবাবু, সুপরিশ করেছেন বলে। কিন্তু বাকি দু'জনের বিশেষ কেউ মুরুব্বি নেই, বড়দের তরফ থেকে কোনো সুপারিশ আসেনি, কালেকটর সাহেব 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলছেন না, ঠেকিয়ে রেখেছেন প্রফেসর

দু'টিকে প্রিন্সিপাল। তিনমাস ঠেকিয়ে রেখে বিদায় করে দিয়েছেন। তারা কারোরই সুপারিশ আনতে পারলে না। মারাত্মক পলিটিক্যালদের কোঠায় এ কটি মাস্টারও পড়েন না। কলকাতার সেক্রেটারিয়েটের কাছে ব্যাপারটা জানানো হয়েছিল। তারা বলে দিয়েছে এ বিষয়ে প্রিন্সিপাল যা ভাল বোঝেন তাই করতে পারেন। প্রফেসরদের রেকর্ড ঘাটিয়ে দেখেছে ডিপার্টমেণ্ট, বিষয়টা তাদের কাছে তেমন গুরুতর মনে হচ্ছে না, মাথা ঘামাবার মত কিছু নেই; যা ঠিক মনে করেন তাই করতে পারেন। তা ত ভালই। কিন্তু প্রিন্সিপাল ঠিক যা মনে করেছেন এ প্রফেসরদের যদি সম্বন্ধে তাই ত করলেন। তবুও দেশ স্বাধীন হলে এই প্রফেসরদর যদি ডাক পড়ে কলেজে, ছেলেরা কলেজে সভাসমিতি করে এদের সম্মান করতে চায়, প্রিন্সিপালকে সভাপতি হতে বলে, খুব পর্যাপ্ত পরিমাণে খুশি হয়ে প্রিন্সিপাল তা করবেন। একেই সেযানা বলে—সিদ্ধার্থ ভাবছিল। জ্ঞানী মানুষ অন্যরকম।

রাজীব বাবুকে সাসপেণ্ড করেছেন নাকি প্রিন্সিপাল।

'একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট চাইছেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সেটা দরখাস্তের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে!'

'তিন সপ্তাহের ছুটি?'

'হ্যাঁ। কাছেই বালিসড়কের সমুদ্র আছে। যুদ্ধের সময় একটা মিলিটারি ঘাঁটি ছিল ওখানে। ভাল ঘরদোব আছে; ঘুরে আসুন—সময় পেলে আমিও যেতাম। কিন্তু আমাকে কে ছুটি দেয?'

কলকাতায কনভোকেশনে গিয়ে পঁচিশ ত্রিশ দিন কাটিযে আসেন ত ফি-বছব প্রিন্সিপাল, যদিও বিশ্ববিদ্যালযের সমাবর্তনের ব্যাপারটা দু-এক দিনেব। তাছাড়া পাবলিক ডিউটির নাম কবে প্রাযই ত কলকাতায় চলে যান ইনি, পনের-কুড়ি-পঁচিশ দিন কাটিযে আসেন। কীসের পাবলিক ডিউটি? কী কবেন? কিন্তু সেটা গভর্নিং বডি জানে। জানলেই হল। তবে বালি-সড়কের সমুদ্র ঠিক নয়, একেবাবে গোপালপুবেব সমুদ্রের পারে পাবলিক ডিউটির বছর মাঝে-মাঝে চলে যায প্রিন্সিপালের। মানে খুঁজে পায় না কোনো-কোনো প্রফেসর। গরমের ছুটি আব পুজোর ছুটির সঙ্গে জুড়ে দিযে খানিকটা বড় মুড়োও ল্যাজা চিবিযে খাবার সহজ অধিকারে কলেজের গতিতে বসে থাকলে স্বভাবতই পাওনা থাকে—দেখেছ ত সিদ্ধার্থ। গভর্নিং বডি ও-সবেব কোনো খবব বাখে না। প্রিন্সিপাল কখন বাসমতীতে থাকেন, কখন থাকেন না, জানবার দবকাব নেই গভর্নিং বডির। প্রিন্সিপাল উদ্যোগ কবে কমিটিব মিটিং ডাকলে এবং কালেক্টব সাহেবেব বাড়িতে সন্ধ্যার পবে সকলেই হাজির হযে নানবকম' বাদবিতণ্ড সত্ত্বেও প্রীতিসম্মেলটাকে শেষ পর্যন্ত বেশ জমিযে বাখেন। বাদবিতণ্ডা অবিশ্যি কলেজের প্রফেসরদের ভাগ্য নিয়ে ছেঁড়াকাটার কলাকৌশলে। প্রিন্সিপাল সেখানে অপারেশন টেবিলের প্রধান নার্স হিসেবে প্রিয পাত্রীব মতন উপস্থিত।

কিন্তু নিজের বরাত মেনে নিতে হবে। তিন সপ্তাহের মাত্র ছুটি দিতে চাইছেন প্রিন্সিপাল। আচ্ছা,তাই নেযা যাক, ডাক্তারের সার্টিফিকেটের একটা দরকার ওব—সিদ্ধার্থের অ্যাপ্লিকেশনেব সঙ্গে গেঁথে রাখবেন ঠিক করেছেন। সিদ্ধার্থ বললে,'আপনার নির্ধারিত কোনো ডাক্তাবেব সুপাবিশ চাইছেন আপনি?'

'না। সিভিল সার্জেনের না হলেও হবে। এটা ত সরকারি কলেজ নয। কলেজটা বড়, কিন্তু নিযমটিযম শক্ত কবে বাঁধা হযনি এখনো—সিভিল সার্জেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'না—' প্রিন্সিপাল একটু দ্বিধায় দোমনায বললেন,'এলে ভাল হত. কিন্তু সে রেওযাজ নেই ত এ-কলেজে—এখনো। পবে দেখা যাবে—অবিশ্যি এ জিনিস গভর্নিং বড়িতে ক্যারি করা—' কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে নিজের সাধ সংকল্পর ওপবওযালার ওসব শিবের গীতি গাইতে আসেননি ত, নিজেকে হাতের মোটা কাজটার দিকে ফিরেযে নিযে বললেন, 'না, সিভিল সার্জন, অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন না হলেও হবে, যে-কোনো ভাল ডাক্তাবের সার্টিফিকেট হলেই চলবে, তিন সপ্তাহের ত মামলা, এব ভেতরে আর চিচিঙ্গেব বাদ্যি দিয়ে কী হবে?' 'ডাক্তার মানে এম-বি ডাক্তার—' প্রিন্সিপাল বললেন।

'বিশেষ কোনো মানে হয না এ-সব সার্টিফিকেটের,' সিদ্ধার্থ বললে।

'কেন।'

'চাইলেই ত পাওযা যায়।'

সিদ্ধার্থের কথাটা প্রিন্সিপাল শুনেছেন এ-রকম কোনো ভাব দেখাতে গেলেন না। ফাইলের কাগজপত্রের দিকে চোখ রেখে নাড়াচাড়া করতে-কবতে একটু গম্ভীর হযে বললেন,'কী হয সেটা রুগী আর তার ডাক্তার বুঝবে। একজন এম-বি ডাক্তারকে শ্রদ্ধাই করতে চাই আমরা, বিশেষত অশ্রদ্ধার

সূচীপত্রে যান

কোনো কাজ না করা পর্যন্ত, তাছাড়া একটা দরকারি বিধি পড়তে-পড়তে বললেন, 'তিন সপ্তাহের ত ব্যাপার শুধু.' চিঠি রেখে দিয়ে বললেন, 'আমরা একটা রেকর্ড রাখতে চাই।'

'আমার শরীর ভাল, আমার কোনো অসুখ নেই।'

'ডাক্তার যদি সে কথা লিখে দেয় তাহলে আপনার দরখাস্তটা ফাইলে পড়ে থাকবে।'

'আমি ঠিক এ রকম ভাবে ছুটি চেয়েছিলাম না।'

'তবে কী হিসেবে?'

তাই ত কী হিসেবে? যে-কোনো একজন এম-বি ডাক্তারকে ডেকে বুক, পিঠ, ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে, বা না নিয়েও, টাকা ফেলে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করা, সার্টিফিকেটটা জাহির করে ছুটি নেয়া—এর চেয়ে সত্যিই অসুখ করলে বেশি—বেশি ভাল লাগত সিদ্ধার্থের। কিন্তু শরীর মনে কোথাও কোনো অসুখ নেই তার—যদি ছুটি চাওয়ার এই আচমকা বাতিকটাকে একটা মনের অসুখ বলে ধরে না নেয়া যায়। কেন ছুটি চাইছে সে? কিন্তু চাইছে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। অবিশ্যি লো ব্লাডপ্রেসার রয়েছে তার, সেটাকে অস্বীকার করাও মনের বাতিক, খুব ভাল ডাক্তারেও সেই কথা বলেবে। একটা গাছের ডালপালা পাতার ভেতরে কী সব বিজ্ঞান রয়েছে সেটা বিজ্ঞানী জানে, নচাড়াল বা দেবদারু গাছের পক্ষেও তা বলা অসাধ্য।

বিজ্ঞান সত্যিই বললে যে ব্লাড প্রেসারের ব্যাপারটা সুবিধার নয় সিদ্ধার্থের—দু-তিন মাসের অন্তত বিশ্রাম দরকার তার। শুনে একদিক দিয়ে বেশ আরাম বোধ করল সিদ্ধার্থ।

যে-সে ডাক্তারকে দেখায় নি সে; এখানকার বেশ নামকরা ডাক্তার মহেন্দ্র ঘোষালকে দেখিয়েছিল। ইনি একসময়ে গান্ধির চিকিৎসাও করেছিলেন—গান্ধির আশ্রমে থেকে। মানুষ ইনি বরাবরই সৎ, আশ্রমের থেকে সত্যার্থ বিষয়ে আরো সিদ্ধ হয়ে এসেছেন। কাজেই টাকা পেয়ে বা খাতিরের মানুষ বলেছে বলে বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ থাকলেও ছুটির দরখাস্তের জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে ইনি রাজি নন। কিন্তু সিদ্ধার্থকে বেশ ভাল ভাবে পরীক্ষা করে ইনি পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে বললেন—আট-ন সপ্তাহ অন্তত, খাবারদাবারের একটা তালিকা ঠিক করে দিলেন, দিন পনের কুড়ি পরে সিদ্ধার্থকে নিজে গিয়ে দেখে আসবেন বললেন, খানিকটা স্বেচ্ছায়ই যাচ্ছেন বলে ভিজিটের টাকাও লাগবে না জানিয়ে দিলেন।

মহেন্দ্র ঘোষালের স্ত্রী শ্রীময়ী ঘোষালও গিয়েছিল গান্ধির আশ্রমে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে আগেই চেনা ছিল শ্রীময়ীর। কিন্তু শ্রীময়ী নেই বসমতীতে, অনেক দিন হল কলকাতাতে চলে গেছে। কবে ফিরবে বলতে পারছিল না মহেন্দ্র ঘোষাল। ডাক্তার ঘোষাল জীবনের সব বিষয়েই সত্য ও সত্যার্থে এত বেশি অব্যর্থভাবে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছেন যে তাঁর স্ত্রীর কাছে সরসতা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। সেই জন্যই ঘোষালের স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে থেকে কলকাতার জীবনের নানারকম দ্বীপাবলীর সমুদ্রে নাবিক হয়ে ফিরছেন, বাসমতীতে ফেরবার কথা মনে পড়ছে না তার, এরকম একটা কানাঘুষো ডাক্তার ঘোষালের স্ত্রী সম্বন্ধে শোনা যায় বাসমতীতে। এইজন্য মহেন্দ্র ঘোষালের ওপর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেছে বুঝি সিদ্ধার্থের। ডাক্তার ঘোষালের সার্টিফিকেট নিয়ে দু-তিন দিন পরে, কলেজের কাজ শেষ করে প্রিন্সিপালের কামরায় ঢুকল সিদ্ধার্থ।

'ও-ঘোষালের সার্টিফিকেট এনেছেন। বসুন সেন; হ্যাঁ ভালই হয়েছে। ভাল হয়েছে।' সার্টিফিকেটটা পড়তে-পড়তে প্রিন্সিপাল বললেন, 'ওর স্ত্রী শ্রীময়ী কি ফিরে এসেছে?' সিদ্ধার্থ চেয়ার টেনে বসে বললে 'না, আসে নি এখনো।'

'দেরি লাগবে আসতে,' প্রিন্সিপাল বললেন, 'কিন্তু ঘোষল বড় একটা সার্টিফিকেট দেয় না ত কাউকে। আপনাকে দিয়েছে দেখছি।'

'ঘোষাল বললেন বেশি ব্লাডপ্রেসার, আট-ন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করতে বললেন।'

প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটটা কুঞ্জ কেরানিকে ফাইলে রেখে দিতে নির্দেশ দিতে বললেন, 'গান্ধীর আশ্রমের ঘোষাল বলেছে, সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু গান্ধীবাদের সঙ্গে ডাক্তারির বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, ঘর-সংসারেরও না, শ্রীময়ী জানে ত তা।'

'শ্রীময়ীর কথা বলে কী আর লাভ?'

'সিদ্ধার্থবাবু,' সল্টের শিশিটা হাতে তুলে নিয়ে প্রিন্সিপাল বললেন, 'আপনি নিজে বলছেন আপনার শরীর ভালই আছে, কোনো অসুখটসুখ আছে বলে মনে হচ্ছে না। ডাক্তারের সাধ্যি আছে আপনাকে ভজাবে?'

'ভালই ত আছি মনে হচ্ছে,' সিদ্ধার্থ নিজের পাঞ্জাবির একটা হাড়ের বোতামের ওপর বাঁ হাতের

আঙুল রেখে বোতামটা ঘোরাতে–ঘোরাতে প্রিন্সিপালের মুখের ওপর চোখ রেখে বললে, কিন্তু উনি ত খুব ভাল করে দেখলেন আমাকে।'

'আজ শুক্কুরবার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কাল শনি,' প্রিন্সিপাল বললেন, 'সোমবার থেকে আপনার তিন সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর হল।'

'দু'মাস হবে না?'

'না।'

'ডাক্তার ত বলেছিলেন অন্তত মাস ছয়েকের বিশ্রাম চাই—'

'টাকা দিলেই সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় ওরা। ওদের আর কী। গান্ধীকে রেখেছে রামের চটিজোড়ার মত। তিনি বড় জোর সোদপুর অবদি আসবেন, এখানে এসে চেলার কীর্তি ফাঁস করবার সময় কোথায় তাঁর?'

বিনয়তোষ এক মিনিটের জন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বললে, 'সেই দুঃখেই ত গান্ধী নিজে পারেন না আর, চেলারা সব গান্ধীটুপি এঁটে বেড়ায়।' 'না, মহেন্দ্র ঘোষাল গান্ধী ক্যাপ পরেন না,' সিদ্ধার্থ বললে।

'ক্যাপ নানারকম আছে, তারি একটা পরেন আর কী।' বিনয়তোষ একটা নধর ইঙ্গিত করে প্রিন্সিপালের দিকে তাকিয়ে বললে। মিহি জিনিসটার থেই ধরে প্রিন্সিপাল একটু ঘাড় নাচিয়ে বললেন, 'সব ক্যাপ মাথায় আঁটতে হয় না আবার।'

হো হো করে হেসে উঠল বিনযতোষ, পাশে দাঁড়িয়ে কুঞ্জ কেরানি ঠোঁটে দাঁতে হাসির একফোঁটা শালিমারের বার্নিশ লাগিয়ে টেবিলের ওপর প্রিন্সিপালের দরকারি কাগজপত্র গুছিয়ে যেতে লাগল।

না, আর কোনো কথা নয়, প্রিন্সিপাল ইস্কাপনের টেক্কা সেঁটেছেন, ফাইনাল বেলও পড়ল, হুট করে বেরিয়ে গেল বিনয়তোষ।

'ঐ তিন সপ্তাহের ছুটিই পাবেন সিদ্ধার্থবাবু।'

সিদ্ধার্থ উঠবে ভাবছিল। তবে প্রিন্সিপালের সঙ্গে দু–একটা কথা আছে তার, ছুটির বিষয়ে নয়, অন্য বিষয়ে। প্রিন্সিপাল কাগজপত্র দেখছিলেন, কুঞ্জ কেরানি দরকার মত এগিয়ে দিচ্ছিল, গুছিয়ে রাখছিল। একেই বোধহয় প্রমোশন দিয়ে রাজীব বাবুর জায়গায় বহাল করা হয়েছে। রাজীব বাবু সাসপেণ্ড হয়েই রইলেন? ভাবতে–ভাবতে সিদ্ধার্থ অন্য কি সব বিষয়ের ভেতব ডুবে গিয়েছিল, ভুরু কুঁচকে প্রিন্সিপালের ঘরের মেঝের দিকে তাকিযে। হুঁশ হল সিদ্ধার্থের।

'আপনি আমাকে ডেকেছেন?' রমা বললে।

'হ্যাঁ, ডেকেছি, বসো।' প্রিন্সিপাল ফাইলের থেকে চোখ তুলে আড়চোখে একবাব রমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন।

'দপ্তরী তোমাকে গিয়ে শ্লিপ দিযেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'সেই কলেজের ঝিলের কাছে, পানফলের কাছে, পানফলের ঝিল ত ওটা, কিন্তু পানফলগুলোব কিনারা দিয়ে ফলেছে, একটা বড় দিঘির মত অটেল জল ত রয়েছে ঝিলে? না?'

'হ্যাঁ, খুব জল, কলকাতার লেকেব মতন' বলতে–বলতে রমা বললে 'লেকেব চেয়ে ঢের বেশি।'

'বুনো হাঁস এসে পড়ে কখনো ঝিলের জলে?'

'পড়ে দেখেছি অনেক সময়ই ত। কিন্তু কলেজের এদিককার ঝিলে বেশি আসে না। এদিকে লোকজনদের সারাশব্দ। এ ঝিলটাব পরে পরে আরো দু–তিনটি ঝিল রয়েছে, একেবারে মাঠজঙ্গলের ভেতর গিয়ে পড়েছে, সেখানেই জমে গিযে বালিহাঁসগুলো।'

'একদিন শিকার করব ভাবছি—'

'কে, আপনি?'

'কালেক্টর সাহেব, লোচনবাবু, অমিয সেন, অরুণ সেন—অমিয় আর অরুণ ত দু'টো খাটাশ, কাঁচা হাঁস চিবিয়ে খেতে পারে। শুনেছি আমি সরে গেলে অমিয সেনকে প্রিন্সিপাল করা হবে, তারপরে অরুণ সেনকে। দু'টো খাটাশ।' প্রিন্সিপাল দাঁত দিয়ে গভর্নিং বডির মেম্বাব লোচন কবিরাজেব ঘাড়ের হাড় যেন ছিবড়ে করে ফেলে বললেন, 'যাক, আমার দলে আছে ওরা সব এখনো। ওদেব নিয়ে একদিন শিকারে যেতে হবে, কালেক্টর বলছেন তার বন্দুকে মরচে পড়ে যাচ্ছে।'

'আজ ত শুক্কুরবার।

'তুমি বালিহাঁসের মাংস খেতে ভালোবাস?' রমা প্রিন্সিপালের ঘরের দেয়ালের ম্যাপটার দিকে তাকিয়েছিল। ম্যাপের ভেতর গোটা বাংলা দেশকেই পাকিস্তানের ভেতর ধরা হয়েছে, আসামকেও। প্রিন্সিপাল একটা কথা জিজ্ঞেস করে উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করেছেন—সিদ্ধার্থদাকে হয়ত কিংবা কুঞ্জবাবুকে—কিন্তু কেউই কোনো কথা বলছে না। রমা বললে, 'আপনি স্লিপে লিখে দিয়েছিলেন যে আজ শুক্কুরবার অনার্স ক্লাশ নেবেন না।'

'অমিয় সেন অরুণ সেন এদের কলকাতায়ই মানায়, মাড়োয়াড়িদের চিনি আর টেক্‌সটাইলের কারবারে, কলেজের টেকসটে নয়, ওরা প্রিন্সিপাল হতে চাচ্ছে, শুনেছ কুঞ্জ?'

'বাসতমতী কলেজের?'

'লোচন করবেজ যায়নি অবিশ্যি এখনো এদের দিকে-তবে যেতে পারে। কালেক্টার আমার দিকে আছেন, তবে ইনি ত আই-সি-এস, বেন্দাবনে এর কতদিন থাকবেন? রমা—'

'আজ্ঞে—' 'মেয়েদের বলে দিয়েছ যে শুক্কুরবাবের অনার্স ক্লাশ আমি নেব না।'

'সে ক্লাশ ত কোনোদিনই হচ্ছে না।'

প্রিন্সিপাল একটু মুখ লজ্জা করে, একটা পয়সা বেশ টাইট হয়ে এঁটে থাকতে পারে ঠোঁট দু'টোকে তেমনি আঁট গোল করে নিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে কামানো গাল আস্তে চুলকে নিতে-নিতে বললেন, 'সিদ্ধার্থবাবুর বইটা শেষ হয়েছে তোমাদের ক্লাশে?'

'হ্যাঁ, রিভিশনও ত প্রায় হয়ে এল।'

'তা বেশ হল। উনি ছুটি নিচ্ছেন তিন হপ্তার। ওর সেই অনার্স ক্লশগুলো আমি নেব। বানেয়ান নেব,—কিছু হয় নি বুঝি বানিযানের? না দু চারটে কবিতা পড়িয়েছিলাম? মেয়েদের নেব, আমার ঘরে। কবে-কবে সেন মশায়ের ক্লাশ সেটা টাইম-টেবিল থেকে দেখে নেব আমি। নোটিশ দেব তোমাদের। তবে তোমাকেও বলে রাখলাম—তুমি জানিয়ে দিও সবাইকে।' রমা কোন কথা বললে না। ও, এরই জন্য-প্রিন্সিপাল ডেকেছিলেন বুঝি তাকে—খুব শখের ডাক ত তাহলে বলতে হবে। সিদ্ধার্থদা ছুটি নিচ্ছে, কেন? কোথাও যাবে নাকি? কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে গেল না সিদ্ধার্থকে রমা।

'সুমিতা নার্স ক্লাসে আসছে শুনলাম।'

হ্যাঁ, আসছে আবার।'

'বাসনাও আসছে।'

'সেও আসছে আজকাল।'

'এই ত ভরে উঠছে আবাব কলেজ,' প্রিন্সিপাল বাঁ চোখ টিপে রমাব দিকে, পবে নিপাতনে সিদ্ধ হিসেবে সিদ্ধার্থর দিকে, তাকিযে একটু ঠোঁট দাঁতে খুশি হযে হেসে বললেন, 'এদের সবাইকে দিয়ে আমি অনার্স পাওযাব। ঋক এসেছে?'

'না'

'আছে বাসমতীতে?'

'আছে।'

'আসে টাসে কলেজে?'

'হ্যাঁ, পাশ পবীক্ষাটা দেবে।'

'অনার্স পেত ঋক,' প্রিন্সিপাল বললেন, 'কি মনে কবেন সেন?'

'বলতে পাবি না—আমি ওব একসারসাইজ দেখিনি কখনো।'

'উঠি তাহলে' রমা বললে।

'রাজীব বাবু তোমাদেব বাড়িতে গিযেছিল?'

'হ্যাঁ, গিযেছিলেন, ও মাসের শেষের দিকে।'

'তার সঙ্গে কথা হয়েছিল?'

'কী কথা?'

'তাকে ত আমি সাসপেণ্ড কবেছি।'

'শুনেছি।'

সিদ্ধার্থ বললে,'রাজীব বাবুকে আপনি বিশ্রাম দিয়েছেন বুঝি, পবে মাইনেটা পাইযে দেবেন? কিন্তু এবকম মনের উদ্বেগে কি ওর ঠিক মতন বিশ্রাম হবে?'

সূচীপত্রে যান

'সাসপেণ্ড করা মানে ত বিশ্রাম দেয়া নয়,' সিদ্ধার্থর দিকে ফিরে একবার সাঁ করে তাকিয়ে প্রিন্সিপাল বললেন। রমার দিকে ফিরে বললেন, 'রাজীব বাবু তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কী বলেছিলেন তোমাকে?'

'মনটা একটু তাড়াতাড়ি নড়ছিল প্রিন্সিপালের, ধীবেসুস্থে কথাবার্তা হবে না হয়ত এখন, রমা কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন, শুধু বিবৃতি দিলেন যে সাসপেণ্ড হয়েছেন?'

'সেটা বললেন আমাদের।'

প্রিন্সিপাল গাল চুলকে গালের একটা ছোট্ট আঁচিলে ঠেকে গিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, 'শুধু বললেন বুঝি? এরই জন্যে রাত করে দানাপুর থেকে জিরানডাঙায় গেলেন, একটা হ্যারিকেন হাতে করে রাত একটার সময় ঢ্যান ঢ্যান করতে-করতে বাড়ি ফিরলেন? প্রভাসবাবুর কাছ থেকে একটা চুরুট ঝাড়বার জন্যে শুধু?'

'কে বললে আপনাকে?'

'কেন রাজীব বাবু নিজে বলতে পারেন না।'

'আমি সেটা বিশ্বাস করি না।'

এক ডাকেই সেরে দিল রমা? প্রিন্সিপালের সঙ্গে একটু ভদ্রতা রেখে অন্তত কথা বলতে হয় ভাবছিলেন মজুমদার সাহেব। কিন্তু গায়ে মাখতে চাইলেন না তিনি এই বিশেষ মেয়েটির সম্পর্কে।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ত হচ্ছে না । একজন গরিব মানুষ বিপাকে পড়ে গেছেন। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমাদের এখানে এসে রমা যদি মুখে বলে যায় যে দরখাস্তটা দিয়ে পরদিনই রাজীব বাবুকে সে-ই নিষেধ করেছিল দরখাস্তটা আমাব কাছে পেশ করতে, ব্যস তাহলেই হয়ে যায় সব, রাজীব বাবুকে আমি কাজে বহাল করি।'

সিদ্ধার্থ ব্যাপারটার সূত্র ধরতে পারছিল না। ঘটনাটা পুরোপুরি কেউ তার কাছে বলেনি, সিকিটাক শুনেছিল হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে, কিন্তু জানাশোনার দিক দিয়ে সেটা কিছু নয়, জানবার জন্যে কাউকে সে জিজ্ঞেস কবতেও যায়নি এতদিন। প্রিন্সিপাল একটা দরখাস্তেব কথা বলছেন—বমা দরখাস্ত কবেছিল? দবখাস্তটা প্রিন্সিপালেব কাছে পেশ করতে রাজীব-বাবুকে নিষেধ করেছিল বমা—বলেছেন প্রিন্সিপাল এই রকমই হয়েছিল সত্যি? ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াল তবে? রাজীব বাবু পর্যন্ত সাসপেণ্ড হয়ে গেলেন—কী হল? রমার দিকে একটু বুঝতে জানতে চাইবার মত চোখ কবে তাকাল সিদ্ধার্থ। কিন্তু দেয়ালেব টাইম-টেবলটার দিকে একবার, মানচিত্রটাব দিকে একবার, তাকচ্ছিল রমা—সিদ্ধার্থের দিকে একবারও নয়।

'অমিয় সেন, অরুণ সেন, গঙ্গানারাযণ মৈত্র, ত্রিদিব পাঠক আব আমি থাকব, এই আমারই ঘবে। তুমি একটা দিন-তারিখ ঠিক কবে দাও সন্ধেব পরে, সেদিনই এসে বসব আমরা এখানে। আমবা গাড়ি পাঠিযে দেব জিরানডাঙায়। গাড়িতে কুঞ্জ থাকবে, বিনযতোষও থাকতে পাবে। তুমি এখানে এসেই আমাদের বলে যাবে শুধু যে রাজীব বাবুকে দরখাস্ত দিযে পরদিন তুমিই নিষেধ করেছিলে দরখাস্তটা আমাব কাছে পাঠিযেয দিতে।'

'সে কথা ত সেদিনই বলেছি আপনাকে আমি।'

'বলেছ বটে,' প্রিন্সিপাল দেবাজেব থেকে একটা সিগাবেটের টিন বের কবে বললেন, 'আমার কাছে বলেছ, আমি ত কলেজের সব নয়, কিন্তু আমি আর ওরা চারজন এই সমবাযটাই কলেজের সব। লোচনবাবু এলে পারতেন—কিন্তু তার নাকি সিফিলিস হয়েছে মনে কবে বড্ড ভয পেযেছেন —আজকালই কলকাতায চলে যাবেন।'

রমা উঠে চলে যেত, কিন্তু রাজীব বাবুর কথা মনে করে বসে ছিল। বললে, আর যা বলার রাজীব বাবু আর আপনাকে বলা হয়ে গেছে সবই।

'প্রিন্সিপাল টিনেব ভেতর থেকে একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে বললে, 'তা ত হয়েছে। কিন্তু এটা হবে এখন সর্বসমক্ষে সীতার অগ্নিপবীক্ষার মতন।'

'বসো রমা,' সিদ্ধার্থ বললে।

কেন, ওঠবার উপক্রম করছিল নাকি সে, প্রিন্সিপালের কথার কোনো একটা রুচিসম্মত কিনারা না করে? এখন সিদ্ধার্থের কথায় বসল বুঝি, সিগাবেটটা মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে রেখে মনে হল স্নেহ সমীচিন দৃষ্টিতে তাকিযে ওজন করে দেখছেন তিনি দু'জনেরই দিকে।

'আমি কিছু বলতে পারব না।'

'কমিটিতে কালেক্টর থাকবেন, খুব সাধুপুরুষ তিনি যেতে পারবে না সেখানে?

'আমি ক্ষমা চাচ্ছি।'

প্রিন্সিপাল সিগারেট জ্বালবার আগে দেশলাইটা বার করে বললেন, 'তাহলে যা হয়েছিল, করেছিল, উল্লেখ করে অল্প কথায় একটা দরখাস্ত লিখে সই করে আমাকে দিয়ে দাও।'

'রাজীব বাবুও বলেছিলেন দরখাস্ত দিতে, কিন্তু আমি সম্মত হতে পারিনি।' সিগারেটের টিনের ঢাকনিটা খোলা ছিল, প্রিন্সিপাল আস্তে-আস্তে সেটা এঁটে ফেললেন। ডান হাতের সিগারেটটা দুই আঙুলের ফাঁকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে আড়াআড়ি ভাবে রেখে বললেন, 'তাহলে রাজীব বাবুকে ত কাজে বহাল করতে পারি না আমি।'

'উঠি।' রমা বললে।

'কিন্তু এ-সম্পর্কে তোমার নিজের কিছু করবার নেই আর?'

'আছে। আমার দোষেই ত তিনি এত বেশি মুস্কিলে পড়লেন। সীমারা যাতে খেতে পরতে পায় সেটা দেখতে হবে।'

'কী করে দেখবে? চাঁদা তুলে?'

'না। চাঁদাটাদা ওরা নেবেন না,' রমা উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপালের জামার বোতামের দিকে তাকিয়ে বললে, 'উনি অনেক দিনের অভিজ্ঞ ভাল কেরানি। বাসমতী কলেজ ওকে ছাড়িয়ে দিলে অন্য কোথাও চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে কি না—সকলে মিলে দেখা যাবে।'

'সকলে? কারা?'

'অনেক কথা বললাম আপনার সঙ্গে' রমা হেসে ফেলে বললে।

'চাকুরি কি এত সহজেই পাওয়া যায় আজকাল?'

'আচ্ছা চলি, কিছু মনে করবেন না' এতক্ষণের ভেতর শুধু এই একবার প্রিন্সিপালের সরস আতুর চোখের দিকে নয়, কিন্তু তার প্রৌঢ়, কামানো মিয়োনো, জোবালো মুখের দিকে তাকাল রমা। এতক্ষণ জামার বোতাম তসরের কোট, বড় জোর নেকটাইয়ের দিকে, মেঝের দিকে, দেয়ালের দিকে টেবিলের কাঁচের ঢাকনি, দরজা, জানালা, ফ্যান, স্কাইলাটের আলোর দিকে তাকিয়েছে। খুব ক্ষমাগম্ভীরতায় পরিতৃপ্ত হয়ে তাকিয়ে রমা বললে, 'আমাদের দোষ মনে করে রাখবার মতন কিছু নয়, এ-রকম একটা মস্ত কলেজের কত রকম বড়-বড় ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় আপনাকে। যাবে নাকি সিদ্ধার্থদা?'

'এখুনি যাব না। আমার কাজ আছে।' সিদ্ধার্থ বললে।

'ওঁর সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'ছুটি নিয়েছ শুনলাম।'

'নিয়েছি তিন সপ্তাহের।'

'কোথাও যাবে নাকি?'

'বালিসড়কের দিকটা কেমন—সমুদ্রের দিক?'

'যাইনি কোনোদিন, স্টিমার যায় খানিকটা দূর, তারপরে শুনেছি নৌকোয় যেতে হয়।'

'তুমি ক্যানিঙ হস্টেলে এসেছ বুঝি?'

'না শালিখডাঙায়ই আছি। যাবে নাকি সমুদ্রের দিকে?'

'দেখি।' সিদ্ধার্থ বললে।

'কী কাজ আপনার?' রমা চলে গেলে সিদ্ধার্থকে প্রিন্সিপাল বললেন, 'এ-মেয়েটাকে ভাল করে চেনেন দেখছি।'

'ওরই জন্য রাজীব বাবুর চাকরি গেল?'

'শুনলেন ত। কিছু করতে চাচ্ছে না রমা।'

'দেখছি ত,' সিদ্ধার্থ বললে, 'আমাদের কলেজের লুক্রেসিয়াসের কবিতা এসেছে নাকি শুনলাম।'

'কে বললে?' প্রিন্সিপাল একটু কঠিন ভাবে সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে বললে। হয়ত রমা বলেছে সিদ্ধার্থকে? এর সম্পর্কে মেয়েটির মনের খানিকটা দ্রবতা যেন দেখা গেল।

'না, কেউ বলেনি। আমি লাইব্রেরির নতুন ক্যাটালগটা নাড়ছিলুম, নতুন বই কী কী এল দেখছিলুম—'

লুক্রেসিয়াস এসেছে। আছে আমার কাছে।'

'এই ছুটির তিন সপ্তাহের জন্যে বইটা আমাকে একটু দিতে পারবেন?'

সূচীপত্রে যান

'এখুনি বলতে পারছি না আমি,প্রিন্সিপাল বললেন। ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি রমাকেও ত বলা হয়নি যে তার মহারোমান এত তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। কিন্তু রমা সরে যাচ্ছে যেন, এই সেদিনও যা ছিল, আজ তা নেই। কেন নেই তা তিনি জানেন বটে; কিন্তু কী করা যায়, ব্যাপারটা রমা আর রাজীব বাবুর হাতে ফেলে রাখলে—অমিয় সেনের কানে যদি একবার যেত কিংবা অরুণ সেনের কানে, তাহলে লোচন কোবরেজের সঙ্গে মিলে এই সামান্য একটা ছুতো নিয়ে মাইনোটরকে জন্ম দেবার আগে জুপিটারের ষণ্ড-অবতার না হয়ে ছাড়ত নাকি স্নেন ব্রাদার্স? উপমাটা গ্রীক হয়ে গেল, ভাবছিলেন প্রিন্সিপাল, আর, এই লুক্রেসিয়াস রোমান। বেশি কিছুদিন ছুটি নিয়ে মহাভারত না হোক, অন্তত উপনিষদগুলো পড়া দরকার। কিছুই করতে পারত না হয়ত কিন্তু কোনোরকম ছিদ্রটিদ্র না রেখে দেয়াই ভাল। রমাও ত প্রথমে চটে গিয়েছিল রাজীব বাবুর ওপর ভদ্রলোকের গাফিলতির নচ্ছার কারবারটা দেখে, তারপরে সীমার বাবাকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যা কথা বললে। হৃদয় আছে রমার, কিংবা ছেলেমানুষি আবেগ। কিন্তু রাজীব বাবুর যখন খুব বেশি দরকার তখন নিজেরই মিথ্যার মুখোমুখি দ্বিতীয়বার দাঁড়াতে কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না রমাকে। আমি তার প্রথম মিথ্যাটাকে বিশ্বাস করেছি ভান করেছিলাম, আমার সেই ভান ধরতে পেরে আগের সেই আবেগের ছেলেমানুষটি কিছুই নেই এখন আর তার—আমার সম্পর্কে নেই। কিন্তু ভাল হচ্ছে রমার, শুক্তির ভেতরের জিনিসটা ক্রমেই কঠিন হচ্ছে, যতই মড়া খোলাটা আমার চোখের দিকে ফিরিয়ে রাখছে ঠিক সে-অনুপাতেই মুক্তোর উজ্জ্বলতাটা অন্য কারো দিকে। এরও একটা বিহিত করা দরকার। এ মেয়ের সঙ্গে হৃদ্যতার একটা শেষ ভূমিতে গিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন রয়েছে জীবনে।

'লুক্রেসিয়াস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওটা আমি পড়ছি। আমিই আনিয়েছি বইটা। ওটা আপনাকে দিতে পারব না আমি।'

সিদ্ধার্থ চলে গেল।

দশ-পনের মিনিট পরে সিদ্ধার্থের খোঁজে এই ঘবে রমা ঢুকল আবার। প্রিন্সিপাল ফাইল নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

'প্রফেসর সেন কি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ। লুক্রেসিয়াস এসেছে। তোমাকে বলতে মনে ছিল না আমাব।' রমার দাঁড়াবার কোনো কথা ছিল না, দাঁড়িয়ে থাকত না, এখুনি চলে যেত কিন্তু—

'লুক্রেসিয়াস?'

'হ্যাঁ, পাওয়া গেল বইটা, কয়েকদিন হল এসেছে আজও কলেজে নিয়ে এসেছি বোজকাব মত, কিন্তু পড়বার সময় পাচ্ছি না, বলতে-বলতে টেবিলের কিনাবের চামড়া সুটকেশটার ডালা তুলে প্রিন্সিপাল বললেন, 'তোমাকে দিচ্ছি বইটা, পড়ে কেমন লাগল আমাকে বলবে। বসো।'

বইটা হাতে তুলে নিয়ে রমা বললে, 'এখুনি চলে যেতে হবে আমাকে।'

'তাড়া নেই। আমার গাড়িতে পৌঁছে দেব তোমাকে।'

'অনেক জায়গায় যেতে হবে ত আমার। সে সব জায়গায় আপনাব গাড়ি না গেলেই ভাল।'

প্রিন্সিপাল রমার শাড়ির ভাঁজেব থেকে বেরনো হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার গাড়িতে চড়তে মন ওঠে না তোমাব।'

'এই বইটা নিয়ে যাচ্ছি আমি, ফিবিয়ে দিতে একটু দেবি হবে।'

প্রিন্সিপালেরও যে ব্লাডপেসার নেই তা নয়, সিদ্ধার্থেব মত লো নয়, সরিৎ মুখুয্যের মত হাইও নয়, কিন্তু কেমন যেন অবসাদের মত একটা জিনিস, কিছু নেই, কিছু নয়, বাসমতী কলেজটা অমিয সেনেব, নিজেব স্ত্রীও পরের জিনিস, আর পবীকীয বলে যা মনে করছেন তা—

'এখুনি বইটা নেবে?' একটা মস্ত বড় মাটিব জালার ভেতব খেলাচ্ছলে ঢুকে বেরবার কোনো পথ না পেয়ে শিশুর মত মাকে ডাকছেন যেন তিনি, নিজেব গলার স্বর শুনে মনে হল তাঁর চুয়ান্ন বছব আগে শিশুকালে এ-রকম হত ত তাঁর। আটমণি দশমণি মটকির ভেতর কেমন একটা নিরেট কৌতুকে ঢুকে পড়তেন তিনি, বেরুনো যেত না আর, মা নিজে না এলে, মাঝে-মাঝে কিছুতেই আসতেন না তিনি।

'বইটা নিয়ে যাই?'

'নাও। আমি ঘমিয়ে পড়েছিলাম?'

'কী যেন ভাবছিলেন চোখ বুজে।'

'ও, সেই জালার কথা,' প্রিন্সিপাল বললেন, 'মনে হচ্ছিল নিজেরই দোষে ভেতরে ঢুকে গেছি কিন্তু বেরুতে পারছিনা আর।'

রমা ধরতে পারল না প্রিন্সিপালের কথা, কী বলছেন তিনি?

'তারপর মা এসে আমাকে বাঁচাতেন। মার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান ঢের বেশি ছিল। যখন বড় হলাম, ওরকম পার্থক্যটা কমে গেল, স্ত্রী এলেন। কিন্তু মা যেমন মাটির জালার ভেতর থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারতেন—'

'বুঝেছি এখন জালার কথা; আটমণ দশমণ জালার কথা বলছেন—ও—' রমা বললে, 'দেখেছি আমি। আমিও নেমে যেতাম ও-সবের ভেতর।'

'তারপর?'

'তাবপর বড় ফাপড়ে হত।'

'কিন্তু সেটা ত বেশিক্ষণ টিকত না—একজন লোক ত শেষ পর্যন্ত এসেই পড়ত।'

'হ্যাঁ, তা আসত।'

'সব সময়ই সেই একই একজন।'

'হ্যাঁ—প্রাযই তিনি।'

'আমিও তাই বলছিলাম। বমা—'

বিনয়তোষ ঢুকে পড়ল।

রমা চলে গেল—সিদ্ধার্থকে এই কবিতাব বইটা পড়াবে, আজই বাতে, সেন যদি জিরানডাঙায় আসে, তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে—এখুনি বালিসড়কের সমুদ্রের দিকে রওনা না-দিলে হয়!

অন্ধকার হয়ে আসছিল; আলো দেয়া হযনি এখনো; মশা ওড়াওড়ি করছিল—তবে খুব বেশি নয়, মাঝে মাঝে আস্তে চড়চাপড় মাবছিল গালে হাতে দাবনায, খুব জোবে ঠাশ করে চড় মেরে মশা মারবার দিকে রুচি ছিল না কারো।

সিদ্ধার্থেব সরোজিনী পিশিমা বললেন, 'তুমি কি মনে কব টিনি যে ব্রাহ্ম সমাজের কাজ সত্যিই ফুরিযে গেছে আমাদের দেশে?'

টিনি বললে,'না, তা কী কবে হয।'

সিদ্ধার্থের ছাতু কাকা বললে,'কোনো ভাল মানুষেব কাজ কি কখনো ফুরোয, তবে জোব কমে আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

তাই তুমি মনে কবো ছাতু?'

'আমাব ত তাই মনে হচ্ছে,' ছাতু কাকা বললে,'আলো দেবে না টিনি।'

'দিচ্ছি, কিন্তু আপনি ত খুব নিরাশার কথা বলছেন ছাতুবাবু।'

'ছাতু কাকাব কানের ওপরে একটা মশা বসেছে, সুড়সুড়ি লাগছিল, তারপরে আস্তে আলপিনের খোঁচার মত হুল ফুটিযে দিতেই সাঁ করে ডান হাত তুলে ওটাকে পালাতে না দিযে সট করে ঘষে ফেলবার চেষ্টা করে ছাতু কাকা বললে, 'কই ব্রাহ্মসমাজে আজকাল লোকজন যায কোথায? দেখি না ত কাউকে যেতে।' পিষে মেরে ফেলবার আগেই মশাটা পালিযে গেছে টেব পেল ছাতু কাকা।

'আপনি নিজে ত নিযমমত যাচ্ছেন না ছাতুবাবু।'

'হ্যাঁ, আমি ফি বোববাব দুবেলাই যাই। সব অনুষ্ঠানেই যেতে হয আমাকে। তাগিদ বোধ করি আমি। সমাজের ঘবদোব পরিস্কাব থাকছে কিনা—মালিকে দিযে কাজ করিযে নিতে, সমাজের লাইব্রেরির বইগুলো গুছিযে মিলিযে ঠিক করে রাখতে আমি রোজই যাই। কিন্তু সবোজিনীদি, টিনি মজুমদার, হিতেনবাবু, গগনবাবু, কখনো সুকুমার ছোকবা, আর সমাজেব উড়ে মালি, এই নিয়েই কি একটা সমাজ হয—'

'হচ্ছে ত, চলছে ত,' সরোজিনী পিশিমা বললেন,'আমাদের এ আলো জ্বালিয়ে রাখতেই হবে।

টিনি বললে, 'আমরা যতদিন আছি, এ বাতি নেভাতে দেব না। মনে পড়ে পনের-কুড়ি বছর আগেও ওঁরা সব যখন বেঁচেছিলেন, কী সব দিন গিয়েছে সমাজেব, ভিড় করে ভেঙে পড়ত বাসমতীর লোকজন দেবব্রতবাবুব এগারই মাঘের সার্মন শোনবার জন্যে। কী গান হত সব—ব্রাহ্মসঙ্গীতের সত্যেন ঠাকুর ছিলেন দ্বিজেন ঠাকুর, ত্রৈলোক্য সান্যাল শাস্ত্রী মশাযের।'

'আবার ফিরে আসবে টিনি।' সরোজিনী পিশিমা এই সত্তর বছর বয়সে এখন আর অসাধ্য-সাধনে খুব সম্ভব বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তবুও নিজেকে নিবেদন করে বিশ্বাস করবার একটা প্রবৃত্তি বাঁচিয়ে রাখতে চান। কে জানে যা দুঃসাধ্য বলে মনে করা যায় তা সম্ভব হতেও পারে। দেবব্রতবাবু সোমনাথ মুখুয্যে, বড় কমল বাবু, ছোট কমল বাবু, অবিনাশ গুপ্ত মশাই,চক্রবর্তী মশাই—এঁরা কেউ নেই যদিও আজ তবুও পঁচিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর পরে এদের উদয় হতে পারে ত এই দেশে আবার? যে-জিনিস শুধু মানুষের এ-লোক ও-লোকের জন্যে বাস্তব ও সারাৎসার, যেমন ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ও ব্রাহ্মসমাজ, তা মাঝে-মাঝে অসাড় আবছা যুগের প্রভাবে পড়ে মরে গেছে বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা মরেনি, আছে, ভবিষ্যতের জন্যে প্রাণ আলো সফলতা সঞ্চয় করেছে, আজকের জন্যে টিনি মজুমদার হিতেন বাবু গগন বাবু সরোজিনী পিশিমার নিজের বুকে-,এমন-কি,ছাতুর ভেতরেও, আশা, পদার্থের মত আছে—বেঁচে রয়েছে—ভাবছিলেন সরোজিনী।

'আছে সব।' সরোজিনী বললেন।

'আছে বটে—কিন্তু আমাদের স্মৃতির ভেতর।' টিনি বললে স্মৃতির কথাই পাড়তে গেল আবার টিনি, কেমন চমৎকার গান করতেন বড় কমল বাবু, দেববাবুর উপাসনা আরাধনা, সার্মনের পর এরকম ভাল জিনিস টিনি আর দেখেনি কোথাও, সত্যিই পায়নি কোথাও, কলকাতায় পাটনায় ঢাকা আসামে. অথবা বাসমতীর পৃথিবীতে।

'বড় কমলবাবুর গান! কী যে মনে করিয়ে দিলে তুমি আমাকে টিনি। তিনি রবি বাবুর গান গাইতে পারতেন না বটে, কিন্তু রামলোচন, দ্বিজেন ঠাকুর, সত্যেন ঠাকুর, ত্রৈলোক্য সান্যাল, অন্নদা চাটুয্যে, বেচারাম চাটুয্যের গান কীই যে গাইতেন তিনি-মনে হত সৃষ্টি যে নাদ তৈরি করেছিল সব চেয়ে প্রথমে, যার চেয়ে স্বাভাবিক শুদ্ধ জিনিস কিছুই আর হতে পারে না। বড় কমলবাবুর গলা সেইখানে গিয়ে মিশেছে, এক হয়ে গেছে তার সঙ্গে।'

'ক্রমেই আরো শুদ্ধ হলেন উনি,' অন্ধকারের ভেতর হিতেন বাবু বললেন। হিতেনবাবুর বয়স চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি হবে, কিন্তু বয়স আন্দাজে বুড়িয়ে যাননি বিশেষ কিছু তেমন, সরোজিনীকে কখনো সরোজিনীদি কখনো শুধু সরোজিনী বলেই ডাকেন, প্রায়ই 'আপনি' বলেন, মাঝে-মাঝে এক আধবার 'তুমি' বলে না যে ডেকে ফেলেন তা নয়, নিজের ইচ্ছায় খুব সম্ভব নয়, কথা বলতে-বলতে এমনিই, দু'জনেরই বয়স যা হয়েছে তাতে এরকম ধরনের সব ব্যবধান স্বভাবতই ঘুচে যায়, হিতেনবাবু সে-রকম নয়।

'আপনি সৃষ্টির প্রথম নাদের কথা বলেছেন সরোজিনীদি, সৃষ্টির না বলে ঈশ্বরেরই সৃষ্টি প্রথম নাদ এও বলতে পারতেন, সে জিনিসের চেয়ে,'হিতেন বাবু বললেন, 'বেশি শুদ্ধ কোনো জিনিস থাকতে পারে না আর? তা নেই। তবুও বড় কমলবাবুর গান শেষের দিকে আগের চেয়েও বেশি সাত্ত্বিক, কেমন একটা শিখার মত হয়ে উঠেছে মনে হত না আপনার সরোজিনীদি? কী বলো তুমি টিনি?'

'সাত্ত্বিক বলছেন আপনি? সাত্ত্বিক বললে জিনিসটার ঠিক চেহারা দেয়া হল না,' টিনি বললে,'ভাল হিন্দু বিধবাদের চানটানের শেষে একাদশীর ভোরবেলার মুখখানির কথা মনে পড়ে। না,তা নয়, বড় কমল বাবু ক্রমেই আরো ব্রহ্মনিষ্ঠ হচ্ছিলেন, গান ধরলেই সেটা মাসিমার মত উপাসিকা—আমার মত ব্রাহ্মিকা, উপাসকমণ্ডলী হঠাৎ যেন একেবারে ভেতরের রসে ডুবে গিয়ে টের পেত।'

'শরবৎ তন্ময়ো ভাব—উপনিষদ বলছেন,' সরোজিনী পায়ের দিকে মশা কামড়াচ্ছে টের পেয়ে এক পায়ের ফাটা চামড়ার গুড়ুলি দিয়ে আর এক পা বগড়ে ঘষে বেশ ভাল শুকনো ধুন্দুলখোলের কাজ হচ্ছে অনুভব করতে করতে খানিকটা আরাম পেয়ে বললেন,'কিন্তু আমরা ব্রাহ্মসমাজের ক'জন মানুষই বা আর ধনুকের তীরের মত বিঁধে লেগে থাকতে পারি পরব্রহ্মের দিনরাতের সত্য প্রকাশের ভেতর। কিন্তু, হিতেন বাবু,—আমার মনে হয় বড় কমলা বাবু সেটা পারছিলেন শেষের দিকে।'

'কিন্তু তিনি ত শেষের দিকে কীর্তনই গাইতেন শুধু' বললেন গগন বাবু. ছাপান্ন বছর বয়স হয়েছে তার, হাতের চুরুটটা নামিয়ে। চুরুটটা নিভে গেছে অনেকক্ষণ হয়।

'এ ঘরে একটা আলো দিলে হত,' সরোজিনী পিশিমা বললেন। 'দিচ্ছি,' টিনি মজুমদার ওঠবার উপক্রম করে বললে। কিন্তু কীর্তন সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার মনে করে গগনবাবুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ- হাতে যেখানে চুলকুনিগুলো, বোরিক পাউডার শুকিয়ে এসেছে প্রায় মশাটা সেইখানেই বসে পড়েছে টের পেয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে চুলকুনির জায়গাটা আস্তে-আস্তে ঘষতে ঘষতে অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

'ধুপকাঠিও জ্বালাতে হবে,' টিনি বললে।

সূচীপত্রে যান

'ধুপকাঠি ফাটি নয়, কিছু খাঁটি ধুপের ব্যবস্থা করতে পার?' সরোজিনী পিশিমা বললেন।

'ধুপ পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল বাসমতীতে—'

'কেন ধুপ কী হল, এ নিয়েও কালোবাজার?'

'চালান নেই হয়ত!'

'ধুপ কোথা থেকে আসে, জিনিসটা বলুন ত কি?' সবোজিনী পিশিমা হিতেন বাবুর দিকে কেমন যেন গুণীজ্ঞানী ভাইয়ের পিঠোপিঠি দিদির মত ব্যস্ত, ক্লান্ত, নির্ভবস্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন।

'বলতে পারছি না,' হিতেন বাবু ভুরু কুঁচকে হেসে বললেন।

'বড় কমলবাবুব কথা হচ্ছিল। ঘরটা বেশি অন্ধকার হয়ে পড়েছে, বাইরে চাঁদ বযেছে বটে—কিন্তু পঞ্চামী-ষষ্ঠীব চাঁদ হয়ত, বেশ ঝরঝবে কাস্তের মত ফলে উঠেছিল কিছুক্ষণ আগে, কিন্তু নানারকম মেঘের বহরে সমস্ত আকাশটা ঢাকা পড়ে গেছে এখন, পাটকিলে, মেটে, উনুনেব ছাইযেব মত আর রাশি রাশি নোংবা-লবণেব মত রঙের আকাশভবা পুরু মেঘের নিঃশব্দ নিরেট থানেব নীচে চাপা পড়ে গেছে চাঁদটা। আকাশে কোনো তাবা দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি হবে না,এ-সব মেঘ বৃষ্টির নয়,বর্ষার ঋতুও কেটে গেছে অনেক দিন আগে, বাতাস নেই, মেঘের চাপে গবম পড়েছে একটু,বেশ খানিকটা ঘোরঘোর ও কিছুটা থমথেমে হযে আছে বাসমতীর পৃথিবী।

'বড় কমলবাবু শেষেব দিকে কীর্তন গাইতেনই ত। ভক্তরা কখনো শুধু নিজেদের মুক্তিই চান না,' ছাতু কাকা বললে, 'যত জনকে পারা যায আলিঙ্গন কবে ঈশ্ববের দিকে নিযে যেতে চান। কাজেই কীর্তনের কাল স্বভাবতই এসে পড়ে তাদেব হৃদযে। খাম্বাজ, বেহাগ, পূববী, পলশ্রী, বাঁরোযা-ওসব হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত সাধনাব গান। কীর্তন সবাইকে নিযে। বড় কমল বাবু সাধনেব পথে ঢের এগিয়ে গিয়েছিলেন বলেই শেষের দিকে কীর্তন গাইতেন।,

'কীর্তনেব আধ্যাত্মিক সাধন ভজনেব হিসেব-নিকেশেব দিকটা সম্পর্কে ঠিকই বলেছেন আপনি ছাতু বাবু,' টিনি মজুমদার বললে, 'কিন্তু মাশিমা যে-নাদেব কথা বলছিলেন, আমাব মনে হয়ে, কীর্তনেই সেই প্রথম নাদ, মূল গায়েনেব গলাযই শুধু নয়, সমগ্র জিনিসটাব ভেতব, অন্য যে-নাদের কথা বলছিলেন, আমাব মনে হয, কীর্তনেই সেই প্রথম নাদ, মূল গায়েনেব গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন' তা কী করে হয।' চুরুটটা জ্বালিযে নেবেন কিনা ভাবছিলেন—এ ঘরে ঢুকে অবদি, চুরুটটা টানেন নি আব। সরোজিনীদি বা টিনি সিগাবেট খাওযা পছন্দ কবেন না, যে লোক সিগাবেট চুরুট খায তাব নীতিনিষ্ঠার অবনতি হযেছে সেটা হযত মনে কবেন না, কিন্তু কর্মসাধনাব দিকে উন্নতিব অন্তরায চুরুট-সিগাবেট নিশ্চযই এটা তাবা বোধ কবেন—সেজন্যেই গুণে গগন বাবুর সিগারেট খাওযাটাকে হাসিমুখে সহ্য করেন যদিও। না চুরুট চালবেন না গগন বাবু এখন আব, আলো জ্বালা হোক, ধুপকাঠি জ্বালানো হোক—বুঝেশুনে তখন দেখা যাবে। 'বড় কমলবাবু ববীন্দ্রনাথেব গান গাইলেন না,' গগনবাবু আজো এতদিন পরে খানিকটা তিতো চোখে এদিক-সেদিক তাকিযে হাঁপিযে উঠে দম নিতে নিতে বললেন।

'তাতে কী হল?' বিবক্ত হযে সবোজিনী পিশিমা বললেন, 'ঠাকুববাড়ির গান গাইতেই হবে এমন ত কোনো কথা নেই, বিশেষ কোনো কেন্দ্রীয কালচার-টালচারেও না। ব্রাহ্মসমাজকে কোনো কিছুর জন্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ির দিকে চেযে থাকতে হবে—এমন কথা বলবেন না। রবীন্দ্রনাথ ভাল গান লিখেছেন বটে, কিন্তু কেন আমাদের ব্রাহ্মসমাজেব লোকজনদেব সাধনাব কথাটা একজন মানুষেব গানের সঙ্গে আপনি জড়িযে ফেলছেন গগন বাবু?'

'আপনি নাদেব কথা বলছিলেন সরোজিনীদি,' হিতেন বাবু বললেন, 'কীর্তনে দোহার যারা গায তাদের ভেতবে না-হোক, আমি টেব পেযেছিলুম বড় কমলবাবুব গলাব কীর্তনেই সে জিনিস ধরা দিযেছিল, তার সঙ্গে যাবা দোহার গেযেছে কমলবাবুর তুলনায নিজেদেব অসাবতাব কথা ভেবে লজ্জা পেযেছে।'

'কে?' গগনবাবু বললেন?

'কীর্তন ত দশজনকে নিযে, সকলেই ত তাদের বড় কমল বাবু নন। অনেক ত ভাঙা কাঁসির গলা জুটত তার ভেতর, শুনেছি ত আমি। ঈশ্বরের সেই প্রথম নাদ—অন্য জিনিস। এই বাসমতী ব্রাহ্মসমাজে বিশ বছর বসে কীর্তন শুনলাম ত আমি। বড় কমল বাবু বুড়ো হয়ে গিযে কীর্তনে একটা নতুন তার এনেছিলেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় সত্য সখা ঘোষাল যখন একা গান্ গাইত, ধরুন তৈলোক্য সান্যালের বা সত্যেন ঠাকুরের,বা......' কিন্তু ওদের হিসেবে যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্য, তর্কের খাতিরে সত্যেন ঠাকুবেব অনুজের নাম উল্লেখ করতে গেলেন না আর গগনবাবু, 'তখন— সত্যসখাই বাসমতী ব্রাহ্ম-

সমাজে গান শুনিয়েছে বটে।'

'শোনানোর কথা নয়।' সরোজিনী পিশিমা লজ্জিত হয়ে বললেন, লজ্জিত হলেন, বেশি দুঃখিত হলেন, বললেন, 'ব্রাহ্মসমাজকে কালোয়াতি গান, এমন কি ভাবগভীর গানেও একটা পীঠ মনে করে অনেকে এখানে গান করতে আসেন, আমি দেখেছি কয়েক বছর ধরে। ভুল করেন তাঁরা। ব্রাহ্মসমাজে কোনোদিন ও গান নিয়ে কালোয়াতি চলে নিত, ও-রকম গানের কোনো প্রশ্রয়ই দেয়নি আমাদের সমাজ কোনোদিন। কেউ কেউ গান গাইবার সময় একটু-আধটু কারিগরি ওস্তাদী দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা স্বভাবতই হয়েছে। সাধনার লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথে সাধকদের প্রাণের আকুতির সঙ্গে খুবই সহজ মিশ খেয়েছে সেটা—আমি দেখেছি। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে যারা উদাসীন, ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবতে যায় না কিছু-সেই সব মানুষের নিছক গীতপিপাসা মেটাবার জন্যে ব্রাহ্মসমাজ তৈরি হয়নি ত। অথচ অনেক দিন থেকে যারা আমাদের সমাজে আসে, তাদের অনেকেই চাটে মজলিশে গান শুনতে ভালবাসে বলে ব্রাহ্মসমাজে আসে, মনে করে ব্রাহ্মসমাজও মজলিশ, কয়েকখানা গান ফেঁদে শ্রোতাদের তৃপ্ত করতে পারলে চরিতার্থ হবে। ওরা যা খুশি ভাবুক গিয়ে কিন্তু গগন বাবু, আপনি তা অনেক দিনের পুরনো ব্রাহ্ম, আপনি এরকম মনে করলেন কী করে?'

গগন বাবু নড়েচেড়ে একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে রইলেন।

সরোজিনী বললেন, 'বড় কমল বাবু বা সত্যসখা ঘোষাল কাউকে শুনিয়ে মাত করবার জন্যে গান গাইতে যান নি, গানকে তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের সেতু হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সবচেয়ে গভীরতম সেতু।'

'মিশনের সেতু সরোজিনীদি সোলো গান?'

'কেন—ডুয়েটও ত।' টিনি মজুমদার বললে।

'ভাবসাধকদের দিক দিয়ে কীর্তনই সব চেয়ে স্বাভাবিক গান,' ছাতু কাকা বললে, 'বড় কমলবাবু সেই জন্যেই শেষ বয়সে কীর্তন ছাড়া আর-কিছু গাইতেন না।'

'গগন বাবু—'

'আজ্ঞে।'

'বড় কমলবাবুকে আপনি চিনলেন না।'

'সত্যসখার গানই আমার বেশি ভাল মনে হত।'

'গান সম্বন্ধে একটা বিলাস রয়েছে আপনার মনে। ব্রাহ্মসমাজ যে একটা ধর্মের ক্ষেত্রে, গানের থিয়েটার নয়, সেটা ভুলে গেলেন আপনি।'

'সরোজিনীদি?'

ছাতু কাকার দিকে তাকালেন সরোজিনী।

'কিন্তু এটা আপনি দেখেছেন হয়ত সরোজিনীদি, আমি অনেক বছর ধরেই দেখছি,' ছাতু কাকা বললে, 'যে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত বটেই, বাসমতী ব্রাহ্মসমাজেও খুব হাঁকডাকের দিনে শহরের এত লোক যে ভেঙে পড়ত এখানে সেটা ব্রাহ্মসমাজে এসে গান শোনবার জন্যে। গান যত বেশি ভাল হয়েছে তত বেশি মজলিশি শখ বেড়ে গেছে ওদের। গানের চমৎকার মৌতাত রয়েছে বলে এটা যে ধর্মসমাজও, সেটা ওরা অগত্যা স্বীকার করেছে। ধর্মের জন্যে মাথা ঘামায়নি, আমাদের সমাজকে বড় একটা গ্রাহ্যও করতে যায়নি।'

'মেয়েরা যখন সোলো গেয়েছে' গগনবাবু বললেন, 'মেয়েপুরুষ মিলে ডুয়েট গেয়েছে- তখন আমেজ আরো ঢের জমেছে। দশই মাঘ এগারই মাঘের উৎসবে অবিনাস গুপ্ত মশাই, চক্রবর্তী মশাই, সরোজিনীদি, সত্যসখা, বীণা, চিনি, অলকা, নন্দাদি, বানুদি, দ্বিজেনবাবু, ছাতু বাবু সকলের কাছেই গানগুলো এসে পৌঁছেছে ধর্মসমাজেরই প্রাণের প্রাধান্যে, একান্তভাবে কিন্তু বাইরের বিশাল সমাজ যে অন্য রকম রুচি বুদ্ধি নিয়ে এই গানগুলি শুনে গেছে এ জিনিসের কোন প্রতিকার নেই। আমরা গান শোনাতে চাই বা না চাই, সত্যসখার মতন একজন লোক এ সমাজে গান গাইতে থাকলে বাইরের ষোল আনি জনসাধারণ এখানে গান শুনতেই আসবে, ধর্ম করতে নয়। ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ করেছিল বটে ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু মানুষ আজকাল ধ্যানট্যান ধর্মটর্মের গণেশ উল্টে দিয়েছে,। ধর্মসমাজ হিসেবে ব্রাহ্মসমাজের কাজ প্রায় ফুরিয়ে গেছে বলেই মনে হয়।'

'প্রায় আর কেন বিনয় করে বলছেন গগন বাবু', ফাটা মহলানবিশ ঘরের পুর্বদিকের খাপটির অন্ধকারে এতক্ষণ ঝিমুচ্ছিল, ফাটাও চুরুট খায়, হাতে চুরুট রয়েছে তার, ধরানো হয়নি এখনো, যখন দরকার ধরিয়ে নেবে। গগনবাবুর মতন ওরকম দ্বিধাটিধা নেই ফাটা মহলানবিশের 'নিজের চোখেই সব জায়গায় দেখে এলাম

ব্রাহ্মসমাজ জাতব্রাহ্মদের নিয়ে বড্ড ব্যস্ত। দেশ পৃথিবী ইতিহাস তাই একবারেই অব্রাহ্ম হয়ে পড়ছে। ইতিহাস ভাল হোক বা খারাপ হোক 'ন' কাটা ব্রাহ্মণদের সেখানেও আর-কোনো স্থান নেই, শাস্ত্রীমশাই মরবার আগেই তাদের দম ফুরিয়ে গেছে।' ফাটা মহলানবিশ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'ও তুমি চুরুট খাও বুঝি?' সরোজিনী বললে; এর চেয়ে বেশি কি আর বলবেন? কিন্তু বলার রকমে একটু বাহাদুরি আছে।

'চুরুটটা একটু পরে, জ্বালালেই পারতেন ফাটাবাবু।' টিনি মজুমদার ঠাট্টা অনুনয়ের সুরে-সুরে বললে, 'আবার তামাকের গন্ধ সইতে হবে, কিন্তু তাই বলে সরোজিনীদির যতটা খারাপ লাগে আমার ততটা না।' এমনি ধরনের একটা ক্ষমাবিলাসেও অনুভূতির বসনে ফাটার দিকে তাকাল সে। টিনির থেকে বয়সে খানিকটা ছোট ফাটা কিন্তু কিছুদিনের পরিচয় সত্ত্বেও এখনো তাকে 'আপনি'বলেই ডাকে টিনি।

'এ-ঘরে কি আলো দেয়া হবে?' ছাতু কাকা বললে।

'তুই একটু চুপ করবি ছাতু?' সরোজিনী বললেন।

'আলো আসছে বুঝি?'

'সময় হলেই পাবি-ধানরাজের মা একটু বাজারে গেছে, এসে নিক। অস্থির করিস নি।'

'সময় হলে পাব?' ছাতু কাকা একটু গোঁফ মুচড়ে নিয়ে দাঁতেব ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে কামড়ে ধরে বললে,'বাত আটটা সোযা আটটা বাজে, সন্ধ্যা দেবার সময় হল না।'

'সন্ধ্যা দেয়া কাকে বলে ছাতু বাবু,' 'হিতেন বাবু বললেন,'সন্ধ্যা হলেই বাতি জ্বালাবার একটা নিয়ম থাকা ভাল বটে, কিন্তু তা না-হলেই যে ঘর অপবিত্র হতে পারে বা অপদেবতা আশ্রয় করতে পারে, এটা যুক্তিব কথা নয়। নিয়ম বাঁধা হয় বটে এক-এক সময়, কিন্তু দিনকাল, ধারণা, প্রায়োজন বদলে যায়, আগেকার নিয়মের কোন সার্থকতা থাকে না। সন্ধ্যার বাতি কী করে জ্বলবে বাসমতীতে বলুন ত ছাতু বাবু?'

ছাতু তাকিযে দেখছিল বেতের চেয়ারে বসে ফাটা বেশ পা ছড়িয়ে চুরুটে বুঁদ হযে টিনির দিকে তাকিযে আছে, চুরুটের গন্ধ ততটা খারাপ মনে হচ্ছে না হযত টিনির, ক্ষমা করে ফেলেছে ফাটাকে-চোখ নরম হযে রযেছে টিনির। হিতেনবাবুর দিকে তাকাল ছাতু কাকা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন উনি, জিজ্ঞেস করে জ্ঞাত সমাধানটা নিজের হাতে বেখে ছাতুর উত্তরটা জানতে চাইছেনই কিন্তু ব্যাপারটা ত সেই কেরোসিন নিযে।

'বাসমতীতে ত আজকাল কেরোসিন তেল পাওযা যায না ছাতু কাকা। মাসে দেড় সের তেল শুধু কণ্ট্রোলে মিলবে। মানুষ বাতি জ্বালাবে কী করে—সবোজিনী কি কালোবাজার কববেন?'

'হ্যাবিকেনেব তেলটেল আছে—তলানির দিকে?'

'না-বে!' সরেজিনী ব্যতিব্যস্ত হযে বললেন।

'এক ক্যানেস্তাবা কেবোসিন চাই আপনার সবোজিনীদি?' ফাটা বললে।

'কত দাম পড়বে?'

'কণ্ট্রোল রেটে সাড়ে তিন-চাব—খুব সম্ভব। কিন্তু গেবস্তদেব ত ক্যানেস্তারা হিসেবে কিনতে দেবে না—তাদের বরাদ্দ আসে সেড় দেড়েকে আন্দাজ। আমি ছালার চটে মুড়ে বাত এগারটা বাবটায এক ক্যানেস্তারা তেল ঢুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তা ত আপনি নেবেন না।'

'তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে হযে একথা কী করে বলছ ফাটা। বড় কমলাবাবুর ছেলে তুমি। তোমার বাবা—'

'কোন কথা সরোজিনীদি? বিনি পযসায আপনাকে কেরোসিনের ক্যানেস্তারা দেযার কথা?'

'না-না—' সরোজিনী পা ঝাড়া দিযে নীচেব দিকের মশাগুলো তাড়িযে দিযে বললেন,'গরমেণ্টেব নিয়ম যে মাসে দেড় সের কেবোসিন পাবে গেবস্ত, আমি সেই নিযম ভেঙে কী করে ক্যানেস্তারা নেই?'

'ও', ফাটা এক রাশ ধোঁয়া বের করে মুখের থেকে চুরুট নামিযে বললে, 'আমার বাবা বড় কমলা বাবু বেঁচে থাকলে নিতেন না বটে, কিন্তু তিনি চাব টাকা পাঁচ টাকা চালের মণ দেখে চলে গেছেন দ্বিতীয় লড়াই বাঁধাবার ঢের আগে, এক টাকায বারো-চোদ্দ সের দুধ ছিল, তিন-চার পযসায একটা তেল চুকচুকে ড্যাকড়া ইলিশ মিলত, দু'টোও মিলত কখনো-কখনো ইলিশে বাজার তলিযে গেলে, তিনি হেসে খেলে গান গেযে চলে গেছেন।'

'এক ক্যানেস্তরা কেরোসিন আপনি দিতে পারেন ফাটা বাবু?' টিনি মজুমদার বললে।

ছাতু কাকা বললে,'তুমি কিসের ব্যবসা করছ হে কলকাতায ফাটা? বছর দুই পরে ত এলে

বাসমতিতে, খুব স্যুট চড়িয়েছ দেখছি আবার যাবে নাকি কলকাতায় ফিরে শিগগির? কিসের ব্যবসা তোমার?' চুরুটটা মুখের দিকে তুলেই হাতটা নামিয়ে রেখে ফাটা বললে,'বড় কমলবাবু যদি আজ এই ফাঁপড়ের ভেতর বেঁচে থাকতেন তাহলে এক ক্যানেস্তারা তেল কি তিনি নিতেন না সরোজিনী?'

সরোজিনী ডান পায়ের খসখসে গুড়লি দিয়ে বাঁ পায়ের ডাট রগড়াচ্ছিলেন মশার সুরসুড়ির-বিষ মারবার জন্যে, আরাম লাগছিল। 'তোমার কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয় সরোজিনী বললেন,'তুমি বড় কমল বাবুকে তোমাব নিজের বাবা শুধু মনে কোরো না ফাটা, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সকলেরই আশার জিনিস, সত্যের জিনিস, প্রীতির জিনিস। তিনি চলে গেছেন-অনেক দিন ত। চোদ্দ-পনের বছর হয়ে গেল আজ। ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এখন আরো ঢের খারাপ হয়ে পড়েছে, কলকাতায়, ঢাকায়, বাসমতীতে। তুমি এই সময়ে এরকম আসার কথা বলবে ফাটা?'

'আপনারা মাসে তিন বোতল তেল পান নাকি সরেজিনীদি?' হ্যাঁ, চার বোতলও পাই কোন-কোন মাসে। দেড় সের-দু'সের তেল—এক মাসের জন্যে।'

'কী করে চলে তাহলে?'

'এই ত কী রকম করে চালাচ্ছি, দেখছ ত। তোমরা সকলে এসেছ, অথচ

'বাতি জ্বালাতে পারছি না।'

ফাটার চুরুটটা তাব আঙুলেব ফাঁকে জ্বলে জ্বলে নিভে গিয়েছে হযত, গোড়াব দিকে দু'টো চারটে টান মেরেছিল শুধু, সবোজিনীদির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হচ্ছে, তিনি এক নাগাড়ে তাকিয়ে আছেন, চুরুট মুখে দিতে বাঁধ-বাঁধ ঠেকেছে তাই। কলকাতায এসব সমীহ ছিল না, সারদা বোসের সামনে দাঁড়িযে চুরুট টেনেছে সে। আর ত সব মরে হেজে গেছে—হেরম্ব মৈত্র, কেষ্টবাবু, প্রাণকৃষ্ণবাবু কলকাতায কেউ নেই এখন আর, ছোট পাণ্ডারা আছে অনেকে কিন্তু তাদের সামনে শুধু চুরুট কেন, কোন কিছুতেই বাঁধে না কারুরই। বাঁধবে কি করে—সবই ত এক ঝাঁকের কই। কিন্তু এখনে কেমন একটা নতুন সমীহ—হিতেনবাবুর সামনে, সবোজিনীদিব সামনে ত নিশ্চযই। চুরুটটা টানতে পেরে খুব অসুবিধা হচ্ছিল ফাটার, কিন্তু কী করে টানবে—এটা ত বড় কমল বাবুর দেশ।

'সারা রাত বাতি না জ্বালিযে কী রকম করে থাকেন এ-রকম কাঠ হোগলা ছাপড়ার বেড়াব ঘবে? ভিতটাও ত মাটির,' বুট দিযে মেঝেব ওপর বাব দুই চাট মেবে ফাটা বললে,'এটা ত চোব-ছ্যাঁচোড়ের দেশ, চারদিকে ধান জমিজঙ্গল ,সাপখোপ ত কম নেই।'

'এখন ত জ্যোৎস্না রাত,দু-চারটে জানালা খোলা রাখি,মুলি বাঁশেব বেড়ার ফাঁক দিযেও আলো আসে, ঘরে আলো থাকে মন্দ না, আমাদেব রাতে তত বেশি উঠতে হয না।'

'মাঝে-মঝে চলাফেবা কবতে হয না ঘবের ভেতরে। বাইবে যেতে হয না? ঘবেব ভেতবেই ল্যাভেটরি?'

'আমাদের ঠিক ল্যাভেটরি বলে কোনো জিনিস নেই, ঘবেব সঙ্গে লাগান নেই, বাইরে।'

' রাতে বাইরে যাবার দরকার হয় না।' টিনি মজুমদার বললে।

'হ্যাঁ টিনি সারারাত দিব্যি মুখ থুবড়ে ঘুমোয। আমি একটা মোম, দেশলাই হাতের কাছে বাখি।' সরোজিনী বললেন।

'সরোজিনীদির ডাযবেটিশ আছে,' ছাতু কাকা বললে,'তাছাড়া ডাক্তার সুধাংশু মিত্তির বলছেন প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের গোলমাল অনেক দিনের, চেপে রাখতে পাবেন না, বার বাব উঠতে হয, কিন্তু এ বয়সে ত অপারেশন করা ঠিক হবে না।'

'বাসমতীতে মোমবাতি পাওযা যায?'

'এক আধটা দোকানে মাঝে-মাঝে। চালানি নেই।'

'রেডির তেল এক জেব কিনে রাখুন সরোজিনীদি,' ফাটা বললে,'ওটার কনট্রোল হয়নি এখনো ; আলো বেশি হবে না ও-তেলে, বেশি আলোর দরকারও নেই আপনাদের। চাঁদেব আলোয ত চালাচ্ছেন, রেডির আলোয তার চেয়ে ভাল হবে। কিছু লেখা পড়া হয়ত করতেও পাববেন। সলতেটা একটু টেনে মুচি হাতে করে বাইরেও যেতে পারেন, কিন্তু মোম জ্বালিয়ে বাইরে যাওয়াই ভাল।'

'রেডির তেল কিনে রেখেছি আমরা।' সরোজিনী বললেন।

'হাটুতে পাক খাইয়ে সলতেও তৈরি করে রেখেছি,' টিনি বললে ফাটাকে, 'আমরা রাত বুঝে রেডির তেল জ্বালাই।'

গগন বাবু চুরুট জ্বালালেন।

সরোজিনীদিদের সঙ্গে কথা বলে একটু সহজ হয়ে এসেছে সবই—কোনো-দিকে আর-না তাকিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে ফেলেছেন গগন বাবু, ধোঁয়াটা একটু অভয়ে ভরসায় ভরাট হয়ে উঠলে ফাটাও এবার একটু জুত করে চুরুট জ্বালাল। 'বললে রাতের বেলায় অত বেশি বাইরে যাওয়া উচিত নয় আপনার সরোজিনীদি, বাসমতীতে সারারাত সাপ মামদো চোর চিমড়ে কিলবিল করে, এদিকটা ত জঙ্গলের মত। ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ডের রোগ বাইরে গিয়ে ঠকাশ করে বিরমি খেতে পারেন—' ফাটা বললে,'আপনাব বড়-বড় ইমানদার ভাইবা দু-তিন বছর আগেও ত হামেশা বাসমতীতে আসতের—কিছু পট কমোড ফেলে রেখে যাননি তারা?'

'রেখে গেছেন,' ছাতু কাকা বললে,'আমাদেব এ-ঘবের উত্তব দিকের ছোট কামরায সেগুলো আছে—টিনি সরোজিনীদি যে-ঘরে শোয তাবই পাশেব কামবায। রাতের বেলায সেইখানেই আমরা যাই। দিনে জমাদারনী এসে সাফ করে দিয়ে যায।'

'তোমরা বড্ড ল্যাভেটবির কথা বলছ,' হিতেন বাবু একটু অস্বস্তি বোধ করে বললেন,'এই ব্রাহ্মসমাজের কথা হচ্ছিল।'

'হবে—ব্রাহ্মসমাজের কথা হবে', ফাটা বললে, 'রাত ত এখন মোটে সাড়ে আটটা, একটা-দেড়টাব আগে আমি নড়ছি না এখান থেকে। হিতেন বাবু ত কাছেই থাকেন-চাঁদেব আলোয মোমেব আলোয পৌঁছিয়ে দেব। গগন বাবু বুঝি সেই দানাপুবেব দিকে?'

'হ্যাঁ, আমি টর্চ এনেছি, তবে ঝপ কবে নিভে গেল সবোজিনীদিব উঠোনে এসে।'

'কেন।'

'বিগড়ে গেছে, তাব পুড়ে গেছে হযত,কে জানে ব্যাটারি ফুবল কি না। বাসমতীতে আমি তিনমাস ধরে খুঁজছি-কোথাও ব্যাটারি নেই।'

'কলকাতাযও নেই,' ফাটা বললে,'আমাব মোটব সাইকেলটা এনেছি গগন বাবুকে বক্সে বসিয়ে নিয়ে যাব। এখান থেকে দেড়টাব সময উঠলে দানাপুবে পৌঁছতে দু'টো সোযা দু'টো আড়াইটাও হতে পাবে, যে-বকম বাস্তাঘাট হয়েছে আজকাল বাসমতীতে।'

তারপবে অত বাতে কোথায আর যাওয়া যায বলো ত ছাতু বাবু।'

'সে-সব ঘাঁটি আজকাল আর নেই বাসমতীতে তিনটে বেজে যেতে পারে।'

'কীসের ঘাঁটি?' জিজ্ঞেস করল টিনি।

'তুমি আমাব এখানে থেকে যাও ফাটা, কোথায যাবে অত বাতে,' সরোজিনীদি বললেন।

'তাহলে ত গগনবাবুবও থাকতে হয।'

'নাগো,' গগন বাবু বললেন,'আমি আব এই আধঘন্টা আছি। তারপর একটা রিকশা কবে চলে যাব।'

'তুমি কবে এলে বাসমতীতে কোথায আছ আজকাল ফাটা? বড় কমলবাবুব ত অনেক জাযগাজমি ছিল ওদিকে—জিরানডাঙার দিকে?'

'জিরানডাঙায নয, পাশাবতীতে।'

'পাশাবতী ত জিরানডাঙার পাশেই।'

'হ্যাঁ,' ফাটা চুরুটটা ঘুরিয়ে ছাই ফেলে বললে।

'ওখানে একটা একতলা দালান ছিল বড় কমলবাবুর, সেটা ত দোতলা কবে রেখেছিলেন? ওখানে থাকতেন না অবিশ্যি তিনি, সমাজবাড়িতেই থাকতেন তিনি আব তোমার মা। তোমরা ছেলেমেয়েবা অনেক সময় পাশাবতীর বাড়িতে থাকতে। ফাটা—'

'আজ্ঞে।'

'বড় কমলবাবুর অতবড় জমিদারির কিছু কি তিনি পাননি-হিন্দু সমাজ ছেড়ে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন বলে?'

'বাবা বেঁচে থাকতে ঠাকুরদার নাযেব গোমস্তাদের মুখে শুনেছিলাম ত রয়েছে বাবার নামে সবই, কিন্তু বাব যেতেন না গ্রাহ্যও করতেন না, পায়ে ধরে ডাকাডাকি করলেও ঘেঁষতেন না এদিকে। গান গেয়ে মাত করে রেখেছিলেন ত ব্রাহ্মসমাজ পঁচিশ বছর—'

'তোমাব বাবাব জমিদারিরর ভাগিদার কারা?'

'ছিলেন ত অনেকেই-অবিশ্যি নিজেদের হিস্মতে, আইনের দিক দিয়ে বিশেষ কোনো সুবিধে করতে পারেন নি। বাবা ছাড়া ঠাকুরদার আরো দুই ছেলে ছিলেন-একজন বাইশ বছর বয়সেই মরে গেছেন, আর একজন প্রায় আমার জন্মাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই যে বিলেত চলে গেলেন—তারপর দু-দু'টো যুদ্ধ হল, ফ্যাসিজম কম্যুমিম অন্ধকারবাদ ব্যবহারবাদ সোভিয়েট বিজ্ঞান অস্তিত্ববাদ,কত কী হল, তিনি এখনো ইয়োরোপেই আছেন।'

'আছেন, কী করে জানলে?'

'তিনি ইউরোপের লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বাবাকে ফি বছরই একবার করে চিঠি লেখেন; এখনো লিখছেন; এবারেও এসে পেলাম তার চিঠি।'

'লিখছেন? বড় কমলা বাবুকে।?'

'হ্যাঁ, আমি ভাল করে পড়ে দেখি তার চিঠি কাকার মাথা খারাপ হয়নি। অনেক উন্নতি হয়েছে শরীর-মনের। অনেক জ্ঞান সাবড়েছেন তিনি। আমাদের দেশ স্বাধীন হচ্ছে সে-খবর পেয়েছেন বটে, কিন্তু ফিরবেন না তিনি ভারতে আর; হাম্বুর্গে আছেন-শিগগিরই বের্লিনে যাচ্ছে।'

'জার্মানি ত আজমাল বড় হ্যাঙ্গামার জায়গা—'

'মস্কোয় ছিলেন, বিয়ে করেছেন হাঙ্গেরির মেয়ে। এবারে প্যারিসে গিয়ে জন্মের মত গুছিয়ে বসবেন লিখেছেন।'

'কিন্তু এসব চিঠি বড় কমলা বাবুকে লেখা? কী হিসেবে? তিনি ত—'

'না, তিনি ত নেই অনেকদিন,' ফাটা বললে,'বাবা যখন চলে গেলেন তখন বড় কাকা ত বলশেভিক গোলমালের ভেতর তলিযে গেছেন। কোথায় তিনি আছেন, বেঁচেই আছেন কিনা কিছু ঠাওর করতে না-পেরে লণ্ডনের ক্রমওয়েল হাউসের ঠিকানায় তাকে চিঠি দেযা হয়েছিল পর-পর চারখানা, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। অনেক পরে কর্তাদের জবাব এসেছিল যে মহলানবিশের নামে পোলিটিক্যাল ওয়ারেণ্ট আছে, কিন্তু সে রাশিয়ায় না সাইবেরিয়ায় বেঁচে আছে না মরে গেছে, কেউই জানে না কিছু। বাবার মৃত্যুর খবর পাননি কাকা। তারপরেই মা মরে গেলেন। গোলামালে কাকাকে আর জানানো হল না কিছু, তাঁর ঠিকানাও পাওযা গেল না।'

'তাঁর ধারণা বড় কমলবাবু এখনো বোঁচে আছেন?'

'বড় কমলবাবু ত তাঁর ষোল বছরের চিঠির একখানাও উত্তর দেননি,' ফাটা বললে,'কাকা হযত উত্তরের প্রত্যাশী নন। প্রকৃতিস্থ মানুষ—খুব মনেপ্রাণে চিঠি লেখেন, তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন বাবা বেঁচে আছেন।'

'তোমরা তার এ ভুল শুধরে দিলে না কেন?'

'গোড়ার দিকে ভেবেছিলাম, দেব। কিন্তু তার সঠিক ঠিকানা পাওযা দুষ্কর। অনেক চিঠিতে ঠিকানাও থাকে না। আজ যেখানে আছেন, কাল সেখানে থাকেন না। তবে এবারে প্যারিসে গিযে পাকাপাকিভাবে থাকবেন লিখেছেন।'

'বড় কমল বাবু যে নেই—এ কথা এখন আর তাঁকে লিখে কোনো লাভ নেই,' হিতেন বাবু বললেন।

'লিখে দেব দু-এক বছরের ভেতর। প্যারিসে বসুন ত গুছিয়ে । বাবা নেই জানলে কাকা হযত আর চিঠিও লিখবেন নাম কোনো সম্বন্ধ রাখবেন না আর আমাদের কারুর সঙ্গে। কিন্তু কী করা যায? এক সময় জিনিসটা ভেঙে বলা দরকার কাকাকে। বড় কমল বাবু নিজে যখন বেঁচে নেই তখন তাঁর হয়ে কাজটা করে দেযা উচিত আমাদের-'ফাটা চটাশ করে কব্জিব ওপব একটা মশা মেরে বললে-'তিনি কোনো রকম বিশৃঙ্খলা ভালোবাসতেন না।'

'তোমার কাকা তাহলে জমিদারি ভাগ ছেড়ে দিলেন?'

'হ্যাঁ, তা দিযেছেন। চিঠিতেও তা লিখেছেন।'

'আর ত কেউ শরিক নেই?'

'না। শাস্ত্রমতে নেই। তবে জমিদারিটা চলছে যখন নানারকম মানুষের হাত আছে এর ভেতর। খোঁজ করে দেখা চলে।'

'তিনি ত হাত ঝেড়ে চলে গিযেছিলেন অনেক দিন—' ফাটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তারপর কে কী করেছে না-করেছে, কী হযেছে না-হয়েছে একটু ভেতরে ঢুকে না-দেখলে বুঝতে পারা যাবে না

কিছু। দিদি বিয়ে করে চলে গেল বেরিলি, ডাক্তরিতে পশার জমিয়ে বসেছেন জামাইবাবু, সেখান থেকে নড়বেন না আর, ইউ-পি, সি-পিব ভেতরেই ওদের চলাফেরা,বাসমতীর কথাও ওদের মনে নেই, কলকাতায়ই আসে না। আর আমার ছোট ভাইয়ের হাতে-খুব ভালই বলতে হবে সরোজিনীদি, বড় কমল বাবুর ধর্মে 'ত' পড়েনি, নিজের দরকার মত ময়ান মিশেয়ে নিয়েছে এই যা। মঠে চলে গেছে।'

'পণ্ডিচেরিতে?' হিতেন বাবু বললেন।

'না। মঠে। মিশনে' ফাটা হাঁটুর ওপর হাত বেখে টাউজার একটু গুটিয়ে নিয়ে বললে।

'আহা, বড় কমলবাবু ব্রাহ্মসমাজ বলতে অজ্ঞান হবেন আর তার ছেলে সমাজ ছেড়ে চলে গেল?' বললেন সরোজিনীদি।

'গান গাইতে পারে না, উপাসনাও করতে পারে না, তবে গড়তে পেটাতে পারে বেশ, কাজে টান আছে, ধর্মেব ভাব আছ, শুনছি মিশনে অনেক কাজ কবছে হীরেন—এখন ন্যু-ইয়র্কে আছে।' ফাটা সরোজিনীদিকে জিনিসটা আস্তে-আস্তে বুঝিয়ে দিয়ে বললে, 'বেশ নিজের ভাবে আছে হীরেন, ভালই করেছে; বাবা ব্যক্তিস্বাধীনতা ভালোবাসতেন। তিনি বেঁচে থাকলে আমাদের আজকের যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে হীরেনকে দেখতে না পেলে খুব সম্ভব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন না। যাক গে, হীরেন গেছে, আমি রয়েছি। বড় কমলবাবুর ছেলে ফাটা মহলানবীশ হিসেবে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়ে রেখে আমি এ-সমাজে শেষ পর্যন্ত থেকে যাব বলেই মনে করেছি।

খানিকটা ভাল লাগল সরোজিনীদিব। বেশি আশ্বস্ত হল টিনি। হিতেন বাবু ভাবছিলেন, শুধু দলে ভাবি করে নাম টিকিয়ে রাখবার জিনিস ত ব্রাহ্মসমাজ নয়। ফাটা এ সমাজে থাকলে বাসমতীর ব্রাহ্মদের সাংসারিক কী সুবিধা হবে—গগন বাবু ভাবছিলেন তাই।

তোমার দিদি তোমার বাবাব কথা মনে রাখছে ত?

দিদি ত খুব গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিল।

আমাদের সমাজে ত কেউ গোঁড়া হতে পাবে না। ব্রাহ্মসমাজ মানুষ সাধাবণের ধর্ম কী, মানুষকেই তা জানতে দিচ্ছে শান্ত একনিষ্ঠ যুক্তিযুক্ত উপায়ে, এখানে গোঁড়ামির ত কোনো কথা নেই ফাটা।

আপনি রামমোহনবাবুর মত কথা বলছেন হিতেন বাবু, ফাটা হাতের চুরুটটা পাশেই একটা ছোট কেরোসিন কাঠের ওপর বাখে। জলচৌকিব ও লেখা যে-একটা ছোট্ট কাপড়ের ঢাকনি ছিল সেটা নজবে পড়েনি তাব। টিনি আস্তে আস্তে এসে কাপড়ের ঢাকনিটা সবিয়ে নিযে চুরুটটা কাঠের ওপব রেখে দিল। কেউ দেখল, কেউ দেখল না, অন্ধকারে কী করা হল কেউ বুঝতে পারলেন না—সবোজিনী ছাড়া।

রাজা এই ধর্ম ঘোষণা করলেন, সমাজেব ভিত গড়লেন, ফাটা বললে কিন্তু তিনি যদি একাই একমাত্র ব্রাহ্ম থাকতেন, তাহলে আপনি যা বলেছেন সেইটেই মোটামুটি ঠিক কথা হত। কিন্তু অনেক সাধারণ লোক ত ঢুকে পড়েছে এই সমাজে; ফলে যা হয় তা হযেছে। বড় কমল বাবু নিজেই ঢের গোঁড়ামি দেখে গেছেন, নিজেরও দুর্বলতা ছিল খানিকটা। বিয়ের আগে দিদি খুব ব্রাহ্ম ছিল।

এখন বুঝি বড়কেও নিজের দলে ভজিয়েছে? টিনি বললে।

'না,' দু'টো পা ট্রাউজার বুটে জাঁকিয়ে একটু ছড়িয়ে বসেছিল, খানিকটা গুটিযে নিযে ফাটা বললে, বাংলা ভাষাই ভুলে গেছে, তার বাঙালির ব্রাহ্মসমাজ? ওটা যাচ্ছেতাই বড়লোক হয়ে গেছে। ধর্মটর্ম ভাব উড়িয়ে দিযেছে। দুনিয়ার সব ভোগ সুখেব জিনিসের সঙ্গে এতটা মাখামাখি হবে আমি ভাবতেও পারিনি, বাবাকে ব্রাহ্মসঙ্গীত থেকে বেছে-বেছে গান ঠিক করে দিত, সমাজে বা পরিবারে উপাসনার সময আমিই ত ঘুমিয়ে পড়তাম, ও আমাকে চাঁটি মেরে জাগিযে রাখত, 'ফাটা জলচৌকিব থেকে চুরুটটা তুলে নিযে বললে, 'এই ত সেদিন হযেছিল সব-এর ভেতরে দেখুন কত-কী হয়ে গেল, কেউ নেই, কিছু নেই, আমারও বাসমতীতে থাকবাব কথা নয়,জয়দ্রথের কাটা মাথাটার মত তবুও এসে ছিটকে পড়েছি কী করে যেন আজও আপনাদের সকলের মধ্যে।

জয়দ্রথ কে? টিনি বললে।

মাঝে-মাঝে দেখেছি লেখাটেখার ভেতর জয়দ্রথের কথা, সরোজিনীদি বললেন, গল্পটা ঠিক মনে নেই আমার। না কি পড়িনি? ভুলে যাই সব।

হিতেনবাবু বললেন, 'জয়দ্রথের গল্প মহাভারতে—'ছেলেবেলায় পড়েছিলুম কিন্তু তোমার তাৎপর্যটা ঠিক ধরতে পারছি না ফাটা।'

গগনবাবু অন্ধকারের ভেতর দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়েছিলেন, আগুনের রঙে মুখ লাল করে চুরুট জ্বালাতে জ্বালাতে বললেন, তাৎপর্য একটা রয়েছে মনে হল, কিন্তু ফাটা কী ভেবে বলেছে সেইটেই ভাবছি।'

সত্যিই কেউ নেই; পনের-কুড়ি বছর আগেও বাসমতী ব্রাহ্ম সমাজেব যে-সব কর্ণধার চিন্তা করে গেছেন, কথা বলে গেছেন, কাজ কবে গেছেন-সেই দেবব্রতবাবু, অবিনাশবাবু, চক্রবর্তী মশাই, বড় কমল বাবু, আরো কতজন, আজ এতদিন পবে স্মবণে রেখে ধববাব ছোঁবার মত হিসেবে মনে হচ্ছে, কিছুই যেন বেখে যেতে পারেননি তাঁবা পরবর্তীদেব জন্যে—সবোজিনী ভাবছিলেন। দোষ তাঁদের নয়—আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন তাঁবা। ধর্ম কি সেইটে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এও বুঝেছিলেন যে ধর্মেব অনুষ্ঠানগুলোকে সর্বতোভাবে সত্য কবে তুলতে না-পাবলে ঠিক ভাবে ধর্মসাধনা হয না—যা বুঝেছিলেন তাই কবেছিলেন তাঁরা, সেই জন্যেই দলে দলে খাঁটি মানুষ পেয়েছিলুম আমবা ব্রাহ্মসমাজে, বাসমতীব ব্রাহ্ম সমাজে কিন্তু কুড়ি বছরেব ভেতব কী ভীষণ ওলট পালট হয়ে গেল সব; এই যে বড় কমল বাবু এখুনি কেন সমাজে বসে শান্ত হবে মম চিত্ত নিবাকুল', 'কব তার নাম গান', গাইছিলেন, কথা বলছিলেন, 'তেন তাক্তেন ভুঞ্জীথ'ব ব্যাখ্যা কবে তাঁব স্ত্রীকে সাধিকাব মত পাশে বসিয়ে ববরারেব সকালবেলাব সমাজ ভেঙে যাবাব পব সমাজেব ভেতরই সতরঞ্জিব ওপর মুখোমুখি আমাদেব সকলের সঙ্গে বসে, হঠাৎ থেমে গেলেন যে তিনি, হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেলেন যে তাবা সব! বাসমতীব সমাজে বেখে গেলেন ইঁদুব আব চামচিকে!

'তোমাব দিদিব নামও ভুলে যাচ্ছি আমি ফাটা। ও, মনে পড়েছে, সবোজিনী বললেন, তোমাব বাবা তাকে মৈতি বলে ডাকতেন। মেয়েকে ডাকতে গিয়ে সমাজেব কবিডবে, বাবান্দায, সমাজ ভেঙে গেলে পুরুষদের ওপবের গ্যালাবিতে কী বকম গানেব গলা বেজে উঠত বড় কমল বাবুর মেয়েকে ডাকতে গিয়ে।'

শুনে নিজেব মানসকর্ণ হযত খানিকটা স্নিগ্ধ হল। বড় কমলাবাবুব ধবনে সকলকে শুনিযে সবোজিনী বলতে চেষ্টা কবলেন, মৈ—তি—ব্রাহ্মধর্মটা নিযে এসো ত 'ব্রাহ্মসঙ্গীত'টা কোথায রেখে দিয়েছে, আমাকে দিযে যাও, মৈ—তি—'

'এসব ত সেদিন শুনেছিলাম জিতেনবাবু—' ভেতব থেকে কী সব চাড় দিয়ে উঠেছে বলে সরোজিনী একটু বুকে গলায চোযালে ব্যাথা পেযে নি:শ্বাসে আটকে গিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে ওবা যেন ঘুমিযে পড়েছে সব বাসমতী ব্রাহ্মসমাজেব ভাদ্রমাসেব উৎসবটা সেবে, কাল ভোরেই জেগে উঠবে আবাব।'

জাগবেই বটে,' ফাটা বুট দিয়ে নিচেব মাটিব আস্তে-আস্তে ঘষতে-ঘষতে বললে, দিদি ত পঞ্চাশ হাজাব টাকা দিয়েছে কালীবাড়ির জন্যে।'

কালীবাড়ি? কোথায়? অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে হিতেন বাবু বললেন, মিশে গেলেন অন্ধকাবেব মধ্যে সবোজিনীদি, না, আব-কোনো কথা বলবাব নেই তাব অসাড় হয়ে পড়েছে যেন সব ।

'ইউ-পি, সি-পি, বিহাবেব যে সব জাযগাব জন্যে ও ওর প্রাণেব টান আছে সেখানে ও-ই উদ্যোগ কবে বাঙালি টোলায কালীবাড়ি তৈবি কবাচ্ছে অথবা যেগুলো আছে সেগুলোকে আবো বাড়িয়ে সাজিয়ে বেশ জমিয়ে তুলেছে কালীবাড়ির মুভমেন্টটা মৈতি,' ফাটা টোকা দিযে নেভা চুরুটের ছাই, ছোট-ছোট তামাব পাতাব কুচি উড়িয়ে দিতে-দিতে বললে, 'বেবিলিতে ওব নিজেব বাড়িতেও ত কালীমন্দিব বযেছে।'

বেবিলিতে ব্রাহ্মসমাজ আছে? অনেকক্ষণ পবে হিতেন বাবু বললেন।

'না।'

'সে সম্বন্ধে কিছু ভাবে টাবে মৈত্রেযী?' জিজ্ঞেস কবলেন হিতেন বাবু।

এতক্ষণ তাহলে কী বললাম আপনাদেব হিতেন বাবু—ফাটা তামাক পাতাব আবো কিছু কিছু ছোট-ছোট কুচি ও অঙ্গাবেব অনু-বেণু আস্তে-আস্তে ছিটকে উড়িয়ে ফেলতে-ফেলতে বললে, ওবা ডেরাডুনে বাড়ি কিনেছে, অনেক জাযগা জমি, মস্ত বড় কালীবাড়িও তৈবি কবে নিয়েছে নিজেদেব বাড়িব ভেতর। এখন থেকে ডেবাডুনে থাকবে ঠিক করেছে।

মৈত্রেবী যদি বামপ্রসাদের মত কালীর উপাসনা করতে পারে, ভাল হবে তাতে, গগন বাবু বললেন, কিন্তু তাত নয, ও ত একটা ঠাট নিয়ে মাতামাতি করছে।

বড় কমল বাবু ওব নাম রেখেছিলেন মৈত্রেয়ী, চব্বিশ বছব আগের কথা, এখনো মনে তাজা হয়ে আছে, যেন আজ ভোরেই কথাটা পাড়লেন, সেই রকম—হিতেন বাবু চশমা খুলে ধুতির খুট দিয়ে মুছতে

গিয়ে না–মুছেই চশমাটা এঁটে নিয়ে বললেন, মাঘ মাসের উৎসবটা তখন শেষ হয়ে গেছে বাসমতীর সমাজে শীত কমে গিয়ে হঠাৎ আবার বেশ শীত পড়েছে, খুব ঠাণ্ডা সকালবেলা, আমি সমাজবাড়িতে ঢুকতেই দেখলাম কেউ কোথাও নেই, ওপরে পুরুষদের গ্যালারিতে চওড়া পাটাতনের ওপর আসন পেতে বড় কমল বাবু বসে আছেন, সুয্যির সাগরের ভেতর, হু হু করে যেন রোদ ঝরে পড়ছে ব্রহ্মপুত্রের তোড়ের মত, পুবের জানালা দিয়ে; পুরনো ঋষিদের মত চেহারা, রূপা, খালি গায়ে বসে আছেন কমল বাবু, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মশাইয়ের উপনিষদের সংস্করণগুলো চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে, আমি গ্যালারিতে উঠতেই তিনি বললেন, আমি সমস্ত সকালবেলা বসে একটা কথা ভাবছিলাম, একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন শান্তি পাচ্ছি—ঠিক হয়ে গেছে সব। ছেলেমেয়েদের ভেতর আমার মেয়েটিকেই ভালবাসি সবচেয়ে বেশি, ও–ই ভবিষ্যতে পূর্ণ ব্রাহ্মিকা হতে পারবে। উপনিষদে যে–মহিলা ভূমার কথা পেড়েছিলেন, বুঝেছিলেন নচিকেতার আত্মার সহোদরার মতন যেন–যে পরব্রহ্মের এক কণিকার তুলনায় ও পৃথিবীর সুখ–ঐশ্বর্য কিছুই নয়, তারই নামে নাম রাখবে আমার মেয়েটির।

নামকরণ হয়েছিল সমাজবাড়ির সামনে ঘাসের উঠোনে সতরঞ্চি, হরিণের ছাল, বাঘের ছাল আর চৌখুপি চাদর পেতে- মনে আছে আমার—সরোজিনী বললেন।

হ্যাঁ, সেদিন বিকেলেই নামকরণ হয়েছিল। দেবব্রত বাবু উপাসনা করেছিলেন। বড় কমল বাবু গাইলেন।

'খাওয়া–দাওয়া হয়েছিল কিছু?' ফাটা জিজ্ঞেস করল 'আমার মনে নেই কিছু।' তুমি ত আজকাল টাকা বাঁধছ বেশ, গগন বাবু বললেন, তোমার দিদির নামকরণের খাওয়াটা এখনো একবার হোক না ফাটা।

মনে থাকবে কী করে তোমার ফাটা। তোমার ত তখন দেড় বছর, সরোজিনী বললেন।

হ্যাঁ, বিস্কুট চা রসগোল্লা খাওয়ানো হয়েছিল, হিতেন বাবু বললেন, চশমার ফাঁকে চক্ষু ঝিলমিলিয়ে উঠল তার, বাসমতীর ভুবন ময়রার বড়–বড় স্পঞ্জ রসগোল্লা।

ও, এই সব ফাটা চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, বড় কমলবাবুর তখন কিছু আয় ছিল না বুঝি সরোজিনী দি? জমিদারিটা ছেড়ে দিলেন—সমাজ থেকে কিছু টাকা পেতেন সমাজের গাইয়ে হিসেবে? তাই নাকি?

খুব অল্পই পেতেন, সরোজিনী চোখে কপাল একবার আস্তে হাত বুলিয়ে নিয়ে একটু চিন্তাগম্ভীর হয়ে বললেন, বাসমতী ব্রাহ্মসমাজ তোমার বাবাকে কিছুই দিতে পারেনি। সমাজের প্রাণ ছিলেন তিনি—এই চারজনেই ত বাসমতী ব্রাহ্ম সমাজের আত্মা ছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেরও ভেতরের দিক দিয়ে এদের চেয়ে কেউ বড় ছিলেন না। কমলবাবুকে সমাজের গাইয়ে বলাটা ঠিক হল না তোমার।

গগন বাবু টানছিলেন, মুখের থেকে চুরুটটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, ও কিছু মনে করে বলেনি। ওর ভাষাই অনেকটা ঐ রকম।

'ভাষাটা বড় কমলবাবুর ছেলের মত হোক তোমার হিতেন বাবু চশমাটা না–খুলে নাকের ওপরেই সেটাকে আলগোছে একবার গুছিয়ে নিয়ে বললেন শেষ পর্যন্ত তাঁর হয়ে তুমিই ত টিকে রইলে ফাটা।—আর সব ত আর সব। ধানরাজের মার পায়ের শব্দ যেন শোনা গেল পাশের ঘরের অন্ধকারে–সরোজিনীর মনে হল। ঝি–র কাপড়ের থেকে তামাক পান এমন–কি কেরোসিনের প্রীতিকর গন্ধ যেন সত্যিই ভেসে এল–টের পেলেন তিনি। কেরোসিন কি পেল তবে ধানরাজের মা? এক বোতল কেরোসিন সরোজিনীর আজকের এই বাসমতীর সংসারে যেন কুড়ি বছর আগের বড় কমল বাবুর গানের এক–আধটা কালির দ্রব পদার্থের মত স্নিগ্ধ।

কিন্তু ধানরাজের মা আসে নি হয়ত একটা ধাড়ি ইঁদুর খস খস করছে, বড় কমলবাবুর ব্রাহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে কেরোসিনের কথা জড়িয়ে ফেলে মনের কাছে পাপ করেছে বোধ হল সরোজিনীর। দু'পায়ে ছেঁকে ধরেছে আবার মশা।

'কত?–কুড়ি পঁচিশ পেতেন ব্রাহ্মসমাজ থেকে বাবা?'

'বাইশ টাকা পেতেন। সরোজিনী বললেন।

'ও সেই জন্যেই বিস্কুট আর চা খাওয়ালেন বুঝি কমল বাবু' ফাটা এমনিই পুড়িয়ে পুড়িয়ে হাতের চুরুটটাকে ছোট করে ফেলেছে, এক–আধবার টেনেছে শুধু, এবারেও একবার টানতে গিয়ে কী মনে করে আস্তে–আস্তে নামিয়ে রেখে বললে, দিদির নিজের মেয়ের নামকরণে দু–হাজার আড়াই–হাজার লোক ডেকে পোলাও মাংস, চকলেট, কালিয়া খাওয়ানো হল, খুব উৎসব হল কয়েকদিন, নাচটাচ হল,

লখনৌয়ের থেকে মেয়েদের নেয়া হয়েছিল, কলকাতার থেকেও কীর্তনের মেয়েরা গিয়েছিল।'

শুনে নড়তে ভুলে গিয়ে বসে রইল সব–অন্ধকারের ভেতর;–ফাটার মনে হল দীনহীনের মত যেন। কিন্তু ভেতরের আলোর সঙ্গে বাইরের অন্ধকারের তুলনা করেছিলেন সরোজিনী, হিতেন বাবু, টিনিও খানিকটা। ও–আলোটা কোনো তেল টেলের ওপর নির্ভর করে না বলে কোন অন্ধকারই মারতে পারে না ওকে–বোধ করেছিলেন যেন।

গগন বাবু বললেন, 'হীরেনও ত স্বামী হয়েছে,·সে এখন ন্যু ইয়র্কে?

'হ্যাঁ।'

'ভালই করেছে। সে–ও ত কালীভক্ত?'

'সেটা আমি বলতে পারছি না।'

'পরমহংস দেব ত কালীর উপাসক ছিলেন।'

স্বামী বিবেকানন্দও হিতেন বাবু বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে সিদ্ধ হয়েছিলেন। নানারকম জিনিসের সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছিরেন, পেরেছিলেন কি না বুঝতে পারছি না।'

'সমস্ত দেশ বলছে ত পেরেছিলেন।'

'সমস্ত দেশ তা বলছে কিনা জানি না আমি, হিতেন বাবু চশমাটা নাক থেকে খুলে ফেলে বললেন, দেশ সময় সন্ততিরা মিলে অনেক কথাই বলে যদিও, তাহলেও সাধনার নানারকম পথ রয়েছে, আমি ব্রাহ্মসমাজের পথের চেয়ে বেশি স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ আর–কিছুই মনে করি না। এটা আমার ব্যক্তিক দুর্বলতা বা সচলতা যা–খুশি তাই বলতে পারো, বিবেকানন্দ বড় খুবই, কিন্তু রামমোহন মহর্ষির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের সাধকদের তুলনা করা উচিত নয়, ব্রাহ্ম হিসেবে আবার ওতে বাধে বড্ড, কথাটা আপাতত শেষ করে হিতেন বাবু খালি চোখে দূর দূরান্তেব অন্ধকারের দিকে তাকিযে রইলেন। বাইরের মেঘের চাপ কমেছে বলে মনে হয, আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হযেছে, তবে পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেছে এতক্ষণে। শর্ট সাইট চোখেও অনেক তাবা দেখা যাচ্ছে আকাশের আনাচকানাচ ভর্তি করে। কিন্তু তারাব আলোয অন্ধকার মরেনি, রাত বেশি হযেছে বলে অন্ধকারটা জমেছে যেন বেশ, চারদিকে তাল, নারকোল, সুপুবি, আম, নিম, জামরুল, সিসু, জামরুলের ঝুপসি জঙ্গলই–বা কত। কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে বাইবেব পৃথিবীটাকে আকাশে, অন্ধকারে সুপুরি সিসু জামরুলে, নক্ষত্রের জ্বলজ্বালানিতে।

'হীরেন মিশনে গিযেছে, হক্সালি ইশারউডদের সঙ্গে আমেরিকায ওব খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হযেছে শুনেছিলাম, কিন্তু ও–সব সাহেবদের মত ধর্ম নিয়ে অতি–জিজ্ঞাসাও নেই ওর মনে, প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওঁরা যা বিলাস করেছেন আজকাল সেটাও নেই।'

'কালীপূজো করে?'

'কে? হীরেন? দেখি নি আমি কোনোদিন।'

'ওকে ব্রহ্মোপসনা করতে দেখেছিলে বড় কমল বাবু বেঁচে থাকতে?

'দেখেছিলাম। আমার চেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল না ওর।'

'তবে করে কালীপূজো,' হিতেন বাবু বললেন,' করে, বেশ করে, ভালই করে। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার পথে প্রত্যেকেই নিজের স্বভাব বুঝে একটা প্রতীক গ্রহণ করে, কালীকে নিযেছে হীরেন।'

'অনেক পুরুষ ধরে কালীই ছিলেন পাশাবতীর জমিদারদের পরিবাবের দেবতা,' গগন বাবু বললেন,'শুধু বড় কমল বাবু মাঝখান থেকে এসে মনপ্রাণ দিযে ব্রাহ্ম হলেন, ছেলেমেয়েরা আবার চুম্বকেব টানে ফিবে যাচ্ছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ টিকবে বলে মনে হয না। চাবদিকেই ত পূজো আচ্চার ধুমধাম, আগের চেয়ে বেড়েছে বলে মনে হয। এটা আবেগের দেশ—এখানে ধর্মই টিকবে, কিন্তু ধর্মকে বেশি বিশুদ্ধ করতে গেলে সেটা টিকবে না। টিকলে কত ভাল হত—কিন্তু হবার নয় বলেই মনে হচ্ছে। এদেশে কর্মপ্রেরণাও টিকবে, কিন্তু কর্ম টিকবে না। না টিকেই ভাল হবে হয়ত, বেশি ধর্মবেগ নিযে আমরাও যেমন পিছিয়ে রইলাম, বেশি কাজ করে ইউরোপও ত এগতে পারল না—আমাদের চেয়ে পিছিযে থাকার সামিল ত।' গগন বাবু একটু খুলে হাসতে গিয়ে শবীরের হৃদযযন্ত্রে হঠাৎ খানিকটা বাঁধা পেয়ে হাসি থামিয়ে ফেলে বললেন, শুদ্ধ ধর্ম ও ষোল আনা সত্য কাজ নিয়ে সিদ্ধ হয়েছে—এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো জাতিকেই ত সে–রকম দেখা গেল না।

সূচীপত্রে যান

'ব্রাহ্মসমাজ একটা চেষ্টা করেছিল' হিতেনবাবু বললেন।

'কিন্তু তা নিরর্থক হবে? টিনি জিজ্ঞেস করল।

'ধর্মের দিক দিয়ে ত হচ্ছে,' গগন বাবু মোটা-মোটা আঙুলের ভেতর হাতের চুরুটটাকে নাচিয়ে নিয়ে বললেন,'একটা স্টিকই যেন গগন বাবুর চুরুট'—টিনির মনে হচ্ছিল,' ভারতবর্ষে ত নানারকম লোকের জটিল হন্দো সব,' ধর্ম চায় তারা বটে, নিরীশ্বর নয় তারা বটে, কিন্তু ধরতে ছুঁতে চায় ঈশ্বর যে মানুষেরই পরাকাষ্ঠা এবং প্রেমভক্তির বলে তার সঙ্গে ঘর করা সম্ভব এর বাইরে তাব যেতেই চায় না। সাড়ে তিন হাত বিস্তার এবং পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়া আর কিছু স্বীকারই করতে চায না। ব্রাহ্মসমাজ একটু অন্য জিনিস চেয়েছিল।'

'অবিশ্যি তাই বলে যুক্তিকে দেবতা বানায় নি ব্রাহ্মসমাজ,' গগন বাবু দেশলাই ধরিয়ে চুরুট জ্বালাতে-জ্বালাতে আগুনটার দিকে চোখ আটকে রেখে বললেন,'ব্রাহ্মসমাজ কোনো দেবতা বানাতে যায় নি-এমনই একটা শুদ্ধ আবেগে স্থিত হতে চেয়েছিল।

'এ ত গেল ধর্ম যুক্তি আবেগের দিক,'ফাটা বললে,' কিন্তু কাজের দিক দিয়ে ব্রাহ্মসমাজ প্রায় প্রথম থেকেই ভেঙে আছে।'

'এ সমাজ ত ধর্মকেই প্রাণের প্রাণ এই বোধ সম্বল করে নেমেছিল কিন্তু সে প্রাণবস্তুর দিক দিয়ে দেশের কাছ থেকে কোনো সায় পেল না—গগন বাবু চুরুটটাকে ভাল করে জ্বালিয়ে নিয়ে তারই হাতের একটা মোটা আঙুল জ্বালিয়ে ফেলেছেন যেন অন্ধকারের ভেতর এ-রকম একটা ধোঁকা তৈরি করে ফেলে বললেন,'কাজকর্মও থিতিয়ে গেল তাই। ধর্ম ও কাজ ত ছ-খুপরির জিনিস নয়, একই জিনিস, এক প্রাণ। নীল রং খুব বেশি গাঢ় হলে কাল দেখায়—কিন্তু একই মাতৃবর্ণ রয়েছে ওখানে—আলো পড়লে নীল ছাযার ভেতরে কলোনীল রংটাকে পৃথক করে বের করা যায় না ত ওর ভেতর থেকে। কাজের দিকটা নীলের মতন যেন আর ধর্মের দিকটা কৃষ্ণ বর্ণেব-' চুরুটটা জ্বালিযেছেন বেশ জুত মতন, কিন্তু মুখে দিয়ে ফুরসত পাচ্ছিলেন না গগন বাবু। জ্বলতি চুরুট, চুরুটের মত মোটা ছ্যাঁচা কাল আঙুলগুলো উঠছিল, পড়ছিল, ঘুরছিল, নাচছিল, ডিঙ্গি কান্নিক মারছিল তার কথার সঙ্গে তাল রেখে। তিনি বললেন, একটা উপমা ব্যবহার করলাম আমি, এর মানে এ কখনো নয় যে ধর্ম কাল রঙের আর কাজ নীল। মানে হচ্ছে এই যে ধর্ম কর্ম অভিন্ন—একটা একই রঙের মাতৃবঙেব ভেতবে যেন।'

'কটা বাজল?' হিতেন বাবু বললেন।

'সাড়ে নটা'

'ধানরাজের মা এল না ত এখনো'-টিনি বললে।

'বড় কমল বাবুব জমিদাবিব একটা কিনাবা করতে এসেছ বুঝি তুমি ফাটা?'

'জমিদারি প্রথা দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে শিগগিরই'—ফাটা বললো। পকেট থেকে সে একটা পাইপ বেব করে নিযেছে, অন্ধকাবে নজরে পড়েনি বড় একটা কারো, টিনি দেখছিল। উঠে গেলেই ভাল বাবা অনেক আগেই সেই কথাটা সরকাবকে বলতে চেযেছিলেন, সেই জন্যে সব ছেড়ে দিযে ব্রাহ্মসমাজে চলে এসেছিলেন, হাতেব ছোট্ট চুরুটটা জানালার ভেতর দিযে আস্তে ছুঁড়ে ফেলে ফাটা বললে,' কাকা ছেড়ে দিলেন, হীবেন ছেড়ে দিল, আমি একা জমিদারির স্বত্বটা দিযে কী করব তাই ভাবছি, প্রজাদের ভেতর ভাগ কবে দেয়া যেত—কিন্তু—

'সত্ত্ব—আইনে-আদালতে বুঝে পেযেছ তুমি?'

'না। যদি পাই?'

'পাওয়া কঠিন,' হিতেন বললে, ' ও-জমিদাবির কিছু কি আছে আর—তোমাদের ভোগেব জন্যে?'

'নেই বলেই ত ধরে নিযেছিলাম, কিন্তু ঠাকুরদার আমলের নায়েব মশাই মুস্কিল লাগালেন!'

'কেন?'

'চিঠিব পর চিঠি লিখে আমাকে হয়রান করেছেন দু-বছর ধরে। গত পনের দিন ধবে কেবল টেলিগ্রাম চলেছে।'

'কেন, কী হল?'

'তিনি বলেন মামলা করতে হবে ম্যানেজার শীতল দত্তের নামে, আরো দু-চারজন জ্ঞাতি ভাই মহিলা-টহিলার নামে, দলিলপত্র সব নায়েবের কাছেই আছে, মোকদ্দমায কোনোই বেগ পেতে হবে না, ঠুকে দিলেই হয়ে গেল,—জমিদারি পেয়ে গেলাম, এক লক্ষ টাকার মুনাফা এখনো কেটে ছেঁটে পাওয়া যাবে বছরে

প্রাণকিশোর বাবু কেবলই লিখছেন আমাকে, ফাটা হাতের পাইপটা পকেটের ভেতর রেখে দিয়ে জার্মান সিলভারেব একটা সিগারেট কেস বের করে বললে,' খবরটা মৈতি, আমাব দিদি মৈত্রেয়ীরও কানে গেছে।'

'কী করে গেল?' কেমন যেন বিপদ গণে সরোজিনীদি বললেন, অথচ বড় কমল বাবুর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে কত ভালবাসতেন তিনি একসময়ে। মাঘোৎসবে যখন গানে বক্তৃতায় লোকে লোকরণ্য, সমাজ সরগরম থাকত দিনবাত—কত আদর করতেন তিনি মেয়েটিকে, কিন্তু শুকিয়ে বুঝি গেছে সব অপ্রস্তুত হয়ে ভাবছিলেন সরোজিনী।

'আমাকে চিঠি-টেলিগ্রাম কবে করে কোনো উত্তবই যখন পাচ্ছিলেন না মরিযা হয়ে অবশেষে দিদিকে লিখে ফেলেছেন প্রাণকিশোব বাবু।'

'ও,' অবসাদ বোধ করে সরোজিনী বললেন, ' শুনে ফেলেছে বুঝি মৈতি। কী বলে?'

'দিদি আট-দশ দিনেব ভেতরেই বাসমতীতে চলে আসছে.' শুনে রক্তের ভেতর ববফ তৈরি হতে লাগল যেন কেমন একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ শীতে, ঝিমিযে আসা টলমলানিব ভেতর, যে-কযটি লোক বসেছিলেন সবোজিনীর ঘরে-তাদেব হৃদযে মনে।

'কেন, মৈত্রেয়ী আসছে কেন?' গগন বাবু বললেন,'জমিদাবি পেলে ত তুমি পাবে।'

'পেলে আমি ওকে দিয়ে দেব।' ফাটা কেস থেকে একটা সিগাবেট বেব করে কেসটা পকেটে ফেলে দিয়ে বললে।

'ও-বকম কাজ কবতে যেও না ফাটা,' সবোজিনী একটু চিৎকাব দিয়ে উঠে বললেন,' তাহলে তোমাব নাম কেটে দেব আমরা বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজ থেকে।' আবো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সবোজিনী, কিন্তু উত্তেজনাব ঘোবে ঢেব বেশি বলা হয়েছে অনুভব করে নিজেকে জোব কবে থামিযে বেখে চুপ করে গেলেন তিনি।

'আমার নাম কি আছে বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজের খাতায?' সিগারেটটা না-জ্বালিযে দু-হাতেব তেলোয আড়াআড়িভাবে রেখে দিয়ে ফাটা জিজ্ঞেস কবল আস্তে-আস্তে।

'আছে,' ছাতু কাকা বললে,'তুমি ত মোটা চাঁদা দিচ্ছ সমাজে। তবে গত ছ' মাসেব ভেতব কিছু দাওনি, প্রায ত্রিশ টাকা জমেছে তোমাব নামে।'

'তুমি কি আজকাল সেক্রেটাবি নাকি বাসমতী সমাজেব ছাতুবাবু?'

'গগন সেক্রেটাবি,' হিতেন বাবু বললেন, 'ছাতু এ্যাসিস্টেন্ট।' তাহলে তোমাকেই দিচ্ছি, এই পঞ্চাশ টাকা নাও,' ফাটা কোটেব ভেতরের গুপ্তি পকেট থেকে পাচটা দশটাকাব নোট বেব কবে ছাতু কাকাব হাতে দিয়ে বললে, 'চাঁদাব খাতায আমাব নামে জমা কবে বেখে দিও। ওবে বাব্বা—বাসমতীব ব্রাহ্মসমাজ থেকে আমাব নাম কেটো না তোমবা, এই একটা জিনিসই ত আছে আমাব; আব-সব দিক দিযেই ত আমি কাটা আব ফাটা। সিগাবেটটা পকেটেব ভেতব ফেলে দিল ফাটা, না সিগাবেট খাবে না এখন সে, সবোজিনীদিদেব সামনে চুরুট খেযেও ঢেব বেকুচি কবেছে। এদেব সামনে এখন সে সিগাবেট চুরুট খাবে না। কোনো ভয ডর সমীহ, এমন-কি নিযম শাসন রুচি সৌজন্য মেনে চলাব জন্যে ঠিক নয, বড় কমল বাবুব কাজ ও স্মৃতিকে শ্রদ্ধা কববাব জন্যেও নয, ধর্ম বলেও বিশেষ কিছু নেই ফাটাব, আনুষ্ঠানিকতা আবো কম, কিন্তু তবুও মনেব উঠতি সমযটা খুব গভীব ভাবে জড়িত বলে-মন সে সময়ে শ্রদ্ধা করতেই চাইত, ভালবাসতে চাইত, বিশ্বাস কবতে চাইত বলে—কযেকজন খুব খাঁটি পুরুষ-স্ত্রীলোক এমন-কি মাঝে-মাঝে মাঘোৎসবেব গভীব রাতে, সমাজ ভেঙে যাবার অনেক পবেও যখন বড় কমল বাবু একা বসে থাকতেন মন্দিবে অন্ধকাবের ভেতব আব পাশে শতরঞ্জিব ওপব শুযে থাকত সে, তখন মনে হত ঈশ্বরকেও যেন পেয়েছে সে,—এইসব কারণেই এখানকার ব্রাহ্মসমাজ ও সবোজিনীদি, হিতেন বাবু, ছাতু বাবু, গগন বাবুব জন্যে আলাদা একটা টান বয়েছে ফাটার। এ আবেক বকম শ্রদ্ধা প্রীতি। অনেক লেখাপড়া শিখেছে সে তাবপব, যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে কেটে ফেলেছে সে-কিন্তু বাসমতীর সেই বিশ্বাসের পাত্রদের কাটতে পাবেনি। ঈশ্বব নেই—কিন্তু বাসমতীব সেই মাঘোৎসবেব রাতেব ঈশ্বর বেঁচে রয়েছে আজও। ধর্ম বিশেষ কোনো ভাব জাগায় না এখন আব তার মনে, কিন্তু তার বাবা, অবিনাশবাবু, দেববাবু, নিশিকান্ত চক্রবর্তী শীতে অন্ধকাবে দবিদ্রতায যে-ধর্মকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন অবচেতনার ভেতরে চেতানায রয়েছে সব—মিথ্যা হয়ে নয সত্য হয়ে নয কিন্তু তর্কোত্তব এক অপবিমেয় অস্তিত্ব হিসেবে। তর্ক করতেই চাই বটে সে, যুক্তি ছাড়া শ্রদ্ধেয় আর-কিছুই নেই আজ

পর্যন্ত বোধ করে সে, কিন্তু এক জায়গায় এসে তর্কেরও কোনো স্থান নেই যেন আর—এমনই সুতর্কিত প্রদেশ সেটা। তার নিজের মনের অতীত কোনো এক আশ্চর্য মন স্বয়ম্ভর বিশুদ্ধ যুক্তির প্রকরণে কেমন অব্যয় সে দেশ—এই বাসমতীর' ব্রাহ্মসমাজ।

'পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিলে এখন?'

'কাল আরো দেব, ফাটা বললে।

'তোমার কাছে আর-ত পাওনা নেই।'

'অনেক পাওনা আছে।'

সরোজিনীদির হুমকি খেয়েই এ-সব কথা বলছে না অবিশ্যি ফাটা। বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজ থেকে তার নাম কেটে দিলে কিছুই এসে যাবে না তার। তার মত অতিশিক্ষিত ছেলেদের মূল্যজ্ঞান বদলে গেছে ত ঢের, প্রথমতম মূল্যের জিনিস টাকা, টাকা যে-সুখ ও সম্মান আনে সেই সব। কোনো মূল্যই ধর্মের, ঈশ্বরের বা নীতির যদি না টাকার হিসেবে সেগুলোর কোনো সার্থকতা থাকে—ভাবছিলেন হিতেনবাবু; ফাটা ত প্রায় সেই দলেরই ছেলে, একটু গায়ে পড়েই যেন ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে খাতির করে এসেছে কিংবা কে জানে শ্রদ্ধা বিশ্বাস খানিকটা রয়েছে এখনো হয়ত।

'বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজটা ভেঙে চুরে গেছে; চারদিকের মাঠ কম্পাউন্ড জঙ্গলে জাংলায় ভরে গেছে সরোজিনীদি।'

'তুমি গিয়েছিলে নাকি দেখতে?'

'হ্যাঁ, আজ সমস্ত দিন ঐখানেই ছিলাম, একজন লোককেও ত দেখলাম না সমাজে।'

'কী করে দেখবে, আজ ত রবিবার নয়।' ছাতু কাকা বললে,'আজকাল এরকমই হাল চলে। রবিবারেও পনের-কুড়ি জনের বেশি লোক আসে না।'

'মালিও নেই? দপ্তরী আছে?'

'আছে একজন—উড়ে মালি, সরকারি অফিসে পেয়াদার কাজ করে, শনি রবিবার এসে আমাদের কাজ করে দিয়ে যায়।'

ফাটা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের বেড়টা আস্তে-আস্তে ঘষতে-ঘষতে বললে, 'সমাজবাড়িটা মেরামত করে ঠিকঠাক করে ফেলতে ছ' হাজার আড়াই হাজার টাকা লাগবে গগন বাবু?'

'তা লাগবে। কিন্তু টাকার জোগাড় কী করে হবে? টাকা নেই।'

দেখি—কিছু জোগাড় করতে পারা যায় কি না; বাসমতীর পাট ত উঠিয়েই দিয়েছি, এখানে আমার উপায়ের কোনো পথ নেই। কলকাতায় বসে রোজগার দেখছি; ব্যবসা করছি।'

'তুমি বাসমতীতে এসে থাকো ফাটা,' সরোজিনী বললেন, 'এই জমিদারিটা পেলে তোমার ত কোনো চিন্তা থাকবে না আর।'

'জমিদারিটা মৈতি চাইছে।'

'তার মানে?' হিতেন বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তার টাকায় ত দশটা পাশাবতীর জমিদারী কিনতে পারা যায় হে ফাটা। যে-ফিরিস্তি দিলে তুমি তার, তারপর মৈতির কথা শুনতেও আমার ঘেন্না করে।'

'তাহলে হীরেনের কথা শুনুন' ফাটা গানের মত সুরে হেসে উঠে বললে, 'তাকে কেবল করেছিল মৈতি সিকাগোতে, উত্তরে হীরেন আমাকে জানিয়েছে যে সে কিছুই চায় না জমিদারির, মৈতি যদি বেশি চেপে ধরে খানিকটা যেন মৈতিকে দিয়ে দিই আমি। খানিকটা কতটা তাও বুঝলাম না। তাছাড়া আগোগোড়া জিনিসটাই ত একটা কাঁটাল হয়ে ঝুলছে, মৈতির গোঁফ নেই, সে-ই তেল মাখছে সব চেয়ে বেশি।'

'তুমি ওকে কিছু দিও না ফাটা; সরোজিনী কঠিন নির্দেশের মত বললেন।

'তুমি মৈতিকে কিছু কথাটথা দিয়েছ নাকি ফাটা?' গগন বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'না। এখনো কিছু বলিনি। তবে শুনেছি মৈতি খুব টাকায় ঠেকেছে।'

'মিথ্যা কথা,' সরোজিনী খুব গরম হয়ে বলে উঠলেন, 'সোনার টুকরো ছেলে আমার হীরেন; রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের একটা আলাদা শালীনতা আছে হিতেন বাবু।'

'তা আছে।'

সত্যিই বড্ড টাকার টানাটানি চলেছে নাকি মৈতির। অনেক ধারধোর হয়ে গেছে সরোজিনীদি,' ফাটা বললে।

মৈতির কথা ভাবতে গিয়ে যেন আগুন সমান জ্বলে যাচ্ছিল সরোজিনীর মনের ভেতর।' ফাটার কথায় এমন-কি বড় কমল বাবুর ছায়ায়-ছায়ায় সেই ফ্রক পরা খুকির কথা ভেবে, নিজেও কত রাতে সমাজের চিকের পর্দার পেছনে অথবা ওপরে মেয়েদের গ্যালারিতে মেয়েটাকে কোলের কাছে টেনে নিতেন—বড় কমল বাবুর স্মৃতির প্রতি কর্তব্যের খাতিরে আজ জোর করে সে-সব কথা ভাবতে গিয়ে কোনো জলের প্রক্ষেপ পড়তে চাইল না যেন মনে কেমন একটা ধিকি ধিকি আগুন ডাঙার ভেতরে।

'মৈতি টাকার লোভে মিথ্যা কথা বলছে, 'সরোজিনী বললেন, 'তুমি যদি মৈতির কথায় কান দাও, 'আবার বললেন সরোজিনী, সকলেই সরোজিনীর মুখের দিকে তাকাল, তাহলে-কিন্তু সরোজিনী যে-কথা বলবেন ভেবেছিলেন সেটা যে বলা চলে না তার মনের মুসাবিদায় শেষ মুহূর্তে সেটা ঠিক করে ফেলে, কিছুই তিনি বলতে গেলেন না আর, ধানরাজের মাও এই মুহূর্তে ঘবের ভেতব ঢুকে পড়ে বাঁচিয়ে দিল সরোজিনীকে।

'একটু আলো দিতে পারো ধানরাজের মা?'

'দিচ্ছি।'

'দিচ্ছি? কেরোসিন পেলে না কি গো?'

'হ্যাঁ, আধবোতল পেয়েছি, কনট্রোলে নয়, ডবল দাম নিলে।'

'ওঃ—চুরি করে কেনা।' সরোজিনী অম্বলের ঢেকুরে ব্যথা পেতে-পেতে বললেন,' ও তেল তুমি ফেলে দাও ধানরাজের মা।'

'বাতি দেব না তাহলে?'

'না।' অম্বল, ঢেকুর, ধানরাজের মা যা কাজ করেছে, ফাটা যা মহাভারত শোনাচ্ছে সব কিছুতেই শেষ বয়সের কেমন একটা অন্তিম সন্নিপাত তাঁকে হতাশ, নিস্তব্ধ করে রাখতে চাইলেও তিনি দু-এক মুহূর্তের ভেতরেই ছাড়িয়ে উঠতে পারলেন সব। বললেন,'তোমাকে কতবার বলেছি সোজাসুজি ন্যায্যভাবে যা পাবে তা ছাড়া কোনো জিনিস হাত দিতে যাবে না ধানরাজের মা।'

'অন্ধকারেই থাকব আমরা,' টিনি সরোজিনীর মনের ভাব সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে নরম ভাবে ভাঙিয়ে বললে,—হয়ত কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এমন কোনো বিনীত সত্যার্থিনীর মত।

চলে গেল ধানরাজের মা।

'আমাকে যেন কী বলছিলেন যেন আপনি সরোজিনীদি,' ফাটা বললে,

'কিন্তু বললেন না ত।'

সরোজিনীর মনে শান্তি এসেছে এইবারে। সংসাবের থেকে আলগা হযে উঠে দাঁড়াতে পেরেছেন যেন তিনি। কিছুক্ষণ আরো বাসনা বেশি জেগেছিল বলে তারই প্রতিশোধন হিসেবে হযত, কিন্তু খুব সম্ভব ধর্ম ও সাধনার সঙ্গে অনেক দিন থেকে আত্মীযতা রযেছে বলে। মনের পরিসব বেড়েই ত আছে—সমস্ত সুপরিসব স্থান ভবে এই মুহূর্তে তৃপ্তি,' এসেছে যেন।

তিনি বললেন, 'তোমার ঠাকুরদা। জমিদারিটা তোমার বাবাকেই দিযে গিযেছেন—তুমি বললে ত। কিন্তু বড় কমল বাবু সেটা একেবারেই ছেড়ে দিযে ব্রাহ্মসমাজের কাজই করে গেলেন সমস্ত জীবন ভবে। এ জমিদারিটা এখন তুমি পাবে হযত। মৈতি চাচ্ছে তোমার কাছ থেকে। মৈতিরা নিজেদের টাকা উড়িযে দিযেছে কিনা, জানি না। দিক বা না-দিক বড় কমল বাবুব জমিদারির ভাগ তাঁর মেযে চাইবে তাঁব ছেলের কাছ থেকে—এ বিষযে বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজের কারুরই কিছু বলবার নেই। তোমবা দু ভাইবোনে মিলে যা ভাল বোঝ তাই করবে। কিছু বলবার আছে আপনার হিতেন বাবু?'

'না।'

'গগন বাবু?'

'জমিদারি সিস্টেম নাকি গভর্ণমেন্ট উঠিযে দেবে শুনছি-ওঠাতে-ওঠাতে এখনো দশ পনেব বছর, আমরাও সংসার থেকে উঠে যাব সে-সময। আমার নিজের তিনকাঠা খাস তালুক আছে বাসমর্তাতে। সেইটুকু জমির ফ্যাকড়া নিয়েই আমার রাত্তিরে ঘুম হয না, বড় কমল বাবুর জমিদারির কথা আমার মাথায় আঁটে না-বলে গগন বাবুর চুরুটে দু'টো আলতো টান মেরে নিযে বললেন দেশ স্বাধীন হলে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সব জমিদারিগুলো স্টেট নিজেব হাতে নিয়ে প্রজাদের ভেতর ভাগ করে দিলেই ভাল হয,' সরোজিনী বললেন, 'বাসমতী ব্রাহ্মসমাজ কমিটির প্রায় সব মেম্বারই ত এসেছেন আমার ঘরে। এ বিষয়ে আজ কিছু বলবার আছে কারো?'

'না।' টিনি বললে।

'কিছু বলবার নেই।' ছাতু বললে।

সুকুমার এক কোণে সরোজিনীর ভাইদের পরিত্যক্ত একটা পুরনো স্টিল ফ্রেমের ন্যাওড়ের খাটে গা বিছিয়ে দিয়ে ঝাড়া ছ'ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে সাড়া দিয়ে বললে,'আপনার প্রশ্নটা আমি শুনেছি সরোজিনীদি, আমাকেও কিছু বলতে হবে?'

'বলো, তুমি ত মেম্বার।'

সুকুমার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

হিতেন বাবু বললেন, 'তোমার কী বলার আছে—কই—কোথায় হে সুকুমার?'

'নাক ডাকাচ্ছে সুকুমার। টিনি বললে।

'আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, তোমাকে ফাটা,'গগন বাবু বললেন,

'মৈতি কবে আসছে বাসমতীতে?'

'দশ-পনের দিনের ভেতর।'

'ওর স্বামী ভবকিঙ্করবাবুও আসছেন?'

'কলকাতা অব্দি পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবেন। তারপব—ফাটা বললে, কিন্তু মৈতি বেরিলির থেকে বাসমতী একাই ত আসতে পারে-পাযে হেঁটে।

আপনি ত চেনেন তাকে গগন বাবু।'

'এসে বাসমতীতেই বসবাস করবে ত এবার?'

'তাহলে গোটা জমিদারি চালাবে কী করে? নায়েব-গোমস্তা দিয়ে? সেই বেরিলির থেকে?

'আমি ত তাকে সমস্ত জমিদারিটা দিচ্ছি না।'

'তবে?'

'জমিদারি আমাব নামেই থাকবে; মুনাফার শতকরা পঁচাত্তরই ভাগ দিদিকে দেব।'

'ও, হিতেনবাবু একটা ঢেকুর তুলে বললেন, কটা বেজেছে গগন বাবু?

'প্রায দশটা বাজে, আমি এবারে উঠব।'

'একটু বসুন গগন বাবু, আপনারা সকলেই ত এখানে আছেন, এ মাসের বক্তৃতা কে কী করবেন একটা খসড়া এখানে বসেই ঠিক করে নিই,' সরোজিনী বললেন।

'কোনো আলোটালো নেই ত-খশড়াটা মুখে-মুখে হতে পারে,' হিতেন বাবু বলছিলেন।

'একটু কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলে ভাল হত, একটা মোমবাতিও নেই টিনি?'

'মোমবাতির ক্যান্ডেলটা ফুরিযে গেছে, আপনাকে কেনার কথা বলেছিলাম ত মাসিমা, তা মোম পাওযা যাচ্ছে না শুনছি, ধানরাজের মার কেরোসিনের কৃপা আছে,' টিনি বললে,'সিদ্ধার্থের ঘরেও অন্ধকাব।'

'বাড়ি ফিরেছে সিদ্ধার্থ?' ফাটা জিজ্ঞেস করল,'এ বাড়িতে ঢোকবাব সময ওকে পেলুম না, ওর ছেলেমেযে স্ত্রী কোথায়? কাউকেই ত দেখলুম না।'

'সিদ্ধার্থ ফেরেনি এখনো। ওবা বোধ হয ঘুমিয়ে পড়েছে। রেডিব তেল আছে। বেড়ির বাতি জ্বালিযে নিযে আসব মাসিমা?'

'থাক,' পকেট থেকে পেন্সিল নোটবুক বের করে গগন বাবু বললেন,

'ওসব বাতিফাতি ঠিক করে আনতে দেরি হযে যাবে। আমি টুকে রাখছি, অন্ধকারে লেখা অভ্যাস আছে আমার,' পকেট থেকে চশমার খাপ বের করে বললেন গগন বাবু।

'চশমা চোখে অন্ধকারে লেখা?' ফাটা বললে।

চশমা এঁটে নিযে গগন বাবু বললেন,'এ মাসে বক্তৃতা হবে না, ব্রাহ্মসমাজের কোনো বড় আচার্য বা নেতাবা বা অন্য কোনো বিশেষ স্মরণীয় কারো মৃত্যু তারিখ নেই এই মাসে, স্মৃতিসভার কোনো দরকার দেখছি না। এমনি ধর্ম, সমাজ, ভারতবর্ষের পুরনো ও নতুন, মর্ম, বার্তা, ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণভাবে বক্তৃতা হতে পারে। কিন্তু কে দেবে? আমাদের বাসমতী ব্রাহ্মসমাজেব সব বড় বড় বক্তারা ত দশ-পনের বছর আগে চলে গেছেন,হিতেনবাবুর বযস হল, সরোজিনীদি বুড়োমানুষ, আমি কিছু বলতে-টলতে পারি না, নোটখাতার লেখরাজ সর্দার। ফাটা, তুমি কিছু বলবে?'

'সমাজে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা?'

সূচীপত্রে যান

'হ্যাঁ, এই পনেব-কুড়ি জন লোকের সামনে। বাসমতীতে যুদ্ধের হিড়িক টিড়িকে কত যে লোক বেড়েছে—এখন ত প্রায় ছ' লাখ, সোয়া ছ' লাখ হয়েছে, কলেজে চুয়াল্লিশ জন প্রফেসর, তিন হাজার ছেলে, কিন্তু সমাজে বক্তৃতা শুনতে কুল্লে পনের জন মানুষ হবে কিনা সন্দেহ। তাও আমরা আমরাই। বাইবেব থেকে [illegible] জন আসবে হয়ত। অথচ এই সমাজেই অবিনাশ গুপ্ত মশাই যখন বক্তৃতা দিতেন কুড়ি-বাই[illegible] আগে, তখন ছোট কমল বাবু, কিংবা চক্রবর্তী মশাই, কিংবা পরেশ সে তখন বাসমতী ব্রাহ্ম সমাজের দেয়ালের ইট ভেঙে যাবাব সামিল হত লোকের ধস্তাধস্তিতে। আমবা ঘবে-বাইরে, গ্যালারিতে, বারান্দায়, বেঞ্চ ঠেলে গাদিয়ে পথ খুঁজে পেতাম না কাব ঘাড়ে বসব দাঁড়াব।'

ফাটা চুরুট জ্বালিয়ে নিল, মনটা তার কেমন যেন তেতে উঠেছে, কিন্তু নিঃসহায় সে, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো জিনিস আশ্চর্যভাবে হয়ে যায়, কিন্তু দ্বিতীয়বাব হবাব নয়, কোনো উপায় নেই, কী করবে সে।

'বক্তৃতা আমি দিতে পাবি না গগন বাবু।'

'তা জানি।' কেমন নিরেটভাবে যেন বললেন গগন বাবু।

'সিদ্ধার্থকে বলুন।'

'ও দিতে পাবে, কিন্তু দেবে না।'

'কেন?'

'কয়েক বছব আগে কয়েকটা বক্তৃতা দিয়েছিল। বেশ বলতে পাবে। বললে হবে না-আধুনিক সমাজের নাড়ী টিপে ঘা দিয়ে যেতে পাবে—ঘায়েব পবে ঘা। আশ্চর্য!' গগন বাবু চুরুটের ছাই নোটবুকেব পেনশিল দিয়ে ঠুকবে ফেলে বললেন, 'কিন্তু তাবপব থেকেই চুপ মেরে গেছে সিদ্ধার্থ, কেউ কিছুতেই ওকে দিয়ে একটা কথাও বলাতে পাবছে না সমাজে, ও বলে ওসবে কিছু হবে না।'

'সিদ্ধার্থ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে,' সরোজিনী পেটেব ভেতব বুকেব ভেতব অম্বলেব ও তারও অতীত একটা কষ্টেব বাষ্প চেপে রাখতে চেষ্টা করে বললেন।

'কীসের বিশ্বাসেব কথা বলছেন সবোজিনীদি?'

'ধর্ম বলতে আমবা যা বুঝি ও তা বোঝে না।'

'কী বোঝে সিদ্ধার্থ?'

'ঈশ্বরকে আমরা যেভাবে উপাসনা কবি—সে পদ্ধতিব থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে সিদ্ধার্থ; টেব পেয়েছি আমি। ও অনেক কথা ভাবে, আমরা সে-সবেব কিনাবা করতে পাবি না। পদ্ধতি সম্পর্কেই শুধু নয়-স্বরূপ সম্বন্ধেও আমি বুঝতে পাবছি সিদ্ধার্থের ধাবণা একেবারে অন্যবকম। ও হয়ত মনে ভাবে যে আমবা স্বরূপেব কাছে যে হিসেবে নিবেদন জানাই তাব কোনো অর্থ হয় না। আমাদেব অনুষ্ঠান পদ্ধতিব অর্থ-ত ভাবছে- আমাদেব মনে রয়েছে শুধু, হিতেনবাবুর মনে, গগন বাবুর মনে, আমাব মনে -কিন্তু সৃষ্টিব ভেতরে নেই।'

'স্বরূপে বিশ্বাস করে না সিদ্ধার্থ?'

'যা বললাম ফাটা তাব থেকে বুঝে নিতে হবে তোমায়।'

'আমাব মনে হয় সিদ্ধার্থ অন্যভাবে বিশ্বাস করে।'

'সিদ্ধার্থের দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না,' গগন বাবু তাড়া দিয়ে বললেন'ওকে দিয়ে সমাজের কাজ হবে ঢের, কিন্তু ও কিছু করবে না। তাহলে সমাজে কিছু বলবে-টলবে না ফাটা? কলেজ-টলেজ, বাব লাইব্রেরি বা বাইরে পাঁচ-ছ জায়গায় কেউ-কেউ আছেন, জ্ঞানী মানুষ, সাধনা টাধনাও করেছেন, কিন্তু তাদের ডেকে এনে সমাজে বক্তৃতাব ব্যবস্থা করে ব্রাহ্মসমাজেব দিকে থেকে বিশেষ কোনো লাভ নেই। অনেকবার ডাকা হয়েছে তাদেব, অনেক বক্তৃতা হয়ে গেছে। তাতে শ্রোতার সংখ্যা কিছু বাড়ে বটে, সমাজের বাতিও জ্বলতে থাকে, কিন্তু বামমোহন, মহর্ষি, শাস্ত্রীমশাই ধর্ম ও সমাজে হিসেবে দেশকে যা দান করতে চেয়েছিলেন সে কাজ একটুও এগোয় না। আমাকে তোমরা গোঁড়া মনে করো না ফাটা, ছাতু আব চিনি, আর সুকুমার, ঘুমুচ্ছে নাকি এখনো?'—

'নাক ডাকাচ্ছে,' টিনি বললে।

'কিন্তু,' গগন বাবু চুরুটে টান মেরে নিয়ে বললেন,'ও-সব বক্তারা শেষ পর্যন্ত পণ্ডিচারি, রামকৃষ্ণ মিশন, পলিটিক্স, জমিদারি উচ্ছেদ, খাদ্য সমস্যা, কম্যুনিজম, কংগ্রেস, দেশের গরু-মহিষ, হিন্দু মহাসভা, বিড়লাটাটাবাদের উপকারিতা—এই সবেব ভেতব থেকে এক-একটা খুঁটি বেছে নিয়ে কোথায় থেকে কোথায়

যে চলে যান—' মুখের কাছে চুরুট তুলে নিয়ে গগন বাবু বললেন,'ওদের কারো বলবার ক্ষমতা আছে, কেউ-কেউ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, কিন্তু ও-সব বক্তৃতা বাইরের জনসভায় চলে। ধর্মসমাজে ও-সব জিনিসকে পটভূমি হিসেবে রেখে মুখ্যত ধর্মের কথাই বলতে হয়। আমাদের সমাজে আমরা ব্রাহ্মধর্মের কথা শুনতে চাই, এর আগেকার ইতিহাস এখনকার অবস্থা, এ দুরবস্থার কারণ কী, কোন দিক দিয়ে জ্ঞানের আলো ও উদ্যম নিয়োগ করতে হবে, দেশ ধর্মের থেকে সরে যাচ্ছে কেন, স্বদেশী আন্দোলনে স্বাধীনতা এল না কেন, ঈশ্বরকে উপাসনা করতে গিয়ে দেশ হাজার রকম ছেলেমানুষি সংস্কার থেকে মুক্ত হল না কেন, কী করে আগামীকালে সার্থকতা লাভ করতে পারা যায়, এইসব নিয়ে বক্তৃতা দেয়া দরকার।'

'একজন সেন্ট পলের দরকার,' ফাটা বললে, চুরুটটা অনেকক্ষণ হল জ্বালিয়ে রেখেছে সে, কিন্তু টানেনি। একবার টানার চেষ্টা করে বললে, করে সমাজের ভেতর সেন্ট পল বা গৌতম বুদ্ধ বেরিয়ে যায় কে জানে; তবে শিগগির কিছু হবার সম্ভাবনা কম। তারপর ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন-মানুষের হাতে সবই যখন প্রায় হয়ে এল, অন্ধকারের স্রোতে-স্রোতে নিমজ্জিত করে যায় সব, এত বেশি যে আজকাল ধর্মের প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। কেন সমাজে আসবে? এটা ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জায়গা। এখানে টাকা, স্ত্রীলোক বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এলাহি খোরাক কোথায়—তা ছাড়া সভ্যতার মানেই বা কী? সভ্যতা মানেই সুখীদের ইকনমিক্স্, অসুখীদের পলটিক্স্, তিনটে বিস্তার নিয়ে কাজ; ধর্ম চতুর্থ বিস্তারের জিনিস, সভ্যতার এলাকায় পড়ে না। সুখীদের ভেতর অনেক তাজা-তাজা কইয়ে-বলিয়ে আছে—গত চার-পাঁচ শ বছর ধরে তারা ত হু হু করে মহাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়া-মাইক্রোফোনের জন্যেও তাদের লোভ আজকাল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখছি। এ পথ ধরে কি তারা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দিকে পৌঁছতে পারবে—ধর্মের দিকে? আশা করেছিলুম পারবে হয়ত। কিন্তু এখন দেখছি সব গাবিয়ে যাচ্ছে, মাইকের বক্তা মহাপুরুষদের কেবলই দাবিকর্দম ত নজরে পড়ছে।'

ফাটা গলায় টাইয়ের ওপর হাত দিয়ে সেটা খসিয়ে নেবার দরকার বোধ করে একটু দম নিয়ে বললে,'একটা বেলপাতা ছিঁড়ে নিয়ে তার ওপর লিখে দাও একটা কথা, বাটখারার একদিকে পাতাটা ফেলে রাখ-আর এক দিকে ধর্ম আর ঈশ্বরকে চাপাও—দেখবে বেলপাতাই অনেক বেশি ভারী।'

'কী কথা লেখা আছে সেই বেল পাতায়?'

'দু চারটে মনের কথা শুধু আজকের সভ্যতার।'

'ও—আমার মনে হয় রূপচাঁদ পক্ষী এরকম একটা গান বেঁধেছিলেন?'

ফাটা বললে, 'না, তিনি হরি আর হরির নামের কথা বলেছিলেন; তিনি বলেছিলেন হরির চেয়েও তুলসী পাতায় হরির নামের ওজন বেশি ভারী হবে বাটখারায়। তখনকার দিনে স্বরূপের চেয়ে নামের প্রতাপ বেশি ছিল, আজকাল আরো অনেক জিনিসের মড়কের মাছি এসে পড়েছে।'

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গগন বাবু বললেন, দশটা বাজে। আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিই এইবার; সুকুমার কি জেগেছে?'

'না।'

'এত ঘুমুচ্ছে অসময়ে?'

'কয়েক রাত খুব জেগেছে; জিবানডাঙায় কলেরা লেগেছিল-সেখানে ডিউটি দিয়েছিল সিদ্ধার্থের সঙ্গে।'

'কলেরা লেগেছে নাকি বাসমতীতে? ফাটা জিজ্ঞেস করল।

'ওসব আধিব্যাধি সব সময়ই আছে কোনো-না-কোনো জায়গায়—শহরটা ত বেড়েছে-ফেঁপেছে খুব। কিন্তু কলেরা বসন্তের মড়ক বাসমতীতে দু-তিন বছরের ভেতর লাগেনি। জিবানডাঙায় কলেরা লাগছিল—তবে উঠতি মুখেই সেটাকে নিকেশ করেছে সিদ্ধার্থরা।'

'সুকুমার কী করে আজকাল?'

'এই কলেজে লেকচারার।'

'কত পাচ্ছে?'

'শ দেড়েক।'

'সিদ্ধার্থ কী রকম পাচ্ছে?'

'দুশ আন্দাজ।'

'এত কম মাইনে?' ফাটা একটু তাজ্জব মেনে বললে,' কলেজটা ত খু বড়।'

'প্রাইভেট কলেজের মাষ্টারদের মাইনে ও-রকমই' ছাতু কাকা বললে, তা ছাড়া অমিয় সেন অরুণ সেন দু'টো চোট্টা ত আছে কলেজ কমিটিতে, ওদের ত কলেজ।'

গগন বাবু বললেন, 'দশটা বাজল।'

'প্রিন্সিপালটাও চোট্টা।'

'থামবি ছাতু?' সরোজিনী বললেন, 'সুকুমার আজকাল আমাদের সমাজে গান করছে ফাটা, বেশ গায়। আমি বেদীতে উপাসনা করতে বসে একটুও অসুবিধা বোধ করি না। ঠিক যে-রকম উদ্বোধন আরাধনা উপাসনা করতুম—সবদিনই তা আর এরকম করি না, কত পার্থক্য থাকে একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের-তা আমার ভাব, প্রস্তাবনা যে-রকমই হোক না কেন, সেই অনুযায়ী গান গাইতে সুকুমার সত্যিই সিদ্ধিলাভ করেছে। বেদীর আচার্যের মনমেজাজ সম্পর্কে এরকম অদ্ভুত চেতনা আমি সত্যসখা ঘোষালকেও অনুভব করতে দেখিনি।'

'সুকুমার অনেক গান জানে তাহলে?'

'ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সব গানই,' সরোজিনী বললেন, 'গান গাইবার সময় ব্রহ্মসঙ্গীত একখানা ওর কাছে রেখে দেয়া হয় বটে, কিন্তু আর-দশজনের মত পনের মিনিট বসে বইটা হাঁটকে জুৎমতন গান খুঁজে বার করবার জন্যে মাথা ঘামাতে হয় না ও—আরাধনা শেষ করেছি কি সুকুমারও হারমোনিযাম বেলো করে গান শুরু করে দিল। গান ত ওর অন্তরের ভেতর আছে শ্রুতিস্মৃতির মতন—বাইরে সেই বাগীশ্বরীর প্রকাশ।'

'ও,' ফাটা চুরুটের ছাইয়ের দিকটা একবার দেখে নিয়ে অন্য দিকটা দিয়ে হাঁটুর ওপর আস্তে আস্তে ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'সুকুমারের বেশ খুলেছে তাহলে। ওকে আমি খাকির হাফপ্যান্ট পরে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি; ওর গান শুনিনি ত কেনোদিন। গান গাইতে পারে তা ত জানতাম না।'

'ইদানিং গাইছে-আগে লুকিয়ে সাধনা করেছিল খুব সম্ভব,' ছাতু বললে।

'সুকুমার ব্রাহ্ম হযেছে'

'না। এখনো হযনি!'

'হবে!'

'তা বলতে পারি না,' সবোজিনী বললেন, মনে প্রাণে বাছা আমার ব্রাহ্ম, দীক্ষিত হয়ে যে হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'তাহলে আর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে কিসের জন্যে?' ছাতু কাকা বললে, 'সুকুমার অবিশ্যি খুব ভাল। কিন্তু তাই বলে সাক্ষীগোপাল এবং দীক্ষিত ব্রাহ্মে সত্যিই একটা ভেদ রযেছে কোথাও, সুকুমার সম্বন্ধে আপনাব মনের আমেজ ঘুচিযে না-ফেললে সেটা আপনি বুঝবেন না, যেমন শাস্ত্রীমশাই বুঝতেন, হেবম্ব বাবু বুঝতেন বড় কমল বাবু বুঝতেন।'

'আচ্ছা সে মীমাংসা পরে; গগন বাবু ঘড়ির দিকে তাকিযে বললেন, 'এ মাসে তাহলে সরোজিনীদি, বক্তৃতা হবে না সমাজে। তুমি সত্যিই কিছু বলতে পাববে না ফাটা?'

'আমি বলব' ফাটা টাইযের ওপর হাত রেখে সেটাকে আস্তে-আস্তে খুলে ফেলতে-ফেলতে বললে,' কিন্তু এখুনি না আজকাল আমাকে বড্ড ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, এবাবে আট-দশদিন আছি বাসমতীতে, মাস তিনেক পবে কলকাতা থেকে ফিরে আসব আবার, আপনাকে কথা দিচ্ছি গগন বাবু,-সেবারে আমি দু-তিনটে বক্তৃতা দেব বাসমতী সমাজে; আমি মন স্থির কবে ফেলেছি।'

'আচ্ছা বেশ, গগন বাবু খুশি হয়ে বললেন, 'খুব ভাল হল, তাহলে কোনো বক্তৃতার পাট রাখলুম না আর এ-মাসে হিতেন বাবু। আচ্ছা এ-মাসে সমাজে গান গাইবে, সুকুমার, চারটে রববার, একা পেরে উঠবে?'

'ঘুমুচ্ছে সুকুমাব?' হিতেন বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'কলেরার ডিউটি দিযে-দিয়ে ওব ভেতরে আর নেই কিছু.' সরোজিনী বললেন,

'জাগিয়ে দরকার নেই হিতেন বাবু।'

'না, জাগাচ্ছি না।'

'সুকুমার গাইবে, তবে রজনী নান এসে মাঝে মাঝে দু-চারটে গান দিযে যায়। দিন ঠিক করে দিন গগন বাবু, রজনীবাবুকে বলবি গিযে তুই ছাতু, কোন-কোন তারিখে সমাজে এসে তাকে গান করতে হবে। একটু সাহায্য না পেলে বড্ড হযবানি হবে সুকুমারের। ব্রাহ্মসমাজের দিকে টান আছে

রজনীবাবুর,' সরোজিনী বললেন,'লাডলি বিশ্বাসের কীর্তনের দলটাকেও আসতে বলিস ছাতু, ওরা বললেই আসে নিজেদের খোল করতাল নিয়ে, তবুও ভাল করে বলে আসিস ছাতু।'

হিতেনবাবুর মুখ ব্যথায় বিমর্ষতার কৃতজ্ঞতায় ভেঙে পড়ছিল কী যেন একটা কথা ভাবার নিরেট জাঁতাকলের চাপে পড়ে, বললেন,'সুকুমার, রজনী নান, লাডলি বিশ্বাসেব কীর্তনের দল ওরা কেউই ব্রাহ্ম নয়, অথচ কী রকম দীনতায় বশ্যতায় সমাজের কাজ চালিয়ে দিচ্ছে ওরা, সমাজের জন্যে ওরা ভাবে বলে নয়, আমরা নিরাশ্রয় হয়ে ওদের ডাকছি বলে, খুব ভাল, খুব ভাল, ওরা আমাদের বুকের-কাছের জিনিস, কিন্তু কোথায় সেই সমাজপ্রাণ ভাবুক ব্রাহ্ম গাইয়ের দল, একজনও কি নেই আজ?'

হিতেনবাবুর কথা শুনে অন্ধকার ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পরে ভাবের ঘনতা একটা কেটে গেলে ফাটা বললে, ' সত্যসখাবাবু আজকাল গাইছেন না বাসমতী সমাজে?'

'তিনি, ত নেই বাসমতীতে ।'

'কোথায় গেলেন?'

'তিনি কলকাতার সমাজে চলে গেছেন, অনেক দিন ত!'

'কোনোই খবর রাখি না দেখছি আমি,' ফাটা বললে, 'সত্যসখাবাবু কলকাতায় গেলেন কেন?'

'কলকাতায় বেড়াতে গেলেন একবার, ঘুরে এসে বললেন কলকাতার সমাজেই সুবিধা হবে তার। তখন সুকুমারকেও পাইনি আমরা,, রজনীবাবুও এদিকে ঘেঁষতেন না, লাডলির দলের গায়েন মহী বিশ্বাসও ছিল না, কী যেন, কী বিষম বিপদে পড়েছিলাম, সত্যসখাবাবুকে সকলে মিলে আমরা বললাম বাসমতী সমাজ, এই সমাজের পরলোকগত আচার্যেবা, আমবা আজকের এ রকম নিরাশ্রয়তাব সময় কেউই তাকে যেতে দিতে পারি না। কিন্তু কারো কথাই শুনলেন না তিনি–চলে গেলেন।'

'কলকাতার সমাজে গাইছেন?'

'গাইছেন কোথাও নিশ্চয়ই, যেখানে বাসমতীর চেয়ে নানা দিক দিয়ে বেশি সুবিধা হয়েছে সেইখানেই আছেন।'

'সত্যসখাবাবু ত চাকরিবাকবি কবতেন না, বেশ পয়সাঅলা বাপের মানুষ ছিলেন; ওর অসুবিধা কি হল বাসমতীতেই?'

'এ সমাজটা বেঙে গেছে সেই অসুবিধা,' হিতেন বাবু এতক্ষণ পরে এ কথায় একটু যোগ দিয়ে বললেন,' স্ত্রী–পুরুষেব আগের মত সেরকম ভিড় নেই, সমাজে বেশি কেউ আসে না, মেয়েদেব চেয়ে দাড়িপাকা বুড়োদেব হুদ্দো বেশি, ও কি বেঞ্চির দিকে তাকিয়ে গান গাইবে?'

একটা বেশ ধপধপে ঝরঝবে হ্যারিকেন হাতে করে সিদ্ধার্থের স্ত্রী সুনীতি ঢুকল ঘরের ভেতর—সঙ্গে বিশাখা আর বনচ্ছবি।

'আলো হল এতক্ষণে,' সরোজিনী বললেন,' বসো তোমরা সব।'

'আমবা বসব না,' বনচ্ছবি বললে, সিদ্ধার্থদার খোঁজে এসেছিলাম, কিন্তু এখনো ফেরেননি তিনি।'

'কোথায় গিয়েছে সিদ্ধার্থ, সুনীতি?'

'বলে যাননি ত, আমার মনে হয় জিরানডাঙার দিকে গিয়েছেন।'

'সেখানে কী?'

'কলেরা আছে বলছিলেন ত।

সবোজিনী বললেন,'বারে, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে সব, সুকুমার কি ঘুমুচ্ছে টিনি? খুব ঘুমুচ্ছে? আচ্ছা তাহলে ঐ ঘুমেব মড়াব বিছানাব কিনার দিয়ে বসো ত ভাই তোমবা তিনজনে '

ফাটা বললে,' আমিই বসি গিয়ে সুকুমারের বিছানায, আপনি এখানে বসুন বৌদি। চিনতে পাবছেন?'

সুনীতি ঘরের মাঝখানে গেলে টেবিলটাব ওপর হ্যারিকেনটা বসিয়ে রেখে বললে,' অনেক দিন পরে ত বাসমতীতে এলে নীরেন, এখন থেকে এইখানেই থাকবে ত।'

'তা থাকব বইকি,' ফাটা উঠে দাঁড়িয়ে বললে,' আমার বাবার মস্ত বড় হোটেল আছে এইখানে। আমি নীরেন নই, ফাটা মহলানবীশ, সিদ্ধার্থ জিরানডাঙায় গেছে? এত রাতে? ভেবেছিলুম রাতচরা রোগ আমারই আছে শুধু, বাসমতীর গেরস্তদের ত এখন খেয়েদেয়ে রাত দুপুর হয়ে যাবার কথা, তা কলেরা ওয়ার্ডের তদারক করছে বুঝি সিদ্ধার্থ? বেশ কথা, এই চেয়ারটায় এসে বসো তুমি বৌদি।'

সূচীপত্রে যান

'না, না, তুমিই বসো, আমরা সুকুমারের বিছানায় বসছি।' সুনীতি বললে।

'আমাকে চিনতে পেরেছ নীরেনদা?'

'ফাটা, ফাটা, নীরেন নয়, ও, তুমি ত বেশ বড় হয়ে গেছ বনচ্ছবি; ছ বছর আগে একবার এসেছিলাম বাসমতীতে; কিন্তু তখন কারো সঙ্গেই দেখা করতে পারিনি। তারো আগে একবার এসেছিলাম আট বছর আগে, তখন তুমি ইস্কুলে পড়ছ, ধাতুরূপ মুখস্থ করছিলে কিন্তু ফ্রক পরে, আত্মনেপদী ধাতু গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাচ্ছে একটা পুতুল যেন। সমুদ্রের নীচে এক রকম ক্রাস্টেশিযান থাকে, বৌদি, তুমি সুকুমারের বিছানায় বসলে গিয়ে শেষে, আরে এসো এ দিকে, তোমার জন্য গতি ছেড়ে দিয়েছি, বাংলায় মসনদ খালি থাকে না কখনো, বসো এসে।'

'কয়েকটা জটিল একসট্রা করিয়ে নিয়েছিলাম তোমাকে দিয়ে মনে পড়ে?' বনচ্ছবি বললে।

'হ্যাঁ, সবই মনে আছে, চুলের একটা কাঁটা অবদি হারায় না, জেরার্ড ম্যানলি হপকিনস বলেছিলেন,' ফাটা ঘরের ভেতরকার মহৎগ্রীব দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে।

'বড় শোভনাদির জ্যামিতির ক্লাশ ছিল সেদিন,' বনচ্ছবি বললে।

'বড্ড কড়া মাস্টার, ভারী ভয় পেয়েছিলুম, খুব বাঁচিয়ে ছিলে আমাকে সেদিন। একে মনে পড়ছে তোমার?' বিশাখাকে দেখিয়ে দিয়ে বনচ্ছবি বললে।

'ভিড়ের ভেতর একে ধরতে পারতুম না আমি,' ফাটা বললে,' এখন চিনতে পারছি।'

'ভিড়ের ভেতর আমিও তোমাকে চিনতে পারতুম না,' বিশাখা বললে,' তা ছাড়া এ-রকম স্যুট,' একটু থমকে থেমে গিয়ে বিশাখা বললে,'আমায় চেননি তুমি, আমায় চেনা তোমার অসাধ্য।'

'একে তুমি বার-চোদ্দ বছর আগে দেখেছ নীরেনদা।; বনচ্ছবি বললে।

'চিনেছি, বিশাখা ত।'

'বাপরে, খুন করতে পারে লোকটা, বনচ্ছবি।'

'কোনো মুরোদ নেই,' বনচ্ছবি বললে, 'সরোজিনাদিই ত ঘরে ঢোকা মাত্র সমাজের নাম ভাঙিয়ে দিলেন।'

'বাসমতী কলেজে তুমি পড়ছ বিশাকা?'

'এখন একথা বল তুমি?' বনচ্ছবি বললে, 'এ-কলেজে পড়াবার সময়ে হয়ে এল বিশাখার—'

'বনচ্ছবি, বি-এ পাস করেছ ত; বছর দুই আগে গেজেটে দেখছিলুম তোমার নাম—

'গেজেটটা এনেছিলুম আমি একটা বিশেষ দরকারে,' ফাটা হ্যারিকেনের সলতের ঠান্ডা ঘরানা আগুনটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে,' কিন্তু কোনো কাজের কথাই পেলুম না, বি-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে, বোকার মতন চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ বনচ্ছবি নামটায় এসে থেমে রইলাম, খুব সম্ভব দু'টো ইংরেজি 'সি' এইচ' পর পর সাজিয়ে রেখেছে বলে, কিন্তু নামটাও অসাধারণ।'

'অসাধারণ মেয়ে ত!' সুনীতি বললে।

'যিনি তোমার নাম রেখেছেন তাকে শ্রদ্ধা করি আমি।'

'বড় কমল বাবু রেখেছিলেন,' সরোজিনী বললেন।

'সেটা জেনেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছ বুঝি ফাটা,' গগন বাবু বললেন,' তবে আরো জেনে নাও; তোমার নাম ফাটা রেখে ওর নাম বনচ্ছবি, কমল বাবু খুব দরের মানুষ ছিলেন বলেই এইসব অনেক রকম করতে পেরেছেন। তুমিও ডাটের মানুষ হয়েছ মন্দ না। সুনীতি—'

'আজ্ঞে—'

'তুমি এই চেয়ারটায় এসে বসো, ফাটা এখন ঘরের ভেতর পাইচারি করে সকলের সঙ্গে কথা বলবে।'

'সুকুমার কি জেগেছে?' সরোজিনী জিজ্ঞেস করলেন।

'না, লোকজন দেখে আরো বেশি ঘুমুচ্ছে।' টিনি বললে।

'সুনীতি, কই এগিয়ে এসে বসল কোথায়?' সরোজিনী বললেন,'তুমিত আমাদের সমাজ কমিটির মেম্বার আছ?'

'হ্যাঁ, আছে,' গগন বাবু বললেন,'ফাটার চেয়ারে এসে বসতে বলছেন সকলে তোমাকে সুনীতি।'

সুনীতিকে বসতে দেখে সরোজিনী বললেন,' কেরোসিন পেলে কোথায় এমন সাদা ফটফটে হ্যারিকেন?'

'বাতিটা আমার নয়।'

'তবে কার?'

'বনচ্ছবি হাতে করে এনে দিল; এটা কি তোমার বাতি বনচ্ছবি?' সুনীতি বললে।

'ওটা বিশাখার।'

'এখন বিশাখাকে জিজ্ঞেস করুন সবোজিনীদি ও কেবোসিন কোথায় পেল, ছাতু বললে।

'ছাতু,' গগন বাবু বললেন,'তুমি বসবাব নাম করে বেশ একটা আলিশান কাঠেব পাটাতন জুড়ে বসেছ; এটা টুলও নয়, বেঞ্চিও নয়, তবে বসে আবাম হচ্ছে বেশ, অনায়াসে দু-তিনজন ওখানে বসতে পাবে। তুমি উঠে গিয়ে সুকুমাবের বিছানায বসো—ফাটাব পাশে; এখানে বনচ্ছবি আব বিশাখা বসবে।'

উঠে তাব নতুন জায়গায় চলে গেল ছাতু।

বনচ্ছবি বললে,'আমরা কি আব এখনি বসব গগনকাকা?'

'কেন না? তোমরা ত সেই মীরমহলেব দিকে যাবে। কে পৌঁছে দেবে তোমাদেব? কাব সঙ্গে এসেছ? বাত ত এখন সাড়ে দশটা,' বেডিয়াম ডায়ালেব দিকে তাকিয়ে গগন বাবু বললেন,'দশটা পঁযত্রিশ বনচ্ছবি।'

'আপনি ত দানাপুরেব দিকে যাবেন?' বনচ্ছবি বললে, 'মীরমহল ত দানাপুরের কাছেই।'

'নিয়ে যাব তোমাদের,' গগন বাবু বললেন, 'কিন্তু কাব সঙ্গে এলে এতটা বাত করে সাহেবডাঙায?'

ফাটা ট্রাউজারেব পকেটে হাত বেখে ঘবেব ভেতব হাঁটতে হাঁটতে বললে, ' বাসমতীব পাড়াগুলোর নাম ত বেশ ডাটেব মাথায তৈবি করেছিলেন আমাদেব বাপদাদাবা—দানাপুব, মীবমহল, জিরানডাঙা, পাশাবর্তী—বা, একেবারে গ্রীক নক্ষত্রদেব নাম—তাই মনে হয না তোমাব বনচ্ছবি।'

'আমের নামের মতই—শোনায ভাল, কিন্তু কাজে কিছু না,' বনচ্ছবি চলন্ত ফাটার দিকে তাকিয়ে বললে, চলতে-চলতে পিঠ ও ঘাড়েব দিকটা ফাটার বনচ্ছবিব দিকে ঘুবে গিযেছে। জানালাব ফাঁক দিযে বাইবেব অনেকখানি আকাশেব অপরিমাণ নক্ষত্র বাশিব দিকে। কোনো দিকে কোনো মেঘ নেই এখন আব। সমস্ত আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, চাঁদ নেই, আগাগোড়া শূন্যতা এখন অযুত কালেব কোটি তাবাব বাসভবন; দেখছিল ফাটা।

'আমবা বেলা থাকতেই বেবিযে ছিলাম গগন কাকা,' বনচ্ছবি বললে, 'কিন্তু এ-বাড়ি ঘুরতে-ঘুরতে বাত হয়ে গেল।'

'সাইকেল বিকশা চড়ে ফিবে যাবে ভেবেছিলে?'

'সে--বকম কিছু ভাবিনি,' বিশাখা বললে,'পাযে হেঁটেও চলে যেতে পাবতাম।'

'তোমাদেব বাড়ি ত অনেক ঝুপসি গলিব ভেতব দিয়ে, বন জঙ্গল ত ঢেব, টর্চ আছে তোমাদেব কাছে?'

'না। ব্যাটাবিই পাওয়া যাচ্ছে না,' বিশাখা বললে,' বাসমতীতে একটু আধটু দাঙ্গাটাঙ্গা হচ্ছে শুনলাম—'

'হুঁ,' গগন বাবুল বললেন। ঘবের কাঠে তক্তাপাতা সিলিঙেব দিকে চোখ ঘুবিয়ে-ফিবিয়ে নিয়ে বললেন, 'এত বাতে সিদ্ধার্থেব কাছে কী দবকাব ছিল তোমাদেব?'

ওকে ত বেশি রাত না-হলে পাওয়া যায না?'

'দিনেব বেলা ত কলেজে, সকালবেলা একটা ট্যুইশন আছে সুনীতিদি?

'দু'টো আছে।'

'বেশি রাত না হলে কথা বলারাবই অবসবই নেই' বনচ্ছবি বললে, 'ছুটিব দিন ঘুম থেকে উঠেই বেবিযে যায। অনকে রাত করে বাড়িতে ফেরে।'

'সিদ্ধার্থেব একটু বাযুচড়া বাতিক হয়েছে আজকাল,; গগন বাবু বললেন, 'না, এ অনেক কালের? তুমি ওকে একটু শতবঞ্জ খেলায আটকে বাখতে পাববে না সুনীতি? যখন থাকে বাড়িতে তখন দিনমানই থাকে—কোথাও বেবয় না। ও এক ধাতের মানুষ। কোথায সিদ্ধার্থ যাচ্ছে হে সুনীতি, আজকাল? এত বাত অব্দি? চুরুটে পব-পব তিন-চারটে বেশি জোবে-জোবে টান দিযে গগন বাবু বললেন,'সমাজের সেক্রেটারি হিসেবে এ কথা জিজ্ঞেস করছি না আমি। সমাজেব দিকে সিদ্ধার্থ একদম ঘেষে না, কোনো ব্রাহ্মদেব বাড়িতেও না। ভেবেছিলাম হিউম-টিউমেব মত একটা দর্শনেব ছক নিয়ে ব্যস্ত হয়, লেখাপড়া নিয়ে আছে। কিন্তু তা ত নয়! আমাদের ব্রাহ্মসমাজে পুরো স্বাধীনতা রয়েছে প্রতিটি যুক্তিবাদীব, সিদ্ধার্থের মনে সুযুক্তি

সূচীপত্রে যান

রয়েছে ঢের, জানি আমি। কিন্তু সত্যিই কী করছে আমরা জানতে পারলে ওর অপকার হবে না।'

সুনীতি ফাটার চেয়ারে এসে বসেছিল, হ্যারিকেনের বাতিটা একটু ডিম করে দিয়ে বললে,'উনি কলেজে কাজ হয়ে গেলেও অনেকটা সময় সেইখানে কাটান, দু'টো ট্যুইশন আছে, মাঝে-মাঝে সভাসমিতি থাকে, পলিটিক্সের নয়, সাহিত্য সমাজ-তত্ত্ব এই সবের। তাছাড়া হাসপাতাল-টাসপাতাল দু'চারটে কমিটির মেম্বার আছেন। এই কিছুদিন ত জিরানডাঙায় কলেরার হিড়িক গেল,' বলতে-বলতে সুনীতি কেমন যেন কাঠ হয়ে আস্তে-আস্তে বললে,' যখন কোনো কাজ থাকে না নদীর পাড়ে রয়ানীর মাঠে শুয়ে থেকে আকাশের তারা দেখে। সত্যি বলছি আপনাকে গগন বাবু।; সুনীতির দাঁত ও চোখের ভেতর থেকে কেমন যেন একটা আগুনের তাত বেরিয়ে এল—সুবিধার লাগল না গগন বাবুর।

রয়ানীর মাঠে শুয়ে তারা দেখে সিদ্ধার্থ? ফাটাও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে—দেখছিল বনচ্ছবি বিশাখা, গগন বাবু, টিনি।

খুব জোরালো চশমার ভেতর দিয়েও এত বেশি রাতে হিতেনবাবুব মরচে পড়া চোখে বিশেষ কিছু ধরা পড়ছিল না, কিন্তু কানে শুনছিলেন তিনি সবই।

'আমি সেদিন রাত দু'টোর সময় জিরানডাঙায় দেখলাম সিদ্ধার্থকে,' বললেন হিতেন বাবু।

'সেদিন? কবে?'

'দশ-বার দিন আগে হবে।'

'অত রাতে ওখানে গিয়েছিলেন আপনি?' গগন বাবু চোখদু'টো একটু কুঁচকে মনোযোগ টেনে আনতে চেষ্টা করে বললেন। ঘাড়টা একটু ভেঙে পড়ল, ডান হাতের মুঠোর ওপর রাখলেন থুতনিটা।

'ওখানে ক্যানেডিয়ান মিশনের ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের একটা কুঠি তৈরি হচ্ছে। আমি খবর পেয়ে গিয়েছিলাম একবার। তারপর ওরা আমাকে ডাকিয়ে নিয়েছিলেন একদিন। ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে ধর্মটর্ম সম্বন্ধে কী বলবার আছে আমাদের, বাসমতীর লোকজনদের মনে ধর্মভাব কী রকম, এখানকার ব্রাহ্মসমাজের কী রকম অবস্থা আজকাল, ওদের নিজেদের মিশন সম্বন্ধে কী-বকম সংকল্প-টংকল্প আছে, এই সব নিয়ে কথা বলতে-বলতে খুব বেশি রাত হয়ে গেল। আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেরবার সময়ে ভালেবিসাহেবের সঙ্গে খানিকটা হেঁটে গিয়ে গাড়িটা ধরতে হল। ওদের নিজেদের মোটর নয়, অন্য কোনো এক সাহেবের। ড্রাইভার মোটরটা এগিয়ে নিয়ে পাকা রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল। হেঁটে যাবার সময় দেখলাম সিদ্ধার্থকে।'

'জিরানডাঙার কষাইদের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বুঝি,' সুনীতি বললে, 'ওখানে ওবা কযেকজন মিলে বস্তির কলেরার তদারকি নিয়েছিল।'

'না, না,' হিতেন বাবু বললেন,' সে বস্তির থেকে অনেকটা দূরে পোস্ট অফিসের প্রভাসবাবুব বাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম সিদ্ধার্থকে। ভেতরে আলো জ্বলছিল। অত রাতে বাইরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে বুঝতে পারছিলাম না।'

'প্রভাসবাবুর সঙ্গে হয়ত বলছিল,' গগন বাবু বললেন।

'তা হবে।'

'ও-বাড়িতে আর-কে থাকে?'

আর-কে থাকে কেউ বলতে পারছিল না। প্রভাসবাবুকে চেনেন সবোজিনীদি, রমাকেও চেনেন। কিন্তু নানারকম সাতপাঁচ ভেবে এত রাতে হিতেনবাবুর কথাটা বাড়াতে গেলেন না তিনি আর। বনচছবিও চেনে রমাকে, বিশাখাও। সিদ্ধার্থদা খুব সম্ভব রমার সঙ্গে কথা বলছিল আন্দাজ করে নিল বনচ্ছবি। কিন্তু রাত দু'টোর সময়ে? হয়ত কলেরার কোনো ব্যাপার সম্পর্কে। গগন বাবুও জানেন প্রভাসবাবুর বাড়ির কথা। রাত দু'টোর সময় রমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলছিল সিদ্ধার্থ-খুব সম্ভব বস্তির কলেরা সম্পর্কে উপলব্দি করেছিলেন তিনি, কিন্তু তবুও অত রাতে হানা দিয়ে কথা না-বললেও হয়ত পারত, মেয়েটিকে ডেকে জাগিয়েছিল সিদ্ধার্থ? বাপ কোথায় ছিল-প্রায়ই টুরে যায় ত, কারা ছিল মেয়েটির কাছে? রমার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বেশি আলাপ আছে? ভাবছিলেন গগন বাবু। কিন্তু হিতেনবাবু যে-বিষয়টা পেড়েছেন তা নিয়ে অনেক অনুসন্ধান আলোচনা সম্ভব হলেও ওদিক দিয়ে গেল না কেউ; ব্যাপারটা সিদ্ধার্থকে নিয়ে—সে নিজের সত্যার্থকে হাতে করে বাসমতীর বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ায়—স্বীকার করল সকলে।

সুনীতির খানিকটা খটকা লাগল। খটকা লাগা উচিত ছিল না অবিশ্যি। সিদ্ধার্থ কত রাতে কোথায় ঘোরে

তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বড় একটা নালিশ নেই সুনীতির। সে জানে, মুখ ফুটে তেমন কিছু বলেনি যদিও, তবুও, তাকে পেয়ে খুশি হয়নি সিদ্ধার্থ। এমনিই বিশেষ কোনো বাঁধনে থাকবার মত মানুষ নয়, বিয়ের জোয়ালে সুনীতিকে পেয়ে আরো খানিকটা অস্বস্তি বোধ করেছে যেন সিদ্ধার্থ। দোষ কার তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায়নি সুনীতি, সে যে ছকের ভেতর রয়েছে সেখানে অনেকদিন থেকে তার নিজের মনও বসেনি।

' ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়েছে বৌদি?' ফাটা জানালাব দিক থেকে ফিরে এসে সুনীতিকে বললে।

'হ্যাঁ, তাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ।'

'সিদ্ধার্থ কখন ফিরবে?'

'বলতে পারি না।'

'আমি এ-রাতটা আজ বোধহয় সরোজিনীদিব ওখানেই কাটাব।'

'দয়া করে থাকো যদি তুমি,' সরোজিনী বললেন।

'গগন বাবু থাকবেন?' ফাটা জিজ্ঞেস কবল।

'না। আমাকে দানাপুর যেতে হবে—মেয়েদের নিয়ে।'

'মেয়েরা ত মীরমহলে থাকে,' ফাটা ট্রাউজাবেব পকেট থেকে হাত নামিয়ে এনে বললে,' কী হবে আর এত রাতে দানাপুরে মীরমহলে গিয়ে। থেকে যান গগন বাবু, থাক বনচ্ছবি বিশাখা, বসুন বৌদি। অনেক দিন পরে এসেছি বাসমতীতে, গল্পগুজব কবে সাবাটা বাত কাটিয়ে দেযা যাক।'

'আর দশবছর আগে একথা যদি বলতে ফাটা,' গগন বাবু ওপেনব্রেস্ট কোটের দু'টো বোতাম খুলে বুক-পেটের ওর আস্তে বাঁ হাতটা বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তাহলে সবোজিনীদিকে দিয়ে টুক করে একটু প্রার্থনা করিয়ে, ব্যস বসে যেতাম গুলতানি পাকিয়ে। মোদ্দা চাবটে চুরুট লাগত আমার—আর দশ সেরি কেটলি উনুনে সারাবাত। মনে নেই নয়ই-দশই মাঘেব রাতগুলোর কথা পনের-কুড়ি বছব আগে?'

'না, সে-বকম বাতের কথা বলছি না আমি।'

'বুঝেছি কী রকম রাতের কথা বলছ তুমি? খুব চুটিয়ে মজলিশ কবতে চাইছ ত সবাইকে নিয়ে? গালগল্প কেচ্ছা হববা ধর্মকর্ম-যা হচ্ছিল এতক্ষণ-লোভ বেড়ে গেছে। রাত ঠান্ডা হয়েছে- এখনই ত জমবার কথা। কিন্তু হিতেন বাবু থাকতে পাববেন কি?'

'না, আমাব চলে যেতে হবে। কটা বাত?'

'সাড়ে দশ। আমাবও উঠতে হবে ফাটা। আগেব সে শবীব নেই—ব্লাড-প্রেসাব হয়েছে, শরীর বোগা হবাব কথা, কিন্তু মোটা হয়ে আবো খাবাপ হচ্ছে। একটু এদিক-সেদিক কবলেই বড্ড কষ্ট পেতে হয-দুশ, শোযা দুশ, আড়াইশ অব্দি—'

'বনচ্ছবি, তুমি থাক,' ফাটা বললে।

'কী কবে থাকে?' গগন বাবু জানতে চাইলেন।

'বিশাখা যদি থাকে তাহলে থাকতে পাবে না?' সবোজিনীদির বাড়িতে থাকবে ত—এব ওপর ত কোনো কথা নেই বাসমতী ব্রাহ্মসমাজে। বৌদি আছেন, টিনিদি আছেন, ছাতু বাবু, আমি আছি, সিদ্ধার্থ এসে পড়বে—বেশ গল্প জমচে সারারাত সকলে মিলে।'

'আচ্ছা তা জমুক,' গগন বাবু বললেন,' আমি আমার কাজটা সেরে নিই। বেশ ফটকটে আলো এসেছে ঘরে,' হ্যারিকেনটাব দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গগন বাবু বললেন,'বনচ্ছবি, ঐ তেপরটা আমার দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে হ্যারিকেনটা রাখত তার ওপব, আমি বইয়ে লিখে নিচ্ছি।'

'আলো এনেছ? আচ্ছা-বসো গিয়ে এখন তুমি। এ-মাসে সমাজের গান উপাসনাব প্রোগ্রামটা আমি ঠিক করে নিচ্ছি সবোজিনীদি। পকেটে রেখে দিয়েছিলেন সব। খাতা, পেন্সিল, চশমা পকেট থেকে বেব করে ফেলে গগন বাবু বললেন,'গান গাইবে তাহলে—ধরতে গেলে—সুকুমার একা; সাহায্য করবে রজনী নান, মহী বিশ্বাস আর অনন্ত মুচ্ছুদ্দির দল—লাডলি বিশ্বাসের দল যাকে বলা হয,' খাতায টুকতে টুকতে বললেন,' ছাতু বলে দিও কিন্তু এদের সবাইকে, সকালবেলা না-হোক ফি-রোববাব সন্ধের সময যেন সমাজে হাজিরা দেয় বাছাবা। মুচ্ছুদ্দিরা ত নিজেদের খোল করতাল আনে। না-যদি আনে আমাদের করতাল-টবতাল ঠিক আছে ত? কটা খোল আছে? তিনটে? টনক ঠিক আছে ত সব কটার ছাতু? এ মাসে মেরামত না-করলেও হবে, নাকি বাযেনদের দোকানে পাঠিয়ে দিতে হবে এক-আধটা?'

একটু ইতস্তত করছিল ছাতু।

'বলো বলো বলে ফেলো, সময় নেই।'

'এখানে মেরামতের দরকার নেই। বিশ্বাসরা নিজেদের খোল আনে। না যদি আনে আমাদের ওগুলো ঢ্যাব ঢ্যাব করবে বলে মনে হয় না।'

গগন বাবু নোট বইয়ে লিখতে-লিখতে বললেন,'তুমি ত নিজেও একজন ভাল বাজিয়ে ছাতু। কাল সকালে সাধন শ্রীমানীকে সঙ্গে নিয়ে সমাজ বাড়িতে গিয়ে আমাদের খোলগুলো একটু বাজিয়ে দেখো ত তোমরা দু'জনে মিলে। যদি কোনো খুঁত বেরিয়ে পড়ে নিমাই বাযেনের দোকানে পাঠিয়ে দেবে—মালী যদি কাল ওখানে থাকে তবে তাকে দিয়ে, না হলে মুটে ডেকে। যা খরচা পড়ে বিল তৈরি করে রেখো।

'বনচ্ছবি।'

'কী গগন কাকা?'

'তুমি গাইবে নাকি এ মাসে সমাজে-এক-আধদিন রাতের উপাসনার সময়ে? কী বলেন সরোজিনীদি—দু'চারটে গান করুক বনচ্ছবি।'

'করুক।'

'এ মাসে নয়,' বনচ্ছবি গাইলেও গাইতে পারে, কিন্তু তবুও আজই এ প্রোগ্রামে ধরা দিতে গিয়ে নানা কারণে অসুবিধা বোধ করে বললে,' এমাসে আমি বড্ড ব্যস্ত, আমি আসছে মাসে নিশ্চযই গাইব গগন কাকা।'

'আচ্ছা।' গগন বাবু লিখতে-লিখতে বললেন,'উপাসনা করবেন সরোজিনীদি, হিতেন বাবু-আর-কে?' পেনসিল থামিয়ে রেখে হ্যারিকেনের আগুনটার দিকে খানিকক্ষণ চোখ গোল করে তাকিয়ে রইলেন। সাপ্তাহিক রবিবারের উপাসনা করবার জন্যে বাসমতী ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে পনের কুড়ি জন বড় বড় উপাসক ছিলেন, আজ দু'জন আছেন শুধু, এঁরাও যে-কোনো মুহূর্তেই সরে যাচ্ছেন, এঁদের হাতে বেশি সময় নেই আর। কিন্তু এ-নিয়ে কথা ভাবতে গেলে কোনো কিনারাই পাওয়া যাবে না। গগন বাবু পেন্সিলটা দু-একবার আঁকিবুঁকির মত নোটবুকের এক কিনারে ঘষে নিয়ে বললেন,'আপনাদের বয়স হয়েছে সবোজিনীদি, মাসে আপনাদের দু'জনের আটবেলা উপাসনা, এটা কি সম্ভব হবে?'

'কষ্ট হবে মাসিমার।' টিনি বললে।

'কিন্তু চলেছে ত এতদিন।' সরোজিনী বললেন।

'চালাতে হবে।' হিতেন বাবু বললেন।

গগন বাবু পেন্সিলটা নোটবুকের ওপর ফেলে বেখে সরোজিনীব দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি কিছুকাল থেকে সুরোজিনীদি, আমাদের সমাজে এখন থেকে শুধু সকালবেলা উপাসনা চালালে কেমন হয়?'

'তা হতে পারে না,' হিতেন বাবু বললেন।

'এই একটা মাস।'

'কেন, এ মাসে কিসের চাপ গগন?'

'কিছুর না। শুধু একবেলা উপাসনা চালিয়ে বিশেষ কোনো অভাব বোধ হচ্ছে না কি আমাদের সামাজিক সাধনাটাধনার জীবনে সেইটে একটু অনুভব করে দেখতাম।'

'অনুভব করেছি,' হিতেন বাবু বললেন,'আমরা মরে গেলে অনুভব কববার সময়ও থাকবে ঢের; কিন্তু এখন ওসব কথা উঠতে পারে না। সরোজিনীর কষ্ট হলে আমি একাই আটবেলা চালাবো, এ মাসটায়, এ-মাসেরই কথা হচ্ছে ত এখন, লিখে নিন গগন বাবু, তারপর বেঁচে থাকলে পরের মাসেব ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন।'

'করে দেবেন, করাচ্ছেন, করিয়েছেন,' ভেতরের থেকে কেমন একটা বেগ, নি:শ্বাসেরই খুব সম্ভব, হঠাৎ চাড় দিয়ে উঠে আটকে ফেলতে চাচ্ছিল সরোজিনীর কথা বলার সহজ দমটাকে, কিন্তু আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল নি:শ্বাসটা, তিনি না করালে আমরা আর কী করতে পারি; তিনি আছেন ভেতরে প্রবেশ করে। তাই সজ্ঞানে কথা বলতে বলতে চলে যাই। ঠিক আছে আমার সব, ঘাবড়াবেন না হিতেন বাবু, আমি চারবেলা করি, আপনি চারবেলা করুন-এ মাসে।'

'চারবেলা তোমার পক্ষে বেশি হয়ে যাবে মাসিমা,' টিনি বললে,' হিতেনবাবুর বয়স ত তোমার চেযে ঢের-ঢের কম; তিনি পুরুষ মানুষ, কোনো রোগও গাড়েনি। তোমার ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেসার,

প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের অসুবিধা। মাসিমাকে তিনবেলা দিন গগন বাবু।'

'হিতেনবাবুকে পাঁচবেলা?'

'তাই হোক,' হিতেন বাবু বললেন,'আমি দু-বেলাও নিতে পারতাম, কিন্তু লোকেরা সরোজিনীদির উপাসনাই শুনতে চায়।'

'সেটা আপনার অমায়িকত,' সরোজিনী হ্যারিকেনের পরিষ্কার কাচ ও আগুনের দিকে, ডিম করে দিয়েছে সুনীতি, স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে হেসে বললেন। এক-আধটা দাঁতের ঝিলিক দেখা গেল—আমেরিক্যান। মুখ বুঝে ফেলেছেন।

'কে কবে কোন বেলা উপাসনা করবেন—সেটাও এবারেই ঠিক করে নিই,' গগন বাবু পেনসিল তুলে নিয়ে বললেন।

'নিন।'

'সরোজিনীদির সকালবেলাই সুবিধা হবে?' নোট করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন গগন বাবু।

'দু'দিন সকালে দিন, একদিন রাতে,' বললেন সবোজিনী 'হবে ত ঠিক হিতেনবাবু?'

'ঠিক হয়েই আছে,' হেসে সায় দিয়ে শালীনতায় স্নিগ্ধ সদয হয়ে বলবেন হিতেন বাবু।

'আচ্ছা, তাহলে—'

'কিন্তু হিতেন বাবু বলছিলেন লোকেরা মাসিমার উপাসনা শুনতে চায়, মাসিমাকে দুদিন অন্তত বাতের বেলা সার্ভিস দিলে হত না? লোকেরা ত রাতের বেলাযই যা-একটু অবসর পায় মন্দিরে আসতে।' টিনি গগন বাবুকে বললে।

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' গগন বাবু চুরুটটার দিকে তাকিয়ে পেনশিলটা থামিযে বাতিটা একটু উসকে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এখনো ত শীত পড়েনি, বিষ্টিবাদলও নেই, আজকাল বাতের সার্ভিসে অসুবিধা হবে না সবোজিনীদির।'

'সাইকেল বিকশ কবে যাবেন। রিকশ ভাড়া সমাজ দেবে ত? মাঝখানে চাঁদাটাঁদা পাওয়া যাচ্ছিল না, একটু অসুবিধা হচ্ছিল,' টিনি গগন বাবুকে বললে।

'এবাবে চাঁদা পাওয়া যাচ্ছে ভালই, ফাটাইত পঞ্চাশ টাকা দিযে দিল। আচার্যদের যাতাযাতের ভাড়া সমাজ ত বরাবরই দিচ্ছে। বুড়োমানুষদের মোটবে কবে নিলেই ভাল হত, কিন্তু কেবাযা মোটর ত নেই বাসমতীতে। আছে? ছাতু?'

'মীরমহলের দিকে এসেছে দু-তিনটে ট্যাক্সি,' বনচ্ছবি বললে।

'বয়ানীর দিকে ট্যাক্সি সার্ভিস আছে,' বিশাখা, গগন বাবু, বনচ্ছবি, ফাটা সবোজিনীর দিকে একবার চোখ ঘুরিযে তাকিযে নিযে বললে।

'মেযেরা ছেলেদেব চেযে বেশি জানে দেখছি,' গগন বাবু পেন্‌সিলের শিষের দিকে তাকিযে ট্যাক্সি সার্ভিসের জানাজানিব সম্পর্কে আরো খানিকটা খুঁটিযে ভেবে নিয়ে কাজের কথায ফিরে এসে বললেন,'রাতের সার্ভিসে ট্যাক্সিতেই নিয়ে যাওযা হবে আপনাদের।'

'সাইকেল রিকশ খুব ভাল,' সরোজিনী বাঁ পাযেব হাঁটুব ওপব ডান পা চড়িযে বসেছিলেন—মাথা কাত করে। গগন বাবুর কথা ফুরতে না-ফুরতেই নিজেকে বসবার স্বাভাবিকতায ফিরিযে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, 'ব্রাহ্মসমাজ কোনো জাঁক ভালোবাসেন না। আগেকার ব্রাহ্মরা ঝড় বাদলে-শীতে, অন্ধকার রাতে, পাযে হেঁটে, বুড়ো-বুড়ো মানুষ সব, বাসমতীর এপার থেকে ওপার পাড়ি দিতেন মন্দিবের কাজে। তাঁদের সময বিকশও ছিল না, ঘোড়ার গাড়ি ছিল, কিন্তু গাড়ি করবাব মত পযসা ছিল না তাঁদের। সেটাকে মিথ্যা ঠাট বলে মনে করতেন তাঁরা। মোটরের কথা হচ্ছে-আমি সাইকেল রিকশতে চড়তেও লজ্জাবেধ করি, তাও সমাজের পযসায? কেন, সমাজকে আমরা উদ্ধার করতে যাচ্ছি না ত।'

'তাঁর জিনিস, তিনিই করছেন সব, আমরা কে? সেই ত্যক্তেন ভুঞ্জীথার কথাই মনে পড়েছে আমার গগন বাবু,' টিনি বললে,' ব্রাহ্মসমাজ সহজ আদান-প্রদান চায, দীনতাকেই ভালবাসে।'

'তাহলে মোটর থাক, রিকশই হোক,' গগন বাবু বললেন।

'পাযে হেঁটেই যাওয়া যায,' হিতেন বাবু বললেন,'তবে সরোজিনীদি বেশি বুড়োমানুষ এ বযসে ওটা ঠিক হবে না ওঁর।'

'অনেক রাত হল।' চুরুটটা নেড়েচেড়ে বললেন গগন বাবু, জ্বালালেন না।

'বসুন, কী আর এমন রাত হয়েছে? আমার মোটর সাইকেলে আপনাকে পৌঁছিয়ে দেব গগন বাবু,' ফাটা বললে।

'আঁটবে কি করে? বনচ্ছবিরাও যাচ্ছে আমার সঙ্গে। সরোজিনীদি, একদিন সকালে, দু' দিন রাতে আপনার সার্ভিস পড়ল এ-মাসে। হিতেন বাবুর তিন দিন সকালে, ছ' দিন রাতে। আপনাদের কারুর যদি হঠাৎ শেষ মুহূর্তে কোনোদিন অসুবিধা হয়ে পড়ে, না যেতে পারেন তাহলে জোড়াতালি দেবার জন্যে-'

'ফাটা রয়েছে,' গগন বাবুর মুখের থেকে কথাটা লুফে নিয়ে ঘাড় টান করে, হাসতে গিয়ে মাঝপথে থেমে একটু গম্ভীর হয়ে ফাটা বললে।

'বাসমতী ব্রাহ্মসমাজের গানের দিকটা ত বাইরের লোকেরাই চালাচ্ছেন। উপাসনা করবার জন্যে সরোজিনী আর হিতেন বাবু আছেন এখনো, ফাটা ধরে নি এখনো, কিন্তু যদি ধরে তাহলে আমা দ্বারা যে কিছু হবে না সেটা জেনেই বাবা আমার নাম ফাটা রেখেছিলেন,' ঘাড় নুইয়ে পিঠের ওপর হাত বেঁধে ঘরের ভেতর আস্তে-আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে ফাটা বলছিল, কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে দেখছি, যখন বাসমতীতে ব্রাহ্মদেব ভেতর মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনা করবার মতন কোনো লোক থাকবে না, তখন বেদীর ওপরে না উঠে, নীচে বেদীর এক কিনারে বসে নানারকম ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে মন্দ হয় না, সেটা আমি করতে পারব। আমাকে দিয়ে সেটা হবে।' ফাটা সুকুমারেব বিছানার কিনারে এসে বসল।

'তোমার ত কলকাতায় ব্যবসা। বাসমতীতে ফিরবে?'

'ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে লিমিটেড কোম্পানি করে দিয়ে চলে আসব আমি। বছবে দু-এক মাসের জন্যে কলকাতায় যেতে পারি।'

'এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ। '

এখানে ত জমিদারির জন্যেও থাকতে হবে ফাটাকে।'

'না, জমিদারি পেলেও নায়েব প্রাণকিশোরবাবুব হাতেই ছেড়ে দিব সব। মৈতি শতকরা পঁচানব্বই চাচ্ছে-তাই নিয়ে নেবে। টাকা বুঝে নিতে হলে মৈতিকে বছর-বছব এসে অনেকটা সময়ই বাসমতীতে থাকতে হবে। ও আমার হিসেবনিকেশে খুশি হবে না, আমার জমিদারি চালনাতেও না, নিজেই চালাতে চাইবে। চালাক ও আর প্রাণকিশোর বাবু।'

বেদীব নীচে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়াব কথা-সেটা তুমি বেশ ভাল কথা বলেছ ফাটা,' গগন বাবু বললেন, একবার পেন্সিল একবার চুরুটটাকে আঙুলেব ভেতর আটকে নিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ জ্বালাননি চুরুট, পেন্সিলটাই তুলে নিলেন, বললেন, কিন্তু সেসব হল ঢের পবের কথা। তাহলে এই ব্যবস্থাই রইল এ মাসে, সরোজিনীদি, আপনি আব হিতেন বাবু, যদি দৈবাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আমি কাজ চালিয়ে নেব কিংবা ছাতু।'

'ছাতু এক-আধ দিন হযত পাবে,' সরোজিনী বললেন, 'কিন্তু আমরা মরে গেলে ওকে দিয়ে সমাজের উপাসনার কাযেমি কাজ চালাতে যেও না। সেটা ঠিক হবে না।'

'এক-আধ দিনের কথাই।'

'এর পরে,' ছাতু বললে,'ফাটা যা বলেছে বেদীর নীচে বসে ধর্মগ্রন্থই পড়তে হবে। অবিশ্যি ব্রাহ্মদের হিতৈষী হিন্দুদের ভেতর জ্ঞানী সাধু মানুষ আছেন কযেকজন, তাঁদের বললে সমাজে এসে উপাসনা করতে রাজি হবেন। কিন্তু গান উপাসনা সবই যদি তাঁরা করেন, অথচ নিজেদেব হিন্দু বলেন, সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরোপুরি হিন্দু থাকেন, তাহলে এ-সমাজটাকে ত ব্রাহ্মসমাজ বলা, চলবে না।'

'এ-মাসের খশড়া হয়ে গেল তাহলে, আমি উঠি,' গগন বাবু বললেন,' সুকুমাব জেগেছে?'

'না।'

'আপিং টাপিং খেল কি?'

'আপিং কোকেন খেয়ে ঝিমোয় মানুষ, ও ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ব্রোমাইড দিয়েছিলেন সরোজিনীদি?'

'না। আমার এখানে ওসব নেই ত। তবে অনেক দিনের পুরনো ভেরামনেব একটা ফাইল ছিল; ট্যাবলেট খেল নাকি?'

'ঘুমোবার আগে মাথার যন্ত্রণার কাতরাচ্ছিল?'

'তোমরা কেউ আসবার আগেই ও আমার ঘরে ঢুকেছে, ঘরের ভেতর ঘুরে ফিরে বেড়াল, শিশি

বোতল নাড়াচড়া করছিল, আমি একটু 'অঘোর প্রকাশ' আর লাবণ্যদির দৈনিক নিয়ে বসেছিলাম, নজর পড়েনি ওর দিকে, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে শুয়ে পড়ল, বললে যে ঘুমব, আমি বললাম ন্যাওড়ের খাটে বিছানা পাতা আছে, ঘুমো।'

'থাক গে, ঘুমোক। রাত দুটো-তিনটের আগে উঠবে বলে মনে হয় না, কলিকের মতন কিছু ব্যথাট্যথায় ভেরামন খেয়েছে হয় ত,' গগন বাবু বললেন।

'ভেরামনের লোভেই সুকুমার তোমার ঘরে এসেছে হয়ত মাসিমা,' টিনি বললে,' জার্মান ওষুধ, কলকাতার কালবাজারেও তিনচার বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এ মাসে পাঁচটা রবিবার হয়ত ছাতু?' গগন বাবু জিজ্ঞেস করলেন। 'চারটে রববার।

'ভালই হল,' নোটবুকের দিকে তাকিয়ে গগন বাবু বললেন,'কোন-কোন সপ্তাহে আপনার সার্ভিস হলে ভাল হয় সরোজিনীদি, বলুন, লিখে রাখছি।'

'প্রথম সপ্তাহে বাতে,' সবোজিনী গগন বাবুর একরত্তি চিমসে পেন্‌সিলটার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রকম মোটা আঙুলেব হাতির শুঁড় এসে সাপটে ধবেছে সেটাকে; 'পরের সপ্তাহে-সকালবেলা, আর একেবাবে মাসের শেষ সপ্তাহে দিন আমাকে—রাতে।'

'হয়ে গেল,' পেন্‌সিলটা গুঁজে বেখে নোটবুক বন্ধ করে পকেটে ফেলে দিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে গগন বাবু বললেন,'আপনার তাহলে কবে কোন-কোন বেলা পড়ল সেটা জানতে পাবলেন হিতেন বাবু। ফি শনিবার আপনাদেব মনে কবিয়ে দেবাব জন্যে মালির হাতে অবশ্য একটা চিট পাঠিয়ে দেব, মাসেব প্রোগ্রামটা কী হল-টাইপ কবে কালই এক এক কপি পাঠিয়ে দেব আপনাদেব দু'জনকে। আজ সোমবার, এই বিষ্যুৎবার সন্ধ্যায় এখানে সবোজিনীদিব ঘরে, সমাজেব কার্যনির্বাহক সমিতির একটা সভাব ব্যবস্থা কবতে পারবে ছাতু?'

'মেম্বাববা শুনে গেলেন ত সব,' ছাতু বললে, যে দু-চারজন আসেননি তাদেব খবব দিয়ে আসব। কাল সকালে আপনাব বাড়িতে যাব গগন বাবু, নোটিশটা লিখে আমাব হাতে দিয়ে দেবেন!'

'এসব কাজ তোমাকে কবতে হয় নাকি ছাতু বাবু,' ফাটা ঘবের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে বললে,'মালি নেই?'

'মালি শনি-রবিবাব ছড়া কাজ কবতে পাবে না, তবে বাতে এসে সমাজে শুয়ে থাকে. পাহাবা দেয় বোজই, তা ছাড়া ঘরদোব পবিষ্কাব বাখে। সাবা দিনরাতেব কাজকর্মেব জন্য লোক বাখতে হলে বেশি টাকা দিতে হয়। চাঁদা কম দিচ্ছে মানুষে-অত টাকা দিয়ে বাখতে পাবি না। ফাটা, তুমি যদি এক নাগাড়ে পাঁচমাস বাসমতীতে থাক ফি বছব—কিংবা বছরে ঘুবে ফিবে ছ-সাত মাস তাহলে তোমাকে আমাদেব সমাজের কমিটির মেম্বাব হতে বলি। থাকবে?'

'এখন না।'

'বনচ্ছবিকে এবার কমিটিব মেম্বাব কবে নেয়া যাক, কী বলেন সবোজিনীদি?' গগন বাবু মুখে থেকে চুরুট নামিয়ে বললেন।

'বিশাখাও হতে পাবে,' সবোজিনী বললেন।

'ব্রাহ্মসমাজেব যে-কটি মানুষ আছি বাসমতীতে সবাই কি আমবা একসিকিউটিভ কমিটির মেম্বার হব?' হিতেন বাবু তাজ্জব মেনে বলেন; আলোটা উশকে দিয়েছিলেন গগন বাবু, পুরু কাচের চশমাটা চক চক কবে উঠছিল হিতেন বাবুব, হ্যাবিকেনের আভা কাঁচেব ওপবে গিয়ে মানুষটাব ভেতবে ধবকটাকে ঠিক ভাবে প্রতিফলিত কবতে পারছিল বলে।

দেখছিল বনচ্ছবি।

'সমাজ কমিটির মেম্বাব হতে পাবলে খুব খুশি হতাম গগন কাকা.' বনচ্ছবি বললে,' কিন্তু আমি কলকাতায চলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'বি-এ পাশ কবে দু-বছর ত বসে রইলাম বাসমতীতে। এবাব ভাবছি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পড়ব।'

'বি-টি?' জিজ্ঞেস করল ফাটা।

'না।-এম-এ।'

'আজকালই যাবে?' গগন বাবু বললেন।

'বিশাখাও যাচ্ছে। না, এখনই না, ছ–মাস পরে,' বনচ্ছবি বললে 'আপনাকে ত কথা দিয়েছি আসছে মাসে সমাজে গাইব।'

'ও—একেবারে গান গেয়ে ডঙ্কা মেরে চলে যাবে বুঝি?'

ফাটা ট্রাউসারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পায়চারি করতে–করতে বললে 'কীসে এম–এ পড়বে হে বনচ্ছবি? বাংলায়?'

'ইকনমিক্‌সে।'

'বিশাখা?'

'আমিও ইকনমিক্‌সেই পড়ব ভাবছি।'

'বেশ ভাল কথা,' পিঠের ওপর দু'হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফাটা বললে,'ইকনমিক্‌স পুরুষদের শাস্ত্র ছিল। অনেকদিন থেকে ধস্তাধস্তি করে আসছে তারা । শেষ মার্কসে এসে সিদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়া সেটাকে প্রামাণিক সাফল্য দিচ্ছে-শুনে ভাল লেগেছিল। কিন্তু হল না কিছু। পুরুষদের হাতে এ শাস্ত্র মনের ভূমিতে বা সমাজ ভূমিতে খুব সম্ভব কোথাও সিদ্ধ হবাব নয়। ইকনমিক্‌স নিছক বিজ্ঞান নয়, কিন্তু এটা কী তাহলে? কোন জিনিস মেয়েরা পাবে। কিন্তু পুরুষরা পারে না? আছে কিছু এমন জিনিস রান্না সেলাই আলপনা আঁকা পিঠে তৈরি করা? সব জিনিসেই পুরুষদেব ভেতর থেকে ওস্তাদ জুড়ি এসে জুটবে। তবে মেয়েরা সৃষ্টি রক্ষা করছে, কিন্তু তাও ত পুরুষদের সঙ্গে মিলে যুগল হয়ে,' ফাটা হাঁটতে–হাঁটতে বলছিল। এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে কারো মুখের দিক না তাকিয়ে বললে 'কিন্তু মেয়েরা, সব মেয়েরা নয় অবিশ্যি, নিজেদেব পরম ভূমিকায় দাঁড়িয়ে মায়ের মত শুশ্রূষা করতে পারে, কক্ষনো কোনো পুরুষের বাবার মত শুশ্রূষার সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। আজকের পৃথিবী এই শুশ্রূষা চাইছে–জ্ঞানেব ভেতব দিয়ে। দরকারে একটা বিশেষ জ্ঞান- ইকনমিক্‌স্। কিন্তু একে এর আধুনিক অবস্থায় ফেলে বাখলে চলবে না, অনেক দূর এগিয়ে নিতে হবে, মানুষেব সেবা শুশ্রূষার বড়, ব্যাপ্ত, প্রাণঘন সুর এর ভেতরে ফুটিয়ে তুলে। পুরুষরা কি তা পারবে?'

কথা বলা শেষ করে হাঁটতে লাগল আবাব ফাটা।

'কিন্তু তোমবা ত ইকনমিক্‌সের টেক্‌স্‌ট পড়তে যাচ্ছ বনচ্ছবি,' ফাটা বললে, 'টেক্‌স্‌টের ওপবে আর ক'জন মানুষ উঠতে পারে? সমস্ত পৃথিবীর ভেতর একজন মেয়েকেও ত উঠতে দেখছি না এই যুগে। অথচ এ–যুগ সে–যুগ একজন দু'জন নয়—খুব বড় পটভূমির কথা বলছিলাম আমি।'

'তুমি ত ভূমার আস্বাদ নিয়ে ফিরছ নীবেনদা,' বনচ্ছবি বললে, 'সমাজে সংসারে ব্যবসায়, মানুষেব মত বেঁচে থেকে চলতে -ফিবতে—'

'আর আমরা ত সেই বৌদ্ধ যুগেরও আগেব ভাবতবর্ষে? নয় বনচ্ছবি? সেই বিদুলাকে যে বলেছিল, নাকি বিদুলা বলেছিল যে মুষিকাঞ্জলি নিয়ে খুশি হয়ে আছি।'

'সুকুমার কি জেগেছে?'

'না। ও ভেরামনই খেয়েছে নিশ্চয়,' টিনি বললে,' তবে একটা ট্যাবলেট খেয়েছে না দু'টো তাই ভাবছি।'

'দু'টো খেলে ত সর্বনাশ,' সবোজিনী একটু আতকে উঠে বললেন, 'আপনি একটু দেখুন ত গগন বাবু।'

গগন বাবু তাঁর মোটা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াবাব জন্যে নীচেব দিক থেকে একটু চাড় দিচ্ছিলেন, কিন্তু সুকুমারের নাড়ীতে হাত রেখেছে ফাটা, গগন বাবুব ওঠবার দবকাব নেই। –কিন্তু উঠতেই হবে, ঘড়িতে এগারটা বেজে গেছে।

'সুকুমার খুব সম্ভব জেগে ঘুমচ্ছে,' ফাটা বললে,' যা হোক ঠিক আছে সরোজিনীদি। বেশ বড় আছে বিছানাটা আমি ওর পাশ দিয়ে শুয়ে পড়ব, যদি শেষ রাতে এলিয়ে পড়ি তাহলে, সে ব্যবস্থা আমিই করব।'

'জেগে ঘুমুচ্ছে?' খটকাটা মিটে গেলে সরোজিনী মিষ্টি গলায় বললেন, 'কিন্তু জেগে ঘুমুচ্ছে কেন?'

'খুব সম্ভব মেয়েরা এসে পড়েছে বলে,' ফাটা বললে,'এই সময়ে গা ঢাকা দিয়ে কান পেতে থাকতে খুব ভাল লাগে।'

কিন্তু তবুও সুকুমার নড়ছিল না, বনচ্ছবি মুখ টিপে হেসে ফাটার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখল জানালার ভেতর দিয়ে নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে আছে, এদেশের সপ্তর্ষি, গ্রেট বেয়ারের দিকে: ধ্রুব, অভিজিৎ, লুব্ধক, অনুরাধা, আলডেবরন, ক্যাসাডা, গ্রীক আর দেশি নামে নিবিড় কত শত নক্ষত্র যে আকাশে। কিন্তু সুকুমারদা ঘুমিয়েছে নিশ্চয়ই—না হলে নীরেনদার কথা শুনে পুরুষমানুষ কি কখনো ও-রকম শুয়ে থাকতে পারে? বনচ্ছবি ভাবছিল, তবে পুরুষমানুষকে শেষ পর্যন্ত চেনেনি হয়ত সে। নীরেনদার সঙ্গে আজকালই খুলে কথা বলতে হবে সমাজবাড়িতে গিয়ে-কলকাতার ইয়ুনির্ভাসিটি সম্পর্কে দেশ স্বাধীন হলে কী রকম হবে, পাকিস্তান হচ্ছে কিনা, এত রাতেও সিদ্ধার্থদা এল না, প্রভাসবাবুর মেয়ে রমা পেয়ে বসেছে নাকি সেনকে? কী কী হিসেবে? সেন ত কোনো হিসেবই মানতে চায় না, সুনীতিদি যে বলেছে অনেক রাতে বযানীর মাঠে শুয়ে থেকে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে—সেই একটি হিসেব ছাড়া।

'একটা সাইকেল রিকশা ডেকে আনবে ছাতু?' গগন বাবু বললেন।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল ফাটা।

'এইবারে মীবমহলের দিকে বওনা দিই আর কি। মীবমহল হয়ে দানাপুব।'

'ক'টা বাজল?'

'সোযা এগারটা। কাছেই ত রিকশাব আস্তাবল আছে ছাতু?'

'আস্তাবল?' ফাটা বনচ্ছবিব দিকে একবার তাকিয়ে গগন বাবুকে বললে।

'ঐ—আস্তানা,' গগন বাবু বললেন।

'আগে ত বাসমতীতে ঘোড়াব গাড়িই চলত শুধু,' বনচ্ছবি বললে,' সেই থেকে সব গাড়িরই আস্তাবল।'

'এক পেযালা চাও দিতে পারলুম না, কারুবই খাওয়া হযনি হিতেন বাবু গগন বাবু ফাটা বনচ্ছবি বিশাখা?' সরোজিনী কি দিয়ে কী কববেন বুঝে উঠতে না পেরে বললেন। ঘুম পাযনি তার নিজের, খিদেও পাযনি। টিনিব পেযেছে?

'এই বারে বাড়িতে পাত পেড়ে বসব আমরা,' গগন বাবু বললেন, 'মোটা শবীর আমাব লাফালাফি পোষায না, একটা রিকশা ডেকে দাও তুমি ছাতু।'

'বিকশা লাগবে না, আমাব মোটব সাইকেলে দিযে আসব।'

'কাকে?'

'দানাপুবে।'

'তা কী করে হয-আমবা তিনজন—তোমাব সাইকেলেব বক্স ত একটা।'

'প্রথমবারে আপনি এঁটে যাবেন, পরের বার ওদেব দু'জনকে নিযে যাব।'

'দু'বার দু'বাব যাবে দানাপুর—এত বাতে? তোমার পৈতৃক প্রাণের আজকাল দাম হয়েছে ফাটা-কলকাতায ইট সিমেন্টের ব্যবসা, এখানে পাশাবতীব জমিদারি, তোমাকে এ রকম হযবানির ভেতর ফেলতে চাই না আমরা,' গগন বাবু চুরুটের সাদা ছাই লালচে আগুনেব দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'বাসমতী আজকাল মোটেই সুবিধাব জাযগা নয। ইংবেজ চলে যাচ্ছে, স্বাধীনতা আসছে, পাকিস্তান হচ্ছে—কেমন একটা ভাঙনেব মহড়ার ভেতর সোবগোল চলছে চাবদিকে-কেউই নিজের মাথায দাযিত্ব নিতে চাইছে না, খুব বিশৃঙ্খল হযে পড়ছে সব; অনেক রকম বিপদ, বেশি রাতে খুব বেশি।'

চুরুটে টান দিতে গিযে গগন বাবু তাব কথাটা আগে সেবে ফেলাব দরকার বোধ করে বললেন,'প্রথমে ত আমাকে পৌছে দিতে যাচ্ছে দানাপুবে, তারপবে ওদেব নিযে মীবমহলে। কিন্তু ওদের বাপ-মা আমাব কাছ থেকে এ ব্যাপাবের কৈফিযত চাইলে কিছু দিয়ে উঠতে পাবব বলে মনে কবতে পারছি না। কৈফিযত কি চাইবেন বনচ্ছবি?'

'কেন চাইবেন? নীবেনদাকে ত চেনেন বাবা।'

'কী বললে তুমি বিশাখা?' চুরুট টান দিযে গগন বাবু বললেন।

'আমি ভাবছি একটা বক্সে তুমি একসঙ্গে আমাদের দু'জনকে কী করে নিয়ে যাবে নীরেনদা, সেটা কী করে হয, 'বিশাখা একটু ইংরেজি মিউজিকের মত সুবে চেঁচিযে হেসে উঠে বললে,' তাছাড়া পিচের বাস্তা ত নয, বাসমতীর রাস্তাঘাট ভেঙে ধসে গিয়ে মেরামতির অভাবে যে বিচ্ছিরি তা ভাবতেই পার না। উঃ, যা জার্কিং হবে, আমি মুটিয়ে গেছি, একটু চেপে ঠেশে থাকতে পাবব, কিন্তু বনচ্ছবি, তুই নির্ঘাত

ছিটকে পড়বি।'

ফাটা ঘরের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে একটা বড় কাল পাথরের থালার কাছে এগিয়ে এসে বললে,' এগুলো কী সরোজিনীদি?

'ও-ওটা পাথরের থালায় আচার রয়েছে।'

'আচার মাটির ওপর রেখে দিয়েছেন কেন?,

'বাইরে রোদে দিয়েছিলাম, রোদ পড়বার আগে ঘবের ভেতর এনে রেখেছি, তুলে রাখতে মনে নেই।'

'কীসের আচার?'

'জলপাইযের, মিষ্টি আচার, খাবে নাকি, পাঁচফোড়ন আব লঙ্কাব ঝালও আছে কিন্তু।'

'খুব বেশি ঝাল,' টিনি বললে,' কিন্তু সেই জন্যেই মিষ্টিতে ঝালে কি যে খাশা হয়েছে। মাসিমার ভারী চমৎকার হাত আচার তৈরি করবার।'

'ফাটাকে দাও টিনি,' সবোজিনী বললেন, 'ঐ ত পিরিচ-চামচে টেবিলের ওপর—'

'না, টিনিদিকে দিতে হবে না, শুধু চামচেটাই দিলে হবে,' বলে টিনির হাতেব থেকে চামচে নিযে আচাবের থালার দিকে এগতেই কোথকে এসে ধানরাজের মা ফাটার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গিযে পালাবাব পথ খুঁজতে গিযে আচারেব থালাটাকে দুই পা দিযে মাড়িযে চলে গেল।

ফাটা চামচ নিয়ে নুযে পড়েছিল, টান-টান হযে উঠে দাঁড়িযে হো হো করে হাসতে হাসতে বললে,' ভৃগু মুনি পদাঘাত করে গেছেন।'

মোটা শরীর নিযে গগন বাবুর হাসির হররাটা দেখবার মত, কোন কাঠেব চেয়ারে বসেছিলেন বলতে পারা যায় না, কিন্তু সেটা সেলাহা কাঠেব মত ছাতু হযে যায আব-কী। বনচ্ছবি ও বিশাখা যে যার গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল, চুলোচুলির মতন একটা দৃষ্টিবিভ্রম জাগিযে তুলে হেসে ছিঁড়ে পড়ছিল তাবা।

হিতেন বাবু একটু হাসলেন—গোঁফে এক-আধ ফোঁটা আতব মাখিযে নেবাব মত বিশেষ কোনো জোর দিলেন না ব্যাপাবটার ওপব তেমন। এ মাসে সমাজে তার নিজের উপাসনাগুলোব রকম কী বকম হলে ভাল হয তাবই একটা খশড়ার ভেতব ডুবে পড়ছিলেন প্রায। ওবা যে হাসছে সেটা মাঝে মাঝে অবশ্য বুঝিযে ছাড়ছিল ওবা হিতেন বাবুকে। অনেকখানি আচারও নষ্ট হযে গেল উপলব্দি কবছিলেন তিনি। ফাটা তাকিযে দেখল, সবোজিনীব চোখ ছল ছল কবছে, বেশি হেসেছেন, না ভেতব থেকে কেমন একটা নিবোধ ঠেলে উঠে তাকে বোবা করে বেখেছে—হাসতে দিচ্ছে না, কাঁদতে দিচ্ছে না—সেইজন্যে চোখ এ-বকম—বুঝে উঠতে পারছিল না ফাটা। ছাতুবাবু হাসছে-না-হেসে পারছে না। কিন্তু হাসিই সব নয তাব, মাঝে -মাঝে ভূরু কুঁচকে উঠছে, ধানরাজের মাকে দু-চাবটে প্যাঁচ দেখিযে ছাড়বে সে, দু-চাবটে বোম্বাই প্যাঁচ, এর-ওব দিকে তেরছা কান্নিক মেরে তাকিযে মাঝে-মাঝে কেমন যেন ঝেঁঝে উঠে জানিযে দিচ্ছে ছাতু। সুনীতি বৌদি মাথা একদিকে হেলিযে বেখে ঠোঁটে কাপড় তুলে প্রাণপণে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে হাসি না অন্য কিছু? হাসিই মনে হল ফাটার, কিন্তু আচাবেব ব্যাপাবের চেয়েও সুনীতি বৌদি হাসছে যেন এক-একবার আড়চোখে নজর দিযে হিতেন বাবুর মুখের দিকে তাকিযে , কিন্তু সে মুখে হাসিব নেই ত কিছু, তিনি ত হাসাতে চাচ্ছেন না কাউকে, সেইজন্যেই দুমড়ে হেসে উঠছে বৌদি, দেখে না-হেসে পারছিল না ফাটা। 'হাসছে কেন?' হিতেন বাবু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন ফাটাকে।

গগন বাবু গম্ভীর হয়ে পড়ছিলেন। হাসির দম ফুরিযে এসেছে তার প্রায, ফাটা হিতেন বাবুব ভেতরে কী রস পেযেছে সেটা গগন বাবু ধরতে পেবেছেন, কিন্তু তা নিযে সবোজিনীদি কিংবা গগন বাবু টসকাতে পারেন না, ওতে রুচি নেই, তাদেব স্বভাবেরই বিরুদ্ধে ওটা, ছোকবাবা যা-খুশি তাই করুক গিযে। হিতেন বাবুর মুখেব দিকে তাকালে গগন বাবু, ফাটা চুপ করে আছে কিন্তু কি ভাবছে, ধবে ফেলেছেন কি হিতেন বাবু? না, তিনি একেবারেই অন্যবকম ভাবনা,-ধাবণা-নিঃশব্দতার ভেতরে,-আরেক রকম পৃথিবীতে। তাঁব মুখের দিকে তাকিযে সুনীতি আব ফাটা (মুখ আড়াল করে) স্বভাবতই না-হেসে পারছে না- কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা সর্বনাশের নেশা আজকালকার এক ধরনেব 'সংস্কার রিক্ত' জ্ঞানীদের—তাদেব হাতে বড় কমল বাবু, ছোট কমল বাবু, হেরম্ববাবু, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী-কেউই বাদ পড়বেন না। গগন বাবু একটু গলা খাঁকারি দিযে বললেন,'অনেক রাত হয়েছে-উঠি সরোজিনীদি।'

সূচীপত্রে যান

'সুকুমার জাগেনি এখনো?'

'না।'

'এর পরও জাগল না? কী হল ওর!' সরোজিনী মিহি পাড়ের ফরাসডাঙার খুঁট দিয়ে চোখের কোনা মুছতে-মুছতে বললেন। আচারের ব্যাপারে নিয়ে সকলকে বেহদ্দ হাসতে দেখে একটু চাপা পড়ে গিয়েছিল টিনি, গগন বাবুর মতন মানুষও এত-এত হাসলেন? কিন্তু হিতেন বাবুও ধানরাজের মাকে ডিঙ্গি মারতে দেখে একবার খ্যাঁক করে হেসে উঠে সত্যিই যে হাসেন নি, ধমক মেরেছিলেন ঝিটাকে-তারপর থেকে চারদিকে যে-হাসির হবরা ফেটে উঠছে সে সম্বন্দে নিবেট থেকে নিজের আলাদা চিন্তাচৈতন্য একেবাবে যে তন্ময় হয়ে বসে আছেন সেই দিকেই তাকিয়েছিলে টিনি, প্রায় ফাটাব মতনই অব্যর্থভাবে হিতেন বাবুর ব্যাপারটা, কিন্তু তবও হাসি পাযনি তাব, ধানরাজ্যের মার নচ্ছার নষ্টামিটা এসে ঠেকিয়ে বাখছিল তাকে; জিনিসটা মোটেই হাসিব নয়, কী বকম পাগলেব মতন হাসছে বিশাখাবা, হল কি গগন বাবু, ভাবছিলেন টিনি। ভাবতে-ভাবতে সময় কাটছিল।

হাসিটা কিছুক্ষণ হল থেমে গেছে। গগন বাবু দস্তুব মত গম্ভীর হয়ে পড়েছেন, বিশাখারা পথে এসেছে, ছাতুবাবুও বিষ ঝেড়ে ফেলেছে সব-ঝিমচ্ছে এখন, পাযচারি করছে ফাটা, ঘাড় গুঁজে আছে সুনীতি, হিতেন বাবু এ-ঘরে যতক্ষণ ওরকম ভাবে বসে থাকবেন ততক্ষণ অবিশ্যি সুনীতি আব ফাটাকে একটু বেগ পেতে হবে গগন বাবুব মত একটা আত্মস্থ গাম্ভীর্য ফিবে পেতে, নজর দিয়ে দেখছিল সব, উপলব্ধি করে নিচ্ছিল টিনি। মাসিমা হাসেননি বটে এতক্ষণ, কাঁদতেও দেখা যাযনি তাঁকে, কিন্তু খুব ক্লান্ত, মুখটা একটু ফাঁক হয়ে পড়েছে, নীচের পাটির একটা দাঁতের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে মাঝে-মাঝে গগন বাবুব দিকে তাকাচ্ছেন, গগন বাবু এখুনি কিছু বলবেন, বললে এখুনি কিছু ভাল হয়ে যাবে-এ রকম ভবসায নয়, এমনি নিজের কথাই ভেবে যাচ্ছেন মাসিমা, কখনো সাক্ষীগোপালের মত কখনো নিজেব কবিৎকর্মারূপ নিয়ে মাসিমার চোখেব সামনে ফুটে উঠছে বুঝি গগন বাবু।

'সুকুমাব জাগল না?'

'না। ভাবছিলাম জেগে ঘুমুচ্ছে, তা নয।'

'ওষুধ খেযে ঘুমুচ্ছে?

'ক্লান্ত হয়েই ঘুমুচ্ছে মনে হয।'

'এত ক্লান্তি? ধানবাজেব মা ত মড়াদেরও জাগিযে দিযে গেল।'

'ও আজ ঘুমুবে সাবাবাত, কাল দিনেব বেলাও হযত জেব চলবে। কাবোকাবো ঘুম খুব বেশি, ও-একবকম ধাত।'

'কিছু খাবেটাবে না?

'জাগিযে ওকে খাওযাবেন সবোজিনীদি। তাহলে ছেলেমানুষেব মত কাঁদতে আবম্ভ কববে। যাদেব বেশি ঘুম তাবা একেবাবেই আব-এক জাতেব মানুষ। খুব ভাল কবে জেগে কাজে লেগে না-গেলে ষাট বছরেব ও নাবালকের মত ওরা হেসেকেঁদে বিড়বিড় কবে মন খাবাপ কবে দেবে মানুষের. ফাটা ঘবেব ভেতব হাঁটতে--হাঁটতে বললে।

'যদি শেষ বাতে উঠে খিদে পায় ওব,' সবোজিনী বললেন।

'বড্ড আহ্লাদ দিচ্ছেন সুকুমাবকে আপনি,' ছাতু বললে।

'সমাজের গান ত ও-ই চালাচ্ছে।'

'দেখছি ত তাই, আমাদেব সকলের মাথা কিনে বেখেছে।'

'কয়েকখানা হাতগড়া রুটি, অড়হবেব ডাল, ডুমুর ছেঁচকি আব পেঁপে আলু বড়ির তবকাবিটা একটা থালায় সাজিযে বেখে দিও ত তেপযের ওপব, সুকুমাবেব মাথায কাছে।' সবোজিনী টিনিকে বললেন।

'ধানরাজেব মা তৈরি করে রেখেছে ত এত সব? বান্নাঘবের কাজে হাত লাগাতে পাবলাম না ত আমরা আজ।'

'না রেঁধে রাখে যদি তাহলে করছে কি ও এতক্ষণ বসে? সবোজিনী বললেন।

রাত এগারটার সময আচারটায় লাথি মেরে গেল ত। এই প্যাচ মেবে ভেগে পড়বার জন্যে রাত দুপুব অবদি বসেছিল নাকি। ঘরে বড্ড মশা, ধুপ নেই, ধুপকাঠি জ্বালানো হল না।'

'এ-ঘরে আপনাব মশা খানিকটা কম,' গগন বাবু বললেন,' দানাপুরের দিকে সন্ধে হলে হাত-পা

ছড়িয়ে বসবে কার সাধ্য।'

'ক্ষীরমহলে আরো বেশি,' বনচ্ছবি বললে,'ধুপটুপ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, সন্ধের পরে শোবার বসবার ঘরে তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।'

'ইশ, তাড়াবে এই সব!' হিতেন বাবু বললেন।

'ধোঁয়া অনেকক্ষণ থাকে বুঝি?' ফাটা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ-'

'কেউ না।'

'রোজই ফিউমিগেট করা হয় বুঝি?' হাঁটতে-হাঁটতে এক জায়গায় থেমে চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে ফাটা বললে।

'ওতে মশা পালাতে পারে, হাঁপানি ঠেকাবে কে?' হিতেন বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন,' তোমার বাবার ত ব্রনকাইটিসের মতন লেগেই আছে। বি-এ, এম-এ, পাশ ছেলেমানুষি ঘুচল না তোমাদের; উনুনের ধোঁয়ার টিউবারকুলসিস হবে না তোমাদেব? তোমার ত বেশ একহারা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, এরকম মেয়েদেরই সহজে টি-বি হয়, টি-বি ত খুব বেড়ে যাচ্ছে আজকাল দেশে। কলকাতায় ওটা আটপৌরে গিন্নি রোগ। তোমার বাবাকে বলে দিও ত যে হিতেন জ্যাঠা বলে দিয়েছেন উনুনের ধোঁযা নিয়ে চ্যাংড়ামো না করতে। কই, সমাজে আসেনটাসেন না ত তিনি। 'হিতেন বাবুর মুখ সেদ্ধ বেগুনের মত দুমড়ে কুঁচকে উঠল, তিনি বনচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এত সুন্দর মেয়ের দিকে এবকম দৃষ্টির দ্রার্ঢ্য নিয়ে যে-মানুষ তাকাতে পারে তার ভেতরে একটা আলাদা শক্তিই আছে, সংসারের বাসনা কোনো প্রশ্নই নয় হিতেন বাবুর সাধনার জীবনে, ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি তবে তাঁর দক্ষিণমুখকে যদি হিসেবের ভেতর গ্রাহ্য করতে হয় তাহলে বনচ্ছবিব মত এই রূপের পবাকাষ্ঠাই ত তিনি, না অরূপ, কুরূপ? হাঁটতে-হাঁটতে কুঁজো হয়ে প্রায় বুকের ওপর মুখ ঠেকিয়ে ভাবছিল ফাটা।

'এত কথা?' সরোজিনী খানিকটা হাঁপিযে উঠে বললেন, 'আমি টিনিকে বলছিলাম সুকুমাবেব জন্যে একটা মশারি ঠিক করে রাখতে—'

'আমাদের বাড়তি মশারি কোথায মাশিমা?'

'দু'টো রযেছে ত।'

'হ্যাঁ, বড়টায আমরা দু'জনে শুই, আরেকটার ছাতু বাবু।'

'সুকুমারের পাশ দিযেই শোবে·ছাতু·আজ, বেশ ঢালা বড় বিছানা ত, আমাদেব বড় মশাবিটা ওখানেই টাঙিযে দিও, আমরা ছাতুর মশাবিতে শোব।'

তোমাদেব কোনোরকম ডি-ডি-টি নেই বনচ্ছবি?' ফাটা বললে।

'কিচ্ছু না, বাসমতীতে কিচ্ছু মিলছে না আজকাল,' বনচ্ছবি বললে এরকম চীনে টেংরি পাওযা যেত—কিট না কি জ্বালালে মশা মরে যেত কিন্তু আজকাল আর সেগুলোও পাওযা যাচ্ছে না।'

'যুদ্ধে ঝেড়ে পুছে উজোড় করে নিযেছে সব।'

'কলকাতার চোরাবাজারে গিয়ে ঢুকছে। বাসমতীব চোরাবাজারেও মোটাসোটা দু চাবটে জিনিস ছাড়া আর কিছু পাওযা যায় না।'

'আমাব কাছে ফ্লিট আছে, দেব তোমাকে। হিতেন বাবু ঠিকই বলেছেন উনুনেব ধোঁযা খারাপ। কিছু ফ্লিট আনাব বাসমতীতে আপনাদেব সকলের জন্যে,' পাযচারি করতে-করতে জানালার পাশে থেমে দাঁড়িযে ফাটা বললে, 'এখানে মশা মাছি উৎখাত করবার জন্যে কতগুলো জিনিসের আমদানি কবলে মন্দ হয় না, একটা ব্যবসাও চলতে পারে। করো না ছাতুবাবু এই ব্যবসা, আমি বাসমতীর চকবাজারে ঘব ঠিক করে দিচ্ছি, টাকা দিচ্ছি, কলকাতাব থেকে মাল চালাবার ব্যবস্থা কবে দিচ্ছি।'

'না গো,' ছাতুবাবু কাতরে উঠে বললে,' আমি ব্রাহ্মসমাজের কাজ করছি, আমার সময কোথায? সারা জীবনে ব্রাহ্মসমাজের কাজে ঢেলে দিয়ে এখন বুড়ো বযসে ডি-ডি-টির ব্যবস্থা করব। বেশ বলছ হে তুমি ফাটা।'

'তোমার কাছে ফ্লিট আছে ফাটা?' সরোজিনী যেন বিন্না ঘাস খুঁজেতে গিয়ে অনেকখানি পদিনাব শাক দেখে ফেলে চমকে উঠে বললেন, 'কাল আমার ঘরগুলো একটু ঠিক কবে দিও তাহলে। আমার ঘরেই ত ব্রাহ্মদের আসতে হয, সন্ধের পরে সমাজের কমিটির মিটিঙ, ব্রাহ্মবন্ধু সভা, এমনি সামাজিক

অধিবেশন, মেলামেশা কতাবার্তা, সবই ত এই দু'পাঁচখানা ঘরে। ওঁরা বসে মশার কামড় খাবেন সেটা ভাল নয়। ফ্লিট দিও তুমি ফাটা।'

'হ্যাঁ, আমাদের ঘরে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিন ত কিছু—কী যে মশা, কী যে মশা।' টিনি বললে 'খুব ভাল হয় এর পর কলকাতার থেকে যদি কিছু আনিয়ে দিতে পারেন-আমরা রেখে দিতে পারি তাহলে। ব্রাহ্মরা ত সন্ধের পর প্রায়ই জমেন এসে আমাদের এখানে। বেঁচে যাই যদি কামড় থেকে একটু রেহাই পাই আমরা সকলে। ভাল করে কথাটথা হতে-পাবে।'

'ফাটা যে আজ এখানে থাকবে বলেছিল টিনি?,

'হ্যাঁ, ফাটাবাবুকে হাতেগড়া আটার রুটি, অড়হরেব ডাল, ডুমুর চচ্চড়ি, আর পেঁপে বড়ির তরকারি দেব।'

'সুকুমার ও আমার জন্যে বাড়তি রান্না করে বেখেছেন নাকি আপনারা?'

কী করে জানলেন আগের থেকে?'

'সুকুমার আসবে বলেছিল। ছাতু সন্ধের পর বললে যে সে কিছু খাবে না- চোঁযা ঢেকুর উঠছে। আমরা দু-চারখানা বেশি রুটি ও একটু মুঠো আলগা করে তরকাবি টরকারি রেঁধে রাখি পরদিন সকালে চাযেব সঙ্গে খাবার জন্যে,' সরোজিনী বললেন,' আমি মাছ খাই না, টিনিও খাচ্ছে না আজকাল। ছাতু খায। এ বাড়িতে মাছটাছ বেশি আনা হয না। সবোজিনীদিব বাড়িতে তোমাকে নিরামিষ খেতে হবে আজ ফাটা। আপনাদের কাউকে চা-টা দিতে পাবলাম না হিতেন বাবু গগন বাবু। ধানরাজের মাকে চা চিনি পূর্ণ ময়রার দোকান থেকে একটু জ্বাল দেয়া দুধ আনতে বলেছিলাম; রাত দশটা বাজিযে এসে আমার আচারের থালা—' সরোজিনী একটু থেমে গিযে বলরেন, 'ফ্লিটে কি মশা মবে ফাটা?'

'মশা মাছি কুমবো পোকা-সব।'

'ছাতু আব সুকুমাব শোবে এক বিছানায। নাকি তুমি শোবে সুকুমারেব সঙ্গে? উত্তরের কোঠায় একটা দড়িব চাবপাই আছে, সেখানেও শুতে পার। আরো একটা মশারি রযেছে আমার কিন্তু জাযগায় ফেঁসে গেছে, গড়িমশি করে তালি দেযা হযনি। ওটা দেব তোমাকে।'

'আজ রাতে কি আব শোবাব দবকাব হবে সরোজিনীদি?'

'কেন?'

'এই ত বেশ কথাবার্তা হচ্ছে; হিতেন বাবু এত রাত অবদি কোথাও থাকেনে নি; উনিও আজ বসবেন।'

'আমি উঠি।' হিতেন বাবু বললেন।

'বাইবে খুব বেশি অন্ধকার,' টিনি বললে।

গগন বাবু পকেট থেকে টর্চ বের করে বললেন,' না, জ্বলছে না, যা ভেবেছিলাম তাই- আলোর কাছে এগিযে গিযে বললেন,' তাব পুড়ে গেছে।'

'মোম এক টুকরোও নেই টিনি? হিতেন বাবুর সঙ্গে দিযে দিতাম।'

'একটুও নেই,' টিনি বললে,' নিভে যাচ্ছে যেন সুনীতিদিব বাতিটা।

'তেল ফুরিয়ে আসছে,' বনচ্ছবি বললে।

'বাতিটা আমার নয-বিশাখাব,' টিনিকে বললে সুনীতি।

'সিদ্ধার্থ বাড়ি ফিরছে?' সবোজিনী জিজ্ঞেস কবলেন।

'না।'

'জিরানডাঙায কলেরা নেই ত এখন আর?'

'অন্য কোথাও গেছে,' টিনি বললে।

'হ্যারিকেনটা নিভে যাবার আগে হিতেন বাবুকে পৌছিযে দিয়ে আসি আগে,' বাতিটা হাতে তুলে নিযে ফাটা বললে।

ফাটার সঙ্গে চলে গেলেন তিনি।

গগন বাবু অন্ধকারের ভেতর চুরুট জ্বালালেন। ঘরদোর সব ঘুরঘুট্টি। চুপ চাপ হযে গেছে দেখে ধানরাজের মা একটু ভরসা পেযে এক দু' পা কবে এগিযে এসে বললে,' আমি কেরোসিন তেল ফেলে দিই নি, বাতিটা জ্বালিযে আনব?'

সূচীপত্রে যান

'তাই আনো বাছা' ছাতু বললে,'তেল নিয়ে অত কড়াক্কড় চলবে না, 'চারা বাজার থেকে এনেছ বেশ করেছ, কী করবে আর? আমাদের কর্তারা যদি আমাদের বাঁচাতে না পারেন, মান-অভিমান বা খুঁতখুতি করে আমাদের মরে গেলে চলবে না ত! মড়ার কোনো ধর্ম নেই, না বুঝে নিজেরা যাঁরা মরণের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ঠিক মনে করি তাহলে ধর্মই মরবে। দেশকাল বুঝে মানিয়ে নিয়ে ধর্ম আব ধার্মিককে চলতে হবে ত।'

'আমি ঠিকই বলেছিলাম,' সরোজিনী বললেন,' ও- তেলটা ধানরাজের মা ফেলে দিলে ভাল কবত।'

'কেন?'

'বরং একটু অন্ধকারেই থাকা যাক। কী ক্ষতি হচ্ছে? কিন্তু চোরাবাজারকে অল্প-স্বল্প সায-দিতে মনের অভ্যাসটা খাবাপ হযে যাবে ক্রমে,' ধানবাজেব মার কড়কড়ে আলোর দিকে তাকিযে চোখটা একটু ধাঁধিযে গেল সরোজিনীর,' একটি চিজ তুমি—' সরোজিনী বললেন, 'সেই চোবাই আলোই নিযে এলে ত শেষ অবদি। আব এই প্রথম হেমন্তের রোদে দেযা আমার মীরমহলের জলপাইগুলো-মিষ্টি মশলা ঝাল পাঁচফোঁড়ন দিযে মেখে বোদে তাতিযে আমি বোতল বোতল তুলে রাখব, তুমি'—

'বাতিটা তাহলে নিবিয়ে ফেলব?'

'নিযে যাও বাতিটা।'

'তেল ফেলে দেব?'

'নিভিযে রাখো।' টিনি বললে।

'বাতিটা থাক,' গগন বাবু বললেন।

'কেন?'

'তোমবা যদি অন্ধকারে থাকতে চাও থাকো,' ছাতু বললে, 'বাতিটা নিযে যাচ্ছি আমি, গগন বাবুদের জন্যে একটা বিকশা ডেকে আনতে হবে।'

'দুটো রিকশা ছাতুবাবু-একটায হবে না।' বিশাখা বললে।

'একটা-গগন বাবু আর বিশাখার জন্যে' ছাতু বললে; 'তুমি মোটর সাইকেলে যাবে না বনচ্ছবি, ফাটা বলছিল?'

'না-দু'টো বিকশাই নিযে এসে ছাতু, ওবা দু'জন একটায বসবে, আমি আব একটায, ওদেব মীরমহল পৌছিযে দিযে দানাপুব চলে যাব আমি। বারটা বেজেছে। এত রাতে বাসমতীতে বাব বাব ঘোরাফেরা ঠিক হবে না ফাটাব। কেমন যেন ভীমরুলেব চাকেব মত হযে আছে সমস্ত শহবটা।'

'যা-পথ ঘাট সাহেবডাঙাব থেকে মীবমহলে আব দানাপুব তাতে মোটব সাইকেল উতবোবে কী করে-বিশাখা বললে।

'তিনি চালিযেছেন ত সাবাদিন।'

'কী কবে জানলে তুমি বনচ্ছবি?' গগন বাবু জিজ্ঞেস কবলেন।

'নীরেনদা কাল ত কলকাতা থেকে এসেছেন। এ দু'দিন চলাফেরা করছেন ত বাসমতীতে, মোটব সাইকেল এনেছেন যখন—ফেলে বাখেননি।'

'বেশ, তাহলে একটাই রিকশাই এনো ছাতু।'

'কে যাবে একটা রিকশায?' বনচ্ছবি বললে।

'আমাদের দু'জন। আর-একজন মোটব সাইকেলে যাবে।'

'ফাটা আবাব যাবে, আবার আসবে, খাবে ত এখানে—' সরোজিনী বললেন,

'ঘুমবে, রাত প্রায একটা বাজতে চলল, তোমবা গগন বাবুব সঙ্গেই বিকশাতে চলে যাও! বিকশাই ডেকে আনো ছাতু—'

'ছাতু, একটু আলোটা দেখাও ত, এই আচাবের থালাটা ধানবাজের মা বের করে নিযে যাক।'

থালা নিযে গেল ধানবাজেব মা। ছাতু হ্যারিকেন হাতে করে রিকশা ডাকতে চলে গেল। ঘরে অন্ধকার জমে উঠেছে, হুড় হুড় করে এসে পড়েছে যেন সব, ছাতুর হ্যাবিকেনের শেষ ঠিকরানিটা মিলিযে যেতেই। আশেপাশে কোথাও কোনো বাড়ি নেই, অনেক দূরে দূরে বাড়িগুলোতে কোথাও-কোথাও আলো জ্বলছিল বটে, কিন্তু নিভে গেছে অনেকক্ষণ আগে। মিউনিসিপ্যালিটির বাস্তা এ-বাড়ির থেকে খানিকটা দূরে, সেখানে ইলেকট্রিক বাতিব ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু একটা ল্যাম্পপোস্টের চেযে আব-

একটা পোস্ট ঢের বেশি দূরে, আলোর বিধিব্যবস্থা বিগড়ে আছে অনেকদিন ধরে। বাল্ব লাগিয়ে দিয়ে গেলেও কারা যেন খসিয়ে নিয়ে যায়, লম্বা সরু ল্যাম্পপোস্টগুলো ন্যাড়া সুপুরিগাছের মত অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে, রাত্তির হলে বাসমতী না হোক, সমস্ত সাহেবডাঙাটাই যে প্রেত, পৃথিবীই প্রেত হয়ে যাবে একদিন, কেমন যেন ধূসর দেহশক্তির নিঃশব্দতায় সেই কথা বলতে চায় এক-আধজন একা লোককে।

'খুব ত অন্ধকার, আমি এত রাত অবদি জেগে দেখিনে শিগগির,' গগন বাবু বললেন, 'তা ছাড়া আমাদের ঘরে সব সময়ই বাতি জ্বলে রাতে—'

'কেরোসিনের বাতি?'

'হ্যাঁ, কেবোসিনের বাতিটা ডিম কবে রেখে দিই সারারাত। দানাপুরেব ফুড কমিটি সাহেবডাঙার মত অত খারাপ নয়। ওখানে বেশি কেরোসিন তেলেব ববাদ্দ আছে।'

'মীবমহলেও' বনচ্ছবি বললে,'মীরমহল দানাপুর মিলিয়ে একটা ফুড কমিটি ত, তুমি সেই কমিটির সেক্রেটারি ত গগন কাকা।'

'এ মাস অবদি আছি। আসছে মাস থেকে ছেড়ে দেব।'

'কেন? বড্ড মুস্কিলে পড়তে হবে তাহলে আমাদের,' বিশাখা বললে' এই ত দেখছেন সাহেবডাঙাব অবস্থা, না দিচ্ছে কেরোসিন, না জ্বালছে রাস্তায বাতি। কী-বকম ঘুরঘুট্টি অন্ধকার সমস্ত সাহেবডাঙাটা। এব ভেতব কী করে থাক তোমরা টিনিদি?'

'কে এখানকার ফুড কমিটির সেক্রেটাবি?' গগন বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'বতিলাল ঘোষ, বাসমতী কলেজেবই একজন বকাটে ছেলে, তিনবাব বি-এ ফেল কবে ঝাউডাঙা স্কুলে মাস্টারি কবত, সকলে মাস্টারমশাই বলে ডাকে, মাস্টাবি ছেড়ে দিযে চোরা-বাজারে ঢুকে রতি ঘোষ টাকা কবেছে অনেক, সাগরেদ জুটেছে ঢের, তারই জোবে রতি ঘোষ ফুড কমিটির সেক্রেটারি হযে গেল। আমাদেব কর্তারা কী রকম যে জেগে ঘুমোন বাসমতীর প্রথম ষাট বছরে আমি যা দেখিনি এই শেষেব দশটা বছবে তাব দশগুণ দেখে নিলাম গগন বাবু।'

'কিন্তু কর্তাবা নিজেবাও ত এক-একটি রতি ঘোষ, আমি জানি সব,' গগন বাবু চুরুটে দু-চারটে টান দিযে বললেন, 'সেইজন্যেই দানাপুর মীবমহলেব ফুড কমিটিব দাযিত্ব আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এসব কাজে ঢের ভালমানুষের দবকার ছিল, দেশের গরিবদেব গেবস্তদের এ-রকম দুরবস্থাব সময সত্যি উপকাব হত কিছু-কিছু, কিন্তু তা হবাব নয। যারা নিজেবা সুবিধা চায শুধু রাতাবাতি বড়লোক হযে যেতে চায তাদের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে-চাবদিকে। আমি যদি চাই, যদি সেক্রেটারি হযে এঁটে বসে থাকতে চায, ওবা আমাকে নাড়তে পারবে না কিছুতেই। কিন্তু কোনো লাভ নেই এ-সব জোচ্চর লোচ্চাদের ভেতর বসে থেকে কাজ করে-এতে কারুবই কোনো উপকার হবে না। আমি উনিশ শ তেতাল্লিশেব কযেকটা মাস, গোটা চুযাল্লিশ আব পঁযতাল্লিশেব খানিকটা সময ফুড কমিটির সেক্রেটারিব কাজ করেছি, তখন দানাপুরের কমিটি আলাদা ছিল, মীবমহলেব সঙ্গে মিশে যাযনি, দেশের খুব খাবাপ অবস্থা ছিল তখন, তবুও জিযাউদ্দিন কালেক্টর ছিল বলে খানিকটা কাজ করতে পেরেছি।

গগন বাবু বাঁ-হাতেব থেকে ডান হাতে কুড়িযে নিযে মুখেব দিকে তুলে নিলেন চুরুটটাকে, কিছু বলবার আগে তামাকের পিপাসা মিটিয়ে খানিকটা আগুন ঠিকবালেন। তাকিয়ে দেখছিল চুরুটের মুখের সেই আগুন খণ্ডটাব দিকে সকলে, চারদিককার কালো চৈতন্য কালো শূন্যের মত অনর্গল অন্ধকারেব চলাফেবাব ভেতবে।

ফাটা এখনো ফিবে এল না। হিতেন বাবুদের বাড়িটা অবিশ্যি এখান থেকে পোযাটাক মাইল দূবে। পথে হ্যারিকেনটা নিভে যাযনি ত? নিভে গেলেও অবিশ্যি ক্ষতি নেই বিশেষ কিছু। দবকাব হলে গবিলার বুড়ো বাপের মত হিতেন বাবুকে কাঁধেব ওপব ফেলে তার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিযে আসতে পারবে ফাটা। গাযেব শক্তি এবং গোষ্ঠীমমতাব দিক দিযে গরিলাব মত, চেহাবাব দিক দিযে অবিশ্যি মানুষের মত মানুষ-টিনি ভাবছিল।

ছাতু বিকশা ডেকে আনতে দেরি কবে ফেলছে—গগন বাবুর মনে হচ্ছিল, তিনি নিজে গেলেই ভাল হত। তাজ মহম্মদের আস্তাবলটা ছিল যেখানে, কাছেই ত, সেখানে ছ্যাকরা গাড়ির দু'টো খোল আছে এখনো, রোগা ছিঁচকে হাড়গোড়ের মতন দু-তিনটে ঘোড়াঘুড়ী চবে বেড়ায, একটা ঘুড়ী দু'টো ঘোড়া, খেয়ালে আছে সব গগন বাবুর, সেইখানেই শাহাবুদ্দিনের সাইকেল রিকশাব ঘাঁটি, চেনে ত খুব ভাল

করে ছাতু, এত দেরি হবার ত কথা নয়। একটা বাজে, এত রাতে দানাপুরে যেতে হলে রিকশা মাথায় দেড় টাকার চাইবে হয়ত। কিন্তু তাহলেও সরোজিনীদির এখানে সারারাত বৈঠক না বসিয়ে-এখনো বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল। সকলেই সব দিক দিয়ে দেরি করে ফেলছে-রাতটা শেষ পর্যন্ত বসে-বসেই এ বাড়িতেই কাটিয়ে দেবার সামিল হয়ে উঠল দেখছি, কিন্তু যেতে হবে, যেতেই হবে, বনচ্ছবি বিশাখাকে গগন বাবুই সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলে দেরি করিয়ে দিয়েছেন,

অনেক আগেই ছাতুর সঙ্গে রিকশা করে ওদের পাঠিয়ে দিতে পারতেন। যাক-যত রাতই হোক, ওদের মার কাছে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে তবে নিজের বাড়ি ফিরবেন।

'সিদ্ধার্থ এসেছে?' সরোজিনী বললেন।

'না। এলে ত টের পেতাম। ও-ঘরে তালা মেরে এসেছি।'

'রাত ত একটা হল। কোথায় ঘুরছে?' সরোজিনী জিজ্ঞেস করলেন।

'কে? সিদ্ধার্থ?' গগন বাবু বললেন, 'কোথাও গিয়েছে নিশ্চয়ই-ঠেকে পড়েছে। ও ত দু-চারটে ব্যাপারের কনভেনার, কিসের কিসের যেন সেক্রেটারি, সদর বাসমতীতে এখনো আলোটালো জ্বলছে মন্দ না, লোকজন চলাফেরা করছে, সভা সমিতি ভাঙছে। আপনাদের সাহেবডাঙার দিকটা সরোজিনীদি একেবারে নিঃসাড়।'

'মীরমহল এত গ্রাম-গ্রাম নয়।' বিশাখা বললে।

'এ যে পাড়াগাঁয়ের ও বাড়া, শীত রাতের অন্ধকাবে মনে হয় কোথায় থেকে কোথায় চলে গিয়েছি আমরা। জঙ্গলের ভেতর পাখির ডিমের মত গাছ থেকে পড়ে গিয়েছি যেন,' টিনি বললে, 'পৃথিবীর একেবারে কিনারে পড়ে রয়েছি। আমরা শীত রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে হুট করে বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে যাই, পৃথিবী টিথিবী কিছু নেই আর সেখানে বনচ্ছবি।'

'তুমি তবু ঘুমিয়ে থাক, ঘুমের ভেতব দিক্‌বিদিক বলে আর কিছু থাকে না-সবই এক পুঁটলিতে ঠেকে, নিবাপদ নিশ্চিন্তি। কিন্তু আমার ত তা নয-কেবলি চটকা ভেঙে যায়, ঘুমোই, আবাব জেগে উঠি-কোন দিকে যে ইস্টিমারের সিটি, বংশাল, মীবমহলের শ্মশান, দানাপুরেব ভাটিখানা, হাসপাতাল, সব জড়িবড়ি হযে যায। একবার মনে হয মন্দিরে শানের ওপব আছি, বড় কমল বাবু ওপবের গ্যালাবিতে শুযে আছেন, কখনো মনে হয দেববাবু উপাসনা শেষ কবে চলে গেছেন, বাতি নিভিযে দেযা হযেছে সব, আমি একা পড়ে আছি। হঠাৎ মনে হয দাদা কী একটা কথা বলে ঘুমতে চলে গেলেন, কাল খুব সকালে সম্বাযেব সমাজে যেতে হবে। মনে হয, যেন বাসমতীতে নেই আমি কলকাতায চলে গেছি, শাস্ত্রীমশাই একবার আমার কপালে মাথায হাত বুলিযে পাশেব ঘরে গিযে বসলেন, সামনেব বড় শূন্যটা কলকাতাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির। তাকাতে-তাকাতে ঘুমের ভেতর থেকে নিজেকে ভাল করে খসিয়ে টের পাই বাসমতীতে রয়েছি অনেক দূরে চলে এসেছি জীবনেব পথে, জানালাব ভেতর দিযে সিদ্ধার্থের আটচালা আর আম-মহানিমেব গাছের ঝুপসি-' সরোজিনী বললেন, টিনির মত যদি একটানা ঘুমতে পারতাম আমি তাহলে এ বুড়ো বয়সে পৌঁছে সাহেবডাঙার অন্ধকারেও এতটা নাকানি-চোবানি খেতাম না। কিন্তু ঘুম হয না, ব্রোমাইড খেতে হয, এ-রকম একটা ধবাবাঁধা রোগ আমার নেই। ঘুম হয, মাঝে- মাঝে বেশ দিব্যি ঘুম এসে পড়ে, কিন্তু ডায়াবেটিস আর প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের গোলমালে ঘুমবে কার সাধ্যি। বারবাব উঠতে হয়।'

ডাযাবেটিসের জন্যে সময় দত্ত দেখছিল না আপনাকে?'

'হ্যাঁ দেখেছে। এর আর কিছু করবার নেই ত। ডাযেটিং। তা সব সময়ে একনাগাড়ে সব বকম স্টার্চ কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়ে চলতে পারি না। আমাবই দোষ। টাকাকড়ি নেই-তাও খুব গুণের কথা নয়। সব দিক দিযেই দেখতে পাচ্ছি ত বুড়ো বয়সে-বাসমতীতে পড়ে থেকে।'

'ওষুধ ত সেই ইনসুলিন।'

আছে, ওষুধ নানারকম। দামি ওষুধ। ভাইয়েরা মাঝে-মাঝে পাঠায় কলকাতার থেকে। তবু ফুরিযে যায-ফুরিয়ে গেলেই কিনে পাঠাতে লিখতে পাবি না। নিজের টাকা আর নিজের বাপের টাকা আর নিজের ডান হাত—আর সব সত্যিই—' কথাটা শেষ না করেই জুতসইভাবে শেষ করে নিলেন সরোজিনী,' এ বুড়ো বয়সে কোনোরকম ওষুধেই হয় না কিছু। রোগটা হচ্ছে বয়স। তবে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের অপারেশনের কথা বলে কেউ-কেউ।'

সূচীপত্রে যান

'ওটা সুবিধা হবে না,' গগন বাবু বললেন।

' এ কলেজের প্রিন্সিপাল নাকি অপারেশন করে ভাল আছেন শুনলাম।

'প্রিন্সিপাল আপনার চেয়ে ঢের ছোট, ষাট হয়েছে হয়ত। অবিশ্যি দেবেন গাঙ্গুলি মশাই বাহাত্তর বছর বয়সে অপারেশন করিয়ে এলেন ত কলকাতার থেকে, হাসপাতালে ছিলেন অনেকদিন আলাদা বেড ভাড়া করে, তারপরে চেঞ্জে গিয়েছিলেন, এখানে এসে ভালই বোধ করছেন।'

'টাকাঅলা মানুষ।'

'দু-চারটে লেগে যায় বেশ, কিন্তু প্রাযই ফেঁসে যায সার্জিকাল অপারেশন আপনাদের মত এই বয়সে।'

'নাক ডাকাচ্ছে কে?' সরোজিনী বললেন।

'সুকুমার।'

'ওর কোনো ফ্যাসাদ হল নাকি গগন বাবু।

'না, কিচ্ছু না, তাহলে কি আর এ-রকম আওযাজ বেরুত।'

'আমি দেখেছি মর্ফিয়া ইনজেকশন করে এবকম হামাদামি করে নাক ডাকে মানুষ।'

গগন বাবু চুরুটে টান দিতে যাচ্ছিলেন, মর্ফিযার কথা শুনে থেমে গেলেন, 'কলিকের টলিকের ব্যাথা আছে সুকুমারের?

'না, শুনি নি ত।'

'মর্ফিযা ইনজেকশন দিযেছে কখনো?'

'বলে নি ত কোনোদিন আমাকে।'

'ফাটা এখনো এল না, হিতেন বাবুর বাড়ি চেনা নেই নাকি ওব, হিতেন বাবু নিজে ত চেনেন?'

'ফাটাবাবুর মোটর সাইকেলটা কি বাইরে নাকি?' টিনি বললে।

'হ্যাঁ,' বনচ্ছবি বাবান্দায় গিয়ে ফিরে এসে বললে,'উঠোনে আছে।'

'ওটাকে ঘরে এনে বাখা উচিত,' গগন বাবু উঠবাব উপক্রম করে বললেন। কিন্তু মোটামানুষ, যে-রকম চেহারার বহব সেই অনুপাতে গাযে জোব নেই কিছু, দম রাখতে পাবেন না, একা পারবেন না। জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ত সাইকেলটাকে, একটু নজব রেখো ত বনচ্ছবি, বাসমতীতে আজকাল জোচ্চর শযতান বাড়ছে-ভদ্রঘবেব ছেলেদেব ভেতরও।'

সুনীতি বললে, 'আলো একটা থাকলে আপনাবা খেতে বসতে পাবতেন সরোজিনী পিসিমা। দেরি হযে গেল বড্ড।'

'তুমি খেযেছ?'

'না।'

'আলোটা এলে তোমার খাবার নিযে এস এখানে, ঢাকা দিযে রেখো সিদ্ধার্থেবটা। কটা বাজল গগন বাবু?'

'একটা বেজে গেছে।'

'বাঃ, এল না ত ছাতু।' সবোজিনী বললেন।

'ফাটাও ত এল না।'

'একে একে পুরুষরা অন্তর্ধান করল দেখছি সকলে,' টিনি বললে,'যদুবংশের মেয়েদের মত অবস্থা হল বুঝি আমাদের। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, বাইবে মোটরসাইকেলটা, সুকুমাব হযত মর্ফিযা ইনজেকশন করে ঘুমচ্ছে। গগন বাবুর ব্লাডপ্রেসার এমনিতে একশ পঁচাত্তব দু'শ আন্দাজ-রাত জেগে চুরুট টেনে-টেনে আড়াইশোয চড়ল বুঝি। এখন যদি কেউ আমাদের ওপর চড়াও হয তাহলে—'

'তুমি বেশি কথা বল টিনি,' সরোজিনী একটু কর্কষতা দেখিয়ে বললেন, বাত দেড়টা,' গগন বাবু বললেন।

'তাহলে নীরেনদা যা চেযেছিলেন, সারারাতেব বৈঠক, তাই ত হল,' বনচ্ছবি গগন বাবুকে বলছিল।

'তাই ত হল,' ঘরের ভেতরে ঢুকে ফাটা বললে, তার হাতেব হ্যারিকেনটা নিভে গেছে ।

'বাতিটা কি যাওয়ার পথেই নিভল নাকি নীরেনদা, না ফেরবার পথে?'

সূচীপত্রে যান

'তাহলে বসবে তোমরা এখন সকলে, এত রাতে কে কোথায় আর যাবে,' ফাটা বললে,'বেশ একটা হ্যারিকেন জুড়ে দিয়েছিলে তুমি আমার হাতে বনচ্ছবি, আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো ত—'

'কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—' বনচ্ছবি একটু এগিয়ে গিয়ে ফাটার পায়ের সমান্তরাল অসংখ্য পায়ের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললে। কিন্তু পা নয়ত ওগুলো-অন্ধকার; কোনো জ্যামিতিক রেখার মত নয়-বিভোল বিন্যাসে রাশিরাশি হয়ে দেখা দিচ্ছে যেন এখন।

'আমিও দেখতে পাচ্ছি না কিছু, তবে হিতেন বাবুর বাড়ির থেকে ফেরবাব সময় রাস্তা ধরে চলতে-চলতে ধানজমি-মাঠ-কাদা-গোবরের একটা তিনমাইল চক্কর ঘুরে এলাম। চক্করটা কেন যে দিতে হল বুঝতে পারলাম না। হিতেন বাবুর বাড়ি ত এখান থেকে শোয়া মাইলের পথ।'

'অনেক কাদা-গোবর লাগল বুঝি,' গগন বাবু বললেন,' হ্যাবিকেনটা কখন নিভল?'

'ও হ্যারিকেনটা বিশাখারও নয়,' বনচ্ছবি বললে,'সিদ্ধার্থদার এখানে আসতে-আসতে রাত হয়ে গেল, পথে হিরণদের বাড়ির থেকে ও এনেছে।'

'ছাতুবাবু কোথায়?' ফাটা বললে।

'রিকশা ডাকতে গেছে-তোমারই সঙ্গে সঙ্গে গেল ত প্রায়,' সরোজিনী বললেন,'আসছে না। '

'আচ্ছা আমি দেখছি, বিকশার আস্তানাটা কোন দিকে গগন বাবু?'

'রাস্তায় নেমে সোজা পুবমুখো গিয়ে, প্রথম বাঁ হাতি গলিতে ঢুকে, ও, তুমি তাজ মহম্মদের আস্তানাটা চিনতে না?'

'সেইখানে?'

'সেইটাই তিনচাক্কির আস্তাবল হয়েছে।'

'চললে নীরেনদা?'

'কাল দুপুরে তুমি সমাজবাড়িতে যেতে পাববে বনচ্ছবি। ছাতুবাবুকে নিয়ে যেও।'

'কেন?'

'ওখানেই আমি আছি। সমাজ-টমাজ নিয়ে কথাবার্তা হবে,' বলতে-বলতে বাবান্দায় এসে চুরুট জ্বালিয়ে নিল ফাটা।

ছাতু রিকশা নিয়ে এসে পড়েছে।

তিনজনেই চলে গেল ওবা। সিদ্ধার্থ এখনো আসেনি।

সবোজিনী, টিনি, সুনীতি, ফাটা হ্যারিকেনেব আলোয় পুবদিকেব ঘবের টেবিলে বসে খেয়ে নিল। নিজের ঘরে চলে গেল সুনীতি। জাগল না সুকুমার। সুকুমারেব পাশে ছাতুবাবুও ঘুমিযে পড়েছে। দড়িব চারপাইয়ে গিয়ে শুযে পড়ল ফাটা। সারারাত জেগে কথাবার্তা বলেই কাটিযে দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু সকলেরই ঘবে ফিরে যাবার, শুযে পড়বাব দিকে মন।

টিনি একটা মশারি নিয়ে এল।

'আপনি ঘুমিয পড়লেন ফাটাবাবু।'

'না, ব্রোমাইড আছে?'

'কেন, ঘুম আসছে না?'

'কেমন যেন পা টিপে-টিপে আসছে।'

'মশারিটা টানিয়ে দিই?

'তাহলে গবমে হাঁপিযে উঠব না?'

'গরম কোথায?' টিনি বললে, শীত পড়েছে,—আপনি গাযের ধবাচুড়ো খসিয়ে নেবেন ত? মোজা বুট সবই এঁটে আছেন দেখছি।'

'ব্রোমাইড নেই?'

'না। অনেক দিন থেকেই নেই। গেল বছর মাঝে-মাঝে খেত নাসিমা, তারপর ছেড়ে দিযেছে।'

'নিতান্তই কিছু খেতে চান?' টিনি মশারিটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বললে।

ফাটা পা ঝুলিয়ে ডান হাতের কনুযের ওপর ভব দিয়ে বসে বললে, হ্যাঁ যাতে ঘুম আসে।'

'শরীরে কোথাও কোনো ব্যথা আছে?'

'না,' ফাটা মাথা হেলিয়ে বললে, 'শরীব দিব্বি। তবু ঘুম আসছে না।'

সূচীপত্রে যান

'রাত কত?'

'দু'টো প্রায়। ঘুমিয়েছেন সরোজিনীদি?'

'না। আজ রাতে কারুরই ঘুম হবে না দেখছি। আমরা এমনি সাড়ে ন'টা দশটার সময় শুয়ে পড়ি; টিনি হাতের মশারিটা ফাটার বিছানার এক কিনারে আস্তে ঝুপ করে ফেলে দিয়ে বললে,' যেদিন মাসিমার বাড়িতে ব্রাহ্মবন্ধু সভা বা সমাজকমিটির মিটিং থাকে সেদিনও শুয়ে পড়তে–পড়তে সাড়ে দশটা এগাবটার বেশি হয় না। দু'টো বেজে গেল আজ।'

'বড্ড ভেঙ্কি লাগিয়ে দিলাম তাহলে আমি এসে,' ফাটা পকেট থেকে পাইপ বের করে বললে।

'এখন আর ওসব নাই–বা খেলেন ফাটাবাবু,' ব্রায়ার পাইপটার দিকে তাকিয়ে টিনি বললে,' তাহলে আবো অস্বস্তি বোধ করবেন, ঘুম হবে না। আপনাকে এক গ্লাস ঠান্ডা জল দিই।'

'না, তেষ্টা পায়নি। জল আমি কম খাই না, জলই খাই। খেতে বসে ঢেব জল খেয়েছি আজ। আজ রাতে আর লাগবে বলে মনে হচ্ছে না। পাশের ঘরেই আপনি আর সবোজিনীদি শুয়েছেন?'

'হ্যাঁ, দশ বছর ধরেই এক খাটে শুই, অভ্যাস হয়ে গেছে। না–হলে মাসিমা ঘুমতেই পারে না। আমি অবিশ্যি–'

'এ ঘর থেকে ওর ঘরে যাবার দরজা ত খোলা আছে দেখছি।'

'ওটা খোলাই থাকবে। বন্ধ করবার দরকার নেই ত কিছু।'

'ও–ঘরে কুজোয় জল রয়েছে ত?

'আছে!'

'তেষ্টা পেলে নেব গিয়ে,' ট্রাউজারেব পকেট থেকে পাউচ বের করে ফাটা বললে,'কিছু মনে করবেন না, দু–চাববার হয়ত যেতে হবে আপনাদেব ঘরে। তবে যদি ঘুমিয়ে পড়ি। না হলে পাইপ জ্বালিয়ে বসে থাকব সারা রাত। মশাবি কী হবে?'

'টানিয়ে দিই?'

'না, মশা লাগে না,' ফাটা পাইপের ভেতব তামাক ভবতে–ভবতে বললে,যখন ঢাকা গিয়েছিলাম মাঘ মাসে, বছব আষ্টেক আগে, মশাবি টানাতে হয়েছিল। এখন অবিশ্যি ঢাকায় গেলেও লাগে না— ছারপোকা মশা কিস্যুতে ঘুম বাধে না। কিন্তু বাতিক চড়ে গেলে ঘুমতে পারি না।'

'সকলকে নিয়ে সারারাত জাগবেন ঠিক করেছিলেন; হিতেন বাবু আর মাসিমাকে ছেড়ে দিলে সে–জিনিসটা জমত।'

'আমরা কথাবার্তা বলছি, সরোজিনীদি শুনছেন?'

'শুনছেন হয়ত,' টিনি ঘরের কোনো খামচিব অন্ধকাবের দিকে তাকিযে কী যেন ভেবে নিয়ে বললে,' আপনি সুকুমাব যা করেছে তাই করুন।

পাইপ জ্বালিয়ে ফাটা বললে,' আচ্ছা, আনুন তাহলে। আমি ভেবেছিলাম জেগে কাটাব, আপনিও বসতেন বেতেব চেযাবটায়। বাসমতীতে এলে অনেক কথা মনে পড়ে, কথাবার্তা বলে বাত কাটাতে ইচ্ছে করে; আপনারা ত বাসমতীর অনেক দিনের মানুষ।'

টিনি মশারিটা বিছানার থেকে কুড়িয়ে গুছিয়ে নিতে নিতে বললে, 'মশারি টানাব না তা হলে? বাসমতী সমাজের কথা বলে কি আর শেষ করা যায়? এ সমাজের যা হয়ে গেছে সেইটাই হল, পরে আব কিছু হবাব নয়। বাসমতীতে এসে থাকুন আপনি, এক রাত কি কথাবার্তা বলে শেষ করা যায়?'

ফাটা পাইপ টানতে–টানতে চুপ করে রইল।

জলের কুজো, একটা বড় কাচের গেলাস আব ভেবামনের ফাইলটা নিয়ে এল টিনি।

'একটা বড়ির বেশি খাবেন না।'

'আচ্ছা।'

'আপনার মাথা ধরে নি ত? শিরদাঁড়ায় ব্যথা নেই?'

'না।'

ফাটার বিছানার বালিশের কিনারে ওষুধের ফাইলটা রেখে দিয়ে টিনি,'জানলাগুলো খোলা থাকবে আপনার ঘরের? বড়ি একটার বেশি খাবেন না।'

কী আর দরকার আছে ফাটার?

দাঁড়িয়ে ছিল টিনি।

বেতের চেয়ারে গিয়ে বসেছে ফাটা; অন্ধকারে খুব নিজমনে পাইপ টানছে। ঘুম হবে না বটে, কিন্তু বেশ নিবিড়ভাবে রপ্ত হতে পেয়েছে অনর্গল পিপাসায় তামাক টেনে চলার একটা আশ্চর্য গতির ভেতর। কোনো কথা বলছে না আর সে।

'জেগে আছে মাসিমা।'

'এখনো? রাত আড়াইটে ত।'

'কিছু আর দরকার আছে আপনার?'

'না। বড্ড ঘুম পেয়ে গেছে।'

ফাটা পাইপ নামিয়ে রেখে বললে, 'এই বারে বড্ড জলতেষ্টা পেয়েছে আমার। উঠে দাঁড়িয়ে কুজোর থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে আধাআধি গ্লাস খেয়ে বাকি জলটায় চোখের মাথায় একটু ঝাপটা দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল সে।

কেউ যেন মশারি টানাচ্ছে মনে হল। ইঁদুর শব্দ করছে সিলিঙের কাঠের পাটাতনের ওপর। মশা ভন ভন করছে। পাইপটা ঠক করে পড়ে গেল মেঝের ওপর-বিছানার একেবারে কিনারায় রেখে দিয়ে ছিল।

টিনি চলে গেছে।

ফাটা বিছানার ওপর উঠে বসে ভাল করে তাকিয়ে দেখল ঘরের চারদিকে। পাশেব ঘবের থেকে ওদের দু'জনের ঘুমের নিঃশ্বাস টের পাওয়া যাচ্ছে, প্রথম ঘুমের গভীবতা-একজন নয়-খুব সঠিক ভাবে দু'জন মানুষের।

খুব শান্তির দেশ এই বাসমতী।

ঘন্টাখানেক বেতের চেয়ারে বসে পাইপ টানল ফাটা। টেবিলের ওপবে ভেবামনেব ফাইলটা রয়েছে। একটা বড়ি, না দু'টো, গিলে নিয়ে ঘুমনো যাবে বটে, কিন্তু সে-রকম ধবনের ঘুমের কোনো প্রয়োজন নেই আজ-এখন বাসমতীতে সরোজিনীদিব এ-বড়িতে ঘুমের দরকার বিশেষ বোধ করছিল না সে।

আরো এক গেলাস জল খেল।

বিছানায় শরীরটা এলিয়ে রেখে দরজার ভেতর দিয়ে অনেক দূবেব দিকে তাকিয়ে রইল ফাটা। বাঁ দিকে ঘন গাছেব জঙ্গলঃ উত্তর দিকের জানলাটার দিকে তাকালে চোখে পড়ে সব। আম কাঁঠাল জামরুল সিসু, জাম, লিচুব বড় উপবনেব ভেতব থেকে কোনো গাছই হারিয়ে যাবার মত যেন নয়, কেউই খোয়া যাবে না যেন পৃথিবীব কোনো অন্তিম রাতেব অশেষ অন্যমনস্কতার ভেতবেও কী যেন একটা ইচ্ছা সংকল্প ক্ষমতার আশ্চর্য দ্রাঢ্যে প্রতিটি গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, সময়ের ভেতর দিয়ে তাদের গতি, সময়ের অতীত কোন এক লক্ষ্যের দিকে তারা অনেক দিন ধবে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। সেই লক্ষ্যই সময়েব নিজ স্বরূপ। সময়ের নিজ স্বরূপ এই গাছগুলো। এই গাছগুলো সময়, মানুষ ধ্যানে সময়কে ধারণ করে টেব পেয়েছে বহিঃপৃথিবীতে তার উপলব্ধি ছবির মত প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

পুব দিকের জানালার ভেতর দিয়ে সমস্ত আকাশখানা দেখা যাচ্ছে। সরু সরু জিরাফেব মত উঁচু কয়েকটা গাছ রয়েছে এইদিকে, বেশি নেই; কী গাছ ওগুলো? কয়েকটা কাঠ আছে। ছোট-ছোট খুদে পাতার মিহি ডালপালার একটা সজনে গাছ খুব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে-ওপরে গলার দিকে সরু লম্বা হয়ে তারার ভেতর দিয়ে ঠেকেছে যেন। আঁধারের পটভূমিকায় মানুষের চোখে দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়ে তোলবার জন্য নয় মনে অন্য এক জিজ্ঞাসা জাগাবাব জন্যে এই উদ্ভিদ আজ প্রাণশক্তির স্রোতে কেমন নিখুঁতভাবে জিরাফরূপী।

পাইপে নিভে গিয়েছে আগুন, জ্বালিয়ে নিল। সৃষ্টির ভেতর প্রাণ এসেছে, প্রাণ পরিকল্পিত করে নিয়েছে নিজেকে বিভিন্ন আধারের ভেতর, কে আগে কোন কোন আধারে কী-রকম বিশেষভাবে শ্রীমন্ডিত হল জিজ্ঞাসা তা নিয়ে নয়, অগ্রপশ্চাতের প্রশ্ন নয়, আত্মীযতার প্রশ্ন। মানুষ বুদ্ধির উৎকর্ষে সমস্ত জড়পৃথিবী প্রাণী পৃথিবীর থেকে খানিকটা আলাদা হয়ে পড়লেও সকলকে যুক্ত করে সব কিছুর সঙ্গে যে নিখুঁত-গ্রন্থি রয়েছে সেটা আবিষ্কারের ভার পড়েছে মানুষের ওপর। এই আবিষ্কার করবার সহজ প্রতিভার ভেতর দিয়েই মানুষ ক্রমে-ক্রমে শুধু যে আত্মীযতারই মিলিত করতে পারছে অ-প্রাণকে প্রাণের সঙ্গে, প্রাণকে প্রাণীর সঙ্গে, প্রাণীদের পরস্পরকে পরস্পরের তা নয়, নিজেও স্পষ্ট সফল আত্মীযতা বোধ করছে

এদের সকলের সঙ্গে। ঐ অত বড় উঁচু নক্ষত্রলেহী সরু সজনে গাছটা একটা জিরাফের মত, জিরাফ আমারই মত—এই অন্ধকার নিঃশব্দতায় স্থিত হয়ে আছে সে বটে আজ, মুছে যাবে কাল, আবার মন্ডিত হয়ে উঠবে অন্য কোথাও, আবার মুছে যাবে—সৃষ্টির মনের ভযাবহ অনিশ্চযতার (প্রাণীদের কাছে) নিরাবিল আনন্ত্যের কাছে রেণুর মতন সে আজ, সূর্য হতে হবে তাকে আর-এক দিন; কিন্তু নিরাবিল আনন্ত্যের শেষ হল না তখনো তবুও, সূর্য আর ধূলিসূর্য রেণুসূর্য, একটা বিস্তীর্ণ আত্মীয়তায় গ্রথিত হয়ে চলতে লাগল। শেষ শৃঙ্খলা শেষ হয়ে গেলে কী থাকে তারপর?

কিন্তু কোনো শৃঙ্খলাই পরিসমাপ্ত হবার নয়, গ্রথিত হয়ে চলছে সব, গ্রথিত হবার প্রতি মুহূর্তেই প্রাণঘন মুর্হূর্ত, এই ত গেলাসটা দিয়ে গেল টিনি, কাচের গেলাসের কিনারে-কিনারে জলবিন্দু জেগে রয়েছে ঢের, তারার আলো এসে পড়ছে তার ওপব, চোখেব খুব কাছে গেলাসটা এনে জলের কণিকাগুলো অনুসন্ধান করা যায়, এইখানে একটা বিশ্ব রযেছে যেন। ঐ সজনে গাছের জিরাফমূর্তি ছোট-ছোট পাতার ফাঁকে ওর শরীরের নিকট আত্মীযের মত নক্ষত্রগুলো, ওর মাথার দিকটা অনিশ্চয়তাব আনন্ত্যের ভেতর জেগে উঠেছে আজ, মুছে যাচ্ছে কাল । ঐ জিরাফের মতন আমিও বাসমতীর এই অদ্ভুত অন্ধকার প্রসূর্যমানতার ভেতর, সৃষ্টির পিঠের ওপর আমরা দু'টি আত্মীয-এইখানেও একটি বিশ্ব রয়েছে যেন। সবোজিনীদির ঘুম ভেঙে গেছে টের পেল ফাটা। পাইপ নিভে গিয়েছিল। জ্বালিযে নিল। বেতের চেয়ার থেকে উঠে ঘরের ভেতর পাযচাবি করতে লাগল। বসল গিযে চেযাবে আবাব।

সরোজিনী অন্য কোনো দিককার দবজা দিয়ে বেরিযে অন্ধকারের ভেতর হাতড়ে-হাতড়ে বাইরেব কাজ সেবে এসেছেন। টিনি জাগেনি। খানিকটা শীত পড়েছে আজ। কাঁপতে-কাঁপতে বিছানায় খসখসে লাল কম্বলটার ভেতরে ঢুকে গুটিসুটি হযে শুযে রইলেন। জেগে আছেন।

জেগে যে আছেন টেব পেযেছে ফাটা । দু'টো কামরাব মাঝখানে একটা খলফাব বেড়ার পার্টিশন।

'সবোজিনীদি—' বেতের চেযাবে বসে থেকে ওপাশের ঘরে মানুষকে ডাকল সে।

'কী দরকার তোমার ফাটা?'

'কিচ্ছু না, আপনি জেগে আছেন টের পেলাম।'

'ও।'

'বেশ চমৎকার জায়গায আপনাব বাড়িটা। আগে ত কতবার এসেছি, কিন্তু এ-রকম দেখিনি কখনো, এত রাতে পৃথিবীর মাটি ছেড়ে আকাশেব দিকে উঠছে যেন সব, চারদিকে জোনাকি, সিসু গাছ, সজনে, ঝাউ। পুবদিকের আকাশটা বেশ খোলা, আমার অনেক দিনেব চেনা নক্ষত্রগুলোকে দেখছিলাম।'

'তুমি কি অঙ্কে এম, এ?'

'আমি? ফিজিক্সে। ইংরেজিতে এ-গ্রুপেরও একটা সার্টিফিকেট নিয়ে বেখেছি।'

'তুমি প্রফেসরি করলে না কেন?'

'ভাবছি। বাসমতীতে এলে এই কলেজে চেষ্টা কবে দেখতে পারি।'

'তাহলে খুব ভাল হয।'

'ঘুমিযে পড়ুন।'

'কেন?

'ঢের জেগেছেন আজ। আমিই পাপ করে জাগালাম। কীট ত একশ পঁচাত্তব আপনার, দুশ সোয়া দুশ হযেছিল বাত একটা দেড়টা অবদি জেগে। এখন না ঘুমলে আড়াইশয উঠবে। ঘুমিযে পড়ুন।'

'তুমি ঘুমিযেছিলে?'

'বেশ চৌকশ ঘুম। আবার ঘুমোবাব চেষ্টায আছি। একটু শীত-শীত পড়েছে, ঘুম জমবে ভালো।'

'টিনি লম্বা ঘুম দিচ্ছে।'

'আমাকেও কাল আটটার সময় উঠতে হবে, যা ভাবগতিক দেখাছি, বেশ বড় একটা ঘুম হয়ে গেল, কিন্তু তার চেযেও বড়টা আসছে এইবাবে।'

'সুকুমার জেগেছিল?'

'না।' ও জার্মান বড়ি খেয়ে ঘুমচ্ছে।'

'ভেরামন?'

'হ্যাঁ, আপনার ফাইলে ত আছে অনেকগুলো। এ জিনিস আজকাল কলকাতার চোরাবাজারেও

পাওয়া যায় না । আপনার এখানে একেবারে পড়ে পাওয়া মাল হিসেবে এমন জিনিস পেয়ে লোভ সামলাতে পারে নি।'

'ফাইলটা সরিয়ে রাখতে হবে ত তাহলে।'

'কাল সকালেই। অনেকগুলো বড়ি আছে শুনলাম,' টেবিলের থেকে ভেরামনের ফাইলটা তুলে নিয়ে সেদিকে তাকাতে-তাকাতে ফাটা বললে।

'টিনি-জানে সব। ও সরিয়ে ফেলতে হবে। আফিম খাওয়ার বাড়া। কী রকম পাগলের মতন ঘুমচ্ছে, দেখছে। ওকে দিয়ে সমাজে গান গাওয়াতে হবে-এ মাসের সমস্ত গানের ভার ওর ওপর। সত্যসখার চেয়ে ভাল গায় সুকুমার, বুঝলে ফাটা? বড় কমল বাবুর পর এ-রকম গান আর শুনিনি আমি কোথাও। অথচ করছে কি সুকুমার? সেঁকো খেয়ে নিজেকে ফোঁপরা করে ফেলছে।'

'ওর কোনো দুঃখ আছে মনে?'

'কিচ্ছু না। কোনো স্ত্রীলোকের দিকে একদম ঘেঁষে না।'

'কেন?'

'ভালবাসে না।'

স্ত্রীলোকের ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে মানুষের মনে দুঃখ হতে পারে না এমন কথা অবিশ্যি সরোজিনীকে বলতে চাননি, সুকুমারের মত ছেলেদের প্রধান দুঃখ কী নিয়ে হতে পারে-নির্দেশ দিয়েছেন। সুকুমার এমনিই ঘুমচ্ছে হয়ত—ঘুমের বাতিক আছে বলে; কোনো ওষুধ খেয়ে ঘুমচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

'ঘুমিয়েছে ফাটা?'

'না।'

'সিদ্ধার্থ ফিরছে?'

'কই টের পাইনি ত।'

'সুনীতি একা ও ঘবে কী কবে থাকে তাহলে?'

'এ নিয়ে কাল সিদ্ধার্থের সঙ্গে কথা হবে আমার।' ফাটা পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে বলবে।

'গগন বাবুরা ঠিক মতন গিয়ে পৌঁছলেন ত?'

'আমার মনে হয় দু'ঘন্টা ঘুম হয়ে গেছে গগন বাবুদের, আরো ঘন্টা চারেক ঘুমাবেন। যাক, কালকে খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানিয়ে যাব এক সময়। সবচেয়ে বেশি ঘুমলেন হিতেন বাবু।'

'ছাতুও ঘুমল যা, খারাপ বলতে পারা যায় না। টিনিও কম যাচ্ছে না। বেশ একটু শীত-শীত। আ—ফাটা। এসব রোগটোক যদি আমাব না থাকত, আর আয়ুটাকে কুড়ি বছব আগে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, বেশ চমৎকার ঘুমের রাত ছিল আজ, কম্বলেব নীচের থেকে শীতের আরামে, একটু কুকড়েসুকড়ে সরোজিনী বললেন।

'বুড়ো মানুষ কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ে।' ফাটা বললে,'বেশ শীত শীত, আধো ঘুমের ভেতর চলে গিয়েছেন আপনি সরোজিনীদি; কাল সকালে উঠে টের পাবেন ঠান্ডা রাত পেয়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে ঐ যে পাশ ফিরে এই শুলেন-এতেই।'

কিছুক্ষণ পরে সরোজিনী বললেন, 'জেগে আছ?'

দু'মিনিট পরে আবার বললেন,'জেগে আছ ফাটা?'

'ও-আমাকে? আমি ভেবেছিলাম টিনিদিকে ডাকছেন বুঝি।'

'না তোমাকেই। শব্দ শুনছ?'

'কোথায়?'

'এ ঘরের সিলিঙের কাঠের পাটাতনের ওপর।'

'ও! কীসের শব্দ?

'ভোঁদড় এসেছে বোধহয় পাশের জঙ্গল থেকে।'

'ভোঁদড়?' ফাটা পাইপ টানতে-টানতে বললে,'কেন, পাটাতনের ওপর কি কলার কাঁদি আছে'

'না, কিচ্ছু নেই।' সরোজিনী চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন খুব সম্ভব, ফাটার কামরার দিকে পাশ ফিরে শুলেন মনে হল; আমাদের বাড়ির গাছপালার সম্বচ্ছরের সুপুরিগুলো রোদে দিয়ে পাকিয়ে শুকনো করে

রেখে দেয়া হয় পাটাতনের ওপরে, সেগুলো রয়েছে ওখানে। আর কিছু নেই।'

'ভোঁদড় সুপুরি খেতে আসে?'

'বলো তুমি কী যে ফাটা, ভোঁদড় কখনো সুপুরি খায়? আসে এখানে একটু ফুর্তি করতে দু-তিনটে ভোঁদড়ে মিলে। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পেয়েছে ত, টিনের ছাউনির নীচে, সুঁপুরি আর গরান কাঠের বেশ মজবুত পালিশ পাটাতনের ওপরে। বনজঙ্গল গেরস্তদের ঘরের থেকে কলা বিলিতি গাব ক্যাঁকড়া ট্যাকড়া গেয়ে এসে এখানে একটু হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে বেশ জিরিয়ে গড়িয়ে নেয়—ঐ যে হড়হড় ধড়মড় গড়গড় হগড় গগড় ঢগড় জাঙড় জাঙড় শব্দ শুনছ ।দু-তিনটে ভোঁদর আসে হেমন্ত-শীতের রাতের দুপুরে।'

'গগন বাবুরা সাত তাড়াতাড়ি চলে না গেলে এ-বাড়িব নানা ঘরের একটা -না একটা খাটে শুয়ে থেকে, খানিক জেগে খানিক ঘুমিয়ে, শীত অন্ধকাবের ভেতব এ-কামবার থেকে ও-কামরায কথা চালানো যেত। এ-সব রাতের মর্ম পরস্পবেব কাছে ভাঙিয়ে বাসমতীর পৃথিবীব সৃষ্টির ক্রমগভীরতার ভেতব সকলেই যে কাছে কাছে আছি জানাবাব বোঝাবার সুযোগ দিতে পারতেন। পৃথিবীতে কড়কড়ে দিনের দৌবাত্ম্য প্রায সমস্তটা জাযগা জুড়ে খুবই অল্প একটা অংশ এ-রকম বাত্রিব জন্যে। আমার খুব ভাল লাগছে- সরোজিনীদি—'

'শুনেছি তোমাব কথা সব।'

'কিন্তু আপনাদের ঘরে কি অত খাট বিছানা ছিল?'

'তা আছে, তোশক, চাদব, পুবনো লেপ-কম্বলও আছে কতকগুলো। আমার ভাইরা ত আট-দশ বছর আগেও প্রাযই আসা-যাওযা করত বাসমতীতে; অনেক জিনিসপত্র, লেপ-তোষক, বালিশ-কোলবালিশ, খাট-চারপাই ফেলে গেছে তাবা।'

'তাহলে ত সব হয়ে যেত,' ফাটা বললে, 'কিন্তু কিছু হয, বাকিটা মুলতুবী থাকে, এই হচ্ছে পৃথিবীব কথা। আমি আপনি কথা বলে খানিকটা শান্তি পাচ্ছি। বনচ্ছবিরা যদি থাকত, সিদ্ধার্থবা যদি আসত, গগন বাবুও থাকতেন-বেশ হত তাহলে। '

'তুমি একটা কথা মনে কবিয়ে দিলে বটে—সবোজিনী নবম বালিশেব ভেতব একটা চোখ ও কপালেব অনেকখানি ডুবিয়ে বেখে বললেন, একদিন সবাইকে বাতেব বেলা আমাব বাড়িতে নেমতন্ন করে আনব ভাবছি। খাওযা দাওযাব পব এখানেই শোবাব ব্যবস্থা হবে। যাঁবা আজ এসেছিলেন তাঁরা সকলেই থাকবেন। তাছাড়া সিদ্ধার্থকে রাখতে হবে। হিতেন বাবু?'

'উনি না-থাকলেই ভাল।'

'আব-কেউ?'

'না, সম্প্রতি আব কেউ না। বেশি লোক এনে হাটহুদ্দো বানিয়ে লাভ নেই,' ফাটা বেতেব চেয়ার থেকে উঠে ভেরামনেব ফাইলটা একবাব হাতে তুলে নিয়ে খাবে কিনা ভাবতে-ভাবতে টেবিলেব ওপব সেটা সবিয়ে রেখে দিযে বললে,'বেশ চমৎকাব হবে তাহলে, সাবারাত ঘুমিয়ে জেগে পাঁচখানা ঘরে পাঁচ-ছটা খাটে যে যাব নিজের কম্বলে শুয়ে থেকে শীতবাতের কথা চালানো যাবে।'ঘবেব ভেতর দু-চাববার পাযচারি কবে চেযাবে এসে বসল সে আবাব, পাইপটা বাববাব নিভে যাচ্ছে, জ্বালিয়ে নিল ভাল কবে। 'খুব অন্ধকার থাকবে ঘব।'

'হ্যাঁ, আজকেব মতন,' সবোজিনী বললেন, 'একটা হ্যারিকেনও জ্বলবে না।'

কেউ কোনো কথা বলছিল না। সবোজিনী হযত ঘুমিয়ে পড়েছেন। ফাটা পাইপ টানছিল। ভোঁদড়গুলো এখনো রয়েছে পাটাতনের ওপব, তবে আগেব চেয়ে সোবগোল কমে গেছে ঢের; হঠাৎ বেড়ে উঠলো আবাব।

'তুমি কি চেয়ারে বসে আছ নাকি?'

'হ্যাঁ, এইবার বিছানায় যাব।' ফাটা বললে।

'তাই ভাবছিলাম,' সরোজিনী বালিশের ওপর একটু এপাশওপাশ ফিবে বললেন,' একজন বসা লোকের সঙ্গে যেন কথা বলছি। তুমি বসে আছ ত অনেকক্ষণ।'

'আপনিও জাগলেন-আমি ত চেয়াবে এসে বসলাম।'

'কীসেব গন্ধ পাচ্ছি?

'আমি পাইপ টানছি সরোজিনীদি।'

'ও।'

আপনার খারাপ লাগছে?

'না চুরুটের মত কড়া গন্ধ নয়। টান তুমি। বেশ শীত পড়েছে। তোমাকে একটা কম্বল দিয়েছিল টিনি?

'দিয়েছে।'

'ভোঁদড়গুলো আবার তিড়বিড় করে উঠছে, টের পাচ্ছ?'

'সারারাতই থাকবে বুঝি?

'এই প্রথম শীত পড়েছে, এখন ওরা জোড়া মিলবে,' সরোজিনী বললেন, 'সেই জন্যেই আজ রাতে—বলতে-বলতে থেমে গেলেন তিনি।

টিনি জেগে উঠে ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে বললে,' ভোঁদব এসেছে বুঝি:

'হ্যাঁ।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিলে তুমি মাসিমা?'

'ফাটা। এই এতক্ষণ জেগেছিল ও ঘরে।'

'একদম ঘুমোন নি?'

'এই কিছুক্ষণ হল ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, ভোঁদড়ের গোলমালে-'

'ও—' টিনি ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে বললে, 'বেশ শীত পড়েছে। একজোড়া ভোঁদব এসেছে, নাকি দু'জোড়া? আমাদের পাটাতনটাকে ওদের আখড়া করে নিয়েছে বেশ। তুমিও বিয়ে কবলে না মাসিমা, আমিও করলাম না, কিন্তু আমাদের ঘবদোবে এসে ওরা বেশ বাচ্চা বানাবার তালে আছে,' টিনি আবো খানিকটা ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতে-যেতে বললে, 'বেশ ভাল, সকলকেই স্নেহ ক্ষমা, ভালবাসতে, ইচ্ছা করে, সকলকে এই সব প্রথম হেমন্তের, কেমন শিশির, অন্ধকার, বাসমতীর এই সব টিনেব, ছনেব ছাউনির রাত,' বলতে-বলতে ঘুমিযে পড়ল টিনি।

খানিকক্ষণ পরে সবোজিনী বললেন,' চলে গেছে ভোঁদড়গুলো।'

'টিনি।'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

'ঘুমিয়ে পড়েছে আবার টিনি। বাবা, কী ঘুমই ঘুমচ্ছে। ফাটাও ঘুমিযে পড়ল বুঝি?'

'ফাটা।'

কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই, ভোঁদড়গুলোও চলে গেছে, চারদিকে ধানজমি, জঙ্গল, হুহু করে ফাঁকা মাঠ, পৃথিবীর বুকভরা অন্ধকাবের মত অনিমেষ নিস্তব্ধতা। সরোজিনীর কথায় কোনো উত্তব দিতে গেল না ফাটা ।পাইপটাও টেবিলেব ওপব নামিয়ে রেখে বুকেব ওপর দু-হাত বেঁধে জানালাব ভেতব দিযে বাইরেব দিকে তাকিয়ে রইল।

'একটা পেঁচা উড়ে এসে বসেছে আমাদের টিনের চালেব ওপব, ঝুং কবে একটু শব্দ হল, আমি টের পেয়েছি,' সরোজিনী বললেন।

কিন্তু কাকে?

টিনি ত ঘুমিয়ে পড়েছে। ফাটাও ঘুমিয়েছে বলেই জানেন তিনি। নিজেকেই বলছেন সরোজিনী। এমনই চলে বুঝি সরোজিনীব স্বগত বিহবলতা- বাসমতীব হেমন্তকাল রাত্রিব গভীরে ঢুকে এরকম আদি অতুল পৃথিবীর মত নিঃশব্দ হলে। এই বারে ডাকবে পেঁচা,' সবোজিনী বললেন, এটা কালপেঁচা নয়, কাল পাখি, হুতোম পেঁচা-ভারি চমৎকাব লাগে এর ভাব আমাব। কোকিল ডাকে, সে-এক বকম। হুতোম ডাকে, সে আর-এক রকম। বেশ গাম্ভীর্য আছে এব ডাকেব ভেতর। কার্তিক অঘ্রানে খুব অথই নিশ্চুপ হয়ে উঠলে অন্ধকার আব শিশিবের ভেতবে জেগে ওঠে হুতোম। কেমন ডাক ছাড়ে শুনছ? ফাটা-'

শুনছিল। ভারি আশ্চর্য লাগছিল তার । অনেক দূরে মোরগ ডাকছে কোনো গেরস্তের ঘরেব ভেতর থেকে হয়ত। কিংবা বুনোপাখি। চারদিককার জমি জঙ্গলের ভেতব থেকে বনমোরগ ডাকছে খুব সম্ভব; শুনে কানই শুধু খুশি হয় না, মানুষকে আলগোছে নিজেদেব দিকে টেনে রাখে যেন এই সব পাখিদেব ডাক-হেমন্ত শীতের বাসমতীর এক কিনারে প্রকৃতির ধান মাঠ-জঙ্গল গন্ধের খুব কাছে বসে-এত রাতে

এত নক্ষত্রের ভেতর। কলকাতার বালিগঞ্জের দিকে শীতকালে বেশি রাতে মোরগের প্রহরে-প্রহরে কহরে ডাক শুনেছে বটে সে-কোনো বড়লোকের বাড়ির খাঁচার ভেতর থেকে ডেকেছে-শহরপাড়ার রাতের নিঃশব্দতায় ছেলেবেলার বাসমতীর কথা মনে পড়েছে তার, বিশেষত পাশাবতী আর সিদ্ধার্থের এই সাহেবডাঙার খেত জঙ্গল ঝিল নক্ষত্র হেমন্তরাত্তির কথা। কিন্তু বালিগঞ্জে হুতোমের ডাক কোনোদিন শোনে নি সে,-অনেক দিন পরে আস্বাদ পেয়ে কান পেতে শুনছিল আজ-হৃদয় অন্তঃকরণের কাজ করছিল, দিনের আলো আর গ্যাসের আলোর নিরেটে একঘেয়েমির শেষ আছে কোথাও-তারপর প্রকৃতি তার নিজের হাতে অন্ধকারের অবতারণা করে এসব দেশেব কার্তিক অঘ্রাণ ঋতুর; বেডিওর অনর্গল শব্দবহ অসাড়তার শেষ আছে-তারপর স্নিগ্ধতা আছে, শিশির আছে, সাকোরখোরা ধানক্ষেত থেকে উঠে এসেছে এই পাখি-এইখানে প্রকৃতি আছে; তার হৃদযের ভেতব হাত রেখেছেন বুঝি সরোজিনীদি, পেবেছেন রাখতে? সুযোগ পেযেছেন বটে অনেক। আমাব অবস্থা বাজসূয় যজ্ঞের শেষে সেই বেদীটাব মত যেন না হয; কিন্তু প্রকৃতি এখানে একটা যজ্ঞের মত ব্যাপার নয। পাইপটা তুলে নিযে নিভে গেছে দেখে টেবিলে সরিয়ে রেখে ভাবল ফাটা; প্রকৃতি এখানে একেবারেই অন্যবকম জিনিস-মিতব্যযী, নিঃশব্দ, কেমন ক্ষমাময়, আদান-প্রদান পবিশীলনে ভরপুব-কিন্তু তবুও আবাব শেষে নিঃশব্দ—

'ঘুমিযে তুমি?'

'ঘুমিযে পড়েছ নাকি ফাটা?' সবোজিনী প্রথম বাবে উত্তর না পেযে জিজ্ঞেস কবলেন।

ফাটা পাইপ জ্বালিযে নিযে বললে কালেকটবেটে এই ত ঘন্টা পেটাল-না?'

'পিটিযেছে।'

'কবাব-শুনতে পারলাম না।'

'চারবার।' সরোজিনী বললেন, পেঁচাটা উড়ে গিযেছে।'

'কেন গেল?'

'এক জাযগাযই কি থাকবে সাবাবাত। আবাব আসবে।'

'কখন?'

'আজ নয-কাল বাত আবাব । এখন সাকোবখোবা নদীব দিকে গেছে—'

'বযানী নদীব কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, সেটা আমাদেব বাড়িব পেছনে উত্তব দিকেব ধানজমি দু'তিন কানি শেষ হলে কালিজিরা ধানেব ক্ষেতগুলোর পাশ দিযে সাকোবখোবাব ক্ষেতটা আছে-ঐখান দিযে ঘুরে যায-দেখনি তুমি?'

'দেখেছি ছেলেবেলা-অনেক দিন যাইনি ওদিকে। নদীটা মোড় ঘুরে কোন দিকে যায ওখান থেকে?'

'জলজিরানিব দিকে।'

'ও-ফাটা পাইপ টানতে টানতে বললে, 'দিককাব নদীটাকে সাকোবখোবা নদী বলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, ভাবি সুন্দব জাযগা, দেখবাব মত। একদিন চড়িভাতি কবলে হয,' টিনি জেগে উঠে বললে,'অনেক জামগাছ আছে নদীব পাবে, বাঁশবন আছে, ঝাউগাছ হযেছে ঢের। স্টিমার কোম্পানিব সাহেবদের একটা সাদা কুঠি আছে নদীব থেকে বেশ খানিকটা দূবে—লিচু জামরুল জলপাই মেহেদি ক্যানার বাগান জঙ্গলেব ভেতব।'

সাহেবরা থাকে ওখানে?'

'না, ওবা শনিবার শনিবাব ওখানে আসে; বিকেলে টেনিশ খেলে, বাতে খাযদায নাচগান করে, রোববারেব দুপুরে অবদি ওখানে থাকে-তাব পবে চলে যায।'

'আর ছ'দিন কী হয?

'ঘরদোবে তালা ঝুলতে থাকে-আব কি হয-ওপাড়ার ছেলে-ছোকরাবা আগানে-বাগানে খেলা করে ফলপাকড় উজোড় কবে যায-বনজঙ্গলে মাঠ ক্ষেত, বাগান মিলিয়ে ভাবি চমৎকার জাযগা। কি রকম নির্জন, কত ফুল, কত বড় আকাশ। গাছ-গাছালির ভেতর ঝাউ, বোনঝাউ, বাঁশবন, লিচু, জামরুল, ধানক্ষেত, আখের ক্ষেত, মেহেদিব বন আর ক্যানার বাগানই বেশি—বন বাগানেব ফাঁকে ফাঁকে কযেকটা পাকা বাড়ি আছে সাহেবদের। আব কোনো বসতি নেই।'

'সেই দিকে উড়ে গেল বুঝি পেঁচাটা?' ফাটা বললে।

ওটা কো-অপারেটিভের বেল পড়েছিল-এবার কালেকটরেটের বেল পড়ছে -শুনছ?' সরোজিনী বললেন।

'কটা পেটাল বুঝতে পারলাম না।'

'চারটে; কো-অপারেটিভের ঘড়িটা দশ মিনিট ফাস্ট,' টিনি বললে, 'চারটে বেজে গেল। আপনি কখন খুব থেকে জাগেন নীরেনবাবু? ভোঁদড়ের গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল বুঝি?

'ভোঁদড় আবার যেন এসেছে মনে হয়।'

'না-ওটা ইঁদুরের শব্দ। অনেকগুলো ধাড়ি ইঁদুর আছে পাটাতনের ওপর, কতকগুলো পায়রা শালিখ টালিখের বাসাও আছে চারদিকের খোপ খুপরির ভেতর। এদের সকলকে নিয়ে শীত রাতে শুয়ে থাকতে বেশ ভাল লাগে। চারদিক খুব বেশি নিঃসাড় হয়ে পড়ে যখন নানারকম প্রাণের আওয়াজের সাড়া পাওয়া যায়-ওরাও ভালবাসে, ডিম পাড়ে, ছোটাছুটি করে, ঘুমচ্ছে, জাগছে-খুব ভাল লাগে—' টিনি বললে।

'সিদ্ধার্থ কি এসেছে ফাটা?'

'কৈ না ত-টের পাইনি।'

'এখনো এল না? তাহলে আজ রাতে আর ফিবব না। তুমি বসে বসে পাইপ টানছ এখনো? শুযে পড়ো এই বারে।' সরোজিনী বললেন।

'রাত দু'ঘন্টা আছে আর নীবেনবাবু।'

'দেড় ঘন্টা—' সরোজিনী বললেন,' তোমরা সাড়ে পাঁচটার সময উঠো, আমি পাঁচটাব সময ব্রহ্মোপসনা করতে উঠব—'

'উপাসনা হবে সরোজিনীদি? কোথায?

সরোজিনী একটু নিজের ভেতর সরে গিযে বললেন, 'কোথাও না, এই আমি বিছানায উঠে বসেই একটু প্রার্থনা করব। এই কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েই। টিনি, কোনোদিন ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। বেশি নয, এই ঘন্টা খানিকেব ব্যাপার।

'পাঁচটার সময? পাঁচটা ত হয়ে এল। '

'হ্যাঁ, এই হল আব কি, এখন একটু চোখ বুজে নিই। '

'আপনার উপাসনায যোগ দেব আমি-আমার ঘরে বসে থেকেই। শুনতে পাব ত? ফাটা বললে।

'জেগে থাকলে শুনতে পাব, সরোজিনী কম্বলটা ভাল কবে গাযে জড়িয়ে শীতেব আবামেব ভেতর বেশ আঁটসাঁট হয়ে বললেন,'উপাসনা সেরে তত্ত্বভূষণ মশাইব ঈশোপনিষৎটা পড়তে হবে একটু আধটু; বাংলা তর্জমা পড়া, সংস্কৃত ভাল জানলে ভাল হত বেশ। অঘোরকামিনীব জীবনচবিত লাবণ্যদির দৈনিক, সাধন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কতকগুলো চিঠি-দাদাকে লিখেছিলেন-এই সব পড়ব কিছু কিছু; টিনি চা করে আনবে; চা না খেযে যেও না তুমি ফাটা—'

'চা আর হাতে গড়া রুটি আর কালকেব আলু-ডুমুবেব তরকাবিটা গবম করে—আমি কিন্তু ভাল চা করতে পারি না নীবেনবাবু; টিনি অন্ধকারের ভেতর চোখ তারিযে তারিযে বললে; ঘুমিযে পড়ছে,'ব্রুকবন্ড লিপটন নয় -সাহেবডাঙার লুজ চা—ভাল লাগবে না আপনার—'

'তোমাব মোটর সাইকেলটা ঘরেব ভেতর নিযে এসেছ ত ফাটা—'

'ও ভাল কথা মনে করিযে দিযেছেন সরোজিনীদি; ফাটা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমারই মনেই ছিল না বাইকটার কথা—'

'সব্বোনাশ চুরি হযে যায যে।'

'এখানে ত জনমানিষ্যি নেই কোথাও সবোজিনীদি—ভোঁদড়ে চুরি করবে—'

ঘুমের নি:শ্বাস আস্তে আস্তে উঠছে পড়ছে সবোজিনীদির ঘরে; টিনি ঘুমিযে পড়েছে বুঝি আবার।

'তুমি জান না ফাটা' সরোজিনী বালিশ থেকে মাথাটা একটু আলগা করে তুলে নিয়ে খানিকটা ব্যস্ত বিপন্ন হয়ে বললেন 'মোটর-বাইকটা যদি তুমি ঘরের ভেতর এনে রাখতে তাহলেও ব্রেড়া কেটে নিয়ে যেত—এই ধরনেব লোক দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে বাসমতীতে। দেখে এস ত—কোথায় রেখেছিলে—কী হল—'

সকালবেলার উপাসনার মুখে একটা জড়িয়ে পড়েছেন সরোজিনীদি, সবকিছুর থেকে আলগা করে এখন থেকেই একটু নিবেদনের ভাবে মনটাকে বসানো উচিত তাঁর; তিনি অবিশ্যি খুব খারাপ কিছু

সূচীপত্রে যান

করছেন না-অব্যয়ের দিকে পা বাড়িয়ে দেবার আগে সাংসারিক ব্যাক্তিহিতের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো। যা হোক-সরোজিনীদির মনটাকে তারই নিজের এবং নিজ সমাজের প্রয়োজনীয় শুদ্ধ তন্ময়তার ভেতর এখনই স্থিত হতে দেয়া যাবে—মোটর-বাইকটা চুরি গেলেও-জানে ফাটা। বাইরে গেল না সে আর,এই বারে সত্যিই অসম্ভব ঘুম পেয়েছে তার, হাতের পাইপটা আলগা মুঠো থেকে খসে মেঝের ওপর পড়ে দু'চারটে গড়াগড়ি খেল, মাথাটা এলিয়ে পড়ল বেতের চেয়ারের এক কিনারে, ঝুলে পড়ল হাতদু'টো, পা ঢিলে হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, বেতের চেয়ারটা একটা বুড়ো উটের হাড়ের মত মড় মড় মচ মচ করে ভেঙে যেতে যেতে কোনোরকমে টিকে থেকে ঘুমন্ত মানুষটাকে ধরে রাখল।

কিন্তু তবুও সরোজিনী ভোর পাঁচটায় উপাসনা আরম্ভ করবার আগেই ফাটা জেগে উঠল; তিন কোয়ার্টার ঘুমিয়েছে হয়ত, আরো কম-খুব সম্ভব। জেগে উঠে হাতটা স্বভাবতই টেবিলের পাইপটার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু, তবুও সেটাকে কুড়িয়ে না নিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখে দিল; কুজোর থেকে জল ঢেলে নিয়ে চোখ মুখ ভাল করে ধুয়ে বড় কমল বাবু বেশি আগ্রহে যে গানগুলি গাইতেন সে সবের ভেতর থেকে প্রথমেই যা মনে পড়ল-সত্যেন ঠাকুরের একটা গান শুরু করল আস্তে-আস্তে। চোখ বুজে গান গাইছিল ফাটা; গান শেষ হবার আগেই একবার চোখ মেলে তাকাতেই দেখল সরোজিনীদি আর টিনি হাত মুখ ধুয়ে বসেছেন এসে তার বিছানার ওপর।

উপাসনা হল মিনিট পনের।

উপাসনার পর আরো তিনটে গান গাইল ফাটা।

'তুমি এত অদ্ভুত গাইতে পার-জানতাম না ত আমি, ফাটা। আমিও ভাবছিলাম বড় কমল বাবুর গলা আর ভাব-তা ত মরবার নয়-'

'আপনার মোটর সাইকেলটা আছে, চুরি যায়নি।' টিনি বললে।

'কী করে জানলেন আপনি?

'আপনি ত সব ভুলে ঘুমোচ্ছিলেন; সত্যি আশ্চর্য মানুষ-এ যেন মিথিলা পুড়ে গেলেও—আমি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখে এলাম; বাইকটা একেবারে শিশিরে ভিজে আছে—

'সরোজিনীদি মিছেমিছি কাল বাসমতীর লোকেদের দুষছিলেন—'

ফাটা বললে,'আমি জানি ওরা একেবারে ভোর হয়ে গেলে চুরি করবে-তার আগে না।'

তার মানে?

ফাটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, বললে,'কই দেখছি না ত বাইকটা—'সিঁড়ির কাছেই ত রেখেছিলাম।'

'বাঃ রে—' টিনি চা করতে করতে এগিয়ে এসে বললে, 'এই ত আধঘন্টা আগে আমি দেখলাম-বলছেন কি আপনি নীরেনবাবু-'

'দেখলে টিনি-তাহলে ভেতরে এনে রাখলেই পারতে-সরোজিনী বললেন, একেবারে সকালবেলা চুরি গেল।'

'ভাল হল,' ফাটা বললে আমার গান সত্যিই ভাল লাগল আপনার?'

'হ্যাঁ, বেশ গেয়েছ—'

'টিনিদির কেমন লাগল?'

'আমি ভাবছিলাম আপনি বাসমতীতে থাকলে কি রকম ভাল হত। কিন্তু বড় কমল বাবুদের সে সব দিন নেই ত এখন আর। আপনারা কি থাকবেন গরিবদের দেশে?

'ছাতুরা কি জেগেছে?—ক কাপ চা করলে টিনি?'

'তিন কাপ-ওদের চা পরে হবে।'

'ধানরাজের মা কি এসেছে টিনি?'

'হ্যাঁ। তরকারি গরম করছে।'

ফাটা রুটি তরকারি চা খেতে খেতে বললে, 'বাবা আমাকে কিছুতেই গান শেখাতে পারেনি, কোনো তালজ্ঞানই নেই আমার। অনেকে অনেক চেষ্টা করেছে, আমিও সাধ্যসাধনা কম করিনি, কিন্তু কিছুই হল না। আজ ভাবলাম সরোজিনীদি উপাসনা করবেন-আমি গাইবই। লোকে যেমন করে কবিতা পড়ে-মোটামুটি সেই ভাবেই গাইলাম; অন্য সময় হলে নিজের এ বেয়াদবিতে খুব লাগত, কিন্তু আজ তা

হয়নি, ভালই লেগেছে।'

সরোজিনীদি তরকারির থেকে আলু সরিয়ে ডুমুর বেছে নিয়ে খুঁটে খুঁটে খেতে খেতে বললেন,' আমি আগেই ত বলেছি তোমাদের দু-রকম ব্রাহ্মসমাজ আছে। আমরা নিজ ব্রাহ্মসমাজের লোক; সেটা গায়কের কাছ থেকে গলা চায় না- ভাব চায়। যেমন তুমি গাইলে।'

টিনি আলু দিয়ে রুটি খাচ্ছিল, ডুমুর পাতে জড়ো হয়ে উঠছে দেখে রুটির টুকরো দিয়ে খপ করে খানিকটা ডুমুর সাপটে মুখে তুলবার আগে ফাটাকে বললে,' আপনার গান শুনে মনে হচ্ছিল গানে কোনোদিন হাতে খড়ি হয়নি আপনার। আপনি যদি কবিতা পড়ার মত গাইতেন, তাহলে সেটা পাঠ হত, কিন্তু মাঝে মাঝে টান দিচ্ছিলেন আপনি কিন্তু কানে যে বাজে সে প্রশ্ন রইল না আর। প্রাণ ঢেলে দিলেন আপনি। শেষের তিনটে গানে ত খুব। বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজ এই রকম গান চায়।'

'ছাতুবাবুরা জাগল না এখনো?'

'তোমার চা খাওয়া হয়ে গেল?;

'হ্যাঁ চলি-সুকুমারকে দেখে যাই একবার।' ফাটা বললে।

'ছাতুবাবু এই উঠে বসেছে-' ফাটা ফিরে এসে চললে,'সুকুমার ঘুমুচ্ছে এখনো-'

'এখনো?' সরোজিনী চায়ের পেযালা নামিযে রেখে বললেন, 'তাহলে ত বড় বিষম হল। এর একটা বিহিত কর তুমি।'

'আমি বিকেলের দিকে আসব।'

'ও মরফিয়া ইঞ্জেকশন করেছে,' সরোজিনী একটু ভেঙে পড়ে বললেন, আমাব এখানে সিরিঞ্জ ছিল- নিজে সঙ্গে করে মার্ফিয়া এনে ছিল হযত। তুমি এরকম অবস্থায় একটু শিগগির আসবে না?'

'ইনজেকশন করলে করেছে,' ফাটা চাবদিককার ঘাস শিশির মাঠ সিদ্ধার্থের আটচালা কার্তিক ভোরের উঠতি আলোর দিকে তাকিয়ে বললে,'ভাল কবে নাড়ীটাড়ি দেখে এসেছি আমি। এইবারে মরবে না।'

মোটর সাইকেলটা কোথায় গেল কাউকে জিজ্ঞেস করতে গেল না আর ফাটা, সরোজিনী টিনিরও মনে ছিল না যেন বাইকটার কথা, কিছুতেই বললেন না তাঁরা, ফাটা লম্বা লম্বা পা ফেলে 'সুনীতি বৌদি' বলে সিদ্ধার্থের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দু-চার সেকেন্ড থেমে কোনো সাড়াশব্দ না পেযে সিদ্ধার্থ এলে নাকি হে—' বলে একটা সন্ধানী ডাক ছেড়ে সজনে গাছটাব পাশ দিয়ে ঝাউগাছের কিনার দিযে চলে গেল।

সিদ্ধার্থ বেলা দশটার সময় বাড়িতে ফিরে এসে দেখল—যে ডেকচেয়াবে বসে সে একটু জিবিয়ে নেবে ভেবেছিল—সেখানে সুনীতি বসে আছে—রোদের ভেতর। ঘরের ভেতর সব জায়গাযই প্রায ছাযা; পুবের দবজা দিয়ে বেশ খানিকটা বোদ আটটা ন'টার সময় খেলে গেছে ঘবের ভেতব—এখন দু'টো উঁচু উঁচু জাম আর সিসুগাছের মাথায় আটকে গেছে সূর্যটা; ডালপালাব ফাঁক দিয়ে তবুও খানিকটা রোদ এসে পড়েছে সুনীতির ক্যাম্বিসের হেলান চেয়ারটাব ওপরে, চেয়াবটার চারদিকে বেশ খানিকটা গনগনে রোদের আমেজ আরামেব বলয় সৃষ্টি করতে পেরেছে অল্প খানিকটা জায়গা জুড়ে। ঘবের ভেতব বাকি সমস্তটা জাযগায় কেমন ঘোর ছাযা আব শীত। কাল সারারাত জেগেছে, খাযনি কিছু, খুব কাহিল বোধ করছে-সেইজন্যেই শীত বেশি লাগছিল সিদ্ধার্থের। গাযে একটা পাতলা পাঞ্জাবির নীচে আধময়লা জালি গেঞ্জি; গেঞ্জিটা অনেক জাযগাযই ফেঁসে গেছে, পাঞ্জাবিও ঘাড়ের দিকে ছিঁড়ে গেছে, গলার দিকে ফেঁসে গেছে জাযগায় জায়গায়, শীত মানাচ্ছে না। একটু রোদে এসে বসলে হত, কিন্তু সুনীতি বসে আছে-এবারে কার্তিক মাসের প্রথম দিক দিয়েই শীতটা খুব তাড়াতাড়ি পড়ে গেল।

একটা চেয়ার টেনে টেবিলেব কাছে ছাযা শীতের ভেতর বসল সিদ্ধার্থ।

কিংবা বাইরে রোদের ভেতর গিযে দাঁড়ালে হয। কিন্তু দাঁড়াতে পারবে না এখন আর সে, কেমন ঠক ঠক করে কাঁপছে যেন পা। খাটে শুযেও পড়তে পারে, কিন্তু এখুনি শোবে না; জামা কাপড় বদলে, মাথায় জল দিযে হাত পা ধুযে-পরে একসময শুযে পড়তে হবে হয়ত। এখন এক কাপ চা খেয়ে নিলে হয়ত একটু ভাল লাগতে পারে; চাও খাওয়া হয়ে ওঠেনি আজ সকালে।

'একটু চা হবে?

'আমাদের চা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।' সুনীতি বললে।

সূচীপত্রে যান

'আমার হয়নি আজ সকালে—'

'আদিনাথকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি।'

সিদ্ধার্থ বাইরের রোদে গিয়ে দাঁড়াবে ভাবছিল, কিংবা মাঠের ঘাসের এক কিনারে রোদের ভেতর বসে থাকলে হয় গিয়ে-শিশির শুকিয়ে গেছে এখন প্রায়, সিসুগাছের ডালপালার ফাঁকে ছায়ারোদের ভেতর ঘাস ওখানে এখনো খানিকটা ভিজে ও নরম। কিন্তু এদিকে—একটু উত্তর পশ্চিমের দিকে মাটি শক্ত সাদা-রোদে তাতছে-ঘাসগুলো শুকিয়ে গেছে সব; যাবে? বসবে গিয়ে?

কিন্তু কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের ভেতরই বসে রইল সে।

'আদিনাথকে উঠিয়ে দিলে কেন?'

'বারো টাকা মাইনে চাচ্ছে-না হলে সে কাজ কাতে পারবে না—'

'কবে বললে? কাল ত বলেনি আমাকে—'

'কাল রাতে বলেছে। কুমুদিনীবাবু মুনসেফের বাড়িতে কাজ ঠিক করে এসেছে-পনের টাকায়।'

'চলে গেছে?'

'আজ সকালে আসেনি আর।'

'আমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে পারত-চলে যাবার আগে,' সিদ্ধার্থ পাঞ্জাবির বোতাম খুলে ফেলতে বললে,'পনের টাকার কাজ পাচ্ছে-তাহলে বারো টাকায় থাকতে চেয়েছিল কেন আমাদের বাড়িতে? থাকত বারো টাকায়?'

'তুমি দিতে পারতে বারো টাকা?'

সিদ্ধার্থ জামাটা খুলে ফেলে আরো খানিকটা শীতবোধ করে বললে,'রাখলেই হত, তোমার ত হাঁপানি; এই শীতকালে আরো বাড়বে। একটা চাকর ঝি ছাড়া চলবে কি করে?'

শীতের সকালে বেশ রোদে বসে থেকে থেকে সুনীতির শরীরটা আরামে তৃপ্তিতে এই বারে বেশ গরম হয়ে উঠেছে, আরো রোদের ঝাঁজ ভাল লাগছিল না, একটা কপাট আবজে রেখে একটু ছায়া করে নিয়ে বললে,' হিসেবটা তাহলে এইখানেই হয়ে যাক—'

'কীসের হিসেব?'

'কলেজ থেকে তুমি দু'শ টাকা পাচ্ছ ত—আমার হাতে দেড়শ টাকা দেয়া হয় ফি মাসে-এর চেয়ে—

'তুমি ছায়ায় বসলে-রোদে ভাল লাগছে না তোমার—' সিদ্ধার্থ ছাড়া পাঞ্জাবিটা কাঁধের ওপর চড়িয়ে রেখে বললে 'আমি তাহলে একটু রোদে বসি, তোমার ডেক চেয়ারটাকে একটু ঘুরিয়ে বস ছায়ায়; আমি আমার এই বেতের চেয়ারটা—

'রোদে নিয়ে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ—' সিদ্ধার্থ পাঞ্জাবিটা ডান কাঁধ থেকে বাঁ-কাঁধে সরিয়ে রেখে সুনীতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'কার্তিক মাসের আঠারোই বুঝি আজ; কেমন শীত শীত করছে—'

'শীত পড়েছে, 'সুনীতি আবজানো কপাটের ছোট ছোট ছ্যাদার অজস্রতা ঘিরে উড়ন্ত পোকাগুলোকে গুন গুন করতে দেখে সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'এ শীতটা কী করে কাটানো যায় তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত। একটাও গরম সেমিজ নেই আমার।'

'তুমি এদিকে এসে বস যদি একটু তাহলে আমি রোদের ভেতর বেতের চেয়ারটা সরিয়ে নিতে পারি।'

'ছায়ায় গিয়ে বসব আমি?' সুনীতি সিদ্ধার্থের স্বার্থপরতার চেহারার দিকে যেন তাকিয়ে নিজেকে নিজের শরীরটাকে একটা নিঃস্বার্থ শিকারের মত বোধ করে বললে,'শীত লাগবে না আমার?'

'ছায়ায়ই ত বসে আছ তুমি,' সিদ্ধার্থ টেবিলের ওপর কয়েকটা চিঠির দিকে তাকিয়ে (চিঠিগুলো ছেঁড়া হয়নি এখনো) বললে, 'কপট আবজে রোদ আটকে রাখলে তুমি, ভাবলাম রোদের দরকার নেই তোমার। রোদে বসবে?'

সুনীতির কাশি উঠল; বেশ কাশি; কথা বলতে পারা যায় না। দম আটকে আসে, নাক-চোখ, ঠোঁট-মুখের দু-চারটে আঁচিল তিলও ঠিকরে ঠিকরে উঠে-কি যেন বলতে চাচ্ছিল সিদ্ধার্থকে, সমুদ্রের জল ফেনা রৌদ্র ঝাঁজের ঘূর্ণির মতন।

'থাক, থাক, বলতে হবে না কিছু, বলতে চেষ্টা কোর না,' সিদ্ধার্থ কর্তব্যের খাতিরে কথা বলতে বলতে খানিকটা মমতাপন্ন হয়ে বললে,'বুঝেছি আমি; রোদের ভেতর বসা দরকার তোমার। বোসো, বোসো। কথা থাক এখন, কেন চেষ্টা করছ কথা বলতে; কাশিটা কিসে পড়ে যায় দেখ-একটু পিঠে হাত বুলিয়ে দেব?'

সুনীতি ডান হাতটা বাড়িয়ে পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশেষ জানিয়ে ইশারার ভাষায় বললে' পিঠে হাত বুলিযে দিতে হবে না—।'

'সেই ধোঁযাটা টানবে?'

'না।'

'এফিড্রিন দেব?'

তক্ষুণি কোনো জবাব এল না। সুনীতি ঘাড় গুঁজে আছে, প্রতীকের মত তার মাথাটা: সিদ্ধার্থের ওপর নিতান্তই যদি সুনীতি রাগ না কবে থাকে, কিংবা আগের দিকে রাগ করলেও শেষেব দিকে সিদ্ধার্থেব কথাবার্তা একটু দায়িত্ব মমতার আঁচ পেযে ক্ষমা কবে থাকে তাহলে সিদ্ধার্থের প্রশ্নের উত্তরে সুনীতির মাথা পাপড়ির ওপরে ঘুমকাতুরে প্রজাপতির মত আস্তে একটু নড়বে;-কি ভাবে নড়েছে-কী তার অর্থ—সেটা বাইরের কেউ ধরতে না পারলেও সিদ্ধার্থ ধবে ফেলতে পারবে। সুনীতিব নাড়ীনক্ষত্র বুঝতে পারে সে-তাবই স্রষ্টা যেন কোনো এক ঐশী পুরুষের মত; কিন্তু তবুও সুনীতিব স্রষ্টা সিদ্ধার্থ নয-প্রকৃতি, হিতেন বাবু গগন বাবুরা হযত বলবেন ঈশ্বর; কিন্তু হিতেন বাবুদের ঈশ্বেবর তৈরি এই স্ত্রীলোকটিকে চিনতে পারলেও নিজের জীবনে তাকে কোথে কে কিভাবে জড়িত করে কোথায় চলেছে তারা-এ জিজ্ঞাসা অর্থ বা সমাজনীতির চেয়ে বিষম প্রশ্ন; বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়েছে, জ্ঞান চেষ্টা করে দেখছে-জ্ঞানের পদ্ধতি অনেকখানি অনুপ্রেরণা ও ভাবনা প্রতিভার ওপর নির্ভর করে বলে। সুনীতি মাথা নেড়েছে। এফিড্রিন চায না সে। ডাক্তার ঘোষকে ডাকি তাহলে?' ঘবের ছাযা ঠান্ডায কার্তিক মাস নিজেকে টের পাইযে পাইযে এখন উঠতি সূর্যের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিল প্রায়, তবুও একটু নাড়ীর শীতে কেঁপে উঠে সিদ্ধার্থ বললে। কে ঘোষ? কোন ঘোষের কথা বলছ তুমি-' হাঁপ সামলাতে সামলাতে সুনীতি বললে।

'আনন্দ ঘোষ—হুপিং কাফ, হাঁফানি ব্রংকাইটিসের স্পেশালিস্ট তিনি—'

'ও-আমি ভাবলাম মহেন্দ্র ঘোষেব কথা বলছ নাকি তুমি—'

'না, তিনি বোধহয় এখন নেই বাসমতীতে।'

'কোথায় গেছেন তিনি? কলকাতায়?'

'না- কলকাতায যান টান না। তবে শুনেছিলাম মৈমনসিং গিয়েছেন-ওখানকার কোন এক জমিদার বাড়ি চিকিৎসায় ডাক পড়েছে—'

'ও—' সুনীতি বললে, কাশির ধকলটা কমে আসছিল তাব; মহেন্দ্র ঘোষের বাইরে খুব নাম ডাক আছে দেখছি। কোথায বা মৈমনসিং-ঐ অতদূব থেকে ডেকে নিয়ে গেল বুঝি তারা।'

'মহেন্দ্রবাবু ত বেশ বড় ডাক্তার।'

'শ্রীময়ী ফিরেছে বাসমতীতে?'

'না।'

'কেন?'

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর কতকগুলো চিঠি এসে বযেছে; কাল বিকেলেব ডাকে এসেছে বোধহয় চিঠিগুলো-সন্ধের সময় বিলি করে গেছে হযত পিওন; চিঠিগুলো না ছিঁড়ে উল্টেপাল্টে নেড়ে চেড়ে সরিয়ে রেখে দিল সে। সিসুগাছের মাথা ছাড়িয়ে আরো ওপরে উঠেছে সূর্য, মুখোমুখি দু'টো জানালার ভেতব দিযেই অনেকখানি বোদ টেবিলের ওপর এসে পড়েছে; নিজে সেখানে সে বসেছিল-বা ঘরের অন্য কোনো দিকে রোদ নেই যদিও -তবুও শীতের ভাবটাও নেই। গেঞ্জিটা খুলে ফেলল সে: গেঞ্জি পাঞ্জাবি ঘরের ভেতর এক দিককার একটা টানানো তারে ঝুলিযে রেখে এসে চেয়ারটা টেনে ধুতির খুট গাযে জড়িয়ে বসে পড়ে বললে,'কী জিজ্ঞেস করছিলে তুমি?'

'শ্রীময়ী ফিরছে না কেন বাসমতীতে?'

'ও—সেই কথা—সিদ্ধার্থ আবার উঠে গেল; একটা শার্ট আঁটতে আঁটতে বললে,'মহেন্দ্রবাবুকে ভাল লাগে না তাঁর-সেই জন্যেই আসে না।'

সূচীপত্রে যান

'কেন, মহেন্দ্রবাবুর ত অনেক টাকা আছে।'

'টাকা সব নয়।' সিদ্ধার্থ শার্টের বাঁ হাতের ঝিনুকের বোতামটা আটকাতে আটকাতে বললে।

'সকলের কাছে সব নয়।' বোতামটা আটকে ফেলে জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ বললে।

'কোথাও যাচ্ছ নাকি তুমি?'

'না।'

'শার্ট পরলে যে?'

কেমন একটু শীত করছে॥

'শ্রীমযী তাহলে বাসমতীতেই ফিরবেই না? মহেন্দ্র ডাক্তারের চেহারা ত শ্রীমযীর চেযে খাবাপ নয়—'

'না—না—শ্রীমতীর চেহারা ঢের ভাল'।' সিদ্ধার্থ বললে, 'কিন্তু চেহারা দিয়ে কি হবে—' কি যেন বলতে যাচ্ছিল সিদ্ধার্থ; কিন্তু থেমে গিযে টেবিলেব চিঠিগুলোব দিকে একবাব চোখ ঘুরিয়ে নিযে বললে, মহেন্দ্রবাবুর চেহারা ঠিকই আছে, মহেন্দ্রবাবুর চেহারা খারাপ ত নয়। তবে—শ্রীমতীর মত অতটা ভাল নয়। কি হবে মানুষের চেহারা দিয়ে? সুস্থ সবল লম্বা মানুষ, মহেন্দ্রবাবু—'

শার্ট গায়ে দিযে দাঁড়িয়েই ছিল সিদ্ধার্থ, চোখ যেন কি একটা জিনিসের কিনারা মাপছে-বাইরেব দিকে একটু চিন্তিত চোখে তাকিযে থেকে আকাশ মাঠ গাছপালাব বদলে ভেতরের পৃথিবীটাকে দেখছিল সে, কি যেন একটা পৃথিবীব অনেকবার মীমাংসিত ব্যাপারেব সিদ্ধান্ত করতে গিযে অন্য কোন নতুন আলো পাওয়া যায় কিনা খোঁজাখুঁজি করছিল।

'বেশ লম্বা চওড়া মানুষ মহেন্দ্রবাবু। গাযের বং কালো বটে, নাকের ফোকা দু'টো বেশ বড় হলেও নাক বেশ উঁচু—'

'মানে অনেকখানি মাংস আছে নাকে।'

'তুমি অত সব আবাব দেখেছ নাকি-সুনীতির দিকে একবাব তাকিযে নিযে সিদ্ধার্থ বললে,'আমি স্ত্রীলোক হলে মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে বেশ সুখী হতাম—'

'অনেক টাকা আছে ত তার।'

'টাকার কথা নয় মানুষেব কথা।'

সুনীতি আবজানো কপাটটা খুলে ফেলে আস্তে আস্তে বললে, 'অস্বাভাবিক সব কথা তোমার; তুমি যদি স্ত্রীলোক হতে, তাহলে মহেন্দ্রবাবুকে নিযে খুশি হতে। এ কিরকম কথা।'

চেযাবটা টেনে বসল সিদ্ধার্থ; টেবিলের চিঠিগুলো কুড়িয়ে এনে হাতের কাছে রাখল, দু'টো চিঠিই এসেছে কলকাতাব ইনসিওরেন্স কোম্পানির থেকে-একটা বিলিতি কোম্পানি, বিশ বছব আগে সেখানে ইনসিওবেন্স কবিযেছিল সে—আব একটা দিশি কোম্পানি-বছর আষ্টেক আগে কুড়ি বছরেব মেযাদে একটা পলিসি নিযেছিল। কী লিখেছে এবা? কোযার্টাবলি প্রিমিযাম দেবার মোটামুটি তাবিখ সিদ্ধার্থকে জানিযে দেবার দাযে এবা যেমন লেখে, আজও তেমনি লিখেছে। না ছিঁড়ে চিঠিদু'টো সরিযে রাখল সিদ্ধার্থ। আরো চিঠি আছে টেবিলেবি ওপর, সবই খাম। কুড়ি পঁচিশ দিনের ভেতবেও একখানা চিঠি আসে না-পোস্ট অফিসেব সঙ্গে এই বকমই সম্পর্ক তার। কিন্তু কাল বিকেলে এতগুলি চিঠি এল।

'তোমার ত খুব কাশি বেড়ে গেল- টানের মতন হল দেখছি-ইনজেকশনের কথা বলছিলাম—'

'না, লাগবে না। ওটা ত আমার গৃহিণী রোগ; একদিনের ইনজেকশনে কি হবে। আনন্দ ঘোষকে চারটে টাকা গচ্চা দিতে হবে-এই ত।'

'তা দরকার হলে টাকা দেব—' সিদ্ধার্থ বিলিতি ইনসিওরেন্স কোম্পানির চিঠিটা কুড়িয়ে নিযে ছিঁড়ে দেখল দু'হাজার টাকার পলিসি নিযেছিল বিশ বছর আগে-পঁচিশ বছবের মেযাদে; বছব দুই আগে পলিসি বাঁধা দিযে হাজার খানেক টাকা ধাব করেছিল কোম্পানির কাছে; ছ'মাস অন্তর বত্রিশ টাকা করে সুদ দিযে আসছে; চিঠি খুলে দেখল এবাবেও সুদের আসলে মিলিযে প্রায ষাট টাকা দিতে হবে। আর দিশি কোম্পানিটাকে কত দিতে হবে? ওখানে ও ত পলিসি বাঁধা দিযে শ পাঁচেক টাকা ধার নিযেছিল ত গত বছর; ওটারও ষান্মাসিক সুদের সময হযেছে, অঙ্কটা কত? কিন্তু দেখবার জন্যে এখুনি কোনো তাগিদ বোধ করল না সিদ্ধার্থ; একশ টাকা সুদ আর প্রিমিযাম দিতে হবে এই মাসে-কিংবা সামনের মাসে। এই মাসের টাকা ত খরচ হয়ে গেছে সব-সামনের মাসের মাইনের থেকে আধাআধি আগাম নিযে এসেছে; কলেজ কো-

অপারিটিতে আড়াই হাজার টাকা ধার, প্রভিডেন্ট ফান্ডে যেটুকু টাকা না থাকলে নয় সেই নামমাত্র টাকাটা আছে-বাকি সব কর্জ করে কবে ফুকে দিয়েছে। মদ খায় না-সিনেমা দেখে না-কোনোরকম বদ খেয়াল নেই—চার পাঁচ বছর হল বই কেনা ছেড়ে দিয়েছে-বাসমতী ছাড়া স্ত্রী পরিবার নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবার সঙ্গতি নেই, যায়ও নি সে কোথাও-এক আধবার কলকাতায় ঘুরে এসেছে।

টাকাকড়ির কেমন একা পাপচক্রের ভেতরে পড়ে গেছে সে; একশ পঁচাত্তর টাকা মাইনে ত. তার-পঁচিশ টাকা ডি এ; কিন্তু নানাদিকের দেনা ও সুদে একশ দশ পনেরর বেশি কলেজ থেকে কোনো মাসেই আনতে পারে না, পঞ্চাশ ষাট টাকা আবার নতুন করে ফি মাসেই ধার করতে হয় কলেজের কোনো না কোনো ফান্ডের থেকে। কিন্তু সে সব ফান্ডেরই ঋণ দেবার একটা নির্ধারিত পরিমাণ ঠিক করা আছে-প্রফেসরদের মাইনের সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে, নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি ঋণ দেয়া হয় না কাউকেই কখনো। সিদ্ধার্থ সব ফান্ডের থেকেই বোধহয় উর্ধ্বতন পরিমাণ ধার করে ফেলেছে; সামনের মাসে কোনো ফান্ড থেকেই ধার নেয়া চলবে না বুঝি আর। তাহলে একশ দশ টাকায সংসার চালাতে হবে সামনের মাস-ইনসিওরেন্স কোম্পানি দু'টোকে দিতে হবে একশ টাকা।

দশ টাকায় সংসার চালাতে হবে? মোটের ওপর দু'টো ইনসিওরেন্স করেছিল সে-সাড়ে তিন হাজার টাকার। দু'টো পলিসিই ল্যাপস করাবে সে,-এ ছাড়া কোনো পথ নেই তার।

কিন্তু বড় বেশি টাকাকড়ির কথা ভাবছে সে। যদি না ভাবতে যাওয়া যায় তাহলে সিসুগাছের ডালে শালিকগুলো পরস্পরকে তাড়া করে যে কি ভীষণ ঠোকাঠুকি করছে তা দেখেও একটা নিস্তার বোধ কবতে পারা যায়; কি-রকম আশ্চর্যভাবে নির্দোষ এই পাখিগুলো মানুষের ইতিহাসের পটভূমিকার তুলনায়; কেমন তিনি ত্রিরাখে নয়ের মতন লাফাচ্ছে সিসুগাছের কচি মিহি মোটা ডালপালার ভেতর, রয়ানী মাঠের সেই দু'টো ষাঁড়ের মত মাথা নিচু কবে গভীর শযতানের মত খিঁচে ছুটেছে একটা পাখি আব একটা পাখিকে নিকেশ করে ফেলবার জন্যে? কী নিযে এত আক্রোশ তাদের? কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কাউকে মারে না, একটা আধটা পালক খসিযে শেষ হযে যায ব্যাপারটা, মিল মিশ হযে যায। প্রথম হেমন্তেব উঁচু উঁচু গাছেব ঝরঝরে রোদে এরাই মানুষের সহজ সরস কল্পনা, সাধের এক একটা স্ফুলিঙ্গ।

কিন্তু তবুও মানুষ অনুভূতিময নয শুধু-চিন্তিতও—কোনো কোনো জাযগায় আশ্চর্য বকমে সুচিন্তিত-। সে সব দিকের প্রায পূর্ণ অভিজ্ঞতা রযেছে বলে কোনো কোনো মানুষ সবচেযে বেশি ব্যথা বেদনা বিজ্ঞানী হতে পেরেছে সৃষ্টির ভেতব।

এই সব দিক দিযে পাখিদের চেযে মানুষ বড়। কিন্তু সব দিক দিয়ে নয; সব মানুষ নয।

'আনন্দ ঘোষকে ডেকে নিযে আসি।'

'না। সে চাবটে টাকা বরং আমাকে দাও।'

'তোমাকে দেব? সিদ্ধার্থ সুনীতিব দিকে তাকিযে বললে,'তাহলে ত তোমাব -হাঁপানিব কোনো উপশম হবে না। '

'আনন্দ এসে আমাকে অ্যাড্রিনেলিন দিযে এক আধ দিন একটু চাপাটাপা দিযে যাবে-কিন্তু আবাব ত চাগিযে উঠবে। তখন কিছু করতে পারবে আনন্দ আবাব অ্যাড্রিনেলিন ছাড়া?'

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়িযে বললে,'সে বকম কোনো ওষুধ নেই হাঁপানিব।'

'তোমাকে কি চিঠি লিখল?' টেবিলেব চিঠিগুলোব দিকে চোখ ইশারা করে সুনীতি বললে।

'ইনসিওরেন্স কোম্পানির চিঠি।'

'প্রিমিযাম দিতে হবে বুঝি এ মাসে?

'হ্যাঁ,' সিদ্ধার্থ পাযচারি করতে করতে বললে,'সামনেব মাসে দিলেও হয।'

'কত টাকা?'

'বরাবর যা দিচ্ছি।'

'দু'টো মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার পলিসি ত?

সিদ্ধার্থ পেছনে হাত বেঁধে একটু কুঁজো হযে ঘরের ভেতর আস্তে আস্তে পাযচারি করছিল-অনেকটা ফাটার মতই; এটা বোধহয বাসমতী সমাজের বয়স্ক ছেলেদের কেমন একটা সংস্কারগত অভ্যাস-কারো সঙ্গে কারো রক্তের বা মনের কোনোরকম মিল না থাকলেও। কিছুই ছিল না মিল ফাটা আর সিদ্ধার্থের।

'হ্যাঁ, সাড়ে তিন হাজারে।' সিদ্ধার্থ বললে।

'বোনাস ফান্ড ফান্ড মিলিয়ে হাজার পাঁচেক টাকা হবে?'

'ওরা ভালই বোনাস দিচ্ছে অনেক দিন থেকে,' সিদ্ধার্থ টেবিলের একটা কিনার ধরে দাঁড়িয়ে বললে,' তবে আজকাল সব ব্যবসায়েরই সময়টা খারাপ যাচ্ছে, বোনাস আগের মতন দিতে পারছে না তাই। তবে হ্যাঁ-মেরে কেটে পাঁচ হাজার ত হবেই।'

এক হাজার টাকা ধার নিয়েছিল যে সানলাইফের থেকে বছর দুই আগে সেটা সুনীতিকে জানায়নি সিদ্ধার্থ। পাঁচশো টাকা ধার নিতে হয়েছে যে হিন্দুস্থানের থেকে গত বছর তাও জানে না সুনীতি। কি হবে এসব জানিয়ে? হাঁপানির টানে এ্যান্টিনেলিনের কাজ করবে না। এমনিই টাকাকড়ির অভাব খুব কাতরে আছে সুনীতির মন-এত বেশি যে কিছু কাল ধরে ঠিক ভাবে ভজিয়ে উচিত মত ব্যবস্থা করে দিলে টাকাঅলা মহেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বসবাস করতে হয়ত রাজি করানো যেতে পারে সুনীতিকে।

হাঁপানির টানে সুনীতির বুক কোক উঠছিল পড়ছিল, ঘবের ভেতর পাযচারি করছিল সিদ্ধার্থ-ময়লা ধুতি ও ধোপা বাড়িব শার্ট গায়ে দিযে; ধুতিটা খুবই ময়লা—

কোনো হিসেবেই-কোনো ক্রমেই মোটেই মানাচ্ছিল না;— জিনিসটা নিজের চোখে পড়েনি সিদ্ধার্থেব। সিদ্ধার্থ চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছিল একবাব; কিন্তু উপায নেই-কে কেচে দেবে? কোনো লোক নেই, সাবান নেই—

'মোটমাট পাঁচ হাজার টাকা বলছ তুমি? এই সব?

'হ্যাঁ-দু'টো ত করেছি। প্রফিট টফিট মিলিযে পাঁচ হাজাব আন্দাজ দাঁড়াবে গিযে।'

'ইনসিওরেন্সের টাকা আমাদের ভাগে খুব কম পড়ে গেল।'

'নেই। ভেবে দেখেছি আমি,' সিদ্ধার্থ ঘাড় গুঁজে হাঁটছিল, ঘাড় তুলে সুনীতির দিকে তাকিয়ে বললে,'আমি মবে গেলে তোমরা মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পাবে। আজকালকার দিনে টাকার দাম যা তাতে পাঁচ হাজাব টাকা কিছু নয়। কিন্তু এর চেয়ে বেশি ইনসিওবেন্স করতে পারলাম না।'

'এবকম কথা বলা হল কেন আবার?'

'না, আমি যদি মরে যাই-সেই কথা বলছিলাম—'

'তোমাব দেরাজে আমার এফিড্রিনের শিশিটা আছে—'

'চাই? বড়ি খাবে একটা?'

'হ্যাঁ, বেশি হাঁপ উঠেছে, না খেলে হবে না। তোমাব টেবিলেব কিনারে কুজো গেলাস আছে-খানিকটা জল দাও ত আমাকে।'

সুনীতি এফিড্রিনেব শিশি হাতে তুলে নিযে বললে,'আমি বলছি তুমি হাজাব পনের কর।'

ওষুধেব শিশিব গাযে কী লেখা ছিল পড়ে দেখছিল সুনীতি; কিছুটা পড়ে সিদ্ধার্থেব দিকে বাড়িয়ে বললে,'হ্যাঁ। না হলে কি দিযে কী হবে আমাদেব -আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

সিদ্ধার্থ কুজোর থেকে জল ঢালছিল, বললে 'এখনই পনের হাজার টাকা ইনসিওরেন্স করতে পাবছি না। তবে একটা ব্যবস্থা তোমাদের জন্যে করে যাব আমি। তুমি হযত ভাবছ আমি শিগগিরই মবে যাব। তুমি ত খুব স্বপ্নে টপ্নে বিশ্বাস কর; কী স্বপ্ন দেখলে আজকাল; অনেক দিন জিজ্ঞেস করিনি। দেখেছ নাকি তেমন কিছু?'

সিদ্ধার্থের হাত থেকে জলের গেলাসটা তুলে নিযে সুনীতি বললে,'প্রভিডেন্ট ফান্ড কত জমেছে?'

'প্রায় হাজাব সাতেক হবে।'

'প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে আগে আগে মাসে মাসে টাকা ধাব টার আনতে শুনতাম—'

'ও—সে অনেক আগের কথা—' একট চুরুট জ্বালিযে নেবে নাকি ভাবতে ভাবতে সিদ্ধার্থ বললে,'যা টাকা ধার নিয়েছিলাম সে সব পুরিয়ে রেখেছি আবাব। এখন আর কোনো ধারধোর নেই।'

জলের গেলাসটা মুখের কাছে এনে সুনীতি বললে, 'মোটমাট বারো হাজাব টাকা তাহলে। ত্রিশ হাজার টাকা হলেই ঠিক হত।' একটু জল চুমুক দিযে এফ্রিডিনের বড়িটা গলার ভেতর ঠেলে দিল সুনীতি।

আজই সে মরে যেতে পারে-কিংবা কালও মরে যেতে পারে সিদ্ধার্থ; মরে গেলে ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো ধার টার কেটে তার ওয়ারিশকে ছ'হাজার টাকাও দেবে কিনা সন্দেহ, কে বা সেই পুরুষমানুষ যে সুনীতির হয়ে খুব চটাপট তত্ত্বতালাশ হযে টাকাটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে এই

স্ত্রীলোকটির হাতে; সিদ্ধার্থের শালাও নেই, শ্বশুরও নেই; সনীতির দেওর আছে এজন্য কিন্তু দূরে থাকে, নানা কাজ কর্ম নিয়ে জড়িত। প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাজার খানেক টাকা আছে-বাকি সব ধার করে খেয়ে ফেলেছে সিদ্ধার্থরা। সে মরে গেলে সব মিলিয়ে এই তিন হাজার টাকা পাবার কথা সুনীতির-কতদিন লাগবে পেতে-বলা কঠিন। কিন্তু সুনীতিকে বারো হাজার টাকার বুঝ দিয়েছে সিদ্ধার্থ। মন মানেনি, ত্রিশ হাজার টাকা চাচ্ছে সুনীতি। জিনিসটাকে উড়িয়ে দিলেও পারে সিদ্ধার্থ। সে যা দিতে পারে-তার চেয়ে বেশি কি করে দেবে সুনীতিকে। কিন্তু ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়া উচিত সুনীতিকে। এ রকম লুকোচুরি করে লাভ কি। সে মরে গেলে লুকোচুরিটা ধরা পড়ে যাবে-ঠিক। কিন্তু কী হবে তাতে? সে ত নেই তখন।

এ রকম অব্যাহতিবাদে অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস নেই তার । জীবনবেদ তার অন্য রকম। কিন্তু বাস্তবে ফলাতে পারছে না সেটাকে। চুয়াল্লিশ বছর বয়স হল।

লাইফ ইনসিওরেন্সে সুনীতির যত প্রাপ্য, প্রভিডেন্ট ফান্ডে কত টাকা আছে-কলেজ কো-আপারেটিভেই বা কত ধার কিছুই জানানো হল না সুনীতিকে।

আজই জানিয়ে দেবে এই অদম্য সংকল্প নিয়ে আজ বেলা দশটায় বাসায় ফিবে ছিল সে। কিন্তু হল না। সানলাইফ অব ক্যানেডার চিঠিটা হাতে তুলে মুড়ে মুচড়ে ফেলল সিদ্ধার্থ, পকেটে ফেলে রাখল, বাকি চিঠিটাও। সুনীতি যে চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলেনি-অব্যাহতির পথেই সুনীতি নিজের অজ্ঞাতসারে সিদ্ধার্থকে চলতে শিখিয়েছে। এই স্ত্রীলোকটির সম্পর্কে এই পথেই কি বারবার চলতে হবে তাকে? বিয়ে মানেই সর্বদাই ভালোবাসার একটা কিছু ব্যাপার নয়, ভালোবাসা হলেও স্ত্রীকে সব সময়ই সত্য কথা বলা কঠিন প্রধানত টাকাকড়িব ব্যাপারে, বিশেষত টাকা জমানোর চেয়ে ধার করাই। যেখানে স্বামীর প্রধান গুণ হয়ে দাঁড়াল। ওতে ভালোবাসার বিষয়ও টেঁসে যেতে চায়-আজকাল বাংলাদেশেও-বিশেষ করে কলকাতার লিগ্যাল সেপারেশন বেড়ে যাচ্ছে স্বামী অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে মজে গেছে বলে ততটা ঠিক নয়, কিন্তু স্বামীর টাকার জোর কমে গেছে বলে কিংবা নিজের স্ত্রীকেই ষোলো আনা ভাগ দেয়া হচ্ছে না বলে। তাই নয়? 'তুমি ত চুরুট খেতে না।'

'না খেতাম না।'

'চুরুট কোথায় পেলে তুমি?'

'এই দেরাজের ভেতরে ছিল।' সিদ্ধার্থ খুব সম্ভব ভাল কথা ভাবছে না। এতক্ষণ যা ভাবছিল। ভাল কাজ করছে না-অনুভব করে। চুরুটটা টেবিলের ওপর রেখে দিল। চুরুটেব পাশেই দেশলাইটা খুঁজে বাব করে রেখে দিয়েছে।

'বড়ি খেয়ে কেমন বোধ করছ?'

'এটায় তাড়াতাড়ি কাজ হবে মনে হচ্ছে, ওষুধটা পার্ক ডেভিসেব।'

'পার্ক ডেভিসে? কে কিনে দিল?'

'সুকুমার।'

'ও-সুকুমার।' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে ঘরেব একটা গবান কাঠেব খুঁটির কিনাবে মূলিবাঁশের বেড়া ঘেঁষে মাকড়সার জালটা বেশ জায়গা জুড়ে জমিয়ে বসেছিল সেটা ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়ে সুতোর মত ফিনফিনিয়ে কয়েকটা মাকড়সা জীবনের স্বাদে নিঝঝুম হয়ে আছে টের পেয়ে হাতটা সরিয়ে নিল। 'সুকুমার কলকাতার থেকে এনে দিয়েছিল?'

'না, এখানে পেয়েছে।'

'বাসমতীতে পার্ক ডেভিসের এফিড্রিন। এখানে ত কোনো বিলিতি ওষুধই পাওয়া যায় না। তবে—'

চোরাবাজারে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে কথা উল্লেখ করতে গেল না সিদ্ধার্থ; কিছু বলে না সুনীতি; সে ঘাড় গুঁজে নিজের ল্যাংসের ব্যাপারের দিকে নিবিষ্ট হয়ে আছে মনে হচ্ছিল তার দিকে তাকিয়ে-কিন্তু এরকম ভাবেই মাথা কাত করে মেঝের দিকে চোখ রেখে নি:শ্বাসের ওঠাপড়ার ভেতর দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের কথা ভেবে নেয় এই মেয়েলোকটি জানা আছে সিদ্ধার্থের।

'চোরাবাজারে কেনে নি সুকুমার।' সুনীতি বললে। হাতের শিশিরটার লেবেলেব লেখাগুলোর দিকে চোখ মেলে সুনীতি বললে,'যা দাম-সেই দামেই এনে দিয়েছে।'

'এক আধটা ফাইল ছিল হয়ত।'

সূচীপত্রে যান

'চুরুট কোথায় পেলে তুমি?'

'আমি কিনেছি এক বাক্সে।'

'খাচ্ছ নাকি আজকাল?'

'একটু আধটু আবম্ভ করেছি আবার।' সিদ্ধার্থ মাটিব মেঝের ড্যাম্পে পা কালিয়ে এসেছে টের পেয়ে বছর দেড়েকের পুরনো নিউ কাটটায় এখনো কিছু পদার্থ আছে বোধ করে জুতো জোড়ার ভেতর পা ঢুকিয়ে দিতে দিতে বললে, 'বিয়ের আগে এক সময় সিগারেট চুরুট নেহাত কম খেতাম না। অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছিলাম তারপর। আবার দেখছি।'

সুনীতি বললে— 'আমার সামনে খাবে না। খাওয়া ভাল কি মন্দ সে নিয়ে সরোজিনী পিসির মত ভিটকেলেমি নেই, হাঁপানিব মানুষ ত।

'শোনো—'

সিদ্ধার্থ নেমে দাঁড়ালে, সিদ্ধার্থ বললে,'সেই দেড়শো টাকাব হিসেবটার—তুমি দু'শো টাকা মাইনে পাচ্ছ–দেড়শো দিচ্ছ আমাকে সংসার চালাতে—পঞ্চাশ নিজে রেখে দিচ্ছ–কি করে দেড়শো টাকায় সব চালাতে পারি আমি? চালের মণ কুড়ি বাইশ টাকার নীচে ত নামছেই না, মাঝে মাঝে ত্রিশ চল্লিশে ওঠে, এক টাকায় দেড়সের দুধ।'

'টেবিলেব থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থ বললে 'ওসব বাতে মুসাবিদা করে ঠিক করা যাবে। তখন তোমার হাঁপানির টানও পড়ে যাবে একেবাবে। খেয়েদেয়ে ঠান্ডা হয়ে হিসেবপত্র নিয়ে বসা যাবে—'

'আজ ত মাসেব বিশ তাবিখ? আমার দেড়শো টাকা ফুরিয়ে গেছে।'

'ফুরিয়ে গেছে?' চুরুটটা জ্বালানো হয় নি–টেবিলেব ওপব রেখে দিল সিদ্ধার্থ। হাঁটছিল, একেবারে থেমে গেল। টেবিলের একটা কিনাবে হাত রেখে বললে 'এত টাকা কি করে খবচ হয়ে গেল? তোমাব ত শুধু খাওযাদাওযা চাকর বাকবের দিকটা দেখতে হয়, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, বাড়ির খাজনা, লাইফ ইনসিওরেন্স, ইনকাম ট্যাক্স, খবরের কাগজেব দাম–কুড়োনির মাইনে, দপ্তবিব মাইনে–পাঁচরকম হাত খবচের ব্যাপার সমস্তই ত আমায দেখতে হয।'

'তুমিই সব চালিও—' সুনীতি বললে, 'সবটাই। মিছেমিছি আমাকে দেড়শো টাকা গছিয়ে ভাঁওতা দিয়ে লাভ কি।'

'তোমার সব কথায চলে আসে টাকাকড়িব চোবাবালিতে ঠেকে যায—

জীবনেব বৃহত্তর ভেদ করে যেখানে টাকাব অঙ্ক এত কম সেখানে সম্ভব ভালোবাসাই শুধু এলে বক্ষা কবতে পারে স্বামীকে ও স্ত্রীকে। কিন্তু টাকা এত বাস্তব বলেই শুধু নয–তাছাড়াও ভালোবাসা ত এক অব্যয় জিনিস। কাকে ভালোবাসে সিদ্ধার্থ? কযেকটা দিন যে আবেদনকে বিয়ের পব প্রথম প্রথম একমাত্র উৎসব মনে হয়েছিল বোঝা গেল যে তা মৃত্তিকাগভীব; মৃত্তিকাগভীরতার একটা মূল্য আছে,কিন্তু সুনীতির শরীব নানারকম পৈতৃক রোগে (হাঁপানীও তাব ভেতরে একটা) অল্প দিনের ভেতবেই ভেঙে চুপসে গিয়ে সেই মদিরতার স্বাদও খুব তাড়াতাড়ি গাদিয়ে দিয়েছিল সিদ্ধার্থের জীবনে। পচা শরীর যাকে ধারণ করে সে আধেয় অনেক সময খুব উচ্ছল হয়, কিন্তু এব বেলা তা হযনি, আরো খাবাপ হল তাতে, কোনো আশ্রযই পাওযা গেল না কোনো দিক দিয়ে তাই। অথচ সমাজের নির্দেশে বিবাহিত হয়ে নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কার কাছে মদিরতা খুঁজতে যাবে সে কিংবা আনন্দ? এ দু'টো জিনিস চাই তার; এ না হলে সময অসমযের পরিপূরক নয়, জীবন সেই; কিন্তু গত পনের বছর ধরে এ জিনিস পাচ্ছে না–সুনীতির কাছ থেকে পাচ্ছে না।

এ দু'টো জিনিস চাই তার? চাই–ই বুঝি? সিদ্ধার্থের হাসি পেল। এতদিনেব ভাবনা চিন্তা মন্থন করে জীবনে তার দু'টি দু–মুখো সিদ্ধার্থে জেগে উঠেছে; এরকম আবিষ্কারের অস্থির তাড়নায তত নয–কিন্তু শুদ্ধভাবে কেবলি সত্য লাভের ফলে নিজেকে নিজেকে জ্ঞানী মনে কবতে চায, আবেক জন সিদ্ধার্থের মনের আর একটা দিক–মানুষের জীবনে অত বেশি আগ্রহ ও আন্তরিকতা যে ফুলে ওঠে স্তনিত নক্ষত্রলোক বৃষ্টি করতে পারে না রঙ বেরঙের বেলুন ফাঁপিয়ে তোলে সেই খাপছাড়া করুণ সুনীতির দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয মানুষের–সৃষ্টি ও সমাজের অন্ধকারে নির্গুণ গহবরের ভেতরে দুর্বল নিঃসহায় মানুষেব। সমাজকে ভাল করা যেতে পারে হয়ত। অনেক কালের সাধনার দরকার। কিন্তু সৃষ্টিকে কে ঠিক করবে?

'কত টাকা চাই তোমার মাসে?'

'আমার দু'শো টাকার কমে হবে না।'

'দু'শো টাকা ত আমার মাইনে।'

'আজকাল টুইশন ত করছ।'

'দু'টো নিয়েছিলাম-কিন্তু ছেড়ে দিতে হয়েছে—'

'ছেড়ে দিলে টুইশন? কেন?'

'যা ইংরেজি লেখে বি এ এমনি পাশ করতে পারবে না, অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দিতে চায়, পরীক্ষার ত আর চার পাঁচ মাস বাকি।' সিদ্ধার্থ টেবিল থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে বললে,' আর একটি ছেলে ইকনমিকস্-এ কিছু না, ইংরেজিতে আরো খারাপ, কিন্তু ইংরেজি পড়াতে বসলেই ইকনমিকস্ টেনে এনে সময় নষ্ট করতে থকে, কোনো লাভ নেই এমন ছেলেদের পড়িয়ে। টাকা পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু টাকার লোভে ফাঁকি দিতে আমি রাজি নই-আমাদের কলেজের প্রফেসররা কী করেন জানি না, তবে প্রফেসরদের ভেতর থেকেই এদের প্রাইভেট মাস্টার জুটে যাবে, হয়ত কেউ নিয়ে নিয়েছেন টুইশন দু'টো—'নিশ্চয় নেবে,' সুনীতি গেলাস থেকে একটু জল খেয়ে নিয়ে বললে,'তাবা ত তোমার মতন ধারে কাটেন না।'

'ধার?' সিদ্ধার্থ চুরুটটা টেবিলে গড়িয়ে রেখে দিয়ে বললে,'কার কাছ থেকে আমি ধাব করেছি?'

'তোমার মাইনের টাকাযই চলছে সব?' সুনীতি জলেব গেলাসটা হাতে তুলে নিযে কাঁচের ভেতব জলটাকে নাড়া খাওয়াতে খাওযাতে বললে।

'ধার করেছি অবিশ্যি আমি—' দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সুনীতির সঙ্গে এবারে একটু বিনত বিব্রত মনে হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধার্থ বললে,'তবে আমি শোধ করে দেব বলেই করেছি ধার—'

'আমাকে লুকিযে ধার করার অভ্যাস ত তোমার—'

'কে বললে?'

'কিন্তু তবুও আমি টের পাই।'

এর পরেই তাহলে সুনীতিকে সব কথাটা ভাঙিযে বললে হয; সুনীতির কানে গিয়েছে হযত কিছু কিছু, কিন্তু সিদ্ধার্থের ধাবকর্জের ব্যাপারের সবটা সে জানে না-অনেকখানিই জানে না। এই বাবে তাহলে স্বামী সব পরিস্কার করে বলে দিক সব-স্ত্রীকে; ফলে যতই অশান্তি আসুক না ঘরে সেটা সইতেই হবে।

সিদ্ধার্থ একটা চেযাব টেনে বসে বললে, 'আমি ধাব কবেছি বটে কিছু, কিন্তু মরবাব আগে শোধ কবে দিয়ে যাব সব। এক পযসাও কর্জ রেখে যাব না। আমার ঋণ টিন নিযে তোমাদের কোনো বেগ পেতে হবে না।'

'কত ধার করেছ প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে?'

তক্ষুণি উত্তর দিল না সিদ্ধার্থ, টেবিলের চুরুট ও দেশলাই নিযে অজানিত শিশুর মতন নিমগ্ন হযে রইল কিছুক্ষণ, মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়ল টেবিলের দিকে।

'যাক, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতে যাব না।'

'বলছি তোমাকে।'

'তুমি নিজের থেকে বলোনি যখন। এখনই ত দ্বিধাবোধ করছ বলতে।' সুনীতি গেলাস থেকে আরো খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে বললে,'আমি খোঁচাব না, বলব না তুমি ফাঁকি দিচ্ছ যা সাধ্যিতে কুলোয ধার টাকা দিচ্ছ তুমি সংসারে। আমি দেখেছি টাকাকড়িব ব্যাপার নিয়ে তুমি খুব ধকলে পড়েছ। কিন্তু তবুও আমাকে কিছু জানাবাব দরকার বলে মনে কর না, আমার ওপর কোনো শ্রদ্ধা নেই তোমার। তোমার ওপরও আমার কোনো বিশ্বাস নেই।'

সিদ্ধার্থ সুনীতির হাতের জলেব গেলাসটার দিকে তাকিয়ে বললে 'ঠান্ডা জল খাচ্ছ খুব।'

'এ ওষুধটা খেলে তেষ্টা পায়।'

'টান পড়ে গেছে ত অনেকটা।'

''না। ভেতরে ভেতরে আছে।'

'বেশি?'

'কম নয়। তবে খানিকটা উপকার হয়েছে। আরো একটা বড়ি খেতে হবে।'

সূচীপত্রে যান

সিদ্ধার্থ টেবিলের থেকে একটা চটি বই তুলে নিয়ে কাঠের ওপর আস্তে আস্তে ঘা দিতে দিতে বললে,'ডাক্তারেরা ত অত বেশি খেতে বলেন না, একটা বড়ির অর্ধেক করে খেতে বলেন শুধু-রোগটা খুব বেশি হলেও—'

'রুগী তার নিজের শরীর বোঝে,' জলের গেলাসটাকে হাতে করে রেখে সুনীতি বললে,'ডাক্তারেরা ত বই পড়ে কথা বলে।'

'প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যা ধার নিয়েছি সেজন্য খানিকটা টাকা প্রতি মাসেই আমার মাইনের থেকে কেটে নেয়া হয়। এরকম করে টাকাটা শোধ হয়ে যাবে।'

সুনীতি সাদা সিটে মুখে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল।

'থাক প্রভিডেন্ট ফন্ডের কথা এখন। সুনীতি হাতেব জলেব গেলাসটাকে একটু খাড়া করে ধরে বললে।

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,'আসছে মাসে হয়ত আমার টাকা মাইনে বাড়াতে পারে'—

সুনীতির হাতে গেলাসটা কাত হয়ে গেছে আবার , পড়ে না ভেঙে যায়,'ও-সুনীতি গেলাসের জলের মত আস্তে একটু নাড়া খেয়ে হেসে বললে, 'তিন বছব থেকেই ত শুনছি মাইনে বাড়িয়ে দেবে। ওদের বলে দিও তুমি দশ টাকা মাইনে কমিয়ে দেয যেন। দশটা টাকাব এদিক ওদিক হিসেবের গরমিল হবে না।'

সিদ্ধার্থ সারাদিন বাড়িতেই থাকল; কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছে তিন সপ্তাহের। বিকেলের থেকে সুনীতির হাঁফানির টান একেবারে কমে গেল। 'যা হোক, সামনের মাস থেকে তুমি আমাকে একশো আশি টাকা দেবে।'

সিদ্ধার্থ দরজাব কাছে ডেকচেযারে বসেছে এবেলা-অবিশ্যি সকালের সেই রোদটুকু নেই এখন এদিকে; কিন্তু রোদের দরকারও নেই, কাল রাতে, সকালবেলাব দিকে শীতও পড়েছিল বটে, কিন্তু এখন শীত ত নেইই। গবম পড়েছে একটু; টেবিলেব পাশের চেয়ারটায সুনীতি বসেছিল; ডেকচেয়ারের পাশে একটা তেপযেব ওপব কযেকটা বই ছড়িয়ে রেখেছে সিদ্ধার্থ, বইগুলোর ভেতর লুক্রেসিযাস এখনো আসে নি, বমার সঙ্গে দেখা হযনি সিদ্ধার্থেব আর।

'তাহলে সেই অনার্সের টুইশনটা নিতে হয় আমায—'

'শুধু একটা কেন—দু'টো টুইশন নেয়া দরকাব।'

'যদি এর মধ্যে কেউ নিযে না থাকে—'

'কবে ছেড়ে দিয়েছিল তুমি?'

'চার পাঁচ দিন হল।' সিদ্ধার্থ বললে,'কিন্তু ওদের আমি পাশ করাতে পারব না।'

'কে আছে ওদেব গার্জেন? স্বচ্ছল সংসার? টাকা দেবে?'

'তা দেবে, আমাকেও নিতে হবে, 'সিদ্ধার্থ একটু নির্জিত হযে বললে, 'কিন্তু পাশ করবে না, পাশ কিছুতেই কববে না-কেউই ওদের পাশ করাতে পারবে না। এটা খুব ভাল কবে বুঝে তবুও খুব ভাল করে ওদের পড়ানো—'

সুনীতি কুজোর থেকে কাছড়ে গেলাসে জল ঢেলে নিয়ে গেলাসটা হাতেব কাছে টেবিলের ওপর রেখে দিযে বললে, 'খুব ভাল করে পড়াবার কোনো দরকার নেই। এসব টুইশনে যে রকম টাকা পাও-সেই টাকাই ত দেবে ওদের গার্জেনরা-স্বীকার করছে?'

'টাকা আমি যা চেযেছি তাতেই রাজি হযেছে।'

'মিটে গেল,' সুনীতি বললে,'মিছেমিছি হাঁদিয়ে লাভ নেই । কিন্তু ঠিক মতন পড়িয়ে দেখ-তা পাশ করতে পারবে। আমি ফাঁকি দিযে টাকা নিতে বলছি না তোমাকে; ভাল মানুষ চেষ্টা করে দেখে—কর তাই। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কিছুকাল আর টাকা ধার করতে যেও না।'

যেন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকেই সিদ্ধার্থ ধার কবেছে শুধু, কলেজ কো-অপারেটিভ, লাইফ ইনসিওরেন্স-ঋণদান সমিতি-সকলের কাছ থেকেই তার শেষ প্রাপ্য ঋণ আদায করে এনেছে ত, আর কিছু পাওয়া যাবে না ওদের কারো কাছ থেকে। এই ত ব্যাপাব। জানাজানি করেও শেষ পর্যন্ত এসবের কিছুই জানতে পারল না সুনীতি; জানানোও হল না ওকে।

'শীত এসে পড়েছে-লে কম্বল ছিঁড়ে গেছে সব-বছর দশেক আগে করানো হয়েছিল ত-শালু পাওয়া

যাচ্ছে না আজকাল, তবে লেপতোষকের কাপড়-তুলো আর ধনুকার কাল সকালেই নিয়ে আসতে হবে তোমাকে।

'কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছ ত?'

'হ্যাঁ।'

'ক' মাসের?'

'তিন সপ্তাহের।'

'সুনীতি বললে—'কিছু টাকা ধার করতে হবে তোমাকে।'

সিদ্ধার্থ পকেট থেকে চুরুট বার করে হেসে বললে,'যে সর্ষে ভূত ছাড়াবে তাকেই ভূতে ধরল বুঝি।'

'তা ধরল ত। কী করব। ধার না করে উপায় নেই । আমি মুখে মুখে হিসেব দিচ্ছি তোমাকে। লেপতোষক গরম কাপড়চোপড় কিছু আমাদের নেই—তোমাবও নেই। তোমার গরম শার্টটা ত ন্যাকড়া হযে গেছে-গরম কোট কিনি কিনি করেও এই আট বছরের মধ্যে কিনতে পারলে না, কুড়ুনির আর আমার গরম শেমিজ ব্লাউজ ত নেইই সুতির ব্লাউজ শেমিজগুলোও ছিঁড়ে গেছে—দপ্তরির কিচ্ছু নেই—'

'ওকে এখনো দপ্তরি ডাকা হয?'

'ঠাকুরদা ওর নাম দিয়ে গেল-তুমি পাল্টে দিতে হলে দাও।'

সিদ্ধার্থ তেপয়ের এক কিনারে চুরুটটা রেখে দিযে বললে,'ওর ঠাকুদ্দা নামটা রেখেছে-এখুনি বদলাবার দরকার নেই। পরে ভেবে একটা কিছু ঠিক করা যাবে। কিন্তু বাবা ওব দপ্তরি নাম রাখলেন কি হিসেবে।' সিদ্ধার্থ একটু ভেবে বললে, 'ঠিকই আছে, আমাদের জীবনের হাড়মাংসের সঙ্গে মিশে গেছে ওর নাম। কিন্তু কোথায়-দেখছি না ত দপ্তরিকে সারাদিন।'

কুড়ুনি এসে বললে,'ওর আজ স্কুল ছুটি-কাল ওদের ইস্কুলের একজন মাস্টার মরেছে। ও আজ ধুচুনিদের সঙ্গে মিলে চড়িভাতি করতে গেছে।'

'ধুচুনি কে?'

চড়িভাতি ত ওর রোজই,' সুনীতি টেবিলের থেকে জলেব গেলাসটা হাতে তুলে নিযে বললে,'কেউ দেখে না বখে গেছে ছেলেটা-ক্লাস ফোরের থেকে ফেল করে ক্লাস ফাইভে উঠল, ক্লাস ফাইভের থেকে ফেল করে ক্লাস সিক্সে-এবারেও পাশ করতে পারবে না-এক মাস পবে ত পবীক্ষা।'

কথা ভাবতে গিযে সিদ্ধার্থের ঘাড় নুযে একটু হেলে পড়ল, চেযাবের ফ্রেমে কাঠ ও কেম্বিসেব মাঝখানের ফাঁকা জাযগাটার কিনাবে, কিন্তু দপ্তরির কথা ভাবছিল না সে শুধু, নানারকম কথা বযেছে, খুলতে চেষ্টা করলে আরো বেশি জঁট পাকিযে যেতে চায সব, কিন্তু তবুও ভাল করে চেষ্টা করে দেখতে হবে; বি এ অনার্সেব ছেলেটি অনার্স পাশ করতে পারবে না; কিন্তু তার ছেলে ক্লাশ ফোর ফাইভ থেকে ফেল করে যে উঠেছে সেটা শুনেছিল বটে সে অনেক আগে-ভুলে গিযেছিল; কিন্তু কেন ফেল কবছে এরকম।

কুড়ুনি বললে,'দপ্তরিকে তুমি অনাথ মুন্সীর ইস্কুলে পড়াও কেন বাবা? সে ইস্কুলে ত মাইনে কনট্রিবিউশনের টাকা দিয়ে দিলেই প্রমোশন দিয়ে দেয়। কাছেই বাসমতীব নাম করা বড় কলেজ ইস্কুল নয়। থাকতে তুমি ওকে অতদূরে দানাপুরের পচা ইস্কুলটায পড়াচ্ছ।'

'আমি ত নিজেই অনাথ মুন্সীর ইস্কুলে পড়েছিলাম, কিন্তু তখন ইস্কুলটা অনেক ভাল ছিল—' সিদ্ধার্থ নড়ে সোজা করে চেযারে ঠিক হয়ে বসেই উঠে দাঁড়িযে বললে; ঘবের ভেতর হাঁটতে লাগল; আমাদের সেই হেডমাস্টার পরেশ বাবু হেডমাস্টার এখনো ত আছেন ঐ ইস্কুলে। ওবকম জ্ঞানীগুণী সাধু মানুষ আমি আর কাউকেই ত দেখিনি এ পর্যন্ত বাসমতীতে। তিনি অবিশ্যি ক্লাশ নাইন টেন ছাড়া আর কোথাও পড়ান না। কিন্তু ওরকম মানুষ ইস্কুলে থাকাতে ওরা টাকা পেয়ে প্রমোশন দেয? আচ্ছা খোঁজ করে আমি দেখব।'

'কী খোঁজ করবে?' সুনীতি বললে।

'মাইনে পেলেই প্রমোশন দেয় কিনা? দপ্তরি ফেল কবেছে তবুও তাকে প্রমোশন দেয়া হল কীসের জন্যে-জানতে হবে পরেশবাবুর কাছ থেকে আমায়।'

'তা জেনে কোনো দরকার নেই।' সুনীতি বললে,'এবারে যাতে পাশ হতে পারে তাই দেখ।'

'পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে।

সূচীপত্রে যান

'কিন্তু দপ্তরির কথা বলে কোনো লাভ নেই। আমি কাজের কথা বলছিলাম তোমাকে–আমাদের কারুরই কিছু জামাকাপড় নেই, জুতো নেই, লেপ তোষক মশারি কম্বল ছিড়ে কাই কাই হয়ে গেছে সব; বেশি শীত পড়বার আগে সব নতুন করে তৈরি করিয়ে নিতে হবে; পাঁচশো টাকা দু–চার দিনের ভেতরই দরকাব–এখুনি যোগাড় দেখতে হবে তোমাকে। হাঁটছিল কোনো কথা বললে না সিদ্ধার্থ।

'আদিনাথ আর ফিরে আসবে না?'

'না।' সুনীতি বললে,'ফিরলেও ওকে রাখব না আমি।'

'এতদিনের পুরনো চাকর' সিদ্ধার্থ নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বললে 'বাবা থাকলেও দশবছর তার কাজ করেছিল–আমাদের এখানে এখানে সাত আট বছর হয়ে গেল।'

'এই পাঁচশো টাকা,' সুনীতি গেলাস থেকে তিনি চার চামচে আন্দাজ জল খেয়ে নিয়ে বললে,' দিন চাবেকের মধ্যেই চাই। তোমার সানলাইফের পলিসি কবে ম্যাচিওর করবে?'

'এখনো বছর চারেক বাকি আছে।'

'সেখান থেকে ধার নিতে পার কিছু।'

'সে ত কলকাতায় লেখালেখি করতে হবে।'

'ক'দিন লাগবে টাকাটা পেতে?

সিদ্ধার্থ বললে,'কুড়ি পঁচিশ দিন লেগে যেতে পাবে।'

সুনীতি বললে,'তোমাব পলিসি দু'টো ত আমাব নামে অ্যাসাইন কবেছ?'

'হ্যাঁ। দেখে ছিলে না তুমি সে সব কাগজপত্র?'

'পলিসি দু'টো আমার কাছে বেখে দিলেই ভাল কবতে তুমি।'

'আমাব ট্রাঙ্কে তালা মেরে রেখে দিয়েছি–হারাবাব ভয নেই।'

'আজ রাতে দেখাতে হবে আমাকে।'

'কোন জিনিস দেখবাব কথা বলছ?'

'সানলাইফ আব হিন্দুস্থানের পলিসি দু'টো।'

শুনে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা কবল সিদ্ধার্থ। কুডুনি কাছেই একটা টুলেব ওপব বসে দু'জনেব কথা শুনছিল–একবার তাকাচ্ছিল সিদ্ধার্থেব মুখেব দিকে আব একবাব সুনীতির হাবভাব নজব কবছিল। সিদ্ধার্থকে কেমন যেন ফাঁপবে পড়তে দেখে খুশি হয়ে খিক খিক কবে হেসে উঠে সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে বললে,'কেমন জব্দ! কেমন জব্দ এইবাবে।'

কুডুনিব দিকে তাকাল সিদ্ধার্থ; খুব আমোদ পেয়েছে বটে মেয়েটি। কিন্তু দশ পনের বছব পবে আজকেব দিনের কথা যদি মনে পড়ে তাব তাহলে একেবাবেই অন্যবকম মনোভাব জাগবে মেয়েটিব হৃদয়ে, নাকি মনেব দিক দিয়ে দপ্তবিব মত কুডুনিও কোনোদিন বড় হবে না? লাইফ ইনসিওবেন্সেব দু'টো পলিসিই আজ বাতে দেখতে চেয়েছে সুনীতি; কিন্তু কী দেখাবে সে-কি কবে দেখাবে। বুঝে উঠতে পাবছিল না। কুডুনিও দপ্তবিকেও পথে আনা দরকাব, কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কি না—ওদের নির্মিতিব ভেতবেই আদিপুরুষদেব দোষ বয়েছে কিনা-ওদেব মায়ের দিক থেকে কিংবা হয়ত বাপের দিক থেকেই -সেই নিস্ফলতার ফলেই সব সৎ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে কি না-ভেবে ঠিক কবতে পাবছিল না সিদ্ধার্থ।

'আমি জব্দ হয়েছি মনে কবেছ তুমি?

'আচ্ছা জব্দ বুড়ো মানুষ, কেমন ঠেলে ধবেছে মা তোমাকে।'

'কি কবে ধবল ঠেসে?'

'কই–দেখাও তুমি,' কুডুনি চোখ কঠিন করে ঘুবিয়ে ঘুবিয়ে হেসে বললে, আজ রাতেই ত তোমাকে দেখাতে হবে-কি সব ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রেখেছ।'

'ও—' সিদ্ধার্থ ভাবল, ভেতরে সম্ভাবনা আছে মেয়েটিব, কিন্তু ঠিক জলবাতাস পাচ্ছে না, দপ্তবিরও হয়ত এরকম; নরম কাদার মত বয়স ওদের এখন, এরই ভেতর থেকে খুব সস্নেহে দৃঢ় কুশল হাতে তৈরি করে নিতে হয়, কাদাটা পাঁক নয় অবিশ্যি। দপ্তরি আর কুডুনির দিকে মন দিতে পারছে না। সুনীতিকে দিয়ে হচ্ছে না কিছু। অনেক ছেলেমেয়ে আছে একটা মোটামুটি নির্দেশ পেলে ঠিক পথে চলতে পাবে। কিন্তু এই দু'টি ভাইবোনের পেছনে পেছনে লেগে থাকা দরকার; একজন আলাদা মানুষেব সর্বক্ষণের কাজ। কত দিনের কত বিশেষ দরকারি কাজ রয়েছে ত, সব ছেড়ে দিয়ে কুডুনি ও দপ্তবিকে নিয়েই

সমস্ত সময় আটকে থাকবার সময় আছে? সুনীতির বদলে অন্য কোনো স্ত্রীলোক (চারদিকে কত অজস্র তারা) যদি এ দু'টি ছেলেমেয়ের মা হত তাহলে একটা গুরুতর দায়িত্বের থেকে অনেকখানি নিষ্কৃতি পেত সিদ্ধার্থ।

'তোমার এবার কোন ক্লাস?'

কুডুনি টান হেয়ে ঠোঁটদু'টো আঁট হয়ে গেছে মেয়েটির। সমস্ত মুখটাই সিদ্ধার্থের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস একটা কঠিন মোয়া বেঁধে ফেলেছে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অবিশ্যি লেনদেন হয় না তার বেশি, এ ছাড়া এদের সম্বন্ধে আর কোনো পাপ করেছে বলে মনে পড়ছিল না সিদ্ধার্থের।

'কেন বলবে না?'

'দপ্তরি দপ্তরি যে ফেল করে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে ওঠে ত তুমি জানতে না-ওকে যে দপ্তরি বলে ডাকা হয়-তা তোমার খেয়াল নেই—ও কোন ক্লাসে পড়ে তা তোমার মনে নেই-আমার এখন কোন ক্লাস তা আমি বলতে পারব না-তুমি কিছু জান না, দেখ না, খবর রাখ না-কেন বলব তোমাকে?'

সিদ্ধার্থ তেপয়ের ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে দেশলাই বাব করে বললে, 'ঠিক কথা বলেছ তুমি। এইবাব থেকে দেখব ভাবছি। আমি ভেবেছিলাম তোমরা-আরো একটু ওপরের ক্লাসে উঠলে হাতে নেব-কিন্তু এখন দেখছি—'

সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালাল।

'ও মা, এ কি চুরুট খায়।' কুডুনি মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল।

সিদ্ধার্থ চুরুটটা নিভিয়ে ফেলে সরিয়ে রেখে বললে,' কোন ক্লাস হল তোমার?'

'ক্লাস ফাইভ।'

সিদ্ধার্থ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, পাযচাবি করতে কবতে বললে,'ফাইভ? দপ্তবি ত সিক্সে পড়ে।'

'ও ত ফেল কবে করে পই পই করে উঠে যায়। ওবকম হলে কী করে পারব ওর সঙ্গে। আমাদেব ই'স্কুলেব মত নয়।'

'তুমি ববাবর পাশ কবে উঠছ?'

'ববাবর।'

কুডুনি বললে,'আমি ক্লাস টুতে ভর্তি হয়ে ছিলাম ত। পাশ করে করে ফাইভে উঠেছি। আমাদেব হেডমিস্ট্রেস খুব কড়া, আমাদেব ইস্কুলের বার্ষিক পবীক্ষাব রেকর্ড গভর্ণমেন্টেব ইনসপেকট্রেসেব কাছে যায়—'

'যায়?' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে থেমে দাঁড়িয়ে কুডুনির দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেন, তোমাদের ত প্রাইভেট ইস্কুল, গভর্ণমেন্ট কি করবে?'

'গভর্ণমেন্ট টাকা দেয়, অন্যসব ইস্কুলের চেয়ে আমাদের বেশি দেয়। তা ছাড়া আমাদেব হেডমিস্ট্রেস বড় শোভনাদির বাবা ত গভর্ণমেন্ট—'

সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে আবার দাঁড়িয়ে গিয়ে বললে, 'কী বলছ তুমি কুডুনি? ওটা মুখ ফোঁড়েব মত কথা হল। ওরকম বলতে হয় না। তোমাদের পরীক্ষা কবে?'

'ডিসেম্বর মাসে।'

'পরীক্ষা কি তুমি পাশই করে যাও শুধু? প্রাইজ টাইজ পেযেছ একবারও?'

'না, আমি অঙ্কে কাঁচা,' কুডুনি বললে,'ইংরেজিতে আরো কাঁচা। তোমরা ত কেউ দেখিয়ে দাও না আমাকে। আমাদের ক্লাসের কত মেযেব বাড়িতে মাস্টাব এসে পড়িয়ে যায়।'

'আচ্ছা আমি দেখব তোমার ইংরেজি আব অঙ্ক।' সিদ্ধার্থ বললে,'প্রাইজ পেলে না তুমি; পড়ছ ফাইভে; তুমি ত দপ্তবির চেযে দু'বছবের বড়, অন্তত ক্লাস সিক্সে-'

'আনব ইংরেজি বই?'

'এখন না। '

'তবে কখন?'

'রাতে।'

'বাতে হবে না,' সুনীতি বললে, 'আদিনাথকে উঠিয়ে দিযেছি, রাঁধাবাড়ার কাজ রযেছে।'

তাই ত, কে রাঁধবে? কুডুনি? কুডুনি আর সুনীতি? জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সিদ্ধার্থ। আজ দুপুরে

ভাত আর আলু সেদ্ধ খেয়েছে তারা। রান্নার সময় কুড়ুনিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি, সিদ্ধার্থ বাড়ি ছিল না, সুনীতি উনুন জ্বালায়নি, চাল আব আলু লুকিয়ে ধানরাজের মাকে দিয়ে এসেছিল এক ফাঁকে সরোজিনী পিসিমাদের তোলা উনুন সেদ্ধ করে পাঠিযে। এই রকম ব্যাপার। অথচ আদিনাথের মতন চাকরকে তাড়িয়ে দিলে সুনীতি।

'আচ্ছা ইংরেজি বইগুলো নিয়ে এস।'

কিন্তু বই আনতে গিযে কুড়ুনি আর ফিরে এল না। দু-চাব বার মেযেকে ডেকে কোনো সাড়া পেল না সিদ্ধার্থ।

সুনীতিকে বললে–'ও আসে না যে?'

'তুমি বুঝি ভেবেছ ও বই আনতে গেছে?'

'কোথায় গেল তাহলে?'

'তোমাদের ত ঐ এক দিনের গরজ,' সুনীতি বললে,'কযেকদিন দেখ; দেখে চোখ জুড়িয়ে নাও।'

'খানিকটা জুড়িয়েছে। বেশ আলগোছে সরে পড়ল দেখছি। এবকম বুঝলে আমিই ওর সঙ্গে সঙ্গে যেতাম।' কুড়ুনির অস্পষ্ট বসিকতায খানিকটা ধাঁধিযে গিযে সিদ্ধার্থ বললে।

সুনীতি এক চুমুক জল খেযে বললে, 'ওদেব আমি পারিনি, তুমি পারবে না।'

'ঠিক হযে যাবে সব' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে,'এখন থেকে চোখ রাখতে হবে আমায।'

সুনীতি জলের গেলাসটা টেবিলেরি ওপর রেখে দিযে বললে,'অন্য ছেলেপিলেদের ও দেখি–এদেবও দেখি। কেন যে এমন হল বুঝতে পারছি না–আমাদেব দেশে বিযে জিনিসটায না আছে বিজ্ঞান, না আছে সহজ মর্মজ্ঞান। ওতে হয না কিছু ঠিক মতন। এদেব আর অতটা দোষ কী করে দিই। এরা একটা সম্বন্ধেব ফলে জন্মেছে।'

সিদ্ধার্থ পাযচারি কবতে কবতে ঠোঁটের কিনারে একটা হাসিব ছোঁযাচ লাগিযেছে, কিন্তু চোখে তা প্রতিফলিত কবতে পাবছে না; কেমন একটা চিন্তাগম্ভীবতা বযেছে সেখানে।

সুনীতি জলের গেলাসটা আবো কাছে টেনে এনে বললে,'আমি অনেক আগেই বুঝেছি, তাবপরে হাল ছেড়ে দিযেছি। আমাদেব দেশে অজাত বলে একটা কথা আছে—'

শব্দটা শুনেছে বটে সিদ্ধার্থ, কিন্তু মানে ঠিক জানে না; কিংবা বাংলাদেশে এদিকে শব্দটার একটা চলতি মানে আছে–সেটা জানে; সিদ্ধার্থেব মাও মাঝে মাঝে খুব বাগ কবলে সিদ্ধার্থকে 'অজাত' বলতেন। কিন্তু দপ্তবিব চেযে অনেক ভাল ছেলে ছিল সিদ্ধার্থ–অনেক–অনেক–কোনো তুলনাই হয না। সিদ্ধার্থেব মা বাবাও বিজ্ঞানসম্মত উপাযে বিযে কবেননি, প্রেমে পড়েও না, নিতান্ত সেকেলে ঘটকালিব ফলে বিযে হযেছিল, কিন্তু তবুও স্পষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হযেছিল তাদেব দু'জনের মধ্যে। মাঝে মাঝে একটু টসকে যেত বটে, আবছা হযে পড়ত, কিন্তু মোটামুটি জিনিসটা সুস্থ ও স্পষ্ট ছিল, সিদ্ধার্থদেব সম্বন্ধেব চেযে সেটা আলাদা রকমেব জিনিস। সিদ্ধার্থের মনে হচ্ছিল সুনীতিই যে গাযে পড়ে এসে তাকে ঠকিযেছে তা নয, সমাজ ত আজকালওঅন্ধ, সৃষ্টির ওপবও মানুষেব তেমন কিছু কর্তৃত্ব নেই—এইসব অন্ধতাব মুখপাত্র হিসেবে সুনীতি এসে পড়েছে; নিজে সিদ্ধার্থ মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছিল সব, কিন্তু এখন অন্ধকারখন্ডটা সিদ্ধার্থকে অন্ধকাবখন্ড বলে সোজাসুজি নালিশ জানিযে ক্লান্তি ও ব্যর্থতায চাপা পড়ে গেল বুঝি।

'হ্যাঁ,' 'অজাত' বলে একটা কথা আছে আমাদের দেশে।'

'দপ্তরির–দপ্তবিদেব জন্মাবার কথা ছিল না।'

'তাই ত মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু তবুও জন্মাল–এ পাপেব ফল মানুষকে ভোগ করতে হবে বৈকি, সুনীতি জলেব গেলাসটাব দিকে তাকিযে দেখছিল, একবাশি বোদের উজ্জ্বলতায গেলাসের জলেব ভেতব কতকগুলো অণু পবমাণু যেন চঞ্চল হযে উঠেছে; ছাযার ভেতর গেলাসটাকে সবিযে দিল সে।

সিদ্ধার্থ তেপযেব ওপব থেকে চুরুটটা কুড়িযে নিল, সুনীতি একটা ব্যাখ্যা দিযেছে বটে, সেটা খুব সম্ভব আত্মিকই শুধু নয, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বলেও মনে করেছে সে; কিন্তু এ বিশ্লেষণের একটু বিজ্ঞানী চেহাবা থাকলেও–খুব সম্ভব এটাই শেষ সত্য নয। দপ্তরিদেব জন্ম যে অনুতাপের ফলেই হোক, তাদেব ভবিষ্যৎ যে শূন্য সেটা স্বীকার করতে পাবে না সে। তবে তার সঙ্গে সুনীতিব স্বামী স্ত্রীব জীবন কতকগুলো কথা ভাবলে বহিত কবলেও চলে, কিন্তু তা কববার উপায নেই, টিকিযে বাখতে হবে।

সূচীপত্রে যান

সিদ্ধার্থ যদি অনেক টাকার মালিক হত তাহলে বিবাহবিচ্ছেদ করতে যেত না হয়ত সে। কিন্তু সেটা করবার ঢের সুবিধা সুযোগ থাকত তার; কিন্তু যে ধাত নিয়ে মানুষ বিয়ে ছেদ করে সে ধাতে সিদ্ধ হওয়া তার পক্ষে বোধহয় কঠিন, তাছাড়া সুনীতি ভালোবাসা না জাগালেও আক্রোশ জাগায় না মনে, করুণা জাগাচ্ছে; আমাদের দেশে অন্তত প্রায় সব স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধই কয়েকটা বছর কেটে গেলে এই করুণা-মমতায় দাঁড়ায় গিয়ে; ভালোবাসা থাকে না, খুব বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে ঘৃণা বা আক্রোশও বেশিক্ষণের জন্যে টেকে না।

খুব সুখী স্বামী স্ত্রীও যে পরস্পরকে ভালোবাসবেই তা নয়। কিন্তু দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখতে হলে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া থাকা চাই, বলতে গেলে সিদ্ধার্থের সেটা নেই-ই একরকম; কিন্তু একেবারে যে নিঃশেষ হয়ে গেছে তা সে মনে করে না। শূণ্য হয়েও যদি যায় আবার খানিকটা এইরকম ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে; অসম্ভব নয়-তার আর সুনীতির ক্ষেত্রে? সুনীতির সঙ্গে থেকে সুখী হল না সে, শান্তি নেই-একেবারেই অন্য নানা কারণে সুনীতির একটা করুণার টান পাচ্ছে না স্বস্তির সুখ, কিন্তু তবুও সিদ্ধার্থের দিক থেকে অনেকদিনের অনুক্ষণের উৎপন্ন হয়েছে- এ না থাকলে শুধুই কর্তব্যের দায়ে এ সম্বন্ধ টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা কবত না সে।

'দপ্তরির সম্বন্ধে আমি হাল ছেড়ে দিই নি,' সিদ্ধার্থ চুরুটটা না জ্বালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললে,'মাঝে মাঝে অবশ্য আমারও ঈডিপাসের মত মনে হয়েছে না জন্মালেই ভাল হত—'

সিদ্ধার্থ নেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু আমাদের দেশে শাস্ত্রে পুবাণে এরকম কথা বলেনি কেউ? বলেছে?'

সিদ্ধার্থ আবার হাঁটতে শুরু করে বললে,'অবশ্য আমাদের দেশে জন্মলাভ কবাটা আগেব আগের যোগির ঋণ পরিশোধ বলেই মেনে নিয়েছে মানুষ, ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওটাই ঠিক জিনিস বলে স্থির করেছে।'

'তুমি ফান্ডেমেন্টালে হাত দিতে পারলে না।' সুনীতি বললে।

'আমি যখন বি-এ পড়তাম তখন ফিলজফিব প্রফেসরেব চেয়েও ইতিহাসের প্রফেসবই এই শব্দটা বেশি আওড়াতেন।'

'বি-এ তে ফিলজফি ছিল বুঝি তোমার।'

'আমাদের দেশে 'বাওযা' বামুন বলে,' সুনীতি জলেব গেলাসটা কাছে এনে টেবিলে বসিযে তার ওপর বাঁ হাতটা চাপা দিযে বেখে বললে, 'নেমতন্ন বাড়িতে যে শ্রেণীর বামুনবা যেচে গিযে পাত পেড়ে বসে,'বাওযা' মানে 'ববাহূত' সমাজ ছোঁয না; জীবনে আর কিছু হল না তাদেব। এই ছেলে মেযে দু'টোও রাওযা ছাড়া আব কিছু নয়, তেমনিভাবেই পৃথিবীতে এসেছে। তেমনিভাবেই পিঠে লাথি খেযে লুট খেতে খেতে বেবিযে যাবে।'

'সুনীতি ভাবছিলঃ সুনীতিব দশ বারো বছর ধরে নানাবকম বিষম রোগে শবীবটা পচে ক্ষযে না গেলে সুনীতিরই ইচ্ছায় যে আবো কযেকটি সন্তান হত তাদের, জানা আছে; নিজেরও সিদ্ধার্থের খুব সম্ভব অনিচ্ছা থাকত না; কিন্তু খুব শিগগিরই সীমা নির্ধারণ কবে দিত; সুস্থ সবল স্ত্রী হলে কোনো ধরা বাঁধা নিয়মের ভেতর রাখা কঠিন হত। দু'জনেই সুস্থ সমর্থ মন ও শবীরের মানুষ হলে জীবনে স্বস্তি সম্ভাব্যতার চেহারাটাই বদলে যেত-হাঁটতে হাঁটতে কথা ভাবছিল সিদ্ধার্থ। রমার কথাও মনে পড়ে গেল তার-শুধু লুক্রেসিযাসেব বইটাব জন্যই নয়-আর বনচ্ছবির কথা-এখুন যা সব ভাবছিল সে-সেই সবের কেমন একটা শুদ্ধ অব্যর্থ পরি সমাপ্তি হিসেবে।

কিন্তু রমাকে বজত মুখার্জীর সাথে যাতে বিয়ে দেযা যায় সেই চেষ্টাই করা উচিত সিদ্ধার্থের। রজত এই কলেজ থেকেই ছ' বছব আগে ইকনমিক্সে ফার্স্টক্লাস পেযে বি এ পাশ করেছিল, এখন কলকাতায় অ্যাকাউন্টটেন্ট জেনারেলেব অফিসে চাকরি করে; পাইলটিঙও শিখেছিল, সেদিক দিযেও বড় কাজের আকার এসেছে, নিবে কিনা ঠিক করতে পারছে না। রজতকে চেনে না রমা। নামও শুনেছে কি না সন্দেহ; কিন্তু পরিচয হলে-তার পর বিয়ে হলে খুব ভাল হবে সেটা। খুব ভাল মনে হচ্ছে; এ পক্ষেব শেষ গোপন কথা অবিশ্যি জানা নেই সিদ্ধার্থের। রজত মদ ধরবে-খারাপ ব্যবহার করবে-এসব কি অবচেতনার বিষম কিমাকার অন্ধকার হাটকে বেড়াচ্ছে সিদ্ধার্থ। তার চেযে এই কথাটা ভাবা ভাল,- সত্য বলেই ভাল: রমা ও রজতের মত অনেক ছেলেমেয়ে হবে রজতদেব, কলকাতায একটা কৃতি, কৃতকৃতার্থ

বিখ্যাত পরিবার দাঁড় করাবে তারা, যে বংশস্রোত কত শত বছর ধরে কত আশ্চর্য দৈবত সম্ভাবনাযও সিদ্ধিতে কত দিক দিয়ে দেশ সমাজ ও পৃথিবীকে খুব ভাল ভাবে সংবদ্ধ করে রাখতে চেষ্টা করবে –মন্ধাতা ও পৃথুরা যা করেছিল কিংবা জ্যাসন ও বিসিযূসরা তার চেয়ে ঢের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে। ভাবতে গেলে ব্যাপারটাকে এখুনি হাতে হাতে অবাস্তব মনে হতে পারে বটে–কিন্তু তা নয়, সত্য সম্ভাবনা খুব বেশি পরিমাণেই রয়েছে। এবকম একটা ব্যাপারের ছোট্ট ভিত্তি পাথরটা শিগগিরই বসানো উচিত সিদ্ধার্থের।

আচ্ছা দেখবে সে।

আর বনচ্ছবি অন্য রকম, গভীরেব কথা মনে পড়িয়ে দেয় সিদ্ধার্থকে।

ফান্ডেমেন্টাল?

সুনীতি কাঁচেব গেলাস থেকে হাত খসিয়ে নিয়েছে। গেলাসটা টেবিলের এক কিনাবায় রয়েছে, টেবিলের এক নীচে একটা ছোট্ট কাচেব পিবিচ ছিল তাই দিয়ে ঢেকে বেখেছে জলেব গেলাস।

'দপ্তবিদেব কথা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না ত অনেক কাজের কথা আছে–' সুনীতির মুখ পুরনো গাছের নতুন চেরা কাঠের মত কঠিন হয়ে উঠল।

'কিন্তু তবুও দপ্তরিদের ব্যাপার সম্বন্ধে আব একটা কথা বলে শেষ কবছি।'

সুনীতি কাঁচের পিবিচটা একবাব হাতে তুলে নিয়ে আবার গেলাসের মুখে চাপা দিয়ে বেখে বললে–অনেকেব সঙ্গেই আমার বিয়েব সম্বন্ধ এসেছিল; যে অবস্থায় আছি তার চেয়ে সেগুলো'—বলতে বলতে থেমে গিয়ে সুনীতি বললে, 'নিখিল বাযদেব পক্ষ থেকে খুব চেয়ে ছিল আমাকে—' সুনীতির কথাটা শেষ হয়নি, ভেতরে হাঁপ বয়েছে এখনো খানিকটা, দুটো এফিড্রিনেব বড়ি খেয়ে শরীরটা বিষিয়ে ঝিমিয়ে বয়েছে তাব; বিয়ের আগেব বারো চোদ্দ বছব পূর্বের জীবনের সে সব বড়, উঠতি সম্ভাবনাব কথা ভাবতে গিয়েও রক্তে একটুও যেন বেশি সচ্ছলতার স্রোত বইতে চায না আজ আর তার।

'নিখিল বায কে?

'সুপাব টেকনোলজিস্ট, কলকাতা ইউনির্ভার্সিটিব ডি–এফ–সি। হাজার হাজার টাকা পাচ্ছেন—

'চাকবি কবছেন কোথায়?'

'দিল্লিতে। মস্ত বড় এযাব কনডিশনড্ বাড়িতে থাকেন আজকাল। কলকাতায় বালিগঞ্জে দু'খানা বাড়ি, বাঁচিতেও বাড়ি আছে, ভুবনেশ্বরে আছে, শিলঙে আছে–চিনিব কাববাব কবে কত লাখ লাখ টাকা তাব।'

'কাববাব? চাকবিও করছেন বললে?'

'অ্যাদ্দিন কবছিলেন–এখন ছেড়ে দেবেন, ব্যবসা নিয়েই থাকবেন, তিনি না হলে আব কেউ অত ভাল কবে বুঝবে না জিনিসটা। কিন্তু ব্যবসা মানে মানুষ ঠকানো নয়, বিদেশ থেকে ত কত লাখ মন চিনি আমদানি হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষেই যাতে চিনিব ব্যাপারে পুবোপুবি আত্মস্বাধীন হতে পাবে সেই চেষ্টা কবছেন উনি।'

'তুমি এত খাবাব পেলে কোথায?'

'ওঁর বোনেবা এসেছিল সেদিন।'

'কোথায়?'

'বাসমতীতে এসেছে, এখানে ত ওঁদেব মামাবাড়ি, আমাব সঙ্গে অনেকদিনের চেনা ধবিত্রীদির'—

'ধরিত্রী কে?'

'ওঁর মেজদি; ভাইয়েব দু'ছেলেকে সঙ্গে কবে এসেছিলেন সবোজিনী পিসিমা ও আমার সঙ্গে দেখা কবতে। তাব কাছ থেকেই ডক্টর বাযেব কথা শুনলাম সব। ডক্টর রাযেব ছেলে দু'টোকে দেখে এমন ভাল লাগল–ওবকম ছেলে হয় না কেন মানুষের ঘরে ঘবে–কাঁচেব পিবিচটা সবিয়ে নিয়ে অনেকখানি জল খেয়ে ফেলে সুনীতি বললে। মাথাটা খানিকক্ষণ টেবিলেব ওপব ফেলে বাখল সে। হাঁপানির ক্লান্তি, এফিড্রিন ও মনেব ভেতরের অব্যয এফিড্রিনের আলোড়নে মড়া শরীরে ঝিমিয়ে পড়ছিল সে। কিন্তু তবুও প্রাণ কোটি ক্ষয়ে ক্ষযেও রেডিযামের মতনই যেন অনুভব কবে সুনীতি আস্তে আস্তে মাথা তুলে বললে,'ডক্টর রাযেব ছেলে দু'টি দপ্তরির চেয়েও কিন্তু চার বছরের ছোট, অথচ দপ্তরির চেয়ে দু'জনেই ওপরের ক্লাসে পড়ে তারা–দিল্লিব বড় বাঙালি স্কুলে–প্রত্যেকবার ফার্স্ট হয়ে ওঠে। সুন্দর পুরুষমানুষের মতন দেখতে,

সূচীপত্রে যান

জ্ঞানীগুণী ছেলেদের মতন স্বভাব। পৃথিবীতে সত্যিই জন্ম হল এদের-সত্য একটা প্রয়োজন মেটাতে। দপ্তরিদের মতন ত নয়—'

সুনীতি গেলাসের বাকি জলটুকু খেয়ে টেবিলের ওপর হাত বিছিয়ে রেখে বাইরের বাতাসের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে,'সেই ডক্টর রায়ের কথা বলছিলাম না' সুনীতি খানিকক্ষণ পরে বললে,'ডক্টর রায় তার পর শেষে যাকে বিয়ে করেছেন সে স্ত্রী দেখতে শুনতে আমার তুলনায় কিছু নয়; খুবই সাধারণ। কিন্তু ছেলেরা এই রকম হল। আমার বাবা কি মনে কবে যে তখন ডক্টর রায়কে কথা দিলেন না বুঝতে পারলাম না আমি।'

'হয়ত ভেবেছিলেন যে তার মেয়ের যখন এত হাঁফানি রোগ হবে তখন মিছে-মিছি রায়কে বিব্রত করে লাভ নেই—' সুনীতিকে বলা যেতে পারে ভাবছিল সিদ্ধার্থ; কিন্তু সুনীতি যা বলেছে তার উত্তরে সিদ্ধার্থের মুখে এরকম কথা নিছক ইয়ার্কির মতই শোনাবে। সুনীতির বক্তব্য খুব চিন্তিত ও সুস্থিব হোক বা না হোক,-এই মুহূর্তে অন্তত লঘুতার স্তর ভেদ করে গভীর হয়ে যাচ্ছে।

সুনীতির গেলাসের জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। কুজোর থেকে আর এক গেলাস জল ঢেলে এনে সে টেবিলের ওপর রাখল।

'আচ্ছা খুব জল খাচ্ছ তুমি।'

'ইচ্ছে করে নয়।'

'এই বড়িটা খেলে খুব জল খেতে ইচ্ছা করে?'

'না-বমি আসে, কিছুই খেতে ইচ্ছা কবে না, অরুচি হয়।' মাস ছযেক আগে বাসমতীব সদর হাসপাতালে কমিটির একটা মিটিঙে মহেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা হযেছিল আমাব,' সুনীতি বললে,'কথাবার্তা হল, আমার হাঁপানির কথা উঠতে তিনি বললেন, দিনে পাঁচ ছ' গেলাস জল খেযে দেখুন আপনি। এতদিন খাইনি। কিন্তু হাঁপানির বাড়াবাড়ি হচ্ছে আজকাল। এইবারে দেখছি-কিন্তু বমি ঠেলে আসে ঐ ওষুধটা খেয়ে জল খেতে গেলে।-এমনিই আমি জল খেতেই পারি না।'

সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে,'ঝাউডাঙায একটা ইন্টারমিডিযেট কলেজে প্রিন্সিপালেব কাজ আমি পেতে পারি, আড়াশ শো টাকা মাইনে দেবে, পঁচিশ টাকা ডি এ, জাযগাটা একেবারে পাড়াগাঁ, বনজঙ্গল, কিন্তু কাজটা মোটের ওপর মন্দ নয়, সব মিলিযে দু'শো পঁচাত্তর আন্দাজ পাওযা যাবে। কী মনে হয় তোমাব?'

'কাজটা পাবেই তুমি-না সম্ভাবনার কথা বলছ?'

'না, ওখানকার কলেজ কমিটির সেক্রেটারি মহম্মদ ইশাক সাহেবের সঙ্গে কথা হযেছে আমার। কাজটা চাইলেই তিনি আমাকে দিযেছেন, আমাকে সাধাসাধি কবছেন, কিন্তু কিছু ঠিক কবতে পাবছি না।'

'যেতে পারা যায।' সুনীতি বলতে, 'পঁচাত্তব টাকা ত বেশি।'

'তাহলে বলে আসব ইশাক সাহেবকে?'

'একেবারে পাড়াগাঁ?'

'হ্যাঁ-এই ত বাসমতীব থেকে পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে-সুন্দববন আব সমুদ্রেব দিকে। মুসলমান আব নমঃশূদ্র ছেলেদেব দিয়ে কলেজ।

সুনীতি জলে দু'চুমুক দিযে বললে, 'বাসমতী ছেড়ে বনজঙ্গলেব দিকে যাওযা; গেলে কলকাতায গেলে ভাল হত তবু।'

'পঁচাত্তর টাকা মাত্র বেশি দেবে তোমাকে-তার বদলে জঙ্গলবাস,' সুনীতি গেলাসটা একটু সরিযে রেখে বললে,'পাঁচ ছ' শ টাকা মাইনে পাওযা যায না কোথাও?'

'না, কলেজ আইনে সে সব নেই।'

'লাইন বদলানো যেতে পারে ত।'

'এই বযসে গভর্ণমেন্টের চাকরি পাওযা যাবে না।'

'দেশ ত স্বাধীন হচ্ছে—'

'খুব ভাল জিনিসটা,' সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'কিন্তু পরাধীন বা স্বাধীন দেশে কারো ব্যাপারের কোনো মীমাংসা হয় না। বাসমতী কলেজের দু' চারজন প্রফেসরের হয়ত সুবিধা হতে পারে,

কিন্তু মোটামুটি মাস্টারদের কোনো লাভ হবে না, আরো ক্ষতি হবে কি না বলতে পারছি না।'

সুনীতি মাথা নেড়ে বললে, 'আমার বিশ্বাস আছে স্বাধীনতার ওপর। ঢের ভাল হবে আগের থেকে। কলেজের জ্ঞানীগুণী মাস্টারদের মুরোদ বুঝবে দেশের কর্তারা। অনেক কিছু ত ভাল করে ঢেলে সাজাতে হবে তখন-তাতে শিক্ষিতদের খুব বেশি দরকার হবে নিশ্চয়ই—'

'যারা টেকনিকক্যাল শিক্ষা পেয়েছে; কিন্তু আমরা' সিদ্ধার্থ চুরুট টেনে নিয়ে বললে, 'বাসমতীতে টিকে থাকা সম্ভব হলে বেঁচে যেতে পারি, কিন্তু কলকাতায় গেলে তলিয়ে যাব।'

শুনে সুনীতি মুষড়াল না।

অনেক আবর্জনা সরে যাবে, অনেক নোংরামি শুদ্ধ হবে, শত হলেও এটা ভারতবর্ষের প্রাণ, সেই প্রাণ অনেক দিন পবে সেই কবে কাব উষাপুরুষের মত জেগে উঠবে আবার। সেই জন্যে সে সত্যিই প্রত্যাশা কবে রয়েছে। কিন্তু সে যা জানে তা সে জানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সেই দ্রার্ঢ্যেব থেকে তাকে নড়াতে পাববে না।'

বাসমতী কলেজের একজন-মাস্টার মানুষকে বিয়ে কবে টাকাকড়ির টানা হ্যাঁচড়া ধর্ষণে রোগের আক্ষেপে অবচেতনে চেতনায় ঘুরে অনেক বকম অদ্ভুত কথা আজ মুখ দিয়ে সে বের করেছে সিদ্ধার্থর সঙ্গে অনেকদিন পরে একটা লম্বা বৈঠকে বসে-আবো অনেক কথা মুখ দিয়ে বেরবে হয়ত তার-কিন্তু এসব কথা প্রায়ই বুদবুদের মত বেরিয়ে ফুরিয়ে গেছে তখুনি, স্থিব সুস্থ অতল সংস্থানের ভেতর থেকে উঠে আসেনি, কিন্তু তবুও তার শিক্ষাদীক্ষা সাধ অনুভূতি প্রাণ মনেব একান্ত দু' একটা কথাও বলেছে সে। কোন রকমের কথা কম আব কোনে রকমেব কথা বেশি বলা হবে সিদ্ধার্থেব সঙ্গে আজ এখন থেকে গভীব রাত পর্যন্ত-ঠিক বলতে পাবছে না সে; রাতে ঘুমের আগে (হাঁপানি কমে গিয়ে ঘুম যদি হয়) সব কথা পরিমাপ করে করে যা মুছে ফেলবাব মুছে ফেলে দেবে সে। যা মনে রাখবাব কাল সকালে মনে থাকবে তাব—জীবনের শেষ সকাল পর্যন্ত।

খানিকক্ষণ বিমুগ্ধ হয়ে বইল তার মন। জানালাব ভেতব দিয়ে অনেক দূবেব দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখছিল চারদিকে হ্যাবিকেনেব আলো নিভে যাচ্ছে। বাসমতীতে কত পাখি থাকে-কত ফড়িং পাতা পোকা প্রজাপতি, তাদেব প্রাণনার, অন্বেষণার একটা আশ্চর্য শব্দে স্নিগ্ধ মথিত হয়ে বিকেলেব আলো আস্তে আস্তে অন্ধকাব হয়ে যাচ্ছে—

ঘবেব ভেতব পাযচাবি করছে সিদ্ধার্থ, মুখটা তার বুকেব কাছে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে; আজ এতক্ষণ বসে কিছু কিছু বিসদৃশ কথা মানুষটাকে আলোড়িত কবে দেবাব জন্যে বলেনি সুনীতি-দরকাব বোধ করেছিল বলে বলেছিল। সে দরকাব অনেক পবিমাণে ফুরিয়ে গেছে; যাকে বলা হয়েছিল সেও বিশেষ কিছু মনে করে বলে থাকেনি, তার মুখেব দিকে তাকালে বোঝা যায়, একটা আত্মস্থতায় নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে; পাযচাবি কবছে পিঠে হাত বেঁধে-সামনেব দিকে ঝুঁকে পড়ে-ঘবেব খুবই লম্বা (যেন অনেকখানি সুদীর্ঘ শালু পাতা) মেঝেব ওপর দিয়ে; হাতে চুরুট নিভে গেছে।

সুনীতিব কথা বা সংসাবেব কথাই যে ভাবছে সিদ্ধার্থ তা নয়-নানা বকম ভাবার কথা আছে তার-মনে হচ্ছিল সুনীতির।

খানিকটা সময় এই রকম কথা চিন্তন ও নিস্তব্ধতাব ভেতর দিয়ে কেটে গেল।

মনে আবার অসুখ-অসুবিধা-আবো হয়ত খারাপ কিছু আস্তে আস্তে জেগে উঠতে লাগল, অথচ যে মানুষ পায়চাবি কবছে তুলনায় সে প্রায় পুরোপুবি কীতকাম স্থিব ও সুস্থ হয়েও নিজের গুণ ও নির্গুণকে স্ত্রীব অসুস্থ মনে কোনোদিনই কোনো প্রকাবেই সংক্রামিত কবতে পারল না বুঝি।

'আদিনাথ আট টাকা পাচ্ছিল-বাবো টাকা চেয়েছিল-আমি তাকে উঠিয়ে দিযে ঝি রেখেছি; কাল সকাল থেকে আসবে।'

'আদিনাথকে উঠিয়ে দেযা ঠিক হযনি তোমার।'

'ঝি কাল সকাল থেকে আসবে।'

'বেশ, আসুক। আদিনাথ একবাব এসে দেখা করলে পাবত আমার সঙ্গে। ঘরে একটা হ্যাবিকেন দেবে কে?'

সিদ্ধার্থ বাইরেব দিকে তাকিযে বললে, 'আর একটু পরে দিলেও হবে হয়ত।'

'ঝিকে আমি চোদ্দ টাকা মাইনেতে ঠিক করেছি।'

'এতগুলো টাকা?' পায়চারির ভেতর ছেদ পড়ল সিদ্ধার্থের, বাঁ হাতের সঙ্গে পিঠের ওপর বাঁধা ছিল হাতটা, খসিয়ে এনে হাতের নেভা চুরুটের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ বললে,'ও ত বারোটাকা চেয়েছিল শুধু; পুরনো চাকর; তাকে তাড়িয়ে দিয়ে এটা করলে বুঝি তুমি। খামখেয়ালি হলে।'

'তা হল,' সুনীতি একটু জল খেয়ে নিয়ে বললে, 'খুব ভালই হল। আমি দেখেছি ভাল একজন ঝি ছাড়া আমার মনের মতন কাজ কিছুতেই হবে না; ও ব্যাটা তোমার পা টেপা মাহিন্দার ছিল ত, সেইজন্য ওর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তোমার কথার এত রস।-ও অনেকদিন চলেছে-এই বারে আমার নিজের লোক চাই। বেশ শক্ত সোমত্ত, ঢের বুদ্ধি রাখে, অনেক বড় বড় বাড়িতে কাজ করেছে, আমার সমস্ত রকম কাজ আগলাতে পারবে-লাল কমলের বউ, বাঁজা-ছেলেপিলে এঁড়ি গেঁড়ি নেই; এই বেশ হয়েছে।'

চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল সিদ্ধার্থ।

সুনীতি বললে,'কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে?'

'কাল রাতে তোমাকে ঠিক সময় খবর দিতে পারিনি;-একটু আটকে পড়েছিলাম। একা থাকতে হয়েছিল তোমাকে এ ঘরে?' সিদ্ধার্থ পায়চারি করতে করতে বললে,'আমি ভেবেছিলাম টিনি এসে শোবে। তোমার সঙ্গে,শুয়েছিল?'

'কেন বলতে যাব তাকে আমি আমার ঘরে এসে শুতে? সে কোন দিন সরোজিনী পিসিমাকে ছেড়ে কোথায় যায়-মানুষ মরে গেলেও?'

'পিসিমা জানত যে আমি বাড়ি ছিলাম না?'

'সকলেই জানত।' সুনীতি বললে, 'কিন্তু আমি অসুখের মানুষ-একা ঘরে রয়েছি-চারদিকে সব শয়তান বজ্জাত-কেউ একটু খোঁজখবর নেওয়াও দরকার মনে করল না। অনেক দিনের পুরনো মানুষ বললে ত তুমি-তোমার বাবার কালের মানুষ-কিন্তু সন্ধের সময় ফ্যাচফ্যাচ করে ঝগড়া করে তোমার মাহিন্দার। এই সব কারণেই লালকমলের বৌকে রেখেছি আমি, সে রাতে আমার ঘরে শোবে; তার জন্যে একটা দড়ির খাটিয়া আর একটা মশারি কিনেছি আমি সংসারের খরচের টাকার থেকে-এই টাকাটা পুষিয়ে দেবে তুমি। আমাদের লেপ তোষকের সঙ্গে ওরও তোষক বালিশ তৈরি করে দিতে হবে, একটা পুরনো কম্বল দিয়েছি। শীত বেশি পড়লে ছিটের কাপড় দিয়ে লেপ তৈরি করে দিতে হবে।'

সিদ্ধার্থ চুরুট টানতে টানতে বললে,—'তা হবে। আমার মাঝে মাঝে রাতে বেরিয়ে যেতে হয়-হাঁটতে হাঁটতে বললে,'আমি আগে আগেও দরকারি কাজে চলে যেতাম রাতে-এই ত জিরানডাঙায় কলেরার সময়-তখন টিনি কি এসে শুত তোমার এখানে? তাই ত মনে করতাম আমি। আগে আগে ত সরোজিনী পিসিমা এসে শুতেন তোমার ঘরে-আমার বেশি দেরি হয়ে গেলে আমি না ফিরলে—'

'সেই সব দিন ত নেই এখন আর, ওরা সকলেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।' সুনীতি জলের গেলাসটা টেবিলের ওপর একটু কাত করে ধরে বললে,'ওরা মনে করে আমার টি বি হয়েছে। হাঁপানিতে টি বি নয়; কিন্তু হাঁপানির থেকে টি বি হতেও পারে; সে রকম শরীর আমার কি হয়েছে কে জানে।'

টি বি হতেও পারে হাঁটতে হাঁটতে সুনীতির দিকে তাকাল সিদ্ধার্থ; অনেক যক্ষ্মা রুগীর চেহারা এই রকমই ত ; চলতে চলতে ভাল করে দু'চারবার তাকিয়ে দেখে মনে হল, যাদের বিশেষ কোনো রোগ নেই তাদের অনেকের চেহারাও এইরকম। তিন চার বছর আগে সুনীতির হাঁপানির চিকিৎসার জন্যে অনেক টাকা খরচ করেছিল সে-অমূল্যকে সঙ্গে দিয়ে চেঞ্জেও পাঠিয়ে দিয়েছিল গিরিডিতে-মাস তিনেকের জন্যে; কিছুই হল না তাতে, যে রকম শরীর নিয়ে গিয়েছিল প্রায় সেটাকেই ফিরিয়ে এনেছিল, সেই শরীরটাই ক্রমে ক্রমে আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে; টি বি যদি হয়ে থাকে তবে হয়েছে; তিন চার বছর আগে সিদ্ধার্থের সংস্থান ছিল এখন তা নেই-চিকিৎসা চেঞ্জের কথা ভাবতে পারে না সে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে- সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল-যাদের বিশেষ তেমন কোনো রোগ নেই, ধরতে গেলে কোনো রোগই নেই-তাদের অনেকের চেহারাও সুনীতির মতন।

অবিশ্যি যাদবপুরের হাসপাতালে বছর দুই আগে সে বাসমতী কলেজের একজন প্রফেসরের সঙ্গে গিয়েছিল প্রফেসরটি একজন আত্মীয়কে দেখবার জন্যে-হাসপাতালে কয়েকজনকে সে দেখেছিল-সুনীতির আগাগোড়া শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখল আবার সিদ্ধার্থ-দেখেছিল এই রকম। সিদ্ধার্থের হাতে টাকা থাকলে তার প্রথম দায়িত্ব হত সুনীতির চিকিৎসা করানো।

কিন্তু কিছুই নেই, যেসব জায়গার থেকে ঋণ পাওয়া যেত সকলেই শেষ পর্যন্ত ঢেলে উপুড় করে

দিয়েছে তাকে। সুনীতির সম্পর্কে যে-কোনো এম বি ডাক্তারকে খাটাতে গেলে খুব সম্ভব হাজার দু' হাজার টাকায় এক্ষুণি পড়তে হবে।

হোমিওপ্যাথি করতে হবে?

তেমন কোনো বিশ্বাস নেই অবিশ্যি হোমিওপ্যাথির ওপর তার। কিন্তু তবুও আগের চেয়ে বিশ্বাস বেড়েছে খানিকটা যেন। কিন্তু বাসমতীতে যে সব ডাক্তার হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করে তাদের ওপর সত্যিই বিশ্বাস নেই সিদ্ধার্থের।

তবুও কেউ কেউ আছে হোমিওপ্যাথি নাকি অ্যালোপ্যাথির চেয়েও ঢের বেশি শক্তিশালী-সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল; তা হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে আরোগ্যশাস্ত্রের সত্যের প্রকৃত স্বরূপ কীসের ভেতর আছে কঠিন। হোমিওপ্যাথিতে থাকতে পাবে। টাকা অবশ্য কম খরচ হবে।

'কাল রাতে কোথায় ছিলে তুমি? জিরানডাঙায়?'

'না।'

'সেখানকার কলেরার কেসগুলো ভাল হয়ে গেছে?'

'মরেছে কয়েক জন, এখন কলেরা নেই জিরানডাঙায়।'

'নতুন কোথাও কলেরা হল?'

'না। সব জায়গায় কলেরা হলেই যে আমার যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'আমি ভাবছিলাম টুইশনের চেয়ে কলেরার তাগিদ বেশি।'

সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে,'এইবারে পথে ফিরতে হবে।'

'তা ত ফিরবে,' সিদ্ধার্থ অনেকক্ষণ জল খায়নি, এবারে চুমুক দেবার আগে গেলাসটা একটু কাছে এগিয়ে রেখে বললে, 'প্রভিডেন্ট ফান্ডের ধার আর ইনসিওরেন্সের পলিসিব মত রাতেব ঘুরে বেড়াবার ব্যাপারটা। এই ছ-সাত মাস ধবে দেখছি। বাত চবলে সর্দি কাশি হয না-ঘুববে; ভালই ত। পথে ফিরবে বলছ মানে বাড়িতে থাকবে রাতে? বাড়িতে থাকলে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পার বাসমতী কলেজের অন্য সব মাস্টারদেব মত। কিন্তু অন্য সব মাস্টাবদেব স্ত্রীদেব চেযে আমি বরাববই একটু বেশি নতুনত্ব দেখে আসছি-আবো দেখতে হবে ঢেব।'

সুনীতিব কথাব শেষ পর্যন্ত শুনে সিদ্ধার্থ হাঁটতে আবম্ভ করল আবাব। হাঁটতে হাঁটতে বললে,'দেশ ত স্বাধীন হচ্ছে-পলিটিকসের এখন বিশেষ কিছু নেই তেমন আব-আমাব দিক থেকে অন্তত এখুনি কিছু নেই। সাহিত্য টাহিত্য হল না আমাকে দিয়ে। এখানকাব হাসপাতালটা যাতে ভাল হয-আরো কয়েকটা ওয়ার্ড বাড়ানো হয-অনেক বেশি বেডেব ব্যবস্থা হয সেই চেষ্টা করছিলাম কয়েকজন মিলে; দেখছি প্রতি পদেই সকলে মিলে হটিয়ে দিতে চায আমাদের। কিন্তু তবুও হটা উচিত নয। একটা তাঁতও বসাতে চেষ্টা করেছি কয়েকজন আমরা। অবিশ্যি হাসপাতালেব কর্মীদেব চেয়ে তাঁতের কর্মীবা আলাদা। কোনো ব্যবসা হিসেবে তাঁত চালাতে যাচ্ছি না-যাতে বাসমতীর নানারকম ভুক্তভোগীদের উপকার হয-সেইজন্যে। সেই জন্যেই কোনো দিক থেকে কিছুই সাহায্য পাচ্ছি না। হটব না। দু'টো নাইট স্কুল খুলেছি। এই সব কারণেই কয়েক মাস পরে খুব বাত করে বাড়িতে ফিবতে হচ্ছে আমায। কোনো কোনো সময ফিরতে পারিনি-নাইট স্কুলে শুয়ে থাকতে হয়েছে।'

'হাসপাতালে ওযার্ড বাড়াবে-টাকা কে দিচ্ছে?'

'যাদের টাকা আছে তাদের কাছেই যাচ্ছি।'

'কিছু দিয়েছে?'

'হাজার পনের পেয়েছি।'

'হাতে হাতে-না ওয়াদা?'

'ক্যাস। আমি ট্রেজারার নই। টাকাকড়ির ব্যাপাবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি টাকাটা আদায় করে বিলাসবাবুকে দিয়ে দিই—'

'ও—' সুনীতি একটু জল খেয়ে যেখান থেকে খুব সম্ভব ভীমরুলবা উড়ে গেছে সেই চাকে খোঁচা দেবার মত একটা চেষ্টা করে বললে, 'তাহলে ত একটা কাজ নিয়ে আছ। কলেজের কাজের থেকে এটা সত্যিই ভাল।'

সিদ্ধার্থ মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বললে, 'টাকাটা আমরা সকলে মিলে খাব কিনা ভাবছ। এ বিষয়ে

বাঙালিদের একটা সুনাম আছে অনেক দিন থেকে। যে কাজটা হাতে নিয়েছি সেটা বাস্তবিকই ঠিক ভাবে না শেষ হওয়া পর্যন্ত নিজেদের ওপর বিশ্বাস নেই আমাদের।'

'মহেন্দ্র ঘোষ কিছু দিয়েছেন?'

'না, তিনি দেননি। তিনি কিছু দিতে পারবে না বলেছেন।'

'কেন?'

'তিনি এরকম দশজনের ব্যাপারে বিশ্বাস করে না বলেছেন। নিজে একাই একটা হাসপাতালের মতন কিছু করবেন টরবেন-ইচ্ছা আছে—'

'বাসমতীতে?'

'না। অন্য কোথাও।'

'উনি ত গান্ধির ভক্ত। সোদপুরে প্রায় যান।'

সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে, মহেন্দ্রবাবু কিছু অন্তত দিলে পারতেন আমাদেব। ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ড, চিলড্রেন্স ওয়ার্ড, অরফান্‌স্ ওয়ার্ড, কলেরা ওয়ার্ড-আরো কত ওয়ার্ড রয়েছে; কতকগুলো নতুন খোলা হবে, আগের গুলো বাড়ানো হবে, বেডের ব্যবস্থা করা হবে আরো কুড়ি বাইশটা-মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে নানারকম কথা হয়েছিল আমার এসব ব্যাপার নিয়ে, তিনি পরামর্শ দিতে রাজি আছেন, কিন্তু টাকা দেবেন না। কোনো ডাক্তারই টাকা দিলেন না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'কেন?'

'বুঝতে পারলাম না কিছু। ডাক্তারি কবে এদের কেউ কেউ ত অনেক টাকা করেছেন। দু' টাকাব ভিজিট-চার টাকা, চার টাকারটা আট টাকা, ষোল টাকা, স্পেশাল কেসে আরো অনেক,-দক্ষিণা বাড়িযে দিচ্ছেন ত ক্রমে ক্রমে। কিন্তু হাসপাতালের ব্যাপাবে হাত গুটিযে রইলেন কেন বলতে পারছি না। আমি অবিশ্যি হাল ছেড়ে দিইনি, আবার দেখব।'

সিদ্ধার্থ বললে,'মীরমহলের দিকে একটা নাইট স্কুল খোলা হযেছে। তোমার শরীর যদি ভাল থাকত, তাহলে সপ্তাহে চার পাঁচদিন পড়াতে পারতে। কিন্তু শরীর ত এই রকম। টিচারের বড্ড অভাব আমাদের।'

'এটা কি মেয়েদের নাইট স্কুল?

'মেয়ে পুরুষ সকলেরই; পুরুষবা একদিকে পড়ে-মেযেদেব জন্যে একটা ভিন্ন ঘর রযেছে।' সিদ্ধার্থ আবার চলতে শুরু করে বললে,'অনেকদিন যাওযা হযনি ওদিকে। কি হল না হল বুঝতে পাবছি না। মনোতোষবাবু আব সাধন দত্ত ত দেখছিলেন।'

'বনচ্ছবিরা আছে এই নাইট স্কুলেব ভেতর?'

'বনচ্ছবি ত উদ্যেগে করেছিল স্ত্রীলোকদের আর ছোট ছেলেমেয়েদের সেকশনটা—' সিদ্ধার্থ বললে। একটু দাঁড়িযে থেকে বললে,'অনেকদিন দেখা হযনি বনচ্ছবিদেব সঙ্গে আমার। অনেকদিন যাইনি মীরমহলেব নাইট স্কুলে—' বনচ্ছবির যে এ বাড়িতে সিদ্ধার্থের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে কথা এখুনি পাড়বার তেমন কোনো প্রযোজনবোধ করছিল না সুনীতি। পরে আস্তে আস্তে বলা যাবে। সরোজিনী পিসীমাই বলবেন, ওরা নিজেরাই এসে পড়বে আজ হয়ত।

'নাইট স্কুলগুলোই আজকাল নাইট ক্লাব হযে দাঁড়ায়।' সুনীতি বাইবের দিকে তাকিযে বললে। আকাশে একটি তারা উঠেছে বলে মনে হচ্ছে, চার দিকে মাঠ, ক্ষেত, ধূলোর পথ, সুরকির রাস্তা আবছা হয়ে আসছে।

পাযচারির ব্যাপারে ক্লান্তি নেই যেন সিদ্ধার্থের। ডেক চেয়ারটার দিকে এগিযে আসছিল সে, বসবে ভাবছিল, চেযারটার পেছনে এসে ফ্রেমের ওপরের কাঠ দরে দাঁড়িযে বলবে,'সত্যি একটা নেশা ধরে যায় এসব করতে করতে, নাইট ক্লাবেব চেযে একটুও কম নেশা বলে মনে হচ্ছে না।'

'তবে নেশা জিনিসটা খারাপ,' সিদ্ধার্থ আবার হাঁটতে শুরু করে বললে, 'এক এক সময় মনে হয় ছেড়ে দেব সব। কলেজ থেকে তিনি সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি, এই ক'টা দিন বাড়িতে থেকে লিখে বই পড়ে কাটিয়ে দেব ভাবছি।' ' একটা বইয়ের অভাব বড্ড করছি।' সিদ্ধার্থ চেযারে এসে বসে বলবে।

'কার বই?'

'লুক্রেসিয়াসের।'

'কে সে?'

'একজন রোমান কবি।"

'তা হোক। নাইট ক্লাবের কথা বলছিলাম,' সুনীতি সিদ্ধার্থের বই পড়াটড়া সমস্ত সাধু উদ্দেশ্যকে আলগোছে সারিয়ে দিয়ে আগের খেই ধরে বললে,'কাল রাতে ত মীরমহলের নাইট স্কুলে ছিলে না, সদরের দিকে আর একটা নাইট ক্লাব করছ নাকি শুনছি।'

'নাইট ক্লাব?'

'নাকি জিরানডাঙার দিকে।'

'কাল রাতে আমি বিলাসবাবুর বাড়িতে ছিলাম.' সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে,'সেখানে হাসপাতালের ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা সভা হচ্ছিল। এই প্রথম বাসমতীর কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে আমার যাওয়া। আমি মাঠঘাটেই থাকি-এক আধজন প্রফেসরের বাড়িতে ক্বচিৎ যাই—'

'সারারাত বিলাসবাবুর বাড়িতে কাটল?'

'না। ওবা আমাকে হাসপাতাল রিকন্‌ট্রকশান কমিটিব সেক্রেটাবি করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি মতই ঠেকল; ও পদ আমাদের কলেজের প্রিন্সিপালকে দিলে ঠিক হত, তিনি সব দিক বেশ মানিয়ে চলতে পারতেন। হাসপাতালেব কথা আমিই ভেবেছিলাম প্রথম, কিন্তু এখন দেখছি কোনো একটা কাজ করতে হলে কাজটা বরং বাদ গেলে চলে, কিন্তু কাজের অফিসের এত ভাল ভাল অফিসার জুটে যায় যে তাদেব বাদ দিতে দুঃখ করে। বোঝেন আমাদেব কলেজের প্রিন্সিপাল এসব, কলেজটা চালিয়ে নিচ্ছেন এসব বুঝেই। আমি বিলাসবাবুকে বলে এসেছি যে প্রিন্সিপালকেই হাসপাতালে রিকন্‌ট্রাকশন কমিটির সেক্রেটাবি করা হোক—'

'প্রেসিডেন্ট হবে কে?'

'কালেক্টর।'

'কালেক্টরেব নাম তুমি সুপারিশ কবেছিলে?'

'না। সেটা বাসমতীর যে সব মহাজনেরা চাঁদা দিয়েছে-দিচ্ছে-তারা জোট পাকিয়ে আমাদেব দিয়ে শর্ত কবিয়ে নিয়েছে। এবাই মোটা চাঁদা দিচ্ছে।'

'তা চোরাবাজারের টাকা মিহি হবে আব কি করেই' সুনীতি গেলাসের দিকে হাত বাড়িয়ে হেসে বললে,'প্রিন্সিপালও আছেন এর মধ্যে? বিলাসবাবুব সভায় বসে বসে বাত বেড়ে গেল বুঝি-নাকি একেবারে ফর্শা হয়ে গেল। যা হোক সভা না ভাঙতে বাড়ি না এসে ভালই করেছ।

সিদ্ধার্থ ডানহাতের চুরুট আস্তে আস্তে একটু ঝাঁকি দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বইল। কেউই কোনো কথা বলছিল না। একটা হ্যাবিকেনেব দরকাব। তেল না থাকলে মোম হলেও হয। কিন্তু অন্ধকার কবে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত জমল না অন্ধকার: ঝাউগাছের মাথার ওপব চাঁদ দেখা যাচ্ছে- খুব সম্ভব ষষ্ঠীর, এক চিলতি ফ্যাকাশে মেঘের মত এখনো, কিন্তু ক্রমেই উজ্জ্বল হবে। বাত দশটা এগাবটা অবদি এই চাঁদেই চলবে।

'হাসপাতালের চাঁদার টাকাটা খেয়ে ফেলবার লোভও আছে কযেকজনেব দেখলাম,' সিদ্ধার্থ চাঁদটার দিকে তাকিয়ে বললে,'বিলাসবাবুর অবশ্য না। একজন মানুষ ঠিক আছেন। তিনি ঠিক থাকলে আমিও কোমরে জোর পাব। না হলে—' সিদ্ধার্থ বললে—'ছেড়ে দিতাম না কিছুতেই অবিশ্যি। আমি একা হলেও ছেড়ে দেব না-কিছুতেই না। হাসপাতালের আরো কযেকটা ওয়ার্ডেব দবকার, আবো অনেক বেডের। যত শিগগির সম্ভব এসব করা দরকাব। কিন্তু খুব কবিতকর্মা মনে করে যাদেব বেছে ঠিক কবেছিলাম—'

'তারা ধোপে টিকছে না?' সুনীতি বললে,'বিলাসবাবুদেব বাড়িতে খুব মশা ছিল না?'

'কাল আমাদের কলেজের একজন প্রফেসব মাবা গেলেন,' সিদ্ধার্থ বললে।

'কে মারা গেলেন?'

'অবনী খাস্তগির মশাই।'

'ও-তার ত হাঁপানি ছিল।'

মনে করে রেখেছে দেখছি সুনীতি; কলেজেব কোন কোন প্রফেসরেব হাঁপানি আছে মোটামুটি জানা আছে সুনীতির; মাঝে মাঝে তাদের খবর জিজ্ঞেস করে সিদ্ধার্থের কাছে। ওদের একটা ট্রেড-ইউনিয়নেব মতন আছে বোধহয়।

সূচীপত্রে যান

'হ্যাঁ, এই ত সেদিনও আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। হাঁপানি সম্বন্ধে তোমাকে কয়েকটা মুষ্টিযোগ জানিয়ে গেলেন।'

'যিনি মুষ্টিযোগ দিলেন তিনি নিজেই ত সরে পড়লেন।'

সুনীতি বললে,'বেশি বয়স হয়নি ত খাস্তগিরের?'

'বছর পঞ্চাশেক হয়েছিল।'

'সেদিন যে এখানে এসেছিলেন, বেশ ভালই ত দেখলাম তাকে।'

'ভালই ছিলেন,' সিদ্ধার্থ চেয়ার থেকে উঠে পিছনে হাত বেঁধে পায়চারি করতে করতে বললে,'কাল সারাদিন কলেজ করেছেন, সাড়ে চারটার সময় কলেজ ওর কাজ হয়ে গেলে কলেজে বসেই এক কাপ চা আর তিন পয়সার বিস্কুট খেয়ে টুইশন করতে বেরুলেন। কম মাইনে, অনেক ছেলেপিলের সংসার, তিনটে টুইশন ওঁর। কলেজ থেকে হেঁটে-চল্লিশ মিনিটের পথ- প্রথম টুইশনটা করলেন; তারপর দেড় মাইল হেঁটে দ্বিতীয়টা। কিন্তু সেটা শেষ করে হেঁটে চলবার কথা রইল না আর-একটা সাইকেল রিকশা· করতে হল, তখুনি বাড়ি চলে যাওয়া উচিত ছিল তার, কিন্তু বাকি ছেলেটির বাড়ির দিকে রিকশা চালাতে বললেন। সমস্তটা পথ দোমনা হয়ে ভাবছিলেন গাড়িটাকে বাড়ির দিকে ফেরাতে বলবেন কিনা-কিন্তু পঁচিশ বছর মাস্টারি করেছেন, সিভিলিয়ানি করেননি ত –সেটা পারলেন না অবনীবাবু; ছেলেটির সঙ্গে দেখা করে পড়াতে বসবেন, কিন্তু পারা গেল না আর; ধরাধরি করে রিকশাতে করে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়া হল। শুতে পারলেন না, একটা কেম্বিসের হেলান চেয়ারে বসিয়ে দেযা হল—স্ত্রী ছেলেপিলেরা সব পায়ের কাছে এসে বসল-টের পেলেন যে মরে যাচ্ছেন—'

'টের পাওয়া যায় সেটা?'

'মরে দেখিনিত।' সিদ্ধার্থ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বললে।

'সকলকেই অনেক কথা বলবার ছিল তার, কিন্তু কাউকেই কিছু বলতে পারলেন না।'

'জ্ঞান ছিল না?'

'বেশ অজ্ঞানে ছিলেন।'

'স্বার ভেঙে গেছল?'

'না, কিচ্ছু না। যে কয় মিনিট বেঁচেছিলেন কেবলি কাঁদলেন। সকলের অবিশ্যি এরকম হয় না, কিন্তু কারো কারো হয—'

সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে,'রাত দশটায মৃত্যু হবে-কিন্তু তবুও সারাটা দিন কলেজ, তারপর গুঁড়ো পাতার চা খেয়ে পায়ে হেঁটে ছ' মাইল দূরে টুইশন, তারপর পায়ে হেঁটে আবার মাইল দেড়েক দূরে আরেকটা-তিন নম্বরের টুইশনটা তারপর-রাত দশটায় মৃত্যুর গাড়ি ধরবার এক-একটা স্টেশন; তারপরে গাড়িটা ধরে ফেলেছেন যখন প্রায় তখন ফিরে আসবার জন্যে শিশুর মত কান্না। অবিশ্যি এর চেয়েও ঢের খারাপ মৃত্যু আছে। কিন্তু তবুও মাস্টারদের মৃত্যুও কম খারাপ না।'

'তুমি দেখছি আজ খুলে ধরছ সব।' সুনীতি বললে।

'কেন?'

'বলছ এই রকম মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে-তোমাকে আমাকে।'

'খবর পেয়ে অবনীবাবুর বাড়ি যেতে হল আমাকে রাত এগারটার সময। আমি বাসায় ফিরছিলাম, পথে বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা-তিনি বললেন যে অবনীবাবু মারা গেছেন।'

'সেইখানেই ছিলে সারারাত।'

'একটা অবদি; তারপর শ্মশানে।'

সিদ্ধার্থ চেয়ারে এসে বসে ঝাউগাছের দিকে তাকাল; চাঁদটা আরো ওপরে উঠেছে; আরো উজ্জ্বল হয়েছে। কাল শীত পড়েছিল বেশ, আজ শীত নেই—মনে হচ্ছে যেন শীত টিত সব ফুরিয়ে ফেলে বসন্তকাল বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছে দেশে। দিনের পাখি কোথাও একটাও নেই; ঝাউয়ের কচি কচি ঝুরঝুরে ডালপালার ভেতর দিয়ে একটা পেঁচা উড়ে গেল।

'দপ্তরি এখনো এল না দেখছি।'

'হিতেন বাবু কাল রাতে একটা কথা বলেছিলেন,' সুনীতি জানালার ভেতর দিয়ে একটা উঁচু গাছের-ঝাউগাছটার নিশ্চয়ই মাথার দিকে তাকিয়ে বললে,'তিনি নাকি তোমাকে কয়েকদিন আগে রাত

সূচীপত্রে যান

দু'টো আড়াইটার সময় জিরানডাঙায় ঘুরতে দেখেছিলেন–কী করেছিলে অত রাতে ওখানে?'

'কবে?'

'কয়েকদিন আগে।'

'হিতেন বাবুর সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?'

'যেখানেই হোক, জিরানডাঙায় অত রাত্রে কী করছিলে?'

'তখন ত কলেরা ছিল–কশাইদের ওখানে আমরা কয়েকজন রাত কাটাতাম রোজ; পিসিমা তুমি টিনি–তোমরা জানতে ত সব।'

'সব কি আর সব মানুষ জানতে পারে।'

আবার উঠে পায়চারি করতে ইচ্ছা করছিল সিদ্ধার্থের, কিংবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে, কোথাও মেঘ নেই আকাশে, শীত নেই, একদিকে ধানজমি আব মাঠ পড়ে আছে, সাদা মাটি দেখা যাচ্ছে; আর একদিকে সরু ফর্সা ধুলোর গাঁয়ের পথ; ডান দিকে লাল রাস্তটা সদবের দিকে চলে গেছে–জিরানডাঙার দিকেও যাওয়া যায়। লুক্রেসিয়াসের বইটা আনতে অন্তত, সিদ্ধার্থ খবর পেয়েছে বইটা ওখানে আছে।

'হিতেন বাবুর সঙ্গে মাস খানেকেব মধ্যে দেখা হয়নি আমাব।' সিদ্ধার্থ বললে।

'তুমি ব্যস্ত ছিলে তাই দেখতে পারনি।'

'কবেকার কথা বলছ তুমি?

'তারিখ মনে করে রাখিনি।'

'কী বলেছেন তিনি? সরোজিনী পিসির কাছে এসেছিলেন বুঝি কাল? বাত দু'টো আড়াইটাব সময় জিরানডাঙায় গিয়েছিলেন একদিন–বললেন?' সিদ্ধার্থ হাসতে লাগল।

'গিয়েছিলেন বলে বললেন, এমনিই সিদ্ধার্থের হাসিটা মুছে যাচ্ছে, তাকিয়ে দেখতে দেখতে সুনীতি বললে,'তিনি মিছে কথা বলেন না। তাঁকে আমি বিশ্বাস করি।'

শুনে চুপ করে রইল সিদ্ধার্থ।

'ওদিকে একটা মিশন আছে?'

'হ্যাঁ আছে; ক্যানেডিয়ান ক্যাথলিক ক্রিশ্চানদের মিশন।'

'ভালোরি নামে এক মিশনাবি আছেন ওখানে?'

'আছেন।'

'মিশনটা কশাইদের বস্তিব থেকে কত দূবে?'

'খানিকটা দূরে।'

'প্রভাসবাবুর বাড়িব কাছে?'

'কাছেই।'

'অত বাতে জিরানডাঙায় প্রভাসবাবুর জানালায় দাঁড়িয়ে তুমি কী করছিলে?'

সিদ্ধার্থ একমিনিট চুপ করে থেকে বললে,'রমার সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'রমা?' সুনীতি জলের গেলাসের জলেব ভেতব বাঁ হাতটা ডুবিয়ে বেখে সিদ্ধার্তের দিকে তাকাল।

'প্রভাসবাবুব মেয়ে। চেন তাকে তুমি।' সিদ্ধার্থ বললে।

সুনীতি জলেব গেলাসের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে রেখে বললে, ''খুব খাবাপ লেগেছিল–হিতেন বাবুর।'

'হিতেন বাবুর? আড়াইটার সময ওখানে কী করছিলেন?'

'দরকাব ছিল–তাই ছিলেন।'

'কোনো মানুষই ছিল না–অত বাতে–জিরানডাঙায–তিনি কি করে থাকবেন।'

সুনীতি জলের ভেতর থেকে আঙুল ক'টা একটু তুলে আবার ডুবিয়ে রেখে বললে,'তিনি ছিলেন কি না ছিলেন সেইটে কোনো একটা কথাই নয়। কিন্তু তুমি ছিলে। '

সিদ্ধার্থ জলের গেলাসটার জলে ডোবানো সুনীতির আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, সুনীতির টি বি রুগীর মতন আঙুলগুলো একটু মোটা দেখাচ্ছিল জলের ভেতর। বিয়ের পরেই ঠিক এইরকম আঙুল ছিল—তাকিয়ে দেখছিল সিদ্ধার্থ–চাঁদের বেশ ফটফটে আলো এসে পড়েছে টেবিলের ওপরে– ঘরের ভেতর।

'হিতেন বাবু ছিলেন সেখানে।' সুনীতি বললে। 'ক্যানেডিয়ান মিশনে গিয়েছিলেন।'

সিদ্ধার্থ ঝাউগাছটার সরু সরু নীলচে অদুরত্বের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বললে,'মিশন থেকে

ফিরছিলেন বুঝি-দেখিনি আমি তাঁকে।'

'তিনি দেখছিলেন। ভালোরিও দেখেছিলেন নিশ্চয়-রাস্তার মোড়ে গাড়িটা ছিল-যাচ্ছিলেন ওঁরা সেদিকে।' সুনীতি বললে,'কিন্তু এসব ত বলবার মত কিছু কথা নয়, আমি তোমাকে হিতেন বাবুর কথাটথা নয়-আসল ব্যাপারটা ভেবে দেখতে বলছি। ভেবে ঠিক করেছ কিছু?'

'রমার কাছে জিরানডাঙার কলেরার ব্যাপারেই—একটা দরকারে গিয়েছিলাম আমি।'

'ও কি লেডি ডাক্তারি পড়ছ?'

চওড়া লম্বা কাচের গেলাসটার ভেতর আরো খানিকটা হাত ডুবিয়ে ফেলে সুনীতি বললে।

'যে ছেলেরা কলেরার ডিউটি দিচ্ছিল তাদের চা খাবার দরকার হল-' সিদ্ধার্থ চেয়ার থেকে উঠে শার্টের পকেটে হাত ডুবিয়ে পায়চারি করতে করতে বললে, ভুরু কুঁচকে উঠছিল তার, 'রাতে দু-তিনবার চা খাবার দরকার; রমাদের একটা নতুন বড় ফ্লাস্ক ছিল-সেইটে নিয়ে আসবার জন্যে গিয়েছিলাম আমি।'

'গল্পটা এরকমও হতে পারে-কে জানে কি হতে পারে—' সুনীতি জলের ভেতর হাতটাকে মুঠ বেঁধে ফেলতে ফেলতে বললে,'কেন গিয়েছিলে, কী হয়েছিল-আমাদের কারো তা জানবার কথা নয়। হিতেন বাবু না দেখলে-কিছু যে ঘটেছিল তাও কারো কানে আসত না। হিতেন বাবু সকলের কাছে বললেন ব্যাপারটা-কাল রাতে।'

'গগন বাবু এসেছিলেন?'

গেলাসে হাত ডুবিয়ে চুপ করে বসে রইল সুনীতি।

'চায়ের দরকার হয়েছিল-ফ্লাস্ক আনতে গিয়েছিলাম। ফ্লাস্কটা দিল আমাকে রমা।—'

'জিনিসটা এক মিনিটে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তুমি তিন কোয়ার্টার দাঁড়িয়ে ছিলে কেন।'

সিদ্ধার্থ এরকম ধরনের জেরার কোনো উত্তর দেবে না ভাবছিল, কিংবা সহজে মোটামুটি সঠিক উত্তর মনের ভেতর এসে পড়ে যদি তার-দেবে সে তাহলে।

'প্রভাসবাবু কী কবছিলেন?' গেলাসটা সরিয়ে বেখে সুনীতি বললে। 'ঘুমিযেছিলেন।'

'ও বাড়িতে আর কোনো স্ত্রীলোক ছিল?'

'না, কেউই ছিল না আব।'

'আশে পাশে কোনো দিকেই কেউ—'

'অত রাতে জিবেনডাঙায় জনমনিষ্যি থাকে না।' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে। 'কোনো ঘববাড়ি নেই এক দেড় মাইলের ভেতর কোনোদিকে; মিশনটা অবিশ্যি আছে, জিরানডাঙার কশাইদের বস্তি-ধানজমি জঙ্গলের ওপারে।'

'বুঝেছি।' খানিকক্ষণ পরে সুনীতি বললে।

'কী বুঝেছ?'

'তিন কোযার্টারের হিসেবটা।'

'ও—' সিদ্ধার্থ আধ মিনিট পরে বললে তারপর হাঁটতে শুরু কবে বললে, 'ওব ভেতর হিসেব টিশেবের কিছু আছে? আমি ফেলে রেখেছিলাম। কিন্তু তোমরা সকলে মিলে ভাবাচ্ছ আমাকে।'

পিঠটা ধনুকের মত বেঁকে গেছে সিদ্ধার্থের-হাঁটতে গিয়ে; হাঁটছিল; বললে,'হিসেবের কিছু নেই। বেশি কথা ভাবতে গেলে মানুষ কাজ করতে পাবে না; আমি অবিশ্যি কথা ভাবি না-কিন্তু—'

সুনীতি হাত চোবানো গেলাসটা নিজের দিকে টেনে এনে বললে, 'কিন্তু তবুও কাজ করবার মানুষই ত তুমি-সে তিন কোয়ার্টারই হোক, কি তিন মাসই হোক। ওঁরা অবিশ্যি ভাবনা চিন্তা কবলেন-সুখী মানুষদের মত কাজের লাফালাফিটা কুললো না।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে যুক্তির কথায় ফিরে এসে সিদ্ধার্থ বললে,'রমা আমার ছাত্রী।'

'ঠিক। ছাত্র নয়।' সুনীতি বললে।

অযৌক্তিক বলেনি-চুরুট টানতে টানতে সিদ্ধার্থের মনে হল; যুক্তিটা একটা উসকে দিয়েছে খুব সম্ভব।

'তুমি কখন এলে সিদ্ধার্থ?' সরোজিনী পিসিমা আর টিনি প্রায় ধবধবে শাড়ি ব্লাউজের কিছু গন্ধ কিছু নির্গন্ধ কিছু স্বাদ নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে বললেন,'বিকেল থেকেই তোমার গলা পাচ্ছি-আসি আসি করে আসা হল না—'

সূচীপত্রে যান

'আমি বেলা দশটার সময়ই এসেছি পিসিমা। বসুন। বসো টিনি।'

সুনীতি উঠে দাঁড়িয়ে বললে,'বসো টিনিদি-আমি চকীতে বসছি।'

ডেক চেয়ারে বসে সরোজিনী বললেন,'তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে সিদ্ধার্থ?'

'হ্যাঁ, আমি পায়চারি করছি—' চুরুটটা নিভে গেছে বুঝি—পকেটের ভেতর ফেলে রাখল সে।

'ঘরে একটি বাতি নেই'—সরোজিনী বললেন।

কেরোসিন নেই।'সুনীতি বললে।

'মোম আছে?'

'আছে- খাওয়ার সময় জ্বালাব। এখন আলো চাই আপনার পিসিমা?'

'না। বেশ জ্যোৎস্না আছে। কী রান্না করলে এ-বেলা?'

'এখনো উনুন ধরাইনি-'

'এখনো না।'বাঁ চোখে সুড় সুড় করছিল, রগড়ে নিয়ে বললেন সরোজিনী, 'তোমাদের মাহিন্দার কী করছে?'

'সে বেশি মাইনের চাকরিতে চলে গেছে।' সিদ্ধার্থ বললে।

'মরণ আর কি! সেই যুদ্ধটার সময় থেকে কি যে আরম্ভ হল- বাসার মাহিন্দারিতে কোনো বাবুই টিকবেন না আর;ব্যাটারা সকলেই রাতারাতি বড় বড় কামিন টামিন হয়ে গেল। একটু ঠুক ঠুক করতে পারলেই মিস্ত্রি- বংশালের এঞ্জিনিয়ার- আরে বাবা রে বাবা-ষাট সত্তর আশি টাকা করে মাইনে সব;' সরোজিনী চলন্ত সিদ্ধার্থের কুঁজো পিঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গেরস্তের কাছে চাকর বাকরদের পাওয়া যাবে না আজকাল আর।'

'কি হবে তোমাদের রান্না সুনীতি?'

'ওবেলা ত ধানবাজের মাকে চাল আর আলু দিয়েছিলাম, পিসিমার উনুনে সেদ্ধ করে দিয়েছিল। এবেলা ভাত তরকারি হবে-ডালও হবে—'

'কিছু ভেজো' সরোজিনী বললেন।

'বড়ির টক করতে পার তেঁতুল দিয়ে;কিছু লাউ বা শশা কুচি কুচি করে দেবে,' টিনি বললে,'কিন্তু এখনো ত তোমরা উনুনই ধরাও নি।'

'আজ রাতের মত তোলা উনুনটা ধরিয়ে নাও—তোমাদের ত কয়লা আছে;হ্যাঁ?'

'না কয়লা ঘুটে কিছু নেই।'

'ও লাকড়ি—' সরোজিনী সুনীতির দিকে মুখ ফিরিয়ে কেমন যেন একটা সুস্থ তিলে টনটনে জড়িবড়ি দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়ে তুলে বললেন, 'এই শীতে বেশ শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে আছে; দেখতে দেখতে রান্নাবান্না হয়ে যাবে তোমাদের। ছোট উনুনটা জ্বালিয়ে নিও। না, রাত হবে নি টিনি। কটা বাজল সিদ্ধার্থ?'

'এই সাড়ে পাঁচটা হবে।'

'মোটে?' টিনি বললে।

'তা কার্তিক অঘ্রান মাসে বিকেলবেলা আর কোথায়। শুরু হতে হতেই রাত নেমে আসে।'সরোজিনী টিনিকে বললেন,'আমরা উঠতি পড়তি বেলা হিসেবে কাজ করি আলো অন্ধকার দেখে- সিদ্ধার্থরা ঘড়ির টাইম দেখে। নাকি সিদ্ধার্থ? ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ, রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে খাওয়া হবে না আমাদের; তোমাদের তখন জোড়া ঘুম হয়ে গেছে পিসিমা। রান্নাবান্না হয়ে গেছে তোমাদের? খাওয়া দাওয়া হল?'সিদ্ধার্থ চলার পথে পিঠের ওপর কথাগুলো সরোজিনী পিসিমাকে পৌছিয়ে দিতে বললে।

'না, খাওয়া হয়নি। রান্না বেশি কিছু না-ধানবাজের মার হয়ে এল প্রায়। শসার তরকারি আছে বড়ি দিয়ে, কাচঁকলা সেদ্ধ আছে, তেল আর মরিচ পোড়া দিয়ে মাখা হয়েছে, বেগুন ভাজা আছে, একটু আলু স্কোয়াস বীম দিয়ে তরকারি আমি নিজে বেঁধে রেখেছিলাম-অড়লের ডাল-হাত-গড়া রুটি—'

জলপাইয়ের টক একটু রাঁধতে বলে এসেছি আমি ধানরাজের মাকে-'টিনি বললে।

:চিনি পাচ্ছ কোথায় তোমরা?' সিদ্ধার্থ বললে।

'গুড় দিয়ে।' সরোজিনী বললেন।

'রুটি দিয়ে কি জলপাইয়ের টক ভালা লাগবে?' সিদ্ধার্থ বললে।'

'তা লাগবে মন্দ না। বেশ জমিয়ে করবে টকটা। বেশ টকও হবে মিষ্টি ও হবে—' সরোজিনী বললেন।

'তোমার ত ডায়বেটিস-মিষ্টি খাওয়া ভাল?'

'ডায়বেটিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি আমি আর কি। বুড়ো মানুষ মিষ্টি ছাড়া কি করে জলপাই খায়।'

জলপাই খাবারই বা দরকার কি—সিদ্ধার্থ ভাবছিল।

'ধানরাজের মা চমৎকার রাধেঁ জলপাই। যেমন টক, তেমনি মিষ্টি, তেমনি ঝাল—'

'ঝালও আবার?'

'উঃ উঃ উঃ-জিভ সিটিয়ে পুড়িয়ে কি যে আরাম। কিছু পাঁচ ফোড়ন থাকবে; ছিট মরিচ দিতে বলে এসেছি ধানবাজের মাকে—বেশ ছিঁড়ে কসিযে কসিযে—টকের মধ্যে। পদিনার চাটটা খাবে সিদ্ধার্থ?'

'তৈরি করেছ নাকি?'

'না আজ নয়—পদিনার শাক আজ আব কুড়োলাম কোথায। কাল তৈবি কবব ভাবছি—তেঁতুল আব লঙ্কা দিযে—পনের কুড়িটা কাঁচা লঙ্কা বেটে। খেয়ে বাবার নাম মনে থাকবে বটে তোমাব। খাবে?'

'হ্যাঁ, তা খাব বইকি,' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে,'কানখুসকিব কিনারে যেটুকু আঁটে-'

'এ্য ম্যা ম্যা মা'—সরোজিনী ভারি অভক্তি বোধ করে বললেন' 'কাব কান খুঁচেছ তুমি সেটা দিয়ে—'

'আরে বাবা রে বাবা, আরে বাবা রে বাবা টিনি বাঁ হাতের তিন চারটে আঙুলের হাড়ে টেবিলের কাঠে ঠক্ ঠক্ করে ঘা দিয়ে বললে,'কি যে আরম্ভ কবেছ তোমরা পদিনার চাটনি আর কানখুসকির কথা; এর পরে ও চাটনি খেতে গেলেই ওযাক করে উঠব বে বাবা! পদিনার চাটনিতে তুমি অত কাঁচালঙ্কা দিও না মাসিমা; মাদ্রাজীরা ওরকম খায—পাঞ্জাবীরাও। ঝাল দিও—তবে ছিট মরিচেব; আর মিষ্টি বেশ কসিযে দেবে—'

'সে ত জলপাইযের বকমফের হল বে বাপু, 'সবোজিনী গাযে পাতলা চাদর একটু আঁটো করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন; 'একটু শীত পড়েছে যেন এখন; জিভে নানারকম স্বাদ মাড়িযে দেখতে হয। টিনিব আছে ঐ ছিট মরিচ আর মিষ্টি দিযে কসিযে-আবে বাবা তা ত জলপাইযে হল-পদিনায ত তাই।'

'তোমরা সালাদ খাও না সুনীতি?' টিনি বললে।

'তোমবা খেতে আবম্ভ করেছ বুঝি? আমি একটা চুরুট খাব পিসিমা।'

'তুমি ত খেতে না চুরুট।'

'এই ধরেছি নতুন।'

'তা খাও; সুনীতির মত থাকলেই হল,' সবোজিনী বললেন,'আমি ওতে এখন আর দোষ ধরি না, চুরুট আজকাল সকলেই খায়-হিতেন বাবু ছাড়া। ছাতু অবিশ্যি চুরুট সিগাবেট খেতে গেলে কাসতে কাসতে দম ফিরে পাবে না আর-সটকাবে। চুরুটটা জ্বালিযে বাতাসটা টেনে কলজের ভেতর নিতে হয-এসব বুঝবে না কিছু ছাতু। তোমরা সালাদ খাও সিদ্ধার্থ?'

'ক্বচিৎ খাওয়া পড়ে'—সিদ্ধার্থ পকেট থেকে চুরুটটা বের করে বললে; চুরুটেব ছাই কালিতে পকেট একটু নোংরা হযে গেছে;'এবারে শীতেব তরকারি উঠলে খাব ভাবছি।'

শীতের তরকারি-মানে বাঁধাকপি পাতার জন্যে বসে আছ নাকি তুমি, শসা, আছে পেঁযাজ আছে, বিলিতি বেগুন পাওয়া যাচ্ছে-এই দিযেই ত চমৎকার সালাদ হয-'

'লেটুস পাওয়া যাচ্ছে, নেবু ত সব সময়ই আছে। কিছু নেবুর বস দিতে পার, কাঁচালঙ্কা অল্প কিছু কুচি কবে-আর পেঁযাজ কুচি-যত খুশি'—টিনি বললে সিদ্ধার্থকে, 'আমরা এ রকম মিলিযে ঘুলিযে খাচ্ছি অনেক দিন থেকে।'

'খেযো' সরোজিনী বললে, 'খুব ভিটামিন আছে সালাদে।'

'তোমরা অনেক জিনিস খাচ্ছ ত' সিদ্ধার্থ চুরুটটা জ্বালাবে কিনা ভাবতে ভাবতে বললে,'এত সব হজম হয়।'

'হজম না হলে মুর্খও খায নাকি?' সরোজিনী বললেন, 'খেযে পেট ভাঙলে জিভ তিতো হয়ে

সূচীপত্রে যান

যায়-কোনো জিনিস খেতে পারা যায় নাকি আর; আমাদের সেরকম না, আমাদের জিভে খুব জোশ।'

'মাসিমাকে এই ডায়বেটিসই খেল,' টিনি খানিকটা জোর দিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটু পিঠ ঝাঁকিয়ে পা দু'টো হাঁটুর কাছে ভেঙে একটু দম দিয়ে বললে,'না হলে মাসিমা সেই গল্পে আইবুড়িমার মত লোহার গুলিও হজম করে ফেলতে পারেন।'

'বাবা কি তুলনা।' সরোজিনী খুশি বিরক্ত নিম-বিরক্ত হয়ে বললেন,'না গো হজম টজম নয়-ঐ প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডটাই আমাকে শেষ করল। অপারেশন হতে পারে সিদ্ধার্থ!'

জ্বালি জ্বালি করে চুরুটটা জ্বালে নি সিদ্ধার্থ, পায়চারি করতে করতে বললে,'এই বয়সে এখানে অপারেশন চলে না-বাসমতীতে সেরকম ডাক্তার নেই।'

'কলকাতায় গিয়ে দেখলে হয় না?'

'কারো কারো এরকম বয়সেও অপারেশন করে কিছু সুবিধা হয়েছে বটে। কিন্তু না করাই ভাল, এত বুড়োরা গ্ল্যাণ্ডের অপারেশন করে প্রায়ই টেকে না।'

'তাহলে কি এই রোগাটা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে-যদ্দিন আছি? অপারেশন টপারেশন করে একটু ঝরঝরে হতে বসতে পারব না?'

সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে,'কাকাদের কাছে লিখে দাও-চেষ্টা করে দেখতে পার কলকাতায় গিয়ে।'

'না, ওসব আর হবে না'-পা-টা ভাল করে ছড়িয়ে নিয়ে স্যান্ডাল দিয়ে আস্তে আস্তে মেঝের মাটি ঘষতে ঘষতে সরোজিনী বললেন, 'যে কদিন আছি বাসমতীতেই থাকব এখন। কাল তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'বিলাসবাবুর বাড়িতে একটা মিটিং ছিল, 'সিদ্ধার্থ বললে, 'সেখানেই ছিলাম রাত দশটা অবদি-তারপর আমি—'

'ও হো হো বিলাসবাবুদের সেই হাসপাতালের কতদূর?' সরোজিনী ভুলেই গিয়েছিলেন সেই কথাটা, হঠাৎ মনে পড়তেই গবজে নড়ে চড়ে উঠে বললেন, 'তুমিই ত উদ্যোগ করে করছ?'

'আমি এখনো আছি এর মধ্যে; কতদিন থাকতে পারি বলতে পারছি না।'

'না রে বাবু, ছেড়ে দিও না। ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড চিলড্রেন্স ওয়ার্ড-না হয় অরফানস্ ওয়ার্ডের একটা কিনারে আমার আর টিনির জন্যে দু'টো ফ্রি বেড রেখে দিতে হবে তোমার বাবা-যে পর্যন্ত না আমরা মরে যাই—'

'সেই জন্যেই ত হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে আমাদের—' সিদ্ধার্থ চুরুটটা মুখের থেকে খসিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার নিজের জন্যেও একটা ফ্রি বেড রেখে দেব-অরফ্যানদের ঘরের এক কিনারে। টিনিকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি; শীত রাতে নিজের বিছানায় শুয়ে থেকে সমস্ত বাসমতীটাকেই একটা ওয়ার্ড মনে হয়?'

'তা হয়,' টিনি বললে, 'বেশ আরামও লাগে কম্বলের নীচে শুয়ে থাকতে থাকতে; তবে নতুন বড় ফ্লাস্কে এক ফ্লাস্ক চা থাকে বিছানার পাশে-মাঝে মাঝে আমার সেই দরকারি নার্স এসে মশারি তুলে পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে যায়-সেইটেই চাই। তা না হলে ছাই ফ্রি বেডের হদ্দ করেও কোনো সুখ নেই। হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেহাৎ ছেলেমানুষি মনে হতে থাকে।'

'চায়ের কথা বললে বুঝি সুনীতি?' সরোজিনী ভাল করে সমস্ত কিছুর খেই ধরতে না পেরে 'একটু চা হলে ভাল হত এখন' এ রকম একটা তৃষ্ণা তাড়নার নিঃশব্দ সংযমে ঘরের চারিদিকে একবার চোখ চালিয়ে নিয়ে তারপর সুনীতির মুখের ওপর সেটা স্থির করে বললেন।

'ঠিকই বলেছ সুনীতি' টিনি সিদ্ধার্থের দিকে তাকাতে গিয়ে সে পিছু ফিরেছে বলে পায়চারিটার দিকে তাকাতে তাকাতে বললে 'হাসপাতালের তুমি যে কোনো ওয়ার্ডই বল না কেন, যারা শীত রাতে আমেরিকান কম্বল মুড়ে যারা কনডালেন্স্ করছে তাদের সমস্ত সুখ সত্যিই মাঠে মারা যায় যদি নার্স এসে মাঝে মাঝে ফ্লাস্ক থেকে গরম চা না ঢেলে দিয়ে যায়—'

'হাসিমুখে নার্স হলে চলবে না,' সুনীতি বললে।

'নার্সের মুখের হাঁড়ি পাতিলের দিকে কেউ তাকাতে চায় না-সরোজিনী পায়ের গাঁটে গুড়লি ঘষে মশার সুড়সুড়িটা পিষে ফেলতে ফেলতে বললেন,'গরম গরম চা পেলেই হল।'

সূচীপত্রে যান

'ফ্লাস্কে ক'ঘন্টা চা গরম থাকে সিদ্ধার্থ?' টিনি খুব নির্দোষ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল। সুনীতির চোখ অনেকখানি জটিল। সরোজিনী মাসিমাকে জিরানডাঙার ফ্লাস্কের বৃত্তান্তটা বললে চোখ দু'টি তার কি রকম হয়ে উঠত বুঝতে পারছিল সিদ্ধার্থ; সম্প্রতি কিছু না বুঝে-বোঝবার কিছু রয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও না করে তিনি যেন দু'চার মুহূর্তের জন্যে চোখের তারা হারিয়ে ফেলে কুমড়ো বিচির মত তাকিয়ে আছেন।

'ফ্লাস্কে মোটামুটি আট দশ ঘন্টা চা গরম থাকে,' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে,'জিরানডাঙায় কসাইদের বস্তিতে কলেরার সময় প্রভাসবাবুর মেয়ে রমার কাছ থেকে আমি রাত আড়াইটার সময় একটা ফ্লাস্ক নিয়েছিলাম—সেটায় আরো অনেকক্ষণ গরম ছিল চা—'

'ও—রমার কাছ থেকে ফ্লাস্ক নিয়েছিলে তুমি' সরোজিনী বললেন 'হিতেন বাবু বলছিলেন কাল। রাত ক'টা তখন?'

'আড়াইটে।'

'তুমি একাই গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি। ছেলেরা ডিউটি দিচ্ছিল।'

'কে ছিল ও বাড়িতে?'

'রমা-আব অধিকারী মশাই।'

'আর কেউই না?' টিনি একটু থমকে-আস্তে আস্তে বললে। আগের মত সেই শান্ত সুব্রত সাক্ষীগোপালের মত চোখ নেই টিনিব-কিংবা সরোজিনীর; -সিদ্ধার্থ আস্তে আস্তে মাথা তুলে দেখল।

'অত রাতে জেগেছিলেন তাঁরা?' সবোজিনী বললেন।

'ঘুমুচ্ছিলেন প্রভাসবাবু। কি যেন লিখছিল রমা।'

'অত রাতে লিখছিল-সে কি।' সবোজিনী একটু বিব্রত হযে বললেন।

'সিদ্ধার্থ ডাক দিযে তাকে জাগায়নি।' সবোজিনী একটু বিব্রত হযে বললেন।

'সিদ্ধার্থ ডাক দিযে তাকে জাগায়নি।' যোগ দিযে বাকি মহিলা দু'টির দিকে তাকিযে সিদ্ধার্থেব পাযচারিটায নিববচ্ছিন্নতাব দিকে নিবিষ্ট হযে চেযে রইল টিনি।

বাইরে জ্যোৎস্না মাইল মাইল জাযগা জুড়ে এখুনি খুব নিঃশব্দ।

'তোমাকে হঠাৎ অত বাতে দেখে ভড়কে গেল ও? ফ্লাস্কটা চাইলে?'

'হ্যাঁ।'

'দিল তক্ষুণি?'

'আধ ঘন্টা তিন কোযার্টাব কথা হযেছিল।' সিদ্ধার্থ বললে,' হিতেন বাবু তখন বোধহয ঐ পথ দিযে যাচ্ছিলেন। আমি দেখিনি তাঁকে।'

সিদ্ধার্থের পাযচারিটার দিকে আর তাকাতে গেল না টিনি; কি করে এবকম ভাবে অনবরত হাঁটে লোক?- মনের ভিতর কি অস্বস্তি-অথবা শান্তি ও হতে পারে এক আশ্চর্য ধবনের-রয়েছে তাব।' কিন্তু যে প্রশান্তিই থাকুক না কেন দেখতে গিযে মাথা কেমন ঝিম ঝিম কবে ওঠে তাব।

বাইরেব ঠান্ডা জ্যোৎস্নার দিকে তাকাল সে।

'উঠবে মাসিমা?'

'দপ্তরিরা কোথায?' সরোজিনী বললেন।

'এখনো ফেরেনি।' সিদ্ধার্থ বললে।

'ফেরেনি? রাত ত হচ্ছে। চারদিকে কি ভীষণ নিঝঝুম। কোথায ওবা?'

'আসবেই।' হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধার্থ বললে।

'এক ঘন্টা দাঁড়িযে কথা, প্রভাসবাবু ঘুমেব থেকে উঠলেন না আর?' সরোজিনী বললেন।

'না।'

'জিরানডাঙায কলেবার ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা? কলেজের ছেলেবা ডিউটি দিচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, ছেলেরা ডিউটি দিচ্ছিল।'

'কলেরার চিকিৎসার জিনিস টিনিস হিসেব নিকেশ-ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা নিযে ওকে একটা অফিসেব মতন রাখতে বলেছিলে নাকি তুমি ওদের বাড়িতে?'

'না, তা কিছু বলিনি আমি; কোনো অফিসের দরকার ছিল না; একটা ফ্লাস্ক চাইতে গিয়েছিলাম।'

সূচীপত্রে যান

'চাইতে গিয়ে তিন কোয়ার্টার লেগে থাকলে সিদ্ধার্থ।' টিনি সিদ্ধার্থেব চোখ খুঁজে নিয়ে কথাটা বলতে চেষ্টা করে বললে; কিন্তু সিদ্ধার্থ ঘাড় ঝুঁকিয়ে হাঁটছে; তার চোখে কারুরই কোনো বকম সাধ লাগাবার সম্ভাবনা নেই।

'কিন্তু সুনীতির এজন্যে কিছু মনে করা উচিত নয়,'সরোজিনী বললেন,'ও সিদ্ধার্থের ছাত্রী। একটা বেডপ্যান বা ডুস বা ফ্লাস্ক চাইতে গিয়ে পাঁচটা কথা মানুষ মানুষকে বলবার জন্যে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে জিরোতে পারে অত রাতে-ওরকম অবস্থায়। ফ্লাস্কটা হাতে পেয়ে হুট করে যদি সটকাতো সিদ্ধার্থ তাহলে সেটা খারাপ হত। খুব ভাল করেছ। হিতেন বাবুরও যত কারবাব-এই মোদ্দা কথাটা বলতে গিয়ে নাশপাতির ঝুড়ি খুলি খুলি করে আঁশটে ডিমের চুবড়ি ছড়িয়ে বসলেন যেন কালকে রাতে আমার ঘরের ব্রাহ্মবন্ধুসভার ভেতরে। ফাটা এসেছে-বলেছ সিদ্ধার্থকে সুনীতি?'

'ফাটা কে?' সিদ্ধার্থ পায়চারির অনর্গলতাকে একটু জিরিয়ে আনতে আনতে বললে। বসবে সে কোথাও।

'ফাটা মহলানবীশ; বড় কমল বাবুব ছেলে।'

'ও—' সিদ্ধার্থ বসবার জন্যে একটা চেয়াব খুঁজে টেনে নিয়ে বললে, 'ফাটাকে দেখিনি অনেকদিন; কবে এল? ক'দিন আছে বাসমতীতে? কী বলে?'

'দিন দুই হল এসেছে।' সবোজিনীর পায়ে মশা সুড়সুড়ি দিচ্ছিল আবাব, একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,'থাকবে কিছুদিন বলছে; বড় কমল বাবুর জমিদাবিবও তদাবক কববে। খুব টাকা পিটছে কলকাতায় ফাটা। কিন্তু সেইবকমই আছে; খুব ভাল; ব্রাহ্মসমাজের দিকে টান আছে। কাল সাবারাত আমাদেব ঘবে ছিল।'

'ফাটাবাবু তোমাকে খুঁজেছিলেন সিদ্ধার্থ, 'টিনি বললে,'আজ ভোব না হতেই চলে গেলেন, কৈ সাবাদিনেব মধ্যে এলেন না ত আব বীরেনবাবু মাসিমা, আমি ভেবেছিলাম সিদ্ধার্থের সঙ্গে দেখা করতে খুবই আসবেন একাবার।'

'নানা কাজে ব্যস্ত-আজ না হোক কাল আসবে।' সবোজিনী ডান পাটা তুলে দু' হাত দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে বললেন,'মোটর সাইকেলটা হাবিয়ে গেল আবাব ফাটাব।'

'কি কবে হাবাল বুঝতে পারলাম না আমি।'

'চুবি গেল।' সরোজিনী বললেন।

'কোথ কে চুরি গেল বাইক।' সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা কবল।

'আমাদেব উঠোনে বেখে দিয়েছিল সাবাবাত' সরোজিনী ডান পা নামিয়ে বেখে বললেন,'ভোরবেলা চুবি গেল। আমি উপাসনা কবছিলাম-ফাটা গাইছিল—'

সবোজিনীব কথা শেষ না হতেই দবজাব কাছে সিঁড়িব নীচেব দিকে এসে দাঁড়াল একজন লোক; মাথার ওপব ভারী একটা মোট; সমস্তটা চটে জড়ানো।

'কে হে তুমি?' হকচকিয়ে বললেন।'

'বাবু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'কোন বাবু?'

'ব্রাহ্মসমাজে যে নতুন বাবু এসেছেন।'

'ফাটা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনিই—এক জেব কেবোসিন তেল পাঠিযে দিয়েছেন প্রফেসববাবুকে—সিদ্ধার্থবাবুকে— কেবোসিনেব ক্যানেস্তাবাটা ঘবেব ভেতরে বেখে লোকটি বললে,'কাল আসবেন তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা কবতে। আচ্ছা আসি—' কেউ কিছু বলবাব আগে হন হন কবে চলে গেল।

'কোথে কে তেল পেল ফাটা?' সিদ্ধার্থ বললে।

'ওর নানারকম কাববাব আছে। চোরাবাজার থেকে কিনেছে বলে মনে হচ্ছে না; পাবমিট পেয়েছে; সরোজিনী সুনীতির কাছ থেকে হাতপাখাটা চেয়ে নিয়ে নীচেব দিকে বাতাস করতে কবতে এ-ঘরের অল্প স্বল্প মশা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তেল আছে তোমাদেব?

'নেই অবিশ্যি—কিন্তু—'

'পাবেও না নচ্ছাব ফুড কমিটির কাছ থেকে—দু'তিন বোতলেব বেশি আসে। মাস্টাব মানুষ

সূচীপত্রে যান

লেখাপড়ার দরকার আছে ঢের। ক্যানেস্তারাটা রেখে দাও।' 'সিদ্ধার্থকে তেলটা রেখে দিতে বলছ বুঝি মাসিমা,' টিনি বললে, 'কিন্তু কাল রাতে ব্রাহ্মসভায় তুমি ত আরেক রকম কথা বলেছিলে।'

'কাল রাতে তারপর আমি অনেক ভেবে দেখেছি।'

'এখন তেল পেলে তুমিও নাও।'

'দরকার হলে সিদ্ধার্থের কাছ থেকে এক বোতল চেয়ে নেব—তা নেব। এটা পারমিটের তেল; ভালবেসে দিয়েছে ফাটা। আমরা সাহেবডাঙার ফুড কমিটির কাছে চাইতে গেলে তারা লাল কেরোসিন অবদি আমাদের দেবে না কালোবাজারে নাকে দড়ি দিয়ে না ঘুরিয়ে। সেটা ধানরাজের মাকে দিয়ে আমি করতে দেব না।'

'সিদ্ধার্থ তোমাকে একবার বেরতে হবে।' টিনি বললে।

'কেন?'

'কৈ, দপ্তরিরা এল না ত। সন্ধে উতরে গেছে—এখন আর বাইরে থাকা উচিত নয় শীতের সময়—ধানজমি জঙ্গলের দেশে। এটা ত সদব বাসমতী নয়।'

একটু শীত করছিল সিদ্ধার্থের, দু'পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'কেন, বাঘ টাঘ নামে নাকি শীতে?'

'এখুনি নামবে না, তবে কাল রাতে ফেউ ডাকছিল শুনেছিলাম। ভোঁদড় আছে, ভাব আছে, শেযাল টেয়াল আছে—'

'ও—টিনি—' সিদ্ধার্থ হেসে উঠে, 'কুড়ুমি আর দপ্তরি—ওবা কি বলে—'কইতর' গেবস্তের হাঁসমুরগি আর কইতরের সামিল বুঝি।'

'তা না হোক, তবু সে রকম ত প্রায়; কত বড় আব। তাছাড়া দপ্তরি আব কুড়ুনির কচি ঠ্যাং আর পাঁজব—কি রকম রিকেট ওদের। ভারি দুঃখ করে—' টিনি বললে, 'তুমি বুঝছ না সিদ্ধার্থ।'

'ঠিক চলে আসবে ওবা।'

'ওরা প্রাযই এর চেয়ে খানিকটা বাত করে আসে।' সুনীতি বললে।

'এখানে এক আধটা হাযনা দেখা যাচ্ছে নাকি—' টিনি বাইবেব জ্যোৎস্না ধানজমিব স্নিগ্ধ, কর্কশ, বিবাট ঢালাও নিঃশব্দতাব দিকে তাকিয়ে বললে।

'কোথায় সাহেবডাঙায? কে বলেছে?' সবোজিনী বললেন।

'আমি শুনেছি।' টিনি বললে।

'হাযেনা থাকলে—তিন চারটে ধানজমিব পেছনে—' সিদ্ধার্থ একটু ভেবে বললে—'কিন্তু দপ্তরিবা ত ওদিকে যায়নি—'

'কোন দিকে গিয়েছে তাহলে?'

কোন দিকে গিয়েছে বলতে পাবল না সিদ্ধার্থ। সুনীতিও টিনিকে আবছা মতনও একটা নির্দেশ দিতে পারল না। কেমন একটা খটকায বেধে টিনি নিশ্চুপ হযে বসে কথা ভাবছিল বাপেদের কথা মাযেদেব কথা ছেলেমেযেদের কথা—যে বকম হওয়া উচিত আব যা না হলে যে বকম হয সেই সব বাবা মা আব ছেলেমেযের পৃথিবীব চারদিকে ভাল ভাল কিছু কিছু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চোরাবালি আর বালুচরেব শীত ছোট্ট জাযগাটুকুব কথা। মাসিমা ও তাব জীবনও মাঝে মাঝে হাবিযে গড়িয়ে সেই সব অন্ধকারেব ভেতরে গিযে পড়ে—সিদ্ধার্থের পড়ে না অবিশ্যি—কি যে সিদ্ধার্থ যে আধারখণ্ড সত্যিই সূর্য তেমন একটা লোকায়তের কাছে—অস্পষ্ট আলোর ভেতর সব সময়ই চলেছে যেন সে। শুধু জানোযার টানোযাব নয—বাসমতীতে আজকাল খারাপ লোকজনও বেড়ে যাচ্ছে ঢের,' টিনি বললে, 'সাহেবডাঙাব এদিকটায আবো বেশি। এখনো দপ্তরিবা এল না—কোথায় আছে তাও ত বলতে পাবছ না তোমরা।'

' ছেলেধরা এসেছে নাকি টিনি?' সরোজিনী বললেন।

' ছেলেধরা ত সাহেবডাঙায বারোমাসই আছে।'

'আছে?'

'এই কার্তিক অঘ্রান মাসে বাড়ে। শুনেছি দু-চারটে নতুন দল এসেছে।'

'কৈ কোথাও ছেলে টেলে ধরে নিয়েছে শুনি নি ত—' সিদ্ধার্থ সাদাসিধে কথাবার্তার গলায় বললে,'কুড়ুনি বলছিল দপ্তরি কোথায চড়িভাতি করতে গেছে। কোন দিকে গেছে বলতে পাব সুনীতি?'

সূচীপত্রে যান

'আমি ওদের কোনো খবর টবর রাখি না।'

'এই ত সন্ধ্যা হল'সিদ্ধার্থ চুরুট মুখে দিয়ে সেটা নিভে গেছে টের পেয়ে বললে,'এখুনি ওদের আসবার কথা নয়।'

'এতক্ষণে এলে পাবত।' সরোজিনী বললেন।

'নিজের ছেলেপিলেদের জন্যে সিদ্ধার্থের কোনো দরদ নেই,'টিনি বললেন,'কাব জন্যে-কীসের জন্যে আছে তাও বলা কঠিন।'

'নার্সের জন্যে আছে।'সুনীতি বললে।

'কে নার্স?'সরোজিনী বললেন,'কোন নার্সের কথা বলছ তুমি সুনীতি?'

'ঐ যে বড় হাসপাতালটাব কথা বলা হচ্ছিল শীত বাতের-এই বাসমতী আর একটা ওযার্ড মাঝে মাঝে রুগীর বিছানার কাছে এসে ফ্লাস্কের থেকে গবম গরম চা দিয়ে যাবে নার্স—'

'ও—' সরোজিনী বললেন; মন তার অন্য দিকে ছিল;বিশেষ খুঁচিয়ে সুনীতির কথাব আসল তাৎপর্যটা ধরতে পারলেন না।

টিনিও অন্য নানাবকম কথা ভাবছিল। সুনিতির ইঙ্গিতেব সঙ্গে জিরানডাঙার বাস্তব ঘটনাটা মিলিযে জিনিসটাব ওপব আলো ফেলি ফেলি করে ফেলতে ভুলে গেল সে।

কেবলি সেই নার্স আর ফ্লাস্কেব একই প্রতীক ব্যবহার করছে যদিও সুনীতি -তবুও মনেব ভেতর জিরানডাঙাব কোয়ার্টার সম্বন্ধে ঝাঁঝ খানিকটা কমে এসেছে যেন সুনীতির-সিদ্ধার্থ টের পাচ্ছিল।

'দপ্তবিরা এইবারে ফিবে এলে পারত—' সবোজিনী হাতপাখাটা সারা গাযে গাযে চালিযে বুলিয়ে মশা উড়িযে দিয়ে বললেন, 'কেমন যেন ক্লান্তি লাগছে।'

'একটু শীত পড়েছে।' সিদ্ধার্থ বললে।

সিদ্ধার্থেব এই শীতটাকে তাড়াবার জন্যে নার্স আব ফ্লাস্কেব গবম চাযেব কথা এবাব আব পাড়তে গেল না সুনীতি।

'আমার পাতলা চাদবে মানাচ্ছে না—বালাপোষটা আনলে পাবতাম;তুমি ত ফযেলের ব্লাউজ পরে বসে আছ টিনি,শীত কবছে না তোমাব ?' সবোজিনী জিজ্ঞেস করলেন।

'এইবারে উঠবে নাকি মাসিমা।'

'ধানরাজের মাব কতদূর হল?'

'এখনো বাঁধছে—না হলে ডাক দিত।'

'বসা যাক'সবোজিনী গাযেব চাদবটা ভাল কবে এঁটে সেঁটে নিযে বললেন,'দপ্তরিরা এসে নিক,ওরা না এলে ধীরে সুস্থে ঘরে বসে খেতে ঘুমোতে পারা যাবে না বাবু বুড়ো বযসে-কোথায গেল-কী হল-কী করল-মন যেন ধর্ম টর্ম ছেড়ে ধর্মক্ষেত্রে ঘুবে মবছে বাবা-'

'মুবগি ধান খেযেছে,কোথায আব যাবে সবোজিনী পিসিমা।'সিদ্ধার্থ চুরুটটা জ্বালিযে নিযে বললে।

'কীসেব কথা বলছ?'

'দপ্তরিদের; -আসবেই-বাড়া ভাতের সময হলেই চলে আসবে। তোমাদেব ও ঘবে পৌছিয়ে দিই। না টিনি একাই পাববে পিসিমাকে আগলাতে?'

সুনীতি টেবিলেব ওপর এনে হ্যাবিকেনটা মুছে পরিষ্কার কবছিল,ছেঁড়া নোংরা তোযালে দিযে খুব ভাল কবে ঝেড়ে পুছে চিমনিটাকে বেশ ঝকঝকে কবে তুলল;চাঁদেব আলো পড়েছে চিমনিটাব ওপর।

'হ্যাবিকেনটার ভেতবে খানিকটা তেল আছে।' সুনীতি বললে।

'আছে? কতক্ষণ জ্বলবে?'

'ঘন্টা দেড়েক—' হ্যারিকেনের খোলটা ধবে একটু ঝাঁকুনি দিযে কেবোসিনেব শব্দে কান পেতে থেকে সুনীতি বললে।

'জ্বালো বাতিটা।'সিদ্ধার্থ বললে।

'এখুনি জ্বালবার কোন দরকার নেই।'

'আমি ভাবছিলাম উনুন জ্বালাবার সময হল হল বুঝি পাববে অন্ধকারে?'

'না,' সুনীতি চিমনিটা ফ্রেমেব ভেতর বসিয়ে ফেলতে ফেলতে বললে,'আজ আর রাঁধব না কিছু,আমাব খিদে নেই,ওবা কত বাতে ফেরে কে জানে- ফিবল ত না, তুমি টিনিদিব ওখান থেকে দু'টো

রুটি খেয়ে নাও। কাল লালকমলের বউ এলে কিছু পরোটা তরকারি রেঁধে দিলে খাবে ত তোমরা পিসিমা টিনিদি?'

'পরোটা তরকারি আমাকে খেতে দাও সুনীতিদি, বড্ড খিদে পেয়েছে—' সুকুমার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে বললে, 'বাঃ, তোমরা টিনিদি সকলে মিলে বেশ গুলতানি পাকিয়ে বসেছ দেখছি ঘরের ভেতরে। কী খেলে টেলে, পরোটা তরকারি? চা দিয়েছ টিয়েছ সুনীতিদি?'

'না দুধ নেই,' সুনীতি বললে 'চিনি ফুরিয়ে গেছে।'

'গুড় আছে? কাঁচা চা তৈরি করে দাও।'

'উনুন জ্বালানো হয়নি' সুনীতি বললে, 'স্টোভ আছে সুকুমার, কিন্তু কেরোসিন নেই—'

'আমাদের একটা অনেক দিনের পুরনো স্পিরিট স্টোভ আছে,' টিনি বললে, 'কিন্তু স্পিরিট কোথায় পাবে সুকুমার-সাহেবডাঙায় ত না।'

'বাসমতীতেও পাবে না,' সরোজিনী হাত পাখাটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'কেরোসিন স্পিরিট চিনি চাল দেশের হাড়মাংস চিবিয়ে গিলে খাচ্ছে ফুড কমিটি—'

'না' সুকুমার বললে, 'মীরমহলের ফুড কমিটি খুব ভাল, গগন বাবু সেক্রেটারি, সাহেবডাঙারটা নচ্ছার-এখানে আর লোক খুঁজে পেলে না তোমরা সিদ্ধার্থদা, রতিলালকে সেক্রেটারি রাখলে-সঙ্গে জুটেছে ক্ষেত্র বিশ্বাস আর নীরদ ঘোষ-তিনটাকে এক সিসু গাছের ডালে ঝুলিয়ে জিভ ক-হাত ক-হাত বেরিয়ে আসছে দেখে নিতে হয়। না বেরলে আমি টেনে বার করে পেটের সঙ্গে লাগিয়ে দেব জিভ।'

'সে কাজটা তুমি কেন করছ না সুকুমার। এখনি বেরিয়ে ক্ষেত্রটাকে কানে ধরে নিয়ে আসতে পার।' সরোজিনী কেমন যেন একটু জ্বলে উঠে অব্রাহ্মির মতন হয়ে পড়ে বললেন। এখন তার দু' চারজনকে নিয়ে একটু নিরিবিলিতে বসবার সময়-উপাসনা করবার জন্যে-ফুড কমিটি নিয়ে মাথা গরম করবার কথা নয়।

'তাকে তাকে আছি আমি সরোজিনীদি-রতি ক্ষেত্র নীরোদ তিনজনকেই সাহেবডাঙার জমিতে ফেলে একটু হাত পায়ের সুখ করে নেব,' সুকুমার সেগুন কাঠের বড়, শক্ত, টেবিলটার এক কিনারে উঠে বসে বললে, 'এ না হলে-বাসমতীতে বেঁচে থেকে সুখ নেই।'

'তুমি একাই তিনজনকে?' টিনি বললে।

'তিনটে বেড়াল সাহেবডাঙায় ঢুকে বনবেড়াল হয়েছে; বোনপো যে কাছেই আছে আর একটু নাবাল জমিতে না নামলে টের পাবে না। আসছে বেশ গোঁফ চুমড়ে ভাম ভাম বাঘের মত এগিয়ে আসছে-ওদের এই হয়ে এল আর কি।' সুকুমার সিদ্ধার্থ-সরোজিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, সাহেবডাঙায় ছিলাম আমি কয়েকদিন; ফেউদের সঙ্গে লাঠালাঠি হয়ে এসে ছিল আমার প্রায়-মীরমহলে ভাল বাড়ি পেয়ে চলে গেলাম-সেখানে গগনদা মহারাজ অশোকের মত চালাচ্ছেন ব্যাপারটা-বাসমতীতে এক গগন বাবুর সুনাম সব্বাই বলছে-'টিনি কিছুটা খুশিতে উসকে উঠে বললে, 'সত্যি খুব ভাল কথা সুকুমার। শুনে খুব ভাল লাগছে আমার।'

'গগন বাবু ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি?'

'পাজিদের সঙ্গে কাজ করতে হয়-সেই জন্যেই মাঝে মাঝে দমে গিয়ে ছেড়ে দেবার কথা বলেন; ছাড়বেন না, তাহলে গগন বাবুর কাছার কাপড় ধরে টেনে রাখবে গেরস্তরা। উনি ত মীরমহলের বাবা হয়ে আছেন।'

'তুমি একটু ব্রাহ্মসমাজ ঘেষা সুকুমার; সেই জন্যেই হয়ত গগন বাবুকে একটু বেশী ভাল লাগছে তোমার।'

'তা বলতে পারেন সরোজিনীদি—'

'যা হোক, ক্ষেত্ররকে মারতে যেও না,' সরোজিনী ভাবুক গাইয়ে সুকুমারকে দেখতে চায় ষণ্ডাটাকে না-সেইভাবে চোখ ছেড়ে স্নিগ্ধ করে এনে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে এনে বললেন, 'রতিকেও না-নীরদকেও না না-ওরা মানুষ নয়; সাহেবডাঙা বাসমতীর ফুড কমিটির বাঙালির কাছে বাঙালির যা পরিচয় দিচ্ছে তাতে জাতি হিশেবে আমাদের মরে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ওদের মেরে কী হবে, তাতে কোনো লাভ নেই—'

সিদ্ধার্থ চেয়ারে বসে ছিল। সুকুমার চেয়ার থেকে নেমে তার সমস্ত লম্বা জোয়ান শরীরটা খাড়া করে

সূচীপত্রে যান

ঘরের ভেতর-এ ঘরটা অনেকখানি লম্বা ও চওড়া,জিনিসপত্র বিশেষ কিছু না থাকাতে বেশ ফাঁকা,খুব সুবিধা পায়চারি করবার পক্ষে,পুরুষদের খুব লোভ হয় হেঁটে বেড়াতে-হাঁটতে হাঁটতে বললে,'আচ্ছা তা দেখা যাবে সরোজিনীদি। তুমি সাহেবডাঙার ফুড কমিটির সেক্রেটারি হলে না কেন সিদ্ধার্থদা?'

'কোনো কাজে ঢুকতে ইচ্ছা করে না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'হাসপাতাল নিয়ে ত আছ।'

'বেশী কাজে এক সঙ্গে হাত দিয়ে সুবিধা করতে পারি না; হাসপাতালে কি হয় না হয় সেইটেই দেখছি এখনো।'

'নাইট স্কুলও ত করছ।'

'মীরমহলে;--সেখানে যাইনি অনকদিন,' সিদ্ধার্থ বললে, 'বনচ্ছবিরা চালাচ্ছে।'

'ছবি এসেছিল কাল-বিশাখাও এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে সিদ্ধার্থ।'

সরোজিনী বললেন।

'কী দরকারে এসেছিল? বললে?'

'না। অনেক রাত অবদি ছিল।'

'অনেকদিন দেখা হয়নি বনচ্ছবিদের সঙ্গে,' দপ্তরিটা এখনো এল না অনুভব করে সিদ্ধার্থ বললে,উঠবে উঠবে ভাবছিল, উঠে পায়চারি করবে ঘরের ভেতর? সুকুমার করছে। 'বোধ হয় নাইট স্কুল সম্পর্কে কিছু বলবে আমার কাছে। ওটা টিকছে না-না কি হে সুকুমার-তোমাদের মীরমহলের ইস্কুলটা?'

'আমি খোঁজ নেই নি,শিগগির।'

'বনচ্ছবিদের সঙ্গে দেখা হয়?'

'না।'

'কাছেই ত থাকে।'

'যে যার ধান্দায় থাকে মানুষ আজকাল,কে কার সঙ্গে দেখা করবে?' সুকুমার একটু গম্ভীর হয়ে বললে, 'হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাত ডিঙিয়ে এসেছিল ত তবু বনচ্ছবিরা সিদ্ধার্থ সেনের সঙ্গে দেখা করতে।'

'একটা ফ্লাস্ক কেনা দরকার।' সুনীতির একটা পরিত্যক্ত খেই ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে চড়িয়ে সম্পূর্ণ একটা নতুন পদার্থে দাঁড় করিয়ে টিনি বললে। কেমন একটা বিসদৃশ হাসি এক ফোঁটা লেগে রয়েছে টিনির ঠোঁটের এক কিনারে। সুনীতি অন্যমনস্ক হয়ে ছিল,চাঁদ আছে বটে,কিন্তু আকাশ ভরা মেটে রঙের মেঘে চাপা পড়ে গেছে,চারদিকটা কেমন ঘোর ঘোর হয়ে গেছে তাই, হ্যারিকেনটা জ্বালাবে কিনা ভাবছিল।

সরোজিনী বুঝলেন না কিছু,বললেন,'ফ্লাস্ক কেনার কথা বলছে কেন টিনি? আমাদের ত চব্বিশ ঘন্টা গরম জল লাগে না।'

সুকুমার হাঁটতে হাঁটতে আরো অনেকখানি অজ্ঞের মত বললে—'ফ্লাস্ক কি হবে টিনিদি? হঠাৎ ফ্লাস্কের কথা বলল কোথাও চড়িভাতি করতে যাবার ইচ্ছা আছে নাকি। ঝড় জল নেই এখন আর,কার্তিক অঘ্রান মাস পড়ল-চড়িভাতি করে সুখ আছে এখন।'

শুনে হাসিটা পেকে উঠল টিনির ঠোঁটে।

সুনীতিও শুনছিল,কিন্তু জিবানডাঙার রমার ফ্লাস্কের সে প্রতীকটা কাটিয়ে উঠেছে এখন তার মন-সেটাকে এখন আর ব্যবহার করার দরকার নেই-প্রয়োজন হলে-পরে অন্য কোনো প্যাঁচ বা পরিভাষা কাজে লেগে যেতে পারে,কিন্তু এটা নয়,এটা দিয়ে সিদ্ধার্থের মনের আচ্ছন্নতা খুব সম্ভব একটুও টলিয়ে দিতে পারেনি সে।

পারেনি সেটা যে বুঝেছে সুনীতি-মনও যে সুনীতির অনেক দূরের চিন্তায় -দপ্তরিদেরও দূরের পটভূমি পেরিয়ে আরো অ-বাক নির্লক্ষোর ভেতরে দানা বেঁধে প্রায় শীত বরফ হয়ে এল-সুনীতির মুখের দিকে তাকিয়ে দু-একবার বুঝতে পারছিল সিদ্ধার্থ।

'না চড়িভাতি হবে না।' সিদ্ধার্থ বললে।

'ফ্লাস্ক দিয়ে কী করবে টিনিদি?'

'কি করবে-ছাই করবে,'সরোজিনী বললেন,'ভারি ফ্লাস্ক কেনবার শখ গজাল টিনির।'

'আমি বাসমতীর সদরে আর একটা নাইট স্কুল খোলার চেষ্টায় আছি সুকুমার-পুলিশ লাইনের থেকে

কিছুটা দূরে,মেডিকেল স্টোর আর জুতোর দোকানগুলোর পেছনে-খেলাৎবাবুদের কম্পাণ্ডে। খেলাৎবাবুরা কেউ নেই এখন আর বাসমতীতে,পাট উঠিয়ে কলকাতায় চলে গেছেন সব. তাদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে তাদের বড় কাঁচারি বাড়িটা পেয়েছি—'

'কি বলছ সেন,অত বড় কাছারি বাড়িটা ছেড়ে দিল?'

সুকুমার একবার চোখ ঘুরিয়ে সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে বললে, 'খেলাৎ ত খুব দিলখোলা মানুষ নয়।'

'এক সঙ্গে পড়েছিলাম আমরা। আমার এক আধটা কথা শোনে এখনো।'

'বাসমতীতে ফিরবে না ওরা?'

'না। কলকাতায় মস্ত বড় কারবার সরিয়ে নিয়েছে। জমিয়ে বসেছে।'

'এখানকার ঘরদোর বিক্রি করবে নাকি সব?'

'না,মাঝে মাঝে খেলাৎ নিজে আসবে; কতবড় জমিদারি পড়ে রয়েছে বাসমতীতে—ঝাউডাঙায়, জলজিবানিতে; সিদ্ধার্থ বললে,'এ নাইট স্কুলটা ঢের বড় হবে;একেবারে সদরের মধ্যিখানে-তোমাকে রোজ পড়াতে হবে একঘন্টা করে—'

সুকুমার একটু আবছামনা ভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'না সেন,দরকার হলে মীরমহলের নাইট স্কুলটা দেখব—'

'ওটা ত বনচ্ছবিরা দেখছে।'

'দেখছে।' সুকুমার হেসে বললে,'কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না ত ওটার। যে যাক গে আমি পুলিশ লাইন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে-বড্ড হাড়ভাঙা খাটুনি আমার কলেজে-তিনটে টুইশন আছে-দেখলে ত অবনী খাস্তগীরের রকমটা' সুকুমার হাঁটতে হাঁটতে হাই তুলে কুড়েমি ভাঙতে ভাঙতে বললে 'তুমি যদি সাহেবডাঙার ফুড কমিটির ভার নিতে পার তাহলে তোমার কথাটাও রাখব আমি-পড়াব গিয়ে তোমার সদর নাইট ইস্কুলে—'

সিদ্ধার্থ চুরুটটা তুলে দেশলাইটা পকেটে না পেয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে,'জান ত তুমি সব,জেনে শুনে আর বলছ কেন,এক মীরমহল ছাড়া বাসমতীর আর কোনো ফুড কমিটির পঞ্চাশ হাত দূরেও গিয়ে কোনো ভদ্রলোক দাঁড়াতে পারে—'

সিদ্ধার্থ দেশলাইটা খুঁজে পেয়ে একটা কাঠি জ্বালিয়ে নিয়ে বললে,'আমাদের উঠোন থেকে ভোর রাতে ফাটার মোটর বাইকটা চুরি গেল-কি করে যায়? কে নেয়? কতগুলেও ভদ্র শয়তান জুটেছে। স্বাধীনতা আসছে আমাদের দেশে;এলে একটা খুব বড় পরিবর্তন হবে সুনীতি তাই ভাবে, টিনিও,সরোজিনী পিসিমাও,তুমিও।'

সিদ্ধার্থ চুরুটটা জ্বালাতে গিয়ে সরিয়ে রেখে বলল, কিন্তু আমি জানি, বাড়াবাড়ি কিছু হবে না। এত পচে গেলে গ্যাংগ্রিনের সার্জনার সহজে কিছু করতে পারবে না। তাছাড়া সার্জেনদের নিজেদেরই ত সব চেয়ে বেশী গ্যাংগ্রিন হল- এদের পেছনে দু' চারশ বছরের স্বাধীনতার কোনো স্পষ্ট সুস্থ ইতিহাস নেই।'

মোটর বাইকটা ভোর রাতে চুরি গেল বুঝি।পুলিশে খবর দিয়েছ তোমরা?' সিদ্ধার্থকে বললে সুকুমার ।

'ফাটার সঙ্গে দেখা হয়নি। নিজে কিছু খোঁজতলব করেছে নিশ্চয়ই।'

'আমি কাল ঘুমের চোখে ভাল করে দেখতে পারছিলাম না ওকে, একবার দু'মিনিটের জন্যে জেগেছিলাম'।

'কে?'

'বড় কমল বাবুর ছেলে।'

'ও—' সুকুমার হাঁটতে হাঁটতে বললে,' ওঁর মেয়ে ত খুব কালীর সাধিকা হয়েছে শুনলাম- ওঁর আর এক ছেলে আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী—সাধকও—তিনিও কালীর সাধক খুব সম্ভব। বড় কমল বাবু ত ব্রাহ্ম ছিলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ একশ বার।' সরোজিনী যেন কোনো একটা শেষ আশ্রয়কে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে কালীর সাধক রামপ্রসাদের মতনই একান্ততাই—কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম এক প্রতীকে বিশ্বাস করে প্রসাদী গানের মত সুরে উছলে আছড়ে উঠে বললেন।

'ফাটাবাবু নিজেও ব্রাহ্ম?'

'এখন পর্যন্ত আছে।' এবং থাকবে হয়ত বিশ্বাস করে টিনি আস্তে আস্তে বললে।

'এ কেমন না— ফাটা' সুকুমার বললে, কমল বাবু নাম দিয়েছিলেন?'

'খুব সম্ভব কমল বাবুর স্ত্রী স্বর্ণদি নাম রেখেছিলেন।' ছোট কমল বাবু, নাকি সরোজিনী নিজে, নাকি চক্রবর্তী মশাই, নাকি চক্রবর্তী গিন্নি-কে রেখেছিলেন নাম-কেনই বা রেখেছিল-অনেক আগের অন্ধকার কুয়াশার হিজিবিজির ভেতব থেকে স্মরণ করতে চেষ্টা করে সরোজিনী বললেন।

'ভাল নাম কি?'

'নীরেন মহালনবীশ?'

'কোথায় আছেন আজকাল?'

'ফাটা সমাজে—আশ্রমবাড়ির একচালা দালানটায় আছে;—থাকবে কয়েকদিন।'

'আমি যাব দেখা করতে। এই ক্যানেস্তারাটা কীসের?'

'কেরোসিন আছে এর ভেতর।'

'ভর্তি? কোথায় পেলে এই অমৃত?'

'ফাটা পাঠিয়েছে।'

'কেরোসিনের কারবার?'

'না। তবে কারবাবি মানুষ,' সিদ্ধার্থ বললে, ভোবেবেলা আমাদেব এখানে ওর মোটব বাইকটা খোযা গেল- পুরিয়ে দিতে সন্ধ্যাবেলা কেরোসিনের ক্যানেস্তারা পাঠিযেছে।'

'তোমার চাই কেরোসিন সুকুমার—' কে যেন অন্ধকারের ভেতর থেকে বললে।

'বাসমতীতে কে না চায়,' সুনীতি বললে,' আমাদের তিন পরিবারের মধ্যে টিনটা ভাগ করে নেয়া যাবে।'

'তাহলে আলো টালো জ্বালিযে একটু পড়া টড়া যাবে,' সুকুমার অন্ধকারেব ভেতর থেকে একটা নড়বড়ে বেতের চেযার টেনে এনে বললে,' আলোব অভাবে পড়াশোনা ছেড়েই দিযেছি, অন্ধকারের ভেতব পড়ে থাকতে থাকতে কেমন ঘুমের অভ্যাস হযে গেলে। কাল রাতে কি আমি খুব বেশি ঘুমিয়েছিলাম সবোজিনীদি?'

টিনি বলল,' মাসিমাব ত ভয লেগে গিয়েছিল কাল—তোমার ঘুমেব বহব দেখে। ভেরামন খেযেছিলে কাল সুকুমার ক'টা? কি কবে খুঁজে পেলে ফাইল?'

'তুমি ত চেযারে বসতে পারবে না সুকুমাব, মচ মচ শব্দ হচ্ছে—ওটায গগন বাবু একবার বসে নিকেশ করে দিযেছেন'—সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি আমারটায এস।'

'বোসো সিদ্ধার্থ , টিনি বললে, আমারটায এস তুমি সুকুমার।'

'না টিনি আমি এখন একটু পায়চারি করব।'

সিদ্ধার্থ বললে—' আগেই উঠতাম—তবে লাইন ক্লিয়াব ছিল না, ক্লিযার করে দিযেছে সুকুমাব। ওকে একটা ভাল চেযার দিতে হয—আমাব এই জারুল কাঠেবটায় এসে বোস, ছাবপোকা কম হবে।'

'খুব বেশী কম না সিদ্ধার্থ' টিনি বললে, চেযাব টেযাব ফেলে তোমাব দিন-রাতেব উদোম পায়চারি দেখে সেটা বুঝতে পারছি আমি অনেকক্ষণ থেকে।

কোথায় পেলে ভেরামন তুমি সুকুমাব?'

'ভেরামন জার্মান ওষুধ,' জারুলের চেযাবে বসে সুকুমার বললে,' ওটা পাওযা যায না আজকাল- কলকাতা বোম্বেব চোবাবাজাবে অবদি কোথাও না—'

মাসিমাব তাকের আলমাবিব সব ওষুধ ত তুমি হাটকেছ ছ' মাস ধবে—'

'সেখানে ভেরামন আছে নাকি?' সিদ্ধার্থ বললে।

'আছে, তুমি জানতে না সিদ্ধার্থ? তোমাব দবকার?' টিনি জিজ্ঞেস কবল, 'মাথার না শরীরের ভেতর ব্যথা আছে কোথাও?'

'ব্যথা নেই আমার।'

'ঘুম হয় না।'

'ঘুম হচ্ছে।'

'তাহলে আর ভেরামন খেয়ে করবে কি?' সিদ্ধার্থের অসুবিধা হলে একটা ভাল জিনিস তাকে দেয়া যেত, কিন্তু এখন ফাইলটা একটু মাঠে মারা গিয়ে কাঁদছে অনুভব করে টিনি খানিকটা ক্লান্তি বোধকরে বললে,'কোথাও ব্যথা টনটনে অথবা ঘুম টুম না হলে আমাকে জানিও তুমি। খাঁটি র্জামানের ভেরামন রয়েছে আমার কাছে।'

'কাল সারারাত তুমি যে কি ঘুম ঘুমটা ঘুমোলে সুকুমার'; সরোজিনী হাত পাখাটা মাটির থেকে তুলে নিয়ে নীচে পায়ের দিকে বাতাস করতে করতে বললেন,' আমরা ভেবেছিলাম দু'টো বড়ি ত তুমি খেয়েছ নিশ্চয়ই।'

'ফুড কমিটির কেরোসিনের অভাবে আমার ঘুমের রোগ হয়েছে। সুকুমার শার্টের পকেট থেকে নস্যির শিশি বের করে বললে, বড্ড গেড়ে বসেছে। গগন বাবু আজকাল সাত আট বোতল কেরোসিন দিয়েও রোগ সারাতে পারছেন না। সাহেবডাঙায় থাকতে তিন বোতল মেটে পাওয়া যেত মাসে;ক্ষেত্রর বলত ওটা কেরোসিনই, লাল কেরোসিন, ভাল জ্বলবে, বোতলে কিছু ননু ফেলে নেবেন সুকুমার বাবু, আমি তেলটা ক্ষেত্রমণির মুখের ওপর ফেলে দিয়ে আসতাম। সেই থেকে সারারাত অন্ধকারে শুযে থেকে থেকে কেমন একটা ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার রোগ হযেছে আমার; কখনো মড়ার মত ঘুমোই, কখনো বিছানায শুযে শুয়ে নাইট শিফটে হাঁকড়াতে থাকি সারারাত; কিন্তু কিসেব শিফট—কোন ফ্যাক্টরি বলে দিতে পার টিনিদি—'

সুনীতি কিছুক্ষণ পরে বললে—'অনেকে তা রাতের বেলা বাইবে বাইরে চবে বেড়ায বাসমতীব মিউনিসিপ্যালিটির বাতি কিংবা সুবিধা বুঝে কোনো বাড়ির টেবল ল্যাম্পেব আলোয। তুমি বাড়ির বিছানায পড়ে থাক এত বড় প্রফেসর মানুষ হয়ে?'

'আমার চেযে বড় প্রফেসর ত সিদ্ধার্থদা।'

'সিদ্ধার্থ রাত বেড়াতে জানে।'টিনি বললে।

'আমাব ধাতে কুলোয না' সুকুমার বললে,' আমাবই মতন সেনেবই ধাত-তেতাল্লিশ বছব অবদি ঘরে বসে বসেই কাটাত, কিন্তু এই চুযাল্লিশে পড়ে কেমন একটা আত্মজিজ্ঞাসা এসেছে সেনের মনে; পলিটিক্স্ নেই, সাহিত্য নেই, তাস পাশা আড্ডা ইযার্কি ঘোটপাকানো অন্য প্রফেসবদের মত, থিসিস লেখা আমাদেব প্রফেসর তারিনীবাবু থাইসিসওযালার মত—কিংবা প্রিন্সিপাল গর্ভনিং বডি বা বাইরের নানা বকম লোকজনদেব মত দশরকম নষ্টামি ত্যাঁদড়ামি—কিছু নেই ত জীবনে;—এই সব অনেক বকম কথা চিন্তা করে বেঁচে থাকার মানে সম্বন্ধে নানারকম নিরেট প্রশ্নে সেনেব ভেতবটা ফুটো ফুটো হযে যাচ্ছে টের পাচ্ছি আমি—হাসপাতাল আব নাইট ইস্কুল তাই'—সুকুমার কেমন যেন একটা আক্ষেপ বোধকবে হাসতে লাগল, কিংবা তত্বভূষণ মশাইর উপনিষদের সংগ্রহগুলো—গুছিয়ে নিচ্ছে আজকাল সেন, দেখনি সুনীতিদি?—অথবা লুক্রোসিযাস'—সিদ্ধার্থ চমকে উঠে বললে, লুক্রোসিযাসের কথা কে তোমাকে বললে?'

সিদ্ধার্থকে এরকমভাবে উত্তেজিত হতে দেখেনি শিগগির টিনি; ফ্লাস্কের মত লুক্রোসিয়াসও যে কোনো জিনিস বা বই একেবারেই নয, একটা প্রতীক—সেটা টিনি জানে না, সুনীতি জানে না, সুকুমাব কি না জানে, এখনো বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

'ভেতরটা ফুটো ফুটো হযে যাচ্ছে সেনেব,' সুকুমাব বললে, কিন্তু সেই ফুটোগুলো কি মধুতে ভরে উঠবে মৌচাকের মতন একটা মস্ত বড় নির্মাণ শিল্পের পরিসমাপ্তির জন্যে অপেক্ষা করে—না থাইসিস হলে মানুষের কলজের ভেতব যে ছ্যাঁদা ছ্যাঁদা হযে যায—'

'তুমি বড় বোকাব মত কথা বলছ সুকুমার,' সবোজিনী ঝেঁজে উঠে বললেন, আমি জানি তুমি কাল রাতে নিজেই মর্ফিয়া ইনজেকশন কবে ঘুমোচ্ছিলে।

বড্ড বাজে—বোকার মতন কথা বলছ তুমি।'

মাসিমা বড্ড লটকে পড়লে তুমি দেখছি সুকুমারকে নিযে , ' টিনি বললে।

'ও কি বলছে বলুক,' সুনীতি বললে, আপনি ওকে মাঝখানে পড়ে বাঁধা দিচ্ছেন কেন? উপাসনা ও গান খুব ভাল জিনিস, কিন্তু কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটাও আমাদেব জানা দরকার। সুকুমার আভাস দিয়ে যাচ্ছে ভেতরের কথা পরে আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে। তারপরে সবকিছু মিলিয়ে দেখতে পারলে ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে থাকবে।'

সুকুমাকো এত ভালবাসেন সরোজিনী হঠাৎ তার ওপর কেন যে ওরকম খেপে উঠেছিলেন বুঝে উঠতে না পেরে পাকা আতার মত ক্ষীরের মত মমতায় নবম হয়ে বললেন,' আমার ব্লাডপ্রেসার খুব বেড়ে গেছে সুকুমার।'

'কত?'

'দু'শ—শোয়া দু'শ—তার ত এই প্রমাণ পেলে—তোমাকে এত ভালোবাসি, অথচ এই সব ছাই পাস বলে ফেললাম। বাগের মাথায় মেয়েমানুষের কথার কোনো অর্থ থাকে না। আমি জানি তুমি আমার ওপর রাগ করনি। এখানে কথা শেষ হল তুমি যাবে আমার ঘরে।'

'সোয়া দু'শ হল'সুকুমার একটু চিন্তিত হয়ে বললে।

'মাসিমাকে গান শোনাতে হবে আজ রাতে।' টিনি বললে।

'উদ্বোধনে বসবেন তারপরে গান, আবাধনে হবে তাবপবে গান,' সুকুমাব ৫তক্ষণে ঘনঘন বড় বড় কয়েক টিপ নস্যি নিয়ে বললে'সেটা ওর দু'শ শোয়া দু'শর দিক দিয়েও সুবিধা হবে না– আমাবও টুইশনে বেরুতে হবে।'

'কখন যাবে?'

'আটটা সাড়ে আটটার সময।'

'কটা বাজল সিদ্ধার্থ?'

'সোয়া সাতটা।'

'তাহলে উপাসনা পরে করব, টিনি আব আমি বসব,তুমি তাব আগে এমনি একটা গান শুনিয়ে যাবে আমাদেব।'

'আচ্ছা, দেখছি' সুকুমার বললে।

'তুমি তত্ত্বকথা বললে বেশ ভাল হয' সরোজিনী বললেন, খুব আবামের চোখের জল চোখ পর্যন্ত না পৌছে সবোজিনীব গলায় ঠেকে গিয়েছে যেন, স্ববটা ভারী এবং নিবিড়,' তুমি লজিকের দিকে যেও না। কোনো কিছু ছিড়ে খুঁড়ে দেখার চেষ্টার কোব না, সেটা বড্ড বেমানানো হয—যা বলবার তোমাব সামনেই বলছি আমি।কিন্তু তত্ত্বকথা যা ঈশ্বরেব কাছ থেকে পাওযা-কোনো একটা বইযেব থেকে পড়লে কিংবা নিজেব মনের থেকে বললে ভারি স্পষ্টতায উপলব্ধি করতে পারি আমি তোমার শক্তি।গানেব গলা তিনিই তোমাকে দিয়েছেন।'

সরোজিনী একটু চুপ কবে থেকে বললেন,'কিন্তু সিদ্ধার্থের কী হল না হল সেটা বোঝাবাব চেষ্টা কবে ভুল পথে যাচ্ছিলে তুমি। এটা সিদ্ধার্থ নিজে জানে,সুনীতি জানে তাবপব। আমাব অনুমান কবতে পাবি কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি কী বলছিলে না বলছিলে সেটা শোনবাব জন্যে সুনীতি গালে হাত দিযে তোমাব মুখের দিকে কি বকম বিভোর হয়ে তাকিয়েছে।'

সবোজিনী বললেন,'সিদ্ধার্থেব বিপদ।'

সুকুমাব তাকিযে দেখল সুনীতির বাঁ কানটা তাব নাগালের ভেতরে,অন্ধকারও জমছে বেশ,আকাশে খুব মেঘ কবেছে বলে—সবোজিনী আবছার ভেতব থেকে কিছু দেখবেন না হযত—সিদ্ধার্থ আস্তে গলা বাড়িযে কানে কানে বললে,'সুনিতিদি,এই রেটে যদি উনি কথা বলেন তাহলে ব্লাডপ্রেসার আড়াইশ হবে না?'

'হয়েছে বোধহয এর মধ্যে।'

'কিন্তু কথাগুলোব মধ্যে বেশ টনক বযেছে যা হোক।'

'তাই ত দেখছি।'

'কিন্তু কী করা যায বল ত।'

'চট কবে কিছু একটা করা যায না,খানিকটা সুখী লোক, মানীও বটে।'

'কিন্তু এরকম কথা বলে যাবেন অনর্গল?'

'না এখুনি থামবেন,থেমে গেছেন ত।'

'দেখছেন নাকি আমি কানে কানে কথা বলছি তোমার?'

'তাকিয়ে আছেন মনে হচ্ছে—'

'তাহলে সবে পড়ি এবারে—'

সূচীপত্রে যান

'থামো, তোমাকে এক কাপ চা দেয়া হল না সুকুমার।'
'কিন্তু রাতে কানে কথা বলে কি চা খাওয়ানো যায় সুনীতিদি?'
'কাল রাতে সত্যি ঘুমিয়েছিলে তুমি? আমার মনে হল আড়ি পেতে শুনছিলে সকলের কথাবার্তা—'
'কাল রাতে আমি ঘুমিয়ে খুব সুখ পেয়েছিলাম। কারো কোনো কথা কানে যায়নি আমার।'
'ভেরামন খেয়েছিলে? সত্যিই?'
'না গো-এমনিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সে-কি যে গভীর ঘুম'—
'তাই ত কারো ভেরামনের সাধ্যি আছে—অমন ঘুম পাড়াতে।'
'তাড়াতাড়ি কয়েক কাপ চা করে দাও না সুনীতিদি।'
'এক কাপ দিতে পারি—ওরা সব চলে গেলে।'
'এক কাপ শুধু? সেন কি দোষ করল?'
'সেন একটু সন্ন্যেসী গোছের মানুষ।'

ঢের মেঘ এসে পড়ে সমস্ত আকাশ ভরে আগেকার মেগগুলোর সঙ্গে আরো অনেক কালি ছুঁড়ে দিয়েছে। সমস্ত আকাশটা যে কালো—শ্রাবণ রাতের এরকম অদ্ভুত অন্ধকাব দেখা যায় না বড় একটা। চাঁদ আছে—ডুবে যেতে এখনো কিছু দেরি; কিন্তু মেঘকালিমার কোনো একটা দিক ছুঁড়ে অল্প একটু ঝিকিমিকি সৃষ্টি করবার কোনো উপায় নেই এখন তার—খুবই চাপা পড়ে গেছে বেচারী; তাকিয়ে দেখছিল সুকুমার। সুনীতি কানেব দিকটা একটু বাড়িয়ে রেখেছিল—হয়ত আরো দু'একটা কথা শোনাবার জন্যে। কিন্তু মাথাটা সবিযে নিযেছে সুকুমার। চাঁদটা কোথায় আছে অনুমান করতে গিযে অন্তহীন আড়ম্বব দেখছিল।

'সুকুমার,' সরোজিনী বললেন, 'সুনীতির সঙ্গে শেষ হয়েছে তোমার কথা?' ও তাহলে এত আবছা টাবছার মধ্যেও মাইনাস ফাইভ চোখ নিযে যা সব দেখে নিয়েছেন সরোজিনী। 'একটু চা-টা হতে পাবে কিনা কথা হচ্ছিল সুনিতীদির সঙ্গে।'

'চা এখন হবে না,' সরোজিনী বললেন, 'দুধ চিনি থাকলে আগে আগেই চা করে দিতে সুনীতি। উনুনও ত জ্বালানো হযনি ওদের। কী বলেছিলে সুনীতিকে?'
'এই চাযের কথাই।'

'খোলাখুলি বললেই ভাল হত'—সরোজিনী হাতপাখাটা মাটিব ওপব বেখে বললেন, 'আমবা শুনলে সাহায্যই করতে পারতাম; সুনীতিব কানেব পোকা খসাবার কোনো মানে হয না।'
'বড্ড অন্ধকার হযেছে,' টিনি বললে।
'ঝড় জল হবে—'
'উঃ একেবাবে ভেঙে আসছে আকাশ—একবার শুরু হলে কাণ্ডই বাঁধাবে দেখছি।'

'না জল টল হবে না।' সিদ্ধার্থ আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে বললে 'তবে রাতটা খুব ঘুটঘুট্টি হয়ে থাকবে—সারারাত—যা দেখছি-সুনীতি,' সিদ্ধার্থ বললে 'হ্যাবিকেনটা জ্বলে ত সুনীতি।'

'এ মাসে দু' বেলাই তোমাকে সমাজে গান গাইতে হবে সুকুমার—কাল রাতে আমার ঘরে ব্রাহ্মবন্ধুসভায এ মাসের প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলেছেন গগন-বাবু।' সরোজিনী আস্তে আস্তে বললেন।
'কতগুলো গান আমি নিজে ঠিক করে নেব সরোজিনীদি—না আপনি বেছে দেবেন।'

'তুমি নিজেই পারবে সব। তোমার বাছনির ওপর কোনো কথা বলাবার নেই আমার। টিনি সুকুমারকে একটু গুড় দিয়ে চা কবে দিতে বলে না ধানবাজের মাকে। তুমি চা খাবে সিদ্ধার্থ?'

'না—আমার কেমন যেন গ্যাসস্ট্রাইটিসের মতন হয়েছে। তোমাকে বাতি জ্বালাতে বলেছিলাম সুনীতি।' সিদ্ধার্থ হাঁটতে হাঁটতে বললে।

'গ্যাস হযেছে পেটে,' সুকুমাব বললে 'চা খাব না কেমন যেন অম্বল ঠেলে উঠছে বুকে। এই বার আমার টুইশানিতে নেমে পড়তে হয। টিনিদি বাইরে কেমন অন্ধকার দেখছ—অথচ রাত্ত দশটা বারটা অবদি জ্যোৎস্নার জোয়ার ছোটাবার কথা ছিল। হ্যারিকেনটা জ্বালিযে ফেল সুনীতিদি—আমার কোনো টর্চফর্চ নেই—তোমাদের আলোটা নিয়েই চলে যেতে হবে আজ। তোমাদের আলোর দুঃখ নেই—এক ক্যানেস্তারা তেল পাঠিযেছেন ত ফাটা মহলানবীশ। দরজা জানালা বন্ধ করে ঐ টিনটার দিকে তাকিযেও সুখ। হ্যারিকেনটা জ্বাল জ্বাল সুনীতিদি। আমার জিরানডাঙায যেতে হবে।'

'পড়াতে?'

'হ্যাঁ গো—'

'ওরে বাবা—সে ত তিনমাইলের পথ।'

'সেই জন্যেই ত আলো চাচ্ছি এই ঘুঘুট্টি রাতে।'

'আজকেব টুইশনটা বাদ দাও সুকুমাব। কিছু হবে না,আব একদিন পুষিয়ে নেবে,'সবোজিনী বললেন,'জিবানডাঙা কি এখানে,মাঝরাতেই তুমি ঝড় জলে পড়ে যাবে।'

'না,তা হবে না,খুব পা চালিয়ে যাব। ছেলে হলে তবুও হত,আমাব নিজের বাড়িতে পড়াতাম,কিন্তু মেয়েদের পড়াতে হচ্ছে—কথা দিয়ে এসেছি মেয়েটিকে।'

সুনীতি বাতিটা জ্বালাচ্ছিল।

সরোজিনী একটু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'জিবানডাঙাব মেয়ে,কে গা?'

সিদ্ধার্থ পাযচাবী করতে করতে চোখ তুলে একবাব সুকুমারেব দিকে তাকাল। তাব পব ঘাড় গুঁজে আত্মস্থতার ভেতব ডুবে গেল। 'নির্মলা দত্ত।' সুকুমাব বললে।

'ও' সবোজিনী যেন মাকড়সাব জালটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন,'তিনি ভেবেছিলেন অন্য আর একজন মেয়েব কথা জিবানডাঙাব কশাইদেব বস্তিটার কাছে—ক্যাথলিক মিশনটার কাছে—'

'তুমি ভুল করছ সুকুমার' টিনি বললে 'ওটা জিবানডাঙা নয,পাশাবতী, জিবানডাঙার কান ঘেষে অবিশ্যি পাশাবতী; একেবাবে কিনাব দিয়ে যে জাযগাটা তাকে কেউ কেউ জিবানডাঙা বলে বটে,কিন্তু ওটা জিবানডাঙা নয।'

হ্যাবিকেনটা জ্বালিয়েছে সুনীতি।

'দপ্তবিবা কি এসেছে?'

'না আসেনি—এখনো।'

'এখনো না?' কি সব্বোনাশ। এই ঝড় যে ভেঙে পড়ল বলে। তোমাবও পাব বাবু সিদ্ধার্থ—এই হ্যাবিকেনটা নিয়ে এক্ষুণি বেবিযে পড় ত' বলতে বলতে সবোজিনী জল ও আগুনের একটা আশ্চর্য শবীবপটের মত উঠে দাঁড়ালেন—কম আগুন,বেশী জল যেন,অথবা কম জল বেশি আগুন; সাদা কাপড়,মাথায সাদা কালো অবিবাম চুল—পেছনেব মেঘবাত্রি বিদ্যুতেব চেয়ে আলাদা একটা জিনিস খুবই,মানুষেব শবীবপাত্র থেকে উদ্ভূত; কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন যেন একটা দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়ে তোলে—সবাই যেন ক্লান্ত,বন্ধ,করুণাত্মক-অন্ধকাব সনাতনেব সঙ্গে এক;—এই বকম একটা ভাব জেগে ওঠে মনে।

'কুড়ুনিবা এখনো ফেবেনি সুনীতিদি?'

'না, টিনি বললে,'কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখত।'

'অদ্ভুত বিশেষ কিছু নয'—বাইবের দিকে তাকিয়ে সুকুমাব বললে।

'সিদ্ধার্থ পাযচাবি কবছে আব চুরুট টানছে। এও কবে মানুষ। কিন্তু সিদ্ধার্থেব মত এত নিবিবিলি হতে পাবে?'সুকুমাবেব দিকে তাকিয়ে টিনি বললে,'এই বকম হয নাকি?'

'সেন এখন বাবা হয়েছে,' সুকুমাব কথাটাকে ঘুবিয়ে নিয়ে বললে,'আমাব নিজেব বাবাব কথা মনে পড়ে; দপ্তবিদেব মত এইবকম কবতাম আমবা; বাবা লেপমুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতেন। ভুশো কাকা বলে আমাদেব এক কাকা ছিলেন—তিনিই কানে ধবে হিঁচড়ে নিয়ে যেতেন—যেখানেই থাকি না কেন। আমাদেব জন্যে বোজ বাতে ডিটমাব লণ্ঠন হাঁকড়ে তাকে ভুশণ্ডিব মাঠে ছুটতে হত বলে লোকে তাকে ভুশো কাকা বলে ডাকত।'

'হতে পাবে তোমবা ঘাপটি মেবে পড়ে থাকতে, হতে পাবে তোমাব ভুশো কাকা ছিলেন,' টিনি বললেন,'কিন্তু মোটেব ওপর তুমি এটা যা বলছ সেটা গল্প হচ্ছে; সিদ্ধার্থ যা করছে সেটা ঠিক কবছে না।''

'আর কিছু করবার নেই সিদ্ধার্থের।' সবোজিনীর পাযে কোমবে খিল ধবে গিয়েছিল অনেকক্ষণ বসে বসে,একটা খুঁটির ওপর হাত বেখে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন।

'পাযচারি করা আর নিরিবিলি চুরুট টানা ছাড়া?' টিনি আস্তে আস্তে বললে। 'এই বকমই হয়ে পড়ে সব—তারপর টের পাওয়া যায় একদিন।' সরোজিনী পাটা যেন একটু নাড়তে পারছেন মনে করে

সূচীপত্রে যান

বললেন। কিন্তু হাঁটতে পারছেন না এখনো; খুঁটিটা আঁকড়ে আছেন।

'তোমার ভুশোকাকা লণ্ঠন হাতে ছুটে যেতেন—তোমার মা কী করতেন সুকুমার?' টিনি বললে।

'আমাব মা ত অনেক আগেই মরে গিয়েছিলেন,'সুকুমাব হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে টিনিব দিকে সেটাকে একটু উঁচু করে ধরে টিনির মুখের ওপর খানিকটা আলো ফেলে বললে।

'ও—সেই জন্যেই বুঝি তোমরা ধানজমি কুমোববাড়ি শেয়ালবাড়ি গিয়ে পড়ে থাকতে, মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ঘবে চলে আসতে?'

'তা বলা যায় না কিছু—' সুকুমাব পা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন।

'বলা যায না, তা ত দেখছি।'

ও—সেনদেব ব্যাপাবে একটা কিছু দেখছে বুঝি টিনিদি-ভাবতে ভাবতে সুকুমাব সবোজিনীর মুখেব দিকে তাকাল।

'তোমার মা চলে গেলেন,' হাঁটু কোমরেব থেকে হাত সবিয়ে শরীরটা সোজা কবে নিয়ে সরোজিনী বললেন,'তোমরা দূবে দূবে অন্ধকাবেব জমিজিরেতে গিয়ে পড়ে থাকতে বুঝি তাই। কিন্তু দপ্তবিবাও সে-রকম কবছে। নাও—এবার হ্যারিকেনটা নিয়ে এগোও সুকুমার,আমাদেবও পৌছিয়ে দাও।'

সবোজিনী বললেন।

'ঝড় হবে আজ?'

'হতে পাবে।'

'এক্ষুণি চেপে বৃষ্টি আসবে যেন মনে হচ্ছে।'

'বাবা বে এমন ঘুটঘুট্টি বাতে কোথায় বইল দপ্তবিবা।' সবোজিনী বললেন।

'চলুন—আপনাব পাযে খিল ধলেছিল দেখছিলাম,খিল না ঝিঝি?—

এইবারে হাঁটতে পাবছেন ত বেশ?'

হ্যাবিকেনটা নিয়ে চলে গেল ওবা।

সুনীতি দবজাব কাছে ডেক-চেযাবটায এসে বসল। অন্ধকাবেব ভেতব পাযচাবি কবতে গিয়ে হুঁচোট খাচ্ছিল সিদ্ধার্থ; টেবিলের কাছে জারুল কাঠেব চেযাবটায বসল; হাতেব এবড়োখেবড়ো চুরুটটা টেবিলেব ওপব বেখে দিল।

'টিনির কথাব কোনো উত্তব দিলাম না আমি।' সুনীতি বললে।

'টিনি কী বলেছে?'

'শুনেছ সব। নতুন কবে বলাব কিছু কথাগুলো নয।'

'টিনিব যা মনে আসে সেই কথাই সে বলে।'

সুনীতি বললে, ঠিক অত সহজে হলে, ভাল লাগত আমাব টিনিকে। খুব খাবাপ লাগে সে কথা বলা ঠিক হবে না। কিন্তু টিনিব নিজেব কথা বলে কী লাভ—যে কথাটা বলেছে সে তা টিনি নয, সেটা একটা কথা।'

খুব সম্ভব দপ্তবিদেব কথা, সুকুমাব যে হ্যাবিকেন নিয়ে চলে গেছে সেই কথা, ভাবছিল সিদ্ধার্থ, কেন সুনীতিব কথা শুনছিল সে—যদিও মনের নিবিষ্ট খণ্ডগুলো কাছে-দূবে অনেক দূব দিকে ঘুবছিল তাব।

'কথাব পেছনে কোনো সত্য বযেছে কিনা ভেবে দেখতে হবে।' সিদ্ধার্থ বললে।

'বাবো বছব পবে?'

'এক একটা সত্যেব কিনাবা কবতে অনেকদিন সময লেগে যায।'

'হযত তোমাব কাছে—কিন্তু টিনিব কাছে ত নয, আমাব কাছেও নয।'

'নয?' সিদ্ধার্থ টেবিলেব থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে,'কী সত্য পেলে?—সবোজিনী পিসিমা আব টিনি আমাদের এই বারো বছর সম্পর্কে যা পেযেছে—সেই রকম একটা কিছু?'

চুরুটটা জ্বালাল সিদ্ধার্থ। উঠে দাঁড়াবে ভাবল; উঠে পাযচারি কববে; কিন্তু ঘবে খুব বেশী অন্ধকাব জমেছে,মেঘেব চারদিককাব গাছপালাব ছাযার,চেযাব টেবিল খাট তেপযগুলো কেমন বিশৃঙ্খল হযে ছড়িয়ে আছে সব—কোথায কৌটো আছে ঠিক ঠাওব কবা যাচ্ছে না।

'ওদেব কথা শুনছিলাম আমি,' সিদ্ধার্থ বললে, 'সুকুমার যে ভুশো কাকাব গল্পটা ফেঁদে বসল—গল্প না

হিতোপদেশ? সেটাও শুনেছি। আমার মনে হয় আমাদেব সম্পর্কে ওবা যে যার নিজের সিদ্ধান্তে পৌছে গেছে। সেগুলোর ভেতবে সরোজিনী পিসিমারটা বেশি ঠিক না টিনিরটা না সুকুমারেটা বলতে পারছি না একটা কিছু সবেব ভেতরে থাকবে হযত;—বারো বছব কেটে গেছে আবো কযেকটা বছর কাটবে হযত।'

'আরো কযেকটা বছব?'

'বেঁচে থাকব আশা করছি ত।'

'আমিও বেঁচে থাকতে পারি, নাও পারি—কিন্তু তুমি জান সবোজিনীদির মতন আমিও একটা সিদ্ধান্তে পৌছেছি—সেটা যা আছে তাই ত আছে,তাই ত থাকবে। বেশি বা কম বেঁচে থাকার সঙ্গে তাব কোনো সম্বন্ধ নেই।'

'পিসিমাকে সবোজিনী বললে?'

'ওভাবে ডাকলেই সুবিধা পাই। সবোজিনী মানী লোক শুনলে কষ্ট পেতেন। কিন্তু তিনি ত নেই এখানে। ও ঘবে গিযে খেতে বসেছেন ওঁবা।'

'এখনো খেতে আবম্ভ করেছেন বলে মনে হয না; দপ্তবিবা ফিবে না এলে বসবেন না—' সিদ্ধার্থ চুরুটটা টেবিলেব ওপব বেখে দিযে বললে,'পিসিমাকে খুব একটা আশ্চর্য কিছু সাধিকা বলে মনে করি না আমি,কিন্তু তিনি অসাধু নন। আমাদের রান্না নেই আজ,মোটামুটি একটা কিছু ব্যবস্থা না করে নিজেদের পাট সাববেন যে মনে হয না আমাব । তাছাড়া দপ্তবিদেব জন্যে উদ্বেগ আছে।'

'তা থাক,ধানবাজেব মা আব দু'খানা বেগুন ভাজা দাও,' শুনছি ত আমি; পাতে দাও না কোথাও দাও সেটা অবিশ্যি বলতে পাবছি না।' সুনীতি হাতের কাছের দূরেব দিকেব দবজাটা পুরোপুরি খুলে দিযে বললে, 'ভাল-মন্দয মিলিযে আছেন এই বকম মানুষ; সেই ছাঁদেই টিনিও। ওবা আমাদেব কাছে থাকে বলে খুব বেশি বাতে—শীতে—ভালই লাগে আমাব; এব চেযে ভাল কিছু খুব সম্ভব ঘব সংসাব সকলেব ভাগ্যেই জোটবাব নয। এসব কথা ত হল—আমি সবোজিনীব সেই মীমাংসাটাব কথা বলছিলাম,সেটা বদলাবে না,আমাবটাও না; তুমি বলছ ভাঙাগড়াব ভেতব দিযে চলছে বলে তোমাব মীমাংসাব ঠিক রূপ তুমি এখনো দেখতে পাচ্ছ না—পবে দেখতে পাববে—হযত অনেক পবে; আমাব মনে হয এগুলো জ্ঞানেব কথা নয সুবিধাবাদেব কথা; নানাবকম সুবিধা বযেছে—সেগুলোকে খুঁজে বাব করে এখন কাজে লাগাবাব আপ্রাণ চেষ্টা চুযাল্লিশ বছবে। সুকুমাব সাবধান-টাবধান করে দিতে পাবে; সবোজিনী থামিযে দেন; সুকুমাব কানে কানে কথা বলছিল আমাব। বেশ ভাল লাগছিল। লুক্রেসিযাস কে?'

'লুক্রেসিযাস অনার্সেব পাঠ্য?'

'না।'

'তোমাব অনার্স ক্লাসের ছাত্রীব কথা এল কি করে তাহলে?'

সিদ্ধার্থ চুপ করে বইল।

'কোন ছাত্রী?'

'সুকুমাবেব এসব ইযার্কিব কোনো মানে নেই।'

'সুকুমাব কবিব কথাটা পাড়ল কেন?'

'সেটা সুকুমাব বলতে পারে।'

সুনীতি বললে, 'এত কবি থাকতে লুক্রেসিযাস কিন্তু বেশ বেছেই বেব করেছে সুকুমার; বেশ বামনামেব মত কাজ কবল দেখলাম।'

সিদ্ধার্থ বললে,'হ্যাবিকেন নিযে যাওযা আমাবই উচিত ছিল,সুকুমাব খুঁজে পাবে না হযত। এখনো আসছে না—বাইরে দিব্যি অন্ধকার হযে আছে—এই বকম অন্ধকারেই ভাল লাগে আমাব। পিসিমা ভেবেছিলেন ঝড় বৃষ্টি এখুনি লটকাবে,আকাশ দেখে সেই বকমই মনে হয; কিন্তু কিছু বলতে পারা যাচ্ছে না; সাইক্লোন হতে পাবে একটা—দেড়টা বেজে যেতে পাবে-'সিদ্ধার্থ টেবিলেব থেকে চুরুটটা তুলে নিযে উঠে দাঁড়িযে ঘবেব চেযাব টেবিলগুলো এক কোনায সরিযে জড়ো করে রেখে সব রান্নাঘবে গিযে খুঁজে হাতড়ে দা-টা নিযে এসে কেরোসিনেব টিনের মুখটা খুলে ফেলে—দেবাজ থেকে মোম বার করে জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর শক্ত করে বসিযে রাখল সেটা নরম মোম দানিব ওপব; বাইবে মেঘ অন্ধকাব; কালো কালো হিমালয; বাতাস নেই। বেশ জ্বলছিল মোমটা।

'দপ্তবিদের কিছু হযনি—' ঘবেব ভেতর পাযচাবি কবতে কবতে সিদ্ধার্থ বললে,

'আমার মনে হয় তুমি জান ওরা কোথায় আছে।'

সুনীতি গালে হাত রেখে দরজার ভেতর দিয়ে শেষ সিসু ঝাউগাছ পেরিয়ে নীলমাধব গোয়ালাদের আটচালার ওপারে—ধান জমির শেষ কিনারের দিকে তাকিয়ে ছিল—কোনো একটা হ্যারিকেন অন্ধকারের ভেতর হঠাৎ আগুনের মার্বেলের মতন ফুটে উঠবে বলে নয়—এমনিই—কিছু সাধা হল না,বলা হল না,করা হল না,ভাল হল না—এমন একটা বিমূঢ় অন্ধকার বুকে নিয়ে;—বাইরেব অন্ধকাটার চেয়ে বড়।

'জান ওরা কোথায় আছে?'

'ক'টা বেজেছে এখন?'

'আটটা—সাড়ে আটটা।'

'ঘড়ি দেখে বলছ?'

সিদ্ধার্থ টেবিলের এক কিনারে বই খাতার নীচের দিকে ঘড়িটাকে বার করে সরিয়ে রেখে বললে,'আটটা কুড়ি।'

সুনীতি তার চোখেব আংটির মত বৃত্ত যেখানে ভূমাব পবিধিব ভেতর মিশে গেছে সেই গাছগাছালি ও অন্ধকারেব দিকে তাকিয়ে বললে,'আমি ওদেব ঠিক মা হতে পাবিনি। তাহলে সুকুমাব যেই ঘরে ঢুকেছিল তখুনি তাকে নিয়ে বেবিয়ে যেতাম। কিন্তু সুকুমাব যখন হ্যাবিকেন নিয়ে বেবিয়ে গেল তখনো কত তেল খরচ হবে ভাবছিলাম।'

'আমাদের চেতনা পাঁচ সাত বকম ভাবে—আমাদেব অবচেতনাও;সব মিলে কে কী ভাবে বলা কঠিন।' সিদ্ধার্থ পায়চারি করতে করতে বললে,'আমার বাবা হ্যারিকেন নিয়ে শীতে বেঘোবে বেরিয়ে পড়তেন মনে আছে আমার, পাবলে মা ছাড়িয়ে যেতেন বাবাকে,কিন্তু আমি চুরুট টানছি,হাঁটছি, তুমি বসে আছ। কিন্তু তারা যে বোধ করতেন,আব আমবা যা বোধ করি,তাব ভেতব খুব বেশি উনিশ বিশ আছে বলে মনে হয় না আমার।'

'আছে। একটা সমুদ্রেবই ব্যবধান আছে।'

'তুমি মনে কব তাই?'

'সেটা সত্য।'

সিদ্ধার্থ পায়চাবি কবতে কবতে পৃথিবীব ওপব নিজেব পাযেব শব্দ শুনতে লাগল। যা জানবাব জানাবাব ছিল সুনীতিব—আপাতত ফুবিয়ে গেছে যেন সব; কোনো কথা বলছিল না সে।

'সুকুমাব আসছে না ত।'

'খট কবে ওটা কী শব্দ হল?'

'ওটা?' সিদ্ধার্থ নেমে দাঁড়িয়ে বললে,'ইঁদুরেব খচমচ,কাঁচা আলু খেতে এসেছে। ঘবে খাবার জিনিস আর কিছু নেই।'

'একটা দু'টো আলু আছে,কাঁচা পেঁযাজ ছিল চাবটে,আব কিছু নেই;পেঁযাজ অবিশ্যি ওরা খাবে না। সুকুমাব ঘুবপথে গিযে ভুল কবেছে। কুড়ুনিবাত এই পথ দিয়ে আসে' সুনীতি অন্ধকাবে কেমন যেন বোগা ডাইনীব মত হাত বাড়িয়ে আমলকি বিলিতি গাব সিসুগাছেব আশপাশের পথটা দেখিযে দিল—আঙুলগুলো খাঁটি ভূতের মতন। তবে আরো চিমসে হাড়গোড়েব যেন;—দেখছিল সিদ্ধার্থ।

'সুকুমাব গেছে ঐ ঝাড় সজনের পথটা দিয়ে। ও বড় ধান জমিটাব দিকে গিয়েছে-'

'তুমি কখন দেখলে? আমি ত দেখিনি—'

'সবোজিনী পিসিমাদেব ও ঘবে পৌছিযে দিযে কোন দিক দিয়ে যায় দেখছিলাম। সট্ করে চলে গেল।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'ছ-সাত মাস ধবে এগাবটা বারটাব আগে বাড়ি ফিরতে পারি না। দপ্তরিরা এমনি ক'টাব সময় ফেরে বোজ?'

'এই এই—সমযই ফেবে—সাড়ে আট,পৌনে নয। ক'টা বেজেছে?'

সিদ্ধার্থ টেবিলের দিকে এগিযে গিযে বললে,'আটটা পঁয়ত্রিশ।'

ঘড়ি দেখে মাথা তোলবার আগে দপ করে নিভে গেল মোমটা।

'কি হল।'

'বাতাস ছেড়েছে।'সিদ্ধার্থ বললে।

সূচীপত্রে যান

এক মিনিটের ভেতরই ঝড়ে অন্ধকারে ডুবে গেল সব। সমস্ত দিক দেশ যেন ডেবে যাচ্ছে,এমন ঝড় এত কালি এত জল—এত গর্জন।

সবোজিনীব অন্ধ হ্যাবিকেনট নিযে এল সিদ্ধার্থ,তেল ভবে জ্বালিযে বাইরে বেরিয়ে পড়ছিল।

সুনীতি বললে,'এখুনি নয়,কখন হবে তাও বলা যায না।'

'সময়—সব সময়ই সময।'

'বাইবে যেতে পাববে—সুকুমাবকে খুঁজে আনতে পাববে?'

'সুকুমাবকে শুধু?'

'তার পরে হিসেব পাওয়া যাবে তাব কাছ থেকে।'

'এটা একটা কথা হল না।'সিদ্ধার্থ ঝড় জলেব ঝাপটার থেকে হ্যাবিকেনটাকে বাঁচাতে বাঁচাতে বললে।

'এব চেযে ভাল কথা সৃষ্টি কব তুমি।'

'কিন্তু ওদের জন্ম দেওযাব সময তোমারও একটা নিমিত্ত ছিল।'

'কিন্তু তোমাকে জন্ম দেওযাব সময পৃথিবীরই একটা বড় ইঙ্গিত ছিল তাতে;

ওদেব বেলা তা হয়নি—'

সিদ্ধার্থ হ্যাবিকেনটাকে উঁচু কবে ধবে সুনীতিব মুখের দিকে তাকাতে গিযে দেখল সুনীতি সবে দাঁড়িযেছে অন্ধকারেব ভেতর আব এক দিকে।

'সেই জন্যেই আলো নিযে ছুটে যেতেন তোমাব বাবা—তোমার মাও,' বলতে বলতে সুনীতি ঘরের কোনো একটা বিশেষ জাযগায দাঁড়াবে স্থিব করে পথ বেছে দেখেছিল—কিন্তু কোথায বা দাঁড়াবে সে, সে জাযগা নেই; কিন্তু আমাদেব হালে সে আলো জ্বলছে না।' সুনীতি সবে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে।

সিদ্ধার্থ হাতের হ্যাবিকেনটা মাটির ওপব নামিযে দেরাজের থেকে খানিকটা শক্ত সুতো বেব করে চিমনিব চাবদিকেব পুরু সাদা কাগজ জড়িযে সুতো বেঁধে আঁট কবে নিল।

'তাই যদি বল তাহলে আর একটা কথা বলব।' সিদ্ধার্থ বললে।

সুনীতি সিদ্ধার্থেব থেকে খানিকটা দূবে একটা জানালাব দিকে এগিযে আসছিল—বাইবে পৃথিবীব দিকে মুখ ঝুঁকে রইল তাব খানিকক্ষণ।

'আমাদেব মতন লোকেব সংখ্যা আজকেব পৃথিবীতে খুব কম নয।' সিদ্ধার্থ বললে।

'এটা কি আজকেব পৃথিবীরই ব্যাধি শুধু?'

'না। সব সময ছিল। তবে আজকে একটু বেশি বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। কিংবা নিজেদেব বোগ আগেব কালের লোকদেব চেযে ভাল কবে বুঝতে পাবছি আমবা।'

'বুঝে যদি কোনো ওষুধেব ব্যবস্থা করতে না পাবি তাহলে শূন্যতা ত আবো বেড়ে যায। কিন্তু কোনো ওষুধ নাই। আমাদেব বেলা অন্তত নেই।'

'নেই?'

'নেই।'

'তুমি খুব তাড়তাড়ি খুব সাংঘাতিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পাব,' সিদ্ধার্থ হ্যারিকেনটা হাতে তুলে নিযে আলোব ঠিকরানিব মত নিঃশব্দে হেসে ফেলে বললে, 'আমাব ধাবণা অন্যবকম, কিন্তু আমাব ধাবণায ত তোমাব বিশ্বাস নেই।'

সিদ্ধার্থ বান্নাঘব থেকে একটা কুপি এনে তেল ভবে সেটাকে জ্বালিযে হ্যারিকেন হাতে কবেকাব সেই নিজের বাবাব মত অন্ধকারেব ভেতব বেরিযে পড়ল, অনেক দিন পরে বাবাকে-সত্যসবণ সেনকে খুব নিবিড়ভাবে মনে পড়ছিল তাব-সিসুগাছ,আমলকি গাছ,মহানিম গাছেব বাতাস সাইক্লোন বৃষ্টিব সমুদ্র পেরিযে। কিন্তু উত্তবাধিকারে সে পিতৃত্ব পাযনি সে,কিন্তু নানাবকম পিতৃত্ব মাতৃত্ব প্রেম ও অপ্রেম বিশ্লেষণ কবে বেশ খানিকটা জ্ঞানসিদ্ধি ও প্রশান্তি পেযেছি কিছু। মড় মড় কবে একটা মস্ত বড় অর্জুনগাছ ভেঙে দুরন্ত শব্দে আছড়ে পড়ল ঘাস মাঠ পেরিযে অনেকখানি সুবকিব বাস্তাটা জুড়ে; আর একটু হলেই চাপা পড়ে গিযেছিল প্রায সিদ্ধার্থ। হাতের বাতিটার বিশেষ কোনো অর্থ হয না—এ আলো থাকলেও বা না থাকলেও তাই; চারদিকে অবিনাশ অন্ধকার—লোকজন একটা পাখি বা শেযাল পর্যন্ত কোথাও কেউ নেই; মাঝে মাঝে বিদ্যুতেব আগুনেব গন্ধটা সে খুব সম্ভব মনেব ভুলে অনুভব কবছে—কিন্তু থেকে থেকে

সূচীপত্রে যান

কড়কড়ে রোদের মত আলোয় ভরে উঠছে চারদিক। সোঁ সোঁ সোঁ ঝড়ের শব্দ—কতগুলো সমুদ্র যেন ছুটে আসছে চারদিক থেকে; মাঝে মাঝে জলের সমুদ্রের তলেই যেন সে তলিয়ে যাচ্ছে—বৃষ্টির জলে।

ঐ কৃষ্ণচূড়ার গাছটা উড়ে গেল। কাদের বাড়ির ছনের চালগুলো দিগদিগন্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। মোচড় দিয়ে ছাউনির টিন খসিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেবও মাটি আকাশের ভেতর থেকে মুছে যাবার কথা তাব,হ্যারিকেনটা ভেঙে আছড়ে অন্ধকার হয়ে যাবার কথা। এখনো টিকে আছে—কিন্তু এখুনি ফুরিয়ে যাবে সব। সামনেব নিমগাছটা মনে হল বিদ্যুতে পুড়ে গেল; হয়ত তাব মনেব ভুল, কিন্তু শত কামানের শব্দ শুনেছে,একটা উৎকট সাদা জ্যোতি—জ্যোতির্ময় আগুন দেখেছে; সবোজিনী পিসিমার ঈশ্বরকে এই রকম আগুন আলোই বোধহয় ঘিরে থাকে—কিন্তু মানুষেব প্রয়োজনে স্নিগ্ধ হয়ে উদয় হয—মানুষের ব্রহ্মোপসনার সময়। সে বকম উপাসনায তেমন কিছু বিশ্বাস কবে না সে; সে আশ্বাসেব শান্তি হিসেবে নিমগাছটাকে না জ্বালিযে সিদ্ধার্থকেই পুড়িয়ে ছাবখার কবে দেয়া উচিত ছিল নাদ ও অগ্নিব চোখরুচিকব নিদারুণ যুগল শক্তির। সৎ প্রকৃতিকে দেখেছে সে অন্য প্রকৃতিকেও দেখেছে জীবনে আনেকবার। এবাবে যে প্রকৃতিকে দেখতে পেল তার আদি আলো আর আগুনের ভেতরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি তাকিয়ে আছে সিদ্ধার্থের দিকে—

সিদ্ধার্থেব পাযে পিছলে মস্ত বড় একটা সাপ লাফ দিযে চলে গেল; পেছনে তার আব একটা সাপ; তেড়ে এল না তারা; চলে যাচ্ছে জল বাতাসেব স্বরূপ ও গতিব ভেতব মিশে গিযে—কী ভীষণ দ্রার্ঢ্যে দ্রুতবেগে চারদিককার সমস্ত বিশ্বেব সঙ্গে একপ্রাণ হযে।

হ্যাবিকেন হাতে করে ঘব থেকে বেরুবাব পর—আজ এই দু'টো প্রাণীকেই দেখল সিদ্ধার্থ; মানুষ প্রাণ বলতে যা বোঝে তাবই চিহ্ন নিয়ে এমন দুবন্ত প্রাণগামী অন্ধকাবে কেউই আর দেখা দেবে না—শেষ পর্যন্ত।

সাপটা কামড়ায নি খুব সম্ভব সিদ্ধার্থকে; পিছল শবীরেব একটা হুঁচোটে অবিশ্যি লেগেছে তাব পাযে; কিন্তু কামড়ালে একটা আগুনেব মতন কিছু জ্বলে উঠত না শবীবেব ভেতব? সে বকম কিছু হযেছে বলে বোধ কবছিল না সে।

আজ বাতে দপ্তবিদের কোথাও পাওযা যাবে না কোথাও।

সুকুমাব ফিবে আসতে পাবে।

বাড়িব দিকে নিজে ফিরে গেলেও পাবে সিদ্ধার্থ। কোনো একদিকে এগিযে চলল,কিন্তু সেটা বাড়িব দিক নয,কোনো দিকও নয; কিন্তু এবকম রাতে দিক নিরিখ বলে কোনো কিছু নেই।

তাই বলে জীবনে অরুচি এসেছে তাব—সেটা বলা ঠিক হবে না।

'কোন দিষ্টে স্যালা কবলেন বাবু—এমন বইন্যা বাগুলাব বাইতে!—হাবে ডাকাইত!' অন্ধকাবেব ভেতবে কে যেন ডাক পেড়ে বলে উঠল।

সিদ্ধার্থ পড়ে যাচ্ছিল।

'তুমি কোন দিকে চললে মহেশ?'

কিন্তু উত্তর দেবাব জন্যে দাঁড়াল না সে। দু'জনেই দু'দিকে চলে গেল। লণ্ঠনটা নিভে গেছে সিদ্ধার্থের। কতক্ষণ হল নিভে গেছে খেযাল ছিল না তাব; ভেঙে চুরে গেছে কিনা বলতে পাবছে না সে।

চোখে দেখা কথা ভাবা ধারণা করাব পৃথিবীটা আস্তে আস্তে যেন সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল—যদিও জলের ঝাপটানি আশ্চর্য বকমেব সুন্দব—বাতেব অন্ধকাবে আবো বেশি,—চাবদিকে বিদ্যুতেব আলো দিনেব মতন উজ্জ্বল—কোথাও একটু শুযে পড়লে ভাল হত।

'চল সিদ্ধার্থ—' তবুও কে যেন বললে। অতএব উঠে চলতে চলতে সরোজিনী পিসিমাব হ্যারিকেনটাকেও সঙ্গে নিতে হয়, আজ হোক কাল হোক মৃত্যু পরপারে হোক বুঝ দিতে হবে পিসিমাকে এই বাতিটা;—দপ্তরি কুড়ুনিদেব ফিবিযে দিতে হবে সুনীতিব কাছে; কিন্তু তার চেয়ে বেশি কবে সিদ্ধার্থেব কেমন যেন আজকেব বাতেব জড়ভরতেব মতন এক আত্মাব কাছে মৃতশিশুকে দেখালে হয়; কিন্তু কোনো দাবি জানাচ্ছে না সেই আত্মা, কোনো হিসেব চাইছে না। কালকেব দিনের আলোয কাজ কর্মের ভেতরে—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে আত্মাব কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

সুকুমার কে খুজেঁ দেখতে হবে।

এতগুলোব দাযিত্ব ওকমনীযতার কাজের পটভূমিকায আজকের রাত এরকম ভীষন সাইক্লোনে এত বেশি অন্ধকার না হয়ে পড়লে ভাল হত।

অথবা এ অন্ধকার ও নিরবচ্ছিন্ন সর্বনাস ছাড়া রামপ্রসাদও একদিন ভাল করে গান করতে পারেনি—সাধক রামপ্রসাদের চেয়ে ঢের বিভিন্ন ও দূর যে সিদ্ধার্থের আত্মা তাও নিজেকে ঠিকভাবে চিনতে পারবে না।

'পরশু আমি সরোজিনীদিব বাড়ি গিয়েছিলাম,' পাইপটা দাঁতের কামড়ে ধরে ফাটা বললে, কাল সাবাদিন কাজকর্মে বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, বিকেলে এসে শুয়ে পড়লাম—আটটা সাড়ে আটটার সময় ঘুম ভাঙ্গল; একটু যাব ভাবছিলাম কোথাও; কিন্তু কাল ত বড় সাইক্লোন হয়ে গেল বাসমতীতে।

আমাদের এই সমাজবাড়িব পুরনো দালানটা হয়ে যাবে ভাবছিলাম, ইট,পাথব,লোহাব চাপে চাপা পড়ে যে কোনো মূহুর্তে থেঁতলে যেতে পারে শবীরটা—কিন্তু বেশ পাকা ঘুমেব ভেতবই থেঁতলালে ভাল ভাবতে ভাবতে মড়াব মতন ঘুমিয়ে পড়লাম। সাবা বাত বেহুশ হয়ে ঘুমিয়েছি। কাল কী হয়েছিল বনচ্ছবি?'

'অনেক গাছপালা ঘবদোব পড়ে গেছে, পাকা দেয়াল ছাদ টাদও ধসেছে কম না;গরু ছাগল হাঁস মুরগি মরেছে ঢেব—অনেকগুলো নৌকো ডুবে গেছে; ডাঙায় মানুষ টানুষ ত বেশী মবেনি—' বনচ্ছবি বললে,' আমি সরোজিনীদির বাড়িতে যেতে পাবিনি আজ।'

'আমিও যেতে পাবিনি' বাসমতি ব্রাহ্মসমাজেব চারদিককার উচু ইটেব পাঁচিল ঘেবা কম্পাউণ্ডে তিন চাবটে বেশ ঝাড়ালো দেবদারু গাছেব নীচে ঘাসের ভেতবে বসে ছিল দু'জনে। বিকেল হয়েছে— শেষ কার্তিকের বিকেল বেশিক্ষণ থাকবে না, সমাজেব পুবনো বাড়িটাকে ঘিরে চাবদিকেই ঘাসের মাঠ , মাঠটাকে বেড় দিয়ে উঁচু পাঁচিল ঘাস ও শ্যাওলায় সবুজ হয়ে বয়েছে; সমাজেব কালিমা পড়েছে সব দিকেই; চোখ কেবলি নিবিড় ঘাস—ও হাত পা কোমলতা মহাশ্বেতা বনচ্ছবিব মুখেব মত চারদিককাব কাশগুচ্ছেব দিকে ফিবে আসতে চায। কত ঘাস;—অনেকখানি জাযগায কাস্তে পড়েছে বটে, কিন্তু বেশি পড়েনি, খুব ভাল ভাবে পড়েনি, ফলে প্রকৃতি যা চেয়েছে তাব সঙ্গে অনেক দূব পর্যন্ত এসে মানুষেব হাত জিনিসটা এমন একটা বিসদৃশ অমনুষত্বে এসে পৌঁছেছে যে এই গভীর সমাজ মন্দিবটাকে পাশে বেখে এই নিস্তব্ধ জাযগায এর চেয়ে ভাল কিছু প্রকৃতি বা মানবসংসাবে কোথাও কোথাও যেন হতে পাবে না—ভাবছিল ফাটা।

তাছাড়া কতকাল এখানকার ব্রাহ্মসমাজেব কার্য নির্বাহক সমিতি খুব বসিক ও সমীচীন - মুখেব থেকে পাইপ নামিয়ে ঘাসেব ওপব বেখে দিয়ে ভাবছিল সে। চাবদিককার আগাছা জঙ্গলগুলো প্রায় সমস্ত নিড়োনো হয়েছে বটে, কিন্তু কাঁশ বাঁচিযে। কোথাও একগুচ্ছ কাশের ওপরও হাত দেয়া হযনি, দেয়ালের কিনাব ঘিবে চাবদিকই ওব বযেছে;—ভিতবেব দিকেও এসেছে বেশ খানিকটা দূব পর্যন্ত ; আবো ভেতবে এসে সমস্তই নিছক সবুজ ঘাস যদিও বটে—কিন্তু প্রকৃতি তাব স্নিগ্ধ ও নির্জন মূহর্তে এই বকমই চেয়েছিল খুব সম্ভব; তার নিজেব হাতে ছেড়ে দিলে সমস্ত জাযগাটাই; কাশে ভবে যেত অবশ্য, কিন্তু জ্ঞানী ও প্রকৃতিস্থ মানুষদেব সঙ্গে পবামর্শ করে কাজ কবতে সে ভালবাসে—সেই জন্যেই সবচেযে ভাল খুলেছে এরকম সত্য ও নিজেব কান্ত স্বরুপ উন্মোচিত হয়ে বযেছে এখানে প্রকৃতিব রূপ ও মানুষেব হৃদয নিজেব হাতের কাজ। কালকেব ঝড়ে এই কাশগুলোব বিশেষ কোনো ক্ষতি কবতে পাবে নি। বোধ হয উঁচু দেযালের ওপর দিয়ে বাতাসটা চলে গেছে—সমাজ মন্দিবেব দেযালে সবুজ খিলান কার্নিস একদিকে আব দেবদারু গাছগুলো আব একদিকে ঠেকিয়ে বেখেছে দৃষ্টিব বিষম ঝাপটাগুলোকে। তবুও নুয়ে পড়েছিল সমস্ত সকাল এই সব কাশ—সমস্ত দিনের পবে প্রাণ পেয়ে খানিকটা মাথা খাড়া কবে উঠেছে আবার।

'ছাতু বাবু ত এসেছিলেন তোমাব সঙ্গে বনচ্ছবি—'

'তিনি অনেক আগে আসছিলেন—আমাদেব গেটেব কাছে দেখা হল তাঁব সঙ্গে। সিদ্ধার্থ সরোজিনীদির কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম।'

'আমার মনে ছিল না। ছাতু বাবু ত এক আধ মিনিটের বেশি এখানে বসলেন না। কোথায় গেলেন?'

'সমাজের লাইব্রেরিতে গিয়েছেন খুব সম্ভব।'

'বিশাখা আসবে?'

'আমার সঙ্গেই আসছিল, পথে আটকে গেল।'

'কোথায়?'

'বাসমতী কলেজের একজন প্রফাসবের বাড়িতে।'

'খোদ প্রফেসরের সঙ্গে কারবার—না তার গিন্নি সঙ্গে?'

'না, কর্তার সঙ্গেই।'

'তোমরা ভায়া খিদিরপুর হয়ে আসছিলে নাকি?'

'না, সদর রাস্তা দিয়ে— রিকশাতে চড়ে।'

'বাড়ির জানালা থেকে গলা বাড়িয়ে ডাক দিলেন বুঝি কত্তা—রিকশার মেয়েটিকে।' ফাটা ঘাসের উপর থেকে পাইপটা তুলে নিয়ে বললে,' কিন্তু তোমাকেই ত ডেকেছিলেন তিনি। ডাকেন নি?'

পাইপটা নিভে গেছে, দাঁতে কামড়ে ধরে ছিল ফাটা, নিভে যাত, তা ক্ষতি কি, এক্ষুনি জ্বালাবার দরকার নেই; দাঁতেব আটকে কথা বললেও চলবে, কিংবা খসিয়ে ঘাসেব ওপব বেখে দিলেও হয়।

'আমাদের এই মন্দিরটা শহরের এক টেরে ছিল এক সময়; তখন আমাব বাবা বড় কমল বাবু বেঁচেছিলেন। কিন্ত আজকাল দেখছি শহবটা এগিয়ে এসেছে এদিকে অনেকখানি—'

'মন্দিরটা আজকাল শহরের বড় লোক আর বড় বড় অফিসারদের এলাকায় ভেতব পড়ে গেল প্রায়। তাই দেখছি চারদিকে গাড়ি ঘোড়া পিটছে খুব; হাটবাজারেব গুলজাবটা বেশ জমেছে এদিকে; মোটব গাড়ি ত বাসমতীতে কম না; প্রাযই ত আসা যাওয়া কবছে।'

শহরটা আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে। এরাই ফেঁপে উঠছে, লোক বেড়ে গেছে ঢেব ; বনচ্ছবি ঘাসের ওপর থেকে ফাটার পাউচটাকে একবার তুলে নিয়ে বললে, পাকিস্তান হলে কি রকম হবে বলতে পারছি না; না হলে বাসমতী দু'চাব বছরের মধ্যে বেশ জমকালো হয়ে দাঁড়াবে।'

'এটা কি?' বনচ্ছবি বললে।

'পাউচ।'

'পাউচ?'

'কাউকে পাইপ টানতে দেখনি তুমি এর আগে,' ফাটা একটু হেসে বললে,' গগন বাবুও চুরুটই টানেন শুধু। তোমরা মফস্বলেব ব্রাহ্মসমাজে থেকে বেশ শুচি শুদ্ধ হয়ে থাকতে পেবেছ। বড় কমল বাবু সেইটেই ভালবাসতেন; আমিও এই বিষয় আমার বাবার রুচি পেয়েছি।'

'ও—পাউচ' বনচ্ছবি বললে, আমি অনাদিবাবুকে এর থেকে তামাক পাতা বেব করতে দেখেছি—'

'অনাদি বাবু কে?' পাইপ টানেন।

'হ্যা। এখানকার ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার।'

'বিয়ে কবেছেন?'

'তার ছেলের নামকরণেই ত তাকে পাইপ টানতে দেখলাম।'

'ব্রাহ্ম—অনাদি বাবু?'

'না। ব্রাহ্মসমাজে একদম ঘেষেন না, মাঘোৎসবেব সময়ই কোনোদিন মন্দিবে দেখিনি তাঁকে। তবে মৈতিদির মতন কালীভুক্ত নন; ধর্মের বাইরের ভড়ংটা রেখেছেন—বছরেব শেষে যখন পূজো আসে তখন খানিকটা মাতামাতি করেন। কিন্তু ওদেব কোনো ধর্মটর্ম নেই।'

ফাটা আলগোছে পাইপটা জ্বালাবার চেষ্টা কবে নিভন্ত পাইপটাব দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে,তোমার নিজেব আছে?'

'তোমার?'

'বলছি।' ফাটা নেভানো পাইপটা মুখের থেকে নামিয়ে দু'চাবটে কচি কাশ ধুইয়ে তাব ওপব সেটাকে রেখে বললে,' আমরা দু'জনে খুব কাছাকাছি ঘেষে বসেছি—একেবারে সদর বাসমতীর মাঝখানে। কোনো অন্যায় করিনি। ভালই করেছি। ঠিক আছে। কিন্তু লোকজন যে নচ্ছারের মত চেয়ে থাকে সেটা আমার পছন্দ হয় না বনচ্ছবি—' ফাটা টাউজারের পকেট থেকে দেশলাই বার করতে করতে বললে, কেউ উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে চোখে পড়েছে তোমাব?'

'আমি রাস্তার লোকের দিকে তাকাই না। আমি খুব কাছে বসিনি তোমার।'

'কোনো দোষ নেই আরো কাছে এগিয়ে বসলে'—ফাটা পাইপের থেকে পোড়া তামাকেব ছাই গুঁড়ি

ঘাসের ভেতর ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে,' কিন্তু এটা মফস্বলের মতন জায়গা এখানকার লোকগুলোর আদিখ্যেতা বেশি, বুদ্ধি চাঁছাছোলা খুব—আমি চাই না যে এরা আমাদের সমাজের সম্বন্ধে কথা বলে বেড়াবে চারিদিকে। ও কি করলে বনচ্ছবি?'

'না তা হবে না।' ফাটা গম্ভিরভাবে বললে, 'তুমি যেখানে বসেছিলে সেখানেই থাক। আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম তোমাকে।'

ফাটা একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে পাইপের ভেতরটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোড়া তামাকের কুচি বাব করতে করতে বললে,'যে রকম বসেছিলে সেইটেই ভাল—আমার বিচাবে। তবে বাসমতী ব্রাহ্ম সমাজের একটা ইতিহাসেব দিকও আছে। কর্তাবা কেউ বেঁচে নেই। তাদেব আমলে এসমাজের ধর্ম সম্বন্ধে অবিশ্যি আপত্তি ছিল বাইরেব লোকদের—আমাদেব নিবাকাবেব উপাসনা গান নিয়ে ঠাট্টা কবত, কিন্তু নীতির দিক দিয়ে আমাদের আবার ব্যবহারের যে কোনো মাব নেই , আমরা যে মিথ্যা কথা অবদি বলি না এটা তাবা খুশি দিলে ববাববই স্বীকাব কবে নিয়েছে।'

ব্রাহ্মদেব সেই নীতিই আকঁড়ে আছ তুমি? পাইপ ত টানছ, ওঁবা কেউ মন্দিবের প্রাঙ্গণে কোনোদিনও তামাক খেতেন না।'

ফাটা পাইপেব ভেতব থেকে আরো কিছু কুচি ঝেড়ে ফেলবাব চেষ্টা করে বললে, এটায় গগন বাবু আমাকে পথ দেখিয়েছেন। উনি আমাব চেয়ে পনেব কুড়ি বছবের বড়। ঢেব বেশি বড় ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে'—একবাব মুখ তুলে বনচ্ছবিব দিকে তাকিয়ে ফাটা বললে, 'মানে সত্যিকারেব সুশীল ও মহাজন। কিন্তু গগন বাবু মন্দিরেব বাবান্দায় দাঁড়িয়ে চুরুট টানেন। চুরুট সিগাবেট আজকাল সকলেই খায়, নীতি টীতি নয়, স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যের কথা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনকালেব সঙ্গে বদলায় এরকম সিগাবেট চুরুটেব ব্যাপাবটা। কিন্তু কতকগুলি জিনিস আছে অবিশ্যি—ফাটা খানিকটা দূবেব দু তিনটে দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশেব দিকে তাকিয়ে বললে,' যেগুলো বড় জিনিস হয়ে রয়েছে—সব সময়েব জন্যে—সেগুলো সম্বন্ধে—'

ফাটা বললে,' আমি অনেক কথা বলছি বনচ্ছবি।'

'কী বলছিলে তুমি—থেমে গেলে কেন?'

'তুমি জান ত এমনিতেই বেশি কথা বলি—না হলে তোমাব মতন জ্ঞানীকে বোঝাবাব জন্যে আমাব কোনো কথা বলবাব দরকাব ছিল না।'

'তুমি কলকাতাব মানুষ, অনেকদিন কলকাতায় আছ। মফস্বলে এসে একটু বেশি সর্তক হয়ে পড়ছ। দেখছি তাই।'

'জ্ঞানী মানুষ, তবু ত তুমি দূবে সরেই বসলে।

'সমাজেব সুনামেব কথা ত চিন্তা করছ তুমি।'

'সেটা ত জ্ঞান নয়।'

'কে বলবে জ্ঞান নয়। জ্ঞান না হোক ধর্ম। ধর্ম খুব সম্ভব জ্ঞানেব চেয়ে বড়।'

কথা ত বলছি অনেক; কিন্তু ধর্ম কি—আজ পর্যন্ত বুঝতে পাবলাম না বনচ্ছবি।'

বনচ্ছবি ফাটাব পাইপটাব খোড়লের ভেতব থেকে কুচি ঝেড়ে ফেলবাব শেষ প্রযাসেব দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দেবদারু গাছ, ঘাস, নিভন্ত রোদ সবই যেন কেমন পট পবিবর্তন কবে ফেলছে দেখতে দেখতে চুপ কবে ছিলে।

'কই বললে না ত?'

'কীসেব কথা?'

'ধর্মেব কথা হচ্ছিল।'

'হচ্ছিল ত।' দেবদারু গাছেব ডালপালাব ভেতব দিয়ে বনচ্ছবিব মুখে রোদ এসে পড়েছে; তোমাব ধর্মে কি আছে তুমি সেধেছ; আমি—' নাই বা সাধলে—আমাব ব্যক্তিগত ধর্মের কথা বলছি না ত।'

বনচ্ছবি ডানহাতের আঙুল দিয়ে ঘাসেব ওপব ছক কাটতে কাটতে বললে,' এ ছাড়া ধর্ম নেই। বড় কমল বাবুব ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মপালন কবে গেছেন। কিন্তু ঠিক তাদের ধর্ম খুব সম্ভব এখন আর আমাদেব নয়—আমাব অন্তত নয়।

'আমি সমাজে মাসে মাসে আসি বটে, কিন্ত—'

ফাটা পাইপ পরিষ্কার করে নিয়ে বনচ্ছবির দিকে তাকাল।

'সিদ্ধার্থদা একেবারেই আসে না।'

'সিদ্ধার্থ?—শুনেছি কাল সরোজিনীদির কাছে।'

বনচ্ছবি বললে, 'ধার্মিক নয় লোকটা।'

'না, তা নয়। নিজের কোন এক আলাদা ধর্ম স্থিব কবে নিয়েছে। সেটা খুব সম্ভব ব্রাহ্মধর্ম নয়,—কিংবা এর ভেতর থেকেই উপত্তি তার। আমাদেব ত জ্ঞানসম্মত ধর্ম ছিল সিদ্ধার্থ ত জ্ঞানের চর্চাই কবে।' '

'ঠিক সেই জন্যেই অবিশ্যি সেনের পথে যাইনি আমি।'

'সে জন্যে নয়?'

'না অতটা সাহস নেই আমার—'

ফাটা পাইপটাব দিকে তাকিয়ে, সেটা ঘুরিয়ে ঘাসেব ওপর রেখে দিয়ে বললে,' বোববার দিন সমাজে না গেলে গগন বাবু বাগ করবেন সেই ভয়?'

'গগনকাকা আছেন—সরোজিনীদিরা আছেন—আরো অনেক আছেন—একসঙ্গে রয়েছি যখন মফস্বলের মতন একটা জায়গা—ব্রাহ্মসমাজেব সব দিকে দিয়ে এই নিভে যাওযাব মতন সময়টা—তখন ওদেব মনে কষ্ট দিতে খারাপ লাগে। ওদের নিজেদেব একটা ধর্ম বয়েছে সেটা সত্য ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে জ্ঞান উপাসনায় সেটা পালন হয় তাও ঠিক,আমাদেব বেলাও সেটা সম্পূর্ণ সত্য হলে কত ভাল হত ; কিন্তু হল না ত।'

ফাটা কিছু বললে না।

বনচ্ছবি বললে, 'কিছু মনে কবলে নাকি নীরেনদা?'

'কেন?'

'আমাদের বেলা বললাম, আমাদেব মানে—তোমাব নয়; আবাব, বিশাখাব—'

'সিদ্ধার্থের।'

'তাকে আমাদেব দলে ফেলি না।'

ফাটা পাইপটা তুলে নিযে ট্রাউজাবেব পকেটে ঢুকিযে বেখে বললে,' না, তা নয, তবে ক্রমে ক্রমে মাষ্টারমশাযের সাহস আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। হিতেন বাবু গগন কাকা সবোজিনীদি কি বলবেন তার বাইবে চলে গেছেন। সমাজে প্রাযই যান না, মাঘোৎসবেব সময এক আধ দিন যান, কিন্ত সেটা কাবো মন বক্ষা কবাব জন্যে নয়; সমাজে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেন, কিন্তু সেটা ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদ ছেড়ে দিযে দেশগুলো করেনি, এই কথাটা বলবাব জন্যে; সেইসঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্মেব খুঁটি আগলে বসে থাকাব যে কোনো দবকাব নেই—সেই কথাটাও বলে দিযে আসেন।'

'সিদ্ধার্থ আজকাল শিগগিব বক্তৃতা দিয়েছে?'

'না। দু'তিন বছব আগের কথা বলছি।'

'আজকাল এ সবও ছেড়ে দিয়েছে।'

'সেনেব সাহসেব কথা বলছিলাম,' বনচ্ছবি বাঁ হাতেব পাঁচটা আঙুল ঘাসের ওপব পেতে বেখে বললে,' কিন্তু সাহসটা কর্কশ নয, ওব বিচারবুদ্ধি—খুবই প্রাণসবস, কাউকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু ওব ব্যবহাবে এখন আব কেউ দুঃখ পায না—সেই জন্যে সেই প্রশ্নটা জাগছে না আজকাল আব।'

'এতখানি দূবে সবে গেছে সিদ্ধার্থ?'

'গগন বাবুদেব ভবসা আমাব বিবেচনার দূরে সবে গেছেনই ত।'

'কী উপকাব হল তাতে সিদ্ধার্থেব?'

'আমাদের চেয়ে ঢেব বেশি জ্ঞান তার নিজে জানেন কি হচ্ছে। কিন্তু সরোজিনীদিবা ধর্মসমাজ বলতে যা বোঝেন সেটাব ক্ষতি হচ্ছে।'

'মাষ্টারমশাইকে'আপনি'বল বুঝি তুমি?'

'না, তা সঙ্গে কথা বলবাব সময় বইল না—তার সম্বন্ধে কাবো কাছে একটা বিবৃতি দেবার সময বলি—' বনচ্ছবি ঘাসেব ওপর নিজেব ছড়ানো আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল, হাতটা তুলে নিয়ে, ফাটাব মুখটাকে নিজের নজবেব ভেতরে এনে বললে,' সেন একদিকে—সবোজিনীদিবা আব একদিকে, তুমি মাঝ পথে বয়েছে।'

সূচীপত্রে যান

'হ্যা, গগন বাবুদের দিকেই একটু ঝুঁকে।'

'তাই মনে হল তোমার,পরশু রাতের কথায়।' ফাটা পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে সেটা বাঁ হাতের আঙুলে আস্তে আস্তে ঠুকতে ঠুকতে বললে,' তুমি সেনেব দিকে ঝুঁকেছ। আমার মনে হয় সমাজটাকে টিকিয়ে রাখা দবকার—ধর্মসমাজ হিসেবে—'

'বাসমতী সমাজের কথা বলছ?'

'হ্যা, কলকাতা ব্রাহ্মসমাজকে ঠেকাবার ভব আমাদেব ওপর নেই আমার। কিন্তু দেশের কোনো এক জায়গায় সমাজ ভাল ভাবে বেঁচে থাকলে আমাব ছোট আত্মা শান্তি পাবে; এটা ত রাইসর্ষের বীজ রামমোহনের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব তুলনায়।'

'নীরেনদা' বনচ্ছবি বললে।

তারপবে বললেন,' খুব বিশ্বাস তোমাব। তোমাকে দিয়ে সমাজেব উপকাব হবে। এই সমাজেই লালিত হয়েছি আমি, বড়দেব দেখিছি। মৃতদের কথা শুনেছি—তাদের আশা ভরসাব দিক দিয়ে শুন্য হয়ে গেছে ত সব—খানিকটা ভবে বাখতে পাববে তুমি; ভেবে ভাল লাগছে আমার। কিন্তু—' ফাটাব চোখে চোখে তাকিয়ে নিজের ভিন্ন রকম বোধ ও সংকল্পেব নেপথ্যে চাঁদসদাগরেব এক বিবোধী দৈবশক্তির মত কিন্তু কানা নয়— খুব সুন্দব বনচ্ছবি অল্পস্বল্প হাসিতে মুখ মাখিয়ে ফেলে বললে,' আমাকে তোমার সমাজের কাজেব কর্মী হিসেবে নিলে আমাব গাফিলতি দেখে কষ্ট পাবে তুমি।'

'তোমাকে নিচ্ছি নাকি আমি বনচ্ছবি? বড় কমল বলতেন কেউ না থাকলেও আমি আছি, সমাজেব বাতি জ্বলবে, আমি একজন গান গাইব। সত্যেন ঠাকুব দ্বিজেন ঠাকুব—রবি ঠাকুর দাদাদেব গান গাইতেন তিনি সব।' ঠিক ছিল।'

শুনে ফাটাব দিকে তাকাল বনচ্ছবি; যুক্তিব পথে সে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে:; ব্রাহ্মসমাজ সেই ইঙ্গিত কবেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে নিয়ে পড়ে থাকতে বলেনি (খুব সম্ভব), কিন্তু এই মানুষটির কথা শুনলে প্রাণ কেমন যেন নড়ে ওঠে, সুকুমাবদা ত গান গেয়ে টলিয়ে দিতে চায়, কিন্ত এই লোক ফিজিক্সে এম এসসি পাশ কবে ধর্ম একটা বিশেষ ধর্ম—ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আত্যন্তিক অনুভূতিব অল্পস্বল্প গদ্যেব ভাষায এব কথা গুনিয়ে ভাবিয়ে ছাড়ে।

কিন্তু তবুও নিজেব পথ বনচ্ছবিব আলাদা।

মানুষ হিসেবে নীবেন তাকে কি ভাবে কতদূব টানে সেটা অন্য কথা, কিন্তু এ মানুষেব একটা বিশেষ সাধনার থেকে, সে সত্যিই বিচ্ছিন্ন—কোনোদিন কোনোভাবে ও-সম্বন্ধে পূবণ কববাব কাজে ডাক যদি পড়ে তাব—তাহলে তাতে সাড়া দেযা সম্ভব হবে না।

ফাটা বললে,' অবিনাশবাবুবা বলতেন যে সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না কবলে পৃথিবীব মুক্তি নাই। ওসব আমি বিশ্বাস কবি না। অদ্ভুত অত্যুক্তি কবতেন পঁচিশ তিরিশ বছব আগেব জোষ ব্রাহ্মেবা। কিন্তু এটা ঠিক যে এক ধবণেব যুক্তিবাদী লোক—বিশেষভাবে বাংলাদেশে যাদের জন্য—হৃদযে যদি তাদেব খানিকটা ভক্তিব ভাব থাকে তাহলে এই ধর্মই খুব সম্ভব সবচেয়ে বেশি মানাবে তাদেব। বনচ্ছবি, আমি এখন পর্যন্ত বোধ কবছি যে, আমাব মন এবকম খানিকটা ; সেইজন্যে সমাজেব কাজ কিছু কিছু করতে পাবব ভাবছি। পরে কি হবে বলতে পাবছি না; অনেক পবিবর্তন হতে পাবে, এখন যা ভাবছি , করছি তাব থেকেই ক্রমে ক্রমেই সরে যেতে পারি। তবে আমাব জীবনে এসব জিনিস নিয়ে মতামতের পবিবর্তন বিশেষ নেই তেমন কিছু। বযস ত অনেক হয়েছে, প্রায এক পথেই চলছি।'

'তুমি এই পথেই চলো।'

'তুমি এটা চাচ্ছ?'

বনচ্ছবি একটা কচি কাশ ছিঁড়ে পাতলা ঠোঁট খসিয়ে হেসে বললে,' আমি না চাইলেও চলবে তুমি।'

ফাটা চুরুটটা জ্বালাবাব জন্যে দেশলাই বেব করে বললে,' আমি জানি তুমি মনে মনে আমাকে খানিকটা করুণার চোখে দেখ।'

বনচ্ছবির ঠোঁটে যে হাসিটা লেগেছিল সেটা চোখেব ভেতবে ঢুকে ভেতবে ডুবে গেল তাব; চোখে আর এরকম ভাব এল।

চুরুট জ্বালাবার আগে ফাটা মুখোমুখি দেবদারুর ডালে দু' চারটে শালিখের ওড়াওড়ির দিকে তাকিয়ে বললে,' বলছি তোমাকে, বেলা পড়ে এল বনচ্ছবি।'

সূচীপত্রে যান

'কার্তিক মাস—'

'ভারি চমৎকার এই বাসমতীতে।'

'তুমি দেবদারু গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে ঘাসের ভেতর পা ছড়িয়ে বসে আছ; অবিশ্যি পা দু'টো ট্রাউজারে ঢাকা। কিন্তু তবুও বাসমতীর হেমন্তের বিকেলের স্বভাবই যেন সমস্ত—ঐ আকাশ— সমাজের বাড়িটা—ধানজমি—লাইব্রেরি ঘরে ছাতু বাবু—অল্পস্বল্প কথাবার্তা—চারদিককার নিঃশব্দতা।'

ট্রাউজারটা বেনামাল হয়েছে কেন।'

বনচ্ছবি কাশের গুছির থেকে এক একটা রোয়া খসিয়ে ছে'ড়া কচি কাশটা ঘাসের ওপব ফেলে রেখে বললে, ওটা পরা তোমাব অভ্যাস হয়ে গেছে। ঐ শালিখগুলোর ঠোঁট হলদে , পা হলদে, চোখের কাছ দিয়ে কালো; ঠিকই মনে হয সব; ঠিকই আছে।'

ফাটা এবারেও চুরুট জ্বালাতে গিয়ে দেশলাইটা আস্তে ঘাসের ওপর বেখে দিয়ে তার ওপর আড়াআড়ি ভাবে শুইয়ে রেখে বললে,' বড্ড ভুল করেছি কলকাতার থেকে আসবাব সময একখানাও ধুতি আনা হল না। শালিখের ঠোঁট হলদে না হয়ে নীল হলেও ভাল হত যেন—পা যদি অত কটকটে হলদে না হয়ে পাকা ধানের মত সোনালি রঙেব হত—তাহলে এই ধান দুর্বার হেমন্ত বিকেলেব বেশি মানাত তাকে আমাদের বাসমতীর মত দেশে।'

'বড্ড লেগেছে তোমার দেখছি।'

'চাবটে ট্রাউজাব এনেছি ,ট্রাউজাবই শুধু—'

'বেশ ভাল দর্জির কাট, চাবদিককাব পড়ন্ত বেলাব ওপর একবাব চোখ বুলিয়ে নিযে বললে, 'খাপছাড়া ঠেকেনি ত—'

'তবুও শালিখের হলুদ রঙের কথা পাড়লে ত তুমি।'

বনচ্ছবি ঘাসের ওপর থেকে কাশেব গুছিটা তুলে নিয়ে স্বল্প গলা খাকারির সঙ্গে একটু হাসি মিশিযে নিযে বললে, শালিখেব হলুদ ঠ্যাং দেখে হাসি পায একথা কাউকে কোনোদিন বলতে শুনেছ তুমি?'

দেশলাইযের বাক্সেব ওপর থেকে চুরুটটা তুলে নিযে ফাটা বললে,' তুমি আমাব দৃষ্টি খুলে দিয়েছ; এখন হযত আমিই হাসব।'

'বড্ড অস্বস্তি বোধ কবছ নীরেনদা। একজোড়া ধূতিব ব্যবস্থা কবা যাবে তোমাব জন্যে। কিন্তু ধূতি একটু মোটা হবে।'

'একেবারে খাখি খদ্দবেব যেন না হয।'

'না, তা হবে না। তবে তুমি আবাব লম্বা মানুষ; হাঁটুর ওপবে গিযে আবাব না উঠে।'

ফাটা একটু চুপ করে বললে,' তুমি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কবেছিলে না বনচ্ছবি?'

'তুমি আমাকে একটা কথা বলবে বলেছিলে, কথাটা সমাজ নিয়ে খুব সম্ভব—'

'হ্যা,ধর্মসমাজ নিযে,' শুকনো চুরুটটা আঙুলেব ভেতব ঘুবিযে ফিরিযে ফাটা বললে,' ধর্ম বলতে ব্রাহ্মরা যা বুঝতেন সিদ্ধার্থ তা বোঝে না এখন, একটা নতুন জিনিস বুঝছে সে; তুমিও সিদ্ধার্থের দিকে। ধর্ম বলতে কি বোঝ তুমি বনচ্ছবি?'

'বাবা বে, 'বনচ্ছবি ঘামিযে ওঠবার ভান কবে বললে, এত বড় একটা কঠিন জিনিস আমি এক কথায় কি করে বলি।'

'যত কথায পার তাই বল।'

'তা আরো কঠিন । এ নিয়ে সেনের সঙ্গে কথা বোলো তুমি।'

'সেনেব কথাই তোমাব কথা।'

ফাটার মুখের কেমন একটা জ্ঞানভিক্ষু উজ্জ্বল দীনতাব দিকে তাকিযে বনচ্ছবিব মনে হল সে যা জানে এখনই এখানে একে সেটা বলে দিয়ে এই মানুষেব সৎ আগ্রহটাকে একটা সম্মান দেয়া উচিত।

'ধর্ম ত প্রথমতই সেই ঈশ্বরকে নিযে ও আমাকে নিয়ে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কী সর্ম্পক ধর্ম প্রধানভাবে সেই জিনিসটে জানাচ্ছে আমাদেব। বিশুদ্ধ ধর্ম বলতে সাধকরা এই বোঝেন; নীতিও ধর্মের অংশ খুব সম্ভব, কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্ম সাধকদের কাছে নীতি পালনের ব্যাপারের চেয়ে আবো অনেকখানি স্পষ্ট ও গভীর জিনিস; অথচ আমি সাধক নই।'

'ও—' ফাটা শুকনো চুরুটটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'সাধনেব পথেও যাবার ইচ্ছে নেই।'

সূচীপত্রে যান

ফাটা বললে,' আমি ব্রাহ্মসাধনের কথাই বলছি।'

'আমি সেটাকে একটু আলাদা করে শুদ্ধ ধর্মসাধনের কথা বলি। আমাকে তাই বলতে দাও তুমি। খাঁটি সাধকদের দিক থেকে দু'টোই এক জিনিস।' বনচ্ছবি সমাজ কমপাউণ্ডের মাঠ ঘাস দেবদারু গাছগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বললে,' ধর্মসাধনা তাহলে এই রকম একটা জিনিস। কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে সাধকদের সাধারণত যে রকম ধারণা চেতনা সে বিষয়ে আমি দিনের পর দিন নিজেকে অজ্ঞ বলে বোধ করছি। অন্য সব দিক দিয়ে জ্ঞানদান বাড়বে কিনা বলতে পারছি না; বাড়লে এদিক দিয়ে অন্ধকারটা ঘুচবে বলে বুঝতে পারছি না।'

'অনেক ঘুরিয়ে বললে,' ফাটা খড়খড়ে চুরুটটা আঙুলের ভেতর নেড়েচেড়ে বললে,' তোমার বিশ্বাস নেই বলতে চাচ্ছ।'

'ধর্মসমাজগুলো সাধকদের পথে পা বাড়াবার শক্তি আমার নেই; এইটে বলতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বিশ্বাস আছে।'

'কীসে বিশ্বাস?'

'ধর্মের বিশ্বাস।'

'তোমার? এই ত বলছিলে যে—'

'সময়ের সঙ্গে মানুষের রীতিনীতি বদলে যাচ্ছে—অগ্রসর হচ্ছে কেউ কেউ বলছে—সেটা ঠিক ভাবে ধারণা করে মানুষের ভালর জন্যে মানুষের কাজে লাগানো—'

'ও এই ? এই সব?'

'হ্যা, প্রায় সব। তুমি বলবে এ ত নীতি হল? কিন্তু আজকাল খুব সম্ভব—'

ফাটা চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল।

'কিন্তু আরো খানিকটা আছে; বনচ্ছবি বললে, 'এই যেমন কার্তিকের বিকেলে আজ যেমন বসেছি ঘাস দেবদারু খোলা আকাশের ভেতর; কিন্তু বাসমতীর হেমন্তকালকে চেন ত তুমি-কালিজিরা চামরমণি সাকোবখোবা ধান কেটে নেয়া হয়ে গেছে যে সব ক্ষেতের থেকে—সোনালি খড়, শালিখ, আকাশ, চাষাভুষোদের অল্প স্বল্প আসা যাওয়া—নিঃশব্দতা মাইলের পর মাইল বয়ে গেছে—সেখানে মাঝে মাঝে বিকেলবেলা বিশাখা বা ওদের দু' একজনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে, কখনো বা বসে থেকে মনে হয়' আরো আছে। বড় কমল বাবু গান গেয়ে (একটা নির্ধারিত সীমায়) পেয়েছেন বলে মনে করতেন। কিন্তু আমার সেরকম কোনো দিক নিরূপণ নেই—খুবই অস্পষ্টতা—কিন্তু তবুও এটাকে বাদ দিয়ে শুধু নীতিবিজ্ঞান নিয়ে ধর্ম হয় না—মনে হয় আমার। অনেকের মত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সত্যই ত হল; এটা আমি পুরোপুরি স্বীকার করি না। শুদ্ধ সত্য এবং মানুষের কাজে কর্মে ফলিত সত্যের রূপ; এগুলো কিভাবে ঠিক ভাবে নির্ণয় করা যাবে তাও প্রায়ই বুঝে উঠতে পারি না। এই সব নিয়েই একটা ধর্মকে দাঁড়া করাবার চেষ্টা আমার—কিন্তু সেটা দাঁড়ায় না কিন্তু তবুও কোনো দিন হয়ত দাঁড়াতে পারে—নাও পারে—'

মাঝে মাঝে ব্রাহ্মসমাজের দালানটার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে দেখতে দেখতে ফাটা এক মনে বনচ্ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছিল; কিন্তু এর এসব সিদ্ধান্তের ওপর এ সমাজ ধর্মের বিশেষ কোনো প্রভাবে নেই বোধ করছিল জ্বালানো চুরুটটা হাতে রেখে; টানছিল না; কথা শেষ হলে ফাটা বললে,' সেই কথাই বলছিলাম তোমাকে আমি তখন—আজকের যুগে আমার মতন এত বয়সে আমি যে ধর্মসাধকদের মানে আগেকার ধর্মসাধকদের আলোয় এখনো খানিকটা পথ দেখে নিতে চাচ্ছি সেটা বোধ করে তুমি অবিশ্যি কাউকে খুব সম্ভব মনে মনে—হাস যদি—তা হাসতেও পার।

সিদ্ধার্থ হাসে?'

'এতক্ষণ পরে এই কথা বলা?'

'কেন?'

'কেন সেন হাসবে?' বনচ্ছবি ভুরু কুঁচকে গানের মত একটা টান দিয়ে হেসে বললে, 'জ্ঞানীরা নিজেকেই একমাত্র হাসির পাত্র বলে মনে করে।'

ফাটা চুরুটটা টানতে গিয়ে নামিয়ে রেখে বললে, 'হ্যাঁ,সেইজন্যেই তারা জ্ঞানী মনটা শুচি থাকে; জ্ঞানও টলটল করে থাকে নির্মলী কলের জলের মতন।'

বনচ্ছবি হেসে বললে, 'তুমি মানুষের মাথা খারাপ করে দেবে দেখছি।'

'কেন?'

'একেবারে লজিক হাকড়ে চলছ।'

'সিদ্ধার্থের অবিশ্যি মেটাফিজিক্স্ নিয়ে ব্যবসা। মেটাফিজিক্স্ ত লজিকেব চেয়ে ঢের বড়।'

চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে দু' একটা টান দিয়ে ফাটা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বনচ্ছবি বললে, 'তুমি যে জ্ঞানীদেব ভেকের কথা বললে—সেটা তাদেব আছে অনুভব কবেই জ্ঞানীবা নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসে; আছে—ঢের আছে বৈকি; সেইজন্যেই জ্ঞানটাকে ধূলিস্যাৎ কবে ফেলতে চায় তারা। আমাদের জ্ঞান ত মোটামুটি বিজ্ঞান—বড় জোব বিজ্ঞানের পোষ্য আধুনিক জানি। তারপর অল্প স্বল্প কিছুটা আত্মজিজ্ঞাসা। তুমি ত ব্রহ্মজ্ঞানের দিক চলেছ। সেটা এ জীবনে আমাদেব দিয়ে সম্ভব হল না।'

নিজেব কথা বলে চলছিল, কথা বলে চলছিল—কিন্তু নিজেব মুখেই এই তর্ক বিতর্কের কথা বলতে বলতে বনচ্ছবির মনে হল কেমন যেন বড় কমল বাবুব গান শুনে মনটা অভিভূত হয়ে পড়েছে তাব; তেমনি যে একটা কিছু হয়েছে গলার দিকেব, অস্ফোটে সেটা ধবা পড়ে গেল যেন ফাটার হৃদয়ে। সমাজের চাবদিককাব উঁচু চাব দেওয়ালের ওপারে সদব বাসমতীব ঘর বাড়ি দালানকোঠা গাছগাছালি ও আকাশেব একটা দূব বলয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল যে; চোখ ফেবালো বনচ্ছবির দিকে। বনচ্ছবি আঙুল দিয়ে ধূলো দূর্বা ঘাস চারখুপীব শিষের ওপব হিজিবিজি আঁকছিল, চোখ তুলে তাকাতে গেল না কোনোদিকে, কী কবছে বনচ্ছবি? যুক্তি সাধিকাব মনে হঠাৎ যে একটু ঢল নেমে পড়ছিল যেন—কোনো মানুষকে নিয়ে নয়, ধর্ম এবং ধর্মেব সেই বিষ্ফল বিষযকে নিয়ে খুব সম্ভব—সেইজন্যে একটু থমকে গিয়ে লজ্জা বোধ কবে ভাবটা কাটিয়ে উঠতে চাচ্ছে বুঝি। খানিকটা সময় কেটে শেষ হলে ফাটা আবাব আস্তে আস্তে বললে 'বিকেল চলে গেল প্রায।'

'অনেকদিন পবে বাসমতীব গাছে ঠেস দিয়ে—ঘাসেব ওপব বসে।' বনচ্ছবি বললে, 'আট দশ বছব এক নাগাড়ে কলকাতা কাটিয়ে এসে কার্তিক মাসে বাসমতীতে এসে পড়েছ তুমি। ঠিক কবেছ। কার্তিক মাস-জ্বর-জাবির মাস-সে হিসেবে কিন্তু বলছি না আমি।'

'জ্বব তোমাব হত—যখন ফ্রক পবে ঘুরে বেড়াতে, আমাবও হত; খলি গা আব খাকিব আফপ্যান্টে তাবপব অনেকদিন সে ম্যালেবিয়া আব হযনি—তোমাব হয়েছে বনচ্ছবি?'

'না—এখানে বেলস্টেশনটা অনেক দূবে-বাসমতীতে ঠিক বেলওযে স্টেশন নেই-স্টিমাব বযেছে—মিউনিসিপ্যালিটিব তদাবকি কি বকম জানি না—তবে ম্যালেবিযা ঢেব কমে গেছে।'

'বাসমতী কার্তিক অঘ্রান মাসেব দেশ,' ফাটা বললে, 'আমি জানি; সেই জন্যেই এই সময়ে এসেছি এখানে।

'আমাদেব ব্রাহ্মসমাজেব বাড়িটা সদবেব এবকম কাছে থেকেও বেশ নিঃশব্দ—এখানে বসে বসে এদেশেব কার্তিক অঘ্রানেব বিকেলেব ঠিক স্বরূপটা অনেক দূব পর্যন্ত বোঝা যায।'

'তুমি অবিশ্যি ব্রাহ্মসমাজেব কাজ কবতে চাচ্ছ।'

'চাচ্ছি।'

'এখানে যাঁবা সাধক ছিলেন তাঁবা এ বকম গাছে ঠেস দিয়ে কার্তিক অঘ্রানেব বিকেলেব ঠিক স্বরূপেব কথা ভাবতেন মাঝে মাঝে হযত—কিন্তু এতক্ষণেব ভেতব উপাসনা আবাধনা হয়ে যেত, কিছু গুণ গুণ করে তাব নাম টেনে দিয়ে সুব কবে—খোল কবতাল এসে পড়ত—সমাজেব মানী আসত—উপাসকেরা জড়ো হয়ে যেতেন—

'বুঝেসি আমি জিনশটা,' ফাটা বললে, 'আমাব সব হয়ে আস্তে আস্তে, কলকাতাব ব্যাপাবটা কাবো হাতে দিয়ে আসতে হবে; এখানকাব জমিদাবিটা যদি পাওযা যায—মৈতি চাচ্ছে—দেযা যাবে তাকে। তারপব এসে বসব।'

শুনে বনচ্ছবি ভাবছিল এই রকম সেন একদিকে চলেছে; এই মানুষ আর একদিকে যেতে চাচ্ছে; সেনের মতামতেব সঙ্গেই বনচ্ছবিরও চলা, কিন্তু এই লোকটিকে তাব মতেব ও বিশ্বাসেব কথা ছেড়ে দিযে দেখা চাই; দেখছে বনচ্ছবি; এর ওপব আগে যা শ্রদ্ধা ছিল তা যেন আবো খানিকটা বেড়েছে মনে হচ্ছে। এই সময়ে এই জাযগায় এত কথাবার্তা এতটা মন খুলে (মোটামুটিভাবে)আর কোনো পুরুষমানুষেব সঙ্গেই সে কোনোদিন করেছে বলে মনে পড়ছে না—এক সেন ছাড়া।

'তুমি বাসমতীতে থাকবে তাহলে?'

ফাটা চুরুটটা ঘাসের ওপর রেখে বললে,'এবার বাসমতীতে এসে নির্গুণ চিন্তা টিন্তা নয়—একেবারে নানারকম বিষয়েব ভেতবে ঢুকে ভেবে বুঝে দেখেছি আমি; কলকাতার চেয়ে—কলকাতাব আশপাশের চেয়ে এই জায়গাটাকে ভাল লেগেছে আমার।'

'এই জায়গাব পবেই কলকাতার দাবি?'

'কলকাতার দাবি বেশি ছিল এক সময়; এখন ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে। বাড়বাব সম্ভাবনা নেই আব। তুমি ত কলকাতায় যাচ্ছ?'

বনচ্ছবি সমাজবাড়ির খোলা দরজাব ভেতরেব অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললে,'বিশাখাও যাবে; আমবা এম এ পড়ব ভাবছি।'

'এম এ পাশ করে কী কববে?'

'অনেক পবের কথা। আগে পাশ কবে নিই।'

'বাসমতীতে ফিরে আসবাব ইচ্ছা নেই?'

'কিছুই বলতে পারছি না এখন—' সমাজেব দালানটাব ভেতরেব সেই আগেকাব অন্ধকারের (কিন্তু কোনো দৃশ্য অন্ধকাব চোখে পড়ছিল না তাব,এটা যে সমাজ সেটা মনে ছিল না) দিকে তাকিয়ে এই মানুষটিব কাছে এক দিকেব অস্পষ্টতাতে খানিকটা স্বচ্ছ কববাব চেষ্টা করে বনচ্ছবি বললে,

'এম এ পাশ কবে কি কি অস্পষ্টতাতে পড়তে হতে পাবে—'

ঘাসেব ভেতব থেকে চুরুটেব ধোঁয়া উড়ছিল,ঘুরে ভেসে মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে;একবাব তাকিয়ে চুরুটটা না তুলে ফাটা সামনেব দূরেব মহাশূন্যেব দিকে তাকিয়ে বইল।

'বি টি মানেই ত টিচাবি কবা, কিন্তু কোথায়?' বাসমতীতে নয় খুব সম্ভব? কথা ভাবছিল,ভুরু আলগাভাবে কোঁচকালো,দূরেব সার্কিট হাউসটাব দিকে তাকিয়েছিল, বললে,'হতে পারে বাসমতীতে: অতটা আগা কিছু ঠিক করে বাখতে পাবি না।'

'তুমি ত কলেজে পড়াবে?' বাসমতী কলেজে ত মেয়েবাও দু-চাবজন প্রফেসাবি কবছে—'

'আমি ইস্কুলেও পড়াতে পাবি—কলকাতায় না কোথায় ঠিক করে উঠতে পারিনি এখনো।' বনচ্ছবি কথা ভাবাব মত একটু গম্ভীর মুখে দূবেব সেই সার্কিট দালানটাব দিকেই তাকিয়ে বললে, 'তুমি জীবনে কি করবে না কববে স্থিব করে ফেলেছ; জায়গাও ঠিক করেছ। তোমাব জীবনে একটা নিশ্চযতা আছে; ধর্মেব থেকে সেই নিশ্চযতা পেলে তুমি। আমাবও একটা ধর্ম আছে বলেছি তোমাকে, কিন্তু সেখানে কোনো গুরু সমাজ এমন কি বিজ্ঞান পর্যন্ত কোনো ঠিক নিবিখ দিতে পারছে না-কারো ওপবই কোনো আপ্তবিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই আমাদেব-কাজেই কিছু স্থিব হচ্ছে না।'

চুরুটটা তুলে নিয়ে ফাটা বললে,'তুমি আধুনিক মানুষ; এ যুগে আধুনিক মানুষ হয়ে সুখে আছ, কিন্তু শান্তি নেই। আমি তোমাকে আমাব সব টাকা দিয়ে দেব; কিন্তু শান্তি পাবে তাতে তুমি?'

বনচ্ছবি এক মনে সমাজেব দালানেব ভেতব বেঞ্চিগুলোব দিকে তাকিয়ে ছিল; অন্ধকাবে শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে সব,কিন্তু এই শূন্যতাব দিকে তাব তেমন কিছু মন ছিল না, চাবদিককাব বড় পৃথিবীর কেমন যেন একটু অন্ধকাব শূন্য গর্ভতার এ ত খুব ছোট প্রতীক; ভাবতে নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল সে; সেই নিস্তব্ধ হ্রদেব ভেতব একটা ঢিল পড়ল যেন ফাটাব কথা শুনে।

'ব্যাঙ্কে আমার হাজাব চল্লিশেক টাকা আছে.' ফাটা চুরুটটা হাতে রেখে বললে, 'ব্যবসা করে জমিয়েছি। ইট বালি চুন সবকিব ব্যবসা।'

'হাজাব চল্লিশ মজুবেব ভেতব বিলিয়ে দিতে পাব টাকাটা এখন।'

'না,' ফাটা চুরুটটা টেনে প্রায় নিভে গেছে এখন। দেখে জোরে দু' চাব বাব টান দিয়ে জ্বালিয়ে তুলে বললে, 'সে বকম দিতে পাবলে ত লা সঞ্চা আমার মনের হত-ডন্ কিক্সটেব মত আশ্চর্য জিনিস ঘটিয়ে তোলবার শক্তিতে মানুষ হয়ে যেতাম আমি বনচ্ছবি। কলকাতাতে যতদিন ব্যবসা করেছি,খুব ঘোড়েল ব্যবসাদাব ছিলাম. কিন্তু বাবুদেব টাকা মেরেও কোনো শান্তি নেই—ওদেব টাকা বিলিয়ে দিয়েও কোনো শান্তি নেই, মনিব দালালদেব দাঁড় কবিয়ে দিয়ে কোনো সুখ শান্তি নেই। ঐ টাকা আমি একজনকেই দেব ঠিক করেছি—যদি সে নেয়।'

ফাটা চুরুটটা আস্তে আস্তে টানতে লাগল—নিভে গেছে সেটা, কিন্তু জিনিসটা খেয়ালের ভেতর নেই

তার। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল—একটা প্রকাণ্ড সিংহকে নিজের বুকের ভেতর প্রতিফলিত করে যেন; ক্ষমা নিস্তব্ধতা; খোলা চোখে সমস্ত সূর্যটাকে দেখা যায় এখন—চোখে কোনো ঝাঁজ লাগে না।

সূর্যটাব দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছিল বনচ্ছবি; আলো ফাটার মুখে পড়েছে খানিকটা। 'জীবনে টাকা আর শান্তির সম্বন্ধে ওরা কি বলে?' বনচ্ছবি একটা মিহি ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে ঘাসটাকেই উপড়ে ফেলে বললে।

'কারা?' কেমন যেন নির্দোষ দয়াময়ের মত মুখে জিজ্ঞেস করল ফাটা। এরকমভাবে ব্রাহ্মসমাজেব মৃত আচার্যদের মুখে ছেলেবেলায় দেখেছিল বনচ্ছবি; মানুষের নির্দোষতার প্রমাণ, কিন্তু ব্যবসার দিক দিয়ে আর এক রকম ব্যক্তিত্ব এই মানুষটির, এবং এই দু'টো দিক—সব দিক মিলিয়ে অন্য রকম কিছু। কোনো কোনো মানুষকে শ্রদ্ধা না করে পাবা যায় না, কিন্তু টানে না তাবা; কেউ কেউ স্বভাবতই এত বেশি টানে যে বিশ্বাস কবে পারা যায় না—ভাবতে ভাবতে সমাজেব দালানেব অন্ধকারেব ভেতর মানুষ ও ঈশ্বর পবিত্যক্ত নিঃশব্দ বেঞ্চিগুলোব দিকে তাকিয়ে চোখ ব্যথিয়ে উঠল বনচ্ছবির।

'ধর্মের চেয়েও শান্তি সম্বন্ধে কথা বলা কঠিন,সমাজ ধর্ম হল অথচ শান্তি হল না, কিন্তু টাকা হল শান্তি হল—এরকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।'

বনচ্ছবি সেই বেঞ্চিগুলোব দিকে তাকাল আবার,আরো অন্ধকার এসে জমে পড়েছে; ভেতরেব সার্শিব কাঁচগুলো বাইরের আকাশেব স্বল্প আলোয ঝিকমিক করছিল এতক্ষণ; সে স্বল্পতা সরে গেছে।

'শান্তি সম্বন্ধে বলা কঠিন, কিন্তু আমাব নিজেব জীবনেব কথা বলতে পারি—টাকা দিয়ে এখুনি কোনো দবকার নেই আমাব।'

সূর্যেব দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে,

'কিন্তু হবে।'

'হবে নিশ্চযই। কিন্তু এখনি না।' বনচ্ছবি একটু হেসে বললে—কাঁচা আত্মকত্রীব চেয়ে বেশি গভীবতা ও গাম্ভীর্য নিয়ে। দেখছিল ফাটা।

চুরুটটা তুলে নিয়ে ঘাসের ওপরেই আবার রেখে দিল,কুড়িয়ে নিয়ে দেশলাইযেব বাক্সটার ওপব রেখে দিতে গিয়ে বাক্সটাকে খুঁজে পেল না সে, চুরুটটা ঘাসেব ওপব ফেলে ট্রাউজাবেব পকেটে আলগোছে হাত ঢুকিয়ে খালি হাতটা বাব কবে এনে ফাটা বললে,'টাকা নেই তোমাব। থাকলে তুমি বোধ কবতে পাবতে যে টাকাকড়ির সঙ্গে সত্যিই শান্তিব কোনো সম্পর্ক নেই।'

'টাকা অল্প স্বল্পই আছে বাবাব,—আমাদেবও বোজগাব করতে হবে—যত বেশি পাবা যায।' বনচ্ছবি সমাজেব লাইব্রেবি ঘরেব জানালার দিকে তাকিযে বললে, টাকা ছাড়া প্রাযই সংসারে বা জীবনে স্বস্তি শান্তি লাভ কবা কঠিন—কিন্তু অসম্ভব নয।'

অনেক দূবে ডালপালাব কালো বঙেব নীচে আধাআধি ডুবে গেছে সূর্য।

'টাকা ছাড়া আরো কিছু আছে। কিন্তু মানুষ বুঝে চলতে পাবলে সেগুলিব মূল্য বেশি কিছু নয। ফলে—যথেষ্ট টাকা থাকলে হযত শান্তি সম্ভব।' বনচ্ছবি আস্তে আস্তে বললে। শুনে ফাটা স্তম্ভিত হযে বনচ্ছবির দিকে তাকিয়ে বইল।

'আমার যা হযেছে তাই বলেছি তোমাকে। কিন্তু আমাব অভিজ্ঞতা ত বেশি নয। তোমাব অস্বস্তি হল হযত।'

'আমি বলছি তোমাকে বনচ্ছবি, যথেষ্ট টাকা অনেকেরই আছে; আমাব নিজেবও বযেছে; চল্লিশ হাজাব টাকা ব্যাঙ্কে—আবো এক বছর ব্যবসা চালালে আবো পঞ্চাশ ষাট হাজাব টাকা জমানো যায। কলকাতায থাকলে এত—সব টাকা দিয়ে বেশ সুখেব জীবন চলে আমার; যখনই চালাতে চেষ্টা কবেছি অনাযাসেই পেবেছি। কিন্তু তাতে শবীব ভাল লেগেছে, কিন্তু কোনো সুস্থিরতা বোধ করেনি। গত আট দশ বছর ধবে প্রাযই প্রতি রাতেই বাবার কথা মনে হয়েছে আমাব; তিনি এক কাপ চা আব মুড়ি খেযে আমাব চেযে ঢের বেশি শারীবিক সুখও পেযেছিলেন—কারণ তার মনে প্রথম থেকেই শান্তি স্থিত ছিল। নিজের আলোয চলতে হয়। খুব ধনী মানী লোকও জানে টাকাব আলোয শান্তি নেই, ও আলো, আলো নয, শান্তির আলো আলাদা জিনিস।

'তোমার দিক দিয়ে তুমি ঠিক কথা বলছ,' বনচ্ছবি বললে, 'কিন্তু তোমার মতন লোক পৃথিবীতে খুব কম।'

সূচীপত্রে যান

'সেই জন্যেই পৃথিবীতে এত অশান্তি।' কে যেন বললে।

'কিন্তু কি করে পৃথিবীর মানুষদের মন বদলাবে তুমি।' ফাটা বললে, 'আমি না, ধর্মসমাজ তা করবে। অন্য আর এক ভাবে সেন চেষ্টা করে দেখতে পারে। কিন্তু ধর্ম সমাজ ছেড়ে দিয়ে সেন কতদূর এগোবে আর?'

'অবিশ্যি পৃথিবীর মানুষদের মন বদলাবার কাজে হাত দেয়নি সেন।'

'কি করে দেবে, বলেছিই ত তোমাকে সে কাজটা ধর্মসমাজের; কিন্তু একদিনের নয়।'

বনচ্ছবি বললে,'আমাদের এই ভীষণ অনিশ্চয়তাব পৃথিবীতে তুমি একটা কিছু লাভ করেছ মনে হয়।' ফাটা চুরুটটা তুলে নিয়ে বললে,'লাভ করিনি এখনো। কিন্ত এবার বাসমতীতে এসে আমাব সমস্ত মন এদিকে ঘুরে পাড়ছে।' চুরুট জ্বালিয়ে সূর্যের খোঁজে অনেক দূর একটা মসজিদের গম্বুজের ওপারে তাকাল—কিন্তু সূর্য ত ওদিক নয়—আকাশে নেই; নাবাল জমির নীল কালো ডালপালার ভেতরে আগুনটা মবে যেতে যেতে সোনার মতন ঠিকরে উঠছিল মাঝে মাঝে; একজন মহাপুরুষেব মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছিল ফাটাব। সন্ধ্যা হচ্ছে শীত করার কথা, কিন্তু আজ আবার একটু গরম লাগছে; বাতাস আছে ফুবফুরে,দেশে ভাল করে শীত পড়বার আগে—কেমন খানিকটা বসন্তের আমেজ; মেঘ নেই কোথাও,—সমস্ত আকাশটা তবু ধোঁয়া ধোঁয়া ধূসব, তারই ভেতর একটা ফাটা পাতিলের ভেতর থেকে সাদাটে এবড়োখেবড়ো চুনের গুঁড়ির মতন উঁকি দিচ্ছে যেন চাঁদ;—পরে আঁট হবে—আকৃতি লাভ কববে—উজ্জ্বল হবে। সমস্ত আকাশটা এতক্ষণ নির্ণয়ের ভেতরে ছিল ফাটার,চোখ নামিযে এনে মনে হল বনচ্ছবি চারদিককার আকাশ সূর্য প্রকৃতির থেকে নিজেকে রহিত কবে মানুষ ও লোকসমাজের কথা আপ্রাণ চিন্তা করছে—অনেক দূরের টেকনিক্যাল ইস্কুলের অ্যাসবেসটসের ছাউনিগুলোব দিকে তাকিযে।

'সেন এলে ভাল হত।'

'তাব সঙ্গে পবে দেখা হবে তোমার। সে এদিকে আসবে না। তার কাছে যেতে হয়।

'বাসমতীতে যখন থাকব ঠিক করেছি—সেনকে দিয়ে বিশেষ দরকাব আমাব।'

'খুব উপকার হবে অন্য নানা দিক দিযে। কিন্তু সমাজেব কাজে লাগবে না।'ফাটা বললে,'আমি একবার শেষ চেষ্টা কবে দেখব—দু'জন মানুষকে নিযে।' চুরুটটা জ্বালিযে নিযে বললে,'দু'জনই যদি আমাকে ছেড়ে দেয—তাহলে খুব মুশ্‌কিলে পড়তে হবে বাসমতীতে। আমি আমার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেব থেকে লোক ঠিক করি; একজনকে আমি শ্রদ্ধা করি; আর একজনকে—' ফাটা কথাটা শেষ না করে আকাশেব একটি কি দু'টি তারার দিকে তাকিয়ে রইল।

বনচ্ছবি কি বুঝেছে না বুঝেছে ব্যক্ত না করে ফাটাকে বললে,'সবোজিনীদি গগনকাকা এরা তোমার নিজেব ক্যাম্পে ছিলেন;—এঁদের ছেড়ে যখন তুমি বিরোধীদের ভেতব থেকে লোক ঠিক করেছ দু'জনেই ডোবাবে তোমাকে।'

'ডোবাক। কিন্তু টাকার লোভে তুমি আমাকে ডোবাবে না। এই মুহূর্তেই ত দেখলাম আমি। তা তুমি দেখনি। সিনেমায নামব না ঠিকই; কিন্তু একটা ডাক্তারি ডিগ্রী থাকলে অনেক টাকা করতে পারতাম; মাঝে মাঝে ভাবি তাই টাকা আমাকে খুব বেশি টানে।'

'তোমাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলাম—কাউকে কোনোদিন সাধিনি, সাধবও না; কিন্তু তুমি নিতে চাইলে না; টাকা টানছে তোমাকে?'

বনচ্ছবি বললে, 'টানে কি না দেখে, আমাকে কলকাতার কোনো অফিসে চাবশ পাঁচশ টাকার একটা চাকরি যোগাড় করে দাও। আমাকে দেখে দেখে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।'

'সব টাকই একই টাকা—যারা টাকা ভালবাসে তাদেব কাছে.' ফাটা বললে, 'তুমি আর্থিক স্বাধীনতা ভালোবাস; ঠিকই আছে। কিন্তু সেটা টাকার ভালোবাসা নয়। তুমি আমার চল্লিশ হাজার নেবে?'—ফাটা পকেট থেকে চেক বই বের করে বললে।

'বইটা সঙ্গে এনেছ দেখছি।'

'ঘরে রেখে আসতাম—কিন্তু খানিকটা কেনাবেচার ব্যাপাবে আড়তে গিয়েছিলাম,সেখান থেকে সোজা এখানে এসে বসেছি—নানাবকম জিনিস সঙ্গে রযে গেছে।'

'কোন ব্যাঙ্কের চেক্?'

গ্রিণ্ডলেজ। চেকটা এখানে তোমার নিজের ব্যাঙ্কে জমা দিতে পার—কযেক দিন পরে টাকা পেয়ে

যাবে।'

'কোনো ব্যাঙ্কে আমার কড়ি নেই।'

'তাহলে কলকাতায় গিয়ে ভাঙিয়ে আনতে পার—আমি বেয়ারার চেক দিচ্ছি—ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া দিচ্ছি তোমার আর—কাকে সঙ্গে নেবে?

'তোমাকে নিতে পারা যায়—'

ফাটা নিজের মনের সাত পাঁচের ভেতরে ডুবে ছিল, বললে 'তাহলে দশ বারো দিন অপেক্ষা করতে হবে। এখনি যদি চাও—সেনকে নিতে পার।' 'সেন কেন যাবে?' বনচ্ছবি শান্তভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বললে, 'আমি তোমার কাছ থেকে এরকম ভাবে টাকা নিচ্ছি জানতে পারলে সে হয়ত খুব সম্ভব মিতভাষিতা আরম্ভ করবে আমার সঙ্গে; একেবারে কথা বন্ধ করে দেবার মত অভদ্রতা করবে না। কিন্তু এ টাকা ত নিচ্ছি না আমি।'

'সেনের ভয়ে?'

'সেনকে জানাবে না ত তুমি; আমিও জানাব না।' বনচ্ছবি গম্ভীর হয়ে বললে, 'তাহাড়া চল্লিশ হাজার টাকা আজকের পৃথিবীতে সেনের ভয়ের চেয়ে ঢের বেশি ভাল জিনিস।'

'কিন্তু তুমি কই তা বোঝাতে পারলে। মৈতি আমার জমিদারি চাচ্ছে—সেটা তাকে দিয়ে দিতে বিশেষ কিছু খারাপ লাগছে না আমার। কিন্তু এ টাকাটা দিতে সত্যিই ভাল লাগবে। তুমি নিলে এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কোথাও কিছু আছে কি না আমি এখুনি তা বলতে পারছি না।'ফাটা গাছে আরো ভাল করে ঠেস দিয়ে একটা পা খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে বললে। অনেকক্ষণ পরে 'কিন্তু তুমি বাসমতীর দু'জন মানুষের কথা বলেছিলে যাদের দিয়ে দরকার তোমার; সেন একজন; এ টাকাটা সেনকে দেবে তুমি?'

'তুমি অনুরোধ করছ?'

'তুমি নিজের থেকে দেবে ভাবছি।'

'না।' ফাটা হাতে চুরুটটা ফেলে দিয়ে বললে, 'তা দেব না আমি। তুমি যদি দিতে বল, তাহলে তুমি একদিকে সেন একদিকে—আমি আর এক বিন্দুতে—এই ত্রিভুজের একটা মীমাংসা না করে কোনো কাজ করব না।'

বনচ্ছবি ফাটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ধূলোর ওপর একটা অষ্টভুজ আঁকতে আঁকতে বললে, 'তাহলে সেন ঠকে যাবে—সে ত বারো বছর হল বিয়ে করেছে।'

'তাতে কিছু হয় না। তাতে কিছু আটকায় না।' ফাটা নিজের কথাটার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বনচ্ছবির দিকে তাকাল।

'তাই বলছ তুমি—কিন্তু তুমি ধর্মসমাজে প্রবেশ করেও এরকম জ্যামিতির ছবিগুলোর কথা ভাববে?'

'না। এখন আমার সব কিছু স্থির হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সেন সম্বন্ধে এটা যা ভেবে রেখেছ তুমি—তা খুব ভুল হল। সেন সুনীতিদি আর আমাকে নিয়ে যখন একটা ত্রিভুজ সৃষ্টি হয় না—সুনীতিকে ছেঁটে ফেলে তখন তোমাকে বসালে কি করে তা হয়? আমি আবার এদিকে একটা অষ্টোহন এঁকে বসেছি। কারো জীবনে ত্রিভুজেব চেয়ে অষ্টোগনই সত্য? তিনটে বিন্দুর জায়গায় আটটা বিন্দু বসাতে হবে। আমি এও দেখছিলাম গণিত সংক্ষেপে কত কথা বলতে পারে। জীবনদর্শন সম্পর্কে একটা অষ্টোগন বা পলিগনের কি রকম সরস মিতব্যয়িতা।'

'হ্যাঁ, ঠিকই। মাব কাছে মামাবাড়ির খবর বলছ তুমি। কিন্তু যেরকম অনেকক্ষণ ধরে বলতে চাচ্ছিলাম আমার মনে হয় সে কথার কাছে একেবারে পৌঁছে গেছি; বনচ্ছবির দিকে তাকিয়ে ফাটা বললে, একটা মীমাংসাও করতে পেরেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু মীমাংসা করবার ভার একা আমার ওপর?'

'ওবকম কথাব উত্তর পৃথিবীতে নেই।'

'কিন্তু কিছু একটা উত্তর পেলে ভাল হত।'

'কারো সঙ্গে কোনো ধর্মনমাজে প্রবেশ করতে আমি রাজি নই।'

'কলকাতার ব্যবসায়ী সমাজে যদি থাকি—তাহলে?'

'তাহলে ত নিজেকেই নষ্ট করে ফেলবে তুমি। তুমি ধর্মই চাচ্ছ।'

বনচ্ছবি বললে, 'একটা লক্ষণ আমি ভাল দেখছি না, তুমি জিনিসটাকে এত বড় করে দেখলে যে সেজন্যে ধর্মসমাজ ছেড়ে কলকাতার ব্যবসায়ী সমাজেও লেগে থাকতে রাজি হলে মনে হল।'

ফাটা বললে, 'না রাজি হইনি—তবে ধর্মসমাজটা শুধু অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না সেটা জানবার জন্যে জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'আমি যদি বলি যে সিমেন্ট-টিমেন্টের ব্যবসা যে রকম করছে সেটা না চালালে জিনিসটা হতে পারবে না?'

'তাহলে আমাদের মিটে গেল;টাকার জন্যে তোমার জন্যে কোনো কিছুর জন্যেই বাসমতী ব্রাহ্মসমাজকে আমি ছাড়তে পাড়ছি না।'

'অথচ কত সহজে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারছি আমি।' বনচ্ছবি ম্রিয়মান দুষ্টুমিতে হেসে বললে।

ফাটা পকেট থেকে পাইপ বের করে বললে,'তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে,সেইটেই সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের আলোয় চলা ভাল। তুমি যদি বিদ্যাবুদ্ধিতে কম হতে তাহলে অনেকদিন বসে বোঝাতাম তোমাকে, প্রায় আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। কিন্তু কোনো দরকার নেই তার; তুমি ত প্রায় সেনের মতন জ্ঞানী। একটা শুধু অভাব বোধ হয় আমার এই যে তোমার জ্ঞান তোমাকে ধর্মসমাজের দিকে নিয়ে এল না কেন। কিন্তু আজকের পৃথিবীর জ্ঞানীদের ভোট নিলে টের পাওয়া যাবে যে আমি নই তুমি ঠিক পথে চলছ। চলেছ—বেশ। আমাব নিজের পথ আমার কাছে সত্য। তুমি বলছ যে সেটা দেখতে আমার ভাল লাগছে।'

'কোথায় দাঁড়িয়ে?'

'তুমি ধর্মের থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলবে—আব আমি অবিশ্বাস থেকে গভীবতর অবিশ্বাসে তলিয়ে যেতে থাকব—'

'কিন্তু যতই তলিযে যাও না কেন সেন সব সময়ই কাছে থাকবে ত তোমার?'

'সেন?'

'হ্যাঁ সিদ্ধার্থ।'

'হ্যাঁ। এখনো কাছে আছেন বটে, কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কববাব ক্ষমতা আমাব নেই।'

'আমার কাছে। সেনকে তুমি সব সময়ই তোমার হাতেব কাছে পাবে।'

'আমার সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলাবে সেন?'

'হ্যাঁ,তোমার মতন লোক তলিয়ে যাচ্ছে বলে।'

বনচ্ছবি পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিযে বললে, 'সেনের মনে অনেক ধাঁধা—হাতে অনেক কাজ। আমি তাব গ্রাহ্যের মধ্যে নেই।'

ফাটা চুরুটটা কুড়িয়ে নিল,দেশলাই হাতড়ে খুঁজে বার কবে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিতে নিতে বললে,'তা নয়,তুমি জান না কিছু বনচ্ছবি। সুনীতিব জন্যেই সিদ্ধার্থ কিছু কবতে পারছে না। তুমি করতে পারছ না কিছু। তুমি যদি দশটা বছব আগে বাসমতীতে জন্মাতে তাহলে সিদ্ধার্থের জীবনের মানেই বদলে যেত।'

ফাটার চুরুট ভার করে জ্বলেনি—অল্প স্বল্প ধোঁযা ছাড়ছে—ভাল কবে জ্বালিযে নেবার জন্যে দেশলাই কাঠি ঘষছিল। বনচ্ছবি তাকিযে দিখল সূর্য নিভে গেছে।

'তুমি যা বলেছ তারপর আমি কিছু বলতাম না,' বনচ্ছবি বললে, 'কিন্তু তুমি সেনকে চেননি সেই জন্যেই বলছি—'

'সেনকে আমি ষোল আনা চিনিনি—এই ত বলতে চাচ্ছ বনচ্ছবি?'

'ওকে বারো আনা চিনেও তুমি কি সব বুঝতে পারবে?'

'ও সুনীতিকে ভালোবাসে না। আমি জানি।'

'কিন্তু তাই বলে সেন অন্য কাউকেই ভালোবাসে না—' অন্ধকার হযে পড়েছে। বাতাস ছেড়েছে। চার পাঁচটা দেশলাইয়ের কাঠি খুইযে চুরুটটাকে জ্বালিযে নিতে পেবেছে ফাটা; দাঁতে দাঁতে কামড়ে একটানা কামড়ে খানিকটা ছাই জমিয়ে নিযে বললে 'তাহলে পারে বনচ্ছবি। কিন্তু না হবারই সম্ভাবনা। সিদ্ধার্থ পারলে মানুষকে না ভালোবেসে পারে না। শুধু প্রেমিক নয়। শুধু কি তাই? বাসমতীতে ওকে কত বড় প্রেমিক বানিয়েছ তুমি জান না। ও জানে—কিন্তু বাইরে কিছু বলবে না; ওর হালচাল দেখে কারো কিছু বোঝার সাধ্য নেই।'

অন্ধকার হযে গেছে। চাঁদ উঠবে অবিশ্যি—কিন্তু দেরী আছে। কোনো মেঘ নেই, কিন্তু বাতাস দিয়েছে, আঙুল প্রমাণ মেঘ কোথাও বা কোথাও রয়েছে হয়ত, দল বেঁধে জমতে কতক্ষণ? কালকের

মতন একটা সাইক্লোনের লক্ষণ অবিশ্যি কোনোদিকেই নেই। বেশ নিরিবিলি অন্ধকার;চারদিককার দেবদারু, ঝাউ নীল আর হরিতের একটানা সঙ্গীতে কতক্ষণ যে আলোড়িত হয়ে চলেছে অবাক হয়ে ভাবছিল ফাটা।

'তুমি বাঁ হাতে কলকাতার সিমেন্টের কারবার কর বুঝি? আর ডান হাতে বাসমতীর নাড়ী টিপে দেখ?'

·'আমার বাবা বড় কমলাবাবুর সে গুণ আমি দেখছি। তিনি অবশ্য মানুষের দৈহিক রোগের নিদান ঠিক করতেন—নাড়ী টিপে—মনের রোগেরও' ফাটা চুরুট টানতে টানতে বললে।

'সেনকে যদি আমি প্রেমিক বানিয়ে থাকি সেটা আমার দোষ?' বনচ্ছবি বললে।

'না।, সেনেরও দোষ নয়।'

'তবে?'

'দোষ পৃথিবীরও নেই কিছু।'

'অনেক দূর ত এগোলে নীরেনদা—'

'দোষ তোমাদের তিনজন নক্ষত্রেব।' ফাটা চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটার ওপর দিয়ে বললে।

কাছে কোথাও মৌমাছির ঝাঁক বেঁধেছে হয়ত, দু' একটা মাছি ছটকে এসে মাটির ওপর পড়ল—বনচ্ছবির পাযেব কাছে,ফাটা দেখেনি, মৌমাছির দিকে তাকিযে দেখবাব মত মন বনচ্ছবিরও ছিল না।

'এতসব সিদ্ধান্তে পৌঁছবাব আগে তুমি সেনকে জিজ্ঞেস কবে দেখো নীরেনদা। সে মিথ্যে কথা বলবার মানুষ নয়—তোমার কাছে ত কিছুতেই বলবে না।'

'সেনকে খুঁচিযে আমি কি বলব। সব ত জলের মতন সত্য।'

'কেন,সে তোমাকে বলেনি যে সে তোমাকে ভালোবাসে?'

মৌমাছিটা ঘাসের ওপর দিযে হাঁটতে হাঁটতে বনচ্ছবির পাযের ওপর এসে পড়েছে। হুল ফুটিযে দিলেই হযেছে। হাঁটুক—হেঁটে চলুক পাযেব ওপর, হুল ফোটাবে না। উড়ে যাবে শিগগির এক সময়।

'কথা বলার মানুষ নয় সেন।' বনচ্ছবি বললেন।

'গত সাত আট বছরে নানা ব্যাপারে তোমবা দু'জনে ত খুব কাছে কাছে এসেছ বাসমতীতে। কথাটা মুখ দিযে একবারও বেরুল না সেনেব?' ফাটা চুরুটে টানা দিযে বললে।

মৌমাছিটা শাড়ির ওপর এসে পড়েছে, এসে নেমে আছে এক জাযগায।

একটা টোকা দিলেই উড়ে পড়ে যেত। থাকুক।

'তুমি নিজেও কি বলোনি তাকে একবাবও?'

'কী কথা?'

'তুমি যে তাকে ভালোবাস—'

'আমি নিজে সেটা স্থির কবে উঠতে পারিনি সে কথা কি কবে বলব তাকে?'

ফাটা চুরুট টানতে টানতে বললে,'সবই স্থির করা আছে,অথচ কিছুই স্থিব হল না।'

বনচ্ছবি হেসে বললে—'মানে নক্ষত্রের দোষ।'

মৌমাছিটা আবার চলতে শুরু করেছে—বনচ্ছবিব শাড়িব ওপর দিযে। কোথাও আঘাত পেযেছে নাকি মাছিটা? ওড়বার ক্ষমতা নেই আব?

খানিক এগিযে থেমে রযেছে আবাব।

'নক্ষত্রের ঘাড়ে দোষ চাপিযে চুপ করে থাকবার মত মন আমার নেই। আমি যা কামনা কবি তাকে পেতে হলে নক্ষত্র আমাকে বাঁধা দেবে কেন?'

'তা দেয। সেই জন্যেই কিছু হয় না বনচ্ছবি।'

ছাতুবাবু গ্যালাবির থেকে নেমে—সমাজ মন্দিরেব উঠানে নেমে—নিজের মনেই অন্ধকারের ভেতর কোনো একদিকে চলে গেছে যেন। বিশাখার এল না আর,হঠাৎ এক হাল্কা বাতাসের ধাক্কা খেযে মৌমাছিটা বনচ্ছবির শাড়ি থেকে ঠিকরে পড়ল ঘাসের ওপর আবার। উড়ে গেল না তবু। আবার আসবে বুঝি ঘাস বেযে বনচ্ছবির শাড়ির ওপর।

'ওঠ নীরেনদা।'

'আমি আরো কিছুক্ষণ বসব এখানে।'

'বড় কমল বাবুর মতন ভাব এসেছে বুঝি তোমাব মনে?'

'এখন কোথায় তুমি যাবে বনচ্ছবি?'

'সেনের কাছে একটু যেতে হবে—সেই নাইট ইস্কুলেব ব্যাপার নিযে।'

'কোথায় পাবে তাকে?'

'তার বাড়িতেই।'

'পাবে বলে মনে হয় না। পবশু বাতে ত দেখলে, সাবা রাতের মধ্যে বাড়ি ছিল না।'

'কাল রাতে সেনদের কি হল? কালকের ঝড় তুফানের সারারাত বাইরে বাইরে ছিল নাকি সেন?'

'অসম্ভব নয়।'

'আমি সাত মাস ধরে সেনকে পাচ্ছি না নীরেনদা। অথচ বাসমতীতেই বয়েছি আমরা সব।'

ফাটা বললে,'খুব ভাল করে খুঁজলে নিশ্চয়ই পেতে পারতে। কলেজ গিয়েও ত সেখানে পারতে দু' চাববার।'

উড়ে গেল মৌমাছিটা। বনচ্ছবি উড়ন্ত মাছিটাকে অন্ধকারে ডুবে যেতে দেখে চোখ ফিরিয়ে এনে বললে,'অনেকবার গিয়েছি কলেজে গিয়েছি নীরেনদা। অতবড় একটা ছেলেদের কলেজে একজন প্রফেসরের খোঁজে আমাদের যে বার বার যাওয়া ভাল নয় সেটা প্রথমে না বুঝলেও নানা কারণে ঠেকে শিখতে হয়েছে।'

ফাটা চুরুট টানতে টানতে বললে, 'কেন,কী হল?'

'অনেক নচ্ছার জিনিস আছে ওখানে—শিক্ষিতদেব মধ্যেও।'

'ও—'

'গত দেড় বছর কলেজে যাইনি আর তাই।' বনচ্ছবি দূরের গাছপালাটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু আজ যদি সেনকে বাড়িতে না পাই—তাহলে কাল একবাব কলেজে যবি ভাবছি।'

একটু চুপ থেকে বললে, 'নাইট ইস্কুলেব কাজটা খুব জরুরি।'

ফাটা চুরুট টানতে টানতে বললে—'এই কলেজে কি তুমি পড়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'সেন পড়িযেছিল তোমাদেব?'

'হ্যাঁ,সেইবারেই প্রথমে কাজ নিল এ কলেজে।'

'তোমার সময এই প্রিন্সিপাল ছিলেন?'

'না।'

'ইনি কেমন?'

'চেন না একে?'

'না।'

'আমিও চিনি না খুব ভাল করে। আলাপ কবে নিতে পাব তুমি। একটা বড় কলেজের প্রিন্সিপাল— আলাপ করে খুশি হবে মনে হয।' বনচ্ছবি বললে,' তুমি এই কলেজে একটা প্রফেসাবি নিলে খুব ভাল হয নীবেনদা।' ফাটা চুরুটে টান দিযে বললে,'তুমিও এস না এমএ পাশ কবে—এই কলেজে মেযেদেব ডিপার্টমেন্টে।'

'আমার লোভ আছে,' বনচ্ছবি বললে,' কিন্তু শক্তি নেই। সেন নাকি এই কলেজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে?'

'কে বললে?'

'সেনের নিজের মুখে অবিশ্যি শুনিনি। কিন্তু কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি বিশ্বাস করি না। সেন বাসমতী ছেড়ে কোথাও যাবে বলে মনে করি না।'

'যাবে না?—এখানে কি আছে সেনেব ?'

বনচ্ছবি বললে—' ওর ভালোবাসার মতন বিশেষ কিছু নেই। তবু নানা রকম ভালোবাসার জিনিস গড়ে তুলতে চায়। তুমি যেমন ব্রাহ্মসমাজটাকে গড়ে তুলতে চাচ্ছ বাসমতীতে এসে।'

সূচীপত্রে যান

বনচ্ছবি অন্ধকার সমাজ মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বললে.' কিন্তু কথা রইল তবুও যে কেন কাজ নিয়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম না কিছু।' ফাটা চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে বললে,' বোঝবার দরকার নেই। জলের মতন পরিস্কার। ও যাবে না কোথাও। তুমিও থাকো বাসমতীতে।'

চুরুটটা টানবার উপক্রম করে মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে ফাটা বললে,' বনচ্ছবি', সময়ের লীলা আশ্চর্য। আরো ক'টা বছর থেকে যেয়ো না বাসমতীতে। অনেক ওলট পালট হয়ে যাবে। আমি যে নক্ষত্রকে দুষছিলাম তুমি হয়ত আশীবার্দ না করে পারবে না তখন।'

কিছুক্ষণ পরে বনচ্ছবি বললে,' তুমি ত অনেকক্ষণ ধরে চোখ বুজে আছ নীরেনদা।'

'হ্যা, একটু বড় কমল বাবুর মতন হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে।

'গান গাইবে?'

'না, এখন নয়, পরে।'ফাটা চোখ মেলেই বললে,' একটু বসে থাকব কিছুক্ষণ, দেখি তেমন কিছু ঘটে কি না যাতে তোমার কথা মনে থাকবে না আমার, সেনের কথাও না। অথচ মনটা লেগে পড়ে থাকবে এমন যে ভালই লাগবে না, ভাবনাই হবে। বড় কমল বাবুর যেমন হত।'

বনচ্ছবি বললে,' আমি উঠি নীরেনদা। আমি এখানে থাকলে তোমার সাধনায় বাঁধা পড়বে।'

'না, তা কিছু হবে না। কিন্তু তুমি চলে যেতে চাচ্ছ। আচ্ছা তাহলে এস বনচ্ছবি।'

'কাল কি তুমি এখানে থাকবে?'

'কখন?'

'বিকেলে?'

'না। রাত্তিরে থাকব।'

'তুমি ক'দিন আছ বাসমতীতে?'

'সাত আট দিন।'

'চলি নীরেনদা।'

'এসো।'

বনচ্ছবি উঠে দাঁড়িয়ে নীরেনের বোজা চোখে দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বইল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। বনচ্ছবি আছে কি গেছে—ঘাসেব ওপর দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেছে কি না মুদ্রিত চোখ মেলা না নীরেনের।

বনচ্ছবি গুটি গুটি চলে যেতে যেতে ভাবছিল বসে থাকলে সে পারে হয়ত কিছুক্ষণ নীরেনের কাছে। কিন্তু রাস্তায় উঠে মনে হল সেনের সঙ্গে আজ রাতে দেখা না হলে কিছুতেই চলবে না। একটা সাইকেল রিকশা ভাড়া করা যাক ঘন্টা হিসেবে। সেনের ত অনেক ঘাঁটি; কোন ঘাঁটিতে পাওয়া যায় দেখা যাক। কোথাও না পাওয়া গেলে বাসমতীর মাঠে আজকাল অনেক বাতে সেনকে দেখা যায় নাকি—তা কেউ কেউ বলাবলি করে চিরদিন ধরে শুনছিল বনচ্ছবি। সেখানেও যেতে হতে পারে।

সূচীপত্রে যান

জীবনযাপন

অজিত চায়ের কাপটা টেবিলে রাখতেই দরজা ঠেলে তারকবাবু ঢুকলেন—

অজিত বল্লে—বসুন রাঙাখুড়ো—এই রাজেন চেয়ার দে—

রাজেনকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না, কোনো প্রয়োজনও ছিল না, অজিত নিজের হাতেই শশব্যস্তে চেয়ার টেনে দিয়ে বল্লে—বসুন—তারপর কি মনে করে রাঙাখুড়ো—তামাক দেব?

—না না না তামাকের কোনো দরকার নেই—দিলেও তোমাব এখানে আমি খাব না তো

অজিত বিস্মিত হযে বল্লে—কেন রাঙাখুড়ো—

—না—না—না—

অজিত ঘাড় হেঁট করে আধ মিনিট চুপ থেকে বল্লে—সব ভাল রাঙাখুড়ো?

—সব ভাল—

তারকবাবু কোঁচানো চাদরের জোড় একবার ঘাড়ের থেকে উঠিযে আবার বিন্যস্ত করে নিয়ে বল্লেন—বড় আঘাত পেযে তোমার কাছে এসেছি অজিত—

—আপনি আঘাত পেযেছেন?

—হ্যাঁ অজিত

—কেন?

—অজিত, তুমি শেষ পর্য্যন্ত থিযেটারে নামলে?

অজিত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হযে তারকবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল

তারকবাবু বল্লেন—তোমার বাবার কথা কি তুমি একটুও মনে কব নি?

অজিত কোনো কথা বল্লে না।

—তোমার মাকেও ভুলে গিয়েছিলে?

অজিত কোনো উত্তব দিল না।

—তোমার মা সেই ছেলেবেলা থেকে কত যত্ন কবে তোমাকে শিক্ষা দিযেছিলেন—

অজিত বল্লে—রাঙাখুড়ো—

তাবকবাবু বাধা দিযে বল্লেন—তারপর বি-এ পাশ কবলে—এম-এ পাশ কবলে—

—হ্যাঁ

—তোমার চরিত্র তোমার বাপের মত মর্য্যাদা পেল—অন্ততঃ আমরা তাই ভেবেছিলাম—অনেক দিন অব্দি ভেবেছিলাম—কিন্তু তোমার যত অধঃপতন হোক না কেন—এ সব দিকে যে তুমি আসবে কোনোদিন এ কথা তো আমরা কল্পনাও করতে পারি না—

অজিত বল্লে—এসে পড়লাম

—এসে পড়লে? থিয়েটারে? মহিমের ছেলে হযে?

তারকবাবু বল্লেন—তোমাদের পরিবারকে আমি চিবজীবন ধরে এমন শ্রদ্ধা কবে এসেছি অজিত। এ পরিবার বামুন বা কায়েত বা কোনো সদ্বংশজাতহিন্দু পবিবার বলেই নয়—কিন্তু এর মনুষ্যত্বের জন্য। তোমার ঠাকুর্দ্দা আমার বন্ধু ছিলেন—তামাকটি অব্দি ছুঁতেন না—কোনো দিন কোনো মজলিস মজুরোয তাঁকে দেখি নি—সঙ্কীর্তন ছাড়া অন্য কোনো গান তাঁর অত্যন্ত উপেক্ষার জিনিষ ছিল—স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনো রকম প্রেমই তিনি কোনো দিন স্বীকার,করতেন না। মেযেমানুষের শরীরের কোনো রকম ব্যাখ্যাও কেউই কোনো দিন তাঁর কাছে করতে সাহস পেত না, পরস্ত্রীর দিকে তিনি ভুলেও কোনো দিন তাকাতে যেতেন না,—অথচ উদার—হৃদযের কত সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী মানুষ—তোমার বাবাও তো

ঠিক তাঁরই মত—সব বিষয়েই তোমার ঠাকুর্দ্দার মত।

একটু থেমে তারকবাবু বল্লেন—আমি ভেবে পাই না তাঁদের বংশের সন্তান হয়ে তোমার বাপমায়ের হাতে চরিত্র গড়ে কি করে তোমার এ রকম অবস্থা হ'ল—

তারকবাবু হতভম্ব হয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে রইলেন

অজিত একটু হেসে বল্লে—এই কথা রাঙাখুড়ো?

—কথাটা কি সামান্য অজিত?

—আপনার কাছে নয়—

—থাক, তর্ক করব না বড় দুঃখ পাই। তবুও এই কথাটুকু নিয়েও তোমার কাছে আসতাম না আমি যদি না জানতাম তোমার ভেতর তোমার বাবাব মতই একটা চমৎকার মর্য্যাদা আছে—

—সে মর্য্যাদা আমি হারিয়ে ফেলি নি কি?

—চরিত্র খারাপ হ'লেও অনেক সময় তা হারায় না—

—হারায় না?

—না

—কিন্তু আমার চরিত্র খারাপ হযেছে এ কথা কেন বলেন?

—এ সব দিকে এলে তা খারাপ হযই—

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে অজিত বল্লে—অনেক দিন আপনাদের নানা জনের সঙ্গে আমার দেখা নেই রাঙাখুড়ো—কিন্তু আপনারা সকলেই কি এই কথাই বলেন?

—হ্যাঁ, আমরা সকলেই এই কথা বলি—

—আপনার ছেলেরাও?

—হ্যাঁ

—আপনার নাতি নাতনীরাও?

—আমার ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী বলেই তো নয—এমন অনেক সন্তান সন্ততি পরিবার রযেছে যাবা তোমাব এ রকম পরিণতি দেখে অত্যন্ত দুঃখ করে, কেউ কেউ তোমাকে খুব ঘৃণাও কবে অজিত—

তারকবাবু থামলেন

—রানীদিও দুঃখ করে বুঝি?

—কে, রানী?

—হ্যাঁ

—সে তো করেই

—কি বলে—?

—কিন্তু রানী একা বলেই তো নয—এমন অনেক মা বধূ কন্যা রযেছেন যাঁবা এতে অত্যন্ত কষ্ট পান, খুব গ্লানি বোধ করেন

অজিত বল্লে—কিন্তু রাঙাখুড়ো রানীদি কি বলে?

—রানী?

—হ্যাঁ

—বানী বলে—তারকবাবু একটু কেশে বল্লেন—রানী বলে যে অজিতেব এ রকম দুর্ভাগ্য হবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি—

তারকবাবু চুপ করে রইলেন—

অজিত চুপ করে রইল।

তারকবাবু বল্লেন—রানী তো খুব বেশী কথাব মানুষ নয়—এই টুকুই বলে—

অজিত তারকবাবুর দিকে তাকিযে ঘাড় নাড়ল—

একটু পরে বল্লে—কিন্তু রানীদিকে বোলো—

—এ সব নিয়ে রানীকে আমি কিছু বলতে পারব না

—আচ্ছা, আমি গিয়ে তার সঙ্গে একদিন দেখা করব

—তা যেও না

—রানী দেখা করবে না?

সূচীপত্রে যান

—আমি বারণ করব।

তারকবাবু বল্লেন—কিন্তু তুমি এ সব ছেড়ে দিলে পার—

—ছেড়ে দেব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সকলেই তাই চাই—

—আপনারা চান?

—নিশ্চয়ই—তোমার বাপমার মনেও কত দূর আঘাত দিয়েছ তুমি—তোমার বংশের মানসম্ভ্রমও কত দূর ছোট করে ফেলেছ—তোমার যে রকম চরিত্র ও মর্য্যাদার সম্পদ ছিল তা নিয়ে এক বার ভেবে দেখ তো অজিত।

তিন চার মিনিট চুপ থেকে অজিত বল্লে—ভেবে দেখেছি রাঙা বুড়ো। ভেবেছিলাম রানীদির সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাব—কিন্তু তা হবে না। আমি যদি খুব ভালো অভিনয় কবতে পারি তাহ'লে হয়তো একদিন এক দল আমাকে মাথায় তুলে নেবে; তাতে আমাব খুব ভালো লাগবে কিনা বলতে পারি না—কিন্তু মা বা বাবা বা আপনি বা রানীদি যে কোনো দিন আমাকে বুঝাবেন না, এ আঘাত চিরদিনই আমার আঁতে লেগে থাকবে। জীবনের অত্যন্ত গৌরবের মুহূর্ত্তেও এই কথা ভেবে আমাকে অনেক ঢোক গিলতে হবে—

তারকবাবু বল্লেন—এতই যদি বোঝ তাহ'লে আর থাক কেন এ সবে?

—থাকি—আপনারা আপনাদের মত করে বোঝেন—তাও আপনাদেব অপরাধ নয়। আমি আমার কল্পনা ভালোবাসা বিচার বিবেকের অনুসারে চলি—

—এখানেও আবার বিবেক?

—তা আছে বৈকি রাঙাখুড়ো

তারকবাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন

অজিত বল্লে—প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা ভালোবাসার জিনিষ থাকে—

—তুমি তো এম-এ পাশ করেছিলে—

—তা করেছিলাম—

—তারপর কোন্ ফার্ম্মে কেমিক্যাল অ্যানালিষ্ট হয়েছিলে, না?

—হ্যাঁ

—কত মাইনে ছিল?

—শত দেড়েক

—তারপরেও প্রফেসবি পাওয়া? না?

অজিত ঘাড় নেড়ে বল্লে—পেয়েছিলাম—

—খুব বড় কলেজেও।

—কলেজটা মন্দ বড় নয়—

—এই সব সৎ পথ শিক্ষা দীক্ষা শ্রদ্ধা মর্য্যাদার পথ ছেড়ে দিলে কেন তুমি—

অজিত একটু হেসে বল্লে—এক দিন লেকচার দিতে দিতে একটা প্র্যাক্টিক্যাল একসপিরিমেন্ট সুরু করতে গিয়েই দেখি সমস্ত ঘর আগুনে ভরে গেছে—

—কে?

—ভুল হয়ে গিয়েছিল ; আর একটু হ'লেই সকলকে পুড়িয়ে মারতাম। এ রকম অল্প বিস্তর ভুল রোজই একটা আধটা হতে লাগল রাঙাখুড়ো। কেন জানেন? এ সব জিনিষেব ভিতর আমার মন ছিল না। এ সব জিনিসের জন্য কোনো মমতা ছিল না—কোনো হৃদয় ছিল না—

—মমতা থিয়েটারের জন্য হ'ল?

—প্রথমে আমি কবিতা লিখতাম—

—সেও তো বেশ ছিল—

—কিন্তু বুঝলাম ঠিক হচ্ছে না ; কলম ছেড়ে দিয়ে ভাবতে লাগলাম কেন এ সব খোঁচ—এ রকম গরমিল কেন সব লেখার ভিতব? বুঝতে পারলাম এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতেও চায় না যেন মন—আমি অন্য কিছু চাই যেন—

—অন্য কিছু শেষ পর্য্যন্ত এই সব গোবরের পাঁকের ভিতর গড়াল? তারকবাবু গলা খাকরে নিয়ে অজিতের দিকে তাকালেন—

অজিত বল্লে—পরের কবিতা আওড়ে যেন ভালো লাগত—ইংরেজী কবিতা। লিয়ার আবৃত্তি করে

এমন ভালো লাগল আমার। অনেকেই মুগ্ধ হ'ত ; নিজের জীবনের ভিতর আমিও এমন একটা আস্বাদ বোধ করতে লাগলাম কি বলব আপনাকে রাঙাখুড়ো! তারপর—

তারকবাবু বল্লেন—কিং লিয়ার সে তো বেশ ছিল—এটুকু আবৃত্তি করেই তুমি থামলে না কেন অজিত—

—কিন্তু বাংলা গল্পের আমাদের বাঙালীর জীবনের কথাবার্ত্তা নিজের মনের মত ক'রে বলতে পারলাম এমনই মনে মত করে যে নিজেই অনেক সময় বিমুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম, ভাবতাম এই তো কথাবার্ত্তা যা কত সময় আমরা বলি, কত সময় আমরা শুনি—এই তো সব ভাব রস যা এমন কিছু গভীর ধোঁয়ার জিনিষ নয়, কিন্তু তবুও এই সব উপকরণ ব্যবহার করেই যতক্ষণ না কবি তার বিধাতার মত হাত নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে একটা গল্প তৈরি করল ততক্ষণ এ সবের মর্য্যাদা আমরা বুঝতে পারলাম কৈ?—তার পর আমি এলাম আমিও কবি ; নট আমি—মানুষের জীবনের গল্পের আশা সাধ বিচ্ছেদ নিষ্ফলতার আমিও এমন মর্য্যাদা দিলাম যে লোকে গল্পলেখককেও ভুলে গেল—

অজিত হো হো করে হেসে উঠল—

তারকবাবু হয়তো শুনছিলেন না কিছু—

অজিত বল্লে—একটা অত্যন্ত অবজ্ঞেয় বইয়ের সাহায্যেও আমরা মানুষের হৃদয়কে অধিকার করে রাখতে পারি। বাংলা ষ্টেজে এ রকম বইই ঢের ; সে সবের কোনোই সাহিত্যিক মূল্য নেই—জীবন সম্বন্ধেও কোনো ধারণা নেই। থিয়েটারে যে নেমেছি রাঙাখুড়ো অনেক জিনিষই আমি চাই—যে সব বই জীবন সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ, যে সব কলম বিধাতার কল্পনা বিচার বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, সফলতা ব্যর্থতার নাড়ীর খবর সব চেয়ে গভীর ভাবে রাখে সে সব লেখা দিয়েই ষ্টেজ জমাতে চেষ্টা করব এখন, শুধু হৈ রৈ বা অবাস্তবতা দিয়ে নয়। এই একটা জিনিষ রাঙাখুড়ো। আর একটা হচ্ছে এই—ষ্টেজের প্রতি লোকের বিরূপ বিরস ভাব আমি ঢের কমিয়ে আনতে চেষ্টা করব। আমি আস্তে আস্তে বোঝাব তাদের যে এই বইগুলো জীবনের পক্ষে যেমন মূল্যবান—এদের অভিনয়ও তেম্নি ; শুধু তাই নয়—অভিনয়েরই একটা মূল্য আছে—একটা ঐশ্বর্য্যভরা কবিতা বা গান বা ছবির যে মূল্য দাও তোমরা তত দূরই। আমি দেখেছি অনেক বাড়ীতে বিশ্রী বীভৎস ছবি সব চিন্তাহীন কবিতা প্রবন্ধের এক একটা লাইব্রেরী নির্ব্বোধ গান সব গানের বই গানের খাত—এই সব—সবই নির্ব্বিবাদে হজম করছে তারা—কিন্তু ছেলেরা যে পাড়ায় ষ্টেজ বেঁধে হয়তো তাদের নিজেদের লেখা একটা বই, কিংবা বাংলা সাহিত্যের কোনো সম্পদময় গল্প অভিনয় করতে চাচ্ছে এ তারা সহ্যই করতে পারে না।

—আমিও তো পারি না।

—এ কি উচিৎ রাঙাখুড়ো?

—তোমার ঠাকুদ্দার কথা মনে কর অজিত

—কি মনে করব?

—তিনি পরের স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকাবেন না—

—অভিনয় করতে গেলেই মানুষ তাই করে নাকি?

—সেই রকম ভাব এসে পড়ে নাকি?

—একেবারেই না

—কি বল তুমি?

—যে নট—আর্টিষ্ট আমি তার কথা বলি?

—কি করে যে?

—একজন সচ্চরিত্র বুড়ো হেডমাষ্টারের চেয়ে তার ঐকান্তিকতা একটুও কম নয়—

—তুমি যা খুসী কর অজিত—কিন্তু বাজে কথা বোলো না—আমাদের দিগম্বর মুখুয্যের সঙ্গে তুমি নটনটীর তুলনা কর—তুমি মহিমের ছেলে হয়ে। ঢের হয়েছে—ঢের হয়েছে—এখন আমি উঠি—

—আচ্ছা নমস্কার রাঙাখুড়ো—

—তুমি ঐকান্তিকতার কথা বলেছিলে?

—হ্যাঁ

—চরিত্রও তোমাদের ভালো—

—যে যে জিনিষকে ভালোবাসে তার সাধনায় যায় যদি, তার না সে? ধূলো লেগে পড়ে সেটা নিয়ে অপরে এত মাথা ঘামাতে যায় কেন? ধূলোকে তো সে নিজেই ধূলো বলে বোঝে—যথাসময়ে ফেলে দেয়।

সূচীপত্রে যান

তার সাধনা কত দূর সত্য হ'ল এই নিয়েই কি বিচার করা উচিৎ নয়। ধূলোই যদি তাকে গিলে ফেলে তা হ'লে সে উকীলও নয় হেডমাষ্টারও নয় দারোয়ানও নয় কবিও নয় নটও নয়—কিছুই নয়—

তারকবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অজিত তৃপ্তি পাচ্ছিল না—

জানালার ভিতর দিয়ে অনেক দূর অব্দি মেঘ ও আকাশের দিকে চেয়ে অজিত বল্লে : একজন মানুষ বাস্তবিকই যখন তার অন্তঃসার হারিয়ে ফেলে তখন সে দারোয়ান হবারও যোগ্য হয় না—নট ঢের বড় জিনিষ রাঙাখুড়ো—

—কিন্তু আমার ছেলেকে নাতিকে তো কখনও সে রকম ষ্টেজ বাঁধতে দেব না—

—তারা যদি না চায়—

—চাইলেও দেব না

—আমাদের বাড়ীর লোকেরাও ঠিক এই রকম কবত—

—যাদের ধর্ম্মবোধ আছে তারাই করে—

—ধর্ম্মবোধ?

—আমাদের বাড়ীর মেয়েদের ওপর কড়া হুকুম আছে—

—জানি দেখাও নিষেধ তাদেব

—কোনো ভদ্র মজলিসেরও গানে যোগ দেবার অনুমতি তাদেব নেই—

—জানি আমি অনেক কিছু অনুমতিই তাদের নেই। অনেক সময়ই ভাবি কি নিয়ে থাকে তারা। জীবনকেই বা এত ভয পায কেন?

—জীবনকে?

অজিত বল্লে—আপনাদের এই পরিবার কিম্বা আমাদের পরিবাবই শুধু নয—এমন অনেক পরিবার আছে জীবনের সংস্পর্শে আসলেই ভয পায—

(পাণ্ডুলিপিব খাতায় এব পর দুই পৃষ্ঠা লেখেন নি।)

অজিত বল্লে—করুণাবাবু

—আজ্ঞে

—আমি ভেবেছি একটা নতুন বই নেব

—কি বই?

—এই ধরুন এমন একটা বই যার বেশ সাহিত্যিক মূল্য আছে—

—তার মানে?

—ভালো ভাব—ভাষা—তাছাড়া—

—হুঁ?

—মানুষের জীবনটা বুঝতে গিয়ে কোথাও ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই। এই সত্য প্রচেষ্টাব ভিতর তবুও এমন একটা সংসত্য রয়ে গেছে যে অনেক দুঃখ অনেক গ্লানি বিচ্ছেদ ও নিষ্ফলতাব এই জীবনটাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে না—এর গভীর মূল্যের কথা ভেবে আপনাদেব অবাস্তব নিয়ে পড়ে থাকতে ভালো লাগে না আর—

—আমাদের অবাস্তব?

—আপনাদেরই—

—কি রকম?

—মহাভারত পুরাণ রামায়ণ ইতিহাসেব থেকে ঢেব নেওয়া হযে গেছে—মহাভাবতীয় নাটকটা আপনারা চালাচ্ছেন সেটা থামিযে দিন এখন—

—বল কি দেড়শো রাত ধরে চলেছে—

—আরো দেড়শো রাত হয়তো চলবে—

—নিশ্চয় দেড় হাজার রাতও চলতে পারে—

—টাকা আপনারা খুব পাবেন—লোকের বাহবাও পাবেন, কিন্তু ষ্টেজেব কর্ত্তব্য কি এইই শুধু—?

—লোকেরা তো এইই চায—

—যাকে আপিং খাওযা শেখানো হযেছে সে আপিংই চায।...যাক্, আমি উপমা দিযে কথা বলব না। আমি এই কথা বলতে চাই করুণাবাবু যে আমাদের বাংলাদেশ এমন এক আধ জন লেখক আছেন যে

জীবনটাকে সত্য ভাবে বুঝতে গিয়ে যাঁরা খুব কঠিন হয়ে ওঠেন নি— যার কঠিন হ'লেও তা কোনো অপরাধের নয়, আমার নিজের মনের ভিতরেও কেমন একটা বিরূপ নিষ্ঠুরতা নেই যে তা নয়—কিন্তু সে যাক, জীবনটাকে সত্যিকার ভাবে বুঝবার মত প্রতিভা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েও দু এক জন লেখক তাদের আন্তরিক সংসত্য এমন অক্ষুণ্ন রেখেছে দেখলাম যে সেটা আমারও ভালো লেগেছে—আপনারও লাগবে—সে সব বই ষ্টেজে যারা দেখতে আসবে তাদেরও খারাপ লাগবে না—

—অবিশ্যি সে রকম বইএ আমরা নেই.; যা লোকের ভাল লাগে তা নেব না কেন?

—আচ্ছা তাহ'লে বেছে দেব আমি?

—এখন নয়

—কেন?

—আপনি নতুন এসেছেন—মানেন না তো?

—কি মানতে হবে?

—ষ্টেজ একটা ব্যবসা। একটা নতুন বই নেবার আগে আমাদের ঢের ভাবতে হয়। আপনার যা ভালো লাগে সকলের তা ভালো লাগে না। এই মহাভারতের নাটকটাকে অনেক সময়ই মিথ্যা হৈ বৈ বলে আপনি আক্ষেপ করেছেন; আজ যদি লঙ্কায় বা কুরুক্ষেত্রে আবার তেম্নি সেই সব যুদ্ধ বাধে, দেবতারাও বিস্মিত হয়ে আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখেন—কিন্তু তবুও আপনার হৃদয়কে সে সব বড় একটা স্পর্শ করে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকদের তো সেই সবই ভালো লাগে-মেয়েদেরও ; আমারও। দেবতাদেরও এক দিন ভালো লেগেছিল—আজো লাগে। এর কি করবেন আপনি?

—এ আমাদেরই অপরাধ—

—কেন?

—এত দিনেও আমরা মানুষের রুচি তৈরি করতে পারি নি?

—সে কি ষ্টেজেব কাজ?

—ষ্টেজেরই।

করুণাবাবু একটু টিটকারি দিযে বল্লেন—আপনি হযতো ভালো অভিনয় করতে পারেন। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট আপনার হাতে দিলে আর বক্ষা ছিল না—

—কেন?

—তা হ'লে দু দিনেই এক একটা থিযেটারকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারতেন আপনি—

অজিত আস্তে আস্তে চুরুটটা জ্বালাল

করুণাবাবু বল্লেন—আপনি হয়তো বার্ণার্ড শ-কে আমাদের ষ্টেজে টেনে আনতে চাইবেন—বলবেন সেই ধরণের নাটক চাই

—না, তা আমি বলব না

—আজকাল কেউ কেউ এমন কথাই তো বলে—

—শয়ের মত লেখক আমাদের দেশে একজনও নেই

—তা আমি জানি

—কোনো দিন হবেও না হয়তো

—তাও বটে

—যদিও বা হয় তাতে আমার আক্ষেপ বড় একটা ঘুচবে না

—কেন?

—বার্ণার্ড শ-কে আমার ভালো লাগে না—

—কি রকম?

—জীবনটাকে বুঝতে গিয়ে ফাঁকি দেওয়াব চেষ্টা তাঁর হয়তো নেই—কিন্তু সমস্তই কেমন একটা ভোজবাজীর ব্যাপার বলে মনে হয়। আমি যাক ভালোবাসি সে মেয়ে শয়ের নায়িকার মত কথা বলে না, বল্লে আমার ভালোও লাগত না, আমিও শযের নাযকের মত অনুভব করি না, কথা বলি না ; পৃথিবীর খুব কম লোকই তেমন ভাবে অনুভব করে—ও রকম ধরণের কথাবার্তাগুলোকেও একটা দায়ীত্বের মত মনে করে শুধু। ও একটা প্রবন্ধকারের জন্য। হয়তো কোনো ভবিষ্যৎ জীবন ঐ রকমই সজাগ সচকিত ও চতুর লোকে ভরে উঠবে কিন্তু আজকের জীবনের সংসত্যকে অন্ততঃ ও রকম ভাবে হারিয়ে ফেলতে উপদেশ

সূচীপত্রে যান

দেই না আমি আপনাদের—

—দিলেও তা গ্রহণ করবাব ক্ষমতা নেই আমাদের—

—কিন্তু নতুন বইয়ের দরকার আমাদের—

—কিন্তু সে বই কে লিখবে?

—আজকের কাজ চলে যায় বাংলা গল্প উপন্যাসের ভিতব এমন দু চার খানা প্রাণসম্পদভরা বই আমি দেখেছি.; হয়তো কালকের কাজও চলে যাবে তাতে—হযতো অনেক দিনের কাজ। কিন্তু ভবিষ্যৎ চলুক আর না চলুক—আমরা অন্ততঃ ধোঁযার হাত থেকে বেবিযে একটা নিস্তাব পাব। এ সংস্কার আপনাদের করা উচিত—এ রকম সাহস সাধ আপনাদের থাকা উচিত। যাতে এ বকম ধরণের বই আরো বেরোয আপনাদেরও একটু আধটু সাহায্য করা উচিত সে জন্য। লেখকেব জন্ম দিতে পারবেন না আপনারা অবিশ্যি—ভবিষ্যতের গঠনের ভিতর কাব কোন প্রতিভাব কতখানি হাত থাকবে তা বলাও শক্ত—কিন্তু আপনাদেরও খানিকটা হাত থাকা উচিত—

অজিত এই সব বল্লে।

এ সব অনেক দিন থেকে ভেবে এসেছে সে ; এই সব তাব প্রিয চিন্তা, প্রিয কথা। কিন্তু সকলের এ সব শুনবারও বড় একটা সময নেই—

করুণাবাবু বল্লেন—আচ্ছা দেখব।

আজ বাতেও কৃষ্ণের পার্টই অভিনয কবতে হবে অজিতকে ; যিনি এই নাটকখানা লিখেছেন অজিত দেখল কৃষ্ণচরিত্রের সম্বন্ধেও তাঁব বিশেষ কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধি নেই—এ চরিত্রকে তিনি ফোটাতে পাবেন নি। তা ছাড়া কোনো ভাবও নেই তাঁর—কোনো ভাষাও নেই। প্রাণহীন অক্ষরগুলোব দিকে তাকিযে ছিল অজিত—চরিত্রেব অবাস্তবতা তাকে ব্যথা দিচ্ছিল—কিছুই ভালো লাগছিল না।

বাইবে ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে—

অজিত বল্লে—এসো পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা সত্যভামার পার্ট অভিনয় করে। এ তাব খুব ভালো লাগে; খুব অনুবাগেব সঙ্গে বলতেও পারে সে; অভিনযে তাই তাব একটা চমৎকার সুব বাজে।

অজিত প্রথম কযেক দিন পূর্ণিমাকে আপনি বলে ডাকত ; কিন্তু পূর্ণিমা একদিন অভিমান ক'বে বল্লে—আপনি বল্লে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব না আর।

অজিত বল্লে—আচ্ছা, তুমিই বলব।

তবুও কযেক বাব ভুল কবে ফেলেছিল সে; পূর্ণিমাও কথা প্রায বন্ধ কবে এনেছিল। কিন্তু এখন 'তুমি' ছাড়া আর কিছু বলে না—অজিতের মুখে আব কিছু আসেও না—তা ভালোও লাগে না তাব।

পূর্ণিমা অবিশ্যি অজিতকে এখনও আপনিই বলে—কিন্তু তাতে অজিতেব কোনো বাগ বা অভিমানের কথা মনেই আসে না; এ নিযে সে চিন্তাও করতে যায না।

পূর্ণিমা বল্লে—বাঃ, আপনি দেখি বই খুলে বসে বযেছেন—

—বসেই বযেছি শুধু

—পড়ছেন না?

—নাঃ

—তবে যে বড় খুলে আছেন

—এ পড়তে আমার প্রবৃত্তি হয না

—কি বই?

পূর্ণিমা কাছে এল—

অজিত বল্লে—বোস

একটা কৌচের ওপর বসল সে

পূর্ণিমা বল্লে—বইটা দিন

অজিত দিল

—ওঃ এই বইটা—

বইটা অজিতেব হাতে ফিরিয়ে দিযে পূর্ণিমা বল্লে—তা আপনার পার্ট তো বেশ নির্ভুলই বলতে পারেন

আপনি—বইটা আর মিছেমিছি খুলে রেখেছিলেন কেন—

অজিত একটু হেসে বল্লে—নির্ভুল!

—বই যখন খুলে বসেছেন তখন নিশ্চয়ই ভুলের ভাবনা আপনার ছিল—

—তা নয়—

—আমিও তো জানি না কি অজিতবাবু : এ সব আপনার মনের ধাঁধা। এত ভালো পার্ট করেন—কিন্তু তবুও আপনার মনের ভিতর একটা সন্দেহ কেন যেন ঘোচে না—

—তাই না কি পূর্ণিমা?

—হ্যাঁ

—তুমি লক্ষ্য করেছ?

—করেছি বৈ কি—

অজিত প্রাণ খুলে হেসে উঠল

তারপর ধীরে ধীরে পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—তুমি সবই বুঝে ফেলতে পার দেখেছি—

অজিত আবার হাসল

তারপর বল্লে—আমি ভেবেছিলাম ষ্টেজে যেমন জীবনেও তেম্নি আমার সব সময়ের অভিনয়ের পিছনের মানুষটিকে কেউ দেখ না—

পূর্ণিমা নিস্তব্ধ হয়ে রইল—

অজিত বল্লে—ষ্টেজে দাঁড়িয়ে ভুল পড়বার ভয় আমার নেই পূর্ণিমা। এ যা বই—এ যে রকম সব কথাবার্তা এর চেয়ে ভালো জিনিষ অভিনয় করতে দাঁড়িয়ে তখন তখনই আমি নিজের মনের থেকে তৈরি কবে নিতে পারি—

পূর্ণিমা ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল

অজিত বল্লে—আমার মুখে এ বইয়ের এ পদগুলোর অনববতঃ গরমিল হয়ে যায় যদি তাতে আমি একটুও ভাবি না—অনেক সময় তা হয়—আমি চাই যে তা হোক্—না হ'লে আমার মন খোলে না—। কোনো একটা বিশেষত্বহীন অসাড় বইয়ের ভুল পড়া ঠিক পড়া নিয়ে আমি একটু মাথা ঘামাই না। আমাব মনের সন্দিগ্ধতা সত্য কিছু নিয়ে

—কি নিয়ে?

—এই এক্ষুণি ভাবছিলাম এমন বই আমাদের অভিনয় করতে হয় কেন; কোনো দিন লিখি না বটে—কিন্তু কলম নিয়ে বসলে এই জিনিষই এব চেয়ে আমিও তো ঢের ভালো করে লিখতে পারতাম—বাংলা দেশের অন্য লেখকদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—

—বইটা ভালো কি মন্দ আমি বুঝি না অজিতবাবু। কিন্তু আপনার পার্ট শুনতেই ঘবটা তো অজস্র লোকে ভরে যায়—

অজিত মনে ভাবছিল।—কিন্তু এই ঘবভরা লোকদের ভিতর দু চার জন বিচক্ষণ মানুষও যদি এক কোণে পড়ে থাকে তারা এই কথাই ভাবে যে এই একটা বই (কোনো দিক দিয়ে) যার কোনো প্রয়োজন ছিল না—লেখকের কোনো বুদ্ধি ছিল না—হৃদয় ছিল না—ভাষা ছিল না—লিখবার কোনোই দরকাব ছিল না তার—কতকগুলো অসাড় নির্ব্বোধ অবাস্তব জিনিষ দিযে একটা মিথ্যা সত্যভামাকে দাঁড় করাল মিছেমিছি সে—কিন্তু তবুও এই হাড্ডিসার চরিত্রের ভিতরেও পূর্ণিমা এমন প্রাণসম্পদ ফুটিয়ে তুল্লে যে বিমুগ্ধ হয়ে রাতের পর রাত বসে থাকতে ইচ্ছে কবে শুধু—বইটার সম্বন্ধেই একটা ভুল ধারণা হয়ে যায়—এই তারা ভাবে না কি?

কিন্তু মুখে সে কিছু বল্লে না।

পূর্ণিমার অভিনয়ের কোনো প্রশংসা করলে না সে।

দুজনেই চুপ করে বসে রইল।

পূর্ণিমা বল্লে—ওঃ এই আপনার সন্দেহ ; এই সব বইটই নিয়ে

—হ্যাঁ

—তাহ'লে নিজেই আপনি লিখুন না কেন?

অজিত বল্লে—আমি লিখতে পারি না।

—তবে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিন

—কাকে দিয়ে লেখাব?
পূর্ণিমা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—তবে কি হবে?
—থাক্ এ সব কথা এখন
পূর্ণিমা বল্লে—আপনার বোধ হয় মনে আছে কিছুদিন আগে বেশ একটা নামজাদা উপন্যাসকে ড্রামাটাইজ করা হয়েছিল এখানে—
—হ্যাঁ
—আপনি বুঝি সেই চান?
—হ্যাঁ : এর চেয়ে ঢের ভালো হয়
—কিন্তু সে রকম উপন্যাস কটা আর আছে?
—বেশী নেই—
—কিন্তু যে কটা আছে সেগুলো একবার আমানত করলে মন্দ হয় না
—আমিও তো তাই বলি—
অজিত বল্লে—কিন্তু, তোমার হয়তো তা ভালো লাগবে না পূর্ণিমা—
—আমার? সে উপন্যাসের অভিনয়ে আমি তো নেমেছিলাম—
—তা আমি জানি—
—কিন্তু এক রাত কি দু রাত হয়েছিল শুধু—
—কেন?
—ভালো করে তৈরি না হতেই নামানো হয়েছিল
—ওঃ
—কিন্তু এবার আপনি তৈরি কবে দিন না
—তাই ভাবছি—
—তা হ'লে হয়তো একশো দেড়শো রাতও চলতে পারে
—চলবে কি পূর্ণিমা? তুমি পাববে (...)? তোমার ভালো লাগবে?
—আমার?
—একটা গল্প হলেই বুঝি তোমাব খুব ভালো লাগে?
—আপনার যা ভালো লাগে না আমাব তা খুব ভালো লাগে এই কথা বোধ কবতেই আপনি বুঝি খুব তৃপ্তি পান
অজিত হেসে উঠল
পূর্ণিমা হাসছিল না।
অজিত গম্ভীর হয়ে গেল।
পূর্ণিমা বল্লে—আপনাকে খুব বড় মনে কবেন আপনি : সে আপনার শোভা পায—কিন্তু
পূর্ণিমা থমকে চুপ কবে রইল
অজিত বল্লে—বড়? মনে করি আমাকে? কোন বিসযে?
—সব বিষয়েই
—অজিত—
পূর্ণিমা বল্লে—আপনি ঢের শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছেন আমাদের চেয়ে—অনেক জানেন—অনেক বোঝেন—সদ্বংশের ছেলে—ভগবান আপনাকে ঢের ক্ষমতা দিয়েছেন—থিয়েটারে না এলেও আপনার কিছু এসে যেত না ; যেখানেই যেতেন সেখানেই আপনি মানুষেব পূজো পেতেন ; থিয়েটারে আপনি এসেছেন এ আমাদের সৌভাগ্য কিন্তু একটা কথা বলি আপনাকে অজিতবাবু—বরাবর আদর আহ্লাদ পেয়েই হোক বা যে করেই হোক—মনে আমার বড় অভিমান; সে অভিমানে অজ্ঞাতসারেও যদি আপনি এক আধ বার ঘা দিয়ে বসেন তা হ'লে বড় কষ্ট লাগে আমার—
—আমি কি তোমাকে আঘাত দিয়েছি পূর্ণিমা? কখন?
—আপনি বল্লেন যে কোনো একটা গল্প হলেই তো তোমাব চলে—
অজিত হাসতে লাগল—
কিন্তু পূর্ণিমা কাঠেব মত শক্ত—

অজিত দু এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হয়ে নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করে বুঝে উঠতে পারল না এ কথা পূর্ণিমাকে কি করে—কেমন করে—কোথায় আঘাত দিতে পাবে—কিন্তু তারপর চমকে উঠে বুঝতে পারল যেন সব—এ মেয়েটির অভিমান ও একটা প্রখরতার অপরিসীম পরিধি চোখ বুঝে দেখে ফেল্ল যেন সব অজিত।

কিন্তু পূর্ণিমা হাসছিল, বল্লে—আপনি এত কি ভাবছেন?

অজিত কোনো উত্তর দিল না

পূর্ণিমা বল্লে—রাগ করেছেন?

—আমি কখন কি বলে ফেলি—আমাকে সতর্ক করে দিও—

পূর্ণিমা বল্লে—আমি বড় বোকা ; এই এক্ষুণি বলছিলাম আমার খুব অভিমান—কিন্তু অভিমানটা আপনার কাছে এলেই যেন বেড়ে ওঠে আমাব। এব সমুচিত শাস্তি যখনই আপনার দরকার হয তখনই আপনি দেবেন। আর কিছু বলবার নেই আমার।

বলেই মনে হল পূর্ণিমার সে ঢের বলে ফেলেছে যেন—এত বলবাব কি প্রযোজন ছিল তার। অত্যন্ত লজ্জা পেতে লাগল পূর্ণিমা—এক এক সময যেন মাটিব সঙ্গে মিশেও যেতে ইচ্ছে করে।

—পড়বেন?

—হ্যাঁ

—যাই তাহ'লে এখন আমি?

—আচ্ছা যাও—

পবদিন পূর্ণিমা এল না—তার পর দিনও না—

তার পর দিন কোনো অভিনয ছিল না।

শেষ রাত থেকেই পৃথিবী কালো করে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়ছে—

ভোর চারটার সময উঠে অজিত বিছানার ওপব জেগে বসে ছিল—কিছুই ভালো লাগছিল না তাব। রেনকোটটা গায দিযে একটা শোলার টুপি মাথায চড়িযে বেবিযে পড়ল সে। কোথায যাওযা যায?

এক পূর্ণিমা ছাড়া আব কোনো লোকের কথাই মনে হ'ল না তার।

কিন্তু পূর্ণিমার কাছে এই সময?

সে উঠেছে কি না তাও বা কেন জানে?

গিযে সেখানে কি দেখতে হবে তাই বা কে বলতে পাবে?

কিন্তু তবুও গেল অজিত।

দোতলায পূর্ণিমাব কোঠার পাশে গিযে দবজাটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল।

পূর্ণিমা একটা শাল গায দিয়ে জানালাব পাশে মস্ত বড় বেতেব ইজিচেযাবে বসে ছিল—অজিতকে দেখে তাব মুখের কোনো ভাবপবিবর্ত্তন হযেছে বলে বোধ হ'ল না ; ইজিচেযাবে বসেই বল্লে—ওঃ আপনি—

—হ্যাঁ আমিই।

অজিত তাব ভিজে কাপড়চোপড় জুতো নিযে ঘরের মাঝখানে এসে সমস্ত কার্পেটে কাদা জল মাখিযে দিতে লাগল—সে দিকে তার কোনো খেযালও ছিল না যেন—

পূর্ণিমা বল্লে—আঃ কার্পেটটা নষ্ট করে ফেল্লেন

—ওঃ তাই তো

—জুতোটা ছেড়ে আসুন

অজিত তাড়াতাড়ি দবজার দিকে সবে গেল

পূর্ণিমা বল্লে—টুপী কোট র‍্যাকে রেখে আসুন

—র‍্যাক কোথায়?

—বাইরের দেযালে

—থাক্—আমি অন্য জাযগায় যাচ্ছিলাম—তোমার জানালা খোলা দেখে ভাবলাম তুমি উঠেছ হযতো—আমি চলে যাচ্ছি—

অজিত দরজা অব্দি গিয়ে একটু থেমে দাঁড়াল

—যা বৃষ্টি

আস্তে আস্তে (পূর্ণিমার) কার্পেটের দিকে তাকিযে বল্লে—তোমার কার্পেটের ওপব এই মহিষের ক্ষুরেব

মত জুতো নিয়ে কি করে যে চড়ে বসলাম আমি?

পূর্ণিমা বল্লে—বুট আপনি খুলুন। একটু ইতস্তত করে সাত পাঁচ ভেবে একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে অজিত শেষ পর্য্যন্ত বুটজোড়া খুলে ফেলতে লাগল—

টুপীটা র‍্যাকে রেখে এল—রেনকোটটাও—

পূর্ণিমা ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—এইখানে বসুন আপনি—

—এইখানে বসব? তা বেশ। অভ্যর্থনা করবার শক্তি ও সহৃদযতা তোমারই আছে —কিন্তু তুমি কোথায় বসবে পূর্ণিমা

—বিছানায়

—ইজিচেয়ারটা একটু কাছে টেনে নি—

—নিন্

চেযারটা পূর্ণিমার দিকে অল্প খানিকটা টেনে নিলে অজিত—

পূর্ণিমা অজিতের বুটজোড়া বারান্দায় রেখে এল—

পূর্ণিমা বিছানার এক কিণারে এসে বসে বল্লে—আপনাকে চুরুট দেব?

—চুরুট?

—খান তো আপনি—

—তা খাই বটে কিন্তু তুমি কোথায় পাবে?

—আনিয়ে দিচ্ছি—হয়তো দেরাজেও আছে

—দেরাজে?

—হ্যাঁ

—কি করে থাকে পূর্ণিমা?

—আপনাদেব জন্য।

অজিত বল্লে—আমাদের? আমাদেব কাদেব জন্য?

কিন্তু প্রশ্ন কবে এর কোনো উত্তব চাইল না সে। কেমন বিহ্বল হয়ে গেল—গম্ভীর হয়ে উঠল—

পূর্ণিমা উপলব্ধি কবে বল্লে—আমাব এখানে কেউ তো বড় একটা আসে না—থিযেটাবের কর্ত্তৃপক্ষ থেকে লোকেরা এসে মাঝে মাঝে আমাকে পার্ট বুঝিয়ে দিয়ে যায়' তা ছাড়া আমাব সঙ্গে দেখা কবতে হলে কার্ড দিয়ে দেখা করতে হয—

(এব পর প্রায তিন পৃষ্ঠা জুড়ে যা লিখেছেন, কেটে দিয়েছেন।)

এই মেযেটিব এই আত্মনিবেদনটুকুই অজিতেব পক্ষে যথেষ্ট—সে কি কবে না কবে—কার্ড দিয়ে মানুষ কত দূব নিজেকে সুবক্ষা কবতে পাবে—সে প্রবৃত্তি কতক্ষণই বা থাকে তাব—কখন সমস্ত আত্মবক্ষাই লাঞ্ছিত হয়ে যায—সে সব কথা ভাবতে গেলে হযবান হযে পড়তে হয।

পূর্ণিমার অভিনযের জীবন নিযেই তো অজিতের দরকাব—অন্য জীবনের খোঁজই বা সে নিতে যায় কেন?

ব্যথা লাগে—কিন্তু তবুও যে খোঁজ নেবাব অধিকাব নেই তাব।

ব্যথা লাগে কি যে!

পূর্ণিমা বুঝল—

অজিত বড় ব্যথা পাচ্ছিল

পূর্ণিমা অত্যন্ত ব্যথিত হযে বোধ কবল তা—

কিন্তু কি করবে যে? কি বলবে? পূর্ণিমা চুপ কবে রইল.

অজিত বল্লে—পূর্ণিমা—

পূর্ণিমা অনেকক্ষণ পরে বল্লে—আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন?

অজিত একটু হেসে বল্লে—না, অস্বস্তি নয—

—কি চান আপনি?

—কেমন শীত করছে, কেন বল দেখি?

—ঠাণ্ডা পড়েছে যে

—এই বাদলার জন্য?

—হ্যাঁ

পূর্ণিমা বল্লে—একটা হুইস্কি দেব আপনাকে?

অজিত স্তম্ভিত হয়ে পূর্ণিমার দিকে তাকাল—

পূর্ণিমা একটু ভয় পেয়ে গেল—

কিন্তু তবুও সে বল্লে—এক গ্লাস সোডার সঙ্গে দেই? তাহ'লে শরীরটা বেশ গরম হয়ে উঠবে—আরাম বোধ করবেন আপনি অজিতবাবু—

অজিত খানিকক্ষণ চুপ থেকে জানালার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বল্লে—মদ!

—অল্প স্বল্প—

জানালার দিকে তাকিয়েই অজিত বল্লে—কোনো দিন খাই নি তো—

—একদিনও না!

—না

—একটুও না?

—শুনলে আমার মা কি বলতেন?

—কিন্তু আপনি থিয়েটার করছেন বলে মা খুব ভাল বলেন না আপনাকে

—কিন্তু আমি জানি—একদিন যদি তাঁকে বুঝিয়ে বলি যে এ জিনিষ ছবি আঁকাব মত, কবিতা লেখার মত নানা রকম মানুষের নানা রকম জীবনেব নানা রকম প্রিয় একাগ্রতাব নিবেদনের ঐকান্তিকতাব জিনিষের মত তাহ'লে তিনি তা বুঝবেন সব; কিন্তু মদ খেযে তাঁকে আমি কি বলব?

—এটা মদ খাওয়া নয়

—কেন?

—এক গ্লাস তো খাচ্ছেন শুধু

—যদি ভালো লাগে?

—আব এক গ্লাস চাইবেন?

—চাই যদি

—আপনাকে দেব না আমি আব—

—কিন্তু এইটুকুই বা কেন দাও পূর্ণিমা?

—এতে আপনাব লোভ বেড়ে যাবে মনে কবেন?

—কত বকম কি হতে পারে—

—এত বড় হলেন—কিন্তু মদ নিয়ে কেউই কি কোনো দিন আপনাকে সাধে নি?

—সেধেছে—

—তবে?

—কিন্তু মেযেমানুষ তো কোনোদিন সাধে নি—

পূর্ণিমাব মুখ দু এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাইযের মত শাদা হযে গেল—

অজিতের চোখ পূর্ণিমাব মুখের দিকে ছিল না—সে মাটির দিকে তাকিযে ভাবছিল—

একটু পবে অজিত বল্লে—সকলকেই আমি অগ্রাহ্য কবেছি, কিন্তু তুমি যদি আর একটু বেশী সাধ তাহ'লে অনেক কথাই আমার মনে পড়তে থাকবে—ওমব খৈয়াম—সাকী—জীবনেব নশ্বরতা—মেযেমানুষেব রূপ—ভালোবাসা—আর্টিষ্টের অধিকাব—কত কি—তার পর একটা গেলাস শুধুই নয়—সমস্ত বোতলটাই আমি শেষ কবে ফেলব—তোমাব অনুমতি নিযেই—তোমার চোখেব সামনেই—

পূর্ণিমা পাথরের মত নিষ্প্রাণ হযে রইল—

—এমন তুমি অনেককে খেতে দেখেছ, না?

পূর্ণিমা কোনো কথা বল্লে না।

অজিত বল্লে—তুমি কি মনে কর পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা কোনো উত্তর দিল না।

অজিত ছোট ছেলের মত বাযনা ধরে বল্লে—বল তুমি কি মনে কর।

পূর্ণিমা পীড়িত ভাবে বল্লে—কিসের কথা অজিতবাবু—

অজিত বল্লে—তুমি বল্লে, আপনি এত বড় হয়েছেন অজিতবাবু—তবুও কেউ আপনাকে সাধে নি? আমি বল্লাম কোনো মেযেমানুষ আমাকে মদ নিয়ে সাধে নি পূর্ণিমা, কিন্তু, তোমার মত মেয়েমানুষ যদি

সূচীপত্রে যান

সাধাসাধি করে তাহ'লে আমি উপেক্ষা করতে পারব না

অজিত একটু থেমে বল্লে—তারপর আমার যে নতুন জীবন আরম্ভ হবে তুমিও সেটাকে উপেক্ষা করবে না—

—কেন উপেক্ষা করব?

—বরং সেই জীবনটাকে তোমার ভালো লাগবে আরো?

পূর্ণিমা কোনো জবাব দিল না। নারী সে; লজ্জা পাচ্ছিল—

অজিত বল্লে—তুমি তো খাও

—খাই

—কবের থেকে

—বছর দুই

—খুব বেশী খাও?

—না

—কতটুকু খাও?

—এক আধ গেলাস—কিম্বা দুই—আড়াই—

বলতে বলতে পূর্ণিমা সঙ্কোচে মুখ নত কবল

অজিত বল্লে—রোজ?

পূর্ণিমা কোনো জবাব দিল না।

অজিত বল্লে—লোকজনের সঙ্গে মিশে?

পূর্ণিমা বল্লে—এ বকম কেন জিজ্ঞেস কববেন আপনি!

অজিত পূর্ণিমাব প্রাঙ্গণেব একটা জামীর গাছের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল—

পূর্ণিমা বল্লে—আমাব ঘবে এসে বসেছেন বলেই নানা বকম অধিকাব আপনাব জন্মায় নি—

এম্নি কবেই মেয়েটি নিজেব লজ্জা চাপতে চাইল।

কিন্তু লজ্জাব বিশেষ কোনো কাবণ ছিল না তো তাব। সে অভিনয় কবেছে, ভেবেছে দু এক গ্লাস খেলে অভিনয় তাব সফল হবে, কিম্বা বন্ধুবান্ধবদেব মাঝখানে বসে দু এক গ্লাস খেলে সকলে তাকে সেযান মনে কববে—এই শুধু, যাতে চোখে কালি পড়ে, মুখ চুন হয়ে যায়, শরীব ঘামাতে থাকে নিঃশ্বাস বক্তেব মত গবম বোধ হয—জীবনের বা হৃদযেব সে সব লালসা ও খেদেব নিষ্ফলতাব থেকে এই দিব্যি চেহাবার নাবীটি ঢেব দূরে। সে ঢেব মূল্যবান—এত মূল্যবান যে অজিতের সঙ্গেও অনেক সময সম্ভ্রম বক্ষা কবে চলাই সে ঠিক মনে কবে—অন্যদের সঙ্গে সে সম্ভ্রমের এক তিলও সে খোযাতে যায নি। কেন যাবে? (সে অভিনয কবতে এসেছে—কোনো অবান্তর আবাধনা করতে আসে নি তো।)

কিন্তু তবুও নাবী সে;—তাব লজ্জা করছিল—বিশেষতঃ অজিতেব কাছে। যে লোকটা জীবনে এক গ্লাস মদও খয নি—অথচ এত বড় হয়েছে—এত ভালো অ্যাক্টও করতে পাবে—থিয়েটাবে এল—তবুও মদেব গেলাসেব সম্ভাবনা দেখে যে মানুষ তার মাযেব কথা পাড়ে তাব কোনো নাড়ীনক্ষত্র বুঝতে পারছিল না যেন পূর্ণিমা—নিজের নারীত্ব তাব কেমন গুমবে উঠছিল যেন ; অজিতকে শোনাতে গিয়ে নিজেই নিজের গলাব সুরে কি যেন শুনতে পেল সে—লজ্জা পেল—

অজিত বল্লে—আমি এক সময কবিতা লিখতাম—

পূর্ণিমা স্নিগ্ধ কথাব সুবে বল্লে—কবিতা লিখতেন?

—হ্যাঁ, পূর্ণিমা, ঢেব কবিদের সঙ্গে মিশবারও সুযোগ হযেছিল। অনেকেব চেযেই আমি ভালো লিখতাম বলে আজো বোধ করি কিন্তু তাদের একটা বিশেষত্বকে আমি কিছুতেই আযত্ত কবতে পারি নি

—কি অজিতবাবু?

—তারা ভাবত এই যে যখন তারা মিল দিয়ে কবিতা লিখতে শিখেছে তখন তাদের জাত বদলে গেছে, অন্যরা যেখানে একটি স্ত্রী নিয়ে রয়েছে সেখানে দশটি মেয়েমানুষ নিয়ে তাদের থাকতে হয়, অন্যরা যেখানে জল চায় সেখানে তাদের মদ না হ'লে চলে না, অন্যরা যেখানে চুল ছাটে সেখানে তাদের বাবরি কাটা চাই—এই সব আর কি—

পূর্ণিমা চুপ করে শুনেছিল

অজিত বল্লে—আচ্ছা ভূযো কবিদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, সত্যিকার কবি হ'লেও বড় বড়

সূচীপত্রে যান

চুল রাখতে হবে? মদ খেতে হবে?

পূর্ণিমা ফাঁপড়ে-পড়া ভাবে অজিতের দিকে তাকাল।

অজিত হেসে বল্লে—বল তো পূর্ণিমা?

—আপনিই তো জানেন—

—কবিত্বের সঙ্গে লম্বা চুল বা মদের কোনো সম্পর্ক নেই

—আমারও তাই মনে হয়—কিন্তু লোকে তো বিশ্বাস করে আছে—

—দু লাইন মিল দিয়ে মদ খাবার নিরঙ্কুশ অধিকার এক এক জনের জন্মায়—তার কবিপ্রতিভাও সাব্যস্ত হয়ে যায়—কিন্তু গণিতের প্রতিভা নিয়ে যে লোকটা নব নব আবিষ্কারে মেতে আছে তার লম্বা চুল মানুষের উপহাসেব জিনিষ—মদ খাওয়াটাও অত্যন্ত দুর্নীতি অত্যন্ত অধঃপতন। কিন্তু সুবিধে এই যে লোক আমাদের চেয়ে মাথা ঢের ঠিক রাখে—মদ খেতেও যায় না, চুলও ছাটে—একটি স্ত্রী নিয়েও কিম্বা মেযেমানুষবিহীন হয়েও প্রতিভার স্ফুরণে বিশেষ কিছু বাধে না তার—তার প্রতিভার কবিত্বের দিকটাও দু লাইনের মিলের চেয়ে ঢের বেশী গভীর—কিম্বা আমাদের অনেক নটের চেযেও খাঁটি নটরাজের তালে তালে ঢের বেশী সিদ্ধ হৃদয়ঘোরে চলেছে—

পূর্ণিমা চুপ করে রইল

অজিত বল্লে—অঙ্ক জ্যামিতি জ্যোতিষ বিজ্ঞান মীমাংসা ন্যায় এই সব নিয়ে যাদের প্রতিভা ফুটে উঠছে তারাও নটরাজেব বন্ধু—তারাও কবি—কিন্তু মদ বা লম্বা চুলের প্রযোজন তাবা বোধ করে না—আমরাই বা কেন বোধ করব? আমাদের এ আনুষঙ্গিকগুলোর কি প্রযোজন আছে? কবিতা লিখতে গিয়ে, গান গাইতে গিযে কিম্বা অভিনয় করবার সময় ছবি আঁকবার সময় ব্রান্ডি ঝাকড়া চুল বা উচ্ছৃঙ্খলতার কি প্রযোজন? কিন্তু আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই যে এক এক জন সত্যিকার কবি বা নাট্যপ্রতিভাও এ জিনিষগুলোকে তাদের অন্তরের জীবনের পক্ষেও এমন দরকার মনে করে।

অজিত বল্লে—এ রকম নির্ব্বোধ কি করে হওয়া যায়?

অজিত বল্লে—এ ঘোর কেন তাদের কাটে না?

অজিত বল্লে—এর চেয়ে মদের রসেব জন্যই যাবা মদ খায় কিম্বা মেযেমানুষ ভালো লাগে বলেই নিরবচ্ছিন্ন উপভোগ করে চলে তারা ঢের বাস্তব।

পূর্ণিমা বল্লে—ঠিক তাই। কিন্তু যে ভড়ং দিযেই সুরু করুক না কেন, কবি গুণী যাই বলুক না কেন অজিতবাবু শেষ পর্য্যন্ত রসেব জন্যই খায় তারা—সব কবে—

—তখন আর ভড়ং থাকে না!

—না। একটা বাস্তব দরকার হযে পড়ে

—তোমাবও তাই হযেছে নাকি!

—এখনও হয় নি—

—কিন্তু হতে পারে?

—বলতে পারি কি অজিতবাবু?

—কিন্তু অভিনযকেই তুমি সব চেযে ভালোবাস না পূর্ণিমা?

—তাই তো বাসি—

—যে জন্য তুমি ভদ্রঘরের মেযে হযেও অনেক লাঞ্ছনা সহ্য কবছ—

—হ্যাঁ, অজিতবাবু—

—তোমার শিক্ষাদীক্ষা এত রূপ এত গুণ তোমাকে মানুষের জীবনেব চলতি পথেব কত সুখ সম্মান সাধের দিকে নিয়ে যেতে পারত পূর্ণিমা—কিন্তু ষ্টেজকে ভালোবেসেই তুমি এলে—কাজেই এ তোমার সুখের নয় সংগ্রামের জাযগা—আরাম নয় নিবেদনের স্থল হযে উঠল—কিন্তু পূর্ণিমা—

অজিতের গলা ভারী হযে উঠল

তিন চার মিনিট চুপ করে রইল সে—

পূর্ণিমা বল্লে—কি ভাবছেন?

অজিত একটু হেসে বল্লে—তোমার এই নিবেদনের মুর্তিটি চিবদিনই রেখো। কোনো কিছুই যেন একে কোনোদিন পশু না করে ফেলে—

পূর্ণিমা হাসতে হাসতে বল্লে—আপনি ভয় পাচ্ছেন মদ খেয়ে আমি বুঝি বা নষ্ট হয়ে যাই—

সূচীপত্রে যান

অজিত ব্যথা পেয়ে বল্লে—থাক এ কথা—
—কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না—
—কি?
—যে মদ খেয়ে বা অত্যাচাব করে প্রতিভা খরচ হয়ে যায়—
—তা যায়
—আপনি জোর করে কেন বলেন?
—জোর নয়
—কিন্তু আমি ঢের শুনেছি—আমি নিজেও জানি যে আমি এক আধ গ্লাস খেয়ে ষ্টেজে যখন উঠি তখন আমার (...) খুলে যায়। ও না হলে আমি হাঁপিয়ে উঠতাম—
অজিত নিস্তব্ধ হয়ে রইল।
পূর্ণিমা বল্লে—এ প্রযোজন আমার বেড়ে চলে যদি—আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমেই বেড়ে যাবে—বাড়ছে যেন—
অজিত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বল্লে—কি?
—এ আমার প্রয়োজন যে—
—আমিও তো অ্যাক্ট করি—
—কিন্তু আপনার মত ভাগ্যবান আমি তো নই—
—তোমার ঢের সম্পদ আছে পূর্ণিমা—তুমি এ আর কোরো না—
—কিন্তু ষ্টেজে উঠে গুলিয়ে যায় যদি সব
—মদ না খেলে?
—হ্যাঁ অজিতবাবু—
—বরং নেমে খেও—বা অন্য সময়ে এক আধটু খেও—এতে এ অভ্যাসের দৃঢ়তা কমে যায়—
—তা হবে না
—কেন?
—বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়ি—
—এ তোমাকে কে শিখিয়েছে?
—প্রথম দু চার বাত এমন ভালো অ্যাক্ট কবলাম—কোনো ভুল হ'ল না। ভয় ভেঙে গেল—একটা সার্থকতা পেলাম—তখনই এই প্রবৃত্তি জাগল আমার। এতে জিনিষটা এমন সহজ হয়ে গেছে—
—সহজে হয়ে যায়?
—হ্যাঁ
—তাহ'লে আমিও খেতে আরম্ভ করব পূর্ণিমা?
পূর্ণিমা শঙ্কিত হয়ে উঠে বল্লে—আপনার কি দবকার? আপনার জন্মগত ক্ষমতাব কাছে এ সব জিনিষের তো কোনো প্রযোজন নেই
অজিত অবসন্ন হয়ে হেসে বল্লে—জন্মগত ক্ষমতা! প্রতিটি রাতেব জন্য আমার কত কষ্ট পেতে হয় তা তুমি জান কি পূর্ণিমা—
—আপনার দুটি পায় পড়ি—তাই বলে এ সব করবেন না
অজিত হাসতে হাসতে বল্লে—আচ্ছা, এখন তো এক গ্লাস ঢাল
—আপনাব দুটি পায় পড়ি, চাইবেন না আপনি—
—দুটি পায়! কিন্তু আমি একটা বোতল কিনে নিয়ে নিজেব ঘবে বসে খাই যদি—
—তাহ'লে আমি সব ছে'ড়ে দেব—
—মদ?
—এ ষ্টেজ এ অভিনয়—যাকে আমাব নিবেদনের জীবন বলেছেন আপনি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব—
অজিত হাসতে হাসতে বল্লে—অত বাড়াবাড়ি কেন কববে?
পূর্ণিমা বল্লে—সব ছেড়ে দিয়ে যখন এখানে চলে এলাম তখনও তো বাড়াবাড়িই করেছি
—তাই তো
—আবার যদি তেম্নি তাগিদে চলে যাই

সূচীপত্রে যান

—আমি মদ খেলে তাগিদটা তত বড় হবে?
—হ্যাঁ
—একটা সামান্য মদ খাওয়ার ব্যাপার শুধু—
—মদ খাওয়ার ব্যাপার শুধু নয়
—তবে?
—আপনার মদ খাওয়া।
অজিত হাসতে লাগল—
হাসতে হাসতে বল্লে—এতে তো আমার অধিকার আছে—
পূর্ণি বল্লে—আপনার?
—হ্যাঁ, আমি কবি ছিলাম—এখন গুণী হয়েছি—লোকেও তো আমাকে সমর্থন করবে।
অজিত একটু থেমে বল্লে—হয়তো আমার কাছ থেকে এ জিনিষ প্রত্যাশাই করবে তারা। আমি কবি ছিলাম—গুণী হয়েছি—তুমি চুপ করে আছ কেন পূর্ণিমা? আমার অধিকার নেই?
—আছে বৈ কি
—তবে?
—আপনার অধিকারের প্রতিবাদ আমি করব না, কিন্তু আপনাব মাকে আপনি কি বলবেন?
—হাঃ হাঃ...মা?
—কি বলবেন তাঁকে আপনি?
—বলবার কি দবকার আর?
—কিছুই বলবেন না?
—না।
—কেন?
—মানুষের জীবন ক্রমে ক্রমে তাব নিজেবই জিনিষ হযে দাঁড়ায—কোনো শ্রদ্ধা মমতা ভালোবাসাব সঙ্গে বাঁধ আর তেমন কঠিন হয়ে থাকে না, ঢিলে হয়—খসে যায। যা তাব ভালো লাগে তা সে কবে—এরই ভিতব থেকে তার নবীন ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও মমতাব জন্ম হয—
এখন আমি অভিনযকে শ্রদ্ধা কবি—চুরুটের প্রতি মমতা—কাকে ভালোবাসি আজো তা বুঝি না—
পূর্ণিমা বল্লে—কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধা মমতা ভালোবাসা মোচড় দিযে ধীবে ধীরে আবাব সেই পুবোনো জিনিষগুলোতেই গিযে বাঁধা পড়ে
—ওঃ—পড়ে না কি?
—হ্যাঁ
—কি কবে বুঝলে তুমি?
—মানুষ শেষ পর্য্যন্ত এই পুরোনো জিনিষগুলোকে কিছুতেই ছাড়াতে পারে না ; যে জিনিষ যত পুরোনো তাকে ভোলা ততই কঠিন—যতই দিন বাড়ছে ততই বুঝছি—
—তোমাবও তোমাব মাকে মনে পড়ে?
—মাকে বাবাকে
—বেঁচে আছেন আজো
—হ্যাঁ
—তুমি বাংলা অক্ষব প্রথম লিখলে কোথায?
—মেমের ইস্কুলে
—মেমের ইস্কুলে? ফ্রক পড়তে?
—হ্যাঁ
—খুব ছোট্ট মেয়ে ছিলে?
—ছিলাম বৈ কি
—দেশের নাম কি?
—হিজলডাঙা
—হিজলডাঙা! বাঃ পৃথিবীতে এমন সুন্দর নামও আছে পূর্ণিমা? এ দেশ বাস্তবিকও কোথাও আছে—না

একটা স্বপ্নের কথা বলছ তুমি? অনেক হিজল আছে সেখানে?

—আছে বৈ কি

—কত দিন হিজল গাছ দেখি নি—ছাতিম দেখি নি—মাছরাঙা দেখি নি—তুমিও তো দেখ নি—এ সবের জন্য দুঃখ হয় না তোমার—

—হয় বৈ কি—এক এক দিন রাতে ঘুম ভেঙে যায়—ঝব ঝব করে বৃষ্টি পড়তে থাকে—এমন একা লাগে—আপনি যে আত্মনিবেদনের মূর্ত্তির কথা বলেছেন তাকে এমন হৃদয়হীন জন্তু বলে মনে হয়—আমি সব ছেড়ে দিয়ে আমার হিজলডাঙায চলে যেতে চাই

অজিত উঠল—

পূর্ণিমা কাতর হয়ে বল্লে—বাঃ হিজলডাঙাব কথা পেড়ে আপনি বিদায নেবেন?

—হিজলডাঙার সঙ্গে আমাব কি?

—কৈ আমার দেশের কথা এত দিন এমন ভালোবেসে জিজ্ঞেস কবে নি তো কেউ! হিজলডাঙা নামেব যে মধুবতা সে আমার নিজেরই জিনিষ ছিল—আপনি এ সব বুঝলেন কি করে অজিতবাবু? কেন আপনি জিজ্ঞেস করলেন সে সব মধুর গাছপালা মানুষ ছায়া নিস্তব্ধতার কথা মনে করে আমাব দুঃখ করে কিনা? আপনি এ সব বোঝেন কি করে? আমি ভেবেছিলাম আমার এ পাড়াগাঁকে আমি ছাড়া কেউ ভালোবাসে না—তার রূপও কেউ বোঝে না, আপনি এসে বল্লেন—কত দিন হিজলেব ফুল দেখি নি—তাই তো—এত সব ধরা পড়ে আপনার হৃদযে?

অজিত এ সব কথাব কোনো উত্তব না দিযে বল্লে—তাবপব তুমি বড় হ'লে—কলকাতার কলেজে পড়তে এলে। অনেক শিক্ষাদীক্ষা পেলে তুমি—আমাদেব ষ্টেজেব পক্ষে এ খুব মূল্যবান জিনিষ হ'ল—এমনটি হয নি কোনো দিন—কে জানে আর কত দিন পবেই বা হবে। তোমার এই নিবেদনের মূর্ত্তিকে সব সমযই মনে রেখো পূর্ণিমা—আমিও মনে বাখব।

আজ আমাদের আব কোনো কথা নেই।

অজিত উঠে চ'লে গেল

অনেক গভীব বাতেও হিজলডাঙাব মাযা কাটিযে উঠতে পাবল না পূর্ণিমা। সেই রূপশালী ধানেব দেশে—দেশেব কত বকম যে রূপ আব বস ছাযা মমতা গন্ধ তাকে নিবিড় ভাবে পেযে বসেছে—

বাইবে ঝব ঝব কবে বৃষ্টি পড়ছে—

জানালার পাশে বসে পূর্ণিমা ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু তারপর অজিতেব কথাগুলো মনে পড়ল তার : মানুষেব জীবন ক্রমে ক্রমে তাব নিজেরই জিনিষ হযে দাঁড়ায...মমতাব জন্ম হয

তাই হয না কি?

আব অজিতবাবুর এই কথাগুলো : তাবপর তুমি বড় হলে ... আমিও মনে কবে রাখব।

মূল্যবান জিনিষ? নিবেদনের মূর্ত্তি? বাইবে কি গভীব বাদল এখনও! হিজলডাঙার বনে না কি? যেন ঝিঁ ঝিঁ জোনাকী অবসাদ কল্পবা স্বপ্ন ঘুম মিশে যাচ্ছে সব।

অজিত টাকা পাচ্ছিল—

একদিন মাযেব নামে দেড় শো টাকা মনিঅর্ডাব কবে সে পাঠিযে দিল—চিঠিতে লিখে দিল—এম্নি মাঝে মাঝে পাঠাব।

কযেক দিন পরে ডাকপিওন এসে সে টাকা ফেরৎ দিযে গেল—এ টাকা যাঁব নামে পাঠান হযেছে তিনি রাখেন নি, তিনি ফিরিযে দিয়েছেন।

দিন তিনেক পবে চিঠি—

মা লিখেছেন : তোমার এ টাকা আমি রাখতে পারলাম না। তুমি আর আমাদের টাকা পাঠিও না। এব চেযে তুমি যদি মুদীব দোকান খুলে, গাড়োযানেব কাজ কবে, জুতো সেলাই কবে আমাদের টাকা পাঠাতে তাও আমরা আদরে গ্রহণ কবতাম।

কিন্তু তোমাব অধঃপতন সে সবেব চেযে ঢের বেশী হযেছে।

তোমার জন্য লজ্জায় ঘেন্নায় অনেক সময় মানুষের কাছে মুখ দেখানোও শক্ত হযে ওঠে।

তুমি এ রকম কববে তা আমবা ভাবতেও পারি নি—নিধিবাবুব ছেলে হরিলাল যাকে সমস্ত দেশশুদ্ধ

কেউ দেখতে পারত না সেও তাহ'লে তোমার চেয়ে ঢের মানুষ—

অজিত চিঠিখানা পনেরো ভাঁজ করল—তবু ছিঁড়ল না—

আবার খুল্ল—আবার ভাঁজ করল—

আবার খুল্ল—

চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল—

একটা মাছি মরে পেয়ালার ভিতর পড়ে রয়েছে—

পূর্ণিমা যে কখন ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে অজিত তা টেরও পায় নি। চোখ যখন তুল্ল তখন দেখল পূর্ণিমা বসে রয়েছে—একটা কৌচে।

—কি মনে করে!?

—আপনি কি ভাবছেন অজিতবাবু?

অজিত কোনো উত্তর দিল না

—আজো সেই বইয়ের কথাই ভাবছেন নাকি?

অজিত ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়্ল—

পূর্ণিমা বল্লে—আপনার হাতে ওটা কি?

—একটা চিঠি

—কার?

—মার—

—ওঃ

দুজনেই চুপ করে রইল—

খানিক ক্ষণ পরে অজিত বল্লে—মা লিখেছেন—

চায়ের পেয়ালা তুলতে গিয়ে অজিত বল্লে—একটা মাছি মরে পড়ে রয়েছে

চায়ের পেয়ালাটা অজিত সরিয়ে রেখে দিল

—মা লিখেছেন তোমার টাকা আমি নেব না—

—মাকে টাকা পাঠিয়ে ছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ—সে টাকা তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন—লিখেছেন এর চেয়ে তুমি যদি মুদীর দোকান খুলে—গাড়োযানের কাজ করে—জুতো সেলাই করে আমাদের টাকা পাঠাতে আমরা তা সাদরে নিতাম—

—এম্নি কথা লিখলেন আপনার মা? থিয়েটারকে তিনি এত দূর ঘেন্নার জায়গা মনে করলেন?

—লিখেছেন 'তোমার অধঃপতন সে সবের চেয়ে ...হরিলাল তোমার চেয়ে ঢের মানুষ—'

—হরিলাল কে?

—আমাদের দেশেরই একটি ছেলে

—কি করে?

—মদ গাঁজা খেয়ে বেড়ায়—বেশ্যাপাড়ায় পড়ে থাকে—

পূর্ণিমার সমস্ত শরীর দু এক মুহূর্ত্তের জন্য কাঁটা দিয়ে উঠল।—অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে দমন করে একটা ঢোঁক গিলে পূর্ণিমা বল্লে—সেই হরিলালের কথাও উঠল আপনার এই টাকার ব্যাপার নিয়ে—তার চেয়েও আপনাকে হীন মনে করেন আপনার মা?

—হ্যাঁ, তার চেয়েও আমাকে হীন মনে করেন আমার মা, না হ'লে টাকা ফিরিয়ে দেন কখনও? পৃথিবীর সব চেয়ে বড় চামারের কাছ থেকে টাকা নিতে সাধুমানুষরা একটুও চিন্তা করে না কতবার দেখলাম—কিন্তু আমার এ টাকাও মার অস্পৃশ্য—

—থিয়েটারকে কি তিনি এতই জঘন্য মনে করেন?

—আমাদের পরিবারকে তো তুমি চেন না—

—কি রকম?

—ভদ্রলোকদের বাড়ীতে যে গানের মজলিস হয় তাতেও তাঁরা

—তাঁরা কি গান গান না?

—গান বৈ কি—ভজন-সঙ্কীর্ত্তন—খুব প্রাণ ঢেলে গান। খুব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—পরলোকে, ভগবানের ওপর—

সূচীপত্রে যান

—তা তো সকলেরই আছে—

—হ্যাঁ, তোমার আছে পূর্ণিমা—তা আমি জানি। কিন্তু তাঁদের খুব বেশী আছে,—বলা না ঘটাই বেশী—ঘটা বেশী না বিশ্বাস শ্রদ্ধা বেশী সে সব খোঁজ নিয়ে আমার মনের কোনো রকম চরিতার্থতা পাই না—তবে খুব শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা তৃপ্ত নন—সে জন্য আড়ম্বরও ঢের আছে বটে—এত আয়োজন এত সমারোহ যে তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না—তোমার কাছে সেগুলো খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে—

—আপনার কাছে মনে হয়েছিল?

—কিন্তু খুব সৎ—কেউ তামাকও খান না—আমিই আমাদের বংশে প্রথম চুরুট খেয়েছি—গানের মজলিসে গিয়েছি—থিয়েটার দেখেছি—কবিতা লিখেছি—

—কবিতা লেখাও পাপ?

—আমাদের পরিবারই তো শুধু নয়—এমন অনেক পরিবার রয়েছে যারা এ সমস্ত জিনিষগুলোকেই অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখে—কবিতা লিখলেও মনে করে—কবি-গুণী হয়ে গেল—জাত হয়ে গেল আলাদা—হয়তো সারা দিন একটা এস্রাজ নিয়ে পড়ে থাকবে—না হয় মদ খাবে—কিম্বা এ সব কিছু না করলেও মেয়েমানুষের রূপ গুণ স্তন চুমো নিয়ে এই সব লিখবে—কবিতা বা কবি যে এ ছাড়া আর কিছু—হতে পারে সে ধারণাও নেই তাদের—

—আপনি হয়তো এস্রাজ নিয়ে পড়ে থাকতেন না সারাদিন!

—থাকতে পারলে মন্দ হ'ত না—

—আপনার কবিতা—

—থাক্

—আজকাল লেখেন না বুঝি আর?

—না

—যেগুলো লিখেছেন তা আছে?

(—তুমি দেখবে?)

—দেখতে ইচ্ছা করে

—ছাপাই নি তো কোনো দিন—পুঁজি করেও রাখি নি—যদি জানতাম তুমি দেখতে চাইবে—

—তাহ'লে নেই?

—এই তো সেদিন সমস্ত পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেল্লাম—

—পুড়িয়ে ফেল্লেন? বলেন কি? কেন? কবে?

—সেই যে বড় বৃষ্টিটার দিনে

—কেন?

—ভাবলাম ও পাট আমার শেষ হয়ে গেছে—এ সব ঘরের এক কোণে পড়ে থাকলেও আমার নতুন জীবনের একান্ততাকে বাধা দেয়—কেমন একটা সমস্যা নিয়ে আসে—কেবলই মনে হয়, আমি নট না কবি?

পূর্ণিমা বল্লে—তাই পুড়িয়ে ফেল্লেন?

—হ্যাঁ। ভালো করি নি? একটা জিনিষকেই তো ধরতে হয় আমাদের—যে জিনিষটা আমরা সব চেয়ে ভালো পারি?

—কিন্তু তবুও কবি—হলে এত অশ্রদ্ধা পেতেন না আপনি—

—তাও পেয়েছিলাম—

—কিন্তু এখন একেবারে কলঙ্ক কুড়োচ্ছেন

—কিন্তু সব পরিবারই তো আমাদের পরিবারের মত নয়—

—কিন্তু নিজের পরিবারের ঘৃণা উপেক্ষাই সব চেয়ে বেশী আঘাত দেয়—

—নিজের মাও যখন ছেলের টাকা ফিরিয়ে দেয়!

অজিত তার মায়ের চিঠিটা পনেরো ভাঁজ করছিল—

পূর্ণিমা বল্লে—এ চিঠিটার ওপর আপনি খুব নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন দেখছি

অজিত একটু হাসল—

হেসে চিঠিটা পকেটের ভিতর রেখে দিল—

চায়ের কাপটা তুলতে গিয়ে অজিত দেখল একটা মাছি মরে পড়ে রয়েছে—

সূচীপত্রে যান

পূর্ণিমার সামনে চুরুট সে আর জ্বালাল না—
পূর্ণিমা বল্লে—আপনাদের পরিবারে আর কেউ বিগড়ায় নি?
—না
—খুব বড় পবিবা।?
—হ্যাঁ আমার ঠাকুদ্দার চোদ্দটি ছেলেপিলে
—তাই নাকি
—আমার জেঠামশায়েরও আঠারো কুড়ি জন
পূর্ণিমা খানিক ক্ষণ চুপ থেকে বল্লে—এরা সকলেই মানুষ হচ্ছে?
—হ্যাঁ
—কেউই চুরুট খায় না?
—না
—গানেব মজলিসেও যায় না?
—না
—কি করে?
—পড়াশুনো কবে
—তার পর
—বিয়ে কববে, সন্তানের পিতামাতা হবে
—এমন আঠারো কুড়ি জন করে সন্তান?
—দেশেরই তো উপকার তাতে—
—নিজেদেরও ঢের সাধ—
বলেই পূর্ণিমা লজ্জিত হ'ল—

অজিত হয়তো শোনে নি—সে বল্লে—তাদের মানুষ কববে—সন্তান সন্ততি কেউ কোনো দিন যাতে কুপথে না যায়—চুরুট না খায়, গানের মজলিসে না যায়, এস্রাজ নিয়ে না পড়ে থাকে—পড়াশুনো করে উকীল মোক্তার হেডমাষ্টার হয় মানুষ হয—এইই তাবা দেখবে—এবা আছে বলেই দেশ টিকে আছে—ষ্টেটের কাছ থেকে এরা বৃত্তি দাবী কবতে পাবে—

—কেন?

—এদেব কুলবধূরা তো খুবই পারে

—কি বকম?

—সমস্ত জীবন ভরে এক একটি বধূ সতেবো কুড়ি জন সন্তানকে পেটে ধববাব অসহ্য কষ্ট ও সহিষ্ণুতা কেন মিছেমিছি বহন কববে? এব জন্য কি তাবা পুরস্কার পাবে না? হাজাব হাজাব বাঙালী বোজ মরে যাচ্ছে সেখানে আঠারো কুড়ি জন কবে জ্যান্ত বাঙালী প্রতিটি মেযের কাছ থেকে চালানি মালের মত জুটে যাচ্ছে—এই অক্লান্ত ক্লেশ ও ধৈর্য্য একটা জাতকে বক্ষা করবার মত, এই নিববচ্ছিন্ন প্রযাসেব কি কোনো মূল্য নেই?

পূর্ণিমা খানিক ক্ষণ চুপ থেকে বল্লে—খুবই মূল্য আছে অজিতবাবু—কিন্তু আমাব এই মনে হয় যে এবা গানও যদি ভালোবাসত—

—উপাসনা ভজনের গান ভালোবাসে বৈ কি—

—সঙ্কীর্ত্তন ভজনেব গানই শুধু নয—অন্য রকম গানও—দিন বাত যে লোকটা বীণা নিয়ে সাধছে তাব একটা মূল্য দিতে পাবত যদি—নিজেদেব প্রথামত জীবনেব বাইবে অন্য অন্য জীবন

—তাহ'লে কি হত?

—আপনার মা কি এই টাকা ফেবাতে পারতেন?

অজিত আবার চাযের পেয়ালাটা মুখে দিতে গিযে দেখল একটা মাছি মবে পড়ে রয়েছে—
বল্লে—পূর্ণিমা—
—কি?
—এই চাযের পেয়ালাটা দেখ তো—
—বসুন আমি চা করে আনছি—

কয়েক দিন কেটে গিয়েছে—

অভিনয় বেশ জমছে—

সেই পুরোনো বইটাই—ভালো লাগছিল না অজিতের—কিন্তু আশ্চর্য্য লোকে তার অ্যাক্টিঙের নিন্দে করে না তবু—অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শোনে—ভালোবাসে—কে জানে আরো কত কি করে—

পূর্ণিমাকে খুব সফল মনে হয় ; এ দু জনের অভিনয়ের সফলতা তো বটেই, আবো কত কি সার্থকতা নিয়ে মানুষেরা চাঁট বসায়।

অজিত ভাবছিল বইটাকে নিয়ে পূর্ণিমার তো বিশেষ ধোঁকা নেই—কিন্তু অজিত নিজে এ লেখাটির অন্তঃসারশূন্যতা পদে পদে বুঝতে পেরেও কোন হৃদয় নিয়েই বা একটা অনভিজ্ঞ নির্ব্বোধ লেখকের অসাড় চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে ষ্টেজে গিয়ে দাঁড়ায়—কি কথাই বা বলে? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত নির্ব্বোধ কথাগুলোই বলে তো সে—বলে প্রশংসাও পায়।

এমন কেন হয়?

অজিত বিছানায় এ পাশ ও পাশ ফিরতে ফিরতে ভাবছিল ষ্টেজে দাঁড়ালেই লেখকের মূর্খতার কথা আর মনে থাকে না তার—অভিনয়কে সে এমনই ভালোবাসে যে তারই গুণে সমস্তই যেন প্রাণ পায়—

পূর্ণিমারও তাই।

কাল কি একটা পর্ব্ব ছিল—সারা রাত অভিনয় করে কাটাতে হয়েছে—পূর্ণিমার তার দু জনেরই।

অজিতের ঘুম পাচ্ছিল—

সে ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু চটকা ভেঙে গেল—স্নান টান করে শোভা সজ্জা রূপের হিল্লোল তুলে পূর্ণিমা এসে ঢুকেছে—

—সারা রাত তো জাগলে কাল—

আপনিও তো জেগেছেন—

—আমি তো ঘুমুচ্ছিলাম—কিন্তু তোমার কি কোনো ক্লান্তি নেই

—আমার ঘুম পায় নি অজিতবাবু

অজিত ভালো করে একবার পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে—তোমাকে দেখে মনে হয়, কাল সারা রাত ফ্রক-পরে খুকির মত ঘুমিয়েছ—। মনে কোনো পাপ নেই তোমার, মুখে কোনো কালি নেই। অথচ সারা রাত জেগে পার্ট থিস্তি। এ সব তুমি কি করে ঘটাও পূর্ণিমা

—আরসীতে একটু আগেও আমার মুখ দেখে এসেছি আমি—দেখে আর ফিরে তাকাতেও ইচ্ছে করে না—

আপনি বড্ড সৌখীন কি না—

—সে যাক, ফিরে যে তাকাতে ইচ্ছে করে না তা আমিই জানি, আর আমার উনিই জানেন, ও রকম একটা রাতের পরিশ্রান্তির পর এই রকমই হয়।—কিন্তু তোমার এ দিব্যি চেহারা কি করে রইল?

অজিত বল্লে—শুনলাম তুমি না কি মদও ছেড়ে দিয়েছ

—দিয়েছি অজিতবাবু

—সেই দিন থেকেই—

—হ্যাঁ

—বাঃ!

—কিন্তু কত দিন ছেড়ে থাকতে পারব বলতে পারি না—

অজিত সে কথার কোনো উত্তর দিল না।

পূর্ণিমা বল্লে—আপনি ঘুমোবেন?

—না

—আমি এসে আপনার ঘুম নষ্ট করে দিলুম—

—তুমি এসে?

পূর্ণিমা ঠোঁট ফাঁক করে হাসছিল—

একটা শাদা বেনারসী শাড়ী পরেছে সে—

ভোরের আলো জানালার ভিতর দিয়ে এসে পূর্ণিমার মুখ ঘিরে একটা দিব্য রৌদ্রচক্র সৃষ্টি করেছিল :

সূচীপত্রে যান

সেই আভার ভিতর পূর্ণিমাকে আকাশযানী দিব্যযোনির মতন মনে হচ্ছিল।

অজিত মেয়েটির আপাদমস্তকের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত ভরসা পেয়ে বল্লে—কলেজে পড়তে যখন থিয়েটার দেখতাম তখন একটা জিনিষ আমাকে বড় আঘাত দিত—

পূর্ণিমা ঘাড় হেঁট করে আঁচ করছিল

অজিত বল্লে—দেখতাম অ্যাকট্রেসদের সব হোঁৎকা চেহারা—কালো ঠোঁট চোখ বসে গিয়েছে—

পূর্ণিমা শিহরিত হয়ে উঠল—

অজিত বল্লে—এমন ঘেন্না করত

—চেহারার জন্য?

—অত্যন্ত কদর্য্য চেহারা তা তুমি ধারণা করতে পার না

পূর্ণিমা বল্লে—পারি না? তা বলবেন না। কালো কুরূপ হলে হয় কি—এক জন যদি ভালো গাইতে পারে কিম্বা পার্ট প্লে করতে পারে—

অজিত বাধা দিয়ে বল্লে—তা সে নিজের ঘরে বসে করুক

পূর্ণিমা ব্যথিত হয়ে বল্লে—কেন?

অজিত বল্লে—শুধু ভালো অভিনয় বা গান করতেই পারলেই হয় না—সে গ্রামোফোনে চলে রেডিওতে বেশ নিজের স্বামী বা স্ত্রী বা প্রেমিকের কাছেও তার মূল্য আছে। কিন্তু থিয়েটারে দেহের মর্য্যাদা কত যে মূল্যবান তা সেই গ্রীকরা জানত, আমাদের যাদের বস্তুচেতনা আছে তারা বোঝে

পূর্ণিমা কিছু ক্ষণ চুপ থেকে বল্লে—চেহারার অপরাধ তো মানুষের নিজের নয় অজিত বল্লে—তা নয়

—তবে?

—যে তাকে আমদানী করে তার অপরাধ—

পূর্ণিমা একটু হেসে বল্লে—কোথায় আমদানী করে?

—থিয়েটারে।

—তার অপরাধ?

—হ্যাঁ

—কেন?

—থিয়েটারের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্যের দিকে তার চোখ নেই—ভাবে গাফিলতি করলেও চলে। কিন্তু এতে তাদের বড্ড খারাপ লাগে যারা দেখতে আসে, তারা বড্ড পীড়া বোধ করে। কলেজে পড়বার সময় আমার কিশোর মনও এম্নি ঢের বিক্ষুব্ধ হয়ে অনেক দিন ফিরে গেছে। শৈবলিনীর পার্ট নিয়ে যে এল সে যদি এক জন হোঁৎকা বুড়ী হয়—ঠোঁটে তার তখনও তামাকের গন্ধ লেগে—মস্ত বড় ভুঁড়ো পেট—হাতের মাংস মুখের মাংস ঝুলছে কেমন লাগে তা হ'লে বল তো—

পূর্ণিমা বল্লে—এ রকম হয় না—এ রকম হয় নি কোনো দিন।

একটু থেমে পূর্ণিমা বল্লে—আমার নিজের চেহারাও কি রকম কে জানে?

অজিত বালিশের থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে বল্লে—তোমার চেহারা এ যুগের একটা সৌভাগ্যের জিনিষ

—এ যুগের?

—হ্যাঁ

—যুগ তো একটা বড় কথা

—তোমার চেহারাও ছোট নজরের জিনিষ নয় তো—বিধাতা খুব মহৎ হয়ে তৈরি করেছিলেন—

অজিত বল্লে—আজকাল যারা কলেজে পড়ে—যাদের কিশোর বয়স—তোমার অভিনয় ও শরীরের রূপকুশলতা দেখে কাটল তারা রোজ রাতেই যে সার্থকতা নিয়ে ঘরে ফিরে যায় তাকে আমি ঈর্ষা করি—আমার কৈশোর যৌবনের সময় শত চেষ্টা করেও এ সার্থকতা আমি একটা থিয়েটার দেখেও পাই নি। কি যে নিষ্ফল নিরুপায় দিন গিয়েছে সে সময়ে!

—উপায়হীন হয়ে পড়েছিলেন?

—থিয়েটারকে আমি ছোটবেলা থেকেই ভালোবেসেছি—বরাবরই এর অভাব অভিযোগগুলো নিয়ে মন হৃদয়হীন মন্তব্যে ভরে উঠেছে—আজো কত অভাব রয়েছে—কিন্তু শৈবলিনীর পার্ট যদি শৈবলিনীর মত মেয়ে এসেই করে কিম্বা পার্ট মত যুবা তাহ'লেও একটা মস্ত অভিযোগ কেটে যায়—

অজিত বল্লে—যুবাদের পাওয়া যায়—কিন্তু তোমার মত এক আধ জন মেয়েমানুষ যখন ষ্টেজের থেকে বিদায়

নেবে তখন রমা বা ষোড়শীর ভূমিকার জন্য একজন ধুমসো ঝি ছাড়া আর কিছুই যদি আমরা খুঁজে না পাই?

পূর্ণিমা শুনে একটু হাসল

পরে বল্লে—না, সে জন্য ভাববেন না অজিতবাবু, সে ব্যর্থতাব দিন চলে গেছে— তুমি এসে দূর করে দিয়েছ বটে—কিন্তু তুমি যে দিন চলে যাবে—

—আমি চলে যাব কেন?

—তুমিই বা কত দিন থাকবে?

—আমাকে তাড়াতে চান?

অজিত হেসে বল্লে—না আমি ষ্টেজের অনেক দূব ভবিষ্যতেব কথা বলছি—যখন আমিও মরে যাব—আমাদের দু জনের কেউই নেই—

—তা নিযে আক্ষেপ করে কি লাভ? সে আপনার প্রতিনিধিরা বুঝবে। আপনি যা পেয়েছেন তাই নিযেই তৃপ্ত থাকুন—

অজিত সুরু কবল—বিলেতে—

—বিলেতে আমার চেযে ঢের ভালো ঢেব অভিনেত্রী মেলে—তা আমি জানি। কে জানে বাংলা দেশেও এক দিন মিলবে কি না—

—কিন্তু তার তো কোনো লক্ষণ দেখছি না—

—কিছুটা পথ আমবা হয়তো কেটে দিযে যাচ্ছি—

—তারপর?

—তারপর—একজন মানুষই দু চার বছবেব মধ্যে কত মুখোস বদলে ফেলতে পারে—একটা ষ্টেজ বা দেশের পরিবর্ত্তনের কি আর সীমা আছে অজিতবাবু? আজ আপনাব মা টাকা নিলেন না—এক দিন হযতো এ দেশেবই কত বড় ঘবেব কত মা তাঁদের মেয়েদের গিযে সাধবেন—অভিনেত্রী হবার জন্য। যে জিনিষ বস্তুনিষ্ঠ সৌন্দর্য্যের এবং হযতো বা সত্যের এক দিন তা তাব মূল্য পাবেই।

পূর্ণিমার কথা শুনতে শুনতে অজিত এব ভেতব প্রতিবাদ কববাব কিছু খুঁজে পেল না—এই মেযেটি যেন নিকষপাথরে রেখা কেটে কথা বলছে।

নিজে অজিত জিনিষটাকে কোনো দিন এমন কবে বুঝে দেখে নি কি?

দু এক মুহূর্ত্তের ভেতবেই অজিত অকাতবে ঘুমুতে লাগল।

পূর্ণিমা ধীরে ধীবে উঠে চলে গেল।

আবো কযেক দিন কেটে গিযেছে।

অনেক লোক আজকাল অজিতেব সঙ্গে দেখা করতে আসে—কেউ বা বইএর পাণ্ডুলিপি নিয়ে, কেউ বা পাশেব জন্য, কেউ মন্তব্য করতে, কেউ বা প্রশংসাব ভাষা খুঁজে পায না—কেউ বা চাঁট বসাতে চায শুধু, কেউ টাকা ধাব করে নিযে যায—কেউ মদ মজলিসের জন্য কামনা কবে আসে—কেউ বা দু কথা শুনিযেও যায—মেযেরাও মাঝে মাঝে আসে—

এক দিন অজিত ভোবরাতে ঘুমোতে এসে বাজেনকে ডেকে বল্লে—দেখ বাজেন—আজ কাউকেই আসতে দিবি না—

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর

—বলবি বাবুর শবীর ভালো নেই, বাবু ঘুমুচ্ছে

—হুজুর

—বেলা আটটাব সময গোলমালে অজিতেব ঘুম ভেঙে গেল—জানালা দিযে তাকিযে দেখল রাজেন দাঁড়িযে আছে

অজিত বল্লে—ভিতরে আয

বাজেন এসে বল্লে—অনেক ভিড় জমে গেছে বাবু—

—কিসের ভিড়?

—লোকজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায—

অজিত পাশ ফিরে শুয়ে বল্লে—বল গিযে দেখা হবে না

রাজেন বল্লে—আমি কোলাপসিবল গেটে তালা বন্ধ কবে এসেছি বাবু

অজিত বিছানায এ পাশ ও পাশ একটু অস্বস্তিব সঙ্গে নড়ে চড়ে উঠে বসল।

বাজেন দোতলাব দবজাব কাছে দাঁড়িযে ছিল
অজিত বল্লে—শোন
বাজেন এসে বল্লে—বলুন
—ক জন লোক এসেছে?
—অনেক
—কি চায?
—যেম্নি বোজ আসে—দেখা কবতে চায আব কি—
অজিত বল্লে—আচ্ছা বৈঠকখানায নিযে বসাও—শ্লিপ কার্ড যা হয পাঠিযে দু এক জন কবে আসুক—
মিনিট পাঁচেক পবে বাজেন এক বাশ শ্লিপ এনে অজিতেব টেবিলেব ওপব বাখল।
অজিত বল্লে—মিশিযে ফেলেছিস দেখি সব—আচ্ছা যা
একটা যে-কে-সে স্লিপ তুলে নিযে অজিত বাজেনকে বল্লে—নিযে যাও এটা—আসতে বল—
মিনিট খানেক পবে এক জন ছোকবা এসে হাজিব
অজিত বল্লে—বোস
অত্যন্ত সঙ্কোচেব সঙ্গে একটা কৌচেব ওপব সে বসল
—কি চাও তুমি?
—কিছু চাই না
—তবে?
—আপনাকে দেখতে এসেছি
—আমাকে দেখতে?
—হ্যাঁ
—ষ্টেজে কি দেখ না?
—দেখি
—তবে?
—এক জন বড লোক তাব প্রাইভেট লাইফে বে
—সেই তো আমাব বাইবেব জীবন—আমি তো প্যান্ড. ন গিযে পোলিটিক্যাল লেকচাব দেই না—
ছেলেটি ব.ল্ল—ষ্টেজে আপনাকে তকমাপবা দেখি—আপনি পবেব কথা আওড়ান—কিন্তু এখা ন আপনাব নিজেব মুখেব কথা শুনব—
—কত ক্ষণ শুনবে?
—যত ক্ষণ আপনি সময দিতে পাবেন—আচ্ছা মানুষেব জীবনটা কি?
অজিত একটু হেসে বল্লে—তুমি কি বোঝ?
—আমাব বোঝাব কোনো মূল্য আছে?
—তুমি নিজে কি মনে কব?
—কোনো মূল্য নেই—
—কেন?
—আমাব কোনো ক্ষমা নেই—
—তুমি কলেজে পড়?
—হ্যাঁ
—কোন ক্লাসে?
—এবাব বি-এ পাশ কবেছি—
—তাব পব?
—বাবা অ্যাটর্নি তিনি আর্টিকেলড হতে বলেন—
—আব তুমি? তুমি কি বল?
—আমি দেখি টাকাব অভাব আমাদেব নেই—আমাদেব তিন পুরুষ অ্যাটর্নিগিবি কবে খেযে ছেলেপিলে বেখে মবে গেছেন—কিন্তু মবে যাবাব পব কেউ তাদেব নামও কবে না—কেউ তাদেব কথা বড় একটা বলে না ভাবে না—ওদিকে যত দিন বেঁচে থাকেন কি কঠোব পবিশ্রমই না এবা কবেন। আমাব

মনে হয় এদের পথে যদি যাই অবস্থা আমারও তো এদের মতনই হবে—এত খাটাখুটি—এত ঝকমারি—এত নেশা—হয়তো টাকার, হয়তো নিছক এটর্নিপনার—যার জন্য জীবনের অন্য সমস্ত সাধ ও সম্পদ বিসর্জ্জন দিতে হয়—শেষ পর্য্যন্ত এর কোনো মূল্য থাকে না কেন?

—থাকে বৈ কি

—কি মূল্য

—তা তাঁরা বুঝেছেন—

—আপনি যদি দয়া করে একটু বলে দেন—

—আমি?

—একটু দয়া করে যদি—

অজিত বল্লে—তুমি তো নিজেও বুঝেছ—বলেও ফেলেছ—বলেছ এত নেশা—হয়তো টাকার—হয়তো নিছক এটর্নিপনার-এই নেশার তৃপ্তিই তাঁদের প্রত্যেক জীবনকে তাঁদের প্রত্যেকের কাছে একটা মূল্য দিয়েছে—

—কিন্তু সে মূল্যকে আমি রাবিশ মনে করি।

—রাবিশ?

—একেবারে রাবিশ-

—কেন?

—লাখ লাখ টাকা তো একটা মুদীও রোজগার করতে পারে—এটর্নিপনায়ও, তা মানুষের অন্তরের কোন্ কামনা বা সাধনা বা সত্য তৃপ্ত হয়—

—তোমার হয় না?

—একেবারেই না অজিতবাবু—এ সব জিনিষকে আমি ঘৃণা করি—

—কি ভালোবাস তা হ'ল—

—সেইটেই আজো বুঝছি না—

—ফুটবল?

ছেলেটির মুখ অভিমানে ও ব্যথায় রক্তিম হয়ে উঠল—

অজিত বল্লে—পড়াশুনো?

—কলেজের ডিগ্রির জন্য পড়াশুনো নয়—এম্নি বইটই নিয়ে অনেক সময় মন্দ কেটে যায় না—কিন্তু সব চেয়ে আশ্রয়ের জিনিষ বইও নয়—

—নারীপ্রেম?

—হয়তো না—কিম্বা কোনো নারীকে ভালোবাসলেও শেষ পর্য্যন্ত তার ভিতর কোনো চরিতার্থতা নেই—

—তাই বল?

—একে একে অনেক মেয়েকেই তো ভালোবেসে দেখলাম

—তারপর?

—তবে এই নিষ্ফলা বা টাকার চেয়ে সে ঢের ভাল—

—তবে এই কর না কেন? টাকার অভাব তো আমার নেই—এক পুরুষ এটর্নি না হলে কিছু এসে যাবে না—তোমার ছেলেকে না হয় এটর্নি করবে আবার—

ছেলেটি বল্লে—দেখুন নারীর সঙ্গে প্রেম নিয়ে জীবনটা কাটানো মন্দের ভাল। এর ভেতর ঢের মাধুর্য্য রয়েছে—তবুও বিচ্ছেদ ব্যথা ঈর্ষা একঘেয়েমিরও কি শেষ আছে? তারপর একটা ভালোবাসা যখন শেষ হয়ে যায় তখন মনে হয় কি কাদামাটি নিয়েই না ছিলাম—

এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই কি নেই যা নিয়ে বাবা ঠাকুর্দ্দার মত তৃপ্তও থাকতে পারি বটে—কিন্তু জীবনের একটা মূল্যবান কাজও করা হয়—

—এটর্নিগিরিকে একটু মূল্যবান মনে হয় না

—একটুও না—

—এত বড় জিনিষই যখন তোমার কাছে অসার হয়ে উঠল তখন আমি ছোট ছোট জিনিষের কথা বলতে পারি শুধু—

—যে কোনো এটর্নি বা রাউন্ডটেবল্‌ কনফারেন্স ম্যানের চেয়ে ঢের বড় মনে করি আপনাকে আমি। একজন ভাইসরায়ের কি দাম অজিতবাবু? একজন ক্যাবিনেট মিনিষ্টারেরই বা কি মূল্য? কিন্তু যে কবি—

অজিত থামিয়ে দিয়ে বল্লে—তোমার এই ভালোবাসাগুলো নিয়ে একটা উপন্যাস লেখ না—

—লিখতে আমি পারি না—

—চেষ্টা কর না—

—লেখা আমার আসে না

—তবু কি করতে চাও তুমি—অ্যাক্ট?

—তাও আমি পারি না—

—তবে

—সেই জন্যই তো বলছি আপনাকে—আমার জীবন বড্ড নিষ্ফল—

—কিন্তু মেয়েরা তো তোমাকে ভালোবাসে?

—তা বাসে

—তবে প্রেম কর না গিয়ে—বাঃ—আমিও তো ষ্টেজে বাঁধা না পড়লে তাই করতাম—

—বাবা ঠাকুদ্দার কাজের চেয়ে সে ঢের ভালো জিনিষ হয়—

অজিত হাসতে হাসতে বল্লে—তবে আর কি?

—কিন্তু জীবনেব কৈফিয়ৎ দেওয়া হয কৈ?

—কার কাছে কৈফিয়ৎ?

—ধরুন নিজের কাছেই—মনে হয জীবনটাকে নিয়ে এ খেলা করছি শুধু—। এব আবো তো ঢের ব্যবহার ছিল। ভালো আমি আরো ঢের বেসেছি যে রোজ হাঁপিযে উঠি। ঠিক যাকে ভালোবাসতে চাই তাকেও কিছুতেই তো পাওযা যায না।

ছেলেটি বল্লে—এবার কাকে ঠিক ভালোবেসেছি জানেন?

—কাকে?

—মিস পূর্ণিমাকে

অজিত একটা ধাক্কা সামলে বল্লে—ওঃ

—এখন কি করি বলুন তো

অজিত কোনো উত্তব দিল না

ছেলেটি বল্লে—তাকে কি করে পাওযা যায

—পেতে চাও? দূরের থেকে ভালোবেসে ভালো লাগে না?

—না

—কেন?

—একটা ভালোবাসা হয় বটে—কিন্তু তাতে কোনো চরিতার্থতা নেই—অজিত-বাবু—

অজিত বল্লে—জীবনটাকে মূল্যবান কবতে চেয়েছিলে?

—হ্যাঁ

—আমি বল্লাম, লেখ, কিম্বা ষ্টেজ-অ্যাক্টিং যদি পার—তাও কব—কিন্তু কিছুই যখন পার না তুমি তখন এই জিনিষটা কর—পূর্ণিমাকে ভালোবেসে অন্য কোনো রকম রস চরিতার্থতাব কথা ভাবতে যেও না। সে একজন অভিনেত্রী—ষ্টেজে দাঁড়িয়ে মানুষেব জীবনের অনেক নিহিত সৌন্দর্য্য ও সম্পাদকে অনুভব কবতে সে তোমাদের সাহায্য করে। তোমবা যদি অনুভব করতে পার তাহলে সে কৃতার্থ হয। তেমন ভাবে অনুভব করতে পেরেছ—এবং সে অনুভবের মাধুর্য্য নিয়ে অনেক দুঃখ ও নিষ্ফলতার রাত একা একা মুগ্ধতায কেটে যাবে তোমাব এমন যদি বোধ কর তাহ'লে তোমার সমস্ত জীবনের এই সাধনাটুকুই পৃথিবীর কোনো অমূল্য জিনিষের চেয়েই কম মূল্যবান হবে না।

তোমার জীবন মূল্যবান হবে—

ছেলেটি মাথা পেতে সব শুনল—

তারপর চলে গেল—

অজিত বল্লে—রাজেন, বেলা তো ঢের বেড়ে গেল—তুমি ওদের একে একে সকলকে আসতে বল।

সূচীপত্রে যান